নুলিয়া

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

ভোরে ঘুম ভেঙে দেখি
সমুদ্র খচিত হ'য়ে উঠেছে
ডিঙির রেখায়,
একটি ক'রে দাগ, দুটি কালো বিন্দু,
একখানা ডিঙি
আর দুজন জেলে।
ক্রমে সেগুলো ছড়িয়ে পড়ে,
আকাশের গায়ে চিলের মতো
দূরে, আরও দূরে
একেবারে দৃষ্টির সীমান্তের ওপারে।
দূরের সমুদ্র
নিশ্বাসপ্রশ্বাসে দুলছে,
আর তীরের কাছে
ফেনার শিকলের অবিরাম ঝাপ্টা।

শীতের দিনে ওরা চলে যায় অনেক দূরে।
সমুদ্র তখন শান্ত।
কত দূরে?
ওরা বলে পাঁচ ক্রোশ, দশ ক্রোশ,
সে-সব কেবল অনুমান।
ওদের আসল নিশানা
শ্রীমন্দিরের চূড়া।
সেই চূড়া ক্রমে ছোট হ'য়ে আসে,
সূর্য ওঠে মাথার উপরে,
সূর্য হেলে পশ্চিমে,
মন্দিরের চূড়াও হেলে পড়ে,
এবারে চূড়া ডুবু-ডুবু,
দেখা যায় কি না যায়।
কেবল দেখা যায় চূড়ায় সূর্য,
তাতে সুদর্শন চক্রের প্রভা,
এই অবধি ওদের সীমা।

ওধারের সমুদ্র ওদের চোখে
ভীষণ-করাল,
চিরান্ধকার,
দৈত্যের হাঁ-এর মতো অতলস্পর্শ।

আর,
এধারের সমুদ্র নীলাচলের ছায়ায় শিষ্ট
মন্ত্রপূত আর স্নিগ্ধ।

এ দুয়ের মাঝখানে আছে এক চোরাপাহাড়
জলের অনেক নীচে।
ওরা নামিয়ে দেয় সেখানে পাথর-বাঁধা দড়ি
পাহাড়ের গায়ে শব্দ ওঠে,
বেরিয়ে আসে
বড় বড় সব মাছ
ধরা পড়ে ওদের জালে।

ওরা ফেরে।
জলতল ভেদ ক'রে দীর্ঘতর হয় চূড়া,
সাথে দীর্ঘতর হয় পৃথিবীর ছায়া।
দেখা যায় পৃথিবীর দিগন্ত
মর্চে-পড়া লৌহচক্রের মতো,
ক্রমে সেই চাকায় জাগে
বনের নীলিমা,
ঝাউ নারিকেলের মাথা,
রৌদ্রে ঝিকিয়ে ওঠে
হর্ম্যরাজির শুভ্রতা।

ক্রমে সৌধমালা আর অরণ্যের
গাঁটছড়া যায় খুলে।
জলের প্রান্তে জাগে
সৈকতের শুভ্রলেখা,
নীলিমার প্রান্তে শুক্ল দ্বিতীয়ার শশী।
আর
সকলকে ছাপিয়ে ওঠে,
আকাশটাকে ঠেলে দিয়ে
শ্রীমন্দিরের তর্জনী,
'জয় জগন্নাথ জয়।'

ওরা যেখানেই থাক
বাঁধা থাকে এক অদৃশ্য সূতোয়
ঐ মন্দিরের সঙ্গে,
তাই ওরা এমন নির্ভয়!

প্রধান মন্ত্রীর দর্শনকামী পার্বত্য অঞ্চলের তিনজন অধিবাসী, বর্শা, তীর, দাও প্রভৃতি অস্ত্রসম্ভে সজ্জিত

প্রধান মন্ত্রীর দর্শনকামী পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী। বর্শা, তীর, দাও প্রভৃতি অস্ত্রসম্ভে সজ্জিত

সুবনসিরির জিরো হেডকোয়ার্টারে উপস্থিত হইলে একটি বালক প্রধান মন্ত্রীকে মাল্য অর্পণ করিতেছে।

প্রধান মন্ত্রীর ৮ পদার্পণ করিয়া প্রধান মন্ত্রী মণিপুরী মেয়েদের অভিবাদন গ্রহণ করিতেছেন।

বিকল্প

বাংলা গদ্যের প্রাচীনতম নিদর্শনে কোচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণ তদানীন্তন (১৫৫৫ খৃষ্টাব্দ) আহোম রাজাকে লিখেছিলেন, "তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকূলে প্রীতির বীজ অংকুরিত হইতে রহে। তোমার আমার কর্তব্যে সে বর্ধতাক পাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক।" অর্থাৎ পত্র আর বার্তার বাহন মাত্র রইল না, পত্ররচনাও ব্যবহারিক স্তর থেকে সাহিত্যিক পর্যায়ে উন্নীত হোলো। সাহিত্যের আরেকটি শাখা হোলো।

এ-শাখার একটি সুন্দর পাতা রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্র'। তাইতে তিনি ১৮৯৫-র ৮ই মার্চ লিখছেন, "চিঠিতে মানুষকে দেখবার এবং পাবার জন্য আরো একটা যেন নতুন ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হয়েছে.....চিঠি মনের ঠিক যে রস দোহন করতে পারে, কথা কিম্বা প্রবন্ধে কখনোই তা পারে না।" স্তাঁদালের পত্র-সঞ্চয়নে* এই রসের অভাব নেই।

কিন্তু অন্যান্য রস থেকে পত্রসাহিত্যের রস বিভিন্ন হওয়া উচিত। এ পার্থক্য দু রকমের। বস্তুতে এবং আধারে। সাহিত্য-রচনায় যে অবশ্যম্ভাবী প্রয়াস আছে, পত্র লিখতে বসে তার দায় নেই। পত্রে তাই লেখককে পাই আটপৌরে পোষাকে। এখানে সব সময় মনে রাখতে হয় না যে, পাঠক নামক অপরিচিত একটি ব্যক্তির মনস্তুষ্টি সাধন না করতে পারলে লেখকের রচনা ব্যর্থ হোলো; এখানে অজ্ঞাত পাঠক-মণ্ডলীর অজ্ঞাত রুচি সর্বদা কনুইয়ের কাছে এসে মন্ত্রণা দিতে থাকে না যে, পাঠক তোমাকে ভালোমন্দ মিশিয়ে দেখবে না, তোমাকে বিচার করবে শুধু তোমার বর্তমান রচনা দিয়ে, একবারও মনে রাখবে না যে, এর আগে তুমি হয়তো তাকে আনন্দ দিয়েছিলে। পাঠককে গল্প শোনাতে হলে তোমার একাধিক সহস্র কাহিনীর প্রত্যেকটি গল্পকে চিত্তহারী হতে হবে, নইলে গলা হারাতে হবে। পত্র-প্রাপকের বা প্রাপিকার বিচার এত কঠোর নয়, এত নির্মম নয়। এখানে তাই লেখকের অপেক্ষাকৃত কম সচেতন একটা চেহারা দেখতে পাওয়া সম্ভব। আধারের নিরাভরণতা বস্তুকেও মুক্তি দেয়, অর্থাৎ পত্র-সাহিত্যের মধ্য দিয়ে লেখকের অন্তরের, তাঁর ব্যক্তিত্বের একটি অনাবৃত রূপ আবিষ্কার করা [illegible] হয়তো লেখকের জীবনের অজ্ঞাতপূর্ব কোনো দিক উদ্ঘাটিত করে দিয়ে তাঁর সাহিত্যেও নতুন আলোকপাত করতে পারে।

লক্ষ্য করতে হবে যে পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে আমি বার বার শুধু সম্ভাব্যতার উপর জোর দিয়েছি, জোর করে বলিনি যে, এমন হতেই হবে; কেন না, পত্র-সাহিত্যের বেআব্রু আন্তরিকতা সম্বন্ধে এই বহুগৃহীত মতটা আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করিনে। পত্র লিখতে বসেও সত্যি আমরা সম্পূর্ণরূপে আন্তরিক কখনো হইনে, ওখানেও নিজেকে একেবারে ধরা দিইনে। শব্দমাধুরীতে যে লেখকের সংস্কার প্রীতি আছে, তাঁর পত্র-রচনাও কখনোই একেবারে সাহিত্যগুণ-বিরহিত হতে পারে না। প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের যে কোনো পত্র। দ্বিতীয়ত, পত্র লিখতে বসে পাঠকের মন ভোলাতে সজ্ঞান কোনো চেষ্টা করিনে বটে, কিন্তু যাঁকে চিঠি লিখছি তার প্রতিক্রিয়ার কথা কি সত্যি একেবারে বিস্মৃত হতে পারি? আমি সত্যি যত ভালো, তার চেয়ে আরো একটু ভালো করে নিজেকে দেখাবার লোভ সম্বরণ করা কি এতই সোজা? প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করতে যাবার সময় আমি যেমন আমার সব-চেয়ে ভালো পোষাকটি পরে নিই, রুমালে একটু সুরভি মাখিয়ে নিই, ভালো করে চুল আঁচড়ে পাকা চুলগুলি সযত্নে অবশিষ্ট কালো চুলগুলির তলায় লুকিয়ে রাখি, পত্র-সাহিত্যেও এমনি মনান্তরিক লুকোচুরির অবকাশ আছে। এখানেও আমরা মুখোস পরি; সে মুখোস কখনো অননুভূত অনুতাপের, কখনো বা অতিকৃত অনুভূতির।

স্তাঁদালের বেলায় অবশ্য এ আলোচনাটা অনেকাংশে অবান্তর। তাঁর উপন্যাসে সচেষ্ট কোনো স্টাইল নেই (স্টাইল সম্বন্ধে তাঁর মতের জন্যে বালজাকের কাছে লেখা চিঠিটি দ্রষ্টব্য), অতএব পত্রে যে তা থাকবে না, তা বলাই বাহুল্য। দ্বিতীয়ত, তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি উপন্যাসে আত্মজীবনীর অংশ এত বেশি যে, তাঁর সাহিত্যে তাঁর জীবনের প্রতিফলন অত্যন্ত স্পষ্ট। সাহিত্য ও জীবনের এই একাত্মতার জন্যেই স্তাঁদালের পত্রগুলি তাঁর অন্যান্য রচনার মতোই অবশ্যপাঠ্য।

ঠিক একই কারণে পত্রগুলি একটু নৈরাশ্যজনকও বটে। কেন না এতে নতুন ও বিভিন্ন কোনো রচনা-রীতি নেই। নেই তাঁর জীবনের অন্য কোনো দিকের নবাবিষ্কার। তাঁর উপন্যাসগুলি পড়ে পাঠকের মনে লেখকের যে রূপটি উদিত হয়েছিল, তাঁর পত্র পাঠে সে ধারণার সমর্থন মেলে। নতুন কোথাও আলো পড়ে না, যেখানে আগে অন্ধকার ছিল।

কিন্তু স্তাঁদালের জীবন ও সাহিত্য এমনিতেই যে অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। মাঁরি আঁরি বেল (১৭৮৩—১৮৪২) ছিলেন সরকারী কর্মচারী; ফরাসী হয়েও তিনি ছিলেন সত্যকার য়ুরোপীয়ান, ভ্রমণ করেছেন ওই মহাদেশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত; ইটালিকে, বিশেষ করে মিলানকে, ভালো বেসেছেন নিজের দেশের চেয়ে বেশি; অপেক্ষাকৃত বেশি বয়সে লিখতে শুরু করেছেন এবং তাও ব্যর্থ-প্রেমের বিষণ্ণতায়, সান্ত্বনার সন্ধানে কিম্বা শুধু দুঃসহ নিঃসংগতা থেকে মুক্তির জন্যে; তবু জর্মান একটা ছদ্মনামে নিজের নাম উৎকীর্ণ করে গেছেন অসীম ঐশ্বর্য-শালী ফরাসী সাহিত্যের ইতিহাসে।

ইটালিয়ান ভাষায় তিনি নিজে তাঁর সমাধি-ফলকের জন্যে লিখে গিয়েছিলেন: Visse, Scrisse, Amo সে বেঁচেছে, সে লিখেছে, সে ভালোবেসেছে। বস্তুত এই তিনটি মিলেই হয়েছিল তাঁর জীবনের ত্রিবেণীসংগম। প্রথমে সেনাবাহিনীতে, তারপর রাজদূত হিসাবে এবং অবসর পেলেই স্কালা থিয়েটারের বাক্সে জীবনকে তিনি স্পর্শ করেছেন অসংখ্য বিন্দুতে; যা দেখেছেন, যা উপভোগ করেছেন, যা থেকে বেদনা পেয়েছেন, তার সব কিছু সবিস্তারে লিখেছেন আপন প্রতিভার রঙে রাঙিয়ে; আর ভালোবেসেছেন জীবন ভরে, অর্থাৎ ভালোবাসতে চেয়েছেন। অভিনেত্রীকে, অভিজাত মহিলাকে, শেষ পর্যন্ত একটি মার্চেসাকে।

এই নানামুখীন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ স্তাঁদালের 'চার্টারহাউস অব পার্মা', 'লাইফ অব আঁরি ব্রুলার্দ', 'দ্ লামুর', 'দি স্কার্লেট অ্যান্ড দি ব্ল্যাক।' জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার, বিশেষ করে প্রেমের, এমন তীক্ষ্ম বিশ্লেষণ বিশ্বসাহিত্যে বেশি নেই। আলোচ্য পত্রগুলিও সেই সূক্ষ্ম দৃষ্টির নির্ভুল পরিচয় বহন করছে।

***To The Happy Few,** Letters of Stendhal, Translated by Norman Cameron, (John Lehmann, 21s.)

স্মৃতির অতলে কালে খাঁ

শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল

গুরুদেব 'শ্যামলালজী' আর খলিফা বদল খাঁ সাহেবের সঙ্গে পরিচয়ের পূর্বেই ওস্তাদ বিশ্বনাথ রাওজী ও মহিমবাবুর মুখের উৎকৃষ্ট ধ্রুপদ-ধামার গান শুনে ধ্রুপদের কান তৈরী হয়ে গিয়েছিল। উত্তর ভারতীয় সংগীতের ধ্রুপদ-ধামার বলতে আমার স্মৃতি আলোড়িত হয়ে ওঠে ওস্তাদ বিশ্বনাথজী, চন্দন চোবেজী, রাধিকামোহন গোস্বামী, মহিমবাবু, ওস্তাদ লছমীপ্রসাদ মিশ্র, ভূতনাথবাবু, এণ্টালির হরিবাবু প্রভৃতি কলাবিদ্ গুণীদের ব্যক্তিগত প্রতিভা ও পরিবেশন-নৈপুণ্যের স্মরণে। এঁদের কণ্ঠের গান স্মরণ করলেই মনে হয় সারস্বত পারাবারে স্বর-শ্রুতির তরঙ্গলীলার কী অপূর্ব ভঙ্গীই না প্রত্যক্ষ করেছি! আমার মনের তটভূমিতে সেই উদ্বেলতার কী অনির্বচনীয় অনুভবই আস্বাদ করেছি! শ্রবণাভিরাম উদ্দীপনার গভীরে কী বিচিত্র প্রশান্তির মধ্যে না নিমগ্ন হয়েছি ক্ষণে ক্ষণে! কথা, সুর ও ছন্দের উত্তাল বিক্ষোভের অন্তরে কী অদ্ভুত ধীরোদাত্ত সংযমের পরিচয় পেয়েছি। সংগীতবস্তুর অন্য সমস্ত গুণের কথা ত্যাগ করে মাত্র গুরুত্ব ও গাম্ভীর্য গুণের সমৃদ্ধির কথা চিন্তা করলে মনে হয়—ধ্রুপদ-ধামারেই যেন গীত-রূপের পরাকাষ্ঠা হয়ে গিয়েছে। ধ্রুপদ-ধামারই ভারতীয় গীতরূপের চরম গৌরব।

মাধুর্যের আবেগ দিয়ে মণ্ডিত সে সব অতীত মুহূর্তের স্মৃতি উদ্ধার করতে গিয়ে মনে হয় যেন গয়ার মৌজুদ্দীনের স্মৃতি দূর দিগন্তের অবগুণ্ঠনে বিদ্যুল্লেখার মত বিলীয়মান হয়ে চলেছে মনের নেপথ্যে। বিশ্বনাথজী আর মহিমবাবুর দীপ্তিমান আবির্ভাবে সমুজ্জ্বল হয়ে রয়েছে বর্তমানের আকাশ।

ধ্রুপদ-ধামারের মহান্ স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেছি বিশেষ করে মহারাজ নাটোরের ভবনে সংগীতের মজলিসে। এই বস্তু-রূপগুলি আমার শ্রবণ ও মনকে সহজেই হরণ করে নিয়েছিল।

এমন সময়ে একদিন শ্যামলালজীর সঙ্গে পরিচয় ঘটে গেল। অভিনব পরিবেশ থেকে নূতন অভিজ্ঞতার সম্পদ সঞ্চয় করার সৌভাগ্যকে তুচ্ছ করিনি। অবিলম্বেই আমার হৃদয় আমাকে জানিয়ে দিল ধ্রুপদ-ধামারই একমাত্র সম্মোহনকারী গীতরূপ নয়; সেই রূপগুলি একমাত্র রূপসজ্জা নয় রাগ-রাগিণীর; বিশুদ্ধ রাগ-রাগিণীর উপভোগও সংগীতের একমাত্র বা চরম উপভোগ নয় আমার শ্রবণ ও মনের পক্ষে। সংগীতের বস্তুরূপের বৈচিত্র্য সেই এক অনির্বচনীয় আনন্দেরই বিচিত্র সংবাদ বহন করে নিয়ে আসে হৃদয়ের সমীপে; আমার সমস্ত সুরতৃষ্ণা, সমস্ত রস-রুচিকে পরিতৃপ্ত করার যোগ্যতা নেই ধ্রুপদ-ধামার গানে। সঙ্গে সঙ্গে অনুভবের প্রমাণ-সম্বলিত টীকাও একটি যোগ করে দিয়েছিল আমার মন; যথা—খেয়াল-ঠুমরী, গজল-দাদ্‌রা প্রভৃতি অন্য সকল গীত কল্পলতিকার মনোহারিত্ব আস্বাদ করতে থাকলেও তা দিয়ে ধ্রুপদ-ধামারের মহান পরিচয়ের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় না অথবা সে রকম আকাঙ্ক্ষার অবলোপ ঘটে না।

এ সময় থেকে এমন একটি সুলগ্ন আমার জীবনের পূর্ব-গগনে উদিত হয়েছিল যার প্রভাবে আমার মন-প্রাণ আনন্দ-ভ্রমরের মধুব্রত নিয়ে নানাদিকে নানারকমের গীত-কুসুমের সন্ধানে অভিসার করে ছুটেছে; আর ফিরে এসেছে বাণী, সুর ও ছন্দের মকরন্দ আহরণ করে, নিভৃতে মানসের মধু-চক্র রচনা করবে বলে। বার বার কানে বেজে উঠেছে তানসেনের ধ্রুব-বাণী "নাদ ঈশ্বররূপী অমৃত রস, যিত্‌না যাকো মিলে উত্‌নাহি পীজিয়ে"। শ্রুতিসঞ্জীবনী এই অমৃত রসধারার, এই সুরের সুরধুনীর বিচিত্র রূপ, বিচিত্রতর গতি, বিচিত্রতম পরিণতি। দেশ-কাল-পাত্রের পরিচ্ছিন্ন আধারের মধ্যে সুনিবদ্ধ রূপই হ'ক, অথবা আনন্দসাগর সঙ্গমের অভিমুখে এদের উচ্ছল উন্মুক্ত প্রবাহের রূপই হ'ক, শাশ্বত সৌন্দর্যই এদের প্রাণতরঙ্গ, অনুভবের চমৎকৃতিই এদের সাক্ষাৎ সার্থকতা। সুন্দরতার মূলে অন্য কিছু আছে কি না, অথবা সাক্ষাৎ চমৎকারিত্বের পরেও কোনও কিছু প্রত্যাশা থাকে কি না, তানসেনের কথায় বুঝা যায় না। ভালই হয়েছে আমার পক্ষে। দার্শনিক তত্ত্বের জালে আমি ধরা দেইনি। আমি মনে করেছি, আমার হৃদয়ের সচ্ছিদ্র অঞ্জলি-সম্পুটে অমৃতধারার যে কয়টি বিন্দু যখনই ধারণ করি আর পান করি, তাই আমার ভাগ্য, তখনই আমি চরিতার্থ। এ থেকেও অন্য কিছু, বেশী কিছু আশা করি নি।

সংগীতের বস্তু আর রূপ, এরাই ত' সেই অমৃতরসের আধার। বস্তু-রূপগত তারতম্য আমাকে উত্তেজিত করেছে; কিন্তু পীড়িত বা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইনি। সরল সহজভাবেই মনে হয়েছে—বস্তুরূপের নানা-রকম তারতম্য স্বীকার করেও, তা দিয়ে বড়-ছোট, উচ্চাঙ্গ-নিম্নাঙ্গ মার্গ-দেশী শ্রেণীকরণ কার্যটি অকাজ; আসল কথা, অনুভবের কষ্টিপাথরে অভিজ্ঞতা সোনার পরখ। রক্তকমল গোলাপ ফুলের চাইতেও বড়; গোলাপ ফুল উদ্ভট কাঁঠালী চাঁপার থেকেও বড় ও সুসম্বদ্ধ। তবে কি মাত্র রক্তকমলেরই প্রতিষ্ঠা, মর্যাদা স্বীকার করতে হবে! আমি সেটা মনে করতে পারিনি।

তরুণ বয়সে সজাগ মনের ওরকম আন্দোলনের অবস্থার মধ্যেই অকস্মাৎ খেয়ালী কালে খাঁ সাহেবের কিছু অসাধারণ ব্যক্তিত্বের পরিচয় পেয়েছিলাম। তা থেকেও বড়ো কথা ছিল তাঁর অদ্ভুত, এমন কি উদ্ভট কলাচাতুর্য। অনুভবের পরখে খাঁটি সোনাই বুঝেছিলাম। সেই কারণেই ত' তাঁর চরিত্র নিরালা, উজ্জ্বল হয়ে আছে আমার স্মৃতিতে।

কালে খাঁ সাহেবকে সাক্ষাৎ করার পূর্ব-সূচনা ছিল শ্যামলালজীর বৈঠকে। সে বৎসর, অর্থাৎ ইং ১৯১৮ সালের, বর্ষার এক সন্ধ্যা; শ্যামলালজী ও আমরা অল্প কয়জন বসে; মনে পড়ছে বাবুজী, তন্নুলালজী ও চিরঞ্জীবকে মাত্র। বাবুজী ফরাস ছেড়ে পৃথক আসনে গড়গড়ায় তামাক সেবন করছেন। তাকিয়া-কোলে তন্নুলালজী বাবুজীকে সাময়িক সংবাদ গোচর করাচ্ছেন। চিরঞ্জীব তার পোষা হারমোনিয়মটি নিয়ে হাত সাধবার আগে পান ও কিমাম ব্যবহার করতে লেগেছে। বদল খাঁ সাহেব অনু-

পস্থিত, বর্ষণের কারণে। গিরিজাবাবু (প্রসিদ্ধ গায়ক গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, এখন স্বর্গগত) বার হয়ে গেলেন বর্ষা মাথায় করে।

এমন সময়ে ভিজে গায়ে এসে উপস্থিত হ'ল ঠান্ডীরাম। তার দু' গালে পান বোঝাই করা। কথা বলার যোগ্যতা নেই তার; কথা বললেই বিপদ; অমৃতবিন্দু মুখ থেকে ছিটকে পড়লে, বাবুজীর তিরস্কার শুনতে হবে। নিঃশব্দে নমস্কার জানিয়ে ঠান্ডীরাম উবু হ'য়ে বস্‌ল ফরাসের উপর; ঐ রকমই ছিল তার আসন পরিগ্রহ করার কায়দা। তার দু'গালে দু'হাত, মুখে কিছু দুশ্চিন্তা, মনে হয়ত অস্বস্তি।

ঠান্ডীরাম ব্যবসায়ী লোক; বয়স বছর চল্লিশ আন্দাজ। দীর্ঘ, কর্মঠ দেহ, অত্যন্ত জোর গলা, অদম্য উৎসাহ, আর অফুরন্ত রসিকতা তার বাইরের পরিচয়। ভিতরের মানুষটি অত্যন্ত সংগীতপ্রিয়, রসক্ষেপা। সব রকমের সংগীত আর গান, এমন কি আমাদের আগমনী, কীর্তন ও রবীন্দ্র গীতি শুনেও সে হায়, হায় করে; অনেকটা দেশী হলে সে যেরকম 'যোহ্' 'যোহ্' করত, তার আওয়াজে ফুটপাথের লোক দাঁড়িয়ে যেত! তার সব চেয়ে প্রিয় সুর ছিল মাড় রাগিণী; বল্‌ত সে, "পাঁচুবাবু, আমাদের দেশে (যোধপুর অঞ্চলে) সুখা মাটি, রুখা পাহাড়, আর পাথরের ইমারতের উপর যখন চাঁদনি ফুটে ওঠে, তখন যদি আপনি মাড়' শোনেন, তবেই বুঝবেন এর সওয়াল জবাব। কলকাতা শহরের ওস্তাদেরা এর কী জানে! এক রত্তিও জানে না।' আমি যোধপুরে যাইনি। কিন্তু—তার দরদ মাখান কথার সত্যটা বিশ্বাস করেছিলাম।

মুখর ঠান্ডীরামের গালে হাত, মুখে দুশ্চিন্তার ভাব দেখে বাবুজী জিজ্ঞাসা করলেন, "ঠান্ডীরাম, বাড়ীর খবর ভাল ত? ছেলে ভাল আছে ত?"

বাবুজী বা অন্য কেউ ঠান্ডীরামকে তার ছেলের কথা জিজ্ঞাসা করলে আমার মনে ত্রাসের সঞ্চার হত। ঠান্ডীরামের চরিত্রের একমাত্র দুর্বলতা ছিল তার ছেলের স্বাস্থ্যের সম্বন্ধে অকারণ দুশ্চিন্তা। তার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের কথা মনে পড়ে। বাবুজীর কাছে ছেলের অসুখের বর্ণনা করতে গিয়ে ঠান্ডীরাম হাঁচি-হে'চকি প্রভৃতি করে নানা-রকম উপদ্রবের পুঙ্খানুপুঙ্খ বৃত্তান্ত গোচর করছিল। আমি তখন গিয়ে সবে উপস্থিত হয়েছি মাত্র। আতঙ্কে হয়ে বাবুজী বললেন, "এই নেও ঠান্ডীরাম! এই পাঁচুবাবু মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র। এঁকে সব কথা বল"; বলে আমাকে চোখ টিপে ইশারা করলেন, যার মানে, কিছু মজা আছে। ঠান্ডীরাম আমার দিকে ঘুরপাক খেয়েই গোড়া বেঁধে বর্ণনা আরম্ভ করল। অপ-রাধের মধ্যে আমি তাকে বাধা দিয়ে বলেছি 'একটু সবুর করুন মহারাজ। দম নিতে দিন আমাকে, অত দৌড়-ধূপ করার কী আছে?' আর যাই কোথা! ঠান্ডীরাম তৎ-ক্ষণাৎ ভ্রূকুটি করে বলতে আরম্ভ করল "অরে বাপ্! মিটিয়ে কলেজে পড়তে পড়তেই এই! এর পরে ডাক্‌টর হয়ে আঠ্ আঠ্ রুপেয়ার গাঁঠ কেটে হাওয়া-গাড়ির পিছনে ধুয়া ওর বদ্‌গন্ধি ছাড়তে ছাড়তে যখন চলে যাবেন, তখন মেজাজ না জানি"—; আমি তাকে আর অগ্রসর হতে দিলাম না। করজোড়ে বল্‌লাম "ভাই থামো। খুব হয়েছে। তোমার ছেলের কী হয়েছে বল।" তার ছেলের কথা শুনে ঠান্ডীরাম একেবারে জল। সমস্ত কথা শুনতে হ'ল; সাবধানে মন্তব্য করতে হ'ল, অভয় দিতে হ'ল। ঠান্ডীরাম তবে খুশী হয়েছে। বাবুজীর দিকে ফিরে বলল, "বাবুজী! আপনার সভায় এই পাঁচুবাবু হ'ল আঠ রতনের উপর নও রতন। তবে একটু রচনা-বনানার দরকার আছে। এর হিরদেয়মে থোড়া ধবড়হাট আছে; ত' দু' চারবার ঘা খেলে ঠিক হয়ে যাবে!" খুব হাসি তামাশার মধ্যে পরিচয় হলেও—তার ছেলের কথা আমাকেই শুনতে হ'ত; সব কথা ফেলে। যাই হোক—ঠান্ডীরাম আমাদের সকলেরই প্রিয় ছিল। বিশেষ করে আমার কাছে সে শ্রদ্ধার পাত্রও ছিল অন্য কারণে। আপাততঃ, ঠান্ডীরামই এমন একটি যোগ-সূত্র এনেছিল, যেটা আমার করায়ত্ত না হ'লে কালে খাঁ সাহেবের সঙ্গে দেখাই হ'ত না।

বাবুজীর প্রশ্নের উত্তরে ঠান্ডীরাম মাথা নেড়ে জানিয়ে দিল সব ভাল। জহরলালজী জিজ্ঞাসা করলেন চাঁড়-মন্দীতে কিছু লোকসান গিয়েছে কিনা। সে জানাল' ওসব কিছু নয়। চিরঞ্জীব একটু ঠাট্টার সুরে বল্‌ল, "ঠান্ডীরামের গাঁঠ কাটা গিয়েছে। ক'টা পয়সা খোয়া গেল ভাই?"

চিরঞ্জীবের কথা শেষ হ'তে না হতেই ঠান্ডীরাম লাফ দিয়ে উঠে বাইরে পিক ফেলে এসে বলল, "বাবুজী! আজ বড় বোকা বনে গিয়েছি। সিঁদুরিয়াপট্টির মোড়ে পানের দোকানে পান নিতে গিয়ে পাশে নজর করে দেখি, বাবুজী! কালে খাঁ সাহেব দাঁড়িয়ে! তাকে বললাম, 'অরে! কালে খাঁ সাহেব কোথা থেকে'? সে আমার দিকে আঁখ বানিয়ে 'অন্ধা' 'বেহুদা' বলে গালিগালাজ করল আমাকে। সঙ্গে সঙ্গে জন কয়েক জওয়ান 'কি হল' 'কি হয়েছে' বলতে বলতে এসে হাজির। আমি দম ধরে থাকলাম; পানওয়ালা খুব কায়দা করে বুঝিয়ে দিল তাদের, কিছু হয়নি এমন। পান নিয়ে পালিয়ে আসতে হ'ল। আর কিছু নয় বাবুজী, একটা ভাল জবাব মুখে এসেছিল, কিন্তু ভয়ে বলতে পারলাম না" ইত্যাদি করে ঠান্ডীরাম অস্ফুট স্বরে আরও দু'চারটে কথা বলল, যেটা লিখতে আমারও ভয় করে।

বাবুজী বললেন, "ঠিকই হয়েছে। বে-আক্কেল আর বদমায়েশ এদের মুলাকাত হলে ঐ রকমই হয়! আর তুমিই বা কেন নজর দিয়ে পথে ঘাটে বরষার আঁধেরায় কালে খাঁকে দেখতে পেলে! কাকে দেখতে কাকে বুঝেছ তার ঠিক নেই।"

ঠান্ডীরাম বলল, "না বাবুজী! আমি ঠিক দেখলাম সেই কালে খাঁ! অমন বদসুরত ত' আর দুটি নেই। কী জানি কেন তার মতিচ্ছন্ন হ'ল, আমাকে গালি দিল"। বাবুজী বললেন, "অরে না ভাই, না। কালে খাঁ কল্‌কাতায় এলে দুলীচাঁদ কি আমি খবর পেতাম না? আচ্ছা, তুমি যে কালে খাঁকে চিনতে, তার বাঁ হাতের আঙ্গুলে মোটা মোটা মেজরাব দেখেছিলে কি?" ঠান্ডীরাম বল্‌ল, "না বাবুজী। তাত' নজর করার সময় পাইনি। তার মুখ, আর মোচ্ আর দেহটাই নজর করেছিলাম। মনে করলাম হয় কালে খাঁ, না হয় তার ভূত।"

এর পরে চিরঞ্জীব আর ঠান্ডীরামের মধ্যে বচসা চল্‌তে থাকে। চিরঞ্জীব আজ ঠান্ডী-রামকে বাগে পেয়েছে, সহজে ছাড়বে না। তুমি আগে একটা আদাবও জানাওনি তুমি আগে একটা আদাবও জানাওনি। তোমার কালে খাঁকে! ঠান্ডীরাম বলল, 'আগে ভাগে লোকটার পহ্‌চান না নিয়ে আদাব জানাবার মত বোকা আমি নই। আদাবটা বরবাদ করব আমি ঠান্ডীরাম!" চিরঞ্জীব বল্‌ল, তুমি আজ দুবার বোকা বনেছ। একবার পানের দোকানে, আর এক-বার এখানে তোমার বোকামির কথা জারি করে' ইত্যাদি করে শেষে চিরঞ্জীব একটা

তৈরী গান আর কিমাম নিয়ে নাছোড়বান্দা ঠান্ডীবাবের মুখ বন্ধ করে দিল।

কালে খাঁর নাম এর পূর্বে মাত্র একবার শুনেছিলাম ওস্তাদ বিশ্বনাথজীর মুখে; মহারাজ নাটোরের বাড়ীতে বসে। বিশ্বনাথজী স্বল্পভাষী ছিলেন। ঐদিন কী একটা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "খেয়ালীতে রয়মৎ (রহমৎ) খাঁ সাহেব আর কালে খাঁ সাহেব।" চপলমতি আমি তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করেছিলাম ওঁদের মধ্যে কে বড় আর কে ছোট। বিশ্বনাথজী তেমনি গম্ভীর স্বরে বলেছিলেন কে বড় কে ছোট তার মাপ নেইনি। তাঁদের মধ্যে তফাৎ এই যে, রয়মৎ খাঁ কবরে, আর কালে খাঁ কবরের বাইরে। আমার চপলতা দূর হয়ে গেল ঐ রকমের কথা শুনে। সেদিনকার মত আমার মুখ বন্ধ হয়ে গেল। তখন ঐ গম্ভীর, রাশভারী, মহানুভব ব্যক্তির স্বরূপের পরিচয় পাইনি। বিশ্বনাথজীর কথাই বলছি।

যাই হ'ক—সে কালে খাঁ ত' গাইয়ে কালে খাঁ। আর আজ যার কথা উঠল, সে কালে খাঁর আঙ্গুলে মোটা মোটা মেজরাব। অবশ্য মাত্র মেজরাব দিয়ে পূর্ণ পরিচয় হয় না। শ্যামলালজীর বৈঠকে সেরা সেরা পালোয়ান এসে বসত। তাদের দু এক জনের হাতে মেজরাব দেখেছি। উত্তর ভারতের একজন অদ্বিতীয় দাবা খেলোয়াড় মাঝে মাঝে এসে দেখা দিতেন বৈঠকে; তাঁর হাতের আঙ্গুলেও মেজরাব দেখেছি। নূরজাহান বাঈজির সংগতী সারেঙ্গিয়া মিঠঠু খাঁর আঙ্গুলেও মেজরাব দেখেছি। শেষ কথা—দিল্লী থেকে একজন বিশিষ্ট আতর-ব্যবসায়ী ভদ্রলোক এসে বাবুজী আর দুলীচাঁদবাবুর আতর সরবরাহ করে গেলেন; তাঁর হাতেও ত' মেজরাব দেখলাম! অতএব?

বাবুজীকেই জিজ্ঞাসা করলাম এই কালে খাঁর কথা, কারণ তিনিই ত মেজরাবের কথা তুলেছেন। গড়গড়া সেবনের অবকাশে বাবুজীর মুখে, আর তাকিয়া কোলে তবুলালজীর মুখে কালে খাঁর সম্বন্ধে যা মন্তব্য শুনলাম, তার সংক্ষিপ্ত সার যথা—কালে খাঁ সাহেব পাঞ্জাবের লোক। ধুরন্ধর (সমুজ্জ্বল প্রতিভাবান) খেয়ালী; জোড়া নেই ওর। লোকটা কিছু পাগলা, খামখেয়ালী রকমের। দুনিয়াভর সমঝদার জানে ঠিক তার মত খেয়াল গাইয়ে আর নেই; অথচ কালে খাঁর ধারণা তার মত বীণকার আর কেউ নেই। তার সামনে অন্য কোনও খেয়ালিয়ার তারিফ করলে অত্যন্ত উদারচিত্তে কালে খাঁ সে কথায় সায় দিয়ে যায়। কিন্তু কেউ যদি কোনও বীণকার বা সুরবাহার বাজিয়ের তারিফ করে, তাহ'লে আর রক্ষা নেই; খাঁ সাহেবের মুখখিস্তির চোট খেতেই হবে। হাঁ, চেহারাটা কিছু বে-ঢং বটে। কালো রঙ, লাল ডগডগে চোখ, আর তার নীচেই বেদুরন্ত এক জোড়া গোঁফ। কালে খাঁর মনটি খুবই ভাল, সরল, খাঁটি। কিন্তু আরও দু'টা বাতিক আছে তার। প্রথম—গহর নাকি তার জন্য দিওয়ানা। দ্বিতীয়—সে গহরকে অত্যন্ত ভয় করে, মনে করে গহর যাদুগরণী, ডাইনি, গহর যার উপর নজর দেয় সে শুকিয়ে মরে যায়। অবশ্য গোলাম পালোয়ানেরও ঐ রকম অদ্ভুত ধারণা ছিল; বেচারা! আবার কেউ যদি খাঁ সাহেবকে বলে গহর যে আপনার জন্য ফকিরী নিল, আপনার গান শুনে পাগল, তাহ'লে খাঁ সাহেবের মুখ রঙ্গীন হয়ে ওঠে। অনেক বড় বড় মাইফেলের শের এই কালে খাঁ সাহেব। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও গহর তাকে নিজের বাড়ীর মাইফেলে নিয়ে যেতে পারেনি। মোট কথা, সবই ভাল, কেবল ভাগ্যদেবতা বিরূপ হয়ে ওর মাথায় ছিট্ লাগিয়ে দিয়েছে। তা হ'ক, কিন্তু—ওর জোড়া নেই।

বৃত্তান্ত শুনেই মনে পড়ে গেল বিশ্বনাথজীর কথা; সেটা বললাম বাবুজীকে। বাবুজী বললেন, খুব ঠিক কথা বলেছেন বিশ্বনাথজী। তবে, রয়মৎ খাঁকে পারা যেত না, খাতির করেই হ'ক বা টাকার লোভ দেখিয়ে হ'ক। রয়মৎ খাঁ ছিল আস্ত পাগল। আর কালে খাঁকে খাতির করে, মিষ্ট কথা দিয়ে পারা যায়, অর্থাৎ গান করাতে পারা যায়। আর ভাল করে খাওয়াতে পারলে কালে খাঁ সাহেব খুব খুশী। টাকার কথা! হায় হায়! বড় বড় গুনীরা সব চির-দরিদ্র। আর কিছু না হ'ক—তারা বেহিসাবী, খরচিলা। টাকা হাতে থাকতে চায় না।

কথায় কথা উঠে প্রসঙ্গ বদলে যায়। এর পর দুমাস কেটে গিয়েছে। বাবুজী চলে গিয়েছেন তাঁর জন্মস্থান মথুরায়; যাওয়ার সময়ে বলে গেলেন সম্ভব হলে চন্দনকে (ধ্রুপদী চন্দন চোবেজী) সঙ্গে নিয়ে ফিরবেন।

কলেজের ছুটি এসে পড়ল; "পূজা প্রত্যাসন্ন। বাবা তখন মৈমনসিংহের সিভিল্ সারজন্। একখানি পত্রে লিখেছেন মুক্তাগাছার স্বনামধন্য জমিদার শ্রীজগৎকিশোর আচার্য চৌধুরীর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ উপলক্ষে বজরং মিশ্র ওস্তাদের ধ্রুপদ গান আর প্রসন্ন বণিক ও মৌলবীরাম বাদ্যবিশারদ-যুগলের সংগত শুনে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। আমার জন্য পূর্ব থেকেই নিমন্ত্রণ করা আছে; ইত্যাদি। চিঠি পড়েই, হিতোপদেশের শৃগালের মত ভাবলাম অহো ভাগ্য! আমার সামনে ত' মহৎ ভোজ্য উপস্থিত! এখন, আপাততঃ দু'চারদিন অদ্যভক্ষ্য ধনুর্গুণ করেই কাটাতে হয় বুঝি!

এরই মধ্যে একদিন নিকুনু (আমার সম্পর্কে পিসতুতো ভাই, ভাল নাম শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মৈত্র, সম্প্রতি সাঁতরাগাছিতে সংসারসমুদ্রে সাঁতার দিতে খুব ব্যস্ত) আমাকে বলল, "পাঁচুদা, এখন ত' সময় আছে। চলুন একদিন বাটরায় আমাদের বাড়ী। সকালে যাব সন্ধ্যায় ফিরব।" আমি বললাম, "বেশ কথা। চলো যাওয়া যাক্।" নিকুনু বড় ভাল ছেলে, আর গান-পাগলা। তার উপর, সে নিজে যেমন খাইয়ে, পরের খাওয়া দাওয়া তদারক করতেও অগ্রণী। অথচ সে বয়সে সিগারেট পর্যন্ত খেত না; অন্ততঃ আমি যতদূর জানতাম।

পরদিন সকাল আন্দাজ সাতটার সময়ে (রিস্টওয়াচ হাতে না দিয়েই আমরা সময়ের উপলব্ধি করতাম তখন) নিকুনু আর আমি আমহার্স্ট স্ট্রীটের মোড়ে হাওড়া-মুখো ট্রামে চেপে বসলাম; ট্রামের মাঝারী একটা সারিতে। ভিড় নেই বললেই হয়, প্রথম শ্রেণীতে। সকাল বেলার হলুদ রংএর আলো আর আমাদের নবীন মনপ্রাণ; কী-করি কী-ই-বা না করি রকমের খাপছাড়া নিরুদ্দিষ্ট উৎসাহে আমরা সর্বক্ষণ সজাগ।

উঠেই লক্ষ্য করলাম, ড্রাইভারের নিকটে প্রথম সারিতে জানালা ঘেঁষে একজন মুসলমান ভদ্রলোক বসে; ড্রাইভারের দিকে মুখ করে জানালার মধ্যে দিয়ে তাঁর দৃষ্টি ছিল সামনের পথের দিকে। সেটা কিছু নয়। আসল কথা, সামনে খাড়া করা মাপসই একটা লাঠির হাতলের উপর তার দুহাতের পাঞ্জা ভর করে আছে। এটাও কিছু নয়। সত্যকারের আসল কথা, তাঁর হাতের মোটা মোটা বেঁটে আঙ্গুল, আর বাঁ হাতের অনামিকাকে জড়িয়ে রয়েছে বিলক্ষণ মোটা তারের গোটা দুই মেজরাব্! বিদ্যুতের গতিতে মনে পড়ে গেল বাবুজী-ঠান্ডী-

রামের মুখে কালে খাঁ সাহেবের বিষয়ে কৌতুক প্রসঙ্গ।

তাও কি হয়! অসম্ভব। কিন্তু ঐ মোটা আঙ্গুলের মোটা মেজ্‌রাব্? একেবারে নস্যাৎ করেও ত' উড়িয়ে দেওয়া যায় না। একটু নেড়ে চেড়ে দেখতেই হয়; লোকটা যে সেতার বাজায়, কম পক্ষে, এ বিষয়ে ত' সন্দেহ নেই। কিন্তু যদি সেই কালে খাঁ-ই হয়! আমার বুকের ভিতর একবার ধড়াস্ করে উঠল। পরক্ষণেই প্রকৃতিস্থ হয়ে ঠিক করলাম তলিয়ে দেখতে হবে। এইটাই হবে অদ্যভক্ষ্য ধনুর্গুণ!

নিকুন্‌কে বল্‌লাম, "দ্যাখ্, ঐ লোকটি গুণ্ডার সর্দার একজন। কিন্তু খুব ভাল লোক। সেতার বাজায়। চল্ ওর সামনে গিয়ে একটু আলাপ করা যাক্। তবে, তুই কোনও কথা বলিস্‌নে যেন।" বলেই সেখান থেকে উঠে টপকে গিয়ে প্রথম সারিতে গিয়ে বসলাম। নিকুন্ নির্বাক হয়ে আমার পাশে বস্‌ল। দুর্গা বলে মিথ্যার বেসাতি মাথায় করে নিয়েছি; নিকুন্ আমার কথায় বিশ্বাস করেছিল।

ভদ্রলোকটি ঠিক সেইরকমে বসে আছেন। লোকটির চেহারায় প্রৌঢ়ত্ব এসে গিয়েছে, যদিও টুপীর আশে পাশে চুলে সুফেদী দেখা দেয়নি তখনও। একটু কায়দা করে নজর করলাম তাঁর মুখের দিকে; দেখলাম শুধু বড় বড় মোচ্, আর পুরুষ্ঠু ঘাড় গরদান। মাথায় পাত্‌লা ময়লা টুপী। গায়ে ঢিলা পাঞ্জাবীর উপর পুরান মল্‌মলের মেরজাই বা ঐ রকমের একটা ব্যাপার।

এমন সময়ে তিনি মুখ ফিরিয়ে বসলেন, আমাদের সামনাসামনি নজরে। তখন দেখি প্রায় চাঁদের মত গোলগাল মুখ; তবে কৃষ্ণ-চন্দ্র; কলঙ্ক বুঝবার উপায় নেই। বড় বড়, লাল ড্যাব্-ডেবে চোখের মধ্যে দিয়ে নাকটি নেমে এসে গিয়েছে বে-বন্দোবস্ত গোঁফ-ঝাড়ের মধ্যে। ঠোঁট বুঝতেই পারলাম না। চোখের দৃষ্টি যেন একটু বিহ্বল উদাস; পরিবেশের সম্বন্ধে খুব সচেতন বলে মনে হ'ল না।

আর দেরী নয়। যেন এইমাত্র নজরে এসেছে এমন ভাবভঙ্গি করে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, "আ হা! আদাবরজ্ খাঁ সাহেব! আপনি! আপনি ওদিক দিয়ে কোথা থেকে আসছেন?" যেন তাঁকে চিনি দেখলেই কৃতার্থ হয়ে যাই, আর তাঁর গতি-বিধি সবই যেন আমার নখাগ্রে! সেই উদাস মুখে টাকায় দু' আনা আন্দাজ চেতনার ভাব দেখা গেল; বুঝলাম তাঁর চোখের পলক্ নড়ায়। গোঁফে জড়ান কথায় তিনি উত্তর দিলেন, "আদাব। কাল রাতে রাজা-বাজারে দাওত্ ছিল। ফিরছি এখন ডেরায়।" দাওত্ অর্থ নিমন্ত্রণ। রাজাবাজারে কি ধরণের রাজারা বাজার করে নিকুন্ জান্‌ত। গম্ভীর হয়ে বসে থাকল সে।

লোকটির চোখ-মুখের ভাব দেখে বুঝলাম আমার বা আমাদের সম্বন্ধে তিল-মাত্রও সন্দেহ বা কৌতূহল জাগেনি তাঁর মনে। তিনি আমাকে জানেন না। আমিও তাঁকে জানিনে চিনিনে, অথচ, গোড়াতেই ভাণ করেছি তিনি আমার পরিচিত। এরকম অবস্থায় অতি সন্তর্পণেই ধাপ্পাবাজি চালিয়ে যেতে হবে। অবশ্য—কিছু গুণী ও ওস্তাদ্ শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশে অতি-রঞ্জিত বিশেষণের কল-কৌশল আমার জানা ছিল। তাহ'লেও লোকটি কোন্ গুণের গুণী, আর কি কর্মের ওস্তাদ কিছুই জানিনে। যাই হ'ক, আমার মূলধন কল্পনা, আর কারবার হ'ল কথার ফিকির। অগত্যা মিথ্যা বচনের সম্ভার ঘাড়ে করেই এগিয়ে যেতে হবে। বিপদ এই যে লোকটা কথা বলতে চায় না। মুখের ভাবও উৎসাহজনক নয়। বার বার তাকাই তাঁর আঙ্গুলের মেজরাবের দিকে; কিন্তু তাতেও তাঁর উত্তেজনা হয় না। এতক্ষণে ট্রাম কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে এসেছে।

আমিই আরম্ভ করলাম, "হায় হায়, খাঁ সাহেব! কী জলসাই হয়েছিল শেঠজীর বাড়ীতে! হপ্তাভর্ সারা কল্‌কত্তায় হল্লা উঠে গিয়েছিল! খাঁ সাহেব সে রকমের কদর্‌দান আর কি আছে এখন!" অবশ্য কিসের জল্‌সা, কার মাইফেল, কার নামে হল্লা এবং কবেই বা ঘটনা ঘটেছে—এ সকল জেরার অবকাশই থাকে না এ রকমের কথাবার্তায়। দেখছিলাম 'শেঠজী' নাম শুনে ভদ্রলোকটির ঔৎসুক্য প্রকাশ হয় কি না। শেঠজী অর্থাৎ দুলীচাঁদ শেঠজী।

আমার কথায় তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে ছোট্ট একটি প্রশ্নসূচক 'হাঁ' উচ্চারণ করে আমার মুখের দিকে চাইলেন। সেই উচ্চারণভঙ্গির মধ্যে কি পরিমাণ তাচ্ছিল্য, কণ্ঠস্বরের মধ্যে কতখানি অবিশ্বাস, আর দৃষ্টির মধ্যে কতটুকু অবজ্ঞা ভরা ছিল বুঝতে পারলাম না। মাত্র এইটুকু বুঝলাম আমার বাণটি ব্যর্থ হয়েছে। দুশ্চিন্তা হ'ল লোকটি কি সন্দেহ করেন আমি ধাপ্পা দিয়ে যাচ্ছি।

মুহূর্তে ভাবলাম নিজের ভুল-চুক স্বীকার করে বিনীত হয়ে নাম ধাম জিজ্ঞাসা করলেই ত' আপদ চুকে যায়। কিন্তু পর-মুহূর্তেই মনে করলাম অনেক দূর এগিয়ে পড়েছি মিথ্যার বেসাতি নিয়ে; এখন পিছিয়ে গেলে নিজের মান রক্ষা হয় না। আর নিকুনই বা কি ভাববে! ভাবছিলাম এদিক ওদিক সাঁতার কেটে জল ঘোলা করব? না কি ডুব দিয়ে দেখব? নিকুনকে, বেশ একটু পরিষ্কার গলায় যাতে ভদ্র-লোকটি শুনতে পান, বল্‌লাম, দেখছিস্ কি! কাজের মস্ত খলিফা ইনি!" নিকুন আমার কথা শুনে হাঁ করে তাকিয়েছে মাত্র। খলিফা বলতে নিকুন দরজি কি নাপিত কিম্বা আর কিছু মনে করেছিল ভগবানই জানেন।

এমন সময়ে ভদ্রলোকটি অপ্রত্যাশিতভাবে একটি অস্ত্র ছাড়লেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন আমাকে "সেই সেবারকার চৌধুরাণের জলসায় আপনি ছিলেন কি?"

সর্বনাশ! ধনুকের ছিলে নিয়ে টানাটানি করছিলাম, এতক্ষণে বুঝি বাণটি ছিটকে ঘায়েল করল আমাকে। ভদ্রলোকটি কি

ধাপ্পা দিয়ে আমার ধাপ্পাবাজি পরীক্ষা করছেন? তাহ'লে ত বড়ই বিপদ। 'সেবার' বল্‌তে কোন্ বার, কোথায়? 'চৌধুরাণ' নামটি জীবনে প্রথম শুনলাম; গোঁফে জড়ান অস্পষ্ট উচ্চারণ, তা হলেও সেটা সম্ভবতঃ স্ত্রীলোকেরই নাম, বাঈ বাইজীর নাম। কিন্তু—কোন্ 'জল্‌সা, কিসের জল্‌সা, গানের, না সেতারের, না বিবাহের, কিছুই ত' জানিনে। গলদ্‌ঘর্ম হলাম আমি; কারণ জ্ঞান-পাপী নিজে। যাই হ'ক, তৎক্ষণাৎ ট্রামের জানলার গরাদের মধ্যে দিয়ে নাক-ঝাড়ি, আর রুমাল দিয়ে নাক মুখ মুছি, আবার নাক-ঝাড়ি বার কতক। ঐ অছিলায় যেটুকু সময় পেলাম তার মধ্যেই ঠিক করে নিলাম হৃদয়-ভেদী বাণ দিয়ে ঐ শব্দ-ভেদী বাণের প্রতিরোধ করতে হয়; নইলে মান-ইজ্জত্ কিছুই থাকে না। রুমাল দিয়ে বেশ করে নাক মুখ মুছতে মুছতেই অস্ত্রটি জিভের আগায় শানিয়ে নিয়েছি।

অস্ত্র ত্যাগ করলাম, অর্থাৎ বল্‌লাম, খুব আশ্চর্যের ভাব করে "কি বল্‌লেন খাঁ সাহেব; চৌধুরাণের জলসা? সে জলসার কথা আর বলবেন না! দোহাই আপনার ইয়াদ্‌গারির! শ্যামলালজী কত কথাই না বল্‌লেন! আর গহর কী গম্‌-দিদাই না হয়েছিল, বেচারা!"

ইয়াদ্‌গারি অর্থাৎ স্মৃতির অভিজ্ঞান, বা নিশানা। 'গম্‌দিদা' অর্থ মহা দুঃখী। শব্দের অর্থ যাই হ'ক—বলার সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম অস্ত্র বিফলে যায়নি।

দেখি তিনি তাঁর আসনে হঠাৎ সোজা হয়ে বসে বিড়্ বিড়্ করে কি যেন মন্ত্র উচ্চারণ করছেন, আর একবার বাঁ হাতের দিকে একবার করে ডান হাতের দিকে মুখ ফিরিয়ে দু'একটা ফুৎকারও ত্যাগ করছেন। তাঁর চোখ মুখের উদাস ভাব কেটে গিয়েছে; সরল চেতনা ও উত্তেজনা উপস্থিত হয়েছে সেই রক্তবর্ণ চোখে, আর গোঁফের ঝাড়ে। মাত্র গহরের নামেই যে ঐ ভাবান্তর দেখা দিয়েছিল এ বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত হলাম; এ পক্ষে বাজী ধরতে পারতাম।

সত্য জিনিসটা স্বয়ংসিদ্ধ। অল্প স্বল্প মিথ্যা দিয়ে সত্য আবৃত থাকে বলেই ভাষা-টীকা করে সেই আবরণ ভেদ করতে হয়। কিন্তু মিথ্যার আবরণেরও একটা সৌন্দর্য, একটা সার্থকতা আছে; নইলে কাব্যের বা অলংকারের প্রয়োজনই ছিল না। ভদ্র-লোকটির প্রশ্নের মধ্যে কতটুকু সত্য ছিল আমি জানতাম না; কিন্তু আমার অজ্ঞতার পক্ষে সেইটুকুই ছিল মারাত্মক। মাত্র আত্ম-রক্ষার উদ্দেশ্যেই আমি শ্যামলালজী আর গহরকে জড়িত করে পরিপূর্ণ মিথ্যার একটা বাক্যজাল রচনা করেছিলাম। ঐ অজ্ঞাত-কুলশীল লোকটি সেই মিথ্যার জালে পড়ে নিজেই প্রমাণ করে দিলেন যে, তিনিই কালে খাঁ সাহেব,—যিনি গহরের নাম শুনলেই অতিমাত্রায় ত্রস্ত, উত্তেজিত হয়ে উঠতেন। আমি বাঁচলাম। কিন্তু—সেই ভদ্রলোকটি তৎক্ষণাৎ মারা গেলেন, আমাদের সামনে, ট্রামে বসে! তার স্থানে দেখলাম কালে খাঁ সাহেব বসে আছেন! এইটুকুই হ'ল মিথ্যার আবরণের সৌন্দর্য, যেটা সত্যের উদ্‌ভাসকে আরও চমৎকার করে তুলে ধরে আমাদের দৃষ্টিতে। মাত্র এরই জন্য এই সামান্য টীকার প্রয়োজন মনে করেছি। যাঁরা মিথ্যার সুন্দরতার দিকটা না বুঝে কেবল তার কুখ্যাতি করে, আমার মনে হয় তারা সত্যের প্রতি নির্বিচারে পক্ষপাতগ্রস্ত। তাদের সঙ্গে কথা বলে সুখ নেই। আমি যদি বলি মিথ্যাও সুন্দর হয়, তারা বলে —সুন্দর-অসুন্দর সমস্ত কিছুই মিথ্যা! আগে ভাগে মিথ্যাকে নিন্দিত করে, পরে জগৎকে মিথ্যা ব'লে তারা আর যাই প্রমাণ করুক, তারা যে বিশ্বনিন্দুক এই সত্যটাই প্রমাণ করে ফেলে। এই বিশ্বনিন্দুকেদের আমি বড় ভয় করি। ঐ ভয়টাই আমার একমাত্র ভরসা।

সমস্ত কথাবার্তা হচ্ছিল হিন্দুস্থানী ভাষায়। নিকুন্ন এ ধরণের ভাষা শুনতে অভ্যস্ত ছিল না বলেই নির্বাক হয়ে বসেছিল। বুঝলে হয়ত অবাক হ'ত।

খাঁ সাহেবের, এখন থেকে খাঁ সাহেবই বলব, আত্মরক্ষার মন্ত্র আওড়ান শেষ হ'ল। আমারও একটু চৈতন্য হ'ল যে, ট্রাম চিৎপুরের মোড়ে পৌঁছেচে, আর আমাদের সারিতে বেশ একটু ভিড় হয়েছে। খাঁ সাহেব আমাকে তাঁর ঠিক পাশেই খালি জায়গায় উঠে বসতে বললেন। আমি যে একজন বুঝদার লোক, এ বিষয়ে ত' সন্দেহই নেই। নিকুন সামনে বসে আমাদের মুখভঙ্গী দেখে যাচ্ছিল। বেচারাকে একটু কৃতার্থ করে দিলাম চোখের ইশারা করে। ইশারা বুঝবার মত আক্কেল ছিল তার, যথেষ্ট। নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে থাকার মত যে বুদ্ধি আর সংযমের যে পরিচয় দিয়েছিল, তাতে আমি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম সেদিন।

চিৎপুরের মোড় ছাড়িয়ে ট্রাম যখন চলতে আরম্ভ করেছে, সেই সময়ে খাঁ সাহেব আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে চুপে চুপে খিশ্‌খিশে আওয়াজে জিজ্ঞাসা করলেন—"হাঁ, হাঁ, ত' শ্যামলালবাবু কোন্ সে কথা বয়ান্ করলেন"?

আমি একটু বিব্রত হলাম, এবার। এই মাত্র সংকল্প করেছি যে, মিথ্যার জালটা গুটিয়ে নেই, কারণ মস্ত বড় একটা সত্যের মাছ ধরা পড়েছে। কিন্তু দেখছি সেই মাছটি ঐ জালে জড়ীভূত হয়ে থাকতে চায় আরও কিছুক্ষণ! ফলে খাঁ সাহেবের জিজ্ঞাসার তুষ্টি বিধান করতে গিয়ে মিথ্যার জালটা আর একটু প্রসারিত করতে হ'ল; জালের উপরে জুয়াচুরির নক্সা, এ এমন বেশি কথা কি!

জিজ্ঞাসার উত্তর দেওয়া কিছুই কঠিন নয়। কারণ তখন আমি কলির কল্পলতা দেবী প্রতারণার এক উদ্ভট্ ও অদ্বিতীয় বার্তাবাহক। জেরা ক'রে আমাকে বিপদগ্রস্ত করে, এমন লোক সেখানে ছিল না।

আমি বিনিয়ে বিনিয়ে বললাম, "শ্যামলাল-বাবু যে কত কথাই বললেন, সে আর আপনাকে বলে আপনার সুরিলা কানের উপর আফৎ চড়িয়ে দিতে ইচ্ছা করছে না", বলে থেমে গেলাম। এখানে মিটে গেলেও ত' রক্ষা পাই।

কিন্তু সেই সরলপ্রাণ খাঁ সাহেব—ভগবান তাঁর আত্মার শান্তি বিধান করুন, তাঁর শ্রবণ-মননের তৃষ্ণা অত সহজে মিটে না! তিনি উদ্‌গ্রীব হয়ে বললেন, "না, না, তাতে কিছুমাত্র রন্‌জিদা হওয়ার কথা নেই, কিছু হর্‌জা নেই, বাবু সাব। যাহ'ক, কিছু ত' বলুন"।

কথায় আছে, মাত্র উপরোধেই ঢেঁকি গেলা যায়। আর আমি অনুরোধের খাতিরে দু-চারটি বাড়তি মিথ্যা বলতে পারব না! মৃদুস্বরে আর খুব গম্ভীর হ'য়ে বললাম, "তাহলে শুনুন খাঁ সাহেব। কিন্তু আমি কসম্ নিতে পারব না, গুণাহ্ হতে পারে। শ্যামলালজী বলছিলেন, গহর সাত দিন সাত রাত জল পর্যন্ত ছোঁয়নি। চার-চারটে ডাক্টর ঔর হাকিম এসে ইলাজ করেছে, সুই লাগিয়েছে, কত কী করেছে। লেকিন, খাঁ সাহেব! আপনিই বলুন জখ্‌মি জিগরের (ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ের) উপর কি মরা লোহার সুই আসর করতে পারে? হুশ-বেহুশ গহর হরদম আপনার নাম ক'রে পুকার দিয়ে উঠেছিল সে কয়দিন। সে আর বয়ান্ করা চলে না।"

বর্ণনার মুখে হয়ত আরও কিছু বিভীষিকার সৃষ্টি করা যেতে পারত। কিন্তু প্রয়োজন হয়নি। দেখলাম, এতক্ষণ পরে সেই চাঁদের মত গোলগাল মুখে অল্প হাসির ভাব দেখা দিয়াছে; বদনমণ্ডল ঈষৎ বিস্ফারিত হয়েছে; নীচের পাটির দু-চারটি বীচি বীচি দাঁতও গোচর হয়েছে। তদবস্থ হ'য়েই তিনি বললেন, "আমি বুঝতে পারছি, আপনার সবই জানা আছে বাবু সাব।"

আমি তৎক্ষণাৎ তার একটু চড়িয়ে বেঁধে অর্থাৎ না ছিঁড়ে যতদূর চড়ান যায়—বললাম, "কী বলছেন, খাঁ সাহেব, আপনি! দুনিয়াভর লোকের মালুম হ'য়ে গিয়েছিল সে সব কথা! অখ্‌বারওয়ালারা সে সব খবর জাহির করতে পারেনি, কারণ গহর হুঁশিয়ারি ক'রে তাদের জানিয়ে দিয়েছিল যে, বেয়াদবী করলে হুরমতের দাবীতে নালিশ করে দেবে। ফের এও ত' খেয়াল করুন, বশর্‌তে (কোনও প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী) আপনার ইজ্জৎকে ত' গহর প্রাণ গেলেও ছোট করতে দেবে না। কত সম্মান করে আপনাকে, ঐ গহর! আপনি ত' দেখছি কিছুই খবর রাখেন না তার"!

কথাগুলি শুনে খাঁ সাহেবের মুখ আবার উদাস, গম্ভীর হ'য়ে গেল! একটা মোলায়েম দীর্ঘনিশ্বাসেরও আমেজ পেয়েছিলাম। এক রকমের তারের যন্ত্র আছে, যাতে মিহি তার চাড়িয়ে বাজালে ভাল শ্বাস দেয়; কিন্তু মোটা তার চড়ালে আওয়াজ খোলতাই হলেও সেই মধুর রেশ আর মোলায়েম শ্বাসটা থাকে না। খাঁ সাহেব বোধ হ'ল এই রকমেরই একটি যন্ত্র! কত রকমের মজার যন্ত্রই না তৈরি ক'রে পাঠিয়েছেন বিশ্বকর্মা! বাইরের কাঠ-চামড়া দেখে ভিতরকার খবর পাওয়া যায় না। ঠিকমত তার চাড়িয়ে একটু বাজিয়ে দেখলে তবে কিছু রেশ আর শ্বাসের মজাটা বুঝা যায়। আর যে যন্ত্রের ধ্বনির মধ্যে রেশ নেই, শ্বাস নেই, সেটা ত' মরা কাঠ আর শুখনা চামড়া দিয়ে তৈরি করা ঘর-সাজান আসবাব মাত্র।

সেই গোঁফে-জড়ান সুরে খাঁ সাহেব একটু অন্যমনস্ক হয়ে বললেন, "হাঁ-হাঁ, নিশ্চয়। খুবসারি কথা বলেছেন আপনি"; বলে থেমে গিয়েই বাইরের জগতে রাস্তার দিকে নজর করলেন। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?"

আমি আর থাকতে পারলাম না। তাঁর মুখের দিকে সরল, সম্মুগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে বলে ফেললাম, "খাঁ সাহেব—আমরা হাওড়ার তরফে জানেওয়ালা ছিলাম। কিন্তু আপনার মত গুণী লোকের দরশন পাওয়া ত' নেহাৎ কিসমতের (অতিশয় সৌভাগ্যের) কথা। যাই হ'ক, আমরা এখন আপনার খিদমতে হাজির। আপনি যা বলবেন, আমরা তাই করব। যদি অনুমতি করেন, আমরা আপনার সঙ্গে আপনার ডেরায় যেতে তৈয়ার আছি।"

একথা অসন্দিগ্ধ সত্য যে, নিকুনের প্রস্তাব মত কাজটা, অর্থাৎ আমহার্স্ট স্ট্রীটে হাওড়াগামী ট্রামে চড়ে বসার কাজটা পাঁচ মিনিট এদিক-ওদিক হ'লে খাঁ সাহেবের সঙ্গে সেদিন দেখাই হ'ত না; এ জীবনেই হ'ত না। কারণ এ থেকে কয়েক-দিন পরে খাঁ সাহেবের খবর নিতে গিয়ে শুনেছিলাম, তিনি ঢাকায় চলে গিয়েছেন; আর সেখান থেকে ফিরে আসার খবর পাইনি আমি। শেষ কথা, ঠান্ডারাম যদি একটি ক্ষীণ সূত্র কুড়িয়ে না নিয়ে আসত, তাহলে —শ্যামলালজী-ভরলালজী প্রসঙ্গই করতেন না। এস্থলে ট্রামে বসে ঐ মুসলমান ভদ্রলোকটির সঙ্গে হয়ত ওরকমের আলাপই করতাম না।

আমার কথা শুনে খাঁ সাহেব দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, "তাহলে চলুন আমার সঙ্গে", বলে আস্তে আস্তে ট্রাম থেকে নামলেন। আমরাও নামলাম তাঁর পেছু পেছু। বনফিল্ডস লেনের নিকটে একটি সরু গলির মধ্যে দিয়ে আমরা যখন তাঁর অনুগমন করছি, দেখি মাঝে মাঝে পথ-চলতি দু-পাঁচ জন লোক খাঁ সাহেবকে 'বন্দেগি' জানিয়ে তাঁর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে আপন আপন কাজে চলে গেল। (ক্রমশঃ)

পাঁচ লাখ লোকের গৃহ সংস্থান

পি এন চন্দ্র

১৯৫১ সালের লোকগণনা অনুসারে ভারতীয় ইউনিয়নের প্রতি আট-চল্লিশজন লোকের মধ্যে একজন পাকিস্থানের উদ্বাস্তু। এই হিসাবে ভারতের রাজধানী দিল্লীতে প্রত্যেক তৃতীয় ব্যক্তি এই উদ্বাস্তু শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

এই জাজ্বল্যমান তথ্যটিই হল দেশ-বিভাগের অব্যবহিত পরে দিল্লীর রূপান্তরের সমগ্র সার-সংকলন। দিল্লী মূলত গড়ে উঠেছিল এর বর্তমান লোকসংখ্যার মাত্র একপঞ্চমাংশের জন্য। ১৯৪৭ সালের আগস্ট পর্যন্ত জনসংখ্যা বাড়ছিল একটা ক্রমিক হারে। কিন্তু দেশ বিভাগের কয়েক সপ্তাহের মধ্যে পাকিস্থান থেকে হিন্দু ও শিখদের ব্যাপক বাস্তুত্যাগের ফলে দিল্লীর অর্থনৈতিক সহনশীলতা এবং অতিরিক্ত চাপে ইতিপূর্বেই জীর্ণদশাগ্রস্ত নগর-জীবনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুলিকে যেন একেবারে ভাসিয়ে দিয়ে পাঁচ লাখ উদ্বাস্তু রাজধানীতে এসে সমবেত হল। সেই থেকে তারা দিল্লীর স্থায়ী অধিবাসী।

এই নূতন জনতার গুরুভারে দিল্লীর অর্থনীতির উপর যে নূতন চাপ পড়ে, তা থেকে উদ্ধার পাবার জন্য গত তিন চার বৎসর যাবৎ কঠোর চেষ্টা চলেছে। নগরীর সম্পত্তিকে নানা দিকে বাড়িয়ে তোলবার জন্য অসংখ্য পরিকল্পনা চালু করা হয়। গৃহ নির্মাণ, বিদ্যুৎ ও জল সরবরাহ, সাধারণ যানবাহন- সব কিছুকে সম্প্রসারিত করা হয়েছে। এই সম্প্রসারণ-প্রক্রিয়া এখনও চলছে।

গৃহনির্মাণ—জরুরী সমস্যা

পাকিস্থান থেকে আগত নিঃস্বদের প্রথমেই সবচেয়ে জরুরী প্রয়োজন ছিল মাথা গুঁজবার আশ্রয়ের। আশ্রয়ের সন্ধানে একদল উদ্বাস্তু পাকিস্থানে চলে যাওয়া মুসলমানদের পরিত্যক্ত বাড়িঘর দখল করল, অনেকে সাময়িকভাবে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের আতিথ্য গ্রহণ করল, অনেকে তাঁবুতে আশ্রয় পেল আর এক বৃহদংশ সরকারী ভবন বা সরকারী কর্মচারীদের খালি বাড়ি 'জবর-দখল' করে অথবা রাস্তার পাশে আস্তানা গেড়ে বাস করতে আরম্ভ করে দিল। এদের স্থায়ী বাসস্থানের জন্য ভারত সরকারের পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় ১৯৪৮ সালের শেষার্ধে এক বিরাট গৃহ নির্মাণ পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করেন।

হাজার হাজার নূতন গৃহ নির্মাণ করতে হলে শুধু রাশি রাশি ইটকাঠ স্তূপীকৃত করলেই হয় না। এজন্য অনেক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতে হয়েছে। প্রথমেই সমস্যা দেখা দেয় উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের। এমন স্থান নির্বাচন করতে হবে যেখানে উদ্বাস্তুদের জীবিকা অর্জনের সুযোগ সুবিধা রয়েছে বা তার উপায় করে নেওয়া যেতে পারে। স্থান নির্বাচনের পর আসে সেই স্থানকে সমান করে বাসোপযোগী করে তোলার কাজ। একেবারে শূন্য থেকে এই কাজ আরম্ভ করতে হয়েছে। এই সঙ্গে আধুনিক নগর পরিকল্পনার বিভিন্ন অঙ্গ, যথা, পয়ঃপ্রণালী, জল সরবরাহ, সড়ক, বিদ্যুৎ এবং আরও অসংখ্য বস্তুর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়েছে। নির্মাণ কার্য দ্রুত অগ্রসর হতে পারে নি এজন্যে যে গৃহ নির্মাণ উপকরণের বিশেষ অভাব ছিল।

বর্তমান চিত্র

দিল্লীতে গৃহ নির্মাণের কাজ আরম্ভ করার পর চার বৎসরেরও কম সময়ের মধ্যে আজ যে চিত্র পাওয়া যায়, তা দেখে যে-কোন নিরপেক্ষ দর্শকই সন্তুষ্ট হবেন। ২৭,০০০ হাজারেরও বেশী বাসগৃহ ও দোকান-ঘর নির্মাণ শেষ হয়েছে এবং আরও ৫,৫০০টি তৈরী হচ্ছে। যে সকল উদ্বাস্তু নিজেরাই বাড়ি তৈরী করতে চান, তাঁদের মধ্যে আনুমানিক ১,৬০০ খণ্ড জমি বণ্টন করা হয়েছে। নূতন তৈরী বাড়িগুলিতে প্রায় দেড় লক্ষ উদ্বাস্তুর বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া, প্রায় ১,১০,০০০জন উদ্বাস্তুকে বাস্তুত্যাগী মুসলমানদের পরিত্যক্ত বাড়িতে স্থান দেওয়া হয়েছে; তবে এরা নিতান্ত গাদাগাদি করে বাস করছে।

বর্তমানে ২০টিরও বেশী আবাসিক উপনিবেশ তৈরী হয়েছে। এগুলি মূল শহর দিল্লী ও নয়াদিল্লীর সম্প্রসারণ। এগুলির কোন কোনটিতে ৫০,০০০ হাজারেরও বেশী লোক ধরতে পারে। এই ২০টি উপনিবেশের মোট আয়তন প্রায় ৩,০০০ একর—অর্থাৎ পুরাতন দিল্লীর সমগ্র লোকালয়ের অর্ধেকেরও বেশী। আধুনিক ধারায় উপনিবেশগুলি পরিকল্পিত। চওড়া রাস্তা, খোলা পার্ক, জন-কল্যাণমূলক ভবনাদি নির্মাণের স্থান—সবকিছুরই ব্যবস্থা করা হয়েছে এগুলিতে। উপনিবেশগুলিতে সর্বসমেত ১৪৬ মাইল

উদ্বাস্তু মহিলাদের জামা-কাপড় কাটার কাজ শিক্ষা দেবার আয়োজন

দিল্লীর আজমীর গেটের বহিরঙ্গণে কমলা বাজার
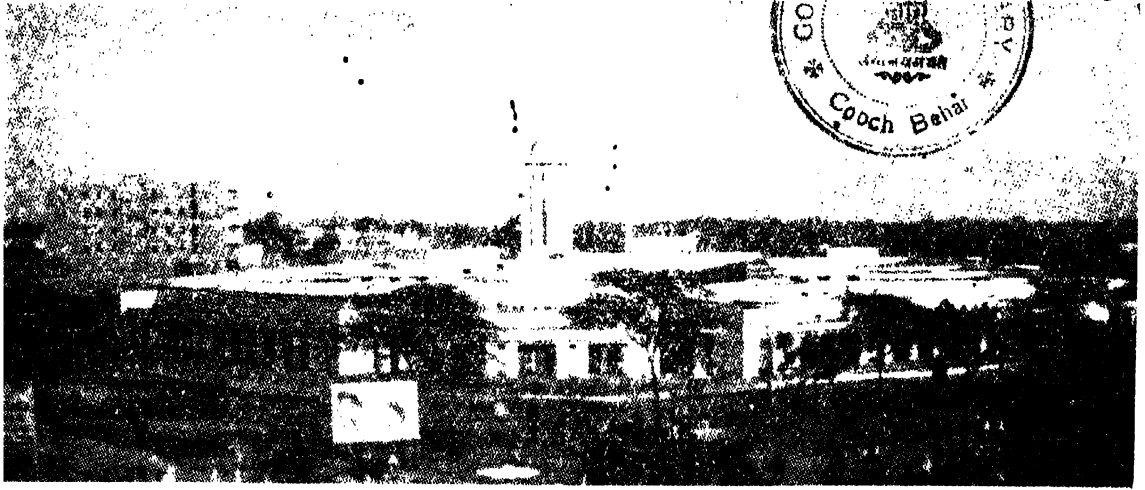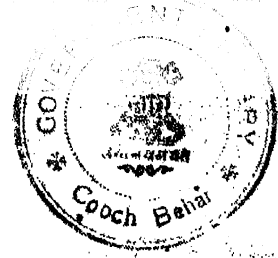
রাস্তা, বৃষ্টির জল নিষ্কাশনের জন্য ১৪৭ মাইল নালা ও ৫১ মাইল ভূগর্ভ পয়ঃপ্রণালী আছে। নূতন উপনিবেশগুলি এমনভাবে তৈরী হয়েছে যে, ঐগুলি বৃহত্তর দিল্লী রচনার সামগ্রিক পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অংশ হতে পারবে।

গৃহনির্মাণের ভার কেন্দ্রীয় পূর্ত বিভাগের হাতে দেওয়া হয়। কাজটি এত বিরাট যে, ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে কেন্দ্রীয় পূর্তবিভাগে একটি পৃথক্ পুনর্বাসন শাখা সৃষ্টি করতে হয়েছে।

উপনিবেশগুলিকে গড়ে তুলতে ও বাড়ি-ঘর নির্মাণ করতে ভারত সরকারকে ১৯৫২ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত খরচ করতে হয়েছে প্রায় ১২ কোটি টাকা। চলতি আর্থিক বৎসরে, অর্থাৎ এপ্রিল ১৯৫২ থেকে এক বৎসরে আরও প্রায় ৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা খরচ হবার সম্ভাবনা। এমন কি, পরবর্তী বৎসরগুলিতেও হয়তো আরও অনেক টাকা খরচ করতে হবে।

জল সরবরাহের জন্য পঞ্চাশ লক্ষ টাকা

বিপুল উদ্বাস্তু সমাগমের আগে থেকেই দিল্লীতে লোকের ভীড় অত্যধিক হয়ে উঠেছিল এবং নগরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুলির উপর চাপ পড়ছিল বিষম। এর উপর উদ্বাস্তু সমাগমের পর অবস্থা যে কী ভয়ঙ্কর হতে পারে, তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। তা সত্ত্বেও নগর-জীবনে যে বড় রকমের কোন বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় নি, সেটা একটা আশ্চর্যের বিষয়।

দিল্লীর দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে নির্মিত পুনর্বাসন উপনিবেশগুলিতে জল সরবরাহের জন্য তিন-পর্যায়ে বিভক্ত একটি জল সরবরাহের কারখানা প্রস্তুত করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ের কাজ ইতিমধ্যেই আরম্ভ হয়েছে এবং শীঘ্রই শেষ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। সমস্ত পরিকল্পনাটির জন্য খরচ হবে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা। প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হলে নব-নির্মিত উপনিবেশগুলির কয়েকটিতে
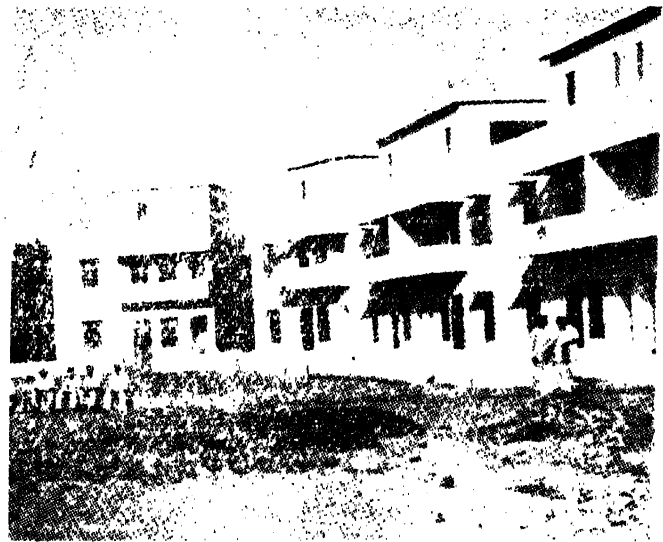
মালকাগঞ্জে উদ্বাস্তুদের জন্য দ্বিতল গৃহ

দৈনিক ৪০০০০০ গ্যালন জল সরবরাহ করা যাবে। প্রথম পর্যায় নির্মাণের ব্যয় হবে ১০ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা।

উপনিবেশগুলিতে হাসপাতাল, ঔষধালয়, শিশু ও মাতৃ-মঙ্গল কেন্দ্র, ডাকঘর, থানা, দমকল, সাধারণ প্রতিষ্ঠান এবং সিনেমা, পার্ক ও বড় বড় মাঠ তৈরীর জন্য জায়গার উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

ছেলেমেয়েদের বিদ্যাশিক্ষা

দেশ বিভাগের আগে শহরে যে সকল বিদ্যালয় ছিল, উদ্বাস্তু ছেলেমেয়েদের জন্য সেগুলির অধিকাংশকেই সম্প্রসারিত করা হয়েছে অথবা দুইবারে ক্লাস নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে যে, উদ্বাস্তু ছেলেমেয়েদের বিদ্যাশিক্ষার সমস্যা এ সকল ব্যবস্থায় অংশত মাত্র মেটান সম্ভবপর হয়েছে।

ভারত সরকার বিভিন্ন উপনিবেশে পনরটি নূতন স্কুল-বাড়ি নির্মাণ করেছেন। এই স্কুলগুলিতে ১০,০০০ ছেলেমেয়ে লেখাপড়া করতে পারবে। বেশীর ভাগ বিদ্যালয়েরই নির্মাণ-কার্য শেষ হয়েছে এবং এগুলি স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। বিদ্যালয়গুলি আধুনিক ধারায় পরিকল্পিত। এগুলিতে সুপরিসর উন্মুক্ত স্থান রাখা হয়েছে, বস্তুাগার, গবেষণাগার ও পাঠ-কক্ষ আছে এবং ক্লাসরুমগুলি আলো-হাওয়ার অবাধ সঞ্চরণে বিধৌত। স্কুল বাড়িগুলি এমনভাবে তৈরী যে, ভবিষ্যতে এগুলিকে বাড়ানও যাবে। স্কুল তৈরী করতে ভারত সরকার ইতিমধ্যেই ৫০ লক্ষ টাকা খরচ করেছেন।

জীবিকা সংস্থান

জীবিকা সংস্থানের উপায় করে দিতে না পারলে পুনর্বাসনের কাজ মাত্র অর্ধেক সম্পূর্ণ হয়। দেশ বিভাগের অব্যবহিত পর ভারত সরকার একটি চতুরঙ্গ কর্মসংস্থান পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। অঙ্গ চারিটি হলঃ কর্মসংস্থান কেন্দ্রগুলির মারফৎ বেসরকারী বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানে এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য-সরকারগুলির অধীনে চাকুরী জোগাড় করে দেওয়া; ছোট ছোট ব্যবসায়ী, দোকানদার ও শিল্পী প্রভৃতিকে অল্প ঋণ দেওয়া; আইন দ্বারা গঠিত পুনর্বাসন ঋণদান সংস্থার মারফৎ মাঝারি শ্রেণীর ব্যবসা ও শিল্পের জন্য পুঁজির যোগান দেওয়া এবং উদ্বাস্তুদের নানা ধরণের বহু লাভজনক কারু-শিল্প ও বৃত্তি শিক্ষা দেওয়া। দিল্লীতে উদ্বাস্তুরা এই পরিকল্পনার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছেন। তা ছাড়া, রাজধানীতে বাস্তুত্যাগী মুসলমানদের প্রায় ৫,৫০০ দোকান-পাট ব্যবসায়ী ও দোকানদারদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। ১ কোটি টাকা খরচে ৩,৭০০টি দোকান-ঘর নিয়ে ৩৮টি নূতন ব্যবসা কেন্দ্র তৈরী হয়েছে বা হচ্ছে। এগুলির মধ্যে ১০টি নিয়মিত বাজার।
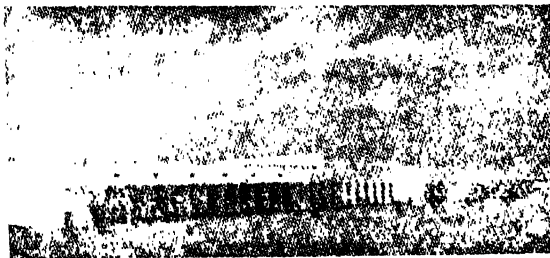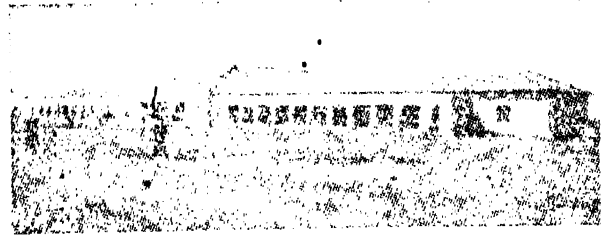
বিধবা ও অনাথ শিশুদের তত্ত্বাবধান

অন্যান্য স্থানের মত দিল্লীতেও পুনর্বাসন কর্তৃপক্ষের একটা বড় দায়িত্ব বাস্তুচ্যুত অনাথ বিধবা, বৃদ্ধ, পঙ্গু ও অক্ষমদের তত্ত্বাবধান ও ভরণপোষণ। নারী ও শিশুদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত কাজ পরিচালনার জন্য পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ে একটি পৃথক বিভাগ খোলা হয়েছে। দিল্লীতে গোড়া থেকেই একটি মহিলা শাখা পুনর্বাসনের কাজে নিযুক্ত আছে। নারীদের জন্য একটি পৃথক উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছে, সেখানে সরকারী ব্যয়ে তাদের তত্ত্বাবধান করা হয়। তারা অল্পবিস্তর সরকারের স্থায়ী দায় বলে গণ্য হয়েছে। কর্মক্ষম মহিলাদের কোন-না-কোন কাজ শেখান হচ্ছে, যাতে তাঁরা অনেকটা আত্মনির্ভরশীল হতে পারেন।

তিলকনগরে উচ্চ বিদ্যালয় ভবন

জবর দখলের সমস্যা

জবরদখলকারীরা একটা দুরূহ সমস্যার সৃষ্টি করেছে। পূর্বেই বলা হয়েছে, বাস্তুত্যাগ শুরু হবার প্রথমদিকে উদ্বাস্তুরা অনেকগুলি বেসরকারী ও সরকারী বাড়ি দখল করে অথবা রাস্তার পাশে আস্তানা গাড়ে। রাস্তার পাশে আস্তানা করায় এমন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি হয় যে, তা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট এক সমস্যার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। জবর দখলকারীদের সংখ্যা এক লাখ বা দেড় লাখ হবে।

জবর দখলকারীদের সমস্যার সুরাহার জন্য ১৯৫০ সালের মাঝামাঝি একটা বড় রকমের পরিকল্পনা করা হয়। স্থির হয় যে, বিকল্প বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিয়ে এক একটা এলাকা ধরে জবর দখলকারীদের সরানো হবে। রাস্তার উপর যারা ব্যবসা চালাচ্ছে, তাদের দোকান-ঘর দেওয়া হবে সাব্যস্ত হয়। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। এখন পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের সমস্ত চেষ্টা এই সমস্যার দ্রুত সমাধানের উপর কেন্দ্রীভূত।

[March of Indiaর সৌজন্যে]

কস্তুরবা নিরাশ্রিত নিকেতন

শুচিবাই

বিমলা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়

সম্রাট্ প্রিয়দর্শী সমাজ-মঙ্গলের জন্যে নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠান এবং প্রজাদের পারত্রিক কল্যাণের উদ্দেশ্যেও একাধিক বিধি-ব্যবস্থা করে গিয়েছেন। তাঁর প্রচারিত 'ধম্ম' কথাটির সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা তিনি নিজেই দিয়েছেন এবং যে কয়টি নৈতিক গুণের উল্লেখ শিলালিপিতে পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে সত্য, শুচি, দয়া, দান, বিনয় ও মৃদুতাই শ্রেষ্ঠ। ভারত মহাপ্রাণ অশোকের উপদেশ শিরোধার্য করেছে বটে, কিন্তু প্রাত্যাহিক জীবনে তার ব্যবহারিক প্রয়োগ করবার সুযোগ কোথায়? তবু বাঙলা দেশ মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত সীমায় পড়ে থাকলেও, সম্রাটের একটি উপদেশ অন্তত মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছে। শুচিতা অবলম্বন করেছে সাংসারিক ও সামাজিক জীবনে। আর বিশেষ কিছু করে নি। কিন্তু যেটিকে নিয়েছে, সেটিকে আঁকড়ে আছে সযত্নে আজও বাইশশো বছর পরে। কম নিষ্ঠা ও কৃতিত্বের পরিচয় নয়!

সত্যি, ভাবতে আশ্চর্য লাগে। ভারতের সর্বত্রই তো তিনি তাঁর বাণী ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু কেমন করে সুদূর অতীতের ব্যবধান লঙ্ঘন করে ঐ 'শুচি' কথাটি বাঙালীর সংসারে কায়েমী বাসা বেঁধে নিল, সেটা কি এই প্রদেশের সমাজতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য সূচনা করে না? সারা প্রাচীন আর মধ্যযুগ অতিক্রম করে ভাটপাড়া, নবদ্বীপ, বিক্রমপুর পরিক্রমা সেরে বাঙলার সমাজ-শাস্ত্র ও লোকাচারের ভিত্তিমূলে প্রবেশ করল ঐ শুচিবোধ। মূর্খ, শিক্ষিত, সধবা অথবা বিধবার বিধিবদ্ধ জীবনে দিল প্রেরণা! বাঙালী নরনারীর কোমল মেরুদণ্ডকে করল কঠিন, নিষ্ঠা-কাষ্ঠায় মণ্ডিত করে দিল তার সাংসারিক ও সামাজিক জীবন-পদ্ধতি। শুচিবায়ুতেই হল আধ্যাত্মিক শুচির ঐতিহাসিক পরিণতি। যুক্তি হয়তো নেই, তবু এই হল ইতিহাস, তথা জাতীয় নিয়তির পরিহাস। বাঙালী পরিহাস-রসিক, যদিও বাস্তব জীবনে তারা নাকি অত্যন্ত গম্ভীর। শুচি নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করে, আবার পালনও করে। বাইরে আধুনিক ভিতরে সংরক্ষণশীল। তা হোক্—ক্ষতি নেই। কিন্তু নিত্যকার জীবনে ও আচরণে এই দ্বৈতবাদ অথবা সুবিধাবাদ মারাত্মক নয় কি?

'শুচি' পদটি সুরুচিপূর্ণ। ওর মধ্যে আছে পবিত্রতা, শালীনতা আর সৌম্য সম্ভ্রম। কিন্তু ঐ নিরীহ পদটিকে যদি 'বায়ু' দিয়ে সমাসবদ্ধ করি, তাহলে হাড়-মাস কালী হয়ে যায়। ঊনপঞ্চাশ বায়ু একসঙ্গে জেগে ওঠে, কুপিত হয় সমগ্র দেহের জটিল নাড়ীমণ্ডল। তখন নিরীহ ভুক্তভোগীকে কাতরস্বরে প্রার্থনা জানাতে হয়, "হে সবজ্ঞ সমাজপতির দল! জীবন্ত নরকবাস আর সহ্য হয় না। ফিরিয়ে নাও তোমাদের শুচি। এর চেয়ে অন্ত্যজের জীবনও সুখকর। চাই না মহাশুচি গোবরছড়া আর গঙ্গাজল। আমি অশুচি অস্পৃশ্য সরমা-পুত্র হয়েই থাকব, রজ্জুবদ্ধ ছাগশিশুও আমার চেয়ে স্বস্তি ও আনন্দে থাকে। আর এমন নির্জন স্থানে আমায় নির্বাসিত কর, যেখানে রাসি বামনী নেই, নেই কোনও অনবদ্যা মুণ্ডিতশ্রী বাল-বিধবা"।

আপনারা নিশ্চয়ই ভাবছেন, একটা সাধারণ কথা নিয়ে এত গৌরচন্দ্রিকার কি প্রয়োজন? আপনাদের অবগতির জন্যে জানাচ্ছি, কথাটি মোটেই সাধারণ নয়। শুচি-বায়ুর অ-সাধারণত্ব সম্বন্ধে আপনারা যথেষ্ট ওয়াকিবহাল নন বলেই এমন বিরক্ত ও সরল প্রশ্ন করলেন। আর বাঙালী ভক্ত বৈষ্ণব একাধিক থাকলেও, গৌরচন্দ্রের ঐ বাছ-বিচারহীন 'আচণ্ডালে ধরে দেয় কোল'-গোছের অতি-বদান্য গায়ে-পড়া ভঙ্গীকে নিষ্ঠাবান্ বাঙালী মোটেই বরদাস্ত করে না। তাই শুচিবাই নিয়ে ভণিতা করা ছাড়া গত্যন্তর কোথায়? সোজাসুজি গায়ে হাত দিয়ে কথা বললে অনেক অসহিষ্ণু পাঠক হয়তো চটে উঠবেন: 'তা বলে কি বাসি কাপড়ে ঘরে বেড়াতে হবে? ছত্রিশ জাতের সঙ্গে ছোঁয়া-লেপা করে ঘরে এসে উঠতে হবে গরু-পুত্রের মতন? তুমি কি পৈতে-পোড়া ব্রহ্মচারী যে, জাত-ধর্ম খুইয়ে বসে আছ, স্পর্শদোষ মানো না?' সত্যিই তো। হাসি-তামাসা করে শুচি-কে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আপনাদের বায়ুই বরং আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। তাই রসিয়ে, উদাহরণ দিয়ে, ভণিতা করে আপনাদের মনোরঞ্জনের চেষ্টায় আছি। সইয়ে সইয়ে যদি অপ্রিয় সত্য শোনাতে পারি। কিন্তু অতিরঞ্জন করে একটি কথাও বলছি না, বলব না—একথা শপথ করে বলতে পারি। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও উদ্ধৃত কাহিনী শুনে হয়তো আপনারা বলবেন, 'তোমার দুর্ভাগ্য।' কিন্তু বাঙালী ঘরোয়া সংসারে সেগুলি কি আজগুবি গল্প? আপনাদের শতকরা তিরিশ জনও কি শুচিবায়ুর তিক্ত সত্য উপলব্ধি করেন নি?

বাতিক আর বাই, দুটি কথা একার্থ-বোধক হলেও আমরা ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করি। বাতিক বলতে আমরা বুঝি ছিটগ্রস্ত। বাতিকগ্রস্তলোক বলতে ইংরেজি 'এক-সেণ্ট্রিক্' শব্দটির ব্যবহার করি আর বুঝি খ্যাপাটে ধরণের লোক, যার স্বভাব-আচরণ মোটের ওপর হাস্যকর। বাতিকগ্রস্ত মানুষকে বুঝিয়ে-পড়িয়ে চালানো যায় যদিও সময়ে সময়ে বিরক্তির উদ্রেক হয়। তবু সেখানে কৌতুকের খোরাক আছে, আছে হাসির ও মজার অবকাশ। যেমন ধরুন মুদ্রাদোষ। চলায়, কথাবার্তার ভঙ্গীতে, অভ্যাসে সে বাতিক ধরা পড়ে। কেউ বা রাস্তায় যেতে যেতে প্রাণায়াম অভ্যাস করেন পাছে নিঃশ্বাসের মধ্য দিয়ে ময়লা ঢুকে যায়। কেউ বা নাড়ী টিপে হরদম বীট্ গণনা করেন, জ্বর আসছে কিংবা হার্টের অসুখ হয়েছে বলে বিমর্ষ হয়ে থাকেন। কেউ বা বছরে দুটি দিন মাত্র স্নান করেন। জিজ্ঞাসা করলে জবাব দেন, 'কুয়োর দড়ি জলে ভিজে বেশিদিন টেঁকে, না কি আলনার শুকনো দড়ি বেশি-দিন চলে?' আবার কেউ বা জীবনে চিনা-বাদাম, তরমুজ খান না, কলেরার ভয়ে। এগুলো বাতিক। বাই হল এর ওপরে। মনের, অর্থাৎ অসুস্থ মনের, সূক্ষ্মতর ঊর্ধ্বতন অবস্থা। ওটা একেবারেই রোগ। পুরোপুরি পাগলামির সামিল। মনো-বিকলনেই তার জন্ম। শুচিবায়ু এমনি

একটি বাই। অতএব প্রথমে যখন এ রোগের আভাস দেখা দেয়, তখন অঙ্কুরেই তাকে বিনষ্ট করা প্রয়োজন। দরকার হলে নিষ্ঠুর হতে হবে এবং প্রতিপদে সে মনোবিকারকে ব্যাহত করতে হবে। মিষ্ট কথায় বুঝিয়ে যখন কাজ হয় না, তখন মুষ্ট্যাঘাত এবং আসুরিক চিকিৎসা প্রয়োগ করতে হবে। উপায় নেই। নইলে এ রোগ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, জীবনে কত লোককে তারি জন্যে ভুগতে হবে, সংসারে নিত্য ট্র্যাজেডির অভিনয় চলবে—এসব দুর্ঘটনা গোড়ায় কল্পনা করা যায় না। দৈহিক ও মানসিক, সকল শক্তি দিয়ে শুচিবাই প্রতিরোধ করা দরকার। উপযুক্ত ঔষধ-প্রয়োগে ভূতও পালায়। হিস্টিরিয়া সারানো সে তুলনায় এমন কিছু সাংঘাতিক ব্যাপার নয়। শুচিবায়ুগ্রস্ত মানুষকে নিয়ে যাঁদের ঘর করতে হয়, তাঁরা নিশ্চয়ই আমাকে সমর্থন করবেন।

শুচি-বাই যখন সবে শুরু হয়েছে, তখন দেখবেন আরম্ভটা প্রায়ই মৃদু এবং তার মধ্যে বিশেষ আপত্তিকর কিছু পাবেন না। ধরুন কোনও এক মহিলা ঘর-দোর পরিষ্কার রাখতে ভালোবাসেন, অপরিচ্ছন্নতা পছন্দ করেন না। ধোপার বাড়ির পাট-ভাঙা কাপড় পরেন না এবং নিত্যই সকলের ছাড়া কাপড় সাবান সিদ্ধ করে দুম্-দাম্ আছড়ে দেন। বেলা দুটোয় কাজ সেরে কোথায় দুটো ভাত মুখে দেবেন, তা নয়। খাবার ঢাকা রেখে ঠাকুর-চাকরকে দ্বিপ্রহরের ছুটি দিয়ে তিনি ওপরে ওঠেন এবং ঘণ্টাখানেক নিজের ঘর-দোর-বিছানা পরিষ্কার করেন, যদিও চাকরে সে কাজ মোটের ওপর ভালোই করে রেখেছে। টেবিল ঘষেন, ফার্নিচারে আঙুল দিয়ে দেখেন ধূলিকণার রেশ পাওয়া যায় কি না। কিছুতেই কারুর কাজ পছন্দ হয় না। মনে করেন সব অগোছালো, অপরিষ্কার। চায়ের বাসনে কোথায় একটি ছোট কালো তিলের মতন দাগ লেগে রয়েছে, সেটা সযত্নে অণুবীক্ষণ করেন এবং আপসোস করেন চাকর-বাকরদের দায়িত্ব-জ্ঞান নেই বলে। কিন্তু তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ হচ্ছে, তিনি ঝামেলা ভালবাসেন না, অকারণ চেঁচামেচি করেন না। যে কাজটি মনোমত পরিচ্ছন্ন হয় নি, সেটিকে তিনি নিজেই করে নেন। ফলে বাড়ির ভৃত্য-পরিচারক দল গৃহিণীর সহিষ্ণুতায় ও স্বাবলম্বিতায় দিব্যি রামরাজ্যে বাস করে। বাইরে থেকে অতিথি-অভ্যাগত এবং আত্মীয়বর্গ এমন মহিলার ধীর-স্থির কর্মপরায়ণতার প্রশংসাই করবে। আমিও করব। কিন্তু গোপনে নজর রাখব—বাতিক বৃদ্ধি হচ্ছে কি না। আমার মনে এ সংশয় থাকবে যে, এই ধরণের স্বভাব একটি নীরব ভূমিকা মাত্র। ভবিষ্যতে এ নিষ্ঠা সকলের অজ্ঞাতসারে হয়তো শুচিবায়ুতে পরিণত হয়ে যাবে। তাই আমার দাওয়াই হল অন্য রকম। ঘর-দোর, জিনিসপত্র আরো বেশি অগোছালো রাখতে হবে। ছাড়া কাপড়, বইয়ের স্তূপ, সিগারেটের ছাই, পানের বোঁটা, চুণের প্রলেপ, দাগ-ধরা চায়ের কাপ ইত্যাদির সাহায্যে অপরিচ্ছন্ন, অবিন্যস্ত বাড়িখানি রীতিমত গোয়াল করে রাখা দরকার এবং দিনের পর দিন, ক্রমাগত। কত প্রতিবাদ, কত সংস্কার একটি মানুষ করতে পারে, করুক। বকা-ঝকা নয়, চেঁচামেচি নয়। প্রচ্ছন্নভাবে সরিয়ে থাকতে হবে। তখন ব্যাধি আপনা থেকেই কমতে শুরু করবে। ধৈর্যচ্যুতি ও শারীরিক অসামর্থ্য এসে এই শুচিতার আসক্তি দূর করবে। কিছু সময় লাগবে, কিন্তু ফল অবশ্যম্ভাবী। আমি এ ব্যাপারে কোনও গাফিলতির প্রশ্রয় দিতে চাই না। কেননা, চলতি ভাষায় যাকে 'ছুচি-বাই' বলা হয়, সেটা প্রথমে ছুঁচই হয়ে প্রবেশ করে ফাল হয়ে বাইরে আসে।

শুচি-বাইর মধ্যে স্তর ও প্রকারভেদ আছে। আর সে সব স্তর এত সূক্ষ্ম আর প্রকারে এত বৈচিত্র্য যে, শুচি-বাইর সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করা রীতিমত গবেষণা-সাপেক্ষ। মোটামুটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এর মধ্যে জাতিগত, বিষয়গত এবং মাত্রাগত বিভেদ আছে। যেমন পুরুষের ও স্ত্রীলোকের শুচিবায়ুর মধ্যে টেকনিকের পার্থক্য আছে। এটা হল জাতিগত প্রকার-ভেদ। আবার বিষয়গত শুচিবায়ু আছে, যেমন কারুর আপ্রাণ দৃষ্টি উচ্ছিষ্টদোষে, আবার কারুর বা ধ্যানতন্ময়তা শৌচাগারের শুচিতায়। এ ছাড়া মাত্রাগত পার্থক্য সর্বদাই লক্ষ্য করা যায়। কেউ বা স্পর্শ-দোষে কেবলি হাত ধোন, কেউ বা কাপড় ছাড়েন, কেউ বা শীতের রাতেও স্নান করে ফেলেন। মোট কথা, ডিগ্রীর তফাৎ। অশুচির ভয়ে কোনও লোক চৌকাঠ ডিঙিয়ে ঘরে ঢোকেন না, কেউ বা বাড়ির সদর দরজায় উঁকি মেরে সরে পড়েন। আগন্তুক ঘরে এলে কোনও মানুষ দশ হাত দূরে প্রথম দুই সারি চেয়ার বাদ দিয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে বসতে অনুরোধ করেন। আবার কেউ বা সমস্তক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন, পাছে কিছু গায়ে বা হাতে লেগে যায়, সেই ভয়ে আড়ষ্ট নির্জীবের মতন অন্যমনস্ক কথা বলেন। আর একটি কথা, হিন্দু শাস্ত্রের অনুমোদিত চারটি বর্ণ ও চারটি আশ্রম আছে। শুচিবায়ুর অলিখিত আইন-কানুনেও তেমনি চারটি স্তর আছে। প্রথম স্তর হল ব্রহ্মচর্য, অর্থাৎ শুচিবায়ুর এপ্রেণ্টিসগিরি। তখন বাহ্য এবং আভ্যন্তরীণ শুচিতার মাহাত্ম্য-কীর্তন চলে। পবিত্র জীবন ও পবিত্র আচরণ, এক কথায় সর্ব প্রকার মালিন্যবর্জনের আপ্রাণ চেষ্টা ও সমর্থন প্রকাশ পায়। এ অবস্থা হ'ল শুচি-বায়ুর বীজ। সর্বদাই একটা সন্দেহ, খুঁতখুঁতে মন আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা ও সংস্কার করবার অদম্য স্পৃহা। এখানে গোড়াতেই কোপ মারা দরকার, সে কথা আগেই বলেছি। দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে গার্হস্থ্য শুচি অর্থাৎ ঘরোয়া শুচিবাই। এটা অনেকেই প্রত্যক্ষ করেছেন, বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। তবে এ অবস্থায় মজাও যেমন, দাম্পত্য অশান্তিও তেমন। ঠাকুর ঘরে ব্যভিচার চলুক, আপত্তি নেই। বৎসরান্তে সন্তানের জননী হতে বাধাও নেই। তবে ছোঁওয়া-ছুঁয়ি না হলেই হলো। আঁতুড় ঘরে আর এঁটো বাসন তোলবার সময়ে যেন ময়লা ন্যাতাখানি ভালো করে নাকের ওপর দিয়ে বুলিয়ে নেওয়া হয়। তৃতীয় স্তর হ'ল বাণপ্রস্থ। অর্থাৎ গোবর-চর্চিত গঙ্গাজল-ছড়ানো ঘর-দোরে বিশ্বাস নেই। তাই তেতলার চিলে-কোঠায় অথবা বাড়ীর প্রান্তসীমায় সন্তর্পণে বাস অথবা কাশীধামের ঘাটে গামছা-জড়ানো দেহে আকণ্ঠ অবগাহন। এটা হলো শুচি-বায়ুর মগডাল। তারপরই চতুর্থ স্তর অর্থাৎ তুরীয় অবস্থা। মানে—স্পর্শাশৌচ ও মালিন্যভয়ে বসন-ত্যাগ। গোবর ও গঙ্গাজলের লোটায় দুটি হাত বাড়িয়ে তৈলঙ্গ স্বামীজির মতন জুলজুল করে চেয়ে বসে থাকা। দেহ অস্থিসার। আহারে, বসনে, শয়নে, স্বস্তি নেই। কেবল উপু হয়ে বসে থাকা, নড়া-চড়া না করা এবং ঘর-সংসার জন্মালয়ে নিজে জীবিত-মৃত অবস্থায় শেষ দিনের সর্ব-পাবক অগ্নি-স্পর্শের প্রতীক্ষায় ভূত অথবা পেত্নীর মতন নরক-যন্ত্রণাভোগ।

এবারে কয়েকটি উদাহরণ দিলে শুচিবায়ুর কমেডি ও ট্র্যাজেডি দুটো চরিত্রই পরিস্ফুট হবে। এর মধ্যে সবচেয়ে মজার জিনিস

হলো—একজন শুচিবায়ুগ্রস্ত মানুষ, আর একজন সগোত্র সহধর্মীর আতিশয্য নিয়ে হাসি-তামাসা করে। আর একটি উল্লেখ-যোগ্য বিষয়—একই সংসারে দু'জন বাতিক-গ্রস্ত মানুষ বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। যাঁর শুচি বাই আছে, তিনি বাড়ির মধ্যে একমেবাদ্বিতীয়ম্ দর্শনীয় বস্তু। তাই রক্ষে। নইলে ধরুন স্বামী স্ত্রী দুজনেই বাতিকগ্রস্ত হলে সংসার মধুময় হয়ে উঠত! একটিমাত্র ব্যতিক্রমের কথা আমি জানি যেখানে দু'জন শুচিবায়ুগ্রস্ত মানুষের মধ্যে চরম প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল, আবার প্রয়োজন মত উভয়ের মধ্যে মৈত্রীবন্ধন স্থাপিত হত। উভয়েই রমণী এবং বিধবা। তাঁদের কথা পরে বলছি। সে অতুলনীয় যুগ্মচরিত্রের মাহাত্ম্য কীর্তন করে আমার নিবন্ধ শেষ করব। আপাতত পুরুষের শুচিবাইর কথা ধরা যাক্। দুটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

এক ভদ্রলোককে অনেক দিন থেকে জানি, যাঁর সমস্ত সাধনা, সময় ও শক্তি নিযুক্ত হয়েছে স্নানের ঘর এবং শৌচাগারের তত্ত্বাবধানে। সকালে উঠে কোনও কাজ তিনি করেননি এবং করতে পারেনও না। যেহেতু চা-পান পর্ব চুকে গেলে, তিনি খবরের কাগজ পড়েন আর বাথরুমে প্রবেশ করবার সাধনা করেন। কল খোলা থাকে, তারি নীচে থাকে বালতি। সে বালতি মাটিতে ঠেকে থাকতে পায় না কারণ মেঝের ওপর দিয়ে জমাদার তো হেঁটে যায়। যদিও ভোরে জমাদার কাজ করে যাবার পর ও রকম পাঁচ সাত বালতি ফিনাইল-গোলা জল দিয়ে সমগ্র বাথ-রুমের মেঝে এবং প্রায় তিন হাত উঁচু দেয়াল পর্যন্ত সযত্নে ধুয়ে ফেলা হয়। তা হোক্, কলের গায়ে দড়ির ফাঁস জড়ানো বালতি ঝোলে এবং জলপূর্ণ হলেই তিনি যেখানেই থাকুন, দড়ি-ছেঁড়া হয়ে বাথরুমে ঢোকেন এবং সন্তর্পণে সেই জল ড্রামে ভরে নেন। এইভাবে দুটি ড্রাম পূর্ণ করা হয়। একটির মুখ ঢাকা ও চাবি-বন্ধ। সে জলে তিনি মুখ ধোন ও বার বার কুলকুচো করেন। দ্বিতীয় ড্রামটিতে একটি বড় পিতলের থালা চাপানো থাকে। এ জল অব্রাহ্মণ। অর্থাৎ হাত-পা ধোয়া এবং অন্যান্য কাজের জন্যে ব্যবহৃত হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত সকালে জল ধরা না হয়, ততক্ষণ তিনি এতই উচাটন থাকেন যে, শ্রীরাধিকাও কৃষ্ণের বংশীধ্বনির জন্যে এতটা উদ্‌গ্রীব থাকতেন না। ড্রাম দুটিও মাটিতে থাকে না, তাদের জন্যে হাত দুয়েক উঁচু কাঠের একটি সিংহাসন আছে। সেখানে কৃষ্ণ-বলরামের মতই যুগল মূর্তি বিরাজ করে। জলপাত্রগুলি ধরণীর স্পর্শে বাঁচিয়ে আপনার শুচিতা রক্ষা করে। যাতে কোনও জলের ছিটে না লাগে, জমাদারের ঝাড়ুতাড়নায় দু'এক ফোঁটা জল যেন ওপর দিকে ছিট্‌কে না যায়, তারি জন্যে এই হুঁশিয়ারি। যেদিন জল কম থাকে, সেদিন বাড়ীতে খিটিমিটি ও অশান্তি। চাকর-বাকর ও গৃহিণী সকলেই সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে। ইলেকট্রিক পাম্প খোলা, বন্ধ করা, বালতি ও ড্রাম ভরা ইত্যাদি প্রক্রিয়াগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত কারুরই কোনও কাজে মন বসে না। এটা হল উদ্যোগপর্ব। তারপর বাথরুমে প্রবেশ। সেখানে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণপর্ব সেরে কুরুক্ষেত্র জয় করে যখন শান্ত ক্লান্ত মূর্তিখানি বেরিয়ে আসে, তখন শান্তিপর্বের সূচনা। ঝাড়া তিন ঘণ্টা, তার কম তো নয়ই। পৃথিবী রসাতলে যাক্, বাথরুম থেকে বেলা এগারটার আগে তাঁর বেরিয়ে আসা কল্পনা করাও যায় না। দু দুবার বড় রকমের ভূমিকম্প হয়ে গেল, কিন্তু দেবতা স্বস্থান-চ্যুত হননি কদাচ! বিকালেও ঠিক দুটি ঘণ্টা কম করে। এই রকম প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় মিলে পুরোপুরি পাঁচ ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হয়। একবার হিসাব করে আত্মীয়স্বজন দেখিছিলেন গত তিরিশ বছরে গড়পড়তা পাঁচ ঘণ্টা দিনপিছু ধরলে জীবনের, মানে সজ্ঞান জীবনের, এক-তৃতীয়াংশ কাল কেটেছে তাঁর বাথরুমে। এর জন্যে কত লাঞ্ছনা-গঞ্জনার ঝড় গিয়েছে, কিন্তু তিনি টলেননি। বাইরে বেরুতে পারেন না, বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়বর্গের প্রতি সামাজিক অ-কর্তব্য হয়। কিন্তু তিনি নিরুপায়। সরকারী চাকরি আর বাকি সময়টা বাথরুম, এই করে তাঁর ষাটের ওপর বয়স হয়েছে। সকাল থেকে জল-জল করে উদ্বেগ, কেউ ড্রাম খুললে কিংবা ছুঁয়ে ফেললে, কল খোলা আছে এবং তাতে জলের ছিটে উঠছে, এই সব দুশ্চিন্তায় তিনি অন্য কোনও কাজে মনোনিবেশ করতে পারেন না। বাথরুম থেকে বেরুনো না পর্যন্ত কেউ তাঁর সঙ্গে দরকারী কথা বলতে সাহস পায় না, এমন কি চেক্ সই করা পর্যন্ত মুলতুবি রাখতে হয়। গৃহিণী মধ্যে মধ্যে তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ করেন। খিটিমিটি শুরু হয়। ভদ্রলোক রাগ করে উপবাস করেন। নয়তো বলেন, 'একদম রাস্টিক্। নোংরা ভূত সব! মেয়ে, পুত্রবধূ, জামাই ও ছেলে পালা করে এসে রাগ ভাঙাবার চেষ্টা করে। তিনি বলেন, 'নাঃ আর এখানে থাকা অসম্ভব। আমি কালই হরিদ্বারে সরে পড়ছি। নির্বোধ স্ত্রীলোক জানে না, যে ডালে বসে আছে, সেই ডালেই কোপ্ মারছে। আমি হরিদ্বারে চলে গেলে বুঝবেন বাছাধন... যদ্দিন হাতীর মতন রোজগার ছিল, তদ্দিনই আমার খাতির ছিল। আর আজ...' গৃহিণী হো-হো করে হেসে উড়িয়ে দেন, বলেন, 'হরিদ্বারে জলের ড্রাম্ আর বালতি ল্যাগেজ করে পাঠাতে হবে তো!' যাই হোক্, পরের দিন রাগ পড়ে যায়। আবার বাথরুম থেকে 'ওগো' 'ওগো' ডাক আসে। 'ওগো' বিস্রস্তবেশে সর্বকর্ম পরিত্যাগ করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটেন। দরজার ফাঁক দিয়ে সিগরেট, টুথব্রাশ, খড়কে অথবা পামোছার গামছা সরবরাহ করেন। যেদিন নটা সাড়ে নটায় তাঁকে বাইরে বেরুতে হয় বিশেষ জরুরী প্রয়োজনে, আগের রাত থেকেই বাথরুম পরিষ্কার ও জল সঞ্চয়ের তোড়জোড় চলে। ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে রাখা হয়, যাতে রাত চারটেয় তিনি নির্বিঘ্নে শৌচাগারে প্রবেশ করতে পারেন। এই বাথরুমে তিন ঘণ্টা কাটানোর জন্যেই তাঁর দু'তিনবার ট্রেন ফেল হয়েছে। স্টিমারের ভোঁ দিয়েছে, ছেড়ে গিয়েছে, কিন্তু খড়কে দিয়ে নখ ও দাঁত খোঁটা, পায়ের তলায় সপ্তমবার সাবান ঘসা তাঁর বন্ধ হয়নি। এই বাথরুম পর্বের জন্যই তিনি যথাসময়ে পাত্র আশীর্বাদ করতে বেরুতে পারেননি। লগন উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। অবশেষে ভিন্ন দিন স্থির করে মেয়ের বিয়ের দিন পর্যন্ত পিছিয়ে দিতে হয়েছে। তাঁর চরিত্রে দুটি গুণ আমায় মুগ্ধ করে। স্ত্রীজাতির উপর তার প্রচুর অনুকম্পা অথচ আপনার স্ত্রীর উপর প্রচুর দাবী। তিনি স্ত্রী-পালিত আদর্শ স্বামি-দেবতা। আর দ্বিতীয়টি হল শুচিতার ওপর তাঁর অবিচলিত নিষ্ঠা। যে যাই বলুক বা ভাবুক, তাঁর শুচিবায়ু তিল পরিমাণেও কমে না। ড্রামের বরাদ্দ জল এক ইঞ্চিও কমে না। অসহায়, পরমুখাপেক্ষী, শুচিগ্রস্ত গৃহস্থ কেমন করে গার্হস্থ্য জীবন এতদিন পালন করে এলেন, অথচ স্বধর্ম এবং স্বাধিকার থেকে বিন্দুমাত্র প্রমত্ত হলেন না, এইটে ভাবলেই আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। দূর থেকে তাঁকে মহাপুরুষ-জ্ঞানে আমি প্রণাম জানাই। তাঁর এই দুর্বলতার কথা সকলেই জানে। কিন্তু কেউই তাঁকে অশ্রদ্ধা করে না। এক স্ত্রী ছাড়া প্রত্যেকেই তাঁকে

সমীহ করে চলে। সমাজেও তিনি বুদ্ধিমান, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সজ্জন হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত।

আর একজন ভদ্রলোকের কথা বলি এবার। তিনি কাজকর্ম করেন, সংসার চালান, সমাজে চলাফেরা করেন। কিন্তু কি দুঃখে তাঁর জীবন কাটে, দেখলেও দুঃখ হয়! তিনি দুটি হাত সমস্তক্ষণ গুটিয়ে উঁচু করে থাকেন। কোনও জিনিস ছুঁতে পারেন না। কোনও বাড়ীর দরজার সামনে ঠায় তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, কেউ হয়তো দেখতে পায়নি তাঁকে। তিনিও হাত দিয়ে ফটক খুলতে পারছেন না অথবা কলিং বেল্ টিপতে পারছেন না। অদৃশ্য বীজাণুই তাঁর কাল্পনিক শত্রু। কোনও কিছুতে হাত

কলিংবেল টিপ্‌তে পারছেন না

ঠেকে গেলে অন্তত আধ ঘণ্টাকাল লাইফবয় সাবান দিয়ে হাত ঘষেন। তারপর পটাশ পারমাং জল এবং তারও পরে ডেটল্ দিয়ে হাত ধুতে হয়। যতক্ষণ এই প্রক্রিয়া চলে, পাশে একজনকে জলের বৃহৎ জগ নিয়ে মোতায়েন থাকতে হয়। অন্য কোনও বিষয়ে তাঁর শুচিবায়ু নেই। মানে, ঐ একটি কাজেই তাঁর এত সময় ও চিন্তা ব্যয়িত হয় যে, দ্বিতীয় দিকে মন দেবার তাঁর অবকাশ থাকে না। মানুষ চমৎকার। নীরব, ভদ্র, সহিষ্ণু এবং আত্মত্রুটি-সচেতন। কেউ কিছু অনুযোগ করলে তিনি আস্ফালন করেন না। নীরব হাসি হেসে রুটিন-মাফিক হস্ত প্রক্ষালন করেন মাত্র। তিনি যে কাজ করেন, তাতে এ শুচিবায়ু তেমন ক্ষতি করতে পারে না। কেবল দিনের অধিকাংশ কাটে দাঁড়িয়ে, এই যা। হাত গুটানোই থাকে, আর পরনের কাপড়ও হাঁটু অবধি তোলা। তবে তিনি যদি ডাক্তার, উকিল, অধ্যাপক অথবা ব্যবসায়ী হতেন, তিনি কি করতেন তাই ভাবি। হয়তো কাজ ছেড়ে দিতেন। প্রফেশনাল মানুষ হলেই কত লোকের সঙ্গে মেশামেশি, একত্র বসা ও চলাফেরা করতে হয়। তাঁদের কেউ যদি স্পর্শদোষের ভয়ে হাত-পা গুটিয়ে ঠুঁটো জগন্নাথ সেজে বসে থাকেন, তাহলে রোগী, মক্কেল, ছাত্রদল কি করবে তাঁকে নিয়ে?

স্ত্রীলোকের শুচিবাই ঐ বায়ুরোগ হলেও তার তীব্রতা এবং ভয়াবহতা অনেক, অনেক বেশি। প্রথম কথা, মহিলারাই গার্হস্থ্য জীবন সচল রাখেন। তাঁদের সুস্থ মন ও দেহ নিয়েই সংসারের শ্রী ও কল্যাণ। তাঁরা যদি কেউ বায়ুগ্রস্ত হন, তাহলে সংসার শুধু অচল নয়, নষ্ট হয়ে যায়। পরিবেশ বিশ্রী হয়ে যায়, সংসারে আসে দারিদ্র্য, জীবনে নামে সন্দেহ অশান্তির কদর্য গ্লানি। সক্‌ড়ি, ময়লা, বাসন, কাপড় কাছা, কলতলা আর আঁস্তাকুড় পরিষ্কার করতেই সূর্য চলে যায়। জীবনের সূর্যও নিভে যায়। সংসারকে ঘিরে থাকে নিত্য অমারজনী। এ জীবন নিরর্থক। যিনি শুচিবায়ুগ্রস্তা, তিনি বুঝেও বোঝেন না। অবুঝের মতন ধোপার বাড়ীর কাপড় আবার ধুয়ে নেন, সর্বত্র গঙ্গাজল ছিটিয়ে বেড়ান, এঁটোর ভয়ে আড়ষ্ট থাকেন, স্বামি-সন্তানের স্নেহ-সেবা-বঞ্চিত হন। এর চেয়ে আফসোস আর কিছু নেই। এ অবস্থায় বেঁচে থাকার অর্থ হয় না। তিনি নিজে জীবিত থেকেও মৃতবৎ। আর যাঁদের নিয়ে তাঁর সংসার, তাঁদেরও জীবন্ত মরণ। খেয়ে সুখ নেই, কোথায় এঁটোর দাগ লাগল। বিধবা হলে তো কথাই নেই। এঁটোর মধ্যেও আবার জাতিভেদ আছে। লক্ষ্মীর দ্রব্য সিদ্ধ হলে উচ্ছিষ্ট, অপক্ক অবস্থায় অনুচ্ছিষ্ট। কাঠাসনে দোষ নেই, শুদ্ধ বস্ত্রে দোষ নেই। কিন্তু মৃত্তিকায় স্পর্শদোষ এবং সুতির কাপড়ে ছোঁয়া লাগলে ছেড়ে ফেলতে হয়। কোন্ স্পর্শে গোবরজল, কোন্‌টায় গঙ্গাজল, কোনটাতেই বা সর্বাঙ্গ স্নান সূচিত হয়, তার মেয়েলি শাস্ত্রই আলাদা। তার ওপর বিধবার পক্ষে আমিষ বিচার। মাছ কুটতে দোষ নেই, কিন্তু থালায় লাগলে দোষ। তাছাড়া, আছে পেঁয়াজ, মশুর ডাল পাউরুটি এবং পুঁইডাটা অর্থাৎ প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের স্পর্শদোষ। মেঝেতে এঁটো বাসন পড়ে থাকলে কতদূর পর্যন্ত পাড়তে হয়, গোবর-ন্যাতায় পুঁছতে হয় অর্থাৎ জননী ধরিত্রীর কতটা অংশ স্পৃষ্ট ও উচ্ছিষ্ট হয়ে যায় তার পৃথক্ আইন-কানুন মেনে চলতে চলতে বাজি ভোর! কেউ বা অল্পে সন্তুষ্ট। কেউ বা সংলগ্ন দ্রব্য, দেওয়াল, দরজা, জানালা পর্যন্ত উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে বলে ধোলাই করেন। সধবা শুচিবায়ুগ্রস্তা হলে স্বামীও উচ্ছিষ্ট বস্তু বলে ধোলাই হতে পারেন। শুচিবায়ুর এলাকা কতদূরে গড়ায়, তার একটি উদাহরণ দিচ্ছি। গল্পকথা নয়। কোনও এক মহিলার সন্দেহ এবং শুচিবাই দুই রোগই ছিল। আমাদের দেশের লোক, কাজেই সংবাদটি নিছক সত্য। ভদ্রমহিলা অসমসাহসী পল্লী রমণী, একাই থাকতেন। স্বামী বিদেশে কাজ করতেন, ছুটি-ছাটায় বাড়ী আসতেন। এঁকে আমরা সুরোর মা বলে জানতাম বাল্যকালে।

'ঘরেই ঢুকতে দিই না'

তাঁর সর্বপ্রধান গৌরবের বস্তু স্বামিসৌভাগ্য নয়, সংসারের স্বচ্ছলতা নয়, সন্তান-গৌরবও নয়। শুচির পরাকাষ্ঠাই ছিল তাঁর দম্ভের সামগ্রী। তিনি সঙ্গিনীদের কাছে গর্ব করে বলতেন, 'বেটাছেলে আছ, স্বমী হয়েছ, তাতে এত খাতির কিসের? হাত-পা ধুয়ে মটকার কাপড় পরে গায়ে গঙ্গাজল ছিটিয়ে যদি ঘরে না ঢোকে, ঘরেই ঢুকতে দিই না। এক বিছানায় শোয়া তো দূরের কথা। মিনসে একদিন ভরপেট খেয়ে ঢেকুর তুল-ছিল। ঘেন্নায় মরি। অত রাত্তিরে গঙ্গাজল দিয়ে গড় গড় করে কুলকুচো করাই, তবে শুতে দিই। কিন্তু সেই থেকে ভাই মুখের কাছে মুখ আনতে দিই না......। সঙ্গিনীরা হেসে বলতেন, 'তা বেশ কর, দাও না। কিন্তু বলি, কোলেরাটি এল কি করে?' স্বামীকে তিনি অশেষ প্রকার নির্যাতন করতেন। বাইরে থেকে বেড়িয়ে এলে, সন্ধ্যা হোক আর রাত্রিই হোক, স্বামীকে রোয়াকের নীচে

প্রথমে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে গলা-খাঁকারি দিয়ে জানাতে হত, বান্দা উপস্থিত। তারপর স্ত্রী হে'সেল থেকে বেরিয়ে গোবরজল-গোলা বালতিটি উপুড় করে ঢেলে দিতন স্বামীর অঙ্গে। জামা-কাপড় আলগোছে তুলে নিয়ে পরনের পোষাক ছেড়ে তবে তিনি সিঁড়িতে পা দিতে পারতেন। অথচ এই স্বামীর ওপর তাঁর মালিকানা স্বত্ববোধ ছিল ষোল আনা। আত্মীয়া হলেও অন্য কোনও মহিলার সঙ্গে স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে কথা বলার সাহস তাঁর ছিল না। একে শুচিবায়ু, তায় ঈর্ষা। সোনায় সোহাগা। বালবিধবা এবং সন্দিগ্ধ-প্রকৃতি রমণীর শুচিবায়ুর উদ্ভব কোন্ নিরুদ্ধ মনোবৃত্তি অথবা অবচেতন মানসের প্রতিফলন এবং তার মধ্যে বিকৃতি অথবা যৌন-রহস্য কতখানি, সে খবর ফ্রয়েডীয় দর্শনতত্ত্বই বিশ্লেষণ করে বলতে পারে। আমরা সাধারণ মানুষে দেখি, আর অবাক হয়ে থাকি।

বাল-বিধবার শুচিবাই প্রসঙ্গে দুটি অমর চরিত্রের কথা মনে পড়ল। তাঁদের চরিতকথা বর্ণনা আমার লেখনীর অসাধ্য। শরৎচন্দ্র যদি তাঁদের একবারটি দেখতেন, তাহলে 'বামুনের মেয়ে' নতুন করে লিখতেন, এইটুকু বলতে পারি। মাতুলালয়ের অতি নিকটেই এই দুটি বিধবা বাস করতেন একখানি পুরাতন জীর্ণ বাড়িতে। এককালে এ'রা খুব বড়মানুষ ছিলেন। কিন্তু সব নষ্ট হয়ে যায়। পুরুষের মধ্যে কেউ বেঁচে ছিলেন না। কেবল ঐ দুটি বিধবা প্রেতরাজ্যের অন্ধকারে বাস করে নিজেরাই প্রেতিনী হয়ে গিয়েছিলেন। বাড়ী থেকে গঙ্গা মিনিট দশেকের পথ। কাজেই গঙ্গাতীরে বাস করার অশেষ পুণ্যফলে তাঁদের বহিরঙ্গ আর অন্তরঙ্গ, দুইই এক-দম শুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। যেটুকু বা সন্দেহ ছিল, সেটুকু দু' বেলা খেয়ে উঠে বিশ্রাম-অবসরে পরচর্চা করে পরস্পর পুষিয়ে নিতেন। এ'দের সম্বন্ধে আর দুটি তথ্য আপনাদের জানা প্রয়োজন। প্রথম কথা, এ'রা সম্পর্কে ননদ-ভাজ। দুজনের মধ্যে যেটুকু অসদ্ভাব বা অবনিবনা, সেটুকু দুই স্ত্রীলোকের একত্র বাসের অবশ্যম্ভাবী ফল। কিন্তু দুজনেরই যেটি সাধারণ গুণ ও বৈশিষ্ট্য, সেটি হল অসম্ভব রকমের শুচি-বায়ু। এই পয়েন্টেই তাঁদের গভীর মিল ও সখ্যভাব। ঠাকুরঝি যখন চারদিকে গোবর-ছড়া ছিটোতে থাকেন, ভাজ, ঠাকরুণ তখন হাঁ করে গোবরের একটি বড়ি পাকিয়ে আল-গাছে মুখে ফেলে গিলে নেন। ঠাকুরঝি

বলি কোলেরটি এল কি করে?'

দেখেন বাইরের পবিত্রতা, ভাজ দেখেন ভিতরের। পাকস্থলীতে উচ্ছিষ্ট থাকে। অত-এব জীর্ণ হবার পূর্বেই তাকে শুদ্ধ করে নেওয়া প্রয়োজন। দ্বিতীয় কথা, এ'রা দুজনেই বিষকুম্ভ কিন্তু পয়োমুখী। ছোটবেলায় একজনকে আমরা মামীমা বলে ডাকতাম, আর একজনকে মাসিমা। বাড়ীর যিনি গৃহিণী ছিলেন, সেই বৃদ্ধাকে বলতাম দিদিমা। কিন্তু এই দুটি শুচিবাই-পীড়িত অর্ধোন্মাদ রমণীকে দিনের পর দিন চালানো যে কি দুরূহ এবং হৃদয়বিদারক ব্যাপার, তার বহু দৃশ্য স্বচক্ষে দেখেছি। শান্তশ্রী নিরীহ বৃদ্ধা কন্যা আর পুত্রবধূর হাতে কিভাবে লাঞ্ছিত হতেন, তা আর বলবার নয়। উভয়ের শুচি-দ্বন্দ্বে অর্ধেক দিন হাঁড়ি চড়ত না, বৃদ্ধা উপোস দিতেন। তার ওপর সন্দেহবশে অনেক সময়ে বুড়ীকে গঙ্গাস্নান করতে হত। যখন শরীরে আর সামর্থ্য রইল না, তখন তিনি বিছানায় শুয়ে শুয়ে গোঙাতেন, 'ওরে তোরা আর চুলোচুলি করিস নি। একবার এদিকে আয়, আমাকে সরিয়ে দে...' তাঁরা ভাল করেই সরিয়ে-ছিলেন। এক শীতের সন্ধ্যায়, শয্যা অপবিত্র হয়েছে মনে করে ননদ-ভাজে মিলে বুড়ীকে চ্যাংদোলা করে পুকুরে ডুবিয়ে আনলেন। মাত্র তিনটি দিনের ওয়াস্তা। বেঘোর জ্বর ও বুকে সর্দি নিয়ে সত্তর বছরের বৃদ্ধা ভবধাম ত্যাগ করলেন এবং বোধ করি শুচিপরায়ণা কন্যা আর পুত্রবধূর পিছু-তাড়ার ভয়ে স্বর্গে আর গেলেন না। রোগে বুড়ী যখন অচেতনপ্রায়, তখন ননদ-ভাজে পরামর্শ করছেন, কেমন করে ও'কে চান্দ্রায়ণ ও বৈতরণী করানো যায়। বুড়ীর কানের কাছে যখন দুজনে চেঁচিয়ে সে প্রস্তাব জানালেন, তাঁর রোগপাণ্ডুর শীর্ণ মুখে একটু হাসির রেশ দেখা গেল। তিনি বললেন, 'ও সবে আর দরকার নেই। তোদের জন্যে তো চাই........... নিজেরাই করে কম্মে নিস। এবার হাড় জুড়োতে দে।' মৃত্যুর সময়ে উপস্থিত ছিলাম। বুড়ীর মুখের দিকে চেয়ে মনে হয়েছিল তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে মরছেন এবং ওপার থেকে তাঁর ছেলে ও জামাই তাঁর শুচিনরক থেকে উদ্ধারের প্রতীক্ষা করছেন।

ননদ ছিলেন বয়সে বড়। কিন্তু শুচি ও আচারে ভাজ ছিলেন সিনিয়র। বেগুন পোড়ান হবে কি না, চাল সিদ্ধ করা চলবে কি না, কাপড় বদলানো দরকার কি না ইত্যাদি দৈনন্দিন সমস্যার ননদ শিষ্যার মতই প্রশ্ন করতেন। ভাজ পোপের মতই শুচিরক্ষা করে মধ্যযুগীয় নির্দেশ দিতেন। ননদ ছিলেন শ্যামবর্ণ। একটু মোটা-সোটা, মাথায় চুল আর পরনে থাটো থান। সে থান অধিকাংশ সময়েই উরুর ওপরে ওঠানো থাকত। ভাজ ছিলেন গৌরবর্ণ। ছোট ছোট করে চুল কাটা, দেখলে মনে হত, একটি সুন্দর কিশোর। কোমরে কখন-সখনও একখানা গামছা জড়ানো থাকত, কখনো কিছুই নয়। যেদিন খিড়কির পুকুরে অবেলায় স্নান করতে যেতেন, সে সময়ে প্রতিবেশীরা লজ্জায় সে দিক মাড়াত না। উভয়ের জীবনপ্রণালীর প্রতিটি খুঁটি-নাটি এবং দৈনন্দিন রুটিন. সকলের মুখস্থ ছিল। বাড়ীর ত্রিসীমানায় কোনও কুকুর, গরু, ছাগল ঘেঁষতে পেত না। প্রতিবেশী কামাখ্যানাথের দুরন্ত নাতির একটি পোষা বিড়ালের দৌরাত্ম্যে ব্যথিত হয়ে দুজনে সমস্বরে অভিশাপ দিয়েছিলেন এবং সর্বশুচি সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার কাছে কাতর নিবেদন জানিয়েছিলেন যেন তে-রাত্তির না পেরোয়—এ অনাচারের একটা বিহিত হয়। জাগ্রত দেবী কথা শুনেছিলেন এবং তৃতীয় দিনের ভোরবেলায় বালকটি অকস্মাৎ ধনুষ্টঙ্কারে প্রাণত্যাগ করে। এর পর লোকে আর কিছু করতে সাহস করে নি। সবাই জানত, এ'রা সিদ্ধ-নারী। রসনায় আছে বিষ যদিও সামাজিক আলাপের কৃত্রিম শিষ্টাচারে এ'দের বাক্যে মধু ক্ষরণ হত। কিন্তু সে কথা থাক। ননদ-ভাজের শুচিবাই-এর কয়েকটি কাহিনী শোনাই।

শুচি অশুচির ব্যাপারে ননদের তবু মাঝে মাঝে সন্দেহ হত। কিন্তু ভাজের মনে সন্দেহ বলে কোনও সমস্যার উদয় হত না। সে মন ছিল নিশ্চিত, প্রত্যয়শীল এবং কঠোর। অশুচির বিন্দুমাত্র সম্ভাবনায় তাঁর মন আগে থেকে তৈরি থাকত এবং অশুচি স্পর্শ ঘটবার পূর্বেই তিনি নির্মম বিধি-

পালনে তৎপর হতেন। তবু ননদের খাতিরে মধ্যে মধ্যে তাঁকে রেহাই দিতেন। করুণা-পরবশ হয়েই বলতেন, 'তোমার দু'দিন উপোস গেছে ঠাকুরঝি। সামলাতে পারবে না। তুমি আজ মাঝের হাঁড়িতে দুটো চাল ফুটিয়ে নাও। আজ আমার হরিমটর........' এখানে আপনাদের অবগতির জন্য বলতে হয় যে, হেঁসেলে মাত্র একটি হাঁড়ি থাকত। সেটি পবিত্র অর্থাৎ যেদিন নিঃসংশয়ে শুচিতা বজায় আছে, সেদিনের রান্না ঐ পাত্রে। হেঁসেলের বাইরে এক কোণে একটি কালো হাঁড়ি, সেটি হল অশুচি হাঁড়ি। ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। আর বারান্দায় শিকেয় ঝুলত একটি পিতলের তিজেল হাঁড়ি। সেটি হল সন্দেহ-হাঁড়ি। যেদিন সন্দেহের কারণ ঘটত, গঙ্গাস্নানের পর পথে কার আঁচল গায়ে ঠেকল কি ঠেকল না বলে মনে হত, সেদিন ঐ মাঝের হাঁড়ি নামানো হত। নিজেদের কোনও নিকট আত্মীয় ছিল না। কিন্তু নিষ্ঠাবতী রমণীরা দূর জ্ঞাতি-জনের জনন ও মরণাশৌচ পালন করতেন। ও বাড়ীর মোতিলাল যখন মারা গেল, এ বাড়ীর মাসিমা গেলেন সান্ত্বনা দিতে। মৃত-দেহ নিয়ে যাবার সময় শয্যার একপ্রান্ত উঠোনের বেড়ায় একটু লেগে গিয়েছিল। সমস্ত বেড়া উপড়ে ফেলে জ্বালানি কাঠ করা হল মাসিমার নির্দেশে এবং সমগ্র উঠোন গোবর-গঙ্গাজল দিয়ে নিকানো হল। মামীমা যান নি, তিনি বাড়ীতে থেকেই নিয়মব্যবস্থা করছিলেন। একটি মেটে মালসায় আগুন করে আর একটি ভাঁড়ে পবিত্র গোময়মিশ্রিত গঙ্গাজল রেখে দিলেন ননদিনীর দেহশুচির জন্যে। মধ্যে মধ্যে কম্পিটিশান চলত মজার। এ ঘর থেকে ননদ একটা কিছু আচার নির্দেশ দিলেন হয়তো অনুচ্চকণ্ঠে। ও ঘর থেকে পাল্টা জবাব দিলেন ভাজ তারস্বরেই। একদিন বারান্দা দিয়ে যাচ্ছেন ননদ। হঠাৎ দখিনা বাতাস অমন নীরস শুচিকঠোর মহিলার সঙ্গে একটা বদ রসিকতা করে বসল। দমকা হাওয়ায় তাঁর লম্বা চুলগুলি দুলে উঠল এবং রুক্ষ তৈলহীন বলেই বোধ হয় একটু উড়ল ফর ফর করে। মলয় বায়ু শুচিবায়ুর সঙ্গে পেরে উঠবে কেন? নিমেষে তার চোদ্দ পুরুষ নরকস্থ করে মাসিমা একটু থামলেন। তারপর একখানা নড়বড়ে কাঠের চৌকি এনে তার ওপর কষ্টে-সৃষ্টে উঠে দাঁড়ালেন। চোখ ছোট করে, ভুরু কুঁচকে অতি পরিপাটিভাবে দীর্ঘতম কেশ কয়টি বেছে নিয়ে শিকেয় ঝোলানো সন্দেহ-হাঁড়ির দিকে তুলে ধরলেন। ঠিক পৌঁছুল না। তখন সেই টলটলায়মান চৌকির ওপর অপঘাত মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে ডিঙি মেরে দেহটাকে উঁচু ও সটান করে লম্বা চুল কয় গাছি ঊর্ধ্বে মেলে ধরলেন। এবার ভরসা পাওয়া গেল। নাগালের মধ্যে যখন পাওয়া গেল, তখন ঠেকলেও ঠেকতে পারে। অতি সন্তর্পণে নেমে এসে মাসিমা ক্যাঁচ করে চুলগুলি কেটে ফেললেন। তারপর স্নান করে এসে সন্দেহ হাঁড়িটাই নামিয়ে নিলেন,

লম্বা চুল ঊর্ধ্বে মেলে ধরলেন

কারণ এ সমস্যাকুল মন নিয়ে হেঁসেল অপবিত্র করা কোনমতেই চলতে পারে না। মামীমা আড়চোখে সবই দেখছিলেন। এ রকম নিষ্ঠা দেখে তাঁর কঠিন প্রাণও দ্রবীভূত হল। তিনি ঈষৎ স্নেহার্দ্র স্বরে বললেন, 'কতদিন বলেছি ঠাকুরঝি, ও পাপ বিদেয় করো। চুল থাকলেই জ্বালা। আমি তো কবে মুড়িয়ে ঘোল ঢেলেছি। তুমি আর কেন মায়া করছ?' কিসের যেন স্মৃতিতে মাসিমা একটু আনমনা হয়ে পড়লেন। জবাব দিলেন, 'তাই দেব লো বউ, দেব। হাতে পাঁজি মঙ্গলবার! প্রয়াগে যাওয়ার কপাল আমার নয়। নিবে ছোঁড়াকে ধরে ত্রিবেণী গিয়ে ক্ষুর বুলিয়ে আসবো। সেই মা বেঁচে ছিল এতদিন, তাই...'

তারপর মামীমার দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'ও কি হলো বউ। আজ আবার মাটীতে গর্ত করছিস কেন?' মামীমা সলজ্জ হেসে বললেন, 'কিছু নয় ঠাকুরঝি। সকালে কি যেন মাড়িয়ে ফেললুম। সিধু গোয়ালা গরু নিয়ে যাচ্ছিল আগে আগে। কিন্তু আমার কপালে ও কি আর গোবর পড়ে 'থাকবে? তা নয় ঠাকুরঝি। খানার ওপরেই দাঁড়িয়েছিল তুলসী ধোপানীর হতচ্ছাড়া গাধাটা। ওরই কম্ম নিশ্চয়ই... এ অবস্থায় কি আর ঘরে ঢোকা যায়! তাই উঠোনের এক কোণেই গর্ত করে মাটীর নতুন সরায় দুটো কাঁচা মুগের ডাল ফুটিয়ে নিই... ভাবলুম চাল চড়ানো তো চলবে না।' 'ও মা, তাই তো বলি...' মাসিমা কণ্ঠে সোহাগের সুধা ঢেলে বললেন, 'সর্ তো বউ। কাঁচা নারকেল কাঠির ধোঁয়ায় চোখ দুটো যে গেল......আমি ফুঁ দিচ্ছি...... সরে বোস্।' মাসিমা ফুঁ দিয়ে আগুনের তেজ বাড়ালেন। ডাল সিদ্ধ হল। নামিয়ে নিকানো মাটিতেই বিনা পাত্রে সরা উপুড় করা হল। মামীমা সোহাগের নাকি সুরে বললেন, 'তুমিও ভাত কটা বেড়ে এনে ঐ কোণটায় বসে যাও না কেন?...'

ননদ-ভাজের আহার-পর্ব শুরু হল দেখে আমরা এবার সরে পড়ি, কি বলেন? শুচি-বায়ুগ্রস্তা অন্তঃপুরিকাদের খাওয়ার সময়ে দাঁড়াতে নেই। দৃষ্টিদানেও অস্পৃশ্যতা লাগতে পারে। কিন্তু কলিকালে ননদ-ভাজের এই সম্প্রীতির অতুলন দৃশ্যে আপনাদের নয়ন ও হৃদয় কি মুগ্ধ হল না? জল ঘেঁটে-ঘেঁটে মাসিমার হাঁটু পর্যন্ত পা দুটি প্রায় সাদা হয়ে গেছে। গোবরজলে আঠারো ঘণ্টা হাত ডুবিয়ে রেখে মামীমার কনুই পর্যন্ত হাজা ধরেছে। দু জনে দুই কোণে বসে, একজন খাটো থান পরে আর একজন বিনা বসনে, উপুড় হয়ে বসেছেন পিণ্ড-গ্রাসে। মধ্যে মধ্যে পুলককণ্ঠে পরচর্চার ঝাল-ফোড়ন। এ স্বর্গীয় দৃশ্য কোনও আধুনিক ননদ-ভাজ কল্পনাও করতে পারবেন না।

আমার এ লেখা শুচিবাই-পীড়িত মানুষদের জন্য নয়। তাঁরা হাত দিয়ে কাগজ ছোঁবেন না, চোখ দিয়ে পড়লে গঙ্গাজলে চোখ ধুয়ে ফেলবেন জানি। কিন্তু আপনারা? বিশ্বাস করুন, এর প্রতিটি ছত্রে অবিমিশ্র সত্য। পড়ে যদি আতঙ্কে শিউরে ওঠেন, তা হলে কাজ হয়েছে বুঝব। ঘরেতে কারুর যদি এ রোগের স্পর্শ লেগে থাকে, এই পাঁচালী শুনে সময় থাকতে সাবধান হোন— এই আমার আন্তরিক অনুরোধ।

অসমাপ্ত চিঠি

অবাক হয়ে যায় সকলেই।

একশো এক জ্বর নিয়েও যে-মানুষ অফিসে বার হয়েছে—কাজ করে এসেছে সমস্ত দিন—গত দাঙ্গা হাঙ্গামায় পর্যন্ত যাকে আটকানো যায়নি—সে আজ অফিস যাবে না?

কিন্তু কেন—কি হয়েছে মলিনের?

কি যে হয়েছে তা কি মলিন নিজেই জানে ঠিকমতো!

কোন কিছুই ভালো লাগছে না তার।

অথচ ঘুম ভেঙেছে অনেকক্ষণ: অন্যান্য দিনের মতোই ভোর সাড়ে পাঁচটায়। তবু বিছানা ছেড়ে ওঠবার কোন আগ্রহ নেই আজ। একটা ওয়াড়হীন বিবর্ণ লেপ মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে চুপচাপ। দিনের আলো চোখে এসে লাগছে না। তবে বোঝা যায়—সকাল হয়েছে। রাতের অন্ধকার উন্মোচিত হয়ে আর একটা দিন এসেছে। মানুষের দৈনন্দিন জীবন আরম্ভ হয়েছে আবার/ তারই কলকোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠেছে চারিদিক।

প্রথমে করপোরেশনের ময়লা ফেলা গাড়ি চলে যায়। তারই ঝকর ঝকর শব্দ ভেসে আসে রাস্তা থেকে। তারপরই তার পাশের সীটের নিবারণবাবু বিছানা ছেড়ে ওঠেন। এবং উঠেই এক গ্লাশ ঠাণ্ডা জল খেয়ে—মানে ঊষা পান করে সামনেকার লম্বা বারান্দায় পায়চারি করেন। তাঁর খড়মের আওয়াজ একবার অতি নিকটে এগিয়ে আসে। আবার আস্তে আস্তে চলে যায় দূরে।

কিন্তু তাও থেমে গিয়েছে এখন। অর্থাৎ যার জন্যে প্রতিদিন এই প্রক্রিয়া করে থাকেন নিবারণবাবু সেই কাজে চলে গিয়েছেন যথাসময়ে। এতক্ষণে সেখান থেকেও বার হয়ে আসবার সময় হলো হয়তো।

ঘরের মধ্যে দীপকের ব্যায়াম শেষ হয়েছে। এখন চিড়িয়াখানার খাঁচায় বন্দী বাঘের মতো ঘরময় ঘোরাঘুরি করছে। আর মাঝে মাঝে দেওয়ালের গায়ে টাঙানো বড়ো আয়নাটার অতি কাছে এগিয়ে গিয়ে হাতের এবং কাঁধের মাসেল ফুলিয়ে দেখছে—আজকে তার শরীরের কতটুকু উন্নতি। লেপের তলা থেকেও যেন দেখতে পায় মলিন।

ও ঘরের নির্মল ঘোষের গলা সাধার আসুরিক চেষ্টাও থেমে গিয়েছে। কাজেই বেলা হয়েছে অনেক। এখন যে যার কাজে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে নিশ্চয়ই।

'একি—মলিন এখনো শুয়ে যে?'

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

আবার বুঝি একটু ঘুমের মতো এসেছিল মলিনের। লেপের তলাকার অলস ওমে নির্বিকল্প হয়ে পড়ে থাকতে ভালো লাগছিল তার। জীবনের অনিবার্য ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চলে গিয়েছিল অন্য এক জগতে। হঠাৎ নিজের নাম অপরের কণ্ঠে উচ্চারিত হতেই সেই আধো ঘুমের আবেশ ভেঙে গেল আচমকা। কিন্তু কোন সাড়া-শব্দ দিলো না। তবে বুঝতে পারলো—সামনেকার ঘরের সুরেশদা' এসেছেন তাদের ঘরের মধ্যে। এইবার যত বাজে আলাপন আরম্ভ হবে।

'কোন অসুখ বিসুখ করেনি তো?'

সুরেশদা জিজ্ঞেস করেন আবার।

না—শুয়ে থাকতে দেবে না। এখনি হয়তো তার মুখের ওপর থেকে লেপখানা সরিয়ে কপালে বুকে হাত দিয়ে দেখবে—সত্যি জ্বর হয়েছে কি না। তাই বুঝি ঝাঁ করে লেপখানা উল্টে ফেলে দিয়ে উঠে পড়ে মলিন। তারপর মাথার বালিশের পাশে রাখা ফ্ল্যানেলের হাফ্ হাতা পাঞ্জাবিটা তুলে নেয় এবং চড়িয়ে দেয় গায়ের ছেঁড়া গেঞ্জিটার ওপরে।

'কি হে—আজ অফিস যাবে না?'

'না।'

কোনদিকে না তাকিয়ে মলিন চলে যায় সোজা কলতলায়। কিন্তু সেখানেও নিস্তার নেই। অতুল দত্ত গায়ে জল ঢালতে ঢালতে

শ‍ুধোয়—'কি হে ঘ‍ুম ভাঙলো? অফিস যাবে না আজ?

মলিন প্রায় চটে বলে—'জ্বালালেরে বাবা। যাবো না অফিসে।'

'হলো কি হে!'—

নিজেরই মেজাজে লজ্জিত হয় মলিন। কিন্তু আশ্চর্য! একদিন না-ই যায় যদি সে অফিসে, তাতে অতো কৌতূহল কেন সকলের! তব‍ু আছে। কারণ নিয়ম বাঁধা জীবনে একট‍ু এই অনিয়মের স‍ুযোগ কোথায় কার!

ঘরে এসেই এলোমেলো হয়ে পড়ে থাকা লেপখানা কোনরকমে ভাঁজ করে রেখে দেয় মাথার বালিশের ওপরে। তার ওপরে সমস্ত বিছানাটা উলটে দেয় একেবারে। সেই সঙ্গে উঠে যায় নীচেকার পাতা তেলচিটে সতরঞ্চিটাও—যেটা বিছানো থাকে সর্ব সময়ে। যার ওপরে মলিন অনবরত গড়ায় সময় পেলেই। এখন হঠাৎ সেটা উঠে যাওয়ায় অনাবৃত হয়ে পড়ে তক্তাপোশের অনেকখানি। আর বার হয়ে পড়ে মলিনের যাবতীয় সঞ্চিত সম্পদ। যত কাগজ পত্র—লাইফ্ ইন্সিওরেন্সের প্রোপোজাল ফরম একখানি—মণিঅর্ডারের রসিদ এবং আরো অনেক কিছ‍ু। সমস্তই ছড়িয়ে পড়ে আছে কিচকিচে ধ‍ুলোর পাতলা একটা আবরণ নিয়ে।

কতদিন থেকে যে এইভাবে রয়েছে সব! যখন যা পেয়েছে তাই মলিন রেখে দিয়েছে এইখানে—নিভৃতে।

আজকে সমস্ত পরিষ্কার করতে হবে। ঝেড়ে ম‍ুছে সাজিয়ে রাখতে হবে আবার নতুনভাবে।

হাত বাড়িয়ে মলিন তুলে নেয় প্রোপোজাল ফরমখানি।

এক সময়ে কোন এক বন্ধ‍ুর অন‍ুরোধে অন্তত এক হাজার টাকার একটা পলিসি নেবে—এই মনস্থ করেছিল সে। হঠাৎ বাবার ম‍ৃত্যুতে সবই ভেস্তা হয়ে গিয়েছে। এখন তাদের সংসারের প্রয়োজন অন‍ুযায়ী খরচ জোটাতে পারে না। কাজেই ভবিষ্যতের চিন্তা করবে কি করে?

একটানে ফরমখানি ছিঁড়ে দ‍ু'খণ্ড করে এবং জানালা দিয়ে ফেলে দেয় বাইরে।

তারপর ধ‍ুলো ঝেড়ে আর একখানা কাগজ তুলে নেয় মলিন। ভাঁজ খ‍ুলে দেখে—তার নিজের হাতেরই লেখা একখানি অসমাপ্ত চিঠি। লিখতে আরম্ভ করে আর লেখা হয়ে ওঠে নি। কেন যে হয়নি—তা আজ মনে করতে পারে না। তবে লেখা উচিৎ ছিল—এটা মনে হয় তার।

চিঠিখানির লাইন ক'টি আবার সে পড়ে গভীর মনোযোগে।

এদিকে দ‍ু'তিন বছর কেটে গিয়েছে। নমিতার সে মনোভাব আর নেই বোধহয়। যে স্বপ্নের জালে আটকা পড়ে গিয়েছিল সে—তার থেকে নিজেকে হয়তো ম‍ুক্ত করে নিতে পেরেছে এতদিনে।

হঠাৎ মলিন আরো একট‍ু বিষণ্ণ হয়ে যায়।

কারণ, সেই জাল বিস্তার করেছিল মলিনই আগে। আর সেই সঙ্গে জাগিয়ে তুলেছিল তার নারী জীবনের স‍ুপ্তিমগ্ন আকাঙ্ক্ষাকে। বলেছিল—'এইভাবে আর না থেকে এসো এইবার আমরা বিয়ে করি।'

অফিসগ‍ুলির ছ‍ুটি হয়েছে তখন। ঘরম‍ুখো ক্লান্ত কেরাণীর দল ছড়িয়ে পড়েছে ডালহৌসির চারিদিকে। ট্রামে বাসে ঠেলাঠেলি ভিড়। ফ‍ুটপাথ দিয়েও চলেছে অনেকে। তারই মাঝে মলিন আর নমিতা চলেছিল পাশাপাশি—ফ‍ুটপাথ ধরে। ওরই এক ফাঁকে একট‍ু নির্জন পেয়ে কথাটা বলেছিল নমিতাকে।

এক একদিন তাই করে ওরা। পাঁচটা বেজে দশ মিনিটের মধ্যে মলিন চলে আসে হংকং ব্যাঙ্কের সামনে—একটা গ্যাস পোস্টের নীচে। তার কয়েক মিনিট পরেই নমিতা আসে। তারপর সম্ভব হলে বাসে কিংবা ট্রামে ওঠে। আর না হয়তো হাওড়া পর্যন্ত যায় হাঁটতে হাঁটতে। সেই সময়ে ওদের কথা হয় যত।

তার থেকেই মলিন জানতে পেরেছে—নারকেলডাঙ্গায় আর থাকে না ওরা। দেড়-খানা মাত্র ঘরে খ‍ুবই কষ্ট হচ্ছিল ওদের। পাকিস্থান থেকে এসে অন্য কোথাও আশ্রয় না পেয়ে উঠেছিল সেখানে—মাসতুতো ভাই যতীনদাদার কাছে। তাতে ওদের ওপরে যেন একটা জ‍ুল‍ুম করা হয়েছিল। তব‍ু তার যতীনদা—অমন মান‍ুষ আর হয় না—ম‍ুখ ফ‍ুটে একটি কথাও বলেনি কোনদিন। তাদের জন্যে বাসায় শোবার জায়গা পর্যন্ত পায়নি। বিছানা বালিশ বগলে করে রোজ শ‍ুতে গিয়েছে অন্য এক জায়গায়—তার এক ডাক্তার বন্ধ‍ুর ডিস্‌পেন্‌সারিতে।

মাসীমা বৌদি বিরক্ত হননি তার জন্যে। কেবল যন্ত্রণা দিয়েছে বাড়িটার অন্যান্য ভাড়াটেরা। তাদের জল কলের উটকো অংশীদার এসে জোটায় অসন্তোষ প্রকাশ করেছে তারা মাঝে মাঝে।

যতীনদা বলেছে—'কারোর কথায় কান দেবে না তোমরা। নিজের নিজের কাজ সেরে চলে আসবে।' একট‍ু থেমে আবার বলেছে—'আমিও ভাড়া দিয়ে থাকি—অমনি থাকিনে।'

তব‍ু শশধরবাব‍ু—নমিতার বাবা—স্বস্তিবোধ করতেন না। তাদের জন্যে অন্য কারোর অস‍ুবিধা হোক—এটা চাইতেন না তিনি। কিন্তু কি করবেন! কোন উপায়ও করতে পারছিলেন না সহসা। ঘ‍ুরেছেন তিনি কলকাতা শহরের প্রায় সর্বত্র। যেখানে যত আত্মীয় স্বজন আছে গিয়েছেন তাদের কাছে। কোন স‍ুরাহা হয়নি। একট‍ু বাসোপযোগী জায়গা আর জীবিকা জোগাড় করতে পারেন নি।

যতীনদা বলেছে—'অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন মেসোমশাই—একটা যাহোক ব্যবস্থা হবেই তখন।'

'ব্যবস্থা যে কি হবে—তা একমাত্র ভগবানই জানেন।' হতাশ হয়ে শশধরবাব‍ু বলেছেন—'আমাদের জন্যে তোমাদের যে কষ্ট হচ্ছে—'

এরই মাঝে মলিন একদিন গিয়েছিল তাদের ওখানে।

যতীন তার আগেকার অফিসের বন্ধ‍ু। পাশাপাশি লেজারে কাজ করেছে তারা দ‍ু'জনে। ওরই মধ্যে একট‍ু ভালো একটা স‍ুযোগ পেয়ে মলিন চলে যায় এক বিদেশী ব্যাঙ্কে। আর যতীন এখনো পড়ে আছে সেখানে। যদিও ইতিমধ্যে পদোন্নতি হয়েছে তার। পাশিং অফিসার হয়েছে। কিন্তু মাইনে যা বেড়েছে—জানা আছে সকলের।

সেদিন অফিসে কাজ করতে করতে হঠাৎ মলিনের মনে পড়ে যায় যতীনের কথা—অনেকদিন দেখা হয়নি। তাই ছ‍ুটির পর গিয়েছিল তার আগেকার অফিসে। ওদের অবশ্য ছ‍ুটি হয় কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটায়। আর যতীনদের থাকতে হয় তার পরে আরো সেদিন। অস‍ুখ করেছে বলে নাকি খবর দিয়েছে। কাজেই মলিন চলে যায় বরাবর নারকেলডাঙ্গায়—যতীনের ঠিকানা জোগাড় করে।

সদর দরজা খোলাই ছিল। তব‍ু মলিনকে কড়া নাড়তে হলো। পাঁচ ভাড়াটের বাড়ি। স‍ুতরাং সরাসরি ঢ‍ুকে পড়া তো যায় না!

একটি মেয়ে—উনিশের মতো বয়স, এসে দাঁড়ালো সামনে। উভয়ের চোখাচোখি হতেই মলিন শুধিয়েছে—যতীন আছে?

অমনি মেয়েটি চলে গিয়েছে ভিতরে—কোন কথা না বলে।

তার একটু পরেই যতীন বার হয়ে এসেছে একটা সুজনী গায়ে জড়িয়ে—উশকো-খুসকো এক মাথা চুল নিয়ে।

'আরে তুই!' অন্তরঙ্গতায় একেবারে সহজ হয়ে গিয়েছে যতীন।— 'আমি ভাবলাম ভদ্রলোক আবার কে এলো। নমিতা গিয়ে যেভাবে বললে আমাকে!...আয়—আয় ভেতরে আয়!'

'কেন—আমি কি ভদ্রলোক নই?' সহাস্যে মলিন বলেছে এবং অনুসরণ করেছে যতীনকে। আর আস্তে আস্তে যেন অন্য-মনস্ক হয়ে গিয়েছে সে। দরজার ফ্রেমের মধ্যে এসে যে মেয়েটি দাঁড়িয়েছিল কৌতুহলী দৃষ্টি নিয়ে—তার নাম তাহলে নমিতা!

হ্যাঁ—নমিতার সঙ্গে সেই প্রথম দেখা হয় মলিনের।

তারপর যতীন একদিন বলেছিল মলিনকে—'নমিতাকে কোথায় একটা চাকরি করে দিতে পারিস?'

মলিন অবাক হয়ে গিয়েছিল সে-কথা শুনে।

'আমি যে চাকরি করে দিতে পারি—এ ধারণা তোর হোলো কি করে?'

'আমার ধারণা নয় ভাই।' যতীন বলেছে মৃদু একটু হেসে—'নমিতাই সেদিন আমাকে বলেছিলো—তোকে একবার বলতে তার চাকরির জন্যে; তারপর যতীন আপন মনে বলে গিয়েছে, অথচ তাকে শুনিয়ে—'বড়ো ভালো মেয়ে। নিজের চেষ্টায় বাড়িতে পড়ে ম্যাট্রিক পাশ করেছে। ইচ্ছে ছিলো আরো পড়ার। কিন্তু মেসোমশায় সে সুযোগ তো করে দিতে পারলেন না। বলু দুলেদেরই শেষ পর্যন্ত পড়াতে পারবেন কি-না সন্দেহ। তবু গাঁয়ের স্কুলে মাষ্টারি করতেন বলে ছেলে দুটোকে ফ্রি পড়াতে পারছিলেন। এখন যে কি হবে!'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করেছে যতীন। তাতে মলিনও বিমর্ষ হয়ে গিয়েছে সে সময়ে। বুঝেছে—নমিতার একটা চাকরি না হলে এখন আর উপায় নেই।

কিন্তু মলিন তার কি করবে? সেও যে সামান্য একজন কেরানী। অপরের দুঃখে অভিভূত হওয়া ছাড়া আর কি ক্ষমতা আছে তার? তবু মলিন বলেছিল 'আচ্ছা, দেখবো আমি—যদি কোন সুযোগ পাই—'

তার বুঝি কয়েক মাস পরে—এই হংকং ব্যাঙ্কের সামনে আবার দেখা হয়েছে নমিতার সঙ্গে। একটু দূরে থেকেই তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সে। কিন্তু কাছাকাছি গিয়েও মলিন কোন কথা বলতে পারেনি প্রথমে। নমিতাই বলেছে আগে—একটু খানি হেসে—'কি চিনতে পারেন?'

মলিন বলেছে—'হ্যাঁ খুব চিনতে পারি।' মুহূর্তেক থেমে আবার জিজ্ঞেস করেছে—'তারপর খবর সব ভাল?'

'হ্যাঁ ভালো।' নমিতাও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছে। বলেছে—'আপনি কিন্তু এখনো চিনতে পারেননি আমাকে।' বলে মিটমিটিয়ে সে হেসেছে।

চিনতে ঠিক পারলেও মলিন এইবার না চেনার ভান করেছে; অনেকদিন আগে—সেই এক মিনিটের দেখাটা তার স্মরণের মণিকোঠায় যে অক্ষয় হয়ে আছে—সেটা ওকে বুঝতে না দেওয়াই ভালো। তাই একটু বোকার মতো হেসে মলিন বলেছে—'না ঠিক চিনতে পারিনি। তবে খুবই চেনা লাগছে।'

'আমি যতীন রায়ের মাসতুতো বোন—নমিতা।'

'ও-হ্যাঁ-হ্যাঁ-ঠিকতো।' এতক্ষণে যেন চিনতে পেরেছে—এই রকম মুখের ভাব করেছে মলিন। জিজ্ঞেস করেছে—'তোমরা সেই নারকেলডাঙাতেই আছো তো?'

'না—এখন আর থাকিনে।' নমিতা বলেছে—'এখান উঠে গিয়েছি অন্যখানে।'

'তা এখানে দাঁড়িয়ে যে?' মলিন শুধিয়েছে অবশেষে।

'দাঁড়িয়ে আছি হাওড়ার বাসের জন্যে' বলে নমিতা তাকিয়েছে মলিনের মুখের দিকে—আপনি যাবেন কোনদিকে—এই কথা জিজ্ঞেস করবার জন্যে; কিন্তু তার মুখ দেখে মনে হয়েছে যে-কথা জিজ্ঞেস করেছে সে—তার সম্পূর্ণ জবাব যেন পায়নি এখনো। এই অফিস কোয়ার্টারে নমিতাকে দেখে একটু আশ্চর্য হ'য়ে গিয়েছে মলিন। তাহলে নমিতা কি চাকরি পেয়েছে?

ইতিমধ্যে যতীনের সঙ্গে আর দেখা হয়নি মলিনের। দেখা হলেই জানতে পারতো—নমিতার চাকরি হয়েছে এ-জি-বেঙ্গলে। আর তারা এখন থাকে শ্রীরামপুরে। তাদের গাঁয়েরই এক ভদ্রলোক—যিনি পার্টিশন হবার আগের থেকেই আছেন এই দেশে—তিনিই নিয়ে গিয়েছেন ওদের শ্রীরামপুরে। সেখান থেকেই ডেলী প্যাসেঞ্জারি করে নমিতা। কাজেই বাসে হাওড়ায় যেতে হলে এইখানেই তো দাঁড়াতে হবে তাকে।

মলিন বলেছে—'কিন্তু ট্রাম বাসের যা অবস্থা—তুমি কি করে উঠবে তাই ভাবছি।'

'দেখি আর একটু। না হয় আজো যাবো হাঁটিতে হাঁটিতে,'

'হেঁটেও যাও নাকি?'

'হ্যাঁ-প্রায়ইতো গিয়ে থাকি।' নমিতা বলেছে—'আজকেও যেতে হবে বোধ হয়। কেননা আর বেশীক্ষণ দাঁড়াতে গেলে ছটা পনেরোর গাড়িটাও পাবো না-তাহলে।' বলে নমিতা হেসেছে; মলিনের কাছে বড়ো করুণ মনে হয়েছে তার সেই হাসি। অফিসের হাঁফ ধরা খাটুনির পর আবার এতখানি রাস্তা হেঁটে যাওয়া!

মলিন বলেছে—'চলো—তোমাকে একটু এগিয়ে দিই আমি।'

সেইদিন থেকেই বুঝি আরম্ভ হয়েছে নমিতার সঙ্গে পাশাপাশি চলা।

কিন্তু হাওড়ায় পেঁছেই উভয়ে ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছে। কারণ মলিন থাকে কালীঘাটে। তাকে ফাইভ-এ বাস ধরে চলে আসতে হবে। আর নমিতা গিয়ে মিশেছে ধাবমান জনপ্রবাহের মধ্যে। অমনি মনে হয়েছে মলিনের—যেন একটি পদ্ম ভেসে চলেছে দুর্দমনীয় নদীর কুটিল স্রোতে। দূরে থেকে দাঁড়িয়ে দেখেছে এক দৃষ্টে—যতক্ষণ দেখা যায় তাকে। তারপর আর যখন দেখা যায়নি—মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছে তার। আরো খানিকটা এগিয়ে গেলে হতো ওর সঙ্গে।

তাই করেছে পরের দিন থেকে; একে-বারে ট্রেনে উঠিয়ে দিয়ে এসেছে। সময় থাকলে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে কথা কয়েছে আরো খানিকক্ষণ। অথবা কথা শেষ হয়ে না থাকলে নমিতাকে নামিয়ে এনেছে ট্রেন থেকে। বলেছে—'এর পরেরটায় যেও।'

নমিতাও হাসতে হাসতে নেমে এসেছে। আবার এক একদিন বলেছে—'ওদিকে পেঁছতে যে রাত হয়ে যাবে অনেক।'

'তবে চলো আমিই যাই তোমার সঙ্গে। পরের ট্রেনে না হয় চলে আসবো।'

এবং তাও করেছে মলিন। শ্রীরামপুরের ইষ্টিশন পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে এসেছে

সে একা। নমিতাকে বলেছে,—'এইবার তুমি এগিয়ে দাও আমাকে, কেমন?'

নমিতা বলেছে—'সেই ভালো। আমি তোমাকে এগিয়ে দিই হাওড়া পর্যন্ত। আবার তুমি আমাকে এগিয়ে দিও—'

বলতে বলতে নমিতা হেসে উঠেছে উচ্ছলিত হয়ে। সেই সঙ্গে মলিনও যোগ দিয়েছে তার পৌরুষ কণ্ঠে। আশপাশ দিয়ে যেতে যেতে অনেকে তাকিয়েছে তাদের দিকে। তবু তারা কোন সংকোচ করেনি। লজ্জা এসে বাধা দেয়নি তাদের।

কিন্তু এইভাবে আর চলবে কতদিন?

সেই কথাই মলিন বলেছিল সেদিন নমিতাকে।

আর নমিতা বলেছিল—'না, এখন আমাদের বিয়ে হতে পারে না।'

'কেন?' অতিশয় উদগ্রীব হয়ে মলিন তাকিয়েছিল নমিতার মুখের দিকে। জিজ্ঞেস করেছিল—'এখন হতে পারে না কেন?'

শান্ত এবং অনুত্তেজিত কণ্ঠে নমিতা বলেছিল—'আমাদের সংসারের বর্তমান অবস্থার কথা তুমি জানো। তোমার কাছে আর গোপন নেইতো কিছু। বাবা এখনো পর্যন্ত সে রকম কোন কাজকর্ম জোটাতে পারেননি। বলু-দুলুদের আবার ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে ইস্কুলে, আর আমি এই সময়ে যদি সরে আসি বাবার কষ্ট হবে তাহলে।'

তা অবশ্য সত্যি। নমিতার এই চাকরিটি হওয়ায় তাদের সংসারের সুরাহা হয়েছে খানিকটা। এবং তাতেই বুকে যেন বল এসেছে তার বাবার। জীবনের আশ্বাস পেয়েছেন এতদিনে। নিজেও আবার ঘোরাঘুরি করছেন পরম উৎসাহে। এর ওপরে তিনিও যাতে কিছু আয় বাড়াতে পারেন—এই আশায়।

কিন্তু মলিন যেন ম্রিয়মান হয়ে গিয়েছে। নমিতা ভরসা দিয়েছে তখন।

'তবে শিগ্‌গিরই বোধ হয় বাবার একটা চাকরি হবে কোনোখানেই একটা হাই ইস্কুলে। আর গোটা দুই টিউশানি করছেন তিনি আগের থেকেই। এদিকে বলু এ-বার পরীক্ষা দেবে ইস্কুল ফাইনাল। পাশ করলেই যেখানে হোক একটা চাকরি জুটিয়ে দেওয়া যাবে আশা করি। তারপরে—'

'সে যে অনেক দেরী হয়ে যাবে!' অধৈর্য হয়ে মলিন বলেছে।

নমিতা বলেছে—'অনেক দেরী কেন হবে? মাস কয়েকের মধ্যেই বন্দোবস্ত হয়ে যাবে।'

মাস কয়েক বলতে ঠিক কতদিন—তা নিয়ে আর মাথা ঘামায়নি মলিন। আপাততঃ যে কোন আশা নেই—তার জন্যেই বোধ হয় অন্য রকম হয়ে গিয়েছে সে। শিথিল হয়ে পড়েছে তার হৃদয়ের উন্মত্ত আবেগ। অফিসের পর নমিতার সঙ্গে মিলবার যে আগ্রহ—তাও কমে এসেছে ধীরে। মাঝে মাঝে দেখাও করেনি—এমন দিনও গিয়েছে। কৈফিয়ৎ দিয়েছে—'অফিসের কাজ বেড়ে গিয়েছে খুব। পাঁচটার পরেও থাকতে হচ্ছে আজকাল।'

একটু হেসে নমিতা বলেছে—'ভালোইতো। ওভার টাইম পাচ্ছো।'

অর্থাৎ কোন সন্দেহ জাগেনি তখনো। স্পর্শ করেনি মলিনের সেই উদাসীনতা। সে যেন কিসের একটা স্বপ্নে আবিষ্ট। ধ্যানমগ্ন তারই আশায়।

তার বাবার চাকরি হয়েছে—সে সংবাদ দিয়েছে নমিতা। বলু পাশ করেছে ভালোভাবে। তাও বলেছে একদিন। আর আনন্দে সে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে।

'এইবার বলুর একটা কোন কাজ হলেই—'

অমনি সচেতন হয়ে উঠেছে মলিন। ভেবেছে এখনো সময় আছে। উপায় আছে সাবধান হবার। বুঝিয়ে বললে নমিতা হয়তো মনে কিছু করবে না। তাকে ভুল বুঝবে না।

কিন্তু তার আগেই নমিতা একদিন বলেছে—'তুমিও চলো আজকে শ্রীরামপুরে—আমাদের ওখানে।'

'কেন?'

কারণটা বুঝতে পেরেও মলিন শুধিয়েছে হাসি মুখে।

কবে যেন নমিতাই তাকে বলেছিল—'বলুরও চাকরি হয়ে যাবে আজ কালের মধ্যেই। কোন্নগরের কাছে যে বিরাট মোটরের কারখানাটা আছে—সেইখানে।'

আশা করা যায়, এতদিন সেই কাজটা হয়েছে বলুর। নমিতাদের গাঁয়ের একটি ছেলে এবং তার বাবার ছাত্র ওখানকার ষ্টোরস্ ডিপার্টমেণ্টে কাজ করে। তার চেষ্টাতেই চাকরিটা হবে—এই রকমই যেন বলেছিল নমিতা। তবু মলিন জিজ্ঞেস করেছে—'কেন?'

নমিতা বলেছে—সলজ্জভাবে একটু হেসে—'কেন আবার! আমার বাবার কাছে গিয়ে আজ বলবে আমাদের—'

সুতীক্ষ্ম একটা হুইসলের শব্দে নমিতার গলার ফিসফিস আওয়াজ চাপা পড়ে গিয়েছে। কথার শেষটা আর শোনা যায়নি।

তবে মলিন বুঝতে পেরেছে সবই। তার উত্তরে যে-কথা সে বলতে গিয়েছিল—তা আর বলা হয়নি। ইঞ্জিনের ফোঁসফোঁসানি—যাত্রীদের হৈ চৈ—কুলিদের ছুটোছুটি আর ক্যানভাসারদের গলা ফাটিয়ে বক্তৃতায় একটা বিভ্রান্তিকর আবহাওয়া সেখানে। তার মাঝে সে সমস্ত কথা বিশদভাবে বলবার অবকাশ কোথায়?

নমিতার ব্যস্তকণ্ঠ শোনা গিয়েছে আবার।

'উঠে এসো তাড়াতাড়ি। গাড়ি যে ছেড়ে দিলো!'

প্ল্যাটফর্মের ওপর দিয়ে চলমান গাড়ির সঙ্গে এগিয়ে যেতে যেতে মলিন বলেছে—'আজ আর যাবো না। আর একদিন—'

ক্রমে গাড়ির গতি বেড়ে গিয়েছে। মলিন
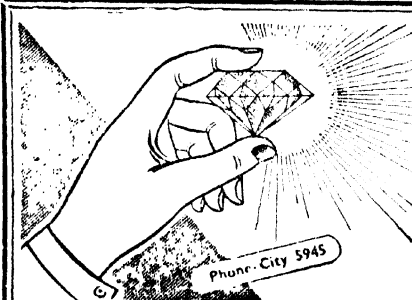
পিছিয়ে পড়েছে। অবশেষে তাকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়েছে এক জায়গায়। আর গাড়িখানি বিসর্পিল গতিতে শিবপুর সিমেণ্ট ব্রিজের তলা দিয়ে গিয়েছে অদৃশ্য হয়ে। নমিতা এখনো জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখেছে তাকে—হাসিহাসি মুখে।

আর মলিন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে। মাথা নীচু করে ফিরে এসেছে তার মেসে। আসবার সময় সারা রাস্তা ভাবতে ভাবতে এসেছে। রাতে বিছানায় শুয়েও ভেবেছে খানিকক্ষণ। তারপর একটা আধ পোড়া মোমবাতি জেবলে চিঠি লিখতে বসেছেঃ

"নমিতা, তোমার বাবার কাছে যাবার পূর্বে আমার কিছু বক্তব্য আছে; আজকে সেই সব কথা তোমাকে বলতেও গিয়েছিলাম। কিন্তু হঠাৎ ট্রেণখানা ছেড়ে দিলো। কাজেই আর বলা হয়নি। এখন ভাবছি ভালোই হয়েছে। সেই অতি অল্প সময়ের মধ্যে আমার সমস্ত কথা গুছিয়ে বলা হতো না। আর বললেও তুমি আমাকে ভুল বুঝতে হয়তো। তারপর একদিন সামনাসামনি কোথাও বসে আমার কথা যে বলবো—তার অবকাশ নেই।—"

একটা দমকা হাওয়া এসে বাতিটা নিভিয়ে দিয়েছে এই সময়ে। আর সেই সঙ্গে অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে উঠেছে ঘরের মধ্যে। শিয়রের দিকে এবং তার বাঁ পাশের সীটের মানুষ দুজন ঘুমুচ্ছে অকাতরে। তাদের নিশ্বাসের ভারি শব্দ শোনা গিয়েছে শুধু। দেশলাইটা বার করে বাতিটা যে আবার জ্বালবে—সে ইচ্ছা হয়নি মলিনের। কলমটি হাতে করে বসে থেকেছে নিশ্চুপে। ভেবেছে—আরো দু'একদিন যাক। আরো খানিকটা ভেবে চিঠিটা লিখতে হবে।

পেছন থেকে হঠাৎ মেসের ঠাকুর জিজ্ঞেস করে—'কি বাবু—আজ আর খাওয়া দাওয়া করবেন না?'

চমকে উঠে মলিন ফিরে তাকায় তার দিকে।

'হ্যাঁ—যাও তুমি ভাত বাড়গে।' বলে হাতের চিঠিখানি ভাঁজ করে রেখে দেয় তার বুকপকেটে।। এবং আবার সে বলে—'আজ আর স্নান করবো না। যা শীত পড়েছে—'

তারপর শীতের ভয়েই হয়তো স্নান না করে মলিন গিয়ে খেতে বসে রান্না ঘরের সামনে। আর ভাবে—চিঠিখানি এখনো লেখা যেতে পারে। একেবারে নীরব থাকা উচিৎ নয়। এতদিনে নমিতা তার সম্বন্ধে যে কি ধারণা করেছে!

তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে মলিন উঠে পড়ে এবং আঁচিয়ে চলে আসে ঘরের মধ্যে। উলটিয়ে রাখা বিছানা থেকে শুধু শতরঞ্চিটা টেনে নিয়ে ছড়িয়ে পাতে—যেমনভাবে পাতা থাকতো আগে। টিনের স্যুটকেশ খুলে তার একমাত্র সখের কলমটি বার করে এবং উঠে গিয়ে বসে তক্তাপোশের ওপরে। তারপর বার করে চিঠিখানি। আর একবার পড়ে নিয়ে লিখতে আরম্ভ করে আবার—যতখানি লেখা আছে তারপর থেকেঃ

'—আমার বাবা মারা গিয়েছেন। সে সংবাদ তুমি জানো। কিন্তু তাতে আমাদের অবস্থা যে কি হয়েছে—তা বোধহয় জানো না; তিনি যতদিন বেঁচেছিলেন—আমরা যেন পাহাড়ের আড়ালে ছিলাম। সারা পৃথিবীতে যে অরাজকতার আগুন জ্বলছে—তার আঁচ একটুও লাগেনি আমাদের গায়ে। তিনি তাঁর বুক দিয়ে যেন ঢেকে রেখেছিলেন আমাদের। যখন যা প্রয়োজন হয়েছে—তাই জুটিয়ে গেছেন তিনি অম্লান মুখে। কারুর মনে কোন খেদ জমতে দেননি।

'কিন্তু অন্যদিক দিয়ে যে ফোঁপরা হয়ে গিয়েছেন তিনি—ভেতরে ভেতরে যে ক্ষয় হয়ে গিয়েছে অনেক কিছু—তা টের পাইনি আমরা। এমন কি তাঁর প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড থেকেও লোন নিয়েছিলেন—যতখানি নেওয়া যায়। তারপর তাঁর মারা যাওয়ার পরে দেখলাম—আমাদের কোন ভবিষ্যৎ নেই—অতীতও নিশ্চিহ্ন। কিন্তু যে কঠোর বর্তমান আমার ঘাড়ে চেপে আছে তাই বয়ে মরছি। মা, তিন বোন, ছোট দুটি ভাই—। তাই অফিসের পরে টিউশানিও করি আজকাল। কিন্তু এদিকে যেভাবে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে চলেছে—'

এমন সময় নিবারণবাবু ফিরে আসেন অফিস থেকে। ঘরে ঢুকেই দেখেন মলিন উবুড় হয়ে পড়ে কি যেন লিখছে আপনমনে। পিঠের শিরদাঁড়াটা বেঁকে গিয়েছে ধনুকের মতো।

গায়ের র‍্যাপারখানি খুলে রাখেন নিবারণবাবু—তাঁর ওলটানো বিছানাটার ওপরে। এবং আর একবার পিছন ফিরে দেখেন মলিনকে। বলেন—'আজ তাহ'লে অফিস যাওনি?'

তারপর একে একে সকলেই ফিরে আসে। আর মলিনকে জিজ্ঞেস করে—'সত্যিই অফিসটা কামাই করলে আজ?'

এদিকে সন্ধ্যে হয়ে আসে। আবছা অন্ধকারে আর লেখা যায় না।

সোজা হয়ে মলিন উঠে বসে এবং সেই অবস্থাতেই চিঠিখানি ভাঁজ করে রেখে দেয় আবার শতরঞ্চিটার তলায়। কাল অফিসে নিয়ে গিয়ে আরো খানিকটা লিখে ডাকে দিলেই হবে।

পরের দিন মলিনের ঘুম ভাঙে একটু দেরিতেই। অমনি তার মনে হয়—অকারণ অফিসটা কামাই করা উচিৎ হয়নি কাল। আজকে গিয়ে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হবে তাকে; এক আধদিন কামাই করলে—অফিস লোক দেয় না সে-জায়গায়। কাজেই তার জন্যে জমা হয়ে আছে সব। তাছাড়া আজ শুক্রবার—ব্যালান্স ডে। নিজের কাজ সামলাবার আগেই যেতে হবে লেজার ডিপার্টমেণ্টে ব্যালান্স করতে।

তাড়াতাড়ি মলিন উঠে পড়ে বিছানা ছেড়ে।

কলতলায় ভিড়—তর্কাতর্কি—আমেরিকা—সোভিয়েট, স্নানঃ

ঠাকু—র—ভা—ত—

কোনরকমে খাওয়া দাওয়া সেরে বার হয়ে পড়ে অফিসে। অন্যান্য দিনের চেয়ে একটু আগেই। কাল যাওয়া হয়নি।

পড়িমরি করে বাস ধরা।

আশ্চর্য! চিঠিখানির কথা একবারও মনে পড়ে না তার।

দুর্গরহস্য

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

১২

পাণ্ডে বলিলেন,—'তল্লাসী পরোয়ানা আছে, আপনার বাড়ী খানাতল্লাস করব। ওয়ারেণ্ট দেখতে চান?'

রামকিশোর ভীত পাংশুমুখে চাহিয়া রহিলেন, তারপর ভাঙা গলায় বলিলেন,—'এর মানে?'

পাণ্ডে বলিলেন,—'আপনার এলাকায় দু'টো খুন হয়েছে। পুলিশের বিশ্বাস অপরাধী এবং অপরাধের প্রমাণ এই বাড়ীতেই আছে। আমরা সার্চ ক'রে দেখতে চাই।'

রামকিশোর আরও কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া—'বেশ, যা ইচ্ছে করুন'—বলিয়া তাকিয়ার উপর এলাইয়া পড়িলেন।

'ডাক্তার!'

ডাক্তার ঘটক প্রস্তুত ছিল, দুই মিনিটের মধ্যে রামকিশোরকে ইনজেকশন দিল। তারপর নাড়ী টিপিয়া বলিল,—'ভয় নেই।'

ইতিমধ্যে আমি জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম, বাহিরে পুলিশ গিশগিশ করিতেছে; সিঁড়ির মুখে অনেকগুলো কনেস্টবল দাঁড়াইয়া যাতায়াতের পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

ইন্সপেক্টর দুবে ঘরে আসিয়া স্যালুট করিয়া দাঁড়াইল,—'সকলে নিজের নিজের ঘরে আছে, বেরুতে মানা করে দিয়েছি।'

পাণ্ডে বলিলেন,—'বেশ। দুজন বে-সরকারী সাক্ষী চাই। অজিতবাবু, ব্যোমকেশবাবু, আপনারা সাক্ষী থাকুন। পুলিশ কোনও বে-আইনী কাজ করে কি না আপনারা লক্ষ্য রাখবেন।'

মণিলাল এতক্ষণ আমাদের কাছে দাঁড়াইয়া ছিল, বলিল,—'আমিও কি নিজের ঘরে গিয়ে থাকব?'

পাণ্ডে তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—'মণিলালবাবু! না চলুন, আপনার ঘরটাই আগে দেখা যাক।'

'আসুন।'

পাণ্ডে দুবে ব্যোমকেশ ও আমি মণিলালের অনুসরণ করিয়া তাহার ঘরে প্রবেশ করিলাম। ঘরটি বেশ বড়, একপাশে খাট, তাছাড়া আলমারী দেরাজ প্রভৃতি আসবাব আছে।

মণিলাল বলিল,—'কি দেখবেন দেখুন।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'বেশী কিছু দেখবার নেই। আপনার দু'টো ফাউণ্টেন পেন আছে সেই দুটো দেখলেই চলবে।'

মণিলালের মুখ হইতে ক্ষণকালের জন্য যেন একটা মুখোশ সরিয়া গেল। সেই যে ব্যোমকেশ বলিয়াছিল, গর্দভ-চর্মাবৃত সিংহ, মনে হইল সেই হিংস্র শ্বাপদটা নিরীহ চর্মাবরণ ছাড়িয়া বাহির হইল; একটা ভয়ংকর মুখ পলকের জন্য দেখিতে পাইলাম। তারপর মণিলাল গিয়া দেরাজ খুলিল; দেরাজ হইতে পার্কারের কলমটি বাহির করিয়া দ্রুতহস্তে তাহার দুদিকের ঢাকনি খুলিয়া ফেলিল; কলমটাকে ছোরার মত মুঠিতে ধরিয়া ব্যোমকেশের পানে চোখ তুলিল। সে-চক্ষে যে কী ভীষণ হিংসা ও ক্রোধ ছিল তাহা বর্ণনা করা যায় না। মণিলাল শ্বা-দন্ত নিষ্ক্রান্ত করিয়া বলিল,—'এই যে কলম। নেবে? এস, নেবে এস।'

আমরা জড়মূর্তির মত দাঁড়াইয়া রহিলাম। পাণ্ডে কোমর হইতে রিভলবার বাহির করিলেন।

মণিলাল হায়েনার মত হাসিল। তারপর নিজের বামহাতের কব্জির উপর কলমের নিব বিঁধিয়া দিয়া অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা কালি-ভরার পিচ্‌কারিটা টিপিয়া ধরিল।

*　*　*

ব্যোমকেশ রামকিশোরবাবুকে বলিল,—'দুধ কলা খাইয়ে কালসাপ পুষেছিলেন। ভাগ্যে পুলিশের এই গুপ্তচরটা ছিল তাই বেঁচে গেলেন। কিন্তু এবার আমরা চললাম, আপনার আতিথ্যে আর আমাদের রুচি নেই। কেবল সাপের বিষের শিশিটা নিয়ে যাচ্ছি।'

রামকিশোর বিহ্বল ব্যাকুল চক্ষে চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। ব্যোমকেশ দ্বার পর্যন্ত গিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, বলিল,—'আর একটা কথা বলে যাই। আপনার পূর্ব-পুরুষেরা অনেক সোনা লুকিয়ে রেখে গিয়েছিলেন। সে সোনা কোথায় আছে আমি জানি? কিন্তু যে-জিনিস আমার নয় তা আমি ছুঁতেও চাই না। আপনার পৈতৃক সম্পত্তি আপনি ভোগ করুন।—চলুন পাণ্ডেজি। এস অজিত।'

*　*　*

অপরাহ্নে পাণ্ডেজির বাসায় আরাম কেদারায় অর্ধশয়ান হইয়া ব্যোমকেশ গল্প বলিতেছিল। শ্রোতা ছিলাম আমি, পাণ্ডেজি এবং রমাপতি।

খুব সংক্ষেপে বলছি। যদি কিছু বাদ পড়ে যায়। প্রশ্ন কোরো।'

পাণ্ডে বলিলেন,—'একটা কথা আগে বলে নিই। সেই যে শাদা গুঁড়ো পরীক্ষা করতে দিয়েছিলেন, কেমিস্টের রিপোর্ট এসেছে। এই দেখুন।'

রিপোর্ট পড়িয়া ব্যোমকেশ ভ্রূকুঞ্চিত করিল,—

'Sodium Tetra Borate-Borax, মানে সোহাগা। সোহাগা কাজে লাগে? এক তো জানি, সোনায় সোহাগা। আর কোনও কাজে লাগে কি?'

পাণ্ডে বলিলেন,—'ঠিক জানি না। সেকালে হয়তো ওষুধ-বিষুধ তৈরির কাজে লাগত।'

রিপোর্ট ফিরাইয়া দিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—'যাক। এবার শোনো। মণিলাল বাইরে বেশ ভাল মানুষটি ছিল, কিন্তু তার স্বভাব রাক্ষসের মত; যেমন নিষ্ঠুর তেমনি লোভী। বিয়ের পর সে মনে মনে ঠিক করল, শ্বশুরের গোটা সম্পত্তিটাই গ্রাস করবে। শালাদের কাছ থেকে সে সদ্ব্যবহার পায়নি, স্ত্রীকেও ভালবাসেনি। কেবল শ্বশুরকে নরম ব্যবহারে বশ করেছিল।

'মণিলালের প্রথম সুযোগ হল যখন একদল বেদে এসে ওখানে তাঁবু ফেলল; সে গোপনে তাদের কাছ থেকে সাপের বিষ সংগ্রহ করল।

*　*　*

'স্ত্রীকে সে প্রথমেই কেন খুন করল আপাতদৃষ্টিতে তা ধরা যায় না। হয়তো

দুর্বল মুহূর্তে স্ত্রীর কাছে নিজের মৎলব ব্যক্ত ক'রে ফেলেছিল, কিম্বা হয়তো হরিপ্রিয়াই কলমে সাপের বিষ ভরার প্রক্রিয়া দেখে ফেলেছিল। মোট কথা প্রথমেই হরিপ্রিয়াকে সরানো দরকার হয়েছিল। কিন্তু তাতে একটা মস্ত অসুবিধে, শ্বশুরের সঙ্গে সম্পর্কই ঘুচে যায়। মণিলাল কিন্তু শ্বশুরকে এমন বশ করেছিল যে তার বিশ্বাস ছিল রামকিশোর তার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দেবেন না। তুলসীর দিকে তার নজর ছিল।

'যাহোক, হরিপ্রিয়ার মৃত্যুর পর কোনও গণ্ডগোল হল না, তুলসীর সঙ্গে কথা পাকা হয়ে রইল। মণিলাল ধৈর্য ধ'রে অপেক্ষা করতে লাগল, সম্পর্কটা একবার পাকা হয়ে গেলেই শালাগুলিকে একে একে সরাবে। দু' বছর কেটে গেল, তুলসী প্রায় বিয়ের যুগ্যি হ'য়ে এসেছে, এমন সময় এলেন ঈশানবাবু; তার কিছুদিন পরে এসে জুটলেন সাধুবাবা। এঁদের দু'জনের মধ্যে অবশ্য কোনও সংযোগ ছিল না; দু'জনে শেষ পর্যন্ত জানতে পারেননি যে বন্ধুরা এত কাছে আছেন।

'রামকিশোরবাবু ভাইকে মৃত্যুর মুখে ফেলে পালিয়েছিলেন এ গ্লানি তাঁর মনে ছিল। সন্ন্যাসীকে চিনতে পেরে তাঁর হৃদযন্ত্র খারাপ হয়ে গেল, যায়-যায় অবস্থা। একটু সামলে উঠে তিনি ভাইকে বললেন, 'যা হবার হয়েছে, কিন্তু এখন সত্যি কথা প্রকাশ হলে আমার বড় কলঙ্ক হবে। তুমি কোনও তীর্থস্থানে গিয়ে মঠ তৈরি করে থাকো, যত খরচ লাগে আমি দেব।' রামবিনোদ কিন্তু ভাইকে বাগে পেয়েছেন, তিনি নড়লেন না; গাছতলায় ব'সে ব'সে ভাইকে অভিসম্পাত দিতে লাগলেন।

'এটা আমার অনুমান। কিন্তু রামকিশোর যদি কখনও সত্যি কথা বলেন, দেখবে অনুমান মিথ্যে নয়। মণিলাল কিন্তু শ্বশুরের অসুখে বড় মুশকিলে পড়ে গেল; শ্বশুর যদি হঠাৎ পটল তোলে তার সব প্ল্যান ভেস্তে যাবে, শালারা তন্দণ্ডেই তাকে তাড়িয়ে দেবে। সে শ্বশুরকে মন্ত্রণা দিতে লাগল, বড় দুই ছেলেকে পৃথক ক'রে দিতে। তাতে মণিলালের লাভ, রামকিশোর যদি হার্টফেল ক'রে ম'রেও যান, নাবালকদের অভিভাবকরূপে অর্ধেক সম্পত্তি তার কব্জায় আসবে। তারপর তুলসীকে সে বিয়ে করবে, আর গদাধর সর্পাঘাতে মরবে।

'মণিলালকে রামকিশোর অগাধ বিশ্বাস করতেন, তাছাড়া তাঁর নিজেরও ভয় ছিল তাঁর মৃত্যুর পর বড় দুই ছেলে নাবালক ভাই-বোনকে বঞ্চিত করবে। তিনি রাজি হলেন; উকিলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চলতে লাগল।

'ওদিকে দুর্গে আর একটি ঘটনা ঘটছিল; ঈশানবাবু গুপ্তধনের সন্ধানে লেগেছিলেন। প্রথমে তিনি পাটিতে খোদাই করা ফারসী লেখাটা পেলেন। লেখাটা তিনি সযত্নে খাতায় টুকে রাখলেন এবং অনুসন্ধান চালাতে লাগলেন। তারপর নিজের শোবার ঘরে গজাল নাড়তে নাড়তে দেখলেন, একটা পাথর আলগা। বুঝতে বাকি রইল না ঐ পাথরের তলায় দুর্গের গুপ্ত তোষাখানা আছে।

'কিন্তু পাথরটা জগদ্দল ভারী; ঈশানবাবু রুগ্ন বৃদ্ধ। পাথর সরিয়ে তোষাখানায় ঢুকলেন কি করে? ঈশানবাবুর মনে পাপ ছিল, অভাবে তাঁর স্বভাব নষ্ট হয়েছিল। তিনি রামকিশোরকে খবর দিলেন না, একজন সহকারী খুঁজতে লাগলেন।

'দুজন পূর্ণবয়স্ক লোক তাঁর কাছে নিত্য যাতায়াত করত, রমাপতি আর মণিলাল। ঈশানবাবু মণিলালকে বেছে নিলেন। কারণ মণিলাল ষণ্ডা বেশী। আর সে যে শালাদের ওপর খুশী নয় তাও ঈশানবাবু বুঝেছিলেন।

'বোধ হয় আধাআধি বখরা ঠিক হয়েছিল। মণিলাল কিন্তু মনে মনে ঠিক করলে সবটাই সে নেবে, শ্বশুরের জিনিস পরের হাতে যাবে কেন? নির্দিষ্ট রাত্রে দু'জনে পাথর সরিয়ে তোষাখানায় নামলেন।

'হাঁড়িকলসীগুলো তল্লাস করবার আগেই ঈশানবাবু মেঝের ওপর একটা মোহর কুড়িয়ে পেলেন। মণিলালের ধারণা হল হাঁড়ি কলসীতে মোহর ভরা আছে। সে আর দেরী করল না, হাতের টর্চ দিয়ে ঈশানবাবুর ঘাড়ে মারল এক ঘা। ঈশানবাবু অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে গেলেন। তারপর তাঁর পায়ে কলমের খোঁচা দেওয়া শক্ত হল না।

কিন্তু খুনীর মনে সর্বদাই একটা ত্বরা জেগে থাকে। মণিলাল ঈশানবাবুর দেহ ওপরে নিয়ে এল। এই সময় আমার মনে হয়, বাইরে থেকে কোনও ব্যাঘাত এসেছিল। মুরলীধর ঈশানবাবুকে তাড়াবার জন্যে ভয় দেখাচ্ছিলই, হয়তো সেই সময় ইট-পাটকেল ফেলেছিল। মণিলাল ভয় পেয়ে গুপ্তদ্বার বন্ধ করে দিলে। হাঁড়িগুলো দেখা হল না; টর্চটাও তোষাখানায় রয়ে গেল।

'তোষাখানায় যে সোনাদানা কিছু নেই একথা বোধ হয় মণিলাল শেষ পর্যন্ত জানতে পারেনি। ঈশানবাবুর মৃত্যুর হাঙ্গামা জুড়োতে না জুড়োতে আমরা গিয়ে দুর্গে বসলাম; সে আর খোঁজ নিতে পারল না। কিন্তু তার ধৈর্যের অভাব ছিল না; সে অপেক্ষা করতে লাগল, আর শ্বশুরকে ভজাতে লাগল দুর্গটা যাতে তুলসীর ভাগে পড়ে।

'আমরা যে স্রেফ হাওয়া বদলাতে যাইনি, এ সন্দেহ তার মনে গোড়া থেকেই ধোঁয়াচ্ছিল, কিন্তু কিছু করবার ছিল না। তারপর কাল বিকেল থেকে এমন কয়েকটা ঘটনা ঘটল যে মণিলাল ভয় পেয়ে গেল। তুলসী তার কলম চুরি ক'রে রমাপতিকে দিতে গেল। কলমে তখন বিষ ছিল কিনা বলা যায় না, কিন্তু কলম সম্বন্ধে তার দুর্বলতা স্বাভাবিক। রমাপতিকে সে দেখতে পারত না—ভাবী পত্নীর প্রেমাস্পদকে কেই বা দেখতে পারে? এই ছুতো ক'রে সে রমাপতিকে তাড়ালো। যাহোক, এ পর্যন্ত বিশেষ ক্ষতি হয়নি, কিন্তু সন্ধ্যাবেলা আর এক ব্যাপার ঘটল। আমরা যখন সাধুবাবার কাছে বসে তাঁর লম্বা লম্বা কথা শুনছি—'হম্ ক্যা নহি জানতা' ইত্যাদি, সেই সময় মণিলাল বাবাজীর কাছে আসছিল; দূরে থেকে তাঁর আস্ফালন শুনে ভাবল, বাবাজী নিশ্চয় তাকে ঈশানবাবুর মৃত্যুর রাত্রে দুর্গে যেতে দেখেছিলেন, সেই কথা তিনি দুপুরে রাত্রে আমাদের কাছে ফাঁস করে দেবেন।

'মণিলাল দেখল, সর্বনাশ! তার খুনের সাক্ষী আছে। বাবাজী যে ঈশানবাবুর মৃত্যু সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, তা সে ভাবতে পারল না; ঠিক করল রাত বারোটার আগেই বাবাজীকে সাবাড় করবে।

'আমরা চ'লে আসবার পর বাবাজী এক ঘটি সিদ্ধি চড়ালেন। তারপর বোধ হয় মণিলাল গিয়ে আর এক ঘটি খাইয়ে এল। বাবাজী নির্ভয়ে খেলেন, কারণ মণিলালের ওপর তাঁর সন্দেহ নেই। তারপর তিনি নেশায় বুঁদ হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। এবং যথাসময় মণিলাল এসে তাঁকে মহাসুষুপ্তির দেশে পাঠিয়ে দিলে।'

আমি বলিলাম,—'আচ্ছা, সন্ন্যাসী ঠাকুর যদি কিছু জানতেন না তবে আমাদের রাত-দুপুরে ডেকেছিলেন কেন?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'ডেকেছিলেন তাঁর নিজের কাহিনী শোনাবার জন্যে, নিজের আসল পরিচয় দেবার জন্যে।'

'আর একটা কথা। কাল রাত্রে যে রামকিশোরবাবুর ঘরে চোর ঢুকেছিল সে চোরটা কে?'

'কাল্পনিক চোর। মণিলাল সাধুবাবাকে খুন ক'রে ফিরে আসবার সময় ঘরে ঢুকতে গিয়ে হোঁচট খেয়েছিল, তাতে রামকিশোরবাবুর ঘুম ভেঙে যায়। তাই চোরের আবির্ভাব। রামকিশোরবাবু আফিম খান, আফিম-খোরের ঘুম সহজে ভাঙে না, তাই মণিলাল নিশ্চিন্ত ছিল; কিন্তু ঘুম যখন ভাঙল তখন মণিলাল চট্ ক'রে একটা গল্প বানিয়ে ফেলল। তাতে রমাপতির ওপর একটা নতুন সন্দেহ জাগানো হ'ল, নিজের ওপর থেকে সন্দেহ সরানো হল। রমাপতির তোরঙ্গতে হরিপ্রিয়ার সোনার কাঁটা লুকিয়ে রেখেও ঐ একই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল। যা শত্রু পরে পরে। যদি কোনও বিষয়ে কারুর ওপর সন্দেহ হয় রমাপতির ওপর সন্দেহ হবে।'

ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইল।

প্রশ্ন করিলাম,—'মণিলাল যে আসামী এটা বুঝলে কখন?'

ব্যোমকেশ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল,—'অস্ত্রটা কী তাই প্রথমে ধরতে পারছিলাম না। তুলসী প্রথম ফাউন্টেন পেনের উল্লেখ করল, তখন সন্দেহ হল। তারপর মণিলাল যখন ফাউন্টেন পেন আমার হাতে দিলে তখন এক মুহূর্তে সব পরিষ্কার হয়ে গেল। মণিলাল নিজেই বললে বাড়িতে আর কারুর ফাউন্টেন পেন নেই। কেমন সহজ অস্ত্র দেখ, সর্বদা পকেটে বাহার দিয়ে বেড়াও, কেউ সন্দেহ করবে না।'

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিবার পর পাণ্ডেজি বলিলেন,—'গুপ্তধনের রহস্যটা কিন্তু এখনও চাপাই আছে।'

ব্যোমকেশ মুচকি হাসিল।

বাড়ির সদরে একটা মোটর আসিয়া থামিল এবং হর্ন বাজাইল। জানালা দিয়া দেখিলাম, মোটর হইতে নামিলেন রামকিশোরবাবু ও ডাক্তার ঘটক।

ঘরে প্রবেশ করিয়া রামকিশোর জোড়হস্তে বলিলেন,—'আমাকে আপনারা ক্ষমা করুন। বুদ্ধির দোষে আমি সব ভুল বুঝেছিলাম। রমাপতি, তোকেই আমি সবচেয়ে বেশী কষ্ট দিয়েছি বাবা। তুই আমার সঙ্গে ফিরে চল্।'

রমাপতি সলজ্জে তাঁহাকে প্রণাম করিল।

১৩

রামকিশোরবাবুকে খাতির করিয়া বসানো হইল। পাণ্ডেজি বোধ করি চায়ের হুকুম দিবার জন্য বাহিরে গেলেন।

ডাক্তার ঘটক হাসিয়া বলিল,—'আমার রুগীর পক্ষে বেশী উত্তেজনা কিন্তু ভাল নয়। উনি জোর করলেন ব'লেই সঙ্গে নিয়ে এসেছি, নইলে ও'র উচিত বিছানায় শুয়ে থাকা।'

রামকিশোর গাঢ়স্বরে বলিলেন,—'আর উত্তেজনা! আজ সকাল থেকে আমার ওপর দিয়ে যা গেছে তাতেও যখন বেঁচে আছি তখন আর ভয় নেই ডাক্তার।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'সত্যিই আর ভয় নেই। একে তো সব বিপদ কেটে গেছে, তার ওপর ভাল ডাক্তার পেয়েছেন। ডাক্তার ঘটক যে কত ভাল ডাক্তার তা আমি জানি কিনা। কিন্তু একটা কথা বলুন। সন্ন্যাসীকে দাদা বলতে কি আপনি এখনও রাজি নন?'

রামকিশোর লজ্জায় নতমুখ হইলেন।

'ব্যোমকেশবাবু, নিজের লজ্জাতে নিজেই ম'রে আছি, আপনি আর লজ্জা দেবেন না। দাদাকে হাতে পায়ে ধরেছিলাম, দাদা সংসারী হতে রাজি হননি। বলেছিলাম, আমি হরিদ্বারে মন্দির ক'রে দিচ্ছি সেখানে সেবায়েৎ হয়ে রাজার হালে থাকুন। দাদা শুনলেন না। শুনলে হয়তো অপঘাত মৃত্যু হত না।' তিনি নিশ্বাস ফেলিলেন।

পাণ্ডেজি ফিরিয়া আসিলেন; তাঁহার হাতে আমাদের পূর্বদৃষ্ট মোহরটি। সেটি রামকিশোরকে দিয়া বলিলেন,—'আপনার জিনিস, আপনি রাখুন।'

রামকিশোর সাগ্রহে মোহরটি লইয়া দেখিলেন, কপালে ঠেকাইয়া বলিলেন,—'আমার পিতৃপুরুষের সম্পত্তি। তাঁরা সবই রেখে গিয়েছিলেন, আমাদের কপালের দোষে এতদিন পাইনি। ব্যোমকেশবাবু, সত্যিই কি সন্ধান পেয়েছেন?'

'পেয়েছি ব'লেই আমার বিশ্বাস। তবে চোখে দেখিনি।'

'তাহলে—তাহলে—!' রামকিশোরবাবু ঢোক গিলিলেন।

ব্যোমকেশ মৃদু হাসিল।

'আপনার এলাকার মধ্যেই আছে: খুঁজে নিন না।'

'খোঁজবার কি ত্রুটি করেছি, ব্যোমকেশবাবু? কেল্লা কিনে অবধি তার আগাপাস্তলা তন্নতন্ন করেছি। পাইনি; হতাশ হয়ে ভেবেছি সিপাহীরা লুটেপুটে নিয়ে গেছে। আপনি যদি জানেন, বলুন। আমি আপনাকে বঞ্চিত করব না, আপনিও বখরা পাবেন। এ'দের সালিশ মানছি, পাণ্ডেজি আর ডাক্তার ঘটক যা ন্যায্য বিবেচনা করবেন তাই দেব। আপনি আমার অশেষ উপকার করেছেন, যদি অর্ধেক বখরাও চান—'

ব্যোমকেশ নীরস স্বরে বলিল,—'বখরা চাই না। কিন্তু দুটো সর্ত আছে।'

'সর্ত! কী সর্ত?'

'প্রথম সর্ত, রমাপতির সঙ্গে তুলসীর বিয়ে দিতে হবে। দ্বিতীয় সর্ত, বিয়ের যৌতুক হিসেবে আপনার দুর্গ রমাপতিকে লেখাপড়া করে দিতে হবে।'

ব্যোমকেশ যে ভিতরে ভিতরে ঘটকালি করিতেছে তাহা সন্দেহ করি নাই। সকলে উচ্চকিত হইয়া উঠিলাম। রমাপতি লজ্জিত মুখে সরিয়া গেল।

রামকিশোর কয়েক মিনিট হেঁটমুণ্ডে চিন্তা করিয়া মুখ তুলিলেন। বলিলেন,—'তাই হবে। রমাপতিকে আমার অপছন্দ নয়। ওকে চিনি, ও ভাল ছেলে। অন্য কোথাও বিয়ে দিলে আবার হয়তো একটা ভূত বাঁদর জুটবে। তার দরকার নেই।'

'আর দুর্গ?'

'দুর্গ লেখাপড়া করে দেব। আপনি চান পৈতৃক সোনাদানা তুলসী আর রমাপতি পাবে, এই তো? বেশ, তাই হবে।'

'কথার নড়চড় হবে না?'

রামকিশোর একটু কড়া সুরে বলিলেন,—'আমি রাজা জানকীরামের সন্তান। কথার নড়চড় কখনও করিনি।'

'বেশ। আজ তো সন্ধ্যে হয়ে গেছে। কাল সকালে আমরা যাব।'

* * *

পরদিন প্রভাতে আমরা আবার দুর্গে উপস্থিত হইলাম। আমরা চারজন, আমি ব্যোমকেশ পাণ্ডেজি ও সীতারাম। অন্য পক্ষ হইতে কেবল রামকিশোর ও রমাপতি। বুলাকিলালকে হুকুম দেওয়া হইয়াছিল দুর্গে যেন আর কেহ না আসে। সে দেউড়িতে পাহারা দিতেছিল।

ব্যোমকেশ বলিল,—'আপনারা অনেক বছর ধ'রে খুঁজে খুঁজে যা পাননি ঈশানবাবু দু'হপ্তায় তা খুঁজে বার করেছিলেন। তার কারণ তিনি প্রত্নবিৎ ছিলেন, কোথায় খুঁজতে

হয় জানতেন। প্রথমে তিনি পেলেন একটা শিলালিপি, তাতে লেখা ছিল,—"যদি আমি বা জয়রাম বাঁচিয়া না থাকি আমাদের তামাম ধনসম্পত্তি সোনাদানা মোহনলালের জিম্মায় গচ্ছিত রহিল।" এ লিপি রাজারামের কথা। কিন্তু মোহনলাল কে? ঈশানবাবু বুঝতে পারলেন না। বুঝতে পারলে বোধ হয় কোনও গণ্ডগোলই হ'ত না, তিনি চুরি করবার বৃথা চেষ্টা না ক'রেই সরাসর রামকিশোরবাবুকে খবর দিতেন।

'তারপর ঈশানবাবু পেলেন গুপ্ত তোষাখানার সন্ধান; ভাবলেন সব সোনাদানা সেইখানেই আছে। আমরা জানি তোষাখানায় একটি গড়িয়ে পড়া মোহর ছাড়া আর কিছুই ছিল না; বাকি সব কিছু রাজারাম সরিয়ে ফেলেছিলেন। এইখানে ব'লে রাখি, সিপাহীরা তোষাখানা খুঁজে পায়নি; পেলে হাঁড়িকলসীগুলো আস্ত থাকত না।

সে যাক। প্রশ্ন হচ্ছে, মোহনলাল কে, যার জিম্মায় রাজারাম তামাম ধনসম্পত্তি গচ্ছিত রেখে গিয়েছিলেন? একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায় মোহনলাল মানুষ হতে পারে না। দুর্গে সে সময় রাজারাম আর জয়রাম ছাড়া কেউ ছিল না; রাজারাম সকলকে বিদেয় ক'রে দিয়েছিলেন। তবে কার জিম্মায় সোনাদানা গচ্ছিত রাখলেন? মোহনলাল কেমন জীব?

'আমিও প্রথমটা কিছু ধরতে পারছিলাম না। তারপর অজিত হঠাৎ একদিন পলাশীর যুদ্ধ আবৃত্তি করল—"আবার আবার সেই কামান গর্জন...গর্জিল মোহনলাল..."। কামান—মোহনলাল! সেকালে বড় বড় বীরের নামে কামানের নামকরণ হ'ত। বিদ্যুতের মত মাথায় খেলে গেল মোহনলাল কে! কার জিম্মায় সোনাদানা আছে। ঐ যে মোহনলাল!' ব্যোমকেশ আঙুলি দিয়া ভূমিশয়ান কামানটি দেখাইল।

আমরা সকলেই উত্তেজিত হইয়াছিলাম; রামকিশোর অস্থির হইয়া বলিলেন,—'আঁ! তাহলে কামানের নীচে সোনা পোতা আছে!!'

'কামানের নীচে নয়। সেকালে সকলেই মাটিতে সোনা পুতে রাখত; রাজারাম অমন কাঁচা কাজ করেননি। তিনি কামানের নলের মধ্যে সোনা ঢেলে দিয়ে মাটি দিয়ে কামানের মুখ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ঐ যে দেখছেন কামানের মুখ থেকে শুকনো ঘাসের গোছা গলা বাড়িয়ে আছে, একশো বছর আগে সিপাহীরাও অমনি শুকনো ঘাস দেখেছিল; তারা ভাবতেও পারেনি যে ভাঙা অকর্মণ্য কামানের পেটের মধ্যে সোনা জমাট হয়ে আছে।'

রামকিশোর অধীর কণ্ঠে বলিলেন,—'তবে আর দেরি কেন? আসুন, মাটি খুঁড়ে মোহর বের করা যাক।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'মোহর? মোহর কোথায়? মোহর আর নেই, রামকিশোরবাবু। রাজারাম এমন বুদ্ধি খেলিয়েছিলেন যে, সিপাহীরা সন্ধান পেলেও সোনা তুলে নিয়ে যেতে পারত না।'

'মানে—মানে—কিছু বুঝতে পারছি না!'

ব্যোমকেশ বলিল,—'পাণ্ডেজি, তোষাখানায় একটা উনন আর হাপর দেখেছিলেন মনে আছে? সোহাগাও একটা হাঁড়িতে ছিল। বুঝতে পারলেন? রাজারাম তাঁর সমস্ত মোহর গলিয়ে ঐ কামানের মুখে ঢেলে দিয়েছিলেন। ওর ভেতরে আছে জমাট সোনার একটা থাম।'

'তাহলে—তাহলে—!'

'ওর মুখ থেকে মাটি খুঁড়ে সোনা দেখতে পাবেন হয়তো। কিন্তু বার করতে পারবেন না।'

'তবে উপায়?'

'উপায় পরে করবেন। কলকাতা থেকে অক্‌সি-অ্যাসিটিলিন্ আনিয়ে কামান কাটতে হবে; তিন ইঞ্চি পুরু লোহা ছেনি-বাটালি দিয়ে কাটা যাবে না। আপাতত মাটি খুঁড়ে দেখা যেতে পারে আমার অনুমান সত্যি কিনা।—সীতারাম!'

সীতারামের হাতে লোহার তুরপুন প্রভৃতি যন্ত্রপাতি ছিল। আদেশ পাইয়া সে ঘোড়সোয়ারের মত কামানের পিঠে চড়িয়া বসিল। আমরা নীচে কামানের মুখের কাছে সমবেত হইলাম। সীতারাম মহা উৎসাহে মাটি খুঁড়িতে লাগিল।

প্রায় এক ফুট মাটি কাটিবার পর সীতারাম বলিল,—'হুজুর, আর কাটা যাচ্ছে না। শক্ত লাগছে।'

পাণ্ডেজি বলিলেন,—'লাগাও তুরপুন!'

সীতারাম তখন কামানের মুখের মধ্যে তুরপুন ঢুকাইয়া পাক দিতে আরম্ভ করিল। দু'চারবার ঘুরাইবার পরই চাক্‌লা চাক্‌লা সোনার ফালি ছিটকাইয়া বাহিরে আসিয়া পড়িতে লাগিল। আমরা সকলে উত্তেজনায় দিশাহারা হইয়া কেবল অর্থহীন চীৎকার করিতে লাগিলাম।

ব্যোমকেশ হাত তুলিয়া বলিল,—'ব্যস্, সীতারাম, এবার বন্ধ কর। আমার অনুমান যে মিথ্যে নয় তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। রামকিশোরবাবু, দুর্গের মুখে মজবুত দরজা বসান, পাহারা বসান; যতদিন না সব সোনা বেরোয় ততদিন আপনারা সপরিবারে এসে এখানে বাস করুন। এত সোনা আলগা ফেলে রাখবেন না।'—

সেদিন বাসায় ফিরিতে বেলা একটা বাজিয়া গেল। ফিরিয়া আসিয়া শুনিলাম ব্যোমকেশের নামে 'তার' আসিয়াছে। আমাদের মুখ শুকাইয়া গেল। হঠাৎ 'তার' কেন? কাহার 'তার'?—সত্যবতী ভাল আছে তো!

তারের খাম ছিঁড়িতে ব্যোমকেশের হাত একটু কাঁপিয়া গেল। আমি অদূরে দাঁড়াইয়া অপলকচক্ষে তাহার পানে চাহিয়া রহিলাম।

'তার' পড়িতে পড়িতে তাহার মুখখানা কেমন এক রকম হইয়া গেল; তারপর সে মুখ তুলিল। গলা ঝাড়া দিয়া বলিল,—'ওদিকেও সোনা।'

'সোনা?'

'হ্যাঁ—ছেলে হয়েছে।'

* * * *

ছয় মাস পরে বৈশাখের গোড়ার দিকে—

কলিকাতা শহরে গরম পড়ি-পড়ি করিতেছিল। একদিন সকাল বেলা আমি এবং ব্যোমকেশ ভাগাভাগি করিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছি; সত্যবতী একবাটি দুধ ও ছেলে লইয়া মেঝেয় বসিয়াছে, দুধ খাওয়ানো উপলক্ষে মাতাপুত্রে মল্লযুদ্ধ চলিতেছে এমন সময় সদর দরজায় খট্‌খট্‌ শব্দ হইল। সত্যবতী ছেলে লইয়া পালাইবার উপক্রম করিল। আমি দ্বার খুলিয়া দেখি রমাপতি ও তুলসী। রমাপতির হাতে একটি চৌকশ বাক্স, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী, মুখে সলজ্জ হাসি।

তুলসীকে দেখিয়া আর চেনা যায় না। এই কয় মাসে সে রীতিমত একটা যুবতী হইয়া উঠিয়াছে। অগ্রহায়ণ মাসে তাহাদের বিবাহ উপলক্ষে আমরা নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম, কিন্তু যাইতে পারি নাই। ছয় মাস পরে তাহাদের দেখিলাম।

তুলসী ঘরে আসিয়াই একেবারে ঝড় বহাইয়া দিল। সত্যবতীর সহিত পরিচয় করাইয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে সে তাহার কোল হইতে খোকাকে তুলিয়া লইয়া তাহাকে চুম্বন করিতে করিতে ঘরময় ছুটাছুটি করিল; তারপর তাহাকে রমাপতির কোলে ফেলিয়া দিয়া সত্যবতীর আঁচল ধরিয়া টানিতে টানিতে পাশের ঘরে লইয়া গেল। তাহাদের কলকাকলি ও হাসির শব্দ পর্দা ভেদ করিয়া আমাদের কানে আসিতে লাগিল।

তুলসীর চরিত্র যেন পাথরের তলায় চাপা ছিল, এখন মুক্তি পাইয়াছে। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ।

ঘর ঠাণ্ডা হইলে ব্যোমকেশ রমাপতিকে জিজ্ঞাসা করিল,—'বাক্স কিসের? গ্রামোফোন নাকি?'

'না। আমরা আপনার জন্যে একটা জিনিস তৈরি করিয়ে এনেছি'—বলিয়া রমাপতি বাক্স খুলিয়া যে জিনিসটি বাহির করিল আমরা তাহার পানে মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া রহিলাম। আগাগোড়া সোনায় গড়া দুর্গের একটি মডেল। ওজন প্রায় দুই সের, অপূর্ব কারুকার্য। আসল দুর্গের সহিত কোথাও এক তিল তফাৎ নাই; এমন কি কামানটি পর্যন্ত যথাস্থানে রহিয়াছে।

আমরা চমৎকৃত স্বরে বলিলাম,—'বাঃ!'

তারপর খাওয়া দাওয়া গল্পগাছা রঙ্গ-তামাসায় বেলা কাটিয়ে গেল। রামকিশোরবাবুদের খবর জানা গেল; কর্তার শরীর ভালই যাইতেছে, বংশীধর নিজের জমিদারীতে বাড়ি তৈয়ার করিয়াছে; মুরলীধর শহরে বাড়ি কিনিয়া বাস করিতেছে; গদাধর তুলসী ও রমাপতিকে লইয়া কর্তা শৈলগৃহেই আছেন; চাঁদমোহন আবার জমিদারী দেখাশুনা করিতেছেন। দুর্গটিকে সম্পূর্ণরূপে সংস্কার করানো হইতেছে। তুলসী ও রমাপতি সেখানে বাস করিবে।

অপরাহ্নে তাহারা বিদায় লইল। বিদায়কালে ব্যোমকেশ বলিল,—'তুলসী, তোমার মাস্টার কেমন?'

মাস্টারের দিকে কপট কুটিল কটাক্ষপাত করিয়া তুলসী বলিল,—'বিচ্ছিরি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হুঁ। একদিন আমার কোলে বসে মাস্টারের জন্যে কেঁদেছিলে মনে আছে?'

এবার তুলসীর লজ্জা হইল। মুখে আঁচল চাপা দিয়া সে বলিল,—'ধেৎ!'

শেষ

বিজ্ঞপ্তি

আগামী সপ্তাহ হইতে শ্রীবিমল মিত্র'র উপন্যাস 'সাহেব-বিবি-গোলাম' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

একখানি মাটির কোঠা ঘর—অর্থাৎ দোতলা, উপরে একখানি নিচে দুখানি কুঠরী—সামনে বারান্দা, সামনে খানিকটা উঠান, উঠানের এক পাশে একখানি রান্নাঘর, এই নিয়ে শান্তির বাসা। সবেরই খড়ের চাল, কিন্তু মেঝেগুলি সবই পাকা সিমেন্ট করা, সে দোতলার কুঠরীর মেঝে পর্যন্ত। ওই প্রমোদ ঘোষের বাড়ীর মতই। এ অঞ্চলের মাটি খুব শক্ত, ভালভাবে মাটির কাজ করে—এ অঞ্চলের লোকে বলে পাকিয়ে দেওয়াল তুললে সে দেওয়াল ইটের দেওয়াল থেকে কম শক্ত হয় না। এখানকার ইঁটই বরং খারাপ, সামান্য আঘাতেই গুঁড়ো হয়ে ভেঙে যায়, ত্রিশ চল্লিশ বছর যেতে না-যেতে নোনা ধরে। এ ছাড়া পাকা দেওয়াল পাকা ছাদ ঘরের থেকে মাটির দেওয়াল খড়ের চাল ঘরগুলি অনেক আরামের। এবং এ অঞ্চলে মাটির দেওয়ালের উপর এমন মাটির পলেস্তারা হয় যে, তার উপর চুনের কলি ফেরালে শোভায় সৌন্দর্যে পাকা ঘরের কাছে হার মানে না।

দেবকী দেবী বলেছিলেন, বলেছিলেন কিশোরবাবুকে, ভাই আমাদের দেশ নরম মাটির দেশ, দেখেছ কিনা জানি না, বাবা ছিলেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মানুষ, ছিটে বেড়ার ঘর, চালটা ছিল টিনের। সে পক্ষে এতো রাজপ্রাসাদ।

সত্য কথা বলতে মা ও মেয়ের পক্ষে বাড়িখানি ভালই। কিন্তু সন্তোষবাবু যে বাড়িখানি কিনে গিয়েছিলেন, সেখানি ছিল একতলা পাকা। সে হিসেবে মূল্যের দিক দিয়ে হয়তো বা দেশকাল অনুযায়ী মর্যাদার দিক দিয়ে এ বাড়ি তার সমতুল্য নয়। তা ছাড়া ও বাড়িতে তাঁদের স্বত্বাধিকার আছে এ বাড়িখানা শান্তি তার চাকরীর জন্য কোয়ার্টার হিসেবে পেয়েছে। এই নিয়ে দেবকী দেবীর অসন্তোষ না-থাকলেও শান্তির ছিল। তার বাপের বাড়ি সে পাবে না কেন? সে মামলা মোকদ্দমা করতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু কিশোরবাবু সে করতে দেন নি।

সেদিন সকাল বেলা শান্তি আপন মনেই বকে যাচ্ছিল—আর বাড়ির মেটে উঠান ঝাঁট দিচ্ছিল। গত সন্ধ্যায় একদফা ঝড় গিয়েছে, কালবৈশাখী হয়ে গেছে, তার জন্য পাতায় খড়ে উঠানটায় আবর্জনা জমে ছিল রাশীকৃত পরিমাণে। বকছিল সে বাউড়ী ঝিকে। বাউড়ী ঝি—শ্রী এককড়ি—ডাকনাম কড়ি—আজ এখনও আসে নি। আসবে কিনা তাও বলা যায় না। কাল ঝড় গিয়েছে ভোর-বেলাতেই নিশ্চয় গ্রামের চারিপাশের বাগানে ছুটেছে, ভাঙা ডাল খসে পড়া তালপাতা সংগ্রহের জন্য। এ জন্য অনুযোগের উপায় নাই, অনুযোগ করলে কড়ি একেবারে দশ-পঁচিশের কড়ির মত কট কট করে উঠবে। শান্তিকে বলবে—নেকাপড়া শিখেছ ইস্কুলে চাকরী কর, চ্যারে অর্থাৎ চেয়ারে, গিদ্দ্যা মেরে বসে এ্যা—বি—সি পড়াবে কত চালে কত জল সেদ্ধ হয়ে ভাত হয়—কত খড় কাট পোড়ে তার হিসেব জান? বলি এখন যদি কাঠ কুটো কুড়িয়ে না রাখব তো বর্ষার সময় চুলো ধরাব কিসে? কয়লার 'ডিপুতে' কয়লা নাই, যদি এল তো কামিটির চিরকুট আন, চিরকুট আনতে যাব তো বলবে রেশন কাট কই? রেশন কাটের লেগে এওনান বোটে যাব তো বলবে ট্যাক্সো আনো। মা গো মা, বলে না কি—রামরাজত্ব হবে, সায়েব মাশায়রা চলে গেল, তা রামরাজত্বের নমুনা ভাল। তার ওপরে কোন দ্যাশ থেকে তোমরা উড়ে এসে জুড়ে বসলে। কেন এলে বাপু?

শুধু ঝড় জলই নয়—পর্ব-পার্বণেও কড়ি কামাই করে। মদ খায়, নাচে, গান গায়, পরের দিন ঘুমোয়, তার পরের দিন আসে। বলে—কি করব, গা-গতরে বেথা করছিল। তোমাদেরও তো মনিষ্যির শরীর;—গা-গতরে বেথা তো তোমাদেরও করে।

তিরস্কার করলে—কড়ি ঝাঁটা ফেলে দিয়ে পালাবে। বলবে—রইল কাজ। তখন ছুটতে হয় বিজয়ের কাছে। বিজয়ের কাছে মানেই ভৈরব দেবতার কাছে। বিচিত্র মানুষ। এক হাতে লাঠী এক হাতে সেবা। আর মুখে কটু কথা। এক কথায় মীমাংসা। মীমাংসা নয় হুকুম।

বিজয়ের পিসীমা একবার বাড়ির বাউড়ী ঝিকে—চিরকালের অভ্যাসমত বলেছিলেন—হারামজাদী—জুতোর-বাড়িতে তোর মুখ ছেঁচে দেব।

বিজয় ঘরেই ছিল সে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসে বলেছিল—এ সব চলবে না। তোমাকে বলতেই হবে এ কথা আমি প্রত্যাহার করছি।

পিসীমার বিস্ময়ের অবধি ছিল না—প্রত্যাহার কি? তার মানে কি?

—মানে আবার কি? প্রত্যাহার মানে প্রত্যাহার। তার মানে ফিরিয়ে নিচ্ছি, ঘুরিয়ে নিচ্ছি।

—ঘুরিয়ে নিচ্ছি। বলেছি কথা ফিরিয়ে নেব কি করে?

—সে হবে না। নিতে হবে।

—কি করে নেব?

—বলতে হবে ওকে। বলতে হবে—কিছু মনে করিস না—কথা ঘুরিয়ে নিচ্ছি আমি।

—তাই বল্। ওর কাছে মাফ্ চাইতে হবে!

—হ্যাঁ। তাই মনে কর তো তাই। হারাম-জাদী বলবার অধিকার নাই তোমার। জুতো মেরে মুখ ভেঙে দেবারও অধিকার নাই।

—বাউড়ীর মেয়েরও নাই?

—না—না—না। নাই।

—বেশ তবে আমি কাশী যাব। এ রাজ্যে আমি থাকব না।

—কাশীও এই রাজ্য। এ রাজ্যের বাইরে নয়।

কাশী শিবের কাশী।

—শিবের বাবার নয়। কাশী ইন্ডিয়ান ইউনিয়নের ভিতরে। মাফ্ তোমাকে চাইতে

হবে। বাউড়ী ঝি-টি ছিল প্রবীণা, অনেক দিনের ঝি—বিজয়কে সে ছেলেবেলায় কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে। সেই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল ঘটনাটার পরিণতি দেখে। সে বলেছিল—হেই বিজয়, তু থাম। বিজয় হেই বাবা!

—থাম, তুই থাম। মাফ্ না চাইলে—তুই যদি কাজ করতে আসিস তো তোর ঠ্যাঙ ভেঙে দেব আমি।

শেষে পিসীমা বলেছিলেন—আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব। কাশী তাদের রাজ্য কিন্তু যমের বাড়ি তো নয়।

সে এক হুলস্থূল কাণ্ড। গণ্ডগোলের মধ্যে সে দিন ব্যাপারটা অমীমাংসিতভাবে শেষ হলেও বিজয় ছাড়ে নি। সে বাড়িতে বাক্যবন্ধ করেছিল। শেষ একদিন পিসীমাই বলেছিলেন—তাই বলছি বাবা—তাই বলছি আমি গোষ্ঠবালাকে।

বিজয় একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছিল এর পর। বক্তৃতাটির যুক্তির জোর থাক বা না থাক বিজয়ের গলার জোরে প্রায় যাত্রার আসর বসে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল প্রভাস যজ্ঞে দ্বারকার দ্বারীর হাতে বৃন্দাবনের গোপাদের লাঞ্ছনা দেখে উত্তপ্ত হৃদয় ভীম শ্রীকৃষ্ণের কাছে গিয়ে চীৎকার শুরু করে দিয়েছেন।—ওরে অকৃতজ্ঞ, ওরে পাষাণ, ওরে হৃদয়হীন, ওরে রাজসম্পদ মোহান্ধ! কাঁধে গদাটা নাচছে, কখন যে ঘুরতে শুরু করবে কেউ বলতে পারে না। তফাতের মধ্যে যাত্রার দলের ভীমের গদাটা হয় তুলোর; বিজয়ের গদাটা নিরেট কাঠের।

আর একবার কড়ির মাসীকে ওদের পাড়ায় নাকে খত দিয়েছিল বিজয়। কড়ির মাসী মনিবের বাড়ি কি প্রয়োজনে অগ্রিম মাইনে নিয়ে রেখেছিল; তারপর খাটতে গিয়ে মনে হয়েছিল বিনা মাইনেতে খাটছে সে তাই একদিকে কাজে যেমন ঢিল দিয়েছিল অন্যদিকে এটা ওটা সেটা চুরিতে তৎপর হয়ে উঠেছিল। একদিন সন্দেহক্রমে ঘুঁটে গুনে—আশী গণ্ডা ঘুঁটে যাট গণ্ডা হওয়ায় মনিব তাকে তিরস্কার করেছিলেন—উত্তরে কড়ির মাসী ঘুঁটে গুণে দেখা ছোটলোক—অভিধানে সম্বোধন করে বলেছিল—এমন ছোটলোকের বাড়ি আমি কাজ করি না।

মনিব মাইনে ফেরৎ চেয়েছিলেন—বলেছিলেন—অগ্রিম মাইনে নিয়ে রেখেছিস—সে ফেরৎ দিয়ে যা।

—সালিশ, সালিশ করে লাওগা। এমন ছোটলোক, এমন ছোটলোক। বলে—থু-থু করে বাড়িতে থুৎকার নিক্ষেপ করে চলে গিয়েছিল।

বিজয় তার পাড়াতে গিয়ে হুকুম জারী করেছিল—পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে হবে মনিবের। জাতির সামনে নাকে খত দিতে হবে। পাঁচ হাত। আর গোবর দিয়ে থুথু ফেলা জায়গা নিকিয়ে দিতে হবে।

কড়ির মাসীর প্রতিবাদের উপায় ছিল না। চার বছর আগে কড়ির মাসীর কলেরা হয়েছিল, সে সময় নিঃসন্তান কড়ির মাসীকে দেখবার কেউ ছিল না, তখন দেখেছিল বিজয়, শুধু দেখা নয় পাশে বসে সেবা করেছিল হাসপাতালের ডাক্তার ডেকে শিরা কেটে জল ঢুকিয়ে বাঁচিয়েছিল। হাত কাটা শিরায় জোড়ের দাগটা এখনও গুটলে বেঁধে রয়েছে। সেটায় হাত বুলাতে বুলাতেই কড়ির মাসী কাঁদতে শুরু করেছিল আমি তা হলে খাব কি বল?

খাবি—ঘাস, খাবি খাবি, মরবি। তা বলে চুরি করবি? বদমাস বেটী পাজী কোথাকার! আবার থুথু ফেলে এসেছিস?

—চুরি করব কেনে? জিনিস আনতে দস্তুরী তো পাওনা গণ্ডা!

—আশী গণ্ডায় কুড়ি গণ্ডা টাকায় সিকি তোর দস্তুরী? এবার থেকে রেশনের কেরাসিন আমি সিকি কমিয়ে দেব। ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স চার আনা বাড়িয়ে দোব। কাপড়ের দোকানে বলে দেব দশ হাত কাপড়ের আড়াই হাত কেটে নেবে।

এরই মধ্যে কোথা থেকে খবর পেয়ে ছুটে এসেছিল কানাই বাউড়ী। পাড়ার মাতব্বর। দু পুরুষ তারা এখানকার মাতব্বরী করছে। নোটন—তার ছেলে কানাই। কানাই পাড়ার কালীতলা বাঁধিয়ে দিয়েছে, কানাই ষ্টেশনে গরুর গাড়ি নিয়ে ভাড়া খাটে। কানাই বিজয়ের চেলা। আবার কড়ির মাসতুত ভাইও বটে। কড়ির মাসী কানাইয়েরও মাসী। কানাই এসেই বলেছিল—এখুনি—এখুনি নাকে খত দে বলছি মাসী। যা বলছে বাবু তাই কর। অন্যায় করেছিস—আবার বাবুর সাথে তকরার জুড়েছিস? তোকে বাঁচিয়েছিল না?

—না তো বলি নাই।

—তবে?

—তবে বাঁচিয়েছে বলে মাথা কিনেছে নাকি?

—মরলে যে মাথাটাও পুড়ে ছাই হত। বেঁচেছিস বলেই তো মাথাটা রইছে।

—আমি খাব কি? খেটে মাইনে পাই না।

—মাইনে যে আগাম নিয়ে রেখেছিস।

—তা তো নিয়েছি। কিন্তু পেট তো আছে!

বিজয় বলেছিল—ওরে বেটী তোকে বাঁচানোই আমার ঝকমারি হয়েছে। বেঁচেছিস তাই পেটটা বেঁচেছে। তাই দায়ে চুরি ধরেছিস। আচ্ছা সে হবে। নলে দেব—মাসে মাসে কেটে নেবে টাকা। বদমাস পাজী। যাও গিয়ে পায়ে ধরে এস—থুথু ফেলার জায়গা নিকিয়ে দিয়ে এস। পাড়ায় নাকে খত নাও। কানাই ভার রইল তোর।

শান্তি কড়িকেই বকছিল—এদিকে আবদারের অন্ত নেই মেয়ের, আজ একটা বডি দাও দিদিমণি, কাল একটা সায়া, পরশু একটা সেমিজ, আর চুরির তো মা-বাপ নেই। যা পাবে চুরি করবে। আজ আর বিজয়কে না বললে চলছে না। তুমি আর বারণ করতে পাবে না। আমি বলবই।

দেবকী দেবী দাওয়া এবং ঘরের ভিতরটা ঝাড়া মোছা করছিলেন। তিনি হেসে বললেন—বলে কি করবি? দু দিন কি চার দিন কাজ করবে ভাল করে—তারপর আবার সেই যা তাই!

—ও কে জবাব দেব।

—আবার যে আসবে সেও তাই করবে।

—আর লোক রাখব না।

—সে অবিশ্যি ভাল কথা। কিন্তু তা তো হবে না। যা হবে না তা ভেবে বা হঠ করে করে ফেলা ঠিক নয়।

—করতেই হবে। তোমাকে বলি নি আমি। কাউকেই বলি নি। কিশোর মামাকেও বলি নি। আমি চাকরীতে জবাব দিয়েছি। সে দিন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে আমি বলে দিয়েছি। এখানে থাকতেও আমার ইচ্ছে নাই। এত বড় পতিতের জায়গা আমি দেখি নি। এখানে লোকে মহাদেব সরকারকে দোষ দেয়। কিন্তু এখানে সবাই মহাদেব সরকার। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট মামার নাম জানে। আমি তাঁর ভাগ্নী শুনে বললেন—আপনি তাঁর ভাগ্নী! এ পাপ জায়গায় আপনি এলেন কেন? এত বড় পাপিষ্ঠের স্থান আমি দেখি নি। এখানে নিখাদ সোনার মত ধাতুতেও কলঙ্ক লাগে। আমার ফাইলে আজও পঁচাত্তর খানা দরখাস্ত রয়েছে। কত জনের নামে যে কত দরখাস্ত তার হিসেব করে উঠতে একটা কেরাণী হিমসিম খেয়ে গেল। সব বেনামী। আমার নামে চারখানা দরখাস্ত। দু খানাতে বিজয়ের সঙ্গে অবৈধ সংসর্গের অভিযোগ। একখানাতে আমি মেয়েদের ধর্ম বিরুদ্ধ শিক্ষা দিই। একখানা এই সদ্য গিয়েছে, যেখানার কথা সে দিন গুণীবাবু ইঙ্গিতে উল্লেখ করেছিলেন। গৌরীদাদার বাড়ি যাই হাস্য পরিহাস করি, অনেক রাত্রি পর্যন্ত থাকি ইত্যাদি, ইত্যাদি। আগেকার তিনখানা দরখাস্ত গুণীবাবু ইস্কুলের সেক্রেটারী হিসেবে এখানকার প্রধান লোক ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হিসেবে মিথ্যে বলে দিয়েছেন, সে বাতিল হয়েছে। কিন্তু এখানা নিয়েছেন, বলেছেন—এ বিষয়ে একটু এনকোয়ারির প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। কেননা, শুনেছি পাঠিকা এবং লেখক হিসেবে ওঁদের পরিচয় ছিল। সেই ধরণের নোটও তিনি দিয়েছেন।

দেবকী দেবী স্তব্ধ হয়ে মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে কথা শুনছিলেন। তাঁর অপরিসীম সহিষ্ণুতাও যেন অপরিসীমার সীমা রেখার আভাষ পেয়েছে—মুখ চোখ কঠিন হয়ে উঠেছে।

শান্তি ঝাঁটাখানা ফেলে কাপড়ের আঁচলটা কোমরে শক্ত করে বাঁধতে বাঁধতে বললে—আর একটা কথা শুনবে? এর নাকি সাক্ষী হল বিজলী।

—বিজলী? চমকে উঠলেন দেবকী দেবী। বিস্ময়ের আর অবধি রইল না তাঁর।

—হ্যাঁ বিজলী। দরখাস্তে লিখেছে—শিক্ষয়িত্রী কুমারী শান্তি দেবীর বাড়িতে স্থানীয় দরিদ্র অভিজাত বংশের কন্যা বিজলী দেবী নামক একটি সহায়হীনা মহিলা পানীয় জল তুলিয়া দেন, আরও দুই চারিটা কাজ করিয়া দেন—এ বিষয়ে প্রয়োজন হইলে গোপনে তাঁহার সাক্ষ্য লইতে পারেন।

শান্তি একটু বিচিত্র হাসি হেসে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে বললে—বিজলীকে গোপনে ডেকে তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে ঠিক এই কথা বলবে।

—সে এই কথা বলবে?

—হ্যাঁ বলবে।

দেবকী দেবী যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

স্বামী সন্তোষবাবুর শ্যালিকার নাতনী বিজলী। মেয়ের মেয়ে। দেবকী দেবী যখন নবগ্রামে প্রথম আসেন—সতীনের ভাইপোদের বাড়িতে এসে দাঁড়ান তখন তাদের ও তাদের ছেলেমেয়েদের সকলের দৃষ্টিই ভ্রূকুটি কুটিল হয়ে উঠেছিল; কপালে সারি সারি তিক্ততার রেখা দেখা দিয়েছিল। শান্তি মুখের উপরেই প্রশ্ন করেছিল—আপনারা এত বিরক্ত হচ্ছেন কেন? আমরা কারও ভার হতে আসি নি। দেবকী দেবী হেসে বলেছিলেন—এ বিপদে ধর্ম রাখতে জাত রাখতে আত্মীয় জেনে তোমাদের আশ্রয়ে এসেই দাঁড়িয়েছি। বর্ধমানে শান্তির বৈমাত্রেয় ভাই আছেন, তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই আছেন—তাঁরা শান্তির খুড়ো আমার দেওর। কিন্তু তিনি নিজে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন নি, আমাদেরও বলতেন—ভুলেও যেন আমরা কখনও সুখে দুঃখে তাদের মনে না করি। তবে নবগ্রামের শ্বশুরবাড়ির কথা তোমাদের কথা একমুখে বলে যেন শেষ করতে পারতেন না তিনি। আর একখানা দলিল তিনি দিয়ে গিয়েছেন—এখানে একখানা বাড়ি তিনি রেখে গেছেন। তাই এসে তোমাদের আশ্রয়ে দাঁড়িয়েছি।

ভ্রূকুটি সরল হয় নি, কপালের রেখা মিলিয়ে যায় নি, বাড়ির নাটমন্দিরে থাকতে দিয়ে তাঁরা চলে গিয়েছিলেন—বলেছিলেন—বাড়ি তো ঠিক তাঁর নয়, তাঁকে থাকতে দেওয়া হয়েছিল মাত্র। জীবনস্বত্ব। তা, সে যা হবার পরে হবে এইখানে থাকুন। পরে একটা আশ্রয় দেখে নেবেন। ভাড়ার বাড়িও পাওয়া যাবে।

তারা চলে যাবার পর নজরে পড়েছিল—বিজলী বসে আছে স্মিত মুখে।

সে নিজেই নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছিল—তুমি তা হলে আমার দিদিমা তুমি মাসীমা। তারপর বলেছিল—বাড়ি দাদামশায়েরই বটে। তা ওরা দেবে না। কিছুতেই দেবে না। বুঝেছ দিদিমা জিলীপির প্যাঁচ। মামলা মকদ্দমায় জুড়ি নাই। এই দেখ না আমার অবস্থা। এ বাড়ির কর্তার উইলে নাকি আমার, আমার ছেলে হলে তার খাবার পরবার ব্যবস্থা আছে। তা দেয় না। বিয়ে হয়েছে হাড় হাভাতের ঘরে, আমাকে নেয় না, ভাত দেয় না, বুড়ো মা রয়েছে চোখে দেখতে পায় না, সে আমার ঘাড়ে; আমি লোকের ঘরে—তা অবিশ্যি, যার তার ঘরে নয়, এই ধর বামুনের বিধবার কি ঠাকুর দেবতার ভোগের খাবার বলে রান্নার জলটা তুলে দিই। দরকার হলে দু দশ দিন রান্না করে দিই। খাই; দু টাকা-চার টাকা যে যা ছেন্দা করে দেয় নিই। কাপড়ও দেয়। তা অবিশ্যি মাইনে নয়, চাকরীও নয়। চাকর বলতে পারবে না। এত বড় ঘরের কন্যে—তা কি পারি? তা ভেবো না দিদিমা। মাসী যদি আমার সঙ্গে লাগে—আমি কাজ দেখে দোব। আর তোমাকেও নয় হাল্কা রান্নার কাজ দেখে দেবো। গতর থাকলে ভাবনা কি? এখানকার ছোঁড়া কটা আছে খুব পাজী। মাসীর পিছনে হয় তো লাগবে। তা লাল চোখ করে তাকালে কেঁচো হয়ে যাবে। নিজে সতী হলে কাকে ভয়! যমকে ভয় করি না। না—কি বল?

শান্তি সবিস্ময়ে প্রায় বিস্ফারিত চোখে তার দিকে চেয়েছিল। দেবকী দেবী অবাক হন নি। তিনি এই দুঃখিনী মেয়েটিকে মুহূর্তে ভালবেসে ফেলেছিলেন। নিজের এই বহু দুঃখের জীবনের বহু কষ্টে অধিকার করা কর্মের গণ্ডীটুকুর মধ্যে তাদের স্থান দিতে পাওয়ার মত উদারতা মেয়েটির পক্ষে তো কম কথা নয়! তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন।

তাই এখানে শান্তির চাকরী হতেই—তিনি বিজলীকে ডেকে বলেছিলেন—ভাই নাতনী মাসীর তো তোমার চাকরী হল সংসারে তো বাজ আছে—সে তো এই বুড়ির ঘাড়ে। নইলে চাকরী করে শান্তি আর সময় পাবে কখন বল? আমার সঙ্গে একটু হাত মিলিয়ে সাহায্য করবে কেমন? এইখানে খাবে। আমি যেমন পারব তেমনি করব; কেমন?

বিজলী বলেছিল—শুধু তাতে হবে না দিদিমা। মাসীকে বল আমাকে লেখাপড়া শেখাতে হবে। এমন করে দাসীবৃত্তি করতে আর পারব না।

শান্তি চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু বিজলীই পিছু হটেছে। সে মাইনে নিয়েই কাজ করে। দেবকী দেবী তাকে অনেকই দেন। সেই বিজলী গোপনে সাক্ষ্য দিলে—এই মিথ্যা কথা বলবে? তিনি আবারও নিতান্ত যন্ত্রচালিতের মত ঐ প্রশ্ন করলেন—বিজলী বলবে এই কথা।

—বলবে—তার সঙ্গে আরও একটা জেনে রাখ—মধ্যে মধ্যে রাত্রে যে আমাদের বাড়িতে ঢেলা পড়ে—সে ফেলে কয়েক জনেই। তার মধ্যে ওই বিজলী একজন।

দেবকী দেবী উঠে দাঁড়ালেন। পাঁচীলের ওপাশে একখানা জীর্ণ বাড়ির দিকে মুখ করে উঁচু গলাতেই ডাকলেন—বিজলী! বিজলী!

শান্তি ব্যস্ত হয়ে বললে—থাম মা। বাইরে পথ দিয়ে কারা যাচ্ছে। এ নিয়ে কেলেঙ্কারী করো না। লড়াই করতে হয় কর। সে করব আমি। চাকরী ছেড়ে দিয়ে করব। (ক্রমশ)

ভলিবল খেলায় ভারত ও বিদেশ

ভগবানদাস জৈন

[এই প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুত ভগবানদাস জৈন গত বিশ বৎসর হইল ভলিবল খেলার হিত বিশেষভাবেই জড়িত। ১৯৩৬ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত লিম্পিক অনুষ্ঠানের কর্মসূচীতে সর্বপ্রথম ভলিবল খেলা অন্তর্ভুক্ত করা হইলে শ্রীযুত জন উত্তর প্রদেশ দলের খেলোয়াড় হিসাবে উহাতে যোগদান করেন। ইহার পর াম্বাইয়ের অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত অলিম্পিক অনুষ্ঠানে উত্তর প্রদেশ দল দ্বিতীয় স্থান ধিকার করে। শ্রীযুত জৈন ঐ দলেও খেলিবার সৌভাগ্যলাভ করেন। এলাহাবাদ শ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে ইনি ভলিবল খেলায় অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করায় বিশ্ব-বদ্যালয় ইঁহাকে "ভলিবল ব্লু" বা কৃতি খেলোয়াড় বলিয়া অভিহিত করেন। ১৯৪০ ালে এলাহাবাদের নিখিল ভারত বিক্রম ভলিবল প্রতিযোগিতায় পাতিয়ালা ও গোরক্ষ-ুর প্রথম যোগদান করেন। শ্রীযুত জৈন ঐ সময় প্রতিযোগিতার সম্পাদক ছিলেন। রবর্তী বৎসরে উত্তর প্রদেশে মহিলা ভলিবল প্রতিযোগিতা প্রবর্তন করা হয়। শ্রীযুত জন ঐ প্রতিযোগিতার প্রবর্তক। মস্কোর প্রথম মহিলা বিশ্ব ভলিবল প্রতিযোগিতায় যে ারতীয় মহিলা ভলিবল দল যোগদান করেন শ্রীযুত জৈন ঐ দলের ম্যানেজার ও শিক্ষক হসাবে দলের সহিত গিয়াছিলেন। মস্কোর বিভিন্ন খেলার বিবরণী তিনি এই প্রবন্ধের ধ্য দিয়া একরূপ ছায়াচিত্র সম প্রতিফলিত করিয়াছেন।]

বিশ্বের সকল ক্রীড়ামোদীর দৃষ্টি বর্তমানে ভলিবল খেলার উপর বদ্ধ। ইহা সোভিয়েট ইউনিয়নের স্পোর্টস ফিজিক্যাল কালচার কমিটির ভলিবল সমিতি সম্প্রতি পরিচালিত প্রথম মহিলা শ্ব ভলিবল ও দ্বিতীয় পুরুষ বিশ্ব লবল চ্যাম্পিয়নসিপের চমকপ্রদ আড়ম্বর র্ণ অনুষ্ঠানেরই ফলস্বরূপ। বিশ্ব লিম্পিক অনুষ্ঠানের উদ্যোগ আয়োজন মার কোনদিন দেখিবার সৌভাগ্য হয় নাই, ন্তু তাহা হইলেও আমি মস্কোতে যাহা খিয়াছি তাহা হইতে বলিতে পারি যে, লবল খেলা মস্কোতে যেরূপ জাঁকজমক, ড়ম্বরপূর্ণ আবহাওয়ায় সম্মানিত হইয়াছে ন খেলার ভাগ্যেই বোধ হয় তাহা হয় । সোভিয়েট ইউনিয়ন এই ভলিবল ম্পিয়নসিপের জন্য খুব কম করিয়া লেও ১০০ মিলিয়ান রুবলস বা ৯ কোটি হাজার টাকা (১৯৪৯ সালের হিসাবে) করিয়া থাকিবেন।

রুমানিয়া বনাম ফ্রান্স

মস্কোর খেলা সম্পর্কে প্রথম উল্লেখ বার পূর্বে আমি একরূপ দৃঢ়তার তেই অভিমত প্রকাশ করিতে চাহি যে, পপরিসর স্থানের খেলার মধ্যে ভলিবল খেলা যে অত্যন্ত কৌশলপূর্ণ, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিসম্পন্ন, শ্রমসাধ্য একনিষ্ঠ দলগত খেলা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। পুরুষ বিভাগের রুমানিয়া ও ফ্রান্সের খেলা অবলোকন করিয়া সত্যই উত্তেজনার অবকাশ ছিল না। ইণ্ডোর স্টেডিয়ামে এই খেলা তীব্র গতিবেগের মধ্যে দুই ঘণ্টা ২০ মিনিট পরিচালিত হয়। উভয় দল ছিল শ্রমশক্তিসম্পন্ন। তাহা হইলেও রুমানিয়া দলে এস রোম্যান নামক একজন নির্ভরযোগ্য স্ম্যাসার বা চাপ মারার অভিজ্ঞ খেলোয়াড় ছিলেন। যাঁহার জন্য এই খেলায় রুমানিয়া সাফল্যলাভ করে। ফরাসী দলের রক্ষণভাগ ও রাউণ্ডহ্যাণ্ড সার্ভিসগুলিও ছিল পর্বতসম অচল ও অটল। তৃতীয় গেমের শেষে উভয় দলের খেলোয়াড়গণকেই দীর্ঘ দৌড় শেষকারী অশ্বের ন্যায় হাঁপাইতে দেখা যায়। প্রথম গেম হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চম বা শেষ গেম পর্যন্ত উভয় দলই ঘন ঘন খেলোয়াড় পরিবর্তন করে। এমনকি শেষ গেমে ১৩ পয়েণ্টের সময়েই খেলোয়াড় পরিবর্তন করা হয়। রুমানিয়া খেলায় শেষ পর্যন্ত ১৫-১২, ১৫-১১, ১৪-১৬, ১১-১৫, ১৫-৯ গেমে ফ্রান্সকে পরাজিত করে। উভয় দলের খেলোয়াড়গণের শ্রমশক্তি ও দৃঢ়তা প্রশংসনীয়। বিশেষ করিয়া ফরাসী দলের অধিনায়ক এফ সুজার দ্যাঁ সকল অবস্থার মধ্যে উত্তেজনাহীন মনোভাবের পরিচয় দেন তাহা উল্লেখ না করিয়া পারা যায় না। সর্বদিক দিয়া খেলাটাকে অপূর্ব ও চমকপ্রদ বলা চলে। এমনকি ফাইনালে রাশিয়া ও চেকোশ্লাভিয়া অপেক্ষাও উন্নত স্তরের হয়।

খেলা সূচনার অনুষ্ঠান

প্রতিযোগিতার খেলার মধ্যে কতকগুলি বিষয় ছিল যাহা উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেকটি খেলার সূচনা ও পরিসমাপ্তি সত্যই সুন্দর ও ক্রীড়ামনোসুলভ। উভয় প্রতিদ্বন্দ্বী দলের ১২ জন করিয়া খেলোয়াড় একের পর এক ধীরস্থির পদক্ষেপে বিরাট ডায়নামো স্টেডিয়ামে প্রবেশ করে। তাঁহাদের পুরোভাগে পাঁচজন পরিচালক, রেফারী আম্পায়ার, স্কোয়ার ও দুইজন লাইনসম্যান। উভয় দলের খেলোয়াড়গণ নিজ নিজ কোর্টের ডানদিকের লাইনের সারিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন। মাইক্রোফোনে উভয় দলের প্রত্যেকটি খেলোয়াড়ের নাম ঘোষণা করা হইতে লাগিল—খেলোয়াড়গণ একের পর এক নাম ডাকের সঙ্গে সঙ্গে লাইন ছাড়িয়া সম্মুখে একপদ অগ্রসর হইয়া পুনরায় লাইনে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এইভাবে বিরাট দর্শকমণ্ডলীর সহিত খেলোয়াড়দের হইল পরিচয়। সর্বশেষে মাইকে ঘোষণা করা হইল দলের শিক্ষকের নাম। তাহার পর খেলা শুরু। ভারতীয় মহিলা ভলিবল দলকেও এইভাবেই পরিচিত করিবার পর প্রত্যেক দিনই ঘোষণা করা হইত যে তাঁহারা প্রতিযোগিতায় সর্বকনিষ্ঠ দল। খেলা শিক্ষা করিবার মহৎ উদ্দেশ্য লইয়াই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছেন। এইভাবে ভারতীয় মহিলা ভলিবল দলের যোগদান সমর্থন করা হয়। খেলার পরিসমাপ্তি হইলে বিজয়ী দলের পতাকা উক্ত দেশের জাতীয় সঙ্গীতের তালে তালে উত্তোলন করা। উভয় দলের অধিনায়ক পরস্পরের সহিত করমর্দন। তাহার পর ইহারা অগ্রসর হইয়া খেলার পরিচালকদের সহিত একের পর এক করমর্দন। ইহার পর উভয় দলের খেলোয়াড়গণ পরস্পরের সহিত করমর্দন ও কোলাকুলি। পুনরায় সারিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া যেভাবে স্টেডিয়ামে প্রবেশ করিয়াছিলেন ঠিক সেইভাবেই ধীর পদক্ষেপে স্টেডিয়ামের বাহিরে গমন। সেইভাবেই প্রতি দিনের প্রত্যেকটি খেলার সূচনা ও পরিসমাপ্তির অনুষ্ঠান পরিচালিত হইল।

স্টেডিয়াম

মস্কোর বিশ্ব ভলিবল চ্যাম্পিয়ানশিপ প্রতিযোগিতায় ১১টি দেশের প্রতিনিধি যোগদান করেন। এই অনুষ্ঠানের স্থান

হিসাবে মনোনীত করা হয় বিরাট ডায়নামো স্টেডিয়াম। এই স্টেডিয়ামে ৮০ হাজার দর্শকের বসিবার ব্যবস্থা আছে। প্রতিযোগিতার সময় বিরাট স্টেডিয়ামের প্রত্যেকটি প্রবেশ-পথের উপরেই 'যোগদানকারী ১১টি দেশের পতাকা উড্ডীন। খেলা অনুষ্ঠানের কোর্টের নিকট যে বিরাট ইলেকট্রিক স্কোর বোর্ড তাহার উপরেই ১১টি দেশের পতাকা শোভা পায়। আন্তর্জাতিক ভলিবল ফেডারেশনের সভাপতির টেবিলের উপরেই ক্ষুদ্রাকৃতি ১১টি দেশের পতাকা সারিবদ্ধভাবে সাজান। মাঠের অপর প্রান্তে স্কোরারের টেবিল তাহাতেও জাতীয় পতাকাসমূহ। স্কোরারই ইলেকট্রিক স্কোর বোর্ডের পরিচালক। দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী দলের দুই কোর্টের পার্শ্বেও নিজ নিজ দেশের ছোট ছোট জাতীয় পতাকা। খেলার মাঠের নেট এইরূপ সুদৃঢ় রজ্জুবদ্ধ যে খেলার সময় মধ্যে মধ্যে তার টানিবার যে স্বাভাবিক দৃশ্য পরিলক্ষিত হয় তাহা অবলোকন করিতে হয় নাই। নেটের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সকল সময়েই পুরুষদের ক্ষেত্রে আট ফিট ও মহিলাদের ক্ষেত্রে সাড়ে সাত ফিট উচ্চতা নিম্ন ভাগের ভূমির সহিত সমান্তরালভাবে রক্ষা করে। এই নেটের উচ্চতা পরিমাপের জন্যও একটি লম্বা রুলে ৬ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের একটি নির্দেশক। নেটের উচ্চতা বৃদ্ধি বা হ্রাসের জন্য একটি পার্শ্বের একটি পোল বা খুঁটিতে ছিল একটি চাবি যাহা ঘুরাইলেই ইচ্ছামত ফল পাওয়া যায়। খেলিবার বলটিও অদ্ভুতভাবে নির্মিত। ইহার উপরিভাগে কোন লেশ্ নাই। মাঠের জমির উপরিভাগ পুরু বালিতে পূর্ণ। মনে হইতেছিল যেন খেলোয়াড়গণ শৈশবে এই মাঠেই যেন স্কেটিং করিয়াছে। অল্প কথা বলিতে গেলে বলিতে হয় সমস্ত কিছুই আমাদের নিকট নূতন ও অভিনবত্ব সৃষ্টি করে।

আইন ও খেলার পদ্ধতি

মস্কোতে মহিলাদের ভলিবল খেলা যাহা অবলোকন করিয়াছি তাহা সত্যই অদ্ভুত। ইঁহারা চিতার ন্যায় বলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়েন। কেহবা নেটের উপরে উঠিয়া যায়। তাহার পর বল স্ম্যাস্ করেন বা চাপ মারেন। বল ধরিবার জন্য ইঁহারা প্রতিবারই স্বচ্ছন্দচিত্তে অপূর্ব দক্ষতার সহিত বলের গতির মুখে ডাইভ করেন। তীব্র গতিবেগসম্পন্ন খেলার মধ্যে ইঁহারা এইভাবেই খেলেন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে একটিও আঁচড় ইঁহাদের দেহে লাগে না। ইঁহাদের কোন সময়েই হাঁটুর উপর ভর করিয়া মাটিতে পড়িতে দেখা যায় না, পড়েন পাশভাবে। বলের গতি যতই বেগসম্পন্ন হউক না কেন ইঁহারা হাতের আঙ্গুলের সাহায্যেই স্ম্যাস্ করেন বা চাপ মারেন। ইঁহাদের খেলার মধ্যে কোন সময়েই চঞ্চল বা বিরত হইতে দেখা যায় না।

এই প্রসঙ্গে কতকগুলি খেলার আইন সম্পর্কে উল্লেখ করিলে বিশেষ উপভোগ্য হবে। একজন খেলোয়াড় বল লব করিবার পরেই সার্ভ করিতে পারেন। ইহার বাহিরের

মস্কো হইতে প্রাপ্ত পুরস্কার

লাইনের ১০ ফিট দূর হইতে সার্ভ করিতে পারেন। এমন কি বল নেট অতিক্রম করিবার পূর্বেই দৌড়াইয়া কোর্টে প্রবেশ করিতে পারেন। একজন খেলোয়াড় যখন বল সার্ভ করিতেছেন তখন সেই দলের দুই কি তিনজন খেলোয়াড় ঠিক তাঁহার সম্মুখে নেটের পার্শ্বে হাত উঁচু করিয়া নাড়িতে পারেন। ইহার দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বী দলের বলের গতি নিরীক্ষণের পথ রুদ্ধ হয়। ইহা ছাড়াও ইঁহারা আঙ্গুলের সাহায্যে তালু দিয়া নহে বল পাস করিতে পারেন। তবে বল পাস করিবার সময় হাতের উপরিভাগ দেহের সহিত লাগিয়া থাকে, ছড়াইয়া নহে। দুই হাতের দুই তালু খোলা অবস্থায় বলে আঘাত করিলে ফাউল হয়। এইরূপ বল একটি হাতের তালুকে অপর হাতের তালুর উপর রাখিতে হইবে ও বিচক্ষণতার সহিত বলে আঘাত করিতে হইবে। কোন কোন সময়ে "বুস্টার" যখন ঠিক নেটের মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছেন তখন তিনি বল লব করিয়া পিছনে ঠেলিয়া দেন ও তিনিই বল স্ম্যাস করেন। যদি বুস্টার ডানদিকের শেষ প্রান্তে থাকেন তখন দুইজন খেলোয়াড় এক সঙ্গে স্ম্যাস করিবার জন্য লাফাইয়া উঠেন যাহাতে প্রতিদ্বন্দ্বী দল বলের গতি সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিতে পারেন। এই খেলায় খেলোয়াড়দের মধ্যে সম্পূর্ণ সহযোগিতা ও বোঝাপড়া থাকা প্রয়োজন—অন্য কোন খেলায় এতটা নাই।

রাশিয়া ও ভলিবল খেলা

আমাকে মস্কোতে বলা হইয়াছে যে, রাশিয়ানরা ভলিবল খেলাটি দৈনন্দিন কর্ম ও আহারের ন্যায় অপরিহার্য হিসাবেই গ্রহণ করিয়া থাকেন। একটি ক্ষেত্রে আমি দেখিয়াছি যে, আটটি কোর্ট ভলিবল খেলোয়াড়ে পরিপূর্ণ। আমার সহিত একজন রাশিয়ান ভলিবল খেলোয়াড়ের আলাপ হইয়াছিল। ইঁহার বাম হস্তটি একেবারেই কাটিয়া ফেলা হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও ইনি একটি হাতে সার্ভ করেন, বুস্ট করেন ও তীব্রভাবে স্ম্যাস করেন। আমি একজন রাশিয়ান মহিলা দেখিয়াছি যাঁহাকে ভলিবল খেলার প্রতীক বলা চলে। ইঁহার নাম ম্যাদাম ম্যাসিয়াভা। ইনি একজন স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। ইঁহার ভলিবল সম্পর্কে কোন শিক্ষা ও রেফারীর ডিপ্লোমা নাই। কিন্তু ইনি বহু খেলায় রেফারী ও স্কোরারের কার্য করিয়াছেন। ইঁহাকে আমাদের দলের শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করা হয়। ইঁহার শিক্ষাপদ্ধতি অপূর্ব। এই ধরণের শিক্ষয়িত্রী ভারতে থাকিলে আমি সত্যই সুখী হইতাম।

এই প্রসঙ্গে আমি ইউরোপের পূর্বাঞ্চলে কিরূপে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপর ভিত্তি করিয়া ভলিবল খেলান হয় তাহা উল্লেখ করিব। খেলা আরম্ভ হইবার পূর্বে খেলোয়াড়গণ মাংসপেশীর জড়তা দূর করিবার জন্য ১৫ হইতে ২০ মিনিটব্যাপী একপ্রকার ব্যায়াম করেন। ইহার ফলও অপূর্ব। আমাদের দলের মহিলাগণই আমাকে এই বিষয় বলিয়াছেন। ইহার পর খেলোয়াড়গণ গোলভাবে দাঁড়াইয়া বল পাশ করা অভ্যাস করেন। ইহার পর ডাইভিং ইত্যাদি। খেলা আরম্ভের পূর্বে আমার

বিশ্ব ভলিবল প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী ভারতীয় মহিলা দল : বাঁদিক থেকে দাঁড়িয়ে—রাজেন্দ্র দুবে, শান্তা সিংহ, শুক্লা রায়, রেণু সিমলাই (অধিনায়িকা), ই সি উইলিয়ামস্ (ওয়েলফেয়ার অফিসার), বকুল বর্মা (সহ-অধিনায়িকা), সুনীতি চন্দ্রভারকর, সাবিত্রী দে ও ভগবানদাস জৈন (ম্যানেজার)। উপবিষ্টা : সবিতা ব্যানার্জি, নির্মলা মুখার্জি, বীরা হেনরী, মীনাক্ষী চৌধুরী, কনস্টান্স উর্সোবিয়াস্, সুধা বর্মা।

...র মহিলাদের ম্যাসাজ করিবার প্রয়োজন ও আমি জানিতে পারি যে, ঐ ব্যবস্থা ...ডয়ামেই আছে। যখন কোন মহিলা বা ...র খেলোয়াড় আঙ্গুলের যন্ত্রণার কথা ...শ করিয়াছেন তখনই একরূপ জলীয় ...র্থ ইনজেকসন করা হইত ফল সঙ্গে ...াই পাওয়া যাইত। একটি মহিলার ...া আঙ্গুলে খেলার পর ফুলিয়া উঠে, ...মিনিটের মধ্যেই তাঁহার রঞ্জনরশ্মি ... হয় ও হাড় ভাঙিয়াছে কি না ...কা করা হয়। খেলোয়াড়দের সাহায্য ...ার জন্য সকল ব্যবস্থাই যে ইহাদের ... ইহা হইতেই প্রমাণিত হয়।

আমাদের সংস্কৃতিমূলক ভ্রমণ

আমাদের এই রাশিয়া ভ্রমণ একরূপ ছাত্রজনোচিত ও সংস্কৃতিমূলক। ছাত্রজনোচিত কারণ আমরা বিশ্বের বিশিষ্ট ভলিবল খেলার দেশগুলি কিভাবে খেলিয়া থাকে, ইহাদের স্ট্যান্ডার্ড কিরূপ এবং ইহাদের খেলিবার পদ্ধতিও কিরূপ তাহা অবলোকন করিয়া শিক্ষা করিতে গিয়াছিলাম। সংস্কৃতিমূলক—কারণ আমরা যেখানেই গিয়াছি সেইখানেই ভারতের কৃষ্টি ও সাধারণ জীবন সম্পর্কে প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা করিয়াছি। যখনই সুযোগ হইয়াছে তখনই আমরা ভারতীয় পোষাক ব্যবহার করিয়াছি। ভারতীয় মহিলাগণ ভারতীয় নৃত্য ও সঙ্গীতের প্রদর্শনীও করেন। আমাদের সহিত ঘুঙ্গুর ছিল গ্রামোফোন রেকর্ডও ছিল। ৩০শে আগস্ট অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি দিনের পূর্বদিন রাত্রে এক বিরাট আন্তর্জাতিক নৃত্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয় আমাদের মহিলাগণকে নৃত্য প্রদর্শন করিতে অনুরোধ করা হয়। সোভিয়েট ইউনিয়নের ভলিবল চ্যাম্পিয়ানশিপের পরিচালকগণ এই দিনে খুবই চিত্তাকর্ষক কর্মসূচীর ব্যবস্থা করেন। ইহার মধ্যে রাশিয়ার সঙ্গীত, নৃত্য, ম্যাজিক ও জিমন্যাস্টিকের ব্যবস্থা ছিল। এই সময় সহস্রাধিক অতিথি সমবেত হন। ইঁহাদের মধ্যে মস্কোর বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি

ও ক্রীড়াপরিচালক, ১১টি যোগদানকারী দেশের পুরুষ ও মহিলা খেলোয়াড়গণ সকলেই ছিলেন। ইঁহারা সকলেই ভারতীয় নৃত্যের অপূর্ব ছন্দ, তাল ভঙ্গিমা দেখিয়া মুগ্ধ হন।

আমরা রাশিয়ান শিল্পকলা ও কৃষ্টি সম্পর্কেও উৎসাহী হইয়া লেনিনগ্রাড ভ্রমণ বাতিল করিয়া তিনজন রাশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ নৃত্যকুশলীর ব্যালেট নৃত্য পরিদর্শন করি। উলানোভার নৃত্য সত্যই অপূর্ব। জারের সময় নির্মিত বিখ্যাত বোলসোই অপেরা হাউসে এই নৃত্যানুষ্ঠান হয়। দীর্ঘ দুই ঘণ্টা নৃত্য পরিচালিত হয়। উলানোভার বর্তমান বয়স ৪৫ বৎসর, কিন্তু নৃত্যের গতি ও ভঙ্গিমা দেখিয়া তরুণী ব্যতীত কিছুই মনে করা চলে না। ইহার পর আমরা জিপসী থিয়েটারে "হাঞ্চ-ব্যাক অফ নোতাদেম" অভিনয় পরিদর্শন করি। বকুতেও আমরা এক অপেরাতে গমন করিয়া "আজের জেলার" সঙ্গীত শুনিয়াছি। ভারতীয়দের শিল্পকলা ও সঙ্গীত-প্রীতি দেখিয়া রাশিয়ান জনসাধারণ মুগ্ধ হন।

আমাদের গর্ব

আমাদের গর্বের বিষয় যে, ১৯৫০ সালেই প্যারিসে বর্তমানের আন্তর্জাতিক ভলিবল খেলার আইন রচিত হইয়াছে। মাত্র দুই বৎসর পূর্বে মহিলাদের খেলায় বল একবার স্পর্শের আইন প্রবর্তিত হইয়াছে। এই বিষয় আমরা প্রথম পথ-প্রদর্শক। ১৯৪০ সালে আমরা যখন উত্তর প্রদেশ বালিকাদের ভলিবল প্রতিযোগিতা প্রবর্তন করি তখন হইতেই একবার স্পর্শ আইন অনুসরণ করিয়া আসিতেছি। এমন কি এলাহাবাদের নিখিল ভারত অলিম্পিক অনুষ্ঠানের সরকারী আইনের মধ্যেও মহিলাদের উপর্যুপরি দুইবার বল স্পর্শ আইনই অনুসৃত হয়। এই বিষয় ভারতের মধ্যে আমাদের প্রতিযোগিতাই আদর্শস্থানীয়। এমন কি আমরা দাবী করিতে পারি যে, আমরাই ১৯৫০ সালের আন্তর্জাতিক ভলিবল প্যারিস কংগ্রেসের পথপ্রদর্শক। এই বিষয়ে আমি আন্তর্জাতিক ভলিবল ফেডারেশনের সভাপতি মিঃ পি লিবোঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করি যাহার ফলেই আমাদের এই আমন্ত্রণ। কারণ আমরাই ভারতের মধ্যে একমাত্র মহিলা ভলিবল পরিচালকমণ্ডলী যাঁহারা একবার স্পর্শ আইন অনুসরণ করিয়া থাকেন।

উত্তর প্রদেশ বালিকা ভলিবল প্রতিযোগিতা গত দশ বৎসর হইতে পরিচালিত। আমাদের দেশে তবু ভলিবল খেলার প্রতি উপেক্ষা পরিদর্শনে আমরা সত্যই ব্যথিত ও মর্মাহত। বিশ্ব ভলিবল প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ভলিবল খেলোয়াড়দের ক্রীড়া-কৌশল পরিদর্শন করিয়া আমাদের জীবনে নূতন উৎসাহ ও পরম আনন্দ লাভ হইল বলাই বাহুল্য। ১৯৩৬ সালে লাহোরের নিখিল ভারত অলিম্পিক অনুষ্ঠানে ভলিবল প্রতিযোগিতা কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় প্রাদেশিক স্তর হইতে জাতীয় স্তরে ভলিবল খেলার স্থান পরিদর্শন করিয়া আমার মনে সেই সময় যে আনন্দ ও উৎসাহ দেখা দিয়াছিল এই বারেও তাঁহারই পুনরাবৃত্তির অনুভূতি আমি পাইয়াছি।

আন্তর্জাতিক ভলিবল এসোসিয়েশনের সভাপতির সহিত আলোচনা প্রসঙ্গে আমি বলি যে, উত্তর প্রদেশ বালিকা ভলিবল প্রতিযোগিতা ভলিবল খেলা যাহাতে ভারতে জাতীয় খেলায় পরিণত হয় তাহার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে। তিনি আমাকে সমর্থন করিয়া বলেন, তাঁহা এসোসিয়েশনও ইহাকে আন্তর্জাতিক খেলায় পরিণত করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি দাবী করেন ও আমিও স্বীকার করি যে, ভলিবল খেলা জনসাধারণের খেলা এবং ইহা একটি সর্বসাধারণের প্রকৃত উপকারী স্পোর্টস। সুতরাং আমরা যাহারা ভলিবল খেলায় উৎসাহী তাহারা যদি সকলে একযোগে কার্য করি তবে হইলে অদূর ভবিষ্যতে এই ভলিবল খেলা ভারতের জাতীয় খেলায় পরিণত হইতে পারে।

তুমি

আনন্দ বাগচী

সমস্ত দেহ দিয়ে তুমি কথা কও
স্বরটা তোমার অহেতুক শিহরণ
অনেক ভেবেছিঃ তুমি ত স্বপ্ন নও
ভাষা ত তোমার ভ্রূ-বিলাস অঙ্কন।

মনের গন্ধ দিয়ে তুমি গান গাও
গন্ধে তোমার বড়ো ঘেঁষাঘেঁষি সুর
সুরের নূপুরে কি কথা বাজাতে চাও?
দেহে খুঁজি তার যদি থাকে অঙ্কুর!

আঁখি ত তোমার রহস্যে অতলান্ত
ঊর্মিল দিঠিঃ কখনো কি খুঁজে পাব
যত কথা হোথা, মন-ছুট আর ক্লান্ত,
মগ্ন রয়েছে, খুঁজে পাব তুমি ভাব?

জানি এ-জীবনে খুঁজে পাওয়া হবে ভার
সারা দেহ কথা, সারা মন গা'বে গান,
বাক্য-বধির তোমার মনের দ্বার
তবু রুদ্ধই র'বে, হবে অবসান!

অনুবাদ সাহিত্য

আজব জীবিকা (জি কে চেস্টারটন)—অনুবাদ শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। মূল্য তিন টাকা।

বাঙলা সাহিত্য অনেক দিক হইতেই দীন, এরূপ আক্ষেপ অনেকে করিয়া থাকেন। কিন্তু সেই দীনতা দূরীকরণের জন্য যে উদ্যোগ আবশ্যক, তাহার কোনো পরিচয় বড় একটা পাওয়া যায় না। আমাদের মাতৃভাষার উন্নতি করিতে হইলে কেবল মাতৃভাষার চর্চা করিলেই চলিবে না। আমাদের "মাতৃভাষা রূপ খনি পূর্ণ মণিজালে" অবশ্যই, কিন্তু সেই খনি খনন করিবার জন্য যে উপকরণের আবশ্যক, তাহা দেশ-বিদেশ হইতে সংগ্রহ করিতেই হইবে। মাইকেল মধুসূদন আমাদের মাতৃভাষাকে মণিজালে পরিপূর্ণ বলিয়া জানিতে পারিলেন তখনই, যখন দেশ-বিদেশের সাহিত্য-মধুচক্র হইতে অজস্র মধু পান করিয়াছেন; যখন তিনি মাতৃভাষার খনি খননের উপযোগী উপকরণ বিদেশী বন্দর হইতে আমদানী করিয়া আপনার মন-ভাণ্ডার কানায়-কানায় পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন; যখন তিনি মননের উপযোগী মানসিক বলিষ্ঠতা অর্জন করিতে শিখিয়াছেন। এই জন্যই বলিতেছিলাম, আমাদের মাতৃভাষার উন্নতি করিতে হইলে কেবল দেশের সাহিত্যিক সীমানার মধ্যে নিজেকে আটক রাখা ঠিক নয়। বিদেশের যাহা ভালো তাহা আহরণ করিয়া আনিয়া দেশবাসীর মধ্যে পরিবেশণ করিতে হইবে, তাহা হইলেই দেশবাসীর মানসিক স্বাস্থ্য উন্নত হইবে এবং দেশের সম্পদ বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হইবে।

বাঙলায় অনেক বিদেশী গ্রন্থ অনূদিত হইয়াছে। তাহার বেশীর ভাগ গ্রন্থই অপাঠ্য। তাহার কারণ অনুবাদকগণের সাহিত্যিক বোধ ও রুচির অভাব। অনুবাদ কার্য যদি সহজ হইত তাহা হইলে যে কোনো ইংরেজি জানা বাঙালী ইংরেজি বইকে বাঙলায় তরজমা করিতে পারিত। কিন্তু অনুবাদের জন্যও সাহিত্যিক ক্ষমতার আবশ্যক এবং ভাষার উপর যথেষ্ট দখল অপরিহার্য। আলোচ্য গ্রন্থটি পাঠ করিয়া বুঝিলাম, উপযুক্ত ব্যক্তির হাতে পড়িলে অনুবাদও কতটা সহজ ও সাবলীল হইতে পারে।

শ্রীযুত নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কবি। কাব্য রচনা করিয়া তিনি সুপরিচিত হইয়াছেন। সাধারণতঃ দেখা যায়, যিনি পদ্য রচনায় দক্ষ, গদ্যে হাত তাঁর কাঁচা। নীরেনবাবু এই নিয়মের ব্যতিক্রম। তিনি গদ্য রচনায়ও তাঁহার দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। চেস্টারটন স্ফূর্তিবাজ লেখক। The Club of Queer Trades গ্রন্থে তিনি এই ফূর্তিরই পরিচয় দিয়াছেন। নীরেনবাবুর অনুবাদের প্রশংসা করিতে হয় এই জন্য যে, তিনি উক্ত ইংরেজি গ্রন্থটি কেবল ভাষান্তরই করেন নাই, চেস্টারটনের মেজাজটিও তিনি বাঙলা ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে একটা গল্প মনে পড়িয়া গেল। কোনো এক প্রার্থনা সভায় মহাত্মা গান্ধী ভাষণ

দিতেছেন এবং জনৈক ভদ্রলোক গান্ধীজীর বক্তৃতাটি বাঙলায় অনুবাদ করিয়া দিতেছেন সঙ্গে সঙ্গে; গান্ধীজী এক জায়গায় একটি কথা বলিয়া একটু হাসিলেন, অনুবাদকার ভদ্রলোকটি গান্ধীজীর কথা বাঙলায় রূপান্তরকালে যথাস্থানে ঠিক গান্ধীজীর অনুকরণে অনুরূপ রূপেই হাসিলেন, অর্থাৎ তিনি হাসিটিকেও যেন translate করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের বক্তব্য হইতেছে, হাসির জায়গায় হাসিলেই মেজাজটা অনুবাদ করা হয় না। আলোচ্য গ্রন্থে নীরেনবাবু এরূপ হাস্যকরভাবে যে বিদেশী লেখককে অনুবাদ করার চেষ্টা করেন নাই, এজন্যে তাঁকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। তিনি কাহিনীগুলির মূল বিষয়ের অনুরূপ বৈঠকী বাঙলায় এই অনুবাদ কার্য সম্পাদন করিয়াছেন। দেশ পত্রিকায় ইহা ইতিপূর্বে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

যাঁহারা বাঙলা সাহিত্যের দীনতার জন্য আক্ষেপ করিয়া থাকেন, এই গ্রন্থ পাঠ করিলে তাঁহারা সান্ত্বনা লাভ করিবেন। সান্ত্বনা লাভ করিবেন এই জন্য যে, এই গ্রন্থ কেবল ভাষান্তর নহে; ইহা একই সঙ্গে অনুবাদ এবং সাহিত্য অর্থাৎ ইহা প্রকৃতই অনুবাদ সাহিত্য। পাত্র-পাত্রীর নাম যদি বিদেশী না হইত, তাহা হইলে এই অনুবাদ পাঠকালে ইহাকে বিদেশী বলিয়া ধরা কঠিন হইত। ২৮৮।৫২

ভ্রমণ কাহিনী

দুয়ার হ'তে অদূরে—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়; বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১২, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—তিন টাকা।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের আধুনিকতম সৃষ্টি, একটি ছোট প্রশ্নের উত্তরে আলোচ্য গ্রন্থের সূত্রপাত—লেখক সবচেয়ে বেশী আনন্দ পেয়েছেন কিসে? প্রশ্নটা ছোট হ'লেও তার তাৎপর্য অনেকখানি। কেন না আনন্দই তো সত্যিকারের জীবন, আর ঐ আনন্দের রকমফেরেই জীবনের নানা অভিব্যক্তি—বেশী-কমে অনেকখানি।

অদূরে, অনাড়ম্বর ভ্রমণই লেখককে বেশী আনন্দ দিয়েছে। ধারে-কাছে সুট ক'রে যে কোন দিন বেরিয়ে পড়তে পারলেই তিনি আনন্দ পান প্রচুর। তাঁর ভ্রমণের দূরপাল্লার আভিজাত্য নেই, নেই কোন ব্যাগ-বিছানা বাঁধার প্রস্তুতি। যাঁরা বিখ্যাত ভ্রমণকারী তাঁরা এই 'বেরিয়ে-পড়া'কে ভ্রমণ বললে হাসবেন। তাঁদের মতে দূরত্বই ভ্রমণের প্রকৃষ্ট সংজ্ঞা। হাঁপাহাঁপি নেই, ছোটাছুটি নেই, এ আবার কোন দেশী, কোন ধরণের ভ্রমণ।

কিন্তু ভ্রমণের আর এক নাম দেখা—দেশ দেখা, মানুষ দেখা। আর এই দেখার অর্থে আলোচ্য পুস্তকের বৃত্তান্ত সার্থক। কারও ভ্রমণ সম্বন্ধে আসল প্রশ্ন বোধ করি, কি দেখলেন? কতদূর গিয়েছিলেন, নিতান্তই গৌণ।

এই দেখার দিক দিয়ে লেখক নিঃসন্দেহে দ্রষ্টা। মাঝেরহাট ফলতা আমাদের প্রতিদিনের দেখা জগত কলকাতা থেকে বড় জোর ত্রিশ মাইল। ছোট্ট ট্রেনে সওয়া দু' ঘণ্টায় যার শুরু-শেষ প্রায় দু'শো পৃষ্ঠায় তার সাবলীল স্বচ্ছন্দ বিচরণ। দৃষ্টির প্রখরতায় নয়, মানবিক চেতনা আর কমনীয় অনুভূতিতে তা মধুর, মন্দাক্রান্তা ছোট রেলের গতির মতই। কাজের মানুষ আমরা—যা দেখেও দেখি না, তা দেখানর ব্যগ্রতায় লেখক উদ্‌গ্রীব—অখ্যাত 'ইস্টিশানের' অনেক 'মিষ্টি' তাঁর লেখনীতে ক্ষরিত হয়েছে। ছোট্ট রেলের ছোট্ট জানালায় যত দৃশ্য উদ্ভাসিত হলো, তার চতুর্গুণ দেখা গেল দেশলাই-খোল কামরার মধ্যে নিরক্ষর সরল চাষীমানুষের ভিড়ে। ভ্রমণের নামে কাছের মানুষকে এমন করে দেখার অভিনব

পন্থা বোধ করি বাঙলা সাহিত্যে এই প্রথম। সে দিক দিয়ে বিভূতিবাবু সাহিত্যরসিকদের অকুণ্ঠ অভিনন্দন পাবেন। তথাকথিত অনেক ভ্রমণকাহিনীর নিরর্থক বাগাড়ম্বর থেকে তিনি আমাদের মুক্তি দিলেন।

যাঁরা কেবল বিভূতিবাবুকে হাসি-কৌতুক, অশ্রু-সজল ঘরকন্নার কাহিনীকার ব'লে জানতেন, আলোচ্য গ্রন্থখানিতে তাঁরা তাঁর আর একটি পরিচয় পাবেন—মানবপ্রেমিক, দরদী বিভূতিবাবু। মনে হয় মানুষই তাঁর কাছে সবচেয়ে বিস্ময়ের, সবচেয়ে আদরের। আর সেই মানুষ দেখবার জন্যেই এই কাহিনীর অবতারণা। ফলতা-মাঝেরহাটের ভূগোলটা তাই তুচ্ছ হয়েছে এই ভ্রমণে। 'রেল-রেল খেলায়' যা তিনি উদ্ঘাটিত করলেন, পাঠক সমক্ষে তা কোন প্রাকৃতিক শোভাসমৃদ্ধ অদৃষ্টপূর্ব ভূখণ্ড নয়, স্নিগ্ধ-শ্যামলীমার পটভূমিতে তুচ্ছ কথার হাসি-কান্নায় তুচ্ছ মানুষজন—পানা-ডোবার ধারে ঝিঙে-এ ফুলের মাচার আড়ে ভাতের হাঁড়ি উনুনে চাপিয়ে ঘাট সরতে যারা রেল দেখে বিস্ময়ে দাঁড়ায় আজও। সন্ধ্যা আকাশে প্রথম তারাটির মত যাদের দৃষ্টি এখনও অম্লান, শিশির-বিন্দুর মত ক্ষণিক; কিন্তু অনন্তকালের জীবনলীলায় গভীর রহস্যাবৃত। ২২১।৫২

উপন্যাস

হাসিকান্নার দিন—শ্রীমতী বাণী রায়; জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড; ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা। দুই টাকা।

শিশু মনের খোরাক আমাদের সাহিত্যে অজস্র। সমগ্র বাঙলা সাহিত্যের তুলনায় তার পরিমাণ অবাক হবার মত। কিন্তু যে বয়সটা বাল্য আর যৌবনের সন্ধিক্ষণে, বাল্যের সরলবিশ্বাসী মন যখন জীবন সম্বন্ধে কৌতূহলী হতে আরম্ভ করেছে, নতুন আদর্শের আস্বাদ পেয়েছে, স্বপ্ন রচনা করবার মত কল্পনার বলিষ্ঠতা পেয়েছে ঠিক সেই বয়সে পড়বার মত—পড়ে ভালো লাগবার মত বিশেষ ধরণের সাহিত্যের পরিমাণ বাঙলায় খুবই কম। যার ফলে বাঙলাদেশের ছেলেমেয়েরা ঠাকুরমার ঝুলি শেষ করেই পল্লীসমাজ এবং দত্তা পড়তে শুরু করে, করতে বাধ্য হয়।

এদিক থেকে শ্রীমতী বাণী রায়ের 'হাসি-কান্নার দিন' বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। এ বই-এর গল্পাংশ গড়ে উঠেছে অনুত্তীর্ণ কৈশোর কয়েকটি স্কুলের মেয়েকে নিয়ে। দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখের সুতোয় গাঁথা তাদের স্বপ্ন কল্পনাই এ বই-এর উপজীব্য। যদিও ভূমিকায় লেখিকা বলেছেন, 'জগতের অন্যান্য দেশের মত এদেশেরও ছোট মেয়েদের জন্য সাহিত্য সৃষ্টি হোক। আমি এই বইটিতে সেই প্রাথমিক চেষ্টাই করেছি।' তবু জীবন যখন সাহিত্য হয় তখন তা সকলের। কাজেই এ বই ছেলেদের পড়তে এবং পড়ে ভালো লাগতে কোন বাধা নেই। লাগবেও।

অনেক মেয়ের মধ্য থেকে যে-কটি মেয়েকে গল্পের মাধ্যম হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে টুকরো ঘটনা এবং বিশ্লেষণের সাহায্যে তাদের সকলের সঙ্গেই পাঠকের ঘনিষ্ঠ পরিচয় প্রতিষ্ঠা করেছেন লেখিকা। জীবনের প্রত্যূষে যারা এক সঙ্গে প্রতিজ্ঞাকঠিন পথে কল্পনার পা বাড়িয়েছিল শেষ পর্যন্ত তারা সবাই প্রায় হারিয়ে গেল। মিশে গেল অজস্রের ভীড়ে, এক মঞ্জু ছাড়া! আজও সে সেই কৈশোরের প্রতিজ্ঞা ভোলেনি। ভোলেনি সেই প্রথম দিনের প্রতিভাভাস্বর প্রতিশ্রুতির মুখগুলি। তারা যে হারিয়ে গেল এ দুঃখ মঞ্জু ভুলতে পারছে না। আর গোটা বইটিই আসলে বয়স্কা মঞ্জুর স্মৃতির পসরা। তাই সর্বত্র একটি সুশৃঙ্খল কাহিনীর ক্রমবিন্যাস নয়, টুকরো টুকরো ইতস্তত ঘটনার সুসমঞ্জস একটি রূপ। কিন্তু তবুও দুটি চারটি রেখারঙে চরিত্রগুলি জীবন্ত।

ভূমিকায় লেখিকা এক জায়গায় বলেছেন, 'উপন্যাসখানি উদ্দেশ্যমূলকভাবে লেখা হয়েছে, শুধু একটি গল্প বলে যাওয়া লক্ষ্য নয়। সুতরাং দোষগুণের বিচার করবার সময় সেকথা মনে রাখতে হবে। কখনও কখনও নীরস লাগলে অধৈর্য হলে চলবে না।' মানলাম, কিন্তু যাদের জন্যে লেখা উপদেশটা সব সময় বেশী প্রত্যক্ষ হলে তাদের একটু গুরুপাক লাগতে পারে। আর এ ক্ষেত্রে সেরূপ আশঙ্কা করবার কিছুটা কারণ আছে বৈকি। শ্রীমতী রায়ের মত কুশলী লেখিকা একটু দুর্বলতা জয় করতে পারলে 'হাসিকান্নার দিন' নিঃসন্দেহে সার্থকতর হতো। ২৭৮।৫২

বাস্তব ও কল্পনা : আশালতা সিংহ : ফাইন আর্ট পাবলিশিং হাউস : তিন টাকা।

বিনোদ বিলেত থেকে ডাক্তারীতে বড় ডিগ্রী নিয়ে দেশে ফিরল। তাঁর বন্ধু সত্যসুন্দরের ডিগ্রী ইঞ্জিনীয়ারীংএ। বিনোদের কল্পনা নিজের গ্রামে ডাক্তারী করে দুঃস্থের সেবা করবে। সত্যসুন্দর চাকরিবিলাসী শহুরে জীব। তাঁর স্ত্রী প্রতিমাও সেই সমাজের আধুনিকা। বিনোদ যাদের কথায় কথায় আঘাত করে। সত্যসুন্দরের বোন সবিতা ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীর অনার্স'

কিন্তু বৌদি প্রতিমার মত 'সেণ্ট পার্সেণ্ট' আধুনিকা নয়। শেষ পর্যন্ত বিনোদের সঙ্গে তার বিয়ে হলো, আর বিয়ের পরে আসতে হলো বিনোদের গ্রামে। এখানে কিন্তু সবিতা নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারল না। সংস্কার প্রবণ শাশুড়ির সাথে বনিবনা হলো না। তার পল্লী প্রীতির মুখোস খুলল। ওখানে অতিষ্ঠ হয়ে বিনোদকে নিয়ে একবার কলকাতায় বেড়াতে এলো সবিতা। সবিতা যে পাড়াগাঁয়ে থাকতে পারবে না এ সত্যটি ততদিনে বিনোদ উপলব্ধি করেছে। তাই সেও এবার কলকাতাতেই একটা মোটা মাইনের চাকরি জুটিয়ে নিল।

মোটামুটি এই হলো গল্প। এতে ঘটনা কিছু আছে, কিছু চরিত্রের আভাস। তবে ঘটনাগুলো বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে ঘটেছে বলে মনে হয় না। চরিত্রগুলোও কোন যৌক্তিক পরিণতির দিকে যায়নি। যে দুটো প্রধান চরিত্র বিনোদ আর সবিতা—তাদের একটিও কোন সুষ্ঠু রূপ পায়নি। সবিতার বিনোদকে অথবা বিনোদকে সবিতার বিয়ে করবার কারণ তেমন দুর্বোধ্য না হলেও বিয়ের পরে এদের আচরণ নিতান্তই অসঙ্গত। বিশেষতঃ শেষ পর্যন্ত বিনোদের কলকাতায় চাকরি নেওয়া।

যতদূর মনে পড়ে লেখিকার 'অমিতার প্রেমে' একটি নির্দোষ গল্পের স্বাদ পেয়েছিলাম। আলোচ্য উপন্যাস পড়ে সেই কথাটি দুঃখের সঙ্গে মনে পড়ল। ২৪১।৫২

স্মৃতিকথা

চলার পথে : জগদানন্দ বাজপেয়ী : প্রসাদী সাহিত্যসত্র, ১।২।৭, দমদম রোড, কলিকাতা—২ : মূল্য তিন টাকা।

বাঙলা সাহিত্যের আসরে জগদানন্দ বাজপেয়ী নবাগত নন। তাঁর কাব্য-প্রতিভা সুধীজন-স্বীকৃত, তাঁর রচনানৈপুণ্য স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

আলোচ্য গ্রন্থটি কাব্য গ্রন্থ নয়, লেখকের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের অতীত কথা। এ জীবনের পথ কুসুমাস্তীর্ণ সরল রেখায় রূপায়িত নয়, এ পথের রূপ ভিন্ন। কঠিন অভিজ্ঞতায় এ পথ বন্ধুর, পরিবেশ নির্মম। ধারাবাহিকভাবে 'সৈনিক' পত্রিকায় প্রকাশিত হবার সময়েই রচনাটি বিদগ্ধজনের দ্বারা অভিনন্দিত হয়েছিলো। সেদিন খন্ড-স্বাদে যাঁরা অতৃপ্তিবোধ করেছিলেন, রচনাটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ায় সামগ্রিকভাবে রসাস্বাদনে তাঁরা সমর্থ হবেন—এজন্য প্রকাশকের এ উদ্যম ধন্যবাদার্হ।

আত্মকাহিনী মূলতঃ নিজের কথা, নিজের ঘরের সুখদুঃখ আশা নিরাশার ক্ষুদ্রাবয়ব আলেখ্য। পরিধি সীমিত, ঠিক সে কারণেই এ জাতীয় লেখার সংবেদনশীলতা ও রসগ্রাহিতার ক্ষেত্রও পরিমিত। এ ধরণের লেখার সাফল্য নির্ভর করে লেখকের রচনা-সৌকর্যের ওপর। অনবদ্য লিপিকুশলতার মাধ্যমে একজনের কথা বহুজনের কথায় রূপান্তরিত হয়, নিজের জীবনের ছোট সুখ দুঃখ জাতির জীবনের সুখ দুঃখ ব্যথা বেদনায় পরিণত হয়। আলোচ্য গ্রন্থটি ঠিক এই কারণেই রসিকজনের কাছে আদরণীয় হবে।

পথপ্রান্তস্থিত অট্টালিকার বাতায়ণ উন্মুখ ক'রে পথ ও পথিক দেখার যে সাময়িক বিলাসিতা, সে নিস্পৃহ বিলাসিতার অবকাশ এ পুস্তকের কোথাও নেই। পথের মানুষ সেজে পথচারিদের মধ্যে নিজেকে বিলুপ্ত করে দেওয়ার আনন্দ এর প্রতি ছত্রে নিহিত। 'সবারে দিয়েছ ঘর, আমারে দিয়েছ শুধু পথ' কবির এই কথাটি লেখকের জীবনের মূলকথা।

এ রচনা লেখকের জীবন মন্থনের ফল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে এ মন্থনে সুধার অংশ সকলের মধ্যে ভাগ করে দিলেও তিক্ত অভিজ্ঞতার গরলটুকু লেখক সংগোপনে নিজের জন্য রেখে দিয়েছেন। এখানেই এ জাতীয় রচনার সার্থকতা।

লেখক প্রধানতঃ কবিমনের অধিকারী হ'লেও রচনা কোথাও কাব্যধর্মী হ'য়ে ওঠেনি। সাময়িকভাবে আবেগপ্রবণ দু একটি ঘটনাকে আশ্রয় ক'রে রচনা স্থানে স্থানে উচ্ছ্বাসধর্মী হওয়ার সঙ্গেই লেখক সুসংযত ভঙ্গীতে সে আবেগ প্রশমিত করেছেন।

লেখকের সুনিপুণ লেখনীর মাধ্যমে দু একটি ছত্রে পারিপার্শ্বিক চরিত্র অপরূপ রূপ পরিগ্রহ করেছে। কাঁড়াদাস বাবাজী, খেপা সাধু, হিকস সাহেব, এমন কি কৃষ্ণনগর ছেলের পকেটমারটি পর্যন্ত জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে। আলোচ্য গ্রন্থটি কোথাও নীরস আত্মকেন্দ্রিক জীবন চরিতে পরিণত হয়নি। কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনাস্রোতের মধ্য দিয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ উহ্য রেখে কাহিনীকে চরম পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়া অসীম কৃতিত্বের পরিচায়ক। শুধু বিগত ঘটনার রোমন্থনই নয়, সামগ্রিক জীবন বোধ আর সচেতন মনের স্পর্শে 'চলার পথে' অপূর্ব জীবনায়নে উন্নীত হয়েছে।

ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট অলংকরণ প্রথম শ্রেণীর। ২৭২।৫২

ধর্মপুস্তক

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা—শ্রীঅবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত ও ব্যাখ্যাত। প্রকাশক : বিদ্যোদয় লাইব্রেরী, ৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। মূল্য ৩৷৷৹ ও ৪৲ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ভারতবর্ষের হিন্দুদের অত্যন্ত প্রিয় ও পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। কিন্তু অধিকাংশ বাঙালী সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ হওয়ার দরুণ মূল সংস্কৃতে এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া অমৃতরস উপভোগ হইতে বঞ্চিত থাকেন। অগত্যা বাঙলা ভাষায় ভাষ্যকারের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া তাঁহাদের গত্যন্তর নাই। সেইদিক দিয়া আলোচ্য গ্রন্থখানি গীতা-পাঠেচ্ছু বাঙালীর কাছে সমাদৃত হইবে। প্রত্যেকটি সংস্কৃত শ্লোক বাঙলা হরফে দিয়া তাহার নিচে অত্যন্ত সহজ সরল গদ্যে বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে, সেই সঙ্গে দু'একটি দুরূহ শব্দের অর্থ থাকায় পাঠকদের বুঝিবার পক্ষে কোনোই অসুবিধা হয় না। গ্রন্থের শেষে গীতার্থসার নাম দিয়া গ্রন্থকার প্রাঞ্জল গদ্যে ধারাবাহিকভাবে সমস্ত শ্লোকের তাৎপর্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই গীতার্থসার পাঠকদের ভাল করিয়া পড়া থাকিলে মূল সংস্কৃত শ্লোকগুলি

পড়িবার সময় অর্থবোধে আর কোনো অসুবিধা হইবে না। ৩২৮ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থ মসৃণ কাগজে মুদ্রিত, প্রচ্ছদচিত্র দৃষ্টিও মনোরম। ছাপা ও বাঁধাই সুদৃশ্য। ৩০৯।৫২

প্রাচীন সাহিত্য

আরব্য উপন্যাসের গল্প—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়; এম এল দে এ্যান্ড কোং; ১৩।১, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। আড়াই টাকা।

গল্পের মায়াকানন। একবার ঢুকলে আর বেরোবার রাস্তা নেই। কোঠার পরে কোঠার দরজা খুলে যাচ্ছে। চত্বরের পর চত্বর পেরিয়ে যাচ্ছে। রঙ আর রস, নানা বর্ণের বর্ণালী। এর আর শেষ নেই। নাকেদাঁড় কৌতূহলের হিড়হিড় সমুত্থান। সেই বহু পড়া এবং বহু শোনা রূপকথা নতুন ঢঙে বাঙলা মেজাজে বলেছেন সৌরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। এর মধ্যে একমাত্র মূল গল্প ছাড়া আর কিছুতেই বিদেশীর ছায়া নেই। রূপকথা বলবার ভঙ্গীমাটি খাঁটি বাঙালী। ছেলেমেয়েদের হাতে পড়লে এক নিঃশ্বাসে শেষ করবে। কিন্তু গল্পের সঙ্গে ছবিগুলো সর্বত্র তাল রাখতে পারেনি। আজকালকার দিনে এ রকম প্রচ্ছদপট প্রায় অচল।

(২৬৪।৫২)

ছোট গল্প

বোবা ঢেউ—স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়; পূর্বাচল প্রকাশক; ৬, কলেজ রো। দুই টাকা।

বিভিন্ন ধরণের কয়েকটি ছোট গল্পের সংকলন। নিম্নবিত্ত জীবনের গ্লানি, মধ্যবিত্তের ব্যর্থতা আর হতাশা, সামন্ততান্ত্রিক ক্রূরতা থেকেই গল্পের উপাদান সংগৃহীত হয়েছে। ভাষার নিরলঙ্কার সারল্য ভঙ্গীমায় একটা সুষমিত এনেছে, কিন্তু সর্বত্র অন্তরঙ্গতায় উত্তরণ সম্ভব হয়নি। এর কারণ হয়তো কোথাও কোথাও পরিবেশ সৃষ্টিতে দক্ষতার অভাব। যে আন্তরিকতা পরিবেশের সঙ্গে পাঠকমনের সেতুবন্ধন করে সর্বত্র তার আস্বাদনে পাঠকমন বঞ্চিত। আর ঠিক একই কারণে পড়তে পড়তে কখনও কখনও ক্লান্তি আসে। যেখানে লেখকের ভঙ্গীর সঙ্গে এই সব গুণের সাযুজ্য ঘটেছে সেখানে গল্প সার্থক, যেমন 'কবরের ক্ষুধা'। 'শেষ অভিসার' গল্পটিও অনেকাংশে রসোত্তীর্ণ। ছাড়া ছাড়াভাবে বলার জন্যেই হয়তো আনারসীর ট্র্যাজেডি তেমন স্পর্শ করে না এবং নিশি বৌও প্রায় স্কেচের পর্যায়ে পড়ে। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে এসব ত্রুটিমুক্ত সার্থকতর গল্প আশা করা যায় বলেই এদের উল্লেখ। ২৬০।৫২

বিবিধ

Students' Own Dictionary—প্রকাশক এ সি ঘোষ, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৫, কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা। মূল্য ৭॥ টাকা।

ইংরেজি হইতে বাঙলা এই অভিধানে যথোপযুক্ত ব্যবহারের উদাহরণ সমেত ৫০,০০০ হাজার প্রচলিত শব্দ সন্নিবেশিত হইয়াছে। অভিধানকারক বিচক্ষণতার সহিত অব্যবহার্য মৃত শব্দের ভীড় এড়াইয়া প্রয়োজনীয় ও প্রচলিত শব্দগুলির নির্ভরযোগ্য অনুবাদ তাহার যথোপযুক্ত উচ্চারণ ও প্রয়োগ রীতির প্রতিই অধিকতর দৃষ্টি রাখিয়াছেন যাহাতে ছাত্রদের নিকট এই অভিধান সর্ব বিষয়েই সহায়ক হইতে পারে। ইহা ব্যতীত অভিধানের শেষে ৫টি অ্যাপেণ্ডিক্স ইংরেজি ভাষার সাধারণ এব্রিভিয়েশন, ইডিয়ম, অন্যান্য ভাষার প্রচলিত প্রকাশ-ভঙ্গী ও প্রবাদ প্রভৃতি যেভাবে সংকলন করা হইয়াছে তাহা যে কোনো ইংরেজি ভাষা শিক্ষার্থী বাঙালীর কাছে অতি প্রয়োজনীয়।

২২৫।৫২

পশ্চিমবঙ্গ ও কলিকাতা—অধ্যাপক পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত। বিবেকানন্দ বুক এজেন্সী, ৭১।২এ, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা ৬। মূল্য ৪৲।

দেশ বিভাগের পর হইতে পশ্চিমবঙ্গের ভূগোল বদলাইয়া গিয়াছে, সেই সঙ্গে তাহার অর্থনীতি, কৃষি, বাণিজ্য শিল্প সব কিছুরই ওলটপালট হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থে লেখক বহু পরিশ্রম সহকারে নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়া সাম্প্রতিক কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক যথার্থ রূপটি উৎসুক পাঠকের নিকট তুলিয়া ধরিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় এই গ্রন্থে পাওয়া যাইবে এবং এই রাজ্যের উন্নতিকামী প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট এই গ্রন্থ "গাইড বুকে"র কাজ করিবে। পশ্চিমবঙ্গের নানাবিধ মানচিত্রে গ্রন্থখানি সমৃদ্ধ। ৩০৬।৫২

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি দেশ পত্রিকায় সমালোচনার্থ আসিয়াছে। পরে সমালোচনা বাহির হইলে তাহা যথাসময়ে প্রকাশক অথবা গ্রন্থকারের নিকট প্রেরিত হইবে।

সংকেত—মনুজেন্দ্র সর্বাধিকারী, মহাভারতী প্রকাশিকা, ২৫এ, শ্রীনাথ মুখার্জি লেন, কলিকাতা। মূল্য—৮০। ৩১৭।৫২

দধীচির অস্থি—কাফী খাঁ, এ মুখার্জি এ্যান্ড কোং লিঃ, ২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য—১৲। ৩১৮।৫২

এক ফালি বারান্দা—অন্নপূর্ণা গোস্বামী, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, ২০৯, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—২৲। ৩১৯।৫২

প্রকৃতি—শ্রীললিতা ভট্টাচার্য, শ্রীঅরুণা ভট্টাচার্য কর্তৃক ২৪এ, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—১৷০। ৩২০।৫২

নানা রঙের দিন—সন্তোষকুমার ঘোষ, ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিঃ, ৮৯, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। মূল্য—৪৲। ৩২১।৫২

চলমান জীবন (১ম পর্ব)—পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিঃ, ৮৯, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। মূল্য—৪৷৷০। ৩২২।৫২

বলাকা কাব্য পরিক্রমা—ক্ষিতিমোহন সেন, এ মুখার্জি এ্যান্ড কোং লিঃ, ২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য—৪৷৷০। ৩২৩।৫২

উত্তরাপথ—সমীর ঘোষ, স্টার লাইট পাবলিকেশান, ১৯এ, চক্রবেড়ে লেন, কলিকাতা। মূল্য—২৲। ৩২৪।৫২

বি টি রোডের ধারে—সমরেশ বসু, ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস লিঃ, ৩, শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—২৷০। ৩২৫।৫২

বিভাবরী—সমীরণ গুহ, সাহিত্য লোক, নারায়ণ রায় রোড, বড়িশা, কলিকাতা, মূল্য—১৷০। ৩২৬।৫২

মনের ময়ূর—প্রতিভা বসু, নাভানা, ৪৭, গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা, মূল্য—৩৲। ৩২৭।৫২

চক্রদত্ত

পিকনিক করবো বলে সেদিন অনেক জিনিসপত্র নিয়ে তোড়জোড় করে গাড়িতে চড়ে বসলাম, কিন্তু গাড়ি চলতে আরম্ভ করতেই হলো মুশকিল। জিনিসপত্র যা সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল, সেগুলোর কোনটাকেই স্বস্থানে রাখা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে এক একটা উঁচু নীচু জায়গায় গিয়ে গাড়িখানা যখন রীতিমত ঝাঁকুনি দিচ্ছে তখনই সমূহ বিপদ. আমাদের চায়ের ফ্লাস্ক খুকীর দুধের জায়গা সকলের জলের বোতল একেবারে গড়াগড়ি যাওয়ার উপক্রম। সবগুলো হাতে হাতে ধরে নিয়ে যাওয়াও অসম্ভব। সেইদিনই বুঝলাম জিনিসপত্র রাখার ভালোমত ব্যবস্থা না থাকলে গাড়ি করে পিকনিক করতে যাওয়া মুশকিল। সুখের বিষয়—এই দুর্ভোগ ভুক্তভোগী এক ভদ্রলোক এই মুশকিলের আসান করতে পেরেছেন। তিনি তার মোটরের বসবার জায়গার পাশেই একটা তাক লাগিয়ে নিয়েছেন। এটা মোটরের তলাপির সঙ্গে স্ক্রু দিয়ে আটকান থাকে। এর তাকের ওপর কতকগুলো নানান্ মাপের খালি চোঙার মত কৌটা আটকান থাকে। এই চোঙাগুলোর মধ্যে এদের মাপের অনুপাত অনুযায়ী শিশি বোতলগুলো বসিয়ে দিলে আর সেগুলো পড়বার ভয় থাকে না।

*

গাড়িতে চড়েই ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়—"কে ধারে বসবে" এই হয় সমস্যা। গাড়ির দরজার পাশে বসে রাস্তা দেখতে দেখতে যাওয়ার লোভ সব ছেলেমেয়েরই থাকে। এতে বিপদের ভয় থাকে বলেই বড়রা বাধা দিতে চান। অনেক সময় অসাবধানতা বশত গাড়ির হাতলটার শিশুর হাত পড়ে গেলেই দরজাটি খুলে যায় আর শিশুর রাস্তায় পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ঘটে। অনেক গাড়িতে এজন্য অন্যরকম বন্দোবস্ত থাকে। সেখানে গাড়ির দরজাটা বন্ধ করার পর একটা বোতাম টিপে দেওয়া হয় এবং ঐ বোতামটা আবার টিপলে তবে দরজাটি খুলতে পারে। এ ব্যবস্থাও খুব নিরাপদ নয়। কারণ ছোট ছোট ছেলেরা কৌতূহলবশত কিম্বা খেলার ছলে এই বোতামটি টিপতে পারে আর তাহলেই দরজা খুলে যাবে। আজকালকার নতুন ব্যবস্থাটিই সবচেয়ে ভালো। গাড়ির দরজাটা বন্ধ করার পর হ্যাণ্ডেলটা একেবারে উল্টো দিকে ঘুরিয়ে
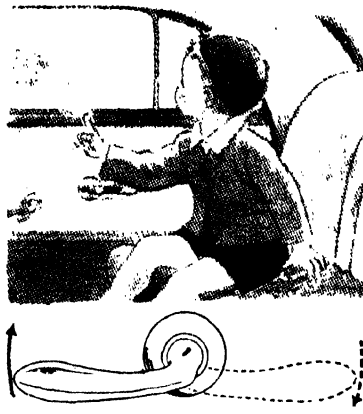
শিশুর বিপদ

রাখা, অর্থাৎ ঐ হ্যাণ্ডেলটি স্বস্থানে ফিরিয়ে না আনা পর্যন্ত আর দরজা খোলা যাবে না এবং সেটা ছোট ছেলেরা সহজে পেরে উঠবে না।

*

বিষেই বিষক্ষয়—কোনও কিছুর বিস্ফোরণের ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা রোধ করার জন্য বিশেষ ধরণের বোমার স্ফুরণের সাহায্য নেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। বৃটেনের 'রয়াল এয়ার ফোর্স'এর রসায়নবিদেরা এই ধরণের রক্ষাকারী বোমাটির ব্যবহার সম্বন্ধে গবেষণা করছেন। সামরিক বিমানবহরে অথবা কয়লার খনিতে হঠাৎ কোনও বিস্ফোরণের দরুণ সাংঘাতিক ধরণের বিপদ ঘটে। এই সব রসায়নবিদের পরিকল্পনা অনুযায়ী এই সব বিস্ফোরণের ধ্বংসলীলা বন্ধ করার জন্য একটি বোমা ফাটানো হবে। সাধারণত সে সব বিস্ফোরণ সহসা ঘটলো মনে হয় আসলে খুব সহসা ঘটে না। স্ফুরণ শুরু হওয়ার পর সশব্দে ফেটে পড়তে বেশ কিছুটা সময় লাগে। এরা আবিষ্কার করেছেন যে, এই ধরণের স্ফুরণ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, এক সেকেণ্ডের ১/৫ হাজার ভাগ সময়ের মধ্যে এক ইঞ্চি পরিমিত স্থানের বাতাসের চাপ প্রায় আধ পাউণ্ড মত বেড়ে যায় এমনকি ১/১৫ হাজার ভাগ সময় আগেও সমপরিমিত স্থানে বায়ুর চাপ মাত্র পাঁচ পাউণ্ড বাড়ে। এর থেকে তারা আন্দাজ করেছেন যে, মাত্র কয়েক সেকেণ্ড আগে ঐ নতুন বোমাটি ফাটানর ব্যবস্থা করলে সাংঘাতিক বিস্ফোরণের কুফল রোধ করা যেতে পারে। বোমাটির ভেতর নিষ্ক্রিয় কার্বন টেট্রা ক্লোরাইড গ্যাস ভরা থাকে। তাছাড়া এর মধ্যে কতকগুলো পাতলা সুবেদী (Sensative) ডায়াফ্রাম থাকে এর সঙ্গে একটা বোতাম মত থাকে। বিস্ফোরণ ঘটার এক সেকেণ্ডের বহু হাজার ভাগ সময় আগে যখন এক ইঞ্চি মত জায়গায় বায়ুর চাপ মাত্র তিন পাউণ্ড হয়, তখনই এই বোমার কাজ আরম্ভ হয়। এই টেট্রাক্লোরাইড গ্যাস তখন ছড়িয়ে পড়তে থাকে, তার ফলে বিস্ফোরণটা এত বেশী জায়গা জুড়ে ঘটে যে, স্থানের বিস্তৃতির অনুপাতে এর ধ্বংস করার ক্ষমতা অনেক কম হয়। এই রক্ষাকর্তা বোমাটি দেখতে একটি ছোট্ট আঙ্গুরের আধখানা মত। পরীক্ষা করার জন্য একটা পেট্রল ট্যাঙ্কের মধ্যে এই ছোট্ট একটি বোমা রেখে ঐ ট্যাঙ্কের মধ্যে বন্দুকের গুলী ছোঁড়া হয়। সাধারণ অবস্থায় ঐ গুলীর পরবর্তী ফল হিসাবে ঐ ট্যাঙ্কে দারুণভাবে বিস্ফোরণ ঘটার কথা, কিন্তু ঐ ছোট্ট রক্ষাকর্তাটির উপস্থিতি বশত ঐখানে সামান্য একটু কম্পন ছাড়া আর কিছুই ঘটেনি। যে সমস্ত রসায়নবিদগণ এই বোমাটি আবিষ্কার করেছেন, তাদের মতে এই বোমা যদি কোন কলকারখানা, কয়লার খনি, বিমানবহর ইত্যাদি যে সব স্থানে বিস্ফোরণের সম্ভাবনা আছে, সেই সব জায়গায় পূর্বাহ্নেই রাখা যায়, তাহলে আর কোনওদিন বিস্ফোরণ ঘটতে পারে না।

সরি, নো রিপ্লাই

রূপদর্শী

সামনে বিরাট বোর্ড, সার সার খোপ, প্রতি খোপে বালব্। যেই বালব্ জ্বলে উঠল অমনি সেটায় মনোযোগ দাও। 'প্লাগ্' লাগিয়ে জিগ্যেস কর, 'নাম্বার প্লিজ্'। জবাব শোনো, ঠিকঠাক যোগ করে দাও নম্বরে নম্বরে। যে নম্বর চাইল, দ্যাখ তা খোলা আছে কিনা? রিং করে

হ্যালো

দ্যাখ সে নম্বরে লোক আছে কিনা, কেউ 'হ্যালো' বলে সাড়া দেয় কিনা। দিচ্ছে না? বাস্ বলে দাও 'নো রিপ্লাই', সাড়া নেই। না কি সে নম্বরে কেউ কথা কইছে? তাহলে বল, 'এন্গেজড্'। সঙ্গে একটা 'সরি' বলো, নম্বর চাইলে 'প্লিজ্' বলো। কেননা, 'সাব্স্ক্রাইবার'রা সব ভদ্রলোক, তাদের একটু খাতির ক'রো। গ্রাহক বিগ্ড়োলেই দফা শেষ। কড়া স্বরের একটি হাঁক, হ্যালো, 'ক্লার্ক ইন্চার্জ'কে চাই, তারপর একটি 'কম্প্লেন্' মানে নালিশ, আধ ঘণ্টা ধরে চিল্লাচ্ছি, তোমার অপারেটরটি নম্বর দিচ্ছে না, বলি ঘুমুচ্ছে নাকি? বাস্ তোমার চাকরী খতম। তন্ময় হয়ে কাজ করছ, প্লাগের পর প্লাগে কানেক্শন্ দিচ্ছ, হঠাৎ তোমার পিঠে হাত পড়ল। চমকে চাইলে। ক্লার্ক ইন্চার্জ। হুকুম হল, বোর্ড ছেড়ে উঠে এস। পাশের মেয়েকে ভার চাপিয়ে উঠে এলে। আর কোনো কথা নয়, নিকালো। কোনো প্রশ্ন নয়, কোনো অনুসন্ধান নয়, 'গেট আউট্'। চোখের জল মুছে ফেলে, ঝাপসা চোখ সাফ করে শুকনো মুখে বেরিয়ে এলে রাস্তায়। আপীল করার সুযোগ নেই।

প্রথমে ছিল প্রাইভেট্ কোম্পানী। বেঙ্গল টেলিফোন কর্পোরেশন। তার আইন তার কানুন আলাদা। সংক্ষেপে বি টি সি রুল। কানুন আর কি? দিন মজুরী। যেদিন কাজ সেদিন মাইনে। কাজ নেই তো হরিমটর খাও। ছুটিছাটা নেই, অবকাশ নেই, অসুখ বিসুখ নেই। অসুখ হয়েছে? তা বেশ তো, এসো না কাজে। জবরদস্তি করছি নাকি আমরা? না কি মাথার দিব্যি দিচ্ছি কাজ করবার জন্য? খুশী হলে আসবে, ইচ্ছে হলে বাড়ীতে বসে থাকবে। তবে কাজ করবে না অথচ পয়সা দিতে হবে, এটা একটু আব্দার নয়? টেলিফোন কোম্পানী তোমার বাপ শ্বশুরের খাস তালুক নয়। অসুখ হয়েছে? তা অসুখ তো আর কোম্পানী তোমাকে ইন্জেক্শন্ দিয়ে দেহের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়নি। অসুখ হবে তোমার আর কাড়ি গুণবে কোম্পানী। মাইরী আর কি।

অবিশ্যি এটা সেই আমলের কথা। যখন কোম্পানী ছিল প্রাইভেট্, রুল ছিল 'বি টি সি'র। অপারেটর ছিল ফিরিঙ্গী মেয়েরা। তারপর টেলিফোনের মালিকানা নিলেন, সরকার। ফিরিঙ্গী মেয়েরা কমতে লাগল। বাঙালী মেয়েতে ভর্তি হল খালি আসন। পোস্ট এন্ড্ টেলিগ্রাফের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল টেলিফোনকে। চালু হল নতুন নিয়ম। 'পি এন্ড্ টি' (পোস্ট এন্ড্ টেলিগ্রাফ) রুলের রাজ্য এল। দিন মাইনের বদলে মাস মাইনে, বচ্ছরান্তে ছুটি, বিনি পয়সায় 'লাঞ্চ'। মেয়েরা একটু জিড়েন পেল। কিন্তু সরকার বড় হুঁসিয়ার লোক। বি টি সি মেয়েদের গায়ে হাতটি দিলে না, তারা যেমন তেমনই রইল। শুধু নতুন যারা ভর্তি হল, নতুন নিয়মের প্রজা হল তারাই। পুরোনো মেয়েরা চাপাচাপি করল। কিন্তু চাপাচাপি করলেই কাবু হয়ে পড়বে এমন ঠুনকো সরকার নয়। তবে যখন নেহাৎ অসহ্য হল তখন একটু সুবিধে দিলে। সুবিধে আর কি? দিন মাইনের বদলে মাস মাইনে আর দিন পনের ছুটি। পি এন্ড্ টি রুলে ওই যে আগে মুফত লাঞ্চটা চালু করেছিল, তাতে সরকার দেখল, বাঃ, মেয়েদের তো দিব্যি সুবিধে হচ্ছে, দাও ওটা তুলে। যা চালু হয়েছে তা আর তোলা গেল না অবিশ্যি। তবে হালে যারা ভর্তি হল তাদের হল বন্ধ, তার বদলে

হ্যালো, হ্যালো

নম নম করে একটা কিছু দিলে, মাসে জলখাবারের এলাউন্স, পনেরটা টাকা। তবে না খেলে পয়সা ফেরৎ পাবে না। সরকারের মতো রসিক কে? পাশাপাশি তিনটে বোর্ড, তিনটে মেয়ে বসে কাজ করছে, তার মধ্যে পুরোনো পি এন্ড্ টি লাঞ্চ খেতে চলে গেল, আর বি টি সি শুকনো ঠোঁটে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। ওদের লাঞ্চের পয়সা নিজের ট্যাঁক থেকে যাবে। সতীন কাঁটা কিনা, এদের উপর তাই দরদ কি?

কাজ কি কম? গ্রাহক বেড়েছে, বোর্ড বাড়েনি। মানুষ তো, যন্তর তো নয়। চল্লিশটে 'কল্' যারা সামলাতে পারত তাদের ঘাড়ে এখন চেপেছে একশ

হ্যালো হ্যালো হ্যালো

চল্লিশটে। পাব্‌লিক্ কি এ খবর রাখে? কাজ না পেলে অপারেটরকে গালাগালি। আর সে যে কি কুৎসিত ভাষা, কি অশ্লীল মন্তব্য, ভদ্দরলোকের মেয়ে হয়ে কিভাবে তা উচ্চারণ করব। তবে গ্রাহকরা ভদ্রলোক, জেন্টেল্‌ম্যান্ সব, আমাদেরকে তো তাদের খাতির করতেই হবে, 'প্লিজ্' বলতেই হবে, 'সার' বলতেই হবে।

মেয়েটি বললে, কিভাবে কাজ করি জানেন? সাড়ে সাত ঘণ্টা ডিউটি। মাঝে তিনটে 'হাফ্ আওয়ার', আধ ঘণ্টার ছুটি, মোট খাটুনি ছয় ঘণ্টা। অফিস টাইমে কি চাপ যে পড়ে। উঁচু বোর্ড, দাঁড়িয়ে থাক সারাক্ষণ। অনবরত চোখের উপর পিট্ পিট্ বালব্ জ্বলছে, এক সঙ্গে কুড়িটা পঁচিশটা। এই বোর্ড সাফ করছি, এই বোর্ড ভরে উঠছে। কানে বাজছে 'হ্যালো' 'হ্যালো' আর অগুণতি সংখ্যার উচ্চারণ। ঝাঁকের পর ঝাঁক কানের পর্দায় ঘা মারছে। মুখের থুথু শুকিয়ে গলা আটকে ধরেছে, জল খেয়ে গলা ভেজাবো ফুরসৎ নেই, অনবরত সাড়া দিচ্ছি, 'নাম্বার প্লিজ্', 'এন্‌গেজ্‌ড্ সার', 'নো রিপ্লাই'। মাথা ঝিম ঝিম করে ওঠে, গা থরথর করে ওঠে, মাঝে মাঝে টলে ওঠে সমস্ত সংসার। ভাগ্য যদি ভাল হয়, সুপারভাইজার যদি সদয় হন তো 'রিলিফ্' পাঠান, অন্য মেয়ে এসে একটু জিরেন দেয়। সেও কদাচিৎ। নইলে সেই হাফ্ আওয়ারের প্রত্যাশা। তাও কি নিয়ম মত মেলে। কি যে খামখেয়ালী ডিপার্টমেণ্টের, কেনই বা এরকম করে বুঝে উঠিনে। তিনটে 'হাফ্ আওয়ার' পাওনা, নিয়ম মতো দু ঘণ্টা কাজ আধ ঘণ্টা বিশ্রাম পাবার কথা। তা সুপারভাইজার করলে কি, প্রথম দু'ঘণ্টার মধ্যেই তিনটে 'হাফ্ আওয়ার' দিয়ে দিলে। তখন আমার মোটেই দরকার নেই, কিন্তু কে শোনে তা। বলতে গেলেই অকথ্য গালাগালি। পেট মানে না তাই চাকরী করতে এসেছি, চাকরী গেলে খাব কি, তাই শত খোয়ার সহ্য করেও পড়ে আছি। আমাদের ঘরের মেয়েরা কতখানি নিরুপায় হলে তবে পথে বেরোয় চাকরী খুঁজতে। কতখানি নিরুপায় হলে এত অপমান, এই অমানুষিক কষ্ট সহ্য করেও কাজ করতে থাকি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজ, কত মেয়ে ফিট্ হয়ে পড়ে যায়, সিট্ ছেড়ে উঠে একটু সাহায্য করব সে ফুরসৎ হয় না। সুপারভাইজার আসেন, ধরাধরি করে নিয়ে যান শুশ্রূষা করবার জন্যে। শুশ্রূষা তো ভারী, থাবলা থাবলা জল মাথায় দিলেন, স্মেলিং সল্টের শিশি শোঁকালেন, ব্যস্ শুশ্রূষা হয়ে গেল। না এক ফোঁটা দুধের বন্দোবস্ত না কিছু। যেই চোখ মেলল, তারপর আধ ঘণ্টা কেটেছে কি না কেটেছে বসিয়ে দিলে বোর্ডে। যদি গুরুতর কিছু হল, তো তখন রেহাই মিলল। বাড়ী যাবার হুকুম হল। তাও পোঁছে দেবার ব্যবস্থা নেই। বাড়িতে খবর পাঠানো হবে, লোক আসবে তবে নিয়ে যাবে। আর লোক যদি না আসে, তবে শুয়ে থাক সেই থ্যাকথেকে ছারপোকার বাথানে, সেই ময়লা ঘিনঘিনে গদিটার পরে। তোমার কোনো বন্ধুর ছুটি হলে তবে সেই তোমাকে নিয়ে যাবেখন।

কেন গ্রাহকরা হায়রানি হন? কেন তাঁরা ঠিকমত কাজ পান না? একদিনের তরেও কি কেউ জানতে চেষ্টা করেছেন? রিসিভার তুলেই আমাদের পান, কাজেই খিস্তি-খিখিস্তি আমাদের উপরই করে যান। তাঁরা নম্বর না পেলে তো গরম হবেনই। কিন্তু কেন তাঁরা নম্বর পান না? সে কী আমরা ফাঁকি মারি বলে, সখীর সঙ্গে গল্পে মশগুল হয়ে যাই বলে, প্রেমিকের সঙ্গে আলাপে ডুবে থাকি বলে? নিরন্তর এইসব মন্তব্য শুনতে হয়। রাগ হয়, কান্না পায়, কখনো কখনো অতি দুঃখে হাসিও আসে। সহকর্মী ফিট্ হয়ে পড়ে মারা গেলেও যাদের উঠে যাবার উপায় নেই, ফুরসৎ নেই, তারা করছে প্রেমিকের সঙ্গে আলাপ! ফাঁকি একেবারে দিইনা তা নয়, কিন্তু তুলনায় কতটুকু? গ্রাহকরা সাড়া পান না সম্পূর্ণ অন্য কারণে। মান্ধাতা আমলের বোর্ড, পচা গলা 'কর্ড' (তার), অকেজো প্লাগ্। কাজ হবে কি করে? এমন 'হেড্ সেট্' (শোনবার কল) দেয়, সেরখানেক ভারী, কান ব্যথায় টন টন করে ওঠে।

হ্যালো হ্যালো হ্যালো হ্যালো

অনবরত খুটখাট কি শব্দ হয়, 'কান্ট্ হিয়ার' হয়ে যাই, শুনতেই পাই না কিছু। হয়ত কেউ নম্বর চাইল, জবাব দিতে যাব, দিতে পাচ্ছিনে, কোন সময় 'কর্ড' আলগা হয়ে গেছে, টের পেয়ে সুপারভাইজারকে বললাম, তিনি ক্লার্ক ইনচার্জকে বললেন, তিনি 'এক্সচেঞ্জ' ইন্জিনিয়ারকে তলব করলেন, এক্সচেঞ্জ ইন্জিনিয়ার এলেন, পরীক্ষা করলেন, খুটখাট করলেন তখন ঠিক হল লাইন। ইতিমধ্যে ঘণ্টাখানেক কাবার, গ্রাহক রিসিভার খট্খট্ করে হয়রান হয়ে অপারেটরের চোদ্দপুরুষ ধুয়ে দিচ্ছেন। যে অনুপাতে এক্সচেঞ্জ বেড়েছে, যে অনুপাতে গ্রাহক বেড়েছে, সেই অনুপাতে যন্তরপাতি নতুন আমদানী হয়েছে অনেক কম। কথাটা একবার জিগ্যেস করুন না কর্তাদের, কি বলে শুনুন।

কি নিয়ে কাজ করি শুনবেন? 'হেড্ ফোন্' নিয়ে, উপরের টুকু 'হেড্সেট্', মাথার সঙ্গে আঁটা থাকে, আর নিচেরটুকু 'মাউথপিস্', মুখের নিচে ঝুলে থাকে। কথা বলতে বলতে তাতে থুথু ছিট্কে পড়ে। কত মেয়ের কতরকম তো রোগ থাকে, তার 'মাউথ্পিসে' অন্য মেয়ের মুখ দিতে ঘেন্না করে না? কত বলেছি, নিজের নিজের আলাদা 'মাউথ্পিস্' দিতে, কেউ কর্ণপাতও করেনি। আমাদের মধ্যে টিবি রোগী আছে, তার 'মাউথপিসে'ও জেনেশুনে মুখ দিতে হয়, হয়ত একটু 'ডেটল্' বুলিয়ে দিল, ব্যস্। কে ঝগড়া করবে? সে সুযোগও নেই, ফুরসৎও নেই। একটা 'রেস্ট রুম্' আছে, খান আষ্টেক সোফা কবে কেনা হয়েছিল জানিনে, হয়ত সীতার বনবাসকালে, ছিঁড়ে খুঁড়ে ফর্দা ফাই, নারকোলের ছোবড়াগুলো যেন আমাদের দুর্দশা দেখে দাঁত বার করে হাসতে বেরিয়েছে। অল্প কয়েকটা বসবার জায়গা আর তিনটে এক্সচেঞ্জের মেয়ে, আঁটবে কেন? ঝাড়া দু' ঘণ্টা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ডিউটি দিয়ে আবার দাঁড়িয়ে থাক এখানে, তারপর ডিউটিতে ফিরে গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজ কর, যতক্ষণ না মূর্ছা খেয়ে পড়ে যাও। রাত্তিরে ডিউটি দিতে আসব, শোবার ব্যবস্থা দেখলে মাথা গরম হয়ে ওঠে। সেই ঠাসাঠাসি, গাদাগাদি। দিনের বেলায় সাড়ে সাত ঘণ্টা ডিউটি কিন্তু রাত্তিরে দশ ঘণ্টা, ওভারটাইম ঠাইম একেবারে লবডঙ্কা। জল খেতে দ্যায়, গেলাসের গায়ে লিপ্স্টিকের দাগ, ধোয় না পর্যন্ত। একটা আলমারী কি ডেস্ক নিজের বলতে কিছু নেই। কাজের জায়গায় কিচ্ছু নিয়ে যাবার নিয়ম নেই। তাহলে কোথায় রাখব ব্যাগটা? ওভার কোটটা? বিছানার চাদরটা? সেখানে খুশী রাখ। খোলা জায়গায় রেখে যাই, ফিরে এসে পাব কিনা কে জানে?

মেয়েটি বললে, গরীবের মেয়ে, তবু আমার একমাত্র ওভারকোটটি খোয়া গেছে এমনি করে, শীত আসছে, এবার বিনা কোটেই কাজ করতে হবে। ব্যাগ চুরি গেছে বার চারেক। এর তার কাছ থেকে দু'চার আনা ধার করে বাড়িতে ফিরেছি।

সরি, নো রিংলাই

সবচেয়ে দুঃখের কথা, আমরা লোকের নম্বর জোগাই, আর আমাদের কোনো জরুরী দরকারে 'কল্' এলে শুনতে পাইনে। আমার সঙ্গে একটি মেয়ে কাজ করত। তার স্বামী অসুস্থ। তাকে রেখেই কাজ করতে আসত। নইলে বেতন কাটা যায়। চিকিৎসার জন্য টাকার তো দরকার। একদিন কাজে এসেছে। হঠাৎ ওর বাসা থেকে 'কল্' এল। ক্লার্ক ইন্চার্জ শুনল কি শুনল না বলে দিলে, 'অন্ ডিউটি'। আবার 'কল্' এল, স্বামীর অবস্থা খারাপ। জবাব গেল, 'অন্ ডিউটি'। ফোন এল, হ্যালো হ্যালো, ওকে শিগ্গির পাঠিয়ে দিন। ক্লার্ক ইন্চার্জ ধমকে উঠল, কি খামাখা বিরক্ত করছেন, বলছি না এখন ওকে ডাকা হবে না, ডিউটিতে আছে। এবার অনেকক্ষণ পরে ডাক এল, হ্যালো; ওকে একটা খবর দিয়ে দেবেন, আর তাড়াতাড়ি করে আসবার দরকার হবে না, ওর স্বামী মারা গেছেন, ডিউটি শেষ হলেই তাকে পাঠিয়ে দেবেন।

ট্রামে-বাসে

একটি সংবাদে জানিলাম খণ্ডজাতীয় লোকেরা শ্রীনেহরুকে শিরস্ত্রাণ হইতে আরম্ভ করিয়া তরবারী, তীরধনুক, ছাগল, মুরগী প্রভৃতি নানারকম উপহার দেয়। সংবাদদাতা বলিয়াছেন যে, একটি হিমালয় প্রদেশের ভল্লুক উপহার পাইয়া নেহরুজী নাকি আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন।

* * *

বিশু খুড়ো বলিলেন—"প্রসঙ্গত একটি গল্প মনে পড়ে গেল। বহুদিন আগে পূর্ববঙ্গের কোন এক অজ্ঞাত কবি একবার চিড়িয়াখানা দেখতে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি এক এক করে অনেক কিছুই দেখলেন, কিন্তু যে মুহূর্তে তিনি একটি খাঁচায় কয়েকটি ভালুক দেখতে পেলেন অমনি তার কবিচিত্ত একবারে উদ্বেলিত হয়ে উঠল এবং তিনি সঙ্গে সঙ্গে গান ধরে ফেললেন:—

'ভল্লুকের কি আমদানী, মহারাণী
ধন্য তোমার জমিদারি' !!"

* * * *

অন্য এক সংবাদে প্রকাশ, শ্রীনেহরু ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নাকি সস্নেহে চুম্বন করিয়াছিলেন। শ্যামলাল বলিল—"ভাগ্যিস ঘটনাটা সভার, সিনেমার হ'লে সেন্সার বোর্ড হয়ত কাঁচি উঁচিয়ে আসতেন।"

* * * *

ছাড়পত্র প্রথা প্রবর্তনের পর একদিন পাকিস্থান হইতে নাকি একটি বিড়াল ট্রেনযোগে ভারতে আগমন করিয়াছে।

—"বোধহয় সে সংবাদ পেয়েছে শিকেটা ভারতেই ছিঁড়ে বেশি"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * * *

একটি সংবাদে পাঠ করিলাম কেন্দ্রীয় সরকার ব্লেড আমদানী বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।—"নেহরুজী থেকে শুরু করে
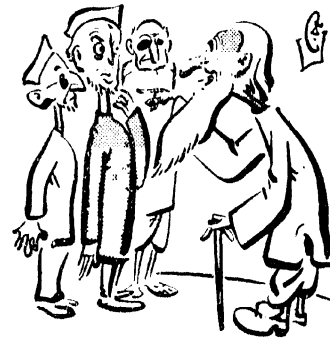
ছোটবড় সবাই যদি দাড়ি গজাতে আরম্ভ করেন, তাহলে ট্যাণ্ডনজীর পক্ষে আর খাঁটি কংগ্রেসী খুঁজে পাওয়া শক্ত হবে না"—মন্তব্য করেন বিশু খুড়ো।

* * * *

কোন এক অনুষ্ঠানে নেহরুজী খণ্ডজাতীয় লোকদের সঙ্গে নৃত্য করিয়াছেন, এই সংবাদও আমরা পাঠ করিয়াছি।—"তবু ভালো; দিল্লীর নৃত্য তো উঠোন বাঁকা বলেই জমলোনা"—মন্তব্য বলা বাহুল্য খুড়োর।

* * *

একটি সাম্প্রতিক সংবাদে জানা গেল, বোম্বাইর কোন অঞ্চলে জাপানী প্রথায় ধান চাষ করিয়া নাকি কর্তৃপক্ষ আশাতীত ফল পাইয়াছেন।—"হাঁড়িকুঁড়ি পূর্ণ হওয়ার সংবাদ সত্যিই আশাপ্রদ। অন্যান্য অঞ্চলে হারিকিরির সংবাদই পাচ্ছি, অবশ্যি সেটাও জাপানী প্রথা"—মন্তব্য করেন বিশু খুড়ো।

* * * *

সম্বলপুরের একটি খোঁয়াড়ে দুইটি গরু অনাহারে প্রাণত্যাগ করায় স্থানীয় অধিবাসীরা অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছেন। শ্যামলাল চোখ বুজিয়া রামপ্রসাদী ধরিল—"শুধু প্রসব করলেই হয় না মাতা"!

* * * *

নাগিবের প্রতিনিধি এল নাহাশকে তাঁর বিত্তসম্পত্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে, তিনি জানান যে, তিনি নিজে বড়ই গরীব। সুতরাং প্রশ্নটা তাঁর স্ত্রীকেই করা উচিত। নাহাশ-পত্নী অতঃপর জানান যে, তিনি বিত্তের অধিকারিণী হইয়াছেন মহিষের ব্যবসা করিয়া।—"অতঃপর খাটাল সাফ সম্বন্ধে নাগিব কর্পোরেশনী নীতি অনুসরণ করেন, না কী করেন, তা দেখবার জন্যে সবাই উদ্গ্রীব হয়ে থাকবে"—বলে শ্যামলাল।

* * * *

কৃত্রিম বৃষ্টির পর আমাদের কমলাকান্তের কৃত্রিম রৌদ্র সৃষ্টির কথা শুনাইলে বিশু খুড়ো বলিলেন, তিনি নাকি খাঁটি রামধনু তৈরির সন্ধান জানেন। জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন—"মন দিয়ে তিন বেলা সরকারী পরিকল্পনা পাঠ কর,

পরে আকাশের দিকে তাকাও—দেখিবে রামধনুর রঙের হোলি লেগে গেছে"!

গত বারো মাসের প্রমোদ বিবরণ

(নভেম্বর ১৯৫১—অক্টোবর ১৯৫২)

আর্থিক অবস্থায় আলোচ্য বারো মাস তার আগের বারো মাসের চেয়ে খারাপ এবং এখনও গতিটা নিম্নগামী। সেটা অবশ্য দেশের সাধারণ অবস্থারই প্রতিফলন। কিন্তু তার মধ্যেও কলকাতার সব রকম প্রমোদ-আসরে একটা নতুনের চেতনা সারা বছর ধরেই অনুভব করা গিয়েছে এবং এ অনুভূতিটা বাড়তির দিকেই চলেছে। নানা রকমের প্রমোদ মাধ্যমের মধ্যেই দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে ও জাগিয়ে তোলার দিকে যেমন, তেমনি দেশ ও সমাজের কাছে প্রমোদকরদের দায়িত্বের কিছু কিছু আভাস পাওয়া গিয়েছে। খুব শক্তিশালী পরিচয় যদিও সব ক্ষেত্রে পাওয়া যায়নি, কিন্তু নতুন দিকে চলবার ঝোঁক যে তৈরি হচ্ছে, সেইটেই হলো বড়ো কথা।

প্রমোদের কথা বলতে চলচ্চিত্রের প্রসঙ্গই হচ্ছে প্রধান, আর এই বারো মাসে বাঙলা দেশের চলচ্চিত্র সারা ভারতেরই চলচ্চিত্র পরিকল্পনাতে বেশ বলিষ্ঠ ঝাঁকুনি দিতে সক্ষম হয়েছে। ছবির বিষয়বস্তু ও পরিবেশন সম্পর্কে নতুন দিক দিয়ে ভাববার প্রেরণা এনে দেওয়াতে বাঙলার এবছরকার কৃতিত্ব স্মরণীয় হয়ে থাকবার মতো।

মঞ্চের দিকে সৌখীন ও অপেশাদারী সম্প্রদায়দের এবারের মতো এতো অভিনয়-প্রচেষ্টা আর কখনও দেখা যায় নি। কলকাতার পেশাদারী মঞ্চ, আশপাশের রেলওয়ে বা অনুরূপ প্রতিষ্ঠানদের মঞ্চ, লোকের বাড়ির নাটমন্দির, নাটপ্রাঙ্গণ প্রভৃতি শহর বা শহরতলীর যে সমস্ত জায়গায় কোন রকমে নাটক মঞ্চস্থ করার উপায় আছে, তা কোনটি কচিৎ ফাঁকা থাকতে দেখা গিয়েছে। শত শত নতুন ক্লাব, সঙ্ঘ বা নাট্যগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে। অফিসে অফিসে 'রিক্রিয়েশন ক্লাব' নাটক অভিনয়ের জন্যে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অথবা যাঁদের আগে থেকেই প্রতিষ্ঠা ছিল, তারা তেড়েফুঁড়ে মাথা চাগিয়ে উঠে নাটক অভিনয় করতে লেগেছেন। বেশ একটা নাট্যাভিনয়ের ব্যাপক হিড়িক দেখা গিয়েছে সারা বছর ধরেই। স্থায়ী মঞ্চগুলি সৌখিন সম্প্রদায়গুলিকে সে-দিনে মঞ্চ ভাড়া দিয়ে এখন একটা বেশ বাঁধাধরা আয় করে নিয়েছে; কেউ কেউ সৌখীন সম্প্রদায়গুলির সখের সুযোগ নিয়ে দাঁও মারারও চেষ্টা করেন বলেও শোনা গিয়েছে।

সৌখীন সম্প্রদায়গুলির কিন্তু অনেকেরই নতুন নাটক পরিবেশন করার দিকে ঝোঁক দেখা গিয়েছে। এদের মধ্যে প্রতিভার পরিচয় দেবার মতো নাটক একখানিও দেখা না গেলেও নতুন কিছু দেবার, দুর্বল হলেও, একটা চেষ্টার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। তবে বেশির ভাগই অভিনীত হয়েছে পুরনো নামকরা নাটক-গুলি। যাই হোক, দেশে নাট্য-আন্দোলন অসংবদ্ধভাবেও ব্যাপকতার আকার নিয়েছে। সেটাও একটা ভালো লক্ষণ—এরই মধ্যে দিয়ে বলিষ্ঠ ও যুগান্তকারী সৃষ্টি বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা সমুজ্জ্বল।

অপেশাদারীদের প্রচেষ্টা

এখন নাম করার মতো প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন অপেশাদার গোষ্ঠীর মধ্যে বহুরূপী দু'খানি নাটক আলোচ্য সময়ের মধ্যে পরিবেশন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের "চার অধ্যায়" এবং ইবসেনের "এনিমি অফ্ দি পিপল্"-এর অনুবাদ "দশচক্র"। "চার অধ্যায়" তাঁরা সাধারণেও বারকয়েক অভিনয় করেন, কিন্তু "দশচক্র" তাঁরা কেবল ঘরোয়াভাবে তাঁদের পৃষ্ঠপোষক ও পরিচিত দর্শকদের সামনে একবার মাত্র মঞ্চস্থ করেন। প্রধানতঃ সবিতাব্রত দত্ত ও তৃপ্তি মিত্রের অভিনয়ের জন্যে "চার অধ্যায়" এক অনবদ্য মঞ্চাবদানে পরিণত হতে পেরেছিলো। তবুও যে কোন কারণেই হোক, এঁরা বার দুইয়ের বেশী এ নাটকখানি মঞ্চস্থ করেননি। "দশচক্র" এই সম্প্রদায়ের এ পর্যন্তকার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিই শুধু নয়, নাটকখানি সাধারণ্যে পরিবেশিত হলে বাঙলা রঙ্গমঞ্চেই একটা সাড়া জাগিয়ে তুলতে পারবে বলে মনে হয়। শ্রীরঙ্গমে অনুষ্ঠিত ঘরোয়া অভিনয়ে বহুরূপীর নিয়মিত শিল্পীরাই এতে অভিনয় করেন।

আগের বছরে "নতুন ইহুদী" পরিবেশন করে উত্তর সারথী সম্প্রদায় প্রভূত খ্যাতি অর্জন করলেও এ দলটি আর কোন নতুন নাটক হাজির করতে পারেননি। শিল্পশ্রী নামক এক সৌখীন নাট্যকে দল "ভুল" নামের একখানি নাটক পরিবেশন করে খ্যাতি অর্জন করেছেন। দুর্বল নাটক কিন্তু অভিনয়ের উৎকর্ষে এটি এ বছরের একটি প্রণিধানযোগ্য সৃষ্টি হতে পেরেছে। বাঙলা পর্দার এবং অধুনা মঞ্চখ্যাতা অভি-নেত্রী শ্রীমতী মলিনা মঞ্চে তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ পরিচয় দিয়েছেন এই নাটকে অভিনয়ে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা উল্লেখ করতে হয়। সৌখীন নাট্যকে দলগুলি তাদের অভিনয়ের মান উঁচু করে তোলার একটা উপায় ঠিক করে নিয়েছেন। তাঁরা নাটকের প্রধান ক'টি ভূমিকাতে মঞ্চ ও পর্দার নামকরা শিল্পীদের ভাড়া করে নিয়োজিত করতে আরম্ভ করেছেন। মঞ্চ ও পর্দার কাজ কমে যাওয়ায় পেশাদার শিল্পীদের অনেককে এই উদ্দেশ্যে পাওয়াও সহজ হয়েছে। তাছাড়া অনেককে অবশ্য খাতিরে পড়ে সৌখীন দলের অভিনয়ে যোগ দিতে হয়। এর ফলে সৌখীন সম্প্রদায়ের অভিনয়ের প্রতি লোকের শ্রদ্ধাও বেড়ে গিয়েছে এবং সৌখীন দলের অভিনয় দেখবার জন্যে জনসাধারণের মধ্যে আগ্রহের সঞ্চার হয়েছে।

সৌখীন দলের অভিনয় ব্যাপারে আরও একটা লক্ষ্য করার বিষয় আছে। আগে স্ত্রী ভূমিকাগুলিতেও পুরুষেরাই অভিনয় করতেন। কিন্তু এবারে দেখা গেলো কয়েকটিমাত্র অভিনয় ছাড়া অধিকাংশই স্ত্রীভূমিকাগুলিতে মহিলা শিল্পীদেরই নিয়োগ করেছেন। মহিলাদের সবায়ের সঙ্গে মিশে অভিনয় করার মনের আড়ষ্টতা চলে গিয়েছে। তাছাড়া এর মধ্যে দেশের অর্থনৈতিক কারণটাও জড়িত রয়েছে। অভিনয়াদির দিকে যাদের ঝোঁক আছে তেমন মেয়েরা সৌখীন দলে অভিনয় করে অর্থাগমের একটা পথ পেয়েছেন। বস্তুত মহিলা শিল্পীদের বেশ একটা দল তৈরী হয়েছে যারা সৌখীন সম্প্রদায়গুলির নাটকাভিনয়ে অংশ গ্রহণ করে অর্থোপার্জন করে থাকেন। জনকয়েক একই অভিনেত্রীকে তাই আজকাল ভিন্ন ভিন্ন দলের অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করতে দেখা যায়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এদের মধ্যে বেশীর ভাগই পেশাদার মঞ্চ বা পর্দার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নন, এরা কেবল সৌখীন দলগুলির হয়েই অভিনয় করে যান। এবং এদের মধ্যে জন-কতক শিল্পী এইভাবে সৌখীন দলে অভিনয় করে জনপ্রিয়তা অর্জন দ্বারা পর্দা ও পেশাদার মঞ্চের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে পেরেছেন। এই পর্যায়ে প্রতিভাসম্পন্ন

শিল্পীদের মধ্যে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, বাণী গাঙ্গুলী প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে করা যেতে পারে।

নৃত্য ও নৃত্যনাট্য

নাচের দিক থেকে আলোচ্য বারো মাসে বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো কতকগুলি কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। খুব নামকরাদের কাউকেই এই সময়ের মধ্যে কলকাতার আসরে দেখা যায়নি তবে এখানকারই কতকগুলি দল নাম করে নেবার মতো কৃতিত্ব দেখাতে সক্ষম হয়েছেন। এদের মধ্যে সবচেয়ে কৃতিত্ব দেখান অনাদি-প্রসাদের অধিনায়কত্বে প্রগ্রেসিভ ব্যালে গ্রুপ। নানা রাজ্যের লোকনৃত্যের দিকেই এদের বেশী ঝোঁক। কিন্তু প্রভূত খ্যাতি অর্জন করলেও বছরের গোড়ার দিকে বার দুই মাত্র তাদের দেখা গিয়াছিলো; পরে আর পাত্তাই পাওয়া গেলো না। "ডিসকভারি অফ্ ইন্ডিয়া" খ্যাত শান্তি বর্ধনের অধিনায়কত্বে বম্বের নিউ স্টেজ দল মনে থাকবার মতো কৃতিত্ব দেখিয়ে গিয়েছেন। এদের অনুষ্ঠানে ছিলো শ্রীরামচরিত মানস অবলম্বনে নৃত্যনাট্য। সর্বাঙ্গীন অভিনয়ের একটা আমেজ সৃষ্টি করে গিয়েছেন এরা এবং আবার এলে এ দলটি এখানকার সুধীমণ্ডলীর কাছে খুবই খাতির পাবেন মনে হয়।

রবীন্দ্রসংগীতের শিক্ষাকেন্দ্র দক্ষিণী রবীন্দ্রনাথের "অরূপরতন" পেশ করেন, কিন্তু এদিক থেকে সাফল্য লাভ করতে পারেননি। তার চেয়ে সুরেমন্দিরের "শ্যামা" অভিনয় প্রশংসা পেয়েছে। সন্তোষ সেন-গুপ্তের অধিনায়কত্বে এই অভিনয়টি অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। রবীন্দ্র জন্মোৎসব উপলক্ষে শান্তিদেব ঘোষের পরিচালনায় মহাজাতি সদনে "তাসের দেশ" অভিনয় রবীন্দ্রনাটকাবলীর মধ্যে অনায়াসেই শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান অর্জন করে।

মীরাবাঈয়ের জীবনী অবলম্বনে নৃত্য-ভারতী এবং অপর একটি সম্প্রদায়, র‍্যাট্‌স, দুটি ভিন্ন ভিন্ন নৃত্যনাট্য পরিবেশন করেন। নৃত্যভারতীর পরিবেশনটি বিজন ঘোষ দস্তিদার, মীরা ঘোষ দস্তিদার ও ইরা দাশগুপ্তের গানে অপূর্ব পুলকময় অবদান হয়ে উঠেছিলো। আর উল্লেখযোগ্য নৃত্যনাট্য পরিবেশন করেছিলেন আর্ট সেণ্টার অফ্ সাউথ—নন্দের. নন্দন, সুর বিজ্ঞান (বালিগঞ্জ)—কচ ও দেবযানী; রঙমহলে 'অভিশপ্ত উর্বশী'; আর্ট সেণ্টার অফ দি ওরিয়েণ্ট—চাঁদ সদাগর।

শুধু নাচের দিক থেকে আতম্বা সিংয়ের পরিচালনায় নৃত্যভারতী দলের মণিপুরী রাস নৃত্যের কথাও উল্লেখ করা যায়। বাইরে থেকে এবারে নাচিয়ে এসেছিলেন দক্ষিণ ভারতের শ্রীমতী কমলা এবং সরস্বতী গণনিলয়মের ছাত্রীদের নিয়ে একটি দল।

ছোটদের নাচের আসরও কয়েকটি দেখা গিয়েছে। এদের মধ্যে যুগান্তকারী অনুষ্ঠান ব'লে অভিহিত করা যায় চিলড্রেনস লিটল্ থিয়েটার বা ছোটদের রঙমহলকে। কলকাতার বিভিন্ন স্কুলের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের সম্মিলিত নাচ ও গানের মধ্যে দিয়ে তাদের শিল্পানুভূতি জাগিয়ে তোলার চমৎকার প্রচেষ্টা এই অনুষ্ঠান। নন্দন এবারে "মহাযুদ্ধ" নামে একটি নতুন মুখোশ অভিনয় এবং সেই সঙ্গে "মুক্তামালা" নামে নৃত্যনাট্য পরিবেশন করেন। এদের আগের বছরের উপহার "রামায়ণ" মুদ্রানাটকের স্রষ্টা অবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায় আর একটি নতুন দল গড়ে "মনসা মঙ্গল" নামে আর একখানি মুদ্রা-নাটক পরিবেশন করেন।

আমেরিকা থেকে ম্যানহাটন পল নামক এক নিগ্রোর অধিনায়কত্বে "হারলেম ব্ল্যাক-বার্ডস" আখ্যাত একটি সম্পূর্ণ নিগ্রো নাচিয়ের দল সপ্তাহ তিনেক কলকাতায় আসর পেতে যান। আদিরসাত্মক নাচের প্রাধান্য এবং আমাদের দেশের বিচার অনুযায়ী চারুসৌষ্ঠবের অনাধিপত্য এদের নাচ সম্পর্কে কোন বড়ো ধারণা পোষণ করার সুযোগ দেয়নি। অভিনবত্ব ছিলো এই যা।

পেশাদার মঞ্চ

মাত্র চারটি পেশাদার মঞ্চ নিয়ে আলোচ্য বছরটি আরম্ভ হয়। তারপর প্রথম মাসেই অর্থাৎ নভেম্বরেই হাওড়াতে কৃষ্ণাশ্রী নামে একটি অভিনয় মঞ্চের উদ্বোধন হয়। তারপর মার্চ মাসে ছবি বিশ্বাস প্রমুখ জনকতক শিল্পী মিলে মধ্যকলকাতার কোরিন্থিয়ান মঞ্চে হিন্দী নাট্যাভিনয়ের অবসর সময়ে বাঙলা নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। মাস দুই এরা সুন্দরম নাম নিয়ে বাঙলা নাটকের অভিনয় চালিয়ে যান এবং তারপর আর টিকে থাকতে পারেন নি। এই সময়ের মধ্যে এরা একখানি নতুন নাটক উপহার দেন।

হাওড়ার কৃষ্ণাশ্রী গোড়াতে "নতুন পৃথিবী" নামক একখানি নাটক পেশ করেন, কিন্তু তারপর কেবল পুরনো নাটকই অভিনয় করে যাচ্ছেন তাও অনিয়মিতভাবে। মঞ্চ হিসেবে আশাপ্রদ কিছু এ'রা এখনও করে উঠতে পারেন নি। সুন্দরম্ আরম্ভ করেন "মন্ত্রশক্তি" নিয়ে, তাছাড়া, তারা বহুরূপীকে তাদের পূর্বেকার সাফল্যমণ্ডিত নাটক "ছেঁড়া তার" ও "পথিক" এবং উত্তর সারথীকে "নতুন ইহুদী" বারকয়েক মঞ্চস্থ করার সুযোগ দেন। সুন্দরম্ তাদের নিজেদের পক্ষ থেকে শরৎচন্দ্রের "স্বামী"-র নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করেন, কিন্তু মাত্র কয়েকদিন অভিনয় করার পরই দলটিই অবলুপ্ত হয়ে যায়। সুতরাং শেষ পর্যন্ত আগেকার সেই চারটি মঞ্চ—শ্রীরঙ্গম, স্টার, মিনার্ভা ও রঙমহলই রয়েছে।

চারটে মঞ্চের এবং সেই সঙ্গে পর্দারও প্রখ্যাত শিল্পীদের একত্রিত করে সম্মিলিত অভিনয়ের হিড়িক এবারে খুব বেশী দেখা গিয়েছে। শিল্পী সম্মেলনে নামকরা পুরনো নাটকগুলিই অভিনীত হয় আর এসব অভিনয় জনপ্রিয়তার দিক থেকেও খুবই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। প্রায় প্রতি

সপ্তাহেই কোন না কোন মণ্ডটিতে সম্মিলিত অভিনয়ের অনবরত ব্যবস্থা হতে থাকায় মঞ্চের ওপরে জনসাধারণের আকর্ষণ অচ্ছেদ্য থেকে গিয়েছে সারা বছর ধরেই। মঞ্চাভিনয়ের দিকে লোকের ঝোঁকও তাই আগের চেয়ে বেড়ে গিয়েছে মনে করা যায়।

হিন্দী নাটক অভিনয়ের আসর আগের বারের মতোই মিনার্ভা, কোরিন্থিয়ান ও মুনলাইট সিনেমার মধ্যে আবদ্ধ আছে। ডিসেম্বর মাসে বম্বের পৃথ্বী থিয়েটার তাদের বিখ্যাত ছ'খানি নাটক—"দীওয়ার", "গদ্দর", "কলাকার", "শকুন্তলা", "পাঠান" ও "আহুতি" সপ্তাহ দুই ধরে কলকাতায় অভিনয় করে বিপুল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়। কিন্তু তার জন্যে এখানকার হিন্দী পেশাদার মঞ্চের কোন উন্নতিই সূচিত হয়নি। তবে পৃথ্বী থিয়েটারের নাট্য পরিবেশন ধারা মূলত বাঙলার মঞ্চধারারই অনুকরণ হলেও পরিবেশ সম্পদে এখনকার বাঙলা মঞ্চের চমৎকারিত্বকে ছাপিয়ে যাবার মতো পারিপাট্য দেখিয়েছে।

নতুন নাটক

নতুন নাটকের আবির্ভাব ক্রমশ কমেই যাচ্ছে। প্রাক্তন বারো মাসের চোদ্দখানি নতুন নাটকের জায়গায় আলোচ্য বারো মাসে মাত্র ন'খানি নতুন নাটক পাওয়া গিয়েছে এবং শংকার বিষয় হচ্ছে এই ন'খানি নাটকের একখানির মধ্যেও প্রণিধানযোগ্য নাট্যশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়নি। আর নাটকের দুর্বলতার জন্যেই মনে ছাপ থাকবার মতো কারুরও অভিনয়-দীপ্তি দেখা যায়নি। অভিনয় প্রতিভার যা কিছু পরিচয় পাওয়া গিয়েছে পুরনো নাটকগুলির সম্মিলিত অভিনয় ক্ষেত্রেই শুধু। নতুন শিল্পীর এ বছরে একজনেরও উদ্ভব হয়নি।

এরিক এলিয়ট নামক বিলেতের এক শিল্পী মার্চ মাস থেকে সপ্তাহকতক ধরে সেক্সপীয়রের তিনখানি এবং বার্নার্ড শ'র একখানি নাটক নিয়ে সসম্প্রদায় কলকাতার মঞ্চে আবির্ভূত হন। সম্পূর্ণ বিলিতী দল কর্তৃক পূর্ণাঙ্গ নাটক অভিনয় এই প্রথম এবং কৌতূহলী নাট্যরসিকদের তা দৃষ্টিও আকর্ষণ করে। কিন্তু এ দলটি কোনরকম সাড়া জাগিয়ে তুলতে পারে নি। বিলেতে যারা অভিনয় দেখেছেন তাঁদের মতে এ দলটির অভিনয় বিলেতের তুলনায় উচ্চশ্রেণীর কিছু নয়। এই এরিক এলিয়টেরই উদ্যোগে শিশিরকুমারের সম্প্রদায় আমেরিকায় গিয়েছিলেন।

চলচ্চিত্র মেলা

আলোচ্য বারো মাস বাঙলার চিত্রশিল্পের একটি স্মরণীয় অধ্যায় রচনা করে দিয়েছে। ছবি ও ঘটনা উভয়দিকেই স্মরণীয় বছর।

মার্চ মাসে এক সপ্তাহ ধরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র মেলাটি সারা পৃথিবীরই একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ২৪শে জানুয়ারী মেলাটি বম্বেতে উদ্বোধিত হয় এবং সেখানে দু' সপ্তাহ থাকবার পর এক সপ্তাহের জন্য যায় মাদ্রাজে, তারপর এক সপ্তাহ থাকে দিল্লীতে এবং দিল্লীর পর এক সপ্তাহের জন্য আসে কলকাতায়।

এই মেলার দরুণ এদেশে চলচ্চিত্র শিল্প এই প্রথম সংবাদপত্রের প্রথম পাতার খবর হ'য়ে দাঁড়ায়। এই উপলক্ষে বেঙ্গল মোশন পিকচার্স এসোসিয়েশনের উদ্যোগে ইডেন গার্ডেনসে দু' সপ্তাহব্যাপী এক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়। প্রতিদিন বিবিধ সাংস্কৃতিক

অনুষ্ঠান ছাড়া চলচ্চিত্র সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ও প্রচারসামগ্রী প্রদর্শিত হয়। রাজ্যপাল ডাক্তার হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। পৃথিবীর ২৩টি রাষ্ট্র মিলিতভাবে ৫০খানি পূর্ণদৈর্ঘ্য ও ১০০খানি ছোট ছবি মেলাতে দেখাবার জন্য প্রেরণ করে। সাতটি রাষ্ট্র প্রতিনিধি-দল পাঠায় এবং ৫টি রাষ্ট্র স্থানীয় বাণিজ্য দূতদেরই প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নির্দেশ দেয়।

এই এক সপ্তাহ চলচ্চিত্র দেখার জন্য কলকাতার জনসাধারণের মধ্যে দারুণ উদ্দীপনা দেখা দেয়। অভিজ্ঞ মহলের মতে আন্তর্জাতিক মেলাটি কলকাতাতেই সবচেয়ে বেশী সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। এক সঙ্গে এতো দেশের নানা রকমের ছবি স্থানীয় চিত্রনির্মাতাদের মধ্যেও নতুন দৃষ্টিলাভ করার সহায়তা এনে দিয়েছে। ছবির রূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে নতুন করে ভাববার প্রেরণা এনে দিয়েছে। এই সঙ্গে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিলো। পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে চিত্রতারকাদের ক্রিকেট খেলা ও স্পোর্টসে যোগদান—এর আগে কখনও হয়নি এখানে।

ছবির বাজার

আনুপাতিক হিসেবে হিন্দীর চেয়ে বাঙলা ছবির বাজারের উন্নতি দেখা দিয়াছে এবং উন্নতিটা ক্রমবর্ধমান। এর কারণ উন্নততর বাঙলা ছবির সংখ্যাধিক্য এবং অবাস্তব ও বিদেশীঘেঁষা হিন্দী ছবির প্রতি দর্শকদের বিতৃষ্ণা।

আলোচ্যকালে কলকাতায় একটিমাত্র নতুন চিত্রগৃহের (মেনকা) উদ্বোধন হয়ে মোট চিত্রগৃহের সংখ্যা ৬৬টিতে দাঁড়িয়েছে। সব ভাষার ছবি মিলিয়ে এই সময়ের মধ্যে মোট ছবি মুক্তিলাভ করেছে ৩৮১খানি—বিদেশী ২৫৬, হিন্দী ৮২ এবং বাঙলা ৪৩খানি। এরই প্রাক্তন বারো মাসে বিদেশী, হিন্দী ও বাঙলা ছবির সংখ্যা ছিলো যথাক্রমে ২৬৮, ৯৮ ও ৪৫খানি। আলোচ্য বছরে হিন্দী ছবিকে ঠেলে সংখ্যায় কমিয়ে দিয়ে সেই পরিমাণ প্রদর্শন-কালটা বাঙলা ছবি দখল করে নিয়েছে। বাঙলা ছবি আগের বারের চেয়ে যে সংখ্যায় কমেছে, তার কারণ বাঙলা ছবির গড়পড়তা প্রদর্শনকাল আগের চেয়ে বৃদ্ধি-লাভ করেছে বলে।

বাঙলার "মহাপ্রস্থানের পথে" (হিন্দী "যাত্রিক"), "রত্নদীপ"-এর হিন্দী সংস্করণ সমগ্র ভারতেরই চিত্রশিল্পে বিপ্লবের সূচনা করে দিয়েছে। এদের সঙ্গে "কার পাপে?"-র মতো সমাজসেবাব্রতী ছবি, "বিন্দুর ছেলে"-র মতো কাহিনীসমৃদ্ধ অবদান, "পাশের বাড়ী", "বসু পরিবারের" মতো প্রমোদচিত্র এবং এদের সঙ্গে "পণ্ডিত মশাই", "নিরক্ষর", "নীলদর্পণ", "পল্লী-সমাজ" প্রভৃতি ছবি বাঙলা ছবির প্রতি লোকের শ্রদ্ধাকে বাড়িয়ে দিয়েছে।

অপরাপর অনুষ্ঠান

গানের জলসা মাত্রায় বেড়েই চলেছে। তানসেন সঙ্গীত সম্মিলন ও নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনের অধিবেশন পূর্বাপূর্ব বছরের মতোই অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া ছোটখাটো আরও অনেকগুলি আঞ্চলিক সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়। একটি বড়ো আকর্ষণ ছিলো রবীন্দ্র জন্মোৎসব সপ্তাহে মহাজাতি সদনে রবীন্দ্র সঙ্গীতের সাতদিন ব্যাপী আসর। জগতের শ্রেষ্ঠ বেহালাবাদক এহুদী মেনুহিনের নিউ এম্পায়ারে তিনটি বৈঠক বছরের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

অন্যান্য প্রমোদানুষ্ঠানের মধ্যে ছিলো মাসাধিককালব্যাপী পি সি সরকারের ম্যাজিক আর অক্টোবর মাসে নিখিল ভারত যাদুবিদ্ সম্মেলন যাতে ভারতের বিভিন্ন স্থানের প্রায় ৪০ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন। বিলেতের নামকরা যাদুবিদ্ গ্রেট লাইলও সপ্তাহ কয়েক যাদুখেলা দেখান।

ক্রিকেট —

ভারতীয় ক্রিকেট দল দিল্লীর ফিরোজ শা কোটলা মাঠে প্রথম ক্রিকেট টেস্ট খেলায় পাকিস্থান ক্রিকেট দলকে শোচনীয়ভাবে এক ইনিংস ও ৭০ রানে পরাজিত করিলে আমরা ভারতের সাধারণ ক্রীড়ামোদীদের উল্লসিত না হইয়া পরবর্তী ফলাফলের জন্য ধৈর্য ধরিয়া অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করি। ঐ প্রসঙ্গেই আমরা উল্লেখ করি যে, কতকগুলি অপ্রত্যাশিত ঘটনার সমাবেশের জন্যই ভারতীয় দলের সাফল্য সম্ভব হইয়াছে। আমাদের ঐ সকল উক্তি অনেককেই ক্ষুন্ন করে। কিন্তু কতখানি ভবিষ্যৎ দৃষ্টি রাখিয়া আমরা ঐ সকল কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম বোধ হয় আর কাহারও উপলব্ধি করিতে বাকী নাই। একটি খেলার অপূর্ব সাফল্যে মত্ত ভারতীয় জনসাধারণের আনন্দোৎসব মলিন বিলীন হইবার পূর্বে কয়েকদিনের মধ্যে ঠিক একইভাবে ভারতীয় ক্রিকেট দল লক্ষ্ণৌর ২য় টেস্ট খেলায় শোচনীয়ভাবে এক ইনিংস ও ৪৩ রানে পাকিস্থান দলের নিকট পরাজিত হওয়ায় জনসাধারণ অপ্রত্যাশিত কুঠারাঘাত সম ব্যথায় মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছেন। এই বেদনাদায়ক অবস্থাকে অবলোকন করিয়া সহজভাবে গ্রহণ করা আমাদের পক্ষেও সম্ভব হইতেছে না, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বলিবার উপায় নাই।" ভারতীয় ক্রিকেট পরিচালক ও খেলোয়াড়দলের মধ্যে যতদিন অন্তর্কলহ বর্তমান থাকিবে ততদিন এই সকল ফলাফল আমাদের সহ্য করিতেই হইবে। এই সকল ফলাফলের জন্য তাঁহারাই দায়ী। খেলোয়াড় ও পরিচালক এই উভয় দলের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা ও সখ্য প্রতিষ্ঠিত না হইলে ভারতের ক্রিকেটের কোনরূপ উন্নতি বা স্থায়ী সাফল্য সম্ভব হইবে না।

দ্বিতীয় ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচ

দ্বিতীয় ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচেও ভারতীয় দল টসে জয়ী হইয়া প্রথম ব্যাট গ্রহণ করেন। প্রথম টেস্ট খেলার শোচনীয় পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ পাকিস্থান দলের বোলারদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ব্যাটসম্যানগণ কতক্ষণ টিকিবেন। প্রথম এক ঘণ্টায় কোন উইকেট পতন না হইলেও উঠিল ১৫ রান। ইহার পর উইকেট পতন আরম্ভ হইল। চা পানের মধ্যেই ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস ১০৬ রানে শেষ হইল। বাঙলার খেলোয়াড় পি রায় আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া দলের সর্বাধিক ৩০ রান করিলেন। পাকিস্থানের ফজল মামুদ ৫০ রানে ৫টি ও মামুদ হোসেন ৩৭ রানে ৩টি উইকেট দখল করিলেন। পরে পাকিস্থান দল খেলিয়া দিনের শেষে কেহ আউট না হইয়া ৪৬ রান করিলেন। দ্বিতীয় দিনেও পাকিস্থান দল সারাদিন ব্যাট করিলেন ও ৭ উইকেটে ২০৯ রান হইল। প্রথম ব্যাটসম্যান নজর মহম্মদ ৮৭ রান করিয়া নট আউট থাকিলেন। তৃতীয় দিনে মধ্যাহ্ন ভোজের পূর্বে পাকিস্থান দল ৩৩১ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করিলেন। প্রথম ব্যাটসম্যান নজর মহম্মদ সাড়ে আট ঘণ্টা ব্যাট করিয়াও ১২৪ রানে নট আউট রহিলেন। ভারত ২২৩ রান পশ্চাতে পড়িয়া দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করিলেন। সকলেই আশা করিলেন খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হইবে। কিন্তু তাহা হইল না। দেখা গেল তৃতীয় দিনের শেষে ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংসে ৯ উইকেটে ১৭০ রান হইয়াছে। এই সময় উপলব্ধি করা সম্ভব হইল যে, ভারতের ইনিংস পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। চতুর্থদিনে মাত্র ১৫ মিনিট খেলার পর ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংস ১৮২ রানে শেষ হইল। অমরনাথ ৬১ রান করিয়া নট আউট রহিলেন। পাকিস্থান এক ইনিংস ও ৪৩ রানে বিজয়ী হইলেন। ফজল মামুদ ৪২ রানে ৭টি উইকেট দখল করিলেন।

খেলার ফলাফল ঃ—

ভারত প্রথম ইনিংস—১০৬ রান (পি রায় ৩০, উমরিগর ১৫, এইচ গাইকোয়াড় ১৪, ফজল মামুদ ৫০ রানে ৫টি, মকসুদ আমেদ ১২ রানে ২টি, মামুদ হোসেন ৩৭ রানে ৩টি উইকেট পান।)

পাকিস্থান প্রথম ইনিংস—৩৩১ রান (নজর মহম্মদ ১২৪ রান নট আউট, মকসুদ আমেদ ৪১, হানিফ ৩৪, জুলফিকার আমেদ ৩৪, গোলাম আমেদ ৮৩ রানে ৩টি, নয়ানচাঁদ ৯৭ রানে ৩টি, গুল মহম্মদ ২১ রানে ২টি ও অমরনাথ ৭৪ রানে ২টি উইকেট পান।)

ভারত দ্বিতীয় ইনিংস—১৮২ রান (ডি গাইকোয়াড় ৩২, কিষেণচাঁদ ২০, উমরিগর ৩২, অমরনাথ ৬১ রান নট আউট, পি যোশী ১৫, মামুদ হোসেন ৫৭ রানে ১টি, ফজলমামুদ ৪২ রানে ৭টি, আমীর ইলাহি ২০ রানে ২টি উইকেট পান।)

ভারতীয় তৃতীয় ক্রিকেট টেস্ট দল

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোলবোর্ডের খেলোয়াড় নির্বাচকমণ্ডলী তৃতীয় ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচে পাকিস্থানের বিরুদ্ধে খেলিবার জন্য যে দল গঠন করিয়াছেন তাহা পূর্বাপেক্ষা বিশেষ শক্তিশালী হইয়াছে স্বীকার করিয়াও বলিতে বাধ্য যে নির্বাচন ঠিক যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। ডি কে গাইকোয়াড় ও জি এস রামচাঁদকে দলভুক্ত করা উচিত ছিল। ডি কে গাইকোয়াড় একজন নির্ভরযোগ্য ওপনিং ব্যাটসম্যান। ইংলণ্ড ভ্রমণের সময় বিশেষ করিয়া শেষ ভাগে নিয়মিত খেলায় যেরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন তাহা বিস্মৃত হওয়া যায় না। জি এস রামচাঁদ ইংলণ্ড ভ্রমণের সময় দলের একজন বিশিষ্ট চৌকস বা অল রাউণ্ড খেলোয়াড় বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম টেস্ট ম্যাচের ব্যর্থতার জন্য এইভাবে প্রতিবার দ্বাদশ খেলোয়াড় নির্বাচন করার কোনই যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ওপনিং ব্যাটসম্যান হিসাবে বোম্বাইর তরুণ খেলোয়াড় এম এল আপ্তেকে গ্রহণ করিয়া ডি কে গাইকোয়াড়ের ন্যায় একজন অভিজ্ঞ খেলোয়াড়কে দল হইতে দূরে রাখিয়া নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়াছেন। এস পি গুপ্তে একজন স্লো বা মন্থর গতিবেগের বোলার। এইরূপ বোলার দ্বারা পাকিস্থানের খেলোয়াড়গণকে বিব্রত করিবার যে কল্পনা নির্বাচকমণ্ডলী করিতেছেন তাহা কখনই কার্যকরী হইবে না। ঐ শ্রেণীর বোলারের বিরুদ্ধে পাকিস্থানের খেলোয়াড়গণ খেলিতে বিশেষভাবেই অভ্যস্ত। তাহা ছাড়া ফিল্ডিং ও ব্যাটিং বিষয় এস পি গুপ্তের পরিচয় ইতিপূর্বেই আমরা পাইয়াছি, যাহার পর একরূপ নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, ইনি ভারতীয় টেস্ট দলের অন্তর্ভুক্ত হইবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। ইহার পরিবর্তে জি এস রামচাঁদকে গ্রহণ করিলে দলের শক্তি অনেকখানি বৃদ্ধি পাইত। নিম্নে ভারতীয় তৃতীয় ক্রিকেট টেস্ট দলের মনোনীত খেলোয়াড়দের নাম প্রদত্ত হইল ঃ—

(১) লালা অমরনাথ, (২) ভি এস হাজারে (৩) বিনু মানকড়, (৪) আর এস মোদী, (৫) এইচ আর অধিকারী, (৬) ডি জি ফাদকার, (৭) পি আর উমরিগার, (৮) গোলাম আমেদ, (৯) রাজেন্দ্রনাথ (উইকেট-রক্ষক), (১০) এস পি গুপ্তে, (১১) এম এল আপ্তে।

দ্বাদশ ব্যক্তি ঃ—জি এস রামচাঁদ।

অতিরিক্ত ঃ—সি ডি গোপীনাথ, এইচ ভি দানী ও এম কে মন্ত্রী।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভ্রমণ

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড শেষ পর্যন্ত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভ্রমণ সমর্থন করিয়াছেন। কি সর্তে ও কি পরিবর্তন হওয়ায় ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড এইভাবে সম্মতি প্রদান করিলেন তাহা সাধারণকে তাঁহারা কিছুই জানিতে দেন নাই। এই প্রসঙ্গে এক ক্রীড়া সমালোচক এক উপভোগ্য অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন; "ভ্রমণ ব্যবস্থার দ্বারা যাঁহারা নানাভাবে লাভবান হন তাঁহারাই ভারতীয় ক্রিকেট পরিচালকগণকে পরিবর্তনের কথা বিস্মৃত হইয়া পূর্ব-ব্যবস্থা অনুযায়ী ভারতীয় ক্রিকেট দলকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রেরণে স্বীকার করাইয়াছেন। এই ব্যবস্থা না হইলে যে তাঁহাদের সমূহ ক্ষতি?" এই উক্তি কতখানি বিশ্বাস্য ও কতখানি নির্ভরযোগ্য তাহা বিচার করিবার আমাদের এতটুকুও ইচ্ছা নাই। আমরা জানিতে চাই, কি সর্তে এই ভ্রমণ ব্যবস্থাতে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড সম্মতি প্রদান করিয়াছেন? যদি পূর্ব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ মানিয়া লওয়া হইয়া থাকে তাহা হইলে বলিতে বাধ্য হইব যে, এখনই এই ভ্রমণ-ব্যবস্থা যাহাতে পরিত্যক্ত হয় তাহার জন্য তীব্র আন্দোলন সৃষ্টি হওয়া উচিত। খেলোয়াড় বলিয়া তাঁহারা কলের পুতুল নহে যে যেমন ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা তাহাদের লইয়া ক্রীড়া পরিচালনা করা হইবে? তাহারা মানুষ তাহাদের খেলিবার শক্তিও সীমাবদ্ধ। বিশ্রামহীন ভ্রমণ-ব্যবস্থা হইলে তাহাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তির চরম ক্ষতিসাধন করা হইবে। এই ক্ষতিকারক ব্যবস্থা কোনরূপেই সমর্থন করা যায় না।

অস্ট্রেলিয়া দলের ভারত-ভ্রমণের ব্যবস্থা

এক সংবাদে প্রকাশ যে, ১৯৫৩ সালের শীতের সময় ভারতে সার ডন ব্রাডম্যান পরিচালিত এক বে-সরকারী অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দলের ভারত ভ্রমণ সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা হইতেছে। এই সংবাদ খুব উৎসাহব্যঞ্জক ও আনন্দদায়ক সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা হইলেও কার্যকরী হইবে বলিয়া মনে হয় না। সার ডন ব্রাডম্যানকে ইতিপূর্বে বহুবার ভারতে

জানাইবারই প্রচেষ্টা হইয়াছে তাহা ফলবতী হয় নাই। এইবারেও হইবে—ইহা আমাদের কল্পনাতীত—যদি হয় উদ্যোক্তার প্রশংসা না করিয়া পারিব না। তিনি অসাধ্য সাধন করিবেন এই বিষয় কোনই সন্দেহ নাই।

ফুটবল

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতা রোভার্স কাপের শেষ মীমাংসা হইয়াছে। গত দুই বৎসরের বিজয়ী হায়দরাবাদ পুলিশ দল এই খেলায় বিজয়ীর সম্মান লাভ করিয়া উপর্যুপরি তৃতীয়বারের বিজয়গৌরবে ভূষিত হইয়াছেন। ইতিপূর্বে আর কোন অসামরিক দলের পক্ষে এইভাবে উপর্যুপরি তৃতীয়বার রোভার্স কাপ বিজয়ী হওয়া সম্ভব হয় নাই। ১৯০২-৪ সালে চেশায়ার্স রেজিমেণ্ট ও ১৯২৪-২৬ সালে মিডিলসেক্স রেজিমেণ্ট দল পর পর তিনবার কাপ বিজয়ী হন। হায়দরাবাদ পুলিশ দল এই দিক দিয়া রোভার্স কাপ ও ভারতীয় ফুটবল ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় রচনা করিলেন। আমরা ইহাদের আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

জাতীয় বা আন্তঃ রাজ্য ফুটবল প্রতিযোগিতা

ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন পরিচালিত জাতীয় বা আন্তঃ রাজ্য সন্তোষ স্মৃতি কাপ প্রতিযোগিতার খেলা বাঙ্গালোরে বিশেষ সমারোহে অনুষ্ঠিত হইতেছে। বাঙলার এই প্রতিযোগিতার প্রবর্তক এবং প্রতিযোগিতার সূচনা হইতে আরম্ভ করিয়া এই পর্যন্ত মাত্র দুইবার বাঙলা বিজয়ীর সম্মান লাভ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে নতুবা প্রতিবারেই সাফল্য লাভ করিয়াছে। সুতরাং এইবারেও বাঙলা ফুটবল দল জাতীয় ফুটবল বা আন্তঃ রাজ্য ফুটবল প্রতিযোগিতায় সাফল্যমণ্ডিত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিবেন বলিয়া যদি বাঙলার ক্রীড়ামোদিগণ কল্পনা করেন তাহা হইলে কোনই অন্যায় হইবে না। কিন্তু আমাদের এই বিষয় যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বাঙলার মনোনীত খেলোয়াড়গণের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ফল সাধারণে না জানিলেও আমরা জানি। পরীক্ষাকারী ডাক্তার দলের একজন খেলোয়াড়কে সম্পূর্ণ সুস্থ বা সবল বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিতে পারেন নাই। তিনি দলের সকল খেলোয়াড়কেই "দ্বিতীয় শ্রেণীর" স্বাস্থ্য বলিয়া সার্টিফিকেট দিয়াছেন। স্বাস্থ্যের এই শোচনীয় অবস্থা কেন হইল সাধারণে উপলব্ধি করিতে পারিবেন না, কিন্তু আমরা পারি। এই সকল খেলোয়াড় গত দুই বৎসরের মধ্যে দীর্ঘ বিশ্রামের সময় পান নাই। ফুটবল খেলা অত্যন্ত শ্রমসাধ্য খেলা। এই খেলায় যোগদানে প্রত্যেক খেলোয়াড়েরই শরীরের অভ্যন্তরে প্রচুর ক্ষতিসাধন হইয়া থাকে। ঐ ক্ষতিপূরণ হয় যদি খেলোয়াড় বিশ্রাম গ্রহণের সুযোগ পায়। কিন্তু বাঙলার ফুটবল পরিচালকগণ এই বিষয় একেবারেই দৃষ্টি দেন না। ইহারা একটির পর একটি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান ও ভ্রমণ-ব্যবস্থা লইয়াই ব্যস্ত। ফলে খেলোয়াড়গণও বিশ্রাম গ্রহণের সুযোগ হইতে বঞ্চিত। গত বৎসরের ফুটবল মরশুম হইতে আরম্ভ করিয়া এই পর্যন্ত বাঙলার অধিকাংশ খেলোয়াড়ই যে একেবারেই বিশ্রাম গ্রহণের সুযোগ পান নাই ইহা জোর করিয়া বলা চলে। দৈহিক অভ্যন্তরীণ ক্ষতির সংশোধনের সুযোগ না হওয়ার জন্যই খেলোয়াড়গণের এইরূপ অবস্থা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ স্বাস্থ্যহীন খেলোয়াড়গণ অপর রাজ্যের খেলোয়াড়দের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যদি পরাজিত হন কোনই আশ্চর্যের কিছু হইবে না। ইহার জন্য খেলোয়াড়গণ দায়ী নহেন—দায়ী খেলার পরিচালকগণ ইহা বিনা দ্বিধায় আমরা উল্লেখ করিতে পারি।

সুদূরপ্রাচ্য ভ্রমণ-ব্যবস্থা

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেল, ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের পরিচালকগণ একটি ভারতীয় দলকে সুদূরপ্রাচ্য ভ্রমণের জন্য প্রেরণের তোড়জোড় করিতেছেন। এই সংবাদ যদি সত্য হয় খুবই অন্যায়। ফুটবল দল সার্কাস পার্টি নহে যে যখন খুশী যেখানে সেখানে লইয়া যাওয়া হইবে। ইহাতে খেলোয়াড়দের কেবল যে শারীরিক ক্ষতিসাধন করা হইবে তাহা নহে আর্থিক ক্ষতিরও কারণ হইবে। অধিকাংশ খেলোয়াড়ই চাকুরীজীবী—এইভাবে সারা বৎসর ধরিয়া খেলার জন্য চাকুরীস্থল হইতে দূরে থাকিলে শেষ পর্যন্ত ইহাদের চাকুরী হইতে বরখাস্ত হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। আমরা আশা করি, উদ্যোক্তাগণ এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া এই ভ্রমণ-ব্যবস্থা বাতিল করিবেন।

অস্ট্রিয়া পেশাদার ফুটবল দলের ভ্রমণ

অস্ট্রিয়ার পেশাদার ফুটবল দলকে আগামী বৎসরের জানুয়ারী মাসের শেষে ভারতে আনিবার ব্যবস্থা হইতেছে। ভারতের ফুটবল মরশুম মে মাসে আরম্ভ হয়। সুতরাং জানুয়ারী মাসে ক্রিকেট মরশুমের মধ্যে একটি বৈদেশিক ফুটবল দলকে ভারতে আনাইয়া কি ফল হইবে উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। কি যুক্তি ও কি অভাবনীয় ফলাফলের সম্ভাব্য কল্পনা করিয়া উদ্যোক্তাগণ এই ভ্রমণ-ব্যবস্থায় উৎসাহিত হইয়াছেন জানাইলে আমরা সুখী হইব। এই প্রসঙ্গে একজন ক্রীড়া-সমালোচক উক্তি করিয়াছেন, "ভারতের ফুটবল পরিচালকগণ যেভাবে সারা বৎসরব্যাপী ফুটবল আয়োজন করিতেছেন তাহাতে অপর সকল খেলার মরশুম বলিতে ভবিষ্যতে আর কিছুই থাকিবে না।" এই উক্তি সমর্থনযোগ্য না হইলেও সত্য, কিন্তু ফুটবল পরিচালকগণ এইরূপ অবস্থা সৃষ্টি করিতে যে চলিয়াছেন ইহা না বলিয়া পারা যায় না। খেলাধূলার অন্যান্য বিভাগের পরিচালকগণ যে কেন ইহার প্রতিবাদ করিতেছেন না ইহাই আশ্চর্যের বিষয়।

অলিম্পিক

হেলসিঙ্কি অলিম্পিক অনুষ্ঠান কয়েক মাস পূর্বেই শেষ হইয়াছে, কিন্তু ইহার আলাপ-আলোচনার অবসান শীঘ্র হইবে বলিয়া মনে হয় না। এখনও পর্যন্ত প্রায় প্রতিদিনই ভারতের বিভিন্ন পত্রিকায় হেলসিঙ্কি অলিম্পিক অনুষ্ঠানের ভারতীয় প্রতিনিধি ও পরিচালকগণের আচরণ সম্পর্কে অনেক কিছু অভিযোগপূর্ণ সংবাদ প্রচারিত হইতেছে। এই সকল অভিযোগের প্রতিবাদ যে একেবারেই হইতেছে না তাহা নহে, তবে অভিযোগ উপাখ্যানসমূহ যেরূপ তীব্র কটূক্তিপূর্ণ ও তীক্ষ্ণধারসম্পন্ন, প্রতিবাদসমূহ সেইরূপ যুক্তিপূর্ণ ও অভিযোগ সম্পূর্ণ খণ্ডনকারী নহে। ইহাতে সন্দেহ করিবার কারণ হইয়া পড়িয়াছে যে, অভিযোগের মধ্যে কিছুটা সত্যতা আছে। এই সকলের অবসান হইতে পারে যদি ভারত সরকার একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি নিয়োগ করেন। পশ্চিম বাঙলার মাননীয় রাজ্যপাল ডাক্তার হরেন্দ্রকুমার মুখার্জি এই বিষয় উদ্যোগী হইয়া ভারতীয় বিভিন্ন দলের ম্যানেজারের নিকট হইতে লিখিত অভিমত প্রেরণের জন্য অনুরোধ করেন। এই অনুরোধের ফলস্বরূপ কয়েকজন মাত্র অভিমত পেশ করিয়াছেন অধিকাংশই করেন নাই। এইদিকে জানা গেল, ভারতীয় অলিম্পিক দলের চীফ ডি মিশন জনাব মৈনুল হক ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া সকল জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে সকল কিছুর লিখিত বিবরণ পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সভাপতি পাতিয়ালার মহারাজাও বিভিন্ন পত্রিকায় অভিযোগপূর্ণ প্রবন্ধ ও বিবৃতি পাঠ করিয়াও ভীষণ চঞ্চল হইয়াছেন। শোনা যাইতেছে তিনিও এই সকল বিষয় চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য শীঘ্রই দিল্লীতে নিখিল ভারত অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সভা আহ্বানের উদ্যোগী হইয়াছেন। এই সকল সংবাদ শ্রবণে আশা হইতেছে, এই সকলের অবসান শীঘ্রই হইবে। হওয়াও বাঞ্ছনীয়। কতকগুলি লোকের দুষ্কৃতির জন্য সমস্ত ক্রীড়ামহল বিব্রত ও জনসাধারণের বিদ্রূপের কারণ হইবে ইহা কোনরূপেই কাম্য নহে। খেলাধূলা ও ব্যায়ামই জাতীয় জীবনের সজীবতার পরিচায়ক—ইহার ধ্বংস মানে জাতীয় জীবনের উন্নতিকর সকল ব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত করা। ভবিষ্যৎ জ্ঞানশূন্য কতকগুলি সাংবাদিক এই বিষয় লইয়া বেশ কিছুটা আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছেন—ইহাও বন্ধ হওয়া উচিত।

দেশী সংবাদ

২০শে অক্টোবর—প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহরু অদ্য বিশ্বের সর্বাধিক বর্ষণসিক্ত চেরাপুঞ্জি পরিদর্শন করেন। চেরাপুঞ্জিতে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রী সম্ভাব্য আপৎকালীন অবস্থার সম্মুখীন হইবার জন্য সমগ্র জাতিকে প্রস্তুত থাকিবার আহ্বান জানান।

২১শে অক্টোবর—প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু অদ্য চাঁদমারিতে ১০ হাজার লোকের এক জনসভায় বক্তৃতাকালে বালীপাড়ার খণ্ড জাতীয় লোকদের স্মরণ করাইয়া দেন যে, তাহারা ভারতীয় জাতিরই অংগীভূত এবং এই বিরাট দেশের অবশিষ্ট অধিবাসীর সহিত সমঅধিকারভোগী।

অদ্য মধ্য রাত্রির কিছু পরে জামসেদপুরের নিকট ওরিয়েণ্ট এয়ারওয়েজের ঢাকাগামী মালবাহী একটি ডাকোটা বিমান অবতরণকালে বিধ্বস্ত হয়। বিমানটির রেডিও অফিসার মিঃ রহমান নিহত হইয়াছেন এবং অপর দুইজন বিমান চালক আহত হইয়াছে।

২২শে অক্টোবর—ভারত সরকার শীঘ্রই খাদ্যশস্যের পূর্ণ বিনিয়ন্ত্রণ এবং উদ্বৃত্ত ও ঘাটতি রাজ্যসমূহ লইয়া অঞ্চল গঠনের ভিত্তিতে নূতন খাদ্য নীতি ঘোষণা করিবেন বলিয়া আশা করা যায়। ভারত সরকারের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীরফি আমেদ কিদোয়াই ঘোষণা করেন যে, খাদ্যশস্য বিনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণ-কল্পে আগামী ৫।৬ দিনের মধ্যে তিনি বোম্বাইয়ে বিভিন্ন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রীদের সহিত আলোচনা করিবেন।

অদ্য ডিব্রুগড়ে আনুমানিক ৫০ হাজার লোকের এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু বলেন যে, আসামে এমন কতকগুলি রাজনৈতিক দল আছে যাহারা গোপনে অস্ত্র ও বোমার সাহায্য লইয়া আমাদের দেশকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছেন। ইহাদের খপ্পরে না পড়ার জন্য তিনি সকলকে সতর্ক করিয়া দেন।

২৩শে অক্টোবর—আগামী জানুয়ারী মাস হইতে কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চল ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য সমস্ত এলাকায় খাদ্য বিনিয়ন্ত্রিত হইবে। পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন অদ্য সাংবাদিকগণকে উক্ত তথ্য জানাইয়া বলেন যে, জানুয়ারী মাস হইতে কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলের রেশনিং এলাকাগুলি ব্যতীত রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় নির্বিরোধে ধান-চাউল চলাচল করিতে দেওয়া হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ পুনর্বসতি বিভাগের এক পরিকল্পনা অনুসারে শিয়ালদহ ষ্টেশনে অবস্থানকারী সমুদয় উদ্বাস্তু নরনারীকে আশ্রয় শিবিরে স্থানান্তরিতকরণের কাজ অদ্য সুরু হইয়াছে।

দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, জবরদখল কলোনীসমূহ আইনানুগ করিয়া লওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রথম পরিকল্পনাটি কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন দপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে এবং পরিকল্পনাটি কার্যকরী করার জন্য রাজ্য

সাপ্তাহিক সংবাদ

সরকারকে ২৮ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হইয়াছে।

আজ প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু ইম্ফলের কয়রেঙ্গী বিমানঘাটিতে পৌঁছিলে দশ হাজার লোক কর্তৃক সম্বর্ধিত হন।

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এক সভায় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, আচার্য কৃপালনী, শ্রীঅশোক মেটা ও অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ পূর্ব-পাকিস্থান হইতে আগত উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানের জন্য ভারত সরকারকে চূড়ান্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে আবেদন করেন।

কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন কলিকাতায় ঘোষণা করেন যে, কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন দপ্তর পূর্ববঙ্গ হইতে আগত প্রায় ৩০ হাজার উদ্বাস্তুকে অতি অল্পকালের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে সন্নিহিত স্থানসমূহে, প্রধানত বিহার ও উড়িষ্যায় পুনর্বাসনের জন্য প্রেরণের ব্যবস্থা করিতেছেন।

২৪শে অক্টোবর—ভারত ও পাকিস্থানের সংখ্যালঘু মন্ত্রী যথাক্রমে শ্রী সি সি বিশ্বাস ও মিঃ আজিজুদ্দীন আমেদ অদ্য ঢাকায় এক বৈঠকে মিলিত হন। পাসপোর্ট ও ভিসা প্রথা প্রবর্তনের ফলে যেসব অসুবিধা দেখা দিয়াছে, সে সম্পর্কেই মন্ত্রিদ্বয়ের মধ্যে আলোচনা হয়।

ভারতীয় বিমানবহরের একখানি বিমান গত বৃহস্পতিবার মধ্যরাত্রের কিছু পর আসামে ডিব্রুগড়ের নিকটে একটি জংগলাকীর্ণ স্থানে দুর্ঘটনায় পতিত হইয়া বিধ্বস্ত হয়। উক্ত বিমান দুর্ঘটনায় ৭ জন নিহত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

২৫শে অক্টোবর—পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই রাজ্যে 'লেভি' প্রথায় ধান-চাউল সংগ্রহের জন্য এক আদেশ জারী করিয়াছেন। এই নূতন আদেশ অনুযায়ী গভর্নমেণ্ট দশ একর অর্থাৎ ৩০ বিঘা ও তদূর্ধ্ব পরিমাণ জমির মালিক বা চাষীর নিকট হইতে তাঁহার পরিবারের প্রয়োজন বাদ দিয়া অবশিষ্ট উদ্বৃত্ত সমুদয় ধান চাউলই সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

ত্রিপুরা রাজ্যের জিরানীয়ায় এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু বলেন, 'স্বরাজের তীর্থযাত্রা সম্পূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু এখন আর এক তীর্থযাত্রা সুরু হইল। এই তীর্থযাত্রা হইল দেশ হইতে দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা দূরীকরণ।' শ্রী নেহরু অদ্য তাঁহার আসাম, মণিপুর ও ত্রিপুরা সফর সমাপ্ত করেন।

বসিরহাটের এক সংবাদে প্রকাশ, পাসপোর্ট প্রথা প্রবর্তিত হওয়ার পর খুলনা জেলার জনৈক বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ বিহারীলাল বৌটিকে তাঁহার গ্রামস্থ মুসলমানগণ বলপূর্বক গোমাংস খাওয়াইলে তিনি ও তাঁহার স্ত্রী উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

২৬শে অক্টোবর—ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তর হইতে ভারতের ফরাসী অধিকৃত অঞ্চলে গুণ্ডামি ও সন্ত্রাসমূলক ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া এক বিবৃতি প্রচার করা হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, উক্ত ঘটনাবলীর ফলে ফরাসী অধিকৃত অঞ্চলের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য গণভোট গ্রহণ অসম্ভব হইয়া উঠিবে।

পেপসু প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি অদ্য এক প্রস্তাবে পেপসুর রাজপ্রমুখকে অপসারিত করিবার জন্য ভারত সরকারের নিকট অনুরোধ জানাইয়াছেন।

পূর্ববঙ্গ হইতে নবাগত যে ১৫০০ জন উদ্বাস্তু উড়িষ্যার অন্তর্গত চরবেতিয়ায় যাইতে অস্বীকার হইয়া দমদম ষ্টেশনে অবস্থান করিতেছিল, তাহাদিগকে অদ্য বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর ট্রানজিট ক্যাম্পে প্রেরণ করা হইয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

২০শে অক্টোবর—বৃটিশ উপনিবেশ দপ্তর হইতে অদ্য ঘোষণা করা হয় যে, আইন ও শৃংখলা রক্ষার জন্য এক ব্যাটেলিয়ান বৃটিশ সৈন্যকে বিমানযোগে নাইরোবী (কেনিয়া) প্রেরণ করা হইতেছে।

গতকল্য দক্ষিণ আফ্রিকার নিউ ব্রাইটনে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সুরু হয়। হাজার হাজার বিক্ষুব্ধ আফ্রিকান দোকানপাটগুলিতে অগ্নিসংযোগ করে। তাহারা বহু মোটর গাড়ী, একটি ডাকঘর ও একটি সিনেমা গৃহও পোড়াইয়া দেয়। দাঙ্গা-হাঙ্গামার ফলে ১১ জন নিহত হয়। তন্মধ্যে চারিজন শ্বেতাঙ্গ।

২১শে অক্টোবর—সঙ্গীণধারী বৃটিশ ও কেনিয়া সৈন্যরা অদ্য কেনিয়ার নাইরোবীর আফ্রিকান ও এশিয়ান মহল্লায় টহল দিয়া বেড়ায়। পুলিশ অদ্য কেনিয়া আফ্রিকান ইউনিয়নের নেতা জোমো কেনিয়াত্তা ও আরও বহু বিশিষ্ট আফ্রিকানকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

২২শে অক্টোবর—ইরাণ অদ্য হইতে বৃটেনের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্কচ্ছেদ করিল বলিয়া সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে।

২৩শে অক্টোবর—ম্যানিলার সংবাদে প্রকাশ, দুই দিবসব্যাপী এক প্রচণ্ড ঝড়ে মধ্য ফিলিপাইনে অন্তত ৪৬ জন নিহত ও ৪০ জন আহত হইয়াছে।

কেনিয়ায় কিকিউ উপজাতির সর্বাপেক্ষা প্রবীণ নেতা সর্দার এন্দেরী সন্ত্রাসবাদীদের গুলীতে প্রাণ হারাইয়াছেন। এন্দেরী মুখ্য সর্দার হিসাবে বিশ বৎসরকাল আনুগত্যের সহিত সরকারের সেবা করিয়াছেন।

২৪শে অক্টোবর—ফিলিপাইনে প্রচণ্ড ঝঞ্চা বাত্যার ফলে নিহতের সংখ্যা অদ্য ৩৭৮ জনে দাঁড়াইয়াছে। স্মরণকালের মধ্যে এরূপ ভয়াবহ ঝঞ্চাবাত্যা আর হয় নাই।

২৫শে অক্টোবর—রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ এবারও রাষ্ট্রপুঞ্জে চীনকে সদস্যরূপে গ্রহণের প্রশ্ন আলোচনা না করার সিদ্ধান্ত করেন। এই সিদ্ধান্ত ৪২—৭ ভোটে গৃহীত হয়।

ভারতীয় মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা—।৵০ আনা, বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক— ১০,
পাকিস্থানের মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা (পাক) ।৵০ আনা, বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, (পাক)
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

কে, পি, ধর এণ্ড কোং
ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স
৯৭/এ, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা • ১২

শাইকা
খোস, একজিমা, হাজা, কাটা, ঘা, পোড়া ঘা নালীঘা, কুস্কুড়ি চুলকানি, ও চুলকানিযুক্ত সর্বপ্রকার চর্মরোগে অব্যর্থ
এরিয়ান রিসার্চ ওয়ার্কস

২০শ বর্ষ
২য় সংখ্যা

দেশ

শনিবার,
২২শে কার্তিক, ১৩৫৯

DESH Saturday, 8th November, 1952.

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

সাময়িক প্রসঙ্গ

পূর্ববঙ্গের সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রী

আমরা যাহা মনে করিয়াছিলাম, তাহাই ঘটিয়াছে। ছাড়পত্র প্রথা প্রবর্তনের ফলে পূর্ববঙ্গ হইতে উদ্বাস্তু সমাগম বন্ধ হওয়াতে ভারতের প্রধান মন্ত্রী বুঝিয়া লইয়াছেন যে, পূর্ববঙ্গের সব সমস্যার সমাধান হইয়া গিয়াছে। গত ২রা নভেম্বর নয়াদিল্লীর এক সাংবাদিক সম্মেলনে পণ্ডিত নেহরু প্রকাশ করিয়াছেন যে, গত ১৫ দিনের মধ্যে পূর্ববঙ্গের অবস্থার অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং বর্তমানে অবস্থা স্বাভাবিক আকার ধারণ করিয়াছে; সুতরাং এখন এ বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা করিবার কিছুই নাই। ভারতের প্রধান মন্ত্রী একথা অবশ্য স্বীকার করিতেছেন যে, পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের অবস্থা সাধারণ-ভাবে বলিতে গেলে কোনদিনই সন্তোষজনক ছিল না তবে উদ্বাস্তু-সমাগমজনিত সমস্যা কাটিয়া গিয়াছে, ইহাই তাঁহার বক্তব্য। বলা বাহুল্য, পণ্ডিত নেহরু যে দৃষ্টিতে পূর্ববঙ্গের সমস্যা দেখিতেছেন, তাহা আমাদের মতে দূর-দর্শিতার পরিচায়ক নয়। তিনি সমস্যার মূলে যাইতেছেন না কিংবা যাইতে চাহিতেছেন না। ছাড়পত্র-প্রথা প্রবর্তিত হইবে এই আশঙ্কায় কিছুদিন পূর্বেই সহস্র সহস্র নরনারী দেশ ত্যাগে ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল, ছাড়পত্র প্রথা প্রবর্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের মনে স্বস্তির ভাব ফিরিয়া আসিয়াছে, এমন যুক্তি সত্যই অদ্ভুত। উভয় বঙ্গের মধ্যে গতিবিধির পক্ষে কোন বাধা নাই এবং ছাড়পত্র-প্রথা প্রবর্তনের পর যাহারা ভারতে আসিতে চায়, তাহারা সহজেই আসিতে পারে পণ্ডিত নেহরুর এই উক্তিতে বাস্তব অবস্থার সঠিক-ভাবে বিচার করা হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি না। ছাড়পত্র প্রথা-প্রবর্তনের ফলে শুধু যাহারা চোরাকারবারী তাহাদের গতিবিধিতে অসুবিধা ঘটিয়াছে, তাঁহার এমন ধারণা একেবারেই ঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে ছাড়পত্র-প্রথা প্রবর্তিত হইবার পর পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে আসিবার পক্ষে যথেষ্ট অসুবিধাই সৃষ্টি হইয়াছে। ফলত কাগজে পত্রে ব্যবস্থা যতটা সহজ বলিয়া মনে হয়, ততটা সহজ হইতেছে না, আমরা ইহা বিশেষভাবেই জানি। পণ্ডিতজী পাকিস্থান সরকারের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাঁহার মতে এইরূপ ব্যবস্থার ফলে কিছুই হইবে না; পক্ষান্তরে উত্তেজনাই বাড়িবে। পণ্ডিতজীর বিশ্বাস এই যে, শান্তির প্রলেপ দেওয়াই বর্তমান সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়। এই সম্পর্কে পাকিস্থানের বিরুদ্ধে অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাবকে পণ্ডিতজী হাতুড়ে চিকিৎসা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন; অথচ অন্যায়কে তিনি বরদাস্ত করিতেও চাহেন না। এ কেমন যুক্তি বস্তুতই আমাদের বুদ্ধির অগম্য। বিরোধ আমরাও অবশ্য বাড়াইতে চাহি না, শুধু অন্যায়েরই আমরা প্রতিকার কামনা করি। পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অবস্থা কোনদিনই ভাল ছিল না, ভারতের প্রধান মন্ত্রী নিজেই একথা বলিয়াছেন। কেন, ভাল ছিল না, পাকিস্থান সরকারের নীতির গতি পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এমন দুর্গতির ফলে কতখানি রহিয়াছে, ভারতের প্রধান মন্ত্রীকে আমরা সেই কথাই বিবেচনা করিয়া দেখিতে বলি এবং তৎসম্বন্ধে প্রতিকার প্রার্থনা করি। নিজেদের রাষ্ট্রীয় স্বার্থ এবং রাষ্ট্রগত কর্তব্যের দিক হইতেও আমাদের নিকট এই প্রশ্ন একান্ত গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ এই সংকটে বর্তমানে বিপন্ন এবং বিপর্যস্ত। পণ্ডিতজী পশ্চিমবঙ্গের এই সমস্যাকে যথোচিত গুরুত্ব দেন নাই বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার মতে জগতে কত রকমের সমস্যা রহিয়াছে, ইহাও সেইরূপ একটা সমস্যা। আন্তর্জাতিক অবস্থার উন্নতি সাধিত না হইলে রাতারাতি এই ধরণের সমস্যার সমাধান করা যায় না। সমাধান সেভাবে সম্ভব না হইতে পারে; কিন্তু সমস্যার সমাধানের জন্য সুনিশ্চিত নীতি অন্ততঃ থাকা আবশ্যক এবং রাষ্ট্র স্বার্থ রক্ষায় সেই নীতিতে প্রয়োগ নৈপুণ্যও প্রয়োজন। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু সমাগমের সমস্যা সমাধানের জন্য শান্তির প্রলেপ হাতে লইয়া আমাদিগকে সদাসর্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে ইহা তো বুঝিলাম। কিন্তু পাকিস্থান সরকার নিশ্চয়ই এই প্রলেপ প্রকরণের জন্য ব্যাধিতের কৃতজ্ঞতা স্বীকারের দ্বারা আমাদিগকে কৃতার্থ করিবেন না, তবে যে সব নরনারী উদ্বাস্তু স্বরূপে পশ্চিমবঙ্গে আসিবে তাঁহা-দের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করিতে এই ব্যবস্থা কাজে আসিতে পারে। অসহায় অবস্থায় যাহারা উদ্বাস্তু স্বরূপে সমাগত হইবে তাহাদের অন্তরের উত্তাপ এই প্রলেপ প্রয়োগে যথাসম্ভব উপ-শমিত হইবে এই আশা। প্রধান মন্ত্রীর প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় ভারতের অন্তরের মাহাত্ম্য, দয়া দাক্ষিণ্য, ধৈর্য, সহিষ্ণুতার পরিচয় অবশ্য পাওয়া গেল; কিন্তু যে নীতির ফলে সহস্র সহস্র নরনারী এইরূপ দয়া-দাক্ষিণ্যের ভিখারীর পর্যায়ে পতিত হইতেছে, মানুষের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া নিঃস্ব জীবনের তিমির-গর্ভে যাহারা তলাইয়া যাইতেছে, নির্মম সেই নিষ্ঠুর নীতির কি কোন প্রতিকার নাই এবং সে সম্বন্ধে রাষ্ট্রীয় মর্যাদার দিক হইতে ভারতের কোন কর্তব্য নাই? নিদারুণ দুঃখে আমাদের অন্তরে শুধু এই প্রশ্নই উঠিতেছে।

সফরের ফল-শ্রুতি

ভারত ও পাকিস্থানের সংখ্যালঘু বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুত চারুচন্দ্র বিশ্বাস এবং জনাব আজিজুদ্দিন আহম্মদ উভয় বঙ্গের সীমান্তবর্তী কতকগুলি অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের পর যুক্তভাবে একটি বিবৃতি দিয়াছেন। এই বিবৃতির স্বরূপ কি হইবে, পারস্পরিক সদিচ্ছাসম্পন্ন সচিবদ্বয় কি দেখিবেন, কি বলিবেন, তাহা আমরা পূর্ব হইতেই অনুমান করিয়া লইয়াছিলাম। সুতরাং ইহাদের মামুলী ধরণের নিতান্তই বিশেষত্ব-হীন বিবৃতিতে আমরা একটুও বিস্মিত হই নাই। ইঁহারা অনেক কিছু দেখিয়াছেন, কিন্তু কিছুই দেখেন নাই; অনেক কিছু তাঁহারা শুনিয়াছেন, কিন্তু কিছুই শুনেন নাই; এতদুভয়ের যুক্ত-বিবৃতির ইহাই মর্ম। তাঁহারা এই কৈফিয়ৎ উপস্থিত করিয়াছেন যে, সময়ের অভাবে অবস্থা বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। সময়ের যখন ইহাদের এমনই অভাব, তবে এমন সখের সফরে বাহির হইবার কি প্রয়োজন ইঁহাদের ছিল, এ প্রশ্ন স্বভাবতই উঠে। পাকিস্থানের সংখ্যালঘু সচিব আজিজুদ্দিন সাহেবের অবশ্য পশ্চিমবঙ্গ ঘুরিয়া দেখিবার মত কিছুই ছিল না, ইহা স্পষ্টই বোঝা যায়। কিন্তু বিশ্বাস মহাশয় কিছুই দেখিলেন না, ইহাই আশ্চর্য! ছাড়পত্র-প্রথা প্রবর্তনের প্রাক্কালে উদ্বাস্তু স্বরূপে ভারতে আসিবার জন্য পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন রেল এবং স্টীমার স্টেশনে সহস্র সহস্র নরনারীর ভিড় জমিয়াছিল, ইহা সকলেই জানে। ইহাদের অবস্থা কি দাঁড়াইল এবং এখনও ইহারা কি অবস্থায় আছে ভারতের সংখ্যালঘু সচিব, এ সম্বন্ধে একেবারে নীরব। যে অবস্থার চাপে পড়িয়া এই নরনারীর দল পথের বাহির হইয়াছিল, তাহার প্রতিকার কিছু হইয়াছে কি? ইহারা যাহাতে গৃহ পরিত্যাগ না করে, পূর্ববঙ্গ সরকার সেজন্য কোন চেষ্টা করেন নাই। পূর্ববঙ্গের পুলিশ এবং আনসারদের আচরণ ইহাদের সম্বন্ধে কিরূপ সে কথা না বলাই ভাল। প্রকৃতপক্ষে পূর্ববঙ্গের হতভাগ্য এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সেখানে পুলিস বিভাগের নিম্নতম কর্মচারী এবং আনসারদের শিকার স্বরূপে পরিণত হইয়াছে। ইহাদিগকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতে পারিলেই পুলিস এবং আনসার—উভয়েরই লাভ। সংখ্যালঘুদের উপর নানাভাবে চাপ দিয়া টাকা-পয়সা লুঠিবার ফাঁদ ইহারা পাতিয়া বসিয়া আছে। পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জনসাধারণ মোটামুটি হিন্দুদের সহিত সদ্ভাবেই থাকিতে চায়, ইহা আমরা জানি, কিন্তু আনসারদের উপদ্রবের শেষ নাই। ইহারা অধিকাংশই নিরক্ষর এবং সাম্প্রদায়িক মনোবুদ্ধিসম্পন্ন। পুলিসের হাতে হাত মিলাইয়া ইহারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিবার চেষ্টায় থাকে; কারণ তাহাতেই তাহাদের লাভ, হাতে দুই পয়সা দস্তুরমত আসে। ইহার উপর চুরি-ডাকাতি তো আছেই। সাম্প্রদায়িকতার ছোপ পাওয়াতে হিন্দুদের উপর এইসব উপদ্রব অপরাধের পর্যায়ে পড়ে না এবং পুলিসের কাছে উপেক্ষিত হয়। পূর্ববঙ্গ সরকার এসব না জানেন এমন নহে; কিন্তু জানিয়া শুনিয়া প্রতীকারের জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনে তাঁহারা পরাঙ্মুখ। ভারতের সংখ্যালঘু সচিব শ্রীযুত বিশ্বাস পূর্ববঙ্গ সফর করিয়া সেখানকার এই অবস্থার সম্বন্ধে একটুও আলোক-সম্পাত করেন নাই কিংবা করিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ পারস্পরিক সৌহার্দ্য বিনিময়ই যদি এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য ছিল, তবে কলিকাতায় বসিয়াও সে কাজ সম্পন্ন হইতে পারিত, সেজন্য সফরের অভিনয় করিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না।

পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যা

পূর্ববঙ্গ হইতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উৎসাদন সম্বন্ধে ভারত সরকার কিরূপ নীতি অবলম্বন করিতে চাহেন। তাঁহাদের এ সম্পর্কে কি কিছুই বলিবার নাই, কিছুই তাঁহারা করিতে পারেন না। ভারত কি কেবল সহ্য করিয়াই যাইবে এবং এইভাবে পূর্ববঙ্গ হইতে উদ্বাস্তু সমাগমের ফলে আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ঘন ঘন বিপর্যস্ত হইতে থাকিবে?" —গত ১লা এবং ২রা নবেম্বর কলিকাতায় সর্বভারতীয় পূর্ববঙ্গ সংখ্যালঘু অধিকার সংরক্ষণ সম্মেলনের সভানেত্রীস্বরূপে শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালনী তাঁহার অভিভাষণে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের সকলের মনের এই প্রশ্নই অভিব্যক্ত করেন। শ্রীযুক্তা কৃপালনী স্পষ্ট করিয়াই বলেন যে, পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা পাকিস্থানের নাগরিক, তাঁহারা ভারতের নাগরিক নহেন, কিন্তু সেজন্য ভারত সরকার তাঁহাদের সম্বন্ধে নৈতিক দায়িত্ব এড়াইতে পারেন না। তিনি একথা স্মরণ করাইয়া দেন যে, ভারত বিভাগ হইবার আগে এদেশের নেতৃবর্গ এবং গভর্নমেণ্ট পাকিস্থানের হিন্দু-সমাজের স্বার্থরক্ষায় সম্পূর্ণ সজাগ থাকিবেন, এই প্রতিশ্রুতি বারংবার দিয়াছিলেন। সুতরাং পাকিস্থান বৈদেশিক রাষ্ট্র এবং তথাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যা সেখানকার ঘরোয়া ব্যাপার; সুতরাং ভারত সরকারের সে সম্পর্কে কিছুই করিবার নাই, এই ধরণের যুক্তির আড়ালে আশ্রয় লওয়া ভারত সরকারের পক্ষে নিতান্তই কর্তব্যবিমুখতার পরিচায়ক। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অবদানের কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্তা কৃপালনী বলেন, "পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা ভারতের স্বাধীনতার জন্য যেরূপ বীরোচিতভাবে সংগ্রাম করিয়াছেন এবং তাহারা যেভাবে যতটা দুঃখকষ্ট বরণ করিয়া লইয়াছেন ভারতের অন্য কোন প্রদেশের লোকেরাই তাহা করে নাই। খণ্ডিত ভারত, যে ভারতে তাহাদের স্থান হইবে না, তাহারা অবশ্য তেমন ভারতের জন্য প্রাণ দেন নাই। পূর্ববঙ্গের এই সব হতভাগ্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বলির বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি। এখন যদি আমরা তাঁহাদের প্রতি আমাদের কর্তব্য প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হই, তবে জাতির ভবিষ্যৎ বংশধরেরা নিশ্চয়ই আমাদিগকে ক্ষমা করিবে না। শ্রীযুক্তা কৃপালনীর একথার উত্তর একই আছে। ভারত সরকারের পক্ষ হইতে সে কথা অনবরত আমরা শুনিতেছি। ভারতের প্রধান মন্ত্রী বহুভাবে সে কথা আমাদের শ্রুতিপথে প্রবেশ করাইতেছেন। সে কথাটি এই যে, তবে কি পাকিস্থানের বিরুদ্ধে আমাদিগকে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে হইবে? শ্রীযুক্তা কৃপালনী এই প্রশ্নেরও উত্তর দিয়াছেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, কোন রাষ্ট্রের অন্যায়ের প্রতিকার সাধনের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে গেলেই যুদ্ধ বাধিয়া যাইবে, এমন মনে করিবার কোন কারণ নাই। পক্ষান্তরে যথাসময়ে কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার ফলে যুদ্ধের কারণই নিরাকৃত হয় এবং এক পক্ষ দুর্বলেরও তোষণমূলক নীতির অবলম্বনের পরিণতিস্বরূপেই যুদ্ধবিগ্রহ পাকিয়া উঠে. ইতিহাস এই সত্যই প্রতিপন্ন করে। বলা

বাহুল্য, শ্রীযুক্তা কৃপালনীর যুক্তির গুরুত্ব সকলেই স্বীকার করিবেন। পাকিস্থানের সঙ্গে যুদ্ধ বাধে, কেহই ইহা কামনা করা দূরে থাকুক, কল্পনাও করে না। কিন্তু পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে পাকিস্থানে মধ্যযুগীয় বর্বরতা-মূলক যে নীতি অবলম্বিত হইতেছে, তাহার গতি রুদ্ধ করা ভারত সরকারের পক্ষে প্রয়োজন। প্রত্যুত পাকিস্থানের প্রক্রিয়ায় বেশ একটা কৌশল দেখা যায়। তাহাদের নীতির গতি কিছু দিন স্থগিত থাকিয়া মাঝে মাঝে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে দমকা হাওয়ার মত ধাক্কা দেয়। ভারত সরকার বশংবদ-ভাবে ক্রমাগত সেই ধাক্কা সামলাইতেই ব্যস্ত থাকিবেন, ইহাতে বাহাদুরী কিছুই নাই এবং নৈতিকতারও ইহা পরিচায়ক নহে। ফলতঃ তাঁহারা এখনো যদি এ সম্বন্ধে সচেতন না হন এবং অন্যায়ের প্রতিরোধে সংকল্পশীলতার পরিচয় তাঁহারা না দিতে পারেন, তবে অবস্থা ক্রমেই গুরুতর হইয়া দাঁড়াইবে এবং ভারতের পক্ষে ভীষণ সংকটের সৃষ্টি হইবে। এ বিষয়ে আমাদের মনে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

সুদিনের প্রতীক্ষা

স্বরাজ আমরা এখনও পাই নাই। ভারতের জনসমাজের অন্ন, বস্ত্র এবং শিক্ষা-সমস্যার যতদিন পর্যন্ত সমাধান না হইবে, ততদিন পর্যন্ত আমরা স্বরাজ লাভ করিয়াছি, এমন কথা বলা ভুল হইবে, ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল সম্প্রতি ওয়ার্ধা গিয়া একটি বক্তৃতায় এই কথা বলিয়াছেন। পণ্ডিতজী বলেন, অনেক রাষ্ট্রেই জমিদারী, জায়গীরদারী প্রথা রহিত করা হইয়াছে, অন্যান্য রাজ্যেও তাহা করা হইবে। অতঃপর ভূমি কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে। ভূমি সংস্কারের এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের সঙ্গে সঙ্গে কুটীরশিল্প-সমূহের সমৃদ্ধি সাধন করা হইবে। এই-ভাবে কাজ করিলে দেশের দারিদ্র্য এবং বেকার সমস্যার অনেকটা সমাধান হইয়া যাইবে বলিয়া ভারতের প্রধান মন্ত্রী আশা পোষণ করিয়াছেন। পণ্ডিতজীর মুখে এই ধরণের কথা নূতন নয়; কিন্তু আমাদের সেই সুখের দিন কবে আসিবে, ইহাই প্রশ্ন। ভারতের প্রধান মন্ত্রী বিভিন্ন রাজনীতিক দলগুলির নীতির বিরূপ সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ঐসব দল গান্ধীজীর নীতি অনুসরণ করিতেছে না। পণ্ডিতজীর মতে গান্ধীজীর নীতিকে কার্যে পরিণত করিবার উপরই দেশের উন্নতি নির্ভর করিতেছে। তিনি বলেন, গান্ধীজীর আদর্শ অনুসরণ করিয়া যদি আমরা চলিতে পারি, তবে শুধু যে ভারতকেই আমরা পুনর্গঠন করিতে পারিব, ইহা নয়, পরন্তু সমগ্র জগতের সম্মুখে তদ্দ্বারা আদর্শ স্থাপন করা হইবে। গান্ধীজীর নীতির প্রতি পণ্ডিতজীর এমন শ্রদ্ধা থাকা স্বাভাবিক; কিন্তু এই কয়েক বৎসরে আমরা কতটা গান্ধীজীর নীতি অবলম্বন করিয়া চলিয়াছি? পণ্ডিতজী কথা চাহেন না; তিনি চাহেন কাজ; কিন্তু দেখা যায় কংগ্রেসকর্মীরা কাজ ছাড়িয়া কথার নেশাতেই কার্যত মাতিয়া উঠিয়াছেন। আচার্য বিনোবা ভাবে গান্ধীজীর আদর্শে একান্ত-ভাবে নিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তি এবং এ সম্বন্ধে তাঁহাদের মতের বিশেষ মূল্য কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ভূমিদান যজ্ঞ সম্পর্কে বিহার পরিদর্শনকালে তিনি সুতীব্র ভাষাতেই ভারত সরকারের বর্তমান নীতির সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ভারত সরকারের অবলম্বিত নীতি ধনী-দেরই অনুকূলে—দরিদ্র জনসাধারণের স্বার্থরক্ষায় কার্যত সে নীতি প্রযুক্ত হইতেছে না। তিনি কংগ্রেসকর্মীদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিয়াছেন, যদি এখনও তাঁহারা এই ভ্রান্ত নীতি ত্যাগ না করেন, তবে বিপদ ঘটিবে। তিনি নিজেই তাঁহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবেন। আচার্য ভাবেজী এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারত সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রকৃত-প্রভাবে দেশের বর্তমান সমস্যার সমাধানের পক্ষে উপযোগী নয়। কারণ তাহা জন-সাধারণের সহযোগিতা উদ্রিক্ত করে না। ভাবেজী বলিয়াছেন, তিনি বিপ্লব চাহেন। জনসাধারণের উন্নতি সাধন বৈপ্লবিক নীতি প্রয়োগের ফলেই সম্ভব হইতে পারে, ইহা তাঁহার বিশ্বাস। ফলতঃ গতানুগতিক অবস্থার কোনরূপ বিপর্যয় না ঘটাইয়াই ভারতের রাষ্ট্রনীতির নিয়ামক-গণ দেশের দুঃখ দূর করিতে চাহেন—কিন্তু কোন দেশে তাহা সম্ভব হইয়াছে কি? সমস্যা হইল এইখানে।

বাঙলার বাহিরে উদ্বাস্তু প্রেরণ

পশ্চিমবঙ্গের পুনর্বাসন-ব্যবস্থায় উদ্বাস্তুদের মধ্যে নাকি অপ্রত্যাশিত রকমে অসন্তোষ দেখা দিয়াছে। যাহারা এইভাবে অন্য প্রদেশে যাইতে ইচ্ছুক, পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাহাদের হাতের স্বাক্ষর কিংবা টিপসহি লইয়া কাজ পাকা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্বে একদল উদ্বাস্তুকে উড়িষ্যায় প্রেরণ করিতে চেষ্টা করিলে তাহারা তাহাতে অস্বীকৃত হয়। এই ব্যাপারের পর এইরূপ নীতি অবলম্বিত হইয়াছে এবং কিছুসংখ্যক উদ্বাস্তুকে উড়িষ্যাতে পাঠানোও হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে উদ্বাস্তুদের যাইবার আগ্রহ সত্যই যদি দেখা দিয়া থাকে, তবে ভাল কথা; কিন্তু সমস্যা সেইখানেই মিটে না। বর্তমানে অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে পড়িয়া এবং নানা রকমের অসুবিধার চাপে ছিন্নমূল এই সব নরনারীর দল অবস্থার যে কোনরূপ পরিবর্তনকে আশার সঙ্গে স্বীকার করিয়া লইতে আগ্রহান্বিত হইবে, ইহা আশ্চর্য নয়; কিন্তু অন্য প্রদেশে গিয়া যদি তাহারা অনুকূল প্রতিবেশ না পায়, তবে তাঁহাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিবার এমন সম্ভাবনা এখনও আছে। সুতরাং বিভিন্ন রাজ্যের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আগে এ সম্বন্ধে পাকাপাকি ব্যবস্থা করিয়া লইয়া এবং এক্ষেত্রে অতীতের ভুলের পুনরাবৃত্তি না ঘটে, সে দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তবে উদ্বাস্তুদিগকে অন্য রাজ্যে পাঠানো উচিত। বস্তুতঃ ইহাদিগকে যে কোন অবস্থার মধ্যে ধাক্কাইয়া লইয়া ফেলা যেমন মানবতাবিরোধী কাজ হইবে, সেইরূপ কাজ পুনর্বাসনের দিক হইতেও সার্থক হইবে না। আমাদের মতে উদ্বাস্তুদিগকে যদি পশ্চিম-বঙ্গের বাহির পাঠাইতে হয়, তবে পশ্চিম-বঙ্গের সীমানার সংলগ্ন অঞ্চলেই ইহাদিগকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা কর্তব্য। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় এখন দেশে ফিরিয়াছেন। কয়েক দিনের মধ্যে তিনি দিল্লীতে যাইতেছেন। আমরা আশা করি, বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলগুলি পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রশ্ন সম্পর্কে তিনি ভারত সরকার এবং কংগ্রেস-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অবিলম্বে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় এই সম্পর্কে তাঁহারই উদ্যোগে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহা প্রতিপালনের দায়িত্ব সম্বন্ধে আমরা তাঁহাকে সচেতন করিয়া দিতেছি।

মার্কিন বৈদেশিক নীতি

"দেশের" বর্তমান সংখ্যা প্রকাশিত হবার পূর্বেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনের ভোট গ্রহণ হয়ে যাবে এবং তার ফলও জানা যাবে। যদিও গভর্নমেণ্ট ডেমোক্রাটিক পার্টির হাতে তাহলেও বৈদেশিক ক্ষেত্রে মার্কিন নীতি মোটামুটি উভয়দলসম্মত বলা যায়। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের সময়ে এবং তাঁর পূর্বে প্রেসিডেণ্ট রুজ্‌ভেল্টের সময়েও মার্কিন বৈদেশিক নীতি নির্মাণে অনেক রিপাবলিক্যান নেতার সহযোগ ছিল। এমন কি আইজেনহাওয়ারকেও এই দলে ফেলা যায়। যদিও তাঁর কাজ ছিল সেনাপতি ও সামরিক বিশেষজ্ঞের, রাজনৈতিক দলাদলির উপরে। তবে বৈদেশিক নীতির সঙ্গে সে কাজের যোগাযোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার কিছুকাল পরে জেনারেল আইজেনহাওয়ার সৈন্য বিভাগের কাজ থেকে অবসর নিয়ে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্টের কাজ নেন। পরে আতলান্তিক চুক্তি স্বাক্ষরকারী জাতিসমূহের তরফে পশ্চিম য়ুরোপের 'সুরক্ষার' জন্য যে সৈন্য বাহিনী তৈরী করার পরিকল্পনা হয় তার সর্বোচ্চ পদে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান তাঁকে নিযুক্ত করেন। ট্রুম্যান গভর্নমেণ্টের বৈদেশিক নীতির মোটামুটি সমর্থক না হলে জেনারেল আইজেনহাওয়ার কখনই নূতন করে আবার এই কাজের দায়িত্ব নিতে আসতেন না। তাঁর আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট পদপ্রার্থী হবার ইচ্ছার কথা যখন প্রথম শুনা যায় তখনও নিশ্চিত ছিল না যে জেনারেল আইজেনহাওয়ার যদি দাঁড়ান তবে কোন্ দলের পক্ষে দাঁড়াবেন। ডেমোক্রাটিক পার্টির পক্ষ থেকেও নাকি তাঁকে প্রেসিডেণ্ট পদপ্রার্থী হবার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। যাই হোক শেষ পর্যন্ত তিনি রিপাবলিক্যান পার্টির পক্ষেই দাঁড়ালেন, তার জন্যও অবশ্য লড়তে হয়েছে। কারণ রিপাবলিক্যান পার্টির বুড়ো ঘুঘুরা অনেকেই তাঁর বিরোধী ছিল। তারা চেয়েছিল সেনেটর টাফ্‌ট্‌কে যার মতামত প্রতিক্রিয়াশীল বলে বিদিত। রিপাবলিক্যান পার্টির মধ্যে উদারমতাবলম্বীরাই প্রার্থী মনোনয়নের সময়ে জেনারেল আইজেনহাওয়ারের সমর্থক ছিল বেশি। আইজেনহাওয়ার রিপাবলিক্যান পার্টির পক্ষে প্রার্থী মনোনীত হলেও অনেক ডেমোক্রাটিক পার্টির লোকও তাঁকে ভোট দেবে বলে স্থির করেছিল। তার কারণ প্রথম হোল বিজয়ী সেনাপতি হিসাবে জেনারেল আইজেনহাওয়ারের খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা; দ্বিতীয় হোল তাঁর মতামতের উদারতার সম্বন্ধে এবং তিনি দলাদলির রাজনীতির উপরে থাকবেন, লোকের এই ধারণা। নির্বাচন যুদ্ধে নামার পরে কিন্তু এসব অনেকটা উল্টে পাল্টে গেছে। নির্বাচন অভিযানে সহায়তা পাবার জন্য জেনারেল আইজেনহাওয়ার সেনেটর টাফ্‌ট্‌ প্রমুখ রিপাবলিকান পার্টির প্রতিক্রিয়াশীল চাঁইদের সঙ্গে অনেকটা মিশে গেছেন বলে লোকে মনে করছে, এমন কি সেনেটর ম্যাক-কার্থীর মতো লোক, যিনি কম্যুনিস্ট-বিরোধিতার অছিলায় আমেরিকার আবহাওয়াকে দূষিত করে তুলেছেন, তাঁকে পর্যন্ত জেনারেল আইজেনহাওয়ার আন্তরিক না হোক অন্তত বাহ্যিক সমর্থন করেছেন দেখা গেছে। এই সব কারণে যাঁরা পূর্বে দলনির্বিশেষে আইজেনহাওয়ারের সমর্থক ছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকের মন নির্বাচন অভিযানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ বিগড়ে গেছে। তাতে করে আইজেনহাওয়ারের

সাফল্য সম্বন্ধে গোড়ার দিকে তাঁর সমর্থক-দের যতটা নিশ্চিত ভাব ছিল তার অনেকটা নষ্ট হয়ে গেছে।

অপরদিকে ডেমোক্রাটিক পার্টির পদ-প্রার্থী মিঃ স্টিভেনসনের সাফল্যের আশা অল্প থেকে ক্রমশ বেড়েছে। মিঃ স্টিভেনসন অবশ্য জেনারেল আইজেনহাওয়ারের মতো বিখ্যাত ব্যক্তি নন। তিনি প্রেসিডেণ্টের পদ-প্রার্থী হতে চানও নি। তবে পার্টি কর্তৃক মনোনীত হবার পর দেখা গেছে যে তিনি বেশ ভালো লড়িয়ে। বক্তাও তিনি বেশ উ'চুদরের। তাঁর আর একটা সুবিধা হোল এই যে ওয়াশিংটনে ট্রুম্যান গভর্নমেণ্টের সহিত সংশ্লিষ্ট লোকদের মধ্যে যে-সব দুর্নীতির কাহিনী প্রকাশ পেয়েছে তার সঙ্গে মিঃ স্টিভেনসনের কোনো রকম সংস্রব ছিল না। ইলিনয়েস স্টেটের গভর্নর হিসাবে তাঁর কাজেরও মোটামুটি সুনামই আছে। নির্বাচনী অভিযানেও তিনি কার্যকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। ফলে আইজেনহাওয়ার পক্ষের সম্ভাব্য সমর্থনের খানিকটা জেনা-রেল ও তাঁর উপদেষ্টাদের কার্যের দরুণ এবং খানিকটা মিঃ স্টিভেনসনের কর্ম-কুশলতার দরুণ ডিমোক্রাটিক পার্টির পক্ষে হয়ত এসে গেছে, তাতে দুই দলের ঘোড়া এখন প্রায় সমান সমান ছুটছে বলে লোকে বলছে। যাই হোক কোন্ ঘোড়া জিতবে তা নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করার আর প্রয়োজন নেই, যা হবার ৪ঠা নভেম্বরই হয়ে যাবে। তবে এই নির্বাচনী খেউড়ের হট্টগোলের মধ্যে একটি বিষয়ে একটা ভুল ধারণা হবার সম্ভাবনা আছে। সেটি হোল আমেরিকার বৈদেশিক নীতির বিষয়ে। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে দুইপক্ষের বাদানুবাদ থেকে লোকের মনে হতে পারে যে, এই নির্বাচনের ফলে আমেরিকার উভয়দলসম্মত বৈদেশিক নীতির বুঝি অবসান হোল। আইজেন-হাওয়ার কোরিয়া যুদ্ধের জন্য ট্রুম্যান গভর্নমেণ্টকে এই বলে দায়ী করছেন যে দক্ষিণ কোরিয়ার সামরিক শক্তি ভালো করে না গড়ে তোলার পূর্বে কোরিয়া থেকে মার্কিন সৈন্য সরিয়ে আনা হয়েছিল বলেই কম্যুনিস্টরা 'আক্রমণ করতে সাহস করেছে। জেনারেল আইজেনহাওয়ার বলছেন তিনি যদি প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন তবে তিনি সম্মানজনক সর্তে কোরিয়া যুদ্ধের অবসান ঘটাবেন। কী উপায়ে সেটা ঘটাবেন তা কিন্তু বলছেন না। রিপাবলিক্যান পার্টির মধ্যে এক দল আছে যারা বরাবর এই প্রোপাগান্ডা চালিয়ে আসছে যে ট্রুম্যান গভর্নমেণ্টের নীতির দোষেই চীন কম্যু-নিস্টদের হাতে চলে গেছে। এরা বলে কম্যুনিস্টদের হাত থেকে য়ুরোপকে বাঁচাবার জন্য তত চেষ্টার দরকার নেই, এশিয়ার দিকে বেশি নজর দেওয়া দরকার; কেউ কেউ এই দূরে সরে থাকার নীতি, যাকে বলে 'Isolationism', তার একটু বেশি সমর্থক। জেনারেল আইজেনহাওয়ার কম্যুনিস্টদের প্রতি ডেমোক্র্যাটিক পার্টির গভর্নমেণ্টের দুর্বলতার অভিযোগ আওড়াচ্ছেন বটে, তবে এশিয় কম্যুনিস্টদের সঙ্গে লড়বার জন্য অ-কম্যুনিস্ট এশিয়ানদের প্রস্তুত করার কথা বল্লেও তিনি Isolationismএর সুরে কিছু বলছেন না। বলার কথাও নয়। আসলে আইজেনহাওয়ার যদি প্রেসিডেণ্ট নির্বা-চিত হন তাহলেও মার্কিন বৈদেশিক নীতির কোনো বিশেষ পরিবর্তন হবে না। যা বলা-বলি হচ্ছে সব নির্বাচনী-হুংকার, নির্বাচন পর্ব শেষ হয়ে গেলে দেখা যাবে যা ছিল তাই আছে। নির্বাচনে যিনিই জয়ী হউন, আমেরিকার বৈদেশিক নীতির বর্তমান উভয়দলসম্মত রূপের পরিবর্তন হবে, এরূপ মনে করার কোনো কারণ নেই।

২।১১।৫২

রঞ্জন

কর্মে ও চিন্তায় কিছুটা ব্যবধান অবশ্যম্ভাবী, তাই কর্মী আর ভাবুকের মধ্যেও মাঝে মাঝে বিরোধ ঘটা অসম্ভব নয়। 'মাঝে মাঝে' বললেম এই জন্যে যে এই বিবাদটা পুরোনো হলেও চিরকালীন নয়। ভাবুক সক্রেটিস প্রয়োজন হলে অস্ত্রধারণ করেছেন সেকথা আমরা সবাই জানি, যেমন জানি গ্যেটের কর্মব্যস্ত জীবনের কথা। ঠিক 'কখন বলতে পারব না, কিন্তু কবে যেন একটা গভীর পরিবর্তন এলো। দুজনের কাজ ভাগা-ভাগি হয়ে গেল ; ভাবুক তার লাইব্রেরী থেকে বেরুতে অস্বীকার করল, আর সেই সঙ্গে কর্মী ভুলে গেল কাজ থেকে ছুটি নিয়ে মাঝে মাঝে চিন্তামগ্ন হতে। ভাবুক রক্তাক্ত ইতিহাসের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'এই তোমার কীর্তি।' কর্মী অবজ্ঞার সঙ্গে উত্তর দিল, 'আর, তুমি কিছু করোইনি।' চিন্তা ও কর্মের এই বিচ্ছেদের ফলে কর্ম প্রায়শই অপকর্ম হোলো, এবং চিন্তা হোলো অকর্মার বন্ধ্যা বিলাসিতা। স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় এদের একটা পুনর্মিলনের চেষ্টা হয়েছিল, সফল যে হয়নি তার প্রমাণ যুদ্ধান্তের বর্ধিত তিক্ততা। স্পেন্ডার ও কোয়েসলারের বর্তমান কর্মবৈরাগ্য সেই বৈরিতারই সাক্ষ্য বহন করছে।

গ্রীকদের মতো আমরা আমাদের ভাবনা ও কাজে যদি একটা সামঞ্জস্যবিধান করতে পারতাম, আমাদের জীবনে কর্ম ও চিন্তার সেই সমন্বয় সাধন যদি সম্ভব হোতো, তাহলে যে সবচেয়ে ভালো হোতো তাতে কোনো সন্দেহই নেই। কিন্তু পূর্বদৃশ্য ভবিষ্যতে তার সম্ভাবনাটা আর যাই হোক স্পষ্ট নয়। এমন অবস্থায় কর্মীরা স্বভাবতই চিন্তাকে ও তজ্জাত আলোচনাকে প্রতিপন্ন করতে চাইবেন সময়ের অপচয় বলে। ভাবুকেরাও বিলাপ করবেন কর্মীদের চিন্তাহীনতা নিয়ে। দুই নিয়েই সমাজ মোটামুটি এক রকম চলতে থাকবে।

কবির স্ত্রী যখন কর্মের ওকালতি করে তিরস্কার করেন, 'অন্ন জোটে না, কথা জোটে মেলা, নিশিদিন ধরে এ কী ছেলে-খেলা?' তখন তার মানে বুঝি। মাথার উপরে বাড়ি পড়ো-পড়ো হলে মাথার ভিতরের চিন্তারাশির চেয়ে কবিরও মাথার বাইরেটা রক্ষা করবার কথাই চিন্তা করা উচিত। অন্তত, সেটা নিশ্চয়ই উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু রাজনীতির নেতারা যখন চিন্তা, আলাপ বা সমালোচনার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করে সবাইকে কাজে হাত লাগাতে বলেন তখন সন্দেহী ও শংকিত হতে হয়। মনে হয় হয়তো এই আলোচনা-বিরূপতার অন্তরালে লুকিয়ে আছে আলোচনা-ভীতি। নেতাদের মধ্যে স্বৈরাচাররোগের পূর্ণাক্রমণের পূর্বে এই বহিঃলক্ষণটি একাধিকবার দেখা গেছে একাধিক দেশে। দেশের লোককে একবার এই নৈঃশব্দ্যের মন্ত্রে দীক্ষা দিতে পারলে অচিরেই গণতন্ত্রের সমাধি রচিত হয়, এবং গণতন্ত্রের সমাধিই যে স্বৈরাচারের সিংহাসন তা বলাই বাহুল্য। গত শনিবার যে পণ্ডিত নেহরু ওয়ার্ধায় এক লক্ষ শ্রোতাকে বাক্য ব্যয় করে কালক্ষয় করতে নিষেধ করেছেন, এ উপদেশ আমি শিরোধার্য করতে অক্ষম। পণ্ডিতজীর বাক্যে এককালে গুণ ছিল, এখনো তা পরিমাণে ধনী, তাঁর কাছ থেকে এমন উপদেশ তাই কিঞ্চিৎ বিস্ময়জনকও বটে। কিন্তু এর নীতিগত দিকটা ভীতিজনক। আধুনিক ইতিহাসেই এমন নজির আছে যে কোনো নেতা আলাপ ও আলোচনার আতিশয্যের নিন্দা করে জাতিকে কর্মে উদ্বুদ্ধ হতে বলে সকলের অলক্ষ্যে নিরংকুশ একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। আমি এমন কথা বলছিনে যে নেহরুর বেলায়ও এমন পরিণতি হতেই হবে। এমন কথাও যেন কেউ না বলে যে নেহরুর বেলায় অমন পরিণতি হতেই পারে না। 'চাণক্য' ছদ্ম নামে লেখা নেহরুর নিজের এসম্বন্ধে প্রবন্ধটিতে এই সম্ভাবনার স্বীকৃতি ছিল।

কিন্তু আমার আপত্তি এই নীতিটাতেই যে আলোচনা সময়ের অপচয়, যে কথা বলা (বা লেখা) কাজ নয়। নাই বেভান কিছু দিন আগে তাঁর "ইন প্লেস অব ফিয়ার" বইটিতে নীতিটা আরো স্পষ্ট করে ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর সূত্রটি ছিল, "It is the verb that matters, not the noun." চিন্তার উপর কর্মের এমন অনাবৃত আক্রমণ আমার আর দ্বিতীয় জানা নেই।

জীবন-দর্শনকে এতে জীবন-ব্যাকরণের আকার দেওয়া হয়েছে, এবং ব্যাকরণ যে দর্শনের একটা অনতিমুখ্য অংশ মাত্র তা ভিটগেনস্টাইন ও এয়ার প্রমুখ লজিক্যাল পজিটিভিস্টরাও বোধহয় অস্বীকার করবেন না। তার উপর বেভান্ কথিত ব্যাকরণও একান্ত অসম্পূর্ণ কেননা, তিনিই বলছেন, এ ব্যাকরণে ক্রিয়াই শুধু শিক্ষণীয়, বিশেষ্যের এশাস্ত্রে স্থান নেই। শুধু তাই নয়, একমাত্র সকর্মক ক্রিয়াই এখানে বিবেচ্য। অকর্মক ক্রিয়া অপাংক্তেয়। এমন ব্যাকরণ নিয়ে বেসিক ইংলিশের কাজ হয়তো চলতে পারে, কিন্তু সাহিত্য-রচনা সম্ভব নয়। তেমনি এমন জীবনব্যাকরণ নিয়ে শাসনযন্ত্র চললেও গণতন্ত্র অচল। সভ্যতা-রচনা তো একেবারেই অসম্ভব।

শুধু বিশেষ্য নয়, বিশেষণ বাদ দিলেও ব্যাকরণ গুরুতরভাবে বিকলাঙ্গ হবে। 'ভালো' এবং 'মন্দ' এই দুটো কথাই বিশেষণ। আমাদের নেতাদের প্রত্যেকটি কথা ও কাজ যদি আমরা প্রকাশ্যে বিশ্লেষণ, বিচার ও সমালোচনা করে অনবরত ভালো কিম্বা মন্দ বলে রায় না দিই, তাহলে আমরা যে আরো বিপথে চালিত হবো না তার নিশ্চয়তা কোথায়? নেতারাই বা জানবেন কী করে যে আমাদের মতামত কী? শুনেছি তাঁরা নাকি জনমতের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল। অন্তত সেই শ্রদ্ধা বাদ দিলে যে সত্যকার গণতন্ত্র হয় না সে সম্বন্ধে দ্বিমতের অবকাশ নেই।

তবু, সরকারের কাজ আজকাল সত্যি এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে নেতাদের পক্ষে কাজ করা ও ভাবা এই দুটোই একসঙ্গে করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। দুটো যে একযোগে সুসম্পাদিত হচ্ছে না তা তো স্পষ্টপ্রত্যক্ষ তাঁদের নিত্যকার বক্তৃতায় ও কাজে। তাই একটা শ্রম-বিভাগ হওয়াই বোধহয় সমীচীন। আমি বলি কি, নেতারা তাঁদের বক্তৃতা কমিয়ে কাজ বাড়িয়ে দিন। আর বাকি সবাই সর্বদা সজাগ থাক তাদের বাক্-স্বাধীনতা সম্বন্ধে, বাক্যের গুরুত্ব সম্বন্ধে ও বাক্‌ক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে। কাজ? কাজ আমরা কেউই হয়তো সানন্দে করিনে, কিন্তু প্রায় সবাই করতে বাধ্য হই। আর আমাদের মধ্যে যারা বেকার তারাও স্বেচ্ছায় বেকার নয়—বেকার শুধু বক্তৃতাব্যস্ত নেতাদের কর্মে ঔদাসীন্যে।

কাগজে-কাগজে বিজ্ঞাপনের ঢাক বাজলো। ফুলে উঠলো ভিড়, ছুটে এলো, ফিরে গেলো, দ্বিগুণ বেগে ফিরে এসে ছাপিয়ে গেলো শহর, ছড়িয়ে পড়লো ট্রামে বাস্-এ ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলে। চৌকোনো গোলদিঘি ঘিরে ছিটকাপড়ের হাট বসলো রাতারাতি; বইয়ের পাড়া গিন্নি-পাড়ায় রূপান্তরিত হ'লো। বালিগঞ্জে গলা ভাঙলো দোকানিদের, কুমোরটুলিতে সারা রাত কেউ ঘুমোলো না, ফুর্তিতে পাগল হ'য়ে গেলো বাচ্চারা। যারা বছর ভ'রে খেটেছে, তাদের ছুটির সুখ শাদা মেঘের রেখায়-রেখায় আঁকা হ'য়ে গেলো, আর যারা বেকার, কিংবা অক্ষম, তারা অন্তত কয়েকটা দিনের জন্য তাদের বেকারত্বের অনুমোদন পেয়ে বাঁচলো। প্রতিমা দেখার ছল ক'রে সারাদিন পরস্পরকে দেখে বেড়ালো তরুণ-তরুণীরা, চাকররা না-ব'লে ছুটি নিলো, উনুনের ধোঁয়ায় গলদশ্রু হলেন মহিলারা। আকাশে চাঁদ বড়ো, আর ময়রার দোকানে সন্দেশের আকার ক্রমশ ছোটো হ'লো। সিমেন্টের মেঝের উপর ফুটে উঠলো পুরোনো কোনো ফ্যাকাশে-হওয়া স্মৃতির মতো আলপনা, চাঁদটাকে দিগন্তের ওপারে ছুঁড়ে দিয়ে লক্ষ্মী দেবী বিদায় নিলেন। এলো কালো-কালো গম্ভীর রাত, ঘুমের শিয়রে কালপুরুষ জ্বলজ্বল করলো, কিন্তু সেই বিশাল [illegible] কেউ লক্ষ্য করলো না, ফুটপাতে-ফুটপাতে জেগে উঠলো কান-ফাটানো হৃৎপিণ্ড-কাঁপানো আওয়াজ। দীপাবলীর নাম ক'রে শব্দাবলীর ঝড় ব'য়ে গেলো, [illegible]ণীয় রণক্ষেত্রে পরিণত হ'লো কলকাতা, হাফ-প্যান্ট আর বুশ-শার্ট পরা ছোকরার দল, মাছ-পাতুরি বোঝাই লরিতে, সচীৎকার নৃত্য ক'রে-ক'রে তাদের বলবন্ত যৌবনের তাড়নাকে সাময়িকভাবে প্রশমিত করলো। এর জের চললো আরো দু-দিন, তিন দিন, হঠাৎ কোনো বোমার শামিল পটকার শব্দে রোগীর প্রাণ ধড়ফড় ক'রে উঠলো, আর তারপর—শেষ হ'লো, শেষ হ'লো শেষ পর্যন্ত। এতদিনের ডামাডোলের পর মনে হ'লো ট্রাম-বাসগুলো ফিশফিশ ক'রে চলছে, আর শহরটার কেমন অসুখ-থেকে-সেরে-ওঠা রোগা কিন্তু শান্তি-পাওয়া চেহারা। দোকানগুলো ফাঁকা-ফাঁকা, পথে লোক কম, গাছে পাতা কম, রোদের রং বদলে গেছে। রোদের রং বদলে গেছে, দিনের স্বাদ অন্য রকম, চটপট সন্ধে হ'য়ে যায়। ইতিমধ্যে, আমরা যখন ভোগ করছিলুম ছুটি, ফুর্তি, অথবা বিরক্তি, কিংবা তলায়-ঠেকা তহবিলের চিন্তায় উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠছিলুম, ইতিমধ্যে কিছু-একটা ঘ'টে গেছে—আমাদের আয়োজনের বাইরে, আমাদের চেষ্টা, ইচ্ছা, সংকল্পের বাইরে কোনো ঘটনা।

এমনি সময়ে কাছে এলো সে। সামনে এসে দাঁড়ালো—শান্ত, নিঃশব্দ, অনুগ্র; উজ্জ্বল নয়, কিন্তু ম্লানতার আভা ছড়িয়ে দিচ্ছে চারদিকে; বিষণ্ণ, কিন্তু সেই বিষাদ যেন সূক্ষ্মতম সুখের মতো ছুঁয়ে যায়। ক্ষীণাঙ্গী, নিরাভরণ, একরঙা ধূসর কাপড়ে সংবৃত, মাথাটি নিচু-করা, তার চুল তার পিঠের কাপড়ে মিশে গেছে রাত্রির বুকে সূর্যাস্তের মেঘের মতো। আমি চেয়ে দেখলুম তার মুখের দিকে, স্বপ্নের মতো অস্পষ্ট মুখ তার; চেয়ে দেখলুম তার চোখের দিকে, যে-চোখ কাঁদবে না কখনো, শুধু একটি ফোঁটা ছলছলানি নিয়ে স্বচ্ছ, স্থির, গভীর হ'য়ে তাকিয়ে থাকবে। আর তাকে দেখে আমি বুঝলুম কী হ'য়ে গেছে এর মধ্যে—কী সেই ঘটনা, যাতে দিনের স্বাদ, জীবনের স্বাদ অলক্ষিতে বদলে গেলো।

—কে? তাকে দ্যাখেননি কখনো? কখনো, মফস্বলের পথে চলতে-চলতে, কোনো সন্ধে-হওয়া সাঁকোর উপর হঠাৎ কেঁপে উঠে মনে-মনে বলেননি—'আ! আবার শীত এলো!' আর ঐ একটু হিমেল স্পর্শে অনেক স্মৃতি কি মনে প'ড়ে যায়নি আপনার—কোন দূর ছেলেবেলার স্মৃতি, জন্মান্তরের স্মৃতি যেন, বাঁশ-পচা জলের গন্ধে, জল-না-পড়া ধুলোর গন্ধে, আকুল হ'য়ে ওঠেনি আপনার কল্পনা? কোনো নির্জন মাঠের মধ্যে পাৎলা নীল চাদরের মতো, গান শোনার পরে স্তব্ধতার মতো, কুয়াশা যখন ছড়িয়ে যায়, তখন দূরে কোনো আলো-জ্বলা জানলার দিকে তাকিয়ে আপনি কি এক নিমেষে বেঁচে থাকার সব আনন্দ বোঝেননি? ভেবে দেখুন, মনে ক'রে দেখুন, হাতের কাজ ভুলে মুহূর্তের জন্য ফিরে যান অতীতে—তারপর নেমে আসুন আপনার ফ্ল্যাট ছেড়ে রাস্তায়, কার্তিকের ধূসর স্পর্শ নিতে-নিতে চ'লে যান গলি পেরিয়ে, কিংবা —যদি ভাগ্যক্রমে তেমন কোনো জানলা আপনার থাকে—জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখুন। পিঙ্গল মেঘের মধ্যে সূর্য যেখানে অস্ত গেছে, আর সেই মেঘের ফাঁকে-ফাঁকে, গাঢ় হলুদ বিষাক্ত কোনো মদের মতো, মুমূর্ষু দিনের ফোঁটা-ফোঁটা রক্ত ঝ'রে মিলিয়ে যাচ্ছে, ঠিক তার উপরে, জঙ্গলের বাইরে পরিষ্কার এক ফালি জমির মতো আকাশে, যেখানে সারা দিনের ব্যস্ততার ঝরা পাতা ঝেঁটিয়ে নিয়ে গেছে হাওয়া, সেই হালকা নীল নির্মল কুটিমে কখন সে অলক্ষ্যে এসে দাঁড়িয়েছে, নরম পায়ে, ঝাপসা কাপড়ে, চারদিকে আভার মতো ম্লানতা ছড়িয়ে। সন্ধ্যাতারার টিপ তার কপালে, কোলে তার বাঁকা চাঁদের শিশু। এই এখন, কলকাতায়, আমাদের ফেনিয়ে-তোলা ফুর্তিকে যখন কিছুতেই আর টেনে রাখা গেলো না, মিলিয়ে এলো সর্বশেষ উৎসবের রেশ, তখন আমাদের ক্লান্তির উপর নেমে এলো সে, দ্বিতীয়ার চাঁদের ফালিকে কোলে নিয়ে আমাদের মনের দিগন্তে এসে দাঁড়ালো, আমাদের অবসাদের শূন্যতার উপর ছড়িয়ে দিলো তার বিষাদের মাধুরী, আমাদের খোয়ারির উপর বিছিয়ে দিলো তার শান্তি। সে হেমন্ত।

২

সম্প্রতি আমি হেমন্ত ঋতুর পক্ষপাতী হ'য়ে পড়ছি। আমার বয়স বাড়ছে, সেটাই হয়তো এর কারণ। হয়তো, জীবনের এই দ্বিতীয় বয়ঃসন্ধির সংকটকালে, আমার মন তার সুরের মিল খুঁজে পাচ্ছে—উন্মন বসন্তে না, বর্ষার বিপ্লবে না, এই শান্ত, শালীন, সুপরিণত হেমন্তেই। যখন যৌবনের দিন-গুলি উতরোল বেগে উড়ে যাচ্ছিলো, তখন মনে পড়ে না কার্তিক মাসটাকে কখনো ভালো ক'রে লক্ষ্য করেছি। কার্তিক: ওটা যেন একট অপলাপ, বছরের সুন্দর কাব্যটির মধ্যে প্রক্ষিপ্ত—সে যেন থেকেও নেই, কিংবা শরতের আর শীতের মাঝখানে একটা ওয়েটিংরুমের মতো কোনোরকমে টি'কে আছে। তাকে আমরা সহ্য করি মাত্র, সঙ্গ দিই না; শুধু আইনত মেনে নিই, হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করি না। তাছাড়া

মনে-মনে আমার বহুকাল পর্যন্ত ধারণা ছিলো যে আমাদের ষড়ঋতু একটা প্রবাদ-বাক্য মাত্র; বসন্তের অস্তিত্ব আছে—বাস্তবে না, শুধু কাব্যে; আর হেমন্ত—তা-ই আমি ভাবতুম তখন—আমাদের দীর্ঘসূত্রী অবসরপুষ্ট পূর্ব পুরুষদের কল্পনার একটা বিলাস ছাড়া কিছু না। মার্ক টোয়েন নাকি ভারতবর্ষে এসে বলেছিলেন যে এ-দেশে শুধু দুটো ঋতু আছে, গ্রীষ্ম আর অতিগ্রীষ্ম—প্রথমটিতে জানলার শিকগুলো চিটগুড়ের মতো হ'য়ে যায় আর দ্বিতীয়টিতে গ'লে-গ'লে ঝ'রে পড়ে;—এই দুই অর্থে হাস্যকর অতিবাদের মধ্যে এটুকু সত্য আছে যে আমাদের প্রধানতম ঋতুই হ'লো গ্রীষ্ম। শাস্ত্রমতে গ্রীষ্মের ভাগে দু-মাস পড়লে কী হবে—আমরা তাকে পুরো ছ-মাস ছেড়ে দিতে রাজি আছি, অনেকের হয়তো আট মাসেও আপত্তি হবে না, অন্ততপক্ষে কলকাতার লোকের হিশেবমতো তা-ই দাঁড়াবে, কেননা এখানে ইলেকট্রিক পাখা চৈত্র মাসে ঘূর্ণিত হ'য়ে কার্তিকের আগে ছুটি নেয় না। ঠিক-ঠিক বসন্ত বলতে বোঝায় শুধু সেই সময়টুকু—বছরের মধ্যে দিন পনেরো সময় হয়তো—যখন আমরা গরম কাপড়গুলোকে ছাড়তেও পারছি না, সইতেও পারছি না, লেপের সঙ্গে বন্ধুতার অবসান হ'লেও পায়ের কাছে সেটা প'ড়ে থাকা চাই—এদিকে একদিন ঘুম ভেঙে দেখলুম জানলার তাকে চড়ুইপাখির নাচ, কি সন্ধ্যেবেলা হঠাৎ চোখে পড়লো একঝাঁক শাদা-কালো হিমালয়ের হাঁস ফিরে চলেছে প্রান্তর থেকে উত্তরে। এই ক-টা দিন পেরিয়ে এলেই বসন্ত আর গ্রীষ্মে কোনো তফাৎ থাকে না, কিংবা যদি-বা থাকে, সে শুধু মাত্রাগত তফাৎ, প্রকৃতিগত নয়—অর্থাৎ, কম-গরমের দিনগুলোকেই কেউ-কেউ ঋতুরাজের সম্মান দিয়ে থাকেন, যদিও সর্বসাধারণের অভিজ্ঞতায় গ্রীষ্ম এসে পৌঁছয় সরকারি মতে পাখা খোলবার নির্দিষ্ট তারিখের অনেক আগেই। আর সেই যে আমরা বলীয়ান গ্রীষ্মের বশবর্তী হলুম, তারই জের চলতে লাগলো দিনের পর দিন, মাসের পর মাস; নানারকম আনুষঙ্গিক বৈচিত্র্যসাধন সত্ত্বেও, বৎসরের অর্ধভাগ জুড়ে তার তেজ অপ্রতিহত থাকলো। এরই মধ্যে, বনেদি রাজত্বের উপর বর্বরের অভিযানের মতো, বর্ষার উপপ্লব হ'য়ে গেলো, বর্ষার পরে সজল সোনালি শরৎ ঋতুকেও চিনতে পারলুম আমরা, আর তারপর শরীরের আরাম নিয়ে রৌদ্রময় শীত যখন আসে, তাকে অনুভব করতেও একটুও দেরি হয় না আমাদের। কিন্তু মাঝখানকার হেমন্ত? কখন আসে, কখন চ'লে যায়, কিছুই যেন বোঝা যায় না। সে কি সত্যি আছে? অন্তত আমি সে-বিষয়ে বহুদিন পর্যন্ত সন্দিহান ছিলুম।

এই সন্দেহের আরো একটু কারণ আছে। আমরা অনেকাংশে বইয়ের হাতে মানুষ; অর্থাৎ, জীবন থেকে আমরা যা পাই, বই থেকেও ততটাই প্রায়, কিংবা আমাদের জীবনের আহরণগুলোকে পুষিয়ে নিই, পুরিয়ে নিই, সংবদ্ধ এবং অর্থময় ক'রে তুলি সাহিত্যের অভিজ্ঞতার সাহায্যে। সাহিত্যের মধ্য দিয়ে পাওয়াটা খুব একরকম সত্য ক'রে পাওয়া, জীবনে তার প্রভাব এড়াতে পারি না, আমাদের ভালো লাগা মন্দ লাগার পিছনে আছে—শুধু আমাদের স্বভাব নয়, প্রিয় পুঁথির স্মৃতি, তাছাড়া বহুযুগের সাহিত্যের সংস্কার, যা এখন আমাদের অচেতন মনের অংশ হ'য়ে গেছে। এখন আমাদের সাহিত্যের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে তাতে হেমন্তকে প্রায় একঘরে ক'রে রাখা হয়েছে; উল্লেখ নেই তা নয়, কিন্তু প্রেম নেই; এই ভারতভূমির আবহমান কাব্যে বসন্ত আর শরৎ দুটি উজ্জ্বল পাড় বুনে দিয়েছে, আর তার মাঝখান দিয়ে বিপুল স্রোতে ব'য়ে চলেছে বর্ষা। আমাদের দেশ যেমন গ্রীষ্মপ্রধান, আমাদের সাহিত্য তেমনি বর্ষাপ্রধান—বোধহয় সেইজন্যই তা-ই। বাল্মীকির বিখ্যাত বর্ণনায় বর্ষা আর শরতের মধ্যে বেছে নেয়া শক্ত হ'তে পারে, কিন্তু 'কুমারসম্ভবে'র বসন্ত-বিলাসকে হাজার মাইল পিছনে ফেলে গড়িয়ে চলেছে 'মেঘদূতে'র মন্দাক্রান্তা; বিদ্যাপতি বলতেই ভরা ভাদর মনে পড়ে আমাদের; আর রবীন্দ্রনাথ—যদিও এডওঅর্ড টমসন তাঁকে চাঁদের আলোর কবি বলেছেন—আমরা যাঁরা তাঁর গান শুনেছি, শুনে আর ভুলতে পারিনি, তাঁকে বর্ষার কবি না-ব'লে আমাদের উপায় নেই। সন্দেহ নেই, আদিযুগ থেকে আজকের দিন পর্যন্ত আমাদের সাহিত্যে ব্যাপ্ত হ'য়ে আছে বর্ষার অধিকার, আর তার কারণ শুধু এই নয় যে তাপের চাপে মূর্ছিত আকাশে প্রথম মেঘ দেখার মতো নিছক শারীরিক পুলক আমাদের প্রকৃতি দেবী আর কখনোই দিতে পারে না, কিংবা এও নয় যে ঐ মেঘেরই দাক্ষিণ্যের উপর আমাদের অন্নপান নির্ভর করে। আসল কথাটা এই যে, আমাদের ঋতুগুলোর মধ্যে বর্ষা সবচেয়ে প্রকট, সবচেয়ে দৃশ্যমান, শব্দায়মান, স্পর্শঘন, অত্যন্ত উদাসীন মনের উপরেও দুর্বার বেগে ভেঙে পড়ে সে। আমাদের অন্যান্য ঋতুগুলোতে তীক্ষ্ম কোনো প্রতিতুলনা নেই; আমাদের শীত চুপি-চুপি বসন্তের মধ্যে মিশে যায়, বসন্ত দেখতে-না-দেখতে গ্রীষ্ম হ'য়ে ওঠে। কিন্তু বর্ষা আসে হৈ-হৈ ক'রে, আকাশ ভ'রে তোলপাড় তুলে, পৃথিবীময় হুলুস্থুল ছড়িয়ে; আনে আকস্মিকের বিস্ময়, অভাবনীয়ের রোমাঞ্চ; তার আবির্ভাবের প্রবলতার সঙ্গে তুলনা হয় একমাত্র সেই সময়ের, যখন তুষারবন্দী হিম দেশে প্রথম ফুল ফোটে, পাখিরা ফিরে আসে, মুগ্ধ মানুষের চোখের সামনে সত্যি যেন জন্মান্তর ঘটে পৃথিবীর। সমতল উষ্ণ দেশে বসন্তের তীব্রতা নেই, ঋতুরাজের ঐশ্বর্য ঠিক বুঝতে হ'লে আমাদের যেতে হবে কাশ্মিরে, আলমোড়ায়, নিদেনপক্ষে দারজিলিঙে, কালিদাস যে-বসন্তের কথা লিখেছেন তারও ঘটনাস্থল হিমালয়। 'Spring, the sweet spring, is the year's pleasant king', এই গান শীতের দেশেই সার্থক; 'Sumer is icumen in, lhude sing cuckoo!' এই আনন্দধ্বনিও তাদেরই গলা ছিঁড়ে বেরোয়, যারা বরফের খপ্পরে প'ড়ে দীর্ঘ দীর্ঘ রাত্রি ভ'রে কেঁপেছে। আমাদের বসন্ত মধুর, দখিন হাওয়ায় উতল-করা পলাশ শিমুল কৃষ্ণচূড়ায় রঙিন, কোকিলের গিটকিরিতে মুখর; তার মধ্যে সুখ আছে আমেজ আছে, আছে মন-কেমন করা মদিরতা, কিন্তু রাজকীয় শক্তির কোনো প্রকাশ নেই। রাজার মতো বসন্ত আসে পৃথিবীর উত্তরাপথেই, কিংবা পার্বত্য উপত্যকায়; সেখানে সে সত্যি রাজা—জয়ী যোদ্ধা, বীর, অজগরের মতো শীতের কুণ্ডলী থেকে মুক্তির অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ে তার সৈন্যদল। তেমনি আমাদের বর্ষা যখন তার মৌশুমি হাওয়া বিশাল সাগর লুঠ ক'রে এনে তপ্ত তৃষিত পৃথিবীকে ত্রাণ করে। সেইজন্য, যেমন ইংরেজি ভাষার কাব্যে বসন্তের গুণগান, তেমনি আমাদের কাব্যে বর্ষার বন্দনা যুগে-যুগে উচ্ছ্বসিত। রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গান—শুধু সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি নয়, আবেগেও সবচেয়ে গাঢ়। তাঁর হাত থেকে বর্ষাকে নতুন ক'রে পেয়েছি

আমরা; আর তারই জন্য বসন্তে আমরা গভীরতর নিশ্বাস ফেলি, নীলতর নীলিমা দেখি আশ্বিনে। বাংলার ঋতুগুলির মিছিল চলেছে রবীন্দ্রনাথের পাতার পর পাতায়; যদিও বর্ষা আর শরতের কথাই সবচেয়ে বেশি, তবু মনে হয় না কোনো সুর, কোনো মীড়, কোনো ভঙ্গি বাদ পড়েছে; শীতের সুন্দর এক-একটি ছবি আছে 'গল্পগুচ্ছে', 'ছিন্নপত্রে', বৈশাখ ফিরে-ফিরে আসে বার-বার। এই রাশি-রাশি উপচারের মধ্যে শুধু হেমন্তের স্থান তেমনি সংকুচিত যেমন কুণ্ঠিত, অনতিস্ফুট সে নিজে। হয়তো এইজন্যই এই পঞ্চম ঋতুর পরীক্ষায় আমি ফেল হয়েছিলুম, তাকে ভালো ক'রে লক্ষ্য করতেই পারিনি, যেহেতু রবীন্দ্রনাথ কিছুই প্রায় লেখেননি এর কথা। যে-এক-মুঠো গান উত্তরজীবনে তিনি একে উৎসর্গ করেছিলেন, তা যেন অনেকটা কর্তব্যবোধে লেখা, তাঁর ঋতুর পাত্র ভ'রে তোলারই জন্য, কিন্তু, যেহেতু তিনি রবীন্দ্রনাথ, তাই ওরই মধ্যে এর নির্যাসটুকু পুরে দিয়েছেন, যেমন 'মধ্যদিনে যবে গান বন্ধ করে পাখি' এই ক্ষীণকায় কবিতাটুকুর মধ্যে বইয়ে দিয়েছেন গ্রীষ্মের সমস্ত দীর্ঘশ্বাস। কিন্তু শুধু নির্যাস নিয়ে সব সময় তৃপ্তি হয় না আমাদের, আমরা বিস্তার চাই, অবয়ব চাই, রঙে রেখায় বর্ণনাও চাই, আর হেমন্তের সে-রকম কোনো অভিজ্ঞান—শুধু রবীন্দ্রনাথে কেন, আমাদের কোনো কবিতেই কখনো আমরা পাইনি, যতদিন-না জীবনানন্দ দাশ তাঁর চাঁদ, প্যাঁচা, কুয়াশার অদ্ভুত নতুন পাঁচালি আমাদের শোনালেন। কাব্যের এই উপেক্ষিতাকে বরণ করলেন জীবনানন্দ, অমানিতাকে সম্মান দিলেন, তাঁর কাব্যে আলোর চেয়ে ছায়া বেশি, দিনের চেয়ে রাত্রি বেশি, বেগের চেয়ে বিরাম বেশি—আমাদের কবিদের মধ্যে তিনিই একমাত্র হৈমন্তিক।

৩

আমি প্রথম থেকেই জীবনানন্দর ভক্ত পাঠক, কিন্তু তিনি আমাকে হেমন্তচেতন করতে পারেননি; জীবনের অনেকগুলো গ্রীষ্ম বর্ষা কাটিয়ে এসে হঠাৎ একদিন স্বাধীনভাবেই কার্তিক মাসটাকে আমি আবিষ্কার করেছিলুম। পুজোর ছুটি চলছে তখনো, মাত্রই দু-একদিন আগে সমুদ্রতীর থেকে বেড়িয়ে ফিরেছি, কলকাতায় মন বসতে দেরি হচ্ছে। একটু মেঘ ছিলো আকাশে, হয়তো পথে পথের কুকুর ডেকে উঠছিলো। এইরকম এক উশখুশ-করা নিস্বাদ দুপুরবেলায়, যখন হাতে কোনো কাজ নেই আবার অবসরও ভালো লাগছে না, আমি কার্তিকের একটি বিশেষ রূপ প্রথম দেখতে পেয়ে সেই কথাটা কবিতায় লিখেছিলুম। সে-রূপ মনোহর নয়, তার অস্পষ্টতা রহস্যের ইঙ্গিত দেয় না, যেন দারিদ্র্যের মতো রুদ্ধ ক'রে রাখে; আলোর, তাপের, গায়ের চামড়ার সংকোচনের এই সময়টাকে আমার মনে হয়েছিলো রুগ্ন, নিদ্রালু, ম্রিয়মাণ। শীত মানেই পৃথিবীর মৃত্যু, আর হেমন্ত সেই মৃত্যুরই দূত, এই রকম ধারণা নিয়ে আরো কিছু বছর কাটলো আমার, আরো কিছু বয়স বাড়লো, তারপর একদিন প্রথম-মোড়-ফেরা উত্তুরে হাওয়ায় শুশ্রূষার স্পর্শ পেলাম আমি, বীতরাগ নির্মম আকাশের ধ্রুপদী রেখায় কেমন একরকম সান্ত্বনা পেলাম, ছোটো-হ'য়ে-আসা দিনগুলোতে এক নতুন নিবিড়তার স্বাদ। চোখ খুলে গেলো, আরো একটা জানলা খুলে গেলো মনের; বুঝতে পারলুম পূর্বপুরুষেরা ভুল করেননি, বছরের ষড়ঙ্গ মূর্তি রচনা ক'রে স্নায়ুযন্ত্রের সূক্ষ্মতারই পরিচয় দিয়েছিলেন তাঁরা, প্রকৃতির অতি লঘু পা-ফেলাটি, অতিশয় হালকাকোমল, স্বপ্নে মেশা ভাবনার মতো পলাতক—সেটিকে তাঁরা আশে-পাশের স্পষ্টতর অনুভূতির মধ্যে মিশিয়ে দেননি, তাকেও আলাদা ক'রে চিহ্নিত করেছেন। এতদিনে মেনে নিলুম হেমন্তকে, শুধু তথ্য ব'লে নয়, অভিজ্ঞতা ব'লে, বাধ্য হ'য়ে নয়, প্রাণের টানে, সভয়ে নয়, সানন্দে। দেখতে পেলুম সে উপস্থিত, শুধু তা-ই নয়, সে সুন্দর; চোখে পড়লো তার সত্যকার রূপ। বয়স বাড়ার প্রধান দুঃখ এই যে, আমাদের উপভোগের পরিসর অনেক কমে আসে; সিনেমা ভালো লাগে না, শরৎচন্দ্রের গল্প আর ভালো লাগে না, সামাজিক বিনিময়ের যেটা প্রধান উপাদান সেই পরচর্চাও আর ভালো লাগে না তেমন; কিন্তু এত সব লোকশানের ফাঁকে-ফাঁকে আয়ের ঘরেও অঙ্কপাত হয় কিছু-কিছু এমন বইয়ে ডুব দিয়ে উঠি আগে যার ধারেও ঘেঁষিনি, পুরোনো পড়ায় গভীরতর অর্থ পাই, অনুভূতির স্বরগ্রামে কোনো-কোনো সূক্ষ্ম শ্রুতি বেজে ওঠে, কৌতূহলের নতুন এক-একটি পাতা, পথের ধারে জীর্ণ পুকুরে শালুক ফুলের পাপড়ির মতো, সলজ্জভাবে খুলে যায়। আর এটাও কিছু কম কথা নয় যে হেমন্তকে উপার্জন করলুম এই সময়ে, চল্লিশের কুখ্যাত রেখা পেরিয়ে এসে এই কৃশ, নম্র, করুণ ঋতুকে ভালোবাসতে শিখলুম।

পশ্চিমি সাহিত্যে খ্যাতি আছে এই ঋতুর। আমাদের সাহিত্যে যেমন বর্ষার পরেই শরতের, পশ্চিমে তেমনি বসন্তের পরেই হেমন্তের গান। ভেবে-চিন্তেই শরৎ না ব'লে হেমন্ত বললুম, কেননা ইংরেজরা যাকে বলে অটাম, আর ফরাশিরা আদর ক'রে ডাকে লতন, সেই রিক্তপত্র পাটলবর্ণ সময়ের কোনো প্রতিচিত্র আমাদের দেশে মনেই আসে না, যতদিন না সন্ধ্যালগ্ন কান্নার মতো ছল-ছল ক'রে ওঠে। শরৎঃ তার মানেই উজ্জ্বলতা, আনন্দ; পুরাকালে ছিলো রাজাদের দিগ্বিজয়, এখন হয়েছে সর্ব-সাধারণের ছুটি, উৎসব, ভ্রমণ। হেমন্ত মানেই সেই বেদনা, সেই বিদায়ের ভঙ্গি, 'অটাম' কথাটি উচ্চারিত হ'লেই আমাদের কবিতা-পড়া মনের মধ্যে যা সঞ্চারিত হয়। অবশ্য অটামও এক নয়, দুই; এক হ'লো কীটস-এর অটাম, কুয়াশার আর পরিপক্ক সফলতার ঋতু, পূর্ণ, তৃপ্ত, তৃপ্তির আবেশে ঘুমিয়ে পড়া; আর অন্যটি রিলকের—যখন পাতা ঝরে, পাতা ঝরে, পৃথিবী ঝ'রে যায় অন্ধকারে, আমরাও ঝরে যাই। এ-দুটোকে মনে হ'তে পারে পরস্পরবিরোধী, কিন্তু আসলে তা নয়, একই অবস্থার দুই স্তর এ-দুটো, একই বস্তুর দু-দিক থেকে দেখতে পাওয়া ছবি। সফলতা, পূর্ণতা, পূর্ণ পরিণতি; তার পরেই অবক্ষয়, তার মানেই অবক্ষয়। যে ঋতুতে ফসল পাকে, ভাঁড়ার ঘর ভ'রে ওঠে পৃথিবীর, সেই ঋতুতেই সূর্য ঢ'লে পড়ে

দাক্ষিণ্যে, এগিয়ে আসে শীর্ণতা, রিক্ততা, শীত। এই ধ্বংসের দিকটা বাদ দিয়ে শুধু ঋদ্ধিকে দেখলে সম্পূর্ণ ক'রে দেখা হয় না। তাছাড়া আজকাল, যখন আমরা র্যাশনের পুষ্যি হ'য়ে বারো মাস ভ'রে নামগোত্রহীন কাঁকরান্ন আহার করছি, তখন হঠাৎ শস্যময়ী হেমন্তলক্ষ্মীর বন্দনা গাইতে বসলে একটু বিসদৃশ হ'য়ে পড়ে, প্রায় বেয়াদবির মতো শোনায়। গোলাভরা ধান, পথ চলতে আমন ধানের গন্ধ, এ-সব আমাদের অনেকের পক্ষেই স্মৃতিকথারও নয়, একেবারে ইতিবৃত্তের অন্তর্ভূত; ও-সব আছে পুঁথিপত্রে, মাসিক-পত্রের কলিতায়, সরকারি দলিলেও থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের জীবনে নেই। না, অন্নপূর্ণা কল্যাণীরূপে হেমন্তকে দেখতে পাইনি আমি, জীবনানন্দীয় আঘ্রাণে ভরা অবসরের নায়িকারূপেও না, আমি তাকে দেখতে পেয়েছি ম্লানায়মান, ক্ষয়িষ্ণু, বিষণ্ণ--কিন্তু সুন্দর, সেইজন্যই সুন্দর। ঐ বিষাদ--পরম প্রসাধন তার--তা-ই তো তাকে দিয়েছে তার গভীর চোখ, ভাবনার মতো নরম স্পর্শ, স্মৃতির মতো মধুর তার কন্ঠস্বর। তার শান্তির জন্য, সুমিতির জন্য, তার মৃত্যুকে মেনে-নেয়া ক্ষমাশীল হাসিটুকুর জন্য, আমি তাকে ভালোবাসলাম।

ব্যর্থ হয়নি এই প্রেম, বিনিময়ে আমাকে প্রচুর দিয়েছে হেমন্ত। হঠাৎ এক-একটি আশ্চর্য দিন, সারা বছরের সংক্ষিপ্তসার যেন, যখন একটি মাত্র দিনের মধ্যে সবগুলি ঋতুর স্বাদ পাওয়া যায়; সকালবেলাটা শরতের মতো আলোময়, দুপুরবেলায় অ্যাসফল্ট তেতে উঠলো, বিকেলে হঠাৎ-মোড়-ফেরা উত্তুরে হাওয়া ব'য়ে গেলো ঠিক যেন চৈত্র মাসের দাক্ষিণ্য বিলিয়ে, তারপর সূর্যাস্তের সময় কালো মেঘের পরদা টেনে ঝমঝম বৃষ্টি নামলো, আর সেই মেঘ সেই কেটে গেলো, বেরিয়ে এলো শীতের মতো চকচকে তারা। এ-রকম চুম্বক-দিন বসন্তকালেও মাঝে-মাঝে পাওয়া যায়; সকালে কুয়াশা, দুপুরে গরম, বিকেলে বৃষ্টি, রাত্তিরে লেপ--এ সব কারসাজি ফাল্গুন মাসেরও জানা আছে। কিন্তু এ-দুয়ে তফাৎ এই যে বসন্ত বড়ো অস্থির, প্রগল্‌ভ, তার কুটিল চাল বাইরের দিকে বিক্ষিপ্ত করে আমাদের, আর কার্তিকের এই এলোমেলো দিনগুলোতেও সংহতির ইঙ্গিত আছে। অন্তর্মুখী এই ঋতু, সে আমাদের দিগ্বিদিকে খেপিয়ে বেড়ায় না, আমাদের মনটাকে বেলুনের মতো ফাঁপিয়ে দেয় না আকাশের দিকে, টুকরো ক'রে ছিটিয়ে দেয় না মুকুলের অপব্যয়ে, ফুল ফোটানোর অমিতচারিতায়। তার ভূমিকাস্বরূপ দুটো-চারটে বৃষ্টি-পড়া হাওয়ায় ওড়া দিন যখন ফুরিয়ে যায়, আর তারপর একের পর এক পরিচ্ছন্ন নিরুদ্বেল দিন নেমে আসে, তখন আমাদের মন চায়--যাকে লোকে বলে আমোদ-প্রমোদ কিন্তু আসলে যা বিক্ষেপ মাত্র, বিক্ষোভ মাত্র, সেই সব বিশৃঙ্খল বৈচিত্র্যপ্রয়াস ফেলে দিয়ে নিজেরই মধ্যে কেন্দ্র পেতে চায় আমাদের মন। তখন আপনি--যদি আপনার মন তেমন স্পর্শশীল হয়, আর কাজের ফাঁকে একটুখানি চুপ ক'রে থাকার অনুমতি দেন নিজেকে--আপনি বুঝবেন যে হেমন্ত ঋতুর বিশেষ রসটুকু এইখানে যে সে আমাদের ঘরে ডাকে, ঘরে ফেরায়, আত্মস্থ হবার পরামর্শ দেয়, ঘটিয়ে দেয় নিজের সঙ্গে নিজের পরিচয়। পাছে কুয়াশায় কেউ পথ হারায়, তাই যেমন আকাশ-প্রদীপে বাড়ি ফেরার সংকেত, তেমনি বাইরে যখন আলো ক'মে আসে, তখনই সময় গৃহ-দীপটিকে উজ্জ্বলতর ক'রে তোলার, আমাদের সন্ধেবেলার মাটির প্রদীপ, ভালো-বাসার চোখের প্রদীপ, চিন্তাশীল মনের প্রদীপ--যে-আলোয় এই মস্ত বড়ো সংসারে সবচেয়ে কাছের যে-ক'টি মানুষ তারা আরো কাছাকাছি হবে, যে-আলোয় এই মস্ত বড়ো জগৎটাতে খুঁজে খুঁজে আমরা বেছে নিতে পারবো ঠিক যেটুকুতে আমাদের প্রয়োজন, যেটুকু না-হ'লে আমরা বাঁচি না, যেটুকু হ'লে সত্যি-সত্যি বাঁচি আমরা। এই তো এই ক্ষীয়মাণ ঋতুর উপঢৌকন, এই বেছে নেবার, গুছিয়ে নেবার প্রেরণা--কেননা অবক্ষয় মানে ধ্বংসের সূচনা নয় শুধু, সেটাই আবার উপলব্ধিরও সময়। বছরের, জীবনের, সভ্যতার অবক্ষয়ঃ তখন অনবরত কিছু করার জন্য ছটফটানি আর থাকে না, কী করছি, কী করেছি, কী পেয়েছি এতদিন ধ'রে, তার মূল্য বিচারের সময় আসে, খোশা থেকে শস্যটুকু ছাড়িয়ে নিয়ে ঘরে তোলার সময় আসে। ঐ শস্য কতটুকু আমাদের জীবনে? কত কিছু করি আমরা, কত চেষ্টা, কত যুদ্ধ, কত আস্ফালন, পলায়ন--আর মনে-মনে কতই না হিশেবপত্র, কতবার আশার মিনার গ'ড়ে তুলি, উদ্যমের জোরে ফুলে উঠি হাওয়ার মুখে পালের মতো, আবার হঠাৎ ঘর-মোছা ন্যাতার মতো এলিয়ে পড়ি--কত সব পরাজয়ের ফাঁকে-ফাঁকে মাঝে-মাঝে জিতেও যাই কত বার--আপাতদৃষ্টিতে জিতে যাই--শেষ পর্যন্ত কতটুকু থাকে তার? তা যদি জানতে চান তাহ'লে আজ হেমন্তের কাছে আত্মসমর্পণ করুন; যে-ঘরে একটুখানি আলো বাইরের অনেক অন্ধকারের সঙ্গে যুদ্ধ করছে, সেই ঘরের একটি কোণে লীন ক'রে দিন নিজেকে, ছড়িয়ে দিন ঐ চোখের তলায় যা-কিছু আছে আপনার, তারপর একমনে চেয়ে-চেয়ে দেখুন--যতক্ষণ না সব ফেনা কেটে গিয়ে, সব ময়লা ম'রে গিয়ে এক চামচে তরল স্ফটিকের মতো ছলছল ক'রে ওঠে আপনার জীবন। তখন দেখবেন, আপনার জীবনের পরম সঞ্চয়--আপনার বালিগঞ্জের বড়ো বাড়ি না, ব্যাঙ্কের মস্ত মোটা বইটি না, রেফিউজী ব'লে নাম লিখিয়ে পাওয়া দুশো বিঘে চাষের জমিও না, কিংবা এই যে আপনার নাম রোজ বড়ো হরফে খবর-কাগজে বেরোচ্ছে, সেটাও না;--দেখবেন যে আপনার কিছুই নেই, যদি কখনো ভালোবেসে থাকেন, সত্যি যদি কিছু ভালোবেসে থাকেন জীবনে, সেটুকু ছাড়া আর-কিছুই নেই আপনার। শেষ পর্যন্ত ঐটুকুই থাকে আমাদের, অন্য সব ঝ'রে যায়।
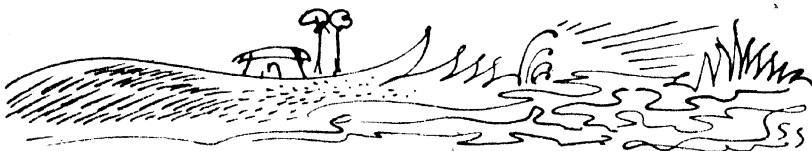
ঠাকুর প্রণাম

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

দিয়েছিলাম সবই তোমায় রাণী,
ছিল কেবল একটুখানি
মনের মণিকোঠায় জমা বহুকালের ধন।
সারাদিনের সারা রাতের মাঝে কিছুক্ষণ
কেড়ে নিতাম হট্টগোলের মাঝে,
এ সংসারের পাওনা দেনা মিটিয়ে দিবার কাজে
শ্রান্ত যখন অশান্ত এ প্রাণ
ঠাকুরঘরে বসব ধ্যানে ছিল না মোর এমন অভিমান,
দূর থেকে তাই ঠাকুর প্রণাম
পাঠিয়ে দিতাম
ঊর্ধ্বলোকে মহাশূন্যপানে
বাহির হ'তে ফিরিয়ে আঁখি অদৃশ্য সন্ধানে;
তাকিয়ে দেখি শূন্য মণি-কোঠা
ছড়িয়ে আছে অনেক কুঁড়ি—কেও ফুটেছে—
হয়নি কারো ফোটা;
কুড়িয়ে নিলাম আধফোটা ফুল, নিলাম আঁজল ভ'রে
ঠাকুর প্রণাম করতে যাব,—পড়ল সে ফুল ঝ'রে
তোমার হাতে, তোমার দু'টি রাঙা কমল হাতে।
সে কি সুখের বেদনাতে
দুই নয়নে অশ্রু আমার ঝরে;—
ঠাকুর-প্রণাম রেখে দিলাম ঠাকুরঘরে।
সেথায় দেখি পূজারিণী চিরকালের আমার
প্রিয়তমা,
আমার প্রেমে বহ্নিময়ী, অনুরাগে নিত্য নিরুপমা।
সন্ধ্যারতির প্রদীপ জ্বালি ঘুচিয়ে দিয়ে
অন্ধকারের কালো,
আমার মনের রঙে রঙে
রাঙিয়ে দিলাম ঠাকুরঘরের আলো।

আপিস শেষের পথটুকু

রূপদর্শী

ডালহৌসি। আকাশ ছোঁয়া ইমারত, সহস্র দ্রুতগতি যান আর অজস্র লোক। ডালহৌসি অঞ্চলের আপিস-দিনের দশটা পাঁচটার চেহারা এই।

গতি, শুধু গতি। ছোটা, শুধু ছোটা। শুধু ব্যস্ততা, শুধু ব্যস্ততা। ঘড়ির কাঁটা
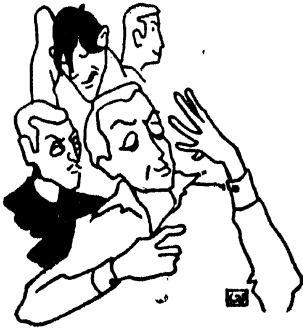
লোকগুলোকে ধীরে সুস্থে হাঁটায়। ঘড়ির কাঁটাই লোকগুলিকে ঘোড়দৌড় করায়। ট্রামে বাসে ঝুলতে ঝুলতে ডালহৌসিতে এসে নামে। সচকিত চোখ পড়ে হয় কোনো ঘড়ি কোম্পানীর বাড়ীর মাথায়, নয়ত জি পি ওর ঘড়ি-গম্বুজে। সর্বনাশ! পাঁচ মিনিট লেট! কি সর্বনাশ! ছোট ছোট। হাজরে খাতাটা এখনো হয়ত পাওয়া যেতে পারে, এখনো হয়ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ঘরে চলে যায়নি। কড়া রৌদ্রে ওদের চাঁদি তেতে ওঠে, দর-বিগলিত ঘর্ম ভুরুর নিষেধ এড়িয়ে চোখে ঢুকে খোঁচা মারে। চোখে সর্ষে ফুল দেখার কথা কিন্তু ওরা দেখে বড়বাবুর রক্তচক্ষু।

দ্রুত ব্যস্ততায় ধাবমান এই মনুষ্যযন্ত্র-গুলো এখন আর কারো বাবা নয়, ভাই নয়, ছেলে নয়, স্বামী নয়, স্ত্রী নয়, বোন নয়। এখন এই সময়টুকু, অপিস দিনের দশটা থেকে পাঁচটাটুকু তাদের মাত্র একটিই পরিচয়, তারা কেরাণী।

ঘরে ঢুকে হাজরে খাতায় একটি করে টিক্, হাজির হয়েছি তার প্রমাণ, সময় মত দিতে পারলেই ব্যস্ নিশ্চিন্ত! এবারে একটা চেয়ার বাগিয়ে বস। এজমালি বিজলী পাখার হাওয়া খাও। সদ্য খেয়ে ছুটে আসায় পেটে অজীর্ণতার যে ব্যথাটুকু চাগিয়ে উঠেছে, পেট চেপে ধরে তার উপসম কর। তাড়াতাড়িতে পেটপুরে খেয়ে আসতে পারনি, বেয়ারাকে বল জল আনতে, জল আনলে গলায় ঢক ঢক ঢেলে খালি পেট পুরো করো।

তারপর শুরু কর দিনের কাজ, বাঁধা সড়কে চলা। ঘাড় গুঁজে খস খস কলম চালাও। লেজারের পাতা ওলটাও। ফাইলের ধুলো ঝাড়। ডিক্টেশন নাও মনিবের। খট্ খট্ টাইপ করো। চিঠিপত্রের জবাব তৈরী করে বড়সাহেবের দস্তখত নাও।

সেই দুপুরে একটি ফোঁটা অবসর। লাঞ্চ টাইম। যাও এবার মুখে কিছু দিয়ে এস। লাঞ্চ না হাতি, এক কাপ চা, একটি দুটি সস্তা বিস্কুট, আর গোটা দুই বিড়ি। এই হল আপিস পাড়ার চর্বচোষ্যলেহ্যপেয়ের সাধারণ নমুনা। পকেটের তাকতের উপর টিফিনের তারতম্য কিছু হয়, অবিশ্যি। তারপর এক সময় এক কাপ চায়ের মত এই স্বল্প অবকাশটুকু শেষ হয়। আবার যাও, বস গিয়ে যার যার চেয়ারে, ঘাড় গুঁজে কাজ কর।

তারপর পাঁচটা। ছুটি। মুক্তি। যে ঘড়ি দুই সাঁড়াশি-কাঁটা দিয়ে এতক্ষণ গলা টিপে ধরেছিল, সমস্ত দিনের মতো রক্ত চোষা শেষ করে আলগা করে দিয়েছে তার দাঁড়া। ছাড়া পেয়ে পিল পিল বেরিয়ে এসেছে মানুষের পাল। এখন আর তত ব্যস্ততা নেই, তত উদ্বেগ নেই, আছে শুধু সীমাহীন অবসন্নতা, শুধু নির্জীবতা।

বাড়ী ফেরায় কারো তাড়া আছে, নতুন বিয়ে, বৌ চেয়েছে ছটার শোতে সিনেমা দেখতে। তাই এত তাড়া। ভিড়ভর্তি ট্রামটায় তারা আরো ভিড় বাড়ায়। কি কার বাড়ীতে সংকটাপন্ন রোগী, কি কার টিউশানি, তারাই বা দেরী করে কি করে ট্রামের ভেতর তাই ঠাসাঠাসি। আর শুরু হয় গালগল্প।

আরে মল্লিক, আমাদের সেক্শনে আজ যা কান্ড হয়েছে, তা আর কি বলব? হাসতে হাসতে মরি। বাঁড়ুজ্জে আজ 'লেট'। খাতায় পাশে কারণ লিখলে স্ত্রীর অসুখ। তারপর পর পর যারাই 'লেটে' এসেছে কারণের ঘরে 'ডু' বসিয়ে গেছে। কে আর ভাল করে দ্যাখে, আবার নতুন করে কে লেখে। মিসেস্ বিশ্বাস, মিস্ চক্রবর্তী ওরাও লেট। ওরাও 'স্ত্রীর অসুখে'র নিচে 'ডিটো' দিয়ে গেছে। আর যাবে কোথায়? খাতাখানা দেখেই তো সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বুড়োর মেজাজ একেবারে চড়াক-চাই। লেট্ওয়ালাদের সব ডাকালে। তারপর খাতা দেখিয়ে সব্বাইকে একচোট
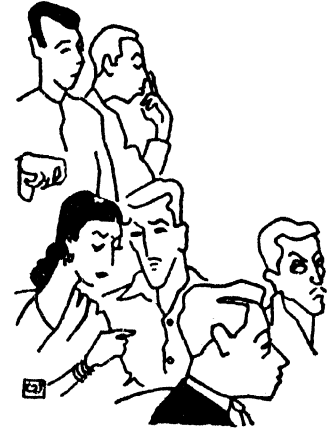
নিলে। বলি পেয়েছেন কি আপনারা শুনি, একই দিনে সবারই স্ত্রীর অসুখ করে গেল? বলি যুক্তি করে নাকি? মিসেস্ বিশ্বাস, মিস্ চক্রবর্তী আপনাদের স্ত্রীরও অসুখ? বলি বাড়াবাড়ি নয় তো? ও! সে যা সিন্ একখানা, একেবারে সিন্‌সিনাকি বুবলা বু। তারপর সেক্শনকে সেকশন্ মিস্ চক্রবর্তীর পেছনে লাগল। একজন একজন যায় আর জিগ্যেস করে, মিস্ চক্রবর্তী, ভাল ডাক্তার দেখাচ্ছেন তো, স্ত্রীর অসুখকে 'নেগলেক্ট' করবেন না। বলেন তো সুবোধ মিত্তিরকে ভিয়েনা থেকে ডেকে পাঠাই। ইনি আপনার প্রথম স্ত্রী? মিস্ চক্রবর্তীর দফা গয়া হয়ে আছে।

জানেন দত্তদা, আমাদের সুরমা কাজ ছেড়ে দিয়েছে।

বলিস কি? তোদের সেকশন যে কানা হয়ে পড়বে, তাহলে।

হ্যাঁ, দাদা, কাজেকর্মে আর মন নেই কারো। ওই তো ছিল 'ইনস্পিরেশন্'।

আমাদের আর কি, দুটো একটা কথা কইতো, দু এক খিলি পান চেয়ে খেত, ব্যস্, ওই আমাদের স্বর্গ প্রাপ্তি। তা এমন কপাল দাদা, তাও সইলে না। কি চেহারা! কি ব্রাইট! কিছুই তো করতে হত না, করতও না, ওর কাজ যা কিছু আমরাই তো করে দিতাম। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অবদি ওর কাজ করে দিয়েছে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তো মুষড়ে পড়েছে। পড়বে না, সুরমা আসার পর থেকে কামাই নেই কারো, লেট্ নেই। চেয়ার ছেড়ে নড়ত না পর্যন্ত কেউ, কি কাজের ঘটা।

হ্যাঁরে, তা এত সুখ ছাড়লে কেন মেয়েটা?

না ছেড়ে করবে কি বল? ওই যতেটা, ওই যে 'লিভ্ সেকশনের' হোৎকাটা, ওই ব্যাটা-চ্ছেলেই তো গোলমালটা বাধালে। হাইকোর্ট থেকে একটা ছেলে আসত, দেখেছিলেন, সুরমাকে যে পেণছে দিয়ে যেত, ওর ব্যাগ্ ওয়াটারপ্রুফ বইতো, একসঙ্গে টিপিন খেতে যেত, সেই ছেলেটাকে যতে একদিন আচ্ছা ধোলাই দিলে। বললে, হাইকোর্টের ছেলে হয়ে নজর দিচ্ছ এ জির মেয়ের উপর। ফের যদি এদিকে ঘুরঘুর করতে দেখি তো খুপড়ি খুলে নেব। তারপরেই যতের সঙ্গে সুরমার ভাব হয়ে গেল। ভাব থেকে লাভ্। লাভ্ থেকে বিয়ে। দশজনের আনন্দ এক-জনেই বাগিয়ে নিলে। এদেশে এখনো 'ইণ্ডিভিজুয়ালিম', 'পাবলিক্ সেন্স গ্রোই' করেনি, বুঝলেন।

আরে সন্তোষ যে। একা? কাউণ্টার-পার্টটি কই।

কে অরুণ? সেটাকে তালাক দিয়েছি। ঝুট কটিয়ে দিলুম। আরে ভাই সেদিন ওই যে লেখাটা ওকে পড়ালুম না, ব্যস্ তারপর থেকেই শালাকে কাট্ দিয়েছি। অত বড় এক্সপেরিমেণ্টটা ধরতেই পারলে না। সেরেফ বলে কেরাণীর বাচ্চা হয়ে যে কবিতা লেখে সে নিউরোটিক। হারামী নাম্বার ওয়ান।

কিন্তু ও নিজে লেখে যে। বইও ছেপেছে। দূরের আকাশ। আ! কি সব কবিতা ভাই। সুপার্ব। বুক সিন্ সিন্ করতে থাকে।

রেখে দাও রেখে দাও তোমার নাইডু। মাস্তাক এখনো মাস্তাক। ওর জুড়ি আর ন ভূত ন ভবিষ্যতি।

কলকাতায় তো আর থাকা চলে না। কফি কিনতে গেলুম বাজারে, তা ছটাকি একটা কফি দাম চাইলে পাঁচ সিকে।

টিকিট?

আছে। কই?

মান্থলি।

দেখি।
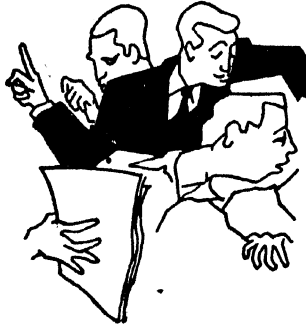
তুমি কি ধরণের উল্লুক হে। ভদ্রলোকের কথায় বিশবাস নেই।

খামাখা গাল দিচ্ছেন কেন মশাই। ওর ডিউটি ওকে করতে হবে না? টিকিট দেখালে কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।

ওই যাঃ, মান্থলীটা কি হল? দেখি মিত্তির পাঁচটা পয়সা। নাও হ'ল তো? যেন ফাঁকি দিয়েই চলে যাচ্ছিলাম। আমরা তেমন লোক নই, হ্যাঃ।

একী, মেয়েছেলেদের কাপড় ধরে টান দিচ্ছেন কেন? আস্পর্দা তো কম নয়।

ভেরি স্যরি, দৈবাৎ হাত লেগে গিয়েছে।

ইয়ার্কি করার জায়গা পান না। দৈবাৎ লেগে গিয়েছে? লায়ার কোথাকার। এই নিয়ে পাঁচবার টান দিয়েছেন। বুড়ো হয়েছেন, কিছু বললাম না। ছি ছি।

বা দাদু বেশ। সিঙকং সিঙকং বেশ চলছে। আঁ। দিন দুঘা কষিয়ে।

আরে ভাই বিপদ তো এই বুড়োদের নিয়েই। শরীরের তেজ কমেছে, তাই মেয়ে-দের পাশে দাঁড়িয়ে, গন্ধ শুঁকে, আঁচল টেনেই সাধ মেটায়। এতো 'কমন্ সাইকোলজি'।

তারপর তোমার ছেলেটার খবর কি?

মারা গেছে।

সে কী কবে? কি হয়েছিল?

সেপ্টিক। ডাক্তার পেনিসিলিন দিতে বললে। পঁচিশ লাখ পেনিসিলিন দেওয়া হল। কিছু হল না। পরে জানা গেল ওষুধ-গুলো জাল।

চ্চুক্ চ্চুক্। কি বলব ভাই দুনিয়াটার হল কি? নীতিজ্ঞান কি একেবারে লোপ হয়ে গেল। এদের ধরে ধরে ফাঁসিতে ঝোলানো উচিত। জীবন নিয়েও ব্যবসা!

হ্যাস্‌শালা।

কি হল রে? দীর্ঘশ্বাস ফেলছিস কেন?

চাকরী আর থাকবে না। তিনদিন ধরে হিসেব মেলাতে পাচ্ছিনে। শালা কোত্থেকে ছ'টা পাই যে বেশী হচ্ছে, একেবারে মাথা খারাপ হয়ে যাবার যোগাড়। চাকরী তো যাবেই, বৌটাও হাত ছাড়া হয়ে গেল বোধ হয়।

সে আবার কি?

বালিস কেন ভাই। ছ পাই-এর ঠেলায় অস্থির, রাতে ঘুম নেই। এদিকে একাউণ্ট বুঝিয়ে দেবার তাড়া, তার উপর বউ-এর ঘ্যানঘ্যানি। চাল নেই, কয়লা নেই। বাচ্চার ফুড নেই। এনে দাও। যেন ইচ্ছে করেই আমি ওসব সরিয়ে রেখেছি। এই নিয়ে কথার থেকে কথান্তর। আর কি বউ গেছেন বাপের বাড়ী। আমিও দিব্যি দিয়ে দিয়েছি, আমি মরবার আগে যেন আমার বাড়ীতে না ঢোকে। সেই ইস্তক মনটা খারাপ। শালার অপিসে গিয়েছিলাম। দেখা পেলাম না। মনটা বড্ড খারাপ হয়ে গেছে। মানে বউটা আবার বড্ড সেণ্টিমেণ্টাল কিনা, তাই ভাবনা। ধুশ্‌, শালার সংসারে আর থাকব না। যেখানে সিম্‌প্যাথি নেই, সেখানে আর কি সুখে থাকা!

আরে নন্দদা যে, ওদিকে গুটিশুটি হয়ে বসে আছেন যে। কি ব্যাপার অফিসেও যান না দেখি।

এই ইয়ে, তোমার বউদির আবার—

কেন কি হয়েছে বউদির?

মেয়ে।

মেয়ে? এবারেও মেয়ে। আগের বছর যেন কি হ'ল?

মেয়ে।

ও, তা তার আগে?

মেয়ে।

তার আগে।

মেয়ে।

ও বাব্বা, বউদি দেখছি মেয়ে কলেজের বাস একখানা।

তাহলে বিয়েটা তুই করলিনে শেষ পর্যন্ত।

নাঃ।

তাহলে মেয়েটাকে নাচালি কেন শুধু শুধু।

সেটা ভুল। নাচাইনি তো, ঠিক করে ছিলাম বিয়ে করব। মেয়েটাকে স্পষ্ট করে বলিনি কিছু। বাবা মা খৃস্টান মেয়ের সঙ্গে বিয়েতে মত করবেন না। মাতো শুনে অবধি কান্নাকাটি লাগিয়েছে। ভাই বোন এদেরও যে খুব মত তাও নয়। তবু এ রিস্‌ক্‌ নিতে রাজী ছিলাম।

তা আবার মত বদলালি কেন?

ফ্ল্যাটের জন্য।

ফ্ল্যাটের জন্য?

হ্যাঁ। তুই তো দেখিস্‌নি, লেকের কাছে কি লাব্‌লি এক ফ্ল্যাটে সে থাকে। এই গৃহ-সংকটের দিনে অমন ফ্ল্যাট যে কোনো রিস্কেই নেয়া যায়। আর এতো সামান্য বিয়ে। সেইজনাই বিয়ে করব ভেবেছিলাম। এমন কি, বাপ মা ভাই—এদের অমতেও। যেদিন মতটা ওকে জানাব ভেবেছিলাম সেই দিনই লাঞ্চ টাইমে ওর সঙ্গে দেখা। হন্তদন্ত হয়ে

আমার অ্যাপিসে এসে হাজির। বলে, একটা ঘর খুঁজে দিন আমাকে। কার জন্যে? বললে, কার জন্যে আবার, আমার জন্যে। বললাম, কেন আপনার ফ্ল্যাট কি হল? এক গাল হেসে বললে, ওটা তো আমার নয়। আমার এক বন্ধুর দাদার। বিলেত যাবার সময় আমার জিম্মায় রেখে গিয়েছিলেন। আজ বোম্বে থেকে তার করেছেন, সস্ত্রীক কলকাতা পৌঁছাচ্ছেন। এখন কি করি বলুন তো? আর তো ওখানে থাকা চলবে না। বোঝ ব্যাপার। তাই কেটে পড়লুম। কেরাণীর কপালে আবার ফ্ল্যাট তাও আবার পুব দক্ষিণ খোলা। বামন হয়ে চাঁদে হাত, হুঃ।

ট্রাম এসে অবশেষে টার্মিনাশে থামল। বড় জোর ঘণ্টা খানেকের জার্নি। এই একটু সময়, অপিস পরের পথটুকু, এই পঁয়তাল্লিশ মিনিট কি এক ঘণ্টা সময়—এই সময়টুকুই এদের অবসর। ভাবনার জোয়াল থেকে মনকে একটু মুক্তি দেওয়া যায়। কেরাণীর পোষাকটি ছেড়ে মানুষের পরিচ্ছদে আত্ম-প্রকাশ করা যায়। তারপর আবার যে কে সেই।

প্রবীণ

দিবাকর সেন রায়

ও কোণের জানালাটি কভু খুলে দিয়ে,
আকাশের রঙ কিছু মনে মেখে নিয়ে—
বৈশাখী বিকেলের গুমোটের মাঝে
রেডিওতে কোনদিন পুরবীতে বাঁশী যদি বাজে,
তখনতো মনে হবে আমি বুঝি একা—
তখনো কি আকাশের রঙ যাবে দেখা?
তারপরে এলোমেলো বোশেখের ঝড়ে—
গাছগুলো যবে সব উড়ে যেতে চাবে,
যে পাখীরা ডানা মেলে যেতে চাবে ঘরে—
তারা কি তখন আর ঘর খুঁজে পাবে?
বিগত দিনের কথা মনে হবে পাখীদের দেখে—
উড়েছি আমিও ওই আকাশের রঙ মনে মেখে,
তারপরে ঝড়ে পড়ে ফিরে এসে বসেছি কুলায়—
এখন জানালা দিয়ে আকাশের নীল রঙ বেশ দেখা যায়।

বিপত্নীক হয়ে বটুকেশ্বর ভয়ানক বিপদে পড়েছেন। বটুকেশ্বর ব্যানার্জি। পার্কার এণ্ড পার্কার কোম্পানীর বড়বাবু।

অর্থাভাব নেই। স্বাস্থ্যও ভাল। কিন্তু তিনদিনের জ্বরে পটল তুলে সুশীলা তাঁর জীবনকে পচা কুমড়োর মত ভুস্‌ভুসে ক'রে রেখে গেছে।

দুইটি সন্তান।

পুত্র বাবলার বয়স বারো। কন্যা টেঁপী। ন বছরে পা দিয়েছে। কি দশও হ'তে পারে। সুশীলার মত সব তারিখ মাস বার মুখস্থ রেখে বটুকেশ্বর ছেলেমেয়ের বয়স বলতে পারেন না।

ছেলে ও মেয়ের সম্পর্কে বটুকেশ্বর যে অনেক কিছুই জানেন না ও করতে পারেন না সুশীলার মৃত্যুর পর এই একটা মাসেই তিনি হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন।

কী ভীষণ ব্যাপার, কী সাংঘাতিক মেহেনত করতে হয় বাচ্চাদের মন জুগিয়ে চলতে!

কি, ওদের স্নানাহারের তদারক করতে গিয়ে কম সে কম দশ দিন তিনি অফিসে লেট্ হাজিরা হয়েছেন। অবশ্য এই মাসটা তাঁর এভাবে যাবে সাহেবকে বলে রেখেছেন। প্রায় পঞ্চাশে এসে মা-হারা দু'টি নাবালক নিয়ে বড়বাবুর অবস্থা কাহিল, অফিসের সাহেব থেকে আরম্ভ ক'রে আর্দালিটাও জানে।

কিন্তু অফিস লেট্ করিয়েই তো বাব্‌লা টেঁপী থামছে না, বটুকেশ্বরের খাওয়া কমিয়ে দিয়েছে, ঘুম কেড়ে নিয়েছে।

সুশীলার অবর্তমানে ওরা যে কি চাইছে না আর কি চাইছে, বটুকেশ্বর তা-ই ঠিক করতে পারছেন না।

টেঁপী তবু মায়ের জাত, ধৈর্য রাখে। কিন্তু বাব্‌লা! উঃ সে আর বলার নয়।

মা মরার পর সাতদিন সে বাবার কোল থেকে নামেনি। কোলে ব'সে খাওয়া, কোলেই ঘুম।

তারপর কোল ছাড়ল কিন্তু বটুকেশ্বরকে মুক্তি দিলে না। একজন মানুষ দু'জনের আদর দিতে গিয়ে বটুকেশ্বর দিন দশ বারো খুব বেশি নরম হয়েছিলেন। এবং তার ষোল আনা সুযোগ নিয়েছে বাব্‌লা। এটা ওটার বায়না ক'রে সে বটুকেশ্বরের এত টাকা দামের হাতঘড়ি নষ্ট ক'রেছে, পেন্-এর নিব্ ভেঙেছে, সেদিন এক পাটি জুতো ছুঁড়ে ফেলেছে কোথায়।

তারপর বটুকেশ্বর যেই চোখ রাঙাতে গেলেন অশান্তি বাড়ল চতুর্গুণ।

ধমকাতে গেলেই বাব্‌লা দেয়ালে মাথা ঠুকে 'মা' 'মা-গো' ক'রে কাঁদছে। আর দাদার সেই অবস্থা দেখে টেঁপী মনের দুঃখে রান্নাঘরে বাথরুমে কি পিছনের বারান্দায় একলা চুপ-চাপ ব'সে অধোবদন হয়ে অশ্রুবর্ষণ করছে। মাকে মনে পড়েছে, কি বাব্‌লার বাড়াবাড়িতে বাপের দুঃখ বুঝে কন্যার এই নীরব অশ্রুবর্ষণ বুঝতে না পেরে বটুকেশ্বর আরো বিব্রত হ'য়ে পড়েন।

দিন যদি বা কাটে, রাত কাটে না।

টেঁপীর দিকে মুখ রেখে বটুকেশ্বর পাশ ফিরেছেন তো তাঁর পিঠের ওপর কিল আঁচড় আরম্ভ হ'ল, কি ঘাড়ে কামড় বসিয়ে দিলে ক্রুদ্ধ বাব্‌লা। বাব্‌লাকে বুকে জড়িয়ে শুয়েছেন তো কোন্ ফাঁকে বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে টেঁপী ঠাণ্ডা মেঝের ওপর হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে হু'সহাস কাঁদতে শুরু করল। তখন আর কি করেন বটুকেশ্বর-বাবু। চিৎ হয়ে শুয়ে দু'জনের মাথায় দুই হাত রেখে বাকি রাতটা জেগে কাটান।

কিন্তু এভাবে ক'দিন কাটে, ক' রাত জাগা যায়!

ইদানীং, শুধু ওদের দেখাশোনা করার জন্য একটা চাকর রেখেছিলেন বটুকেশ্বর। স্নান করানো, জামা কাপড় পরানো, ঘুম পাড়ানো, কি বেড়াতে নিয়ে যাওয়া নিয়ে তিনি ক'দিনে খুব ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছেন।

এক মাসে বটুকেশ্বর লেট্-হাজিরা হ'লেন এগারো দিন আর অফিস কামাই হ'ল তাঁর সাতদিন।

হা-রে চাকর! পুরো একটা দিন ভোলা এ বাড়িতে থাকতে পারল না। বেচারাকে কিল কামড় আঁচড় লাথি থুৎথু। কোনো পুরস্কার দিতেই বাবলু কসুর করল না, বটুকেশ্বর লক্ষ্য করলেন, চাকরকে অভিনন্দন করার ব্যাপারে দাদাকে টেঁপীও বেশ সাহায্য করল। সন্ধ্যার আগেই ভোলানাথ তার টিনের বাক্স ও কম্বলে জড়ানো বিছানাটি বগলে তুলে কেটে পড়ল। বটুকেশ্বরবাবু মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়লেন। কি করেন, কি করা যায়!

বাগবাজারের এড্‌ভোকেট বিনোদবিহারী বটুকেশ্বরের বিশেষ অন্তরঙ্গ। বিনোদবাবু সৎপরামর্শ দিলেন। মাথা নেড়ে বটুকেশ্বর বললেন, 'বুঝেছি। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে বাবলা ও টেঁপী এখন সুখে থাকলেও একদিন ওদের দুঃখ পেতে হবে, হবে নাকি?'

'ওসব পুরোনো আইডিয়া রেখে দাও। তা ছাড়া, সতেরো বছরের খুকি আনছো না তুমি ঘরে। মেয়েরা আজকাল অনেক বেশি উন্নত চরিত্রের হ'য়ে গেছে। পর আপন জ্ঞান না করাটাকেই বলে প্রগতি। আর এদিক দিয়ে দেখতে গেলে তোমারও স্বাস্থ্য ভাল। দুটো পয়সাও জমেছে হাতে।'

কিন্তু বটুকেশ্বরের এ প্রস্তাব মনঃপুত হ'ল না।

'না না ওটি ছাড়া আর কিভাবে শান্তি পাব বলো?'

বিনোদবিহারী বললেন, 'তবে ভালো ঝি রাখো একটি ঘরে। বিলিতি কথায় 'মিস্‌ট্রেস্', ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা করবে। ও কি পুরুষের কাজ হে মা-হারা দুটো শাবককে বড় করে তোলা?'

বটুকেশ্বর চুপ থেকে বন্ধুর মুখ দেখেন।

'ও কি পুরুষমানুষের কাজ মা-হারা দুটো অবুঝকে বড় ক'রে তোলা? তুমি পারবে কেন। চাকর রেখে করবে কি? আমি দেখছি তুমি তোমার হেলথ্ রুইন্‌ড্ করার মতলব করেছ।'

'তবে কি তুমি বলছ—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।' উকিল ভুরু পাকালো। 'আমি ভাবতেই পারছি না তুমি কি ক'রে ইয়ে না ক'রে সাহস পাচ্ছ এদের বড় ক'রে তুলতে?'

বটুকেশ্বর অসহায় চোখে বন্ধুর মুখের দিকে তাকাল।

'না হয় কোনো ভাল নার্সিং-হোমে এদের রেখে দাও?'

'তাই বা কি ক'রে পারি।' বটুকেশ্বর পকেট থেকে রুমাল বার ক'রে চোখ মোছার চেষ্টা করলেন। 'তা যদি পারতুম।'

'পারবে হে পারবে, একটু সময় লাগবে আর কি, ন' মাস ছ' মাস। ঐ গোড়াতে সবাই এসব বলে।'

বিমর্ষচিত্ত বটুকেশ্বর বন্ধুর গৃহ ত্যাগ করলেন।

সবে সন্ধ্যা। একটু নিশ্চিন্ত আজ তিনি এই জন্যে যে, ভোলানাথ যখন বাক্স বিছানা নিয়ে পালায় তখন রসা রোড থেকে বাচ্চাদের মাসীমা আজ হঠাৎ উপস্থিত ছিলেন এ বাড়িতে। তাই চাকর তাড়িয়ে দেবার পর বাচ্চাদের চোখ রাঙানো ও পরে বাবলার দেয়ালে মাথা ঠোকাঠুকি ও টেঁপীর অন্যত্র সরে গিয়ে চুপি চুপি কান্না আর হ'ল না। মাসীমা তক্ষুণি তাদের নিয়ে গেছেন বাইরে, রেস্টুরেণ্টে খাওয়াবে, পার্কে বেড়াবে ব'লে।'

সেই ফাঁকে বটুকেশ্বর বহুকাল পর সন্ধ্যাবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করছিলেন। বিপত্নীক হবার পর বটুকেশ্বর এক অফিস ছাড়া কোথাও আর বেরুতেই পারছেন না।

না, বটুকেশ্বর যে এত নরম সুশীলা মারা যাওয়ার আগে তা তিনি টের পান নি।

বন্ধুরা এভাবেই তাঁকে বোঝাবে সুশীলা বেঁচে থাকতে তিনি তা জানতেন যদিও, কিন্তু এখন সবটা ব্যাপার, সমস্ত চিত্রটাই যেন কেমন অদ্ভুত ঠেকছে। বাবলা নোখ দিয়ে আঁচড়ে বাবার বুকের রক্ত বার ক'রে দেখছে, রক্তে মার গন্ধ আছে কিনা, মার ভালবাসা নিজের রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে সন্তানকে আদর করছেন কি না বটুকেশ্বর। টেঁপীও সুযোগমত আড়ালে গিয়ে মাকে মনে প'ড়ে কাঁদছে, এই অবস্থায় হঠাৎ একজন মহিলাকে আনা। তিনিও বিব্রত হবেন বৈকি,—বিনোদবিহারী যেভাবেই বোঝাক।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় বটুকেশ্বর সেই সন্ধ্যায় একটা সিনেমা হাউসের সামনে ঘোরাঘুরি করলেন একটু সময়, ছেলেমানুষের মত এক আনার চিনেবাদাম কিনে চিবোন খানিকটা সময়।

সময় কাটানো নয় শুধু, নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে স্থিরচিত্ত হয়ে একটু ভেবে দেখা।

সুশীলা মরবার পর বিষয়টা নিয়ে এক দণ্ড ভাবতে বসার সময় পর্যন্ত দেয়নি এরা, টেঁপী ও বাবলা।

বটুকেশ্বর জনবহুল ফুটপাথ ছেড়ে একটু মাঠের মত জায়গায় গেলেন। হয়তো পার্ক।

একটা চেয়ারে বসে আরো কতকগুলো চিনাবাদাম চিবোবার পর তিনি সিগারেট ধরালেন।

বেশ ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছিল। আকাশে ঝকঝকে তারা।

সবুজ ঘাসে মোড়া একটা ঢিবির ওপর ব'সে চিনাবাদাম চিবোচ্ছিলেন আর একজন।

কিন্তু তিনি বটুকেশ্বরবাবুর মতন মনের সুখে খেতে পারছেন না। সঙ্গে সাত আট বছরের মেয়েটা ভয়ানক জ্বালাতন করছিল।

'আপনার কাছে আর আছে বাদাম? একটা বাদামওয়ালাকেও আর এখন দেখা যাচ্ছে না।'

অর্থাৎ বাদাম ফুরিয়ে যাওয়ার পরও কন্যাটি অবিরাম বাদাম বাদাম ক'রে মার মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ায় তিনি বটুকেশ্বরবাবুর সামনে এসে দাঁড়ালেন।

ত্রিশ অতিক্রান্তা। বটুকেশ্বর এক নজর দেখেই অনুমান করলেন। এটি সন্তান। মেয়ের মুখ দেখে বটুকেশ্বর বুঝতে পারেন। তারপর মহিলার মুখের দিকে তাকিয়ে লজ্জিত হয়ে হাসেন, 'না, আমিও যে সব শেষ করে ফেলেছি।'

এ কথার পর হঠাৎ মিতার কান্না থেমে গেল। মেয়ের নাম 'মিতা' বটুকেশ্বর মহিলার মুখে দু'বার শুনেছেন।

'তবেই দেখো, মিতা, সব ভাল লোক এক সময় না এক সময় বাদাম খেয়ে শেষ করেন। ইনিও করেছেন। কেবল তুমিই বাদামের শেষ দেখতে চাইছ না, সুতরাং তুমি পাপী, ঈশ্বর তোমাকে দুঃখ দেবেন।'

দুহিতা মার কথায় চোখ বড় ক'রে যেন কথাটা ভাবতে ভাবতে বটুকেশ্বরের মুখ দেখছিলেন।

শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি মনে মনে বটুকেশ্বর অনুমোদন করলেন কিন্তু ওদিকে 'মিতা'র প্রায় রক্তহীন বিবর্ণ চেহারা দেখে বটুকেশ্বরের প্রাণে ভয়ানক লাগল। 'না, না কে বলে তোমায় পাপী, তুমি

সকালের ফুলের মত টাট্‌কা সুন্দর, তুমি আমার কাছে এসো, আমি তোমায় চিনা-বাদাম এনে দেব। চিনাবাদাম কেন, চকোলেট চিউইং গাম্‌ বিস্কিট সন্দেশ সব। এসো।'

মিতাকে বটুকেশ্বরবাবু কোলে টেনে নিলেন।

'ভদ্রলোকের সঙ্গে তা'লে তুমি চলে যাও, তাঁর বাড়ি, যাবে? পারবে আমাকে ছেড়ে থাকতে।'

বটুকেশ্বর বিস্মিত হলেন।

ছোট্ট ঘাড় বেঁকিয়ে মিতা বলল, 'নিশ্চয় পারি, তুমি কি আর আমায় ভালবাস। বাবার মত তুমি আমায় ভালবাস না। সেজন্যেই বাবা মরেছে পর থেকে মিছিমিছি আমায় ভয় দেখাচ্ছো। তুমিই পাপী।'

বটুকেশ্বরের বুকের মধ্যে ধক্‌ ক'রে উঠল। অবশ্য মুখে তিনি তা প্রকাশ করলেন না।

'খুকির বাপ কি—'

'হ্যাঁ, এবার হঠাৎ পক্ষ হয়ে—'

বটুকেশ্বর চুপ ক'রে রইলেন।

মহিলা বিষণ্ণ বিশুষ্ক কণ্ঠে নিজের দুঃখ বর্ণনা করলেন। হঠাৎ বিপদে ফেলে গেছেন খুকির বাবা তাঁকে। পয়সা রেখে যাওয়ার মতন তো আর চাকরি করতেন না নির্মল বাগচী। রেখে গেছেন একটি বোঝা। এই মেয়ে। অবাধ্য অশিষ্ট।'

খুকি ড্যাব্‌ড্যাবে চোখে মাকে দেখছিল। বটুকেশ্বর তা লক্ষ্য করলেন।

নির্মল বাগচীর সদ্যবিধবা তেমনি কম্পিত দুঃখিত কণ্ঠে বললেন, 'ভাগ্যিস ক্ষেমদাসুন্দরী ইনস্টিটিউটে সে মাসেই আমি প্রথম চাকরিতে ঢুকেছিলাম।'

'ও আপনি ক্ষেমদাসুন্দরী গার্লস্‌ স্কুলের টীচার, নমস্কার নমস্কার।' বটুকেশ্বর টীচার হিসাবে মহিলার প্রতি আর একবার শ্রদ্ধা প্রকাশ করলেন।

'কিন্তু, যাই বলুন খুকির মত এমন ভাল মেয়ে হয় না। আপনি খামোকা তখন ওকে গালমন্দ করেছেন।'

খুকিকে আদর করার ছলেই যেন বটুকেশ্বর নিজের পরিচয়টা গোপন করতে চেষ্টা করলেন, যে তিনি একটা ডাকসাইটে সদাগরি অফিসের বড়বাবু। তাঁর পয়সা প্রতিপত্তি মান যশ কাগজে না ছাপলেও মোটামুটিরকম একটা শাঁসালো লোক তিনি এবাজারে। সদ্য বিপত্নীক হয়েছেন। দু'টো শাবক আছে ঘরে। তারাও মিতার মত বটুকেশ্বরবাবুকে রাতদিন জ্বালাতন করছে। মা হারিয়ে তারাও বাপকে কম জ্বালাতন ক'রে মারছে না। তা তিনি বলবেন কেন, শুধু হেসে আর একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'তা বেশ, মিতা আজ আমাদের বাড়িতে যাবে বেড়াতে। সেখানে থাকবে রাত, ওর আরো দু'টো ভাই-বোন আছে সেখানে। থাকবে সুখে। নিশ্চয়ই মিসেস বাগচী খুব বেশি দূরে থাকেন না আমাদের থেকে।' বটুকেশ্বর-বাবু মিতার মার দিকে তাকালেন। নীহার বাগচী নিজের বাড়ির রাস্তা ও নম্বর বললেন।

'হ্যাঁ, স্বচ্ছন্দে ও চলে যেতে পারবে আমায় ছেড়ে, রাতদিন ভাইতো চাইছে, বাপের মত আমি আদর করতে পারছি না ব'লে অভিমানের শেষ নেই। আমি ওর বড় শত্রু।'

'না না না। এটা আপনার ভুল ধারণা। মিতা কিন্তু তা মনে করতে পারছে না। পারছো কি মিতা, বলো, লক্ষ্মী মেয়ে, ফুলের মতো মেয়ে, ভোরের আকাশের সবুজ তারার মত ফুটফুটে মেয়ে।'

ভদ্রলোক যে মিতাকে খুব বেশি আদর করছিলেন এটা ও বেশ বুঝতে পারছিল।

'তুমি আমাদের বাড়ি যাবে?'

'হ্যাঁ, এখুনি, আজই।'

মিতার ব্যস্ততা দেখে বটুকেশ্বর হাসলেন।

'পাজি মেয়ে, অলক্ষ্মী মেয়ে কোথাকার?' নীহার ভ্রূকুঞ্চিত করে শাসন করলেন। এই রাত্রে গিয়ে তিনি অতিথি হবেন ভদ্র-লোকের বাড়ি আর সবাইকে জ্বালাতন ক'রে মারবে।' নীহার বটুকেশ্বরের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'এই কাজে তাঁর জুড়ি নেই। উনি মারা গেছেন পর থেকে মামা মামি মাসী পিসির বাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এমন কি, তাঁর বন্ধুদেরও। আমি ছাড়া সব বাড়ির বৌঝিরা ওকে আদর করে। সব বাড়িতে দু'টি তিনটি ক'রে ভাই-বোন আছে, এটাও কম বড় আকর্ষণ নয়।'

'ও, এজন্যেই আপনার ওপর আরো বেশী রাগ।' মৃদুমন্দ গলায় বটুকেশ্বর হাসলেন। 'যাকগে, মিতা, চলো, আমি তোমাকে দু'টো ভাই-বোন দেব।'

মিতা উঠে প্রায় রওনা হ'ল বটুকেশ্বরের সঙ্গে। নীহার ভুরু কপালে তুললেন।

'না না না ভয়ানক যন্ত্রণা করবে রাত্রে। কাঁদবে, বলবে এখুনি মা'র কাছে নিয়ে চলো।'

'না না না কক্ষণো বলব না, চলুন, মা আমায় কেউ আদর করলে এখন এমন হিংসা করে।'

হেসে, সুন্দর শান্ত গলায় বটুকেশ্বর মা ও মেয়ের দ্বন্দ্ব থামাতে চেষ্টা করলেন। 'কিচ্ছু ভয় নেই আপনার। কাল সকালে গাড়ি ক'রে আমি মিতাকে আপনার কাছে এনে দিয়ে যাব। আমি নিজেই চলে আসব।' নীহারকে বুঝিয়ে বটুকেশ্বর মিতাকে ভাই-বোন ছাড়াও আরো কয়েকটা জিনিসের প্রলোভন দেখালেন। তাঁর বাড়িতে প্ল্যাস্টিকের কুমীর আছে কুড়িটা, রেলগাড়ি আছে পঁচিশটা, উড়ো জাহাজ আছে পঞ্চাশটা। আর ভাই-বোন দু'টি ওর জন্য বাড়িতে এক বাক্স ভর্তি চকোলেট নিয়ে অপেক্ষা করছে। তুমি গেলেই ওরা তোমার হাতে তুলে দেবে, চলো।'

'এক্ষুণি চলুন।' মিতা বটুকেশ্বরবাবুর হাত ধরে টানাটানি করতে লাগল। নীহার ক্ষুব্ধ ভাঙ্গা গলায় বললেন, 'আপনারই জিৎ হ'ল। একটু লোভানি পেলেই ও আর আমার দিকে ফিরে তাকায় না। ওর বাবা মারা যাওয়ার পর ক'দিন খুব বেশি আদর করেছিলাম তারই সুফল।'

'আচ্ছা চলি তাহলে, মিসেস বাগচী। বেবির জন্যে ভাববেন না। কাল সকালেই আমি আপনাকে ফিরিয়ে দেব মেয়ে। ওরাও একটি সুন্দর সাথী পাবে আজ। একটু ঠান্ডা থাকবে।'

মিসেস বাগচী তাঁর শেষ দু'টো কথায় কান দিতে পারেননি। মিতাকে সাবধান করে দিচ্ছিলেন।

'আর দু'টো ভাইবোনের সঙ্গে ঝগড়া করবে না। যা দেয় তা দিয়েই খেয়ে উঠবে। জ্যাঠাইমাকে প্রণাম করবি।'

মিসেস বাগচী অপেক্ষা সুশীলা বড় ছিল কি ছোট বটুকেশ্বরবাবু যেন হঠাৎ আন্দাজ করতে পারলেন না।

'আচ্ছা, নমস্কার।' মিসেস বাগচী সুন্দর হেসে বিদায় নিলেন।

আশ্চর্য বাপমরা নীহার দুহিতা। এক মুহূর্তে সারা বিশ্বকে ও আপনার ক'রে ফেলল।

একটি সন্ধ্যার মধ্যে বাড়িতে হেন ব্যক্তি নেই যে, মিতাকে বন্ধু মনে না করতে লাগল। বাড়ির চাকর ঝি দারোয়ার বামুন-

ঠাকুরের কাছ থেকে যতটা সম্ভব খাতির আদায় ক'রে নিয়ে পরে বাবলা আর টেঁপীকে নিয়ে ওদের ছোট্ট পড়ার ঘরে আসর জমাল।

বটুকেশ্বরবাবুকে সন্ধ্যা হতে আর জ্বালাতন করতে বাবলা টেঁপী তাঁর আরাম কেদারার আশেপাশে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেল না। বটুকেশ্বরবাবু ভারি নিশ্চিন্ত-বোধ করছিলেন। মা-মরা নিজের দুটো সন্তানের চরিত্রের সঙ্গে নীহার বাগচীর বাপ মরা মেয়ের চরিত্রের তুলনা করলেন। এই একটু আগে রসা রোডের মাসিমা দুজনকে তাঁর বাড়ি নিয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু যায়নি ওরা। তাঁর পয়সায় রেস্টুরেন্টে খেয়ে সিনেমা দেখে পরে তাঁকেই নাকি বাবলা কানে কামড় বসিয়ে দিয়েছে, টেঁপি আঁচড়ে দিয়েছে রসা রোডে যাবার প্রস্তাব দিতে।

অর্থাৎ অস্থির হয়ে উঠেছিল ওরা কত-ক্ষণে ঘরে এসে বাবাকে নিয়ে পড়বে। এটা হল না কেন ওটা কই। বাবলা বলত, 'মা হলে এরকম হতে পারত না।'

বটুকেশ্বরবাবু একদিন দুটির জ্বালায় অস্থির হয়ে দুজনকেই নার্সিং হোমে পাঠাবার প্রস্তাব করাতে বাবলা ক্ষেপে গিয়ে তাঁরই পায়ের ভারি একটি কাবুলি স্যান্ডেল তাঁর বুকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মেরেছিল। তারপর দেয়ালে মাথা ঠুকে চীৎকার করে কেঁদে বলছিল মা নেই বলে বাবা পাষাণ হয়ে গেছে। আমাদের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে।

আর নীহারের মেয়ে বাবার অবর্তমানে মা কি হচ্ছে ওর জন্যে কি করছে না করছে ইত্যাদি নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে বাড়ি ছেড়ে সোজা চলে এসেছে এখানে।

পরদিন সকাল বেলা বটুকেশ্বরবাবু নীহারের সঙ্গে দেখা করলেন।

'কি ব্যাপার?'

'কিছুতেই এল না বলল, এখানে থাকব।'

নীহার শাদা সুন্দর দাঁতে হাসলেন। 'ওই রকম হয়েছে মেয়ে। আমিও ভাবি বাড়িতে থাকলে চব্বিশ ঘণ্টা জ্বালাবে, তার চেয়ে ও যদি—'

'আমিও খুব হাল্কাবোধ করছি, মিসেস বাগচী?'

'কি রকম?'

সেই পার্কে চলে এসেছেন দুজন বেড়াতে বেড়াতে। রৌদ্র উজ্জ্বল সুন্দর সকাল। সবুজ ঘাসের গা ঘেঁসে লাল ফড়িং লাফাচ্ছে, উড়ছে, ঘাসের আড়ালে মুখ লুকোচ্ছে কখনো।

'আমিও উইডোয়ার। মা মরেছে পর থেকে রাতদিন শাবকদুটো জ্বালিয়ে মারছিল। এবার আপনার মেয়ে গিয়ে—'

শব্দ করে নীহার হাসলেন।

'তাই বলুন, তাই বলুন। কেন দুজন হয়েও বুঝি ওরা আর একটির জন্যে অস্থির হয়ে—'

'না, তা ঠিক নয়।' যেন ঈষৎ লজ্জিত হয়ে বটুকেশ্বর শব্দ না করে হাসলেন। 'ভারি চমৎকার আপনার মেয়ে, কি সুন্দর মিশতে পারে সবাইর সঙ্গে। বাবলা টেঁপীকে নিয়ে কাল সারা রাত ওদের পড়ার ঘরে মিতা লুডু খেলেছে। অনেকদিন পর কাল শান্তিতে ঘুমোতে পেরেছিলাম।'

'দেখবেন ওর সঙ্গে মিশে আপনার দুটিও না বাপকে আবার শত্রু মনে করতে থাকে।'

বটুকেশ্বর এবার শব্দ করে হাসলেন।

হাওয়ায় খোঁপার আঁচল খসে পড়েছিল নীহারের। হাত দিয়ে ঠিক করলেন।

'না না তা নয়। আসলে এই বয়সে সঙ্গী সাথীদের নিয়ে খেলাধুলো করতে পারলে আর কিছু চায় না ওরা।'

'তাই কি?' যেন হঠাৎ বিমলিন হয়ে নীহার আকাশ দেখলেন। তারপর এক সময় আস্তে আস্তে বললেন, 'আমার পাশের ফ্ল্যাটের ভদ্র মহিলার সঙ্গে মেয়ে সেদিন দিব্যি দার্জিলিং-এ চলে গেল। ঘুরে এল চব্বিশ দিন পর। একদিনও নাকি 'মা' বলেনি। অথচ সেই মহিলার কোনো ছেলে-পিলে ছিল ওর বয়সের তা-ও না। আসলেই ও আমাকে আর ভালবাসে না।'

নাকি বাবলা টেঁপীকে মিতা এই করে দেবে। এখন তো জ্বালাতন করছে, বাড়িতে আছে, পরে না অপরের বাড়িতে ছুটে যাবে বাবার চেহারা আর দেখতে হবে না বলে?

অবশ্য খুব অল্প সময়ের জন্যে বটু-কেশ্বরের এই দুর্ভাবনা হল। এবং বাবলা টেঁপী কোনদিন বাড়ি ছাড়বে, তা তিনি ভাবতেই পারেন না। বাড়িতে না থাকলে তার চশমার কাচ ভাঙবে কে, কলমের নিব্ ভোঁতা করবে কে, নস্যির ডিবি হারাবে কারা।

গেল একদিন দুদিন। মিতার আবির্ভাবের পর বটুকেশ্বর যে কি মহা সুখে আছেন, মাঝে মাঝে তিনি তা ভাবেন। বন্ধু বিনোদবিহারীর বাজে প্রস্তাবে কান না দিয়ে তিনি কি বুদ্ধিমানের কাজ করেননি?

বেশ আছে তিনটিতে।

বাবলা টেঁপীর পড়ার ঘরটাই মিতার বেশি পছন্দ হয়েছে।

সেই ঘরে তিনজন খায়, শোয়, বিশ্রাম করে, গল্প করে আর লুডো খেলে রাত বারোটা একটা অবধি। তারপর বটুকেশ্বর-বাবু একবার গিয়ে আলো নিভিয়ে দেন। বলেন, 'এইবেলা সব শুয়ে পড়ো।'

তিনজন চুপচাপ শুয়ে পড়ে এর ওর গলা জড়িয়ে ধরে।

বটুকেশ্বরবাবু ফিরে আসেন নিজের শোবার ঘরে। তারপর আলো নিভিয়ে দিয়ে আরাম কেদারায় বসেন গড়গড়ার নল হাতে নিয়ে। শিশুদের মত বুড়োরা কি আর চট্ করে ঘুমোতে পারে, না ঘুম আসে।

বটুকেশ্বরবাবু পরলোকগতা সুশীলার কথা ভাবেন। সুশীলার কি আর একটি সন্তান হতে পারত না টেঁপী ও ওর মৃত্যুর মাঝামাঝি সময়টার মধ্যে।

তিন শিশু। পাশের ঘরে তাঁর তিনটি সন্তান। বটুকেশ্বরবাবু একসময়ে কল্পনা করেন। কল্পনাটা কি খুব কষ্টকর, তা-ও তিনি ভাবেন।

কেন না ঠিক সেই মুহূর্তে পাশের ঘরে হঠাৎ কান্না শুনলেন। টেঁপী? বাবলা? কান খাড়া করে রইলেন বটুকেশ্বর। দুজনের ঘুমের ঘোরের বহু কান্না শুনে এমন অভ্যস্থ হয়ে পড়েছিলেন তিনি যে, আলাদা ঘরে শুয়েও কে কাঁদছে শুধু নয়, কেন কাঁদছে, তা-ও বলে দিতে পারতেন। কিন্তু এ যে নীহারের মেয়ের কান্না!

বটুকেশ্বরবাবু আরাম কেদারা ছেড়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

'মিতা মিতা!'

বটুকেশ্বরবাবু আস্তে ডাকেন। তারপর দরজার চৌকাঠ পার হয়ে ওঘরে ঢোকেন।

আলো জ্বালেন না, ওদিকে টেঁপী বাবলার উঠে যাবার ভয়। এই রাত দুপুরে দুটির ঘুম ভাঙলে বটুকেশ্বরবাবুর আর উপায় থাকবে না তখন।

একটা না একটা কিছুর জন্যে আব্দার আরম্ভ করে দেবে দুজন এই মধ্য রাত্রে।

সদ্য মা হারিয়ে ওরা কি কম জ্বালাতন করে মারছে বটুকেশ্বরবাবুকে।

কিন্তু মিতা, মিতার মত শক্ত মেয়ের এই আব্দারে-কান্নার কারণের জন্যে বটুকেশ্বর মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না।

কি? না আমি এক্ষুনি মার কাছে যাব। মাকে দেখব।

শুনে বটুকেশ্বর একেবারে ঠান্ডা মেরে গেলেন।

রাত দুটো। এইমাত্র ঘড়ি দেখে এসেছেন তিনি।

এখন অলিগলি পার হয়ে মিতার মার বাড়িতে যাওয়ার হাঙ্গামা কত!

ট্যাক্সী এরাস্তায় ঢোকে না, উপায় রিক্সা এবং রিক্সওয়ালারাও এখন গলির কোন মাথায় চুপটি করে শুয়ে আছে, তাই বা খুঁজে বার করার হাঙ্গামা কত!

কিন্তু মিতাকে খুব আস্তে আস্তেও একথা বোঝাবার পর ও এমন জোরে চিৎকার করে কেঁদে উঠল যে, টেঁপু। বাবলা লাফিয়ে উঠে বসল।

দুই হাতে চোখ কচলে বাবলা মিতার আব্দারের কারণটা শুনে গর্জন করে উঠল, 'না তার চেয়ে বরং বলো, বাবা তোমার মাকে এখানে নিয়ে আসুক, এই ঘরে, এটা আমাদের টেন্ট, বেশতো তোমাদের মাকেও আমরা ক্লাবের মেম্বার করে নিচ্ছি, মিতা। হ্যাঁ বাবা, তাই ভাল, মিতার মাকে তুমি এক্ষুনি যে করে হোক এখানে নিয়ে এস, থাকুক এখানে দিন কতক। তবু আমরা মিতাকে, এমন চমৎকার একটি ফ্রেন্ডকে হারাতে চাই না।'

বটুকেশ্বরবাবু বড় বড় চোখে বাবলার দিকে তাকাতেই টেঁপী বলল, 'হ্যাঁ, বাবা, মা মরেছে পর তুমি আমাদের একটা কথাও রাখো না। এখন রাখো, মিতার মাকে এনে দাও।'

আলো জ্বালতে হয়েছিল বটুকেশ্বর-বাবুকে অনেক আগেই।

কেননা বাবলার গর্জন শুনেই তিনি সতর্ক হয়ে গেছেন বেশি।

'মিতা বলছিল মিতার মা খুব ভাল।' বাবলা তার বাবাকে বোঝাল, 'আমরা তাকে এখানে রাখব, রাখতে চাই, বুঝলে।'

বটুকেশ্বরবাবু চুপ করে রইলেন।

'আর মা কি অদ্ভুত ক্যারম খেলাতে পারে তোরা বিশ্বাস করবি না ভাই।' মিতার চোখের জল সরে গেছে, মুখে হাসি। বটু-কেশ্বরবাবুর চোখের ওপর মিতা আর দুটি শিশুর কাছে নিজের মার গুণপনার এমন বর্ণনা দিচ্ছিল যে, তিনি হঠাৎ যেন এই একরত্তি একটা মেয়ের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। 'কই, তখন দেখলাম, বলছিলে মাকে তোমার একটুও ভাল লাগে না, মার কাছে থাকতে ইচ্ছা করে না।'

'আগে করেনি, এখন করছে।' গম্ভীর হয়ে মিতা বলল, 'মাকে আমার এখন খুব বেশি মনে পড়ছে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, দুদিন ও ওর মাকে দেখছে না। নয় ভদ্রতা করে ও আমাদের ক্লাবে দিনকতক খেলাধুলা করতে এসেছে, আর ওদিকে ভদ্রতা করে তোমারও উচিত ছিল এক আধ-দিন ওর মাকে ডেকে আনা, একটু চা খাওয়ানো।'

এমন পালিশ মাজাঘসা কথা বটুকেশ্বর ছেলের মুখে শোনেন নি। এখন শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

বাবলা বলল, 'আশ্চর্য, তুমি আমাদেরও মাকে নিয়ে এমনভাবে ঠকাচ্ছ, এখন নতুন মানুষ পেয়ে মিতার সঙ্গেও এসব আরম্ভ করছ বাবা।'

'হ্যাঁ ভাই,' টেঁপীর কানের কাছে মুখ সরিয়ে নিয়ে নীহার বাগচীর মেয়ে বলল, 'আমার মা এমন অদ্ভুত মিশুক তোরা যদি দেখতিস।'

'চলে যাও বাবা কাল সকালে ওদের বাড়ি। একটা রিক্সা করে ওর মাকে আমাদের এখানে নিয়ে এসো। তারপর তুমি সারাদিন গিয়ে আপীস করো। আমরা গ্রাহ্য করব না। মিতার মার সঙ্গে সারাদিন বসে এই ঘরে ক্যারম খেলব।'

'হ্যাঁ ভাই, আর আমার মা ছোট্ট মেয়েদের মাথায় এমন চমৎকার বেণী তৈরী করে দেয়, ছোট্ট ছেলে, বাবলাদার মত ছেলেদের শার্টের গলা এমন চমৎকার ইস্ত্রী করে দেয়, ইস্, যদি দেখতিস!'

'শুনলে বাবা, শুনছ?' বাবলা গর্জন করে উঠল। 'ওর বাবা মরেছে পর মা ওকে এমন যত্নে রাখছে, আদর দিচ্ছে, সঙ্গে থেকে খেলাধুলো করছে যে, মা মরল পরদিন থেকে তুমি তার ওয়ান ফোর্থও করছ না আমাদের জন্য।'

স্কুলে ভাল বুঝে আসেনি ব'লে বটু-কেশ্বরবাবু ভগ্নাংশটা মুখে মুখে সেদিন বাবলাকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন। পুত্র আজ সেটা যোগ্য স্থানে প্রয়োগ করল।

টেঁপী মিতাকে বলল, 'আমার মাও আমাকে দাদাকে এমন আদর করত, সঙ্গে থেকে খেলাধুলো করত, বাবা তার ছটাকও করছে না। কেবল আপীস আর আপীস।'

মিতা বটুকেশ্বরবাবুকে বোঝাল, আনিয়ে নিন। কাল সকালেই নিয়ে আসুন মাকে। আমার মা শুধু আমাকে নয়, পরের ছেলে-মেয়েকেও যা ভালবাসতে পারেন, তা আপনি চোখের ওপর দেখবেন।'

বটুকেশ্বরবাবুর চোখ গোল হয়ে গেছল মিতার বাকপটুতা দেখে।

'আর যদি কাল তুমি ওঁকে না এনে দাও, বুঝতেই পারছ বাবা কিরকম যন্ত্রণা করব আমরা। হ্যাঁ, হাঙ্গার স্ট্রাইক করব। তিন জনে কিসসু খাব না।'

মিতা বলল, 'আমি তোমাদের বোঝাতে পারব না, কত কাগজের ফুল আর পাখি ক'রে দিয়েছিল মা আমাকে গত সামার ভেকেশনে। একটাও অঙ্ক কষতে হয়নি। কেবল খেলা খেলা খেলা। বাবা মরেছে পর মা আমাকে রাক্ষুসের মত ভালবাসতে আরম্ভ করেছে কিনা।' বলে টেঁপীর দিকে তাকিয়ে মিতা খিলখিল করে হাসতে লাগল। 'আমি দেখছি তোমাদের বাবা তোমাদের তার ওয়ান এইটথ্‌ও আদর দিচ্ছে না।'

যেন মার শোকে নতুন করে মুহ্যমান হয়ে টেঁপী হঠাৎ একটু সময় চুপ করে ছিল।

'কিছু না কিছু না।' বাবলা মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'বাবা কেবল ব্লাফ দিচ্ছে। ব্লাফ আর ব্লাফ। বলছে দমদমের নতুন বড় সাহেবের সঙ্গে ওর খাতির আছে, আর মা মরেছে পর আমরা দুটি ভাইবোনের মন খারাপ থাকা সত্ত্বেও একদিন একবেলা প্লেনে চড়াল না। একি বাবার মতন ব্যবহার।'

'দরকার নেই আর প্লেনে চেপে।' টেঁপী দাদাকে বোঝাল, 'মিতার মা আসুক। আমরা সারাদিন বসে এই ঘরে লুডো আর ক্যারম খেলব।' 'আর বাগাটেলী পিংপং', মিতা বলল, 'আমারও তাই ইচ্ছা, কিন্তু তোমার বাবা কি মাকে আনবে, দেখছ না কেমন চুপ করে আছে।'

'আলবৎ আনবে।' বাবলা বাজখাই গলায় গর্জন করে উঠল। 'যদি না নিয়ে আসে কাল আমরা কি ভয়ানক গণ্ডগোল করি তুমি দেখবে। তুমি কি মনে কর বাবা আমাদের যখন দুঃখ দেয়, তখন বাবাকেও আমরা সুখ দিই। কক্‌খনো না। বাবার কপালের বাঁ-দিকে একটা দাগ দেখছো মিতা, পরশু আমাকে এয়ারগান কিনে দেওয়ার বদলে বাজার থেকে নিয়ে এল নতুন একসেট্ জামা। আর আচ্ছা করে আঁচড়ে দিলাম কপাল।'

অল্প হেসে মিতা বটুকেশ্বরবাবুর দিকে তাকাল। 'খুব লেগেছিল আপনার?'

অধোবদন হতবাক বটুকেশ্বর এবার মুখ তুলে বললেন, 'না।'

'দরকার নেই আর আঁচড় কামড় খেয়ে, বরং বাবলা টেঁপী যা চাইছে আপনি তাই করুন।' মিতা বটুকেশ্বরবাবুকে বোঝাল, 'মা মরা ছেলেমেয়ে তো, মেজাজ খিঁচড়ে আছে, এখন আমার মাকে যখন ওরা ক্লাবের মেম্বার করতে চাইছে তাই করুন, আপনি কাল সক্কালে চলে যান, গিয়ে মাকে নিয়ে আসুন। বলামাত্র মা আসবে। আমার মা যে কি সাংঘাতিক মিশুক আপনি ধারণা করতে পারবেন না।'

পাকা গৃহিণীর মত গলার সুর করল মিতা। 'আপনিও তখন সারাদিন নিশ্চিন্ত হয়ে অফিস করতে পারবেন।'

'আচ্ছা আচ্ছা তাই হবে।' বটুকেশ্বর বুঝলেন এই আব্দার রোধ করা তাঁর পক্ষে কষ্টকর হবে। বাবলা এমন ডাকাতের মত চোখ করে বাবাকে দেখছিল যে, তাঁর 'না' ও 'হাঁ'-এর সঙ্গে সঙ্গে যেন সে লাফিয়ে ঘাড়ের ওপর পড়ে বটুকেশ্বরবাবুকে কামড়াবে অথবা গালে চুমো খাবে।

'তোমরা এই বেলা শুয়ে পড়ো। আমি আলো নিবিয়ে দিই।' তাঁর দেয়াল ঘড়িতে তিনটে বাজার শব্দ হল। 'অত রাত জাগলে অসুখ করে।'

বটুকেশ্বরবাবু সুইচ টিপতে হাত বাড়াবেন, বাবলা বলল, 'আলো আমি নেভাতে পারব বাবা। কিন্তু তুমি প্রমিজ করো আমার ফ্রেন্ড মিতার অনুরোধ রাখবে। আসলে ওটা মিতার মাথায়ই প্রথম এসেছে। ওর মাকেও আমরা ক্লাবের মেম্বার করে নেব।' মিটমিটি হাসছিল মিতা। দুষ্টুমী ভরা কালো কালো চোখ। তাই নিও। যেন সভয়ে ঘাড় নেড়ে বটুকেশ্বরবাবু সেই ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন। পাগল ঋষি এবং শিশুদের ইচ্ছা ও খেয়ালের কেন একসঙ্গে তুলনা করা হয়, মর্মে মর্মে তা অনুভব করবার জন্যে যেন গড়গড়ার নল হাতে করে আরাম কেদারায় বসে বাকি রাতটুকু বটুকেশ্বর জেগে কাটালেন। কিছুতেই ঘুম এল না।

সব শুনে নীহার রাগের সুরে বললেন, 'কী দুষ্টু হয়েছে আমার মেয়ে, এখন একবার ভেবে দেখুন।'

'না না তাতে কি।' বটুকেশ্বর মৃদু হেসে নীহারকে বোঝালেন, 'তা ছাড়া অনেক আগেই আমার উচিত ছিল আপনাকে একটু চা খাওয়ার নেমন্তন্ন করা।'

'কেন আমারও তো উচিত ছিল, আমার কি ত্রুটি হয়নি।' নীহার কোমল গলায় বলল, 'না, না, শুধু চা খাওয়া নয়। ঐ যে মাকেও ক্লাবের মেম্বার করে নাও। কি কুবুদ্ধি দিয়ে বেড়ায় আমার মেয়ে আর পাঁচটি শিশুকে একবার চিন্তা করুন।'

তেমনি মন্থর হেসে বটুকেশ্বর বলেন, 'পাগল শিশু ও দেবতার মর্জি আমরা বুঝি না। সমালোচনা করতে যাওয়াও বিপদ, মিসেস বাগচী।' এবং একটা ট্যাক্সী ডেকে নীহারকে নিয়ে বটুকেশ্বর বাড়িমুখো রওয়ানা হন।

রাস্তায় একটু সময় চুপ থেকে নীহার প্রশ্ন করেন, 'এমনিতে তিনটি আছে কেমন?'

'খুব ভাল খুব ভাল। সারাদিন তিনজনের গলা মিলিয়ে ছড়া কবিতা আবৃত্তি, ক্যারম লুডো খেলা আর সাপ ভূতের গল্প বলার একতিল বিরাম নেই। খাওয়া ঘুম পাটে উঠেছে। বই খাতা ঢুকেছে বাক্সে।'

'সত্যি শিশুরা শিশুদের মত জগৎ নিয়ে থাকতে চায়। আমরা সেই রকম পরিবেশ ওদের জন্যে গড়তে পারি না ব'লে যত গোল বাধে। সুন্দরভাবে তাদের ইচ্ছা পূরণ করতে পারি না বলেই তো সেই ইচ্ছাকে পাগলের ইচ্ছার পর্যায়ে ফেলছি।'

খুশি অথচ সংযত গলায় বটুকেশ্বর আড় নয়নে একবার নীহারকে দেখে বললেন, 'কি রকম সরল, কত সরল হলে ওরা বলতে পারে মিতার মাকেও বাবা এখানে নিয়ে এস, এবাড়ি। রাতদিন আমাদের সঙ্গে থেকে খেলবে, গল্প করবে, কবিতা পড়বে।'

'বিশেষ এই ধরণের ছেলেমেয়েদের জন্য, যারা বাবা মা কি এদের একজনকেও হারিয়ে খিটখিটে মেজাজের হয়ে যায়, তাদের জন্য ভাল কোনো নার্সিং হোম নেই এদেশে।'

যেন নীহারের দুই চোখ ছলছল করে উঠল, শুধু মিতার জন্যে, না কি তাঁর দুটি মা-হারা সন্তানের জন্যেও। বটুকেশ্বর একনিমেষে ভাবলেন। আর এই শেষ সুশীলার মুখ তাঁর মনে পড়ে চক্ষুদ্বয় ভয়ানক ছলছল করে উঠল।

বাড়িতে একটা উৎসব লাগল।

সকলের আগে বাবলা ছুটে এসে মিতার মায়ের হাত ধরল।

টেঁপী ধরল নীহারের বাঁ হাত। 'এই দুটি', বটুকেশ্বর পরিচয় দিলেন।

'আহা দুটি ফুলের কুঁড়ি' বলে নীহার একটু নুয়ে বাবলা ও টেঁপীর কপালে চুমো খেলেন।

'এসো, তুমি আমার হাত ধরো।' বটুকেশ্বর নিজের ডান হাত মিতার দিকে বাড়িয়ে দিতে মিতা তাচ্ছিল্যভরে সেই হাত প্রত্যাখ্যান করল এবং চোখ বড় করে মার দিকে তাকাল।

বটুকেশ্বরবাবু এই তাকানোর অর্থ বুঝে মনে মনে ভারি কৌতুকবোধ করছিলেন অনেক কাল বাদে। বাবলা যখন সুশীলার হাত ধরে থাকত, তখন টেঁপী মার দিকে এভাবে তাকাত। বটুকেশ্বর হাত বাড়ালেও তা গ্রাহ্য হত না।

আর বটুকেশ্বর বাবু দেখে অবাক হয়ে গেলেন।

একটা সকালের মধ্যে নীহার বাবলা ও টেঁপীর চিত্ত জয় করে ফেলেছে।

কবিতা পড়ল, ক্যারম খেলল তারপর বটুকেশ্বরবাবুর বাড়ির পিছনের বাগানটুকুতে তিনজনকে নিয়ে পায়চারী করতে করতে গল্প করে নীহার বেলা ন'টা বাজাল।

'আমাকে কিন্তু বেরুতে হচ্ছে মিসেস বাগচী? বটুকেশ্বরবাবু একসময় বিনয়নম্র কণ্ঠে হেসে বললেন, 'ওরা আপনার জিম্মায় রইল।'

'তা রইলই বা।' হেসে নীহার উত্তর করল, 'আমি আজ আর বেরুব না। ক্যাজুয়েল লীভ নেব। বাচ্চার মমতার চেয়ে চাকরির মমতা বেশি হবে এখনো এমন পাষাণ হইনি। কোনো ভয় নেই, আপনি যান আপীসে। দুপুরটাও আমি এখানে থেকে যাচ্ছি।'

'দুপুরে মানে? রাত্রি।' বাবলা হুঙ্কার ছাড়ল, 'মিসেস বাগচী কথার নড়চড় করবেন না, আপনি আমাদের ক্লাবের লাইফ মেম্বার থাকার ওথ্ নিয়েছেন। সুতরাং রাত্তিরে ছেড়ে গেলে চলবে না। বাবার সঙ্গে আর কথা বলবেন না, ছেড়ে দিন ওকে এই বেলা আপীস যাক, লেট্ হবে।'

মিতা মাকে শাসালো, 'মা, বাড়িতে আমাকে তুমি যতই ফাঁকিঝাঁকি দাও, এখানে আর একটা ক্লাবে এসে কো-মেম্বারদের ব্লাফ দিলে চলবে না। এতে বন্ধুদের কাছে আমারই লজ্জা পেতে হবে শেষটায়, সুতরাং।'

হেসে বটুকেশ্বরবাবু মিতাকে বোঝালেন, 'না না নিশ্চয়ই থাকবেন, তিনি তো বলছেন না, আজই চলে যাচ্ছেন। তিনি থাকবেন, তিনি চিরকাল এই ক্লাবে থাকবেন। সুতরাং তাকে পেয়েছো যখন, আর কান্নাকাটি না করে এই বেলা খেলা কর সবাই। আমি চললাম, আমি এখুনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি, যত খুশি তোমরা উঠানে বারান্দায় ছাদে সিঁড়িতে লাফালাফি করো ডাক দেবার কেউ নেই।'

বলে বটুকেশ্বরবাবু আর চোখ না তুলে ব্যস্ততার ভাণ করে স্নানের ঘরের দিকে ছুটে গেলন। আর শুনলেন, বাপ হারা মিতাকে মিতার মা ধমকাচ্ছেন, 'ভয়ানক ডেঁপো হয়েছ তুমি। বাইরে এক ভদ্রলোকের সামনে তুমি আমাকে এখন ব্লাফার বলছ। কর্তা মরে গেছেন, না হ'লে বঁটি দা দিয়ে আমি তোমার জিভ কেটে ফেলতাম।'

'আহা না হয় একটু কড়া বলেছে, ওর ওপর অত কঠিন হবেন না মিসেস বাগচী, একটা ব্লাফ দিয়েছেন তো, তেমন কি লজ্জার কথা। বাবা, আমাকে ও টেঁপীকে ক' হাজার ব্লাফ দেয় দিবারাত্র শুনলে অবাক হবেন, দুপুরে বলছি সেইসব গল্প, আগে তো হিজ হাইনেসকে অফিসে বেরুতে দিন।'

বাথরুমে বসে বটুকেশ্বরের মনে পড়ল টাকাপয়সার হিসাব নিয়ে সুশীলার সঙ্গে যখন তাঁর কলহ বাধত, তখন সুশীলা বটুকেশ্বরকে বোঝাতে হিজ হাইনেস কথাটা বলত।

নিশ্চিন্ত মনে স্নান করে খেয়েদেয়ে বটুকেশ্বরবাবু প্রত্যহ দুপুরবেলা আপীসে বেরুতে লাগলেন।

ব্লাদারকে বেশ পোস্টাই পোস্টাই চেহারা দেখাচ্ছে, আবার কি তাহলে?

আপীসে রাস্তায়-ঘাটে কেউ কেউ যখন প্রশ্ন করে, হেসে বটুকেশ্বর উত্তর দেন, 'আমার ছেলেমেয়ে দুটোকে দ্যাখনি, যদি দ্যাখতে, বলতে ডাকাত ডাকাতনী। ওই কথা মুখে এনেছি কি আমায় খুন করেছে।'

তথাপি বটুকেশ্বরের চেহারা ভাল হওয়ার কারণ তিনি নিজেই বুঝতে চেষ্টা করে গোপনে পুলকিত হয়ে উঠলেন।

কিন্তু মুখে সেটা কখনো প্রকাশ করার চেষ্টা করলেন না, বাড়িতে, বিশেষ মিসেস বাগচীর সামনে।

ভয়ানক ভদ্র তিনি।

এইটেই বটুকেশ্বরকে আরো বেশি মুগ্ধ করল। যখন স্পষ্ট হেসে নীহার বলেন, 'তাতে কি, না ওসব প্রেজুডিস আমার নেই। আপনার বাড়িতে এক রাত কাটালুম কি দু'রাত কাটালুম লোকে দুর্নাম দেবে আর সেই ভয়ে আমার এই সবুজ ক্লাব ভেঙ্গে বাড়িতে ফিরে যাব এতটা জানোয়ারী সভ্যতা আমি সমর্থন করি না। কেন সমাজের একটা উদার দৃষ্টিভঙ্গী থাকতে নেই? হ্যাঁ, শিশুদের একটা সঙ্ঘ। ওরা আমাকে এভাবে ওদের মধ্যে পেতে চাইছে, এভাবে পেয়ে ওরা বাঁচতে বড় হতে চাইছে। এই সত্য এমন বৈজ্ঞানিক একটা উপায় যদি থাকে শিশুদের বাঁচাবার নিজে বাঁচবার তো মাস্টারি ছেড়ে দিয়ে এখানেই আমি থেকে যাব, তাতে আমার সম্ভ্রমের হানি হয় গ্রাহ্য করব না, আপনি করেন নাকি?'

'না না', অনেক দিন পর প্রায় যৌবনের একটা আবেশ অন্তরে অনুভব ক'রে বটুকেশ্বর সরস ঢোক গিললেন। 'আপনাকে নিয়েই কথা। আপনি নারী, আমি পুরুষ বুঝতেই পারছেন। সেজন্য গ্রাহ্য করব কেন।'

'তবে আর কি।' মিসেস বাগচী প্রফুল্ল নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'আজ আমরা সবাই খুব ব্যস্ত, একটা নাটকের রিহার্স্যাল হচ্ছে।'

'ক্লাবে নাটক হবে বুঝি?'

'হ্যাঁ, চিরকুমার সভা।'

'বলেন কি, এই নাটক?'

যেন বটুকেশ্বর আকাশ থেকে পড়লেন। নীহার বললেন, 'আর বলেন কেন! মিতার দুষ্টুমী। সেদিন পিসিমার সঙ্গে শিলং বেড়াতে গিয়ে এই নাটক দেখে এসেছে। সেখানে ক্লাবে বড়রা করছিল।'

'বটে!' বটুকেশ্বর ভারি কৌতুক অনুভব করলেন। 'এই ক্লাবের সভ্যদের এখন সেই নাটকের অভিনয় না করলে মর্যাদা থাকবে কেন।'

'বললাম তো, মিতার মাথায় ওর বয়সের একশ'টা ছেলেমেয়ের কুবুদ্ধি গিজগিজ করছে। দিনে একশ' রকমের বুদ্ধি দিচ্ছে বাবলা টেঁপীকে এটা করো, ওটা করো।'

'আপনাকেও বুঝি পার্ট দিয়েছে?'
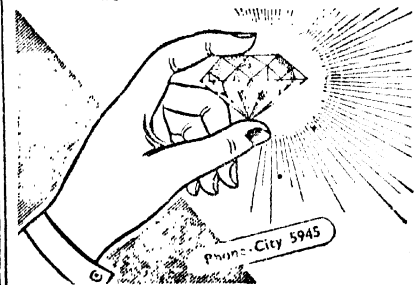
'বাবাঃ, না হলে আপনার বাবলা আমাকে রেহাই দেবে নাকি?' নীহার মন্দ হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, অভিমান ক'রে রোজই তো আমায় একবার ক'রে ক্লাবের মেম্বারশীপ থেকে বাদ দিচ্ছে সে খবর রাখেন না বুঝি।'

'তাই বলুন!' বড় বড় চোখ ক'রে বটুকেশ্বর তাঁর ও নিজের বাচ্চাদের দুরন্তপনার আরো খানিকটা অধ্যায় শুনলেন। 'কি বলছে আপনাকে বাবলা?'

'না ওর দোষ কি। শেখাচ্ছে আপনার মিতাদেবী। বলছে, যদি মিসেস বাগচী আমাদের কথামতন কাজ না ক'রে, তবে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হোক, লামডিং-এর মাসিমাকে চিঠি দিয়ে আনিয়ে তাকে মেম্বার করে নেওয়া যাক, মিস পুর্ণিমা সেন অনেক বেশি ফরোয়ার্ড মেয়ে।'

'বটে! সবাই ওরা আপনাকে এখনো মিসেস বাগচী ডাকছে নাকি।'

যেই রাজ্যে মিতা আছে সেই রাজ্যের শিশুরা এর চেয়ে ভাল হবে আশা রাখেন কেন,' নীহার আর হাসলেন না। 'বলছে

বাবলা টেঁপীকে, 'মা বাবা কিছু না। বাবা মরেছে পর এটা আমি বুঝেছি।'

'আচ্ছা মেয়ে আপনার!'

'রাতদিন আমাকে এখানে শাসাচ্ছে, মা আমি ভাল মনে তোমাকে এদের কাছে এনেছি। যদি আমার কথা মতন কাজ না করো, বাবুলাদা তোমায় কামড়ে দেবে, দেখছো না রাগ হ'লে ওর বাবাকে ও কি ভীষণ কামড় বসিয়ে দেয়।'

বটুকেশ্বর অতি কষ্টে হাসি সংবরণ ক'রে নীহারের মতো গম্ভীর হবার চেষ্টা করলেন।

'বলছে, বাড়িতে আমার কাছে তুমি মা, কিন্তু এখানে এদের কাছে এবং আমার কাছেও তুমি বন্ধু, মিসেস বাগচী। মা হতে গেলেই তোমার আলসেমী আসবে, খেলাধুলো কিছু হবে না, কি একজামিনের খাতা দেখতে বসবে, সেই সব হাঙ্গামা গুন্ডা ছেলে বাবলাদা সইবে না।'

'বাবলাটা ভয়ানক বোম্বেটে হচ্ছে!' বটুকেশ্বর বললেন। 'তা আপনি ওদের খেয়াল খুশির মালমসল্লা যুগিয়ে কি করে সুন্দরভাবে চালাচ্ছেন তাই আমি দেখছি, ভাবছি।'

বটুকেশ্বরের গলায় উচ্ছ্বাস ছিল। একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে নীহার বলল, 'তা আর বেশি দিন পারব কি। পুজো ভেকেশনের সঙ্গে ক'দিনের ক্যাজুয়েল লীভ নিয়ে বড় জোর আর বিয়াল্লিশ দিন আমি আছি আপনার বাড়িতে, স্কুল খুললে আর না গিয়ে পারব কি, তখন অবস্থাটা কি দাঁড়াবে ভাবলে আমার চোখে জল এসে যায়।'

'তা আর করবেন কি। এখুনি মন খারাপ করলে এই ক'দিনের আনন্দটাও মাটি হবে। তারপর আমার আপনার যেমন ডাকাত-ডাকাতনি ছেলেমেয়ে।'

'তাই চিরকুমার সভারও পার্ট নিলাম।' নীহার এইবার মৃদু হাসলেন।

'আমাকে নাটক দেখার নেমন্তন্ন করবে না ওরা?' 'মনে হয় না', নীহার মাথা নাড়ল। 'বলছে বাবা বেজায় বেরসিক। বাইরে কোনো ক্লাবে গিয়ে তাস-পাশা খেলুক, সিনেমায় যাক, ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে ভাল বক্তৃতা আছে গিয়ে শুনতে ব'লে দিন মিসেস বাগচী। এখানে এমন লোকের জায়গা হবে না।'

'বেরসিক কেন বলছে সেটা আপনার কানে তুলেছে কি শ্রীমান বাবলা?'

'না', নীহার সুন্দর মন্থর হেসে বটুকেশ্বরের দিকে তাকাতে বটুকেশ্বর বললেন, 'কোনো এক বন্ধু ছেলের সামনে সেদিন বলে বসল, আবার বিয়ে ক'রে ফেলো, একটি নতুন মা ঘরে থাকলে বাবলা টেঁপী ঠান্ডা হয়ে যাবে।'

'ও সেই থেকে আপনার ওপর আরো বেশি চটা। ওদের সামনে রেখেই ভদ্রলোক আপনাকে এই সদুপদেশ দিচ্ছিলেন? আচ্ছা বুদ্ধিমান লোক!' নীহার বটুকেশ্বরবাবুর অনুপস্থিত বন্ধুকে বেশ কিছু ভর্ৎসনা ক'রে পরে বললেন 'এবং এই সম্পর্কে আমি ভয়ানক হুঁশিয়ার, পাছে রহস্যের ছলেও কেউ আমার ন'বছরের মেয়ের সামনে হঠাৎ না অন্য রকম প্রস্তাব দেয়। নিশ্চয়ই বুঝেছেন।'

'কেন বুঝব না।' বটুকেশ্বর সোৎসাহে ঘাড় বাঁকালেন। 'এইজন্যেই শাস্ত্রে বলে ছেলেমেয়ে মানুষ করা কঠিন, সবাই বোঝে না, সবাই পারে না এই কাজ।'

নীহার বললেন, 'আমার মিতা ভুলেও কোনোদিন এই ধরনের আব্দার করবে না এসব নিয়ে মাথা ঘামাবে না। বরং আমি যে ওর মা এইটাই আস্তে আস্তে ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা করছি।'

বটুকেশ্বর বিস্ফারিত চোখে নীহারকে দেখছিলেন।

'এইজন্যেই মিসেস বাগচী,—তাই বাবলা টেঁপীকেও ও আপনি এখানে আসতে না আসতেই শিখিয়ে দিয়েছে,—মা টা কিছু না, মিসেস বাগচী। এখানে সবাই আমরা বন্ধু।'

অন্য সময় বটুকেশ্বর শব্দ ক'রে হাসতেন এখন হাসলেন না।

নীহার বাগচী পরিচ্ছন্ন গলায় হেসে বললেন, 'এবং আমার মনে হয় এটাই আমাদের মত রুচির মানুষের, যাদের কোনোকালেই কিছু করা সম্ভব হবে না, সেই ছবি শিশুদের মন থেকে একেবারে দূর করতে হ'লে এভাবেই ওদের সঙ্গে মেলা-মেশা রাখা ভাল।'

'আমি পারিনি, আমি পারলাম না।' বটুকেশ্বর আক্ষেপের সুরে বললেন, 'তার আগেই বাবলা-টেঁপী এমন হাঙ্গামা শুরু করবে। এমনি তো সুশী মরেছে পর ওদের চোখে আদ্ধেকটাই প্রায় পর হয়ে গেছি, তারপর যদি বলি,—'

নীহার বললেন, 'যতক্ষণ মা আছি ততক্ষণ বাবার প্রশ্ন, বাবার বেলায় মার কথা আসে, আসে না কি?'

ঘাড় নাড়লেন বটুকেশ্বর।

'না না, ঠিকই, আপনি শিশুদের মন যেমন অদ্ভুতভাবে স্টাডি করেন, করেছেন আমি পারিনি, পারতাম না। দেখছি তো আজ ক'টা দিন। কী সুন্দরভাবে এদের নিয়ে আছেন!'

'হ্যাঁ, নাটকটা হয়ে গেলে, বাবলা তো আজ থেকেই বলছে, কাল আপনার পিছনের বাগানে নাকি ফড়িং ধরার কম্পিটিশন শুরু হবে।'

'হ্যাঁ, অনেক ফড়িং ওখানে।' বটুকেশ্বর গদগদ গলায় হাসলেন। 'আপনাদের পেয়ে নিত্যনতুন খেলার আইডিয়া আসছে ওদের মাথায়।'

'না এটা অবিশ্যি আমিই প্রস্তাব দিয়েছি।' ঈষৎ মন্থর গলায় নীহার বলেন, 'এক আধটু আউট-ডোর গেম,—বাড়িতে থেকেই যতটা সম্ভব—'

'বটে, বটে। সারাদিন ঘরে থেকে বাগাটেলি লুডো ক্যারম বা গল্প নাটক করার চেয়ে—'

কিন্তু তাঁকে শেষ করতে না দিয়ে নীহার বললেন, 'আর কি, বুড়ো বয়সে গাছকোমর হয়ে লাফালাফি করি এখন ফড়িং ধরতে।'

'তা আপনি পারেন পারছেন।' উৎফুল্ল কৃতজ্ঞতায় বটুকেশ্বর নীহারের চোখের ভিতরে তাকালেন, 'শিশুর সঙ্গে শিশু হয়ে থাকার প্রতিভা আপনার আছে।'

মদির সলজ্জ হেসে নীহার বললেন, 'কিন্তু আপনাকে যে বাচ্চারা একেবারে ভুলতে চলল।'

'তা হোক, তাতে আফসোস নেই।' প্রসন্ন উদার গলায় বটুকেশ্বর উত্তর করলেন, 'কথায় বলে সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল, আপনি আর মিতা আসবার আগে আমার অবস্থা যে কি ক'রে তুলেছিল দু'জনে মিলে।' (আগামীবারে সমাপ্য)

২

সে গলির এমন গড়ন-পেটন যে মনে হল, সূর্য কখনও তাকে বে-আবরু করতে পারে না। এতক্ষণে নিকুনের মুখ ফুটল; জিজ্ঞাসা করল, "পাঁচুদা! ব্যাপার কি? কিছুই ত' বুঝছিনে।" তার গলার আওয়াজের মধ্যে ভয়ের খাদ ছিল।

আমি গম্ভীর দৃষ্টিতে নিকুনের পায়ের দিকে তাকালাম। তার পায়ে নূতন চক্‌চকে 'সু' জুতো। নিকুন ও তার জুতোর মধ্যে পরস্পরে গোলামী সম্বন্ধ ছিল চিরকাল। জুতোর সেবা করতে নিকুনের মত লোক দেখিনি; নিকুনের জুতোর মত অমন নিত্যসহচর গোলামও দেখিনি। নিকুনকে বললাম, "জুতোর ফিতে আল্‌গা করে ফ্যাল; যত শিগ্‌গির পারিস।" বিস্মিত হয়ে সে বলল, "কেন? তার মানে?"

আমি চুপে-চাপে বললাম, "বলা যায় না ত', কি হয়। যদি দৌড় ধরতে হয়, চট্‌পট জুতো খুলে নিয়ে হাতে করে দৌড়তে পারবি। জুতোর মায়াটা তোর বেশি কিনা, তাই বলছি। আমার পুরান এল্‌বার্ট স্লিপার, ফেলে দিয়েই দৌড়ব। বুঝলি কি না।"

নিকুন থমকে গেল। বলল, "কী যে বলছেন আপনি তার ঠিক নেই। এতক্ষণ গহর-টহর কত কী নাম করে গেলেন। আবার এখন বলছেন সাবধান হতে! কাজে কাজ নেই পাঁচুদা। ফিরে যাওয়া যাক", বলে হাত চেপে ধরে আমার! নিকুন সত্য সত্যই ভয়ে ইতস্তত করছে দেখে আমি খুব সংক্ষেপে ব্যাপারটি বুঝিয়ে দিলাম। তখন সে আশ্বস্ত হয়ে চলতে লাগল। অবশ্য নিকুন যে বিলক্ষণ সঙ্গীতপ্রিয় ছিল, একথা তার শত্রুরাও স্বীকার করত।

খাঁ সাহেব একটি বাড়ির দরজায় থামলেন। বাড়ীর নম্বর বুঝবার উপায় ছিল না; আমাদের পকেটে দেশলাই থাকত না। কিন্তু আমার চোখ বেঁধে দিলেও সে বাড়ি ঠাহর করে নিতে পারতাম, তখন। সে গলিতে খোলা চোখ আর বাঁধা চোখ দুই-ই সমান। দু' দিকে হাত বাড়িয়ে দিলে দু' দিকের বাড়ির দেয়াল ছুঁয়ে চলা যায়। এমনি সুন্দর ব্যবস্থা সে গলির।

দরজা ঠেলতেই দরজা খুলে গেল। খাঁ সাহেব এমনভাবে আমাদের চলে আসতে বললেন, যেন সেটা তাঁর নিজেরই বাড়ি। দুর্গানাম স্মরণ করে খাঁ সাহেবের সঙ্গে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলাম; পুরান ঢংএ খিলান করা ঘুট-ঘুটে প্রবেশপথ দিয়ে। অল্প অগ্রসর হয়ে মোড় ফিরতেই একটি দেড়-মহল্লা বাড়ির খোলা উঠান দেখা গেল। লোকজনের নামগন্ধ নেই। একটা তেলা-পোকা নেই, টিকটিকিও নেই!

ডানদিকে ঘুরে খাঁ সাহেব বাহির বাড়ির সংলগ্ন একটা কাঠের সিঁড়ি বয়ে উঠতে লাগলেন; আমরাও মহাজনের পদানুসরণ করলাম। সিঁড়িতে উঠতে উঠতে একটা দেয়ালের ব্যবধানে অনতিদূরে একটি ছোট চত্বর দেখলাম; তার পাশেই একটি শূন্য চণ্ডীমণ্ডপও প্রকাশ পেল। সে জায়গাটা পায়রাদের অবাধ লীলভূমি হয়ে অত্যন্ত অপরিষ্কার হয়ে আছে। অপরিষ্কার চণ্ডী-মণ্ডপ দেখে নিকুন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। বাড়িটা তাহলে হিন্দুরই নিশ্চয়।

সিঁড়ির শেষে উপরে অপ্রশস্ত বারান্দায় উঠে খাঁ সাহেব ঘুন্‌সিতে বাঁধা একটি চাবি দিয়ে খুব কায়দা করে ডান দিকে একটি ঘরের তালা খুলে ফেললেন; দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকতে আমাদেরও আসতে বললেন নিঃসঙ্কোচে। ঘরের মধ্যে উপস্থিত হলাম আমরা। দেখলাম, জারুল কাঠের উলঙ্গ তক্তাপোষ; কোণে একটি জড়ান মাদুর, ঠেশ দেওয়া; তার পাশে মেঝেতে একটি বদনা; একটা লম্বালম্বি দড়িতে ময়লা গেঞ্জি, লুঙ্গি, ল্যাঙ্গোট আর একটি ধূসরবর্ণের গামছা টাঙ্গান রয়েছে। এর অতিরিক্ত আর কোনও আসবাব বা ছবি সে ঘরে ছিল না। পাশেও একটি ঘর আছে, কিন্তু তালা লাগান। ঘরের দুটি জানালা; একটি খাঁ সাহেব নিজহাতে খুলে দিলেন। এরকম রিক্ত পরিবেশের মধ্যে অমন একজন নাম-জাদা গুণী কি করে থাকেন ভেবে ঠিক করতে পারলাম না। তাঁর কোনও সাথী বা সঙ্গী সেখানে বাস করে, এমনও ত' লক্ষণ বুঝলাম না।

খাঁ সাহেব ঐ ছ'-পায়া তক্তা দেখিয়ে দিয়ে আমাদের বললেন, "আপনারা বসুন, আরাম করুন", বলে গায়ের মেরজাইটা খুলে দড়িতে টাঙিয়ে দিলেন, লাঠিটা এক কোণে ঠেশ দিয়ে এলেন, আর পাঞ্জাবীর পকেট থেকে একটি রুমাল বার করলেন। খাঁ সাহেব আসন না নিলে আমরা বসতে পারিনে। তিনি ঝপ করে বসলেন তক্তার একদিকে। ডবল সাইজের তক্তা সেটা। খাঁ সাহেবের বসার সঙ্গে সঙ্গে তক্তার কোনও একটি পায়া আওয়াজ দিল 'ঠিক্'। বুঝলাম—সেটা খাঁ সাহেবের গুরুত্বের প্রতি সেলামী নিশানা। আমি একটু ব্যবধান করে সাবধানে বসে পড়তেই তক্তাটি বলে উঠল "ঠিক"। অদ্ভুত! আমরা অতিথি; এটা বোধ হয় অতিথির সেলামী। নিকুন ভয়ে ভয়ে আমার পাশে বসতেই তক্তা আওয়াজ দিল "ঠিক্-ঠিক্"। নিকুন অবাক।

রুমাল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খাঁ সাহেব হাওয়া খেতে লাগলেন। এরই মধ্যে বোধ হয় ঐ তক্তাপোশের স্বভাব-চরিত্র পরীক্ষার ছলে নিকুন একটু ঝুঁকে তক্তার নীচের দিকটা দেখে নিল। বেচারা ছেলেমানুষ! কখনও মেসে থাকেনি। জারুল কাঠের তক্তার জাতি-ধর্মের কথা বুঝতো না সে। তার অজ্ঞতা দেখে দুঃখ হল; আবার তত্ত্বানুসন্ধানের প্রবৃত্তি দেখে আনন্দও হল। তাকে একটু জ্ঞান দিলাম তখুনি। বলল, "কল-কব্জা-জোড়ের ব্যাপার নয় রে; ওর কারণ আলাদা।" চোখ-ভরা জিজ্ঞাসা দিয়ে সে তাকায় আমার পানে। তাকে বুঝিয়ে দিলাম "ওর মধ্যে কারিগরী নেই, ওটা হল পূর্ব-জন্মের স্বভাব। পূর্বজন্ম মানিস ত'?" নিকুন হাঁ করে থাকে। বললাম তাকে, "এক রকমের লোক আছে, যারা রক্ত-মাংসের মানুষের মুখে গুরু-গৌরবের কথা শুনেই 'ঠিক ঠিক' করে, বিচার করে দেখে না একটুও। সে সব লোক মরে জারুল কাঠের তক্তা হয়ে জন্মায়। অল্পভার বা গুরুত্বের ছোঁয়াচ পেলেই পূর্বজন্মের স্বভাববশে বলে ওঠে "ঠিক ঠিক"। স্বভাব যায় না

ম'লে এটা ত' জানিস!" আমার জ্ঞানের বহর দেখে নিকুন স্তম্ভিত হয়ে যায়। নিকুন ত' সোনার ছেলে! কত বড় বড় নাস্তিকদের ঘায়েল করে দিয়েছি ঐ জারুলের তক্তার তত্ত্ব-কথা বলে। জন্মান্তরবাদের স্বপক্ষে অত বড় প্রমাণও আর নেই ঐ জারুলের তক্তার মতো। তাহলেও সুধী পাঠককে একটা কথা বলে রাখি। এরকমের কথা যাঁরা পরীক্ষা-নিরীক্ষার না করেই মনে মনে 'ঠিক' বলবেন, তাঁদেরও নিদারুণ দারুময় জারুলের তক্তা হয়ে জন্মান্তর পরিগ্রহের সম্ভাবনা থাকল। অনুপ্রাসটা মাত্র প্রসঙ্গের বশেই এসেছে; ওটা কিছু নয়।

বেশিক্ষণ চুপ করে থেকে লাভ নেই। খাঁ সাহেবকে বললাম, "কিছু হুকুম ফরমায়েশ করুন মেহেরবানি করে।" খাঁ সাহেব তৎক্ষণাৎ বললেন, "আপনার কাছে সিগারেট আছে?" আমি অত্যন্ত লজ্জিত হলাম। বললাম, "এক মিনিটের মধ্যে আনিয়ে দিচ্ছি"; বলেই, নিকুনকে বললাম পান-সিগারেট-জরদা নিয়ে আসতে বড় রাস্তার সেই মোড়ের দোকান থেকে। নিকুন নড়েছে কি তক্তার আওয়াজ হ'ল "ঠিক"! হঠাৎ একটা খেয়াল হ'ল। খাঁ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম "কিছু নিম্‌কি মিঠাই আনিয়ে নেব কি?" নিমকি অর্থ যে কোনও নোন্‌তা খাবার। কিছুমাত্র সঙ্কোচ বা লৌকিকতা না করে সরল প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি বললেন, হাঁ হাঁ, কুছ্‌ পুরি-জিলেবিভি মঙ্গাইয়ে। ক্যা হরজ্‌?" অর্থাৎ সেই আসন্ন শরতের প্রাতে যদি দোকানীর দোকান থেকে পান-সিগারেট সমেত পুরি-জিলিপি প্রভৃতি কিছু বস্তু সংগ্রহ করা যায়, তাতে জগতের কার কী এমন ক্ষতি বা আপত্তি হতে পারে! বাস্তবিক কথা, ক্ষতি আমার নয়, খাঁ সাহেবের নয়, দোকানীর ত' নয়ই। আর নিকুনও আপত্তি করতে পারে না; কারণ ট্রামে উঠবার আগে সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, যাওয়া-আসার সমস্ত খরচ, মায় রাস্তায় (ভগবান না করুন) কোনও অপঘাত হলে টিংচার আওডিন ব্যাণ্ডেজ প্রভৃতির সমস্ত খরচ, অধিকন্তু সাময়িক জলযোগের খরচ—ইত্যাদি করে সমস্ত রকমের সম্ভাবনার জন্য সে প্রস্তুত; এতই ভক্তিশ্রদ্ধা করে সে আমাকে। অতএব—নিকুনকে বললাম, "টাকা খানেকের মতো কচুরি জিলিপি নিয়ে আসবি; পুরিও নিয়ে আসবি, যদি পাস; হালুয়া আর তরকারি ফাউ নিবি বেশি করে। তা ছাড়া এক প্যাকেট সিগারেট, একটা দেশলাই বাক্‌স, পান আর জরদাও নিয়ে আসবি। মিঠা পান; মনে থাকে যেন।" নিকুন ভাল-মানুষের মতো তক্তা ছেড়ে উঠেছে কি আওয়াজ হল "ঠিক-ঠিক"। নিকুন চলে গেল।

গম্ভীর হয়ে খাঁ সাহেবকে বললাম "খাঁ সাহেব! খুব হুঁশিয়ার আর আজব্‌ তখ্‌ত (সিংহাসন) এইটে আপনার! এর আদমিয়তি এসে গিয়েছে, মানুষের মতো জবাব দিচ্ছে! দু' চার রোজ বাদে হয়তো রেখব-গান্ধারও বলতে থাকবে মনে হচ্ছে; আপনার মতো গুণীর সঙ্গত্‌-সুহবত্‌ পেলে কী না হতে পারে!" খাঁ সাহেব সম্ভবত হাসবার চেষ্টা করেছিলেন; তাঁর চোখ বুজে গেল, গোঁফ-জোড়া উঁচু হ'ল, মুখব্যাদানও হ'ল। কিন্তু হাসি এতই গভীরে ছিল যে, বাইরে প্রকাশ হল না। মাত্র বললেন, "আপ দিল্‌লগী কর্‌ রহে হ্যাঁয়।" অর্থাৎ আপনি বুঝি ঠাট্টা করছেন। বুঝলাম, খাঁ সাহেব ও ধরণের কথার রস গ্রহণ করলেন না।

প্রসঙ্গ বদলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "খা সাহেব আপনার সাজ্‌ (বাদ্যযন্ত্র) কোথায় রেখে এসেছেন?" অর্থাৎ আমি তাঁর বীণার কথাই তুললাম। তিনি যথেষ্ট সপ্রতিভ হয়ে বললেন, "লাহোরে রেখে এসেছি তাকে, মেরামতের জন্য। তুম্বার যোড়ী বিগড়ে গিয়েছে তার।" তুম্বার যোড়ী অর্থাৎ বীণার লাউ বা বশের যুগল।

প্রসঙ্গত কিছু বলতে হচ্ছে যা পরে জেনেছিলাম। কলকাতার মান্যগণ্য গুণী ও গুণগ্রাহকেরা, যথা—বিশ্বনাথজী, বদল খাঁ সাহেব, শ্যামলালজী প্রভৃতিরা কেউ চর্ম-চক্ষে কালে খাঁ সাহেবের বীণা দেখেন নি। তবুও তাঁরা বলতেন কালে খাঁ সাহেব বীণা বাজাতেন। আমার ধারণা খাঁ সাহেবের বীণা একটা ছিল, নিশ্চয়ই। পরে অর্থাৎ ইং ১৯২০—২১ সালে ইন্দোরের প্রসিদ্ধ বীণকার মজিদ খাঁ সাহেবের বীণা বাদনে বিশিষ্ট একরকমের কারিগরী শুনে দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল, কালে খাঁ সাহেব বীণা শুধু বাজাতেন নয়, ভালই বাজাতেন; কিন্তু—এ সব কথা পরে হবে।

তখনকার প্রসঙ্গে মনে হয়েছে—কালে খাঁ সাহেব কিছুদিনের খেয়ালে বীণা বাজিয়ে সেটা ত্যাগ করেছিলেন; মেরামতের অজুহাতে। বীণ-বাজানের বা পুষে রাখার কাজে এত ঝঞ্ঝাট যে, এর মোহ কাটান খুবই সহজ। তিনি যে বললেন সেটা মেরামত করতে দিয়ে এসেছেন, সে কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেছি। তবে, ঐ ঘটনাটি সম্প্রতি না হয়ে সম্ভবত বিশ-ত্রিশ বৎসর পূর্বে ঘটেছে। হয়তো সেই মেরামতী বীণ লাহোরে কোনও দোকানঘরে নিভৃতে ঘুণ সঞ্চয় করে মিথ্যা প্রপঞ্চের মায়াভেদ করছে। হয়তো বা, সেই দোকানঘরটিই নষ্ট হয়ে গিয়েছে; অথবা দোকানের মালিক নির্বংশ হয়ে গিয়েছে। তবুও—খাঁ সাহেবের মনে সেই বীণাটি যেমন-কে-তেমনই আছে। কালে খাঁ সাহেবের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের পরে বুঝেছিলাম তাঁর অন্তঃকরণ হীরকের মতই স্বচ্ছ। সেই হীরার বনাই, যাকে বলে "কাটিং", একটু এলোমেলো, অসমান। অন্ধকারের মধ্যে একটু বে-কায়দায় নাড়া-চাড়া হলেই অতীত ও বর্তমানের সঙ্গতি-অসঙ্গতি সব একসঙ্গে ঠিকরে পড়ত তাঁর হৃদয় থেকে। কিন্তু সেই হৃদয়ে যখনই সুরের আলো জ্বলে উঠেছে, তখনই সেই অদ্ভুত প্রাতিভ-দীপ্তির মধ্যে অবলীন হয়ে গিয়েছে সে সব বিরূপতা বিসদৃশতা। মিথ্যা প্রবঞ্চনার অতীত ছিল সেই আত্মা, যে গহর বাইজীকে ডাইনী মনে করে শিউরে উঠত, আর নিজেকে সবচেয়ে বড় বীণকার মনে করে নিরীহ রকমের আত্ম-প্রসাদে নিমগ্ন হ'ত মাঝে মাঝে। গহর ছিলেন অপরূপ সুন্দরী, অসামান্য প্রতিভার অধিকারিণী। বিধির বিচিত্র বিধানে একটি নিন্দার কালিমা তাঁর জীবনকে ছায়ার মতো অনুসরণ করেছিল, যদিও সেই জ্যোতির খর্বতাসাধন করতে পারেনি; কেউ বলত তিনি যাদুগরণী, ডাইনী, কেউ বা বলত তিনি বিষকন্যা, যার সংস্রবই মারাত্মক! যাই হোক—সত্য হোক বা মিথ্যা হোক, কালে খাঁ সাহেব ঐ খ্যাতি এবং নিন্দার সমস্তটাই বিশ্বাস করতেন সরল মনে। আর নিজেকে বীণকার মনে করে আত্মপ্রসাদ লাভ করাটাই বা কী এমন বিচিত্র কথা, যখন দেখি বেসুরো গান গেয়ে, বেতালা বেকায়দায় নেচে শত শত লোক আত্মবিমূঢ়! পরপীড়ন হচ্ছে কি না, ধ্যান নেই ধারণা নেই, জ্ঞান নেই এদের! বরং আমি মনে করি কালে খাঁ সাহেবই ভাল। তিনি মনে মনে মনোবীণা বাজাতেন; মেজ্‌রাব দুটি বাঁ-হাতের আঙ্গুল ছেড়ে ডান-হাতের আঙ্গুলে চড়ে বসত না। পরপীড়নের প্রশ্নই উঠে না তাঁর পক্ষে।

কথায় ফিরে যাই। খাঁ সাহেবের শরীর মেজাজ ভাল আছে কিনা জিজ্ঞাসা করতে তিনি জানালেন মন-মেজাজ ভাল নেই তাঁর;

ছ' মাস কেটে গেল একটাও মাইফেল রোজগার হ'ল না; যার বাড়ীতে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন, সে বেচারা সেবা-খবরদারি করতে জানে না ওস্তাদ মুরশিদ্ লোকের। আর তবিয়ৎ ভাল থাকবে? কী করে ভাল থাকবে! বলেই তিনি টুপী আর গায়ের পাঞ্জাবী খুলে ফেললেন। এতক্ষণে বুঝলাম তিনি সেই মেরজাইটা ভিতরে পরেননি কেন। তাঁর বুক-পিঠ দাদের মত চর্ম্মরোগে ছেয়ে ফেলেছে। তিনি কখনও গোসল করেন বলে মনে হ'ল না। বুক-পিঠ চুলকাতে চুলকাতে তিনি বল্লেন, রাতে ঘুমই হয় না, এতে কি তবিয়ত ঠিক থাকে বাবুসাব? দেখে শুনে আমার মন বিষাদে ভরে গেল। যতবার তাঁর সেই উদাস দৃষ্টির ছবি আমার মনে জেগে উঠে, ততবারই আমার হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে, এখনও পর্যন্ত। ছলনা আর মিথ্যা কথা দিয়ে তাঁকে আবিষ্কার করেছিলাম, এতে আমার মনে অপরাধ বোধ হয়নি, হয় না। কিন্তু ঐ যে সামান্য ছ'পায়া সিংহাসনের কথা দিয়ে তাঁর সঙ্গে রসিকতা করেছিলাম, সেটা যে নির্ম্মম হয়ে আমার অজ্ঞাতসারে তাঁর দারিদ্র্যের প্রতি কটাক্ষপাত হয়ে থাকবে—একথা মনে ক'রে আমি অনুতপ্ত হয়েছি; এখনও অনুতাপ করি। তিনি যে রসিকতা বুঝেন না, এমন ধারণা নেই। কিন্তু সেই চপলতার বশে রসিকতা তাঁর পক্ষে শেলসম মনে হয়েছিল, এই চিন্তাটাই আমাকে পীড়িত, লজ্জিত করে এখনও।

জিজ্ঞাসা করলাম 'খাঁ সাহেব আপনি শ্যামলালজী দুলীচাঁদজীর মত মুরুব্বী লোকদের খবরাখবর নিলেন না কেন? তাঁরা যে আপনার গুণে মুগ্ধ'।

অকুণ্ঠিত চিত্তে খাঁ সাহেব উত্তর দিলেন, 'কৈমন করে তা হবে বাবুসাব। একটি সাফা মুরেঠা আর এক জোড়া সাফা কুরতা-পায়জামা ব্যবহার করিনে। কারণ একদিনের ব্যবহারে ময়লা-কুচলা হয়ে যাবে। রইস লোকদের বাড়ীতে দৌড়াদৌড়ি করতে হলে হর-বখত্ সাফ কাপড়া-লত্তার দরকার' বলে থেমে গেলেন। ফের বললেন, 'খএর, না গেলাম ত নাই বা গেলাম। খোদা যেদিন আমার মাথায় মুরেঠা চড়িয়ে দেওয়ার মর্জি করবেন, সেই দিনই চড়বে নয় ত নয়।'

অদ্ভুত, অতুলনীয় সেই অভিমানের কথা আর সুর আমার কানে লেগে রয়েছে। ক্ষোভের মুরেঠা অভিমানের বাক্সে বন্ধ করে খাঁ সাহেব নিবেদন করে রেখে দিয়েছিলেন খোদার মর্জ্জির উদ্দেশ্যে! মাত্র এক রাত্রির মাইফেলে তাঁর মাথায় রক্তজবা রং-এর মুরেঠা দেখেছিলাম। তখন মনে হয়েছিল অমন অপূর্ব রঙ আর শোভা'ত আর দেখিনি। খাঁ সাহেবের অন্তর্ধানের পরে বারবার মনে হয়েছে ও রকমের মুরেঠা উত্তর ভারতের দোকানে হাজার হাজার পাওয়া যাবে নিশ্চয়; আর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ফেটিয়ে নিয়ে মাথাটাও ভারী আর জমকাল করা যেতে পারে। কিন্তু সেই রাত্রির সেই অপূর্ব রাগরঞ্জিত শিরশ্চালন, আর আত্মভোলা আবেদন ত' দোকান থেকে পাওয়া যায় না।

এমন সময়ে নিকুন রসদ নিয়ে ফিরে এল। বলতে নেই, তখনকার দিনের হিন্দুস্থানী হালুইকরদের তৈরী এক টাকার পুরী, কচুরি, জিলিপি, মায় হালুয়া আর তরকারী! খাঁ সাহেব বাক্যব্যয় না করে অনায়াসে উদরসাৎ করলেন। খাঁ সাহেব প্রায় শেষ করে এনেছেন দেখে বল্লাম, 'খাবার জল আনিয়ে দিই?' মিথ্যা কথা বলব না; পাত্রের মধ্যে মাত্র একটি বদনা। সেটা আমি কিছুতেই ছুঁতে পারতাম না। কিন্তু তাঁর যৎসামান্য সেবা করতে কুণ্ঠিত ছিলাম না মোটেই। তিনি হুকুম দিলে যেন তেন প্রকারেন অন্তত দোকানের মেটে শরবতী খুরি করেও জল এনে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। যাই হোক, তিনি ঠিক সেই মুহূর্তে গুটি কয়েক কচুড়ী আর খানদুই জিলিপি একসঙ্গে চর্বণ-পেষণের কার্যে রত ছিলেন। আমার কথা শুনে তিনি বাঁ হাতখানি ঊর্ধ্বে উঠিয়ে এমন করে নেতিবাচক সঙ্কেত করলেন যাতে করে মনে হ'ল, তাঁর পক্ষে জল খাওয়াও যা, বিষ খাওয়াও তাই। খাওয়া শেষ হ'লে পাতাগুলি উঠিয়ে নিয়ে আর বদনাটি নিয়ে তিনি নীচে নেমে গেলেন মুখ হাত ধুতে।

নিকুনকে আমি বললাম, "তবু ত' কাল রাত্রিতে খাঁ সাহেবের নিমন্ত্রণ ছিল" আর বলিতে হ'ল না। নিকুন হাসি চাপতে গিয়ে গলায় বিষম লাগে, আর যতবার কাসতে যায়, ততবার তক্তাপোশটি বিরক্তির আওয়াজ করে শাসিয়ে দেয় নিকুনকে।

আমাদের মধ্যে জল্পনা কল্পনা হচ্ছিল

খাঁ সাহেবকে একটা মুজরা পাইয়ে দিতে হয়। শেষে আমি বললাম, 'দাঁড়া আগে একটু গলার সুর শুনে নিই, তারপর সে চিন্তা'। নিকুন বলল, 'ইনি কি সহজে গাইবেন?' আমি বললাম, 'দেখাই যাক না একটু চেষ্টা করে; ক্ষতি কি।'

খাঁ সাহেব বদনা হাতে উঠে এলেন অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত ভাব নিয়ে; গামছায় মুখ হাত মুছে নিলেন। পরে তক্তাপোশের একধার ঘেঁসে এমন করে চিৎ হয়ে শুলেন, যাতে আমাদের অসুবিধা না হয়। যেন সকাল বেলার সব কাজ মিটে গিয়েছে; বাঁকি শুধু আরাম করা। আমি বললাম, 'খাঁ সাহেব, পান খান, সিগারেটও মজুদ রয়েছে আপনার জন্য।' তিনি বললেন, 'হাঁ, হাঁ ঠিক কথা। ওটা আমার খেয়াল থেকে উতরে গিয়েছিল'; বলেই উঠে বসলেন। পান মুখে পুরলেন। তারপর ধীরে ধীরে সিগারেট ধরিয়ে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর গোড়ার মধ্যে তাকে কয়েদ করে লম্বা লম্বা টান দিতে থাকলেন। দেখলাম মুখে আবার সেই উদাস ভাব এসেছে, চোখের দৃষ্টি দূরে চলে গিয়েছে।

বুকে সাহস সঞ্চয় করে বললাম, 'গোস্তাকি মাফ করেন ত' একটা আরজ করি খাঁ সাহেব'। তিনি অবিচলিতভাবেই বললেন, 'হাঁ হাঁ কহিয়ে বাবুসাব।' আমি বললাম, 'আপনার গলার একটু সুর একটু ছেড়-ছাড় শুনতে পাব কি?' ঠিক করেছিলাম সরল মানুষটির সঙ্গে সরলভাবেই কথা চালিয়ে যাব এখন থেকে।

তিনি ছোট্ট একটি হাঁই তুলে বললেন, 'এখন বখ্‌ত নয়, মেজাজও আসছে না' বলে একটু থেমে বোধ হয় করুণা করেই বললেন, 'খএর মোকা মিলনে পর কভি সুনাউঙ্গা', অর্থাৎ 'যাই হ'ক, সুযোগ হলে কোনও না কোনও দিন শোনাব'। প্রশ্নের খুব সরল জবাব। অবশ্য এছাড়া আর কী হতে পারে! সামান্য কচুরি-জিলিপির ভোগ দিয়ে যদি কালে খাঁ সাহেবের মত লোকের মন ভিজান যেত, তাহ'লে ত' ভাবনাই ছিল না।

আমি চুপ করে থাকলাম কিছুক্ষণ। ভাবছিলাম খাঁ সাহেব আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে এলেন কিজন্য, কি উদ্দেশ্যে। আমাদের মাথায় হাত বুলিয়ে প্রাতঃকালীন 'নাস্তা'টা সেরে নেওয়ার জন্যে নয়, নিশ্চয়ই; সে মানুষই নন খাঁ সাহেব। তবে কি জন্যে? তখন ভেবে ঠিক করতে পারিনি। এই নির্জন আবাসে কিছুক্ষণের জন্য সঙ্গলাভ করা? মানুষের সঙ্গে কথা বলার জন্য? কি জানি!

পরে ভাবলাম সোজা আঙুলে ঘি উঠে না। অথচ এক কলসি ঘি সামনে রয়েছে। একটু নমুনা দেখবার চেষ্টা করতেই হবে। আমি যে কত বড় বেহায়া, খাঁ সাহেব ত' স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি।

আবার বললাম, "খাঁ সাহেব! এই বে-শরম না-লায়েক আপনার সামনে আর একটি আরজ পেশ করতে ইচ্ছা করে, যদি আপনার ইজাজত্ (অনুগ্রহপূর্বক অনুমতি) পাই'। তিনি নির্বিকার চিত্তে বললেন, 'হাঁ হাঁ কহিয়ে আপ'। তখন আমি বললাম, 'খাঁ সাহেব একখানা উতরি রেখবওয়ালা (কোমল রেখব দেওয়া) আসাওরির চিজ্ (জিনিষ, গান) পেয়েছি। কিন্তু অল্প একটু বাঢ়ত ফিরত্ করতে গেলে উতরি রেখবের ইজ্জত্ থাকছে না। যাই হ'ক রাগের শকল্ (চেহারা) ঠিক আছে কিনা যদি কৃপা করে"—বলেই বদ্ধাঞ্জলি হ'লাম। অর্থাৎ এই না-লায়েক নির্লজ্জ পাঁচু সাণ্ডেল কালে খাঁ সাহেবকে আসাওরির এক কলি শুনাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে; তাঁর অনুমতির অপেক্ষা করছে।

আমার এই দুঃসাহসের নিবেদন শুনে তিনি যেন বর্তমানের বাস্তবে নেমে এলেন। কিন্তু তিনি 'নারভাস শক্' পাননি; খাঁ সাহেবের কলেজা সিংহের কলেজা! আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'অচ্ছা! আপনি গানও করেন! খুব আশ্চর্য কথা! আপ দিল্‌লগীভি করতে হ্যাঁয়, ঔর গানাভি গা লেতে হ্যাঁয়! ক্যা কহ্ না'! বলে এমনভাবে নীচের দিকে তাকালেন, যার অর্থ—যে ঠাট্টা তামাশা করে, তার পক্ষে গান করাটা খুবই অদ্ভুত। যাই হ'ক, খাঁ সাহেবের কথা শুনে আমি হপ্‌কে গেলাম। চুপ করে থাকলাম।

দেখলাম, তিনিও যেন কি ভাবছেন। মনে করলাম কী আর ভাববেন। তিনি নিশ্চয়ই তাঁর দুর্বিষহ জীবনকে ধিক্‌কার দিচ্ছেন, আর মনে মনে বলছেন তোর পোড়া কপালে এত'ও ছিল! হা ভগবান! একটা ফচ্‌কে ছোঁড়ার মুখে গান শুনতে হবে। আপদগুলো বিদায় হ'লে যে বাঁচি......।

কিন্তু তিনি হঠাৎ বল্লেন, 'অচ্ছা, অচ্ছা, সুনাইয়ে বাবুসাব' বলেই চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লেন, মাথার নীচে দু'খানি হাত রেখে। তক্তাটা সে'বার অত্যন্ত অপমানসূচক সুরে 'ঠিক ঠিক' বলেছিল। দেখি খাঁ সাহেবের চক্ষুদুটি মুদ্রিত প্রায়, দেহ শিথিল; শ্বাস উঠছে আর পড়ছে।

নিকুন ফিস্ ফিস্ করে আমার কানে বলল, 'আর কেন পাঁচদা। এবার যাওয়া যাক।' আমি লজ্জাটা গায়ে না মেখে গম্ভীর মৃদু স্বরে বললাম, 'দাঁড়া। আগে নাক ডাকুক। গান শুনি না শুনি, নাক ডাকার সুরটাও ত' শুনতে পাব!' কথাটা শুনে তরলমতি নিকুন যেমনি হাসি চাপতে গিয়েছে, অমনি তক্তাপোশ 'ঠিক' করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গেই খাঁ সাহেব বলে উঠলেন, 'গাইয়ে বাবুসাব, গাইয়ে। শরমাইয়ে মত।'

খাঁ সাহেবের অভিমান হতে পারে, আর আমার বুঝি অভিমান হ'তে পারে না? বললাম, 'খাঁ সাহেব আপনি এখন সুস্ত (ক্লান্ত) হয়েছেন, আপনাকে আর দিক্ করতে চাইনে।' খাঁ সাহেব তৎক্ষণাৎ উঠে বসলেন। বললেন, 'নহি, নহি বাবুসাব, আমিত' একটু আরাম করছিলাম মাত্র। আপনি গান করুন।' বুঝলাম, এবার খাঁ সাহেব দুঃসহ অথচ অনিবার্য ভবিতব্যকে সহ্য করে নেওয়ার মত মানসিক শক্তি সঞ্চয় করে নিয়েই যেন গা-ঝাড়া দিয়ে উঠলেন। আর সেই তক্তাটাও যেন সমর্থন করল তাঁর মনের ভাব।

খুব বড়ো চোখ করে নিকুনের দিকে তাকালাম; সে বুঝুক, আর সাক্ষী থাকুক, যে স্বয়ং কালে খাঁ সাহেব পাঁচু সাণ্ডেলকে দু-দুবার গান করতে বললেন। কিন্তু আমার পোড়া কপাল! নিকুন কথাটা তলিয়ে বুঝল না। বলল, 'পাঁচদা! শিগ্‌গির ধরে দিন। নইলে আবার শুয়ে পড়বেন উনি। ধরুন, ধরুন, আর দেরি করবেন না, পারা যাচ্ছে না।' বুঝলাম নিকুনের পেটে খিদের আঁচ লেগেছে। তাহ'লেও নিকুন হয়ত খুব বাজে কথা বলেনি। আর একবার দুর্গা নাম স্মরণ করে তাঁরই ভর্তার নামে গান ধরে দিলাম 'তুয়া চরণকমলপর মনভ্রমর ভালভান যঁউ চন্দ চকোর।' কলিকাতার কোনও এক গায়ক সম্প্রদায় এই মধুর গানটি চালু করে দিয়েছিলেন; শুনে শিখেছিলাম। বিশ্বনাথজীর সঙ্গে পরিচয়ের পরে তিনি সুরের ভাঁজগুলি স্থানে স্থানে শুধরে দিয়ে বলেছিলেন, এটা যেমন আছে তেমনি গাইবেন, কারদানী করতে যাবেন না যেন। আরও বলেছিলেন 'ভালভান' শব্দের 'ভান' হ'ল 'বহন' অর্থাৎ বহ্নি শব্দের অপভ্রংশ; ভালভান্ অর্থ কপালে যার বহ্নি, অর্থাৎ মহাদেব। বিশ্বনাথজী

মনে করতেন, এই আশাওরির পদটি ধ্রুপদের ঢংএ গান করেই এর মহিমা পরিস্ফুট করা যায়, আর রচয়িতাও ধ্রুপদ মনে করে রচনা করেছিলেন। কিন্তু সাধারণে প্রচলিত হওয়ার পর গায়করা একে খেয়ালের ছাঁচে ফেলে রূপান্তরিত করে ফেলেছে; যার ফলে গানের মধ্যে আশাওরির বিশুদ্ধতা রক্ষা হ'ত না। একথাটা তখনকার নাটোর মহারাজকুমার শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায় এবং আমি বুঝে স্বীকার করে নিয়েছিলাম। কিন্তু অল্পস্বল্প কারদানী করার লোভটা ছিল আমাদের; লোভের বশে পরীক্ষাও করতাম, আর বিপদ টেনে আনতাম। যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে ঐ বিপদের কথা বলি, কারণ ইচ্ছাকৃত বিপদের সংগে কালে খাঁ সাহেবের বৃত্তান্ত জড়িত আছে।

খেয়ালের ঢংএ একটু এদিক ওদিক চলতে ফিরতে গেলেই ঐ গানটির মধ্যে ভৈরবী বা জৌনপুরীর ভেজাল এসে পড়ত। 'এলই বা!' বলে উড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপার নয় এটা। অথবা অজ্ঞাতসারে কোমল রেখবটি চড়ে গিয়ে তীব্র রেখব হ'ত; তখন। পরে বদল খাঁ সাহেবের সঙ্গে পরিচয়ের পরে দেখলাম, জবরদস্তি করে রেখবের কোমলত্ব সুরক্ষিত করলেও হয় বিলাসখানি না হয় খট্ ভৈরবীর (খুব চলতি দৃষ্টান্ত 'বিপদবারণ তুমি নারায়ণ লোকে বলে তোমায় করুণানিধান' গান) চেহারা এসে পড়ত এবং বদল খাঁ সাহেবের মুখের অভ্যস্ত বুলি স্মরণ করে বলতে হয় আশাওরির 'হলাকৎ' (অপমৃত্যু) ঘটল। সম্ভবতঃ এ সকল কারণে খেয়ালীরা উতরা রেখবকে ছেঁটে ফেলে দিয়ে তার স্থানে চড়ি রেখব কায়েম করেছিল; একটু নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য। কিন্তু আমরা নিশ্চিত হতে পারিনি; আমি ও শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায় তখনও নয়, এখনও নয়। কারণ এতাবৎ দেখে আসছি কলাবন্ত খেয়ালী (একজন বাদে বাকী নিরনব্বই জন) চড়ি রেখবের আশাওরি দেবীর ভোগ-রাগ-সাজিয়ে মহানন্দে গানের পূজায় মেতে গিয়েছেন, খেয়ালের কল্পনা বিলাসে চোখ বুঁজে এসেছে। কিন্তু খেয়াল নেই যে, পিছনকার খিড়কি দিয়ে সুচতুরা সিন্ধু-ভৈরবী আর যাদুমণি জৌনপুরী এসে পূজারীর অজ্ঞাতসারে নৈবেদ্যগুলি নিজেদের ভোগে চড়িয়ে দিচ্ছেন বা বেমালুম লুটে নিয়ে যাচ্ছেন আর লোভে লোভে ফিরে আসছেন। এমনও মনে হয়েছে আমাদের যে, সিন্ধুভৈরবী আর জৌনপুরিকে পৃথক, বিশিষ্ট করে জানার থেকে না জানার আনন্দটাই বেশী; না জেনে বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে গাওয়া যায়, সুর খেলান যায়; কি মজা! কিন্তু জানা মানেই বিপদকে টেনে আনা! যাক্, প্রসংগে ফিরে আসি।

খাঁ সাহেব অর্ধ নিমীলিত নয়নে বসে। আমি থামতেই বললেন, 'মিঁয়া আগে বঢ়িয়ে' অর্থাৎ অন্তরাতে এগিয়ে চলুন। আমিও অন্তরাটি মাছিমারা রকমে শেষ করে নিছক আন্দাজে নূতন কায়দায় মুহরা অর্থাৎ গানের মুখটি সাজিয়ে গান করতেই তিনি বলে উঠলেন' এয়সা মত কীজিয়ে বাবুসাব। ইস্‌সে অন্তাইকা ডৌল বিগড় যাতা হ্যায়' অর্থাৎ ওরকম করলে গানটার মূলগত অস্থায়ীতে আশাওরির যে চেহারা, সেটা নষ্ট হয়ে যায়। যাবেই ত! নইলে করলাম কেন! বললাম 'মেহেরবানি করে একটা নূতন কায়দার মুহুরা বাতলান। আমি সারা জীবনভর সেইটে সাধনা করব।'

তিনি আমার কথাটা কিভাবে নিলেন জানিনে। বললেন, 'ঠিক হ্যায়। মগর শুনিয়ে'। এর অর্থ সম্ভবতঃ এই যে, তোমার সাধনার কথা রাখো, সে কথা যাক। এখন শোন' মন দিয়ে।

বলেই তিনি গুণগুণ্ করে নিমেষের মধ্যে আমার সুরের খাদের পঞ্চমে নিজের সুর কায়েম করে নিলেন। আমার সুরটি ছিল বেশ চড়া। যাই হোক, খাঁ সাহেব নিজ কণ্ঠে গানের মুখটি ধরেই আছাড়! যেন একটা কুস্তির প্যাঁচ হয়ে গেল পালকের মধ্যে। এমন একটি অভাবনীয় অথচ সুন্দর মুহুরা জাহির হ'ল, যেটা অতি চমৎকার, বিস্ময়জনক এবং নিরতিশয় কঠিনও বটে। স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে আমার মন, নিখুৎ সুরেলা কণ্ঠের সেই কারিগরী প্রত্যক্ষ করে। এর পরেই আরম্ভ হ'ল, অবশ্য যতদূর মনে পড়ে একটির পর একটি করে নূতন মুহরা, আর তারই জমিতে একটির পর একটি বিস্তার আর বিরতির লহর। গানের আরম্ভের কথাগুলি যেন ভেসে যাচ্ছে এদিক ওদিক, কখনও বা ঘূর্ণিপাক খেয়ে তলিয়ে যাচ্ছে সুরের তরঙ্গে, তরঙ্গের গভীরে; কখনও বা সঙ্গীহারা হয়ে অকস্মাৎ দেখা দিচ্ছে তরঙ্গের চূড়ায়। ক্রমে তাদের আর দেখা পাওয়া যায় না; বিস্তারের পর বিস্তারের বন্যা বয়ে যেতে আরম্ভ করল। কথা দিয়ে বাঁধা গানের তরী ওলট-পালট খেতে খেতে কোথায় অদৃশ্য হয়েছে কে জানে, কে খবর রাখে! সুর-তরঙ্গের কলকল্লোলে ভেসে চলেছে আমার অনুভব। এর কি বিচার-বিশ্লেষণ সম্ভব! মাত্র গোড়ার দিকের একটা কথা স্মরণে আছে। সমস্ত কাজগুলি হচ্ছিল জমজমার বুনানি দিয়ে, যার মধ্যে চমক দিয়ে উঠছিল ছোট্ ফিরতের ফুল তোলা মনোহারী নক্শা। এর বর্ণনা হয় না, বিজ্ঞাপনা

অসম্ভব। মাত্র অনুভবই 'সর্বক্ষণ উদগ্র থেকে আমাকে জানিয়ে দিয়েছিল, আশাওরির, কোমল রেখবওয়ালা আশাওরির ধ্যানমূর্তি যত বা উজ্জ্বল হতে' উজ্জ্বলতর হয়েছে, তত' বা বিক্ষেপচঞ্চলা সুর-নর্তকীর আবেদন-নিবেদন তীব্র, হতে তীব্রতর আবেগে লুটিয়ে পড়ছে যেন, সেই নটরাজেরই চরণে। গানের ভাষা যেন ছিল মাত্র লোকাতীত অনুভবের একটা ইঙ্গিত। সেই অবর্ণীয় অনুভবই যখন সংবিদে দেখা দিল, তখন আর ইঙ্গিতে প্রয়োজন কি! মিলনের পূর্বে চন্দ্র চন্দন কোকিলের উদ্দীপনার সার্থকতা আছে বুঝি। কিন্তু দেখা হ'লে এরা যেন মিলিয়ে যায় সেই মিলনের মধ্যে: তখন জ্যোৎস্নাই বা কি, সুগন্ধই বা কোথায়, আর কুহু-ধ্বনিই বা কিসের জন্য! তখন সব একাকার!

আরম্ভের দিকে মাত্র আর একটি কথা আবছায়ায় মনে পড়ে। যে স্বল্পক্ষণ পর্যন্ত আমার বস্তুগ্রাসী চেতনা সজাগ ছিল, বিস্তারগুলির বৈশিষ্ট্য আর চমৎকৃতি আমার জ্ঞানবৃত্তিকে উৎকুলিত করে দিয়ে ছিল, মাত্র সেই সময়েই আমি দু' একবার 'আহাঃ' উচ্চারণ করে ফেলেছিলাম। কিন্তু তারপর বহুক্ষণের কথা বিশেষ মনে নেই। নির্বিশেষে সুর আর নিরুপম অনুভব দিয়ে যেন সমস্ত ঘর, আকাশ, বাতাস ভরে গিয়েছে। অভিনব পরিচয়ের স্মরণীয় অভিজ্ঞতা বলতে সব কিছু লোপ পেয়ে গিয়েছে তখন।

সেই জ্ঞানহারা বহুক্ষণটি কতক্ষণ? এ প্রশ্নের সামাধান হয়েছে পরে, আমার আর নিকুনের আলোচনার ফলে। ট্রামে উঠেছিলাম বেলা সাতটায়, খাঁ সাহেবের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করে শেষে তাঁর আবাসে পেঁাছিয়ে স্থির হয়ে বসে তাঁর জলযোগ শেষ হয়ে গান শুরু হ'তে বেশী পক্ষে বেলা আটটা হবে।

আমরা যখন সুরের লীলার মধ্যে আত্ম-সমর্পণ করে মুগ্ধ হয়ে বসে আছি, তারই মধ্যে কোনও একসময়ে একটি অবান্তর ঘটনা ছায়ার মত দেখা দিয়েছিল আমাদের চেতনায়। দরজার সামনে লক্ষ্মী প্রতিমার মত একটি বালিকা, আর তার পাশে একজন বাঙালী ভদ্রলোক, খালি গায়ে আর মনে পড়ে এক ছড়া সোনার চেন গলায় ছিল তাঁর—ভাসাভাসারূপে দেখা দিলেন। ঐ সময়ের সামান্য কিছু কথা মনে আছে। খাঁ সাহেব সুরের অপূর্ব ভঙ্গি দিয়ে এক অদ্ভুত রকমের বড় বড় পাল্লার গমক সৃষ্টি করে চলেছেন। এর মত ব্যাপার ইতিপূর্বে কখনও প্রত্যক্ষ করিনি। আর মনে পড়ে, খাঁ সাহেবের সেই সুরে হারিয়া যাওয়া চাহনি; আর মাঝে মাঝে তাঁর ডান হাতটি ডান কানের কাছে চলে যায়। আর বা হাতটি একবার উঁচু হয়ে উঠে ঘুরতে ঘুরতে নীচের দিকে নেমে এসে তক্তাটি ছুঁয়ে যায়, আবার কী জানি কেন উঠে যায়। এত' সে কালে খাঁ নয়! সে কালে খাঁ দেহ ও মনের রোগ, বাতিক, দারিদ্র্য ও দুশ্চিন্তায় বিষণ্ণ মলিন উদাস ও উদ্বিগ্ন একটি মূর্তি। আর এই মুহূর্তের এই কালে খাঁ? সশ্রদ্ধ বিনতি জানিয়ে মন আমাকে বলে, তুমি এই জ্যোতিপুঞ্জ বিগ্রহ, এই শ্রুতিমন্ত্রের ধ্যানী সাধক, এই আশাওরি রসধারার অমৃত প্রস্রবনস্বরূপ সত্যকার কালে খাঁর বর্ণনা করতে চেষ্টা করো না; কারণ পারবে না, পারবে না তুমি। তোমার কাজ শুধু এই

হীরের টুকরাকে বাইরের আবরণ, ময়লা-মাটি থেকে মুক্ত পরিষ্কৃত করে তোমারই স্মরণের অঞ্জলিতে তুলে ধরা। একে যখন আবার স্মৃতির দেউলে রেখে দেবে, তখন বুঝবে তুমি নিজেই গ্লানি থেকে মুক্ত হয়েছ, তোমার ক্লান্তি অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছে শ্রমের সার্থকতা দিয়ে অনুভবের সুধা পান করে। এইটুকুই তোমার পক্ষে যথেষ্ট। মনের কথা শুনে ক্ষান্ত হই আমি, আমি যে কত অক্ষম, তা আমি জানি আর আমার মনই জানে।

ঐ লক্ষ্মীমূর্তি আর ভদ্রলোকটিকে আমরা বসতে বলিনি, অভিবাদন করিনি। খাঁ সাহেব তাঁদের লক্ষ্যই করেননি সম্ভবত। এ'রা কখন চলে গিয়েছিলেন তাও মনে নেই।

গান শেষ হতে না হ'তেই সেই ভদ্রলোকটি এসে দাঁড়িয়েছিলেন, দ্বিতীয়বার। সর্বপ্রথমেই মনে পড়ছে খাঁ সাহেব সেই তক্তাপোশের উপর ডান হাঁটু গুটিয়ে সোজা হয়ে বসে সিগারেটের প্যাকেট থেকে সিগারেট বার করে তাতে অগ্নি সৎকার করছেন। আমি ও নিকুন চুপ করে বসে তখনও। এমন সময়ে সেই মেয়েটি আবার উপস্থিত হয়ে ঐ ভদ্রলোকটিকে বলল, 'বাবা দশটা বাজতে দেরি নেই, মা বলল, তোমাকে চান করে নিতে।' দশটা বাজতে দেরি নেই! আমি আর নিকুন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করি। প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে বসে আমরা গান শুনেছি, কিন্তু কিছু বুঝতে পারিনি সময় কোথা দিয়ে চলে গিয়েছে!

খাঁ সাহেব সিগারেট টেনে চলেছেন নির্বিকার চিত্তে। আমি কথা বলতে গিয়ে দেখি আমার গলা ভার হয়ে গিয়েছে, কি আশ্চর্য! খাঁ সাহেবকে উদ্দেশ করে বললাম, 'ভগবান আপনাকে শত বৎসরের জিন্দগি আর জান্‌দারি দিয়ে বাঁচিয়ে রাখুন।' ভগবানের নামে তিনি মাথানত করেছিলেন। একটু পরেই হাসি মুখে বললেন, 'কে'ও বাবুসাব, আপ্ রাজি হুয়েত?' হায় হায়! আমার মত অর্বাচীনের রাজি হওয়ার প্রশ্ন ঐ লোকের মুখে! লজ্জিত হয়ে বললাম, 'আমার চেয়ে কত বড় বড় সমঝদার আর কদরদান লোক আপনার তারিফ করে চুকেছেন। খাঁ সাহেব! আপনার গলার সুর আর লিয়াকতের তারিফ করার যোগ্যতা কি আমার আছে? তবে জেনে রাখুন, আপনার মেহেরবানি আর সুর আমদের হৃদয়ে ভরে থাকল, কখনও স্মরণ থেকে চলে যাবে না।'

কিন্তু আশ্চর্য এই কালে খাঁ সাহেব! তিনি যেন আমার কথায় সন্তুষ্ট হতে পারেননি। আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'ঠিক হ্যায় ঠিক হ্যায় বাবুসাব। লেকিন আপ্ খুশিত' হুয়ে? ইয়েভিত' কহিয়ে।' ভগবানের কৃপা প্রার্থনা করলে হবে না। রাজি হ'লেও হবে না। খোলাখুলিভাবে খুশি হ'তে হবে এবং সেই কথাটি তাঁকে জানিয়ে দিতে হবে! এমন খুশ-কাঙ্গাল ত' দেখিনি! আর কেনই বা এত তার কাঙ্গাল-পনা যে অমন সম্পদের মালিক হয়ে বসে আছে! এ জীবনে বুঝিনি আমি তার রহস্য। যাই হ'ক—উত্তর দিয়ে বললাম খোলসা করে 'খাঁ সাহেব! ওকথা ফজুল (অনর্থক) জিজ্ঞাসা করছেন আমাকে! খুশী! আমাদের দিলভরে গিয়েছে। সেখানে অন্য কোনও লোকের আসাওরির যায়গা আর থাকল না। এর পরে কেউ যদি আমাকে আসাওরি শোনাতে চায় ত' আমি তাকে বলব কালে খাঁ সাহেবের আসাওরি কি শুনেছেন? যদি না শুনে থাকেন ত', আগে সেই আসাওরি শুনে এসে তারপর আপনার আসাওরি শোনাবেন।' আমার কথাটা দ্বিতীয়বার যাচিয়ে নিতে পারিনি, এত দিনেও। এত' গান আর রাগ শুনলাম এপর্যন্ত; কিন্তু কোনও খেয়ালীর মুখে উতরি রেখবওয়ালা আশাওরি জাহির হ'তে দেখলাম না। চড়ি রেখবের আশাওরি অর্থাৎ জৌনপুরি, সিন্ধুভৈরবী, দেশী তোড়ীর ভেজাল দেওয়া আশাওরি শুনেছি অজস্র। যখনই শুনি তখনই মনে হয়, কোথায় সেই বিশ্বনাথজীর ধ্রুপদের আশাওরি, সেই কালে খাঁ সাহেবের খেয়ালের আশাওরি।

আমার প্রাণখোলা কথায় খাঁ সাহেব খুশী হয়েছিলেন কিনা জানিনে। ওরকম লোক বাস্তবিক কিসে খুশি হয়, কিসে হয় না বুঝা দুস্কর। কিন্তু আমার কথার শেষে একটা হুল ছিল; খাঁ সাহেব তাতে আপত্তি জানিয়ে সরল, গম্ভীরভাবে বললেন, "নহি বাবুসাব্, এয়সা মত্ কহিয়ে। গুণীওমে এক্‌সে এক হ্যায়। আল্লাহি জানে হরেক ইনসান্‌কে দিমাগ্ কিস্ কদর লায়েকিসে ভরা হুয়া হ্যায়। ফির্ হমারে আপ্‌কে কহ্‌নেমে ক্যা হক্ হ্যায়!" অর্থাৎ আমরা যে গুণীদের তুলামূল্য করে থাকি, সে কথায় হক্ অর্থাৎ সত্য নেই। কারণ—একের থেকে বড় আর গুণী আছে। একমাত্র ভগবানই জানেন প্রত্যেক মানুষের মধ্যে কতখানি লায়েকি অর্থাৎ গুণ ও শক্তির যোগ্যতা আছে। ভগবানই সর্বজ্ঞ; কিন্তু আমি আপনি ত' সর্বজ্ঞ নই! অতএব—ও-রকম কথা আমাদের মুখে সাজে না।

আমার এ ক্ষুদ্র জীবনের অভিজ্ঞতায় বুঝেছি খাঁ সাহেবের কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। যেমন প্রিয় আর বিচিত্র সত্য, তেমনি অপ্রিয় আর একঘেঁয়ে সত্য। আমি কি ভারতের সমস্ত গুণীর গান শুনেছি, না কি, খবর রাখি? কখনও নয়। কিন্তু যাঁদের জানিশুনি, তাঁদের মধ্যে কেউ দরবারীর সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে পারেন, ত' খাম্বাজের বেলায় পারেন না; কেউ হয়ত তোড়ীতে সিদ্ধ কিন্তু তিলককামোদে কাঁচা! এর মধ্যে ভগবানের হাত রয়েছে। এক একজন এক এক রকম; প্রত্যেককে ওজন করে তুলনা করতে যাওয়াটা অত্যন্ত অনধিকার স্পর্ধার কথা। বরং ভগবান কার মধ্যে কোন বিষয়ে কতখানি উদ্ভাবনী প্রতিভা ছিটিয়ে দিয়েছেন, সেই প্রতিভার সাক্ষাৎ করা, সম্মান করাটাই হ'ল সেরা কাজ; কার মধ্যে কি নেই এ রকমের অনু-

সম্মিৎসা নির্বোধেরই কাজ। ময়ূরের শুঁড় নেই, হাতি পেখম ধরতে পারে না এরকমের বিচার করা শিল্পকলার সমালোচনা নয়; ওটা কিছুই নয়, গালগল্প মাত্র।

সেদিনকার মত মনে পড়ছে খাঁ সাহেবের গম্ভীর মৃদু স্বরের বাহনে ঐ কথাগুলি কত সুন্দর সত্য ও যথার্থ বিনয়কে আমার হৃদয়ের মধ্যে পেঁছিয়ে দিয়েছিল। এর পরেও ও ধরণের কথা শুনেছি যথার্থ গুণীদের মুখে। কিন্তু ও কথা প্রথম শুনেছিলাম কালে খাঁ সাহেবের মুখে; এত মিষ্ট লেগেছিল যে, তার স্বাদ এখনও ভুলতে পারিনি।

এর পরেই খাঁ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম, "খাঁ সাহেব! বেআদবী মাফ্ করবেন। আপনার মাথায় সেই মুরেঠা চড়াতে কত দক্ষিণা লাগে জানতে ইচ্ছা করি।" তিনি তৎক্ষণাৎ বল্‌লেন, 'কাহে?' আমি তাঁকে বুঝিয়ে দিলাম যে ভগবানের অনুগ্রহ হলে হয়ত অবিলম্বে তাঁর জন্য একটা মুজ্‌রার বন্দোবস্ত করতে পারি।" দেখি মজুরার কথায় তিনি খুবই আগ্রহ করলেন। বল্‌লেন, "আমার মজ্‌রা পঞ্চাশ টাকা। কোথায় মুজ্‌রা হবে?" এমন অকপট মন আর বালকের মত আগ্রহও ত' দেখিনি!

বল্‌লাম তাঁকে, "কোথায় হবে আমি আজ সন্ধ্যায় এসে খবর দিয়ে যাব। তার জন্য চিন্তা নেই। তবে একটা কথা আপনাকে বলি। যেখানে বন্দোবস্ত করব মনে করছি সেখানে ভগবান শুধু পয়সাই দেননি, তার উপরে দিল্ দিয়েছেন আর রেখব-গান্ধারের সমঝ্‌ভি দিয়েছেন।" আমার কথা শুনে খাঁ সাহেবের আকুলতা, উৎফুল্লতা দেখে কে! তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার তরুণ-মনে একসঙ্গে যে হর্ষ বিষাদ উপস্থিত হয়েছিল, সেরকম আর হয়েছে কিনা সন্দেহ।

খাঁ সাহেবকে বহুবার আদাব জানিয়ে আপ্লুত হৃদয়ে যখন আমরা উঠে তাঁর নিকট বিদায় প্রার্থনা করলাম, তখন সেই নগ্নদেহ বিগ্রহটি দু'হাত দিয়ে আমার হাত চেপে ধরলেন! আর বল্‌লেন, "বাবুসাব! আপনি সন্ধ্যাবেলা আস্‌ছেন ত?" বলে এমনভাবে তাকালেন আমার দিকে যে, আমি অনুভব করলাম আমার কণ্ঠের মধ্যে কী যেন এসে আটকে গিয়েছে, আমি কথা বলতে পারছিনে; আমার চোখের জল ধরে রাখা কঠিন মনে হয়েছিল। কোনও রকমে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে, মাত্র মাথা নেড়ে তাঁকে বুঝিয়ে দিলাম যে, প্রতিশ্রুতি পালন করব। ভগবানকে ডাকার অভ্যাস ছিল না। কিন্তু তখন আমি মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম—আমার মুখের কথাটা যেন রাখতে পারি। ভগবান সে প্রার্থনা শুনেছিলেন, মঞ্জুরও করেছিলেন।

আমরা যখন উপর থেকে নীচে নেমে এসেছি তখন সেই ভদ্রলোকটি সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করলেন। বল্‌লেন, তিনি এই গরীবখানার মালিক। আমরা তাঁকে আগে খাতির করিনি বলে ক্ষমা চাইতে তিনি বললেন, "ও কথা বলতে হবে না। আপনারা তখন নেশায় ভরপুর" ইত্যাদি। বাদ সাধ দিয়ে সংক্ষেপে বৃত্তান্ত বলতে তিনি আশ্চর্য হয়ে বললেন, "তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু ছ-মাসের মধ্যে ও'র গলা থেকে সুর বার করতে পারিনি, মশায়। সন্ধ্যার আগেই বেরিয়ে যান। সকালে বলেন, মেজাজ ঠিক নেই। ভাগ্যি আপনারা এসেছিলেন।" দু' চারটি তুম্ তানা নানা করে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলাম আমরা।

গলি থেকে বার হয়ে আসার সময়ে আমাদের যেন স্বপ্নভঙ্গ হ'ল। নিকুনই বলল, "পাঁচ্‌দা! ব্যাপারটা স্বপ্নের মত বোধ হচ্ছে, নয় কি?" আমি বললাম, "তুই আমার মুখের কথাটা কেড়ে নিলি ভাই! আর সেই পয়মন্ত তক্তাপোশটা!"

নিকুন রাস্তায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ প্রাণভরে হেসে নিল; বেচারা! আমি বললাম, "দেখ্ নিকুন্, ভদ্রলোকটিকে বলে কয়ে ঐ তক্তাপোশটা কিনে নিলে হয় না? অমন জামাই-ঠকানো জারুলকাঠের তক্তাপোশ বোধহয় আর পাওয়া যাবে না, কলকাতায়!" নিকুন অতিশয় সরল প্রাণ। বলল, "কী যে বলেন তার ঠিক নেই! উনি হলেন খাঁ সাহেবের শাক্‌রেদ। উনি কি গুরুদেবের আসন বেচে দিতে পারেন! কখ্‌খনো নয়।" নিকুনের কথার গুরুত্বে তক্তাপোশটির লঘুত্ব কেটে গেল। সেই যাদুকর তক্তাপোশের সঙ্গে আমার পুনর্মিলন আর ঘটেনি।

ঠিক করে ফেল্‌লাম আর কোথাও না গিয়ে সোজা মহারাজভবনে যাওয়াই আবশ্যক। যে কথা সেই কাজ। চললাম আমরা মহারাজ শ্রীজগদীন্দ্রনাথ রায়ের সমীপে, দরবার করতে। ট্রামে করে এস্‌প্লানেড্; তারপর ভবানীপুরের ট্রামে চড়ে এল্‌গিন্ রোডের মোড়; সেখান থেকে পদব্রজে ৬নং ল্যান্সডাউন রোডে রাজভবনে। গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হলাম যখন তখন বেলা দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি।

(ক্রমশ)

পূর্বাভাষ

ওদিকে বউবাজার স্ট্রীট আর এদিকে সেণ্ট্রাল এভিনিউ। মাঝখানের সর্পিল গলিটা এতদিন দুটো বড় রাস্তার যোগসূত্র হিসেবে কাজ চালিয়ে এসেছিল। কিন্তু আর বুঝি চললো না। বনমালী সরকার লেন বুঝি এবার বাতিল হয়ে গেল রাতারাতি। এতদিনকার গলি। ওই গলিরই পশ্চিমদিকে তখন বনমালী সরকারের পূর্বপুরুষ রাজত্ব করে গিয়েছিলেন সুতানটি আর গোবিন্দপুরের সময় থেকে। কথায় ছিল, "উমিচাঁদের দাড়ি আর বনমালী সরকারে বাড়ী", দু'টোরই বোধহয় সমান জাঁকজমক আর বাহার ছিল। সদ্‌গোপ বনমালী সরকার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছ থেকে পাটনায় দেওয়ানী পেয়েছিলেন। আর কলকাতায় পেয়েছিলেন কোম্পানীর অধীনে ব্যবসা করবার অধিকার। সে-সব অনেক যুগ আগের কথা। তিনি সেকালের কুমারটুলীতে লাটসাহেবের অনুকরণে এক বাড়ী করেন। তাঁর দেখাদেখি সেকালের আর এক বড়লোক মথুর সেন বাড়ী করেন নিমতলায়। কিন্তু বনমালী সরকারের বাড়ীর কাছে সে-বাড়ীর তুলনাই হতো না। তারপর কোথায় গেল সেই কুমোরটুলীর বাড়ী—কোথায় গেল বনমালী সরকার নিজে আর কোথায় গেল মথুর সেন! সত্যিই তো ভাবলে অবাক্ হতে হয়। কোথায় গেল সেই আরমানী বণিকরা, যারা করতো সুতা আর নটীর ব্যবসা! আর কোথায় গেল জব চার্নকের উত্তরাধিকারী ইংরেজরা—যারা কালিকট থেকে পোর্তুগীজদের ভয়ে পালিয়ে এসে সুতানটীতে আশ্রয় নিলে—আর পরে কালিকটের অনুকরণে সুতানটীর নামকরণ করলে ক্যাল্‌কাটা। আজ শুধু কোম্পানীর সেরেস্তার কাগজপত্রে পুরোন নথিপত্র ঘেঁটে সুতানটীকে খুঁজে বার করতে হয়। তবু যে বনমালী সরকার ওই এঁদোপড়া গলির মধ্যে এতদিন দম্ আটকে বেঁচেছিলেন তা' কেবল কলকাতা কর্পোরেশনের গাফিলতির কল্যাণে। এবার তা'ও গেল। এবার গোবিন্দরাম, উমিচাঁদ, হুজুরি মল্, নকু ধর, জগৎ শেঠ আর মথুর সেনের সঙ্গে বনমালী সরকারও একেবারে ইতিহাসের পাতায় তলিয়ে গেল। আধখানা আগেই গিয়েছিল সেণ্ট্রাল এভিনিউ তৈরী হবার সময়ে, এবার বাকি আধখানাও শেষ।

ভার পড়েছে ইম্‌প্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের ওপর। গলির মুখে ছিল হিন্দুস্থানী ভুজাওয়ালাদের মেটে টিনের দোতলা। হোলির এক মাস আগে থেকে খচ্‌মচ্ খচ্‌মচ্ শব্দে খঞ্জনী বাজিয়ে "রামা হো" গান চলতো। তারপর সোজা পুব মুখো চলে যাও। খানিকদূর গিয়ে বাঁয়ে বেঁকে আবার ডাইনে বেঁকতে হবে। সদ্‌গোপ বনমালী সরকারের প্যাঁচোয়া বুদ্ধির মত, তাঁর নামের গলিটাও বড় পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে মিশেছে গিয়ে বউবাজার স্ট্রীটে। গলিটাতে ঢুকে হঠাৎ মনে হবে বুঝি সামনের বাড়ীর দেয়ালটা পর্যন্ত ওর দৈর্ঘ্য। কিন্তু বুকে সাহস নিয়ে এগিয়ে গেলে অনেক মজা মিলবে। নীচু নীচু বাড়ীগুলোর রাস্তার ধারের ঘরগুলোতে জম্-জমাট্ দোকান-পত্তর। বেঁকের মুখে বেণী স্বর্ণকারের সোনা রুপোর দোকান। তারপর পাশের একতলা বাড়ীর রোয়াকের ওপর 'ইণ্ডিয়া টেলারিং হল্'। কিছুদূরে গিয়ে বাঁ হাতি তিন রঙা ন্যাশ্‌নাল ফ্ল্যাগ আঁকা সাইনবোর্ড। প্রভাস পরামাণিকের "কার্ট্ ওয়েল হেয়ার কাটিং সেলুন"। তারপরেও আছে গুরুপদ দে'র 'রেশন শপ্'। যখন রেশন নিতে খদ্দেরের কিউ হয় তার জেরটা গিয়ে ঠেকে পাশের বাড়ীর "সবুজ সংঘে"র দরজা পর্যন্ত। এক একদিন "সবুজ সংঘ" হঠাৎ মুখর হয়ে ওঠে রেডিওতে, য়্যাম্‌প্লিফায়ারে, আলোতে আর জাঁকজমকে। একটা উপলক্ষ্য তাঁদের হলেই হলো। হয় সরস্বতী পুজো, স্বাধীনতা দিবস, রবীন্দ্র জন্মোৎসব, নয়তো নেতাজী দিবস কিম্বা শিবরাত্রি। সেদিন পাড়ার লোকের ঘুমোবার কথা নয়। সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি সবুজ সংঘের জয় ঘোষণা ছাড়া পৃথিবীতে আর কোনও ঘটনা ঘটে না। লোকে অফিসে যায় না, রেশন কেনে না, বাজার করে না, ঘুমোয় না, খায় না—শুধু সবুজ সংঘ আর সবুজ সংঘ। কিন্তু তারপরেই আছে জ্যোতিষার্ণব শ্রীমৎ অনন্ত ভট্টাচার্যের "শ্রীশ্রীমহাকালী আশ্রম" যেখানে এই কলিকালের ভেজালের যুগেও একটি খাঁটি নবগ্রহ কবচ মাত্র ১৩৷৵১০ পাওয়া যায়—ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। সত্য ত্রেতা দ্বাপর—বর্তমান, ভূত ভবিষ্যৎ—ত্রিকালদর্শী রাজজ্যোতিষীর প্রস্তুত বশীকরণ, বগলামুখী আর ধনদা কবচের প্রচার ইংলণ্ড, আমেরিকা, আফ্রিকা, চীন, জাপান, মালয়, সিঙ্গাপুরের মত দূর-দূর দেশে। বনমালী সরকার লেনের "শ্রীশ্রীমহাকালী আশ্রম"-এর আরো গুণাবলী সাইনবোর্ডে লাল, নীল ও হলদে কালীতে সবিস্তারে লেখা আছে। তারপরের টিনের বাড়ীটার সামনের চালার নীচে বাঙ্কার তেলেভাজার দোকান। আশে পাশের চার পাঁচটা পাড়ায় বাঙ্কার তেলেভাজার নাম আছে। তিন পুরুষের দোকান। বাঙ্কা এখন নেই। বাঙ্কার ছেলে অধর। অধরের ছেলে অক্রুর এখন দোকানে বসে। অক্রুর কারিগর ভালো। বেসনটাকে মাটির গামলায় রেখে বাঁ হাতে একটু সোডা নিয়ে বেসনটা এমন ফেটিয়ে নেয় যে, কড়ার গরম তেলে ফেলে দিলে প্রকাণ্ড ফোস্কার মত নিটোল হয়ে ফুলে ফুলে ওঠে বেগুনিগুলো। হাতকাটা কেলো এসে সকাল থেকে বসে থাকে। তখন ঝাঁপ খোলেনি অক্রুর। শীতকালের সকালবেলা চারদিকে গোল হয়ে ভীড় করে দাঁড়িয়ে আছে খদ্দেররা—আর অক্রুর ঝাঁঝ্‌রি খুন্তিটা দিয়ে বেগুনিগুলো ভেজে ভেজে তোলে চুবড়িতে। সময় সময় চুবড়িতে তোলবারও অবসর দেয় না কেউ।

জিভ পুড়ে ফোস্কা পড়বার অবস্থা। তেমনি চলে দুপুর বারোটা পর্যন্ত। এমনি করে আরো হরেক রকমের দোকান বাঁদিকে রেখে বনমালী সরকার লেন এঁকে বেঁকে ঘুরে ফিরে গিয়ে পড়েছে বউবাজার স্ট্রীটে। দোকানপত্তর যা কিছু সব বাঁদিকে কিন্তু অত বড় গলিটার ডানদিকটায় প্রায় সমস্তটা জুড়ে কেবল একখানা বাড়ী। নিচু নিচু ছোট ছোট পায়রার খোপের মতন ঘরগুলো। সরিকের চাপাচাপিতে কালনেমির লঙ্কা ভাগের মতন আর তিল ধরাবার জায়গা নেই ওতে, লোকে বলতো 'বড়বাড়ী।' তা' এদিককার মধ্যে সে-যুগে ও-পাড়ায় অত বড় বাড়ী আর ছিল কই! বালির পলেস্তারার ওপর রঙ্ চড়িয়ে চড়িয়ে যতদিন চালান গিয়েছিল ততদিন চলেছে। তারপর রাস্তার দিকের চারপাঁচখানা ঘর নিয়ে কর্পোরেশনের ফ্রি প্রাইমারী স্কুল' হয়েছিল ইদানীং। সমস্ত দিন ঘণ্টায় ঘণ্টায় পেটাঘড়িটাতে ঢং ঢং আওয়াজ হতো। আর টিফিনের সময় লেবেন-চুষওয়ালা আর জিভে-গজার ফেরি-ওয়ালারা ঠুন্ ঠুন্ বাজনা বাজিয়ে ছেলেদের আকর্ষণ করতো। কোনও সরিকের ছোট বৈঠকখানার মধ্যে সন্ধ্যেবেলা গানের আসর বসে। তানপুরার একটানা শব্দের সঙ্গে বাঁয়া তবলায় কাহারবা তালের রেলা চলেছে। 'পিয়া আওয়াত নেহি'র সঙ্গে মিঠে তবলার তেহাই পাড়া মাত করে দেয়। কোনও কোনদিন 'মিয়া কি মল্লারের' সঙ্গে মিষ্টি হাতের মধ্যমানের ঠেকায় আকৃষ্ট হয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ে রসিক লোকেরা। জানালা দিয়ে উঁকি মারে। তবু বড়বাড়ীর ভেতরে ঢুকতে কারো সাহস হয় না। ছোট ফ্রক-পরা একটা মেয়ে টপ্ করে এক দৌড়ে অক্রূরের দোকান থেকে এক ঠোঙা তেলেভাজা কিনে আবার ঢুকে পড়ে কোঠরের মধ্যে। দোতলার ওপর থেকে হঠাৎ তরকারীর খোসা ঝপ্ করে পুষ্প-বৃষ্টির মত পড়ে কোনও লোকের মাথায়। লোকটা ওপর দিকে বেকুবের মত চোখ তুলে চায়, কিন্তু কে কোথায়। এ-বাড়ীর রান্না-ঘর থেকে আসে কুচো চিংড়ি আর পেঁয়াজের ঠাট্টা আর হয়ত পাশের রান্নাঘর থেকেই আসছে মাংস গরম-মশলার বিজয়-ঘোষণা। একটা দরজার সামনে এসে থামলো ট্যাক্সি—মেয়েরা যাবে সিনেমায়। আবার হয়ত তখনও পাশের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে একটা পর্দা ঢাকা রিক্স—মেয়েরা যাবে হাসপাতালের প্রসূতি-সদনে। জন্ম-মৃত্যু-সঙ্গমের লীলাবিলাস কবে ষাট-সত্তর-আশী বছর আগে এ-পাড়ার বাড়িগুলোতে প্রথম শুরু হয়েছিল আভিজাত্যের খরস্রোতে, আজ ওই ক'টি বছরের মধ্যে তা বইতে শুরু করেছে নিতান্ত মধ্যবিত্ত খাতে।

হোক মধ্যবিত্ত! না থাক সেই সেকালের জুড়ি, চৌঘুড়ি, ল্যান্ডো, ল্যান্ডোলেট, ফিটন আর ব্রুহাম। নাই বা রইল ঘেরাটোপ দেওয়া পাল্কি। তসর কাপড়-পরা ঝি, কিম্বা সোনালি-রুপোলি কোমরবন্ধ পরা দরোয়ান, সরকার, হরকরা, চোব্দার, হুকাবরদার, আর খানসামা। নাই বা চড়লাম চল্লিশ দাঁড়ের ময়ূরপঙ্খী। ছিল চিংড়ি মাছ, পেঁয়াজ, পুঁইশাক, মাথার ওপর একটা ছাদ আর সূতিকা-রুগী বউ। এবার তা'ও যে গেল। এবারে দাঁড়াব কোথায়?

নোটিশ দিয়েছে ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট যথা-সময়ে।

জোর আলোচনা চলে বাঙ্কার তেলে-ভাজার দোকানে। 'ইণ্ডিয়া টেলারিং হলএ'। গুরুপদ দে'র রেশন-শপের কিউ-তে দাঁড়িয়ে। প্রভাস প্রামাণিকের 'কাট-ওয়েল-হেয়ার কাটিং সেলুন'এর ভেতরে বাইরে। আর সবুজ সঙ্ঘের আড্ডায়। আরো আলোচনা চলে ত্রিকালদর্শী শ্রীঅনন্ত-হরি ভট্টাচার্যের "শ্রীশ্রীমহাকালী আশ্রমে"। জ্যোতিষার্ণব বলেন—আগামী মাসে কর্কট রাশিতে রাহুর প্রবেশ—বড় সমস্যার ব্যাপার—দেশের কপালে রাজ-রোষ—আরো আলোচনা চলে বড় বাড়িতে। এর থেকে ভূমিকম্প ছিল ভাল। ছিল ভাল ১৭৩৮ সনের মত আশ্বিনে ঝড়। যেবার চল্লিশ ফুট জল উঠেছিল গঙ্গাতে। তাও কি একবার! বড় বাড়িতে যারা বুড়ো, তারা জানে সে-সব দিনের কথা। তোমরা তখন জন্মাওনি ভাই। আর আমিই কি জন্মিয়েছি না আমার ঠাকুর্দা জন্মেছে। এ কি আজকের দেশ? কত শতাব্দী আগে। গঙ্গা তো তখন পদ্মায় গিয়ে মেশেনি। নদীয়া আর ত্রিবেণী হয়ে সাগরে গিয়ে মিশতো। ওই যে দেখছ চেতলার পাশ দিয়ে এক ফালি সরু নর্দমা, ওইটেই ছিল যে আদিগঙ্গা, ওকেই বলতো লোকে বুড়িগঙ্গা। তারপর যেদিন কুশী এসে মিশলো গঙ্গার সঙ্গে, স্রোত গেল সরে। ভগীরথের সেই গঙ্গাকে তোমরা বল হুগলী নদী, আমরা বলি ভাগীরথী। তখন হুগলীর নামই বা কে শুনেছে, আর কলকাতার নামই বা শুনেছে কে! প্লিনি সাহেবের আমল থেকে লোকে তো শুধু সপ্তগ্রামের পাশের নদীকেই বলতো দেবী সুরেশ্বরী গঙ্গে! তারপর উত্থান আর পতনের অমোঘ নিয়মে যেদিন সাতগাঁর পতন হলো, উঠলো হুগলী, সেদিন পর্তুগীজদের কল্যাণে ভাগীরথীর নাম হলো গিয়ে হুগলী নদী।

গল্প বলতে বুড়োরা হাঁপায়—
বলে—পড়োনি হুতোম প্যাঁচার নক্সায়—
আজব শহর কলকাতা
রাঁড়ি বাড়ি জুড়ি গাড়ি মিছে কথার
কি কেতা।
হেতা ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে
বলিহারী ঐক্যতা,
যত বক-বিড়ালী ব্রহ্মজ্ঞানী, বদমাইসির
ফাঁদ পাতা—

চূড়ামণি চৌধুরী আলীপুরের উকীল। বলেন—আরে কিপ্লিং সায়েবই তো লিখে গেছে—

Thus from the midday halt of
Charnock
Grew a city....
Chance-directed chance-erected,
laid and
Built
On the silt
Palace, lyre, hovel, poverty and
pride
Side by side....

বড় বাড়ির নতুন ছেলেরা সেই সব দিনের কাহিনী জানে না। গড়গড়ায় তামাক খেত নাকি ওয়ারেন হেস্টিংস আমাদের মতন। বড় বড় লোকদের নেমন্তন্নর চিঠিতে লেখা থাকতো 'মহাশয় অনুগ্রহ করে আপনার হুকাবরদারকে ছাড়া আর কোনও চাকর সঙ্গে আনবার প্রয়োজন নেই।' আর সেই জব চার্ণক। বৈঠকখানার মস্ত বড় বটগাছটার নিচে বসে হুঁকো খেত, আর আড্ডা জমাত, আর সন্ধ্যে হলেই চোর-ডাকাতের ভয়ে চলে যেত বারাকপুরে। বিয়েই করে ফেললে বামুনের মেয়েকে। ডিহি' কলকাতায়, গোবিন্দপুর আর সুতানটিতে বাস করবার জন্যে নেমন্তন্ন করে বসলো সকলকে। একদিন এল পোর্তুগীজরা। এখন তাদের দেখতে পাবে মুরগীহাটাতে। আধা-ইংরেজ, আধা-পর্তুগীজ। নাম দিয়েছিল ফিরিঙ্গী। ওরাই ছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম যুগের কেরাণী। তারাই শেষে হলো ইংরেজদের

চাপরাশী, খানসামা আর ওদের মেয়েরা হলো মেমসাহেবদের আয়া। আর এল আরমানীরা। তাদের কেউ কেউ খোরাসান, কান্দাহার, আর কাবুল হয়ে দিল্লী এসেছিল। কেউ এসেছিল গুজরাট, সুরাট, বেনারস, বেহার হয়ে। তারপর চুঁচুড়াতে থাকলো কতকাল। শেষে এল কলকাতায়। ওদের সঙ্গে এল গ্রীক, এল ইহুদীরা, এল হিন্দু-মুসলমান—সবাই—

এমনি করে প্রতিষ্ঠা হলো কলকাতার। সে-সব ১৬৯০ সালের কথা—

পাঠান আর মোগল আমল দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল। লোকে একদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখলে ইন্দ্রপ্রস্থ আর দিল্লী কোথায় তলিয়ে গেছে। তার বদলে এখানে এই সুন্দরবনের জলো হাওয়ায় মাটিতে গজিয়ে উঠেছে, আর এক আরব্য উপন্যাস। ভেল্কী বাজি যেন। কলকাতার একটি কথায় রাজ্য ওঠে, রাজ্য পড়ে। জীবনে উন্নতি করতে গেলে এখানে আসতে হয়। রোগে ভুগতে গেলে এখানে আসতে হয়। পাপে ডুবতে গেলে এখানে আসতে হয়। মহারাজা হতে চাইলে এখানে আসতে হয়। ভিখিরী হতে চাইলে এখানে আসতে হয়। তাই এলেন রায় রায়ান রাজবল্লভ বাহাদুর সুতানটীতে। মহারাজ নন্দকুমারের ছেলে রায় রায়ান মহারাজ গুরুদাস এলেন। এলেন দেওয়ান রামচরণ। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, এলেন ওয়ারেন হেস্টিংসের দেওয়ান কান্তবাবু, এলেন হুইলারের দেওয়ান দর্পনারায়ণ ঠাকুর, এলেন কলকাতার দেওয়ান গোবিন্দরাম মিত্র, উমিচাঁদ—আর এলেন বনমালী সরকার।

এই যার নামের রাস্তায় বসে তোমাদের গল্প বলছি—

চূড়ামণি চৌধুরীর মক্কেল হয় না। কালো কোটটার ওপর অনেক কালি পড়েছে। সময়ের আর বয়েসের। হাতে কালি লেগে গেলেই কালো কোটে মুছে ফেলেন। বাইরে থেকে বে-মালুম। কোর্টে যান। আর পুরোন পূর্বপুরুষের পোকায় কাটা বইগুলো ঘাঁটেন। তোমরা তো মহা-আরামে আছো ভাই। খাচ্ছ, দাচ্ছ, সিনেমায় যাচ্ছ। সেকালে সাহস ছিল কারো মাথা উঁচু করে চৌরঙ্গীর রাস্তায় হাঁটবার? বুটের ঠোক্কর খেয়ে বেঁচে যদি যাও তো বাপের ভাগ্যি। সেকালে দেখেছি সাহেব যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে। হাতে বেতের ছড়ি। দুপাশের নেটিভদের মারতে মারতে চলেছে। যেন সব ছাগল, গরু, ভেড়া। আর গোরা দেখলে আমরা তো সাতাশ হাত দূরে পালিয়ে গেছি। ওদের তো আর বিচার নেই। নেটিভরা আর মানুষ নয় তা' বলে। রেলের থার্ড ক্লাসে পাইখানা ছিল না ভাই। নাগপুর থেকে আসানসোল এসেছি—পেটের টুঁটি টিপে ধরে। কিছছু খাইনি—জলটি পর্যন্ত নয়—পাছে......

তা' হোক, তবু ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের নোটিশ দিতে বাধা নেই। বড় বাড়ির বড় ছোট সরিকরা নোটিশ নিয়ে সই দিলেন।

নোটিশের পেছন পেছন এল চেন্, আর কম্পাস, শাবল, ছেনি, হাতুড়ী, কোদাল, গাঁইতি, ডিনামাইট—লোকলস্কর, কুলি-কাবারি। আরো এল ভূতনাথ। ওভারসিয়র ভূতনাথ। ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়, স্বভাব কুলীন। নিবাস—নদীয়া। গ্রাম—ফতেপুর, পোস্ট অফিস—গাজনা।

দুপুরবেলা ধুলোর পাহাড় ওড়ে। টিনের চালাগুলো ভাঙতে সময় লাগবার কথা নয়। এদিকে ভুজাওয়ালাদের টিনের দোতলা বাড়িটা থেকে শুরু করে সবুজ সঙ্ঘের ঘরটা পর্যন্ত ভাঙা হয়ে গেছে। শীতকাল। দল বেঁধে কুলির দল লম্বা দড়ির শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে সুর করে চীৎকার করে—

—সামাল জোয়ান—

—হেঁইও—

—সাবাস জোয়ান—

—হেঁইও—

—পুরী গরম—

—হেঁইও—

গরম পুরী ওরা খায় না। দুপুরবেলায় এক ঘণ্টা খাবার সময়। সেই সময় ছাতু কাঁচালঙ্কা আর ভেলীগুড় পেটের ভেতর পোরে। বউবাজার স্ট্রীটের ট্রামের ঘড় ঘড় শব্দ এখানে ক্ষীণ হয়ে আসে—আর এদিকে সেণ্ট্রাল য়্যাভিনিউতে তখন দুপুরের ক্লান্তি নেমেছে। মাঝখানে "শ্রীশ্রীমহাকালী আশ্রমে"র অশথ গাছটার তলায় একটু গড়িয়ে নেয় ওরা। বনমালী সরকার লেনের সর্পিল গতি সরল হয়ে গেছে। ভাঙা বাড়ির সমতল ভূমিতে দাঁড়িয়ে বেহারী কুলিরা জানতেও পারে না—কোন্ শাবলের আঘাতে জীবনের কোন্ পর্দায় কোন্ সুর মূর্চ্ছিত হয়ে উঠলো। এক একটা ইঁট নয়ত এক একটা কঙ্কাল। ইতিহাসের এক একটা পাতা ভাঙা ইঁটের সঙ্গে গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যায়—আর তারপর উত্তরে হাওয়ায় আকাশে উঠে আকাশ লাল করে দেয়।

চূড়ামণি চৌধুরী কোর্ট ফেরৎ বাড়ি যেতে যেতে তখন ফিরে চেয়ে দেখেন। মনে হয় আকাশটা যেন লাল হয়ে গেছে। আশে পাশে ট্রামে লোক বসে আছে—মুখে কিছু বলেন না। বাড়িতে এসে ইতিহাসটা খুলে বসেন। কোথায়, কবে সিরাজদ্দৌলা শহর পুড়িয়ে ছারখার করে দিলে। আবার দেখতে দেখতে নতুন করে গড়ে উঠলো কলকাতা। পোড়া কলকাতা যেন। আবার আজ পুড়ছে—নতুন করে গড়ে ওঠবার জন্যে। ভালোই হলো। বহু বিষ জমে উঠেছিল ওখানে। খোলা হাওয়া ঢুকতো না ঘরগুলোতে। পাশের বাড়িতে উনুন জ্বাললে ধোঁয়ায় ধোঁয়া হয়ে যেত তাঁর লাইব্রেরী। পুরুষানুক্রমে বড় বাড়ির অবস্থা যা দাঁড়িয়েছিল, তাতে সরিকের সঙ্গে সরিকের আর পাশাপাশি বাস করা চলতো না। বড়কর্তাদের সে আমলের একটা রুপোর বাসন নিয়ে মামলা হয়ে গেল সেদিন। তবু আজকালকার ছেলেরা সেসব দিন তো দেখে নি। চূড়ামণি চৌধুরীও তখন খুব ছোট। মেজ-কাকীমার পুতুলের বিয়েতে মুক্তোর গয়না এসেছিল ফ্রান্স থেকে। আর মেজগিন্নীর পায়রা নিয়ে মোকদ্দমা লাগলো ঠনঠনের দত্তদের সঙ্গে। সে কী মামলা। সে মামলা চললো তিন বছর ধরে। কজ্জনবাঈ সেকালের অত বড় বাইজী। গান গাইতে এসেছিল দোলের দিন। ধর্মদাসবাবু ডুগি-তবলা বাজিয়ে-ছিলেন। বড়দের দোলের উৎসবে ছোটদের ঢোকবার অধিকার ছিল না তখন। লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেছিলেন দপ্তরখানার ভেতর দরজার ফাঁক দিয়ে। সে কী নাচ। সেই কজ্জনবাঈ-ই এসেছিল আর একবার দশ বছর পরে। তখন সে চেহারা আর নেই। মেজ কাকীর কাছ থেকে ভিক্ষে চেয়ে নিয়ে গেল। অনেক বলা-কওয়াতে একটা গান গাইলে। সে গানটা সে দশ বছর আগে গেয়েছিল।

বাজু বন্ধ খুলু খুলু যায়—

ভৈরবী সুরের মোচড়গুলো বুড়ীর গলায় যেন তখনও যাদু মেশানো। ঠুংরীতে ওস্তাদ ছিল কজ্জনবাঈ। আজকালকার ছেলেরা শোনে নি সে গান।

কোর্টে আসা-যাওয়ার পথে ট্রামের জানালা দিয়ে বাড়িখানা আর একবার দেখেন। এদিককার সব ভাঙা হয়ে গেছে। বড় বাড়িটা এখনও ছোঁয়নি ওরা। এদিকটা শেষ করে ধরবে ওদিকটা। চূড়ামণি

চৌধুরীর মনে হয় যেন এখনও কিছু বাকি আছে। চোখ বুজলেই যেন দেখতে পান সব। পাল্কী এসে দাঁড়াল দেউড়ীতে। মেজ কাকীমার পেয়ারের ঝি গিরি এসে দাঁড়িয়েছে তসরের থান প'রে। সদর গেটে ঘণ্টা বাজিয়ে দিলে ব্রিজ সিং। হাটো সব, হাটো সব। পাল্কী বেরুচ্ছে। বড় ছোট সব যোগে মেজ-কাকিমার গঙ্গাস্নান চাই।

তারপরেই মনে হয় ভালোই হয়েছে। সেই বড় বাড়িতে একটা চাকরও রইল না তোষাখানাতে। মধুসূদন ছিল বড়কর্তার খাস চাকর। চাকরদের সর্দার। সে-ও একদিন দেশে গেল পুজোর সময়, আর ফিরলো না।

যখন চোখ খোলেন চূড়ামণি চৌধুরী, তখন ট্রাম হাতীবাগানের কাছ দিয়ে হু হু করে চলেছে। পাতলা হয়ে গেছে ভীড়। কালো কোটের পকেটে দুটো হাত ঢুকিয়ে চুপ করে বসে থাকেন আর ভাবেন, বাড়িতে গিয়েই কটন্ সাহেবের হিস্ট্রিটা পড়তে হবে। আর বাসটীডের বইটা। সার ফিলিপ ফ্র্যান্সিসের সঙ্গে ম্যাডাম গ্র্যাণ্ডের প্রণয়-কাহিনী। কী রাজত্বই করে গেছে বেটারা। সাত সমুদ্র থেকে জব চার্নক আর ছ'জন সহকারী আর সঙ্গে মাত্র তিরিশজন সৈন্য। আকবর বাদশা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারে নি এত বড় সাম্রাজ্যের কথা।

বেহারী মজুরেরা পেতলের থালা ধুয়ে মুছে আবার ইঁট ভাঙতে শুরু করে।

দুম-দাম করে পড়ে ইঁট। চূণ-সুরকীর গুঁড়ো আকাশে উড়ে যায়। চোখ-মুখ ধুলোয় ধুলো হয়ে যায়। তবু ঠিকাদারের লোক হুঁশিয়ার নজর রাখে। কাজে কেউ ফাঁকি দেবে না। সায়েব কোম্পানী শহর বানিয়েছে, রাস্তা বানিয়েছে। বড় বড় তালাও কেটেছে। জলের কল বসিয়েছে। মাথায় বিজলী বাতি আর পাখা দিয়েছে। সব দিয়েছে সায়েব কোম্পানী। বনমালী সরকারের গলি ভেঙে দেশের কোনও ভালো করবে নিশ্চয়ই সায়েবরা।

—সেলাম হুজুর—

সেলাম করে সরে দাঁড়াল বৈজু।

—সেলাম হুজুর—

গাঁইতি থামিয়ে দুখমোচনও সেলাম জানায়।

দু'পাশে পদে পদে সেলাম নিতে নিতে চলতে লাগলো ভূতনাথ। ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়। একবারে সোজা এসে দাঁড়াল বড় বাড়ির সামনে।

কুলির সর্দার চরিত্র মণ্ডল সামনে এসে নিচু হয়ে সেলাম করলে।

এতক্ষণে ভূতনাথ মাথা নিচু করলে। বললে—দাগ শেষ করেছ চরিত্র—

চরিত্র মণ্ডল মাথা নাড়লে—আজ বড় দাগ দিতে হবে হুজুর—কাল আরো চল্লিশ-জন কুলি লাগাচ্ছি—এদিকটা তো দিলাম শেষ করে—সন্ধ্যে নাগাদ সব সমান করে তবে কুলিরা ছুটি পাবে হুজুর—

ভূতনাথ চারিদিকটা চেয়ে দেখলে একবার। অনেকদিন আগেই সব বিলুপ্তপ্রায় হতে চলেছিল। এবার যেটুকু আছে, তা-ও নিঃশেষ করে দিতে হবে। কোথায় বুঝি কোন্ অভিশাপ করে এ বংশের রক্তের মধ্যে প্রবেশ করেছিল শনির মত নিঃশব্দে আজ তা' নিশ্চিহ্ন হলো।

চরিত্র মণ্ডল আবার কথা বললে—কাল তা হলে ওই দাগটা ধরবো হুজুর—

—না না, মদটদ্ আমি খাইনে—

বলেই চমকে উঠলো ভূতনাথ। চরিত্র মণ্ডলও কম চমকায় নি। ওভারসিয়ার বাবুর দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখলে হঠাৎ।

কিন্তু এক নিমেষে সামলে নিয়েছে ভূতনাথ। এরই মধ্যে কি তার ভীমরতি ধরলো নাকি।

সামলে নিয়ে ভূতনাথ বললে—কী বলছিলে যেন চরিত্র—

—আজ্ঞে দাগের কথা বলছিলাম—বলছিলাম এদিকটা তো শেষ করে দিলাম, কাল কোত্থেকে শুরু করবো তাহলে হুজুর—

ঈশ্বরের কী অভিপ্রায় কে জানে! যদি সেই অভিপ্রায়ই হয়, সে বড় নিষ্ঠুর কিন্তু। একদিন নিজের নিশ্চিন্ত আশ্রয়স্থলকে নিজের হাতেই আবার একদিন ভাঙবার আদেশ দিতে হবে, কে জানতো! একদিন এই বড় বাড়িতে প্রবেশ করবার অনুমতির অভাবে এইখানে এই রাস্তার ওপর হাঁ করে পাঁচ ছ'ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। ব্রিজ সিং ওইখানে লোহার গেটের সামনে দাঁড়িয়ে। ডান হাতে সঙ্গীণ উঁচু করা বন্দুক। আর বুকের ওপর মালার মতন বন্দুকের গুলীভরা বেল্ট। সেদিন এমন সাহস ছিল না যে, ওইখানে ব্রিজ সিংএর সামনে দিয়ে ভেতরে যায় ভূতনাথ।

কোথায় সে গেট। কোথায়ই বা সে ব্রিজ সিং।

ব্রিজ সিং ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে চেঁচাত—হুঁশিয়ার—হুঁশিয়ার—হো—

ছোটবাবুর ল্যাণ্ডোলেট্ যখন ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে রাস্তায় বেরুত, তখন সাড়া পড়ে যেত এ-পাড়া ও-পাড়ায়। কড়ির মত সাদা জুড়ি ঘোড়া টগবগ্ করতে করতে গেট পেরিয়ে ছুটে আসতো রাস্তায়। আর রাস্তায় চলতে চলতে লোকেরা অবাক হয়ে থেমে চেয়ে দেখত ঘোড়া দুটোকে।

গাড়িটা যখন অনেক দূরে চলে গেছে, তখন ব্রিজ সিং আবার সেই আগেকার মত কাঠের পুতুল সেজে সঙ্গীণ খাড়া করে দাঁড়িয়ে থাকতো।

সেসব অনেক দিনের কথা। তারপর কত শীত কত বসন্ত এল। কত পরিবর্তন হলো কলকাতার। কত ভাঙা কত গড়া। ভূতনাথের সব মনে পড়ে।

এখনও দাঁড়ালে যেন দেখা যাবে ব্রজ-রাখাল রোজকার মতন অফিস থেকে বাড়ি ফিরছে। সেই গলাবন্ধ আলপাকার কোট। সামনে ধুতির কোঁচাটা উল্টে পেট-কোমর গোঁজা। মুখের ভেতর পান গোঁজা। হাতে পানের বোঁটায় চুণ। রোগা লম্বা শক্ত-সামর্থ্য মানুষটি।

ব্রজ-রাখাল বলতো—না না, এটা কাজ ভাল করোনি ভূতনাথ—আমরা হলাম গিয়ে গোলাম—ওদের গোলাম—আর বাবুরা হলো সায়েব—সায়েব বিবির সঙ্গে কি গোলামের মেলে—কাজটা ভাল করোনি বড় সম্বন্ধি—

(ক্রমশ)

মধ্যপ্রাচ্য-পরিচয়

সরোজ আচার্য

ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে, "যে কেবল ইংলণ্ডকে জানে সে ইংলণ্ডের কী-ই বা জানে?" স্বদেশকে জানা কেবল স্বদেশ বলেই সহজ নয়। আমরা নিজেকে জানি অন্য পাঁচজনের সঙ্গে মিলে মিশে, পরস্পরের মধ্যে কতখানি মিল বা অমিল আছে তার মোটামুটি ধারণা করে। ভারতবর্ষকে আমরা জানি, জানবার চেষ্টাও করি নানাভাবে—তার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরা ভাবি, কখনও গৌরব অনুভব করি, কখনও বা চিন্তিত হই, হতাশ বোধ করি। পৃথিবীর অন্য সব দেশগুলির সঙ্গে ভারতবর্ষের জীবন ধারার সঙ্গতি কোথায় এবং কতখানি এ ধরণের প্রশ্ন এবং সমস্যা আজকাল আর এড়িয়ে যাওয়া চলে না। পৃথিবী আজ একাকার, বহুদূরে দেশে যুদ্ধের আগুনের আঁচ আমাদের ক্ষুদ্রতম গ্রামেও এসে লাগে, বড়ো বড়ো শক্তিপুঞ্জের স্বার্থসংঘাত, নানা আদর্শের প্রতিযোগিতা এবং বিরোধ আমাদের জীবনকে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে ফেলছে। পৃথিবীর ভাবনা না ভেবে উপায় নেই, অন্তত রোজ সকালে খবরের কাগজ খুললে, বেতারবার্তা শুনলে ভাবতেই হয় মিশরে কি ঘটছে, পারস্যের ব্যাপারটা ঘুরপাক দিচ্ছে কেন, এশিয়াতে যে ঝড় উঠেছিল হঠাৎ কী করে সেটা আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যে এমন তাণ্ডব শুরু করল?

মধ্য প্রাচ্যের রূপরূপ

আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্য সম্বন্ধে আমরা সাধারণত খুব সামান্যই জানি। ছেলেবেলার ভূগোলের টুকিটাকি খবর আর রূপকথা, উপকথা মিলিয়ে তৈরী হয়েছে আমাদের মোটামুটি ধারণা রহস্যময় আফ্রিকা এবং রোমাঞ্চকর উট-খেজুর-বেদুইনের দেশ মধ্যপ্রাচ্য সম্বন্ধে। অর্থাৎ মধ্যপ্রাচ্য সম্বন্ধে আমাদের ধারণা খুব পরিষ্কার নয়—ওটা কোন দেশ না কতকগুলি দেশের সমষ্টি? রূপকথা, উপকথা এবং কিছুটা ইতিহাসের টুকরো খবর নিয়ে গড়া আমাদের ধারণায় মিশর হল ফ্যারাও, ক্লিওপেট্রা, পিরামিড ও নীল নদের দেশ। পারস্যের গোলাপ এবং ওমর খৈয়াম আমাদের কল্পনার ছবি; তারপর খলিফা হারুণ অল রশীদ, নানা অদ্ভুত ঐশ্বর্য, বিলাসলীলা ও য়্যাডভেঞ্চারের কাহিনী এবং মক্কা-মদিনা, ধর্মগুরু হজরত মহম্মদের ইসলাম প্রবর্তন আর ওদিকে জেরুসালেম বেথেলহেমে ঘিরে খৃষ্টের করুণ-মধুর আবির্ভাব ও বিলয়—এই সব মিলিয়ে গড়ে উঠেছে মধ্যপ্রাচ্য সম্বন্ধে আমাদের মনের পটভূমি। কিন্তু এ হল অতীত। এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চের পটপরিবর্তন ঘটেছে, নায়ক এবং কথক বদলেছে, গত দুই শতাব্দী ধরে য়ুরোপের ধনিক ও বণিক মধ্যপ্রাচ্যে যে ইতিহাস রচনা করেছে আজ তার অন্তিম কাল, সমাপ্তির দিন ঘনিয়ে এসেছে। 'মধ্যপ্রাচ্য' শব্দটাই য়ুরোপের ধনিক, বণিক ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের অভিধান থেকে নেওয়া। এটা কোনো দেশের নাম ত নয়ই, কোনো সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলও মধ্যপ্রাচ্য দিয়ে বোঝান যায় না। য়ুরোপের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা যখন আফ্রিকা ও এশিয়ায় রাজ্যবিস্তার ও বাজার দখলে অগ্রসর হয়, তখন নিজেদের সুবিধা মতো ভৌগোলিক ছক তৈরী করে—তুর্কী ও এশিয়া মাইনর নিয়ে হল নিকট প্রাচ্য; মিশর থেকে পারস্য পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্য আর বাকী এশিয়া হল দূরপ্রাচ্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে এই ভৌগোলিক ছকের বর্ণনায় আবার কিছু অদলবদল করা হয়েছে। এখন 'নিকট প্রাচ্য' নামটির ব্যবহার উঠে যাচ্ছে। তুর্কী থেকে পাকিস্থান পর্যন্ত গোটা এলাকাটাকেই মধ্যপ্রাচ্য বলে ধরা হচ্ছে আর এরসঙ্গে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে আরব মুসলমানপ্রধান উত্তর আফ্রিকার মরোক্কো, আলজিরিয়া, টিউনিসিয়া এবং লিবিয়া। আবার দূরপ্রাচ্যকে ভেঙ্গে ভারতবর্ষ, বর্মা, সিংহল, মালয়, শ্যাম, ইন্দোনেশিয়াকে আলাদা করে নামকরণ হয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া।

সবার উপরে মানুষ সত্য?

'সবার উপরে মানুষ সত্য' আদর্শটি নিশ্চয়ই সুমহান। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের রাজ্য বিস্তার ও মুনাফা শীকারের ব্যবস্থায় মানুষের দাম কানাকড়িও না। সাম্রাজ্যবাদীদের চাই তেল, চাই সামরিক যোগাযোগ ব্যবস্থা আর উপনিবেশে সস্তায় মজুর শোষণ করার সুযোগ পেলে ত মনিকাঞ্চন যোগ। কাজেই মধ্যপ্রাচ্যের মানুষ সাম্রাজ্যবাদীদের হিসাবে মানুষ বলেই গণ্য হয়নি। তবে ইতিহাসের চাকা ঘুরেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে যে স্বাধীনতা আন্দোলনের জোয়ার ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে সাম্রাজ্যবাদকে গ্রাস করেছে তার ঢেউ এখন পারস্যের উপকূলে থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত পৌঁছেছে। তবে সাম্রাজ্যবাদ সহজে হটবার পাত্র নয়। তার ভোল বদলাচ্ছে, কথাবার্তার ধরণ কখনও নরম কখনও গরম হচ্ছে। তবু কখনও কখনও সত্যকথাও সাম্রাজ্যবাদীরা সোজাভাবে বলে ফেলেছে এবং সে কথাটা হল, মধ্যপ্রাচ্যের অগণিত জনসাধারণের স্বাধীনতার জন্য তাদের আদৌ মাথাব্যথা নেই। গত ১৯৫০ সালে বৃটিশ সরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে 'মধ্যপ্রাচ্য বিবরণ' নামে একখানা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, সেই গ্রন্থে সাম্রাজ্যবাদের উকিলেরা বেশ স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন, "বিশ্ব রাজনীতিতে মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্ব হ'ল সামরিক ভূখণ্ড হিসাবে।" এরসঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের বিরাট তেল সম্পদের গুরুত্ব যোগ করলেই বোঝা যায়, মধ্যপ্রাচ্যের লক্ষ লক্ষ বিক্ষুব্ধ, দুর্গত জনসাধারণের জন্য সাম্রাজ্য-

বাদীদের দরদ কতখানি। বৃটিশ সেনাপতিমণ্ডলীর প্রধান ফিল্ড মার্শাল শ্লিম ১৯৫০ সালে জুন মাসে ঘোষণা করেন, "মধ্যপ্রাচ্যের চাবি কাঠি হ'ল মিশর। মিশর যার হাতে মধ্যপ্রাচ্যও তার।"

দিনের পর দিন খবরের কাগজে টুকরো টুকরো পালিশ-করা ছাঁটাই-করা যে সব খবর লণ্ডন, কায়রো, তেহ্‌রান থেকে আসে, সেগুলি থেকে প্রকৃত ঘটনার এই মূল সূত্রগুলি সামান্যই বোঝা যায়। রাজা ফারুকের বিলাস-ব্যসনের চটকদার গল্পে ভুলিয়ে দেয় যে প্রায় ৮০ বৎসর ধরে ইংরেজ মুরুব্বিরাই মিশরী রাজা ও পাশাদের পিছনে থেকে ঘাঁটি আগলাচ্ছে। ঘটনা এবং রটনা যে এক নয় তার দুই একটি সাম্প্রতিক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ইংরেজের রক্ষণাধীনে আরব উপমহাদ্বীপে এডেন অঞ্চলে কতকগুলি সুলতান এবং শেখ গদীতে কায়েম আছে। কিছু দিন পূর্বের খবর—লাহেজের সুলতানকে গ্রেপ্তার করার জন্য এডেন থেকে ইংরেজ মুরুব্বিরা কস্মিনকালে এই ধরণের পালিয়ে সৌদী আরবে আশ্রয় নিয়েছে। সুলতানের অপরাধ? অপরাধ অবশ্যই গুরুতর। সুলতান স্বেচ্ছাচারী, সন্দেহপ্রবণ; তিনি কয়েকজন আত্মীয়কে বিষ খাইয়ে মারতে চেষ্টা করেছেন এবং একটি সুন্দরী তরুণীকে অপহরণ করেছেন। সুলতানের ইংরেজ মুরুব্বিরা কস্মিনকালে এই সব কুকর্মের শাস্তির জন্য ফৌজ পাঠায় এরকম কদাচিৎ শোনা যায়। অবশেষে গূঢ় রহস্যটি জানা গেল। ইংরেজ পারস্যের আবাদান থেকে হটতে বাধ্য হয়েছে। আবাদানের তেল-শোধনের কারখানা ছিল মধ্যপ্রাচ্যের তেল-ব্যবসায়ে ইংরেজের প্রধান ঘাটি। এখন নতুন ঘাটি সুবিধাজনক জায়গায় করা জরুরী দরকার। লাহেজ রাজ্যটি এদিক থেকে খুবই সুবিধাজনক ও নিরাপদ। প্রথমত এডেনের কাছে, দ্বিতীয়ত এই রাজ্যের অশিক্ষিত উপজাতিগুলি সংখ্যায় কম, এরা এখনো বিদেশী-বিরোধী জাতীয় আন্দোলনের সংস্পর্শে আসে নি। অতএব সুলতানকে সরিয়ে ইংরেজ ফৌজ লাহেজ দখল করল।

প্রায় এই রকম ঘটনাই ঘটেছে ইংরেজ-রক্ষিত তথাকথিত স্বাধীন দেশ জর্ডানে। জর্ডানের পরলোকগত রাজা আবদুল্লা ছিলেন ইংরেজদের পরম অনুগত। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় কর্নেল লরেন্সের নেতৃত্বে তুর্কীর খলিফার বিরুদ্ধে আরবদেশে বিদ্রোহ পরিচালনা করেন আবদুল্লা এবং তাঁর ভাইয়েরা। পুরস্কারস্বরূপ আবদুল্লা পান জর্ডানের আমীরি, তাঁর ভাই ফৈজল পান ইরাকের গদি। কয়েক বৎসর পূর্বে আবদুল্লা নিহত হন। নিয়মমত তাঁর বড় ছেলে আমীর তালালের রাজা হওয়ার কথা। তালাল তাঁর পিতার আমলে যুবরাজ থাকা কালে ইংলণ্ডে সামরিক বিদ্যায় শিক্ষা নেন। তবে শোনা যায়, তিনি ইংরেজের অনুরাগী ছিলেন না। জর্ডানের সৈন্যদলের ইংরেজ অধিনায়ক গ্লাব পাশার সঙ্গে তাঁর বনিবনাও ছিল না। ইংরেজ-অনুগত আবদুল্লার এজন্য দুশ্চিন্তা ছিল। অতএব সাব্যস্ত হ'ল যুবরাজ তালালের মাথা খারাপ হয়েছে, চিকিৎসা প্রয়োজন। মুরুব্বি ইংরেজের

বিরুদ্ধে বেয়াদবী করা মাথা খারাপের লক্ষণ ছাড়া আর কি! আবদুল্লার মৃত্যুর পর অবশ্য যুবরাজ তালাল জর্ডানের রাজা হন। কিন্তু খবর রটতে থাকল তালালের রোগ সারে নি। প্রমাণ? তিনি কিনা রাজা হয়েও একলা ঘোড়ায় চড়ে রাজধানীতে প্রজাদের মধ্যে ঘুরে বেড়ান। এরকম রাজা মধ্যপ্রাচ্যে অচল, অন্তত নিজের দেশে গণতান্ত্রিক হ'লেও সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ মুরুব্বিরা এরকম রাজাকে পছন্দ করতে পারে না। অতএব জর্ডানের মন্ত্রিসভা এক কলমের খোঁচায় রাজা তালালকে বরখাস্ত করে তাঁর নাবালক ছেলেকে তক্তে বসিয়েছেন। এই নূতন রাজা নাকি পিতামহ আবদুল্লার মত হবে— অর্থাৎ ইংরেজ মুরুব্বিদের মান্যগণ্য করে চলবে। মধ্য-প্রাচ্যের তথাকথিত স্বাধীন দেশের কর্তা-ব্যক্তিদের দৌড় সর্বত্রই ঐ পর্যন্ত। বিলাতী শিল্প-পতিদের মুখপত্র 'ইকনমিস্ট' বেশ খোলাখুলি ভাষায় লিখেছে, 'মিশরে কোনো দায়িত্বশীল রাজনীতিকই বিদেশী দূতা-বাসের সঙ্গে পরামর্শ না করে কোনো কাজে হাত দেয় না।' অথচ মিশর হ'ল মধ্য-প্রাচ্যের সবচেয়ে অগ্রসর দেশ।

খাল ও তেল

কোনো কোনো দেশ বা অঞ্চলের উন্নতি-দুর্গতি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে ভৌগোলিক অবস্থানের উপরে। মধ্যপ্রাচ্য হচ্ছে সেই রকম একটি এলাকা—নেপো-লিয়নের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যের ভাগ্য নিয়ে শক্তির দ্বন্দ্ব চলেছে তিনটি মহাদেশের সংযোগস্থল হিসাবে। ১৯৫০ সালে প্রকাশিত বৃটিশ সরকারী গ্রন্থ 'মধ্য-প্রাচ্য বিবরণ'এর কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ গ্রন্থের একটি মন্তব্য এই বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য—'এই অঞ্চল (অর্থাৎ মধ্য-প্রাচ্য) তিনটি মহাদেশের সংযোগস্থল। এই অঞ্চল নৌ-বলে ক্ষমতাশালী কোনো শক্তির অধিকারে থাকলে যে কোনো সামরিক শক্তির বিজয় অভিযান একটি মহাদেশে আবদ্ধ করে রাখা যেতে পারে।' এই বর্ণনা অবশ্য মহা সাধুতার ভান করছে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে গোটা মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চল য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের দখলে। এরা মধ্যপ্রাচ্যকে আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করার ছল করছে বটে, কিন্তু কার্যত মধ্যপ্রাচ্যের জনসাধারণই সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা আক্রান্ত এবং পদানত হয়ে আছে। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা মধ্য-প্রাচ্যের দখল ছাড়তে চায় না, স্বেচ্ছায় ছাড়বে
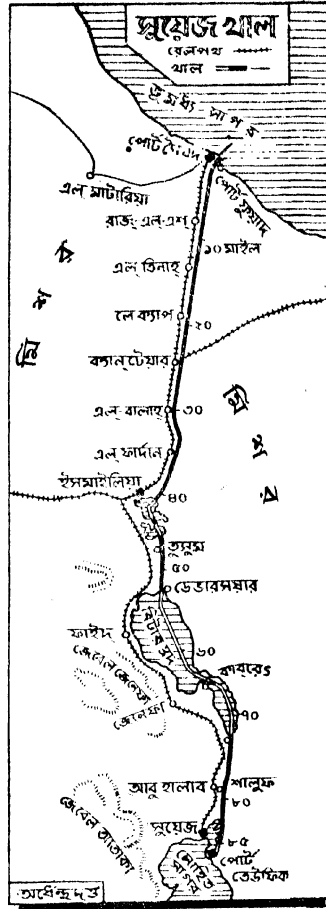
না। তারও কারণ সুস্পষ্ট। মধ্যপ্রাচ্যের দেশ-গুলিতে জনগণের জাতীয় আন্দোলন সফল হলে য়ুরোপের সঙ্গে এশিয়া ও পূর্ব আফ্রিকার যাতায়াতপথ সাম্রাজ্যবাদীদের হাতছাড়া হবে, মধ্যপ্রাচ্যের বিরাট তেল-সম্পদের একচেটিয়া মালিকানা থেকে য়ুরোপের ধনিক বণিকেরা বেদখল হবে। সুয়েজ খাল ও মধ্যপ্রাচ্যের তেল য়ুরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির জীয়ন-কাঠি মরণ-কাঠি।

আমাদের এক কবি লিখেছেন—

"বৃদ্ধ এশিয়া নব ইউরোপ মৃত্যুমগ্ন আফ্রিকার
বৈশ্যযুগের সিংহদ্বার!
স্তব্ধ পাঁজরে বিগত দিনের কাহিনী
পণ্য খড়্গে দ্বিখণ্ড দেহ পশ্চিমী প্রাণবাহিনী
সুয়েজ খাল!
শুকনো পাহাড়ী ধুলোয় লাল।"

বর্তমান মধ্যপ্রাচ্যের পরিচয় দিতে গেলে সুয়েজ খালের জন্ম-বৃত্তান্ত না বলে উপায় নেই। মধ্যপ্রাচ্যের স্থলপথ ধরে য়ুরোপ এবং এশিয়ার বাণিজ্যিক আদানপ্রদান সুদূর অতীতকাল থেকে চলে এসেছে। তার পর উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করে জলপথে এশিয়ার কাঁচা মাল, বাজার ও রাজ্য দখলের নতুন ইতিহাস রচনা হয়েছে ষোড়শ শতাব্দী থেকে। তবে সুয়েজ অন্তরীপকে দ্বিখণ্ডিত করে লোহিতসাগর ও ভূমধ্যসাগরকে সংযুক্ত করার পরিকল্পনা মধ্যযুগেও মাঝে মাঝে আলোচিত হয়েছে। তারপর গত শতাব্দীতে যখন পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার শুরু হ'ল এশিয়া এবং আফ্রিকায়, তখন সুয়েজ খাল খননের জল্পনাকল্পনা নতুন করে আরম্ভ হয়। ১৮৫৬ সালে ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার ফার্ডিনান্ড দ্য লেসেপস মিশরের খেদিভের অনুমতি নিয়ে সুয়েজ খাল খননের জন্য একটি কোম্পানী গঠন করেন। মিশর সরকার বিনামূল্যে জমি, পাথর ও অধিকাংশ মজুর সরবরাহ করেন। খাল খোঁড়া শুরু হয় ১৮৫৯ সালের এপ্রিল মাসে। শোনা যায় প্রায় কুড়ি হাজার মিশরী মজুর এই খাল খোঁড়ার কাজে রোগে, অর্ধা-শনে, অতি পরিশ্রমে মারা যায়। সুয়েজ খাল চালু হয়, ১৮৬৯ সালে। মজার ব্যাপার এই যে, সুয়েজ খাল খোঁড়ার ফরাসী প্রচেষ্টা প্রথমে ইংরেজদের পছন্দ হয়নি। ১৮৫৯ সালে লর্ড পামারস্টোন বলেছিলেন, খালটা হচ্ছে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ফরাসী কূটনীতির চাল। পরে অবশ্য সুয়েজ খালের দখলী-স্বত্ব এবং পরিচালনার ভার ইংরেজরাই আত্মসাৎ করে। কিভাবে ফরাসীদের মুখের গ্রাস ইংরেজের উদরস্থ হ'ল সে-ও এক নাটকীয় কাহিনী। বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে ইহুদী ডিজরেলীর প্রতিভা ও নিপুণতা বনিয়াদী ইংরেজ লর্ড পারমারস্টোনের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। ডিজরেলীর বন্ধু, লর্ড ডার্বি একদিন খবর পান যে, মিশরের খেদিভের টাকার খুব জরুরী প্রয়োজন। সুয়েজ খালে খেদিভের ১৭৭,০০০ শেয়ার ছিল, সেগুলি বন্ধক দিয়ে তিনি টাকা সংগ্রহের চেষ্টায় আছেন। সুয়েজ খাল কোম্পানীর মোট শেয়ার ছিল ৪০০,০০০, তার অধিকাংশ তখন ফরাসী ধনিকদের হাতে। লর্ড ডার্বি ছিলেন খুব সাবধানী লোক। তিনি খেদিভের শেয়ার বন্ধকে রেখে টাকা দিতে উৎসাহ বোধ করলেন না। কিন্তু খবরটা শুনে ডিজরেলির

প্রখর কল্পনা উত্তেজিত হ'ল—কারণ সুয়েজ হচ্ছে ভারত সাম্রাজ্যে যাবার সোজা সড়ক। মিশরে বৃটিশ প্রতিনিধিকে তার করে ডিজরেলি খবর পেলেন এক ফরাসী কোম্পানীকে খেদিভ চারদিনের সময় দিয়েছেন—চারদিনের মধ্যে ৩৬ লক্ষ ৮০ হাজার পাউন্ড শেয়ার বাবদ দিতে হবে। তবে অবিলম্বে টাকা পেলে বৃটিশ সরকারের সঙ্গে লেনদেন করতে খেদিভের আগ্রহ বেশি। কিন্তু টাকা চাই, প্রায় ৪০ লক্ষ পাউন্ড চারদিনের মধ্যে ডিজরেলির চাই। এদিকে পার্লামেন্টের অধিবেশন তখন স্থগিত আছে। পার্লামেন্টের বিনা সম্মতিতে ৪০ লক্ষ পাউন্ড কোথায় পাওয়া যায়? পরদিন মন্ত্রিসভার অধিবেশন চলছে, ডিজরেলী তাঁর পার্শ্বচর মণ্টেগু কোরিকে পাঠিয়েছেন প্রসিদ্ধ ধনপতি রথসচাইল্ডের কাছে, একদিনের মধ্যে ডিজরেলীর ৪০ লক্ষ পাউন্ড চাই। 'জামিন কি?' রথসচাইল্ড জিজ্ঞাসা করলেন। 'জামিন বৃটিশ সরকার।' কোরি জবাব দিলেন। 'টাকা পাবেন,' রথচাইল্ডের এই আশ্বাস নিয়ে কোরি ফিরে এলেন মন্ত্রিসভাকে খবর দিতে। সেদিন সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার আনন্দ ধরে না। ডিজরেলীকে ডিনার খাওয়ার জন্য থাকতে হ'ল। সে হ'ল ১৮৭৫ সালের নভেম্বর মাসের ঘটনা। ফরাসীরা সুয়েজ খাল খুঁড়েছিল; মিশরী মজুরদের রক্ত জল করে খোঁড়া হয়েছিল এই খাল। অবশেষে এর মালিকানার সিংহভাগ পেল, না ফরাসী না মিশরী। ১৮৭৫ সালে বৃটিশ সরকার পেল সুয়েজ খালের দখলী স্বত্বের সিংহভাগ। তারও দশ বৎসর পরের কথা। ফরাসী মনীষী রেনাঁ ফার্ডিন্যান্ড দ্য লেসেপ্সের সম্বর্ধনাসভায় স্মরণ করলেন ইতিহাস-বিশ্রুত উক্তি 'আমি শান্তি আনি নি, এনেছি তরবারি'. রেনাঁ দ্য লেসেপ্সকে বললেন, 'আপনি ভাবীকালের জন্য এক বিরাট যুদ্ধক্ষেত্র তৈরী করেছেন।'

সুয়েজ খাল কোম্পানীর শতকরা ৪৪ ভাগ শেয়ার এখন বৃটিশ সরকারের। একসঙ্গে এতগুলি শেয়ারের মালিক হিসাবে বৃটিশ সরকারই সুয়েজ খাল পরিচালনের হর্তাকর্তা। কোম্পানীর অন্য ডিরেক্টরেরা মোটা দর্শনীমাত্র পান। বিলাতী কাগজ স্টাটিস্টের হিসাবে ১৯৪৯ পর্যন্ত সুয়েজ খাল কোম্পানী থেকে বৃটিশ সরকারের নিট মুনাফা হয়েছে ৬ কোটি ৩০ লক্ষ পাউন্ড। ডিজরেলী খেদিভের শেয়ার নিয়েছিলেন মাত্র ৪০ লক্ষ পাউন্ড দিয়ে। খাল এলাকা মিশরের কাছ থেকে সুয়েজ খাল কোম্পানী ১৮৬৯ সাল থেকে ৯৯ বৎসরের ইজারা নিয়েছে। খাল দিয়ে জাহাজ, মাল ও যাত্রিচলাচলের মোট আয়ের শতকরা ৭ ভাগ মাত্র মিশর পায়।

সুয়েজ হচ্ছে মাল চলাচলে পৃথিবীর বৃহত্তম জলপথ। ১৯৫০ সালে সুয়েজ খাল দিয়ে ১১৭৫১ খানি জাহাজ ৮ কোটি ২০ লক্ষ টন মাল নিয়ে যাতায়াত করেছিল। মধ্যপ্রাচ্যের তেল ও এশিয়ার কাঁচা মাল দক্ষিণ থেকে উত্তরে সুয়েজ খালের মাঝ দিয়ে চালান যায় আর তার বদলে উত্তর থেকে দক্ষিণে এশিয়ার বাজারে আসে য়ুরোপের কারখানা-জাত পণ্য। এখানেও লক্ষ্য করার বিষয় সস্তায় কাঁচামাল ও তেলের রপ্তানি বেশি, তার বদলে য়ুরোপের শিল্পজাত জিনিসের আমদানি কম। যেমন, ১৯৫০ সালের হিসাবে সুয়েজ খাল দিয়ে দক্ষিণ থেকে উত্তরে মাল গিয়েছিল ৬ কোটি ৫ লক্ষ টন আর উত্তর থেকে দক্ষিণে এসেছিল ১ কোটি ২১ লক্ষ টন। সুয়েজ খালের সৌভাগ্য অবশ্য মধ্যপ্রাচ্যের তেল রপ্তানি ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত। দক্ষিণ থেকে উত্তরে সুয়েজ দিয়ে যা মাল যায়, তার শতকরা ৭০ ভাগ হ'ল মধ্যপ্রাচ্যের তেল। ১৯৫০ সালে ৪ কোটি ৭৫ লক্ষ টন তেল সুয়েজ দিয়ে য়ুরোপে গিয়েছিল। এর মধ্যে কুয়েট থেকে গিয়েছিল ১ কোটি ৫৭ লক্ষ টন, পারস্য থেকে ১ কোটি ৪১ লক্ষ টন এবং সৌদী আরব থেকে ১ কোটি ৩৮ লক্ষ টন। এই তেলের বখরাদার হ'ল বৃটেন ১ কোটি ৩ লক্ষ টন, ফ্রান্স ৯৩ লক্ষ টন, আমেরিকা ৭৭ লক্ষ টন, ইতালী ৫০ লক্ষ টন, হল্যান্ড ৫০ লক্ষ টন ইত্যাদি।

খাল এবং তেলের যোগাযোগে সুয়েজ এলাকা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের কাছে অমূল্য সম্পদ একথা বলাই বাহুল্য। মধ্যপ্রাচ্যের তেলের কাহিনী আরও চমকপ্রদ। এখানে সুয়েজ খালের উপর সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃত্বের ইতিহাস বর্ণনা করেই শেষ করা যাক। ইংরেজের সঙ্গে মিশরের বিরোধের একটি মূল কারণ এই খাল এলাকায় বৃটিশ ফৌজের দখল। সুয়েজখাল এলাকায় বৃটিশ মধ্যপ্রাচ্য সমর বিভাগের প্রধান ঘাঁটি। বিমান ঘাটি, সৈন্য-ব্যারাক ইত্যাদি নিয়ে বৃটিশের অধীন এই এলাকা কায়রো নগরের চেয়েও প্রশস্ত। এই এলাকায় কোনও মিশরী বৃটিশ কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করতে পারে না। ১৯৩৬ সালের ইঙ্গ-মিশরী সন্ধি চুক্তি (বর্তমানে যা মিশরীরা বাতিল করেছে), অনুসারে সুয়েজ খাল এলাকায় দশ হাজার মাত্র বৃটিশ ফৌজ মোতায়েন রাখা যেতে পারে। কিন্তু বর্তমানে এক লক্ষেরও বেশি বৃটিশ ফৌজ সুয়েজের ঘাটিতে রাখা হয়েছে। পারস্য থেকে মরোক্কো পর্যন্ত যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় আন্দোলন শুরু হয়েছে তার হিসাব নিকাশ করবার জন্যই ইংরেজ সুয়েজের ঘাঁটি শক্ত করছে। সুয়েজের ঘাঁটিতে বৃটিশ ফৌজ ও বিমানবাহিনী মোতায়েন রাখার উদ্দেশ্যটি ব্যাখ্যা করে লণ্ডনের টাইমস পত্রিকা লিখেছেন, "শান্তির সময়ে বৃটিশ বিমানবাহিনীর কাজ হ'ল সারা মধ্যপ্রাচ্যে বৃটিশ স্বার্থের খবরদারী করা; সাম্রাজ্যের বিমান যাতায়াত-পথ চালু রাখা এবং শৃঙ্খলা রক্ষা করা।" শৃঙ্খলা রক্ষা মানে হ'ল মধ্যপ্রাচ্যের জাতীয় আন্দোলনকে হুমকী দেওয়া এবং দরকার হলে দমন করা।

(ক্রমশ)

শান্তির অনুমান ভুল নয়। দূরের একটা বাদ-প্রতিবাদের উচ্চ ভাষণের শব্দ দেবকী দেবীর কানে এসেছিল। কিন্তু সেটা যে পথের উপরের বাক্‌বিতণ্ডা এবং বিতণ্ডাকারীরা এগিয়ে আসছে—এটা ঠিক বুঝতে পারেন নি। মিনিট খানেকের মধ্যেই বাদানুবাদ প্রায় বাড়ির দোরে এসে পড়ল। শান্তি কথা বন্ধ করলে, কিন্তু কাজ বন্ধ করলে না। দেবকী দেবী সদরের খোলা দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। দরজা দিয়ে লম্বা উঠানটার এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত প্রায় সবটাই দেখা যায়। শান্তির মুখে মাথায় কাপড়ে কাদা লেগেছে; শান্তির অবশ্য তাতে ভ্রূক্ষেপ নাই, কিন্তু দেবকী-দেবী মা হয়ে সেটা সইবেন কি করে?

হঠাৎ ওদিকের পাঁচিলের একটা ভাঙনের ভিতর দিয়ে একখানি মুখ ঢুকল; মুখখানি ওই বিজলীর মুখ। এক গাল হেসে বিজলী বললে—গাঁয়ে তো হুলুস্থুলু কাণ্ড দিদি-মা।

দেবকী শান্তি দুজনেই বিজলীর দিকে ফিরে তাকালেন। শান্তি একটু হাসলে, দেবকী দেবী গম্ভীর হয়ে উঠলেন, বললেন—তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে বিজলী।

—এখন নয় দিদি-মা। আসব ও-বেলা। এ হাঙ্গামার কি হয় না দেখে আমার শান্তি নাই! সেই উ-পাড়া থেকে শুনতে-শুনতে আসছি। রণের শেষ ঋণের শেষ রাখতে নাই —এ রণের শেষ না দেখলে ভাত হজম হবে না আমার। হি-হি করে হাসতে লাগল বিজলী।

অপার আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠেছে মেয়েটি।

—অকা ঘোষালকে যে চড় মেরেছে কানাই বাউড়ী। সে কি বলব দিদি-মা। ঠাঁ-ই করে এক চড়! আর 'একটুকুন' কানমূল ঘেঁষে হলে অকা ঘোষাল অক্কা পেতো! অকা চড় খেয়ে বোকা হয়ে গিয়েছে। গোটা গাঁয়ে লড়াইয়ের ডুমডুমি বেজে উঠেছে। গেল বুঝি লেগে! আঃ—তোমাদিগে শুদ্ধু জড়িয়ে যে কুবাক্যি বললে অকা। কানে আঙুল দিতে হয়! ওই কিশোর দাদা না থাকলে আমার সঙ্গেই হয়ে যেত এক-পাল্টা। সেই দখিনপাড়া থেকে ওরা আসছে পথে পথে, আমি আসছি গলি গলি।

কৌতুকে তার ছোট চোখ দুটো জবল-জবল করে উঠল—দাঁতগুলি বেরিয়ে পড়ল নিঃশব্দ হাসির ভঙ্গিতে।

তারপর হঠাৎ ও-ই, এসেছে। বলেই মুণ্ডুটি সরিয়ে নিলে।

সত্যই কোলাহল প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে। শালীনতা নাই, শীলতা নাই, উত্তপ্ত রূঢ় উচ্চকণ্ঠে একসঙ্গে চার-পাঁচজন বিষোদ্গার করে চলেছে।

দেবকী দেবী সচকিত হয়ে বললেন—এর মধ্যে ঢাকার টানের কথা বলে কে শান্তি?

—কে আবার! ওই নার্সের ভাই—সদয় মল্লিক।

—সে কেন এদের ঝগড়ার মধ্যে?

—কেন আবার? তালে রয়েছে। ওর বোন এখানে একটা বাড়ি করেছে। সেইখানে থাকে, বোনের ঘাড়ে খায়। একটা কাজ তো চাই। মহাদেব সরকার, অক্ষয় ঘোষাল, সুশীল চাটুজ্যে—এদের সঙ্গেই ওর মেলা-মেশা। ও থাকবে না?

* * * *

ব্যাপার গতকাল সন্ধ্যার ঝড় থেকেই সৃষ্টি হয়েছে বলতে গেলে।

গ্রামের বাইরে অক্ষয় ঘোষালের একটি ষোল আনা পুকুর আছে। বছর কুড়ি আগে ঘোষাল মজা পুকুরটা কিনে তাকে নতুন করে কাটিয়ে পাড়ের উপর বাগান লাগিয়েছে। বাগান বলতে এ অঞ্চলে সাধারণত কতকগুলি আঁটির আমের গাছ, তার সঙ্গে কয়েকটা কাঁঠাল, কয়েকটা জাম আর চারিপাশে ঘন-সন্নিবদ্ধ তালগাছের সারি, কেউ কেউ তালগাছের সারির মধ্যে তেঁতুলের গাছ লাগিয়ে থাকে। অক্ষয় ঘোষালের বাগানের বিশেষত্ব আছে—তার জন্য তার অহংকারও অনেক। আঁটির গাছের সঙ্গে সাত-আটটা কলমের আম গাছ আছে, গোটা দুয়েক লিচু, চার-পাঁচটা জামরুল, ভাল বেল এবং একটা গোলাপজামের গাছ আছে। ঘোষালের ওই একটি ষোল আনা পুকুর এবং তার জীবনে তার দুটি কীর্তির মধ্যে ওই একটি কীর্তি এবং শ্রেষ্ঠ কীর্তি। অপরটি তার বাড়ি। বাড়ি যে যেমনই করুক এ সংসারে সে বাড়িকে ভোগ ষোল আনা নিজে নিজেই মানুষ করে বলে তাকে বড় করে জাহির করা যায় না। পুকুর এবং বাগানের জল ও ছায়া এ সর্বসাধারণে ভোগ করে, বাড়ির জন্যে পাঁচ সের মাছ ধরিয়ে পাঁচ ছটাকও প্রতিবেশীর বাড়ি দেওয়া যায়, কখনও সখনও দরিদ্র প্রতিবেশী বা আত্মীয়ের বাড়ির ক্রিয়াকর্মে সের-দুই-আড়াই খয়রাতও করা হয়। এবং ফলের বেলাতেও তাই—ঝড়ি দরুণে আম এলে—দশটা ছেলের হাতে দশটা এবং পাড়া-প্রতিবেশীর বাড়ি দু-এক গণ্ডা হিসেবে বিলিয়ে দান-ধর্মের পুণ্যাস্বাদন করা যায়, সঙ্গে সঙ্গে দাতা নামের অধিকারীও হওয়া যায়। সুতরাং বাড়ির থেকে বাগান-পুকুর কীর্তি হিসেবে বড়। এই একটিমাত্র বৃহৎ কীর্তির অহংকারে ঘোষাল দস্তুরমত অহঙ্কৃত; কারণ বাগানে কলমের গাছ আছে, লিচু-জামরুল গোলাপজামের গাছ আছে; পুকুরে অবশ্য মাছের বৈচিত্র্য নাই—সেই রুই কাতল মৃগেল, কিন্তু ঘোষাল বলে—মাছ এমন বাড়ে না কোন পুকুরে। আর টেস্ট! টাটকা মাছ অল্প একটু তেল দিয়ে ছেড়ে দাও, মাছ ভাজা নামিয়ে তেল মেপে নাও, দেখ এক ছটাক তেল আধ-পো তো হয়েছেই, তিন ছটাকও হয় আমি মেপে দেখেছি।

অক্ষয় ঘোষাল এগুলি আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করে। ঘোষালের দোষ নাই। শৈশব বাল্য কৈশোর তার গভীর দারিদ্র্যের লজ্জার মধ্যে কেটেছে। শৈশবে পিতৃহীন অক্ষয়কে কোলে নিয়ে অক্ষয়ের দিদি রতনবালাকে হাত ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে মা নবগ্রামে এসে-

ছিলেন আশ্রয়ের সন্ধানে। স্বামী-বিয়োগের পর জমিদার একমাত্র সম্বল কয়েক বিঘা জমি এবং ভিটা নীলাম করে নিয়েছিলেন। বিধবা কোথায় দাঁড়াবেন? এসে দাঁড়িয়েছিলেন নবগ্রামে। নবগ্রাম তাঁর পিত্রালয়, কিন্তু বাপের ভিটে তখন ভূমিসাৎ হয়েছে, ভাইপো গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে মাতুলালয়ে।

ওই দক্ষিণপাড়াতে—রাধাকান্তবাবুদের বাড়ির পাশেই ছিল বিধবার বাপের ভিটা। তখন কালের ধারা ছিল অন্য রকম; সমাজের রীতি আচার ছিল স্বতন্ত্র। পড়ো ভিটের সামনে বিধবা এসে দাঁড়ালেন—খবর পেয়ে রাধাকান্তবাবু এলেন এদিক থেকে, ওদিক থেকে এলেন স্বর্ণবাবু; তখনকার দিনের এ গ্রামের প্রায় প্রধান ব্যক্তি। বললেন—ভয় কি! এবং বিধবা অক্ষয়কে নিয়ে রাধাকান্তবাবুর বাড়ি গিয়ে ঢুকলেন, বারো-তের বছরের রতনকে নিয়ে গেলেন স্বর্ণবাবু। অক্ষয়ের কৈশোর পর্যন্ত কেটেছে রাধাকান্ত অর্থাৎ গৌরীকান্তদের বাড়িতে। গৌরীকান্ত তার থেকে অনেক ছোট, তার সঙ্গে অক্ষয়ের একটি গভীর প্রীতির সম্পর্ক ছিল; সে তাকে পিঠে করে বেড়িয়েছে; নিজে ঘোড়া হয়ে গৌরীকে পিঠে চড়িয়েছে।

তারপর সে কুড়ি টাকা মাইনেতে ঢুকেছিল গোপীচন্দ্রবাবুর ব্যবসায়ের মধ্যে, কয়লার খাদে। ক্রমে ক্রমে কর্মদক্ষতায় ধাপের পর ধাপ উঠে কীর্তিবাবুর দক্ষিণ হস্ত হয়ে উঠেছিল—যাকে বলে বড়বাবু—তাই হয়েছিল অক্ষয়। তারপর কীর্তিবাবুর ব্যবসায়ে বিপর্যয় ঘটলে ইনসলভেন্সি মামলার সময় তার আরও পদোন্নতি ঘটেছিল, সে হয়েছিল মনিবের ত্রাণকর্তা এবং কীর্তিবাবু পরিত্রাণও পেলেন। এর পর ইনসলভেন্ট বলে আদালতের মঞ্জুরী নিয়ে কীর্তিবাবু তাঁদের বিরাট জমিদারীর গদিতে চেপে বসলেন বা পার্শ্ব-পরিবর্তন করলেন; অক্ষয়ও চাকরী ছেড়ে বাড়ি এল; এবং পুকুর কাটানো ও সম্পত্তি কেনায় মন দিলে। প্রৌঢ় বয়সে বিবাহ করে সংসারী হল। এবং সংসারানন্দকে উপভোগ করবার জন্য অথবা সস্ত্রীক মন্ত্রদীক্ষা নিয়ে পারে যাবার জন্য তন্ত্রমতানুযায়ী কারণ ও গঞ্জিকা সেবন শুরু করলে। তখন তার বিপুল প্রত্যাশা।

কোন বিখ্যাত জ্যোতিষী নাকি তার কোষ্ঠী-গণনা করে বলেছিল—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ভাগ্যে যে রাজ-চক্রবর্তীর যোগ ছিল—তারও ঠিক সেই যোগ আছে। সেই রাজ-চক্রবর্তীত্বের আশায় অক্ষয় ঘোষাল শুধু উৎসাহিতই হয়ে ওঠেনি, স্ফীতও হয়ে উঠেছিল। নবগ্রামের সকল রকম প্রতিষ্ঠানে সকল রকম কোলাহলে কলহে সে নিজেকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছিল। ওই অট্টহাস দেবস্থলের বন্দোবস্তের ব্যবস্থা থেকে ইউনিয়ন বোর্ড, রামের সঙ্গে শ্যামের কলহে পর্যন্ত অক্ষয় ঘোষাল নিয়মিতভাবে ছুটে যেত তখন। অট্টহাসের ব্যবস্থায় সে যথেষ্ট কৃতিত্বেরও পরিচয় দিয়েছিল। কিন্তু জমিদারেরা দেবস্থলের সেবায়েত হিসেবে তাকে বিতাড়িত করেছিলেন। এবং অন্য সকল স্থান থেকেও সে সরে আসতে বাধ্য হয়েছিল। তারপর একদিন সে ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরে কোষ্ঠী খুলে গণনার কাগজখানা বের করে পড়ে দেখলে যে, যে বয়সের মধ্যে তার 'রাজ-চক্রবর্তীত্ব' যোগটা ছিল, সেটা পার হয়ে গেছে। গণক বললে—যোগ তো ছিল, সে তো মিথ্যে নয় বাবু। তবে কথা কি জানেন? বললে রাগ করবেন না তো? দেখুন সংসারে একই গাছের দুটি বীজ দুটি ক্ষেত্রে পড়ে ঠিক একরকম চেহারা তো নেয় না বাবু। ক্ষেত্রের উর্বরতার পার্থক্যে পার্থক্য ঘটে।

—তার মানে? আমি গরীবের ছেলে, আর চিত্তরঞ্জন বড়লোকের ছেলে?

—আজ্ঞে, তাও বটে আর তাঁর জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ—এ দুয়েও কত প্রভেদ ভেবে দেখুন।

—কুষ্ঠীর নিকুচি করেছে। বলে গণনার কাগজখানা ছিঁড়ে টুকরোগুলোকে দেশলাই জেলে পুড়িয়ে রাজ-চক্রবর্তীত্বের আশার মুখে ছাই দিয়ে বাড়ি ফিরেছিল।

তারপর থেকেই অক্ষয় ঘোষাল ক্রমে ক্রমে প্রচণ্ড ক্রোধে এবং নিদারুণ তিক্ততায় নিজেকে—বাইরের দুনিয়া থেকে নিজের সংসার পর্যন্ত সর্বত্রই—দক্ষালয়ে বিরূপাক্ষের মত অসহনীয় করে তুললে। জীবনের দাক্ষিণ্য ও প্রসন্নতাময় অংশটাই যেন তার পাথর হয়ে জমে গেল। পৃথিবীতে মিত্র বলে কেউ তার রইল না। রইল শুধু শত্রু। কুটীল বাম চক্ষুর দৃষ্টি ও বাম হস্তের করাঙ্গুলির গণনাই হল তার সব।

সে গণনায় প্রথম রাধাকান্তের পুত্র গৌরীকান্ত, দ্বিতীয় রাধাকান্তের ভাইপো বিজয়, তৃতীয় স্বর্ণবাবুর বংশধর, চতুর্থ কীর্তিবাবুর ভাইপো গণেন্দ্রনাথ, পঞ্চম তার প্রৌঢ় বয়সে পরিণীতা স্ত্রী পড়ে যায়। তারপর আর তার গণনা করবার আঙুলও নাই, গণনা করে দেখতেও চায় না। সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের কথা, অক্ষয় ঘোষালের প্রকৃতির পরিবর্তন নয়, বড় বিস্ময়ের কথা হল তার আকৃতির পরিবর্তন। এককালে তাকে রূপবান বলা যাক বা না-যাক, সুদর্শন কান্তিমান বলা চলত। সেকালে এখানকার শখের রঙ্গমঞ্চে শ্রেষ্ঠ নারী-ভূমিকায় সে অভিনয় করত। লোকে বলত—সুন্দরী মেয়েরা লজ্জা পেত অক্ষয় ঘোষালের নারী-বেশ দেখে। সেই অক্ষয় দেখতে আজ পোড়া মানুষের মত কদর্য এবং রূঢ়।

এই অক্ষয় ঘোষাল।

কাল সন্ধ্যার পর ঝড়ের সময় ছেলেকে বলেছিল, পুকুর পাড়ে যাবার জন্য। আম পাকতে শুরু হয়েছে, ঝড়ে প্রচুর পরিমাণে ঝরে পড়বে; তার উপর কলমের গাছে আমের গুটিগুলি সবে বড় হয়ে উঠেছে। বেল গাছে বড় বড় বেলগুলিতে রঙ ধরেছে, জামরুল, লিচু, গোলাপজাম সবেরই এখন পাকবার সময়। ঘোষাল নিজেই যেত; কিন্তু এ ইউনিয়নের ফুড কমিটির নতুন ইলেকশন হবে, সেই ইলেকশনে তারা জনকয়েক মিলে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে—তারই একটা পরামর্শ-সভা ছিল, সেখানে না গিয়ে তার উপায় ছিল না।

গত মহাযুদ্ধের সময় থেকেই জীবনে দুঃখ-দুর্দশা এসেছে। কিন্তু উনিশ শো সাতচল্লিশের পর সে দুর্দশা অসহনীয় হয়ে উঠেছে এই কয়েক মাসের মধ্যে। চিনি ময়দা কেরোসিন কাপড় এ সবের উপরে ইংরেজদের আমল থেকেই কণ্ট্রোল ছিল, কিন্তু এই কয়েক মাসে তার পরিণতি যা হয়েছে, সে আর অক্ষয় সহ্য করতে পারছে না। সে আমল থেকেও কোটার পরিমাণ কমেছে, দর বেড়েছে এবং বণ্টনব্যবস্থায় এমন ব্যভিচার আর কখনও হয় নি।

অক্ষয় ঘোষালের নিজের কষ্ট খুব নাই। তার বাড়িতে চিনি কেরোসিনের অভাব হয় না। মুসলমান পাড়ায় তার খাতক আছে, তারা তাদের রেশন কার্ডের চিনি সবটাই তাকে দিতে চায়। চিনি তারা বড় একটা খায় না। তারা পছন্দ করে গুড়। গুড় তাদের অনেকের ঘরেও কিছু কিছু হয়—তাছাড়া চিনির দামে গুড় খানিকটা বেশিই পায় তারা। কেরোসিনও একটু আধটু করে তাদের ভাগ থেকে তারা দেয়। অক্ষয় দাম দেয় চুল-চেরা হিসেব করে। তার অভাব হয় না। তার প্রতিবাদ তার ক্ষোভ সাধারণ লোকের জন্য। সাধারণের অধিকারের জিনিস

নিয়ে, নিত্যকারের প্রয়োজনের বস্তু নিয়ে, রোগীর খাদ্য নিয়ে, অন্ধকারের মধ্যে আলো জ্বালবার উপাদান নিয়ে, কতকগুলি অযোগ্য অনধিকারী লোক ছিনিমিনি খেলছে। প্রতিবাদ তারই বিরুদ্ধে। উনিশ শো পাঁচ সালে বঙ্গ-ভঙ্গ হয়েছে, সেই—সেই কাল থেকে মনে মনে সে দেশের স্বাধীনতা কামনা করে এসেছে। যথাসাধ্য দেশী জিনিস ব্যবহার করেছে। গোপনে কত চাঁদা দিয়েছে। নবগ্রামের রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করবার সময় দেশপ্রেমকে গভীর আবেগের সঙ্গে প্রচার করেছে। উনিশ শো একুশ—উনিশ শো তিরিশ—বিয়াল্লিশের আন্দোলনের সময় সে প্রাণপণে ভগবানকে ডেকেছে—ভগবান জয়যুক্ত কর। এ দেশকে এ দেশের মানুষকে জয়যুক্ত কর। আজ পর্যন্ত যত নির্বাচন হয়েছে, প্রতি নির্বাচনে সে স্বাধীনতাকামী দল কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছে, আত্মীয়-স্বজন-বন্ধুবান্ধব প্রত্যেককে অনুরোধ করেছে গোপনে। তার মনিব ছিলেন কীর্তিবাবুরা; তাঁরা চিরকাল কংগ্রেসের বিরোধিতা করেছে। কংগ্রেস ইংরেজ রাজত্ব উচ্ছেদ করতে চাইত বলেই তাদের বিরুধাচরণ করত। তাঁদের চাকরী করেও সে এ ক্ষেত্রে তাদের আদেশ মানে নি। যখন যেখানে বিপ্লবীরা এক-একটি কাণ্ড করেছে, হত্যা, ডাকাতি—এমন কি ব্যর্থ বোমা ছোঁড়ার সংবাদেও সে মনেপ্রাণে প্রবল উৎসাহে উৎসাহিত হয়ে উঠেছে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছে তারা যেন ধরা না পড়ে, ধারা পড়ে থাকলে প্রার্থনা করেছে বিচারে যেন মুক্তি পায়। এই নবগ্রামে বোধ করি প্রতিটি দিন দেশের স্বাধীনতা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তুলতে চেয়েছে। যতজন ডেটিনু এখানে এসেছে, প্রত্যেকের সঙ্গে আলাপ করেছে, সহানুভূতি প্রীতি শ্রদ্ধা জানিয়েছে। অনেক দিন থেকেই সে কংগ্রেসের সভ্য। নিজের কর্মকুশলতায় তার বিশ্বাস আছে। স্পষ্ট কথা বলতেও সে দ্বিধা করে না, সে ন্যায়পরায়ণ, তার বিশ্বাস, তার চেয়ে ন্যায়পরায়ণ এখানে আর কেউ নেই। সুতরাং এই ফুড কমিটির সভ্য হবার যোগ্যতম ব্যক্তি সে। অন্তরের মধ্যে বিপুল আবেগ অনুভব করে সে এখানকার ফুড কমিটিকে একটি আদর্শ ফুড কমিটি করে গড়ে তুলবে। সেই কাজ করবার স্থান এবং সুযোগ তাকে পেতেই হবে।

—যত ন্যাড়াবুনে কীর্তুনে হবে ন্যাড়া-মাথার জোরে সে তারা গান জানুক আর নাই জানুক, আর যারা সত্যিকারের গাইয়ে গান জানে, তাদের মাথায় চুল আছে বলে তারা কীর্তন গাইতে পাবে না—এ কোন্ দেশী কথা? এ কি কাজীর বিচার না কি?

এই কারণেই সে এবার প্রাণপণ চেষ্টায় কাজে লেগেছে।

ওই চক্রধারী এখানকার চিনি, কেরোসিন, কাপড়ের লাইসেন্স হোল্ডার। দেশের লোকে তৃষ্ণায় এক গ্লাশ সরবত খেতে পায় না, রোগীতে সাবুর সঙ্গে চিনি পায় না, ইস্কুলের ছেলে কেরোসিনের অভাবে পড়তে পায় না। ঘরে আগন্তুক এলে অন্ধকারে সম্বর্ধনা করতে হয়। মেয়েরা কাপড়ের অভাবে বাইরে বের হতে পারে না। অথচ চক্রধারী কালোবাজারে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা উপার্জন করছে। তার বিরুদ্ধে দরখাস্তে কিছু হয় না, কারণ গুণীবাবুর সে অনুগত লোক। ওদিকে ওই বিজয়, কংগ্রেসের পাণ্ডা, একটা মূর্খ উদ্ধত অপদার্থ, সে ইচ্ছামত অনুগত লোকদের চিনি কেরোসিন কাপড় বিতরণ করছে অর্থাৎ টিপ কেটে পারমিট দিচ্ছে। অথচ সত্যিকারের অভাবী যারা, তারা পাচ্ছে না! চারিদিকে আজ দুর্নীতি। চারিদিকে অনাচার। মধ্যে মধ্যে ক্রোধে ক্ষোভে সে সারা গ্রামের পথে পথে চীৎকার করে বেড়ায়! ওরে তোরা শোন্! তোরা শোন্! বুঝে দেখ্। কিন্তু আশ্চর্য, এরা অন্ধ এরা বধির! সে জানে, লোকে তাকে অবজ্ঞা করে। একদিন সে গরীব ছিল বলে, একদিন তার মা পাচিকাবৃত্তি অবলম্বন করেছিল বলে, তাকে অবজ্ঞা করে। কিন্তু—"দৈবায়ত্ত কুলে জন্ম, পুরুষত্ব করায়ত্ত মোর।" এই কথাটা সে এখানকার থিয়েটারের বই থেকে শিখেছে। কথাটা সে হাত মুঠো করে উপরের দিকে তুলে প্রচণ্ড আবেগ এবং দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারণ করে।

কাল ঝড়ের আগে আকাশে তখন মেঘ দেখা দিয়েছে—ঝড়ের ইঙ্গিত ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে দেখে তার ছেলেকে বলেছিল—ওরে ঝড় উঠবে, তুই পুকুরপাড়ে যা।

ছেলের মা বলেছিল—যাবে তো, কিন্তু ঝড়ের সময় দাঁড়াবে কোথায়?

—কেন? গাছতলায়।

—গাছতলায়! মা গো, যদি ডাল ভাঙে, যদি শিল হয়, জল হয়, বাজ পড়ে।

মুহূর্তে অক্ষয় ঘোষালের উত্তপ্ত মস্তিষ্কে বিদ্যুৎ খেলে গিয়েছিল—প্রতিবাদ

সে সইতে পারে না। বলেছিল—তা হলে মরবে। মরবে। বুঝলি মরবে!

—তার থেকে বুড়ো তুই মর। তুই যা।

—আমি মরলে তোদের পিণ্ডি জোগাবে কে? নইলে মরলে তো খালাস পেতাম।

কথায় অক্ষয়ের স্ত্রী স্ত্রীজাতি হয়েও এবং একেবারে বঙ্গদেশের সেই বিখ্যাত বাক্‌পটু বঙ্গললনাদের যুগের ললনা হলেও অক্ষয়কে পেরে ওঠে না। কাজেই তাকে হার মানতে হয়েছিল। কিন্তু অক্ষয় চলে যাবার পর ছেলেকে বলেছিল—খবরদার বাবা, যাসনে তুই। জল-ঝড় থামুক, তারপর যাবি। ভয় নেই, কেউ যাবে না পুকুরপাড়ে। প্রাণের ভয় সবারই আছে। তার উপর তোর বাবার যা মুখ! কেউ যাবে না। পাকা আমের স্বাদের জন্যে কানে তপ্ত কথার ছেঁকা কোন লোকের সহ্য হবে না।

কথাটা কিন্তু সত্য হয় নি, তেমন লোকও আছে, অনেক আছে। এবং তাদের মধ্যে এককড়ি বাউড়িনী একজন। শুধু একজনই নয়, অগ্রবর্তিনী একজন। সেই এককড়ি বাউড়িনী যে শান্তির বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে এবং বাউড়ীদের প্রধান কানাই বাউড়ী যার মাসতুত ভাই—সে। কড়ি বাউড়িনী।

ঝড় শেষ হতেই অক্ষয়ের ছেলে ছুটে গিয়েছিল বাগানে। তখন কড়ি সেখানে উপস্থিত। এক আঁচল আম কুড়িয়ে, ঝড়ে খসে পড়া কয়েকখানা শুকনো তালপাতা জড়ো করে মাথায় তুলে বাগান থেকে বেরিয়ে আসছে। সে আম সে তালপাতা কেড়ে নিতে অক্ষয়ের ছেলের সাধ্য হয় নি। সে সমানে তার সঙ্গে ঝগড়া করেছিল। বলেছিল—চিরকাল এ নিয়ম আছে; ঝড়ে ঝরে পড়া আম, তার উপর কারও স্বত্ব নাই। এবং এ অধিকার সেই আদ্যিকাল থেকে ভোগ করে আসছে তারা। আর তোমরা বাবু-ভাইয়েরা যে হাজার কাজ বিনি-পয়সায় করিয়ে নাও, তার কি? এই তো সেদিন অক্ষয়ের বাড়ির পাশ দিয়ে সে আসছিল, অক্ষয় যে তাকে বলেছিল—ওরে, নর্দমায় এই কাপড়খানা উড়ে পড়েছে, ওখানা তুলে পুকুরঘাটে কেচে দিয়ে যা দেখি! সে কি তা দেয় নি?

এ সব তকরারে কড়ির নৈপুণ্য অসাধারণ। এবং সে মুখরা। অক্ষয়ের ছেলেকে তকরারে হারিয়ে সে গণ্ডা-চারেক আম এবং কয়েকখানা তালপাতা নিয়ে বিজয়িনীর ভঙ্গিতেই চলে গিয়েছিল। এবং পথে বার-বার আপন মনেই হেসেছিল! ঘোষাল থাকলে কিন্তু বিপদ হত। সে দিত না। এবং সে ক্ষেত্রে কড়িকে তকরার করতে হত অন্য ধরণে। কৃপা প্রার্থনা করতে হত, হাত জোড় করতে হত, হয়তো বা কাঁদতে হত, বহুকাল পূর্বে মৃত বাপ বা ভাই বা স্বামীকে স্মরণ করে। এবং আজ সকালে যে সে শান্তির বাড়ি কাজ করতে আসে নি, তাও ঠিক এই কারণেই। অক্ষয় ঘোষালের দরজা হয়েই যেতে হয় দিদি-মণির বাড়ি। তাও যদি ঘুর-পথেই যায়, তাতেও ঘোষালের সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বাড়ি দুটি একই পাড়ায় কাছাকাছি, এবং অক্ষয় ঘোষাল সকাল থেকে পাড়ায় ঘুরছে ও বক্তৃতা দিচ্ছে।

তবুও অক্ষয় ঘোষালের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল।

ঘোষাল সকালবেলা কয়েকজন দলের লোক নিয়ে গিয়েছিল ফুড কমিটির ভোটের জন্য। এবং কানাই বাউড়ীর সঙ্গেও দেখা করার উদ্দেশ্য ছিল। কানাই নাকি ফুড কমিটিতে সভ্য হিসেবে দাঁড়াচ্ছে। এটা একটা বিস্ময়কর সংবাদ। কানাই বাউড়ী নোটনের ছেলে, নোটন চিরদিন দক্ষিণ পাড়ার স্বর্ণবাবুর অনুগত ব্যক্তি ছিল। স্বর্ণবাবুর বংশধরেরা এখন গুণীবাবুর কাছে দাসখত লিখেছে। সুতরাং এটা কি গুণীর নির্দেশ?

অথবা, বিজয়ের নির্দেশ? তার পশ্চাতে গৌরীকান্তের নির্দেশ?

সেই এসে দুর্ভাগ্যক্রমে কানাইয়ের পরিবর্তে প্রথমেই দেখা হল তার কড়ির সঙ্গে। এবং হারামজাদী বলেই কষে দিলে এক চড়।

ঠিক তার পরমুহূর্তেই পাড়ার গলি থেকে কানাই বেরিয়ে এসে বিনা বাক্যব্যয়ে এক চড় কষিয়ে দিয়ে পরে বললে—হারাম-জাদা বামুন! মেয়ের গায়ে হাত তোল তুমি? স্তম্ভিত হতবাক্ বিমূঢ়—যা বলবেন তাই অথবা সবগুলিই একসঙ্গে মিলনে যা হয় তাই হয়েছিল অক্ষয় ঘোষালের। কানাই বাউড়ী তাকে চড় মারতে পারে—এ যে ভাবতেও পারে না। কিন্তু মারলে কি করে? কোন্ সাহসে? কার সাহসে?

হে ভগবান! হে বিচারক!

তাকে ডাকা ছাড়া অক্ষয় ঘোষালের আর গত্যন্তর ছিল না।

কানাই বাউড়ী কষ্টিপাথরে খোদাই করা ভৈরবমূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে সামনে। পিছনে তার বাউড়ী পুরুষেরা। তাদের পিছনে রোরুদ্যমানা কড়িকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু তার কান্না শোনা যাচ্ছে।

এই নিয়ে কোলাহল। প্রতিশোধ নেবার শক্তি নাই অক্ষয়ের। মামলা করবারও উপায় নাই। কড়ি মেয়েছেলে, তাকে সেই চড় মেরেছে আগে। নিরুপায় অক্ষয় প্রথমেই এল দক্ষিণ পাড়ায়।

চীৎকার করে অভিসম্পাত দিয়ে কুৎসা রটনা করে আকাশ পর্যন্ত বায়ুস্তর দূষিত করে তুললে।

সে ক্ষমা কাউকে করলে না, সে ভীরু নয়, সে মুখের উপর প্রতি জনটিকে বলে এল—এর শোধ সে নেবে—নেবে—নেবে।

কিশোরকে বললে—তুমি ভণ্ড, তুমি ইতর, ধার্মিকতার অন্তরালে তুমি—তুমি—তুমি দেশটাকে দিয়েছ উচ্ছন্নে।

স্বর্ণবাবুর বংশধরকে বললে, গুণীকে উদ্দেশ করে বললে। বললে—নবগ্রামের পুঞ্জীভূত পাপে আজ ব্রাহ্মণের অভিশম্পাতের আগুন লাগল। এইবার দাউ-দাউ করে জ্বলবে। তাকিয়ে দেখ—ওই অট্টহাসের ডাঙ্গার দিকে। মনে করে দেখ, চাঁদপুরের রায়েদের ভিটের দিকে।

গৌরীকান্তকে বললে—বিজয়কে বললে। অকস্মাৎ সে প্রায় দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে উঠল, বললে—নূতন কালের ধর্মহীন আচারহীন মেকী পণ্ডিত ব্যভিচারীকে ভগবান কখনও ক্ষমা করবেন না।

তারপরেই শান্তির নাম নিয়ে কুৎসা রটনা শুরু করে দিলে।

এ পাপ—এত পাপ কখনও সয় না। নবগ্রাম ধ্বংস হয়ে যাবে। নিশ্চয় যাবে।

ইতিমধ্যেই তার পাশে এসে একে একে জুটল মহাদেব সরকারের ছেলে, ওই সদয়, সুশীল এবং আরও ক'জন। (ক্রমশ)

পুস্তক পরিচয়

উপন্যাস

বিংশ শতাব্দীর শেষ ডিটেকটিভ উপন্যাস : প্রবোধচন্দ্র বসু : পরিবেশক বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা—১২ : দেড় টাকা।

কী করে ডিকেটটিভ উপন্যাস লিখতে হয় সে সম্বন্ধে আমেরিকান লেখক স্টিফেন লীককের চমৎকার একটি সরস লেখা আছে। রচনাটিতে লীকক ডিটেকটিভ উপন্যাসের লেখকদের নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করলেও জমিয়ে ডিটেকটিভ গল্প লেখা যে দস্তুরমত কঠিন কাজ এ সম্পর্কে অনেকেই দ্বিমত হবেন না। আলোচ্য বইটিতে লেখক এ দুইর মধ্যে একটি রফা করতে প্রয়াস পেয়েছেন, কিছুটা সফলও হয়েছেন। রহস্য-উপন্যাস-ভবনের অন্যতম সহকারী সম্পাদক গঙ্গারাম দস্তিদারকে চায়ের টেবিলে ঘুম পাড়িয়ে হত্যা রহস্যের গলি পথে স্বপ্নবিহার করিয়েছেন লেখক। গল্পের শেষ গঙ্গারামের নিদ্রাভঙ্গে, তখন চায়ের দোকান বন্ধ করবার সময় হয়ে গেছে। সরস ভঙ্গীতে মাঝে মাঝে গল্প বেশ জমে উঠেছে। গল্প বলবার কৌশলে লেখক আর একটু নিপুণ হলে প্রচেষ্টা সার্থকতর হতো। গল্পটি কয়েক রোমহর্ষক হত্যা এবং এক মুঠো সস্তা প্রেমের ফেনা নিয়ে ততোধিক সস্তা কোন দুর্বল গল্প ফাঁদতে বসেননি অন্তত এ কারণে লেখককে ধন্যবাদ।

(২৪৯।৫২)

আঁধি : সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। তিন টাকা।

পত্নীর মৃত্যুর পর অভয়াশঙ্কর স্থির করে-ছিলেন আর বিয়ে করবেন না। একমাত্র ছেলে নিখিলকে কেন্দ্র করেই দিন কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু বিপদ বাধাল নিখিল। মামাবাড়ী গিয়ে দূর সম্পর্কের অনাত্মীয়া এক মাসীমার স্নেহে তার মার স্পর্শ খুঁজে পেল। শ্বাশুড়ির অনুরোধে এবং নিখিলের দিকে চেয়ে শেষ পর্যন্ত সেই মেয়েটিকেই (সুষমা যার নাম) অভয়াশঙ্কর বিয়ে করে আনলেন। সুষমাকে তিনি বিয়ে করলেন বটে মনের শরীক করলেন না। নিখিলের পরিচর্যার সব ভার পড়ল সুষমার উপর। সুষমা বুদ্ধিমতী। নিখিলকে সে যথার্থই স্নেহ করে। গৃহের সে কর্ত্রী তবু ভর্ত্রী তাঁর নাগালের বাইরে। এ অপমান সে শুধু নিখিলের মুখ চেয়ে সইল। তবু স্বামীর সঙ্গে বিবাদ ঘনিয়ে এলো। সুষমার স্নেহ মায়ের, অভয়াশঙ্করের পিতার। মায়ের স্নেহে নিঃশ্বাস নেবার খোলা আকাশ, সস্নেহ প্রশ্রয়। পিতার স্নেহে শাসনের বন্ধ দেয়াল। এই নিয়ে দ্বন্দ্ব। আর এই দ্বন্দ্বই উপন্যাসের উপজীব্য।

বলাই বাহুল্য, এ উপন্যাস ঘটনাশ্রয়ী নয়, মনস্তত্ত্বের গ্রন্থী মোচনেই এর সার্থকতা। সে প্রচেষ্টায় শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় সঠিক সাফল্য-লাভে সমর্থ হননি। সুষমার চরিত্র চিত্রণে তিনি তিনি যতটা সার্থক অভয়াশঙ্করের বেলায় তা নন। অভয়াশঙ্করের চরিত্রে যে ব্যক্তিত্ব আরোপ করতে চেয়েছেন তা ব্যর্থ হয়েছে অসঙ্গতির জন্য। এমনকি অভয়াশঙ্করকে পুত্রস্নেহে অন্ধ বলে ধরে নিয়েও সে অসঙ্গতি সমর্থন করা যায় না। মা আর বাবার দুই বিপরীতধর্মী স্নেহ-ধারার মাঝখানে বিমূঢ় নিখিলের চরিত্রটি মোটা-মুটি ভালো ফুটেছে।

একটি ছোট ছেলের চরিত্রকে কেন্দ্র করে উপন্যাস বলে তার প্রচ্ছদেও ছেলেমানষির পরিচয় দিতে হবে এমন কি কথা আছে।

(২৪৮।৫২)

চক্রান্তজালে নারী : দীনেন্দ্রকুমার রায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলকাতা—৬। দুই টাকা।

অলস অবসরের সঙ্গী সেই জাতীয় আরও একখানি উপন্যাস। অনিদ্রার মহৌষধ। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক নিহত, সন্দেহক্রমে তার সুন্দরী যুবতী প্রাইভেট সেক্রেটারী খুনের দায়ে বন্দী। অবশেষে চক্রান্তজাল ছিন্ন করে প্রণয়ী উকিল কর্তৃক তার অব্যাহতিলাভ; এবং বলাই বাহুল্য, এর পরেই বিবাহ প্রসঙ্গ। ঘটের ওপর আম্র-পল্লব। কাহিনীটি তেমন জটিল করে ফাঁদা না হলেও কৌতূহল জাগায়। কিন্তু কথোপকথনের ভাষায় আর অপ্রচলিত ক্রিয়াপদের ব্যবহার না করলেই ভালো।

(২৪৬।৫২)

রাজমোহন (প্রথম) : রাধারমণ দাস সম্পাদিত। ফাইন আর্ট পাবলিশিং হাউস। ২, টাকা।

রাজমোহন (দ্বিতীয়) : রাধারমণ দাস সম্পাদিত। ফাইন আর্ট পাবলিশিং হাউস। ২, টাকা।

ডিটেকটিভ সিরিজের প্রথম দুখানি বই। রহস্যভেদকারী উকিল রাজমোহনের মারফৎ গল্প বলা হয়েছে। রাজমোহন একাধারে উকিল এবং ডিটেকটিভ। ডিটেকটিভ গল্পের জন্য সাধারণত যে যে মালমশলার প্রয়োজন তার প্রায় সবই এ বই দুখানিতে সমুপস্থিত। চক্রান্ত, হত্যা এবং নিরাপরাধকে গ্রেপ্তার। সর্বোপরি ডিটেকটিভ-উকিলের অসাধারণ বুদ্ধিবলে প্রকৃত খুনীর সন্ধান ও নিরপরাধের মুক্তি। কেবল একটি জিনিসের ঘাটতি—সে হলো কৌতূহলকে ক্রম-বর্ধমান করে অসাধারণ নৈপুণ্যে একটু একটু করে গল্প বলা। আর সেই হেতু এখানে ছেলে-ভুলান ছোট গল্পের সঙ্গে জটিল ডিটেকটিভ গল্পের তফাৎ লুপ্তপ্রায়। সিরিজ যখন শুরু হয়েছে আশা করা যায় আরও দুচার দশখানা ইত্যাকার গল্প না পড়ে পাঠকদের নিস্তার নেই।

(২৩৯।৫২) (২৪০।৫২)

নাটক

মনোবৈজ্ঞানিক : সত্যেন সিংহ : দাশগুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ৫৪।৩ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা—১২। দেড় টাকা।

ভ্রান্তপথ কোন এক বিখ্যাত মনোবৈজ্ঞানিকের ট্রাজেডি মনোবৈজ্ঞানিক নাটকের বিষয়বস্তু। বিশ্ববিখ্যাত প্রফেসর প্রমথনাথ তরফদারের গবেষণার বিষয় ছিল মানুষকে বিশেষ পরিবেশে লালন করে মন বাদ দিয়ে তাকে স্বভাবের দাস করা যায় কিনা। এজন্যে তিনি নিজের একমাত্র ছেলেকেও মৃত বন্ধুর পুত্র বলে মানুষ করেছেন নিজের গবেষণার সহকারী হিসেবে। রাস্তা থেকে কুড়িয়ে পাওয়া মেয়েকে লালন করেছেন নিজের মেয়ে বলে। তাঁর গবেষণার কাজে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, আর সে প্রয়োজন মেটাবার জন্যে অভিনব উপায়ে মেয়ে আর বন্ধু পুত্র বলে পরিচিত নিজের ছেলেকে দিয়ে গয়না চুরি করালেন বিখ্যাত অলঙ্কার বিক্রেতার দোকান থেকে। অনেক নাটকীয় ঘটনার পরে অধ্যাপকের চৈতন্য হলো মানুষকে তার মনের থেকে আলাদা করা যায় না। কিন্তু তখন তিনি প্রথম পরাজয়ের উত্তেজনায় ছেলেকে গুলী করে মেরে ফেলেছেন। শেষ দৃশ্যে, আদালতে, কুড়িয়ে পাওয়া মেয়েরও

পিতৃপরিচয় মিলল। আর এই পিতা সেই অলংকার ব্যবসায়ী। আর একটি চরিত্র প্রতিভাবান তরুণ মনোবৈজ্ঞানিক জজ বিমল রায়চৌধুরী। তাকে নিজের গবেষণার উত্তরসাধক করতে চেয়েছিলেন প্রফেসর তরফদার, কিন্তু তরফদারের সাধনাকে শ্রদ্ধা করলেও তাঁর মতামতের বিরোধী ডাঃ সুবিমল রায়চৌধুরী। আর এবিষয়ে তরফদারের কন্যা সবিতাকে সেই সচেতন করে তুলল। এখান থেকেই ট্র্যাজেডির সূত্রপাত।

দ্রুতগতিশীল ঘটনা এবং তার যথাযথ সংস্থাপনে গল্প শেষ পর্যন্ত একটি ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছেছে এবং একটি নাটকীয় পরিণতিও হয়েছে। চরিত্র সৃষ্টিতে নাট্যকার মোটামুটি সৃজনতার পরিচয়ই দিয়েছেন। নাটকের শেষ বিচার, সম্ভবত, তার অভিনয়োপযোগিতায়। সেদিক থেকে মনোবৈজ্ঞানিক দর্শকদের আনন্দ দিতে পারবে।

আদালতের দৃশ্যে গল্প ক্লাইম্যাক্সে তোলা বহু ব্যবহৃত পদ্ধতি। অতিনাটকীয়তা এসে ভারসাম্যে বিঘ্ন ঘটাবার আশঙ্কাও আছে। কিছুটা হয়েছেও। আর যতদূর জানি চার্জ বুঝে নিয়ে জুরিরা নিজেদের মন্ত্রণাকক্ষে চলে যায়, ফিরে এসে ফোরম্যান তাঁদের মতামত জানায়। এখানে তার ব্যতিক্রম করা হয়েছে। এই ধরণের ত্রুটি একটু দৃষ্টিকটু বলেই মনে হবে।

নাট্যকারের এই প্রথম প্রচেষ্টা। সেদিক থেকে তিনি নিঃসন্দেহে সফল। বাঙলা নাটকের এই দুর্দিনে ভবিষ্যতে তিনি সার্থকতর নাটক রচনা করবেন এ আশা করব।

(২৪৩।৫২)

জন্মান্তর ঃ শ্রীসত্যচরণ ঘোষ ঃ আসর প্রকাশিকা, ২।১ নারায়ণচন্দ্র সুর স্ট্রীট, কলিকাতা—৫। আড়াই টাকা।

বাঙলার নাট্যসাহিত্যের কথা ভাবতে গিয়ে মনে হলো, মিত্রাক্ষর ছন্দপদ্ধতিতে একটি পঞ্চমাঙ্ক নাট্যকাব্য রচনা করলে কি রকম হবে', ভূমিকায় এবম্বিধ উক্তি থেকেই জন্মান্তর নাট্যকাব্যের উদ্দেশ্য প্রাঞ্জল হবে। বিষয়বস্তু সম্পর্কে নাট্যকার বলছেন, 'জন্মান্তরে জন্মান্তরবাদকেই গ্রহণ করেছি।'...'পরম আত্মীয়তাবোধ, প্রেম ও ভালবাসার আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের মূলে যে একটা জন্মান্তরের সম্বন্ধ আছে 'জন্মান্তর' নাটকের মধ্যে দিয়ে তারই প্রমাণ করবার একটা চেষ্টা করা হয়েছে।' বিষয়বস্তু এবং উদ্দেশ্য ভূমিকাতেই নাট্যকার বিশদ করেছেন। কিন্তু মুশকিল হয়েছে মূল নাটক নিয়ে। নাট্যকার যিনি লিখছেন নাটক সম্বন্ধে এত ভূমিকার পরেও, তাঁর ধারণা ভাসা ভাসা এবং কাব্য সম্বন্ধে একেবারেই অনুপস্থিত থাকায় যে বিপদ আশংকা করা যায় তা হয়েছে। ফলে জন্মান্তর নাটক হিসেবে দুর্বল, কাব্য হিসেবে অপাংক্তেয় এবং নাট্যকাব্য হিসেবে অপাঠ্য। পর পর দুটি লাইনের শেষে মিল থাকলেই, নাইবা থাকল তাদের মাত্রার কোন সঙ্গতি, মিত্রাক্ষর ছন্দ হয় কথাটা জানা ছিল না। বাঙলায় নাট্যকাব্য লিখতেই হবে এমন স্বনিয়োজিত কোন মহৎকার্যে ব্রতী না হয়ে নেহাৎ গদ্যে লিখলে বরং গল্পের নাটকীয়তাটুকুর খানিকটা সদ্ব্যবহার হতো।

(২০২।৫২)

জীবনী

ব্রহ্মর্ষি রজনীকান্ত—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-হৃদয় বন মহারাজ প্রণীত। শ্রীকামাখ্যাচরণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মহেন্দ্রু পাটনা, বিহার হইতে প্রকাশিত। গ্রন্থকারের নিকট ভজন কুটীর, বৃন্দাবন; মথুরা প্রাপ্তব্য। মূল্য—সাড়ে দশ টাকা।

বর্তমানে বৃন্দাবনবাসী শ্রীমৎ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ বাঙালী পাঠক সমাজের নিকট অপরিচিত নহেন। পরম ভক্ত এবং বহুশ্রুত বৈষ্ণব বন মহারাজের ইংরেজী এবং বাঙলা ভাষায় লিখিত কয়েকখানি গ্রন্থ চিন্তাশীল সমাজে যথেষ্টই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থখানি তাঁহার পিতৃদেবের জীবনী। আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। বিক্রমপুরের ব্রাহ্মণ-সমাজের মুকুটমণি স্বরূপ ব্রহ্মর্ষি রজনীকান্তের এই ৬২৪ পৃষ্ঠাব্যাপী জীবনীতে সেকালের ব্রাহ্মণ-সমাজের ত্যাগ, তিতিক্ষা এবং শাস্ত্রসম্মত সদাচার নিষ্ঠার উজ্জ্বল আদর্শ পরিস্ফুট হইয়াছে। বাঙলার মাটিতে বহু ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। এই সব তপঃ-পরায়ণ পুরুষের ব্যক্তিগত জীবনের সমুদায় প্রভাব পারিবারিক গণ্ডীকে অতিক্রম করিয়া সমাজের উপর বিরাট মহীরূহের মত স্নিগ্ধচ্ছায়া বিস্তার করিয়াছিল এবং বাঙলার সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে প্রাণধর্মে উজ্জীবিত রাখিত। সাংসারিক দ্বন্দ্ব-সঙ্ঘাতের মধ্যে নিজদিগকে ব্রহ্ম-সাধনায় নির্লিপ্ত রাখিয়া এ দেশের মনোমূলে ইঁহারা যে অমৃত নিষিক্ত করিয়া গিয়াছেন তাহা অদ্যাপি বাঙলার সাংস্কৃতিকে

প্রতিবিত করিতেছে। ব্রহ্মর্ষি রজনীকান্ত এমনই ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। এই পবিত্র জীবনী পাঠের সঙ্গে সঙ্গে শতাধিক বৎসর পূর্বে বাঙলার সমাজ-জীবনের একটি সুস্পষ্ট ছবি আমাদের চোখের সামনে ফুটিয়া উঠে। সুখে দুঃখে বিজড়িত বাঙলার শ্যামল রূপটির আমরা পরিচয় পাই। গ্রন্থখানি সাহিত্য সৃষ্টির দিক হইতে সার্থকতা লাভ করিয়াছে। পারিবারিক তথ্যের ভিত্তি হইতে সর্বজনীন আগ্রহ জাগাইবার মত রসের উদ্দীপ্তি এ আলোচনার মধ্যে বিশেষভাবেই পাওয়া যায়। ব্যক্তি জীবনের এই ব্যাপ্তির দিকটা পরিস্ফুট করাতেই জীবনী রচনার সার্থকতা। গ্রন্থকারের রচনা-রীতির এইখানেই কৌশল পরিলক্ষিত হইবে। অবশ্য সকলের জীবনে সর্বজনীন সত্যের এই ব্যাপ্তি ও দীপ্তির উপযোগী উপাদান সমানভাবে থাকে না; বস্তুত ব্রহ্মর্ষি রজনীকান্তের মত জীবন সকলের হইবে, ইহা সম্ভব নয়। কিন্তু দেখে কয়জন? বুঝে কয়জন? বিশেষতঃ আধুনিক রাজনীতিক-দের মত জীবন তো ইঁহাদের নয় যে কতকগুলি ঘটনার ফিরিস্তি দিলেই প্রকাণ্ড একখানা পুঁথি হইয়া যাইবে। একান্ত অনপেক্ষ, অনাড়ম্বর এবং নিরহংকৃত এই সব সাধকের জীবনে বাহিরে তেমন চমক মিলে না, ইঁহাদিগকে বুঝিতে হইলে, ইঁহাদিগকে ধরিতে হইলে, অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োজন হইয়া থাকে। এ ক্ষেত্রে শ্রদ্ধার সহিত বুদ্ধিকে প্রয়োগ করিতে হয়। বৈষ্ণব শাস্ত্রে যাহাকে বলে বৈশারদী ধী এ কাজে সেই জিনিস দরকার। সেই দিক হইতে গ্রন্থকারের দক্ষতার পরিচয় আমরা পাইয়াছি। এই পুণ্য জীবনী-পাঠে সকলেই প্রীতি লাভ করিবেন এবং বাঙলা দেশের সমাজ-জীবন এবং সাধনা সম্বন্ধে বহু তথ্য পরিজ্ঞাত হইয়া উপকৃত হইবেন, সন্দেহ নাই।

ছোট গল্প

বহুদিন পরে ঃ শ্রীরিক্ত ঃ মায়া গ্রন্থাগার ঃ কদমকুঁয়া, পাটনা ঃ পাঁচসিকা।

গুটি কয়েক ছোট গল্পের সংগ্রহ। গল্পগুলি নেহাত যেন লিখবার জন্যেই লেখা। দুয়ে আর দুয়ে মিলিয়ে চার করা। সেই ছকে ফেলা গল্প, তাও আবার সব সময় ছক মেলেনি। তবু ভাষার একটি অনিপুণ সারল্য আছে বলে কোন কোন গল্প শেষ পর্যন্ত পড়া যায়।

(২৪৯।৫২)

প্রবন্ধ-সাহিত্য

বলাকা কাব্য পরিক্রমা—শ্রীক্ষিতিমোহন সেন; এ মুখার্জি এণ্ড কোং লিঃ; ২, কলেজ স্কোয়ার। মূল্য—৪৷৷০ টাকা।

'বলাকা কাব্য পরিক্রমা'য় শ্রীক্ষিতিমোহন সেন বিভিন্ন সময়ে রবীন্দ্রনাথ বলাকা কাব্য সম্বন্ধে যা আলাপ আলোচনা করেছেন, তাই ধরে রেখেছেন। বইটি ৫টি অংশে বিভক্ত। প্রথমে গ্রন্থকারের 'নিবেদন'—তাতে বলাকার গতিবাদের পূর্বরূপ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে এবং রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য লেখায় যা পাওয়া যায় তার আলোচনা আছে। বলাকা পূর্ববর্তী কাব্যে এই গতিরূপের আলোচনায় রবীন্দ্র-নাথের নিজের স্বীকৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় বিভাগ হল—'বলাকার জন্মকথা', তারপর 'বলাকার ছন্দ' 'গ্রন্থ-ভূমিকা', 'কবিতা ব্যাখ্যা'। বলাকার ছন্দে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছন্দের বিভিন্ন পরীক্ষার যে ইতিহাস দিয়েছেন সেটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

বলাকার তত্ত্ব এবং ইতিহাসের যে আলোচনা আছে, তার মধ্যে নতুন তথ্য কোন না থাকলেও, বলাকার 'গ্রন্থ পরিচয়ে' যে সব তথ্যের সমাবেশ আছে, তার বিস্তৃত ফুটনোটে গ্রন্থকার ঐ গানটি "ওগো তুমি নানা রূপে এস প্রাণে" বলে উল্লেখ করেছেন। গানটি আসলে "তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে" হবে। আর সেটিও অসমাপ্ত পড়েছিল না। শারদোৎসবের ঐ নান্দী রচিত হয় ১৩১৫ সালে। 'তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে' ১৩১৪ সালেই সম্পূর্ণরূপে রচিত। শারোৎসবের নান্দীটি পড়েই বোঝা যায় "তাকেই পূর্ণ করে নান্দী লিখলাম" একথাও ঠিক নয়। তবে ঐ গানটির কিছু ছাপ আছে। শারদোৎসবের প্রথম অভিনয়ে নান্দীর পর ঐ গানটিও গাওয়া হয়েছিল।

৩২৩।৫২

কবিতা

তদবধি ঃ শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য ঃ মায়া গ্রন্থাগার ঃ কদমকুঁয়া, পাটনা ঃ এক টাকা।

আর্ট পেপারে ছাপা কাব্যগ্রন্থ। সব কটি কবিতার উৎসই পল্লী বিয়োগ ব্যথা। কবিকর্ম গতানুগতিক এবং বৈশিষ্ট্য বর্জিত হলেও একটি সহজ আন্তরিকতা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, আর এই আন্তরিকতাই গ্রন্থটিকে কবিতা-না-হবার হাত থেকে বাঁচিয়েছে। কিন্তু কবিতা অনুরাগের বলে কালির রংও লাল হতে হবে এ কেমন কথা।

(২৫১।৫২)

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি দেশ পত্রিকায় সমালোচনার্থ আসিয়াছে। পরে সমালোচনা বাহির হইলে তাহা যথাসময়ে প্রকাশক অথবা গ্রন্থকারের নিকট প্রেরিত হইবে।

আর্তনাদ—বীরেশ্বর সিংহ; ক্রান্তি প্রকাশনী, ১১৫এ, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—১৷০ আনা। (৩২৮।৫২)

দূরেভাষিনী—নরেন্দ্রনাথ মিত্র; ইণ্ডিয়ানা লিমিটেড, ২।১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—২৷৷০ টাকা। (৩২৯।৫২)

মানবধর্ম ও বাঙলাকাব্যে মধ্যযুগ—অরবিন্দ পোদ্দার; ইণ্ডিয়ানা লিমিটেড, ২।১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—৬৷৷০ টাকা। (৩৩০।৫২)

বাঙালীর ইতিহাস (কিশোর সংস্করণ)—সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বুক ওয়ার্ল্ড লিমিটেড, ৫, হেস্টিংস্ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—৪্ টাকা। (৩৩১।৫২)

কথাগুচ্ছ—সুধীরচন্দ্র সরকার; এম সি সরকার এণ্ড সন্স লিঃ, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—৭্ টাকা। (৩৩২।৫২)

সরস্বতীর খাস তালুক

মহাশয়,—আলোচনার ক্ষেত্র থেকে নিজেকে সরিয়ে নিজের দেশের সব কিছুকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে উড়িয়ে দেওয়া এক শ্রেণীর লোকের কাছে একটা ফ্যাশন বলে পরিগণিত হয়েছে। ভয় হচ্ছে রূপদর্শীও এই মোহের বশবর্তী হয়েই অনেক কিছু বলছেন যা পড়ে বারবার মনে হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের 'গোরার' কথা—নিজের মাঝে নিজের সব কিছুর প্রতি গভীরতম শ্রদ্ধা পরিপোষণের কথা। সে শ্রদ্ধা সে ভালবাসার অভাবে সমালোচনা, সমালোচনা না হয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ভরা প্রচারে পর্যবসিত হয়। এতে লেখকের নিজের একটা সুলভ আত্মতৃপ্তির অবকাশ থাকলেও সত্যের বিকৃতিতে রচনা নিজে মলিন হয়ে ওঠে। প্রশ্ন উঠতে পারে সহজ রচনার ক্ষেত্রে পরিহাসকে লঘু করে গ্রহণ করাই শ্রেয়, কিন্তু সেদিকেও লক্ষ্য রাখা উচিত পরিহাস তার মুখোশ ফেলে 'সমুদ্যত প্রহরণধারী' হয়ে সব কিছুকে যেন মিথ্যা আঘাত না করে—পরিহাসের ব্যর্থতা সেখানেই।

'সরস্বতীর খাস তালুক' এর মাঝে বিশ্ববিদ্যালয় আর তার বাঙালী ছাত্র সম্বন্ধে যে মন্তব্য রূপদর্শী করেছেন তার সম্পর্কে একথা বলতে বাধ্য হলেম।

আজকের দিনে দেশজোড়া, শুধু দেশ জোড়া নয় পৃথিবী জোড়া শিক্ষা সংস্কৃতির যে বিরাট সংকট মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে তার ছায়া কেবল খণ্ডিত হয়ে এশিয়ার এ অঞ্চলে শুধু কলকাতা আর বাঙলার শিক্ষা জীবনকেই রাহুগ্রস্ত করেনি, রাহুগ্রস্ত করেছে ভারতবর্ষকে, এশিয়াকে, আমেরিকা ও পৃথিবীর অন্য অংশকে—কোথাও কম কোথাও বেশী। শিক্ষা জগতের অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র আমেরিকার ছাত্রদের, মেয়েদের ডরমিটরি ঘেরাও করে, রাস্তা ঘাটে তাদের শালীনতা হানির প্রচেষ্টা সাক্ষ্য দেবে শিক্ষা প্রণালীর পঙ্গুতার ওপর, তার সর্বব্যাপী সংকটের ওপর।

এর মূল রয়েছে অনেক গভীরে, আলোকপাত করতে হবে তারই ওপরে নইলে গোলদিঘীর পশ্চিমপাড়ের তিনটে বিল্ডিং-এর কামরায় ঝাঁটা চালালেই সব কিছু সহজ সরল হয়ে উঠবে না, এ সত্য হৃদয়ঙ্গম করা উচিত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতির বোঝা অনেক দোষের ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে স্বীকার করি; কিন্তু সে কেবল কলকাতায় নয়, ভারতের অন্য অংশে, অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অন্ধকারাচ্ছন্ন অন্দরে অনেক বিষ জমা হয়েছে—একটু সন্ধান করলেই এর সত্যতা বোঝা যাবে।

সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বাঙালী ছাত্র সব ছাত্রের চেয়ে খারাপ উত্তর করে 'বই-এর পাতার বাইরে অতি সামান্য জিনিসেও হাঁ হয়ে থাকে'—এ কথা রূপদর্শীর সাথে একমত হয়ে মানতে পারলেম না, অন্য ভদ্রলোকের উক্তির সাহায্যে কোলকাতার ছাত্ররা 'ঠাসবুনোন উজবুক' বলে যে মন্তব্য লেখক করেছেন পরিহাসের এক্তিয়ার ছাড়িয়ে তা হীনতম প্রচারে পরিণত হয়েছে—এখানেই আমার প্রধান আপত্তি।

সংখ্যাবিজ্ঞানের সামান্য সাহায্য নিয়ে—বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গে সহজ মেলামেশার সুযোগ নিয়ে রূপদর্শী যদি তাঁর বক্তব্যের সমর্থন খুঁজতে যান, তবে তিনি ব্যর্থ হবেন, এ সম্বন্ধে আমি দৃঢ় নিশ্চিত।

সর্বভারতীয় পরীক্ষায় বাঙালী ছাত্রদের ক্রমব্যর্থতার কারণ কতটা তাদের অজ্ঞতা আর কতটাই বা প্রাদেশিকতার বিষময় ফল সে সম্বন্ধেও তিনি কিঞ্চিৎ তথ্য আহরণ করলে সুখী হব।

—সুবীর রায়, কলিকাতা।

খেলোয়াড় চরিত

মহাশয়,—গত ৩১শে শ্রাবণের "দেশ" পত্রিকায় রূপদর্শী লিখিত "খেলোয়াড় চরিত" রচনাটি পড়িয়া খুবই আনন্দিত এবং উৎসাহিত হলাম। তিনি খেলোয়াড়দের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে কয়টি অতি সত্য কথা লিখেছেন তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারি না। রূপদর্শী "দেশের" ঐ সংখ্যার ১৮৬ পৃষ্ঠায় এক জায়গায় লিখেছেন যে,......"ক্লাবগুলিতে অজস্র টাকা চাঁদা ওঠে, বিলাস-ব্যসনে সে টাকা নিয়ত উড়ে যায়; কিন্তু সর্বত্র দেখেছি যাদের জীবনের স্বর্ণময় মুহূর্তগুলির বিনিময়ে এই আমোদ, এই স্ফূর্তি পরিবেশিত হচ্ছে, সেই হতভাগ্য পুরানো খেলোয়োড়দের জন্য একটি আধলাও কেউ বের করছেন না। বহু খেলোয়াড় ব্যাধি জর্জরিত অবস্থায় অশেষ দুর্দশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।"

রূপদর্শী এই যে ভাল ভাল খেলোয়াড়দের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অনুভব করেছেন, আশা করি সকল বড় বড় স্থায়ী ক্লাবই মেনে নিতে বাধ্য হবেন যে, ভবিষ্যতে গরীব অথচ সুনিপুণ খেলোয়াড়দের অতি শোচনীয় অবস্থায় পড়তে হয়। কারণ এইসব খেলোয়াড়রা খেলার নেশার বশে জীবনের অতি মূল্যবান বয়স খেলার জন্যই উৎসর্গ করে থাকেন। প্রতি ক্লাবেরই কর্তব্য এইসব খেলোয়াড়দের সংসারের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখা। কোন একটি প্লেয়ারের খেলার জীবনে তাঁর সংসারের প্রতি অমনোযোগিতার জন্য কি ক্ষতি হতে পারে বা হচ্ছে সে বিষয়ে ক্লাবের সভ্যবৃন্দের সচেতন থাকা প্রয়োজন। সেই প্লেয়ারটিই যেমন খেলায় ক্লাবের মর্যাদা বৃদ্ধি করে তখন সেইভাবে ঐ প্লেয়ারটির স্বাস্থ্যের এবং সংসারের প্রতি দৃষ্টি রাখাও ক্লাবের বিশেষ কর্তব্য। এর জন্য প্রতি বৎসর মাঝে মাঝে পুরাতন এবং নূতন সভ্যদের নিয়ে মিটিং করা দরকার যাতে খেলাধুলার আলোচনা ছাড়াও পুরান ভাল ভাল খেলোয়াড়দের ভবিষ্যৎ কি অবস্থায় পরিণত হচ্ছে তারও আলোচনা করে প্রতিকার করা দরকার। যেখানে পুরাতন ভাল খেলোয়াড় সুস্থ সবল আছেন অথচ অর্থাভাব—সে ক্ষেত্রে ক্লাবের সভ্যবৃন্দের চেষ্টা করা উচিত যাতে কোনরকম চাকরীর উপায় হয়। আবার যখন কোন ভাল খেলোয়াড় হয়ত কোন শোচনীয় অবস্থায় পড়েছেন জানা যায় এবং ক্লাবের বেনিফিট ফাণ্ডেও হয়ত সাহায্য কুলাচ্ছে না তখন সভ্যবৃন্দের কর্তব্য অন্য কোন উপায় বিশেষভাবে চাঁদা আদায় করে তাঁর সাহায্য করা। রূপদর্শী এই গুণীর গুণ বুঝে তাঁদের ভবিষ্যতের শোচনীয় অবস্থায় সমবেদনা জানিয়েছেন এর জন্য তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ। —শ্রীমোহিনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মেদিনীপুর।

বিকল্প ও প্রতিধ্বনি

সবিনয় নিবেদন,—অধ্যাপক নিরঞ্জনপ্রসাদ চৌধুরীর পত্র ও রঞ্জনের উত্তর পড়লাম। রঞ্জনের লেখার ভঙ্গীটি আমারও ভালো লাগে। স্থানে স্থানে তাঁর ভাষা সত্যিই সুন্দর, উজ্জ্বল, চিত্তহারী। প্রতিটি শব্দ চয়নে ও তার যথার্থ প্রয়োগে তিনি যথেষ্ট যত্ন ও শ্রম স্বীকার করে থাকেন। কিন্তু সাহিত্য অংক নয় বলেই বোধ হয় এত হিসেব সত্ত্বেও লেখার সহজ গতিটি মাঝে মাঝে আড়ষ্ট হয়ে যায়। দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হয় এতে পাঠকের স্বচ্ছন্দ গতি ব্যাহত হয়। রঞ্জন বিষয়ের দুরূহতার কথা বলেছেন। কিন্তু দুরূহ বিষয় সহজভাবে প্রকাশের মধ্যেই তো লেখকের শক্তির পরিচয়। তাছাড়া দুরূহ বিষয় সহজভাবে প্রকাশের দৃষ্টান্তও সাহিত্যে নিতান্ত বিরল নয়। রঞ্জন এ পর্যন্ত যে সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন সেগুলি সত্যই যথেষ্ট দুরূহ কিনা সন্দেহ আছে। আমার মনে হয় স্টাইলের দিকে আর একটু কম লক্ষ্য দিয়ে সহজভাবে নিজের বক্তব্য প্রকাশের চেষ্টা করলে রঞ্জন আরও অধিক সংখ্যক পাঠককে আরো অধিক পরিমাণে তৃপ্ত করতে সক্ষম হবেন। অবশ্য এ অনুরোধ কতটুকু রক্ষিত হবে জানি না। কারণ যতদূর জানি রঞ্জন তাঁর নিজস্ব স্টাইল সম্বন্ধে যেন একটু বেশি পরিমাণেই সচেতন। —রমলা মুখোপাধ্যায়, ঝরিয়া।

সাতের বছর পারে

সন্তোষকুমার দে

বিয়ে হয়ে গেলে নাটক যখন শুরু হবার কথা, তখনই উপন্যাস শেষ হয়। কিন্তু জীবন তো সেখানে থমকে থাকে না, এগিয়ে চলে, তার ইতিহাস তাই আরো বিচিত্র, আরো রহস্যময়, আরো প্রাণবন্ত। পরিচয় যখন নিবিড় হয়, তখনই তাতে সহজ সুরের আমেজ আসে। চাঁদ ও চাতক, রজনী ও রজনীগন্ধা থেকে মন নেবে আসে তেল-নুন-লকড়ির দৈনন্দিন ঘরোয়া পরিবেশে। তাতে রুক্ষতা হয়তো কিছু আছে, সূক্ষ্মতা একেবারে নেই, তাই বা বলি কি করে?

সরোজ ও সবিতার সংসার দূর থেকে দেখলে আর দশজনের মতোই মনে হবে। তারাও খায়-দায়, ছেলেমেয়ে মানুষ করে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মান-অভিমান হয়, আবার মিলনের বন্যায় ভেসে যায় উষ্মার বিষ-বাষ্পটুকু। পরিচ্ছন্ন পরিবেশে হেসে ওঠে দুটি অনাবিল চিত্ত।

সরোজ পিছন ফিরে তাকায়—সতেরো বছর আগের দিনগুলির দিকে। সব সময় যে সহজে সব কিছু নজরে পড়ে তা নয়। দিন যাপনের গ্লানি কম নয়, তার আবিলতায় চোখ ঝাপসা হয়ে থাকে, কানেও বেশী দূরের বাঁশী পশে না। কিন্তু রোগশয্যায় শুয়ে অখণ্ড অবসরে অবিরাম রোমন্থনের অবকাশ জুটল যখন, সরোজ দেখতে চাইল পিছন ফিরে।

সতেরো বছরে পৃথিবীর চেহারা পাল্টে গেছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে, দেশের হাল-হকিকত বদল হয়ে গেছে। লোকের জীবনে যেন কিছুতেই তৃপ্তি নেই, স্বস্তি নেই, শান্তি নেই। যতোই আনো, আরো চাই। খাক্তি মিটছে না কিছুতে। আয় দুগুণ-তিনগুণ বেড়েছে, খরচ বেড়েছে তার বহুগুণ, চাল বেড়েছে তারো বেশি। জীবনের সহজ আনন্দ কোথায় উবে গেছে।

শুধু কি সরোজের জীবনে, না এমনই আরো অনেকের—প্রশ্নটা নিজের মনেই শুধায় সরোজ। তার বয়স বেড়েছে, পাক ধরেছে মাথার চুলে। সংসারের যাঁরা প্রধান ছিলেন, একে একে বিদায় নিয়েছেন। গোটা দায়িত্ব এখন পড়েছে তার উপর। সে যে, সে দায়িত্ব সম্পূর্ণ সুন্দরভাবে বহন করতে পারছে, এমন বৃথা গর্ব তার নেই। তবে হয়ত আরো অনেকের থেকে নিতান্ত খারাপভাবে চলছে না তার।

কিন্তু সবিতা কি মনে করে? প্রশ্নটা মনে করে চমকে ওঠে সরোজ। এখন তার সময় হয় না যে, সবিতাকে নিয়ে দুদণ্ড গল্প করে—তাই বলে মন থেকেও কি সরে গেছে সে? নিশ্চয় নয়, নিশ্চয় নয়। মনে মনে না-না বলে অস্বীকৃতির দৃঢ়তায় সে শির-শ্চালন করতে থাকে।

সবিতার সাথে সরোজের বিয়েটাই একটা গোটা উপন্যাসের কাহিনী। লেখকের রুচিমতো তাতে রং ফলিয়ে দুশো থেকে চারশো পৃষ্ঠার কেতাব করা কঠিন নয়। মোট কথা, সরোজ ও সবিতা একদিন ভালো-বেসে বিয়ে করেছিল। সরোজ মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে, মফস্বল শহরে মানুষ। পিসীর বাড়ি পল্লীগ্রামে, সেখানে যেয়ে সবিতাকে দেখে তার ভালো লাগে। লাবণ্য-ময়ী কুমারীর রূপ তাকে মুগ্ধ করেছিল—তার অতিরিক্ত হয়তো আর কিছু ছিল না। কিন্তু সরোজের চোখে পড়েছিল আরো অনেক কিছু। সবিতার নম্র স্বভাবের মাধুর্য, অকপট আন্তরিকতার আকর্ষণ সে অন্তর দিয়ে অনুভব করেছিল। সে যে বড়ো বড়ো পরীক্ষা পাশ করেনি, গাইতে জানে না, নাচতে জানে না, এমনকি, শহরের চালচলনেও নিতান্ত অনভ্যস্ত—সেসব ত্রুটির কিছুই তখন তার চোখে পড়েনি।

বিয়ের ইতিহাসে রং ফলাবো না। তবে রং যে তাদের দুজনের মনেই সমানভাবে লেগেছিল সেটা প্রতিবেশীরাও টের পেতো। স্বপ্নের মধ্য দিয়ে কাটল কিছুদিন। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে নিয়ে যতো হাসি-ঠাট্টা তামাসা চলুক, তারা উভয়ে সেটা গায়ে মাখতো না, উল্টে তারাও সে হাসিতে যোগ দেওয়ায় ব্যাপারটা হাল্কা পরিহাসে পর্যবসিত হয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু আর দশজনের সাথে মিশতে সবিতা যাতে লজ্জা না পায়, সরোজ তাতে কম যত্ন নেয়নি। তার নিজের বোন পরের ঘরে গিয়েছিল, প্রতিবেশী সম্পর্কে একটি অনূঢ়া ভগিনীর সাথে সবিতার সখ্য ঘটিয়ে দিয়ে একদিকে সে যেমন সবিতাকে শহুরে ফ্যাশানে চৌপিঠে করে তুলতে লাগল, অপর দিকে রাতে নিজে পড়িয়ে তার প্রবেশিকার পাঠ তৈরি করতে লাগল। দু' বছর পরে পরীক্ষার ফল বেরুলে দেখা গেল—সবিতা দ্বিতীয় বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়েছে।

স্বামী দেবতা। সবিতার কাছে সরোজের অন্য পরিচয় ছিল না। সে যে তাকে কি আদরে অধ্যবসায়ে চার বৎসরের পাঠ দু' বৎসরে শেষ করিয়েছে, তার ইতিহাস আর কেউ না জানুক, সবিতা তো জানে। কৃতজ্ঞতার তার অন্ত ছিল না।

সরোজ ইস্কুল মাস্টার, ছাত্র পড়াবার কৌশল তার জানা আছে। কিন্তু কেবল কি কৌশলে অসাধ্য সাধন হয়, যদি তার সাথে ছাত্রীরও ঐকান্তিক প্রচেষ্টা না থাকে? সবিতার ত্রুটি ছিল না। ছোট সংসারের কাজ বেশি নয়, তবু ঝামেলা কম নয়। সব সেরে তবে সে পড়তে বসত। যতদূর সম্ভব লোকের চোখ এড়িয়েই চলেছিল তাদের এই সাধনা। ফল আরো ভালো হলে সরোজ খুশি হত, কিন্তু পাশের খবরটাই সবাই অপার আনন্দের সাথে গ্রহণ করলেন দেখে সরোজের মনের সেই ছোট আক্ষেপটুকু আর প্রকাশের অবকাশ পেলে না।

ইণ্টার মিডিয়েটও এইভাবে চলল, কিন্তু দু বছরের মাথায় পরীক্ষা দেওয়া হলো না। সবিতার শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ায় পরীক্ষা দেওয়া গেল না। অকালে, হয়ত গুরু পরিশ্রমের ফলেই তার প্রথম সন্তানটি নষ্ট হয়ে গেল। স্বামী-স্ত্রীর জীবনে হয়তো সেই প্রথম দুঃখের আবির্ভাব দেখা দিল। কিন্তু তার জন্য দায়ী নয় কেউ।

একটা মন্দ-মধুর লজ্জার আবহাওয়ায় কুসুমিত কামনা এইভাবে বিনষ্ট হওয়ার বেদনা উভয়ে উভয়ের দিকে তাকিয়ে সহ্য করলে। কিন্তু শরীরের উপর যে ধকল গেল, তাতে পড়াশুনার পাট বন্ধ রইল। আর হয়ত সেই বিশ্রামের বিভ্রান্তির মধ্যেই বাসা বাঁধল নতুন প্রত্যাশা। সেই আবেশ, সেই উদ্বেগ, সেই প্রতীক্ষা, সেই উন্মাদনায় দিন কেটে গেল। এবার নবজাতক সুস্থ সবল দেহে সরোজের ঘর আলো করে এলো। সবিতা মা হয়ে গেল।

মেয়েদের এই আরেক রূপ। প্রিয়া নয়—জননী, স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিতা জগদ্ধাত্রীর জীবন্ত মূর্তি। সরোজ যতো দেখে, ততো ভালো লাগে। এ যেন তার পরিচিত সবিতা নয়, আরেক মানুষ, কোন নিপুণ শিল্পীর তুলিকায় আঁকা নবীনা জননীর স্নেহ-করুণ চিত্র। দূরে থেকে দেখে, নিকট থেকে দেখে—বিস্ময়, আনন্দ, হর্ষোচ্ছ্বাস শত ধারায় বয়ে চলেছে। এক ফোটা কচি ছেলেকে ঘিরে এ যেন এক মায়া রাজ্যের সৃষ্টি। তার চৌহদ্দির বাইরে দাঁড়িয়ে দেখতে বেশ, ভিতরে প্রবেশের পথ বন্ধ। দূরে থেকেই সরোজ অনুভব করলে, সবিতা তার কাছ থেকে সরে যাচ্ছে—অথচ তার জন্য বিশেষ বেদনা বোধ হচ্ছে না। হয়ত এমনই হয়, সরোজ বাইরের দিকে চোখ ফেরায়।

বিবাহের পাঁচ বৎসরের মাথায় প্রথম সন্তান, সবার আদর নিয়ে বাড়তে থাকে। একটা টুইশান জুটিয়ে নিতে হয়—কিছু বাড়তি আয় আসা উচিত। সময় যায় কিছু তার পেছনে, কিন্তু এখন আর রাতে তো ঘরে কাউকে পড়াতে হয় না। সময়ের আর মূল্য কি সরোজের?

সতেরো বছর। কতো তার ইতিহাস। সবিতার আরো দুটি সন্তান এসেছে। তাদের নিয়েই সে ব্যস্ত। তাদের স্নান—আহার—বেশভূষা, তার উপর লেখাপড়া, গানবাজনা। সরোজও সরে এসেছে। ইস্কুল, টুইশান, নোট বুক লেখা, এক্‌জামিনের খাতা দেখা। কতো কাজ। ছুটির জন্যেও জোটানো কতো না ঝঞ্ঝাট। দম ফেলবার ফুরসৎ কোথায়—নিজের ছেলেমেয়েদের দিকেই তাকাবার সময় হয় না, তা আবার তাদের মা। দূর সতেরো বছর আগের দিনের কথা ভাববার তো অবকাশই নেই।

হয়ত কোনদিনই ভাবনাটা মাথায় আসত না। হঠাৎ রোগটা দেখা দিলে নতুবা হয়ত এতদিন পরে নতুন করে বেদনা পাওয়ার সুযোগই ঘটত না। যেমন সরে এসেছিল, মরচে ধরে পড়েছিল যে মননশক্তিতে, তাতে আবার নতুন করে জীবন্ত, উজ্জ্বল করে তুললে এই জোর করে চাপিয়ে দেওয়া বিশ্রামের হাতকড়ির বন্ধন।

রোগটা ভালো নয়, সময় থাকতে সে তাই সরে এসেচে। তার ছোয়াচ থেকে ছেলে-পুলেদের বাঁচাবার দরকার। তাই বলে সবাই তার থেকে দূরে চলে যাবে এতটা কি সরোজ চেয়েছিল।

ডাক্তার বলেছিল, ফুসফুস থেকে রক্ত ঝরচে। সরোজের মনে হল—বুকের উপরেও তো একটা অলক্ষ্য ক্ষতমুখে রক্তের ধারা বইচে। সে ধারা মুছতে চাইলেও মোছে না যে! অশ্রদ্ধা—তাকে সবাই এখন অশ্রদ্ধা করে, সবাই এড়িয়ে যেতে চায়, সবিতাও।

মনে পড়ে কতো কথা। শ্বশুরবাড়ী ফিরে যেয়ে সরোজ সবিতার আরেক রূপ দেখেছিল। শহর থেকে ফিরেছে, সদ্য পরীক্ষায় পাশের গৌরব নিয়ে ফিরেছে সে

রাজেন্দ্রাণী। তার মুখে সে কি অপূর্ব আনন্দ-জ্যোতি। স্বামী সোহাগিনী স্বামীর বুকে মুখ লুকিয়ে বলেছিল, এ সবই তো তোমারই দান! সরোজেরও বুক আনন্দে ভরে গিয়েছিল। সেই কৃতজ্ঞতা, সেই আনন্দ কিসে উবে গেল?

সরোজের রোগটা ধরা পড়বার আগেই সবিতার ব্যবহার বদলেছিল। সংসারে অভাব আছেই—সব ঘরেই কিছু সমান স্বাচ্ছল্য থাকে না। কিন্তু তার জন্য স্বামীকে তাচ্ছিল্য করে লাভ কি? ইস্কুল মাস্টারের পত্নী যদি প্রতিবেশীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সাথে নিজেদের জীবনযাত্রার মান তুলনা করে দুঃখ পেতে থাকেন তবে তার উপশম হবে কিসে?

দুঃখটা অভাবের দরুণ ততটা নয় যতটা স্বামীর স্বভাবের দরুণ। তার স্বামীটি যথেষ্ট সময়োপযোগী নয় বলেই সবিতার ধারণা। যখন সকলেই দুহাতে উপরি আয়ের ব্যবস্থা করছে তখন ছাঁকা সওয়া শ' টাকার প্রত্যাশায় বসে যে থাকে সে যে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের প্রতিও যথেষ্ট দরদশীল নয় সেকথা অকুণ্ঠে প্রচার করতে সবিতার বাধে না। ভেবে সরোজের হাসি পায়, এই সবিতাকেই সে না নিজে লেখাপড়া শিখিয়েছিল, পরীক্ষা পাস করিয়েছিল। পাস করলেই যে শিক্ষা হয় না এর আগে এমন নির্মমভাবে বুঝি আর কোন দিন বুঝতে পারেনি সরোজ। যে শিক্ষা মনকে উন্নত করে না সে শিক্ষা অশিক্ষা, কুশিক্ষা।

এর থেকে যে অশ্রদ্ধার সূত্রপাত তার খেই খুঁজতে খুঁজতে দিনে দিনে নানা তথ্য হাতে আসে চোখে পড়ে, কানে শোনে। দেহী মাত্রেই দেহাতীত পারমার্থিক শক্তির অধিকারী হয় না। দেহের জৈবধর্মও আছেই, সরোজ তার ব্যতিক্রম নয়। সবিতা সেখানেও ঘা দিতে ছাড়ল না। যার পুত্র-কন্যার যথোচিত লালনপালন নির্বাহের ক্ষমতা নেই তার পুত্রকন্যার সাধ কেন। ভদ্রতার মুখোশের মধ্যে একটা নগ্ন কুশ্রীতা ব্যঙ্গ করে ওঠে। সরোজ মাটির দিকে চোখ নামায়। ঝিম ঝিম করতে থাকে মাথার ভিতর।

সবিতার ছোট বোনের বিয়ে হয়েছিল একজন কেরাণীর সাথে। যুদ্ধের দৌলতে সেও দু পয়সা কামিয়ে কলকাতায় বাড়ি করে ফেলেছিল। সে একদিন বেড়াতে এলো।

নমিতার নম্র চেহারাটাই সরোজের মনে ছিল, যতদিন যেখানে দেখা হত, সরোজের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করত। বয়সে অন্তত পনের বছরের ছোট, তাছাড়া সরোজ যে সবিতাকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তুলেছিল নিজের চোখে তার কিছু দেখে এবং মায়ের কাছে তার আদ্যন্ত ইতিহাস শুনে এই ভগিনীপতিটিকে নমিতা সত্যই আন্তরিক শ্রদ্ধা করতে শিখেছিল।

কিন্তু এবার দিদির মুখে তার গুণগান শুনে নমিতার মনও খিচড়ে গেল। প্রণাম করা দূরে থাক, কাছেও এলো না, দূরে দাঁড়িয়ে দিদির দুঃখে শোক জ্ঞাপন করে চলে গেল। কিন্তু যাওয়ার আগে ভগিনীপতিকে ব্যঙ্গ করতে ছাড়ল না। 'পুরুষগুলো জাতটাই এমন, দেখলে গা ঘিন ঘিন করে।"

যাকে নিজের স্ত্রী শ্রদ্ধা করে না, অপরের স্ত্রী তাকে ব্যঙ্গ করবে তাতে আশ্চর্য কি? মনে মনে ভাবে সরোজ।

অথচ সে শ্রদ্ধা হারালো কেন? কি তার অপরাধ?

দেহটা বাদ দিয়ে মন নিয়ে যতদিন কারবার ছিল ততদিন কি সে শ্রদ্ধার পাত্র ছিল? হয়ত তাই। প্লেটনিক লাভ হয়ত সত্যই আদর্শ বস্তু।

কিন্তু বিবাহের জৈবিক তথা দৈহিক দিকটা ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া যায় কি? দেহের আকাঙ্ক্ষা কি কেবল পুরুষের, অপর পক্ষের কিছুই নেই? সম্ভোগের পরিতৃপ্তি কি কেবল একের, অপরের কিছু কি আকাঙ্খা থাকে না। 'না'—বলেই এত বড় সত্যটাকে ধামাচাপা দেওয়া চলে না অথচ দোষের ভাগটা কেন সবই একদিকে পড়ছে?

নমিতাও তাকে ভুল বুঝলে, তাকে ক্ষমা করতে পারল না। যে একদিন পায়ে হাত দিতে নিষেধ করলেও জোর করে প্রণাম করত, সেই এখন ঘৃণা করছে। তার মধ্যে কি আর কিছু কারণ নেই? সরোজের কামনার আগুনে সবিতা যদি পুড়ে ছাই হয়েও যায়, নমিতাকে সে আগুন স্পর্শ করতে পারেনি, অতটা নামতে পারেনি সরোজ। তবে কেন নমিতার এই ব্যবহার? তার স্বামীর সৌভাগ্য লাভ কি কিছু মাত্র প্রেরণা যোগায় নি? নমিতার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত কি বলছে না, তুমি কামুক না হও কাঁপুরুষ তো বটেই, উপার্জনের অধিকারে তুমি নিম্নস্তরের, তুমি অপাংক্তেয়! সরোজকে ক্ষমা সবিতাও করে নি। স্মরণ রাখেনি সতেরো বছর আগেকার দিনগুলি। সবিতা এখন শিক্ষিতা মহিলা, চলতে বলতে কিছুতেই কারো থেকে কম যায় না, সে কেন পিছিয়ে থাকবে তার স্বামীর অক্ষমতার জন্য?

সতেরো বছর আগের কাহিনী আজ আর ভেবে লাভ কি? কেউ কি ভাবে, অন্ততঃ সবিতা ভাবে না, ভাবলে এমন ব্যবহার করতে পারত না। পরিবর্তনশীল জগৎ, নতুনের দাবী পুরাতনকে হটিয়ে দেয়। কবে কতোদিন আগে একটি পল্লী-কিশোরী লাজনম্র বক্ষে একটি তরুণ যুবকের দিকে প্রেম মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল, আজ মধ্যাহ্ন সূর্যের খরতাপে সেই দূরবিস্তীর্ণ ছায়াময় ছবিখানি যেন মরিচীকার মতো মনে হয়, ওতে যেন সত্যের আলো নেই, নেই তার সবল প্রতিষ্ঠা।

সতেরো বছর আগের সেই যুবকটিও তো বেঁচে নেই। অনেক উত্তাল হাওয়ায় তারও রঙগীন পাতারা ঝরে গেছে। সে কবিতা লিখত, গান লিখত, কবে তা বন্ধ হয়ে গেছে। সাহিত্য সাধনার স্রোতটি অনুদার আবহাওয়ায় মাথা গুজেছে, ফল্গু ধারায় দীর্ঘকাল যা বেঁচে ছিল, হয়ত আজও গভীরভাবে

খ‍ুঁড়লে প্রস্রবনের সাক্ষাৎ মেলে, কিন্তু কে তা করতে চাইবে? যে পারত, সেই সমূলে সবলে উৎসমুখ বন্ধ করেছে।

সরোজ সহজভাবে অবস্থাটা ভাবতে চেষ্টা করে। আমি গৃহিণী, ঘর আমার সত্য, কিন্তু স্বামীও তো আমার। যদি স্বামী আমার মনের মতো ভাবে না চলে, আমি কি তাকে মানিয়ে নিতে পারিনে? তার যদি লেখাপড়ায় শখ, আমি কি চেষ্টা করেও তাতে আগ্রহশীল হতে পারিনে? নেহাৎ আগ্রহশীল নাও যদি হই বরদাস্ত কি করতে পারিনে। যেমন কিনা আমার শখ সেলাই-তে, তাতে তারও কোন আগ্রহ নেই, কিন্তু তবু বাধা দিতে আসেই না, বরং কিসে সুবিধা করে দিতে পারবে তার জন্য সুচ সুতা কিনে আনে, সেলাইতে বসলে মেসিনের ঢাকনা খুলে দেয়। চাই একে অপরের কাজে উৎসাহ দেওয়া। নিজেও উৎসাহ বোধ করতে পারি ভালোই, অন্তত বরদাস্ত করা। তা নয়—আমি সইব না আমার ঘর ছেঁড়া কাগজ ছিটিয়ে নোংরা করা। কাগজগুলো কি? না, কবিতার পান্ডুলিপি, কি উপন্যাসের খসড়া। যাতে টাকা পয়সা মিলবে না তার যত্ন করে লাভ কি? লাভ লোকশান টাকার অঙ্কে খতিয়ে সব জিনিসের দাম ধরলেই মুশকিল। আবার টাকা নেই বা বলছ কেন? উপন্যাসটা বিক্রী হলে টাকা আসবে, যদি সিনেমা হয়, তাতেও টাকা পাবে, নাটক করলেও টাকা। কিসে কিভাবে টাকা আসবে বলতে পারে কেউ? ভাগ্যং ফলতি সর্বত্রম্।"

কিন্তু সে বিচার মাথায় এলো না সবিতার, নিজের ইচ্ছা নমিত করতে চাইলে না কোথাও। সে যা ভালো বুঝবে তার উপরে কারো কথা সহ্য করা তার অভ্যাস নয়, সে তা পারবে না।

উপেক্ষা? একে কি উপেক্ষা বলে? যদি বলে, সবিতা নাচার। এর থেকে আপ্যায়ন করা তার ধাতের বাইরে! হাসলে সরোজ। উপেক্ষা সে গায়ে মাখেনি কোনদিন। দীর্ঘদিন সে একা মেস জীবন যাপন করেছে, জামার বোতাম লাগাতে, গেঞ্জিতে সাবান দিতে তার বিরক্তি নেই—যদি সময় পায়। এখন সময় পায় না, তা নিয়ে তো সে কোনদিন অভিযোগ করেনি। জামার চারটা ঘরে একটা বোতাম থাকলে ক্ষতি কি, কিন্তু ওই ফাঁক দিয়েই তার বুকে বেদনা বাসা বাঁধতে আসবে তাতো সে বোঝে নি।

ইস্কুল থেকে ট্যুইশানি, তারপর রাতে ঘরে ফিরে এসে খুঁজে পেতে নেয় লুঙ্গি-খানা, গামছাখানা। স্যান্ডালের এক পাটি আর চটির এক পাটি পেলেও খুশী হয়, যদি কিনা দুখানাই এক পায়ের না হয়ে যায়। ক্ষিধে পায়—সেটা জীবধর্ম। ভাত পেতে দেরী হলে রান্নাঘরে তল্লাস নেয়, রুটি হয়ত তখন সবে গড়তে শুরু হয়েছে।

সতেরো বছরের কাহিনীটা তখনও মাঝে মাঝে মনে পড়ে। আহা, ছেলেপুলের ঘর একা পেরে ওঠে না। ঠিকা ঝি যদি রাতেও আসতো!

সপ্তাহ শেষে রবিবার। ঘুম ভাঙতে দেরী হলে কথা শুনতে হয়। বাজারে না গেলে উনুনে চড়াবার কিছু নেই সে কথাটা বলবার আগে সরোজের তল্লাস করা উচিত ছিল তরকারির ডালাটা।

বাজার থেকে ফিরে যদি দু দন্ড কাগজে মন দিলে অমনি অভিযোগ আসবে, রবিবার দিনটা শুধু শুয়ে বসেই কাটাবে? ছেলেমেয়েগুলো শুধু জন্ম দিয়েই দায় শেষ? ওগুলো মানুষ হবে কি সে? ওদের অঙ্ক ইংরাজিটা ধরলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়?

গোটা সপ্তাহের মধ্যে একটা রবিবার, সত্যি তো! পরের ছেলেমেয়েকে সপ্তাহভর তালিম দিচ্ছি আর নিজের ছেলেমেয়েকে সপ্তাহে একদিনও দেখব না! সরোজ কাগজ রেখে ছেলেমেয়েদের নিয়ে বসে। মনের মধ্যে একটা ক্লান্ত মন মুখিয়ে থাকে, উপলক্ষ্য পেলেই নিরপরাধ শিশুগুলির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, চড়টা চাপড়টা লাগিয়ে আবার নিজেই লজ্জিত হয়, পরিমাণ বেশী হয়ে গেলে চোখে জলের আভাসও দেখা দেয়! সতেরো বছর আগে একটি তরুণ যুবক একটি তরুণী কিশোরীকে কত ধৈর্য ধরে চার বছরের পড়া দু বছরে পড়িয়েছিল সেটা যেন ইতিহাসের ছেঁড়াপাতার মতো উড়ে চলে যায় মনের উপর দিয়ে।

সব কিছুতেই সে অপরাধী, কেন না সে গৃহী হয়েছে অথচ গৃহস্থালী জানে না।

মাঝে মাঝে তবু বিভেদের অন্ত হয়, সরোজ যে সর্বদাই কায়মনপ্রাণে তাই চায়। শান্তি চায়, তৃপ্তি চায়, দিতে চায়, পেতে চায়। তাই যখন কোন দুর্বল মুহূর্তে মিলনের আকাঙ্ক্ষা জাগে, সরোজ মুখ ফেরায় না, আশ মিটিয়ে দেয়। মনে হয়, এতদিনের সব গ্লানি বুঝি ধুয়ে মুছে গেল এই মিলন মোহনায়। কিন্তু রাতের মোহিনী দিনে সাহিনী সাপের দুমুখো ছোবল তুলতে ভোলে না। এগুলোও রেহাই নেই, পেছুলেও রেহাই নেই। চুপ করে থাকো তো তুমি—ভিজে বেড়াল, ম্যান্তামুখো। আর যদি জবাব দাও তবে তো কুরুক্ষেত্র। নিরুপায় হয়ে নাকে মুখে দুটি গুঁজে ইস্কুলে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

অবহেলার মধ্য দিয়েই রোগটা গুটি গুটি এগিয়েছিল। বুকে মাঝে মাঝে বেদনা লাগত সে কথা বলা হয়নি কাউকে। শুনবার আছে কে? যে ছিল সে এখন এত ছোট কথা শুনতে পায় না। তার ছেলে-মেয়ে-সংসার, কত ঝঞ্ঝাট। এর উপর আবার পুরুষ মানুষের জন্য চিন্তা করবার সময় নেই।

মাঝে মাঝে মনে হয়েছিল, নিজেকে অত সহজলভ্য করেই হয়ত ভুল করেছে সরোজ। আপোষে মিটিয়ে ফেলতে চেয়েই বিরোধটা জটিল হয়ে গেছে। রোজই একটা প্রবল প্রত্যাশা নিয়ে সে ঘরে ফিরত, হয়ত অন্যায় ব্যবহারের কুজ্ঝটিকা কেটে যাবে, আবার ফিরে আসবে সতেরো বছর আগের সহজ সরল দিন, কিন্তু তা আর আসে না।

শুয়ে শুয়ে সরোজ নিজের উপরেই ধিক্কার দিতে লাগল। তার শিক্ষায় নিশ্চয় গলদ ছিল, গলদ ছিল প্রবল প্রশ্রয়ের মধ্যে। অবাধ ব্যবহারটাই যে কাউকে অবাধ্য করে তুলবে একথা সে ভাবতেই পারেনি।

বারো বছরের ছেলে বিশু কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। সরোজ ওর মুখের আগলে একটি তরুণী কিশোরীর মুখের সন্ধান করে। দু চোখ বেয়ে জল নেমে আসে। কবির দৃষ্টি, ভাবুকের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়। চোখ বন্ধ করে কান পেতে শোনে—দূরের দিনের চপল কাকলী কি কিছু ভেসে আসে না?

বিজ্ঞান-বৈচিত্র্য

চক্রদত্ত

অস্ত্রোপচারের জন্য রোগীকে অজ্ঞান করাই ডাক্তারদের পক্ষে বড় সমস্যা হয়ে পড়ে—রোগী যদি নিজেই নিজেকে অজ্ঞান করতে পারে তবেই এ সমস্যার সমাধান হয়। আজকাল এ ব্যবস্থাও হয়েছে। এক রকম যন্ত্র বার হয়েছে সেটা রোগীর

নিজেকে নিজে অজ্ঞান করছে

নাকের ওপর আটকে রাখা হয়, আর রোগী নিজেই পাম্প করে প্রয়োজন মত ওষুধটা প্রয়োগ করতে পারে। ওষুধটা যথাযথ প্রযুক্ত হলে রোগীর পাম্প করার ক্ষমতাও চলে যায়। এই অবস্থায় এক থেকে দেড় মিনিট পর্যন্ত থাকে এবং তারপরে এর আর কোনও মন্দ ফল পরিলক্ষিত হয় না।

*

নিউমোনিয়া রোগটা খুবই সাধারণ রোগ, কিন্তু সামান্য নয়। এ রোগের নাম বহুদিন থেকেই জানা আছে এবং এটা হয় জীবনে গঠিত না হয় বীজাণুঘটিত আজকাল তাও জানা গেছে। সাধারণত "নিউমো কক্কাস" বীজাণু দ্বারাই (Backteria) এ রোগ হয়ে থাকে। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে এই বীজাণু পাওয়া যায় না। এতথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে গত পনের বছরের মধ্যে। এই কয়েক বছরে বহু নিউমোনিয়া রোগী পরীক্ষা করে তাদের মধ্যে নিউমো কক্কাস বীজাণু পাওয়া যায়নি। এই নিউমোনিয়াকে ডাক্তারেরা অসাধারণ নিউমোনিয়া (Alypical pneumonia) বা জীবাণুঘটিত (virus) নিউমোনিয়া বলে। ডাঃ রবার্টসন ও ডাঃ মর্লি বলেন, এ রোগ ভাইরাসঘটিত নয়, বরং ফুসফুসের কোনও অংশ নাক অথবা গলা থেকে নির্গত শ্লেষ্মা বা ঐ জাতীয় কোনও কিছু দ্বারা বন্ধ হয়ে যাওয়ার দরুণই এই ধরণের নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা যায়। তারা প্রায় পাঁচশত এই ধরণের রোগী পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, প্রতি ক্ষেত্রেই নাক বা গলা রোগ দ্বারা সংক্রমিত হয়েছে। এ ছাড়া এক্স-রে-পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে যে, ফুসফুসের একটি অংশই রোগাক্রান্ত হয়েছে। তাদের মতে ফুসফুসে, রক্ত, পুঁজ অথবা শ্লেষ্মা ঢুকলেই এ ধরণের ক্ষত হয়। তাঁরা আরও বলেন যে, এ রোগ ভাইরাসঘটিত হলে শুধু একটি অংশ মাত্র রোগ দুষ্ট না হয়ে সমস্ত ফুসফুসেই রোগটি ছড়িয়ে পড়তো। রোগীর পূর্ব ইতিহাস দেখলে জানা যায় যে, নাক অথবা গলা সংক্রামিত হওয়ার পর খুব কঠিন পরিশ্রম করার দরুণ এ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। কারণ, তখনই রক্ত, পুঁজ অথবা শ্লেষ্মা, ফুস-ফুসে প্রবেশ করার সুযোগ পায়। প্রমাণ-স্বরূপে এঁরা আরও বলেন যে, সাধারণতঃ নিউমোনিয়ার ওষুধ হিসাবে সালফাঘটিত বা এণ্টিবায়োটিক জাতীয় ওষুধই ব্যবহার করা হয় এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাতে সুফল পাওয়া যায়। যে সব ক্ষেত্রে এই দুই ধরণের ওষুধ ফলপ্রদ হয় না তখনই বোঝা যায় ও রোগ ভাইরাসঘটিত নয়। এই কারণেই সহসা রোগের আক্রমণের কোনও কারণ পাওয়া যায় না। এই অসাধারণ নিউমোনিয়া রোগের চিকিৎসার্থে নির্গমন (Draining), শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বাষ্প গ্রহণ (Inhalation) এবং ডায়াথারমি (Diathermy) ব্যবস্থা করা দরকার।

*

টাইপরাইটিং মেশিনের হরফগুলির ওপর থেকে ধুলো, বালি বা শুকনো কালি পরিষ্কার করা যে কত শক্ত তা যাঁরা এই যন্ত্রে কাজ করেন তাঁদেরই জানা আছে। সম্প্রতি পেট্রল, স্পিরিট ইত্যাদি জাতীয় হাল্কা অথবা যা সহজেই উবে যায় এই ধরণের তরল পদার্থের সাহায্যে এই যন্ত্রের ময়লা পরিষ্কার করার ব্যবস্থা হচ্ছে। এই পদার্থ ব্যবহার করলে খুব সহজেই

টাইপরাইটীং মেশিন পরিষ্কারের নূতন পন্থা

ময়লাগুলো আল্গা হয়ে যায় আর তারপর বুরুশ দিয়ে অল্পায়াসেই পরিষ্কার করা সম্ভব হয়।

চরণদাস বাবাজীর সাধনা

শ্রীমৎ রাধারমণ চরণ দাস বাবাজী মহারাজের লীলানুস্মরণের সৌভাগ্য আপনারা আমাকে দিয়েছেন, এজন্য আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আগেই আমাকে এ কথাটা আপনাদের নিবেদন করতে হচ্ছে যে, কৃপার অনুধ্যানে একেবারে ডুবে না গেলে বাবাজী মহারাজের রস-সাধনার ধারাটির সাড়া অন্তরে কিছুতেই পাওয়া যায় না। কিন্তু তেমনভাবে ডুবে যাওয়া আমার মত বদ্ধজীবের পক্ষে কি করে সম্ভব হ'তে পারে? তবে কৃপা এ যুগে অসীম। নিতাইয়ের কৃপায় সবই সম্ভব হ'তে পারে। যাঁরা আমার মুখে একথা শুনতে চাচ্ছেন, তাঁদের ভিতর আমি প্রভু নিত্যানন্দের সেই কৃপা-শক্তিরই পরিচয় পাচ্ছি। সত্য কথা বলতে কি? আমার মত লোককে কৃপা আপনারা করতে পারেন, এতো' আমি আমার নিজের দিকে তাকিয়ে কিছুতেই বিশ্বাস করে উঠতে পাচ্ছি না। অধম, তাপিত সকলের জন্য যাঁর কোল সমানভাবে প্রসারিত রয়েছে—"উত্তম-অধমে কিছু না করে বিচার', তিনি ছাড়া আমাকে অঙ্গীকার আর কে করতে পারেন? সুতরাং আপনাদের ভিতর দিয়ে তিনিই সাড়া দিচ্ছেন। তবে বাইরে বিভিন্ন যে আকার আপনাদের দেখতে পাচ্ছি সে শুধু আমার মনেরই বিকার মাত্র। "যদ্দৃষ্টং অনিষ্টং, অতিলোলং অলাতচক্রং বিভ্রমিদং মনসো বিলাসং।" ইষ্ট সেই একই। আমার অহঙ্কৃত অবস্থার জন্যই সে বস্তু দৃষ্ট হচ্ছে না। তবু মিষ্টত্ব এ লীলায় অস্বীকার করতে পাচ্ছি না। লীলা-রস আমাকেও আকৃষ্ট কচ্ছে। সে প্রেম এমনই অযাচিত।

'লহ প্রেম হৃদয়ে ধরিয়া' ঠাকুর মহাশয়ের এই যে নির্দেশ এর মধ্যে অযাচিত প্রেমের সেই রস-ধর্মের উৎকর্ষ ব্যক্ত হ'য়েছে। এ লীলার ধ্বনিতত্ত্ব তো তিনিই। তাঁর বাণীতেই ধ্বনির মধুরত্ব অর্থাৎ শুনি, শুনি, চিনি চিনি, এইভাবে প্রেমের প্রত্যক্ষ সংবেদন আমাদের অন্তরে বিদ্ধ হচ্ছে, উদ্দীপ্ত হচ্ছে। 'আত্মা অরে দ্রষ্টব্য', সে যে দেখিবার ধন অমূল্য রতন, তৃপ্ত হয় কি মন করে অনুমান?" কিন্তু দেখবার পথটি কি? শ্রুতি এর উত্তরে বলেছেন, শ্রোতব্য; অর্থাৎ শোনার পথে তাঁকে দেখতে হয়। ভাগবতও বলছেন, নাথ, শ্রবণের ভিতরে তোমাকে দেখবার একমাত্র পথ রয়েছে। তোমার নাম শুনেই তোমার লীলা চোখের সামনে খুলে যায়। কিন্তু বিষয়বদ্ধ জীব নাম তাঁর শুনতে চাইবে কেন, যদি নামের মধ্যে কাম না মেলে, সর্বেন্দ্রিয়ের পরিপোষক এবং ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহের একান্ত নিবৃত্তি এবং আত্যন্তিক তৃপ্তির উন্মেষক রস সে তাতে না পায়? কৃষ্ণ-লীলায় এমন রসটি ফুটে উঠেছিল। কুন্তি দেবী শ্রীভগবানের বন্দনা করতে গিয়ে বলেছেন, অবিদ্যা এবং কামকর্মের চাপে পড়ে জগতের নর-নারী ক্লিষ্ট হচ্ছে, তোমার নামটি আস্বাদন কর্তে পাচ্ছে না, যাতে সেই নামটি শুনতে তাঁদের কান যায়, সেইজন্যেই তোমার এই লীলা। অন্য সব কারণ গৌণ এবং পরোক্ষ।

কিন্তু কৃষ্ণলীলায় উদ্দেশ্যটি পরিপূর্ণ হয়েছে কি করে বলি? উদ্ধব বিদুরের কাছে আক্ষেপ করে বলেছিলেন, যাদবদের অত্যন্ত দুর্ভাগ্য, তারা কৃষ্ণকে বড় একজন মহাপুরুষ বলেই বুঝেছিল। তারা তাঁকে তাপের পথে, ভাবের সূত্রে অন্তরে একান্ত করে পায় নাই। তপনীয় তাঁর যে বর্ণ, সে বর্ণ তারা কানে শুনতে পায় নাই। বচনের মধ্যে তাঁর আপন-তত্ত্ব তারা ধরতে অসমর্থ হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে নামের মহিমা কৃষ্ণ-লীলাতেও গোপন থেকে গিয়েছিল। কোলে বোলে এক হ'ল শুধু এই যুগে। দুর্লভ যে কৃষ্ণ-প্রেম হৃদয়ে ধরবার ভাগ্য পেয়েছে শুধু এই যুগে যারা জন্মেছে তারাই। এজন্যই সব শাস্ত্রে কলিযুগের পরম মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে।

এযুগের এ মাহাত্ম্যটি আপনারা সকলেই বুঝেছেন, বিশেষ করে বলবো এমন কি সাধ্য আমার আছে? অলঙ্কার শাস্ত্রের কথা এখানে তুলতে যাবো না; কারণ সেটা আমার পক্ষে নিতান্তই অনধিকার চর্চা হবে। শাস্ত্র-বিচারে ধ্বনি বলতে কি বস্তু বুঝায়, পণ্ডিত যাঁরা, তাঁরা সে সব বলতে পারেন। আমার শুধু বলবার আছে এই যে, কৃষ্ণনাম, হরিনাম, এযুগে এই নামটি যে আমরা এতভাবে শুনতে পাই এবং একথাও বলতে হয় যে শুনতে চাই বলেই যে শুনতে পাই—এর মূলে কোন্ রসটি রয়েছে? কৃষ্ণ-লীলাতেও যে রসটি এমন করে উথলে উঠেনি, অর্থাৎ সকলের পক্ষে শ্রবণ এবং স্মরণার্হ হয়নি? নামের সে ধ্বনি, তাঁর ভিতর শুনি শুনি, এমন চেতনা কিসের থেকে আজ জাগছে? ধ্বনির ভিতর এমনকি বিশেষত্ব রয়েছে? ভাগবত এ গূঢ় তত্ত্বের ইঙ্গিত করেছেন। ধ্বনির ভিতর ব্রজাঙ্গনাদের ভাবটি জড়ানো মাখানো রয়েছে। তাঁদেরই সুরে সুরে রসের ধারা ছড়িয়ে পড়ছে। তাঁরা রাধারাণীই রঙ্গিণী এবং সঙ্গিনী। তাঁদের অঙ্গদ, বলয় ধ্বনি, নূপুরের রিণিঝিনি বাজছে নামের ভিতর। তাঁদের নাচে নাচে নাম আমাদের কানের কাছে এসে পড়েছে। শ্রীকৃষ্ণ, আনন্দময়ী রাধারাণীর ভাবকে সর্বভাবে অঙ্গীকার করাতেই নামের ভিতর দিয়ে রস ও আনন্দের ধারা বা ছন্দ এমন করে ছড়িয়ে পড়ছে, চারিদিকে বিস্তার লাভ করছে। সিদ্ধান্তের দিক থেকে কথাটা কতকটা এইভাবে বলা চলে যে, শ্রীকৃষ্ণ চাইছেন রাধারাণীকে, আর রাধারাণীকে কৃষ্ণ চাওয়াতে এবং পাওয়াতে সখীরা যুগলমিলন রস নিবিড়ভাবে আস্বাদন করে উল্লসিত হয়ে উঠেছেন। আর শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ এবং সখীদের মিলিত ও পরিস্ফূর্ত রসতত্ত্ব মঞ্জরীগণের আস্বাদনের ভিতর দিয়ে সর্বতোব্যাপ্ত পূর্ণতার মাধুরিমায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে। শ্রীভগবানের রস-স্বরূপত্ব, তাঁর আনন্দময়ত্ব এইভাবে উত্তম-অধম সবাইকে এযুগে ভাসিয়ে চলেছে।

প্রকৃতপক্ষে আনন্দ সম্বন্ধকেই খোঁজে, ছন্দে ছন্দে সম্বন্ধের ভিতরই মজে। ছন্দই দোল, সেই দোলই বোল আবার বোলই কোল। রাধাগোবিন্দের একসঙ্গে মিলন-লীলার আনন্দময় ছন্দে শ্রীকৃষ্ণের ক্রিয়াশক্তির দোল এযুগে খোলের গোল আর রাখছে না। বলরাম ব্রজধামে সেবার ছন্দটি ছড়িয়ে জড়িয়ে এ'দের উভয়ের প্রেমলীলার রসকে পুষ্ট করছেন। সখী-মঞ্জরী এ'দের প্রকাশ করে রসরাজ শ্রীকৃষ্ণকে তিনিই রস আস্বাদন করাচ্ছেন; কিন্তু এ রসের মহাজন হচ্ছেন রাধারাণী। সুতরাং রাধাভাবের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ যতটা পড়বেন শ্রীবলরামের সেবার আনন্দ, প্রেমের ছন্দ ততটা বেশী বিস্তার লাভ করবে। শ্রীমদ্ভাগবতে বেণু-গীতায় এ তত্ত্বটি আপনারা পেয়েছেন, আস্বাদনও করেছেন শ্রীগুরুকৃপায়। রাধা, রাধা ব'লে বাঁশী যেই বেজে উঠলো বলরামও সেবার উপাচার সাজিয়ে ছুটে এসে মেশামেশি করতে লাগলেন। সেই বাজনায় নিজেকে মাজিয়ে দিলেন। বেণু ধ্বনির সঙ্গে দুইয়েরই সুর জড়িয়ে মধুর হ'লো। দুইজনেরই অনুরক্ত কটাক্ষ-মোক্ষের দক্ষতা দেখা দিল। ক্রিয়াশক্তির বলরামের কারিগরীতে বাঁশীর ভিতর দিয়ে রাধাভাব অঙ্গীকারের অনঙ্গ-রঙ্গ তরঙ্গিত হ'য়ে ছুটলো। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যেই শ্রীবলরাম সখী ও মঞ্জরীদের সঙ্গে রয়েছেন। অনঙ্গ মঞ্জরী শ্রীবলদেবের আনন্দলীলার বিস্তার ও প্রেম-সেবার পুষ্টি সাধন কচ্ছেন। ফলতঃ আনন্দময় গোবিন্দ সম্বন্ধস্বরূপিণী রাধারাণীর প্রেমে যতটা বাঁধা পড়ে গেলেন, সম্যক্ বাসনা পরিস্ফূর্তির ছন্দে রাধাভাবে শৃঙ্খলে যতটা ধরা দিলেন; ততই তাঁর ক্রিয়াশক্তি বলদেব নিত্যানন্দ স্বরূপে ততই চরাচর বিশ্বে প্রেমলীলার সেই শৃঙ্খলার খেলা ব্যক্ত করলেন। এইভাবে যুগল-সেবার অনঙ্গ মঞ্জরীর ভিতর দিয়ে মাধুর্য ভগবত্তা-সার, যা ব্রজে প্রচার হয়েছিল তা এ যুগে সর্বত্র, সকল লোকে পেয়ে গেল।

শ্রীল রাধারমণ চরণ দাস বাবাজী জীবন-লীলায় এই রহস্যটিই প্রকট পেয়েছে। শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত আমি বুঝতে পারি না। আপাদের কৃপার প্রভাবে সহজভাবেই এ কথা বলছি। আমার জ্ঞান অতি সামান্য; যতটুকু বুঝি ততটুকুই শুধু বলতে পারি। আমার কিন্তু এই মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণ যদি বৃন্দাবন-লীলাতেই সবকিছু বুঝে পেতেন, অর্থাৎ তাঁর সব বাঞ্ছা সেখানে স্বকীয়তাতেই বিবর্ত লাভ করতো তবে তো গৌরলীলার কোন প্রয়োজনই থাকতো না। তবে শ্রীরাধার ভাব-কান্তি অঙ্গীকার করবার আর কি দরকার তাঁর পক্ষে থাকতো? স্বরূপ-দামোদর প্রভু গৌর-লীলার যে গূঢ়তত্ত্বটি ব্যক্ত করলেন, স্বয়ং মহাপ্রভু রথাগ্রে নর্তনকালে

সাহিত্য-দর্পণের শ্লোকছন্দে নিজের স্বরূপতত্ত্ব সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত করলেন এবং শ্রীরূপের ভিতর শক্তি সঞ্চয় করে যে তত্ত্ব তিনি প্রকট করলেন, সে সবের তবে সামঞ্জস্য ঘটে কোথায়? প্রকৃত-পক্ষে প্রকট, অপ্রকট লীলার এ বিচার করতে আমার মন আদৌ এগোয় না। যেটি নিকট সেটির সাড়াতেই ডুবে পড়তে চায়। প্রকৃতপক্ষে স্বকীয়তার নৈতিক দিক হতে শুদ্ধিগত শ্রেষ্ঠতার যে ধারণা আমার কাছে তা নিতান্ত বুদ্ধির স্তরের ব্যাপার বলেই মনে হয়। কিন্তু নীতির উপরে প্রীতি। রস স্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ যিনি, রসের সংস্পর্শে তাঁর প্রীতির টানে পড়তে হয়, ভাবনায় মজতে হয়। সেখানে স্বকীয় বা পরকীয় বিচার খাটে না; সব ছুটে যায়। রসই আমাদের প্রয়োজন, আনন্দই আমাদের আবশ্যক। শ্রুতিও বলেছেন, ব্রহ্মের আনন্দটুকুই আমাদের পক্ষে সাধ্যবস্তু। তাঁকে পেলে সবই আনন্দময় হয়ে যায়।

প্রকৃতপক্ষে অধ্যাত্ম-সাধনার ক্ষেত্রে লৌকিক নীতির গতি বড় বেশী দূরে নয়। কারণ নীতি মানলেই ভীতি আর ভীতির ক্ষেত্রে প্রীতির রীতি স্বভাবতঃই সংকুচিত হয়ে পড়ে। তবে কি নীতিকে মানতে হবে না? হাঁ, জীবনে যতদিন পর্যন্ত ভগবৎ-প্রীতি সত্য হয়ে না উঠে, রসময় দেবতার রূপ-রসের বিলাস চিত্তকে উদ্ভাসিত না কোরে তোলে ততদিন পর্যন্তই সাধনা, এবং ধারণায় নীতির চুক্তি চলে; নীতির নিক্তি কষিয়া ততদিনই বুদ্ধির বিচারের মাপে মাপে চলতে হয়। কিন্তু মাপে তো ভাব মিলে না! যুগল-লীলার প্রেম-স্পর্শ অন্তরে যদি একবার এসে লাগে, তখন বিচার করবার কে থাকে? সবই তো লীলা-শক্তির অধিকারে চলে যায়। ভাবের প্রভাবে প্রীতি টানের ভজন-সাধন স্বভাবে পরিণত হয়। এইভাবে সাধক স্বরূপত্ব লাভ করেন। তিনি নিত্য-লীলার রাজ্যে অনুপ্রবিষ্ট হন। প্রেমময়ী বৃন্দাবন-বাসিনীদের লীলার অনুধ্যান তাঁদের রূপ-রসাভিসারে ছন্দের আবর্তে চিত্ত তাঁদের ডুবে যায়, তবু নীতির নিরিখটি ঠিক রাখতে হবে, শুধু বাইরে থেকেই এ বিচার এবং এমন হুঁসিয়ারী চলতে পারে। ফলতঃ লীলারস-মাধুর্যের ক্ষেত্রে এমন অবীর্য থাকা সম্ভব হ'তে পারে বলে তো আমার মনে হয় না। মহাভাবের এমন আনন্দময় চিন্ময় রসের উচ্ছ্বাসই গৌরাঙ্গ-লীলায় ছুটেছে, বৃন্দাবন-লীলারই এ যে বিবর্ত-বিলাস। সোজাসুজি এসত্যটি স্বীকার করলে বৃন্দাবন-বিলাসিনী রাধারাণী এবং তাঁর অন্তরঙ্গিনী সঙ্গিনীদের মাধুর্য-রসকে স্বকীয়তার যুক্তির মধ্যে এনে পরিশুদ্ধ করবার আর কোন প্রশ্নই উঠে না। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকে "ঈশ্বরানাং"এর দলে এনে ফেলতে হয় না। শ্রীল রাধারমণ চরণদাস বাবাজী মহাশয়ের দিব্য-জীবনে এই গূঢ়তত্ত্বটিই পরিস্ফুর্ত হয়েছে। 'নিতাই বিহনে চাই রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,' তিনি এই সত্য উন্মত্ত করে সাধ্য-বস্তুর সঙ্গে সোজা-সুজি আমাদের সম্বন্ধের নিবিড়ত্ব স্থাপন করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে ভগবানকে যদি প্রেমময়, আনন্দ-ময় বলে মানতেই হয়, তবে প্রেম এবং আনন্দ এ বস্তু তাতে সক্রিয়, এ সত্যও স্বীকার করতে হবে; অর্থাৎ তিনি নিজে প্রেম এবং আনন্দ আস্বাদন করছেন, এটিও সে ক্ষেত্রে অনস্বীকার্য হয়ে পড়ে। অবশ্য এ বলতে একথা বুঝতে হবে না যে, বাইরে থেকে প্রেম বা আনন্দকে তাঁর আহরণ করতে হচ্ছে। প্রেম বস্তুত বাইরের থেকে আহরণ করা যায় না, এ পদার্থ নিজের বীজগত। সুতরাং প্রেমের ঠাকুরকে নিজত্ব দীপ্ত করে পরম মাধুর্য আস্বাদনে বীজত্বকে ব্যক্ত বা পরিস্ফুর্ত করতে হচ্ছে; নিজের গোপন রসটিকে ক্রিয়াশক্তিতে পূর্ণ করে আস্বাদন করতে হচ্ছে। এ যুগের যিনি অবতার এই জন্যই তিনি অবতারী। হাঁ, তাঁর নিজ রসটি বীজে মিশে সকলকে তাঁকে দিতে হচ্ছে। চুরির চাতুরী তাঁর খুবই আছে; কিন্তু চুরি করে এবার আর তাঁর পক্ষে পাড়ি জমানো সম্ভব হচ্ছে না, সকলকে ধরা দিয়ে এবার সর্বশক্তিমান্ যদি ঈশ্বর যিনি, তাঁকে শ্রীমান্ হতে হচ্ছে, হরি হতে হচ্ছে। এ লীলার মুখ্য উদ্দেশ্য নিজ মাধুর্য আস্বাদন। নিজ মাধুর্য আস্বাদন করতে গিয়ে এইরূপে ত্রিভুবনের তিনি নিজ হচ্ছেন, তিনি ত্রিভুবনকে প্রেমময় করছেন। বস্তুতঃ এ কাজটি করতে হলেই বীজে যেতে হয়, আর বীজে যেতে হ'লে বীজের ভিতর যেটি স্ব-তত্ত্ব, অর্থাৎ নিজ মাধুর্যের প্রাণস্বরূপ তাঁকে নিজকে দিতেও হয়। এজন্যই 'আপন মাধুর্য কৃষ্ণ না পারে বুঝিতে, ভক্তভাব অঙ্গী কর তাহা আস্বাদিতে।' আবার ভক্তভাব অঙ্গীকার করতে হলেই ভক্ত-স্বরূপ যিনি তাঁকেও অঙ্গীকার করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। 'স্বয়ং ভক্ত অবতার চৈতন্য গোঁসাই ভক্তস্বরূপ তাঁর নিত্যানন্দ ভাই।' সুতরাং রাধারাণীকে একান্তভাবে স্বীকৃতিতে এবং সেই স্বীকারহেতু প্রেমস্বরূপিণী রাধারাণীর অন্তরঙ্গা সঙ্গিণীদলের বিভঙ্গীর অনঙ্গ-সেবা রসের উদ্দীপ্তির তরঙ্গরঙ্গেই নামের ভিতর দিয়ে ভক্তির রীতি উথলে উঠে। শ্রীকৃষ্ণের ক্রিয়াশক্তি এইভাব তোড়ে জোরে নাড়া দিয়ে, সব স্তরে আনন্দছন্দের সাড়া জাগিয়ে এবার নেমে এসেছে। 'প্রেমসিন্ধু গোরা যায় নিতাই তরঙ্গ তায়'—এই তরঙ্গের সংস্পর্শে আনন্দময় গোবিন্দলীলার ছন্দটি আমরা সমগ্রভাবে স্বচ্ছন্দ-রূপে পাচ্ছি। নাম ছাড়া অন্য কোন সাধন বা ভজনের কোন প্রয়োজন আর থাকছে না। অপ্রাকৃত নবীন মদনস্বরূপে যিনি নিত্যধাম বৃন্দাবনে স্থাবর-জঙ্গম সকলের বীজগতভাবে নিজত্ব আস্বাদন কচ্ছেন, নামের ভিতর দিয়ে তাঁকে

আমরা সেই নিজত্বের আলোকেই পরিস্ফূর্তভাবে পাই। সুতরাং নিতাইকে ধরলেই গৌরকে পাওয়া গেল; আর গৌরকে পেলেই রাধাশ্যামের সেবানন্দ সম্বন্ধসূত্রে আমাদের পরম পুরুষার্থও সিদ্ধ হলো। শ্রীমৎ চরণদাস বাবাজী এই নামের রস-রহস্য সর্বতোভাবে প্রকাশ করেছেন। নাম-সাধনার ধারাটিকে তিনি হেতুমৎ এবং বিনিশ্চিত ক'রে দিয়েছেন। এ যুগের সাধ্য এবং সাধনতত্ত্বের সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ আর রাখেন নাই।

এইভাবে নাম-বিলানোর ব্যাপারটিতে কার অধিকার? এ প্রশ্ন উঠছে। গুরুজ্ঞান-উপদেশ তো শ্রীভগবান যুগে যুগেই দান ক'রে আসছেন, বেদ-বেদান্ত সব তাঁরই বাণী, কিন্তু সে বাণীর অন্তর্নিহিত ধ্বনি সহজে ধরা যায় না। নিজ বোধে মজলে তবে তো জ্ঞান। নিজ-বোধের তেমন চেতনায় বা ভাবময় ক্ষেত্রে সাধারণ লৌকিক রীতি বা আচার-বিচারের নিরিখ চলে না। নামেই সে বোধ জাগ্রত হয়। এজন্য নামের মহিমা তর্কের গোচর নহে।

লৌকিক রীতিনীতির বিধি-বিধান ভেঙ্গে ফেলে নামের শক্তি ছড়িয়ে যায়। যাঁকে যন্ত্র ক'রে এই ছন্দটি খেলে, নিন্দা-স্তুতির অপেক্ষা তাঁর থাকে না। এই বৈষ্ণবশাস্ত্রে বলা হয়েছে —"মূঢ় লোকে নাহি বুঝে ভাবের বৈভব।" শ্রীমৎ চরণদাস বাবাজীর জীবন-লীলায় আমরা নানাভাবে এরূপ অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাই। বাইরে থেকে দেখলে হয়ত প্রশ্ন উঠবে, এ সবগুলি কি বিভূতি? কিন্তু তাহা কি ক'রে সম্ভব হ'তে পারে? প্রেমের গন্ধও যদি অন্তরের আশেপাশে যায়, তবেই বড় বড় সিদ্ধি, এমন কি ব্রহ্মানন্দও যে তুচ্ছ হ'য়ে পড়ে! বস্তুত শ্রীমৎ চরণদাস বাবাজী মহারাজের জীবন-লীলায় আমরা যে সব অপ্রাকৃত ব্যাপার ঘটতে দেখি, বিভূতি বলতে যা বুঝায়, সে বস্তু সেগুলির মধ্যে নাই—আছে প্রেমেরই শক্তি। তিনি নিজকে গুপ্ত ক'রে সব ক্ষেত্রে বীজকেই ব্যক্ত করেছেন। তিনি শ্রীভগবানের নাম, গুণ এবং লীলার মাহাত্ম্যকে পরিস্ফূর্ত করেছেন। তাঁকে ধরতে গেলেই সার্বভৌম সত্য যে প্রেম, তার সাড়া অন্তরে নাড়া দিয়ে উঠে—ভগবৎ-কৃপার সম্বন্ধে সব বিতর্ক, সব সন্দেহ ছুটে যায়। একটু অনুধ্যান করলেই এ তত্ত্বটি স্পষ্ট হ'য়ে পড়ে। অবশ্য খণ্ড খণ্ড ব্যাপারের পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টি নিয়ে এ'দের আচরণের বিচার করা চলে না। আবার এমন জীবন-লীলায় জড়ানো খেলানো অপরিচ্ছিন্ন সম্মূর্তিকে ঈষৎ আভাষেও অনুভূতির মধ্যে আনা সহজ ব্যাপার নয়। শ্রীভগবানের নাম যে ভব-ব্যাধির পক্ষেও ভেষজ, এ দেশের বিভিন্ন শাস্ত্রে বহুভাবে তা কীর্তিত হ'য়েছে। মহাত্মা গান্ধী নিশ্চয়ই অবাস্তব ভাবপ্রবণ পুরুষ ছিলেন না। নামের ফলে ব্যাধি নিরাময় হ'য়ে থাকে—এ সত্য তিনি সুস্পষ্ট ভাষাতেই অভিব্যক্ত ক'রে গিয়েছেন। সর্বভূতের অন্তরে ভগবান রয়েছেন, এই সত্যটি উপলব্ধি করতে পারলে উপাধির আবরণ সরিয়ে ফেলে তিনি যে সাড়া দেন, এ দেশের সব শাস্ত্রেই এ তত্ত্ব উপদিষ্ট হয়েছে এবং এ তত্ত্বটি স্বীকার না ক'রে ভারতের সমগ্র সংস্কৃতি এবং সাধনাকেই অস্বীকার করা হয়। নামের গুণে গাছ কেমন করে নাচে, মরা মানুষ কথা বলে, অন্ধের দৃষ্টি খোলে, আধুনিক জড়-বিজ্ঞানের যুক্তি হয়তো এক্ষেত্রে চলবে না। নামের কৃপায় পশুদেহের আবরণ কেটে গিয়ে স্বরূপ স্ফূর্ত হয়ে উঠে, জড় বিজ্ঞান এ সব এখনও বুঝবে না। কিন্তু সে বিজ্ঞানের শক্তি যতই থাকুক না কেন, মানুষের কোন সমস্যার তা সমাধান করতে পেরেছে? পক্ষান্তরে জগৎ জুড়ে অশান্তিই সে পথে বেড়ে চলেছে। প্রকৃতপক্ষে জড়-বিজ্ঞানের সাধনার পথে বাইরের উপচার বাড়িয়ে মানুষের অভাব কোন দিন মিটবে না এবং মানুষ তার স্বভাবেও প্রতিষ্ঠা লাভ করবে না, আনন্দময় স্ব-স্বরূপের উপলব্ধি তো দূরের কথা। এ দেশের অধ্যাত্ম-সাধনা মানুষের আনন্দময় নিত্য-জীবন, দিব্য-জীবনেরই সন্ধান দিয়েছে। প্রেমই তেমন জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করবার একমাত্র উপায়। কিন্তু প্রেম বললেই প্রেমে পড়া যায় না, প্রেমকে চোখে দেখতে হয়। আমাদের অভাবাত্মক জীবনে প্রেমের সর্বতোময় জীবন্ত এবং প্রত্যক্ষ প্রভাব পরিস্ফূর্ত হ'য়েছে, প্রেমকে আমরা দেখতে পেয়েছি চরণদাস বাবাজী মহারাজের জীবন-লীলায়। তিনি নাম ও প্রেমের অপরিচ্ছিন্ন সম্মূর্তি। নামের রসতত্ত্ব—দোল, বোল, কোল, নিতাইয়ের অখণ্ড ভাবটি তাঁর দিব্যলীলায় উজ্জ্বল। এমন লীলার স্মরণ, মনন এবং অনুধ্যানে আমাদের সব দুর্গতি দূর হ'তে পারে—অন্য কোন পথ নাই। সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর উদ্যোগে আহূত স্মৃতি-সভায় 'দেশ' পারে—অন্য কোন পথ নাই।

সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর উদ্যোগে আহূত স্মৃতি-সভায় 'দেশ' সম্পাদকের বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত অনুলিপি।

কার্জন পার্ক

দেবদাস পাঠক

দিনের সহস্র পাওনা শেষ করে দিয়ে সন্ধ্যায়
যদি এই ক্লান্ত মন একটু দ্বীপের শান্তি চায়,
নির্জন একটু ক্ষণ। অন্ধকার আকাশের নীচে
ত্রিপাদ ঘাসের জমি। জীবনের সব চাওয়া মিছে
না হয় হলোই তার। তবু এইটুকু অধিকার
একটি কেরাণী যদি দাবী করে তার জীবিকার
ক্রুর বিধাতার কাছে। যদি তার মন
লোনা গন্ধে ভরে ওঠে। যদি কোন একান্ত নির্জন
দ্বীপের সুদূরে স্বপ্ন ছায়া ফেলে শ্রান্ত চোখে তার।
কার্জন পার্কের হাওয়া যাদু জানে ঘুম পারাবার।

এখানে মিঠেল হাওয়া, সমুদ্র না জানি কতদূর,
সন্ধ্যায় কার্জন পার্কে শুনি তবু সমুদ্রের সুর।
আকুতি-আকুল মন গান শোনে—জীবনের গান
সহস্র কাজের ভারে যদিও এ-দেহ-মন-প্রাণ
পরিশ্রান্ত। অন্ধকারে অনির্বাণ সহস্র তারার
উজ্জ্বল প্রদীপ্ত চোখ হীন-দীপ্তি চোখে বারবার
আশ্চর্য স্বপ্নের ছায়া ফেলে। তবু হিসেবী এ-মন
মুহূর্তে সংযতরাশ। এখানে অজস্র ফুল, ঘাস,
এ-স্বপ্ন মুহূর্ত-জীবি। জীবনের সহস্র প্রয়াস
নির্মম পুষণে ব্যর্থ। অন্ধকার মসীম্লান দিন,
কখনও হবে না শোধ কার্জন পার্কের এই ঋণ।

বিশুখুড়ো বলিতে লাগিলেন—"চলতি হপ্তার সব চেয়ে জোর খবর হলো শ্রীযুক্ত এন্‌, বি, খেরের খৈ ভাজার সংকল্প গ্রহণ"। আমরা খুড়োর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাইলে তিনি বলিলেন—"মধ্য প্রদেশে যেদিন ভারতের সঙ্গে পাকিস্থানের ক্রিকেট খেলা হবে সেদিন তিনি গেটে দাঁড়িয়ে "পিকেট্‌" করবেন কেননা তিনি মনে করেন যে, পাকিস্থান হিন্দুদের উৎখাত করছে তাঁদের খেলার নিমন্ত্রণ জানানো ভারতের নৈতিক অবনতিরই পরিচায়ক। সুতরাং বলতে হয়, সত্য সেলুকস, কী বিচিত্র এই খৈ"!!

* * *

শ্রীযুক্ত নেহরু মন্তব্য করিয়াছেন যে, তিনি নিজে আংশিকভাবে পাহাড়ী বলিয়া পাহাড়ীদের প্রতি তাঁর একটু পক্ষপাতিত্ব আছে এবং তিনি পাহাড়ীদের সুখ-দুঃখের কথাটা ভাল করিয়াই বুঝিতে পারেন। জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"সমতলবাসীদের সুখদুঃখের কথাটা কেন যে তিনি সম্যক বুঝতে পারেন না তা এতদিনে বোঝা গেল"।

* * * *

নেহরুজী সম্প্রতি প্রেসের মারফতে অনুরোধ জানাইয়াছেন, তাঁর জন্মদিনে কেহ যেন তাঁহাকে কোন উপহার

প্রেরণ না করেন। কেহ যদি সত্যই কিছু দিতে চান তবে তাহা কোন প্রতিষ্ঠানে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পাঠাইয়া দিলেই খুশী হইবেন। শ্যামলাল বলিল—"অনুমান

ট্রামে-বাসে

করছি ভালুক জাতীয় উপহার সম্বন্ধে পণ্ডিতজী অন্য মত পোষণ করেন"।

* * *

মিসেস আসফ আলি তাঁর এক সাম্প্রতিক ভাষণে বলিয়াছেন যে, ভারতের স্বাধীন হওয়ার পর দেশের

অবস্থার কোন উন্নতি হয় নাই। খুড়ো বলিলেন—"তা ঠিক জানিনে, তবে জেনেভার জলবায়ুতে অনেকের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে বলেই তো শুনেছি"!!

* * * *

সংবাদে শুনিলাম কলিকাতার অনুকরণে পূর্ব পাকিস্থানের ঢাকা শহরে নাকি একটি 'নিউ মার্কেট' স্থাপন করা হইয়াছে। শ্যামলাল বলিল—"কিন্তু তাঁরা তাল রাখতে পারবেন কি? এরপর জগুবাজার, কোলে বাজার, বৌবাজার, আরো কত কী। তার চেয়ে সেরা বাজার ফাট্‌কা বাজার করে নিলেই এক ঢিলে অনেক পাখী মারতে পারবেন।"

* * * *

পশ্চিমবঙ্গের ভূগর্ভে নাকি তেলের খনির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। আমাদের এক সহযাত্রী মন্তব্য করিলেন—"আশ্চর্য কিছু নয়, ভূপৃষ্ঠে তৈলদানের বহর দেখেই তা বোঝা যায়"!

* * * *

নর্দমার জল হইতে গ্যাস্‌ উৎপাদনের ব্যবহার জন্য নাকি মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় চেষ্টা করিতেছেন। বিশুখুড়ো বহুদিন বিস্মৃত একটি রেকর্ড সঙ্গীত শুনাইলেন: "কনের মা ঐ বলছে জোরে, আসতে হবে সজ্জা করে, আবার গ্যাস্‌ লাইট্‌ না হলে পরে শোভা হবে না"।

* * * *

একটি সংবাদে প্রকাশ, নিউজিল্যান্ড হইতে ইউরোপে ঘোড়ার মাংস চালান দেওয়া হইতেছে।—"মানুষে আবার মানুষের মাংস খাবার যুগে ফিরে যাবার তোড়জোড় করছে; সুতরাং এই পরিবেশে ঘোড়ার মাংসের কথাটা সংবাদই নয়"—মন্তব্য করে আমাদের শ্যামলাল।

* * * *

রেডিও প্রোগ্রামে মুস্তাক আলির সেতার বাজনার ঘোষণা শুনিয়া জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"মুস্তাক আলির সেতার তার ব্যাটিং-এর মতোই প্রশংসনীয়"। খুড়ো বলিলেন—"পুরুষস্য ভাগ্য ভাই; এই দেখনা জওহরলাল কাপড়ের দোকান ছেড়ে দিব্য প্রাইম্‌ মিনিস্টার বনে গেলেন"!!

* * * *

পাক্‌ সরকার নির্দেশ দিয়াছেন—পশ্চিম পাকিস্থানে ভারতীয় ছায়াচিত্র প্রদর্শন চলিবে না। জনৈক সহযাত্রী

বলিলেন—"শুনলুম তারা তার বদলে ভানুমতীর খেল্‌ দেখাবার ব্যবস্থা করেছেন"।

শান্তিনিকেতন সংগীতগুরু আল্লাউদ্দীনের সম্বর্ধনা

[নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র]

৩০শে অক্টোবর সন্ধ্যায় উত্তরায়ণে ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ সাহেবকে আশ্রমের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জানান হয়।

ওস্তাদ আলাউদ্দীন তাঁর বাসস্থান থেকে গাড়িতে উত্তরায়ণে আসেন। রথীন্দ্রনাথ

সুর-তপস্বী ওস্তাদ আলাউদ্দীন

তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে যান। গাড়ি থেকে নামলেন অশীতিপর বৃদ্ধ সংগীতগুরু—গায়ে সাদা পাঞ্জাবী, পায়জামা পরনে, মাথায় সাদা টুপি, কাঁধে সরোদ, সঙ্গে তাঁর ১৩ বছরের পৌত্র আশিস খাঁ। আস্তে আস্তে সমবেত সবাইকে নমস্কার করে ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ সাহেব, রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুসজ্জিত বারান্দায় তাঁর আসনে এসে বসলেন। তাঁর একপাশে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী, আরেক পাশে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মালা-চন্দন দিয়ে অভিনন্দন জ্ঞাপনের পর 'বিশ্ববিদ্যাতীর্থ প্রাঙ্গণ' গানটি হয়। গানের পর রথীন্দ্রনাথ ওস্তাদ আলাউদ্দীনকে স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে বল্লেন, "বিশ্বভারতী উপাচার্য হিসেবে আমার ওপর অনেক সময় অনেক কাজের ভার এসে পড়ে। কিন্তু আজকের কাজটির মত আনন্দজনক কাজের ভার কখনো আমার ওপর পড়েনি। ওস্তাদ আল্লাউদ্দীনের পরিচয়, শুধু সংগীতজ্ঞ বলে নয়; তাঁর পরিচয় সংগীতসাধক বলে।

রঙ্গজগৎ

তিনি আজ শান্তিনিকেতনে এসে আশ্রমের কাজে যোগ দিয়ে আমাদের গৌরবান্বিত করেছেন। তার যোগ্য সমাদর করি সে সামর্থ্য আমাদের নেই। আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধার দ্বারা তাঁকে স্বাগত করি।"

রথীন্দ্রনাথের পর আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন তাঁর ছোট্ট ভাষণে বলেন, "অনেকে হয়ত ভাবছেন আমাদের এই ধর্মের আশ্রমে ইনি কেন? ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ সাহেব ত শুধু বাজিয়ে নন, তিনি তপস্বী। সংগীতই হল তাঁর ধর্ম। সঙ্গীত হচ্ছে তিন প্রকারের—সাত্বিক, রাজসিক, তামসিক। ওস্তাদ আলাউদ্দীন সংগীতের সেই সাত্বিকরূপের সাধক। আমাদের দেশে অনেকবারই সংগীতের বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়েছে। হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজের নেতারা সংগীতের বিরুদ্ধে কত প্রচারই না করেছেন। তবুও আমাদের ঋষিদের সংগীত-সাধনা থামেনি। আজ আমি বেশি কিছু বলব না, বেশি কথার দিনও আজ নয়। ২০০ বছর আগেকার এক বাউলের একটি গান কেবল বলব। তাঁর বাড়ি ছিল পূর্ব-বঙ্গে—ওস্তাদ আলাউদ্দীনের বাড়িও সে অঞ্চলেই। গেয়ে শোনালে ভাল হত। তা ত আমি পারব না। ২০০ বছর আগে এই বাঙলা দেশেও সংগীতের বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়েছিল। তখন মদন নামে ... মুসলমান বাউলকে সবাই বলে, 'তুমি ... কর কেন? ধর্মে বারণ গান গাওয়া।' ... মদন গেয়ে বল্লেন,—

> যদি করস্ মানা ওগো বন্ধু,
> মানি এমন সাধ্য নাই।...
> কোনো ফুলের নামাজ রংবাহারে,
> কারও গন্ধে নামাজ অন্ধকারে,
> বীণার নামাজ তারে তারে,
> আমার নামাজ কণ্ঠে গাই।"

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের ভাষণ শে... হল, কিন্তু তার রেশ বাজতে থাকল শ্রোতা...দের কানে। ওস্তাদ আলাউদ্দীন উ... আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনকে প্রণাম করলে... তাঁর দু'পা জড়িয়ে ধরে বল্লেন, "আমা... আপনার পায়ের ধুলো দিন। আজ গুরু...দেব নেই, আপনার পায়ের ধুলো দিন। ... আশীর্বাদ করুন, যেন আমার সংগী... সাধনা সফল হয়।" তারপর আসরের সাম... এগিয়ে এসে বল্লেন (তাঁর চোখে তখন জল) "আমি কী বলব আপনাদের। আমি ভা... জানি না। আমার সুরেই আমার ভাষ... সংগীতই আমার ধর্ম, সংগীতই আমার ক... সংগীতই আমার জীবন। এঁরা আমা... যে সম্মান দিলেন আমি তার যোগ্য নই... আমার সাধনা সম্পূর্ণ নয়। আমি এখন সুরের রাজ্যে পৌঁছতে পারিনি।"

সভার শেষে ছিল ওস্তাদ আলাউদ্দীন... তাঁর পৌত্র আশিস্ খাঁর সরোদ বাজনা... প্রায় দু'ঘণ্টা বাজনার পর ওস্তা... আলাউদ্দীন হাত জোড় করে উ...

বম্বেতে গত ৯ই অক্টোবর টেগোর সোসাইটির উদ্যোগে ভারতীয় বিদ্যাভবনে অভিনীত রবীন্দ্রনাথের 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যের গায়কদল। এদের মধ্যে রয়েছেন দময়ন্তী গুপ্তা, মিনতি চৌধুরী, মীরা মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা মিত্র, নির্মল মুখোপাধ্যায়, পিনাকিন, গৌরাঙ্গ দত্ত প্রভৃতি। নৃত্যনাট্য প্রযোজনা করেন বাচুভাই শুক্লা ও সুশীলা আমার; সংগীত পরিচালনা করেন শিবকুমার দত্ত।

দাঁড়ালেন। আশ্রমবাসী সকলে তাঁকে নমস্কার করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন।

মিনার্ভার নতুন নাটক 'কেরানীর জীবন'

নাট্যকারঃ ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিচালনা ও সুরযোজনা রঞ্জিৎ রায়; প্রধান কর্মসচিবঃ জলু বড়াল; ভূমিকায়ঃ রঞ্জিৎ রায়, গৌরি-শংকর, সুশীল রায়, সমর মিত্র, শিবকালি চট্টোপাধ্যায়, বিভূতি দাস, সন্তোষ সিংহ, ঠাকুরদাস মিত্র, গোপাল চট্টোপাধ্যায়, সুধাংশু মুখোপাধ্যায়, ভগবান ভট্টাচার্য, সুধীর গঙ্গোপাধ্যায়, রমা দেবী, সুদীপ্তা রায়, মঞ্জুশ্রী চট্টোপাধ্যায়, বেলারাণী, মাধুরী, সূর্য প্রভৃতি। প্রথম অভিনয়—২৩শে অক্টোবর।

বাস্তবধর্মী বিষয়বস্তু নিয়ে ও বাস্তবের চেহারায় সাজিয়ে নাটক করার দিকে পেশাদার মঞ্চের চেতনা জাগতে আরম্ভ করেছে। কিছুদিন আগে রঙমহল "জীবন-মরণ" নামে একখানি নাটক উপহার দিয়েছে; এবারে এগিয়ে এসেছে মিনার্ভা থিয়েটার "কেরানীর জীবন" নিয়ে। এর আগে যে বাস্তবধর্মী নাটক হয়নি তা নয়, বরং আমাদের দেশে এ পর্যন্ত মোট যতো নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে, তার বেশির ভাগই বাস্তবকেই নিয়ে। কিন্তু তফাৎ এই যে, এখন যে নাটকের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে, এগুলি একান্তই সম-সাময়িক বাস্তবকে নিয়ে, এদের কোন কিছুতেই কল্পনার তুলি বোলানো নেই আদপেই। এদের বানানো নয় কিছুই, যা সত্যি, তা-ই সবটুকু। সেইমত "কেরানীর জীবন"ও সামনে এনে দিয়েছে কেরানীদের সত্যিকারের জীবনের চেহারা। কেরানী-দের জীবনের নৈরাশ্য, তাদের দুর্দশা, তাদের অশান্তি এবং তাদের শংকাকুল ও সংশয়াকীর্ণ জীবনের দিকটা শুধু নিয়ে এই নাটকের গল্প।

কেরানী বলতেই যাদের কথা মনে পড়ে, তারাই এই নাটকের সব চরিত্র এবং ঘরে ও অফিসে তাদের যে সমস্ত সমস্যার সামনে পড়তে হয়, সেই সব সমস্যাকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে এর ঘটনাবলী। কেবল ঘর আর অফিস। অফিসে কেবলই অনুযোগ, অভিযোগ; ওপরওয়ালাদের অবিচার ও অনাচার। আর বাড়িতে যতো সব অভাব ও আক্ষেপ। সারা নাটকখানিতে কেবলই এরই পুনঃপৌনিক বিবরণ। আর ঘটনার পটভূমি বলতেও কেবল ঐ দুটি জায়গাই আছে—অফিস আর একটি কেরানী পরিবারের গৃহস্থালী।

মুখ্য চরিত্র হচ্ছে বিধুভূষণ—একুশ বছর ধরে একই অফিসে কাজ করে আসছে। সংসারে তার স্ত্রী আর চার-পাঁচটি ছেলে-মেয়ে। বড়টি মেয়ে মাধু; বিয়ের অল্পকাল পরই একটি শিশুপুত্র কোলে নিয়ে বিধবা অবস্থায় বাপের গলগ্রহ হয়েছে। তার-পরেরটি পটলা ওরফে পরেশ—চার বছর ধরে ম্যাট্রিক ফেল করে যাচ্ছে; পাড়ার ক্লাবে থিয়েটার করে, বাপের পকেট মেরে বা মায়ের কাছে আবদার করে পয়সা জোগাড় করে রেস খেলে, মদও খেতে শিখেছে। তৃতীয় সন্তান, মিনু ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করেছে, কিন্তু আর পড়তে পারেনি পয়সার অভাবে। তারপর মেয়ে বুলু এবং সবশেষ ছোট ছেলে মিণ্টু। একা বিধুভূষণেরই যাকিছু রোজগার। ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। বাড়িভাড়া বাকি পড়েছে; মুদীও এসে অপমান করে যায়। এই সময়ে বন্ধুপুত্র রবীন বিপর্যয়ে পড়ে এলো বিধুভূষণের কাছে চাকরীর খোঁজে। অফিসে বড়সাহেব মিস্টার নন্দী লোকটি ভদ্র; বিধুভূষণকে খাতির করেন। অন্যের মুখের দিকেও চেয়ে দেখেন। কিন্তু নবাগত ছোটসাহেব মিস্টার গুহ উগ্রপ্রকৃতির লোক, যা-তা অপমান করে বসেন, অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করেন, অফিসের টাইপিস্ট মেয়েদের দিকে ঝোঁক দেখান।

কথার ছলে বিধুভূষণ বড়সাহেবকে রবীনের চাকরীর জন্যে বলেন। রবীনের চাকরী হলো, সেই সঙ্গে অফিসে একটি টাইপিস্ট মেয়ের দরকার থাকায় এবং বিধুভূষণের মেয়ে মিনুর ভালো টাইপ জানা থাকায় তারও চাকরি হয়ে গেল। এখানে উল্লেখ দরকার যে, রবীন একদা প্রতিবেশী থাকার সময় থেকেই মিনুর সঙ্গে তার প্রেম হয় এবং সপত্নী বিধু-

বাবুরও ইচ্ছে ছিলো, অসম্ভব না হলে ওদের বিয়ে দেবার। বছরখানেক সময় পার হয়ে গেল। পটলা একদিন মদ খেয়ে হাজির; তারপর রক্ত বমি; ডাক্তারি পরীক্ষায় রোগ ধরা পড়লো যক্ষ্মা বলে। বিধুভূষণও দীর্ঘকাল রোগে ভুগছে; মাইনে পায়না, সংসার চলছে মিনুর রোজগার সম্বল করে। অফিসেও মিস্টার নন্দী অবসর গ্রহণ করেছেন আর মিস্টার গুহ হয়েছেন সর্বেসর্বা। গুহ একদিন সুযোগ করে নিয়ে মিনুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার চেষ্টা করলে; হঠাৎ কথা বলতে বলতে মিনুর হাত ধরে আর সেটা দেখে ফেলে রবীন। মিনু চাকরি ছেড়ে দেওয়াই ঠিক করেছিলো, কিন্তু ছোট বোন বুলুর কাতর অনুনয়ে তার চেতনা ফিরে আসে। রবীন প্রচ্ছন্নভাবে বিধুভূষণকে টাকা সাহায্য পাঠায়; বিধুভূষণ সামান্য অর্থ সাহায্যের চেয়ে রবীনের কাছ থেকে বড়ো অনুগ্রহ কামনা করেছিলেন। রবীনকে আর মিনুকে ডেকে তিনি দুজনের হাতে হাত মিলিয়ে দিলেন। এর পরের ঘটনা পটলার মৃত্যু; আর সন্তানের মৃত্যুতে শোকে উন্মাদপ্রায় রুগ্ন বিধুভূষণেরও আকস্মিক মৃত্যু। এইখানেই নাটকখানিতে যবনিকা পড়েছে।

নাটকখানি যেখানে শেষ হয়েছে, গল্পের ওখানে শেষ হয় না, তবে হয়তো কেরানীদের জীবন এই গড্ডলিকা প্রবাহেই গড়িয়ে চলেছে এমনি একটা নির্দেশ দেবার জন্যেই বোধহয় নাটকের পরিসমাপ্তিটা ঐরকম করা হয়েছে। এতে শাশ্বত আবেদন নেই, একেবারেই সমসাময়িক অবস্থা। এখন যেমন বেশির ভাগ অফিসে কেরানীদের অ... তাদের পারিবারিক জীবনে যেমন দৈ... অভাবের প্রাধান্য, শুধু তারই একটা বি... এটা। কেরানীদের জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষার কোন চেহারা মূর্ত করে তো... নেই, এতে রয়েছে কেবল কেরানী জীবনের একটানা দুঃখ, দৈন্য ও ব্যর্থ... দিকটাই—জীবনের বিপরীত কোন ... এদের স্বপ্ন ও অভিলাষের মধ্যেও থাকতে পারে, তার আভাস মাত্রও নেই। ... বৈলক্ষণ্য বা contrast-এর অভাব না... পুষ্টির খোরাকটা অপূর্ণ রেখে দিয়েছে... তাই কেরানীদের জীবনের মর্মন্তুদ দিকটা এতে আছে, সমস্যাগুলিকে তীব্রভাবে মূর্ত করাও নেই, সমাধানেরও কোন ইশারা নেই। কেরানী জীবনে সুখের আশ্বাস কোন...
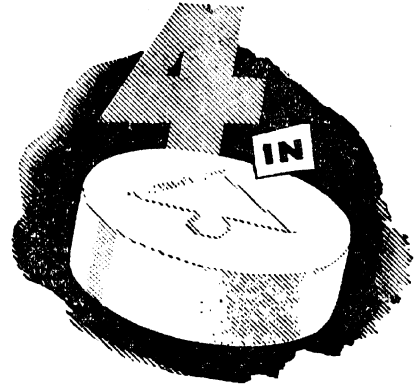
...ধরে আসতে পারে, তা নিয়ে কোন কথার অবতারণা করা হয়নি নাটকখানিতে। নাটকখানির উপস্থাপনে গতানুগতিকতার বাইরে যাবার একটা চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। দৃশ্য সংস্থাপনে অভিনবত্ব আনার জন্যে একটুখানি যেন চিন্তা করা হয়েছে বলে মনে হলো। অফিসের তিন কুঠরীতে ভাগ করা সেটটিতে একযোগে তিনটি দৃশ্য দেখিয়ে দেবার ব্যাপারটি বিশেষভাবে প্রশংসিত হবে। এক কুঠরীতে বড়সাহেব, তারপরেরটিতে বস্ কেরানীরা এবং আর একধারে ছোটসাহেব। যখন যে কুঠরীতে ঘটনা পড়ে, আর দুটি কুঠরীর ওপর আলো নিষ্প্রভ করে দিয়ে সেই কুঠরীর ওপর আলোকে জোর করে দেওয়া হয়। দৃশ্যপটে থিয়েটারি রূপটা কটকটে।

দৃশ্য পরিবর্তনের মাঝের সময়ে দর্শকদের অপেক্ষা করার বিরক্তি দূর করার জন্যে কেরানীদের জীবন বর্ণনা-করা দুখানি গানের ব্যবস্থা করা হয়েছে—বড়ো সেকেলে ব্যাপার। ঠিকে ভুলও চোখে পড়ে—তিনদিন বাড়িতে হাঁড়ি চড়ে না, কিন্তু সবারেরই সদ্য পাটভাঙা ধোপদরস্ত সাজ, আর বিশেষ করে মেয়েদের রঙচঙে পরিপাটি চেহারা বিষয়বস্তু ও ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নিদর্শ মনে হয়; আর চরিত্রগুলির প্রতি দর্শকদের দরদটা থমকে যায়। মিণ্টু ছেলেটিকে প্রথম দৃশ্যে যেমন এবং যে পোষাকে দেখা গেল, তার এক বছর পরের ঘটনার দৃশ্যে ঠিক সেইভাবে সেই পোষাকেই রাখা হলো কেন?

নাটকখানি পৃষ্ঠপোষকতা অর্জনের যোগ্যতা অর্জন করেছে সম্মিলিত অভিনয়ের জন্যে। ব্যক্তিগত বিশেষ কৃতিত্বও জনকয়েকের অবশ্য রয়েছে। সন্তোষ সিংহ, ঠাকুরদাস মিত্র, রঞ্জিৎ রায়, গৌরীশঙ্কর ও শিবকালি যথাক্রমে বিধুভূষণ, পটলা ওরফে পরেশ, অফিসের ফাঁকিবাজ কেরানী নিবারণ, ছোটসাহেব মিঃ গুহ ও মুদীর ভূমিকায় আলাদাভাবে নাম উল্লেখ করার মতো কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। পটলা চরিত্রে ঠাকুরদাসকে গোড়াতে একটু বেশি বয়সের বলে বেখাপ্পা লাগে, কিন্তু অভিনয়ের জোরে দর্শকমন থেকে তিনি সে-ভাবটা কাটিয়ে দেন এবং মৃত্যুর দৃশ্যে লোককে অভিভূতও করে তোলেন। গৌরীশঙ্কর নিজেকে মঞ্চের একটি নতুন রত্ন প্রতিপন্ন করতে সক্ষম হয়েছেন।

চিত্রাভিনেত্রী সন্দীপ্তা রায় মিনুর ভূমিকায় মঞ্চে টিঁকে থাকার পক্ষে যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। তার গানের গলা আছে এবং গেয়েছেনও দুখানি গান, কিন্তু সঙ্গতের জোর আওয়াজে শোনায় ব্যাঘাত ঘটছে। তাছাড়া গান দুটির প্রয়োগও ঠিকভাবে হয়নি। এদের মধ্যে বিধবা মাধুর ভূমিকায় রমার অভিনয়ই দরদী মনকে বেশি আকৃষ্ট করবে। ছোট-মেয়ে বুলুর ভূমিকায় মঞ্জুশ্রীর ওপরে দর্শকদের সপ্রশংস দৃষ্টি পড়বে—মিনুকে চাকরি না ছাড়তে ওর অনুনয়ের ঘটনাটি ওর অভিনয়ে আবেগময় হতে পেরেছে।

দুখানি আগামী ছবি

আগামী ডিসেম্বরের একটি বিশেষ আকর্ষণ হবে বলে ঘোষিত হয়েছে জেমিনীর পঞ্চম অবদান "মিঃ সম্পত"। শ্লেষ ও কৌতুকে ভরা এর বিষয়বস্তু রস-পরিবেশনে অভিনবত্ব নিয়ে আসবে বলে আশ্বাস পাওয়া যাচ্ছে। নতুন ধারার কাহিনী এবং চরিত্রসমন্বিত ছবিখানি অভিনবত্ব আনায় জেমিনীর খ্যাতিকে অক্ষুণ্ণ রাখবে বলে আশা করা যায়।

অচিরেই মুক্তিপ্রতীক্ষায় রয়েছে এম পি প্রডাকসন্সের 'আঁধি' যা 'বাবলা'র সুখ্যাতদের দিয়ে তৈরি করানো হয়েছে। কাহিনী সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের, পরিচালনায়ও আছেন সেই অগ্রদূত সম্প্রদায়ই। এর প্রধান ভূমিকায় আছেন বিভু, দীপ্তি রায় ও রাধামোহন। সুরযোজনা করেছেন দুর্গা সেন।

খেলার মাঠে

ক্রিকেট —

পাকিস্থান ক্রিকেট দলের খেলোয়াড়গণ সকলেই যে ম্যাটিং উইকেটে খেলিতে অভ্যস্ত ইহা লক্ষ্ণৌর দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচে ও নাগপুরের মধ্যাঞ্চল দলের বিরুদ্ধের খেলায় প্রমাণিত হইয়াছে। এই দুই খেলায় পাকিস্থানের কয়েকজন খেলোয়াড় ব্যাটিং ও বোলিংয়ে সাফল্য লাভ করিয়াছেন। লক্ষ্ণৌর টেস্ট ম্যাচে ভারতীয় দলকে শোচনীয়ভাবে ইনিংসে পরাজিত করিয়াছিলেন। নাগপুরের খেলায় তাহার পুনরাবৃত্তি করা সম্ভব না হইলেও শক্তিশালী মধ্যাঞ্চল দলকে পরাজিত করিবার ন্যায় অবস্থা সৃষ্টি করেন। এমন কি এই খেলায় তিনজন খেলোয়াড় শতাধিক রান লাভের গৌরবে ভূষিত হইয়াছেন। প্রথম ইনিংসের খেলায় পাকিস্থান দলের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান ইমতিয়াজ আমেদ পূর্ব খ্যাতি অনুযায়ী খেলিয়া ২১৩ রান করিয়া শেষ পর্যন্ত নট আউট থাকেন।, ধুরন্ধর প্রবীণ কর্নেল নাইডু ইহাকে আউট করিবার সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন। দ্বিতীয় ইনিংসেও খুরসীদ আমেদ ও অধিনায়ক আব্দুল হাফিজ কারদার উভয়েই দৃঢ়তার সহিত ব্যাটিং করিয়া শতাধিক রান করিয়াছেন। ইঁহাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া মধ্যাঞ্চল দল প্রথম ইনিংসে কিছুটা ব্যাটিংয়ের দৃঢ়তার পরিচয় দিলেও দ্বিতীয় ইনিংসে তরুণ বোলার ইসরার আলী ও খলিদ কুরেশীর মারাত্মক বোলিংয়ের বিরুদ্ধে বিপর্যয় ও বিব্রত হইয়া একের পর এক বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। একমাত্র সময়াভাবের জন্যই পরাজয় হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন। পর পর দুইটি খেলায় পাকিস্থান দলের খেলোয়াড়গণের ব্যাটিং ও বোলিংয়ের নৈপুণ্যের পরিচয় পাইয়া আশঙ্কা হয় তৃতীয় টেস্টে ইঁহারা ভারতীয় দলকে রীতিমত বেগ দিবেন। ভারতীয় খেলোয়াড় নির্বাচকমণ্ডলী আশা করি এই সকল বিষয়ের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া পরবর্তী টেস্ট দল গঠন করিবেন। শিশু প্রতিষ্ঠানের খেলোয়াড় বলিয়া পাকিস্থান ক্রিকেট দল সম্পর্কে পূর্বে যে ধারণা পোষণ করিতেন, বোধ হয় তাহা এতদিনে ভারতের ক্রিকেট পরিচালকগণ পরিবর্তন করিয়াছেন। আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা একটি দলের ভাগ্যকে কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করে, পাকিস্থান ক্রিকেট দল তাহারই প্রত্যক্ষ নিদর্শন। ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়গণ আশা করি ইহা উপলব্ধি করিয়া কার্যক্ষেত্রে তাহার পরিচয় দিবার জন্য সচেষ্ট হইবেন।

মধ্যাঞ্চল ও পাকিস্থানের খেলা

মধ্যাঞ্চল ও পাকিস্থান দলের তিনদিনব্যাপী খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হইয়াছে। পাকিস্থান দল প্রথম খেলিয়া ৩৫৬ রানে প্রথম ইনিংস্ শেষ করিলে মধ্যাঞ্চল দল প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করেন। মধ্যাঞ্চল দলের প্রথম ইনিংস্ ২৭১ রানে শেষ হয়। পাকিস্থান প্রথম ইনিংসে অগ্রবর্তী হইয়া দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করেন ও তৃতীয় বা শেষ দিনের মধ্যাহ্নভোজের ৭০ মিনিট পরে ৫ উইকেটে ২৭৫ রান করিয়া ডিক্লেয়ার্ড করেন। ইহার প্রত্যুত্তরে মধ্যাঞ্চল দল দ্বিতীয় ইনিংসে ৮ উইকেটে ৯৮ রান করিতে সক্ষম হন।

ঃঃ ফলাফল ঃঃ

পাকিস্থান ঃ প্রথম ইনিংস্—৩৫৬ রান (ইমতিয়াজ আমেদ ২১৩ রান নট আউট, ওয়াজির মহম্মদ ৪৫ রান, আব্দুল কারদার ২২ রান; এইচ গাইকোয়াড় ১৩১ রানে ৪টি উইকেট, বি বি নিম্বলকার ৪৪ রানে ২টি উইকেট, সি টি সারভাতে ৭৫ রানে ২টি উইকেট পান)

মধ্যাঞ্চল ঃ প্রথম ইনিংস্—২৭১ রান (মুস্তাক আলী ৭৩ রান, বি বি নিম্বলকার ৫৫ রান, সি টি সারভাতে ২৫ রান, কে পি কেশরী ৩৯ রান, সি কে নাইডু ২০ রান, এইচ গাইকোয়াড় ২২ রান; আব্দুল হাফিজ ৪৮ রানে ৪টি উইকেট, মামুদ হোসেন ১১৬ রানে ৫টি উইকেট পান)

পাকিস্থান ঃ দ্বিতীয় ইনিংস্—(৫ উইকেট) ২৭৫ রান ডিক্লেয়ার্ড (খুরসিদ আমেদ ১০১ রান, হাফিজ ১০৬ রান, আনোয়ার হোসেন ৪১ রান নট আউট; রহিম ৬৭ রানে ৩টি উইকেট পান)

মধ্যাঞ্চল ঃ দ্বিতীয় ইনিংস্—(৮ উইকেট) ৯৮ রান (খান্না ৪৩ রান, মুস্তাক আলী ১৩ রান; খলিদ কুরেশী ২১ রানে ৫টি উইকেট, ইসরার আলী ১৭ রানে ২টি উইকেট পান)

মানকড়ের টেস্টে বিশ্ব-রেকর্ড প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা

বিনু মানকড় এই পর্যন্ত ভারতের পক্ষে ২৩টি টেস্ট ম্যাচ খেলিয়াছেন ও ইহার মধ্যে ১,০৭৮ রান ও ৯৬টি উইকেট দখল করিয়াছেন। আগামী বোম্বাইয়ের তৃতীয় টেস্ট ম্যাচে যদি আরও ৪টি উইকেট দখল করিতে পারেন, তাহা হইলে টেস্ট খেলায় দ্রুত সহস্র রান ও শত উইকেট রেকর্ড লাভের যে রেকর্ড আছে, তাহা ভঙ্গ করিতে পারিবেন। ইতঃপূর্বে অস্ট্রেলিয়ার এম এ নোবল ২৭টি টেস্ট ম্যাচে সহস্র রান ও শত উইকেট লাভ করিয়া রেকর্ড করেন।

টেবিল টেনিস

টেবিল টেনিস খেলা ভারতের বিশেষ জনপ্রিয় খেলায় পরিণত হইয়াছে। বিশেষ করিয়া গত বৎসর বোম্বাইতে বিশ্ব-টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হইবার পর হইতেই সারা ভারতের একরূপ প্রত্যেকটি রাজ্যেই এই খেলার অভাবনীয় উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হইতেছে। ইহার ফলস্বরূপই এইবারের ইন্দোরের জাতীয় ও আন্তঃরাজ্য টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে শত শত পুরুষ ও মহিলা খেলোয়াড়কে অংশ গ্রহণ করিতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও ভারতের টেবিল টেনিস খেলার স্ট্যাণ্ডার্ড বা মান বিশ্ব-টেবিল টেনিসের সমপর্যায়ভুক্ত হইবার যোগ্য হইয়াছে বলিয়া যদি আমরা দাবী করি, খুবই অন্যায় হইবে। ভারতের খেলার স্ট্যাণ্ডার্ড বা মান এখনও পর্যন্ত চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, অস্ট্রিয়ান, ফ্রান্স, হাঙ্গেরী, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের তুলনায় বহু নিম্নস্তরের। এমন কি বৃটেনের সহিতই সমপ্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে অক্ষম, তাহাও সম্প্রতি বৃটেনের দুইজন কৃতী খেলোয়াড় জনি লীচ ও রিচার্ড বার্জম্যানের ভারত ভ্রমণেই প্রমাণিত হইয়াছে। ইহাদের উপরে স্থান বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ান জাপানের ও হংকংয়ের টেবিল টেনিস খেলোয়াড়গণের। কয়েকবারের বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন খেলোয়াড় রিচার্ড বার্জম্যান এইজন্যই বোধ হয় সারা এশিয়া ভ্রমণের শেষে যে বিশ্ব-টেবিল টেনিস খেলোয়াড়গণের ক্রমপর্যায় তালিকা প্রকাশ করেন, তাহাতে ভারতের কোন খেলোয়াড়ই স্থান পান নাই। তবে ইহাতে হতাশ হইবার কিছুই নাই। ভারতীয় উদীয়মান টেবিল টেনিস খেলোয়াড়গণ যদি আন্তরিকভাবে ও নিষ্ঠার সহিত সাধনা করেন, আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি যে, কয়েক বৎসরের মধ্যেই ভারত বিশ্ব-স্ট্যাণ্ডার্ড বা মানের সমতুল্য হইতে পারিবেন। এই সাধনার সহিত দৈনিক শক্তি ও শারীরিক পটুতা বৃদ্ধির দিকেও বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হইবে।

জাতীয় প্রতিযোগিতায় বাঙলার গৌরব

ইন্দোরের জাতীয় টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে বাঙলার গৌরবই পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাঙলার কৃতী খেলোয়াড় কল্যাণ জয়ন্ত সিঙ্গলস্ ও ডাবলস্ উভয় বিভাগের চ্যাম্পিয়ান হইয়াছেন। ডাবলস্ চ্যাম্পিয়নশিপের সাফল্যের সাহায্যকারী বাঙলার অন্যতম কৃতী খেলোয়াড় রণবীর ভাণ্ডারী মিক্সড ডাবলস্ ফাইন্যালেও হায়দরাবাদের জাতীয় মহিলা চ্যাম্পিয়ান মিস্ সুলতানার সহযোগিতায় সাফল্য লাভ করিয়াছেন। সুতরাং বাঙলার খেলোয়াড়গণই প্রতিযোগিতায় পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে তিনটিতে সাফল্য লাভ করিয়াছেন বলিলে কোনরূপ অত্যুক্তি করা হইবে না। বাঙলার টেবিল টেনিস খেলোয়াড়দের এই সাফল্যের জন্য আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

হায়দরাবাদের মহিলা টেবিল টেনিস খেলোয়াড় মিস্ সৈয়দ সুলতানাও উপর্যুপরি চতুর্থবারের সিঙ্গলস্ চ্যাম্পিয়নশিপের গৌরবে ভূষিতা হইয়াছেন। মিক্সড ডাবলসেও সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছেন। কেবল মহিলাদের ডাবলস ফাইন্যালে বোম্বাইয়ের খেলোয়াড়দ্বয়ের নিকট ইনি পরাজিত হইবার ফলে প্রতিযোগিতায় গত বৎসরের ন্যায় তিনটি বিষয়ের গৌরব লাভে বঞ্চিত হইয়াছেন। তাহা হইলেও এই

বালিকা খেলোয়াড়টির সাফল্য প্রশংসনীয়। ইঁহাকে ইউরোপে উন্নততর ক্রীড়াকৌশল শিক্ষার জন্য প্রেরণের ব্যবস্থা হইতেছে। ইহাতে আশা হয় অদূরভবিষ্যতে ইনি মহিলা খেলোয়াড় হিসাবে বিশ্বের খেলোয়াড়দের মধ্যে ভারতের স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইবেন। নিম্নে জাতীয় প্রতিযোগিতার বিভিন্ন খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইলঃ—

পুরুষদের সিংগলস্ ফাইন্যাল

কল্যাণ জয়ন্ত (বাঙলা) ২১—১৫, ১৮—২১, ২১—১৭, ২১—১৩ গেমে ডি পি সম্পৎকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস্ ফাইন্যাল

কল্যাণ জয়ন্ত ও রণবীর ভান্ডারী (বাঙলা) ২১—১২, ২১—১৬, ১৬—২১, ২১—১৫ গেমে ইউ এস চন্দ্রানা ও ডি পি সোম্মায়াকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিংগলস্ ফাইন্যাল

মিস্ সৈয়দ সুলতানা (হায়দরাবাদ) ১০—৯, ১৩—৭, ১০—৭ গেমে (টাইম লিমিট) মিসেস গুল নাশিকওয়ালাকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস্ ফাইন্যাল

রণবীর ভান্ডারী (বাঙলা) ও মিস্ সুলতানা (হায়দরাবাদ) ১৮—২১, ২৭—১৫, ২১—১৮, ২১—১৩ গেমে কল্যাণ জয়ন্ত (বাঙলা) ও মিসেস্ গুল নাশিকওয়ালাকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস্ ফাইন্যাল

এনিদ্ বোকারো ও মিসেস্ গুল নাশিকওয়ালা (বোম্বাই) ২০—২২, ২১—১৮, ১৯—২১, ২১—১২, ২১—১০ গেমে মিস্ সৈয়দ সুলতানা ও মিস্ নলিনীকে (হায়দরাবাদ) পরাজিত করেন।

আন্তঃরাজ্য টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ

ভারতীয় টেবিল টেনিস ফেডারেশন পরিচালিত আন্তঃরাজ্য টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতার খেলা ইন্দোরে বিশেষ সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগে ১৩টি রাজ্য ও মহিলা বিভাগে ১০টি রাজ্য দল যোগদান করে। পুরুষ বিভাগের মধ্যেও দুইটি গ্রুপ করা হয়। "এ" গ্রুপে বাঙলা, মহীশূর, সিংহল, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ ও দিল্লী। "বি" গ্রুপে মাদ্রাজ, বোম্বাই, রাজপুতানা, হোলকার, বিহার ও হায়দরাবাদ। এই দুই গ্রুপের খেলায় বাঙলা ও বোম্বাই উভয় অপরাজিত থাকিয়া ফাইন্যালে পরস্পরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ও বাঙলা বিজয়ীর সম্মান লাভ করে।

বাঙলার পুরুষ দলের কৃতিত্ব

বাঙলার পুরুষ টেবিল টেনিস দল এইবার লইয়া উপর্যুপরি চতুর্থবার আন্তঃরাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপের গৌরব লাভ করিল। এই গৌরব অর্জনে সাহায্য করিয়াছেন কল্যাণ জয়ন্ত ও রণবীর ভান্ডারী। ইঁহারা দুইজনে এই প্রতিযোগিতার কোন খেলাতেই পরাজিত হন নাই। ইঁহাদের সহিত তৃতীয় খেলোয়াড় হিসাবে জে এম ব্যানার্জিকে গ্রহণ করা হয়। তিনিই বিভিন্ন বিশিষ্ট খেলোয়াড়ের সহিত তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া পরাজিত হইয়াছেন। বাঙলার পুরুষ টেবিল টেনিস দল আন্তঃরাজ্য চ্যাম্পিয়ান হইয়া বার্না বেলাক কাপ লাভ করিয়াছেন। বাঙলা দলের এই সাফল্য লাভের জন্য আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। বাঙলা দল কিভাবে আন্তঃরাজ্য প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন দলকে পরাজিত করিয়াছেন, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ—

(১) বাঙলা ৫—০ খেলায় সিংহল দলকে পরাজিত করে।

(২) বাঙলা ৫—০ খেলায় মধ্যপ্রদেশ দলকে পরাজিত করে।

(৩) বাঙলা ৫—২ খেলায় উত্তরপ্রদেশ দলকে পরাজিত করে।

(৪) বাঙলা ৫—০ খেলায় গুজরাট দলকে পরাজিত করে।

(৫) বাঙলা ৫—২ খেলায় দিল্লী দলকে পরাজিত করে।

(৬) বাঙলা ৫—২ খেলায় মহীশূর দলকে পরাজিত করে।

(৭) বাঙলা ৫—২ খেলায় বোম্বাই দলকে পরাজিত করে।

ফাইন্যাল খেলার ফলাফল

আর ভান্ডারী (বাঙলা) ২৪—২২ ২১—১৮ গেমে ডি পি সম্পৎকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

ইউ এম চন্দ্রানা (বোম্বাই) ২১—১৬, ২২—২০, গেমে জে এম ব্যানার্জিকে (বাঙলা) পরাজিত করেন।

কল্যাণ জয়ন্ত (বাঙলা) ২১—১০, ২১—১৪ গেমে ওয়াই ভায়াসকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

আর ভান্ডারী (বাঙলা) ২১—১৮, ২১—২৩, ২১—১৭ গেমে ইউ এস চন্দ্রানাকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

কল্যাণ জয়ন্ত (বাঙলা) ২১—১৬, ২১—১৭ গেমে ডি পি সম্পৎকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

ওয়াই ভায়াস (বোম্বাই) ২১—১৫, ২১—১২ গেমে জে এম ব্যানার্জিকে (বাঙলা) পরাজিত করেন।

কল্যাণ জয়ন্ত (বাঙলা) ২১—১১, ২১—১৭ গেমে ইউ এম চন্দ্রানাকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

বোম্বাই মহিলা দলের কৃতিত্ব

আন্তঃরাজ্য টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতার মহিলা বিভাগে বোম্বাই দল অপরাজিত থাকিয়া চ্যাম্পিয়নশিপের জয়লক্ষ্মী কাপ লাভ করিয়াছেন। এইবার লইয়া বোম্বাই দল উপর্যুপরি সপ্তমবার উক্ত বিভাগের বিজয়ীর গৌরবে ভূষিতা হইলেন। ইঁহাদের অসামান্য সাফল্য সত্যই প্রশংসনীয়। নিম্নে খেলার তালিকা প্রদত্ত হইলঃ—

মহিলা বিভাগের খেলার ফলাফল

টীমের নাম—		ম্যাঃ বি	ম্যাঃ প	গেঃ বি	গেঃ পঃ
বোম্বাই	...	৯	০	২৭	২
হায়দরাবাদ	...	৮	১	২৬	৫
মাদ্রাজ	...	৭	২	২২	৬
সিংহল	...	৬	৩	১৮	১৫
হোলকার	...	৫	৪	১৯	১০
দিল্লী	...	৪	৫	১২	১৭
বাঙলা	...	৩	৬	১৩	২৩
মহীশূর	...	৩	৬	১২	২০
মধ্যপ্রদেশ	...	১	৮	৫	২৫
গুজরাট	...	০	৯	৪	২৭

[ম্যাচ বিজয়ী, ম্যাচ পরাজিত, গেম বিজয়ী ও গেম পরাজিত]

[বিজয়ী বোম্বাই মহিলা দলে ছিলেন— মিসেস্ এনিদ বোকোরো, মিসেস্ গুল নাশিকওয়ালা]

বাঙলা মহিলা দলের ব্যর্থতা

বাঙলার পুরুষ টেবিল টেনিস দল যেরূপ গৌরবে ভূষিত হইয়াছেন মহিলা দল সেইরূপ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছেন। ইঁহারা দশটি রাজ্য দলের সহিত খেলিয়া মাত্র তিনটি দলকে পরাজিত করিতে সক্ষম হন ও ৭টি রাজ্যের নিকট পরাজয় বরণ করেন। বিশেষ করিয়া শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে খেলিয়া একটি খেলাতেও জয়ী হইতে পারেন নাই। ইহা খুবই দুঃখের বিষয়। ভবিষ্যতে বাঙলার মহিলা টেবিল টেনিস দল যাহাতে বিশেষ শক্তিশালী করিয়া গঠন করা সম্ভব হয় সেই বিষয়ে বাঙলার টেবিল টেনিস এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ দৃষ্টি দিলে আমরা সুখী হইব। নিম্নে বাঙলা মহিলা দলের বিভিন্ন খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইলঃ—

(১) বাঙ্গলা ৩—০ খেলায় বোম্বাই দলের নিকট পরাজিত।

(২) বাঙ্গলা ৩—০ খেলায় দিল্লী দলকে পরাজিত করে।

(৩) সিংহল ৩—২ খেলায় বাঙ্গলা দলকে পরাজিত করে।

(৪) মহীশূর ৩—২ খেলায় বাঙ্গলা দলকে পরাজিত করে।

(৫) হোলকার ৩—০ খেলায় বাঙ্গলা দলকে পরাজিত করে।

(৬) মাদ্রাজ ৩—০ খেলায় বাঙ্গলা দলকে পরাজিত করে।

(৭) হায়দরাবাদ ৩—০ খেলায় বাঙ্গলা দলকে পরাজিত করে।

(৮) বাঙ্গলা ৩—১ খেলায় গুজরাট দলকে পরাজিত করে।

(৯) বাঙ্গলা ৩—১ খেলায় মধ্যপ্রদেশ দলকে পরাজিত করে।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

২৭শে অক্টোবর—কলিকাতা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু অধিবাসিগণের নিরাপত্তা বিধানের প্রশ্ন ও উদ্বাস্তু পুনর্বসতির সমস্যা সম্পর্কে এক বিরাট জনসভা হয়। সভায় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীহেমন্তকুমার বসু প্রভৃতি বিশিষ্ট বক্তাগণ পাকিস্থান সম্পর্কে ভারত সরকার কর্তৃক অনুসৃত দুর্বল নীতির তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং পূর্ব পাকিস্থান সরকার যাহাতে তথাকার সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে তাঁহাদের নীতির পরিবর্তনে বাধ্য হন তজ্জন্য পাকিস্থানের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্ক ছিন্ন করার দাবী জানান।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ইউরোপ হইতে চক্ষু চিকিৎসান্তে অদ্য বিমান-যোগে কলিকাতা পৌঁছিলে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হন।

ভারতের সংখ্যালঘু মন্ত্রী শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস পূর্ববঙ্গের বরিশাল, খুলনা ও যশোহর জেলার বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করিয়া অদ্য কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। শ্রীযুত বিশ্বাস ঐ পরিভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের বলেন যে, পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের মধ্যে সাধারণভাবে নিরাপত্তার অভাবের একটা মনোভাব দেখা যায়।

২৮শে অক্টোবর—অদ্য অপরাহ্নে বেলঘরিয়ার নিকট ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের উপর দুইখানি যাত্রীবাহী বাসের মধ্যে ভীষণ সংঘর্ষের ফলে ৮ ব্যক্তি নিহত এবং ৫৩ জন অল্পাধিকতর আহত হয়।

ভারত সরকারের প্রাকৃতিক সম্পদ এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিভাগের সেক্রেটারী ডাঃ এস এস ভাটনগর অদ্য দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, সুন্দরবন হইতে ধানবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে পেট্রল পাইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

গতকল্য ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে যে ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনা হয়, তাহাতে আহতদের মধ্যে আরও দুইজন অদ্য মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহাদের লইয়া উক্ত দুর্ঘটনায় মোট ১০ জনের মৃত্যু হইল।

২৯শে অক্টোবর—অদ্য ভারতের রাষ্ট্রপতি ১৯৫২ সালের লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানী-সমূহের একত্রীকরণ অর্ডিন্যান্স নামক একটি অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন। উহাতে এই মর্মে বিহিত হইয়াছে যে, স্টীল কর্পোরেশন অব বেঙ্গল লিমিটেড ১৯৫৩ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ইণ্ডিয়ান আয়রণ অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানী লিঃ-এর সহিত একত্রিত হইবে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য সচিব ডাঃ এম ইউ আমেদ অদ্য রাত্রি ১২-২০ মিনিটের সময় অকস্মাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৪৭ বৎসর বয়স হইয়াছিল।

পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার এক বিশেষ অধিবেশনে কলিকাতায় ভূগর্ভস্থ রেল নির্মাণ, কাঁথিতে লবণ উৎপাদন কারখানা স্থাপন ও কলিকাতার ময়লা নিষ্কাশন পরিকল্পনা রচনার ব্যাপারে বিদেশ হইতে বিশেষজ্ঞ আমদানী সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের প্রস্তাবগুলি চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হইয়াছে।

৩০শে অক্টোবর—আসাম সরকার খাদ্য নিয়ন্ত্রণ প্রথা চালু রাখিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু সগরে বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, সরকার এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কড়াকড়ি শিথিল করিবেন, যাহাতে মুনাফাখোর ও চোরাকারবারীরা আর সুযোগ না পাইতে পারে।

ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রযোজক কার্যনির্বাহক কমিটি অদ্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ভারতে পাকিস্থানী ফিল্ম আমদানী সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করিয়া দেওয়ার জন্য আদেশ জারীর সুপারিশ করেন।

৩১শে অক্টোবর—নাগপুরে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু ভারতের কোন কোন মহলে পাকিস্থানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার যে কথা হইতেছে, তাহাকে শিশুসুলভ দায়িত্বজ্ঞানহীন উক্তি বলিয়া অভিহিত করেন।

অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সভাপতি ডাঃ এন বি খারেকে ১৪ ঘণ্টা আটক রাখার পর অদ্য রাত্রে নাগপুর সেণ্ট্রাল জেল হইতে বিনাসর্তে মুক্তি দেওয়া হয়। অদ্য সকালে ডাঃ খারেকে নিবারক নিরোধ আইন অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল।

আসাম সরকার অদ্য বিপ্লবী সাম্যবাদী দলের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিয়াছেন এবং উক্ত দলের যে সব সদস্যকে আটক করা হইয়াছিল, তাহাদের মুক্তির আদেশ দিয়াছেন।

১লা নভেম্বর—কলিকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালনীর সভাপতিত্বে নিখিল ভারত পূর্ববঙ্গ সংখ্যালঘু অধিকার সংরক্ষণ সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে পাকিস্থানের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ ব্যবস্থা অবলম্বন, বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করণ, পাস-পোর্ট প্রত্যাহার এবং উদ্বাস্তুদের সুপরিকল্পিতভাবে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার জন্য ভারত সরকারের নিকট দাবী জানান হইয়াছে।

নিখিল ভারত উদ্বাস্তু সমিতির ওয়ার্কিং কমিটি সংখ্যালঘুর প্রশ্নে পাকিস্থানকে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ জানাইয়াছেন। নয়াদিল্লীতে সংসদ সদস্য ডাঃ চৈতরাম গিদোয়ানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে উপরোক্ত মর্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

২রা নভেম্বর—প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু অদ্য এক সাংবাদিক বৈঠকে ভারত ও সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যা এবং তৎসম্পর্কে ভারত সরকারের নীতি পর্যালোচনা করেন। প্রধান মন্ত্রী দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করেন যে, কাশ্মীর সমস্যার কোন সমাধান চাপাইয়া দিবার চেষ্টা আমরা মানিয়া লইব না। শুধু কাশ্মীর কেন, কোন ব্যাপারেই কোন সময়ে অপরের আরোপিত কোন ব্যবস্থা ভারত মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহে।

অদ্য ঢাকুরিয়াস্থিত পোদ্দারনগরে উদ্বাস্তু কলোনীতে এক ঘটনার ফলে জনৈক মধ্যবয়সী পথচারী ঘটনাস্থলেই নিহত ও একজন বালক সহ ১২।১৩ জন আহত হয়। প্রকাশ জনৈক জমিদারের কর্মচারী বলিয়া অভিহিত একদল লোক কলোনীর অধিবাসীদিগকে আক্রমণ করিয়া মারপিট করার সময় ঐ ঘটনা ঘটে।

বিদেশী সংবাদ

২৮শে অক্টোবর—লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ, দক্ষিণ আফ্রিকায় নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলনে রত ব্যক্তিদের পরিবারবর্গের দুর্গতি নিরসন-কল্পে খৃষ্টান কর্মপরিষদ যে ধনভাণ্ডার স্থাপন করিয়াছে, অদ্য 'টাইমস' লিখিত এক পত্রে নয়জন বিশিষ্ট ইংরেজ উহা সমর্থন করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে, ১৯৪৮ সালে কোরিয়া হইতে মার্কিন দখলদার বাহিনী অপসারণের জন্য জেনারেল আইসেনহাওয়ারই স্বয়ং দায়ী।

২৯শে অক্টোবর—ইঙ্গ-মিশরীয় সুদানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জেঃ নাগিবের গভর্নমেণ্ট ও সুদানের উম্মা দলের মধ্যে এক চুক্তি হইয়াছে। স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার ভিত্তিতেই এই চুক্তি হইয়াছে।

৩০শে অক্টোবর—কমন্স সভায় এক প্রশ্নের উত্তরে কমনওয়েলথ দপ্তরের সহকারী মন্ত্রী মিঃ জন ফস্টার বলেন যে, রাষ্ট্রপুঞ্জে বর্ণ বৈষম্য সংক্রান্ত কোন বিষয়ের আলোচনা বৃটিশ সরকার সম্পূর্ণ অবৈধ বলিয়া মনে করেন।

কেনিয়ায় ইংরেজ সৈন্যদল পার্বত্য অঞ্চলে ব্যাপকভাবে হানা দিয়া পাঁচ শতাধিক আফ্রিকা-বাসীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

১লা নভেম্বর—রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতীয় প্রতি-নিধি শ্রী বি শিবরাও আজ এই পরিষদে বলেন যে, ভারতস্থিত ফরাসী ও পর্তুগীজ উপনিবেশ সম্পর্কে ফ্রান্স ও পর্তুগালের সঙ্গে ভারত অনির্দিষ্ট কালের জন্য নিষ্ফল আলোচনা চালাইবে না।

২রা নভেম্বর—রাষ্ট্রপুঞ্জের আরব-এশিয়া গোষ্ঠী সোমবার এক বৈঠকে মিলিত হইয়া কোরিয়া সম্পর্কে আলোচনা করিবেন। ১৯৫১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে চীনকে পররাজ্য আক্রমণকারী বলিয়া ঘোষণা করিবার পর এই প্রথম এই গোষ্ঠীটি কোরিয়া সম্পর্কে আলো-চনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। নভেম্বর মাসে এই গোষ্ঠীর সভাপতিত্ব করিবে ভারতবর্ষ।

ভারতীয় মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা—।৵ আনা, বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক— ১০,
পাকিস্থানের মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা (পাক্) ।৵০ আনা, বার্ষিক—২০,, ষাণ্মাসিক—১০, (পাক্)
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র

২০শ বর্ষ
৩য় সংখ্যা

দেশ

শনিবার,
২৯শে কার্তিক, ১৩৫৯

DESH Saturday, 15th November, 1952.

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

সাময়িক প্রসঙ্গ

নৈব চ নৈব চ

পশ্চিমবঙ্গের সীমানা সম্প্রসারণের প্রশ্ন সহজে ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে, আমরা কোন দিনই ইহা মনে করি নাই। প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমবঙ্গের জনমত এ-সম্বন্ধে যতই প্রবল হোক্ এবং এই বিষয় লইয়া এখানে যত রকমেই আন্দোলন চলুক, অধিকন্তু পূর্ববঙ্গ হইতে ক্রমাগত উদ্বাস্তুসমাগমের ফলে ভারতের মধ্যে বর্তমানে আয়তনে ক্ষুদ্রতম এই রাজ্যের উপর চাপ যেমনই পড়ুক, ভারত সরকার সে সম্পর্কে যে সমভাবেই উদাসীন থাকিবেন, ইহা অনুমান করিয়া লইতে কষ্ট হয় না। কারণ, ভারতের প্রধান মন্ত্রী নিজেই এই প্রশ্ন লইয়া উচ্চবাচ্য না করা হয়, ইহাই চাহেন। সুতরাং সম্প্রতি ভারতীয় সংসদে তৎ-সম্পর্কিত একটি প্রশ্নের যে উত্তর মিলিয়াছে, তাহাতে আমরা আদৌ বিস্মিত হই নাই। স্বরাষ্ট্র-বিভাগের উপমন্ত্রী শ্রী দাতার প্রকাশ করিয়াছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের বিধান-পরিষদে বিহারের কয়েকটি অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত করিবার জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ করিয়া যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, ভারত সরকার তাহা অবগত আছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট হইতে তাঁহারা যথারীতি এ সম্পর্কে কোন চিঠিপত্র পান নাই।। চিঠিপত্র যখন পাওয়া যাইবে, তখন এ সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া দেখা যাইবে। অধ্যাপক হীরেন্দ্র মুখার্জি ইহার পরও প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, ভারত সরকার সীমানা-সম্পর্কে বিচার করিবার জন্য অবিলম্বে কোন কমিশন নিয়োগের সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেছেন কি না। এই প্রশ্নের উত্তর স্বভাবতই নেতিবাচক হইবে, ইহা সুস্পষ্ট; কারণ ভারত সরকারের নিকট প্রশ্নটি যখন উত্থাপিত হয় নাই, তখন সে সম্পর্কে ব্যবস্থা করিবার কোন কথাই তাঁহাদের কাছে উঠে না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ সম্পর্কে কোন কথাই ভারত সরকারের নিকট উপস্থিত করেন নাই, ইহাই হইতেছে আমাদের বিস্ময়ের বিষয়। গত ৭ই আগষ্ট পশ্চিমবঙ্গের বিধান-পরিষদে এতৎ সম্পর্কিত প্রস্তাবটি পাশ হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী নিজে সেই প্রস্তাবের সমর্থন করেন, সুতরাং এ সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটা দায়িত্ব নিশ্চয়ই রহিয়াছে। অথচ প্রস্তাবটি পাশ কয়েক মাস কাটিয়া গিয়াছে, তবু পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া ইহা সত্যই বিস্ময়জনক। কোন দায়িত্ব সম্পন্ন সরকারই জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা সমর্থিত এত বড় একটা গুরুত্বসম্পন্ন প্রস্তাব সম্বন্ধে এমন উদাসীন থাকিতে পারেন বলিয়া আমরা মনে করি না। তবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ সম্বন্ধে কেন এই-রূপ উদাসীনতা অবলম্বন করিলেন, সরকারী লাল ফিতার রীতি মাফিক ঐ বিলম্ব না ইহার মূলে অন্য কোন কারণ আছে, দেশের লোকের মনে স্বভাবতই এই প্রশ্ন উঠিতেছে। প্রকৃতপক্ষে প্রস্তাবটি পরিষদে যখন গৃহীত হয়, তখনই আমরা এ সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সচেতন করিয়া দিয়াছিলাম। আমরা বলিয়াছিলাম, প্রস্তাবটি শুধু পাশ হওয়াই যথেষ্ট নয়। এই প্রস্তাব যাহাতে যথাযথভাবে ভারত সরকার কর্তৃক বিবেচিত হয়, সে সম্পর্কেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দায়িত্ব আসিয়া বর্তাইয়াছে। সে দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিভাবে প্রতিপালন করিয়াছেন, এখন তাহার পরিচয় আমরা পাইলাম। ফলত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাজে প্রস্তাবটির গুরুত্বের লাঘব ঘটিয়াছে এবং এখানকার জনমতের মর্যাদা সম্পূর্ণ রক্ষিত হয় নাই বলিয়াই আমরা মনে করি। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী দিল্লীতে গিয়াছেন। তিনি এ সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিবেন বলিয়া আমরা শুনিতেছি। তাহার ফল কি দাঁড়ায়, পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরা আগ্রহের সঙ্গে তাহা লক্ষ্য করিতেছে। কারণ, বিষয়টির সহিত পশ্চিমবঙ্গের জীবন-মরণের প্রশ্ন বিজড়িত রহিয়াছে। সুতরাং বিষয়টিকে তেমন লঘুদৃষ্টিতে দেখিলে চলিবে না এবং প্রশ্নটি অনির্দিষ্ট-কালের অপেক্ষায় অমীমাংসিত রাখিলেও সমস্যা মিটিবে না। আমরা পূর্বেও বলিয়াছি এবং এখনও সেই কথাই বলিতেছি যে, পূর্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুদিগকে প্রধানত পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই উপনিবিষ্ট করিতে হইবে। বস্তুত পশ্চিম-বঙ্গের বাহিরে সুদূর বিন্ধ্য প্রদেশে কিংবা হায়দরাবাদে উদ্বাস্তুদের ইহার বিরুদ্ধে জোর করিয়া পাঠাইয়া দিলে, অনর্থ বাড়িবে ছাড়া কমিবে না। নিজেদের সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং সামাজিক প্রতিবেশ ছাড়া মানুষ বাঁচিতে পারে না, সমাজ-জীবনে সংস্থিত হওয়াও সে অবস্থায় সম্ভব নহে। বিশেষ-ভাবে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের দৃঢ়সংবদ্ধ পারিবারিক জীবনে অভ্যস্ত নরনারীদের পক্ষে তো নহেই। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের সীমানা সম্প্রসারণের প্রশ্নটি একটা সখের ব্যাপার নয় এবং সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গেই ইহার কোন সম্পর্ক নাই। দেশবিভাগের ফলে বিপর্যস্ত বাঙালী সমাজ আজ নিজে-দের বাঁচিবার দাবীটুকুই শুধু করিতেছে। বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলের সম্বন্ধে তাহারা সুদীর্ঘ কালের নিতান্তই যে দাবী ন্যায্য, যদি সঙ্কীর্ণ জিদের বশে কিংবা কর্তৃপক্ষস্থানীয় কয়েকজনের অনিচ্ছায় তাহা উপেক্ষিত হয় তবে সমগ্রভাবে ভারতের পক্ষেও বিড়ম্বনাই বৃদ্ধি পাইবে। এ বিষয়ে আমাদের মনে কোন সন্দেহ নাই।

বাঙলায় সমর-সাধনা

পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশপাল পশ্চিমবঙ্গের তরুণদিগকে আঞ্চলিক সেনা বাহিনীতে যোগদানের জন্য আহ্বান করিয়াছেন। এদেশের তরুণদের প্রতি আমরা বিশ্বাসী। প্রদেশপালও সেই বিশ্বাস ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, তরুণেরা অবাধ্য, তাহারা উচ্ছৃঙ্খল, এই ধরণের মত প্রকাশ করা, আজকাল যেন একটা ফ্যাশন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এ অভিযোগ ঠিক নয়। প্রদেশপালের এই অভিমতের যৌক্তিকতা আমরাও স্বীকার করি। প্রকৃতপক্ষে তরুণদের চিত্ত স্বভাবতই ভাবপ্রবণ এবং আদর্শের অভিমুখে তাহাদের প্রেরণা উপযোগী কর্মসাধনা চায়। প্রাণময় যেরূপ কর্মসাধনার উপযোগী ক্ষেত্র না পাইলে অবাঞ্ছিত গতি অবলম্বন করিবে, ইহা অস্বাভাবিক নয়। বস্তুত অগ্নিময় স্বদেশপ্রেমের যে আদর্শ একদিন বাঙলার তরুণ সম্প্রদায়কে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, আমাদের বর্তমান প্রতিবেশে সেই আদর্শ অনেকটা বিমলিন হইয়া পড়িয়াছে। তরুণের জীবন্ত আদর্শ তাহাদের সম্মুখে পাইতেছে না। পশ্চিমবঙ্গের প্রাদেশিক সেনা বাহিনীতে যথেষ্ট-সংখ্যক তরুণদের যোগদানের অভাবের মূলে এই কারণ অনেকটা রহিয়াছে। স্বদেশপ্রেমের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের স্বার্থরক্ষার বীর্যময় প্রেরণা জাগাইয়া তোলা আজ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। জাতির যুবকদিগকে আমরা বাঙলার গৌরবময় ইতিহাসের কথাই এই সম্পর্কে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। সুভাষ-চন্দ্র এই বাঙলা দেশেরই সন্তান। এদেশের পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করিবার জন্য সুভাষচন্দ্র বিশেষ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেই যে সমর-শক্তি সংগঠন করিয়াছিলেন, সমগ্র বিশ্বে তাহা চমক সৃষ্টি করে। শুধু তাহাই নয়, প্রকৃতপক্ষে নেতাজীর সেই শক্তিতে শঙ্কিত হইয়াই প্রবল বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদিগকে ভারত ছাড়িতে হইয়াছে। নেতাজীর আদর্শ এদেশের তরুণ সমাজ কি বিস্মৃত হইবে? দেশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় যে শক্তি কাজ করিয়াছে, দেশের স্বাধীনতাকে রক্ষা করিবার জন্যও তাহা প্রয়োজন। জাতির তরুণদের এ সত্যটি বোঝা দরকার। প্রকৃত-পক্ষে যাহারা শক্তিমান্ এ জগতে তাহারাই টিকিয়া থাকিতে পারে, দুর্বল যাহারা জগতে তাহাদের স্থান নাই। এমন কি স্বয়ং ভগবান আসিয়াও তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন না। বাঙলার তরুণ সমাজ মনুষ্যত্ব-বোধে জাগ্রত হোক্ এবং আঞ্চলিক সেনা দলে যোগ দিয়া সমর-শিক্ষার সুযোগ তাহারা সর্বাংশে গ্রহণ করুক। দেশ ও জাতির জন্য অস্ত্রধারণের যে আদর্শ নেতাজী আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন, পশ্চিমবঙ্গের যুবক সম্প্রদায়ের সমরশিক্ষা সাধনায় তাহা সার্থকতা সম্পন্ন হোক্, আমরা ইহাই দেখিতে চাই।

টি বি সীল আন্দোলন

ভারতের উপ-স্বাস্থ্যসচিব শ্রীযুক্তা এম চন্দ্রশেখর সম্প্রতি ভারতীয় পার্লামেন্টে প্রকাশ করিয়াছেন যে, এদেশের অন্যূন ২৫ লক্ষ নরনারী ক্ষয়রোগে পীড়িত আছে।। জগতে অন্য কোন দেশেই এই মারাত্মক ব্যাধির এমন প্রকোপ দেখা যায় না। বিশেষ আশঙ্কার বিষয় এই যে, এই ব্যাধি ক্রমেই বিস্তার লাভ করিতেছে এবং শহর অঞ্চল হইতে গ্রামাঞ্চলে সমধিক সম্প্রসারিত হইতেছে। উপমন্ত্রী মহোদয়া বলিয়াছেন, ভারত-বিভাগের পর ভারতের কয়েকটি রাষ্ট্রে বিশেষ বিপর্যয় ঘটিয়াছে। ছিন্নমূল নরনারীর দল নিতান্ত নিঃস্ব অবস্থায় ভারতের সীমান্তে প্রবেশ করিতেছে। ইহার ফলে সমাজের বিভিন্ন স্তরে এই রোগের সংক্রামকতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারত বিভাগজনিত বিপর্যয়ে পশ্চিমবঙ্গ আজ বিপন্ন। পূর্ববঙ্গ হইতে দলে দলে নরনারী পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু-স্বরূপে আগমন করাতে এখানকার স্বাস্থ্যের অবস্থাও নানাভাবে ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। সুতরাং ক্ষয়রোগ সম্প্রসারণের আশঙ্কা এখানে সব চেয়ে বেশী। কারণ, দারিদ্র্য, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, উপযুক্ত বাসস্থানের অভাব এবং অল্প জায়গায় বহু-লোকের বাস এই রোগ বৃদ্ধির সহায়ক হইয়া থাকে। উদ্বাস্তু সমাগমের ফলে পশ্চিমবঙ্গে এই সব সমস্যা যে বিশেষভাবে দেখা দিয়াছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু এজন্য আমাদিগকে নিরাশ হইলে চলিবে না, সঙ্কল্পশীলতার সঙ্গে এই ব্যাধির সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইবে। উপযুক্ত প্রতিকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে এই রোগের আক্রমণ দমন করা যে সম্ভব হইয়া থাকে, জগতের বিভিন্ন দেশে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গত ৫০ বৎসরের মধ্যে এই রোগের আক্রমণ সংখ্যা শতকরা ৮৫ ভাগ কমাইতে সমর্থ হইয়াছে। ডেনমার্কে শতকরা ৯৮ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে। এই ব্যাধি অপ্রতিষেধ্য নয়। বৈজ্ঞানিক এই যুগে এ সত্য প্রমাণিত হইয়াছে এবং আন্তরিকতার সঙ্গে চেষ্টা করিলে পশ্চিমবঙ্গেও এই রোগের প্রকোপ হ্রাস করা সম্ভব হইতে পারে। জাতির স্বার্থ, রাষ্ট্রের কল্যাণ এবং সর্বোপরি মানবতার দিক হইতে আজ এই প্রশ্ন জাতির সম্মুখে দেখা দিয়াছে। বেঙ্গল টিউবার-কিউলোসিস এসোসিয়েশন এই দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। গত ২রা অক্টোবর গান্ধী জয়ন্তী দিবস হইতে এই প্রতিষ্ঠানের টি বি সীল বিক্রয়ের তৃতীয় বার্ষিক আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যেকটি সীলের মূল্য এক আনা মাত্র। সুতরাং সকলেই এই সীল ক্রয় করিয়া এই আন্দোলনকে সাধ্যমত সাহায্য করিতে পারেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, প্রথম বৎসর এই প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টায় যে পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল, দ্বিতীয় বৎসরে ততটা হয় নাই। অধিকন্তু অনেক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বিক্রয়ের জন্য সীল লইয়া এ পর্যন্ত সেগুলির মূল্য দেন নাই এবং বহু পরিমাণে সীল অবিক্রীত অবস্থায় ফেরৎ আসিয়াছে। আমাদের সমাজ-জীবনের পক্ষে ইহা নিশ্চয়ই সুলক্ষণ নয়। সহস্র সহস্র নর-নারী ক্ষয়রোগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে, এই অবস্থা দেখিয়াও যদি আমরা সচেতন না হই এবং এই সব হতভাগ্য নরনারীদের রক্ষা করিবার জন্য যথাশক্তি সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়া না আসি, তবে আমাদের মনুষ্যত্ব কোথায় এবং স্বাধীনতার মূল্যই বা আমাদের কি আছে? কারণ, যাহারা মানুষ স্বাধীনতা ভোগ করিতে শুধু অধিকারী তাহারাই। যে সমাজে মানুষের জন্য মানুষের বেদনা-বোধ নাই, সে সমাজ বা সে জাতি কোন দিনই উন্নতিলাভ করিতে পারে না। প্রত্যুত জগতে তাহারা টিকিয়া থাকিতেও সমর্থ নহে। আমরা সহৃদয় দেশবাসীর দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিতেছি। তাঁহাদের যাঁহার যেরূপ সামর্থ্য টি বি সীল ক্রয় করিয়া বঙ্গীয় টিউবারকিউলোসিস এসো-সিয়েশনের কল্যাণকর প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করুন।

করো কথা… (২০)

সাজা, বাজা, কেশ—বাংলা দেশে বেশ।' প্রবাদবাক্যে ঠাট্টার সুরটা স্পষ্ট। কিন্তু বুঝি অন্য কোনো বাঙলাদেশের কথা, ানে ঠাট্টার যত যাই হোক, সুখও ছিল, শর পারিপাট্য নিয়ে পরিহাস চলত। কিন্তু হ মনে দুঃখ যেখানে উপচে পড়ছে, সেখানে মুখে হাসি ফোটে না, রসিকতার আমেজ গ না গলায়, কেশ রুক্ষ হয়, চোখে আলো ভ আসে। এ-অবস্থায় মাসের পর মাস ন বই লেখার, নতুন বই ছাপানোর, নতুন কিনতে বলার কথা করুণ বিদ্রূপের মতোই নাত, যদি না সেই সঙ্গে একথাও আমরা বলে জানতাম যে, 'বৃষ্টির জলও লুকোয়, খের জলও শুকোয়।' তাই সংসারে বিচিত্র য়োজনের দাম কখনো কমে না। ঠাট্টা আর শ্বাসভরা দুটোই প্রবাদবাক্য! সুশীলকুমার সম্পাদিত 'বাংলাপ্রবাদ' না দেখলে বিশ্বাস

তা না যে, এত হাজার-হাজার প্রবাদ চলতি ছে বাংলা ভাষায়, কিংবা একদা চলতি ছিল। ই অগুনতি প্রবাদের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে আশ্চর্য লৌকিক—কোথাও বা প্রাকৃত—নর প্রজ্ঞা আর চাতুর্য, 'নেকা, বোকা, ঢলঢলে ছা, তিনে প্রত্যয় কোরো না বাছা।' দুর্বল নর চরিত্রের প্রতি কত স্বাভাবিক এবং সরস দ্রূপ ('ঈশ্বর যদি করেন, কর্তা যদি মরেন, ব ঘরে বসেই কেত্তন শুনব'), সামাজিক তিনীতি, দুঃখ-ক্লেশ আনন্দের প্রতি কত কটাক্ষ (পুড়ল মেয়ে, উড়ল ছাই, তবে তার ণ গাই')। বাংলাপ্রবাদের আদিসংগ্রহ য়ছিল ইংরেজের হাতে। ভিন্ন শিক্ষা, ভিন্ন চির গুণে প্রবাদের ব্যবহার আজ প্রায় লোপ য়েছে। তাই সম্পূর্ণ ভোলবার আগে ৌকিক মনের সরস বুদ্ধির রচনার এই একটি মাণিক সংগ্রহ বাংলাভাষায় গ্রথিত হল—এটা বই বড় খবর॥

উপন্যাস জিনিসটা ইউরোপের। ঔপন্যাসিক স্টয়, ডস্টোয়েভ্স্কি, টমাস মান্—এমন কি াস হার্ডির কথা ভাবলে স্বীকার করতেই —'ওয়র অ্যান্ড পীস্' 'ব্রাদার্স কারামাজোভ', াজিক মাউণ্টেন', কিংবা 'টেস্ অব্ দি রবারভিলস্'এর প্রতিতুলনা বাংলায় নেই।

হয়তো নেই, কিন্তু ছোট গল্পের মতো াট মাপের উপন্যাসে বাঙালী লেখকের হাত ব পাকা। প্রমাণ—প্রতিভা বসুর 'মনের ্রে', রমেশ সেনের 'গৌরীগ্রাম', নরেন্দ্র ত্রের 'দূরভাষিণী', সন্তোষ ঘোষের 'নানা ঙর দিন', সমরেশ বসুর 'বি টি রোডের ্র', **স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চন্দনডাঙার হাট', মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পাশাপাশি'। নতুন উপন্যাসের মধ্যে এই রচনাগুলি বিশিষ্ট।** আরো কিছু উপন্যাস। গোলাম কুদ্দুসের 'বাদী', বিমল করের 'ঝড় ও শিশির', সাবিত্রী রায়ের 'স্বরলিপি', সুমথনাথ ঘোষের ''দিগন্তের ডাক' এবং মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইতিকথার পরের কথা'॥

প্রমথ চৌধুরীর ছদ্মনাম 'ছিল 'বীরবল'। বুদ্ধিদীপ্ত তীব্র পরিহাসের রচনাগুলি তিনি যে এই আকবরী বিদূষকের নামে চালাতেন, তার কারণ অল্প বয়সেই তিনি ভাবতে শিখে-ছিলেন—'হায়, আমার মুখে যদি বীরবলের রসনা থাকত, তাহলে এই সব ঘ'রো আকবর শাহ্দের বোকা বানিয়ে দিতুম।' সবুজপত্রের সম্পাদক হয়ে বাংলা গদ্যসাহিত্যে তাঁর বীরবলী রসনা নিয়ে সত্যি তিনি কালান্তর আনলেন। তাঁর মৃত্যুর অনেক দিন পরে যে 'প্রবন্ধ সংগ্রহ' প্রকাশিত হয়েছে, তা যে কোনো গদ্যরসিকের কাছেই মহামূল্য বলে গণ্য হবে॥

কলকাতার সাহিত্যসমাজে পবিত্র গঙ্গো-পাধ্যায় প্রবেশ করেছিলেন একবারেই 'সবুজ পত্রের' কর্মকর্তা হয়ে। 'চলমান জীবন' নামে তিনি তাঁর আত্মজীবনীর যে অংশ প্রকাশ করেছেন, তাতে আছে সেই সেকালের মেফেয়ারে চৌধুরী পরিবারের বিস্তারিত এবং অভাবিত একটি ঘরোয়া চিত্র। এই বই লিখে আধুনিক বাংলাগদ্যের গুরুঋণ শোধ করলেন পবিত্রবাবু। এ একটি মহৎ কাজ॥

ভালো প্রবন্ধের আরো দুটি বই : ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্তের 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ'—যার প্রতিপাদ্য হচ্ছে এই যে, রাধা ছিলেন আদিতে বিশুদ্ধ শক্তিরূপিনী, 'ক্রমপরিণতির প্রবাহের ভিতর দিয়া তিনিই আসিয়া রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন পরম প্রেমরূপিনী মূর্তিতে।' আর ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ের সংক্ষেপিত 'বাঙ্গালীর ইতিহাস।' বিখ্যাত আদিগ্রন্থ থেকে সংক্ষেপ করেছেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। জানা গেছে যে, মোহিতলালের 'কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রকাব্যের' দুখণ্ড নয়, তিন খণ্ড প্রস্তুত আছে; ২য় খণ্ডের ছাপা প্রায় শেষ হ'য়ে এলো॥

ছুটির শেষে ছোট গল্পের তিনটি নতুন বই

নাম করবার মতো: নরেন্দ্র মিত্র আর আশাপূর্ণা দেবীর 'শ্রেষ্ঠ গল্প' সঙ্কলন এবং প্রমথনাথ বিশীর 'ধনেপাতা'। নরেন্দ্র মিত্রের সুন্দর গল্পগুলিতে প্রধানত থাকে মনের দুর্জ্ঞেয় রহস্যের উদ্ঘাটন, অন্য দুজনের গল্পে প্রধানত হাস্যরস॥

বিরাট দেশ চীন, ভারতবর্ষের প্রতিবেশী। নতুন এক সমাজ গড়বার দুঃসাহসী পরীক্ষা চলছে সেখানে। এই নতুন চীনের শহর গ্রামে **প্রত্যক্ষ ভ্রমণের** আবেগজড়িত বর্ণনা আছে গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মস্কো থেকে চীন' বইটিতে। 'বিজ্ঞান-বিচিত্রা' সিরিজে ছোটদের জন্য বিজ্ঞানের ৫ম বই বেরিয়েছে : দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 'যমের সঙ্গে যুদ্ধ'। সোভিয়েট রাশিয়ায় যৌনজীবন বিষয়ে এই লেখকের 'নিষিদ্ধ কথা আর নিষিদ্ধ দেশ' ২য় সংস্করণ হয়েছে। ব্যক্তিগত প্রবন্ধশ্রেণীর একটি নতুন সঙ্কলন বেরিয়েছে 'কালপেঁচার দুকলম' লেখকের আগের বই 'কালপেঁচার নক্সা' পড়ে রাজশেখর বসু লিখেছিলেন—'চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে'॥

বাংলায় নাটক লেখা হয় সব চাইতে **কম**, তারও আবার অত্যন্ত কম অংশই পাঠযোগ্য। বিরোধী দুই মনস্তাত্ত্বিক মতবাদ নিয়ে সত্যেন সিংহের নাটক 'মনোবৈজ্ঞানিক' এর মধ্যে ব্যতিক্রম॥

নাটকের চাইতে বাঙালী লেখকের বেশি উৎসাহ বরং অনুবাদে। কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী অনুবাদ করেছেন জি কে চেস্টারটনের মজার উপন্যাস 'দি ক্লাব অব্ কুইয়ার ট্রেডস্'—'আজব জীবিকা' নামে। পুলিৎজার পুরস্কার পাওয়া মার্কিন উপন্যাস 'দি ইয়ার্লিং'-এর

অনুবাদ করেছেন বিমল মিত্র আর শিশুদের জন্য ক্যাপটেন ম্যারিয়টের 'দি চিলড্রেন অব্ দি নিউ ফরেস্ট' এবং কিংস্লের 'দি ওয়াটার বেবীজ্' বাংলায় 'অথৈ জলের রূপকথা'—অনুবাদ করেছেন শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্তী। ইনি কবি অমিয় চক্রবর্তী নন্। মুল্করাজ আনন্দ-এর কয়েকটি গল্প অনূদিত হয়েছে 'নরসুন্দর সমিতি' নামে। অনুবাদক অমল দাশগুপ্ত। উর্দু গাল্পিক কৃষণ চন্দরের 'ফুলকি ও ফুল' আর হিন্দী লেখক প্রেমচাঁদের 'গল্প'-ও বাংলা অনুবাদ করেছেন পারুল ঘোষ, কৃষণ চন্দরের পার্থকুমার রায়॥

কলকাতা শহরের পার্কে ফুটপাতে এক আশ্চর্য আন্দোলনের সূত্রপাত করেছেন তরুণ বাঙালী কবি। 'আরো কবিতা পড়ুন'—এই হচ্ছে তাঁদের বক্তব্য। নির্বিবাদী ভালোমানুষরা তাতে চমকে উঠেছেন। এদিকে ক্ষতি দিয়ে চালাতে হলেও শুধু কবিতার পত্রিকাই বাঙলা দেশে চলছে পাঁচটি। পঞ্চম পত্রিকার নাম 'সব শেষের কবিতা'। 'একক'ও কিছুদিন ধরে আবার প্রকাশিত হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য প্রথম কবিতার বই : অরুণকুমার সরকারের 'দূরের আকাশ' এবং বটকৃষ্ণ দাসের 'পাখনা'। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের নতুন কাব্যগ্রন্থ বেরিয়েছে 'প্রেম ও অপ্রেম', প্রচ্ছদপট এঁকেছেন কবি নিজেই। বাঙলাদেশে এই কবিতা আন্দোলনের খবর ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন লণ্ডন থেকে প্রচার করেছেন বলে শোনা গেছে। কিন্তু যে-কানে পৌঁছলে উদ্যোগী কবিদের ক্লেশ সার্থক হবে, সেই বাঙলাদেশের কানে কি এই আবেদন পৌঁছলো—'আরো কবিতা পড়ুন?'

জেনারেল আইসেনহাওয়ারের সাফল্য

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন-যুদ্ধে জেনারেল আইনসেনহাওয়ার জয়ী হয়েছেন। মার্কিন ব্যবস্থাপক সংস্থা কংগ্রেসের দুটি পরিষদ আছে—হাউস অব রিপ্রেজেণ্টেটিভস্ এবং সেনেট। প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে হাউস অব রিপ্রেজেণ্টেটিভস-এর নূতন নির্বাচন হয়েছে, সেনেটেরও এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের নূতন নির্বাচন হল, হাউস অব রিপ্রেজেণ্টেটিভস্-এর প্রতি দু' বৎসর অন্তর নূতন নির্বাচন হয়। সেনেটের এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের প্রতি দুবছর অন্তর নির্বাচনের পালা আসে। এবারের নির্বাচনের ফলে উভয় পরিষদেই রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটিক পার্টির বল প্রায় সমান সমান হবে, রিপাবলিকান পার্টির সাফল্য বেশি হতে পারে। এরকম অবস্থায় এক পার্টির দ্বারা এমন কোনো নীতির প্রবর্তন সম্ভব নয় যাতে অপর পার্টির বিশেষ আপত্তি আছে। তবে আমেরিকার যে প্রধান দুই পার্টি, ডেমোক্র্যাটিক এবং রিপাবলিকান, মতবাদের দিক দিয়ে এদের মধ্যবর্তী সীমানা খুব যে স্পষ্ট বা সুনির্দিষ্ট তা নয়। ডেমোক্র্যাটিক শাসনকালে গভর্নমেণ্টের সব নীতি বা কাজ যে কংগ্রেসের সকল ডেমোক্র্যাটিক সদস্যের দ্বারা সমর্থিত হয়েছে তা নয়, অপর পক্ষে গভর্নমেণ্ট অনেক রিপাবলিকান সদস্যের সমর্থনও পেয়েছেন। রিপাবলিকান আইসেনহাওয়ারের গভর্নমেণ্টও তেমনি কিছু কিছু ডেমোক্র্যাটিক সদস্যের সমর্থন পাবেন, আবার এমন কিছু রিপাবলিকান সদস্যও থাকবে, যারা কোনো কোনো বিষয়ে আইসেনহাওয়ারের নীতির বিরুদ্ধাচরণ করবে।

রিপাবলিকান পার্টির মধ্যে কারা মিঃ আইসেনহাওয়ারের প্রতি প্রসন্ন ও অপ্রসন্ন হবে সেটা অনেকটা বুঝা যাবে যখন নূতন প্রেসিডেণ্টের মন্ত্রিমণ্ডলীর নাম জানা যাবে। মিঃ আইসেনহাওয়ার কাদের মন্ত্রি-মণ্ডলীতে এবং অন্যান্য বড়ো পদে নিযুক্ত করবেন তাই এখন জল্পনাকল্পনার বিষয় হয়েছে। ২০এ জানুয়ারী নূতন প্রেসিডেণ্ট গদিতে বসবেন। অবশ্য ইতিমধ্যেই প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান কথাবার্তা বলার জন্য মিঃ আইসেনহাওয়ারকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এবং সম্ভবত ১৭ই নভেম্বর তাঁদের কথাবার্তা হবে। বিভিন্ন বিভাগের কাজ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হবার জন্য মিঃ আইসেনহাওয়ারকে তাঁর নিজের বিশ্বস্ত লোক পাঠাতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। এজন্য মিঃ আইসেনহাওয়ার কাদের পাঠান সেটা দেখে আন্দাজ করা যাবে তাঁর মন্ত্রিমণ্ডলী কি ধরণের হবে।

যাই হোক, মিঃ আইসেনহাওয়ার প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হয়েছেন বলেই আমেরিকার বৈদেশিক নীতির কোনো মৌলিক পরিবর্তন হবে, এরূপ মনে করার সঙ্গত কারণ নেই। এ বিষয়ে গত সপ্তাহে কিছু আলোচনা করা গেছে। অবশ্য রিপাবলিকান প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হয়েছেন বলে যদি আমেরিকার সম্পর্কে অন্যান্য দেশের মনোভাব ও আশা-আশঙ্কার পরিবর্তন কোনো ক্ষেত্রে একটু বেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তবে তার একটা প্রতিক্রিয়া মার্কিন গভর্নমেণ্ট এবং মার্কিন বৈদেশিক নীতির ওপরে হবে।

ওয়াফ্‌দ্ পার্টি ও নেগুইব ডিক্টেটরী

মিশরে জেনারেল নেগুইব-এর ডিক্টেটরীর জনপ্রিয়তা কি আবার একটু কমের দিকে? তা না হলে ওয়াফদ্ পার্টি নেগুইব সরকারের আদেশ অমান্য করে মিঃ নাহাসকে পার্টির 'অনারারী' সভাপতি রাখার চেষ্টা করছে কী করে? একবার ওয়াফদ্ পার্টি জোর করে বলেছিল যে, নাহাসকে বাদ দিয়ে তারা নূতন আইন অনুসারে পার্টি রেজিস্ট্রি করবে না। তাতে যা হবার হয় হোক। সেকথা ওয়াফদ্ রাখতে পারে নি। শেষ পর্যন্ত সভাপতির আসন থেকে মিঃ নাহাসকে সরিয়েই পার্টি রেজিস্ট্রি করতে রাজী হয়েছিল। তবুও মিঃ নাহাসকে 'অনারারী' পদে রেখে তাঁর এবং পার্টির কোনোরকমে একটু মুখরক্ষার চেষ্টা চলছিল। নেগুইব সরকার তাতেও রাজী নন।

পূর্বের ঝগড়ার সময়ে জেনারেল নেগুইব একবার দেশের মধ্যে সফরে বেরিয়েছিলেন—দেখাবার জন্য যে জনসাধারণ তাঁর পিছনে আছে। সেই সময়ে জেনারেল নেগুইব সত্যই খুব সম্বর্ধনা পেয়েছিলেন, জনসাধারণের মনে এই আশা জেগেছিল যে, সত্যই এবার তাদের অবস্থার কিছু পরিবর্তন হবে। জেনারেল নেগুইবের সফরের ফল দেখেই তখন বোধহয় ওয়াফদ্ পার্টি নরম হয়েছিল, তা না হলে অনেকেই ভেবেছিল যে ওয়াফদ্ সহজে নতিস্বীকার করবে না। তারপর কিছু দিন গত হয়েছে। এখন আবার ওয়াফদ্ পার্টি একটু জোর দেখাবার চেষ্টা করছে। তার মানে কি এই যে জেনারেল নেগুইব-এর জনপ্রিয়তায় ভাঁটা লেগেছে? অসম্ভব নয়।

জওহরলাল

সুবোধ ঘোষ

ভারতে অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠাতা জ্ঞানী শংকরের ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের পরিচয় জওহরলাল নেহরু এইভাবে বর্ণনা করেছেন:

"বিস্ময়কর অধ্যবসায়ের ও বিপুল কর্ম-জীবনের মানুষ ছিলেন শংকর। ...রের আর সকলের ভাল-মন্দ পরিণাম ...চিন্তাশূন্য হ'য়ে থাকার মত বৈরাগ্য গ্রহণ করেননি। নিজের পারমার্থিক ...র পূর্ণতা লাভের জন্য তিনি ...কে কঠিন নির্লিপ্ততার আবরণে আচ্ছাদিত ক'রে রাখেননি, অথবা অরণ্যের কোণে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণও করেননি। দক্ষিণ ভারতের মালাবারে তাঁর জন্ম, কিন্তু তিনি ভারতের সর্বত্র অবিরাম পর্যটন করেছিলেন। অসংখ্য ব্যক্তির মধ্যে তিনি নিজেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। আলোচনা ক'রে, তর্ক ক'রে, যুক্তি দেখিয়ে এবং বিশ্বাস সৃষ্টি ক'রে তিনি অসংখ্য ব্যক্তির মনে তাঁর নিজেরই বিপুল কর্ম-চেতনার ও প্রেরণার কিছুটা সঞ্চারিত করেছিলেন। তাঁর জীবনের লক্ষ্য ও কর্তব্য সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। কন্যাকুমারী থেকে হিমালয় পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র ভারতভূমিকে তিনি তাঁর কর্মের ক্ষেত্ররূপে এবং বিশেষ এক ঐক্যের সূত্রে যুক্ত একটি অখন্ড সংস্কৃতিভূমিরূপেও উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন, কন্যাকুমারী থেকে হিমালয় পর্যন্ত বিস্তৃত এই ভারতভূমির অন্তর একটি ভাবানুভূতির দ্বারা অভিষিক্ত হয়ে আছে, তার বাইরের রূপে ও প্রকাশে যতই বিভিন্নতা থাকুক না কেন। তাঁর সময়ে ভারতে যে-সব বহু ও বিভিন্ন ধারার চিন্তা প্রথা ও মতের দ্বন্দ্বে ভারতীয় মানুষের মন বিভ্রান্ত হ'য়ে পড়েছিল, তিনি সেই সব বিভিন্ন ধারাকে সমন্বিত করার জন্য প্রবল প্রয়াস করেছিলেন, যা'তে ভারতের এই সুবৈচিত্র্যের তথা বিভিন্নতার মধ্যেও জীবনদর্শনের একটি ঐক্য সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে।...বহুমুখী প্রতিভার বিস্ময়কর সমন্বয় দেখা গিয়েছিল শংকরের ব্যক্তিত্বে। তিনি ছিলেন একাধারে দার্শনিক ও শাস্ত্রজ্ঞ সুধী, অজ্ঞেয়বাদী ও মিস্টিক, কবি ও সাধক এবং সেই সংগে একজন কর্মিষ্ঠ সংস্কারক ও সুদক্ষ সংগঠয়িতা।।"

শংকরের ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে নেহরু যে মন্তব্য করেছেন, তার অনেকখানিই তাঁর নিজের সম্বন্ধেও সত্য। দশম শতকের ভারত ও বিংশ শতকের ভারত, উভয়ের মধ্যে ব্যবধান অনেক, অমিলও অনেক। তেমনি তুলনা করলে সেদিনের জ্ঞানী শংকর ও আজকের রাজনীতিক নেহরুর মধ্যে অনেক ব্যবধান এবং অনেক অমিলও খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে আবার মিলও আছে, এবং নৈকট্যও দেখা যায়। উভয়ের ব্যক্তিত্বে ও প্রকৃতিতে বিস্ময়কর একটি সাদৃশ্য বিশেষভাবে চোখে পড়ে, যদিও দুই যুগের পার্থক্যের মত উভয়ের ভাবনা এবং লক্ষ্যের মধ্যে মস্ত বড় পার্থক্য রয়েছে। ধর্মনীতিক আদর্শের প্রচারক, সংগঠয়িতা ও স্থাপয়িতা শংকর, এবং অর্থনীতিক-রাজনীতিক আদর্শের প্রচারক ও সংগঠয়িতা নেহরু—উভয়ের কর্তব্যক্ষেত্রের এই পার্থক্য সত্ত্বেও

মাতা স্বরূপরাণীর সহিত পুত্র জওহরলাল

যৌবনে নেহর, (১৯১১)

উভয়ের ব্যক্তিত্বের প্রক্রিয়া যেন ভারত-ইতিহাসের একই গঢ় প্রয়োজন সিদ্ধ করেছে এবং ক'রে চলেছে। নেহর, আজও আমাদের অতি নিকটে, সত্তরাং তাঁর কর্মসাধনার ঐতিহাসিক তাৎপর্য হয়তো ততটা সহজে এবং স্পষ্ট ক'রে বঝে উঠতে অসুবিধা আছে, যতটা সহজে ও স্পষ্ট ক'রে সদুরাতীতকালের কোন জ্ঞানী কর্মী ও মনীষীর ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের স্বরূপ নির্ণয় করা, পরিমাপ করা ও উপলব্ধি করা যায়। নেহর, শংকর নন, ঠিকই, কিন্তু দলীয় রাজনীতি ও প্রচার-সংবাদের ক্ষুদ্রার্থতা হ'তে দৃষ্টি মুক্ত ক'রে আজকের নেহরুর দিকে তাকালে এ সত্য সহজেই স্পষ্ট হ'য়ে ধরা দেবে যে, তাঁর মধ্যে সেই শংকরতুল্য প্রকৃতি ও ব্যক্তিত্বই সর্বমহিমা নিয়ে প্রকট হ'য়ে রয়েছে। এই ভারতের বহুবৈচিত্র্যের মধ্যে এক ঐক্যবিধায়ক ভাবনার অস্তিত্বের সন্ধান নেহরুও পেয়েছেন। শংকরের মত তিনিও ভারত-জীবনকে সেই মহান্ ঐক্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য হিমাচল হ'তে কন্যাকুমারী পর্যন্ত নিরন্তর প্রচারে ও পরিব্রজায় জীবনের দীর্ঘকাল অতিপাত করেছেন। মহাকবির মন, শিল্পীর দৃষ্টি, বিজ্ঞানীর সন্ধিৎসা এবং সেবকের নিষ্ঠা নিয়ে ভারতের জওহর আজ বিংশ শতকের ভারতের চিন্তায় এক বলিষ্ঠ কর্মবাদের প্রতিষ্ঠার জন্য সহস্র উদ্যম ও আয়োজনের মধ্যে নিজেকে উৎসর্গ ক'রে দিয়েছেন। তিনি স্বয়ং আজ ভারতের ঐক্যের প্রতীক, তিনি অতীত ও বর্তমানের মধ্যে ঐতিহাসিক যোগসূত্রের প্রতীক, সংস্কৃতির জগতে তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের সমন্বয়ের প্রতীক, তাঁর চিন্তারীতির মধ্যে ভবিষ্যতের ভারতের মানুষজাতিরই অন্তরের আভাস পাই।

বিগত সাধারণ নির্বাচনের সময় নয় সপ্তাহের মধ্যে নেহরুকে ভারতে পঁচিশ হাজার মাইল ভ্রমণ করতে হ'য়েছিল, বিমানে, মোটরযানে, ট্রেণে এবং জলযানে। যাত্রা সুরু হয়েছিল হিমাচল থেকে এবং সারা ভারত পরিক্রমার পর তাঁর যাত্রা ক্ষান্ত হয়েছিল হিমালয়েরই গুহানিঃসৃত স্রোতঃধারা রামগঙ্গার তটে ফিরে এসে। প্রায় তিনশত বৃহৎ জনসমাবেশের এবং অজস্র সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনসমাবেশের সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে তাঁকে বক্তৃতা দিতে হ'য়েছিল। তা ছাড়া, পথের দু' পাশে প্রতীক্ষমাণ হাজার হাজার জনসমাবেশের সম্মুখে এসে শুধু তিনি 'দর্শন' দান করেছিলেন। মাত্র এই নির্বাচনী পরিক্রমা উপলক্ষেই তাঁকে ছত্রিশ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে প্রায় সাত কোটি ভারতবাসীর প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে আসতে হ'য়েছিল। পৃথিবীর রাজনীতির ইতিহাসেও এই ঘটনাকে একটা 'রেকর্ড' বলা যায়, কারণ পৃথিবীর কোনকালে কোন রাজনীতিক নেতার পক্ষে জনজীবনের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য লাভের এমন কৃতিত্বের নিদর্শন দ্বিতীয় আর পাওয়া যায় না।

কিন্তু এই ঘটনাকে কি নিতান্তই রাজনীতিক ঘটনা বলা উচিত? নেহরু স্বয়ং এই ঘটনাকে তাঁর জীবনের এক তীর্থ পরিক্রমার ঘটনা ব'লে বর্ণনা করেছেন। নয় সপ্তাহের মধ্যে দেশের সাত কোটি মানুষ নেহরুকে দেখেছেন এবং নেহরু দেশের সাত কোটি লোকের জীবনের রূপ দেখেছেন। নির্বাচন উপলক্ষে এইসব জনসমাবেশ হ'য়ে থাকলেও, এইসব জনসমাবেশের অন্তরের মধ্যে নির্বাচন অথবা রাজনীতির কথাগুলিই অবশ্যই প্রধান কথা ছিল না। নির্বাচন এবং রাজনীতির অতিরিক্ত কিছু এর মধ্যে ছিল। নেহরু

বলেন, তিনি ভারতীয় জনচিত্তের পুণ্যতীর্থ ভ্রমণ ক'রে ফিরেছেন। এবং জনতার মনের কথা আমরা অনুমান ক'রে নিতে পারি। জনতা নেহরুকে 'দর্শন' ক'রে ধন্য হয়েছে। ভোটের ব্যাপার থাকলেও, ভারতের এই সাত কোটি নরনারী ও শিশুর চিত্তে নেহরুকে দেখবার স্পৃহাই যেন একটা ধর্মীয় স্পৃহার মত প্রবল হ'য়ে উঠেছিল। নেহরুকে যাঁরা দেখেননি, তাঁদের অনেকেই নেহরু-সমর্থিত কংগ্রেসের পক্ষে ভোট দিয়েছেন; তেমনি আবার যাঁরা নেহরুকে দেখে মুগ্ধ ও ধন্য হয়েছিলেন, তাঁদের
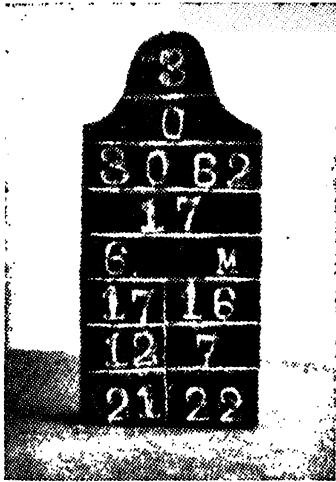
কয়েদীর গলার চাকতি। ১৯২১-২২ সালে যখন প্রথমবার নেহরুর ৬ মাসের কারাদণ্ড হয় তখন তাঁকে এই চাকতি গলায় ঝোলাতে হয়েছিল

অনেকে নেহরুর পক্ষে ভোট দেননি। ভোটতত্ত্ব ছিল গৌণ ব্যাপার, এবং মুখ্য ব্যাপার ছিল নেহরুর দর্শন।

সুতরাং প্রশ্ন ওঠে, নেহরুকে দর্শনের এই আগ্রহ ভারতের জনজীবনে বস্তুতঃ একটা পুণ্যকর্মস্পৃহার মত স্বভাবসঞ্জাত আবেগে পরিণত হয়েছে কেন এবং কেমন করে? এই ঘটনা থেকে আমরা দুটি বস্তুর পরিচয় পাই। ভারতীয় জনচিত্তের প্রকৃতির এবং নেহরুর ব্যক্তিত্বের; উভয়েরই পরিচয় তথা স্বরূপ এই বিস্ময়কর 'দর্শন' তত্ত্বের মধ্যে নিহিত রয়েছে। মহাত্মা গান্ধীকে দর্শন করবার জন্যও এইভাবে জনতা ব্যাকুল হয়ে ছুটে আসতো। কিন্তু যিনি মহাত্মা নামে পরিচিত নন, যিনি রাজনীতিক নেতা এবং প্রধানমন্ত্রী নামে পরিচিত, ধর্মজীবনের রীতিনীতি সম্বন্ধে যিনি কোন দিন উপদেশ প্রচার করেন নি, সেই নেহরুকে দর্শন করবার জন্য হিমাচল হতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ভারতীয় জনতার মনে এ হেন প্রবল অভিলাষের রহস্য কি?

ভিনসেণ্ট শীয়ান নামক জনৈক মার্কিন লেখক মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে একটী গ্রন্থ লিখেছেন ('লীড কাইণ্ডলি লাইট')। এই গ্রন্থে তিনি এই 'দর্শন' রহস্যের একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছেন। লেখক শীয়ানের মতে, ভারতের লক্ষ লক্ষ মানুষ যে এইভাবে দেশের এক ব্যক্তিকে শুধু ক্ষণিকের জন্য দর্শন লাভ করে ধন্য হবার জন্য ছুটে আসে, এই আগ্রহ বস্তুত একটা 'স্পিরিচুয়্যাল অ্যাক্ট' তথা আত্মিক পুণ্যকর্মের মত অনুষ্ঠান, যার ফলে দর্শকের চিত্ত অত্যদ্ভুত এক শান্তিরসে অভিষিক্ত হয়ে ওঠে। নেহরুর ভাষা যে বোঝে না, তাঁর প্রতিশ্রুতির তাৎপর্য বুঝে উঠবার মত শিক্ষা-দীক্ষাও যার নেই, এমন ব্যক্তিও অন্তরের কি-যেন কিসের একটা ক্ষুধা মিটিয়ে নেবার জন্য তাঁর দর্শনের জন্য ছুটে আসেন। শীয়ানের ব্যাখ্যাত তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক সত্যতা সম্বন্ধে বিচার করতে চাই না। রাজনীতিক নেতা নেহরুকে 'দর্শন' ক'রে কোন দর্শকের চিত্ত দিব্য আশ্বাসে প্রসন্ন হয়ে ওঠে কি না, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলতে চাই না। বাস্তব ঘটনার দিকে তাকিয়ে শুধু এই সত্যই স্বীকার করবো যে, যেমন মহাত্মা গান্ধীকে দেখবার জন্য ভারতের জনতা ব্যাকুল আগ্রহে ছুটে আসতো, তেমনি আজ দেখা যায় যে, নেহরুকে দেখবার জন্য জনতা ছুটে আসে। এই আগ্রহটাই বাস্তব ও সত্য, তার মূলে যা-ই থাক্। ভারতের পূর্ব সীমান্তের উপজাতীয় আবর ও মিশ্‌মি বন্ধ দশদিন ধরে দুর্গম অরণ্য-পথ অতিক্রম করে কেন যে নেহরুকে শুধু দেখবার জন্য বিমানক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছিল, এর উত্তর সহজে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এর মধ্যে একটা দুর্বোধ্যতা ও রহস্যের কিছু আছে, যার সহজ ব্যাখ্যাও এক কথায় হয় না।

এই ঘটনার মধ্যে একটি সত্য অবশ্য খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং তার মধ্যে কোন দুর্বোধ্যতা নেই। ভারতের জনতা নেহরুকে ভালবাসে, কারণ ভারতীয় জনতার মনে এই বিশ্বাস আজ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে যে, নেহরু ভারতের জনতাকে ভালবাসেন এবং সেই ভালবাসার মধ্যে কোন খাদ নেই। তাই নেহরুকে দেখবার জন্য জনতার এই ব্যাকুলতাকে বস্তুত এক আপন-জনকে দেখবার ব্যাকুলতা বলা যায়। এই হলো নেহরুর ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠার আসল রহস্য। তিনি কার স্বার্থ কতটুকু উন্নত করতে পারলেন, তারই হিসাব দিয়ে আজ ভারতীয় জনতা তাঁকে বিচার করছে না। তাঁর মন

১৯৪০ সালে কাণপুরে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক সম্মেলনে জওহরলাল

ভারতের সর্বসাধারণের কল্যাণচিন্তায় নিমগ্ন হয়ে রয়েছে। জনমনের এই বিশ্বাসই আজ নেহরুকে ভারতের ইতিহাসে এক পথিকৃৎ লোকনায়কের ভূমিকায় সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। ব্যক্তিগতভাবে নেহরু-জীবনের শ্রেষ্ঠ সফলতাও এখানে। নেহরু তাঁর শক্তির সন্ধানও পেয়েছেন জনহৃদয়ের এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রীতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগের মধ্যেই। এ বিষয়ে নেহরুর চিন্তার মধ্যেও কোন অস্পষ্টতা নেই। তিনি জানেন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সরকারী যন্ত্রের চেয়ে জনচিত্তের এই সৌহার্দ্য-পূরিত শ্রদ্ধা একটি জাতিকে আদর্শের পথে পরিচালিত করবার পক্ষে

বুদ্ধশিষ্য সারিপুত্ত মোগ্গল্লানের পূতাস্থির প্রতি পণ্ডিত নেহরুর শ্রদ্ধানিবেদন

বেশি সহায়ক। নেহরু বিশ্বাস করেন, বর্তমানের ভারতজীবনে বিপ্লবের স্পর্শ লেগেছে এবং শুরু হয়েছে বিরাট এক পরিবর্তনের অধ্যায়, যদিও এইটুকু বুঝবার মত অনুভবশক্তি অথবা দৃষ্টিশক্তি অনেকের আছে এবং অনেকের নেই। নেহরু জানেন, এই পরিবর্তনকে যথোচিত ছন্দ ও সৌষ্ঠব দান করতে হলে, এই পরিবর্তনকে বিশুদ্ধ লোকহিতরূপে সুত্বরান্বিত করতে হলে জনসাধারণের শুভেচ্ছা ও চেতনাই সাফল্য লাভের সহায়ক সব চেয়ে বেশি শক্তিশালী অস্ত্র অথবা অবলম্বন। তাই শাসনিক ক্ষমতার উচ্চতম পদের অধিকার লাভ করেও নেহরুর কাছে কোটি কোটি সাধারণের প্রীতি, বিশ্বাস এবং শুভেচ্ছাই অধিকতর মূল্যবান বলে অনুভূত হয়েছে। তাই জনজীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ লাভ করে তিনি নিজেকে সফল-কাম তীর্থপথিকের মতই কৃতার্থ বলে মনে করেন।

ত্রিশ বৎসর আগেও নেহরু ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে কর্মিরূপে উপস্থিত ছিলেন। অল্পকালের মধ্যেই তিনি তাঁর প্রতিভা, কর্মনিষ্ঠা ও মতবাদের অভিনবত্বে ভারতের শিক্ষিত যুবসাধারণের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। সে সময়ে তাঁকে দেখবার জন্য ও তাঁর কথা শুনবার জন্য যে ভীড় হতো সেটা ছিল প্রধানতঃ শিক্ষিতসাধারণেরই ভীড়। কিন্তু তাঁর দর্শনের জন্য আজ যারা বেশি ভীড় করেন, তাঁদের বেশির ভাগ হলো নিঃস্ব অজ্ঞ ক্লিষ্ট ও পীড়িত ভারতবাসী। এই পরিবর্তন নেহরুরই ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশের ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দেয়। এই ত্রিশটি বৎসর হলো, নেহরুর কর্মজীবনের, চিন্তার ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিব্যাপ্তির ইতিহাস নেহরু-প্রকৃতির প্রসারতার ইতিহাস। সহজে বা সহসা তিনি এই ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেন নি। দীর্ঘকালের নিরলস প্রয়াস, পরীক্ষা, চিন্তা, সন্ধান ও উপলব্ধির স্তর হতে স্তর অতিক্রান্ত হয়ে তিনি আজ ভারতের বৃহৎ ও বিরাট সত্তার সঙ্গে সাযুজ্য লাভ করেছেন।

জনসাধারণের যে ভক্তি চিরকাল একমাত্র ভারতীয় ধর্মশীল সাধক ও মহাপুরুষদের জন্যই সংরক্ষিত ছিল, সেই ভক্তি আজ নেহরুর প্রতি প্রদর্শিত হয়ে থাকে, এ ঘটনাও ভারতের ইতিহাসে অভিনব। এই ঘটনাকে ভারতীয় জনচেতনার ইতিহাসে এক নূতন জাগৃতির লক্ষণ বলে অভিনন্দিত করতে পারি। রাজদণ্ডধারী ও শাসনিক প্রতাপের অধীশ্বরেরা ভারতীয় জনতার কাছ থেকে যে শ্রদ্ধা পেয়েছেন, তার চেয়ে অনেক বেশি শ্রদ্ধা পেয়েছেন, কবি সাধক শিল্পী এবং সন্ন্যাসী। কিন্তু ভারতীয় জনতার আচরণে বোধহয় এই প্রথম দেখা গেল যে, তাঁরা সভক্তি শ্রদ্ধার ভাব নিয়ে যে নেহরুকে দর্শন করে আত্মিক প্রসন্নতা লাভ করেন, সেই নেহরু সাধক-মহাপুরুষ নন, কবি বা শিল্পী হিসাবেও প্রখ্যাত নন। ভারতের বৈষয়িক সমৃদ্ধির পরিকল্পনায় তিনি ব্যস্ত, তিনি অর্থ-নীতির ও রাজনীতির সাধক। তবু তিনি ভারতীয় জনমনের সেই শ্রদ্ধার আসনে স্থান লাভ করেছেন, যে-আসনে চিরকাল ধর্মপ্রাণ মহাপুরুষেরাই স্থান লাভ করে এসেছে। এ ঘটনা নিঃসন্দেহেই ভারতীয় জনপ্রকৃতির ইতিহাসে এক অভিনব ঘটনা। এ ঘটনা প্রমাণিত করে যে ভারতীয় জন-চিত্ত জীবনদর্শনেরই এক নতুন অভিরুচি লাভ করছে, যে অভিরুচি কঠিন এক অদৃষ্টবাদের ভারে চাপা পড়েছিল। ভারতীয় জনতার মনে আজ সেই আকাঙ্ক্ষা বিশেষ একটি রূপ গ্রহণ করেছে, যে আকাঙ্ক্ষা জাতির মনে তার বৈষয়িক অভাব ও নিঃস্বতার পীড়ন হতে মুক্তি লাভের চেতনা প্রণোদিত করে। এই চেতনাকে একটা জীবনমুখীন আগ্রহ বলা যায়, যার অভাব ভারতীয় জনজীবনে কোনদিন সাত্ত্বিকতার সহায়ক হয়নি, হতে পারেও না। বরং বলা যায়, জাতি হিসাবে সে চেতনার অভাব

একটা জীবনাবমুখী তামসিকতার প্রকোপই যেন পরিব্যাপ্ত করে রেখেছিল। আজ ভারতীয় জনতা অর্থনীতিক আদর্শের প্রচারক নেহরুকে যখন লক্ষকণ্ঠে জয়ধ্বনি তুলে অভিনন্দিত করেন, তখন সে জয়-ধ্বনির মধ্যে ভারতীয় জনজীবনে নবাবির্ভূত এক জীবনমুখীন আদর্শেরই জয় ঘোষিত হয়।

ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম দেখা গেল যে, ঈশ্বর, ধর্ম, মোক্ষ এবং অধ্যাত্ম পথের পরিচয় সম্বন্ধে সব চেয়ে কম কথা বলেছেন, এমন কি সে-সব বিষয়ে তাঁর ঔদাসীন্যের কথা সব চেয়ে বেশি স্পষ্ট করে ঘোষণা করেছেন, নেহরু নামে এমন এক ব্যক্তিই ভারতের কোটি কোটি সাধারণ মানুষের ভক্তি ও ভালবাসা লাভ করেছেন। এর কারণ বোধহয় এই যে, নেহরুর ধর্মপ্রাণতা বা ধর্মীয়তা অথবা ঈশ্বর-বিশ্বাস, কিংবা তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে কোন প্রশ্নও দেখা দেয় না। দেখা না দেবার প্রধান কারণ এই যে, নেহরুর একটি পরিচয় ভারতীয় জনসাধারণ ভালভাবেই জেনে এবং বুঝে ফেলেছেন। নেহরু হলেন মানবপ্রেমিক। মানুষকে তিনি ভালবাসেন, এতে যখন কোনই সন্দেহই নেই, তখন তাঁকে ভাল-বাসবার ও শ্রদ্ধা করবার আর কোন যুক্তি খুঁজবারও দরকার নেই। ভারতীয় জনতা বোধহয় একমাত্র মানবপ্রেমীকেই ঈশ্বরপ্রেমী বলে বিশ্বাস করে এবং ভারতীয় জনতার এই ধারণায় যুক্তিগত ভুলও নেই নিশ্চয়।

কিন্তু জওহরলাল কি মনে করেন? জীবন সম্বন্ধে জওহরলালের মনে কি কোন সন্ধান নেই? নিজের মনের কাছে তিনি কি সত্যই নিতান্ত এক অর্থনীতির সাধক ও রাজনীতিক সংগঠয়িতা? ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে কি ধারণা তিনি পোষণ করেন? অতীতকে কি তিনি অশ্রদ্ধা করেন? তিনি কি আধুনিক বিজ্ঞানকে মানুষের শ্রেষ্ঠ শ্রেয়ঃ ব'লে বিশ্বাস করেন? তিনি কি এই বিশ্বপ্রকৃতিকে নিতান্ত এক জড়পুঞ্জের রূপে নিয়ম ও প্রক্রিয়া বলে ধারণা করেন? জীবনের কোন পরমার্থ আছে কি? বৈষয়িক ভোগ ও সুখ ছাড়া ব্যক্তিগত জীবনে অন্য কোন পরম কাম্য থাকতে পারে কি? কালোত্তর সত্য বলে কিছু আছে কি, যে সত্য ধ্রুব এবং অপরিবর্তনীয়?

নেহরু-চিত্তের এই সব জিজ্ঞাসার অভি-যানও কত প্রবল তার প্রমাণ তাঁর স্বলিখিত বহু গ্রন্থে এবং তাঁর আচরণে ও উক্তিতে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর জিজ্ঞাসার অভিযান ক্ষান্ত হয়নি। 'আত্ম-জীবনী'তে নেহরু-মনের যে-পরিচয় পাই, 'ভারত-আবিষ্কার' গ্রন্থে সে মনের পরি-ব্যাপ্তি ও অন্তর্মুখীনতার আর এক অধ্যায়ের পরিচয় জানতে পারা যায়। কিন্তু তাঁর জিজ্ঞাসা কখনো থেমে গেছে বলে মনে হয় না। সাম্প্রতিক কালে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতা-বলী ও বিভিন্ন উক্তির মধ্যে তাঁর সন্ধানী মনের আরও অগ্রসর হবার এবং আরও প্রাপ্তির এক একটি তত্ত্ব আভাসে শুনতে পাওয়া গিয়েছে, যে সব তত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি পূর্বে বস্তুত নীরব ছিলেন।

অতীতকে অস্বীকার করেন না নেহরু, কারণ অতীতকে অস্বীকার করা যায় না। তিনি বলেন, আমাদের সত্তার মূলেই যে নিহিত রয়েছে অতীতের ঐতিহ্যে। কিন্তু অতীতকে তিনি জীবনের ভার বা বোঝা হ'য়ে উঠতে দিতে রাজী নন। অতীতকে নিছক সৎ বা নিছক অসৎ ব'লে তিনি মনে করেন না। দেরাদুন জেলে যখন বন্দী জওহরলাল বাস করতেন, তখন ফুলগাছ রোপণের জন্য তাঁর নিজের ইয়ার্ডের মাটি খুঁড়তে গিয়ে তিনি অতীত দিনের একটি অদ্ভুত নিদর্শন-বস্তু পেয়েছিলেন। প্রায় চল্লিশ বৎসর আগের এক ফাঁসিমঞ্চের কয়েকটি কাঠ। আমেদনগর দুর্গে বন্দী হ'য়ে থাকার সময়েও ফুলবাগান করার জন্য মাটি খুঁড়তে গিয়ে অতীতের একটি নিদর্শন-বস্তু পেয়েছিলেন নেহরু। এটি হ'লো একটি পাথর কুঁদে তৈরী করা একটি সুদৃশ পদ্মফুল। এই দুই নিদর্শন-বস্তু নেহরুর মনে অতীতকালের ইতিহাস সম্বন্ধে কি ধারণা সৃষ্টি করেছিল জানি না। কিন্তু তিনি অতীতকে এই দুই বস্তুরই মিশ্রণ ব'লে যে মনে করেন, সেটা তাঁর লেখায় ও কথায় খুবই স্পষ্ট ক'রে অভিব্যক্ত হ'য়ে থাকে। অতীতের বহু গ্লানির প্রতীক ঐ ভূপ্রোথিত জীর্ণ ও প্রাচীন ফাঁসিমঞ্চের কাষ্ঠফলকের কয়েকটি ভগ্নাংশ, এবং অতীতের বহু গৌরবের প্রতীক ঐ পাথরের পদ্মফুল। ভারতের অতীত ইতিহাসের বহু ঘটনা, প্রথা ও সংস্কারকে এবং দীর্ঘকালপ্রচলিত বহু রীতিকে ঘৃণা করেন নেহরু, কারণ তিনি মনে করেন যে, ঐসব প্রথা, রীতি ও সংস্কার সহস্র বৎসর ধ'রে ভারতীয় জীবনে মানুষের মর্যাদাকে বিনষ্ট ক'রে এসেছে। দৃষ্টান্ত জাত-প্রথা এবং অস্পৃশ্যতা। এ

ষাট বৎসর বয়সে পণ্ডিত নেহর্। জন্মদিবস উপলক্ষে গৃহীত চিত্র

প্রথাকে ভারত-ইতিহাসের অগৌরব ব'লেই মনে করেন নেহর্, এবং এই প্রথার পক্ষে ধর্মীয় সমাজতাত্ত্বিকের কোন ব্যাখ্যাকেই মুহূর্তের জন্য প্রশ্রয় দিতে রাজী নন কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ নেহর্।

কোন রাজনীতিক মতবাদে ধরা দেননি নেহর্, কোন ধর্মীয় এবং দার্শনিক মতবাদেও তিনি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেননি। তিনি নিজেকে সোস্যালিস্ট ব'লে কয়েকবার উল্লেখ করেছেন ঠিকই, কিন্তু তিনি একথাও বলেছেন যে, সোস্যালিজম্ নামে যে তত্ত্ব প্রচারিত হয়ে থাকে, তার সবই তিনি যুক্তিসহ বা বিশ্বাস্য সত্য ব'লে গ্রহণ করতে অক্ষম। কার্ল মার্ক্সের পাণ্ডিত্য ও গবেষণা তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গেই অনুধাবন করেছেন, কিন্তু একশত বৎসরের প্রাচীন সেই মার্ক্সীয় মতবাদকে তিনি অনন্তকালীন সত্য ব'লে অথবা আজকের দিনের প্রয়োজনের পক্ষে উপযোগী ব'লে মনে করেন না। মার্ক্সের পর মানুষের জ্ঞানের আবিষ্কারের ও সন্ধানের জীবন বহুদূরে অগ্রসর হয়ে গেছে। এবং আধুনিকতম এইসব আবিষ্কারের সত্যতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে একশত বৎসরের পুরাতন মার্ক্সীয় মতবাদের উপাসনাকে তিনি পুরাতনমুখী প্রতিক্রিয়া ব'লেই অভিহিত করেছেন।

নেহর্ বলেন, দার্শনিক চিন্তারীতির মধ্যে ভারতের অদ্বৈতবাদে তাঁর মন অনেকখানি আশ্রয় খুঁজে পায়, যদিও এ তত্ত্বকে সমূহভাবে বুঝে উঠতে বা গ্রহণ করতে তিনি পারেননি। কিন্তু তিনি এই উক্তির মধ্যেই তাঁর মানসিক প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য অনেকখানি প্রকাশ ক'রে দিয়েছেন। দৃষ্টিভঙ্গী ও অভিমতের ক্ষেত্রে কতগুলি বিষয়ে সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ ও অ-সন্ন্যাসী নেহরুর মধ্যে যে সাদৃশ্য দেখা যায়, তার হেতুও বোধ হয় উভয়ের দার্শনিক চিন্তারীতির এই নৈকট্য। স্বামী বিবেকানন্দ যদিও মানবজীবনে শ্রেষ্ঠ বিকাশের শক্তি ও অবলম্বনরূপে ধর্মকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দান করেছেন, এবং নেহর্ করেননি, তবুও ভারতের জাতীয় জীবনের ইন্টানিস্টের বিশ্লেষণে এবং ব্যক্তি-জীবনের কল্যাণ-তত্ত্বের বিচারে উভয়ের বক্তব্যে বিস্ময়কর মিল দেখা যায়। ভারতীয় জনসমাজের উচ্চ শ্রেণীর মনোবৃত্তির প্রতি বিবেকানন্দের মত নেহর্ও বিশেষ কোন আস্থা স্থাপন করতে পারেননি। বিবেকানন্দ তো স্পষ্টই বলেছেন যে, এইসব উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে 'প্রকৃত ভারত' নেই। প্রকৃত ভারত ঐ মাঠে ঘাটে নিঃস্ব অজ্ঞ যারা যুগের পর যুগ খেটে চলেছে, এক টুক্রো রুটি খেতে পেলে 'যাদের তেজ ত্রিলোকেও ধরবে না।' বিবেকানন্দ 'উচ্চ' শ্রেণীর লুপ্তিই কামনা করেছেন। ভারত আবিষ্কারের চেষ্টায় নেহর্ও গ্রাম-ভারতের জনতার মধ্যে 'এমন কিছু' দেখতে পেয়েছেন যেটা তিনি সাধারণ মধ্যশ্রেণীর মধ্যে দেখতে পাননি। নেহর্ বলেছেন, গ্রাম-ভারতের জনতার চরিত্রে নিহিত এই বস্তুটিকে ঠিক ব্যাখ্যা ক'রে বুঝানো যায় না। তবু এই 'এমন-কিছু' বস্তুটিই হ'লো সাধারণ ভারতীয় জনতার চরিত্রে নিহিত এক দুর্মর ঐতিহাসিক শক্তির আধার। 'ভারত-মাতা' কল্পনার মধ্যে নেহরুর মত কবিমনের মানুষও কোন কাল্পনিকতাকে প্রশ্রয় দেবার আগ্রহ পোষণ করেন না। তিনিও স্পষ্ট ভাষায় ভারতীয় কৃষকের কাছে এই তত্ত্বই প্রচার ক'রে থাকেন যে, ভারতের এই কোটি কোটি মানুষের জীবনই হ'লো 'ভারত-মাতা'। নেহরুর বাস্তবসচেতন মন বোধ হয় সমাজবোধ বা জাতিবোধের বিষয়টিকে

প্রতীকাশ্রয়ী ক'রে রাখতে ইচ্ছা করেন না। কাল্পনিকতার ক্ষেত্র হতে ভারতবোধকে তিনি পরিপূর্ণ মানবতাবোধের ক্ষেত্রে এনে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। মানবপ্রেমিক হিউম্যানিস্ট নেহরুর পক্ষে এই বাস্তবিকতা খুবই স্বাভাবিক।

স্বামী বিবেকানন্দকে আধুনিক ভারতের জাতীয়তাবাদের প্রবর্তক ব'লে মনে করেন নেহরু। রামমোহনের যুক্তিবাদী মন ও আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী নেহরুর বিশেষ শ্রদ্ধা লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব-প্রীতি এবং মানবধর্ম জওহরলালের চিত্তের অভিনন্দন লাভ করেছে। মহাত্মা গান্ধীর ব্যক্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রভাবে নেহরু স্বয়ং লালিত হয়েছেন, এবং গান্ধী-প্রচারিত নীতিতত্ত্বের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা বস্তুত তাঁর হৃদয়বৃত্তিরই অংশে পরিণত হয়েছে। রামমোহন, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী —যাঁদের মনীষা আধুনিক ভারতকে গড়েছে ও রূপদান করেছে, তাঁদের পরস্পরের ব্যক্তিত্বের ও মনীষার রূপের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও মূলত তাঁরা যেন একই চিত্তের একই আগ্রহের বিভিন্ন রূপ। নেহরু-মনীষাও ভারতের এই মনীষাগত ঐতিহ্য-ধারার ব্যতিক্রম নয়, যেমন বিগত ঐ চারিজন ভারতীয় মনস্বী বস্তুত কেউ কারও ব্যতিক্রম ছিলেন না, যদিও তাঁদের পরস্পরের চিন্তায়, কর্মে ও বাণীতে অনেক পার্থক্যের পরিচয়ও যথেষ্টভাবেই পাওয়া যায়। ভারত ইতিহাসে এইসব প্রতিভা বস্তুত পরস্পরের পরিপূরকরূপেই সত্য হ'য়ে উঠেছে। নেহরুকেও ভারতের এই মনস্বিতারই ঐতিহ্যগত ধারার মধ্যে আধুনিকতম প্রকাশরূপেই দেখতে পাচ্ছি, যাঁর কর্মজীবন ভারতকেই আত্মবিকাশের পূর্ণতর সার্থকতার দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

আধুনিক ভারতের স্রষ্টা ও সংগঠয়িতা এইসব মনস্বীদের অভিমত ও চিন্তারীতির মধ্যে পার্থক্য ব'লে যেটা চোখে পড়ে সেটা তাঁদের প্রতিভাগত বৈশিষ্ট্যের রূপ ব'লেও ধ'রে নিতে পারি। জাতীয় জীবনে বিশেষ কোন তত্ত্ব, মূল্য বা নীতির ওপর গুরুত্ব প্রদানই তাঁদের প্রতিভাকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য দান করেছে। রামমোহন, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর প্রতিভাগত ও মনীষাগত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় আমরা পেয়েছি। সুতরাং, প্রশ্ন উঠতে পারে, নেহরু-মনীষার প্রধান বিশেষত্ব কোথায় এবং কিসে? ভারতের জাতীয় জীবনের সম্মুখে তিনি এমন কোন্ নীতি, মূল্য বা তত্ত্বকে বিশেষ প্রয়োজনীয় ও গ্রহণীয় একটি সত্যরূপে উপস্থিত করেছেন, যেটা তাঁর মতন আগ্রহ নিয়ে পূর্বে কেউ কখনো উপস্থিত করেননি?

নেহরু বলেন, শুধু ভারতের জনসমাজ নয়, আধুনিক যুগের জনসমাজই বৈজ্ঞানিক অভিরুচির অধিকারী হ'তে পারেনি, যদিও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিস্ময়কর অগ্রগতি আধুনিক যুগের মানুষেরই প্রতিভার কীর্তি। বৈজ্ঞানিক প্রতিভার অভাব নয়, বৈজ্ঞানিক কুশলতার অভাব নয়, নেহরু যে বস্তুর অভাব দেখে আক্ষেপ করেছেন, সে বস্তুকে তিনি বৈজ্ঞানিক অভিরুচি ('scientific temper') আখ্যা দান করেছেন। পাশ্চাত্যের মানুষ বিজ্ঞানে খুবই বলীয়ান, কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজের মন বৈজ্ঞানিক অভিরুচি লাভ করতে সক্ষম হয়েছে ব'লে নেহরু মনে করেন না। নেহরু তাঁর এই অর্থগূঢ় কথাটির যে ব্যাখ্যা করেছেন, তাতে মনে হয় যে, তিনি বৈজ্ঞানিক অভিরুচি অর্থে বিশেষ এক মানসিক প্রকৃতির গঠনতত্ত্বের কথাই বলেছেন। "সত্যের সন্ধান ও নূতন জ্ঞানের সন্ধানের আগ্রহ, পরীক্ষার দ্বারা বিচার করার, পরীক্ষালব্ধ নতুন তথ্যের দ্বারা পুরাতনকে পরিবর্তন বা শোধন করাবার যোগ্যতা। বিনা তথ্যে ও বিনা প্রমাণে কোনো সিদ্ধান্ত ও মতের সত্যতায় আস্থা স্থাপন না করার মনোভাব। অনুমানের পরিবর্তে পর্যবেক্ষণ ও অন্বেষণের দ্বারা প্রাপ্ত তথ্যের উপর নির্ভরতা স্থাপন এবং মন ও মনোবৃত্তির ওপর কঠিন সংযম আরোপ করার ক্ষমতা।" আর একটু ব্যাখ্যা করে নেহরু বলেছেন—"জীবনে বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করার জন্য নয়, জীবনের জন্যই এই বৈজ্ঞানিক অভিরুচির প্রয়োজন। এই অভিরুচি জীবনচর্যারই একটি পদ্ধতি, একটি মানস-প্রকৃতি, কর্ম

১৯৪৯ সালে পণ্ডিত নেহরু

ও আচরণের একটি রীতি এবং মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের একটি প্রণালী।" বৈজ্ঞানিক অভিরুচির অথবা বৈজ্ঞানিক 'স্পিরিট' অর্থে নেহরু যে মানস প্রকৃতির কথা বলছেন, সেটা প্রায় অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকের মানসপ্রকৃতির অনুরূপ কিছু বলে ধারণা হয়।

নেহরুর দার্শনিক মনকে বুঝতে যতটা দুরূহতা অনুভব করতে হয়, তাঁর কবিমন বা শিল্পীমনকে বুঝতে সে দুরূহতার কিছুই অনুভব করতে হয় না। রবীন্দ্রনাথ নেহরুকে 'ঋতুরাজ' আখ্যা দান করেছিলেন। চিরনবীন নেহরুর মন। বিশ্বসৃষ্টির রহস্যমাধুরী হতে আনন্দ আহরণ করবার জন্য তাঁর চিত্তে রয়েছে এক দিব্য পিপাসা। মানুষের ইতিহাসের রূপকে তিনি শিল্পীর চক্ষু দিয়ে দেখবার ও বুঝবার শক্তি রাখেন। অনুরাধাপুরের বুদ্ধমূর্তি দেখে তিনি এত মুগ্ধ ও প্রসন্ন হয়েছিলেন যে, সেই মূর্তির একটি ফটো তিনি বহুকাল তাঁর সঙ্গে সঙ্গে রেখেছিলেন। এলিফ্যান্টা দ্বীপের ত্রিমূর্তির মধ্যে তিনি ভারতেরই মূর্তি দেখতে পেয়েছেন। এ মূর্তির 'প্রশান্ত প্রসন্ন করুণালালিত জ্ঞানগভীর দৃষ্টি' হতে ক্ষরিত আশীষধারায় অভিষিক্ত হয়েছে নেহরুর মন। কাশ্মীরের রঙীন মেঘ নেহরুর মনে কুহক সৃষ্টি করে। শুভ্র তুষারে আবৃতদেহ সুমহিম হিমালয়ের চূড়ার দিকে তাকালে নেহরুর মনের সব বিমর্ষতা ও বিষণ্ণতার ভার নেমে যায়। তিনি বলেছেন, মন যখন বিষণ্ণ হয়, তখন আমি হিমালয়ের চূড়ার দিকে তাকিয়ে প্রেরণা লাভ করি। গঙ্গার জলকল্লোলের মধ্যে তিনি ভারতের শত শতাব্দীর সুখ-দুঃখ-বেদনার, ভাঙ্গা-গড়ার ও উত্থান-পতনের ইতিহাসের ভাষা শুনতে পান। সারনাথের স্তূপের কাছে দাঁড়িয়ে নেহরু দেখতে পান, তথাগত বুদ্ধ যেন সম্মুখেই বসে উপদেশ প্রদান করছেন। নেহরুর শিল্পী-সুলভ অনুভব ও আবেগ প্রায় সাধকোচিত সূক্ষ্মানুভূতির রূপ গ্রহণ করে। নেহরু বলেন, অশোকস্তম্ভের কাছে দাঁড়ালে আমি যেন তার ভাষা শুনতে পাই।

এই হলো ভারতের নেহরু, নবীন ভারতের প্রতিনিধি নেহরু, বিজ্ঞানের প্রতি ও নতুনের প্রতি সদাশ্রদ্ধায় উৎসাহিত নেহরু, তবুও ভারত-ঐতিহ্যের কত বড় শ্রদ্ধাশীল অনুরাগী ভক্ত! তিনি বলেন, মানুষের মধ্যেই দেবত্ব রয়েছে এবং সে দেবত্ব তিনি দেখতে পেয়েছেন। তাই হিউম্যানিস্ট নেহরুর সাধনা একান্তভাবে মানবপ্রেমেই সমাশ্রিত। গৈরিক তাঁর বহির্বাস নয়, তবু মনে হয় এই মানুষটির অন্তরে গৈরিকের ছাপ পড়েছে। মানবজাতির শুভবুদ্ধির প্রতীক তিনি। অবিচল তাঁর সত্যনিষ্ঠা। বিপদে ও সংগ্রামে একান্ত নির্ভীক এই নেহরু সহস্রলক্ষ অন্যায়ীর ভ্রূকুটিকে তুচ্ছ করবার শক্তি রাখেন। এ শক্তিকে তিনি পেয়েছেন তাঁর বিশুদ্ধ কল্যাণকামী জীবনের সদ্ধর্ম হতে, যে জীবন ত্যাগে ও স্বার্থবিহীনতায় পবিত্রীকৃত। সে বহ্নি আছে নেহরুর মধ্যে যে বহ্নি রুদ্রের প্রিয়। কিন্তু সে বহ্নিকে দীপশিখারূপেই স্ফুরিত করবার ঐতিহাসিক পৌরুষ ও শক্তি নেহরু আজ লাভ করেছেন।

জওহরলাল নেহরু

গোবিন্দ চক্রবর্তী

কাঞ্চনজংঘার থেকে নামে গ্লেসিয়ার
উত্তরে সে আর্যাবর্ত—দক্ষিণেতে আর
ভারত-সাগর দোলে ঝড়ে উদ্বেল ঃ

আরো উঁচু করো এরিয়েল।

আকাশ প্রসন্ন আজো নয়—
কালো মেঘে, কুয়াশায় বারবার দিগ্‌ভ্রম হয়!
ইন্দ্রপ্রস্থ কিংবা মালাবারে
চতুর চক্রান্ত ঘোরে মুখোশেতে মুখ ঢেকে
অলিন্দে, প্রাকারে;
কূলে-উপকূলে গড়ে বিরোধের দৃঢ় ভিত যত
প্রতিকূল—
নিদ্রাহীন একান্ত নির্ভুল
তুমি তবু জেগে আছো একা।
প্রাণের উত্তাপে ছুঁয়ে ভারতের প্রতি প্রান্তরেখা।

হিমালয়-শির চুমি
মাতৃভূমি
অনেক পাথর বেছে অবশেষে খুঁজে নিল
একটি জহর—
নর্মদা-জাহ্নবী-কলস্বর
বাজালো অশান্ত রক্তে স্বপ্নের মধুর ঝুমঝুমি ঃ
নোতুন ভারতবর্ষ তুমি।

যে-ভারত চোখ মুছে জাগে ঃ
গঞ্জে, গ্রামে, জনপদে অগ্রগামী তুমি পুরোভাগে—
কৃষকের ভাই ধরো লাঙলের ফাল ঃ
সারেঙের সাথে টানো হাল ঃ
মেহনতী মানুষের বেদনার সাথী—
স্বস্তির রুমালে তার স্বেদাশ্রু মুছিয়ে জ্বালো
টকটকে লাল সূর্যভাতি;
একটি বিশাল জাতি
মালার মতন গাঁথো হৃদয়ের তারে—
পৃথিবীর এই এক ধারে!

গন্ধকের কটুগন্ধ বারুদখানায়
প্রাণ-বায়ু চেয়ে তবু এ সভ্যতা যখনি হাঁপায়—
সেখানেও তুমি অগ্রদাতা
স্নেহাতুরা যেন মাতা
দ্রুত ছুটে গিয়ে ঢালো দুধ-শান্তিজল ঃ
নীল ঠোঁটে তুলে ধরো হৃদয়-পানীয় টলোমল;
তবু যদি ক্ষুব্ধতার ছাই-চাপা আগুন ধোঁয়ায়—
নিদারুণ চিন্তান্বিত দেখি যে তোমায়!

জীবনের তেষট্টি বছর
পুরোনো পাতার মত তাই যবে টুপটাপ ঝরে পর-পর ঃ
প্রশ্ন কি করেছে অন্তর?
তুমি যত বেগে ব'য়ে যাবে—
অতীত প্রহরগুলি খুঁটে খুঁটে কেউ কি কুঁড়াবে!
ঝিনুকের বুকে-জমা মুক্তোর মতন
তোমার বিশেষ নামে
স্মৃতির সুবর্ণ এলবামে
তারাও যে ফ্রেমে-গাঁথা মহা আয়োজন!
তুমি যদি না রাখো খেয়াল ঃ
তোমাকে সবাই চেনে—এ **নেহরু জওহরলাল।**

সার্কাস

রূপদর্শী (N.R.

সার্কাস। বিরাট তাঁবু! তাঁবু নয়, এক আস্ত শহর। এক আজব দুনিয়া। দুম দুম বাদ্য বাজে। মুহূর্তে মুহূর্তে গায়ে কাঁটা দেয়, বুক ধক্ ধক্ করে। এ কোন ধরণের লোক সব! তাঁবুর মটকা থেকে ঝাঁপ খেয়ে পড়ে। সিংঘীর মুখে মাথা ঢোকায়। হাতীকে বুকের উপর রাখে। ছেলেগুলো যদি বাহাদুর, তো মেয়েরাও বাহাদুরাণী। তারের উপর নাচতে পারো, চালাতে পারো সাইকেল? উঁচু এক পাটাতনের উপর কাঠের এক গড়ানে গুঁড়ি। তার উপর এক তক্তা। সেই তক্তার উপর দাঁড়াতে হবে। পারবে? শুধু দাঁড়ালেই চলবে না। নাচতে হবে, বল নিয়ে লোফালুফি করতে হবে। তাও এক আধটা বল নয়, তিনটে, চারটে, পাঁচটা...... শুধু কি বল? ওই ছোরাগুলো? ওগুলো লুফতে হবে না? আবার শুধুই কি ছোরা? আগুনে ছোরা আছে না? হ্যাণ্ডেলে আগুন জ্বলছে দাউ-দাউ, ভ্রুক্ষেপ নেই, একটার পর একটা ছোরা ছুঁড়ছে আবার পটাপট লুফে নিচ্ছে। গায়ে হাতে একটু আঁচ কি তাত কি ফোস্কা, কিচ্ছু নেই। ওরা কি মায়াবী? ওদের মেয়েগুলো কি ডাকিনী? বাঃ তা হবে কেন! নাই যদি হবে, তবে কোন মন্তরে বশীভূত করেছে দড়িগাছকে, তারকে, ছোরা-ছুরিকে, বাঘ সিংহ হাতীকে? কিসের বশে ওরা এদের কথা শোনে? ছোরা কি তোমার কথা শোনে? হাতী কি শোনে? ঘোড়া কি শোনে?

না না, মন্তর তন্তর নয়। সার্কাসে বুজরুকি নেই কোথাও। সেরেফ মানুষের কেরদানি। তার সাহস, তার ধৈর্য, তার কষ্ট-সহিষ্ণুতা, তার অক্লান্ত অভ্যাস। সার্কাস যদি দেখ তবে বুঝবে মানুষ কি? সে কি পারে আর কি না পারে? পশুকে বাগ মানানো তো তুচ্ছ, যার মধ্যে প্রাণ নেই, সেই দড়িকাছি, ছুরি, তারকেও তার কথায় ওঠাবে, বসাতে চাইলে বসাবে। ছিল একটুকরো লম্বা দড়ি, তাতে এক ফাঁস লাগালে, তার পর দড়ির মাথা ধরে তাকে ঘোরাতে লাগলে। দড়ি যত ঘোরে ফাঁস তত বড় হয়। ফাঁস বড় হতে হতে হয়ে দাঁড়াল সুদর্শন চক্র। উপরে, নিচে, সামনে, পিছে বন বন ঘুরছে, দড়ির ফাঁস উঠছে, নামছে। কি তাজ্জব! সেই ফাঁস মনে হবে তুমি ঘোরাচ্ছ। তোমার শরীরের চার-পাশে ঘুরতে লাগল, এই মাথার কাছে, এই পায়ের কাছে। এই কোমরে পেঁচিয়ে ঘুরছে। বাঃ বাঃ, আবার সেই ঘুরন-দড়ির-ফাঁস ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে লোকটা এদিক থেকে ওদিক, যাচ্ছে ওদিক থেকে এদিক। এ পায়ের থেকে ও পা, ওপায়ের থেকে এ পা, খুব ঘুরছে। দেখে মনে হবে কি সোজা, কি সোজা? কিন্তু করতে গেলে আর পারবে না।

পারবে, যদি প্র্যাকটিস্ করো, যদি ওই নিয়েই লেগে থাক রাতদিন। ওই ধ্যান, ওই জ্ঞান করতে পার যদি।

এক একটা খেলা, দেখাতে আর ক' মিনিট। কিন্তু শিখতে? দিন মাস বছরের কি হিসেব থাকে, না রাখা যায়? এই যে রোজ খেলা দেখানো, এও তো প্র্যাকটিস্। দিনভোরই অভ্যাস।

অক্লান্ত অভ্যাস, নিখুঁত সময়-বোধ আর নিরেট একতা, এক কথায় এই হল সার্কাস। এক দোলনা থেকে আরেক দোলনায় লাফ মারবে, সময় এক পলক। তো প্রতিবারই ওই সময়টুকুর মধ্যে কম্ম কিলিয়ার করতে হবে। একটু হেরফের হয়েছে কি অমনি ধপাস, পপাত চ মমার চ। ওই সময়টুকু বাগে আনবার জন্য তো অভ্যাসের দরকার, সাধনার দরকার।

আর চাই একতা। রিংবয় থেকে প্রোপাইটার অবধি সবাইকে এক সুরে বাঁধা পড়া চাই। একটু গড়বড় সড়বড় কিছু হয়েছে তো, ব্যালান্স নষ্ট হয়ে যাবে। সার্কাস বরবাদ হয়ে যাবে। সার্কাস-অলাদের জাত বেজাত নেই। কুলীন মৌলিক, এদের জন্ম দিয়ে মাপা হয় না, মাপা হয় কম্ম দিয়ে। যার নামে বক্স আফিসে ভিড় হবে, ঝনাঝন টাকা আসবে সেই তখন মুনিবের পেয়ারের। তার পোজিশন এক নম্বর। নইলে এখানে একটা জর্মনের যা দাম, ফরাসীরও তাই, একটা বাঙালীর যা দাম, একটা মালাবারী কি মারাঠিরও সেই দাম। সব দেশের সার্কাসেই সব দেশের আদমী আছে, জেনানা আছে।

তবে, ভারতবর্ষে তিন জায়গাকার লোকই সার্কাসে বেশী আসে, বাঙলার আর মহারাষ্ট্রের আর মালাবারের। এদেশে সার্কাস চালু হয় এই তিনটি দেশের উৎসাহ আর উদ্যমে। ১৮৮৪ সালে প্রোঃ চত্রির সার্কাস প্রথম কালাপানি পার হয়। আমেরিকা আর চীন মুলুককে খেলা দেখিয়ে এসেছিল। তারপর দেবল সার্কাস ইতালীতে ঘুরল, ঘুরল দূরপ্রাচ্যে। বোসের সার্কাস গেল জাপান, চীন, ইন্দোচীন।

সে অন্যকালের কথা। সিনেমা তখনো আসেনি। তখনো লোকে আসল নকলের ফারাক বুঝত। নকল ফেলে আসলের কদর করত। তাই সার্কাসের ছিল অমন রবরবা। কী লোকই না হত! আর এখন? কারই বা নজর আছে!

আমরা দুঃখু করে করব কি? ভদ্রলোক বললেন, যুদ্ধের মধ্যে সব দেশের সার্কাসেই ভাঁটা পড়েছিল। দুঃখ সে জন্য নয়। যুদ্ধের পর আবার সব দেশেই সার্কাস মাথা চাড়া দিয়ে উঠল আর আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে গেলাম। অবনতিটা হল অন্য দেশের সঙ্গে পা মিলিয়ে। আর অন্য সবাই যখন আগে বাড়ল তখন আমাদের পা গুটিয়ে রইল। মজাটা মন্দ নয় মশাই।

যুদ্ধের মধ্যে যে সার্কাসের অবস্থা হয়ে এসেছিল নিবু নিবু, যুদ্ধ-শেষে অন্য দেশে তার তেজ আবার বেড়ে গেল দুনো। আম্‌রিকা আর রুশিয়া এই দু দেশেই সার্কাস খুব জোশদার হয়ে দাঁড়াল। ওদের গভর্নমেণ্টও মদত দিচ্ছে, পাবলিকও।

এক একটা সার্কাস খাড়া করা, সে কি চাট্টিখানি কথা মশাই। কত মেহনৎ, টাকা পয়সার কত ছড়াছড়ি! আপনাদের মালুম হবে কি করে? আপনারা টিকিট কিনলেন, খেল দেখলেন, তালি বাজিয়ে বাড়ি ফিরলেন। ডেলি খরচা কত জানেন? এই আমাদের খরচা ১২০০ টাকা, কম সে কম। এক একটা বাঘ সিংহ আছে না, দশ সের মাংস লাগে মাথাপিছু। খাসীর মাংসের দাম কত? কলকাতায় আড়াই থেকে তিন টাকা সের। তাহলে হিসেব করুন, চারটা বাঘ আর ছটা সিংহ থাকলে, কত খরচ হতে পারে? তেমন এক একটা হাতীর পিছে ডেলি খরচা বিশ টাকা, ঘোড়া পাঁচ, মানুষ পাঁচ। সেরেফ খোরাকী খরচাই এই। আরো তো কত রকমের খরচ আছে।

আর মানুষ কি এক আধটা? যে কয়জন খেলা দেখায়, বাস? কটা লোক আর খেলা দেখাতে পারে? বিশ বড় জোর পঁচিশ? কিন্তু তার চেয়েও ঢের ঢের বেশী লোকের দরকার হয় খেলার তোড়জোড় করতে। আপনি হাওয়াই ঝুলার খেল দেখছেন, ফ্লাইং ট্রাপিজ। তো ট্রাপিজের খেলা দেখাচ্ছে চারজন, আর তিন চারটা জোকার খুব রং ঢং করছে। কিন্তু এই খেলা জমাতে মজুত আছে ষোল আঠারোটা রিং-বয়। চারটা তো উঠে গেছে তাঁবুর উপর। ট্রাপিজকে ঠিক ঠাক করছে। গড়বড় কিছু না হয়, তার জন্য আছে কড়া নজর। আর বাদবাকী খটাখট খুটা পুঁতছে, সটাসট জালি টাঙাচ্ছে। ফুর্তি ফুর্তি কাজ। এক মিনিট বরবাদ হবে তো এক ঘণ্টা বরবাদ হয়ে যাবে। এই রকম 'টাইমিন', রিং-বয় বললে। এক পার্টিতে আমরা তিশ চাল্লিশ ভি থাকি। আগে পিছে হর জায়গায় আমাদের কাজ। কোথায় নেই।

কালো কোলো ছেলেটা বেজায় চটপটে। মুখে এখনো গোঁফের রেখা ওঠেনি। বেট্রে-খাট্টো এক জোয়ান ও ধারে যাচ্ছিল। তাকে ডাকলে, এ রিং-মাস্টার, ইধর আও। বাবুজী, এ আমাদের সর্দার আছে, রিং-মাস্টার। উ অর্ডার দিবে তো আমরা কাম করব। ক্যা বে, বাতলাও না কুছ কামকা তরিকা।

জোয়ানটা ধমক দিলে, বকো মাৎ, শালে। মারেগা এক ঝাপড় তো খুপড়ি যাকে ট্রাপিজ খেলেগা। মারব থাপ্পড় তো খুলি গিয়ে ট্রাপিজ খেলবে। ছোকরা একগাল হেসে বললে, বড়া ভাই। তো জোয়ানটাও হেসে দিলে। ছোকরাটা বললে, বড় ভাই, বাবুকে বল তো আমরা কি করি?

বড় ভাই বললে, সব কাম, বাবুজী, মেহনতের বিলকুল কাম এই রিং-বয়দের। সার্কাস যেখানে পয়লা যায়, কি থাকে সেখানে। স্রিফ ময়দান, ব্যস্ আর কি? খালি জঙ্গাল, ভাঙ্গা কাঁচ, টুকরা ইঁট, গাড়া গর্ত। টিরেনসে নামলাম তো ট্রাকে মাল কে তুলবে? রিং-বয়। ময়দানে কে নামাবে? রিং-বয়। আর ময়দানকে ডেরেস করতে হবে না? আপনি যখন সেলুনে যান,

বাল-উল ছাঁটেন, তো কাম কি ওখানেই খতম হয়ে যায়? মোচ ছাঁটবেন, দাঁড়ি কাটবেন, 'সোনো' পাউডার মুখে দিয়ে দলাই মলাই, 'ডেরেস' উরেস করবেন, টেড়ি বাগাবেন, তবে তো চেহারা খোলতাই হবে। তবে তো সুরৎ চিকচিকাবে। পাঁচজনে দু' এক নজর দেখে লিবে। তো এইরকম আছে ময়দান। আগে গাড়াগর্ত ভর্তি করতে হবে, জংগল জঞ্জাল সাফ করতে হবে, কাঁচ, লোহা দূরে ফেকতে হবে। একে বলে ময়দান 'ডেরেসিন্'। ময়দান 'ডেরেস' হল তো, তাম্বু উঠাও। সেই শুরু হবে খটাক্‌খট্ খুঁটো গাড়া। ভারী ভারী শাল গুঁড়ির আড়িয়া হাফিজ, রশারশির হর-কসরৎ। দনাদ্দন সনাস্‌সন, কাম পুরা হয়ে গেল। দু' ঘণ্টার মধ্যে 'তাম্বু' উঠানা ফিনিস্। এক নয়া শহর বসে গেল। বাজা বাজল, বিজলী বাতির রোশনাই-এ ঝিলিক মিলিক শুরু হল। ভিতরে গেলারী বসল, চেয়ার বসল চারো তরফ। পিছু সীট তো মাশুল ভি কম আঠ আঠ আনা টিকট। সামনে যত, পয়সাও তত। রিং-এর কাছেই "বক্স", পাঁচ পাঁচ টাকা, দশ দশ টাকা।

তো খেলার রিং। একদম মাঝখানে একদম যে গোল, ওই হল রিং। রিং থেকেই রিং-বয়। আর রিং-বয়দের এক সর্দার, আমি, রিং-মাস্টার। অর্ডার দিব আমি তো পুরা করবে সব রিং-বয়। রিং বানাতে হয় বহোৎ হুঁসিয়ারীসে। বিলকুল খেল তো ওইখানে হয়। মর্দানা জেনানা দৌড় ঝাঁপ করে। জানোয়ার কসরৎ দেখায়। একটুকরা কাঁচ কি একটা পিন্ পায়ে ফুটল তো ঘায়েল। এক হাতী খতম তো হাজার দোহাজার রুপিয়া কোম্পানীর গজব, একদম চল্লিশ হাত পানির নিচে। তাই এত হুঁসিয়ারী, এত খবরদারী। আর এ খবরদারী কারা করে? এই রিং-বয়েরা। এক এক খেলার এক একরকম তৈয়ারী। ব্যালান্সের খেলা হবে, তারের উপর হাঁটবে জেনানা, তো খুঁটি লাগাও, তার টাঙাও। তারো আবার হিসেব আছে, বেশী টাইট চলবে না, বেশী ঢিলাও চলবে না। একদম সই সই। এ খেলা শেষ হল তো ঝটপট তোড়ো, ভেঙে দাও। ডিগ্‌বাজীর খেলা হবে, না পিরামিড্? সতরঞ্চি আন, বিছানা বিছাও। এ খেলা খতম হয়েছে? এবার কি হাতীর খেলা? আচ্ছা তো তার সরঞ্জাম আনো।

দুঃখের কথা কি জানো বাবু সাহেব, আমাদের চোখের উপর হরবখৎ আছি, কিন্তু দেখতে পাওনা আমাদের একজনকেও। তোমাদের নজর তখন তারে, নাচনে-ওয়ালী জেনানার উপর। আমাদের ঘামে মাটি ভিজে সপসপ, আর হাততালি কুড়োচ্ছে খেলোয়াড়রা। নসিবের চক্কর কে বোঝে?

তোমরা শুধু তো খেলার তাঁবুটাই দ্যাখ। কিন্তু তাঁবু কি একটাই ওঠে? আরো ওঠে। সেগুলো থাকে তোমাদের অন্তরালে। তাঁবুই আমাদের ঘর বাড়ী, বাসা না পেলে খেলোয়াড়রাও থাকে। এইতো ও হিন্দু, আমি খ্রীষ্টান, ও মারহাটি, আমি মালাবারী, ওই ট্রাপিজ-অলা বাঙ্গালী, গ্লাস-উলি চিনে। বল ছোঁড়ে যে সাহেব স ইহুদী, হাতী-অলা মুসলমান। মোটর সাইকিল সাহাব ফরাসী। লেকিন্ উ সব, এই জাত আর ধরম আর চামড়ার সওয়াল যার নিজের নিজের পকেটে। তাতে কারোরই মাথাব্যথা নেই। সার্কাসের তাঁবুতে এলে সবাই সার্কাস-অলা, সবাই ইনসান, সবাই মানুষ, ভাই বেরাদর।

তাঁবুতে খাওয়া, তাঁবুতে শোয়া। লঙ্গর-খানা সাথে সাথেই চলে। ইচ্ছা হলে এখানেও খেতে পার। ইচ্ছা হলে পাকও করতে পার, সে তোমার রুচি মতো।

রিং-বয় ছাড়া আর আছে স্টেব্‌ল্ বয়। জন্তুজানোয়ারের খিদমতগার। ঘোড়ার জন্য ঘোড়া-অলা, হাতীর জন্য হাতী-অলা, আর বাঘ-সিংহের ছোকরার নাম 'শিকার-খানা' আংরেজীতে 'মেনেজারী বয়েজ্'।

এই স্টেব্‌ল্ বয়েদেরও অশেষ ঝক্কি।

ছোকরাটি বললে, কোনো কোনো জানোয়ার আস্ত শয়তান, আবার কতক-গুলো নিরেট বুদ্ধু। এদের দিয়ে খুশী মতো কাজ হাসিল করে নেওয়া বেজায় শক্ত। জান একদম হালুয়া হয়ে যায়। নাক দিয়ে যা জল আর গা দিয়ে যা পসিনা ঝরে তাতে জাহাজ ভাসিয়ে লন্দন তক্ পৌঁছানো যায়। কিন্তু, তবু এদের কথা বুঝতে হয়, আমার ইসারাও বোঝাতে হয়। না হলে খেলা দেখাবে কি করে? যেমন করে বাচ্চাকে শিখাতে হয়, 'বল বাবা' 'বল মা' 'বল দাদা' বলে বুলি ফোটাতে হয়, তেমনি ট্রেনিং এদেরও দিতে হয়। রাগলে চলবে না, অধৈর্য হলে চলবে না। জন্তু জানোয়ারের জিম্মাদারী স্টেব্‌ল্-বয়েদের। এ ছাড়া আছে পাহারাদার। দিনে রাতে পালা করে চৌকী দেয়। কি জানি কখন কি হয়ে যায়। দেশলাই-এর একটা জ্বলন্ত কাঠি, কি একটু আগুনের স্ফুলিক, তাহলেই গেল। এক তাঁবুর দাম পঁচিশ হাজার টাকা।

ম্যানেজার বল্‌লেন, এ ব্যবসার সবটাই রিস্ক। লাখ টাকার কাছ বরাবর লগ্নী, কিন্তু সে টাকা উশুল হবে কি না কে জানে? তারপর দেখুন সরকারের সহ-যোগীতা মোটে নেই। বাঙলা আর বোম্বাই সরকার তবু কিছু কৃপা করেন। কিন্তু অন্যান্য প্রদেশ গলাটি কেটে ছেড়ে দেয়। তারপর ধরুন, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত। তাতেও কি অসুবিধে কম? সময়মত ট্রান্‌স্‌পোর্ট পাওয়া গেল না, আটকে গেলাম দু'দিন। সেই দু'টি দিনে বেকার কত টাকা বেরিয়ে গেল। বক্স অফিসের উপরই আমাদের জীবন মরণ মশাই। টিকিট বিক্রী না হ'লে খাব কোত্থেকে? আর তাতেও দেখুন কত বাগড়া। শহরের মধ্যে মাঠ পাবার উপায় নেই। কেন যে ওরা তা মঞ্জুর করেন না বুঝিনে। এই শহরের একটেরে কে আপনার সার্কাস দেখতে আসে বলুন তো। অথচ সার্কাস ছাড়া আর কি আছে যাতে গোটা ফ্যামিলি এক সঙ্গে মজা পায়, বলতে পারেন? এই যদি ব্যবস্থা হয় তো সার্কাস টি'কবে কি করে?

এক একটা সার্কাসে ম্যানেজার থাকেন প্রায় ৪।৫ জন, তার উপরে একজন ডিরেক্টার, তার উপরে মালিক খোদ। এরা সবাই সার্কাসের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন।

আর থাকেন খেলোয়াড়রা। অনেকে আবার পরিবার নিয়ে থাকেন। নিজেও খেলা দেখান, স্ত্রীও দেখান, ছেলে মেয়েরাও দেখায়। তাই সার্কাসের নেশা পৈতৃক। আবার অনেক খেলোয়াড়কে সেই জায়গা থেকেই ভাড়া করা হয়। অনেকে নিজের জিনিষ নিজেই আনে। অনেক জিনিষ কোম্পানীও দেয়। খেলোয়াড়দের যতদিন শক্তি ততদিনই খাতির। অচল খেলোয়াড়ের স্থান সার্কাসে নেই।

ম্লান হেসে খেলোয়াড়টি বললে, ভবিষ্যৎ আবার কি? আমাদের শুধু বর্তমান। ব্যান্ডের বাদ্যে মাতাল হয়ে যাই। হাজার জোড়া চোখের উপর মৃত্যুর সঙ্গে ইয়ার্কি মারি। হাততালি কুড়োই। পেট পরিবার পালন করি। তারপর দম ফুরোলেই ফক্কা; তুবড়ির খোলাকে আর কে পোঁছে?

সার্কাস শেষ তো ফের কাজ রিং-বয়দের। ভাঙচুর চলল জোর। চার ঘণ্টার মধ্যে তাঁবু নামল, প্যাকিন্ উকিন্ হয়ে গেল। লরী বোঝাই হল। টেরেনে চাপল। যে ময়দান, সেই ময়দানই পড়ে থাকল। বাদামের খোসা, কাগজের ঠোঙা আর ছেঁড়া টিকিটের টুকরো হাওয়াতে সাঁতার কাটতে থাকল। মাটির বুকে থাকল অনেক গর্ত। মোটা মোটা খুঁটির দাগ। ম্লান কালিতে যেন লেখা, এখানে একদিন সার্কাস হয়েছিল।

আমরা খেলোয়াড়রাও ওই ছেঁড়া ঠোঙার জাত। তাকত ফুরোলে ভাঙ্গা বাদামের খোলার মত পড়ে থাকি অন্তরালে। কচিৎ কখনো সার্কাসের বাজনা শুনে চমকে উঠি। অচল দেহ নাড়তে পারিনে। স্মৃতি শুধু ফিস্ ফিস্ করে বলেঃ তুমিও একদিন সার্কাস-বয় ছিলে।

রঞ্জন

প্রমথ চৌধুরীর এক কঠোর সমালোচক তাঁর দীর্ঘ প্রবন্ধের মাঝামাঝি তাঁর তূণের তীক্ষ্ণতম বাণটি প্রয়োগ করে লিখেছিলেন: "সত্য বলিতে কি, প্রমথবাবু লেখক নহেন, প্রমথবাবু দার্শনিক নহেন, প্রমথবাবু পণ্ডিত নহেন, প্রমথবাবু সমালোচক নহেন, প্রমথবাবু যুগপ্রবর্তক নহেন, প্রমথবাবু প্রমথবাবু।"—(শনিবারের চিঠি, বৈশাখ, ১৩৩৫)। কার দাবীর প্রতিবাদ বা প্রত্যাখ্যান এগুলি? প্রমথবাবু একমাত্র লেখক-সমালোচক হওয়া ছাড়া আর কোনো দাবী নিজে বোধহয় কখনোই করেননি। কিন্তু থাক সে কথা। সমালোচকের অপবাদপ্রয়াসের অভ্যন্তরে প্রমথ চৌধুরীর ব্যক্তিত্বের অনন্যতার যে স্বীকৃতি নিহিত আছে সেটা অনিচ্ছাদত্ত ব'লেই বিশেষভাবে লক্ষণীয়। শুধু অনন্যতাই নয়, সে ব্যক্তিত্বের নীরন্ধ্র আত্মস্থতাও (ইনটেগ্রিটি) সমান স্বপ্রকাশ।

প্রমথ চৌধুরীর 'প্রবন্ধসংগ্রহে'* এই দুটি বৈশিষ্ট্যই সমভাবে প্রতিভাত। ওই লেখকটি শুধু উনিই—আর কেউ নন, এমন কথা ক'জন লেখক সম্বন্ধে বলা চলে? 'প্রমথবাবু প্রমথবাবু'—অপবাদকের এই নিন্দাটি তাই সানন্দে শিরোধার্য। প্রথম পর্বের ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধগুলিতেও লিপিচাতুর্য, দর্শন, পাণ্ডিত্য, সমালোচনা ও যুগপ্রবর্তনা-প্রয়াসের প্রমাণের অভাব নেই। বিশ্বসাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রমথ চৌধুরীর আলোচনা করলে আলোচকের পাণ্ডিত্য প্রদর্শিত হয়, প্রমথ চৌধুরীকেও পরোক্ষ সম্মান করা হয়, কিন্তু সুবিচার হয় না। যিনি হয়তো য়ুরোপীয় সাহিত্যে খুচরা কারবারীর স্থান পেতেন, তিনিই বাঙলা সাহিত্যে পাইকার বলে পরিগণিত হতে পারেন। বাঙলা গদ্যসাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী নিঃসন্দেহে মস্ত একজন পাইকার।

বাঙলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীর স্থাননির্ণয়ে আমাদের শ্রেষ্ঠ সহায়ক আলোচ্য সংগ্রহের 'ফরাসি সাহিত্যের বর্ণপরিচয়' শীর্ষক প্রবন্ধটি। তাঁর আগেও বাঙলা সাহিত্যের অনেক গুণ ছিল; কিন্তু সেগুলি, একান্ত ঐতিহাসিক কারণেই, ছিল ইংরেজি গুণ। প্রমথ চৌধুরী তার সঙ্গে যোগ করলেন কয়েকটা ফরাসি গুণ। বাঙলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি এতে দ্বিগুণ হোলো না কেননা (আমার এক সহৃদয়া পাঠিকা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন) সাহিত্য অঙ্ক নয়। এই সাহিত্যের যোগফলে এক আর একে তাই দুই হয়নি, বহু হয়েছে। প্রসঙ্গত বলি, বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে প্রমথ চৌধুরী যা যা চেষ্টা করেছিলেন তার মধ্যে প্রধান একটা ছিল আমাদের চিন্তা ও তার প্রকাশকে অঙ্কের মতো স্পষ্ট, কঠোর, নিয়মানুগ, নির্দিষ্ট ও দ্ব্যর্থশূন্য করা।

কিন্তু সাহিত্যের ইংরেজি গুণই বা কী? আর ফরাসি গুণই বা কী? প্রমথ চৌধুরী নিজে তা চমৎকারভাবে ব্যক্ত করেছেন। 'সরস্বতীদর্শনের কাল, ফরাসি কবিদের মতে, গোধূলিলগ্ন নয়। যা কেবলমাত্র কল্পনার ধন, সে ধনে ফরাসি সাহিত্য অনেক পরিমাণে বঞ্চিত। অপরপক্ষে এই আলোকপ্রিয়তার ফলে সে সাহিত্য অপূর্ব স্বচ্ছতা, অপূর্ব উজ্জ্বলতা লাভ করেছে। এর তুল্য স্পষ্টভাষী সাহিত্য ইউরোপে আর দ্বিতীয় নেই।......ফরাসি সাহিত্য এই অর্থে স্পষ্টভাষী যে, সে সাহিত্যের ভাষায় জড়তা কিংবা অস্পষ্টতার লেশমাত্র নেই।' একটু পরে বলছেন, 'সংস্কৃতের ন্যায় ফরাসি সাহিত্যও প্রধানতঃ অবজেক্টিভ, বাহ্যঘটনা ও সামাজিক মন নিয়েই ফরাসি সাহিত্যের আসল কারবার; এক কথায় ফরাসি জাতির দিব্যদৃষ্টি অপেক্ষা বহির্দৃষ্টি এবং অন্তর্দৃষ্টি ঢের বেশী প্রখর।' ফরাসি প্রভাবে প্রমথ চৌধুরী বাঙলায় 'সচেতন সচেষ্ট মনের' গুরুত্ব প্রচার করে আমাদের 'বুদ্ধিবৃত্তিতে মার্জিত ও চিত্তবৃত্তিকে সুশৃঙ্খল' করতে চেয়েছিলেন। তাঁর নিজের লেখায় অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন এই নীতি যে, 'সমালোচনার বিষয় কেবলমাত্র সাহিত্য নয়, সমগ্র মানবজীবন।' আমরা সাধারণত অশিক্ষিতপটুত্বের অনুরাগী, তাই তিনি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, 'সঙ্গীতের মতো সাহিত্যও একটি আর্ট, এবং যত্ন ও অভ্যাস ব্যতীত এ আর্ট আয়ত্ত করা যায় না।' চিন্তায় তিনি চাইলেন যুক্তি, এবং তাই তার প্রকাশের জন্যে চাই 'সুগঠিত রচনা।' যে যুগের লেখকদের 'শব্দের নির্বাচন ও পদের যোজনার প্রতি কোনোই লক্ষ্য' নেই তাকে তিনি আর্টহীন বলে অভিহিত [...] কুণ্ঠিত হননি। বোয়ালো ফরাসি স[...] যেমন করেছিলেন, তেমনি প্রমথ চৌ[...] বাঙলার 'অত্যুক্তি ও অতিবাদ, কষ্টক[...] ও অবোধ পাণ্ডিত্য' বিতাড়ন করতে চে[...] করেছিলেন। তিনি মানতেন যে, 'যে জ[...] আমাদের জাগ্রত বুদ্ধির আয়ত্তাধীন, [...] যা ন্যায়শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয়, তাই হচ্ছে যথ[...] সত্য', এবং এই সত্যের স্পষ্ট প্রকাশের জ[...] তিনি এমন একটি বাঙলা গদ্য তৈরী কর[...] চেয়েছেন যা হবে ফরাসির মতো 'সুসংব[...] সুসংহত এবং সুশৃঙ্খল।' তাঁর চে[...] যতখানি সফল হয়েছিল আমরা [...] উত্তরাধিকারী।

তবু ছত্রিশ বছর পূর্বে আনীত [...] অভিযোগ আজো সত্য যে, 'ইংরে[...] সাহিত্যের amateurishness আ[...] সাদরে অবলম্বন করেছি, কেননা যে[...] তেমন করে যা-হোক-একটা-কিছু লি[...] ফেলার ভিতর কোনোরূপ আয়াস [...] কোনোরূপ আত্মসংযম নেই।' আ[...] সাহিত্যসৃষ্টিতে প্রেরণা নামক অনির্দে[...] বস্তুটিকে এত বেশি প্রাধান্য দিতে অভ্য[...] যে, আয়াস ও সংযমকে প্রমথ চৌধুরী [...] উচ্চাসনে আসীন করে বাঙলা রচনার [...] প্রাপ্তির পথ দেখিয়েছেন। বস্তুত, রচ[...] কাজে চেষ্টা, শিক্ষা ও যত্নের প্রয়োজনীয়[...] এবং দৃষ্টিতে পরিচ্ছন্নতার গুরুত্বের বাণ[...] প্রচারই বোধহয় বাঙলা সাহিত্যে প্র[...] চৌধুরীর শ্রেষ্ঠ দান। এদুটিই শক্তি[...] গদ্যের পক্ষে অপরিহার্য এবং দুটিই ফরা[...] গুণ। এই গুণেরই কল্যাণে প্রমথ চৌধু[...] আমাদের সাহিত্যে সর্বাপেক্ষা 'সফি[...] কেটেড' লেখক এবং 'সফিস্টিকেশন'কে আ[...] সংস্কৃতি ও সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ব[...] মনে করি।

ইংরেজ চলে গেছে, ইংরেজি আ[...] ভুলতে বসেছি। অবিলম্বে আমরা যত্ন[...] না হলে হঠাৎ দেখব আমাদের এমন এক[...] ভাষা নেই যাতে উচ্চস্তরের চিন্তা ও [...] সুনির্দিষ্ট প্রকাশ সম্ভব। ফরাসি শিখ[...] ভালো কথা। আরো ভালো কথা নিজে[...] বাঙলা ভাষা ওই স্তরে উন্নীত করতে চে[...] করা। তার জন্যে প্রথম পাঠ প্রমথ চৌধুর[...] 'প্রবন্ধসংগ্রহ'। একটু আগে তাঁর যে দু[...] দানের উল্লেখ করেছি আমরা তা যোগ্যত[...] সঙ্গে গ্রহণ করলে প্রমথ চৌধুরীর [...] আশাটি সফল হবে যে, 'প্রাচীন ইউরো[...] এথেন্স যে স্থান অধিকার করেছিল, ভবিষ[...] ভারতবর্ষে বাঙলা সেই স্থান অধিক[...] করবে।'

*** প্রবন্ধ সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড), প্রমথ চৌধুরী (বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা। ছয় টাকা।)**

২

নাটক দেখতে নিমন্ত্রণ!

সে তো ক্লাবের সভ্য হবার পর।

ক্লাব ব'লে ক্লাব, বাড়িতে বটুকেশ্বরকে সবাই অ-সভ্য ব'লে পৃথক চোখে দেখতে লাগল এবং ঠাকুর, চাকর, ঝি ও সভ্যদের নিয়ে ক্লাবের জনসংখ্যা বেশি ব'লে এবং বটুকেশ্বর একলা ব'লে তাঁর খাওয়া, শোওয়া, পায়চারী ও বিশ্রামের জায়গা ছোট হয়ে এল।

ক্লাবের প্রধান চারজন সভ্য রাত্রে তাঁর শোবার ঘর দখল করল। সুতরাং অ-সভ্য বটুকেশ্বরের শোবার জায়গা হ'ল বৈঠকখানা ঘরে।

পড়ার ঘরটা, চারজনের পক্ষে ছোট তো বটেই, খেলনার সরঞ্জাম, স্টেজ তৈরী হচ্ছে, স্টেজের পর্দা, খুঁটি কাঠ ইত্যাদি আছে, এককোণে রাখা হয়েছে পিক্‌-নিক্‌-এর সরঞ্জাম। সুতরাং সেখানে কারো ঘুমোনো চলে না। বাচ্চারা পড়ার টেবিলটা মাঝ-ঘরে টেনে এনে সারা-রাত্রির জন্য একটা মোম-বাতি জ্বালিয়ে রাখল। জাপানীদের মধ্যে নাকি এই প্রথা আছে। খেলার সরঞ্জামকে আগে ঘুম পাড়িয়ে তারপর খেলোয়াড় বা নিজেদের শয়ন ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করা।

এই ব্যবস্থা অনুযায়ী তাঁর আদি শোবার ঘর থেকে নস্যির কৌটো, গামছা, দেশলাই, মশলার বাটি, টর্চ, চটি এমন কি যে ছড়ি নিয়ে বটুকেশ্বর সকালে পায়চারী করতে বেরোন, যে গেঞ্জী ও পাঞ্জাবী ঘুম থেকে উঠেই গায়ে পরেন সব সন্ধ্যাসান্ধ্য চালান এসে যায় বৈঠকখানায়।

এমন কি, দিনের বেলায়ও বারান্দায়, বাথরুমে, ঘরে কি বাগানে তাঁর গতিবিধির ওপর একটা নিয়ম ও কড়াকড়ি এসে গেল।

যেমন বটুকেশ্বরবাবু অফিস থেকে ফিরে এসে যদি দেখেন বারান্দায় ওরা ব'সে খেলা করছে তো তৎক্ষণাৎ তিনি ছাদে গিয়ে একটু হাওয়া খান, ওরা যখন বাগানে খেলাধূলো করে তখন তিনি বাথরুমের কাজ সারতে ভিতরে ঢোকেন। ওদের খাওয়ার সময় হ'লে তিনি জুতো জামা পরে ছড়ি হাতে বাইরে যাবার উদ্যোগ করেন।

আজ ঠিক সেই সময়ে নীহার ও বটু-কেশ্বরের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছিল। প্রায়ান্ধকার অলিন্দ। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দু'জন। একজন চৌকাঠ ধরে আর একজনের হাত ছিল দেয়ালে। কিন্তু খুব বেশি সময় বটুকেশ্বরবাবু মিসেস বাগচীর সঙ্গে কথা বলতে পারলেন না। হুড়মুড় ক'রে ছুটে বেরিয়ে আসে বাথরুম থেকে টেঁপী-বাবলা-মিতা।

লুকিয়ে একজন অসভ্যের সঙ্গে কথা বলছে দেখলে বাবলা মিতা ভয়ানক রাগা-রাগি করবে ভয়েই যেন নীহার তাড়াতাড়ি ব'লে শেষ করেন, 'আপনার ফিরতে খুব বেশি রাত হবে কি?'

'না, এই একটু, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ—'

বাবলার গলার আওয়াজ কানে আসতে বটুকেশ্বর এই পর্যন্ত ব'লে তাড়াতাড়ি সিঁড়ির দিকে পা বাড়ান। রাস্তায় নামেন। না, মিথ্যা কথা। কোনো বন্ধুর সঙ্গেই আজকাল বটুকেশ্বর বড় একটা দেখা করছেন না। কারুর বাড়িতে যাচ্ছেন না। বিশেষ এ বাড়িতে নীহার এসেছে পর। অথচ সুশীলার মরার পর থেকে এখন এই ক'টা দিনই তাঁর সেই সুযোগ গেল বেশি।

সিনেমা এবং ক্লাবও তাঁকে টানল না। বরং বিশ্রামটাকে আরও রম্য ও সুখকর ক'রে তোলার জন্য তিনি এই গড়ের মাঠেরই কোনো এক নির্জনতম প্রান্তে ব'সে, ঠিক বসা নয় শুয়ে, খবরের কাগজ বিছিয়ে তার ওপর হাত-পা ছড়িয়ে পাঁচ সন্ধ্যা শুধু একটি বিষয় চিন্তা করলেন।

গভর্নেস, মিসট্রেস, একটা অরফ্যানেজ খুলেছেন বটুকেশ্বর, মিসেস বাগচী তার

প্রিন্সিপাল,—বা এমনি একজন আদর্শ-পরায়ণা, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্না, শিক্ষিতা মহিলা চারটি শিশু-বন্ধুকে নিয়ে পুজোর ছুটিতে তাঁর বাড়িতে ক্যাম্প ক'রে থাকতে এসেছেন। বটুকেশ্বরের বাড়িটা অন্ততঃ আর তিন জনের বাড়ির চেয়ে দেখতে ও থাকতে ভাল, বন্ধুরা একথা স্বীকার করবে। কিন্তু তারা, সেখানে থামবে কি। হৈ-হৈ ক'রে বটুকেশ্বরকে চারদিক থেকে আক্রমণ করবে। বলবে, 'সামাজিক কর্তব্য সম্পর্কে রাতারাতি এমন সজাগ হয়ে উঠেছো, বিশ্বাস করতুম যদি মিসেস বাগচীকে বাড়িতে ডেকে আনার আগে আমাদের সঙ্গে কনসাল্ট করতে। না, ব্যাপার অন্য রকম, আর কিছু মনে আছে তোমার, স্কাউন্ড্রেল!'

অর্থাৎ কিছুতেই তারা এবাড়িতে মিসেস বাগচীর ক'টা দিন কাটিয়ে যাওয়াকে শাদা চোখে দেখবে না, সহজভাবে নেবে না। বরং উল্টো দু'কথা শুনিয়ে দেবে। ভয়ে বটুকেশ্বর এখন একেবারেই আর কারো কাছে গেলেন না। মিসেস বাগচীকে নিয়ে বটুকেশ্বরকে টিট্‌কারী করা মানে মিসেস বাগচীকে অপমান করা।

আর যাই করুক বটুকেশ্বর, এই অবিচার মিসেস বাগচীর ওপর করবেন না। তিনি কি তিনি কে, তা বন্ধুরা দেখেনি, দেখেছেন বটুকেশ্বর। যা বিশ্বাসের বাইরে বিস্মিত হওয়ার চেয়েও বেশি।

কী উন্নত চরিত্র প্রশস্ত হৃদয় অদ্ভুত আধুনিক মন।

এমন মন সহস্র মনের অভাব মোচন করে বৈকি।

বটুকেশ্বর, বলতে কি, মিসেস বাগচী আসার পর এই ক'দিনের মধ্যে পৃথিবীর আর কোনো মানুষের সঙ্গে দেখা হওয়ার প্রয়োজন আছে বলেই মনে করেন নি। তাঁর নতুন জীবন আরম্ভ হয়েছে।

বন্ধুরা সেই বন্ধুরা পুরাতনই থাকুক। তিনি নতুন হয়ে গেছেন।

এমন কি যদিও এটা শুনতে খারাপ শুনায়, বটুকেশ্বর এক এক সময় ভাবেন, বাবলা ও টেঁপী তার সন্তান নয়।

তিনি বিয়েই করেন নি।

সুশীলা কেউ নয়।

হ্যাঁ, এতটা লাইফ এমন এনার্জি দিয়ে যাচ্ছেন দিয়ে গেলেন নীহার বটুকেশ্বরকে।

সম্ভব। কেন সম্ভব হবে না। তিনি কেউ নন, তুমি কেউ নও, ছেলেমেয়েরা কেউ নয়, সেসব সম্পর্কই এখানে আসছে না। এখানে সবাই সবার বন্ধু।

'যদি হতে পারেন আমাদের ক্লাবের সভ্য!' বটুকেশ্বর গড়ের মাঠের অন্ধকারে বসে নীহারের গলা শোনেন, 'কিন্তু বাবলা টেঁপী আর যা-ই করুক, আপনাকে মিঃ ব্যানার্জি বলে ডাকাডাকি করবে, অন্ততঃ আমি তা সহ্য করতে পারি না, তাই তো বাবলার শত অনুরোধ উপরোধ ও টেঁপী মিতার কাঁদাকাটা সত্ত্বেও আমি আপনাকে এই ক্লাবের মেম্বার হতে দিচ্ছি না।'

কথা শেষ করে রূপালী সুন্দর দাঁত বার করে নীহার হাসেন।

'আপনি কি করে হলেন। মিতা দিব্যি উঠতে বসতে মিসেস বাগচী বাগচী বলছে।'

'আমি বুড়িয়ে গেছি, আমার ওর মা-সম্পর্ক রেখে লাভই বা কি আছে বলুন। কাজেই—'

'আমার বুঝি সেই সম্পর্ক রাখবার বয়স আছে।' বটুকেশ্বর চাপা খিলখিলে গলায় হেসেছিলেন।

'নিশ্চয়, নিশ্চয়ই, পুরুষের এই বয়েস কিছুই নয় মেয়েদের সব। যাকগে আমি আর এসব নিয়ে আপনার সঙ্গে বেশি কথা বলব না, চললাম, রিহার্স্যালের সময় যাচ্ছে। এখানে দেরি করছি টের। আমায় ওরা ক্লাব থেকে তাড়িয়ে দেবে।'

তাড়িয়ে দিলে তো ভালই হয়।' বটুকেশ্বর বলতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু নীহার তা হতে দেননি। তার আগেই সিঁড়ি বেয়ে ওপরে বাচ্চাদের পড়ার ঘরে ছুটে গেছেন।

এই দৃশ্য দেখতে দেখতে এই সবল দৃপ্ত ভঙ্গিমা চোখে নিয়ে বটুকেশ্বর প্রত্যহ বাড়ি থেকে বেরোন, বেড়ান, আর ভাবেন পৃথিবীতে কত রকম আদর্শ আছে, বেঁচে থাকার কত সুন্দর বৈজ্ঞানিক পথ আছে, জীবনকে চালাবার।

কিন্তু মানুষ তা পারে কই, চেষ্টা কোথায় এই সব পন্থা অবলম্বনের।

সব স্থূল, বাগবাজারের সূক্ষ্মবুদ্ধি বিনোদ উকিলকে নিয়ে সমস্ত বন্ধু সমাজটাকেই মনে হ'ল বড্ড পুরোনো, সেকেলে, এদের নিয়ে ক্লাব!

বটুকেশ্বর সেই ক্লাবের দিকে অনেকটা নাক সিঁটকানো ভাব নিয়ে নিরিবিলি চুপচাপ তাঁর বাড়িতে তাঁরই ঘরে একটি ক্লাবের চিন্তায় প্রায় আমজ্জ ডুবে থেকে সন্ধ্যার পরও অনেকটা সময় খবর কাগজের বিছানার ওপর শুয়ে শুয়ে কোটি নক্ষত্রের উদয় ও কোটি নক্ষত্রের পতন দেখতে দেখতে প্রায় একটি কলেজের ছেলের মতন গড়ের মাঠের অন্ধকারে অনেক সিগারেট পোড়ান এবং অনেক চিনাবাদাম চিবোন। রোজ।

তারপর আস্তে আস্তে আলোর মালা দেখে দেখে হগ সাহেবের বাজারের দিকে এগোন।

রুটি, মাংস, মাখন, ফল ও দুধের টিনের কৌটা কিনে বাজার থেকে বেরিয়ে রিক্সায় কুলোয় না যখন দেখেন, একটা ট্যাক্সী ডেকে বাড়ি ফেরেন। বাড়ি ফেরেন আর ভাবেন, বন্ধু কেউ দেখলে এবং জিজ্ঞেস করলে বলবে, 'পুজো অবকাশে বাড়িতে এক আত্মীয়া এসেছেন একটি মেয়ে সঙ্গে আছে, তাই সওদার পরিমাণ বেড়ে গেছে।'

ক্লাবট্যাব ওরা বুঝবে না, বুঝিয়ে লাভ হবে না।

অর্থাৎ ইচ্ছা করেই এই মিথ্যা উক্তি করবেন বটুকেশ্বর।

আর মিথ্যাই বা কেন। সত্যিই তিনি আত্মীয়া।

আত্মার সঙ্গে এমন শুভ যোগ ঘটাতে পারেন যিনি, আত্মীয়া ছাড়া তিনি কি।

শুধু পূজাবকাশের জন্য না হয়ে বাকি সমস্ত জীবনটাই যদি এমন হ'ত। বটুকেশ্বর এভাবে কাটাতে রাজী ছিলেন।

এতক্ষণ মাঠে বেড়িয়ে গড়ের মাঠে শুয়ে তারপর আবার হেঁটে অত বড় হগ সাহেবের বাজার তিনবার পাড়ি দিয়ে এক গাড়ি বাজার করে বাড়ি ফেরার শক্তি ও উদ্যম তাঁর অনেকদিন ছিল না।

বটুকেশ্বর হগ সাহেবের বাজারের মুখে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান চা-এর দোকানে চা ও ছোট এক ডিস ভেড়ার মাংস পর্যন্ত খেয়ে নিয়েছেন।

এই তারুণ্যবোধ, মনের এই স্বচ্ছন্দতা অনেকদিন পরে ফিরে এল। শরীরের এতটা শক্তি। এই জন্যেই একটু আগে তাঁর মনে হয়েছিল বাবলা টেঁপী কেউ নয়, তিনি এক নতুন মানুষ।

মিতার মা বটুকেশ্বরের কানে এই মন্ত্র শুনিয়েছেন কি।

'কিন্তু মিসেস বাগচী, নতুন মানুষ এই ক'টা দিনের জন্যেই আছি। আপনি চলে গেলে আমার অবস্থা যে-কে-সে?'

'কি রকম?'

নীহার চোখ বড় করেছিলেন।

বটুকেশ্বর উত্তর করেছিলেন, 'বাবলা পাগলা কুকুরের মত ছুটে এসে বলবে, বটু, তুমি আমাদের বিকেলে চাকরবারকদের হাতে ফেলে রেখে দিব্যি হাওয়া খেতে বেরুতে শিখেছ। মা মাত্র সেদিন মরল আজই তুমি ফাঁকি দিতে আরম্ভ করেছ, আজ আমি তোমার হাতপা কামড়ে রক্ত বার করে দেব।'

'না, না', বটুকেশ্বর বেড়াতে বেরুবার আগে নীহার বলেছিলেন, 'তিদিনে ওরা মাকে ভুলবে। আমি যে ওদের এসব দিক থেকে মন সরাবার কত রকম আইডিয়া বার করছি ও সেভাবে শিখিয়ে ওদের মন তৈরী করে তুলছি, এক মাসের রেজাল্ট দেখে তখন আমার সুখ্যাতি না করে পারবেন না।'

এক ঝলক দক্ষিণের বাতাস লেগেছিল বটুকেশ্বরের গায়ে। মিসেস বাগচীর সুন্দর হাসির ঝলক শুনে।

'এমন কি, হঠাৎ যদি একদিন আপনি বাড়িতে না-ও ফেরেন, ওরা ভ্রূক্ষেপ করবে না। দেখবেন, ওরা ওদের ক্লাবের সভ্য হতে অনেক টাকার ডাক টিকিট খরচ করে দেশ বিদেশের বাপ মা'মরা ছোট বন্ধুদের কাছে চিঠি লিখছে।'

'অনেক বড় বন্ধুও তো সভ্য থাকবে?' ভ্রূকুটি করে বটুকেশ্বর বলেছিলেন।

'হ্যাঁ, এই আমার মত, যারা আর বিয়ে করবে না কনফার্মড।'

'আমিও, আমায়ও সভ্য করে নিন মিসেস বাগচী।' বটুকেশ্বর চাপা ব্যগ্র স্বরে বলেছিলেন, আপনাদের কাছ থেকে দূরে সরে থেকে আমি শান্তি পাব না।'

'আপনার মন নরম। সেইজন্যে আপনার ছেলেমেয়েকে ট্রেনিং দিয়ে তুলতে আমার বেশ বেগ পেতে হচ্ছে।' অল্প হেসে নীহার জবাব দিয়েছিলেন, 'শুধু 'বাবা' আর 'মা' কথা দুটো আমি সাত দিনের মধ্যেও একেবারে ভোলাতে পারছি না ওদের। আপনাকে তো কিছুতেই অন্ততঃ এখন ক্লাবের মেম্বার করা যায় না।'

নীহারের ঈষৎ রহস্যমাখা মদির হাসি বটুকেশ্বরের বুকে ইন্দ্রধনু রচনা করেছিল।

'আচ্ছা বেশ ভাল ভাল।' তার ঘরের পাশেই এমন সুন্দর একটা ক্লাব আছে। এই সান্ত্বনা। আনন্দের নেশায় বুঁদ হয়ে সেদিন বেশ রাত করে বটুকেশ্বর বাড়ি ফিরলেন।

ক্লাবের তিনি কেউ নন বটে, কিন্তু তাঁর টাকায়ই ক্লাবের যাবতীয় খরচ চলছে। এতগুলি লোকের রসদ জোগাচ্ছেন তিনি।

কেউ বিশ্বাস করবে কি। মিতা আর মিতার মা এবাড়ি এসেছে পর এক ইলেক্‌ট্রিকের বিল উঠেছে পঁচাত্তর টাকা।

আলো জেলে গভীর রাত পর্যন্ত খেলাধূলা তো আছেই, সারা রাত বড়ঘরের পাখা খুলে ক্লাবের সভ্যদের ঘুমানো চাই।

তেমনি দিনের বেলায় যখন তখন ইলেকট্রিক কেট্‌লী জেলে চা ভাজাভুজি প্যাস্ট্রি পোচ বড়া পায়েস ইত্যাদি চলছে।

বিশেষ যখন কুকিং-এর ক্লাস বসে।

'খেলাছলে শেখা, খাওয়াছলে খেলা', নীহার বলেন, 'এক মাসে বাব্‌লো টেঁপীর স্বাস্থ্য যা ক'রে দিয়ে যাব দেখে অবাক হবেন।'

বটুকেশ্বর আনন্দে গলে গিয়ে বলেছিলেন, 'না আপনি যা ভাল বোঝেন, যেভাবে রাখলে ভাল থাকবে দেখেন সেইভাবে রাখুন ওদের, আটা কত লাগছে, চিনি কত লাগবে দেখে ঘাবড়াব না।'

নীহার নিঃশব্দে নতনেত্রে বটুকেশ্বরের হাতে ধরা নোট ক'খানা তুলে নিয়েছিলেন। চাকর দাঁড়িয়ে ছিল তখন বাজারে যাবে, রেশন তুলবে। আজ সকালের ঘটনা।

বটুকেশ্বর মনিব্যাগ খুলে কোনো হিসাব না নিয়ে টাকা বার করেছিলেন।

ছবিটা মনে পড়ল এখন তাঁর। বটুকেশ্বর সওদার মালপত্র নিয়ে ট্যাক্সী থেকে নেমে চোখ তুলে বাড়ির চেহারা দেখে একটু অবাক হ'য়ে গেলেন।

এরি মধ্যে নাটকের রিহার্স্যাল শেষ হয়ে গেছে? আলো জেলে খেলাধূলো আজ বন্ধ!

বটুকেশ্বর বারান্দায়ও আলো দেখতে পেলেন না।

তবে কি এরা সবাই এরি মধ্যে শুয়ে পড়ল!

অনুমান মিথ্যা হ'ল না বটুকেশ্বরের। ঝি বলল, 'মার শরীর খারাপ তাই শুয়ে পড়েছেন। বোধ করি, খাবেনও না।'

'বাচ্চাগুলো?'

বটুকেশ্বর প্রশ্ন ক'রে হাতের টর্চটা জেলে হলঘরের দরজার ওপর চোখ বুলিয়ে টের পেলেন, ক্লাব অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছে। দরজা ভিতর থেকে অর্গলবদ্ধ। উত্তেজনা, বাড়ি ফেরার মত্ততা তাঁর হঠাৎ প্রশমিত হ'লেও তিনি তা হাবেভাবে প্রকাশ করেন না। কেবল হাতের জিনিসগুলো ঝি-এর হাতে তুলে দিয়ে সোজা চলে এলেন নিজের বৈঠকখানায়। এখন এটা তাঁর শয়নগৃহ। এবং রাত্রে তাকে এই ঘরে বসেই খেতে হয়।

তাঁর ডাইনিংহল পিছনের দিকে প্যাসেজ হলঘরের ভিতর দিয়ে। ক্লাবের লোকেরা কখন শুয়ে পড়বে এটা আগে থাকতে, তিনি ক্লাবের মেম্বার নন ব'লে, কোনোদিনই জানানো হয় না তাঁকে।

বলে যে মানুষের খাওয়া, ঘুম এবং বিশ্রাম সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত ব্যাপার। ক্লাবের সভ্য ছাড়া আর কাউকে আমরা তা প্রকাশ করি না।'

'আমার অসুবিধা হবে না।' বটুকেশ্বর উত্তর করেছিলেন একদিন।

বাব্‌লো, টেঁপী ও মিতা জানিয়েছিল, বাইরের লোকের এসব হাংগামা তারা সহ্য করবে না। রাত দুপুরে এসে ডাকাডাকি। অর্থাৎ রাত ন'টার সময় গল্প শোনার ক্লাস আরম্ভ হবে এবং সেটা মাঝখানে নীহারকে রেখে বাকি তিনজনে একটা বড় বিছানার ওপর ত্রিভুজের তিনটি রেখার মত আড়াআড়ি হয়ে না শুলে গল্প শোনা হয় না। এই অবস্থায় কারোর বাথরুমে যাবার দরকার কি ডাইনিং হলে খেতে যাবে ব'লে গল্প শোনা বন্ধ ক'রে উঠে দরজা খুলে দেওয়ার মত বিরক্তিকর কিছু আছে নাকি।

'বরং রাত্রের খাওয়া বাবা যেন হোটেলে সেরে আসে,' বলতে বাব্‌লো কসুর করেনি।

কিন্তু বাব্‌লো মিতার মত নীহার ততটা অভদ্র হ'তে পারেন না।

রাত্রে বটুকেশ্বর যখনই বাড়ি ফিরুন তা নিয়ে ক্লাবের মাথাব্যথার দরকার নেই। তিনি তাদের বুঝিয়ে বটুকেশ্বরের রুটি, তরকারি, দুধ, কলা, মিষ্টি বৈঠকখানায় ঢাকা দিয়ে রাখতে বামুনকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। হাতমুখ ধোয়ার জল, তোয়ালে, খেয়ে হাত ধুতে হবে সাবানটি পর্যন্ত ঠিকভাবে রাখা হয়েছে। বটুকেশ্বর ঘরের আলো জেলে সব দেখতে পেয়ে টের পান ও মৃদু হাসেন।

অর্থাৎ কোনো অজুহাতেই তিনি বড় ঘরে ঢুকতে বা দরজা খুলে দিতে ক্লাবের সভ্যদের বিরক্ত করতে পারবেন না।

'ভাল ভাল', বটুকেশ্বর মনে মনে বলেন এবং জামাকাপড় ছেড়ে আরামকেদারায় শরীর ছেড়ে দিয়ে ক্লান্তির হাই তোলেন।

অসভ্য ও অপাংক্তেয় হয়েও বটুকেশ্বরের মনে এই সান্ত্বনা যে, বাইরের সব লোক

সম্পর্কে ক্লাব নিয়মকানুন যতই কড়া করুক, বটুকেশ্বর সম্পর্কে এই কড়াকাড়ি এক সময় না এক সময় শিথিল করতেই হবে।

অবশ্য এইরকম হোক বটুকেশ্বর কখনও চাইবেন না, কিন্তু যদি এমন হয় যে, মিতার শক্ত ভেদবমি আরম্ভ হয়েছে, রাত দুপুরে কর্তব্যের খাতিরে মিসেস বাগচী ছুটে আসবেন তাঁর কাছেই। তারপর বটুকেশ্বর-বাবু মিসেস বাগচীকে সঙ্গে নিয়ে সভ্যদের শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকবেন। তারপর, দরকার হলে সেক্ষেত্রে যেমন করণীয়, তিনি হয়তো ডাক্তার ডাকবেন, হয়তো সারা রাত জেগে ওদের বিছানার পাশে বসে কাটিয়ে দেবেন।

অর্থাৎ সকালে ঘুম ভাঙলেই বাবলা টেঁপী চোখ মেলে দেখতে পাবে, ক্লাব ক'রে বাবাকে ওরা যতই পর ক'রে দিক, ক্লাব বিপদে পড়লে বাবা ছাড়া গতি নেই।

বাবা তাদের বন্ধু।

ভাবতে ভাবতে বটুকেশ্বর একটা সিগারেট ধরান। সিগারেট ধরিয়ে হাই তোলেন।

অবশ্য এইরকম একটা অপ্রীতিকর ঘটনার সুযোগ নিয়ে তিনি ভিতরে ঢুকবেন এমন কামনা বটুকেশ্বর কোনদিনই করেন না।

একটা স্পোর্ট, সরল আনন্দের বন্যায় গা ভাসিয়ে মিসেস বাগচী এই শিশুর জগত গড়ে তুলেছেন। খামখেয়ালীর জাহাজে চড়ে এই বাড়ির চারদেয়ালের মধ্যখানে থেকেই তার সন্তানেরা যদি সুখে থাকে, আনন্দে বড় হয় ও স্বাভাবিকভাবে বাড়ে তো এই আনন্দের তুলনা আছে নাকি। নিশ্চয়ই, এ হল তার দুঃখ স্বীকারের পুরস্কার।

না, বাড়াবাড়ি করলে, কেউ যদি হঠাৎ বলে, এটা কি রকম, তিনি আবার এলেন। পুজোর ছুটি ও সামারের ছুটির মধ্যে দূরত্বটা খুব বেশি নয় হে। আত্মীয়াটির সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা কোনশ্রেণীর?

বটুকেশ্বর, হ্যাঁ, নীহার যেমন এখানে এইভাবে তার সন্তানকে নিয়ে থেকে খুশি হচ্ছে, ভয় পাচ্ছে না, পুরুষ বটুকেশ্বর আরও এক পা অগ্রসর হবার দাবী রাখেন, করেন।

হ্যাঁ, কালই তিনি মিতার মাকে বলবেন, বৈঠকখানাটা বাদ দিয়ে বাড়ির বাকি সবটা অংশই তিনি ভাড়া দিয়ে দিয়েছেন, মিসেস বাগচী একটা শিশু আশ্রম গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন। এই তিনটিকে দিয়েই আরম্ভ।

হ্যাঁ, এমন ভাল একটা সুযোগ কাজে লাগাবার লোভ বটুকেশ্বর সংবরণ করতে পারেননি। তিনি আশ্রমে তাঁর নিজের দুই মা-মরা ছেলেমেয়েকেও ঢুকিয়েছেন।

লোকের ঠাট্টা ইয়ার্কি মাথাধরা মাথাব্যথা, বটুকেশ্বর জানেন, তিনি নিজে যেমন গ্রাহ্য করেন না, করবেন না, তেমনি মিতার মাও করেন না, করবার ইচ্ছা নেই।

অবশ্য এত মধুর আত্মীয়তা জন্মাবার পর বাড়ির অংশ ভাড়া দেওয়াদেওয়ি অশোভন। খুবই নিন্দনীয়। চিন্তা করেন বটুকেশ্বর। এবং চিন্তা করে পরে মার্জিতরুচি ক্ষুরধার বুদ্ধি নীহারকে সেই যে বলে টন টন ধন্যবাদ, ভালবাসা, অভিনন্দন জানিয়ে দক্ষিণ হাতের কাজ সারতে জলের গ্লাসটি হাতে নিয়ে জানালার কাছে যান হাত ধুতে।

বটুকেশ্বর হাত ধুতে ধুতে নিজের মনে হাসেন।

নিশ্চয়, এই বিশ্বাস এই মাধুর্য তাঁর পাওনা ছিল। সুশীলার মৃত্যুর পর থেকে তিনি যখন এই সম্পর্কে আর কিছুই ভেবে দেখা যুক্তিসংগত মনে করলেন না।

হ্যাঁ, এই তাপ এই উজ্জ্বলতা এই মধু-মাখা দিন ও রাত্রিগুলি তার পাওনা ছিল। ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় অস্থির হয়েও বাবলা টেঁপী সুখী হবে না মনে করে আগুনে হাত বাড়াতে যাননি বলে ভগবান বটুকেশ্বরকে সুন্দরভাবে দুঃখের হিম রাত্রি আরামে থাকবার জন্যে একটি ঘেরদেওয়া, যাতে কখনই হাত পুড়বে না এমন একটি আগুন এনে দিলেন কি।

ক্লাব, বাকি জীবনটাই বটুকেশ্বর এমন একটা ক্লাব গড়বার, এই ক্লাবে থাকবার ও সভ্য হবার লোভ করবে। খেতে খেতে বটু-কেশ্বর ভাবেন। বাবলা টেঁপী বাবাকে মিঃ ব্যানার্জি বলে ডাকবে? ডাকুক। যা তুমি ওদের দিতে পার না তা দেবার লোভ দেখিয়ে শুকিয়ে মারছ কেন। মিসেস বাগচীর আইডিয়া যথার্থ। সংসারে বাবা মা ছাড়াও মানুষ আছে, ফুল আছে, পাখি আছে, কবিতা আছে, বাগাটেলি আছে, নাচ, গান, গল্প খাওয়া ও ঘুম।

কিন্তু আজ নাটকের রিহার্সাল হল না, বা মিসেস বাগচী বিকেলেও এমন হেসে-টেসে কথা বললেন, শরীর খারাপ ও একেবারে না-খাব হয়ে তিন তিনটে শিশু সহ দরজায় খিল দিলেন ব্যাপারটা বটু-কেশ্বরের কাছে একটু অপ্রত্যাশিত ঠেকল।

গল্পটল্প বলছে না কেউ, বটুকেশ্বর চুপ মেরে থাকা অন্ধকার হল কামরাটির দিকে চোখ বুলিয়ে বুঝে নিয়েছেন।

বা কারোর তেমন সাংঘাতিক অসুখ বিসুখও না। তা ছাড়া, ক'দিনই বটুকেশ্বর লক্ষ্য করেছেন, চারজনের একজনের শরীর খারাপ হলেও তারা চুপচাপ বসে বা শুয়ে থাকবার নাম করে না। সিক মেম্বারকে ছোট্ট পড়ার ঘরে হাসপাতালের বেড-এ তুলে দিয়ে বাকি তিনজন হল ঘরে এসে আড্ডা জমায়, কি ক্লাবের নিয়মকানুন সম্পর্কে গম্ভীরভাবে আলোচনা করে।

মিসেস বাগচী বলেন, 'ডিউটি জ্ঞান এবং রেসপন্সিবিলিটি বোধ হবে তোমাদের চরিত্রের প্রথম গুণ। সেন্টিমেন্ট নিয়ে থাকলে কখনও মানুষ হবে না।

অর্থাৎ সেদিন টেঁপীর দাঁত ব্যথা এবং তার শুয়ে থাকার দরুণ বাবলা মন খারাপ করতে নীহার তাকে বোঝাচ্ছিলেন।

'এই সময়টাই তুমি আরো দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ করবে। মনে ফূর্তি রাখবে। আশা রাখবে বোন ভাল হয়ে উঠবে।' একটু থেমে নীহার বলেছিলেন, 'তাহলে দেখা যাক বোন যদি আর কোনোদিন ভাল না হয় তুমিও চিরকাল মন খারাপ ক'রে বসে কাটিয়ে দেবে। তাহলে সমাজ চলে কি, সভ্যতা অগ্রসর হয় না।'

ইতিমধ্যে নীহারের মেয়ে মিতা বাবলাকে বুঝিয়েছিল একবার ওদের ক্রিকেট ক্লাবের ফাংশন ছিল, তার মা নীহারের খুব মাথা ধরেছিল, কিন্তু সেই মাথা-ধরা অগ্রাহ্য ক'রে মিতা ক্লাবের ফাংশন অ্যাটেন্ড করেছিল। ব্যক্তিগত দাবীর চেয়ে সমাজের দাবী বেশি। এই বয়সে মিতা দেবী এত কথা কি ক'রে শিখল বটুকেশ্বর অবাক হয়ে সেদিন ভেবেছিলেন। আর উজ্জ্বল উৎফুল্ল চোখে নীহারকে দেখছিলেন।

'কোথায় ওর ক্রিকেট ক্লাব?' উৎসুক গলায় বটুকেশ্বর প্রশ্ন করেছিলেন।

'কোথায় নেই, ওর ক্লাব সর্বত্র, ঘর ছাড়া অন্য যে কোনোখানে ওর খেলার সাথীরা ছড়িয়ে আছে হাত বাড়িয়ে ডাকছে ওকে।'

বটুকেশ্বর চাপা গলায় হেসে একটা হ্রস্ব নিশ্বাস ফেলেছিলেন।

'এখানেই প্রমাণ পাবেন একদিন, হয়তো টেঁপীর মত আমি দাঁতের ব্যথায় বিছানা নিয়েছি, আর সেই দিনটির সুযোগ নিয়ে তিন বন্ধুতে ফন্ডের পয়সা কম খরচ হবে

ব'লে সিনেমা দেখতেই বেরিয়ে গেল। মিতা নিয়ে গেল ওদের।'

বটুকেশ্বরবাবু আর হাসলেন না।

'অবশ্য আপনার ছেলেমেয়ে এখুনই এতটা হার্টলেস হবে আমি বলি না, আবার এমন নরম হলেও চলে না। নরম লোক কেরিয়ার গড়তে জানে না।'

মিসেস বাগচীর এই উপদেশের পর টেঁপীর জন্যে আর মন খারাপ না করে বাবলা সেদিন খেলায় মন দিয়েছিল।

কিন্তু আজ হ'ল কি?

আহার শেষ ক'রে ফের আরামকেদারায় ব'সে, বটুকেশ্বরবাবু সিগারেট ধরিয়ে ভাবতে লাগলেন।

তাঁর দ্বিধাগ্রস্ত মন।

ডাকবেন কি ডাকবেন না।

একবার জিজ্ঞেস করতে পারে না কি দরজার কাছে গিয়ে, সবাই আজ এত চুপচাপ কেন? খুব বেশি তো রাত বাজে নি। শহরে মিডনাইট শোগুলো তো এইবেলা শুরু হ'ল। তোমাদের নাটকের রিহার্সাল আজ হয়েছিল?

কিন্তু সাহস পেলেন না। কেননা, সবাই ঘুমন্ত। জেগে থাকলে তবু জিজ্ঞেস করার একটা অজুহাত থাকতে পারত, ঘুমের মানুষকে সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়ার কারণ জিজ্ঞেস করতে ডাকতে গেলে ঘুনোখুনি বাধবে। তার উপর বটুকেশ্বর-বাবু বাইরের লোক। ক্লাবের সভ্য নন।

বাবলা এবং মিতা পরদিন কি সাংঘাতিকভাবে তাঁকে আক্রমণ করবে সেই ছবি মনে হতে বটুকেশ্বরবাবু হলঘরের দিকে কান খাড়া রেখে বৈঠকখানার অন্ধকারে আরামকেদারায় শুয়ে একটা সিগারেট শেষ ক'রে আর একটা সিগারেট ধরান। রাত দেড়টা। পৌনে দু'টো বাজে—

হঠাৎ পাশের ঘরে, হলঘরের মধ্যে চিৎকার শুনে বটুকেশ্বর চমকে উঠে বসেন। এত বেশি চমকে ওঠেন যে হাত থেকে জ্বলন্ত সিগারেটটা পড়ে যায়। আরামকেদারায় শোয়া ছিলেন। মেরুদাঁড়া সোজা ক'রে বসেন।

তিনি পরিষ্কার শুনতে পেলেন পুত্র বাবলার হুঙ্কার।

যেন বাঘ, বাঘের বাচ্চা গর্জন করছে। ঘুমের ঘোরে গুমগুমিয়ে বলছে, 'ব্লাফ্ দিও না, মিসেস বাগচী, মা, মা ছাড়া তুমি আমাদের কেউ না।'

'কি পাগল ছেলে!' যেন বাবলা তাঁকে জড়িয়ে ধ'রে শুয়েছিল, মিসেস বাগচী ওর হাত সরিয়ে দেন। 'কে বলেছে একথা?' সদ্য ঘুমভাঙ্গা নীহারের গলার হাসি রুপোর ঘণ্টা হয়ে বটুকেশ্বরের কানে এসে লাগল।

'মিতা।' বাবলার গলা। 'মিতাকে জিজ্ঞেস করুন।'

'তুই বলেছিস?' মিসেস বাগচীর স্বর কঠিন হয়ে উঠল।

'নিশ্চয়।' মিতা। 'যতক্ষণ জেগে আছি ততক্ষণ আমার কাছে তুমি মিসেস বাগচী, আমার এবং আমার বন্ধু বাবলা ও টেঁপীর কাছে। ঘুমোতে এলে তুমি যদি আমার মা হও তো এদেরও মা।'

কিন্তু কন্যার বাক্যে নীহারের মন টলল না দরজার এপারে অন্ধকার করিডোরে দাঁড়িয়ে বটুকেশ্বর বেশ উপলব্ধি করতে পারেন।

'ঘুমের সময়ও আমি মিসেস বাগচী, তোমার এবং ক্লাবের আর দুটি সভ্যের কাছে।'

'আশ্চর্য!' এবার মিতার গলায় অভিমান ছিল না, বেশ কাটা-কাটা কথা। 'ঘুমের সময়ও তুমি আমায় ফাঁকি দিতে চাইছ, কেন একটু সময়ের জন্য এখন মা হতে দোষ কি? বাবা মরেছে পর দিন দিন কী হচ্ছ শুনি?'

'এখানে নয়, বাড়িতে। এখানে আমি মিসেস বাগচী। কই, বাড়িতে মার কথা তোমার একবারও মনে পড়ে না, পড়ে কি?'

'আলবৎ মা, তুমি আমাদের নতুন মা।' বাবলার হুঙ্কার শোনা গেল। 'বাড়িতে আপনি মিতাকে যত খুশি ফাঁকি দিন এখানে নয়।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, ঘুমোও লক্ষ্মীরা, রাত ক'টা বাজে জানো।' নীহার গলায় আবার হাসি আনবার চেষ্টা করেন।

'ষ'টা বাজুক।' বাবলার হয়ে মিতা চিৎকার ক'রে উঠল। 'আগে তুমি এদের কথা দাও।'

কি?' ক্ষীণ অসহায় শোনায় নীহারের গলা। 'কি কথা?'

'ওদের এবং আমার মা হবে, অন্তত রাতটা।'

'তাহলে ক্লাবের নিয়মকানুন ভাঙ্গতে হবে।' তেমনি অসহায়ভাবে নীহার উত্তর করেন।

'দরকার হলে ভাঙ্গব বৈকি।' সেয়ানা সুরে মিতা বলল। 'আমাদের ক্লাব। যখন যেমন খুশি নিয়ম করব।'

'দুষ্টু, তুমি একটা দুষ্টু মেয়ে ছাড়া আর কিছু নও। অপরকে কেবল কুবুদ্ধি দিয়ে বেড়ানো তোমার কাজ।' যেন ক্লান্ত হয়ে মিসেস বাগচী পাশ ফিরে শোবার চেষ্টা করেন অনুমান করেন বটুকেশ্বর। আর সেই মুহূর্তে বাবলার চিৎকারে বাড়ির দেয়ালগুলো কেঁপে উঠল।

'না, মিতাকে আপনি যা-তা বলবেন না, জানেন ওর বাবা নেই, মনে কত কষ্ট ওর?'

'আমি কালই ক্লাব ছেড়ে দিয়ে চলে যাব।'

'ইয়ার্কি'।' মুখিয়ে ওঠে বাবলা। ছেলের বিকৃত চেহারা কল্পনার চোখে বেশ দেখতে পান বটুকেশ্বর। 'বল, বল তুমি আমাদের নতুন মা।'

'আঃ ছাড়ো, লাগে।' নীহারের গলা। প্রমাদ গণলেন বটুকেশ্বর। গোঁয়ারটা না মিসেস বাগচীকে আবার আঁচড় কামড় বসিয়ে দেয়। কি করা যায়। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বটুকেশ্বর দাঁড়িয়ে ভিতরের কথা শোনেন।

'ছাড়ব! আগে বলো, কথা দাও।' নাছোড়বান্দা বাবলা। 'মিতা আর টেঁপী দুই বোন দিব্যি জড়াজড়ি ক'রে বিছানার ওধারটায় শোয়, আর আমি, আমি শালা একলা, কেন আমার আর একটা ভাই থাকতে দোষ কি। আগে আমায় ভাই দাও একটি তারপর ক্লাব ছেড়ে যেখানে খুশি চলে যেও তুমি।'

'ছিঃ, পাগলামী করে না।' নীহার বোঝান, 'কি সব অদ্ভুত কথা বলছ, তুমি বড় হয়েছ।'

'না না না।' বাবলার গর্জন।

'আঃ, ছাড়ো, উঃ—'

'বাবলা! বাবলা!' দরাম দরাম ক বটুকেশ্বর দরজায় ধাক্কা মারেন। 'মি বাগচী একবার দরজাটা দয়া ক'রে খুলে কি।'

মুহূর্তকাল সব চুপ।

মিসেস বাগচী দরজা খোলেন না, টেঁপ উঠে খুলে দেয়। বটুকেশ্বর ভিতরে ঢো আলো জ্বালেন। দেখেন দুই হাতে মু ঢেকে বিছানার ওপর উপুড় হয়ে আছে নীহার। তাঁর নগ্ন সাদা বাহুতে এত বড় একটা লাল কামড় ও আঁচড়ের দাগ। রক্ত ঝরছে। বটুকেশ্বর রীতিমত ভয় পান।

আঃ, একটা দিন।

পরদিন সমস্ত দিনটাই বটুকেশ্বরবাবুর ব্যস্ততা ছুটোছুটি ভয় উৎকণ্ঠা ও নিরবচ্ছিন্ন অশান্তির মধ্য দিয়ে কাটল। না হ'ল তাঁর স্নান, না খাওয়া, না গেলেন অফিসে, না দশ মিনিট নিজের আরাম কেদারাটায় বসতে পারলেন। কী জীবন! দু'একবার আক্ষেপও করলেন। কিন্তু বুকি তা-ও করার সময় ছিল না। আক্ষেপ করতেও এক দণ্ড ব'সে ভাবতে হয়। বাবলা টেঁপী মিতা এবং তার মা বটুকেশ্বরবাবুকে সেই অবসরও দেয়নি।

সকালে উঠেই বাবলা (মিতার মার গায়ে আঁচড় কামড় দেওয়ার দরুণ রাত্রে বটুকেশ্বরবাবু বেশ দু'ঘা বসিয়েছিলেন) সব আক্রোশ ঝাড়ল বুড়ি ঝি-এর ওপর, কি

…ার রাগ ক'রে সরসীর মাথায় এক বাটি …ল ঢেলে দিলে আর দিলে এক গাদা …ধুলো ছিটিয়ে।

…যেন কেউ খুন করেছে, ঠিক সেইভাবে চিৎকার করতে লাগল ঝি।

বটুকেশ্বরবাবু রাগে দুই চোখে অন্ধকার দেখে, কোনোদিন যা করেননি, বাবলার হাত-পা বেঁধে বৈঠকখানায় ওকে ফেলে রেখে তাড়াতাড়ি ছুটে হলঘরে ঢোকেন মিসেস বাগচীকে দেখতে। কেননা সকালে উঠেই বাবলার আর এক মামলা সারতে সারতে বেলা হয়ে যায় এবং মিতার মার …ও কেমন খোঁজ নেওয়া হয় না।

ঘরে ঢুকে দেখেন মিসেস বাগচী যন্ত্রণায় বেশ একটু আ-উ করছেন।

তিনি বেশ কাতর হয়ে পড়েছেন বুঝতে বটুকেশ্বরের কষ্ট হল না, কেননা তাঁর ঘরের ঢোকার পরও নীহার মাথা তুললেন না।

…তুললেন, বটুকেশ্বরবাবু যখন বিছানা ঘেঁষে দাঁড়ালেন। সভয়ে বটুকেশ্বর লক্ষ্য করলেন নীহারের দুই চোখ লাল। অনিদ্রা, …না কি কামড়ের দরুণ হাত ফুলে …য়ে জ্বর, জ্বরের ঘোরে চোখের এই …অবস্থা?

কোনোরকম দ্বিধা বা লজ্জাবোধ না করে, এমন কি মিসেস বাগচীর অনুমতি না নিয়ে বটুকেশ্বরবাবু তাঁর কপালে হাত রাখলেন। …একটু গরম বৈকি। যখন টের পেলেন …কোনো দিকে দৃকপাত না করে বটুকেশ্বর তৎক্ষণাৎ ডাক্তারের কাছে ছুটে গেলেন।

বাড়িতে ডাক্তার এলেন, ইঞ্জেকশন দিলেন এবং তিন দাগ ওষুধ খেতে দিয়ে গেলেন মিসেস বাগচীকে। বটুকেশ্বর খানিকটা নিশ্চিন্ত হলেন।

একি কম লজ্জার কথা। একি অল্প দুঃখের!

তা ছাড়া, বটুকেশ্বর এ সব বিষয়ে অনেক হুঁশিয়ার। মনুষ্যদন্তে বিষ থাকে। বটুকেশ্বরবাবুকে বাবলার কামড় কোনো দিন কাবু করতে পারে নি। কেননা, তাঁর শরীরের রক্ত বাবলার শরীরে আছে, কিন্তু ওর কামড়, নোখের ঘা আর এক শরীরে সইবে কেন। মিসেস বাগচীর হাত সেপ্-টিক টেফ্‌টিক কিছু একটা হলে তখন তার ঠেলা কে সামলাবে, যেন অনেকটা ভয়ে ভয়েই বটুকেশ্বরবাবু সর্বাগ্রে এই কাজটি সেরে রাখলেন। ইঞ্জেকশন করার পর সেসব ভয় সচরাচর থাকে না। তারপর, ঠিক ডাক্তারও বেরিয়ে গেছেন, হঠাৎ, এই ঝামেলার মধ্যেই তিনি শুনলেন মিতার জ্বর হয়েছে এবং নীহারের নির্দেশক্রমে হাস-পাতালে অর্থাৎ টেঁপীদের পড়ার ঘরে একলা চুপচাপ শুয়ে আছে।

'একটু ম্যালেরিয়ার দোষ আছে ওর, ভাববেন না!' বললেন নীহার।

কিন্তু না ভাববার কি আছে, ভাবলেন বটুকেশ্বর। 'এটা পরের বাড়ি ওর নিজের বাড়িতে যদি থাকত আপনার মেয়ে ভাবতুম কি' মৃদু হেসে নীহারের কথার জবাব দিয়ে তখুনি আবার তিনি ছুটে যান ডাক্তারের বাড়ি।

যেন অসুখ হবার আর দিন ছিল না, মিতার ম্যালেরিয়া মাথা চাড়া দিতে ঠিক এই দিনটির অপেক্ষায় ছিল কেন, ডাক্তারের ব্যবস্থা অনুযায়ী ওষুধ নিয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে বটুকেশ্বর বার বার চিন্তা করলেন। বাড়ি ফিরে বৈঠকখানায় ঢুকবেন দেখেন হাট-খোলা দরজা। ঘরে বাবলা নেই। বাঁধন পড়ে আছে মাটিতে। ছেলে দাঁত দিয়ে বাঁধন কেটে পালিয়েছে কোন সন্দেহ রইল না বটুকেশ্বরবাবুর। মিতাকে ওষুধ খাওয়াতে খাওয়াতে ওদিকে শোনেন বাথরুমে কান্নার শব্দ। টেঁপী কাঁদছে। সেই 'মা' 'মা' করে ঘ্যানর ঘ্যানর কান্না। সারাদিন চলবে এভাবে বটুকেশ্বরবাবুর বুঝতে বাকি রইল না। যা হোক, বাথরুমে না ঢুকে দরজার বাইরে দাঁড়িয়েই কন্যাকে মৌখিক এক আধটা প্রবোধ দিয়ে তিনি যখন ছেলেকে খুঁজতে রাস্তায় নামলেন বেলা সাড়ে বারোটা বাজে তখন, অর্থাৎ অফিসে তাঁর টিফিনের ঘণ্টার আর মাত্র আধ ঘণ্টা বাকি। ক্লান্ত বিমর্ষ নিস্তেজ মুহ্যমান বটুকেশ্বর রোদ বাঁচাতে ছায়া ধরে হাঁটেন আর চারদিকে তাকান। কোথায় বাবলা। শেষটায় না থানায় খবর দিতে হয় ভেবে বটুকেশ্বর ভারি অস্বস্তি-বোধ করলেন।

কপাল ভাল বটুকেশ্বরবাবুর।

বাবলা নিজে থেকেই ফিরল। তখন প্রায় বিকেল। তিনিও সবে বাড়ি ফিরেছেন। অস্নাত অভুক্ত রৌদ্রে ঘুরে ঘুরে বটুকেশ্বর-বাবুর চেহারা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। শুনলেন মিতার জ্বর রেমিশন হয়েছে, নীহারের হাতের ফোলা নেই, টেঁপী অনেক-ক্ষণ আগেই কান্না থামিয়ে চোখেমুখে জল দিয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসেছে। এবং চারজন গিয়ে আবার মিলেছে ক্লাবঘরে।

বটুকেশ্বরবাবু সেখানে গেলেন না।

বৈঠকখানায় বসে একটা সিগারেট ধরান।

কবিতা ছড়া গান শেষ হয়ে ক্যারমের গুটির শব্দ যখন তাঁর কানে এল বাইরে তখন এক ফোঁটা রোদ নেই। এর মধ্যেই এক ফাঁকে, মনে হল চুরি করে এ ঘরে উঁকি দিয়ে নীহার বললেন, 'সারাদিন আপনার স্নান-খাওয়া কিছু হল না, এই বেলা—'

'আমার জন্যে ভাবতে হবে না।' সুন্দর মন্থর হেসে বটুকেশ্বর উত্তর করলেন, 'আপনারা ভাল আছেন দেখে আমি নিশ্চিন্ত হয়েছি।'

'এখন ত ভালই, দিনের বেলা, যন্ত্রণা আরম্ভ হবে রাত্তিরে।' কথার শেষে অনিন্দ্য-সুন্দর হাসির আভা চকিতে নীহারের চোখেমুখে ফুটে আবার মিলিয়ে গেল।

বটুকেশ্বর অধোবদন, নীরব।

'যান, আপনি এইবেলা একটু ঘুরে আসুন। ক্লাবে যাচ্ছেন, পার্কে, সিনেমায়?'

'এখনো ঠিক করিনি, এইবেলা ভাবব,' বলে উঠে পাঞ্জাবিটা গায়ে চড়িয়ে জুতো পায়ে দিয়ে বটুকেশ্বর ধীরে ধীরে বাড়ি থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

বটুকেশ্বর পার্ক সিনেমা ক্লাব মাথায় রেখে বাগবাজারের এডভোকেট বন্ধু বিনোদ-বিহারীর শরণাপন্ন হলেন।

সব শুনে বিনোদ বললেন, 'বুঝলে ব্রাদার, চালাকি করে ছেলেমেয়ে মানুষ করা যায় না, অশান্তি তোমার আরো বাড়বে।'

বেশ কিছুক্ষণ গম্ভীর থেকে বটুকেশ্বর প্রশ্ন করলেন, 'কি করা যায় এখন, কি করতে পারি!'

'কি আবার করবে', গড়গড়ার নলটা নামিয়ে মুখব্যাদান করে বিনোদ বললেন, 'এইবেলা বাবলাকে একটি ভাই উপহার দেবার ব্যবস্থা কর। নইলে দেখবে এক রাত্তিরে খুনোখুনি কাণ্ড বেধেছে, আঁচড় কামড় ভাল।'

বটুকেশ্বর আর বাক্যব্যয় এবং সময়-কর্তন না করে বন্ধুর ফরাস ছেড়ে উঠলেন। বাড়ি ফেরার সময় মোড়ের স্টেশনারী দোকান থেকে এক গাদা প্রজাপতি ছাপ দেওয়া চিঠির কাগজ ও লাল খাম কিনে নেন।

—শেষ—

৩

প্রথমেই আমরা অভিযান করলাম মহারাজের সকাশে। পশ্চিম দিকের অর্থাৎ বড় মহলের গাড়ী-বারান্দার উপরের ঘরটি ছিল মহারাজের বিশ্রাম কক্ষ। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠেই দেখি মহারাজ অর্ধশায়িত অবস্থায় হাতে একখানি বই ধরে নিবিষ্ট রয়েছেন। তাঁর আহারাদি শেষ হয়েছে, বুঝলাম। আমাদের গতিবিধি ছিল প্রায় অবাধ; কোনও গুণের কারণে নয়, মাত্র একটা সম্বন্ধের কারণে। মহারাজকুমার আমার খুড়তুত ভগিনিকে অর্থাৎ নবীর সহোদরা ভগিনীকে বিবাহ করেছিলেন। বঙ্গের অভিজাত বংশের কুলতিলক মহারাজ শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়ের চরিত্র, গুণাবলীর কথা আমি আর কি বলব! আমরা শুধু জানতাম বুঝতাম তিনি অতিশয় স্নেহপ্রবণ, কৌতুকপ্রিয়, আর সঙ্গীতপ্রাণ। তিনি যখন ওস্তাদ বিশ্বনাথজীর ধ্রুপদ গানের সঙ্গে সঙ্গত করতেন, তখন আমি এই ভেবে বিস্মিত হয়ে যেতাম যে পাখাওজের বাজনা আর সঙ্গত অত মধুর হয় কি করে। তাঁর হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে বুঝেছিলাম, অন্তরের স্নেহধারা মাত্র সজীব মনুষ্যকে কৃতার্থ করেই ক্ষান্ত হয়নি, নির্জীব বাদ্যযন্ত্রকেও স্নিগ্ধ সরস করেছে মনের মাধুর্য ও আহ্লাদ দিয়ে।

এখনকার স্মরণের আনন্দ দিয়ে উপলব্ধি করি তখনকার যোগাযোগের মাহাত্ম্য। আমার অকিঞ্চন জীবনলতা সৌভাগ্যলব্ধ সেই সম্বন্ধকে কেমন করে কতো নিবিড়ভাবে আশ্রয় করেছিল; আর প্রতানিত হয়ে উঠেছিল মনোরম অভিজ্ঞতার কোরকসম্ভার নিয়ে। জীবনের একটি শাখা পল্লবিত হয়েছিল মহারাজ নাটোরের ভবনে স্নেহস্পর্শ পরিবেশের মধ্যে, মৈত্রী ও করুণার সুশীতল ছায়ায় অনুরাগ সঞ্চয় করে, সঙ্গীতের ভাস্বর জ্যোতির অপূর্ব আস্বাদ পেয়ে। অন্য একটি শাখা বিস্তৃত হয়ে গিয়েছিল শ্যামলালজীর সঙ্গীততীর্থের বিচিত্র আলোছায়ার মধ্যে দিয়ে, গীত-বাদ্য-নৃত্যের নব নব হিল্লোলের প্রলোভনে, নব নব প্রত্যাশার আকর্ষণে। বর্তমানের ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ে উন্মুখ যৌবনের সেই অতীত শুভ মুহূর্তগুলি; অনাবিল আনন্দে আপ্লুত এই হৃদয়কে যারা সহজেই জয় করে নিয়েছিল সঙ্গীতের বিচিত্র ধ্বনি আর রূপ দিয়ে; বিদায়ের কালে যারা উন্মেষিত করে গিয়েছিল আমার স্বল্প পরিসর জ্ঞানের মঞ্জুল কোরকগুলি; আমার অজ্ঞাতসারেই যারা আমার অন্তরকে সুপুষ্ট, সমৃদ্ধ করেছিল অনুভবের নিগূঢ় সম্পদ দিয়ে। জীবনের সেই অতীত মুহূর্তগুলির সন্ধান করে ফিরছি ব্যাকুল হয়ে, সঞ্চিতলোভী কৃপণের মতো; স্মরণের প্রদীপ জেলে।

মাত্র এখন বুঝতে পারি, অনুভবে সেই নিঃস্বার্থ স্নেহ-বাৎসল্যের কোন্ মধুর মহিমায় মণ্ডিত হয়ে মহামহিম মহারাজ ও মাতৃসমা মহারাণীমাতা আমার জীবনে প্রতিভাত হয়েছিলেন। মহারাজকুমার আমাকে চিরতরের জন্যই বন্ধন করেছিলেন অকৃত্রিম প্রীতি, অনলস সৌহার্দ্যের শৃঙ্খল দিয়ে। আত্মীয়স্বজনেরা আমার সমস্ত ত্রুটি অপরাধ ক্ষালন করে নিতেন অকৃপণ ভালবাসার পূত বারি দিয়ে। নির্বাক শিষ্টতা দেখে শিষ্ট হওয়ার শিক্ষা পেয়েছি; সৌজন্যের আশ্রয়েই সৌজন্যের মর্যাদা করতে শিখেছি, তার মূল্য নির্ধারণ করতেও পেরেছি। কিন্তু সেই সুকৃতিলব্ধ স্নেহ-বাৎসল্যের গোপন উত্তরাধিকার যা আজ বর্তমান অনুভবের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়, সেই প্রীতি আর ভালবাসার নিগূঢ় সরিৎ-প্রবাহ যা আজ স্মৃতির মধ্যে স্বচ্ছন্দ উৎসের আবেগ নিয়ে উচ্ছলিত হয়ে ওঠে—তাদের আন্তরিক মূল্য তখন আমি বুঝিনি, তাদের মর্যাদা তখন আমি বিচার করিনি। এখন এই অমার্জিত লেখনী-কণ্টক মাত্র যৎকিঞ্চিৎ স্থূল ঘটনাগুলিকে একটির পর একটি করে বিদ্ধ করে পুনরুদ্ধার করে নিয়ে আসতে চেষ্টা করে; স্মৃতির অতল থেকে। এমন শক্তি এমন যোগ্যতা আমার নেই, যা দিয়ে সেই অমূল্য রত্নাবলীর মান মর্যাদা নিরূপণ করি। সকল শরণ যিনি, সেই দীননাথকেই হৃদয় জানিয়ে দিতে চায় প্র অক্ষমতা। স্নেহ-প্রীতি-বাৎসল্যের মু আজ অকস্মাৎ অনুভবে আবির্ভূত হ তাদের মান মর্যাদা বিচার করা আমার বৃথা মনে হয়।

নির্ভয় অকুণ্ঠিত চিত্তে মহারাজের বি কক্ষে উপস্থিত হয়েছিলাম আমরা দু নিকটে যেতেই আমাদের দিকে তাঁর স্ব সিদ্ধ কৌতুকদৃষ্টি দিয়ে তিনি বলে "কে, পাঁচু নাকি; আরে, আয় আয়। ও নিকুঞ্জ দেখছি! আয়, বস্।" তাঁকে প্রণ করে আমরা সতরঞ্জের উপর বসলুম। তি জিজ্ঞাসা করলেন "কি খবর বল্। দীননাথ দাদা (আমার পিতৃদেব) ভাল আছেন ছুটিতে যাচ্ছিস্ ত' মৈমনসিংহে?" আমি সঠিক উত্তর দিয়ে চুপ করে থাকলাম। তিনি নিকুনের বাড়ীর হাল খবরও নিলেন। পরে বললেন "নূতন কি খবর বল্।" আমি বলতে যাব, এমন সময়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন "অন্দর বাড়ীতে গিয়েছিলি তোরা?" আমরা বল্লাম "না এখনও যাইনি। আপনার কাছেই প্রথম এলাম।"। বলতেই তিনি বল্লেন "বুঝেছি। কোনও ওস্তাদ-টোস্তাদের খবর নিয়ে এসেছিস বলে সন্দেহ হচ্ছে। বল্ ত শুনি।" আমরা চমৎকৃত হলাম। আমি বল্লাম "আপনি নিশ্চয়ই টেলিপ্যাথী করেছেন। নয়ত কি করে বুঝলেন আমরা একজন ওস্তাদের খবর নিয়ে এসেছি।" তিনি খুব গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বল্লেন "না, রে, না। শারলক্ হোম্সের গল্প পড়েছিস্ ত? সেই বিদ্যাটা একটু খাটিয়ে দেখলাম ঠিক লাগে কিনা। এই অসময়ে মানে মনু-টনু এখনও ঘুম থেকে ওঠেনি। এমন সময়ে তোরা বাড়ির মধ্যে না গিয়ে চলে এলি আমার কাছে। এর কারণ আর কী হতে পারে, তুই বল"।

আমি চকিত দৃষ্টিতে তাঁর হাতের বইখানি দেখে নিলাম; সেটা ছিল "মেমইয়ারস্ অব্ শারলক্ হোমস্"! তাঁর যুক্তি যোজনা অকাট্য। বল্লাম "আপনি ঠিক ধরেছেন"। তিনি বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করতে আমি আনুপূর্বিক ঘটনার প্রধান কথাগুলি বলে গেলাম; এমন কি শ্যামলালজীর বৈঠকের সন্ধান

পর্যন্ত। তিনি সমস্তক্ষণ আমার দিকে নীরবে তাকিয়ে ছিলেন। কথা হলে আমাকে তাঁর কাছে উঠে আসতে লেন। আমি তাঁর নিকটে গিয়ে বসলাম; ছিলাম হয়ত কাণমলা খেতে পারি। হায় ! তা হয়নি। হলে ত' একটা বলবার মত হ'ত যে মহারাজ নাটোরের হাতে, যে আঙুলে মৃদঙ্গের মধুর পরন্দ বেজে ওঠে ই আঙুলের কাণমলা খেয়েছে পাঁচু ণ্ডেল! তিনি আমার হাতের কবজি আর ইসেপ্‌স পরীক্ষা করে বললেন "তাইতো! ই লায়েক হয়ে গেলি কেমন করে! যাই হ'ক জ থেকে তোর উপর একটা কাজের ভার দিলাম। তোদের পাড়ায় (অর্থাৎ উত্তর কলিকাতা অঞ্চলে) নামী ওস্তাদ এলে তুই নিজে দেখেশুনে আমাকে খবর দিবি। বুঝলি ত? কতকটা বীরবলের মত। বীরবলের গল্প জানিস ত?"

বীরবলের গল্প দু' দশখানা জানতাম আমি; "বীরবল্‌কা কিস্‌সা" বলে হিন্দী ভাষার পুস্তকও পড়েছিলাম তখন। কিন্তু তিনি বিশেষ কোন্ গল্পের ইঙ্গিত করলেন বুঝতে পারলাম না। তাছাড়া তাঁর মুখে অন্য ছোট ছোট মজার গল্প শুনে আমার একটা ধারণা হয়েছিল মুখে গল্প বলারও একটা বিদ্যা আছে; মহারাজের গল্প বলার ঢং ছিল হৃদয়হারী। বল্‌লাম আমি "মহারাজ, আপনি কোন্ গল্পটির কথা বলছেন আমরা নিশ্চয়ই জানিনে। আপনার মুখ থেকে আমরা শুনবো"।

দেখ্‌লাম, তিনি অন্যমনস্ক হয়ে পাশের দরজার দিকে তাকালেন। এমন সময়ে সাক্ষাৎ মা জননীর মতো স্নেহপ্রতিমা মহারাণীমা এসে দেখা দিলেন। আমাদের দেখেই বললেন, "কে রে! পাঁচু! নিকুঞ্জ! এখন কোথা হ'তে এলি তোরা?" আমরা তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে উঠে তাঁর শুভ্র সুকোমল চরণ দুটি স্পর্শ করে নিজেদের ধন্য মনে করলাম। কোনও উত্তরের অপেক্ষা না করেই তিনি বল্‌লেন, "মুখ দেখে মনে হচ্ছে, তোদের খাওয়া দাওয়া হয়নি। তোরা বাড়ীর মধ্যে চল্, খাওয়া দাওয়া সেরে নিবি। মনু এখন ওঠেইনি, তার খেতে অনেক দেরী। আয় আমার সঙ্গে।" আমি একটা ক্ষীণ আপত্তির সুরে বললাম, "মহারাজের মুখে বীরবলের গল্প শুনব ঠিক করেছি এইমাত্র;" বলতেই মহারাজ বললেন, "না, না, তোরা আগে বাড়ীর মধ্যে গিয়ে পেট ঠাণ্ডা করে আয়। খালি পেটে গল্প ভাল লাগে না। আমি ত' সেইজন্যই তোদের মহারাণীর কাছে টেলিপ্যাথি করলাম। বুঝতে পারলিনে! আর, অম্‌নি উনি এসে হাজির! একেই বলে টেলিপ্যাথি!" বলে, মহারাণীমার মুখের দিকে বিনয়ের সুরে যেন অভিনয় করে বললেন, "মহারাণী! আপনি কী বলেন? এরকম টেলিপ্যাথি কতবার হয়েছে তার হিসাব কি আপনার কাছে আছে?" আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসে। তাঁদের দৃষ্টির অন্তরালে যথার্থই কোনও হিসাব-নিকাশ ঘটেছিল কি না, কী করে বুঝব আমি! শুধু মনে আছে—মহারাণীমা আমাদের হাত ধরে মহারাজকে বললেন, "খুব হয়েছে, তোমার আর তামাশা করতে হবে না। গল্প ওরা পরে শুনবে। এখন খাইয়ে নিয়ে আসিগে এদের;" বলে, আমাদের সঙ্গে নিয়ে মৃদুমন্দ চরণচ্ছন্দে অন্দর বাড়ীর দিকে চললেন তিনি।

সেই ধীর চরণসঞ্চার! অতি ক্ষুদ্র এই বাস্তব ঘটনা স্মরণ করতে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে যাই। আমার দুর্বল লেখনী দুর্বলতর হয়ে পড়ে। সেদিনকার সেই বাস্তব মুহূর্তগুলির মধ্যে আমার চোখে মহারাণীমা ও মহারাজ বিশিষ্ট মানুষের রূপেই ত' দেখা দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন মনে করতে গিয়ে দেখি—সেই চরণধ্বনি আমাকে কোথায় নিয়ে যায়, কী সংবাদ শোনায়! সেই ক্ষণে সত্য-সত্যই হর-পার্বতীর রহস্য-কৌতুকেরই আদান-প্রদান হয়ে গেল, দুই নিমেষের মধ্যে। কে বর্ণনা করতে পারে সেই অনির্বচনীয় রহস্যের মর্মকথা, সেই করুণাগর্ভ কৌতুকের অমৃতময়ী বাণী! অন্তত আমি ত' নই। ঘটনাকে মাত্র প্রত্যক্ষই করি আমরা; ঘটনার অন্তরালে দেবতার পূজা ত' করি না। আর, আজ আমার স্মৃতি কোন্ মহাস্মৃতির পূজা করছে, অনুভবের নৈবেদ্য দিয়ে! সেই মহাস্মৃতির রহস্য বুঝি না; সে অনুভব কোথা থেকে এসে ঝলকে দেখা দিয়ে যায় তাও জানিনে; আর অন্তরের পূজার ঘরে কে কখন সেই নৈবেদ্য সাজিয়ে রেখেছে তাও জানিনে। মাত্র এইটুকুই বুঝি, বুঝে ক্ষান্ত হওয়ার চেষ্টা করি, মনো-মন্দিরের গোপন দুয়ার সব সময়ে উন্মুক্ত থাকে না। আজ এই মুহূর্তটিকে আমি কিছুতেই উপেক্ষা করব না। অতীত প্রত্যক্ষের মুহূর্তে, অন্তরাত্মার গভীরে মহাস্মৃতির আনন্দধামে, আমার অজ্ঞাত-সারেই সঞ্চিত হয়েছিল না জানি কোন্ সুকৃতির কুসুমসম্ভার যা এখন অকস্মাৎ দেখা দেয় স্মরণের নৈবেদ্য হয়ে। একে কি অবহেলা করতে পারি! এ যে নিতান্তই আপনার; একান্তই আপন অন্তরের সুকৃতি সঞ্চয় সেই চরণধ্বনির প্রতিধ্বনি!

অন্দর বাড়ীতে যখন আমরা খেতে বসেছি, যথার্থ কথা বলতে, ভোজন ব্যাপারে মনোনিবেশ করেছি আর মহারাণীমা স্বয়ং অন্নপূর্ণারই রূপে পরিবেশন করছেন, তখন কথায় কথায় নিকুন বলে ফেল্‌ল কালে খাঁ সাহেবকে শিকার করার কাহিনী; অবশ্য সে যতটুকু বুঝেছিল। নিকুনের ব্যবহার দেখে মনে মনে রেগে গিয়েছিলাম; তার চিত্তের বিক্ষেপ দোষ দেখে ব্যথিত হয়েছিলাম। অর্থাৎ ঠিক সেই সময়টিতে অহৈতুকী কৃপার জ্বলন্ত দৃষ্টান্তের রূপে আমাদের থালায় পরিশায়িত হয়েছিল কদাচন কোনও সুবৃহৎ চিত্রফল্লিকা মৎস্যের উৎকৃষ্ট অংশের পাকপরিণামসম্ভূত অতুলনীয় সুদর্শন খণ্ডযুগল; প্রাথমিক ধ্যানের অপেক্ষায়। আমি সবেমাত্র চিত্তবৃত্তিকে একাগ্র করে তাদের ধ্যান-ধারণায় উদ্যত হয়েছি, এমন সময়ে নিকুনের কথায় আমার ধ্যান ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। এতে কার না রাগ হয়। পরে একদিন ঐ কথা তুলে নিকুনকে তিরস্কার করে বলেছিলাম অমন প্রত্যক্ষ মনোহারী সরষে বাঁটা ঝাল রসের চিতল মাছের পেটিতেই যখন তুই ধ্যান ঠিক করতে পারলিনে, তখন বুড়ো হ'লে অলক্ষ্য, নির্গুণ, নিরাকার ব্রহ্মে তুই কি করে মন স্থির কর্‌বি? তোর ভবিষ্যৎ অন্ধকার, ইত্যাদি বলে তাকে বিভীষিকা দেখালাম। কিন্তু মনে মনে তাকে ক্ষমা করে ফেলেছি তখন। সে যখন অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চাইল, তখন বললাম তাকে ক্ষমা হয়ে গিয়েছে কবে; তোর নূতন অপরাধের প্রতীক্ষায় আছি। ভাগ্যে নিকুন অপরাধ করত, আর আমার ক্ষমা ধর্মকে শান দিয়ে দিত মাঝে মাঝে!

নিকুনের মুখে বিবরণ শুনে মহারাণীমা খুবই চমৎকৃত হয়েছিলেন আমাদের আগ্রহ আন্দাজ করে বল্‌লেন "তাঁকে এখানে নিয়ে এসে তোরা ভাল করে গান শুনলেই ত' পারিস্।" আমি তখনই বললাম "মহারাজ আধা-আধি মঞ্জুর করে বাঁকিটা আপনার জন্য রেখেছিলেন। সেটাও আদায় করলাম আপনার কাছে।" তাঁর দিকে তাকিয়ে মনে হ'ল স্নেহ-বাৎসল্যের অবদানে সেই মাতৃমূর্তি উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে। সেই অনুপম স্বচ্ছ দৃষ্টির মধ্যে আমাদেরই ঔৎসুক্য প্রতিবিম্বিত

হয়েছে; অধরপ্রান্তে সেই স্মিত হাসির রেখার মধ্যে লেখা রয়েছে আমাদেরই আশার ভবিতব্য! সে ছবি কখনও মুছে যায় না; ভবিতব্যের সে রকম লেখা কখনও তো বিফল হয়নি!

ভোজনপর্ব শেষ হলে সংবাদ পেলাম কুমার বাহাদুর (বর্তমান মহারাজ শ্রীযোগীন্দ্র-নাথ রায়) স্নান করতে গিয়েছেন। অর্থাৎ দু ঘণ্টার আগে তাঁর সঙ্গে দেখা হচ্ছে না। কুমারের তখনকার স্নান বলতে আমি বুঝতাম গ্রহণস্নানের ব্যাপার। প্রথমে পোষ্য-প্রেষ্যদের কৃত অভ্যঙ্গ-সংবাহন প্রভৃতি দিয়ে গাত্র স্পর্শের জন্য হ'ত স্পর্শস্নান। মধ্যপর্বে বাথ-টাব্ নামে বিরাট আকৃতির মর্মরদেহী যেন রাহুর কবলে চন্দ্রের অবস্থান ও বিলীন হয়ে যাওয়ার একটা বিলম্বিত ব্যাপার। শেষ অর্থাৎ মোক্ষপর্বে—বাথ-টাবের গ্রাস থেকে মুক্ত হয়ে "শাওয়ার-বাথে"র ঝরণাধারায় মুক্তিস্নান করে স্নানপর্বের সমাধা; সেদিনকার একবেলার মত! এর পরেই মণি-রত্নাদি ধারণ করে যেন সাক্ষাৎ পূর্ণচন্দ্রের মতো কুমার আবির্ভূত হতেন পাশের আরাম কামরায়। আমরা ভাগ্যক্রমে সেখানে উপস্থিত থাকলে কিছু অমূল্য দানপর্বও নিষ্পন্ন হতে দেখেছি। যথা কাউকে স্নিগ্ধ কটাক্ষের জ্যোৎস্না দিয়ে মোহিত করা; কাউকে বা বিচিত্র ভ্রূক্ষেপ বা গাত্রবিক্ষেপের পবন হিল্লোল দিয়ে কাউকে বা সহাস পরিতোষের কোকিল কূজন দিয়ে বিভ্রান্ত করে দেওয়া ইত্যাদি রকমের দানখণ্ডগুলিকে অমূল্য বলেই মনে করেছি আমি।

কুমারের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিনই বুঝেছিলাম তিনি বিশেষ করে ধ্রুপদ গানের মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে স্বর-শ্রুতির সুধা পান করে আকুল হওয়ার ব্রতই যেন গ্রহণ করেছেন। মনে পড়ে যায় সেদিনের ঘটনা। রাজবাড়ীর উত্তরদিকের গাড়ী-বারান্দায় উপরে সুসজ্জিত আসরে স্বয়ং বিশ্বনাথ ওস্তাদজী আসন গ্রহণ করেছেন; তাঁর এক পাশে কুমার আর অন্য পাশে ব্রজেন্দ্র গাঙ্গুলী দু' জনের হাতে তম্বুরা; চাটুর্যে মহাশয় (গিরীশ চট্টোপাধ্যায়) পাখাওজ নিয়েছেন প্রবীণ মদনমোহন ভট্টজী পাশে বসে উৎকর্ণ হয়ে সুর ও ছন্দের সহ-যোগিতা লক্ষ্য করে বসে আছেন ধ্যানীর মত। বিশ্বনাথজী একবার গান করেন তার পরেই গান করেন কুমার, তার পরেই ব্রজেন্দ্রবাবু। গান হচ্ছিল "মোকো তো তিহারো ভরোসা" শ্রীআনন্দকিশোর রচিত খাম্বাজের চৌতাল। বিশ্বনাথজীর কণ্ঠে স্বরশ্রুতির লীলা আভাস দিচ্ছিল যেন বিদ্যুতের চমৎকৃতির মত, গানের দিগন্তকে মুহূর্তে উদ্ভাসিত করে; সূক্ষ্ম, মধুর, সুললিত কণ্ঠে কুমার যেন সাদর আহ্বান জানাচ্ছিলেন খাম্বাজের চকিত মনোহর সেই মূর্তিকে; ব্রজেন্দ্রবাবুর কণ্ঠে ছিল ধ্বনির মাধুর্য, দূরাগত হর্ষ আর বিহ্বলতা! কাকে দেখি কাকে শুনি, কাকে ফেলি! তম্বুরা গুঞ্জন আর মৃদঙ্গের ধ্বনির মধ্যে দিয়ে প্রথম ও অন্তরের পরিচয়; এ রকমের কুটুম্বিতার আস্বাদ জীবনে আর ত' পাইনি, কোথাও, কখনও!

ক্রমশ পরিচয়ের মধ্যে প্রকাশ হয়েছিল কুমারের স্বর্গসন্ধানী হৃদয়ের; স্বর্গ অর্থাৎ
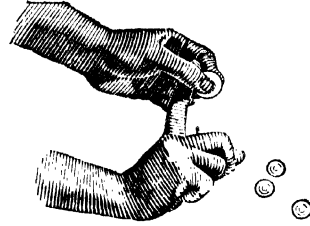
বাণী সুর ও ছন্দের অলকনন্দা যে দিব্যধাম থেকে উৎসারিত হয়ে মর্ত্যলোককে প্রবাহ প্লাবিত করে চলেছে, সঙ্গীতের সেই কল্প-লোক, রাগ-রাগিণীর সেই অমরাবতী। মানব হৃদয়ের শত সহস্র কলুষের সংস্পর্শ সেই ত্রিধারার আবিলতা ঘটাতে পারে না, শত সহস্র বিরুদ্ধ প্রভাব সেই ত্রিধারার গতি ও বেগকে নিরুদ্ধ করতে পারে না, শত সহস্র রুচিভেদ সেই ত্রিধারার সনাতন স্বরূপের অবলোপ সাধন করতে পারে না। কুমারের ললিত মধুর কণ্ঠে কত বার শুনেছি বাংলা টপ্পা কীর্তনগীতি ছোট ছোট খেয়াল, রবীন্দ্র গীতি, গজল, আরও কত কী। সুরে একপ্রাণতা আর সমান অনুভূতি দিয়ে আমাদের বন্ধন হয়েছিল দৃঢ় অথচ মধুর। বন্ধন শিথিল হয়েছে বলে সন্দেহ হয়নি এখনও।

সেই তরুণ সহৃদয় রসপ্রবণ স্বরূপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের কোনও এক দিন নিভৃতে তাঁর স্নানের প্রসঙ্গ তুলে ঐ সকল কথা বলেছিলাম তাঁকে। কৌতুক কটাক্ষের সঞ্চারে তিনি হাসতে হাসতে বল্‌লেন, "পাঁচুবাবু! পদ্য-টদ্য লেখা অভ্যাস আছে না কি আপনার?" আমি বললাম "ছিল না। কিন্তু আপনার কাণ্ডকারখানা দেখে যেন একটা প্রবৃত্তি চেগে উঠছে।" তিনি ভ্রূকুটি করে বললেন, "যথা?" আমি বললাম, "ধরুন, আপনিই যেন চন্দ্র; কিন্তু আকাশের চাঁদ থেকে লাখোগুণে ভাল, কারণ, হাতের কাছে পাওয়া যায় আপনাকে;" ইত্যাদি। তিনি তখনই বললেন, "আর কলঙ্কটা?" আমি বললাম, "সে ত' বোঝাই যাচ্ছে! যে সম্বন্ধের ভারে আপনি হাতের কাছে নেমে এসেছেন, সেই সম্বন্ধটাই ত' এ চন্দ্রের কলঙ্ক! এ কলঙ্ক ত' ঘুচবে না, আপনার!" ঐ সাঙ্ঘাতিক কথা শুনে মুহূর্তের পরাজয় হয়েছিল তাঁর। কিন্তু সামলে নিলেন তিনি বাক্যের যুযুৎসু প্যাঁচ দিয়ে; বললেন তিনি, "দোহাই পাঁচুবাবু, যা বলেছেন বলেছেন আর বলবেন না যেন। নইলে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে আপনার সঙ্গে।" কথার যুযুৎসু দিয়ে হেরে যাওয়ার ভাণ করেই জিতলেন তিনি; সত্যকারের পরাজয় আমাকেই স্বীকার করতে হ'ল সেই নিরহঙ্কার হৃদয়ের কাছে। তখনই কফি পরিবেশনের হুকুম দিয়ে হয় সাময়িক সন্ধির প্রস্তাব। প্রস্তাবের সূচনা তিনি করলেন, পরজ-কালংড়ার মধুমাখান একটি গানের বাণ সন্ধান করেঃ "কলঙ্কেতে ভয় করো না বিধুমুখি।" কানের মধ্যে দিয়ে সেই বাণটি আমার হৃদয়কে বিদ্ধ করেছে; সেই মাধুর্যও সংক্রামিত হয়েছে, অজ্ঞাত-সারে। আমিও মাঝে মাঝে সুর ছাড়ি। দু'জন সুর-পাগলার নিভৃতে মিলন হ'লে যা ঘটবার তাই ঘটে; অর্থাৎ কখন যে কফি দিয়ে গিয়েছে খেয়াল নেই আমাদের। গান থামলে দেখি কফি জুড়িয়ে জল! এ যেন মিলনের পর সন্ধির মূল প্রস্তাবটাই বাতিল হয়ে গেল, এতই ঘটা সে মিলনের! আবার নূতন করে প্রস্তাব হয়, টাটকা গরম কফি আসে; ভবিষ্যৎ কোনও যুদ্ধের আগেই সন্ধির প্রস্তাব করে তাতে শীল-মোহর দিয়ে রাখি আমরা।

এখন তিনি আর কলঙ্কের ভয় করেন না। পরজের সুরসন্ধানী নিষাদের পর্দা থেকে প্রাণের সুর নেমে এসেছে বিনীত অভি-মানের গান্ধারে। জীবনের পুঞ্জীভূত অনু-রণনগুলি বিশ্রান্ত হতে চায় যেন খাম্বাজের সুরে, যেন একটি গানে—

> ধীরে, ধীরে করো পার;
> আমরা গোপের নারী না জানি সাঁতার!
> তরী করে টলমল পসরাতে উঠে জল,
> মাঝখানে ডুবালে তরী কলঙ্ক তোমার!

একটা দুঃখ থেকে গেল জীবনে। গান জিনিষটা লিখে শুনান যায় না। তা যদি যেত—তাহ'লে জীবনসন্ধ্যার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি চেষ্টা করে যেতাম। সেটা যখন হওয়ার নয়, তখন মূল প্রসঙ্গেই ফিরে যাই।

কুমারের স্নান পর্বের কথা মনে করে আমি একা চলে গেলাম মহারাজের নিকট আমার ভগ্নি বধূরাণী কি একটা কাজে নিকুনকে ধরে রেখেছিলেন।

মহারাজ তখনও বই পড়ছিলেন। আমি উপস্থিত হতেই আমাদের আহারাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন; উত্তর শুনেই বললেন, "মনুর (কুমারের আটপউরে নাম) সঙ্গে দেখা করে বলবি আজ রাত্রিতে এখানে সাহিত্যের আসর আছে আমাদের। আমি ঠিক করেছি কালে খাঁর গান কাল সন্ধ্যার মজ্‌লিসে হ'তে পারে। ওস্তাদজী (বিশ্বনাথজী) আর অন্যদের জানিয়ে রাখে যেন আগে থেকে;" বলে তিনি মৌন হলেন। আমি অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে বল্‌লাম, "বীরবলের সেই গল্পটা কি এখন বলবেন?"

তিনি বললেন, "ঠিক কথা মনে করিয়ে দিয়েছিস;" বলেই উঠে বসলেন কোলবালিস নিয়ে।* "আচ্ছা, তাহ'লে শোন্, বলি," আরম্ভ করে তিনি একটি কাহিনী বলে গেলেন; অতি চমৎকার। গল্পের মূল কথা —বীরবল ও একজন অজ্ঞাতনামা ধ্রুপদ গায়ক অপ্রত্যাশিতভাবে মিলিত হয়েছিলেন বাদশাহ আকবর ও মিয়াঁ তানসেনের সঙ্গে; বাদশাহের খাস্ কামরায়। মীরা বাইকি মল্লার নামে একটি রাগিণীর কিম্বদন্তীও জড়িত ছিল তার সঙ্গে। শেষ কথা—অর্থাৎ আসল কথা ছিল, গান মাত্রেরই কিছু আন্তরিক নিবেদন আছে, প্রকাশ্য আবে-দনের রূপে যাকে ফুটিয়ে তোলাই গুণীর পক্ষে চরম কৃতিত্ব, আর, যাকে অনুভব দিয়ে হৃদয়ের আসনে বরণ করে নেওয়াই শ্রোতার চরম সার্থকতা।

তখন সদ্য কালে খাঁ সাহেবের মুখে গান শুনে আমার মনপ্রাণ ভরে আছে। সেই কাহিনীর মর্মকথাগুলি আমার মনে বিচিত্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল; যাকে শান্ত করতে পরে অনেক সময় কেটে গিয়েছে। দ্বিতীয়বার কালে খাঁ সাহেবের গান শুনার পরে একটা মীমাংসার কূলকিনারা পেয়েছিলাম। কূলের কথা পরেই হবে। আপাতত গল্প শুনে মহারাজের নিকট বিদায় নিয়ে যখন কুমারের সঙ্গে দেখা করতে চলেছি, তখন একেবারেই অকূলে ভাসছি। অকূল অর্থাৎ কালে খাঁ সাহেবের কণ্ঠধ্বনি আশাওরির এমন এক অপূর্ব সমুদ্র প্রত্যক্ষ করিয়েছিল যার মধ্যে কথার বাঁধন দিয়ে তৈরী করা গানের তরণীখানির অস্তিত্ব বিলুপ্তই হয়ে গিয়েছিল সুর-লহরীর বিক্ষোভলীলার মধ্যে; স্থায়ী কূল-কিনারা বলতে কিছু ছিল না যেন। সে গানের মর্মকথা বা 'অরমাঁ' ত' ধরে ছুঁয়ে পাচ্ছি না। এ রকম কূলহারা অনুভবের তলাতল কোথায়, আর, পারে উঠলামই বা কেমন করে!

কুমারের আরাম কক্ষে উপস্থিত হয়েই দেখি কুমারের সঙ্গে নিকুন গল্প করছে। পরস্পর প্রীতি সম্ভাষণের পরে কুমারই উৎ-সুক নয়নে জিজ্ঞাসা করলেন, "পাঁচুবাবু, নিকুন যা বলল, তার সবই সত্য?"

অতি সংক্ষেপে ঐতিহাসিক নিষ্পত্তির ভাষায় 'সবটাই সত্য' বলে চরম সত্যটা জানিয়ে দিতে চেষ্টা করলাম সুরে, গান করে, "ননদিনি বলো নগরে সবারে; ডুবেছে

[* দেশ পত্রিকায় ১৩৫৭ সাল ১২ই ফাল্গুনে সংখ্যায় এই গল্পটি প্রকাশিত হইয়াছিল—লেখক

রাই রাজনন্দিনী কৃষ্ণকলঙ্ক সাগরে;" বল্‌লাম কালে খাঁর আশাওরির দরিয়ায় হাবু-ডুবু খেয়ে ফিরেছি আমরা। পরে, কাজের কথা উঠিয়ে বললাম, মহারাজ আপনাকে বলতে বললেন যে, কাল সন্ধ্যায় কালে খাঁ সাহেবকে নিয়ে এসে গান শোনার ব্যবস্থাটা আজই করা যেতে পারে, ইত্যাদি। মহারাজ একটি চমৎকার গল্প বললেন, বীরবলের সম্বন্ধে ইত্যাদি।

কুমার কিন্তু কল্পনায় আশাওরির দরিয়ায় পাড়ি দিতে ইচ্ছা করেন; বলতে থাকেন, "পাঁচুবাবু গলায় একটু সুরের ভাজ দেখান, কেমন সে আশাওরি।" আমি তাঁকে অনেক কষ্টে বুঝলাম যে, ও কাজ এখন একেবারেই বাতিল, অসম্ভব; ধ্যানটা থিতিয়ে গেলে, তবে একটু জলে নামার চেষ্টা করা যেতে পারে। এখন সবে বান্ ডাকার অবস্থা। তখন তিনি কালে খাঁ সাহেবের প্রসঙ্গে কাজের কথাই তুললেন।

কথায় কথায় তম্বুরার প্রসঙ্গ উঠল। বল্‌লাম তম্বুরা ত' দেখলাম না ত্রিসীমানায়; আছে কি না সন্দেহ। তবে ভাবনা নেই। আপনার সুরের যাদুঘর রয়েছে। তা থেকে তম্বুরা বার করে বিশ্বনাথজী বা ব্রজেন্দ্রবাবুকে দেখিয়ে নিলেই ত' হবে। কি বলেন?"

কুমারের মহলে উত্তরদিকের গাড়িবারান্দার উপরে সুন্দর করে সাজান 'কার্পেট বিছান' সেই ঘরটি ছিল যেন সঙ্গীত-নিকুঞ্জ। সেই ঘরে বিরাট আয়তনের কাচ-বসান একটি আলমারিতে ছিল রবাব, সুরশৃঙ্গার, সুরবাহার, সেতার, বড়-ছোট এক জোড়া দিলরুবা, এস্রাজ, দুটি তম্বুরা, দুটি পাখাওজ, খোল, খঞ্জনী, করতাল আর তবলার যুড়ী। কতবার যে এদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকেছি, তার সংখ্যা নিষ্পত্তি হয় না! কখনও মনে হয়েছে এরা যেন কাঠ চামড়া লোহা পিতল দিয়ে গড়ে তোলা জমাট-বাঁধা সুরের সংযত তপোমূর্তি! আবার মনে হ'ত, যেন কোন্ অচিন্ সুরমূর্চ্ছনার স্বপ্নকে হৃদয়ে ভরে নিয়ে অভিশাপের সুষুপ্তির মধ্যে নিমগ্ন হয়ে আছে দিব্য বিদ্রোহিনীর দল; প্রতীক্ষা করে আছে কোনও দরদী কলাবন্তের যাদুস্পর্শের নিমিত্ত! ঐ আলমারির নাম দিয়েছিলাম সুরের যাদুঘর। সাধারণ, নিত্যকার মজ্‌লিসের জন্য পৃথক তম্বুরা প্রভৃতিও ছিল। আর কুমারের প্রিয় সুরসুকুমারী সেতারটি থাকত বিশ্রাম ঘরে। ওস্তাদ্ কেরামতউল্লা খাঁ সাহেবের পরিকল্পিত জম্‌কালো স্বরোদটি তখনও আবির্ভূত হয়নি।

কুমার বললেন, "ঠিক ঠিক, আপনি যা বলেছেন তাই হবে। সন্ধ্যার সময়ে ব্রজেন বাবু এলেই ঠিক্-ঠাক্ বন্দোবস্ত করা যাবে। আর ওস্তাদজীকেই বলব সঙ্গতীয়ার কথা, কি বলেন?"

ব্রজেনবাবু অর্থাৎ ব্রজেন্দ্র গাঙ্গুলীর স্মৃতি দেখা দেয় মনে। ইনি ওস্তাদ্ বিশ্বনাথজীর শিষ্য ছিলেন, এ কথা বল্‌লে এঁর যথার্থ পরিচয় দেওয়া হয় না। ইনি যখন ধ্রুপদ গান, বা রবীন্দ্রনাথের গান, বা রজনী সেনের গান করতেন তখন এঁর কণ্ঠ থেকে ভেসে আসত বংশীধ্বনির প্রাণ-জুড়ান সুর, আর আবেশভরা বাণীর মূর্তি। কিন্তু —জাতীয় সঙ্গীত, বিশেষ বঙ্কিমের 'বন্দে-মাতরম্' গান করার সময়ে এঁর কণ্ঠধ্বনি ভরে উঠত দীপ্ত, মধুর, ওজস্বী একরকমের সুরে, যা এখনও আমার কানে বাজে, স্মরণে উদ্দীপনা আনে। বন্দেমাতরমের সুরটিই সমুজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয় আমার স্মৃতিতে আজ। তিলক-কামোদ রাগিণীর বাহনে, অপরূপ একটি সুরধ্যান দিয়ে অভিষিক্ত সেই মহীয়সী মাতৃপূজার আবাহনী বাণী! বীর ও অদ্ভুত রসের অলৌকিক ভাব-বিভাবনাগুলি যেন স্বতই উচ্ছলিত হয়েছে লৌকিক শৌর্য বীর্য উৎসাহের শব্দ-ছন্দোময়ী প্রস্রবণধারায়! সেই ধ্যান, সেই ভাব, সেই বিভাবনাই আমার অন্তরকে নিষিক্ত, দ্রবীভূত করে দেয় আজও। শত শত ধন্যবাদ জানাই আমি ব্রজেন্দ্র গাঙ্গুলীর স্মৃতিকে; তিনি গান করে আমার আন্তরিক শ্রবণ-প্রত্যক্ষে মায়েরই ডাক শুনিয়ে দিতেন। বন্দেমাতরমের গানের সে সুর ও ছন্দের মধ্যে ছিল না ভাবের দ্বন্দ্ব, ধ্যানের বিক্ষেপ, ধ্বনির পরাভব। আজকের গানের সুর ও ছন্দ আমার অনুভবকে ক্লিষ্ট করে। আজকের দিনের দেশমল্লারে বর্ষারম্ভের আলো ছায়া, দূরবিরহকাতরার বিপ্রলম্ভ, বেদনাতুর কান্তার হা-হুত ধ্বনি, তান-গিটকারীর শৃঙ্গার রচনা, আর অলঙ্কারচমৎকারী বন্দে-মাতরমের মর্মভেদ করেই তার স্বরূপকে বিকৃত করে ফেলেছে। এ ত' মায়ের আগমনী নয়; এ যেন বিরহিনী নায়িকার অভিসার-কল্পনা। আমার ভাল লাগে না এ ব্যাপার। অন্যের মন জানি না, তাঁদের কথা বলতে পারি না। আমি জানি সে যুগকে পিছনে ফেলে এ যুগ অগ্রগতির সুরে আত্মসমর্পণ করেছে। কিন্তু অন্তরের অনুভবের গতি

নেই, প্রবাহ নেই; আছে মাত্র হৃদয়ের স্পন্দ, ভাবের তরঙ্গে উঠা-নামা। সুপ্রাচীন কালের 'স্ফোট' বা স্পন্দবাদের কথা তুলে লাভ নেই; আধুনিক বিজ্ঞানের তরঙ্গবাদের প্রসঙ্গ করতে চাইনে। আমি জানি মনের ভাবের গতি নেই, স্থানান্তর হয় না; সম্ভব মাত্র উত্থান আর পতন, আবির্ভাব আর তিরোভাব।

আজকের যুগপ্রগতির লম্ফ-ঝম্পসার মুহূর্তগুলির মধ্যে মাতৃপূজার আসর জমেছে ভাল! আরম্ভেই বন্দেমাতরমের আর্তনাদ; এর মধ্যে পাই বিসর্জনের ধ্বনি। কিসের বিসর্জন? সঙ্গীতের বাহনে মাতৃ-মূর্তির বিসর্জন! শেষের দিকে ভেসে আসে চলচ্চিত্রের চর্চরীপ্রবাহ; ভাসিয়ে নিয়ে আসে উচ্ছৃঙ্খলতার উপচার, রিরংসার মৌসুমী কুসুমদল! পৈশাচিক উল্লাসসূত্রে দিয়ে গ্রথিত এই আদ্য আর উপান্তের কী সুন্দর মালাই না রচনা করতে লেগেছেন আধুনিক স্বয়ংসিদ্ধ রূপদক্ষের দল; চিত্রে, শিল্পে আর সঙ্গীতে! দু'চারজন বিষাদ-বায়ুগ্রস্ত ব্যক্তি ব্যাপার প্রত্যক্ষ করে ভীত হয়েছেন; দু' চারজন দুর্বলচিত্ত সামাজিক ব্যথিত হয়েছেন; অন্য কেউ কেউ অভিযোগ করেছেন যে, বন্দেমাতরম খণ্ডিত, কর্তিত হয়ে গেল, কী সর্বনাশ! আমি মনে করি এতে ভয় বা দুঃখ করা বৃথা; সহ্য করতেই হবে যে একে! তা হ'লে—কালে খাঁ সাহেবের কথাতেই বলি, "ঠিক্ হ্যায়; মগর শুনিয়ে বাবুসাব্।" প্রবাদ আছে, যে কাঠায় মাপ, সে কাঠাতেই শোধ। শক্তি-মাতৃকার পরিমাপ করেছিলাম ত' আমরাই পঞ্চ-মকারের কাঠায়; বহুদিনের কথা সেটা। প্রতীচ্যের জড়বাদের কাঠা দিয়ে প্রতিমা-মূর্তির পরীক্ষা করতে প্রস্তুত হয়েছি এখন; প্রতিমা ত' মাটি পাথর কাঠ পিতলের পুতুল! দেব-বিগ্রহ ত' দেশের গলগ্রহ! আবার—শুম্ভ-নিশুম্ভের দৃষ্টির মাপ-কাঠা দিয়ে সম্প্রতি জগতের মাতৃকাদের নিরীক্ষণ করতে, আর বাহ্যিক রূপ-সৌষ্ঠবের মূল্য, পদক দিয়ে কৃতার্থ হ'তে চেষ্টা করছি। একেই বলে কাঠায় কাঠায় ধার আর শোধ; যা সবে আরম্ভ হয়েছে।

অন্তরার দিকে একটু এগিয়ে যাই; কারণ খাঁ সাহেবই বলেছিলেন, 'ফির্ আগে বাঢ়িয়ে বাবু সাব্!" আমি বলি ভয় বা দুঃখ করে লাভ নেই। এই ত' সবে আরম্ভ হ'ল চতুর্দশী আর অমাবস্যার সন্ধিক্ষণ; আর দেখা দিয়েছে সাইক্লোনের আগে সোঁওটা। ঐ যে উল্লাস, ওটা ত' রুদ্রগণের নিঃশ্বাস সঙ্কেত, ভূত পিশাচের নেপথ্য-রচনা। দক্ষের অর্থাৎ আধুনিক রূপদক্ষদের শিবহীন যজ্ঞ ত' সবে আরম্ভ হ'ল! আধুনিক মন্ত্রাচার্যের দল ত সবে বিলাতি উন্মাদনার আসব দিয়ে আচমন সেরে আঙ্গুলে নির্ভয় নিরঙ্কুশ কুশের আংটি চড়িয়েছেন। এখনই হয়েছে কী! আগে যজ্ঞটা শেষ হ'ক, তখন নিজের ঘাড়ে নিজের মাথাটা আছে কিনা হাত দিয়ে দেখে নিতে হবে। দক্ষের মুণ্ড বিজাতীয় ছাগমুণ্ড কি না, মায়ের বাহান্নপীঠ হবে কি চৌষট্টি পীঠ হবে এ সব ত' পরের কথা। এখন শুধু সাদা চোখে যজ্ঞটাই দেখি।

আর নয়; রজেন্দ্র গাঙ্গুলীর কণ্ঠে বন্দে-মাতরমের ধ্বনির স্মৃতিকে উদ্ধার করতে গিয়ে ময়লা-মাটি উঠে পড়েছে। স্মৃতির ডোলটা বিগড়ে গেল না ত? কিন্তু হাত ধুতে গিয়ে দেখছি আঙ্গুল জ্বালা করছে। মনকে জিজ্ঞাসা করি 'এ কেমন হ'ল?' মন বলে, 'ও কিছু নয়; ময়লা-মাটি ছাই গাদার মধ্যে গেলাস—বোতলভাঙ্গা কাচের টুকরা ছিল, তার খোঁচা লেগেছে। ভয় নেই; সঙ্গীতের পূর্বসূরি, গুণী, গায়কদের স্মরণ করো, জ্বালা দূরে যাবে।' তাই করি আমি। দেখি, গানের মধ্যে সঙ্গীতের মধ্যে পৌত্তলিকতার গন্ধ নেই, গন্ধ ছিলও না। কত শত মুসলমান গুণী গায়ক শ্রীকৃষ্ণ, শিব, গণেশের বিষয়ে পদ গান করে গিয়েছেন, গীত রচনাও করে গিয়েছেন এবং মুসলমান বাদশাহের দরবারেও সে সব গান গেয়ে গত হয়েছেন। সদ্য সদ্য কালে খাঁ সাহেবও ত' উচ্চারণ করলেন, 'তুয়া চরণ-কমল পর মন!' তখনই জ্বালা মিটে গেল প্রায় পনের আনার মত। বুঝলাম—বিলাতি বোতল আর গেলাসে ভরে আমরা ধার করে এনেছি পৌত্তলিকতার গন্ধবাতিক। সেকালে ঘট, কলসী বা মাটির ভাঁড়ও ছিল; কিন্তু তাদের ভাঙ্গা টুকরাগুলি গুঁড়ো হয়ে এই মাটিতেই মিশে গিয়েছে মহিষাসুরের খুরের চাপে, দেহের ভারে। কিন্তু একালের বোতল—গেলাস ভাঙ্গা কাচের কুচি এ মাটিতে মিশতে চায় না। সাবধান হয়ে যাই, ভবিষ্যতের জন্য।

তবুও একটি অস্বস্তি থেকে যায়। রজেন্দ্র গাঙ্গুলী এবং তখনকার পুলিন বাবুর (সৌখীন সুকণ্ঠ গায়ক পুলিনবাবু) কণ্ঠের গান আর বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়ের সুরকে ত' আমরাই চাপা দিয়েছি। এখন ফলভোগ করছি; জাতীয় প্রচার সঙ্গীতের নামে সভা-মজলিসের আরম্ভ ও শেষে উঠ্-ব'স করছি। প্রতীচ্য থেকে আমদানী করা একরকমের কণ্ডূতি রোগ আমাদের পশ্চাতে আক্রমণ করেছে; স্থিরাসনে বসে 'বন্দেমাতরম্' গান হ'তে পারে না, স্থিরাসনে ব'সে 'বন্দেমাতরম্' গান শুনলে হবে যুগদ্রোহ বা রাষ্ট্রদ্রোহ! বঙ্কিমচন্দ্র কি স্বপ্নেও ভেবেছিলেন তাঁর সাধনার সিদ্ধিকে মাঠে মাঠে লেফ্‌ট-রাইট্ তালে নেচে-কুঁদে পরীক্ষা দিতে হবে! অথবা, ঘরের মধ্যে ওঠা-বসা মাত্র আনুষ্ঠানিক উপোদ্‌ঘাতের বিড়ম্বনা সহ্য করে যৎকিঞ্চিৎ শ্রদ্ধার সঙ্কেতে পরিণত হতে হবে! ঐ তিনটি আত্মার নিকট ক্ষমা চাই, আমি! তবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বলতে পারি যে, সঙ্গীতের বস্তুকে যেন সঙ্গীতের রূপেই ভালবাসি। তাকে খাটিয়ে স্বার্থসিদ্ধি বা প্রচারকার্য সাধন করে তার অপমান যেন কখনই না করি আমি।

অন্যের কথা বলতে পারিনে; আমার অস্বস্তি আমিই দূর করেছি। এখন প্রসঙ্গে ফিরে যাই।

তম্বুরার প্রসঙ্গে কুমারের মুখে 'ঠিক-ঠাক' শব্দগুলি শুনে মনে পড়ে গেল সেই জারুল কাঠের তক্তার কথা। গাম্ভীর্যের অভিনয় করে বল্লাম, "বার-বার ওরকম 'ঠিক্-ঠাক্' বল্‌বেন না। ওতে বিপদ ঘটতে পারে।"

নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে যে কোনও দেশ কাল পাত্র ঘটিত বিপদের ইঙ্গিত মাত্র করলেই কুমার চম্‌কে উঠতেন, ভয় পেতেন। এই ছিল তাঁর স্বভাবের নিরতিশয় সৌকুমার্য। তাঁর জীবন-বীণার তারগুলি ছিল মিহি আর মোলায়েম; বাঁধা ছিল অত্যন্ত চড়া সুরে; যেন, তারের উপর মাছি বসলে রিণ্ ঝিন্ করে উঠে। খামখা কুমারকে জব্দ করে দেওয়ার ঐ কৌশলটি রপ্ত করেছিলাম আমি আর ননী। আমার মুখে অজানা বিপদের আভাস পেয়ে কুমার থমকে গেলেন। তখন সেই হুঁশিয়ার তক্তা-পোশের চরিত্র বর্ণনা করলাম; নিকুন এ কথাটা তাঁর গোচরে আনেনি। কথাগুলি শুনে কুমারের মুখে চোখে হাসি আর কৌতুক দেখে কে! বিলাসপ্রাচুর্যের মধ্যে ঘনসন্নিবিষ্ট উপকরণ দিয়ে সজ্জিত সেই আরাম কক্ষ যেন এতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে অপেক্ষা করছিল কুমারের সহাস সানন্দ ধ্বনির নির্দেশকে। মনে হ'ল এরা যেন এখন সজীব হয়ে প্রতিধ্বনি করছে; বিচিত্র ভঙ্গির

মর্ম্মর মূর্তিগুলি, আর চিত্রার্পিত কারু সুন্দরীরা যেন সচকিত উল্লাসে শিহরিত হয়ে উঠল। অর্থাৎ আমি যা দেখেছিলাম, বুঝেছিলাম। হয়ত' সে সব আমার দৃষ্টিরই ভ্রম; হয়ত' বা বুদ্ধির প্রমাদ মাত্র। কিন্তু তরুণ মনের সেই অনুভব করার প্রলিপ্সা এখনও ত' নিবৃত্ত হ'ল না। প্রত্যক্ষ বা কল্পনার সৌন্দর্যকে অস্বীকার করার মত পটুতা এখনও আমার হ'ল না; এ বিষয়ে আমার অপাটব দোষটা বহুকালের সঞ্চিত।

হাসি তামাশার রেশ চলেছিল, কিছুক্ষণের জন্য। তারই মধ্যে কুমার বলে উঠলেন, "যাই বলুন, পাঁচুবাবু, আমার হাতের তম্বুরা খাঁ সাহেবকে দেব না, বলে রাখছি।" আমি বললাম, "বুঝতে পেরেছি। নিকুন বোধ হয় খাঁ সাহেবের দেহশ্রীর কথা বলেছে আপনাকে।" তিনি হাসতে হাসতে বললেন, "ঠিক ধরেছেন আপনি;" বলেই, হঠাৎ থেমে গেলেন, আনমনা হয়ে। সেই সুশ্রী সুন্দর মুখখানি বিষাদের মেঘছায়ায় আবৃত হয়ে গেল যেন। খঞ্জনের মতো স্বভাব চঞ্চল চক্ষু দুটি অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে গিয়ে যেন দৃষ্টিকে লাঞ্ছিত প্রতিহত করে ফিরিয়ে দিল অন্তরের দিকে, মুহূর্তের মধ্যে। কোমল অথচ প্রগাঢ় স্বরে তিনি বললেন, "অত বড় গুণীর ওরকম বেহাল করলেন কেন, ভগবান!"

সেই এক সনাতনী জিজ্ঞাসা! এক নিমেষের মধ্যে বিচিত্র শব্দ-রূপের সেই রস্য পরিবেশ যেন অদৃশ্য হয়ে গেল আমার মনের মেঘাবরণের অন্তরালে। হাস-পরিহাসের উর্মিমালা বিলীন হয়ে গেল হৃদয়ের অক্ষুব্ধ অপরিমেয় গভীরে। চিরন্তনের প্রশ্নটিও যেন অন্তর্হিত হয়ে গেল মনের নেপথ্যে, মীমাংসার সন্ধানে। আমার মানস নেত্রে আবির্ভূত হলেন কালে খাঁ সাহেব: বিদায়কালীন সেই হর্ষোৎফুল্ল আভাস। আর একবার যেন শুনতে পেলাম তাঁর কথাটি, "বাবুসাব, আপনি সন্ধ্যাবেলা আসছেন ত?" সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের উদ্দেশে 'কেন' বা 'কি হেতু'র অভিযোগ ত' ছিল না এ প্রশ্নের মধ্যে। এর মধ্যে ছিল, দুটি অক্ষম, দুর্বল মানবহৃদয়ের পরস্পরের পরিচয়ের শেষে 'কবে' আর 'কখন' বলে কিছু প্রতীক্ষার বার্তা, সুযোগের সন্ধান, আশা আর আকুতির রেশ। তখনকার তখন আমার মনে এই শেষের ছবিটিই বড়ো হয়ে দেখা দিল; কুমারের প্রশ্নটা যেন কিছু নয়। কিন্তু—সন্দেহ হয়, কি জানি, হয়ত' বা সেই সনাতন প্রশ্নই অনন্তের কূল না পেয়ে ঘুরতে ঘুরতে শতধা খণ্ডিত হয়ে ফিরে আসে, আর যে যেমন পারে ভিড়িয়ে যায় —মানুষের সান্ত মনেরই কিনারায়; এই টুকরাগুলিই কি আমাদের আশা আর আকাঙ্ক্ষা!' তা হলেও—হৃদয়ের উপকূলে ভিড়িয়ে যাওয়া এই আশা আকাঙ্ক্ষার টুকরাগুলিই আমাদের প্রেয়, আর নির্ভর-যোগ্য। বড় বড় সনাতনী প্রশ্নের দার্শনিক মীমাংসা দিয়ে মন মজে না, কাজ মিটে না, মানব জীবনের।

এমন সময়ে কুমারের কোনও স্বজন এসে মৃদুস্বরে সংবাদ দেয়, তাঁর আহার্য সজ্জিত হয়েছে। তখন প্রায় দু'টা বাজে! কুমারের নিকট বিদায় নিলাম আমি। তিনি শেষবারের মত অনুরোধ করলেন, কালেখাঁ সাহেবকে নিমন্ত্রণ করা, আর আগামী সন্ধ্যায় তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে আসা, এ দু'টি ভার যেন আমিই নিই। আমার জীবনে আরও কয়েকবার ওরকম দায়িত্ব নিয়েছি স্কন্ধে। কিন্তু প্রতিবারই সেটা আমার মাথার উপরে উঠে গিয়েছে, আনন্দের উপঢৌকন হয়ে। গুণীদের সঙ্গলাভ করা, তাঁদের সঙ্গে যাতায়াত করা ত' মহান্ সুনিমিত্ত বলেই মনে হয়েছে। সর্বপ্রথম কালেখাঁ সাহেবই এরকম ব্যাপারের স্বাদটি পাইয়ে দিয়েছিলেন।

রাজভবন থেকে ফিরে এলাম ননীদের বাসায়। ননী জানত নিকুন আর আমি হাওড়ায় গিয়েছি। আমাকে একলা ফিরতে দেখে প্রশ্ন করে ননী; আমি সব কথা বললাম তাকে। খুবই উল্লসিত হ'ল ননী; কিন্তু আশ্চর্য হয়নি সে। অভাবনীয় বলে যে ফল, তার রস আর শস্যই বেছে নিত', ঘটনার ছোবড়াকে সে আমলই দিত' না! তাকে বললাম, "ভাই, বাসায় ফিরে স্নান করতে হবে; তাড়াতাড়ি চা খেয়ে নিয়েই সাড়ে পাঁচটা আন্দাজ রওনা হব খাঁ সাহেবকে খবর দিতে। তুমি তৈরী হয়ে নেও, এক সঙ্গে যাওয়া যাক্। কালে খাঁ অদ্ভুত লোক।" আমি একটু অধীরই হয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল, বেলা বুঝি বয়ে গেল। ননী আমার কথা শুনে তড়াক করে লাফ দিয়ে ওঠে; কিন্তু প্রস্তুত হওয়ার জন্য নয়। উল্লাসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, আর মাঝে মাঝে গগন ওস্তাদের (স্বনামধন্য বিদ্যাসুন্দর টপ্পা গাইয়ে) ভঙ্গিতে কোমর দুলিয়ে, হাতে তালির চাপড় দিয়ে ননী সুর করে এক কলি ধরল—

ও যাদুমণি ধৈর্য ধরো, ধৈর্য ধরো;
এই ত' কলির সন্ধ্যাবেলা,
ভোর না হ'তে হও অ-ধর!"

কালংড়ার সুরে, আর আড়খেমটার ছন্দে। হীরা মালিনীর মুখে সুন্দরের রূপ-যৌবন গুণপণার পরিচয় পেয়ে বিদ্যা 'অ-ধর' হয়েছেন; তাঁকে যেন ধরে রাখা যাচ্ছে না। বিদ্যার ভাবগতিক দেখে হীরা ঐ কথাগুলি শুনিয়ে দিচ্ছেন রসিয়ে রসিয়ে।

অগত্যা ধৈর্য ধরি আমি ননীর কথায়।

(ক্রমশ)

শ্রীবিমল মিত্র

২

হঠাৎ চরিত্র মণ্ডল সামনে এল আবার—বললে—তা হলে আজ আমি হুজুর—

তার মানে! ওভারসিয়ার ভূতনাথ চোখ ফিরিয়ে দেখলে চারিদিকে। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। শীতকালের বেলা দেখতে দেখতে যায়।

বললে—তা' হলে ওই কথাই রইল—এই দাগেই হাত দেবে কাল সক্কাল বেলা—

চরিত্র মণ্ডল সেলাম করে চলে গেল। সঙ্গে দু'চারজন যারা অবশিষ্ট ছিল সবাই সেণ্ট্রাল য়্যাভিনিউ-এর দিকে পা বাড়াল। একটা কুকুর কোথা থেকে ভূতনাথের পায়ের কাছে ন্যাজ নাড়াতে লাগলো। ধুলোয় ধুলো সারা গা। সমস্ত দুপুর বোধহয় বসে বসে রোদ পুইয়েছে। এখন হয়ত ভাঙা ইঁটের স্তূপের মধ্যে আশ্রয় নেবে রাতটুকুর জন্যে। কেমন যেন মায়া হলো ভূতনাথের। যারা মালিক তারা কবে নোটিশ পেয়ে কোথায় চলে গেছে। কিন্তু কুকুরটা বোধহয় বাস্তুভিটের মায়া ছাড়তে পারছে না। ও-পাড়ায় গিয়ে—ওই হিদারাম বাঁড়ুয্যের গলিটা পর্যন্ত গেলেই চপ-কাটলেটের এঁটো টুকরো গিলে আসতে পারে। বউবাজারের পাঁটার দোকানের ফুটপাথে গিয়ে দাঁড়ালেও দু'চারটে টেংরি মেলে। তবে কীসের মায়া ওর? বাস্তু-ভিটের? কুকুর একটা—তার আবার বাস্তু-ভিটে—তার আবার মায়া।

—দূর—দূর—দূর হ—

ভূতনাথ কুকুরটার দিকে একটা লাথি ছুঁড়লে।

মেজদিদির অত সখের পায়রা সব। তা-ই রইল না একটা। এক-একটা লক্কা পায়রা ময়ূরের মতন পেখম তুলে আছে তো তুলেই আছে। হাতে করে ধরলেও পেখম উঁচু করে ছড়িয়ে থাকতো। কী সব বাহার পায়রার। তা-ই বলে একটা রইল না।

—দূর—দূর—দূর হ—

ক্রমে অল্প অল্প অন্ধকার হয়ে আসছে। দূরে বউবাজারের ট্রাম লাইনের ঘড় ঘড় আওয়াজ আরো কর্কশ হয়ে এল। রাস্তায় রাস্তায় আলো দেখা যায়। বনমালী সরকার লেন-এ আর আলো জ্বলবে না এবার থেকে। লোক চলবে না। ইতিহাস থেকে বনমালী সরকার বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

বনমালী সরকারের সঙ্গে এই বড়বাড়ির ইতিহাসও তো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কথাটা ভাবতেই ভূতনাথ কেমন যেন অবশ হয়ে এল। তারপর একবার আশে পাশে চেয়ে নিয়ে টুপ করে ঢুকে পড়ল সদর দরজা দিয়ে। কেউ কোথাও নেই, কে আর দেখতে আসছে তাকে। কিন্তু দেখতে পেলে হয়ত তাকে পাগলই ভাববে। ভূতনাথ পাশের ঘড়িঘরটার নিচে সাইকেলটা হেলান দিয়ে সোজা চলতে লাগলো।

তখন এই ঘড়িঘরের ঘণ্টার ওপর নির্ভর করেই সমস্ত বাড়িখানা চলতো।

সকাল ছ'টায় বাজতো একটা ঘণ্টা।

ব্রজরাখাল উঠতো তারও আগে। তারই মধ্যে তখন তার মুখ ধোওয়া, প্রাতঃকৃত্য সমস্ত শেষ হয়েছে। পাথর বাটিতে ভিজোন খানিটা ছোলা আর আদা-নুন নিয়ে কচ্ কচ্ করে চিবোচ্ছে।

—ওঠো হে বড়-সম্বন্ধী, ওঠো, ওঠো—ব্রজরাখাল ঘন-ঘন তাগাদা দেয়।

আড়া-মোড়া ভাঙতে ভাঙতে উঠতে দু'চার মিনিট দেরিই লাগে ভূতনাথের। তখনও একতলার আস্তাবল থেকে ঘোড়া ডলাই-মলাই-এর শব্দ আসে। ছপ্-ছপ্—ছপ্-ছপ্—হিস্-স্—হিস্-স্—ক্রপ্-ক্রপ্—। ওধারে দরোয়ান ব্রিজ সিং আর নাথু সিং-এর ঘরে তখন হুম্-ম্ হুম্-ম্ করে ডন্-বৈঠকের আওয়াজ হচ্ছে। সিমেণ্টের দাগ-বাজি করা সামনের উঠোনের ওপর দাসু জমাদারের খ্যাংরা ঝাঁটার খর-খর কর্কশ শব্দ আসছে। বোঝা যায়, সকাল হ'লো। আর চোখ বুজে থাকা যায় না—

ভূতনাথ দেউড়ি পেরিয়ে আরো সামনে এগিয়ে গেল।

বাঁদিকের এই ঘরটায় থাকতো ইব্রাহিম।

ইব্রাহিমের গালপাট্টা দাড়ির কথা এখনও মনে পড়ে ভূতনাথের। একটা কাঠের চিরুণী নিয়ে ছাদের নিচু বারান্দাটায় বসে ইয়াসিন সহিস ইব্রাহিমের লম্বা বাবড়ি চুল আঁচড়ে চলেছে তো আঁচড়েই চলেছে। কিছুতেই ইব্রাহিমের মনঃপূত হয় না। ইব্রাহিম কাঠের কেদারাটায় বসে এক মনে বাঁ হাতের কাঠের আর্শিতে মাথা কাত্ করে নিজের চুলের বাহারই দেখছে। কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই—

তারপর হঠাৎ এক সময় ফট্ করে উঠে দাঁড়াত। অর্থাৎ চুলটা বাগানো পছন্দ হয়েছে। এবার সে নিজের হাতে চিরুণী নিয়ে বাগাবে পাঠানী দাড়িটা।...এমনি করে চলতো সকাল সাতটা পর্যন্ত—

ভূতনাথ আরো এগিয়ে চললো পায়ে পায়ে—

ইতিহাসের সিংহদ্বার যেন আস্তে আস্তে খুলছে ওভারসিয়ার ভূতনাথের চোখের সামনে। সন্ধ্যে হয়ে এল। কিন্তু চল্লিশ-পঞ্চাশ - ষাট - সত্তর - একশো - দেড়শো বছর পেছনে যেন ভূতনাথ চলে গেছে। কালের নাট্যমঞ্চ যেন ক্রমশ ঘুরতে লাগলো। অষ্টাদশ শতাব্দীর মুর্শিদকুলী খাঁর কানুনগোর বংশধর বদরিকাবাবু যেন সামনের একতলার বৈঠকখানা-ঘরের শেতল-পাটি ঢাকা নিচু তক্তাপোশটার ওপর হঠাৎ উঠে বসেছেন।

সাধারণত সমস্ত দিন ওইভাবে ওই তক্তাপোশটার ওপরই চিত্ হয়ে পায়ের ওপর পা দিয়ে শুয়ে থাকেন বদরিকাবাবু। তাঁর ভয়ে ও-ঘর কেউ মাড়ায় না। তবু কাউকে দেখতে পেলেই হলো। ডাকেন। কাছে বসান। ট্যাঁকে একটা ছোট্ট ঘড়ি।

বলেন—বাড়ি কোথায় হে ছোকরা?

—বাপের নাম কী?

—গাঁ? কোন্ জেলা?

—বামুন কায়েত ক' ঘর?

—বিঘে প্রতি ধান হয় কত?

—দুধ ক' সের করে পাও?

এমনি অবান্তর অসংখ্য প্রশ্ন। ব্যতি-ব্যস্ত করে ছাড়েন সবাইকে। গ্রীষ্মকালে খালি গা। একটা চাদর কাঁধে। আর শীতকালে একটা তুলোর জামা। প্রথমটা কেউ সন্দেহ করে না। সরল সাদাসিধে মানুষ। তারপর যখন শুরু করেন গল্প—সে-গল্প আর শেষ হতে চাইবে না। মুর্শিদকুলি খাঁ থেকে শুরু করে লর্ড ক্লাইভ—হালসীবাগান আর কাশিমবাজার আর...ফিলিপ ফ্রান্সিস, ওয়ারেন হেস্টিংস্...নন্দকুমার—

সব শুনতে গেলে আর ধৈর্য থাকে না।

তারপর যখন রাত ন'টা বাজে, তোপ পড়ে কেল্লায়, তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে বসেন বদরিকাবাবু। হাই তোলেন লম্বা একটা। তারপর দুটি আঙুলে তুড়ি দিয়ে একবার চীৎকার করে ওঠেন—ব্যোম্ কালীঃ—কলকাত্তাওয়ালীঃ—

তারপর ট্যাঁকঘড়িটা বার করে মিলিয়ে নেন্ সময়টা।

বাঁ ধারে বদরিকাবাবুর বৈঠকখানা আর ডানদিকে দপ্তরখানা। দপ্তরখানা মানে বিধু সরকারের ঘর। সামনে একটা ঢালু কাঠের বাক্স নিয়ে বসে থাকে বিধু সরকার। চশমাটা ঝুলছে নাকের ওপর। সে-খেয়াল নেই। মাদুরের ওপর উবু হয়ে বসে চাবি দিয়ে খোলেন বাক্সটা। ভারি নিষ্ঠা বিধু সরকারের ওই ক্যাশবাক্সটি আর ওই চাবির গোছাটির ওপর। প্রতিদিন ঠনঠনে কালী-বাড়ীর ফুল আর তেল সিঁদুর আসে তার জন্যে। বিধু সরকার নিজের হাতে চাবির ফুটোটার তলায় ত্রিশূল এঁকে ঝুলিয়ে দেয় একটা। আর একটা ত্রিশূল আঁকে পশ্চিমের দেয়ালে আঁটা লোহার সিন্দুকটার চাবির ফুটোর নিচেয়।

সামনে বরফওয়ালা মেঝের ওপর ঠায় বসে আছে পাওনা টাকার তাগাদায়।

সেদিকে বিধু সরকারের নজর দেবার কথা নয়।

ত্রিশূলে আঁকার পর বিধু সরকার ক্যাশ-বাক্সটি খুলবে। খুলে ফুলটি রাখবে তলায়। তারপর বার করবে ছোট একটি ধুনুচি। বিধু সরকারের নিজস্ব ধুনুচি। একটি ছোট কৌটো থেকে বেরুবে ধুনো, বেরুবে কাঠকয়লা আর একটি দেশলাই। দেশলাইটি জ্বালিয়ে আগুন ধরাবে ধুনোয়। তারপর ঘন ঘন পাখার হাওয়া করতে করতে যখন গল্ গল্ করে ধোঁয়া বেরুবে, ধোঁয়ায় চোখ নাক মুখ অন্ধকার হয়ে আসবে বিধু সরকারের, তখন সেই মজার কাণ্ডটি করে বসবে সে। আগুন সমেত ধুনুচিটি বাক্সর মধ্যে বসিয়ে বাক্সর ডালাটি ঝপাং করে বন্ধ করে দেবে। নিচু হয়ে বাক্সয় মাথা ঠেকিয়ে অনেকক্ষণ ধরে নমস্কার করবে বিধু সরকার। তারপর মাথা তুলে বাক্স খুলে ধুনুচি বার করে আবার ডালা বন্ধ করবে। তখন কাজ আরম্ভ করার পালা। সামনের দিকে চেয়ে বলবে—এবার বল তোমার কথা—

বিধু সরকারের মত খাজাঞ্চীর কাজে এমন নিষ্ঠা ভূতনাথ আর কারও দেখেনি।

দুপাশে দু'টি ঘর, মধ্যেখান দিয়ে বার-বাড়িতে ঢোকবার রাস্তা।

রাস্তার ওপাশেই বারমহলের উঠোন। উঠোনের দক্ষিণমুখো পুজোর দালান।

সেই পুজোর দালানটা এখনও তেমনি আছে। আশে পাশের আর স[illegible] গেছে বদলে। শ্বেতপাথরের সিঁ[illegible] টালিগুলো সবই প্রায় ভাঙা। বোধ[illegible] এখনও পুজোটা চলছিল। ওটা বন্ধ হয়[illegible]

একবার নবমী পুজোর দিন একটা কা[illegible] হয়েছিল। শোনা গল্প। এই বাড়িতে এইখানেই ঘটেছিল।

পুজো টুজো সব শেষ হয়ে গেছে প্রসাদ বিতরণ হচ্ছে। রাঙাঠাকমা তসরে[illegible] কাপড় পরে পুরুতমশাই-এর জন্যে নৈবেদ্যর থালাগুলো সাজিয়ে গুণে গুণে তুলছে। ওধারে উঠোনে রান্নাবাড়িতে গোলাবাড়িতে, আস্তাবলবাড়িতে যে-যেখানে ছিল সবাই ছুটে এসেছে—প্রসাদ পাবে। ভেতরে অন্দরমহলের জন্যে বারকোষ ভর্তি

প্রসাদ গেল ঠিকে লোকদের মাথায় মাথায়। ওদিকে ভিস্তিখানা, তোশাখানা, বাবুর্চিখানা, নহবৎখানা, দপ্তরখানা, গাড়িখানা, কাছারিখানা সমস্ত জায়গায় যারা কাজের জন্যে আসতে পারেনি, আটকে গেছে—তাদের কাছেও পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

দরদালান দেউড়ি নাচঘর, স্কুলঘর সব জায়গায় সবাই প্রসাদ খাচ্ছে।

হঠাৎ এদিকে এক কান্ড হলো।

—খাবো না আমি—

—কেন খাবিনে—

—পুজো হয়নি—

—সে কি—কে তুই—

—আমি হাবু—

—কোথাকার হাবু? কাদের হাবু? বাড়ি কোথায় তোর?

আশে পাশে ভীড় হয়ে গেল। সবাই জিজ্ঞেস করে—কী হলো? কে ও? কাদের ছেলে? কিন্তু চেহারা দেখেই তো চিনতে পারা উচিত। পাগলই বটে! পাগলা হাবু। বাপের জন্মে কেউ মনে করতে পারলে না যে দেখেছে ওকে কোথাও। আধময়লা কাপড়, খালি গা, এক পা ধুলো, চুল একমাথা। উদাস দৃষ্টি! গেলো না তো বয়ে গেল। সেধো না ওকে। কলাপাতা আসন পেতে রুপোর গেলাস দিয়ে আসুন বসুন করতে হবে নাকি! দাও তাড়িয়ে। হাঁকিয়ে দাও দূর করে।

মেজকর্তা খবর পেয়ে ছুটে এলেন। মেজকর্তা শুধু নামে—আসলে কিন্তু মেজকর্তাই মালিক। সারা গায়ে গরদের ওড়না, পরনে গরদের থান। কপালে চন্দনের ফোঁটা। ভারিক্কী মানুষ। নিখুঁত করে দাড়ি কামানো—শুধু তীক্ষ্ম একজোড়া গোঁফ মুখের দু'পাশে সোজা ছুঁচলো হয়ে বেরিয়ে রয়েছে। গায়ে আতরের গন্ধ কিন্তু আতরের গন্ধকে ছাপিয়েও আর একটা তীব্র গন্ধ আসছে গা থেকে। যারা অভিজ্ঞ তারা জানে ওটা ভারি দামী গন্ধ। দামী আতরের গন্ধের চেয়েও আরো দামী। মেজকর্তাকে দেখে সবাই সরে দাঁড়াল।

এসে বললেন—কই দেখি—

দেখবার মত চেহারা নয় তার। ভয় নেই। জড়সড়ো হওয়া নেই। মেজকর্তাকে নমস্কার করাও নেই। শুধু একদিকে আপন মনে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে।

একবার জিজ্ঞেস করলেন—প্রসাদ খাবিনে কেন?

—আজ্ঞে পুজো হয়নি—

—পুজো হয়নি মানে—

—পিতিমের পান পিতিষ্ঠে হয়নি—

মেজকর্তা হাঁসলেন না। কিন্তু হাসলেন রূপলাল ভট্টাচার্য। পাশে তিনিও এসে দাঁড়িয়েছিলেন। পায়ে খড়ম। পরনে কোসার থান—গায়ে নামাবলী। মাথায় লম্বা শিখায় গ্যাঁদা ফুল। বললেন—পাগলের কথায় কান দেবার প্রয়োজন নেই বাবাজী—তুমি এস—

কিন্তু মেজকর্তা সহজে ছাড়বার পাত্র নন।

বললেন—না ঠাকুরমশাই—আমার বাড়িতে বসে অতিথি নবমীর দিন অভুক্ত থাকবে—এটা ঠিক নয়—

রূপলাল ঠাকুর কেমন যেন চিন্তিত হলেন।

জিজ্ঞেস করলেন—প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়নি তুই বুঝলি কিসে—

পাগলা হাবু বললে—মা তো নৈবিদ্যি খায়নি—

রূপলাল ঠাকুর এবার বিরক্ত হলেন।

আশে পাশের ভীড়ের মধ্যে যেন একটা কৌতুক সঞ্চার হয়েছে!

রূপলাল ঠাকুর এবার জিজ্ঞেস করলেন—প্রাণ প্রতিষ্ঠা তা হলে কীসে হবে?

—আমি পিতিষ্ঠে করবো—

—বামুনের ছেলে তুই?

—আজ্ঞে মায়ের কাছে আবার বামুন শুদ্দুর কী—মা যে জগদম্বা জগজ্জননী—

পাগলা হাবুর কথায় যেন সবাই এবার চমকে গেল। নেহাৎ বাজে কথা নয় তো। মেজকর্তা কেমন যেন মজা পাচ্ছেন মনে হলো। মেজকর্তা যেন অন্যদিনের চেয়ে একটু বেশি মৌজে আছেন। নইলে অমন খিট্‌-খিটে মেজাজের লোক—আজ কেমন যেন মিষ্টি মিষ্টি হাসি হাসছেন।

—তো কর তুই প্রাণ প্রতিষ্ঠা—বলছে যখন, তখন করুক ও—

রূপলাল ঠাকুর প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বৃথা। মেজকর্তার ওপর কথা বলা চলে না।

ততক্ষণ খবর ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। বারমহল ঝেঁটিয়ে এসে জুটেছে পুজোর দালানে। কেউ বলে ছদ্মবেশী সাধু বটে। পাগলাটার সঙ্গে কথা বলবার লোভ হচ্ছে। রান্নাবাড়ি থেকে ঠাকুররা এসেছে রান্না ফেলে। শুধু মেজকর্তার ভয়ে কেউ বেশি এগুতে সাহস পায় না। দাসু মেথর আজ ছেলেমেয়ে নাতি নাতনি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক কোণে। নিজে পরেছে চিনাসিল্কের গলাখোলা কোট—আর বউ ছেলেমেয়েদেরও গায়ে নতুন জামা-কাপড়-সাড়ী।

পাগলা হাবুকে নিয়ে চললো পুজো-মণ্ডপে। পুজো দালানের ভেতর।

—কর প্রাণ প্রতিষ্ঠে—কর্

—কলার বাশ্‌না দাও—

—কলার বাশ্‌না কী হবে—

—আগে দাওই না, দেখই না, কী করি—

এল গাদা গাদা কলার বাশ্‌না দক্ষিণের বাগান থেকে। মেজকর্তার হুকুম। দেখাই যাক্ না মজা। পুজোর বাড়িতে মজা করতেই আর মজা দেখতেই তো আসা। ভীড় করে সবাই দাঁড়াল শ্বেত মার্বেল পাথরের সিঁড়ির ওপর। ঝুঁকে দেখছে সামনে পাগলা হাবুর দিকে।

পাগলা হাবু কিন্তু নির্বিকার, ধারালো কাটারী দিয়ে কলার বাশনাগুলো ছোট ছোট করে কাটলে। তারপর এক কাণ্ড!

সেই এক-একটা বাশনা নেয় আর কী মন্ত্র পড়ে, আর জোরে ছুঁড়ে মারে প্রতিমার গায়ে, মুখে, পায়ে, সর্বাঙ্গে।

রূপলাল ঠাকুর বাধা দিতে যাচ্ছিল হাঁ হাঁ করে। কিন্তু মেজকর্তার দিকে চেয়ে আর সাহস হলো না। মেজকর্তা তখন এক দৃষ্টে পাগলা হাবুর দিকে চেয়ে মিষ্টি মিষ্টি হাসছেন।

পাগলা ততক্ষণ মেরেই চলেছে। সে কী জোর তার গায়ে।

হঠাৎ সবাই অবাক্ হয়ে দেখলে দুর্গা প্রতিমার শরীর দিয়ে আঘাতের চোটে রক্ত ঝরছে। এক-একটা বাশ্‌না ছুঁড়ে মারে পাগলা, আর ঠাকুরের গায়ে গিয়ে সেটা লাগতেই রক্ত ঝরে পড়ে সেখান থেকে।

সমস্ত লোক হতভম্ব।

শেষে এক সময় পাগলা থামল। মেজকর্তার দিকে চেয়ে বললে—হয়েছে—এবার

মায়ের পান পিতিঠে হয়েছে—এবার পেসাদ খাবো, দিন—

সে কী ভীড়! তবু সেই ভীড়ের মধ্যেই প্রসাদ আনতে পাঠানো হলো। দেখতে দেখতে খবর রটে গেছে ও-বাড়ি, এ-পাড়া সে-পাড়া। হাটখোলার দত্তবাড়ি, পোস্তার রাজবাড়ি, ঠনঠনের দত্তবাড়ি, শোভাবাজারের দেবেদের বাড়ি, জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ি, মল্লিকবাড়ি থেকে লোকের পর লোক আসতে লাগলো।

এদিকে ভেতরবাড়ি থেকে প্রসাদ আনানো হয়েছে। ভালো করে বসিয়ে প্রসাদ খাওয়ানো হবে, মেজকর্তার হুকুম।

কিন্তু পাগলা হাবু উধাও।

খোঁজ খোঁজ—কোথায় গেল। দশজন লোক দশদিকে খুঁজতে গেল। কোথাও নেই সে। পাগলা হাবু সেই যে গেল আর কেউ দেখেনি তাকে কোনদিন।

তখনও লোকের পর লোক আসছে। সবাই দেখতে চায় পাগলা হাবুকে। প্রতিমার শরীরে তখনও রক্ত লেগে রয়েছে টাট্‌কা রক্ত। সেই ভীড়, সেই লোকারণ্য চললো সমস্ত দিন, সমস্ত রাত ধরে—

এক সময় বংশী এসে ডাকতেই ভূতনাথের চট্‌কা ভাঙল।

—শালাবাবু—

—আমাকে ডাকছিস বংশী—ভূতনাথ ফিরে তাকাল।

—ছোট মা আপনাকে একবার ডাকছে—

আজ আর সে-বয়েস নেই ভূতনাথের। এখন বয়স হয়েছে। চাকরি করতে করতে রিটায়ার করবার সময় হয়ে এল। কিন্তু তবু এই নির্জন শ্মশানপুরীতে দাঁড়িয়ে সেদিনকার ছোটবৌদির ডাক অমান্য করতে পারলো না সে। আজ আর সে-বাড়ি সে-রকম নেই। পার্টিশনের ওপর পার্টিশন হয়ে হয়ে অতীতের স্মৃতিসৌধের সিংদরজা প্রায় বন্ধ হবার জোগাড়। তবু কেমন করে ভূতনাথ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে।

—তুই যা বংশী, আমি আসছি—

ভূতনাথ উঠলো।

বারমহল পেরিয়ে অন্দর মহল। অন্দর মহলে ঢুকতেই যেন সেই গিরির সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। গিরি মেজগিন্নীর পান সাজতে এসেছে। পান নিতে এসে ঝগড়া বাধিয়েছে সদুর সঙ্গে। সদু হলো সৌদামিনী।

সৌদামিনীরও গলা খুব। বলে—আ ভগবান, কপাল পুড়েছে বলেই তো পরের বাড়িতে গতর খাটাতে এইচি—

—গতরের খোঁটা দিস্‌নি সদু, তোর গতরে পোকা পড়বে লো পোকা পড়বে—সেই পোকাশুদ্ধ গতর নিয়ে নিমতলার ঘাটে মুদ্দোফরাসরা পুড়োবে একদিন দেখিস তখন—

হ্যাঁলা গিরি—গতরের খোঁটা আমি দিলুম না তুই দিলি—যারা গতরখাগী তারাই জন্ম-জন্ম গতরের খোঁটা দিক—

—কী এত বড় আস্পর্ধা—আমাকে গতরখাকী বলিস্—বলচি গিয়ে মেজ-মার কাছে—বলে দুম্ দুম্ করে কাঠের সিঁড়ির ওপর উঠতে গিয়ে সামনে ভূতনাথকে দেখেই যেন থমকে দাঁড়াল গিরি—তারপর জিভ্ কেটে এক গলা ঘোমটা দিয়ে এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে রাস্তা করে দিলে।

সেই নির্জন সিঁড়ি। সেই নিরিবিলি অন্দর মহল।

কোথায় গেল সেই সদুর মা। সিঁড়ির ওপাশে রান্নাবাড়ির লাগোয়া ছোট্ট ঘরখানাতে বসে কেবল বাটনা বেটেই চলেছে। হলুদ আর ধনে বাটনার জল গড়িয়ে পড়ছে রোয়াক বেয়ে নর্দমার ভেতর। কখন সূর্য ডুবতো, কখন উঠতো, কখন বসন্ত আসতো, শীত আসতো আবার চলেও যেত খোঁজও রাখতো না বুড়ী। যখন কাজ নেই, দুপুরবেলা, তখন হয়ত ডাল বাছতে বসেছে। সোনামুগের ডাল, খেসারী, মুসুর, ছোলা—আরো কতরকমের ডাল—। কখনও কথা বলতো না। শুধু জানতো কাজ। কাজের ফুটো দিয়ে কবে তার জীবনটুকু নিঃশেষ হয়ে ঝরে পড়ে গেছে—কেউ খবর রাখেনি।

সিঁড়ি দিয়ে ভূতনাথ উঠতে যাবে হঠাৎ আবার পেছনে ডাক—

—শালাবাবু—ও শালাবাবু—

ভূতনাথ পেছন ফিরে তাকাল।

—শিগ্‌গির আসুন—

—কেন?

—ছুটুক্‌বাবু ডাকছে—গোঁসাইজী আসেনি—আসর আরম্ভ হচ্ছে না—

ছুটুকবাবুর আসরে তবল্‌চী বুঝি অনুপস্থিত। ছুটুকবাবু বসবে তানপুরো নিয়ে। ওদিকে কানা ধীরু ইমনের খেয়াল ধরেছে আর গোঁসাইজী তবলা। সমের মাথায় এসে সে কী হা-হা-হা-হা চীৎকার। ঘর বুঝি ফেটে যায়। অনেক রাত পর্যন্ত চলবে আসর। এক-একদিন মাংস হবে। মুরগীর ঝোল আর পরটা। আর পর্দার আড়ালে এক-একবার এক-একজন উঠে যাবে আর মুখ মুছতে মুছতে ফিরে আসবে।

ছুটুকবাবুর আদ্দির পাঞ্জাবী তখন ঘামে ভিজে জব্ জব্ করছে। কপালে দর দর করে ঘাম ঝরছে। গলার সরু সোনার চেনটা চিক্ চিক্ করছে ইলেক্‌ট্রিক আলোয়।

তালে তালে মাথা দুলবে ছুটুকবাবুর।

বলবে—কুছ পরোয়া নেই—শালাবাবু, তুমি এবার থেকে তবলার ভারটা নাও—গোঁসাই-এর বড় গ্যাদা হয়েছে—শশী ভূতো, কাল গোঁসাই এলে তুই জুতো মেরে তাড়াবি—বুঝলি—বুঝলি তো—দেখাচ্ছি তোমার গ্যাদা—

কিন্তু ব্রজরাখালের কথাটা ভূতনাথের আবার মনে পড়ে—ওদের সঙ্গে অত দহরম-মহরম কেন ভূতনাথ, বাবুরা হলো সায়েবের জাত, আর আমরা হলুম ওদের গোলাম—গোলামদের সঙ্গে কি সায়েব-বিবির মেলে—খুব সাবধান ভূতনাথ—খুব...

ভূতনাথ শেষ পর্যন্ত বললে—ছুটুক-বাবুকে গিয়ে বল্—ছোটবৌদি আমাকে ডেকেছে—

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলো ভূতনাথ দোতলায় উঠে লম্বা বারান্দা। ডানদিকে রেলিং ঘেরা। চক্-মিলান মহল। চারদিকে ঘেরা রেলিং—রেলিং-এর ওপর ঝুঁকলে নিচে একতলার চৌবাচ্চা উঠোন দেখা যায় রান্নাবাড়ি থেকে রান্না করে শশী ঠাকুর এক-তলার রান্নার ভাঁড়ারে ভাত ডাল তরকারি এনে সাজিয়ে রাখে। এখানে দাঁড়ালে আরো দেখা যায় যদুর মা শিল নোড়া নিয়ে দিনের পর দিন হলুদ বেটেই চলেছে। আর ও-পাশের জানালা দিয়ে দেখা যায় আনাজ-ঘরে এক টুকরো মেঝে—সেইখানে হয়ত সদু ঝি—তারকেশ্বরের বিরাট একটা বঁটি পেতে আলু বেগুন কুমড়ো কুটছে চারদিকে কাঁচা আনাজের পাহাড় তার মধ্যে সদু একলা বটি নিয়ে ব্যস্ত কিম্বা হয়তো পান সাজছে—খিলি তৈরি করছে—কিম্বা বিকেল বেলা প্রদীপের সলতে পাকাতে বসেছে—জানলার ওই ধারটিতে ছিল সদুর বসবার জায়গা। হাতে কাজ চলছে আর মুখও চলছে তার। কার সঙ্গে যে কথা বলছে কে জানে। যেন আপন মনেই বকে চলে—

—আ মরণ, চোক্ গেল তো তিভুবন গেল—ভোলার বাপ তাই বলতো—ফুলবউ চোক্ কান থাকতে থাকতে তিভুবন চিনে

নাও—তা' সে ভোলার বাপও নেই, ভোলাও নেই—আমি মরতে পরের ভিটেয় পিদিম জ্বালছি—আর আমার সোয়ামীর ভিটেয় অন্ধকার ঘুরঘুট্টি।—

সদুর মা'র কানে যায় সব। কিন্তু সে কারো সাতেও নেই পাঁচেও নেই। কিন্তু হঠাৎ গিরির কানে যেতেই বলে—কা'র সঙ্গে বক্ বক্ করছিস লা সদু—

এখন হঠাৎ চুপ হয়ে যায় সদু।

ভূতনাথ রেলিং ধরে ধরে এগুতে লাগলো। ভাঙা রেলিং-এর ফাঁকগুলো যেন উপোসী জন্তুর মত হাঁ করে আছে। এর পর ডাইনে বেঁকে, বাঁদিকে ঘুরে—এ-গলি সে-গলি পার হয়ে উত্তরদিকে তিনচারটে ধাপ উঠে পড়বে বউদের মহল। আকাশ-সমান উঁচু কাঠের ঝিলিমিলি দিয়ে ঢাকা। আর তার সামনে দক্ষিণমুখো সার-সার বউদের ঘর। ছোটবউদির ঘর একেবারে শেষে।

ডানদিকে প্রথমেই বড় বউয়ের ঘর। তিনি বিধবা। কোথা থেকে যে এ-বাড়ির সব বউরা এসেছিল। মেম-সায়েবদের মত গায়ের রং। ফরসা দুধে-আলতা ছোপ্। বড় বউএর বয়েস হয়েছে. তবু চেহারায় বয়েস ধরবার উপায় নেই। পরনে সাদা ধব্‌ধবে থান।

ভূতনাথকে দেখে সিন্ধু সরে দাঁড়াল।

বড় বউএর ঝি সিন্ধু।

ভেতর থেকে গলার আওয়াজ এল—কে রে সিন্ধু—

ভূতনাথ শুনতে পেলে সিন্ধু বলছে—মাস্টারবাবুর শালা—

তারপরেই মেজ-গিন্নীর ঘর। পর্দাটা তোলা। ভূতনাথের নজরে পড়ল এক পলক। মেজগিন্নী মেঝের ওপর বসে তাকিয়া হেলান দিয়ে গিরির সঙ্গে বাঘ-বন্দী খেলছেন।

চোখ সরিয়ে নিয়ে ভূতনাথ একেবারে শেষ ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

পায়ের আওয়াজ পেতেই কে দরজা খুলে দিলে যেন।

কত বছর আগের ঘটনা। তবু অতীতের মায়াঞ্জন যেন আজো চোখে লেগে আছে স্পষ্ট। ভূতনাথ আজ স্মৃতির পাখীর পিঠে চড়ে বর্তমানের লোকালয় ছেড়ে অতীতের অরণ্যে ফিরে গেছে।

ছোট বৌদি দরজা খুলে ডাকলে—কে ভূতনাথ—এসো—

হঠাৎ দু'টো হাত ধরে ফেলেছে ছোট বৌদি।

—একটা কাজ তোমাকে করতে হবে ভাই—বলে ছোট বউ তার কালো চোখ দু'টো তুলে সোজা তাকাল ভূতনাথের মুখের ওপর।—সেইজন্যেই তোমায় ডাকা—

—কী কাজ—বল না—

—এই নাও টাকা—বলে ভূতনাথের হাতের মুঠোর মধ্যে গুঁজে দিল টাকাটা।

কী আনব এতে? ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে।

—মদ—গলাটা নিচু করে ছোট বউদি বললে।

চমকে উঠেছে ভূতনাথ। মদ? কানে ঠিক শুনেছে তো সে।

—হ্যাঁ মদ—

—এতো রাত্তিরে—

—হ্যাঁ যেখান থেকে পারো, যেমন করে পারো—খুব ভালো মদ, খুব দামী—

হঠাৎ কান থেকে হীরের দুলটা খুলে ভূতনাথের মুঠোর মধ্যে পুরে দিলে ছোট বউদি জোর করে। বললে— ও টাকাতে যদি না কুলোয় তো এটাও রেখে দাও ভাই—

—এ কি করলে, এ কী করলে ছোট বৌদি—চীৎকার করে উঠলো ভূতনাথ। চীৎকার শুনে পাশের ঘর থেকে ছুটে এসেছে গিরি আর মেজগিন্নী আর সিন্ধু আর বড় বউ। কী হলো? কী হলো রে ছোট বউ?

হঠাৎ যেন নিজের চীৎকারে নিজেই অপ্রস্তুত হয়ে গেল ভূতনাথ। ছোট বউ নয়, ভূতনাথ লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল যেন। বুড়ো বয়েসে এ কি করলে সে। কেউ তো কোথাও নেই। সে তো একলাই দাঁড়িয়ে আছে ভাঙ্গা বাড়ির মাথায়। সে তো ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্টের ওভারসিয়ার ভূতনাথঃ ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়—স্বভাব কুলীন। নিবাস—নদীয়া, গ্রাম—ফতেপুর, পোস্টাপিস—গাজনা। কোনও ভুল নেই।

হীরের দুল আর টাকাটা আর একবার দেখবার জন্যে হাতের মুঠো খুলতেই ভূতনাথের নজরে পড়ল—কিছু নেই শুধু সাইকেলের চাবিটা মুঠোয় বাঁধা রয়েছে।

হঠাৎ কেমন ভয় হলো ভূতনাথের।

এ অভিশপ্ত বাড়ি। ভালোই হয়েছে। এত উঁচু থেকে লাফিয়ে পড়তে ইচ্ছে হলো তার। কেউ কোথাও নেই। বিষাক্ত বাড়ির আবহাওয়া ছেড়ে সে যত শীঘ্র বেরিয়ে যেতে পারে ততই মঙ্গল। কালই এসে চরিত্র মণ্ডল এখানে গাঁইতি বসাবে। বনমালী সরকার লেন-এর স্মৃতির সঙ্গে চৌধুরী পরিবারের ইতিহাসও বিলুপ্ত হয়ে যাবে একেবারে। তাই যাক্। তাই ভাল।

অন্দরমহল, রান্নাবাড়ি, বারবাড়ি, বৈঠকখানা, দপ্তরখানা, দেউড়ি সব পেরিয়ে ভূতনাথ একেবারে সাইকেলটা নিয়ে উঠতে যাবে—এমন সময় কাপড় ধরে কে যেন টানলে—

ভয়ার্ত একটা চীৎকার করতে যাচ্ছিল ভূতনাথ।

কিন্তু ভালো করে চেয়ে দেখতেই একটা লাথি ছুঁড়লো—দূর—দূরহ বেরো—

সেই কুকুরটা! অনেকদিন আগে আর এক দিন এমনি করে এ-বাড়ি ছেড়ে যাবার সময় বাধা দিয়েছিল যে সে ছোট বউ। আর আজ দিলে এই কুকুরটা।

সাইকেল চড়ে অন্ধকার বনমালী সরকার লেন দিয়ে চলতে চলতে ভূতনাথের মনে হলো তার সমস্ত অতীতটা যেন ওই কুকুরের মত তাকে আজ কেবল পেছু টান দিতে চেষ্টা করছে। ওই কুকুরটার মতই তার অতীত কালো, বিকলাঙ্গ, মৃতপ্রায় আর অস্পষ্ট।

ভূতনাথের সাইকেলের চাকার ঘূর্ণায়িত তরঙ্গে ক্রমে ক্রমে উদ্বেলিত হতে লাগলো তার বিস্তৃত প্রায় কাহিনী-মুখর অতীত।

পূর্বাভাষ সমাপ্ত

(ক্রমশঃ)

পনের

অক্ষয় ঘোষাল গ্রামের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত চীৎকার করে ঘুরে এল। একদিন নয় দিনের পর দিন—প্রায় এক সপ্তাহ।

ঠিক যেন একটা পুরোনো কালের মজা দীঘির পঙ্কস্তরের একটা বুদ্বুদ নির্গমনের মুখ প্রচণ্ড কোন একটা খোঁচা খেয়ে হঠাৎ বড় হয়ে গেল এবং সেই প্রশস্ততর মুখের সুযোগ পেয়ে পঙ্কস্তরের মধ্যে বদ্ধ বিষবাষ্প হু হু করে বেরিয়ে এল, সঙ্গে সঙ্গে বেশ খানিকটা পাঁক এবং পলি ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত হয়ে মজা দীঘিটার স্বল্প জলকে কাদাগোলা ঘোলাটে করে তুললে।

নবগ্রামে কুৎসিৎ কুৎসা রটনা গালি-গালাজ নিয়মিতভাবে প্রাত্যহিক ঘটনা। মহাদেব সরকার গ্রামপ্রান্তে বসে অহরহই এই বিষবাষ্প উদ্গীরণ করে থাকে। কিন্তু মহাদেব সরকারের এ বিষবাষ্পই উদ্গীরণে নবগ্রামের মজা দীঘিতে কোন আলোড়ন তোলে না। নবগ্রামের গ্রাম-জীবনকে মজা দীঘির সঙ্গে তুলনা করলে—মহাদেব সরকারকে বলতে হয়, দীঘির জল-নিকাশি নালার মধ্যে একটা গলিত সুড়ঙ্গমুখ। সে মুখ দিয়ে যে পাঁক এবং পলি ও বিষ বের হয়, তা বেরিয়ে যাওয়া জলের সঙ্গে বেরিয়েই যায়—দীঘির ভিতরের জলে তার প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। অক্ষয় ঘোষালও প্রায় তাই, তবুও সে যেন দীঘির খানিকটা ভিতরের বুদ্বুদ মুখ। মহাদেব সরকার মনেপ্রাণে খাঁটি জমিদার এবং ব্যুরো-ক্র্যাট। তার আয় বাৎসরিক আড়াই শো টাকার বেশি নয়, কিন্তু সে এখানকার প্রাচীনতম জমিদারবংশের সন্তান—একথা সে এক মুহূর্তের জন্য বিস্মৃত হয় না; এবং সে একদা সরকারী চাকুরে ছিল; মহাদেব বলে—দি মোস্ট রেসপেক্টেবল প্রফেশন, এ গভর্নমেণ্ট সার্ভিস। সেই চাকরীর দরুণ সে বিরানব্বুই টাকা দশ আনা পেনশন আজও পায়; এ কথাই বা সে ভুলবে কি করে? ইংরেজ আমলের আমলাতান্ত্রিকতার বিশেষত্বই এই। হয়তো একাল পর্যন্ত সকল দেশের সকল কালের রাজকর্মচারীদের এ বৈশিষ্ট্য আছেই, তবুও ইংরেজের আমলের এ মনোভাবের সঙ্গে কোন কালের কোন দেশের মনোভাবের বোধ হয় তুলনাই হয় না। চাকরী পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষগুলি দেশের সমাজের জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর সকল জন থেকে পৃথক হয়ে যেতেন। স্বাধিকার প্রমত্ততার আর তুলনা থাকত না। যেন চণ্ডালত্ব মোচন হয়ে এক-দিনেই হয়ে উঠতেন প্রবল-প্রতাপ দুর্বাসা ঋষির মাতুলের শ্যালকের পিসেমশায়ের ভাইয়ের আপন মাসীর ননদের পৌত্র বা প্র-পৌত্র। ঠিক এই কারণেই মহাদেব সরকার নবগ্রামের মানুষদের থেকে বিচ্ছিন্ন পৃথক। তারাও তাকে নিজেদের কেউ বলে ভাবে না—সে নিজেও তা ভাবতে পারে না। কিন্তু অক্ষয় ঘোষাল তা নয়, তার জমিদার বংশ-গৌরবও নাই এবং এ বংশগৌরবকে সে ঘৃণাই করে; তার গৌরব নগদ টাকার ও জমির ধানের; সেই কারণে সাধারণের সঙ্গে তার কারবারসূত্রে যোগাযোগ আছে; দাদন দেবার এবং বিশেষ করে আদায়ের সময় তাকে ঘোরাঘুরিও করতে হয় অনেক। সেই দিক থেকে নবগ্রামের জীবনের মজা দীঘিতে খানিকটা ভিতরের মানুষ সে।

এই ঘটনায় হঠাৎ সে ব্রাহ্মণ হয়ে উঠল চীৎকার করে বললে—আমি ব্রাহ্মণ—আমি ব্রাহ্মণ!

এবং পৈতেটাও সে পট্ করে ছিঁড়ে ফেলেছে।

বেশিদিনের কথা নয়, প্রায় চল্লিশ বছর আগে পাশের গ্রামে অবস্থাপন্ন প্রবল প্রতাপ জমিদার রায়বংশের সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে ব্রাহ্মণের অভিশাপে। রায়বংশের এক প্রতিদ্বন্দ্বী উপস্থিত হয়েছিল অকস্মাৎ। তাঁদেরই এক আত্মীয় শিক্ষক চাকরী থেকে অবসর নিয়ে এই শিক্ষকটি গ্রামে এসে রায়বংশের তরুণ উচ্ছৃঙ্খল মালিকের অনাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে-ছিলেন। রায়বংশের তরুণ উচ্ছৃঙ্খল মদাপ উত্তরাধিকারী এই ঔদ্ধত্যের শাস্তি দিয়ে-ছিলেন ঠিক এমনিভাবে। একজন উদ্ধত দাঙ্গাবাজ মুসলমানকে পাঁচটি টাকা বকশিশ দিয়েছিলেন—মুসলমানটি বকশিশের বদলে প্রকাশ্য দিবালোকে বাজারের মধ্যে এই শিক্ষকটির কান ধরে গালে কটি চড় মেরে নির্বিকার ধীরপদক্ষেপে চলে গিয়েছিল। বাজারের লোক স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু হিংস্র জানোয়ারের মত এই দাঙ্গা-বাজকে কিছু বলতে সাহস করে নি। এ নিয়ে সরকারী তদন্ত হয়েছিল, কিন্তু রায়েদের গায়ে হাত পড়ে নি। কিন্তু এ অপরাধের দায় থেকে নিষ্কৃতি পায়নি রায়েরা। বৎসর দশেকের মধ্যেই রায়বংশ প্রায় পথের ভিক্ষুকে পরিণত হয়েছে। রায়েরা নাই—তাদের বাড়ির বিধবারা আছে। তাদের দুর্দশার আর সীমা নাই।

তার আগে, পঁয়ষট্টি বৎসর আগে, এই গ্রামেরই শ্যামাকান্তবাবু, ওই গৌরীকান্তের জ্যাঠামশাই সন্তানের জন্য বৈদ্যনাথধামে হত্যা দিয়েছিলেন। স্বপ্ন হয়েছিল—পূর্ব-জন্মে ধনগর্বে দুপুরবেলা এক পুণ্যবান ব্রাহ্মণ অতিথিকে অপমান করার পাপে তার সন্তান বাঁচে না। দুপুরবেলা স্বামী-স্ত্রী সন্তান কোলে করে বিশ্রম্ভালাপে রত ছিলেন—ব্রাহ্মণ বার বার কাতরস্বরে চেয়েছিল জল। ব্যাঘাতে বিরক্ত হয়ে দারোয়ান দিয়ে ব্রাহ্মণকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছিলেন—সেই ব্রাহ্মণের অভিশাপে এই অবস্থা। সেই ব্রাহ্মণ পরি-তুষ্ট না হলে সন্তান হবে না। নবগ্রামের কাছেই সেই ব্রাহ্মণ এ জন্মেও পুণ্যবান ব্রাহ্মণ সাধকরূপে জন্ম নিয়েছেন। তাঁর

পরিতুষ্টির উপর নির্ভর করছে তাঁর বংশ। শ্যামাকান্তবাবু নাখরাজ জমি, বাৎসরিক বৃত্তি দিয়ে তাকে পরিতুষ্ট করেছিলেন। তারপর তাঁর সন্তান হয়েছিল।

এমন নিদর্শনের অভাব নাই। অজস্র রাশি রাশি প্রমাণ আছে। চেয়ে দেখ ওই মহাপীঠ অট্টহাসের পূর্বদিকে রুক্ষ তৃণহীন প্রান্তরের দিকে। নাম পোড়াডাঙ্গা। ধূধূ করছে লাল মাটি। ওইখানে ছিল এককালে সেই সত্য ত্রেতা দ্বাপরের যে কোন এক যুগে বিরাট নগর। সে নগর অপমানিত রাজগুরুর অভিশাপে পুড়ে ছারখার হয়ে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। ঘাস জন্মায় না। জন্মাবার উপায় নাই। ব্রাহ্মণের অভিশাপ।

অক্ষয় ঘোষাল সাতদিন ধরে স্মরণ করিয়ে দিলে এই কথা—এই কাহিনী। নূতন করে উপবীত ধারণ করে মহাপীঠ অট্টহাসে গিয়ে স্নান করে দেবীর পূজা করে—হাত জোড় করে বললে—তুমি ব্রাহ্মণের মান রক্ষা কর!

বেরিয়ে এসে সূর্যের দিকে তাকিয়ে দু হাত তুলে—উপবীত ধরে বললে—হে দিনের ঠাকুর, তুমি এর বিচার কর।

মনে মনে সে কল্পনা করলে—কাল রাত্রি প্রভাতে ওই দক্ষিণপাড়ার প্রান্তে বাউড়ী পাড়ার আকাশ দীর্ণ করে উঠবে ক্রন্দনরোল, কানাইয়ের মোটা চেরা-গলায় আর্ত চীৎকারের সঙ্গে নারীকণ্ঠের কান্না।—ওরে বাবা রে—ওরে মাণিক রে!

কাল রাত্রে কানাইয়ের দুটি ছেলের দুটিই গিয়েছে। সর্পাঘাত হয়েছে। অথবা মহামারী হয়েছিল। কলেরা। ডাক্তার বৈদ্য অনেক করেছিল কানাই—কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নি।

শুনবে বিজয় মরণাপন্ন। হঠাৎ পড়ে গিয়ে এ্যাপোপ্লেক্সির স্ট্রোক হয়েছে। কিম্বা কেউ খুন করেছে।

শুনবে স্বর্ণবাবুর বাড়ীতে মহা বিপদ। শুনবে জিপ উল্টে গুণী হাসপাতালে গিয়েছে—এখন তখন অবস্থা।

শুনবে, গৌরীকান্তের বাড়িটা ভেঙে পড়ে গিয়েছে।

বিকেলবেলা সে রাস্তায় বের হয়। তখন সে যেন অন্য অক্ষয় ঘোষাল—সে তখন চীৎকার করে সমালোচনা এবং কুৎসা রটনা করতে করতে চলে যায় শেখপাড়া। সঙ্গে নেয় সদয়কে। সেখানে সইদ শেখ জোবেদ আলিকে ডেকে নিয়ে বলে—যে কোন উপায়ে হাটে মাঠে ঘাটে, যেখানে হোক, গায়ে পড়ে ঝগড়া করে কানাই বাউড়ীর হাতখানা ভেঙে দিতে হবে। দশ টাকা দেব আমি। মামলা মোকর্দমা হয়, তার খরচও দেব। বিজয়কে ঘায়েল করতে পারলে একশো টাকা।

সইদ, জোবেদ এ কাজ পারে না তা নয়। খুব পারে। অন্তত বছর দেড়েক আগে অনায়াসেই পারত। কিন্তু এখন তাদের শক্তি থাকতেও সাহস নাই। তারা অক্ষয় ঘোষালের অনুগত লোক, অভাবের সময় অক্ষয় ঘোষাল তাদের ধান দেয়, টাকাও দেয়; বিনিময়ে ঘোষালের দাদন আদায়ে সাহায্য করে, দু' চরাটে ডাক-হাঁক করে দেয় প্রয়োজন মত। তারা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে—আমাদের কোমর ভেঙে গিয়েছে ঘোষাল মশায়, আমরা জ্যান্তে মরার সামিল। কোন মোসলমান হ'ত তবে তা পারতাম। কিন্তু হিঁদুর গায়ে হাত তুললে দাঙ্গা লেগে যায় তো, সব্বনাশ হয়ে যাবে। ইয়ার লেগে কোনও হিঁদুকে দেখেন।

নিরুপায় হয়ে ফিরতে হয় অক্ষয়কে।

পথে সেদিন সদয় বললে—আমি লোক দিতে পারি অক্ষয়বাবু।

অক্ষয় তার দিকে সবিস্ময়ে ফিরে তাকালে। —তুমি? তুমি কোথায় লোক পাবে?

—আছে। বলেন—কিছু টাকা দ্যান—দিই ব্যবস্থা করে। বোমা মেরে উড়ায়ে দিই বিজয় ব্যাটারে।

—বোমা?

—হ্যাঁ; বোমা। যে বোমায় ইংরাজ মারছি—সেই বোমা। সঙ্গে সঙ্গে রসিকতা করে বললে—হর্স মানে ঘোড়া—যে ঘোড়ায় ঘাস খায়।

—বোমা কোথা পাবে তুমি?

—সে ভাবনা আপনি করছেন কেন? সে দায় আমার। নয় তো বলেন, পিস্তলের গুলী—সেও পারি।

অক্ষয় মুহূর্তের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে—অন্তত উঠতে চেষ্টা করলে, বললে—পার?

—হুঁ। আমাদের কি? মরেছি না মরতে আছি। শ' পাঁচেক টাকা দ্যান—দিই দু' ব্যাটারে ফুটায়ে।

—পাঁচ শ'!

—হুঁ। মামলা মোকদ্দমা কিছু করবারে হবে না আপনাকে। কে করলে, কাকে-কে কিলে জানবারে পারবে না। আপনি টাকা দিয়ে খালাস।

অক্ষয় যেমন অকস্মাৎ মরিয়া হয়ে উঠেছিল—তেমনিভাবেই আবার অকস্মাৎ দমে গেল। নবগ্রামের মানুষ সে, নবগ্রামের ইতিহাসে জমির টুকরো নিয়ে, প্রতিষ্ঠার দাবী নিয়ে দাঙ্গা আছে, মাথা ফাটানো আছে, মামলার পর মামলা আছে, ঘর জ্বালানোও আছে, কিন্তু বোমা-পিস্তল নাই। বোমা-পিস্তলের ছোঁয়াচ—যারা ওই সব জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করেছে, তাদের ছোঁয়াচ লেগেছিল গৌরীকান্তকে। এই মাত্র। সুতরাং বোমা-পিস্তলের উৎসাহ মুহূর্তেই তার নিভে গেল।

সে নীরবে পথ চলতে শুরু করলে।

সদয় ডাকলে—অক্ষয়বাবু!

—হুঁ!

—কি? তাহলে ব্যবস্থা করি?

—না।

—না?

—না। ওসবে অনেক বিপদ। ওর মধ্যে যাব না আমি।

—কি করবেন?

—ধর্মের দিকেই তাকিয়ে থাকব। দেখব ধর্ম কি করে?

হেসে উঠল সদয়। —আহলে ধর্ম মানেন আপনি?

—মানি বই কি! কে বললে আমি ধর্ম মানি না?

—কে বলবে? আমি মনে করতাম তাই। ধর্ম যদি মানেন, তবে শান্তিদেবীর নামে ওই দরখাস্তটা কেমন করে করলেন? মিথ্যা দরখাস্ত করাটা কি ধর্ম না কি?

—কে বললে ও দরখাস্ত আমি করেছি?

—যে লিখেছে দরখাস্ত, সেই বলেছে। তারই মুখ থেকে শুনেছি আমি।

—কি বলছেন আপনি?

—কি কথা বলছি মশায়। রমা দেবী বলেছে আমাকে।

—রমা দেবী?

—হুঁ-হুঁ মশয়। রমা দেবী। আপনাদের গাঁয়ের বেটী—সবরেজিস্টরী অফিসের বড়া কেরানীর সাতে বিয়া হইছিল।

অক্ষয় চমকে উঠল। সদয়ের মুখের দিকে মিনিটখানেক তাকিয়ে রইল সে। তার পর রূঢ় স্বরেই বললে—মিছে কথা বলছেন আপনি।

—না। তবে হ্যাঁ, একটুকু ফের আছে। দরখাস্তের লেখাটা আপনার হাতের না। লেখাটা রমার। তবে যা লেখা আছে, সে সবই আপনার কথা। আপনি বলেছেন তাকে। সে সেই সব শুনে গিয়া দরখাস্ত দিছে।

হাসতে লাগল সদয়। হাসতে হাসতেই বললে—বলেন না, রমা আপনার বাড়ি আসছিল কিনা? গৌরীকান্তবাবু পয়লা বোশেখে আসবার পর আট-নয় তারিখে আসে নাই? বলেন না?

এসেছিল। অকস্মাৎ একদিন একখানা ছইওয়ালা গরুর গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছিল দুপুর বেলা। নেমেছিল রমা। রমার মা কাজ করত শ্যামাকান্তের বাড়িতে, অক্ষয় ঘোষালেরা এককালে রাধাকান্তের বাড়িতে ছিল; সেই সূত্রে হৃদ্যতা ছিল দুই পরিবারের মধ্যে। অক্ষয় ঘোষালের ভাগ্নী শ্যামা রমার সখী। সম-অবস্থার দুই মায়ের এমনই হৃদ্যতা ছিল যে, মেয়েদের নামের মধ্যে একটা মিল না রেখে পারে নাই। দীর্ঘকাল পরে সেই সখীত্বের দাবীর জের টেনে অকস্মাৎ রমা এসে হাজির হয়েছিল শ্যামার বাড়ি। শ্যামাও বালবিধবা অক্ষয় ঘোষালের বাড়ির পাশেই তার বাড়ি। শ্যামাই রমাকে সঙ্গে নিয়ে তার বাড়ি এসে বলেছিল—বলতো মামা কে?

এই আধুনিকা মেয়েটিকে তার বিধবা বোনের অনাড়ম্বতা সত্ত্বেও অক্ষয় চিনতে পারে নি। বলেছিল—কে বলতো? চিনি চিনি মনে হচ্ছে—অথচ—।

শ্যামাকে আর কথা বলতে হয়নি—বলেছিল রমা নিজেই। বলেছিল—চিনি চিনি কথাটাও সত্যি নয় অক্ষয়দা। মিথ্যে বলছ বলে মাননীয় জন তুমি, তোমার অমর্যাদা করব না। মোটেই চেন নি।

আরও গোল বেঁধে গিয়েছিল অক্ষয়ের। কে? এই মেয়ে, যে অমন করে কথা বলতে পারে—গুছিয়ে, সাজিয়ে, জলুস ছড়িয়ে—তাকে সে কি করে চিনবে। নিজের জীবনের গোটা অতীত কালটা এমনই
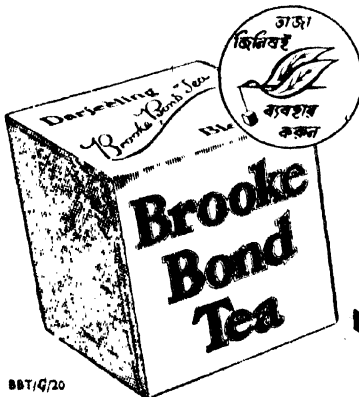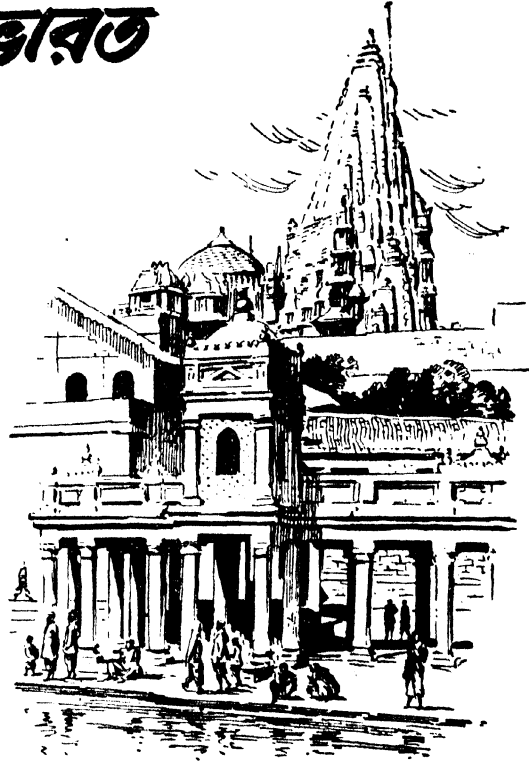
শ্রীহীন, শিক্ষাহীন যে, তার মধ্যে থেকে এমন শিক্ষায় এবং শ্রীতে উজ্জ্বল ও প্রসন্ন একটি মেয়ের সম্ভাবনা অসম্ভব বলেই মনে হল।

—মাসী গো! রমা মাসী! আমার ছেলে-বয়সের সখী। ওই যে—

আর বলতে হয় না। চকিতে মনে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই রমা? রমা এমন হ'ল কি করে? প্রশ্নটা কিন্তু তুলতে পারে নি অক্ষয়। তবে সে 'কিন্তু' ভাবটা রমার চোখ এড়ায় নি। সে নিজেই গল্প করেছিল নিজের জীবনের। বলেছিল—সে লোকটা বুড়ো বয়সে আমাকে বিয়ে করেছিল বলে প্রথম প্রথম তার উপর একটা আক্রোশ ছিল—রাগ ছিল। তাছাড়া ছেলেবয়সের অনেক রকম গোপন সাধ থাকে তো। তাও ছিল। কত জনকে তখন ভালবেসেছি—তার কি ঠিক আছে। দুদিন, দশ দিন, এক মাস, দু মাস পর পর এক-একজনকে মনে-মনে ভালবাসতাম। বুঝেছ—!

মুখ টিপে হেসে রমা বলেছিল—তুমি যখন থিয়েটারে নায়িকা সাজতে অক্ষয়দা—ভাল পার্ট করতে, তখন মনে হতো ভালই—কল্কে ফুল তুলে মালা গেঁথে তোমার গলায় পরিয়ে দেব। আর বলব যে, মালা যদি না-নাও, তবে কল্কে ফুলের বীজ খেয়ে মরেই যাব আমি। এই সব নিয়ে মানুষটির উপর আক্রোশ থাকা তো স্বাভাবিক—তাই ছিল। যদি বল—অন্যায়। পাপ, তা নিয়ে ঝগড়া করব না। তাই—তাই। তারপর কিন্তু তার উপর সত্যিই ভক্তি হয়েছিল আমার। সে-ভক্তি আজও আছে। গুরুর মত ভক্তি। পড়িয়ে শুনিয়ে আর এক মানুষ করে দিয়ে গিয়েছে।

অক্ষয় ঘোষাল ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল—সান দেওয়া তলোয়ারের মত মেয়েটার এই খাপ-খোলা চেহারা দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল; কথাবার্তার মোড় ফেরাবার জন্যে বলেছিল—কিন্তু হঠাৎ আজ নবগ্রামে এলে যে? কোথায় এসেছিলে?

—উপলক্ষ্য মহাপীঠে পুজো দেওয়া। গন্তব্যস্থল বোনঝির বাড়ি। লক্ষ্য। আবার মুখ টিপে হাসলে সে। বললে—যদি বলি তোমাকে দেখতে, বিশ্বাস করবে?

—না। বুঝব মিথ্যে বলছ।

—তাহলে মিথ্যে বলব না। শুনলাম গৌরীদা এসেছেন—তাঁকে দেখে যাব।

অক্ষয় আপনার অজ্ঞাতসারেই মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে উঠেছিল। বলেছিল—হুঁ।

মানুষ অকস্মাৎ গম্ভীর হয়ে ওঠে, তার কারণ হ'ল মানসিক অপ্রসন্নতা। অপ্রসন্নতার মূলে আছে অপ্রীতির উত্তাপ। কথায় কথায় সেই উত্তাপে উত্তপ্ত হয়ে অনেক কথাই বলেছিল অক্ষয় সেদিন। এ-গ্রাম, এখানকার মানুষ সম্পর্কেও গৌরীকান্তের নির্লিপ্ততা উদাসীনতা একটা বক্র অবজ্ঞা ছাড়া কিছুই নয়। বলেছিল—যাও দুটো মিষ্টি মিথ্যে কথা, দুটো পিঠ চাপড়ানি, মিথ্যে আশীর্বাদ পাবে। আমার তো সমস্ত শরীর জ্বালা ক'রে ওর কথা শুনে।

তারপর আর কথার মোড় ফেরে নি, মুখ বন্ধ হয়নি। সে বলেই গিয়েছিল—যত অভিযোগ তার আছে। সেই সূত্রে শান্তির কথা উঠেছিল—বিজয়ের কথা উঠেছিল। কিশোরবাবুর কথা উঠেছিল। শান্তির কথাই বেশি। একটি চব্বিশ-পঁচিশ বছরের যুবতী অনূঢ়া মেয়ে—হ'লই-বা বি-এ পাশ; সে নির্জনে তার সঙ্গে বসে গল্প করবে, বহুজনের সঙ্গে বসেও প্রগল্ভতা করবে—এটা কোন্ দেশি আচার? তার উপর সেই মেয়ে ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রী!

রমা সমস্ত শুনে বলেছিল—এ নিয়ে উপরে লেখ না কেন তোমরা?

—লিখি না! কেন লেখে না—এ-কথার জবাব অক্ষয় দিতে পারে নাই। কিছুক্ষণ পর বলেছিল—গৌরীকান্তকে ভাইয়ের মত স্নেহ করতাম—করিও এখনও। সেও বটে—তাছাড়া লিখে হবেই-বা কি? উপরে হয়তো বিশ্বাসই করবে না!

—এন্‌কোয়ারি তো হবে! তোমরা সত্যিই মানুষ নও অক্ষয়দা! আচ্ছা। এন্‌কোয়ারি হ'লে যেন একটু সাহস করে কথাগুলো বলো। কেমন?

কথাগুলি মনে পড়ে গেল অক্ষয়ের। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ে সে অবাক হয়ে গেল। রমা এই দরখাস্ত করেছে? করেছে তাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। পৃথিবী বিচিত্র! এখানে অসম্ভব কিছু নয়, অবিশ্বাস্য কিছু নাই। ওঃ, কি স্নেহই করত গৌরীকান্ত এই মেয়েটিকে। আর পোষা বেড়ালের মত কি স্নেহ-কাঙাল ভীরু স্বভাবই না ছিল এই মেয়েটির। অনবরত ঘুরঘুর করে বেড়াত। বরাত খাটত। সেই মেয়ে এই দরখাস্ত করেছে?

সদয় বললে—কি? কিছু কথা বলেন না যে?

—কি বলব? আমার বলবার কিছু নাই। আপনার কথাও আমি শুনতে চাই না। বোমা-পিস্তলের কথা বললে আমি আপনাকে ধরিয়ে দেব।

—আমিও সব ফাঁস করে দিব। আর বিজয়-কানাইয়ের বদলে আপনার উপরেই চালায়ে দিব ওগুলো।

—তাতে আমি ভয় করি না। অক্ষয় একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল এবার। বোধ করি, এবার সে অপরাধের গণ্ডির বাইরে এসে আত্মদানের সাহস দেখাবার সুযোগ পেয়ে মুক্ত বায়ুর সংস্পর্শে জ্বলে উঠল।

তারপর বললে—আর ফাঁস করে দেবে? কি ফাঁস করে দেবে? আমি যা বলেছি? আমি যা ঘরের মধ্যে বলেছি, তা বাইরে বলতে ভয় পাই না। বলেছি—বলব।

আবার সে আরম্ভ করলে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা।

নবগ্রামের বাজারের মধ্যে তখন আলো জ্বলতে শুরু হয়েছে। এখানে-ওখানে, দোকানের বারান্দায় কোথাও পাঁচজন, কোথাও সাতজন, কোথাও দশজন টুকরো টুকরো মজলিস-বৈঠক জমিয়ে তুলছে। তামাকের সঙ্গে গল্প, হাসি, তর্ক-তকরার চলছে। অক্ষয়ের উচ্চকণ্ঠ সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে উঠল।

সে বলছিল—সত্যি যদি না হবে, তবে হেড মিস্ট্রেস রেজিগনেশন দেয় কেন? এন্‌কোয়ারিতে আপত্তি কেন তার? সে বলুক। আর এই সব কথা বিজলী ওদের নিজের লোক—ওদের বাড়ি কাজ করে দেয় চব্বিশ ঘণ্টা থাকে—সে বলেছে। আমি মিথ্যে রটনা করিনি! মিথ্যে কথা আমি বলি না। মিথ্যে দরখাস্ত আমি করি না। যদি করি, তবে আমার মাথায় বজ্রাঘাত হবে।

(ক্রমশ)

বিদায় নিয়ে গিয়েছিলাম বারে বারে
ভেবেছিলাম ফিরব না রে
এইতো আবার নবীন বেশে—

না, নবীন বললে ঠিক হয় না, বয়সে প্রবীণ হয়েছি। তা ছাড়া আপনাদের কাছে নিতান্তই পুরোতন। পূর্বতন পাঠকরা দু' লাইন পড়লেই চেনা গলার আমেজ পাবেন।

কিন্তু এর কোনো প্রয়োজন ছিল না। বেশ ছিলাম, আমি যে কোনোকালে লিখতুম সে কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। হঠাৎ সম্পাদক মশায় আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, এককালে আমি যৎকিঞ্চিৎ লিখেছি এবং সে লেখার কথঞ্চিৎ কদরও নাকি হয়েছে। আমি অত খবর রাখিনে। বাজার-দর দিয়ে যদি কদরের পরিমাপ করা যায়, তবে সম্পাদক মশায়কে নিভৃতে বলছি চার বছরেও বই-এর প্রথম সংস্করণ শেষ হয় নি। কদর যদি হয়ে থাকে তো 'দেশ'-এর পাঠক মহলে হয়েছে, দশের মহলে হয় নি।

পাঠকদের এক একটা ঘাটি আছে, এক ঘাটির পাঠক অন্য ঘাটির খোঁজ রাখেন না। তার ফলে যেটা পাঠকদের কর্তব্য, সেটা লেখকদেরই করতে হয় অর্থাৎ লেখক বেচারীকে ঘুরে ঘুরে নানান্ ঘাটের জল খেয়ে বেড়াতে হয়। সেই জন্যে ভেবেছিলাম আবার যদি লিখি তো 'দেশ' ছেড়ে দেশান্তরে যাবো। কিন্তু ঘুরে ফিরে সেই 'দেশ'। আমি স্বভাবতই কুণো প্রকৃতির মানুষ, এ্যাডভেঞ্চার আমার ধাতে সয় না। 'দেশ'-এর পাতাতে আমার জন্ম। কবিবাক্য বোধ করি মিথ্যা হবে না—আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতেই মরি। যেই 'দেশ'-এর কল্যাণে আমার যৎসামান্য প্রতিষ্ঠা সেই 'দেশ'-এর পাতাতেই ঐ প্রতিষ্ঠার কবর হবে কি না, কে জানে!

আশঙ্কা এই কারণে যে, আমার প্রথম পর্যায় যখন লিখেছিলাম, তখন আমি মানুষটা ছিলাম অন্য রকম, একেবারে মুক্ত পুরুষ। কাজের তাড়া ছিল না, সময়ের তাগিদ ছিল না। মুখে বাক্যের স্রোত বইত। প্রয়োজন ছিল একটি দুটি শ্রোতার, তবে কখনো অভাব হতো না। শত কথা মুখে বলতাম তারই এক-আধ কথা লিখে আপনাদের কাছে নিবেদন করেছি। কথার জন্য কথা, আর্টের জন্য আর্টের মতোই বড় জিনিস। প্রয়োজন নিরপেক্ষ যে কথা তাকেই বলে কথা-সাহিত্য। প্রয়োজনের দাবী মেটায় যে কথা, তাই দিয়ে দুনিয়াদারি চলে, সাহিত্যের কারবার চলে না, দলিল-দস্তাবেদ হয় সাহিত্য হয় না। যে মেঘ বৃষ্টি দেয় তার স্থান ফারমার্স বুলেটিনে। শরতের মেঘ অকারণে ভেসে যায়। আবহাওয়া আপিস তার খোঁজ রাখে না। তার স্থান কবির কাব্যে।

আসরের প্রথম দিবস

এখন আমি অন্য মানুষ—বিষম কাজের লোক। যে মানুষ পথের ধারে গাছের তলায় যেখানে সেখানে পা ছড়িয়ে বসে গল্পে মেতে যেত, এখন সে অত্যন্ত ভব্যসভ্য হয়ে আপিসে বসে থাকে। অত্যধিক গম্ভীর মুখ করে ততোধিক বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করে। স্বভাববিরুদ্ধ কাজ করতে গেলে মানুষের চরিত্রহানি ঘটে। সে দিক থেকে বলতে গেলে আমার চরিত্রহানি হয়েছে। বলা বাহুল্য, লেখকের চরিত্র বদলালে লেখারও চরিত্র বদলে যায়। অতএব আমার পুরোনো লেখার অনুবৃত্তি যদি এবারে আশা করেন, তবে হয়তো বা নিরাশ হবেন।

লেখকদের মনে একটা হ্যাংলামি আছে। একটু যদি আস্কারা পেল তো আর রক্ষা নেই। সম্পাদক মশাই যেই না আহ্বান করেছেন, অমনি মনের অহমিকাটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। অথচ আপনাদের মনে থাকবার কথা, সেবারে অনেক ইনিয়ে বিনিয়ে আপনাদের কাছে বিদায় নিয়েছিলাম। বলেছিলাম, এবারে আমার কথাটি ফুরাল। মনের মধ্যে যত কথা জমেছিল, সব ঝেড়ে-ঝুড়ে খালি করে দিয়েছিলাম। কিন্তু শূন্য স্থান বেশীক্ষণ শূন্য থাকে না। কথার বাষ্প এসে মনকে আবার আচ্ছন্ন করে। অনেকটা যেন সাপের বিষ-দাঁতের মতো, উপড়ে ফেললেও আবার গজায়।

সাপের সঙ্গে লেখকের তুলনা শুনতে ভালো শোনায় না; কিন্তু দুইএর মধ্যে খানিকটা যে সাদৃশ্য আছে, সে কথা অস্বীকার করবার জো নেই। এ যুগে অধিকাংশ লেখকই সাপের মতো বিষধর অমৃত পরিবেশন করেন এক-আধজন, বেশীর ভাগই করেন বিষোদ্গার। লেখার ঝাঁঝ যত লেখার কাটতি তত। কৃতিত্ব বলতে হবে পাঠকদের। তাঁরা নীলকণ্ঠ, সেই বিষ নিজ কণ্ঠে ধারণ করেন অর্থাৎ সেই সব ঝাঁঝালো কথা মুখে মুখে আবৃত্তি করে বেড়ান। বয়সের দোষে আমার মনের সেই উত্তাপ আর নেই। ঝাঁঝ প্রকাশের চেষ্টাই আর করব না। ঝাঁঝালো কথার ঝাঁঝটুকু বাদ দিয়ে বাকীটুকু যদি দিতে পারতাম, তবেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করতুম—ইংরেজ সমালোচক যাকে বলেছেন—Sweetness and light.

আজ আসরের প্রথম দিন, আজকে আর বেশী কথা বলব না। আজ শুধু আলাপের সূত্রপাত। আলাপ জমাবার আগে নিজের পরিচয়টা দেওয়া বাঞ্ছনীয়। আমার পুরোনো বন্ধুরা ইতিমধ্যেই আঁচ করে থাকবেন। নতুনদের কাছে পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন—অধমের নাম ইন্দ্রজিৎ।

আমার নব-পর্যায় কথামালার নামটা কি হবে, সম্পাদক মশায় পূর্বাহ্নে তা জানতে চেয়েছিলেন। নামকরণের ভারটা আমার উপরে ছেড়ে না দিয়ে তিনি নিজে করলেই ভালো করতেন। অনায়াসেই বলতে পারতেন 'ইন্দ্রজিতের কথামৃত'। নিজের মুখে বলতে গেলে কথাটায় অহঙ্কারের সুর লাগে। আমি স্বভাবতই বিনয়ী ব্যক্তি। নিতান্তই বিনয় বশত অমন যুৎসই নামটা ত্যাগ করতে হ'ল। অতএব সেই পুরোনো নামই ভালো। আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে তো 'ইন্দ্রজিতের আসর' নামটাই বহাল রইল। আমার একটি বন্ধু অবশ্য বলছিলেন, আসর শব্দের র স্থানে ব আদেশ হলে ব্যাপারটা অধিকতর লোভনীয় হতে পারত। তা অবশ্যই হতো। কিন্তু কি করব বলুন, প্রহিবিশনের যুগে ওসব দ্রব্য পরিবেশন করতে সাহস হয় না।
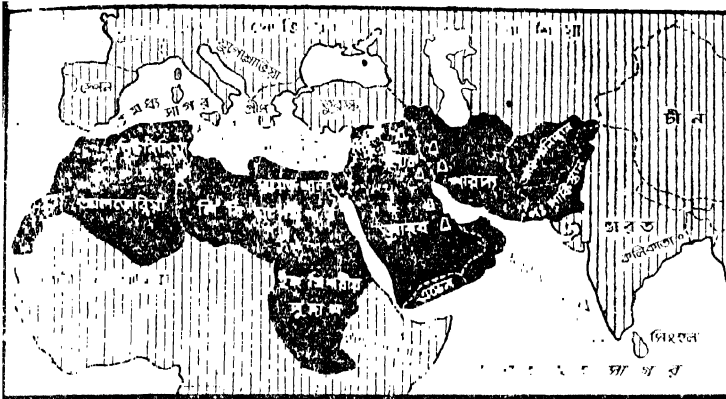
মধ্যপ্রাচ্য-পরিচয়

সরোজ আচার্য

(২)

সুয়েজ খাল কি করে ইংরেজদের খাস-তালুকে পরিণত হল, তার রোমাঞ্চকর কাহিনী বলা হয়েছে। এই খাল এলাকায় ইংরেজ ফৌজের দখল নিয়ে মিশরের সঙ্গে ইংলণ্ডের রেষারেষি আজও শেষ হয়নি। প্রায় আশী বৎসর ধরে মিশরের জনসাধারণ ইংরেজকে মিশর থেকে হটানোর জন্য আন্দোলন করছে। কত বিক্ষোভ, সংঘর্ষ, রাষ্ট্রনায়কদের উত্থান-পতন, পরাজয় ও বিশ্বাসঘাতকতা মিশরের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস রচনা করেছে, তার বিবরণ পরে আলোচনা করা যাবে। কেবল মিশর নয়, সারা মধ্য প্রাচ্যেরই এই দুর্ভোগ ও দুর্ভাগ্য। ইতালির এক প্রাচীন কবি বলেছিলেন, ইতালির দুর্দশার কারণ হল, তার অপরূপ সৌন্দর্য। মধ্য প্রাচ্যের দুর্ভোগের কারণ হল তার ভৌগোলিক অবস্থান এবং তার বিপুল তেল-সম্পদ। আগেই বলা হয়েছে, পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদীদের হিসাবে মধ্য প্রাচ্য করতলগত রাখার একটি কারণ হল, এই ভূখণ্ড তিন মহাদেশের সংযোগ-স্থল। এই সংযোগস্থলের কর্তৃত্ব দখলে রাখার জন্য ইংরেজই এতকাল সবচেয়ে অগ্রণী ছিল। য়ুরোপের অন্য কোনো কোনো দেশও ইংরেজের সৌভাগ্যের ভাগীদার হতে চেষ্টা করেছে। নেপোলিয়নের নজর ছিল মিশর এবং সিরিয়া ও লেবাননের উপরে। নেপোলিয়ন মিশর পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন একবার, কিন্তু ট্রাফালগারের যুদ্ধেই নেপোলিয়নের মধ্য প্রাচ্য বিজয়ের কল্পনা খতম হয়। এর পর ফরাসীরা উত্তর আফ্রিকায় মরক্কো, আলজিরিয়া ও টিউনিসিয়ায় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে বটে, কিন্তু সেটা ইংরেজদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে। এদিকে ইংরেজদের জার্মান প্রতিদ্বন্দ্বী কাইজার মরক্কোতে গোলমাল বাধানোর চেষ্টা করেছিলেন, আর বার্লিন থেকে বাগদাদ পর্যন্ত রেলপথ খুলে ইংরেজদের প্রভাব খর্ব করার চেষ্টা শুরু করেছিলেন। ওদিকে রুশ বাদশাহ পারস্যের উপরে মাঝে মাঝে হুমকি দিয়ে অনেক কিছু সুবিধা আদায় করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে ইংরেজদেরই প্রভাব আরও শক্তিশালী হল মধ্য প্রাচ্যে। তুর্কীর খলিফার বিরুদ্ধে আরব জাতিদের উস্কানি দিয়ে ইংরেজ একদিকে যুদ্ধ জিতবার সুবিধা করল, অন্য দিকে যুদ্ধের পরে আরব দেশে নতুন নতুন রাজ্য গড়ে বিশ্বাসী আমীরদের সিংহাসনে বসিয়ে ইংরেজই মুরুব্বী হয়ে বসল। ইংরেজদের মিত্র হিসাবে ফরাসীরা অনেক মান-অভিমান করে সিরিয়া এবং লেবাননের অছিগিরি আদায় করল; ওদিকে রুশ বাদশাহী লোপ পাওয়ার পর বলশেভিকেরা পারস্য থেকে সরে গেল এবং বাদশাহী আমলে পারস্যে যেসব সুবিধা আদায় করা হয়েছিল, সেগুলিও তারা ছেড়ে দিল। তখনকার মত ইংরেজেরই সুবিধা হল, যদিও ইংরেজের আশঙ্কা এবং আতঙ্ক আগের চেয়ে বাড়লো বই কমলো না। আগে ছিল রুশ বাদশাহ, যার সঙ্গে ইংরেজ রাজার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল, বাদশাহে বাদশাহে বিবাদ যেমন হয়, দরকারমতো রফাও হতে পারে। কিন্তু এখন হল বলশেভিক—যাদের মন্ত্রতন্ত্র, কলকৌশল সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের। ওদিকে ভারত-সাম্রাজ্য, এদিকে মধ্য প্রাচ্যের তেল ও সাম্রাজ্যের যাতায়াত ব্যবস্থা। প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানী ও তুর্কীর পরাজয়ে ইংরেজের প্রতিদ্বন্দ্বী কমল বটে, ফ্রান্স এবং ইতালির সঙ্গে স্বার্থের মিতালিও কতকটা পাকা হল। কিন্তু এক সম্পূর্ণ নতুন ধরণের শক্তি—সোভিয়েট রাশিয়া হল ইংরেজের ভয়ের কারণ। যাহোক, এই নতুন পরিস্থিতি মধ্য প্রাচ্যের সমস্যা কিভাবে আরও জটিল করেছে, সেকথা পরে আলোচনা করা যাবে। আপাতত দেখা যাচ্ছে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সুনির্দিষ্ট নীতি প্রথম থেকেই হল সাম্রাজ্যের যোগাযোগ-ব্যবস্থার জন্য মধ্য প্রাচ্য দখলে রাখা।
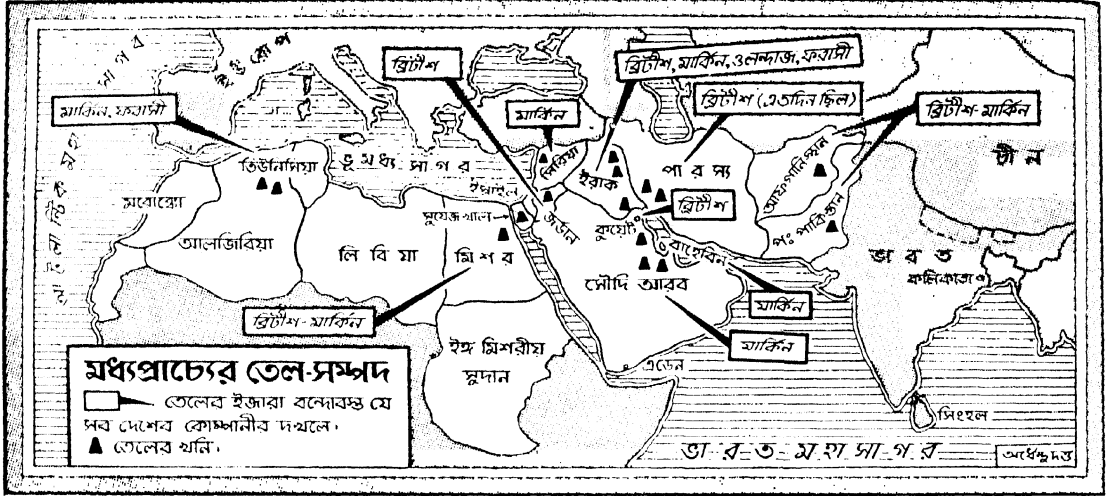
আফ্রিকার উত্তর দিয়ে, ভূমধ্যসাগরের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ, মালয়, চীন ও অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত যাতায়াতের সমুদ্র-পথ গত দেড়শ' বছর ধরে ইংরেজ নিজের আয়ত্তে রাখার চেষ্টা করেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে বিমান চলাচলের ব্যবস্থা ক্রমশ প্রসারিত হয়েছে। সেজন্যও মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলিতে সুবিধামত বিমান ঘাটি ইংরেজই প্রথমে দখল করেছে। এছাড়া সমুদ্রপথে যাতায়াত-ব্যবস্থায় আর একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন হয় প্রথম মহাযুদ্ধের পরই। পূর্বে জাহাজ চালানোয় কয়লাই প্রধানত ব্যবহৃত হত। প্রথম মহাযুদ্ধের পর কয়লার বদলে তেলে চালানোর ইঞ্জিন জাহাজগুলিতে ব্যবহার চালু হল। মধ্য প্রাচ্যের গুরুত্ব আরও বাড়লো। তেলের খনি দখল করা ও তেল চালানোর জন্য পাইপ লাইন বসানোয় ইংরেজ, ফরাসী এবং য়ুরোপের আরও নানা দেশের মূলধনীরা এগিয়ে এল, প্রতিযোগিতা শুরু করল।

মধ্যপ্রাচ্যের তেল-সম্পদ

"প্রাচীন রাজা কয়লা" (Old King Coal) কিভাবে সিংহাসন হারাল, সারা পৃথিবীতে তেল-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হল সে কাহিনী যেমন রোমাঞ্চকর, তেমনি শঠতায়, লোলুপতায়, পররাজ্য-গ্রাসের জন্য হানাহানি ও রক্তক্ষয়ে মানুষের ইতিহাসের এক চরম কলঙ্কময় পরিচ্ছেদ। এই কাহিনী অবশ্য কেবল মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলের নয়। কয়লার বদলে তেল (পেট্রোলিয়াম, কেরোসিন) ব্যবহার সম্বন্ধে বিজ্ঞানী ও মূলধনী মহলে জল্পনা-কল্পনা শুরু হয় গত শতাব্দীর মাঝামাঝি। এর আগেও তেলের ব্যবহার অজানা ছিল না, তবে দুনিয়াজোড়া বিরাট শিল্প-ব্যবসায়ের লোভনীয় সম্পদ হিসাবে তেলের কদর হয়েছে ১৯ শতাব্দীর শেষ দিকে। তেল-সম্রাটের জন্মকথা কিছুটা জানা দরকার, নতুবা বর্তমান মধ্যপ্রাচ্যে তেল-মূলধনীদের মুনাফা-মৃগয়ার স্বরূপ ভালমতো বোঝানো যাবে না। বহু প্রাচীন যুগেও মাটির নীচে তেলের প্রস্রবণ সম্বন্ধে নানা অলৌকিক ধারণা ও অভিজ্ঞতা মানুষের হয়েছিল। এই অভিজ্ঞতা থেকেই বোধ হয় মধ্যপ্রাচ্য, ভারত-বর্ষ এবং রাশিয়ার তেল-খনি অঞ্চলে প্রাচীন-কালে নানাভাবে অগ্নি-উপাসনার প্রবর্তন হয়। প্রাচীন পারস্যের অগ্নি-উপাসনা বখ্‌তিয়ারী ও লোরী পাহাড়ের জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড থেকে শুরু হয়, শোনা যায়। প্রাচীন গ্রীক, লাতিন গ্রন্থে এবং বাইবেলে বাকু (দক্ষিণ রাশিয়া)র "তেল-নদী" ও গহ্বরের উল্লেখ পাওয়া যায়। দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার নাকি স্ফূর্তি করবার জন্য একটি ছেলেকে "জ্বলন্ত জলে" অর্থাৎ তেলে ভিজিয়ে আগুনে পুড়িয়ে মারেন। ১৩শ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী মার্কো পোলো দেখেছিলেন, উটের পিঠে বড় বড় জালা বোঝাই তেল বাগদাদের পথে রওনা হয়েছে। কিন্তু এ সব হল অতীতের কাহিনী। শিল্প-বিপ্লবের পরে যন্ত্রের ক্ষুধা বেড়েছে, কাঠ থেকে কয়লা, কয়লা থেকে তেল, এমনি করে তার ইন্ধন সংগ্রহে সারা দুনিয়াতে ভাগ্যসন্ধানীরা ছুটেছে জমি দখল করেছে, মাটি খুঁড়েছে, পাইপ বসিয়েছে। যন্ত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তেলের চাহিদা এত বেড়েছে যে, জালা পিপায় মজুত করে কাজ চলে না। চব্বিশ ঘণ্টা তেলের স্রোত পারস্য উপসাগর থেকে ভূমধ্য সাগর পর্যন্ত বয়ে নেবার জন্য পাইপ লাইন বসেছে পাঁচ-ছয়টি দেশের মধ্য দিয়ে তেল বয়ে নিয়ে দেশে দেশে চালান দেবার জন্য তৈরি হয়েছে বিরাট 'ট্যাংকার' জাহাজের বাহিনী।

তেল উৎপাদন ও সরবরাহের এ বিরাট সমারোহের মূলে হল যন্ত্র-যুগের কয়েকটি যুগান্তকারী আবিষ্কার—প্রথম হ[ল] বেইনজ্ ও ডেইম্‌লারের মোটরগাড়ি দ্বিতীয় হল রাইট্ ভ্রাতাদের উড়োজাহাজ। তেল এবং তার আনুষঙ্গিক তেলজাত ইন্ধ[ন] যে শিল্পে, যানবাহনে কি বিপুল পরিমাণে কাজে লাগবে, সেটা ভালোমতো বোঝা গে[ল] প্রথম মহাযুদ্ধের সময় সময়। ১৮৮০ সনে ইংলণ্ড ও আমেরিকার দূরদর্শীরা কতক অনুমান অবশ্য করেছিলেন। ১৮৫৯ স[নে] আমেরিকায় তেল আবিষ্কার হয়, রাশিয়া[য়] ১৮৬৩—১৮৭৩ সনের মধ্যে পেট্রোলি[য়াম] ব্যবসায় তেজী হয়ে উঠে। ব্যবসাে[য়]

যাদুকর কোটিপতি রকফেলারই তেল-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। শেষ জীবনে দান-দক্ষিণায় তিনি যেমন খ্যাতি অর্জন করে-ছিলেন, ব্যবসায় ক্ষেত্রে যে কোনো উপায়ে তাঁর একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠায় তেমনি তিনি ছিলেন বেপরোয়া। ১৮৭০ সনে তিনি তাঁর বিখ্যাত স্ট্যান্ডার্ড অয়েল কোম্পানী গঠন করেন। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম পর্যন্ত তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না পৃথিবীর তেল-সাম্রাজ্যে। পরে অবশ্য রথচাইল্ড, ডেটার্ডিং এবং আরও কোনো কোনো বেপরোয়া তেল-মূলধনী রকফেলারের সঙ্গে পাল্লা দিতে এসেছিলেন। ইংরেজদের সৌভাগ্যই বলতে হবে, মধ্যপ্রাচ্যের তেলের দিকে রকফেলার প্রথমে নজর দেন নি। তাঁর তেল-সাম্রাজ্য উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার এলাকাতে অনেকদিন সীমাবদ্ধ ছিল। তেলের ব্যবহার সম্বন্ধে ইংরেজ প্রথমে অনেকটা উদাসীনও ছিল। ব্রিটেনের প্রচুর কয়লাই ছিল তার প্রধান ভরসা। ব্রিটেনের কয়লা-খনির মালিকেরাও অনেক দিন পর্যন্ত তেল-ব্যবহারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়েছিল। কিন্তু মূলধনী মাত্রেই সহজে প্রচুর মুনাফা করার সুযোগ খোঁজে। ইংরেজ মূলধনী বাকুর তেলের খনিতে যখন টাকা লগ্নী করছিল, তখন সুবিধামত অন্যত্র তেলের খনির ব্যবসা কেন হাতে নেবে না? কিন্তু এ ছাড়াও বড়ো কারণ ছিল ব্রিটিশ সরকারী মহলে তেল-সম্পদের ভবিষ্যৎ গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা ও নতুন নীতি নির্ধারণ।

ঠিক প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বক্ষণ, ইংরেজদের সাম্রাজ্য তখনও সর্বদিক দিয়ে প্রবল ও স্বচ্ছল—তার বিরাট জাহাজ-বাহিনী সারা পৃথিবীর সমুদ্রপথে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সাম্রাজ্যের কর্ণধারেরা এবং মূলধনীরাও অনুভব করছিলেন সাম্রাজ্যের শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে প্রচুর তেল নিজেদের দখলে রাখা দরকার হবে। ওদিকে রকফেলার এবং ডেটার্ডিং-শেল-রথচাইল্ড গোষ্ঠীরা ভালো ভালো তেলের এলাকা ভাগাভাগি ও দখল করে নিচ্ছে। তখন ইংরেজের টনক নড়ল। ঠিক এই সময়ে ব্রিটিশ নৌ-বিভাগে একজন পদস্থ কর্মচারী ছিলেন জন ফিসার। তাঁকে লোকে বলত 'তেল-পাগল'; ফিসার এর পরে লর্ড হন এবং নৌবিভাগের প্রধান কর্তা হন। ফিসারের যুক্তি ছিল যে, কয়লার বদলে তেল-ব্যবহার করলে ব্রিটিশ নৌবাহিনী দেড় গুণ বেশি কর্মশক্তি পাবে। যা হোক, ফিসারের প্রাণপণ চেষ্টায় এবং শেষ পর্যন্ত মিঃ চার্চিলের উদ্যোগে ব্রিটিশ সরকার তেল-সাম্রাজ্যের ভাগ-দখলে সক্রিয়ভাবে অগ্রণী হ'ল। ১৯০০—১৯১৫ সনের মধ্যে বর্মা অয়েল কোম্পানী এবং এ্যাংলো-পারসীয়ান অয়েল কোম্পানীর মারফৎ ব্রিটিশ সরকার মধ্যপ্রাচ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার তেল-খনিগুলির প্রধান অংশীদার হয়ে পড়ল। পারস্যের তেলের খনিগুলির ইজারা বন্দোবস্ত নিয়েই মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটিশ তেল-ব্যবসায়ের গোড়াপত্তন হ'ল। কিভাবে পারস্যের তেলের এলাকা ব্রিটিশের হাতে পড়ল সেই কাহিনীটা এখানেই সংক্ষেপে বলা যেতে পারে। নক্স ডার্সি নামে একজন ভাগ্যসন্ধানী দক্ষিণ পারস্যে তেলের সন্ধানে ঘোরাফেরা শুরু করেন। পারস্যের শাহের সঙ্গে খাতির জমানোর কাজে ডার্সি অনেকদিন ধরে নানা কলাকৌশল করেন। এর মধ্যে ডার্সি অন্য একজন ভাগ্য-সন্ধানীর নিকট থেকে খবর পান দক্ষিণ পারস্যে বখ্‌তিয়ারী উপজাতিদের এলাকায় তেলের খনির সন্ধান পাওয়া গেছে। বখ্‌তিয়ারী উপজাতিদের রকমসকম অবশ্য আদৌ ভালমানুষী ধরণের ছিল না। কিন্তু ডার্সিও এক-রোখা লোক। অস্ট্রেলিয়ায় সোনার খনি বার করে মোটা রকমের নগদ লাভও তিনি করে এসেছিলেন। ১৯০১ সনের মে মাসে পারস্যের শাহের কাছ থেকে মাত্র পাঁচ হাজার পাউন্ড সেলামী দিয়ে ডার্সি সেই প্রসিদ্ধ ইজারা বন্দোবস্ত আদায় করেন, যার বলে য়্যাংলো-ইরানীয়ান অয়েল কোম্পানী বিপুল মুনাফা করেছে ৩০।৩৫ বৎসর ধরে। ডার্সির ইজারা-বন্দোবস্তে পারস্যের উত্তরের পাঁচটি প্রদেশ ছাড়া গোটা দেশটাই পশ্চিমী তেল-মূলধনীদের হাতের মুঠোয় এল। পাঁচ লক্ষ বর্গমাইল জুড়ে তেলের খনি বসানোর ইজারা বন্দোবস্ত ৬০ বৎসরের জন্য পাওয়া গেল মাত্র ৬৫ হাজার টাকা সেলামী দিয়ে। অবশ্য এর সঙ্গে আরও সর্ত ছিল যে, কোম্পানীর মুনাফার একটি অংশ পারস্য সরকার বরাবর পেতে থাকবে। অনেকদিন পর্যন্ত খোঁড়াখুঁড়ি করেও প্রচুর তেলের সন্ধান পাওয়া যায়নি। এমন কি একবার কাজ বন্ধ করবার হুকুমও জারী হয়েছিল। ঠিক সেই সময়ে ১৯০৮ সনের মে মাসে এক প্রাচীন পার্সিয়ান মন্দিরের কাছে ১০০০ ফিট নীচে তেলের খনি পাওয়া গেল। ডার্সির ইজারা-বন্দোবস্তকে ভিত্তি করে ১৯০৯ সনে য়্যাংলো-ইরানীয়ান তেল কোম্পানী গঠিত হ'ল। এর পর প্রথম মহাযুদ্ধের সময় "তেল-পাগল" ফিসার এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সেরা কর্ণধার চার্চিলের উদ্যোগে ব্রিটিশ সরকার য়্যাংলো-ইরানীয়ান তেল কোম্পানীর শতকরা ৫১ ভাগ শেয়ার প্রায় ১৪ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা দিয়ে কিনে নিল। এই ব্যাপারটি ঘটল ১৯১৪ সনে। প্রথম মহাযুদ্ধ বাধবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে চার্চিল পার্লামেন্টে ঘোষণা করলেন, "অনেক বৎসর ধরে আমাদের পররাষ্ট্র দপ্তর, নৌ-বিভাগ এবং ভারত সরকারের নীতি হ'ল পারস্য এলাকায় ইংরেজের

স্বার্থরক্ষা এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার হ'ল এই এলাকা যাতে 'শেল' অথবা অন্য কোন বিদেশী কোম্পানীর খপ্পরে না পড়ে তার প্রতিবিধান করা।"

মধ্যপ্রাচ্যের তেলের গুরুত্ব

পারস্যের তেল-ব্যবসায়ের জন্মবৃত্তান্ত বলা হ'ল। সারা মধ্যপ্রাচ্যই তৈলাক্ত এবং সেইজন্যই এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে কূট-রাজনীতি গত ৩০।৪০ বৎসর ধরে শঠতা, দুর্নীতি ও রক্তারক্তির ভৈরবী-চক্র সৃষ্টি করেছে। মধ্যপ্রাচ্যের তেল এখন বিশ্ব-রাজনীতিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। তার কারণগুলি না জানলে মুনাফা-শিকারী মূলধনী, সামন্ত জমিদার শ্রেণী ও বৃহৎ শক্তিদের রেষারেষি, দর-কষাকষি এবং জনগণের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি বোঝা কঠিন। সাত বৎসর আগের হিসাবে সারা পৃথিবীর তেল-সম্পদের শতকরা ৩৪ ভাগ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে, শতকরা ১০ ভাগ মেক্সিকো এবং কারিবিয়ান অঞ্চলে, ৯ ভাগ সোভিয়েট রাশিয়ায়, ৫ ভাগ বর্মা, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশে আর শতকরা ৪২ ভাগ হ'ল মধ্যপ্রাচ্যে। এখনকার হিসাবে মধ্যপ্রাচ্যেই সারা পৃথিবীর অর্ধেক তেল সঞ্চিত আছে।

মার্কিন বিশেষজ্ঞদের মতে পৃথিবীর তেল উৎপাদনের ভারকেন্দ্র উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা থেকে মধ্যপ্রাচ্যে সরে আসছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সবচেয়ে শিল্পোন্নত ও স্বচ্ছল দেশ। তার তেলের খরচ হয় দরাজভাবে, চাহিদাও সেজন্য সবচেয়ে বেশি। অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তেলের খনিগুলিতে ১৪ বৎসরের মত সংকুলান হয় এই পরিমাণ তেল এখন আছে। সারা পৃথিবীতে যত তেল লাগে, তার ২/৩ ভাগ কেবল মার্কিন মুলুকেই খরচ হয়। গত মহাযুদ্ধ থামবার সঙ্গে সঙ্গেই মার্কিন ধনপতিদের কাগজ , "ওয়াল স্ট্রীট ম্যাগাজিনে" একজন বিশেষজ্ঞ লেখেন, সমস্ত মধ্যপ্রাচ্য এখন রাজনীতি ও অর্থ-নীতির দাবাখেলার ছকের মতো দেখাচ্ছে।" মিঃ ট্রুম্যান যখন ১৯৪৭ সনে তুরস্ক এবং গ্রীস মার্কিন রক্ষণাধীনে নেন তখন বিখ্যাত মার্কিন ভাষ্যকার ওয়াল্টার লিপম্যান মন্তব্য করেন, রব উঠেছে বটে গ্রীস ও তুরস্কের স্বাধীনতা রক্ষা, কিন্তু আসলে নজর হ'ল মধ্যপ্রাচ্যের বিরাট তেল-সমুদ্রের উপর। তবে মধ্যপ্রাচ্যের তেল কেবল একলা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরই ভোগের জিনিস নয়। পশ্চিম য়ুরোপের কলকারখানার শতকরা ৮০ ভাগ নির্ভর করে মধ্যপ্রাচ্যের তেলের উপর। ভূমধ্যসাগরের যুদ্ধঘাটি-গুলির তেলের চাহিদাও মেটায় মধ্যপ্রাচ্য।

তেলের মালিক ও মুনাফা

পশ্চিম পাকিস্থান থেকে মরক্কো, টিউ-নিসিয়া পর্যন্ত মধ্য প্রাচ্যের সব দেশেই মাটির নীচে অল্প-বিস্তর তেল আছে। বর্তমানে বোধহয় সৌদী আরবে সবচেয়ে বেশি তেল সঞ্চিত আছে। যাদের মাটির নীচে তেল তারা অবশ্য তেলের মালিক নয়; তেল উৎপাদন, শোধন ও বিক্রীর কারখানা, কোম্পানী, মূলধন সবই বিদেশীদের এক-চেটিয়া। একমাত্র পারস্য থেকে সম্প্রতি য়্যাংলো-ইরানীয়ান কোম্পানীর দখলীস্বত্ব লোপ করা হয়েছে, তবু বিদেশী তেল মূল-ধনীদের ষড়যন্ত্রে পারস্য তার তেল এক ফোঁটাও বেচতে পারছে না। অন্য সব দেশে বিদেশী তেলমূলধনীরা কিছু নজরানা, সেলামী ও মুনাফার অংশ দিয়ে কারবার চালায়; কিন্তু সেই সেলামী, নজরানা ও

মুনাফার ভাগ পেয়ে মধ্যপ্রাচ্যের জনসাধারণের কোন উপকারই এ পর্যন্ত হয়নি। শেখ, আমীর, এফেন্দী ও পাশা এবং রকমারি সমস্ত প্রভুদের বিলাস-ব্যসনে খরচ হয়ে এই টাকার বেশির ভাগ; বাকী অংশ যায় অস্ত্র-শস্ত্র কিনতে, ফৌজ পুষতে। পারস্যের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ মোসাদেক কিছুদিন পূর্বে তার দেশের তেল-মুনাফার একটা হিসাব দিয়েছিলেন। ১৯৪৮ সনে য়্যাংলো ইরানীয়ান তেল-কোম্পানীর মুনাফা হয়েছিল ৯২ কোটী টাকা, ১৯৪৯-এ ৮৫ কোটী, ১৯৫০-এ ৯২ কোটী। এই হিসাবেও গলদ আছে, কারণ পারস্য সরকার স্বাধীন হলেও নিজের দেশে যে তেল-কোম্পানী কারবার চালায় তার হিসাবপত্র পরীক্ষা করার এক্তিয়ার ছিল না। যাহোক সে কোম্পানী ১৯৪৮ থেকে ১৯৫০ তিন বৎসরের হিসাবমত মুনাফা করেছিল ২৬৯ কোটী টাকা সেই কোম্পানী ৩১ বৎসরে পারস্য-সরকারকে খাজনা ও সেলামী ইত্যাদি বাবদ দিয়েছিল মাত্র ১৪৪ কোটী টাকা। এর মধ্যেও প্রায় ৫০ কোটী টাকা খরচ হয়েছিল পারস্যে 'আইন শৃঙখলা' বজায় রাখার জন্য গুলী-বারুদ কেনায়। একথা সকলেই জানে বিদেশী তেল-মূলধনীরা মধ্যপ্রাচ্যে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি গঠিত সরকার পছন্দ করে না; শেখ, আমীর, ওমরাহ, জবরদস্ত ফৌজী নায়কদের মারফৎ বন্দোবস্ত করলে বিনা ঝঞ্ঝাটে কাজ চালানো যায়। বিদেশী তেল-মূলধনীরা সাধারণত প্রতি ১ টন তেল বাবদ ৫৲ টাকা পরিমাণ সেলামী দেয়। এখন অবশ্য দিনকাল খারাপ, জনসাধারণের চাপ বাড়ছে, হাতের মুঠো আর একটু আলগা করতে হচ্ছে। সম্প্রতি ইরাক ও কুয়েটের তেল-ব্যবসায়ে নতুন চুক্তি অনুসারে বিদেশী মূলধনীরা মুনাফার অর্ধেক দিতে রাজী হয়েছে। তবু মধ্যপ্রাচ্যে বিদেশী মূলধনীদের মুনাফার হার চড়া। কারণ জনসাধারণের ভয়াবহ দারিদ্র্য, যার ফলে উৎপাদনের মজুরী খরচা অন্য অঞ্চলের চেয়ে' অনেক কম। একজন মার্কিন বিশেষজ্ঞ হিসাব করেছিলেন, মধ্যপ্রাচ্যে মজুরী এবং সমস্ত আনুষঙ্গিক খরচা মিলিয়ে গড়ে ব্যারেল প্রতি পড়ে মাত্র ৮ আনা। মধ্যপ্রাচ্যের তেলের কারবারের প্রধান প্রধান ভাগীদার হ'ল ইরাক পেট্রোলিয়াম কোম্পানী, য়্যাংলো-ইরানীয়ান, স্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল প্রভৃতি মার্কিন কোম্পানীদের গঠিত আরামকো (আরব-আমেরিকান অয়েল কোম্পানী) এবং কুয়েট অয়েল কোম্পানী। এইসব বড় বড় কোম্পানীর মধ্যে যেমন প্রতিযোগিতা আছে, তেমনি ভাগাভাগি ব্যবস্থাও আছে। যেমন ইরাক পেট্রোলিয়ম কোম্পানীর প্রায় ২৩ ভাগ শেয়ার য়্যাংলো-ইরানীয়ান কোম্পানীর আর ২৩ ভাগ রয়েল ডাচ শেল, ফরাসী তেল কোম্পানীও নিউজার্সি (মার্কিন) স্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীর। জর্ডানের তেল উৎপাদনের ইজারা বন্দোবস্ত ৭৫ বৎসরের জন্য নিয়েছে ইরাক পেট্রোলিয়ম কোম্পানী। সিরিয়া এবং মিশরের তেল প্রধানত মার্কিন মূলধনীদের হাতে। সেইরকম টিউনিসিয়ায় তেল-কোম্পানীর শতকরা ৬৫ ভাগ মূলধন মার্কিনের। এক সময়ে ব্রিটিশ মূলধনীরাই ছিল মধ্যপ্রাচ্যের তেলের প্রায় একচেটিয়া মালিক। এখন একমাত্র য়্যাংলো-ইরানীয়ান অয়েল কোম্পানী ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের আর সব কয়টি তেলের কারবারেই মার্কিন মূলধন প্রথম স্থান দখল করছে। য়্যাংলো-ইরানীয়ানও তার প্রধান ঘাটি পারস্যে গণেশ উল্টিয়েছে। গত মহাযুদ্ধের পর থেকে ব্রিটিশ মূলধনীরা মার্কিন মূলধনীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হটতে বাধ্য হচ্ছে। ইরাক পেট্রোলিয়ম কোম্পানীর শতকরা ৪০ ভাগ শেয়ার মার্কিনের হাতে চলে গিয়েছে; বাহেরিন ও সৌদী আরবের তেলও মার্কিন মূলধনীরা দখল করেছে। সারা পৃথিবীতে তেল ব্যবসায়ের রাজা হ'ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সির স্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল, সোকোনী-ভ্যাকুয়াম অয়েল, ক্যালিফোর্নিয়ার স্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল, গাল্‌ফ অয়েল কর্পোরেশন এবং টেক্সাস অয়েল কোম্পানী। এদের পরেই হ'ল ব্রিটিশ এবং ওলন্দাজদের ভাগে কারবার রয়েল ডাচ শেল এবং ব্রিটিশের (বর্তমানে রাহুগ্রস্ত) য়্যাংলো-ইরানীয়ান। এগুলি ছাড়া যেসব ছোট-খাট তেল-কোম্পানী আছে তাদেরও প্রধান অংশীদার হ'ল বড়ো বড়ো তেল-কোম্পানীগুলি। মার্কিন মূলধনীদের নজর এখন ষোল আনাই মধ্যপ্রাচ্যের তেলের উপর, বিশেষতঃ ব্রিটিশের দুর্দিনে এগিয়ে আসার জরুরী কূটনৈতিক প্রয়োজনও আছে। সৌদী আরবে মার্কিন তেল-মূলধনীরা লগ্নী করেছে ১০০ কোটী টাকা; ১৯৫১ সালে এখানে তেল উৎপাদন করেছে প্রায় ৪ কোটী টন। সঙ্গে সঙ্গে তেল চালান দেবার জন্য সৌদী আরব, সিরিয়া ও লেবাননের মধ্য দিয়ে পাইপ-লাইন বসানো হয়েছে। কাজেই এইসব রাজ্যে শান্তি ও শৃঙখলার খবরদারী করার দায়িত্ব, তেল-মূলধনীদের পরামর্শে সুবোধ বালকের মত মেনে চলে এইরকম সরকার চালু রাখার ভারও নিতে হচ্ছে। ব্যবসায়ের প্রতিযোগিতায় অবশ্য ব্রিটিশ ও মার্কিন বন্ধুরা সব সময়ে গলাগলিভাবে চলতে পারছে না। কাজেই মধ্য প্রাচ্যে কখনও একের চাল অন্যে বানচাল করে দেবার চেষ্টাও করছে। কিন্তু এক বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে পুরাদস্তুর বোঝাপড়া সব সময়েই আছে। সে হ'ল, নিজেদের মধ্যে যতই প্রতিযোগিতা চলুক না কেন, মধ্যপ্রাচ্যের প্রধান সম্পদের অধিকার সেখানকার জনসাধারণের আয়ত্তে কোনোমতেই যেতে দেওয়া হবে না। এখন অবশ্য মার্কিনেরই পড়তা ভাল, মধ্যপ্রাচ্য এবং সারা পৃথিবীতেই। ১৯৩৮ সনের হিসাবে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ন ছাড়া বাকী পৃথিবীর তেলের কারবারে শতকরা ৩৫ ভাগ মাত্র ছিল মার্কিনের, ৫৫ ভাগ ছিল ব্রিটিশের, ১৯৫১ সালের হিসাবে মার্কিনের ভাগ হ'ল শতকরা ৫৫, ব্রিটিশের মাত্র ৩০। চাকা ঘুরেছে বটে, কিন্তু তার ফলে মধ্যপ্রাচ্যের জনসাধারণের সুবিধা কাণাকড়িও হয়নি। (ক্রমশ)

দামোদর পরিকল্পনার দুটি কেন্দ্র

গৌরীশংকর ভট্টাচার্য

চণ্ডীদাস তার দৈহিক ভার দিয়ে আমার সঙ্গে বয়সের ফারাকটুকু মেক আপ করে নিয়েছে। তাই যখন আমি বললাম—"চলো হাটে যাই।" তখন সে পাখার রেগুলেটারটা আরও একটু জোরে ঘুরিয়ে দিয়ে ক্লান্তভাবে জবাব দিল—"উঃ, এই দুপুরে রোদে বেরুলে মারা যাবেন। তার চেয়ে একটু বিশ্রাম-টিশ্রাম করুন।"

বিশ্রামের বেহালাটা আবার কলকাতায় ফিরে গিয়ে এ্যালবার্ট হলে ব'সে ব'সে বাজানো যাবে। অতএব 'ডাক্‌রা' গৃহস্বামীর সঙ্গে হাটে রওনা হই। চন্‌-চনে রোদ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কী আকাশ—কি উদার নির্মেঘ সমুদ্রের মত নিঃশেষ এই আকাশ! ডান দিকে তাকালে চোখে পড়ে মানুষের হাতে তৈরী খেলনার মত ছোট ছোট সব বাঙলাগুলো। আরও দৃষ্টি বাঁকালে দেখি পাওয়ার হাউসের তিনটে চিমনী। আর সামনে উঁচু উঁচু টিলাগুলোর ওপরে ছবির মত এক একখানা বাড়ি। অফিস র‍্যাঙ্কের তাল সামলাবার জন্য বড় সাহেবদের বাড়ি উঁচুতে তৈরী হয়েছে। সবার উপরে প্রাচীন একটি অবজারভেটরী।

হাটের ভেতরে ঢুকে প্রথম চোটেই ডাক্‌রাদাদাকে হারিয়ে ফেললাম। একজন আধবুড়ো বাজীকর খুব জোরে চীৎকার করছে আর জড়োসড়ো একটা কাপড়ের হাঁসকে বিড়ি খাওয়াবার চেষ্টা করছে। ওপাশে একজন হাঁড়ি কলসী বিক্রী করছে। হাটের বিক্রেতা অধিকাংশই দেহাতী মুসলমান। এরাই নাকি বোকারোর পুরানো বাসিন্দা। দামোদর ভ্যালির কাজের জন্য যখন এই অঞ্চলটা দখল করা হয় তখন এই গ্রামের লোকেদের অন্যত্র জমি জায়গা অথবা টাকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আজও নাকি কোন বৃদ্ধ, কোনো প্রৌঢ়া নূতন এ্যাশফাল্টের রাস্তা দিয়ে হেঁটে এসে তার পুরনো মাটির ওপর দাঁড়িয়ে দু-দন্ড চোখের জল ফেলে ফিরে যায়। এখন সে জমির ওপর নূতন বাংলোয় বিজলী বাতি জ্বলে, মাটির প্রদীপ কোথায় গুঁড়ো হয়ে ধুলোয় মিশে গিয়েছে।

হাটের মধ্যে অনেক অনেক ছিমছাম কিনিয়ে ঘোরাঘুরি করছে। তার ফলে আনাজপাতির দর বিস্তর। বাঙালী ত আছেই, অভারতীয়ও অনেকে হাটে গিয়েছেন। বোকারোতে সপ্তাহে দু-দিন হাট। আজ রবিবার, আজকের হাটই বড়, বৃহস্পতিবারে আপিস কারখানা খোলা থাকে, সেদিন অনেকে বাজার করবার ফুরসৎ পায় না। বাঙলাদেশের মত হাটে চিড়ে-মুড়িও বিক্রী হয়, আবার সেদ্দ রাঙা আলুও বেশ বেচাকেনা হতে দেখলাম।

হাটেই আলাপ হ'ল একজন ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে। সূত্র, আমার কাঁধে ঝোলানো ক্যামেরা। তিনি সহসা প্রশ্ন করলেন—"হ্যাঁ মশাই, কল্‌কেতা থেকে আসছেন বুঝি?"

উত্তর দিলাম, যেন মস্ত বড় একটা অপরাধ করে ফেলেছি—"যে আজ্ঞে!"

—"এসেছেন খুব ভালো হয়েছে। কিন্তু হাটে আসবার কোনো দরকার ছিল না—ব্যারাজে যান—পাওয়ার হাউসের মধ্যে ঢুকে সব দেখাশুনোর চেষ্টা করুন, সময়টা কাজে লাগবে!"

—"এই যাবো!"

আমি জবাব দিতে না দিতেই তিনি নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন—"আসবেন আমার বাড়ি বিকেলে, চা খেতে খেতে কল্‌কেতার কেচ্ছা শোনা যাবে।" আপনার অজ্ঞাতে বোধ করি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললে কলকাতার উদ্দেশে।

সেদিন বিকেলে ব্যারাজ দেখতে গেলা বোকারো থার্মাল পাওয়ার স্টেশনের ঠি পাশেই কুনার নদীকে বাঁধা হচ্ছে। যদি বাঁধটা কুনার নদীর ওপর পড়ছে, বোকা নদীটি তার চেয়ে বেশি দূরে নয়। যেখা দেওয়া হচ্ছে সে জায়গাটা বোকারো না আর কুনার নদীর সঙ্গমের খুব কাছাকাছি অবশ্য দুই নদীর সঙ্গম বলতে যা অনুম হয় এ সঙ্গম তেমন স্রোতাপ্লুত নয় পাহাড়ী নদীর যা চরিত্র বর্ষায় ভীমরূ আর শীতে গ্রীষ্মে বিস্তীর্ণ বালুময় প্রান্ত যজ্ঞোপবীতের মতই শীর্ণ স্রোতরেখা ছা আর কিছুই গোচর হয় না।

জেসপের ইঞ্জিনীয়ার বেইল সাহেবে সঙ্গে আলাপ হ'ল। ব্যারাজের দরু তৈরীর জন্য জেসপই কণ্ট্রাক্ট নিয়েছে কংক্রীটের দেওয়াল উঠলে নদীর বুকে ওপরে—ঊনিশটি গেট দিয়ে নদীকে অবরু করা হবে। ব্যারাজের কাজ খুব এগিয়ে গেছে। ১৯৫৩-এর মার্চ মাসের মধ্যে এঁরা ব্যারাজের কাজ শেষ করে ফেলতে পারবেন শুনলাম। এই ব্যারাজের গভে জলধারণ শক্তির সীমা হবে ৬০,০০০,০০০ কিউবিক ফিট। বাঁধের জন্য আশপাশে জমিকে খুব উঁচু করা হয়েছে—পাওয়া
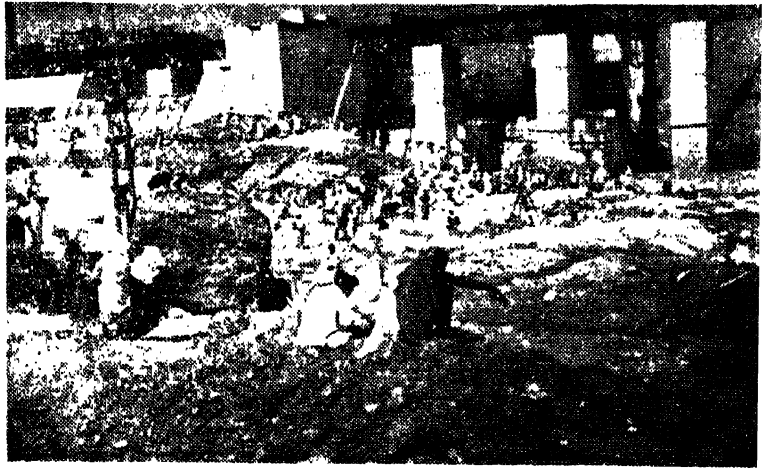
কুনারের কর্মরত শ্রমিকগণ দুপুরের আহার কর্মস্থলেই সমাপন করে
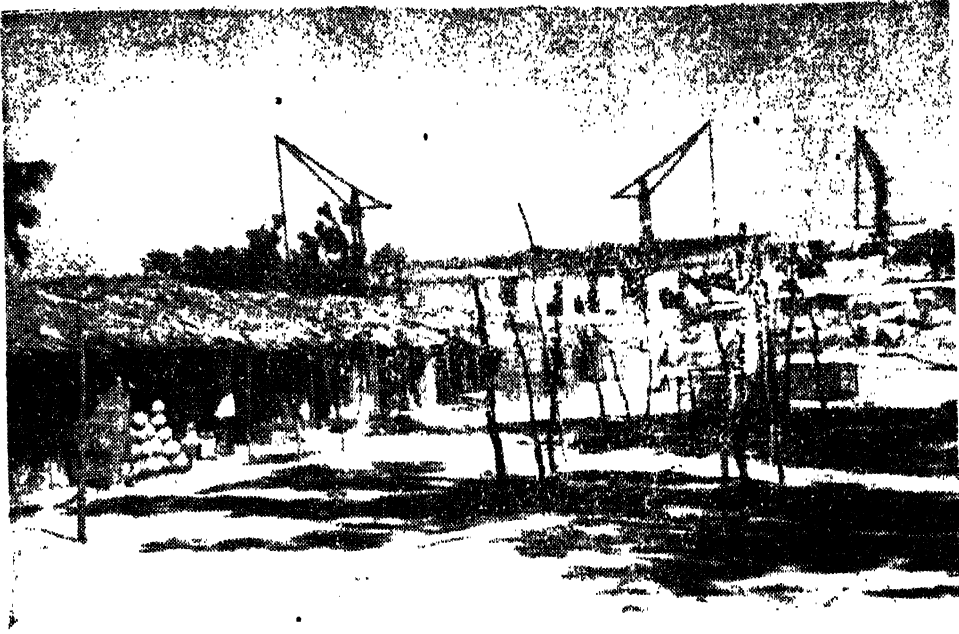
কুনার বাঁধের পাশ্বর্স্থ বাজার এবং অস্থায়ী আবাস

হাউসও সেই উঁচু জমির ওপর বসছে। আমরা নীচে নেমে নদীর স্রোতে পা ডুবিয়ে ঠাণ্ডা জল পরখ করলাম। একেবারে যেখানে লিফট গেট দিয়ে নদীর মাঝখানে পার্টিশন পড়বে সেই অংশে যাবার চেষ্টা করলাম। গেটের মুখগুলোতে পাথর বোঝাই বস্তা দিয়ে স্রোতের বেগ আপাতত রোধ করা হয়েছে। সেখানে দাঁড়িয়ে ওপরের দিকে তাকালে ওপরের মানুষগুলোকে ক্ষুদে লিলিপুট বলে মনে হয়।

ব্যারাজের ব্যাপারস্যাপার দেখে আমার মন ঘাবড়ে গ্যালো। কলকাতায় বসে বসে অনেক রাজাউজীর মেরেছি। দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের পরিকল্পনা কোনোদিনই বাস্তবে রূপায়িত হবে না এই কথাটাই জেনেছি। কিন্তু ফিরতি পথে মনটা হাওয়া বদল করল। আরও একটা নতুন জিনিস দেখলাম, সেটা স্যানিটারী পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা। বোকারোর সমস্ত পায়খানার নোংরাগুলি একটি গভীর চৌবাচ্ছাতে এসে জমা হচ্ছে, তারপর ঘূর্ণ্যমান চাকার সাহায্যে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সেগুলি অতি সহজেই জলীয় অংশ বাদ দিয়ে কঠিন অংশ সারের কাজের উপযোগী করা হচ্ছে।

রাত্রে পাওয়ার হাউস প্রসঙ্গে অনেক আলোচনা হ'ল। তার কতখানি গ্রাহ্য, তা আমি এখনও বুঝতে পারিনি। ওখানকার তিন চারজন কর্মী এসে জমেছিলেন তাঁদের মতে এই পাওয়ার স্টেশন তৈরীর জন্যে এ পর্যন্ত বারো কোটি আন্দাজ খরচ হয়ে গিয়েছে, এখনও দেড় কোটি টাকা খরচ হবে। অবশ্য সব টাকাটাই যে হিসেব মাফিক খরচ হয়েছে তা হলপ করে বলা চলে না—চেষ্টা করলে এর চেয়ে অনেক কম খরচে এই কাজ সুসম্পন্ন হয়ে যেত। আর আমেরিকানদের টাকা আছে বটে, তবে টাকা থাকলেই কিছু ভালো ইঞ্জিনিয়ার হয় না। যদি বড় জার্মান এঞ্জিনিয়ার দিয়ে এই কাজ করানো যেত তাহলে নাকি অনেক সুন্দর কাজ হ'ত।"

একজন বললেন—"অপচয়ের জন্যে শুধু আমেরিকানদের ঘাড়ে দোষ দিলে চলবে না। এই যে তোমাদের এক দেশী কোম্পানীর তৈরী কংক্রীটের ইটগুলো লাখে লাখে পথের ধারে পড়ে নষ্ট হচ্ছে তার কী!"

সত্যি পরদিন সকালে উঠে দেখলাম রাস্তার পাশে বালি সিমেন্ট জমানো টুকরো টুকরো ব্লক সাজানো রয়েছে। অনেক গৃহস্থ নিজেদের বাংলোর পাঁচিল দিয়েছে ওই ব্লক সাজিয়ে (অবশ্য গরুরা শিং-এর গুঁতো দিয়ে সে পাঁচিল ভূমিসাৎ ক'রে বাগানের বেগুন চারা সাবাড় করছে এও শুনলাম)। এই ব্লক-গুলো কোনো কাজেই আসবে না। অথচ পাইকারী পরিমাণে তৈরী হয়েছিল।

একজন বললেন—"মশাই কলকাতায় গিয়ে এ সব কথা লিখবেন খবরের কাগজে! আর কত বলব, পাওয়ার হাউসে ঢোকবার পথে যে দুটো বাংলো তৈরী হয়েছে বিদেশীদের থাকবার জন্যে সে দুটো করতে পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকা খরচ হয়েছে, বুঝলেন—তা সেগুলোও ভেঙে ফেলবেন এ'রা।"

একথা শুনে মনে মনে উষ্মা কম হয়নি। ভেবেওছিলাম যে খুব কড়া ক'রে কিছু লিখে ফেলব—কিন্তু পরে খোঁজ নিয়েছি কর্তা ব্যক্তিদের কাছে কথাটা ভিত্তিহীন। ওই বাংলো দুটো ভবিষ্যতে ভিত্তিময় হয়ে থাকবে।

বোকারোর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের নাম—থার্মাল পাওয়ার স্টেশন। দামোদর ভ্যালি পরিকল্পনার অন্য তিনটি জলশক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ সৃষ্টি করা হবে, একমাত্র বোকারোতেই কয়লার সাহায্যে বয়লার চালানো হবে। তবে একটা কথা, এখানে

যে কয়লা কাজে লাগানো হবে তা খুব নীচু দরের কয়লা তার মধ্যে ছাই-এর ভাগ খুব বেশি, আন্দাজ ২৭% ছাই যে কয়লাতে আছে, যা নাকি এমনিতে অকেজো তেমনি কয়লা দিয়েই এই পাওয়ার হাউস চালু রাখা হবে। তাই বলে মনে করবেন না যেন বোকারোর বিদ্যুতের জোর কম! মাইথন, তিলাইয়া এবং কুনার-এর পাওয়ার স্টেশন গুলির মিলিত শক্তির সঙ্গে সমশক্তি হবে বোকারোর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের। না, শুধু সমান নয়, অনেক বেশি। ডি ভি সির হিসেব মত পাওয়া যাচ্ছে যে তিলাইয়াতে ৪০০০০ কিলোওয়াট, কুনারে ৪০০০০ কিলোওয়াট, মাইথনে ৪০০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে। আর বোকারোতে আপাততঃ ১৫০০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ প্রস্তুত হবে এবং ২০০০০০ কিলোওয়াট শক্তি বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা বোকারো কেন্দ্রের হবে।

পাওয়ার হাউসের মধ্যে একবার প্রবেশ করলে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে হয়। এখানকার কর্মব্যস্ত মানুষগুলির দিকে তাকিয়ে একটা ধাক্কা লাগে। আমার নিজের মনে হচ্ছিল, মিথ্যে সময় নষ্ট করবার অধিকার কোনো মানুষের নেই আমারও নয়। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার রায় মশাই-এর সৌজন্যে মুগ্ধ হয়ে গেলাম, পাওয়ার হাউসের গঠন কার্য দেখাটাই খুব বড় কাজ মনে হ'ল। উনি বললেন—"এখনও সময় আছে দেখবার, কিন্তু এরপর যাঁরা বোকারোতে আসবেন তাঁরা তো ঝক্‌ঝকে মোজাইক করা মেঝের ওপর সাজানো ইমারৎ দেখবেন। জেনারেটরগুলোর আসল স্বরূপ ও এ্যাসবেস্টসের প্রলেপের তলায় ঢাকা পড়ে যাবে! আর নীচের তলায় যেখানে পাকস্থলীর অন্ত্র-তন্ত্র ঢাকাচাপা থাকবে সেগুলো এখনো খোলামেলা অবস্থায় রয়েছে। দেখতে ইচ্ছে করলে এখন আপনারা সব কিছুই দেখতে পারেন, কিন্তু এরপর আর কোনো উপায় থাকবে না!"

এখানকার পাওয়ার স্টেশনের তৈরী বিদ্যু নাকি এ বছরের শেষে বাইরে সরবরাহ করবা কথা ছিল। কিন্তু আপাতত সেটা সম্ভবপ হচ্ছে না। ১৯৫৩ সালের মার্চ মাস নাগা বোকারোর বিজলী দ্যুতি বিতরণ করবে।

বোকারোর বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহ কে থেকে বছরে ৫২৬০০০০০০ কিলোওয়া বৈদ্যুতিক শক্তি দিয়ে আড়াই হাজার বর্গ মাইলকে সমৃদ্ধ করবার আয়োজন চলেছে বিদ্যুৎ যে আমাদের দেশের অন্ধকার ঘ আলো জোগাবে তাই নয়। পৃথিবীর অন্যান সভ্য দেশসমূহে বিদ্যুতের প্রভূত শক্তি দি দেশের কৃষি ও শিল্পের সমৃদ্ধি সাধি হয়েছে। আমেরিকার অর্থ গৌরবের মূ রয়েছে বৈদ্যুতিক শক্তি। টেনেসিভ্যালি কাহিনী আমরা এতদিন শুনেই এসেছি কে জানে যে অদূর ভবিষ্যতে আমাদে ভারতবর্ষেও সেই সুদিন আসবে না!

দামোদর ভ্যালির পরিকল্পনা সামান্য
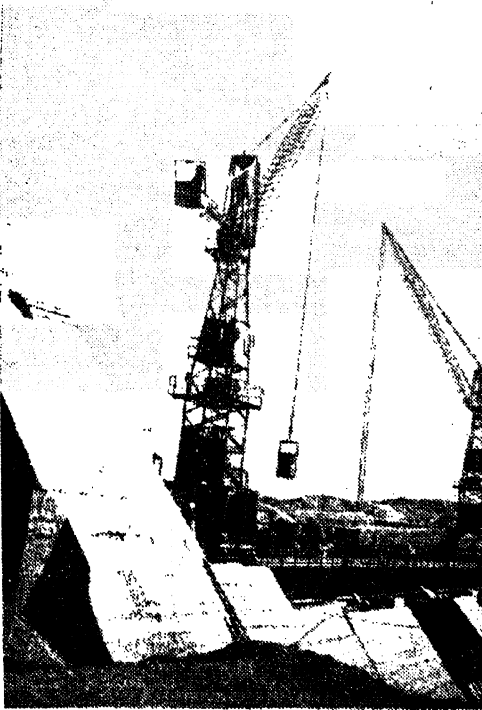
কুনার বাঁধের একাংশে কাজ চলছে
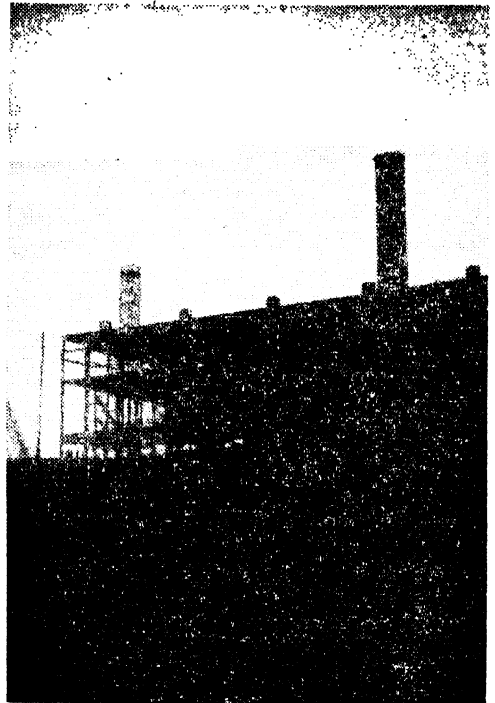
বোকারো থার্মাল পাওয়ার স্টেশনের একাংশ
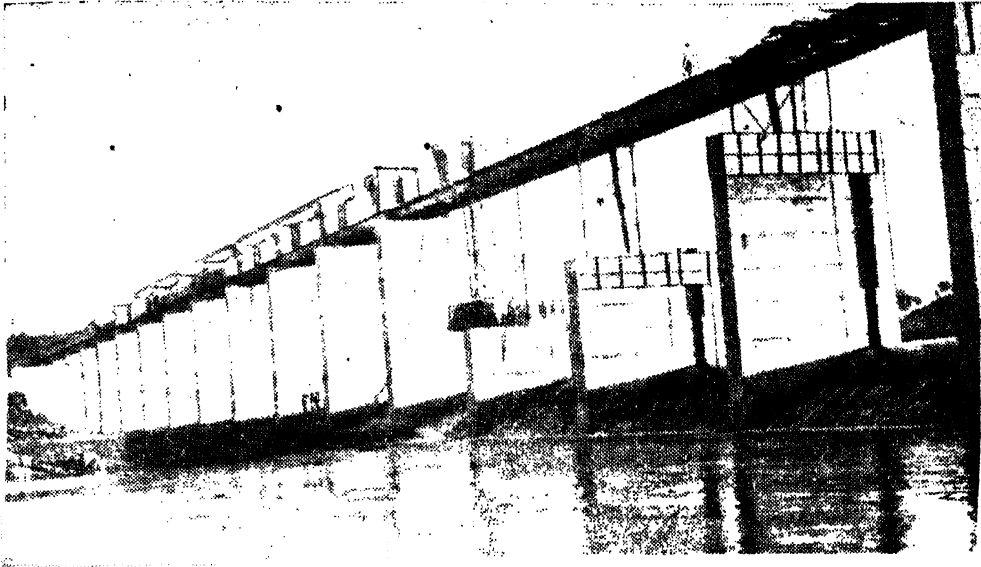
পরিসমাপ্তির পথে বোকারোর ব্যারাজ। এই ব্যারাকটি কুনার নদীর ওপর তৈরী হচ্ছে

ব্যাপার নয়। কাজেই বাস্তবে রূপায়িত হয়ে আমাদের চোখের সামনে এর ফলাফল গজিয়ে উঠতেও কিছু সময় লাগবে বই কি।

বোকারো থেকে কুনার পাহাড়ী পথ ধরে ১৫ মাইল দূরে। তবে আমাদের সে পথ অতিক্রম করতে কিছুমাত্র অসুবিধে হয়নি। দ্যামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের তৈরী নিজস্ব রাস্তাটি খুব চমৎকার। দুপাশে জঙ্গল আর কোথাও কোথাও মাথার ওপর উঁচু পাহাড়। দূরে লঘু পাহাড়ের ওপর হাল্কা মেঘ শুভ্র দেহ মেলে রোদ পোহাচ্ছে। গাড়ির মধ্যে একটু 'কমপ্যাক্ট' হয়ে বসবার দরকার ছিল। জিপের পিছন দিকে আমরা মোট পাঁচজন ছিলাম। অবশ্য চণ্ডীদাস এবং চৌধুরী মশাই খুবই অঙ্গাঙ্গীভাবে বসেছিলেন। আমাদের কর্ণধার ছিলেন তরুণ ইঞ্জিনিয়ার দত্ত।

প্রথমে আমরা দেখে নিলাম কুনার ড্যামের একটি 'মডেল'। মডেলটির সঙ্গে অবশ্য আসল ড্যামের গঠনে, বিশেষ ক'রে পাওয়ার হাউস বসবার জায়গাটার কিছু পার্থক্য ঘটবে।

কুনার ড্যামের কাজ শেষ হতে এখনও অনেক দেরী আছে। পরিকল্পনার ছক-

যন্ত্রের সাহায্যে কংক্রীটের মশলা তৈরী ক'রে রেলগাড়িতে ঢেলে দেওয়া হচ্ছে
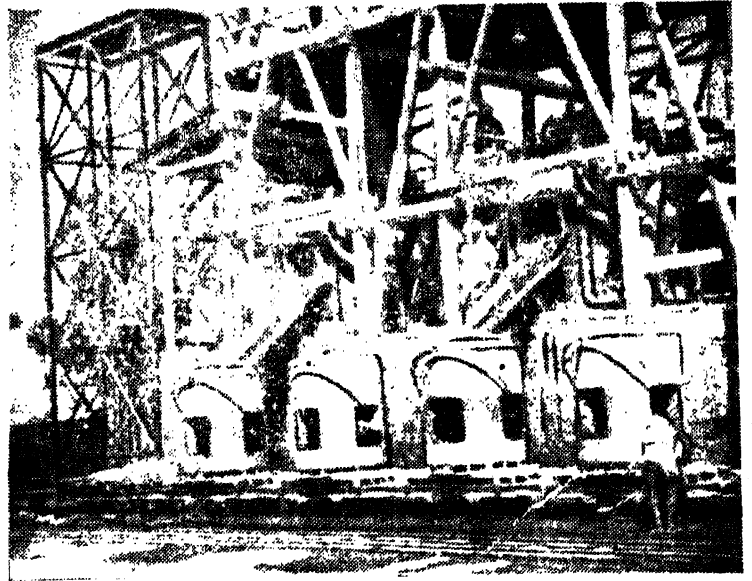
মাফিক অন্তত এক বছর ত বটেই। তবে ১৯৫৩ সালের জুন মাস নাগাদ এখান থেকে বোকারোর পাওয়ার স্টেশনকে ঠান্ডা রাখার জন্য সরবরাহ করবার মত যথেষ্ট পরিমাণ জল জমানো যাবে ব'লে মনে হয়।

সত্যি কথা বলতে কি কুনারের বাঁধের বিরাটত্ব বোকারোর চেয়ে অনেক বড় এবং বোধ হয় জটিলতর। আমরা চারিদিক ঘুরে ফিরে দেখে বুঝলাম যে গভীর অরণ্যের মধ্যে হঠাৎ কি করে মার্কিনী সভ্যতা নাক গলাবার চেষ্টায় ব্যাপৃত।

এখানকার পাথর চূর্ণ করার যন্ত্র থেকে শুরু ক'রে অনেক কিছুই হার্লাফিলের আমদানী। মানুষের অনেক কাজই দেখলাম যন্ত্রেরা কেড়ে নিয়েছে। এখানে দেখলাম না লাঠির ওপর ছাতা বেঁধে রেখে হাতুড়ির ঘা মেরে ইট ভেঙে কাউকে 'খোয়া' তৈরী করতে। তার বদলে পাথরের চাঁইগুলো গিলছে একটা যন্ত্র দানব—তারপর নানা মাপের পাথরকুচি উগরে দিচ্ছে বিভিন্ন মুখ দিয়ে। ঝুড়ি বোঝাই ক'রে কেউ মাল বইছে না। তার বদলে ডিজেলের জোরে চালিত ছোট ছোট গাড়িতে বোঝাই দিয়ে সরু রেল লাইনের ওপর গুর গুর করে পাথরের কুচিগুলো হাজির হচ্ছে কংক্রীট তৈরীর কারখানার সামনে। অন্যদিক থেকে সিমেন্ট বালি চলে যাচ্ছে। তারপর কংক্রীট তৈরীর মেশিনে 'চিড়ে দই মাখা'র মত মন্ড তৈরী হয়ে আবার অন্য গাড়িতে চড়ে তৈরী কংক্রীট মশলাগুলো কাজের জায়গায় রওনা হচ্ছে।

ওদিকে নদীর মাটিকে যথেষ্ট পরিমাণে দুরমুশ করবার জন্য মোটা মোটা কাঁটা লাগানো গাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছে।

নদীর পারে পাথরের স্তূপ দিয়ে যেন মানুষ পাহাড় রচনার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। আমাদের সঙ্গে জনৈক প্রৌঢ় ইঞ্জিনিয়ার কলকাতা থেকে গিয়েছিলেন তিনিও স্বীকার করলেন যে খুব জোর কাজ হচ্ছে।

কুনার ড্যামের পরিকল্পিত মাপ জোক হচ্ছে এই : নদীর ওপর থেকে রাস্তা পর্যন্ত ১৫৬ ফিট উঁচু। ৮৬০ ফিট লম্বা। মাটি দিয়ে ঘেরা বহিরাংশের মাপ ডান দিকে ৪০০০ ফিট, বামে ৫৮০০ ফিট। চওড়া ১৪০ ফিট।

এই বাঁধের সাহায্যে মোট ৬৮০০০ একর জমিতে রবিশস্যের উৎপাদন হবে আর ৬৬০০০ একর জমিতে খারিফ ফসল উৎপাদন করা সম্ভবপর হবে এই রকম শুনলাম।

ইঞ্জিনিয়ার দত্ত ফিরতি পথে বললেন—"আপনারা কলকাতায় বসে আমাদের খুব নিন্দে করেন, কিন্তু এখন স্বীকার করছেন যে কাজ হচ্ছে!"

চণ্ডীদাস গম্ভীরভাবে বললে—"সত্যেন মজুমদার কি বলেছেন জানেন? তিনি বলেছেন রাশিয়াতেও এত বিরাট প্রোজেক্ট হয়নি!"

[ইস্টার্ন রেলওয়ের বরকাকানা লুপ লাইনে বারমো জংশন থেকে সাত মাইল দূরে, কুনারবাঁধ হল্টে নামলেই বোকারো গ্রাম। বোকারো থেকে ১৪ মাইল দূরে কুনার ড্যাম তৈরী হচ্ছে। হাজারীবাগ থেকেও বাসে করে কুনারে যাওয়া চলে।]

[লেখক কর্তৃক গৃহীত চিত্র।]

মাতৃদেবীর সঙ্গে রামেশ্বরধাম

শ্রীআশুতোষ মিত্র

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

এখানে ভারতের বহু প্রাচীন শহর মাদুরার একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি। ভারতে রেলপথ নির্মাণ হইবার বহুপূর্বে যাত্রীদিগের সুবিধার্থে রাণী অহল্যাবাঈ বঙ্গদেশের মেদিনীপুর হইতে শ্রীক্ষেত্র হইয়া রামেশ্বর পর্যন্ত একটি সুবিস্তৃত রাস্তা নির্মাণ করিয়া দেন। এই রাস্তার স্থানে স্থানে সাধুসন্ন্যাসীদের জন্য সত্র বা সদাব্রত আছে। এখনও অনেক সাধু-সন্ন্যাসী এই পথে শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ দর্শনান্তে জিওড়ে নৃসিংহজী, বেঙ্কটাদ্রি বা শ্রীশৈলে বালাজী, বিষ্ণুকাঞ্চী বা শিবকাঞ্চী, ত্রিচিনপল্লীতে শ্রীরঙ্গম মদুরা, কুর্মক্ষেত্র প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান সকল দর্শন করিতে করিতে রামেশ্বর আসিয়া থাকেন। আবার রামেশ্বর হইতে অপর একটি হাঁটা রাস্তা ভারতের পশ্চিম সাগরের উপকূল দিয়া দ্বারকা পর্যন্ত গিয়াছে। সাধুরা রামেশ্বর দর্শনান্তে ঐ পথে পদ্মনাথ, জনার্দন, কন্যাকুমারী, কানাড়ায় গোকর্ণ মহাদেব, মহাবালেশ্বর, পান্তারপুর ইত্যাদি তীর্থস্থান দর্শন করিতে করিতে প্রভাস ও দ্বারকায় উপস্থিত হয়েন।

মাদুরা ভাগাঈ বা ভগারু নদীর দক্ষিণ তটে সবস্থিত। এখানে দুইটি ধর্মশালা আছে। একটি রেল স্টেশনের নিকট এবং অপরটি ভাগাঈ নদীর তীরে। অপরাহ্নে আমরা মন্দির দর্শনে বাহির হইলাম। মাদুরার মন্দির অতি প্রসিদ্ধ মন্দির। এরূপ সুন্দর প্রাচীন ও প্রকান্ড মন্দির দক্ষিণ ভারতে আর নাই। ভাস্কর্য নৈপুণ্যে ইহা ভারতে অদ্বিতীয়। এই মন্দির সম্বন্ধে স্থলপুরাণে বিবৃত হইয়াছে—

দেবরাজ ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে নিস্কৃতি পাইবার জন্য ভারতের তীর্থ সমুদায়ে ভ্রমণ করিতে করিতে এই স্থানে আসিবামাত্র ঐ পাপ তাঁহাকে পরিত্যাগ করে। তখন তিনি সহসা পাপ মুক্তির কারণ অবগত হইবার জন্য, অন্বেষণে এক অনাদি-লিঙ্গ দেখিতে পাইয়া বিশ্বকর্মার দ্বারা মন্দির নির্মাণ করাইলেন এবং বৈশাখী পূর্ণিমায় বৈদিকমতে বৃহস্পতির দ্বারা প্রতিষ্ঠা করাইয়া লিঙ্গমূর্তির নামকরণ করিলেন,—'সুন্দর'। উক্ত পুরাণে আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, শ্রীরামচন্দ্র সীতা-অন্বেষণে লঙ্কাভিমুখে আসিবার সময় অগস্ত্য মুনির আদেশে মাদুরায় ঐ সুন্দর দেবের পূজা ও আরাধনা করেন।

খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের মুসলমান শাসনকর্তারা ঐ মন্দিরের সম্মুখ ভাগের প্রাচীর ও গোপুর বা প্রবেশদ্বার ভাঙিয়া দিয়াছিল। এক্ষণে ঐ ভাঙ্গা গোপুরের নিম্নে বাজার বসিয়া থাকে। মন্দিরটি চতুর্দিকে রাজপথে বেষ্টিত। উহাতে নয়টি প্রবেশদ্বার আছে। তন্মধ্যে একটি ১৫২ ফুট উচ্চ। ঐ দেবালয়ের প্রাকার উত্তর-দক্ষিণে ৮৩৭ ফুট এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৭৪৪ ফুট। মন্দির মধ্যে সুন্দরেশ্বর স্বামী বা 'সুন্দর' লিঙ্গের এবং মীণাক্ষীদেবীর মূর্তি বিরাজিত। স্থানে স্থানে সুন্দরেশ্বরের লীলার জন্য কতকগুলি মন্ডপ আছে। তন্মধ্যে সহস্র স্তম্ভ মন্ডপ ও বসন্ত মন্ডপ নামে মন্ডপদ্বয় প্রসিদ্ধ। মন্দিরের

সমুদয় অন্তর্ভাগ একটি খিলানের উপর স্থাপিত এবং সহস্র স্তম্ভ মণ্ডপ অর্থাৎ এক সহস্র স্তম্ভ যুক্ত দালান ভাস্কর্য-শিল্প ও চিত্র-চাতুর্যে বর্ণনাতীত—উহা এক দেখিবার জিনিস। বসন্ত মণ্ডপ দৈর্ঘ্যে ১০০ গজ ও প্রস্থে ৬০ ফুট। উহার ছাদ ১২০ ফিট প্রস্তর-স্তম্ভের উপর নির্মিত এবং প্রত্যেক স্তম্ভ ২০ ফুট উচ্চ। উহার মধ্যে জল প্রবাহিত হইবার পয়ঃপ্রণালী আছে। ঐ মণ্ডপে বৈশাখী শুক্ল পঞ্চমী হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত সুন্দরেশ্বর স্বামীর বসন্ত-ক্রীড়া উৎসব হইয়া থাকে। সে উৎসবে বহুলোক সমাগম হয়। ঐ মণ্ডপ ভক্তরাজ তিরুমল নায়ক কর্তৃক কুড়ি লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে নির্মিত। মন্দির পার্শ্বে প্রস্তর নির্মিত শিবগঙ্গা নামক সরোবর। সরোবরটির চতুর্দিকে চাঁদনি এবং মধ্যস্থলে ঐ সুন্দর-লীলা-মণ্ডপ।

শ্রীশ্রীমাতৃদেবী প্রভৃতি সকলে ঐ সরোবরে অপরাহ্ণে স্নানান্তে যথাবিধি দর্শনাদি করিয়া সন্ধ্যার পর প্রত্যাগমন করিলেন। এদেশে চলিত প্রথা অনুসারে স্ত্রীলোকেরা সন্ধ্যার সময় দীপ কিনিয়া শিবগঙ্গার তীরে নিজ নিজ নামে রাখিয়া যায়। শ্রীশ্রীমাতৃদেবীও নিজ নামে দীপ দান করিলেন। রাত্রে মন্দিরটি আলোকমালায় আলোকিত করা হয়।

এক মাইল দূরে তিরুমল নায়কের চৌলট্টী বা রাজভবন দর্শনযোগ্য স্থান। সমুদয় ভবনটি প্রস্তর নির্মিত ও সুগঠিত। ঐ প্রশস্ত গৃহের ছাদ ১২৫টি আশ্চর্যজনক খোদিত স্তম্ভের উপর সুরক্ষিত। এক্ষণে ঐ স্থানে জজের আদালত আদি কয়েকটি সরকারী দপ্তর আছে। ঐ স্থানে জজের বাংলো সংলগ্ন জমির উপর একটি প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ আছে—যাহার মূলের আয়তন প্রায় ৭০ ফিট এবং শাখাগুলি প্রায় ১৮০ ফিট পর্যন্ত বিস্তৃত। ঐ চৌলট্টি হইতে দেড় মাইল পূর্বোত্তরে 'রামেশ্বরের হাঁটা রাস্তার পার্শ্বে তিল্লনপুলম্ নামে এক সুবৃহৎ সরোবর আছে। উহার প্রত্যেক দিক ১২৩৫ গজ দীর্ঘ। চতুর্দিকে প্রস্তর নির্মিত সৌধাবলি ও স্থানে স্থানে প্রস্তর নির্মিত অশ্ব, নরাদি মূর্তি। সরোবরের মধ্যস্থলে চতুর্দিক প্রস্তরে বাঁধান একটি উপদ্বীপ আছে। উহার মধ্যস্থলে দ্বিমহল দেবালয় ও চারি কোণে চারিটি কারুকার্যবিশিষ্ট ক্ষুদ্র দেবমন্দির আছে। গ্রীষ্মকালে জলযাত্রা উৎসবে সন্ধ্যার পর সুন্দরেশ্বর স্বামী—মীণাক্ষীদেবীর সহিত ঐ সরোবরে আসিয়া নৌকারোহণে ঐ উপদ্বীপের চতুর্দিকে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। সেই সময় সরোবরটি চতুর্দিকে এক লক্ষ বাতি দ্বারা আলোকিত করা হয়। শ্রীশ্রীমাতৃদেবী প্রভৃতি 'রামেশ্বর যাইবার এবং প্রত্যাগমনের সময় ঐ সব স্থান দেখিয়া অতিশয় আনন্দিতা হয়েন। শ্রীশ্রীমাতৃদেবী বলেন, 'কি সব ঠাকুরের লীলা।'

পরদিন দ্বিপ্রহরের গাড়িতে যাত্রা করিয়া অপরাহ্ণে পাম্বান প্রণালী বা হরবলার খাড়ির (Pamban Pass) তটে আসিলাম। ঐ স্থানে রেল শেষ হইয়াছে। স্টেশনটির নাম মাণ্ডাপাস্। এখানে একখানি ক্ষুদ্র স্টীমারযোগে খাড়িটি পার হইয়া রামেশ্বর দ্বীপে আসিতে হইল। এক্ষণে ঐ খাড়ির উপর রেল চলিতেছে। কিন্তু আমরা যখন যাই, তখন সেতুর স্তম্ভগুলির কিয়দংশ মাত্র নির্মিত হইয়াছিল। ত্রেতাযুগের সেই নল-নির্মিত সেতু সমুদ্রোপকূলস্থিত উচ্চাপল্লী হইতে আরম্ভ হইয়া লঙ্কা পর্যন্ত দৈর্ঘ্যে প্রায় ৬০ মাইল এবং প্রস্থে প্রায় ২।৩ মাইল স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। তবে মধ্যে দুই তিন স্থান ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় আর উহার উপর দিয়া এক্ষণে চলাচল হইতে পারে না। এখনও উহার উচ্চাপল্লী হইতে খাড়িকা বা হরবলার খাড়ি পর্যন্ত ১১ মাইলের একটি অংশ ভারতের সহিত সংবদ্ধ রহিয়াছে। তাহার পর দুই মাইল ভগ্ন—উহাকেই পাম্বান পাস বলে। জাহাজ গমনাগমনের জন্য পরে তোপ দিয়া ঐ অংশটুকু ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। এখনও স্থানে স্থানে জল মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড সকল দেখিতে পাওয়ায় মনে হয় যে, শ্রীরামের সেতু প্রস্তর দ্বারাই নির্মিত হইয়াছিল। ঐ পাম্বান খাড়ির পর ২৪ মাইল দীর্ঘ ও ৩।৪ মাইল বিস্তীর্ণ রামেশ্বর দ্বীপ। উহার পর আবার প্রায় ৩ মাইল ভগ্ন; তথায় জোয়ারের সময় জল থাকে, কিন্তু ভাঁটার সময় স্থানে স্থানে বালি ও প্রস্তর জাগিয়া উঠে। তাহার পর আবার সেতুর ১৮ মাইল দীর্ঘ ও আড়াই মাইল বিস্তৃত আর একটা অংশ। ঐ অংশটির নাম 'মান্নার দ্বীপ' উহাতে একটি দুর্গ এবং বহুলোকের আবাসভূমি ও নগর আছে। তাহার পর পুনরায় দুই মাইল ভগ্ন, ঐ ভগ্নাংশটি পার হইয়াই লঙ্কা। ঐখানেও জল খুব কম। এ রকম যে, ভাঁটার সময় মান্নার দ্বীপ হইতে মনুষ্য ও গাভী হাঁটিয়া পার হইয়া লঙ্কায় যায়। পূর্বে ঐভাবে লোকে যাতায়াত করিত। কিন্তু সমুদ্রের তরঙ্গাঘাতে ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় ১৪৮৪ খৃঃ অবধি চলাচল বন্ধ হইয়াছে। ঐ সেতুর উভয় পার্শ্বে সমুদ্রের জল কম এবং অভ্যন্তরে বালুকা ও পর্বত। এই হেতু ক্ষুদ্র নৌকা-ব্যতীত জাহাজাদি চলিতে পারে না। শ্রীশ্রীমাতৃদেবী ঐ সব দেখিয়া ও শুনিয়া বলেন, 'দেখেছ বাবা, কোন্ যুগের চিহ্ন আজও রয়েছে।'

আমরা স্টীমারযোগে রামেশ্বর দ্বীপের যে স্থানটিতে আসিলাম, তাহাকে পাম্বান বা পবন বন্দর বলে। ঐ বন্দর হইতে কতকগুলি স্টীমার কলম্বো, মাদ্রাজ, তুতুকুরী (Tuticorin) আদি স্থানে যাতায়াত করে। ঐ বন্দরে সমুদ্রোপকূলে সাহেবদিগের তিন চারিটি বাংলো, কয়েকটি মালগুদাম এবং একটি ধর্মশালাও আছে। আমরা ঐ বন্দর হইতে পুনরায় রেলযোগে রামেশ্বর স্টেশনে রাত্রি প্রায় ১১টার সময় পৌঁছি এবং পাণ্ডা গঙ্গারাম পীতাম্বর নিযুক্ত একখানি দ্বিতল বাড়িতে গিয়া উঠি। স্টীমার হইতে নামিয়া রামেশ্বর দ্বীপের রেল গাড়িতে চড়িবার সময় শ্রীশ্রীমাতৃদেবীকে ধরিয়া লইয়া যাইতে হয়, আর যেহেতু একটি পুঁটুলি হারাইয়া যায় এজন্য শ্রীশ্রীমাতৃদেবীর নিকট ভর্ৎসিত হইতেও হয়। (ক্রমশ)

খুব শীতের মধ্যে ঘরে বসে কাজ করতে হলে টেবিলের তলায় পা দু'টি রেখে কাজ করা বেশ কষ্টকর হয়ে পড়ে কারণ পায়ের তলায় ঠান্ডা লাগলে সমস্ত শরীরটাই ঠান্ডা হয়ে যায়, সেজন্য পা খোলা রাখার কিছুক্ষণ পরেই শীত ধরে যায়। অবশ্য নিজের ঘরে বসে কাজ করার সময় এই অসুবিধার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য পা দু'টি চেয়ারে উঠিয়ে নিয়ে ঢেকে বসতে পারা যায়। মুশকিল হয় অফিসে অথবা অন্য কারো বাড়ীতে কাজ করতে।

একখানি পিলোথার্ম মেয়েটিকে কত আরাম দিচ্ছে!

পিলোথার্ম নামক রবারের মোটা চাদর জাতীয় জিনিসটি পায়ের তলায় রাখতে পারলে বেশ আরাম পাওয়া যায়। আরও সুবিধা এই যে, এই পিলোথার্মটি বিদ্যুতের সাহায্যে গরম করা যায় এবং ১০০ ডিগ্রী পর্যন্ত উত্তাপ এতে বজায় রাখা চলে। যেসব জায়গার ঘরের মেজে একটু স্যাঁতস্যাতে মত সেখানে পায়ের নীচে পিলোথার্ম বসিয়ে রাখলে বেশ আরামে কাজ করা যায়। বর্ষাতি ধরণের জিনিস দিয়ে তৈরী হয় বলে দরকার হলে এগুলো ঘরের বাহিরেও ব্যবহার করা যায়। যেসব মোটর মিস্ত্রীদের গাড়ীর নীচে শুয়ে শুয়ে কাজ করতে হয়, রাস্তার পুলিশ এবং দ্বারবান ইত্যাদি লোকেদের জন্য পিলোথার্ম খুব কার্যকরী। রাস্তার পুলিশ অথবা দ্বারবানরা একটা পিলোথার্ম পায়ের নীচে রেখে দাঁড়ালে অনেক আরাম পেতে পারে। মোটর-মিস্ত্রীর পক্ষেও তাই—এরা একখানা পিলোথার্মের ওপরে শুয়ে কাজ করলে অনেকটা সুবিধা হয়।

বিজ্ঞান-বৈচিত্র্য

চক্রদত্ত

*

মানবসমাজ গঠনের সঙ্গে সঙ্গে বহু সমস্যার উদ্ভব হয়েছে এবং একটির সমাধানের সাথে সাথে আর একটি সমস্যা দেখা দেয়। খাদ্য-সমস্যার সমাধান করা হয়েছে কৃষি-শস্যের দ্বারা কিন্তু বর্তমানে এই কৃষিসম্পদ রক্ষা করাও সমস্যায় পরিণত হয়েছে। শতাধিক বৎসর ধরে পঙ্গপালের অত্যাচারে বহু লক্ষ টাকার কৃষিজ সম্পদ ধ্বংস হচ্ছে। এই পঙ্গপাল একক থাকলে একে ফড়িং বলা হয় এবং অত্যন্ত তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখা হয়ে থাকে। দলবদ্ধ ফড়িং যখন বহু বিস্তৃত স্থান দখল করে এবং বহু শস্যক্ষেত ধ্বংস করতে থাকে, তখনই এরা "পঙ্গপাল" আর পতঙ্গবিদ্‌গণের সমস্যা বিশেষ হয়ে পড়ে। পঙ্গপালের আক্রমণ থেকে কোনও দেশই এ পর্যন্ত রেহাই পায়নি। কোনও কোনও দেশে পঙ্গপাল সমস্যা সমাধানের জন্য বৈঠক বসানও হয়েছিল। অনেক নতুন নতুন উপায়ের উদ্ভব হয়েছিল। এই সব উপায়গুলির মধ্যে এই ক্ষুদে শত্রু দমনের জন্য জীব-জগতের অন্য জাতীয় কোনও প্রাণীর সাহায্য নেওয়ার পন্থাই আজকাল বহু প্রচলিত। এই উপায়কে "বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোল" বলা হয়। প্রাকৃতিক জগতের সমতা রক্ষার জন্য প্রকৃতির নিয়মানুসারেই কোনও বিশেষ ধরণের জীবজন্তুর সঙ্গে অন্য কোনও বিশেষ ধরণের জীবের শত্রু-সম্বন্ধ বা খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ থাকে। এই প্রাকৃতিক নিয়মের ওপর নির্ভর করেই পতঙ্গবিদ্‌গণ শস্য-সম্পদ ধ্বংসকারী কীটপতঙ্গ ধ্বংস করার পন্থা বার করলেন। কোন্ জাতীয় পতঙ্গ কোন্ পতঙ্গের শত্রু বা ধ্বংসকারী এর একটা তালিকা তাঁরা তৈরী করলেন। এর পর তাদের অভিযান শুরু হলো। প্রথমদিকে এটা খুবই কার্যকরী হয়। ক্যালিফোর্নিয়ার কমলা-ক্ষেত এক সময় কট্‌নী কুশন স্কেল (Cottony Cushion Scale) নামক এক জাতীয় পতঙ্গের দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং এই পতঙ্গের আক্রমণ এত ভীষণ আকার ধারণ করে যে, মনে হয়েছিল এরা বুঝি ঐ লেবু-ক্ষেতের অস্তিত্বই মুছে দেবে। কীটতত্ত্ববিদেরা তখন লক্ষ্য করেন যে, অস্ট্রেলিয়ার ভ্যাডালিয়া (Vadalia) বা লেডীবার্ড জাতীয় পতঙ্গ ঐ লেবু-ক্ষেত ধ্বংসকারী পতঙ্গগুলি খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। এরা প্রায় ১৪০টি লেডীবার্ড পোকা এনে লেবু-বাগানে ছেড়ে দিলেন, এর ফলে প্রায় বছর দেড়েকের মধ্যেই কটনী কুশন স্কেল পতঙ্গগুলি প্রায় নির্বংশ হয়ে গেল। লিফ হপার (Leaf hopper) নামে এক ধরণের পতঙ্গ আখের ক্ষেত নষ্ট করে। সুখের কথা যে, এক ধরণের কীট এই লিফ্ হপারের ডিমগুলি খেয়ে ফেলে, সুতরাং আখের ক্ষেতে ঐ কীটের আমদানী করলেই লিফ্ হপার ধ্বংস হতে পারে। বহু জাতীয় পোকায় মিলে এইভাবে শস্য-ক্ষেত নষ্ট করে। ত্রিশ রকমের পতঙ্গভুক পতঙ্গের সাহায্যেই এই ক্ষতির হাত থেকে কৃষিসম্পদ রক্ষা করা হয়। এছাড়া বেশীরভাগ পাখীর খাদ্যই কীটপতঙ্গ। এদের মধ্যে কোনও বিশেষ জাতীয় পাখী বিশেষ ধরণের কীটপতঙ্গ খেতে ভালবাসে। ভারতবর্ষের একজাতীয় পাখী আর আফ্রিকার সাদা সারস জাতীয় পাখীর কাছে পঙ্গপাল উত্তম খাদ্য। অস্ট্রেলিয়ার ইবিস (Ibis) পাখী পঙ্গপালের প্রধান শত্রু এবং এই পাখী এত বেশী পঙ্গপাল ধ্বংস করে যে, একে সাধারণভাবে কৃষকবন্ধু বলা হয়। এই পাখী বক-সারসের জাত। এই লম্বা ঠ্যাং, লম্বা ঘাড় আর লম্বা ঠোঁটওয়ালা সাদা-কালো পাখীগুলি দুর্লভ। এই কৃষকবন্ধু পাখীগুলিকে ঐ দেশীয় গভর্নমেণ্ট আইন দ্বারা রক্ষা করে।

পুস্তক পরিচয়

উপন্যাস

মনের ময়ূর। প্রতিভা বসু। নাভানা, ৪৭ গণেশচন্দ্র এভিন্যু, কলিকাতা। ৩৲ টাকা।

প্রথম বই 'মাধবীর জন্য' লিখে ছোটো গল্পের গুণে শিল্পী বলে প্রতিভা বসু একেবারেই খ্যাত হয়েছিলেন, 'মনের ময়ূর' লিখে তিনি প্রমাণ করলেন যে ছোটো উপন্যাসেও তাঁর হাত ওস্তাদ শিল্পীরই হাত। 'মনের ময়ূর'-এর সব চাইতে বড় গুণ যে এ-বই একবার পড়লেই শেষ হয়ে গেল মনে হয় না, ইচ্ছে করে আবার পড়ি, যে-কোনো পাতা খুলে যে-কোনো অংশের আস্বাদ নিই আরো একবার—আরো অনেকবার। বিষণ্ণ এবং মধুর একটি নিভাঁজ গল্প বলার সম্পূর্ণ উপযোগী নিটোল, নিখুঁত, লাবণ্যমণ্ডিত গদ্য রচনার এমন একটি দৃষ্টান্ত এই বইটিতে আছে যার সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে এখনকার গল্প উপন্যাসের রাজ্যে প্রায় বৃথাই হাতড়াতে হয়। এমন একটিও বাক্য এ-বইতে চোখে পড়লো না যা অসতর্কভাবে লেখা, আর কোনোভাবে ঘুরিয়ে আর একরকম করে বলতে পারলে যা আরো ভালো হোতো। কবিতার মত সূক্ষ্ম কাজের পরিচয় আছে স্বচ্ছন্দ, অবিরল, স্বতোৎসারিত ভাষার আশ্চর্য ব্যবহারে। গল্পের শেষটুকু কোনোরকমে জেনে নেবার আগ্রহে বাংলা গদ্যের পরিচিত বিরস বন্ধুর পথে ঠোক্কর খেতে খেতে ওলটাতে হয় না এর পাতাগুলি। এমনকি শেষটা যে কী হবে তা গল্পের তিনভাগের একভাগ শেষ হওয়ার আগেই আমরা জেনে ফেলি। ঘটনার প্যাঁচ কষে পাঠকের কৌতূহলকে উস্কে রাখার এতটুকু চেষ্টাও করেন নি লেখিকা। এটা বড়ো সামান্য শক্তির কথা নয়।

'আজ অনসূয়ার বিয়ে'—এই দিয়ে গল্পের সুরু। শালকের গরিব পাড়ায় 'একখানি সিমেন্ট-চটা মেঝের উপর চুপচাপ শুয়ে', তিরিশ পেরিয়ে-বিয়ের-কনে অনসূয়া তার রিক্ত-নিঃস্ব-দুঃখী জীবনের কথা ভাবছে। যাকে সে একদিন তার সর্বস্ব সমর্পণ করেছিল, শুধু জাতের অমিল ছিল বলে তার হিতৈষী পিতৃব্য তাকে চক্রান্ত ঘটিয়ে জেলে ঢুকিয়েছিলেন। আর যৌবন প্রায় পেরিয়ে আজ এই এতকাল পরে যার সঙ্গে তার বিয়ে হচ্ছে, ভাগ্যের পরিহাসে তার জাতকুলবর্ণ কোনো কিছুই জানলে না কেউ, চাইলেন না জানতে। এ পর্যন্ত পড়ে মনে যে কৌতূহল ঘনিয়ে ওঠে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার নিবৃত্তি করেন লেখিকা মালাবার হিলে মিঃ রায়ের সৌখীন প্রাসাদে আমাদের পৌঁছে দিয়ে। 'অনসূয়ার রহস্যময় নতুন বর বিনয় রায়ই যে ষোলো বছর আগেকার সেই লাঞ্ছিত প্রেমিক—আজ এক প্রতিষ্ঠাবান সম্পন্ন প্রৌঢ় ভদ্রলোক—তা আর গোপন থাকে না আমাদের কাছে। এবং গল্পের এই প্রধান রহস্যটি উদ্ঘাটিত হয়ে গেলে তার পরেও কাহিনীর যেটুকু জানার থাকে তা হচ্ছে অনসূয়া—বিনয় রায়ের প্রাক-বিচ্ছেদ প্রেমপর্ব, আর জানার থাকে কি করে একদিন সতর্ক বিজ্ঞ গুরুজনের অতি উৎসাহে সেই ব্যাকুল উদ্বেল যুগ্ম-হৃদয় দ্বিধা হয়েছিল। কিন্তু গল্পের শেষ পাতায় টেনে নেবার পক্ষে এটুকুই যথেষ্ট হোতো না, যদি না সেই সঙ্গে আরো থাকতো অকৃত্রিম আবেগকম্পিত কবিতার মতো হৃদয়গ্রাহী লেখার গুণ, বিষয়কে শিল্পিত করার কলাকৌশল। এই গুণ এই কলাকৌশলে নিজের উপর তাঁর এত আস্থা যে কাহিনীর চুম্বক উপন্যাসের গোড়াতেই বলে দিতে তিনি সাহস করেছেন। 'মনের ময়ূর' পড়ে আর একবার বোঝা যায় যে কাহিনীটুকুই উপন্যাসের—ভালো উপন্যাসের—সব নয়। গল্পটাই যদি সব হোতো তাহলে এক বই দুবার, জানা গল্পকেই ঘুরিয়ে আবার পড়ার কোনো অর্থ থাকতো না। প্রায় স্বতঃসিদ্ধ হলেও কথাটা 'মনের ময়ূর' প্রসঙ্গে মনে করিয়ে দিতে চাই, কেননা বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে লেখার এই গুণটি বিরল হয়ে এসেছে।

প্রতিভা বসুর গল্প খুবই মধ্যবিত্ত ঘরোয়া জীবনের গল্প এবং তাঁর প্রধান উৎসাহ প্রেমের বৈচিত্র্য এবং তার ঘরোয়া তীব্রতা। বাঙালি সংসারের নিবিড় অন্তরঙ্গ ছবি একটি আশ্চর্য মমতা আর আগ্রহ নিয়ে আঁকতে পারেন তিনি। পূর্ববাংলার গ্রামে সুখী সম্পূর্ণ একটি ছোটোখাটো পরিবারের যে ছবিটি বিরল রেখায় এই উপন্যাসে তিনি এঁকেছেন সেটি অসামান্য। মেয়েদের যে মন সহস্র খুঁটিনাটিতে ভরা চিরকালের ঘরোয়া জীবনেই পরমতৃপ্তি খুঁজে পায়, তাতেই আবিষ্কার করে অন্তহীন সুখের গল্প—সেই মন নিয়ে তিনি লেখিকা। বাংলার খুব বেশি লেখিকার বিষয়ে একথা বলা চলে না। এবং প্রতিভা দেবীর লেখায় যে সংযমী ভাষার লালিত্যের কথা উল্লেখ করেছি সে ভাষাও একান্তই মেয়ে মনের ভাষা, অসংখ্য ইডিয়ম দিয়ে গড়া। ইডিয়মের এমন সহজ সুন্দর উপযুক্ত ব্যবহার সচরাচর অন্য কারো লেখায় এতটা চোখে পড়ে নি।

এই একই কারণে তাঁর গল্পে মেয়ে চরিত্ররা যতো উজ্জ্বল, যতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যতোটা স্পর্শ করতে পারে মনকে, ততোটা হয়তো পারে না তাঁর পুরুষ চরিত্র। লেখার গুণের মতো তাঁর লেখার ত্রুটিরও এই একই উৎস। পড়তে পড়তে দেখছি 'মনের ময়ূরের' অনসূয়া মেয়েটি জেগে উঠে চোখের সামনে অবিকল দাঁড়ালো, তাকে চিনলাম, সে হয়ে গেল কাছের জানা মানুষ, আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি মর্মরিত হয়ে উঠল তাকে ঘিরে। মালাবার হিলে লক্ষপতি বিনয় রায় সে অনুপাতে একটু ঝাপসা, কম চেনা। জেল কয়েদীর কথা বলতে

গিয়েও তাই খুব খুশি করতে পারেন না তিনি। কিন্তু মেয়েদের মনের কথা মেয়েদের মতো করেই বলার যে শক্তি আছে তাঁর, সেটি দুর্লভ।

এ উপন্যাসে গল্পাংশ কোথাও কোথাও একটু দুর্বল, এবং ষোলো বছর পরে অনসূয়ার সঙ্গে বিনয়ের এই বিবাহ বড়োই আকস্মিক—এতোটা আকস্মিক যে রচনা প্রায় রোমান্সের সীমানা ছুঁয়ে যায়। কিন্তু প্রায়-রোমান্স এই গল্পটি নিয়ে লেখা উপন্যাসখানা আঙ্গিকের দিক থেকে আবার খুবই সুগঠিত। মনের নির্ভার খুশিতে ডুবে গিয়ে লিখেছেন তিনি গল্পটি—সেই খুশি একেবারেই পাঠকের মনকেও অধিকার করে। আগাগোড়া কোথাও শিথিলতা নেই, একটানা সাধা সুর বেজে গেছে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। উপন্যাসের চার অংশঃ অনসূয়া, মিঃ রায়, মা-বাবা, উপসংহার—যেন একটি ঘরের চারটি জানালা, চার কোণায়। একটির পর একটি খুলে যাচ্ছে আর আলো এসে পড়ছে ক্লান্ত-বিষন্ন-হতাশাম্লান একটি চন্দনে আঁকা মুখে—সে মুখখানি 'রোগা ছোট্ট তেত্রিশ বছরের দুঃখ-পাওয়া অনসূয়ার'। ভালোবাসায় ভারি হয়ে উঠেছে তার বুক। আর সে হয়ে উঠেছে 'অনেক বেশি নিটোল, অনেক সম্পূর্ণ। সম্পূর্ণতম।'

প্রতিভাদেবীর সব চাইতে ভালো রচনার মধ্যে পড়ে 'মনের ময়ূর'। ছোটো বাংলা উপন্যাসেও এ বইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নাভানা প্রেস সুন্দর এই বইটির জন্য যথোপযুক্ত প্রচ্ছদ এবং মুদ্রণের ব্যবস্থা করেছেন। নক্সাটা শীতলপাটির মতো দেখতে মনোরম প্রচ্ছদপট এ গ্রন্থের শোভা।

৩২৭।৫২

রুদ্রাক্ষ—সুশীল রায়; টি কে ব্যানার্জি এণ্ড কোম্পানী, ৬এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য—৩৲ টাকা।

হাল-আমলের বাঙলা কথাসাহিত্যের একটা মস্ত বড় দুর্লক্ষণ এই যে, তাতে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য বড় কম। সমাজের ছোট্ট একটা অংশের আরও ছোট ভাবনা-পরিসরের মধ্যেই ইদানীং তার সর্ব-সম্ভাবনাকে এনে সীমাবদ্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে। এ-বইয়ের নরেনের সঙ্গে ও-বইয়ের হরেনের, একমাত্র নামের পার্থক্য ছাড়া কোনো ব্যাপারেই কোনো বৈসাদৃশ্য আর আজকাল চোখে পড়ে না। একটা অদৃশ্য অথচ অনিবার্য রুটিনের ছককাটা আঁটোসাটো পরিসরের মধ্যে তারা একইভাবে কাজ ক'রে চলেছে; একই ভঙ্গীতে উঠছে, বসছে, কিংবা প্রেমনিবেদন করছে। দেখেশুনে এক-এক সময় ক্লান্তি লাগে। মনে হয়, বাঙলাদেশের কথাসাহিত্যিকেরা যদি সাহিত্যক্ষেত্রে পরিবেশ এবং পট পরিবর্তনের গুরুত্ব এখনো উপলব্ধি না ক'রে থাকেন, তবে বারংবার এই একই অঙ্কের একই দৃশ্যের পুনরভিনয় না হয়ে তার চাইতে বরং যবনিকাপাত হওয়া অনেক ভালো।

জীবনের পরিধি যে কত বড়, এমন কি বাঙালী জনসাধারণের জীবনযাত্রাও যে শুধু প্রাত্যহিক দশটা-পাঁচটার বাঁধাধরা চৌহদ্দীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, লেখকরা কি তা জানেন না? যদি জানতেন তো তাঁদের সাহিত্যকর্মের মধ্যে জীবনের এই বহুবিচিত্র রূপটি আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারতাম। জীবনের অনধিক একটিই মাত্র ক্ষেত্রের সঙ্গে তাঁরা পরিচিত; তার বাইরে তাঁরা বড়-একটা পা বাড়াতে যান না, বাড়ালেও অস্বস্তিবোধ করেন। নবতব ক্ষেত্রের সঙ্গে অপরিচয়ই তাঁদের এই অস্বস্তির হেতু; আর তার দরুণ তাঁদের রচনার মধ্যে তখন এমন একটা অসহায়তা ফুটে ওঠে, সার্থক সাহিত্যসৃষ্টির পক্ষে যা আদৌ অনুকূল নয়। ব্যতিক্রম যে নেই, এমন কথা বলি না। ব্যতিক্রম আছে। এমন দু-একজন লেখক এখনও উপস্থিত, জীবনের বহুবিচিত্র রূপের সঙ্গে যাঁদের সম্যক পরিচয় ঘটেছে এবং পাঠকসাধারণের সম্মুখে জীবনের সেই পূর্ণতর চেহারাটিকে উপস্থাপিত করবার দায়িত্ব যাঁরা পরম নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করছেন। কিন্তু আগেই বলেছি, তারা ব্যতিক্রম মাত্র; তাই সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত। তাঁদের কথা যদি ছেড়ে দেওয়া যায় তো দেখা যাবে, জীবনের দৈনন্দিন আটপৌরে-চৌহদ্দীর বাইরে পদচারণার ব্যাপারে বাদবাকী আর প্রায় সকল লেখকেরই মানসিক অপ্রস্তুতি বড় শোচনীয়। সেই কারণেই বোধ হয় পাঠকসাধারণের বৈচিত্র্য-তৃষ্ণার শান্তিসাধনে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন; ব্যর্থ হ'য়ে অতঃপর একটা নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যেই ঘোরাফেরা করে বেড়াচ্ছেন। অবস্থাটা দুঃখ-দায়ক। লেখকদের পক্ষে তো বটেই, পাঠকদের পক্ষেও। 'রুদ্রাক্ষ'র লেখককে এই কারণে অভিনন্দন জানাই যে, পাঠকসাধারণকে তিনি একই দৃশ্যের পৌনঃপুনিক অভিনয় দর্শনের সেই মর্মান্তিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়েছেন।

শ্রীযুক্ত সুশীল রায় খ্যাতিমান সাহিত্যিক। কবি, প্রাবন্ধিক এবং ছোট গল্পলেখক হিসাবে তিনি যথেষ্টই সুনাম অর্জন করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থখানির মধ্যে ঔপন্যাসিক হিসাবেও তাঁর সযত্নায়ত্ত দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গেল। ঘটনাবিন্যাস, চরিত্রচিত্রণ, আবেগ ও মননধর্মের সম্যক্ ব্যবহার এবং নাটকীয় রসবিমিশ্র মুহূর্ত নির্বাচন—সর্ব বিষয়েই তিনি সেই দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন বটে; তবে—আমাদের অন্তত

ই মনে হলো—সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এর হিনী। ঠিক এই ধরণের কাহিনীর সঙ্গে পাঠকসাধারণের যে ইতিপূর্বে আর চয় ঘটেনি, তা এক রকম জোর করেই চলে। এ-কাহিনী নূতন তো বটেই, স্থানে প্রায় বিস্ময়জনকও। আর এই ঘটনাবলীর মধ্য দিয়েই লেখক তাঁর দের কাছে জীবনের একটি অনাস্বাদিত-রসের, একটি অদৃষ্টপূর্ব ক্ষেত্রের সন্ধান দিয়েছেন।

দ্রাক্ষার মূল চরিত্র সোহাগা। এই সিকা তরুণীকে কেন্দ্র ক'রে গল্পাংশের যে বিস্তার ঘটেছে এবং একটির পর একটি নীয় দুর্বিপাকের মধ্য দিয়ে লেখক তাকে স্বনির্ভর নিষ্ঠার ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ ক'রে ছেন, তাতে সাম্প্রতিক উপন্যাসসাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি ব'লেই পরি-হবে। এ-বইয়ের অন্যতম পার্শ্ব-চরিত্র সোনা। সোনা ভীরু; সোহাগার পাশে শুধু তাকেই নয়, বাকী সবাইকেও—নিরুত্তাপ বলেই মনে হয়। কিন্তু, চরিত্রগুলিকে এই রকমের একটু দুর্বল আঁকবারই দরকার ছিল হয়তো, সোহাগার মহিমাকে তা নইলে হয়তো এত ভাবে ফুটিয়ে তোলা যেত না।

শৈল রায় মূলত কবি। আলোচ্য সের মধ্যেও ইতস্তত তাঁর কবি-সত্তার পাওয়া যাবে। প্রমাণস্বরূপ ছোট্ট অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি : "রেললাইন তারা চলল। সম্মুখে দুটি লাল চোখ লের। কিন্তু তাদের যেন কেবলই মনে লাগল, পৃথিবীর মাটি ভেদ ক'রে দু'টি যেন অনেকটা উঁচুতে উঠে তাদের গতি-উপর কড়া নজর রাখছে।" উপমাটি সুন্দরই নয়, চমকপ্রদও।

দ্রাক্ষার ছাপা, বাঁধাই পরিপাটি; প্রচ্ছদপট চিত্তস্নিগ্ধ। ২৮৩।৫২

টক

কৃতি—শ্রীললিতা ভট্টাচার্য; শ্রীঅরুণা র্স, ২৪এ, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা প্রকাশিত। মূল্য—১৷৹ আনা।

য় ঋতুর সমাহার বাঙলাদেশে যেমন দৃষ্টি-র হয়, এমনটি আর কোথাও হয় না। একটি ঋতুর নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য গাছে র মাটিতে—এক কথায় স্থলে জলে রীক্ষে প্রকাশিত করে। শুধু ঋতু হইতে অন্তরে রূপান্তরিতই নয়, একের পর ট অদ্ভুত সমন্বয়ে দীর্ঘ বারো মাস বাঙলার লীলাবৈচিত্র্য দেখায়। নয়নেন্দ্রিয় দ্বারা প্রকৃতির এই রূপ হৃদয় দ্বারা অনুভব তে হয়। এই অনুভূতি স্বতঃই প্রকৃত পমনকে উদ্বেলিত করিয়া তোলে। এই বৈচিত্র্যের যিনি আধার, আনন্দের উৎস, তিক সম্পদের প্রাণস্বরূপ সেই লীলা-রের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

লেখিকা নাটকাকারে ঋতুবৈচিত্র্যের মাধ্যমে চিরসুন্দরের উপাসনা করিয়াছেন। লেখার দগুণে পঞ্চপ্রদীপ জ্বালাইয়া বিগ্রহের সম্মুখে আত্মনিবেদনের ভঙ্গী ও অপূর্ব আরতির মাধুর্য-লেখার প্রতি ছত্রে নিহিত। ভাবপ্রকাশের জন্য লেখিকা কোথাও দুরূহ গল্পের অবতারণা করেন নাই, কোন জটিলতা নাই, অস্পষ্টতা নয়, সরল ব্যঞ্জনা ও সরস রচনাশৈলীগুণে সমগ্র নাটকটি জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

সংলাপ ও পরিস্থিতি নাটকের প্রাণবস্তু। আলোচ্য নাটকটিতে বিভিন্ন ঋতু সজীব সত্তার রূপ ধারণ করিয়াছে। তাহাদের রঙের পরশ শুধু গাছের পাতায়, দীঘির জলে, মেঘের কোলেই নয়; মানুষের মনেও ছোপ ধরাইয়া দেয়। ইহা সম্ভব হইয়াছে লেখিকার ঘরোয়া পরিবেশ সৃষ্টি করার দরুণ। শশধরের প্রিয়া তারকাপুরকে নিশার মাসী সম্বোধন, শীত ঠাকুর্দা, গ্রীষ্মের জননী ক্ষিতি—অপূর্ব এর পারিবারিক পরিবেশে প্রত্যেকটি চরিত্র হীরকের ন্যায় দ্যুতিময়। বিভিন্ন ঋতুর স্পর্শে বিভিন্ন পুষ্পসম্ভারের জাগরণ কাহিনীটিও অনবদ্য। সূর্যমুখী ও কমলের দিবাকরকে লইয়া দেবষ-হিংসার যে অপূর্ব আলেখ্য লেখিকা চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়।

আলোচ্য গ্রন্থটি পাঠ করিয়া এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, লেখিকার অন্তরের অন্তস্থলে নিভৃতে এক কবি সমাসীন। সে কবিহৃদয়ের পরিচয় শুধু যে আলোচ্য নাটকের সংগীতগুলির মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহাই নয়, নাটকোল্লিখিত চরিত্র-গুলির বেশবাসের যে মনোজ্ঞ বিবরণ লেখিকা প্রতি দৃশ্যের প্রারম্ভে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়। লেখিকার আগামী রচনার জন্য আমরা সাগ্রহে অপেক্ষা করিব। এমন একটি অপূর্ব গ্রন্থ পাঠকসমাজের কাছে সহজলভ্য করার জন্য প্রকাশিকাও আমাদের ধন্যবাদার্হ। (৩২০।৫২)

তখত্-ই-তাউস্—অজয় দাশগুপ্ত; ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য—১৷৹ টাকা।

নাট্যকার ভূমিকায় নিজের নামের পাশে 'অধিকারী' লেখায় প্রতীয়মান হয় যে, সম্ভবতঃ নাটকটি যাত্রার উদ্দেশ্যেই রচিত। অবশ্য এ আমাদের অনুমান মাত্র; কারণ অংক ও দৃশ্য বিভাগে মনে হয়, নাটকের পথই অনুসৃত হয়েছে।

স্থবির শাজাহানের অক্ষমতার সুযোগে তখত্-ই-তাউসের লোভে সম্রাটতনয়দের মধ্যে ভ্রাতৃবিরোধই এই নাটকটির উপজীব্য। অন্তঃ-পুরের ষড়যন্ত্র, অনুগ্রহপুষ্ট তোষামোদকারীদের উস্কানি, পরিশেষে ভ্রাতৃরক্তে হিন্দুস্থানের মাটি কলুষিত করার কাহিনীই লেখক যথেষ্ট মুন্সিয়ানা সহযোগে ফুটিয়ে তুলেছেন। স্থানে স্থানে রচনাকৌশলে দু' একটি দৃশ্য অতি মনোরম হ'য়ে উঠেছে।

বহু স্থানে স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলালের 'শাজাহান'-এর প্রভাব পরিলক্ষিত হ'তে পারে—এ কথা নাট্যকার মুখবন্ধেই স্বীকার করেছেন। কিন্তু নাটকটি পড়ে মনে হলো কেবলমাত্র ঘটনা-সংস্থাপনই নয়, বহু স্থানে পাত্রপাত্রীদের উক্তিও বহুলাংশে শাজাহানে বর্ণিত চরিত্রের অনুরূপ। উদাহরণস্বরূপ প্রথম অঙ্কে প্রথম দৃশ্যে কেবল-মাত্র রোশেনারা ব্যতিরেকে অন্যান্য চরিত্র এবং তাঁদের সংলাপ শাজাহানের প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যের কথা মনে করিয়ে দেয়।

এ ছাড়া দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে আওরংগজেবের স্বগোতোক্তি দ্বিজেন্দ্রলালের আওরংগজেবের স্বগতোক্তির সমপর্যায়ের। দুটি দৃশ্যেই আওরংগজেব দারার সংখ্যাগুরু সৈন্যের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর স্বপক্ষে নিজের মনকে তৈরী ক'রে নিচ্ছেন। শেষ দৃশ্যে আওরংগজেবের ক্ষমা প্রার্থনার কাহিনীও শাজাহানের শেষ দৃশ্যেরই অনুকরণে রচিত বলে হয়।

তবু এসব সামান্য দোষত্রুটি সত্ত্বেও নাটকটি আমাদের যথেষ্ট আনন্দদানে সমর্থ হয়েছে। নাট্যামোদিগণ নাটকটি কোথাও মঞ্চস্থ করলে নাট্যকারের শ্রম সফল হবে বলেই মনে করি।

(২৬৮|৫২)

অনুবাদ সাহিত্য

ছোটদের গণতন্ত্র—রিলিস ও ওমর গসলিন; এম্ সি সরকার এণ্ড সন্স লিঃ, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা— ১২। মূল্য—ছয় আনা।

ছোটদের জন্য গণতন্ত্রের স্বরূপ সহজ ভাষা আর শিক্ষাপ্রদ ছবির মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ইংরাজী থেকে বইটি অনূদিত হয়েছে এদেশের ছেলেমেয়েদের সহজবোধগম্য ক'রে। গণতন্ত্রের গোড়ার কথা শৃংখলা আর নিয়মানুবর্তিতা। স্বীকার করতে লজ্জা নেই এ দেশের ছেলেমেয়েদের এ দুটি গুণের প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশী। শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতাই নয়, মানসিক স্বাধীনতাও গণতন্ত্রের অংগীভূত। বইটিতে তার ওপরও যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়েছে। ছবিগুলো সবই বিদেশী, অবশ্য সেটা হওয়াই স্বাভাবিক; কারণ বইটাই মূলত বিদেশী; কিন্তু ছবিগুলোর বিষয়বস্তু সর্ব দেশের প্রতি প্রযোজ্য হওয়ায় এ দেশের ছেলেমেয়েদের তাৎপর্য গ্রহণ করার পক্ষে কোন অসুবিধা হবার কথা নয়।

ছবি ছাপানর ব্যাপারে প্রকাশকদের তরফ থেকে যথেষ্ট যত্ন নেওয়া হয়েছে; কিন্তু আমেরিকার ঘরের কথা এ দেশের ছেলেমেয়েদের কতটা আনন্দ দিতে পারবে সেটা বিচার্য।

তবুও এধরণের অনুবাদের প্রয়োজন রয়েছে। স্বাধীন দেশের ছেলেমেয়েদের অন্য স্বাধীন দেশের কথাও জানতে হবে বৈকি।

(৩১৪|৫২)

একদিন যারা মানুষ ছিল—ম্যাক্সিম গোর্কি; অনুবাদক—পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়; কত কথা, ৬৮।২, মির্জাপুর স্ট্রীট। দেড় টাকা।

এরাও একদিন মানুষ ছিল। হতভাগ্যদের সরাইখানার মালিক আরিস্তিদ ক্যুবালদার হাড় পাঁজরা বেরকরা যাত্রীনিবাসের সবাই। এদের আসেপাশে এদেরই সমগোত্র যারা তারাও। কিন্তু আজ আর নেই। সামাজিক এবং আর্থিক শোষণে সবাই আজ নিঃস্ব। এদেরই কথা তাঁর নিপুণ দরদী ভাষায় অনতিবিস্তারে বর্ণনা করেছেন গোর্কি 'একদিন যারা মানুষ ছিল' বইতে। এই সব ভাগ্যবিড়ম্বিতদের প্রতিভূস্বরূপ কতকগুলি টাইপ চরিত্র সৃষ্টি করা হয়েছে। সুসম্বন্ধ কোন জমাট গল্প নয়। কিন্তু ফল হয়েছে আশ্চর্য। স্বল্প-বিস্তারে অল্প ঘটনায় এদের জীবনের পুঞ্জীভূত গ্লানি বাণীমূর্তি পেয়েছে যেন।

অনুবাদে শ্রীযুক্ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় লব্ধখ্যাতি। আলোচ্য বইটির অনুবাদ মোটামুটি ভালই হয়েছে। কিন্তু সর্বত্র তেমন স্বাচ্ছন্দের সঞ্চার হয়নি। কয়েক জায়গায় সম্বোধনের সময় যুবক কথাটির প্রয়োগ একটু শ্রুতিকটু লাগল।

(২৩৫|৫২)

বিবিধ

দধীচির অস্থি—কাফি খাঁ; এ মুখার্জি এণ্ড কোং লিঃ, ২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য—১, টাকা।

মাত্র কয়েকটি বলিষ্ঠ আঁচড়, রংয়ের স্পর্শ নয়, কোন বিশেষ ধরণের শিল্পরীতির অনুধাবন নয় সাদা আর কালোর বিচিত্র রেখা-চিত্র; কিন্তু তাতেই গোটা দেশের সম্পূর্ণ ইতিহাস, গোটা জাতির ভাঙাগড়ার কাহিনী সুপরিস্ফুট। শিল্পসাধনার এ দুরূহ কৃতিত্ব সম্ভব শুধু কাফি খাঁরই রেখাঙ্কনে। কার্জনের বাঙলা বিভাগের অপপ্রয়াসে এ এ্যালবামের শুরু, শেষ র‍্যাডক্লিফের অমোঘ শক্তিশেলে। যুগে যুগে জাতির জীবনের মহাসন্ধিক্ষণে যে ঐশীশক্তি প্রভাবে বাধাবিপত্তি সব দূরীভূত করা সম্ভব হয়েছিল, সে শক্তি আজ নির্জীব, মুমূর্ষু। অভিশপ্ত জাতির ভাগ্যে আত্মবিলুপ্তিই কি শেষ কথা?

শিল্পীর তুলিকা এ প্রশ্নের উত্তর দেয়নি, হয়তো উত্তর দেবে ইতিহাস। জাতির পরিণতি জয়ে অথবা ক্ষয়ে—এ কথা জানবার কোন উপায় নেই; কিন্তু কাফি খাঁর অনবদ্য রেখাঙ্কন হৃদয়তন্ত্রীতে মোচড় দেয়, অভাগা জাতির দুঃখে বিচলিত করে।

শিল্পীর এ প্রচেষ্টা এখানেই সার্থক। স্বল্প মূল্যের এমন একটি এ্যালবাম বাঙালীর ঘরে ঘরে স্থান পাক, এমন কামনা করা নিশ্চয় অনুচিত নয়।

(৩১৮|৫২)

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি দেশ পত্রিকায় সমালোচনার্থ আসিয়াছে। পরে সমালোচনা বাহির হইলে তাহা যথাসময়ে প্রকাশক অথ গ্রন্থকারের নিকট প্রেরিত হইবে।

ভারতে মাউণ্টব্যাটেন—অ্যালান ক্যাম্বে জনসন, শ্রীঅশোককুমার সরকার, আনন্দবাজার পত্রিকা লিঃ, ১, বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা মূল্য—৭॥০।

৩৩৭|৫

ধর্ম ও তাহার স্বরূপ—সুরেন্দ্রনাথ সিদ্ধান্ত বিশারদ, গ্রন্থকার কর্তৃক তুলসীবেড়িয়া, উদ হাওড়া হইতে প্রকাশিত। মূল্য—১॥০।

৩৩২|৫

অতিক্রমা—কিংশুক, দীপালী গ্রন্থশালা ১২৩।১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা মূল্য—২,।

৩৩৪|৫২

শুভা—প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, বিশ্বনাথ বুক স্টল, ৮৮, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—২,।

৩৩৫|৫২

বুধ্ধু ভুতুমের গল্প—সলিলকুমার পাল কর্তৃক কিশোরকল্যাণ কেন্দ্র, ১৩।২, কাঁটাপুকুর থার্ড বাই লেন, হাওড়া হইতে প্রকাশিত। মূল্য—১॥০।

৩৩৬|৫২

হৈমবতী উমা বা দর্পহরণ—স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, গ্রন্থকার কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, খার, বোম্বাই—২১ হইতে প্রকাশিত। মূল্য—৮০।

৩৩৮|৫২

নচিকেতা—স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, গ্রন্থকার কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, খার, বোম্বাই—২১ হইতে প্রকাশিত। মূল্য—১,। ৩৩৯|৫২

ভূমিকা—গোপাল হালদার, ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—৩॥০।

৩৪০|৫২

নিশিথ রাতের সূর্যোদয়ের পথে—সুষমা মিত্র, গুরুদাস লাইব্রেরী, ২০৩।১।১, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—২৫০। ৩৪১|৫২

চক্রবৎ—বিষ্ণুপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বীণাপাণি কর্ণার; ৫, শংকর ঘোষ লেন, কলিকাতা। মূল্য—৪,।

৩৪২|৫২

ভারতীয় অর্থনীতি (২য় খণ্ড)—হিমাংশু রায়, এইচ চ্যাটার্জি এণ্ড কোং লিঃ, ১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—৩॥০।

৩৪৩|৫২

ট্রামে-বাসে

আইসেনহাওয়ার ও স্টিভেন্‌সনের মধ্যে নির্বাচন প্রতিযোগিতাকে রসিক সমাজ হাতী ও গর্দভের যুদ্ধ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বিশু খুড়ো এই

সিকতায় যোগদান করিয়া বলিলেন—হাতীর জয়ে গাধারা আবার নূতন করে ধা বনে গেল, ভেড়ারা খেয়ে গেল যাবাচ্যাকা আর ছাগলরা পরমানন্দে দাড়ি ড়তে লাগল!!”

* * * *

আমেরিকার নির্বাচনের ফলে শুনিতেছি কোথাও কোথাও নাকি দানার দর পড়িয়া গিয়াছে।—“মুড়ির জার সম্বন্ধে কোন সংবাদ বেরিয়েছে কি?-প্রশ্ন করেন জনৈক সহযাত্রী।

* * * *

একটি সংবাদে জানা গেল আজ কয়-দিন যাবৎ কলিকাতায় বানরেরা াকি বেশ মনের আনন্দে ঘুরিয়া বড়াইতেছে। বিশু খুড়ো বলিলেন—অত্যন্ত বাজে খবর, কোলকাতার পথে-াটে বাঁদরদের মনের আনন্দে ঘুরে বড়ানোর সংবাদ মোটেই নূতন নয়।”

* * *

জনৈক প্রশ্নকর্তার প্রশ্নের উত্তরে **নেহরুজী** জানাইয়াছেন যে, রাণী লিজাবেথের করোনেশন উৎসবের নিমন্ত্রণ-াত্র ভারত এখনও পায় নাই।—“রবাহূত হয়ে নিমন্ত্রণে যোগদানে কোন বাধা আছে কি না, সে প্রশ্ন করা হয় নি এবং নেহরুজীও সে সম্বন্ধে কোন নির্দেশ দেন নি। আমরা বলি নেহাৎ আপত্তি না থাকলে রবাহূতই সই, এমন একটা নেমন্তন্ন হাতছাড়া হয়ে যাবে?”—মন্তব্য করে শ্যামলাল।

* * * *

একটি সংবাদে প্রকাশ সেবাগ্রামে শ্রীযুক্ত নেহরু নাকি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নাচিয়াছেন।—“নাচি কি নাচি না, মিছে এ ভাবনা, মিছে মরি লোক লাজে”—বলেন বিশু খুড়ো।

* * *

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় তাঁর এক সাম্প্রতিক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার এমন কোন লক্ষণ তিনি দেখিতে পাইতেছেন না।

শ্যামলাল বলিল—“আমাদের শঙ্কা হচ্ছে তাঁর চোখের চিকিৎসাটা বুঝি তবে ঠিক মতো হয় নি!”

* * * * *

ডাঃ পট্টভি সীতারামাইয়া তাঁর এক সাম্প্রতিক ভাষণে বলিয়াছেন যে, ছোটবেলা ক্রিকেট খেলায় একটি ক্যাচ্‌ ধরিতে গিয়া তিনি আঙ্গুলে আঘাত প্রাপ্ত হন, সেই আঙুলটি এখনও স্বাভাবিক

অবস্থায় ফিরিয়া আসে নাই।—“অবশ্যি ভাঙা-আঙুল নিয়েও পরে তিনি ব্যাটিং করেছেন এবং ভালো ‘স্কোর’ করেছেন” —মন্তব্য করেন খুড়ো।

* * * *

পরমেশ্বর পঞ্চাননের পাঁচটি মুখ—এই সত্য হইতেই পঞ্চায়েৎ শাসনতন্ত্রের যৌক্তিকতা খুঁজিয়া পাওয়া যায়—বলিয়াছেন বিহারের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত দীপনারায়ণ। —“দীপাবলী একটি অপরিহার্য অনুষ্ঠান, সুতরাং Q. E. D”—বলে শ্যামলাল।

* * * *

জনৈক অবসরপ্রাপ্ত মিলিটারি অফিসার নাকি পৌরাণিক সুমেরু পর্বত আবিষ্কার করিয়াছেন। বিশু খুড়ো বলিলেন—“আমরা অতঃপর মূষিক প্রসবের আবিষ্কার কাহিনী শোনার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি।”

* * * *

ভারত সরকার বিদেশে হাতী রপ্তানির উপর বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করিয়াছেন। শ্যামলাল বলিল—“কাজটা ভালো করেন নি। নির্বাচনের পর থেকে বলদরা জোয়াল কাঁধে নিতে চায় না; মহাজনদের পথ বেছে নিয়ে আমরা হাতী দিয়ে চাষের কথাই ভাবছিলাম; সুতরাং হাতী চালান সুরু হয়ে গেলে বাকী ভরসা রামছাগল!!”

শ্রীমতী প্রভা দেবী

শনিবার ৮ই নভেম্বর দুপুরে খবর পাওয়া গেলো, রঙমহলে থিয়েটার বন্ধ। তারপর শোনা গেল, শ্রীরঙ্গম ও মিনার্ভাতেও সেদিন কোন অভিনয় হবে না। কারণ, প্রভা দেবী মারা গিয়েছেন, তাই বাঙলা মঞ্চগুলি সেদিন অভিনয় করবেন না, শিল্পীরা সেদিন আত্মসচেতন হয়ে আর এক মহান্ শিল্পীর আত্মার প্রতি সম্মান দেখাবেন। কেবলমাত্র স্টার থিয়েটার শিল্পীদের এই সচেতনতাকে আমলে আনেননি, তাঁরা যথানির্দিষ্ট অভিনয়ই করে গিয়েছিলেন সেদিনও।

প্রভা দেবী শনিবার সকালে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করেই বুকের যন্ত্রণা অনুভব করেন এবং তখুনিই ডাক্তার ডাকতে বলেন, ছেলে মেয়েদেরও কাছে টেনে বসান। কিন্তু কোরামিন ঠোঁটেই রয়ে গেলো, তাঁর প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেলো সকাল ৬-৩০ নাগাদ। অত্যন্ত আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত ঘটনা। শুক্রবারও রাত ৮টা-৯টা পর্যন্ত কালিঘাটের সূর্য সারথীদের ওখানে মহরৎ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এসেছেন। তার আগের দিন বৃহস্পতিবার শ্যুটিং করেছেন, আবার রঙমহলে "সেই তিমিরে"-তে অভিনয় করেছেন, অনেক রাত পর্যন্ত মহলাও দিয়ে গিয়েছেন। আর সেই ব্যক্তিই চলে গেলেন অমন হঠাৎ! নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ বলছিলেন, ক'দিন ধরেই শ্রীমতী প্রভা তাঁর খোঁজ করছিলেন বাঙলা মঞ্চের বর্তমান দুর্দিন সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য; তিনি শনিবার সকালে দেখা করবেন বলে ঠিক করেছিলেন। শনিবার তিনি এসেওছিলেন দেখা করতে, দেখাও হলো কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গে। আর এই মৃত্যু, আচার্য শিশিরকুমার শোকার্ত হয়ে বলেন—"নাট্যসম্রাজ্ঞী প্রভা দেবী আজ ইহলোকে নেই, তাই মঞ্চ আজ নিষ্প্রভ।"

সত্যিই বাঙলার মঞ্চের উজ্জ্বলতম দীপটি নিভে গেলো, কারণ আজ শ্রীমতী প্রভা তাঁর শিল্পপ্রতিভার উচ্চতম শিখরেই শুধু অধিরোহণ করেননি, বৎসরাধিককাল ধরে তিনি, বলতে গেলে, একারই ক্ষমতার জোরে একটা পুরো থিয়েটারকে সসম্ভ্রমে চালিয়ে নিয়ে যেতে সহায়ক হয়েছিলেন। একথা আসছে রঙমহলে "নিষ্কৃতি" নাটকে শ্রীমতী প্রভার অভিনয় সম্পর্কে। একখানা নাটকে অভিনয়

রঙ্গজগৎ

করে বছরখানেক ধরে তিনি রঙমহলকে চালিয়ে নিয়ে যেতে যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে গেলেন, শিশিরকুমার বলছিলেন, মহিলা শিল্পীদের মধ্যে কেবলমাত্র তারাসুন্দরীর সঙ্গে তাঁর তুলনা করা যায় তবে

প্রতিভার সর্বোচ্চ পরিচয় "নিষ্কৃতি"-তে প্রভা দেবী

শ্রীমতী প্রভা আরও ভাগ্যবতী কারণ তিনি প্রতিভার সর্বোচ্চ শিখরে উঠে মারা গেলেন বেশ সাড়া জাগিয়ে। আর তারাসুন্দরী, আক্ষেপ করে নাট্যাচার্য বলেন, তাঁর মৃত্যুর খবর জানতেও পারেনি কেউ।

খুব ছেলেবয়সেই শ্রীমতী প্রভা অভিনয়-শিল্পে আত্মোৎসর্গ করেন এবং একাদিক্রমে ৩৬ বছর ধরে তিনি বাঙলার মঞ্চ ও পর্দার জ্যোতিষ্ক হয়ে জ্বলজ্বল করে বিরাজ করেছেন। একটা নতুন ধারারই তিনি প্রবর্তন করে দিয়েছেন। কলকাতার সিমলা পাড়ায় শ্রীমতী প্রভা জন্মগ্রহণ করেন। আট-ন বছর যখন বয়েস, সে সময়ে তখনকার নৃত্যশিক্ষক শ্রীললিতকুমার গোস্বামী শ্রীমতী প্রভাকে তাঁর সখীর দলে ভর্তি করে মিনার্ভা থিয়েটারে নিয়ে যান এবং তাঁর প্রথম মঞ্চাবতরণ ঘটে ১৯১৬ সালে "সিংহল বিজয়" নাটকে সখীর দলের সঙ্গে। কিছুদিন পর তিনি মঞ্চ ছেড়ে দেন। আবার মঞ্চে ফিরে আসেন ১৯২২-২৩ সালে ম্যাডান কোম্পানীর সখীর দলে; ছোটখাটো ভূমিকাতেও নামতেন কখনও কখনও। এই সময়ে তিনি শিশিরকুমারের দৃষ্টিতে পড়েন। "অপরাধী কে?" নামক একটি নাটকে ছোট্ট ভূমিকায় প্রভাকে তিনি দেখেন এবং নিজের দলে টেনে নেন। শিশিরকুমার বলেন, তন্বী, সুগঠিত চেহারা দেখেই তিনি নিয়েছিলেন, শিল্প প্রতিভা তিনি লক্ষ্য করে দেখেননি গোড়াতে। শিশিরকুমার সে সময়ে "আলমগীর" (গোড়ার নাম "ভীমসিংহ") প্রস্তুত করছিলেন। ঐ নাটকে একটি ভূমিকায় কথা বলিয়ে শিশিরকুমার প্রভার কণ্ঠস্বর শুনে চমৎকৃত হন এবং একটি ভূমিকা দেন তাঁকে অভিনয় করতে। শিশিরকুমার প্রভার কণ্ঠ ও চেহারা কাজে লাগাতে পারবেন মনে করেন। তারপর ম্যাডান ছেড়ে শিশিরকুমার নিজের দল করে ইডেন গার্ডেনে ডি এল রায়ের "সীতা" অভিনয়ে প্রভাকে গ্রহণ করেন। সেই থেকে শিশিরকুমার প্রভাকে নিজের দলেই রেখে দেন এবং নাট্যমন্দিরের "সীতা"-র নামভূমিকায় এক অসাধারণ প্রতিভাময়ী শিল্পীতে পরিণত করে দর্শকসমাজে উপস্থাপন করেন। সেটা ১৯২৪ সাল।

তারপর প্রভা শিশিরকুমারের দলে থেকে ইতিহাস সৃষ্টি করে চলেন একটানা প্রায় বারো বছর। বাঙলা মঞ্চের শ্রেষ্ঠতম যুগ সেটা। এই সময়ের মধ্যে তিনি "আলমগীর", "চন্দ্রগুপ্ত", "দিগ্বীজয়ী", "সধবার একাদশী", "জনা", "রঘুবীর", "রীতিমত

আমাদের নিবেদন
চন্দ্রলেখা-য়
রাজকুমারী
আমাদের নিবেদন
নিশান ও মঙ্গলায়
ভানুমতী
আমাদের নিবেদন
সংসার-এ
পুষ্পাবলী
আমাদের নিবেদন
মিঃ সম্পত-এ
পদ্মিনী
জেমিনী চিত্র

নাটক", "বিষ্ণুপ্রিয়া", "বিন্দুর ছেলে" প্রভৃতি একের পর এক বহু নাটকে অভিনয় করে ধাপে ধাপে যশের শিখরে উঠতে থাকেন। মাঝে তিনি শিশিরকুমারের সঙ্গে আমেরিকায় যান এবং সীতাতে অভিনয় করে ওদেশেও নাম করেন। বোধহয়, আমেরিকায় আমাদের দেশের কোন মহিলা শিল্পীর সুখ্যাতি এই প্রথম।

পরে শ্রীমতী প্রভা অন্যান্য মঞ্চেও অবতরণ করেন। "দেবদাস", "ধাত্রীপান্না", "জীজাবাই", "চাঁদবিবি", "জীবন সংগ্রাম", "বড় বৌ", "নিষ্কৃতি", "সেই তিমিরে" প্রভৃতি বহু নাটকে তাঁর অবিস্মরণীয় প্রতিভার পরিচয় দান করেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি অভিনয়ের ধারা বদলে নিতে থাকেন এবং একটি বিশেষ ধরণের টাইপ চরিত্র সৃষ্টিতে যে একান্ত নিজস্বতা নিয়ে এসেছিলেন তার চরম বিকাশ ঘটে "নিষ্কৃতি"-তে। বাঙলা মঞ্চের ইতিহাসেই এ এক অবিস্মরণীয় চরিত্র সৃষ্টি।

চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও শ্রীমতী প্রভা সমান কৃতিত্বের নিদর্শন রেখে গিয়েছেন। নির্বাক যুগ থেকেই তিনি ছবিতে কাজ করতে থাকেন, তবে সে সময়ে তাঁকে মনে করা যায় না। "সীতা"-র সবাকচিত্র সংস্করণ এবং "পল্লীসমাজ" তাঁকে প্রতিভাময়ী চলচ্চিত্রাভিনেত্রীরূপেও পরিচিত করে দেয়। সেই থেকে অসংখ্য ছবিতেই তিনি অভিনয় করেছেন এবং যতো ছোট ভূমিকাতেই তিনি নেমে থাকুন না কেন, দর্শকদৃষ্টিকে ঠিক টেনে নিতে পেরেছেন। তিনি একটা বিশেষ টাইপ চরিত্র সৃষ্টি করে গিয়েছেন যার কোন তুলনা পাওয়া যায় না। "নন্দিনী", "শহর থেকে দূরে", "মানে না মানা", "বাবলা" প্রভৃতি তাঁকে বাঙলা পর্দায়ও চিরস্মরণীয় করে রাখবে। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে চারখানি ছবির কাজ অপূর্ণ রয়ে গেলো। আর যে "নিষ্কৃতি" তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ পরিচয় তারও দ্বিশততম রজনী ঘোষিত হয়েও আর হতে পারলো না।

শ্রীমতী প্রভার প্রতিভা সম্পর্কে নাট্যাচার্য বলেন, প্রভা নাটকের অন্তরে ঢুকতে পারতো, দর্শকদের মনহরণ করার শিল্প-বৃত্তি তার জানা ছিলো; সে অভিনয়ের বস্তুর সন্ধান পেয়েছিলো—জানতো অভিনয় কি, সুঅভিনয় কাকে বলে।

নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত জানান, শ্রীমতী প্রভা নাট্যশালাকে বাঁচাবার কথা ভাবতেন দিনরাত। প্রগতিশীল নাটকাভিনয়ে তাঁর •

ছিলো খুব, অনেকবার নিজে উপ- া হয়ে ওদের নাটকে অভিনয় ছেন; আর পেশাদার মঞ্চে প্রগতিশীল াভিনয়ের কথা মনে করেছেন।

দুই পুরুষ" নাটকে প্রভা বিমলার ত্র অভিনয় করেন। সেই সূত্রে তারা- র বন্দোপাধ্যায় তাঁর সান্নিধ্যে আসেন। বলেন, প্রভার মর্যাদাবোধ, মিষ্টভাষা াট্যজ্ঞান তাঁকে চমৎকৃত করেছিলো। বিমলাকে যেভাবে কল্পনা করেছিলেন তাঁর অভিনয়ে চরিত্রটিকে উজ্জ্বলতর তুলেছিলেন।

প্রভা দেবীকে মায়ের মতো মনে করতো ডও ও থিয়েটারের সকলে। আর নও মায়ের মতোই স্নেহ করতেন দকেই। তিনি অভিনয় শেখাতেন দের। শিক্ষায়, দীক্ষায়, আচরণে তী প্রভা দেবী নাট্য ও চলচ্চিত্র জগতে আদর্শ রেখে দিয়ে গেলেন। তিনি খ গেছেন চারটি পুত্র ও দুই কন্যা; অন্যতমা হচ্ছেন চিত্রাভিনেত্রী কেতকী। রেখে গেছেন শতসহস্র গুণমুগ্ধ সুধী শিল্পী যারা আজীবন তাঁর প্রতিভাকে রণ করে রাখবেন।

তানসেন সংগীত সম্মেলন

আগামী ২৮শে নভেম্বর থেকে চারদিন- পী ভবানীপুরের ইন্দিরা সিনেমায় নসেন সংগীত সম্মেলনের পঞ্চম বার্ষিক ধিবেশন বসবে। এবারের অধিবেশনের শেষ আকর্ষণ হবে আল্লাদীন খাঁ, তদ্‌পুত্র লি আকবর খান, জামাতা রবীন্দ্রশংকর ং পৌত্র আশীষ খানের একত্র সমাবেশ।

তাছাড়া যোগদান করবেন বড়ে গোলাম আলি খান, আগ্রার বসির খান, বম্বের সরস্বতী রাণে ও আল্লা রাকে, বেনারসের অনোখীলাল, শান্তাপ্রসাদ ও রামনাথ, পূর্ব পাকিস্থানের ক্ষীরোদ নাট, যিনি ঢোলেতে মার্গ সংগীতের গৎ তুলে শুনিয়ে দিতে পারেন; আর নাচেতে আসছেন বম্বের শীলা নায়েক। এছাড়া এখানকার বিশিষ্ট শিল্পি-বৃন্দও থাকবেন।

কলিকাতায় উদয়শংকর

আগামী ২১শে নভেম্বর থেকে উদয়-শংকর তাঁর সম্প্রদায় নিয়ে নিউ এম্পায়ার মঞ্চে অবতরণ করবেন। এইখান থেকেই তাঁর এবছরকার পরিক্রমা শুরু। কলকাতার পর তিনি ভারতের বিভিন্ন শহর পরিভ্রমণ করবেন এবং তারপর আবার যাবেন আমেরিকা।

এবারের নাচের সূচীতে নতুন অংশ কিছু কিছু যোগ করা হয়েছে, তাছাড়া সাজপোষাক, আলোকসম্পাত ইত্যাদি বিষয়ে উন্নততর শিল্প কৃতিত্ব দেখাবার চেষ্টা করা হচ্ছে।

খেলার মাঠে

ফুটবল

বাঙলা জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার প্রবর্তক। এমনকি বাঙলাই এই পর্যন্ত সর্বাধিকবার জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় সকল গৌরবের অধিকারী হইয়াছে। সেই বাঙলা দল এইবারেও বিজয় গৌরবে ভূষিত হইবে ইহাই ছিল সকলের আশা ও কল্পনা। কিন্তু ফলতঃ তাহা হয় নাই। বাঙলা দল ফাইন্যালে মহীশূর রাজ্য দলের নিকট পরাজিত হইয়াছে। ইহা খুবই পরিতাপের ও দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। তবে আমরা এইরূপ ফলাফলের জন্য প্রস্তুত ছিলাম। বাঙলা দল প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াই যেভাবে ক্রীড়াকৌশলের পরিচয় দিতে আরম্ভ করে, তাহাতে ফাইন্যাল পর্যন্ত বাঙলা দল যে অগ্রসর হইবে, ইহাও আমরা কল্পনা করি নাই। সেইজন্য বাঙলার অসাফল্যে আমরা এতটুকুও আশ্চর্য হই নাই। ইহার জন্য দায়ী বাঙলার ফুটবল পরিচালকগণ। দীর্ঘ এক বৎসরের বিশ্রামহীন খেলায় যোগদানে ক্লান্ত ও শক্তিহীন খেলোয়াড়গণ ইহা অপেক্ষা ভাল ফলাফল প্রদর্শন করিতে পারে না। ইহার কিছুটা আভাষ আমরা প্রতিযোগিতার সূচনাতেই দিয়াছিলাম। আমরা আশা করি, বাঙলার ফুটবল পরিচালকগণ এই বিষয়ে বিশেষ চিন্তা করিয়া ভবিষ্যৎ কর্মসূচী রচনা করিবেন। খেলোয়াড়গণ মানুষ। তাঁহাদের যন্ত্রের ন্যায় নির্জীব পদার্থ জ্ঞান করিয়া যেমন খুশী চালাইবার চেষ্টা করিলে কখনই সুফল লাভ হইতে পারে না। এই প্রসঙ্গে জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়ান মহীশূর রাজ্য দলের কৃতী খেলোয়াড়দের সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করি। তাঁহারা কেবল যে ১৯৪৬ সালের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন তাহা নহে, প্রমাণিত করিয়াছেন তাঁহাদের নিজ দেশের মাঠে পরাজয়ের কালিমা তাহারা লেপন করিতে পারে না। বাঙলা দল ১৯৪৬ সালের বিজয়ী মহীশূর দলের তিনজন খেলোয়াড় রমণ, আমেদ ও জে এন্টনীকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে খাড়া করিয়া জয়লাভের আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাও ব্যর্থ করিয়া ইহাই প্রমাণিত করিলেন যে, তাঁহারা খেলোয়াড় তৈয়ারী করিতে পারেন। ইহার জন্য পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় না। বাঙলার ফুটবল পরিচালকগণ যদি ইহা উপলব্ধি করিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা সুখী হইব। ভাড়াটে খেলোয়াড় লইয়া খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড বৃদ্ধির আশা দুরাশা মাত্র। ইহা পরিত্যাগ না করিলে সুচিন্তিত কোন কর্মসূচী গ্রহণ না করিলে বাঙলার ফুটবল খেলার এখনও যেটুকু সম্মান আছে, তাহাও ভবিষ্যতে রক্ষা করা সম্ভব হইবে না ইহা জোর করিয়া বলিতে আমাদের কোনরূপ দ্বিধা বোধ হইতেছে না।

জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার পূর্বের ফলাফল

১৯৪১ সাল—বাঙলা ৫—১ গোলে দিল্লীকে পরাজিত করে। খেলা কলিকাতায় হয়।

১৯৪২-৪৩ সাল—কোন খেলা হয় নাই।

১৯৪৪ সাল—দিল্লী ২—০ গোলে বাঙলাকে পরাজিত করে। খেলা দিল্লীতে হয়।

১৯৪৫ সাল—বাঙলা ২—০ গোলে বোম্বাইকে পরাজিত করে। খেলা বোম্বাইতে হয়।

১৯৪৬ সাল—মহীশূর ০—০, ২—১ গোলে বাঙলাকে পরাজিত করে। বাঙ্গালোরে খেলা হয়।

১৯৪৭ সাল—বাঙলা ০—০, ১—০ গোলে বোম্বাইকে পরাজিত করে। খেলা কলিকাতায় হয়।

১৯৪৮ সাল—কোন খেলা হয় নাই।

১৯৪৯ সাল—বাঙলা ৫—০ গোলে হায়দরাবাদ দলকে পরাজিত করে। খেলা কলিকাতায় হয়।

১৯৫০ সাল—বাঙলা ১—০ গোলে হায়দরাবাদ দলকে পরাজিত করে। খেলা কলিকাতায় হয়।

১৯৫১ সাল—বাঙলা ১—০ গোলে বোম্বাইকে পরাজিত করে। বোম্বাইতে খেলা হয়।

ডুরাণ্ড ফুটবল প্রতিযোগিতা

রোভার্স কাপ প্রতিযোগিতার শোচনীয় ব্যর্থতার পর বাঙলার দলসমূহের ডুরাণ্ড ফুটবল প্রতিযোগিতায় যোগদান যে কতখানি নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক, তাহা প্রতিযোগিতার সূচনা হইতেই নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। ইহা খুবই দুঃখের বিষয়। আমরা মনে করি, এইরূপ ফলাফল লক্ষ্য করিয়া বাঙলার অপর সকল দল ডুরাণ্ড প্রতিযোগিতায় যোগদান হইতে বিরত হইবেন। ইহা কেবল যে দলের সুনাম রক্ষায় সাহায্য করিবে তাহা নহে, বাঙলার ফুটবল খেলা সম্পর্কে বাঙলার বাহিরের জনসাধারণ যেরূপ নিম্ন ধারণা পোষণ করিতে আরম্ভ

য়াছেন, তাহার দৃঢ় মূলে ধারণের পথ রুদ্ধ হইবে।

কেট —

লেণ্ড ভ্রমণকারী ভারতীয় ক্রিকেট দলের জারের 'স্বাস্তিবাচন' সত্যই উপভোগ্যের হইয়াছে। অবস্থান্তরে কিভাবে লোকে র উক্তির সকল কিছু ধামাচাপা দিয়া নূতন- নূতন যুক্তিতে সাধারণের সম্মুখে নিজ দোষত্রুটি স্খালনের ব্যবস্থা করিতে পারে, র চরম নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। বিশ্রামহীন হব্যাপী খেলার ব্যবস্থা, শক্তিহীন দল শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তরণ প্রভৃতি সকল বিষয়ই ম্যানেজারের যে াত ছিল, ইহা কেহ স্বীকার করিবেন কিনা ন না। কিন্তু আমরা করি না। তাহা ছাড়া হাওয়ার কথাও যে তিনি জানিতেন না ইহাও । সুতরাং সেই সকল বিষয় জানিয়া শুনিয়া ন যাত্রার প্রাক্কালে বড় বড় ভাষায় ছটার মধ্যে সাহোদ্দীপক উক্তি করিয়াছিলেন, তিনি কি রয়া বর্তমানে তাহাই ভারতীয় ক্রিকেট দলের াফল্যের সমর্থনে উচ্চারণ করিতে সাহসী লেন, ইহা সত্যই উল্লেখ করিবার বিষয়। রতীয় ক্রিকেট দল ইংলণ্ডে যে সুবিধা করিতে রবে না, ইহা আর কাহারও বলিবার সাহস না লেও আমাদের ছিল এবং আমরা এখন উহা টভাবেই উল্লেখ করি। এমনকি ইহাও উল্লেখ রি যে, ভ্রমণের কর্মসূচীতে বিশ্রামহীন খেলায় ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাও ভারতীয় খেলোয়াড়- র শারীরিক ক্ষমতার বাহিরে। কিন্তু এখন এই নেজারকে উহা সমর্থন করিতে দেখি নাই। পরন্তু তখন ইহাকে জোর গলায় প্রচার করিতে শানা যায় যে, ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়গণ রতের মাঠে এম সি সির বিরুদ্ধে যেরূপ ীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহারই নরাবৃত্তি করিবেন। এমনকি বহু ক্ষেত্রে নাকি হারা ভারতীয় ক্রিকেট খেলার স্ট্যান্ডার্ড বা ান যে খুবই উচ্চস্তরের, তাহা প্রমাণিত রিবেন। সেই একই ব্যক্তি কিভাবে যে কথার রিবর্তন করিতে পারিলেন ইহাই বিস্ময়ের বষয় হইয়াছে। আর্থিক সংগতির কথা যে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাতে কি প্রমাণ হইতে পারে, াহা উল্লেখ করিলেই আমরা সুখী হইতাম। বাধ হয় করিতে পারেন নাই এই জন্যই যে, স্ট্রেলিয়া ভ্রমণের কথা স্মরণ করিয়া। ঐ মণের শেষেও আর্থিক সংগতির কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, মার্থিক ক্ষতি হইয়াছে। এইবারেও কি ঐরূপ কোন আশঙ্কা করিবার মতন কারণ আছে?

পাকিস্থান বনাম পশ্চিমাঞ্চলের খেলা

বোম্বাইর ব্রাবোর্ন মাঠে পাকিস্থান ও পশ্চিমাঞ্চল দলের তিন দিনব্যাপী খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হইয়াছে। তবে এই খেলায় ভারতীয় খেলোয়াড় হিসাবে পি পাঞ্জাবী প্রথম পাকিস্থান দলের বিরুদ্ধে শতাধিক রান করিয়াছেন। পাকিস্থান দলেরও ওয়াজির মহম্মদ শতাধিক রান করিয়া দলের ষষ্ঠ খেলোয়াড়ের শতাধিক রানের গৌরবে ভূষিত করিয়াছেন। পাকিস্থান দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে অনেকেই যে শতাধিক রান করিবার ক্ষমতা রাখেন, ইহাই এই খেলায় প্রমাণিত হইয়াছে। শিশু ক্রিকেট প্রতিষ্ঠানের সভ্যদের এই গৌরব লাভ সত্যই প্রশংসার। ইহা আমরা না বলিয়া পারি না যে, পাকিস্থান দলের খেলোয়াড়গণ সকলই দেশের ও দলের গৌরব প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ইহা ভারতীয় খেলোয়াড়গণ অনুকরণ করিলে সত্যই সুফল লাভ হইতে পারে। নিম্নে খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইল:—

পশ্চিমাঞ্চল প্রথম ইনিংস—৬ উইঃ ৩৩২ রান ডিক্লেয়ার্ড (পি পাঞ্জাবী ১৪২, দীপক সোধন ৮৯ রান নট আউট, হাজারে ৩৮, মামুদ হোসেন ৭০ রানে ২টি, মকসুদ আমেদ ৬৬ রানে ২টি, আমীর ইলাহি ৮৬ রানে ২টি)।

পাকিস্থান প্রথম ইনিংস:—২৯২ রান (ওয়াজির মহম্মদ ১০৪ নট আউট, ইসরার আলী ৫৫, কারদার ৫১, নেয়ালচাঁদ ১১৮ রানে ৫টি, জসু প্যাটেল ৮১ রানে ৩টি, হাজারে ৫৫ রানে ২টি)।

পশ্চিমাঞ্চল দ্বিতীয় ইনিংস:—৩ উইঃ ১২৩ রান (ই এস মাজা ৫৬)।

পাকিস্থান দ্বিতীয় ইনিংস:—২ উইঃ ৫৪ রান (মকসুদ আমেদ ২৫)।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

৩রা নবেম্বর—ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আরও তিন কোটি ৮৩ লক্ষ ৫০ হাজার ডলার (প্রায় ১৮ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা) সাহায্যের জন্য অদ্য নয়াদিল্লীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত সরকারের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ পরীক্ষামূলকভাবে আগামী ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার জন্য ইংরাজী পাঠ্যতালিকা হ্রাস করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রী কয়াজী আজ বোম্বাই সরকার ও বোম্বাইয়ের বিক্রয়-কর বিভাগের কালেক্টরের উপর এক রুল জারী করিয়া, ১৯৫২ সালের ১লা নবেম্বর তারিখে প্রবর্তিত বোম্বাই বিক্রয়-কর আইন কেন সংবিধানের ২৮৬ অনুচ্ছেদ বিরোধী ও অসিদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হইবে না তাহার কারণ দর্শাইতে বলিয়াছেন।

৪ঠা নবেম্বর—বিলোনিয়ার সংবাদে প্রকাশ, ত্রিপুরা-নোয়াখালি সীমান্তে অবস্থিত বিলোনিয়া শহরের নিকটবর্তী স্থানে পাকিস্থানী সৈন্যগণ ভারতীয় অঞ্চলে প্রবেশ করিয়া উহা অধিকার করিয়াছে।

ঢাকার সংবাদে প্রকাশ, গত রবিবার চট্টগ্রাম শহরের রাজপথে এক শোচনীয় বাস দুর্ঘটনার ফলে ঘটনাস্থলেই ৮ জন মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং অপর ১২ জন আহত হয়।

৫ই নবেম্বর—অদ্য নয়াদিল্লীতে লোক সভার শীতকালীন অধিবেশন আরম্ভ হয়। অর্থমন্ত্রী শ্রী দেশমুখ মৃত্যু-কর বিল ৩৫ জন সদস্য লইয়া গঠিত এক সিলেক্ট কমিটিতে পাঠাইবার প্রস্তাব করেন।

অদ্য লোক সভায় প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু বলেন, ভারত সরকার ফরাসী সরকারকে জানাইয়াছেন যে, একমাত্র ভারতভুক্তির ভিত্তিতেই ফরাসী উপনিবেশ সমস্যার আলোচনা হইতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গের পুনর্বাসন দপ্তরের অব্যবস্থা ও টালবাহানার ফলে সুন্দরবন অঞ্চলের 'জি প্লট' ত্যাগী ৬২টি উদ্বাস্তু পরিবার প্রায় তিন মাস যাবৎ হাওড়া স্টেশনে চরম দুর্দশার মধ্যে কাল কাটাইতেছে। পশ্চিমবঙ্গ ও বাহিরের অন্যান্য সরকারী শিবির ও কলোনীত্যাগী আরও প্রায় আড়াই হাজার উদ্বাস্তু নরনারী হাওড়া ও শিয়ালদহ স্টেশনে অনুরূপ দুরবস্থার মধ্যে রহিয়াছে।

৬ই নভেম্বর—লোকসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে পররাষ্ট্র দপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রীঅনিলকুমার চন্দ বলেন যে, এই বৎসরের ১৫ই আগস্ট হইতে ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত 'পূর্ব পাকিস্থানের অ-মুসলমান অধিবাসীদের উপর ভারত-পাক সীমান্তে ২৪ বার গুরুতর ধরণের আক্রমণ হইয়াছে এবং পাকিস্থানের অভ্যন্তরে থাকাকালীন তাঁহাদের উপর ৫২ বার আক্রমণ করা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

লোকসভায় প্রশ্নোত্তরকালে পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন জানান যে, এই বৎসরে পূর্ববঙ্গ হইতে ২ লক্ষ ৭৮ হাজার উদ্বাস্তু ভারতে আসিয়াছে।

৭ই নভেম্বর—লোকসভায় প্রশ্নোত্তরকালে সহকারী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী বি এন দাতার বলেন, পশ্চিমবঙ্গের সীমানা পুনর্বিন্যাসের জন্য সরকারের অবিলম্বে কোন কমিশন নিয়োগের অভিপ্রায় নাই।

অবিভক্ত বাঙলার ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী জনাব ফজলুল হক ঢাকায় সাংবাদিকদের নিকট এক বিবৃতিতে বলেন যে, বাখরগঞ্জ জেলার কোন কোন অংশে অত্যন্ত খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছে এবং ইহার ফলে ৮ লক্ষ লোক দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

৮ই নভেম্বর—নয়াদিল্লীতে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হয়। পরিষদের সভাপতি শ্রীজওহরলাল নেহরু উহাতে সভাপতিত্ব করেন। তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকে বাস্তব ক্ষেত্রে রূপায়িত করার জন্য সরকার ও জনসাধারণের সম্মিলিত উদ্যোগের প্রয়োজন।

পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন পাঞ্জাব মুসলিম লীগ সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ঘোষণা করেন যে, কাশ্মীর সম্পর্কে পাকিস্থানের জনসাধারণের ধৈর্য শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। গতকল্য লায়ালপুরে পাঞ্জাব প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সম্মেলন আরম্ভ হয়। 'রাষ্ট্রপুঞ্জ যদি জম্মু ও কাশ্মীরের মুক্তি সম্পর্কে টালবাহানা করিতে থাকেন' তাহা হইলে পাকিস্থান সরকারকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নীতি অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিয়া সম্মেলন একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ আঞ্চলিক সৈন্যবাহিনী সপ্তাহ উদ্বোধন করিয়া এক বেতার বক্তৃতা দেন। উহাতে তিনি বলেন যে, স্বদেশ রক্ষার জন্য প্রত্যেক দেশভক্ত ভারত সন্তানের যথাসাধ্য ত্যাগ করা কর্তব্য। কারণ এক্ষণে দেশরক্ষার কাজ সরকারী অথবা সশস্ত্র বাহিনীর দায়িত্ব মাত্র নহে,—নাগরিকগণের উপরও উহা বর্তিয়াছে।

৯ই নভেম্বর—নয়াদিল্লীতে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের দুই দিবস অধিবেশন অদ্য সমাপ্ত হইয়াছে। পরিষদ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সাধারণভাবে অনুমোদন করেন এবং পরিকল্পনায় সন্নিবিষ্ট কার্যসূচী এবং উদ্দেশ্য সমর্থন করেন।

নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন সমাপ্ত হয়। জানা গিয়াছে, যে ক্ষতিপূরণের প্রশ্নটির জন্য দেশের ভূমি সংস্কার বিলম্বিত হইতেছে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

৩রা নবেম্বর—অদ্য রাষ্ট্রপুঞ্জের রাজনৈতিক কমিটিতে দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্যমূলক নীতি সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ভারতের পক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেন।

৪ঠা নবেম্বর—অদ্য বৃটিশ পার্লামেণ্টে রাণী এলিজাবেথ বৃহৎ রাজনৈতিক সংগ্রামের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন।

৫ই নবেম্বর—রিপাব্লিকান দলের প্রার্থী মিঃ ডুইট ডেভিড আইসেনহাওয়ার বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করিয়া অদ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন। ভাইস-প্রেসিডেণ্ট পদে রিপাব্লিকান দলের প্রার্থী সেনেটর রিচার্ড এম নিক্সনও জয়লাভ করেন।

৬ই নবেম্বর—অদ্য সুইডিস একাডেমী পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র ও সাহিত্যে বর্তমান বৎসরের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নাম ঘোষণা করিয়াছে। দুইজন ইংরেজ বৈজ্ঞানিক যৌথভাবে রসায়নে পুরস্কার লাভ করিয়াছেন; তাঁহাদের একজন হইলেন ডক্টর আর্চার জন পোর্টার মার্টিন এবং অন্যজন হইলেন ডক্টর রিচার্ড লরেন্স মিলিংটন সিঞ্জ। দুইজন মার্কিন আণবিক বৈজ্ঞানিক যথা—ডক্টর এডোয়ার্ড পার্সেল এবং অধ্যাপক ফেলিক্স ব্লক যৌথভাবে পদার্থ বিদ্যায় পুরস্কার পাইয়াছেন। ফ্রান্সের অন্যতম বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ফ্রাঁকোয়া মরিসের সাহিত্যে পুরস্কার লাভের সৌভাগ্য হইয়াছে।

সিংহলের প্রধান মন্ত্রী মিঃ ডাড্‌লে সেনানায়ক অদ্য প্রতিনিধি পরিষদে ১৯৪৯ সালের ভারতীয় ও পাকিস্থানী অধিবাসী (নাগরিক অধিকার) আইন সংশোধনের জন্য একটি বিল উত্থাপন করেন।

৭ই নভেম্বর—সোমবার দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নের সর্বত্র ধর্মঘট আরম্ভ করিবার জন্য আফ্রিকা জাতীয় কংগ্রেস ভারতীয় ও আফ্রিকানদের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছে।

ভারতীয় মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা—।৵০ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষাণ্মাসিক— ১০৲
পাকিস্থানের মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা (পাক্) ।৵০ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষাণ্মাসিক—১০৲ (পাক্)
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২০শ বর্ষ
৪র্থ সংখ্যা

দেশ

শনিবার,
৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯

DESH Saturday, 22nd November, 1952

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

সাময়িক প্রসঙ্গ

পণ্ডিত নেহরুর উত্তর

পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা সম্বন্ধে ভারত সরকার যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন গত ১৫ই নভেম্বর ভারতীয় লোকসভায় বহু-সংখ্যক ভোটাধিক্যে তাহা সমর্থিত হইয়াছে। প্রস্তাবের ফল যে এই রকম দাঁড়াইবে তাহা পূর্বে হইতেই অনুমান করিয়া লওয়া গিয়াছিল। বস্তুতঃ প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলালের ব্যক্তিত্বের প্রভাবেই এ ক্ষেত্রেও পূর্ববৎ যথারীতি কাজ হইয়াছে। পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের অবস্থা যে সত্যই সঙ্কটজনক পণ্ডিতজী একথা স্বীকার করিতে পারেন নাই। প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন, সেখানকার সরকারী নীতির ফলে তাহাদের উপর চাপ পড়িতেছে। সর্বদা একটা আতঙ্কমূলক প্রতিবেশের মধ্যে উৎকণ্ঠিত অবস্থায় তাঁহাদিগকে বাস করিতে হইতেছে। কিন্তু এ অবস্থায় প্রতিকারের জন্য কার্যতঃ কোন ব্যবস্থাই করা সম্ভব নয়। একটিমাত্র উপায় আছে। সে উপায় পণ্ডিতজী ইতিপূর্বেই নির্দেশ করিয়াছেন এবং সেটি হইল হৃদয় স্পর্শের প্রলেপ, স্নিগ্ধ মলম। পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন, পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থের সঙ্গে ভারতের যে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে, একথা তর্কের দ্বারা বুঝাইবার কোন প্রয়োজন রাখে না। আজই না হয় তাঁহারা পাকিস্থানের অধিবাসী হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের শত শত, হাজার হাজার বৎসরের সম্পর্ক রহিয়াছে, সে সব ধুইয়া মুছিয়া ফেলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁহাদের প্রতি আমাদের সকলেরই আন্তরিক সহানুভূতিও আছে। কিন্তু আমরা কি করিতে পারি, ইহা বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে, ভাবাবেগে মাতিলে কোন কাজ হইবে না ইত্যাদি। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সুস্পষ্ট অভিমত এই যে, পাকিস্থান যাহাই করুক, ভারতের পক্ষ হইতে শুধু হৃদ্যতার নীতিই অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী তাঁহার সমালোচকদিগকে যথেষ্ট উত্তেজনা এবং ভর্ৎসনার সুরেই এই কথা শুনাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ইতিহাসের গতি কেহ পরিবর্তন করিতে পারে না। সুতরাং তাহা মানিয়াই আমাদিগকে চলিতে হইবে। সমস্যার সমাধান আগামীকল্যও হইতে পারে পরশ্বও হইতে পারে কিংবা বহু বৎসর পরেও হইতে পারে। পণ্ডিত নেহরুর কথায় মোটামুটি ইহাই দাঁড়াইতেছে যে, পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের উপর অবিচার এবং অত্যাচার হইতেছে ইহা সবই সত্য; কিন্তু তাহাদিগকে অদৃষ্টের ভরসায় ভাসাইয়া দেওয়া ছাড়া ভারতের পক্ষে করিবার কিছুই নাই। প্রধানমন্ত্রী হৃদ্যতার স্পর্শের যে প্রলেপ একমাত্র ঔষধ বলিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন, এই কয়েক বৎসর ক্রমাগত তাহা প্রলেপ করিয়াও তাহাতে কোন ফলই হয় নাই এবং অল্প দিনের মধ্যে তাঁহার চিকিৎসা-ব্যবস্থায় ব্যাধির বিশেষ কোন প্রতিকার হইবে, এমন সম্ভাবনাও দেখা যাইতেছে না। দশ বিশ বৎসর পরে পূর্ববঙ্গ হইতে হিন্দু যখন একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে, তখন তো ঔষধের কোন প্রয়োজনই আর থাকিবে না। পণ্ডিতজী এই প্রশ্ন করিয়াছেন যে, পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের রক্ষার পক্ষে ভারত সরকারের অবলম্বিত নীতি যথেষ্টরূপে দৃঢ় নয়, এমন অভিযোগ কেন যে করা হয়, তিনি তাহা বুঝিতে পারেন না। এই প্রশ্নের উত্তর তাঁহার নিজের উক্তির ভিতরই রহিয়াছে। পূর্ববঙ্গের হিন্দুদিগকে উৎখাত করিবার জন্য তাহাদের উপর অনবরত চাপ পড়িতেছে। তাহাদিগকে আতঙ্ক এবং উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটাইতে হইতেছে, সহস্র সহস্র নরনারী ভিটা মাটি ছাড়িয়া পথের বাহির হইয়া ছুটিয়াছে, অথচ ভারত সরকার এই অবস্থার কোন প্রতিকার করিতে সমর্থ হইতেছেন না। পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা সম্বন্ধে তাঁহাদের দায়িত্ব আছে, মানবতার দিক হইতে একটা কর্তব্য রহিয়াছে, এ সব কথা তাঁহারা স্বচ্ছন্দে বলিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু কর্তব্য প্রতিপালনে তাঁহাদের নীতি যদি কার্যকর না হয়, তবু তাহা দৃঢ়, তাঁহাদের এমন দাবী, নেহাৎই যে গায়ের জোরের উপর, এই কথাই বলিতে হয়। বাস্তবিক পক্ষে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যা সম্বন্ধে যে সব কথা বলিয়াছেন, যে নীতির তিনি নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা একটুও আশ্বস্তি লাভ করি নাই। পক্ষান্তরে ভবিষ্যতের অন্ধকার আমাদের সম্মুখে সমধিক গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে।

উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী দিল্লীতে গিয়া পূর্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের সম্বন্ধে পাকাপাকি ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন বলিয়া শোনা যাইতেছে। এই সম্পর্কে তিনি যে উদ্দেশ্য লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা নাকি সার্থক হইয়াছে। ভারত সরকার এ সম্বন্ধে দুইটি কমিটি গঠনের প্রস্তাবও করিয়াছেন দেখিতেছি। ভারতের অর্থসচিব, পুনর্বাসন মন্ত্রী এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে লইয়া একটি কমিটি গঠন করা হইবে। আর একটি কমিটি হইবে তথ্য সংগ্রহমূলক।

পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সম্বন্ধে ভারত সরকারের অতীতের ঔদাসীন্য যদি এখন ভাঙ্গে, তবেই সুখের বিষয়। ফলত পূর্ববঙ্গ হইতে আগত ছিন্নমূল নরনারীদের পুনর্বাসনের প্রশ্ন অত্যন্তই গুরুতর। এ কাজে কোটি কোটি টাকার প্রয়োজন, কিন্তু শুধু টাকার প্রশ্নই বড় কথা নয়, পুনর্বাসনের উপযোগী স্থানের সংস্থান করার সমস্যাও কঠিন। একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে, ভারত সরকার প্রকৃতপক্ষে এই প্রশ্নটিকে পশ্চিমবঙ্গের ঘরোয়া ব্যাপার বলিয়াই যেন গণ্য করিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিকপক্ষে দেশ বিভাগজনিত এই সমস্যার জন্য দায়িত্ব যে সমগ্র ভারতের রহিয়াছে এবং অন্যান্য প্রদেশও এই দায়িত্ব হইতে রেহাই পাইতে পারে না, কিন্তু ভারত সরকারের নীতি এই বিবেচনার ভিত্তিতে প্রযুক্ত হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। পূর্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য ভারত সরকার এ পর্যন্ত ত্রিশ কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছেন। সমস্যার গুরুত্ব অনুযায়ী এই পরিমাণ অর্থ যথেষ্ট নহে, ইহা সহজেই মনে হইবে। ছাড়পত্র-প্রথা প্রবর্তনের হিড়িকে সম্প্রতি আড়াই লক্ষ নরনারী পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া পড়িয়াছে, ইহাদের পুনর্বাসনের জন্যও অন্ততঃপক্ষে আরও তিন কোটি টাকা ব্যয় করিতে হইবে। সমস্যার সমাধান যে তাহাতে হইবে, ইহারও কোন নিশ্চয়তা নাই। পাকিস্থানের কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের নীতিতে আবার একটু মোচড় দিলেই পূর্ববঙ্গ হইতে দেশত্যাগের হিড়িক দেখা দিবে। অতীতে এমন ব্যাপারই ঘটিয়াছে; সুতরাং সরকারকে এজন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। বলা বাহুল্য, ক্ষুদ্র রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে এত অধিক পরিমাণে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের উপযুক্ত জমির একান্তই অভাব; সুতরাং উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের সমস্যার সমাধান করিতে হইলে তাহাদিগকে পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে পাঠাইতে হইবে। ইহাতেও সঙ্কট আছে। এইরূপ চেষ্টা এ পর্যন্ত বিশেষ সফলতা লাভ করে নাই। পূর্ববঙ্গ হইতে যে অবস্থায় এই সব উদ্বাস্তুদের ঘরবাড়ি ছাড়িয়া আসিতে হয়, তাহাতে তাহাদের মনের অবস্থা স্বভাবতঃই ঠিক থাকে না। ইহার উপর প্রতিকূল সামাজিক অবস্থার ভিতর গিয়া যদি তাহারা পড়ে, তবে তাহারা কিছুতেই সে অবস্থার সঙ্গে নিজেদের মনকে খাপ খাওয়াই লইতে পারে না। প্রশ্নটি মনস্তাত্ত্বিক। উদ্বাস্তুদের সার্থকভাবে উপনিবিষ্ট করিতে হইলে এজন্য তাহাদের মনের অবস্থাটা দেখাও দরকার, হৃদ্যতামূলক প্রতিবেশ তাহাদের পক্ষে প্রয়োজন। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে যদি তাহাদিগকে একান্তই পাঠাইতে হয়, তবে পশ্চিমবঙ্গের সীমানার সংলগ্ন অঞ্চলগুলিই এজন্য সমধিক উপযুক্ত। এই কারণে পূর্ণিয়া জেলায় উদ্বাস্তুদের উপনিবিষ্ট করিবার চেষ্টা এতটা সার্থকতা লাভ করিয়াছে। বিহারের বাঙলাভাষী অঞ্চলগুলি যদি পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তবে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের এই সমস্যা সহজভাবে সমাধানের পথ অনেকটা পরিষ্কার হইতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী দিল্লীতে গিয়া ফারাক্কায় গঙ্গার উপর বাঁধ নির্মাণের গুরুত্ব সম্বন্ধে ভারত সরকারকে সচেতন করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে এবং বিষয়টি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে অগ্রগণ্য স্বরূপেও ধার্য হইবে, এমন সম্ভাবনাও নাকি আছে, আশার কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু বিহারের বাঙলাভাষী অঞ্চলগুলি পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য যে প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহার যে পরিণতি ঘটিল, সে বিষয়ে কিছুই জানিতে পারা যায় নাই। আশঙ্কা হয়, এই প্রশ্নটির সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা একটুও আগায় নাই এবং বিষয়টি এখনও অমীমাংসিতই রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু এই প্রশ্নের সমাধান না হইলে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের সমস্যার পথ প্রশস্ত হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না।

আত্মানুসন্ধানের প্রয়োজন

কলিকাতা শহরে কিছুদিন পূর্বে পূর্ববঙ্গ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণের সম্বন্ধে বিবেচনার জন্য যে সর্বভারতীয় সম্মেলনের অধিবেশন হয়, সেই সম্মেলনের প্রস্তাব অনুসারে আগামী ২৩শে নবেম্বর পূর্ববঙ্গ দিবস প্রতিপালনের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হইয়াছে। পাকিস্থানের সংখ্যালঘু সচিব জনাব আজিজুদ্দিন আহম্মদ ইহাতে আতঙ্কিত হইয়াছেন। তাঁহার মতে উগ্রপন্থীদের দ্বারা এই আন্দোলন শুরু হইয়াছে এবং ইহার ফলে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার সৃষ্টি হইতে পারে। তিনি ভারতের সংখ্যালঘু সচিব শ্রীযুত চারুচন্দ্র বিশ্বাসের কাছে এই শঙ্কা জ্ঞাপন করিয়াছেন। পাকিস্থানের সংখ্যালঘু সচিব সাহেবকে আমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে বলিতেছি। মধ্যযুগীয় সাম্প্রদায়িকতা পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির বিরোধী বস্তু। 'পূর্ববঙ্গ দিবস' প্রতিপালনের উদ্যোক্তৃগণের উদ্দেশ্য সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করা নিশ্চয়ই নয়। ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ এবং নিরাপত্তার দিকে তাঁহাদের ষোল আনা দৃষ্টিই যে আছে, একথা তাঁহারা বহু পূর্বেই জানাইয়া দিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শান্তি এবং নিরাপত্তার জন্য অকারণ উদ্বিগ্নবোধ না করিয়া পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার দিকেই যদি একটু দৃষ্টিদান করেন, তাহা হইলে আমরা অধিক সুখী হইব। ভারতের বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গের সংবাদপত্রসমূহ কিরূপ উৎকট মিথ্যা প্রচার করিতেছে এবং সেইভাবে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ উস্কাইয়া তুলিতেছে, তৎসম্বন্ধে তিনি যদি মনোযোগী হন, তবেই শোভন হয়। জলপাইগুড়ি জেলার আলিপুর দুয়ার অঞ্চলে পশ্চিমবঙ্গ হইতে পূর্ববঙ্গে প্রবেশ করিতে গিয়া চারশত মুসলমান নিহত এবং বহুসংখ্যক মুসলমান আহত হয়, ঢাকা হইতে এই সংবাদ প্রচার করা হইয়াছিল। ঢাকার 'মর্ণিং নিউজ' পত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। বলা বাহুল্য, সংবাদটি সম্পূর্ণই মিথ্যা। ভারত সরকার এ সম্বন্ধে পাকিস্থান সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন এবং এমন উত্তেজনাকর সংবাদ প্রচারকারীদিগকে সাজা দিতে অনুরোধ করিয়াছেন। এই অনুরোধের ফল কি হইবে, আমরা অনুমান করিয়া লইতেছি। মিথ্যা প্রচারকারীদের সাজা হইবে, এমন আশা আমাদের নাই। ভারতের বিরুদ্ধে এই ধরণের মিথ্যা প্রচারের ফলে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইতে পারে, পাকিস্থানের কর্তৃপক্ষ তাহা বুঝিতে না পারেন, এমন নয়; কিন্তু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহারা মিথ্যা প্রচারকারীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই অবলম্বন করেন নাই; এমন কি, এমন মিথ্যা প্রচারের প্রতিবাদ করাও প্রয়োজন বোধ করেন নাই। অথচ ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য উদ্বেগের তাঁহাদের অন্ত দেখা যায় না। এমন অহেতুক উদ্বেগের উদ্দেশ্য কি অবশ্য সহজেই বোঝা যায়। যে কোন রকমে সাম্প্রদায়িকতার মনোভাবকে তাঁহারা জিয়াইয়া রাখিতে চাহেন। তাঁহাদের এই সঙ্কীর্ণ

মনোভাব তাঁহাদিগকেই অবশেষে আঘাত করিবে, ইহা নিশ্চিত।

পরলোকে পণ্ডিত বসন্তরঞ্জন রায়

বিদ্বদ্বল্লভ পণ্ডিত বসন্তরঞ্জন রায় গত ২৩শে কার্তিক ৮৮ বৎসর বয়সে তাঁহার কাঁড়গ্রামস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। পণ্ডিত বসন্তরঞ্জন বাঙলার সাহিত্য-জগতের অন্যতম ঐতিহাসিক যুগ-স্রষ্টা। চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামক পুঁথির আবিষ্কার এবং সম্পাদন তাঁহার জীবনের অক্ষয় কীর্তিস্বরূপ। প্রাচীন বাঙলা ভাষা, বাঙলা লিপি, বাঙলা উচ্চারণ ও বানান, বাঙলা সাহিত্যের ছন্দ ইত্যাদির উপর এই গ্রন্থখানি অপূর্ব আলোকসম্পাত করিয়া বাঙলা, সংস্কৃতি ও সাহিত্য সাধনায় এক নবীন চেতনার সঞ্চার করে এবং বঙ্গমনীষার মণি-মঞ্জুষার সন্ধানে এদেশের চিন্তাশীল সমাজে নূতন সৃষ্টির পথে প্রেরণা আনিয়া দেয়। বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় পরিণত বয়সে এবং সাধনায় সিদ্ধিতে সমারূঢ় হইয়াই দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার জীবন সার্থক হইয়াছে। বাঙলা সাহিত্যের পরবর্তী সাধকগণ নিতান্ত নিরহঙ্কৃত এবং সমাহিত-চিত্ত বঙ্গভূমির এই মনস্বী সন্তানের আদর্শের ধারাটি অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিলেই তাঁহার প্রতি জাতির কর্তব্য কিয়ৎপরিমাণ প্রতিপালিত হইতে পারে। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি এবং তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

চিত্ত ও বিত্ত

ধন অর্জন করায় পাপ নাই, এদেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা অনেকেই এই কথা আমাদিগকে শুনাইয়া থাকেন। তাঁহাদের যুক্তি আমরা স্বীকার করি; কিন্তু ধন অর্জন করাতে পাপ না থাকিলেও অন্যায় ভাবে ধন সঞ্চয় করাতে নিশ্চয়ই পাপ আছে। ধন সঞ্চয়ে অন্যায়ের এই নিরিখও সমাজের নৈতিক বোধের উপর অনেকখানি নির্ভর করে। সম্প্রতি উদ্বাস্তু অনাথা বালিকাদের সাহায্য বিধান সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশপাল এদেশের ধনী সম্প্রদায়ের যে মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে উক্ত শ্রেণীর নৈতিক সমুন্নত মনোভাবের পরিচয় নিশ্চয়ই পাওয়া যায় না। পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশপাল এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, বিপন্ন এবং দুর্গতদের এই শ্রেণীর সাহায্য কার্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নরনারীদেরই অপেক্ষাকৃত উদার মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহারাই দুঃস্থের দুঃখ দূর করিবার জন্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আগাইয়া আসেন এবং ত্যাগ স্বীকারের পরিচয় দেন। ধনীদের নিকট হইতে এই সব কাজে তেমন সাড়া পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে তাঁহাদের মধ্যে এই সম্পর্কে নির্বিবেক উদাসীনতার ভাবই প্রধানত পরিলক্ষিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপে প্রদেশপাল বলেন, উদ্বাস্তু নরনারীদের জন্য বস্ত্র প্রার্থনা করিয়া তিনি আবেদন করিলে বিলাসপুরের একজন সাব-পোস্ট মাস্টারের পত্নী দুইখানা শাড়ি পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে এদেশের মিলওয়ালাদের কাছে বারংবার অনুরোধ জানাইয়াও তিনি কোন ফল পান নাই। ব্যাপার এমনই হয়। ধনীদের বুদ্ধির জোর আছে। তাঁহারা রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক বড় বড় যুক্তির জাল বিস্তার করিয়া নিজেদের বিবেকের সঙ্গতি রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবেন; কিন্তু সেসব আত্ম-প্রবঞ্চনা ছাড়া অন্য কিছুই নয়। প্রকৃতপক্ষে বিত্ত তাঁহাদের চিত্তের স্বাভাবিক ধর্মকে সঙ্কুচিত করিয়া ফেলিয়াছে এবং ব্যক্তিগত কর্তব্য প্রতিপালনে তাঁহাদিগকে বিমুখ করিয়া তুলিয়াছে। বস্তুত ব্যক্তিকে লইয়াই জাতি। ব্যক্তির চেতনা যেখানে সমষ্টি বেদনাকে যুক্তির জোরে এইভাবে এড়াইয়া যাইবার জন্য প্রবল হইয়া উঠে, সেখানে রাষ্ট্রগত কোন বৃহৎ সাধনাও সার্থকতা লাভ করিতে পারে না। সমাজের প্রতি কর্তব্য বা দায়িত্বের সব বোঝা সরকারের উপর চাপাইয়া ধনী ব্যক্তিরা যদি এইভাবে নিজদিগকে বাঁচাইবার খোঁজেই থাকেন, তবে জাতির অধোগতির পথ প্রশস্ত হইতেছে বুঝিতে হইবে।

ব্যক্তির নিদান-নির্ণয়

ভারতীয় লোকসভায় পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যা সম্বন্ধে পণ্ডিত নেহরু যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই এ সত্য প্রমাণিত হয় যে, রোগ-নির্ণয়েই তিনি আগাগোড়া ভুল করিতেছেন এবং এ সম্বন্ধে তাঁহার মনের বদ্ধসংস্কার কিছুতেই দূর হইতেছে না। পূর্ববঙ্গের বর্তমান সমস্যার মূল কারণ সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত এই যে, দেশ বিভাগের ফলেই সাধারণভাবে এই সঙ্কট দেখা দিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, দেশ-বিভাগের ফলে প্রলয়ঙ্কর বিপর্যয় দেখা দেয়; অনর্থ যে একটা ভয়াবহরূপে দেখা দিবে, ইহা কেহই অস্বীকার করে নাই। যতরকম পাপ-প্রবৃত্তি ঐ সময় ছাড়া পায়; যতরকম উপদ্রবের আঘাত সমাজজীবনের উপর আসিয়া পড়ে। এইসব বিপর্যয় কাটাইয়া উঠিতে সময় লাগিবে। পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যা সম্বন্ধে ভারতের প্রধান মন্ত্রীর এই যে রোগ-নির্ণয়ে এখানেই ভুল রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে দেশ-বিভাগের ফলে যেসব অনর্থ দেখা দিয়াছিল তাহারই জেরস্বরূপে পূর্ববঙ্গের হিন্দুসমাজের পক্ষে বর্তমান সংকট দেখা দিয়াছে, এমন বলা ঠিক হইবে না। প্রত্যুত দেশ-বিভাগজনিত বিপর্যয় যত বড়ই হোক্ না কেন, পাকিস্থান সরকার যদি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে বৈষম্যমূলক নীতি অবলম্বন করিয়া না চলিতেন, রাষ্ট্রের সকল অধিবাসী যদি সমভাবে সেখানে মর্যাদা লাভ করিত, তবে এ সমস্যা এতদিন মিটিয়া যাইত বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। সেক্ষেত্রে উভয় রাষ্ট্রের সুদীর্ঘকালের সংহতি স্বাভাবিক আকারে সমাজ-সংস্থিতির মূলে আসিয়া কাজ করিত। কিন্তু দেশ-বিভাগের কালে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার যে প্রতিশ্রুতি পাকিস্থান সরকার দিয়াছিলেন, তাঁহারা তাহা পালন করেন নাই। পক্ষান্তরে পূর্ববঙ্গের যুগযুগান্তের সংস্কৃতির সংরক্ষণ-শক্তি এবং ঐতিহ্যের আশ্রয়ের উপরই তাঁহারা আঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; মধ্যযুগীয় বর্বরতার বিভীষিকাকেই তাঁহারা উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। পাকিস্থান সরকারের এই নীতিতে সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সকলের সমর্থন রহিয়াছে, আমরা এমন কথা বলি না। বাস্তবিক পক্ষে সেখানেও অনেকেই উভয় রাষ্ট্রের অধিবাসীদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য এবং সদ্ভাব কামনা করেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মতের সমর্থন করিয়া আমরাও স্বীকার করি যে, বিশেষ স্বার্থসংশ্লিষ্ট কতকগুলি দলই পাকিস্থান সরকারের বর্তমান নীতির মূলে কাজ করিতেছে। কিন্তু এ সত্যের স্বীকৃতিতে সমস্যার কার্যত কোনরূপ সমাধান ঘটে না। স্বার্থসংশ্লিষ্ট সেইসব দলগুলিকে তাহাদের অন্যায়ের সম্বন্ধে সচেতন এবং তাহাদের অবলম্বিত নীতির পরিণতির অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চার করাই প্রতীকারের এক্ষেত্রে পথ।

বাস যায়

গোবিন্দ চক্রবর্তী

গ্রাম কি শহর—
জিরুবার এতটুকু নেই অবসর;
ঊর্ধ্বশ্বাসে অবিরাম ব্যস্ত-ত্রস্ত ছুট
উড়ন্ত পাখীর মত সময়ের কাকলী অস্ফুট—
বাতাস ভরিয়ে রুক্ষ ধুলো ও ধোঁয়ায়
নক্ষত্রের মত ক্ষিপ্র বাস চলে যায়।

বাস যায় চ'লে—
ফোঁটা কয় পোড়া পেট্রোলে
ক্ষণিক 'স্টপেজ'-এ রেখে ক্ষণেকের বিরামের দাগঃ
তপ্ত অনুরাগ
স্টেশনের স্মৃতিতে সজাগ!

একটি করুণ অভিপ্রায়
—বাস যায়—
দিতে এসে যেন কার ফিরে-যাওয়া মনঃ
সৈনিকের মদির চুম্বন
যেমন সে যায় ছিঁড়ে চকিত সাইরেনে!

বাস চলে উলকার মত রেখা টেনে
রুটীনমাফিক—
ধরাবাঁধা 'রুট' ধ'রে নির্ভুল, ঠিক
গ্রহের সমান কুতূহলে;
প্রতি পলে
সকলের তরে সমুৎসুক
যে ওঠে উঠুক।

তারপর—
খুশীমত যাও নেমে যার যেথা ঘর।
যত দামী কাটো-না টিকিট
সমান কিন্তু 'সিট'
কোথাও পাবে না কোনো ইতরবিশেষ;
নির্বিশেষ
বাস ফেরে বুকে ক'রে
মানুষের খাঁটি মহাদেশ।

অর্ধনারীশ্বর

অরুণকুমার সরকার

দাও আগুনে তবে জ্বালিয়ে দাও
যত দূরের স্মৃতি মলিন ছবি।
দিনাবসানে যদি শান্তি চাও
কিছু চেয়ো না, কিছু চেয়ো না, কধি।

আছে আলো তোমারই চোখের নীলে
খোঁজো আঁধারে পাবে নিজেকে ফের,
যাকে পেয়েও তুমি হারিয়েছিলে
দুর্দৈবে সেই ঘুর পথের।

তার প্রাপ্য তাকে দেবে না কেন
কেন দেবে না তাকে এগিয়ে ঠোঁট?

দেখ উন্মাদিনী কুন্দ হেন
তার পাপড়িগুলো বেঁধেছে জোট।

তার মনের মাঝে গভীর ক্ষত
তাই সাধের চুল এলিয়ে গেছে;
নেই কপালে টিপ আগের মতো
বুঝি মন্দজনে গাল দিয়েছে।

আজি শ্রাবণঘনগহনমোহে
কিছু চেয়ো না, কিছু চেয়ো না, কবি।
মনোমুকুর নিয়ে দাঁড়াও দোঁহে
পাবে হারিয়ে ফেলে যা কিছু সবই।

...তীয় সিংহলীদের অবস্থা

...রতীয় সিংহলীদের নাগরিক অধিকার বঞ্চিত করার জন্য যে আইন রচিত. তাতে একটা খু্ঁৎ (অবশ্য সিংহলী ...মেণ্টের চক্ষে) বেরোয়। "Ordinary ...lent"-এর যে অর্থ সিংহলী গভর্নমেণ্ট ... চান সেটা সিংহলের সুপ্রীম কোর্ট বিলাতের প্রিভি-কাউন্সিল পর্যন্ত ...ধ বলে রায় দিয়েছেন। নিজেদের ...নত অর্থ বজায় রাখার জন্য মিঃ ...নায়কের গভর্নমেণ্ট একটি নূতন ...াধনী বিল সিংহল পার্লামেণ্টে উপস্থিত ...ন। সম্প্রতি সেই বিলটি পাশও হয়েছে।

সেনানায়ক ভারতীয় সিংহলীদের ...বাদে এবং ভারত গভর্নমেণ্টের কোনো ...রোধে কর্ণপাত করেন নি। পূর্বেই ...াইন চালু করা হয় তার ফলে সিংহলের সাধারণ নির্বাচনে অতি নগণ্য সংখ্যক ...তীয় সিংহলী ভোট দিতে পায়। ...রিকত্বের জন্য ভারতীয় সিংহলীদের ...বদন করতে বলা হয় কিন্তু তার জন্য ...নব সর্ত ও নিয়ম কানুন জারী হয় তাতে ... অল্প লোকেরই আবেদন সফল হবার ...া থাকে। সাত লক্ষ প্রার্থীর মধ্যে ... পর্যন্ত মাত্র ১৪ হাজারের আবেদন ...র হয়েছে। সিংহলী সুপ্রীম কোর্ট ও ...ভ কাউন্সিলের রায় নিষ্ফল করার জন্য নূতন সংশোধনী আইন প্রণীত হোল ...ত বাকী প্রার্থীদের অধিকাংশের পক্ষেই ...রিক অধিকার লাভের আর কোনো ...া রইল না।

...কিছুকাল পূর্বে সিংহল ভারতীয় ...গ্রেসের নেতারা যখন সত্যাগ্রহ আন্দোলন ...য়িকভাবে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ ...রন তখনই আমরা এই আশঙ্কা প্রকাশ ...রয়াছিলাম যে, উহার প্রতিদানে সিংহলের ...মান গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে কিছু ...াশা করলে নিরাশ হতে হবে। সিংহল ...র্নমেণ্ট ও ভারতীয় সিংহলীদের মধ্যে ...মলা আর মীমাংসার ভার কোনো ...রপেক্ষ সালিশের উপর অর্পণ করার কথা ...ণ্ডিত নেহরু তুলেছেন। কিন্তু এই ...ন্তাবে মিঃ সেনানায়ক যে রাজী হবেন তার ...ভাবনা নেই। মুশকিল হচ্ছে এই যে, মিঃ ...নানায়ক যে পার্টির নেতা সেই পার্টির ...তিই হচ্ছে ভারতীয় সিংহলীদের সিংহল ...কে খেদানো এবং যাদের খেদানো যাবে না

তাদের কোণঠাসা করে রাখা। গত সাধারণ নির্বাচনে ন্যাশনাল পার্টির এইটাই ছিল প্রধান বুলি। সুতরাং এই ব্যাপারের সঙ্গে মিঃ সেনানায়ক ও তাঁর দলের স্বার্থ সাক্ষাৎ-ভাবে জড়িত হয়ে গেছে। এই জন্যই সিংহলের বর্তমান গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে ভারতীয় সিংহলীদের সহজে সুবিচার পাবার আশা নেই। অতএব আজ হোক কাল হোক সিংহল ভারতীয় কংগ্রেসকে আবার সত্যাগ্রহ সংগ্রাম হয়ত আরম্ভ করতে হবে। তবে কেবল কলোম্বোতে প্রধান মন্ত্রীর অফিসের সামনে ধর্ণা দিয়ে যে কাজ হবে না সেটা ভারতীয় সিংহলী নেতারা বুঝেছেন। নূতন করে সত্যাগ্রহ আন্দোলন করতে হলে সেটা আরো ব্যাপক করা আবশ্যক এবং তার রূপও হয়ত বদলাতে হবে। তার জন্য যদি সিংহল ভারতীয় কংগ্রেস প্রস্তুত হতে আরম্ভ করেন এবং মিঃ সেনানায়ক বুঝেন যে আন্দোলন এবার বড়ো রকমের হবে ও ভারতীয় সিংহলীরা স্বাধিকার রক্ষার জন্য দুঃখ বরণ করতে পশ্চাৎপদ হবে না তাহলে হয়ত তিনি একটু চিন্তিত হতে পারেন।

আফ্রিকায় আগুন

সন্ত্রাসবাদী "মৌ মৌ" সঙ্ঘকে দমন করার অছিলায় চার্চিল গভর্নমেণ্ট কেনিয়াতে ঔপনিবেশিক অবিচারের প্রতিবাদী সমস্ত কণ্ঠকে নীরব করে দেবার চেষ্টায় আছেন। কয়েক সহস্র আফ্রিকানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, ছোট বড়ো কোনো আফ্রিকান নেতাই জেলের বাইরে নেই। বৃটিশ সৈন্য সারা কেনিয়া চষে বেড়াচ্ছে, আফ্রিকানদের সমঝিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, কেনিয়ায় সাদার রাজত্বের বিরুদ্ধে টু করা চলবে না, কেনিয়ার ভালো জমি যা তা সব মুষ্টিমেয় সাদারা ভোগ করবে। দেশের যারা আদিম অধিবাসী সেই আফ্রিকানরা থাকবে দাসের মতো।

কেনিয়াতে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের কার্য-কলাপে দক্ষিণ আফ্রিকায় ডক্টর মালান খুব খুসী কারণ কেনিয়াতে চার্চিল গভর্নমেণ্টের ও দক্ষিণ আফ্রিকায় মালান গভর্নমেণ্টের কার্যনীতির মধ্যে আর কোনো তফাৎ দেখা যাচ্ছে না। দক্ষিণ আফ্রিকায় অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলনকে মালান গভর্নমেণ্ট এঁটে উঠতে পাচ্ছেন না। সেইজন্য নানাভাবে

হিংসাত্মক কাজের উস্কানি চলছে যাতে অহিংস সংগ্রামের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হয়। ইতিমধ্যে কয়েকটা জায়গায় দাঙ্গাহাঙ্গামা ঘটেছে এবং মালান গভর্নমেণ্ট বেপরোয়া গুলী চালাচ্ছেন। এই এঁদের কাম্য যদিও আখেরে সাদাদের পক্ষেই এই নীতির সর্বনাশা পরিণাম অনিবার্য।

—আফ্রিকার অপর প্রান্তে টিউনিসিয়াতে সাদা প্রভুত্বের নীতি বজায় রাখার কাজে ফরাসীরা ব্যস্ত, তাদের হাতও রক্তাপ্লুত। মরোক্কোতেও তাই। ইউনোতে এই সব দেশের কথা উঠলে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ফরাসীদের সমর্থন করবেন, দক্ষিণ আফ্রিকাকে তো বটেই। আজ দক্ষিণ আফ্রিকা, কেনিয়া, টিউনিসিয়া এবং মরোক্কোর সাদা প্রভুদের একে অপরের সমর্থন করা ছাড়া গতি নেই। আফ্রিকাই এখন সাদা সাম্রাজ্যবাদের বৃহত্তম লীলাভূমি, হয়ত তার কবরও হবে আফ্রিকায়। তার আগে কতো হানাহানি, কতো রক্তপাত, কতো অগ্নিকাণ্ড মানুষের জন্যে লেখা আছে কে জানে!

ওয়াইৎসম্যানের পরলোকগমন

ইজরেলের প্রেসিডেণ্ট ওয়াইৎসম্যান পরলোক গমন করেছেন। প্যালেস্টাইনে একটি ইহুদী রাষ্ট্র স্থাপনের আন্দোলনের তিনি অন্যতম প্রধান নেতা ছিলেন এবং সেই রাষ্ট্র যখন স্থাপিত হোল তখন তার প্রথম প্রেসিডেণ্টের পদে তাঁকে বরণ করা হয়। ওয়াইৎসম্যান জন্মগ্রহণ করেন রাশিয়ায়, পরে তিনি বৃটিশ নাগরিক হন। তিনি একজন খুব বড়ো রাসায়নিক ছিলেন এবং প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে বৃটিশ নৌ-বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট ল্যাবরেটরী-সমূহের ডিরেক্টর ছিলেন। তাঁর আবিষ্কার কার্যের দ্বারা যুদ্ধের সময়ে বৃটেনের খুব উপকার হয় এবং তাতে মিত্রপক্ষের যুদ্ধজয়ের অনেক সহায়তা হয়। অনেকটা ওয়াইৎসম্যানের চেষ্টার ফলেই বৃটিশ গভর্নমেণ্ট প্যালেস্টাইনে একটি ইহুদী রাষ্ট্র গঠনের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেন, যেটা ব্যালফুর ঘোষণা (Balfour Declaration) বলে খ্যাতিলাভ করে। বৃটিশ গভর্নমেণ্টের ঘোষণায় যথারীতি একটা প্যাঁচ ছিল। ইহুদী রাষ্ট্র স্থাপন ও আরব স্বার্থ সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি এক সংগে জুড়ে দেয়া হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত কার্যত ইহুদীরা যুদ্ধ করেই রাষ্ট্র স্থাপন করেছে। বৃটিশ শক্তিকেও প্যালেস্টাইন থেকে সরার আগে দু পাঁচটা খোঁচা খেয়ে আসতে হয়েছিল; আরব স্বার্থ সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি পালিত হয়নি। আরব রাষ্ট্রগুলি এক জোট হয়ে যুদ্ধ করেও ইজরেলকে কাবু করতে পারেনি। ইজরেলের প্রতি আমেরিকার সহানুভূতি থাকাতে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট আরবদের প্রতি বেশি ঝুঁকতে সাহস করেননি। তাছাড়া গত মহাযুদ্ধের অবসানের পরে নানা দেশ থেকে প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের আগমন বন্ধ করার সাধ্য কারো ছিল না। ইহুদীদের সমর-কুশলতা ও নবাগত ইহুদীদের চাপ, এই দুয়ে মিলে প্যালেস্টাইনে আরব সমাজের মূল আগলা করে দিল।

১৬।১১।৫২

ভীরু মনের প্রতি

জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়

রূপ-বর্ণ-স্বাদ
পরমাদ যদিবা ঘটায়,
ভেবনা : আমারি সঞ্চার—আকাশ নিনাদ
কিংবা ব্যর্থ-বাসরের মৃত্যুদীর্ণ শীতল প্রপাত!

কথার কাকলী যেথা ভাঙে নীড়—
নীড়ের মায়ায়, অশান্ত-বাতাস খোঁজে সোহিনীর
বিলম্বী-বিজ্ঞাপন আকাশের নিবিড়-ছায়ায়,
সেথা, ধীর, যদি আসে মোর মন,
ভেবনা—ভেবনা তারে, শোণিতের নিলাজ-ক্রন্দন!

আকর্ণ আঁখির আশায় নিয়ে, সোনা, মায়ার কাজল
হৃদয়ের গভীরে, যেথা সজল-কল্লোলে জাগে কেউ—অবিরল,
কাঁপায় উভয় তীরে, সেথা, থির, বস একবার—
শুধু একবার দেখো ঢেউ!

উত্তরায়ণ

সরিৎ শর্মা

ভাবতে অবাক্ লাগে : আবারো খুসির হাওয়া বুক ভ'রে নিয়ে
হৃদয় কবিতা হয়, প্রাণের আশ্চর্য পাখা স্বপ্ন ছুঁয়ে ছুঁয়ে
বিচিত্র আল্পনা আঁকে মুক্তির আকাশপটে! এ-মন ছিনিয়ে
আনছে নোতুন গান চলন্ত সময় থেকে; এক এক ফুঁয়ে
কি করে উড়িয়ে দেয় স-ব ব্যর্থতার স্তূপ, ফেলে অনায়াসে
পুরোনো ছাইয়ের মত এ্যাসট্রের থেকে ঝেড়ে স্থবির নীতির
জঞ্জাল। অনেক স্মৃতি যুদ্ধাহত সৈনিকের মতো আশে-পাশে
বুকে হাঁটে কী করুণ! আশ্চর্য যৌবন, আহা : তবুও নিবিড়
আবারো প্রেমের স্পর্শ : ভাবতে অবাক্ লাগে : নোতুন প্রথম
অভিজ্ঞতা ফিরে ফিরে হ'য়েছে নোতুনতর, শীতের শাখায়
উদ্ধত রিক্ততা ঢেকে সবুজ আগুন জ্বলে যেন! কী নির্মম
বঞ্চনা—রক্তাক্ত তীর...ব্যর্থই! নীলিমা ছুঁই বিক্ষত পাখায়।

সোনার হরিণ কতো জীবন পেলো না কুয়াশায়, তবু ফিরে
যৌবন বসন্ত হোলো, অবাক্! দুরন্ত আরো প্রেমের গভীরে!

বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ

অন্নদাশঙ্কর রায়

গত কাল বাঙলা ভাষাকে আমরা প্রাদেশিক ভাষা হিসাবে গণ্য করে ছি। এখন আর তাকে প্রাদেশিক ভাষা রে গ্রহণ করলে চলবে না। ইতিমধ্যে তার প্রাদেশিক গণ্ডী উত্তীর্ণ হয়েছে। তের আরো কয়েকটি ভাষা সম্বন্ধেও এ বলতে পারা যায়। বাঙলা, মারাঠী, রাটী, তামিল, উর্দু—এগুলির ত্যসম্পদ এত বেশী যে, এগুলিকে শিক ভাষা বলে চিহ্নিত করলে ভুল । হিন্দীর চেয়ে এরা কম সমৃদ্ধ নয়। । বিস্তৃতিও বহুদূরব্যাপী। মাথা ত ছাড়া হিন্দীর চেয়ে কিসে এরা ? এদের সমৃদ্ধি দিন দিন বাড়ছে। র্মান অধিকাংশ বাঙালী সাহিত্যিক া ভাষার মাধ্যমে লিখলেও সমগ্র কে সম্মুখে রেখে লেখেন। সমগ্র র সমস্যা, দেশের সমস্যাই তাঁদের তা রচনার উপজীব্য। তাই বাঙলা তাকে ন্যাশনাল লিটেরেচার অনায়াসে চলে। 'জনগণমন' এখন সারা ভারতের ীয় সঙ্গীত। বাঙলা বই এখন সর্বত্র াদ করা হয়। রাষ্ট্রভাষা না হলে কি ীয় ভাষা হয় না? আমি তো মনে করি া এখন ভারতের অন্যতম জাতীয় । আর রাষ্ট্রভাষাই বা একটিমাত্র হতে কেন? সুইটজারল্যাণ্ডের মতো ক্ষুদ্র ণ্ড ফরাসী, জার্মান ও ইটালিয়ান এই টি ভাষারই তুল্য মূল্য। তিনটিই রাষ্ট্র । কেন্দ্রীয় সরকার তিনটি ভাষাতেই কর্ম করেন। কোনটির সর্বাধিক প্রচার ত কিছু আসে যায় না। তিনটিই সমান দ্ধ। শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই তিনটির সঙ্গে বিস্তর পরিচিত। তিনটিই জাতীয় দ। তাই যদি হয়, তবে ভারতের মতো টি ভূখণ্ডে একটিমাত্র রাষ্ট্রভাষা পর্যাপ্ত । পাঁচটি ছয়টি রাষ্ট্রভাষা থাকাই সঙ্গত। ত ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি মানুষ রের তাগিদে আকৃষ্ট হয়। ভাষাপ্রীতি রকার্যের দ্বারা সম্ভব নয়। কবিগুরুর লা গান যেমন জাতীয় সম্পদ সুরদাস মীরার ভজনও তেমনি জাতীয় সম্পদ। ালী অবাঙালী সকলেই গানগুলির ুপম রসে সমভাবে আকৃষ্ট ও আপ্লুত । সুন্দরের কোনো জাত নেই। তা লের। সেকালে এ দেশে এমন বিষাক্ত দেশিকতা ছিল না। ভারতকে একটি ইউনিট হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। সামাজিক ক্ষেত্রে একতা যদি এখনি সম্ভব নাও হয়, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে একটু চেষ্টা করলেই সম্ভব হতে পারে। সম্ভব হবে একটিমাত্র ভাষার একাধিপত্যের দ্বারা নয়। প্রধান প্রধান ভাষাগুলির সর্বস্বীকৃতির দ্বারা। রাষ্ট্রভাষা না হয় একটিই হলো, কিন্তু জাতীয় ভাষা হবে পাঁচটি ছয়টি। এগুলিকে প্রাদেশিক মর্যাদার ঊর্ধ্বে জাতীয় মর্যাদা দিতে হবে। বাঙলা ভারতের অন্যতম জাতীয় ভাষা।

বাঙলার বর্তমান সাহিত্যসৃষ্টিতে আমি আস্থাশীল। বাঙলা ভাষার লিখনশৈলী অনেক উন্নত হয়েছে। অনেকেই বেল্ লেৎর (belles lettres) বা রম্য রচনায় মুনশিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন ও দিচ্ছেন।

এর চাহিদাও সুস্পষ্ট। পাঠকগোষ্ঠীর উপর সাহিত্যসৃষ্টি অনেকটা নির্ভর করে। সেই পাঠকগোষ্ঠী বর্তমানে সংখ্যায় অধিক, সুতরাং পুস্তকের ক্রেতাও অধিক এবং প্রচারও অধিক। পূর্ব বাঙলা, যা এখন পাকিস্থান রাষ্ট্রের অন্তর্গত, সেখানেও বাঙলা কেতাবের চাহিদা কিছু কম নয়। কলকাতায় প্রকাশিত বাঙলা বই সেখানকার চাহিদামতো সরবরাহ করতে হলে কলকাতার পাঠক সম্প্রদায়কে পুস্তকপাঠে বঞ্চিত হতে হয়। বাঙলা ভাষার প্রতি তাদের ভালোবাসা পূর্ববৎ রয়েছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি শহরে বাঙলা পুস্তকের প্রকাশকেন্দ্র খুলেছে। কলকাতার ভাষাকেই তারা সাহিত্যিক ভাষার মান হিসাবে নিয়েছে। মাতৃভাষার প্রতি তাদের গভীর অনুরাগ এই সেদিনও প্রাণ বলি দিয়ে প্রমাণ করেছে।

দেশের মানচিত্র যত সহজে বদলানো যায়, মনের মানচিত্র তত সহজে যায় না। তাই দেশ বিভক্ত হলেও মন বিভক্ত হয়নি। পাকিস্তানী কর্তারা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ও বাঙলাকে উর্দুতেয়ো করবার যতই প্রয়াস পান না কেন, কোনো দিনই সফল হবেন না। গাধা পিটিয়ে যেমন ঘোড়া হয় না, তেমনি বাঙলা পিটিয়ে উর্দু হবে না। বছর পাঁচেকের মধ্যে বাঙলা ভাষাই সেখানকার সরকারী ভাষা হবে। গত ছয় মাসের মধ্যে পূর্ব পাকিস্থানের গণমনোবৃত্তির অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটেছে।

এসব তো হলো আলোর কথা। এই আলোর নীচেই আছে অন্ধকার। মানুষের মনে যেন আশা নেই, ভাষা নেই, আনন্দ নেই। কোনো আদর্শের প্রতি বিশ্বাস নেই। মানুষ জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হয়েছে বলেই মনুষ্যজীবন তার কাছে তুচ্ছ বলে বোধ হচ্ছে। তাই সে নিজের প্রাণ রাখবার জন্যে অন্যের প্রাণ নিতে দ্বিধা বা কুণ্ঠাবোধ করে না। প্রাণের এই অসাড়তা, এই হৃদয়হীনতা, এই প্রেমহীনতা একান্তভাবে বর্জনীয়। বর্তমান সাহিত্যের সাধারণ সুর হচ্ছে মরবিড (morbid) বা অসুস্থ। তাই চোখে পড়ে নিকৃষ্ট গল্প উপন্যাস গোয়েন্দা কাহিনীর প্রবল চাহিদা। শিশুপাঠ্য পুস্তকেও খুনজখমের ছড়াছড়ি। এমন কি মাঝে মাঝে রাজনীতিও আলোচিত হয়ে থাকে। এই ভারসাম্য বা ব্যালান্সের অভাব সর্বত্র লক্ষিত হয়। এর প্রত্যক্ষ হেতু হয়তো গত মহাযুদ্ধ, গৃহবিবাদ ইত্যাদি।

রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহাপুরুষেরা ছিলেন স্থিতধী অর্থাৎ ব্যালান্সড ব্যক্তি। এই ব্যালান্সের অভাব দিন দিন প্রকট হয়ে উঠছে। সাহিত্যেও তার অন্ধকার ছায়া পড়ছে। সবই যেন টলমল করছে, এখনি ভেঙে পড়বে। এর মূলে রয়েছে আত্মপ্রত্যয়ের অভাব। আত্মপ্রত্যয়ের শূন্যতা না ভরলে বেঁচে সুখ নেই। বাঁচার মতো বাঁচতে হলে থামলে চলবে না। দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হতে হবে। অগ্রসর হতে হলে চাই আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু, সাহসবিস্তৃত বক্ষপট। অস্বাস্থ্যকর ক্ষীণজীবী বা ক্ষণজীবী সাহিত্য সে আনন্দোজ্জ্বল প্রাচুর্যের পথ দেখাতে অক্ষম। নতুন কিছু করলেই ভালো কিছু করা হয় না বা 'প্রগতিশীল' হওয়া যায় না। 'প্রগতি' যেখানে অগ্রগতি বা প্রোগ্রেস অর্থে ব্যবহৃত হয়, সেখানে শাশ্বতের সন্ধান থাকবে,

থাকবে অমৃতের আস্বাদ। অফুরন্ত পুস্তক প্রকাশ করলেই প্রোগ্রেস হয় না। প্রকৃত উন্নত বৃহৎ সৃষ্টির মধ্যে পরম তৃপ্তির সুধা লুকানো থাকে। বাইবেলের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় বৃহৎ সাহিত্য হবে Waters of life যা না হলে জীবনধারণ প্রায় অসম্ভব বোধ হবে। এমন সৃষ্টি এযুগে কোথায়!

মানুষকে শান্ত সাধনশীল হতে হবে। চিত্তবিক্ষেপের নানা কারণকে আয়ত্তের মধ্যে এনে তার ঊর্ধ্বে উঠতে হবে। তবেই বৃহৎ সৃষ্টি সম্ভবপর হবে। বর্তমান মানুষ মগ্ন হতে ভুলেছে। কোনো কিছুতে মগ্ন না হলে সত্য আবিষ্কার করা যায় না। তবু আশ্বাসের কথা এই যে, আমরা যেন ক্রমেই নিজেদের ভুলভ্রান্তি সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছি। পূর্বাপেক্ষা আত্মস্থ হয়েছি। আমরা মোড় ঘুরেছি। এই সামান্য পরিবর্তনের মধ্যে বিরাট সম্ভাবনার বীজ নিহিত রয়েছে। এই ক্ষীণ আশার রশ্মিটুকু আমার ক্ষুব্ধ হতাশ চিত্তে আনন্দ ও উৎসাহের বাণী বহন করে এনেছে। আমি আবার নূতন উদ্যমে রসসৃষ্টির কর্মে নিমগ্ন হবার প্রেরণা পাচ্ছি।

নিরানন্দ, রসহীন সংসার, বন্ধ্যা সংসার। রসধারায় স্নাত করে তাকে শ্যামল সুন্দর আনন্দময় করতে হবে। তাই তো শিল্পী সাহিত্যিক সংগীতজ্ঞ প্রভৃতি রসস্রষ্টার এত প্রয়োজন। দেহের ক্ষুধাকে যেমন আমরা উপেক্ষা করতে পারিনে, মনের ক্ষুধাতেও তেমনি অতৃপ্ত রাখলে চলবে না। যদি রাখি তো আমরা মানুষের মতো বাঁচতে শিখব না। Man does not live by bread alone—

বাইবেলের এই মহার্ঘ বাণীটি মানুষের শাশ্বত পিপাসার ইঙ্গিত বহন করছে। *

---

* [গত ৫ই আশ্বিন রবিবার সন্ধ্যায় পাটনা সুহৃৎ পরিষদ ও হেমচন্দ্র লাইব্রেরীর বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশনে আমি প্রধান অতিথিরূপে যে ভাষণ দিই, শ্রীযুক্ত [illegible] মিত্র তার সারাংশ লিখে আমাকে দেখতে দেন। তাঁর অনুরোধে আমি সেটি সংশোধন করে ছাপতে দিচ্ছি। স্মৃতির সাহায্য নিতে হয়েছে বলে মৌখিক ভাষণের সঙ্গে অসংগতি থাকা সম্ভবপর।]

১৩৫৯-এর শারদীয়া ও বাংলা সাহিত্য

হরপ্রসাদ মিত্র

মেঘ-রৌদ্র-রামধনুর সমারোহ নিয়ে ১৩৫৯-এর পুজোর হিড়িক এলো এবং গেল। পুজোর বেশ কিছুকাল আগে থেকেই এবার মনে মনে জট বেঁধেছিলো পূর্ববঙ্গ-পশ্চিমবঙ্গ ঘটিত উদ্বেগ এবং দুশ্চিন্তা। পাসপোর্ট আপিসে ভিড়, শিয়ালদহ স্টেশনে উদ্বাস্তুসমাগম, খবর কাগজের স্তম্ভে-স্তম্ভে সম্পাদকীয় উদ্বেগ এবং জিজ্ঞাসা—এইসব রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের দাহ-দুর্নীতির মিছিল ভেদ ক'রে শরৎকালের অভ্যস্ত উৎসাহ-উদ্দীপনা শেষ হ'লো।

পুরানো আমলে শরৎকালে রাজারা যেতেন মৃগয়ায়। একালের বাঙালী সাহিত্য-সমাজে এই ঋতুটি অনুরূপ অভিযানেরই স্পৃহা জাগায়। তার মানে, মৃগবধ আর সাহিত্যসৃষ্টি তুলামূল্য মনে করবার মূঢ়তা নিবেদন করা নয়। মনু বলেছেন, মৃগয়া একটি ব্যসন মাত্র,—এতে নাকি প্রশংসনীয় কোনো আদর্শ নেই! কিন্তু রাজা দুষ্মন্তের সেনাপতি বলেছিলেন, "মৃগয়ার ফলে শরীরের মেদ কমে, উদর ক্ষীণ হয়, মনে উৎসাহ জাগে এবং লক্ষ্য ভেদ করতে পারলে ধনুর্ধারীরা বিশেষ খুশি হন। এই শেষের লক্ষণটি সাহিত্যিকদের সম্পর্কে অপ্রযোজ্য নয়। শিল্পীমাত্রেই লক্ষ্যভেদের অভিলাষী। বাঙলা দেশের শিল্পীরাও তাই চান। শরৎকালে পুজোসংখ্যার পত্র-পত্রিকার অরণ্য তাঁদেরই একটি শাখাগোষ্ঠীর উৎসাহে গজিয়ে ওঠে। অর্থাৎ, সাহিত্যিকরা এ সময়ে সৃষ্টির তাগিদ অনুভব করেন। এই তাগিদের মূলে আছে একটি প্রবীণ প্রথা। বিশেষ সংখ্যা বিশেষ শোভন ক'রে ছাপিয়ে বের করবার প্রথাটি বাঙলা দেশের পত্রিকা-পরিচালক মহলে পুজোর সময়ে সর্বজনীন দায়িত্ববোধেই যথাবিধি অনুসৃত হ'য়ে আসছে। বাঙালী পাঠকসমাজের পক্ষ থেকে এই পরিচালকগোষ্ঠী নিঃসন্দেহে এবং সর্বসম্মতিক্রমে বন্দনীয়! কারণ, তাঁরা এই অনুষ্ঠানটি চালিয়ে আসছেন ব'লেই নবীন-প্রবীণ সব সাহিত্যব্রতীই এই সময়টায় লক্ষ্যভেদ করতে উদ্যোগী হ'তে পারেন। সে কাজে সকলে সমান কৃতিত্ব-গৌরব পেতে পারেন না বটে,—তবে এই সুযোগে কৃতিত্বের দু' একটিমাত্র দৃষ্টান্তও যদি ঘটে যায়, তা'হলে তাই বা কম কিসে? বস্তুত, তাই ই হয় এবং এবারও তাই হ'য়েছে। লেখা—পরিমাপে বিপুল হ'য়ে উঠেছে: কিন্তু গুণে তীক্ষ্ণ হয়নি,—দীপ্তিতেও সব কথা চন্দ্র-সূর্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে ওঠেনি। এ কথা মামুলী সত্য। অন্যান্য বছরেও প্রায় এই রকমই হ'য়ে থাকে।

শুধু যে লেখারই পরিমাণ বেড়েছে, তা নয়। কাগজের সংখ্যাও উত্তরোত্তর বাড়তির মুখে। তার ফলে, এ সমুদ্রে পাঠককে কতকটা কপাল ঠুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। সব কাগজ কেনা সম্ভব নয়, পড়া হয়ে নয়,—এবং সব কাগজে স্বল্পপারাসে [illegible] নয়। নতুন কোনো পত্রিকা সম্পর্কে দীর্ঘ পরিচয়ের অভিজ্ঞতাও অবান্তর। সে-সব কাগজ বছরে বছরে পাঠকের চোখে পড়েছে এবং মনে জেগেছে সেইগুলিই অথবা সেই ক'খানিই হোল বাঙলা সাহিত্যের পুজো-মরশুমের প্রধান নৈবেদ্য। 'আনন্দবাজার', 'দেশ', 'যুগান্তর', 'বসুমতী'—পুজো-সংখ্যার কুলীন বনেদী আকর্ষণটা প্রধানত এই চতুরঙ্গবাহিত। এই ক'খানি কাগজের জন্য বাঙলার প্রত্যন্ত সীমা অবধি প্রতীক্ষা ছড়িয়ে থাকে,—এমন কি, সাম্প্রতিক বাঙলা দেশের রাষ্ট্রীয় এবং ভৌগোলিক গণ্ডীর বাইরে সারা ভারতের বাঙালী মহলে এদের জন্য ব্যাপক একটি জাতীয় কৌতূহলই যেন পরিব্যাপ্ত হয়। এবং মহালয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের বিদ্যায়তনগুলির অবকাশ শুরু হওয়া থেকেই নৈসর্গিক বিধিক্রমেই দেখা দেয় এদের লেখক-লেখিকার তালিকা সম্বলিত বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপন-পরিবেশকরা বিশেষভাবে জানিয়ে দিতে ভোলেন না যে, নবীন এবং প্রবীণ উভয় শ্রেণীর লেখক-লেখিকার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সার্থক হ'য়ে উঠছে তাঁদের আয়োজন। তারপর, রামধনু রঙের মলাটশোভিত এক একটি আবির্ভাব!

শরৎকালেই বাঙলার সাহিত্য বিতানে আনুষ্ঠানিক বসন্তের আয়োজন দেখা যায়। এবারে সেই আয়োজন অভ্যস্ত উৎসাহে-ই সম্পন্ন হ'য়েছে বটে,—তবে, অল্পকালের ব্যবধানে বড়ো বড়ো দু'টি জ্যোতিষ্কের তিরোধান ঘটার ফলে শরৎ-বসন্তের যোগ-ফল সত্ত্বেও বাঙলা দেশের সাহিত্যলোকের অনুরাগী মহলে কেমন যেন বিষাদ-অবসাদের ছায়া পড়েছিলো। মোহিতলাল এবারকার উৎসবের আগেই দেহত্যাগ করেছেন,—আর উৎসবের শেষ পর্বে মহা-প্রয়াণ ঘটেছে ব্রজেন্দ্রনাথের।

আমাদের শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে মোহিতলাল আসরে দেখা দিয়েছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তখন নবীন কবিদের মধ্যমণি হ'য়ে রবীন্দ্র-প্রতিভার স্বাতন্ত্র্যের সৌরলোকে অধি-ষ্ঠিত থেকেও নিজের স্বতন্ত্র এক সুরলোক গড়ে তুলেছিলেন। তারপর সত্যেন্দ্র গেলেন, নজরুল এলেন,—এলেন প্রেমেন্দ্র, জীবনানন্দ, [illegible], অচিন্ত্য-কুমার, বুদ্ধদেব;—নজরুলের উদ্দীপনার পাশে জেগে রইলো যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের বিষাদকুণ্ঠ মৌলিকতা। মোহিতলাল সত্যেন্দ্রনাথের কীর্তিতে অনুরক্ত ছিলেন,—নজরুল ইসলামকে তিনি বরণ ক'রে নিলেন, —তারপর, পরবর্তী কবিসভার দিকে এগিয়ে না এসে ১৯২০-২৫-এর মনন থেকে ক্রমশ পিছিয়ে গেলেন রামকৃষ্ণ-বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে। মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য হ'লো তাঁর মানস পরিক্রমার ধ্রুবতারা। বিশ শতকের প্রথমার্ধের শেষদিকে বঙ্কিমী রীতির হাস্য-কটাক্ষ-তিরস্কার পরিবেশিত হ'লো মোহিতলাল মজুমদারের লেখা বাঙলা সমালোচনার অনেকগুলি বইয়ে। মৃত্যুর পূর্ববর্তী কয়েক বছর তাঁর সক্রিয় অস্তিত্ব ঘোষিত হ'য়েছে প্রধানত ধর্ম-সমাজ-সাহিত্য সম্পর্কিত কয়েকটি কড়া প্রবন্ধে। কবি মোহিতলাল সমালোচক হ'য়েও বিখ্যাত ছিলেন।

আশা করা গিয়েছিলো যে, বাঙলা দেশের অন্যতম প্রিয় কবি এবং প্রতিষ্ঠিত সমা-লোচক মোহিতলালের বিষয়ে পুজোসংখ্যার কাগজগুলিতে আরও কিছু লেখা দেখা যাবে। কিন্তু পুজোর পূর্ববর্তী 'শনিবারের চিঠি'র বিশেষ সংখ্যার পরে মোহিতলালের বিষয়ে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু আর চোখে পড়লো না। ১৯১০-এ লেখা ডস্টয়েভ্স্কী সম্পর্কে মোহিতলালের একখানি ইংরেজী চিঠি ছাপা হ'য়েছে শারদীয় 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে'। 'দৈনিক বসুমতী'র বিশেষ সংখ্যায় তাঁর বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন কালিদাস রায়। তা'ছাড়া, ঐ পত্রিকাতেই মোহিতলালের 'বঙ্গলক্ষ্মী' কবিতাটি ছাপা হয়েছে। 'যুগান্তরে' বেরিয়েছে তাঁর অন্য একটি কবিতা—'বধূ-প্রসাধন' এবং 'আনন্দ-বাজারে' দেখা গেলো আরও একটি—'শেষ গান!'

কবিত্বের দিকে বাঙলার স্বাভাবিক ঝোঁক বোধ হয় ক্রমশ কমে আসছে! অর্থাৎ বাঙলার স্বভাব বদলাচ্ছে ব'লে মনে হয়। বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা', শুদ্ধসত্ত্ব বসু এবং বীরেন্দ্র মল্লিক সম্পাদিত 'একক'—মননপক্ষে এই দু'খানি কবিতানিষ্ঠ কাগজের কথা মনে রেখেও এ সন্দেহ মনে টিঁকে থাকে। কারণ, যে-সব লেখক কেবল কবিতা লিখেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন অধুনাজীবিত সেইসব প্রবীণ কবিদের সম্পর্কে আলোচনা বন্ধ হয়ে গেল কেন? যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, জীবনানন্দ দাস প্রভৃতি এখনো লিখছেন। বাঙলা দেশের সমালোচক মহলে তাঁদের লেখা পৌঁছচ্ছে কিনা, পুজোসংখ্যার কাগজ দেখে সে কথা জানবার উপায় নেই। 'বসুমতী'তে জসীমুদ্দীনের প্রবন্ধ 'কাজী নজরুলকে যেমন দেখেছি', 'আনন্দবাজারে' বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তর-সাধক'—এই দু'টি লেখা এদিকে কতকটা কৌতূহল এবং অভাব মিটিয়েছে বটে—কিন্তু বিশুদ্ধ সাংবাদিক দায়িত্ববোধে লেখা মোহিতলালের কাব্য সম্পর্কে টুকরো আলোচনাগুলি দেখলে কবিতা সম্পর্কে বাঙালী লেখক-পাঠকের সাম্প্রতিক শ্রদ্ধা-মান্দ্যের বিষয়ে অবশ্যই নিঃসংশয় হওয়া চলে।

তবে, সাহিত্যের অন্যান্য বিষয়ে চিন্তাশীল প্রবন্ধকাররা যে লেখনী সংবরণ করেননি তার প্রমাণ পাওয়া গেল 'দেশে' প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর 'বাংলা শিশু-সাহিত্য', 'সত্যযুগে' প্রকাশিত নারায়ণ চৌধুরীর 'ভঙ্গিপ্রধান সাহিত্য', 'কথা-সাহিত্যে' প্রকাশিত রাজশেখর বসুর 'বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা' এবং কালিদাস রায়ের 'এম্ফেসিস' নামে ছোটো আয়তনের দু'টি লেখা এবং এই শ্রেণীর আরও কোনো কোনো রচনার সামর্থ্যসূত্রে। এই সূত্রে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গবেষণামূলক রচনা 'নিরুপমা দেবী' (শনিবারের চিঠি) এবং 'ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়' (আনন্দ-বাজার), ডক্টর সুকুমার সেনের 'বিদ্যাসুন্দর তত্ত্ব' (জনসেবক), শান্তিদেব ঘোষের 'রবীন্দ্রনাথের ঋতুসঙ্গীত' (জনসেবক), স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের 'বাঙ্গালা দেশে সঙ্গীতের বিকাশ' (জনসেবক), প্রবোধচন্দ্র সেনের 'গীতা-বিচার' (দেশ) এবং 'প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান চর্চা' (আনন্দবাজার), শান্তিদেব ঘোষের 'উচ্চাঙ্গের হিন্দি গানে রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্থান' (যুগান্তর), আজাহারউদ্দিন খানের 'মেদিনীপুরে শরৎ-চন্দ্র' (যুগান্তর) ইত্যাদি লেখাগুলিও ১৩৫৯-এর বাঙলা প্রবন্ধ-সাহিত্যপ্রচেষ্টার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হিসেবে স্মরণীয়। এছাড়া, আছে চিঠিপত্রের গুচ্ছ,—দ্বিজেন্দ্র-লালের অপ্রকাশিত রচনা এবং পত্র ছাপা হয়েছে পুজোর 'সচিত্র সাপ্তাহিকে',—বঙ্কিমচন্দ্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরীর চিঠি ছাপা হয়েছে 'যুগান্তরে',—ত্রিপুরাধিপতি রাধাকিশোর-মাণিক্য বাহাদুরের কাছে লেখা রবীন্দ্রনাথের ১৩০৯ সালের একখানি চিঠি দেখা গেল 'দেশে' এবং সেই সঙ্গে সংলগ্ন পুলিন-বিহারী সেন মহাশয়ের 'ত্রিপুররাজ, রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র' প্রবন্ধটি এবারকার শারদীয় সাহিত্যানুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ বলে মনে হলো। 'বসুমতী'তে ঐতিহাসিক তথ্যময় আরও কয়েকখানি মূল্যবান চিঠি ছাপা হয়েছে। তাছাড়া, ঐ পত্রিকায় কবি যতীন্দ্রমোহন

বাগচীর 'আমার ছেলেবেলা' প্রবন্ধটি দেখে বাঙলা সাহিত্যের অনুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিক খুশি হবেন বলে মনে হয়। অন্যান্য যেসব ভালো প্রবন্ধ ইতস্ততঃ চোখে পড়েছে তার মধ্যে 'একক' পত্রিকায় শুদ্ধসত্ত্ব বসুর 'জীবনানন্দ দাশ', নন্দগোপাল সেনগুপ্তের 'সাহিত্য অন্বেষা'—সচিত্র সাপ্তাহিকে' বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'বড়বাজার',—'সত্যযুগে' এবং অন্যত্র অন্নদাশঙ্কর রায়ের টুক্‌রো টুক্‌রো বিচিত্র কথা পুজোর হৈ চৈ থেমে যাবার অনেক পরেও আবার মনে পড়বে। 'জয়শ্রী'র শারদীয়া সংখ্যায় পরলোকগত অনিল রায়ের সমাজতত্ত্ব সম্পর্কিত অপ্রকাশিত বই 'বিবাহ ও পরিবার'-এর ভূমিকা থেকে যেটুকু তুলে দেওয়া হয়েছে তা দেখে বাঙলা ভাষায় লেখা সমাজতত্ত্ব বিষয়ে প্রকাশিতব্য বইখানি সম্পর্কে পাঠকসমাজে প্রতীক্ষা যে তীক্ষ্ম হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

প্রবন্ধ থেকে গল্প-উপন্যাসের দিকে চোখ ফেরালে এবারকার বিশিষ্ট আকর্ষণগুলির মধ্যে প্রথমেই দেখা যায় রাজশেখর বসুর পরশুরাম মূর্তি। পরশুরামের পুনরভ্যুদয়ে বাঙলা দেশের লেখক-পাঠক উভয় পক্ষই বিশেষ তৃপ্তি পেয়েছেন। 'দেশে' তাঁর 'রটন্তীকুমার' এবং 'গল্পভারতী'তে তাঁর 'অগস্ত্যদ্বার'—দুটিতেই পরশুরামের ব্যক্তিত্ব ফুটেছে অম্লান দ্যুতিতে। 'আনন্দবাজারে' পরশুরামের 'যদু ডাক্তারের পেশেন্ট'-ও সমান উপভোগ্য।

'বসুমতী'তে বঙ্কিমচন্দ্রের অপ্রকাশিত গল্প 'ইস্টিশান মাস্টার' এবং যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর অপ্রকাশিত নাটক 'রাধাকৃষ্ণ' ছাপা হয়েছে। 'দেশে' দেখা গেল অবনীন্দ্রনাথের রসরচনা 'হংসনামা'।

'আনন্দবাজারে' প্রবোধকুমার সান্যাল লিখেছেন নতুন উপন্যাস 'বনহংসী'। 'বসুমতী'তে উপন্যাস লিখেছেন মনোজ বসু। তাঁর রচনার নাম 'বকুল'। 'শনিবারের চিঠি', 'গল্প ভারতী'—এই দুখানি কাগজে নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন যথাক্রমে 'বিদিশা' এবং 'একতলা'। প্রতিষ্ঠিত গল্পলেখকদের মধ্যে পুজোর কাগজগুলিতে পুনঃ পুনঃ যাঁদের নাম চোখে পড়লো তাঁদের মধ্যে আছেন সুবোধ ঘোষ, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, বিমল মিত্র, প্রমথনাথ বিশী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বাণী রায়—আছেন অন্নদাশঙ্কর রায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায় চৌধুরী, প্রবোধকুমার সান্যাল, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, অমলা দেবী, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সুশীল রায় ইত্যাদি। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিমল গোস্বামী, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস—এঁরা আজকাল অত্যন্ত কম লেখেন ব'লেই পুজোর মরশুমে এঁদের প্রত্যেকের লেখা দেখতে পেয়ে ভালো লাগলো।

ছোটোদের মহলে দক্ষিণারঞ্জন থেকে শিবরাম চক্রবর্তী, লীলা মজুমদার, মৌমাছি, বিশু মুখোপাধ্যায়, সুনির্মল বসু, স্বপনবুড়ো ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত লেখক-লেখিকারা তো আছেন-ই, তাছাড়া, নবীন উৎসাহীদের অনেকেই আছেন। অবিশ্যি ছোটদের জন্য না হলেও, বাঙলা শিশু-সাহিত্যের ওপর বুদ্ধদেব বসু 'দেশে' যে প্রবন্ধটি লিখেছেন এবং যে লেখাটি এই রচনার অন্যত্র স্মরণ করা হয়েছে—এবারকার সমস্ত লেখার মধ্যে সেটি বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

অর্থাৎ, খুব তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে গেলে ১৩৫৯-এর পুজোর কাগজগুলি নবীন প্রবীণ উৎসাহী বাঙালী লেখক-লেখিকার বেশ একটি মিলনমণ্ডপ হ'য়ে উঠেছে ব'লে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। বিজ্ঞাপন অনুযায়ী পরিবেশন যে ঘটেছে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। পরিচালকদের ধন্যবাদ,—সম্পাদকদের ধন্যবাদ,—মুদ্রাকরদের পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ। বাঙলা ছাপা সত্যিই আগের চেয়ে অনেক উন্নত হয়েছে। মোটামুটি মাঝারি লেখা থাকা সত্ত্বেও কোনো কাগজ যে একালেও সুশোভন না হ'তে পারে,—তার বিরল দৃষ্টান্ত দেখা গেল শুধু এবারকার 'সত্যযুগ'-এ।

এ-রকম ত্রুটি দুর্লঙ্ঘ্য নয়। আর একটু যত্ন নিলে আরও ভালো দরের ছাপা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু ছাপা-বাঁধাই, মলাট-কাগজ—এতো গেল অন্য প্রসঙ্গ। লেখার দাম কষে দেখতে হলে লেখকের আন্তরিকতার দিকে চোখ ফেরাতে হবে। সেজন্য পাঠকের মর্জি এবং ফুরসৎ থাকা দরকার। পুজোর সময়ে বাঙলা দেশের লেখক-লেখিকার যে ফুরসৎ থাকে না, একথা সম্পাদকরা জানেন। তবু তাঁরা সম্পাদকীয় কৌশলেই লেখা সংগ্রহ করেন, পরিচালকরা যা-হোক-কিছু দর্শনীও দিয়ে থাকেন এবং ক্রেতা-পাঠক প্রয়োজনবোধে অথবা বিলাসবশে পুজোর সময়ে কিছু কিছু 'বিশেষ সংখ্যা' কিনতেও কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু পুজোর উদ্দীপনা সাময়িক। সাহিত্যের আয়ু সর্বক্ষেত্রে সময়াতীত যে নয়,—সেকথা মেনে নিতেও আপত্তি হবার কথা নয়। তবু বিশেষ সংখ্যার সাহিত্য-পত্রের সাহিত্যানুরাগী ক্রেতা তাঁর অর্থের বিনিময়ে যে সুমুদ্রিত, সুশোভন, সুচিত্রিত লেখাগুলি পেয়ে থাকেন, সেগুলির আয়ুর প্রশ্ন সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলা সুসাধ্য মনে হয় না। এবং ১৩৫৯-এর সদ্য-অবসিত শরতের সাহিত্যসম্ভার কতোকালের স্থায়িত্বগুণেই যে সমৃদ্ধ হয়ে এবারের পুজো সংখ্যাগুলির কলেবর পুষ্ট করেছে,—সে প্রশ্নের ত্বরিৎ জবাব দেওয়া হঠকারিতা মাত্র। অনুরাগী পাঠক অসহিষ্ণু নন। প্রশ্নটি তাঁদের মনেই জাগবে এবং এ প্রশ্নের জবাব তাঁদেরই রুচি, আগ্রহ, সামর্থ্য অনুসারে তাঁরাই নিজগুণে পাবেন। অলমতিবিস্তরেণ।

বিক্ষুব্ধ কেনিয়া

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রায়

আফ্রিকা, কাফ্রী আর বর্বরতা—এ তিন হচ্ছে সমার্থক; সভ্য জাতির প্রচার গুণে একথাটা আমরা বুঝে নিয়েছি। বুঝে নিয়েছি যে আফ্রিকাবাসীরা অসভ্য, বর্বর, জংলী, নরঘাতক ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ, তাদের মধ্যে ভাল কিছু নেই। হতে পারে না। এটা বুঝে নিয়েছি বলেই পূর্ব আফ্রিকার 'ক্রাউন কলোনী' কেনিয়ায় যে জাতীয় আন্দোলন দেখা দিয়েছে, তা আমাদের মনে কোন সাড়া জাগায়নি। বরঞ্চ বিরূপ মনোভাবেরই সৃষ্টি করেছে। অবশ্য এরও কারণ রয়েছে। প্রথমতঃ, আফ্রিকানদের সম্পর্কে আমাদের অদ্ভুত ধারণা। তার উপর চলেছে বিলিতি সংবাদপত্রসমূহের বিরূপ সমালোচনা। তাদের মতে সাম্প্রতিক আন্দোলন হচ্ছে একদল নরঘাতক, রক্তপিপাসু বর্বরের অপকীর্তি। তারা খুন করছে, ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিচ্ছে, দেশে ভীতির রাজত্ব সৃষ্টি করেছে। সুতরাং নির্মমভাবে এদের দমন করতে হবে। সেজন্য অমানুষিক যত পন্থা আছে, তা প্রয়োগ করা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে এমন প্রচারণা চলছে, যাতে বিশ্বজনমত তাদের পক্ষে থাকে। কিন্তু এত প্রচার সত্ত্বেও আন্দোলনের আসল রূপটি প্রকাশ পেতে বিলম্ব হয়নি। অনেকের মতে এ আন্দোলনকে ইংরেজ যেভাবে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রচার করছে, আসলে ব্যাপারটা তেমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয়। কেনিয়ার জাগ্রত জনমতকে দমন করার জন্য ইংরেজ একটা অজুহাত সৃষ্টি করেছে মাত্র।

ইংরেজের প্রচারণা যেমন বিদ্বেষপ্রসূত, উপরির উক্ত ধারণাও তেমনি অবস্থাকে উপেক্ষা করার মনোভাব হতে সৃষ্ট। কেনিয়াতে জাতীয় আন্দোলন উগ্রতর রূপ ধারণ করেছে এবং তা অহিংস থাকেনি। 'নিউ ইয়র্ক টাইমস্' পত্রিকায় প্রকাশ, আন্দোলনকারীরা গত কয়েক মাসে অর্ধ শতাধিক মানুষ খুন করেছে। এর মধ্যে কিকুউ গোষ্ঠীর একজন প্রধানও রয়েছেন। তাছাড়া ওরা বাড়িঘর, শস্যক্ষেত্র পুড়িয়ে দিয়েছে, বহু গৃহপালিত পশু হত্যা করেছে এবং ইংরেজদের সম্পর্কে নানা গুজব রটিয়েছে। তাদের এই হত্যাকাণ্ড কোন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিই সমর্থন করতে পারেন না। ইহা সর্বথা নিন্দনীয়। কিন্তু তারা কেন এই মানবতাবিরোধী কার্যে উদ্বুদ্ধ হয়েছে, তা বুঝতে হলে কেনিয়ায় ইংরেজ শাসন ও শোষণের ইতিহাসকে জানতে হবে। ইংরেজ তার আর আর উপনিবেশে যেভাবে শাসনের নামে শোষণ কার্য চালিয়ে গিয়েছে, এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সে কথা বলার আগে বর্তমান আন্দোলনকারীদের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়ে নি।

বর্তমানে কেনিয়ায় যারা মুক্তি-যুদ্ধ শুরু করেছে, তাদের নাম হচ্ছে 'মো মো

কেনিয়ার প্রবীণ সর্দার মিঃ কয়নাঙ্গ। সম্প্রতি ইনি বৃটিশ সরকারের কারাগারে বন্দী

দল।' 'মো মো' একটি গুপ্ত সমিতি। এর অর্থ হচ্ছে 'গুপ্ত দল'। এ গুপ্ত সমিতি কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কে কে এর নেতৃস্থানীয়, এসম্বন্ধে বিশদ বিবরণ ইংরেজ সরকার বহু চেষ্টা করেও জানতে পারেনি। তাদের ধারণা এই সমিতিটি হচ্ছে কেনিয়া আফ্রিকান ইউনিয়নেরই অংশবিশেষ। প্রায় ৩০ বছর আগে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল আবেদন-নিবেদনের ভিতর দিয়ে কেনিয়াবাসীদের জন্য কিঞ্চিৎ সুবিধা আদায় করা। কিন্তু কিছুই সে আবেদন নিবেদন করে আদায় করতে পারেনি। ফলে প্রতিষ্ঠানের প্রগতিশীলদের মধ্যে একটা চাপা অসন্তোষ দেখা দেয় এবং সেই অসন্তোষই শেষে আন্দোলনের আকারে প্রকাশিত হয়। এ হচ্ছে গত যুদ্ধের পূর্বের অবস্থা। আন্দোলন [illegible] হওয়ায় যুদ্ধের সময় কেনিয়া আফ্রিকান ইউনিয়নকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয় এবং দলপতিদের গ্রেপ্তার করা হয়। ফলে ইহার গতি মন্দীভূত হলেও একেবারে বন্ধ হয়নি। সেই চাপা অসন্তোষ আরও বিস্ফোরক অবস্থায় পৌঁছায় এবং তাই জন্ম দিয়েছে 'মো মো' নামক উগ্রপন্থী দলের।

চার পাঁচ বছর আগে প্রথম এই গুপ্ত দলের কার্যকলাপ প্রকাশ পেতে থাকে। কিন্তু তখন কেউ বিশেষ এতে নজর দেয় নি। দলটি বিশেষভাবে ছড়িয়ে পড়তে থাকে কিকুউ গোষ্ঠীর মধ্যে। কেনিয়া উপকূল থেকে ভিক্টোরিয়া হ্রদ, উগান্ডা এবং টাঙ্গানিকার অংশবিশেষে ঐ কিকুউ গোষ্ঠী বসবাস করে। 'মো মো' দল এত ধীরে ধীরে এই গোষ্ঠীর ভিতর তাদের আদর্শ প্রচার করে যে, কেউ তা জানতে পারেনি। পরে যখন এদের কার্যকলাপ শুরু হয়, তখন এদের কথা কেনিয়ার শাসক শ্রেণী ও বিশ্বজগৎ জানতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে এই গুপ্ত দলটিকে বে-আইনী ঘোষণা করে নির্মম অত্যাচার আরম্ভ হয়। সমিতিকে উচ্ছেদ করবার জন্যে চেষ্টার ত্রুটি হচ্ছে না। কিন্তু এখন যেখানে কিকুউ জাতি আছে, সেখানেই দলের 'সেল' রয়েছে। সেভাবে অনেকের বিশ্বাস দলের বর্তমান সভ্যসংখ্যা হচ্ছে প্রায় ১০০,০০০ লক্ষ।

'মো মো' গুপ্ত সমিতি কেবলমাত্র যে অত্যন্ত সঙ্ঘবদ্ধ তা নয়, তারা কেনিয়াতে সমান্তরাল সরকার প্রতিষ্ঠা করতেও সমর্থ হয়েছে। লণ্ডনের 'ডেইলী টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় এসম্পর্কে লেখা হয়েছে যে, "...মো মো সমিতি ইতিপূর্বেই একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছে। এদের নিজেদের আদালত রয়েছে। তাদের আদেশ কার্যকরী করার ক্ষমতা এদের কেনিয়া পুলিশের চেয়েও অনেক বেশী।" সমিতির গুপ্ত পুলিশ অনেক বেশী চতুর বলে 'স্পেক্টেটর' কাগজ স্বীকার করেছেন।

এই দলে লোক ভর্তি করার মানে শপথ গ্রহণকালীন অনুষ্ঠানের যে কাহিনী প্রচারিত হয়েছে, তা সত্যি চাঞ্চল্যকর। মধ্য রাত্রিতে গভীর বনে নির্জন ও স্বল্পালোকিত একটি কুঁড়ে ঘরে দলে ভর্তি হতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হয়। তারপর একটি ঘাসের মালা তার মাথায় বা গলায় পড়িয়ে

কেনিয়ার গণ-আন্দোলন দমনঃ বৃটিশ সরকার কর্তৃক জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর নাইরোবির রাস্তায় আফ্রিকানদের গ্রেপ্তার করা হইতেছে

দেওয়া হয়। এর পর তার হাতে দেওয়া হয় একটি লাঠি। লাঠিতে বাঁদর পাঁঠার রক্ত ও মাটি মাখান থাকে। এবং ঐ রক্ত ও মাটি মাখান একটি কলার মোচা তার মাথার উপর দিয়ে ছুঁড়ে দেওয়া হয়। তারপর সে শপথ গ্রহণ করে। শপথের বয়ান হচ্ছে এই, "যদি আমাকে কোন ইউরোপীয়ানের মস্তক আনতে বলা হয় এবং আমি তা করতে অস্বীকৃত হই, তবে এই শপথ আমাকে হত্যা করবে। রাত্রে যে কোন সময় যদি আমাকে ডাকা হয় এবং আমি যদি বাইরে যেতে আপত্তি করি, তবে এই শপথ আমাকে হত্যা করবে। যদি মো মো দলের সদস্যদের সম্পর্কে কোন তথ্য আমি প্রকাশ করি, তবে এই শপথ আমাকে হত্যা করবে...ইত্যাদি।" শপথ বাক্য গ্রহণের পর, সদ্য কাটা পাঁঠার রক্ত পরিপূর্ণ একটি কাপ শপথ গ্রহণকারীর মাথার উপর সাতবার ঘোরানো হয়। পরে কিছু উৎসবও সেখানে চলে।

উপরি উক্ত বর্ণনা সত্যি রোমহর্ষক, কিন্তু তা কতদূর সত্য তা এখনও বলা যায় না। 'স্পেক্টেটরের' মত পত্রিকাটিও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, "মো মো' এমন একটি গুপ্ত দল, যার গোপনীয়তা ভঙ্গ করা খুবই দুরূহ কাজ।" এবং এই দুরূহ কার্য সম্পাদনের জন্যেই কেনিয়াতে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। ব্রিটিশ উপনিবেশ সচিব মিঃ অলিভার লিটেলটন কেনিয়া ঘুরে এসেছেন। কেনিয়াতে মধ্যপ্রাচ্য থেকে ইংরেজ সৈন্য আমদানী করা হয়েছে। দলের নেতৃস্থানীয় সন্দেহে পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক নৃবিদ্যা-বিশারদ জামো কেনিয়াত্তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ইনি কিছুকাল রুশিয়ায় ছিলেন, তাই কেউ কেউ এ আন্দোলনকে কম্যুনিস্ট প্ররোচিত বলে অলংকৃত করার চেষ্টা করছেন। আবার কেউ কেউ প্রচার করছেন যে, ভারতীয়রাই এই গুপ্ত আন্দোলনের উস্কানিদাতা। যাহোক, পুলিশ নির্বিচারে কিকুয়ু উপজাতীয় লোকজনকে গ্রেপ্তার করছে। হাজার হাজার লোককে প্রকাশ্যে বেত্রাঘাত করা হচ্ছে। নিরস্ত্র জনতার উপর গুলীবর্ষণ, খানাতল্লাসীর নামে গৃহ ধ্বংস, কোন কিছুই বাকী নেই। অর্থাৎ ইংরেজ কেনিয়াতে জরুরী অবস্থার নামে ভীতির রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। সেখানকার বর্তমান অবস্থার কিছু জানতে পারা যায় বৃটিশ পার্লামেন্টের শ্রমিক সদস্য মিঃ ফেনার ব্রকওয়ে ও মিঃ লেসলি হেল সম্প্রতি কেনিয়া ঘুরে এসে যে বিবৃতি দিয়েছেন তা থেকে। অবশ্য এমন অবস্থা হওয়া আশ্চর্য কিছু নয়, ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া অবশ্যই দেখা দেবে। কিন্তু কেন এই ক্রিয়া, কেন কেনিয়াবাসী সশস্ত্র বিপ্লবের পথ গ্রহণ করেছে, তা একবার অনুধাবন করা প্রয়োজন।

পূর্বেই বলেছি কেনিয়া হচ্ছে 'ক্রাউন কলোনী।' ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাই দেশটি আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রিটিশ ক্রাউনের অধীনে যায়। সভ্যতাবিবর্জিত ঘন অরণ্য পরিবেষ্টিত রাজ্যটিকে শোষণ করার আয়োজন তখন থেকেই আরম্ভ হয়। সেজন্য ইংরেজ সর্বপ্রথম রেল লাইন স্থাপন করে এবং বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে রেলপথ হওয়ার পর আরম্ভ হয় বিদেশীদের আগমন। তারা আসে মাটির লোভে; খনিজ এবং বনজ সম্পদের লোভে। জমির জন্যে প্রথম আবেদন করে ইস্ট আফ্রিকান সিণ্ডিকেট নামে ১টি বিদেশী প্রতিষ্ঠান। সেটা ১৯০২ সাল। তারপর আরও অনেকে জমির জন্য আবেদন জানায়। ১৯০৩ খৃঃ হাজার হাজার বসবাসকারী এসে উপস্থিত হয় কেনিয়ায়। এদের মধ্যে বেশীর ভাগ হচ্ছে ওলন্দাজ আর ইংরেজ। কেনিয়ায় প্রথম বসবাসকারী হচ্ছেন লর্ড ডেলামের। তিনিই ছিলেন বহিরাগত শ্বেতাঙ্গদের নেতা।

বহিরাগত শ্বেতাঙ্গরা যেমন পরিশ্রম করে জমির উন্নতিসাধন করলেন, তেমনি

ক্রমে উৎকৃষ্ট জমি তাদের অধিকারে গেল। কেনিয়ার ৫৩ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ৫২ লক্ষই আফ্রিকান। বৃটিশের সংখ্যা ২৯৬৬০ হাজার, বাদ বাকী ভারতীয় এবং আরব। কিন্তু সংখ্যা কম হলে কি হবে ইংরেজই আজ কেনিয়ার উর্বর উচ্চভূমির মালিক। সেখানে আফ্রিকানদের আবাদ করার অধিকার নেই। তাদের জন্য 'সংরক্ষিত অঞ্চল' করে রাখা হয়েছে নিম্ন জমি আর অনুর্বর ভূমি। দীর্ঘকালের পরিকল্পনায় ইংরেজ কেনিয়াবাসীদের কোণঠাসা করে ভাল ভাল জমির মালিক হয়ে বসেছে। কেবল কি তাই? অর্থকরী ফসল, কফি প্রভৃতি আবাদ করার অধিকারও তাদের নেই। ওটাও ইংরেজদের একচেটে। তাছাড়া রাজ্যের সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্য হলো ইংরেজদের হাতে। কেনিয়াবাসীরা হয় ক্ষেত মজুর নয়ত শহরের কুলি। এতে আর কত আয় হতে পারে। তাই তাদের দারিদ্র্য, দুরবস্থা এবং দুর্ভাবনা চিরস্থায়ী। অসহায় পশুর মত তারা জীবনযাপনে বাধ্য।

রাজ্যের শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারেও তাদের কোন হাত নেই। আংশিকভাবে নির্বাচিত এবং আংশিকভাবে মনোনীত কেনিয়া লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্যসংখ্যা হচ্ছে ৫৬ জন। এর মধ্যে ভারতীয় ৬, আরব ২, আফ্রিকান ৬, আর বাদবাকী ইউরোপীয়। মানে মোট জনসংখ্যার ·৫৫ ভাগ হলেও পরিষদে ইউরোপীয়ানদের দেওয়া হয়েছে ৭৫ ভাগ আসন। নির্বাচন কেন্দ্রগুলিকে ইউরোপীয়, ভারতীয় এবং আরব মানে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভাগ করা হয়েছে। যা হোক, আইন পরিষদে আফ্রিকানদের কিছু সদস্যপদ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ব্যবস্থা পরিষদে তাও নেই। গবর্নরসহ ১২জন সদস্য নিয়ে যে ব্যবস্থা পরিষদ, তাতে আফ্রিকানদের কোন আসন নেই। তাদের স্বার্থ সেখানে রক্ষিত হয় অন্যের মারফৎ। ফলে অবস্থা দাঁড়িয়েছে এই, 'দেশের শাসন ব্যাপারে তাদের বলার কোন অধিকার নেই; কেরাণী, পাহারাদার, কনস্টেবলের উপরে সরকারী চাকুরি পাওয়ার সম্ভাবনা নেই।" এই অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে অতীতে বহুবার সতর্কবাণী প্রচার করা হয়েছে। এমনি অত্যাচার চালালে আফ্রিকানরা যে তাদের ন্যায্য দাবী আদায়ের জন্য বিদ্রোহ করবে, তাও বলা হয়েছে। ৬ বৎসর পূর্বে কিয়াম্বু জেলার কিকুউ সংরক্ষিত অঞ্চলের অধিবাসীদের অবস্থা সম্পর্কে যে সরকারী রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে বলা হয়েছিল যে, এখানকার জনসংখ্যার শতকরা ৪০ জন ভূমিহীন মজুর। শীঘ্রই হয়ত তারা বেকারে পরিণত হবে এবং তার ফল হবে মারাত্মক। কিন্তু সে সতর্ক বাণী তখন

রাস্তার মোড়ে গলায় রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় ধৃত বিড়াল। শ্বেতকায়দের নিকট হইতে আত্মগোপন করিবার জন্য ইহা একটি সংকেত। ইহার গায়ে রক্তের দ্বারা শ্বেতকায় সংস্রব পরিত্যাগের প্রতিজ্ঞালিপি লিখিত
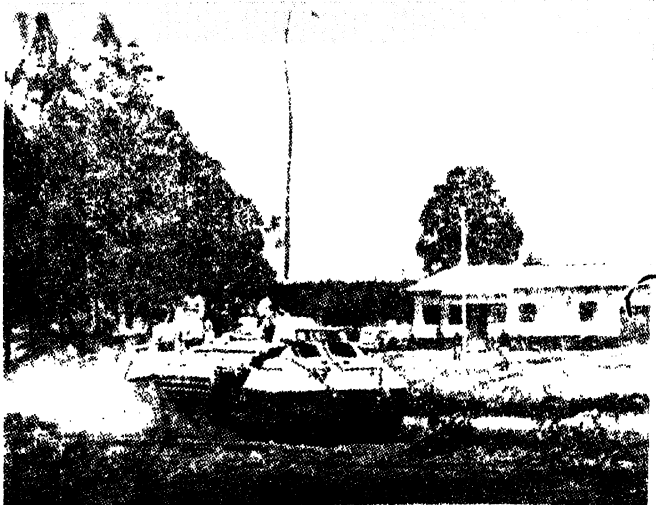
কেউ শোনেনি। ইংরেজ মানে শাসকগোষ্ঠী মনে করেছিল, আগুনকে ছাই চাপা দিয়ে নিভিয়ে দেওয়া যাবে, অত্যাচারের স্টীমরোলার চালালে সব কিছু স্তব্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু আসলে দেখা যাচ্ছে, তা হচ্ছে না। আফ্রিকানদের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বে-আইনী ঘোষণা করে এবং নেতৃস্থানীয়দের গ্রেপ্তার করে জাগ্রত জাতীয়তাবোধকে প্রতিরোধ করা যায় না।

কেনিয়ায় সশস্ত্র বিদ্রোহের কারণ প্রধানত অর্থনৈতিক। কিন্তু ব্রিটিশ উপনিবেশ সচিব মিঃ অলিভার লিটিলটন তা স্বীকার করেন না। সম্প্রতি কেনিয়া পরিভ্রমণ করে এসে এক বেতার বক্তৃতায় তিনি বলেছেন, "অর্থনৈতিক চাপে মো মো আন্দোলন সৃষ্ট বলে প্রায়ই বলা হয়ে থাকে, কিন্তু কথাটা ঠিক নয়; বরঞ্চ এর বিপরীত। কুৎসিত ও জঘন্য কার্যকলাপের

বৃটিশ ট্যাঙ্ক বাহিনী কিকিউদের সন্দেহজনক ঘাটির অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছে

জন্যে একটি 'রাজকীয় কমিশন' নিয়োগের কথাও তিনি ঘোষণা করেছেন। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে কিকুউ উপজাতিকে ভীতি প্রদর্শনও করেছেন। কিন্তু তাঁর স্তোক বাক্য বা ভীতি প্রদর্শন যে কাঙ্ক্ষনীয় শান্তি আনয়নে সমর্থ তা মনে হয় না। কারণ তাঁর বক্তৃতা দানের পরেও 'মো মো'-দের কার্যকলাপ অব্যাহত রয়েছে।

এপ্রসঙ্গে বিলেতের 'নিউ স্টেটসম্যান এন্ড নেশনে'র একটি মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। পত্রিকাটি বলেছেন, "কেনিয়ার এই অসন্তোষ বন্ধ করা যেতে পারে ভূমি ও সামাজিক ব্যবস্থার সংস্কার দ্বারা নির্যাতন দ্বারা নয়।" কথাটা খুবই সত্য। কেনিয়ার বিদ্রোহের কারণ তিনটি, যথা—ভূমি ব্যবস্থা, বর্ণবিদ্বেষ ও সমাজ-ব্যবস্থা। অবশ্য এই তিনটির সংস্কার সাধিত হলেই যে কেনিয়ার অবস্থার পরিবর্তন হবে, তা মনে হয় না। কেনিয়ায় সত্যি-কারের শান্তি সেদিন আসবে যেদিন সেখানে শ্বেতাঙ্গ প্রভুত্বের হবে অবসান।

বৃটিশভক্ত সর্দারদের জীবন রক্ষার জন্য পাহারা রত আফ্রিকান পুলিশ

মধ্য দিয়ে এই গুপ্ত দলটি বর্ণবৈষম্য সৃষ্টি করে চলছে। এই আন্দোলন ইউরোপীয়ানবিরোধী, এশিয়াবাসী ও খ্রিশ্চিয়ানবিরোধী এবং ইহা শান্তিপ্রিয় আফ্রিকানদের প্রধান শত্রু।"

মিঃ লিটিলটন তাঁর বেতার বক্তৃতায় সত্যকে বিকৃত করার চেষ্টা করেছেন পুরো মাত্রায়। টেরারিস্ট, কম্যুনিস্ট, ব্যানডিট নাম দিয়ে আন্দোলনের জঘন্যতা প্রমাণের কসুর করেননি। সঙ্গে সঙ্গে এ-ও প্রচার করতে ভোলেন নি যে, কেনিয়াবাসীদের অর্থ-নৈতিক উন্নতিসাধনের জন্য সরকার ৩,০০,০০,০০০ কোটি পাউন্ডের উপর ব্যয় করেছেন। কেনিয়ার তিনটি প্রধান অর্থনৈতিক সমস্যা—ভূমি, মজুরী এবং শিক্ষা সম্বন্ধে বিস্তারিত তদন্ত করার

প্রাভদা এই আন্দোলনকে বলেছে, উপ-নিবেশিক শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটি জাতির মুক্তি অভিযান। এই অভিযানের ফলে বর্তমান শতাব্দী শেষ হবার পূর্বেই আফ্রিকা থেকে শ্বেতাঙ্গ প্রভুত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে বলে শ্রমিক দলের সদস্য লর্ড স্ট্রবলগি মনে করেন। তাঁর এই ভবিষ্যৎ বাণী হয়ত অচিরেই সত্য হবে না, কিন্তু যে ইংরেজ কেনিয়াতে স্বর্গ রাজ্য বানিয়ে-ছিল, তা যে ধ্বসে পড়তে আরম্ভ করেছে, জমির মালিক ইংরেজরা যে একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে, তা 'টাইম' পত্রিকার বর্ণনায় বেশ বোঝা যাচ্ছে। টাইমের সংবাদদাতার নিকট কেনিয়া প্রবাসী জনৈক জার্মান বলেছেন, "রাত্রে আমরা ঘুমোতে পারি না। ...আমার মনে হয় শ্বেতাঙ্গদের এখানে থাকার দিন ফুরিয়ে এসেছে।" আশা করা যায় শীঘ্রই সেদিন আসবে এবং পদ-দলিত কেনিয়াবাসী সভ্যজগতে আপন অধিকার স্থাপন করতে সমর্থ হবে।

মধ্যপ্রাচ্য-পরিচয়

সরোজ আচার্য

৩
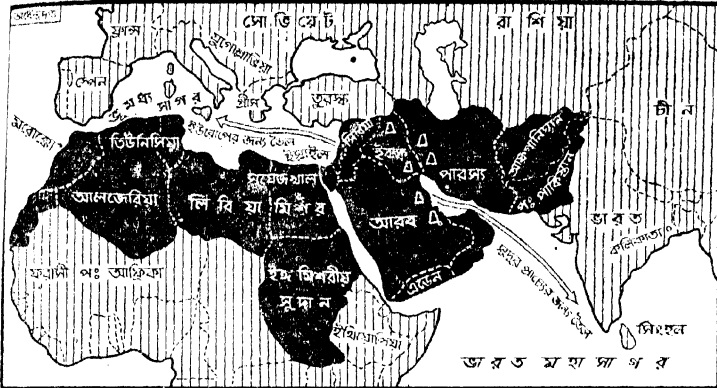
মধ্য প্রাচ্যের বিপুল তেল সম্পদের মালিকানা, মুনাফা এবং ভাগ-বাটোয়ারা ও প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে কিছু বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তেল-এলাকার ইজারা দখল নিয়ে হানাহানি, ষড়যন্ত্র এবং ঘুষ দিয়ে কার্যসিদ্ধির কাহিনী যেমন তৈলাক্ত তেমনই রক্তাক্তও বটে। খুব উঁচু-দরের পকেটমার এবং ডাকাতের প্রতিভার সমন্বয় করলে যে সব গুণ (!) দেখতে পাওয়া যায় তেলের দুনিয়া-জোড়া কারবারে সেইগুলিই সব চেয়ে কাজে লাগে। সম্প্রতি আমেরিকান রাষ্ট্র পরিষদের একটি অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে—এতে দেখা যায়, তেলের একচেটিয়া মূলধনীরা পৃথিবীর কোন এলাকায় কি দরে তেল বেচবে সেটা তারা গোপনে নিজেদের মধ্যে বন্দোবস্ত করে নিয়েছিল। কিন্তু এ ত হ'ল খুব নিরামিষ ব্যাপার। তেলের এলাকা দখল এবং ইজারা বন্দোবস্ত নিয়ে গত পঞ্চাশ বৎসর ধরে রাজ্য ভাঙ্গা-গড়া, ভাগ-দখল চলেছে, সে কাহিনী হ'ল ঘোর তামসিক। সে কাহিনীর শেষ হয়নি এখনও। মধ্য প্রাচ্যের কথাই ধরা যাক্। একদা এই এলাকার তেলের প্রধান মালিক ছিল বৃটিশ, তারপর ছোট সরিক ছিল ফরাসী এবং ওলন্দাজ। বৃটিশের এখন শনির দশা, মার্কিন মহাজনদের ছোট অংশীদার না হয়ে উপায় নাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরই ঠিক হয়েছিল অবস্থাচক্রে বৃটিশকে যদি সরতে হয় তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার জায়গা দখল করবে। প্রসিদ্ধ মার্কিন ভাষ্যকার কার্ল ভন ওয়াইগান্ড কোটিপতি হার্স্ট গোষ্ঠীর খবরের কাগজগুলিতে ১৯৪৭ সনের প্রথমে লেখেন, "এতদিন যে ক্ষমতা ও যে শক্তি বৃটিশ সাম্রাজ্যের আয়ত্তে ছিল তার স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী হ'ল আমেরিকা।" ওয়াল্টার লিপ্‌ম্যানও একই সুরে বলেন, বৃটিশের গুরুভার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাঁধে তুলে নিতে হবে। ১৯৪৯ সনে বৃটিশ ব্যবসায়ীদের মুখপত্র ইকনমিস্ট নিজেদের মান বাঁচিয়ে প্রস্তাব করেন, "মধ্য প্রাচ্যে বৃটেনের নতুন করে শুরু করতে হবে ইঙ্গ-মার্কিন সহযোগিতা। গত ৮০ বৎসর ধরে বৃটেন এই অঞ্চল থেকে মার্কিনকে বাইরে রেখেছিল, তার ফল ভাল হয়নি।" ফল যে অন্যদিক দিয়েও ভাল হয়নি তার নানা লক্ষণ অবশ্যই দেখা যাচ্ছিল। প্রথম হ'ল মধ্য প্রাচ্যে গণ-জাগরণ, এতদিন মধ্য প্রাচ্যের আমীর ওমরাহ জমিদার খানদানদের কিছু কিছু সেলামী দিয়েই খুশী রাখা গিয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে বিদেশী-বিরোধী গণ-আন্দোলন মধ্যপ্রাচ্যে প্রবল হতে থাকল। আন্দোলনের চাপে আমীর ওমরাহ এবং পেশাদার রাজনীতিকদেরও সুর বদলাতে থাকলো। বিদেশী ইজারাদার কোম্পানীদের কাছ থেকে তেলের মুনাফার অর্ধেক ভাগ দাবী করা হতে লাগল। এটা কিন্তু কেবল গণ-আন্দোলনের চাপেই হয়নি। মার্কিন তেল-মূলধনীরাও কোনো কোনো জায়গায় প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রিটিশ কোম্পানীদের প্যাঁচে ফেলার জন্য চড়া সেলামী ও মুনাফার মোটা অংশ দিতে এগিয়েছিল। এর উপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বৃহৎ শক্তিরূপে সোভিয়েটের আবির্ভাব। মধ্যপ্রাচ্যের উত্তর সীমান্ত ঘেঁষেই সোভিয়েটের তেলের এলাকা, তা'ছাড়া যুদ্ধের সময়ে মার্কিন-ব্রিটিশ মিত্রদের সঙ্গে সোভিয়েট সৈন্যও পারস্যে মোতায়েন হয়েছিল। বল্‌তে গেলে সোভিয়েটের সঙ্গে মার্কিন-ব্রিটিশ প্রভৃতি পশ্চিমী শক্তিদের "ঠাণ্ডা যুদ্ধের" শুরুই হ'ল ১৯৪৬ সনে উত্তর পারস্যের তেলের ইজারা প্রস্তাব নিয়ে।

তেলের "ঠাণ্ডা যুদ্ধ"

তেলের ভাগ-দখল নিয়ে মনকষাকষি নতুন কিছু নয়। এখন অবশ্য তেলের সঙ্গে মিশেছে ভাবনৈতিক সংঘাত ও শক্তির দ্বন্দ্ব। তবে প্রথম মহাযুদ্ধের পরেও গণতান্ত্রিক ব্রিটেন ও গণতান্ত্রিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মধ্য-প্রাচ্যের তেলের ভাগাভাগি নিয়ে ঝগড়া করেছিল। ১৯২০ সনে লণ্ডন-ওয়াশিংটন পত্রালাপ খুব প্রেমপূর্ণ হয়নি। শেষ পর্যন্ত ইরাক পেট্রোলিয়াম কোম্পানীর ভাগাভাগি করা হয় মার্কিন, ব্রিটিশ, ফরাসী এবং ওলন্দাজ তেলমূলধনীদের মধ্যে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ সময়ে মধ্যপ্রাচ্যের তেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে ব্রিটিশ ও মার্কিন সরকার আলোচনা শুরু করেন। এবারে উভয়পক্ষে অন্ততঃ সরকারীভাবে আপোষ-নিষ্পত্তি করার জরুরী দরকার ছিল। ব্রিটিশ সরকার জানতো, যুদ্ধের পরে তার পক্ষে একলা মধ্যপ্রাচ্য সামলানো সম্ভব হবে না। বিশেষত ভারতবর্ষ হাতছাড়া করতে হলে মধ্যপ্রাচ্যে খবরদারী করার ফৌজ মোতায়েন রাখাও কঠিন হবে। এর উপর সোভিয়েট ইউনিয়নকে বেড়ে উঠতে দেওয়া হয়েছে, কম্যুনিজমের দাপট বাড়ছে। আর প্রত্যেকটি বড়ো যুদ্ধের পরে যা' হয়, মধ্যপ্রাচ্যেও সাম্রাজ্যবাদের স্বর্ণলঙ্কায় আগুনের আভাস দেখা দিচ্ছে। অতএব তেলের ভাগ দখল ব্যাপারে ব্রিটিশ-মার্কিন সমঝোতা না হয়ে উপায় নাই। শোনা যায় রুজভেল্টের পরিকল্পনা ছিল যুদ্ধের শেষে যাতে মিত্র-

শক্তিদের মধ্যে বন্ধুত্ব বজায় থাকে সেজন্য তেল উৎপাদন কেনা-বেচা সম্পর্কে একটা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা করা। অবশ্যই মার্কিন মূলধনীরা এটা পছন্দ করেননি, মিঃ চার্চিল এবং পরে মিঃ বেভিনও খুব স্পষ্টভাষায় জানান, মধ্যপ্রাচ্য সম্বন্ধে কোনোমতেই সোভিয়েটের সঙ্গে আপোষ-বন্দোবস্ত চলবে না। মধ্য প্রাচ্যে 'পরম মিত্র' (যুদ্ধকালের) সোভিয়েটকে আনতে দেওয়া মানে হ'ল ব্রিটেনের গলায় ছুরি বসানো। এ কথা মিঃ বেভিন ঘোষণা করেন ১৯৪৬ সনে। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, মধ্যপ্রাচ্যের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার নিয়ে যেসব ইংরেজরা হৈ চৈ করে তাদের মনে রাখা উচিত মধ্যপ্রাচ্য হাতছাড়া হলে প্রত্যেক ব্রিটিশ শ্রমিকের হপ্তাপ্রতি আয় কমে যাবে। রুজভেল্টের পরিকল্পনা যাই থাকুক না কেন, ইয়াল্টায় তিন বৃহৎ শক্তি তেলের আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিয়ে কোনও আলোচনা বা নিষ্পত্তি করতে পারেনি। রুজভেল্টের স্বরাষ্ট্র সচিব ছিলেন হ্যারল্ড ইক্‌স। ইনি 'তেল-সাম্রাজ্য-বাদ' নীতির একটা যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা করেন, তারই ভিত্তিতে মিঃ বেভিন ও হ্যারল্ড ইক্‌স ব্রিটিশ-মার্কিন চুক্তি করেন তেলের ভাগদখল দিয়ে। রুজভেল্ট এই নীতিই মেনে নিয়েছিলেন যুদ্ধের শেষ সময়ে। সৌদী আরবের রাজা ইবন্‌ সাউদের সঙ্গে রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট স্বয়ং দেখা করেছিলেন এই সময়। সৌদী আরবেই যুদ্ধের পর মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন তেলসাম্রাজ্যের শুভ সূচনা। সৌদী আরবের তেল এত প্রচুর যে, সেখানে প্রতিদিন গড়ে একটি খনি থেকেই ওঠে ১৪০০ টন তেল, সেই হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খনিগুলিতে ওঠে ২ টনেরও কম।

তেলের 'ঠাণ্ডা যুদ্ধে' সরকারীভাবে ব্রিটিশ-মার্কিন আপোষ একটা হ'ল বটে। তবু রইল তেলমূলধনীদের তলায় তলায় ফন্দীফিকির ও দর হাঁকাহাঁকি। তার একটা কারণ হ'ল ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ব্যাপক অসন্তোষ ও আন্দোলন। মার্কিন তেল-মূলধনীরা এর সুযোগ সদ্ব্যবহার করবে না কেন, স্বাধীন ব্যবসায়ের মূল নীতিই যখন প্রতিযোগিতা। এ ছাড়া ব্রিটিশের অবস্থা দুর্বল দেখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্তারাও ধরে নেন, যেখানে সম্ভব ও সুবিধা, হয় ব্রিটিশের জায়গা দখল করতে হবে নয়ত ব্রিটিশের পিছনে খুঁটীর জোর দিতে হবে; নতুবা সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রভাব মধ্য-প্রাচ্যে প্রতিরোধ করা যাবে না, তেল যাবে, গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি সব হাত ছাড়া হবে। একদিকে ব্রিটিশের কায়েমী স্বার্থ তার সঙ্গে প্রয়োজন ও সুবিধামত মার্কিনের পৃষ্ঠপোষকতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা দুই-ই, অন্য দিকে মধ্যপ্রাচ্যের বিদেশী-বিরোধী গণ-আন্দোলন; এর উপরে সমস্যা জটিল ও মারাত্মক করেছে সোভিয়েট এবং কম্যু-নিজমের সঙ্গে দুনিয়া-জোড়া আদর্শের ও শক্তির দ্বন্দ্ব।

এই দ্বন্দ্বের সূচনা মধ্যপ্রাচ্যে হ'ল ১৯৪৬ সনে উত্তর পারস্যের তেলের ইজারা নিয়ে। শতকরা ৫০ ভাগ নিজের ও পারস্য সরকারের ৫০ ভাগ অংশীদারীর ভিত্তিতে উত্তর পারস্যে তেল উৎপাদনের একটি কোম্পানী গঠনের প্রস্তাব সোভিয়েট সরকার উত্থাপন করে। প্রস্তাবটি সব দিক দিয়ে আকর্ষণীয় করার জন্য সোভিয়েট সরকার সর্ত দেয় যে, ২০ বৎসর পরে উত্তর পারস্যের তেল-কোম্পানী পুরোপুরি পারস্য সরকারের হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে, কোনো-রকম ক্ষতিপূরণ দাবী না করে; তাছাড়া পারস্যের লোকদের তেল-খনি চালানোর যন্ত্র-বিদ্যায় সম্পূর্ণ শিক্ষিত করে দেবে এই কোম্পানী। দক্ষিণে ব্রিটিশের অ্যাংলো-ইরানীয়ান কোম্পানীর ব্যবস্থার তুলনায় অবশ্যই এইসব সর্ত আকর্ষণীয় ছিল। কিন্তু ব্যাপারটা কেবল তেল-ঘটিত নয়, কূট-রাজনীতিরও। প্রথমতঃ পারস্যের উত্তর অঞ্চলে এবং দক্ষিণ অঞ্চলে দুই বিরোধী বৃহৎ শক্তি তেলের কারবার চালু করলে পারস্যের অবস্থা শেষ পর্যন্ত উলুখড়ের মতই হতে পারে। এখনও অবশ্য প্রায় সেই অবস্থাই, যদিও ব্রিটিশ-মার্কিন ইত্যাদি পশ্চিমী শক্তিরা সোভিয়েটকে কাস্পিয়ান হ্রদের এপার থেকে বিদায় করেছে। যুদ্ধের সময়ে 'পরম মিত্র' বলে গণ্য হলেও সোভিয়েট প্রভাবকে মধ্যপ্রাচ্যে এগুতে না দেওয়া পশ্চিমী শক্তিদের দৃঢ়সঙ্কল্প। ওদিকে যুদ্ধশেষে হওয়ার পর সোভিয়েট সরকারও তার 'পরম-মিত্র'দের মতলব সম্বন্ধে সন্দিহান হচ্ছিল। পারস্যের উত্তর সীমানার অপর পারেই সোভিয়েটের তেলের এলাকা। বলশেভিক রাশিয়ার বিরুদ্ধে ১৯১৭-১৯১৯ সনের ব্রিটিশ-মার্কিন বাহিনীর একটি অভিযান পারস্যের মধ্য দিয়ে হয়েছিল। এমন কি দ্বিতীয় মহা-

যুদ্ধের প্রথম পর্যায়েও ফরাসী ও তুর্কী সেনাপতিমণ্ডলী এইরকম আর একটা অভিযানের পরিকল্পনা করছিল। তাই সোভিয়েটের উদ্দেশ্য ছিল উত্তর পারস্যে তেলের খনি এলাকায় এগিয়ে এসে মধ্যপ্রাচ্যে 'পরম-মিত্র' ব্রিটিশ-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গতি-বিধির উপর নজর রাখা। আর কতকটা অসন্তোষও ছিল—যেহেতু 'পরম-মিত্র' ব্রিটিশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েটেরও যে তেলের দরকার হতে পারে, এ কথা আদৌ আমল দেয়নি, মধ্যপ্রাচ্যের তেল নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগির চুক্তি করে ফেলেছে। তেল নিয়ে সোভিয়েট ও পশ্চিমী শক্তিদের ঠাণ্ডা যুদ্ধে পারস্যের রাজনীতিকেরা জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় বেশ কূট কৌশলের পরিচয় দিয়েছিলেন। পারস্যের শাসকশ্রেণী স্বৈরাচারী, ক্ষমতালোভী, দুর্নীতিপরায়ণ এবং জনসাধারণের ভালোমন্দ বিষয়ে উদাসীন, এসব অভিযোগ অনেকখানি সত্য, কিন্তু বিদেশী স্বার্থকে দেশ থেকে হটিয়ে দেবার চেষ্টা পারস্যের শাসকেরা সাধ্যমত অনেকবার করেছেন। একে দেশের প্রধান শিল্প বহুদিন ধরে বিদেশীদের হাতে, তার উপরে শাসকশ্রেণী ও জনসাধারণের মধ্যে বিরাট ব্যবধান। কাজেই পারস্যের শাসকদের প্রধান অস্ত্র হ'ল কূটকৌশল। উত্তরে সোভিয়েটের অবস্থিতির ফলে ব্রিটিশের মনে সর্বদাই পারস্য হারাই-হারাই ভয়। এই ভয়ের সুযোগ নিয়ে স্বয়ং খোদ শাহান-শা বাদশাহী রেজা পেহলভী ১৯৩১ সনে ঘোষণা করে বসলেন, বিদেশী স্বার্থের তাঁবেদারী করার চেয়ে তিনি কম্যুনিস্ট হওয়া অনেক বেশি পছন্দ করেন। পরে অবশ্য রেজা শাহ নাৎসীদের সঙ্গে মিতালী করেন এবং ১৯৪১ সনে রাজ্যপাট হারিয়ে ব্রিটিশের হুকুমে দক্ষিণ আফ্রিকায় নির্বাসিত হন। কিন্তু ১৯৩১-৩২ সনে রেজা শাহের কম্যুনিস্ট হয়ে-যাব এই হুমকীতে কিছু কার্য সিদ্ধি হয়েছিল। য়্যাংলো-ইরানীয়ান তেল-কোম্পানীর প্রধান কর্মকর্তা সার জন ক্যাডম্যান চটপট কিছু সেলামী ও নজরানা বাড়িয়ে দিয়ে রেজা সাহের দিল খুশ করেন। ১৯৪৬ সনে সোভিয়েট যখন উত্তর পারস্যে তেল-ইজারা দেবার লোভনীয় সর্ত দিল, তখনও পারস্যের শাসকদের সুবিধাই হল। প্রধানমন্ত্রী গাভাম সুলতানে সোভিয়েটের সঙ্গে চুক্তির কথাবার্তা চালানোর ভাণ করলেন। ওদিকে ব্রিটিশ মার্কিন তেল-মূলধনী ও কূটরাজনীতিকদের টনক নড়লো, তাঁরা পারস্য সরকারের উপরে চাপ দিলেন, সোভিয়েটকে তেলের ইজারা দেওয়া চলবে না। পারস্যের জনসাধারণের কাছে বিষয়টা আরও সোজাভাবে দেখা দিল। যদি দক্ষিণে ব্রিটিশ-মার্কিন মূলধনীরা ইজারা-দখল পায়, তবে উত্তরে সোভিয়েটকে আরও ভাল সর্তে ইজারা দিতে আপত্তি কোথায়? আর যদি জাতীয় দাবী যোলো আনা পূরণ করতে হয়, তবে সমস্ত বিদেশী তেল-কোম্পানীর ইজারা-বন্দোবস্ত বাতিল করা হোক। শেষ পর্যন্ত সোভিয়েটের প্রস্তাব ১৯৪৭ সনে না-মঞ্জুর হ'ল; কিন্তু পারস্যের মজলিস (আইন পরিষদ) জনসাধারণের দাবী কতক পরিমাণে মেনে নিয়ে আইন পাশ করল যে, ভবিষ্যতে আর কোনও বিদেশী কোম্পানীকে পারস্যের তেল ইজারা দেওয়া হবে না। ব্রিটিশের য়্যাংলো-ইরানীয়ান কোম্পানী টিঁকে রইল বটে, কিন্তু পায়ের তলায় মাটিতে কাঁপন ধরল এই প্রথম। বিদেশী কোম্পানীকে আর তেল-ইজারা দেওয়া হবে না এই জাতীয় সংকল্প থেকে বিদেশী তেল কোম্পানীর উচ্ছেদ করার জন্য জাতীয় আন্দোলন খুব বেশি তফাৎ নয়—সময়ের দিক থেকে নয়, আদর্শের দিক থেকেও নয়। সাম্রাজ্যবাদীরা নাকি সবকিছু একটু বিলম্বে বোঝে। এখন কোনো কোনো ব্রিটিশ কূটনীতি বিশারদ বলছেন, ১৯৪৬ সনে যখন সোভিয়েটের বিরুদ্ধে পারস্যের তেল ব্যাপারে পশ্চিমী শক্তিরা হল্লা শুরু করেছিল, তখন নিজেদের ঘর সামলানোর কথা মনে রাখা উচিত ছিল, পারস্যকে খুশী রাখার জন্য য়্যাংলো-ইরানীয়ান কোম্পানীর উচিত ছিল সোভিয়েটের মত ভাল সর্ত দিয়ে নতুন ইজারা-বন্দোবস্তের চুক্তি করা। তা না করে মার্কিন ধনপতি ও যুদ্ধ-বিশারদেরা পারস্যকে কয়েক কোটি ডলার ধার ও খয়রাত দিলেন অস্ত্রশস্ত্র কেনা ও সামরিক রাস্তাঘাট তৈরীর জন্য; পারস্যের সৈন্য ও পুলিশ বাহিনীর পরামর্শদাতা হিসাবে মোতায়েন হ'ল মার্কিন সেনাপতি ও ও বিশেষজ্ঞের দল। এ রকম ঘটা কিছু আশ্চর্যের কথা নয়। আগেই বলা হয়েছে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই দুর্বল ব্রিটিশের সাম্রাজ্যিক স্বার্থের উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হয়েছে। ১৯৪৮ সালে প্যান-আমেরিকান ইউনিয়নের কর্মকর্তা উইলিয়ম ভগ্‌ট্‌ 'রোড টু সারভাইভল' (বাঁচার পথ) নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ঐ গ্রন্থে ভগ্‌ট্‌ মন্তব্য করেন, 'আমাদের তেলের ভাণ্ডার নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ার সময় আসছে; আমাদের নৌবাহিনী আমরা ভূমধ্যসাগরে পাঠাব, সোভিয়েটকে হুমকী দেব এবং এশিয়াটিক (অর্থাৎ মধ্যপ্রাচ্যের) তেল দাবী করব।' প্রশংসনীয় স্পষ্টবাদিতা! তবু প্রশ্ন এই, যাদের দেশের তেল সেই মধ্যপ্রাচ্যের লোকেরা কেন নিজ-বাসভূমে উপবাসী হবে, ব্রিটিশ-মার্কিন অথবা সোভিয়েটের উপকারের জন্য? সেই প্রশ্নের সমাধানের দাবীতে আজ মধ্যপ্রাচ্যের দেশে দেশে জনসাধারণ চঞ্চল, বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে।

মার্কিন-ব্রিটিশ সহ-(প্রতি)যোগিতা

এই তৈলাক্ত কাহিনীর তলায় অনেক গোপন ষড়যন্ত্র ও রেষারেষির কাহিনী আছে। তার কিছু পরিমাণ জানা যায়, কিছুটা অনুমান সাপেক্ষ। পারস্যের তেল সংকট নিয়ে ব্রিটিশ ও মার্কিন নীতি কখনও দুই বিরোধী ধারায় চলেছে, কখনও বা সহযোগিতা করছে। সম্প্রতি সরকারীভাবে ট্রুম্যান-চার্চিল ঘোষণায় দেখা যাচ্ছে ব্রিটিশ-মার্কিন কর্তারা এখন 'এক-দিল'। কিন্তু গত কয়েক বৎসর ধরে পারস্যে কূটনীতির খেলায় মার্কিন তেল-মূলধনী ও রাজদূতেরা য়্যাংলো-ইরানীয়ান কোম্পানীর স্বার্থের বিরোধিতা করেছে অনেকবার। পারস্যে মার্কিন রাজদূত ডাঃ গ্র্যাডী য়্যাংলো-ইরানীয়ানের কার্যকলাপ সম্বন্ধে কড়া মন্তব্য করেন, ফলে ব্রিটিশ সরকার ওয়াশিংটনে তার প্রতিবাদ করেন ও ডাঃ গ্র্যাডীকে বিদায় নিতে হয়। দেশে ফিরে গিয়ে ডাঃ গ্র্যাডী একটি প্রবন্ধে পারস্যে ব্রিটিশ নির্বুদ্ধিতার উপরে খুব এক হাত নিয়েছেন। ১৯৫১ সালের মার্চ এপ্রিলে পারস্যের মজলিশ সমস্ত তেলসম্পদ জাতীয়করণের আইন পাশ করে, য়্যাংলো-ইরানীয়ান কোম্পানীকে কারবার গুটানোর আদেশ দেওয়া হয়। য়্যাংলো-ইরানীয়ান যেসব এলাকায় তেল বিক্রী করত সেখানকার বাজার দখলের জন্য নিউজার্সি স্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল ও অন্যান্য বৃহৎ মার্কিন তেল মূলধনীরা তাড়াতাড়ি একটা সংগঠনে সঙ্ঘবদ্ধ হয়। সরকারীভাবে মার্কিন সরকার পারস্যের তেল 'একঘরে' করে রাখলেও ইণ্টারন্যাশনাল ব্যাঙ্কের মারফৎ মার্কিন তেল মূলধনীরা পারস্যে সুযোগ সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করেছে। গত বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে ইকনমিস্ট' লেখে, কায়রো এবং তেহরানে

মার্কিন প্রতিনিধিরা এই ধারণা সৃষ্টি করেছে যে, ব্রিটিশ বিদায় হলে তারা খুশীই হবে। গত বৎসর নভেম্বরে লেবর সদস্য মিঃ ইভানস্ পার্লামেণ্টে বলেন, মার্কিন নীতি দু-মুখো হয়ে পড়েছে। একদিকে যেন মার্কিনরা চায় আমাদের (ব্রিটিশদের) খাড়া রাখতে; আর একদিকে কাজ করে ঠিক এর বিপরীতভাবে। লেবর সদস্য ইভানস্ পারস্যের তেল হাত ছাড়া হবার শোকে মার্কিন-মিত্রদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন, তারা তেলের উপর ডলার কর্তৃত্ব চাপাচ্ছে। মার্কিন নীতির দু-মুখো ধরণের একটি কারণ সম্ভবত তার নিজের দেশের তেল মূলধনীদের চাপ, আর একটি হল সোভিয়েটকে ঠেকিয়ে রাখার তাগিদ। ১৯৪৯ সনে পারস্যে খাদ্যের অভাব ঘটে-ছিল। পারস্যের প্রধানমন্ত্রী রাজমারা তখন বিনিময় চুক্তি করে সোভিয়েট থেকে গম আমদানী করেন। মার্কিন মহল প্রমাদ গণল। ব্রিটিশের ব্যবসাদারী কৃপণতার ফলে শেষে পারস্যও হাত ছাড়া হবে! তাড়া-তাড়ি মার্কিন সোকোনি-ভাকুয়াম তেল কোম্পানীর প্রতিনিধি ঘোষণা করলেন, তাঁরা পারস্য সরকারকে শতকরা ৬০ ভাগ সেলামী দিতে প্রস্তুত। আর একটি বৃহৎ মার্কিন কোম্পানী 'আরামকো' দর আরও চড়িয়ে বলল, তারা শতকরা ৭২ ভাগই দেবে। শোনা যায় প্রধানমন্ত্রী রাজমারা নাকি ছিলেন ব্রিটিশের পেয়ারের লোক। য়্যাংলো-ইরানীয়ানের বিরুদ্ধে মার্কিন তেল কোম্পানীদের দর হাঁকাহাঁকিতে রাজমারা মুশকিলে পড়লেন। তাঁর দুঃসাহস এবং দুর্ভাগ্য বলতে হবে; 'আমেরিকার কণ্ঠস্বর' নামক বেতার কেন্দ্র তিনি বন্ধ করে দিলেন, কয়েকজন মার্কিন বিশেষজ্ঞকে পারস্য ছেড়ে যাওয়ার হুকুমও জারি করলেন। রাজমারা য়্যাংলো-ইরানীয়ানের সঙ্গে রফা-নিষ্পত্তির জন্য কথাবার্তাও চালাচ্ছিলেন। কোন্ অলক্ষ্য ইঙ্গিতে ঘাতকের গুলীতে রাজমারা নিহত হলেন। এরপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যিনি এককালে পারস্যের রাজদূত ছিলেন এবং ১৯৪৬ সালে সোভিয়েটের সঙ্গে 'ঠাণ্ডা যুদ্ধে' বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়ে-ছিলেন, সেই হুসেন আলা কয়েক দিনের জন্য প্রধানমন্ত্রী হলেন। মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের সহকারী পররাষ্ট্র সচিব মিঃ ম্যাকগী তৃতীয়বার পারস্য পরিদর্শনে এলেন, আশ্বাস দিলেন, 'আমরা পারস্যকে পুরো-পুরি সমর্থন দিচ্ছি এবং পারস্যকে আমরা যতদূর সম্ভব সাহায্য করতে চাই।' ইতি-মধ্যে পারস্য মজলিস তেল জাতীয়করণের প্রস্তাব পাশ করেছে। লণ্ডনের তখন এক-মাত্র আশা যে পশ্চিমী দেশগুলি থেকে তেল-খনি-বিশেষজ্ঞ পারস্য একজনও পাবে না, সোভিয়েটের সাহায্য নিতে সাহস করবে না। মিঃ ম্যাকগী যেভাবে পারস্যের পিঠ চাপড়ালেন তাতে মার্কিন কর্তাদের উপর লণ্ডনের অভিমান বাড়লো। টাইমস পত্রিকা ইতিমধ্যেই অভিযোগ করছিল, পারস্যে ব্রিটিশ ও মার্কিন নীতির বিরোধ একটা কেলেঙ্কারীর ব্যাপার হয়ে উঠছে। লণ্ডনের কর্তারা ওয়াশিংটনে দরবার শুরু করলেন ১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসে; তেল-ব্যাপারে ব্রিটিশ-মার্কিন বোঝাপড়া নতুন করে আর এক দফা হ'ল—অবশ্য সরকারী-ভাবে। তাই বলে বেসরকারীভাবে মার্কিন তেল মূলধনীরা য়্যাংলো-ইরানীয়ানের ভূতপূর্ব খাসতালুকের আনাচে কানাচে উঁকি মারতে ছাড়ছে না। তার সাম্প্রতিক নিদর্শন কতকগুলি পাওয়া যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র সরকার অনুমোদন না করলেও মিঃ অ্যালটন জোনস নামে একজন ক্ষমতাশালী মার্কিন তেল মূলধনী পারস্য সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়েছেন। গত মে মাসে (১৯৫২) পারস্য উপসাগরে ব্রিটিশ রণতরীর পাহারা এড়িয়ে 'রোজ মেরী' নামে একখানি ইতালিয়ান তেলবাহী জাহাজ ১০০০ টন তেল পারস্য থেকে নিয়ে যাচ্ছিল। য়্যাংলো-ইরানীয়ান কোম্পানীর তরফ থেকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সেই জাহাজ এডেন বন্দরে আটক করেন। পরে জানা যায়, 'রোজ মেরী'র মালিক ইতালিয়ান জাহাজ কোম্পানী মার্কিন তেল মূলধনীদের বেনামদার। আবাদান থেকে য়্যাংলো-ইরানীয়ান কোম্পানীকে যখন পাত-তাড়ি গুটোতে হল তখন নাকি ব্রিটিশ সরকার পারস্যে ফৌজ পাঠাতে প্রস্তুত হয়ে-ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অপমান ও স্বার্থনাশ মেনে নিতে হয়; ব্রিটিশ ফৌজ পাঠালে মার্কিনের সঙ্গে দ্বন্দ্বটা আরও খোলাখুলি হয়ে পড়ত। কারণ ওদিকে পারস্যের সৈন্যবাহিনীর প্রধান পরামর্শ-দাতা (কর্তাই) হলেন একজন মার্কিন জেনারেল। ব্রিটিশ মহলে এখনও অস্বস্তির সীমা নাই, পারস্যের তেল ব্যবসায় চালু করার জন্য মূলধন, বিশেষজ্ঞ ও জাহাজ দিতে মার্কিন তেল মূলধনীদের আগ্রহ বেশি ছাড়া কম নয়—সরকারীভাবে ব্রিটিশ মার্কিন সমঝোতা থাকা সত্ত্বেও। ব্রিটিশ-মার্কিন সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতার তৈলাক্ত কাহিনী কেবল পারস্যে নয়, সিরিয়া লেবানন এবং ইস্রায়েলেও তার দু একটি রক্তাক্ত পরিচ্ছেদ সম্প্রতি লেখা হয়েছে। তেলের ইজারা-দখল যেমন চাই তেমনই সস্তায় তেল চালান দেবার জন্য পাইপ লাইনও চাই। তেল নিয়ে যেমন বিরোধ তেমনই পাইপ লাইন চালানো নিয়েও। যুদ্ধের পরে মার্কিন তেল কোম্পানী, 'আরামকো' সৌদী আরব থেকে ভূমধ্য-সাগর পর্যন্ত তেল চালানের জন্য ট্রান্স আরাবিয়ান পাইপ-লাইন কোম্পানী খোলে। এই পাইপ-লাইন দিয়ে চালান দিলে সৌদী আরব থেকে মার্কিনের তেল ব্রিটিশের য়্যাংলো-ইরানীয়ানের তেলের চেয়ে সস্তা পড়বে। কাজেই সিরিয়ার মধ্য দিয়ে এই নতুন মার্কিন পাইপ-লাইন চালু হতে দেওয়া ব্রিটিশ স্বার্থের অনুকূলে নয়। তারপর যেমন ঘটে, সিরিয়ায় ১৯৪৯ থেকে ১৯৫১ সালের মধ্যে পর পর তিনটি সামরিক অভ্যুত্থান হল—জাইম ও হিনভী, দুই ফৌজী নায়ক ক্ষমতা দখল করল, তিন দিনের সুলতানের মতই গদি ও গর্দান হারাল। অবশেষে তৃতীয় নায়ক, শিশাকলী এখন গদীয়ান। ব্রিটিশের 'বৃহত্তর সিরিয়া' পরিকল্পনা বানচাল হয়েছে, মার্কিন তেল কোম্পানীর ট্রান্স আরাবিয়ান পাইপ-লাইন নির্বিবাদে কারবার চালাতে পারছে।

মধ্যপ্রাচ্যের খাল, তেল, সামরিক গুরুত্ব ও বৃহৎ শক্তির দ্বন্দ্বের কাহিনী এই পর্যন্ত। এর পর বলা বাকী রইল মধ্যপ্রাচ্যের স্বাধীন, পরাধীন ও আশ্রিত দেশগুলির পরিচয়, জনসাধারণের দুর্গতি, আশা আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমের কথা।

(ক্রমশঃ)

৪

আন্দাজ সাড়ে পাঁচটার সময়ে ননী ও আমি ট্রামে করে চলেছি খাঁ সাহেবকে নিমন্ত্রণ জানাতে। ননীর ছিল শৌখীন নাগরিকের বহির্ভ্রমণের বেশ, অর্থাৎ গিলে করা ধব্‌ধবে পাঞ্জাবী, শান্তিপুরের ধুতি আর গ্লেজ্‌ কিডের অ্যাল্‌বার্ট সু; অসাধারণ বলতে ছিল হাতে একগাছা ছড়ি। সে যখন রাজবাড়ি যেত তখনই ঐ ছড়ি নিত। সেদিন কথা ছিল খাঁ সাহেবকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে সে চলে যাবে রাজভবনে আর কুমারকে সাক্ষাতে সংবাদ বলবে। ট্রামের মধ্যে ননীর পাশে আমি বসে ছিলাম যেন বিদূষক, বড় জোর রাজন্যবন্ধু।

কালে খাঁ সাহেবকে আবিষ্কারের কথা আদ্যোপান্ত শুনিয়েছি ননীকে। খাঁ সাহেবের চিত্রটি কল্পনায় এঁকে নিয়ে রং ফলাতে গিয়ে বলল সে, "খাঁ সাহেব ত' তাহলে খুব নিরীহ ভাল মানুষ যতদূর বুঝা যাচ্ছে; ও'র সঙ্গে কথা বলে ত' সুখ হবে না ভাই। চট্‌পট্‌ কথা বলে না যে সে ত' একটা পাথর, পাথরে ঘা দিয়ে লাভ নেই।" আমি ননীকে বলি যে সব সময়ে ঘা দিয়ে দেখতে হবে মানুষকে এই বা কি কথা। যাই হ'ক, ও'র সামনে কোনও বীণ্‌ সেতার বা সুরবাহার বাজিয়ের কথা তুলো না, ভয়ানক চটে যান তিনি; বলে শ্যামলালজী আর তম্মুলালজীর মুখের বর্ণনাটাও বল্‌লাম ননীকে। ননী সে কথা শুনে উৎসাহিত হয়ে বলে 'তাই নাকি! তাহ'লে ত' খুব মজা। ইম্‌দাদ্‌ খাঁ সাহেবের সেদিনকার সেই দরবারীর আলাপ আর গান্ধারের কথাটা ত' পাড়তেই হয় দেখ্‌ছি!" মহারাজভবনে যে সব যন্ত্রীরা আসতেন তাঁদের মধ্যে কলিকাতাবাসী ইম্‌দাদ্‌ খাঁ সাহেবই যথার্থ সুরে মজিয়ে ছিলেন আমাদের। বিশেষ করে একদিন দরবারীর আলাপের অছিলায় বারকতক এমনভাবে এমন একটি কোমল গান্ধারের সম্মোহন বাণ মেরেছিলেন যাতে আমরা অনেকদিন মোহগ্রস্ত হয়ে ছিলাম। মূর্চ্ছার ভাবটা কেটে গেলে বাণটি নেড়ে চেড়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখি—সেই মাধুর্যের বিষটা নিঃশেষ হয়ে যেতে চায় না হৃদয় থেকে! ইম্‌দাদ্‌ খাঁ সাহেব ইনায়েত হুসেন খাঁ সাহেবের পিতা। আমার ধারণা হয়েছে ইম্‌দাদের বাজনা শুনে তাঁর ছেলেদের কারিগরী শিক্ষার আন্দাজ করতে পারি। কিন্তু ছেলেদের বাজনা শুনে ইম্‌দাদের প্রতিভা কিছুতেই আন্দাজ করা যায় না, গতেই বা কি, আলাপেই বা কি!

ননীর কথায় ভয় পেলাম আমি, বল্‌লাম, "সর্বনাশ! আর যাই করো ভাই ঐ কাজটি করো না; করলে খাঁ সাহেবের মুখে খিস্তি শুনতে হবে।" ননী বলে, "তাই নাকি! তা হ'লে ত' আরও মজা! খিস্তির মুখেই ত' আসল মানুষটা বার হয়ে পড়ে! আর নূতন বোল-চালের পাঞ্জাবী খিস্তিও শোনা যাবে। এ ত' ভাল কথা; ভয় কি?" ননীর ভাবগতিক আমার ভাল বলে বোধ হ'ল না; বল্‌লাম, "ভাই আজকের শুভলগ্নে খিস্তিটা না হয় নাই শুনলে, নাই টেনে বার করলে। তা ছাড়া, খাঁ সাহেব একটু আজব রকমের সৃষ্টিছাড়া মানুষ; চটে গিয়ে হয় ত' মুজ্‌রা নিতেই গর্‌রাজি হবেন। তাহ'লে যে বড়ো বিপদ হবে। আজকের দিনটা খোঁচাখুঁচি করো না ভাই, মুখ সামলে রাখো, দোহাই তোমার।" ননী হাল ছেড়ে দিয়ে বলে, "তাই নাকি! আগে বলতে হয় আমাকে! আচ্ছা, তুমি-যখন বল্‌ছ' তখন তাই হবে, উপায় কী।"

এ কথা সে কথার মধ্যে চীৎপুরের মোড়ের আগেই ট্রাম মন্থরগতি হয়েছে খেয়াল হ'ল আমাদের। ননী হঠাৎ বলে, "মোড়েই নামা যাক্‌। করিমের দোকানে অনেক দিন যাইনি। কিছু পেস্তা-আখ্‌রোট নিতে হবে আজ। বাকি রাস্তাটুকু হেঁটে মেরে দেওয়া যাবে, যথেষ্ট সময় আছে।" আমি ভাবলাম তাই হক। ননীর সব রকমের সাধ-আহ্লাদে বাদ সাধাও ত' ঠিক নয়; আর, খাঁ সাহেব হয় ত' এতক্ষণ নমাজে বসেছেন।

করিমের দোকান অর্থাৎ দু' নম্বরের ফলের দোকান। অবশ্য সেই দোকানের মালিক করিম নয়। তা হ'লেও আমরা দু'নম্বরের দোকানকে করিমের দোকান বলতাম। সে দোকানের সঙ্গে বেশ একটু খাতিরের সম্বন্ধ ছিল আমাদের; সখ্‌-সওগাতের জন্য ত বটেই, বিশেষ করে ননীর বচনপটুতার জন্য। আর সেই দোকানেই ছিল আমাদের সমবয়সী একটি ছোকরা, যার নাম ছিল করিম আর বাড়ী ছিল নওশেরা অঞ্চলের পার্বত্য প্রদেশে, ভারত সীমান্তের পারে কোনও গ্রামে। সে নিজেকে পাঠান বলে পরিচয় দিয়েছিল।

সুন্দর চেহারা ছিল করিমের; ফরসা রং, ডিমের মত মুখের আকৃতি, বাঁশীর মত নাক, আর নাকের নীচেই গোঁফের রেখা, চিকন পরিষ্কার। তার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ ছিল হৃদ্য, অথবা হৃদয়ের কাছ-বরাবর। সম্বন্ধটা আবিষ্কার আর রচনা করেছিল ননী—, প্রথমে একটি সাবলের ঘা দিয়ে, আর পরেই কাশ্মিরী সূঁচের ফোঁড় দিয়ে। সেই দোকানে বসে তার সঙ্গে প্রথম কথাবার্তার একটু অবকাশে ননী কি বুঝেছিল জানিনে, তার হাত ধরে অনতিদূরে একটু নিভৃতে নিয়ে এল আর মোলায়েম অথচ মজবুত স্বরে জিজ্ঞাসা করল, "অরে ইয়ার! বিয়া-সাদি করছ কবে? জওয়ানির পেয়ালা ত' ভরে উঠেছে করিব্‌-করিব্‌! এখন থেকে চুমুক না দিলে যে উছলে পড়বে!" অকস্মাৎ ঐ প্রাণখোলা ভাষণ শুনে করিমের সুরমা-টানা বড় বড় সরল চোখ দুটি সংকুচিত হয়ে যায়; যেন চোর ধরা পড়েছে রকমের ভাব তার মুখে। সামলে নিল সে একটি মাথা ঝাড়া দিয়ে। মুখের কথা বলে ধরা দিল না তখন; কিন্তু মনে হ'ল যেন তাঁর মনের দোলনই ছড়িয়ে পড়ল সেই বাবরি চুলের ঢেউএর বাহারে। পাহাড়ী দেশের ছোকরা কখনও বিয়ের কথা ভাবে না; সুযোগ নেই, অবসর হয় না, উত্তেজক কারণও ঘটে না। এ সব কথা কাহিনী শুনেছিলাম আমরা শ্যামলালজীর এমন কয়েকজন আত্মীয়ের মুখে যাঁরা হিন্দু হয়েও দু' তিন পুরুষ ক্রমে বাস করেছেন ডেরাইস্‌মাইল খাঁ অঞ্চলে; আর মাঝে মাঝে মথুরা আর কলিকাতায় এসে স্বজন বিরহের ভার লাঘব করে ফিরে যেতেন সেই দেশে।

যাই হ'ক, করিম বেচারা পাঞ্জাবে আত্মীয়ের গৃহে বাস করতে এসে একটা মনোরম ফাঁদে পড়ে গিয়েছিল; ননীর কথার চাপে মোটা-মুটি স্বীকার করল সে কথা। এর পরেই ননীর মুখে যখন গুণ্ গুণ্ স্বরে "জুলফ্ পুর্ পে'চ মে দিল্ এয়সা তো গিরফ্তার্ হুয়া, ছুট্‌না দুশ্‌ওয়ার হুয়া" গজলের সুর করিম শুনল, তখন সে একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে বসেছিল; মাথা ঝাড়া আর দেয়নি। শাবলের ঘা'এর পরেই কাশ্মিরী স'চের ফোঁড় দু'চারটি একেবারে মর্মে সন্ধান করেছে! সত্য সত্যই, সেই আত্মীয়ের বাড়ীতে একটি কিশোরীর ঝুমকা-লাগান কাণের পাশে লপেট্‌দার জুল্‌ফির পে'চের মধ্যে তাঁর মনটি আটকা পড়ে গিয়েছিল; করিমই এ সব কথা বল্‌ল ক্রমশ, প্রাণ খুলে অসঙ্কোচে। কলিকাতা শহরে করিম নূতন এসেছে, চালানি কাজ-কারবার শিখতে। কিন্তু আমাদের মত' সহৃদয় শ্রোতা পাবে কোথায় সে! ফলের দোকানে ফল কিনতে এসে ননীই আবিষ্কার করেছিল এই পাহাড়ী ফুলটি, অমন সরল প্রাণটি। দোকানের মালিক ছিলেন করিমের মুরুব্বি; কড়া নজর ছিল তাঁর এই ফুলের উপর। করিমের সঙ্গে আমাদের দোস্তির মনোভাব দেখে মনে মনে খুশীই ছিলেন; কিছু না হ'ক, ভাল খরিদ্‌দার পাকা আর কায়েমী হ'তে চলেছে।

করিমের কথা এখানেই শেষ হ'তে চায় না। স্মৃতির পথে শেষ ফলের অতিরিক্ত একটা ফুলের সুঘ্রাণও জমাট বেঁধে রয়েছে; নিষ্কিধরা প্রয়োজনের নিরপেক্ষরূপে একটা প্রেয় বস্তুরও সন্ধান রয়েছে। কালে খাঁ সাহেবের আলোর এলাকায় পড়ে গিয়েছে করিম। তবুও তার নিজের জীবনরেখার এমন কিছু স্বতন্ত্র দীপ্তিও ছিল যেটা প্রকাশ পেয়েছিল পরে, একটি ঘটনাসূত্রে।

তখন থেকে এক বৎসর পরের সেই ঘটনা। বিপিনবাবু, শচীন, আর আমি ফিরছি বেলুড় মঠ থেকে। বিপিনবিহারী দে ঈশান স্কলার দর্শনশাখায় (১৯১৪ সাল); শচীন অর্থাৎ শচীন্দ্রলাল দাস বর্মাও কম নয়, ইংরাজি সাহিত্যে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট (১৯১৪); তাঁদের সঙ্গে আমি ত' জাহাজের পিছনে জালিবোট! বেলুড় মঠে আনন্দের কালীকীর্তন দলের ধ্রুপদ শুনে আমার মন রস-সিক্ত হয়ে রয়েছে। শচীনের কথা এই যে, গান খুবই ভাল লেগেছে, তবে সেখানে অতিথিসৎকারের মধুর সরস আস্বাদটাও ত' কম নয়! বিপিনবাবু গান সহ্য করতে পারতেন না, পারতপক্ষে; আর অজীর্ণের রোগ ছিল বলে ভোজনের কাজটা সেরেছেন ভয়ে ভয়ে। আমরা যখন গান শুনছি তখন বিপিনবাবু উঠে গিয়ে নিভৃতে স্বামীজীদের সঙ্গে বোধ হয় মানব-জীবনের ইষ্টানিষ্ট প্রসঙ্গ করেছেন। সন্ধ্যার একটু পরেই ফিরছি আমরা হাওড়া ব্রিজের দিক থেকে, হ্যারিসন রোডের ডান দিকের ফুটপাথ ধরে।

ফলওয়ালাদের দোকানের কাছে একটা বাড়ির সামনে দেখি ভিড় হয়েছে, আলোর বাহারও দেখা দিয়েছে। ভিড়ের পাশ দিয়ে যেতেই প্রথমে কানে এল বিজাতীয় সুর; ক্রমশ নজরে এল পেশোয়ারীদের জমাত; রাস্তার ধারেই একটি ঘরের মধ্যে। একটু চেষ্টা করে উঁকি দিয়ে দেখি, ঘরের ভিতরে গ্যাস-লাইটের আলো আর ছায়ায় সতরঞ্চের উপর আসর। আসরে জনচারেক পেশোয়ারী, খালি মাথা, আর প্রত্যেকে একটি করে ছোট গড়নের রবাব নিয়ে এক সঙ্গে বসে গান করছে; এমন ভাষায় যা আমরা বুঝি না, এমন সুর যা আমি কখনও শুনিনি আগে। কিন্তু কী প্রাণমাতান সেই গান! আর কত সরল ছন্দের দোলা সেই গানের সুরে! তিনজনই দাঁড়িয়ে গেলাম।

ভাল করে নজর দিতে গিয়ে দেখি, আমাদের করিম সেই গায়কদের একজন! সে ত' অনেকদিন ছিল না! তা হ'লে ফিরে এসেছে। কিন্তু করিম অমন সুকণ্ঠ গায়ক আর বাদক! গানের ধারা বিচার করে বুঝলাম, করিমই মূল গায়েন; প্রথমে করিম গান করে এক কলি; শেষ করলে অন্য তিনজন এক সঙ্গে সেই কলিটি গান করে। করিম তাহ'লে পাকা গাইয়ে!

এমন সময় একজন চেনা পেশোয়ারী আমাকে দেখে সাদর অনুরোধ জানায় ঘরের মধ্যে গিয়ে বসতে। তার অনুরোধ উপেক্ষা করিনি। বিপিনবাবুকে হাতে ধরে টেনে নিয়ে আমি আর শচীন ঘরের মধ্যে আসন নিলাম। মুহূর্তের জন্য করিম আমাকে দেখে হর্ষভরা চাহনি ও আদাবমাত্র দিয়ে আপ্যায়িত করল; কিন্তু কোনও কথা বলেনি সে গানের মধ্যে। চারজন গায়ক গান করে চলেছে যেন পাগলের মত'! তাদের মাথার দোলানি আর চোখের অজানা-সন্ধানী দৃষ্টি দেখে আমাদের তাই মনে হল। সুরের ভাঁজ আর চলত্-ফিরতও ছিল অদ্ভুত, সাবলীল। মাঝে মাঝে এক একটি চরণের শেষে হঠাৎ রবাবের তান আর সঙ্গত্ বিশ্রান্ত হয়ে যায় মাত্র একটি সুরে; আর, ঠিক সেই সময়েই ব্যঞ্জনের অন্তে কোনও একটি স্বরবর্ণের প্লুত ধ্বনি আর রাগাপ্লুত কণ্ঠের আবেগ-ভরা রেশটি ঈষৎ কম্পমান রেখার মতো সুরের দিগ্‌দিগন্তরে ক্রমশ সূক্ষ্ম হয়ে মিলিয়ে যেতে থাকে; পাহাড়ী বনলতার শীর্ষে ত্বরিতচুম্বনের বিদায় সঙ্কেত জানিয়ে প্রলম্বিত নিস্বনের রূপে মিলিয়ে যায় যেন একটির পর একটি সমীরণ হিল্লোল, দূরে, সুদূরে, অতিদূরে। সে দীর্ঘশ্বাস যখন শ্রবণের সীমা পার হয়ে গিয়েছে, এক নিমিষের এক শতাংশের মধ্যেই মানসগগনের অলক্ষ্য অবকাশে ভাবের বিচিত্র তারাবলী দেখা দিতে আরম্ভ করেছে, এমন সময়ে আবার আরম্ভ হয় রবাবের "দুং দুং দোঁ দোঁ" ধ্বনি; পাহাড়ের বুক ফেটে বেরিয়ে পড়া সুদূর নির্ঝরের নিকট প্রতিধ্বনির মতই চমৎকার অলৌকিক! চারজন বাদকের হাতের চারটি জর্‌বার (রবাব্ বাজানার উপযোগী কাঠের মেজ্‌রাব একরকমের) সমকালীন এক একটি আঘাত যেন এক একটি হৃৎস্পন্দন! যন্ত্রীর না যন্ত্রের? কথার, না সুরের, না কি ছন্দের? অথবা শ্রোতারই হৃদয়ের? আমি জানি না; আমার মনে হয় সকলের; সেখানকার সব কিছু, জড় ও চেতন বস্তুরই যেন স্পন্দন সেগুলি।

পরে কতবার আমার মনে হয়েছে, যখনই করিমকে মনে করেছি তখনই মনে হয়েছে—কলিকাতার সন্ধ্যায় একতলার ঘরে বসে যদি এমন অনুভব সম্ভব হ'ল, তাহ'লে—করিমের দেশে, তার বাড়ীর জমাতের আনন্দের মধ্যে ওরকম অভিজ্ঞতা না জানি কত তীব্র অনুভূতি সাক্ষাৎ করাতে পারে! কিন্তু সে সৌভাগ্য আমার হয়নি।

গান শেষ হ'লে করিম উঠে এসে আমার হাত চেপে ধরে, কুশল জিজ্ঞাসা করে, ননীর কথা জিজ্ঞাসা করে।

আমরা উঠে বিদায় নেওয়ার সময়ে করিম ও বাড়ির কর্তা, একজন পেশোয়ারী ভদ্রলোক, আমাদের প্রত্যেককে রেকাবী করে বাদাম-পেস্তা প্রভৃতি এনে দিলেন। আমরা সেগুলি নিলাম। করিম বার হয়ে এসে ফলের দোকান পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে যায় আমাদের।

আমরা সেই ফুটপাথ ধরে চলতে চলতে গানের সুরের বিষয়ে কত কি কথা বলছি। আর পকেট থেকে বাদাম-পেস্তা আর

মিছরির টুকরা বার করে খেয়ে যাচ্ছি। বিপিনবাবু চলেছেন নীরবে: বোধহয় সময়ের অপব্যয়ের দার্শনিক তত্ত্ব চিন্তা করছেন। কলেজ স্ট্রীটের মোড়ের কাছে এসে আমাদের খেয়াল হ'ল যে, পকেটের মাল ফুরিয়ে গিয়েছে। আর কী আশ্চর্য! আমার আর শচীনের কি এক সঙ্গেই মনে হ'ল যে, বিপিনবাবুর মত' অজীর্ণ রোগীর পকেটে বাদাম-পেস্তার মত বিস্ফোরক পদার্থ থাকা বা থাকতে দেওয়া উচিত হয় না মোটেই। দাঁড়িয়ে গেলাম। বিপিন-বাবুর পকেট থেকে আমরা ঐসব বিপজ্জনক পদার্থ বার করে আমাদের পকেটে পুরলাম। বিপিনবাবুর মুখে কথাটি নেই: আমাদের ধন্যবাদ করতেও ভুলে গেলেন।

তাঁর কষ্ট হয়েছিল নিশ্চয়। সান্ত্বনা দেওয়ার ছলে বল্লাম, "বিপিনবাবু, আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে বোধ হয়?" দীর্ঘ সময়ের অন্তে এই আমার প্রথম প্রশ্ন। বিপিনবাবু আমার কথা শুনে চমকে উঠলেন যেন: ধ্যানভঙ্গের মত। বল্লেন "কি বলছেন? কষ্ট? কষ্ট হয়নি ত'! আমার জীবনে আমি এই সর্বপ্রথম গান শুনলাম। সত্য বলছি আমি। এর আগে যেন গানই শুনিনি"; বলে' গম্ভীর হয়ে চুপ করে গেলেন। এবার অবাক হওয়ার পালা আমার আর শচীনের! আমি কী জিজ্ঞাসা করলাম আর বিপিনবাবু কী ভেবে কোন্ দিক দিয়ে তার উত্তর দিলেন! সামলে নিয়ে আমি বললাম "আপনি কি স্টিফেন সাহেবের সাগরেদের মত কথা বলছেন? না কি, ইমার্সনের বুলি আউড়ে কথা বলছেন"?

আদালতে হেড্ জুরির মত দৃঢ় অবিচলিত স্বরে বিপিনবাবু বললেন "না, মোটেই না। আমার নিজের মনের কথাই ত ভাবছিলাম এতক্ষণ। মনের কথাই বলছি, আমি যেন একটা নূতন রকমের জগত প্রত্যক্ষ করলাম ঐ পেশোবারীদের গান শুনবার সময়ে। ভাবছি হয়ত আমার একটা ফ্যাকাল্‌টি চাবি-বন্ধ ছিল। আজ সেই ঘরের দরজা জানালা খুলে গেল। কেমন করে এটা হ'ল তাইত ভাব-ছিলাম এতক্ষণ"।...

দিন কয়েক বাদেই শচীনের সঙ্গে দেখা হল। সে বল্লে বিপিনবাবু আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, তিনি একটা হারমোনিয়ম কিনবেন, আমি সঙ্গে না থাকলে হবে না। আশ্চর্য বটে! ধীর স্বল্পবাক্ দার্শনিক বিপিনবাবু যাঁকে বাঙলা বা হিন্দি কোনও গান শুনিয়ে কিছুমাত্র প্রভাবিত করতে পারিনি আমি বা অন্য কেউ, তিনিও সুরের ফাঁদে পড়লেন। আর তিনি ধরা দিলেন পষতু ভাষার গানে আর পাহাড়ী সুরে! শ্রুতির তূণীরে বাইস বাণ; সুরের জালে বদ্ধ আমরা: কখন কোন বাণে ঘায়েল হই জানিনে।

করিমের স্মৃতি সহজেই উদিত হয়; কিন্তু অত সহজে বিদায় নেয় না তার সেই পাহাড়ী দেশের গান আর সুর: যে সুর বিপিনবাবুর মনে অনুভবের নূতন রাজত্ব আভাসিত করে দিয়েছিল। এখন প্রসঙ্গে ফিরে যাই।

চিৎপুরের মোড়ে ভিড়ের মধ্যে ননী আর আমি অগ্রসর হচ্ছি। দু নম্বরের দোকানের দিকে আমার দৃষ্টি গিয়েছে কি আমি থেমে যাই! দেখি সেই দোকানের সামনে রাস্তার ধারেই স্বয়ং কালে খাঁ সাহেব, মনে হল যেন একটা টুলের উপর বসে তিনি! এমনটি ত আশা করিনি।

ননীর হাত চেপে ইশারা করলাম, ননী দাঁড়িয়ে গেল: তৎক্ষণাৎ বল্লোম তাকে সাক্ষাৎ খাঁ সাহেব বসে রয়েছেন ঐ দেখ। ননী খাঁ সাহেবকে দেখ্‌লে, প্রথমবার। খাঁ সাহেব অবশ্য আমাদের লক্ষ্য করেন নি তখন। ননী ভাল করে এক টিপ নস্য নিয়ে নাক-মুখ পরিষ্কার করে নিল রুমাল বার করে। বল্লে "চলো, পাকড়াও করা যাক।"

একটু এগিয়ে যেতেই দু'তিন জন পেশোবারী ননীকে দেখেই বল্‌তে আরম্ভ করছে "সেলাম বাবু সাব্" "আইয়ে বাবু-সাব্, ইধার আইয়ে"। তাদের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ননী এগিয়ে চলে পালোয়ানী ঢংএ বুক চিতিয়ে: আমিও চলি সেই করিমের দোকানের দিকে।

তখনও সন্ধ্যা হয়নি যদিও দোকানে আলো জ্বলছে। করিমের দোকান থেকে একজন চেনা লোক চট্ করে বার হয়ে আসে, ননীকে ও আমাকে সেলাম্ জানায়; আর দু' হাত আগলে দাঁড়ায়, মতলব এই যে আমাদের আর অগ্রসর হতে দেবে না সে। আমি প্রায় পাশ কাটিয়ে উঠেছি। ইতিমধ্যে ননী জোর গলায় প্রায় ধমকের সুরে বল্লে অরে, "হটো মিঁয়া। দেখতে নহি সামনা পর হিন্দু-স্তানকে রিঝানেওয়ালা খুদ্ বৈঠে হুয়ে হ্যাঁয়! পহ্‌লে উন্‌সে মুলাকাত হো যায়, বন্দ্‌গি করেঁ; তবু পিছে লেন্‌দেন্ কি বাত। ঘবড়াতা কেঁও"। রিঝানেওয়ালার অর্থ যে আনন্দ সঞ্চার করে।

ননীর কথা শুনে লোকটি হাত নামিয়ে নিল; ঘাবড়াবার ছেলে নয় সে; কিন্তু ননী, অর্থাৎ তাদের ডাক্‌টর সাব্ কালে খাঁ সাহেবকে চেনে এইটাই তার পক্ষে যথেষ্ট কথা। ননী আর আমি খাঁ সাহেবের সামনে উপস্থিত হয়ে বন্দগি জানালাম। খাঁ সাহেব আমাদের দেখে উঠে দাঁড়িয়েছেন, প্রতি-নমস্কার করেছেন। আর কিছু হয়ত বলতেও যাচ্ছিলেন: কিন্তু ননীর একটা কথায় খাঁ সাহেব স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। ননী ফলওয়ালাদের উদ্দেশে মুরুব্বিয়ানার গলায় প্রায় চিৎকার করে আর তিরস্কার করে বল্লে যে, তারা এমনই গঁওয়ার (গ্রাম্য) বে-আক্কেল্ লোক যে, খাঁ সাহেবের মত বুজুরগ্ শরীফকে একটা রদ্দি না-কামিল্ (বস্‌বার অযোগ্য) তিপাইয়ের উপর বসিয়ে রেখে তাঁকে তক্‌লিফ্ দিচ্ছে! হায়, হায়, ক্যা শরম্‌কি বাত্! সারা কল্‌কত্তা শহরের বদ্‌নামি হ'ল আজ! আর ভাই, চেয়ার-টেয়ার কিছু থাকে ত' বার করো; জল্‌দি।

বাস্তবিক, সেই টুলটার চারটি পায়া থাকলেও, একটি পদ ছিল বিপদের কারণ হয়ে: তাছাড়া, বাইরে সাধারণের মধ্যে খাঁ সাহবকে টুলে বসতে দেওয়াও ত' অসম্মান-জনক, বিশেষ যখন দোকানে চেয়ার রয়েছে। কিন্তু—তখন আমরা জানতাম না যে—ডেরা থেকে বার হয়ে এসে খাঁ সাহেব নিত্যনৈমিত্তিকরূপেই ঐ দোকানটিতে বসেন; এটা তাঁর প্রথম হল্‌টিং স্টেশন্। আর চতুষ্পদ চেয়ার ও চতুষ্পদ টুলের পার্থক্যটা খাঁ সাহেবের পক্ষে এমন কিছু ইতরবিশেষ নয়।

ননীর সেই চেহারা আর তার সঙ্গে মুরুব্বিয়ানার চাল্-চাল্ দেখেই বোধহয় খাঁ সাহেব অবাক্ হয়েছিলেন। দোকানীরাও যেন একটু লজ্জিত বোধ করেছিল ননীর কথায়; তাড়াতাড়ি করে একখানা চেয়ার বার করে ফেল্‌লে। ননী খাঁ সাহেবের হাত ধরে টেনে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে তবে ছাড়ে। ইতিমধ্যে করিম' ভিতরে ছিল, ননীর হাঁক-ডাকের চেনা আওয়াজে সে বার হয়ে এসে দাঁড়াল, নমস্কার করল আমাদের। সে হয়ত ভাবছিল, আমরা দু'জন কি করে, কবে খাঁ সাহেবের সঙ্গে চেনা-পরিচয় করেছি।

একটিমাত্র খালি টুল, আর তার পাশেই অতিথিসৎকারের মামুলী বেঞ্চ। আমরা বস্‌ব বস্‌ব করছি এমন সময়ে খাঁ সাহেব দাঁড়িয়ে উঠে করিমের দিকে তাকিয়ে উচ্ছ্বাসের আওয়াজে বল্লেন, "লাহলওয়েলা

কুবত্! দো কুরসি ঔর ভি ত' নিকালো। ক্যা, ইন্‌লোগ্ খাড়ে রহেঙ্গে?" করিম ছুটে যায় আর কি; এমন সময় একজন আর একখানামাত্র চেয়ার উঠিয়ে নিয়ে এল; তৃতীয় চেয়ার আর নেই। আমি ননীকে চেয়ারে বসতে বলে নিজে টুলখানি টেনে নিয়ে বসলাম। করিম আর দোকানের লোকজন শশব্যস্ত হয়ে উঠেছিল এতক্ষণ; এখন তারা স্বস্তি লাভ করল যেন।

ননী সুস্থির হয়ে বসে পকেট থেকে দামী সিগারেট্ কেস্ বার করে তা থেকে একটি নিয়ে খাঁ সাহেবকে নিবেদন করে আর দিয়াশলাই কাটি বার করে খাঁ সাহেবকে সাহায্য করে। নিজেও একটা ধরিয়ে নিল; করিমকেও দিতে গেল, কিন্তু করিম আদার্ব্ জানিয়ে বল্‌ল, মাফ করুন। ননী সিগারেট্ ব্যবহার করত কদাচিৎ; কিন্তু কেস্‌টা বোঝাই করে নিয়ে বাড়ি থেকে বার হ'ত সর্বদা।

দু'জনার মুখ বন্ধ। আমিই আরম্ভ করলাম; বল্‌লাম ইনি আমার চচেরা ভাই (খুড়তুত ভাই), ডাক্‌টর্, রইস্ আদ্‌মি; আর সুর বলতে নিহায়েত্ রাগিব্ (অত্যন্ত আসক্ত) ইনি; আমার মুখে আপনার কথা শুনে ইনি আর থাকতে পারলেন না। বল্‌লেন, চলো ভাই খাঁ সাহেবকে দরসন্ করে আসি; ইত্যাদি করে শেষে বল্‌লাম, মহারাজ নাটোরের রিস্তাদার ইনি; আপনার সামনে কিছু আরজ্ করবেন; বলে ননীকে ইশারা করলাম, অর্থাৎ সেই যেন খাঁ সাহেবের নিমন্ত্রণ সংবাদটা জাহির করে, তার মুখে মানাবে ভাল।

ননী সে রাস্তায় গেল না। বল্‌লে "খাঁ সাহেব বুরা মত্ সমঝিয়ে। আপনার ডেরাতেই যাচ্ছিলাম আমরা, দৌড়তে হুয়ে (যেন দৌড়তে দৌড়তে)। সিরফ্ একটা মৌজ্ আর খেয়ালের বশেই আমরা এখানে নেমে পড়েছিলাম। বলুন ত', যদি এখানে না এসে পড়তাম, কী মুশকিলই হ'ত! আপনার পত্তা পেতাম না, বুক চাপড়ে হায় হায় করে ফিরে যেতাম মুলাকাত্ হওয়ার ভাগ্য নেই বলে"। খাঁ সাহেব যেন কথার খিলাফ্ করেছেন এমন একটা প্রচ্ছন্ন অভি-যোগের সুর ছিল ননীর গলায়।

ননীর কথার দোষ নিলেন না খাঁ সাহেব। লজ্জিতও হলেন না। চেয়ারে সোজা হয়ে বসে হঠাৎ পাশের দিকে তাকিয়ে বিড়্ বিড়্ ধ্বনি করে পরে গম্ভীর স্পষ্ট স্বরে বল্‌লেন "হর্‌গিজ্ নহি (কখনও নয়) ডাক্‌টর সাব্! এয়সা হো নহি সক্‌তা। খোদাকা মর্জি হৈয়ে হ্যায় কে ইসি জাগাহ্ পর আপ্ ঔর হামারা মুলাকাত্ হোয়ায়গি। ত' ফির্ ক্যা কহুঁ উন্‌কে রহম্ ঔর মর্জি'কে হিসাব"! অর্থাৎ ঈশ্বরের ইচ্ছায় আজ এখানে মুলাকাত্ হওয়াটা ছিল, তাই হয়েছে। আর, তাঁর ইচ্ছা আর কৃপার হিসাব-নিকাস আমি কি করে দিব?—ওরকমের কথা হ'ল শেষ কথা; ওর কি জবাব আছে, না হয়!

কথাটা শুনে ননী একটু থেমে যায়; পরে ঘাড় নেড়ে তারিফ করতে করতে বল্‌ল "বহুত্ ঠিক বাত্ বললেন, আপনি; এর জবাব নেই" বলেই করিম আর অন্যদের দিকে তাকিয়ে বল্‌ল "কী ছাই লেন্-দেনের কথায় মস্ত হয়ে আছ ভাই! খাঁ সাহেবের কথাটা একবার খেয়াল করলে না হায় হায়!" তারা খেয়াল করেছে। ননীর কথা শুনে এখন তারা জোরে মাথা নেড়ে জানিয়ে দেয় যে, তারা খেয়াল করেছে। এরই মধ্যে ননী আমাকে চাপা গলায় জানিয়ে দিল যে খাঁ সাহেব একজন প্রচ্ছন্ন সাধক, যে সে লোক নয়; তবে সেটা আমি এখন বুঝতে পারব না। কথাটা আমার প্রাণে লাগেনি। খোদার মর্জি আর ভগবানের কৃপার বুলি শুনে শুনে কান পচে গিয়েছে; ওগুলি ত' কথার মাত্রা। যাই হ'ক, ননী খাঁ সাহেবকে বল্‌ল "ইনি আমার ভাই। আপনি কী এক আজব্ আসাওরি এঁকে শুনিয়েছেন আর ঘায়েল করেছেন এঁকে। আপনি ত' মনে হচ্ছে যেন খোদার তরফের লোক; সব কিছু জানেন বুঝেন। এখন আমার নসিবে আপনার গান শুনতে পাওয়া আছে কি না মেহেরবানি করে বলুন।" ননীর কথায় চপলতা বা ঠাট্টা-তামাশার সুর একেবারেই নেই যেন।

খাঁ সাহেব তেমনি নির্বিকার স্বরে বল্‌লেন খোদাই জানেন খোদার মর্জি আর আপনার নসিবের নতিজা (শেষ ফল)! আমি কী জানি কি হবে! ননী একেবারেই নির্বাক হয়ে যায়। ননীর একটা দুর্বলতা ছিল: কাউকে সাধক মনে করে ফেল্‌লে তার কথার জোর কমে যেত; শুন্‌বার আগ্রহটাই প্রবল হ'ত। আমি থাকতে পারলাম না চুপ করে।

খাঁ সাহেবকে বল্‌লাম আপনি হয়ত মহারাজ নাটোরের নাম শুনে থাকবেন। বাংলা মুলুকের পুরানা শাহী শরীফ্ ঔর সিল্‌সিলা (রাজগৌরব ও বংশপরম্পরা) চলে এসেছে আজ পর্যন্ত। এখনকার মহারাজ নাটোর আপনাকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন আর অনুরোধ করেছেন আগামী কালের সন্ধ্যায় আপনি তাঁর ভবনে তশ্‌রিফ্ নিয়ে যান; আর, কিছু সুর আর রাগের সকল্ জাহির করে খুশী ঔর ইনায়েত্‌কি খুশ্‌বু ডাল দেঁ (আনন্দ আর পরস্পর প্রীতির সুঘ্রাণ ছড়িয়ে দেন)। মেহেরবানি করে বলুন আপনার সুবিধা হবে কি না। আপনার রাজীর কথা শুনে তবে আমরা খবর দেব আর প্রস্তুত হয়ে থাকব"।

আমার মুখের প্রস্তাব শুনে খাঁ সাহেব আদাব জানাতে জানাতে বল্‌লেন "বহুত্ খুশিকি বাত্! মগর আপকো বড়ি তক্‌-লিফ্ হুয়ি হোগি, মেরে খুশিকে লিয়ে;" বলে চেয়ার থেকে উঠে এসে আমার হাত চেপে ধরলেন। আমিও উঠে দাঁড়ালাম; কিছু বলতে বা করতে সাহস হ'ল না। কারণ, দেখি তিনি উপরে নজর করে কি একরকম মন্ত্র আউড়ে যাচ্ছেন! একটু পরেই উৎফুল্ল নয়নে ননী আর আমার দিকে চেয়ে বল্‌লেন "খোদা আপনাদের ভাল করবেন। আর আমি তাঁর কাছে দোয়া চেয়েছি আপনাদের হৃদয় যেন এরকম লুতফ আর সখাওত্ (সৌজন্য) দিয়ে ভরা থাকে।" তাঁর হৃদয়ে কি ব্যাপার হচ্ছিল আমি জানিনে। কিন্তু—তাঁর হাত দু'খানি অনুভবে মনে হয়েছিল সুখোষ্ণ আর কোমলস্পর্শ। আমাদের হৃদয় সর্বদার জন্য আনন্দ আর সৌজন্য দিয়ে ভরে যায়নি; দুঃখ, দৈন্য হিংসায় মলিন হয়েছে কখন কখনও। কিন্তু একথা বলতে পারি তাঁর প্রার্থনা আর আশিসের বচন আমাদের হৃদয় থেকে মুছে যায়নি।

খাঁ সাহেবকে বসতে অনুরোধ করলাম। তিনি বসলে জিজ্ঞাসা করলাম "তাহ'লে আপনি রাজি আছেন এ সংবাদ পাঠিয়ে দিতে পারি?" তিনি বললেন "জরুর, বেশক্ আপ্ ইস্ বাতকো খবর ভেজ্ দিজিয়ে। ময়্ তৈয়ার রহুঙ্গা ঔর আপকা ইন্তিজার করুঙ্গা। মগর"; তাঁকে কথা শেষ করতে দিল না ননী। ননী তাঁকে বল্‌ল আগামীকাল এরকম সময়ে আমার এই ভাই আপনার কাছে আসবেন এখানেই আসবেন, আর আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন রাজভবনে।

ননীর কথা শুনে খাঁ সাহেব তাকে বল্‌-লেন "বহুত্ মেহের্‌বানি হ্যায় আপকি। অব্ দেখিয়ে ডাক্‌টর সাব্! আপ্ নসিবকা জিক্‌র করতে থে; খোদা উস্ বাতকো মন্‌জুর কর রখ্‌খা হ্যায়, ন-মালুম কর্‌বসে! খএর্, আপ্‌তো জল্‌সেমে তশরিফ্

লায়েংগে?" ননী একরকমের হাত ঘুরিয়ে বলে "অজী! হামারা জিক্‌র্‌কা জিক্‌র্‌ ছোড় দিজিয়ে, খাঁ সাব্‌! হাম্‌ ত' বিল্‌কুল নালায়েক হ্যায় ঔর আপ্‌কে অধিন্‌ হ্যায়। আপ্‌ বুজ্‌রুগ্‌ হ্যাঁয়, আপকা মুহসে যোঁ বাত্‌ নিকলেগি উসি বাত্‌ কায়েম্‌ হো যায়েগি! জী হাঁ, জলসেমে ম্যায় জরুর হাজির রহুংগা।" ননী আর আমি প্রায় একসংগেই বল্‌লাম যে ওস্তাদ্‌ বিশ্বনাথ রাওজীও থাকবেন; কুমার বাহাদুর ত' বিশ্বনাথজীর শাগিরদ্‌। আরও সব কদরদান সমঝদারেরা থাকবেন আশা করছি।

খাঁ সাহেব তম্বুরা আর সংগতীর প্রসংগ করতে তাঁকে ঐ বিষয়ে নিশ্চিন্ত করলাম আমি; বল্‌লাম কম্‌সে কম্‌ দো তম্বুরা মজুদ্‌ রয়েছে আপনার জন্য আর স্বয়ং বিশ্বনাথজী সংগতীয়া নিয়ে আসবেন। খাঁ সাহেবের চরিত্রগত ব্যাপার পরীক্ষা করতে বাবুসাব আজ সকালে আমার সংগে বাসায় গিয়েছিলেন। খাঁ সাহেবের কথা শুনে করিম খুব আশ্চর্য হয়ে যায়, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে; আমি করিমকে বল্‌লাম যে আমি আর আমার অন্য এক ভাই খাঁ সাহেবের দরসন্‌ পেয়েছিলাম আজই সকালে।

এমন সময়ে ননী খাঁ সাহেবকে বল্‌ল "বিশ্বনাথরাওজীর মুখে আপনার বীণ্‌ বাজনার প্রশংসা শুনেছি। যদি মেহেরবানি হয় ত আপনার বীণটাও সংগে করে নিয়ে গেলে হয় না কি?" বুঝলাম, ননীও খাঁ সাহেবের চরিত্রগত ব্যাপারে পরীক্ষা করতে চায়! খাঁ সাহেব কিন্তু সপ্রতিভ হয়েই বল্‌লেন যে তাঁর বীণাটি এখানে নেই, লাহোরে ছেড়ে এসেছেন! সেই এককথা! হাজার হ'ক, খাঁ সাহেব ভদ্রলোক! লাহোর ছাড়া অন্য কোনও স্থানের নাম করলেন না তিনি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল তিনি যথার্থই বীণ্‌ বাজাতেন কোনও কালে।

ননীর কথার হাওয়া পালটে দেওয়ার জন্যই আমি জিজ্ঞাসা করলাম খাঁ সাহেবকে "আপনি কি এখন ডেরায় ফিরবেন? নাকি, অন্য কোথাও যাবেন?"

খাঁ সাহেব জানালেন তিনি ডেরায় যাবেন না, এখনি একজন লোক আসবে তার সংগে যাবেন মেছুয়াবাজারে। বল্‌তে বল্‌তেই একজন লোক এসে সেলাম করে দাঁড়াল! তখনই আমার মনে হ'ল ভাগ্যে ননী আর আমি ফলওয়ালাদের দোকানে এসেছিলাম, না হ'লে আজ খাঁ সাহেবের দেখাই পেতাম না এবং খাঁ সাহেব আমার আসার ভরসা না করেই ডেরা থেকে বার হয়ে পড়েছিলেন! কেন তিনি মেছুয়াবাজারে যাবেন বুঝলাম না, কিন্তু জিজ্ঞাসা করাটাও উচিত মনে করিনি।

খাঁ সাহেব আমাদের কাছে বিদায় নিয়ে চলে যাবেন এমন সময়ে ননী আর একটি সিগারেট বার করে খাঁ সাহেবকে ভক্তি করে। আমরা দাঁড়িয়ে উঠে আদাব জানাই; খাঁ সাহেব চলে গেলেন। ননী বলে ভাগ্য আমরা ট্রাম থেকে নেমেছিলাম।

ননী তখন বাদাম পেস্তা আখরোট কেনার দিকে মন দিল। করিম ছিল আমার কাছে। করিমকে খাঁ সাহেবের কথা জিজ্ঞাসা করতে সে খুব শ্রদ্ধার সুরে আমাকে কিছু বৃত্তান্ত বলে গেল; মোটকথা—খাঁ সাহেবের সংগে আলাপ হয়েছে পাঞ্জাবে। খাঁ সাহেবকে আপন বাপ-দাদার মত ভক্তি করে সে। খাঁ সাহেব পীর-বুজ্‌রুগ্‌ রকমের লোক, খুব অদ্ভুত লোক, দুনিয়ায় কিছু পরবা করেন না। যাঁর বাড়ীতে আছেন সেখানে খাওয়া-দাওয়া করেন না; মাসের মধ্যে প্রায় কুড়ি দিন এখানে পাশের হোটেল থেকে আনিয়ে নেওয়া রুটি-তরকারি আহার করেন। এই দোকানের মালিক অর্থাৎ করিমের মুরুব্বিই সে খরচ বহন করেন এবং সে বিষয়ে তদারক করেন।

বলতে বলতেই করিমের ডাক পড়ে, করিম দোকানের মধ্যে চলে যায়। একটু পরেই দোকানের মালিক, করিম আর ননী এসে দাঁড়ায় বাইরে যেখানে আমি বসে। ননীর হাতে বেশ বড় একটা মালের পুট্‌লি, মালিকের হাতে ঐ রকম আর একটা পুট্‌লি। মালিক সাহেব (বড়ই দুঃখের কথা এর নামটি ভুলে গিয়েছি, অথচ ননীও নেই যে জিজ্ঞাসা করব) ঐ পুটলিটা আমার হাতে দিয়ে অনুরোধ করলেন যে এ উপহার আমাকে নিতেই হবে; যৎসামান্য নজ্‌রানা এটা আজকের আনন্দের দিনে। আমি একটু আম্‌তা আম্‌তা করতেই মালিক আর করিম অত্যন্ত সরল ভাষায় বলল যে আমি যদি খাঁ সাহেবকে কচুরি-জিলেবীর নাস্তা করাতে পারি, ত' এঁরা আমাকে সামান্য মেওয়াও কি খাওয়াতে পারেন না! আমি একেবারেই নির্বাক হয়ে গেলাম তখন। তাঁদের মনোভাবের সম্মান করার মত কথা খুজে পাইনি! আমি যদি সেই পাহাড় অঞ্চলের সরল ভাষা জানতাম, আর তাদের মত সরল হৃদয়ে ব্যাপারটা বুঝতাম তাহ'লে বোধ হয় কিছু ধন্যবাদ বা আর কিছু কথা বলতে পারতাম। আমি সভ্য শিক্ষিত জগতের লোক। আমার তরুণ প্রাণ যত বা অস্থির, চঞ্চল আমার মন তত বা সন্দেহকাতর; আর হৃদয়ের মধ্যে স্থায়ী বিশ্বাস বলতে কোনও কিছু দেখা দেয়নি। কিন্তু সেই মুহূর্তের একটা সৌন্দর্য অনুভব করেছিলাম আর বুঝেছিলাম লৌকিকতার কৃত্রিম উত্তর দিয়ে আমার নিজ হৃদয়কে কলুষিত করব না।

ননীর পক্ষে সরাসরি রাজবাড়ী যাওয়া সম্ভব হ'ল না। আমরা দুজন যখন বাসায় ফিরছি তখন ননী ও আমার মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। ননী বলে খাঁ সাহেব একজন প্রচ্ছন্ন সাধক; আমি বলি খাঁ সাহেব একজন সরল আর গোটা মানুষ। ননী মানুষের মধ্যে সাধক খুজে বার করার চেষ্টা করে; আমি খুঁজি মানুষের মধ্যে যেটা আসল, তাজা মানুষ। অনেক তর্কের পর তবে আমাদের মধ্যে সাময়িক রফা হয়ে গেল। মানুষের মধ্যে প্রচ্ছন্ন সাধক বলে ননী যাকে শ্রদ্ধা করছে—সেইটেই হ'ল মানুষের মধ্যে আসল মানুষটি যাকে আমি চিনে নেওয়ার চেষ্টা করছি। এককথায় প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আসল মানুষটি প্রচ্ছন্ন সাধক; আর বাইরের নকল মানুষটি হ'ল সমাজের ছাপ দেওয়া একটি জড় ও চৈতন্যের পিণ্ড।

(ক্রমশ)
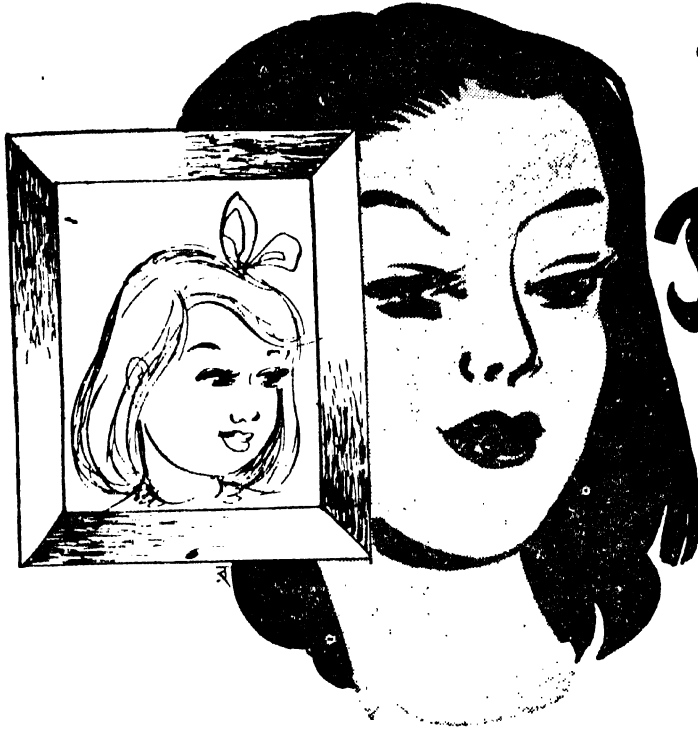
তা হলে একটা গল্প বলি, শোনো—পাঁচুদা বললেন, আমাদের ছেলেবেলার গল্প।

নিশ্চয় ভূতের? রাসবিহারী সিগারেটের টুকরোটা ছুঁড়ে দিয়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসলো।

ভূতের কি—পাঁচুদা এক মুহূর্তে রাসবিহারীর মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবলেন। পরমুহূর্তেই আবার বললেন, ঠিক যে ভূতের তা নয়, বাসু। তবে ভূতেরও বলতে পারো। গল্পটা যদিও সে বয়সের, যে বয়সে আমাদেরও তোমার মতন মরাল—রেসপন্সিবিলিটির ভূত ঘাড়ে চেপেছিলো, কিন্তু আসলে সব মানুষেরই সব বয়সের গল্প সেটা।

কথা শেষ করে পাঁচুদা নীরবে অর্থপূর্ণ হাসি হাসলেন। রাসবিহারী বোধ হয় আরও বিরক্ত হলো। আমরা পাঁচুদার গল্পের অস্পষ্ট ইঙ্গিতটাকে অনুমান করতে পেরে পুলকিত হয়ে উঠলাম। 'বলুন পাঁচুদা, বলুন।' অরুণ বললে, বসে পড় রাসু, পাঁচুদার গল্পটা শোন্। আখেরে তোর কাজে দেবে।

কয়েক মিনিট চুপচাপ চোখ বুজে পাঁচুদা বোধ হয় কাহিনীটা সাজিয়ে নিলেন। তারপর চোখ খুলে ধীরে ধীরে শুরু করলেন—

আমরা ছিলাম তিন বন্ধু; বীরু, তিনু আর আমি। কতোই বা বয়স হবে তখন আমাদের, বড় জোর বছর বারো-তেরো। থাকতাম ধানবাদে—; ডোমপাড়ায়, রেলকোয়ার্টার্সে। পড়তাম পুরোনো স্টেশনের 'এ্যাকাডেমি'তে।

ধানবাদ বাজার ছাড়িয়ে ডোমপাড়া। আমরা যখন ছিলুম তখন ওপাশটায় ক্রমাগত রেল কোয়ার্টার্স তৈরি হচ্ছে। লোক বাড়ছে দিন-দিন। অবশ্য তাতে আমাদের কিছু যেতো-আসতো না, কারণ পাড়ার পুরোনো লোক আমরা। সমবয়সী মহলে আমাদের আধিপত্য একচ্ছত্র। সেখানে নতুন কারুর হাত দেবার সাহস হতো না, আর কেউ যদি দিতো তাকে আর আস্ত রাখতুম না।

ডোমপাড়ায় ঢুকতেই ডানহাতি যে ব্লকগুলো সারবন্দিভাবে দাঁড়িয়ে আছে তারই একটাতে থাকতাম আমি এবং আর একটাতে তিনু। আমার বাবা এবং তিনুর বাবা দু'জনাই ছিলেন রেলের চাকুরে। বীরুর বাবা কাজ করতেন ধানবাদ বাজারের সবচেয়ে চোখ-ধাঁধানো বিরাট এক সাহেবী দোকানে 'গ্রেগারী ব্রাদার্সে'। থাকতেন কাছাকাছি ভাড়াটে বাড়িতে। মোহিত কাকাবাবু কি কাজ করতেন তা জানি না, তবে বীরু প্রায়ই পকেট ভর্তি করে লজেন্স, টফি, বিস্কুট—এমনি কতো কি নিয়ে আসতো। আর আমরা সেই সব পকেটে করে হাজির হতাম বরফ সাহেবের বাড়ি। বরফ সাহেবের মেয়ে—জিনির কাছে।

বরফ সাহেব! নামটা শুনে কেমন যেন লাগছে তোমাদের না? সেই ছেলেবেলায় আমরাও যখন বরফ সাহেবের কথা প্রথম শুনেছিলুম, কেমন যেন অদ্ভুত লেগেছিলো। যখন ভাব হলো, যাওয়া-আসা শুরু হলো, বৃদ্ধি পেলো অন্তরঙ্গতা তখন কিন্তু আর অদ্ভুত লাগতো না। আর কেই বা তাঁর নাম দিয়েছিলো বরফ সাহেব তাও জানতে চাইনি, ইচ্ছেই করেনি। আজও জানি না কি তাঁর আসল নাম!

আমাদের পাড়াতেই, জোড়াফটক যাবার পথে ডানদিকে বিরাট সাদা পাঁচিল-তোলা ফটক লাগানো প্রকাণ্ড এক বাড়ি ছিল।

বাড়িটা বরফ কলের। ওই পাঁচিলের মধ্যে এক পাশে টালি আর খাপরা-ছাওয়া ছোট্ট একটা কটেজ, অনেকটা দিশী-বাঙলোর মত। গীর্জার চূড়োর মত সে বাড়ির মাথাতেও এক চূড়ো ছিল। লতানো গাছে শ্যাওলা-মাখা সে চূড়ো ঢাকা থাকতো অনেকটা। কতো রকমের ফুল দেখেছি সেই চূড়োর গায়ে।

এই বাড়িতেই থাকতেন বরফ সাহেব। ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এক কটেজে। সামনের ছোট্ট বাগানে ঋতু বদলের সাথে সাথে নানান ফুল ফুটতো। বারান্দায় থাকতো ক্রোটনের টব। একটিমাত্র টব ছিলো জিনিয়া ফুলের। একেবারে সাদা—বরফের মত ধবধবে ফুল দেখতাম সেই টবে—একটিই ফুল শুধু। বরফ সাহেব নিজের হাতে কি সব করতেন যেন, আর সম্বৎসর সেই টবে ফুটিয়ে রাখতেন নিঃসঙ্গ একটি জিনিয়া ফুল, একটি-দুটি কুঁড়িও! দুটি ফুল কখনো আমরা সে গাছে দেখিনি। শুনেছি, দুটি কুঁড়ি ফুটবো ফুটবো হলেই একটি তিনি কেটে সরিয়ে ফেলতেন। কোথায় তা জানি না, বরফ সাহেবের মেয়ে জিনিয়া। হ্যাঁ, বরফ সাহেবের মেয়ের নাম ছিল জিনিয়া—আমরা অবশ্য বলতুম জিনি. লোকে বলতো বরফ সাহেবের মেয়ে—সেই জিনি বলতো, একটি ফুল বরফ সাহেব তার মাকে স্বর্গে পাঠিয়ে দেয়। আমরা চোখ বড় বড় করে সে কথা শুনতাম আর ভাবতাম বরফ সাহেব নিশ্চয় মন্ত্র-তন্ত্র জানেন।

বরফ সাহেবের বাড়িতে কিসের যেন যাদু মাখানো ছিল। সে বাড়ির বারান্দায় সকাল থেকেই ছায়া নামতো, সবুজ রঙ্-করা বেতের চেয়ার-টেবিলগুলো সারাদিন অসাড়ে ঘুমুতো, হাওয়ায় হাওয়ায় পর্দা দুলতো ঘরের থেকে থেকে, খাঁচার টিয়া পাখিটা থেকে থেকে ডেকে উঠতো, দূর থেকে ভেসে আসতো ঘুঘুর ডাক, আর বরফ কলের শব্দও নিরবচ্ছিন্ন বেজে চলতো কানের কাছে।

আমরা—বীরু, তিনু আর আমি আমরা নিত্যই যেতাম সেখানে। বরফ সাহেব আমাদের খুব ভালোবাসতেন। বেঁটে-খাটো, গোলগাল, মাথায় পাকা চুল, চোখে কান-জড়ানো চশমা আমাদের সেই বরফ সাহেবকে আজো যেন স্পষ্ট মনে ক'রতে পারি। আমরা যেন ছিলাম তাঁর বন্ধু, কি নাতির দল। আমাদের গ্রাউণ্ডে ফুটবল খেলা থাকলে বরফ সাহেব কল থেকে আধ চাঁই বরফ দিয়ে দেন, দিয়ে দেন অমন দশ-বারো বোতল লেমনেড্। একটা রূপোর কাপ কিনে দিয়েছিলেন তিনি আমাদের। সেই কাপ খেলা হতো ফুটবল সিজিনে। বরফ সাহেব ছিলেন তার কর্মকর্তা। ক্রিকেট খেলার মরশুমে তিনি আমাদের ব্যাট, উইকেট, বল সব কিনে দিতেন। তাছাড়া সর্বত্রই তো তিনি আমাদের। সরস্বতী পুজো করতাম বরফ সাহেব চাঁদা দিতেন দশ টাকা। নিজে এসে ঠাকুর সাজাতেন, বিসর্জনের সময় সঙ্গে যেতেন সবার আগে, বরফ সাহেবের মেয়ে জিনি এসে অঞ্জলি দিতো।

আমরা তিন বন্ধু বরফ সাহেবকে আরো ঘনিষ্ঠভাবে পেয়েছি তাঁর বাড়িতে। ফাঁক পেলেই তিনি আমাদের সঙ্গে লুডো, স্নেকল্যাডার, ক্যারাম, হর্সরেস কতো কি খেলতেন। আমাদের নিয়ে বেড়াতে বেরুতেন বরফ-কল ছাড়িয়ে ধানক্ষেত আর মাঠের মধ্যে, কবরখানার শেষে যে চাঁদমারি আছে সেখানে। আমরা ছুটতাম—বীরু, তিনু, আমি আর জিনি। বরফ সাহেব রুমাল উড়িয়ে স্টার্ট দিতেন। খেলতাম। কাণামাছি। বেশির ভাগ সময় বরফ সাহেব হতেন চোর। তাঁর চোখ বেঁধে দিতাম আর তিনি ছড়ি দিয়ে দিয়ে বাতাসে আঁক কাটতেন—হ্যাই বীরু, ক্যাঁহা গিয়া? তিনু, তোকে ধরবো এবার। জিনি—জিনি —শয়তান পাঁচুটা কোথায় রে?

বরফ সাহেবের বাড়ির আড্ডায় বরফ সাহেবকে সব সময় অবশ্য পেতুম না, পেতুম জিনিকে। জিনি আমাদের জন্যে পথ চেয়ে বসে থাকতো। সমবয়সী সখি আমাদের। জিনিয়া ফুলের মতই গায়ের রঙ, বরফ সাহেব তাই বুঝি ওর নাম রেখেছিলেন জিনিয়া—জিনি। একরাশ ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কাঁধ পর্যন্ত চুল জিনির। কী কোঁকড়ানো আর নরম। ঈষৎ লম্বাটে ধরণের মুখ। টানা টানা চোখ, মণি দুটো একটু কটা। জিনির গাল ঠোঁট লাল হ'য়ে থাকতো। লুডো খেলায় হেরে গিয়ে গলা বেঁকিয়ে জিনি যখন আমাদের সঙ্গে ঝগড়া করতো কী অভিমান জানাতো আমরা ফ্যাল ফ্যাল করে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতুম। ফ্রক পরতো জিনি, কতো রঙ বে-রঙের ফ্রক ছিল তার। আর সেই ফিকে গোলাপী সিল্কের মোজা, ওর নরম দুধ-রঙের পায়ে গা মিশিয়ে যে মোজা আরও মধুর দুধ-আলতা রঙ ধরতো।

জিনি ছিলো আমাদের খেলার সাথী, সুখ-দুঃখের বন্ধু। আমরা গল্প করতাম খেলতাম, খেতাম। কতোদিন এমন হয়েছে বীরু পকেট ভর্তি করে চকলেট এনেছে, তিনু এনেছে ডাঁশা পেয়ারা আর আমি স্রেফ তেঁতুলের আচার। জিনির কাছে তিনজনে লজেন্স, পেয়ারা আর তেঁতুলের আচার নামিয়ে রেখেছি। তারপর চারজনে মিলে বারান্দার তলায় লতা-গাছের ছায়ায় বসে এক সাথে সেই সব সুখাদ্য এবং কুখাদ্য খেয়েছি। মাঝে মাঝে জিনি জিব বের করে মুখ চোখ কুঁচকে বলেছে, কি টক্! বীরু বলেছে 'খাসা'; তিনু বলেছে 'বেড়ে' আর আমি জিনির জিব থেকে আমার জিবে, মনে মনে সব টক টেনে নিয়ে বলেছি 'গ্র্যাণ্ড'।

এই আমাদের জিনি। তিন বন্ধুর মনের বাগানে একটি ফোটা ফুল। তার রূপে, তার গন্ধে, তার খেলায় আমরা মুগ্ধ, আমরা খুশি, আমরা বিভোর। তার চেয়েও বড় কথা বুঝি জিনি আমাদের বন্ধু এতে আমরা কৃতকৃতার্থ।

অথচ এই জিনি যে সত্যি সত্যি কে তা আজও জানি না। ছেলেবেলায় বড়দের মুখে নানারূপে উক্তি শুনেছি। ভাসা ভাসা ভাবে তার মানে বুঝলেও সে কথা নিয়ে মাথা ঘামাতে বসিনি। কেউ বলতো জিনি বরফ সাহেবের কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে; কেউ বলতো, বরফ সাহেবের বাড়িতে এক বুড়ো বাবুর্চি ছিল তার মেয়ের ওপর প্রৌঢ় বয়সে বরফ সাহেবের দুর্বলতা জাগে। জিনি সেই দুর্বলতার ফল। আবার কাউকে বলতে শুনেছি বরফ সাহেবের এক মেয়ে ছিলো, বিয়ে করেছিলো বাঙ্গালী এক রেলের গার্ডকে, জিনি তারই মেয়ে। সে মেয়ে কবে মরে ভূত হয়ে গেছে। গার্ড সাহেবেরও পাত্তা নেই।

এ সমস্ত কিম্বদন্তীর কোন্‌টা যে সত্যি, আদপেই কোনটা সত্যি কি না, কে জানে। তবে এটুকু বলতে পারি, জিনির জন্ম-রহস্য যাই হোক্, বরফ সাহেবের জিনিই সব, আর জিনির বরফ সাহেবই সব। তিন কুলে ওদের আর কেউ আছে বলে জানতাম না, কোনদিন আর কাউকে দেখলাম না। জিনির জাত কি, কি তার ধর্ম, কোনটা তার মাতৃভাষা সেকথা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। বরফ সাহেব নিজে বাঙলায় কথা বলতেন আমাদের

সাথে, একটু তাতে উচ্চারণ বিকৃতি ছিল এই যা। আর জিনি, জিনি ইংরিজী পড়তে লিখতে পারতো যতো না, তার বেশি ওর দখল ছিল বাঙলায়। জিনি সরস্বতী পুজোতে অঞ্জলি দিতে আসতো সেকথা তো আগেই বলেছি তোমাদের, দুর্গা পুজো,' কালী পুজোতে ঠাকুর দেখে বেড়ানোর উৎসাহও আমাদের চেয়ে তার কম ছিলো না। ওদিকে আবার দেখেছি জিনির গলায় সোনার সরু হারে একটা ক্রশ ঝোলানো।

বেশ ছিলাম, বীরু, তিনু, আমি আর জিনি। আর, আর বরফ সাহেব।

সুখেরও ঋতু বদল আছে। একথা ছেলেবেলায় প্রথম জানলাম, বরফ সাহেব যেদিন মারা গেলেন। একেবারেই হঠাৎ: মাত্র একদিনের জ্বরে। বরফ কলের কাছেই ছিলো গ্রেভ্ ইয়ার্ড কয়েকটা ধান ক্ষেতের ব্যবধানে। বরফ সাহেবকে সেখানে কবর দেওয়া হ'লো। সেদিন বরফ সাহেবের বাড়িতে অনেক লোক দেখেছিলাম। সবই সাহেব-সুবো লোক। অবশ্য অন্ত্যজ কুলেরই বেশি। আমরা তিন বন্ধু বরফ কলের গেটের কাছে ঠায় দাঁড়িয়েছিলাম চৈত্র মাসের রোদ্দুরে। অতো লোক আর সাহেব-সুবো দেখে ভেতোরে ঢুকতে সাহস হয়নি। বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খালি হাঁ করে তাকিয়ে থেকেছি, বিরাট সাদা উঁচু পাঁচিল ভেদ করে কিছু দেখতে পাইনি, কিছু শুনতে পাইনি, শুধু নিমগাছের ডালে সেদিনও ঘুঘুটা ডাকছিলো আর চৈত্র মাসের ঘূর্ণি হাওয়ায় উড়ে-আসা ধুলোয় আমাদের মাথা, মুখ, চোখ ভরে উঠছিলো।

বিকেল হয় হয়—একটা কালো মতন ফুল দিয়ে সাজানো গাড়িতে বরফ সাহেবের মৃতদেহ নিয়ে ওরা চলে গেল। আমরা শুধু গাড়ি দেখলুম, দেখলুম ফুল আর লোক। আর কিচ্ছু না। জিনি কই? জিনি! চোখ দিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম আমরা—দেখতে পেলুম না জিনিকে।

তিন বন্ধু ছুটে গেলাম খোলা গেট দিয়ে। সেই বরফ সাহেবের বাড়ি। বারান্দা ফাঁকা, জিনিয়া ফুলের টব ফাঁকা। সব শূন্য, স্তব্ধ, নিঝুম। বীরু ভয়ে ভয়ে ডাকলো, জিনি—জিনি। তিনু ডাকলো, জিনি, জিনি। কোন সাড়া-শব্দ নেই। অধৈর্য হয়েই আমি চীৎকার করে ডাকলুম, জিনিয়া—জিনি।

বারান্দার নীচে লতাগাছের ঘন ছায়া থেকে কে যেন ডুকরে কেঁদে উঠলো। আমরা তিন জনে ছুটে গেলাম। ওই তো জিনি, আমাদের জিনি। গুমরে গুমরে জিনি কাঁদছে। ফোলা ফোলা চোখ তুলে জিনি তাকালো আর তাকিয়ে থাকতে থাকতে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে কেঁদে উঠলো আবার। তার কান্নায় আমাদের গলাও বুজে এল। এতোক্ষণ যেন জোর করে আগলে রেখেছিলুম, আর পারলুম না; জিনির পাশে বসে আমরাও কাঁদতে লাগলুম। কতোক্ষণ কেঁদেছি খেয়াল নেই। সন্ধ্যার অন্ধকার যখন ঘন হ'য়ে এসেছে, তারা উঠেছে আকাশে তখন জিনির হাত ধরাধরি করে আমরা উঠলুম।

বীরু বললো, রাত্রে এসে সে শুতে পারে। তিনু বললে, সেও। আমিও মাথা নাড়লুম।

জিনি বললে, না, কাউকে আসতে হবে না, আয়া তো তার আছেই।

আমরা তিন বন্ধু ফিরে এলুম।

পরের দিন বিকেলে জিনিকে সঙ্গে করে গেলাম গ্রেভ্ ইয়ার্ডে, বরফ সাহেবের কবর দেখতে। জবা গাছের তলায় বরফ সাহেবের কবর হয়েছে। নতুন কবর। বড্ড ঠান্ডা যেন! কবরের চার পাশে বসে বীরু, তিনু, আমি আর জিনি অনেক কাঁদলুম। উঠে আসার সময় আমরা বুঝি সকলেই মনে মনে বললুম, বরফ সাহেবের না থাকার দুঃখ জিনিকে আমরা পেতে দেবো না। না—না—না।

দু'-দশ দিন কেটে গেল। জিনির কাছে রোজই যাই আমরা। একদিন শুনলাম, জিনিকে বরফ সাহেবের ঘর ছেড়ে চলে যেতে হবে। কেন, কোথায়, কি ব্যাপার—? জিনি কিছুই জানে না। বরফ কলের মালিকের হুকুম। অন্য সাহেব আসবে সে বাড়িতে। মুখ শুকনো জিনির। বললে, কি হবে বীরু, তিনু, পাঁচু—আমি কোথায় যাব?

তাই তো মহা দুশ্চিন্তায় পড়লাম আমরা। জিনি যাবে কোথায়, থাকবে কার কাছে, খাবে কি? জিনিকে সাহস দিয়ে বললাম, ভয় কি আমারা আছি।

তারপর তিন বন্ধুতে চুপি চুপি ফাঁকায় বসে গালে হাত দিয়ে কতো পরামর্শ, কতো চিন্তা। রাত্রে আমাদের ঘুম বন্ধ। বীরু বললে, 'তার বাবা লোক ভালো, কিন্তু মা—মা খেস্টান মেয়ে বাড়িতে রাখতে রাজি নয়।' তিনু বীরুর কথা শুনে বললে, তার মা বড় ভালো কিন্তু ঠাকুমা। বুড়ি একেবারে হাড়-জ্বালানো ছুঁচিবাই। জিনিকে ঘরের চৌকাঠ মাড়াতে দেবে না। আমি বললুম, জিনি সরস্বতী পুজোতে অঞ্জলি দেয়, মা কালীকে প্রণাম করে। ও খেস্টান নয়। তিনু বললে, তা হোক, ও খেস্টানই। গলায় যীশু আছে।

গলায় যীশু-ঝোলানো মেয়েকে আমিই বা ঘরে এনে তুলি কি করে, বাবা মা আমারও আছে অতএব বীরু, তিনু যা পারে না আমিও পারি না। অথচ এই না-পারাটা তখন আমাদের কাছে অত্যন্ত মর্মান্তিক দুঃখ নিয়ে দেখা দিয়েছে। কতো ভেবেছি আমরা তিন বন্ধু আম-বাগানের ছায়ায় বসে, রাগ করেছি গুরু-জনদের ওপর, মন তিক্ত হয়েছে যীশুর ওপর—যেন ওই গলার ক্রশটাই সমস্ত বাধা আর নিজেদের অসহায়তার কথা তুলে সান্ত্বনা দিয়েছি পরস্পরকে।

আশ্চর্য, ওই বয়সেও আমাদের লজ্জা পাবার মত মন ছিল। জিনির জন্যে কিছুই করতে পারছি না তারই লজ্জা। পরম লজ্জাই বলা যায়। জিনির কাছে যাওয়া বন্ধ করতে হলো। কাঁহাতক আর রোজ রোজ মিথ্যে কথা বলে তাকে ঠেকিয়ে রাখি। তাছাড়া সত্যি কথা বলতেও যেমন মুখ ফুটতো না, জিনির কাছে মিথ্যে কথা বলতেও তেমনি কষ্ট হতো।

জিনি বিহনে আমাদের কিশোর-বৃন্দাবন অন্ধকার। মন খারাপ, মেজাজ খারাপ—এমন কি বোধ হয় শরীরটাও সকলের একটু খারাপ হ'য়ে গেল।

সেদিন শনিবার। স্কুল থেকে ফিরে এসে বীরু আর আমি ঘুড়ির সুতোয় মাঞ্জা চড়াচ্ছি এমন সময় লাফাতে লাফাতে তিনু ছুটে এলো। হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'জিনি—জিনি ডাকছে তোদের; শীঘ্রি চ'—। জিনি? কোথায় জিনি? মাঞ্জা মাথায় থাকলো—ছুটলাম আমরা জিনি সন্দর্শনে।

পাড়ার শেষে মাঠের কাছে ল্যাঙড়া ডাক্তারের বাড়িতে দেখা পেলাম জিনির; কুলতলায় দাঁড়িয়ে ছিল আমাদের অপেক্ষায়। দেখা হ'তে জিনি অভিমান-ভরে কাঁদলো, বললো, তার মনোব্যথা করুণ সুরে।

বরফ সাহেবের বাড়িতে জিনির যে আয়াটা ছিল, সেই আয়া বুড়িই শেষ পর্যন্ত জিনিকে এখানে এনে ঠাঁই দিয়েছে। আমরা বললাম, তোমার ঘর কই? জিনি জবাব দিলে তার ঘর নেই। আয়া বুড়ির সাথে এক সঙ্গে একটা কুঠরীতে সে থাকে।

জিনি আরও কতো কথা বললে, সমস্ত কথাই এ বাড়ির। এখানে তার কতো যে কষ্ট তারই কথা। আমরা চুপ করে শুনলাম শুধু। বলার কিছু ছিলো না।

আসার সময় বীরু বললে, মন-টন খারাপ করো না, জিনি। আমাদের পাড়ার মধ্যে এসে গেছ, বেশ হয়েছে এক পাড়াতেই কাছাকাছি থাকবো। রোজ আসবো আমরা।

বীরুর সান্ত্বনাটা যে নেহাতই অসার একথা বুঝতে বেশ কিছুদিন লাগলো। জিনিকে আমাদের পাড়ার মধ্যে পেয়ে প্রথমটায় অবশ্য পুলকিত হয়েছিলাম, দুর্ভাবনা দূরে হয়েছিলো জিনি আশ্রয় পেয়েছে জেনে। কিন্তু প্রথমে যা ভাবিনি, দেখিনি ক্রমেই তা চোখে পড়তে লাগলো।

জিনি যে বাড়িতে এসে উঠেছিলো সেটা এক পার্শী বুড়োর পাঁউরুটি-বিস্কুট-কেক তৈরির কারখানা। পার্শীটার নাম ছিলো পেসরানজী, আমরা বলতুম পেস্তা-বাদামজী। বাড়ির এক অংশে থাকতো সেই পেস্তাবাদামজীর পরিবার—সাহেবী কায়দায়; আলাদা করে ঘেরা সে অংশ। বাকি বাড়িটা ছিল পাঁউরুটির কারখানা—যেমনি নোঙরা, তেমনি গন্ধ। ওখানেই রুটি-বিস্কুট-কেক তৈরি হয় আর এদিক-ওদিক মাথা গুঁজে পড়ে থাকে কারিগররা—যতো সব খানসামা, বাবুর্চি ক্লাসের ছোটলোকের দল। ওরা বিড়ি ফোঁকে, ইতর ভাষায় কথা বলে, রগড় করে জিনিকে নিয়ে, আমরা গেলে আমাদের নিয়েও।

কাণ্ড-কারখানা যত দেখি তত চোখ বড় বড় হ'য়ে ওঠে। প্রথম প্রথম দেখতাম জিনির কোনো কাজ ছিলো না। বাড়ির কোনো নির্জন কোণে এসে সে একা-একা বই পড়ছে কি তেঁতুল-বিচি নিয়ে খেলছে। বাড়িতে স্থান না জুটলে কুল-তলায় ঠায় বসে থাকতো জিনি একা-একা। চলে আসতো আমাদের কাছে। ক্রমেই সেসব বন্ধ হলো। জিনি দেখলাম কাজ-কর্ম করে। কখন দেখি জিনি দু'হাতে বড় বালতি ধরে টেনে-ছেঁচড়ে জল বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কখন মাথায় তার পাঁউরুটির ঝুড়ি, কখন বা তোয়ালে জড়ানো খাবার বয়ে দুপুর রোদে জিনি চলেছে পেস্তা-বাদামজীর দোকানে—সেই পোস্টাফিসের কাছে।

চোখের সামনে দেখি জিনি দিন দিন রোগা হ'য়ে যাচ্ছে। তার ঠোঁটের হাসি মুছলো, মুছলো তার গালের লাল আভা। আটার গুঁড়োয় অমন চুল তার রুক্ষ্ম লালচে হ'য়ে উঠেছে। জিনির গায়ে ছেঁড়া ফ্রক; পায়ে রঙ-করা মুসলমানী মেয়েদের মত খড়ম।

জিনিকে একদিন বললাম, তুমি এতো কাজ করো কেন? জিনি করুণ সুরে জবাব দিলো, কাজ না করলে মারে, খেতে দেয় না।

জিনির কথা শুনে বীরু লাফিয়ে উঠলো, কে মারে তোমায়—নাম বলো। সে ব্যাটার আমি হাত ভাঙবো। জিনি জবাব দিলো, কার নাম বলবো, সকলেই। কাজ করতে না পারলে মারবে ছাড়া আর কি করবে।
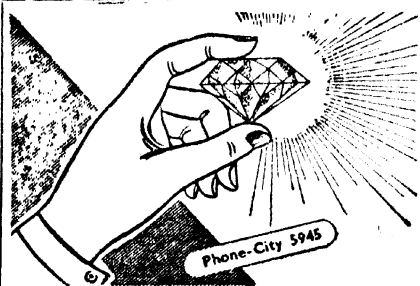
আমাদের সেই আয়াবুড়ির কাছে গেলাম। সে বুড়ি কেঁদে-কেটে বললে, বাবুরা, আমার নসিব। আঁখ গেছে আমার—দেখতে পাই না এক চোখে, পার্শী সাহেবের বাড়িতে ফাইফরমাস খাটি। সাত টাকা তলব দেয়। জিনিমিসি কারখানায় খাটে পাঁচ টাকা তলব। না খাটলে দানা পড়বে না পেটে। তবুভি জিনিমিসিকে আমি এক আঁখে রাখি। নয়তো এরা ওকে কুত্তার মত ছিঁড়ে খেত। জিনিমিসির উমার বাড়লো।

সত্যিই, জিনির বয়স বেড়েছে; বয়স বেড়েছে আমাদেরও। এখন অনেক জিনিস বুঝি, অনেক জিনিস দেখি। ময়লা রঙীন শাড়ি পরে, কোমর পর্যন্ত রুক্ষ্ম চুলের এক বেণী ঝুলিয়ে জিনি যখন আমাদের কাছে এসে দাঁড়ায় আমরা তখন তার বাড়ন্ত দেহটাকে আড় চোখে লক্ষ্য করে জিনির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শঙ্কিত হয়ে উঠি।

আমরা কারখানায় জিনির কাছে গেলে ইদ্রিস, নুলো—সব কটা লোকই ইতর রসিকতা করে, হাসে কুৎসিতভাবে। সম্মানে আঘাত লাগে আমাদের। বীরু বলে, এ বাড়িতে জিনি থাকে থাকুক, আমাদের আসা চলবে না। তিনু মাথা নেড়ে সায় দিয়ে জানায়, কারখানায় আসি বলে সেদিন বিশুদা কি রকম টিটকিরী দিয়ে কথা বললো, মাইরি, শুনলি তো! আমিও মাথা নাড়লুম।

জিনির সঙ্গে বন্ধুত্বের বন্ধনটা আরও ক্ষীণ হলো। আমরা বেশ বুঝতে পেরে-ছিলাম বরফসাহেবের বাড়িতে যে জিনি আমাদের স্বপ্ন ছিলো, যাকে মনে মনে অনেক উঁচুতে স্থান দিয়েছিলাম—সেই জিনি পেসরানজীর পাঁউরুটি কারখানায় ছোট-লোকদের ভিড়ে একসাথে থেকে, খেয়ে, চুল্লি ধরিয়ে, আঠা মেখে অনেক নীচুতে নেমে গেছে। আমাদের সাথে ওর মেলামেশা প্রকাশ্যভাবে আর চলে না। সেটা দৃষ্টিকটু।

দিনে দিনে যাওয়া আসা, দেখা সাক্ষাৎ

বন্ধ হলো। নেহাতই যদি কোনদিন পথে দেখা হতো, কিম্বা জিনি আসতো গল্পের বই চাইতে তবেই কথা হতো। তাও যৎসামান্য দু চারটে কথা।

জিনিকে আমরা এড়িয়ে চলি প্রত্যক্ষ-ভাবে কিন্তু পরোক্ষভাবে তার নামে কথা উঠলেই কান খাড়া করে শুনি। হ্যাঁ—তখন ক্রমাগতই জিনির নামে কুৎসা শুনেছি, নানান মুখে।

একদিন তিনু এসে বললে, 'এ শালা জাতের দোষ—।'

—কিসের? প্রশ্ন করলুম অবাক হয়ে।

—জাতের; বুঝলি না, হাঁদারাম। যার জন্মের ঠিক নেই, দো আঁশলা—সে ছুঁড়ির আর হবে কি? যাই বলো, ও ঠিক ওর মনের মত জায়গায় জমে গেছে।

—কার কথা বলছিস রে, জিনির কথা?—বীরু লাল গুটিটা পকেটে ফেলে ক্যারাম বোর্ডটা ঠেলে সরিয়ে দিলো।

—আজ্ঞে হ্যাঁ—জিনি নয় তো কার! আমি বাজি ফেলে বলতে পারি, মাইরি ও কিছুতেই সাহেবটাহেব নয়, একেবারে লেড়িকুত্তার জাত। ময়ূরপুচ্ছ গুঁজে বসে ছিল। এখন সব পুচ্ছ খসে গেছে।

তিনুর উত্তেজিত হবার কারণটা জানা গেল। কাল শেষ বিকেলে নাকি কোন ধান-ক্ষেতের ধারে জিনি আর ইদ্রিসকে দেখা গেছে—বিজন বলেছে তাকে।

খবরটা জানিয়ে তিনু নানারকম খারাপ মন্তব্য করতে লাগলো।

—যা মুখে আসে তাই যে বলছিস, তিনু! বললাম আমি অসন্তুষ্ট হয়ে।

—কি খারাপ বলেছে? বীরু তিনুর হয়ে জবাব দিলো।

—জিনি ভালোই হোক, আর মন্দই হোক তোর আমার কি? বললুম আমি।

—কেন নয়? বীরু দপ্ করে জ্বলে উঠলো যেন, 'জিনি কি ইদ্রিসের?'

—তো কি তোর নাকি? আমার মুখ দিয়ে ফস্ করে কথাটা বেরিয়ে গেল।

—আলবাৎ। আমাদের নয় তো কোন শালার?

আমি চুপ এবং আমরাও।

জিনি কি আমাদের? আমি ভাবলুম। শুধুই কি আমি ভেবেছি? না, না, বীরু, তিনু, আমি—আমরা সবাই হয়তো সে দিন ভেবেছি জিনি কি আমাদের?

মাস, বছর কেটে গেল চোখের ওপর দিয়ে। আমরা তখন ম্যাট্রিক পাস করে বেকার বসে আছি। তিন জনেই চেষ্টায় আছি রেলের চাকরীর। মাঝে মাঝে ইন্-টারভ্যু দিয়ে আসি আসানসোল গিয়ে। ওই পর্যন্ত, চাকরী আর কপালে জোটে না।

বেকার যুবকদের কাজ কি কি হতে পারে—তোমরাই ভেবে নাও। স্রেফ হোটেল-ডি-পাপার অন্ন ধ্বংস, ঘুম, আড্ডা, বিড়ি ফোঁকা। আমরাও তার জের টেনে চলেছি। তফাৎটুকু শুধু এই যে, আমরা অধিকন্তু তিনটি কাজ করতাম। রেল ইনস্টিটিউট থেকে রাতারাতি অখাদ্য কুখাদ্য উপন্যাস এনে রাতারাতি শেষ করা, খেলা থাকলে মাঠে ছোটা আর আর বুঝতেই তো পারছো যেহেতু বয়সটা খারাপ এবং হাতে অনন্ত সময় সেহেতু নিজেদের মধ্যে পাড়া বে-পাড়ার মেয়ে নিয়ে একটু খোস গল্প।

ফেত্তা দিয়ে কাপড় পরে, গলার ওপর সার্টের কলার তুলে, বাঁ হাতে সাইকেল চালিয়ে, বাঁশি বাজিয়ে—বেশ মসৃণ গতিতে দিন কাটাচ্ছি, হঠাৎ জিনি সব সুখ ভেস্তে দিলে।

পাশাপাশি পেসরানজীর বেকারী উঠে গেছে, জিনি কাজ নিয়েছে ধানবাদ রেল ইনস্টি-টিউটের সিনেমাতে—লেডিস গেটের গেট-কিপার। নীল শাড়ি পরে, বিনুনী দুলিয়ে, স্লিপারে ধুলো উড়িয়ে জিনি আমাদের চোখের ওপর দিয়ে চাকরী করতে যায়। তখনও সে থাকে আমাদের পাড়াতেই একটা ঘর ভাড়া করে।

সে কথা যাক্, আসল কথা বলি এই বয়সে জিনিকে আবার যেন হঠাৎ একদিন নতুন চোখে দেখলাম।

সিনেমা দেখতে গিয়েছিলুম আমরা—বীরু, তিনু আর আমি। টিকিট পেলাম না। কী একটা বাঙলা বই হচ্ছিলো, বেজায় ভিড়। রাত্রের শো'র টিকিট কিনে সামনের চায়ের স্টলে বসে বসে গল্প করছি আর চা খাচ্ছি মৌজ করে, সেই সঙ্গে এদিক ওদিক চোখ রেখে সিগারেট ফুঁকছি।

এমন সময় দেখি কলকাতা থেকে নতুন আমদানী চালিয়াৎ সিনেমা অপারেটার সুখেন্দু ট্রাউজারের পকেটে হাত ঢুকিয়ে হি হি করে হাসতে হাসতে স্টলে ঢুকছে—পাশে তার জিনি। আমাদের দেখে জিনি হাসি মুখেই কি একটা বললো যেন, তার-পর ওরা দুজনেই পর্দা ফেলা ঢাকা জায়গার মধ্যে গিয়ে বসলো।

বীরু তাকালো আমার দিকে, আমি তিনুর দিকে। তিনজনে মুখ চাওয়া চাওয়ি করে সবাই একসঙ্গে তাকালুম পর্দার দিকে। সব লক্ষ্য করলাম আমরা। চপ্ গেল, কেক্ গেল, টি-পটে করে চা গেল পর্দার ভেতরে। সুখেন্দুর হাসির সাথে মাঝে মাঝে জিনির হাসিও কানে এলো। সিগারেটের গন্ধও ভেসে আসতে লাগলো পর্দার ভেতর থেকে।

সে দিন যে মাথা মুণ্ডু কি ছবি দেখেছি জানি না। শোয়ের শেষে তিন বন্ধুই গুম হয়ে অন্ধকারে পথ হেঁটেছি। পাড়ার কাছা-কাছি এসে বীরু বললো, 'জিনি তা হলে বেশ ভালোই আছে।' তিনু বললে, বেকারীতে থাকার সময় শুঁটকি মেরে গিয়ে-ছিলো, দেখলে মনে হতো টি বি রুগী। এখন চেহারাটা বেশ ফিরেছে।' আমি বললুম, 'সুখেন্দু লুঠছে।' আমার কথা শুনে বীরু উত্তেজিত হয়ে ঘোষণা করলে, 'লুঠোচ্ছি। ও সব কলকাতিয়াগিরি ধান-বাদে চলবে না।'

মিথ্যে কথা বলবো না। সেই দিন থেকে কি যেন হয়ে গেল আমাদের সে অবস্থা বর্ণনা করা মুশকিল। এক কথায় বলতে পারি বিশ্রী একটা ঈর্ষায় আমরা জ্বলতে লাগলুম মনে মনে। এ ঈর্ষা কেন—কার ওপর তা কি খতিয়ে দেখেছি নাকি? উঁহু, সে সব দেখি নি। খালি ভেবেছি এ আমাদের হার। একেবারে থ্রি টু নীলে। ক্যালকেশিয়ান সুখেন্দু আমাদের হারিয়ে দিয়েছে।

পাড়ায় ঘাঁটি ফেললাম—ঘাঁটি ফেললাম সিনেমায়। জিনির যাওয়া আসা চাল চলনের নজর করি। কখন যায়, কখন ফেরে, কি করে?

একদিন তিনু এসে বলে, সুখেন্দু আর জিনি অপারেটারের ঘরে গা জড়াজড়ি করে বসে থাকে। বীরু বলে, সুখেন্দু জিনিকে ওই ফুল তোলা শাড়িটা কিনে দিয়েছে। আমি বলি, জিনি আজকাল রোজ বেশ রাত করে ফেরে।

অসহ্য—অসহ্য। এ আমাদের অসহ্য। মনে পড়ে বীরুর কথা, 'আলবাৎ জিনি আমাদের। আমাদের নয় তো কার?' সেই জিনি বেলাল্লাপনা শুরু করেছে; আর আমরা শুধু দেখেই যাবো।

বীরু সুখেন্দুকে একটা উড়ো চিঠি দিয়ে শাসালো। কোন কাজ হলো না। আড্ডায় তিন জনেই আমরা লোভনীয় তিনটি

প্রত্যক্ষ দৃশ্য দেখেছি বলে বর্ণনা দিলুম। সত্যি বলতে কি, আমি কিছুই দেখি নি। কিন্তু বীরু, তিনু যদি দেখে থাকে আমার না দেখাটা শোভা পায় না। বানিয়েই বললুম, সুখেন্দু আর জিনি রাত প্রায় বারোটার সময় কাল পাড়ায় এসেছে। সুখেন্দু জিনির ঘরেই ছিলো। সারা রাত।

শুনে বীরু আমাদের টেনে নিয়ে সটান গিয়ে হাজির হলো জিনির কাছে।

—কি? জিনি প্রশ্ন করলে।

—এটা ভদ্রলোকের পাড়া, জিনি।

—ওমা, তা কে না জানে? জিনি হেসে ফেললো।

—জানো তো এমন হয় কেন? বীরু অনেক কষ্টে বললে।

—কি? জিনি জানতে চাইলো।

বীরু আমায় বলতে বললে 'কি'-টা। আমি কি বলবো! আমি বললাম তিনুকে। তিনু বললে বীরুকে।

শেষ পর্যন্ত কিছুই বলা হলো না। আমরা বোকার মত তিনজনে ফিরলাম। জিনি খিল খিল করে হাসতে লাগলো।

জিনির হাসি যেন আমাদের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিলে। জ্বলে পুড়ে মরতে লাগলুম তিন বন্ধু। এ অপমান বরদাস্ত করা যায় না।

এমন সময় হঠাৎ একদিন হকি খেলে ফেরার পথে সুখেন্দুকে পেয়ে গেলুম ফাঁকায়। বীরু তাকে গিয়ে ধরলো, সঙ্গে সঙ্গে আমরাও।

হকি স্টিকের মার তো কম নয়। সুখেন্দু বেশ ক'দিন বিছানায় পড়ে থাকলো।

তারপর আবার যে কে সেই। সুখেন্দু আর জিনি। একটা শুধু পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। জিনি আজকাল আমাদের দেখেও দেখে না। পথে দেখা হলে মুখ নীচু করে দ্রুত পায়ে পাশ কাটিয়ে যায়।

এও অসহ্য। বীরু বললে, 'ওর লভারকে ঠেঙিয়েছো ও তোমাদের দিকে তাকাবে কেন? মনে মনে ক্ষাপ্পা হয়ে গেছে।' তিনু বললে, 'তাই বলে এ অপমান!' আমি একদিন পথের মাঝে ফাঁকা দেখে জিনিকে প্রশ্ন করলাম, 'কোথায় যাচ্ছ?' জিনি আমার কথার কোন উত্তর দিলো না। সে ব্যাপারের পর আমার মেজাজও গরম হয়ে উঠলো।

তিন বন্ধু যুক্তি আঁটলাম নানারকম এবং সবচেয়ে সাংঘাতিক যেটা সেটাই প্রয়োগ করলাম এবার। প্রতিশোধ নেবার এমন 'দুর্দমনীয় বাসনা মানুষের কেন হয় কে জানে।

সিনেমা সেক্রেটারী মাণিক অধিকারীকে এক চিঠি পাঠালাম। আমাদের রেল পাড়ার কয়েকজন বাপের বয়সী ভদ্রলোকের নাম সই জাল করে, ব্লক নম্বর দিয়ে; তাতে জিনির চরিত্র সম্পর্কে লোমহর্ষক কুৎসিত ইঙ্গিত নানারকমের। ও মেয়েকে চাকরীতে রাখলে বাড়ির বৌ ঝি আর সিনেমা দেখতে পাঠানো যাবে না। যদি জিনির চাকরী এর পরও থাকে তবে জেনারেল মিটিংএ এই সব নিয়ে কেলেঙ্কারী হবে কিন্তু।

মফস্বল শহরের রেল ইনস্টিটিউটের সিনেমা সেক্রেটারী,—তাঁর অতো ঝামেলায় কাজ কি। জিনির চাকরী গেল। এমন কি কয়েক দিন বাদে সুখেন্দুরও।

আমরা খুব খুশি। যেন যুদ্ধ জয় করেছি। আনন্দের চোটে একদিন ভিজে বেড়ালের মত জিনির বাড়িতে তাকে সহানুভূতি জানাতে গেলাম। জিনি সেদিন আমাদের পরম বিস্ময় ভরা চোখ নিয়ে অনেকক্ষণ দেখেছিলো, একটাও কথা বলে নি।

গল্পটা এখানে শেষ হতে পারতো যদি জিনি সুখেন্দুর সাথে ধানবাদ ছেড়ে চলে যেতো। আমরা তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু জিনি আমাদের অনুমান মিথ্যে করলো। সুখেন্দু ধানবাদ ছেড়ে চলে গেল আর জিনি আমাদের পাড়া ছেড়ে বাজারের মধ্যে খোলার চালওয়ালা এক সরু নোংরা গলিতে গিয়ে ঘর বাঁধলো। একা।

জিনি যেখানে ঘর বাঁধলো সে গলিটা সম্পর্কে নানান জনে নানা কথা বলতো। ওখানে বাজারের শাকসব্জি আলু পটলওয়ালারা থাকে, থাকে মুটে মজুর ঝিয়ের দল এবং আরও এ ও যাদের দুচার টাকায় মাথা গোঁজার জায়গা চাই তারাই।

বাজারের মধ্যে দিয়ে ইনস্টিটিউট যাবার ওইটেই ছিলো সর্টকাট পথ। আমরা সাইকেল নিয়েও ওই পথ দিয়ে যাতায়াত করতুম। জিনি যাওয়ার পর ওই পথে যাতায়াতটাও আমাদের ঘেড়ে গেল।

একদিন এক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলুম। ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি পড়ছে। ইনস্টিটিউট থেকে আমরা দুই বন্ধু বীরু আর আমি ব্রিজ টুর্নামেন্ট খেলে ফিরছি ভিজতে ভিজতে, জিনিদের অন্ধকার গলির পথ দিয়ে। হঠাৎ চেপে বৃষ্টি এলো। একটা ঘোড়ার গাড়ির আস্তাবলের টিনের চালার তলায় দাঁড়ালুম আমরা।

এক সময় বীরু হঠাৎ বললে, 'এই দ্যাখ্ —দ্যাখ্'—

বীরুর নির্দেশ অনুসরণ করে করে আমি তাকালুম। মিউনিসিপ্যালিটির মিটমিটে লাইট পোস্টের কাছে একটা লোক ঘুর ঘুর করছে। টল-টল পা। দু চার পা এদিক ওদিকে যাওয়া আসা করতে করতে শেষ পর্যন্ত একটা ঘরের দরজায় বসে পড়লো।

—নন্দ না?

—হ্যাঁ, নন্দ বলেই মনে হচ্ছে। আমি বললুম।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে বীরু বেশ একটু কঠিন গলায় বললে, 'নন্দও আজকাল জিনির কাছে আসে।'

—জিনি? আমি অবাক, 'তুই জানলি কি করে?'

—জানি। ও বাড়িটা জিনির।

বৃষ্টি থেমে এলো; আমরাও পথে নামলাম।

পরের দিন জিনির প্রসঙ্গ উঠলো। উঠবেই যে সেটা স্বাভাবিক। তিনু সব শুনে টিপ্পনী কাটলো, মাত্র এ্যাই—এ আমি আগেই জানতাম।

—জানতিস তো বলিস নি কেন? বীরু ধমকে উঠলো তিনুকে।

—কি হবে বলে! কতো খেল হচ্ছে এখন জিনির—সব যদি তোদের বলতে হয় তা হলে আমায় কমসে কম এক ডজন এক্সারসাইজ বুক ভর্তি করে সব লিখতে হবে।

—ও সব পিঁয়াজী রাখ্। কি দেখেছিস বল্। বীরু চটে মটে বলে।

—কি না দেখেছি, আর না শুনেছি। রীতিমত একটা বেশ্যা হয়ে উঠেছে জিনি। বাজারের যতো মদোমাতাল আলুওয়ালা বিড়িওয়ালা ওর কাছে যায় আসে।

তিনুর কথা শুনে বীরু দপ্ করে জ্বলে উঠলো।

—যাওয়াচ্ছি সব শালাকে। দাঁড়া—

—কি করবি তুই? আমি প্রশ্ন করলুম।

—পেঁদিয়ে বাজার থেকে ওঠাবো। এ কি মুফতি মাল নাকি? যে আসবে সেই। বীরু উত্তেজনার মাথায় বিড়ির টুকরোটা ছুঁড়ে দিলো তিনুর গায়েই। তিনু ক্ষিপ্র হাতে জামা বাঁচিয়ে বিড়ির শেষ অংশটুকু ফুঁকতে লাগলো চোখ ছোট করে।

—শেষ পর্যন্ত আলুওয়ালা নন্দ! শেম্! বীরু কপালে হাত তুললো।

—কী অধঃপতন! তিনু চোখ ছোট ছোট করেই যোগ করলে, 'বরফ সাহেবের মেয়ে আলুওয়ালা নন্দর—

তিনুর বাকি কথাটা শেষ করতে না দিয়ে আমি বললুম, 'আচ্ছা, বীরু, আমাদের এতো মাথা ব্যথার দরকার কি? যার ছাগল সে যেখানে খুশি কাটুক।'

বীরু কটমট করে আমার দিকে তাকালো। এবং পরমুহূর্তেই অধৈর্য হয়ে চীৎকার করে উঠলো, পাঁঠাটা কি নন্দর?

—আমাদেরও না। আমি বললুম।

—আলবাৎ আমাদের। আমাদের নয় তো কোন ব্যাটার। আস্ক্ তিনু, এ একটা মরাল রেসপন্সিবিলিটির কোশ্চেন। হাজার হোক জিনি আমাদের ছেলেবেলার বন্ধু—বরফ সাহেবের মেয়ে। একসঙ্গে, এক পাড়ায় আমরা থেকেছি। সেই মেয়েটা বাজারের বনে যাবে, দ্যাটস্ ইম্পসিব্‌ল! উই ক্যান্ট এল্যাও দ্যাট্।

—ঠিক বলেছে বীরু। তিনু আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'তুই ভাব পাঁচু, ছেলেবেলার সেই জিনি আর আজকের জিনি। এ একেবারে তোর সেই হেভেন্ এ্যান্ড হেল্। বরফ সাহেব কান্ডকারখানা দেখে স্বর্গ থেকে আমাদের মুন্ডুপাত করছে।

—শোনো! বীরু আমার দিকে তর্জনী তুলে শাসালো, যেন আমিই জিনি। বললে, 'আমার বাবা প্লেন্ কথা। তুমি আমাদের বন্ধুলোক, গরীব হও বড়লোক হও যায় আসে না। বাট্ ইউ মাস্ট্ বি গুড্। ও সব বেলাল্লাগিরি চলবে না। জিনিকে শেষবারের মত এই কথাটা জানিয়ে দেবো।

বীরু আর তিনু যা বললে তাতে আর আমার সন্দেহ রইলো না, জিনিকে সৎপথে রাখাটা আমাদের নৈতিক কর্তব্য অর্থাৎ মর‍্যাল রেসপন্সিবিলিটি।

এরপর কয়েক দিন বীরু, তিনু আর আমি বাজার পাড়ার সেই গলির মধ্যে ঘুর ঘুর করলাম এক সঙ্গেই। বাড়ির বাজারটা আমরা স্বহস্তে করতাম। বেকার অবস্থায় ইন্‌কামের ওই একটা পথ গার্জেনরা আমাদের দয়া করে দিয়ে থাকেন। আলুওয়ালা নন্দর কাছে আলুটা আমরা কিনতাম বরাবরই। তার প্রধান কারণ নন্দ আমাদের কাছে ধার রাখতো। আর দ্বিতীয় কারণ ভদ্রলোকের ছেলে সে; ইউ পি স্কুলের শেষ ক্লাস পর্যন্ত আমাদের সাথে পড়েছিলো, সেই সুবাদে বাল্যবন্ধু। অবশ্য বাল্যকালটা যেমন চিরন্তন নয়, তেমনি নন্দরও সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্বের সম্পর্কটাও সেই ফাইভ ক্লাসেই শেষ হয়ে গেছে। পরবর্তী কালে নন্দ তার তরফ থেকে বন্ধুত্বটুকু রাখতে চেয়েছিলো, আমরা পাত্তা দিই নি। ইদানীং ধার পাই বলে হেসে টেসে দু চারটে কথা বলি। যাই হোক, বাজার করতে গিয়ে আমরা আভাসে নন্দকে ঠেস দিয়ে কথা বলেছি, পরখ করতে চেয়েছি তার মনোভাব। মোটা মাথা, নাদুস নুদুস নন্দ পানের ছোপ্ ধরা দাঁত বের করে শুধু হেসেছে। কিছুই বোঝে নি, কিছুই বলে নি।

বীরু বললে, ও বেটা পয়লা নম্বরের শয়তান। তিনু বললে, তা না হলে আলুর ব্যবসা করে টু পাইস্ করে। আমি বললুম, ওর মাথা মোটা নয় মাইরি, বেড়ে চালাক দেখছি।

ইতিমধ্যে এক সুযোগ এলে আমাদের হাতে। একেবারেই আকস্মিক ভাবে।

রাত তখন গোটা দশেক হবে বোধ হয়। বর্ষার দিন। বৃষ্টি আসে হঠাৎ, থামে খানিকক্ষণ, তারপর আবার দেখো সেই একঘেয়ে ইলসেগুঁড়ি। বীরু, তিনু আর আমি সেদিন একসঙ্গে রাত করেই ইনস্টিটিউট থেকে ফিরছি বাজার পাড়ার গলি দিয়ে। গলি ফাঁকা। মিউনিসিপ্যালিটির সেই বাতিটা টিম টিম করে জ্বলছে। গলি প্রায় ফুরিয়ে আসে আসে এমন সময় দেখি নন্দ। অন্ধকারের কোন সংগোপন কোণ থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে আমাদের প্রায় ঘাড়ের ওপর পড়ে আর কি।

আমরা একটু সরে গেলাম। নন্দও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টলতে লাগলো পা ফাঁক করে। তারপর দু হাত জোড় করে মদের ঝোঁকে সে যেন জড়িয়ে জড়িয়ে কি একটা বলবার চেষ্টা করলে। বোধ হয় ঘাড়ের ওপর এসে পড়ার জন্যে ক্ষমা চাইছিলো।

বীরু তাকালো তিনুর দিকে, তিনু আমার দিকে। তিনু ইতর একটা উক্তি করলো নন্দকে উপলক্ষ্য করে। তিন জনে সেই উক্তির সূত্র ধরে আর একবার চোখ চাওয়া চাওয়ি করলাম। আমাদের চোখে যে কি ছিল জানি না। বীরু হঠাৎ দু পা এগিয়ে নন্দর মুখে ধড়াম করে এক ঘুঁষি বসিয়ে দিলে। আচমকা ঘুঁষি খেয়ে মাতাল নন্দ টলতে টলতে রাস্তার ওপর প্রায় পড় পড়, দেখি তিনু ছুটে গিয়ে তার পেটে টেনে এক লাথি মারলো। কেমন একটা আঁতকে ওঠার শব্দ করে নন্দ রাস্তার ওপর মুখ গুঁজে পড়লো।

—ঠিক হয়েছে। শালা, মাতাল। দাঁতে দাঁত চেপে বললে তিনু, 'চল পালাই!'

—চল্ঃ বীরু জামায় হাত ঘষতে ঘষতে পিছু ফিরলে।

—বীরু। আমি ডাকলুম।

বীরু, তিনু ফিরে দাঁড়ালো।

নীচু গলায় বললাম আমি, 'কেটে তো পড়ছি। কিন্তু নন্দটা কেমন করে গোঙাচ্ছে দেখ্। ব্যাটা যদি মরেই যায়।'

—মরে মরুক, চলে আয়। তিনু জবাব দিলে।

বীরু নন্দর ভূলুণ্ঠিত দেহের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কি ভেবে তার পাশেই বসে পড়লো। একটু পরে উঠে দাঁড়িয়ে নীচু গলাতেই বললে, 'মারটা বড় জোর হয়ে গেছে রে, পাঁচু। শালার নাকমুখ দিয়ে এখনও রক্ত পড়ছে। মাইরি। এ ভাবে সারারাত পড়ে থাকলে ব্যাটা মরুক না মরুক নির্ঘাৎ নিমোনিয়া হয়ে যাবে।

বীরুর কথায় ভীত হলাম। বললাম, 'কি করবি? ফেলে পালাবি?'

বীরু দাঁতে ঠোঁট কামড়ে কি যেন ভাবছিলো। হঠাৎ বললে, 'অল্ রাইট্। ধর শালাকে, চ্যাংদোলা করে তোল!'

আমরা তাকালুম। অর্থাৎ চোখেই প্রশ্ন করলুম, চ্যাংদোলা করে না হয় তুললাম নন্দকে কিন্তু তারপর,—তারপর কি!

আমাদের মনোভাব বুঝে বীরু বললে, ঘাবড়াস না। সবচেয়ে ভালো বুদ্ধি মাথায় এসেছে। নন্দকে জিনির জিম্মায় দিয়ে যাই। যার জিনিস সে বুঝুক। জিনিও জানুক, আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে পীরিত করা যায় না।

বীরুর প্রস্তাব আমাদের মনঃপূত হলো। ঠিক বলেছে বীরু।

নন্দর সেই বিশাল সিক্ত বপু আমরা কোন রকমে টানতে টানতে বয়ে চললাম। উৎকট গন্ধ ভাসছে নন্দর গা থেকে। কি যেন বিড় বিড় করছে হারামজাদাটা তখনও।

অনেকক্ষণ কড়া নাড়ার পর ভেতর থেকে জবাব এলো, কে?

বীরু জবাব দিলো। বললে, 'আমরা—বীরু, তিনু, পাঁচু। বিপদ হয়েছে। শীগগির খোলো।

দরজা খুললো জিনি, হাতে তার লণ্ঠন। কোন ভূমিকা না করেই নন্দর বেহুঁস দেহটাকে আমরা রোয়াকে নামিয়ে রাখলুম।

লণ্ঠনের আলো নন্দর মুখে ফেলে জিনি আঁতকে, আর্তনাদ করে বলে উঠলো, 'এ

কি? একে এখানে নিয়ে এসেছো কেন?'

বীরু নন্দর কাপড়ের খুঁট দিয়ে তার নাকমুখ মুছিয়ে দিয়ে বললে, 'মাতাল লোক, পথ চলতে পারে না, নালির ওপর মুখ থুবড়ে পড়েছে। ভয় নেই, রক্ত বন্ধ হয়ে এসেছে—ঠিক হয়ে যাবে।'

—তা, তা তোমরা ওকে এখানে আনলে কেন? জিনি ভীত, বিস্মিত গলায় আবার বললে।

—কোথায় তবে নিয়ে যাবো?—বীরুর গলার স্বরে তীক্ষ্ম বিদ্রূপ, 'ছেলেবেলার বন্ধু আমাদের নন্দ আর তুমিও হলে ছেলেবেলার বান্ধবী। নন্দ নর্দমায় মুখ গুঁজে সারারাত পড়ে থাকবে তাই কি চোখে দেখতে পারি! পোঁছে দিয়ে গেলাম তাই। আয় পাঁচু, তিনু—

বীরুর ডাকের সাথে সাথে আমরা জিনির ঘরের দরজা টপকে রাস্তায় এসে নামলুম। দরজা হাঠ হয়েই খোলা থাকলো।

গলি পেরিয়ে আমরা যখন বড় রাস্তায় পা দিয়েছি—তিনু বললে, 'আ—এ যা একটা হলো না মাইরি, খাসা—সব অপমান স্রেফ জুড়িয়ে জল হয়ে গেল।

বীরু গম্ভীর স্বরেই জবাব দিলে, 'নোবল রিভেঞ্জ!'

এ ঘটনার কয়েক দিন পরের কথা। বীরুদের বাড়িতে বসে আমরা তাস খেলছি। তখন দুপুর। হঠাৎ দেখি নন্দ। নন্দকে ক'দিনই আর আলুর দোকানে দেখি নি।

ঘরে ঢুকেই নন্দ আমাদের পাশে বসে পড়ে তিনবার তিনজনের হাত জড়িয়ে ধরলো। কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলুম আমরা। নন্দটাও যে কি বলবে ঠিক করতে পারছে না। পানের ছোপ ধরা দাঁতগুলো বের করে হাসিতে, আহ্লাদে, মিনতিতে সে ঠিক একটা কুকুর-ছানার মত কেঁউ কেঁউ করতে লাগলো।

—কি ব্যাপার! বীরু জানতে চাইলো যথাসম্ভব গম্ভীর হয়ে।

নন্দ আরও একবার কেঁউ কেঁউ করে বীরুর হাত চেপে ধরলো।—ভাই, আজ আমি তোমাদের কাছে এসেছি, একটা কথা আমার রাখতেই হবে।

আমরা সন্ত্রস্ত হলুম। নন্দ নিশ্চয় ধারের পাওনা টাকা চাইতে এসেছে। তিন জনে চোখাচুখি হয়ে গেল।

—কি কথা? তিনু বললে।

যেন কেউ নন্দকে কাতুকুতু দিচ্ছে, মুখ, চোখ, গলার তেমনি একটা কিম্ভুত-কিমাকার আহ্লাদে মুখ করে নন্দ বললে, 'আমার বিয়ে ভাই আজ, তোমাদের যেতেই হবে। তোমরা না গেলে হবে না, কিছুতেই হবে না। তোমরা আমার বন্ধু, তোমাদের দয়াতেই তো পেয়ে গেলাম।'

নন্দর বিয়ে! আমরা বোবা, বোকা বনে গেলুম।

—কোথায় বিয়ে? বীরু প্রশ্ন করলে।

—কোথায় আবার এখানেই। বাজার-গলিতে। তোমাদের ভাই যাওয়া চাইই। আমার অনুরোধ—নন্দ একটু থেমে বিগলিত হ'য়ে দাঁত বের করে হেসে বললো, আমার ভাবী বউয়েরও। সে তো বার বার ক'রে বলে পাঠিয়েছে। তাছাড়া তোমরাই তো তাকে চেনো, আমার হাতে দিয়েছো, তোমরাই সাক্ষী হবে বিয়ের।

—সাক্ষী হবো আমরা? বীরু লাফিয়ে উঠলো, 'কি বলছিস নন্দ—ও সমস্ত তোর ইলিবিলি কথা রাখ—; সাফ সোফ জবাব দে। কার সঙ্গে বিয়ে তোর, কিসের সাক্ষী?

—যাঃ! নন্দ মেয়েমানুষের মত মিন-মিনে লাজুক গলায় বললে, কিছুই যেন জানো না তোমরা। জিনিয়া ভাই—তোমাদের সেই জিনিয়ার সঙ্গে বিয়ে। সই-করা বিয়ে কি না, বোঝোই তো, তোমরা ছাড়া কে আমাদের স্বাক্ষী হবে!

নন্দ উঠলো। চট করে তার কোঁচার খুঁট গলায় জড়িয়ে হাত জোড় করলে আবার। বললে, 'গলায় কাপড় দিয়ে বলে যাচ্ছি ভাই নিশ্চয় যেও। না এলে বড় দুঃখ পাবো। সন্ধ্যেবেলায় একটু সকাল সকাল আসা চাই। অনেক কাজ এখন আমার। চলি ভাই।'

নন্দ যেমন ঝড়ের মত এসেছিল, তেমনি ঝড়ের মত চলে গেল। আমরা, বীরু, তিনু আর আমি, আমরা সেই ঝড়ের ধাক্কায় যেন সমূলে বৃক্ষের মত ছিটকে পড়েছি।

অনেকক্ষণ পরে বীরু বললে, কি রে কি বুঝছিস? —ভ্যাড়া বনে গেলুম মাইরি, বুঝবো আবার কি? দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে জবাব দিলে তিনু।

—যাবি নাকি? প্রশ্ন করলুম আমি।

বীরু ঘরের মধ্যে খানিকটা পায়চারী করলে, বিড়ির ধোঁয়ায় আরও ধোঁয়া করে তুললো আমাদের মন। অবশেষে কম্যান্ড করলো।

—আলবৎ যাবো। বেশ একটু আগেই যাবো। জিনিকে গিয়ে বোঝাবো, এখনো সময় আছে। আলুওয়ালা নন্দকে বিয়ে করা আর গলায় দড়ি দেওয়া সমান।

—বুঝিয়ে লাভ! আমি মিয়নো গলায় বললুম।

লাভ আবার কি? এটা আমাদের মর্যাল রেসপনসিবিলিটি। কর্তব্য। বরফ সাহেবের মেয়ে জিনি, যার পায়ের নখের যুগ্যি নয় নন্দ, তাকে সে বিয়ে করবে? কেন—? বিয়ে করার মত আর ছেলে নেই নাকি? বীরু অসম্ভব উত্তেজিত হ'য়ে উঠলো।

—কিন্তু—তিনু আমতা আমতা করে বললে, জিনি যদি আমাদের কথা না শোনে?

—না শুনে যাবে কোথায়? সাক্ষী—রেজেস্ট্রি ম্যারেজের সাক্ষী কারা? আমরা তিন জনেই তো। তবে বাছাধন—হোয়ার টু গো? বীরু চোখ টিপে ভুরু নাচালো, 'আজ সন্ধ্যায় গ্রান্ড একটা থিয়েটার হবে রে, পেঁচো—। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি—নন্দ ব্যাটা হাতে-পায়ে ধরছে আমাদের, জিনি হাউ-মাউ করে কাঁদছে—বীরু সিনেমা-থিয়েটারের ভিলেন নায়কের মতই মুখ বেঁকিয়ে হেসে উঠলো।

মর‍্যাল রেসপন্সিবিলিটি পালন করার মহান দায়িত্ব নিয়ে এবং মজা দেখবার অসীম আগ্রহ সাথে করে আমরা তিন বন্ধু বেশ সেজে গুজেই সন্ধ্যের গোড়াতেই বেরিয়ে পড়লাম।

জিনির বাড়ির কাছে পৌঁছে দেখি দরজা বন্ধ। ভেতর থেকে জোর একটা আলোর রোশনাই উঁকি দিচ্ছে। কড়া নাড়বার জন্যে হাত বাড়াতেই দরজাটা খুলে গেল। খোলাই ছিল দরজা, ভেজানো ছিল আর কি। মাথা বাড়িয়ে আমরা দেখলুম উঠোন ফাঁকা, বারান্দাটুকুও। ঘরের ভেতরে বাতি জ্বলছে।

গলা পরিষ্কার করে বীরু ডাকলো, নন্দ।

ডাকের সাথে সাথে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো জিনি। দরজার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বললে, 'তোমরা এসে গেছ? দাঁড়িয়ে রইলে কেন? এসো—ঘরে চ'লো।'

বারান্দায় জুতো খুলে রেখে আমরা ঘরে গিয়ে বসলাম। একটা তক্তাপোশের ওপর সতরঞ্চি আর নক্সা-কাটা সুজনি বিছিয়ে বসবার জায়গা করেছে নন্দ। জাপানী কাঁচের প্লেটে এক রাশ বেল ফুল। পাশেই একটা পানের ডিবে, সিগারেটের প্যাকেট। ঘরের এক কোণে টুলের ওপর পেট্রোম্যাক্স বাতিটা জ্বলছে নীলচে আভা ছড়িয়ে। ঘরটা আমরা নজর করলুম চোরা চোখে চেয়ে চেয়ে। নিরাভরণ ঘর। টুকি-টাকি কটা জিনিস। একটা শুধু ছবি দেখলাম দেওয়ালে—মনে হ'লো বরফ সাহেবের ছবি।

ঘরে ঢুকে জিনি বললে, 'তোমাদের জন্যে চায়ের জল চড়িয়ে এলুম। একটু চা খাও কেমন, সবে তো সন্ধ্যে।'

নন্দ কই? বীরু প্রশ্ন করলে।

—হীরাপুরে গেছে। এখুনি আসবে। জিনি কেমনভাবে যেন হাসলো। সলাজ হাসিই বোধ হয়।

কথা যেন আর এগোচ্ছে না। চুপ-চাপ। অস্বস্তি বোধ করছি সকলেই। জিনি বোধ হয় অবস্থা বুঝেই বললে, 'তোমরা বসো। চা-টা নিয়ে আসি।'

জিনি ঘর ছেড়ে চলে যেতেই আমি ফিসফিস করে বললুম, 'জিনিকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে না?' তিনু বললে, 'খাসা দেখাচ্ছে।' বীরু কিছু বললে না। সত্যিই জিনিকে আশ্চর্য সুন্দর দেখাচ্ছিলো। অমন ধবধবে রঙ যার, অমন যার মুখ, চোখ, দেহের বাঁধুনী তাকে টকটকে লাল শাড়ি ব্লাউজে পেট্রোম্যাক্সের উজ্জ্বল নীলচে আলোয় যে ভালো লাগবে দেখতে এ আর নতুন কথা কি। জিনি আজ খোঁপাও বেঁধেছে দেখলুম, খোঁপায় গুঁজেছে দুটি বেলের কুঁড়ি। এই প্রথম দেখলুম বিনুনী ছেড়ে জিনি খোঁপা বাঁধলো।

মুগ্ধ গলায় বললাম আমি, 'নন্দর ভাগ্যটা ভালো।' কথাটা বীরুর কানে গেল। বীরু তাকালো আমার দিকে উগ্র-দৃষ্টিতে। ফিসফিস করেই বললে, 'দেখা যাক্ ভাগ্যটা কতদূর ভালো থাকে।' একটু থেমে আবার, জিনি চা নিয়ে এলে কথাটা আমি তুলবো, তোরা যোগান দিবি। হুঁশিয়ার। বাজে কথাটি কেউ বলবে না। গেভ হতে হবে।

জিনি আমাদের হাতে একে একে চায়ের পেয়ালা তুলে দিয়ে সরে দাঁড়ালো।

আমি, তিনু চায়ের কাপে ঠোঁট ঠেকিয়ে অপেক্ষা করছি—এইবার বীরু শুরু করবে।

বীরু আর শুরু করে না। চায়ের কাপ শেষ হলো। আমরা আড়চোখে বীরুকে দেখছি। শেষ পর্যন্ত বীরু কি নার্ভাস হয়ে পড়লো!

জিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চলে যাবার উপক্রম করছে, বীরু হঠাৎ কথা বললে, তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছো কেন, বসো না? এখানেই বসো। বীরু সরে বসলো। আমরাও সরে বসলুম।

জিনি এসে বসলো। বীরু একটা সিগারেট ধরালো। কড়িকাঠের দিকে তাকালো, চাইলো আমাদের দিকে, জিনির দিকে তারপর খুব আস্তে মোলায়েম সুরে বললে, 'এটা কি ঠিক হলো?'

—আমায় বলছো? জিনি নরম চোখ তুলে প্রশ্ন করলে।

বীরু মাথা নাড়লে।

—কিসের কথা বলছো? জিনি জিজ্ঞাসা করলে।

—কিসের আর—এই ইয়ের, এই ব্যাপার-টার—বীরুর গলায় যেন কথা যোগাচ্ছে না। তিনু বীরুকে সাহায্য করলে।

বীরু তোমাদের বিয়ের কথাটা বলেছে।

জিনি বীরুর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলো।

—বিয়েটা কি হলো?

—ঠিক হলো না! বললুম আমি, নন্দ তোমার ঠিক ম্যাচ নয়—মানে মানায় না।

—কেন? জিনি তখনও ঠোঁট টিপে হাসছে।

—কেন কি, মানায় না, মানানসই নয় বলে। হাজার হোক নন্দ একটা থার্ড ক্লাস লোক, আলুওয়ালা। কি তার স্ট্যাটাস। ভদ্র সমাজে ওর জায়গা নেই। বীরু উত্তেজিত হয়েছে দেখলাম।

জিনি সব শুনলো। উঠলো তক্তাপোশ থেকে। তাকালো আমাদের দিকে একে একে। ঠোঁটের কোণে তার হাসি নেই, আর তার বদলে আশ্চর্য একটা কাঠিন্য। খুব ধীরে ধীরে স্পষ্ট উচ্চারণে জিনি জবাব দিলো আমাদের কথার।

—ভদ্র সমাজে জায়গা তো আমারও নেই।

—কে বললে? বীরু আপত্তি জানালো, 'তুমি আমাদের বন্ধু—বরফ সাহেবের মেয়ে, আলবাৎ তোমার ভদ্র সমাজে জায়গা আছে।'

—না কি? তবে, তবে তোমরা অভদ্র, বাজারের আলুওয়ালা একটা মাতালকে রাত-দুপুরে আমার বাড়িতে তুলে দিয়ে গেলে কেন? জিনির গলার স্বর থর থর করে কাঁপছে।

আমরা চুপ। বিহ্বল বাক্। বীরু অনেক কষ্টে দোষ কাটাবার চেষ্টা করলে, 'অন্যায়টা কি করেছি? আমরা শুনেছি নন্দ—নন্দ তোমার কাছে আসতো।

—তোমরাও তো আসতে। তা বলে তোমরা—জিনির বেঁকা হাসি ধারালো ছুরির মত আমাদের অতিগোপন বিষফোঁড়াসম মনবাসনাটাকে মুহূর্তের মধ্যে প্রকাশ্য আলোয় উন্মুক্ত করে দিলো।

তিন বন্ধু আমরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে চোখ নীচু করলাম।

—বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে, জিনি। বীরু উঠতে উঠতে বললো, 'আর কারুর কথা জানি না, আমি কোনদিন তোমার ঘরে ঢুকি নি। দরজার বাইরেই থেকেছি। দেখতে আসতুম তোমার লীলাখেলা কেমন চলছে।

—অযথাই? জিনি এবার জোরেই হাসলো শুধু।

—অযথা ফযথা জানি না। তোমায় দেখা—মানে তুমি যাতে খারাপ হয়ে না যাও, তা দেখা আমার কর্তব্য—মর‍্যাল রেসপন-সিবিলিটি বলে ভেবেছি।

বীরুর কথা শেষ না হতেই তিনু দাঁড়িয়ে উঠে বললে,—আমিও তাই। তোমার ঘরে ঢোকার জন্যে আসতাম না। অতো ছোটলোক ভেবো না আমায়।

এবার আমার পালা। আমিও উঠতে উঠতে বললুম, 'সকলকে সমান ভেবো না, জিনি। আমি নন্দ নই।'

—জানি। নন্দও তোমাদের মত নয়। তোমরা অনেকবার এসে দরজা খোলা পাওনি। সে একবার এসেই—

আমরা তিনজনে ততক্ষণে ঘরের চৌকাঠে এসে দাঁড়িয়েছি। ঠিক এই সময় দরজা দিয়ে চীৎকার করতে করতে নন্দ ঢুকলো। সঙ্গে তার দুই ভদ্রলোক। একজন তার মধ্যে উকীল। চিনি তাঁকে। এ-পাড়াতেই থাকেন।

—তোমরা এসেছ, ভাই। কী খুশিই যে হয়েছি। কতক্ষণ এলে? বাইরে কেন? চলো, চলো, ঘরের ভেতর চলো—নন্দ আমাদের দুহাত দিয়ে ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলো।

সমস্ত অবস্থাটা তখন এমনই হয়ে এসেছে যে, আমরা ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছি নির্বাক, বিমূঢ় হয়ে আর দর দর করে ঘামছি।

শুনলাম নন্দ বলছে, 'বসুন স্যার—বসুন; বসুন উকিলবাবু, তোমরাও বসো ভাই। স্যার, এরাই আমার বন্ধু, ওরও বন্ধু। এরাই সাক্ষী দেবে।'

—সবই রেডি। তবে আর শুভকাজে বিলম্ব কেন? বললেন উকিলবাবু।

আমাদের চোখের সামনে পেট্রোম্যাক্সের নীলাভ আলোটা ধীরে ধীরে আবার স্পষ্ট হয়ে উঠছে, স্পষ্ট হয়ে উঠছে জিনির মুখ, নক্সাকাটা সুজনি, বেলফুলের প্লেট। দেখছি সেই স্যারকে—ধানবাদ কোর্টের কোন হাকিম বা মহকুমা অফিসারকে। কাগজপত্র বেরুলো, দু-চারিটি প্রশ্ন করলেন স্যার।

—নিন্ সই করুন আপনারা; উকীলবাবু আমাদের দিকে তাঁর কলম এগিয়ে দিয়ে আহ্বান জানালেন।

আমরা তিনজনে—তিনজনের দিকে তাকালাম। আমার বুকটা ধক্ ধক্ করছে তখন। এই বুঝি হলো। এখুনি ঘরের সমস্ত আলো দপ্ করে নিভে যাবে। ছুটে এসে পা জড়িয়ে ধরবে নন্দ; ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠবে জিনি।

অপেক্ষা করছি শেষ পরিণতিটুকুর জন্যে—বীরুর দিকে তাকিয়ে।

বীরু আর একবার আমাদের দিকে তাকালো, তাকালো জিনির দিকে, তারপর হঠাৎ এক লাফে ঘরের বাইরে এসে সোজা রাস্তা।

আমরা প্রথমটায় হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। নন্দ, উকীলবাবু এবং স্যারও। পর-মুহূর্তে ব্যাপারটা অনুধাবন করেই তিনু আর আমি বীরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করলাম।

নন্দ যখন হেই হেই করছে, ততক্ষণে আমরা রাস্তায়—বীরু অনেকটা আগে, আমি আর তিনু একসাথে ছুটছি প্রায়।

গলি পেরিয়ে বাজারের বড় রাস্তা—সেই রাস্তার অনেকখানি ছুটতে ছুটতে এসে আমরা দাঁড়ালাম এক অন্ধকারে—শিব-মন্দিরের পাঁচিলের গায়ে।

সকলেই চুপ। কেউ কোন কথা বলছি না; বলতে পারছি না। হাঁপাচ্ছি আর ঘাম মুছছি।

বেশ খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে বিশ্রী একটা অস্বস্তি জমে উঠতে লাগলো আমাদের মধ্যে। সবাই হয়তো মনে-মনে জিনির বিবাহ-বাসরের কথা ভাবছি।

সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে হঠাৎ বীরু বললে, 'তোরা যা তিনু, আমি একবার স্টেশন যাবো। বম্বে মেলের আর-এম-এসে একটা জরুরী চিঠি ফেলার আছে।' কথা শেষ করেই বীরু আবার বাজারে পথ ধরে হন হন করে এগিয়ে গেল।

বীরুর যাবার পথে তাকিয়ে তাকিয়ে তিনু যেন কি ভাবলে। বললে, 'এখনও নিশ্চয় ন'টা বাজে নি—কি না রে পাঁচু। যতীনবাবুর বাড়িটা একবার ঢুঁ দিয়ে আসি—কি যে করছেন ভদ্রলোক চাকরীর এ্যাপ্লিকেশানখানা নিয়ে।' কথার শেষে তিনুও অপেক্ষা না করে শিবমন্দিরের বাঁদিকের পথ ধরলো।

আমি একা। বীরু, তিনুর যাবার পথে তাকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়লো আমার। পা-পা করে এগিয়ে চললাম। কোথায় যাবো? কোথায়? সামনেই বার্জদের বাঙলোর মাঠ। তার টপকে সেই মাঠে গিয়ে বসলাম।

অন্ধকার। জলো বাতাস ভেসে আসছে হু-হু করে। ভিজে ঘাসের ঠান্ডা লাগছে হাতে পায়ে। আকাশে চাঁদ নেই, তারা নেই। মেঘ জমছে।

সন্ধ্যে বেলার ঘটনাটাই চোখের ওপর ভাসছে তখনও। দেখছি সেই ঘর, সেই আলো, জিনি, জিনির খোঁপা, খোঁপার ফুল। কি হলো শেষ পর্যন্ত কে জানে? ভেস্তে যাওয়া বিয়ের বর-কনে নন্দ আর জিনি পেট্রোম্যাক্স নিভিয়ে ধুলোয় বুঝি গড়াগড়ি দিচ্ছে। কাঁদছে নন্দ, কাঁদছে জিনি—। নাকি অন্য কিছু!

অসম্ভব কৌতূহল হলো আমার। জিনিদের বিয়ের বাসরের পরিণতিটুকু না দেখলে যেন সব—সব বৃথা হয়ে যাবে। দোষ কি? কেউ তো আমায় দেখছে না। একবার উঁকি মেরে দেখেই চলে আসবো।

উঠে বসলাম। পিছনের পথ ধরে এগিয়ে চললাম জিনিদের গলির উদ্দেশে।

গলিটায় পৌঁছনো গেল। অন্ধকার গলি। দু-একজন লোক যাওয়া-আসা করছে। দু-চার ফোঁটা বৃষ্টি পড়লো। গা ঢাকা দিয়ে দিয়ে এগিয়ে এলুম জিনির বাড়ির কাছে। দরজার একটা পাট ভেজানো। আর একটা দিয়ে আলো আসছে তখনও সেই নীলাভ্ আভা। তাহলে? তবে কি নন্দ—? পা টিপে টিপে সেই খোলা দরজার কাছে গিয়েছি—মাথা বাড়াবো হঠাৎ কে যেন ডাকলো নাম ধরে।

চমকে উঠে পালাতেই যাচ্ছিলাম, দেখি পাশে বীরু।

—তুই বীরু? আমি আকাশ থেকে পড়লুম।

—তিনুও এসেছে, আস্তাবলের কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

তিনু এগিয়ে এলো। আমরা তিনজনেই দাঁড়ালাম জিনির দরজার সামনে।

—চল্—ফিরে চল। বললে বীরু।

—ওদের কি হলো! প্রশ্ন করলুম আমি।

—যা হবার। গম্ভীর হয়ে জবাব দিলে বীরু, 'উকীল থাকতে আবার বিয়ের ভাবনা। ব্যাটা নন্দর ওপর যা রাগ হচ্ছে—যত সব বাজে লোক ধরে এনে বিয়ের সাক্ষী দেওয়ালে শেষ পর্যন্ত। কি হয়েছিল একটু সবুর করতে। আমি তো একটু পরেই এলাম।

—তুই বুঝি অনেকক্ষণ এসেছিস? আমি প্রশ্ন করলাম।

—এলাম। কি করবো? তোদের ছেড়ে দিয়ে ভাবলাম কাজটা ঠিক হয়নি, আফটার অল নন্দ, জিনি আমাদের বন্ধু—একটা মরাল রেসপনসিবিলিটি আছে তো! সইটা করেই দি! গম্ভীর সুরে বললো বীরু।

—যা বলেছিস ভাই। আমারও তাই মনে হলো। শেষ পর্যন্ত এলুম সই করতে; বললে তিনু।

আমিও ওই কথাই ভেবেছি। বীরুর দিকে তাকিয়ে বেমালুম বলে দিলাম, 'সইটা করেই কেটে পড়তাম।'

আমরা তিন বন্ধু ফিরে চললাম। আমরা এসে মর‍্যাল রেসপনসিবিলিটি পালন করার আগেই ইম্‌মর‍্যালের দল এসে সেটা পালন করে গেছে। জিনি আর নন্দ এখন নীলাভ আলোর তলায়, নক্সাকাটা সুজনির ওপর বসে। হয়তো হাসছে কিম্বা—

পাঁচুদা গল্প শেষ করে থামলেন।

আমরা সকলেই চুপ। জিনি আর নন্দর বিবাহ-বাসরটা কল্পনা করার চেষ্টা করছি হঠাৎ অরুণ বললে, 'পাঁচুদা, আপনার মর‍্যাল রেসপনসিবিলিটির কাহিনী তো শুনলাম; কিন্তু গল্পের মর‍্যালটা কি?

পাঁচুদা কিছু জবাব দেবার আগেই রাসবিহারী উঠে দাঁড়ালো, ঝাঁঝালো গলায় বললে, 'মর‍্যালটা অত্যন্ত ইম্‌মর‍্যাল।' এবং দ্বিতীয় কোন কথা না বলে, আমাদের দিকে দৃক্‌পাত না করে রাসু ঘর ছেড়ে সোজা রাস্তায় বেরিয়ে গেল।

পাঁচুদা নীরবে হাসলেন শুধু।

কাংড়া ও কুলুতে জীবনছন্দ

কে ই লিট্‌ল
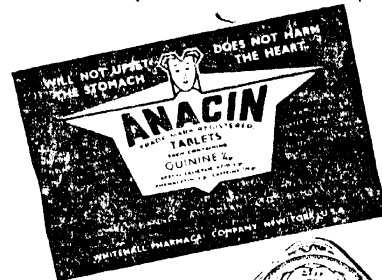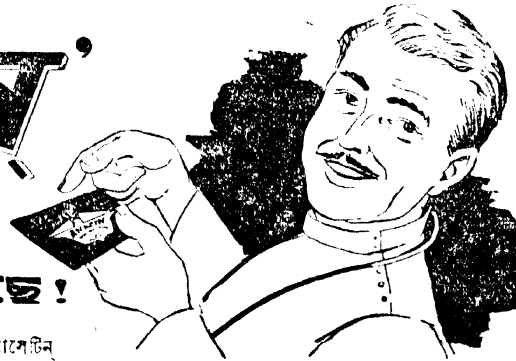
সাধারণভাবে বলা যায় যে, কোন জাতির আচার-অনুষ্ঠান এবং তার শিল্প-সৃষ্টিতে সে সকল আচার-অনুষ্ঠানের অভিব্যক্তির মধ্যেই সেই জাতির সাংস্কৃতিক পরিচয় নিহিত।

যন্ত্রপাতি, ছাপাখানা, বাধ্যতামূলক শিক্ষা আমেরিকা ও ইউরোপের অনেকগুলি জাতির সংস্কৃতির একটা ধরাবাঁধা মান নির্দিষ্ট করে দিয়েছে; কারখানা শিল্প-কলাকে গ্রাস ক'রে 'হাতের' ব্যবহার সীমিত ক'রে দিয়ে বাঁধা ছাদের পণ্য উৎপাদন করছে। সংবাদপত্র শিক্ষিতজনের চিন্তা-জগৎকে একটা নির্দিষ্ট ছাঁচে গড়ে তুলছে এবং সিনেমা চিত্তবিনোদনের সস্তা, গতানুগতিক ও অকিঞ্চিৎকর খোরাক যোগাচ্ছে।

তবুও এই যন্ত্রসিদ্ধিই পাশ্চাত্ত্য জগৎকে বৈষয়িক উন্নতির পুরোভাগে স্থান দিয়েছে এবং জড়শক্তির অধীশ্বর করেছে। অন্যান্য জাতিকেও হয় এই পথে চলতে হবে, আর না-হয় পেছনে পড়ে থাকতে হবে।

যন্ত্রশিল্প কি অনিবার্যরূপেই ভারতের সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে ফেলবে? শিল্পীরা এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে নিশ্চয়ই; কিন্তু কোন জাতির কিছুসংখ্যক লোক যদি একটা বাঁধা মজুরিতে একটা বাঁধা সময়ের জন্য একটা বাঁধা কাজ করতে প্ররোচিত হয়, তবে তার ফলে সেই জাতির আচার-ব্যবহারে বিভ্রাট ঘটবার কি কারণ থাকতে পারে? কিন্তু যন্ত্রের চাইতেও বেশি বিপজ্জনক পাইকারী হারে মেধাহীনদের বাধ্যতামূলক শিক্ষা—পরীক্ষা পাশের মধ্যে যার চরম সার্থকতা, সিনেমা এবং সংবাদপত্র। তবুও ভারতের সংস্কৃতি সংরক্ষণে, এমনকি, এর পরিবর্ধনেও এগুলি অশেষ হিতকর হতে পারে।

শিক্ষাবিদ্‌গণ এই সমস্যা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন।

স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার জন্য যা-কিছু প্রয়োজন, ভারত যদি নিজেই তা উৎপন্ন করতে চায়, তবে সর্বপ্রযত্নে পাশ্চাত্ত্য জগতের কারখানা-পদ্ধতির যা-কিছু শ্রেষ্ঠ, তার অনুকরণ করুক; কিন্তু ধর্ম ও পারিবারিক আদর্শের দিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির দেশগুলির শিক্ষাপদ্ধতির হুবহু নকল করতে গেলে তা ভ্রমাত্মক হবে, আর পাশ্চাত্ত্য জগতের আমোদ-প্রমোদের অনুকরণ করতে গেলে তা হবে খুবই বড় রকমের ভুল। সিনেমা ভারতের সংস্কৃতির ধারক হতে পারে। কিন্তু খেলার মাঠ সম্বন্ধে বলতে হয়, লোকে যেন পয়সা খরচ করে বসে বসে পেশাদার খেলোয়াড়দের ক্রীড়ানন্দ না দেখে নিজেরাই খেলে। প্রতিটি খেলার মাঠ প্রতি সপ্তাহে ঘণ্টা দেড়েকের জন্যে মাত্র বাইশজন খেলোয়াড় ব্যবহার করে থাকে। এই খেলার মাঠগুলো আর সিনেমা হচ্ছে শিল্প-শহরের পরিণাম—অবাঞ্ছনীয়, তবুও হয়তো আবশ্যক; ঠিক যেমন শিল্প-শহরগুলি হয়তো আবশ্যক, যদিও অবাঞ্ছনীয়।

সারা ভারতে এখনও সদাসন্তুষ্ট এমন এক-একটি মানব-গোষ্ঠীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যারা এক সম্পূর্ণ ও চিরন্তন সংস্কৃতি নিয়ে বাস করছে। এ জিনিসটি হিমালয়ের পাদশৈল ও উপত্যকাগুলিতে যেমন দেখা যায়, তেমন আর কোথাও নহে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কুলুর কথা ধরুন। আপনি যদি বোম্বাই অথবা কলকাতা অথবা লণ্ডনের মত বৃহৎ কোন নগরে বাস করে থাকেন, তবে দু-এক মাসের জন্য কুলুতে গেলে আপনি নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ পৃথক এক জীবন-যাত্রার স্বাদ পাবেন—অধিবাসীদের পারি-পার্শ্বিক অবস্থা এবং দৈনন্দিন প্রয়োজন যে জীবনযাত্রার ভিত্তি। আপনারা যাঁরা অন্ন-বস্ত্র, বিহার, আমোদ-প্রমোদ ও কাজের জন্য পরনির্ভরশীল, যে-বাড়ি নিজে তৈরি করেন নি, সে-বাড়িতে বাস করেন এবং মেরামতেরও দায়িত্ব বহন করেন না—সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল লোকের এক সমাজে কিছুকাল বাস করার আকর্ষণকে অবহেলা করতে পারবেন না।

খুব সহজেই যাওয়া যায় ওখানে। ট্রেনে ক'রে গেলেন পূর্ব-পাঞ্জাবের পাঠানকোটে। ট্রেন এলে সেখান থেকে ট্রেনের যাত্রী নিয়ে কতকগুলো বাস চলাচল করে; তারই একটিতে ক'রে আপনি সেদিনই সন্ধ্যায় পালামপুরে পৌঁছুবেন।

আপনি ইতিমধ্যেই হিমালয়ের ক্রোড়ে এসে গেছেন—আধ ডজন মাইল উত্তরে তুষারমৌলি চতুর্দশ সহস্র ফুট উচ্চ পর্বত-

বৈজনাথের গায়িকা

কাংড়ার একটি কিশোরী

প্রাকার ধাউলি ধার। তির্যক-দৃষ্টি, আরক্তিম গণ্ড, মহানুভব-দর্শন, এই সব লোকদের দেখুন; এ'দের গলায় ধাতুর মালা, পায়ে পশমের জুতো এবং পশুলোম-শোভিত টুপি। এরা মোংগল; লাহুল, লাডখ ও তিব্বতে এদের বাস। আর নগ্ন-পদ, অকৃপণ মাপে ঢিলে-ঢালা করে ছাটা একরঙা একটিমাত্র কম্বলের আজানুলম্বিত আরামপ্রদ কুর্তাপরিহিত, কোমরে কৃষ্ণ-ছাগের লোমে দড়ি-পাকানো কটিবন্ধ আঁটা—এসব লোককেও দেখুন। এই ভূষণের অধিকারীকে বলা হয় 'গদ্দি'। এরা মেষপালক ও আর্যকুলোদ্ভব। তারা কাংড়া পর্বতে কিছুকাল বাস করলেও তাদের নির্দিষ্ট কোন বাসস্থান নেই। ঋতুপর্যায়ের আবর্তনে তারা স্থান থেকে স্থানান্তরে চলে যায়।

গদ্দির কুর্তা তৈরিতে যন্ত্রের কোন স্থান নেই; লাহুলবাসীর রক্তবাস তৈরিতেও যন্ত্রের কোন স্থান নেই। উভয় শ্রেণীর লোকরাই নিজস্ব পশুদেহের পশমে অবিরত সুতো কাটছে; তারপর নিজেরাই হোক বা পরিবারের আর কেউই হোক, সেই সুতো বুনে লঘু, কোমল উষ্ণ বস্ত্র তৈরি করছে, যা তাদের জীবনযাত্রা ও স্ব স্ব দেশের আবহাওয়ার সম্পূর্ণ উপযোগী।

পালামপুর ও এর বাজার মনোহর। চারদিকে দেবদারুমণ্ডিত বনানী ও প্রশান্ত চা-বাগানগুলির শোভা এত অপরূপ যে দ্বিতীয়বার না দেখে দ্রুতবেগে এ স্থান-গুলো অতিক্রম করে চলে যাওয়া সম্ভবপর নয়। বাজারে কয়েকজন শিল্পী আছে—স্যাকরা, কুম্ভকার, চর্মকার প্রভৃতি।

অতি প্রত্যুষে ডাক-বাংলো ছেড়ে আপনাকে যাত্রা আরম্ভ করতে হবে। পাইন-বীথি ঘেরা ছোট্ট আরামপূর্ণ ডাক-বাংলোটি ছেড়ে যেতে আপনার কষ্ট হবে। পাহাড়ের গা ঘেঁষে আপনি সারাদিন পথ চলবেন; আপনার বামে সর্বক্ষণ ধাউলি ধারের অমিতকায় পাষাণ-স্তূপ এবং ডাইনে চকিতে সমতল ভূমির দৃশ্য। আপনি চড়াই ভাঙতে ভাঙতে স্মরণাতীত কালের প্রাচীন হিন্দু দেবালয়ের পীঠস্থান বৈজনাথ ও যোগীন্দ্র-নগর অতিক্রম ক'রে যাবেন; তারপর খাদ পেরিয়ে উৎরাই পথে নামতে থাকবেন এবং প্রতিটি বাঁক নব নব সৌন্দর্য, নব নব কৌতূহল আপনার দৃষ্টির সম্মুখে উদ্ঘাটন করতে থাকবে। ক্রমে উপত্যকায় প্রচ্ছন্ন ছোট একটি শহর আপনার দৃষ্টিগোচর হবে। প্রত্যেক মোড় ঘোরার সংগে এবং আপনি যতই নিকটতর হবেন, ততই ছোট শহরটি ক্রমশ বড় হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। এই হল মণ্ডি।

সায়াহ্নে আপনি খরস্রোত বিপাশার কূলে পৌঁছুবেন। এর ওপর একটি ঝোলানো পুল—পুলের ওপারেই মণ্ডি।

মণ্ডির নিসর্গ শোভা অপরূপ। মাত্র এক রাত্রি যাপন ক'রে আপনি এখান থেকে চলে যেতে পারবেন না। এর সমগ্র পারি-পার্শ্বিকের মধ্যে রয়েছে যুগ-যুগান্তরের প্রাচীনত্ব। মণ্ডিতে পা দিয়ে আপনি যেন শত শত শতাব্দী পেছিয়ে গেছেন। এর প্রাচীনত্বের অচলায়তনে কোন কিছু অনধিকার প্রবেশ করতে পারে না। এর ভাস্কর্যে আছে ছন্দ-সুষমা; নদীতীর বরাবর হিন্দু দেব-মন্দিরগুলি নির্মিত; নদী গর্ভ হতে প্রশস্ত সোপান-শ্রেণী উপরে উঠে গেছে; আঁকাবাঁকা সরু পথগুলি বাজারে এসে শেষ হয়েছে; একটি স্নিগ্ধ, সুন্দর ছোট উদ্যান যাতে আছে আশ্চর্য রকমের চীনা ধরণের একটা ঘড়িঘর।

আপনি ক্বচিৎ কখনও কাংড়ার দু' এক-জন গদ্দির সাক্ষাৎ পাবেন; লাহুল ও তিব্বত থেকে আগন্তুক বণিক ও লামাদের দেখা পাবেন; কার্পাস বস্ত্র পরিহিত পাঞ্জাবের সমতলবাসীদেরও দেখতে পাবেন; কুলুর পাহাড়িয়া অধিবাসীরাও আছে। এ সকলকেই আপনি মুহূর্ত মধ্যে ও অনায়াসে চিনে ফেলতে পারবেন তাদের পোশাক দেখে।

এখানে চুনাট করা খড়ের তৈরী পাদুকা, পশমের টুপি, অতি জটিল কারুকার্যময় রুপার কণ্ঠহার এবং বড় ও ভারী কর্ণাভরণ বিক্রি হয়ে থাকে।

কুলুভ্যালীর কৃষক

বাজারে কারিগররা রয়েছে যারা পেতল, রূপো, তামা ও লোহার কাজ করে। বাজারের মধ্যভাগে সারি সারি বসে স্ত্রীলোকেরা বিক্রি করছে নিকটবর্তী ক্ষেতের তরিতরকারী—ঝুড়ি-ভর্তি টম্যাটো, শশা, ফুলকপি; আর প্রতিনিয়ত বিক্রি করছে ফুল—দেবার্চনার পীতপুষ্প।

কারণ কলমুখর রাস্তাগুলির অতি নিকটেই রয়েছে মন্দিরগুলি যেগুলির স্নিগ্ধশীতল প্রাঙ্গণে নন্দীর ষাঁড় সুখ-শয়ান; পূজারীরা দিনের মধ্যে বহুবার মন্দিরে পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছে।

এই যে এখানের মন্দিরগুলি—এদের মূল সুদূর অতীতে নিবদ্ধ; অধিবাসীদের পূর্ব-পুরুষেরা যে পরিচ্ছদ পরতেন আজকের উত্তরপুরুষরাও সেই পরিচ্ছদই পরছেন, পিতৃপুরুষরা যে দেবতার পূজা করে গেছেন, আজও তারা সেই দেবতারই পূজা করছেন। এক অক্ষয় ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় অটল থেকে তাঁরা এক প্রসন্ন জীবন যাপন করে যাচ্ছেন।

তারপর আপনাকে মণ্ডি ছেড়ে যেতে হবে। বিপাশার স্রোত অনুসরণ করে আপনি কুলু উপত্যকায় পৌঁছুবেন—যা দেখবার জন্যে আপনি এতদূরে এসেছেন। কতক-গুলি জিনিস এখানে আছে যা এখানকার সম্পূর্ণ নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। কুলুর বাড়িঘর সমস্ত উপত্যকাতে—যা কাংড়া অথবা মণ্ডিতে দেখা যায় না। এমনটি আপনি কাশ্মীর অথবা সিমলা অথবা দার্জিলিং কিংবা কুমায়ুন পাহাড়েও দেখবেন না। এখানে পোশাকও সম্পূর্ণ পৃথক। পুরুষ-মাত্রই কুলু টুপি মাথায় দেয়; একটি সাড়ম্বর আঁটসাট টুপি যার সম্মুখভাগে উজ্জ্বল বস্ত্রখণ্ডের একটি বন্ধনী যাতে বিশেষ উপলক্ষে ফুল গুঁজে দিয়ে শিরো-শোভা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। স্ত্রীলোকেরা ডোরাদার কম্বল মনোজ্ঞ ভাঁজে ঢিলেঢালা করে গায়ে এঁটে রাখে। বিবাহিত নারীরা একখণ্ড কালো কাপড়ে মাথা বেঁধে রাখে; সদ্য বিবাহিতারা লাল কাপড় পরে আর অবিবাহিত মেয়েদের মাথা থাকে অনাবৃত।

উপত্যকার যে কোন স্থানে ইচ্ছা আপনি যান—কুলুতে (প্রায়ই সুলতানপুর নামে অভিহিত), কাতরাইনে, নগরে, রায়সনে, মানালিতে। থাকবার জায়গা ভাল, প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোহর, অধিবাসীরা অতিথিবৎসল। বাজারে গিয়ে তাদের দামদস্তুর করতে শুনুন; তাদের চোখে হাসি, কণ্ঠে হাসি, উত্তেজনাহীন শান্ত সরস তাদের প্রকাশ-ভঙ্গী। গ্রামে যান তারা আপনাকে সাদর অভ্যর্থনা করবে। গ্রামে গিয়ে দেখুন কম্বল বুনা, পশম থেকে সুতো কাটা, ক্ষেতের ও বাগানের ফসল মজুত করার জন্যে গোলায় তুলে রাখা, মাঠে পশুচারণ। তাদের বাড়ি-ঘরের আপনি প্রশংসা করবেন। বাড়িগুলি কাঠের তৈরী, এখন পুরাতন ও জীর্ণ এবং ধূম্রসেকে গভীর পিঙ্গলবর্ণ। দোতলা ঠিক একতলার উপরে এবং ছাদ অমসৃণ শ্লেট পাথরের। বারান্দার থামগুলি সুন্দর খোদাই-কাজে সমৃদ্ধ। এ সমস্তই হাতে তৈরী, বাড়ির বর্তমান যে মালিক তারই পূর্বপুরুষেরা বাড়ি তৈরী ও সজ্জিত করে গেছেন এবং বাড়ি মেরামত রাখাও সে নিজেই করে থাকে। ক্ষেতে গিয়ে তাদের কাজ দেখুন, তাদের জলশক্তি চালিত ছোট যাঁতা-কলও এক নজর দেখে নিন।

এই যে জীবনছন্দ, তা শাশ্বত এবং উপত্যকার সর্বত্র এই একই জীবনছন্দের পুনরাবৃত্তি।

সংকীর্ণ পায়ে-চলা পথ দিয়ে আপনি প্রবেশ করুন ঘন দেওদার বনের ঐশ্বর্যের মধ্যে। পাইন-কাঁটা ও বন্য গুল্ম পদদলিত করে আপনি মায়াময় ছোট ছোট স্রোত-

কম্বল বয়নরত তাঁতী

স্বিনীর কূলে এসে পেশছুবেন, যেগুলি তুষারপাতে হিম-শীতল; তারপর আচম্বিতে একটি মোড় ঘুরতেই আপনি বিরাট বরফ স্তূপের সম্মুখীন হবেন যা থেকে ঐ ছোট ছোট স্রোতস্বিনীর উৎপত্তি।

কিন্তু উপত্যকার সৌন্দর্য উপভোগে আপনি যতই ব্যস্ত থাকুন না কেন, একটি গ্রাম্য উৎসব দেখতে ভুলবেন না; এই গ্রাম্য উৎসবের অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হওয়া কাহারই উচিত নয়।

বসন্ত ঋতুর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই মেলার সমারোহ। এ সপ্তাহে হয়তো বাসখিন্ত গ্রামে একটা উৎসব আছে; পরের সপ্তাহে হয়তো জয়সুখে; এর দিন কয়েক বাদে হয়তো মানালিতে—এভাবে চলেছে সমগ্র উপত্যকাময়। সবাই যোগ দিচ্ছে এগুলিতে; পার্বত্য পথ বেয়ে জনস্রোত চলেছে এবং প্রায় সব দলেই কতক লোক গ্রামের দেববিগ্রহকে সঙ্গে করে মেলায় নিয়ে আসছে। ইষ্ট-দেবতাকে একা ফেলে এসে আনন্দ উপভোগ করার কথা গ্রামবাসীরা ভাবতেও পারে না। মেলা যখন পূর্ণোদ্যমে চলেছে, তখন দেখবেন, নৃত্যস্থলের একপাশে বিগ্রহগুলির সারি সারি চন্দ্রাতপ এবং অপর পাশে পুরুষ দর্শকরা; মেয়েরা পর্বতসানুর দিকে পৃথক্ সারিতে বসে। কতক স্ত্রীপুরুষ একত্র মিশে গেলেও সাধারণত স্ত্রীপুরুষ পৃথক পৃথক বসে এবং ঘনকৃষ্ণ অরণ্যানী ও শুভ্রসমুজ্জ্বল তুষার স্তূপের পটভূমিকায় মেয়েদের আভরণ ও বর্ণসমারোহে যে দ্যুতি বিকীরণ হতে থাকে, তা স্মরণ করে রাখার মত এবং দেখে মুগ্ধ হবার মত।

নৃত্য চলেছে; গতি মন্থর হলেও একটি করুণ রসাত্মক সঙ্গীতের তালে তালে নিখুঁত অঙ্গভঙ্গিমায় নৃত্য চলেছে। নৃত্যটি যেমন প্রাচীন ও অর্থগৌরবে পূর্ণ, গানটিও তদ্রূপ। নৃত্যের তালমান রক্ষা করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অবিশ্রান্ত তারা নেচে চলেছে। জনতার সারিগুলি উদ্বেল হয়ে উঠছে। নর্তকীদের করকমলে রঙীন রুমাল দোলায়িত হচ্ছে, অপরূপ ছন্দে লীলায়িত হচ্ছে তাদের ঘাগরা। শিরোভূষণের পীতপুষ্পদাম তাদের ক্লান্তিপাণ্ডুর সুন্দর মুখাবয়বের পার্শ্বে ঝুলে পড়ছে। নৃত্যমদরসে ও সঙ্গীতের মূর্ছনায় এরা সম্বিৎহারা। ভাবলেশহীন নির্বিকার অঙ্গ-বিক্ষেপে তারা নেচে চলেছে। সূর্য অস্ত যায়। তবু নৃত্যের বিরাম নেই। দর্শকরা এতক্ষণে চঞ্চল হয়ে উঠেছে; তারা আলাপমুখর হয়ে, সন্দেশ খেয়ে, মেলার বিভিন্ন বিপণিতে ছোটখাট উপহার-সামগ্রী কিনে বেড়াতে লাগল।

এই উৎসবের বৃত্তান্ত আপনি পরদিনের খবর-কাগজে দেখতে পাবেন না, কারণ কুলুতে দৈনিক কাগজ নেই।

চিত্তবিনোদনের প্রয়োজনীয়তা আছে এবং এই সরলপ্রাণ লোকেরা যে-পদ্ধতিতে চিত্তবিনোদন করে, তার একটা তাৎপর্য আছে। এখানে যন্ত্রের কোন চিহ্নও নেই, কারখানায় তৈরী একটি জিনিসও কোথাও দেখা যাবে না। এখানে একটা সজীব অর্থপূর্ণ সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে, যাকে যন্ত্রশালা, বিদ্যালয় ও ছাপাখানার সাহায্যে লালন ও রক্ষা করতে হবে; এটা একটা বাস্তব ও মূল্যবান সংস্কৃতি, যেহেতু বংশপরম্পরার ঐতিহ্যের ভিতর দিয়ে এর উদ্ভব; অর্থসঙ্গতির দিক দিয়ে এ সংস্কৃতি সত্য এবং এই সংস্কৃতির একটা সৌন্দর্য আছে।

সুতরাং, পশ্চাতের সবকিছুকে নির্মমভাবে ধ্বংস করে অনিয়মিত পদক্ষেপে নহে—একটা বলিষ্ঠকায়, দৃঢ়মূল সংস্কৃতির স্বাভাবিক বৃদ্ধির মতো ক্রমিক ও সবল পদক্ষেপে কিভাবে প্রগতির পথে যাত্রা করা যেতে পারে, ভারত জগতের সামনে তার এক দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে পারে।

(March of India হইতে)

শ্রীবিমল মিত্র

কাহিনী

৩

ফতেপুর গ্রাম থেকে তিন ক্রোশ পথ হেঁটে মাজদিয়া ইস্টিশান। সেই ইস্টিশানে ট্রেন ধ'রে একদিন এসেছিল ভূতনাথ এই কলকাতায়।

শেয়ালদা ইস্টিশানের চেহারা, লোকজন, চীৎকার আর বাইরের দৃশ্য দেখে হাঁ হয়ে গেল ভূতনাথ। কোথায় এসে পড়েছে সে। কুলিদের টানাটানি বাঁচিয়ে কোনওরকমে বাইরে এসে দাঁড়াল। দু'টো টাকা ছিল পকেটে—সে দু'টো পুরে নিল ট্যাঁকে। ব্রজরাখাল বলেছিল—খুব সাবধান, পকেটে টাকাকড়ি থাকলে সে আর দেখতে হবে না—কলকাতা শহর তোমার ফতেপুর নয় যে...

কলকাতা শহর যে ফতেপুর নয় তা ভূতনাথ জানতো। মল্লিকদের তারাপদ সেবার বারোয়ারী পার্টির যাত্রার নাটকের বই কিনতে এসেছিল কলকাতায়। তা'র কাছেই শোনা। বললে—ওই যে দেখছো মিত্তিরদের ঢিপ্-চালতে গাছ—ওই ঢিপ্-চালতে গাছের হাজার-ডবল্ উঁচু সব বাড়ি, বুঝলে কাকা—সেই উঁচু বাড়ির মাথায় দেখি না মেয়েমানুষরা দিব্যি আরামে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখছে—

ভূষণ কাকার বয়স হয়েছে। প্রচুর টাকার মালিক। তবু কলকাতায় যায়নি কখনও। যাবার প্রয়োজন হয়নি। কাকা বললে—মাথায় ঘোমটা-টোমটা নেই—?

তারাপদ বললে—ঘোমটা দেবে কেন শুনি—কোন্ দুঃখে—ভালো করে কি দেখতে পাচ্ছে কেউ তাদের—আমি রাস্তা থেকে দেখছি ঠিক যেন এই এবটা য়্যাট্টুক্ কড়ে আঙুলের মত—

ভূষণ কাকা বললে—হ্যাঁরে শুনেছি নাকি কলকাতায় আজকাল বিয়ে-অলা মেয়েরা সিঁদুর পরে না—ঘোমটা খুলে সোয়ামীর সঙ্গে মটরে হাওয়া খেতে যায়—পরপুরুষের সামনে সোয়ামীর সঙ্গে কথা বলে—

—মিথ্যে কথা, একেবারে মিথ্যে কথা কাকা—

তারাপদ মাথা নাড়তে লাগল।

—তা' হ'তে পারে না—আমি যে নিজের চোখে সমস্ত দেখে এলাম কাকা—ধরনা কেন সকালবেলা নামলাম তো ট্রেন থেকে—আর সন্ধ্যেবেলা আবার ট্রেন ধরলাম—কলকাতার কিছু দেখতে তো আর বাকি রাখিনি কাকা—রাণাঘাট থেকে পাঁউরুটি কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম—আর মাজদে'র রসগোল্লা—পেটটি পুরে তাই খেয়ে নিয়ে সব খুঁটে খুঁটে দেখলাম—ঘোড়ার ট্রাম গাড়ি দেখলাম—কী জোরে যায় যে কাকা—সামনে আসতে দেখলে বুকটা দুর দুর করে ওঠে—

—কেন বুক দুর দুর করে কেন?—জিজ্ঞেস করেছিল ভূতনাথ।

জবাব দিয়েছিল ভূষণ কাকা। বলেছিল—তুই থাম তো ভূতো—বোকার মত কথা বলিস নে—লোকে হাসবে—

ভূতনাথ সত্যি সত্যি আর কথা বলেনি। চুপ-চাপ শুনে গিয়েছিল।

তারাপদ বলেছিল—আমার একবার ইচ্ছে করে কাকা ভূতোকে দিই ছেড়ে গিয়ে কলকাতার রাস্তায়—ও ঠিক হাউ-মাউ করে কেঁদে ফেলবে—দেখো—

ভূষণ কাকাও যেন বিজ্ঞের মত জবাব দিয়েছিল—তা' তো বটেই—এ কি আর ছিন্নাথপুরের গাজনের মেলা যে, রাত হয়ে গেল ভাবনা নেই—কেষ্ট ময়রার দোকানের মাচায় দু'টো চিঁড়ে মুড়কি চিবিয়ে শুয়ে পড়লাম—

মল্লিকদের বাড়ির তারাপদর কথায় সেই ছোটবেলা থেকেই কলকাতার নাম শুনলেই যেন রোমাঞ্চ হ'তো ভূতনাথের। একদিন মিত্তিরদের ঢিপ্-চালতে গাছটার মগডালে গিয়ে উঠেছিল ভূতনাথ। এর হাজার-ডবল উঁচু। সে যে কতখানি—তা' অনুমান করা শক্ত। তবু অনেক অনেক দূরে চেয়ে চেয়ে দেখেছে সে। সোজা পশ্চিমদিকে চাইলে শুধু দেখা যায় কেবল গাছ আর গাছ। গাছের ফাঁকে ফাঁকে মাঠ। তারপর আকাশ। শুধু আকাশ আর আকাশ। আকাশময় চারিদিক। সন্ধ্যেবেলা বাদুড়-গুলো ওদিক থেকে ফল-পাকড় খেতে একটার পর একটা উড়ে আসে। ওই শহরের দিক থেকে। মাজদে' স্টেশনের চেয়েও অনেক দূরে—কত শহর—ফতে-পুরের মত কত গ্রাম পেরিয়ে তবে কলকাতা। সেখানে ঘোড়ার ট্রামগাড়ি চলে খুব জোরে—সামনে আসতে দেখলে বুক দুর দুর করে। (কেন করে তা' বলা যায় না) মিত্তিরদের ঢিপ-চালতে গাছের হাজার-ডবল উঁচু উঁচু সব বাড়ি। তার মাথায় লোকগুলো দেখায় এই এতটুকু কড়ে আঙুলের মত।

এমনি ভাবতে ভাবতে গাছ থেকে নেমে পড়ে ভূতনাথ।

এর পর আর একদিনের ঘটনা। তখন অনেক বড় হয়েছে ভূতনাথ। ইস্কুলে এসে ভর্তি হলো গঞ্জের হাসপাতালের বড় ডাক্তারের ছেলে ননী। ভারি ফুটফুটে ছেলেটা। যেমন ফরসা, তেমনি কালো কালো চোখ; বড় বড় চুল। পরে অনেক-বার ভূতনাথ ভেবেছে ননী যেন ছেলে নয়। অনেক ভাব হবার পরেও ননীর হাতে আচমকা হাত ঠেকে গেলে কেমন যেন শিউরে উঠতো ভূতনাথ। ইস্কুল থেকে মাইলের পর মাইল হেঁটে হেঁটে বাড়ি আসার পথে ননীর কথাই সারা রাস্তাটা ভাবতো। এক-এক সময় মনে হতো, ননী তার বোন হলে বেশ হতো। তা'হলে দু'জনে এক বাড়িতে থাকতো, শুতো এক বিছানায়। অনেক ছুটির দিন ভূতনাথ হেঁটে হেঁটে একা চলে গেছে ইস্কুলের কাছে। তারপর লুকিয়ে লুকিয়ে হাস-পাতালের আশে পাশে ঘুরে বেড়িয়েছে। ননীকে যদি একবার এক ফাঁকে দেখতে পাওয়া যায়! আবার লজ্জাও হতো। যদি ননী তাকে সত্যি সত্যিই দেখে ফেলে! যদি ননী জিজ্ঞেস করে—কী রে ভূতনাথ তুই এখানে কেন—

তখন কী জবাব দেবে সে।

ননীকে তো বলা যায় না যে তাকে দেখতেই তার আসা। ভুল করে নিজের একটা বই ননীর বই-এর মধ্যে মিশিয়ে দেয়। তবু যদি সেই অছিলায় স্কুলের পরেও তার সঙ্গে আবার কথা বলার সুযোগ হয়।

সেই ননী কতদিনই বা ছিল তাদের স্কুলে। তবু কত গল্প হতো। কত জায়গায় তার বাবা বদ্‌লি হয়েছে। কত স্কুলের গল্প—কত ছেলের গল্প।

সেই ননী একদিন চলে গেল।

চলে গেল চিরকালের স্বপ্নের দেশ—কলকাতায়—

যাবার আগের দিন কেমন যেন মনখারাপ হয়ে গিয়েছিল ভূতনাথের। ননীর বাবা বদ্‌লি হয়ে কলকাতায় যাবে—ননীর তাই আনন্দ হয়েছিল।

ভূতনাথ অনেক সাহস সঞ্চয় করে জিজ্ঞেস করেছিল—তোর খুব কষ্ট হচ্ছে না ননী—

—কেন? কষ্ট হবে কেন?—

কলকাতায় যাওয়াতে কষ্ট হওয়ার যে কী আছে তা' ননীর মাথায় আসেনি। কিন্তু ভূতনাথের মনে হয়েছিল তা'র নিজের যেমন কষ্ট হচ্ছে—ননীর তেমন হলেই যেন ভালো হতো। কেন যে ননীর মনে কষ্ট হওয়া উচিত—তা ভূতনাথ লজ্জায় ব্যাখ্যা ক'রে বলতে পারেনি। ভূতনাথের সে দুঃখ সেদিন বুঝতে পারেনি ননী। না পারবারই কথা। কত দেশ সে দেখেছে। কত বড় লোক তারা। কত ভূতনাথ তার জীবনে আসবে যাবে। মনে আছে ননীরা কলকাতায় চলে যাবার দিন খাটুরোর বিলের ধারে শাঁড়া গাছটার তলায় বসে হাউ হাউ ক'রে কী কান্নাটাই না কেঁদেছিল সে।

কিন্তু একদিন ননীর চিঠি এল। খাস কলকাতা থেকে। জীবনে সেই তার প্রথম চিঠি পাওয়া। সেদিন সে-চিঠি পড়ে যে-আনন্দ ভূতনাথ পেয়েছিল—তা' আর কোনদিন কোনও চিঠি প'ড়ে পায়নি। চিঠিখানা সে কতবার পড়েছে। বালিশের তলায় রেখে ঘুমিয়েছে দিনের পর দিন। চিঠিখানা জামার তলায় বুকের ওপর রেখেছে। যেন ননীর হাতটার স্পর্শ আছে ওই একটুকুরো কাগজে। অথচ কী-ই বা লিখেছে ননী। বলতে গেলে কিছুই নয়—

ননী লিখেছিল—

'প্রিয় ভূতনাথ,

আমরা ত শনিবার দিন এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। কলিকাতা বেশ বড় দেশ—কী যে চমৎকার দেশ বলিতে পারিব না। এখানে আসিয়া অবধি বাবার সঙ্গে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। বড় বড় বাড়ি আর বড় বড় রাস্তা। খুব আনন্দ করিতেছি, তোমাদের কথা মনে পড়ে। তুমি কেমন আছ জানাইও। উপরের ঠিকানায় চিঠি দিও—'

দশখানা খাতার কাগজ নষ্ট হয়ে গেল। তবু সেদিন ননীর চিঠির উত্তর কিছুতেই পছন্দ হয়নি তার। কত কথা ভূতনাথ লেখে—আবার কেটে দেয়। বড় লজ্জা করে। কলকাতা থেকে ননীর চিঠি আসাটাই সেদিন মনে হয়েছিল জীবনের চরম স্মরণীয় ঘটনা। সেই ননীর চিঠির উত্তর পাঠাতে হবে কলকাতায়! এ যেমন বিস্ময়কর তেমনই অবিশ্বাস্য যে।

শেষ পর্যন্ত চিঠি ভূতনাথ কোনওরকমে পাঠিয়েছিল। কিন্তু উত্তর আসেনি আর। সেদিনকার মত ননী হারিয়ে গিয়েছিল ভূতনাথের জীবন থেকে একেবারে। কিন্তু কলকাতার স্বপ্ন ভূতনাথের মন থেকে মুছতে পারেনি কেউ!

এর পর আর এক ঘটনা ঘটল।

ভূতনাথের বয়েস তখন বারো কি তেরো আর রাধার এগারো। রাধার বিয়ে হবে। রাধাকে দেখতে এল কলকাতা থেকে। সে যে কী রোমাঞ্চ! রাধার রোমাঞ্চ হ'লো কিনা ভূতনাথ জানতে পারেনি সেদিন। কিন্তু যদি হয়েই থাকে তার হাজারগুণ হয়েছিল ভূতনাথের। রাধা! সেই রাধা! তার শ্বশুরবাড়ি হবে কলকাতায়। কী যে হিংসে হ'য়েছিল ভূতনাথের মনে। রাগও হয়েছিল খুব। রাগে রাধার সঙ্গে ভূতনাথ ক'দিন দেখাও করেনি, কথাও বলেনি।

কোঁচানো চাদর আর বার্নিশ করা পম্পশু পায়ে কয়েকজন ভদ্রলোক একদিন এল ফতেপুরে। একটা রাত থাকলোও। খেলও খুব। নন্দ জ্যাঠা গাছের ডাব, পুকুরের মাছ, গাওয়া ঘি, ছিন্নাথপুরের কেষ্ট ময়রার কাঁচাগোল্লা আর কাটারিভোগ চালের ভাত খাওয়ালেন।

রাধাকে পছন্দও ক'রে গেল তারা।

মাজদিয়া ইস্টিশান থেকে পাল্কী চ'ড়ে একদিন ব্রজরাখাল এল বর হয়ে। ব্রজরাখাল কলকাতা থেকে বিয়ে করতে এসেছে। বর দেখে রাধার পছন্দ হলো কিনা কে জানে কিন্তু ভূতনাথের হ'লো না। বরের গোঁফ নেই এ কী রকম বর! ফতেপুরে যত বর এসেছে—সব বরের গোঁফ ছিল। রাধার সই হরিদাসীর বরেরও গোঁফ ছিল। আর ভূষণকাকার মেয়ে জ্ঞানদার বর এখনও আসে—তারও গোঁফ। কিন্তু সেদিন সেই অল্প বয়সে ভূতনাথের মনে হ'য়েছিল রাধার বরের গোঁফ থাকলেই যেন মানাত! এখন অবশ্য ভাবলেই হাসি পায়। 'যা' হোক, সেদিন ব্রজরাখালের গোঁফ না থাকায় যে ক্ষোভ হয়েছিল ভূতনাথের, তা পুষিয়ে গিয়েছিল রাধার কলকাতায় শ্বশুরবাড়ি হওয়ার সৌভাগ্যে।

বাসরে অনেক রাত পর্যন্ত ভূতনাথ বসেছিল বরের পাশে। কত লোক কতরকম প্রশ্ন করছে—একে একে সব উত্তর দিচ্ছে ব্রজরাখাল। রাঙাকাকী ভূতনাথকে দেখিয়ে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল—একে দেখছ তো—এ তোমার বড় সম্বন্ধী—সম্পর্কে গুরুজন—

মল্লিকদের আন্না বলেছিল—তা' গুরুজন যদি, এখেনে আমাদের সঙ্গে ব'সে কেন বাপু—বাইরে যাওনা তুমি ভূতোদাদা—

সবাই হেসে উঠেছিল।

লজ্জায় ভূতনাথও আর বেশিক্ষণ বসতে পারেনি সেখানে। আস্তে আস্তে এক ফাঁকে উঠে চলে এসেছিল। ইচ্ছে ছিল—ব্রজরাখালের সঙ্গে আলাপ করে, কলকাতার কথা দুটো জিজ্ঞেস করে—কলকাতার বড় হাসপাতালের ডাক্তারবাবুর ছেলে ননীকে চেনে কিনা জেনে নেয়—ইত্যাদি ইত্যাদি কত কথা মনের ভেতরে গুঞ্জন করছিল, কিন্তু কিছুই হ'লো না। পরের দিন যতক্ষণ ব্রজরাখাল ছিল বাড়িতে তার সামনে যেতেও লজ্জা হ'লো তার।

সকালবেলা, মনে আছে, কুয়োতলার পাশে আতাগাছটার আড়ালে দাঁড়িয়ে ভূতনাথ শুনতে পেলে রাধা জ্যাঠাইমাকে বলছে।

—মা, ভূতোদাদা বলছিল ও আমার সঙ্গে যাবে—

—কোথায়?—অবাক্ হয়ে গেছে জ্যাঠাইমা।

—আমার সঙ্গে—

—তোর শ্বশুরবাড়িতে? কেন?

—তা' জানিনে—ভূতোদাদা বলছিল—

—পাগল—বলে হেসে উঠেছিল জ্যাঠাইমা। ছি ছি—কী ভাবলো জ্যাঠাইমা। রাধা যে সে-কথা জ্যাঠাইমাকে বলবে কে জানতো। কী বোকা মেয়ে।

কিন্তু পরে শুনতে পেলে ভূতনাথ। রাধার শ্বশুরবাড়ি কলকাতায় নয়। কলকাতা থেকে অনেক দূরে গ্রামের মধ্যে। কামারপুকুরে। কোথায় কামারপুকুর কে জানে। রাধা সেইখানে থাকে। আর ব্রজরাখাল কলকাতার আপিসে চাকরি করে আর শনিবার-শনিবার বাড়ি যায়।

রাধা যখন প্রথম বাপের বাড়ি এল—সে-রাধাকে আর যেন চেনাই যায় না।

রাধা হেসে উঠলো হো হো করে—ওমা, ভূতোদাদা আমার দিকে কেমন হাঁ ক'রে চাইছে দেখ—

ভূতনাথ কিন্তু অন্য জিনিস দেখছিল। রাধা এই ক'দিনে এত মোটা-সোটা হলো কী ক'রে! আরো ফরসা হয়েছে যেন। ভালো ভালো জামা-কাপড় পরেছে। আরো গয়না হয়েছে।

রাধা মুখ বেঁকিয়ে বলেছিল—না বাপু, তুমি আমার পানে অমন ক'রে চেয়ো না ভূতোদাদা—ভয় করে আমার—

ভূতনাথ অবাক্ হয়ে গিয়েছিল—কেন, ভয় কীসের—

—বারে নজর লাগে না বুঝি, আমার নতুন বিয়ে হয়েছে—নজর লাগা বুঝি ভাল—

—আহা। তাই নাকি আবার লাগে।—

—আর আমি যদি নজর দেই—তোমার কেমন লাগে শুনি—

—দে না যত পারিস নজর দে—কীসে নজর দিবি দে—ব'লে ভূতনাথ রাধার দিকে আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে এগিয়ে গিয়ে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

রাধা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে কী যেন ভাবলে। ভূতনাথের নজর দেবার মত কিছু আছে কিনা হয়ত তাই দেখলে। তারপর বললে—এখন তো দেব না, তোমার বউ আসুক তখন দেব—

সে অবকাশ রাধা পায়নি!

পরের বার রাধা এল।

ভূতনাথ চেহারা দেখে অবাক্—এ তোর কী চেহারা হয়েছে রে রাধা—

রাধা বললে—তোমারও তো চেহারা খারাপ দেখছি ভূতোদাদা—

—আমার হোক—কিন্তু তোর কেন হবে—

রাধা এবার যেন একটু গম্ভীর-গম্ভীর। কিছু কথা বললে না। মুখ নিচু ক'রে রইল।

ভূতনাথ বললে—সেবার আমি নজর দিয়েছিলাম বলে, নারে—

—দূর, তা' কেন—বলে রাধা চুপ করল। আর কিছু বললে না। শেষে মল্লিকদের আম্মার কাছে শুনতে পেলে ভূতনাথ।

আম্মা বললে—জানো ভূতোদা—রাধাদির ছেলে হবে—!

সেদিন খবরটা শুনে ভূতনাথ যে কেন অমন চমকে উঠেছিল কে জানে।

কিন্তু চমকানো শেষ হ'লো ভূতনাথের, যেদিন পেটে ছেলে নিয়ে রাধা মারা গেল। কেমন ক'রে যে কী হ'লো সব আজ মনে নেই। তবু মনে আছে, খবর পেয়ে ব্রজরাখাল এসেছিল শেষ দেখা দেখতে। গম্ভীর মানুষ ব্রজরাখাল। বেশি কাঁদেনি। রাধার গায়ের গয়না-টয়নাও কিছু নিলে না। নন্দ-জ্যাঠার একমাত্র মেয়ে। তার শোকটাও সমান গভীর। তবু বারবার পীড়াপীড়ি করলেন।

ব্রজরাখাল বললে— মানুষটাই যখন চলে গেল—তখন আর মিছিমিছি ওসব...

নন্দজ্যাঠা কিন্তু এদিকে শক্ত মানুষ। বললে—তুমি আবার বিয়ে কর বাবা—আমি বলছি—

সেইবারই ব্রজরাখালের সংগে প্রথম দু' একটা কথা বললে ভূতনাথ।

ব্রজরাখাল বললে—কলকাতা? তা' আমি তো কলকাতাতেই থাকি আমার বাসায়—দেখাবো তোমায় কলকাতা! সে আর বেশি কথা কি—কলকাতা দেখতে তোমার এত সাধ?

ঠিকানাটা নিয়ে রাখলে ভূতনাথ। ঠিক হ'লো—ভূতনাথ চিঠি লিখলেই সব ব্যবস্থা করবে ব্রজরাখাল। তারপর যতদিন ইচ্ছে তার বাসায় থাকো আর দেখে বেড়াও কলকাতা শহর!

ব্রজরাখাল পরদিনই চলে গিয়েছিল কলকাতায়। আর আসেনি।

তারপরেই এল ভূতনাথের পরীক্ষা। মহকুমা থেকে একদিন এণ্ট্রান্স পরীক্ষাও দিয়ে এল। কোথা দিয়ে দিন আর রাত কাটতে লাগলো কে জানে। আর তারপরেই বিধবা পিসী পড়ল অসুখে। পিসী ছিল মার মতন। ভাঁরি কঠিন অসুখ। কয়েক মাস চললো পিসীকে নিয়ে।

পিসী প্রায়ই বলতো—ভূতো মানুষ হবার পর যেন মরি—এই কামনা কর মা তোমরা—

লোকে বলতো—তুমি নিজের পরকাল তিথি-ধম্মো নিয়ে থাকো না কেন—ছেলে হ'য়ে জন্মেছে, যেমন ক'রে হোক্ ওর উপায় ও ক'রে নেবেই—

পিসী বলতো—পেটেই ধরিনি—নইলে বাপ-মা কী জিনিস ও জানে না তো—আমি চোখ বুজলে ওকে দেখবার কেউ নেই যে—

পাড়ার বউদের সংগে গল্প করতো পিসী আর ভূতনাথ শুনতো পাশে ব'সে।

—বউ-এর ছেলে হয় আর মরে যায়—শেষে বামুনগাছির পঞ্চানন্দের থানে মানত করলাম আমি—সেই পঞ্চানন্দের দোর ধ'রেই তো হ'লো এই ছেলে। ওর বাপ সতীশ বললে—নাম রাখ 'অতুল'—আমি বললাম—শিবের দোর ধ'রে যখন বেঁচেছে—নাম থাক ভূতনাথ—তা' ভূতনাথ তো ভূতনাথই আমার—আমার ভোলানাথ—বই পড়ছে তো পড়ছেই—ঘুমুচ্ছে তো ঘুমোচ্ছেই—খেতে ভুলে যায় এমন ছেলে কখনো দেখেছ মা তোমরা—ওকে নিয়ে আমি কী করি বল তো মা—

সেই পিসীমাও একদিন মারা গেল।

পিসীমার শ্বশুরবাড়ি থেকে বিধবার নামে পাঁচ টাকা ক'রে মাসোহারা আসতো—তা' গেল বন্ধ হ'য়ে। তখন আর করবার কিছু নেই। ভূতনাথ বারোয়ারিতলায় গিয়ে আড্ডা জমালে। আড্ডা বলতে পারো, আবার যাত্রার মহড়াও বলতে পারো।

'নল-দময়ন্তী' পালায় একবার ভূতনাথ প্রতিহারীর পার্ট করলে যাত্রার আসরে দাঁড়িয়ে, কিন্তু বড় ভয় করতে লাগলো তার। কাঁপতে লাগলো পা দু'টো। কেমন গলাটা শুকিয়ে আসতে লাগলো। গ্লাস-গ্লাস জল খেলে খুব।

ভূষণ কাকা বললে—ও তারাপদ, ভূতোকে কেন পার্ট দিলে শুধু-শুধু—কোনও কম্মের নয়—লেখাপড়া শিখলে কী হবে—মাথায় যে গোবর পোরা—

কিন্তু ভূতোর তবলা শুনে সবাই অবাক্। রসিক মাস্টার বললে—ডুগি-তবলার খাসা হাত তো ছোকরার—

দিনকতক তবলা নিয়েই পড়ল ভূতনাথ। বহুদূরে থেকে শোনা যায় ভূতনাথের তবলার চাঁটি। অন্ধকার রাত্রে ঘরে ব'সে ব'সে সাধনা করে ভূতনাথ।—বোল মুখস্থ করে—তা গে না ধিন, না গে ধিন—

আবার কখনো—

তা ধিন
তা তা ধিন্
ধিন তে কেটে তে কেটে তাক্—
ধিন্...

কিন্তু তবলাও ঠিক শান্তি দিতে পারলে না ভূতনাথকে। পিসীমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যেন হঠাৎ তার জীবনের একটা পরিচ্ছেদের একেবারে শেষ হয়ে গেছে। মনে হ'লো একান্ত নিরাশ্রয় সে। আজ এর বাড়ি, কাল ওর বাড়ি—এমনি ক'রে পরের অন্নদাস হওয়ার অগৌরব যেন তার ঘাড়ে ভূত হ'য়ে চেপে বসলো সেদিন প্রথম আর প্রখর হ'য়ে।

ভূতনাথ একদিন বাঁয়া তবলা নিয়ে ফিরিয়ে দিয়ে এল বারোয়ারিতলায়। আর ও-মুখো হ'লো না।

খুব ছোটবেলায় ভূতনাথ একটা বেজি পুষেছিল। বুনো বেজি। বেশ পোষ মেনেছিল। কিন্তু সংসারে যারা পোষ মানে তারাই বুঝি কষ্ট পায় বেশি। ভূতনাথেরই অত্যাচারে মারা গেল একদিন বেজিটা।

সেই বেজির মৃত্যু প্রথম আর শেষ পিসীমা।

দুই প্রান্তের দুই চরম শোকের মধ্যে ডাক্তারবাবুর ছেলে ননীর বিচ্ছেদ আর রাধার মৃত্যু—সমস্ত মিলিয়ে ভালমানুষ ভূতনাথ কেমন মনে মনে স্তিমিত হ'য়ে এল।

এমন সময় এল ব্রজরাখালের চিঠি। রাধার স্বামী ব্রজরাখাল।

ব্রজরাখাল ভূতনাথের চিঠি পেয়েছে অনেক পরে। ব্রজরাখাল যে-ঠিকানা দিয়েছিল ভূতনাথকে, সে-ঠিকানা বদলে গেছে। তাই চিঠি পেতে অত দেরি।

পরীক্ষায় পাশ করেছে জেনে ব্রজরাখাল খুশী হয়েছে। লিখেছে—চাকরী চেষ্টা ক'রলে হ'তে পারে। কিন্তু এখনি কিছু বলা যায় না। তবে কলকাতায় কিছুদিন থাকতে হবে—ঘোরাঘুরি করতে হবে।

শেষে লিখেছে—চলিয়া আইস—যেমন নির্দেশ দিলাম ওইভাবে আসিবে। বাসস্থান ও আহারের বন্দোবস্ত আমি করিব। এ কলিকাতা শহর—ট্রেনে ও রাস্তায় খুব সাবধানে আসিবে। জুয়াচোরেরা নতুন মনুষ জানিলে......ইত্যাদি ইত্যাদি।

পিসীমার পেতলের ঘটিটা আর রূপোর গোট ছড়াটা হর গয়লানীর কাছে বন্ধক রেখে বাড়ির দরজায় তালা চাবি লাগিয়ে ভূতনাথ রাত থাকতে বেরিয়ে পড়েছে পায়ে হেঁটে।

তারপর সকালবেলা এই কলকাতায়। রেলের টিকিট কিনে, বাকি দু'টো টাকা রয়েছে। টাকা দু'টো সাবধানে ট্যাঁকে পুরে নিয়ে ভূতনাথ শেয়ালদা' স্টেশনের বাইরে এসে দাঁড়াল।

(ক্রমশ)

ষোল

কিশোরবাবু যেন দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠলেন।

নিজেই তিনি বিস্মিত হলেন—এই ক্রোধ এই জ্বালা এতদিন কোথায় ছিল তাঁর। প্রথম যৌবনে তিনি একদা স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বান অন্তরে অন্তরে অনুভব করেছিলেন, গৃহত্যাগ করে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিয়েছিলেন। তারপর আবার একদিন ওই মন্ত্র নিয়েই গ্রামে ফিরেছিলেন—নবগ্রামের সমাজে তাকে প্রচারের ব্রত নিয়ে। সে ব্রত তাঁর সফল হয়নি। নবগ্রামের মানুষ সে মন্ত্র গ্রহণ করেনি, করতে পারেনি। সাময়িকভাবে এক একটা ঢেউ এসেছে আবার সরে গিয়েছে। তার জন্য তাঁর দুঃখও নেই হতাশাও নেই। কিন্তু নিজে তিনি অক্লান্তভাবে এই সাধনা করে এসেছেন। এই মন্ত্র জপ করতে একদিন ভুল হয়নি। দুঃখে আঘাতে নিন্দায় কুৎসায় তিনি নিজেকে অবিচল রেখে এসেছেন। লোকে বলেছে, তাঁর ক্রোধ নেই। নিজেও মনে মনে ভেবেছেন, ক্রোধ থেকে মুক্ত হোন বা না-হোন ক্রোধকে অন্তত আয়ত্তাধীনে এনেছেন তিনি। কিন্তু আজ গ্রামের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত এই কুৎসিৎ রটনা ঘোষণার কথা শুনে এক মুহূর্তে তিনি যেন ক্রোধে আত্মহারা হয়ে গেলেন।

কুৎসিত রটনা যতটা অক্ষয় ঘোষাল করলে উচ্চকণ্ঠে, রটনাটায় সেইখানেই ছেদ পড়ল না। "খোঁচা-খাওয়া হিংসক অজগর রুদ্ধ নিঃশ্বাসে ছোবল-মেরে গর্তে কি জঙ্গলে ঢুকে স্তব্ধ হলেই তার আক্রমণের পথে ছেদ পড়ে না; তারপর সে নিঃশব্দে পদ সঞ্চারে গাছপালার আড়ালে আত্মগোপন করে হিংসা চরিতার্থতার জন্য মানুষের পিছন নেয়। সশব্দ প্রকাশ্য ক্রুদ্ধ হিংসার জের এইভাবে গোপন কুটীল চক্রান্তের পথেই বোধ করি চলে থাকে। ওই তার স্বভাব। শান্ত সে হয় না। ওটা তার জীবন প্রকৃতির বিরোধী। মানুষের জীবনে শান্তি এলে সে শীত ঋতুর জর্জর সাপের মত মনের অন্ধকূপে বায়ুভুকের মত নিথর হয়ে উত্তপ্ত কালের প্রতীক্ষা করে।" এই কথাগুলি কিশোরবাবুর নিজেরই কথা। তাঁর নিজের ভাবনার কথাগুলি তিনি একখানি খাতায় লিখে রাখেন; একথাগুলি সেই খাতাতেই আছে। তবুও কিশোরবাবু আত্মসম্বরণ করতে পারলেন না; অকস্মাৎ অতর্কিতে ওই গোপনচারী সাপটা তাঁর পিছনে একটা ছোবল মারলে।

এই সন্ধ্যার অর্থাৎ যে সন্ধ্যায় সদয়ের সঙ্গে অক্ষয় ঘোষাল ঝগড়া করে গৌরীকান্ত এবং শান্তির অন্তরঙ্গতার কথা নিয়ে উচ্চকণ্ঠে কুৎসা রটনা করলে তার ঠিক পরদিন প্রত্যুষেই কিশোরবাবু উঠেই বাটীর বাইরের দরজার গায়ে একখানা কাগজ আঁটা দেখতে পেলেন। টুকরো খবরের কাগজের উপর লাল এবং কালো কালীর মোটা হরফে লেখা কয়েকটা লাইন। সাপের বিষে ভেজাল নেই, মানুষ বিষের সঙ্গে রসিকতার ভেজাল দিয়ে শতগুণ নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেয়; সুন্দরী কন্যার দেহে ধীরে ধীরে বিষ সঞ্চার করে সে বিষকন্যা তৈরী করে। এই লাইনকটিও ওই বিষমযোগে—মারাত্মক কাঁকড়া বিছের বিষের জ্বালা তার সর্বাঙ্গে। "কালনেমীর লঙ্কাভাগ। রাবণকে সীতা দিয়ে কালনেমী নিবেন মন্দোদরী। মা-মন্দোদরী সীতা তার মেয়ে। শান্তি স্বরূপিনী বিশ্বাস না হয় অদ্ভুত রামায়ণ পড়। চিরকিশোর কালনেমী লাগিয়ে জটা দাড়ি, গেরুয়া আলখাল্লা পড়ে সাজেন ব্রহ্মচারী।"

মা-মন্দোদরী সীতা মেয়ে শান্তি স্বরূপিনী চিরকিশোর কালনেমী কথা কয়টা পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই অর্থটা স্পষ্ট হয়ে উঠল মস্তিষ্কের মধ্যে। মনে হল সাপে তাঁকে ছোবল মেরেছে, এ সাপের বিষে বৃশ্চিক বিষের জ্বালা মেশান রয়েছে। তাঁর আজীবনের সংযম সাধনা মুহূর্তে ভূমিকম্প দীর্ণ পাহাড়ের মত ফেটে গেল এবং তার ভিতর থেকে ক্রোধের বহ্নিজ্বালা দাউ দাউ শিখায় বেরিয়ে এল।

* * * *

কিশোরবাবু কাগজখানাকে ছিঁড়ে ফেলতে গেলেন, একটা কোণ ধ'রে টান দিতে গিয়ে কিন্তু ছেড়ে দিলেন। থাক্। আজ কাগজখানা ছিঁড়লে কাল রাত্রে দেওয়ালে আলকাতরা দিয়ে লিখে দিয়ে যাবে। কিন্তু—। কিন্তু কি করবেন তিনি? বাড়ির মধ্যে চায়ের উনুন জ্বলেছে ওরই একখানা জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে এই গলিত শবের মত নবগ্রামের চিতায় আগুন ধরিয়ে দেবেন? উচ্চকণ্ঠে বলবেন, "নিজের বিষে জর্জরিত হয়ে অপঘাতে মৃত, গলিত-ক্ষত-সর্বাঙ্গ, সৃষ্টির অঙ্গ দূষিতকারী নবগ্রাম—আমার দেওয়া এই অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে মুক্ত হও!" স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। কি করবেন?

হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল, বাড়ির ভিতরে ওপাশের বারান্দায় উনুনের ধারে ব'সে ছবি তাঁর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে। ছবি সেই মেয়েটি—মহাদেব সরকারের বাড়িতে ছিল—যাকে সঙ্গে নিয়ে শান্তি সেদিন গৌরীকান্তের বাড়ি গিয়েছিল। বলেছিল, এর অভিশাপে নবগ্রাম ধ্বংস হয়ে যাবে? সেদিন ওকে আশ্রয় দিয়ে তিনি বাড়ি এনেছেন। বিচিত্র মেয়ে, অদ্ভুত কর্মিষ্ঠা, তেমনি অদ্ভুত মেয়েটার মানসিক ক্ষুধা; তেমনি অদ্ভুত ওর কৌতূহল ও বিস্ময়। চা করতে বসে স্থির দৃষ্টিতে তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ লক্ষ্য করছে সবিস্ময়ে। মেয়েটার জৈব জীবন ছাড়া মানস-জীবন যেন একেবারে নাই। কিশোরবাবু এবার কাগজখানাকে ছিঁড়ে

নিলেন এবং বাড়ির দাওয়া থেকে পথে নেমে গ্রাম ছেড়ে লাইন পার হয়ে—মাঠের মাঝখানে এসে বসলেন একটা উঁচু ঢিবির উপর। ভাবতেই বসলেন কি করবেন!

জ্যৈষ্ঠ মাসের শস্যহীন মাঠ ধূ-ধূ করছে। ধূসর তৃণহীন।

দিন তিনেক আগে জল-ঝড় হয়ে গিয়েছে খান কয়েক হাল ঘুরছে মাঠের মধ্যে। দু একখানা এখনও গ্রাম থেকে আসছে এবং আসবে। হালের বলদগুলির অবস্থা শোচনীয়, মর্মান্তিক রকমে শোচনীয় মানুষগুলির অবস্থাও তাই। চারিদিকের মাঠে গত বৎসরের ধানের গোড়াগুলিরও চিহ্ন নাই। বৎসরের পর বৎসর অজন্মা চলেছে। শস্য হয়েছে সেই তেরশো পঞ্চাশ-উনিশশো তেতাল্লিশ সালে তারপর এই উনিশশো আটচল্লিশ, পর পর চার বছর অনাবৃষ্টি-অজন্মা। যুদ্ধে মহামারীতে অনাহারে দাঙ্গায় দেশটা যেন প্রেতের রাজ্যে পরিণত হয়েছে।

হবেই তো। মানুষ যেখানে প্রেতে পরিণত হয়েছে রাজ্যও সেখানে প্রেত রাজ্যে পরিণত হবে বৈ-কি! যুদ্ধ গেল পৃথিবী জুড়ে। মহাশ্মশানে পরিণত করে দিয়ে গেল। কিন্তু দিকে দিকে নবগঠন শুরু হয়েছে, নবজীবনের জাগরণ আরম্ভ হয়েছে, শীতের শেষে পাতা-ঝরা কঙ্কালের মত গাছগুলিতে পাতার মুঞ্জরণ দেখা দিয়েছে। শুধু অভিশপ্ত মানুষের সমাজের মধ্যে বোধ করি সর্বাপেক্ষা অভিশপ্ত নবগ্রাম বিষাক্ত-ক্ষত-ভরা-পচে-ওঠা দেহ নিয়ে দুর্গন্ধ ছাড়ছে বিষ ছড়াচ্ছে চারিদিকে। তার চেয়ে নবগ্রামের ধ্বংস হয়ে যাওয়া কি পৃথিবীর পক্ষে মঙ্গল নয়?

—এই ঠেনে বসে রইছেন কাকাবাবু? পেনাম!

পিছন দিকে কথা বলে সামনে এসে অল্প হেঁট হয়ে প্রণাম করলে কানাই বাউড়ী; পরনে খাটো কাপড়, মাথায় গামছার পাগড়ী, হাতে পাঁচন, কানাই মাঠে চলেছে। হাল আগেই চলে গিয়েছে, ছেলে নিয়ে গিয়েছে; কানাই ইষ্টিশানের চায়ের দোকানে চা খেয়ে তবে আসছে।

কিশোরবাবুর রাগের আগুন আবার জ্বলে উঠল। এই হতভাগা বদমাসের জন্যই এতটা হয়ে গেল। লঘু-গুরু জ্ঞান নাই মুর্খের—পাপিষ্ঠ, ওটা পাপিষ্ঠ! সংসারে শুধুমাত্র মনুষ্যজন্মের দাবীতে উঁচু আসনে বসিয়ে দিলে ঠিক এইভাবেই বিচারবুদ্ধির অভাবে বিপর্যয় ঘটে। পাথরের মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা না হলে দেবতা হয় না, সে ততক্ষণ পর্যন্ত পুতুলই থাকে; ততক্ষণ পর্যন্ত তার দেবার বস্তু একটিমাত্র আঘাত; প্রাণ প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত কোন কল্যাণই সে দিতে পারে না। কিশোরবাবু তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, যাঃ হতভাগা বদমাস! তোর মুখ দর্শন করব না আমি!

কানাই কিন্তু গেল না, একটু হেসে সে তাঁর সামনে বসলে, মাথা চুলকে বললে—রাগ করেছেন কাকাবাবু। তা বুঝেছি!

কিশোরবাবুর সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল কানাইয়ের হাসি দেখে, তিনি স্বভাব অনুযায়ী চীৎকার করেই বলে উঠলেন—তুই একটা পাষণ্ড। বর্বর। বুঝলি! ওই একটা বর্বর ব্রাহ্মণের ঘরের ষণ্ড আর তুই হলি পাষণ্ড!

মাথা চুলকে কানাই হেসেই বললে তা কাজটা 'হটকারী' হয়ে গিয়েছে কাকাবাবু! তা বলতে হবে। বুড়ো বামুনকে 'ফড়াম্' করে চড়টা না মারলেই হ'ত।

—না মারলেই যদি হ'ত তো মারলি কেন!

—হয়ে গেল। সামলাতে পারলাম না। বুয়েচেন কি না। ধাঁ ক'রে এমন আগুন জ্বলে গেল মাথায়! দেলাম কষে চড়। খানিক রাগ কাকাবাবু, আমার বামুনের ওপর ছিল। মিছে আমি বলব না। বাবার আমলের তিন বিঘে জমি বামুন আমাদের কাছ থেকে মামলা ক'রে কেড়ে নিয়েছে। স্বয়ংবাবুদের জমি আমরা কোর্ফাতে করতাম। বাবু মারা গেলেন, বাবা তার আগেই মরেছিল, বাবুর ছেলেরা কি সব টাকার গণ্ডগোল নিয়ে জমাটা ঘোষালকে বেচলে। ঘোষাল মামলা ক'রে উচ্ছেদ করে নিলে জমি। রাগ আমার ছিল।

ব্যাপারটা জানেন কিশোরবাবু। সে অনেক কথা। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, অন্যায় করেছিস। বুঝলি, খুব অন্যায় করেছিস। তোর মুণ্ডুটা কেউ যদি কেটে ফেলে তবে তার মুণ্ডুটা কাটলে তোর মুণ্ডুটা জোড়া লাগবে না, বুঝলি। তাতে খুনই বেড়ে যাবে! হতভাগা বদমাস হাসছিস যে! শয়তান!

কথা বলতে বলতে কানাইকে হাসতে দেখে চটে উঠলেন কিশোরবাবু। কানাই হাসছিল তাঁর কথা শুনে। সে ভেবেই পাচ্ছিল না তার মুণ্ডুটা কাটা পড়লে সে আর কি ক'রে তার মুণ্ডু-কাটিয়ের মুণ্ডুটা কাটবে।

কিশোরাবাবু দীর্ঘ বক্তৃতা শুরু করে দিলেন। বুঝিয়ে দিলেন, তার মুণ্ডু কাটা পড়লে অবশ্যই তার কারও মুণ্ডু কাটবার উপায় থাকবে না, কিন্তু তার ছেলের থাকবে। সে যার মুণ্ডু কাটবে তার ছেলে থাকবে। একটি ছেলের পরিবর্তে তিনটি ছেলে থাকলে ছেলেতে ছেলেতে হত্যার জের টানবে এবং তখন দুটি হত্যার পরিবর্তে ছটি হত্যা হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। একটি ভাঙা কাঠি নিয়ে নরম মাটির উপর অঙ্ক কষতে শুরু করে দিলেন।

কানাই হঠাৎ চীৎকার ক'রে উঠল এ্যাই-এ্যাই! খেলেরে-খেলেরে! হ্যাই-হ্যাই! অ-হ-হ! বীজ খেয়ে শেষ করে দিলেরে!

কোথায় মাঠের মধ্যে বীজ-ধানের জমিতে গরু ঢুকেছে, কানাই তাই দেখতে পেয়েছে, সে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—আমি যাই কাকাবাবু! বীজে গরু লেগেছে।

পাঁচনখানা তুলে নিয়ে সে ছুটে চলে গেল। কিশোরবাবু মুখ তুলে চাইলেন। কই? কোথায়? কই? সামনে ধূ-ধূ করছে শস্যহীন মাঠ। কোথায় ওয়েসিসের মত বীজ-ধানের সবুজ টুকরো? ওই। কিন্তু ওখানে গরু কই?

কানাই ছলনা করে উঠে পালাল।

একটু হাসলেন কিশোরবাবু, তারপর উঠলেন।

ভাল কথা এরা শুনবে না। অরুচি হয়েছে। মৃত্যুরোগগ্রস্ত মানুষের মত সুপথ্যে রুচি গিয়েছে। রুচি হয়েছে কুপথ্যে।

স্টেশনে এসে উঠলেন। ওখানেই চা খাবেন। বাড়ির চা জুড়িয়ে গেছে। আবার চায়ের হাঙ্গামা করতে হবে। তার থেকে স্টেশনের স্টলেই চা খেয়ে নেবেন।

স্টেশনের ভিতরে ঢুকেই আবার তার ক্রোধবহ্নি জ্বলে উঠল। স্টেশনের দেওয়ালে সেই ছড়া-কাটা কাগজ সাঁটা রয়েছে। জন-কয়েক যাত্রী দাঁড়িয়ে ছড়াটা পড়ছে। কালনেমীর লঙ্কাভাগ। অদ্ভুত রামায়ণ।

দীর্ঘপদক্ষেপে তৎক্ষণাৎ তিনি ফিরলেন। ফিরে গ্রামের মধ্যে ঢুকে নিজের বাড়িতে প্রবেশ করলেন না। কোন দিকে তাকালেন না, এগিয়ে চললেন। এরই মধ্যে তাঁর মনের মধ্যে একটি সংকল্প এসে গিয়েছে। শুধু এসে যাওয়াই নয়, দৃঢ়সংকল্প হয়েই তিনি পথ চলছিলেন, পা-ফেলার ভঙ্গীর মধ্যে সে পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তিনি এসে উঠলেন গৌরীকান্তের বাড়ি।

গৌরীকান্তের বাড়ির দরজাতেও ঐ ছড়া-লেখা কাগজ সাঁটা রয়েছে। কাগজ-খানাকে ছাড়িয়ে হাতে নিয়েই তিনি বাড়ি ঢুকলেন।

মুখ হাত ধুয়ে গৌরীকান্ত একখানা বাঁধানো বই হাতে বসেছে। দিব্য নিরুদ্বিগ্ন চিত্ত। বেশ আছে। কিশোরবাবু নিজেই একটা মোড়া টেনে বসে কাগজখানা হাতে দিয়ে বললেন, পড়।

গৌরীকান্ত পড়তে লাগল। কিশোরবাবু বললেন, সারা গাঁয়ে বোধ হয় ছড়িয়ে দিয়েছে। সকাল থেকে এই খানিকটা জায়গার মধ্যে আমি তিনখানা দেখেছি। আমার দরজায়, স্টেশনে, এটা তোমার দরজায় সাঁটা ছিল।

গৌরীকান্ত কাগজখানা ফেলে দিলে। একটু হাসলে।

কিশোরবাবু গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, শোন আমি তোমার কাছে যে জন্যে এসেছি। তুমি শান্তিকে বিবাহ কর।

গৌরীকান্ত একটু চমকে উঠল।—শান্তিকে বিবাহ করব?

—হ্যাঁ। ওই ফুলের মত পবিত্র মেয়েটির গায়ে যে কলঙ্কের কালী ক্লেদ এখানকার লোকে ছিটিয়ে দিলে তার প্রতিবাদে তোমাকে ওকে নির্মাল্যের মত মাথায় নিতে হবে।

গৌরীকান্ত একটু হাসলে। বললে—আপনি যা বলছেন সে শুনতে খুব ভাল, কিন্তু সে হবে কি ক'রে। সে তো হয় না।

—কেন?

—প্রথম হ'ল আমি বিবাহ করব না। দ্বিতীয় হ'ল, এইভাবে দুর্নাম রটনা করলেই যদি বিবাহ করে প্রতিবিধান করতে হয় তা'হলে তো বিপদের কথা। কারণ, তাতে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত করতে হবে এবং ডাইভোর্স প্রথা চালাতে হবে একই সঙ্গে।

—এই নিয়ে রহস্য করছ তুমি গৌরীকান্ত?

—করছি বই-কি একটু। কারণ এতে বিচলিত হবার কি আছে। এ তো এ গ্রামে নূতন নয়। কত কুৎসা রটনা করেছে কত জনের নামে। সে তো আপনার অজানা নয়! আর আসল যে মানুষটিকে নিয়ে আপনি চিন্তিত হয়েছেন সে হ'ল একালের শিক্ষিতা মেয়ে! শুধু তাই নয়—সে হ'ল এক কঠিন গুরুর শিষ্যা। সে তো এতে বিচলিত হবে না এবং তার নামে এর আগে থেকেই আরও কুৎসা লোকে রটনা করে আসছে। সে তো সেসব গ্রাহ্য করেনি!

না, তা' করেনি। সেকথা সত্য। খানিকটা চুপ ক'রে রইলেন কিশোরবাবু। গৌরীকান্ত বললে—আরও একটা কথা আপনাকে বলি কিশোরবাবু। আপনি নিশ্চয়ই জানেন না। শান্তি বা দেবকী দেবী বলেননি, প্রয়োজন নেই মনে ক'রে বলেননি। শান্তির বিবাহ একরকম স্থির হয়েই আছে। সে বয়স্কা মেয়ে—এক-জনকে ভালবেসেই—তার কথা স্থির হয়ে আছে।

ঠিক এই মুহূর্তে কাছেই কোথাও কান্নার রোল উঠল! —ওরে সোনারে। ওরে বাবারে। কি হ'লরে!

সঙ্গে সঙ্গে বিজয়ের প্রচণ্ড হুঙ্কার শোনা গেল—চুপ কর বলছি—চুপ কর। চুপ কর!

কি হ'ল? কিশোরবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠে চলে গেলেন। গৌরীকান্ত স্থির হয়ে কান পেতে শুনতে লাগল। বিজয়ের বাড়িতে শোকাবহ কিছু ঘটেছে, কিন্তু বিজয় সে শোককে স্বীকার করতে দেবে না।—চুপ কর বলছি চুপ কর বলে চীৎকার করছে।

(ক্রমশঃ)

নিরুপায়

মানস রায়চৌধুরী

অনেক দিন দেখেছি চোখে, তবু মনের কাছে
পাইনি তাকে। আকাশে নীল পাখীর ডানা থেকে
রোদ্দুরের আবির কতো নেশার ঘোরে মেখে
ক্লান্ত হই। এদিকে ভয়—ধূসর ছায়া পাছে
আবার এই জীবনে আসে। প্রাণের ভীরু কলি
যদি বা যায় হারিয়ে—আমি কি করে তাকে বলি
মনের কথা, মেঘের কথা? আহা এ' প্রহরেই
হৃদয় মিছে উতল হয়। সে মন কাছে নেই।

আশঙ্কার দীপ্ত আমি। কাজল কালো মেঘ
আকাশে নেই—কোথায় গেল এখানে উদ্বেগ
ছড়িয়ে দিয়ে। প্রাণের মাঠে বেদনাশীল ঢেউ
উঠছে শুধু। এ'মরু মাঠে আবেগ নিয়ে কেউ
দ্যায় না প্রেম। সূর্য শুধু দু-হাত ভরে দেখি
আগুন ঢালে।

সহসা সারা আকাশ ছেয়ে একি
তার সে চোখ, তার সে ছবি কাঁপছে থরথরো......
আবার বুঝি শ্রাবণ আসে—আমি তো জড়োসড়ো!

বিকল্প

রঞ্জন

লেনিন বলতেন, ধনতন্ত্রের ধ্বংস-সাধনের শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে তার কারেন্সির মূল্যাহরণ। মুদ্রাস্ফীতির অর্থ হচ্ছে মুদ্রার মূল্যের সঙ্কোচন। টাকা টাকাই রয়ে গেল, কিন্তু তার দাম হয়ে গেল আট আনা; কেননা আগে আট আনায় যা পাওয়া যেতো এখন তা পুরো একটি টাকা দিয়ে কিনতে হয়। জিনিসের দাম যেমন টাকা দিয়ে নির্ণীত হয়, তেমনি টাকারও দাম নির্ধারিত হয় তার ক্রয়-ক্ষমতার মান দিয়ে। অর্থাৎ ক'টা কড়ির বিনিময়ে ক'টা জিনিস পাওয়া গেল, তাই দিয়ে। দুটি মহাযুদ্ধের কল্যাণে মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটেছে, অতএব বিস্তৃততর ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। তাছাড়া অর্থনীতিতে আমার স্বেচ্ছাকৌতূহল একান্ত পরিমিত।

কিন্তু শব্দের অর্থ সম্বন্ধে আমি সবিশেষ উৎসাহী। এই সাহিত্যিক অর্থনীতি ও টাকার কথায় আমার মনে যোগাযোগ সাধন করেছেন সীরিল কনোলি। তিনি বলেছেন, লেখকের শব্দসম্ভার হচ্ছে তার কারেন্সি। কিন্তু এটা কাগজী কারেন্সি, অর্থাৎ নোটের কোনো মূল্যই নেই যদি না তার পশ্চাতে সমপরিমাণ স্বর্ণ বা অন্যান্য বিনিময়যোগ্য ঐশ্বর্য থাকে। লেখকের বেলায় সেই স্বর্ণ হচ্ছে শব্দের অর্থ। টাকার নোটের মূল্যহ্রাস ঘটলে অর্থ-নীতির ক্ষেত্রে যে বিপর্যয় ঘটে, সাহিত্যেও অর্থহীন শব্দের অতি-প্রচলন ঘটলে অনুরূপ বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। সাহিত্যের শত্রুরা তাই সর্বদা সচেষ্ট থাকে শব্দ থেকে তার অর্থ চুরি করে নিতে। স্বর্ণ দুর্লভ না হয়ে সহজলভ্য ধাতু হলে যেমন অর্থের মান হতে পারতো না, তেমনি শব্দেরও সুলভতা তার অর্থহানি ঘটাতে সাহায্য করে। অর্থস্ফীতি যেমন তার মূল্যাপহারী, তেমনি শব্দস্ফীতি তার অর্থাপহারী।

বাক্-কারেন্সিতে এই ইনফ্রেশন আমরা নিয়তই দেখছি। ভাষার এই উদরী রোগ হয় প্রধানত দুটি কারণেঃ এক, কথার অতিব্যবহার; আর দুই, কথার অপ-ব্যবহার। প্রথমটির অনুষ্ঠাতা সাধারণত লেখক ও সাংবাদিকরা। দ্বিতীয়টি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পলিটিশানদের অজ্ঞান অথবা সজ্ঞান ষড়যন্ত্র।

অনাচার না করলেও যেমন কখনো কখনো কঠিন ব্যাধি হতে পারে তেমনি লেখক-দের চিন্তাহীনতা ও রাজনৈতিক বক্তাদের ষড়যন্ত্র বাদেও বাক্যোৎসার ঘটা অসম্ভব নয়। শব্দের উপর ধুলো জমে, শব্দ ঘষা পয়সার মতো ক্ষয়ে যায়। অলডাস হাক্সলের 'আইলেস ইন গ্যাজা' বইতে টোনি বীভিস্ ভাবছেঃ "সমস্যা হচ্ছে কী করে ভালোবাসা যায়। (আবার, ওই 'ভালোবাসা' কথাটাই সন্দেহজনক — বংশপরম্পরা স্টিগিনসুরা কথাটিকে ব্যবহার করে মলিন ও তৈলাক্ত করে দিয়েছে। ময়লা কাপড়ের মতো মলিন শব্দ-রাশিরও ধোবাবাড়ি পাঠাবার ব্যবস্থা থাকা উচিত। ওই যে এক রাশ শব্দ পড়ে আছে— প্রেম, পবিত্রতা, সততা, আত্মা।" শব্দের জন্যে সত্যি লণ্ড্রি থাকা উচিত; কিন্তু তা যতদিন না হচ্ছে ততদিন শব্দ নিয়ে যাদের কাজ, অর্থাৎ লেখকরা, তাদের উচিত ওগুলিকে সযত্নে ব্যবহার করা যাতে যতদিন সম্ভব শব্দগুলি পরিহার্য অপরিচ্ছন্নতা থেকে মুক্ত থাকতে পারে।

রাজনৈতিক বক্তাদের অশুচি স্পর্শে শব্দ যে প্রতিদিন অর্থহীন হয়ে পড়ছে তার দৃষ্টান্ত এমনই অগণিত যে তা নিশ্চয়ই আমাদের প্রত্যেকের অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত। 'স্বরাজ' কথাটা আমার ছেলেবেলায় আমাদের জাতীয় আকাঙ্ক্ষার প্রতীক ছিল। আর আজ? দুরন্ত শিশুকে শাসন করতে গিয়ে বাবারা বলেন, 'স্বরাজ পেয়েছিস বুঝি?' জনমত, স্বাধীনতা, দেশপ্রেম, গণতন্ত্র, জন্মভূমি, ইত্যাদি শব্দগুলি কারণে অকারণে এত অসংখ্য সাবানের বাক্সের উপর থেকে এত অসংখ্যবার ঘোষিত হয়েছে যে এদের মূল অর্থ কখন হাওয়ায় উবে গেছে। আজ শুধু বাকি আছে ধ্বনিটা, যা শুনলে শ্রোতার প্রাণে বিন্দুমাত্র প্রতিধ্বনি জাগে না, কান শুধু লাঞ্ছিত হয়। এমনি অপমৃত্যু ঘটেছে 'মহাত্মা' কথাটির, আজ আর এতে বিন্দুমাত্র মাহাত্ম্য অবশিষ্ট নেই কেননা গান্ধীজী, শিশিরকুমার থেকে সুরু করে আরো অনেকের নামের আগে কথাটি বসানো হয়েছে। শুধু যদি যোগ্য ব্যক্তিকে এই সম্মান দেওয়া হোতো তাহলে এর ব্যবহার অল্প কয়েকজনের মধ্যে নিবদ্ধ থাকতো এবং শব্দটির অর্থ অক্ষুণ্ণ থাকতো—যেমন আছে ইংরেজি 'সেণ্ট' কথাটির কেননা তা যদৃচ্ছ ব্যবহৃত হয়নি। শব্দোৎসারের এই দিকটি ষড়যন্ত্র বলে অভি-হিত করেছি কেননা পলিটিশানদের অভিসন্ধিই হচ্ছে আমাদের চিন্তা বিভ্রান্ত করে দিয়ে আমাদের উপর তাঁদের ইচ্ছা আরোপ করা এবং আমাদের চিন্তাশক্তি পঙ্গু করে দিয়ে শান্ত সুবোধ বালকে পরিণত করা।

আরো দুঃখের কারণ ঘটে যখন শক্তিমান লেখকরাও জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে শব্দের এই অর্থহরণের অপকার্যে সাহায্য করেন। শৈলেন রায় বা প্রণব রায় যখন নিজেদের নামের আগে 'কবি' কথাটি স্থাপন করেন তখন তার উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার। না বলে দিলে সত্যি হয়তো ভুল হবার আশঙ্কা ছিল। আর আমরাও যখন বিজ্ঞাপন বেআইনী করিনি তখন সাবান বা শাড়ির মতো কেউ যদি তার রচনার জন্যেও বিজ্ঞাপন দিয়ে বাজার খোঁজে তার জন্যে দোষ দিতে পারিনে। কিন্তু জীবিকার্জনের জন্যে আত্মবিজ্ঞাপনের এই অভিসন্ধি যখন অনুপস্থিত তখন কথাটির অপব্যবহার আরো অসমর্থনীয় হয়ে পড়ে। আমার মতে, রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে 'কবি' কথাটি প্রয়োগ সমর্থনযোগ্য নয়। এর পরে 'কবি' কথাটির সুনির্দিষ্ট আর কোনো অর্থ রইল না।

'চলন্তিকা' অভিধানে দেখছি 'কবি' কথাটির অর্থ কাব্যরচয়িতা। অর্থাৎ কবি বলে পরিগণিত হতে হলে কাব্য রচনা করতে হবে। শুধু ভাবলে চলবে না, এমন কি অন্যতর ক্ষেত্রে অপরিসীম সাফল্যও যথেষ্ট নয়। ভগবৎ সাধনায় সিদ্ধ হলে তিনি সাধক বলে খ্যাত হবেন, ধর্ম স্থাপন করলে তিনি ধর্মগুরু বলে সম্মানিত হবেন, এমন কি স্বয়ং ভগবানের অবতার বলে পুষ্পচন্দনে পূজিত হবেন। কিন্তু কবি বলে ফুলের মালা পেতে হলে তাঁকে কাগজ কলম নিয়ে কাব্য রচনা করতে হবে। কবির সংজ্ঞা এতে সঙ্কীর্ণ হোলো বুঝি? কিন্তু লজিক নামক শাস্ত্রের সঙ্গে যাঁর সামান্যতম পরিচয় আছে তিনিই জানেন যে সংজ্ঞার কাজই হচ্ছে ব্যাপক সাধারণ থেকে সঙ্কীর্ণ বিশেষকে বিভিন্ন বলে চিহ্নিত করা, অর্থাৎ কোনো একটি বস্তু বা ব্যক্তিকে তার বৃহৎ পরিবেশ থেকে সঙ্কীর্ণ করে দেখিয়ে বস্তু বা ব্যক্তিবিশেষের বিশিষ্ট রূপটি পরিস্ফুট করা। অক্সফোর্ড অভিধানে 'ডিফাইন' ক্রিয়াটির মানেই দেওয়া আছেঃ সীমা নির্দেশ করা। এই নৈয়ায়িক সঙ্কীর্ণতা বিসর্জন দিয়ে আমরা শব্দব্যবহারে উদার হতে গেলে শব্দের উদরী অবশ্যম্ভাবী।

আলোচনা

পলাশীর যুদ্ধ

মহাশয়,—আমি ইতিহাসের ছাত্র নই, তার একজন সাধারণ পাঠক। শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সদ্য সমাপ্ত 'পলাশীর যুদ্ধ' পড়ে আনন্দ পেয়েছি, জেনেছি আরও বেশী। ইতিহাসের তথ্যবহুল পুঁথি ও পাণ্ডিত্যের তত্ত্ব-বিরোধের প্রাচীর ডিঙিয়ে সব অনুসন্ধিৎসুর ইতিহাস পাঠ সম্ভবপর হয় না; একথা অকপটে বলা যায়, শ্রীতপনমোহনের লেখা তাঁদের মনে ইতিহাস সম্পর্কে উৎসাহ ও ঔৎসুক্য সঞ্চার করেছে। তাঁর বিবক্ষিত ইতিহাস শুধু বিশ্লেষণমূলক নয়, সংশ্লেষণমূলকও। তিনি ইতিহাসের বিবর্তন পরিণতি দেখিয়ে ক্ষান্ত হননি। নিয়তির অমোঘতার কথাও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাঁর শেষ কথাটিকে স্বীকার করে নিতে পারলাম না। যেখানে তিনি বলছেন, 'বিধাতার বিধানে কোথাও কোন যন্ত্রতা না থাকলেও অমোঘতা আছে। স্বীকার করে নিতে পারলাম না একারণে যে, তাঁর এই উক্তিটি বিজ্ঞানের কার্যকারণবাদের বিরোধী। ঐতিহাসিকের এরকম উক্তি ইতিহাসের প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সহায়ক নয়।

ইতিহাসের পরিণতি অমোঘ। তার নিয়তির নির্মম নির্দেশে ভারতকে সেদিন পলাশী ক্ষেত্রে পরাধীনতার শৃঙ্খল পরতে হয়েছিল। আবার ইতিহাসের শক্তি সংঘাতে ভারত সেই শৃঙ্খল আজ ছিন্ন করেছে। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির হাত থেকে অব্যাহতি পেতে হলে আজকের পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাসের সেই সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি, স্খলন-পতন, ভুল-ভ্রান্তিকে যাচাই করে দেখতে হবে। তাই মনে হয়, উপসংহারে শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের এরকম উক্তি আমাদের এই কর্তব্যবুদ্ধি সম্পর্কে সজাগ হতে সাহায্য করে না, বরং এটা পলায়নী মনোবৃত্তিরই পরিচায়ক।

তবুও বলব, শ্রীচট্টোপাধ্যায় তাঁর তথ্যবহুল ও কাহিনীমূলক পলাশীর যুদ্ধের ইতিহাস লিখে সময়ের একটি বিরাট দাবীকে মেটালেন। কারণ দেশ ও জাতির সম্যক পরিচয় তার ইতিহাসে। জাতীয়তার ভিতকে শক্ত করে গড়তে হলে জাতীয় ইতিহাসের বহুল প্রচারও অত্যাবশ্যক। আর সে কারণে জনপ্রিয় ইতিহাস লেখার প্রয়োজনও দেখা দিয়েছে আজ সবচেয়ে বেশী; এবং সে ইতিহাস গল্পাকারে লিখিত হলে ইতিহাস পাঠে আমাদের অনুরাগও বৃদ্ধি পাবে বেশী করে। তাই শ্রীচট্টোপাধ্যায় গতানুগতিকতার শান বাঁধানো পথে না চলে যে ব্যতিক্রম সৃষ্টি করলেন, তজ্জন্য তিনি আমার মতন বহু সাধারণ পাঠকের ধন্যবাদার্হ। শ্রীচট্টোপাধ্যায় শুধু সাহিত্যিক নন, শুধু ঐতিহাসিকও নন—তিনি একাধারে দুই-ই, তিনি সাহিত্যিক-ঐতিহাসিক। জাতীয় ইতিহাসের উপর তাঁর কাছ থেকে এধরণের লেখা 'দেশ' মারফতে আমরা আরও বেশী করে আশা করছি। প্রসংগক্রমে আমার একথাটিও মনে জাগছে, উচ্চস্তরে কলেজীয় ইতিহাসের কেতাবসমূহ নিরস তথ্যের মজবুত পাথরের উপর ভিত্তি করে রচিত হলেও; প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের স্কুল ইতিহাস গ্রন্থসমূহ এইরূপ সরস কাহিনীমূলক হলে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মনে তার প্রভাবও সুদূরপ্রসারী হবে।

পরিশেষে আর একটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই। শ্রীচট্টোপাধ্যায় যেভাবে সিরাজের চরিত্র চিত্রণ করেছেন, তা মোটেই আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করে না; শুধু শেষের দিকে মা আমিনা বেগম ও মহিষী লুৎফুন্নিসার করুণ কাহিনী এই হতভাগ্য নবাবের প্রতি আমাদের করুণোদ্রেক করে মাত্র। অথচ উত্তরকালে অনেক ঐতিহাসিক সিরাজের দেশাত্মবোধের কথা উল্লেখ করেছেন। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে রচিত 'সিরাজদৌল্লা' নাটক সাম্প্রতিক কালে বাঙলার মঞ্চদর্শকদের মনে অভূতপূর্ব উদ্দীপনা সঞ্চার করেছিল। শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের লেখায় উচ্ছৃঙ্খল সেই দেশাত্মবোধী সিরাজকে মেলে না—ইতি, বিনীত শ্রীনিরঞ্জনপ্রসাদ চৌধুরী, অধ্যাপক, রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়।

'বিকল্প ও প্রতিধ্বনি'

সবিনয় নিবেদন,

২০শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা দেশে রমলা মুখোপাধ্যায়ের 'বিকল্প ও প্রতিধ্বনি' আলোচনা পড়লুম। পড়ে মনে হোল এই পাঠিকাটি রঞ্জনের লেখার অত্যন্ত অনুরাগী ভক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর লেখক মনটিকে ঠিক যেন চিনতে পারেন নি। যদি পারতেন তবে এই বিষয় নিয়ে আলোচনার পাতায় তাঁর দেখা মিলতো না নিশ্চয়ই।

রঞ্জন আমারও অত্যন্ত প্রিয় লেখক। আমার কাছে তিনি প্রিয় তাঁর লেখার বিষয়বস্তু ও স্বকীয় স্টাইলটুকুর জন্যে। বিশেষ করে দেশে প্রকাশিত তাঁর বিকল্প ও প্রতিধ্বনি আমি নিয়মিত পড়ি আর সেই পড়ার জন্যেই যেন রঞ্জন ও আমার লেখক ও পাঠক সম্বন্ধটুকু আরো বেশি মধুর করে তুলেছে। এই লেখা পরিকল্পনা ও পরিবেশের জন্যে রঞ্জনকে অশেষ ধন্যবাদ।

সাহিত্য অঙ্ক নয় সত্যি। কিন্তু যে দুরূহ বিষয়বস্তু নিয়ে রঞ্জন প্রকাশের পথ খুঁজেছেন তা এর চেয়ে সহজভাবে লেখা সম্ভব নয় বলেই মনে হয় তিনি সহজভাবে তা প্রকাশ করতে পারেন নি। রঞ্জনকে আমি চিনেছি তাঁর লেখার মাধ্যমে। আর তার ভিতর দিয়েই আমার ধারণা রঞ্জন তাঁর লেখার স্টাইল সম্বন্ধে যত সচেতন তার চেয়েও বেশি সচেতন তাঁর অনুরাগী পাঠক সম্বন্ধে। নতুবা তাঁকে এই বিশেষ ধারার লেখার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যেতো কিনা সন্দেহ!

পরিশেষে বলবো রঞ্জন যদি এই প্রবন্ধকণিকাগুলিতে এ দেশীয় সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করেন তবে অত্যন্ত উপকৃত হবো। আশা করি রঞ্জন সাড়া দেবেন। —তৃপ্তি দাশগুপ্ত, ঝরিয়া।

'বিকল্প'

মহাশয়,

মানুষের মনের ভাবনা আড়াল করবার জন্যেই কথার সৃষ্টি। কিন্তু এই সৃষ্টি কালে কালে এমনি অনাসৃষ্টি রূপে দেখা দিল, রঞ্জন বিকল্পে তার মোটামুটি চেহারাটা মেলে ধরেছেন। কথা ছিল, মনের ভাব আর মুখের কথা একই রাস্তার মোড়ে ব্রেক কষবে—ঠোকাঠুকি লাগবে না কোথাও। জগতের আর পাঁচটা নিয়ম নীতি আপেক্ষিকতার গুণে যেমনি বদলায় তেমনি এই বাক্-নীতিরও বদল ঘটলো। ফলে মনের ভাব মনের অতলে তলিয়ে গেল—আর মুখের কথা ফানুষের মতো ফুরফুরে হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়লো বিশ্বময়—শ্লোগানে গানে, শোভাযাত্রা কি শবযাত্রায়, ফুটবলের মাঠে আর ফাটকার বাজারে। হালের ভারতবর্ষে এর মাত্রাধিক্য ঘটেছে সবচেয়ে বেশি।

কিছুদিন আগে কি একটা কাগজে পড়েছিলাম যে, বয়স্কদের "অসার কথামৃত বিতরণ" বন্ধ করবার জন্যে 'Farnborough'র Rev. Hutchinson সাহেব ছেলেদের একটা দল করে আন্দোলন সুরু করেছেন। তবু ভালো, এদেশে এমন কোনো আন্দোলন সুরু হয়নি এখনো। রঞ্জন তো শুধু কথা থামাবার বিকল্পে কাজ করার প্রস্তাব করেছেন দেশের আর দশজনের বেকার-বৃত্তি ঘোচাবার জন্যে। সত্যি আশ্চর্য হবো, এমন দিন কবে আসবে, যেদিন রাস্তা-ঘাটে, ট্রামে-বাসে, দেশে-বিদেশে ছেলে-ছোকরাদের মধ্যে শ্লোগানের মড়াকান্না থামবে, থামবে রাজনীতি-নকীবদের আর্তনাদ! বিনীত—শ্রীদুলাল দাস, কলিকাতা।

২

সবিনয় নিবেদন,

'দেশ' পত্রিকায় রঞ্জনের আবির্ভাব দেখে খুবই আনন্দিত হয়েছি। রঞ্জনের স্টাইল ও শব্দ-বিন্যাস সত্যই খুব মনমুগ্ধকর। রমলা মুখোপাধ্যায়ের রঞ্জনের বিকল্প সম্বন্ধে আলোচনা পড়লাম। তাঁর আলোচনার সাথে আমি, শুধু আমি কেন; আরও অনেকে একমত না হয়ে পারবেন না। লেখকের বা সাহিত্যিকের বৈশিষ্ট্য তখনই ভাল ভাবে প্রকাশ পায়, যখন তিনি অতি দুরূহ জিনিস অতি সহজ ও সরল ভাষার মাধ্যমে পাঠকদের নিকট পরিবেশন করেন (ব্যক্তিগত মতামত)। তাহলে সব রকমের পাঠকের কাছে লেখকের বক্তব্য বুঝতে অসুবিধা হয় না। রঞ্জনের লেখা পড়ে মনে হয় তিনি তাঁর বক্তব্যের চেয়ে স্টাইলকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। স্টাইল ও শব্দ-বিন্যাসের পিছনে তাঁর বক্তব্য বস্তু লুকিয়ে থাকে বলে মনে হয়। সাহিত্যে স্টাইলের ও শব্দ বিন্যাসের প্রাধান্য নেই এ কথা আমি বলছি না। সহজ ও সরল ভাষায় যে নিজের বক্তব্য প্রকাশ করা চলে, এর দৃষ্টান্ত সাহিত্যে অনেক আছে। রঞ্জনের লেখা পড়তে গিয়ে শুধু তাঁর স্টাইল ও শব্দ-বিন্যাস মনে বাজে, কিন্তু তাঁর বক্তব্য কিছুতেই সহজ হয়ে ওঠে না। —শিবু দত্ত, ধুবড়ী।

বিজ্ঞান-বৈচিত্র্য

চক্রদত্ত

বনভোজন করতে গিয়ে সেদিন ছোট্ট ছেলেটি অনবরত ক্লিক ক্লিক করে ছবি তুলে বেড়াচ্ছে, আর ভাবছে কতদিনে বাবার মত চলন্ত ছবি তুলতে শিখবে। ছেলেটির কাছে এই চলন্ত ছবির পর আর কোনও উন্নত ধরণের ছবি তোলার কথা জানা নেই। বাস্তবিক পক্ষে আজকাল কত উন্নত ধরণের ক্যামেরা যে বার হয়েছে, তা অনেকেরই জানা নেই। জলের নীচে চলন্ত ছবি তোলার জন্য এক রকম ফরাসী ক্যামেরা বার হয়েছে।

জলের নীচে ছবি তোলার নতুন ধরণের ক্যামেরাটি ডাঙ্গাতেই পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে

ক্যামেরাটা দেখতে একটি এরোপ্লেনের ল্যাজের শেষের দিকটার মত। এর লেন্সটা একটু নতুন রকম, জলের নীচে ছবি তোলার সময় আলোর গতি পরিবর্তিত হয়ে যায়, বলে সাধারণ লেন্সে যে অসুবিধা ভোগ করতে হয়, এই লেন্সে তা হয় না। ছবি তোলার যাবতীয় সরঞ্জামই এই ক্যামেরাটির সঙ্গে থাকে, আলাদা কোনও ব্যবস্থা সঙ্গে নিয়ে যেতে হয় না, এমনকি, একটি অক্সিজেনের বোতলও থাকে। দরকার হলে চিত্রগ্রহণকারী ঐ বোতল থেকে অক্সিজেন ব্যবহার করতে পারে।

*

"তেল না দিলে যন্ত্র চলে না।" যন্ত্রপাতির কলকব্জা সময়মত তৈল নিষিক্ত করার বিশেষ দরকার। কী ধরণের তৈলাক্ত পদার্থ দিলে যন্ত্রপাতি ভাল রাখা যায় তাও একটা সমস্যা। প্ল্যাস্টিলিউব (Plastilube) নামে একটি নতুন তৈলাক্ত পদার্থ বার হয়েছে। এই নতুন পদার্থটির গুণ হচ্ছে এটি সহসা গলে যায় না অথবা জমে যায় না কারণ সাধারণ তৈলাক্ত পদার্থের মত এতে চর্বিবহুল এসিড্ ও ধাতব সাবান নেই। যেটুকু তাপে জল জমে বরফ হয় তার চেয়েও কম তাপবিশিষ্ট পদার্থ থেকে শুরু করে ৫০০ ডিগ্রী ফারেনহাইট উত্তাপ বিশিষ্ট যন্ত্রপাতিতেও প্ল্যাস্টিলিউব ব্যবহার করা যায়। যে সব ইঞ্জিনে জল অথবা আর্দ্রতার জন্য সাধারণ চর্বি কার্যকরী হয় না সেখানেও প্ল্যাস্টিলিউব বেশ কার্যকরী। ফুটন্ত গরম জলের মধ্যে যেসব যন্ত্রপাতির কাজ হয় সেখানেও প্ল্যাস্টিলিউব গলেও যায়না এবং যন্ত্রপাতির গা থেকে বার হয়েও যায় না।

*

পৃথিবীতে নিতানতুন জীবজন্তুর আবিষ্কার হচ্ছে এর ফলে শুধু যে, মানুষের জ্ঞান বাড়ছে তা নয়, অনেক নতুন নতুন জীব জীব-জগতে সংযোজিত হচ্ছে। কীট-পতঙ্গ-জগত থেকেই নিত্য নতুন প্রাণীর খবর পাওয়া যাচ্ছে। কীট-পতঙ্গের মধ্যে পৃথিবীর আদিমতম কীটের নাম প্রোটিউর‍্যানস (Proturans) এগুলো দেখতে খুব ছোট্ট। এগুলি অন্ধ এবং ডানাহীন প্রাণী। এগুলোকে গাছের বাকলের নীচে এবং কখনও কখনও পাতার স্তূপের নীচে পাওয়া যায়। খুব অল্পসংখ্যক প্রোটিউর‍্যানস্-এর কথা কীটতত্ত্ববিদের জানা আছে। এগুলি কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায় এবং অনেক সময় এগুলি কোনও পতঙ্গের শূককীট বলে মনে করা হয়ে থাকে। এই অতি পুরাতন কীটগুলি জনসাধারণের কাছে এতই অপরিচিত ছিল যে, বলতে গেলে ১৯০৭ সালের আগে এর অস্তিত্ব সম্বন্ধেই কারো জানা ছিল না। গ্রেস্ প্ল্যান্স নামে একজন কীটতত্ত্ববিদ্ এর কয়েকটি প্রজাতি আবিষ্কার করেছেন। বলতে গেলে এইটিই এই কীটগুলি সম্বন্ধে দ্বিতীয় আবিষ্কার বলা যায়। এর প্রায় চৌদ্দ বছর আগে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে প্রোটিউর‍্যান্স সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয়। বর্তমানে নতুন প্রজাতির মাপ লম্বায় ১/২৫ ইঞ্চি। খুব গাঢ় হলদে রং আর সমস্ত শরীরটা একটি আবরণীর মধ্যে থাকে। এদের গতি খুব ধীর, কেননা এদের তিনজোড়া পায়ের মধ্যে দু জোড়া পা দিয়ে চলা ফেরা করে আর সামনের পা দুটি চলবার সময় সামনে বাড়িয়ে রাখে কোনও কিছু অনুভব করার জন্য। সাধারণ কীট পতঙ্গের যেমন মাথার দিকে অনুভূতিসম্পন্ন শুঙ্গ থাকে এদের এই পা দুটি সেই শুঙ্গের কাজ করে।

*

"আরও ফসল ফলাও" অভিযানের যুগে প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থেরই গৃহসংলগ্ন ছোটখাট সব্জির বাগান একটা করে থাকে। এইসব বাগান ঠিকমত পালন করা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। অনেক সময়ই কতকগুলো সাধারণ আইনকানুন না জানার জন্যই বহু যত্নে তৈরী গাছগুলো নষ্ট হয়ে যায়। গাছে জল দিলে গাছ বাড়ে, একথা সকলেই জানে, কিন্তু ছোট ছোট চারাগাছগুলোর পক্ষে প্রতিদিন অল্পস্বল্প জল ছিটিয়ে দেওয়ার চেয়ে সপ্তাহে একদিন খুব বেশী জল দেওয়া অনেক ভাল। গাছে কতবার জল দেওয়া হচ্ছে, সেটা ভাবার কথা নয়, কতটা পরিমাণ জল দেওয়া হয় সেইটেই দেখা দরকার। গরমকালে মাটির চার-পাঁচ ইঞ্চি তলা পর্যন্ত ভিজিয়ে দিলেও খুব তাড়াতাড়ি জলটা বাষ্প হয়ে উড়ে যায় এবং জমি শুকিয়ে যায়, সেইজন্য মাটির নীচে অনেকখানি গভীর স্থান ভিজিয়ে দেওয়া দরকার।

যদিও গাছের অবস্থা এবং গাছে ঠিকমত জল দেওয়াই গাছ জন্মানোর প্রধান লক্ষ্য হওয়া দরকার, কিন্তু এ ছাড়াও আরও কতকগুলো বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার। বীজ বপনের প্রথমদিকে মাটির ওপর জল ছিটিয়ে মাটির ওপরের কয়েক ইঞ্চি গভীর জায়গা পর্যন্ত ভিজিয়ে রাখলেই চলে। আবার যখন শেকড়গুলো গাড়তে থাকে তখনও জল ছিটানর দরকার হয়। তারপর গাছ যখন রীতিমত বেড়ে ওঠে, তখন তার গোড়ার দিকের মাটির জল খুব শুষে নেয়, তখনই প্রচুর জল-সেচনের প্রয়োজন হয়। তখন অন্তত মাটির নীচের দু-ফিট পর্যন্ত গভীর জায়গা ভিজিয়ে রাখতে হবে। বেলে মাটির জায়গায় যাতে দু-ফিট নীচে পর্যন্ত জলটা যেতে পারে, তার জন্য একই জায়গায় দু-তিন ঘণ্টা ধরে জল দিতে হবে। সমপরিমাণ এঁটেল মাটির জমিতে ঐ রকম নীচ পর্যন্ত জমি ভিজোতে চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগে।

মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ (পর্ষদ) তাহাদের অধীনস্থ বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের কতকাংশকে মধ্যাহ্নে জলযোগ দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন বলিয়া পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা লইয়া যে আলোচনা হইতেছে, তাহাতে সর্বজনীন সন্তোষের চিহ্ন পরিস্ফুট এবং অনেকের কাছে ইহা শিক্ষাবোর্ডের একটি নূতনতর উদ্যম বলিয়া বিবেচিত হইতেছে।

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

এই প্রচেষ্টা যে আপামর সকলের সমর্থন লাভ করিবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। মধ্যাহ্নে ক্ষুধার উদ্রেক হয়, একথা কাহারও অজ্ঞাত নয়, অবশ্য যাঁহারা সকালে জলযোগ সমাপনান্তে মধ্যাহ্নে ভোজন করেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু ছাত্রদিগের সম্বন্ধে স্বতন্ত্র কথা। ইংরেজি প্রথায় স্কুল পরিচালিত হওয়ায় সকাল সাড়ে দশটায় ক্লাশ আরম্ভ হয়, সুতরাং তাহার পূর্বেই ছাত্রদিগকে আসিয়া উপস্থিত হইতে হয়। পল্লীর দিকে স্কুলের অভাব আছে এবং অনেক সময় আধ ঘণ্টা হইতে এক ঘণ্টা পথ অতিক্রম করিয়া অনেক ছেলেকে বিদ্যালয়ে আসিতে হয়। সুতরাং সাধারণত ছেলেরা দশটায় অন্ন গ্রহণ করিলেও এমন বহু ছাত্র আছে, যাহারা নয়টা সাড়ে নয়টায় অন্ন গ্রহণ করে। তাহার উপর পেট ভরিয়া খাওয়া কতজনের ভাগ্যে ঘটে এবং তাহাতে দেহের পুষ্টিকর অংশ কতটা আছে, বিশেষত আজকালকার অভাবের দিনে, সে প্রশ্ন সকলের মনেই একটা খোঁচা দিবে। পথের শ্রম ছাড়া, অনেক ছেলে ক্লাশ বসিবার আগেই আসিয়া পৌঁছিয়া থাকে এবং খানিকক্ষণ ছুটাছুটি খেলা করে। সময় ও শ্রমের ফলে তাহারা যখন ক্লাশে বসে, তখন অন্ন কতক জীর্ণ হইয়াছে, যাহারা পেট ভরিয়া খাইতে পায় নাই, তাহাদের ক্ষুধার উদ্রেক হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

এই সকল ছেলের ছুটি হয় বেলা চারটায়। মাঝখানে স্কুলের জল ছাড়া যখন কিছুই খাইবার ব্যবস্থা নাই, তখন একটা সময় হয় "টিফিন!" কথায় আছে একজনের ইচ্ছা এক বাটি গরম দুধ চুমুক দিয়া খায়। সে মাঝে মাঝে দুধ ঠাণ্ডা করিবার উদ্দেশ্যে "ফুঁ" দিবার আর দুধ চুমুক দিবার মুখভঙ্গী করিত। লোকে ঠাট্টা করিলে বলিত, "আরে বাবা 'চুঁ'ও আছে, 'ফুঁ'ও আছে, নেই কেবল দুধ আর বাটি। একদিন জুটে গেলে তখন আর এ কাজে অসুবিধে হবে না।" বিদ্যালয়ের বর্তমান "টিফিন" সেই পর্যায়ে পড়িয়াছে। একটা বস্তুহীন ফাঁকা কথা সারা ছাত্র-সমাজকে প্রতারিত করিয়া রাখিয়াছে। এই মধ্যাহ্নে বিশ্রাম বা ছুটির সময় ছাত্রেরা আবার দৌড়াদৌড়ি করে। এ সময় পূর্ণ ক্ষুধার উপর আবার পরিশ্রম করায় তাহাদের ক্ষুধার তীব্রতা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। যখন মধ্যাহ্নের পরে ক্লাস আরম্ভ হয়, তখন তাহারা পাঠে মনোযোগ দিতে পারে না, পারা সম্ভবও নয়। ক্লান্তিতে তখন পড়া অত্যন্ত বিরক্তিকর হয় এবং তাহা মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌঁছায় না। সুতরাং বিকালের দিকটা তাহাদের উপর বিদ্যাদানের নামে অত্যাচার করা হয়।

অনেকের ছুটি হইলেই বাড়ি যাওয়া ঘটে না। "ড্রিল", স্বাস্থ্যচর্চা প্রভৃতি কার্যে আবার সময়ক্ষেপ করিতে হয়। স্কুলে ইহা বাধ্যতামূলক। ইহার উপর আবার "vocational training"এর ব্যবস্থা আছে। যদি সকল ছাত্রই ছুটির পরই বাড়ি যাইতে পায়, তাহা হইলেও অনেকের বাড়ি পৌঁছিতে পাঁচটা হইতে ছ'টা বাজে। সেই সময় কিছু জলখাবার জোটে (অনেকের তাহাও জোটে না); তাহার কিছুক্ষণ বাদে রাত্রের জন্য ভাত (বা রুটি) খাইবার সময় হয়। অর্থাৎ বহু সময়ের ব্যবধানে, যখন কিছু "পেটে পড়া" দরকার ছিল, তখন না-পাইয়া সন্ধ্যার সময় অল্পবিস্তর যাহাই হউক, দুইবার খাইতে পাওয়া যায়। রাত্রে পড়ার সময় দিনের ক্লান্তি ও ক্ষুধার জন্য দুর্বলতার পর অন্ন গ্রহণে নিদ্রার আবেশ হয়, পাঠের ক্ষতি হইয়া থাকে।

একথা কেহ জানেন না বা মধ্যাহ্নে কিছু জলযোগের অভাব উপলব্ধি করেন না, তাহা নহে। সারা বাঙলাদেশে দু-তিনটি স্কুলও আছে, যাহারা নিয়মিতভাবে বহু-কাল ধরিয়া এরূপ টিফিনের ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছে। আর মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের প্রস্তাবিত সাহায্যের কথাও নূতন নহে। বর্তমানের অর্থসংকটের পূর্বে প্রতি জেলায় বিদ্যালয় পরিদর্শকের বিবেচনাধীনে দেয় কিছু টাকা জমা থাকিত যাহা হইতে টিফিনের জন্য স্কুলকে সাহায্য দান করার ব্যবস্থা ছিল। টাকার পরিমাণ খুবই কম। কোনও মনোনীত স্কুলের ছাত্রদের নিকট প্রতি মাসে ছয় পয়সা টিফিনের হিসাবে লইলে শিক্ষা বিভাগীয় ব্যবস্থায় ছাত্রপ্রতি তিন আনা দিবার ব্যবস্থা ছিল। দুঃখের বিষয় প্রায় কোনও স্কুলই সে দিকে মনো-যোগ দিত না। সে কারণে স্কুলকেই দোষ
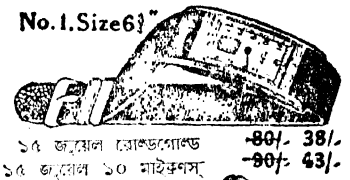
দেওয়া যায় না বা যুক্তিযুক্ত নয়। গভর্ন-মেণ্টের শিক্ষাবিভাগের নিজের এ বিষয়ে যথেষ্ট যে উৎসাহ ছিল তাহা মনে হয় না। আজও নানা স্কুলে জিজ্ঞাসা করিলে জানা যাইবে যে, কর্তৃপক্ষ বা শিক্ষকগণ এ বিষয়ে কিছুই অবগত নন। এ সম্বন্ধে সকল স্কুলকে উপযুক্ত সময়ে জানাইয়া দেওয়ার কোনও ব্যবস্থা ছিল বলিয়া মনে হয় না। শাসন পরিচালন প্রভৃতি বহু সার্কুলার কর্তৃপক্ষ প্রায় প্রতি সপ্তাহে প্রেরণ করিয়া থাকেন কিন্তু টিফিন সম্পর্কিত কোনও কাগজপত্র নিয়মিত প্রেরিত হইত এরূপ বলা যায় না। বৎসরের পর বৎসর টাকা জমা পড়িয়া থাকিত, মার্চ মাসে সরকারী 'বৎসর' শেষ হইলে মোট তহবিলে জমা হইয়া যাইত।

সরকারী এ মনোবৃত্তির দুইটি মুখ্য কারণ ছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ টাকার পরিমাণ কম। দেশে যত স্কুল এবং তাহাতে যত ছাত্র আছে, তাহার তুলনায় সমুদ্রের নিকট গোষ্পদ বলা যাইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে যত কম স্কুল জানে, টাকার পরিমাণ ততই কম লাগিবার কথা। টাকা না থাকায় বিভিন্ন স্কুল কর্তৃপক্ষের তাগিদ মিটাইতে না পারিয়া অসন্তোষভাজন হওয়া অপেক্ষা তাহা বেশী জানাজানি না হইলেই মঙ্গল। জমা টাকা সরকারী মূল তহবিলে বৎসরের শেষে জমা দেওয়া বিশেষ কষ্টকর নয়। হয়ত টিফিন সমর্থক কোনও কর্মকর্তা একটা "এক্সপ্ল্যানেসন" বা বরাদ্দ টাকা খরচ না হওয়ার জন্য একটা সদুত্তর চাহিয়া বসিলেন। এ জবাব দেওয়া কষ্টকর নয়, কারণ কোনও স্কুল হইতে এই দাবী আসে নাই, গায়ে পড়িয়া টাকার অপ-ব্যয় করা যুক্তিযুক্ত নয়, সুতরাং হাতের টাকা হাতে থাকাই মঙ্গল।

দ্বিতীয়তঃ অফিসের কর্মচারীর মধ্যে কার্যে অনুৎসাহ বা নূতন কাজ বৃদ্ধির পক্ষে আপত্তি। যাহা না করিলে চলে অথচ পুরা পারিশ্রমিক পাওয়া যায়, তাহা করা সাধারণ কর্মচারীর পক্ষে অস্বাভাবিক ব্যাপার। সরকারী টাকা যাহা ব্যয় হয়, তাহার হিসাব রাখিবার কড়াকড়ি খুব বেশী। টিফিনের টাকার প্রতি মাসে কম-বেশী হইয়া থাকে। ছাত্রসংখ্যার উপর যাহা নির্ভর করে, তাহার হিসাবে মোট টাকার পরিমাণে ইতরবিশেষ হয়। সরকারী দপ্তরে এবং স্কুলের পক্ষে যত কাগজ লেখাপড়া এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব দাখিল করিবার ব্যবস্থা আছে, তাহাতে নিরুৎসাহ হইবার কারণ অনেকাংশে বর্তমান। মাসিক নিয়মিত সাহায্য ছাড়াও স্কুলের প্রয়োজনে এককালীন সাহায্য দিবার ব্যবস্থা ছিল; বিশেষতঃ প্রারম্ভিক তৈজসপত্র কেনার জন্য অর্থসাহায্য পাওয়া যাইত। টিফিনের প্রয়ো-জনীয়তা বুঝিয়া যে কর্মচারী ইহা প্রসারের চেষ্টা করেন এরূপ লোক ভারপ্রাপ্ত হইলে তবেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে।

পূর্বে যাহা ছিল তাহার উল্লেখ করার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয়। যে সকল ত্রুটি ছিল তাহার সংশোধন না হইলে যে অবস্থা ছিল তাহার পুনরাবৃত্তি হওয়াই স্বাভাবিক। নিতান্ত পরীক্ষামূলক-ভাবে না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যাঁহারা গভর্নমেণ্টের পক্ষে প্রধান উদ্যোক্তা তাঁহারা সর্বদা এ বিষয়ে অবহিত থাকিয়া বরাদ্দ টাকা যাহাতে নিয়মিত খরচ হয়, তাহার জন্য সুষ্ঠু ব্যবস্থা করিলে তবে কিছু ফল আশা করা যাইতে পারে। টাকার বিষয়ে কৃপণতা না করিয়া ক্রমে ক্রমে সকল স্কুলেই যাহাতে এই ব্যবস্থার আমলে আসে তাহার দিকে মনোযোগ দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

গভর্নমেণ্টের তরফে যতই চেষ্টা হউক, যদি বিদ্যালয়ের তরফে কোনও বাধা থাকে এবং শিক্ষক ও পরিচালক সমিতি ইহাতে মত না করেন তাহা হইলে কোনও কালেই 'টিফিন' চালু হইবে না। যাহাতে ছেলেরা অভ্যস্ত নয়, তাহার জন্য কাহারও চিন্তার কথা নাই। কিন্তু কিছুদিন টিফিন পাইতে অভ্যস্ত হইলে তাহার পর হঠাৎ বন্ধ হইলে সকলেরই অসুবিধা। প্রবর্তকের বদনাম হইবার সম্ভাবনা। সকল ছেলের জন্য নিত্য ভোজ্য বস্তু সংগ্রহ করা এক বিষম সমস্যা। তাহার উপর নানা রুচির নানা স্বাস্থ্যের

পড়িয়া আছে, তাহাদের প্রয়োজন ও রুচি অনুযায়ী ব্যবস্থা করিতে হইবে। সপ্তাহের প্রতি দিনটিতে ছাত্রসংখ্যানুযায়ী খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে কিনা তাহা বিচার করিলে সাহস অন্তর্হিত হয়। সহরের দিকে যদিই বা সম্ভব হয়, পল্লীর দিকে ইহা সম্ভব হওয়া যে দুষ্কর তাহা মনে হইবে। যদি স্কুলের পক্ষ হইতে খাদ্য প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিতে হয় তাহা হইলে নূতন সমস্যা আছে। কাজে নামিলে হয়ত অনেক বিষয় সহজ হইবে, আবার নূতন নূতন অসুবিধা উপস্থিত হইতে পারে এরূপ কল্পনা করা স্বাভাবিক।

বিদ্যালয়ে আসা, ছাত্রদের পাঠের ব্যবস্থা, নিজেদের বিশ্রাম, সংসার চালাইতে প্রাণান্ত এবং অধিকাংশ শিক্ষকের পক্ষে "প্রাইভেট টুইসান" করিয়া শরীর ও মনের যে অবস্থা দাঁড়ায়, তাহাতে টিফিন সম্পর্কিত ভার লইবার পক্ষে নিরুৎসাহ হইবার যথেষ্ট কারণ বর্তমান।

বিদ্যালয় পরিচালকবৃন্দের এ সম্পর্কে কোনও মনোযোগ দিবার অবসর নাই। মাসান্তে একটা মিটিং করিতে পারিলে সাধারণতঃ কর্তব্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। যাহাতে বিদ্যালয়ের তহবিল তছরূপ না হয়, যথাকালে হিসাব দাখিল করা হয়, সময়ে পরীক্ষা গৃহীত হয়, তাহার ফলাফল বাহির হয় এবং অতিরিক্ত পক্ষে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় যাহাতে ফল ভাল হয়, এই সকল ব্যবস্থা করিলেই কর্তব্য সম্পাদন করা হইল বলিয়া মনে করেন। অনেকেরই সময় নাই, অনেকের রুচি নাই, কেবল স্কুল কমিটির সভ্য হইবার সম্মান লাভ করিতে পারিলেই যথেষ্ট এবং অধিকাংশেরই একটা নূতন কিছু করিবার জন্য প্রেরণা নাই বা সে সম্বন্ধে কোনও ধারণা নাই। সাধারণতঃ পরিচালকবৃন্দ শিক্ষকদিগের সহিত একমত হইয়া থাকেন যে, শিক্ষা সম্বন্ধীয় ছাত্রদের প্রতি যত মনোযোগ দিতে হয়, সরকারী নির্দেশে যত প্রকার হিসাব পত্র রাখিতে হয় বা দাখিল করিতে হয়, তাহার উপর আবার মধ্যাহ্ন জলযোগের ব্যবস্থা করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, আবার কম বেতনের শিক্ষকদিগের উপর ইহা একটা বোঝা বা অত্যাচারের নামান্তর। সুতরাং এ সম্মিলিত বাধার বিপক্ষে নূতন ব্যবস্থা চালু করা যে সহজ ব্যাপার নয় তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না।

ইঁহারা বাদে অভিভাবক ও ছাত্রপক্ষ আছেন। সাধারণভাবে মনে হয়, যখন পরিচালক সমিতি অধিকাংশ সভ্য অভি-ভাবকগণের প্রতিনিধি তখন মোটামুটি তাঁহাদের যখন আপত্তি আছে, তখন সাধারণ অভিভাবকদিগেরও আপত্তি থাকাই স্বাভাবিক। বিশেষতঃ যখন অভিভাবক-দিগকে নূতন করিয়া কিছু চাঁদা বা ট্যাক্স দিতে হইবে, তখন আপত্তির যথেষ্ট কারণ আছে। কার্যক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, এই ধারণার মূলে কোনও ভিত্তি নাই। কোনও কোনও স্থলে অভিভাবকদিগের সভায় শিক্ষক ও পরিচালকমণ্ডলীর অধিকাংশের বহু অসুবিধা তারস্বরে প্রকাশ করার পরও অভিভাবকমণ্ডলী একবাক্যে টিফিন ব্যবস্থার সমর্থন করিয়াছেন। দুপুরে জলখাবারের প্রয়োজন আছে এ কথা সকল অভিভাবকই জানেন সুতরাং সামান্য কিছু বেশী খরচ করিলে, মাসিক হয়ত চার আনা ঊর্ধ্বপক্ষে আট আনা খরচ করিলে যদি ছাত্ররা নিত্য কিছু খাইতে পায়, তাহাতে কাহারও আপত্তি দেখা যায় নাই। দরিদ্র অভিভাবকদিগকে চাপ দিয়া অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজন নাই। যাঁহাদের ছেলেরা বা মেয়েরা অর্থাভাবের জন্য বিনা বা সামান্য বেতনে পড়াশুনা করিতে পায়, তাহাদের নিকট চাঁদা লইবার প্রয়োজন নাই। প্রশ্ন উঠিতে পারে, ইহাদের জন্য যে খরচ হইবে তাহা কোথা হইতে পাওয়া যাইবে? পূর্বের নিয়মে, গভর্নমেণ্ট হইতেই স্কুলের মোট ছাত্রের শতকরা দশজনের জন্য খরচ দিবার ব্যবস্থা ছিল এখন যে তাহার কোনও ব্যতি-ক্রম হইবে বলিয়া মনে হয় না। তাহা ছাড়া যাহারা দিতে সক্ষম তাহাদের প্রত্যেকের নিকট মাসিক দুই পয়সা বাড়াইয়া লইলে বা স্কুলের তহবিল হইতে এই টাকা দিলে সহজেই চলিয়া যায়। যে স্কুলের তহবিল নাই, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় সহৃদয় গ্রাম-বাসী কেহ কেহ নানারকম পারিতোষিক দিতে উন্মুখ থাকেন। তাঁহাদের নিকট টিফিন উপলক্ষ্যে অর্থ প্রার্থনা করিলে সহজেই পাওয়া যাইতে পারে। তাহা ছাড়া দরিদ্র ছাত্রের জন্য যখন সরকারী ব্যবস্থা আছে তখন এ সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তার কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না।

ছাত্রদের তরফে পূর্ণ সমর্থন যে, পাওয়া যাইবে সে বিষয়ে কোনও দ্বিমত নাই। অন্ততঃ যে সকল স্কুলে টিফিন আছে বা ছিল সেখানে কোনও ছাত্রের কোনও আপত্তি কেহ কখনও শুনিতে পান নাই। কোথাও হয় ত' টিফিনের রকমফের, ভোজ্য-বস্তুর একঘেয়েমি প্রভৃতি লইয়া সামান্য আপত্তি হয়। বণ্টনে ছাত্রে ছাত্রে ব্যতিক্রম থাকিলে হয়তো অসুবিধা হয়; তাহা ছাড়া কোনও আপত্তি নাই। ছাত্রদের কেহ কেহ বাটী হইতে সামান্য জলখাবার লইয়া আসে। তাহার মধ্যে অনেকেই, যাহারা জলখাবার লইয়া আসে না, তাহাদের সামনে খাইতে সঙ্কোচবোধ করে; বিশেষত যেখানে সহ-পাঠীর সহিত গভীর প্রীতি আছে। আবার এমন নীচমনারও অবস্থিতি অসম্ভব নহে, যাহারা অভুক্ত ছাত্রের নজর লাগিবার ভয়ে প্রকাশ্যে খায় না। শরৎচন্দ্র তাঁহার "বিন্দুর ছেলে"তে ছাত্র মহলে জলখাবার লইয়া যে ঘটনার বেদনাদায়ক বিবরণ দিয়াছেন, তাহার পর টিফিন সম্বন্ধে কাহারও আপত্তি থাকা উচিত ছিল না। সকল ছাত্রই এক-সঙ্গে একই ধরণে খাইতে পায়, ইহা তাহাদের একটা বিরাট আনন্দের কথা। তাহা তাহাদের সহযোগিতায় যখন এই ব্যবস্থা চালু রাখা সম্ভব, তখন তাহাদের নূতন শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ ঘটিয়া থাকে। দায়িত্বের বোঝা বড় বোঝা। টিফিনের ব্যাপারে তাহাদের প্রথমেই এই শিক্ষা আসিয়া পড়ে। সময়ানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা, বিধিবদ্ধ কার্যে রুচি বা রীতি, সমাজসেবা প্রভৃতি নানা কাজ ও গুণের সমাবেশে ছাত্রদের শিক্ষার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়। শিক্ষকে ছাত্রে প্রীতির বন্ধনের একটা নূতন সুযোগ উপস্থিত হয়। একটু চিন্তা করিলেই টিফিন-ব্যবস্থার নানা গুণের কথা আপনিই আসিয়া পড়ে, সুতরাং তাহার বিস্তৃত বিশ্লেষণে প্রয়োজন নাই, কি উপায়ে অসুবিধা দূর হইতে পারে, সমস্ত স্কুল, অন্ততঃ অধিকাংশ স্কুল এই ব্যবস্থা অবলম্বন করে সেই সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাইবে।

ট্রামে-বাসে

স্কটল্যাণ্ডের একটি খবরে প্রকাশ, সেখানে কোন একটি প্রতিষ্ঠান স্বামীর মাহিয়ানার একদশমাংশ স্ত্রীর প্রাপ্য হিসাবে ধার্য করার জন্য একটি আইনের পরামর্শ দিয়াছেন। বিশুখুড়ো বলিলেন—"ভারতে আমীরা একদশমাংশ কেন, সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং পর্যন্ত ত্যাগ করে থাকি, কিন্তু কথা সেটা নয়। ভাবছি আমাদের সেন্সর কর্তৃপক্ষ এমন একটা সংবাদ ছাপতে দেওয়ার আগে কি নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছিলেন, না তারা সব আইবুড়োর দল?"

* * * *

লায়লাপুরের পাঞ্জাবী নেতা আওরংগজেব খাঁ নাকি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্থানের মধ্যে প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় করার জন্য বাঙালী ও পাঞ্জাবী তরুণ-

তরুণীদের মধ্যে পরস্পর বৈবাহিক সম্পর্কের পরামর্শ দিয়াছেন। শ্যামলাল বলে—"সম্পর্কটা 'বিবাহের চেয়ে বড়ো' হলে অবশ্য আরো ভালো হয়। আর না হলেই বা এমন কি, মোক্ষম তালাক্ তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না।"
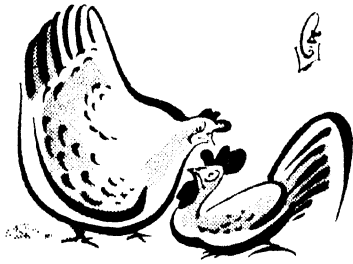
* * * *

পেপ্সুর শিক্ষামন্ত্রীর এক প্রশ্নের উত্তরে ভাতিন্ডা কলেজের জনৈক ছাত্র নাকি বলিয়াছে যে, আমেরিকার নব নিযুক্ত প্রেসিডেণ্টের নাম মার্শাল স্টালিন।—"জনৈক ওস্তাদের সেতারে ভৈরবী আলাপ শুনে সংগীত-অজ্ঞ জমিদারবাবু জিজ্ঞেস করলেন—ওস্তাদজী বুঝি ললিত বাজাচ্ছেন? ওস্তাদ বাজনা বন্ধ করে বল্লেন—ধরেছেন প্রায় ঠিক, তবে ললিত নয়, তার ছোট ভাই যামিনী"। গল্পটা শুনাইলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * * *

জুনাগড়ের নিকট গির নামক জংগলে সম্প্রতি দশটি সিংহের এক-সংগে মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুর কারণ রহস্যাবৃত বলিয়া স্থানীয় কংগ্রেস কমিটি নাকি সৌরাষ্ট্র সরকারের কাছে কারণ অনুসন্ধানের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। বিশুখুড়ো বলিলেন—"সরকারী অনুসন্ধানের ফলাফল কি হবে বলা শক্ত, তবে অনুমান হয় স্বজাতিরা দলে দলে কুইট করার ফলেই তারা বিরহে না খেয়ে খেয়ে প্রাণত্যাগ করেছে।"

* * * *

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত সেন সম্প্রতি একটি পিন্ তৈরীর কারখানার উদ্বোধন করিয়াছেন।—"শেলের চেয়ে পিন্‌প্রিক্ ভালো একথা যদি সেন

মশাই জানতেন তবে তো আর......সহযাত্রী কথাটা শেষ করিলেন না।

* * * *

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী নাকি বলিয়াছেন যে, তিনি জওহরলালজীর অনুকরণে Discovery of hunger for education নামক পুস্তক রচনা করিবেন। —"খাদ্যমন্ত্রী মশাই 'ক্ষুৎ পিপাসার অভাব আবিষ্কার' নামক কোন বই লিখবেন কিনা, তা অবশ্য জানা যায়নি।" —মন্তব্য করেন খুড়ো।

* * *

এক সংবাদে প্রকাশ, ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড তাদের জুবিলী উৎসবে অস্ট্রেলিয়া হইতে একটি টিম আনিবার
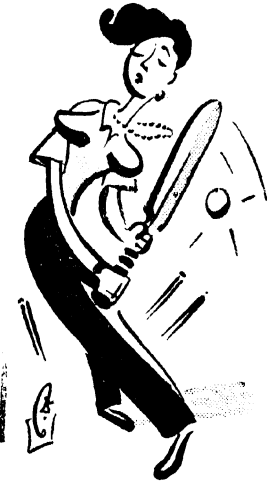
ব্যবস্থা করিতেছেন। খুড়ো বলিলেন—"তার চেয়ে চিত্রতারকাদের টিম্‌কে খেলাতে পারলে জেল্লা বাড়তো, বোর্ড কথাটা ভেবে দেখবেন!!"

* * * *

U.N.-এর সেক্রেটারী জেনারেল Lie-এর গদিতে কে বসিবেন তা নিয়ে নানা জল্পনাকল্পনা চলিতেছে। শ্যাম বলিল—"কে আসবেন জানিনে, তবে অন্ততঃ Lie-এর পর Truth-এর কোন চান্স নেই!!"

দ্বৈত

শ্রীকল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

আমরা উভয়ে আজকে করুণ-ক্লান্ত
পথ হেঁটে হেঁটে, বলো তো সে কার জন্যে
নিয়তি-অন্ধ প্রেমের প্রাচীন পান্থ
পথ-হারা হয় দ্বৈত হৃদয়ারণ্যে।

মধুর মদির মাধবী মাসের রাত্রি
নামবে যেদিন দ্বৈত প্রাণের প্রান্তে
শুধাবো সেদিন, 'আমরা যে সহযাত্রী
মনের তরীতে, এ-কথা আগে কী জানতে?'

অথবা ঝড়ের রাতের তিমির-তীর্থে
ভয় পাও যদি অজানা ভয়ের জন্যে,
বলবো তাহলে সে ভয়ের ছায়া ছিঁড়তে
আমরা দ্বৈত-হৃদয়, হে রাজকন্যে।

যতো ভয় যতো আশংকা সব মিথ্যে,
কি ঝড়ের রাতে কি মধু-মাধবী রাত্রে
আমরা যে বাঁধা দ্বৈত প্রাণের বৃন্তে
কতোকাল থেকে—কালের সাগর সাঁতরে।

সেই কবে থেকে কুসুম-কোমল শয্যা
ছেড়েছি, এখন উধাও ধুলোর তীর্থে,
আমরা দ্বৈত-হৃদয়, ফুলের সজ্জা
করতে তাইতো পারলে না তুমি ফিরতে।

আমরা উভয়ে ক্লান্তি করুণ-ক্লান্ত
আজকে, অথচ এদিকে হে রাজকন্যে,
মৌন-মুখর মন যে অনতিক্রান্ত
পথ-শেষে চায় দ্বৈত হৃদয়ারণ্যে।

বৃষ্টি

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

জানিনা কী ক'রে হয়, বৃষ্টি যেই নীলাকাশ হ'তে
নামে তীব্র ক্ষিপ্রধার, নামে শুষ্ক মাঠে তেপান্তরে;
ভিজে কাক ডাকে দূরে, সারমেয় আর্ত কণ্ঠস্বরে
নিভৃত আশ্রয় খোঁজে; প্রবল জলের খরস্রোতে
মাঠ ঘাট পথ একাকার। বিদ্যুতের ক্ষণ-ঝলকানি
প্রাসাদের উচ্চচূড়ে, গাছপালা কাঁপে দূর বনে
শাণিত বাতাসে বেগে; ঊর্ধ্বে কৃষ্ণ মেঘে ক্ষণে-ক্ষণে
বজ্রের নির্ঘোষ, সারা আকাশে-বাতাসে হানাহানি—

তখন হৃদয়ে যেন কোথা থেকে বন্যাস্রোত আসে,
নামে ধারা মনের গহনে, মঞ্জুরিত দেহময়
অপরূপ অনুভূতি, ঠাণ্ডা হিম মন্থর নিশ্বাসে,
ভিজে মৃত্তিকার ঘ্রাণ, প্রকৃতির সাথে পরিচয়
মুহূর্তেই সুনিবিড়; বর্ষার সন্ধ্যায় এই ঘরে
হারানো অনেক সুর কেঁপে-কেঁপে মাথা কুটে মরে॥

চিঠি

গোবিন্দচরণ মুখোপাধ্যায়

অনেক জলের ভারে থম্‌থমে যেমন মেঘেরা
তুমি ছিলে তেমনি তো রহস্যের বেড়া দিয়ে ঘেরা!
কথার বর্ষণ শুরু, লঘু-পাখা প্রজাপতি মন
উড়ে উড়ে এক মুঠো পেঁজা-তুলো মেঘের মতন
ধরা দিলে। দিনান্তের স্বর্ণ-আভা গোধূলির লেখা
সেইদিন হতে রাঙা, জানো মেয়ে, যা-কিছু অ-দেখা
সকলই রহস্যময় যেন আজো—সকালের ডাকে
বিকেলের চিঠি ফেলি, দুপুরের সব কথা থাকে
রাতের পাথেয়। লেখায় তো দেখা নয়, মনে হয়—
সবুজ পাতায় মোড়া বহুদামী তোমার সময়
গোলাপের মতো আছে, বুকে রাখি, চোখ বুজে ভাবি
অশরীরী তোমাকেই। সজীব মনের সব দাবী
কম নয়, ভাসা ভাসা টানা টানা ভুরু দুটি বাঁকা
কপালে টিপের পরে আমারই তো ভীরু প্রেম আঁকা।

পুস্তক পরিচয়

আত্ম-জীবনী

চলমান জীবনঃ পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিমিটেড কর্তৃক ৮৯ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭, থেকে প্রকাশিত। দাম ৪॥০, ২৯৫ পৃষ্ঠা।

এই বইখানির প্রধান গুণ লেখকের আত্মম্ভরিতাশূন্যতা। আত্মজীবনী হওয়া সত্ত্বেও এতে লেখকের ব্যক্তিগত পরিচয় একান্ত অস্পষ্ট। বইটির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এর লেখকের স্বচ্ছ সততা। বাঙলা সাহিত্যের হাটে তাঁর প্রধান কাজ যে, বস্তুত কী ছিল তা তিনি তৃতীয় পৃষ্ঠায়ই নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ করেছেনঃ 'দালালি' কথাটা ভদ্র নয়, কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে অপপ্রযুক্ত হয়নি। জোড়হাটে তিনি উকিলের মুহুরি ছিলেন, কলকাতায় এসে সাহিত্যিকের মুহুরি হয়েছিলেন। স্থান পরিবর্তনের চেয়ে পেশা পরিবর্তনটা কম অর্থপূর্ণ। চট্টগ্রামে তিনি সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়েছিলেন বিনা টিকিটে (পৃষ্ঠা ৪০); বাঙলা সাহিত্যের গাড়িতে পবিত্রবাবু বিনা টিকিটের যাত্রী।

কিন্তু 'সবুজপত্র'-প্রতিষ্ঠাতা প্রমথ চৌধুরীর বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছোবার সৌভাগ্য লেখকের হয়েছিল। অমন সাহিত্যিকসভায় 'রবাহূতকেও' (পৃষ্ঠা ৪৭) ঈর্ষা করতে হয় বৈকি? কিন্তু ঈর্ষা প্রশমনযোগ্য রিপু, এবং এই পুস্তকপাঠে সেই চরিত্রবিশুদ্ধি সহজেই ঘটে। বইখানির শেষ গোটা কয়েক পাতায় ছাড়া আর কোথাও অনুমান করবার উপায় নেই যে, পবিত্রবাবু বাঙলা সাহিত্যের একটা বৃহৎ বিপ্লবের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। তাঁর কান ছিল বীরেন নামক এক পরশ্রীকাতর প্রতিবেশীর দিকে, বীরবলের দিকে নয়; তাঁর চোখ ছিল আশুতোষ চৌধুরীর পায়ের কটকি জুতোর উপর, প্রমথ চৌধুরীর লেখার উপর নয়। ছেলেবেলায় (পৃষ্ঠা ২৭) লেখক যেমন বান্ধব সমিতির পাঠাগার থেকে 'বাঁশ বনে কানা ডোমের মতো একখানা বইও' না পড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন, বাকি জীবনেও অসামান্য দৃঢ়তার সঙ্গে সেই নীতির তিনি ব্যত্যয় ঘটতে দেননি। বাঙলা দেশের গত পঞ্চাশ বছরের ঘটনাজমাট অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে লেখক বেঁচেছেন, কিন্তু সেসব আন্দোলনের প্রভাব তাঁর মনের উপর যেন হাঁসের গায়ে জল, এক বিন্দুও বসতে পায়নি। সেদিনকার সাহিত্যিক আভিজাত্য যেমন মুছে গেছে, আজকের মজদুরি মায়াকান্নার অশ্রুও তেমনি অনতিদূর ভবিষ্যতেই শুকিয়ে গেলে বিস্মিত হবো না। বইটির তৃতীয় ও শ্রেষ্ঠ গুণঃ পবিত্রবাবু সত্য তাঁর দেশের ও জাতির সত্যকার প্রতিনিধি। কোনো সাংস্কৃতিক বিপ্লব বা রাজনীতিক আন্দোলন আমাদের চরিত্রস্থাণুতার কিছুমাত্র স্থায়ী পরিবর্তন সাধন করতে পারে না!—'র'। (৩২২।৫২)

উপন্যাস

প্রশান্ত—শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য; মায়া গ্রন্থাগার; কদম কুঁয়া, পাটনা।

শিক্ষণীয় এবং সারগর্ভ অনেক ভালো ভালো কথা আছে, আছে বহুবিধ অমূল্য উপদেশ। শিক্ষকের আদর্শ, পিতামাতার এবং সন্তানদের প্রতি কর্তব্য, দেশ ভ্রমণের উপকারিতা—ইত্যাকার সব উদাহরণমূলক দৃষ্টান্ত। কিন্তু তাতে কি হলো? বইখানা যদি উপন্যাস হয় তাহলে বলতে হয় লেখকের প্রচেষ্টা কোন কাজে লাগে নি। কারণ গল্পাংশে উপদেশাত্মক বক্তৃতা এবং উদাহরণরাজি নিতান্ত বেখাপ্পা হয়েছে। অনুপাত অসম। আর উদ্দেশ্য যদি হয় সারগর্ভ প্রবন্ধ রচনা (বোধ হয় তাই) তাহলে জোড়াতালি দেওয়া গল্পটুকুর কোন প্রয়োজন ছিল না। এমনিতেই বোধগম্য হতো। (২৫০।৫২)

অভিষেক—শ্রীশান্তিময় ঘোষাল; কমলা বুক ডিপো; ১৫, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা। এক টাকাবার আনা।

সাহিত্যিকের সঙ্গে প্রেম, বিবাহে মেয়ের বাবার অসম্মতি এবং মৃতা মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞা হেতু পিতার অমতে কিছু করতে মেয়ের অক্ষমতা। ফলে নায়িকার কঠিন অসুখ। ডাক্তারের পরামর্শে শেষকালে অপমানিত সাহিত্যিককে আবার ডেকে আনতে হলো। শেষটা হয় অবশ্যই মিলনান্তক। বাঙলাদেশের সিনেমা দেখা দশ বছরের ছেলেও একথা বলতে পারে। ভূমিকায় প্রকাশক অনেক আশার কথা শুনিয়েছেন। যেমন, 'অভিষেক একখানি বাস্তববাদী সাহিত্য; এবং সনাতনী মূর্তির একটি মূর্ত প্রতিবাদস্বরূপ।......এই পুস্তকে লেখকও এক স্থানে একটি ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করিয়া পাঠক-পাঠিকাগণকে ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, কোনও পুস্তক যদি বাস্তবতার অপরিপন্থী অথচ চিরাচরিত রীতি-নীতির বিরোধী কিন্তু উন্নততরা রীতিনীতির ধারক হয় তবে তাহাকে সমালোচনা দণ্ডে ধূলিসাৎ না করিয়া দিয়া সমাজেরই উন্নীত হইয়া ওঠা কর্তব্য।' প্রকাশকের স্পর্ধিত উক্তির (অর্থ বুঝতে হয়তো একটু কষ্ট হবে) কিছুমাত্র সমর্থনও বইটিতে পেলে নিঃসন্দেহে খুশি হবার কারণ হতো। অযথা এবং অক্ষম উপমা-রূপকে ভারাক্রান্ত ভাষা। কৃত্রিম পরিবেশে দুর্বল গল্প। এই হলো অভিষেক। প্রচ্ছদপটও শিশুসুলভ মনোবৃত্তির পরিচায়ক। (২৫৭।৫২)

কবিতা

ফুল বাগিচা—কবিতার বই। আব্দুল জব্বার প্রণীত। সালাম ব্রাদার্স কর্তৃক পোঃ নাকোল, যশোহর, পূর্ব পাকিস্থান হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২॥০ টাকা।

সাহিত্য ক্ষেত্রে লেখক নূতন। তাঁহার রচিত কবিতাগুলি পড়িয়া আমরা প্রীতি লাভ করিয়াছি। লেখক মরমী। সহজ এবং সরল ভাষায় মনের গোপন ভাবটি ব্যক্ত করিবার কৃতিত্ব তাঁহার বেশ আছে। এই দিক হইতে তাঁহার রচনা-রীতিতে কবি-অনুভূতি এবং মৌলিক মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার সুর মৃদু এবং মধুর। অনুভূতির গতি শাণিত উদ্দীপনার ধারা তেমন ছড়ায় না। কবির রচনা সত্য-সংবেদনে মনের মূলকে গভীরভাবে স্পর্শ করিয়া ব্যাপ্তি ভাবনা জাগায়। মানুষের মনের গূঢ় এবং গভীর রহস্য দুই একটি ছোটখাটো কথার ভিতর দিয়া ফুটাইয়া তুলিবার কৌশল কবিতাগুলিতে আছে; এজন্য সেগুলির রস উপলব্ধি করিতে গিয়া ভাষার পাকে কিংবা বুদ্ধির বিভ্রমে পড়িতে হয় না। কবিতাগুলি সহজভাবেই সরস এবং কোন কোনটি তাজা ফুলের মতই স্নিগ্ধ, সজীব এবং সুন্দর। সাধনার পথে অগ্রসর হইলে নবীন কবি সমধিক সাফল্য অর্জন করিতে সমর্থ হইবেন বলিয়া আমরা মনে করি।

কটাক্ষ: কুমারেশ ঘোষ, গ্রন্থগৃহ, ৪৫এ, গড়পাড় রোড, কলিকাতা—৯, দু টাকা।

বাঙলা সাহিত্যের বিদ্রূপাত্মক রচনার ভূমিতে আরেকজন লেখকের আবির্ভাব হল, এ সংবাদ নিশ্চয়ই সুখকর। এই লেখকটির নাম কুমারেশ ঘোষ। 'কটাক্ষ' সম্ভবত তাঁর প্রথম ছড়ার বই।

বিদ্রূপের পেছনে সচরাচর একটি উদ্দেশ্য থাকে। প্রচলিত ব্যবস্থা, তা সে রাজনীতিকই হোক কি অর্থনীতিকই হোক কি সামাজিকই হোক, লেখকের মনঃপূত না হলে তার বিরুদ্ধে তাঁর কলম খাড়া হয়ে ওঠে। উদ্দেশ্যমূলক রচনাতে কাব্য গুণ ফোটানো তাই বড় শক্ত। যে লেখক উদ্দেশ্যকে যত প্রচ্ছন্ন রেখে কলম দাগতে পারেন, তিনি তত সার্থক।

কুমারেশবাবু দুঃখের বিষয় স (সার্থক হতে পারেননি। তাঁর রচনায় ধার আছে, তাঁর কলমে জোর আছে। তবুও তাঁর রচনার অনেকগুলিই শুধু 'খোঁচা মারার' এলাকাতেই আবদ্ধ হয়ে থাকল, রসের ঠিকানায় পৌঁছতে পারল না। তার কারণ বোধ হয় তার উদ্দেশ্যের অতিশয় স্পষ্টতা।

তবু একথা বলতে বাধা নেই যে, তাঁর রচনাগুলি (নিতান্ত কয়েকটি গ্রাম্য ধরণের রসিকতা ছাড়া) উপভোগ্য।

ব্যঙ্গচিত্রগুলি এঁকেছেন রামকৃষ্ণ রায়। রঘুনাথ গোস্বামীর প্রচ্ছদপটটি খুবই সুন্দর হয়েছে। বইখানি উপহার দেবার মতো।

৩০১।৫২

প্রাচীন সাহিত্য

মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ—অরবিন্দ পোদ্দার, এম, এ, ডি ফিল প্রণীত। ইণ্ডিয়ানা লিমিটেড, ২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৬।।০ টাকা।

ডক্টর অরবিন্দ পোদ্দার প্রণীত আলোচ্য পুস্তকখানা পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। বৌদ্ধ সহজিয়া সিদ্ধাচার্যগণের সাধনার ভাব-সম্পদসঞ্জাত চর্যা গীতিমালার যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীচৈতন্যোত্তর সহজিয়া বৈষ্ণবসাহিত্য সম্বন্ধে পুস্তকখানিতে আলোচনা করা হইয়াছে। গ্রন্থকার এই যুগকে মধ্যযুগ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং মধ্যযুগের এই বাংলা সাহিত্যে মানব-ধর্ম অর্থাৎ মানুষের সুখদুঃখ এবং দ্বন্দ্ব-সংঘাত বিজড়িত বাস্তব জীবনের মাহাত্ম্য কিরূপভাবে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে, তাহার কারণ বিশ্লেষণ করাই পুস্তকখানার প্রতিপাদ্য বিষয়। এই বিচার-বিশ্লেষণে গ্রন্থকার তৎকালীন সামাজিক প্রতিবেশের উপরই বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তাঁহার প্রধান বক্তব্য এই যে, সামাজিক প্রতিবেশ এবং তৎসংশ্লিষ্ট অর্থনীতিক অবস্থা হইতে উদ্ভূত বঞ্চনা এবং অভাববোধের চাপে পড়িয়াই এই যুগের সাহিত্য সাধনার ভিতর দিয়া মানব-ধর্মের মাহাত্ম্যের ভাবটি বিবর্তিত হইয়া উঠে। বস্তুতঃ সে যুগের সাহিত্য পার্থিব জীবনের অভাব ভাবরাজ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া পূরণ করিতে চাহিয়াছে। বাংলায় সামাজিক প্রতিবেশের অভাববোধের এমন চাপ কোথা হইতে আসিয়া পড়িল, তৎসম্বন্ধে গ্রন্থকারের অভিমত এই যে, বাংলা দেশের আর্যপূর্ব সংস্কৃতি এবং সমাজ-বোধের সহিত আর্য সংস্কৃতি, বিশেষভাবে সংস্কার-সর্বস্ব ব্রাহ্মণ্য-সাধনার সংঘাতই ইহার কারণ। বাংলার প্রাচীন সংস্কৃতি অনার্য-প্রধান, এই সংস্কৃতির উপর ব্রাহ্মণ্য প্রভাব আসিয়া পড়ে এবং বাংলার অনার্য সংস্কৃতির সেই পরকীয় প্রভাবের আড়ষ্টকর অবস্থা অতিক্রম করিবার চেষ্টা পায়। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি প্রধানতঃ প্রজ্ঞাধর্মী; পক্ষান্তরে অনার্য সংস্কৃতি প্রাণধর্মী। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির উপর অনার্য সংস্কৃতি যতখানি প্রাধান্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে, তৎকালীন সাহিত্যে মানবধর্ম ততটাই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ সাংসারিক দুঃখকে অতিক্রম করিতে চাহিয়াছেন। ভোগের বা সুখাস্বাদনের কামনা তাঁহাদের সাধনার ভিতর দিয়া প্রকাশ না পাওয়ায় সে সাহিত্যে সাংসারিক বা কাম্যজীবনে মানুষের মহিমাকে তেমন প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু পরবর্তী মঙ্গল কাব্যসমূহ অন্তরের সম্পদে একান্তই লৌকিক, মানবিক। বৈষ্ণব জাতিকারদের সাধনা এদিকে অধিকতর অগ্রসর হইয়াছে মানুষের পৃথিবীই এখানে আধ্যাত্মিক জগতের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে। বৈষ্ণব নীতিকারদের বৃন্দাবন এই পৃথিবীর ধূলি দিয়াই গড়া। ব্রাহ্মণ্য সাধনা পৃথিবীকে পরিত্যাগ করিতে চাহিয়াছে, বৈষ্ণবেরা পৃথিবীকে বুকে গ্রহণ করিয়াছেন। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বৈষ্ণব-সাধনায় এই মানবধর্মের আদর্শ পূর্ণতা লাভ করে।

গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকের সাহিত্যেই এই আবির্ভাবের আভাব অভিব্যক্ত হইয়াছিল মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ে। গ্রন্থকারের মতে বড়ু চণ্ডীদাস এবং বিদ্যাপতিও এমনভাবেই এই বিরাট পুরুষের আবির্ভাবের আগমনী গান গাহিয়াছিলেন। গ্রন্থকার বলেন, বৈষ্ণব সাহিত্যিকগণ অশ্রদ্ধেয় পরিণতি হইতে মানুষকে রক্ষা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। তাঁহারা মানুষকে সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে সচেষ্ট হন। চৈতন্যের প্রভাবে অবাস্তব কাহিনীর প্রাচীর ভাঙিতে আরম্ভ করে। অতি-প্রাকৃত শক্তির বন্ধন হইতে সাহিত্য ধীরে ধীরে মুক্তিলাভ করিতে থাকে। বৈষ্ণব ভাবধারা মানবিক পর্যায়ে ভগবানকে নামাইয়া আনিয়াছে।

বাঙলা দেশের সাংস্কৃতিতে আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির সংঘাত এবং সংমিশ্রণ যুক্তি অবশ্য নূতন নয়। একথা পূর্বেও আমরা শুনিয়াছি। বাঙলার কয়েকজন মনীষী সন্তান এ তত্ত্বের বিচার এবং বিশ্লেষণও করিয়াছেন। বিনয়কুমার সরকারের কথা এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবেই উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু গ্রন্থকারের বিচারের দৃষ্টিভঙ্গীতে একটু স্বাতন্ত্র্য আছে। তিনি মানুষের সর্বজনীন আকুতির উপর জোর না দিয়া প্রতিবেশজনিত সাময়িক বিশেষ প্রভাবের পরিচয়ই বাঙলার মধ্য যুগীয় সাহিত্যের মর্ম বাণীর মধ্যে পাইয়াছেন। তাঁহার মতে মধ্যযুগীয় বাঙলার সংস্কৃতির এই মানবধর্ম সমগ্রভাবে সমাজ-জীবনকে নাড়া দিবার মত পর্যাপ্ত প্রাণশক্তি লাভ করিতে পারে নাই, অর্থাৎ বৈপ্লবিক আকার ধরিয়া নিজকে বলিষ্ঠভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হয় নাই। তৎকালীন বাঙলার সমাজ-চেতনা জীবনকে রূপায়িত করিয়াছে সত্য; কিন্তু ভবিষ্যৎ বাঙলার ভাগ্য নির্ধারণে তাহার মূল্য কতখানি এ সম্বন্ধে গ্রন্থকার সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে অবশ্য মতভেদ আছে। প্রকৃতপক্ষে প্রাণহীন আচারনিষ্ঠা এবং অনুদার সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বাঙলার সংস্কৃতিতে বিদ্রোহের একটা ভাব আগাগোড়াই কাজ করিয়াছে, দেখা যায়। মানবধর্মের স্বীকৃতি বাঙলার সাধনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাহার শক্তি এখনও সজীব সক্রিয় এবং বৈপ্লবিকও কম নয়। সব ইতিহাসে পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ বাঙলার ভবিষ্যৎকেও যে সেই বিদ্রোহের ভাব অনেকখানি গঠনও করিয়া চলিয়াছে, একথাও অস্বীকার করা যায়

(শেষাংশ ২৫৩ পৃঃ ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

ইসলামী সংস্কৃতি সম্মেলন

আয়ুর্বেদ চিকিৎসা পদ্ধতির পুনরুজ্জীবন

রাষ্ট্রীয় সহায়তার জন্য শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষের আবেদন

সম্প্রতি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্থানের চিন্তা-জগৎ ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের নায়কগণ ঢাকায় ইসলামী সংস্কৃতি সম্মেলনের তিন দিবসব্যাপী অধিবেশনে সমবেত হইয়া জাতীয় জীবনের পুনর্গঠন ও ক্রমোন্নতির সহিত জড়িত নানা সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

সাধনা ঔষধালয়ের অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ এই সম্মেলনে আমন্ত্রিত হইয়া আয়ুর্বেদ চিকিৎসা-শাস্ত্রের উত্থান-পতন-বন্ধুর ইতিহাসের এক মনোজ্ঞ বিবরণ দেন। বিশ্বে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান আয়ুর্বেদ কিভাবে একদা তৎকালে পরিচিত সমগ্র জগতের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল এবং প্রাচীন অথবা আধুনিক অপর সমস্ত প্রকার চিকিৎসা বিদ্যার পোষকতা করিয়াছিল, সে সম্বন্ধে তিনি বিশদ আলোচনা করেন।

ডাঃ ঘোষ এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, পীড়িত মানবতার কল্যাণ সাধনের জন্য আয়ুর্বেদের মধ্যে এখনও বিপুল ক্ষমতা নিহিত রহিয়াছে। আয়ুর্বেদ চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পুনরুজ্জীবনকল্পে ডাঃ ঘোষ রাষ্ট্রীয় সহায়তা ও উৎসাহ দানের জন্য আবেদন জানান।

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ

নিম্নে ডাঃ ঘোষের বক্তৃতার পূর্ণ বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

আয়ুর্বেদ ও ইউনানী উভয় চিকিৎসা-পদ্ধতিরই ইতিহাস যে অতি প্রাচীন, আপনারা সকলেই সম্ভবতঃ তাহা অবগত আছেন। কয়েক শতাব্দী পূর্বেও এই চিকিৎসা-পদ্ধতি দুইটি শুধু আমাদের এই ভারত-পাক উপমহাদেশেই নহে, সমগ্র প্রাচ্যখণ্ডেই প্রচলিত ছিল। কিন্তু সেদিন আর নাই। সুতরাং আজ আমরা আনন্দ ও বেদনা মিশ্রিত চিত্তে অতীত ইতিহাসের কিছুটা পরিচয় নিতে চেষ্টা করিব।

আপনারা জানেন, ——চিকিৎসা পদ্ধতি দুইটির মধ্যে আয়ুর্বেদ অনেক বেশী প্রাচীন এবং প্রধানতঃ অথর্ব বেদ হইতে ইহার উৎপত্তি বলিয়া দাবী করা হয়। আয়ুর্বেদ তখন আটটি সুস্পষ্ট শাখায় বিভক্ত ছিল। শাখাগুলি হইতেছে—(১) শল্য, (২) চক্ষু-কর্ণ-কণ্ঠ পীড়া, (৩) চিকিৎসা, (৪) মনোরোগ, (৫) বালরোগ, (৬) বিষতত্ত্ব, (৭) স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ-জীবন লাভের প্রক্রিয়া এবং (৮) বাজীকরণ। এই জ্ঞান-ভাণ্ডারে সমৃদ্ধ হইয়া তৎকালীন ভারত এশিয়া এবং ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের সমস্ত জাতির সহিত ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপন করিয়াছিল এবং ইহার ফলে সেই সকল দেশের মনীষী ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা আয়ুর্বিজ্ঞান শিক্ষা করিবার জন্য ভারতে আসিতেন। গ্রীসের ডাঃ গালেন যথার্থই বলিয়াছেন যে, গ্রীকগণ হিন্দুগণের চিকিৎসা বিজ্ঞান হইতে প্রচুর জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া নিজেদের ভেষজ-ভাণ্ডারকে পরিপুষ্ট করিয়াছিল। ডাঃ গালেনের মতে পারাসেলসাস, হিপোক্রেটাস পিথাগোরাস প্রভৃতি গ্রীক মনীষিগণ প্রাচ্যদেশ পরিভ্রমণ করিয়া ভারতের বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও ভেষজশাস্ত্র স্বদেশে প্রচলনের সহায়তা করিয়াছিলেন। গ্রীক দার্শনিকগণ মিশরীয় মনীষিগণের নিকট হইতেও সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন এবং ডাঃ ওয়াইজ অনুমান করেন যে, মিশরীয়গণ প্রাচ্যের কোন রহস্যময় জাতির নিকট হইতে বহুলাংশে এই বিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন। গ্রীকদের মত রোমানরাও ভারতীয় ভেষজ-বিজ্ঞানীদের সংস্পর্শে আসিয়া নিজেদের চিকিৎসা-পদ্ধতির বহুল উন্নতি সাধন করে।

আয়ুর্বেদীয় ঔষধের বহির্বাণিজ্য

বহু শতাব্দী পূর্বে ভারত ও রোমের মধ্যে যে আয়ুর্বেদীয় ঔষধের বাণিজ্য প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ আছে। প্লিনির সময়ে এই ঔষধ ব্যবসায় এত বিরাট আকার ধারণ করে যে, ভারতের মহার্ঘ ঔষধ ও মসলা ক্রয় করিতে রোমের বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ ভারতে চলিয়া যাইতেছে বলিয়া তিনি প্রকাশ্যে অভিযোগ করিয়াছিলেন।

আমাদের আয়ুর্বেদ চিকিৎসা-পদ্ধতির মহিমার এইগুলিই যথেষ্ট প্রমাণ। রোগ নিরাময়ের যে অমোঘ শক্তি আয়ুর্বেদে নিহিত রহিয়াছে, এই সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়।

আরব দেশে আয়ুর্বেদের প্রভাব

মিশর, গ্রীস ও রোমের মত আরব দেশও অবাধে আয়ুর্বেদ হইতে গ্রহণ করিয়া নিজস্ব চিকিৎসা-পদ্ধতিকে সমৃদ্ধ করিয়াছিল। আরবের খ্যাতনামা চিকিৎসক আল্ রাজী সমগ্র চরক ও সুশ্রুত সংহিতা আরবীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। এবং তিনিই দক্ষিণ ইউরোপের দেশগুলিতে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র প্রচারের নিমিত্তস্বরূপ হন। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, তৎকালীন লাতিন পণ্ডিতগণ চরক ও সুশ্রুতের এই আরবীয় অনুবাদ হইতেই নিজ নিজ দেশের ভাষায় ঐ গ্রন্থদ্বয়ের অনুবাদ করেন।

আরবের প্রসঙ্গে পয়গম্বর হজরত মহম্মদের কথা অবশ্যই বলিতে হইবে। তিনি শুধু এক নূতন ধর্মের প্রবর্তক নহেন, তিনি এক-ঈশ্বরের নামে আরবীয় জাতির সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করিয়া তোলেন। এই নব বলে বলীয়ান হইয়াই আরব জাতির পক্ষে জ্ঞানের বর্তিকা হস্তে এক বিরাট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়।

আরবের খ্যাতনামা রসায়নবিদ ও চিকিৎসকদের মধ্যে নেবার, সিরাপিয়ান, অভিসেন এবং রাসেম বুবাকরের মত ব্যক্তিদের নাম বাস্তবিকই অবিস্মরণীয়। তাঁহারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রকৃতই অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন এবং মুসলমানদের ভারত বিজয়ের পর তাঁহাদের জ্ঞান ও বৈশিষ্ট্য চিকিৎসা-পদ্ধতি এই উপ-মহাদেশে প্রসার লাভ করে।

আয়ুর্বেদ চিকিৎসা-পদ্ধতির অবনতির বহু কারণ রহিয়াছে, তন্মধ্যে আমি মাত্র দুইটি কারণের উল্লেখ করিতেছি।

মুসলমানগণের ভারত আক্রমণের বহু পূর্বেই আয়ুর্বেদের উন্নতি আপনা-আপনিই বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। প্রকৃত গবেষণা বা

নূতন আবিষ্কার কার্যে আত্মনিয়োগ করিবার লোকের অভাব ঘটিয়াছিল। পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত জ্ঞানও লোকে বিস্মৃত হইতে লাগিল। আয়ুর্বেদের প্রামাণ্য গ্রন্থাদিও দুষ্প্রাপ্য হইতে লাগিল। কালক্রমে অর্ধ শিক্ষিত পুরোহিতগণ এই সমস্ত রোগাপহারক ঔষধপত্রের জ্ঞানের একমাত্র জিম্মাদারে পরিণত হইলেন এবং তাঁহারা এই সমস্ত দুষ্প্রাপ্য পুস্তকে বর্ণিত মতে প্রকৃত ঔষধপত্রের চাইতে তথাকথিত মন্ত্রতন্ত্রের উপর অধিক নির্ভর করিতেন। ইহা ছাড়া, তাঁহারা মৃতদেহ স্পর্শ করা পাপ বলিয়া মনে করিতেন; কাজেই শব-ব্যবচ্ছেদ পরিত্যক্ত হওয়ায় শারীর সংস্থান বিদ্যা ও শল্য বিদ্যায় উন্নতি স্বভাবতঃই ব্যাহত হইতে থাকে।

কিন্তু আরবীয় অর্থাৎ ইউনানী পদ্ধতি তৎকালে সরকার স্বীকৃত চিকিৎসা-পদ্ধতি হিসাবে গণ্য হইলেও ইউনানী চিকিৎসকগণ পুরোপুরিভাবে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা-পদ্ধতি কখনও ত্যাগ করেন নাই। আয়ুর্বেদ চিকিৎসা-পদ্ধতি তখন রাজ দরবারে সরকারীভাবে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী হইলেও ইহার প্রাধান্য কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই। প্রাচীন আয়ুর্বেদীয় পদ্ধতি ও ইউনানী পদ্ধতির মধ্যে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া বিশেষতঃ অবিভক্ত ভারতবর্ষে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল বলিয়া উভয়ের মধ্যে প্রচুর আদান-প্রদান ঘটে এবং একে অন্যের ভেষজ গ্রহণ করে। ইহার ফল হইল এই যে, মুসলমান সাম্রাজ্যের পতনের পর উভয় পদ্ধতিরই অবনতি ঘটিলেও উভয় পদ্ধতির সংমিশ্রণে একটি সুসমৃদ্ধ ভেষজতত্ত্ব গড়িয়া উঠে।

ত্রুটি-বিচ্যুতি

দেশীয় ভেষজাবলী সম্বন্ধে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, আয়ুর্বেদীয় এবং ইউনানী চিকিৎসা-পদ্ধতি তখন অবনতির মুখেই ছিল। কাজেই ইহাদের তথাকথিত অবলুপ্তির জন্য আমাদের তদানীন্তন ব্রিটিশ শাসকদের প্রত্যক্ষভাবে দায়ী করা যায় না। তাঁহারা শুধু পাশ্চাত্য চিকিৎসা-পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। এই পদ্ধতি দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রসার লাভ করে এবং চিকিৎসাদি ব্যাপারে যথোপযুক্ত ও আধুনিক অন্য কোন ব্যবস্থা না থাকার ফলেই পাশ্চাত্যের এই চিকিৎসা-পদ্ধতি জনসাধারণ কর্তৃক এত সমাদৃত হইয়াছিল।

পাশ্চাত্য চিকিৎসা-পদ্ধতির নিন্দা করিবার মত কোন অভিমত আমরা অবশ্যই পোষণ করি না। বরং যে চিকিৎসা-পদ্ধতি এত উন্নত এবং যাহা এত অধিক লোকের এতখানি উপকার করিতেছে, তাহার জন্য আমরা আনন্দিতই বটে।

কিন্তু উপরোক্ত চিকিৎসা-পদ্ধতির বিজ্ঞানসম্মত উন্নয়ন সত্ত্বেও বলা চলে যে, বিবিধ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের রোগ নিরাময়ে এই চিকিৎসা-পদ্ধতি আজও সর্বদাই ফলপ্রদ হয় না। এই চিকিৎসা পদ্ধতিতে যেখানে ফল পাওয়া যায় না, আয়ুর্বেদীয় ও ইউনানী-পদ্ধতি মতে দেশীয় ঔষধ ব্যবহারে সেই সব ক্ষেত্রে হাজার হাজার পীড়িত ব্যক্তির রোগ অত্যাশ্চর্যরূপে সারিতে দেখা গিয়াছে। হইতে পারে, ইহা আয়ুর্বেদ ও ইউনানীর অতীত গৌরবেরই অন্যতম নিদর্শন। কিন্তু আমাদের সমূহ অবহেলা ও বিদেশী সরকারের ঔদাসীন্য হেতু পুরাতন চিকিৎসা-পদ্ধতির বিস্মৃতপ্রায় বিগত গরিমাই ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয়।

একথা সত্য যে, আয়ুর্বেদ ও ইউনানী চিকিৎসকগণ আজকাল আর ধাত্রীবিদ্যা, স্ত্রীরোগ চিকিৎসা, উন্নত ধরণের অস্ত্রোপচার বিদ্যা এবং কতিপয় বিশেষ কঠিন রোগের চিকিৎসা আয়ত্ত করেন না। আরও বলা যায় যে, যে চিকিৎসা পদ্ধতি মৌলিক ধারণা ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে স্থিতিশীল এবং যে পদ্ধতি পৃথিবীর সর্বত্র বৈজ্ঞানিক কর্মীদের গবেষণা ও আবিষ্কারের সহিত তাল রাখিয়া চলে না, তদ্দ্বারা চিকিৎসা প্রত্যাশী কেহই যথোপযুক্ত সাহায্য পাইতে পারে না।

অবস্থার উন্নতির উপায়

ভোর কমিটির রিপোর্টে বর্ণিত ত্রুটিগুলি আমরা নিশ্চয়ই স্বীকার করি। তবে এই সব ত্রুটি দূর করিতে এবং আধুনিক আবিষ্কার ও উন্নত বিজ্ঞানের সাহায্যে আমাদের দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতিকে আধুনিকীকরণের জন্য আমাদিগকে অবশ্যই চেষ্টা করিতে হইবে। একমাত্র ইহাই আয়ুর্বেদীয় ও ইউনানী চিকিৎসা-পদ্ধতিকে আমাদের আকাঙ্ক্ষিত স্থানে লইয়া যাইতে পারে। তবেই উহা বর্তমান পাশ্চাত্য চিকিৎসা-পদ্ধতির সমকক্ষ হইতে পারিবে এবং দেশে সমভাবে প্রচলিত হইয়া ধনী-দরিদ্রনির্বিশেষে হাজার হাজার রোগীর রোগারোগ্য করিতে পারিবে।

কিন্তু এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে অর্থ ও সরকারী সহায়তা অত্যাবশ্যক। ব্রিটিশ শাসনাধীনে বিগত ৫০ বৎসরকাল আয়ুর্বেদীয় ও ইউনানী চিকিৎসা পদ্ধতির অনুরাগিগণ এইগুলির প্রতি সরকারী অনুমোদন লাভের চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন এবং সবিশেষ প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও তাঁহারা তাঁহাদের সাধু প্রচেষ্টা দ্বারা কিছুটা সাফল্যও লাভ করিয়াছিলেন। ব্রিটিশ শাসনাধীনে দেশব্যাপী জাতীয় জাগরণের একটি সুমহান অধ্যায়ের উহা ছিল শ্রেষ্ঠ একটি সূচনা। কাজেই সেই সময় বাধাও ছিল বহু। কিন্তু আজ সমস্ত বাধাই অপসারিত হইয়াছে। জনসাধারণের ইচ্ছা পরিপূরণে দেশে আজ জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—এখন আমরা স্বাধীন। আয়ুর্বেদীয় ও ইউনানী মতের চিকিৎসা-পদ্ধতিকে উহাদের গৌরব-শিখরে প্রতিষ্ঠা দিয়া সমুন্নত করিতে অত্যাবশ্যক সরকারী সাহায্য আজ নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে। তবুও এতৎসম্পর্কে বিজ্ঞজনোচিত ব্যবস্থাবলম্বনে যাহাতে অযথা বিলম্ব না হয়, তন্নিমিত্ত আমাদের জাতীয় সরকারকে উদ্বুদ্ধ করিতে আমরা সর্বদাই চেষ্টা করিব। একদা যা নাকি বহু সম্ভাবনা লইয়া প্রাচ্যের গৌরব ছিল, তা আবারও গৌরবোজ্জ্বল হইয়া উঠুক। আয়ুর্বেদীয় ও ইউনানী মতের চিকিৎসা পদ্ধতি আরও গৌরব ও যশোগাথা লইয়া কেবল আমাদের দেশেই নয়, সমগ্র প্রাচ্যে আবার স্বীয় আসন গ্রহণ করুক।

(২৫১ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

না। কিন্তু সে বিচার এক্ষেত্রে অনেকটা অবান্তর। প্রত্যুত মধ্যযুগীয় বঙ্গ সাহিত্যের গতি এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে ডক্টর পোদ্দারের এই আলোচনা বেশ মনস্বিতাপূর্ণ। এই আলোচনা বাঙলার চিন্তাশীল সমাজের অনেকখানি খোরাক যোগাইবে। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া সকলেই উপকৃত হইবেন। ৩৩০।৫২

ধর্মপুস্তক

ধর্ম ও তাহার স্বরূপ—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সিদ্ধান্ত-বিশারদ প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী, ১৪নং বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

গ্রন্থকার জগতের বিভিন্ন ধর্মমতের আলোচনা করিয়া ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, বৈদিক ধর্মই সনাতন ধর্ম এবং সেই ধর্ম হইতেই অন্যান্য সাম্প্রদায়িক ধর্মের উদ্ভব হইয়াছে। তিনি বলেন, পার্শি ধর্ম বৈদিক ধর্ম হইতে উদ্ভূত। ইহুদী ধর্ম আবার পার্শি ধর্ম হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। খৃষ্টান ও ইসলাম ধর্মের মূল নীতি ইহুদী ধর্ম হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। তাঁহার যুক্তি প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তিনি সৃষ্টিতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতির অবতারণা করিয়াছেন এবং বহু পাশ্চাত্য মনীষীর অভিমত উদ্ধৃত করিয়াছেন। বিভিন্ন ধর্মের সম্বন্ধে গ্রন্থকার যে সব মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সব যুক্তির সমর্থন করা না গেলেও পুস্তকখানিতে বৈদিক ধর্মের সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা জানা যায় এবং ভারতের প্রাচীন গৌরবের প্রতি মর্যাদা-বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়। ৩৩৩।৫২

প্রাপ্তি-স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি দেশ পত্রিকায় সমালোচনার্থ আসিয়াছে। পরে সমালোচনা বাহির হইলে তাহা যথাসময়ে প্রকাশক অথবা গ্রন্থকারের নিকট প্রেরিত হইবে।

মস্কো থেকে চীন—গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—২৸০। ৩৪৪।৫২

খেলা ও হাসি—পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য—১।০। ৩৪৫।৫২

খেয়াল খুসী—পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য—১।০। ৩৪৬।৫২

গৌরী গ্রাম—রমেশচন্দ্র সেন, মিত্র ও ঘোষ। ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—৫৲। ৩৪৭।৫২

আজব দেশে এলিস—তারাপদ রাহা। জ্ঞান সঞ্চয়ন, ১৫ গড়িয়াহাট রোড, বালিগঞ্জ, কলিকাতা। মূল্য—২৲। ৩৪৮।৫২

মাটির পুতুল—দেবব্রত পাল। বিমলপ্রকাশ বসু কর্তৃক সাহিত্য সঙ্ঘ, ঝাড়গ্রাম হইতে প্রকাশিত। মূল্য—১৲। ৩৪৯।৫২

রঙ্গজগৎ

আঁধি (এম পি প্রডাকসন্স—ন্যাশনাল সাউণ্ড ষ্টুডিও)—কাহিনী : সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়; গীতিকার : শৈলেন রায়, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : অগ্রদূত; আলোকচিত্র : বিজয় ঘোষ; শব্দযোজনা : জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়; সুরযোজনা : দুর্গা সেন; শিল্পনির্দেশ : সত্যেন রায় চৌধুরী। ভূমিকায় : রাধামোহন, বিভু, আদিত্য ঘোষ, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, রাজকুমার মিত্র, দীপ্তি রায়, প্রভা দেবী, আশা দেবী, নিভাননী, সন্ধ্যা মঞ্জুলা প্রভৃতি। ডি লাক্স ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্সের পরিবেশনায় ১৪ই নভেম্বর উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলায় মুক্তিলাভ করেছে।

"বাবলা" ছবিখানি আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করায় এম পি প্রডাকসন্স যদি ওরই কাহিনীকার সৌরীন্দ্রমোহনের গল্প নিয়ে এবং ওরই পরিচালকগোষ্ঠী অগ্রদূতকে দিয়ে পরিচালনা করিয়ে আরও ছবি তোলায় ব্রতী হ'য়ে থাকেন, তাহলে খুবই যে উচিত কাজ করেছেন সে বিষয়ে কোন কথা উঠতেই পারে না। সেই সঙ্গে গল্পতে যদি একটা ছোট ছেলেকে ধরে দেওয়া যায় তাহলে আরেকখানা "বাবলা" হয়ে ওঠার ধারণাতে অসম্পূর্ণতা আর থাকে কি করে! "আঁধি" কিন্তু শেষ হয়ে "বাবলা" হতে তো পারলই না, এমন কি তুলনায় "বাবলা"র কাছাকাছিও আসবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারলো না। তার সোজাসুজি কারণ, "বাবলা"তে যা ছিলো, "বাবলা" যে জন্যে সম্মান ও সম্বর্ধনার পাত্র হয়েছিলো, "আঁধি"-তে তা নেই। প্রযোজক "বাবলা"-র সৃষ্টিকর্তা ব্যক্তি কজনকেই কাজের ভার দিলেন, কিন্তু যে বস্তু "বাবলা"কে অন্তরস্পর্শীতার মহিমায় মনোহর করে তুলেছিলো সেই বস্তুটিকেই সরবরাহ করতে অক্ষম হয়ে পড়লেন। অবশ্য সে কাজটা প্রযোজকের নয়—ছবিখানি তৈরী করার ভার যাদের ওপর ছিলো, ছবিকে প্রাণবন্ত ও আবেগময় করে তোলার দায়িত্ব তাদেরই ছিলো, এবং তাঁরা সে দায়িত্ব পালনে নিদারুণ ব্যর্থ হয়েছেন। বস্তুতঃ ব্যর্থতা এতোখানি চরম যে, এঁরাই "বাবলা"-র মতো ছবি তুলেছিলেন বলে বিশ্বাসই করা যায় না। "বাবলা"তে যে গুণগুলো ছিলো "আঁধি"তে সেই সমস্ত দিকগুলিই হয়েছে দুর্বল।

একটা নিরুদ্দীপ্ত কিলিয়ে-পাকানো গল্প, যার ঘটনাবলীকে যুক্তির জন্যে সবুর করতে দেওয়া হয়নি প্রায় গোড়া থেকেই—ঘটনা চরিত্রের প্রতিবাহন হবে, না চরিত্র হবে ঘটনার দ্বারস্থ, এই দ্বন্দ্ব মেটাতে মেটাতেই গল্পের শেষ হয়ে যায়। গল্পের আরম্ভই হয়েছে প্রকৃতিকে বিপরীত পথে চালিয়ে নিয়ে।

প্রথমেই দেখা যায়, বনেদী জমিদার অভয়শংকরকে মৃতা স্ত্রী লীলার জন্য উদাস ও উদ্বেলিত হয়ে থাকতে। লীলাকে যে অভয়শংকর প্রচণ্ডভাবে ভালোবাসতেন এবং তার অভাবে দুনিয়াটাই যে অভয়শংকরের কাছে একেবারে অসার ও নিরর্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে সেটা বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। এর পর উপস্থিত হচ্ছে লীলার ছেলে নিখিল। তার মা অন্যত্র গিয়েছে এই স্তোকবাক্যে অভয়শংকর নিখিলকে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন; নিখিল মার জন্যে বায়না করতে থাকে। অভয়শংকর লীলার স্মৃতিতে এতোই আত্মবিমনা যে, নিজের একমাত্র পুত্র নিখিলকে লীলার স্মারক বলে ধরে নিতে পারলেন না; বরং লীলার স্মৃতিকে ধরে রাখার পথে নিখিলকে প্রতিবন্ধকই মনে হলো তার; তাই নিখিলকে তার দিদিমার কাছে রেখে দিয়ে অভয়শংকর বেরিয়ে পড়লেন পথে পথে ঘুরে লীলার চিন্তায় আত্মনিহিত হয়ে থাকতে। দিদিমা নিখিলকে দেখাশুনো করার জন্য তার ভাইজী সুষমাকে আনালেন। সুষমাকে দেখতে অবিকল লীলার মতো; নিখিল তাকেই তার মা বলে মনে করলে। অন্যে সুষমা সন্তানমায়ায় নিখিলকে আঁকড়ে ধরলেন; নিখিলের কাছ থেকে সুষমাকে ক্ষণমাত্রও সরিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে উঠলো। অভয়শংকর দু' বছর পর ফিরে এসে নিখিলকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এলেন। সুষমার ওপরে নিখিলের টান দেখে দিদিমা চাইলেন অভয়শংকর সুষমাকে বিয়ে করে; সুষমারও নিখিলকে ছেড়ে থাকা সম্ভব নয় মনে হওয়ায় বিয়েতে সে অরাজী ছিলো না, কিন্তু অভয়শংকর লীলার জায়গায় আর কাউকে মনে ঠাঁই দিতে রাজী হবেন না। তবে যখন দেখা গেলো, সুষমা না হ'লে নিখিলকে রাখাই মুশকিল তখন নিখিলের সুখের জন্যেই অভয়শংকর সুষমাকে বিয়ে করে ঘরে আনলেন। প্রথম দিনেই সুষমা জানলো, অভয়শংকর নিখিলের আবদার মেটাতেই তাকে ঘরে এনেছে, পত্নীর সবরকম অধিকার দিতে রাজী নন। তবুও দৈনন্দিন ঘটনার মধ্যে দিয়ে অভয়শংকর ও সুষমার মাঝের ব্যবধান সরে যেতে লাগলো এবং সান্নিধ্য হঠাৎ নিবিড় হলো এক ঝড়ের দাপটে অভয়শংকরের জমিদারীতে। প্রত্যুষেই কিন্তু অভয়শংকর সুষমার বিছানা থেকে পালিয়ে এলো একেবারে কলকাতার বাড়ীতে। তারপরই তার উদ্ভট আচরণ—সহনশীল শান্ত প্রকৃতির মানুষটি হঠাৎ নির্মম দুর্বৃত্ত হয়ে উঠলো। সুষমার কাছ থেকে নিখিলকে আলাদা করে দিলেন; এমন কি, সুষমাকে চলে যেতেও বলে দিলেন সকল সম্পর্ক অস্বীকার করে। নির্মমতা একেবারে অমানুষিকতায় পরিণত হলো যখন নিখিল দারুণ অসুখে পড়ে বিকারের ঘোরে তার মা অর্থাৎ সুষমার কথাই অহরহ উচ্চারণ করা সত্ত্বেও সুষমাকে তার কাছে আসতে না দিয়ে। শেষে সুষমা এলেন, আর নিখিলও ভালো হয়ে উঠলো মাকে পেয়ে। অমনি অভয়শংকর সুষমাকে মর্মপীড়া দিতে আরম্ভ করলেন; সুষমার গর্ভে তখন অভয়শংকরের সন্তান। নিজের সন্তান জন্মালে পাছে নিখিল তার অনাদরে পড়ে যায় এই আশংকায় সুষমা চাইলেন সন্তানের যেন গর্ভেই মৃত্যু হয়ে যায়। বালক নিখিলের কেমন যেনো ধারণা হলো যে, সে না থাকলে তার বাবা তার 'মা'-কে আর বকাবকি করবেন না। নিখিল বেরিয়ে

হলিউডের কপালে টিপ—হলিউড পরিভ্রমণরত ভারতীয় মহিলা চিত্রতারকাদের কপালে আঁকা টিপের প্রতি অভিনেত্রী এ্যান শেরীডন আকৃষ্ট হন। নিজে টিপ পরে তিনি পার্টিতে যোগদান করেন এবং অন্যান্য মহিলাদেরও এই ভারতীয় রূপচর্যাটির প্রতি আকৃষ্ট করেন। এখানে দেখা যাচ্ছে, মাদ্রাজের অভিনেত্রী সূর্যকুমারীর কাছ থেকে এ্যান শেরীডন টিপ পরা শিখে নিচ্ছেন আর পাশে রয়েছেন শেরীডনের রূপসজ্জাকর।

পড়লো, আর হাওয়ায় এলো তুফান। নিখিলকে খ‍ুঁজতে ছ‍ুটে বেরিয়ে পড়লেন সুষমা; অভয়শংকর তাঁর পিছনে পিছনে। দুর্যোগকে ঠেলে আঁধির বুক থেকে সুষমা নিখিলকে উদ্ধার করলেন, অভয়শঙ্করের মন অবশেষে নিবদ্ধ হলো সুষমার ওপরে। জ্ঞানহারা সুষমাকে বাড়ীতে আনা হলো; একটি মৃত সন্তান প্রসব করলে সে। সুষমা পরম তৃপ্ত হলো এই খ‍ুসীতে যে, নিখিলের সঙ্গে আদরের ভাগ নিতে কেউ রইলো না। বলা বাহ‍ুল্য, অভয়শঙ্করও এইবার সুষমাকে স্বীকার করে নিলেন।

ঘটনার ঝাপটায় মান‍ুষের প্রকৃতি অবশ্যই বদলে যায়, কিন্তু সে পরিবর্তনের মধ্যে কোন সূত্রই থাকবে না, সেটা মানানসই হয় কি করে! এখানে অভয়শঙ্করকে তো সেইরকমই করে তোলা হয়েছে। নিখিলকেও কোন্ আবেদনের প্রবাহে লোকের আবেগে পৌঁছে দেওয়া হবে সে বিষয়েও কোন হদিশ ঠিক করে উঠতে পারেননি—না কাহিনীকার, আর না বিন্যাসকার। "বাবলা"-তে ছেলেটিই ছিলো আবেদনের একমাত্র লক্ষ্য; কিন্তু এখানে নিখিল উপলক্ষ্য মাত্র; কিন্তু ওকেই জোর করে প্রধান লক্ষ্য করে তুলতে গিয়ে আসল যেটা লক্ষ্য—অভয়শংকর ও সুষমার মানসিক দ্বন্দ্ব ও তার প্রতিক্রিয়া—তার ধারাবাহিকতাটাকেই নিষ্পিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। তাই না জমেছে নিখিলের কাহিনী, আর না অভয়শঙ্কর ও সুষমার বৃত্তান্ত। বিন্যাসে অবোধ মনের পরিচয় আগাগোড়া।

অভয়শঙ্করের ভূমিকায় রাধামোহনের অভিনয় দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়—চরিত্রচিত্রণে তার যে কোনরকম শিল্পানুভূতিই নেই তারই অতি রুক্ষ একটা চেহারা তিনি সামনে ধরে দিয়েছেন। অভিনয়ের দিক থেকে যা কিছু তৃপ্তি এনে দিয়েছেন দীপ্তি রায় সুষমার ভূমিকায়। বিবাহিতা হয়েও দাম্পত্যজীবন থেকে বঞ্চিতা, স্বামীর কাছ থেকে অহরহ নিপীড়ন, নিখিলের জন্য তার আকুলতা, তার অন্তর্দ্বন্দ্বের চেহারাটা বেশ আবেগময় করে অভিব্যক্ত করে তুলেছেন। বস্তুত দীপ্তি রায়ের অভিনয়ই ছবিখানি দেখবার জন্যে দর্শককে বসিয়ে রেখে দেয়। দিদিমার চরিত্রে প্রভা দেবীর ভূমিকাটি ছোট, তবুও তার দরদভরা অভিনয়ের ছাপটা মনোজ্ঞ করেই ফুটিয়ে গিয়েছেন। নিখিলের ভূমিকায় মাস্টার বিভু থাকার জন্যেই মনের ভাবালুতায় স্পন্দন জাগে; ওকে ভালো লাগবেই। বিশেষ করে ওকে দিয়েই ছোটখাটো আবেগময় ঘটনা কয়েকটি সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছে সেই দৃশ্যগুলিই ছবিখানির ওপর দর্শকের বিরক্তিকে সরিয়ে দিতে সক্ষম হয়।

রাধারাণীর কীর্তন নিয়ে খানতিনেক গান বেশ ভালো লাগবে। মোট গান পাঁচখানি। তবে ঐ কীর্তনখানি ছাড়া আর গানগুলির উপস্থাপন অপপ্রয়োগ মনে হবে। আবহ সংগীত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিরক্তিকর এবং ঝাঁঝালো। কলাকৌশলের অন্যান্য দিক অপ্রশংসনীয় নয়; শিল্পনির্দেশের কাজ ভালও লাগবে। শেষে আঁধির দৃশ্যটি সৃষ্টিতে সব বিভাগেরই বাহাদুরীর প্রমাণ পাওয়া যায়।

লিটল থিয়েটারের অভিনয়

এদেশের লোককে বিদেশী অর্থাৎ ইংরাজী নামকরা 'ক্ল্যাসিক' নাটকাবলীর রসগ্রহণে সহায়তা করার উদ্দেশ্য নিয়ে লিটল থিয়েটারের উৎপত্তি। আগেও এরা কয়েকখানি নামকরা বিলাতি নাটক অভিনয় করেছেন। সেগুলো দেখবার সৌভাগ্য

শ্রীমতী অমলাশঙ্কর—২১শে নভেম্বর থেকে নিউ এম্পায়ারে উদয়শঙ্করের পত্নী ও নৃত্যসঙ্গিনী দর্শকদের নতুন কয়েকটি নাচে অভিবাদন জানাবেন।

হয়নি, তবে শুনেছি এঁরা নাকি অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন সেগুলিতে। এঁদের সেই খ্যাতিই গত সোমবার সেণ্ট টমাস হলে বার্ণার্ড শ'র "আর্মস্ এণ্ড দি ম্যান" দেখতে বাধ্য করে তোলে, কিন্তু দেখবার পর দেশের উদ্দীপ্ত শিল্পোন্মুখতার নিদারুণ অপচয় দেখে মর্মাহত হতে হলো।

কাদের জন্যে এঁদের অভিনয়? অভিনয় করছেন এঁরা ইংরিজী নাটক এবং ইংরিজী ভাষাতেই। সুতরাং এঁদের অভিনয় দেখতে গেলে ইংরিজী জানা চাই। মোটামুটিভাবে জানা থাকলে চলবে না, বার্ণার্ড শ'র মনীষাকে হৃদয়ঙ্গম করার মতো পাণ্ডিত্য জ্ঞান থাকা দরকার। কাদের জন্যে তাহলে এই অভিনয়-বিলাস?

বিচিত্র উচ্চারণ করলেন সেদিন অভিনয়-শিল্পীরা। ইংরেজের ইংরিজীও নয়, আবার উচ্চারণে দিশী আড়ষ্টতাকেও ভাঙবার চেষ্টা—ফল যা দাঁড়ালো, তাতে আর কিছু না হোক, বার্নার্ড শ'র মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভেংচি কাটবার বেশ দুঃসাহস সেদিন এঁরা দেখিয়েছিলেন।

বার্নার্ড শ'র মনীষার গভীরে টোপ ফেলার যোগ্যতা বা অধিকার নেই বলে স্বীকার করে নিয়েও এ যোগ্যতাটা দাবী করতে পারা যায় যে, শ' "আর্মস্ এণ্ড দি ম্যান"-এর চরিত্রগুলিকে আর যা কিছুই কল্পনা করুন সব কজনকেই কিন্তু কিম্ভূত-কিমাকার বেতালা চরিত্র করে রেখে যাননি, সেদিনের অভিনয়ে যেমন দেখা গেলো।

অভিনয়প্রবণতার পরিচয় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত নয়—অন্ততঃ পরিচারিকা লুকা ও মেজর পেটকফের ভূমিকায় যথাক্রমে প্রেমাশীষ সেন ও ইরা সেনগুপ্তা তার প্রমাণ দিয়েছেন, কিন্তু সবচেয়ে যার ওপর লোকের আশা ছিলো সেই উৎপল দত্তই প্রধান ভূমিকায় এবং পরিচালক হিসাবেও বার্নার্ড শ'র সৃষ্টিকে ব্যঙ্গ করে গিয়েছেন। অভিনয়-শিল্পীদের মধ্যে অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন স্টেলা ব্রাউন, সোথিয়া ফাঙ্ক, আলি হাফিজ, আনন্দ দে ও প্রতাপ রায়। আলোকসম্পাতে ছিলেন তাপস সেন।

নিজেদের প্রচেষ্টায় গায়ে বিদেশী ক্ল্যাসিকের প্রলেপ মাখিয়ে এঁরা আত্মতৃপ্তির ঢাক পিটে চলেছেন। দেশের সংস্কৃতি ও চিন্তাধারার ধারও ধারেন না এঁরা, তবুও চাইছেন জনসাধারণকে তৃপ্তি দিতে।

ইন্দ্র দুগারের চিত্রপ্রদর্শনী

আগামী ২৬শে নভেম্বর রাজ্যপাল ডাক্তার হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় কুমার সিং হলে শ্রীনন্দলাল বসুর বিশিষ্ট শিষ্য ইন্দ্র দুগারের চিত্রাবলীর একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করবেন। প্রদর্শনীটি ১৪ই ডিসেম্বর পর্যন্ত বেলা ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত সর্বসাধারণের জন্যে খোলা থাকবে।

প্রদর্শনীর ছবিগুলি সম্পর্কে গুরু নন্দলাল বসু বলেছেন, "অধিকাংশ ছবিই আমি দেখেছি ও আমার ভালো লেগেছে। ছবিগুলির বিশেষত্ব হলো, ইহা প্রকৃতির হুবহু নকলও নয় আবার একেবারে মন-গড়াও নয়। ইহাতে আছে শিক্ষার অন্তরের আনন্দ, ভাব, রস ও ছন্দ যা শিল্পের প্রাণ। ছবির মৌলিকতা শিল্পে অকৃত্রিম অনুরাগ, গভীর নিষ্ঠা দর্শককে আনন্দ দিবে।"

খেলার মাঠে

ক্রিকেট —

ভারতীয় ক্রিকেট দল তৃতীয় টেস্ট ম্যাচে বোম্বাইর মাঠে পাকিস্থান দলকে ১০ উইকেটে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করায় ভারতের ক্রিকেট উৎসাহীগণের দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ভারতীয় দলের ইনিংস পরাজয়ের মর্মবেদনার কিছুটা উপশম হইয়াছে সত্য কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাধান্য এখনও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ভারতীয় ক্রিকেট দল উপর্য্যুপরি চতুর্থ ও পঞ্চম টেস্ট খেলায় ইহার পুনরাবৃত্তি করিলে তবেই জোর করিয়া বলা চলিবে যে পাকিস্থান ক্রিকেট দল সৌভাগ্যদেবীর অপ্রত্যাশিত করুণার জনাই ভারতীয় ক্রিকেট দলকে একবারমাত্র শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে বলা চলে যে ভারতীয় ক্রিকেট দল বিজয় হাজারে ও বিনু মানকড়ের সাহায্য ব্যতিরেকে কোন টেস্ট খেলাতেই পাকিস্থান দলকে পরাজিত করিতে পারিবে না ইহা প্রথম ও তৃতীয় টেস্টের ফলাফল হইতেই প্রমাণিত হইয়াছে। ইহারা দুইজনে প্রকৃতই উক্ত দুই টেস্ট খেলায় জয়লাভের জন্য বিশেষভাবে দায়ী। তবে ইহা ঠিক ভারতীয় ক্রিকেট দল তৃতীয় টেস্ট খেলায় পাকিস্থান দলকে শেষ পর্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিতে পারিয়াছে খুবই আনন্দের বিষয়। ভবিষ্যতের টেস্ট খেলাসমূহে অনুরূপ কৃতিত্ব ভারতীয় ক্রিকেট দল প্রদর্শন করুক ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

মানকড়ের অসাধারণ কৃতিত্ব

বিনু মানকড় এই টেস্ট খেলায় পৃথিবীর টেস্ট খেলার দ্রুত সহস্র রাণ ও শত উইকেট দখলের যে রেকর্ড ছিল তাহা ভঙ্গ করিয়া অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। মানকড় ২৩টী টেস্ট খেলায় সহস্রাধিক রাণ ও ১০০ উইকেট দখল করিয়াছেন। ইতিপূর্বে অষ্ট্রেলিয়ার চৌখস খেলোয়াড় নোবল ২৭টী টেস্ট খেলায় এইরূপ অসাধারণ নৈপুণ্যের গৌরব অর্জন করেন। ইহা ছাড়াও ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার আরও কয়েকজন আছেন যাঁহারা টেস্ট খেলায় সহস্রাধিক রাণ ও ১০০ উইকেট পতন সম্ভব করেন। মানকড় প্রথম টেস্ট খেলার ন্যায় এই খেলাতেও বোলিংয়ে সাফল্য অর্জন করিয়াছেন।

দুইজনের শতাধিক রাণ

ভারতীয় ক্রিকেট টেস্ট খেলায় দুইজন পাকিস্থান দলের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে শতাধিক রাণ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে একজন হইতেছেন বিজয় হাজারে ও অপর জন পলিউমরিগর। ইহাই ভারতীয় ক্রিকেট দলের পাকিস্থান দলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাধিক রাণ। ইতিপূর্বে পশ্চিমাঞ্চলের পি পাঞ্জাবী শতাধিক রাণ করেন। তবে হাজারে ও উমরিগারের শতাধিক রাণের বৈশিষ্ট্য আছে। কারণ ইহারা টেস্ট খেলায় পাকিস্থানের বিরুদ্ধে প্রথম ও দ্বিতীয় শতাধিক রাণ করিয়াছেন।

পাকিস্থান খেলোয়াড়গণের দৃঢ়তা

পাকিস্থান ক্রিকেট দলের খেলোয়াড়গণ এই খেলায় অসাধারণ দৃঢ়তা ও ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন। সারাদিন আক্রমণাত্মক দলের বিরুদ্ধে খেলিয়া দ্রুত উইকেট পতন পথ বন্ধ করিয়া সত্যই কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। শেষ পর্যন্ত পরাজয় বরণ করিলেও অবস্থা অনুযায়ী খেলিতে ইহারা যে অভ্যস্ত তাহার কিছুটা পরিচয় দিয়াছেন।

চতুর্থ ক্রিকেট টেস্ট দল

ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড় নির্বাচকমণ্ডলী প্রতি টেস্ট খেলায় নূতন নূতন খেলোয়াড়কে দলভুক্ত করার নীতি চতুর্থ টেস্ট দল গঠনের সময়েও অনুসরণ করিতে বিস্মৃত হন নাই। এই প্রথা অনুসরণে ফলাফল কি হইবে বলা কঠিন তবে ইহারা ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ভ্রমণের ভারতীয় দল গঠনের জনাই এইরূপ করিতেছেন। এইবারে যে সকল খেলোয়াড়দের লইয়া চতুর্থ ক্রিকেট টেস্ট দল গঠন করিয়াছেন তাহা শক্তিশালী দল সন্দেহ নাই তবে রাজেন্দ্রনাথের নির্বাচন ঠিক সমর্থন করিতে পারিলাম না। ইহার পরিবর্তে পি সেনকে দলভুক্ত করা উচিত ছিল। রাজেন্দ্রনাথ কিরূপ শ্রেণীর খেলোয়াড় তাহার পরিচয় তৃতীয় টেস্টেই পাওয়া গিয়াছে। ইহার পরও ইহাকে দলভুক্ত করা যুক্তিযুক্ত হয় নাই। নিম্নে চতুর্থ ক্রিকেট টেস্ট দলের মনোনীত খেলোয়াড়গণের নাম প্রদত্ত হইল:—

লালা অমরনাথ (অধিনায়ক) বিজয় হাজারে, বিনু মানকড়, ডি কি কাদকার, গোলাম আমেদ পি উমরিগার, সি ডি গোপীনাথ, রমেশ ডিভেচা, জি এস রামচাঁদ, রাজেন্দ্রনাথ, এস পি গুপ্তে, এম এল আপ্তে, ই এস মাকা, জি গাদকারী ও দীপক শোধন।

তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ

পাকিস্থান ক্রিকেট দল তৃতীয় টেস্ট খেলায় প্রথম ব্যাটিংয়ের সুযোগ লাভ করে। কিন্তু তাহা হইলেও পাকিস্থানের প্রথম ইনিংস ১৮৬ রাণে শেষ হয়। একমাত্র ওয়াকার হাসান ও ফজল মহম্মদ শেষ সময় দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিং করেন। অমরনাথ ও বিনু মানকড়ের মারাত্মক বোলিং এই দ্রুত পতন সম্ভব করে। পরে ভারতীয় দল খেলিয়া ৪ উইকেটে ৩৮৭ রাণ করিবার পর ডিক্লেয়ার্ড করেন। হাজারে ১৪৬ রাণ করিয়া নট আউট থাকেন। উমরিগারও শতাধিক রাণ করেন। পরে পাকিস্থান দল খেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংস ২৪২ রাণে শেষ করেন। তরুণ খেলোয়াড় হানিফ ৯৬ রাণ করিয়া অপূর্ব দৃঢ়তার পরিচয় দেন। ভারতীয় দলকে জয়লাভের জন্য পুনরায় ব্যাটিং করিতে হয় ও কেহ আউট না হইয়াই প্রয়োজনীয় রাণ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হন। ফলে পাকিস্থান দল ১০ উইকেটে পরাজিত হন।

খেলার ফলাফল:—

পাকিস্থান প্রথম ইনিংস:—১৮৬ রাণ (হাফিজ ২০, ওয়াকার হাসান ৮১, ফজল মামুদ ৩৩, অমরনাথ ৪০ রাণে ৪টী, বিনু মানকড় ৫২ রাণে ২টী, এস গুপ্তে ৪২ রাণে ২টী, উইকেট পান)

ভারত প্রথম ইনিংস:—৪ উইঃ ৩৮৭ রাণ ডিক্লেয়ার্ড (হাজারে ১৪৬ রাণ নট আউট, উমরিগার ১০২, মানকড় ৪১, এম, আপ্তে ৩০, মোদী ৩২, অধিকারী নট আউট ৩১, মামুদ হোসেন ১২১ রাণে ৩টী উইকেট পান।)

পাকিস্থান দ্বিতীয় ইনিংস:—২৪২ রাণ (হানিফ ৯৬, ওয়াকার হাসান ৬৫, ইম্তিয়াজ ২৮, মামুদ হোসেন ২১ রাণ নট আউট, মানকড় ৭২ রাণে ৫টী, এস গুপ্তে ৭৭ রাণে ৩টী, উইকেট পান।)

ভারত দ্বিতীয় ইনিংস:—কেহ আউট না হইয়া ৪৫ রাণ (মানকড় নট আউট ৩৫, এম আপ্তে নট আউট ১০ রাণ)।

ভারতীয় ক্রিকেট দলের পাকিস্থান ভ্রমণ

ভারতীয় ক্রিকেট দলের পাকিস্থান ভ্রমণ সম্পর্কে সম্প্রতি আলাপ-আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। এই আলোচনার সূচনা করিয়াছেন পাকিস্থানের ভারত ভ্রমণকারী দলের অধিনায়ক আব্দুল হাফিজ কারদার। তাঁহার মতে পাকিস্থানের জনসাধারণ একমাত্র অমরনাথ ব্যতীত কোন কৃতী ভারতীয় খেলোয়াড়ের খেলা দেখেন নাই। এই উক্তি খুবই যুক্তিহীন। আমাদের যতদূর মনে আছে হাজারে, মানকড় প্রভৃতি খেলোয়াড় ভারতের যে যে অংশ পাকিস্থানের এলাকাভুক্ত করা হইয়াছে তথায় খেলিয়াছেন। তাঁহারা ভারতীয় ক্রিকেট দলকে আমন্ত্রণ করিতে চাহেন ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইত।

ফুটবল

আই এফ এর পরিচালকমণ্ডলীর সভ্যগণ আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলার এখনও কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই। সংবাদে প্রকাশ, তাঁহারা আগামী বৎসরের জানুয়ারী মাসে পেশাদার বৈদেশিক ফুটবল দলের ভ্রমণের সময় ফাইনাল খেলার ব্যবস্থা করিবেন। ইহা কতখানি কার্যকরী হইবে বলা কঠিন। একটি অনুষ্ঠান কয়েক মাসের পর হইলে উহার কোনই আকর্ষণ থাকে না। তাহা ছাড়া অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা এমন সময় করা হইয়াছে যখন ক্রিকেট খেলা চলিতে থাকিবে। এইরূপ অবস্থায় দুইটি দলকে শীল্ড লাভের আনন্দের কিছুটা ভাগ দিবার সুযোগ যখন আছে তখন তাহা অবলম্বিত হইতেছে না কেন এই কথাই আমরা চিন্তা করিতেছি। কারণ আমরা আশঙ্কা করিতেছি ইহার পর যখন ফাইনাল খেলার ব্যবস্থা করা হইবে তখন কোন না কোন দল এই যুক্তি দেখাইয়া খেলায় যোগদানে আপত্তি করিবে যে সকল খেলোয়াড় এখন কলিকাতায় নাই। পুনরায় অনুষ্ঠানের দিন পরিবর্তন করিতে হইবে। এইরূপ অপ্রীতিকর অবস্থা সৃষ্টি হইবার পূর্বে উভয় দলকে ছয় মাস করিয়া শীল্ড রাখিবার অধিকার দিলেই সকল দিক দিয়া ভাল হইবে।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

১০ই নবেম্বর—রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতীয় প্রতিনিধি-দল কাশ্মীর সম্পর্কিত ইঙ্গ-মার্কিন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিবেন বলিয়া ভারত সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রধান কার্যালয়ে ভারতীয় প্রতিনিধিমণ্ডলীর নিকট এই মর্মে নির্দেশ প্রেরণ করা হইয়াছে।

কোরিয়ার অচলাবস্থা সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু এবং সাধারণতন্ত্রী চীনা গভর্ণমেণ্টের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চৌ-এন লাইয়ের মধ্যে পত্রালাপ চলিতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

লোকসভায় অদ্যকার অধিবেশনে মৃত্যুকর বিল সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত হয়।

১১ই নবেম্বর—প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু আজ লোকসভায় পাকিস্থান সীমান্ত-রক্ষি বাহিনী কর্তৃক পাঞ্জাবের কোন কোন গ্রামে গুলীবর্ষণ সম্বন্ধে এক বিবৃতি দেন। তিনি বলেন যে, পাকিস্থানী সৈন্যগণ গত ২২শে অক্টোবর ভারতীয় এলাকায় প্রবেশপূর্বক এক ভারতীয় জরিপকারী দল কর্তৃক চিহ্নিত নিশানাগুলি অপসারিত করে। এবং পরদিন কোনরূপ উত্তেজনার কারণ ব্যতীত অকস্মাৎ গুলীবর্ষণ করে। ভারতীয় বাহিনী উহার উত্তর দেয়; চারি ঘণ্টাব্যাপী সংঘর্ষে ভারতীয় পক্ষ হইতে ৪৬৭টি গুলী বর্ষণ করা হয়।

পূর্ববঙ্গের সংবাদপত্রগুলিতে ক্ষতিকর মিথ্যা সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় আসাম সরকার পূর্ববঙ্গ সরকারের নিকট প্রতিবাদ জানাইয়াছেন।

১২ই নবেম্বর—করাচীতে পাক পার্লামেণ্টে পাকস্থান সরকারের খাদ্যনীতি সম্পর্কে জনাব সৌকত হায়াৎখান কর্তৃক আনীত মুলতুবী প্রস্তাবের আলোচনাকালে সরকারের বিরুদ্ধে 'অমার্জনীয় অবহেলা, অপরিণামদর্শী নীতি এবং গুরুতর ধরণের গাফিলতির দ্বারা জন-গণের মৃত্যু ঘটাইবার' অভিযোগ আনা হয়। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বক্তৃতা প্রসঙ্গে পূর্ব পাকিস্থানের খুলনায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, সম্প্রতি সেখানে ১০ হাজার লোক অনশনে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে সদ্যাগত পূর্ববঙ্গের আড়াই লক্ষ উদ্বাস্তুর সাহায্য ও পুনর্বাসন সম্পর্কে অদ্য নয়াদিল্লীতে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু ও পশ্চিম-বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বি সি রায়ের মধ্যে এক বৈঠকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

লোকসভায় এক প্রশ্নের জবাবে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু বলেন যে, সিংহলে ভারতীয়দের সম্পর্কে সিংহল সরকারের মনোভাব খুবই নৈরাশ্যজনক।

১৩ই নবেম্বর—লোকসভায় প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহের একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেন, গত কয়েক মাসে প্রায় ১,৩০,০০০ বাস্তুত্যাগী রেলপথ ভিন্ন অন্যান্য পথে পূর্ব পাকিস্থান হইতে পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছে। প্রধান মন্ত্রী বলেন, সাধারণভাবে নিরাপত্তা-বোধের অভাব এবং অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতিই বাস্তুত্যাগের প্রধান কারণ। ছাড়পত্র-প্রথা প্রবর্তনজনিত আতঙ্কও ব্যাপক বাস্তু-ত্যাগের অন্যতম কারণ বলিয়া প্রধান মন্ত্রী উল্লেখ করেন।

শিলং-এর সংবাদে প্রকাশ, গত ৭ই ও ৮ই নবেম্বর তারিখে সশস্ত্র পাক সৈন্যদল ভারতীয় এলাকাভুক্ত খাসিয়া ও জয়ন্তীয়া পার্বত্য জেলার পশ্চিম অংশে তথাকার অধিবাসীরা যখন ফসল কাটায় প্রবৃত্ত ছিল, সেই সময় তাহাদের উপর গুলীবর্ষণ করে।

পূর্ব পাকিস্থান হইতে আগত উদ্বাস্তুদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থাকল্পে পশ্চিম-বঙ্গে দ্রুত অর্থ প্রেরণের নিমিত্ত সম্প্রতি ভারত সরকার উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

১৪ই নবেম্বর—যুবরাজ করণ সিং বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের প্রথম সদর-ই-রিয়াসৎ নির্বাচিত হইয়াছেন। এই নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে কাশ্মীরে ১০৬ বৎসর-ব্যাপী ডোগরা বংশীয় শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটিল।

অনাড়ম্বর ও গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে অদ্য ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুর ৬৪তম জন্মদিবস পালিত হয়।

অদ্য লোকসভায় ভারতীয় শুল্ক (৪র্থ সংশোধন) বিল পাশ হয়। উহাতে ২১টি শিল্পকে প্রদত্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থা বহাল রাখা হইয়াছে।

১৫ই নবেম্বর—পূর্ব পাকিস্থানের সংখ্যা-লঘুদের সম্পর্কে ভারত সরকার যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, অদ্য লোকসভা ২১৬-৫৯ ভোটে সেগুলি অনুমোদন করেন। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালনী, ডাঃ মেঘনাদ সাহা প্রমুখ ২৪ জন সদস্য সম্মিলিত ভাবে একটি সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া সরকারকে অনুরোধ জানান যে, পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুগণ যাহাতে শান্তিতে ও সম্মানের সহিত বাস করিতে পারে, এরূপ অবস্থা সৃষ্টির জন্য অর্থনৈতিক অবরোধ ও অন্যান্য কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হউক। এই সংশোধন প্রস্তাব সহ সকল সংশোধন প্রস্তাবই অগ্রাহ্য হয়।

অদ্য বারাণসীতে সংস্কৃত বিশ্ব-পরিষদের অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ দেশবাসীকে অধ্যাত্মবাদের প্রতি নিষ্ঠা রাখিয়া সত্য পথের অনুসরণ করিতে এবং মানব সেবায় ব্রতী হইতে আহ্বান জানান।

অদ্য প্রাতে খিদিরপুর ডকে ৮ হাজার টনের বৃটিশ মালবাহী জাহাজ 'সিটি অব বৃষ্টলের' খোলের মধ্যে এক অগ্নিকাণ্ডের ফলে জাহাজের চীফ অফিসার মিঃ জ্যাক ড্রমণ্ড মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

অদ্য আসানসোলের নিকট এক সশস্ত্র ডাকাতির ফলে একজন নিহত ও দুইজন আহত হয়। ডাকাত দল একটি ব্যাঙ্কের ভ্যান আক্রমণ করিয়া ২৬ হাজার টাকা লইয়া সরিয়া পড়ে।

১৬ই নবেম্বর—নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী পার্টির সভায় প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু বলেন, সরকারের মূল খাদ্যনীতি অপরিবর্তিত থাকিবে এবং কি পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বহাল থাকিবে তাহা স্থানীয় পরিস্থিতিরই উপর নির্ভর করিবে।

অদ্য বারাণসীতে সংস্কৃত বিশ্ব পরিষদের অধিবেশনে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে একটি সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বিদেশী সংবাদ

১০ই নবেম্বর—মিঃ ট্রিগভি লী অদ্য রাত্রে রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেলের পদ ত্যাগ করিয়াছেন।

পূর্ব তিব্বতে চীন সীমান্তের নিকটবর্তী খাস নামক স্থানে অন্যূন ৩০ জন তিব্বতী ও ১০ জন চীনা সৈন্য নিহত হইয়াছে। ঐ এলাকার খাম্বাস নামে পরিচিত তিব্বতীরা চীনা বাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করায় উপরোক্ত ঘটনা ঘটে।

১১ই নবেম্বর—অদ্য রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ভারতীয় প্রতিনিধি-মণ্ডলীর অধিনেত্রী শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, কোরিয়া যুদ্ধের নিষ্পত্তি অথবা আফ্রিকার বর্ণ-সমস্যার সমাধান প্রচেষ্টা যদি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, তাহা হইলে শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রপুঞ্জের অস্তিত্ব বিপন্ন হইয়া পড়িবে।

১২ই নবেম্বর—ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ অদ্য ১৯৫৩ সালের জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জ শিক্ষা-বিজ্ঞান-সংস্কৃতি সংস্থার সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন।

১৩ই নবেম্বর—তৈলের ব্যাপারে বৃটেনের সহিত মীমাংসার উদ্দেশ্যে পারস্য ইঙ্গ-ইরাণ তৈল কোম্পানীকে ক্ষতিপূরণ দিবার এক নূতন প্রস্তাব পেশ করিয়াছে।

১৪ই নবেম্বর—থাই পুলিশের প্রধান কর্তা ফাও অদ্য প্রকাশ করেন যে, থাইল্যাণ্ডে রাজ-তন্ত্রের উচ্ছেদ সাধনের একটি কম্যুনিষ্ট ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে।

১৬ই নবেম্বর—পিকিং বেতারের ঘোষণায় এই দাবী করা হইয়াছে, অক্টোবর মাসে কোরিয়ার যুদ্ধে রাষ্ট্রপুঞ্জের ৬০ সহস্রাধিক সৈন্য হতাহত হইয়াছে।

অদ্য ইরাণের প্রধান মন্ত্রী মহম্মদ মোসাদেক বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া ইরাণের সুপ্রীম কোর্ট বাতিল করিয়া দিবার আদেশ দিয়াছেন।

ভারতীয় মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা—।৶০ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষাণ্মাসিক— ১০৲
পাকিস্থানের মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা (পাক্) ।৶০ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষাণ্মাসিক—১০৲ (পাক্)
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র

২০শ বর্ষ | দেশ | শনিবার,
৫ম সংখ্যা | | ১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯

DESH Saturday, 29th November, 1952

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন   সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

সাময়িক প্রসঙ্গ

বিশ্ব-সংস্কৃতি ও ভারত

আগামী ৩০শে নবেম্বর ভূপালের অন্তর্গত সাঁচীতে একটি নূতন বৌদ্ধ-বিহার প্রতিষ্ঠার কাজ মহা আড়ম্বরের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হইবে। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে সোমনাথের মন্দির পুনঃ প্রতিষ্ঠার ন্যায় ইহাও একটি স্মরণীয় ঘটনা। সাঁচীর এই নবপ্রতিষ্ঠিত বিহারে ভগবান্ বুদ্ধের শিষ্য শারিপুত্র এবং মৌদ্গলায়নের পবিত্র দেহাস্থি সংরক্ষিত হইবে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল এই অমূল্য সম্পদ্ বৌদ্ধধর্মাচার্যগণের হস্তে সমর্পণ করিবেন। এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিবার জন্য জগতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রতিনিধিস্বরূপে ভারতে আগমন করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদিগকে আমাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। হিংসা-বিদ্বেষের আবর্তে বর্তমান জগতের রাজনীতিক প্রতিবেশ উত্তপ্ত। বিজ্ঞান মানুষের হাতে আজ দানবীয় শক্তি তুলিয়া দিয়াছে। বিজ্ঞানবলে মানুষ শূন্যে এবং জলে প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছে, কিন্তু মাটির এই পৃথিবীতে টিকিয়া থাকার পক্ষেই মানুষের নিকট সমস্যা দেখা দিয়াছে। বিজ্ঞানের দানবিক শক্তি জগৎকে ধ্বংসের মুখে লইয়া চলিয়াছে। আণবিক বোমার ভয়াবহতা আমরা বিগত যুদ্ধে কতকটা লক্ষ্য করিয়াছি; কিন্তু জাপানের হিরোশিমায় নিক্ষিপ্ত সেই আণবিক বোমার চেয়ে বহুগুণ শক্তিশালী বোমা আবিষ্কৃত হইয়াছে। তারপর দেখা দিয়াছে হাইড্রোজেন বোমা। এই বোমার কয়েক টন ছুঁড়িলে প্রকাণ্ড এই ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ড নাকি প্রলয়-পয়োধি-জলে খোলামকুচির মত বিলীন হইয়া যাইবে। অতঃপর আসিতেছে আধুনিকতম আবিষ্কার মরণ-রশ্মি! মানুষ মারিবার পথ তো এইভাবে পরিষ্কার হইতেছে; কিন্তু বাঁচিবার পথ কি? বিশ্ব-পণ্ডিতদের বিবেচনা, গবেষণা এবং সম্মেলন কি বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক এই অবিশ্বাস ও জিঘাংসা হইতে মানুষকে রক্ষা করিতে পারিবে? ভারতের উপরাষ্ট্রপতি জগতের অন্যতম প্রধান মনীষী ডক্টর রাধাকৃষ্ণন্ কিছুদিন পূর্বে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে গিয়া জগতের বিভিন্ন ধর্মমতের মূলগত আধ্যাত্মিক আদর্শের উপর এ সম্বন্ধে জোর দিয়াছেন। সব ধর্মমতের মধ্যে অবশ্য একটা সার্বভৌম আদর্শ আছে; কিন্তু বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান সেই আদর্শকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে এবং সেগুলির প্রভাবে মানবতার দিকটা চাপা পড়িয়াছে। অথচ সার্বভৌম মানবতার আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করার পথ ছাড়া মানব-সংস্কৃতি এবং সংস্থিতিকে রক্ষা করিবার অন্য উপায় দেখা যায় না। কারণ পাণ্ডিত্য-নির্ণীত কতকগুলি ব্যবহারিক নীতির নির্দেশ করাই বর্তমান সংকটের একমাত্র প্রয়োজন নয়, আবশ্যক চিন্তাধারার পরিবর্তন এবং দরকার তদুপযুক্ত দার্শনিক দৃষ্টির। ভগবান্ বুদ্ধের জীবন এবং আদর্শ আসুরিক অন্ধ সংস্কারের প্রভাব হইতে মানুষের মনে সর্বজনীন মৈত্রীর উদার দৃষ্টিকে উন্মুক্ত করিতে পারে। বিভিন্ন ধর্মের মতবাদ এবং আধ্যাত্মিক চিন্তার ক্ষেত্রে ভগবান্ বুদ্ধের প্রবর্তিত মানব-মৈত্রীর দার্শনিকতাকে প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়োজনীয়তা এই দিক হইতে বিশেষভাবেই দেখা দিয়াছে। আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে ভগবান্ বুদ্ধের জীবন-লীলায় এবং তাঁহার সাধনায় এই ভারতভূমি উজ্জ্বল করিয়া যে প্রজ্ঞানময় জ্যোতি জগৎকে উদ্ভাসিত করিয়াছিল, বর্তমান জগতের দিগ্‌চক্রবালের পুঞ্জীভূত অন্ধকার দূর করিবার শক্তি তাহারই আছে। বুদ্ধশিষ্য শারিপুত্র এবং মৌদ্গলায়নের পবিত্র দেহাস্থি-প্রতিষ্ঠায় সেই জ্যোতির আবাহন সার্থকতা লাভ করুক।

জমিদারী-প্রথা ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার

এতদিন পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সত্যই জমিদারী প্রথার অবসানকল্পে আন্তরিকতার সঙ্গে উদ্যোগী হইয়াছেন। শুনা যাইতেছে, বিধান সভার আগামী অধিবেশনে এই সম্পর্কে একটি বিল উপস্থিত করা হইবে। পশ্চিমবঙ্গের জমিদারমণ্ডলীর একদল প্রতিনিধি সম্প্রতি এ সম্পর্কে এক স্মারকলিপি লইয়া মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তাঁহারা কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতেই পশ্চাৎপদ নহেন, তবে সামান্য কিছু ক্ষতিপূরণ মাত্র চাহিয়াছেন। ডাঃ রায় সাংবাদিকদিগকে বলিয়াছেন, জমিদারদের কি হিসাবে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে, তিনি এখনও তাহা নিশ্চিতভাবে বলিতে পারেন না। শুনিতেছি, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এ সম্বন্ধে উত্তর প্রদেশের ব্যবস্থাই অনুসরণ করিবেন। দশ বৎসরের খাজনা নগদ জমা দিয়া প্রজা ও কৃষক স্বকীয় ভূমির উপর পূর্ণ অধিকার লাভ করিতে পারিবে। ডাঃ রায়ের পরিকল্পিত ব্যবস্থার পূর্ণ রূপ কি হইবে, তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে একথা সত্য যে, কংগ্রেস বিনা ক্ষতিপূরণে সর্ববিধ শোষক শ্রেণীর উচ্ছেদের কোন বৈপ্লবিক কার্যক্রম গ্রহণ করে নাই। কংগ্রেস জমিদারদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাও করিয়াছে। কিন্তু কংগ্রেস সরকারের এই ঔদার্যে ভূস্বামীরা কৃতজ্ঞ হয় নাই।

তাহারা আইনের আশ্রয় লইয়া সরকারী প্রচেষ্টাগুলি ব্যর্থ ও বিলম্বিত করিবার জন্যই চেষ্টা করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গেও তাহাদের এইরূপ মনোবৃত্তির অন্যথা ঘটিবে, এমন আশা আমরা করিতে পারি না। প্রকৃতপক্ষে আমরা ভালভাবেই জানি, জমিদারদের অন্যায় প্রভাব এবং অপ্রকাশ্য পথে চাপ দিবার ফলেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধনের উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে এতদিন সংকুচিত হইয়াছেন। জমিদার শ্রেণীর নির্বিবেক শোষণের ফলে সুন্দরবন অঞ্চল শ্মশানে পরিণত হইতে চলিয়াছে। সরকার চোখের উপর এসব দেখিয়াও স্বার্থ-লোভী উৎপীড়কদের সংযত করিতে কোন চেষ্টাই করেন নাই। ফলত তাহাদের দীর্ঘ দিনের এই লোভ এবং লালসা আজ উদারতার বানে ভাসিয়া যাইবে, এমন আশা করা নিতান্তই ভুল। আইনের ফাঁকের ভিতর দিয়া জমিদারদের স্বার্থ পিপাসার পাকচক্র খেলিতে আরম্ভ করিবে, ইহা সুনিশ্চিত। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী কলিকাতা শহরে ভূগর্ভে রেলপথ চালাইয়া কিংবা ১২০ মাইল দূরবর্তী দুর্গাপুর হইতে পাইপে গ্যাস আনাইবার বহু ব্যয়সাধ্য বিলাসের ঝোঁকে না মাতিয়া আজ সত্যই যদি এদেশের দুর্গত কৃষক-সমাজের উন্নয়ন সাধনের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বলিষ্ঠ নীতি লইয়া তাঁহাকে এক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে। পক্ষান্তরে এ-কূল ও-কূল দুকূল রক্ষা করিতে গেলে অনর্থই নানা আকারে পাকিয়া উঠিবে। বাস্তবিক পক্ষে পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক উন্নতি সাধন করিতে হইলে ভূমি সংক্রান্ত ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন। কলিকাতার নাগরিক জীবনের উন্নয়ন সাধনের প্রয়োজন না আছে, এমন কথা আমরা বলিতেছি না; কিন্তু রাজ্যের ভূমি-ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের দ্বারা পল্লী-জীবনকে সুসংস্থিত করিবার প্রয়োজন, তাহার অপেক্ষা অনেক বেশি। পল্লীগুলি যদি রক্ষা না পায়, তবে শহরও বাঁচিবে না, ইহাই আমাদের বক্তব্য। আমরা আশা করি, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী কমিটি, কমিশন, তদন্ত, তথ্য সংগ্রহের মামুলি অজুহাত তুলিয়া জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধনে কালবিলম্ব ঘটিতে দিবেন না।

ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ

গত ৫ই অগ্রহায়ণ কলিকাতার পৌর-সভা ভারত পরিদর্শনে আগত নাইজিরিয়ার মন্ত্রি-দ্বয় মিঃ আওয়ালোয়ো এবং মিঃ একিন-লোয়েকে সম্বর্ধিত করেন। সুদূর পশ্চিম আফ্রিকার এই দুইজন মহামান্য অতিথিকে নিজেদের মধ্যে পাইয়া আমরা বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি। ভারতের সহিত আফ্রিকার সাংস্কৃতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ইঁহাদের ভারত পরিদর্শন সাহায্য করিবে। অভিনন্দনের উত্তরে মিঃ আওয়ালোয়ো ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মকথাই সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এদেশের অনেকেও সম্ভবত এমনভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির উপর আলোক-সম্পাত করিতে পারেন না। তিনি বলেন, ভারতের সভ্যতা গ্রীস এবং রোমক সভ্যতা হইতেও প্রাচীন। এত বড় একটা প্রাচীন সভ্যতার অধিকারী যে জাতি, তাহারা দীর্ঘকাল কেন বিদেশীর অধীনে ছিল! এ প্রশ্ন স্বভাবতই উঠে। এই প্রশ্নের আলোচনা করিয়া নাইজিরিয়ার মন্ত্রী এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, দর্শন এবং জ্ঞানের সাধনায় যাঁহারা এতটা উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন, ধ্বংসাত্মক মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্র প্রস্তুত করিতে তাঁহারা যে না পারিতেন এমন নয়। নিশ্চয়ই বর্তমান বিজ্ঞান যে সব শক্তিশালী অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছে, প্রাচীন ভারতীয়েরা যদি চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে তদপেক্ষা সমধিক মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করিবার যোগ্যতা তাঁহাদের ছিল। কিন্তু জীবনকে তাঁহারা খণ্ড করিয়া দেখেন নাই। তাঁহাদের জীবনের মূলীভূত দর্শন, তাঁহাদের সাধনার সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছিল এবং তাঁহারা মানুষের স্বাধীনতা, মানব-মহত্ত্বকেই সমধিক মূল্য দান করিয়াছেন। মৈত্রীকেই বড় বলিয়া বুঝিয়াছেন। মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র পশুশক্তি দিতে পারে, তাহার ফলে অপরের স্বাধীনতা অপহরণ করা যায়; কিন্তু কোন জাতি সে পথে বড় হয় না। পশু শক্তির তেমন অধিকার মানুষকে অমানুষ করিয়া তোলে। মানুষ তাহার ফলে বর্বর জীবনে অভ্যস্ত হয়। সভ্যতার নামে এই বর্বরতা কিভাবে জগতে বিভীষিকার বিস্তার করিতেছে, সেই সম্পর্কে আলোচনা করিয়া মিঃ আওয়ালোয়ো কেনিয়ার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, সেখানকার স্বাধীনতা আন্দোলন দমন করিবার জন্য যত রকমের বর্বর নীতি অবলম্বন করা হইতেছে। এই সব দমন-নীতির স্বরূপ কি, সাম্রাজ্য-বাদীদের শাসনে যাঁহাদিগকে কোন দিন থাকিতে হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই উপলব্ধি করিতে পারেন। মহাত্মা গান্ধীর জীবনাদর্শ—পরাধীন জাতিসমূহের স্বাধীনতা সংগ্রামে নূতন পথ উন্মুক্ত করিয়াছে। সর্বপ্রকার অধীনতাকে উৎখাত করিবার জন্য নাইজিরিয়া শান্তিপূর্ণ পথে, সেই সঙ্গে অনমনীয় মনোবৃত্তি লইয়া গান্ধীজীর আদর্শই অনুসরণ করিবে। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া নাইজিরিয়ার মন্ত্রী বলেন, ভারতের এই বীর সন্তান তাঁহার অত্যুজ্জ্বল ত্যাগের অবদান-মহিমায় আমাদের অন্তরে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। গান্ধীজী এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সাধনার মহত্তম আদর্শ সমগ্র জগতকে ভারতের সহিত প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া তুলিতেছে। এই শক্তির স্বরূপ বাহ্যদৃষ্টিতে ততটা হয়ত সব সময় ধরা পড়িতেছে না; কিন্তু কাজ যে ইহার আরম্ভ হইয়াছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। মিঃ আওয়ালোয়ো আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতীয় সংস্কৃতি এবং রাষ্ট্রসাধনার যে প্রভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা সর্বাংশে সত্য; কিন্তু এই সংস্কৃতির ঐতিহ্যের জন্য গর্ববোধ করাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট নয়। বস্তুত এই আদর্শের প্রভাবকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার দায়িত্বও স্বাধীন ভারতের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। ত্যাগ এবং তপস্যার দ্বারা যদি আমরা সেই আদর্শকে উজ্জীবিত রাখিতে না পারি, ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং সুখের আকর্ষণ যদি আমাদিগকে দুর্বল করিয়া ফেলে, তবে জাতির প্রতি আমাদের বিশ্বাসঘাতকতাই করা হইবে এবং সেই গ্লানি আমাদিগকে অভিভূত করিয়া ফেলিবে। মৈত্রীর পথ কিংবা অহিংসার পথ, দুর্বলের জন্য নয়। প্রকৃতপক্ষে প্রাণ দিয়াই প্রাণময় সেই আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করিতে হয়।

পাক-ভারত মৈত্রীর পথ

'পূর্ববঙ্গ দিবস' প্রতিপালন উপলক্ষ্যে সাম্প্রদায়িক অশান্তি এবং উত্তেজনার যাঁহারা আশঙ্কা করিতেছিলেন, তাঁহাদের সে আশঙ্কা অমূলক প্রতিপন্ন হইয়াছে, ইহা সুখের বিষয়। প্রকৃতপক্ষে প্রশ্নটি আদৌ সাম্প্রদায়িক নয়; সুতরাং কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ এজন্য এতটা বিচলিত হইয়া-

ছিলেন কেন বোঝা যায় না। কংগ্রেস যদি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা বজায় রাখিতে চায়, তবে জাতির জনমতকেও সে উপেক্ষা করিতে পারে না। পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের সম্বন্ধে পাকিস্থান সরকারের নীতি পশ্চিমবঙ্গের জনমতকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে, একথা অস্বীকার করা যায় না। এই বিক্ষোভের মূলে মানবতার সেই প্রশ্নটি রহিয়াছে, সেই প্রশ্নের সমাধান করিবার দিকেই কংগ্রেসের কর্মসাধনা প্রযুক্ত হওয়া উচিত। জোর করিয়া ইহাকে অস্বীকার করিলে চলিবে না পরন্তু রাষ্ট্রগত চেতনা এবং মানবতার বেদনা ঐতিহাসিক বিবর্তনের মুখে অগ্রসর হইবেই। জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেস যদি জনচেতনার সহিত একক্ষেত্রে সংযোগ রক্ষা করিয়া না চলে, তবে আদর্শের ফাঁকা কথার উপর শুধু জোর দিয়া কংগ্রেস তাহার মর্যাদা বজায় রাখিতে পরাঙ্মুখ হইবে, ইহা নিতান্তই সহজ কথা। পাকিস্থান সরকারের নীতির বিরুদ্ধেই জাতির প্রতিবাদ। ভারতের প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছেন, সমস্যাটি জাতীয়, কিন্তু কে বলিতেছে যে তাহা নয়, সাম্প্রদায়িক? পণ্ডিতজীর মতে একমাত্র রাজনীতিক ভিত্তিতেই এ সমস্যার সমাধান হইতে পারে। কিন্তু তিনি তাহা করিতেছেন না কেন? জগতের নিগৃহীত, অত্যাচারিত জনগণের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন, তাহাদের প্রতি অনুষ্ঠিত অত্যাচারের প্রতিকার সাধনে ভারতের প্রধান মন্ত্রীর উৎকণ্ঠার অবধি নাই। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের বিরুদ্ধে অবলম্বিত নীতির প্রতিবাদে আমরা আন্দোলন করিতে পারি, টিউনিসিয়ার জন্য 'দিবস' প্রতিপালন করাতে কংগ্রেসের সমর্থন থাকে; কিন্তু পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় জাতিতে হিন্দু এই কি তাহাদের অপরাধ? তাহাদের প্রতি অত্যাচারের প্রতিবাদ করিতে গেলেই ভারতের প্রধান মন্ত্রী হিষ্টিরিয়ার পরিচয় পান, এবং পূর্ববঙ্গের উপদ্রুত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দুর্দশার প্রতিকারের কথা উত্থাপন করিলেই তিনি সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন সেক্ষেত্রে সব সময় জড়িত দেখেন। কিন্তু তাঁহার এই ব্যক্তিগত মনোভাব মানবতার বৃহত্তর বেদনা এবং চেতনাকে রুদ্ধ করিতে পারিবে না। শত শত ছিন্নমূল উদ্বাস্তু আজও কলিকাতার পথে পথে অন্নহীন, বস্ত্রহীন অবস্থায় হাহাকার করিতেছে, তাহাদের চোখের জলে মাটি ভিজিতেছে। অথচ অপরাধ তাহাদের কিছুই নাই। ইহাদের দুঃখকষ্ট দেখিয়া মানুষের মন বিচলিত হইবে, ইহা স্বাভাবিক। বাস্তবিত পক্ষে যাহারা মৌলিক সদিচ্ছা মাত্র প্রকাশ করিয়া এই সব ছিন্নমূল নরনারীর বেদনাকে উপেক্ষা করিতে চায়, আমরা তাহাদের মনোবৃত্তির প্রশংসা করিতে পারি না এবং তেমন আত্মবঞ্চনার পথে আমাদের অর্থনৈতিক কিংবা রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধানও হইবে না; ইহা সুনিশ্চিত। বাঙালী জাতি এইভাবে ধ্বংস হইয়া যাইবে। তাহারা সমাজ-জীবনের সংস্থিতি হারাইয়া স্রোতের শেওলার মত ভাসিয়া বেড়াইবে, আর ভারত স্বাধীনতার স্বর্গসুখ আস্বাদন করিবে, এমন ধারণা নিতান্তই উৎকট; অধিকন্তু অবাস্তব। 'পূর্ববঙ্গ দিবসের' আন্দোলন শুধু ভারত সরকারকেই নয়, পাকিস্থানের কর্তৃপক্ষকেও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিবে, আমরা ইহাই আশা করি।

সত্যনিষ্ঠ জীবনের আদর্শ

কংগ্রেসের সভাপতিস্বরূপে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সম্প্রতি কংগ্রেসকর্মীদিগকে আদর্শনিষ্ঠ হইতে উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার মতে কংগ্রেসের আদর্শের প্রতি যাহাদের নিষ্ঠা নাই, কংগ্রেসে তাঁহাদের স্থান থাকা উচিত নয়। পণ্ডিতজী একথাও বলিয়াছেন যে, নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসকর্মীর ভেল ধরিয়া কেহ কেহ কংগ্রেসে প্রবেশ করিতেছে, ইঁহাদের সম্বন্ধে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। কংগ্রেস-সভাপতির এই নিরিখ অনুসারে কংগ্রেসকর্মী বলিয়া যাঁহারা নিজদিগকে অভিহিত করিয়া থাকেন, তাঁহারা কয়জন প্রকৃতপক্ষে আদর্শনিষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইবেন, স্বভাবতই এই প্রশ্ন উঠে। বস্তুত কংগ্রেসের বর্তমান আদর্শ কি, সাধারণ লোকে ইহাই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। যাঁহারা কংগ্রেসকর্মী বিভিন্ন আইনসভার সদস্যপদ লাভ করাই যেন তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্যস্বরূপে পরিগণিত হইয়াছে এবং আইনসভায় বক্তৃতা করাই তাঁহাদের জীবনের ব্রতস্বরূপে পরিণত হইয়াছে। জাতির সেবামূলক সংগঠনমূলক কর্মসাধনার পথে মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসে যে প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিলেন, তাহা আর নাই। জনসাধারণের প্রতি দরদের পরিচয় কংগ্রেসকর্মীদের কথার ভিতরেই আমরা শুধু পাই, কাজে নয় এবং জনসাধারণের প্রতি তাঁহাদের সেই মৌখিক দরদও শুধু সৌখীন একটা মানসিক বিলাস মাত্রে পরিণত হইয়াছে। আইনসভার সদস্য না হইতে পারিলেই কংগ্রেসকর্মীরা অবসন্ন হইয়া পড়েন এবং মন্ত্রী বা উপমন্ত্রীর আখড়াই করিবার সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইলে তাঁহাদের মুখ শুকাইয়া যায়। মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ বোধ হয় একমাত্র আচার্য বিনোবা ভাবেই মনে-প্রাণে অনুসরণ করিতেছেন এবং দরিদ্রের বেদনা তিনিই তাঁহার কর্মসাধনায় রূপ দিতেছেন। তাঁহার নিজের জীবনের এবং দরিদ্র জনসাধারণের অর্থনৈতিক কোন ব্যবধান তিনি রাখেন নাই। পদ, মান এবং প্রতিষ্ঠা তাঁহার জীবনাদর্শের কাছে তুচ্ছ হইয়া পড়িয়াছে। এমন চরিত্রশক্তিই ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করিয়া তোলে এবং সমষ্টি-জীবনের সমুন্নতি সাধন করে। মনুষ্যত্বের ইহাই সাধনা এবং মহামানবদের ইহাই আদর্শ। আদর্শের প্রতি এমন নিষ্ঠাই কংগ্রেসকে একদিন শক্তি দিয়াছিল। মহাত্মা গান্ধীর ত্যাগময় জীবনের প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে সেই প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়া কাজ করিয়াছে। গান্ধীজীর জীবন সত্যনিষ্ঠ ছিল বলিয়াই তাঁহার শক্তি ছিল এত বেশি। সম্প্রতি প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক অধ্যাপক আইনস্টাইনের আচরণে আমরা এমন সত্যনিষ্ঠারই পরিচয় পাইয়াছি। ইস্রায়েল রাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি কিছুদিন হইল পরলোকগমন করিয়াছেন। অধ্যাপক আইনস্টাইনকে এই পদ গ্রহণ করিতে আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির পদ, মান, যশ, প্রতিষ্ঠা সেই সঙ্গে জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য, আকর্ষণ সামান্য নয়। অধ্যাপক আইনস্টাইন নিজে ইহুদী এবং প্যালেস্টাইনের প্রতিষ্ঠিত ইহুদী রাষ্ট্রের সঙ্গেও তাঁহার সহানুভূতিও বিশেষ রকমেই রহিয়াছে। কিন্তু জ্ঞানের সাধক আইনস্টাইন মান, যশ ও প্রতিষ্ঠার প্রতিবেশের মধ্যে পড়িতে অস্বীকৃত হইয়াছেন। শিক্ষারতীর সাধারণ জীবনে জ্ঞানের সাধনাতে তিনি নিমগ্ন থাকিবেন। জীবনের এই আদর্শকে পদ, মান এবং প্রতিষ্ঠার দায়ে ক্ষুণ্ণ করিতে তিনি প্রস্তুত নহেন। প্রকৃতপক্ষে সত্যনিষ্ঠ জীবনের এমন আদর্শই জাতিকে সমুন্নত করিয়া তোলে এবং বিশ্ব-সংস্কৃতিকে স্থায়ীভাবে সমৃদ্ধ করিয়া থাকে।

কোরিয়া সমস্যার সমাধান চেষ্টা

একমাত্র বন্দীদের মুক্তি দেয়া সম্পর্কে দুই পক্ষ একমত হতে পারছেন না বলে নাকি কোরিয়া যুদ্ধের অবসান ঘটছে না। এই সমস্যা যেমন করে মিটতে পারে সে সম্বন্ধে একটা 'ফরমুলা' দিয়ে ইউনো'তে ভারতীয় প্রতিনিধিরা একটা প্রস্তাব উপস্থিত করেছেন। এই 'ফরমুলা'র রচয়িতাদের মতে এর দ্বারা দুই পক্ষের দাবীর যে-সামঞ্জস্য করা হয়েছে সেটা উভয়ের পক্ষেই সম্মানজনক এবং যে-ব্যবস্থার সুপারিশ করা হয়েছে সেটা যুদ্ধ-বন্দী সম্পর্কিত জেনেভা কনভেনশন ও আন্তর্জাতিক আইনসম্মতও বটে। বন্দীদের ধরে রাখা বা স্বদেশে ফেরৎ পাঠানো, কোনোটার জন্যই বলপ্রয়োগ করা হবে না। প্রস্তাবটির বিস্তৃত আলোচনা এখানে অনাবশ্যক। বর্তমান প্রবন্ধ মুদ্রিত হবার পূর্বেই বুঝা যাবে যে, এর দ্বারা কোনো কাজ হবে কি না। আমেরিকা ভারতীয় প্রস্তাবের দু'একটা খুঁত বার করেছে, তাই নিয়ে জটলা চলছে। বৃটিশ গভর্নমেণ্ট নাকি একটু আধটু সংশোধন করে নিয়ে ভারতীয় প্রস্তাবটিকে সমর্থন করার পক্ষপাতী এবং ইডেন সাহেব নাকি এ্যাচিসন সাহেবকে এতে রাজী করার জন্য চেষ্টা করছেন। অন্য পক্ষে উত্তর কোরিয়া এবং চীনের প্রতিনিধিরা যে ইউনো'তে নেই, তবে সোভিয়েট এবং অন্যান্য কম্যুনিস্ট গভর্নমেণ্টের প্রতিনিধিদের কথাবার্তা থেকে অনুমান করা যাবে যে উত্তর কোরিয়া এবং চীনের মনোভাব কী রকম হবে। সোভিয়েট ও অন্য কম্যুনিস্ট প্রতিনিধিদের ভাবগতিক এখনো স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে না, তবে রাশিয়ার সংবাদ-পরিবেশক 'টাস' এজেন্সী ও মস্কোর 'প্রাভ্‌দা' সংবাদপত্র কর্তৃক নাকি ভারতীয় প্রস্তাবটির বিরুদ্ধ সমালোচনা হয়েছে যার মর্ম এই যে, বাগাড়ম্বরের অন্তরালে প্রস্তাবটি মূলত মার্কিন মতেরই সমর্থক।

আসল কথা, যুদ্ধ থামাতে যদি উভয় পক্ষের সত্যই আগ্রহ হয়ে থাকে তবে যুদ্ধ থামবে, 'ফরমুলা'র জন্য আটকাবে না। আর যদি সে আগ্রহ না এসে থাকে তবে ইউনো'তে দুইপক্ষের প্রতিনিধিদেরই কাজ হবে ঠিক তার উল্টোটি বুঝাবার চেষ্টা করা, অর্থাৎ, প্রত্যেক পক্ষই বলবে সে যুদ্ধ থামাতে চায়,

অপর পক্ষ চায় না। সুতরাং ইউনোতে যে যা বলছে তার সঙ্গে দুই পক্ষের মনো-মত অভিপ্রায়ের মিল না থাকারই সম্ভাবনা। আমেরিকা যদি যুদ্ধ থামাবার পক্ষপাতী না হয় এবং বুঝে যে, ভারতীয় প্রস্তাবে কম্যুনিস্টরা রাজী হয়ে যেতে পারে তবে প্রস্তাবটিতে রাজী না হওয়ার পক্ষে যুক্তির অভাব হবে না। যুদ্ধ থামাবার ইচ্ছা না থাকলেও আমেরিকা ভারতীয় প্রস্তাবটি সমর্থন করতে পারে, যদি বুঝে যে কম্যুনিস্টরা রাজী হবে না। কম্যুনিস্ট পক্ষ সম্বন্ধেও এই এরকম বলা যায়। আবার যদি দুই পক্ষেরই যুদ্ধ থামাবার ইচ্ছা হয়ে থাকে তবে দরাদরি করার জন্য দুই পক্ষই কোনো প্রস্তাবিত ব্যবস্থা সম্বন্ধে এ-টা সে-টা আপত্তি তুললেও শেষপর্যন্ত একটা মীমাংসায় পৌঁছতে পারে। আসল প্রশ্ন হচ্ছে, দুই পক্ষই যুদ্ধ থামাতে প্রস্তুত হয়েছে কিনা! এ বিষয়ে উভয় পক্ষের সম্বন্ধেই সন্দেহ আছে।

উপর-উপর দেখলে দুপক্ষই নিজের নিজের মুখরক্ষা হয়েছে বলে মনকে প্রবোধ

দিতে পারে। আমেরিকা বলতে পারে, ইউনো'র হয়ে সে যে কাজে হাত দিয়েছিল সেটা করা হয়েছে, আক্রমণকারী 'aggress-ion'কে ৩৮ অক্ষরেখার ওদিকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। চীন বলতে পারে যে, 'উত্তর কোরিয়া'কে সাম্রাজ্যবাদী'রা গিলে ফেলতে চেষ্টা করেছিল। উত্তম মধ্যম দিয়ে তাদের সে চেষ্টা নিষ্ফল করা হয়েছে। কিন্তু এ তো উপরের কথা! ভিতরে দু'পক্ষেরই অন্য অনেক কথা আছে। চীন কেবল উত্তর কোরিয়ানদের রক্ষার জন্যই কোরিয়াতে 'ভলাণ্টিয়ার' পাঠায়নি, তার নিজের গরজও ছিল ও আছে। কোরিয়া থেকে সম্পূর্ণভাবে আমেরিকানদের বিতাড়িত করাই চীনের উদ্দেশ্য ছিল। বর্তমান অবস্থায় যুদ্ধের অবসান হলে দক্ষিণ কোরিয়ায় মার্কিন ঘাঁটি থাকবে, এটা সুনিশ্চিত। আইসেন-হাওয়ার এশিয়ায় মার্কিন রক্তপাতের পক্ষ-পাতী নন, এশিয়ানদের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য তিনি এশিয়ানদের তৈরী করার পক্ষপাতী। সুতরাং প্রেসিডেণ্ট আইসেন-হাওয়ারের আমলে দক্ষিণ কোরিয়ানদের খুব ভালো করে সামরিক শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ফলে দক্ষিণ কোরিয়া কেবল উত্তর কোরিয়ার পক্ষেই নয় চীনের পক্ষেও একটি বিপদের ক্ষেত্র হয়ে থাকবে। মার্কিন শক্তির পা রাখার জায়গা হয়ে থাকবে। আমেরিকা চিয়াং-কাইশেককেও ফরমোজায় জীইয়ে রাখছে। সে বিষয়েও মার্কিন নীতি যে অদূর-ভবিষ্যতে কিছু নরম হবে, সে আশা নেই, বরঞ্চ আমেরিকায় রিপাবলিকান পার্টির গভর্নমেণ্ট হওয়ায় আমেরিকায় চিয়াং-কাইসেকদরদীদের প্রভাব কিছু বাড়বে। সুতরাং চীনের এইসব সমস্যার সমাধানের কোন আশা দেখা যাচ্ছে না।

কোরিয়া যুদ্ধে আমেরিকা ও তার মিত্রেরা ফে'সে যাওয়াতে রাশিয়ার কিঞ্চিৎ সুবিধা হয়েছে সন্দেহ নেই, কোরিয়ার যুদ্ধ না হলে হয়ত তারা য়ুরোপের 'সু-রক্ষার' কাজ আরো এগিয়ে আনতে পারত। কোরিয়ায় আমেরিকার ও তার মিত্রদের শক্তি ক্ষয় হচ্ছে এটা রাশিয়ার অকাম্য হতে পারে না। আর একটা কারণে কোরিয়ার যুদ্ধ রুশ কূটনীতিকদের কাজে লেগেছে। কোরিয়ার যুদ্ধ বিশেষ করে আমেরিকার নিজের যুদ্ধ, যদিও তার সঙ্গে আরো কয়েকটি দেশ যোগ দিয়েছে। কিন্তু কর্তৃত্ব আমেরিকারই। যারা আমেরিকার সঙ্গে আছে, তারা ঠিক সমান উৎসাহীও নয়, সব বিষয়ে তারা আমেরিকার কাজকর্ম, হাবভাব পছন্দও করে না; আমেরিকা যতদূর এগুতে চায় ততদূর এগুতেও অনেকে রাজী নয়। বৃটেন ও আমেরিকা যে অনেক সময়েই এক-দিল হতে পারে না তার প্রমাণ অনেকবার পাওয়া গিয়েছে। আমেরিকার য়ুরোপীয় ও এশিয় নীতির দ্বন্দ্বও তার মিত্রদের পক্ষে অনেক সময়ে দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠে। আমেরিকা ও তার মিত্রদের মধ্যে মন-কষাকষি সৃষ্টি করার পক্ষে এই সব ব্যাপার রুশ কম্যুনিস্ট প্রচার বিশারদদের খুব কাজে লেগেছে ও লাগছে।

অন্য পক্ষে বর্তমান অবস্থায় যুদ্ধ বন্ধ করে দিতে আমেরিকারও মুশকিল লাগবে। কোরিয়া যুদ্ধ আমেরিকায় 'জনপ্রিয়' নয়। আইসেনহাওয়ারের নির্বাচনী অভিযানের একটা ধুয়া ছিল যে, তিনি কোরিয়ার যুদ্ধ শেষ করবেন। কিন্তু এরকম না-জিৎ না-হার অবস্থায় যুদ্ধ শেষ করা বোধহয় আমেরিকার লোকরা চাইবে না। যুদ্ধে আমেরিকা জিতেছে এই ধারণাটা হওয়া চাই। কোরিয়ায় মার্কিন সেনাপতিরাও অধৈর্য হয়ে উঠেছেন, তারা নাকি আরো সৈন্য-সামন্ত চাচ্ছেন, যাতে বর্তমান অচল অবস্থার শেষ করে একটা এস্পার ওস্পার করা যায়। এ অবস্থায় যুদ্ধ শেষ করলে এশিয়ায় আমেরিকার সামরিক মান থাকবে না। এ সম্বন্ধে সন্দেহ নেই যে, কোরিয়াতে চীনা ও উত্তর কোরিয়ানরা আমেরিকা ও তার মিত্রদের ঠেকিয়ে দিয়েছে, তাদের জয়ী হতে দেয়নি। এশিয়ার সামনে এই ঘটনাকে এইখানেই থেমে যেতে দিলে আমেরিকার শক্তি সম্বন্ধে এশিয়াবাসীর মনে আর সম্ভ্রম থাকবে না। এটা কি হতে দেয়া যায়? আইসেনহাওয়ার সাহেব কোরিয়াতে যাচ্ছেন ---হয়ত চলে গিয়েছেন, আমরা জানি না, কারণ তাঁর যাওয়ার সংবাদ নিরাপত্তার খাতিরে গোপন রাখা হচ্ছে---তিনি এ বিষয়ে কী মনোভাব নিয়ে ফিরে আসেন তার ওপর কোরিয়ার যুদ্ধ অথবা শান্তির ভবিষ্যৎ অনেকটা নির্ভর করছে, ইউনোতে শ্রীকৃষ্ণ মেননের যুক্তি অথবা আমাদের প্রধানমন্ত্রীর আবেদনের উপর নয়। ২৩।১১।৫২

সকালের দেওঘর

শ্রীপ্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

ঝাঁকে ঝাঁকে হরিয়াল, বুনোপাখি, আর
অনেক মাঠের পথ পেরিয়ে এলাম---
কুয়াশানিলীন ভোরে। দেওঘরে। নন্দনপাহাড়।

আঁকা বাঁকা পাহাড়ে রাস্তার
সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে। আর, একটি ঝর্ণার
গতিকে পিছনে ফেলে, তারপর,
মন্দির। প্রণাম।

মাথার ওপর,
সূর্য সবে মুক্ত করে কুয়াশার জাল।
ঘড়িতে তাকিয়ে দেখি ছটার সকাল।

রঞ্জন

ব্যক্তিবিশেষের চরিতামৃত বা যুদ্ধ-বিশেষের জয়কীর্তন, এই ছিল আদি ইতিহাস। মধ্যযুগে ঐতিহাসিক হলেন ঈশ্বরের প্রচার-সচিব। রেনেসাঁসের পরে ইতিহাস অতীতের আলোচনা করল বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে। শুধু বর্তমান নয়, ভবিষ্যতের রঙীন আশাও অতীতের ছবিতে প্রতিফলিত হলো। এদিকে স্তূপীকৃত ইতিহাস-গ্রন্থে রাশীকৃত ঘটনাতরঙ্গ পরস্পরকে আঘাত করে ফেনোদ্গীরণ করল, গর্জন করল। বেশির ভাগ ঐতিহাসিক (যথা এ্যাক্টন ও ফিশার) মুগ্ধ হয়ে তীরে বসে সমুদ্রের অপার ব্যাকুলতা, সুগম্ভীর মৌন আর সমুচ্ছল কলকথা শুনলেন। তার বেশি জানতে চাইলেন না। জনকয় উদ্ধত উৎসুক কিন্তু এতে তুষ্ট না থেকে ইতিহাস মন্থন করতে চাইলেন ঘটনাসমুদ্রের গর্ভ থেকে অর্থামৃত আবিষ্কার করবার মানসে। তাঁরা ইতিহাসকে বিবরণসর্বস্ব আত্মতৃপ্তি থেকে আত্মজিজ্ঞাসু হতে উদ্বুদ্ধ করলেন। ইতিহাসের কাছ থেকে তাঁরা ব্যাখ্যা দাবী করে বললেনঃ কেন এমন হয়েছে এবং অমন হয়নি? ঘটনাপারম্পর্যে কার্যকারণ কোথায়? ইতিহাসের বিবর্তনের সূত্রটি কী? কোন চাঁদের টানে ইতিহাসের ধারা নিরবচ্ছিন্নভাবে বয়ে চলেছে? আর বয়েই বা চলেছে কোন্ নিয়মে?

ইতিহাসের মধ্যে এই নিয়মের আবিষ্কার কে প্রথম করতে চেয়েছিলেন বলা শক্ত। 'ইতিবৃত্ত' কথাটার মধ্যে কি লুকিয়ে আছে এই বিশ্বাস যে ইতিহাস বৃত্তগতি? 'চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ,' এই উক্তিতেও অনুরূপ ধারণার ইঙ্গিত আছে। কিন্তু আমাদের ইতিহাস য়ুরোপের তুলনায় একান্ত অস্পষ্ট। ওখানে হাজার দুয়েক বছর আগে এ-বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে ইতিহাস হচ্ছে প্রকৃতির প্রতিবিম্ব, মানব-জীবনের প্রতিচ্ছবি। ঋতুমালায় যেমন গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত, বসন্ত নির্ধারিত নিয়মে ঘুরে ঘুরে আসে, ব্যক্তিজীবন যেমন শৈশব-কৈশোর-যৌবন-জরা পেরিয়ে মৃত্যুতে পরিণতি লাভ করে, তেমনি তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন যে সভ্যতার গতিও এই নিয়মের দাস। নিয়ম যখন নিয়তির মূর্তি ধরে মানুষের পুরুষকারের আত্মসমর্পণ দাবী করল, তখন এলো খৃস্টিয়ানিটি তার আশা-বাদিতা নিয়ে। অষ্টাদশ শতাব্দীর আলোক-প্রাপ্তি ও উনবিংশ শতাব্দীর যন্ত্রপ্রাপ্তিতে এই বৃত্তনিয়তির দাসত্বে বিশ্বাস আরো শিথিল হোলো।

কিন্তু কারো কারো মনে সন্দেহ রয়েই গেল যে প্রগতির অগ্রগতি অবধারিত নয়, মানুষ যেমন এগুতে জানে তেমনি পিছিয়েও পড়ে। এই নৈরাশ্যবাদীরা তাই ইতিহাসের গতির সরল রেখার সারল্যে সন্দিহান হয়ে অন্যতর নক্সার সন্ধান করলেন। ১৭২৫ খৃস্টাব্দে নেপলসের জিওভানি ভিকো চেষ্টা করলেন ইতিহাসের বিচারে বেকন্-দর্শিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করতে। এক শ বছর পরে তাঁর ফরাসি শিষ্য জুল্যে মিশলে (১৭৯৮—১৮৭৪) সেই প্রেরণায় লিখলেনঃ "পৃথিবী সৃষ্টির সঙ্গে একটি সংগ্রামের শুরু হয়েছিল এবং সে সংগ্রামের শেষ হবে শুধু বিশ্বাবসানের সঙ্গে। এ সংগ্রাম হচ্ছে প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষের, বস্তুর বিরুদ্ধে আত্মার, নিয়তির বিরুদ্ধে নিয়ন্ত্রণের। ইতিহাস এই অনন্ত সংগ্রামের কাহিনী বৈ আর কিছু নয়।" উদ্যম নিয়তির স্থান অধিকার করল।

এই প্রচেষ্টার ফল যে সভ্যতা ও সংস্কৃতি তাদের প্রকৃতি কীরূপ, গতি সর্পিল না সরল, আয়ু কতটুকু? অধুনা এই প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছেন নিকোলাই ডানিলেভস্কি (১৮২২—১৮৮৫), অসভাল্ড স্পেংলার (১৮৮০—১৯৩৬), আর্নল্ড টয়নবি (১৮৮৯—), ভাল্টার শুবার্ট, এল এস সি নরথপ (১৮৯৩—), আলফ্রেড ক্রোবার (১৮৭৬—), অ্যালবার্ট শোয়াইৎসার (১৮৭৫—), এবং নিকোলাই বের্ডায়েভ্ (১৮৭৪—১৯৪৮) প্রমুখ পণ্ডিতগণ। এ'দেরই সঙ্গে, যদিও বোধ হয় কয়েক ধাপ নীচে, নাম করতে হয় পিটিরিম সরোকিনের এবং তিনিই আলোচ্য গ্রন্থে* ভার নিয়েছেন পূর্ববর্তীদের ঐতিহাসিক দর্শনের বিশ্লেষণ ও বিচার করে তাঁর নিজের মতের সঙ্গে সাদৃশ্য ও পার্থক্য প্রকাশ করবার। বিষয়টি প্রত্যক্ষতই বিশেষ দুরূহ, রুশ লেখকের ইংরেজিও ঠিক প্রাঞ্জল নয়, কিন্তু তবু বইটি সার্থক হয়েছে লেখকের চিন্তার স্পষ্টতার গুণে। এত-গুলি মতের স্থূলে বৈশিষ্ট্যগুলির এই তালিকাকরণ ও বিশ্লেষণ অন্তত তাঁদের কাজে আসবে যাঁদের মূল বইগুলি পড়বার সময় বা সামর্থ্য নেই।

উপরের নবরত্নের ঐতিহাসিক দর্শনের মিলিত, বিভিন্ন ও বিপরীত মতগুলির মধ্যে দুটি ঐক্য লক্ষণীয়। এক, তাঁরা সবাই একমত যে ভৌগোলিক বা রাজনৈতিক সীমাবদ্ধ দেশবিশেষের ইতিহাস (যা আমরা পড়ি) ইতিহাসই নয়; ইতিহাস হবে সংহত কোনো সভ্যতা বা সংস্কৃতির, (যদিও এদুটি বস্তুর সংজ্ঞা ও সংখ্যা নিয়ে এ'দেরই মধ্যে মতভেদ বর্তমান)। দুই, ইতিহাসের যাত্রায় অবশ্যম্ভাবী প্রগতিপ্রবণতায় এ'দের কারোই অবিচল আস্থা নেই। সত্য বলতে কি, এ'রা সবাই কমবেশি নৈরাশ্যবাদী। কেউ কেউ সভ্যতার নিশ্চিত মৃত্যুতে বিশ্বাস করেন না, কিন্তু সবাই শঙ্কিত যে গত পাঁচ ছয় শতাব্দী ধরে যে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা নিরঙ্কুশ-ভাবে বিশ্বনিয়ন্ত্রণ করে এসেছে তার অবসান আসন্ন। সে সভ্যতার গোধূলিতে এই পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি আশ্যর দিবালোক সহ্য করতে পারছে না। এখন সে হয় ফিরে যেতে চাইছে অন্ধকার মাতৃজঠরের নিরাপত্তায় (যেমন বাটারফিল্ড বা ওকশট), কিংবা প্রায় অসহায় হয়ে তাকিয়ে আছে নতুন এক অবতারের আবির্ভাবের আশায়, (যেমন টয়নবি)। এই নৈরাশ্যের উৎস সেই স্থির বিশ্বাস যে সভ্যতা অনির্বাণ প্রদীপ নয়, যে সংস্কৃতির যেমন মধ্যাহ্ন আছে তেমনি সন্ধ্যা ও রাত্রিও আছে। অর্থাৎ ইতিহাস সরল রেখা নয়, বৃত্ত।

এমত কতটুকু সত্য? এ প্রশ্নের উত্তর অসম্ভব। তবে, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মানুষের আশা ও বিশ্বাস যখন শীতের পাতার মতো ঝরে যায় তখন সে বর্তমান দৈন্যের নজির খোঁজে অতীতের ইতিহাসে; তখন সে মানতে চায় যে তার আজকের জরা গতকালের ভ্রান্তি বা অমিতাচারের পরিণাম নয়, জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। এই ঐতিহাসিক দর্শন অতীতকে সত্যনিষ্ঠভাবে ব্যাখ্যা করুক আর না-ই করুক, এর প্রধান মূল্য এই যে বর্তমান মানবের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নৈরাশ্য এতে স্পষ্টভাবে প্রতিবিম্বিত। সরোকিন সাধারণের নির্বোধ আশালুতায় বাদ সেধে ভালো বৈ মন্দ করেননি।

---

* ***Social Philosophies of an Age of Crisis*** **by Pitirim A. Sorokin, (A. & C. Black, London, 20s.).**

বোদলেয়ার অবলম্বনে

আলাপ

বুদ্ধদেব বসু

তুমি সুন্দর শরতের আকাশ, স্বচ্ছ, রক্তিম!
কিন্তু আমার বুকে বিষাদ বেয়ে ওঠে, সমুদ্রের মতো,
রেখে যায়, ফিরতি টানে, আমার তিক্ত, হিম
ঠোঁটের উপর ধারালো পাঁক—স্মৃতি, জ্বালা, ক্ষত।

বৃথাই তোমার হাত আমার মুহ্যমান বুকের উপর
নেমে আসে; কী চাও, প্রিয়তমা? এখানে কিছু নেই,
শুধু বিধ্বস্ত
দেশ, নারীর হিংস্র দাঁতে আর বিষাক্ত প্রখর
ফণায় ছারখার। আমার হৃদয় আর খুঁজো না তুমি;
বন্য পশুরা
সেটা খেয়ে নিয়েছে, রক্ত, মাংস, সমস্ত।

আমার হৃদয় এক পরিত্যক্ত প্রাসাদ, জনতার দৃষ্টি এড়ায়,
সেখানে মানুষ মাতাল হয়, আত্মহত্যা করে,
হাতাহাতি করে উন্মাদের মতো!
—তোমার নগ্ন দুটি স্তন ঘিরে সুগন্ধ ঘুরে বেড়ায়।··

হে সুন্দরী, হে সুন্দর, আত্মার নিষ্ঠুর যন্ত্রণা,
এই তো চাও তুমি, এই তো!
তোমার জ্বলন্ত চোখ, যেন হাজার দেয়ালি,
উৎসবের ঝাড়,
তা দিয়ে পোড়াও ছেঁড়াখোঁড়া ন্যাকড়াগুলো, বন্য পশুরা
যা রেখে গেছে আমার!

আমার কথা

ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ

[শ্রীশুভময় ঘোষ কর্তৃক অনুলিখিত]

২৩ অক্টোবর তারিখ সকালে
তা থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরছি।
রে বাসের কাছে খুব ভীড়।
ম, তার মধ্যেই দাঁড়িয়ে আছেন
বৃদ্ধ। পিঠে কাপড়ের খোলে জড়ান
। সঙ্গে একটি প্রিয়দর্শন ছোট ছেলে,
কাঁধেও একটি বাজনা। ওস্তাদ আল্লা-
ন খাঁ। সঙ্গে তাঁর নাতি, আলী আকবর
ছেলে, আশিস্ খাঁ। যত্ন করে বাজনা
তুলে বৃদ্ধ বসলেন। বাসে সবার সঙ্গে
থেকেই আলাপ করে নিলেন। কথায়
বঙ্গের ছাপ এখনও খুব বেশি। আগেও
ছন শান্তিনিকেতনে। "তখন গুরুজী
ন। আবিসিনিয়ায় তখন যুদ্ধ ছিল।
রোপ যাব, তার আগেই এখানে ছিলাম।
যাব তখন গুরুজী বল্লেন, 'নন্দলাল!
উদ্দীনের মাথাটা রেখে দাও!' নন্দ-
র এক ছাত্র (শ্রীরামকিংকর বেইজ)
র মাথাটা রেখে দিলে মূর্তিতে। তখন,
ও দাড়ি ছিল। নন্দবাবু ভাল আছেন?"
বসে বসেই খবর নিলেন থাকা খাওয়ার
ব্যবস্থা। "রুটি পাওয়া যাবে ত? আমি
দিনে বাঙালী। রাত্রে পশ্চিমা।"

স্তাদ আল্লাউদ্দীন আছেন সংগীত
নের নতুন হস্টেলে। পুরো বাড়িটা তাঁকে
দেওয়া হয়েছে। রোজ সন্ধ্যায় যখন
কে তালিম দেন, সবাই আসে শোনে।
ন্ত আমুদে, আলাপী, অমায়িক, বিনয়ী
। চমৎকার কথা বলেন। বাজনার সঙ্গে
া গল্পগুজব, গান অনেক কিছু হয়।
গল্প, তাঁর বাজনার মতই মনোহর।
এবং রসিকতায় ভরা। এই কয়দিন
াদ আল্লাউদ্দীন নিজের মুখে তাঁর
নের গল্প বলছেন। আল্লাউদ্দীনের
র জবানীতে তাঁর জীবনী শুনুন।—
লেখক]

আপনারা 'দেবীচৌধুরাণী' জানেন ত? 'ভবানী পাঠক'—আমার পূর্ব-পুরুষেও এক 'ভবানী পাঠক' ছিলেন। দীননাথ দেবশর্মা—মুলুকগ্রামে তাঁর বাড়ি। দেবশর্মা,—কী? ব্রাহ্মণ ত? হ্যাঁ, তাই ছিলেন। তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুতে তিনি ছেলেকে নিয়ে গৃহত্যাগী হলেন। সেই বনে পাহাড়ে চলে গেলেন। কুকীদের দেশে। কুকী জানেন ত? তারা মানুষে খায়—এই যেমন আপনাদের সাঁওতাল তারা ত অনেক সভ্য হয়েছে কুকীরা এখনও অসভ্য। তারা—বাবা মা বুড়ো হলে তাদের খেয়ে ফেলে। বলে—বাবা মা আমাদের পেটে রেখেছিলেন, এবার আমরা তাঁদের পেটে রাখি। সেই কুকীদের মধ্যে গিয়ে দীননাথ বাস করলেন। কালীমন্দিরে কালীপূজো করেন। কুকীরা তাঁকে খুব ভয় পায়, ভেট এনে দেয়। দীননাথ সাধু প্রকৃতির লোক। তাঁর ছেলেকে সংস্কৃত পড়ালেন, বাঙলা পড়ালেন। ছেলে কিন্তু কুকীদের সঙ্গে পার্টি করল—এই যেমন পলিটিকাল পার্টি তেমনি। তিনি ইংরেজের খাজানা লুট করতেন। আর যত অত্যাচারী জমিদার, যারা প্রজার রক্ত শোষণ করে, তাদের টাকা লুট করে, গরীবদের দান করেন। তারপর যখন ক্লাইভ সায়েব যুদ্ধ জিতলেন, তখন ইংরাজরা পুরস্কার ঘোষণা করল—এই সব ডাকাতদের ধরে দিলে লক্ষ লক্ষ টাকা দেবে। তিনি তখন মুসলমান হয়ে গেলেন—নাম পাল্টে নিলেন। সিরাজু ডাকাত। তাঁর বাবা দীননাথ তাঁকে ছেড়ে চলে গেলেন। একদিন সিরাজু ডাকাত শিলেটে এক জমিদারের কাছে চিঠি পাঠালেন, 'অমুক তারিখে যাব, এত টাকা দিতে হবে'। সেদিন ত তাঁর দল-বল নিয়ে সিরাজু ডাকাত গেলেন সেই জমিদার বাড়ি। গিয়ে দেখলে সব ফাঁকা, বিলকুল ফাঁকা। ঘরে ঢুকে দেখলেন কেউ নেই—কেবল এক পালংকে এক শিশু মেয়ে শুয়ে আছে। সিরাজু সেই মেয়েকে নিয়ে আসলেন তাঁর সঙ্গে। **তাঁর নিজের ছেলের সঙ্গে তাকেও পাললেন। পরে সেই ছেলের সঙ্গেই তাঁর বিয়া দিলেন। সিরাজু নতুন জীবন শুরু করলেন। শিবপুরে (ত্রিপুরা) এসে বাড়ি করলেন, জমিজমা করলেন।** সিরাজু ডাকাতের ছেলের আবার তিন ছেলে—আলী আহম্মদ, সালী আহম্মদ আর জাফর মহম্মদ। জাফরের ছেলে মাদার হোসেন। তাঁর ছেলে সদু খাঁ (দীনের বাবা)। তিনি সাধু প্রকৃতির ছিলেন বলেই সাধু থেকে সদু খাঁ নাম। তাঁর আবার পাঁচ ছেলে, দুই মেয়ে—শমীরুদ্দীন, আফতাবউদ্দীন, আল্লাউদ্দীন, নায়েবউদ্দীন, হায়াত আলী—হায়াত ত ছিল শান্তিনিকেতনে। আমার বড় দিদি, সর্বজ্যেষ্ঠ—তাঁর নাম মধুমালতী। আর আমার মার নাম সুন্দরী—বড় ভাল নাম। শিবপুরের শিব—তাঁর নামেই গ্রামের নাম—জাগ্রত দেবতা। সব মানস পূর্ণ হয়। রাজা কৃষ্ণকিশোর চৌধুরী একবার চেয়েছিলেন তাঁকে উঠিয়ে নিজের গ্রামে নিয়ে যেতে। পাঁচশ হাতিতে টানল। কিন্তু একটুও নড়ল না। স্বপ্ন দিলেন রাত্তিরে—"আমাকে নিয়ে যাবার চেষ্টা কর না।" রাজা কৃষ্ণকিশোর তখন সেইখানেই ভাল মন্দির করলেন দেবত্র সম্পত্তি দিলেন। হিন্দু-মুসলমান যেই হোক, বাগানের প্রথম তর-কারি, নতুন গাইয়ের দুধ আগে, শিবকে দিবে। সেই শিববাড়িতে শিশুকালে খেলতাম, সবাই বলত শিবও খেলতেন আমাদের সঙ্গে। তাঁকে চিনতুম না। বড় বড় সাধু সেখানে গাঁজা খেত, গান করত, সেতার বাজাত। আমার শিশুকাল থেকেই সাধু সন্ন্যাসী ভাল লাগত। মা আমাকে ইস্কুলে পাঠাতেন আর পাঁচটা ছেলের সঙ্গে, বগলে বই নিয়ে বেরতুম। চলে যেতুম শিববাড়ি। সেতার শুনি, আবার ছেলেদের সঙ্গে বাড়ি ফিরি। আমার বাবা ছিলেন সংগীতপ্রিয়। কাশেম আলী খাঁ আমার গুরুর মামা। উজীর আর মামা, আগরতলার রাজসভায় আছেন। আমাদের বাড়ি থেকে ২০।২২ মাইল দূরে। চারা-বাড়ির চাল, ঘি (খুব ভাল চাল হত আমাদের বাড়িতে), মুর্গী, খাসি, ভেট দিতেন খাঁ সাহেবকে। কাশেম আলী সব শুনে একদিন বল্লেন, "২০ মাইল দূরে থেকে হেঁটে আস?" "হ্যাঁ খাঁ সাহেব, তোমার বাজনা শুনে পাগল হয়ে যাই। শিখবে? যদি পেশাদার না হও তবে এস, শেখাব।" "আমার বয়স গেছে। শিখতে পারব?" "আলবৎ হবে। তোমায় সেতার শেখাব।" **(এই সময় শ্রোতাদের কেউ জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার বাবার তখন কত**

ওস্তাদ আল্লাউদ্দীন খাঁ

বয়স?' উত্তরে বল্লেন, 'আমি তখন মায়ের পেটে। বয়সটা জিজ্ঞেস করতে পারি নি'।) বাবা সংসার দেখতেন না। মা দেখতেন, মা খুব রাগী লোক ছিলেন। মা কিছু জিজ্ঞেস করলে বাবা বলতেন, ও পাপের সম্পত্তি আমি চাই না।" বাবা সেতার বাজান। আমার তখন দেড় বছর বয়স। বাবার বাজনা শুনি, আর মার বুকে তবলা বাজাই। এই ইমনের গৎ শুনুন—বাবা বাজাতেন। এ ঢঙের গৎ আর কোথাও শুনিনি। গুরুকে শোনাতে, গুরু লাফিয়ে উঠলেন, "আরে, এত আমাদের গৎ। মামার গৎ। কোথায় পেলে তুমি?" এ জিনিস জগতে কোথাও পাবে না। (আরেকটা গৎ শোনালেন, হাত নেড়ে হাত নেড়ে, ঝোঁকের মাথায় হাতে করে কিছু দেওয়ার ভঙ্গীতে)। পরিবেশন, পরিবেশন করছে,—বলছে, একটু খান আপনি একটু খান আপনি। তারপর এই ঢিমে ছায়ানট (আশিস্ জায়গা ছেড়ে উঠতে, হেসে বল্লেন,—'কোথায় ভাগছ! আমার বাবার গৎ শোন, তোমার প্রপিতা-মহ।') দাদাকে (আফতাবউদ্দীন) শেখাবার জন্য বাবা দুই ওস্তাদ রেখেছিলেন—রাম-কানাই শীল, রামধন শীল। রামকানাই তবলা বাজায়, রামধন বেহালা। ও অঞ্চলে তাঁরাই তখন প্রধান ওস্তাদ। আমি দাদার বাজনা শুনি। আর সকালে ইস্কুল যাবার নাম করে সাধুদের আড্ডায় যাই। একদিন হেড মাস্টার আমাদের বাড়ি এসে নালিশ করলেন, "তোমার ছেলে ত ইস্কুল যায় না।" মা—"কেন? রোজ পাঠাই।" "তবে আর কোথাও যায়। দেখ খোঁজ নিয়ে।" বাবা তাই শুনে, গিয়ে দেখেন—সাধু সেতার বাজাচ্ছে, আমি ঠেকা দিচ্ছি। দাদার শুনে যা শিখেছি। বাবা ফিরে এসে বল্লেন, "শিববাড়িতে ঠেকা দিচ্ছে, এক মহাত্মা সাধুর সঙ্গে। ওকে তুমি মের না।" মা—"যেমন বাবা, তেমনি ছেলে।" মা ধরে এনে তিন দিন হাত পা বেঁধে রাখলেন, খেতে দিলেন না আর খুব মারলেন।

তিনদিনের দিন, আমার বড় দিদি, হাতেই আমি মানুষ—মধুমালতী, শ্বশুর বাড়ি ঐ গ্রামেই—এসে আ নিয়ে গেলেন তাঁর কাছে। তারপর ফিরে এসেছি। মার অসুখ। আস্তে আ মার আঁচলের চাবি নিয়ে বাক্স খুলে মুঠ যা পেলাম ১০।১২ টাকা তুলে নি একটুও যাতে শব্দ না হয়। আস্তে আ বাক্স বন্ধ করে চাবি লাগিয়ে মার আ চাবি বেঁধে পা টিপে টিপে ঘর বেরিয়েই ভাগলাম, সেই রাত্রেই মানিক স্টেশনে—ডাকাতের বংশের ছেলে নারায়ণগঞ্জ হয়ে এলাম শিয়ালদহ। দিকের গাড়িঘোড়া, আলো, বাড়িঘর ঘাবড়ে গেলাম। গ্রামের ছেলে, হাতে বোচকা আর আটটা টাকা। হ্যারিসন ধরে চলেছি গঙ্গার পুলের দিকে। কাতায় তখন রাস্তার মাঝখানে ই থাকত। সেই সব দেখতে দেখতে মাঝে মাঝে বসছি, মাঝে মাঝে দাঁড় আর বাড়িঘর দেখছি। ছেলেরা সব যাচ্ছে, আর আমায় দেখে একবার একবার ওকান টেনে পালাচ্ছে, ভাব আবার কোন ভূত! হ্যাঁ, সত্যি কথা আর কান টেনে পালায় কলকাতার ছে এইভাবে গঙ্গার ধারে আসতেই সন্ধ গেল। খুব খিদে পেয়েছে—গঙ্গা তখন উড়েদের করা চমৎকার ড পাওয়া যেত—খুব ভাল খেতে। পয়সার কিনে খেলাম। জল খাব। আর জলের কলটল জানি না। গঙ্গায় লোনা জল। ভাবলাম, 'আহ জল খায় এ দেশের লোক?' রাত্রে বাঁধান ঘাটে বোঁচকা মাথায় শুয়ে সকালে উঠে দেখি বোঁচকা নেই। কাঁদতে লাগলাম। এক সিপাহী পুলিস, এসে বল্ল, "ক্যায়া "সিপাহীজী আমার বোঁচকা চুরি "আরে তুমি বোকা ছেলে। ও কেউ বোঁচকা রাখে। কত টাকা "আট টাকা!" কাঁদতে কাঁদতে নিম এলাম। সেখানে সাধু বসে আছে এই বড় বড় জটা। এক মহাত্মা ব ধুনী জেলে,—তাঁর চার পা সাধুরা। খুব গাঁজা চলছে। গি পড়লুম। সাধু বল্লেন, "কুছ পরে গঙ্গা নাহাও।" গঙ্গা নেয়ে এল ভস্ম দিলেন। খেলাম। বল্লেন, " সিধা গেলাম, এক কাঙালী

জায়গায়। যত খোঁড়া, নুলো, অন্ধ, কানা জুটেছে, তাদের ভাত, শাক, ডাল দিচ্ছে এক ব্রাহ্মণ পরিবেশক। আমায় দাঁড়াতে দেখে ব্রাহ্মণ বল্ল, "কী খোকা! খাবে?" খুব খেলাম—মোটা ভাত, ডাল, শাক। "যাও এবার জল খাও।" "কোথায় যাব! সেই গঙ্গায়?" "গঙ্গা কেন? ঐ নল রয়েছে।" সেই শিখলুম জলের কল। সামনেই কেদার-নাথ ডাক্তারের ডিস্‌পেন্‌সারী—ভাল বারান্দা, সেইখানেই ঘুমোলাম। রোজ এক-বেলা গঙ্গাজল খাই সাধু বলে দিয়েছেন আরেক বেলা লঙ্গরখানায়, আর ঐ কেদার-ডাক্তারের ডিস্‌পেন্‌সারীর বারান্দায় শুই। একদিন জিজ্ঞেস করলেন কেদার ডাক্তার "এই ছোক্‌রা, কে তুমি?" "আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছি। ত্রিপুরায় বাড়ি। গান বাজনা শিখতে চাই।" "কী গানবাজনা? দুষ্টু ছেলে? চুরিটুরি করবে না ত?" "আজ্ঞে, কোন ওস্তাদ আপনার জানা থাকলে যদি দেখিয়ে দেন।" "ওস্তাদ? জুতো মারব? বেরও।" "আজ্ঞে, দয়াকরে আমায়, তাড়িয়ে দেবেন না। আমি এখানেই শুয়ে থাকব। আপনি যাবার সময়ে ঘরে তালা দিয়ে যাবেন।" থাকি সেখানে। ছোট ছোট ছেলেরা ওষুধ কিনতে আসে, জিজ্ঞেস করে, "খোকা, তুমি কে? কোথা থেকে আসছ?" "ত্রিপুরা থেকে এসেছি, গানবাজনা শিখতে চাই। এক ওস্তাদ দেখাবে?" কেউ শোনে, কেউ শোনে না। কেউ কেউ দু' এক পয়সা দিয়ে যায়। একবেলা গঙ্গাজল খাই—সাধু বলে দিয়েছেন,—আরেক বেলা লঙ্গরখানা। এর মধ্যে একটি ছেলে একদিন শুনে বল্ল, "আমি শিখি এক ওস্তাদের কাছে। তোমায় নিয়ে যাব।" গেলাম লুলু গোপালের কাছে। বিখ্যাত ধ্রুপদীয়া, খেয়ালও গান। যতীন্দ্র-মোহনের কোর্টের গাইয়ে। লুলু গোস্বামী বল্লেন, "১২ বছর সুর সাধনা করতে হবে।" "জীবন পর্যন্ত শিক্ষা করব।" বেশি কথা বলতে পারি না—চারপাশের ঐশ্বর্য বিছানা-পত্তর কাপড়চোপড় দেখে ঘাবড়ে যাই। সাধু বলেছে গঙ্গাজল খেতে—তাই খাই একবেলা, আরেক বেলা লঙ্গরখানায় ভাত। সুর সাধি—একহাতে তানপুরা, আরেক হাতে বাঁয়া ধরি, একপায়ে মাত্রা গুণি, আরেক পায়ে তাল। এই হল গুরুর মূলমন্ত্র—শিষ্যদেরও তাই শেখাই—নাতিকেও শেখাই। ৩৬০ রকম পালটা করালেন গুরু। তার সঙ্গে তাল। তাতে এমন পাকা হলুম, যা শুনি, তাই ধরে ফেলি। সুর সাধনা খুবই দরকার—সরগমই ত অক্ষর। এরা ত কেউ করে না। কিছুদিন শিখলাম। তারপর তিনি মারা গেলেন প্লেগে। হতাশ লাগল—আর ত শিখতে পারব না। বিবেকানন্দের ভাই হাবু দত্ত। সিমলায় থাকেন। বিবেকানন্দের ঘরের সবাই ওস্তাদ। বিবেকানন্দ ভাল ধ্রুপদ গাইতেন। হাবু দত্ত ক্ল্যারিওনেট, সেতার, অনেক ইন্স্ট্রুমেন্ট বাজাতেন। ন্যাশনাল থিয়েটারের কনসার্ট তৈরী করতেন। গেলাম তাঁর কাছে। "কী শিখবে, গান শিখবে?" "আজ্ঞে না যন্ত্র শিখব। বেহালা।" ইংরিজী ব্যাণ্ড, শানাই শুনে বড় ভাল লাগত। শিখতে লাগলাম। হাবু দত্তের তৈরী কন-সার্টের সুর—ইমন। একেকদিন চার পাঁচটা গৎ শিখি। এক মাসে ওঁর খাতা শেষ করে দিলাম। নদুবাবু লুলুবাবুর সঙ্গে মৃদঙ্গ, তব্‌লা বাজাতেন। তাঁর কাছে তব্‌লা, মৃদঙ্গ শিখি। হাবুবাবু বল্লেন, "ঠিক আছে, সব যন্ত্র শেখাব।" চাকরিও ঠিক করে দিলেন মিনার্ভায়। ১২ টাকা মাইনে। গিরিশ ঘোষ প্রোপ্রাইটার। সরাব্‌ খেয়ে এই মস্ত্‌ হয়ে আসতেন। দানীবাবু, চুনীবাবু, এঁরা সব ছিলেন। নৃপেন বসু নাচ শেখান। সে সব কী বাজনা! কী গান! মর্জিনার গান—"বাজে কাজে মিন্‌সেকে আর যেতে দেব না," "লেও সাকী দাও ভর প্যালা"—এই ত গান। ওরা মনে করে এমন গুণী আর নেই। একদিন তবলা বাজাচ্ছি। গিরিশ ঘোষ বল্লেন—"নেড়েটাত বেশ বাজায়। এই চুনী, নিকেল—দেখ। এই নেড়ে, তুই কি আমাদের কাছেও নেড়ে থাকবি।" আমার ভয়, সরাব্‌টরাব্‌ খেয়ে কী করেন! পিঠে থাবড়া দিয়ে বল্লেন—"তোর নাম হল প্রসন্ন বিশ্বাস।" বেতন পেলেও কাঙালী ভোজন ছাড়িনি। লোবো সাহেবের কাছে যাই ভায়োলিন শিখতে। সাহেব বলে—"নিগারকে শেখাব? যাও। গেট্‌ আউট্‌। মেম সাহেবটি ভাল ছিলেন। তাকে বলে সব হল। ইংরিজী মাত্রা, নোটেশন শিখলাম। (একটা দম দিই, দাঁড়াও, চাঙা হয়ে নিই)। লোবো সাহেব আসলে গোয়ানীজ। ইডেন গার্ডেনের ব্যান্ড মাস্টার। তাঁর শিষ্যের কাছে কর্নেটও শিখছি। হাবু দত্ত ক্ল্যারিওনেট শেখান। মেছোবাজারের হাজারী ওস্তাদের কাছে শানাই, নাকাড়া, টিকারা। আড়াই বছর শিখলাম। বড় অহংকার হল। মুক্তা-গাছার জগৎকিশোর আচার্যের কাছে অনেক বড় ওস্তাদ যান। কর্নেট, শানাই, বেহালা নিয়ে গেলাম তাঁর কাছে। তখন পুজো। কর্নেটটা ভাল বাজাতাম। পুকুরপাড়ে সন্ধ্যায় রাজা বেড়াচ্ছেন। "কী চাও?" "আজ্ঞে সাত বচ্ছর সুর সেধে এত বিদ্যা শিখেছি। বাঙলাতে ত নেই-ই, ভারতবর্ষেও আমার মত ওস্তাদ নেই।" "ব্যাটা কি পাগল হয়েছে নাকি? কী যন্ত্র বাজাও?" "পৃথিবীর সব বাজনা বাজাতে পারি!" থিয়েটারের কুসঙ্গে এই শিক্ষা। "সকাল ৮টায় আসবে।" ৮টা ত ৭টাতেই চলে গেলাম। দেখলাম বড়-সুন্দর-দাড়ি একজন সরোদের তরফ মিলাচ্ছেন, রাজা পাত্রমিত্র সব বসে আছেন। তোড়ীর সুর বাঁধছেন—আর আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে। যেই যন্ত্রটা বেঁধে নিখাদ থেকে সা পর্যন্ত একতান দিয়েছেন—আর হো হো করে কেঁদে উঠলাম। যখন শেষ হল—কাঁদতে কাঁদতে পা-টা জড়িয়ে ধরলাম—"আপনি আমার গুরু। আপনার রান্নাবান্না ঘর ঝাঁট দেওয়া যাবতীয় সব কাজ করব। আমাকে এমন বাজনা শিখিয়ে দিন।" "রো মৎ" রাজা বল্লেন, "এখনই সাক্‌রেদ্‌ করে দেব তোমাকে।" সেদিনই সাক্‌রেদ্‌ হলাম। তখন বয়স আমার ১৬।১৭ হবে। ওস্তাদের নাম আহ্‌মদ্‌ আলী। রামপুরের। আবেদ আলীর ছেলে। এঁর পূর্বপুরুষ, বাহাদুর শাহ-র কাছে ছিলেন। আহমদ্‌ আলী চাকরি করতেন ঘুঘুডাঙ্গায় দুলিচাঁদ মারওয়ারির কাছে—গণপৎ রাও, বাদল খাঁ, তারাবাঈর মত গুণীরাও এঁর আসরে আসতেন। প্রথমে আহমদ্‌ আলী রুটি মাংস পোলাও রাঁধতে শেখালেন। পাক করতে পারতেন ভাল। আমি মাংস খাই না—মাঝে মাঝে রুটি মাংস কাঁচা থাকত।

সারেগামা যা বাজাতে দিলেন, সব এক বছরেই ঠিক হল। আহ্‌মদ্‌ আলী যেখানে যেখানে বাজাতে যেতেন আমিও যেতাম। ওঁর সঙ্গে তবলা, বেহালা বাজিয়ে ২৫, ৩০ টাকা পেতাম। তাঁর টাকাও আমার কাছে রাখতেন। দরকারের সময় চাইতেন। যা বাজান, শুনি। সকালে চা খেয়ে আহমদ্‌ আলী চলে যেতেন কলকাতায়। আমি রাঁধার সময়, রান্নাঘরে বসে, তাই বাজাই—চুরি করে। চার বছর পুরা এই করলাম। একদিন তোড়ি বাজাচ্ছি। আহমদ্‌ আলী ফিরে এসে এক ঘণ্টা বাইরে দাঁড়িয়ে শুনলেন। তারপর দরজায় টোকা দিলেন—"তুম্‌ চোর হ্যায়, ডাকু হ্যায়। (ডাকাতের বংশধর আমি, মার থেকে টাকা চুরি করেছি, বিদ্যা চুরি ত

সরোদ হাতে ওস্তাদ আল্লাউদ্দীন

করবই), বেরও!" বলি, "আমি আর করব না। কিন্তু বলুন এ সব বাজনা কি খারাপ?" "হাত তৈরী কর আগে। রেওয়াজ কর।" ওঁর সঙ্গে একবার পাটনা, বনারস গেলাম। দুজায়গাতেই হাজার ৪।৫ টাকা জমল। "চল রামপুরে।" গেলাম। খোলার বাড়ি মাটির দেওয়াল। আমাকে রাখলেন দূরে পায়খানার কাছে, এক ঘরে। গন্ধে কষ্ট পাই আর ওস্তাদ জিজ্ঞেস করেন, আল্লা-উদ্দীন চা খাও, কষ্ট হয় নি ত? "আজ্ঞে গন্ধে......।" এঁর মধ্যে ওস্তাদের মার সঙ্গে একদিন দেখা হল। তারপর ওস্তাদকে বল্লাম, "গুরুদেব আপনার সব পয়সা যা দিতেন, তার হিসেব নিন।" "আছে নাকি কিছু? আমার আগের চাকররা ত কখনও কিছু ফেরৎ দেয় নি। তারা বলত সব খাওয়ার বাবদে খরচ হয়ে গেছে।" দিলাম, বাক্স ভর্তি সব মোহর। (আমারটাও দিলাম গুরুদক্ষিণা। তাছাড়া কাঙালী ভোজনটা তখন বন্ধ হয়েছে কিনা, ওঁর কাছেই খাই।) গুরুর মা বলেন, "এ ত দেবতা? আর কেউ কি কখনও ফেরৎ দিত?" বাবা মা দুজনেই খুব খুসি হলেন। তখন আরেকটা একটু ভাল ঘরে জায়গা পেলাম। কাপড় সেলাই করে পরি। মোটা রুটি খাই। দিন দশ বাদে একদিন দেখি গাড়ি ভর্তি ভর্তি ইঁট আসছে। "আল্লাউদ্দীন ইঁটগুলো নামাও।" কী কুক্ষণেই দশ হাজার টাকা ফেরৎ দিয়েছিলাম তাই দিয়েই ত নতুন বাড়ি উঠছে।

তারপর চুন সুরকি মিস্ত্রী এল—"আল্লাউদ্দীন একটু হাত লাগাও।" "হ্যাঁ, গুরুজী, জরুর" বলে হাত লাগালাম। ইঁট বয়ে—শূলরোগ হল—এখনও আছে। (তোমরা বাবা সব ভাল করে শিক্ষা কর। গুরুজী ইস্কুল করেছেন। গুণী ব্যক্তিদের এনেছেন। আমি ত সে সুযোগ পাইনি।)। একদিন আবেদ আলী ডেকে বল্লেন, "দেখ বাবা, এক ডাক্তারের কাছে যদি অসুখ না সারে, তখন লোকে আরেক ডাক্তারের কাছে যায়। আমার ছেলের কাছে যা শিখেছ, শিখেছ। এবার আরেক জনের কাছে যাও।" আমি ভাবি আমায় বুঝি তাড়িয়ে দেবেন। কেঁদে পড়ি। "কোথায় যাব। কার কাছে যাব?" "উজীর খাঁ সাহেব আছেন। তাঁর কাছে যাও।" যাই উজীর খাঁর কাছে। যাই, দেখাই হয় না। দরওয়ান বলে, "নেই হোগা, কার্ড আছে?" ৬ মাস গেল এই-ভাবে। থিয়েটারের ৬।৭ টাকা মাত্র তখনও ছিল। ভাবলাম আমার মত গরীব লোক কি আর শিখতে পারবে? কিন্তু বাঙলা দেশে মুখ দেখাব কী করে, যদি মানুষ না হলুম? ঠিক করলাম জীবন দেব। দুতোলা আফিম কিনলাম। সেদিন ভোরে নামাজ পড়ছি। মনটা উদাস। এক মৌলভী জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার মন কেন এমন উদাস?" মসজিদে মিথ্যা কথা বলা মহাপাপ। তাই স্বীকার করলাম, "আফিম কিনেছি প্রাণ দেব। বাজনা শিখতে পেলুম না, কী হবে জীবন রেখে।" "আরে, আরে বাজনা শিখবে। অন্য ওস্তাদের কাছে যাও।" "কেউ শেখায় না।" "আরে তুমি জাহের আদ্‌মি আছ। শোন—হিম্মতে মর্দা, মদতে খুদা—চেষ্টা কর। চেষ্টা করলে খুদাকেও পাওয়া যায়।" মৌলভী একটা আর্জী লিখে দিলেন—"আমার নিবাস ত্রিপুরা। আমি সরোদ শিখিতে এতদূর আসিয়াছি। আমি আফিম খাইয়া প্রাণ দিব।" উজীর খাঁ কবিও ছিলেন। তাঁর নাটক ছিল 'ভর্তৃহরি'। নবাব যাচ্ছেন সেই থিয়েটার দেখতে। মোটরে। আমি ছুটে গিয়ে দুহাত মেলে রাস্তা বন্ধ করে দাঁড়ালাম। সিপাই সান্ত্রীতে আমায় নিয়ে টানাটানি। দেখায়, আমরা কেমন কাজের, বুঝতে পারি। নবাব বলেন, "কী ব্যাপার? কী চাও?" আর্জী এগিয়ে দিলুম। নবাবের প্রাইভেট সেক্রেটারী পড়লেন—"আপনার দরবারের উজীর খাঁ, তাঁর কাছে বাজনা শিখিতে চাহি। তাহা না হইলে আমি আফিম খাইয়া প্রাণ ত্যাগ করিব।" শুনেটুনে নবাব বল্লেন, "কোথায় আফিম, দাও দেখি।" আফিমের গুলি দুটো নিয়ে নবাব লোফা-লুফি করতে করতে বল্লেন—"তুমি ত বড় জাহের আদমি আছ। চল, থিয়েটার দেখব না, আমার সঙ্গে এস।" হামিদ মঞ্জিল নবাবের প্রাসাদ। নবাব জিজ্ঞেস করলেন, কী যন্ত্র বাজাও, আন।" যন্ত্র আনলাম, সরোদ, বেহালা। রামপুর দরবারে সাতশত গাইয়ে বাজিয়ে। বড় বড় তবলচি। একটু আলাপ করলাম—সেই চুরি-করা আলাপ। নবাব বল্লেন, "তুমি ত সরোদ শিখেছ, আর কী শিখবে?"

"বীণা।"

"বীণা ত এরা ছেলেকে ছাড়া আর কাউকে শেখায় না। আমি অবশ্য শিখেছি।"

"আপনি নিজে শেখান।"

"আমার গানের সঙ্গে সংগৎ করতে পারবে?"

"হাঁ পারব।"

বেহালা তখন ভাল বাজাই, ধরলাম। শুনে নবাব খুসি—"চাকরী কর আমার দরবারে।"

"আজ্ঞে না, চাকরী করব না, বিদ্যা শিখব।"

গান গেয়েছিলেন একটা বেহাগের হোরি "যমুনা জলে, সখি, ক্যায়সে যায়ু।" বাজাব

কি গান শুনে মুগ্ধ। বলি হুজুর, আরেকটা গান।"

"ক্যায়া, হুকুম কর রাহা হ্যায়! আচ্ছা তুমি ত হারিয়ে দিলে আমাকে ঠিক ঠিক বাজিয়ে। এবার বাজাও ত টপ্পা।" এটা বাজাতে পারলাম না।

নবাব হেসে বল্লেন, "এই মরা মরা।"

"হুজুর আমি ত মরাই। এসব শেখান।" নবাবের কথায় তখন প্রাইভেট সেক্রেটারী খাঁ সাহেবকে নিয়ে এলেন। নবাব উজীর খাঁকে বল্লেন, "খাঁ সাহেব, এই বাঙালী জাত, জঙ্গালের জাত। এ দেখুন এসেছে, ত্রিপুরা থেকে। ছ'মাস আপনার বাড়ির দরজা থেকে ফিরে এসেছে। আজ বলছে প্রাণ দেবে। আপনি একে শেখান। কাশেম আলির শিষ্য এর বাবা।" তক্ষুনি নাড়া বাঁধার পালা হল। বড় বড় থালা মিঠাই এল। সাদা পাগড়ি এল। গুরুদেব প্রথম নবাবকে নাড়া বাঁধলেন (প্রথম শিষ্যকে আবার বাঁধতে হয়, নতুন শিষ্যগ্রহণের সময়), তারপর আমাকে। সত্য করলাম—"আমার বিদ্যা কুপাত্রে দেব না। কুসঙ্গে যাব না। বিদ্যা ভাঙ্গিয়ে ভিক্ষা করব না। বাঈজী বেশ্যাকে গান শেখাব না।" চারিদিকে রটে গেল এক বাঙালী নবাব বাহাদুরের গাড়ি আটকেছে। পুলিশ ডিটেক্‌টিভ আমি বাঙালী, বোমা মারি কি না খোঁজ নিল। নবাব তাই জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি বোমা মার না ত?"

"আজ্ঞে না, তবে যদি শেখান তবে সুরের বোমা মারতে পারি।"

রয়ে গেলাম গুরুর সঙ্গে। সারাদিন গুরুর জুতো, হুঁকো, পানদান, মেডেল পরিষ্কার করি। খুব সন্তুষ্ট হতেন। দিনের বেলা রেওয়াজ করবার সময় পেতাম না। রাত্রে ৭টার সময় বসতাম রেওয়াজ করতে। ভোর ৪টায় উঠতাম। সকালে নামাজ করে এসে মাটির হাঁড়িতে গোবর মাখিয়ে একটু চা খাওয়া হয়, বাসি রুটি লবণ দিয়ে খাই। একদিন চা'টা খেয়েদেয়ে তৈরী হয়ে বাজাচ্ছি—ভৈরবী বড় ভালবাসি আমি। দেখি এক কাবলী এসে হাজির—এই পর্যন্ত দাড়ি। "আমি আসতে পারি?" আমি বাজিয়ে চল্লাম। ১ ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা বাজনার পর চোখ খুললেম। "অনেকদিন থেকেই ঘুরছি এখানে। তোমার বাজনা শুনি। চা খাওয়াতে পারবে?" চা তৈরী করলাম। তিনি তখন ঝোলার থেকে একটা কাল কটোরা বের করলেন। আগুনে দিয়ে কী টিপ দিলেন, সেটা সোনা হয়ে গেল। "তুমি এটা ভাঙ্গিয়ে আন। রোজ চা খাওয়াবে।"

"তা এই সোনার কী দরকার! চা, আপনি এমনিই রোজ খেয়ে যাবেন।"

"আঃ, যাও ত, আমার দরকার আছে।"

রামপুরের সুন্দরলাল আমার কাছে তবলা শিখত। তার কাছেই প্রথমে গেলাম। কী জানি, পুলিশে ধরে যদি। সুন্দরলাল দেখে ত বল্ল, "আরে এ ত আসলি সোনা—কোথায় মিল্ল?"

"এক মহাত্মা দিলেন।" তিন তোলার টাকা দিলাম তাঁকে। রোজ তিনি চায়ের সরঞ্জাম আনতেন। ৭ দিন চা খেতেন, ৮ দিনের দিন একটা রুটি। এক মাস ছিলেন। যাবার আগে তমসা নদীর জলে ৭ দিন গলা-জলে নেমে রইলেন। তারপর একটা মাদুলী তৈরী করে দিলেন আমাকে। আপনারা কি বিশ্বাস করবেন একথা? বল্লেন, "এটা তোমার। রেখে দেবে। খুব উপকার হবে। আমি চলে গেলে শনিবার ধুনো দিয়ে হাতে বাঁধবে।" তাই করলাম। ঘুমের থেকে উঠে দেখলাম দুটো দৈত্যের মত আমার দুপাশে শুয়ে। "সর্বনাশ, এটা কী? স্বপ্ন দেখছি নাকি?" মাদুলিটা খুলে ফেল্লাম। দেখি আর নাই। কী ব্যাপার! আলাউদ্দীনের চেরাগ্ পাব নাকি? ২য় দিনও তাই—চক্ষু মেলে দেখি আর ভয় পাই। এই বড় বড় লোম, নিজের চোখে দেখেছি। ৩য় দিন ফেলে দিলাম তমসার জলে। গুরুদেবকে বল্লাম। তিনি শুনে বল্লেন, আরে আরে করলে কী? তোমাকে দুজন জামিন দিয়ে গেছল—যা বলতে তাই করত ওরা। তুমি মহা-বেয়াকুব আদমি। আমাকে দিয়ে দিতে!"

গুরুদেব কখনও রামপুর ছেড়ে কোথাও যেতেন না। কাশ্মীরের রাজা একবার এলেন—এই বড় পাগড়ি—এত বড় পাগড়ি কোনও রাজার দেখিনি। বাজনা শুনে বল্লেন, "চলুন, কাশ্মীর দেখে আসবেন।"

তা গুরুজী বল্লেন, "পরে দেখা যাবে।" গুরুজী খুব সম্মানী লোক ছিলেন। দরবারে খুব বড় বিশিষ্ট অতিথি এলে তখনই বাজনা শোনাতে যেতেন। এমনিতে কখনও শোনাতেন না। তাঁর মাইনেই ছিল ৭০০, টাকা। এছাড়া ১০০০০ টাকা আয়ের জমি। নবাব বাড়ি থেকে তার বাঁক ভর্তি ভর্তি খাবার আসত। ৫০ বাঁক ভর্তি খাবার। পোলাও, কাবাব, বিরয়ানী, কোপ্তা, পান-জর্দা। দেখে মনে খেয়ে ফেলি। মাঝে মাঝে পে[illegible] গুরুজী ছিলেন মাংস খাওয়ার [illegible] বলতেন, "সকালবেলা রুটি দিয়ে খাও, টান দাও, গলা খুলবে। [illegible] কেন? মাংসই খেলি না?"

"গুরুদেব, মনে হয় কী কুকুরের না কী খাচ্ছি?"

"আচ্ছা, আমি রাঁধব—খেয়ে দেখ।"

একদিন শামী কাবাব করলেন। নিয়ে শুঁকে শুঁকে দেখি—

গুরুজী ধমক দিলেন—"এই, দেখছিস কী? খাস ত ব্যাটা মছলি পানী।" ভয়ে ভয়ে খেলাম। খেলাম। বড় ভাল লাগল। "হুজুর, আরও একটা দেন।" এ[illegible] আট দশটা খেয়ে ফেল্লাম।

চুপসা মিঞার কবরের কাছে বাড়িতে আমি থাকি। একটা [illegible] অপর সাইডে গুরুর বাড়ি, [illegible] দর্গা। নবাব বলে দিয়েছেন, "[illegible] রোজ সেবা করবে। টাকা-পয়সায় [illegible] পাওয়া যায় না। জান ত?" [illegible] গেলাম। ৮টার সময় গুরুদেব [illegible] পায়খানায় বদনায় জল দিলাম, [illegible] দিয়ে ধুলাম। রোজ এই কাজ ক[illegible] যন্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। এই[illegible] ২॥ বৎসর। এক ঘণ্টাও কেউ [illegible] পারত না। রামপুরের একটা [illegible] ছিল। অর্কেস্ট্রা। ৭০০ যন্ত্রী [illegible] মহম্মদ হুসেন খাঁ—এই মাস্টার [illegible] খাঁর গুরুর ভাই, আর এনায়েৎ [illegible] তিনি ছিলেন সেই অর্কেস্ট্রার [illegible] তিনির কাছে যেতাম। তা তিনি বল্লেন, "মন্ত্র নাও তুমি, আমার কাছে।" বেরিলীতে তাঁর [illegible] সাধুর কাছে। গুরু হাত ধরে "আরে মহম্মদ হুসেন, এর ত [illegible] দিকে মন। সেদিকেই এর [illegible] সাধনা। এদিকে নাইরে তার [illegible] আমার কাছে এনেছ কেন?" [illegible] হুসেনেরও সাকরেদ হলাম। তিনি বীণকার। ১২টার সময় গুরুর কা[illegible] তাঁর কাছে যেতুম। খাওয়ার [illegible] জল খেতাম, পেট ভরে যেত। এক [illegible] ছোলা। খুব উপকারী জিনিস। মটরবালী। আর এক ব্যান্ড মাস্টার রাজা হোসেন খাঁ। লক্ষ্ণৌর [illegible] ছেলে—ধ্রুপদ হোরি গাইতেন। তিনি

পৌত্র ও দৌহিত্রকে শিক্ষাদানরত ওস্তাদ আল্লাউদ্দীন খাঁ। ডানদিকে উপবিষ্ট সরোদ হাতে আশীষ খাঁ

খুব তারিফ করলেন। সেখানে ... মুস্তাক হুসেনের শ্বশুর ... হুসেনের ঠাকুর্দা হায়দার হুসেন ... হুসেন খাঁ। বেহালা শুনে ... "আরে এখানে চলে এস।" ... খাঁ ধ্রুপদ হোরি গান, ব্যাণ্ড ...। আমি হবু দত্তের ব্যাণ্ড ... হুসেন ব্যাণ্ডের গৎ তৈরী ... সেগুলো ভেঙে চুরে আমি টিউন ... দিই। রাজা হুসেন বলেন, ...মাকে অনেক ধ্রুপদ দিব, তুমি ...।" আমার গুরু তখনও শিখাচ্ছেন ... একদল গাইয়ে থাকে তাদের ...। বড় বড় গাইয়ে যেই গেয়ে ... হুকুমে, তক্ষুনি তারা ... সেই রকম করে গেয়ে যাবে। রাজা 'নকল কর' অমনি হীরালাল ... ঠিক ফৈয়জ খাঁর মত করে গেয়ে ... হাসিয়ে মারবে। ঐ ছিল ওদের ... দাড়িওয়ালা বাহাদুর, আলি ...—এরা ছিল সব নক্কাল। এদের ...নেক পেয়েছি।

আমার লজ্জার কথা বলি—মা ...তিরা সব আছেন, ত্যক্ত হবেন না। ...ড়ি গাঁয়ে। গৃহস্থলোক। বাড়িতে ...। তাঁরা যখন বাইরে যান, দুটো ... লোক পিছনে লাগে। বড় বৌদি সাহসী। তিনি একদিন বল্লেন লোকটাকে, "আমরা গৃহস্থ বউ, আমাদের পেছনে লেগেছ, লজ্জা করে না?" দাদাকেও জানালেন সেকথা। পঞ্চায়েৎ বসল হিন্দু-মুসলমান মিলে লোকটাকে দণ্ড দিল। আমার স্ত্রী সেইদিনই ফাঁসি দেবার চেষ্টা করেন। তাঁর মনে হল "আমার উপর কুদৃষ্টি দিয়েছে। কোনদিন ধরে নিয়ে যাবে। আমার কলঙ্ক হবে।" তিনবার ফাঁসি যাবার চেষ্টা করেছিলেন। এ আমার স্ত্রীর কথা শুধু নয়—বঙ্গললনাদের কথা, সতীত্ব। আমার গুরুর কাছে তার এল। বেয়াদবীর কথা বল্লাম মনে কিছু করবেন না। গুরুদেব ত তার পেয়ে অবাক—"আরে আরে বাবু আছে কোথায়—পিয়ারা মিঞা, মজ্‌লা সাহাব, ছোটা সাহাব বাবু কোথায়।" বাঙালীকে ওরা বাবু বলে। গুরুর ছেলেরা বলেন, "হুজুর, সেত রোজই ১২টা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকে," "তোমরা তাকে শিখালে না কেন?" "আপনার অনুমতি নেই, কেমন করে শেখাই।" "ডাক তাকে।" ডাক শুনে তাড়াতাড়ি গেলাম। বল্লেন, "আমি কে?" "খোদা।" "আরে আরে ওস্তাদ বল। কে কে আছে তোমার?" "বাবা মা ভাই দাদারা, দিদিরা।" "বিয়ে করেছ?" মাথা নত করে রই। "কেন বিয়ে করলে?" "বাবা মা দিয়ে দিলেন।" কবে?" "মনে নেই, আমার তখন বছর ৭ বয়স।" গুরু শুনে হাসতেও পারেন না?—"এত ছোট বয়সে তোমাদের বিয়ে হয়?" "বাবা আর শ্বশুরের বন্ধুত্ব ছিল, তাই।" একথার পর ডাকলেন তাঁর ছেলেদের (নসীর খাঁ, নজীর খাঁ, সগীর খাঁ—নসীর খাঁর ছেলে হচ্ছেন দবীর খাঁ)। তাদের বল্লেন, "পিয়ারা মিঞা, মজ্‌লা সাহাব, ছোটা সাহাব আজ থেকে আল্লাউদ্দীন তোমাদের ভাই হল। তোমাদের যা তালিম দিয়েছি, সব তোমরা একে দাও। আমিও শিখাব।" এই শুরু হল আমার শিক্ষার, আমার স্ত্রীর ফাঁসীর খবর পেয়ে।

আমাদের ব্যাণ্ড মাস্টারও গুরুজীর শিষ্য। তিনি এসে বল্লেন, "হুজুর, আমি ত এক প্রার্থনা চাই। এই বাবুকে দিন। আমাদের ব্যাণ্ডে বাজাবে। ও অনেক মদৎ করে।" শুনলেন। দিলেন। ব্যাণ্ড পার্টিতে এক ঘণ্টা বেহালা বাজাতাম, পেতাম ১২ টাকা, সেই কলকাতার ১২ টাকা। চানা খাওয়া তখন শেষ হল, গুরুর কাছেই খেতাম। আমার গুরুমাতা তিনিও খুব ভাল সেতার বাজাতেন। তাঁর গৎ একটা শুনোই। রাত্তিরে যখন বাজাতেন, শুনতাম—পিছে থেকে গুরু বলতেন, "তোমার মা বাজাচ্ছেন। মা, তোমার গৎ একে শিখিয়ে দাও।" গুরুমাতা মহরমে মর্চিয়া গাইতেন—কাঁদিয়ে দিতেন। গুরুজী বাজাতেন সারারাত, ১২টার পর। তারপর ঘুম ৮টা পর্যন্ত। সে কী বাজনা, মনে হত "ভগমান আ গয়া।" গুপী দত্ত গাইতেন ভাল। খুব সুন্দর দেখতে ছিলেন। শ্যামবর্ণ। আমার কাছে ছবি আছে। ৪০।৫০ বছরের। মারা গেছেন, তখন বয়স ৬৫। ৩০ বছর শিক্ষার পর গুরুজী আদেশ দিলেন "দেশভ্রমণ কর, শিক্ষা, দীক্ষা, পরীক্ষা—এই তিনেই বিদ্যা। গুণীদের বাজনা শোন আর শোনাও।" বেরলাম। ঘুরতে ঘুরতে এলাম কলকাতা। সেখানে ছিলেন গণপৎ রাওএর শিষ্য শ্যামলাল ক্ষেত্রী। ভবানীপুরের এক সঙ্গীত সম্মেলনে নিমন্ত্রণ পেলাম। আমি আছি পুটিয়ার রাণীর বাড়ি। ঐ তো হেদুয়ার কাছে। বীণকার লছমীপ্রসাদ, কেরামৎ উল্লা, না না মিথ্যা কথা বলব না এমদাদ খাঁ, ছিল বিশ্বনাথ রাও, ধামার গাইয়ে দানীবাবু, রাধিকা গোঁসাই। আমার সঙ্গে মৃদঙ্গ বাজাবেন কালিবাবু, তাঁর ড্রেসের কী বাহার—গিলে করা পাঞ্জাবী। আমারও তেমনি। তখন নিকারী কোট দেখেছি নতুন। খুব সখ তাই পরি। সেই একটা পরে, দাড়িও আছে, রামপুরী কোট,

পায়জামা। ধুতি কোথায়? গরীব অবস্থা। গেলাম সম্মেলনে। কিন্তু কেউ আমায় ডাকেই না। এর কাছে যাই, ওর কাছে যাই, কেউ পাত্তা দেয় না। আমার বাজনার সময় এল—কালিবাবুকে ডাকি, তিনি তখন পান চিবিয়ে তাস খেলতেই ব্যস্ত, কেউ আমার কথাই শোনে না। শেষকালে এলেন। মণীন্দ্র নন্দী এসেছেন। এত দেরী। সবাই তটস্থ। দেরী কেন? কালিবাবু বল্লেন—"আল্লাউদ্দীনের দোষ নেই। দেরী আমার জন্যই হয়েছে। খাঁ সাহাব তৈরি ভোর থেকে।" প্রথমে কেউ ভাল করে দেখেই না আমাকে। ঐ সাজ, ভাবে কোথাকার জংগলী এসেছে। তারপর তানপুরা বেঁধে যখন একটা তান মারলুম সব বল্লে, "আরে, গুণ আছে ত?" সবাই শুনতে আরম্ভ করল। প্রায় আধ ঘণ্টা বিলম্বিত আলাপ। তখন গুরুদেবের স্মৃতি মাথায় রয়েছে। কারোর হাতে পান, কারোর হাতে সিগারেট থমকে আছে—মুখে আর দেওয়া হয় না। দেশলাই জেবলে সিগারেট ধরাতে গেছে—আগুন নিভেই গেল, ধরান হল না। তিন ঘণ্টা হয়ে গেল। দর্শন সিং তবলচি এসেছিল বাজাতে। কালিবাবু বল্লেন, "এ হল তবলচির যম। বসিয়ে দাও আরও কয়েকজন তবলচি।" দর্শন সিংয়ের দম আধা ঘণ্টায়ই বেরিয়ে গেল। অন্য তবলচি এল। চার ঘণ্টা বাজালুম। লছমীপ্রসাদ বীণকার শুনে বল্লেন, "এত বীণকারের তালিম। আল্লাউদ্দীন তুমি বেঁচে থাক, এই বিদ্যা এদেশে প্রচার কর।" "তা হয় না। আমি শিক্ষা করি। আমার সাধনা এখনও বাকি। গুরুদেবের আদেশ দেশভ্রমণের, শেখাবার আদেশ নেই।" শ্যামলাল ক্ষেত্রী লেগে রইল পিছনে। বল্লে, মাইহার একটা ছোট স্টেট। তবুও রাজার খুব সখ গান বাজনা শেখার। তুমি যাও। পুজো আসছে, এই সময়েই যাও। রাজা আমার বন্ধু।" রাজি হলাম। শ্যামলাল রাজাকে তার করে দিলে "ছেড়না একে।" এলুম মাইহার। গেস্ট হাউসে জায়গা হল। খুব খাতির করলে। সপ্তমীর দিন ডাক পড়ল রাজার কাছে। নকীব এসে বল্লে—"ইয়াদ্ যারমাতা— রাজাবাহাদুরের দরবার ইয়াদ কিয়া হ্যায়।"

৪০।৫০জন সর্দার তলোয়ার নিয়ে রয়েছে ঘরে। যন্ত্র বাঁধছি—কেউ নেই তানপুরা ছাড়ে। মথুরার ঘোর্‌রে মহারাজা ছিলেন, তিনি বদনচৌবের শিষ্য। ঘোর্‌রে মহারাজ তানপুরা ধরে বল্লেন, "আমি দিচ্ছি সুর।" মহারাজ এলেন। সব খাড়া হয়ে দাঁড়াল। নকীব—"নজর দৌলত ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছু বল্ল। আমি উঠে পাঁচ টাকা নজর দিলুম। আট আনার মোহর দিলুম। রাজা বল্লেন, "আপ আচ্ছা হায়, আপ্‌কো তক্‌লিফ নেই হুয়া?" "নেহি সরকার।" "আমার স্টেট ছোট। আমার বড্ড সখ সংগীতে। এইত এক বছর হল গদী পেয়েছি। আপনি আমার গুরু হন।" আমি চুপ করে থাকি। আমিই ত শিষ্য; আমি কী করে গুরু হই। রাজার পণ যে লোক সবরকম বাজনা এবং গান জানবে তাকেই গুরু করবেন। যাই হোক, রাজা বল্লেন কিছু বাজাতে। ধরলুম শ্রীরাগ। তখন বিকেল ৫টা। যেই আরম্ভ করেছি—দেখি রাজা এ দিক চায় ওদিক চায় শেষে ৫ মিনিট পর বলে "আরাম কি জিয়ে।" আরাম করব কিরে বাবা, শুয়ে থাকব নাকি! ফিরে গেলাম। ভাবলাম এ কোন মূর্খের কাছে এলাম। মনটা ত খারাপ হয়ে গেল। নামাজের সময় ভগবানকে প্রশ্ন করলাম—এ কোন্ পশুর কাছে পাঠালে। আবার আটটার সময় ডাক পড়ল। একেবারে এক্ষুনি আসুন। গিয়ে দেখি একটা বড় কামরা। যন্ত্রে ভর্তি, নানারকম যন্ত্র, বাঁশি, শানাই, এস্রাজ, সেতার, সরোদ, বেহালা, মৃদংগ, তবলা আরও কত রকম। মহারাজ নেই। ঘোর্‌রে মহারাজ আছেন। তিনিই বল্লেন, "আপনি প্রত্যেক যন্ত্র একটু একটু বাজান। রাজার পণ যে সব যন্ত্র বাজাতে পারবে, তাকেই গুরু করবেন।" রাজা আছেন দূরে, তিনি টেলিফোনে সব শুনবেন, তাঁর যা বলবার টেলিফোনেই বলবেন। বাজালুম। কী আর বাজাব, আগের ঘটনার পর মনটা খারাপ, ধরলুম 'লেও প্যালা ভর সাকীরে'—সেই থিয়েটারের গান। তারপর 'ছিঃ ছিঃ এত্তা জঞ্জাল'—একটু বাজাই বলে 'বন্ধ করো।' ব্রড হর্ন এনে দিল—বাজালুম পঁ পঁ পঁ ভঁ—আর সঙ্গে সঙ্গেই 'বন্ধ করো।' Bassএ একবার ফুঁক দিই, রাজা বলে 'বন্ধ করো'। যাই বাজাই—সাগাপাসা সাগারেসা—লালালা টুক টালা—রাজা বলে 'বন্ধ করো'। ৫০ রকম যন্ত্র বাজালুম। 'ড্রাম ভি বাজাইয়ে', বাজালেই বলে 'বন্ধ করো'। ঢোল বাজাও—'ঢিক্কা খিৎতা'—'ব্যস্, বন্ধ্ করো'। চামড়ার যন্ত্র শেষ হল ত এল এস্রাজ,— 'তা-আ-আ'...করে তান দিয়ে ধরতেই বলে 'বন্ধ্ করো'। দু ঘণ্টা কেটে গেল। পরীক্ষা হল আমার, বড্ড জবর পরীক্ষা। তারপর এল বেহালা। সেতার-টেতারও ভাল ছিল, কিন্তু রাজা বল্লেন—"ও সব হয়ে গেছে। পণ পূরণ হয়ে গেছে। একটা গান শোনান। গান হল। তখন বলেন, "ভায়োলিন?' বেহালা শোনালাম। তখন বল্লেন, "আসুন আমার কাছে।" সব টেলিফোনে হচ্ছে, কথাবার্তা। শুনে ভাবছি এবার আবার কী পরীক্ষা করবে রে বাবা! সন্ধি প্রকাশ শ্রীরাগ আমার গর্ব, আনন্দের জিনিস—সেই যখন ৫ মিনিট শুনেই বন্ধ করে দেয়, তখন ঐ পশুর কাছে যাব কি? তবুও গেলাম। ঘণ্টাখানেক শুনলেন মন দিয়ে। তারপর বল্লেন, "আপনি রাগ করেননি ত?" "কেন, মহারাজ, একথা কেন? আপনার ওপর কি রাগ করতে পারি?" তখন কী রাগ বাজিয়েছিলেন?" সন্ধিপ্রকাশ শ্রীরাগ। সকালে আর সন্ধ্যায় বাজায়। সূর্যাস্ত আর সূর্যোদয়ের সময়ের রাগ। "সে রকম রাগও হয়?" "হ্যাঁ মহারাজ। সব সময়েরই রাগ রাগিণী আছে।"

"আপনি যখন বাজাচ্ছিলেন, আমার শরীরে রোমাঞ্চ হল। সহ্য করতে পারলাম না। বন্ধ করতে বল্লাম। কাল দরবার হবে। আপনার আসন সর্দার, আর মন্ত্রীর পর, তৃতীয় স্থান। আসার সময় জড়োয়া পাগ্‌ড়ি দিলেন।

পরের দিন গেলাম। জংলী লোক পাগড়ী বাঁধতে জানি না। ঘোর্‌রে মহারাজ পাগ্‌ড়ি বেঁধে দিলেন। সেদিন দরবারে রাজ্যের প্রজারা সব এসেছে, ছোট্ট রাজ্য। রাজা সবাইকে বল্লেন, "আজ দশহারা। আমার বহুদিনের ইচ্ছে, সংগীতচর্চা করি, ওস্তাদ রাখি। আজ যা চেয়েছি তার বেশি পেয়েছি। আপনারাও এঁকে গুরু বলে স্বীকার করবেন। প্রজারা সব হাত তুলে স্বীকার করলে।

কিন্তু আমি তখনও শিষ্য। গুরুর আদেশ আছে কেবল দেশ ভ্রমণের। তাই রাজাকে বল্লুম,—"গণ্ডা বাঁধতে পারব না।" রাজা বল্লেন—"আপনাকেই আমি গুরু বলে স্বীকার করেছি। আপনি এখন যেতে পাবেন না। আপনাকে আমি গুরু না বলে দাদা বলব। "কিন্তু গুরু ত শুধু দেশ ভ্রমণের আদেশ দিয়েছেন।" "ঠিক আছে। দেওয়ানজী! আপনি এক্ষুনি যান রামপুর।" দেওয়ান গেলেন। গুরুদেব শুনে খুব খুসি। নিজের হাতে গণ্ডা তৈরি করলেন—মা সরস্বতীর প্রসাদ

পাঠালেন। চাকরি নিলাম। আমি নিজের শিক্ষার জন্য অনেক কষ্ট করেছি—তাই আমার পণ এই বিদ্যাদান করে কারও কাছে একটি পান নেব না, পয়সা নেব না। তাই রাজাকে বল্লাম, "আপনি আমার শিষ্য, আপনার কাছ থেকেও আমি কিছু নিতে পারি না।"

"সে কী, তবে খাবেন কী?" তখন রাজা তাঁর রাজ্যে যে ভগবানের জমি আছে, দেবত্র, তার ম্যানেজার করে দিলেন। মাইনে ১৫০৲ টাকা। এখনকার ১০০০৲ টাকাও তার কাছে কিছু না। তাছাড়া ভাল বাড়ি, মোটর ত আছেই। তারপর উদয়শংকর যখন ইউরোপে গেল, আমাকেও নিয়ে গেল। ইউরোপ থেকে এসে নিজে বাড়ি করেছি। ৪৮ বছর আছি মাইহারে। প্রথম যখন রাজা শিষ্যত্ব নিলেন—একদিন জিজ্ঞেস করলেন—"আমি ত বাজনা শিখতে চাই না, আমার গান হবে কি?"

"আপনার আওয়াজটা শুনি, দেখি গলাটা কী রকম?" এবার রাজার পরীক্ষা। গলা শুনে দেখি ভঁইসের আওয়াজ। বল্লাম, "মহারাজ, সংগীত সাধনা যাঁরা করেন, তাঁদের অনেক কিছুর প্রয়োজন হয়। আমি যা বলব আপনি শুনবেন কি?"

"শুনব।"

"তবে সরাব্ ছাড়ুন।"

"তথাস্তু।"

"রাণী ছাড়া আর কারও দিকে কুদৃষ্টি দিতে পারবেন না।"

"তথাস্তু।"

"ব্রহ্মচর্য মানতে হবে।"

"এটা ত পারব না, ওস্তাদজী। তবে যতটা পারি করব।"

"যা বলব, সেইভাবে সাধনা করতে হবে।"

"হ্যাঁ করব।"

১॥ বৎসর স্বর-সাধনা করালুম। মাংস ছাড়লেন—ফলাহার গ্রহণ করলেন। এখনও এই নিয়মে চলেন। এইভাবে চলে দেড় বৎসরে ভঁইসের মত গলা তারের মত হয়ে গেল। রাণীদেরও শেখাই—মেয়ে হলেও উঁরা মায়ের জাত, তাই শেখাতে আপত্তি নেই। রাজার আদেশে এক ব্যান্ড পার্টিও খুললাম। সব অনাথ ছেলেদের ডাক দেওয়া হ'ল। ঢেঁড়া পিটিয়ে ৩০০।৪০০ ছেলে জোগাড় করা হল। তারা আমার বাড়িতেই মেস্ করে থাকে। খাওয়াদাওয়া করে। আমার স্ত্রী আসেননি তখনও। আমার তখন সারাদিন কাজ। রাজাকে ৮ ঘণ্টা শেখাই। ৪ ঘণ্টা ব্যান্ড পার্টির কাজ। তিমিরবরণ ছিল, তখন তাকে ২।৩ ঘণ্টা শেখাই। রাজা বলেছেন—"আমি যেখানে বের হই যেন গান শুনতে পাই। বেসুর যেন কোথাও না থাকে।"

এই করি আর রেওয়াজ হয় না। আকুল পিয়াসা গেল। সংগীতের ক্ষিদে, ভীষণ ক্ষিদে। ভাল লাগে না। রাজাকে বলি, "রেওয়াজ করতে পারি না। ভাল লাগে না। আমার পাগলের মত লাগে।"

রাজা বলেন, "আপনি এখানেই খাওয়া-দাওয়া করুন, তাতে সময় পাবেন।"

"তা হয় না।"

"আপনি বিয়ে করেন নি?"

"হ্যাঁ, করেছি—কবে মনেও নেই।"

"তবে গুরুমাকে নিয়ে আসুন।"

খবর পাঠালাম। আমার দাদা আফ্‌তাব তাঁকে নিয়ে এলেন।

এক বৎসর হয়ে গেল চাক্‌রির। একদিন বাজারে গেছি, এমন সময় এক কাল লেফাফা এল। গুরুর বড় ছেলে মারা গেছেন। বাজার থেকেই চলে গেলাম, রামপুর। গুরুজীর আকুল অবস্থা। আমি যেতেই বল্লেন, "কে? আল্লাউদ্দীন, এস এস। তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। সে শাপ আমাকে লেগেছে। আমার বড় ছেলে, তাকে সব শিখিয়ে তৈরি করেছি। সে সব শেখাতে মারা গেল। শিষ্যের শিক্ষা, পুত্রের শিক্ষা, আর মেয়ের ঘরের শিক্ষা। বড় ছেলের সব শিক্ষা তোমাকে দেব। বীণা শেখ—তিন বছরে সব শেখাব।"

রয়ে গেলাম, এক কাপড়ে এসেছি। রাজার কাছে তার গেল। "৪০ দিন পরে শেখাব" গুরুজী বল্লেন। তাঁর পুত্রের ঘরের সব শেখালেন। "হামার ভগবান" ধামার—এইটে তখন শিখেছিলাম। ধ্রুপদও শিখি তাঁর কাছে। বীণ শেখানর কথায় বল্লাম, "বীণ মরে যাব, গুরুজী।"

"তবে রবাব শেখ, সুরশৃংগার শেখ।"

তাই শিখলুম। শেখাতে শেখাতে গুরুজী প্রায়ই বলেন, "সব শেখ, আর কাকে এ জিনিস দেব। নাতিরা সব ছোট—তুমি শিখাবে এদের। তোমাকে কষ্ট দিয়েছি। তোমার কষ্ট দূর হবে।"

তারপর গুরুজী মারা গেলেন।

আমার তিন মেয়ে এক ছেলে। আলি আকবর। মেয়েদের নাম—সরোজিনী, অন্নপূর্ণা, জাহানারা। জাহানারা মারা গেছে। আমার ছেলেকে আমার গুরুর কৃপায় পেয়েছি। গুরুর কাছে ছেলে হয় না বলে ধরে পড়ায়, গুরু (উজীর খাঁ নয় কিন্তু, অন্য গুরু) এক ভস্ম দিয়ে বল্লেন, "বৌকে খাওয়াও।" তারপর তাই করে আলি আকবরকে পেলাম। আমি আরেক ছেলেও পেয়েছিলাম—তা ভগবান দিলেন না। তাও দিলেন—রবিশংকর, অন্নপূর্ণাকে বিয়ে করেছে।

এ হল আমার নাতি। আলি আকবরের ছেলে। নাম দিয়েছি মহম্মদ আশিস। মুসলমান হয়ত মহম্মদ। হিন্দু হয়ত আশিস্।

আমি বাঁহাতে সরোদ বাজাই। রামপুরে ৪ বছর ডান হাতেই শিখেছি। রামপুর দরবারের অনেকে খুব ঠাট্টা করত আমাকে। "বাঙালী ধুতিখোর, মচ্ছিকে পানি পীনে-ওয়ালা—রোজ এই চলত। মাস দু-এক গেল, চুপচাপ শুনলুম। বেহালা ভাল বাজাই—ওরা জ্বলে। আর ঠাট্টা করে—"মচ্ছিকে পানি পীনেওয়ালা। ওসব খেলে গান-বাজনা হয় না।" ব্যান্ড মাস্টার বলতেন, "না না, অমন বল না। বাঙালীর জোড়া মাথা আর নেই। আল্লাউদ্দীন কেমন নোটেশান জানে; তুমি গাও এক মিনিটে শুনিয়ে দেবে।" ওরা শুনে বলে, 'কেয়া, নোটেশন মে গানা হোতা। মচ্ছিকে পানি পিয়া হুয়ে?' আমার তখন আর সহ্য হয় না, বল্লাম, 'আপকো বাপ্‌কো পিয়া হ্যায়।' ওরা তবুও ছাড়ে না—'মাছ খাও?' 'মাছ ত পাই না। ছোলা খেয়ে থাকি। পয়সা কোথায়?' 'নোক্‌রী কর। এসব খেয়ে কি সরোদ বাজান যায়, গান গাওয়া যায়?' 'তবে কী খাব? হাতীঘোড়া?' 'গোস্ত খাও। পোলাও, বিরিয়ানী।' 'গোস্ত, গোমাংস আমি খাই না।' 'ও! হিন্দু নাকি?' এই রকম ঝগড়া রোজই প্রায় হয়। একদিন জামিরুদ্দীন আর আরও কয়েকজন,—ফাজিল সব জুটেছে। আমায় নিয়ে খুব ঠাট্টা চলছে। জামিরুদ্দীন বলছে, 'গোস্ত খাও; বাজাও। মচ্ছিকে পানি মে কুছ্ নেহি হোগা।' শুনেই মেজাজ চড়ে গেল আমার 'শুয়রের বাচ্চা—কী শুনতে চাও। বাজনা নেহি হোগা? পায়ে ধরে সরোদ বাজাব। শুনবি? মা সরস্বতীর জিনিস, তাই পায়ে ধরব না। বাঁ হাতে বাজিয়ে শোনাব। জমি-রুদ্দীন বলে 'হিন্দুর মত কথা বল কেন?' 'আমরা ত হিন্দুই ছিলুম।' 'কাফের'। কাঁহাতক সহ্য করা যায়। হ্যাঁ শুয়োরের

বাচ্চাই বলেছিলাম। সেই থেকে বাঁ হাতে তারের যন্ত্র, ডান হাতে চামড়ার যন্ত্র বাজাই। থাপ্পড়ও বাঁ হাতে মারি। বাঙালীর মেজাজ। রাজাকেও মেরেছিলাম। আঙুল মচকে গিয়েছিল রাজার থাপ্পড় খেয়ে। বাঙালীকে শান্ত দেখেন—রেগে গেলে বোমা মারে।

এই ত আমার কথা সব শেষ হল। আপনাদের অনেক কষ্ট দিলুম।

'আপনার ইউরোপের গল্প?' সব বলতে হবে নাকি? সে আরেক দিন হবে।' আমি এবার সংসার করতে যাব। খাওয়া দাওয়া। রাত হয়েছে। এইখানেই থাক। আমি একথা বল্লাম, আমার জীবনী বলে না, তোমরা সব 'দেখ কী কষ্ট করে সংগীতের সাধনা করতে হয়।

ইন্দ্রজিতের আসর

সেক্রেটারিয়েট টেবল

অনেকদিন আগে একবার বলেছিলাম যে, চেয়ার টেবিলে বসে কাজ করা আমার একেবারে পোষায় না। দিব্য লেপটিয়ে বসে কিম্বা তাকিয়া ঠেসান দিয়ে গা এলিয়ে দিতে না পারলে আমি ঠিক স্বস্তি বোধ করি না। বিধাতা সুপ্রসন্ন ছিলেন। এতাবৎকাল জীবনধারণের নিমিত্ত আমাকে যে দৈনন্দিন কাজকর্ম করতে হ'ত সেটা মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে দিব্যি আরামেই করা যেত। ভাগ্য বিপর্যয়ে ইদানীং মৃত্তিকাসন ছেড়ে আমাকে কাষ্ঠাসন গ্রহণ করতে হয়েছে। মাঝারি গোছের একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিল সম্মুখে করে চেয়ারে বসে আমাকে কাজকর্ম করতে হয়। আমি মেরুদণ্ডহীন ব্যক্তি। পিঠ সোজা করে ঠায় বসে থাকা যে কি দুর্দশা সে আমিই জানি আর আমার চেয়ার জানে। চেয়ারটাকে বেশীর ভাগ সময় সামনের পা দুটো উঁচিয়ে পেছনের পায়ে ভর করে দাঁড়াতে হয় দেয়ালে ঠেসান দিয়ে। যে কোন দিন ওর উরুভঙ্গের আশঙ্কা আছে।

সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওধারে এক সারি চেয়ার। কাজে কর্মে যাঁরা আসেন তাঁরা ওধারটায় বসেন। টেবিলটা মাঝখানটায় সিগ্‌ফ্রিড্ লাইনের কাজ করে। মাঝখানের ব্যবধানটা এমন দুর্লঙ্ঘ্য যে যাঁরা নিতান্ত গল্প করতে আসেন তাঁরাও বড় আরাম বোধ করেন না, আমি তো করিই না। চেয়ারে টেবিলে বসে গল্প জমে না এমন নয়, চায়ের টেবিলে খুবই জমে, কিন্তু তাই বলে সেক্রেটারিয়েট টেবিলে নয়। ফাইলের চাপে হাওয়া defiled হয়ে আছে। এখানে কথাবার্তা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং পরিমিত। মনখোলা কথা নেই, প্রাণখোলা হাসি নেই। কাষ্ঠাসনে বসে বড় জোর কাষ্ঠহাসি হাসা যায়। আসল কথা হ'ল, আপিস যেখানে বসে আসর সেখানে জমে না।

এতকাল জানতুম স্বভাব যায় না ম'লে; কিন্তু এখন দেখছি স্বভাব যায় সেক্রেটারিয়েট টেবিলে বসলে। যে মানুষের মুখে এতদিন বাক্যের স্রোত বইত সে মানুষ এখন নিক্তির ওজনে কথা বলে। হাসির কথা বললে আগে গড়াগড়ি যেত। এখন চেয়ারে বসে গড়াবে কোথায়? গড়াতে গেলে চেয়ারের বিকলাঙ্গ হবার আশঙ্কা, আমারও অধঃপতন অনিবার্য। ফলে আমার মুখে বাক্যি নেই, ঠোঁটে হাসি নেই। তাই দেখে বরং অপরে হাসে। কোথাকার হাসি কোথায় গড়ায়, দেখুন। এই যদি সেক্রেটারিয়েট টেবিল আর চেয়ার না হয়ে ফরাস আর তাকিয়া হোত তাহ'লে হেসে খেলে গড়াগড়ি করে কাজ করা যেত। কাজ জিনিসটা যে একটা নিরানন্দের ব্যাপার হয়ে উঠেছে তার মূল কারণটা এইখানে। আমাদের দেশে কাজকে চিরকাল আরাম হিসেবেই দেখা হ'ত। জমিদারের সেরেস্তা, মহাজনের গদি, এগুলোই ছিল আমাদের দেশের অপিস। অত্যন্ত ঘরোয়া ব্যাপার—হাত পা ছড়িয়ে আরাম করে বসুন—পান আছে, তামাক আছে, পরনিন্দা আছে, পরচর্চা আছে। কাজের পক্ষে আইডিয়েল আবহাওয়া। আর ইংরেজ বলে কিনা—work is worship! দেখুন কাণ্ড, আপিসের আবহাওয়া যদি গির্জের আবহাওয়া হয় তবে ধর্মেও সয় না, কর্মেও সয় না।

আমাদের কংগ্রেসী নেতারা একদা ফরাস পেতে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে ইংরেজ বিতাড়নের জল্পনা করতেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে তাকিয়ার বহর দেখে লোকের তাক লেগে যেত। এক রকম শুয়ে শুয়েই ইংরেজকে তাড়িয়েছেন। কিন্তু যেই না ইংরেজ পালিয়েছে, অমনি নিজেরা ফরাস ছেড়ে তাকিয়া ফেলে ইংরেজদের পরিত্যক্ত তক্তে এসে বসেছেন। বোধকরি দেশের লোককে তাড়াতে হলে ওখানটায় বসতে হয়। তবে এ কথাটি ভাবছেন না যে, ও'দের যাঁরা তাড়াবেন তাঁরা আর কোথাও তাকিয়া ঠেসান দিয়ে এখন থেকেই কংগ্রেস বিতাড়নের জল্পনা করছেন।

সেক্রেটারিয়েট টেবিল নামক আপদটা এদেশে এনেছে ইংরেজ দুঃশাসন। সে দুঃশাসন পালিয়েছে; কিন্তু পালাবার বেলায় যাকে বলে ল্যাজ গুটিয়ে পালানো তা করেনি। ল্যাজটা ইচ্ছে করেই কেটে গেছে এখানে। জানেন তো আসল হুলটা থাকে ল্যাজে। সেই সেক্রেটারিয়েট টেবিল হ'ল সেই হুল। ইংরেজের দাসত্ব ঘুচেছে, কিন্তু সেক্রেটারিয়েটের দাসত্ব কোন কালে ঘুচবে বলে মনে হয় না।

যাক্‌গে আমি পলিটিশন্ নই, আমি সাহিত্যিক। যে কথা বলতে এসেছিলাম সে কথাতেই ফিরে আসা যাক্। আমার কাছে সব চাইতে বিসদৃশ ঠেকে সেক্রেটারিয়েট টেবিলের গায়ে সবুজ আস্তরণ। দেখলেই হাসি পায় দাঁড়কাকের ময়ূর পুচ্ছের মতো। সেক্রেটারিয়েট টেবিলের রুক্ষ মূর্তি কি আর সবুজে ঢাকা পড়ে? সবুজ ওকে মানায় না, ছাই রং হ'লে বরং মানাত। টেবিলে বসে ছাইভস্ম লিখি—আপনার অমুক তারিখে লেখা অত সংখ্যক পত্রের উত্তরে জানানো যাইতেছে যে, ইত্যাদি ইত্যাদি। মেজাজ এমনি কাঠখোট্টা হয়ে উঠেছে যে, অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুকে চিঠি লিখতে গেলেও ভাষাটা কাষ্ঠকঠিন রসকষহীন হয়ে আসে। চার্লস্ ল্যাম্ এক নাগাড়ে ছত্রিশ বছর আপিসের টেবিলে কাজ করবার পরে লিখেছিলেন—I had grown to my desk as it were, and the wood had entered into my soul. তবেই বুঝুন,—আমার তো এখনও ছত্রিশ মাসও হয়নি।

ইদানীং আমি অনেক সময়ে ভাবি—আমাদের দেশে অনেক সাহিত্যিক আছেন যাঁরা সরকারী চাকুরে। তাঁরা আপিসের সেক্রেটারিয়েট টেবিলে বসে কখনো সাহিত্য রচনা করেছেন? গল্প কিম্বা কবিতা?

অন্নদাশঙ্কর রায়, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত এঁদেরকে জিগ্যেস করতে হবে। আমি তো এখানে বসে লেখার কথা ভাবতেই পারিনে। ল্যাম-এর কথা বলছিলাম। তিনি তাঁর ইলিয়া-র essay কোথায় বসে লিখতেন? আমার তো মনে হয় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আপিস টেবিলে বসেই লিখেছেন। ও'র পক্ষে সব সম্ভব ছিল। ঐ একটি মানুষ,—অশথ গাছের মতো পাথরের থেকে রস বের করেছেন। ঐ যে আপিস ডেস্কের কাঠের কথা বলেছেন সেই কথাটিও কত রসিয়ে বলেছেন। সাউথ সী হাউসের বর্ণনা পড়লে বোঝা যাবে আপিসের দোয়াতদানের মহিমা, লেজার বই-এর রোম্যান্স।

ল্যাম এর আমলে সেক্রেটারিয়েট টেবিলের জন্ম হয়নি। ইংরেজ তখনো ব্যবসাদারের জাত, রাজার জাত হয়নি। বনেদি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডেস্ক গিয়ে সেক্রেটারিয়েট টেবিল এসেছে। আমার তো মনে হয় এটি ভিক্টোরীয় আমলের সৃষ্টি। গ্লাডস্টোন ব্যাগের মতো সেক্রেটারিয়েট টেবিলটাও গ্লাডস্টোন সাহেবেরই অবদান কিনা কে জানে। ভিক্টোরীয় জীবন ছিমছাম কেতা-দুরস্ত জীবন। অবশ্য গ্লাডস্টোনকে ঠিক কেতাদুরস্ত মানুষ বলা চলে না। যিনি ফোর্থ ক্লাস নেই বলে থার্ড ক্লাসে ভ্রমণ করতেন তিনি ডেস্কের পরিবর্তে সৌখিন টেবিলের প্রবর্তন করবেন এমনটা ভাবা স্বাভাবিক নয়। বরং ডিজ্‌রেইলি ছিলেন সৌখিন মানুষে। সে যুগের ঐতিহাসিকরা বলেছেন ও'র পোষাকটা ছিল লাউড, চোখে লাগত। সেক্রেটারিয়েট টেবিলের চেহারাটাও লাউড। যে-জাতীয় কাজে ওর ব্যবহার সেই তুলনায় ওর চেহারা অতিমাত্রায় সৌখিন। এইজন্যেই বলছিলাম যে, ডিজ্‌রেইলির আমলে এর প্রবর্তন হওয়াটা কিছু অসম্ভব নয়।

যখন কাজের ভীড় থাকে না তখন আমার সেক্রেটারিয়েট টেবিলকে অবলম্বন করে আমার অলস কল্পনা অবাধে পক্ষ বিস্তার করে। নির্জন ঘরে বসে আমি আপন মনে নিজেকে একটি ছোটখাট রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি বলে কল্পনা করি। স্টীভেনসন শৈশব কল্পনায় তাঁর বিছানাটাকে মনে করতেন এক বিরাট রাজ্য। তাই থেকে পরবর্তীকালে অতি মনোরম শিশুপাঠ্য কবিতা রচনা করেছেন—the land of the Counterpane. বিছানার এক ধারে বালিশের উপর বালিশ সাজিয়ে সেটাকে একটা মস্ত বড় পাহাড় বলে কল্পনা করতেন। আর সেই বালিশের উপরে চেপে বসে নিজেকে ভাবতেন পর্বতবাসী এক দৈত্য! ইচ্ছে করলে ফাইলের উপর ফাইল সাজিয়ে আমিও পাহাড় তৈরী করতে পারি। কিন্তু তার উপরে চেপে বসতে গিয়ে দেখি ফাইলের পাহাড়ই আমার মাথায় চেপে বসে আছে।

সেকালে ছিল রাউণ্ড টেবিল। রাজা আর্থার রাজ্যের সব বীরপুরুষদের জড় করেছিলেন—তাঁর রাউণ্ড টেবিলের পাশে। এ কালের বীরপুঙ্গবরা সব জুটেছেন সেক্রেটারিয়েট টেবিলের পাশে। সেক্রে-টারিয়েট টেবিলের জন্মদাতা যিনিই হোন তিনি এ যুগের মার্লিন অর্থাৎ বিশ্বকর্মা। সমস্ত বিশ্বকে সেক্রেটারিয়েট টেবিলের পাশে এনে জুটিয়েছেন। স্বাধীন দেশ, পরাধীন দেশ, ডিমোক্রেসির রাজ্য, কমিউ-নিজম্‌-এর রাজ্য সর্বত্র এক টেবিল। একই ছাঁচের টেবিলে বসে কে কার উপরে টেবিল উল্টাবেন (ইংরেজী ইডিয়ম্‌ মতে) তারই ফন্দি আঁটছেন।। কিন্তু একটি কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য। রাউণ্ড টেবিলের পাশে অন্তত একটি ছিল মারাত্মক আসন—Siege Perilous. ও আসনে বসতে হ'লে নিষ্কলঙ্ক চরিত্র চাই। নতুবা মৃত্যুরেব ন সংশয়ো। সেক্রেটারিয়েট টেবিলের বিশেষ আসনটিও Siege Perilous. আমাকে যাঁরা এখানে বসিয়েছেন তাঁরা কি ভেবেছেন আমি Sir Galahad?

সবুজ দ্বীপের ডাক

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

অরণ্যের গাছে গাছে আষাঢ়ের ঘন কালো মেঘ
ছায়া ফেলে গেল আজ সায়াহ্নের বেলা-শেষ ক্ষণ,
গ্রামের সীমানা শেষে এখানেতে ক্যানেলের পারে
সে ছায়ার ছোঁয়া এসে ভরে যায় নারিকেল বন।

আকাশ-অরণ্য ছেয়ে আষাঢ়ের বিষাদের সুর
তার মাঝে জেগে ওঠে মাঠে মাঠে সবুজ অঙ্কুর।

নূতন পাটের ক্ষেতে আগাছার বাছা শেষ হ'ল
সতেজ সরল ডাঁটা, মাঝে ফাঁকা শ্যাওলার দল,
পানকৌড়ির বাসা এখানেতে নির্জন ক্ষেতে
বাহিরে পৃথিবী জাগে। এই মাঠ, নিথর নিশ্চল।

পাটের ধানের মাঠে আকাশের নীল রঙ যত
রাতের শিশির সাথে চুপি চুপি ঝরে অবিরত।

এখানে সবুজ ঘ্রাণ, চোখভরা কী সবুজ রঙ
কলমী ঘাসের বুকে ছোট ছোট নরম পরশ,
শান্ত সাঁজের শেষে এইখানে মাঠের কিনারে
পৃথিবীর যাত্রা শেষ, পান্থশালা নির্জন অবশ।

অনিবার পথ চলে যে পথিক অবসন্ন হ'ল
মাঠের কিনারে তারে একবার থেমে যেতে বলো।
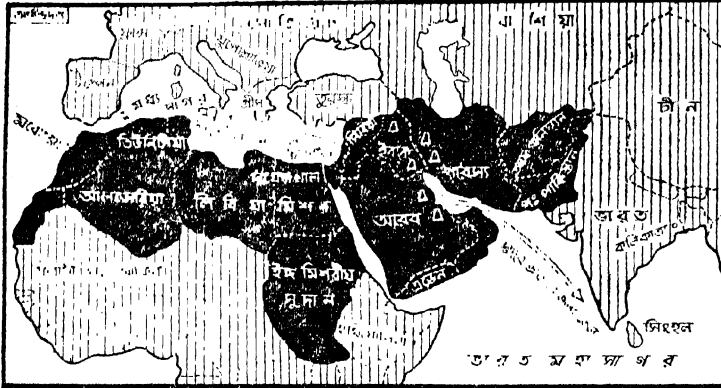
মধ্যপ্রাচ্য-পরিচয়

সরোজ আচার্য

(৪)

মানচিত্রের দিকে তাকালে দেখা যাবে, মধ্যপ্রাচ্যের চেহারাটা প্রথম মহাযুদ্ধের সময়কালীন বলকান ও পূর্ব য়ুরোপের মত; নক্সা করা কাঁথার রং বেরং-এর চৌকোর আকারে ছোটো বড়ো দেশ, কোনোটা স্বাধীন, হয়ত নামেমাত্র, কোনোগুলি পরাধীন আর কতকগুলি রক্ষণাধীন অর্থাৎ পশ্চিমী প্রভুদের খামারবাড়ী। আগেই বলা হয়েছে নেপোলিয়নের আমল থেকে পশ্চিমী শক্তিরা মধ্যপ্রাচ্যের যাতায়াত পথের উপরে দখল রাখার জন্য এই অঞ্চলের দেশ ও জাতিগুলির ভাগ্য নিয়ে জুয়া খেলেছে, ষড়যন্ত্র করেছে, যুদ্ধে নেমেছে বহুবার। সুয়েজ খাল উন্মুক্ত হবার পর থেকে এই অঞ্চল দখল রাখা নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্র হয়েছে; তারপর মধ্যপ্রাচ্যের বিপুল তেল-সম্পদ কূটরাজনীতিকে আরও তৈলাক্ত করেছে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি কিভাবে ভাঙ্গা-গড়া হয়েছে তার পরিচয় পাওয়া যায় ১৯১৪, ১৯২৮ এবং ১৯৫২ সনের মানচিত্র তিনখানি তুলনা করলে। ১৮৮০ থেকে ১৯৪০ সন পর্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ছিল এই বিরাট ভূখণ্ডের প্রধান অভিভাবক। লণ্ডনের কর্তাদের ইঙ্গিত বা হুকুম ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যে একটি পাতাও নড়তে পারতো না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কথাবার্তাও এসব বিষয়ে খুব পরিষ্কার চিরকালই। মিশরে ব্রিটিশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার কিছুকাল পর সুদান বিজয়ের উল্লাস বর্ণনা করে মঃ চার্চিল ১৮৯৯ সনে লিখেছিলেন, "ব্রিটেন একটা বিরাট এলাকা লাভ করেছে; এর গুরুত্ব বাড়িয়ে বলা চলে বটে; কিন্তু এবিষয়ে সন্দেহ নাই, য়ুরোপের যে কোনো বৃহৎ শক্তির কাছে এটা লোভনীয়।"

মিশর ও সুদান যেমন লোভনীয় পারস্য এবং অন্য অঞ্চলের উপরও লোভ তেমনই উদগ্র। ১৮৯২ সনে "পারস্য এবং পারস্যের সমস্যা" গ্রন্থে লর্ড কার্জন লেখেন, "আফগানিস্থান, ট্রান্সকাস্‌পিয়া ও পারস্য হল, আমার মতে দাবাখেলার ঘুঁটি, বিশ্ব-প্রভুত্বের খেলা চলছে এগুলি নিয়ে। ব্রিটেনের ভবিষ্যৎ য়ুরোপে নির্ধারিত হবে না।" এসব হল পঞ্চাশ বৎসরেরও পূর্বের কথা। মধ্যপ্রাচ্যকে দাবাখেলার সতরঞ্চ বলে বর্ণনা এখনও করা হচ্ছে। পঞ্চাশ বৎসরে ইতিহাস থেমে থাকেনি, দুটি মহাযুদ্ধ সুরু এবং সারা হয়েছে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের গৌরব-সূর্য মধ্যগগন থেকে নামতে সুরু করেছে, লণ্ডনের কর্তারা মুরুব্বীর আশ্রয় নিয়েছেন ওয়াশিংটনে। ভোগের ক্ষমতা কমলে নাকি ভোগের ক্ষুধা আরও তীব্র হয়। সাম্রাজ্যবাদের দাপট কমেছে; কিন্তু লোভ দুরন্ত হয়েছে। আগে একলা ভোগ করবার ক্ষমতা ছিল অফুরন্ত, বন্দোবস্ত ছিল পাকা। এখন হল পশ্চিমী শক্তির একজোট হবার ব্যবস্থা। এই জোট হওয়া বিষয়ে ফ্যাসিষ্ট সার অসওয়াল্ড মোজলে থেকে লেবর পার্টির পররাষ্ট্র মন্ত্রী বেভিন পর্যন্ত সকলেই একমত হয়েছিলেন, সেটা যুদ্ধের পরই দেখা গিয়েছিল। তাঁরা ১৯৪৭ সনে নানা বক্তৃতা ও বিবৃতিতে দাবী করেন, উত্তর আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্য পশ্চিম য়ুরোপেরই বর্ধিত অংশ; পশ্চিম য়ুরোপের সভ্যতাকে টিঁকিয়ে রাখতে হলে ইংরেজ, মার্কিন, ফরাসী, বেলজিয়ান, পর্তুগীজ, ইতালিয়ান সকলকে একযোগে আফ্রিকার শান্তি এবং উন্নতির দায়িত্ব নিতে হবে। আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যের লোকদের কাছে এটা একটা মারাত্মক রসিকতা মনে হবে, তবে সকলের কাছে নয়। মধ্যপ্রাচ্যের আমীর, ওমরাহ, শেখ এবং খানদানীরা ইংরেজী ও ফরাসী হালচাল দুরস্ত, ভিসি এবং সপাতে স্বাস্থ্য চর্চা করেন, ফ্রান্স ও ইতালির 'কেসিনো' ও 'কাবারে'তে জুয়া এবং নাচের স্ফূর্তি লুটে সুখ পান, আর ভয় করেন নিজের দেশের 'অসভ্য' চাষাভূষোকে। কাজেই তাঁরাও বলে থাকেন, কথাটা ঠিকই। মিশর চিরকালই পশ্চিম য়ুরোপের বৈঠকখানা, পারস্যেরও কানু বিনা গীত নাই। এহেন অবস্থায় ইংরেজ কি মার্কিন অথবা অন্য কোনো বিদেশী শক্তি মধ্যপ্রাচ্যে মুরুব্বীগিরি করবে এটা এতদিন খুব আশ্চর্যের বিষয় ছিল না।

ইংরাজ-রাজ-চক্রবর্তী

এতদিন ইংরেজের একচ্ছত্র মুরুব্বিয়ানায় মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি কিভাবে ভাঙ্গা ও গড়া হয়েছে তার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া হল। প্রধানতঃ আরব মুসলমান-প্রধান হলেও মধ্যপ্রাচ্যে নানা জাতি, উপজাতি ও অন্য ধর্মের লোকও আছে। ব্রিটিশের সনাতন বিভেদ-নীতি এইসব জাতিতে জাতিতে, গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গোষ্ঠীকে বিরোধে উৎসাহ দিয়েছে। মুসলমান, খৃষ্টান, ইহুদী, আসিরিয়ান, কুর্দ, আর্মেনিয়ান ও ড্রুজদের মধ্যে রেষারেষি এবং সংঘর্ষের ইতিহাস ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চিরাচরিত পদ্ধতিতে রচনা করা হয়েছে। প্যালেস্টাইনে আরব ইহুদী সংঘর্ষ সুরু হয় লীগ অফ নেশনের তরফ থেকে ব্রিটিশ অছি নিযুক্ত হওয়ার পর। হাসেমী, ওয়াহাবী এবং মিশরী রাজবংশগুলিকে ব্রিটিশ (এবং কখনও কখনও ফরাসী) সাম্রাজ্যবাদীরা পরস্পরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে, আবার দরকার মত রাশ টেনে ধরেছে। ১৮৮০ থেকে ১৯৪০ সনের মধ্যে ব্রিটিশের কলকাঠিতে ছোটো বড়ো ২০টি রাষ্ট্র গজিয়েছে মধ্যপ্রাচ্যে, এর মধ্যে কোনো কোনো রাষ্ট্রের লোক সংখ্যা কয়েক হাজার মাত্র, ঠিক

• প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী পরিবর্তনের চিত্র •
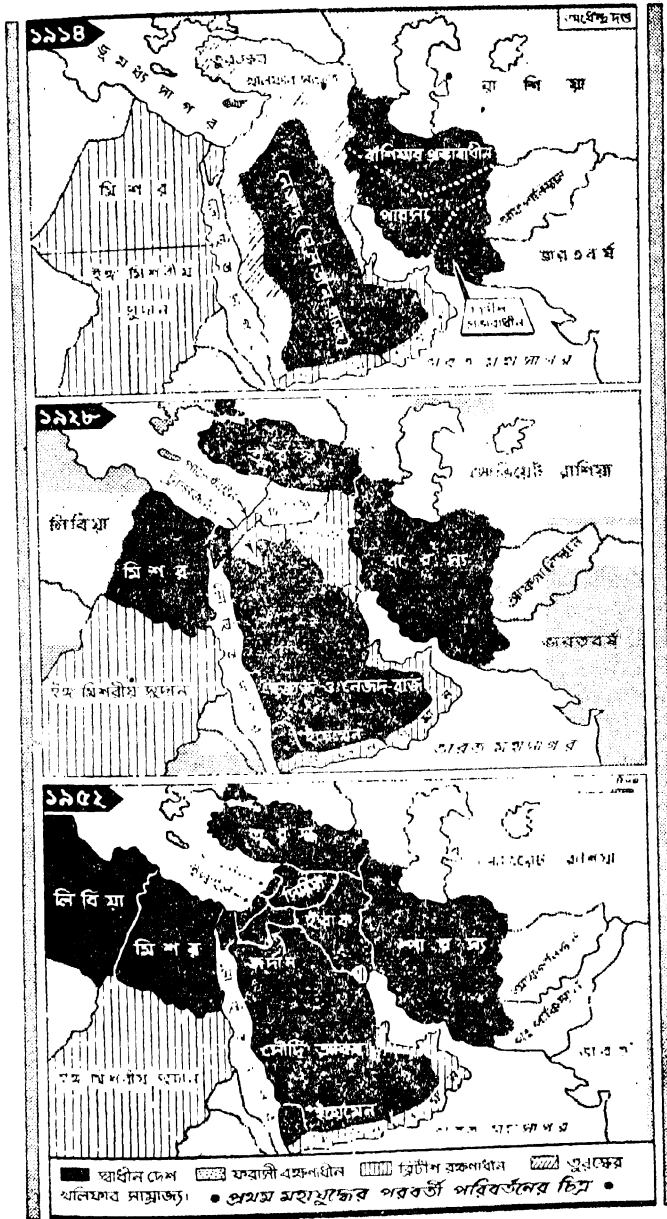
আমাদের দেশে ব্রিটিশ আমলে যেমন অনেক সামন্ত রাজ্যের ছিল। আরব উপমহাদেশে এডেন হ'ল একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্রিটিশ উপনিবেশ; এর সঙ্গে প্রায় এক লক্ষ বর্গ-মাইল জোড়া ব্রিটিশ রক্ষণাধীন এলাকা।

এই এলাকায় ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের অভিভাবকত্বে গদীয়ান আছেন ২৬ জন সুলতান। এই বন্দোবস্তে সুবিধাটা কার তা সহজেই অনুমান করা যায়; লাহেজের সুলতানকে ব্রিটিশ অভিভাবকেরা কি উদ্দেশ্যে গদীচ্যুত করেছে সে কাহিনী পূর্বেই বলা হয়েছে।

শেখ-সুলতান-সাগরেদ

সৌদী আরব ছাড়া আরব উপমহাদ্বীপে আর যে সব নামে মাত্র স্বাধীন রাজ্য আছে সেগুলির পরিচয় এখানে সংক্ষেপে দেওয়া যেতে পারে। এই রকম একটি রাজ্য হল এডেনের উত্তর-পশ্চিমে 'ইমেন'। এর আয়তন ৭৫,০০০ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৩৫ লক্ষ। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় পর্যন্ত ইমেন এবং এই ধরণের ছোট ছোট শেখ, সুলতানের রাজ্যগুলি ছিল কাগজে পত্রে তুর্কীর খলিফার অনুগত। তুর্কীর সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ার পর ব্রিটিশই এই সব রাজ্যের অভিভাবক হয় প্রথম মহাযুদ্ধের পরে। এই রাজ্যের অধিপতি ইমাম ইয়াহিয়া এবং তাঁর ৯ ছেলের মধ্যে দুইটি ছেলে নিহত হন ১৯৪৮ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে। পরের মাসেই তাঁর ছেলেরা আবার সিংহাসন দখলকারী আব্দুল্লাকে পরাজিত করে ইমাম ইয়াহিয়া বংশের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজ্যের ৩৫ লক্ষ লোক নানা উপজাতিতে বিভক্ত। শেখ ও সর্দারদের কৃপায় কোনো-মতে দিন গুজরান করার প্রাণান্তকর চেষ্টা ছাড়া তাদের অস্তিত্বের আর কোনো পরিচয় নাই। আরব জাতির নেতৃত্ব করার দাবীদার হিসাবে ইমাম ইয়াহিয়া এক সময়ে রাজা ইবন সৌদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। ইমামের হত্যার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক আছে কিনা বলা যায় না।

মস্কট এবং ওমানের সুলতানও স্বাধীন; ব্রিটিশের সঙ্গে বন্ধুত্বের সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ। আরবের পূর্ব প্রান্তে এই রাজ্যের আয়তন ৮২,০০০ বর্গমাইল, জনসংখ্যা সাড়ে পাঁচলক্ষ। মস্কটের গুরুত্ব হল বোম্বাই-বাসরা যাতায়াত পথের প্রধান বন্দর হিসাবে। একেবারে নির্ভেজাল খেজুর এবং উটের অর্থনীতি হ'ল এই রাজ্যে। বার্ষিক আয় ২৫।৩০ লক্ষ টাকা। বলাই বাহুল্য, রাজ্যের আয় এবং সুলতানের খাস তহবিলে তফাৎ নাই।

কুয়েট

কুয়েটের শেখ এদিক থেকে খুবই ভাগ্যবান। পারস্য উপসাগরের উত্তর-পশ্চিম উপকূলে এই ছোট রাজ্যটির আয়তন কুড়ি হাজার বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ১ লক্ষের কম, হলে কি হবে, মানুষের চেয়ে মধ্যপ্রাচ্যে যে জিনিস অনেক দামী সেই তেল

কুয়েটের মাটির নীচে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেছে। রাজ্যের দক্ষিণ অঞ্চলে কুয়েট অয়েল কোম্পানী ১৯৫০ সনে উৎপাদন করেছিল ১ কোটি টন তেল। কেবলমাত্র তেলের সেলামী ও খাজনা আদায় করেই কুয়েটের শেখ পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ ধনী। ১৯৪৮ সনে সেলামী পেয়েছিলেন ২।০ কোটী টাকার উপর আর খাজনা ৩০ লক্ষ টাকা। এ্যাংলো-ইরাণীয়ান এবং গাল্‌ফ্‌ অয়েল কোম্পানী (মার্কিন) কুয়েটের তেল-এলাকার ইজারদার। যে রাজ্যের তেল থেকে কয়েক কোটী টাকা বার্ষিক আয় হয় অথচ জনসংখ্যা ১ লক্ষেরও কম সে রাজ্যের জনসাধারণের অবস্থা ভাল হওয়া উচিত, অনুমান করা যেতে পারে। কিন্তু অনেক উচিত ব্যাপারই ঘটে না। তেলের সেলামীও খাজনা শেখের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। তবে কোনও কোনও ব্রিটিশ মুরব্বী বলছেন, বর্তমানে যিনি শেখ তিনি উদার হৃদয় শাসক। কাজেই জনসাধারণের উপকারের জন্য কিছু কিছু খরচ করছেন। হয়ত এটা যথার্থ সংবাদ। কিন্তু সম্প্রতি ডিকসন নামে একজন প্রত্যক্ষদর্শী ইংরেজ "মরুভূমির আরব" শীর্ষক একখানি গ্রন্থে কুয়েটের জনসাধারণের দুর্গতির বর্ণনা দিয়েছেন। ডিক্‌সন কোনও বিশেষ রাজনৈতিক মতাবলম্বী নন, য়্যালেন এবং আন্‌উইন কোম্পানী তাঁর গ্রন্থের প্রকাশক। কুয়েটের তেল বিদেশী ইজারদারদের হাতে, তেল বাবদ আয় ভোগ করেন শেখ স্বয়ং। সাধারণ লোক যারা তাদের অনেকে হ'ল ভূমিদাস,—কুয়েটে এখনও গোলামী প্রথা চলতি আছে—আর পারস্য উপসাগর থেকে মুক্তা তোলার ডুবুরীর কাজ যারা করে তারা মুক্তা ব্যবসায়ীদের কাছে সামান্য বার্ষিক মজুরী এবং অগ্রিম দাদনের ব্যবস্থায় বাঁধা। যক্ষ্মা এবং সিফিলিস এদের নিত্য সংগী। যক্ষায় চিকিৎসা ব্যবস্থাও অভিনব—হাত এবং জিভে গরম লোহার ছেঁকা দেওয়া। ডিক্‌সন কুয়েটে ছিলেন অনেক বৎসর শিশুকাল থেকে, এক আরব ধাত্রীর স্তন্য পান করে মানুষ হয়েছেন তিনি। এই দেশের জনসাধারণের ভয়াবহ দারিদ্র্য ও দুর্গতির বিবরণ প্রকাশ করে তিনি মাতৃ ঋণ পরিশোধ করেছেন। এই মহানুভব ইংরেজ আমাদের নমস্য। কুয়েট ব্রিটিশের রক্ষণাধীনে আছে গত শতাব্দীর শেষ সময় থেকে। মধ্যপ্রাচ্যের এই এলাকা পারস্য উপসাগর পর্যন্ত ছিল ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আমলা ও ফৌজের রক্ষণাধীনে। ১৯০১ সনে বড়লাট কার্জন কুয়েট পরিদর্শন করেন এবং স্থায়ীভাবে একজন ব্রিটিশ এজেন্ট রাখার ব্যবস্থা পাকা করে আসেন।

বাহেরিন

পারস্য উপসাগরে আরব উপকূলের কাছাকাছি এই ছোট দ্বীপপুঞ্জটি সামরিক ঘাটি হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ, তেল ও মুক্তা উৎপাদনেও সমৃদ্ধিশালী। কাজেই বাহেরিনের শেখ ব্রিটিশ রক্ষণাধীন, যদিও এই দ্বীপপুঞ্জের অধিকার নিয়ে ব্রিটিশের সঙ্গে পারস্যের বিবাদ চলছে ১৯০৬ সন থেকে। বাহেরিন দ্বীপপুঞ্জের আয়তন ২১৩ বর্গমাইলের বেশী নয়, লোকসংখ্যা মাত্র ১ লক্ষ। কিন্তু তাহলে কি হয়? পারস্য উপসাগরে ব্রিটিশের নৌবাহিনীর ঘাঁটি এখানে, এশিয়ায় যাতায়াত পথের বিমান ঘাঁটিও আছে। উপরন্তু আছে তেল, পাইপ লাইন ও মুক্তার ব্যবসায়। বাহেরিন তেল কোম্পানীর মালিক হ'ল (মার্কিন) স্টান্ডার্ড অয়েল ও টেক্সাস কর্পোরেশন। বাহেরিনের অধিকার সম্পর্কে পারস্যের মামলা অনেকদিনের পুরানো, সম্প্রতি নতুন করে পারস্য বাহেরিনের উপর দাবী উত্থাপন করেছে। এর কারণ হ'ল অবশ্য ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজ বাহেরিন থেকে পারস্য উপসাগর পাহারা দিচ্ছে, যাতে এক ফোঁটা তেলও পারস্য বিদেশে চালান না দিতে পারে। বাহেরিন পারস্যের দখলে ছিল ১৭৮৩ সন পর্যন্ত। ঐ সময়ে আরবরা বাহেরিন দখল করে। ১৯০৬ সনে বাহেরিনের শেখ ব্রিটিশের রক্ষণাধীন হবার জন্য সন্ধি করেন। পারস্য অবশ্য কখনও এই সন্ধি অনুমোদন করেনি। ১৯২৭ সনে পারস্য একবার ব্রিটিশ দখলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে; ১৯২৯, ১৯৩০, ১৯৩৪ এবং ১৯৩৬ সনেও ব্রিটেন, লীগ অফ নেশনস ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বাহেরিন ফেরত পাওয়ার জন্য পারস্য দাবী পেশ করে। বলাই বাহুল্য, এই দাবীতে আগেও কর্ণপাত করা হয়নি, ভবিষ্যতে হওয়ার সম্ভাবনা আরও কম।

জাতীয়তাবাদ—লৌকিক ও ইসলামী

কুয়েট, বাহেরিন, মস্কট, ওমান, এই ধরণের ছোট ছোট রাজ্যে বিদেশী দখলীকারদের বনিয়াদ এবং বন্দোবস্ত এখনও মজবুত রয়েছে এবং থাকবে মনে হয়। প্রথমতঃ লোকসংখ্যা যৎসামান্য, বিস্তীর্ণ মরুভূমির মধ্যে ছোট ছোট জনপদে বিক্ষিপ্ত উপজাতি সব, জীবন ধারণের ব্যবস্থা ও রীতিনীতি একেবারে প্রায় আদিম স্তরের, অশিক্ষায় দারিদ্র্যে, মৌলভী মোল্লার প্রভাবে শেখ ও সর্দারদের জবরদস্ত শাসনের চাপে এই দুর্ধর্ষ আরব বেদুইন দিশাহারা, নিজেদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভারবার, বুঝবার ক্ষমতা এদের পঙ্গু হয়ে গিয়েছে। আরব জাতীয় জাগরণের সূত্রপাত সেজন্য হয়েছে ভূমধ্যসাগরের উপকূল ধরে স্থায়ী আরববাসিন্দা অঞ্চলগুলিতে। ইমেন এবং ওমান ছাড়া আরব উপমহাদ্বীপের বিরাট ভূখণ্ডে ছড়ানো রয়েছে বিস্তীর্ণ মরুভূমি, অনুর্বর প্রান্তর আর তরুলতাহীন পাহাড়। মাঝে মাঝে কেবল মরু উদ্যান অঞ্চলে জনবসতি। সিরিয়া এবং ইরাকের ঘনবসতি বহুল উর্বর অঞ্চলে, দামস্কস, বেইরুট, জেরুসালেম, হাইফার মত সমৃদ্ধ শহরগুলিতে আরব জাতীয়তাবাদ প্রথম দানা বেঁধেছে, য়ুরোপের সঙ্গে ব্যবসায় ও ভাবের লেনদেন চলেছে, অনুকরণ, [illegible]যোগিতা এবং সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে আরব দেশগুলির স্বাধীনতা স্পৃহা শক্তিশালী হয়েছে। আরব জাতীয় আন্দোলনের এই উন্নত এবং প্রগতিশীল ধারার মৌলিক গড়নটি অন্য সব অগ্রসর দেশের জাতীয়তাবাদের মতই। এর প্রেরণা হ'ল নাগরিক সংস্কৃতি, এর লক্ষ্য হ'ল লৌকিক, ইসলাম ধর্মাবলম্বী হয়েও এই আরব জাতীয়তাবাদে ধর্মের গোঁড়ামি নাই। সিরিয়া লেবানন, ইরাক, মিশর, মরক্কো এবং টিউনিসিয়ায় গত শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে আরব জাতীয় আন্দোলন যে ধারায় অগ্রসর হয় তার মধ্যে ইসলামী গোঁড়ামির ভেজাল ছিল না। হাসেমী, ওয়াহাবী সুলতান ও শেখ বংশদের গোষ্ঠীগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনুপ্রবেশ করতে পেরেছিল না। মধ্য আরবে ছিল এর ব্যতিক্রম। এখানকার আরব বেদুইনরা আরব জাতীয় ঐক্যের প্রেরণা পেয়েছিল প্রাচীন ইসলামের আদর্শে খলিফার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা থেকে। মধ্য আরবের ওয়াহাবী বেদুইনেরা ছিল এই পরিকল্পনার উৎসাহী উদ্যোক্তা—প্রথম মহাযুদ্ধের সময় কালে এদের নেতৃত্ব করেন ইবন সাউদ। ইবন সাউদ এবং মক্কার শেরিফ হুসেনের গোষ্ঠীগত বিবাদ ও তার পরিণতি কি হয়েছিল সে কাহিনী পরে বর্ণনা করা যাবে। এখানে কেবল স্মরণ রাখা দরকার যে, বর্তমান মধ্যপ্রাচ্যের জাতীয়তাবাদী গণ-

আন্দোলনের জন্ম ইসলামের পীঠভূমি মধ্য আরবের মক্কাও মদিনায় নয়। আরব জাতীয়তাবাদী গণ-আন্দোলনের শক্তির উৎস এবং কেন্দ্র হ'ল মিশর, মরোক্কো, টিউনিসিয়া, সিরিয়া এবং লেবানন। আরবগোষ্ঠী থেকে স্বতন্ত্র হলেও পারস্যের জাতীয় আন্দোলন অনেক বিষয়ে মিশর, মরোক্কো এবং সিরিয়ার সমকক্ষ গণ্য হতে পারে। মধ্যপ্রাচ্য গণ-জাগরণের বৃত্তান্ত বলতে গেলে প্রধানত মিশর এবং পারস্যের বর্তমান যুগের ইতিহাস আলোচনা করতে হবে। আয়তন এবং রাজনৈতিক ও সংস্কৃতিক গুরুত্বের দিক থেকেও এই দেশ দুইটির প্রথম স্থান। মধ্যপ্রাচ্যের বৃহৎ দেশগুলির পৃথক পৃথক ভাবে পরিচয় এখন দেওয়া আরম্ভ করা যেতে পারে। যথাক্রমে মিশর, পারস্য, ইরাক, সিরিয়া, লেবানন, সৌদী আরব, ইস্রায়েল, মরোক্কো এবং টিউনিসিয়া এই কয়েকটি দেশ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজনও হবে। এইগুলি ছাড়া জর্ডান, লিবিয়া, আলজিরিয়া এবং সুদান সম্পর্কে কিছু কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য উল্লেখ করা হবে। তুরস্ক, আফগানিস্থান ও পশ্চিম পাকিস্থানকে মধ্যপ্রাচ্য পরিচয়ের অন্তর্ভুক্ত না করাই সঙ্গত। ইঙ্গ-মার্কিন পরামর্শ মত তুরস্ক সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্যের সামরিক জোটে যোগ দিতে রাজী হয়েছে বটে, কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের কোনও রাষ্ট্রই তুরস্কের এই নূতন ভূমিকাকে অভিনন্দন করেনি। কামালপাশার তুরস্ক নিজের স্বাতন্ত্র্যে ও শক্তিতে বলীয়ান ছিল, মধ্যপ্রাচ্য তুর্কী খলিফার সাম্রাজ্য হারিয়েও নূতন তুরস্কের মর্যাদা কমেনি, বরঞ্চ বেড়েছিল। এখন বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের সাগরেদ হিসাবে তুরস্ক মধ্যপ্রাচ্যের খবরদারীতে অগ্রসর হলে, মধ্যপ্রাচ্যের জনসাধারণের সঙ্গে তার আত্মিক যোগ সম্পূর্ণ নষ্ট হবে। কাজেই মধ্যপ্রাচ্য পরিচয়ে তুরস্কের স্থান স্বীকার না করাই ভালো। আফগানিস্থানের সাম্প্রতিক ইতিহাস এতই ঘটনা-বিরল ও পরিবর্তনহীন যে এই দেশ সম্বন্ধেও বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নাই। অবশ্যই আফগানদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক গভীর প্রীতি এবং শ্রদ্ধার। পাকিস্থানের ধর্মান্ধ এবং ভারত-বিরোধী নীতি এবং কার্যকলাপ মধ্যপ্রাচ্যের কোনও দেশই সমর্থন করে না। আফগানী-স্থানের সম্প্রীতি যেমন আমাদের কাছে মূল্যবান তেমনই মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশ-গুলির সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতা প্রচেষ্টা আমাদের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির যোগ্য।

মিশর

[আনুমানিক আয়তন—৩৮৬,১৯৮ বর্গ-মাইল। আনুমানিক লোকসংখ্যা—১ কোটী ৭০ লক্ষ; মুসলমান শতকরা ৯১ জন; খৃষ্টান শতকরা ৮ জন; ইহুদী এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী শতকরা ১ জন। রাজধানী কাইরো (জনসংখ্যা প্রায় ২১ লক্ষ)]

এই প্রাচীন দেশের প্রাচীন ইতিহাস বর্ণনা করা এখানে অবান্তর। আধুনিক যুগে ব্রিটিশ প্রভাবাধীন হওয়ার পর থেকে মিশরের উন্নতি অবনতি, জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সংগ্রামের কাহিনী হল বর্তমান মিশরের পরিচয়। এই পরিচয় বিস্তারিত ভাবে দেওয়ার পূর্বে কয়েকটি ভৌগোলিক তথ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন। আমরা নীল-নদী বিধৌত মিশরের উর্বর উপত্যকার কথা শুনেছি। কিন্তু আমরা অনেকেই হয়ত জানি না, মিশরের শতকরা ৯৭ ভাগ হ'ল মরুভূমি। নীল নদীর উপত্যকায় চাষের জমির পরিমাণ হ'ল মাত্র ৫০ লক্ষ একর। অথচ মিশরের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭০ জন—প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ লোক চাষবাসের উপর নির্ভরশীল। ইংলণ্ড এবং ওয়েলসের মত শিল্প প্রধান দেশে প্রতি বর্গমাইল গড়ে বসতি হল ৬৭২ জন। মিশরের গ্রাম অঞ্চলে গড়ে প্রতি বর্গমাইলে বসতি হ'ল ১৪৫০ জন। নীল নদীর উপত্যকায় কোনও কোনও জেলায় প্রতি বর্গমাইলে বসতি ২০০০ থেকে ৩০০০ পর্যন্ত। এদিকে মিশরে কলকারখানা যন্ত্র শিল্পের প্রসার নামমাত্র হয়েছে, কেন প্রসার হতে পারেনি তার কারণ কোন কোন ব্রিটিশ শিল্প-ব্যবসায়ীরা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন। সেই কারণ পরে আলোচ্য। তুলা এবং খাদ্যশস্য উৎপাদন হ'ল মিশরী অর্থনীতির মূল ভিত্তি। অথচ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ এবং হার কমছেই, বাড়ছে না। ১৮৯৭ সনে মিশরের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৯০ লক্ষ, ১৯৪৩ সনের হিসাবে হয়েছিল ১ কোটি ৭০ লক্ষ। মৃত্যুর হিসাবে অবশ্য মিশর পৃথিবীতে অদ্বিতীয়, খাতায় পত্রে হিসাবে হাজার করা মৃত্যু হ'ল ২৬ জন, আসল সংখ্যা আরও কিছু বেশি। কিন্তু জন্মের হারও বেশী—হাজার করা ৪০, যদিও ১৯৩৫ সনের হিসাবে প্রত্যেক ১০০০ শিশুর মধ্যে মারা যায় ২২৪টি। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জনসাধারণের আর্থিক সঙ্গতি সব কিছুই নির্ভর করছে মিশরের কৃষি প্রধান অর্থনীতির উপরে। মিশরের বর্তমান ডিক্টেটর জেনারেল নগুইব নাকি মিশরী চাষীর জমির সমস্যা সমাধান করে ফেলেছেন। সমস্যাটা কি এবং তার সঙ্গে সাম্প্রতিক কূটরাজনীতির যোগাযোগ কতখানি সে বিষয় আলোচনা করতে হলে গত ৮০ বৎসর ধরে মিশরী রাজনীতিতে যে ঘাত-প্রতিঘাত চলেছে তার বৃত্তান্ত জানা দরকার। **(ক্রমশ)**

৫

পরের দিন সন্ধ্যার একটু পরেই করিমের দোকানে খাঁ সাহেবের দেখা পেলাম। তিনি তাঁর বাসায় গিয়ে বেশ পরিবর্তন করবেন। করিম ও আমি চললাম তাঁর সঙ্গে। করিমের হাতে একটি লণ্ঠন। যেতে যেতে সে বলল প্রায় প্রতি রাত্রিতেই খাঁ সাহেবকে সে পোঁছিয়ে দেয় তাঁর ডেরায় লণ্ঠন নিয়ে। বুঝলাম, করিমই তাঁর যথার্থ সেবক।

সেই উপরের ঘরে উপস্থিত হয়ে দেখি তক্তাপোশটি গায়েব্! তার স্থানে রয়েছে দড়ির জাল্তি দেওয়া একটি খাটিয়া। আমাদের আরাম করতে বলে খাঁ সাহেব পাশের ঘরের দরজা খুলে ফেললেন; লণ্ঠন হাতে করে ঢুকলেন সেই ঘরে। ইতাবসরে করিমকে জিজ্ঞাসা করি সেই তক্তাপোশের কথা। করিম বলল খাঁ সাহেব সেটাকে আজ সকালে না-মনজুর করে বিদায় দিয়েছেন, কারণ সেটা সব সময়ে বদ্-আওয়াজ করে ভদ্রলোকদের বিরক্ত করে।

এমন সময়ে খাঁ সাহেব আমাকে ডাক দিয়ে বললেন, "বাবুসাব্, জেরা দেখিয়ে ত' ইস্ চিজ্‌কো"। আমরা দাঁড়িয়ে উঠতে না উঠতেই খাঁ সাহেব আস্মানি রংএর একটা লম্বা কুরতা হাতে করে নিয়ে এসে হাজির; করিমকে বললেন লণ্ঠনটা তুলে ধরতে। লণ্ঠনের আলোয় পরীক্ষা করে দেখতেই হ'ল সে জিনিসটা; খাঁ সাহেব ছাড়বেন না যে! রেশমের বুনানির উপর ছোট ছোট তারাগুচ্ছের জরীদার নক্সা; দেখতে নেহাৎ মন্দ নয়, তবে পুরান বলে মনে হ'ল। খাঁ সাহেব আমার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে আছেন দেখে বল্‌লাম "বড়ি বারিক্ (নরম) ঔর্ বেহ্‌তর্ (উৎকৃষ্ট) চিজ্ হৈয়ে কুর্‌তা আপ্‌কে! মালুম হোতা যৈসেকে সিতারোঁসে (নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে) রোশ্‌নিকি টুক্‌রিয়েঁ কুদ্ পড়্ রহি হ্যাঁয়! আহঃ হ"! খাঁ সাহেব প্রসন্ন মুখে আবার চলে যান সেই ঘরের মধ্যে, লণ্ঠন আর কুরতাটি নিয়ে।

এবার একেবারে পাক্‌কা দরবারী বেশে খাঁ সাহেব বেরিয়ে এলেন; মুখে সংযত আনন্দের ভাব; মাঝে মাঝে গোঁফ জোড়া চুম্‌রে কায়দা করে নিচ্ছেন তিনি। বুকের বুটিদার বোতামগুলি টাইট হয়েছে বলেই নেয়াপাতি রকমের ভুঁড়ির একটু উন্নত আভাস ছিল; তবে বেমানান হয়নি, কারণ মাথায় বৃহদাকার মুরেঠার সুষ্ঠু কুণ্ডলীবন্ধ দিয়ে উপর নীচে পাষাণ-দেওয়া হয়ে গিয়েছে। কিন্তু একটা বেখাপ্পা জিনিস নজরে এল। দেখি সেই রেশ্‌মী তারা-কাটা জামার বাহার নষ্ট করে দিয়েছে গলায় ঝুলান একটি লাল ফিতার ঘের, আর তার শেষে একখানি সবুজ পাথরের চাকতি যার উপর সোণার জলে খোদাই করা আরবি হরফে কী সব লেখা রয়েছে। এ'ত ফিরোজ পাথরের চাক্‌তি! দেখেই মনে পড়ে গেল আমার মায়ের কথা। পূর্বে, আমরা গয়াতে থাকার সময়ে মা মাঝে মাঝে মানসিক এক রকমের উদ্বেগে কাতর হয়ে পড়তেন, যাকে আজ-কাল 'নিউরোসিস' বলেন, চিকিৎসকেরা। আমার পিতৃদেবের একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান বন্ধু আমার মায়ের রোগের প্রতিকারকল্পে ঐ রকম একখানি ফিরোজ্ পাথরের চাক্‌তি আনিয়ে দিয়েছিলেন। যাই হ'ক, 'ফিরোজ' নাম আর তার অর্থ 'বিজয়' এটা জেনে-ছিলাম তখন। খাঁ সাহেবের গলায় ঝুলান পাথরখানি আমার চোখে ভাল লাগে নি। তাঁকে বল্‌লাম ফিরোজ পাথরের যাদু-মন্ত্রগুলি কুরতার ভিতরে কলেজার কাছে রাখলে খুব ভাল হয়; আর ফিরোজ! সে' ত আপনার গলার সুরে দম্ পর্ দম্ বার হয়ে আসবে মাইফেলের মধ্যে! খাঁ সাহেব আমার পরামর্শের সম্মান করে আমাকেই বললেন, বোতাম খুলে যাদু-পাথরখানি ভিতরে চালিয়ে দিতে। বুটিদার বোতাম খুলি, সেই ফিতা আর চাক্‌তিখানি ভিতরে চালিয়ে দেই, আর বেশ পরিশ্রম করে বোতামগুলি এ'টে দেই, আবার। হাঁফ ছেড়ে 'দু'কদম পাছু হটে খাঁ সাহেবের দিকে তাকাই। তাঁর মাথায় রক্তজবা রংএর মুরেঠা খুব দুরস্ত সওয়ার হয়েছে বটে; যেমন সুন্দর তার ঢং তেমনি সুন্দর তার পরি-পাটি। বললাম আপনার লাল মুরেঠা যেন মালকোস্ রাগের মধ্যমের মতো জগ্‌মগ্ করছে, লা-জওয়াব্! খাঁ সাহেব এবার মুখ খুলে হেসেই ফেল্‌লেন! তাঁর মুখে ঐ একবারই হাসির আওয়াজ শুনেছিলাম। আওয়াজ্‌টা ভাল লাগেনি আমার। মনে পড়ে গেল গ্রীক্‌দেশীয় বুদ্ধিমন্তের প্রবাদ বাক্য 'Laugh if you are wise' অর্থাৎ —বোকাদের দাঁত বেরিয়েই আছে, যখন তখন হেসে ওঠে তারা; আর বুদ্ধিমান ব্যক্তি হাসবার আগে বুদ্ধি খাটিয়ে দেখেন যে হাসার কারণ উপস্থিত হয়েছে কিনা; বুঝেসুঝে হাসেন বুদ্ধিমন্ত। বাস্তবিকই বুদ্ধিমন্তেরা সশব্দে হাসতে নারাজ; তাঁদের বুক থেকে আওয়াজ্‌দার হাসি বার করার চেষ্টা কতকটা সিজেরিয়ান্ অপারেশন্ করে পেটের ছেলে বার করার মতো; তখন আমাদের মনে হয়েছে।

করিম সপ্রশংস নেত্রে খাঁ সাহেবের পোষাকের দিকে চেয়ে আছে। খাঁ সাহেব আমাকে বললেন এই করিম ছোকরা বড় তমিজ্‌দার (শিষ্ট) আর হোশিয়ার, এর উপর আল্‌লার নেক নজর আছে। করিমের সুখ্যাতি শুনে আমার হিংসা হয়েছিল! খাঁ সাহেবকে বল্‌লাম আমি যে এত করে আপনার পোষাকের তারিফ করলাম তবু আমার জন্য ত কিছু মুবারক (ভালাইয়ের কথা) বললেন না আপনি।

খাঁ সাহেব বিশদ নয়নে চাইলেন আমার দিকে; কাছে এসে আমার মাথায় হাত দিয়ে কী যেন অস্ফুট শব্দ করে আমার মাথার উপর তিনবার ফু দিলেন! আর বললেন, 'কোনও ভয় নেই, কিছু পরবা করবেন না, আল্লা আপনার ভালই করবেন, মনে রাখবেন। কেন তিনি এ রকম কথা বললেন বুঝতে পারিনি, কারণ ভয় বা পরবা করতাম না কিছুর। তবে, পরে ভেবে ঠিক করে-ছিলাম যে যৌবন বয়স আমার; গানে ও সুরে উন্মত্ত আমি; প্রায় অবাধ আমার গতি; বিপদাপদ দেখা দিতে কতক্ষণ! হয়ত খাঁ সাহেব ভেবেছিলেন আমার জন্য

একটা রক্ষামন্ত্র বা প্রার্থনার কবচের প্রয়োজন আছে বা হতে পারে।

ট্যাক্সি ধরে নিয়ে খাঁ সাহেব আর আমি চলেছি রাজভবনে। খাঁ সাহেব চুপ করে বসে আছেন। এমন সময়ে মনে করলাম তাঁকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। সেদিন ট্রামে বসে তিনি আমাকে চৌধুরাণের জল্‌সার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। কেন, কী ভেবে তিনি সে কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন এই কথাটাই জিজ্ঞাসা করলাম এখন।

সর্বনাশ! প্রশ্ন শুনেই মনে হল তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছেন, কারণ তিনি হঠাৎ আওয়াজ্‌ করে উঠলেন, "লাহল্‌ওয়েলা কুবত্‌" আর কিছু বিড় বিড় করতে করতে এক রকমের গা-ঝাড়া দিয়ে ভাল করে বসলেন সিটের উপর। আমি একটু অপ্রস্তুত হয়েছি; ভাবলাম অপরাধটা কোথায় হল! তিনি নিজেই ত ঐ কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমাকে। যাক্‌, চুপ করেই থাকি। কিন্তু মন চঞ্চল আমার। সতর্ক দৃষ্টিতে তাঁর শরীরের দিকে চেয়ে দেখি, তাঁর ডান হাঁটুর উপর ডান হাতের আঙুলে একটি তস্‌বির মালা ঘুরছে; যে রকম মালা দিয়ে মুসলমান সাধকেরা জপের কাজ সারেন। হরি বোল হরি! তিনি যে মালায় আছেন, আগে বললেই ত চুকে যেত, আমি তাঁর জপে বিঘ্ন করতাম না! চুপটি করে বসে থাকি আর ননীর কথা ভাবি। ননী ত' নেহাৎ বাজে কথা বলেনি; কিন্তু বুঝল কেমন করে! ননীই বা কোন্‌ মানুষটিকে দেখল আর বুঝল: আমিই বা কোন্‌ মানুষটিকে দেখছি, কিন্তু বুঝে উঠতে পারছিনে! যাই হোক, মানুষ দুটি নয়; মানুষ একই।

এল্‌গিন রোডে যখন গাড়ি ঘুরছে তখন খাঁ সাহেবের ধ্যান ভঙ্গ হ'ল। হাতের দিকে তাকিয়ে দেখি জপমালা অদৃশ্য হয়েছে, তাঁর পকেটের মধ্যে নিশ্চয়ই। তবুও কথা বলতে সাহস হ'ল না আমার। দেখি, খাঁ সাহেব তাঁর বুকের কাছে অলক্ষ্য ফিরোজ পাথরের চাকতির উপর হাত বুলিয়ে নিচ্ছেন! অথচ, ইনিই আমার মাথায় ফুঁ দিয়ে কৃপা করে অভয় দিয়েছিলেন। এমন সময়ে তিনিই জিজ্ঞাসা করলেন আমি গণেশীলাল চোবেজীর তারিফ অর্থাৎ নাম-ধাম গুণপনার কথা শুনেছি কিনা। আমি ঐ নামটি জীবনে প্রথম শুনলাম তাঁর মুখে। বললাম, না আমি শুনিনি। তিনি তখন নিজে থেকেই সেই গণেশীলাল চোবেজীর বিষয়ে এমন কিছু তারিফ করে গেলেন যা থেকে বুঝলাম সেই চোবেজী একজন সঙ্গীত-সিদ্ধ ধ্রুপদ গায়ক; শুধু তাই নয়, তিনি একজন ইলম্‌দার বুজুরুগ্‌ শ্রেণীর লোকও বটে। তিনিই খাঁ সাহেবকে বলেছিলেন যে, দুনিয়াতে শয়তানের বান্দা-বান্দীদের প্রলোভনের হাত থেকে রক্ষা পেতে হ'লে ফিরোজ্‌ পাথরে লেখা যাদুমন্ত্র ধারণ করাই উচিত। খাঁ সাহেবের কথা শুনে মনে হ'ল যেন বালকের মত সরল বিশ্বাসের প্রবণতা ভরে আছে খাঁ সাহেবের হৃদয়। আর বলিহারি এই ফিরোজ্‌ পাথর! মুসলমান এটাকে এনে দেয় হিন্দুর কল্যাণের উদ্দেশে, আর হিন্দুসাধক পরামর্শ দেয় মুসলমানকে এই সবুজ পাথরের চাক্‌তি ধারণ করতে! পরে জেনেছিলাম তুরস্ক আর এশিয়া মাইনরই না কি এর জন্মস্থান, মিশর এর প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র, পয়গম্বর মহম্মদের বহু পূর্ব থেকে বেদের দল এই চাক্‌তির গুণাগুণ প্রচার করে এসেছে। আজব দেশ এই ভারত, আর তার সর্বলোলুপ মনোভূমি!

*   *   *   *

রাজভবনে কুমারের তরফে উত্তর দিকের গাড়িবারান্দায় নেমেছি আমরা। একজন বাঙালী ভদ্রলোক ও দু'জন কৃপাণধারী রক্ষীপুরুষের অভ্যর্থনা স্বীকার করে সুসজ্জিত অলিন্দ পার হয়ে ভিতরে প্রবেশ করি। সেখানে পাই নীরব সমাদর। দুয়ারের দু'দিকে দু'টি দীর্ঘাকার লৌহ্‌-বর্ম এমনভাবে খাড়া করে সাজান রয়েছে যেন জীবন্ত সৈনিকযুগল পাহারা দিচ্ছে। তাছাড়া কয়েকটি নির্জীব জন্তুও সজ্জিত রয়েছে, সজীবের ভঙ্গিতে। খাঁ সাহেব এদের আমলই দিলেন না। কার্পেট মোড়া সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠি আমরা। খাঁ সাহেবের পরিশ্রম হয়েছে বলে মনে হ'ল না, যদিও তাঁর হাতে লাঠি নেই। তিনি জাহাজী সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করেন। তাঁর জীবন কাষ্ঠ-কঠিন আরোহ-অবরোহে অভ্যস্ত; এটা ত' তাঁর পক্ষে কুসুমকোমল সংকার; সুরশৃঙ্গারের সুচিক্কণ বক্ষে সুরের আস্তরণ! উপরে সিঁড়ির শেষে বারান্দার আরম্ভদেশে দু'টি মর্মরময়ী কিশোরী মূর্তি বিজলীর প্রদীপ হাতে নিয়ে অতিথিদের বরণ করতে প্রস্তুত রয়েছে। এর পরেই চোখে পড়ে সেই হাতির দাঁতের বড় খন্ডটি; অদ্ভুত, বৃহদাকার, অথচ নিরতিশয় শোভনরূপ হয়েছে তার, রূপালি বলয়ের বহু বিচিত্র বেষ্টনীচর্যা দিয়ে। সঙ্গীত নিকুঞ্জে অর্থাৎ আসর ঘরে যেতে প্রবেশপথে নানারকমের শিল্পসজ্জার মধ্যে এতই সমঞ্জস পরিবেশন ছিল এই কারু-পদার্থটির যে সমাগত দর্শকের চক্ষুর পীড়া ঘটায় না। অথচ, এর রূপটি চোখে পড়া মাত্র বিস্ময়ে মতি স্তব্ধ হয়; অজ্ঞাতসারে গতিও মন্থর হয়ে যায়, এমন কি, স্থিরও হয়ে যায়। কিন্তু খাঁ সাহেবের মতি বা গতি কিছুই ব্যাহত হ'ল না, সেই মর্মর-সুন্দরীযুগলের নির্নিমেষ আমন্ত্রণে অথবা গজদন্তের বিচিত্র শোভাসম্পদে।

নিকুঞ্জের প্রবেশদ্বারেই আমরা দাঁড়িয়ে যেতাম একটি বুদ্ধমূর্তির প্রতি নির্বাক শ্রদ্ধানিবেদনের উদ্দেশ্যে। সম্যক্‌ নির্বিরোধ প্রশান্তিই যেন ঘনীভূত হয়ে আছে সেই সৌম্য প্রতিমূর্তির রূপে। কতোবার চেয়েছি এই মূর্তির দিকে, কিছু ইঙ্গিত, কোনও সংকেতের প্রতীক্ষায়। আশাভঙ্গ হয়নি আমার। নির্মল অনুদ্ধত মনোভাবের পটভূমিকায় আমাদের জীবনরেখার শান্ত দীপ্ত প্রতিভাস সম্ভব হ'ক, জীবন-সঙ্গীতের পবিত্র উল্লাস দিয়েই আমাদের তরুণ হৃদয় স্পন্দিত হ'ক, আনন্দের পরিশেষ মুহূর্তগুলি যেন পুনরায় শান্তির কোলেই সার্থক পর্যবসিত হ'ক,— মাত্র এ রকমের কিছু অস্ফুট বাণী মাঝে মাঝে যেন শুনেছি বুদ্ধমূর্তির সেই নিস্পন্দ ওষ্ঠযুগলের ইঙ্গিতে। এ থেকে গূঢ়তর কিছুর আভাস পাইনি আমি। সুরের কুসুমবাণ দিয়ে অনুবিদ্ধ আমার হৃদয়ের তরুণ গ্রন্থিগুলি; এদের উচ্ছেদ করে নির্বাণের কল্পনা করাই যে আমার পক্ষে প্রাণান্তকর!

খাঁ সাহেব সেই বুদ্ধমূর্তির দিকে ভ্রূক্ষেপও করলেন না। খাঁ সাহেবের মন কি লোহা, হাতির দাঁত বা মার্বেল পাথরের চেয়েও কঠিন, দুর্ভেদ্য? তাও ত' নয়; আমি তাঁকে যেমন দেখেছি আর বুঝেছি।

*   *   *   *   *

আসরে খাঁ সাহেবের আগমনে উপস্থিত সকলেই উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার জানালেন, অভিবাদন করলেন ব্রজেন্দ্রবাবু ও নগেন্দ্র-বাবু (ভবানীপুর নিবাসী সুকণ্ঠ ধ্রুপদ গায়ক ও সুরসিক পুরুষ)। খাঁ সাহেব মৃদু গম্ভীর স্বরে আদাব জানাতে থাকেন। তখনও বিশ্বনাথজী আসেননি। আসরের একদিকে দু'টি সুন্দর তম্বুরা প্রস্তুত ও শায়িত রয়েছে। পাশেই রয়েছে তবলায়

যোড়ী আর স্থিরস্বরা একটি বক্স হারমোনিয়ম্। স্থিরস্বরাই বটে! হারমোনিয়মের স্থিরস্বর না হ'লে তম্বুরা বাঁধার সুবিধা হয় না, কণ্ঠে স্কেল্ ঠিক করা সুবিধা হয় না, প্রাথমিক গীতনবিশের কণ্ঠে সুর অভ্যাস করার সুবিধা হয় না। বিশ্বনাথজী এ যন্ত্রটিকে ত্যাজ্য বা অপাঙ্‌ক্তেয় মনে করতেন না। তখনকার দিনে গণপৎ রাও সাহেব, শ্যামলালজী, সোহ্নীজী, বশীর খাঁ, জনাব মির্জাসাহেব ও জংগীর যাদুভরা অংগুলিক্ষেপনে হারমোনিয়ম্ যন্ত্রের হৃদয় থেকেই যেন সুরের বন্যা বয়ে আসত। ঐ সকল গুণীরা হারমোনিয়মের স্থির অনাড়ম্বর স্বরলহরী দিয়েই রচনা করতেন সুত্ ও মীড়ের ইন্দ্রজাল; যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন এই আশ্চর্য ব্যাপার তাঁরাই বুঝেছেন, অন্যের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন। সম্প্রতি এই যন্ত্রটি অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে পড়েছে। অবশ্য আমরা আশা করিনি যে, সোহ্নী-শ্যামলালজীর দল দেহ ধারণ ক'রে অজর অমর হয়ে থাকবেন। তাঁরা কীর্তিতে অমর হয়ে থাকবেন; কীর্তিলেখার সংগে অবিচ্ছেদ্য হয়ে থাকবে হারমোনিয়ম্ এবং তার সম্ভাবনা।

আসরের আলোক শোভার উজ্জ্বলতায় আমাদের সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে ছিল খাঁ সাহেবের লাল পাগড়ীর জৌলুশের দিকে। ইতিপূর্বে আসরে বুকভ খাঁ (ওস্তাদ কেরামত উল্লা খাঁ সাহেবের ছোট ভাই, যিনি ব্যাঞ্জো বাজিয়ে কলিকাতায় নাম কিনে নিয়েছিলেন) চন্দনচোবেজী আর মোজুদ্দিন খাঁ সাহেবও পাগড়ী পরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু এমন জমকালো লাল পাগড়ী আমরা আর দেখিনি।

আমি কুমারের কাছে চলে গিয়ে খবর বলতেই তিনি বললেন, মহারাজ হয়ত' উপস্থিত থাকতে পারবেন না; বিশেষ একটি সভায় আহূত হয়েছেন তিনি। মহারাজ বলে গিয়েছেন, ওস্তাদজী অর্থাৎ বিশ্বনাথজী এলে যেন গান আরম্ভ করিয়ে দেওয়া হয়, মহারাজের প্রতীক্ষা যেন না করেন বিশ্বনাথজী। কুমার আমাকে অনুরোধ করলেন যে, আসরে বিশ্বনাথজী এলেই কুমারকে যেন সংবাদ দেই আর খাঁ সাহবকে পান-এলাইচি প্রভৃতি দিয়ে খাতির করার কাজটা যেন আমি তদারক করি; ততক্ষণ কুমার বেশ পরিবর্তন করবেন।

আসরে ফিরে গিয়ে বসি। সামনেই বড় রূপোর থালায় পান-এলাইচ প্রভৃতি রয়েছে, খুদে হাওয়া-গাড়ির মত ঘুরঘুরে চাকা লাগান একটি আধারে ভাল সিগারেট সরঞ্জামও রয়েছে। খাঁ সাহেব পান নিলেন না, মাত্র সিগারেটে মনোনিবেশ করলেন।

* * *

ওস্তাদ বিশ্বনাথজী এসেছেন; সংগে একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোকও এসেছেন; ইনিই সংগত্ করবেন। ওস্তাদে ওস্তাদে দাঁড়িয়ে প্রীতিসম্ভাষণ হয়, আর আমরা উঠে দাঁড়াই ততক্ষণ। বিশ্বনাথজীকে বল্লাম, তিনি এলেই কুমারকে খবর দেওয়ার কথা আছে; আমি খবরটা দেইগে? বিশ্বনাথজী কী যেন ভেবে বললেন, একটু সবুর করতে; আর খাঁ সাহেবকে টেনে নিয়ে গেলেন জানলার ধারে একটু আড়ালে। সেখানে তাঁদের মধ্যে কিছু কথা হ'লে ফিরে এসে আসরে বসলেন তাঁরা। তখন বিশ্বনাথজী বললেন, চলুন, কুমার বাহাদুরের সংগে একটু কথা আছে।

বিশ্বনাথজীর সাক্ষাৎ হতেই কুমার পদধূলি নিলেন গুরুদেবের। , বিশ্বনাথজী বললেন, খাঁ সাহেবকে আগে খাওয়াতে হবে, না হ'লে তিনি অস্বস্তি বোধ করেন! তৎক্ষণাৎ হুকুম হয়ে গেল, খাঁ সাহেবের আহারের আয়োজন করতে। আমার মনে পড়ে গেল, মৌজুদ্দিনের তৈয়ারী হওয়ার কথা। এমন সময়ে ননী এসে উপস্থিত। কুমার বিশ্বনাথজীকে মহারাজের অনুপস্থিতির কথাটা বুঝিয়ে দিলেন। বিশ্বনাথজী অল্প কথা বলতেন, আর কাজের কথা আগেই সেরে রাখতেন; বললেন, খাঁ সাহেবকে খাইয়ে দাইয়েই গান আরম্ভ করিয়ে দেওয়া যাবে; কি বলেন, কুমার বাহাদুর? কুমার বললেন, আপনি যা বলবেন তাই হবে।

খাঁ সাহেবের খাওয়ার সময়ে উপস্থিত থেকে তদারক করার ভার পড়ল ননীর উপর।

* * *

যখন অন্দর মহল থেকে ঘুরে এলাম তখন খাঁ সাহেব জলযোগ সেরে আসরে গিয়েছেন। ননীকে একান্তে জিজ্ঞাসা করলাম, খাঁ সাহেবের জলযোগের কথা। সে বলল, খাঁ সাহেবের পাতে চারখানি করে পাঁচবারে কুড়িখানা লুচি পড়েছে, তবে চব্বিশ পর্যন্ত যায়নি; তার উপর তরকারী মাছ মাংস দই রাবড়িও ছিল, খাঁ সাহেব অমান্য করেননি কোনও কিছুর। আমি বললাম, "কী সর্বনাশ"! অর্থাৎ ভবিষ্য গানের কথা ভেবে। ননী আমার কথা বুঝতে না পেরে বলল, সাধকদের পক্ষে এ আর কী এমন কথা! কলসী কলসী দুধ-মালাই বা মদ বা শ' ছিলিম গাঁজা ত' তাঁরা গণ্ডুষ করে শুষে নিতে পারেন; আবার সাত-আট দিন নিরম্বু উপবাসও দিতে পারেন তাঁরা। আমি বললাম,—বাঁচলাম! ভাগ্যে সাধকদের ওরকমের ব্যালেন্স আছে আহারে আর উপবাসে, তাই ভারতের গৃহস্থেরা এখনও বেঁচে আছে! ননী বলল, তুমি একটা নাস্তিক, তুমি এসব রহস্য বুঝবে না।

* * * *

বিশ্বনাথজী ও কুমার আসরে আসন গ্রহণ করেছেন; প্রাথমিক শিষ্টাচার সব কিছু সম্পন্ন হয়েছে; মাইফেল সরগরম হয়েছে। বিশ্বনাথজীই মাইফেলের কর্তা; তিনিই খাঁ সাহেবকে অনুরোধ করলেন যে, অন্য কিছু অসুবিধা না থাকলে খাঁ সাহেব গান আরম্ভ করুন। খাঁ সাহেব বিনীত স্বরে বললেন, রাওজি! আপনি ধ্রুপদের বাদ্শাহ; আপনি প্রথমে একখানা ধ্রুপদ গাইবেন না কি? বিশ্বনাথজী খাঁ সাহেবকে বুঝিয়ে বললেন, এই মাইফেল খাঁ সাহেবেরই মাইফেল আর কারুর নয়; আর মহারাজ বাহাদুর ঐরকম বন্দোবস্তই হুকুম দিয়ে রেখেছেন। অতএব খাঁ সাহেব অনুগ্রহ করে তম্বুরা গ্রহণ করুন।

খাঁ সাহেব একটি তম্বুরা হাতে নিয়েছেন এমন সময়ে ঢুং ঢাং শব্দে সুপরিস্ফুট ধ্বনি করে বাজতে থাকে কয়েকটি বড় ক্লক ঘাড়, ষড়জ গান্ধার পঞ্চম নিষাদের সুরে; এ ঘরে সে ঘরে সিঁড়ির উপর থেকে, নীচে থেকে। সেই ধ্বনি আর অনুরণনগুলি খাঁ সাহেবের সংবিদ্‌কে নাড়া-চাড়া দিয়েছে, হৃদয় স্পর্শ করেছে; তিনি ঈষৎ আবেশের ভাবে অল্প মাথা নাড়তে লাগলেন। বারবার তিনবার স্বরপরিক্রমা দিয়ে যেন আমাদের হৃদয়াকাশ বিধ্বনিত করে ঘড়িগুলি এক সংগে এক সুরে পর পর ধ্বনি তুলে জানিয়ে দিল যে, রাত্রি ন'টা বাজল। ঘণ্টার এই সংকেতশব্দগুলিও সুরে বাঁধা। আমরা এই সুরকেই মূল ষড়জ মনে করে পূর্বের সুরসন্দোহকে 'স-গ-প-ন' বলে অনুভব করতে অভ্যস্ত ছিলাম। ঘণ্টাধ্বনির রেশ যখন মিলিয়ে যাচ্ছে তখন খাঁ সাহেব বিশ্বনাথজীর দিকে চেয়ে বললেন,

"কি সুন্দর রসিলা সুর দিয়ে ঘাড়ির আওয়াজ বেঁধে দেওয়া হয়েছে! বাঃ বাঃ"! বলে তিনি রেশটি নিঃশেষে মিলিয়ে যাওয়ার প্রতীক্ষায় থাকেন। এ পর্যন্ত অভিজ্ঞতায় বুঝলাম, অন্তত এই একটা জিনিস খাঁ সাহেবের মন হরণ করেছে। খাঁ সাহেব বোধহয় শব্দতান্ত্রিক লোক; শ্রব্যরূপের সৌন্দর্যই তাঁর কাছে অধিক মনোরম, দৃশ্যরূপের সৌন্দর্যের চেয়ে। চক্ষুষ্মান লোকেদের মধ্যে তিনি অসাধারণ লোক এমন মনে হয়েছে আমার।

খাঁ সাহেব একটি তম্বুরা হারমোনিয়মের সাহায্যে সুরে বেঁধে নিয়ে বিশ্বনাথজীকে সেটা দিলেন পরীক্ষা করতে; ততক্ষণ অন্য তম্বুরাটিও বেঁধে নিলেন খাঁ সাহেব। লক্ষ্য করলাম, খরজের তারটি খাঁ সাহেব বাঁধলেন খাদের মধ্যমে, অথচ পঞ্চমের তারটি পঞ্চমেই বাঁধা হ'ল। দুই তম্বুরা যখন এক সুরে বাঁধা হয়ে গেল তখন বিশ্বনাথজী তাঁর হাতের তম্বুরাটি ব্রজেন্দ্রবাবুর হাতে দিয়ে স্বয়ং তবলা বেঁধে দিলেন তম্বুরার সুরে। সংগীত নিকুঞ্জ ভরে উঠল তম্বুরার গুণ্‌গুণ্ ধ্বনিতে।

আশ্চর্য যন্ত্র এই সরল সুরকণ্ঠাভরণ তম্বুরা; অতুলনীয় এর চারটি তারের গাঢ় মধুর গুঞ্জন ধ্বনি, যেন শতদল কমলের চারিদিকে সমাগত ভ্রমরবৃন্দের মিলনমুখর ঝঙ্কার! উন্মুখ শ্রোতার হৃৎপঙ্কজ যদি বিকশিত ও রাগোৎফুল্ল হয়ে ওঠে সেই চারটি তারের উপচ্ছন্দময় গুঞ্জনের প্রভাবে তাতে আর আশ্চর্য কি! কে এই যন্ত্রটি নির্মাণ করেছিলেন? তখন পর্যন্ত আমরা জেনেছিলাম তুম্বুরু নামে কোনও দিব্য গন্ধর্ব পুরুষ এই তুম্বুরু বীণা অর্থাৎ তম্বুরার উদ্ভাবক। বেশ একটা তৃপ্তিতে ছিলাম। কিন্তু ঐতিহাসিক চর্চা করতে গিয়ে তৃপ্তিটা একরকম নষ্টই হয়ে গেল। মহামুনি ভরতের প্রণীত নাট্যশাস্ত্র, নারদীয় "সংগীত মকরন্দ" গ্রন্থ, মতঙ্গ প্রণীত "বৃহদ্দেশী" গ্রন্থ এবং শার্ঙ্গদেব রচিত "সংগীতরত্নাকর" গ্রন্থে (খৃঃ ১২৪৭) সর্বসাকল্যে নানারকম বীণার নাম উল্লেখ ও বর্ণনা পড়ে মুগ্ধ হ'লেও "তুম্বুরু বীণা" নাম পাইনি, চার তারের বীণাজাতীয় কোনও যন্ত্রের উল্লেখও পাইনি। ঐ সকল গ্রন্থে দু'তার, তিন-তার, পাঁচ-তার, সাত-তার, ন'-তার, একুশ-তার, ছেবট্টি-তার, এমন কি, একশ'—তারের বীণার উল্লেখ রয়েছে; নেই কেবল এই চার-তারের তম্বুরা বা তুম্বুরু বীণার উল্লেখ! কোনও কোনও অর্বাচীন শাস্ত্রকার নিজের উদ্ভাবিত বীণার নাম-রূপে প্রচারও করেছেন, অথচ তুম্বুরু গন্ধর্বের খাতির করলেন না; এই বা কিরকম কথা! প্রশ্ন হয়, তম্বুরা নামে এই চার-তারের যন্ত্রটি এল কোথা হতে? আর, কবেই বা এসে উড়ে বসল ধ্রুপদ-খেয়াল-আলাপ সংগীতের কোল জুড়ে? এর চরম উত্তর আজও পাইনি আমি! প্রাচীন সংস্কৃত শব্দকোষে তম্বুরা বা তানপুরা, তুম্বুরু বীণা বলে শব্দ পাওয়া যায় না। সোজা সরল কথা এই যে, তম্বুরা নামে যন্ত্রটি প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় সংগীত-শাস্ত্রের স্বীকৃত, বা সম্মত নয়।

জার্মানী দেশের বৈজ্ঞানিকপ্রবর সংগীত-রসিক ডাক্তার হেল্‌ম্‌হোল্‌জের প্রণীত শব্দ-ধ্বনিবিষয়ক গ্রন্থ (অবশ্য ইংরাজি অনুবাদ তৃতীয় সংস্করণ খৃঃ ১৮৯৫) পড়ে দেখি, তার ভাষ্য-টীকার মধ্যে তম্বুর নামে একটি আরবদেশীয় তারের যন্ত্রের প্রসঙ্গ রয়েছে। ক্রমে জানতে পারলাম, "তম্বুর"* শব্দটি আরবী অভিধানে পাওয়া যায়; শব্দটি পারসি ও আরবী ভাষার শব্দ।

তবে কি ঐ যন্ত্রটি নাম-রূপ সম্বল করে আরব ধাউ (সমুদ্রগামী বড় বজরা) চড়ে আরবসাগর পাড়ি দিয়ে ভারতের উপকূলে অবতীর্ণ হয়েছিল! অসম্ভব কি! যদি তাই হয় তাহ'লে সেই নৌকাগুলি জেহাদী (ধর্মযুদ্ধের) নৌকা ছিল না, নিশ্চয়! যে রকমের নৌকা করে ভারত থেকে সেতার যন্ত্র রপ্তানি হয়ে পারস্য প্রভৃতি দেশে পৌঁছত সেই রকমের নৌকায় আমদানী হয়ে থাকবে এই শান্তিময় তম্বুরা যন্ত্রটি। হয়ত' ফকির দরবেশী বা ভবঘুরে শ্রেণীর লোকের হাতে চড়ে ঘুরতে ফিরতে এসে পড়েছিল এটা। সেই নৌকাগুলি হয়ত' করাচীর ছিদ্রপথ সন্ধান না করে, মালাবার উপকূলের অরণ্যবেষ্টিত স্থানে ভিড়িয়ে যেত। "মিরাজ" নামে যে স্থানটি বহুকাল থেকে তম্বুরা প্রস্তুতির কারণে বিখ্যাত হয়ে আছে সারা ভারতে, সেই 'মিরাজ' ত' পশ্চিমোপকূলেরই সন্নিকটে। মিরাজই হয়ত' ছিল সেরকম পণ্যের প্রাথমিক গন্তব্যস্থান, বা আমদানী মালের আখাড়া; কে বলতে পারে! সংগীতশাস্ত্রের প্রণেতারা যদি ম্লেচ্ছসংস্রব হেতুতে ঐ যন্ত্রটিকে গ্রহণের বা উল্লেখের অযোগ্য মনে করে

* [মাত্র সাধারণ আলোচনার দিঙ্‌নির্ণয় কল্পে বলা যায়—(১) Cassel and Company Limited কর্তৃক প্রকাশিত The Encyclopaedic Dictionary (1889) গ্রন্থাবলীর প্রাসঙ্গিক বিভাগে তম্বুরা শব্দের উল্লেখ আছে ও উল্লেখকার বলেছেন পারস্য, তুরস্ক, ইজিপ্ট ও হিন্দুস্থানে এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয় এবং প্রাচীন আসিরিয়া ও ইজিপ্ট দেশে এই একই যন্ত্র বিভিন্ন নামে প্রচলিত ছিল; (২) ডাঃ হেল্‌মহোল্‌জের গ্রন্থের (Sensation of Tone, 1895) পরিশিষ্ট অংশে খোরসানী তম্বুর ও বাগ্‌দাদী তম্বুরের বিশিষ্ট উল্লেখ আছে; (৩) রাজা সর্ সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রণীত "Universal History of Music" গ্রন্থে (খৃ ১৮৯৬? ১৮৯৪?) আরব, পারস্য, আসিরিয়া, প্যালেষ্টাইন ও প্রাচীন ইজিপ্ট দেশের এবং হিব্রু জাতির সংগীত প্রসঙ্গে "তম্বুর" যন্ত্রের উল্লেখ আছে; ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস প্রসঙ্গে গ্রন্থকার বলেছেন (বিশেষ প্রমাণ উদ্ধৃত না করে) যে তুম্বুরু নামে গন্ধর্ব তুম্বুরু বীণার উদ্ভাবক, কিন্তু তিনি বলেন না যে ঐ তুম্বুরু বীণা ও অধুনা প্রচলিত তম্বুরা একই বস্তু। মুসলমান বাদশাহী যুগের সংগীতের প্রসঙ্গে গ্রন্থকার যে সকল যন্ত্রের নামোল্লেখ করেছেন তার মধ্যে তম্বুর, তম্বুরা বা তানপুরা নাম নেই, চার তারের যন্ত্রও উল্লিখিত হয়নি। ইতি—লেখক]

থাকেন, তাতে ক্ষতি হয়নি, কাজ আটকে থাকেনি। তম্বুরা যদি আরবসাগরের ঢেউ সহ্য করে ভেসে এসে থাকে, ত' আমি বলি ভালই হয়েছে, রক্ষা পেয়েছে সে, সম্মানও পেয়েছে সে ধ্রুপদধামার, খেয়াল ও আলাপের গুণীদের কোলে উঠে, তাদের করাঙ্গুলির কোমল স্পর্শে। গ্রন্থকারদের কলমের মুখে এর নামটি কলিত না হয়ে থাকে, নাইই বা হ'ল। মনে করা যাক্—কল্পনার এই 'হয়তো' আর 'যদি'গুলি সবই অপ্রামাণিক; তাতেই বা ক্ষতি কি! বেঁচে থাকুন (বোধহয় আর বেশীদিন নয়) আমাদের বাংলাদেশের অশিক্ষিত চিত্র-পটুয়ার দল যাঁরা এই তম্বুরাকে মানানসই করে' বসিয়ে দিয়েছেন নীলকণ্ঠ মহাদেবেরই কোলে; কিন্তু তুম্বুরু গন্ধর্বে'র ছবি আঁকেন না এঁ'রা। নীলকণ্ঠ সমুদ্রজাত বিষ হজম করে ফেলেছেন, আর সামান্য তম্বুরাকে হজম করতে পারবেন না? আমি বলি, পেরেছেন তিনি, কারণ তিনি যে আশুতোষ। বর্তমানে যেটা ভাল কাজে লাগাতে পারছি, যাকে সদ্য ও সহজে নিবেদন করতে পারছি তাতেই তিনি তুষ্ট; অতীতের পরিবর্তনশীল ইতিহাসের 'হয়তো' বা 'আহা যদি'র হা-হুতাশের অভিমানে উপবাসী হয়ে থাকেন না তিনি। তম্বুরার অতীত বলতে কিছু থাক্ বা না থাক্, বর্তমানে আশু ফল দেয় এই যন্ত্রটি। তম্বুরার চারটি সুরভ্রমরের সঙ্গীতির মধ্যে হৃদয় দিয়ে মিলনেরই ধ্বনি রয়েছে; সেই ধ্বনিমাত্রকে হৃদয়ে ধরে নেই এখন।

আসরকে নতি জানিয়ে খাঁ সাহেব কণ্ঠের সুর ছাড়লেন তম্বুরা কোলে নিয়ে।

কোনও তোম্ তায় নোম্ বোল ব্যবহার না করে, মাত্র স্বরবর্ণ উচ্চারণ করে খাঁ সাহেব সুরের নক্শা ফুটিয়ে তুললেন এক নিঃশ্বাসে। প্রথম অংশটিই মনে আছে। আরম্ভেই প্রকাশ হ'ল মুদারার মধ্যমস্বর; এর পরে যেন মুক্তাহারে মুক্তাদানার মত' স্পষ্ট সমান ও ঘনসংলগ্ন কয়েকটি সুর দেখা দিল অবরোহনক্রমে; শেষের সুর এসে দাঁড়াল উদারার মধ্যমে; দ্রুত অভ্রান্ত সুর ক্ষেপ দিয়ে যেন একটা রেখাঙ্কন আবির্ভূত হ'ল আমাদের শ্রবণে। কানের ধ্যানে বুঝলাম, দরবারী কানাড়ার সুরগুলি; কিন্তু রেখবটি তখন ছিল না। দরবারী রাগ নয়, কারণ উদারার মধ্যম স্বর দরবারীতে অমন করে প্রকাশমান হয় না। কণ্ঠের চারু চরিত্রপটে সুররেখার অপূর্ব সে মহিমা! জীবনে এমন বিশিষ্ট সাক্ষাৎকার আর ত' ঘটেনি। আমার শ্রবণের আকাশ যেন অকস্মাৎ কয়েকটি সুরনক্ষত্র দিয়ে খচিত হয়ে উঠল; অজানা তাদের সংকেত, মধুর তাদের আভাস। আর, সকলের মধ্যে সেই মন্দ্র মধ্যমই যেন সমুজ্জ্বল মধ্যমণি! মধ্যমের সেই দীপ্তিমান নিষ্কম্প স্বরূপ আজ মনে পড়ে বিশেষ করে। অতিত্বরিত স্মৃতির আলোয় ঝক্‌মক্ করে ওঠে একটি উদারার গান্ধার,—মৌজুদ্দিনের কন্ঠে 'সুপনেমে আয়ে' পূরিয়া রাগিনীর গানের সেই অপূর্ব গান্ধার; সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় ওস্তাদ মুস্তাক হুসেন খাঁ সাহেবের কণ্ঠে "তান তলবার" বসন্তমালতী রাগের গানে উদারার শুদ্ধ মধ্যমের নিরালা মাধুরী! আহা! এ যেন অন্ধকারের মধ্যে হারান রতনের একটির আলোয় অন্যগুলিকে ফিরে পাওয়া; সন্ধানের কষ্ট নেই! নিরভ্র শারদ-শর্বরীর নিশীথে ঊর্ধ্বগগনে কৃত্তিকা নক্ষত্রপুঞ্জের মত এরা যেন পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করে উদিত হয়। আমার জীবনশরতে স্মৃতির নিশীথগুলি ভরে ওঠে কত শত তারকার স্নিগ্ধ রশ্মিচ্ছটায়, কিন্তু আজকের লগ্নের এমন উজ্জ্বল সমাবেশ আর ত' দেখিনে; ঐ দু'টি মধ্যম আর একটি গান্ধারের মত। মৌজুদ্দিন কালে খাঁ সাহেবেরা গত হয়েছেন, তাঁদের কণ্ঠের সুর আর দেখা দেবে না। মুস্তাক হুসেন খাঁ সাহেব (ভগবান এঁকে ও এঁর যোগ্য পুত্রকে দীর্ঘজীবী করুন) এখনও সুস্থ প্রাণবন্ত কণ্ঠে সঙ্গীত পরিবেশন করে চলেছেন। এঁর কণ্ঠের গান শোনার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে, বা এখনও যাঁদের সে সৌভাগ্য নূতন করে দেখা দেয় তাঁদেরই জিজ্ঞাসা করি সেই বসন্তমালতীর গানের কথা, উদারার সেই মধ্যমের শোভা-সুগন্ধের, অনুপম সৌন্দর্যের কথা। একবারের জন্যও যদি এর সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে থাকে, ত' কখনও তাঁরা ভুলতে পারবেন না ঐ মন্দ্র মধ্যমকে; এই আমার ধারণা।

খাঁ সাহেব গান আরম্ভ করলেন "দুখকে পাত সব ঝর গয়ে' দিয়ে আরম্ভ একটি পদ; পরেই বিশ্বনাথজীর মুখে শুনেছিলাম রাগের নাম কৌশিকী কানড়া। উদার ও অসাধারণ একরকমের আবেদনের মাহাত্ম্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মুদারার মধ্যমস্বর। কেনই বা হবে না! আরম্ভের প্রথম পাঁচটি মাত্রায় অবিরল দাক্ষিণ্য দিয়ে মণ্ডিত হয়ে আবির্ভূত হয়েছে এই মধ্যমস্বর। পরেই পঞ্চম আর কোমল গান্ধার যেন প্রিয় নর্মসখার আকুল আবেগ দিয়ে সেই মধ্যমকে প্রদক্ষিণ করে ফিরেছে; কোনও আকস্মিক সুসংবাদের আনন্দ এরাই ত' বহন করে নিয়ে গিয়েছে ষড়জ ঋষভ আর কোমল ধৈবতের শ্রুতিপ্রস্থে। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়া আকুলতা শেষ চরণের ধ্বনির মধ্যে মিলিয়ে যায়; নূতন উচ্ছ্বাসের সৌন্দর্য নিয়ে আবার দেখা দেয় "দুখকে পাত সব ঝরু গয়ে"। উপক্রমণিকার মুহূর্তে মন্দ্র-মধ্যম শুনিয়েছিল অলক্ষ্য লোকের অশ্রুত-পূর্ব একটি ধ্বনি। এখন গানের মধ্যে সেই ধ্বনিই নিজ থেকে ধরা দেয় মরলোকের মানবহৃদয়ের বাণীর ছদ্মবেশে। সমগ্র পদের ভাবার্থ ছিল—দয়িতের আগমন সংবাদ শুনে, হে সখি! আমার আশালতিকা থেকে দুঃখের শুষ্ক পত্রগুলি ঝরে পড়েছে; তোমরাও আনন্দ করো, আর আমাদের হৃদয়ের আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁকে সত্বর নিয়ে এস।

অতীত দুঃখের ছায়া দিয়ে ঘেরা অথচ সুখস্মৃতি দিয়ে ভরা এই কলিটি স্মরণে জেগে ওঠে বার বার। সমস্ত গানটি পেয়েও হারিয়েছি তাকে। এ পর্যন্ত অন্য কোনও গুণীর মুখে ঐ পদটি শুনিনি, কৌশিকীতেই হ'ক, বা অন্য রাগেই হ'ক। পরে চন্দন চোবেজীর নিকট কৌশিক-কানাড়ার একটি গান পেয়েছিলাম আমি। এই গানের সুর দিয়ে কতবার মিনতি জানিয়েছি আমার স্মৃতিকে যে ঐ "দুখকে পাত সব" ফিরিয়ে আনতে; কিন্তু গানের চরণধ্বনি মাত্র শুনি মাঝে মাঝে, মূর্তিটি ঘুরে বেড়ায় স্মৃতির পথে, অলক্ষ্যে।

অল্পক্ষণ পরে খাঁ সাহেব হাতের তম্বুরাটি পাশে নগেন্দ্রবাবুকে দিলেন এবং ডান হাঁটু উঁচু করে কায়দা করে বসলেন; তাঁর ডান হাত চলে গিয়েছে ডান কানের কাছে, বাঁ হাতটি রেখেছেন বাঁ হাঁটুর উপর। মৌজুদ্দিনও এরকম আসনে বসে গান করেন মনে পড়ে গেল।

এতক্ষণে যেন আবেগ সঞ্চয়ের কারণেই তাঁর কণ্ঠস্বর উজ্জ্বলে মধুরে অপূর্ব হয়ে উঠেছে; চিকণ সুমার্জিত সেই কণ্ঠধ্বনির ঝলকে ঝলকে আভাস দেয় মীড়মূর্ছনা দিয়ে তৈরী অলংকারগুলি। গায়কির শৃঙ্গারসজ্জায় সার্থক হয়েছে রাগের আবাহন। তখনও কাণে "দুখকে পাত সব"

শব্দগুলি ধরতে পারছি। প্রতি আবর্তে নূতন তানের উপসংহার হয়ে যেন নূতন সাজে ফিরে আসে ঐ শব্দগুলি।

এর পর স্মৃতির পথে কথা আর যেন এগিয়ে চলে না। সুরের ঢেউগুলি বিশাল হয়ে উপছে পড়ে মুখপাতের উপকূল-ভূমিতে। গানের কোন সময়ে অন্তরায় পদচারী শেষ হয়েছে জানিনে আমরা। মনে পড়ে মাত্র জমজমা আর গমকের মালা দিয়ে নূতন নূতন সুরের সাজ রচিত হয়ে চলেছে; বিচিত্র তানের ফুলঝুরি দিয়ে রাগের আরতি আরম্ভ হয়েছে। সাক্ষাৎ রাগই আবির্ভূত হয়েছেন আমাদের অনুভবের রাজ্যে। কথা ও সুরের উপচার-গুলিকে স্তরে স্তরে সাজান আর বড়ো কথা নয়; নিবেদন করে দেওয়ার কাজটাই তখন বড় কথা, একমাত্র কথা। পূজারী কখন গোটা ফুলকে চন্দন মাখিয়ে নিবেদন করেন, কখনও বা ফুলের দল ছিঁড়ে নিয়ে এক একটি পাঁপড়িকে সচন্দন নিবেদন করেন। রাগের পূজারীও তেমনি গোটা কথা বা শব্দকে সুরের চন্দনে সুরভিত করে নিবেদন করেন; কখনও বা কথার, শব্দের টুকরাগুলিকেই সুরে সুরভিত করে' সমর্পণ করেন রাগদেবতার চরণে। অনুষ্ঠানের পর্যায় বিলীন হয়ে যায় অন্তরের আরাধনায়; আরাধনাই রূপান্তরিত হয়ে ফিরে আসে অনুরাগের রঞ্জনায় আরক্তিম হয়ে, অনুভবের অমৃতে সুসিক্ত হয়ে। এই অনুভূতি, এই অমৃতের আস্বাদ, এই মনসী রতি না জানি কোন আশ্চর্যরূপে সংক্রামিত হয় শ্রোতার হৃদয়ে; গায়ক ও শ্রোতার ব্যক্তিত্বে যেন পার্থক্য আর থাকে না।

গান শেষ হয়ে গেলে মনে হয়েছে ধ্রুপদ-ধামার আর খেয়ালের ভেদ মাত্র সাধন বা অনুষ্ঠানেরই ভেদ; শেষ অর্থাৎ চরম সাধ্য যে অনুভবের উন্মেষ তাতে ত' ভেদ নেই। ধ্রুপদ-ধামারের গায়ক কখনও কথার ফুল ছিঁড়ে ছিন্নদল নিবেদন করেন না রাগ-দেবতার পূজায়। খেয়ালের গায়ক আবেগের বশেই হয়ত আনুষ্ঠানিক নিয়ম জলাঞ্জলি দিয়ে ফেলেন, তবুও অনুতপ্ত হন না তিনি।

অনুভবের মুহূর্তে সুরের বিশ্লেষণ হয় না, কথার আকর্ষণ থাকে না। কিন্তু কণ্ঠস্বরে বিশিষ্ট আভাস থাকে সর্বক্ষণ। খাঁ সাহেবের কণ্ঠস্বরের বৈশিষ্ট্য অনুভব করলাম যখন তিনি ছোট ছোট পাল্লার "হরকত" (অর্থাৎ প্রত্যেক নূতন বিস্তারের মুখে মূর্ছনার মোলায়েম আল্পনা) দিয়ে বিস্তারের বিচিত্র তরঙ্গগুলি ভাসিয়ে দিচ্ছিলেন সুরের তরঙ্গে। তখনকার তখন সেই কণ্ঠের তুলনা পাইনি। পরে, ইন্দোর নিবাসী বীণকার মজিদ খাঁ সাহেবের হাতে বীণার হরকতগুলি শুনে মনে পড়ে গেল কালে খাঁ সাহেবের কণ্ঠের স্নিগ্ধ গম্ভীর লীলায়িত চরিত্র যার মধ্যে রুক্ষতার লেশমাত্র ছিল না। কত রকমের গতিবেগ দিয়ে কতরকমের অজস্র তান হ'তে থাকে অথচ কণ্ঠের সেই কোমলতার বিচ্যুতি ঘটেনি। আমার কানে সুরের স্নেহলেপনই অনুভব করেছি, স্বর দিয়ে শ্রবণের বেধ বা আঘাত ঘটেছে বলে মনে পড়ে না। জরব্‌দার্ (অর্থাৎ staccato style-এর) বোল বা তানের ছুঁই-ফোঁড় লক্ষণ সহজেই কাণে ধরা পড়ে; সুরগুলি যেন তাদের বিশিষ্ট পরিচ্ছিন্ন আবির্ভাব স্পষ্ট আঘাত দিয়ে জানিয়ে দেয়। খাঁ সাহেবের কণ্ঠের চরিত্র ও কারুকার্য এরকম জরব্‌দার তানকে যেন উপেক্ষা করেছে বলে মনে হ'ল; এমন কি, চৌদুনি তানের মধ্যেও জরব্‌দার লক্ষণ ছিল না।

মজিদ্ খাঁ সাহেবের বীণার গমক্-যোড় শুনে মনে পড়ে গিয়েছিল কালে খাঁ সাহেবের কণ্ঠের মোলায়েম গমকের কাজ-গুলি। তম্বুরার গুঞ্জনের সহযোগে কণ্ঠের সেই আন্দোলনগুলি বীণাযন্ত্রে গমকেরই অনুরূপ ছিল নিশ্চয়; তা' নাহ'লে মজিদ্ খাঁ সাহেবের হাতে গমক শুনে কালে খাঁ সাহেবের কণ্ঠের গমক মনে পড়ত না। কালে খাঁ সাহেবের গান শোনার আগে ইম্‌দাদ খাঁ সাহেবের সেতার সুরবাহারে গমক শুনেছি; পরে কেরামত্ উল্লা খাঁ সাহেব, আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব, ফিদাহুসেন খাঁ সাহেবদের হাতে সরোদের গমকও শুনেছি। কিন্তু এসব ব্যাপার কালে খাঁ সাহেবের কণ্ঠের চরিত্রকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারেনি। এই হ'ল আসল কথা।

কণ্ঠস্বরের সঙ্গে কণ্ঠস্বরের সাদৃশ্য অনুভব করেও একরকমের তুলনা সম্ভব। মাত্র আব্দুল করিম খাঁ সাহেবের কণ্ঠের স্বভাবচরিত্রের সঙ্গে কালে খাঁ সাহেবের কণ্ঠের বিশিষ্ট চরিত্রের সাদৃশ্য বা সাজাত্য বোধ করেছি। এরকমের বোধকেও একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে স্মৃতিতে ধরে রেখেছি। সারেঙ্গির ধ্বনি আর এস্রাজের ধ্বনির যে সাদৃশ্য, কালে খাঁ সাহেবের কণ্ঠধ্বনি আর আব্দুল করিম খাঁ সাহেবের কণ্ঠধ্বনির মধ্যে সেইরকমের সাদৃশ্য বোধ করি। পার্থক্যও ঐ দৃষ্টান্তের অনুগত হয়ে দেখা দেয়। এস্রাজ যন্ত্রে তারার সপ্তকে সুর-গুলির চরিত্রে একটা অসাধারণ তীক্ষ্ণতা দেখা দেয়, যাকে ইংরাজিতে falsetto বলে; সারেঙ্গিতে এরকমের হয় না। কালে খাঁ সাহেবের কণ্ঠ ছিল সারেঙ্গীর মত; তার সপ্তকের সুরে কোনও কৃত্রিম তীক্ষ্ণতা দেখা দেয়নি। আব্দুল করিম খাঁ সাহেবের কণ্ঠ এস্রাজের মতই, তার সপ্তকে পোঁছে কৃত্রিম ও সুতীক্ষ্ণ একটা রূপ ধারণ করত। এই আমার ধারণা।

গান শেষ হ'লে অল্পক্ষণ বিশ্রাম নিলেন খাঁ সাহেব। ইতিমধ্যে বিশ্বনাথজী মৃদু স্বরে বাংলা ভাষায় কুমারকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, খবরদার যেন খাঁ সাহেবকে ফরমাইস করা না হয়, উনি আপন খেয়ালে যা গাইবেন সেইটেই হবে চরম।

(ক্রমশ)

৪

১৬৯০ সালের জবচার্নকের কলকাতা নয়। বিংশশতাব্দীও শুরু হয়নি তখন। চৌধুরীদের লাইব্রেরী ঘরে সে-কলকাতার ছবি দেখেছে ভূতনাথ। করফিল্ড সাহেবের ছবির বইতে চৌরঙ্গীর সেই ছবি। ১৭৮৭ সালের চৌরঙ্গী। এদোঁপড়া পুকুর চারদিকে। ছই ঢাকা গরুর গাড়ি চলেছে চৌরঙ্গী দিয়ে। লোক চলেছে উটের পিঠে চড়ে। তারই পাশাপাশি আবার সঙিগন উঁচু করে সৈন্যরা প্যারেড করতে করতে যাচ্ছে। এখন ভাবলে হাসি পায়।

অথচ যে-দিন ভূতনাথ শেয়ালদ' স্টেশনে এসে প্রথম ট্রেন থেকে নেবেছিল—সে-শেয়ালদর সঙ্গে আজকের শেয়ালদরও কোনও মিল নেই।

ভ্রূন অদেহ—ভূতনাথ স্টেশন থেকে বাইরে এসে বৈঠকখানা বাজারের সামনের ফুট-পাতে এসে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো। ভাবতে লাগলো কোথায় কোন দিকে যাওয়া যায়। ব্রজরাখাল বলে দিয়েছিল—সোজা পশ্চিম দিকে যেতে।

পশ্চিমের রাস্তার দিকেই চলতে লাগলো ভূতনাথ।

কিন্তু ঠিক পথেই চলেছে কিনা কে জানে। এত লোক একসঙ্গে কখনও দেখেনি সে। ঘোড়ার গাড়ির কী বাহার। ঘোড়াগুলোর মাথার দু' পাশে কানের দিকে ছোট ছোট ঝালর লাগানো। কারো কারো গলায় ঠুংঠুঙিগ বাজছে তালে তালে। হৈ হৈ করতে করতে ছুটেছে। একটা গাড়ি যেমন-ইচ্ছে একবার রাস্তার ডাইনে-একবার বাঁয়ে হাঁকিয়ে চলেছে। সামনে কে একজন পড়েছিল—চাবুক দিয়ে বেদম্ মেরে পলকের মধ্যে উধাও হয়ে গেল।

বুক কাঁপতে লাগলো ভূতনাথের। তাকেও যদি মারে কেউ। সরে এসে দাঁড়াল রাস্তার ধারে গা ঘেঁষে।

দুটো ঘোড়ার গাড়ি টেক্কা দিতে দিতে চলেছে। ঘোড়ার লাগাম ধরে গাড়োয়ান দুটো চিৎকার করছে—উ—উ—উ—উ—

এক-একবার মনে হয় বুঝি ধাক্কা লাগলো ট্রামগাড়ির সঙ্গে। কিন্তু লাগলো না। উ—উ—উ—উ—করতে করতে গাড়োয়ান দুটো দাঁড়িয়ে উঠে চালাচ্ছে গাড়ি। কে আগে যাবে—

একদৃষ্টে ওই দিকে চেয়ে চলতে গিয়ে হঠাৎ হুড়মুড় করে পড়ল ভূতনাথ। যত রাজ্যের জঞ্জালের পাহাড় জমে ছিল রাস্তার ওপর। একগাদা ময়লার ওপর পড়ে আবার উঠে দাঁড়াল। সবাই দেখছে তার দিকে। ভূতনাথ মাথা নিচু করল। সবাই হয়ত ভাবছে—নতুন কলকাতায় এসেছে। ভারি লজ্জা হলো। সকলের দৃষ্টি এড়াবার জন্যে পাশের এক গলির মধ্যে ঢুকলো সে। একটা খাবারের দোকানের সামনে গরম-গরম জিলিপী ভাজছে একটা লোক।

ভূতনাথ খানিকক্ষণ দেখলে চেয়ে চেয়ে।

দোকানদার বললে—কী দেখছ গা ছেলে—?

ভূতনাথ দেখলে চেয়ে লোকটার দিকে। আদুড় গা। বড় উনুনের ওপর বিরাট একটা কড়া চাপিয়েছে। নারকোল মালার তলা দিয়ে মশলা ছাড়ছে হাতটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এঁকিয়ে বেঁকিয়ে, আর হলদে হলদে জিলিপীগুলো ভেসে উঠছে গরম ঘিয়ের ওপর।

লোকটা আবার বললে—হাঁ করে কী দেখছ গা ছেলে—

—জিলিপী ভাজা দেখছি তোমার—বললে ভূতনাথ।

—দেখোনা অমন করে জিলিপীর দিকে—যারা খাবে তাদের পেট কামড়াবে যে—সরে যাও ভাই—পয়সা আছে পকেটে—?

—পয়সায় ক'টা করে—জিজ্ঞেস করলে ভূতনাথ।

ক্ষিধেও পেয়েছে বেশ। খেলে হয়। এক পয়সার নিলে। চারটে করে পয়সায়। তা' হোক—এ তো আর ফতেপুর নয়। কলকাতা মাগ্গি-গন্ডার দেশ।

বললে—আর এক পয়সার দাও তো—

খেতে খেতে ভাব হলো। ফতেপুরের পাশের গ্রাম মামারাকপুরে ভগ্নির শ্বশুর বাড়ি।

লোকটা আসলে ভালো। ময়রার ছেলে। জাত-ব্যবসা ধরেছে।

বললে—আমিও ভাই একদিন তোমার মতন নতুন এসেছিলুম কলকাতায়—তারপর এই ধরেছি—কে দেবে চাকরি বল না, লেখা-পড়া তো শিখিনি কিছু, তোমার মত লেখা-পড়া শিখলে দশ-বারো টাকার চাকরি একটা জুটিয়ে নিতুম ঠিক—পাঁচ টাকায় মাস চালাতুম আর পাঁচ টাকা পাঠাতুম দেশে—

পেট ভরে এক গ্লাশ জল খেলে ভূতনাথ।

লোকটা বললে—বনমালী সরকার লেন? বড়-বাড়িতে যাবে—তাহ'লে এখান থেকে বড় রাস্তা ধরে নাক-বরাবর সোজা চলে যাও—তারপর বাঁ দিকে গিয়ে আবার ডান দিকে প্রেথম যে রাস্তা পড়বে......

রাস্তার নির্দেশ পেয়ে উঠলো ভূতনাথ।

বললে—তোমার নামটা—

—প্রেকাশ—আর তোমার?

—ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়—বামুনগাছির পঞ্চানন্দের দোর ধরে হয়েছি কিনা তাই পিসী ওই নাম রেখেছিল—পরে দেখা করবো—

সমস্ত কলকাতার মধ্যে হঠাৎ যেন আশ্রয় পেয়ে গেল ভূতনাথ। ব্রজরাখালের ঠিকানা যদি খুঁজে না-ই পাওয়া যায় আজ, এখানে এই প্রকাশ ময়রার কাছে এসেই ওঠা যাবে। মামারাকপুরে ওর ভগ্নির বিয়ে হয়েছে—আত্মীয়ই বলা চলে। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে ভূতনাথ। ভগবান সহায় থাকলে নরকে গিয়েও নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। কথাটা ভূষণ কাকার। সে-কথার সত্যতার প্রমাণ আজ যেন হাতে হাতে পাওয়া গেল এই কলকাতায় এসে।

রাস্তায় চলতে চলতে একবার মনে হলো—এখন যদি হঠাৎ ননীর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। এত বড় কলকাতা শহরে কোথায় ননী খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তা আজ না হোক—কাল হোক পরশু হোক একদিন দেখা হবেই। ননীর সঙ্গে দেখা করতেই হবে।

বউবাজার স্ট্রীট দিয়ে বনমালী সরকার

লেন-এ ঢুকতেই প্রকান্ড একটা বটগাছ। বেশ ছায়া হয়েছে চারদিকে। এইখান দিয়েই ঢুকতে হবে গলির ভেতরে।

একটা বেঁটে কালো পানা লোক গাছ-তলায় বসে ছিল।

ডাকলে—আস বাবু আসো—

ভূতনাথকে বাবু বলে ডাকা এই বুঝি প্রথম। মনে হলো—তার হাব-ভাব দেখে বুঝতে পেরেছে নাকি যে গ্রাম থেকে আজ নতুন এসেছে ভূতনাথ।

—তোমার বাসনা সিদ্ধ হবে বাবু, সিদ্ধ হবে—

বলতে বলতে এক কান্ড করে বসলো লোকটা। বলা নেই কওয়া নেই, কড়ে আঙুলে সিঁদুরের ফোঁটা নিয়ে লাগিয়ে দিলে ভূতনাথের কপালে।

বললে—সিদ্ধিদাতা গণেশের পায়ে কিছু প্রণামী দাও বাবু—যাত্রা শুভ হবে—মন-বাঞ্ছা পূরণ হবে—

ভূতনাথ এতক্ষণে ভাল করে দেখলে। বট-গাছটার তলায় অনেকখানি জায়গা জুড়ে ইঁটের উঁচু বেদী বাঁধানো। তারি ওপর নানা জানা-অজানা দেব-দেবীর মূর্তি ছড়ানো। শুধু সিদ্ধিদাতা গণেশ নয়। কালী, শিব, দুর্গা, মনসা, জগদ্ধাত্রী—পুতুলের মতন মাপের সব দেবতামন্ডলী। ফুল, বেলপাতা, সিঁদুর আর অসংখ্য আধলা আর পয়সা ছড়ানো চারপাশে।

লোকটা আবার বলতে লাগলো—কপালে রাজটীকা আছে বাবু—অনেক পয়সা হবে—অনেক সুখ হবে—বাবুর তিনটা বিবাহ হবে—

গড় গড় করে লোকটা অনেক সুসংবাদ শুনিয়ে গেল। হাসি পেল ভূতনাথের। তিনটে বিয়ে। মরেছি। চাকরি-বাকরি নেই, খাওয়াব কি। ভূতনাথ পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল। বেলা হয়ে আসছে। স্নান নেই, খাওয়া নেই, ঘুম নেই, মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছে।

—প্রণামী দাও বাবু, প্রণামী—গণেশের ফোঁটা নিলে প্রণামী দিলে না—মহাপাতক হবে—দেবতার শাপ লাগবে—বোধহয় রেগে গেল পুজারী বামুন।

ট্যাঁক থেকে একটা আধলা বার করে দিলে ঠাকুরের পায়ে, তারপর গড় হয়ে প্রণাম করলে বেদীতে মাথা ঠেকিয়ে। দেবতা সন্তুষ্ট হলেন কিনা কে জানে কিন্তু পুজারী বামুনের মুখ প্রসন্ন হলো।

হাতে একটা ফুল দিয়ে পুজারী বললে বল—নমামি—

হাত জোড় করে ভূতনাথও বললে—নমামি—

—সর্বসিদ্ধিদাতাঃ

—সর্বসিদ্ধিদাতাঃ—

—বিনায়কং

—বিনায়কং—

আরো কী কী বলেছিল মনে নেই। লম্বা সংস্কৃত শ্লোক। ছাড়া পেয়ে ভূতনাথ গলির দিকে চলতে চলতে বাড়ির নম্বরগুলো দেখতে লাগলো। পকেট থেকে ব্রজরাখালের চিঠিটা আর একবার বার করলে ভূতনাথ। পাঁচ নম্বর—বনমালী সরকার লেন। এক নম্বর, দু' নম্বর করে—পাঁচ নম্বর বাড়িটা দেখেই চমকে গেল ভূতনাথ।

এত বড় বাড়ি! এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত সমস্তটা ঘুরে দেখে নিলে একবার। এ-বাড়ির নম্বর যে পাঁচ, সে-সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু তবু সন্দেহ হলো। এই ব্রজরাখালের বাড়ি। এখানে থাকে নাকি ব্রজরাখাল।

সামনে লোহার গেট খোলা। কিন্তু বিরাট এক যমদূতের মত চেহারার দারোয়ান বন্দুক উঁচিয়ে পাহারা দিচ্ছে। বুকে মালার মত গুলীগুলো সাজানো।

সামনে দাঁড়িয়ে ভেতরে চেয়ে দেখতে ভয় হলো।

বলা নেই—কওয়া নেই—অমনি ভেতরে গিয়ে ঢুকলেই হলো নাকি। বাড়িটার উল্টো দিকে অনেকগুলো বাড়ি। একটা বাড়ির সামনে ছোট এক ফালি সিমেন্ট বাঁধানো রোয়াক। বসলো সেখানে ভূতনাথ। সেই সকাল থেকে হাঁটছে; পা দুটো বুঝি ব্যথা করে না। দেয়ালে পিঠ দিয়ে হেলান দিলে একটু। বনমালী সরকার লেন। খুব বড় রাস্তা নয়। ট্রাম নেই এ-রাস্তায়। তবু লোকজন চলাচল আছে খুব। আস্তে আস্তে দুপুর গড়িয়ে এল। রাস্তাটা যেন একটু নিরিবিলি হয়ে আসছে। ভূতনাথের সমস্ত শরীরটা যেন ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে এল। একবার মনে হলো ফিরে যায় সেই জিলিপীর দোকানে—প্রকাশ ময়রার কাছে। একটা রাত তো থাকা যাবে তবু সেখানে। তারপর কাল তাকে সংগে নিয়ে এলেই চলবে। প্রকাশ লোকটা ভালো। ভগ্নিপতির দেশের লোক শুনে জিলিপীর দাম নেয়নি।

একটা ঘড়-ঘড় শব্দে ঘুম ভাঙলো ভূতনাথের।

কখন সেই কঠিন রোয়াকের ওপর ঘুমিয়ে পড়েছিল মনে নেই। সামনে দিয়ে একটা গাড়ি যাচ্ছে নজরে পড়লো। ঘোড়ায় টানছে গাড়িটা। চ্যাপটা চেহারার গাড়ি। কিন্তু পেছনের একটা অসংখ্য ফুটোওয়ালা নল দিয়ে ঝির ঝির করে জল পড়ছে। ধুলোর ওপর জল ছিটিয়ে দিচ্ছে। ধুলো ওড়া বন্ধ হবে। কিন্তু খোয়ার রাস্তার ওপর গাড়ির লোহার চাকা লাগতে কী বিকট শব্দই না হচ্ছে।

উঠলো ভূতনাথ।

সেই প্রকাশের জিলিপীর দোকানেই ফিরে যেতে হবে শেষ পর্যন্ত। বামুনের ওপর ভারি ভক্তি প্রকাশের। প্রকাশ শুধু চাল আর জল দিয়ে হাড়ি চাপিয়ে দেবে উনুনে, আর ভাত হলে নাবিয়ে নেবে ভূতনাথ। ময়রার এঁটো বামুনকে খাইয়ে মহাপাতক হবে নাকি সে।

যে-রাস্তা দিয়ে এসেছিল ভূতনাথ, আবার সেই রাস্তা দিয়েই চলতে হয়।

—একী বড়সম্বন্ধী না—

চেনা গলার আওয়াজ পেয়ে ভূতনাথ আশে পাশে সামনে পেছনে চেয়ে দেখলে। চেনা মুখ কেউ নেই। কে তবে ডাকলে তাকে। কিন্তু সামনের গোঁফ দাড়িওয়ালা লোকটাই যে ব্রজরাখাল একথা কে বলবে।

ব্রজরাখাল বললে—কখন এলে?

—সকাল বেলা। বললে ভূতনাথ।

—আচ্ছা মুশকিল তো, সেই সকাল থেকে এই বিকেল পর্যন্ত রাস্তায় কাটিয়েছ নাকি? কী কান্ড দেখ দিকিন—একটা চিঠি দিতে হয় তো আসবার আগে—কিন্তু খাওয়া-দাওয়া হয়নি বোধহয়—সারাদিন হরিমটর—কপালে কী—?

ভূতনাথ কপালে হাত দিয়ে মুছতেই হাতের পাতায় সিঁদুর লেগে গেল।

বললে—গণেশের ফোঁটা—

—ওই নরহরি দিয়েছে বুঝি—হুঁ—দেখদিকিনি, ঠিক টের পেয়েছে, তুমি নতুন এসেছ গাঁ থেকে—চল—এখন আমার সঙ্গে যদি দেখা না হতো—

টানতে টানতে নিয়ে এল ব্রজরাখাল বাড়ির ভেতর।

ব্রিজ সিং আপত্তি করলে না। ব্রজরাখাল ভূতনাথকে নিয়ে সোজা ভেতরে ঢুকলো। বিরাট বাড়ি। কোথায় কোন্ দিকে কে থাকে, কোথায় রান্না হয়, কে কোথায় খায়—অসংখ্য লোক ঘোরাফেরা করছে—কেন করছে কেউ বলতে পারে না।

ব্রজরাখাল সোজা চললো সামনে। আসল বড় বাড়িটা ডানদিকে রেখে, পেছনের পুব-পশ্চিম বরাবর লম্বা বাড়িটার নিচে এসে দাঁড়াল। একতলায় সার-সার তিনটে পাল্কী। তারপর ঘোড়ার গাড়ি। আর তার ওপাশে কয়েকটা ঘোড়া। মুখের দু'পাশে দাঁড় দিয়ে বাঁধা। ঘোড়াগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শক্ত ইঁটের মেঝের ওপর ঘন ঘন পা ঠুকছে। তারই পাশ দিয়ে সরু সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে ব্রজরাখালের পেছনে ভূতনাথ চললো।

ওপরে ডানদিকে সার সার ঘর। চাকর-বাকর ঘোরা ফেরা করছে। মেঝের ওপর ময়লা বিছানা গোটানো পড়ে রয়েছে পর পর। নাথু সিং তখন নিজের ঘরে লেঙট্ পরে পেতলের থালায় একতাল আটা মাখছে।

সব পার হয়ে পুবদিকের একেবারে শেষ ঘরটায় এসে দরজার তালা খুললো ব্রজরাখাল। ঘরে ঢুকে বললে—এই হলো আমার ঘর—আর পাশের ঘরটাও তোমায় দেখাই চল—

বলে পাশের আর একটা ঘর খুললে।

—এটাও আমারই, কিন্তু আমার আর কে আছে বলো—খালিই পড়ে থাকে—যত রাজ্যের জঞ্জাল জমে আছে—তুমিই না-হয় এ-ঘরটায় থেকো—

তারপর বললে—বিছানা-টিছানা তো কিছু আনোনি দেখছি—তা'তে কিছু অসুবিধে হবে না, কিন্তু তুমি হলে আবার বড় কুটুম কিনা, একটু খাতির-যত্ন না করলে নিন্দে হবে—কী বলো—

ব্রজরাখাল নিজের তোষক বিছানা পেতে দিলে ভূতনাথের জন্যে। বললে—আমার জন্যে তুমি ভেবো না, আমি সন্নিসী মানুষ—আমার ও-সব কিছু কাজে লাগে না—

সত্যিই ব্রজরাখাল সন্ন্যাসী মানুষ। অফিসের ধুতি আলপাকার কোট খুলে একটা গেরুয়া রং-এর ছোট ফতুয়া পরলে। [illegible] ধুতি—কাছা কোঁচাহীন। ভূতনাথের এতক্ষণে নজরে পড়ল—দেয়ালের গায়ে একটা মস্ত বড় সাধুর ছবি। ফুলের মালা ঝুলছে ছবির গায়ে। নিচে কুলুঙগীর ওপর কয়েকটা বই—অনেকটা গীতার মতন চেহারা।

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—ও কা'র ছবি ব্রজরাখাল?

—প্রণাম করো ও'কে—

বলে ব্রজরাখাল নিজেই আগে সভক্তি প্রণাম করলে।

তারপর মাথা তুলে বললে—আমার গুরুদেব—পরমহংসদেব—সেদিন দেহরক্ষা করেছেন—

খানিক থেমে বললে—সারাদিনটা তো উপোষ—আজ রাত্রে কী খাবে বলতো বড়-কুটুম—আমি তো মাছ মাংস খাইনে—অড়র ডাল ভাতে দিয়ে দেবখন; আর গাওয়া ঘি আছে ব্রিজ সিং-এর দেশ থেকে আনা—সঙ্গে একটু আলুর দম করি কী বলো—

ভূতনাথের মনে আছে সেই বিকেলবেলা ব্রজরাখাল নিজের হাতে উনুনে আগুন দিয়ে ভাত চড়িয়ে দিলে। তারপর এক ঘণ্টার মধ্যে রান্না সেরে, খাওয়া-দাওয়া করে নিয়ে বললে—এইবার শুয়ে পড় আরাম করে—আমি ততক্ষণ ছেলেদের পড়িয়ে আসি—

ব্রজরাখাল ধুতি চাদর পরে ছেলে পড়াতে গেল। ভূতনাথ নিজের বিছানায় শুয়ে আবোল-তাবোল নানা কথা ভাবতে লাগলো। সেদিনকার সেই ব্রজরাখাল—বর-বেশী ব্রজ-রাখাল—এ হঠাৎ এমন অন্য মানুষ হয়ে গেছে যেন। মাছ-মাংস খায় না। কোন্ সাধুর শিষ্য! কোথাকার পরমহংসদেব! কে তিনি? কেনই বা এই চাকরি করছে সে? কার জন্যে? ঘুমের মধ্যে কত রকম শব্দ কানে আসতে লাগল। একতলায় ঘোড়াগুলো শক্ত সিমেন্টের মেঝের ওপর পা ঠুকছে। গেটের ঘড়িঘরে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজছে। আশে পাশের ঘর থেকে চাকর-বাকরদের হাঁক-ডাক শোনা যায়। কোথা থেকে যেন কালোয়াতী গানের সুর ভেসে আসছে। ইমনকল্যাণের খেয়াল। সঙ্গে তবলা। রাত বাড়তে লাগলো। রাধার কথা মনে পড়লো। এ-সংসার তো তারই। কপালে নেই তার। হয়ত রাধা মরে গেছে বলেই ব্রজরাখালের এই বৈরাগ্য। ননীর সঙ্গে দেখা করলে হয় একবার। খুব চমকে যাবে। ননী কোন্ কলেজে ভর্তি হয়েছে কে জানে। প্রকাশ ময়রা জিলিপী ভাজতে জানে বটে। জিলিপী করা কি যার-তার কাজ। অমন পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে...কিন্তু গো-ব্রাহ্মণে ভক্তি আছে প্রকাশের। এই বাজারে দু'টো পয়সা কে ছাড়ে অমন!... অনেক রাত্রে ঘুমের মধ্যে মনে হলো যেন গেট খোলার শব্দ হলো। ঘোড়ার টগবগ্ শব্দ—গাড়ি যেন এসে দাঁড়াল নিচের এক-তলায়। লোকজনের কথাবার্তা। চাকরদের ছুটোছুটি।

কেমন যেন ভয় করতে লাগলো ভূত-নাথের। নতুন জায়গা, নতুন বিছানা। তন্দ্রার মধ্যে একটা যেন কেমন অসহ্য অস্বস্তিতে বিছানা ছেড়ে উঠলো। যেন গলা শুকিয়ে এসেছে। ডাকবে নাকি ব্রজ-রাখালকে। বাইরে ফুটফুটে জ্যোৎস্না। ঘরের ভেতরে চাঁদের আলো এসে পড়ছে। মনে পড়ে গেল ফতেপুরের কথা। কাল এই সময় যে ছিল ফতেপুরে আর আজ এই কলকাতায়। ফতেপুরের আকাশেও এমনি চাঁদের আলো এখন। গাঙের ধারে কুঁচ-গাছের ঝোপে জঙ্গলে আচমকা ছাতার পাখীর পাখা-ঝাপ্টানির শব্দ হচ্ছে। মাঝরাত থাকতেই হর গয়লানীর মেয়ে বিন্দী উঠেছে মল্লিকদের বাগানে আম কুড়োতে। মালোপাড়ায় বেহুলার ভাসান গানের ঢোলের আওয়াজ অস্পষ্ট ভেসে আসছে। কত দেশ—কত বিচিত্র মানুষ—এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের মিল নেই—কিন্তু আকাশ একটা—। যে আকাশ কলকাতার মাথায়—সে-আকাশ ফতেপুরের মাথাতে—সে-আকাশ সর্বত্র। একশো বছর আগেও এই আকাশ ছিল—একশো বছর পরেও থাকবে...

ভূষণকাকা বলতো—তুই থামতো ভূতো—যত সব বিদ্ঘুটে বিদ্ঘুটে ভাবনা—

মল্লিকদের তারাপদ বলতো—ও বোধহয় বড় হয়ে কবি হবে কাকা—মধু কামারের মত পালা-যাত্রার গান বাঁধবে—

কবি ভূতনাথ হয়নি। হয়েছে শেষ পর্যন্ত ওভারসিয়ার!

কিন্তু সে-সব কথা যাক্, সেই মাঝরাতে ভূতনাথ ডাকতে লাগলো—ব্রজরাখাল—ও ব্রজরাখাল—ও শব্দটা কীসের—

উত্তর নেই। মাঝখানের দরজাটা ভেজানো ছিল। সেটা খুলতেই ভূতনাথ অবাক্ হয়ে দেখলে ঘরের মাঝখানে যোগাসনে বসে আছে ব্রজরাখাল। আবছা আলো-অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা যায় না—কিন্তু মনে হলো ব্রজ-রাখাল যেন তন্ময় হয়ে আছে কোন দুশ্চর তপস্যায়। বাহ্যজ্ঞানশূন্য। সামনের দেয়ালে সেই সাধুর ছবিটা ঝুলছে। শিরদাঁড়া সোজা—চোখ দুটিও বোজা—শরীরে প্রাণ-স্পন্দনের লেশমাত্রও নেই বুঝি।

ভূতনাথ আবার ডাকলে—ব্রজরাখাল—

এবারও উত্তর নেই। ভূতনাথের মনে হলো—ব্রজরাখাল এখন যেন আর সামান্য ব্রজের রাখাল নয়, মথুরায় গিয়ে রাজা হয়ে বসেছে—রাধার নাগালের বাইরে—। ফতে-পুরের নন্দজ্যাঠার এগার বছর বয়সের নগণ্য মেয়ে রাধা!

(ক্রমশ)

নারীরা রহস্যময়ী! হয়ত রহস্য করে কেউ বলে থাকলেও কথাটা মিথ্যে না। এর অন্তর্নিহিত সত্য, সত্যিই, মর্মান্তিক। এবং আজো তার কোনো বিহিত হয়নি।

বছর দশেক বাদে দেখা; তাহলেও দেখেই মণিকাকে চিনলাম। একশো বছর পরে দেখলেও যে কোনো মেয়েকে দেখবামাত্রই চেনা যায় যদি তাকে মুহূর্তের তরেও মন দিয়ে দেখে থাকি (কিম্বা দেখে মন দিয়ে থাকি)। কিন্তু আবার হাজার বছর ধরে চোখে চোখে রাখলেও যে অচেনা সেই অচেনাই সে থেকে যায়।

সেই রকমটিই আছে। স্কটিশ চার্চে পড়তে যেমন ছিলো সেই ক্ষীণ কটি পীন-বক্ষ মীনাক্ষি—ঠিক তেমনটিই রয়েছে। বদলায়নি একটুও, দেখা গেল।

'এই, মণিকা!' ডাকলাম আমি।

'কনক যে!' আমাকে দেখে মিনিটখানেক একটু অবাক থেকে সাড়া দিলো মণিকা: 'ইস্, কদ্দিন পরে দেখা! আছো কেমন?'

'তোফা!' আমি বল্লাম: 'তবে কনক নই। কাঞ্চন। কাঞ্চনকে ভুলে গেছ?'

কনক আর কাঞ্চন, মানের দিক থেকে ঐক্য থাকলেও নামের দিক দিয়ে এক নয়। দুয়ের মধ্যে বেশ প্রভেদ। সেই ইতর বিশেষটুকু উল্লেখ করতে হোলো।

'ওমা, তাইতো! কাঞ্চনই তো!...ইস্, কি করে যে দুদিনের মধ্যে ছেলেরা এমন গুলিয়ে যায়! কিন্তু...কিন্তু তুমি না—' বলে সে একটু থামে: 'তুমি না লেকে গিয়ে ডুবে মরেছিলে?'

'আমি নই। কনক। তোমার প্রেমে হতাশ হয়ে যে ডুব মারলো সেই...সেই তো কনক!'

বলে, বলতে কি, ঢাকুরিয়ায় যথাকালে নিজেকে না ডোবাতে পারার জন্য লজ্জিত হই। কেবল নামের দিকেই না, দামের দিক দিয়েও কনকের সঙ্গে আমার ফারাক্। প্রেমের কষ্টিপাথরে সে পাকা সোনা, আর আমি—আমি নিতান্তই গিলটি। এই গিল্‌টি বোধটা আমাকে পীড়া দিতে থাকে।

কিন্তু কষ্টিপাথরে পাশ না করতে পারলেও কষ্টের পাথার পাশেই থাকে। সব প্রেমিকের পাশেই রয়েছে। এমন কি, গিল্‌টি প্রেমিকেরও।

ভালোবাসায় যারা হাবুডুবু খায়, তাদের খুব কমই ভালোয় ভালোয় বাসা বাঁধতে পারে। তাদের ভারী একটা অংশ শেষ অব্দি ডুবু হয়, আর বাকীটা হাবু হয়ে যায়। সারা জন্ম বোকা বনে থাকে। প্রেমের রাজ্যে আমি সেই হাবুচন্দ্র।

মণিকাঞ্চন যোগ

'আহা কনক! বে-চা-রি!...' মণিকার মুখের কোণে একটুখানি দুখের আভাস দেখা দেয়, লহমার জন্যেই,—'কিন্তু সেই ছেলেটি, যে আমাদের সঙ্গে পড়তো—অনেকটা তোমার মতই দেখতে...?'

'আমার মতন এমনি মোগলাই চেহারার? ও, সেই—সেই জাফর খাঁ? যে তোমার সঙ্গে বে হোলো না বলে সেধে দাঙ্গার মধ্যে মাথা গলিয়ে জবেহ্ হোলো? না, সে আমি নই' বলতে আমি বাধ্য হই: 'সহীদ হওয়া আমার সহ্য হয় না।'

'সে তাহলে তুমি নও?' মণিকা নিশ্বাস ফ্যালে: 'আমার কেমন একটা ধারণা ছিলো যে তুমিও যেন কোনো ছুতোয়...আচ্ছা, তাহলে মেল ট্রেনের তলায় কাটা পড়েছিলো কে?'

'সেও আমি নহি।' আমায় বলতে হয়। বোধ হয় অনেক ফিমেল ট্রেনের তলায় পড়তে হবে বলেই ফাঁড়ার মতন অকাট্য আমাকে বিধাতা এমনি করে বাঁচিয়ে রেখেছেন। পলে পলে তিলে তিলে কাটবেন বলেই। নইলে মণিকাকে হারিয়ে জাফরের মতো আমার জীবনও তো খাঁ খাঁ হয়েছিলো, কিন্তু হায়, ভালোবাসার সেই খাঁই কি আমি মেটাতে পেরেচি? মোটেই না। বরং মণিকা ছাড়াও যে বেঁচে থাকা যায়, আধমরা হয়েও বহাল তবিয়তে থাকা যায়, তা প্রমাণ করে প্রেমিকার অমর্যাদা করেছি। এটা যারপর নাই বিশ্বাসঘাতকতাই। জাফর নয়, প্রেমের পলাশী থেকে পলাতক আমি মীরজাফর। অকথ্য আমার আচরণ।

'আহা, কে তবে সেই দু ছত্রের চিঠি পাঠিয়েছিলো আমাকে? কবিতায় লেখা... হে বন্ধু বিদায় গোছের...?'

তখন গোছাটা ধরে টানতে হয় আমায়—বাধ্য হয়েই। আলগোছেই টানি:

"জীবনের হে মোর অমিয়,
হে আমার একমাত্র প্রিয়,
লইনু চির বিদায়—আমারে ক্ষমিয়ো'?
এই ক'লাইন?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তাই বটে!' মণিকা চেঁচিয়ে ওঠে।

'সে বোধ হয় আমি।' নিজের ঘাট মানি।

'ছাপানো তা আবার! চমৎকার ঝকঝকে এক কার্ডে...খামের মধ্যে আঁটা। মনে পড়ছে এখন।' মণিকা অতীতের স্মৃতি

সমুদ্র মন্থন করে হলাহল—যা হল আর যা হল না—টেনে তোলে সমুদ্দুর।

'তা, এমনি গোটা গোটা অক্ষরে হাতে লিখে দিলেই পারতে? পয়সা খর্চা করে ছাপাতে গেলে কেন?'

'লিখতে গিয়ে কবিতা হয়ে গেল যে। আর কবিতা তো চাপবার জিনিস নয়, ছাপবার।'

'কিন্তু কবিতাটা বেশ। আহা, কার্ডখানা আমি হারিয়ে ফেলেছি।'

'কবিতাটা তোমার ভালো লেগেছিলো তাহলে?' শুনে আমি পুলকিত হই: 'চাই তোমার সে কার্ড? আছে আমার কাছে আরো।'

'আরো আছে? কখানা ছাপিয়েছিলে গো?'

'এক ঝুরি।'

'কেন? অতো কেন? অতো কি জন্যে?' সে একটু অবাক হয়।

'একখানাই তো ছাপতে গেছলাম, কিন্তু ছাপাখানাওয়ালা বল্লো, একটা ছাপতেও যা খর্চা এক হাজার ছাপতেও তাই। তাই সব দিক খতিয়ে হাজারই ছাপিয়ে ফেললাম।'

'আ-ক-হা-জা-র! বাব্বাঃ!'

'কেননা ভেবে দেখলাম, প্রথম বউনিতেই যখন এই হোলো তখন আমায় এজন্মে আর বউ নিতে হবে না। এ জীবনে প্রেমের প্রতি আখ্যানের শেষেই এই প্রত্যাখ্যান আছে আমার কপালে। আর, তো দিতে হবে আরো আরো মেয়েদের? অনেকগুলো ছাপিয়ে রাখাই ভালো।'

'তুমি তাহলে আরো প্রেমে পড়েছিলে? আরো অরো মেয়ের সঙ্গে? আমার পরেও?' মণিকার মুখে ভার হয়।

অভিমানিকা হলে এখনও ওকে বেশ দেখায়। চেয়ে চেয়ে আমি দেখি। —'কী করবো? প্রেমে কি আমি সাধ করে পড়ি? প্রেমে তো আমি পড়তে চাইনে। প্রেম আমার লাগে। অনেকটা ঠিক সর্দি লাগার মতই। দিনকতক নাকের জলে চোখের জলে করে নাকানি-চুবুনি খাইয়ে—শেষে আবার আপনার থেকেই একদিন ছেড়ে যায়।...... যেমন তুমি ছেড়ে গেলে।'

'তাহলে আর আমার দোষ কি? কেউ যদি 'লইনু চিরনিদ্রায়' বলে লেখে তাহলে লোকে ধরে নেয় সে আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু সে যদি তা না করে সে-কি আমার দায়?' বলে মণিকা নিজের দায়-খালাস হয়: 'তুমি যদি আত্মহত্যা না করে থাকো তো আমি কী করবো? যাক্, না করেছো নাই করেছো—এখন তাহলে করছো কী?'

'আত্মহত্যাই।' আমি বলি: 'তবে প্রথম-কার মোকা ফস্‌কে গিয়ে—এক তালে না করতে পেরে—সেই কাজই তিলে তিলে করছি। দিনের পর দিন।'

'খুলে বলো।'

'কী আর করবো? সেই কার্ডগুলো কাজে লাগাচ্ছি।' আমি জানাই: 'এখনো বিস্তর আছে। তিনশো বাহাত্তরখানাই।'

'তবে যে শুনেছিলাম—অবশ্যি গুজব সেটা—আমার সঙ্গে কাটান্-ছেড়ানের পর তুমি কলেজ থেকে নাম কাটিয়ে নিজের নামটাও নাকি পাল্‌টে ফেললে। জগন্নাথ না বলরাম কী যেন নাম নিয়েছো?'

আলোকের ঐ ঝরণা ধারায়

'প্রায় কাছাকাছি।' আমি সায় দিই: 'নামকাটা সেপাইদের যা হয়ে থাকে।'

'তা কেন করতে গেলে? নিজের নাম কেউ ছাড়ে?'

'মহাপুরুষদের কথা মনে পড়লো। তাঁরা বলেছেন, কামিনী কাঞ্চন ছাড়তে। আর, কামিনী যখন নিজেই আমাকে ছেড়ে গেল, তখন আমিও বাকীটা—আমার কাঞ্চন-ভাগ ত্যাগ করলাম। নামমাত্রই তো সম্বল ছিলো আমার। তার বেশি তো কিছু ছিল না।'

'জগন্নাথ নাম নিয়ে কী যেন সব লিখে থাকো কাগজে? লোকে বলে। আমি বিশ্বাস করি না। কী লেখো? কবিতা?'

'জগাখিচুরি। সে কিছু না। সেও এক-রকমের লাইনে কাটা পড়া। আত্মহত্যার সামিলই। তার প্রাত্যহিক সংস্করণ। কিন্তু সেকথা থাক্। তুমি কেমন আছো বলো? কলেজের সেই ছাড়াছাড়ির পর থেকে ধারা-বাহিক বলে যাও। বিয়ে করেছো দেখছি... সুখে আছো তো বেশ?'

'হ্যাঁ......ভয়ংকর।' মণিকা বলে: ধারা-বাহিক কী বলবো? এককথায় বলতে পারি। শেষপর্যন্ত সমস্তই আমার মিলে গেল।'

'অংকের মতন?'

'অংকের মত? না না, অংক না, অংক কি সব সময় মেলে? মনের মতই মিলে গেল সব।'

ভেবে দেখি, কথাটা ঠিক। যেখানে মনের মিল হয় সেখানে অংকও মেলে, এমন কি, টাকা আনা পাইয়ের আঁকও; আবার অংক-শায়িনীও মিলে যায়। তবু জিগ্যেস করি —'কি রকম?'

'তোমরা চলে আসার পর—তারপরে আরো দুটি ছেলে এলো স্কটিশে। আলোক আর হিরণ। থার্ড ইয়ারে এসে তারা ভর্তি হোলো আশুতোষ থেকে। তুমি, জাফর, কনক, আরো কে কে—একে একে আমায় ছেড়ে গেলে! শেষপর্যন্ত দুটিতে দাঁড়ালো। হিরণ আর আলোকে।......'

'ওদের মধ্যে ভালো কে?'

'দুজনেই। দুজনেই মনের মত। দেখতে সুশ্রী। সুগঠিত দেহ দুজনারই। দুজনেই বেশ ভদ্র। দুজনের সঙ্গেই আমার ভাব হলো খুব। আমি ভারী ভাবনায় পড়লাম।'

'ভাব হলে আবার ভাবনা কিসের?'

'কাকে ছেড়ে কাকে রাখি? শেষ পর্যন্ত একজনকে তো বেছে নিতেই হবে। জীবনের সঙ্গী করতে হলে—কিন্তু, কাকে বাছি? কার গলায় মালা দি? একদিকে হিরণ, শান্ত-শিষ্ট, পয়সাওয়ালা ঘরের ছেলে। সব-সময়ে ফিটফাট্। ওধারে আলোক, সপ্রতিভ, স্মার্ট, কাল্‌চারড্—আর কী চমৎকার বাঁশি বাজায়। কিন্তু ভারী গরীব। এধারে নারী জীবনের যা কিছু কাম্য—গাড়ি আর বাড়ি, গয়না-জুয়েলারি সব—আমার পায়ের তলায়; ওদিকে শুধু আলোক আর তার ভালোবাসা। আর তার মনভোলানো বাঁশি। সুরের মায়াজাল।......'

'ভারী জ্বালা তো!' সায় দিতে হয় আমায়—'কার জালে পড়লে শেষটায়?'

'দুজনেরই। কিন্তু কার জালে উঠবো তাই ঠাওরাতে পারছিলাম না।' সে দীর্ঘ-নিশ্বাস ফ্যালে।

'আহা, দুজনকে ভালোবাসলেও ভালো-বাসার কি উনিশ-বিশ নেই?......যে মারে, যার হাতে মারা পড়ি সেই হচ্ছে বিশতুল্য।'

রাখিবার মানসে ঐস্থানে শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিতে যত্নবতী হয়েন। অতএব প্রতিষ্ঠার উপযোগী শিবলিঙ্গ আনয়ন করিতে হনুমান প্রেরিত হয়। আদেশ পাইবামাত্র হনুমান ভারতের নানা স্থানে ঘুরিয়া অবশেষে কেদারনাথ, গোকর্ণ এবং আরও কতকগুলি লিঙ্গ লইয়া উপস্থিত হয় এবং সেইগুলিই সীতাদেবীকে দেয়। কিন্তু যখন জানকী দেখেন যে, ঐসব লিঙ্গের ভিতর কাশীর বিশ্বনাথ নাই, তখন তিনি উহা আনিতে পুনরায় হনুমানকে প্রেরণ করেন। অতঃপর হনুমানের আসিতে বিলম্ব হওয়ায় তাহাকে অপারগ ভাবিয়া সীতাদেবী নিজে খিচুড়ী বা অন্নপিণ্ড ঐ স্থানে ঢালিয়া দেন, যাহা ক্রমে জমিয়া প্রস্তরবৎ কঠিন এবং লিঙ্গের আকার ধারণ করে। তখন তিনি উহার নাম রামেশ্বর রাখেন। ঐ উপায়ে রামেশ্বরের প্রতিষ্ঠা হইয়া যায়। পরে হনুমান কাশীধাম হইতে বিশ্বেশ্বর লইয়া আসে এবং রামেশ্বর দৃষ্টে ক্ষোভ ও অপমানে ক্রোধান্ধ হইয়া স্বীয় পুচ্ছ ঐ লিঙ্গে জড়াইয়া উহাকে উৎপাটন-পূর্বক নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হয় কিন্তু জানকী স্থাপিত শিবলিঙ্গ উৎপাটিত হওয়া দূরে থাকুক, হনুমানের ঐরূপ বলপ্রয়োগে তাহারই পুচ্ছ ছিঁড়িয়া যাওয়ায় সে ঐ স্থান হইতে ১ মাইল দূরবর্তী 'রামঝরকা' নামক স্থানে গিয়া পতিত হয়। শ্রীরাম ঐ ব্যাপার দৃষ্টে ভক্ত হনুমানের নিকট গিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দেন এবং তাহার আনীত বিশ্বনাথ ও গোকর্ণাদি রামেশ্বরের চতুর্দিকে প্রতিষ্ঠা করেন।

অপর বৃত্তান্ত—লঙ্কা হইতে জানকীকে উদ্ধার করিয়া প্রত্যাবর্তনকালে শ্রীরামচন্দ্র ঐ স্থানে আগমনপূর্বক শিবপূজার মানসে হনুমানকে কাশীধাম হইতে একটি শিব-লিঙ্গ আনিতে আদেশ করেন। আদেশ পাইবামাত্র পবননন্দন পবনবেগে ধাবিত হইয়া ত্বরায় কাশীধামে উপনীত হয়েন এবং তথায় পথে অসংখ্য শিবলিঙ্গ পতিত দেখিয়া স্বীয় বানরবুদ্ধিবশত শিব পলাইতে পারেন ভাবিয়া একটির পরিবর্তে দুইটি লিঙ্গ দুই বাহুমূলে লয়েন এবং শিবের তুষ্টি সাধনার্থে স্বীয় পুচ্ছে একটি ঘণ্টা বন্ধনপূর্বক উহার বাদ্য সহকারে আনয়ন করেন; কিন্তু ঘণ্টাবন্ধনের অবসরে একটি শিব পলায়ন করেন বা পড়িয়া যান। তথায় অবশিষ্ট শিব সহ প্রত্যাগমন করিয়া দেখেন, তাঁহার আসিতে বিলম্ব হওয়ায় শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্রতীরস্থ বালুকা দ্বারা শিব-লিঙ্গ নির্মাণ ও স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাকে ঐ লিঙ্গের পূজায় উদ্যত দেখিয়া হনুমান ভক্তাভিমানে মুখ ভার করিয়া দণ্ডায়মান থাকেন। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার মনোভাব বুঝিয়া ভক্তের মান বাড়াইবার নিমিত্ত তাঁহার আনীত শিবের প্রতিষ্ঠান্তে অগ্রেই পূজা করিয়া তৎপরে নিজ শিবের পূজা করেন। অদ্যাবধি সেই নিয়মে অগ্রে হনুমান-আনীত বিশ্বনাথের এবং পরে শ্রীরামচন্দ্র স্থাপিত রামেশ্বরের পূজা ও ভোগাদি হইয়া থাকে।

৺রামেশ্বর মন্দির প্রস্তরনির্মিত অতি প্রকাণ্ড এবং খোদিত কারুকার্যপূর্ণ, দেখিতে অতি চমৎকার। উহার চতুষ্কোণ-প্রাঙ্গণ দৈর্ঘ্যে ১০০০ ফুট এবং প্রস্থে ৬৫৭ ফুট। মন্দিরের বাহিরে চতুর্দিকে রাজপথ। প্রবেশদ্বারের উচ্চতা ১০০ ফুট এবং মন্দিরের ১২০ ফুট। চতুষ্কোণাকার ঐ সুবিস্তীর্ণ মন্দিরদ্বার দ্বারা অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে দেখা যায়, পূর্বদিকের বারান্দায় মন্ত্রীসহ পলিগার রাজমূর্তি পূর্ণ রহিয়াছে। ঐ রাজাই ঐ স্থানে দীপশালা স্থাপন করিয়াছেন। মন্দির মধ্যে এক পার্শ্বে চতুর্দিকে প্রস্তর-বাঁধান একটি কুণ্ড আছে। মন্দির মধ্যে কয়েকটি মহল আছে এবং সেইসব মহলে কতকগুলি দালানে দেবতার ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন লীলা বা উৎসবের স্থান ও দেবদেবীর মূর্তি আছে। ঐরূপে দুই তিন স্থানে অতিক্রম করিয়া ৺রামেশ্বরজীর মহলে প্রবেশ করিতে হয়। ঐ মহলের প্রাঙ্গণে প্রায় একতলা সমান উচ্চ প্রস্তরনির্মিত একটি বৃষ আছে যাহাকে নন্দী নামে অভিহিত করা হয়। সমীপে প্রায় তিনতলা সমান উচ্চ একটি লৌহনির্মিত যূপস্তম্ভ প্রোথিত আছে—প্রত্যহ উহার পূজা হইয়া থাকে। ঐ মহলের চতুর্দিকে বিশ্বনাথ, কেদারনাথ, গোকর্ণ আদির মূর্তি পৃথক্ পৃথক্ এবং পশ্চিমদিকে পৃথক্ মহলে পার্বতী দেবীর মূর্তি।

আমরা সে রাত্রে রাজপথ হইতে ঐ উদ্দেশ্যে ৺রামেশ্বরকে প্রণাম করিয়া বাসায় গিয়া উঠি। পরদিন প্রাতে সমুদ্র স্নানান্তে যথারীতি উপরোক্ত দেবদেবীর দর্শনান্তে ৺রামেশ্বরের স্থানে উপনীত হই। ৺রামেশ্বরের বালুকাময় প্রস্তরের লিঙ্গ-মূর্তি কুণ্ডমধ্যে অবস্থিত। অতি ক্ষুদ্রকায় কুণ্ডের উপর প্রায় অর্ধ হস্ত উচ্চ ঐ মূর্তি কঠিন পাষাণের নহে। বালুকাময় পাষাণের বলিয়া সর্বদা স্বর্ণমুকুটে আবৃত রাখা হয়, জল চড়ান ও পূজাদি করা হয়। তবে প্রাতে গঙ্গাজলে সর্বপ্রথম স্নান-কালীন মুকুটাবরণ উন্মোচন করা হয়। তখন প্রকৃত মূর্তি দর্শন হইয়া থাকে অথবা কোন যাত্রী গঙ্গোত্তরীর জল চড়াইতে চাহিলে এবং সে মর্মে রামনাদের রাজার কাছারী হইতে ১৮০ জমা দিয়া অনুমতি পত্র লইয়া আসিলে মন্দিরের পূজারিগণ আবরণ উন্মোচন করিয়া সেই জল বাবার মাথায় ঢালিয়া দেন। ৺রামেশ্বরের নিত্য স্নান ও ভোগে গঙ্গাজল ব্যবহৃত হয় এবং প্রত্যহ সেই জল সরবরাহের ব্যয়নির্বাহার্থে হোলকারের রাণী অহল্যাবাঈ বহু অর্থ দিয়া ঐ বিষয়ের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন।

(ক্রমশ)

বিজ্ঞান-বৈচিত্র্য

চক্রদত্ত

রাজরাজড়ারা অনেকেই শখ করে বাগান-বাড়িতে বাস করেন। এই রকম শখ ছাড়া প্রয়োজনেও অনেক সময় এই রকম আলো-হাওয়াযুক্ত খোলা মেলা জায়গায় বাস করতে হয়। বিশেষত যক্ষ্মা রোগীদের সব সময়েই বেশ রোদ ও আলো-হাওয়াওয়ালা বাড়িতে রাখা দরকার হয়। অনেক স্যানিটোরিয়ামে সূর্যের গতিবিধির সঙ্গে সঙ্গে রোগীর ঘরটিও আস্তে আস্তে ঘুরে যাওয়ার ব্যবস্থা থাকে, এতে রোগী সব সময়ই রোদ ও আলো পেতে পারে। রোগ
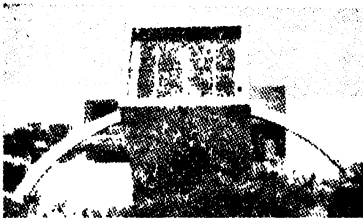
পাহাড়ের ওপরে ঝুলন্ত বাড়ী

ভোগ ছাড়াও শখ করেও যদি এই ধরণের বিলাসিতা করা যায়, তাহলে ভালই লাগে, অবশ্য যদি অল্প খরচে হয়। হলিউডের এক ভদ্রলোক পাহাড়ের ওপর একটি ঝুলন্ত ঘর তৈরি করেছেন, কোনও শক্ত ভিত্তির ওপর বাড়িটি তৈরি না করে ষাট ফুট লম্বা একটা কাঠের খিলানের ওপর ঘরটি তৈরি হয়েছে। খিলেনের দুটো দিক দুটি কংক্রিটের থামের ওপর বসান হয়েছে। এইভাবে বেশ ভালভাবে বাস করার উপযোগী দোতলা বাড়িটি তৈরি করা হয়েছে। ঘরের এক দিকটা শুধু কাচের শার্সি দিয়ে তৈরি। সবশুদ্ধ এই বাড়ির ওজন বিশ হাজার পাউন্ড। বাড়িটির সামনে একটি বারান্দা থাকার দরুণ আলো-হাওয়া উপভোগ করা ছাড়াও চারিদিকে মনোরম দৃশ্য উপভোগ করা যায়।

*

পুজোর মরশুমে যারা কাপড়ের বাজারে ঘুরেছেন কিংবা পুজোমণ্ডপে নানা বর্ণের শাড়িতে সুসজ্জিতা তরুণী যাদের চোখে পড়েছে, তাদের কাছে নাইলনের কোনও নতুন পরিচয় দেওয়ার আর দরকার নেই। তবে এই নাইলন আরও একটি নতুন উপায়ে মানুষের সৌন্দর্য বৃদ্ধির সহায়তা করছে। রোগগ্রস্ত দাঁত তুলে ফেল্লে কিংবা দাঁত পড়ে গেলে ফোক্‌লা হয়ে থাকার রীতি আর নেই, তার জায়গায় আজকাল নকল দাঁত ব্যবহার করা হয়। অবশ্য এই দাঁত যাতে নকল বলে বোঝা না যায়, তার জন্য দন্ত-চিকিৎসকগণ বিশেষ সচেষ্ট। নকল দাঁতের মাড়ির রং প্রায় আসল দাঁতের মতই করা হয়, কিন্তু আসল দাঁতের মাড়ির মত রক্ত-বহনকারী শিরা-উপশিরার অস্তিত্ব ঠিকমত দেখানো সম্ভব হয় না। ডাঃ ফ্র্যাঙ্ক এক রকম লাল রংয়ের নাইলন দিয়ে নকল দাঁতের মাড়ির ওপরে ঠিক আসল দাঁতের মত শিরা-উপশিরার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারেন, এমনকি, এই নাইলন দিয়ে আসল মাড়ির রংয়ের মত নকল দাঁতের মাড়িটিও তৈরি করতে পারেন।

*

গাছপালাও মানুষের মত শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে, একথাটা যখন প্রথম শোনা গিয়েছিল, তখনই বেশ অবাক হতে হয়। এর চেয়েও অদ্ভুত কথা যে, মানুষের মত গাছ-পালারও জ্বর হয়। জনৈক উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, ছত্রকজাতীয় এবং ভাইরাস জাতীয় রোগে আক্রান্ত গাছ-পালার জ্বর দেখা যায়। এই ধরণের রোগগ্রস্ত গাছগুলির উত্তাপ সাধারণ গাছের চেয়ে ·১ ডিগ্রী থেকে আরম্ভ করে ২ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড পর্যন্ত বেশি হয়। তিনি আরও বলেন যে, ভাইরাস রোগগ্রস্ত গাছের চেয়ে ছত্রক রোগাক্রান্ত গাছগুলির উত্তাপ বেশি হয়।

*

প্লাস্টিকের ভ্যানিটি ব্যাগ যেমন মেয়েদের কোমল হাতের শোভাবর্ধন করে, তেমনি যুদ্ধক্ষেত্রে এই প্লাস্টিকের ব্যাগ সৈনিকদেরও কাজে আসে। অবশ্য তখন আর এটাকে ভ্যানিটি ব্যাগ বলা যায় না। এই প্লাস্টিকের ব্যাগ কাচের বোতলের পরিবর্তে রক্তাধার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। প্লাস্টিকের রক্তাধারগুলি কাচের রক্তাধারের চেয়ে কোনও অংশেই খারাপ নয়—এগুলি হাসপাতালে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সমানভাবে কার্যকরী। উপরন্তু এগুলো কাচের বোতলের চেয়ে অনেক বেশী সুবিধাজনক। যেখানে যুদ্ধ পুরোদমে চলতে থাকে, সেখানে কোনও কিছু হাতে হাতে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয় না, এরোপ্লেনের ওপর থেকেই ফেলে দেওয়া হয়। এসব ক্ষেত্রে প্লাস্টিকের ব্যাগগুলিই বেশী কাজ দেয়, কারণ এগুলো ওপর থেকে ফেলে দিলে ভাঙতে পারে না। কাচের বোতলের চেয়ে কম জায়গা লাগে। এক বোতল রক্তে এই ব্যাগের অর্ধেকটা ভরতে পারে। এগুলো কাচের বোতলের চেয়ে ওজনেও অনেক কম, তাছাড়া খালি ব্যাগ ফেরৎ পাঠানোর সময় খুব অল্প জায়গা নেয়। সাধারণত বোতলে করে রক্ত পাঠানো হলে সেটা শরীরে প্রবেশ করানোর জন্য অনেক যন্ত্রপাতি পাঠাতে হয়, কিন্তু ব্যাগের মধ্যে রক্ত পাঠালে তার সঙ্গে সামান্য একটু ব্যবস্থা করতে পারলেই হয়। কারণ এর সঙ্গে একটা টিউব লাগিয়ে শিরার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারলে শুধুমাত্র হাতের চাপ দিলেই রক্ত শরীরের মধ্যে পাঠানো যায়। রক্তটা ব্যাগের মধ্য থেকে একেবারে শরীরের মধ্যে প্রবেশ করানোর দরুণ নিরাপদও হয়।

*

দক্ষিণ আমেরিকার শেষ প্রান্তে সাইবিরিয়ার কাছাকাছি আলাস্কা দেশটি অবস্থিত। সুমেরুর খুব কাছে থাকা সত্ত্বেও দেশটি ক্রমশ গরম হয়ে যাচ্ছে। এদেশে এমন কতকগুলো বন্দর আছে, যেগুলো আগে সারা বছরই বরফে ঢাকা থাকতো, এখন গরমের কিছু সময় এই বন্দরে জাহাজ চলাচল করতে পারে। যেসব বন্দরগুলো আগে খুব অল্প দিনের জন্য খোলা পাওয়া যেতো, এখন সেগুলো অনেক-দিন খোলা থাকে। আবহাওয়াতত্ত্ববিদগণ এ বিষয়ে বিশেষ কোনও মতামত পোষণ করেন না। তাঁদের মতে এটা একটা সাময়িক পরিবর্তন হতে পারে কিংবা চিরস্থায়ী পরিবর্তনও হতে পারে। প্রমাণ-স্বরূপ আরও বলা হয় যে, আগে যে রকম হিমবাহ দেখা যেতো, সেগুলো এখন গলে যাচ্ছে, আর সেই অনুপাতে হিমবাহ গড়ে উঠছে না। ক্রমশ তুষারের ভাগ কমে যাওয়ায় যেসব তুষারাবৃত জায়গায় যে ধরণের গাছপালা জন্মাত, এখন আর সেগুলো জন্মায় না। আবহাওয়াতত্ত্ববিদরা অবশ্য বলছেন যে, ১৮৮৫ সাল থেকে প্রতি বছরে এখানে এক ডিগ্রী ফারেনহাইট উত্তাপ বেড়ে যাচ্ছে। ফলে এমনও হতে পারে যে, ঠিক এর উল্টোদিকে অর্থাৎ কুমেরু অঞ্চলে এক ডিগ্রী তাপ কমে যাচ্ছে।

—সতের—

গৌরীকান্তের বাড়ি এবং বিজয়দের বাড়ি পাশাপাশি। একসময়ে সবটাই ছিল এক বাড়ি। পরে মাঝখানে পাঁচিল পড়েছে। কান্নাটা বিজয়ের বাড়িতেই বটে। কাঁদছেন বিজয়ের মা, চীৎকার করছে বিজয়। সে মাকেই চুপ করতে বলছে, কাঁদতে সে দেবে না।

মা এবং ছেলেতে এই ধরণের পর্ব অত্যন্ত সাধারণ। এক্ষেত্রে কান্নাটাই আশঙ্কার সৃষ্টি করেছে। বিজয়ের মা কাঁদেন না কখনও। অভাবের সংসার। পৈত্রিক সম্পত্তি যা আছে তাতে খুব একটা অভাবের কথা নয় কিন্তু জমিদারী সম্পত্তির হিসেব নিকেশের খাতা খাতিয়ান থোকা ইত্যাদির গাদা যখন উই পোকায় খেয়ে শেষ করে এবং তদ্বিরের অভাবে জীর্ণ হয়ে ছিড়েখুঁড়ে বাতাসে উড়ে বেড়ায়, চালের ফুটোয় জল পড়ে পচে যায় তার উপর ব্যাঙের ছাতা গজায়, যখন দেনা-পাওনার হিসাব পকেটে এবং মাথার থাকে আশ্রয় গ্রহণ করে তখন যে অবস্থা হয় তাই হয়েছে। এই নিয়ে মায়ের সঙ্গে তার কলহ হয়, দিনে দুবার তো বটেই কোন কোন দিন তিন চারবারও হয়। বিজয়ের মা এক বিচিত্র ধরণের মানুষ; নিজের জীবনের জন্য কোন কামনাই তাঁর নাই; সংসারে দুঃখটাকেই অতি মহৎ এবং মধুর মনে করে এসেছেন চিরকাল; স্বার্থত্যাগকে অতিমাত্রায় প্রশ্রয় দিয়ে স্বকীয় অর্থকেও শূন্যের কোঠায় এনে ফেলেছেন—সেই প্রথম জীবন থেকেই। সম্ভবত বিজয়ের এই জমিদারী-পকেটে-পোরার স্বভাবটা ওই থেকেই জন্মেছে এবং তার নিজের লেখাপড়াবিমুখতার সঙ্গে জট পাকিয়ে গোটা সংসারটাকে সেই জটার মধ্যে বন্দিনী জাহ্নবী ধারার মত গতিহীন করে তুলেছে। তাতে মায়ের খুব দুঃখ নাই; ছেলে দেশোদ্ধার করে বেড়ায়—তাতেই মা গৌরব অনুভব করেন। শুধু দুটি কারণে ঝগড়া হয়। এক দেবসেবার প্রাচীন কালের বরাদ্দের মত বরাদ্দের মূল্যের অভাব হয়: পাঁচপো চিনির স্থানে পাঁচ ছটাকে দেবতার ভোগ দিতে হয়। এবং ওই পাঁচ ছটাকের মূল্য দিতেও বিজয়ের কষ্ট হয় সে ঘোরতর আপত্তি করে—রূঢ় কঠোর ভাষায় প্রচণ্ড নাস্তিকতা প্রচার করে বলে—আমি পারব না, দোব না, আমার নাই। ভোগ দিয়ো না, দিতে হবে না। ঠাকুর! দেবতা! ঠাকুরই বা কিসের? দেবতাই বা কিসের? ও-সব আমি মানি না। ফেলে দাও গে জলে!

মা বলেন—তুমি পারব না বললে হবে না। ঠাকুর যিনি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, তিনি সম্পত্তি করে গেছেন। ঠাকুর এবং সম্পত্তি যখন হয়েছিল তখন তুমি ছিলে না। তুমি তারপর উড়ে এসে জুড়ে বসেছ। সুতরাং আগে ঠাকুরের হবে—তারপর থাকলে—তুমি খাবে—তোমার ছেলেরা খাবে।

এই নিয়ে কলহ এমন উচ্চ হয় যে গোটা নবগ্রাম শুনতে পায়; কোনদিন রাগ করে বিজয় বেরিয়ে চলে যায় গ্রামান্তরে দু মাইল আড়াই মাইল কোন প্রজার কাছে টাকা সংগ্রহ করে এনে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলে—ওই নাও। রাশ রাশ কিনে এনে—দেবতার নাম করে গুষ্টিশুদ্ধ গেল!

কোনদিন মা নিজেই পাড়ায় বেরিয়ে ধার করে এনে অথবা চাল বিক্রী করে দেবতার সামগ্রী কিনে আনিয়ে কাজ চালান।

আর কলহ বাধে—বিজয়ের ছেলেদের নিয়ে।

বিজয়ের ছেলে মেয়েতে ছ সাতটি; এ ছাড়াও চার পাঁচটি মারা গেছে। দু তিনটি মারা গেছে অবহেলায়—অচিকিৎসায় বললে বেশী বলা হবে না। বিজয় দেশোদ্ধারে প্রমত্ত, মদমত্ত গণ্ডারের মত গোঁয়ের মাথায় চলে, তার ছেলেমেয়েদের প্রতি দৃষ্টিপাতের অবকাশ নাই; বিজয়ের স্ত্রী বোকা নন—বুদ্ধিমতীই বলা চলে, কিন্তু হয় স্বামীর ওই স্বভাবের জন্যই হোক আর জন্মায়ত্ত কোন দোষগুণের জন্যই হোক—বেশ খানিকটা নির্বিকার ধরণের মানুষ। ছেলেরা নিজেদের যত্ন যা পারে নিজেরাই করে, না-পারে অযত্নেই থাকে, তিনি বলেন—আমি আর কত করব? বাবা! আর পারি না। যা হয়—হবে, যেমন অদৃষ্ট তেমনি করবে!

ছেলেরা পড়ছে—হাত পা ছড়ছে, রক্তপাত হচ্ছে; হোক।

জ্বর আসছে, কাঁথা পাড়ছে বিছিয়ে শুচ্ছে, তিনি এক গেলাস জল মাথার গোড়ায় রেখে নিশ্চিন্ত। বাস্।

ছেলেদের কাপড় জামা ছেঁড়া ময়লা, তার আর তিনি কি করবেন? কত পরিষ্কার করবেন? কত সেলাই করবেন? ওতেই একরকম করে মানুষ হয়ে উঠবে!

স্বামীকে বলেই বা কি করবেন? সে যাবেই বা কোথা—আর রোজগারই বা করে কখন? তাকে বললে তৎক্ষণাৎ উত্তর শুনতে হবে—কি করব? আমার নাই। আমি দিতে পারব না।

এইখানে মা এসে দাঁড়ান—দিতে পারব না বললে তো হবে না বিজয়!

—হবে না মানে? না থাকলে আমি দেব কোথা থেকে?

—সে ওরা জানে না। এটা বাপের দায়িত্ব।

—সে দায়িত্ব আমি মানি না। বাপের দায়িত্ব। বাপ হয়ে যেন চোরের দায়ে ধরা পড়েছি।

মা বলেন—ছি-ছি-ছি!

বিজয় বলে—ওরা মরুক মরুক মরুক!

মা বলেন—বিজয়!

—কি?

—তার থেকে তুই মর বিজয় আমি ওদের কাছে তোর মা ব'লে মুখ দেখানোর লজ্জা হতে রেহাই পাই!

বিজয় বলে—আমি কেন মরব? তুমি মর। তুমিও লজ্জা থেকে খালাস পাবে, আমিও তোমাকে পিণ্ডি দিয়ে খালাস পাব! বলতে বলতেই ছেঁড়া জুতোটা টেনে নিয়ে উত্তর দেয়—আমি দরবারপুরে চললাম। সেখানে কলেরা হয়েছে শুনলাম। ফিরব ও-বেলা।

—ছেলেদের মাইনে চাই। ইস্কুলে নাম কেটে দেবে।

—দিক গে কেটে। পড়তে হবে না। দরকার নাই।

—কি বললি?

—ঠিক বলেছি। পড়ে কি হবে?

মা মাথা ঠুকতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তার আগেই সে বেরিয়ে যায়। ফিরে আসে সন্ধ্যায় অস্নাত অভুক্ত। ডাকে—মা।

মা সাড়া দেন না। তিনি সেই তখন থেকেই শুয়ে আছেন—তিনি খান নি। বিজয়ের স্ত্রী বলে—মা শুয়ে আছেন।

—কেন? কি হ'ল?

—কি হ'ল? জিজ্ঞাসা করতে তোমার লজ্জা করে না?

—ও! সেই কথা নিয়ে?

—সেই কথা? সে কথাগুলো কি সামান্য কথা হল? ছি! তোমাকে ছি! গলায় দড়ি দাও গে তুমি।

কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে বিজয়। তারপর বলে—বেশ! আমি চললাম। সেই ভাল—আমার গলায় দড়িই ভাল। তোমরাও খালাস আমিও খালাস।

এর পর মা অন্ধকারে বেরিয়ে পড়েন—বিজয়।

—কি?

—আমার দশটা টাকার প্রয়োজন বাবা। আমি ভাইয়েদের ওখানে যেতে চাই। আমি আর পারছি না, পারব না। তোমার যদি না-থাকে বল, আমি ভিক্ষে করে জোগাড় করে নেব। তোমার বাসনের ঘরের চাবী নাও, লক্ষ্মীর ঘরের চাবী নাও।

তিনি ফেলে দেন চাবি।

চাবি পড়ে থাকে—বিজয় উঠে চলে যায়।

এরএর মা অন্ধকারে বেরিয়ে পড়েন—ডাকেন—বিজয় ফিরে আয়।

বিজয় ফিরে আসে।

কোন কোন দিন মা ডাকেন না। বিজয় তবুও কিছুক্ষণ পর ফিরে আসে। মায়ের কাছেই বসে। কয়েক মুহূর্ত পর হঠাৎ মায়ের পা দুটো জড়িয়ে ধরে বলে—আমার দোষ হয়েছে।

মা পা টেনে নিতে চেষ্টা করেন—পা ছাড়ো বাবা পা ছাড়ো।

—না। আমাকে ক্ষমা কর তুমি। কেঁদে ফেলে বিজয়।

এইভাবেই শেষ হয়। অবশ্য সব দিন এতখানি এগোয় না; ঝগড়া হয়ে—কিছুক্ষণ বাক্যে কর্মে অসহযোগিতার পর আবার এক সময় কথাবার্তা শুরু হয়। মায়ে ছেলেতে বিচার করে দেখেন—কে বেশী কটু কথা বলেছে।

ছেলে বলে—আমার স্বভাব তো জান! কেন আমাকে রাগাও।

তারপর সাড়ম্বরে শুরু করে কোথায় আজ কোন মহৎ কর্ম করে এসেছে, তারই বিবরণ বর্ণনা। মা মনে মনে ছেলের দীর্ঘ-জীবন কামনা করেন। সঙ্গে সঙ্গে বলেন—ওরে বিজয়, তোর কথা তুই সংশোধন কর। রূঢ় ভাষাটা ছাড় বাবা! ওঠা ছাড়।

আজকের কলরবের সুরটা স্বতন্ত্র।

কান্না। মা কাঁদছেন। কোন গোপাল মাণিকের নাম করে কাঁদছেন।

কিশোরবাবু এবং গৌরীকান্ত ঘরে ঢুকে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। দাওয়ার উপর বছর দুয়েক বয়সের একটি শিশুর মৃতদেহ! পাশে বিজয়ের স্ত্রী বসে আছে পাথরের মত। মা বসে কাঁদছেন—ওরে গোপাল! ওরে গোপাল! ওরে মাণিক—এ কি দুঃখ তুই পেলি রে—কি দুঃখ আমায় দিলি রে! ওরে সোণা! বাপের অপরাধে তোর ওপর এ কি নিষ্ঠুর দণ্ড রে! অভিশাপ শেষে তোর উপর ফলল বাবা!—

বিজয় মাকে বলছে—চুপ কর বলছি। চুপ কর!

কিশোরবাবু স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে যেন পাথর হয়ে গেছেন—তাঁর চোখের কোণ থেকে নেমে আসছে দুটি জলধারা। উষ্ণ লবণাক্ত। শিশুটির মৃতদেহ দেখে তাঁর অন্তর স্বভাবধর্মবশে আলোড়িত বিগলিত হয়ে পড়েছে মুহূর্তে। কথা বলবার শক্তি হারিয়েছেন তিনি। এই কিশোরবাবুর স্বভাব।

—কি হয়েছিল বিজয়? কোন অসুখের কথা তো শুনি নি?

—অভিশাপ গৌরীকান্ত, অভিশাপ। মানুষের মর্মান্তিক দুঃখের অভিশাপ বড় ভয়ংকর বস্তু বাবা।

বিজয় চীৎকার করে উঠল—মা, তোমাকে আমি চুপ করতে বলছি, তুমি চুপ কর। অভিশাপ? অভিশাপে যদি মানুষ মরত, তবে পৃথিবীতে কেউ বেঁচে থাকত না। ভগবান পর্যন্ত মরে যেত!

গৌরীকান্ত বিজয়ের হাত ধরে বললে—আয় বাইরে আয়। এ সময়ে এসব তুই কি বলছিস? ছি! আয়। আসুন কিশোরবাবু, কাঁদলে একটু শান্তি পাবেন ওঁরা। আমরা থাকলে বউমার অসুবিধে হবে। আসুন।

—নাও কাঁদ। পেট ভরে কাঁদ। কিন্তু—।

বিজয় কেঁদে ফেললে হঠাৎ। বললে—অভিশাপে এই হয়েছে বলে কেঁদো না কিন্তু। আমি কোন অন্যায় করি নি। আমি বিন্দুবিসর্গ জানি না। এ অপরাধ, এ অন্যায় মা হয়ে আমার ঘাড়ে চাপিয়ো না তুমি।

দায়ী বিজয়। ওই শিশুটির এই শোচনীয় পরিণতির জন্য দায়িত্ব ষোল আনা বিজয়ের; তা সে অস্বীকার করে না। সকালবেলায় উঠে ওই ছোট ছেলেটির হাত ধরে বাইরের বাড়ি এসেছিল। বিজয়ের স্বভাবই হল সব থেকে ছোট ছেলেটিকে নিয়ে সমাদর করা। সকল সমাদর গিয়ে পড়ে তার উপর। বাইরের বাড়িতে এসে ছেলেটির সঙ্গেই নিতান্ত একটি শিশুর মতই স্নেহবিগলিত পুরুষটি আবোল-তাবোল বকছিল। হঠাৎ রেলের পুলের উপর ট্রেনের শব্দ শুনেই চকিত হয়ে ছেলেটিকে বাইরের বাড়ির দাওয়ায় বসিয়ে দ্রুতপদে স্টেশন অভিমুখে রওনা হয়েছিল। এই সকালের ট্রেনে ফুড কমিটির সেক্রেটারী যাবে সদরে। গতকাল রাত্রে হঠাৎ বিজয়ের একটা কথা মনে হয়েছে। সামনে ধর্মরাজ পূজো আসছে। ধর্মরাজ পূজোর ভক্তেরা উপবাস করে এবং ধর্মরাজের ভক্তদের সকলেই হল হরিজন সম্প্রদায়ভুক্ত; জেলে, বাউড়ী, রাজবংশী ইত্যাদি। তাদের জন্য কিছু চিনি বরাদ্দ করবার জন্য ডিস্ট্রিক্ট কন্ট্রোলারকে অনুরোধ করা প্রয়োজন। ব্রত-পার্বণে পূজায় উচ্চবর্ণের লোকেদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়; রমজানের মাসে মুসলমানদের জন্য ব্যবস্থা আছে, ক্লাবে, সঙ্ঘে, উৎসবে অনুষ্ঠানে দরখাস্ত করলে চিনির পারমিট মেলে, কিন্তু এই এদের জন্য কোন ব্যবস্থা নাই; এদের উৎসব বলতে দুটি—এক চৈত্র-সংক্রান্তিতে গাজন, দ্বিতীয় বুদ্ধ-পূর্ণিমায় ধর্মরাজ পূজা। এরা নিজেরা বলে না, বলতে পারে না বা জানে না, অন্য কেউ বলেও না এদের জন্য। এবার এ কথাটা বিজয়ই তুলে দিয়েছে ওদের মহলে। এই ফুড কমিটির নির্বাচনে কানাইকে সভ্যপ্রার্থী হিসাবে দাঁড় করিয়ে দাবীটা ও-ই তুলে দিয়েছে। এবং দাবী পূরণের জন্য নিজেই সচেষ্ট হয়েছে। কিন্তু এমনই ধারার মানুষ সে যে, শিয়রে সংক্রান্তি না এলে তার কোন চেতনাই কার্যকরী হয় না। পূর্ণিমা এসে পড়েছে, ফুড কমিটির নির্বাচনও সমাগত, ফুড কমিটির সেক্রেটারী যাচ্ছে সকালের ট্রেনে; কথাটা হঠাৎ কাল রাত্রে মনে পড়েছিল, কাজে কাজেই সকালে ট্রেনের বাঁশী শুনেই বিজয়কে ছেলেটাকে দাওয়ায় বসিয়ে রেখে স্টেশনে ছুটতে হল। স্টেশনে গিয়ে সেক্রেটারীকে কথা বলে ফিরবার মুখে চোখে পড়ল ওই নোটিশ। ওই নোটিশ পড়ে উত্তেজিত হয়েই সে গিয়েছিল কিশোরবাবুর বাড়ি। কিশোরবাবু তখন মাঠে বেরিয়েছিলেন। কিশোরবাবুকে না পেয়ে তাঁর দরজায় ছেঁড়া নোটিশের চিহ্ন দেখে আরও উত্তেজিত হয়ে গোটা পাড়াটা ঘুরে দেখে এসেছে আরও কতগুলো নোটিশ দেওয়ালে সেঁটেছে এই শয়তানেরা। পাড়া ঘুরে সে যাচ্ছিল গৌরীকান্তের বাড়ি। কতকগুলি কটু কথা বলবার জন্যেই যাচ্ছিল। বলতে যাচ্ছিল, তোমার এই ধারার নির্বাক নিস্পৃহতার মানে কি বলতে পার? এই তো এবার তো দেওয়ালে দেওয়ালে তোমার নামে কাদা ছিটিয়েছে—এবারও কি তুমি চুপ করে শুধু একটু হাসবে, আর ড্যাবড্যাব করে চেয়ে দেখবে? দোহাই তোমার, তুমি এমন জড়পিণ্ডের মত বসে থেকো না। তার চেয়ে তুমি এখান থেকে চলে যাও। তুমি এখানে এসেও এখানকার নাগালের বাইরে বসে থাকবে, সে হবে না। তার চেয়ে তোমাকে আমরা চাই না।

গজ্ গজ্ করে কথাগুলো আওড়াতে আওড়াতেই সে আসছিল—হঠাৎ নিজের বাইরের বাড়ির সামনে এসেই মনে পড়ে গিয়েছিল ছেলেটার কথা। ছেলেটা? কোথায় গেল?

খোকন! খোকন! ওরে! ও দুষ্টুটা!

বাইরের বাড়িতে না পেয়ে বাড়ির দিকে গিয়ে খুঁজেছিল—ছেলেটা এসেছে? ছেলেটা?

স্ত্রী ঘরের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। বলেছিলেন—তুমি তো নিয়ে গেলে।

—হ্যাঁ। কিন্তু বাইরের বাড়িতে রেখে আমি একটু ওদিকে গিয়েছি, ফিরে দেখি নাই। বাড়ি আসে নি?

—না। স্ত্রী ঝাঁট দিয়ে চললেন, চঞ্চল হলেন না।

—তবে গেল কোথায়?

—যাবে কোথায়? কেউ হয়তো কোলে করে নিয়ে গিয়েছে, দেখ।

তাও যায়। অনুমানটুকু অসঙ্গতও নয়, অসম্ভবও নয়। বিজয়ের ছেলেগুলির রূপ আছে। অভাব-অযত্ন সত্ত্বেও তাদের শ্রী ম্লান হয় না, আরও একটা গুণ আছে, বড় মিষ্ট ভাষা এবং চেনা-অচেনা নেই ওদের কাছে—কেউ হাত বাড়িয়ে ডাকলেই হ'ল—দু-হাত বাড়িয়ে কোলে চেপে চলে যায়। বসুধাই কুটুম্ব ওদের। অথবা ওরাই সারা বসুধার কুটুম্ব। এই মাধুর্যে এবং তাদের শ্রীতে মুগ্ধ হয়ে এখানকার হরিজন পল্লীর বধূকেন্যারা বিশেষ করে বাউড়ীপাড়ার মেয়েরা ওদের কোলে তুলে নিয়ে যায় এবং কিছুক্ষণ ওদের কলকণ্ঠের আধোভাষায় কথা শুনে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যায়।

ঠিক এই মুহূর্তেই বিজয়ের মা পুকুরের ঘাট থেকে শিশুর শবদেহ তুলে নিয়ে ভগ্ন-কণ্ঠে ওই অভিশাপের কথা বলে কাঁদিতে কাঁদিতে ঘর ঢুকলেন।

হতভাগ্য শিশু একলা স্বাধীনভাবে কোন খেয়ালে নেমেছে বাড়ির ওপাশের পুকুরঘাটে। গ্রীষ্মের জল শুকিয়ে ঘাটের চাতালের নীচে এসেছে—সেখানে এক হাঁটু গর্ত। বোধ করি চাতাল থেকেই উল্টে পড়ে গেছে।

বিজয়ের মা দেবতার বাসন নিয়ে মাজতে গিয়েছিলেন ঘাটে। বাসনগুলি চাতালে বসে ঘাটে ডুবিয়ে দিতে গিয়ে তাঁর হাত পড়েছিল তার গায়ে।

—কে রে? কার সর্বনাশ হ'ল রে? বলে আর্তস্বরে চীৎকার করে টেনে তুলেছেন তিনি।

সর্বনাশ তাঁরই হয়েছে?

কেন? কোন্ পাপে? এ সর্বনাশ তাঁর?

মানুষের অভিশাপে!

বিজয় কিন্তু তা মানে না। মানতে পারে না। মাকে তা মানতে দেবে না।

এ হতে পারে না। (ক্রমশ)

আলিম মিনার

মৌলানা খাফি খান

মুনশী চক্রবর্তী আলিমের পূর্বপুরুষদের একজন ছিলেন বিখ্যাত ডাকাত। তাঁকে সবাই আড়ালে মাটির মানুষ বলতো—শান্ত স্বভাবের জন্য নয়, মাটির উপর তাঁর অসম্ভব টানের জন্য। কখনও তাঁর লুটের মাল ঘরে উঠতো না, হাতে সোনা এলেই লোকটি ছেলের নামে জমি কিনতেন।

আরেকজন ছিলেন স্বনামধন্য কবি। তাঁরও সমস্ত রচনার, সকল স্বপ্নের মধ্যে লুকিয়ে থাকতো অর্ধস্বগত একটি ইচ্ছা—তিনি গান গেয়ে রাজাকে খুশী করে চেয়ে নেবেন পাহাড়ঘেরা, ঝরণাধোয়া তে-ফসলো ছোট্ট একটি তালুক। আরেকটি পূর্বপুরুষ ইতিহাসে সুবিদিত। বিদেশীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে নিজের দেশটি তিনি পরকে পাইয়ে দিয়েছিলেন নবাবীর আকণ্ঠ তৃষ্ণায়।

এমনি ওঁদের পরিবারে পেয়াদা উকীল হকীম হাকিম মুদী লেঠেল জেলে জোলা সবারই ভূম্যধিকারের প্রতি একটা বংশানুক্রমিক ঝোঁক ছিল। কারো তোশাখানায় থাকতো সনদ, কারো ভিটেয় পোঁতা থাকতো মাঝারি সাইজের দলিল। নেহাৎ ভিকিরী যে তারও পুঁটলিতে পাওয়া যেত দখলীস্বত্ব প্রমাণের দুটি একটি আসল বা জাল চিরকুট।

পিতৃপিতামহের এমনধারা বংশগতি পুত্র-পৌত্রে অর্সে কেন এ নিয়ে বৈজ্ঞানিকদের ঝগড়া চলে চলুক। কিন্তু ইতিহাসের যে তাতে কিছু এসে যায় না তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ মুনশীজী স্বয়ং।

পূর্ববঙ্গে কোথায় একটা চর নিয়ে দাঙ্গায় মুনশীজীর বাবা মার যান। শিশুসন্তানকে কোলে নিয়ে মা পিত্রালয় কলকাতায় চলে আসেন। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন ছেলেটিকে একটি দিনের তরেও চোখের আড়াল হতে দেন নি এবং পিতৃকুল অথবা পিতৃপিতামহের পেশা সম্বন্ধে কারো মুখ থেকে একটি কথাও শুনতে দেন নি।

মায়ের হুকুম ছিল ছেলে দিনে দশ ঘণ্টা ঘরে বন্ধ হয়ে পড়বে—উঁচু গলায়, যাতে অলক্ষিতে রুটিনের ভরাট ছাঁচে ফাঁকির বুদ্বুদ ঢুকে না পড়ে। সকালে ব্যাকরণ, দুপুরে অভিধানপাঠ এবং রচনা, রাত্রে সৎসাহিত্য চর্চা। সোমবারে ইংরেজী, মঙ্গলবারে সংস্কৃত, বুধে বাঙলা, বৃহস্পতিবারে আরবী ও ফারসী, শনিবারে উর্দু। রবিবারে মামুলীরকম পাটীগণিত ও আলজেব্রা পড়া চলতো। জ্যামিতি বারণ ছিল, জ্যামিতির ওপর ভদ্রমহিলার প্রচণ্ড আক্রোশ ছিল।

ইতিহাস ভূগোলের উপরও মুনশীজীর মায়ের কম রাগ ছিল না। তিনি বলতেন, "যত সব গাঁজাখুরী। বলে কিনা কলকেতার শহর 'কর্কটক্রান্তির নিকট, বাইশ ও তেইশ অক্ষাংশের মধ্যবর্তী'। কোথায় বাইশ অক্ষাংশ? চোখে দেখা যায়? দেখাও দিকি আমাকে! নিরীহ অবোলা পৃথিবীর ওপর কতকগুলো মিছিমিছি দাগ কেটে তাই নিয়ে রক্তারক্তি। তার আবার মাপ জোখ হিসেব তারিখ। কচি কচি ছেলেদের মাথাগুলো শুধু শুধু চিবিয়ে খাওয়া। ছি ছি ছি।"

এই প্ল্যানে পাঠ চললে মুনশীজী যে কী হয়ে দাঁড়াতেন জানা গেল না। কারণ, বয়েস যখন ছেলের বারো তখন প্রারব্ধ কর্ম অসম্পূর্ণ রেখে মা হঠাৎ মারা গেলেন।

মামা ছিলেন পণ্ডিত। মুনশীজীর শিক্ষার ছক তিনিই বেঁধে দিয়েছিলেন, বোনের অনুরোধে। কিন্তু সে প্ল্যান চালু রাখার যে একজেক্যুটিভ ক্ষমতা তাঁর বোনের ছিল সেটি তাঁর একেবারেই ছিল না। অতএব বোন মারা যাওয়ার পর হতবুদ্ধি হয়ে তিনি ভাগ্নেটিকে নতুন শিক্ষার নিঃসঙ্গ পথ ছাড়িয়ে যাত্রীবহুল চিরন্তনের পথে চালিয়ে দিলেন। মুনশীজীকে মাথা-চিবিয়ে খাওয়া স্কুলেই ভর্তি হতে হলো। তবে গোড়াপত্তনটা হয়েছিল ভালো, অতএব স্কুলে ঢোকা সত্ত্বেও ওঁর লেখা-পড়ায় আশ্চর্যরকম উন্নতি হতে লাগলো।

পরীক্ষাতে মুনশীজী টপকে টপকে ক্রমশ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলেন। কিন্তু ঐখানে এসেই মার্কশীটে মরচে ধরে গেল, প্রথম স্থানটি কোনোক্রমেই দখলে এলো না। ওটি একচেটে ছিল মেদবহুল স্থূলমস্তিষ্ক একটি বালকের। ক্লাশে সে অনেক পিছিয়ে থাকতো, কিন্তু অদ্ভুত, পরীক্ষায় কেউ তাকে ডিঙোতে পারতো না। জনশ্রুতি ছিল যে, হেডমাস্টার মশাই নাকি নিজে ছেলেটির প্রাইভেট টিউটর ছিলেন।

মুনশীজীর রোখ চেপে গেল, তিনি অন্তত আগামী হাফ্-য়ীয়ারলিতে প্রথম হবেনই। তাঁর খেলা গেল ধুলো গেল, সময়ে স্নানাহার মাথায় উঠলো, চেহারা হলো হাড়গিলের মত—পড়ার তবু বিরাম নেই। মামাতো ভাইবোনেরা গল্প করতে এলে উল্টে তাদের পড়া ধরতে হতো। রাত্রে আলো নিবিয়ে দিলে ছাত্রটি বাড়ির বাইরে রাস্তার আলোতে পড়তো। জোর করে ঘরে বন্ধ করে রাখলে পাড়া ফাটিয়ে চীৎকার করে মেঘনাদ-বধ মুখস্থ আওড়াতো। ক্রমে শত্রু-মিত্র সবাই হাল ছেড়ে দিল, প্রেপারেশনের স্রোতের তোড়ে পাঠাভ্যাস তীরবেগে অগ্রসর হতে লাগলো।

পরীক্ষা শেষ হলো। ফলাফল সম্বন্ধে যথারীতি নানা রকমের গুজব রটলো। নিজের সাফল্য সম্বন্ধে মুনশীজীর কণামাত্র সন্দেহ ছিল না, অতএব যেদিন রেজাল্ট বেরোলো, তিনি স্কুলে না গিয়ে মোহন-বাগানের খেলা দেখতে গেলেন। খেলার মাঠে এক সহপাঠীর মুখে যা খবর শুনলেন, তাতে তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তাঁর বিশ্বাস হলো না খবরটা। পরেরদিন স্কুলে গিয়ে বোর্ডে যা দেখলেন, তাতে তাঁর কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়ে গেল—যথা-পূর্বং, তিনি দ্বিতীয়, মোটা ছেলেটি প্রথম। ঠোঁটকাটা সহপাঠীরা মুচকি হেসে বললে, "দেখছ কী হে, বোর্ডটাকে ভস্ম করে ফেলবে নাকি? অন্তত ম্যাট্রিক অবধি এই ধারাটাই চলবে বুঝলে? সোনারচাঁদ, যে ইস্কুলে পড়ো, তার বাড়িখানা কার খবর রাখো? ঐ কেঁদোটার বাবার। দাদা আমার ফার্স্ট হবেন। বাড়িখানা কেনবার মুরোদ আছে—মায় দু'বিঘে জমির স্বত্ব?"

চড় চড় করে মুনশীজীর মায়ের পড়া ইণ্টেলেকচুয়াল বনিয়াদে বিরাট একটি চিড় খেয়ে গেল। সেই ফাটলের মধ্য দিয়ে পিতৃকুলের আদি বীজ অঙ্কুরিত হয়ে ডালপালা ছড়াবার জন্য ছটফট করতে লাগলো। বিভ্রান্ত মুনশীজীর কানের কাছে আধুনিক সিনেমার সবাক চিত্রের মত চাপা আওয়াজ হতে লাগলো "মুরোদ আছে কেনবার—মায় জমির স্বত্ব! মুরোদ আছে—"

পৈতৃক বংশগতি আর মায়ের গড়াপেটার বুনো-ওল, বাঘা-তেঁতুলের দ্বন্দ্বে কার জয় হলো বলা কঠিন। মুনিদের মত এ ব্যাপারে ভিন্ন।

আমাদের ধারণা মায়েরই, কারণ মুনশীজী আজ যে সর্বত্র পূজ্য, তার কারণ তার ধনসৌরভ নয়, বিদ্যাগৌরবই।

কিন্তু জমির দালাল ক্যাল্‌ডিক্ট কোম্পানী, সলিসিটার্স বসু, দত্ত, গুঁই, কলকাতা কর্পোরেশন এবং ভারত সরকারের আয়কর বিভাগ আমাদের মুনশীজীকে চেনে জমির যাদুকর হিসেবে। টাকাকে মাটি, মাটিকে টাকা করে আয়ের অঙ্কটাকে ক্রমাগত
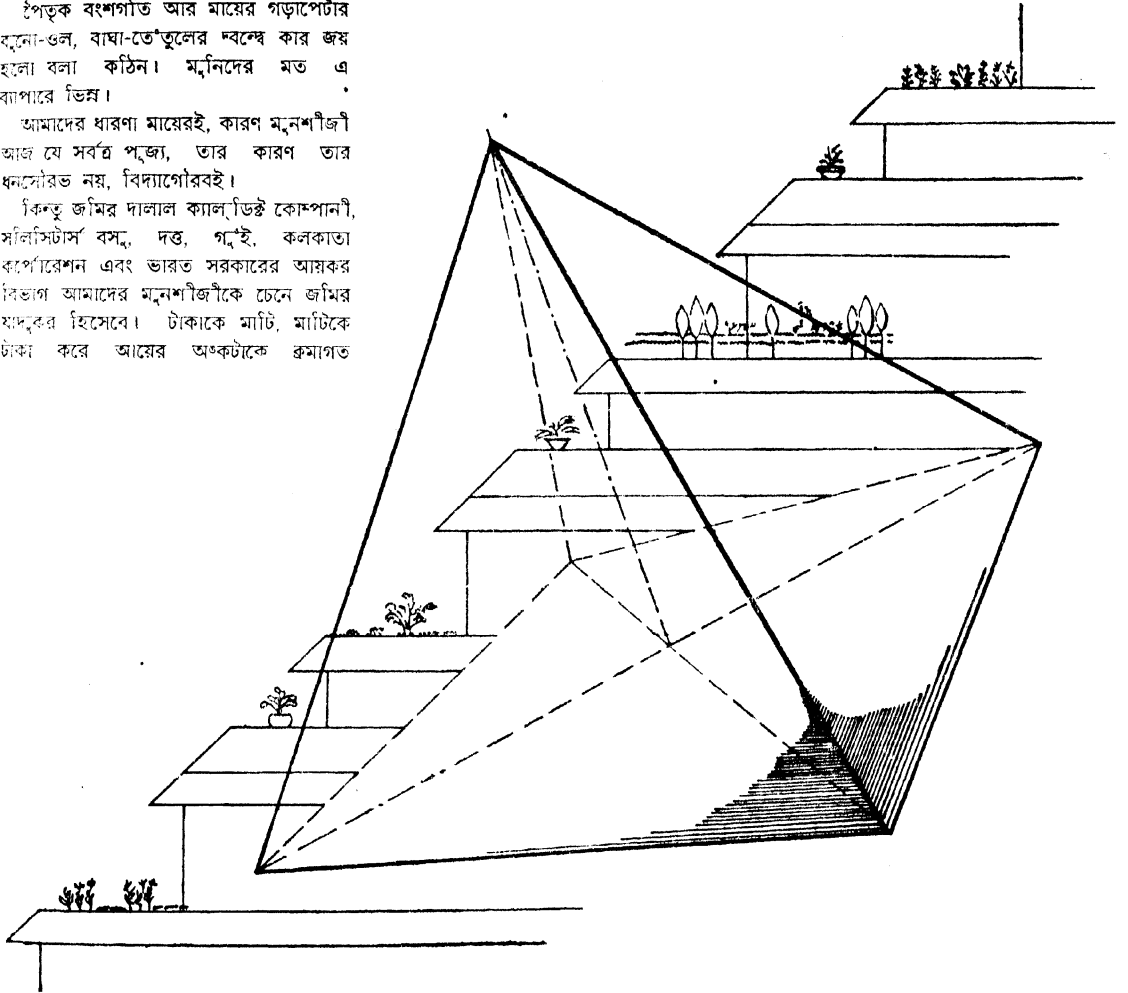
মুনশীজীর মিনার

ফাঁপিয়ে তুলে সেটিকে বেমালুম লুকিয়ে ফেলার খেলায় ভদ্রলোকের বাস্তবিকই অসামান্য হাতসাফাই।

ক্যালডিক্ট সায়েব বলতেন, বহুদিন ব্যবসা করছি মুনশীর হয়ে, দেখেছি জমি কেনাবেচার ব্যাপারে ওর ইন্‌স্টিংকট্‌ ম্যান্‌ক্যানি, আনারিং, অর্থাৎ আন্দাজ ওঁর এত নির্ভুল যে, মনে হয় উনি ভূতসিদ্ধ। বাস্তবিক অবশ্য সবটাই আন্দাজ নয়, সন্ধানেও কাজ খানিকটা এগোতো—যেমন ঐ ঢাকুরের বড় প্লটটার দাঁও-এ। নানা খন্দের গুজব শুনে এখানে সেখানে এলো-পাতাড়ি জমি কিনছিলো। মুনশীজী একেবারে ভেতরের খবর বার করে এনে যে দাগ ধরে ইম্‌প্রুভমেণ্ট ট্রাস্‌টের রাস্তা এগোবে, ঠিক সেই দাগের ওপরকার জমি ধড়াধড় কিনতে শুরু করলেন। যথাসময়ে সে জমি আগুন-দরে বিক্রী হয়ে গেল।

তবু আন্দাজ যে ভদ্রলোকের অদ্ভুত, সেটা অস্বীকার করা অন্যায় হবে। জমির চেহারা দেখেই ওঁর মালুম হতো, দশ বছরে তার টাকার ওজন কত হবে। তবে কোপটা মারার আগে উনি ঝোপটার নাড়ী-নক্ষত্রের হিসেব বুঝে নিতেন। তাই কুণ্ডুরা মার খেয়ে গেলেও উনি টস্‌কাতেন না—না জমি কেনার বেলায়, না জমি ছেড়ে দেওয়ার মওকায়।

আমাদের সলিসিটার গুঁই মশায়ের লেখাপড়ার চর্চা ছিল। মাঝে মাঝে তিনি পদ্যও লিখতেন। ব্যবসায়সূত্রে মুনশীজীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল এবং সেই সুযোগে তিনি মাঝে মাঝে নিজের লেখাগুলো সম্বন্ধে ওঁর মতামত জানতে চাইতেন। প্রথম লাইনটি পড়েই মুনশীজী বলতেন,—"অযথা সময় নষ্ট করেন কেন মশাই? ঐ সময়ে যদি কিছু বাড়তি রোজগার করে

কোন গরীব কবিকে টাকাটা দিতেন তো একটা কাজ হতো। যান চেম্বারের কুপো-দরে ঢুকুন গে।"

একদিন গুঁই সাহস সঞ্চয় করে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার কী করে হলো মুনশী-মশায়? আপনাকেও তো শুনেছি আপনার মাতৃদেবী ঘষে ঘষেই সাহিত্য শিখিয়ে-ছিলেন।"

মুনশী বললেন, "সাহিত্য শেখান নি, সরগম্ ভাঁজিয়েছিলেন। ভেতরে জিনিস ছিল, তাই কসরৎটা কাজে লেগে গেল।"

গুঁই একটু গরম হয়ে বললেন, "আমিও তো কসরৎই করছি, আপনি দমিয়ে দিচ্ছেন কেন? ভেতরে যদি জিনিস থাকে সময়ে বেরোবে।"

মুনশীজী বললেন, "আমি কথা দিচ্ছি, আপনার ভেতরে জিনিস নেই। একদল কবিতা লিখে কবি হয়, আরেক দল কবি হবে বলে কবিতা লেখে। আপনি ঐ দ্বিতীয় শ্রেণীর জীব, আপনার হবে না।"

গুঁই বিশেষ রুষ্ট হয়ে বললেন, "কার ভেতরে যে সত্যি কী থাকে বলা কি যায়? বাজারে তো গুজব সাহিত্য-চর্চাটা আপনার একটা ভেক, আসল ভেতরটা আপনার স্রেফ বিঘা-কাঠা-আঙুল আর টাকা-আনা-পাইয়ের স্টক এক্সচেঞ্জ!"

মুনশীজী বললেন, "শুনুন মশায়, এত তো ভেতরের খবর রাখেন, কখনও শুনেছেন আমার লেখা বেচা টাকা আমি ব্যাঙ্কে জমা দিইছি?"

গুঁই প্রশ্ন করলেন, "জমি কিনেছেন বুঝি?"

"আজ্ঞে না। বিদ্যার চোরাবাজারে আমার আনাগোনা নেই। বাইবেলে পড়েন নি, যীশু বলেছেন, "রাজার কড়ি রাজাকে দাও, ভগবানের নৈবেদ্য ভগবানকে দাও"? আমি সেই নীতিই মেনে চলি, বরং মানার বেশী করি। খোঁজ নিলে জানবেন, বরং আমি জমির আয় দিয়ে বই কিনি, লেখার আয় -আমি কদাচ ব্যবসায়ে লাগাই না।"

গুঁই মনে মনে স্বীকার করলেন মুনশীজীর ধরণের দুর্বোধ্য নীরস লেখার সওদাগরি করে আয় যদিবা হয়, তবু তা দিয়ে কলকাতার শহরে বিঘে বিঘে জমি খরিদ করা যায় না।

মুনশী বললেন, "শুধু আর্টের খাতিরে, অকারণ পুলকে আর্ট সৃষ্টি করতে হলে কী চাই জানেন? প্রথমত ক্ষমতা, দ্বিতীয়ত জীবিকানির্বাহের এমন একখানা ব্যবস্থা যাতে অরক্ষণীয়া লেখা হাতে করে গলবস্ত্র হয়ে প্রকাশকের দোরে দোরে ঘুরতে না হয়। তবেই বেরোয় খাঁটি আর্ট। তাই দেখবেন আমার লেখায় যে বস্তুটির পরিবেশন সেটি পাউডার রুজ-বর্জিত, শুদ্ধ এবং কামগন্ধহীন।"

উদাহরণ মুনশীজীর "ওমর খৈয়াম" (প্রথম খণ্ড যন্ত্রস্থ)। লেখাটি গোড়ায় ধারাবাহিক একটি সাপ্তাহিকে বেরোচ্ছিল। মুনশীজীর প্রতিপাদ্য, ওমর যে সুরার কথা বলেছেন, সেটি আঙুর মজানো মাদক পদার্থ বিশেষ নয়। বাস্তবিক ওটি ওয়াইনের চেয়ে বহুগুণে সূক্ষ্ম, নির্গুণ, অব্যয় অধ্যাত্মরসের অস্পষ্ট অনুভূতি। এই জিনিসটি তিনি পাতঞ্জল, প্রজ্ঞাপারমিতাদি বহু মূল গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত বচনের সাহায্যে বোঝাচ্ছিলেন। প্রায় দু বৎসর লেখাটি বেরোনোর পর সম্পাদক বলে পাঠালেন, পাঠকেরা তাঁকে ক্রমাগত তাগিদ দিচ্ছে লেখাটি অবিলম্বে বন্ধ করে দিতে। তারা লিখেছে, প্রবন্ধটিতে ওমরের কোন রুবাইয়ের নামমাত্র উল্লেখ নেই, আছে শুধু ফারসী, সংস্কৃত এবং পালি ভাষায় প্রোহিবিশনের প্রপাগ্যান্ডা।

তৎক্ষণাৎ মুনশীজী ওই সাপ্তাহিকের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিয়ে বইখানি নিজের খরচায় ছাপানো মনস্থ করলেন। পানদোষ নিবারণী সভার একজন উদ্যোগী তাঁকে জানিয়েছিল যে, লেখাটি গুজরাতী ভাষায় তরজমা করে ছাপালে বোম্বাই সরকারের কাছ থেকে মোটা সাহায্য পাওয়া যাবে। তবু মুনশী তাঁর নিজের মতের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য বইখানি নিজেই প্রকাশ করা স্থির করলেন।

* * * *

জ্ঞানের বাঁধ দিয়ে পিতৃকুলের ধারাটা আটকানো গেল না, কিন্তু স্রোতের মুখটা পাল্‌টে গেল।

মুনশীজীর বাপ-পিতেমো জমি কিনতেন জমিদার হবার জন্য। 'ততঃ কিম্' এই জিজ্ঞাসা তাঁদের চিত্তকে কখনো ব্যাকুল করে নি। তাঁদের এক এক টুকরো লালসা এক এক খণ্ড জমি দখল করেই পুরোপুরি তৃপ্ত হয়ে যেত। সে জমিতে অড়হর ছড়ানো থাকবে কি শালি ধান উঠবে, না তাকে পতিত ফেলে রাখা হবে, সে-চিন্তা শূদ্দুরদের, জমিদারদের নয়। তা থেকে খাজনা ঠিক ঠিক আদায় হচ্ছে কি না, সে প্রশ্নও কতকটা অবান্তর। আসল কথা হচ্ছে জমির মালিকানা। ঐটে পেলেই সব পাওয়া হলো।

উত্তরাধিকারী জিনিসটাকে ঠিক অমন অন্ধভাবে নিতে পারলেন না। তাঁর মনে হতো, ঐ ইচ্ছেটারও একটা ইতিহাস আছে, যেটা বোঝা এবং বোঝানো আবশ্যক। সে কোন্ এক যুগে তাঁর কোন্ এক প্রপিতামহের মনে বিশেষ কোন কারণে ভূম্যধিকারের এই অদম্য আকাঙ্ক্ষার উৎপত্তি হয়েছিল। হয়তো সে কারণটি তিনি পুত্র-পৌত্রদের বলেন নি, শুধু ইচ্ছেটা তাদের মনে গভীরভাবে বসিয়ে দিয়েছিলেন। সেটা শক্ত নয়; মুনশীজীর মা-ও তো কেন পণ্ডিত হতে হবে, ছেলেকে বুঝিয়ে বলেন নি, কেবল ছেলেকে বিদ্যাভ্যাসের অন্তর্বন্ধনে বেঁধে দিয়েছিলেন। বাইরের সে বাঁধন যে কোন্ মুহূর্তে ভেতরের আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়েছে, তা কে জানে?

যাক্‌গে ওসব অধ্যাত্ম রসায়নের ব্যাপার বর্তমান সমস্যা হচ্ছে জমিকেনার পারিবারিক হুজুগটাকে তলিয়ে দেখা। তার জন্যে গভীর গবেষণার কোন প্রয়োজন নেই। সেকালটা ছিল হাপ্-সামন্ত যুগ—যার জমি থাকতো সেই কল্‌কে পেতো, যেমন আজও হয় পাঞ্জাবে। পঞ্চনদে ইদানী জম্‌হুরিয়তের জমানা, গণ-ভোট বিনা উজীর বলা যায় না; তত্রাচ, যার 'মোরব্বা' অর্থাৎ প্রমাণ সাইজের জমি নেই, তার আজও পাঞ্জাবে রাজনীতিক্ষেত্রে নাম বাতুলতা।

অর্থাৎ সংক্ষেপে, জমিদারীর উদ্দেশ ছিল খাতির কাড়া।

মনে মনে মুনশীজী পরলোকগত পিতৃগণকে বোঝালেন, সেদিন আর নেই। আজকের ভাঙা বাঙলায় জমিদারীর সে খাতির ঝরে গেছে। সাবেকী মালিকানা ভাঙিয়ে, আধুনিক যৌথ ব্যবসায়ের, বিশেষ করে এক-আধটা ব্যাঙ্কের ডিরেক্টারী না বাগাতে পারলে বর্তমানের জমিদারদের মান গড়িয়ে এসে নিম্নমধ্যবিত্তদের পর্যায়ে পড়ে যাবে।

এই ফর্মুলা অনুযায়ী মুনশীজী প্রথমে জমিদারীকে জমি-ব্যবসায়ে দাঁড় করালেন তারপর সেই জোয়ালে ব্যাঙ্ককে জুড়ে কলকাতার বুকের ওপর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে টাকার চাষ শুরু করলেন।

কানের কাছে জিজ্ঞাসার গুঞ্জন থাম্‌লো না।

"অতঃ কিম্‌? ব্যাঙ্ক বহু আছে, ব্যাঙ্কারও বহু। ও লাইনে তোমার নিজস্ব সৃষ্টি যেটুকু তা-ও থোড়-বড়ি-খাড়া, খাড়া-বড়ি-থোড়—তোমার ক্যালিবারের লোকের পক্ষে। আজ যদি তুমি মারা যাও, কোন্‌ ইতিহাসে তোমার সুদখুরীর খবর থাকবে? এই শহরেই তোমার নাম লোকে ভুলে যাবে, বছর না ঘুরতে। যে কলকাতা আজ চষে খাচ্ছ, তার ওপর তোমার কোন চিহ্নই অবশিষ্ট থাক্‌বে না।"

উত্যক্ত হয়ে মুনশীজী বললেন, "চ্যালেঞ্জ করছো? বহুৎ আচ্ছা, এমন একখানা চিহ্ন রেখে যাবো যে, শুধু ইতিহাস নয়, ভূগোলেও নাম থেকে যাবে।"

* * * *

এলাহি ব্যাপার। ল্যান্ডহোল্ডার্স ব্যাঙ্ক বাড়ি তুলছে।

ব্যাঙ্ক মাত্রেই বাড়ি তোলে। কেউ ছ'তলা, কেউ ন'তলা। প্রথমে খানিকটা জমি দরমার দেয়ালে ঘিরে বিকট শব্দে পাইল ঠোকা হয়। পাশের বাড়িগুলোতে দেয়াল ফাটে, ছাত থেকে চ্যাঙড় পড়ে, এমন কি যেসব বৌয়েরা আজও ছাতে বড়ি শুকোতে দেন, পাইল ঠোকার ধাক্কায় তাঁদের বড়ি বাতাসার আকার ধারণ করে। বেকার ব্যক্তি এবং ছেলের পাল দরমার দেয়ালের ফুটোয় চোখ লাগিয়ে বাড়ির জন্ম-রহস্য ভেদ করে। তারপর জয়েস্টের খাঁচা তৈরী, ঘূর্ণিযন্ত্রে কংক্রীট গোলা, মজুরদের হাঁকাহাঁকি, মেঝে ঘষা, ছুতোরের কাজ, রং-মিস্ত্রীর অঙ্গরাগ এসব হয়ে গেলে গভর্নর বা মন্ত্রী দিয়ে বাড়িটির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হয়। এ তো সনাতন পন্থা। অতএব মুনশীজীর ল্যান্ড-হোল্ডার্স ব্যাঙ্ক বাড়ি তুলবে এ এমন কী নতুন কথা!

নতুন যে কী, সে তত্ত্ব অতি গূঢ় এবং তাতে অধিকারী শুধু মুনশীজী নিজে এবং গুটি দুই বিশ্ববিখ্যাত স্থপতি ও স্ট্রাক্‌চারাল এঞ্জিনীয়ার। বাড়িটি হবে একটি পিরামিড। দুর্দান্ত পিরামিড, গীজার খুফুর পিরামিড তার কাছে শিশু।

অবশ্য গীজার পিরামিডের সঙ্গে মুনশীজীর পিরামিডের সাদৃশ্য শুধু বাইরেকার। ভিতরে জিনিসটি হবে ব্যাঙ্ক, সেফ ডিপজিট ভল্‌ট, গ্যারাজ, মৌমাছির চাকের মত অসংখ্য আধুনিক গৃহক বা ফ্ল্যাট, ক্লাব, সুইমিং পুল, বাজার, গাড়ি চলবার পথ—মায় হেলিকপ্‌টার ওঠা-নাবার বিমানক্ষেত্র এবং বাসা। সবার উপরে ফ্ল্যাগস্টাফ্‌ এবং তার তলায়ই একটি পাঠাগার।

পুরো একটি শহর, কলকাতার পাশে। মানুষ-গড়া একশো পঁচাত্তর তলা পাহাড় ১৮০০ ফুট উঁচু।

শহরতলীতে এক বর্গমাইল জুড়ে কাজ আরম্ভ হলো। নিমেষে চোরাবাজারে সিমেন্টের দর চড়ে গেল। পুরোনো লোহা রপ্তানি বন্ধ হয়ে আমদানী হতে লাগলো। আশপাশ ঝেঁটিয়ে মজুর জোগাড় করা হলো, তাতেও কুলিয়ে উঠলো না, পাকিস্তান, আরাকান থেকে রাজমজুর রিক্রুট করতে হলো।

প্ল্যানমাফিক কাজ, নিক্তির মাপে এগোতে লাগলো। বিরাট টাকার খেলা, এক চুল আগু-পিছু হলে সব ভেস্তে যাবে। মুনশীজী চরকীর মত পাক খাচ্ছেন, কখনো ল্যান্ড এজেন্টদের কাছে—ছ'তলা পিরামিড উঠেছে, আঠারোতলা অবধি বিক্রী হয়ে গেছে, আরও দশতলার খদ্দের এখুনি চাই। কখনো তিনি কাস্টমসে—চট, পশম, হাতী আর বাঁদর রপ্তানি করে দেশে ডলার কত জমছে, তার শেষ খবর নিতে—সেই বুঝে পিরামিডের মালমশলা আমদানীর প্রোগ্রাম করতে হবে। কখনো ডকে, বাহাত্তরটা দলিলে যথাস্থানে সই লাগিয়ে জাহাজ থেকে বাড়ি তৈরীর লোহালক্কড় যন্ত্রপাতি নাবাতে হবে। কখনো হর্টিকালচার্যাল বিভাগে, ফ্ল্যাটগুলোর কংক্রীটের ছাতে বাগান বসাবার তাগিদ দিতে—একটু ঘাস, একটু ফুলের লোভ না দেখালে বিলিতী খদ্দের পাওয়া যাবে না। অডিটারেরা হাঙ্গামা বাধিয়েছে, প্যারাবোলা বা অধিবৃত্ত আকারে বাড়ি তুললে এই খরচায় আরো বেশীসংখ্যক ফ্ল্যাট তোলা যেত কিনা তার জবাব চাই—তাদের পুনঃ পুনঃ বোঝাতে হবে পিরামিড নামের একটা গুড্‌উইল আছে, যেটা প্যারাবলয়েডের নেই, অতএব বেশী আয়ের সম্ভাবনা এদিকেই। তারপর জলের বন্দোবস্ত—সেও এক বিরাট সমস্যা। শুধু পাম্পের ভরসায় থাকলে চলবে না, তলায় তলায় কৃত্রিম হ্রদ করে সম্বৎসরের জলও ধরতে হবে। অনাবৃষ্টি হলে নকল বৃষ্টি নাবাতে হবে, তারও একটা ব্যবস্থা চাই। সবটা একসঙ্গে ভাবতে গেলে মাথা ঘুরে যায়, অতএব চোখ, কান মন বুঁজে কাজ করে যেতে হবে। প্ল্যানের জগন্নাথের রথ চলেছে, না থেমে যতটুকু ভাবা যায়, তাই দিয়েই কাজ চালাতে হবে।

মাঝে মাঝে তিনি ছুটে যেতেন পিরামিডে—কাজ কতদূর এগোলো দেখতে। এঞ্জিনীয়ারদের প্রশ্ন করতেন না; ওরা রোজকার ছক বাঁধা কাজ পুরো হলেই খুশী, আসল কাজের হিসেব ওরা কি জানে? মুনশীজী একলা বসে বসে বাড়ি তোলা দেখতেন, কখনো এ কোণ কখনো ও কোণ থেকে। বর্তমানের ছ'তলা, ভবিষ্যতের আঠারোতলা, সব ছাড়িয়ে তাঁর চোখ যেত সেই দূরে শীর্ষবিন্দুর দিকে, যেখানে তাঁর পিরামিডের চারটি রেখা মিশে গিয়ে মিলিয়ে যাবে। দেহ তাঁর শ্রান্ত হয়ে পড়তো, মন অবসন্ন হয়ে যেত। কাজ যে অনেক বাকী। এক একবার তাঁর মনে দুঃস্বপ্নের মত কুতবের পাশের পরিত্যক্ত আগাছায় ভরা অসম্পূর্ণ মিনারটার কথা জেগে উঠতো। পরক্ষণেই তিনি অট্ট হেসে নিজের ক্লৈব্য নিজেই দূর করে আবার যুদ্ধে মেতে যেতেন।

একদিন দুপুরবেলায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডলার-পারমিট বিভাগের একজন কর্মচারীর সঙ্গে তুমুল ঝগড়া করে বিরক্ত হয়ে মুনশীজী পিরামিডের দক্ষিণ কোণে বসে ছিলেন, মনটাকে একটু শান্ত করে নিতে। ত্রাটকরত হঠযোগীর মত তাঁর চোখ চেয়ে-ছিল দূরের ১৮০০ ফুট সেই শিখরটির দিকে।

হঠাৎ তাঁর মনে হলো আরো বহুদূরে তারার মত তীব্র আলোর একটি বিন্দু দেখা যাচ্ছে। আরো মনে হলো, বিন্দুটি আস্তে আস্তে নেমে আসছে, যেন পিরামিডেরই দিকে।

দু' তিনবার চোখ রগড়েও যখন বিন্দুটাকে অদৃশ্য করা গেল না, তখন

মুনশীজীর খেয়াল হলো ব্যাপারটা গুরুতর। "অহিফেন প্রসাদাৎ" যে দৃষ্টিভ্রম ঘটছে না, এটা মুনশীজী এবং তাঁর জীবনীকার উভয়েই জানেন। নেশা-ভাঙ, গাঁজা-চরস দূরে থাক, এমন কি পান-তামাক কফি চা পর্যন্ত, উনি বিষবৎ পরিহার করেন। অতএব ঘটনাটির সত্যাসত্য সম্বন্ধে বাদানুবাদ মুনশীজী নিষ্প্রয়োজন মনে করলেন।

তাঁর ভয় হলো, কোনো শত্রুর কাজ নয় তো! একটা বিদেশী কম্বাইন বড়ই ঝুলো-ঝুলি করেছিল পিরামিডের গোটা কণ্ট্রাক্টটা হাতাবার জন্য। তাদের মুনশীজী হাঁকিয়ে দিয়ে কাজটা দেশী আরকিটেক্ট এবং এঞ্জিনীয়ারদের মধ্যেই ভাগ করে দিয়েছিলেন। সেই কম্বাইন ভয় দেখিয়ে মজুর ভাগাবার চেষ্টা করছে না তো! নাকি পরমাণু বোমার কোনো রকম পরীক্ষা হচ্ছে? একবার ভাবলেন চীৎকার করে সবাইকে সাবধান করে দেন। তারপর ভাবলেন হয়তো ওটা দেখতেই ভয়াবহ, ধূমকেতুর মত—কাজে কিছু নয়।

আলোর তীব্রতাটা সত্যিই একটু একটু কমতে লাগলো, কিন্তু সেই অনুপাতে জিনিসটা আকারে ক্রমশই বাড়তে লাগলো। মুনশীজী মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে রইলেন। কৌতূহলের আতিশয্যে তাঁর আত্মরক্ষা এবং পিরামিড রক্ষার সমস্ত স্পৃহা চাপা পড়ে গেল।

বস্তুটা যখন মাটিতে এসে ঠেকলো, তখন বোঝা গেল তার জ্যোতি সূর্যের মত প্রচণ্ড নয় বরং ছায়াপথ দূরে থেকে আমাদের চোখে যেমন ঠেকে, সেই ধরণের মসলিন মিহি স্থির হয়ে থাকলে চট্ করে ধরা যায় না কিছু আছে কি নেই, তবে নড়লেই বোঝা যায়। আলোটার তলার দিকটা বিরাট একটা গোলার মত, ওপর দিকটা লম্বাটে।

স্থির দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে মুনশীজী বুঝলেন জ্যোতিঃসর্বস্ব হলেও জিনিসটি নির্জীব জ্যোতিষ্ক নয়। গোলাটির মধ্যে ছোট ছোট দুটি গোলা, একটু নীলচে রঙের। ঠিক একজোড়া চোখের মত সে দুটি গোলক ঘুরে ঘুরে পিরামিড ও তার আশপাশটা দেখে নিচ্ছে। জীবদেহের মত আরও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হয়তো ওপরে উঠলে দেখা যেত, কিন্তু নীচ থেকে মুনশীজীর ঠিক ঠাহর হলো না।

পিরামিড পরিদর্শন শেষ করে জ্যোতিশ্চক্ষু দুটি মুনশীর উপর নিবদ্ধ হলো। কেমন একটু সপ্রশ্ন ভাব চোখ দুটিতে। নীলাভ গোলক দুটির মধ্যে আরও এক একটা গোলক, ঘন মেঘের মতো কালো তার রং। তারও ঠিক মধ্যখানে বিদ্যুতের মত চঞ্চল সাদা আলোর ছটা।

হঠাৎ কানে শব্দ এলো "পাট্টা?"

হকচকিয়ে মুনশীজী বললেন—"অ্যাঁ?" বোঝা গেল না শব্দটা এলো কোথা থেকে। কোনো হদিস না পেয়ে তিনি চারদিকে চেয়ে দেখছিলেন, এমন সময় আলোর ছটার সঙ্গে চোখোচোখি হতেই আবার শুনলেন প্রশ্ন "বলি, পাট্টা কই?"

মুনশীজী এবারে বুঝলেন প্রশ্নটি আসচে জ্যোতির্ময় ঐ জীবটির কাছ থেকে। হতভম্ব হয়ে তিনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন—"আপনি কথা বলছেন?"

চোখ বললে "হ্যাঁ"

সহসা মুনশীজীর বাঙ্‌নিষ্পত্তি হলো না। কে এই জ্যোতির্ময় পুরুষ, কেন এই সংকট সময়ে ধরাতলে অবতীর্ণ হলেন? অস্ফুটস্বরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন,—

"আপনিই কি বেদকথিত হিরণ্যগর্ভ, অথবা অণুমাত্র মায়া-আচ্ছাদনে আবৃত উপরহু, অথবা কি নির্বাণোন্মুখে তথাগত? আপনিই কি তিনি, যিনি জ্যোতিরূপ পরিগ্রহ করে পয়গম্বর মুসার সম্মুখে অবতীর্ণ হয়েছিলেন?"

চোখে হাসির ঝিলিক খেলে গেল। বললে "ধ্যেৎ, আমি কেন ওসব হতে যাবো! আমাকে দেখে কি বুড়ো-হাবড়া মনে হয়? তুমি বুঝি ভলতেয়ার পড়ে আমার বয়েসের হিসেব জুড়েছ? ওসব ঠিক নয়, ভলতেয়ার বড্ড বাড়িয়ে লিখেছে।"

মুনশীজী ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা সামলে নিয়ে বললেন, "ভলতেয়ার আমি পড়ি নি।"

জ্যোতির্ময় বললেন, "কেন?"

"আমি ফরাসী জানি না।"

"ইংরাজীতে তরজমা রয়েচে!"

মুনশীজী বললেন, "অনুবাদ পড়ে রচনার প্রকৃত রসগ্রহণ করা যায় না। আমি কক্ষণো অনুবাদ পড়ি না। কিন্তু সে কথা অবান্তর, বলুন আপনি কে?"

জৈব-জ্যোতি বললেন, "আমি হ্রস্ব-দীর্ঘ, আদিনিবাস সিরিউস নক্ষত্র। বর্তমানে কালপুরুষ পরিদর্শন সেরে আসছি। ভলতেয়ারে আমার কথা সব লেখা আছে, পড়ে নিও। তবে তখন আমি ছিলাম শিক্ষানবীশ, এখন চাকরী করি, হিসেব দেখে বেড়াই। আমার অবকাশ অতি অল্প, অতএব বাজে প্রশ্ন করো না। তরজমা তোমার পছন্দ না হয় তো, সুবিধেমত ফরাসী শিখে মূল গ্রন্থ পড়ে নিও, এখন প্রশ্নের ঝামেলা লাগিয়ে আমার সময়ের হিসেবের দফা-রফা করে দিও না।"

মুনশীজী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "চলতি বাংলায় আপনার এমন অদ্ভুত দখল কি করে হলো?"

চোখ বললে, "আমার অচল-চলতি কোনো ভাষাতেই দখল নেই। আমি চোখ দিয়ে ছাড়চি ছাঁকা ভাব, তোমার কান শুনচে ভাষা, চোখ দেখচে লেখা হরফ। তুমিও ফারসীই বলো আর দোখ্‌নে বাংলাই বলো, আমি বুঝে নেবো তার ভাবটুকু, ভেঙচিগুলো নয়। যাক, কথার জবাব দাও। তোমার পাট্টা কোথায়?"

মুনশীজী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "পাট্টা? কিসের?"

জ্যোতির্ময় বললেন, "আকাশের, আবার কিসের? এতখানি যে আকাশ দখল করলে এবং আরও করবে, তার পাট্টা কই?"

"আপনি আমার সঙ্গে রহস্য করছেন?"

"তোমার সঙ্গে রগড় করবার অবকাশ আমার কোথায় দাদু? আমার ফোর্থ ডিমেনশনের লেজারে হিসেব যে ভণ্ডুল হয়ে যাবে!"

"আপনার ভাবটা তো এবারে সে রকম ঝরঝরে হলো না!"

হ্রস্বদীর্ঘ বললে 'হুঃ, তুমি যে আমার জ্যামিতিতে একেবারে জয়দ্রথ! বুঝিয়ে বলছি। তোমাদের ব্যাঙ্কিং-এ যে রকম লেজার অ্যাকাউন্ট আছে আমাদেরও সেই রকম। তবে তোমাদের কারবার শুধু ডলার শিলিং আর টাকা নিয়ে আমাদের হিসেব দেশকাল নিয়ে। চারটি ডিমেন্‌শনের চারখানি আলাদা লেজার, তিন মাত্রা দেশ, একমাত্রা কাল। সব কটির হিসেবে কাঁটায় কাঁটায় মিল দেখাতে হবে, নইলে ছাড়ান নেই। বরং দেশের এ তরফের হিসেবে একটু গরমিল হলে ও তরফ থেকে ট্রান্‌স্‌ফার অ্যাকাউন্ট মারফৎ ধার ধোর করে পুষিয়ে নেওয়া যায়, কিন্তু কালের লেজারে একটুকরো সময় তছরূপ হলে হুড়মুড় করে সব ভেঙে পড়বে। তাই আমাদের সময়ের হিসেব চুল-চেরা, নষ্ট করবার উপায় একেবারে নেই। নাও, পাট্টা দেখাও।'

'যদি না দেখাই?'

চোখের নীল রং বদলে গিয়ে ঘোর লাল হয়ে গেল, আলোর ছটা বৈদ্যুতিক চুল্লীর

বিদ্যুৎ-তরকার মত অসহ্য সাদা হয়ে গেল। মনুশীজীর চোখ ধাঁধিয়ে উঠল। তিনি তাড়াতাড়ি বললেন।

"আহা এতেই বিশ্বরূপ দেখাবার কী দরকার, আমি তো আর 'না' বলিনি। তবে কাগজপত্র ভল্টে বন্ধ আছে, এখুনি দেখাই কি করে?"

চোখ ঠাণ্ডা হয়ে বললো 'সে কাগজপত্র আমি চাইনে, ওগুলো তো জমির পাট্টা, ওতে আছে শুধু জমিঘেঁষা দাগের চ্যাপটা হিসেব। আকাশ দখলের অনুমতি ওতে কোথায়?'

মনুশীজী বললেন, 'কালপুরুষে কী রেওয়াজ আমার জানা নেই, তবে আমাদের এই পৃথিবীতে জমির দখল হাতে এলেই তার ওপরকার আকাশটা অমনি পাওয়া যায়—

জ্যোতির্ময় টিপ্পনি দিলেন—'যদি তার গায়ে হাত না তোলো। কিন্তু সে আকাশটাকে দুমড়ে চেপ্টে দেওয়ার হক তোমাকে কে দিলে? তুমি আঠারো শো ফুট উঁচু পিরামিড তুলবে, তারপর? যতখানি আকাশ উচ্ছন্ন হলো সেটা যাবে কোথায়, তা ভেবেছ?'

মনুশীজী নির্বাক।

জ্যোতির্ময় বললেন, 'ঐ উদ্‌বাস্তু আকাশের গোঁত্তা খেয়ে খেয়ে ব্রহ্মাণ্ড ঝালাপালা হয়ে গেল। তাই এবারে আইন হয়েছে, যে-আকাশ কেটে বাড়ি তোলা হবে অন্যত্র তার বন্দোবস্ত না করে দেওয়া পর্যন্ত দরখাস্তকারীকে আকাশের পাট্টা দেওয়া হবে না।'

মনুশীজী প্রশ্ন করলেন, 'বিধিটা কি দৈব না জৈব?'

হ্রস্বদীর্ঘ বললে, 'দৈব আবার কী? আমরাই পাঁচজনে মিলে সজীব নির্জীব সবার সুবিধের জন্য আইন তৈরী করেছি।'

মনুশী বললেন, 'তাই মনে হয়। কারণ এতদিন ধরে বিরাট বিরাট স্তূপ মন্দির গীর্জা মসজিদ নির্ঝঞ্ঝাটে তৈরী হয়েছে, তাতে তো কোনো আধিদৈবিক বিঘ্নের সৃষ্টি হয় নি।'

হ্রস্বদীর্ঘ বললে, 'দেখতে-ভালো জিনিসের আলাদা নিয়ম, তার জন্যে আইন ভাঙো ক্ষতি নেই। কিন্তু তোমার পিরামিডটি তো আর সে গোত্রের জিনিস নয়, তার জন্য পাট্টা চাই।'

মনুশী একটু আহত হয়ে বললেন, 'সৌন্দর্যের ধারণা যুগে যুগে বদলায়। ভেবেই দেখুন না, কলকাতার চক্রবালরেখায় খোঁচা খোঁচা চটকলের চিমনীর পাশে কি আর কোণারক ভুবনেশ্বর মানাবে?'

হ্রস্বদীর্ঘ বললে, 'কথা এড়িয়ে যেও না। তোমার পিরামিডটি দেখতে হবে কিম্ভূত। তাতে বাস করবে সৌন্দর্যজ্ঞানরহিত কতকগুলো ব্যবসাদার আর সরকারী চাকুরে আর তাকে দেখতে আসবে যত অসভ্য টুরিস্ট কোথায় অশোকস্তম্ভ আর কোথায় তোমার অশ্বডিম্ব।'

মনুশী ক্ষীণস্বরে বললেন, 'ঘাস হবে ফুল হবে।'

সিরিউসবাসী বললেন, 'ঘাস ফুল কি পৃথিবীর মেজের ওপর গজায় না?'

মনুশীজী বললেন, 'কলকাতার লোকসংখ্যা অসম্ভব বেড়ে গেছে।'

হ্রস্বদীর্ঘ বললেন, 'বেড়ে গেছে তো কমাও! লোককে কলকাতা থেকে খেদিয়ে দেশময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাও। উল্‌টে আরো বেশী লোকের জায়গা করে দিলে তো আরো লোক আসবে, ঘিঞ্জি বাড়বে। এমনও নয় যে অর্থাভাবে বস্তির অন্ধকূপে যারা বাস করে তাদের থাকার সংস্থান তোমার পিরামিডে করে দিচ্ছ! আঠারো শো ফুটের ওপর যে কুঁড়ে তার কড়ি যোগাবার সামর্থ্য তাদের কোথায়?'

'ঠিক আঠারোশো ফুটের কাছটায় কারো বাসগৃহ থাকবে না। ওখানে হবে প্রকাণ্ড এক পাঠাগার। পণ্ডিতেরা সেখানে জ্ঞানচর্চা করবেন'—

'দরকার নেই। আঠারো শো ফুটের গজদন্তশ্বেত চূড়ায় বন্দী না হলে যে পণ্ডিতের জ্ঞান স্পৃহা জন্মায় না, তাকে খরচা দিয়ে তুষারশৃঙ্গ গৌরীশৃঙ্গে পাঠিয়ে দাও, একেবারে স্ফটিকের মত মোলায়েম জ্ঞান বেরোবে, এ সংসারের একটি কলঙ্ক রেখাও তাতে পড়বে না।'

মাসের পর মাস প্রচণ্ড পরিশ্রমে মনুশীজীর তর্কের স্পৃহা অনেকটা কমে এসেছিল। যেটুকু বাকী ছিল তা-ও ক্ষুধা তৃষ্ণা অনিদ্রায় এবং সরকারী গণ্ডারগুলোর সঙ্গে ঝগড়া করে প্রায় উবে গিয়েছিল। অতএব আর কথায় কথা না বাড়িয়ে তিনি বললেন,—

'আচ্ছা ধরুন যদি নিই পাট্টা, দরখাস্ত কিভাবে করবো?'

'দরখাস্ত টরখাস্তর কিছুর দরকার নেই। যতখানি আকাশ নেবে, ততখানি আকাশ দিতে হবে—সহজ হিসেব। রয়েছে তো পড়ে অন্ধকূপের ঘিঞ্জি কলকাতা জুড়ে, দাও না খানিক মুক্ত করে।'

'বাড়িওলারা ছাড়বে কেন?'

'পয়সা দিলেই ছাড়বে। নয়তো যাদের বাড়ি বস্তী ভেঙে গড়ের মাঠ করে দেবে তাদের তোমার পিরামিডে বন্দোবস্ত করে দেবে!'

এবারে মনুশীজী দস্তুরমতো চটে গেলেন। বললেন,

'আমি ওসব করবো না, আপনি যা পারেন করুন।'

হ্রস্বদীর্ঘ বললেন, 'বেশ'।

যোজনব্যাপী হাত নামিয়ে বগল থেকে হ্রস্বদীর্ঘ বিরাট এক লেজার বার করলো। একটা বোতাম-টিপতেই রেজিস্টারটা নির্দিষ্ট একটা জায়গায় খুলে গেল। মনুশীজী চেয়ে দেখলেন ফোলিওর মাথায় লেখা 'চক্রবর্তী আলিম—রুট ওভার এক।

হ্রস্বদীর্ঘ বললেন, 'এ দানে পেন্‌সিলে কাটছি চল্লিশ বছর। যদি তোমার চৈতন্য হয় রবার দিয়ে মুছে দেবো। নইলে কালির ঢ্যারা পড়বে।'

ঘ্যাঁচ করে হ্রস্বদীর্ঘ হিসেবের খানিকটা কেটে দিলেন।

মনুশীজী চোখ মেলে দেখলেন হৈ হৈ ব্যাপার, হেড মাস্টার মশাই নিজে তাঁকে হাওয়া করছেন, একটি সহপাঠি মাথায় বরফ ঘষে দিচ্ছে, আরেকজন পা রগড়াচ্ছে। অদূরে স্কুলের বোর্ড, হাফ-ইয়ারলির রেজাল্ট টাঙানো রয়েছে।

মুনশীজী চীৎকার করে উঠলেন, 'কখনো হতে পারে না—হ্রস্বদীর্ঘ—'

হেড মাস্টার মশাই বললেন, 'চুপ করো বাবা চুপ চুপ। সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমার মামাকে খবর দিইছি।'

মুনশীজী বললেন, 'কিন্তু ভেবে দেখ হ্রস্বদীর্ঘ, অতখানি ঘনফুট আকাশের জায়গা করে দিতে হলে কত বস্তী কত বাড়ি কিনে ভাঙতে হবে। তার স্ক্র্যাপ্ ভ্যালু কতই হবে? গোটা টাকাটাই প্রায় জলে যাবে যে।'

হেড মাস্টার ক্লাস মাস্টারকে ফিস ফিস করে বললেন, 'ওহে, এতো মৃগী নয়, স্নায়বিক উত্তেজনার মত মনে হচ্ছে। হয়েছিল কী?'

মোটা ছেলেটি বললে, 'হিংসেয় স্যার। ফার্স্ট হতে পারে নি কিনা সেই জন্যে।'

মুনশীজী চ্যাঁচাতে লাগলেন, 'টাকা তো সব আমার নয়, শেয়ারহোল্ডারদের কী বোঝাবো? তাছাড়া, অত টাকা পাবোই বা কোথায়? আকাশের সিকিউরিটি তো আর কল্যাটরাল নয়। কে দেবে টাকা? বুঝে দেখ হ্রস্বদীর্ঘ।'

হেড মাস্টার বিমর্ষ মুখে বললেন, 'না হে, এ সুবিধে বোধ হচ্ছে না, ফাঁড়ি থেকে একবার অ্যাম্বুল্যান্সকে টেলিফোন করে দাও।'

মোটা ছেলেটি বললে, 'কেন ঘাবড়াচ্ছেন স্যার ও ন্যাকামো কচ্ছে। রগে পটাপ্পট দু ঘা বসিয়ে দিলেই চাঁদ ঠাণ্ডা হয়ে যাবেন।'

বিকট চীৎকার করে মুনশীজী বললেন, 'হার মানলাম—হ্রস্বদীর্ঘ, মুছে দাও পেন্সিলের দাগ। চল্লিশ বছর ধরে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে লেখাপড়া শিখেছি; সে সব খুইয়ে আবার ঐ হাতীর বাবার স্কুলে ঘষ্ড়াতে পারবো না।'

* * * *

হ্রস্বদীর্ঘ বললে, 'আচ্ছা তা হলে তাই কথা রইল। চিঠি যাবে। এখন চলি।'

সিরিউসতনয়ের জ্যোতির্ময় দেহের মেরুরেখা আস্তে আস্তে ধ্রুবতারার দিকে হেলতে আরম্ভ করলো। প্রায় প'য়তাল্লিশ ডিগ্রী হেলবার পর দেহ পশ্চিমের দিকে পনর ডিগ্রী ঘুরে গেল। তারপর বিদ্যুদ্বেগে, নিঃশব্দে হ্রস্বদীর্ঘ মহাশূন্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পরিশিষ্ট

আঠারোতলা বাড়ি তোলার পর কেন মুনশীজী হঠাৎ ডিরেক্টরদের কাছে পিরামিডের কাজ কিছুদিন স্থগিত রেখে কলকাতার ঘিঞ্জি অঞ্চল ভেঙে পার্ক বসানোর এক উদ্ভট স্কীম পেশ করলেন কেউ বুঝলো না। সবাই ধরে নিল ওর মধ্যে একটা খুব গভীর এবং কূট ফাইন্যান্শ্যাল ফন্দী আছে। সেটা কী জানবার জন্য তারা মুনশীজীকে বেজায় চাপাচাপি করতে লাগলো। মুনশীজী বিরক্ত হয়ে পদত্যাগ-পত্র দাখিল করলেন।

অবধূতেরা বললো উনি হিমালয়ে যাবেন। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক বললে, পিরামিডে ভয়ানক লোকসান হচ্ছিল তাই ব্রহ্মচারী দিন থাকতে সরে পড়লেন। খবরের কাগজে বেরোলো মুনশীজী ভারত সরকারের মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন বা হবেন। বিদ্বৎমণ্ডলী বললেন, শিক্ষামন্ত্রী, পিরামিডের লোক বললে প্ল্যানিংমন্ত্রী।

মুনশীজী লিখে জানালেন, তিনি কোণারকে আছেন এবং কায়েমীভাবে থাকবেন।

পিরামিডের কাজ চলতেই থাকলো। মুনশীজীর যেমন কাজ চালাবার মন্তরটা জানা ছিল, তেমনি প্রয়োজন হলে গোছ করে কাজ গুটিয়ে নেবার ক্ষমতাও ছিল। তাঁর সহকারীদের কোনোটাই পর্যাপ্ত পরিমাণে না থাকায় কাজ গতানুগতিক পন্থায় যতদিন চলা সম্ভব চললো। তারপর নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে লাগলো। আজ সরবরাহে গোলমাল, কাল কনট্র্যাক্টরের চুরি, একবার সময়ে মাইনে দিতে না পারায় মিস্ত্রিরা ধর্মঘট করলো, আরেকবার অডিটারদের প্রশ্নের জবাব না দেওয়ায় তারা হাতগুটিয়ে বসে রইল। কখনো ডলার না জোগাতে পারায় যন্ত্রপাতি কেনা বন্ধ থাকলো, কখনো কেনা যন্ত্রপাতি ডকে পড়ে থাকায় ডেমারেজের খেসারত দিতে হল। এমনিভাবে পিরামিডের কাজ কয়েক মাস খুঁড়িয়ে চলার পর এলো একটি চিঠি

সরকারী চিঠি—তিন নম্বর জরুরী লেবেল মারা, সীক্রেট এবং মোস্ট ইমিডিয়েট্। আধা-সরকারী চিঠি, মুনশীজীর নামে—লেখকের সই অস্পষ্ট, পড়া গেল না: তাতে লেখা এইঃ শব্দের চেয়ে দ্রুতগামী উড়োজাহাজ অদূর ভবিষ্যতে যাত্রী পরিবহনের কাজে ব্যবহার হবার সম্ভাবনা আছে। যদি তা হয়, তবে ভারতবর্ষে তার বিমান ঘাঁটি হবে কলকাতায়। শহর থেকে কতদূরে এবং কোথায় তার বিমানক্ষেত্র তৈরী হবে সেটা আন্তর্জাতিক বিমান পরিহবন কর্তৃপক্ষের বিশেষ পরীক্ষা এবং ভারত সরকারের বিবেচনা সাপেক্ষ। যতদিন বিষয়টির নিষ্পত্তি না হয় ততদিন পর্যন্ত পিরামিডের কাজ স্থগিত রাখতে হবে।

এর ফলে যে পিরামিডের ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির সমূহ ক্ষতি হবে সেটা সরকার জানেন। এই ক্ষতি অন্যভাবে পূরণ করবার একটা ব্যবস্থা সম্প্রতি হয়েছে। সুইডিশ বিশেষজ্ঞদের তৈরী একটি পাইলট স্কীমের আশাতীত সাফল্যের ফলে সরকার কলকাতার ঘিঞ্জি অঞ্চলগুলো সাফ করে সেখানে ফুল ও ফলের বাগান বসানোর একটি ব্যাপক পরিকল্পনার অনুমোদন করেছেন। সরকারের দৃঢ় ধারণা, পিরামিড প্রতিষ্ঠানগুলি এবং জনসাধারণ উভয়েই উপকৃত হবেন।

কবি-বন্দিত কোকিল

এম কৃষ্ণন
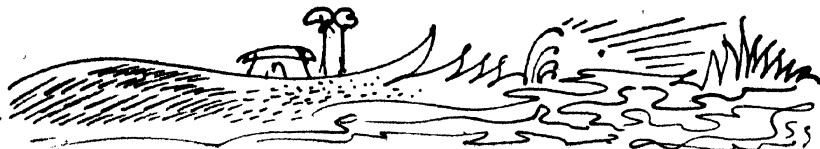
প্রকৃতি থেকে উপমা বা কাব্যবস্তু নির্বাচনে পৃথিবীর সমস্ত দেশের কবিদের মধ্যে একটা সাধারণ মিল আছে। যেমন, সর্বদেশের কবি-চিত্তে প্রস্ফুটিত গাঁদাফুলের চেয়ে আরক্তিম গোলাপ ও গন্ধমদির যুঁই-মল্লিকার আবেদন বেশী। পশু-পাখি নিয়ে কবিদের নিজস্ব একটা প্রাণি-জগতও আছে। দেশ-বিশেষে পক্ষি-জগতের বৈচিত্র্য-হীনতায় সে-দেশের কবিরা গায়ক-পাখি সম্বন্ধে ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন, কিন্তু ভগবানের সৃষ্টিতে সর্বশ্রেষ্ঠ গায়ক-পাখি কোন্‌টি সে-বিষয়ে কারো মতভেদ নেই। নাইটিঙ্গেল? না—যদিও পারসীক ও ইংরেজী কবিতায় নাইটিঙ্গেলেরই প্রাধান্য।

পাপিয়া

বুলবুল (এহার মতে যা 'Lalah Rookh' নামক বই-এর পাতার বাইরে গান গায় না") অথবা চাতক বা ইংরেজী সাহিত্য-বর্ণিত কুকুও নয়। এই মর্যাদার অবিসম্বাদিত অধিকারী হচ্ছে কোকিলঃ সম্ভবত আমাদের দেশের বিশাল ও বহুবিচিত্র সাহিত্যে একা কোকিল যত প্রশস্তি পেয়েছে, অন্য সমস্ত পাখি একত্রেও তা পায় নি! ভারতের সর্বত্র কোকিলের স্থান—হিন্দী প্রভৃতি আর্যাবর্তের, মারাঠি প্রভৃতি মধ্যভারতের: তামিল-তেলেগু প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের ভাষাগুলিতে, প্রাচীন কাব্য-গাঁথায়, নাটকে, লোক-সঙ্গীতে, এমন কি আধুনিক সিনেমার গানেও। এমন আর কোন পাখি নেই যার সঙ্গে কোকিলের তুলনা হতে পারে। ইঙ্গ-ভারতীয় সাহিত্যেও কখনও কখনও এই মধুকণ্ঠ পাখির দেখা মিলে।

আমার মনে হয় গীতিকবির চিত্তে কোকিলের আবেদনের রহস্যটি আমি জানি, কিন্তু সে-কথাটি প্রকাশ করার আগে আমি আমাদের দেশের ও ইংরেজী সাহিত্যের গায়ক-পাখিগুলির একটা পরিচয় দিতে চাই। আমাদের ভারতে নির্মল স্বরমধুর, উদাত্ত-কণ্ঠ, তীক্ষ্ম সুর-ঝঙ্কারময় গায়ক-পাখির অভাব নেই, যেমন চাতক, দোয়েল, শ্যামা প্রভৃতি। সুরেলা পাখি আরও আছে, কিন্তু তালিকা বাড়িয়ে লাভ নেই, কারণ কবির দৃষ্টি তাদের প্রতি পড়েনি এবং শুধু নামের নির্ঘণ্টে তাদের মাধুর্যেরও কোন পরিচয় পাওয়া যাবে না। এ সব পাখির কতকগুলো ভীরুও নয়, দুষ্প্রাপ্যও নয়; আবার কতকগুলো মানুষের বিশেষ প্রিয় (যেমন অরণ্যচারী শ্যামা) এবং মিষ্ট স্বরের জন্যে তাদের পিঞ্জরাবদ্ধ করে রাখা হয়। কিন্তু কোকিল একান্ত সাধারণ পাখির মতই সর্বত্র সুলভ এবং বসন্তে তাদেরই অশ্রান্ত কূজন আর সব পাখির কাকলিকে ছাপিয়ে উঠে। আমি মে মাসের শেষে এক কর্মব্যস্ত শহরে বসে এই প্রবন্ধ লিখছি এবং আমার চতুর্দিকে শুনতে পাচ্ছি কোকিলের উদ্দাম অশান্ত কূজন।

প্রসঙ্গত ইংরেজী কাব্য-সাহিত্যের পক্ষি-মহলের নাম করা যেতে পারে, কারণ ইংরেজী কবিতার নাইটিঙ্গেল, লার্ক, থ্রাস, ব্ল্যাক-বার্ড ও রবিনের মধ্যে কোকিলের একটি জ্ঞাতিভ্রাতা—কুকু (হিমালয় ও অন্যান্য স্থানেও দেখা যায়)—রয়েছে। লোগান ও ওয়ার্ডসওয়ার্থের যুগেরও পূর্বে কুকু ইংরেজী সাহিত্যে কায়েম হয়েছে। কুকু নিঃসন্দেহে নিজের শাবককে অন্য পাখির দ্বারা প্রতিপালন করাবার স্বভাবের জন্যে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং এলিজাবেথের যুগে প্রেম-বিষয়ক কবিতা অবলম্বন করে খিড়কি দরজা দিয়ে সাহিত্যের অঙ্গনে প্রবেশ লাভ করেঃ—

> "কোকিল, কোকিল! ভীতি-ভরা নাম
> নব-দম্পতি শ্রবণ-কুহরে
> বিষ ঢালে অবিরাম।"

ইংরেজী কবিতায় আর কোন পাখির সঙ্গে (ঘুঘু পাখি ছাড়া) আদিরসের কোন যোগ আছে বলে মনে হয় না। অন্যান্য ভাষার সাহিত্যে অনেক পাখিরই (যথা, বুলবুল ও তোতা) প্রেমের কবিতায় স্থান আছে, কিন্তু সেগুলিতেও কোকিলের সমগোত্রীয় পাখি-দেরই বিশেষ প্রাধান্য।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমাদের দেশের সাধারণ পাপিয়া আদিরসাত্মক কবিতায় প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এখানকার ইউরোপ-প্রবাসীদের কাছে এর কাকলী অর্থহীন, কিন্তু ভারতীয় কানে এর বিষাদময় অশ্রান্ত ডাকের মধ্যে একটা মর্মস্পর্শী অর্থ আছে—তা' হল হিন্দীতে 'পী-কাঁহা' ও 'পিউপিয়া', বাঙলায় 'চোখ গেলো'। 'পাপিয়া'র উপর সরোজিনী নাইডুর একটা সুন্দর কবিতা আছে। পাপিয়া দেখতে ধূসর এবং অনেকটা উড়ন্ত বা গুঁড়ি মেরে বসা শিক্‌রা বা আমাদের দেশের

কাকের বাসায় কোকিলের ছা

সাধারণ বাজপাখির মতো, কিন্তু এর কণ্ঠ-স্বরে—একই ধ্বনির অবিরাম পুনরাবৃত্তিতে জানিয়ে দেয় যে এটি কোকিলেরই সমগোত্র। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে, যখন আকাশে চাঁদ থাকে, তখন উভয়েই যেমন রাত্রে তেমনি দিনে কূজন করতে থাকে এবং উভয় পাখিরই কণ্ঠস্বরের ব্যঙ্গ-বিকৃতি করা হয়েছে সিনেমার গানে। আমি অনেক বিবেচনা করেই 'ব্যঙ্গ-বিকৃতি' শব্দটা ব্যবহার করছি। আমি সিনেমার গানে হুবহু কোকিল-কণ্ঠের নকল বা প্রতিধ্বনির মতো কিছু কখনও শুনিনি, কিন্তু সম্প্রতি একটি গানে পাপিয়ার ডাক যথেষ্ট নিপুণতার সঙ্গে অনুকৃত হতে দেখে আমি বিস্মিত ও আনন্দিত হয়েছি।

কোকিল প্রেম ও বসন্তের পাখি। কিন্তু এডুইন আর্নল্ডের ভাষায় কোকিল-কণ্ঠের 'বাঁশরী-নিক্কনে'র জন্য নহে, বা 'কোকিল-গান' (আমাদের মিষ্টস্বর গায়ক-পাখি-গুলির উপর আরোপিত একটা আখ্যা যা

বসন্ত-পূর্ণিমার কোকিল

বিচারসহ নহে) বলতে যা বুঝায় তার জন্যেও নহে—বস্তুত কোন সময়েই এই বিহঙ্গমের সুতীব্র স্বনন মিষ্ট বা বাঁশরী-নিক্কণের মতো নহে। আদিরসের ব্যঞ্জনায় আমাদের কাব্যের সাথে কোকিলের নিবিড় সম্পর্ক কেন, তা বুঝতে হলে খরতপ্ত চৈত্রদিনে কোকিলের কুহুরব শুনতে হবে।

কোকিল মার্চ-এপ্রিল পর্যন্ত নীরব থাকে, কিন্তু গ্রীষ্ম থেকে অক্টোবর পর্যন্ত তাদের স্বরগ্রাম পঞ্চমে উঠে। তারা তোতলামির মতো একটা হ্রস্ব রবে ঋতুরাজের আগমন ঘোষণা করে। এই অস্ফুট ভাষা তাদের বিচিত্র ধ্বনি-প্রকরণের একটা সংক্ষিপ্ত রূপ —সংক্ষিপ্ত হলেও ব্যঞ্জনায় উপেক্ষনীয় নয়। ক্রমে চিত্রিত-দেহ পিকবধূর তীক্ষ্ম গভীর কণ্ঠের 'কিক্-কিক, কিক্' ধ্বনি শোনা যায়—স্বরগ্রাম কোমল হলেও কখনও কখনও তাতে দ্রুতলয়ের একটা কম্পিত শিহরণ থাকে। এ সময়েই কোকিলার আহ্বানের উত্তরে কৃষ্ণকায় কোকিলের অনির্বচনীয় ব্যাকুলতা ভরা অনুরাগ-রঞ্জিত কণ্ঠের ধ্বনিতে দিগ্বিদিক মুখর হয়ে উঠে এবং উভয়ে চঞ্চল পাখায় বৃক্ষ শীর্ষে শীর্ষে উড়ে বেড়ায়। তারপর অচিরে পল্লবের আড়াল থেকে কোকিলের সুপরিচিত ধ্বনি-বিস্তার আরম্ভ হয়—'কু-উ, কু-উ, কু-উ, কু-উ, কু-উ; ধ্বনি সমে পৌঁছলেই অকস্মাৎ তাতে ছেদ টেনে দিয়ে আবার নূতন করে নিম্নতম খাদের 'কু-উ' থেকে কূজন আরম্ভ করে। কখনও কখনও কোকিলের একটা পরিত্রাহি চীৎকার-ধ্বনি (সন্ত্রস্ততার লক্ষণ?) শোনা যায় এবং আরও একটা ধ্বনি শোনা যায়, যাকে বলা হয়েছে—"'কেকারী, কেকারী, কেকারী' রবের একটা প্রবল উচ্ছ্বাস।" এই শেষোক্ত ধ্বনিটিই হচ্ছে কোকিলের প্রেম-নিবেদনের পরম আকুতির চূড়ান্ত অভিব্যক্তি—যে ধ্বনির মধ্যে কোকিল নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসারিত করে দেয়। কোকিল-কোকিলা উভয়ের প্রণয়রাগরঞ্জিত এই উদ্দাম কাকলির জন্যই কোকিল বসন্ত ও প্রেমের সার্থক প্রতীক। এই গুণের জন্যই কবিরা কোকিলের বন্দনা করেছেন। কিন্তু আমার মনে হয়, তাঁরা শুধু বলিষ্ঠতর কণ্ঠ কোকিলকেই জানেন—বিচিত্র দেহ কোকিলার সাবলীল স্বরগ্রাম তাঁদের অজ্ঞাত।

চন্দ্রালোক স্নাত নিদাঘ রজনী বিরহী কোকিলের ডাকে আকুল হয়ে উঠে। অশান্ত অস্থির বসন্তের অনুভূতিকে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষভাবে মূর্তিমান করে তুলতে পারে কোকিলের ডাক ছাড়া এমন আর কিছু নেই। নীচে একটি তামিল কবিতার অনুবাদ দেওয়া হচ্ছে যাতে জ্যোৎস্না রাতে কোকিল-ডাকের মর্মকথাটি ফুটে উঠেছে। গল্প বলার জন্য একজন প্রেমিকের অনুরোধের উত্তরে কবিতাটি লিখিতঃ

"যাযাবর চাঁদ এখন অস্তমিত,
মৃদু-মন্থর দখিন-বাতাস বয়।
ঘুম পলাতক, প্রতি যাম রাত্রির—
ডেকে আনে স্বর কোয়েল পাখীর,
গল্প বলার এখন সময় নয়।"

রোমাণ্টিক সাহিত্যে প্রেমের নানা বিচিত্র গতির উল্লেখ আছে। কোকিল বিষফল ভক্ষণে আসক্ত এবং কোকিলের মত প্রেমিক-পাখির পক্ষে তা অস্বাভাবিক নয়। পক্ষিদের মধ্যে একমাত্র কোকিলই ঘন ঘন করবীর ঝোপে গিয়ে পরম পরিতৃপ্তির সাথে করবী গাছের ফল খায়। বাহ্যত মনে হয়, করবী ফলের ভেতরের গ্লুকোসাইড এর কোন অনিষ্ট করে না। আমার নিজস্ব পর্যবেক্ষণ (আমার বিশ্বাস, এটিই কোকিলের এই অভ্যাস 'আবিষ্কারের' জন্য দায়ী) এবং আর যাঁদের মতামত আমি চেয়েছি, তাঁদেরও পর্যবেক্ষণে এমন আর একটি পাখিও চোখে পড়েনি, যা নিশ্চিতরূপে এই বিষাক্ত ফল খায়। বিষাক্ত ফলের প্রতি কোকিলের লোলুপতা ঠিক গ্রীষ্ম আরম্ভ হবার মুখে সবচেয়ে বেশি প্রকট হয়ে উঠে বলে মনে হয়। ঋতুরাজের অর্ঘ্য রচনায় অনুপ্রেরণা

করবী গাছে ফল ভক্ষণ-রত কোকিলা

লাভের জন্য উত্তেজক হিসাবেই কি কোকিল বিষফল খেয়ে থাকে?

কুকু শ্রেণীর কতকগুলি পাখি গার্হস্থ্য ধর্মের দায়-দায়িত্ব এড়িয়ে তাদের প্রেম-জীবনকে বাধাবন্ধনহীন রাখে—তাদের ডিমে তা দেবার কাজ অন্য পাখির উপর চাপিয়ে দিয়ে। কিন্তু তারা কেউ-ই কোকিলের মত এমন দুরন্ত ও বৈরীভাবাপন্ন প্রতিপালক বেছে নেয় না। কোকিলের অভ্যাস হচ্ছে কাকের বাসায় ডিম পাড়া এবং ঘোর-কৃষ্ণ দাঁড়কাকের চেয়ে সাধারণ কাকের বাসাই তাদের বেশি পছন্দ। কোকিলের দাম্পত্য-জীবন তাদের পালক পিতামাতার দাম্পত্য-জীবনের সাথে যে কত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত, তা লক্ষ্য করবার বিষয়। এ বৎসর অস্বাভাবিক গরমের জন্যে কাকরা বিলম্বে তাদের বাসা তৈরি করতে আরম্ভ করেছে এবং ঠিক এ সময়েই কোকিলরাও তাদের অভীষ্ট পূরণের ফিকির খুঁজতে আরম্ভ করেছে। এতে যে কোকিলের কোন ধূর্ততা বা বুদ্ধির পরিচয় আছে, তা নয়। যে প্রাকৃতিক কারণ কাকের ডিম্ব-প্রসব বিলম্বিত করেছে, কোকিলের বেলায়ও তাই।

ধাড়ী কোকিল দু রকম কাকেরই দু চক্ষের বিষ। তারা কিছুতেই কোকিলকে বরদাস্ত করতে পারে না। কোকিলও কাকের এই বীতশ্রদ্ধার সুযোগ নিয়েই তাকে জব্দ করে। পুরুষ কোকিল কাকের বাসার অদূরে নর্তন-কুর্দন করে বায়সীকে বাসার বাইরে টেনে আনে। বায়সী যখন কোকিলকে তাড়া করে বেরিয়ে পড়ে, স্ত্রী-কোকিল সে অবসরে কাকের বাসায় ডিম পেড়ে আসে। কোকিলের ডিম অনেকটা কাকের ডিমের মতোই, কিন্তু শাবকগুলি সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। বিচক্ষণ কাক যে নিজের ছানা ও কোকিল ছানার পার্থক্য বুঝতে পারে না, তা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়। আমার মনে হয়, সন্তান পালনের সহজাত সংস্কারই তাদের সাময়িকভাবে অন্ধ করে রাখে। প্রকৃত উত্তরাধিকারীদের নীড়চ্যুত করে কোকিল-ছানা শত্রু-শিবিরে তাদের পালক পিতামাতার স্নেহচ্ছায়ায় আশ্চর্য রকমে বর্ধিত হতে থাকে। তারপর তারা যখন বেশ বড়োসড় হয়ে উঠে, নিজেরাই আত্মরক্ষায় পটুত্ব অর্জন করে, তখন তারা মুক্তাকাশে উড়ে গিয়ে তাদের প্রেম ও প্রবঞ্চনাময় কোকিল-জীবন আরম্ভ করে দেয়। (March of India হইতে)

পুস্তক পরিচয়

ইতিকথা

বাঙালীর ইতিহাস (কিশোর সংস্করণ): ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়। সংকলক: সুভাষ মুখোপাধ্যায়। বুক ওয়ার্ল্ড লিমিটেড, ৫, হেস্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা। চার টাকা।

নীহাররঞ্জন রায়ের মহৎ ও বৃহৎ গ্রন্থ 'বাঙালীর ইতিহাস: আদিপর্ব' যখন প্রকাশিত হয়েছিল তখন তার ভূমিকায় আচার্য যদুনাথ সরকার লেখককে যোগ্য অভিনন্দন জানিয়ে এই আশা প্রকাশ করেছিলেন যে, অচিরেই বইটির একটি সংক্ষিপ্ত ও সুলভ সংস্করণ প্রস্তুত হবে সাধারণ পাঠকের জন্যে। আলোচ্য বইটি কিশোর সংস্করণ, অতএব যদুনাথের ইচ্ছার পূর্ণ পূরণ নয়। ডি সি সমরভিল উনবির জন্যে যা করেছেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় নীহাররঞ্জনের জন্যে ঠিক তা করেননি। এটি যেন ল্যাম্ব-লিখিত শেক্সপীয়রের গল্প। তবু এর প্রয়োজন ছিল; এবং এ কাজ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অর্ধেক ভালো করে সম্পাদন করতে পারতেন এমন দ্বিতীয় লেখকের কথা মনে করতে পারিনে। ছোটোদের জন্যে লিখতে হলে বড়ো লেখক হওয়া চাই, এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায় অসামান্য নিষ্ঠা ও অসাধারণ সাফল্যের সঙ্গে এই সংস্করণটি সংকলন করে তাঁর কবিখ্যাতির মুকুটে আরেকটি আলাদা রকমের রত্ন অর্জন করলেন। মূল গ্রন্থের দৃষ্টান্ত-প্রাচুর্য ও পুনরাবৃত্তি সংস্কার করে তিনি মূল কাহিনীটি সহজ অথচ সুন্দর গদ্যে এমনভাবে পরিবেশন করেছেন যা প্রত্যেক কিশোরের হৃদয় হরণ করবে। এবং শুধু কিশোরদেরই নয়।

উপরের উচ্ছ্বসিত কিন্তু অনতিকথিত প্রশংসার এক বর্ণও ফিরিয়ে না নিয়ে দুটি সমালোচনা করব। প্রথমটি দৃষ্টিভঙ্গীর কথা। সংকলক তাঁর ভূমিকায় বলছেন: "বাঙলা দেশের ইতিহাসে কোথায় কেমন করে লুকিয়ে আছে সেই অনিবার্য শ্রেণী-সংগ্রাম ইতিহাসকে যা সামনে ঠেলে নিয়ে যায়?" সাম্যবাদী সংকলকের এ নৈরাশ্য বুঝি। কিন্তু নিশ্চয়ই শ্রেণী-সংগ্রামের রক্তবর্ণ চশমার ভিতর দিয়ে ছাড়াও ইতিহাসকে দেখবার ও ব্যাখ্যা করবার অন্যান্য পদ্ধতি ও রীতির অস্তিত্ব সংকলকের অজ্ঞাত নেই। এই মতবাদের ফল হচ্ছে এই যে তিনি কিশোর পাঠকদের পরামর্শ দিচ্ছেন: 'রাজারাজড়া' অধ্যায়টি সকলের পক্ষে খুঁটিয়ে পড়ার দরকার নেই। সামাজিক ইতিহাস অধুনা যে ঐতিহাসিকদের মনোযোগ পেয়েছে এটা ভালো কথা, কিন্তু এর ফলে আগেকার রাজ-প্রধান ইতিহাসের প্রতি অবজ্ঞার প্রশ্রয় দেয়া রাজনীতির দিক থেকে চতুর হলেও ইতিহাসের দিক থেকে অসাধু। সাধারণ জনতার কথা যত লেখা হয় ইতিহাস ততই পূর্ণাঙ্গ হয়, কিন্তু রাজারাজড়াদের বাদ দিলে প্রাচীন ইতিহাসের গুরুতর অঙ্গচ্ছেদ ঘটে। শুধু তাই নয়, সেকালের সত্য পরিচয়ও মেলে না। কার্ল মার্কসের যে কটি কথা আমি সর্বাংশে গ্রহণ করি তার মধ্যে একটি হচ্ছে: "The ruling ideas of an age were the ideas of its ruling class." এঁদের, অর্থাৎ রাজারাজড়াদের, কথা তাই ঘৃণাভরে বাদ দিলে সেকালের ধ্যান ধারণার প্রধান অংশটাই অজ্ঞাত থেকে যায়।

দ্বিতীয় সমালোচনাটি ব্যাকরণগত এবং বইটি কিশোরদের জন্যে লেখা বলেই সামান্য এ ত্রুটির উল্লেখ করছি। মাঝে মাঝে (যেমন ১৪৪—৪৫ পৃষ্ঠায়) 'থেকে' ও 'চেয়ে' এই দুটি কথার অসঙ্গত ব্যবহার আছে। প্রথমটির ইংরেজি 'ফ্রম' এবং দ্বিতীয়টির 'দ্যান'। কথা দুটির সুষ্ঠু ব্যবহার হবে এই রকম: সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী আমার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আলাদা। কিন্তু তাই বলে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখা আমি কারো চেয়ে কম ভালোবাসিনে। ৩০১।৫২

প্রাচীন সাহিত্য

পদাবলী পরিচয়—শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়; গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩-১-১, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬, মূল্য—তিন টাকা।

শুধু রবীন্দ্রপূর্ব যুগেরই নহে, বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসেরই প্রধান গৌরব বাঙলার বৈষ্ণব পদাবলী। গৌড়ীয় বা বাঙলা বৈষ্ণব-সাহিত্যে শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় একজন বিশেষজ্ঞ, গবেষক এবং ব্যাখ্যাতা বলিয়া স্বীকৃত ও সম্মানিত। আলোচ্য গ্রন্থখানি তাঁহার বহু অধ্যয়ন ও বহু শ্রমের সার্থক সৃষ্টি। গ্রন্থখানি বাঙলা সাহিত্য গবেষণায় বিশেষ একটি অবদান এবং তেমনি বিশেষ একটি উদ্দেশ্য লইয়া রচিত। বি এ (অনার্স) ও এম এ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী এবং অধ্যাপকদের প্রয়োজনকে লক্ষ্যে রাখিয়াই মূলতঃ গ্রন্থখানি সংকলিত হইয়াছে। এই কারণেই গ্রন্থের সুচিন্তিত ভূমিকায় ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলিয়াছেন, "পদাবলী সাহিত্যে পূর্ণরস পাইতে হইলে, তাহার পারিপার্শ্বিক ও বাতাবরণ, তাহার ভাবধারা ও প্রকাশভঙ্গী সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক। অধ্যাপনার সময়ে অধ্যাপকগণ নিশ্চয় আনুষঙ্গিক আবশ্যক বিষয়সমূহের যথাযথ বিচার করিয়া থাকেন, কিন্তু তথাপি

এই বিষয়ে একখানি হ্যান্ডবুকের, যন্মধ্যে হস্তামলকবৎ সব কিছু সহজেই আয়ত্ত করিয়া দেখা যায়, তাহার আবশ্যকতা ছাত্র ও সাধারণ পাঠক, গবেষক ও শিক্ষক সকলেরই নিকট অনুভূত হইতেছিল। 'পদাবলী পরিচয়' সেই আবশ্যকতা বা অভাবকে অনেক অংশে দূরীভূত করিবে।" ডাঃ সুনীতিকুমার আলোচ্য গ্রন্থখানিকে "পদাবলী জগৎ-এর একখানি সম্পুট" আখ্যা দিয়া গ্রন্থ ভূমিকায় মন্তব্য করিয়াছেন, "যুবাবস্থায় কলেজে অধ্যয়নকালে যখন পদাবলী সাহিত্যের অধ্যয়ন করি, তখন এইরূপ একখানি পথনির্দেশক গ্রন্থ পাইলে কত না খুশী হইতাম। এ যুগের ছাত্রছাত্রী ও পদাবলী রসিকগণ শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণের মত পথ প্রদর্শক পাইয়াছেন বলিয়া তাঁহাদিগকে আমি অভিনন্দিত করি।"

যে বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধি বা অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে গ্রন্থখানি রচিত, তাহা কতখানি সাধিত হইয়াছে, ডাঃ সুনীতিকুমারের ন্যায় বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতজনের পূর্বোক্ত অভিমত হইতেই অনুমেয়। পণ্ডিত অধ্যাপক ও বিদ্যার্থী ছাত্র সমাজের প্রয়োজনের মধ্যেই গ্রন্থখানির মূল্য ও মর্যাদা একান্তভাবে সীমাবদ্ধ করিয়া দেখিলে গ্রন্থকার ও গ্রন্থের প্রতি অবিচার করা হইবে। বৃহত্তর সমাজের দিক দিয়াও গ্রন্থের যে উপযোগিতা ও মূল্য রহিয়াছে, তাহা কোন অংশেই কম বা উপেক্ষনীয় নহে। সেই দিক দিয়া গ্রন্থখানির সামান্য একটু পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে।

পদাবলী বলিতে 'কীর্তন' বুঝাইয়া থাকে এবং কীর্তন একান্তভাবে বাঙলার নিজস্ব সম্পদ। শুধু সম্পদমাত্র নহে, ইহা বাঙলার একান্ত আপন একটি সাধনার ধারা বা পদ্ধতি; এই জন্যই ইহার অন্য নাম 'মহাজন পদাবলী'। প্রেমধর্ম সাধনায় যাঁহারা সিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারাই এখানে 'মহাজন' বলিয়া কথিত। কীর্তনে বাঙলার হৃদয় কিরূপ সাড়া দিয়া থাকে, তাহার জন্য মহাপ্রভুর যুগে যাইবার আবশ্যক করিবে না, এ যুগেও কোন গুণী ও সিদ্ধ কীর্তনীয়ার গানের আসরে উপস্থিত হইলেই তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। কীর্তনকে দুইভাগে ভাগ করা চলে—নাম কীর্তন এবং লীলা কীর্তন। লীলা কীর্তনও দুই ভাগে বিভক্ত হইতে পারে—শ্রীকৃষ্ণলীলা ও গৌর লীলা। রাধাকৃষ্ণ লীলা কথাকেই কীর্তনের প্রধান বিষয় ও উপজীব্যরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই লীলার মূল রসটির নাম 'মধুর রস'। শ্রীরাধাকৃষ্ণের বয়ঃসন্ধি, পূর্বরাগ হইতে আরম্ভ করিয়া মাথুর লীলা পর্যন্ত সর্বত্রই মূলে এই 'মধুর রস' আদ্যন্ত অনুস্যূত। ভক্ত ও সাধক হৃদয়ে এই চিন্ময় আনন্দরস সহজেই ধরা দেয় সত্য, কিন্তু সাধারণ শ্রোতার মনও এই রস হইতে বঞ্চিত থাকে বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। একটু সচেতন থাকিলেই ধরা পড়ে যে, একটি লোকাতীত অলৌকিক রস বা আনন্দই তাহাদের মনকেও অভিষিক্ত ও উদাসীন দুইই করিয়া থাকে, এই বোধই কীর্তনের সাধারণ শ্রোতামাত্রেরই হইয়া থাকে।

কীর্তনের এই অপার্থিব রস ও আনন্দকে পূর্ণ আস্বাদনের জন্য সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে যে মানসিক শিক্ষা ও প্রস্তুতি আবশ্যক, সেদিকেও গ্রন্থকার বিশেষভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া 'পদাবলী পরিচয়' রচনা করিয়াছেন, ইহাই আমাদের অভিমত। রসের পরিচয়, বিভাগ ও বিশ্লেষণে শ্রীমদ্ভাগবত, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু, উজ্জ্বল নীলমণি, অলঙ্কার কৌস্তুভ, শ্রীচৈতন্য ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, উজ্জ্বল চন্দ্রিকা, রসমঞ্জরী প্রভৃতি গ্রন্থের সার এই গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে, বিশেষভাবে শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বল নীলমণি' গ্রন্থই গ্রন্থকার অবলম্বন ও আশ্রয় করিয়াছেন। প্রেম বৈচিত্র্য, প্রবাস, সম্ভোগ, পদাবলীর নায়ক, পদাবলীর নায়িকা, শ্রীরাধা সখী ও দূতী এবং রস ও ভাব বিশেষভাবে এই অধ্যায় কয়টি রসসাধক ও কীর্তন পিপাসুদের নিকট অমূল্য ও অপূর্ব সম্পদরূপে সমাদৃত হইবে। প্রেম ও রসধর্মের মূলতত্ত্ব এবং কীর্তনের যাবতীয় রসতত্ত্ব এক স্থানে সংহত আকারে যেভাবে গ্রন্থকার পরিবেশন করিয়াছেন, তাহাতে বাঙলা সাহিত্যকেই তিনি এক অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। 'পদাবলী পরিচয়' বাঙলা সাহিত্যে একটি স্থায়ী কীর্তিরূপে স্বীকৃত হইবে, এই বিষয়ে আমরা নিঃসংশয়।

উপন্যাস

কাল-কল্লোল (উপন্যাস)—শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩-১-১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৪৷৷৹ আনা।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিক রামপদবাবুর আলোচ্য পুস্তকখানি বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ পর্যায়কে পটভূমিস্বরূপে অবলম্বন করে লেখা হয়েছে। হিটলারের বিরোধী শক্তির বিজয় লাভ, আজাদ-হিন্দ দলের তৎপরতা হইতে আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া, ভারতে মন্ত্রিমিশনের দৌত্য, রাজনৈতিক রোয়েদাদ, মহাত্মাজীর নোয়াখালিতে আগমন, কলিকাতার হাঙ্গামা, ১৬ই আগস্টের স্বাধীনতা

দিনসের ব্যাপার প্রভৃতি বিষয় উপন্যাসখানির আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে এসে পড়েছে। কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনার ফিরিস্তি দেওয়া ঔপন্যাসিকের কাজ নয়। রামপদবাবুরও তা' লক্ষ্য হয়নি। ঐতিহাসিক এসব বিপর্যয়ের ভিতর দিয়ে সমাজ-চেতনায় অন্তর্দ্বন্দ্বের যে আবর্ত উঠেছে, জন-মানসে সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্র করে যে ছন্দ জেগেছে তারই রসরূপ তিনি দিয়েছেন। ব্যক্তি এবং সমাজ-জীবনের এসব চেতনা এবং বেদনা মহাকালের বারিধিবক্ষে বুদ্বুদের মত ক্ষণিক হলেও যাঁরা সাহিত্যিক, যাঁরা স্রষ্টা, তাঁদের দৃষ্টিতে এর মধ্যে প্রাণময় এবং মনোময় একটি লীলার উদয় হয়—মানুষের সাধারণ চোখে যেটি ধরা পড়ে না, অথচ যেটিতে রয়েছে চিরন্তন বিস্ময় এবং বিচিকিৎসা, যা'তে পরিচয় মিলে সনাতন সত্যের সন্ধানের জন্য মানুষের চিরন্তন বুভুক্ষার। রামপদবাবুর চরিত্র-সৃষ্টির ভিতর দিয়ে সেই সত্য যতটা প্রমূর্ত হয়েছে, তাঁর উপন্যাসখানির সার্থকতা নির্ভর কচ্ছে তারই উপর।

উপন্যাসখানির আখ্যান এরূপঃ—দুর্গা-মোহন এবং অঘোরনাথ দুই ভদ্রলোক পরস্পরের প্রতিবেশী। দুর্গামোহনের ছেলে প্রশান্ত। অঘোরনাথের ছেলের নাম মলয়। দুর্গামোহনের স্ত্রী হেমলতা। অঘোরনাথের স্ত্রীর নাম বিরাজমোহিনী। প্রশান্তের বিবাহ হয়নি। দুর্গামোহনের ইচ্ছা সে চাকুরী করে। মলয় বিবাহিত। তার স্ত্রী সুচিত্রা আধুনিক ধরণের শিক্ষিতা এবং প্রেমে পড়ে তাদের বিয়ে হয়েছে। প্রশান্ত চাকুরী পেয়েও করতে অনিচ্ছুক। দুর্গামোহন ছেলেকে চাকুরী করাতে রাজী করাবেন, এই মতলব নিয়ে কলিকাতায় গেলেন। খোঁজ নিয়ে জানলেন, প্রশান্ত চাকুরীতে ইস্তফা দিয়েছে। সন্ধ্যা বেলা দেখেন, প্রশান্ত শোভার সঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলেছে। শোভা কম্যুনিষ্ট। দেখে তাঁর মনে জাগলো যুগপৎ বিস্ময় এবং বিরক্তি। প্রশান্ত শোভার সঙ্গে যোগ দিয়ে কম্যুনিষ্ট দলের সম্পর্কে গেল; কিন্তু তাঁদের সঙ্গে ষোল আনা মিশতে পারলো না।

এদিকে মলয় চাকুরী ছেড়ে দিয়ে মহাত্মাজীর শান্তি-প্রচেষ্টায় যোগ দিল। সুচিত্রা একাজে তার সাথী হল। কলিকাতার হাঙ্গামায় সাম্প্র-দায়িক শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করতে গিয়ে মলয় প্রাণ দিলো।

প্রশান্ত কিছুদিন পরে একটি ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার হল। এই সম্পর্কে মালতীর সঙ্গে হল তার পরিচয়। মালতী বড়লোক অন্য একজন ফ্যাক্টরীর মালিকের ভাইঝি। মালতী ও প্রশান্ত উভয়ের মধ্যে ক্রমে প্রণয়ের ভাব জমে উঠলো। কিন্তু এদের সে প্রণয় বিবাহে কিন্তু সার্থক হলো না। প্রশান্ত দুঃখ-কষ্টের ভিতর দিয়ে কর্মের পথই শেষটা বেছে নিলো। মলয় আত্মোৎসর্গ করবার পর সুচিত্রা এসে মানব-কল্যাণ-ব্রতে নিজেকে নিবেদন করবার ইচ্ছা যখন জানালো তখন প্রশান্ত তাঁকে বলেছিল—হাঁ, ছেদন করতে হবে বন্ধন। সুখে দুঃখে উদাসীন থেকে নয়—কাজকে ভালবাসে। সুখ ও দুঃখ উভয়কেই গ্রহণ করতে হ'বে।

গান্ধীবাদ এবং কম্যুনিষ্ট মতবাদ সমাজ-জীবনে এই দুটি তরঙ্গ তুলেছে। রামপদবাবু শোভা আর প্রশান্তর চরিত্র চিত্রনের ভিতর দিয়ে এই দুই মতবাদের সঙ্ঘাতজনিত মনস্তাত্ত্বিকতার সূক্ষ্ম গতি • বিশ্লেষণ করেছেন এবং ভবিষ্যতের ইঙ্গিত করেছেন। মালতী যেন এই দুই মতবাদের আপোষ-নিষ্পত্তির সূত্র জোগাচ্ছে। কিন্তু ধনীর আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে দরিদ্রের জন্য যে বেদনা বা দরদ, তা'তে আন্তরিকতা কোথায়? গান্ধীবাদের আদর্শ তো তা নয়, মলয় এবং সুচিত্রার চরিত্রের ভিতর দিয়ে গ্রন্থকার গান্ধীবাদের আদর্শকে রূপ দিয়েছেন। প্রশান্তের সঙ্গে মালতীর সম্পর্কের কথা উঠলে সুচিত্রা বলেছিল—"ওই সাম্যবাদের জাঁক করি না আমরা, আমাদের মন থেকে বৈষম্যের বিষ সহজে যাবার নয়। মালতী এর বাগদত্তা বধূ। রূপে গুণে মেয়েটির তুলনা নেই। আবার ধনবতীও।"

প্রশান্ত এ বন্ধন সত্যই ছিন্ন করলে। সে শোভার বাড়ীতে গেলো। শোভা বুঝেছে তার ভুল। সে বাড়ী ছেড়ে যাবার আগে ডায়েরীতে লিখে রেখে গেছে—"আমাদের নীতিও ভেজাল শূন্য নয়। সত্য আছে এ দুয়ের মাঝামাঝি।" শোভা লিখেছে—"সম্পদ সঞ্চয় করব না আমরা। তাকে ভাসিয়ে দেব কালের স্রোতে। নতুন সমাজ, নতুন বিধি-বিধান, নূতন পারিপার্শ্বিক বারবার ফিরে আসুক, নতুন হ'য়ে।" তার কলমে ফুটে উঠেছে একটি অভ্রান্ত সত্য—You are not that which you you want to appear আমি যা নই, ভঙ্গিতে ভাষণে, চালচলনে তাই হবার চেষ্টা করছি।" গোর্কীর এই কথা।

শক্তিময়ী নারী। আলোচ্য উপন্যাসখানিতে রামপদবাবু নারী মহিমার এই দিকটা ফুটিয়ে তুলতে বিশেষ মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। শহরের আঁধা-কোঠায় শোভার উচ্ছৃঙ্খল নিতান্ত ভাবাবেগলেশহীন দৈন্য ও দুর্গতির বেদনার আঘাতে আঘাতে ক্লিষ্ট বস্তুনিষ্ঠ জীবন, সুচিত্রার চিত্তের উদারতা, আত্মত্যাগ ও প্রীতিময় সেবার রীতি এবং মালতীর মৃদুল কোমল ও মধুর জীবনের মদির আকর্ষণ, তা'তে রয়েছে বড় রকমের পরিবর্তনের পথে না যাবার একটা ভীরুতা বা সঙ্কোচের ভাব, এই ত্রিশক্তির ধারা জাতির অন্তরকে নাড়া দিচ্ছে। ভবিষ্যতের গতি হবে কোন দিকে? বঞ্চিতের বেদনা জয়যুক্ত হবেই। রাজনীতির মতের দোহাইতে কোন মিথ্যাচারই তা মানবে না। রামপদবাবু 'কাল কল্লোলে' এই সুরটি জাতির কানে বাজিয়ে তুলেছেন। তাঁর রস-সৃষ্টির ভিতর আমাদের সমাজ-জীবনের পরিচয়টি নিখুঁতভাবেই ফুটে উঠেছে। উপন্যাসখানি বাঙলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করবে সন্দেহ নাই।

ছোট গল্প

অন্তর্যামী : শ্রীমতী আশালতা সিংহ : ফাইন আর্ট পাবলিশিং হাউস : ৬০, বিডন স্ট্রীট, কলকাতা : ২৷৷০ টাকা।

পাঁচটি ছোটগল্পের সঙ্কলন। সবকটি গল্পই মুখ্যত প্রেমের। একটি গল্পের নাম আবার "প্রেমে পড়া"। কাহিনীর দিক থেকে সব কটি গল্পই পুরনো। কোথাও এতটুকু বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ল না। রচনা কুশলতা সম্পর্কে বিশেষ কিছু লক্ষ্যনীয় না থাকলেও একটি স্বাচ্ছন্দ্য প্রায় সর্বত্র বিদ্যমান, আর সেই স্বাচ্ছন্দ্যই অধিকাংশ ক্ষেত্রে গল্পকে চরম দুর্দশার হাত থেকে রক্ষা করেছে। অপমান গল্পটি সুখপাঠ্য। (২৩৬।৫২)

রাজঘাট : শ্রীযতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস : ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট : তিন টাকা।

গল্পগুলির কাহিনীতে কোথাও কোন নতুনত্ব না থাকলেও ভাষার একটি অনায়াস প্রসাদ গুণ আছে যা সচরাচর চোখে পড়ে না। মিঠে মেজাজে মৃদু ভাষায় বলার ভঙ্গীটি ঘরোয়া। আর এই ভঙ্গীই এই গল্প গ্রন্থের একমাত্র উল্লেখ্য গুণ। জীবনের হাজারো জটিলতার কোন ছাপ দু একটি গল্প ছাড়া এত বড় বইএর আর কোথাও নেই। কোন এক বিস্মৃত অতীতের পটভূমিকায় সাজিয়ে বলা গল্প মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করে না। তবু স্টাইলের অনাড়ম্বর সারল্যের জন্য অনেকগুলি গল্পই স্বাচ্ছন্দে পড়া যায়। (২৬৩।৫২)

প্রথম অর্ঘ্য : ভূপেন্দ্রনাথ : ২৭, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলকাতা—৬ : দেড় টাকা।

কয়েকটি ছোট গল্পের সংগ্রহ। নিতান্তই সাধারণ। কাহিনী অথবা স্টাইল কোথাও এমন কিছু নেই যা কিছুমাত্র দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মাঝে মাঝে কিশোরসুলভ রোমান্টিক উচ্ছ্বাস

বিরক্তিকর। গল্পের বই প্রকাশ না করলেই কি চলত না! (২৬৫।৫২)

ক্ষ্যাপার দল—মনোজ রায়। গ্রন্থকার কর্তৃক গ্রাম থালনা, পোস্ট থালনা, জেলা হাওড়া হইতে প্রকাশিত।

মফঃস্বল স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং সমাজ-সেবকরূপে অর্জিত অভিজ্ঞতার কাহিনী ডায়েরীর আকারে লেখা। গ্রাম্য রাজনীতি, দলাদলি, পরশ্রীকাতরতা, ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য বন্ধুর প্রতি অবিশ্বস্ততা প্রভৃতি সর্বপ্রকার দুঃখজনক অভিজ্ঞতার কাহিনী বর্ণনায় লেখক প্রয়াসী হয়েছেন। ভাষায় একটি গভীর আন্তরিকতা আছে। (১১৯।৫২)

একফালি বারান্দা—অন্নপূর্ণা গোস্বামী। ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, ২০৯ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

কয়েকটি গল্পের সংকলন। লেখিকার নামের সঙ্গে বাংলার পাঠকগণ পরিচিত। গ্রন্থারম্ভে লেখিকা সম্বন্ধে "বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণের স্বতপ্রবৃত্ত অভিমত" পত্রস্থ করা হইয়াছে। প্রখ্যাত সাহিত্যিকগণ তাঁহাকে অকুণ্ঠ প্রশংসা করিয়াছেন। এই কারণে নূতন করিয়া প্রশংসা করিবার কিছু নাই। গল্পগুলি মোটামুটিভাবে আমাদের ভালোই লাগিল। ৩১৯।৫২

প্রবন্ধ-সাহিত্য

মানবতার প্রাণশক্তি : রফি উদ্দীন : প্রকাশক—মহী উদ্দীন, জিলা পাড়া, পোঃ পাবনা। ২৷০।

মানব সভ্যতার ইতিহাস হলো তার সংস্কৃতিতে। মানুষ চিরকাল বাঁচে না, বাঁচে তার সংস্কৃতি। মানবতার প্রাণশক্তি তাই তার সংস্কৃতিতে নিহিত। আলোচ্য গ্রন্থে প্রাচীন গ্রীক, রোমান, সেমিটিক, মধ্যযুগীয় আরব এবং বর্তমান ইউরোপীয় সংস্কৃতির ইতিহাস, অর্থাৎ মূল দার্শনিক মতামতগুলি আলোচনা করা হয়েছে। একশ' পাতার পুস্তিকায় এ প্রচেষ্টা দুঃসাহসিক, তবু প্রয়াসের জন্য লেখক ধন্যবাদার্হ। কিন্তু পরিসর স্বল্প বলে দার্শনিক মতবাদের ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়নি। ফলে অনেক জায়গায় ক্যাটালগের মত হয়েছে। যেসব জায়গায় কিছু আলোচনা করবার অবকাশ ছিল তারও পূর্ণ সদ্ব্যবহার হয়নি। লেখক ভবিষ্যতে এবিষয়ে অবহিত হবেন আশা করা যায়। ভাষার আরও প্রাঞ্জলতা, একটু কঠিন কাজ হলেও বাঞ্ছনীয়।

সাময়িক পত্র

মাসিক রোমাঞ্চ—সম্পাদক রঞ্জিৎ চট্টোপাধ্যায়; আশ্বিন, ১৩৫৯। মূল্য—১৵০ আনা।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত এদেশের বুদ্ধি-জীবীদের কাছে গোয়েন্দা কাহিনী অপাঙক্তেয়ই ছিল। দোষ অবশ্য পাঠকসমাজেরই শুধু নয়, তখন গোয়েন্দা কাহিনী বলতে প্রধানত সস্তা বিদেশী ডিটেকটিভ উপন্যাসের ছায়ানুবাদ কিম্বা জঘন্য খুনখারাপির কুৎসিত বিবরণই থাকতো। অপসাহিত্যের আবর্জনা থেকে গোয়েন্দা কাহিনীকে যাঁরা সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করলেন, তাঁরা শুধু অগণিত পাঠকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন তা 'নয়; বাঙলা-সাহিত্যের একটি বিশেষ শাখাকেও সমৃদ্ধ ক'রে তুললেন।

আজকের বাঙলা গোয়েন্দা কাহিনী যে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত, আর প্রকৃত সাহিত্যপদবাচ্য এ বিষয়ে দ্বিমত থাকার কথা নয়। গোয়েন্দা কাহিনীকে আজকের অবস্থায় যাঁরা রূপান্তরিত করেছেন, 'মাসিক রোমাঞ্চের' প্রতিষ্ঠাতা তাদের মধ্যে অন্যতম। হাতেকলমে তিনি এ কাজ হয়তো পারেননি, কিন্তু অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন, যাতে সাহিত্যিকেরা এ কাজে অগ্রণী হ'তে সক্ষম হয়েছিলেন।

নবপর্যায়ের 'মাসিক রোমাঞ্চ' পূর্বতন সংখ্যাগুলোর ঐতিহ্য অক্ষুন্ন রাখবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

ছাপা ও প্রচ্ছদচিত্র অপূর্ব।

বিবিধ

মণি-মঞ্জুষা—শ্রীমতী পারুল মুখার্জি, বি,এ, বি,টি, শিক্ষয়িত্রী ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউসন এবং শ্রীমতী শেফালিকা ঘোষ, বি,এ, বি,টি, প্রধানা শিক্ষয়িত্রী বিদ্যাসাগর বাণী ভবন, জুনিয়র ট্রেণিং স্কুল। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মল্য ৷৷৵০ আনা।

সুকুমারমতি বালক-বালিকাদের জন্য পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে। পুস্তকখানির প্রথম অংশে প্রার্থনা, বৈদিক স্বস্তি পাঠ, দেবদেবীর স্তবস্তুতি, দ্বিতীয় অংশে বেদ, উপনিষদ, সংহিতা, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, চণ্ডী প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং সেগুলির মর্মকথা, শেষ অংশে বাংলা প্রার্থনা-সঙ্গীত, ধর্ম সঙ্গীত এবং জাতীয় সঙ্গীত প্রদত্ত হইয়াছে। সূচী দেখিয়া পুস্তকখানি অল্পবয়স্ক বালক বালিকাদের পক্ষে দুরূহ এবং আকর্ষণীয় হইবে না বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা মোটেই নয়। এই খানেই গ্রন্থরচয়িত্রীদ্বয়ের বিষয় নির্বাচনে এবং যথোপযুক্তভাবে সেগুলির পরিবেশনে সার্থকতা। শিশুকাল হইতেই বালক-বালিকাদের মনে ভারতীয় সংস্কৃতির সার্বভৌম আদর্শ যাহাতে বদ্ধমূল হইয়া উঠিতে পারে পুস্তকখানিতে উদ্ধৃতাংশ সেইভাবে সংগ্রথিত হইয়াছে। উপনিষদের শিক্ষা, রামায়ণ, মহাভারতের মহোচ্চ আদর্শ, গীতা এবং চণ্ডীর অমৃতরস কয়েকটি সহজ, সরল কথার ভিতর দিয়া গ্রন্থকর্ত্রীদ্বয় যেভাবে ছাঁকিয়া ছানিয়া শিশুদের উপযোগীভাবে উপস্থিত করিয়াছেন তাহা বিশেষরূপে প্রশংসনীয়। বালক-বালিকাদের পক্ষে সংস্কৃত শ্লোকগুলির মর্ম হৃদয়ঙ্গম করা অবশ্য সহজ হইবে না, কিন্তু সেগুলির আবৃত্তি তাঁহাদের নৈতিক সমুন্নতি সাধনে বিশেষভাবে সাহায্য করিবে, জাতীয় মর্যাদাবোধ তাহাদের বৃদ্ধি পাইবে এবং ভারতীয় সংস্কৃতির প্রধান আশ্রয় সংস্কৃত ভাষার প্রতি তাহাদের আকর্ষণ বাড়িবে। বাংলা দেশের ছেলে মেয়েদের মধ্যে এমন পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

৩৫৯।৫২

শিশু-সাহিত্য

আত্মহত্যা : স্বপন বুড়ো : সাহিত্য চয়নিকা : ৫৯, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট : এক টাকা।

ছোটদের অভিনয়োপযোগী কৌতুক নাটক, স্বচ্ছন্দ সংলাপে গতিশীল। কাহিনীর শেষ পর্যন্ত কৌতূহল সমান প্রবল থাকে। কৌতুকটুকু ছোটদের কাছে উপভোগ্যই হবে। সাজ-পোষাকের অথবা দৃশ্য শয্যার বাহুল্য নেই বলে অভিনয়ের পক্ষে খুবই সুবিধে। ২৩১।৫২

প্রাপ্তি-স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি দেশ পত্রিকায় সমালোচনার্থ আসিয়াছে। পরে সমালোচনা বাহির হইলে তাহা যথাসময়ে প্রকাশক অথবা গ্রন্থকারের নিকট প্রেরিত হইবে।

চলাচল—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, দিলীপ মুখার্জি কর্তৃক ৬০।১ বি, হরিশ মুখার্জি রোড কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—৪৷৷০। ৩৫০।৫২

জীবন-তৃষ্ণা (২য় সংস্করণ)—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, দিলীপ মুখার্জি কর্তৃক ৬০।১ বি, হরিশ মুখার্জি রোড কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—৩৵০। ৩৫১।৫২

বর্ষপঞ্জী—১৩৫৯—সন্তোষরঞ্জন সেনগুপ্ত এস আর সেনগুপ্ত এন্ড কোং, ২৫এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা। মূল্য—৪৲। ৩৫২।৫২

হাসি-খুসি—(১ম ভাগ)—যোগেন্দ্রনাথ সরকার, সিটি বুক সোসাইটি, ৬৪, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—৵০। ৩৫৩।৫২

ছোরা পরী ও পিস্তল—শচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, নবজীবন প্রেস, ৬৬, গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—১৷৷০। ৩৫৪।৫২

বেপরোয়া—স্বপন বুড়ো, মিত্রালয়, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—২৲। ৩৫৫।৫২

দূরের আকাশ—অরুণকুমার সরকার মিত্রালয় ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—২৲। ৩৫৬।৫২

ইন্দুমতী (রঘুবংশ)—কবিশেখর কালিদাস রায়, মিত্রালয়, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—৩৲। ৩৫৭।৫২

মুখ-রোচক—সরজিৎ বাগছি, উত্তর বাঙলা সাহিত্য মন্দির, জলপাইগুড়ি হইতে প্রকাশিত। মূল্য—১৵০। ৩৫৮।৫২

মহুয়া—আযীম উদ্‌দীন আহমদ, সিরাজ হোসেন খান কর্তৃক পি, ৪৮, পুরানো পল্টন, ঢাকা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—২৲। ৩৬০।৫২

মনোলীনা

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

সারারাত ভাবি ভোরবেলা কোনো কাজে
দেখা পাবো তার অরুণাভ ফুলসাজে।

সে আসে না, এই পুরোনো খবর প্রতিবেশীদেরও জানা,
আমার জীর্ণ জানালায় তবু চড়ুইয়েরা ভোর হ'লে
নীহারকণার নিপুণ আহারে আহ্লাদে আটখানা;
আমার জীর্ণ জানালায় দেখা মাঠের তৃণের কোলে
প্রথম আলোর প্রসন্ন সম্মতি
স্বর্ণরেণুর ঝর্ণায় ঝরে, শিশির মৃত্যু ভোলে,
রেশমী ডানায় মুক্তি ছড়ায় অভিজাত প্রজাপতি,
অন্তরঙ্গ মধুকর ভুলে মমতার মৌচাক
বন-বনান্তে পাঠালো সুরের ডাক—
দিক্-দিগন্তে প্রতিধ্বনির গুঞ্জিত মূর্ছনাঃ
সে শুধু আসে না ফুলসাজে, যাকে কোনোদিন ভুলবো না।

সে আসেনি ব'লে কান্নায় চোখ বুজে
প্রান্তর কই কান পাতেনি তো পায়ের শব্দ খুঁজে,
আকাশ তো কই মেঘলা করেনি চুল,
রাতের কাঁকন-কেয়ূরে খোলেনি ফুল!
দূরের শীর্ণ হিমঝুরি গাছে রাতের তুহিন হিম
ধুয়ে মুছে গেছে, প্রাণের শাখায় আশায় আরক্তিম
প্রথম আলোর আলিঙ্গনের তাপঃ
ওর ললাটেও ফলেনি কুটিল রাত্রির অভিশাপ!

না-ই বা এলো সে ফাল্গুনী ফুলসাজে—
মনে তার ছবি সুর হলো, আজ মনোলীনা বীণা বাজে॥

হতোস্মি

আরতি দাস

কি কথা লিখ্‌ব?
কি কথা লিখ্‌ব তোমায় বলত?
কথা কিছু নেই লিখ্‌বার মত,
কত কতবার বলেছি তবু ত
ভুলে গিয়ে তুমি ফিরে বলেছ ত
'কথা বল তুমি'।
কি কথা বল্‌ব?

জোনাকী সে এক পাখা মেলেছিল,
নিশুতে রাতের মখমল কালো
আঁধারের বুকে নিভু নিভু কিছু
আলো জেলেছিল,
সেই আলোতেই থাম্‌তে হয়েছে;
তার বেশী কিছু হয়নি, হবে না
হতেই পারে না,
এই কথা নিয়ে বল্‌বার মত
কি আছে বল ত?

কোনো মেয়ে একা আল্পনা দেয়,
মাটির আঙ্গণে ফল ফুল এঁকে
ভালবাসা লেখে,
ঝির্‌ঝিরে হাওয়া বৃষ্টি বাদলে
মুছে যায় সব,
চোখ মুছে সেও চুপ করে থাকে
কোনো কথাই কি বলা যায় তাকে?
কি কথা বল্‌বে?

কালো মেঘে মেঘে কী কালো আঁধার,
এ মেঘে না জানি কি ঝড় আসবে,
না জানি কি হয়!
থম্‌থমে হাওয়া ঝড়ের আশায় বুক বেঁধেছিল,
মনে মনে বুঝি মল্লার রাগে সুর সেধেছিল,
হঠাৎ হাওয়ায়,
দুটো কি চারটে পাতাই ঝর্‌ল
হলনা কিছুই,
তারা ঝক্‌মক্‌ আকাশের আড়ে
মেঘেরা সর্‌ল;
প্রত্যাশী মুখ হল ত নীচুই;
কি কথা বল্‌ব?
কোন্ গানে আর মনকে ছল্‌ব?

বিজ্ঞানের কথা

জীবাণুশাস্ত্রের গোড়ার কথা

শ্রীতরুণ ঘোষ

আঙুরের রস পরিবর্তিত হয়ে কিছু দিনের মধ্যে মদে পরিণত হয়, প্রাচীনকাল থেকেই এই নিত্য-নিয়ত পরিবর্তন মানুষের মনে জাগিয়ে এসেছে বিস্ময়। শুধু তাই নয়, জীবিত ও মৃত প্রাণীসমূহের বিভিন্ন দৈনন্দিন অবস্থান্তরের অজানা রহস্য উন্মোচনের প্রচেষ্টা আজকের প্রাণীবিদ্‌দের মত সেকালের দার্শনিকদের মধ্যেও ছিল। আমরা যাকে গাঁজান বা ফারমেন্টেশন বলছি তার কারণ কি? জিনিস কেন পচে এই সবের কারণ তাঁরা বরাবরই ভেবে এসেছেন। মনে রাখতে হবে, অণুবীক্ষণ বলে যে যন্ত্রটি আধুনিক বীজাণুতত্ত্ববিদ্‌দের ডান হাত সেটাও ছিল তখন স্বপ্নেরও অগোচর। যে জীবাণুদের আজ আমরা অম্লানবদনে প্রায় সব কিছুর জন্যই দায়ী করে বসি, ভেবে দেখুন, অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া এর অস্তিত্ব তাঁরা কিভাবে বুঝতে পারতেন। তবুও বহুকাল থেকেই বিভিন্ন মানুষের ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাধারা কালক্রমে অণুবীক্ষণের অপেক্ষা না করেও মোটামুটি একটি নির্দিষ্ট গতি নিয়ে-ছিল—নৈলে সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি টমাস উইলিস কিভাবে বললেন যে, গাঁজানোর কারণ পচনশীল বস্তুর মধ্যে অণুপরমাণুগুলির অহেতুক আভ্যন্তরিক আন্দোলন বৃদ্ধি। মনে হয় এ আর এমন কি কথা, কিন্তু কেবলমাত্র চিন্তাশক্তির ওপর ভর করেই উইলিস সাহেব এ হেন কারণ দেখান। জানি না কেন অন্য বহু আবিষ্কারকের মত লোকের বিদ্রূপের বদলে তিনি পেলেন কিছুটা সমর্থন, এমন কি বহুদিন পর্যন্ত তাঁর কথা পরবর্তী যুগের বৈজ্ঞানিকদের মনে দাগ কেটে ছিল।

এই সূত্রে বলা যায় যে, প্রাচীন দার্শনিক-দের মধ্যে অন্য একটি মত বহুকাল থেকেই চলে আসছিল—তাঁরা বলতেন যে পচা বা গলিত প্রাণী বা উদ্ভিদ দেহ থেকে একরকম বিষাক্ত বায়ব পদার্থ বের হতে থাকে সেটা কোন জীবিত প্রাণী সহ্য করতে পারে তবে মৃতেরা পারে না। মহামারীর পর মহা-মারীতে যখন বহু প্রাণীর একজোটে বিনাশ হয়েছে, তখন তাঁরা বললেন যে, এই মহা-মারীর বিস্তার এরও কারণ সেই দূষিত গ্যাস। অর্থাৎ মহামারীর (প্রসঙ্গক্রমে রোগেরও) বিস্তার অবশ্যই কোন বাহনদ্বারা হয়ে থাকে। কে যে সেই বাহন সেটা অবশ্য তাঁরা জোর দিয়ে বলতে পারলেন না—তাঁদের মতে এই বিষাক্ত গ্যাস শুধু গলিত বা মৃত বা রোগগ্রস্ত জীবদেহ থেকেই নয়, বাতাস বা পৃথিবীর যে কোন রকম অজানা পরিবর্তন থেকেও আসতে পারে যার ফলে মহামারীর বিস্তার হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

এইভাবে পচা, গেঁজে যাওয়া, রোগের বিস্তার বা মহামারীর প্রকোপ, যুগ যুগ ধরে এদের মূল কারণের সন্ধানীরাই করে গেছেন আধুনিক জীবাণুশাস্ত্রের গোড়া-পত্তন। এই ব্যাপারে বোধহয় চূড়ান্ত দূর-দর্শিতার পরিচয় দেন খৃঃ পূর্ব প্রথম শতকের দুই মনীষী ভারো ও কলুমেলা। তাঁদের ভাষায় রোগবিস্তারের কারণ কোন-রকম অদৃশ্যমান জীবিত প্রাণীসমূহ, এরা খাদ্য বা শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে। দুঃখের বিষয় যে তাঁদের এই যুগান্তকারী চিন্তাধারা প্রায় দু' হাজার বছর ধরে কোনরকম আঁচড় কাটতে পারল না মানুষের মনে, কেননা এহেন অদৃশ্যমান অথচ জীবিত প্রাণীদেহের অস্তিত্ব কেই বা স্বীকার করতে রাজী। ফলে এই দুজনের কথা হয়ে রইল বহুকাল বাক্সবন্দী। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি ডাঃ ফ্রাকাস্টোরিয়াস আবার এর খেই তুললেন। তিনিও রীতিমত জোর দিয়ে বললেন যে, এহেন প্রাণীজগৎ ত একটা আছেই, মানুষ সেটা চোখে না দেখতে পেলে কি হবে। এরা শুধু রোগের কারণ তাই-ই নয়, বাহকও। সুযোগ পেলেই এক রুগ্নদেহ হইতে কোন সুস্থদেহে গিয়া উহাকেও ঠিক সেই প্রকার রোগগ্রস্থ করে। এ সত্ত্বেও ডাক্তারের কথায় আনল না কোন নতুন সাড়া। এহেন ধ্রুব চিন্তাধারা খৃঃ পূর্ব প্রথম শতক হইতে যতটুকু আবেদন এনেছিল, তার চেয়ে কণামাত্র বেশী রেখা-পাত করল না। যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি তাঁর এই কল্পনাপ্রসূত প্রাণীগুলির অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন সে পর্যন্ত তাঁর এহেন ব্যাখ্যা কে মানতে রাজী। দু চারজন যাঁরা ডাক্তারের কথায় আংশিক কান দিলেন, তারা আবার প্রশ্ন তুললেন এই ক্ষুদ্র প্রাণীগুলির উৎপত্তি সম্বন্ধে। প্রসঙ্গক্রমে বলছি যে এরিস্টটলের আমোল থেকেই লোকের মনে একটা ধারণা চলে আসছিল যে, মূল পদার্থগুলি কোন উপায়ে সংযুক্ত হয়ে প্রাণ সঞ্চারিত হতে পারে। সমর্থকরা কেউ কেউ এর নজির দিলেন। কয়েকজন অতিউৎসাহী গবেষক আবর্জনার মধ্যে পোকা-মাকড় এমন কি ইঁদুর ইত্যাদির স্বয়ংক্রিয় জন্ম পর্যন্ত প্রমাণ করে দিলেন—কাজে কাজেই সেই অদৃশ্য প্রাণীগুলির জন্ম হওয়া আর বিচিত্র কি? যা হোক তাঁদের এই ধারণা দৃশ্যমান প্রাণী সম্বন্ধে আর বেশী দিন টিকল না, তাঁদের পরীক্ষাগুলিতেও গলদ ধরা হল, কিন্তু জীবাণুদের সম্বন্ধে একেবারে বাদ পড়ল না। এমন কি অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার হওয়ার অনেক পরই মানুষের মন থেকে জীবাণুদের এই স্বয়ংক্রিয় জন্মপ্রণালীর পন্থা দূরীভূত হয়।

জীবাণুদের চোখে দেখার জন্য প্রয়োজন হল এমন একটা অবলম্বন যার মধ্যে দিয়ে কোন কিছু অনেকগুণে বড় করে দেখা যায়। পেটমোটা লেন্সের চলন ত অনেকদিন আগে থেকেই হয়েছিল এবং অনেক সন্ধানী লোকেরা এর সাহায্যে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিসই বড় করে দেখতে পান। তাঁরা অবশ্য চাইলেন এরই সাহায্যে তথাকথিত রোগবাহক প্রাণীগুলিকেও দেখবেন। কিন্তু দেখতে চাইলেই ত হল না—আতস কাচ দিয়ে ত জীবাণু দেখা চলে না। তবে কতকগুলো লেন্সের যোগাযোগে যে যৌগিক যন্ত্রটা তৈরী হল সেটাতেই সম্ভবপর হল জীবাণুদের চক্ষে দেখা।

তা হলে দেখুন খৃঃ পূঃ প্রথম শতক থেকেই পচন, গাঁজান, রোগের আক্রমণ ও বিস্তার সব কিছুর জন্য দার্শনিকেরা যাদের দায়ী করতে চাইছিলেন, সেই সকল সমস্যাগুলির মূল কারণ উদ্ঘাটন এই অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে জীবাণুদের অস্তিত্বটুকু প্রমাণ করার জন্যই যেন বসেছিল। তবে সিঙ্গার সাহেব তাঁর Dawn of mycroscopic Discoveryতে বলেছেন যে, আধুনিক জীবাণুশাস্ত্রের উন্নতি সম্ভব হয়েছে অনুবীক্ষণের সাহায্যে সন্দেহ নেই, তবে এর আবিষ্কারকেই সব কিছুর জন্য দায়ী করলে চলবে না। তিনি বলেন

যে, সপ্তদশ শতকের গোড়াতেই হল্যাণ্ডের জানসেন ও ইতালীর গ্যালিলিও লেন্সের পর লেন্স সাজিয়ে অণুবীক্ষণ তৈরী করেন —অথচ প্রাতঃস্মরণীয় লিউএন্‌হুক্‌ জীবাণুদের আবিষ্কার করলেন ১৬৭৬ সালে অর্থাৎ এই জীবাণুদের আবিষ্কারটাই আসল। বহু মেহনৎ করেই তিনি তাঁর এই ক্ষুদ্র প্রাণীদের অস্তিত্ব জগৎকে জানাতে সমর্থ হন। একদল বলেন যে, লিউএন্‌হুকের আগেই আরও কেউ কেউ জীবাণুদের দেখতে পান। সিঙ্গার এই সূত্রে বয়েল ও কির্চার এই দুজনের নাম তুলেছেন। কিন্তু মজা এই যে তাঁরা জীবাণুদের যা বর্ণনা দিয়েছেন তা অত্যদ্ভুত, তা ছাড়া তাঁরা যে সব লেন্স বা যন্ত্র ব্যবহার করেছিলেন তা দিয়ে প্লেগ প্রভৃতি রোগের জীবাণু দেখা কি সম্ভব? এই সব দেখেশুনে আজকের বৈজ্ঞানিকেরা লিউএন্‌হুক্‌ সাহেবকেই জীবাণুর আবিষ্কর্তা বলে মেনে নিয়েছেন—বর্তমান জীবাণু শাস্ত্রের জনক যে তিনিই এ বিষয়ে কোন সন্দেহ আছে কি?

রঙ্গজগৎ

উদয়শংকরের এখনকার নাচ

গত ২১শে নভেম্বর শুক্রবার থেকে উদয়-শংকর নিউ এম্পায়ার থিয়েটারে তাঁর দল নিয়ে নাচ আরম্ভ করেছেন। প্রায় বিশ বছর হতে চললো উদয়শংকরের নাচ প্রথম দেখবার সুযোগ হয়, তার পর থেকে শংকর যতবারই কলকাতায় এসেছেন, প্রতিবারই তাঁর এবং তাঁর দলের নাচ দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। কাজেই উদয়শংকরের নাচ সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানটা একটা অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতার সূত্রে গাঁথা বলে ধরে নিতে পারি। আর এই জন্যেই এবারকার তার নৃত্যপ্রদর্শনী দেখবার পর স্পষ্ট করে কয়েকটা সত্যিকথা বলার দরকার হয়েছে বলে মনে করছি।

উদয়শংকরের এবারের নাচের আলোচনা প্রসঙ্গে ওপরে যে ধাঁচের ভূমিকার অবতারণা করা হয়েছে তাতে এবারের নাচ সম্পর্কে আমাদের বিক্ষোভের একটা ইঙ্গিত অবশ্যই রয়েছে; আসলে সেটা থাকবার জন্যেই এই রকম বাঁকা রাস্তায় আলোচনার পথ ধরা হয়েছে।

উদয়শংকরের নাম উঠলেই তক্ষুণি মনে এসে যায় পরলোকগত হরেন ঘোষের নামটাও। প্রথম যারা উদয়শংকরকে নাচতে দেখেছেন, তাঁদের পক্ষে এই মনে হওয়াটাকে চেপে রেখে দেওয়া কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়। হরেন ঘোষ উদয়শংকরকে নাচতে অবশ্য শেখাননি, উদয়শংকর তাঁর নিজের প্রতিভার জোরে তা আয়ত্ত করেছেন; লোকের শিল্পানুভূতিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার কলাবিদ্যাও উদয়শংকরের নিজস্ব। কিন্তু উদয়শংকর যে পরম গুণের অধিকারী, সেটা সকলে জানতে পারেন হরেন ঘোষের চেষ্টাতে।

নাচটা তখন নেমে পড়েছিল অনেক নীচের আসরে; সমাজে ভব্য প্রমোদ বলে লোকে গ্রহণ করতো না, আর নাচিয়েদেরও বড়ো সভ্য লোক বলে সহজে কেউ খাতির করতো না। উদয়শংকর এবং হরেন ঘোষ মিলে নাচের ওপরে লোকের রুচি ফিরিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করলেন। তাঁরা চাইলেন, ভারতকে এবং জগৎকে ভারতের শিল্পধারার রূপ সম্পর্কে অবহিত করে তুলতে। সেই উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে দল তৈরি হলো। দলটিকে সুষ্ঠু ও শিল্পসমৃদ্ধ করে তুলতে সহায়ক হলেন ওস্তাদ আল্লাউদ্দীন খাঁ, গুরু শংকরণ নম্বুদ্রী, গুরু আতম্বা সিং প্রভৃতি ভারতীয় সঙ্গীত ও ভিন্ন ভিন্ন নৃত্যধারার শ্রেষ্ঠ গুণীবৃন্দ। দলেতে তখন সম্মিলিত হলেন সিমকী, কনকলতা, দেবেন্দ্রশংকর, রবীন্দ্রশংকর, তিমিরবরণ, সিরালি, খগেন ও নগেন দে প্রভৃতি, যাঁদের প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত শিল্পকুশলতা ছিল অসাধারণ। আর উদয়শংকরকে ধরে সম্মিলিতভাবে সব্বাইকে নিয়ে যে দল গড়ে উঠেছিল, এমনটি আর কখনও হয়েছে বলেও জানা নেই। সেই দল পৃথিবীময় ভারতীয় সংস্কৃতি ও শিল্প-মহাত্ম্য সম্পর্কে নতুন চেতনার সঞ্চার করে দেশে ফিরে এলো। তারপর দলের অনেকে ছেড়ে দিলেন, কয়েকজন নতুন গুণীও আবার এসে দলে যোগ দিলেন। আবার উদয়শংকর বেরিয়ে গেলেন পৃথিবী পরিক্রমায়। ফিরে এসে আবার দলের রদ-বদল হলো। এইভাবে উদয়শংকর যতবারই বিদেশে গিয়েছেন, ফিরে এসে প্রতিবারই নতুন করে দল গঠন করতে হয়েছে তাঁকে। নতুনদের নিয়ে দল গড়েছেন বলে নালিশ ওঠবার কথা নয়, কিন্তু দেখা গেল যে, যত-বার তিনি নতুন দল তৈরি করেছেন, প্রতিবারই তিনি পূর্ববর্তীদের চেয়ে নিকৃষ্টতর শিল্পীদের গ্রহণ করেছেন। প্রত্যেক বিভাগের ক্ষেত্রেই একরকম নিয়মের মতোই উদয়শংকর এই ধারাটা পালন করে যাচ্ছেন। ফলে উদয়শংকরের প্রথম আবির্ভাবে যে সম্পদ সামনে তুলে ধরেছিলেন, ধারা-বাহিকভাবে তিনি তা হ্রাস করতে করতে আজ প্রায় নিঃস্ব অবস্থার মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছেন। শুনতে রূঢ় হলেও, না বলে পারা যাচ্ছে না যে, এখনকার উদয়শংকর সম্প্রদায় আগেকার কংকালটাই আঁকড়ে রেখে দিয়েছে। অত্যন্ত মর্মান্তিক সত্য একথাটা।

উদয়শংকরের ব্যক্তিগত শিল্প-প্রতিভা অনস্বীকার্য। আজ দেশে নাচের ওপরে লোকের যে ব্যাপক ঝোঁক দেখা দিয়েছে, সেটা তাঁরই জন্যে সম্ভবপর হয়েছে। সমাজের উচ্চতম আসরে নাচের আদর তিনিই ফিরিয়ে এনে দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর সে শক্তিটা তাঁর একার জোরের ওপরে ছিল না; দলের ভিন্ন ভিন্ন শিল্পীদের শক্তি আহরণ করেই তিনি শক্তিমান হয়েছিলেন। উদয়শংকরের নাচ দেখতে যাবার কথা মনে উঠলেই লোকে দেশের জনকতক শ্রেষ্ঠ শিল্পীকে একত্র দেখবার সৌভাগ্য হবে বলে
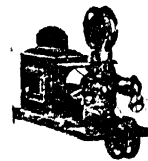
অপর নতুন সৃষ্টিটি হচ্ছে ব্যালে বা নৃত্যাভিনয়ে সিদ্ধার্থের মহাসন্ন্যাস, যার নাম রাখা হয়েছে 'দি গ্রেট রিনানসিয়েশন'। এতে কিছু কিছু নানা ধারার ভারতীয় নাচের মুদ্রা রাখা হয়েছে, নয়তো ভঙ্গী ও নৃত্যরেখা রচনা একেবারেই পাশ্চাত্ত্য ধারার। পট ও পরিবেশ সৃষ্টির কৌশলও ভারতীয় নৃত্যধারার আওতার বাইরেকার। দৃশ্যপটের ব্যবহার আমাদের কোন নাচেই পাওয়া যায় না। নাচের ভঙ্গী, মুদ্রাদি ও সঙ্গীতের সাহায্যে মনের ভাবকে পরিপুষ্ট করে তোলার বাহাদুরী নিয়েই ভারতীয় নাচ; কোন অবলম্বনের ধার দিয়েও যাবার দরকার করে না, যদি নাচের কৃতিত্ব থাকে। উদয়-শঙ্কর যে ব্যালে হাজির করেছেন, সেটা ভারতীয় নৃত্যধারাসম্মত নয়, অথচ ভারতীয় দল গড়ে ভারতীয় নাচ বলে এই সবই তিনি বিদেশে দেখিয়ে আসছেন।

বহুবার বিদেশে ঘুরে আসাতে ভারতীয় নাচিয়ে বলে উদয়শঙ্কর খ্যাতিমান সর্বত্রই। উদয়শঙ্কর যা উপহার দেবেন, বাইরের লোকে সেইটাই ভারতীয় বলে ধরে নেবে; উদয়শঙ্কর যা দিতে যাচ্ছেন, সেটা যে আসলে ভারতীয় নৃত্যধারার অন্তবর্তী নয়, সেটা বাইরের লোকে ধরতেই পারবে না। এটা বাঞ্ছনীয় অবস্থা নয় মোটেই। এই-ভাবেই শঙ্কর তাঁর প্রতিভা, তাঁর গৌরবকে অশ্রদ্ধেয় করে তুলছেন।

জেমিনীর মিঃ সম্পত চিত্রে পদ্মিনী

ধরে নিতো। উদয়শঙ্কর সম্প্রদায়ের তখন সেইটেই ছিল গৌরব। উদয়শঙ্কর তখন শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ ছিলেন, কিন্তু লোককে আকৃষ্ট করতেন দলের আরও অনেকেই। আজ সেই 'অনেকে'র আর কেউ নেই, আজ উদয়শঙ্কর একেবারেই একা—তিনিই শুধু আছেন, তাঁর দলের সে-গৌরব আর নেই আজ।

আগের নৃত্য-রচনার সবগুলিই আছে এখনও, কিন্তু আগের মতো লোককে পুলকিত করার শক্তি নেই কোনটিরই, কারণ শিল্পীরাই তেমন কৃতবিদ্ নন। স্বতই তাঁর নিজের নাচেও সে জৌলুস নেই। তাই নতুন নৃত্য-রচনাগুলিতে যান্ত্রিক কুশলতার সহায়তা গ্রহণের ছাপটাই বেশি স্পষ্ট। সঙ্গীতের জায়গা নিয়েছে তালমাত্রিক ধ্বনি, নৃত্যভঙ্গীর ওপর থেকে দৃষ্টিকে টেনে রাখার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে সাজ পোষাক এবং দৃশ্য পরিবেশের চমৎকারিত্বের ওপরে, আলোকসম্পাতের বিস্ময়কারিতায়।

পোষাককে কেন্দ্র করে অমলাশঙ্করের জন্যে একটি একক নাচই রচনা করা হয়েছে দেখা গেল। অপূর্ব শিল্পকাজ করা বিজনৌরের মেয়েদের এক সেট পোষাক নাচটি রচনায় প্রণোদিত করে। নাচটির নাম 'নিরীক্ষণ': পোষাকটাই হচ্ছে এই নাচে দেখবার যা কিছু। নাচের বিষয়বস্তুও তাই—গ্রামের যুবক এক চটুলা তরুণী পরিহিত পোষাকটার দিকে চেয়ে আছে মুগ্ধ হয়ে। ঢোলক-জাতীয় যন্ত্রে সুর-বর্জিত ধ্বনির সৃষ্টি করে পদভঙ্গীর তাল রেখে যাওয়া হয়েছে।

ভারতীয় নাচের প্রতি দুনিয়ার দৃষ্টি তিনি টেনে রেখেছেন, তাই তাঁর দেশের কাছে দায়িত্ব হচ্ছে আসল ভারতীয় নাচই শুধু সবায়ের সামনে তুলে ধরার; এদেশের সত্যিকারের গুণীদের নিয়ে গিয়ে বিদেশে ভারতীয় শিল্প-সম্পদের আসল রূপটা দেখিয়ে নিয়ে আসা। তাঁর গুরুস্থানীয় ওস্তাদ যাঁরা রয়েছেন, যাঁদের সামনে তাঁর নাচও নিষ্প্রভ, তাঁদের নিয়ে তিনি ঘুরে আসুন দেশে দেশে—নিজে না হয় নাইবা নাচলেন। বিদেশে নৃত্য পরিবেশনের যে অভিজ্ঞতা তিনি এতকাল ধরে অর্জন করে এসেছেন, সেইটেই তিনি কাজে লাগাতে থাকুন এবার থেকে। তাতে দেশের কাছে তাঁর গৌরব আরও বাড়বে; বাইরের লোকেও সত্যিকারের ভারতীয় নাচ দেখবার সুযোগ পাবে। নয়তো শিল্পগুণবর্জিত এখনকার মতো দল নিয়ে আর কদ্দিনই-বা তিনি চালাতে পারবেন?

ট্রামে-বাসে

শ্রীযুক্ত মবলঙ্কর নির্দেশ দিয়াছেন,—লোকসভায় বক্তৃতা দেওয়ার সময় সারাক্ষণ অধ্যক্ষের দিকে তাকাইয়া বক্তৃতা

দিতে হইবে। শ্যামলাল গান ধরিল—"নয়নে নয়ন দিয়ে, সারাদিন বসে থাকি।" তারপর অকস্মাৎ গান ছাড়িয়া মন্তব্য করিল—"কবি হারীন্দ্রনাথ কী বলেন, বড্ড মিইয়ে পড়ছেন মনে হচ্ছে, বেশ তো হচ্ছিল।"

* * * * *

পশ্চিমবঙ্গে রায়-মন্ত্রিসভার কলেবর বৃদ্ধির যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, একটি সাম্প্রতিক সরকারী বিবৃতিতে তার প্রতিবাদ করা হইয়াছে। "অবশ্য সামান্য ক'টি ঘণ্টার জন্যে হলেও মিনিস্টের কলেবর যথেষ্টই বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু অদেষ্টে ঘি নেই, সুতরাং ঠক্‌ঠকালে আর কী হবে"—মন্তব্য করেন বিশু খুড়ো।

* * * *

পশ্চিমবঙ্গ সরকার নাকি খদ্দরের "পবিত্রতা" রক্ষার জন্য একটি আইন প্রবর্তন করিবেন। বিশু খুড়ো বলেন—আইনের প্রয়োজন নেই. পুণ্ডরীকাক্ষকে স্মরণ করলেই বাহ্য এবং অভ্যন্তর শুচি হয়ে যায়। সাদা বাংলায় উড়ু খৈ গোবিন্দায় নমঃ বললেও চলবে।"

* * * * *

জনৈক শিকারী সম্প্রতি দুইটি পাগলা হাতীকে গুলী করিয়া হত্যা করায় জনৈক পত্রপ্রেরক এই নৃশংসতার প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে চাষের কাজের জন্য হস্তী সংরক্ষণের প্রয়োজন রহিয়াছে। শ্যামলাল একটি অসমর্থিত সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া শুনাইল—"মধ্য প্রদেশ সরকার হাতী দিয়ে চাষের যে পরিকল্পনা করেছেন তা কালো হাতী নয়, শ্বেত-হস্তী সুতরাং পত্রপ্রেরক নিশ্চিন্ত হতে পারেন।"

* * * * *

কলিকাতা কর্পোরেশন শুনিলাম অচিরেই পার্কে-ময়দানে ব্যাণ্ড বাজনার ব্যবস্থা করিবেন। জনৈক সহযাত্রী

বলিয়া উঠিলেন—"নাকের বদল নরুন পেলাম তাক্ ডুমা ডুম্ ডুম্!!

* * * * *

কানাডার এক সংবাদে প্রকাশ যে, সেখানে ছদ্মনামে কোন এক ব্যক্তি অনেক দিন ধরিয়া শল্য চিকিৎসা করিতেছিল। সম্প্রতি জানা গেল যে লোকটি চিকিৎসাশাস্ত্র কিছুই অধ্যয়ন করে নাই, কতদিন হাসপাতালের চাপরাশি ছিল মাত্র। বিশু খুড়ো বলিলেন—"এ ধরণের খবরের দাম আমাদের দেশে নেই। এখানে নাড়াবুনেরা বহুদিন আগেই কীর্তুনে হয়েছিল, সে কীর্তন এখনো শুধু চলছে না, বেশ জোর চলছে!"

* * * * *

আমেরিকার মহিলারা নাকি সরকারী দপ্তরখানায় Key Post-এর জন্য নবনির্বাচিত প্রেসিডেণ্টের নিকট আবেদন

পেশ করিয়াছেন।—"সম্ভব না হলে ভারতীয় নীতি অনুসারে চাবির গোছা দিয়ে দেখ্‌তে পারেন"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * * * *

ইফেল টাওয়ারের ডিজাইন মতো হ্যাট্ পরাই নাকি প্যারির সব চেয়ে আধুনিক ফ্যাসান। শ্যামলাল—"ভাগ্যিস আমাদের মেয়েরা হ্যাট্ পরেন না, নইলে অক্টারলনি মনুমেণ্টের অনুকরণে হ্যাট্ কেনার বায়না তারা ধরতেন। তবে হ্যাঁ, অক্টারলনি শাড়ীটা হয়ত নেহাৎ বেমানান হবে না; মনুমেণ্ট্ ফ্যাসানটা একেবারে অচল নয়!!"

* * * * *

বিলাতের লর্ডসভার কতিপয় সদস্য নাকি এই মর্মে আবেদন জানাইয়াছেন যে, রাণী এলিজাবেথের অভিষেক উৎসবে তাঁহাদিগকে যেন সাধারণ পোষাক পরিয়া যোগদান করিতে অনুমতি দেওয়া হয়, কেন না উৎসবের মর্যাদা অনুযায়ী পোষাক ক্রয়ের ক্ষমতা তাদের নেই। খুড়ো বলিলেন—"অনুমতি তাঁরা পেলে ভারত হয়ত চূড়ান্ত সস্তায় পোষাক সরবরাহ করতে পারবে। মেয়েদের বাঁধিপোতার গামছা এবং পুরুষদের কৌপীন নামক পোষাকটি লর্ডদের নিশ্চয়ই মনোমত হবে।"

খেলার মাঠে

ফুটবল

এই বৎসরের কলিকাতা ফুটবল লীগ চ্যাম্পিয়ান ও দিল্লী ক্লথ মিলস কাপ বিজয়ী ইস্টবেঙ্গল ক্লাব উপর্যুপরি দ্বিতীয়বারের নিখিল ভারত ডুরাণ্ড কাপ বিজয়ের সম্মানে ভূষিত হইয়াছেন। ডুরাণ্ড কাপ প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব রোভার্স কাপ প্রতিযোগিতার উপর্যুপরি তৃতীয়বারের বিজয়ী শক্তিশালী হায়দরাবাদ সিটি পুলিশ দলকে পরাজিত করিয়াই এই গৌরব অর্জন করিয়াছেন। ইহা প্রকৃতই আনন্দের ও প্রশংসার বিষয়। ডুরাণ্ড কাপ জয়লাভের জন্য আমরা ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের খেলোয়াড়গণকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও উল্লেখ করিতে আমাদের কোনরূপ দ্বিধাবোধ হইতেছে না যে, ইস্টবেঙ্গল ক্লাব এই সাফল্যের দ্বারা বোম্বাইর রোভার্স কাপ ও জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় এইবারে বাঙলা দলের পরাজয়ের কালিমা দূরীকরণেও সহায়ক হইয়াছেন। ইহারা বাঙলার ফুটবল খেলোয়াড়দের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

কোন কোন সংবাদপত্র ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের এই সাফল্যে কলিকাতার কতকগুলি ক্লাবের খেলোয়াড়ের সাহায্য গ্রহণ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, 'ইহা প্রকৃত ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সাফল্য বলা চলে না। বাঙলার সম্মিলিত দলের বলা উচিত।' ইহার উত্তরেও আমরা বলিতে পারি যে, এইরূপভাবে কলিকাতার বিভিন্ন দলের খেলোয়াড়দের সাহায্য গ্রহণ করিয়া ইতোপূর্বে বহু বিশিষ্ট ক্লাবই বাঙলার বাহিরের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছেন ও করিয়াও থাকেন। এমনকি এইবারেও বোম্বাই রোভার্স কাপ প্রতিযোগিতায় বাঙলার যোগদানকারী দলসমূহকে অনুরূপ সাহায্য গ্রহণ করিতে দেখা গিয়াছে। সুতরাং ডুরাণ্ড কাপ প্রতিযোগিতায় ইস্টবেঙ্গল ক্লাব রাজস্থান বা কালীঘাট ক্লাবের খেলোয়াড়গণের সাহায্য গ্রহণ করিয়া চিরপ্রচলিত নীতিরই অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র। তবে তাঁহারা এরিয়ান ক্লাবের সম্পূর্ণ নিজ দলের বাঙালী খেলোয়াড়গণ লইয়া ডুরাণ্ড প্রতিযোগিতায় যোগদান ও সেমি-ফাইনাল পর্যন্ত খেলিবার যোগ্যতা লাভের যে প্রশংসা করিয়াছেন, তাহাও আমরা সমর্থন করি। সম্পূর্ণ নিজ দলের খেলোয়াড় লইয়া সকলে প্রতিযোগিতায় যোগদান করে ইহাও আমাদের কাম্য সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা যখন সকল দল অনুসরণ করিতেছেন না, তখন ইস্ট-বেঙ্গল না করিয়া কিছুই অন্যায় করেন নাই। ভবিষ্যতে ইহারা যে নিজ দলের খেলোয়াড়দের উপর নির্ভর করিয়া বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবেন না ইহাই বা কে বলিতে পারে?

আই এফ এ শীল্ড ফাইন্যাল

আই এফ এ শীল্ড ফাইন্যাল সম্পর্কে আমরা যেরূপ সন্দেহ করিয়াছিলাম, ফলত তাহাই দাঁড়াইয়াছে। মোহনবাগান ক্লাব খেলিতে স্বীকৃত হইলেও রাজস্থান ক্লাব হইতেছেন না। তাঁহারা আই এফ এর ৩০শে সেপ্টেম্বরের পরে কোন দলকে খেলিতে বাধ্য না করিবার অক্ষমতার আইনের সাহায্য লইতেছেন। আই এফ এর পরিচালকমণ্ডলী বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছেন। তবে আমরা এখনও বলিতে বাধ্য যে, ইহার জন্য পরিচালকগণই দায়ী। তাঁহারা যদি ঐ দিন অথবা তাহার পরের এক দিন খেলার অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতেন, তাহা হইলে এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইত না। আই এফ এ শীল্ড ফাইন্যাল এইরূপ অবস্থায় এই বৎসরে আর অনুষ্ঠিত হইবে না ইহা ধরিয়া লইলেও কোনরূপ অন্যায় করা হইবে না।

লীগের অবতরণের অদ্ভুত সিদ্ধান্ত

আই এফ এর পরিচালকমণ্ডলীর সভ্যগণ দীর্ঘ তিন মাস গবেষণার পর প্রথম ডিভিসনের তিনটি দলের দ্বিতীয় ডিভিসনে অবতরণের নিষ্পত্তির সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা সত্যই হাস্যকর। নিজেদের অমার্জনীয় ত্রুটি ধামাচাপা দিবার জন্যই যে পরবর্তী মরসুমের প্রথমে খেলার ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইহা কাহারও উপলব্ধি করিতে কষ্ট হয় নাই। ইহার পর মরসুমের প্রথমে অন্য প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে দেখিলেও আমরা কোনরূপ আশ্চর্য হইব না।

বৈদেশিক ফুটবল দলের ভারত ভ্রমণ

বৈদেশিক ফুটবল দলের ভারত ভ্রমণ ব্যবস্থা সম্পর্কে আই এফ এর বেতনভুক সম্পাদক যেরূপ বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন, তাহা সত্যই উপভোগ্য। তিনি যুগোশ্লাভ দলের ভ্রমণ সম্ভাবনা সম্পর্কে উল্লেখ করিয়া সেই সঙ্গে সঙ্গে সুইডেন, জার্মানী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের ফুটবল দলের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার পর অস্ট্রিয়ার পেশাদার ফুটবল দলের আগমনের কথাও বলিয়াছেন। ইহারা যে কোন বৈদেশিক ফুটবল দলকে অসময়ে ভারতে আনিতে তথা বাঙলার ক্রীড়ামোদীদের অর্থ নষ্ট করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ইহা উপলব্ধি করিতে আর কাহারও দেরী হয় নাই। ইহারা আর্থিক দিক ছাড়া অন্য কোন বিষয় যে চিন্তা করেন না, ইহাও বিবৃতি হইতে প্রমাণিত হইয়াছে। এই সকল শ্রেণীর ফুটবল পরিচালকদের সম্মানিত গদীতে আর কতকাল রাখা হইবে সেই প্রশ্নই বর্তমানে আমরা করিতে চাহি। ইহারা যতদিন বর্তমান থাকিবেন, ফুটবল খেলার মরসুমে ক্রমশই বৃদ্ধি পাইবে ইহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই।

ক্রিকেট

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের প্রতিযোগিতা উপসমিতি রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার খেলার তালিকা প্রচারের সময় দৃঢ়তার সহিত অভিমত প্রকাশ করেন যে, কোন অবস্থাতেই রচিত কর্মসূচীর পরিবর্তন করা হইবে না ও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই প্রতিযোগিতার শেষ নিষ্পত্তি করা হইবে। এই সময় একমাত্র আমরাই প্রতিবাদে জানাই যে, উহা কার্যকালে কখনই অনুসৃত হইবে না—বহু অদল-বদল হইবে ও প্রতিযোগিতার শেষ নিষ্পত্তি নির্দিষ্ট সময়ে হওয়া অসম্ভব হইবে। ইহাতে অনেকেই বিরক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু বর্তমানে এই প্রতিযোগিতার বিভিন্ন খেলা যেভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহাতে আমরা যে যুক্তিহীন অভিমত প্রকাশ করি নাই তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। বিশেষ করিয়া বাঙলা বনাম বিহার দলের রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার খেলা ঠিক কবে যে হইবে, তাহা পরিচালকগণই বলিতে পারেন না। বেঙ্গল ক্রিকেট এসোসিয়েশন জানুয়ারী মাসে কোন এক সময় হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া বসিয়া আছেন। বাঙলার ক্রিকেট পরিচালকগণই ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কর্ণধার। সুতরাং তাঁহারাই যখন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের তালিকা ঠিকমত অনুসরণ করিতেছেন না, তখন অপর সকল [illegible] পরিচালকগণ করিবেন ইহা কোনরূপেই আশা করা যায় না। প্রতিযোগিতার শেষ নিষ্পত্তি [illegible] যে অসম্ভব হইবে, এই বিষয় আমাদের [illegible] কোন সন্দেহ নাই। প্রতিবারেই হকি [illegible] সময় যেভাবে রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার বিভিন্ন খেলা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, এ[illegible] তাহারই পুনরাবৃত্তি হইবে।

আগামী বৎসরে পাকিস্থান ভ্রমণের ব্যবস্থা

পাকিস্থান ক্রিকেট দলের ভারত ভ্রমণ [illegible] সূচী এখনও শেষ হয় নাই। কিন্তু ইতোমধ্যে এই দলের অধিনায়ক আগামী বৎসরে [illegible]

ক্রিকেট দলকে পাকিস্থান ভ্রমণের জন্য আমন্ত্রণ করিবেন বলিয়া বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন। পাকিস্থান ক্রিকেট দলের অধিনায়ক নিশ্চয়ই ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের কোন বিশিষ্ট কর্মকর্তার নিকট হইতে এই বিষয় সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাইয়াছেন। নতুবা তিনি এইভাবে হঠাৎ ভারতীয় দলের পাকিস্থান ভ্রমণের কথা উল্লেখ করিতে সাহসী হইতেন না। এই সংবাদ পাঠে আর কাহারও মনে কোন প্রশ্নের উদয় হইয়াছে কিনা জানি না, তবে আমাদের আশংকা হইতেছে, ইতিপূর্বে কমনওয়েলথ দল, অস্ট্রেলিয়া দল প্রভৃতির ভারত ভ্রমণ সম্পর্কে যে সকল সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় কার্যকরী হইবার সম্ভাবনা একেবারেই নাই। যদি ইহা সত্য হইয়া থাকে খুবই মঙ্গল। প্রতি বৎসর বিভিন্ন বৈদেশিক ক্রিকেট দলের ভারত ভ্রমণ ব্যবস্থায় সত্য সত্যই ভারতীয় সাধারণ ক্রীড়ামোদিগণ অতিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছেন। ভারতের দারিদ্র্যক্লিষ্ট জনসাধারণের অর্থে বৈদেশিক ক্রিকেট দলের তোষণনীতি আমরা কোন দিনই সমর্থন করি নাই এখনও করিতে পারি না।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভ্রমণ ব্যবস্থা

আগামী ২৭শে নবেম্বরের মাদ্রাজের ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সভায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভ্রমণকারী ভারতীয় দলের অধিনায়ক ও ম্যানেজার মনোনয়ন হইবে। এই সম্পর্কে ইতোমধ্যেই সাধারণ ক্রীড়ামোদিগণের মধ্যে নানা প্রকার আলাপ আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। অনেকেই আশা করেন, এই দলের অধিনায়ক হইবেন লালা অমরনাথ ও ম্যানেজার হইবেন ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুত কর্মকার। এই ভ্রমণ ব্যবস্থায় বিশেষ আর্থিক সংগতির কোন সম্ভাবনা নাই। সেইজনাই যিনি বৈদেশিক ভ্রমণকারী ভারতীয় দলের ম্যানেজার পদের একচেটিয়া ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি নাকি বিশেষ উৎসাহী নহেন। এই অভিমত কত খানি কার্যকরী হইবে বলা কঠিন। তবে লালা অমরনাথ যে অধিনায়ক হইবেন, এই বিষয় কোন সন্দেহ নাই। তিনি বর্তমানে বেকার। বৈদেশিক ভ্রমণকারী দলের অধিনায়ক হইলে তাঁহার ভারতের কোন না কোন স্থানে ক্রিকেট শিক্ষক নিযুক্ত হওয়া সহজ হইবে। ম্যানেজার হিসাবে শ্রীযুত কর্মকার মনোনীত হইলেও আশ্চর্যের বিষয় হইবে না। ইনি এইরূপ পদলাভের জন্য দীর্ঘকাল হইতেই আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন। তাহা ছাড়াও ইনি যে কণ্ট্রোল বোর্ড নিয়ন্ত্রণ গোষ্ঠীরই একজন। এক গোষ্ঠীর ব্যক্তি ছাড়া আর কাহারও ভাগ্যে এইরূপ বৈদেশিক ভ্রমণকারী ক্রিকেট দলের ম্যানেজার হওয়া অসম্ভব।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের অধিনায়ক

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভ্রমণকারী ভারতীয় ক্রিকেট দলের বিরুদ্ধে টেস্ট দলের অধিনায়ক হিসাবে জেফ স্টলমায়ারকে মনোনীত করা হইয়াছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজে বহু কৃতি খেলোয়াড় বর্তমান থাকিতে ইহাকে কেন অধিনায়ক করা হইয়াছে উপলব্ধি করিতে পারা গেল না। ইহার প্রকৃত পরিচয় নিশ্চয়ই ভ্রমণের সময় পাওয়া যাইবে। ইনি ভারত ভ্রমণ করিয়াছেন। সুতরাং ভারতীয় খেলোয়াড়গণ সম্পর্কে ইহার যথেষ্ট জ্ঞান আছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

গুজরাট বনাম বরোদা দল

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পশ্চিমাঞ্চলের প্রথম রাউণ্ডের খেলায় গুজরাট দল শক্তিশালী বরোদা দলকে পরাজিত করিয়া দ্বিতীয় রাউণ্ডে উন্নীত হইয়াছে। খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয় ও গুজরাট দল প্রথম ইনিংসে অগ্রগামী থাকায় বিজয়ীর সম্মানলাভ করে। অধিকাংশ তরুণ খেলোয়াড় দ্বারা গঠিত গুজরাট দলের এই সাফল্য সত্যই প্রশংসনীয়। এই খেলায় গুজরাট দলের তরুণ খেলোয়াড় এন জে কনট্রাক্টর উভয় ইনিংসে শতাধিক রান করিয়া বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছেন। ইনি সর্বপ্রথম রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া ব্যাটিংয়ে নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা ছাড়াও এই দলের তরুণ অধিনায়ক চৌকস খেলোয়াড় দীপক সোধন শতাধিক রান করিয়া নট আউট থাকিয়া ও বরোদা দলের প্রথম ইনিংসে ৯৮ রানে ৫টি উইকেট দখল করিয়াও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। বরোদা দলের অধিনায়ক বিজয় হাজারে গুজরাট দলের সাফল্যের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছেন। অদূর ভবিষ্যতে গুজরাট রাজ্য হইতে ভারতীয় ক্রিকেট দল কয়েকগুলি কৃতি ও চৌকস খেলোয়াড় লাভ করিবেন তাহার নিদর্শন এই খেলা হইতে পাওয়া গিয়াছে। ইহা খুবই আনন্দের বিষয়।

গুজরাট দল প্রথম ব্যাটিং লাভ করিয়া ৩৬৪ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করে। এন কনট্রাক্টর ১৫২ রান ও যতীন সোধন ৯৮ রান করেন। হাজারে ১০১ রানে ৬টি উইকেট দখল করেন। পরে বরোদা দল খেলিয়া ২৪৬ রান করেন। সি জি যোশী ১০৪ রান ও জে এম ঘোরপদে ৭৪ রান করিয়া ব্যাটিংয়ে নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। দীপক সোধন ৯৮ রানে ৫টি ও নয়ালচাঁদ ৫৮ রানে ৪টি উইকেট পান। গুজরাট দল প্রথম ইনিংসে ১১৮ রানে অগ্রগামী হইয়া দ্বিতীয় ইনিংসে ৪ উইকেটে ৪৫১ রান করিয়া ডিক্লেয়ার্ড করেন। ইউ ডি ভাগেলা ১০৭, এন জে কনট্রাক্টর ১০২ রান নট আউট ও দীপক সোধন ১১৯ রান নট আউট থাকেন। পরে বরোদা দল খেলিয়া চতুর্থ দিনের শেষে ৩ উইকেটে ২৭৭ রান করেন। ডি কে গাইকোয়াড়, বিচারে, সি জি যোশী, জি কিষেণচাঁদ প্রত্যেকের ব্যাটিং উল্লেখযোগ্য হয়। চারিদিনব্যাপী খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হইলে প্রথম ইনিংসের ফলাফলে জয়পরাজয় নিষ্পত্তি করিতে হয়।

খেলার ফলাফল—

গুজরাট প্রথম ইনিংস—৩৬৪ রান (এন কনট্রাক্টর ১৫২, জে এইচ সোধন ৯৮, ই এস মাকা ২৯, পি পাঞ্জাবী ২২, বিজয় হাজারে ১০১ রানে ৬টি উইকেট, জে এম ঘোরপদে ১২২ রানে ৩টি উইকেট পান।)

বরোদা প্রথম ইনিংস—২৪৬ রান (সি জি যোশী ১০৪, জে এম ঘোরপদে ৭৪, দীপক সোধন ৯৮ রানে ৫টি, নয়ালচাঁদ ৫৮ রানে ৪টি উইকেট পান।)

গুজরাট দ্বিতীয় ইনিংস—৪ উইঃ ৪৫১ রান ডিক্লেয়ার্ড (ইউ ডি ভাগেলা ১০৭, এন জে কনট্রাক্টর ১০২ রান নট আউট, দীপক সোধন ১১৯ রান নট আউট, পি পাঞ্জাবী ২৭, ই মাকা ২৩, ডি গাইকোয়াড় ৪০ রানে ১টি, হাজারে ৯৩ রানে ১টি, ঘোরপদে ১২২ রানে ১টি উইকেট পান।)

বরোদা দ্বিতীয় ইনিংস—৩ উইঃ ২৭৭ রান (বিচারে ৫৮, সি জি যোশী ৫৬ রান নট আউট, জি কিষেণচাঁদ ৭৬ রান নট আউট, নয়ালচাঁদ ৭৪ রানে ২টি ও লস্করী ১৪ রানে ১টি উইকেট পান।)

পাকিস্থান বনাম দক্ষিণাঞ্চল

হায়দরাবাদে পাকিস্থান বনাম দক্ষিণাঞ্চল দলের তিন দিনব্যাপী খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হইয়াছে। পাকিস্থান দল প্রথম ব্যাটিংয়ের সুযোগ লাভ করিয়া ৬ উইকেটে ৩৫১ রান করিয়া ডিক্লেয়ার্ড করে। এই খেলায় পাকিস্থান দলের প্রথম খেলোয়াড়দ্বয় নজর মহম্মদ ও হানিফ মহম্মদ উভয়ে শতাধিক রান করিয়া একত্রে প্রথম উইকেটে ২৪৮ রান করেন। উক্ত রান পাকিস্থান ভ্রমণকারী দলের প্রথম জুটীর নূতন রেকর্ড। ইতোপূর্বে কোন খেলাতেই পাকিস্থান দলের প্রথম খেলোয়াড়দ্বয় তত অধিক রান করিতে পারেন নাই। হানিফ এই খেলায় শতাধিক রান করিয়া ভ্রমণের চতুর্থ শতরান করিয়াছেন। দক্ষিণাঞ্চল দল ইহার পরে খেলিয়া প্রথম ইনিংসে ৬ উইকেটে ৩৫২ রান করিয়া ডিক্লেয়ার্ড করে। আদিশেষ, শ্যামসুন্দর, আইবরা, সূর্যনারায়ণ প্রভৃতি খেলোয়াড়গণ প্রত্যেকেই ব্যাটিংয়ে নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। পরে পাকিস্থান দল খেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংসে ২ উইকেটে ৪০ রান করিলে খেলার নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইয়া যায়।

খেলার ফলাফল—

পাকিস্থান প্রথম ইনিংস—৬ উইঃ ৩৫১ রান ডিক্লেয়ার্ড (নজর মহম্মদ ১৫৬ রান নট আউট, হানিফ মহম্মদ ১৩৫, ফজল মামুদ ১১ রান নট আউট, কানাইয়ারাম ৬৭ রানে ৩টি, কৃষ্ণ ৭৮ রানে ২টি উইকেট পান।)

দক্ষিণাঞ্চল প্রথম ইনিংস—৬ উইঃ ৩৫২ রান ডিক্লেয়ার্ড (শ্যামসুন্দর ৫৫, এল টি আদিশেষ ৮৫, সি গোপীনাথ ৩৫, আইবরা ৫৭, সূর্যনারায়ণ ৫৪ রান নট আউট, গোলাম আমেদ ২৭ রান নট আউট, খলিদ কুরেশী ১১৭ রানে ২টি উইকেট পান।)

পাকিস্থান দ্বিতীয় ইনিংস—২ উইঃ ৪৪ রান (ইমতিয়াজ আমেদ ২১, মকসুদ আমেদ ১৭ রান নট আউট, আইবরা ১১ রানে ১টি, সূর্যনারায়ণ ১১ রানে ১টি উইকেট পান।)

দেশী সংবাদ

১৭ই নবেম্বর—ভারতের খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী শ্রীরফি আমেদ কিদোয়াই অদ্য লোকসভায় ভারত সরকারের নূতন খাদ্যনীতি সম্পর্কে ঘোষণা করেন যে, সরকার চাউল ও গমের উপর বর্তমান নিয়ন্ত্রণ অক্ষুণ্ণ রাখার এবং বাজরা ও অন্যান্য মোটা দানার উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ শিথিল করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

শ্রীকরণ সিং কাশ্মীরের সদর-ই-রিয়াসৎরূপে নিযুক্ত হইবার পর আজ হইতে জম্মু ও কাশ্মীরের দীর্ঘকালের রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিল। অদ্য শ্রীকরণ সিং জম্মু ও কাশ্মীরের প্রথম সদর-ই-রিয়াসৎরূপে শপথ গ্রহণ করেন।

করিমগঞ্জের সংবাদে প্রকাশ, খাদ্যের দাবীতে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে ব্যাপক গণবিক্ষোভের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। পাকিস্থান যুব লীগের সম্পাদক জনাব মাহমুদ আলী সম্প্রতি কুমিল্লায় এক জনসভায় বলেন, 'পাকিস্থানের জনসাধারণ আজ উপবাসী।' তিনি জনগণকে মুসলিম লীগ সরকারের নির্বিকার মনোভাবের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইবার অনুরোধ জানান। শ্রীহট্ট শহরে এক জনসভায় শ্রীহট্টকে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত এলাকা বলিয়া ঘোষণা করার দাবী জানান হইয়াছে।

শিলিগুড়ির সংবাদে প্রকাশ, পূর্ববঙ্গের পাবনার অন্তর্গত একটি গ্রামে আন্সাররা জনৈক হিন্দু বিধবার নিকট হইতে তাহার একমাত্র পুত্রের শবদাহ করিবার পূর্বে 'সৎকার কর' বাবদ ৫৲ টাকা আদায় করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

আগামী ২৩শে নবেম্বর নিখিল ভারত পূর্ববঙ্গ দিবস পালনের আহ্বান জানাইয়া ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, ডাঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জি, শ্রীহেমন্তকুমার বসু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এক বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন।

১৮ই নবেম্বর—পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন আজ সাংবাদিকদের নিকট সরকারের নূতন খাদ্যনীতি বিবৃত করিতে গিয়া বলেন যে, ১৯৫৩ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে পশ্চিমবঙ্গে লেভি প্রথায় খাদ্য সংগ্রহ আরম্ভ হইবে এবং রেশন অঞ্চল ব্যতীত রাজ্যাভ্যন্তরে এক জেলা হইতে অন্য জেলায় খাদ্যশস্য আদান প্রদানে কোন বাধা থাকিবে না। কেবল রাজ্যের বাহিরে এবং রেশন এলাকায় খাদ্যশস্য চালানের ক্ষেত্রেই নিষেধাজ্ঞা থাকিবে।

লোকসভায় খাদ্যনীতি সম্পর্কে আলোচনাকালে প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু ঘোষণা করেন যে, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বহাল রাখা সম্পর্কিত বর্তমান মূলনীতি অপরিবর্তিত থাকিবে, এ বিষয়ে সরকার কৃতসংকল্প। তিনি আরও বলেন, খাদ্য পরিস্থিতির উন্নতি হইলেও, এমন কি যদি রপ্তানিযোগ্য উদ্বৃত্তও থাকে তথাপি মূলনীতির কোন পরিবর্তন হইবে না। এই দিন লোকসভায় খাদ্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত সরকারী নীতি অনুমোদিত হয়।

১৯শে নবেম্বর—আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিষ্ণুরাম মেধী অদ্য ঘোষণা করেন যে, ভারতের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে পাকিস্থানীরা ক্রমাগত যে লুঠতরাজ চালাইতেছে, তাহা বন্ধ করার জন্য আসাম সরকার এক শক্তিশালী সীমান্তরক্ষী বাহিনী গঠন করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

২০শে নবেম্বর—ভারতের খাদ্যমন্ত্রী জনাব রফি আমেদ কিদোয়াই আজ লোকসভায় ঘোষণা করেন যে, আগামী ১লা ডিসেম্বর হইতে চিনির মূল্য মণ করা ৪৲ টাকা হ্রাস পাইবে। অদ্য লোকসভায় চিনি উৎপাদন শুল্ক বিল গৃহীত হয়।

২১শে নবেম্বর—অদ্য লোকসভায় এক বিবৃতিতে প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু রাষ্ট্রপুঞ্জে উত্থাপিত কোরিয়া সংক্রান্ত ভারতের প্রস্তাবটি গ্রহণের জন্য বিশ্বের জাতিসমূহের নিকট আবেদন জানান।

কিষাণ-মজদুর-প্রজা দল ও ভারতীয় সমাজতন্ত্রী দলের সম্মেলনে যে নবগঠিত প্রজা সমাজতন্ত্রী দলের অভ্যুদয় হইয়াছে, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে উহার এড হক প্রদেশ কমিটিসমূহের গঠন সম্পন্ন হইয়াছে। অদ্য কলিকাতায় আচার্য জে বি কৃপালনীর সভাপতিত্বে প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের জাতীয় কার্যনির্বাহক সমিতির প্রথম দিনের বৈঠকে নেতৃবৃন্দের আলাপ-আলোচনায় উপরোক্ত তথ্য জানা যায়।

খড়্গপুরের সংবাদে প্রকাশ, শ্রীশান্তিপদ রায়ের নব পরিণীতা সালঙ্কারা স্ত্রী শ্রীমতী যূথিকারাণী রায়কে গতকল্য শেষ রাত্রি আড়াইটার সময় রিভলভারধারী একদল ডাকাত অপহরণ করিয়াছে।

২২শে নবেম্বর—লক্ষ্ণৌয়ে এক সাংবাদিক বৈঠকে প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু বলেন, পূর্ববঙ্গ দিবস পালন দ্বারা পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অনিষ্ট হইতে পারে এবং ভারতেও সংখ্যালঘুদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করিতে পারে।

২৩শে নবেম্বর—নিখিল ভারত পূর্ববঙ্গ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে কলিকাতার ময়দানে লক্ষাধিক লোকের এক বিরাট সভা হয়। প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের সভাপতি আচার্য জে বি কৃপালনী সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে পাকিস্থান সরকারের হিন্দু বিতাড়ন নীতির তীব্র নিন্দা করিয়া ভারত সরকারকে অবিলম্বে এই জরুরী সমস্যার সমাধান করিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করেন।

নয়াদিল্লীতে প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল, জনসংঘ, হিন্দু মহাসভা, আকালী দল ও ফরোয়ার্ড ব্লকের সমবেত উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জনসভায় গৃহীত একটি প্রস্তাবে পাকিস্থানের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধের দাবী করা হয়। পূর্ববঙ্গ দিবস উপলক্ষে আহূত এই জনসভায় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি প্রমুখ কয়েকজন বক্তা বক্তৃতা করেন।

বিদেশী সংবাদ

১৭ই নবেম্বর—কোরিয়ায় যুদ্ধবন্দী সমস্যার সমাধানের জন্য ভারত যে পরিকল্পনার খসড়া রচনা করিয়াছে, তাহাতে ১৭টি প্রস্তাব আছে। এই পরিকল্পনার মর্ম সম্পর্কে বিবেচনার জন্য অদ্য পুনরায় ২১টি জাতির প্রতিনিধিবৃন্দ এক বৈঠকে মিলিত হন। ভারতীয় পরিকল্পনা লইয়া রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রধান কার্যালয়ে বিভিন্ন জাতির প্রতিনিধিদের মধ্যে ব্যাপক আলোচনা হইয়াছে।

ওয়াশিংটনের সংবাদে প্রকাশ, বিশেষজ্ঞগণ অদ্য বলেন যে, এনিওয়েটকে একটি ক্ষুদ্রাকৃতি হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস।

১৮ই নবেম্বর—অদ্য অক্সফোর্ডে এর সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণকে আইন বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান করা হয়।

১৯শে নবেম্বর—উত্তর কোরীয় সরকার গতকল্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোরিয়ায় বিষাক্ত গ্যাস বোমা ব্যবহার ও জীবাণু যুদ্ধ চালাইবার অভিযোগ করিয়াছেন।

২০শে নবেম্বর—রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের রাজনৈতিক কমিটিতে কোরিয়ার যুদ্ধ বিরতি সংক্রান্ত অচল অবস্থার অবসানকল্পে ভারত যে প্রস্তাব রচনা করিয়াছে তৎসম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে।

দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন সরকারের জাতি বৈষম্য নীতি সম্পর্কে আলোচনার অধিকার রাষ্ট্রপুঞ্জের নাই বলিয়া দক্ষিণ আফ্রিকা যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছে, অদ্য ৬০টি রাষ্ট্র লইয়া গঠিত রাষ্ট্রপুঞ্জের বিশেষ রাজনৈতিক কমিটি ৬—৪৫ ভোটে উহা গ্রহণ করিয়াছেন।

২১শে নবেম্বর—বৃটেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ ইডেন আজ রাষ্ট্রপুঞ্জে পরিষদের রাজনৈতিক কমিটিতে ঘোষণা করেন যে, কোরিয়া সংক্রান্ত ভারতের প্রস্তাবটি বৃটেন সমর্থন করে।

২২শে নবেম্বর—কোরিয়ার অচলাবস্থা অবসানকল্পে ভারতবর্ষ যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছে, অদ্য রাষ্ট্রপুঞ্জ রাজনৈতিক কমিটিতে আরও কতিপয় প্রতিনিধি উহা সমর্থন করেন।

২৩শে নবেম্বর—অদ্য বাগদাদে প্রায় ২০ হাজার বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী বৃটিশ ও মার্কিন অফিসসমূহে অগ্নিসংযোগ করে। বিক্ষোভকারী ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে এবং উহার ফলে ৭ জন নিহত হয়। বিক্ষোভকারীরা বৃটিশ ও মার্কিন বিরোধী ধ্বনি উচ্চারণ করে এবং ১৭ বৎসর বয়স্ক রাজা দ্বিতীয় ফয়জলের অধীনে বর্তমান ইরাকী রাজ-শাসনের অবসান দাবী করে।

ভারতীয় মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা—।৶৹ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষাণ্মাসিক— ১০৲
পাকিস্থানের মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা (পাক্) ।৶৹ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষাণ্মাসিক—১০৲ (পাক্)
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২০শ বর্ষ
৬ষ্ঠ সংখ্যা

শনিবার,
২০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯

DESH Saturday, 6th December, 1952

সম্পাদক—**শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন** সহকারী সম্পাদক—**শ্রীসাগরময় ঘোষ**

সাময়িক প্রসঙ্গ

শাশ্বত-বাণী

গত ১৪ই অগ্রহায়ণ প্রাচীন বিদিশা এবং বর্তমান সাঁচীতে নবনির্মিত বিহারে বুদ্ধ-শিষ্য শারীপুত্ত এবং মহামৌদ্‌গলায়নের পূতাস্থি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে আহূত বৌদ্ধ সম্মেলনে বক্তৃতাদান করিতে গিয়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন যে, "বুদ্ধের বাণী প্রয়োগের দ্বারা পৃথিবীকে তাহার বর্তমান সংকট হইতে কতখানি উদ্ধার করা যাইবে, তাহা তিনি জানেন না; কিন্তু কোন অভিনব ঘটনা নিশ্চয়ই ঘটিবে; কারণ পৃথিবীর ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে।" প্রধানমন্ত্রীর এই উক্তি শুনিয়া সাধারণতঃ এই প্রশ্নই আমাদের মনে উদয় হয় যে, এই নূতন অধ্যায়টি কি? পৃথিবীর এই নূতন অধ্যায় মরণের বিভীষিকাই মানুষের মনে সৃষ্টি করিতেছে, না আনিতেছে নূতন আলোক? এ প্রশ্নের উত্তর সম্ভবতঃ এই যে, মরণের বিভীষিকার মধ্যে জীবনের ঈষৎ আলোকও ফুটিয়া উঠিতেছে। জগৎ-জোড়া ভেদ-বিদ্বেষ এবং ঈর্ষাজনিত দ্বন্দ্ব ও সংঘাত সত্ত্বেও বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে নৈকট্য নিবিড় হইয়া পড়িতেছে এবং ব্যবধান বিলুপ্ত হইতেছে। কিন্তু এই নৈকট্য যদি পরস্পরের মধ্যে একাত্মতা জাগাইতে না পারে তবে ধ্বংস অনিবার্য। বস্তুতঃ ভগবান্ বুদ্ধের জীবন এবং তাঁহার বাণীই বর্তমান ক্ষেত্রে মানব জাতিকে সংকট হইতে রক্ষা করিতে পারে। শাশ্বত সে বাণী বিলুপ্ত হয় নাই। সুর তাহার এখনও বাজিতেছে এবং সেই সুরের প্রাণময় ঝংকার যুগ যুগ ধরিয়া ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে। ভারতের আধুনিক যুগের যে হিন্দু সংস্কৃতি তাহার প্রাণস্বরূপ এখনও কাজ করিতেছে বৌদ্ধধর্মেরই প্রভাব। বুদ্ধ-প্রবর্তিত শুদ্ধ মননমূলক সাধনা ভারতের বর্তমান হিন্দু ধর্মের মধ্যেই আপনার স্বাতন্ত্র্য মিশাইয়া দিয়াছে। তাহার ফলে ভারতের সংস্কৃতি জড় প্রভাবের অন্ধ অনুরক্তি হইতে রক্ষা পাইয়াছে। সেখানে মানুষের মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতের পুরাণকার ভগবান্ বুদ্ধকে শ্রীভগবানের দশাবতারের মধ্যে নবম অবতারস্বরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন এবং তাঁহার নিত্য-নৈমিত্তিক পূজা ও কর্তব্য বলিয়া বিহিত করিয়াছেন। বুদ্ধ মূর্তির নিকট ভারতের অবৌদ্ধ জনসাধারণ শতাব্দীর পর শতাব্দী পরম শ্রদ্ধায় শির নত করিয়া আসিতেছে। ফলতঃ ভগবান্ বুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে ভারতের প্রাণদেবতারূপে এখনও প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন এবং একথা সত্য যে, নিউইয়র্ক বসিয়া বিশ্বপণ্ডিতগণ বিশ্বের শান্তি সমস্যার সমাধান করিতে পারিবেন না। প্রত্যুত ভগবান্ বুদ্ধের মৈত্রীর আদর্শকে মানব-সমাজে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়া মানুষের অন্তরের গ্লানি আগে দূর করিতে হইবে। ফলতঃ তৃষ্ণার আগুন ভিতরে যেখানে জ্বলিতেছে, সেখানে বাহিরের বিধি-ব্যবস্থা কোনই কাজে আসিবে না। আধুনিক যুগেও ভারত এ কথা বিস্মৃত হয় নাই। ভারতের মনীষী ভক্ত এবং সাধকগণ এই সত্য সম্বন্ধে এ যুগেও জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের বাণী এবং সাধনায় আমরা শাশ্বত সেই সত্যেরই সাড়া পাইয়াছি, গান্ধীজী তাঁহার জীবন-দানের ভিতর দিয়া সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধশিষ্য শারিপুত্ত এবং মহামৌদ্‌গলায়নের পবিত্র দেহাস্থি প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়া সেই শাশ্বত বাণীর ছন্দই বিশ্বের আকাশে বাতাসে ঘোষবান্ হইবে। সুরটির গতি অবশ্য সূক্ষ্ম, এবং সকলের কাণে হয়ত তাহা বাজিবে না। কিন্তু মানবতার বেদনায় অন্তর যাঁহাদের উজ্জ্বল হইয়াছে, তাঁহাদের কাণে সে বাণীর ধ্বনি জাগিবে এবং অমৃতের আস্বাদনে তাঁহা-দিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবে। বিভিন্ন দেশ এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে এই শ্রেণীর সাধকদের জাগরণে সঙ্ঘশক্তির সৃষ্টি হইবে। আশা এই যে, সঙ্ঘই এই বিশ্ববাসীকে সত্যকার সুখের পথ দেখাইবে। সত্যের জন্য তাপ জাগাইয়া এইসব সাধকরাই পারস্পরিক প্রীতি এবং সদ্ভাবকে জীবন-সাধনায় বিশ্বের সর্বত্র সত্য করিয়া তুলিবেন। বুদ্ধভূমি ভারতে এই সঙ্ঘশক্তির উদ্বোধন ঘটিতেছে, আমরা লক্ষ্য করিতেছি। ইহা আমাদের পক্ষে সত্যই আনন্দ এবং গর্বের বিষয়।

কাপড়ের বাজারে অব্যবস্থা

মিলগুলিতে তাহাদের ধুতির উৎপাদন পরিমাণ শতকরা ৪০ ভাগ হ্রাস করিতে হইবে, ভারত সরকার হইতে এই বিধান প্রবর্তিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবার ফলে কাপড়ের দাম বাড়িয়া যাইবে। সুতরাং জনসাধারণের দিক হইতে এমন ব্যবস্থায় সন্তোষের কারণ না ঘটিয়া বিক্ষোভেরই কারণ সৃষ্টি হইবে। পক্ষান্তরে এই ব্যবস্থায় বস্ত্রব্যবসায়ীদেরও সুবিধা কিছুই নাই; কারণ, বর্তমান মূল্যে দিয়াই জনসাধারণ যথেষ্ট পরিমাণে কাপড় কিনিতে পারিতেছে না। ইহার উপর কাপড়ের দাম যদি আরও বৃদ্ধি পায়, তবে বাজারের কাপড় কাটতির পরিমাণ আরও কমিয়া যাইবে। তাঁত-শিল্পকে সুবিধা দিবার উদ্দেশ্যেই কর্তৃপক্ষ এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন এবং কারণও তাহার বোঝা যায়। মাদ্রাজের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুত রাজগোপালাচারী মহাশয়ের চাপে পড়িয়াই তাঁহাদিগকে এই কাজ করিতে হইয়াছে তাহা বুঝিতেও বেগ পাইতে হয় না

মাদ্রাজের বিভিন্ন রাজনীতিক দলের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে তাঁত-শিল্প সংরক্ষণে এইরূপ নীতি অবলম্বন করিলে কংগ্রেস সুবিধা পাইবে, চক্রবর্তী রাজগোপালাচারী এইরূপ মনে করিয়াই এ বিষয়ের জন্য ভারত সরকারের উপর কিছুদিন হইতে ক্রমাগত চাপ দিতেছিলেন। সেই চাপে পড়িয়াই ভারত সরকারকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে এই নীতি অবলম্বন করিতে হইয়াছে। প্রত্যুত তাঁত এবং মিলের উৎপন্ন বস্ত্রের প্রতিযোগিতার সমস্যা সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া একটি সামঞ্জস্যমূলক নীতি নির্ধারণের উদ্দেশ্যে কিছুদিন পূর্বে ভারত সরকার একটি কমিটি নিযুক্ত করেন। মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রীর পীড়াপীড়ির জন্য তাঁহারা উক্ত কমিটির সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় থাকিবারও অবসর পান নাই। কিন্তু মিলের ধুতি উৎপাদনের সংখ্যা এইরূপ ব্যাপকভাবে হ্রাস করিবার ফলে তাঁত শিল্পের যে কি সুবিধা হইবে, বুঝিয়া উঠা দুষ্কর। বস্তুত তাঁতের কাপড় কিনিতে লোকের আপত্তি নাই। লোকে তাঁতের কাপড়ের চেয়ে মিলের কাপড় সস্তায় পায় বলিয়াই তাহারা তাহা ক্রয় করে। কিন্তু কাপড়ের দর বৃদ্ধি পাইবার ফলে লোকের ক্রয়-সামর্থ্যই যদি না থাকে তবে তাঁতের ব্যবসা যে সমধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে ইহা তো সহজ কথা। প্রকৃতপক্ষে মিহি, মাঝারী, মোটা, সব রকমের ধুতির উৎপাদন হ্রাস না করিয়া, যদি মিহি ধুতির বাজারে তাঁত-শিল্পকে সুবিধা দেওয়া হইত, তবে সরকারের অবলম্বিত ব্যবস্থায় বরং কিছুটা সাফল্যের সম্ভাবনা ছিল। ও সেক্ষেত্রে অর্থশালী ব্যক্তিরা সৌখীনতার জন্যই তাঁতের মিহি কাপড় কিনিতেন। ফলত, সেই ব্যবস্থায় সাধারণভাবে ধুতির দাম বাড়িবার কারণও তেমন থাকিত না। কিন্তু বর্তমানের অবলম্বিত ব্যবস্থার ফলে ইহাই দাঁড়াইবে যে, কাপড়ের দামই শুধু বাড়িবে, তাঁত শিল্পের সুবিধা কিছুই হইবে না। প্রকৃতপক্ষে তাঁত শিল্পের উন্নয়ন অর্থাৎ তাঁতে উৎপন্ন কাপড়ের কাটতি যদি বাড়াইতে হয়, তবে তাঁতের কাপড়ের দাম যাহাতে কমে, তেমন ব্যবস্থাই করা দরকার। মিলওয়ালার কোন সম্মোহন-প্রভাবে পড়িয়া লোকে তাঁতের কাপড়ের প্রতি বিরাগী হইয়া উঠিয়াছে, এমন ধারণাও সত্য নয়। বস্তুতঃ তাঁতের কাপড়কে এদেশের লোকে স্বভাবতই সৌখীনতার দৃষ্টিতে দেখে এবং মিলের কাপড়ের চেয়ে তাঁতের কাপড় কিনিবার দিকে তাহাদের ঝোঁকও বেশী। এরূপ অবস্থায় তাঁত শিল্পের জন্য অপেক্ষাকৃত সুলভে সুতার ব্যবস্থা, সুবিধাজনক হারে শিল্পীদের ঋণ দান এবং ক্রেতাদের কাছে উপযুক্তভাবে মাল উপস্থিত করা প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি দেওয়াই কর্তৃপক্ষের কর্তব্য ছিল। তাঁহারা বর্তমানে যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা একান্তই অবিবেচিত হইয়াছে। ইহার ফলে কাপড়ের বাজারে অব্যবস্থার সৃষ্টি হইবে এবং জনসাধারণের স্বার্থে আঘাত পড়িবে। সুতরাং তাড়াহুড়া করিয়া এমন নীতি অবলম্বন করা কর্তৃপক্ষের উচিত হয় নাই। আমাদিগকে এই কথাই বলিতে হইতেছে।

দুর্গত সুন্দরবন

পরিকল্পনা কমিশনের উপদেষ্টা শ্রীযুত রামমূর্তির নেতৃত্বে একটি কমিটির তিনজন সদস্য সম্প্রতি কলিকাতায় আগমন করেন। তাঁহারা দুই দিন সুন্দরবন অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। শুনিতেছি, সুন্দরবন অঞ্চলের উন্নয়ন-ব্যবস্থা ভারত সরকারের পাঁচসালা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রস্তাব হইয়াছে, এই সম্পর্কেই এই কমিটি নিযুক্ত করা হইয়াছে। সুন্দরবন অঞ্চলের রাজনীতিক এবং অর্থনীতিক গুরুত্ব বিশেষভাবেই রহিয়াছে। উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে এই অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের শস্যভাণ্ডারে পরিণত হইতে পারিত; কিন্তু তৎপরিবর্তে এই অঞ্চল চির দুর্ভিক্ষের লীলা-নিকেতন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিছুদিন পূর্বে কলিকাতা কর্পোরেশনের একটি সভায় বিশ্বস্তসূত্রে প্রকাশ পাইয়াছে যে, গত এপ্রিল হইতে নবেম্বর মাস পর্যন্ত মোট ২৬৮৫ জন নিঃস্ব কলিকাতার ফুটপাথে জীবন-লীলা সাঙ্গ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে সুন্দরবনের দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলের নরনারীরা কিছু সংখ্যায় আছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কয়েক বৎসর পূর্বে সুন্দরবন উন্নয়ন কমিটি নামে একটি কমিটি গঠন করিয়াছিলেন; কিন্তু সেই কমিটির দ্বারা কোন কাজই হয় নাই, অথবা যদি কিছু হইয়া থাকে দেশের লোকে সে সম্বন্ধে কিছুই জানে না। উক্ত কমিটির সব কর্মতৎপরতা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দপ্তরখানার কবুতর-কক্ষে কীটদষ্ট হইতেছে। এরূপ অবস্থায় সুন্দরবনের উন্নয়নের জন্য ভারত সরকারের তৎপরতা খুবই আশার কথা সন্দেহ নাই। রামমূর্তি কমিটির কাজের ফল কতটা কি দাঁড়াইবে, আমরা বলিতে পারি না; কিন্তু উক্ত কমিটির কাজ যেরূপভাবে সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে, তাহাতে আমাদের আশা এবং উৎসাহ অনেকটাই স্তিমিত হইয়া পড়ে। কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত রামমূর্তি বলিয়াছেন, তাঁহাদের কর্তব্য সুন্দরবন অঞ্চলের পানীয় জল, রাস্তাঘাট সংস্কার এবং আগামী দুই বৎসরের জন্য লোককে কিভাবে কাজ দেওয়া যায় ইহাই। এই কয়টি বিষয়ের মধ্যেই তাঁহাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকিবে। রাস্তাঘাট, পানীয় জল এবং বেকারদের জন্য কাজের সংস্থান প্রভৃতি তত্ত্বাবধানের প্রয়োজনীয়তা আমরা অস্বীকার করিতেছি না; কিন্তু যে কারণে সুন্দরবন আজ দুর্গত অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে, তাহা স্বতন্ত্র। বস্তুত সুন্দরবন অঞ্চলকে শস্যশালিনী করিতে হইলে বাঁধ সমস্যার প্রতি সর্বাগ্রে দৃষ্টি দিতে হইবে এবং বাঁধ ভাঙিয়া লোনা জলের প্লাবন যাহাতে না ঘটে, তাহা দেখিতে হইবে এবং এই দুইটি ব্যবস্থা সর্বাংশে সার্থক করিতে হইলে ভূমিব্যবস্থার পরিবর্তনও বিশেষভাবেই প্রয়োজন। এই সব ব্যবস্থা সম্বন্ধে যথাযথ উপায় নির্ণয় করিবার পক্ষে উপযুক্ত অঞ্চলের প্রতিনিধিস্থানীয় বেসরকারী ব্যক্তিদের পরামর্শ এবং সহযোগিতা গ্রহণ করাও দরকার। প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্থানীয় কর্মচারীদের উপর জনসাধারণের বিশ্বাস নাই। কিছুদিন পূর্বে ভারত সরকারের খাদ্যসচিব জনাব কিদোয়াই এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল যখন এই অঞ্চল পরিদর্শনে গমন করেন, তখন এই সব কর্মচারীরা যেভাবে কাজ করিয়াছিলেন, তৎসম্পর্কে নানা অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে। আমরা আশা করি, নবনিযুক্ত কমিটির কাজে সেই ধরণের অভিযোগ উত্থাপনের কোন কারণ ঘটিবে না এবং ভারত সরকার হইতে নিযুক্ত কমিটির কাজে দুর্গত সুন্দরবনের উন্নয়নকার্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ঔদাসীন্য এবং ত্রুটির পুনরাবৃত্তি আমাদিগকে ব্যথিত করিবে না। সুন্দরবন অঞ্চলের দুর্ভিক্ষপীড়িত সম্পন্ন কৃষক গৃহস্থেরা আজ ভিক্ষুকে পরিণত হইয়াছে। তাহারা কলিকাতা শহরের লোকের দ্বারে দ্বারে হাত পাতিয়া ক্ষুদ-কুঁড়া মাগিয়া খাইতেছে এবং পরিশেষে কেহ কেহ অন্নাভাবে পথে পড়িয়া

প্রাণ দিতেছে; এ দৃশ্যের যবনিকাপাত হয়, আমরা ইহাই দেখিতে চাই।

সরকারী নীতি ও যুক্তি

ভারতের স্বরাষ্ট্র সচিব ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু ত্রিপুরা, মণিপুর এবং আসাম পরিদর্শনে যাইবার পথে গত ২৯শে নবেম্বর কলিকাতায় আগমন করেন। ঐ দিবস অপরাহ্ণকালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির অফিসে তিনি কংগ্রেসকর্মীদের এক সভায় পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। পূর্ববঙ্গ সরকারের অবলম্বিত নীতির ফলে পশ্চিমবঙ্গে যে সব সমস্যা দেখা দিয়াছে, তাঁহার আলোচনায় সেগুলি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিল। ছাড়-পত্র প্রথা উল্লেখ করিয়া ডাঃ কাটজু বলেন, এক মাস হইতে চলিল উভয় বঙ্গের মধ্যে ছাড়পত্র প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছে। এখন স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, ইহার ফলে ভারত বা পাকিস্থানে কাহারও কোন কল্যাণ সাধিত হয় নাই। এ ব্যবস্থায় ভাল কিছুই হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে এই প্রথা যদি রহিত হয় এবং উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে পূর্বের অবস্থা ফিরিয়া আসে, তবে ভারত সরকার বাস্তবিকপক্ষে খুসীই হইবেন। কিন্তু স্বরাষ্ট্র সচিবের অভীপ্সিত সে অবস্থা ফিরিবে কিভাবে, ইহাই হইতেছে সাধারণের পক্ষে প্রশ্ন। ডাঃ কাটজুর আশা এই যে, এক-দিন এমন দিন আসিবে, সে সময় ভারত এবং পাকিস্থান সরকার উভয়েই এই প্রশ্নটির সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করিবার প্রয়োজন উপলব্ধি করিবেন। আপাততঃ তিনি এই কথা বলিতে পারেন যে, ভারত এবং পাকি-স্থান এই উভয় রাষ্ট্রের অধিবাসীরা যদি নিজের অধিকার সংরক্ষণে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হন, তাহা হইলে উভয় সরকারই এ বিষয়ে উদ্যোগী হইবেন। ডাঃ কাটজুর মতে ভারত এবং পাকিস্থান উভয় রাষ্ট্রের জনমত যদি ছাড়পত্র-প্রথা রহিত করিবার জন্য সুস্পষ্ট এবং শক্তিশালী হইয়া উঠে, তাহা হইলে কোন সরকারই সে দাবী উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। প্রকৃতপক্ষে সংকট তো এইখানেই দেখা দিয়াছে। ভারত, বিশেষভাবে পশ্চিমবঙ্গের জনমত আগাগোড়াই ছাড়পত্র-প্রথা প্রবর্তনের বিরোধী, ভারত সরকার ইহা যথেষ্টভাবেই অবগত আছেন। কিন্তু এই জনমত হয়ত ভারত সরকারকে জাগ্রত করিবার পক্ষে যথেষ্ট সুস্পষ্ট এবং শক্তিশালী নয়; কিন্তু জনমতের সুস্পষ্টতা বা শক্তিমত্তার পরি-মাপই বা হইবে কিসে? পাকিস্থান সরকারের কোন নীতির বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট এবং শক্তিশালীভাবে জনমতের অভিব্যক্তি করিতে গেলেই' ভারতের প্রধানমন্ত্রী কার্যতঃ অসহিষ্ণু হইয়া উঠেন এবং সাম্প্র-দায়িক অনর্থ সৃষ্টির জন্য উত্তেজনার পরিচয় পান। অধিকন্তু পাকিস্থান সরকার অবলম্বিত নীতি সম্বন্ধে তাঁহাদের কিছুই করিবার নাই, এই কথাই শুনাইয়া দেন। এরূপ অবস্থায় জনমতকে আরও যদি শক্তি-শালী করিয়া তুলিতে হয়, তবে তো আরও বিপদের কথা। প্রকৃতপক্ষে ভারত, পাকি-স্থান চুক্তি সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা হয়, ইহা, যদি ভারতের স্বরাষ্ট্র সচিবের সত্যই যদি অভিপ্রেত হয় এবং ছাড়পত্র-প্রথা ভারতের পক্ষে অনিষ্টকর হইয়াছে, এই বিশ্বাস তাঁহার আন্তরিক হইয়া থাকে, তাহা হইলে ভারত সরকারকে এ সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করিবার জন্য পরামর্শ দেওয়াই তাঁহার পক্ষে উচিত। পাকিস্থানী পূর্ববঙ্গের জনমত সম্বন্ধে পাকিস্থান সরকার কিরূপ মতিগতি অবলম্বন করিবেন, সে কর্তব্য পাকিস্থান সরকারের, পরন্তু পশ্চিমবঙ্গের জনমতের মর্যাদা এবং পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থ-সংরক্ষণে ভারত সরকারের কর্তব্য। বস্তুতঃ পাকিস্থান সরকার কি করিবেন না করিবেন সেদিকে তাকাইয়া ভারতের জনমতকে অনির্দিষ্ট-কালের অপেক্ষায় চাপা দেওয়া কিংবা ভারতের স্বার্থকে উপেক্ষা করা কোনক্রমেই ভারত সরকারের কর্তব্য হইতে পারে না। ভারত এবং পাকিস্থান উভয় রাষ্ট্রের কোন নীতি সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন যদি একান্ত হইয়া থাকে, তবে এক পক্ষকে আগাইয়া যাইতে হইবে এবং অন্যায় বিরুদ্ধতার প্রবৃত্তিই সেক্ষেত্রে কর্তব্য-বোধকে জাগ্রত করিবে। যে পক্ষই উদ্যোগী হোন্ না কেন। ডাঃ কাটজু বলিতেছেন, ছাড়পত্র-প্রথা প্রবর্তনের ফলে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের সমাগমের ভিড় দেখিয়া তিনি আতঙ্কিত হইয়াছিলেন এবং ১৯৫০ সালের ভয়াবহ স্মৃতিই তাঁহার মনে জাগ্রত হইয়াছিল। আমাদের প্রশ্ন এই যে, সেই ভয়ের কারণ কি দূর হইয়াছে? ছাড়পত্র-প্রথার কড়াকড়ির আড়ালে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, ভারত সরকার সম্যকরূপে তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতেছেন না। আমরা এই কথাই বলিব। পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ লক্ষ হিন্দুর স্বার্থ পূর্ববঙ্গের সঙ্গে জড়িত, যেখানে তাঁহাদের আত্মীয়স্বজন রহিয়াছে, ধনসম্পদ আছে, সেইরূপ পূর্ববঙ্গের বহু মুসলমানের আত্মীয় স্বজন, ধনসম্পত্তি পশ্চিমবঙ্গে আছে, যে নীতি দীর্ঘদিনের এই সম্পর্ক ছেদন করিয়া জনগণের মধ্যে অশান্তি, উপদ্রব এবং অনর্থ সৃষ্টি করে, তেমন নীতির বিরুদ্ধে কার্যতঃ কোন ব্যবস্থা অবলম্বন না করিয়া শুধু ভবিষ্যতের ভরসা দেখানো রাজনীতি কিংবা মানবধর্ম—কোন দিক হইতেই সঙ্গত হইতে পারে না।

পাকিস্থান সরকারী নীতি

ভারতীয় লোকসভায় পশ্চিমবঙ্গ উদ্বাস্তু সম্পত্তি বিধির ত্রিপুরা রাজ্যের সম্পর্কিত বিলটি পরিগৃহীত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিগণ এই বিলের বিরোধিতা করিয়া-ছিলেন। স্বরাষ্ট্র সচিব ডক্টর কাটজু বিরোধী পক্ষের সমালোচনার উত্তরে বলেন, পশ্চিম-বঙ্গ এবং আসামে এইরূপ বিধান পূর্ব হইতেই প্রবর্তিত হইয়াছে, শুধু ত্রিপুরা রাজ্যের সম্পর্কেই বিলটি উপস্থিত করা হইয়াছে এবং ছাড়পত্রের সহিত এই বিলের কোন সম্পর্ক নাই। ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিবের যুক্তি আমরা বুঝিলাম; কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তিকে পূর্ণাঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যেই যে ভারত সরকার এই বিলটি উপস্থিত করেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পাকিস্থান এবং ভারত সরকার এই উভয় পক্ষের মধ্যে উক্ত চুক্তি হয়। এক পক্ষ যদি চুক্তি ভঙ্গ করেন, তবে অপর পক্ষের চুক্তি প্রতিপালনে দায়িত্ব থাকে কি? পাকিস্থান সরকার দিল্লী চুক্তি প্রতিপালনে কোন দিনই আন্তরিকতা প্রদর্শন করেন নাই। পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে ছাড়পত্র-প্রবর্তনের দ্বারা তাঁহারা কার্যতঃ সাক্ষাৎ-সম্পর্কে নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন। ছাড়পত্র-প্রবর্তনের ফলে পূর্ব-বঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে লৌহ-যবনিকা আপতিত হইয়াছে। এমন অবস্থা সত্ত্বেও নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তিকে গুরুত্ব দানের জন্য ভারত সরকারের গরজে পাকিস্থান সরকার কর্তৃক ছাড়পত্র-প্রবর্তনের কার্যত সমর্থনই সূচিত হয়, অধিকন্তু পূর্ববঙ্গ হইতে সংখ্যা-লঘু সম্প্রদায়কে উৎসাদনের জন্য পাকি-স্থান সরকারের অবলম্বিত নীতির তাঁহারা পরিপোষক না হইলেও প্রতিবাদী যে নহেন, ইহাই প্রতিপন্ন হয়।

শিল্পাচার্য নন্দলাল

১৮ই অগ্রহায়ণ শিল্পাচার্য শ্রীযুত নন্দলাল বসু সপ্ততিতম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। আমরা এই উপলক্ষে তাঁহাকে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি।

মানুষের জীবনের মূলে কি অনন্ত শক্তি সম্পুটিত থাকে এবং কেমন বিভিন্ন গতি-পথে সেই শক্তি বিচিত্র রূপে বিকশিত হইয়া বিশ্বকে বিস্মিত এবং শ্রদ্ধিত করিয়া তোলে, কে তাহার স্বরূপ নির্ণয় করিবে? ১২৯০ বঙ্গাব্দে মুঙ্গেরের অন্তঃপাতী খড়্গপুরে যে শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, উত্তরকালে তাঁহার শিল্প-সাধনা রূপে, রসে, বর্ণে, ছন্দে বিচিত্র বৈভব বিস্তার করিয়া বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চিরসুন্দরকে তিনি রেখার বন্ধনে বন্দী করেন। তাঁহার তুলিকা শিবজটা-বিনির্গত গঙ্গাধারার মত শ্যামল শোভায় এ দেশের সংস্কৃতিকে সরস এবং সঞ্জীবিত করিয়া রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী সার্থক করিয়া তোলে। ইনিই আমাদের বঙ্গ-জননীর আদরের সন্তান আচার্য নন্দলাল।

শৈশব হইতেই বীণাবাদিনীর স্বর-লহরীর ঝঙ্কার নন্দলালের অন্তরে বাজিয়া উঠিয়াছিল। সেই সুরে মাতিয়া বালক সনাতন আনন্দের সম্বন্ধ খুঁজিতেছিল। বাঁশী কোথায় বাজে, বনমাঝে, না মনের মাঝে? অন্তরে যে ঝঙ্কার সে অবিরত শুনিতে পায়, কোথায় তাহার সূত্র? সে সুর বাজিয়া উঠে গাছে লতায় পাতায়। সে সুর ছড়ায় আকাশে বাতাসে। ক্ষণে ক্ষণে বালকের চিত্তে চমকের মত তাহার উজ্জ্বল আভাস আসে। কোথায় সে দেবতা, মধুপাতা, মধুদাতা? সে আঁকা-বাঁকা রেখার ফাঁকে ফাঁকে তাঁহাকে আকার দিতে চায়; কিন্তু কই তাহার প্রকাশ—অনাবিল এবং অনাময়? সত্যের মুখ হিরণ্ময় আবরণে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। হে দেবতা, সে আবরণ উন্মোচন কর! সত্য-ধর্ম দীপ্তি লাভ করুক। এই আকুতি বালক নন্দলালের অন্তরে এক অব্যক্ত ভাবনায় বৈদিক ঋষিদের প্রার্থনার অন্তর্নিহিত আকুলতার সঞ্চার করে।

সে প্রার্থনা ব্যর্থ হয় নাই। অন্তরের আগুনে যে প্রার্থনা উজ্জ্বল, জীবন-সাধনাতেও তাহা একদিন সত্য হইয়াই উঠে। নন্দলালের প্রার্থনাও বিধাতার কানে পেঁছে। তিনি সৎগুরুর কৃপা লাভ করেন। অবনীন্দ্রনাথ তাঁহাকে কোলে তুলিয়া লন এবং তাঁহার সব ভার গ্রহণ করেন। অবনীন্দ্রনাথের রসাবিষ্ট চিত্তের স্পর্শ, তাঁহার সাধনা, তাঁহার জীবন ও চরিত্রের প্রভাব নন্দলালের অন্তরে সুন্দরের প্রগাঢ় অনুভূতি জাগ্রত করে। গুরুদত্ত মন্ত্র-বীজে তাঁহার নিজের সত্যকার সংস্থিতি বা স্বরূপের উপলব্ধি হয়। পরে কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথের সাধনা-প্রভাবিত শান্তি-নিকেতনের অনুকূল প্রতিবেশে তিনি মন্ত্রচৈতন্য লাভ করেন। তাঁহার নবজীবনের সূত্রপাত হয়। স্থাবরে জঙ্গমে চরাচরে অখণ্ড চৈতন্যময় সত্তার আনন্দঘন মূর্তি তাঁহার দৃষ্টিতে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠে।

এইভাবে নন্দলাল কবিগুরুর সান্নিধ্য-লাভে এবং তাঁহাকে সেবা করিবার সৌভাগ্য পাইয়া সিদ্ধ-জীবনে সমধিষ্ঠিত হন। বাণ-বিদ্ধ ক্রৌঞ্চ-মিথুনের বেদনায় মহাকবি বাল্মিকীর অন্তরের বীণা বাজিয়া উঠিয়াছিল। পরে নারদরূপী গুরুর কৃপায় সেই ঝঙ্কার ব্যাপ্তি এবং দীপ্তি লাভ করিয়া ভারতের সংস্কৃতিকে নবসৃষ্টির রূপে রসে বর্ণে গন্ধে ছন্দোময় এবং প্রাণময় করিয়া তোলে। বাণাহত হংসের বেদনায় ব্যথিত সিদ্ধার্থের চিন্ময় লীলার অনুধ্যানকে অবলম্বন করিয়া নন্দলালের অন্তরে দিব্যানুভূতির যে চেতনা জাগিয়াছিল অবনীন্দ্রনাথের কৃপায় এবং পরে শান্তিনিকেতনের পুণ্যপীঠ-প্রভাবে তাহা অমূর্ত অমৃতরসে অনন্ত এবং অশেষের সর্বোপলব্ধি-বিনির্মুক্ত এক অবাধ সত্য সাধকের দৃষ্টিতে উন্মুক্ত করিয়া দেয়। সিদ্ধ জীবনের এইখানেই সার্থকতা।

একই রূপ প্রতিরূপে ফুটিয়া উঠিতেছে এবং ভাবভেদ বিলীন হইয়া গিয়াছে। শুধু এক ভাব—মহাভাব, প্রেম। সত্য শিব সুন্দরের সেইসূত্রে সর্বত্র লীলা। সে এক অপূর্ব অনুভূতি! শিল্পাচার্য নন্দলাল

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা আচার্য নন্দলালের প্রতিকৃতি (প্যাস্টেল)

অনুভূতিকে ব্যক্ত করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—"শান্তিনিকেতনে থাকতে এসে মনে হ'ল, দশদিক্ যেন কৌতূহলী হ'য়ে প্রশ্ন করছে—'তুমি তো শিবেরই ছবি আঁকো?' অন্তরের কথা ধরা পড়িয়াছে। অন্তর্যামী যিনি তাঁহারই এই বাণী; সুতরাং অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নন্দলাল উত্তর দিয়াছেন, 'হাঁ, আমি তাই এঁকেছি। এখন শাল গাছ, তাল গাছ যদি আঁকি, তার মধ্যেও শিবকেই আঁকব।"

সত্যের মূলকে এইভাবে পাওয়া যায় এবং কূলকে পাওয়া এইভাবেই সম্ভব হয়। এখানে আর ভুল হইবার ভয় নাই। সত্যং শিবং সুন্দরমং—শিল্পাচার্য নন্দলালের অনুভূতি ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনার গূঢ় রীতি ধরিয়াই অগ্রসর হইয়াছে। তাঁহার দৃষ্টি উপাধির জড়ত্বের সীমাকে অতিক্রম করিয়া ভাবাদ্বৈত, ক্রিয়াদ্বৈত এবং পরিশেষে দ্রব্যাদ্বৈতে সমীহিত এবং চিন্ময় আনন্দরসে ঘনীভূত পরম সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সাধক অনাহত আকাশে—নিখিল প্রাণের যেখানে ঘোষণা, সেই রাজ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন। চিত্ত যেথা নিত্য মুক্ত। এখানে কোন বাধা নাই, সর্বত্রই প্রসাদ। রুদ্রের দক্ষিণ মুখের উল্লাসেরই প্রকাশ। সেই প্রকাশের আলোকে ঝলকে ঝলকে বিশ্ব-প্রকৃতিতে প্রাণের প্রাচুর্য এবং মাধুর্যের বিলাস—"ভূমি চিন্তামণি হয়, সব তরু কল্পতরু সেথা।"

নন্দলালের সাধনা এবং তাঁহার রসভূয়িষ্ঠ সৃষ্টি এই প্রাণ-ধর্মে বলিষ্ঠ। সে সৃষ্টিতে অনুমানের আবরণ নাই। সে সৃষ্টির তাক্ মনের মূলে ফাঁক রাখে না। একান্ত অন্তর গ্রাহ্য তাঁহার নিরহঙ্কৃত অলঙ্করণের তাৎপর্য। মনোময় এবং প্রাণময় সত্যের উদয়ে সেখানে সকল সংশয়ের লয় হইয়া যায়। এই কারণে নন্দলালের সৃষ্টি উদার এবং অখণ্ড, জীবন-চেতনায় সেগুলি উজ্জ্বল এবং প্রবল। আচার্য নন্দলাল তাঁহার সাধনায় ভারতের আত্মার বাণীকেই মূর্ত করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টি ভক্তের দৃষ্টি। তাঁহার সৃষ্টি ভাগবত-সৃষ্টি। সীমার বন্ধনকে অতিক্রম করিয়া অসীমকে তিনি তাঁহার তুলিকা-স্পর্শে রূপ দিয়াছেন।

শিল্পীহিসাবে আচার্য নন্দলালের অবদান দেশ এবং কালের কোন গণ্ডিই মানে না। তাঁহার সাধনা, যে সকল দেশের জন্য এবং সব যুগের জন্য, এ সত্যও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবু আমরা বাঙ্গালী। তিনি আমাদের একান্তই নিজের, একথা আমরা বিস্মৃত হইতে পারি না। বস্তুত তাঁহাকে পাইয়া বাঙ্গলাদেশ ধন্য হইয়াছে, আমরা ধন্য হইয়াছি। বিশ্বের কাছে আমাদের মুখ উঁচু হইয়াছে। একথা আমরা বলিবই এবং আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরাও বলিবে। তাহারা সেজন্য গর্ব অনুভব করিবে। শিল্পাচার্য নন্দলাল সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া আমাদিগকে অমৃতরসে অভিষিক্ত করিতে থাকুন, তাঁহার সপ্ততিবর্ষ প্রাপ্তি উপলক্ষে আমরা শ্রীভগবানের নিকট এই প্রার্থনা জানাইতেছি এবং তাঁহার প্রতি পুনঃ পুনঃ আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

দ্বিতীয়ালীর সংকট

ইউনোতে ভারতীয় প্রতিনিধি দল কর্তৃক উত্থাপিত কোরিয়া সম্পর্কিত প্রস্তাবের উপর ভোটাভুটি বর্তমান প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পূর্বেই হয়ে যাবার কথা। তার ফলাফলও একরকম নিশ্চিত হয়ে গেছে। নানাভাবে সংশোধিত হয়ে প্রস্তাবটি এখন আমেরিকার আদরণীয় হয়েছে, অন্যদিকে উহার প্রতি কম্যুনিস্টদের বিরাগ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। সোভিয়েট প্রতিনিধি জানিয়ে দিয়েছেন তাঁরা ভারতীয় প্রস্তাবটি সমর্থন করবেন না, পিকিং গভর্নমেণ্টও সেই মত প্রকাশ করেছেন। ইতিমধ্যে ইউনোতে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা যে-রকম বক্তৃতাদি দিয়েছেন তা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, সোভিয়েট ব্লকের কয়েকটি ভোট ছাড়া বাকী সব ভোটই সংশোধিত ভারতীয় প্রস্তাবের পক্ষে যাবে।

কিন্তু এতে আমেরিকার প্রচারকার্যের কিঞ্চিৎ সুবিধা করে দেয়া ছাড়া আর কী হবে? ভারতীয় প্রস্তাব এই ভিত্তির উপর রচিত হয়েছে যে, বন্দি-মুক্তির সমস্যাই যুদ্ধাবসানের পথে একমাত্র অন্তরায়। গত সপ্তাহের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে এই ধারণাটাই ভুল। বন্দি-মুক্তি নিয়ে এই যে ঝুলোঝুলি চলছে তার কারণ এই যে, আমেরিকা যে-ভাবে ব্যাপারটি নিষ্পন্ন করতে চায়—সংশোধিত ভারতীয় প্রস্তাব তার সহায়ক হবে—তাতে একাধিক অমীমাংসিত চীন-মার্কিন রাজনৈতিক মামলায় পরোক্ষভাবে চীনের হার স্বীকার হয়ে যাবে। ভারত গভর্নমেণ্ট নাকি এখনো ভারতীয় প্রস্তাবটির সম্বন্ধে পিকিং গভর্নমেণ্টের "ভুলধারণা" নিরসনের জন্য চেষ্টা করছেন কিন্তু তাতে বিশেষ কোনো ফল হবে বলে মনে হয় না। সোভিয়েটের পক্ষ থেকে যে-প্রস্তাব দেয়া হয়েছে এর মর্ম হচ্ছে এই যে, যুদ্ধনিবৃত্তির আদেশ আগে হোক এবং বন্দি-মুক্তির ব্যাপারাদি সমাধানের ভার ১১ জনের একটি কমিটির উপর দেয়া হোক, এই কমিটিতে চার জন কম্যুনিস্টশাসিত দেশের প্রতিনিধি থাকবেন এবং কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ দুই-তৃতীয়াংশের ভোটের দ্বারা হবে। তাহলে কম্যুনিস্ট মত অগ্রাহ্য করে কিছু করা যাবে না। আমেরিকা এ প্রস্তাবে রাজী নয়, যুদ্ধবন্দীদের ভবিষ্যৎ অনির্দিষ্ট কালের জন্য অনিশ্চিত করে রাখতে তার আপত্তি। এই সোভিয়েট প্রস্তাবের উপর ভোটাভুটির সুযোগ যাতে না হয় আমেরিকা সেই চেষ্টা করছে। আগে ভোটে তুলে সংশোধিত ভারতীয় প্রস্তাবটি পাশ করিয়ে নিতে পারলে সোভিয়েট প্রস্তাবটি খারিজ হয়ে যাবে।

ভারতীয় প্রস্তাবটি পাশ হলে কোরিয়ায় যুদ্ধরত উত্তর কোরিয়ান এবং চীনা "ভলাণ্টিয়ার" বাহিনীর প্রধান সেনাপতিদের ঐ প্রস্তাবে উল্লিখিত ব্যবস্থা অনুযায়ী বন্দি-মুক্তির সর্ত স্বীকার করে নিয়ে যুদ্ধ-নিবৃত্তির চুক্তি ঝট্‌পট্ করে ফেলার জন্য ইউনোর তরফ থেকে বলা হবে। কম্যুনিস্ট পক্ষ যদি তাতে রাজী না হয় এবং স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে যে, রাজী হবে না—তবে তারপর কী? আমেরিকা তখন বলতে পারবে যে কম্যুনিস্ট পক্ষের যুদ্ধ থামাবার কোনো ইচ্ছা নেই অতএব "এখন আমরা যা ভালো বুঝি করব" অর্থাৎ যুদ্ধের একটা এস্পার

ওপার করার জন্য পথ খোলা থাকবে। বলা বাহুল্য, ভারত গভর্নমেণ্ট কখনই চান না যে কোরিয়ার যুদ্ধ আর বাড়ে বা তার সীমানা আরো বিস্তৃত হয়। কিন্তু ভারতীয় প্রস্তাবটি যে-পথে চালিয়ে নেয়া হচ্ছে তাতে ভবিষ্যত মার্কিন নীতি—তা যেদিকেই চলুক—ঐ প্রস্তাব থেকে কিছুটা নৈতিক সমর্থন লাভ করতে পারবে। ভারত গভর্নমেণ্ট যদি মনে করেন যে তাঁদের সংশোধিত প্রস্তাব সম্পূর্ণ ন্যায়সংগত এবং সে প্রস্তাব আমেরিকা কর্তৃক সমর্থিত ও কম্যুনিস্ট পক্ষ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয় তবে পরে মার্কিন গভর্নমেণ্ট কিছু করলে তার প্রতিবাদ করতে ভারত গভর্নমেণ্টের পক্ষে একটু অসুবিধা হবে। অবশ্য কম্যুনিস্টরা ভারতীয় প্রস্তাব গ্রহণ করল না বলে আমেরিকা যা-খুশী করতে পারে এবং তাতে ভারত গভর্নমেণ্ট প্রতিবাদ করতে পারবেন না, তা নয় তবে এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে, ভারতের বহু-বিঘোষিত "নিরপেক্ষতা" এবার কিঞ্চিৎ জখম হবে। যখন দেখা যাচ্ছে যে, প্রস্তাবটির উভয় পক্ষের দ্বারা গ্রাহ্য হবার কোনো ভরসা নেই তখন এটাকে প্রত্যাহার করে নেয়াই উচিত হোত। কিন্তু প্রস্তাবটি এখন এমনি জালে জড়িয়ে পড়েছে যে ঐটিকে বার করে আনার আর উপায় নেই।

কমনওয়েলথ্ কনফারেন্স

লণ্ডনে কমনওয়েল্থ্ প্রধান মন্ত্রীদের কনফারেন্স আরম্ভ হয়েছে। দিল্লীতে পার্লামেণ্ট চলেছে বলে পণ্ডিত নেহরু যেতে পারেন নি, ভারত গভর্নমেণ্টের তরফে অর্থ-সচিব শ্রীচিন্তামন দেশমুখ গিয়েছেন। অবশ্য তাঁর সঙ্গে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর প্রভৃতি দু' একজন বড়ো সরকারী কর্মচারীও গেছেন। কনফারেন্সের প্রধান আলোচ্য বিষয় নাকি অর্থনৈতিক—স্টার্লিংকে কীভাবে জোরালো করা যায় এবং স্টার্লিং অঞ্চলের অন্তর্গত দেশগুলির ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তৃতি ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি কীভাবে করা যায় তার উপায় চিন্তা। যেটুকু খবরাখবর পাওয়া যাচ্ছে তাতে বুঝা যাচ্ছে যে মিঃ চার্চিল আমেরিকার কাছে কী কতটা চাইবেন এবং কীভাবে চাইবেন সেইটি স্থির করার আগে কমনওয়েলথ্-এর বিভিন্ন দেশের হাবভাবটা একটু বুঝে নিতে চান। অবশ্য যাঁরা মিলিত হয়েছেন তাঁরা সকলেই একমত যে স্টার্লিং অঞ্চলকে খাড়া রাখতে হলে ডলারের ঠেকনা আবশ্যক; আমেরিকার আনুকূল্য ছাড়া উদ্ধার নেই। ভারতবর্ষ থেকে যাঁরা গেছেন তাঁরাও তো যাকে বলে ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের হাতে-গড়া মানুষ, কারণ বৃটিশ শাসনকালে এ'রা বরাবর ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের কাছ থেকে যে সাপ্তাহিক উপদেশটি আসত চক্ষু বুজে সেইটি অনুসরণ করাকেই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের "নীতি পরিচালনা" বলে মনে করতেন। সুতরাং নীতিগত মতভেদের কোনো সম্ভাবনা নেই। লণ্ডনে যেটা ভালো বলে স্থির হবে সেইটাই ভারতবর্ষের পক্ষে একমাত্র ভালো বলে ধরে নিতেই হবে।

কোনো কমনওয়েল্থ্ কনফারেন্স হলেই অনেকের মনে এই প্রশ্ন জাগে যে ভারতবর্ষ কমনওয়েল্থ্-এ আছে কেন? অনেকেই দক্ষিণ আফ্রিকার গভর্নমেণ্টের ভারতীয়দের প্রতি ব্যবহারের কথা তোলে। কিন্তু প্রশ্নটা কেবল দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের প্রতি ব্যবহারের কথা নয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় যদি ভারতীয়দের সমস্যা নাও থাকত তবুও প্রশ্নটা উঠ্ত। এ প্রশ্ন ক্রমশ বড়ো হয়েই দেখা দেবে। কেবল ম্যালান গভর্নমেণ্টের প্রতি দোষারোপ করে কী হবে? কেনিয়াতে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট কী করছেন? আসলে কমনওয়েলথ্-এর মূল গ্রন্থি তো বৃটেনের সহিত সম্বন্ধে। বৃটেন আফ্রিকায় কী নীতি অনুসরণ করছে? পৃথিবীর সামনে আজকের দিনে আদর্শের দিক দিয়ে বৃটেন ও বৃটিশ কমনওয়েল্থ্-এর সম্পর্কে যে বিশেষ কাম্য তা বলা যায় না। কমনওয়েল্থ্-এর মধ্যে থাকলে নাকি অনেক সুবিধা আছে। একথা সত্য যে বৃটেনের সঙ্গে বর্তমান ভারতের অর্থনৈতিক এবং সামরিক কতকগুলি বন্ধন আছে। সেগুলি সুষ্ঠুভাবে স্বীকার করতে আমাদের নেতারা লজ্জা পান, সেইজন্য প্রশ্ন উঠ্লেই বলেন যে আমরা স্বেচ্ছায় কমনওয়েল্থ্-এ আছি, তাতে আমাদের স্বাধীনতা এতটুকু ক্ষুণ্ণ হচ্ছে না, বরঞ্চ আমাদের কতকগুলি সুবিধা হচ্ছে। এই ভাবের ঘরে চুরির দণ্ড একদিন পেতে হবে, যেদিন দেখা যাবে ভারতবর্ষের জন-মনের নিকট আফ্রিকায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের নির্মম অন্তিমলীলা অসহ্য হয়ে উঠেছে অথচ ভারতবর্ষ নানা বৈষয়িক বন্ধনে এরূপভাবে বৃটেনের সঙ্গে জড়িত যে তার নৈতিক প্রতিবাদ নিজের নিকটও উপহাসের মতো শোনাচ্ছে। ৩১-১১-৫২

চোখ

রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী

আশ্চর্য তোমার চোখঃ স্বপ্নের সমুদ্র সীমাহীন,
দক্ষিণ হাওয়ায় কাঁপে জীবনের নিরুদ্দিষ্ট দিন—
মনের জাহাজ ভাসে, আদিগন্ত রোমাঞ্চের ঝড়,
আশ্চর্য সে শুভ দৃষ্টি, দিক্‌ভ্রান্ত সমুদ্র-সফর।
এমন নিঃশব্দ তবু স্পন্দিত মুহূর্ত শব্দময়,—
সংকীর্ণ বাসর তবু সমুদ্রের বিপুল বিস্ময়,
দীপের শিখায় জ্বলে পৃথিবীর চন্দ্রসূর্যতারা,
এক জোড়া চোখ শুধুঃ সীমাহীন তবু সে ইশারা।

কখন ফিরালে চোখ! সমুদ্র কি শেষ হলো আজ?
বন্দর তুলেছে মাথা—সারি সারি অনেক জাহাজ।
নিঃসীম আকাশ ফুঁড়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী সমুদ্যত,
আকাশের সূর্য আজ মনে হয় স্ফুলিঙ্গের মতো,
তোমার চোখের আলো নিভে গেল কখন—কখনঃ
এত শব্দ তবু যেন নিস্তরঙ্গ নিস্পন্দ জীবন।
তোমার আশ্চর্য দৃষ্টি পলাতক, ছিন্নভিন্ন ধ্যান,
একজোড়া চোখ আজ নিরুত্তাপ নির্বাক পাষাণ।

আশীর্বাদ

। পঞ্চাশ বছরের কিশোর গুণী নন্দলাল বসুর প্রতি সত্তর
বছরের প্রবীণ যুবা রবীন্দ্রনাথের আশীর্ভাষণ। ।

নন্দনের কুঞ্জতলে রঞ্জনার ধারা,
জন্ম-আগে তাহার জলে তোমার স্নান সারা।
অঞ্জন সে কী মধুরাতে
লাগালো কে যে নয়ন পাতে,
সৃষ্টি করা দৃষ্টি তাই পেয়েছে আঁখি তারা॥

এনেছে তব জন্মডালা অজর ফুল রাজি,
রূপের লীলা-লিখন-ভরা পারিজাতের সাজি।
অপ্সরীর নৃত্যগুলি
তুলির মুখে এনেছে তুলি,
রেখার বাঁশি লেখায় তব উঠিল সুরে বাজি'॥

যে মায়াবিনী আলিম্পনা সবুজে নীলে লালে
কখনো আঁকে কখনো মোছে অসীম দেশে কালে,
মলিন মেঘে সন্ধ্যাকাশে
রঙীন উপহাসি যে হাসে
রং জাগানো সোণার কাঠি সেই ছোঁয়ালো ভালে॥

বিশ্বসদা তোমার কাছে ইসারা করে কত,
তুমিও তারে ইসারা দাও আপন মনোমত।
বিধির সাথে কেমন ছলে
নীরবে তব আলাপ চলে,
সৃষ্টি বুঝি এমনিতরো ইসারা অবিরত॥

ছবির 'পরে পেয়েছ তুমি রবির বরাভয়,
ধূপছায়ার চপলমায়া করেছ তুমি জয়।
তব আঁকন-পটের পরে
জানি গো চিরদিনের তরে
নটরাজের জটার রেখা জড়িত হয়ে রয়॥

চির-বালক ভুবন ছবি আঁকিয়া খেলা করে।
তাহারি তুমি সমবয়সী মাটির খেলা ঘরে।
তোমার সেই তরুণতাকে
বয়স দিয়ে কভু কি ঢাকে,
অসীম পানে ভাসাও প্রাণ খেলার ভেলা 'পরে॥

তোমারি খেলা খেলিতে আজি উঠেছে কবি মেতে,
নববালক জন্ম নেবে নূতন আলোকেতে।
ভাবনা তার ভাষায় ডোবা,—
মুক্ত চোখে বিশ্বশোভা
দেখাও তারে, ছুটেছে মন তোমার পথে যেতে॥

নন্দলাল বসু

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্পিনোজা ছিলেন তত্ত্বজ্ঞানী, তাঁর তত্ত্ব-বিচারকে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় থেকে স্বতন্ত্র করে দেখা যেতে পারে। কিন্তু যদি মিলিয়ে দেখা সম্ভব হয়, তবে তাঁর রচনা, আমাদের কাছে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। প্রথম বয়সেই সমাজ তাঁকে নির্মমভাবে ত্যাগ করেছে, কিন্তু কঠিন দুঃখেও সত্যকে তিনি ত্যাগ করেন নি। সমস্ত জীবন সামান্য কয় পয়সায় তাঁর দিন চলত; ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুই তাঁকে মোটা অঙ্কের পেন্সন দিবার প্রস্তাব করেছিলেন, সর্ত ছিল এই যে, তাঁর একটি বই রাজার নামে উৎসর্গ করতে হবে। স্পিনোজা রাজি হলেন না। তাঁর কোনো বন্ধু মৃত্যুকালে আপন সম্পত্তি তাঁকে উইল করে দেন, সে সম্পত্তি তিনি গ্রহণ না করে দাতার ভাইকে দিয়ে দেন। তিনি যে তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন, আর তিনি যে মানুষ ছিলেন, এ দুটোকে এক কোঠায় মিলিয়ে দেখলে তাঁর সত্য সাধনার যথার্থ স্বরূপটি পাওয়া যায়, বোঝা যায়, কেবলমাত্র তার্কিক বুদ্ধি থেকে তার উদ্ভব নয়, তাঁর সম্পূর্ণ স্বভাব থেকে তার উপলব্ধি ও প্রকাশ।

শিল্পকলায়, রস-সাহিত্যে মানুষের স্বভাবের সঙ্গে মানুষের রচনার সম্বন্ধ বোধ করি আরও ঘনিষ্ঠ। সব সময়ে তাদের একত্র করে দেখবার সুযোগ পাইনে। যদি পাওয়া যায়, তবে তাদের কর্মের অকৃত্রিম সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হোতে পারে। স্বভাব-কবিকে, স্বভাব-শিল্পীকে কেবল যে আমরা দেখি তাঁদের লেখায়, তাঁদের হাতের কাজে তা নয়, দেখা যায় তাঁদের ব্যবহারে, তাঁদের জীবনযাত্রায়, তাঁদের জীবনের প্রাত্যহিক ভাষায় ও ভঙ্গীতে।

চিত্রশিল্পী নন্দলাল বসুর নাম আমাদের দেশের অনেকেরই জানা আছে। নিঃসন্দেহে আপন আপন রুচি মেজাজ শিক্ষা ও প্রথা-গত অভ্যাস অনুসারে তাঁর ছবির বিচার অনেকে অনেক রকমে করে থাকেন। এরকম ক্ষেত্রে মতের ঐক্য কখনো সত্য হতে পারে না। বস্তুত প্রতিকূলতাই অনেক সময়ে শ্রেষ্ঠতার প্রমাণরূপে দাঁড়ায়। কিন্তু নিকটে থেকে নানা অবস্থায় মানুষটিকে ভালো করে জানবার সুযোগ আমি পেয়েছি। এই সুযোগে যে মানুষটি ছবি আঁকেন, তাঁকে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা করেছি বলেই তাঁর ছবিকেও শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে পেরেছি। এই শ্রদ্ধায় যে দৃষ্টিকে শক্তি দেয়, সেই দৃষ্টি প্রত্যক্ষের গভীরে প্রবেশ করে।

নন্দলালকে সঙ্গে করে নিয়ে একদিন চীনে জাপানে ভ্রমণ করতে গিয়েছিলুম। আমার সঙ্গে ছিলেন আমার ইংরেজ বন্ধু এলম্‌হর্স্ট। তিনি বলেছিলেন, নন্দলালের সঙ্গ একটা এডুকেশন। তাঁর সেই কথাটি একেবারেই যথার্থ। নন্দলালের শিল্পদৃষ্টি অত্যন্ত খাঁটি, তাঁর বিচার শক্তি অন্তর্দর্শী। একদল লোক আছে আর্টকে যারা কৃত্রিম শ্রেণীতে সীমাবদ্ধ করে দেখতে না পারলে দিশেহারা হয়ে যায়। এইরকম করে দেখা খোঁড়া মানুষের লাঠি ধরে চলার মতো, একটা বাঁধা বাহ্য আদর্শের উপর ভর দিয়ে নজির মিলিয়ে বিচার করা। এই রকমের যাচাই প্রণালী মুজিয়ম সাজানোর কাজে লাগে। যে জিনিস মরে গেছে, তার সীমা পাওয়া যায়, তার সমস্ত পরিচয়কে নিঃশেষে সংগ্রহ করা সহজ, তাই বিশেষ ছাপ মেরে তাকে কোঠায় বিভক্ত করা চলে। কিন্তু যে আর্ট অতীত ইতিহাসের স্মৃতি-ভাণ্ডারের নিশ্চল পদার্থ নয়, সজীব বর্তমানের সঙ্গে যার নাড়ীর সম্বন্ধ, তার প্রবণতা ভবিষ্যতের দিকে; সে চলেছে, সে এগোচ্ছে, তার সম্ভূতির শেষ হয়নি, তার সত্তার পাকা দলিলে অন্তিম স্বাক্ষর পড়েনি। আর্টের রাজ্যের যারা সনাতনীর দল, তারা মৃতের লক্ষণ মিলিয়ে জীবিতের জন্যে শ্রেণী বিভাগের বাতায়নহীন কবর তৈরী করে। নন্দলাল সে জাতের লোক নন, আর্ট তাঁর পক্ষে সজীব পদার্থ। তাকে তিনি স্পর্শ দিয়ে দৃষ্টি দিয়ে দরদ দিয়ে জানেন, সেই জন্যেই তাঁর সঙ্গ এডুকেশন। যারা ছাত্ররূপে তাঁর কাছে আসবার সুযোগ পেয়েছে, তাদের আমি ভাগ্যবান বলে মনে করি, তাঁর এমন কোন ছাত্র নেই একথা যে না অনুভব করেছে এবং স্বীকার না করে। এসম্বন্ধে তিনি তাঁর নিজের গুরু অবনীন্দ্র-নাথের প্রেরণা আপন স্বভাব থেকেই পেয়েছেন সহজে। ছাত্রের অন্তর্নিহিত শক্তিকে বাহিরের কোনো সনাতন ছাঁচে ঢালাই করবার চেষ্টা তিনি কখনোই করেন না; সেই শক্তিকে তার নিজের পথে তিনি মুক্তি দিতে চান এবং তাতে তিনি কৃতকার্য হন, যেহেতু তাঁর নিজের মধ্যেই সেই মুক্তি আছে।

কিছুদিন হোলো বোম্বায়ে নন্দলাল তাঁর বর্তমান ছাত্রদের একটি প্রদর্শনী খুলে-ছিলেন। সকলেই জানেন, সেখানে একটি স্কুল অব আর্টস আছে এবং একথা বোধ হয় অনেকের জানা আছে সেই স্কুলের অনুবর্তীরা আমাদের এদিককার ছবির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ কোরে লেখালেখি কোরে আসছেন। তাঁদের নালিশ এই যে, আমাদের শিল্পসৃষ্টিতে আমরা একটা পুরাতন চালের ভঙ্গিমা সৃষ্টি করেছি। সে কেবল সস্তায় চোখ ভোলাবার ফন্দি, বাস্তব সংসারের প্রাণ-বৈচিত্র্য তার মধ্যে নেই। আমরা কাগজে পত্রে কোন প্রতিবাদ করিনি, ছবিগুলি দেখানো হোলো। এতদিন যা বলে তাঁরা বিদ্রূপ কোরে এসেছেন, প্রত্যক্ষ দেখতে পেলেন তার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ প্রমাণ। দেখলেন বিচিত্র ছবি, তাতে বিচিত্র চিত্তের প্রকাশ বিচিত্র হাতের ছাঁদে, তাতে না আছে সাবেক কালের নকল না আছে আধুনিকের; তাছাড়া কোনো ছবিতেই চলতি বাজার দরের প্রতি লক্ষ্য মাত্র নেই।

যে নদীতে স্রোত অল্প, সে জড়ো করে তোলে শৈবালদামের ব্যূহ, তার সামনের পথ যায় রুদ্ধ হয়ে। তেমন শিল্পী সাহিত্যিক অনেক আছে, যারা আপন অভ্যাস এবং মুদ্রাভঙ্গীর দ্বারা আপন অচল সীমা রচনা করে তোলে। তাদের কর্মে প্রশংসা-যোগ্য গুণ থাকতে পারে, কিন্তু সে আর বাঁক ফেরে না। এগোতে চায় না, ক্রমাগত আপনারই নকল আপনি করতে থাকে, নিজেরই কৃতকর্ম থেকে তার নিরন্তর নিজের চুরি চলে।

আপন প্রতিভার যাত্রাপথে অভ্যাসের জড়ত্ব দ্বারা এই সীমা বন্ধন নন্দলাল কিছুতেই সহ্য করতে পারেন না আমি তা জানি। আপনার মধ্যে তাঁর এই বিদ্রোহ কতদিন দেখে আসছি। সর্বত্রই এই বিদ্রোহ সৃষ্টিশক্তির অন্তর্গত। যথার্থ সৃষ্টি বাঁধা রাস্তায় চলে না, প্রলয়শক্তি কেবলই তার পথ তৈরী করতে থাকে। সৃষ্টিকার্যে জীবনী শক্তির এই অস্থিরতা নন্দলালের প্রকৃতিসিদ্ধ। কোনো একটা আড্ডায় পৌঁছে আর চলবেন না, কেবল কেদারায় বসে পা দোলাবেন, তাঁর ভাগ্যলিপিতে তা লেখে না।

শান্তিনিকেতনের নন্দবাবু

নীরোদ রায়

জীবনে অনেক সময় অতি সামান্য বিষয়গুলি মনের ভেতর এমনি একটা রেখাপাত করে যায়, যা সহজে ভোলা যায় না। কারণে অকারণে সেগুলো অনেক সময় মানসপটে পরিষ্কার হয়ে ফুটে ওঠে এবং ঐটুকু ছোট্ট একটি বিষয় মনের ভেতর কতখানি আনন্দের দোলা দিয়ে যায়, তা অপরকে বোঝানো সম্ভব নয়।

বিখ্যাত শিল্পী নন্দলাল বসুর সম্বন্ধে এমনি একটি ছোট্ট ঘটনা বলছি, যা আমার মনের ভেতর গেঁথে আছে। নন্দবাবুকে যাঁরা দেখেন নি, তাঁরা এই মাটির মানুষটির সম্বন্ধে কিছু ধারণা করতে পারবেন কি না, জানি না। নিরভিমান, সাদাসিধে, লাজুক প্রকৃতির এই ভদ্রলোক শান্তিনিকেতনের কতখানি জুড়ে বসে আছেন এবং শুধু বাংলা কেন, ভারতবর্ষে চিত্রকলার উৎকর্ষ-সাধনে তাঁর কতদূর দান, তা বর্তমান জগৎ জানে। শান্তিনিকেতন-উদ্যানে তিনি ফুলের মত বিকশিত হয়ে সৌরভ বিলিয়ে যাচ্ছেন, সে সৌরভের সমাদর হোল কিনা, সে খেয়াল তাঁর নেই। তিনি কোলাহলের বাইরে নিজেকে রেখে প্রকৃতির সঙ্গে দিন যাপন করতে ভালবাসেন।

সেদিন শান্তিনিকেতনে ভারতের প্রধান মন্ত্রী নেহরু, বিশেষ করে আচার্য হিসাবে প্রথম পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আয়োজন ছিল যথেষ্ট। যথারীতি নেহরু সমস্ত বিভাগ পরিদর্শন করে কলাভবনে যাবেন। কলাভবনের কয়েকটা ভাল ছবি তুলবো, এই আশায় আমি আগে থেকেই সেখানে গিয়ে সব দেখে নিতে লাগলাম। ভেতরের ঘরে প্রবেশ করে দেখি নন্দবাবু একা একা কি যেন দেখছেন। আমি একটু এগিয়ে গিয়ে নমস্কার জানালাম, তিনিও প্রতিনমস্কার জানিয়ে আবার আপনমনে এদিক ওদিক দেখতে লাগলেন।

যথাসময়ে নেহরু রথীবাবুদের নিয়ে কলাভবনে প্রবেশ করলেন। রথীবাবু সব দেখাতে লাগলেন নেহরুকে। কিন্তু একি! যার ঘরে ব্যাপার তিনিই সেখানে নেই। নন্দবাবু সেই ঘরে একলাটি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। খেয়াল হোল অনিলবাবুর—তিনি ছুটে গিয়ে 'মাস্টারমশাই আসুন' বলে হাত ধরে নিয়ে এসে হাজির করালেন নেহরুর সামনে। নেহরুর মুখমণ্ডল নিমেষে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। যিনি এতক্ষণ স্বাভাবিকভাবে দেখে যাচ্ছিলেন, তিনি যেন অতি প্রিয় জিনিস হাতের কাছে পেয়ে তাঁর উচ্ছ্বাস লুকিয়ে রাখতে পারলেন না। আনন্দে হাসিমুখে নন্দবাবুকে দু'হাতে ধরে বলে উঠলেন—'আরে—আরে—আপনি কোথায় ছিলেন, দেখতে পাচ্ছিলাম না, আপনি কেমন আছেন, আপনার শরীর ভাল তো.........। তাঁর জিজ্ঞাসার যেন শেষ নেই।

নন্দবাবু লজ্জায় নিজেকে অপ্রস্তুত মনে করলেন, কিছুই যেন বলতে পারলেন না। তিনি শুধু একটুখানি কথা বলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইন্দিরা আসে নি বুঝি?'

নেহরু তেমনিভাবে জানালেন যে, ইন্দিরা তাঁর সঙ্গে অনবরত ঘুরে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে—তাই এবার ওকে বিশ্রাম করতে বলেছেন।

তারপর কিছুক্ষণ দুজনে মুখোমুখি

রাষ্ট্রনায়ক নেহর‍ুর সঙ্গে শিল্পাচার্য নন্দলাল : সঙ্গে শ্রীঅনিল চন্দ ও শ্রীসুরেন কর

দাঁড়িয়ে কি কথা হোল আমার আর খেয়াল ছিল না। আমি শুধু দেখছিলাম, নেহরু যেন সব-কিছু ভুলে গেছেন, নন্দবাবুকে শুধু একটুখানি প্রাণভরে দেখছেন, আর নন্দবাবু যেন লজ্জায় কিছু বলতে না পেরে মাটির দিকে তাকিয়ে আছেন। দু'জনের এই একটুখানি মিলন-দৃশ্যের ভেতর কত মাধুর্য প্রকাশ পেল, তা চোখে দেখে উপলব্ধি করা যায়, ভাষায় বোঝানো সম্ভব নয়। আমার হাতের ক্যামেরা হাতেই রইল। মুগ্ধ হয়ে যে দৃশ্য দেখছিলাম, তার ছবি মনের ভেতর এ'কে নিচ্ছিলাম বলে, হাতে ক্যামেরা কাজ করলো না। আমার ছবি-তোলার কথা খেয়াল হোল যখন দু'জনে আবার এগিয়ে চললেন।

নেহরু আবার শিল্পের কারুকার্য দেখতে লাগলেন—কিন্তু নন্দবাবু পেছনে পড়ে থেকে আবার আপন মনে এদিক ওদিক দেখতে লাগলেন। নেহরুর সঙ্গে নন্দবাবু না থাকার দরুণ দু'জনের ছবি একসঙ্গে তোলা হোল না ভেবে আমি অস্বস্তি বোধ করছিলাম। শেষকালে নেহরু যখন ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছেন দেখতে পেলাম, তখন আমি অনিলবাবুকে আমার ইচ্ছা জানালাম, অনিল বাবু ছুটে গিয়ে নেহরুকে বলতেই তৎক্ষণাৎ তিনি আবার ঘরের ভেতর এলেন। কিন্তু নন্দবাবুর সেই আপত্তি। তিনি ছবি তুলতে আপত্তি করছেন দেখে নেহরু এসে নন্দবাবুর হাতের ভেতর হাত দিয়ে ধরে বললেন 'নিশ্চয়ই ছবি তুলতে হবে।' আর কোন কথা না বলে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন কোথায় ছবি ভাল হবে। তারপর তিনি নিজে একটা জায়গা বেছে নিয়ে বললেন—এখানে ভাল হবে। নন্দবাবুকে সেইভাবে পাকড়াও করে সেখানে গিয়ে দাঁড়ালেন।

এবার আমি ছবি তুলে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

রূপরাগের কবি নন্দলাল

কানাই সামন্ত

চলো, নন্দলালের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিইগে' এই কথা বলে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ তরুণ এক শিল্পশিক্ষার্থীকে নিয়ে গেলেন জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির পাঁচ নম্বর থেকে ছ নম্বরে, দোতলার এক ঘরে। অলৌকিক প্রতিভা অপরূপ মূর্তিতে অধিষ্ঠিত ছিল সেই ঘরটিতে, ১৩৩০ সালের সেই ভুলে-যাওয়া তারিখে। শিল্পরুচি ও রূপৈশ্বর্যের সুষমাময় প্রকাশ ছিল বৈকি চতুর্দিকে; কবির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপশ্রী ও শালীনতা, ঔদার্য ও গাম্ভীর্য, সেও ছিল সম্রাটের মতোই—কিন্তু, সেদিকে তো সহসা চাওয়া যেত না, অথবা চাইলেও দেখা যেত আপন মহিমাতেই আপনি আছেন আবৃত। শুনলাম—

অরুণদুয়ার খোলো,
এসো এসো নীরব চরণে

এই সুরটি ধরিয়ে দিচ্ছেন তিনি গানের দলকে। শিউরে-ওঠা সমস্ত শরীর দিয়ে শুনলাম, আর দেখা গেল, স্বরগ্রামের উচ্চমে সপ্তকে উঠে সত্যই অরুণদ্বার ছুঁয়ে এল সুর, খুলে গেল অলক্ষ্য কবাট, ফোটো ফোটো সোনালি চাঁপার স্নিগ্ধকোমল দ্যুতিতে দ্যুলোকের আলো লুটিয়ে পড়ল প্রণত ভূলোকে।

'বিসর্জন' নাটকের অভিনয় হবে। দলবল নিয়ে এসেছেন কবি শান্তিনিকেতন থেকে কোলকাতায়। রূপসজ্জার ভার নিয়ে সঙ্গে এসেছেন শিল্পী নন্দলাল। কবেকার কোন্ সুকৃতির ফলে জানিনে, পরিচয় হল, প্রণাম করলাম, বাসায় ফিরে এলাম হীরকের মতো দ্যুতিক্ষর দুর্লভ সেই মুহূর্তটিকে মনের মণিকোঠায় সঞ্চিত করে।

অবনীন্দ্রনাথ যেমন ভাবে ভাষায় ভঙ্গিতে, স্বতোৎসার উৎসাহে উল্লাসে অভিনয়ে, আপনার চিরবালকস্বভাবে, সর্বদাই উচ্ছলিত, নন্দলাল তেমনি সংযত গম্ভীর, আত্মস্থ ও স্বল্পবাক্। উভয়েরই প্রতিভা অলৌকিক, রূপকৃতি অনন্তবৈচিত্র্যময়, সাধনা অতন্দ্র এবং সিদ্ধি যুগ যুগান্তরের সৌভাগ্য ও সম্পদ বলতে হবে। স্বভাবের এ বৈচিত্র্য বা আপাতপ্রতীয়মান বৈপরীত্য কেন, এ প্রশ্নের উত্তরে আজ মনে জাগছে তট এবং তরঙ্গিনীর উপমা। একটি নিত্য-চঞ্চল, আর একটি দৃশ্যতঃ স্থির। একটি ছায়া বা ছবি কিছুই ধরে রাখে না, তরঙ্গে তরঙ্গে দুলিয়ে খেলিয়ে ভাসিয়ে দেয় পার থেকে অপারের দিকে; আর একটি কায়া মায়া সবকেই আশ্রয় দেয়, দৃঢ় প্রতিষ্ঠা দেয় পদতলে, মাটির ঘর গড়তে দেয় বাসের জন্যে, পাষাণের দেউল তুলতে দেয় আকাশোৎসুক ধ্যানের ও আরাধনার অনুকূলে। দৃশ্যতঃ এতই বিভিন্ন, এতই বিপরীত। তবু তো একটিকে না হলে আর একটির চলে না। কবির ভাষায় বলা যায়, স্তব্ধ তট আর উচ্ছলিত তরঙ্গ উভয়ের যোগেই জীবনের গান। উভয়ের যোগেই বাঙলার তথা ভারতের নবউদ্বোধিত রূপকলার আশ্চর্য আকার ও সুষমা, ব্যাপ্তি ও গভীরতা, প্রকাশ ও ব্যঞ্জনা।

যে কালের কথা তুলেছি সেই সময়টিতে তরুণ শিক্ষার্থীদের প্রায়ই বলতেন অবনীন্দ্রনাথ, 'ছবি আঁকা শিখবে তো যাও নন্দলালের কাছে।' কখনো বলেছেন, 'আমার ঝুলি ঝেড়ে সব বিদ্যা দিয়ে এসেছি নন্দলালকে।' কখনো বলতেন, 'নন্দলাল আমার প্রথম ও শেষ ছাত্র।' কখনো বা, 'ও আমার কাঙালের ধন, ভিক্ষার ঝুলি, ছেঁড়া ন্যাকড়ার পুঁটুলি আমার—হাতছাড়া করব না, দেব না কাউকে।' সে বলার ভঙ্গী বা কত, সুর কত, আর কী অপরিসীম স্নেহ ও প্রীতি-সিঞ্চিত, গুরুগৌরবে ও গরবে ডগোমগো—যে না শুনেছে, না দেখেছে (অবনীন্দ্রনাথের কথা শোনবার ছিল না শুধু, দেখবারও; রাধাকানুর মতো আধা তার ভাব ভাষা, আধা তার রূপ ছন্দ) না দেখেছে যে তাকে তো বর্ণনা ক'রে বোঝানো যাবে না।

যাহোক, কোনো সম্বল যার ছিল না সেও হাজির হল একদিন কবিতীর্থে, বীরভূমের সেই রাঙা ধুলোর রাস্তায় মাথা ঠেকিয়ে বলল না কি—

রবীন্দ্রের এ কবিরজের অরুণ রজের
স্পর্শ লইলাম ললাটে আমার।

পৌঁছে গেল কলাভবনের সীমানায়, নন্দনের নাচদুয়ারে। অহেতুক সৌভাগ্যহেতু গৃহীত হল, স্বীকৃত হল।

তারপর থেকে আনাগোনা করেছি নন্দনে, দুর্লভ স্নেহ ও সঙ্গ পেয়েছি। রূপকলা হাতে তো আসেনি, এসেছে মনে নানা রঙের আলো বিকীর্ণ ক'রে। আশা আছে, সব আলো মিলে মিশে এক শুভ্র উদ্ভাস তাও হয়তো দেখতে পাব কোনো দিন কোনো জীবনে। মনে পড়ে, কত শীত ও হেমন্তের দুপুরে, নিদাঘের খরদাহে, নন্দলাল কাজ করতেন যে বাড়িটিতে তারই দেহলিলগ্ন মধুমালতীর বিতানিত ছায়ার আশ্রয়ে, অবারিত খোয়াইয়ে দিগ্বলয়বনলেখায় আর উজ্জ্বল নীলাকাশে মগ্ন হয়ে মনে হয়েছে—কী আশ্চর্য এই মুহূর্ত! অনশ্বর! চিরন্তন! মহাকালের জপমালায় গাঁথা অক্ষয় একটি গুটিকা! অত্যন্ত কাছে, উত্তরে ঐ দেখা যায় অট্টালিকাচূড়া, এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, সব যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ গীতিকবি অজস্র সৃষ্টিকার্যে তন্ময়। আর এই পথ দিয়ে এখনই হেঁটে আসবেন এ যুগের শ্রেষ্ঠ রূপকার ধূলিধূসর পায়ে। হেঁটে আসেন যখন হাঁটছেন ব'লে তো মনে হয় না, মনে হয়, ধ্যান করছেন হাঁটতে হাঁটতে, যুক্তযোগী আরাধনা করছেন চোখ চেয়ে দেখতে দেখতে। আসবেন যিনি তাঁর কথাও শুনব, কাজও দেখব, নানা উপলক্ষ্যে তাঁর স্নেহ ও প্রীতি লাভ করব, তাঁর প্রসাদে তাঁরই শিক্ষায় রূপ রচনা করতে না পারি, রূপ দেখতে শিখব চোখ চেয়ে। দীপ্ত দুপুরের স্বপ্ন এ নয়, বাস্তব সত্যই।

এই টুকু বিস্ময়ের ভূমিকা ক'রে কত যে বিস্ময় সে কি বোঝাতে পেরেছি—গুরুপ্রণাম নিবেদন ক'রে, এখন শিল্পী নন্দলালের জীবন-আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক।

বসুপরিবারের পূর্ববাসস্থল ছিল তারকেশ্বরের কাছে জেজুর গ্রাম। পরে তাঁরা হাওড়া জেলায় রাজগঞ্জ স্টীমারঘাটের অদূরবর্তী বাণীপুরে এসে বাড়ি করেন, সরস্বতী নদীর ধারে। প্রপিতামহ কৃষ্ণমোহন বসু ফোর্ট উইলিয়ম তৈরির সময় ইঁটের জোগানদারি নিয়ে প্রচুর অর্থোপার্জন করেছিলেন। শিবপুর থেকে দক্ষিণে অনেক দূর পর্যন্ত গঙ্গার পশ্চিম তটে তাঁর ইঁট-খোলা ছিল। লক্ষ্মী চঞ্চলা। প্রপিতামহের অর্জিত ধনসম্পদ পিতার আমল পর্যন্ত স্থায়ী হয়নি। শ্রীনন্দলাল বসুর পিতা পূর্ণচন্দ্র বসু ডায়মন্ড হারবার অঞ্চলে খাল কাটার কাজে পরিদর্শক নিযুক্ত হয়েছিলেন। পরে মুঙ্গের-খড়্গপুরে খাল কাটানোর কাজ নিয়েই সপরিবারে বাস করেন। সে সময় শ্রীরাজশেখর বসুর পিতা চন্দ্রশেখর বসু ছিলেন দ্বারভাঙ্গা এস্টেটের অন্যতম নায়েব; খড়্গপুর কাছারি ছেড়ে তিনি সদরে চলে যাওয়াতে, পূর্ণবাবু কিছুকাল তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে কাজ করেন। পরে তিনি চন্দ্রশেখর বাবুরই সুপারিশে দ্বারভাঙ্গা-রাজের স্থপতি নিযুক্ত হন। স্থাপত্যে নূতন নূতন রূপ-

উদ্ভাবনে তাঁর একটা স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল। অন্যদিকে শ্রীনন্দলাল বসুর মাতৃদেবী ক্ষেত্রমণি সুন্দর সুন্দর খয়েরের পুতুল, মিষ্টান্নের ছাঁচ, সূচিকর্মবিচিত্র কাঁথা—এসব রচনা করতে ভালোবাসতেন। প্রীতি ও ভগবদ্‌ভক্তিপূর্ণ ছিল তাঁর উদার স্বভাব। যাহোক, উক্ত খড়্গপুরে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর তারিখে (বাঙলা ১২৯০ সালের ১৮ই অগ্রহায়ণ) নন্দলালের জন্ম হয়। বাল্য ও কৈশোর অতিবাহিত হয় খড়্গপুরে ও দ্বারভাঙ্গায়। বাল্যকাল থেকেই শিল্পানুরাগের এই পরিচয় পাওয়া যায় যে, বালক নন্দলাল স্থানীয় কুমোরদের মূর্তি নির্মাণ দেখতে ভালোবাসতেন; তাদের দেখাদেখি নিজেও কাদামাটি নিয়ে দেবদেবীর মূর্তি তৈরি করতেন। গেঁহু ও ভুট্টার খেতে, প্রকৃতির অবারিত বক্ষে, খেলার সঙ্গীদের নিয়ে, তাদের নেতৃত্ব করে, উৎসাহে উদ্দীপনায় সহজ আনন্দে যে দিনগুলি কেটেছিল তাতে গূঢ়প্রভাব-সঞ্চারিণী, রূপময়ী, আনন্দময়ী প্রকৃতির যে 'পরশ' লেগেছিল বাল্যস্বভাবে, তা নিষ্ফল হয়নি—রূপরাগের অনুরাগে বালকের দেহ-মন ও ইন্দ্রিয় ধুয়ে ধুয়ে পরিষ্কৃত সুন্দর করেছিল, ভাবী জীবনের ভূমিকা রচনা করেছিল, সন্দেহ নেই।

প্রাথমিক শিক্ষা শেষ ক'রে ষোলো বছর বয়সে নন্দলাল আসেন কোলকাতায়। ক্ষুদিরাম বসুর স্কুলে বা সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হয়ে কুড়ি বছর বয়সে এনট্রেন্স পাস করেন। একুশ বছর বয়সে হয় বিবাহ। এদিকে, আরো লেখাপড়া করবেন বলে জেনারেল অ্যাসেম্ব্লিতে ভর্তি হতে হয়। মধ্যবিত্ত ঘরের বাঙালী যুবক—জীবনের ভাবী মানচিত্রে ছকা আছে এনট্রেন্সের পর এফ-এ, তারপর বি-এ, তারও পরে এম-এ যদি বা না হয় ওকালতি, ডাক্তারি, এঞ্জিনিয়ারি, মাস্টারি, আর তদভাবে সরকারি বা সওদাগরি আপিসে বিরস রুটিনবাঁধা চাকরি। অথচ, কলালক্ষ্মী গোপনে যাকে বরণ ক'রে রেখেছেন তার কি কোনো সোয়াস্তি থাকে পুঁথি প'ড়ে আর পুঁথি মুখস্ত ক'রে? ক্ষুদিরাম বসুর স্কুলে যখন পড়েন সংস্কৃত পাঠ্যগ্রন্থে ছিল বীণা-কর্ণ-চূড়াকর্ণ দুই বন্ধু আর এক মূষিকের গল্প। বিন্যস্ত পদাবলীর তাৎপর্য আর ব্যুৎপত্তি নিখুঁতভাবে আয়ত্ত করতে না পারায় পণ্ডিতমশায়ের ভর্ৎসনা শুনেছিলেন কিনা জানা যায় না। কিন্তু জল্পনাতৎপর দুই বন্ধু আর তণ্ডুলস্থলীর উদ্দেশে লম্ফনতৎপর এক ইঁদুর, রঙ রেখা দিয়ে ছবিতে এঁকেছিলেন, এ আমরা শুনেছি। জেনারেল আসেম্ব্লিতে তেমনি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতাবলী ছিল পাঠ্য; তারই পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায় কবিতার পাশে পাশে নন্দলাল এঁকেছিলেন রঙিন ছবি। সে হয়তো অমর কবির অতুল রচনার উপযুক্ত ভাষায়ই হয়েছিল সর্বজনবোধ্য ভাষায়—চোখে দেখিনি, বইখানি কালাপানি পাড়ি দিয়েছিল গুণগ্রাহী রোদেনস্টাইনের হাতে পৌঁছুবে ব'লে, যে কারণেই হোক আর ফিরে আসেনি—যা হোক, মার্ক ওঠেনি তবু পরীক্ষার খাতায়। নইলে এফ-এ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলেন কেন? কিন্তু, যে কোনো রকমে পাস না করলে নিস্তার কোথায়? ভর্তি হলেন মেট্রোপলিটনে অর্থাৎ এখনকার বিদ্যাসাগর কলেজে। যথাকালে দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দিয়েও ফেল করলেন। তখন অভিভাবকেরা চাইলেন বেলগাছিয়া আর জি কর মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি শেখাতে। সেখানে প্রবেশ মিলল না। ভর্তি হতে হল প্রেসিডেন্সী কলেজের কমার্শিয়াল ক্লাসে। মন পড়ে রইল অন্যত্র। পিসতুতো ভাই ছিলেন শ্রীঅতুল মিত্র, সরকারী আর্ট স্কুলে ড্রাফ্‌ট্‌স্‌ম্যানশিপের ছাত্র। তাঁর শিক্ষায় তাঁরই দেখাদেখি অভ্যাস করা চলল মডেল ড্রয়িং, স্টীল লাইফ পেন্টিং, সস পেন্টিং। নাম লেখা রইল কলেজের খাতায়; পড়া-শোনা হবে কী, বই কেনা হল না ছ' মাসের মধ্যে, মাইনে দেওয়া হল না—সেই টাকায় ছবির বই, সচিত্র সাময়িক পত্র কিনতে লাগলেন কলেজ পাড়ায় পুরানো বইয়ের দোকানে ঘুরে ফিরে। ভালো লাগল রাফেলের আঁকা মাতৃমূর্তি, তারই নকল করলেন অখণ্ড মনোযোগে। রবি বর্মার ছবিও ভালো লাগল, তারই প্রেরণায় নিজে কল্পনা করলেন মহাশ্বেতার রূপ—আদর্শ-অনুকারী অতিপ্রকট ভঙ্গীতে ফুটে উঠল না হয়তো নিজস্ব প্রতিভা, কিন্তু রূপকলার অভিমুখে অনুরাগ ও আগ্রহ উত্তরোত্তর তীব্র হয়ে উঠতে লাগল। একেবারেই তিক্ত আর ব্যর্থ মনে হল অর্থকরী বিদ্যার অধ্যয়ন, আরাধনা। অবশেষে স্থির সংকল্প নিলেন মনে মনে, আর্ট স্কুলে ভর্তি হতে হবে অবনীন্দ্রনাথের ক্লাসে। ইতিমধ্যে ছাপা ছবি দেখেছেন তাঁর সাময়িক পত্রে—বুদ্ধ-সুজাতা, বজ্রমুকুট। মুগ্ধ হয়েছেন নব চিত্রকলার অভিনব ভাবলাবণ্যে। এনগ্রেভিং ক্লাসের একটি ছাত্রের মুখে শুনেছেন তাঁর উদার মজলিশি স্বভাবের কাহিনী। গুরু-বরণ হয়েই গেছে মনে মনে। কাজেই, সত্যেন বটব্যাল ব'লে এনগ্রেভিং ক্লাসের ঐ ছাত্রটিকে সাথী করে একদিন হাজির হলেন অবনীন্দ্রনাথের সামনে। অবনীন্দ্রনাথ চেয়ে দেখলেন 'কালোপানা একটি ছেলে' এবং স্বভাবসিদ্ধ অভিনয়চাতুর্যে গম্ভীরভাব ধারণ ক'রে, সেই ছদ্মগাম্ভীর্যে সকৌতুক সহৃদয়তাকে প্রায় তিরস্কৃত ক'রে, কুঞ্চিত ভ্রূযুগে একপ্রকার কৃত্রিম তিরস্কার ভঙ্গিতে করে বললেন, 'কিছু হল না লেখাপড়ায়? স্কুল পালিয়ে তাই ছবি আঁকতে এসেছ?' আত্মঅভিজ্ঞতার কল্যাণে ধরে ফেলেছিলেন ঠিকই। স্কুল-পালানো ছেলে রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ[১] উভয়েই। রসলোকের রূপ-লোকের এক-এক দিগন্ত আলো করেছেন আপন আপন প্রতিভাছটায়। আমার 'মাস্টার-মশাই' মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, বাল্যে স্কুল পালাবার সুযোগ অথবা সাহস না পেলেও কলেজ পালিয়ে এসেছিলেন সত্যই। নন্দলাল ভয়ে ভয়ে বললেন, এফ-এ পর্যন্ত পড়েছেন। অবনীন্দ্রনাথ বসে আছেন ভাইস প্রিন্সি-প্যালের আসনে, ঐটুকু মৌখিক খবরে তুষ্ট হলে চলে না, দেখতে চাইলেন এনট্রেন্স পাসের অভিজ্ঞানপত্র। অন্য একদিন নিয়ে আসবেন ব'লে নন্দলাল তো চলে এলেন। ছ মাসের মাইনে বাকি পড়ায় সার্টিফিকেট ছিল কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে জব্দ। অনেক কাতরতা জানিয়ে, তথ্য হিসাবে অভ্রান্ত নয় এমন পাঁচ কথা সাজিয়ে ব'লে, করুণহৃদয় প্রাচীন কেরাণীবাবুর অনুগ্রহে কিভাবে উদ্ধার হল সার্টিফিকেট সে এক কাহিনী। মোটের উপর পাওয়া গেল, আর পকেটে সার্টিফিকেট, বগলে ছবির তাড়া, আর একদিন আর্ট স্কুলে পৌঁছে প্রিন্সিপ্যাল হ্যাভেল সাহেবের সঙ্গেও দেখা করতে হল। সাহেব ছবির তাড়া খুলে মৌলিক ছবিই পছন্দ করলেন—মহাশ্বেতা। অন্য পাঁচরকম কাজ, রাফেল প্রভৃতি নামজাদা পাশ্চাত্ত্য শিল্পীদের ছবির নকল, টেবিলের একধারে সরিয়ে রেখে আস্তে আস্তে ঠেলতে লাগলেন। যেন অসাবধানেই, টেবিলের থেকে মেজেয় উপুড় হয়ে পড়ল সেগুলি। নন্দলাল তুলতে যেতেই, ইঙ্গিতে নিষেধ করলেন হ্যাভেল। এদেশকে আর এদেশের শিল্পকে এত আপন করে নিয়েছিলেন এই ভারতপ্রেমিক মনীষী। এদেশের মানুষ, এদেশের ছেলে, এদেশের চিন্ময় ঐশ্বর্যসম্ভার অবহেলা ক'রে অন্য দেশের মায়ামরীচিকার পিছনে ছুটবে, দ্বারে দ্বারে কাঙালপনা করবে, এ তিনি সহ্য করতে পারেননি। অবনীন্দ্রনাথের ভাষায়, হ্যাভেল তাঁকে 'দিব্যচক্ষু' দিয়েছিলেন। হ্যাভেলের পরিচয় আরো যা পাই 'জোড়াসাঁকোর ধারে' বইখানাতে, অবনীন্দ্রনাথের মুখের কথায়, উদ্ধৃত ক'রে দিলে একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হবে না—

---

১ অন্তত 'জোড়াসাঁকোর ধারে' পড়লে তাই মনে হয়। পক্ষান্তরে 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় (জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮, পৃ ১৫৬) হেঁয়ালির সৃষ্টি হয়ে রয়েছে, এনট্রেন্স পাস করেছিলেন বা পাশ কাটিয়েছিলেন এ নিয়ে।

অবনীন্দ্রনাথের জন্মদিনে : গুরু ও শিষ্য

'তার উপরে ছিলেন আমার হ্যাভেল গুরু। এ দেশের আর্ট বুঝতে এমন দুটি ছিল না, রোজ দু ঘণ্টা নিরিবিলি তাঁর পাশে বসিয়ে দেশের ছবি মূর্তির সৌন্দর্য, মূল্য, তার ইতিহাস বুঝিয়ে দিতেন। হুকুম ছিল......চাপরাশিদের উপর ওই দু ঘণ্টা কেউ যেন না এসে বিরক্ত করে।

সদ্‌গুরু পাওয়ে, ভেদ বাতাওয়ে,
জ্ঞান করে উপদেশ।
তব্ কয়লা কি ময়লা ছোটে
যব্ আগ্ করে পরবেশ॥

ভাবি, সেই বিদেশী গুরু আমার হ্যাভেল সাহেব অমন ক'রে আমায় যদি না বোঝাতেন ভারতশিল্পের গুণাগুণ, তবে কয়লা ছিলেম, কয়লাই হয়তো থেকে যেতেম, মনের ময়লা ঘুচত না, চোখ ফুটত না দেশের শিল্প-সৌন্দর্যের দিকে।'

যা হোক, নন্দলালের কাজ দেখে হ্যাভেল খুশী হলেন। দস্তুরমাফিক পরীক্ষাও করা হল নানা প্রকারে। ঈশ্বরীপ্রসাদ নন্দলালকে যাহোক একটা মন থেকে আঁকতে বলায়, আঁকলেন তিনি সিদ্ধিদাতা গণেশের ছবি। অবনীন্দ্রনাথ অভিমত জানতে চাইলে স্বীকার করলেন পরীক্ষক, 'হাত পোক্ত হ্যায়।' হাতের ড্রয়িং পাকা। মডেল ড্রয়িঙের পরীক্ষায় হরিনারায়ণবাবু টেবিলের উপর ঘটি বাটি পিরামিড আর ইজেলের উপর ঢাউস একখানা কাগজ দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন, 'সতেরো মিনিটমাত্র রয়েছে সময়—এঁকে ফেলো চট্‌পট্।' ছাত্র দেখলেন, নির্দিষ্ট পনেরো মিনিটে বা সতেরো মিনিটে সমস্ত কাগজ জুড়ে কীই বা আঁকা যাবে; এক কোণে দু-তিন বর্গ ইঞ্চি ঘিরে নিয়ে পাঁচ মিনিটে সেরে ফেললেন। এ রকম ফাঁকির কাজে, অসন্তুষ্ট পরীক্ষক নিয়ে গেলেন কর্তার কাছে; তিনি বললেন খুশী হয়ে, 'ছোটো হোক, ঠিকই তো হয়েছে। উপস্থিত বুদ্ধিরও পরিচয় পাওয়া গেছে বেশ।'

এখন, অবনীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী তুমি শিখবে?' দেশী বিলাতি, শৌখিন ব্যবহারিক, জলরঙ তেলরঙ—শেখবার আছে তো অনেক। একটি বেছে নিতে হবে। তরুণ নন্দলাল এবারেও ঠকলেন না; তখনই উত্তর করলেন, 'আপনার কাছে এসেছি, যা শেখাবেন আপনি তাই শিখব।' প্রথম থেকেই আত্মসমর্পণ করলেন গুরুর পায়ে। আর, এই আত্মসমর্পণের ভাব শেষপর্যন্তই রক্ষা করে গেছেন। গুরুবরণ, গুরুর কাছে আত্মসমর্পণ, নিরলস সাধনা—এদেশের এই ধারা। সাধক, শিল্পী, নানা ক্ষেত্রের নানা প্রতিভাবান গুণী জীবনে এগিয়ে গেছেন এই ক'রেই, অবিনশ্বর সিদ্ধির অধিকারী হয়েছেন। একনিষ্ঠ সাধনার গভীর মর্মে একটি আত্মনিবেদনের ভাব থাকাতেই, একার সিদ্ধি সকলের হয়েছে এবং ছোটো-আমি বড়ো-আমির বড়ো দাবিদের পথে রুখে দাঁড়ায়নি, বাধা ঘটায়নি পদে পদে। এই আত্মনিবেদনের কল্যাণে এইসব সাধু ও মনীষীর নিরভিমান জীবনে খ্যাতি-প্রতিপত্তির ও বিত্তের কাঙালপনা দেখা যায়নি। এইভাবেই ভারতের অধ্যাত্মসাধনা রূপকলা সংগীত বড়ো হয়েছে, অপরিসীম ঐশ্বর্য প্রকাশ ও পোষণ করেছে। অবনীন্দ্রনাথের কাছে শিল্প-শিক্ষার্থী হয়ে যারা গেছে তাদের অনেককেই শুনতে হয়েছে, 'কেন এসেছ? এ পথ হয় বাদশা'র নয়তো ফকিরের।' বাইরের বেশ-বাসে তফাৎ থাকলেও, যে বাদশাহ সেই ফকির—সেই যে-কোনো সাধনার অধিকারী—কারণ, খ্যাতি প্রতিপত্তি অর্থ এসব ঝুটো জিনিস সে চায় না, চাইবার দরকারও থাকে

না। সিদ্ধিও কি চায়? সাধনার সিদ্ধি পদে পদেই, পুরস্কার হাতে হাতে, কোনো একটা শেষ লক্ষ্যে পৌঁছুবার অপেক্ষা থাকে না। সাধক যে সাধনাটাই চায় সে একান্ত করে।

নন্দলাল আর্ট স্কুলে ভর্তি হলেন। এদিকে তাঁর অভিভাবকেরা, বিশেষতঃ শ্বশুরকুল, তাঁর গতিবিধির সম্পর্কে দিশা পান না। নানা গুজবও হয়তো কানে গিয়ে পৌঁছুল। জামাই শেষে কি কালীঘাটের পোটো হবে? ('জামাই নাকি শ্মশানবাসী' সেই মতোই ভয়ের কথা এ যে) মেয়ে দিয়েছেন, কাজেই স্থির থাকতে না পেরে নন্দলালের শ্বশুর এলেন সরেজমিনে তদন্ত করতে। নন্দলালকে পাকড়াও করতে পেরেছিলেন কিনা জানিনে, অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করলেন। অবনীন্দ্রনাথ বিধিমতে তাঁকে আশ্বস্ত করলেন, আর্ট করেও উপায়-উপার্জন সংসার-প্রতিপালন হতে পারে যে, সেটা বোঝালেন, সবশেষে বললেন, 'আমি নন্দলালের সব ভার নিলাম।' শ্বশুর মহাশয় নিশ্চিন্তমনে ফিরে গেলেন।

তরুণ শিল্পী সাহস করে তখন চিঠি লিখলেন দাদা শ্বশুরকে, বারো দফা যুক্তি সাজিয়ে—কেরানি হবার বিদ্যা কিছুতে মনে ধরছে না নন্দলালের, হলেও মাসিক ষাট টাকার ঊর্ধ্বে কোনো দিন উঠতে পারবেন কি, অপর পক্ষে ছবি এঁকে কম হলেও মাসিক একশো টাকা নিশ্চয়ই উপার্জন করতে পারবেন ইত্যাদি। অবশ্য, অনুমতি চেয়ে নিপুণ এই ওকালতির তেমন কোনো প্রয়োজন ছিল না তখনো। তাঁরা স্বনিঃশ্বাসে মেনে নিয়েছেন, নন্দলালের ভাগ্যে নেই ইঞ্জিনীয়ার, উকিল বা ডাক্তার হওয়া।

নন্দলাল প্রথমে ঈশ্বরীবাবুর ডিজাইনের ক্লাসে ভর্তি হলেন। ঈশ্বরীপ্রসাদ বিহারে (পাটনার?) কোনো চিত্রকর বংশে জন্মে ধারাবাহী চিত্ররীতিতে হাত পাকিয়েছিলেন এবং হ্যাভেলের মনোনয়নে আর্ট-স্কুলের শিক্ষক পদ পেয়েছিলেন। তাঁর ক্লাসে নন্দলাল ডিজাইন, অর্থাৎ আপন মন থেকে চিত্র-কল্পনা আর কারিগরি (বিশেষ ক'রে জেসো আর রঙিন কাঁচ কেটে নক্সা বানানো) সবই শিখতে লাগলেন। কিছুকাল পরে অবনীন্দ্রনাথ টেনে নিলেন তাঁকে নিজের ক্লাসে। অবশ্য, 'ক্লাস' সেই শুরু হল, নন্দলাল হলেন প্রথম ছাত্র। হ্যাভেলের প্রেরণে কাশী থেকে তাঁত শিখে ফিরে এসেছেন সুরেন গাঙ্গুলী। দেশের চারু ও কারুকলা উভয়ের উজ্জীবনই ছিল হ্যাভেলের অভীষ্ট। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রথমটিতেই পড়ল বিশেষ ঝোঁক, তারই ক্ষেত্র তৈরি হল। অবনীন্দ্রনাথের ক্লাসে এসে অচিরায়ু সুরেন গাঙ্গুলী হলেন তাঁর দ্বিতীয় ছাত্র। অবনীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'আমার ডান হাত আর বাঁ হাত'। কিন্তু সে কি ক্লাস? মাস্টারির কোনো কথাই ছিল না সেখানে। ছিল একতান একমন সাধনা। সে সাধনায় গুরু-শিষ্য সকলেই মশগুল। অবনীন্দ্রনাথ ছবি আঁকছেন, গল্প করছেন, ব্যাখ্যা করছেন, অজস্র আনন্দ ও উল্লাস বিকীর্ণ করছেন চতুর্দিকে, আর তাঁকে ঘিরে ছাত্ররা (ক্রমে ক্রমে ভেঙ্কটাপ্পা, শৈলেন দে, অসিত হালদার, ক্ষিতীন মজুমদার প্রভৃতি এসে জুটেছেন, কে কবে, বিনা অনুসন্ধানে বলা যাবে না) সকলে ছবি আঁকছেন, কথা শুনছেন, নিত্য নূতন বিষয় ভাবছেন ও বুঝছেন, রসবোধ ও রূপানুভূতির তড়িৎ-সঞ্চারিত পরিবেশে নূতন জীবন পান করছেন সকল সত্তা দিয়ে। নবসৃষ্টিক্ষণের অপূর্ব সেই আব-হাওয়া উত্তরকালীন আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও সুকঠিন, ভাষায় ছুঁকে দেওয়া নিশ্চয়ই সম্ভব হবে না। 'জোড়াসাঁকোর ধারে'র কথকতায় অবনীন্দ্রনাথ কিছু আভাস দিয়েছেন মাত্র তাঁর নিজস্ব 'ওয়াশের' ভঙ্গীতে। তাতে তথ্যের দিক দিয়ে জানতে পারি, শিল্পের সহকারী প্রেরণা হিসাবে সাহিত্য-চর্চাও চলেছিল পুরোদমে। অবনীন্দ্রনাথের তো কথাই নেই, সাহিত্য-সাধনা আর শিল্প-চর্চা দুই নদীতেই কোটালের বান ডেকে এসেছে তাঁর; ছাত্রদের জন্যে ব্যবস্থা হয়েছিল পুরাণেতিহাসের সরস কথকতা। একটা নূতন যুগের তরঙ্গ-চূড়ায় এগিয়ে চলেছেন তাঁরা, চেতন বা অবচেতন মনে তার খবর এসেছিল বৈকি। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ, অজন্তা ও বাগ্-গুহার আবিষ্কৃতি, স্বদেশী আন্দোলন, ওকাকুরা ও নিবেদিতার অভ্যুদয় —সমসাময়িক চরিত্র ও ঘটনাবলী মনের চোখে একবার দেখে নিলেই আজকের মানুষের পক্ষেও এ সত্য স্বতঃ-প্রমাণিত হবে। এটাও মনে রাখতে হবে, প্রাচীন অতীতের অনুগমন করে সহজে ও অবাধে এসে পৌঁছায় নি শ্রদ্ধাশীল নতুন কাল। মাঝে গেছে অন্ধ অমারাত্রি, ভারতীয় হৃদয়-বুদ্ধি চেতনার সাময়িক অবসাদ ও মূর্ছা। কাজেই ধর্মে, সাহিত্যে, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে, শিল্পেও তেমনি, এ হল নূতন দেহধারণ ও নূতন প্রাণ-সঞ্চারের যুগ—নূতন উজ্জীবন। আত্মা চির নূতন, চির পুরাতন। মনে পড়ে অমর বিহঙ্গমের কাহিনী, সিন্ধুকূলে চিতা সাজিয়ে যুগে যুগে যে অগ্নি প্রবেশ করে, আর যুগে যুগেই দীপ্ততর নূতন দেহ নিয়ে উদিত হয়।

নব্য চিত্রকলায় পুরাণ ইতিহাস সাহিত্য থেকে আংশিক প্রেরণা এসেছিল সন্দেহ নেই।২ কারণ, যুগ যুগ প্রবাহিত সেই ভাব-জাহ্নবী বয়ে চলেছিল লোকালয়ের মাঝখান দিয়ে, জীবনযাত্রার পাশাপাশি। তাতে অবগাহন করা, তা থেকে চিত্তস্ফূর্তি লাভ করা কিছুই কঠিন ছিল না। রসায়িত চিত্তের সেই স্ফূর্তি থেকে, রক্তধারাধাবিত সহজাত ধ্যান থেকে ছাত্র নন্দলাল প্রথম আঁকলেন—বাণাহত হাঁস কোলে করে সিদ্ধার্থ। পরে আঁকলেন দশরথের মৃত্যু, কালী, সত্যভামা-কৃষ্ণ, কর্ণ, জগাই-মাধাই, শিবের তাণ্ডব, সতী, শিবসতী, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা, এমনি আরও অনেক ছবি। হ্যাভেলের সংগৃহীত মোগল ছবি ক্লাসেই ছিল, যাদুঘরে স্থান পায়নি তখনো। নন্দলাল তার মধ্যেও চার-পাঁচখানির নকল করেন। পূর্বোক্ত তালিকার অনেকগুলি ছবি অল্পবিস্তর পরিচিত। ভগিনী নিবেদিতা

---

২ রসবোধ ও রূপপ্রীতির এক ক্ষেত্র থেকে আর এক ক্ষেত্রে স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে পড়েছিল ব'লে দোষ হয়েছিল কিছু? বারুদ সঞ্চিত ছিল সেখানেও যেমন এখানেও তেমনি; উড়ন্ত স্ফুলিঙ্গকে উপলক্ষ্য করে নিমেষেই নানা আকার নানা ঢঙের তুবড়ি হাউই আশমান-তরা নানা রঙে আগুনের ফুল কাটল, ফোয়ারা ছোটালো, এইটেই চরম খুশির কথা নয়? শিল্প যেখানে খাঁটি হল, রসোত্তীর্ণ হয়, কবিতা থেকেও ছবি হয় নি আর ছবি থেকেও কবিতা হয় নি; দুই হয়ে উঠেছে মানুষের হৃদয় থেকে, চেতনা থেকে, রূপ ও রসের সংহত সংযত আনন্দ থেকে। বাইরে-কুড়োনো তথ্য যাই বলুক। আরও এগিয়ে বলা যায়। বিশ্বপ্রকৃতি থেকে যা নেওয়া হয়, যাকেই 'বিশুদ্ধ শিল্প' কেউ কেউ বলেন, তাও মানব প্রকৃতিরই দান বিশ্বপ্রকৃতির হাত-ফেরত এসে পৌঁছল। স্রষ্টার তথা রসিকের গভীর প্রকৃতি যা কিছু স্বীকার ক'রে নিল, স্বকীয় করে নিল, তাই সকল প্রকার ঋণ-মুক্ত হল দলিল-দস্তবেজ-ধারী যাই বলুন। স্থূলে বিচারেও 'বিজাতিস্পর্শবিমুখ বিশুদ্ধতার কোনো অর্থ নেই। বিজ্ঞান, ধর্মবিশ্বাস, সাহিত্য, শিল্প, কায়দা, আচার, অনুষ্ঠান সবগুলি কি একই মানব-জীবনের বিভিন্ন অঙ্গ নয়? একই প্রাণে একই উদ্দেশ্যে সঞ্জীবিত ও সক্রিয় নয়? প্রত্যেকটির একক প্রকর্ষের সাময়িক, সঙিনও বটে, একটা প্রয়োজন থাকলেও, সবগুলির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়, একতান বিকাশে ও উন্নতিতেই তাদের ঐশ্বর্যের সীমা, সার্থকতারও।

প্রথম যেদিন আর্ট স্কুলে এসে নন্দলাল প্রভৃতির পরিচয় নেন, সেদিনের স্মৃতি আচার্যের মনে আজও উজ্জ্বল। দশরথের মৃত্যু, কালী, সত্যভামা-কৃষ্ণ—তিনখানি ছবি সম্পর্কে তিনি কিছু কিছু মন্তব্য করেন। মুমূর্ষু দশরথকে তালপাখায় ব্যজন করানো হচ্ছে দেখে বলেন, এ-পাখা রাজ-ভবনে মানায় কি? ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐশ্বর্যের দ্যোতক কারুকলাদি দেখা উচিত। কালীকে কটিবাস দেওয়াতে বলে-ছিলেন, কালীর যে ধ্যান-ধারণা যুগ যুগ প্রচলিত, তার সঙ্গে সঙ্গতি হয় না। কালী করালরূপিণী, নগ্নিকা, অথচ ভক্তের কাছে বরাভয়দায়িনী বিশ্বজননী। ব্যবহারিক জ্ঞান-বুদ্ধি সহায় করে মায়ের রূপ ও চরিত্র ধারণা করা যায় না। ভগিনী বিশেষ বিচলিত হন শেষোক্ত ছবিটি দেখে। সত্যভামার পায়ে ধরে মান ভাঙাচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, এই ছবি এঁকেছিলেন শিল্পী। নিবেদিতা অত্যন্ত জোর দিয়ে, অত্যন্ত আবেগভরে বলেন, 'এমন পৌরুষনাশা কল্পনা কখনো কোরো না। পুরুষ স্ত্রীলোকের পায়ে পড়বে কী!' এই উক্তিতে যেমন বোঝা যায় নিবেদিতার চরিত্রগত তেজ, তেমনি পরিস্ফুট তাঁর অন্তর্দৃষ্টি। 'দেহি পদপল্লবমুদারম্' বাঙালিসুলভ এই ভাবালুতার সাধক আর যে খুশি হোক, নন্দলাল যে নন, তাতে আর ভুল কি? পৌরুষ, গাম্ভীর্য, গভীরতা, শান্তি, সংযম ও উদাত্ত ভাবই যে নন্দলালের সহজ, স্বাভাবিক, একথা মনস্বিনী ঠিকই বুঝেছিলেন, আর সেই দিকেই নন্দলালকে প্রেরণা দিয়েছিলেন। ছাত্রাবস্থাতেই রেখাঙ্কনের কতদূর উৎকর্ষে পৌঁছেছিলেন শিল্পী, জগাই-মাধাই ছবিটি তার বিশিষ্ট উদাহরণ। একটি হুঁকা আছে, শ্রীচৈতন্যের আমলে যার সম্ভাবনা ছিল না, এ মন্তব্য করেও নিবেদিতা ছবিটির প্রশংসা করে-ছিলেন।[৩] ছাত্রাবস্থায় আঁকা ছবির ভিতরে সতী ও সতীর মৃতদেহ কোলে নিয়ে শিব বা শিবসতী সঙ্গত কারণেই সর্বজন-পরিচিত হয়েছেন। 'সতী' সম্পর্কে চমৎকার গল্পও পাওয়া যায় অবনীন্দ্রনাথের উক্তিতে। প্রতিচিত্র তৈরির জন্যে জাপানে আসতে-যেতে কেমন করে তা বিবর্ণ হয়ে যায়, কেমন করেই আবার অগ্নিশুদ্ধ স্বপ্রভা তার ফিরে আসে। অবনীন্দ্রনাথের অপূর্ব কথকতায় তথ্যের কিছু হেরফের আছে, তা থাক। সতী, শিবসতী, জগাই-মাধাই, শিবতাণ্ডব, এই রকম অল্প কয়েক-খানি ছবিও স্মৃতির মন্দিরে সাজিয়ে নিলে অর্থহীন মনে হয় না এই সেদিনও আচার্য যা বলছিলেন, একজন আর্টিস্ট জীবনে অল্প কয়েকখানি ছবি আঁকেন; অসংখ্য কাজের ভিতর থেকে ঠিক ঠিক তিন-চারখানি বেছে নিতে পারলেও তাকে সম্পূর্ণ জানা যায়, পাওয়া যায়। অর্থাৎ বিশেষ প্রতিভার বিশিষ্ট যা স্বরূপ, তা অল্পেই ধরা পড়ে। সেই সঙ্গে একথাও যোগ করে দিই, আদিপর্বেও ধরা পড়ে যায়। যথার্থ যে রসিক, তার পক্ষে প্রভাত-সঙ্গীত আর মানসীর কয়েকটি কবিতা থেকে, প্রকৃতির প্রতিশোধ থেকেও, বিরাট বিশাল বিচিত্র রবীন্দ্র-প্রতিভার দিগ্‌দেশের জ্ঞান তথা আদিগন্ত সমীক্ষণ অসম্ভব নয়। তেমনি নন্দলালের পূর্ণ প্রতিভার জাজ্বল্যমান ছাপ তাঁর শিল্পী-জীবনের সূচনাকালীন কাজেও পরিস্ফুট হয়েছে। তা ব'লে রবীন্দ্রনাথের মানসী বা প্রকৃতির প্রতিশোধ নিয়েই আমাদের সন্তোষ হ'ত না নিশ্চয়। তেমনি শিল্পী নন্দলালেরও প্রায় অর্ধশতকের অনলস সাধনার অজস্র দান, জাতি বা যুগ তারও কিছুই ফেলতে চাইবে না। কারণ কী? শুধু গভীরতা, গম্ভীরতা নয়, সারের সার বস্তুটি নয়, আর্টে বিস্তার, বৈচিত্র্য, এমনকি, বিপুলতারও যথেষ্ট মূল্য আছে। নইলে অমর ঐশ্বর্যও মর্তে যথোচিত প্রতিষ্ঠা পায় না, তার ভার থাকে না, যেন বা সকলের গোচরীভূত হয় না, স্থায়ী হয় না—এসে ফিরে যায় অনন্তে, শাশ্বতে। আর এক কথা এই যে, রূপের যা স্বরূপ, ছন্দের যা অন্তঃস্পন্দন, ভাবেরও যা অনুস্যূতে অনুভাব—প্রায় অপরিবর্তনীয় বলা যায় শুধু সেইটিকেই। এক-এক প্রতিভার বিকাশে, এক-এক চরিত্রভঙ্গীতে, তা এক-এক প্রকার। সেইটি অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত রেখে দেহের ও পরিচ্ছদের, বর্ণের ও প্রসাধনের, আবেদনের ও ব্যঞ্জনার পরি-বর্তন হয় বৈকি, আর সেটি পরম লোভনীয়। নূতন নূতন বিষয়, নূতন কালের নূতন ঘটনা ও সমস্যা-রাজি, আর্টের নূতন করণ উপকরণ ও আশ্রয়, যেমনি উপস্থিত হয় শিল্পীর সামনে, শিল্পীকে আহ্বান করে দাঁড়ায়, অথবা ছল করে স্পর্ধা দেখায় পথ-রোধের, অমনি একই প্রতিভা বহুশঃ বিচিত্র হয়। সে এক কৌতুক, সে এক বিশেষ সার্থকতা। যেমন তা রবীন্দ্রনাথের জীবনে, তেমনি অবনীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে, তেমনি আবার নন্দলালের রূপকৃতিতে প্রমাণিত হয়েছে।

মূল প্রসঙ্গে ফিরে যাই। সহজ সরল করে বললে এই তো দাঁড়ায়, যে মুহূর্তে 'সতী' রূপ নিল আবিষ্ট তুলির টানে ক্ষুদ্র একখণ্ড কাগজে, অমনি চিরকালের নন্দলালকে পাওয়া গেল, নন্দলালের বিশেষ প্রতিভাকে। সহৃদয় জনের হৃদয়গোচর ও নয়নগোচর হল। অথচ হয়তো এ ছবি তাঁর প্রথম বৎসরের কাজ।

সিদ্ধার্থের ছবি, আর্ট স্কুলে নন্দলালের যেটি আদিম কল্পনা, সেটিতে হাঁটু অর্থাৎ হাঁটুর চাকি আঁকা হয়েছিল গোলাকারে। অবনীন্দ্রনাথ সেই অ্যানাটমি-অশুদ্ধ ড্রয়িং শোধরাতে উদ্যত হলে মনীষী হ্যাভেল বলেন, ঠিক হয়েছে, বড়ো সুন্দর হয়েছে, কারণ, ছবিটির আদ্যন্ত আলংকারিক রীতির সঙ্গে সঙ্গত হয়েছে। একনিষ্ঠ অনুশীলনের ফলে হ্যাভেল তাবৎ ভারত-শিল্পের অন্তর্নিহিত মণ্ডনগুণের যেমন পরিষ্কার ধারণা করতে পেরেছিলেন, তেমনি বুঝে-ছিলেন, ঐ বিশেষ গুণে নন্দলালের প্রতিভা বিশেষভাবে ভারতীয়, অর্থাৎ ভারত-শিল্পের ধারাবাহী। কিন্তু কেবল আলংকারিকতা নয়, ভারত-শিল্পের ধ্রুবপদী রূপ যা তাতে ফুটে উঠেছে আবার বিশালতা এবং এক প্রকার প্রতীকী বাস্তবতা। নিছক আলংকারিকতা পারস্য শিল্পেও আছে, প্রাচ্য যে কোনো 'চিকন' কাজে বা 'মিনিয়েচার' ছবিতেই আছে, ফলে বিশালতা ও বাস্তবতা নিরস্ত হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অজন্তায় বা বাগ্-গুহার কাজে তা হয়নি। নন্দলালের ছবি দেখে হ্যাভেল বুঝেছিলেন মনে হয়, এদিক দিয়েও নন্দলাল ভারত-শিল্পের যোগ্য উত্তরাধিকারী। কোনো উপলক্ষ্যে বলেছেন মনে পড়ছে, বৃহৎ পটভূমি পেলে তৈলচিত্রাদির রূপ নিলে, তবেই নন্দলালের চিত্রদক্ষতার পরিসীমা ও রূপসৃষ্টির স্বরূপবোধ সম্ভব হবে। বিরল সুযোগে ও অল্প কয়েকটি কাজে শিল্পী নন্দলাল উত্তর জীবনে ঐ ভবিষ্যদ্বাণীর যাথার্থ্য প্রমাণিত করেছেন বটে, আরো ব্যাপক ক্ষেত্র, আরো স্থায়ী আশ্রয় পেলে কী রূপৈশ্বর্যে এদেশ এই যুগ ঐশ্বর্যশালী হতে পারত, তা কেবল অনুমানের ও নিরাশ কল্পনার বিষয় হয়ে রইল। অল্পপরিসর কাগজে কাঠে কাপড়ে যা এঁকেছেন শিল্পী, সেও অনেক সময়েই স্বরূপতঃ বৃহৎ জানি; কিন্তু বৃহৎকে বৃহৎরূপে দেখবার সৌভাগ্য হল না।

আর্ট স্কুলে নন্দলাল পাঁচ বছর ছিলেন; বেতন দিতে হয়নি, বরং বছর দুই পরে মাসিক ১২।১৩ টাকা হিসাবে বৃত্তি পেয়ে-ছিলেন—এই তথ্য দিয়েছেন শ্রীমণিভূষণ

---

[৩] এ ঘটনা সম্ভবতঃ নন্দলাল ও নিবেদিতার প্রথম-সাক্ষাৎকারকালীন নয়।

গুপ্ত। ৪ পাঁচ বৎসর আর্ট স্কুলে ছিলেন কলা ও কারু নিয়ে নূতন এক সৃজন-বেদনার বৈদ্যুতিক আবহাওয়ার মধ্যে। হাতে ধরে অবনীন্দ্রনাথ শিখিয়েছেন অল্পই, কিন্তু তাঁর শিল্পসৃষ্টির ধারা-ধরণ, তাঁর রসাবিষ্ট চিত্রের স্পর্শ, তাঁর সাধনা, তাঁর জীবন ও চরিত্র, প্রভাব বিস্তার করেছে, প্রেরণা জুগিয়েছে সকল ছাত্রের অন্তরে, আর সব থেকে নন্দলালেরই শিল্পীজীবনে। তবে অচিরায়ু সুরেন গাঙ্গুলীর প্রসঙ্গ বাদ দিলে বলতে হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে প্রভাব হয়েছে সর্বনাশা, নয়তো অচিরস্থায়ী, নয়তো ভাসা-ভাসা, একমাত্র নন্দলাল নিয়েছেন তার স্পিরিট, কায়া বা মায়া নয়, ফলে আপন মৌলিকতা বিসর্জন দেন নি, বরং দিনে দিনে তাকে চিনে নিয়েছেন, তাকে দৃঢ় করেছেন, তাকে পুষ্ট করেছেন—অথচ, পরিণত বয়সেও বলেছেন শ্রদ্ধায় ভক্তিতে প্রীতিতে নত হয়ে, 'অবনীন্দ্রনাথ আমাকে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন আমায় শিল্পের ভুবনে। আমি তাঁর শিষ্য, আমি তাঁর পুত্রেরই মতো।'

এই সময়েই কলালক্ষ্মীর ধ্যানধারণার অনুকূলে আরো এক শিল্পসমজদার ভাবুকের অনুজভাব ও শিষ্যত্ব স্বীকার করেন নন্দলাল, তিনি হলেন শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত, স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা। আর্টের গভীর মর্ম, কোথায় তার মূল প্রেরণা, কিসে তার স্বতঃসিদ্ধ আধ্যাত্মিকতা, নন্দলাল ও শৈলেন দে'র সঙ্গে এসব নিয়ে তিনি বহু আলোচনা করেছিলেন। সেই আলোচনার ফলস্বরূপ অবনীন্দ্রনাথের ভূমিকাসহ একখানি বইও লেখা হয় ইংরেজিতে।

নন্দলাল আর্ট স্কুলের শিক্ষা শেষ করলেন যখন তার পূর্বেই অবনীন্দ্রনাথ সেখানকার সঙ্গে সকল সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছেন। পার্সি ব্রাউন, তখন প্রিন্সিপাল, তিনি নন্দলালকে বললেন, আর্ট স্কুলেই কাজ করতে, চাকরি নিতে। এদিকে অবনীন্দ্রনাথ ডাকলেন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে থেকে কাজ করবার জন্য। বলা বাহুল্য কোন ডাকে নন্দলাল সাড়া দিলেন। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর প্রিয় ছাত্রকে মাসিক ষাট টাকা হিসাবে বৃত্তি দিয়েছিলেন তিন বৎসর। এই সময়েই নন্দলাল ভাগনী নিবেদিতার Indian myths of Hindoos and Buddhists বইখানার ছবি আঁকেন। প্রাচ্য-শিল্পবেত্তা কুমারস্বামী আসেন গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের অতিথিরূপে। ঠাকুর শিল্পসংগ্রহের তালিকা-প্রণয়নে নন্দলাল তাকে সাহায্য করেন, বহু পুরাতন ড্রয়িং বা রেখাচিত্রের নকল করে দেন তাঁরই অনুরোধে। সে সময় ঠাকুরবাড়ি ছিল তীর্থবিশেষ; বহু দিক দেশ থেকে সেখানে এসে মিলেছে বহু মনীষার ধারা। ওকাকুরা প্রথম এসেছেন সুরেন ঠাকুরের বাড়িতে, নন্দলাল তখনো স্কুলে বা কলেজে। আর্ট স্কুলে ভর্তি হয়েছেন যখন তার পূর্বেই ওকাকুরার নির্দেশে এসেছিলেন জাপানী শিল্পী হিশিদা ও টাইকান, জাপানে ফিরে চলেছেন। ওকাকুরা আবার পাঠিয়ে দেন খারসুতা ও কিরাটান এই দুই শিল্পীকে অবনীন্দ্রনাথের বাড়িতে। অতঃপর দ্বিতীয়বার স্বয়ং ভারত-ভ্রমণে এসে, আর্ট স্কুলের তরুণ চিত্রকর-গোষ্ঠীর সঙ্গে পরিচিত হন। কিছু উপদেশ চাওয়ায় জিজ্ঞাসা করেন, কার কত বয়স। জন্মকাল খতাতে দেখে বলেন, তা নয়, কে কতদিন ছবি আঁকছে। কেউ দু বছর, কেউ তিন বছর। ওকাকুরা বললেন, 'এখনো সময় হয়নি। আবার আশা হয় তো তখন বলব।' তখনকার মতো সুরেন গাঙ্গুলী, নন্দলাল প্রভৃতি ছাত্রের ছবি দেখে দেখে মন্তব্য করলেন, বাতিল ছবি এক-একখানি ধরে সংক্ষেপে বোঝালেন কেন নষ্ট হল। 'কালী দিঘির পাড়ে ইন্দিরা' দেখে বললেন, ছবি ভালো, বর্ণ আবিল হয়েছে। ওকাকুরার সঙ্গে নন্দলালের এই প্রথম সাক্ষাৎকার। এর পরে পুনরায় যখন এদেশে আসেন, বক্তৃতা দেন নি, বিস্তৃত আলোচনা করেন নি, তবু যেটুকু বলেছেন, বুঝিয়েছেন, ইঙ্গিত করেছেন, বাংলার নূতন শিল্পগোষ্ঠীতে, অন্তত নন্দলালের শিল্পীজীবনে, তার প্রতিক্রিয়া হয়েছে শুভ ও সুদূরপ্রসারী। ওকাকুরার সঙ্গে এই শেষ দেখাশোনা। এ সময় তিব্বতে চলছিল লড়াই। ওকাকুরাকে কথাপ্রসঙ্গে কেউ প্রশ্ন করেন, জাপানীরা ভারত অধিকার করলে কী হবে? ওকাকুরা বলেন, 'কোনো কল্যাণ হবে না। চীনা হলে অন্য কথা ছিল, অতি প্রাচীন ও অভিজাত তাদের সংস্কৃতি। কিন্তু, জাপানীরা বর্বর, ভুঁইফোড় (upstart); হয়তো গায়ের জোরে এদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি মুছে ফেলবার দুশ্চেষ্টায় লেগে যাবে।' পাশ্চাত্য-অভিমুখিতা, পাশ্চাত্য শক্তিউপাসনার অনুকৃতি, জটিল পাশ্চাত্য সভ্যতার স্থূল লক্ষণগুলির আহরণ, বিজীগিষা, প্রাচ্য-ভাবের ক্রমিক পরিহার—যা দেখতে দেখতে জেগে উঠছিল নবীন জাপানে, তাতে যে ওকাকুরার হৃদয় বুদ্ধির সায় ছিল না, বিশেষ বেদনাই ছিল, দৃষ্টিও ছিল মোহমুক্ত, তারই প্রমাণরূপে এ কথার উল্লেখ হল। ভারতভারতীর কেমন ছিলেন মর্মজ্ঞ ভক্ত সেও বোঝা যায় যখন শুনি বার বার বলেছেন তিনি, এ দেশ ভাস্কর্যের দুরূহ ও তপঃসাধ্য মূর্তিকলার পুনরুজ্জীবন না হওয়া পর্যন্ত, সাধারণভাবেও ভারতীয় শিল্পকলার জীবনলাভ বললাভ ঘটে উঠবে না, পরমোৎকর্ষে পৌঁছোনো অসম্ভব হবে। কথা মিথ্যা নয়, আর আচার্য নন্দলাল অন্য যুগে অন্য অনুকূল পরিবেশে জন্মগ্রহণ করলে মূর্তিকার হতেন যে সে বিষয়েও তাঁর বা আমাদের সন্দেহ নেই।

ওকাকুরার কথা এই পর্যন্তই। কেমন অলক্ষ্যে কী প্রভাব তিনি বিস্তার করেছিলেন নবভারতের শিল্পে (তা ছাড়া রাজনীতিতে) তার কতক কাহিনী অবনীন্দ্রনাথও বলে গেছেন। 'জোড়াসাঁকোর ধারে' বসে স্মরণ করেছেন কিভাবে জাপানের আর ভারতের শিল্পে শিল্পে তথা শিল্পীতে শিল্পীতে হৃদয়বিনিময় হল, ভাববিনিময় হল, কবে কোথা থেকে সৃষ্টি হল—ছবিতে রঙ ধুয়ে ধুয়ে আঁকার অভিনব পদ্ধতি। কৌতূহলী পাঠক বই থেকেই প'ড়ে নেবেন। অধিকন্তু এইটুকু যোগ করা যেতে পারে আরও পরবর্তীকালে 'বিচিত্রা' ভবনে এসে থাকেন আরাইসান। নন্দলাল প্রমুখ শিল্পীরা তাঁরই ক্লাসে শেখেন জাপানী চিত্ররীতি কালীতুলির কাজ।

প্রতিভার বয়ঃসন্ধিকালে তার বিকাশ ও মজবুৎ গড়নের অনুকূলে, আর যে কয়েকটি ঘটনা ঘটে, নিশ্চিত পারম্পর্য না জানলেও তারও উল্লেখ করে রাখি এইখানে। 'শিবসতী' সোসাইটি বা ভারতীয় প্রাচ্য কলামণ্ডলীর প্রদর্শনীতে দেখানোর পরে শিল্পী পাঁচ শো টাকার একটি পুরস্কার লাভ করেন এবং স্বামীজীর সহপাঠী প্রবীণ শিল্পী প্রিয়নাথ সিংহকে সঙ্গী লাভ করে ঐ টাকায় পাটনা গয়া কাশী আগ্রা দিল্লী মথুরা ঘুরে, সেসব স্থানের শিল্পকীর্তিগুলি তন্ন তন্ন করে দেখে, শেষে বৃন্দাবনে কিছুকাল বাস করেন। এইভাবে উত্তর ভারতের ধারাবাহী শিল্প ও সংস্কৃতির সঙ্গে ভালোরকম পরিচয় হয়। তেমনি দক্ষিণ ভারতের অতুল শিল্পৈশ্বর্য দেখবেন বলে বেরিয়ে পড়েন শ্রীঅর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীঅসিতকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের সাহচর্যে। শ্রীক্ষেত্র থেকে কাঞ্চী অবধি সব তীর্থনগরীগুলি দেখা হয়

---

৪ 'আচার্য নন্দলালের জীবনীকথা'—নিরীক্ষা। নন্দলাল-সংখ্যা। ১৩৫১ আশ্বিন। উল্লিখিত রচনা থেকে বর্তমান প্রবন্ধ-রচনায় বিশেষ সাহায্য পাওয়া গেছে। আচার্যের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে নিরীক্ষার এই সংখ্যাখানি মূল্যবান, —— [illegible] ও প্রতিচিত্রে ভূষিত।

কেবল বাকি থেকে যায় ভারতীয় মূর্তিকলা ও স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠনিদর্শনরূপী কোণার্ক মন্দির। শিল্পই যার দেবতা, রূপরচনাই যার আরাধনা, রসানুভূতিই একমাত্র লভ্য—ইহলোকেই, কোনো পরলোকে নয়, আর পাপপুণ্যের জমা খরচের কোনো খাতিয়ান কেটে নয়—তেমন মনের মতো সঙ্গী পেয়ে কোণারক গিয়েছিলেন ঠিক কোন্ সালে কোন্ তারিখে, তা অনুসন্ধানের বিষয় হলেও কী দেখেছেন, কী পেয়েছেন, আজও জ্বল্ জ্বল্ করছে তা শিল্পীর স্মৃতিতে। সপরিবারে গিয়েছিলেন সপ্তাহের রসদ নিয়ে, শিশুপুত্রকন্যাগুলি বাদ যায়নি। সঙ্গে ছিলেন শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর আর জাপানি চিত্রকর আরাইসান। শেষোক্ত ব্যক্তিটি মাতৃভাষা ছাড়া কিছুই জানতেন না; কাজেই সমুদ্রের দুই পারের দুই শিল্পী আলাপ জমাতেন আকারে ইঙ্গিতে আর দরকার হলেই চিত্র এঁকে এঁকে, অর্থাৎ সর্বজনীন ভাষায়। তাতে কথা তো হতই, তা ছাড়া কৌতুক ছিল প্রচুর। কোণারকের রাস্তায় দেখলেন যথেচ্ছচারী হাজার হাজার হরিণ; বিজাতীয় জীবের সাড়া পেয়ে শৃঙ্গীগুলি সব নিমেষে কান খাড়া করে শিঙ উঁচিয়ে দাঁড়ালো ব্যূহ বেঁধে, হরিণী আর হরিণশাবকগুলি অনেক দূর চলে গেলে কে যে তাদের রাইট অ্যাবাউট টার্ন-এর হুকুম দিল অনুচ্চারিত ভাষায় সহসা ঘুরে দাঁড়িয়ে দল বেঁধে বিদ্যুদ্ভঙ্গীতে দিল ছুট।

সবশেষে যে ঘটনা উল্লেখযোগ্য সে হল, ইংরাজি ১৯১০ (?) সালে বিলাত থেকে লেডি হেরিংহ্যামের আগমন অজন্তা গুহাচিত্রের নকল করতে। ভগিনী নিবেদিতা অবনীন্দ্রনাথকে বললেন, নন্দলাল অসিত হালদার প্রভৃতিকে তাঁর কাজের সহকারী করে পাঠাতে। শুধু বলা নয়, সকলের সব দ্বিধা আপন দৃঢ় প্রত্যয়ের শক্তিতে ঠেলে ফেলে, নিশ্চিন্ত হলেন না যে পর্যন্ত নন্দলালদের পাঠানো না হল। অনভিজ্ঞ যুবকদের সঙ্গ দিতে গণেন ব্রহ্মচারীকেও পাঠিয়ে দিলেন পরে। আর আচার্য জগদীশচন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে নিজেও একদিন উপস্থিত হলেন সেই ভারতশিল্পের অমলানদ্যুতি পুণ্যতীর্থে। বৃদ্ধা হেরিংহ্যাম যে নিষ্ঠা যে শ্রদ্ধা যে দক্ষতা নিয়ে কাজ করেছিলেন, অজন্তা-চিত্রের প্রতিলিখনে, তার যা শিক্ষা, আচার্য নন্দলাল আজও তা স্মরণ করেন। বলা বাহুল্য, সমাগত শিল্পীদের, বিশেষতঃ নন্দলালের ধারাবাহী ভারতচিত্রকলার পরিচয় অজন্তাচর্যার ফলেই পূর্ণ হল, দৃঢ় হল, অন্তরঙ্গ হল। এরও বহুদিন পরে ইংরেজি ১৯২১ সালে গিয়েছিলেন বাগ গুহার ভিত্তিচিত্রের নকল নিতে; ভারত-চিত্রকলার প্রকৃষ্ট পরিচয়ই সেখানে পাওয়া গেল সত্য; একান্ত নূতন কোনো পরিচয় পাওয়া যায়নি। 'বাগ গুহার অভিজ্ঞতা' নন্দলালেরই মুখের কথায়, কৌতুকদীপ্ত ভঙ্গীতে, ১৩৪৮ আশ্বিনের 'প্রবাসী' পত্রে মুদ্রিত রয়েছে।

আর্ট স্কুল-উত্তীর্ণ নন্দলালপ্রমুখ তরুণ শিল্পীরা এক সময় স্থির করলেন, তাঁরা সপরিবারে একত্র থাকবেন, একত্র শিল্পসাধনা করবেন, একত্র উপার্জন করবেন এবং যার যার প্রয়োজনমতো ব্যয় করবেন, হবে যেন একান্নবর্তী একটি পরিবার বা সঙ্ঘ বা মঠ। বাড়িও একটি দেখা হল। কিন্তু কত দূর কী গড়ে উঠত শেষ-বেশ, জানা গেল না এইজন্য যে, এই সময়েই ইংরেজী ১৯১৬ সালে, 'বিচিত্রা' সভা স্থাপিত হল এবং সেই সভায় যোগ দিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের ডাক দিলেন। নন্দলাল, অসিতকুমার, মুকুল দে ও সুরেন্দ্র কর, বিচিত্রার শিল্পী হিসাবে প্রত্যেকে মাসিক ষাট টাকা হারে বৃত্তি পেতে লাগলেন। জাপানী শিল্পী আরাইসান এই বিচিত্রারই অতিথি ছিলেন এবং নন্দলাল প্রভৃতির সঙ্গে কোণারক দর্শনে গিয়েছিলেন, সে কথা পূর্বে বলা হয়েছে।

বিচিত্রা বেশিদিন স্থায়ী হল না। রবীন্দ্রপুত্রবধূ শ্রীমতী প্রতিমা দেবীর শিল্পশিক্ষার ভার পেলেন নন্দলাল। বাণীপুরে আপন বাড়িতে থেকে কোলকাতায় যাওয়া আসা করেন; সেই সময়েই (ইংরেজি ১৯১৯) আচার্য জগদীশচন্দ্রের আহ্বানে তাঁর বিজ্ঞান-মন্দিরে এঁকে দেন মহাভারতের ছবি, অন্য ছবি। স্বগ্রামে থাকতে থাকতেই পিতৃবিয়োগ হয়। কিছুকাল সোসাইটিতে বা ভারতীয় প্রাচ্যকলামণ্ডলীতে শিল্পশিক্ষার্থীদের আচার্যরূপেও কাজ করেন। মাঝে মাঝে যান শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যবিদ্যালয়ে। কবে যে প্রাণের যোগই কাজের যোগ হয়ে তাঁকে ধরে রাখল—খাতাপত্রের ভাষায় বলতে হলে, কলাভবনের অধ্যক্ষপদে—আসলে তার গুরুর পদে, প্রাণের প্রাণ হিসাবে! ধীরে ধীরে আচার্যের জীবনসাধনার মহিমান্বিত উত্তর পর্ব উদ্ঘাটিত হতে থাকল—তাঁর গুরুগোষ্ঠী, তাঁর মিত্রগণ, তাঁর পুত্রস্থানীয় শিষ্যগণ মুগ্ধ বিস্ময়ে তা দেখল, দেখে আনন্দিত হল, নইলে 'অলক্ষ্যে' বলা চলত—খবরের কাগজে কাগজে অসময়ে রটনা হয়নি তার।

১৩২১ সালের পুণ্য বৈশাখে শ্রীনন্দলাল বসু প্রথম এসেছেন সেই আশ্রম-পদে যেখানে একদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এসেছিলেন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এলেন, এসেছে বহু মানবের ধারা, বহু সাধনার, আসবে কালে কালে। ইষ্টক-অট্টালিকা, কংক্রিটের গাঁথুনি, আজ যা আছে কাল রাখবে না, থাকবে হয়তো আশ্রমবীথিকার শালপুষ্পোচ্ছ্বসিত আকাশ, মাধবী মালতী ও সপ্তপর্ণীর সৌরভ-বীজিত সমীরণ, আর চিরন্তন রাঙা ধূলি, কবি যাকে বলেছেন 'তোমার পথের রাঙা ধূলি'—কার, কবিই তা জানতেন, আর কেউ বা জেনেছেন, জানবেন কালে কালে।

গ্রীষ্মাবকাশের পূর্বে আশ্রমবাসী গুরু শিষ্য মিলে অভিনয়-অনুষ্ঠান ছিল অচলায়তন নাটকের। কাঙ্ক্ষিত অতিথি নন্দলালকে পেয়ে অর্ঘ্য দিয়ে বরণ করলেন কবি, আশীষ বর্ষণ করলেন তাঁর প্রণত শিরে। রবিকরপ্রোজ্জ্বল সকালবেলায় সেই অনুষ্ঠানটির শেষে এখন যেখানে শিশু-বিভাগ তার সম্মুখীন কালাচাঁদবাবুর বাড়িতে নির্দিষ্ট হয়েছিল নন্দলালের স্থান—শিল্পী এসে দাঁড়ালেন কুটীরদ্বারে, আশ্রমের প্রীতি-অর্ঘ্য তখনো রয়েছে তাঁর বদ্ধাঞ্জলিতে। হঠাৎ মনে হল, দেহ থেকেও তো নেই, জড়বাধা কোথায় অপসৃত হল, আলো হাওয়া চলে যাচ্ছে শরীর ভেদ করে। অননুভূতপূর্ব আনন্দে আপ্লুত হল চেতনা। আচার্য বলেন, আজও তার রেশ বাজছে জীবনে। মহর্ষি কি অলক্ষ্য আশীর্বাদে স্পর্শ করলেন শিল্পীকে, নিলেন তাঁকে আশ্রমের গূঢ় অন্তরে?

শ্রীঅসিতকুমার হালদার ছিলেন আশ্রমবাসী। নন্দলালও ফিরে ফিরে আসেন আন্তরিক টানে, কিছু কাল থাকেন, কাজ করেন, আবার চলে আসেন কোলকাতায় অথবা স্বগ্রামে। ক্রমশ স্বপ্ন থেকে বাস্তবে সত্যই রূপ নিতে লাগল কলাভবন, কবি প্রথমে টেনে নিলেন শ্রীসুরেন্দ্রনাথ করকে। পরে একদিন জোড়াসাঁকোয় এলেন, নন্দলাল ধূমাবতীর ছবি আঁকছেন একমনে, কখন তাঁর পিছনে এসে দাঁড়ালেন আর আস্তে আস্তে তাঁর পিঠে হাত দিয়ে বললেন, 'নন্দলাল তুমিও চলো।' বলাই বাহুল্য, খুশী হয়ে নন্দলাল সাড়া দিলেন কবির আহ্বানে। এই ঘটনার কাল, কত কাল রইলেন আশ্রমে, কবে প্রতিষ্ঠা হল 'সোসাইটি'র, গুরু অবনীন্দ্রনাথের আহ্বানে কবে ফিরে আসতে হল কোলকাতায়—শিল্পীর স্মৃতিতে নেই তার সন-তারিখ, নেই তার সপ্তাহ পক্ষ মাস বা বৎসর-গত পরিমাণ। তবু একথা খুবই মনে আছে, কবি সহজে আসতে দিতে চান নি নন্দ-

লালকে, নন্দলালও ফিরে এসেছিলেন গুরু-আজ্ঞাবশে, খুড়ো-ভাইপোর মধ্যে অনেক লেখালেখি হল, শেষে রবীন্দ্রনাথ এই মর্মেই লিখেছিলেন, 'সরকারী সাহায্য বিষময়, সরকারের প্রসাদপুষ্ট হয়ে স্থায়ী হবে না সোসাইটি, হতেও পারে না, অথচ এখানে আমি যে সৌধ গড়ে তুলতে চেয়েছি, নন্দলালকে নিয়ে গিয়ে, অবন, তুমি তার চূড়ো ভেঙে দিলে।'

কয়েক বৎসর গেল। শেষে (১৯২৩?) সোসাইটি থাকতেই গুরুআজ্ঞা পেয়ে নন্দলাল স্থায়ীভাবে এলেন শান্তিনিকেতন আশ্রমে। কলা-ভবনের অধ্যক্ষপদে এলেন একথা বললে হবে ঊনোক্তি। শান্তিনিকেতন আশ্রম, দু' চোখের কাছে যার অবারিত দূর-দিগন্ত পর্যন্ত সীমা, মনে যার সীমা নেই—সব দেশ আর সব যুগেই যেন ব্যাপ্ত হয়ে চলেছে দিনে দিনে—সেই আশ্রম, সেই বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতিই জানি কোলে নিয়েছে শিল্পীকে, শিল্পীও আপন করেছেন, আত্মসাৎ করে চলেছেন তাকে প্রতিদিনের তপস্যায় আশ্চর্য ও অজস্র রূপকৃতিতে। **রবীন্দ্রনাথ তাঁকে আর্ট স্কুল চালাতে আহ্বান করেন নি। 'এসো তুমি এখানে, এখানে থেকে সাধনা করো, সৃষ্টি করো'—এই ছিল তাঁর একমাত্র দাবী।** নিজেও তিনি ভুবনবরেণ্য শিল্পী, স্রষ্টা—সৃষ্টি থেকেই সৃষ্টি জেগে ওঠে, প্রাণ থেকেই প্রাণ, এ তাঁর ভালোই জানা ছিল। আর, সে প্রাণ সৃষ্টির ক্ষুধায় সব-কিছু থেকেই রস নেয়। অজস্র রসের প্রেরণা যেমন বর্তমানে এবং প্রকৃতিতে তেমনি তা অতীতের সঞ্চিত সম্পদে আর ভবিষ্যতের ধ্যানগম্য আদর্শে, সাহিত্যে সঙ্গীতে, নৃত্যে অভিনয়ে; যেমন চারুকলায় তেমনি বিচিত্র কারুকর্মে; যেমন মানুষের দূরপ্রসারিত ইতিহাসে তেমনি তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়। স্বভাবসিদ্ধ হলেও পরিবেশের বিশেষ মাহাত্ম্যে এই বোধ জাগ্রত, জীবন্ত ও স্পষ্ট হল নন্দলালের শিল্পীজীবনে। রবীন্দ্রনাথ কী অনুকূল ক্ষেত্র, কী রসের আবহাওয়া স্বতঃই সৃষ্টি করে তুলেছিলেন শান্তিনিকেতনে! সচেতন চেষ্টাও তাঁর কতখানি ছিল! নিজের রচিত গান কবিতা গল্প প্রবন্ধ পাঠ তো ছিলই; তা ছাড়া শেলি কীট্স ব্রাউনিং কালিদাস এঁদের রচনা নিয়েও অধ্যাপনা করেছেন তিনি মাঝে মাঝে। সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা মূল মহাভারতের কণ্ঠস্থ শ্লোকাবলী আবৃত্তি করে গেছেন সুর করে, আর তার ব্যাখ্যা ও আখ্যান-অনুসারিত করেছেন অভিনব কথকতার ভঙ্গীতে। মন্দিরে উপাসনা, উৎসব, অভিনয়, নিত্য বা নৈমিত্তিক বৈতালিক, জ্ঞানী ও গুণীজনের নিয়মিত যাওয়া-আসা, বহুজনের সম্মিলিত জীবনের হৃদ্যতাপূর্ণ মেলামেশা, পারিপার্শ্বিক সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তা ও সহজ লেন-দেন—এ সবও আছেই। আশ্চর্য নয়, নন্দলালের জীবনের বিশেষ ঐশ্বর্যপূর্ণ অধ্যায় এখানে শুরু হয়েছে, প্রতিভার আত্মআবিষ্কার সম্পূর্ণ হয়েছে এবং তাঁর সৃষ্টিধারায়, শিষ্য-প্রশিষ্যধারায়, চিত্র মূর্তি কারিগরী উৎসব-সজ্জা নাট্যপ্রসাধন ও সেই সেই বিষয়ে স্থায়ী রুচি—সব দিক দিয়েই জাতি ও যুগ বিশেষ লাভবান হয়েছে, ধন্য হয়েছে।

এই আশ্রম থেকেই কবিগুরুর সাহচর্যে গিয়েছেন তিনি (১৯২৪ সালে) চীনে, জাপানে, দ্বীপময় ভারতভূমিতে, বর্মায় এবং পরবর্তী অন্য এক উপলক্ষ্যে সিংহল দ্বীপে। মহাত্মার আহ্বানে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে এখান থেকেই গেছেন তিনি লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে ভারত-শিল্পের প্রদর্শনী সাজাতে; ফৈজপুর কংগ্রেসে সামান্য বাঁশ ও 'বল্লী' দিয়ে অসামান্য মঞ্চ ও তোরণরাজি নির্মাণ করতে, কংগ্রেসের প্রথম পল্লী-অধিবেশনের সকল রূপসৌষ্ঠবের ব্যবস্থা করতে—আজও কানে বাজছে বাপুর উচ্ছ্বসিত প্রশস্তি, বিস্ময় জাগাচ্ছে তাঁর অলৌকিক লোকচিত্ত ও লোকচরিত্র-জ্ঞান. নন্দলাল যখন বলেন, 'আমি তো বাস্তুকর্ম জানিনে', তিনি বলেছিলেন 'নন্দলাল, তুমি যদি চিত্রবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে থাকো অন্য বিদ্যাও তোমার সহজেই জানা হয়েছে'—অবশেষে এই শান্তিনিকেতন থেকেই গেছেন নন্দলাল হরিপুরা কংগ্রেসপুরী সাজাতে, নূতন কাসের উপযোগী শত শত নূতন পট দিয়ে বিচিত্র বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছেন, ইঙ্গিতও করেছেন অতীত প্রথা আর যুগের প্রয়োজন, লোকচিত্ত আর শিল্পীর খুশি, দিনমজুরী আর চিরন্তনের বেগার, উভয়ের চেনাপরিচয় ও কোলাকুলি কোন্ রাস্তায়, কোন্ দিকে। শেষোক্ত প্রসঙ্গে মনে পড়ে নন্দলাল আর অবনীন্দ্রনাথ উভয়ের মুখেই শুনেছি, গুরু একবার গুরুদক্ষিণা চেয়ে বসলেন প্রিয় শিষ্যের কাছে, 'আমাদের আর্ট বিশেষ গোষ্ঠীর জিনিস, গণ্ডীর জিনিস, পট আঁকো যাতে শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেরই হবে আনন্দ।' কত কথাই তো বলেছেন অবনীন্দ্রনাথ কত রকম মেজাজে, নন্দলাল কথনো হাল্কাভাবে নেন নি। এক্ষেত্রেও বসে গিয়েছেন চাষী ও মজুরের আনাগোনার রাস্তার ধারে, না জানি কোন্ রাইরাজাতলার হাটে, রঙ তুলি দিয়ে দ্রুত রীতিতে এঁকেছেন নবোদ্ভাবিত পট এবং যার ভালো লেগেছে দু' চার আনা দামে তাকে বিক্রীও করেছেন। যে পটগুলি উদ্বৃত্ত রইল একদা এনেছেন গুরুকে দেখাতে, গুরু অবশ্য তৎক্ষণাৎ গুরু-প্রণামী হিসাবে বাজেয়াপ্ত করেছেন—জনজীবনের অংশভাক্ হবার দায়ে আর সেগুলি ফেরি করতে দেন নি।

উপস্থিতকালে, অর্থাৎ শান্তিনিকেতনে যখন নন্দলাল স্থায়ী হয়েছেন ও সৃষ্টি করছেন সেইকালে ফিরে আসা যাক। কৃতী হয়েছেন, সংস্কৃতিবান সমাজে আজ পরিচিত হয়েছেন, এমন সকল ছাত্রই এইকালে এসেছেন নন্দলালের কাছে, কেউ আগে কেউ পরে। একাল আমাদের চোখে দেখা এবং আজও যেন চোখের সামনেই রয়েছে, অথচ হুঁশ হয় আবার, জানি, নেই—কত দূরেই চলে গেছে। যাক, খেদ করে লাভ নেই। শিল্পীজীবনের এই প্রৌঢ় পূর্ণপরিণত অধ্যায়ে বিশেষ কী ঘটেছে, তার তাৎপর্যই বা কী, সেইটে আলোচনা করাই দরকার এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাবশতঃ হয়তো সম্ভবও।

(১) ওয়াশ বা রঙ ধুয়ে ধুয়ে আঁকার পদ্ধতি ত্যাগ করে পরম্পরাগত টেম্পারা পদ্ধতির দিকে ক্রমিক ঝোঁক পড়ায় নন্দলালের শিল্পপ্রতিভার যে অনন্যতা তা বিশেষ করে ফুটে উঠেছে, দৃঢ় হয়েছে। পরম্পরাগত অঙ্কনপদ্ধতিকে মুখ্য করায় পরম্পরাগত শিল্পাদর্শ, ধ্যান ও মনন, দৃষ্টিভঙ্গী ও অনুভূতি নন্দলালের চিত্রকর্মে এগুলি সহজেই প্রকাশমান ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

(২) অথচ, চীনা, জাপানী, বিলাতি—মিশরীয়, পারসিক, গ্রীক—প্রাগৈতিহাসিক, বর্বর, সুসভ্য—অনুকারী, অনুবাদকারী, অবাস্তব—সব রকম আর্টেরই তত্ত্বসন্ধান, প্রয়োজনমতো অনুশীলন, সম্ভবমতো আত্মীকরণ, তাও চলেছে আশ্চর্য দ্রুতগতিতে। বিবিধ করণ উপকরণ ও আশ্রয় নিয়ে বিচিত্র পরীক্ষা তারও যেন শেষ নেই। অর্থাৎ, জাগ্রত মন ও জাগ্রত প্রতিভা যেমন নিজেকে দিচ্ছে তেমনি নিজের করে নিচ্ছে যেখানে যা পাওয়া যায়—তাতে শরীর-সংস্থানবিদ্যাও বাদ পড়ে নি আর চীনা তুলির বিশ-পঁচিশ রকমের টান-টোন ছাপ-ছোপের কায়দাকানুন সার্থকতা তাও পরিশীলিত ও পরিচিত হয়েছে।

(৩) হ্যাভেল, গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, আরো অনেকে চেয়েছিলেন চারুকলার সঙ্গে কারুকলারও উজ্জীবন। চেষ্টা চলেছিল ক্ষীণপ্রাণ মন্দগতিতে। শান্তিনিকেতন আশ্রমের যৌথ জীবনের প্রয়োজনে, নিত্য-নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান ও উৎসবাদির আয়োজনে এবং রবীন্দ্র-কাঙ্ক্ষিত গণসংযোগের চেষ্টার ফলে, আজ তা প্রাণপূর্ণ বেগে, বিচিত্র ক্ষেত্রে, বিবিধ উপায়ে উপকরণে প্রবন্ধ হয়ে উঠতে লাগল। এই সকল ব্যাপারে নন্দলালের প্রতিভা নিযুক্ত থাকাতে, মনে হতে পারে, অযথা তার কালব্যয় হয়েছে, শক্তির অপচয় হয়েছে, কিন্তু তা নয় - প্রয়োগ-বৈচিত্র্যহেতু তার স্ফূর্তি হয়েছে, বহু ক্ষেত্র থেকেই তা রাজখাজনা আদায় করে নিয়েছে, অজস্র খুঁটি-নাটির ভিতর দিয়েও আপনাকে চিনে নিয়েছে, আর কেবল ছবি এঁকে বা মূর্তি নির্মাণ করে কোন্ পরিণাম, কে বুঝবে, কে তা নেবে, কোথায় বা রাখবে—সব দিক দিয়ে শিল্পের পরিবেশ সৃষ্টি করতে না পারলে তার দৈনাদুর্বলতাও ঘোচে না আর ঠিক-ঠিক সে গৃহীতও হয় না।

(৪) অবশ্য, সমাজে সভ্যতায় যে সংকট বা সমস্যাজটিলতা আজ অতিপ্রকট কোনো একজন দুজন বা দশজন শিল্পীর তা বশীভূত নয়; যুগচিত্তের যে অস্বাভাবিকতা, উন্মার্গগামিতা, তার স্বাস্থ্যবিধান অতি দুরূহ। তবু তো সাগ্নিকের যজ্ঞাগ্নির মতো শিল্পকে শিল্পাদর্শকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, আশা ও বিশ্বাস হারালে চলবে না। সেদিক দিয়ে শিষ্য-প্রশিষ্যধারায় নন্দলালের প্রভাব যে ধীরে ধীরে, দিকে দিকে, ভারতের প্রদেশে প্রদেশে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে বা পড়ছে, তা থেকে কল্যাণই হবে, ভারতীয় শিল্পশ্রী উজ্জ্বল হবে। পরম্পরাগত শিল্প সম্পর্কে বিদ্রোহ যদি জেগে থাকে, যথা-কালে সেও কি আপন নির্দিষ্ট বক্রপথ শেষ করে শমে ফিরে আসবে না? কলা-ভবনে এসেছে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ছাত্র শুধু নয়। ছাত্রীও। এই সম্পর্কে আচার্যের একটি মন্তব্যের উল্লেখ না করে থাকা যায় না। পরমহংসদেব বলেছেন ওদের 'আনন্দময়ী'। কবি বা শিল্পী যে বলবেন, তাতে আর আশ্চর্য কী? তা ছাড়া, জীবধারিণী জীবপালিনী মেয়েরা উত্তর-জীবনে শিল্পের অখণ্ড সাধনা নাও যদি করে উঠতে পারেন, শিল্পের প্রভাব, শিল্পের পরিবেশ, তার আহ্বান ও অনুরাগ জাগিয়ে তুলবেন ঘরে ঘরে, সমাজের কোথায় বা নয়? অবস্থাবিশেষে জড়োপাসক সমাজের সঙ্গে শিল্পীর যে সংগ্রাম নিঃশব্দ ও নিরবধি, তাতে ওঁরাই তো দক্ষ 'পঞ্চম বাহিনী'—অতিশয় নিঃশব্দ (আসল উদ্দেশ্যের বিষয়ে) আর চতুর বলেই শত্রু-শিবিরে আদৌ জানাজানি হবে না।

(৫) পূর্বেই বলেছি, যে মুহূর্তে নন্দলাল শান্তিনিকেতন আশ্রমে, এই শাল-তাল-খেজুর-শোভিত নতোন্নত রাঙা মাটির দেশে পা দিলেন, অমনি এখানকার প্রকৃতি তাঁকে আপন করে নিল। প্রকৃতির স্পর্শ পূর্বেও পেয়েছেন, না হলে কোনোরকম প্রাণস্ফূর্ত রূপকলাই সম্ভব হত না—কিন্তু সে যেন ছেঁড়া ছেঁড়া ভাবে এবং সম্পূর্ণ সচেতনভাবেও নয়। চেতনা অন্তরে থাকলেও বিশেষভাবে অনুশীলন ও আরাধনা করা হয়নি রহস্যময়ীর, অন্তরের গোপনে যিনি কাজ করে গেছেন মায়া বুলিয়ে, বাইরে তেমন ধরা দেন নি। এখন নীড় বাঁধলেন অবারিত বিশাল প্রকৃতির পরিবেশে, আবর্তিত ঋতুনাট্যের কেন্দ্রস্থলে। নটরাজ কালের পাদপীঠতলে, দ্বিতীয়বার জন্ম হল যেন প্রথম ও পুরাতন জননীর ক্রোড়ে। জন্মের তো শেষ নেই। রবীন্দ্রনাথ বিশেষ করেই প্রকৃতির কবি সে তো জানা আছে। তাঁর গানে গল্পে কবিতায় অভিনয়ে সেই প্রকৃতিকেই তিনি অন্তঃপ্রকৃতির রঞ্জনে ও রসায়নে নিবিড় ও তদ্গত মানব-উপলব্ধির বিষয় করেছেন—শিল্পীর জীবনে তারও তো ছোঁয়াচ লাগল। চিরন্তনকে নূতন করে চিনে নেবার জিজ্ঞাসা জাগল। ফলতঃ, আচার্যের মুখে শুনেছি, এখানে থাকতে এসে মনে হল দশ দিক যেন কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করছে, 'তুমি তো শিবেরই ছবি আঁকো?' শিল্পীকে অপ্রস্তুত করা গেল না- আশ্রমে পদার্পণ মাত্রেই এখানকার আলো-বাতাসের স্পর্শদীক্ষা পেয়েছেন তিনি, দৃষ্টি ধুয়ে গেছে—তিনি বললেন, 'হাঁ, তাই এঁকেছি। এখন শালগাছ তালগাছ যদি আঁকি তার মধ্যেও শিবকেই আঁকব।' অবিশ্বাসী যুগকে বলতে ভয় হয়, এ কথার তাৎপর্য অতিশয় গভীর ও দূরগামী। প্রথমতঃ, এতদিন শিব যে এঁকেছেন শিল্পী লোকের মুখের কথা শুনে, কাব্য পুরাণ পড়ে বা ধার-করা বিশ্বাসের উপর নয়। দৃশ্যতঃ যেমন মনে হোক, সত্যই যদি তাই হত, তাহলে শালগাছ তালগাছ সামনে এসে দাঁড়াতেই হতবুদ্ধি হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। দ্বিতীয়তঃ শিবকে মন্দিরে বা মনো-মন্দিরে, বড় জোর গুরুর মধ্যে, মহতের মধ্যে, মানুষের মধ্যে দেখাই এককালে পর্যাপ্ত ছিল, আজ তা নয়। গাছের মধ্যেও দেখতে হবে। ফলে নন্দলালের তুলি নূতন বিষয় পেল, আর আজ থেকে নবতন রূপেই তাকে প্রকাশ করবার সাধনায় মজে গেল। তাঁর চিত্রপটে গাছের মধ্যেও দেবতাকে প্রত্যক্ষ করিনি কখনো, ক্ষুদ্র কার্ডে পেন্সিল বা কালী দিয়ে আঁকা ধোপার গাধাতেও ধ্যান মূর্তিমান হয়নি কোনোদিন—তা বলতে পারব না। পূর্বেও যেমন সাঁওতালি নাচের রেখাচিত্রে আমাদের অধিকাংশের চোখে-দেখা সাঁওতাল মেয়ে পুরুষের অনেক বেশি দীপ্ত হয়ে উঠেছে।

সে কথা যাক। শান্তিনিকেতনে এসে অবিরাম অনুশীলনের দ্বারা যেমন যুগ-যুগান্তরের দেশ-দেশান্তরের রূপকলা সম্পর্কে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বেড়ে গেল, একটার পর একটা শিক্ষার দ্বারা, পরীক্ষার দ্বারা, আঙ্গিক বা ক্রিয়াকৌশলের প্রকার বেড়ে গেল, তেমনি বিষয় বেড়ে গেল চিরন্তনী অসীমাকে প্রত্যক্ষ করে।

অদ্যতন ভারতীয় চিত্রে প্রকৃতিচিত্র যে ক্রমশই অনেকটা আসর জুড়ে বসেছে, এই-ভাবেই তার সূচনা। নন্দলালের ছাত্রদের বিষয়-বাছাইয়ে এর ইতিহাস পরিস্ফুট, কৃতী ছাত্র কয়েকজন এই দিকেই বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। যেমন টেক্‌নিকের তেমনি বিষয়ের পরিবর্তনে, অবনীন্দ্রনাথের অক্ষম অনুকরণ-হেতু নব-অভ্যুদিত চিত্রকলায় যে একটা বদ্ধ জলের বা রুদ্ধকক্ষের ভাব এসে যাচ্ছিল, তার থেকে মুক্তি পাওয়া গেল এক উদার বহতা স্রোতে, এক সজন লোকালয়ে, এক বৃহৎ পৃথিবীতে। নন্দলালি প্রতিভার ক্রমবিকাশে তাঁর আপন রূপকৃতিতে তো বটেই, তাঁর শিষ্যপরম্পরার সাধনাতেও মনে হয়, শিল্প-গুরু অবনীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত নব্যচিত্রকলা অকালমৃত্যু বা মূর্ছা থেকে রক্ষা পেল।

এখন থেকে শুধু ছবিতে নয়, অজস্র স্কেচের ভিতর দিয়ে নব্যচিত্রকলার এক নূতন ধারা প্রবাহিত হয়ে চলল। আমাদের দেশে এ একটা আশ্চর্য অপূর্ব ব্যাপার। আর এ জিনিস অন্য দেশের ক্ষীণপ্রাণ অনুকরণ হয়েই থাকবে না, খবর বলার বা নোট রাখার স্তরেই পড়ে রইবে না—শিল্প-সঙ্গীতিতে সহজ সুরের, দ্রুত তালের, বিচিত্র ভঙ্গীর সর্বজনহৃদয়স্পর্শী এক জলসা জমিয়ে তুলবে—এজন্য নন্দ-লালের মতোই বড়ো শিল্পীর প্রতিভার অপেক্ষা ছিল। আচার্য বলেন—মিথ্যা অহমিকা তাঁর নেই—'আমি মুকুল দে'র স্কেচ করা দেখে প্রথম প্রেরণা পাই। সেকালে তার স্কেচের নকলও করেছি।' কিন্তু আজ তাঁর স্কেচ, তার মধ্যে কার্ড স্কেচও অনেক, বিষয়ের দিক দিয়ে নয় শুধু, আঙ্গিকের দিক দিয়ে আর মেজাজের দিক দিয়েও এত বিচিত্র নিপুণ আর স্বতঃস্ফূর্ত যে, অন্যের অনুকরণের বাইরে এবং স্বতন্ত্র এক

উছলে পড়ে দেখা দেয় যেন পঞ্চমের স্পর্শে; যেন আত্মসমর্পণের ক্রমিক লীলাপর্যায় দেখা দিয়ে যায় সুরের পথে শ্রুতিদের সাথে সাথে। প্রতিটি সুর আসে আপন অভিমানের স্পর্ধায় আপন আবেগ সঞ্চয় করে। পর ...হূর্তেই, যেন বিমোহ আর বিস্ময়ের মধ্যে ... আত্মবিস্মরণের চমৎকারী! অস্ফুট ...নীয় অনুভবের সেই মাধুর্য! ধরি ...করেও ত' তাকে ধরা যায় না; অথচ ...সারেই সে ধরা দিয়ে সরে যায় বার- ...খন সরে গিয়েছে তখন মনের মাধুরী ...ঝি কোন্ এক মধুর সুন্দর এসে ... করে গিয়েছে আমাকে। চলে ...ময়ে আমার সমস্ত মনোভূমিকে ... দিয়ে গিয়েছে সুরশ্রুতির ... সিঞ্চনে।

...টি অক্ষরকে ধরে খাঁ সাহেব ... ক্রমশ অগ্রগামী সুরের ভাঁজ ... রাগ-বিস্তার) রচনা করে ... পর একটি। প্রতিবারেই ...বন আয়ে"র মুখবন্ধনী শান্তি...

আসে, ভেসে যায়। এদের সকলকে অবহেলা করিনি, এখনও করিনে। ক্বচিৎ এদের শ্রুতিগুলি যেন ঈষৎ অবগুণ্ঠনের অন্তরাল হ'তে কটাক্ষ ও ভ্রূবিলাসের ইঙ্গিতমাত্র করে চলে যায়, কিন্তু স্পষ্ট করে কিছুই বলে না। কখনও বা সুরেরা হাসিমুখে বুঝিয়ে দিয়ে যায় যে শিল্পীর অভ্যাস নিগড়ে বন্ধ বিহঙ্গ এরা; কলকাকলী সৃষ্টি করে মাত্র শিল্পচাতুর্যের "Window-dressing" বজায় রাখতেই এরা আসে আর চলে যায় পালাক্রমে। কখনও বা এরা শান্ত-শিষ্ট নির্বিকার ধ্বনি করতে থাকে একটির পর একটি; টাইম্‌পিস্‌ ঘড়ির টিক্‌-টিক্‌ আওয়াজের মতো শব্দের দাঁড় বয়ে কাল-সমুদ্রকে খণ্ডিত বিখণ্ডিত করে দেওয়াই যেন এদের জীবনের একমাত্র কর্তব্য, আগমনের একমাত্র হেতু! এদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলেই বলি এদের,—"এসেছ এই আমার ভাগ্য। তোমাদের কর্তব্যনিষ্ঠা দেখে প্রীত হলাম, কৌশল দেখে চমৎকৃতও হয়েছি। আশীর্বাদ করি বেঁচে বর্তে

বিপর্যয়ের চিত্র অঙ্কিত হয়ে গিয়েছে, তাদের বর্ণরেখা আমার অন্তরে ক্ষণে ক্ষণে দেখা দেয় এটা বুঝতে পারি। সেই বিপর্যয়েরও গভীরে না-জানি কোন্ গোপন অনুভূতি ঘটে যায় যার আভাসমাত্র পেয়ে আমি আবিষ্ট হয়ে যাই তখনই, আর সার্থক, ধন্য মনে করি নিজেকে।

নিখাদ-ধৈবতের সংগমে এই গানের আন্তরিক ভাব-বিপর্যয় নানারকমে বুঝবার চেষ্টা করেছি। শ্যামলালজী ও বদল খাঁ সাহেবের সঙ্গে আলোচনার অবসরে বদল খাঁ সাহেব কৃপা করে এই গান ও ললত্-পঞ্চম রাগের একটি গান শিখিয়ে দিয়ে-ছিলেন। পরীক্ষা করেই দেখি সেই একই নিখাদ আর ধৈবতের খেলা! একই রকমের মাধুর্য আর বিস্ময় দিয়েই ঐ দুই সুর সহসা অনুভবের উন্মেষণা ঘটায়; একই রকমের অনুভূতি রাগের কোনও অন্ত-র্নিহিত আকাঙ্ক্ষার সাক্ষাৎকার ঘটিয়ে দেয়। মাধুর্য আর বিস্ময় দিয়ে মাখান এই পরিচয়, এই আত্মসাক্ষাৎকার। গানের এই

আলোচনার বিষয়। শুনেছি, তাঁর নিজেরই কাছে কার্ড-স্কেচ প্রায় তিন হাজার আছে, ছাত্রছাত্রী আত্মীয়-বন্ধুদের যা বিতরণ করেছেন, সে হল ঐ সংখ্যার আট-দশ গুণ। তোতাপুরি রামকৃষ্ণদেবকে বলেছিলেন, রোজ ধ্যান করতে হয়, চিত্ত পরিষ্কৃত থাকে ঘটি নিত্য মার্জনা করলে যেমন নিত্যই ঝক্‌ঝক্‌ করে। এই অজস্র স্কেচ শিল্পীর সেই দৈনন্দিন চোখ-চাওয়া ধ্যান। অল্পই আঁকেন দেখে বা বিষয় সামনে রেখে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মনে ছাপ নেন, পরে আঁকা হয়; ভোর চারটায় উঠেও আঁকেন হ্যারিকেনের আলোটি জেলে—বিজলীর আলো সর্বত্র পাওয়া যায় না, পূর্বে সর্বদা পাওয়া যেত না শান্তিনিকেতনে।

আলোচনা সাময়িকের মাপে বড়ো হল। অথচ আচার্য নন্দলালের কথা অল্পই বলেছি, মানুষ নন্দলালের বিষয় উত্থাপন করা হয় নি। শিল্পীর পরিচয় রয়েছে সর্ব-জনসমক্ষে, সকল কালের জন্যে। লোকে (অর্থাৎ, এদেশে অল্প যাঁরা শিল্পরসিক ও অনুসন্ধিৎসু) জানেন, তাঁর আঁকা সাঁওতাল যুগলের পূর্ণায়তন রেখাচিত্রে প্রেরণা পেয়ে কবি লিখেছেন 'দূরে গিয়েছিলে চলি', তাঁর কার্ডগুলির রসোজ্জ্বল ভাষ্য 'ছড়ার ছবি' কবিতার বই, ছন্দের মালা পরিয়ে তাঁকে বার বার বরণ করেছেন কবি, আশীর্ভাষণ উচ্চারণ করেছেন। বসুবিজ্ঞানমন্দিরে বরোদারাজের কীর্তি-মন্দিরে, শান্তি-নিকেতন চীনাভবনে, সেখানকার গ্রন্থাগারে, শ্রীনিকেতন উৎসব-প্রাঙ্গণের অনাবৃত ভিত্তি-গাত্রে, শিল্পীর সাবলীল সাহসিক তুলির স্বাক্ষর, নূতন নূতন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়-লিপি যে কেউ গিয়ে পাঠ করতে পারবেন। 'তপস্বিনী উমা', কাহিনী যার অবনীন্দ্রনাথ বলে গেছেন, ভাগ্যবান সংগ্রাহক কর্তৃক পরবর্তী কালে উপহৃত হয়ে আজ ঘরে ফিরে এসেছে তাও বলা যায়, রয়েছে কলা-ভবনের হ্যাভেল হলে; 'উমার ব্যথা' চোখে আঁকা রয়েছে তারই যে একবারও দেখেছে অনিমেষ দৃষ্টিতে। কালী-তুলিতে আঁকা মহাপ্রস্থানের বৃহৎ ছবিতে অপরিচিতপূর্ব আঙ্গিকের যার-পর-নেই দুরূহতা ও দুর্জ্ঞেয়তা লুপ্ত হয়ে গিয়ে, ভিতরের ও বাহিরের আকাশের বিস্তার, আনন্ত্যের ব্যঞ্জনা ও প্রশান্তি, ফুটে উঠেছে এমন যা উঁচুদরের চীনা ছবিতে কেবল পাওয়া যাবে। পথহারা গাভী, পার্থসারথি, রাধার বিরহ, কলঙ্কভঞ্জন, নটীর পূজা ৫, সংঘমিত্রা, তামার পাতে খোদাই গাণ্ডীবী, কাঠে বা লিনোলিয়ামে কাটা গ্রীষ্ম-দুপুর বা জ্যোৎস্নারাত, পুরী ও গোপালপুরের সমুদ্র —মানস চিত্রশালায় দরোজার একটি পাল্লা একটু ঠেলে দিতেই এক ঝলকে সবই দেখা যায়, এগুলি এবং অপরিসীম রূপৈশ্বর্য আরও যা আছে সেখানে কিছুরই তো ক্ষয় নেই।

শিল্পীর সামান্য এই পরিচয়। সব যুগের সব দেশের শিল্পীমহলে কত উচ্চে তাঁর

---

৫ যে ছবির প্রতিলিপি রয়েছে শান্তি-নিকেতনে গ্রন্থাগারের এক তলায়, ভিত্তিগাত্রে সেইটির কথাই বলছি। রেখাছন্দ প্রাচ্যচিত্রের প্রাণ। রেখাই নন্দলালেরও চিত্রপ্রতিভার ধারক বাহক এবং ক্রিয়াকৌশলগত উৎকর্ষের সীমা স্বরূপ। উল্লিখিত ছবিখানি আঁকতে বসে হঠাৎ অনুভব করলেন নন্দলাল, জীবন্ত রেখা তুলির অনুসরণ করে না, তুলির আগে আগে চলেছে অপূর্ব এক আবেশ ও আনন্দ। রূপকারের তন্ময়তার অবিরল মুহূর্তে, এ উপলব্ধি আর কখনো কি নন্দলালকে ত্যাগ করেছে?

যৌবনের বিভ্রম! কতো বিচিত্র বিকার ও চঞ্চলতা দেখা দেয় নায়িকার দেহে মনে বাক্যে আচরণে। "বিভ্রম" অর্থাৎ অস্থির মতির বশে কারণে অকারণে আসন ত্যাগ, হাস্য, রোষপ্রকাশ, কার্য শেষ না হ'তেই অন্য কার্যে মনোনিবেশ প্রভৃতি বিশিষ্ট প্রকাশ্য লক্ষণ। কিন্তু, আশ্চর্য এই কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণ! বিভ্রমগুলির জন্য নানারকমের চঞ্চলতা ও অধীরতা নায়িকার আচরণে উদ্‌ভ্রান্তির সৃষ্টি করলেও, ক্ষণে ক্ষণে তিনি নিজ চরণের নূপুরশিঞ্জিত শুনে সহসা স্তব্ধ বিমূঢ় হয়ে যান; যেন আত্ম-প্রকৃতির প্রশান্তির মধ্যে ডুবে যান তিনি! যৌবন উপগমের ভাব-বিপ্লব তাঁর সমস্ত অভিমান ও রূপগর্বকে অভিভূত করে ফেলে মুহূর্তের মধ্যে; বাল্যাবস্থার পূর্বাস্বাদিত বিস্ময়-বিমোহের পুনরাস্বাদই যেন ঘটে তাঁর অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যে। ফলকথা, বিশেষ সন্ধিক্ষণেই এই বিপ্লব-বিপর্যয়ের সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ হয়; এবং সেই অতিপরিচিত নূপুরধ্বনিও এ-সময়ে ঐ রকমের আন্তরিক আলোড়নের কারণ হতে পারে।

যিনি ভাবুক তিনি ভাবের ইঙ্গিত করে ক্ষান্ত হন। যিনি রসিক তিনি ভাব-সৌন্দর্যের রস গ্রহণ করেন, কিন্তু অন্যকে রসাস্বাদ করান না। আর যিনি কবি, তিনি ভাবুক ও রসিকেরও ঊর্ধ্বে, কারণ একমাত্র তিনি অন্যকে রসাস্বাদ করাতে পারেন। ঐ শ্লোকটির লেখককে আমি ভাবুক বলেই মনে করেছি। আমি নিজে ঐ ভাবুকের রচনার আলোচক মাত্র, কারণ ঐ রচনার ভাবের আলোচনা করছি, আর কালে খাঁ সাহেবের গানের মুহরাটি শুনে আমার মনে যে আলোড়ন উপস্থিত হয়েছিল তার সঙ্গে ঐ ভাবুকের ইঙ্গিতগুলিকে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করছি মাত্র। আমার একটা প্রত্যয় এই যে, অনুভূতির কোঠায় সাদৃশ্য আছে বলেই আমি এরকমের বিশিষ্ট চেষ্টা করলাম। ঐ গানের "যোবন আয়ে"ই হয়ত রাগানুভূতির একটি সন্ধিক্ষণ; নিখাদ আর ধৈবতের ব্যঞ্জনাই হয়ত সেই সন্ধিক্ষণে নূপুরধ্বনির মত চমৎকৃতি আস্বাদন করিয়েছে।

অবশ্য কালে খাঁ সাহেবের প্রতিভা ওরকমের উন্মেষণা আর সাক্ষাৎকারের চরম সৌন্দর্য আস্বাদ করিয়ে দিয়েছিল। বদল খাঁ সাহেবের অন্য গানে ('ফুলি বসন্ত বাহার') ধৈবত সুরেই ছিল গূঢ় ঘূর্ণী-পাকের প্রকাশ্য নিশানা; রাগোচ্ছ্বাসের হঠাৎ তিরোধানের প্রথম স্তম্ভ। বহির্জগতের দৃষ্টান্ত খুঁজেছি। মনে হয়েছে, এরকমের রাগে ধৈবত-নিখাদের মধুর চক্রান্ত যেন সমুদ্রতটের কিছু দূরে ব্রেক্-ওয়াটারের তরঙ্গবন্ধনীর মতো বিপর্যয়-কারী; তরঙ্গের বিক্ষোভ যেন কারণে অকারণে এখানে থেমে যায়। বাইরের জগতের উদাহরণ দিয়ে ভিতরকার ভাব-জগতের ঘটনাকে বুঝবার একটা চেষ্টা মাত্র; কিন্তু সাক্ষাৎ অনুভূতির রহস্য যেন আচ্ছন্ন থেকে যায় ভাবের প্রহেলিকার অন্তরে।

আরও মনে হয়েছে, ষড়জ ঋষভ গান্ধার প্রভৃতি সুরের অন্তরে বস্তুত কত অদ্ভুত শক্তি লুকিয়ে রয়েছে, ধ্বনির বিচিত্র সংঘাত-গুলি শ্রোতার অন্তরকে কত রকমের উন্মেষণা দিয়ে আপ্লুত, অনুগৃহীত করতে পারে, এসকল কথা আমরা তখনই বুঝি যখন সঙ্গীতের প্রতিভা আমাদের বুঝিয়ে দেন গান করে', হৃদয়ের আঁধারে সুরের আলো পৌঁছিয়ে দিয়ে; যখন সুরতরঙ্গের মধুর কল্লোল দিয়ে তিনি উৎসাদিত করে দেন আমাদের কানে-শোনা নিত্য-নৈমিত্তিক কোলাহলগুলি। এমনি করেই কবিপ্রতিভা আমাদের হৃদয়ের মধ্যে পরিচয় ঘটিয়ে দেন শব্দ-বাক্যের অলৌকিক ধ্বনিমাহাত্ম্য; আমাদের অনুভবের যন্ত্রকে উন্মুখ করে তোলেন বিচিত্র অনুভূতির প্রত্যাশা দিয়ে। সঙ্গীতের অনুভব আর কাব্যের অনুভব! এদের মধ্যে হয়ত মৃণালসূত্রের ব্যবধান আছে। গানের অবকাশে এই সূত্রটি যেন ক্ষণে পাই ক্ষণে হারাই। তাইতে মনে করি, ব্যবধান থাকলেই বা কী আর না থাকলেই বা কী! যে রকম হ'ক, আর যে রকমেই হ'ক, কৃপা করে অনুভবটা ঘটিয়ে দেও, হে গায়ক, হে কবি! অনুভবের ঘর যদি আকাঙ্ক্ষা আর অনুরাগে ভরে না ওঠে, তা হ'লে গান আর কবিতা, অর্থাৎ সুরের ষড়যন্ত্র আর কথার কাকলীকলরব দিয়ে কর্ণকুহরকে উত্তেজিত করে কী লাভ!

খাঁ সাহেবের গান আর সুর কানে ধরে নেই। আগেকার সেই বিস্ময় বিমোহ এখন আর নেই; গানের আলোয় দেখা দিয়েছে বর্ণের ছটা, রূপের শোভা। ঢিমা একতালার ছন্দোবন্ধনে খাঁ সাহেব রচনা করে চলেছেন গিটকারির কুসুমগুচ্ছ; বাণী ও সুরকে ছন্দের বাঁধনে জড়িয়ে অলঙ্কৃত করেন বোল তানের বিভূতি দিয়ে। রাগের আলো আর ছায়া, ছন্দের আভাস আর নিরাভাসের সুযোগে যেন লুকোচুরি খেলায় মেতে উঠল কথা ও সুরের দল। গানের লয়ে কথা ও সুরের পলকে প্রলয়, পলকে আবির্ভাব। সমের নিকুঞ্জ পথেই এদের পরস্পরে ধরা-ছোঁওয়ার অভিযান; অভিযানের মধ্যেই যেন মিলন আর বিচ্ছেদের খেলা। কত মধুর মিলন, আর কী অপূর্ব বিচ্ছেদ! ইতিপূর্বে এ রকমের ব্যাপার আর কখনও প্রত্যক্ষ করিনি বলে'ই মনেপ্রাণে সজাগ হয়ে আছি। রাগের শরধি থেকে বাছাই করা সুরের বাণ তুলে নেন খাঁ সাহেব; কথার ডালি থেকে চয়ন করেন ব্যঞ্জনের শিলষ্ট ধ্বনিগুলি; মাত্রা ছন্দের সন্ধিক্ষণে কথার কুসুমগুলিতে ডুবিয়ে-তোলা সুরের বাণগুলি খাঁ সাহেবের কণ্ঠচ্যুত হয়ে ছেয়ে ফেলে আমাদের শ্রবণের আকাশ; মুহূর্তের পরিচয় মাত্র। এরা যখন শ্রুতির দিগন্তে বিলীন হয়ে যায় তখনই আবার ফুটে ওঠে গানের রূপ, আপন দীপ্তিতে আপন সুষমায়।

ঢিমা খেয়ালের মন্থর গতিভঙ্গির অন্তরালে এতখানি চপলতা গোপন থাকতে পারে, গিট্‌কারি ও বোলতানের ছন্দসজ্জায় গানের রূপ এমন মহিমায় মূর্ত হয়ে উঠতে পারে একথা স্বপ্নেও ভাবিনি। তখন পর্যন্ত আমরা টপ্‌পা গানের অঙ্গেই গিট্‌কারির শোভা দেখেছি; আর বোলতানের রূপই দেখিনি ইতিপূর্বে, এমন কি মৈজুদ্দিনের গানের মধ্যেও এরকমের ছন্দোবন্ধ সুশৃঙ্খল প্রত্যক্ষ করিনি। পরে বদল খাঁ সাহেব ও শ্যামলালজীর সঙ্গে এদের বিষয়ে আলোচনা করে একটা স্পষ্ট ধারণা হয়েছে। এপর্যন্ত নানা গুণীর মুখে নানা রকমের খেয়াল গান শুনে ধারণা হয়েছে, ধ্রুপদ গানের আনুগত্য স্বীকার করে আর বিধি-নিষেধের গণ্ডীবদ্ধ হয়েই সাধারণভাবে খেয়াল গানের রূপ গড়ে উঠেছে। কিন্তু এমনও সব খেয়াল গানের রূপ দেখেছি— বিশেষ করে বদল খাঁ সাহেবের ও আল্লাদিয়া খাঁ সাহেবের সম্প্রদায়ের মধ্যে যেগুলি আপনার নিয়মে গড়ে উঠে আপন ভঙ্গিমায় চল্‌তে ফিরতে থেকে সুন্দরের পরিচয় দেয় ইচ্ছামত জম্‌জমা, গিট্‌কারি আর বোলতানের সাজে, আপনার নিজের সম্ভ্রমে। ধ্রুপদ গানের নিয়মনিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে এরা গড়ে ওঠেনি। খেয়াল গানের এই স্বচ্ছন্দ স্বতন্ত্র রূপের চরম পরিচয় সর্বপ্রথম ঘটেছে কালে খাঁ সাহেবের মুখে

বিলম্বিত আস্থায়ী শুনে। আরও মনে হয়েছে, স্থপতি-শিল্পের পাশ্চাত্য সমালোচকেরা যাকে "বারোক্ স্টাইলে"র রচনা বলেন, বস্তুত সেই ধরণের রচনা আর বিভূতি ছিল কালে খাঁ সাহেবের গানের মধ্যে। তাঁর গান শুনে মনে করতে বাধ্য হয়েছিলাম—খেয়াল ত' খেয়ালই! আর গুণীর আপন খেয়ালই চরম কথা। পরের খেয়ালে গান করা ত' চাক্‌রি করার সামিল। মাত্র এই কথাটি মনে করলে কালে খাঁ সাহেব মৌজুদ্দিন আর আব্‌দুল করিম খাঁ সাহেব ছাড়া আর কাউকে মনে করতে পারিনে।

বোলতালের বাহনে গানের কথাগুলির অর্থ সামর্থ্য পরিস্ফুট হচ্ছিল বলেই আমি সন্ধান করেছি গানের ভাবার্থ। ভাবার্থ ছিল, দেহধামে যৌবনশ্রী যেন রাজনন্দিনীর রূপে দেখা দিয়েছে। প্রিয় হিতৈষী সখিজনের মত যেন অংগ-প্রত্যংগেরা নিজ নিজ রূপ গুণ শোভা আর অলংকারে সমৃদ্ধ হয়ে রাজনন্দিনী যৌবনশ্রীকে সাগ্রহ অভিনন্দন জানায়। গান শুনতে শুনতে মনে হয়, তবে কি গীতেরই যৌবন দেখা দিল কথা সুর ও ছন্দে সমৃদ্ধ হয়ে। সত্য সত্যই যেন গানের উল্লাস-চঞ্চল যৌবনই প্রত্যক্ষ হ'ল আমাদের।

বিচিত্র ছন্দের বোল্‌তান শুনে আমরা উত্তেজিত হয়ে উঠেছি; ছন্দে বা মাত্রায় আমাদের দেহ দুলে ওঠে; শিষ্ট শান্ত হয়ে বসে থাকার কথাই ওঠে না। খাঁ সাহেবের পাগড়িও থেকে থেকে দুলে উঠছে; তাঁর বাঁ হাতখানি ঊর্ধে উঠে যায় তানের আগে, আর বোলতানের চক্রের সংগে ঘুরতে ঘুরতে নেমে আসে। সময়ে সময়ে আবেগের চরমে সেই হাতখানি বেগে নেমে এসে বাঁ হাটুর উপর ধাক্‌কা দিয়ে থেমে যায়; কখনও বা আসরের জাজিমের উপর একটা চাপড় দিয়ে উঠে যায়। সংগতীয়া ভদ্রলোকটি গান শোনার উল্লাসে অন্যমনস্ক হয়ে ইতিপূর্বে একবার অপ্রতিভ হয়েছিলেন। তার পর থেকে সযত্নে ঠেকাকে সংযত করে রাখেন তিনি, কিন্তু মাথা নড়ে ওঠে তাঁরও।

সহসা আমরা শুনি একটি নূতন গানের কলি, —— "ললিত-লবংগ-লতা-পরসীলন কোমল-মলয়-সমীরা"! খাঁ সাহেবেরই মুখে সুরে ছন্দের বাঁধনে, বোলতানের সাজে! তিনি যেমনটি উচ্চারণ করেছিলেন ঠিক তেমনটিই লিখেছি। রাগ ত' একই বোধ হল; কিন্তু এটা কি নূতন গানের আরম্ভ? সংগতীয়া ভদ্রলোকটি ত্রস্ত হয়ে ঠেকা ছেড়ে দিলেন, কী করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। আমি ভাবছি নূতন গানের মুখেই এত বাহার কি করে হয়! অবিলম্বেই সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে গেল। খাঁ সাহেব নূতন চরণটির শেষে অর্থাৎ কবিশেখর জয়দেবের লেখা সমস্ত চরণটি শেষ করে গাইলেন "বিহরত হরিরহ সরস বসওনত, যোওবন আ"; একেবারে পূর্বের গানের মুহরা আর সম্! এ কী উদ্ভট প্রথাবিরুদ্ধ ব্যাপার, এই এক গানের মধ্যে অন্য গানের বোল! যেন দু'টি গানের লতা হঠাৎ একসংগে জড়াজড়ি করে দেখা দিল আর নিমেষের মধ্যে হয়ে গেল ছাড়াছাড়ি! স্তম্ভিত হতবুদ্ধি হয়েছি আমরা! এটা কি খেয়াল না খাঁ সাহেবের খামখেয়াল!

হতবুদ্ধি হ'ননি দুজন: স্বয়ং কালে খাঁ সাহেব আর বিশ্বনাথজী। ঠেকা বন্ধ হলেও তম্বুরার ছেড়-ছাড় গোলমাল হলেও খাঁ সাহেব অবিচল গান গেয়ে চলেছেন, আপন খেয়ালে। আর বিশ্বনাথজী! তিনি সংগতীয়া ভদ্রলোকটির হাত থেকে তবলার জোড়া একরকম কেড়েই নিলেন বলতে হয়; যে রকম ব্যগ্র দেখলাম তাঁকে! গানের ছন্দের অনুক্রমগুলি অবলীলাক্রমেই ধরে নিলেন বিশ্বনাথজী। শুধু তাই নয়, চৌতালের দু'-চার ছয় মাত্রার কয়েকটি ছোট ছোট মানানসই বোল এমনভাবে সংগতে লাগিয়ে দিলেন তিনি, যে খাঁ সাহেবের উৎসাহ বেড়ে গেল এবং আমাদের মনে হল বিশ্বনাথজী এতক্ষণ সংগত করলে গানের বাহার আরও খুলে যেত। তখন আরম্ভ হল এক উদ্ভট, অথচ সুন্দর চমৎকার গীতরূপের রচনা। গানের ভূমিকায় গান! এক গানের ফ্রেমে যেন অন্য গানের ছবি! এক গানের লতাপাতা ফুল দিয়ে অন্য গানের শৃংগার সাজ! প্রথমে বুঝতে অস্বস্তি হয়েছিল। অস্বস্তিটা চলে গেল যখন বুদ্ধির কারচুবি বন্ধ রেখে গান শোনায় মন দিলাম!

সেই "যৌবন"ই যেন থেকে থেকে অদৃশ্য হয়ে যায় "ললিতলবংগলতিকা"র সুর ছন্দ-তান প্রতানের আড়ালে, আবার ফিরে এসে দেখা দেয় "বসওনতে"র আগমনী-বার্তা পেয়ে! এখন আর সুরে সুরে নয় গানে গানেই যেন লুকোচুরির খেলা; অদ্ভুত! আর মনে হল যেন অসম্ভব সাধন-চাতুর্য দিয়ে নিরতিশয় মনোরম ভঙ্গিতে, প্রতিবার এক এক রকমের গিটকারি আর বোলতানের সাজে দেখা দেয় "ললিতলবংগ-লতা"। শব্দগুলি কখন সূক্ষ্ম গমকের নিস্বনে কেঁপে কেঁপে ওঠে, কখনও বা

জম্‌জমার মাদকতায় হেলতে দ্বলতে সপ্তকের এদিক ওদিক যেখানে সেখানে ন্‌ত্যের আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে ঘ্বরে ফিরে চলে যায়। শীতের অন্তে বসন্তের আমেজে পত্রপল্লবের মত যেন কথার ট্‌করাগ্বলি ঝক্‌ঝক করে ওঠে। বসন্ত আর যৌবন-সমাগম একসঙ্গে। এদের আভাস ইঙ্গিতে রাগলতিকার বৃন্তে দেখা দেয় গিটকারির গ্বচ্ছ, আধ-ফ্বটন্ত ফ্বলের স্তবকের মতো। ললিতাপণ্যম রাগিনীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেই ত' দেখি বসন্তের চমক! স্বরশ্রুতির শিহরণ ত' যেন গানের শরীরে যৌবনেরই জাগরণ! এমন আশ্চর্য কখনও দেখিনি, শ্বনিনি, কল্পনাও করিনি। একি বাস্তবিকই ললিতা-পণ্যমের উন্মত্ত যৌবন বিভ্রম? না কি, গ্বণীর হ্বদয়ে প্রতিভার উন্মাদনার চরম একটা ম্বর্তি?

পরে অবসর সময়ে ঐ রকমের প্রশ্ন আলোচনা করতে গিয়ে মনে হয়েছে ম্বলে একটি প্রহেলিকার স্বত্রকে দ্বখণ্ড করে দ্ব' রকম সমস্যা রচনা করা আর দশ রকমের ব্যাখ্যার জাল স্বষ্টি করে তাদের ম্বল র্বপটি আবরণ করে তৃপ্তি পাওয়াটা অনর্থক পরিশ্রম। গ্বণী, আর তার গ্বণ, শক্তি ও প্রতিভাকে প্থক করার অর্থ এক চুল চিরে চার চুল করা। এ যেন প্রাণবস্তুর সন্ধান করতে গিয়ে জিয়ন্ত মান্বষকে কেটে শত খণ্ড করে, প্রতি খণ্ডের মধ্যে প্রাণকে খ্বজে বার করার চেষ্টা! আসল কথা যা মনে হয়েছে আমার,—অগ্নি আর তার দাহিকা শক্তি, তার আলো, তার শিখা, তার ঔজ্জ্বল্য যেমন অগ্নি থেকে প্থক, বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়, সে রকম গ্বণীর হ্বদয়ে সংকল্প, তাঁর কণ্ঠধ্বনি, আর সেই ধ্বনির বাহনে গান বা রাগর্বপের অভিব্যক্তি সেই সংকল্প থেকে প্থক, বিচ্ছিন্ন নয়; এরা সমস্ত মিলেই একটা গোটা জিনিষ। গ্বণীর হ্বদয়ে রয়েছে প্রতিভার আগ্বন; বাইরে থেকে আমদানী করা কাটা-ছাঁটা শিক্ষার কথা স্বর আর ছন্দগ্বলি বিচিত্র রকমে মিলে মিশে সেই আগ্বনের জ্বালানির কাজ করে। সকলের শেষে কণ্ঠের স্বরে যে আলো দেখা যায় সেই আলোই হ'ল চরম কথা। গ্বণী, গ্বণীর প্রতিভা, আর এই শিখার দেদীপ্যমান র্বপগ্বলি,—এদের নিয়ে প্থক করে সমস্যা গড়ে তোলা আর তাদের মীমাংসা করতে যাওয়া হল,—ইচ্ছা করে, অনর্থক হাতে কাদা মেখে পরে কষ্ট করে কচ্‌লে কচ্‌লে ময়লা সাফ করে' একরকমের তৃপ্তি পাওয়া।

খাঁ সাহেব গানের জাল গ্বটিয়ে নিয়ে এসেছেন। "ললিতলবঙ্গলতিকা"র ইন্দ্রজাল অদ্বশ্য হয়ে যায় কয়েকটি সরল মধ্বর হলক্ তানের হিল্লোলে। আমরা ভাবি না জানি আরও কি খেলা ল্বকিয়ে আছে খাঁ সাহেবের ঝ্বলিতে। ক্রমে দেখা দেয় চৌদ্বনি তালের বিদ্যুৎ-বলয়; রাগের উপয্বক্ত অলংকারই এরা। কয়েকটি কথার ইঙ্গিতে ঝলকে ঝলকে স্বরগ্বলি আরোহ-অবরোহের অলাত-চক্র স্বষ্টি করতে করতে মিলিয়ে যায় "যোবন আয়ে"র মধ্যে; আখেরী তান এরা। অন্বভবে বোধ হল স্বরের প্রদীপের শেষ আরতি দিয়ে গানের প্বজো সমাপন করেন খাঁ সাহেব। গান সমাপ্ত হল। গানের সমগ্র মহিমার একটা রেশ যেন বিদায় নিতে চায় না আমাদের হ্বদয় থেকে, তখনও।

খাঁ সাহেবকে সবিশেষ প্রশংসা করতে পারিনি আমরা; বাক্যের সামর্থ্য নেই বলে। সকলে তাকিয়ে আছি বিশ্বনাথজীর ম্বখের দিকে। তাঁর চোখ দ্ব'টি আনন্দে ছল-ছল; এরকম চাহনি বড় একটা দেখিনি সেই শ্যেন-দ্বষ্টির অন্তরে। গদ্‌গদ কণ্ঠে বিশ্বনাথজী বল্‌লেন খাঁ সাহেবের জিহনের (প্রতিভার) পক্ষেই এমনতর আশ্চর্য বে-নজির ব্যাপার সম্ভব হল। খাঁ সাহেব সেই রক্তজবার রংএর ম্বরেঠা সমেত মাথা নীচু করে যেন প্রশংসা ধরে নিলেন। ভগবানের প্রতি অভিমান করে এই ম্বরেঠাকে তিনি বাক্‌স বন্দী করে রেখেছিলেন। পবিত্র অভিমানে মহীয়ান এই শিরোভূষণই ত' প্রতিভার যোগ্য প্রশস্তি ধারণ করে বয়ে নিয়ে যাবে অন্তরের দেউলে। এক প্রতিভার ম্বখে অন্য প্রতিভার প্রশংসা আর সাধ্ববাদ! হ্বদয়ের কোন গোপন মন্দিরে এই দ্বই আলোর মিলন ঘটে আমরা বাইরে থেকে তার রহস্য কীই-বা ব্বঝতে পারি! বিশ্বনাথজী একটি চরম কথা বলেছিলেন,—খাঁ সাহেব! আমি আর বড় বেশী দিন থাকব না। কিন্তু এ'রা থেকে যাবেন অনেক দিন, আর এদের ঠোঁটের আগায় আপনার নামওয়ারি চলে যাবে অনেক দিনের রাস্তায়। তার পর সব খতম্! আবার যখন আপনার মত লোক দেখা দেবে দ্বনিয়ায়, তখন আবার দো-চার রোজের পাল্‌লায় দ্বনিয়া হায় হায় করবে।

খাঁ সাহেব তম্ব্বরার স্বর অদল-বদল করে নিয়েছেন, খরজের তার খরজে আর পঞ্চমের তার মধ্যমে। আসর গম্‌গম্ করতে থাকে য্বগল তম্ব্বরার স্বর—মধ্যমের সংবাদে। বিশ্বনাথজী বল্‌লেন, আমাদের "খাঁ সাহেব ত' মালকোশে সিদ্ধ"! আমি ভাবলাম সিদ্ধির আর কী নম্বনা বাকী থাকতে পারে! সত্য সত্যই খাঁ সাহেব আরম্ভ করলেন মালকোশ রাগের একটি পদ "পগ্‌লাগন দে", মধ্য লয়ের তেতালায় আর বিনা উপক্রমণিকায়। জীবনে এই গানটি প্রথম শ্বনলাম। পরেও শ্বনেছি কয়েকবার, কিন্তু প্রথম পরিচয়টি যেন শেষ পরিচয় হয়ে আছে, এপর্যন্ত সময়ে।

(ক্রমশ)

পুস্তক পরিচয়

ছোট গল্প

কথাগুচ্ছ — শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার সম্পাদিত। এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স লিঃ। ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য সাত টাকা।

সাহিত্যের প্রসঙ্গে 'সাম্প্রতিক' এবং 'সনাতন' —এই দুটি জাতির উল্লেখ কেমন যেন অসংগত মনে হয়। সময়ের বেষ্টনী দুর্লঙ্ঘ্য—একথা অস্বীকার করলে স্বৈরাচারী বলে অনেকে অভিযোগ করবেন। সময়ের খাদের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে মানুষের জীবন। আমাদের রুচি, অভ্যাস, সংস্কার, দাবী, যোগ্যতা ইত্যাদি নির্বর্তিত হচ্ছে কালধারার জোয়ার ভাঁটায়। অতএব, সময় যে নগণ্য নয়,—এ বিশ্বাসটি এখন স্বতঃসিদ্ধের মতো স্বীকার্য।

তবু সাহিত্য সম্পর্কে মূল আগ্রহটি কাল-ধর্ম নয় বলেই মনে হচ্ছে। অর্থাৎ সময়ের পর্ব-পর্যায়ভেদ সাহিত্য বিচারের অপরিহার্য অঙ্গ নয়। সংস্কৃত সাহিত্যের বিচারকদের কাছে এ বিষয়ে যে আর্য সত্যটি পাওয়া গিয়েছিল, সেটি অকাট্য। 'রসের' চেয়ে বড়ো সত্য এ রাজ্যে অলভ্য। রস হলো সহৃদয় হৃদয় সংবাদী। পাঠকের সহৃদয়তার সামর্থ্য কমে এলেই সাহিত্যস্রষ্টা কালপ্রভাব সম্পর্কে অতি সচেতন হতে বাধ্য হন।

সে অবস্থায় রসের সম্ভাবনা প্রসঙ্গের সাম্প্রতিকতার দ্বারা সীমিত হয়। অর্থাৎ মনের বিশেষ একটি বেড়ার বাধা প্রাধান্য পায়। কেন যে এমন হয়, তার বিশ্লেষণ করেছেন সমাজ-রাষ্ট্র-সম্পদ ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক তত্ত্বাধিকারী পণ্ডিতরা। পাণ্ডিত্যের সংক্রাম স্রষ্টারাও এড়িয়ে চলতে পারেন না। অতএব, ইতিহাস-অর্থনীতির শাসন অব্যাহত ভাবে প্রকট হবার সুযোগ পায়। সাহিত্য যে যুগমানসের দর্পণ, কবি যে ভবিষ্যদ্বাণীপ্রদাতা, ঔপন্যাসিক যে সমকালের ঐতিহাসিক—অথবা গল্পকার যে খণ্ডকালের বর্ণনকার—এইসব প্রবাদ পর্যালোচকমহলে স্বীকৃত হতে থাকে।

সাহিত্যের সমালোচনা এই বিশ্বাসের বশবর্তী। ফলে কালের কষ্টিতেই বিচার চলতে থাকে। এক কালের আলোচক যে কষ্টিটি ব্যবহার করেন, অন্য কালের আগন্তুক তাকে উপেক্ষা করতে বাধ্য হন। সাহিত্যের সনাতনত্ব ক্রমে উপেক্ষার বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। রাম-শ্যাম-যদু-মধুর মতো সাহিত্যও নশ্বর হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু একথাটা অভ্যস্ত সংস্কারের বড়ো বেশি বিরোধী হয়ে পড়ে। সুতরাং এক সংস্কারের সঙ্গে অন্য সংস্কারের আপোষ ঘটাতে হয়। রবীন্দ্রনাথ ওষধি আর বনস্পতির রূপক দিয়ে ব্যাপারটি বেশ গ্রাহ্য করে তুলেছেন। তবু তাঁর মতামত ভাবতে ভাবতে চলতি আর স্থায়ী—এই দু'হাতের সাহিত্যপ্রয়াস ও সাহিত্যসিদ্ধি সম্পর্কে আগাছা আর বনস্পতি—এই দুটি শ্রেণী সম্বন্ধেই মন সজাগ হয়ে ওঠে।

নতুন বাঙলা গল্পের হিসেব কষতে বসে কথাটা আর একবার মনে হলো। 'কথাগুচ্ছের' দ্বিতীয় সংস্করণ বেরিয়েছিল ১৩৫৩ সালে। প্রথম সংস্করণ ছাপা হয়েছিল ১৩৪০-এ। তৃতীয় সংস্করণ ছাপা হয়েছে ১৩৫৯-এর কার্তিকে। তৃতীয় সংস্করণের সংকলনটি দেখতে দেখতে ১৩৪৫-এর আর একখানি সংকলনের কথা মনে পড়লো। প্রেমেন্দ্র বিশ্বাসের সম্পাদনায় সে বছর 'আধুনিক বাঙলা গল্প' নামে একখানি বই বেরিয়েছিল। সে বইয়ের ভূমিকায় লেখক বলেছিলেন, 'মানুষের স্বভাবচরিত্র, রুচি, আচারব্যবহার দেশ-কালের হাওয়ায় ভাঙে গড়ে, নানা সংসর্গে নানা রূপ পায়। সাহিত্যিক অভিমতও তেমনি সংসর্গমিতে গড়ে ওঠে।' এই সংসর্গবাদে বিশ্বাসী বিশ্বাস মহাশয় অতঃপর লিখেছিলেন, 'বাঙলা ছোট গল্প সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের পর শৈলজানন্দ মুখো-পাধ্যায়ই বোধ হয় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বাঙলা গল্পকেও অনেক দিন পর্যন্ত আচ্ছন্ন করেছিলো, শৈলজানন্দ নিজেরই অজ্ঞাতে মোড় ফিরিয়ে দিলেন। বীরভূম জেলার 'স্থানীয়' গল্প বাঙলা গল্পে নতুন পটভূমি আনলো। কয়লাকুঠির ছোট ছোট কাহিনীতে শৈলজানন্দর যে প্রতিভার সূত্রপাত, 'নারী মেধ', 'সমাপ্তি' প্রভৃতি অপূর্ব ও নিষ্ঠুর গল্পে তার পরিসমাপ্তি।'

এই মন্তব্যে মোড় ফেরানোর ব্যাপারটি পট-ভূমি পরিবর্তনের কৃতিত্বের নামান্তররূপে গৃহীত হয়েছিল। সম্পাদক মহাশয় 'অপূর্ব' বিশেষণটি অনাবশ্যকভাবে ব্যবহার করেছিলেন। সার্থক সাহিত্য মাত্রেই অপূর্ব! অপূর্বত্ব এবং সনাতনত্ব সাহিত্যরসের অবিচ্ছেদ্য লক্ষণ।

শৈলজানন্দ থেকে শুরু করে অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেব, প্রেমেন্দ্র মিত্র, তারাশঙ্কর, সরোজ-কুমার, অন্নদাশংকর, শরদিন্দু, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মুখোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি এবং পরবর্তী খ্যাতিমানদের মধ্যে বনফুল, সুবোধ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বিমল মিত্র,—গল্পের পটভূমি পরিবর্তনের প্রয়াসে এঁদের কৃতিত্বও উল্লেখযোগ্য। পূর্ব প্রতিষ্ঠিতদের মধ্যে প্রমথ চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, হেমেন্দ্রকুমার রায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশি, কেদারনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়, পরশুরাম—এইসব গল্প লেখক কি পৃথক পৃথক পটভূমির প্রতি নিষ্ঠাবান ছিলেন না? তবু গল্পের রস এঁদের সকলের কলমে সমানভাবে ধরা দেয়নি। পরশুরাম এবং সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়—এই দুজনের কথা ভেবে দেখলেই চলবে। দুজনের পটভূমি-নির্বাচন সমশ্রেণীভুক্ত নয়। পরশুরাম সাম্প্রতিকতা অতিক্রম করে সনাতনত্ব লাভ করেছেন। সৌরীন্দ্রমোহন তৎকালীন সাম্প্রতি-কতার বেড়া ডিঙিয়ে যেতে না পেরে প্রকরণ-প্রযুক্তির মুদ্রাদোষের চরম দৃষ্টান্ত হিসেবে রসগ্রাহীর উপেক্ষণীয় এবং ঐতিহাসিকের প্রিয় হয়ে উঠেছেন।

অতএব শুধু সময়ের কিংবা কেবল দেশ বিশেষের গণ্ডী কেটে গল্পের ভালো-মন্দ বিচার করা দুঃসাধ্য। ঐ প্রথাটি বিজ্ঞানসম্মত মনে করতে দ্বিধা হয়। বিজ্ঞান কোনওক্রমেই পরীক্ষার কৌশলটাকে পরীক্ষার লক্ষ্যের চেয়ে বড়ো মনে করে না। অপবিজ্ঞানীরাই লক্ষ্যের চেয়ে প্রযুক্তি (technique)কে আদর জানান। রসের চেয়ে ইতিহাস, অর্থনীতি, ভূগোল, মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি সাহিত্যে যদি প্রাধান্য পেতে থাকে, তাহলে সাহিত্যের অপঘাতমৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'কথা-গুচ্ছ' সর্বসমেত ৪১টি গল্পের সংকলন। সংকলনটি উপাদেয় মনে হলো, কারণ সম্পাদক মহাশয় রসকেই অগ্রগণ্য সত্য বলে মেনেছেন। অবিশ্যি সব সংকলনের মতো এ সংকলনেও কিছু অবাঞ্ছিত অনাদর ঘটেছে। এবং এ ব্যাপার অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন হয়, এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। বিমল মিত্র, নরেন্দ্রনাথ মিত্র জায়গা পেয়েছেন দেখে ভালো লাগলো। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বাণী রায়, সন্তোষকুমার ঘোষ প্রভৃতি—এঁদের জন্য স্থান সংকোচ চোখে পড়লো। তবু, সম্পাদনার তারিফ করতে হয় এবং সেই সঙ্গে সম্পাদকের সতর্কতাগুণটি স্বীকার না করে গত্যন্তর থাকে না। শেষোক্তদের যে পরের সংস্করণে পাওয়া যাবে, এ অনুমান পক্ষপাত ব্যতিরেকেই গ্রাহ্য। সংকলয়িতা প্রতীক্ষা করতে চান, আরও কিছুদিন যাক না—আর কিছু পাঠক স্বীকার করুন—তারপর যথাকালে নিশ্চিত মর্যাদার অধিকারী পাবেন, নিশ্চিত স্বীকৃতি। হয়তো পরের সংস্করণে এই কয়জনের সঙ্গে পাওয়া যাবে আরও কয়েকজনের লেখা,—গজেন্দ্রকুমার মিত্র, সুশীল জানা, সুশীল রায়, আশাপূর্ণা দেবী, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। এঁরাও হয়তো আমন্ত্রিত হয়ে আসরে প্রবেশ করবেন। ইতোমধ্যে যাক না

কিছুকাল প্রতীক্ষায়! 'আর একটু সতর্ক হওয়া' সব সময়েই ভালো,—'আর একটু প্রতীক্ষা করা' সব সময়েই ধ্রুবত্বপ্রদ—অন্যত্র না হোক, সাহিত্য পর্যালোচনা এবং সাহিত্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে তো বটেই!

'কথাগুচ্ছের' দ্বিতীয় সংস্করণে সর্বসমেত গল্প ছিল ৪০টি। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, অনুরূপা দেবী, সীতা দেবী, শান্তা দেবী সে সংস্করণে ছিলেন,—বর্তমান সংস্করণে অনুপস্থিত। 'নিবেদনে' সম্পাদক লিখেছেন, 'প্রায় সাত বৎসর পরে 'কথাগুচ্ছে'র তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হোল। এই সংস্করণে গল্পের অনেক অদলবদল হয়েছে।' পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগে—'কেন হয়েছে?' কারণটি সম্পাদক বলেননি। সে প্রশ্নের জবাব পাঠক নিজ গুণে আবিষ্কার করবেন। 'রসের' দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ রাখলে সাত বছর কেন, সাতাত্তর বছরেও সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কারণ ঘটে না। তাহলে?

গল্প-সংকলয়িতা-ও তবে কি পরিবর্তনধর্মী পাঠক সংস্কারের দিকে পিঠ ফিরিয়ে থাকবেন? গল্পের বাহনটাই কি বিশেষ যুগোত্থ নয়? সনাতন রস তো প্রকার-প্রযুক্তি-প্রয়োগকৌশলকে পরিহার করে স্বাদ্য হতে পারে না।

অতএব, এসব দিকেও অবহিত হতে হবে। কিন্তু প্রসঙ্গ (Subject), প্রযুক্তি (Technique), প্রকার (Type) যে সব ক্ষেত্রে বিশেষত্বসূচক (Significant) ভাবে সাহিত্য-ধারার দিঙ্‌নির্ণায়ক হয়ে উঠেছে কেবল সেই সব ক্ষেত্রই স্মরণীয়। আলোচ্য গল্প-সংকলনে সম্পাদক রসের দিকে যতোটা দৃষ্টি রেখেছেন, প্রকার-প্রযুক্তি ইত্যাদির দিকে ততোটা রাখেন নি। এবং তৎসত্ত্বেও বইখানি যে কিছু পরিমাণে অর্ধশতাব্দীর প্রতিনিধিস্থানীয় বাংলা গল্প-মালার সংকলন হয়ে উঠেছে, তার কারণ, পরি-বর্তমান যুগরুচির পর্ব-পর্বান্তের মধ্য দিয়ে রসানুসন্ধিৎসু সম্পাদক অকুণ্ঠভাবে বিচরণ করে এসেছেন। কোনও তরুণ সংকলয়িতা এ কাজে এতোটা সিদ্ধি লাভ করলে বাংলাদেশের সাহিত্য পর্যালোচনার সাম্প্রতিক তারুণ্যের সামর্থ্য প্রশংসনীয় মনে করা যেতো। সুধীরচন্দ্র মনে তরুণ, কিন্তু পাঁজির হিসেবে প্রবীণ। সহজাত প্রৌঢ়-যৌবনের স্বকীয় প্রসাদ তিনি তাঁর এই সংকলনেও অজ্ঞাতসারে পরিব্যাপ্ত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'দুরাশা', অবনীন্দ্রনাথের 'দেবী প্রতিমা', কেদারনাথের 'দুর্গেশনন্দিনীর দুর্গতি', রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের 'দিবাধামের বেসাতি', প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর 'কালীপুজোর রাত্রি', শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রক্তসন্ধ্যা', বনফুলের 'তিলোত্তমা', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার', অচিন্ত্য-কুমারের 'মাটি', বুদ্ধদেবের 'ব্যবধান', মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক', সুবোধ ঘোষের 'সুন্দরম্'—এই বিচিত্র কথাগুচ্ছ রসগ্রাহীর নির্বাচনে ধরা দিয়েছে। যদি পাঠক ভাবেন, অচিন্ত্যকুমারের 'ছুরি' গল্পটি 'মাটি'র চেয়ে কোন্ অংশে নিকৃষ্ট, তাহলে অবিশ্যি জবাব দেওয়া সহজ নয়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'থার্মোফ্লাস্ক ও চীনের যুদ্ধ' গল্প-প্রযুক্তির দিক থেকে এবং প্রসঙ্গ-চেতনার দিক থেকে 'তেলেনাপোতা আবিষ্কারে'র চেয়ে কম উপাদেয় নয়। এ রকম দৃষ্টান্ত যথেষ্ট বিস্তারিত করা যায়। এবং এরকম অজুহাত তুলে সম্পাদকের কৃতিত্ব খর্ব করার প্রচেষ্টাও বিরল নয়। কিন্তু সে কথা অবান্তর। ব্যক্তির রুচি ব্যক্তিত্বের মতোই ব্যাখ্যার দ্বারা সর্বথাবোধ্য বস্তু নয়। সুধীরচন্দ্র সরকারের প্রবীণ রসরুচির স্বাক্ষরটি যে এই সংকলনে অকৃত্রিম হয়ে উঠেছে, এই কথাটিই প্রণিধানযোগ্য। তাঁর রুচির সঙ্গে অন্যের রুচির বিভেদ ঘটা দিবা-রাত্রির বিভেদের মতোই স্বাভাবিক। রস-লোকে অস্তিত্বানুভূতিটাই বড়ো কথা। এবং সে অনুভূতি আপেক্ষিক হলেও, নিত্য,—কাল-দেশ-আচার-সংস্কারের প্রতিফলন স্বীকার করেও তা' শাশ্বত। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সংস্করণের মধ্যবর্তী সাত বছরের মৌনীতার মধ্যে সম্পাদকের এই অনুভূতি ক্ষান্ত থাকেনি,—তারই নিত্য-জাগর গ্রহণ-বর্জনের প্রভাবে বর্তমান সংস্করণে বিমল মিত্র, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের আবির্ভাব ঘটেছে—সুরেশ সমাজপতি অস্ত গেছেন। কিন্তু সীতা দেবী, শান্তা দেবী, অনুরূপা দেবীরা কেন গেলেন? এ জিজ্ঞাসার সদুত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। ব্যক্তিগত রুচিকে বাদ দিলে সাহিত্য পর্যালোচনা কতোদূর সাধ্য? —এ প্রশ্ন পূর্বপ্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। এ সম্পর্কে আলোচনা অনেক হয়েছে, অনেক হচ্ছে,—এবং আরও অনেক হবে। আপাতত বাংলা গল্পের যে সংকলনটি পাওয়া গেল, সেটি বহু সমাদরে গৃহীত হতে বাধা নেই। তা ছাড়া লেখকদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিটি লিখে দিয়ে শ্রীযুক্ত বিশু মুখোপাধ্যায় যে পাঠকদের উপকার করেছেন, এ স্বীকৃতিটিও অবান্তর নয়।—হরপ্রসাদ মিত্র।

৩৩২।৫২

উপন্যাস

গৌরীগ্রাম (উপন্যাস)—রমেশচন্দ্র সেন প্রণীত। মিত্র ও ঘোষ; ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৫, টাকা।

গ্রন্থকার বাঙলা সাহিত্যিক সমাজে লব্ধ প্রতিষ্ঠ। বাঙলার গ্রাম-জীবনের অন্তরের

সুরটি দরদী মনের সংস্পর্শে বাজাইয়া তুলিতে রমেশ সেনের দক্ষতা বাস্তবিকই উল্লেখযোগ্য। ইতোপূর্বে প্রকাশিত তাঁহার গল্প এবং উপন্যাসগুলিতে এ পরিচয় আমরা পাইয়াছি। তাঁহার ভাষার, একটি বিশেষ আকর্ষণ আছে। সে ভাষায় বাঙলার মাটির সরস আমেজটি স্বচ্ছন্দভাবে ফুটিয়া উঠে। সে ভাষার টানে মন সোজাসুজি অন্তরাজ্যে ডুবিয়া যায় এবং বাঙলার রূপটি স্নিগ্ধ, করুণ কোমল রসে উদ্ভাসিত হইয়া জাগে। অন্তরঘেঁষা ভাষার এমন প্রয়োগ-অপপ্রয়োগের আড়ম্বরের আবিলতা হইতে ভাষাকে মুক্ত করিয়া শুদ্ধ ভাবটিকে পরিবেশন করিবার এই কৌশল প্রয়োগ করা প্রগাঢ় সংবেদনশীল স্রষ্টার সূক্ষ্ম মনের পক্ষেই সম্ভব হইতে পারে। ব্যাপ্ত অনুভূতির দীপ্তির আলোকে এখানে সৃষ্টি সজীবতা পায়।

'ভারত ছাড়' আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রতিবেশে উপন্যাসখানির অবতারণা। বাঙলার বিগত দুর্ভিক্ষ, কন্ট্রোল-ব্যবস্থা, সমাজ-জীবনে তজ্জনিত দুর্নীতির প্রভাব, চোরাবাজার, এবং ধনী-মহাজনদের শোষণ-পীড়িত চাষীদের আন্দোলনে ইহার উপসংহার করা হইয়াছে।

আখ্যানভাগ এইরূপ—গোকুল গৌরী গ্রামের অধিবাসী। সে বাউতীর ছেলে। মাঝীর কাজ করে। সরকার হইতে তাহার নৌকা বাজেয়াপ্ত করিয়া লওয়াতে সে বেকার অবস্থায় পতিত হয়। গোকুল চাকুরীর খোঁজে বাহির হইয়া পড়ে। বরিশালে গিয়া বারবনিতা জুঁইফুলের সে ভৃত্য নিযুক্ত হয়। ক্রমে জুঁইফুলের টানে পড়িয়া স্ত্রী গোলাপী, ছেলে মাণিক এবং কন্যা চুনীর কথা ভুলিয়া যায়। বাড়ীতে টাকা-পয়সা আর পাঠায় না। কিছুদিন পরে বাবুরা তাহাকে চোর বলাতে সে জুঁইফুলের চাকুরী ছাড়িয়া দেয়। কলিকাতায় আসে। শহরে আসিয়া আগস্ট আন্দোলনকারীদের দলে ভিড়িয়া তাহার জেল হয়। জেলখানা হইতে বাহির হইয়া তাহার দুর্গতের জীবন। শহরের রাস্তায় রাস্তায় খাদ্যাভাবে মৃত নরনারীর শবদেহ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। ক্ষুধার তাড়নায় এক মিঠাইয়ের দোকানে খাবার চাহিলে গোকুল তাড়া খায়। একটা হাংগামার সৃষ্টি হয়। বুভুক্ষা-পীড়িত গোকুল প্রহৃত হইয়া মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে। পরে হাসপাতাল হইতে সে পঙ্গু অবস্থায় বাহির হয়। ভিক্ষা-ব্যবসায়ী একটা লোক তাহাকে ভিখারী করিয়া রাস্তার ধারে বসাইয়া রোজগার করিতে থাকে। এই অবস্থায় তাহার গ্রামবাসিনী বারিবালার সঙ্গে গঙ্গার তীরে তাহার দেখা হয়। বারিবালা পতিতার জীবন অবলম্বন করিয়াছিল। সে তাহাকে দেশে পাঠাইয়া দেয়। দেশে গিয়া গোকুল স্বাস্থ্যলাভ করিয়া জনকল্যাণ নামক প্রতিষ্ঠানে যোগ দেয়। গ্রামের এম ই স্কুলের শিক্ষক সুকুমার এই প্রতিষ্ঠানের নেতা। এই আন্দোলনে যোগ দিয়া সে চাষীদের দাবী প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টিত হয়। তেভাগা আন্দোলনে মহাজন পরাণ নন্দীর গুণ্ডাদের প্রহারে গোকুল মারা যায়। এই ভাবে উপন্যাসখানির মর্মান্তিক পরিসমাপ্তি ঘটে।

উপন্যাসখানির পটভূমি বেশ ব্যাপক। গ্রন্থকার তৎকালীন বাঙলার, গ্রাম-জীবনের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতগুলি সুনিপুণ তুলিকায় আঁকিয়া তুলিয়াছেন। গোকুল এবং তাহার স্ত্রী গোলাপীর পারিবারিক জীবন উপন্যাসখানির ভিত্তি। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় হইল এই যে, এই দুইটি প্রধান চরিত্রের সামগ্রিক অভিব্যক্তিতে অপেক্ষাকৃত অপ্রধান চরিত্রগুলিই জীবন্তভাবে কাজ করিয়াছে; প্রধান চরিত্রগুলিতে নাড়া দিলে সেগুলির সাড়া চারিদিক হইতে ঝকমক করিয়া উঠে, অর্থাৎ প্রধান চরিত্র দুইটির মধ্যে সেগুলি বিলীন বা নিঃশেষ হইয়া যায় নাই; পরন্তু চরিত্রগুলি নিজেদের ব্যক্তিত্ব বিশেষভাবে বজায় রাখিয়াছে এবং মনের উপর সেগুলি স্পষ্টভাবে ছাপ রাখে। ভীম এবং গোকুলের ছেলে মাণিক, ইহাদের চরিত্র উপন্যাসখানিতে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্তু উলকী পিসি, গফুর, ছোটরাণী, নিস্তার, ফটু ভুঁইয়ার স্ত্রী মলিনার চরিত্র সৃষ্টির দিক হইতে সার্থক হইয়াছে। পতিতা নারীর চরিত্র রমেশবাবু ইতঃপূর্বে অন্য উপন্যাসেও আঁকিয়াছেন। আলোচ্য উপন্যাস-খানিতে এ জীবনের দ্বৈত মূর্তি দেখা যায়, জুঁই ফুল এবং বারিবালাতে। মনে হয়, এই দুইটি চরিত্রে এ জীবনের বাহ্য এবং আন্তর রূপ দেওয়া হইয়াছে। স্বৈরিণী জুঁইফুলের উচ্ছৃঙ্খল জীবনের মূলে চাপা একটি বেদনা যেন গভীরভাবে কাজ করিতেছে। লাস্য-লীলার আকারে তাহাকে কৃত্রিমভাবে সে ঠেলা দিয়া রাখিতেছে। রূপোপজীবিনী জুঁই ফুলের নির্বিশেষ নিষ্ঠুরতা কতই করুণ! এই বেদনাই বারিবালার ভিতরে আন্তর রূপ পাইয়াছে।

উপন্যাসখানির পটভূমিকায় রাজনীতিক মতবাদের ঐতিহ্য স্বভাবতই আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু রাজনীতিক মতবাদের সূত্রগত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সৃষ্টিকে আচ্ছন্ন বা আড়ষ্ট করিতে পারে নাই। রমেশবাবু সাময়িক রাজনীতির মূলে তাঁহার দৃষ্টিকে প্রসারিত করিয়া বাঙলার জন-জীবনের স্বাভাবিক গূঢ় গতি এবং শক্তিরই নিজস্ব রীতিকে রূপে, রসে লীলায়িত করিয়াছেন। বাঙলার গ্রামের জল, মাটি, এ দেশের সমষ্টিমনের বেদনা এবং ভাবনার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক সুনিবিড় করিয়া তুলিয়াছেন। রস-পারিপাট্যের দিক হইতে তাহার এই সৃষ্টি সার্থক হইয়াছে। ৩৪৭।৫২

আর্তনাদ—বীরেশ্বর সিংহ, ক্রান্তি প্রকাশনী, ১১৫এ ধর্মতলা স্ট্রীট। মূল্য—এক টাকা চার আনা।

বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিকায় লেখা উপন্যাস। বাঙলার দাঙ্গাবিধ্বস্ত সুদূর পল্লীতে এর শুরু আর শেষ কলকাতার রাস্তায় ভুখা মিছিলে। যে পটভূমিকা এবং সমস্যা বেছে নেওয়া হয়েছে তা নিঃসন্দেহে মহৎ উপন্যাসের উপযোগী। ভবিষ্যতে কোন শিল্পী হয়তো এর থেকে অক্ষয় সৃষ্টিও করবেন। কিন্তু 'আর্তনাদ' নিতান্তই হতাশাব্যঞ্জক। গল্পের কোন সুসমঞ্জস গতি নেই, গুটি কয়েক অতি নাটকীয় ঘটনা ছাড়া। শুরুতে বিকৃত বাঙলা বলিয়ে মিঃ ব্লেক, মৌলবী এবং কানুরীয়াজীর চরিত্র নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক। এমন কিছু অপরিহার্য ঈঙ্গিত এরা বহন করছে বলে মনে হয় না। ভাষা নিতান্ত কাঁচা। চরিত্রগুলি অপরিণত। যে আদর্শবাদ লেখক প্রচার করতে চেয়েছেন লেখার দুর্বলতার জন্য তা বিরক্তিকর মেঠো বক্তৃতা ছাড়া আর কিছুই হয়নি। উপন্যাস লেখায় হয়তো তিনি হাত মক্স করছেন। কিন্তু গানের আগে গলা সাধার মত লেখার আগে প্রস্তুতিটাও লোকচক্ষুর অগোচরে করলে ভালো হতো নাকি? ৩২৮।৫২

মাস্টার মহাশয়—দরবেশ, প্রাপ্তিস্থান—অমরেন্দ্রনাথ পাল, ২সি নবীন কুণ্ডু লেন, কলিকাতা—৯। মূল্য—পাঁচ সিকা।

হাতে যদি কলম থাকে আর লেখার প্রতি যদি কোন আইনের নিষেধ না থাকে তাহলে যা খুশি তাই লেখা যায়। আর লিখেই যদি ফেলা যায় তাহলে আর ছাপিয়ে বের করতে বাধাটা কোথায়। এই হলো সখের সাহিত্যের স্বরূপ। কেন,

আরও তো অনেক ভালো ভালো কাজ আছে অবসর সময়ে করবার, অনেক জিনিস আছে বাড়তি টাকায় কিনবার। সে সব রেখে দরবেশ যে কেন গল্প লিখতে গেলেন বোঝা দায়। না আছে গল্পের কোন মাথামুণ্ডু, না আছে ভাষাজ্ঞানের কোন বালাই। গল্পে নাকি ঘটনা চাই, তাই আছে। কিন্তু নেই সেই সব ঘটনার কোন কারণ। চরিত্রগুলোর একের সঙ্গে অন্যের কী সম্পর্ক তাও জানেন লেখক নিজে। তাদের আনতে হয় তাই এনেছেন। এমন কি গল্পের যে একটা শেষ আছে বই পড়ে তাও বোঝা গেল না। কেন যে তাঁর উপন্যাস লিখবার দুর্মতি হলো কে জানে। ৩০৪।৫২

অতিক্রমা—বিংশুক, দীপালী গ্রন্থশালা, ১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য—দু টাকা।

এ দেশের সাহিত্যে, হয় তো বাণিজ্যিক প্রয়োজনেই, বড় গল্প আর উপন্যাসের মধ্যে ভেদ রেখা টানার আবশ্যক হয় নি। কিন্তু মূলত বড় গল্প আর উপন্যাসের জাত যে সম্পূর্ণ আলাদা এ বিষয়ে তিলমাত্র মতদ্বৈধ থাকার কথা নয়। অথচ ছোট মেয়েকে শাড়ী পরানোর মতন, বড় গল্পকে সাজিয়ে গুছিয়ে উপন্যাসের রূপ দেওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

আবার এর মাঝামাঝি ব্যাপারও আছে। না ঘাবড়া, না ঘাটকা। আলোচ্য পুস্তকটি এই জাতের। নায়কের ভ্রান্তি বিয়োগের কাহিনীই পুস্তকটির মূল উপজীব্য। কিন্তু বুকনির তোড়ে সে কোথাও দানা বাঁধার সুযোগ পায় নি। নিষ্কাম প্রেমের নামান্তর ভ্রান্ত কৃচ্ছ্রসাধন, যৌবনকে অতৃপ্ত রাখা অর্থহীন তাই যৌন কামনার তাগিদে ভ্রান্তি নিজের সর্বনাশ ডেকে আনলো, দেহের চাহিদা মিটতে, দেহকেই করলো বিনষ্ট।

আলোচ্য গ্রন্থটির ঘটনা হয়তো ঠিক উপন্যাসের উপাদান নয়, বড় জোর বড় গল্পের রূপ নিতে পারে, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় লেখকের দুর্বল লেখনী, চরিত্র চিত্রণের অপটুতা, কাঠামোটির মূর্তিই তৈরী করেছে, তাতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় নি।

জীবন সম্বন্ধে, বিবাহ সম্বন্ধে লেখকের মতামত প্রবন্ধের মাধ্যমে হয় তো চিন্তার খোরাক জোটায় কিন্তু গল্পের মধ্যে, রসঘন কাহিনীর মধ্যে সে মতকে জোর ক'রে প্রবেশ করালে তা দুশ্চিন্তারই কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়।

রচনা যেখানে রসোত্তীর্ণ নয়, সেখানে ছাপা, বাঁধাই, প্রচ্ছদপট অলংকরণের প্রশ্ন অবান্তরই শুধু নয় হাস্যকরও। ৩৩৪।৫২

আজব দেশে এলিস—তারাপদ রাহা, জ্ঞান-সঞ্চয়ন, ১৫ গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা—১৯। মূল্য—দুই টাকা।

বিখ্যাত শিশু সাহিত্যিক লুই ক্যারলের Alice in Wonderlandএর সুন্দর বঙ্গানুবাদ। অনুবাদ করেছেন খ্যাতনামা সাহিত্যিক তারাপদ রাহা। ও দেশের গল্প এ দেশের ভাষায় রূপান্তরিত করার অসুবিধা অনেক। শিশু চরিত্র অবশ্য এক, যদিও দু দেশের শিশুদের মন বেড়ে ওঠে, মন গড়ে ওঠে বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশে, বিভিন্ন সংস্কারের মধ্য দিয়ে। তাই রূপকথার রাজ্যে অদ্ভুত ভাবে মিশে যায় দু দেশের শিশুর মন। আলোচ্য গ্রন্থটি কল্পরাজ্যের এমনি এক কাহিনী।

স্বচ্ছন্দ অনুবাদ, অপূর্ব বর্ণনা ভংগী, প্রচুর রেখাচিত্র সব মিলিয়ে শিশুদের উপভোগ্য করার কোন উপকরণের অভাব নেই। শিশুদের মনোরঞ্জনের কোন ত্রুটি প্রকাশকেরা রাখেন নি। শিশুমহলে পুস্তকটি যথেষ্ট আদরণীয় হবে, এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। ৩৪৮।৫২

খেলা ও হাসি—শ্রীপঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা চার আনা।

ভূমিকায় লেখক বলেছেন যে, খেলাচ্ছলে আনন্দ বিতরণ করার উদ্দেশ্যেই এই পুস্তকটি সঙ্কলিত হয়েছে। কেবলমাত্র আনন্দ বিতরণই নয়, সুকুমারমতি বালকবালিকাদের দৈনিক ও চারিত্রিক উন্নতিবিধানের দিকেও যথেষ্ট নজর রাখা হয়েছে। খেলাধুলার মাধ্যমে শিশু-মনস্তত্ত্বের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রত্যেকটি খেলাই সমভাবে আকর্ষণীয় করার প্রয়াস বইটির প্রতি ছত্রে সুস্পষ্ট।

খেলার মধ্য দিয়ে বালকবালিকাদের নিয়মানুবর্তিতা ও প্রতিযোগিতার স্পৃহা সম্বন্ধে সজাগ রাখাও পুস্তকটির অন্যতম উদ্দেশ্য।

যাহাদের উদ্দেশে পুস্তকটি রচিত তাহাদের কাছে পুস্তকটির প্রয়োজনীয়তা যে স্বীকৃত হ'য়েছে সেটা অল্প সময়ের ব্যবধানে পুস্তকটির দ্বিতীয় সংস্করণ হওয়াতেই সম্যকরূপে প্রমাণিত। ৩৪৫।৫২

নাটক

খেয়াল খুশী—শ্রীপঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য—এক টাকা চার আনা।

গ্রন্থকার শিক্ষাবিদ। দীর্ঘকাল তিনি বুনিয়াদী শিক্ষণ কলেজের শারীর-শিক্ষার অধ্যাপকরূপে হাতে কলমে গবেষণা করার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছেন। "খেয়াল খুশী" তাঁর সেই দীর্ঘ গবেষণা ও নিরীক্ষার ফল। শরীর চর্চার পদ্ধতি আর প্রক্রিয়ার যে নতুন দিক আলোচ্য নাটিকার মাধ্যমে তিনি উন্মোচিত করতে সচেষ্ট হ'য়েছেন তা সুধীজন-প্রণিধানযোগ্য। অনাড়ম্বর পরিবেশে স্বল্প আয়াসে ছাত্রছাত্রীদের অভিনয় করার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী নাটক।

ছড়া ও গানের মাধ্যমে সুনিয়ন্ত্রিত অঙ্গ সঞ্চালনই এই নাটকের মূল উদ্দেশ্য। আমাদের মনে হয় বাঙলা দেশে এ জাতীয় নাটকের প্রবর্তনের প্রচেষ্টা এই প্রথম।

শুধু পুস্তকটির বহুল প্রচারই নয়, অভিজ্ঞ শিক্ষকদের পরিচালনায় আলোচ্য নাটিকাটি নানা জায়গায় মঞ্চস্থ হলেই গ্রন্থকারের পরিশ্রম সার্থক হবে ব'লে আমাদের ধারণা। ৩৪৬।৫২

পরিচয়—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। প্রাপ্তি-স্থান—শ্রীরঙ্গম, ২।এ রাজা রাজকিষণ স্ট্রীট, এবং গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স। দুই টাকা।

বাঙলা নাটকের ধূধূ মরুভূমিতে একটি সবুজ ঘাসের ডগা দেখলেও মন খুশি হয়। পরিচয় নাটকখানি শ্রীরঙ্গমে অভিনয়কালে মোটামুটি সাফল্য অর্জন করেছিল। অবশ্য তার শিশির ভাদুড়ীর পরিচালনা এবং নাটকের বৈশিষ্ট্যই এ সাফল্যের কারণ। একটি গতিশীল এবং ঘটনাবহুল গল্পের মারফৎ নাট্যকার সমাজ জীবনের একটি বিশেষ সমস্যাকে উপস্থাপিত করেছেন। হিন্দু বিধবার গর্ভজাত এবং সমাজরোষে ইসলামে আশ্রিত সন্তান ডাঃ আলির চরিত্রটি অন্য সব প্রধান চরিত্র ছাড়িয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কারণ বোধ হয় আলিই লেখকের উপস্থাপিত সমস্যার বাস্তব-রূপ। তার জীবনের তিক্ত স্মৃতি, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব স্নেহ-ঘৃণা সব মিলিয়ে একটি মানুষের পূর্ণাঙ্গ অবয়ব প্রতিফলিত। সে তুলনায় সাহিত্যিক নীরোদের চরিত্রটি ম্লান।

দৃশ্য স্থাপন এবং চরিত্র পরিচয়ে যথেষ্ট কুশলতার পরিচয় আছে। তবে শেষ দিকে একটু অতিনাটকীয়তা এবং ঘটনার অতি-আকস্মিকতা ভারসাম্যে সামান্য ব্যাঘাত জন্মিয়েছে। সংলাপ মোটামুটি সুষ্ঠু, দু-এক জায়গায় আশ্চর্য চমকপ্রদ ও তীব্র।

যতদূর মনে হয় এইটিই নাট্যকারের প্রথম নাটক। সেদিক থেকে দোষত্রুটি খুবই নগণ্য। নাট্যকারের কাছ থেকে আরও ভালো নাটক আশা করবার আশ্বাস পেয়েছি। (২৬৫।৫২)

শিশু সাহিত্য

বুদ্ধু-ভুতুমের গল্প—বুদ্ধুভুতুম। কিশোর-কল্যাণ কেন্দ্র, ১৩।২, কাঁটাপুকুর থার্ড বাই লেন, হাওড়া। দাম দেড় টাকা।

আনন্দবাজার পত্রিকার 'আনন্দমেলা'র পাতায় যখন বুদ্ধুভুতুমের এই গল্পগুলো পড়েছি, তখনই এগুলি আমাদের ভালো লেগেছিল। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের তখন লেখাগুলি কেটে কেটে রাখতে দেখেছি, তাতেই মনে হয়েছে তাদের ভালো লেগেছে কতটা। গল্পগুলো যাতে ভুলে না যায় তার জন্যেই বুঝি তারা সঞ্চয় শুরু করেছিল। এখন সেগুলি একত্র ক'রে বই-আকারে বের হওয়ায় ছোটদের মহলে নিশ্চয়ই আনন্দের সাড়া পড়েছে।

ছোটদের কথাই বলছিলাম। কিন্তু আমরা, বড়রাও যে গল্পগুলি ভালো বেসেছি, তার প্রমাণ পেলাম—বই হাতে আসা মাত্র আবার দুটো গল্প পড়ে ফেলতে হল—'মুড়িঘণ্টের মার' ও 'অজ-উদ্ধার'। দুটো-গল্প পড়েই পুরো-বইটার আলোচনা করতে ভরসা করছি এইজন্যে যে, সেগুলি একমেটে পড়া আছে। গল্পের খুঁটিনাটি ঘটনা মনে না থাকলেও তার কাঠামোটা ভুলে যাই নি। ছোটদের উদ্দেশ ক'রে লিখলেই সে-লেখা ছোটদের উপযোগী লেখা হয় না। বুদ্ধুভুতুমের হাত ছোটদের জন্যে লেখারই হাত। কেন না, লেখার সময় তিনি নিজেকে ছোটদের দলে ভিড়িয়ে নিতে জানেন। মোটকথা বইটি ভালো। আর ভালো লাগলো, আর একটি জিনিস—এর ছবি। ক্ষুদে ক্ষুদে ছবির মধ্যে দিয়েও শিল্পী মজা বিলোতে পেরেছেন। শিল্প-রুচিরও তাই তারিফ করতে হল। ৩৩৬।৫২

কবিতা

মুক্তিপথের গান—শ্রীঅমরকুমার দত্ত, বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—দেড় টাকা।

সংকেত—শ্রীমনুজেন্দ্র সর্বাধিকারী, মহাভারতী প্রকাশিকা, ২৫এ শ্রীনাথ মুখার্জি লেন, কলিকাতা—৩০। মূল্য—বারো আনা।

বিভাবরী (কাব্যোপন্যাস)—শ্রীসমীরণ গুহ, সাহিত্য লোক, নারায়ণ রায় রোড, কলিকাতা—৮। মূল্য—পাঁচ সিকা।

সৃষ্টির আদি থেকে মানুষের দুটি প্রিয় বস্তু। এক প্রিয়া দুই পৃথিবী এবং আরও খণ্ডিতার্থে নিজের দেশ। এই ভালোবাসাকেই আমরা প্রকাশ করেছি শিল্পে সাহিত্যে। বিশেষত শিল্পসৃষ্টির আবেগবহুল শাখায়, অর্থাৎ কাব্যে। কাব্য-সাহিত্যের বড় অংশই তাই এই দ্বিবিধ প্রীতির শিল্পায়ন। এখানে আলোচ্য তিনখানি কাব্য গ্রন্থের প্রধান সুর দেশপ্রেম।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরাট অধ্যায়ের বিভিন্ন স্মরণীয় ঘটনা এবং রাজনৈতিক চেতনা মুক্তিপথের গানের অধিকাংশ কবিতার উৎস। ভাব সম্পদ অথবা কবিকর্ম কোথাও উল্লেখযোগ্য কিছু না থাকলেও একটি সহজ আন্তরিকতা প্রায় সর্বত্রই পরিব্যাপ্ত। সুর সংযোগে কবিতাগুলি গীত হলে হয়তো খুব খারাপ হবে না।

'সংকেত'এর বিষয়বস্তুও অনুরূপ। তবে এক্ষেত্রে ঘটনাগুলি সবই সমসাময়িক, দৃষ্টি-ভঙ্গী অনেকাংশে খণ্ডিত। কবিকর্মের কোন সূক্ষ্ম নৈপুণ্য নেই বলে বক্তব্য খুবই সুস্পষ্ট এবং সরল। কেবল 'পদ্য' বলা হয়েছে এইমাত্র। মাঝে মাঝে ছন্দপতন শ্রুতিকটু।

বিভাবরী কাব্যোপন্যাসে একটু অভিনবত্ব আছে। একে কাব্যোপন্যাস বলাও বোধ হয় ঠিক নয়। কারণ কাব্যের মাধ্যমে বিশেষ কোন গল্প নয়, পত্রাকারে লেখা কয়েকটি মেয়ে-পুরুষের সুখ-দুঃখের কাহিনী। সুখও নয়, যুদ্ধ আর মন্বন্তরের পটভূমিকায় মধ্যবিত্ত জীবনের দুর্দশার চিত্র। যারা মরেছে আর যারা মেরেছে এই দুইএরই কথা। কবির বক্তব্যে যে আন্তরিকতা আছে প্রকাশে ঠিক ততটা নৈপুণ্য নেই। ফলে বক্তব্য যেখানে অতি প্রত্যক্ষ কাব্য সেখানে প্রায় অনুপস্থিত। তবুও আশার কথা, কোন কোন জায়গায় দুইএর মিলন সাধনে কবি সক্ষম হয়েছেন। ছন্দে আরও কিছু বৈচিত্র্য থাকলে প্রচেষ্টা সার্থকতর হতো। ২৮৯।৫২, ৩১৬।৫২, ৩১৭।৫২

প্রাপ্তি-স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি দেশ পত্রিকায় সমালোচনার্থ আসিয়াছে। পরে সমালোচনা বাহির হইলে তাহা যথাসময়ে প্রকাশক অথবা গ্রন্থকারের নিকট প্রেরিত হইবে।

উত্তরতিরিশ—বুদ্ধদেব বসু, নিউ এজ পাবলিশার্স, ২২ ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—৪৲। ৩৬১।৫২

গোধূলি সূর্য—সন্তোষকুমার অধিকারী, অশোক লাইব্রেরী, ১৫।৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—॥০। ৩৬২।৫২

একতারা—জলধর চট্টোপাধ্যায়, চলতি নাটক নভেল এজেন্সি, ১৪৩ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—২৲। ৩৬৩।৫২

মোগল-পাঠান—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা। মূল্য—২॥০। ৩৬৪।৫২

জহান্-আরা—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা। মূল্য—১॥০। ৩৬৫।৫২

ভারত মঙ্গল—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা। মূল্য—১০। ৩৬৬।৫২

শ্রীশ্রীললিতা সখী—দীনেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, নিমাইচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক মাশিলা "ভক্তি-নিকেতন" আন্দুলমৌড়ী পোঃ, জেলা হাওড়া হইতে প্রকাশিত। মূল্য—২৲। ৩৬৭।৫২

ছেঁড়া তার—তুলসীদাস লাহিড়ী, রঙ্গালয়, ২০এ লেক রোড, কলিকাতা। মূল্য—২৲। ৩৬৮।৫২

বাঁদী—গোলাম কুদ্দুস, সাধারণ পাবলিশার্স, ৭ ওয়েস্ট রো, কলিকাতা। মূল্য—৩৲। ৩৬৯।৫২

গীতি-মালিকা—শ্রীশ্রীনৃপেন্দ্রনাথ, শ্রীচন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ১২।১ কালিদাস পতিতুণ্ডি লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—১০। ৩৭০।৫২

চিত্রবাণী—চিত্রবার্ষিকী ১৯৫২—গৌর চট্টোপাধ্যায়, চিত্রবাণী প্রকাশনী, ৫ হাজরা লেন, কলিকাতা। মূল্য—৪৲। ৩৭১।৫২

অখণ্ড মহাযজ্ঞ—গুরুপ্রিয়া দেবী, শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম, কাশী। মূল্য—২॥০। ৩৭২।৫২
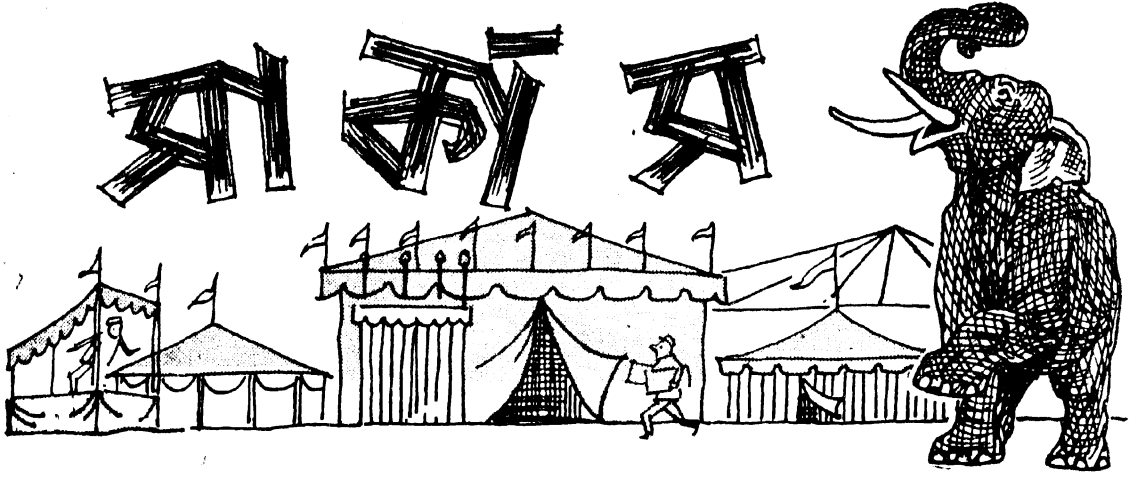
রূপদর্শী

আমার এক বন্ধু আছেন, নাম 'জরদ্গব'। চমৎকার লিখতে পারতেন। লিখতে সুরুও করেছিলেন। কিন্তু যেই লোকে ধন্য ধন্য করতে লাগল, অমনি কলমের নিব থেকে কালি পুঁছে বল্লেন, লোকে তালি বাজাচ্ছে হে, এই বেলা সরে পড়ি। হাততালির প্যাঁচ বড় প্যাঁচ। পেঁচিয়ে ধরলে ছাড়ানো শক্ত। বলে সত্যি সত্যিই লেখার ময়দান থেকে সরে পড়লেন। আমার আগে তিনি সার্কাস নিয়ে লিখেছিলেন। তিন চার বছর আগের কথা।

'জরদ্গব' বলেছিলেন, শ্বশুর যদি মিল মালিক হন, আর তিনি যদি মনে করেন যে জামাই চিফ্ ইঞ্জিনিয়ার হোক, তো জামাই-এর পেটে কানাকড়ি এলেম না থাকলেও সে তক্ষুনি তা হতে পারে। কিন্তু সার্কাসের বেলায় সেটি হবার জো নেই, এখানে নেপোমি চলবে না। শ্বশুর সার্কাস কিনলেন, আর জামাইকে করে দিলেন ট্রাপিজ পেলেয়ার। বললেন, কাল থেকে বাপু ট্রাপিজের খেলা দেখাবে, কি বললেন, যাও তো বাছা ছপটি গাছা হাতে নিয়ে, ঢোকো তো বাঘের খাঁচাখানায়, মাথাটি পুরে দাও তো বাঘের মুখে, আর অমনি জামাতা বাবাজী সেটি হাঁসিল করে এলেন, ব্যাপারটি অত সোজা নয়। 'নেপোটিজ্‌ম্' সর্বত্র চলে, কিন্তু সার্কাসই একমাত্র জায়গা যেখানে তারও জারিজুরী ঠাণ্ডা।

কথাটা যে কত বড় সত্য, প্রমাণ পেলাম সার্কাসের লোকেদের সঙ্গে আলাপ করে।

সার্কাসের খেলা হেকমতের খেলা! সে খেলায় হাতটি পুরো না পাকালে কদর নাস্তি। আর সার্কাসের টানও বড় জবর। টানটা পেশার যতটা না হোক তার বেশী নেশার। পেশার টান তবুও তো এড়ানো যায়। নেশা কি প্রাণ থাকতে ছাড়ে? আজ আটচল্লিশ বছর হয়ে গেল, সার্কাসের সঙ্গে সঙ্গে। সেই বাড়ী থেকে পালিয়েছিলাম কবে! এখনও মনে করতে পারিনে ভাল করে। বছর বারো বয়স ছিল তখন। বুকে ছিল আশা আর কলজে ভরা তাজা দম। আর এখন দেখছেন তো? ভদ্রলোক হাসলেন। বললেন, ষাট বছর বয়েস হল। দম নাই, খেলা দেখাইনা। আশা এক গোরে যাবার, আর তো সবই পুরেছে, কি কতক পোরেনি, তার জন্য পরোয়া নাই, দুখও নাই। তবু কেন দেশে দেশে ঘুরি বাল-বাচ্চা সঙ্গে নিয়ে? মার বয়েস এই নব্বুই, বুড়ি বেঁচে আছে, দেখবার জন্য বড় আশা। কত চিঠি লেখে। তা গিয়ে যে থাকব, দুদণ্ড

মায়ের কাছে থাকব, তার কি উপায় আছে? শুধু কি পয়সার জনোই? মনেও ভাববেন না। আপনাদের আশীর্বাদে পয়সার অভাব আমার কোন কালেই ছিল না। বাপ জীবনের কামাই রেখে গিয়েছিল। আরো তিন ভাই আছে দেশে। কাপড়ের কল আছে। তাতে আমারো হিস্যা আছে। 'ইন্‌কাম' খারাপ নয় নিতান্ত। তবু সেখানে গিয়ে থাকতে পারিনে। যাই, দু পাঁচ দিন থাকিও। ভাবি আর ফিরব না, বাকী দিন কটা ঘরেই কাটিয়ে দিই। কিন্তু পারি না। ব্যাণ্ডের বাজনা শুনিনা দুদিন, মনে হয় যেন কত বছর শুনি না। বাঘ সিংহীর হাঁকাড় শুনিনা এক বেলা, তো মনে হয় কত মাস শুনি না। চোখের সামনে হাজার বাতির রোশনি ভাসে না, মনে হয় সবই অন্ধকার। মনে হয় সব ফাঁকা। হাঁফ ধরে, বাতাস টানতে কষ্ট হয়। তাই চুপে চুপে একদিন বেরিয়ে পড়ি। তারপর ঘুরতে ঘুরতে সেই সার্কাসের তাম্বুতে ফিরে এলে তবে গিয়ে স্বোয়াস্তি।

সার্কাস এদেশে প্রথম আসে, ঠিক মনে পড়ছে না, বোধহয় ১৮৭৮ সালে। বোম্বাই শহরে বিলাতের এক সাহেব তাঁর সার্কাস পার্টি এনে খেলা দেখান। তাই দেখে এক মারাঠি ভদ্রলোকের সখ টগ্‌বগিয়ে ছুটে দিল। কিছুদিন পরেই, আর তাঁরই কেরামতিতে দিশী সার্কাস মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। তারপর থেকে দেখুন, এখন অব্দি সে রেওয়াজ চলেছে। ভদ্রলোক বলতে লাগলেন, চলেছে, তবে গভর্নমেণ্ট যদি এই রকম 'ক্যালাস্' হয়, যদি নজর এদিকে না

দেয় তো অচিরাৎ এই সার্কাস বলে বস্তুটি ট্রয়েল্‌ভ-ও-ক্লক্‌ স্ট্রাক্‌' করবে। সিধে বাংলায় মশাই বারটা বাজবে। অথচ সার্কাস চললে সরকারের লোকসান তো নেই-ই বরং লভ্যাই আছে ষোল আনার উপরে আরো আট পাই। সিনেমা থিয়েটার থেকে চার-মাসে যত প্রমোদ কর পান, একটা সার্কাস শহরে চালু হলে এক মাসে সে টাকা তাঁরা সিন্ধুকে তুলে ফেলতে পারেন। কিছুই তো তাঁদের করতে হয় না, যদি দয়া করে বেশ ভালমত জায়গা আমাদের জন্য বন্দোবস্ত করে দেন তবেই আমাদের পিতৃপুরুষ উদ্ধার হয়ে যান।

এই কলকাতা শহরটার কথাই ধরুণ। ভেতরে এমন একটু জায়গা পাবেন না,

যেখানে মন খোলসা করে সার্কাসের তাঁবু খুঁটো গাড়তে পারে। চিরদিন এমন ছিল না মশাই। এ লাইনে ঢের দিন থেকে আছি, অন্দিসন্ধি সব এই নখের ডগে। ওই যে যেখানে এখন হিন্দুস্তান বিল্ডিংস্‌ হয়েছে, কি জি ই সি-র বাড়িটার ওখানে, কি এখন যে জায়গাটায় বার্মা শেলের অফিস হয়েছে, ওই সব জায়গা আগে ছিল ফাঁকা। অনেক সার্কাসের খেলা ওই জায়গাগুলোতে হয়ে গেছে। কি ধরুণ বৌবাজার থানা এখন যেখানটায়, ওখানেও সার্কাসের খেলা দেখান হয়েছে। আর হ্যাঁ ভুলেই যাচ্ছিলাম ওয়াছেল মোল্লা সাহেবের কথা। ওর দোকানবাড়িটা যেখানে, আগে তো ওখানেই সার্কাস খেলা কত হয়েছে। ওয়াছেল মোল্লা সাহেবের নিজেরও তো একটা সার্কাস ছিল। কি যেন নাম ছিল? হ্যাঁ, মিনার্ভা সার্কাস।

ভদ্রলোক খবরের জাহাজ। উৎসাহ পেয়ে পুরো ইস্টিমে ছুটলেন। বললেন, খুব আগে পারব না, তবে কুড়ি বাইশ বছরের খবর দিচ্ছি। ধরুণ ১৯৩০-৩১ সালের কথা, কলকাতায় এল কার্লেকার গ্র্যান্ড সার্কাস। ৩১—৩২এ এল গ্রেট এসিয়াটিক সার্কাস। গ্রেট অলিম্পিক সার্কাস এল ১৯৩২—৩৩এ। ৩৪-৩৫ সালে গ্রেট রেমান সার্কাস। সেই বছরেই এল জার্মান সাহেব হেগেন বেগের সার্কাস। হুলুস্থূলু পড়ে গিয়েছিল শহরে। কিন্তু কি অদৃষ্ট দেখুন, দেশে ফিরতে পারলে না। কি হয়েছিল কে জানে, বোম্বাইতে পিস্তল দিয়ে সুইসাইড্‌ করলে। বেচারা। চুচুক চুচুক চুচুক। কার কপালে কি লেখা কে বলবে মশাই। হ্যাঁ যা বলছিলাম। কার্লেকার গ্র্যান্ড সার্কাস আরো দুবার এসেছিল; ৩৫—৩৬ সালে একবার, আরেকবার এসেছিল ৪০—৪১এ। গ্রেট্‌ রেমানও দুবার এসেছে, ৩৭—৩৮এ আর ৪৭—৪৮-এ। ৩৬—৩৭ সালে এসেছিল রুস্তাবাঈ সার্কাস। কত আর বলব? রয়্যাল সার্কাস এসেছে ৩৮—৩৯এ, সেই বছরই আবার হোয়াইটওয়ে সার্কাস কলকাতায় এসেছিল। ৩৯—৪০ সালে এসেছে গ্র্যান্ড ফেয়ারী সার্কাস। ৪১—৪২এ এসেছে গ্র্যান্ড ওলিম্পিক সার্কাস। তারপর যুদ্ধের হিড়িকে ভাল সার্কাস পর পর বছর তিনেক আসেনি। সেই থেকেই টেস্ট বদলে গেল বোধহয়। তারপর ৪৫—৪৬ সালে এল গ্রেট ইস্টার্ণ সার্কাস, পরের বছর গ্রেট রেমান, তারপরে গ্রেট ওরিয়েন্টাল সার্কাস এল ৪৮—৪৯ সালে, ৪৯—৫০, ৫০—৫১ এই দুবছর পর পর এল জুবিলি, আর এ বছর গ্রেট রয়্যাল সার্কাস। এই নিন আপনার পুরো হিসেব। একেবারে আপ-টু-ডেট্‌।

হ্যাঁ, তা যা বলছিলাম। আগে যাও বা সুটেব্‌ল্‌ জায়গা পাওয়া যেত, এখন তাও গেছে। বাড়ী ঘর, বিরাট বিরাট বিল্ডিং হয়ে সার্কাসের ন্যাতার মেরে দিয়েছে। অন্য অন্য দেশের গভর্নমেণ্ট রিজার্ভ করা জায়গা রেখে দিয়েছে, শুধু সার্কাসের খেলা দেখাবার জন্য। ছেলেমেয়েরা, বাড়ীর মেয়েছেলেরা ছবির নয় সিনেমার নয় সত্যিকার বাঘ সিংহ দেখবে, ডাক শুনবে, কিছু প্রত্যক্ষ জ্ঞান হবে তাদের। আমাদের দেশে তো আর সে সব ভাবাচিন্তার বালাই নেই। রিজার্ভ করা জায়গা তো দূরের কথা, নিজেরাই খুঁজে পেতে জায়গা জোগাড় করেছি। তুমি এস ডি ও সাহেব, দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, একটা পার্মিশন শুধু করে দাও। তো তাতেও গাফিলতী।

বলে কি পার্মিশন কি চট্‌ করে দিলেই হল? খোঁজ খবর নিতে হবে না ভাল করে? যার জমি সে অনুমতি দিয়েছে কিনা, দিয়ে থাকলে লিখিত পড়িত কিছু আছে কিনা? পাড়ার লোকজনের আপত্তি আছে কিনা? এই এক মহা গ্যাঁড়াকল মশাই, এই পাড়ার লোকেরা। কিছুর মধ্যে কিছু নেই, আপত্তি জানিয়ে বসল। কি, না সার্কাস পাড়ার মধ্যে বসান চলবে না। কেন, না ছেলেদের চরিত্র খারাপ হয়ে যাবে। ওদের লেখাপড়া হবে না। একজন যদি এই কথা বললেন তো পোঁ ধরলেন দোসরা জন। বললেন, লোকেরা দলে দলে আসবে সার্কাস দেখতে, আর রাত্রে পাড়া নোংরা করবে। দলে বাঘ সিংহ আছে নাকি? আছে? ও বাবা, দরকার নেই
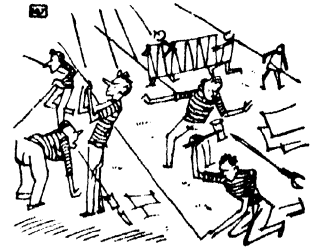
সার্কাসের। আমার গরুটা দ্বিতীয় বিয়েন দিয়ে 'উইক' হয়ে পড়েছে। সিংহের ডাকে ভড়কে গিয়ে দুধ কমিয়ে দেবে। তাই বলছি সার্কাস ফার্কাসে কাজ নেই। —এই দূর থেকেই নমস্কার।

তখন শুরু হয় পাল্টি চালের খেলা। হ্যাঁ আপত্তি নাকচ করতে পারি, কিন্তু মশাই 'ফ্রি পাশ' দিতে হবে। একটা ফ্যামেলি পাশ। রাজী? তো ব্যস্‌, আপত্তি নেই আমার। সার্কাস চলুক। একটা সার্কাসে ছেলেরা কত কি দেখতে পারে, শিখতে পারে। 'ফ্রি' পাশের মহিমা তাহলে বুঝুন। ধোবা থেকে দারোগা আর মুটে

থেকে 'ম্যাজিস্টর' সবাই মুকিয়ে থাকেন 'ফিরি'তে সার্কাস দেখবার তালে।

একটা সার্কাস এক জায়গায় নিয়ে যাওয়া কি চাড্ডিখানি কথা। হুট্ করে কোন শহরে সার্কাস গিয়ে পড়ে না। কোথায় যাবে না যাবে আগে থেকেই ঠিক করা থাকে। ঠিক করাও কি সোজা। সার্কাস যাবে বহরমপুর। তো তিন মাস আগে থাকতেই সেখানে তার ম্যানেজার গিয়ে হাজির। খবরাখবর নিতে লাগল খুঁটিয়ে। সেই শহরে কত লোক? লোকের হাতে পয়সা কেমন? কেমন সিনেমা থিয়েটার দেখে? সার্কাস এর আগে ওখানে কোনদিন গিয়েছিল কিনা? গেলে, কবে? কি কি খেলা দেখিয়েছিল? কেমন পয়সা পেয়েছিল? ইস্কুল কলেজ কটা? ছাত্রছাত্রী কত? নতুন কোন সার্কাস এলে সুবিধে পাওয়া যাবে কিনা? এইসব রিপোর্ট আসে ডিরেক্টর কি প্রোপ্রাইটারের কাছে। তাঁরা পরে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত করেন, সেখানে যাওয়া সমীচীন হবে কিনা? যদি তাঁরা হ্যাঁ বলেন তো চল। তাঁবু উঠাও। আগু বাড়। ম্যানেজার মশাই বাগড়া দিলেই, কি ভুলচুক কিছু করলেই গেল। গোটা কোম্পানীকে তার খেসারৎ দিতে হবে। তাই সার্কাসের ম্যানেজাররা প্রায়ই জাঁদরেল হয়ে থাকেন। তাদের 'পাওয়ার' খুব। আর কাজকর্মও এমন জানে যা সচরাচর দেখা যায় না। রেল কোম্পানীর কেউ বলুক দেখি, কলকাতা থেকে কালনার ভাড়া কত? হাতীর ভাড়া, ঘোড়ার ভাড়া কত? মালের ভাড়া কত? কতখানা ওয়াগন লাগবে। ক'খানা তার বন্ধ আর কখনাই বা খোলা? এ হিসেব চট করে যদি কেউ বলতে পারে তো সে এক সার্কাসের ম্যানেজার। এদের মাইনেও বেশ মোটা।

রকম রকম লোক নিয়েই সার্কাস। কেউ ফ্যালনা নয়, সবাই দরকারী। যেমন বাঘ সিংহ, তেমনি পেলোয়ার, তেমনি ক্লাউন। অন্য অন্য দেশের ক্লাউনরা যেমন তেজী, আমাদের দেশের ক্লাউনগুলো কিন্তু তেমন সরেস নয়। অথচ ক্লাউন 'গেট্ সেল্' বাড়াতে কত সাহায্য করে। বিলাত আমেরিকার কথা আলাদা। ক্লাউনের পিছনে ওরা টাকা ঢালে কত? দু' তিন হাজার টাকা মাইনে পায় এমন ক্লাউনও আছে। কি তাদের রংদার পোষাক আর কি মেক্‌আপ্! ক্লাউন পয়লা দর্শনধারী, পরে গুণ বিচারী। মেকদার চেহারা দেখেই যদি হাসির গুঁতোয় পেট না ফাটল তো আর ক্লাউন কি?

এই তো, তিন চার বছর আগেও আমি ক্লাউনের কাজ করতাম। আর করিনে,

ছেড়ে দিয়েছি। এখন দাঁতের খেলা দেখাই। আগে এই খেলা দেখাতো আমার বউ। বলেই লোকটি একটুক্ষণ থামল। একটু জিরেন নিয়ে বলল, আর আমি ছিলাম ক্লাউন। সতের রকম হাসতাম। ঠিক দশ মিনিট টাইম। আমরা ক্লাউনরা বেশীর ভাগ কাজ করি খেলার ইন্টারভালগুলোতে। ওদিকে নতুন খেলার জোগাড়যন্ত্র হতে থাকে, আর আমরা মজাক্ মস্কারা করে সময়টা পার করে দিই। আর জানেন তো প্রোগ্রাম একবার ঠিক হয়ে গেলে তার নড়চড় হবে না। এই হল সার্কাসের রুল। কড়া ডিসিপ্লিন। আগে আমার বউ-এর দাঁতের খেলা। তারপরে চীনে মেমের তারের ব্যালান্স। মাঝখানের দশ মিনিট আমার বৌ খেলা দেখাতে গেছে। আমি ফাইনাল মেক্‌আপ নিয়ে রেডি হচ্ছি। রিং মাস্টার সিটি মারবে তো আমি পালটি খেতে খেতে রিংএ ঢুকব। একহাতে ছোট এক তালা আর কোমরে বোম্বাই এক চাবি। চাবি তো তালায় ঢুকবে না আর তখন আমি হাসব। এক রকম, দু'রকম, তিন রকম, এইভাবে রকম রকম সতের রকম হাসব। ঠিক পুরো দশ মিনিট। তারপর ফের সিটি বাজবে। ছাতা নিয়ে চীনা মেম আসবে তারে উঠতে, তখন আমার ছুটি।

সেদিন পুরো মেক্‌আপ্ নেওয়া শেষ হল না, রিং মাস্টারের সিটি পড়ল। তাড়াতাড়ি পালটি খেতে খেতে ছুটলাম রিংএ। ভেতরে খুব গণ্ডগোল। হঠাৎ নজরে পড়ল বৌকে ধরাধরি করে ভেতরে নিয়ে যাচ্ছে। রক্তে মুখ ভেসে যাচ্ছে। আমার মাথা ঘুরে উঠল। কিন্তু আমার প্রোগ্রাম। সতের রকম হাসতে হবে। পুরো দশ মিনিট। ভেতরে খুব গণ্ডগোল হচ্ছে। তো বাবুজী পুরো দশ মিনিট হাসলাম। ভেতরে যখন এলাম, বৌ তখন হাসপাতালে। ড্রেস পরেই ছুটলাম। হাসপাতালে যখন গেলাম, বৌ তখন অনেক দূরের এক জায়গায় চলে গেছে। আর নাগাল পেলাম না। সেই থেকে আমার হাসির খেলা বন্ধ হল। দাঁত দিয়ে চেপে ধরলাম রশির কোণা। ধীরে ধীরে উপরে উঠি, মনে হয় বুঝি বৌ-এর কাছ বরাবর পেঁছিলাম। আর যদি কোনদিন ছিঁড়ে পড়ে যাই তো মনে হত বুঝি ভালই। একখানেই মিলব গিয়ে। প্রাণের ভয় মুছে ফেলে খেলতাম। তাই দুবছরেই পাকা হয়ে গেলাম। তখন এই খেলাতেই আমার রোজগার বাড়ল। তারপর বিয়েও করলাম আর একটা। এখন তাই একটু সাবধানে খেলি। এ-ও একটা বড় খেলা, জীবন সার্কাসের খেলা, নয় কি?
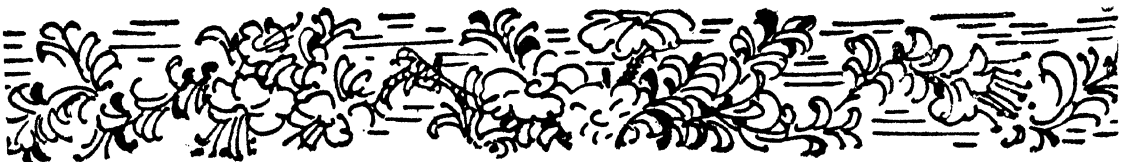
বর্ষা নামিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও বর্ষা নামে নাই। চারিদিকে আগুন ছুটিতেছে। দ্বিপ্রহরে তাপমান যন্ত্রের পারা অবলীলাক্রমে ১১৮° পর্যন্ত উঠিয়া যায়। মনে হয়, আর দু'চার দিন বৃষ্টি না নামিলে গয়া শহরের লোক-গুলার অচিরাৎ গয়াপ্রাপ্তি ঘটিবে।

একটি পাকা বাড়ী। দ্বিপ্রহরে তাহার দরজা জানালা সব বন্ধ: দেখিলে সন্দেহ হয় বাড়ীর অধিবাসীরা বাড়ী ছাড়িয়া পালাইয়াছে। কিন্তু আসলে তা নয়। বাড়ীর যিনি কর্তা, তিনি গৃহিণী ও পুত্রবধূকে লইয়া দার্জিলিং পালাইয়াছেন বটে, কিন্তু বাকি সকলে বাড়ীতেই আছে। ইহারা সংখ্যায় তিনজন। এক, কর্তার পুত্র সুনীল: সে কলেজের ছুটিতে বাড়ী আসিয়া বিরহ এবং গ্রীষ্মের তাপে দগ্ধ হইতেছে, কারণ বৌ দার্জিলিংয়ে। দুই সুনীলের বিবাহিতা ছোট বোন অনিলা। সে শ্বশুর-বাড়ী হইতে অনেক দিন বাপের বাড়ী আসিয়াছে, শীঘ্রই শ্বশুর তাহাকে লইয়া যাইবেন, তাই সে দার্জিলিঙ যাইতে পারে নাই। তিন, তাহাদের ঠাকুরমা। বৃদ্ধা অতিশয় জবরদস্ত ও কড়া মেজাজের লোক, বাড়ী হইতে তাঁহাকে নড়ানো কাহারও সাধ্য নয়।

দ্বিতলের একটি ঘরে অনিলা দ্বার বন্ধ করিয়া আঁচল ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া নিজেকে বাতাস করিতে করিতে ঘুরিয়া বেড়াইতে-ছিল। আর একটা ঘরে সুনীল লুঙ্গি পরিয়া গায়ে ভিজা গামছা জড়াইয়া মেঝের উপর পড়িয়াছিল। তাহার চক্ষু কড়িকাঠের দিকে, মন দার্জিলিঙ পাহাড়ে। দার্জিলিঙ পাহাড়ে গিয়াও মন কিন্তু তিলমাত্র ঠাণ্ডা হয় নাই। দেহমনের উত্তাপে গামছা যখন শুকাইয়া যাইতেছে, তখন সে কুঁজার জলে গামছা ভিজাইয়া আবার গায়ে জড়াইতেছে।

ঠং ঠং করিয়া ঘড়িতে দুটো বাজিল। এখনও চার ঘণ্টা এই বহ্নি প্রদাহ চলিবে: আকাশে সূর্যদেব ভস্মলোচন সন্ন্যাসীর মত একদৃষ্টে তাকাইয়া আছেন।

অনিলা আঁচলটা গায়ে জড়াইয়া ঘর হইতে বাহির হইল। সুনীলের দরজায় করাঘাত করিয়া অবসন্ন কণ্ঠে ডাকিল,—'দাদা!'

সুনীল দরজা খুলিয়া দিল। দুই ভাই বোন কিছুক্ষণ ঘোলাটে চোখে পরস্পরের পানে চাহিয়া রহিল, তারপর সুনীল বলিল,—'কি চাই?'

ক্লান্ত মিনতিভরা সুরে অনিলা বলিল, 'দাদা, একটা কাজ করবে?'

সন্দিগ্ধভাবে সুনীল বলিল, 'কি কাজ?' এ অবস্থায় কাজের নাম শুনিলেই মন শঙ্কিত হওয়া ওঠে।

অনিলা বলিল, 'আমার গলায় দড়ি বেঁধে কুয়োতে চোবাতে পারো? তবু যদি একটু ঠাণ্ডা পাই।'

সুনীল একটু বিবেচনা করিয়া বলিল, 'চোবাতে পারি, কিন্তু তাতে আমার লাভ কি? আমার শরীর তো ঠাণ্ডা হবে না!'

অনিলা বলিল, 'তোমার শরীর ঠাণ্ডার দরকার কি? তোমার অর্ধাঙ্গিণী দার্জিলিঙে আছেন, তাঁকে চিঠি লেখো না, শরীর আপনি জুড়িয়ে যাবে।'

সুনীলের নাসারন্ধ্র স্ফীত হইল, সে বলিল, 'চিঠি লিখব! অর্ধাঙ্গিণীকে চিঠি লিখব! এ জন্মে আর নয়। অরুচি হয়ে গেছে।' ভিজা গামছা বুকে ঘষিয়া বক্ষস্থল কিঞ্চিৎ শীতল করিয়া বলিল, 'চিঠি লিখলেই যদি শরীর জুড়িয়ে যায়, তুই হেবোকে চিঠি লিখগে যা না।'

হাবু অনিলার স্বামীর ডাক-নাম। তাহাকে হেবো বলিয়া উল্লেখ করিলে অনিলা চটিয়া যাইত, কিন্তু আজ তাহার রাগ হইল না। বস্তুতঃ স্বামীর চিঠি কয়েকদিন হইল আসিয়াছে, কিন্তু সে রাগ করিয়া উত্তর দেয় নাই। বিবাহিতা যুবতী-দের এমনই স্বভাব, ক্লেশের কোনও কারণ ঘটিলেই তাঁহাদের সমস্ত রাগ পতিদেবতার উপর গিয়া পড়ে।

অনিলা বলিল, 'বাজে কথা বোলো না, ওর উপর আমার আর একটুও ইয়ে নেই। যদি কোনও উপায় থাকে তো বল।'

সুনীল বলিল, 'একমাত্র উপায় যজ্ঞ করা। আমাদের সংস্কৃতের অধ্যাপক সেদিন বল-ছিলেন, যজ্ঞ করলেই বৃষ্টি হয়—যজ্ঞাৎ ভবতি পর্জন্যঃ।'

অনিলার মাথার মধ্যে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল, সে বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া বলিল—'দাদা!'

সুনীল বলিল, 'কি?'
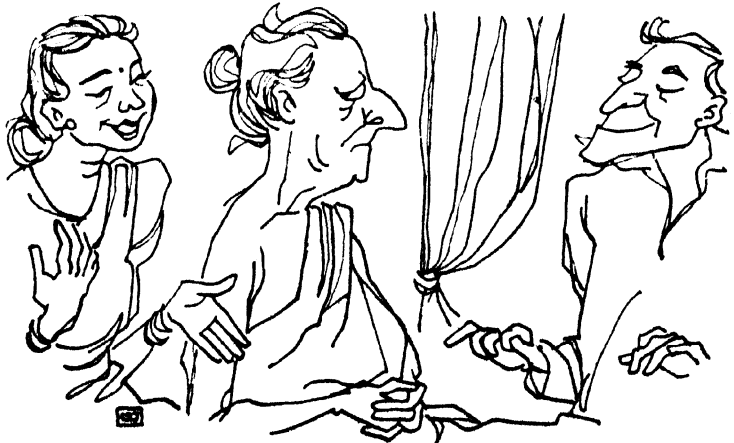
অনিলা রুদ্ধশ্বাসে বলিল, 'বড়ি!!'

সুনীলের শংকা হইল, গরমে অনিলার মাথার ঘিলু গলিয়া গিয়াছে, তাই সে এলোমেলো কথা বলিতেছে।

'বড়ি! কিসের বড়ি?'

'বড়ি বড়ি—বড়া বড়ির নাম শোননি কখনও?'

'শুনেছি। তা কি হয়েছে?'

'বলছি, ঠাকুরমা যদি বড়ি দেন, তাহলে নিশ্চয় বিষ্টি হবে। আজ পর্যন্ত কখনও মিথ্যে হয়নি।'

কথাটা সত্য। সেকালের ঋষিরা যজ্ঞ করিলে বৃষ্টি হইত কিনা এতকাল পরে তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায় না, কিন্তু ঠাকুরমা বড়ি দিলে বৃষ্টি নামিবেই। আজ পর্যন্ত ইহার অন্যথা হয় নাই। এবিষয়ে ঠাকুরমার ব্যতিক্রমহীন রেকর্ড আছে। তিনি শেষ পর্যন্ত রাগ করিয়া বড়ি দেওয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন।

সুনীল একটু উৎফুল্ল হইয়া বলিল, 'বুদ্ধিটা মন্দ বার করিস নি। কিন্তু বুড়ীকে রাজি করানো শক্ত হবে।'

অনিলা তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, 'চল না, দাদা, চেষ্টা করে দেখি। যেমন করে পারি রাজি করাবো। আমার ডাল ভিজানো আছে। বড়ার অম্বল করব বলে ভিজিয়েছিলাম—'

সুনীল বলিল, 'আচ্ছা তুই এগো, আমি লুঙ্গিটা ছেড়ে যাচ্ছি।' ঠাকুরমা দুচক্ষে লুঙ্গি পরা দেখিতে পারেন না, লুঙ্গি পরিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে কার্যসিদ্ধি তো হইবেই না, অনর্থক বকুনি খাইতে হইবে।

নীচের তলায় ঠাকুর ঘরটি সবচেয়ে ঠাণ্ডা, কারণ এই ঘরে সংসারের পানীয় জলের ঘড়াগুলি থাকে। ঠাকুরমা মেঝেয় শুইয়া এক হাতে পাখা নাড়িতেছেন, অন্য হাতে মহাভারত বাগাইয়া ধরিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেছেন। অনিলা প্রবেশ করিয়া বলিল, 'ওমা, তুমি ঘুমোও নি দিদি! তা এই গরমে কি আর ঘুম হয়। পাখা নেড়ে নেড়ে হাতটাও বোধ হয় ধরে গেছে। দাও, আমি বাতাস করছি।'

শিয়রের কাছে বসিয়া অনিলা ঠাকুরমার হাত হইতে পাখা লইয়া জোরে জোরে বাতাস করিতে লাগিল। ঠাকুরমার মুখ-খানি ঝুনা নারিকেলের মত, বাহিরে শুষ্ক হইলেও ভিতরে শাঁস আছে। তিনি নাতিনীর প্রতি একটি তীক্ষ্ম কটাক্ষপাত

করিলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না। অনিলা বলিল, 'বাবাঃ, কি গরমই পড়েছে এবার, চিংড়িপোড়া হয়ে গেলুম। এমন গরম আগে আর কখনও পড়েনি।'

ঠাকুরমা বলিলেন, 'কেন পড়বে না, ফি বছরই পড়ে।'

এই সময় সুনীল প্রবেশ করিল; বিনা বাক্যব্যয়ে ঠাকুরমার পায়ের কাছে বসিল এবং তাঁহার একটা পা কোলের উপর তুলিয়া লইয়া টিপিতে আরম্ভ করিল। বৃদ্ধা ক্রুদ্ধ বিস্ময়ে ঘাড় তুলিয়া বলিলেন, 'নেলো, ঠ্যাং ছেড়ে দে শিগ্‌গির। আজ তোদের হয়েছে কি?'

সুনীল বলিল, 'হবে আবার কি, কিছু না। সবাই বলে, আজকালকার ছেলেমেয়েরা গুরুজনকে ভক্তিচ্ছেদ্দা করতে জানে না। তাই দেখিয়ে দিচ্ছি। গুরুজনের মত গুরুজন পেলেই ভক্তিছেদ্দা করা যায়'

বলিয়া আরও প্রবলবেগে পা টিপিতে লাগিল।

অনিলা পাখা চালাইতে চালাইতে বলিল, 'যাই বল, মা বাবা শ্বশুর শাশুড়ী সকলেরই আছে; তাঁদের কি আমরা ভক্তি করি না? কিন্তু এমন ঠাক্‌মা কটা লোকের আছে? আমাদের কী ভাগ্যি বল দেখি দাদা!'

ঠাকুরমা উঠিয়া বসিলেন, পর্যায়ক্রমে নাতি ও নাতিনীকে নিরীক্ষণ করিয়া কড়া সুরে বলিলেন, 'কি মৎলব তোদের বল্‌ দিকি! ঠিক্ দুপুরবেলা আমাকে ছেঁদো কথা শোনাতে এলি কেন?'

সুনীল আহত স্বরে বলিল, 'কোথায় ভাবলাম, দুপুরবেলাটা বৃথাই কেটে যাচ্ছে, যাই ঠাকুরমার সেবা করিগে, তবু পর-কালের একটা কাজ হবে। তা তুমি বলছ ছেঁদো কথা। তবে আর আমরা যাই কোথায়।' বলিয়া গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল।

অনিলা বলিল, 'শুধু কি তাই! বাবা দার্জিলিঙ থেকে চিঠি লিখেছেন—তোরা ঠাকুরমার দেখাশুনো করছিস তো! বাবা যদি এসে দেখেন—'

ঠাকুরমা ধমক দিয়া বলিলেন, 'আ গেল যা! ইনি আবার ঢাকের পেছনে ট্যামটেমি এলেন! যা বেরো আমার ঘর থেকে। দুটো ভূত-পেত্নী জুটেছে!

ভূত-পেত্নী কিন্তু নাছোড়বান্দা। সুনীল আবার ঠাকুরমার পা টানিয়া টিপিবার উপক্রম করিল। ঠাকুরমা অনিলার হাত হইতে পাখা কাড়িয়া লইয়া সুনীলের পিঠে এক ঘা বসাইয়া দিলেন,—'তোরা যাবি, না আমার হাড় জ্বালিয়ে খাবি! বেরো শিগ্‌গির, আমি এখন দ্রৌপদীর রন্ধন উপাখ্যান পড়ছি।'

সুনীল এইরূপ একটা সুযোগেরই অপেক্ষা করিতেছিল, বলিয়া উঠিল, 'দ্রৌপদীর রন্ধন উপাখ্যান। হুঁঃ, রন্ধনের কী জান্‌ত দ্রৌপদী? তোমার মতন বড়ি দিতে জান্‌ত?'

অনিলা অমনি বলিল, 'সে আর জানতে হয় না। দ্রৌপদী তো তস্য কালের মেয়ে, আজকালই বা কটা মেয়ে ঠাক্‌মার মতন বড়ি দিতে পারে? সরোজিনী নাইডু পারে? বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত পারে?—আহা, সেই কবে ঠাক্‌মার বড়ি খেয়েছি, এখনও যেন মুখে লেগে আছে।'

সুনীল সশব্দে ঝোল টানিয়া বলিল, 'বলিস নি, বলিস নি, আমার জিভে জল আসছে।'

ঠাকুরমার মনটা নরম হইল, কিন্তু সন্দেহ দূর হইল না। তিনি বলিলেন, 'নে, আর ন্যাকরা করতে হবে না, আসল কথাটা কী তাই বল্। কি চাস তোরা?'

সুনীল অবাক হইয়া বলিল, 'চাইব আবার কি, তোমার সেবা করতে চাই। তবে বড়ির কথায় মনে পড়ে গেল। কন্দীন তোমার বড়ি খাইনি। দুটো বড়ি পাড়োনা দিদি!'

অনিলা বলিল, 'হ্যাঁ দিদি, লক্ষ্মীটি দিদি, আমার ডাল ভিজানো আছে, আমি এক্ষুনি বেটে দিচ্ছি—'

কিছুক্ষণ ঠাকুরমার কলহ-কলিত কণ্ঠের সহিত নাতি-নাতিনীর করুণ মিনতি মিশ্রিত হইল; তারপর বৃদ্ধা পরাভূত হইলেন। কিন্তু আদৌ উঁহারা যে বড়ি পাড়াইবার মৎলবেই আসিয়াছিল, তাহা ধরিতে পারিলেন না।

বেলা তিনটের সময় ঠাকুরমা তেল মাখানো থালায় কয়েকটি বড়ি পাড়িয়া রোদে দিলেন।

*   *   *   *

বেলা চারটের সময় আকাশের কোণে সিংহের মত স্ফীত কেশর কয়েকটা মেঘ মাথা তুলিল। দেখিতে দেখিতে গুরুগুরু ধ্বনির সহিত বর্ষণ শুরু হইয়া গেল। অতি ভৈরব হরষ, ক্ষিতিসৌরভ রভস, কিছুই বাদ পড়িল না। ঠাকুরমার বড়ি ভাসিয়া গেল।

কিন্তু ইহাই একমাত্র অলৌকিক ঘটনা নয়।

পুলক রোমাঞ্চিত রাত্রি। বৃষ্টির উদ্দাম প্রগলভতা কমিয়াছে; টিপিটিপি মেঘ-বধূরা যেন অভিসারে চলিয়াছে।

সুনীল নিজের ঘরে চিঠি লিখিতে বসিয়াছে—

প্রিয়তমাসু, আজ প্রথম বিষ্টি নেমেছে—

অনিলা নিজের ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া চিঠি লিখিতেছে—

প্রিয়তমেষু—

মাতৃদেবীর সঙ্গে রামেশ্বর ধাম

শ্রীআশুতোষ মিত্র

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

বাবার পূজারী সকলেই দক্ষিণী ব্রাহ্মণ। বাবার গৃহে কোন যাত্রী প্রবেশ করিতে পারে না। কোন যাত্রীর পূজা করিতে হইলে ঐ পূজারীদিগের হাত দিয়াই পূজা করিতে হয়। এমন কি, দক্ষিণী ব্রাহ্মণীরাও পর্যন্ত প্রবেশ করেন। কিন্তু আর্যাবর্তের প্রবেশাধিকার নাই। প্রত্যুত শিবমন্দিরের ঐ নিয়ম আর কুত্রাপি নাই। তবে শ্রীশ্রীমাতৃদেবীর জন্য ভিন্ন কথা। রামনাদের রাজা স্বামীজির শিষ্য। রাজা পূর্ব হইতে সংবাদ দিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, তাঁহার গুরু পরমগুরু দর্শনে আসিতেছেন। তাঁহার জন্য যেন সব সুবন্দোবস্ত হয়। শ্রীশ্রীমাতৃদেবী এবং তাঁহার স্ত্রী ও পুরুষ ভক্তেরা সকলেই স্বহস্তে গঙ্গোত্তরীর জল ১।০ সিকা হিসাবে ক্রয় করিয়া বাবার মুকুটাবরণ উন্মোচন করাইয়া উক্ত গঙ্গোত্তরীর জল এবং সুবর্ণ বিল্বপত্রে পূজা করেন। স্বামী মহারাজ শ্রীশ্রীমাতৃদেবীর পূজার জন্য ২০৮টি সুবর্ণ বিল্বপত্র পূর্ব হইতেই পাঠাইয়াছিলেন।

আমরা যথারীতি রামেশ্বরে বাস এবং সমুদ্রস্নান, বাবার পূজা ও আরাত্রিক দর্শন করিলাম। তৃতীয় দিন শ্রীশ্রীমাতৃদেবী বিশেষভাবে বাবাকে পূজাদি দিলেন এবং পাণ্ডাদিগের পুঁথিতে লিখিত রামেশ্বরের কাহিনী কথক মুখে শ্রবণ করিয়া পাণ্ডা ভোজন করাইলেন। প্রত্যেক পাণ্ডাকে একটি করিয়া জলের ঘটী দান করা হইল। শ্রীশ্রীমাতৃদেবী হাতে শুপারী ও পয়সা লইয়া কথা শুনিলেন এবং শ্রবণান্তে ঐগুলি দিয়া প্রণাম করিলেন।

যেদিন শ্রীশ্রীমাতৃদেবী গঙ্গোত্তরীর জল ও সুবর্ণ বিল্বপত্রে 'রামেশ্বরের স্নান ও পূজা করিয়াছিলেন, সেদিন প্রথমে নিজ সন্তানদ্বয়কে বাবার অঙ্গ স্পর্শ করাইয়া এবং তাহাদিগকে দিয়া স্নান ও পূজা করাইয়া তবে স্বয়ং পূজা করেন। তারপরে গোলাপ মা, ছোটমাসী এবং রাধু করেন।

প্রায় প্রত্যহ সন্ধ্যার পর ধূমধামের সহিত আলোক বাদ্যাদি রোশনা ও হস্তী, ঘোড়া লইয়া 'রামেশ্বরের সোয়ারী বা পাল্কি রাজপথে বাহির হয়। প্রত্যহই বাবার এক একটি পৃথক্ পৃথক্ লীলা বা উৎসবের অনুকরণ সোয়ারীতে দেখিতে পাওয়া যায়। সোয়ারীতে যে সকল মূর্তি বাহির হয় সেসব স্বর্ণ বা রৌপ্যনির্মিত বাবার সচল মূর্তি। সোয়ারীর সঙ্গে তাঁহার নর্তকীগণ, যাহাদের দেবনর্তকী বলে, অগ্রগামী হইয়া নৃত্যগীত করে। এইরূপে সমগ্র মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া সোয়ারী পুনরায় মন্দিরে প্রবেশ করে এবং তথায়ও আবার কিছুক্ষণ দেবনর্তকীদিগের নৃত্যগীত হয়। ঐ সকল দেবনর্তকীদিগের অলঙ্কারাদি ও বসন-ভূষণ মন্দির হইতে দেওয়া হয়। তবে কাহারো কোনরূপ চরিত্রদোষ ঘটিলে তাহার নিকট হইতে অলঙ্কারাদি কাড়িয়া লওয়া হয় এবং মন্দিরের কার্য হইতে তাহাকে বিদায় দেওয়া হয়।

কথিত আছে, বাবার মাথায় গঙ্গোত্তরীর জল চড়াইবার সময় লিঙ্গমূর্তি ঈষৎ বর্ধিত হয়। 'রামেশ্বরের কার্তিক মাসে এক মেলা হয়। উহাতে প্রায় দুই লক্ষ লোকের সমাগম হইয়া থাকে। অনতিদূরে শ্রীশঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্গেরী বা শৃঙ্গগিরি মঠ শহর প্রান্তে একটি পুরাতন মহল ও উহার পার্শ্বে স্থিত নলমন্দির বা টুলাগারি। ঐ মহল ও সেতুনির্মাতা নলের মন্দিরে বিশেষ কিছু নাই। প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ মাত্র। নিকটে লক্ষ্মণকুণ্ড নামক চতুর্দিকে প্রস্তরে বাঁধান পথিপার্শ্বস্থ কুণ্ড—ঐ কুণ্ডে স্নান, পূজা ও শ্রাদ্ধাদি করিতে হয়। কুণ্ডের জল মিষ্ট ও স্বাদু। শহর প্রান্তে সমুদ্রের উপকূলে রামঝরকা। উহা বালির পাহাড় বা বালিয়াড়ীর স্তূপ। ঐ স্তূপের নিম্নে ভগ্ন ফটক এবং কয়েকটি মন্দির ভগ্নাবস্থায় আছে। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিলে একটি বড় মন্দির। তাহাতে রাম, সীতা ও হনুমানের মূর্তি আছে। রামঝরকার উপর হইতে সমগ্র রামেশ্বর

দ্বীপ এবং চতুর্দিকের সমুদ্র সুন্দর দেখিতে পাওয়া যায়। পাণ্ডা বলিল, শ্রীরামচন্দ্র ঐ স্থান হইতে হনুমানকে লঙ্কায় সেতু বাঁধিবার স্থান নির্দেশ করেন। গন্ধমাদন পর্বতও আছে।

রামেশ্বর হইতে ১৪।১৫ মাইল ব্যবধান দ্বীপের শেষ সীমানায় প্রসিদ্ধ ধনুস্তীর্থ বা ধনুষ্কোটি। এই স্থান পর্যন্ত রেল গিয়াছে। হাঁটাপথে যাইতে গেলে ২ দিন এবং নৌকায় বা মেছুয়ায় প্রায় ৩॥ ঘণ্টা লাগে। ঐ স্থানে মাত্র ৪।৫ ঘর পাণ্ডার বাস। এখানে স্নান, দান ও শ্রদ্ধাদি এবং সোনারূপোর তীর ধনুক দিয়া সমুদ্রের পূজা করিতে হয়। শ্রীমাতৃদেবী তাঁহার পক্ষ হইতে কৃষ্ণলাল এবং লেখককে সোনা-রূপোর তীর ধনুক দিয়া পাঠাইয়া দিলে তাহারা যথারীতি ঐখানে রেলে গিয়া সমুদ্রের পূজা করিয়া আসে।

ধনুস্তীর্থের বিষয় যে দুইটি বৃত্তান্ত পাণ্ডা মুখে শুনা যায় সেই দুইটিই নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

(১) নল শ্রীরামচন্দ্রের সেতুনির্মাণকার্য করিতে করিতে ঐ পর্যন্ত আসিলে সমুদ্র আর তাহাকে অগ্রসর হইতে দেয় না। বানরেরা যতই প্রস্তর দ্বারা নির্মাণ করিতে থাকে সমুদ্র ততই উহা ভাঙিয়া দেয়। সমুদ্রের ঐ প্রকার বাধা প্রদানে শ্রীরামচন্দ্র স্বীয় ধনুর্বাণ দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিতে উদ্যত হইলে সে ভীত হইয়া শ্রীরাম সমীপে উপস্থিত হইয়া অর্ঘাদির দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া কহে, 'আর আমি আপনার কার্যে বাধা দিব না।' এই হেতু ঐ স্থানের নাম ধনুস্তীর্থ হইয়াছে।

(২) লঙ্কা হইতে শ্রীরামের প্রত্যাগমন কালে সমুদ্রের আশঙ্কা হয় যে, আপামর সাধারণ সেতু বাঁধা হইলে লঙ্কায় উপস্থিত হইতে পারে অতএব সে নিজ মর্যাদা রক্ষা হেতু শ্রীরাম সমীপে আসিয়া উহা ভগ্ন করিতে করযোড়ে প্রার্থনা করে। শ্রীরামচন্দ্রও তাহাকে দুঃখিত দেখিয়া স্বীয় ধনুর্বাণ সাহায্যে উহা ভগ্ন করিয়া সমুদ্রের মর্যাদা রক্ষা করে। এইজন্য ঐ স্থানের নাম ঐপ্রকার হইয়াছে।

ধনুস্তীর্থ হইতে ২।৩ মাইল দূরে মান্নার দ্বীপ বা সেতুর অপর অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। সেতুর ঐ স্থান জলমগ্ন বটে, কিন্তু জল বেশী না থাকায় উহার মধ্য দিয়া নৌকা ভিন্ন জাহাজাদি যাইতে পারে না। ঐ স্থানটির দৃশ্য বড়ই রমণীয়। বামে শান্ত মূর্তি বঙ্গোপসাগর এবং দক্ষিণে প্রবল তরঙ্গায়িত ভারত মহাসাগর। ঐ পরস্পরবিরোধী দুইটি সমুদ্রের ধনুস্তীর্থে মিলন হওয়ায় উগ্র ও শান্ত ভাবের একত্র সমবায় দেখা যায়। একদিন শ্রীশ্রীমাতৃদেবীকে মন্দির পক্ষ হইতে মণি-কোঠা খুলিয়া দেখান হয়। প্রকোষ্ঠে সামান্য একটি দীপ জ্বলিতেছে অথচ সমস্ত ঘরটি এবং অলঙ্কারাদি সেই ক্ষীণ আলোকে ঝক্ ঝক্ করিতেছে। শ্রীশ্রীমাতৃদেবী দেখিয়া অতিশয় আনন্দিতা হইলেন।

রামেশ্বরে ত্রিরাত্রি বাসের পর মাদুরায় ফিরিয়া আসা হয়। সেখানে একদিন থাকা হয়। শশী মহারাজের একটি বক্তৃতা হয়। পরদিন তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পুনরায় মাদ্রাজ ফিরিয়া আসা হয়।

কোন এক বন্ধুকে

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

কখনো কখনো
কি আমার মনে হয় শোন
দুজনের মাঝখানে
এই যে সামান্য ব্যবধান
রেলপথে শ' কয়েক মাইল
এর যেন সীমা নেই কোন
মনে হয় কখনো কখনো।

ভৌগোলিক এই দূরত্বকে
মাঝে মাঝে ভারি ভয় হয়
দিনে দিনে মুহূর্তে মুহূর্তে
যে আড়াল গড়ে ওঠে
সে তো শুধু ভৌগোলিক নয়।
নির্মম কুটিল কাল
অলক্ষ্যে কৌশলে গড়ে
কত বাধা, কত অন্তরাল
গোপনে গোপনে
আভাস কিছু তো পাই মনে।

কত দিন ভুলে যাই
ভুলে থাকি আরো কত রাত
জীবনযাত্রায় কই কোথাও তো
হয় না ব্যাঘাত।

কত কাজ, কত কথা
কত ব্যথা কত সুখ দুঃখের মিছিলে
ভুলে যাই তুমি ছিলে।

হাত পেতে নিতে বাধা
হাত দিয়ে পারিনে যে ছুঁতে
তোমার মুহূর্তগুলি
হাসিতে অশ্রুতে
ভেসে ভেসে চলে যায়।

পাহাড়ের অন্য পিঠে
চোখের আড়ালে
আর এক জীবনধারা ছোটে
ক্ষীণতোয়া অন্তঃশীলা
তবুও দুকূল ভাঙে
তবুও পাথরে মাথা কোটে।

সে কূলে হৃদয় বন্ধু
সে পাথরও
থরো থরো কম্পিত হৃদয়
পাথরই তো শেষ কথা নয়।

মধ্যপ্রাচ্য-পরিচয়

॰ সরোজ আচার্য ॰

(৫)

মিশর

দু' বৎসর পূর্বের একটি ঘটনা। আলেকজান্দ্রিয়ার বিমানঘাটিতে মিশরী শুল্ক বিভাগের কর্মচারী একজন ইংরেজ যাত্রীর কাগজপত্র পরীক্ষা করছিলেন। ইংরেজ যাত্রীটি অসহিষ্ণুভাবে বলে উঠ্‌ল, "তাড়াতাড়ি করুন না।" মিশরী কর্মচারীটি ধীর গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "তাড়াতাড়ি? আমরা কি ৬৮ বৎসর ধরে অপেক্ষা করে নেই?" ৬৮ বৎসর পূর্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তারা যত শীঘ্র সম্ভব মিশর থেকে বিদায় নেবে। সে প্রতিশ্রুতি এখনও পূর্ণ হয়নি। ঘটনাটির বিবরণ উল্লেখ করে বিখ্যাত বিলাতী কাগজ 'ইকনমিস্ট' স্বীকার করেছিল, মিশরের জাতীয় চেতনায় ব্রিটিশ দখলীকারদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ কী গভীর ও ব্যাপক। সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতারণা এবং আত্মপ্রতারণার ক্ষমতা অসীম। তারা এখনও বলছে, আগেও বলেছে, মিশরের মঙ্গলের জন্যই মিশরে ব্রিটিশ ফৌজ মোতায়েন রাখা হচ্ছে, রাখা দরকারও। "তাড়াতাড়ি? আমরা যে ৬৮ বৎসর ধরে অপেক্ষা করে আছি।"—ঐ সংক্ষিপ্ত কথা-কয়টির মধ্যে নিহিত রয়েছে মিশরের অগৌরব, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রভুত্বলিপ্সা ও ছলনা, মিশরী জনসাধারণের রুদ্ধ ক্রোধ ও সাম্রাজ্যবাদী শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলার নিরন্তর চেষ্টা।

নাহাস পাশা

আধুনিক মিশরের কাহিনী বলতে গেলে ৭০।৭২ বৎসর পূর্ব থেকেই শুরু করতে হয়। ডিজরেলি কিভাবে মিশরের খেদিভ ইসমাইলের কাছ থেকে সুয়েজখালের শেয়ার কিনেছিলেন তা পূর্বেই বলা হয়েছে। এর পরের ঘটনাবলী আরব দেশের সেই উটের গল্পের মত—গৃহস্বামীর করুণা ভিক্ষা করে উট প্রথমে ঘরের মধ্যে নাক গলানোর অনুমতি নেয়, তারপর সমস্ত শরীরটি স্বভাবতই ঘরে ঢোকে এবং গৃহস্বামীকে গৃহ-হীন করে। মিশরের কাহিনী অবিকল এইরকম। সুয়েজ খালের শেয়ার কিনবার পর নানা অজুহাতে ব্রিটিশ সরকার মিশরের আর্থিক সুবন্দোবস্তের জন্য 'কমিশন' পাঠাতে শুরু করল। নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধের সময়েই ইংরেজদের পরিকল্পনা ছিল মিশরের উপর স্থায়ী আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার। সেই পরিকল্পনা এখন ধাপে ধাপে এগিয়ে চল্‌ল। খেদিভ ইসমাইলের প্রচুর দেনা, পাওনাদার হ'ল ইংরেজ ও ফরাসী মহাজন। অকর্মণ্যতার অভিযোগে খেদিভ গদীচ্যুত হলেন, তাঁর ছেলে তৌফিক হলেন রাজ-পদে অভিষিক্ত আর সেই সঙ্গে নিযুক্ত হ'ল একজন ইংরেজ অর্থনৈতিক কমিশনার। ইনি হলেন মেজর ইভ্‌লিন ব্যারিং পরে লর্ড ক্রোমার নামে খ্যাত। ২৬ বৎসর ধরে মিশরের হর্তাকর্তা ছিলেন লর্ড ক্রোমার—খেদিভ, পাশা, ফেল্লা (চাষী) সকলেই ছিল ক্রোমারের দাসানুদাস।

প্রতারণার ইতিহাস

ইতিহাসে নামতা পড়ার মত করে আমরা মুখস্থ করেছি এককালে মহামতি গ্ল্যাডস্টোন ও দয়াবতী ভিক্টোরিয়া। মিশরীদের কাছে ইতিহাস পড়লে আমরা অন্য দিকটাও জানতে পারতাম, অখ্যাত এক চাষীর ছেলে, আরবী পাশার (যাঁর মুখে প্রথম সেই বজ্র-গর্ভ সঙ্কল্প উচ্চারিত হয়েছিল "মসর-লি-মস্রিজিন" মিশর মিশরীদের জন্য) কাছ থেকে যদি আমরা ইতিবৃত্ত-কথা শুনতে পেতাম, তাহলেও মহামতি গ্ল্যাডস্টোন ও দয়াবতী ভিক্টোরিয়ার আর একটি দিক দেখতে পেতাম। মহামতি গ্ল্যাডস্টোন সম্বন্ধে অবশ্য ভিক্টোরিয়ার ইংলণ্ডেও একটা কথা চলতি ছিল—'উপরে অক্সফোর্ড, তলায় লিভারপুল' অর্থাৎ সংস্কৃতির চকচকে পালিশের নীচে ঘোর বিষয়বুদ্ধি। বৃটিশ ফৌজ মিশরে মোতায়েন হয় ১৮৮২ সনের ১৪ই সেপ্টেম্বর। মহামতি গ্ল্যাডস্টোন তখন বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী। প্রথমে মিশরের আর্থিক ব্যবস্থার উন্নতি করার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে বৃটিশ সরকার মিশরকে কিছু ঋণ দেন। অবশ্যই গ্ল্যাডস্টোনের মন্ত্রিসভার স্যার চার্লস ডিল্ক আশ্বাস দেন, 'মিশরের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার সেখানকার অধিবাসীরাই তত্ত্বাবধান করবেন।' কিন্তু এসব ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে, অল্পবুদ্ধি মিশরীরা বৃটেনের সদুদ্দেশ্য বুঝল না, ইংরেজ ও ফরাসী কূটনীতি বিশারদেরা ও সেই সঙ্গে খবরের কাগজগুলি এক সঙ্গে রব তুলল,

কতকগুলি দায়িত্বজ্ঞানহীন ধর্মোন্মাদ য়ুরোপীয়দের বিরুদ্ধে জেহাদ শুরু করেছে, মিশরের শান্তি ও শৃংখলা বিপন্ন হচ্ছে। অতএব বৃটিশ ফৌজ পাঠানোই সাব্যস্ত হল। ১৮৮২ সনের ১৬ই আগস্ট মহামতি গ্ল্যাডস্টোন পার্লামেন্টে ঘোষণা করলেন, 'মিশরীরা স্বায়ত্তশাসনে অভিজ্ঞতা লাভ করুক, এছাড়া মিশরে থাকার আমাদের আর কোন উদ্দেশ্য নাই। শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হলেই আমরা মিশরের প্রশ্ন য়ুরোপে একটা বৈঠক ডেকে আলোচনা করব। বলাই বাহুল্য, ১৮৮২ সনে গ্ল্যাডস্টোন যে বৈঠক ডাকবার আশ্বাস দিয়েছিলেন, সেটা এখন পর্যন্ত স্থগিত আছে, অথবা সে বৈঠকের কাজ এখন লণ্ডন-ওয়াশিংটনের মধ্যপ্রাচ্য সামরিক জোট বাঁধার শলা-পরামর্শে সমাপ্ত হয়েছে। মহামতি গ্ল্যাডস্টোন কথাবার্তা বলতেন সব সময়ে খুব জোর দিয়ে, অসাধারণ বাগ্মী ত বটেই। ১৮৮২ সনের ১১ই জুলাই বৃটিশ নৌবহর আলেকজান্দ্রিয়ায় গোলাবর্ষণ করে। এর প্রায় এক মাস পরে এবং বৃটিশ ফৌজ মিশর দখল করার ঠিক এক মাস পূর্বে তিনি পার্লামেন্টে ঘোষণা করেন, 'মাননীয় সদস্য জিজ্ঞাসা করেছেন, আমরা কি অনির্দিষ্ট কালের জন্য মিশর দখলে রাখতে চাই? নিঃসংশয়ে বলতে পারি, এমন কাজ আমরা করতেই পারি না, যা বৃটিশ সরকারের সমস্ত নীতির বিরোধী।' সেপ্টেম্বর (১৮৮২) মাসে মিশর বৃটিশ দখলে যায়; ডিসেম্বর মাসে মন্ত্রী জোসেফ চেম্বারলেন একটি বক্তৃতায় বলেন, 'শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হলেই আমরা ফিরে আসব।' ১৮৮৭ সনে আবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, তিন বৎসর উত্তীর্ণ হলেই মিশর থেকে বৃটিশ ফৌজ অপসারিত হবে। সেই প্রতিশ্রুতি মত ১৮৯০ সনে বৃটিশের মিশর ছাড়বার কথা ছিল। সেটা কথামাত্র, তখনও এবং এখনও এই ১৯৫২ সনে। তবু আর একবার মহামতি গ্ল্যাডস্টোনকে স্মরণ করা যাক। ১৮৯৫ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তিনি আর একদফা প্রতিশ্রুতি দেন, 'বৃটিশ সরকার সুদানে প্রয়োজনের বেশি একদিনও থাকবে না।' ভিক্টোরিয়ার যুগের বিখ্যাত কবি ও সমাজতন্ত্রী উইলিয়ম মরিস মহামতি গ্ল্যাডস্টোন চেম্বারলেনদের ঢালাও প্রতিশ্রুতির গূঢ় অর্থকে ব্যঙ্গ করে লিখেছিলেন, 'গল্প আছে যে, সেকালে এক মদের দোকানে নোটিশ টাঙ্গান ছিল—বিনা পয়সায় ভালো মদ কাল পাওয়া যায়। অবশ্যই পরমবিশ্বাসী মাতাল সোমবারে নোটিশ দেখে মঙ্গলবারে বিনা পয়সায় অমৃত চাইতে গিয়ে শুনলো কাল ত আজ নয়। মিশরেও তাই হবে।' অতঃপর ১৮৮২ সনের প্রতিশ্রুতি দুই মহাযুদ্ধের পরীক্ষা পেরিয়ে নানা প্রতারণার সুড়ঙ্গ দিয়ে ১৯৪৬ সনে মিঃ য়্যাটলীর ঘোষণায় সম্পূর্ণ নূতন রূপ পরিগ্রহ করল। এই ১৯৫২ সনে বিশ্বাস করা কঠিন যে, বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ য়্যাটলী ১৯৪৬ সনের মার্চ মাসে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, স্বেচ্ছায় ও বিনা-সর্তে মিশর থেকে বৃটিশ ফৌজ সরানো হবে। কায়রোর একজন উদ্যোগী সাংবাদিক ঐ সময় নথিপত্র ঘেঁটে একটা হিসাব তৈরি করেন। ঐ ধরণের প্রতিশ্রুতি ৬৮ বৎসরে বৃটিশ সরকার বিস্তর বার দিয়েছে। মিঃ য়্যাটলীর এই প্রতিশ্রুতির কোনও আন্তরিকতা ছিল কি না, বলা কঠিন। তবে এটা সময়োচিত উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছিল। প্রথমত, যুদ্ধের ঠিক পরেই সেই ১৯৪৫-৪৬ সনে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অবস্থা টলমল ছিল ভারতবর্ষে, ব্রহ্মদেশে এবং মালয়ে, প্যালেস্টাইনের ভবিষ্যৎ নিয়ে বৃটিশ-মার্কিন মতভেদ ছিল গুরুতর, তার উপরে পারস্যের অবস্থাও নানাভাবে সংকটজনক দেখা যাচ্ছিল। কাজেই মিশরের জাতীয় দাবী 'স্বেচ্ছায় ও বিনাসর্তে' পূরণের প্রতিশ্রুতি মিঃ য়্যাটলী মহামতি গ্ল্যাডস্টোনকে স্মরণ করেই দিয়েছিলেন হয়ত। বৃটিশ সাম্রাজ্যের ঐরকম সংকটজনক মুহূর্তে মিশরকে ঠাণ্ডা রাখা কূটনীতির কৌশল হিসাবে প্রয়োজন ছিল। এছাড়া আরও একটা কারণ সম্ভবত ছিল—অন্তত কোন কোন বৃটিশ সাংবাদিক বলেন, ১৯৪৬ সনে য়্যাটলী সরকার সত্যিই মিশর থেকে বৃটিশ ঘাটি সরিয়ে নিতে প্রস্তুত হয়েছিল। তার কারণ নাকি বৃটিশ সমর-বিশারদেরা সিদ্ধান্ত করেছিলেন, আগামী যুদ্ধে ভূমধ্যসাগরের উপকূলের ঘাটি প্রথমেই বিপন্ন হবে, অতএব মিশর থেকে বৃটিশ ঘাটি আরও পিছনে হটিয়ে কেনিয়াতে কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করাই নিরাপদ, এছাড়া বৃটিশের ভরসা ছিল, প্যালেস্টাইনের ঘাটিগুলিও হাতে থাকবে যদি মার্কিনের সঙ্গে প্যালেস্টাইন নীতির সন্তোষজনক বোঝাপড়া হয়। ১৯৪৭ সনে 'ঠাণ্ডা যুদ্ধ' শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিশর সম্বন্ধে বৃটিশ নীতির কিছু অদলবদল হয়। যখন ঘোষণা করা হয়েছিল, 'স্বেচ্ছায় ও বিনা-সর্তে' মিশর ছেড়ে আসা হবে, তখনও অবশ্য সর্ত ছিল একটা—সে হল এই যে, মিশরের 'স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা' রক্ষার জন্য ১৯৩৬ সনের সন্ধিপত্র বদলে নতুন করে ইঙ্গ-মার্কিন সন্ধি করতে হবে। ১৯৪৭ সন থেকে ঠাণ্ডা যুদ্ধ জমে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রতারণার ধরণ বদলালো, নরম সুর গরম হল, কারণ ইতিমধ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ মোটের উপর তার সংকটজনক অবস্থা

সামলে নিয়েছে, খয়রাতি ডলার ও মার্কিন পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে মিঃ য়্যাটলী-বেভিন-মরিসন 'স্বেচ্ছায় ও বিনাসর্তে' মিশর ছাড়বার প্রতিশ্রুতিটা বেমালুম চাপা দিতে পারলেন। মিঃ মরিসন ঘোষণা করলেন, মিশর যদি বৃটিশের নতুন সন্ধি-সর্ত না মেনে নেয়, তবে বৃটিশ তার অধিকারে অটল থাকবে। মিঃ বেভিন আক্ষেপ করে বললেন, জাতীয়তাবাদ বড়ো খারাপ, বড়ো অবুঝ। অতঃপর মিশরী নেতাদের বোঝানোর চেষ্টা শুরু হল, বৃটিশ মিশর ছাড়লেই ত সোভিয়েট এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে। অতএব মিশরের 'স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার' জন্য একটা পাকা বন্দোবস্ত হোক—অবশ্যই এতবার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর বৃটিশ দখল বজায় রাখাটা বড়ই খারাপ দেখাতে পারে, মিশরী জনসাধারণও সেটা সহজে বরদাস্ত করবে না। অতএব বৃটিশ ফৌজের সংগে মার্কিন, ফরাসী ইত্যাদি অতলান্তিক সঙ্ঘের ফৌজও থাকুক, তার সংগে জুড়ে দেওয়া যাক তুরস্ক এবং অন্যান্য আরব দেশের একটা সামরিক জোট। এরকম বন্দোবস্ত করলে বৃটিশকে যেতে হবে না, মিশরেরও 'মান' বাঁচবে। প্রস্তাবটি অভিনব মনে হলেও মিশরে সাম্রাজ্যবাদী প্রতারণার ইতিহাসে এটা আদৌ নতুন নয়। ১৮৮৭ সনে একটি প্রস্তাব হয়েছিল, পশ্চিমী শক্তিদের অধীনে সুইডিশ, বেলজিয়ান অথবা সুইস বাহিনী মিশর ও সুদানে শান্তি ও শৃংখলা রক্ষার জন্য মোতায়েন করা হোক। তফাৎ শুধু এই, এখন কোন শান্তি ও শৃংখলার অজুহাত দেওয়া হচ্ছে না, মিশরের 'স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার' জন্যই বিদেশী ফৌজের খবরদারী প্রয়োজন বলা হচ্ছে। মিশরের জাতীয়তাবাদী জনসাধারণ কিন্তু এই ছলনায় প্রতারিত হচ্ছে না। তারা ভালমতই জানে, ১৮৮২ সন থেকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্য মিশরের স্বাধীনতা মাত্র হরণ করে নি, মিশরী জনসাধারণের ভয়াবহ দুর্গতির কারণও হল এই সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণ-ব্যবস্থা। মিশরের 'স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার' জন্য বৃটিশের দুশ্চিন্তা নতুন নয়। আরবী পাশার বিদ্রোহের সময় থেকে ১৯১৯ সনে জগলুল পাশার নেতৃত্বে ব্যাপক গণ-আন্দোলন, ১৯২৪ এবং ১৯৩০-এর গণ-বিক্ষোভ, ১৯৪৫ থেকে ১৯৫২ সন পর্যন্ত তীব্র বৃটিশবিরোধী আন্দোলন এবং সঙ্ঘর্ষ সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, মিশরী জনসাধারণ কোনও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের অভিভাবকত্বে থাকতে প্রস্তুত নয়। ১৯৩৬ সনে যখন নতুন ইংগ-মিশরীয় সন্ধিপত্র তৈরি হয়, তখন মিশরের প্রধান জাতয়ীতাবাদী 'ওয়াফদ' দল সুয়েজ খাল এলাকায় বৃটিশ ফৌজ রাখার সর্ত মেনে নিতে বাধ্য হয়। তখনও বৃটিশের যুক্তি ছিল, মুসোলিনীর আবিসিনিয়া বিজয় এবং য়ুরোপে নাৎসীদের অগ্রগতির ফলে মিশরের নিরাপত্তা বিপন্ন হচ্ছে, সেইজন্যই মিশরে বৃটিশ ঘাটি রাখা দরকার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরও সেই যুক্তিই মিশরীদের ঘাড়ে চাপানো হচ্ছে, কেবল মুসোলিনী ও হিটলারের স্থানে বলা হচ্ছে স্টালিন অর্থাৎ এখন মিশরের 'স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা' বিপন্ন সোভিয়েট রাশিয়ার জন্য। কাজেই কেবল বৃটিশ ফৌজ নয়, গোটা অতলান্তিক সঙ্ঘ এবং আরব গোষ্ঠীর ফৌজ মিলে মিশরে এবং মধ্যপ্রাচ্যে খবরদারী করা দরকার।

এই যুক্তির পিছনে যদি গত ৭০ বৎসর ধরে সাম্রাজ্যবাদী প্রতারণা, পীড়ন ও শোষণের ইতিহাস না থাকত, তাহলে হয়ত মিশরী জনসাধারণ দরদী বৃটিশ বন্ধুদের পরামর্শ বিশ্বাস করতে পারত। কিন্তু যারা ৭০ বৎসর প্রতিশ্রুতি ভংগ করেছে, মিশরের ঘাড় থেকে নামে নি, ষড়যন্ত্র ও শোষণের কলংকময় কাহিনী রচনা করেছে, তাদের মুখে সাম্রাজ্যবাদী দখলের নতুন ভাষ্য শুনলে লোকে বিশ্বাস করবে কেন? বিলাতী আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান 'রয়েল ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল য়্যাফেয়ার্স' প্রকাশিত 'মধ্যপ্রাচ্য বিবরণ' (১৯৫০) গ্রন্থে লিখল, মিশরীদের সর্বক্ষণ দুশ্চিন্তার কারণ হল এই সামরিক ঘাটিগুলি, তারা মনে করে এই ঘাটিগুলি বেড়েই চলেছে, কমছে না এবং কোনদিনই দেশ থেকে যাবে না। ১৯৩৬ সনের ইংগ-মিশরী চুক্তি অনুসারে বৃটিশ ফৌজ কায়রো এবং আলেকজান্দ্রিয়া থেকে ঘাটি সরিয়ে নিয়েছিল বটে, কিন্তু এইটুকু দয়ার জন্য মিশরী জনসাধারণের কাছ থেকে চড়া মাশুলও আদায় করেছিল। সুয়েজ খাল এলাকায় বৃটিশ ফৌজের ঘাটি তৈরি করবার খরচা দেবে কে? অবশ্যই মিশর সরকার। বৃটিশ ফৌজের ব্যারাক, বিমানঘাটি ইত্যাদি গড়বার খরচ আদায় করা হল মিশরের কাছ থেকে; উপরন্তু সর্ত এই রইল, মিশরের বন্দর, বিমানঘাটি ও অন্যান্য যাতায়াত-ব্যবস্থা ব্যবহারের পূর্ণ অধিকার থাকবে বৃটিশের। ১৯৫০ সনের জানুয়ারী মাসে মিশরে সাধারণ নির্বাচন হল; জাতীয়তাবাদী ওয়াফদ দল বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল মিশরী পার্লামেণ্টে। ওয়াফদ দল নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তারা বৃটিশ ফৌজের অপসারণ দাবী করবে, মিশর ও সুদানের মিলন প্রতিষ্ঠা করবে এবং দেশে গণতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তন করবে। ওয়াফদ নেতৃত্বের দুর্বলতা অবশ্য বৃটিশেরও জানা ছিল। বৃটিশ মুখপাত্রেরা মনে করিয়ে দিতে ছাড়লেন না, ১৯৩৬ সনের ইংগ-মিশরী সন্ধিপত্র সই করেছিলেন ওয়াফদ নেতা নাহাশ পাশা। যাহোক মিশরের জাতীয় দাবী নিয়ে আর এক দফা কূটনীতির জুয়া খেলা শুরু হল। নাহাশ পাশা বৃটিশের সংগে আলাপ-

আলোচনা শুরু করলেন। মার্কিন সমর্থন পাওয়ার আশায় নাহাশ এবং তাঁর পররাষ্ট্র মন্ত্রী সেরাগ-এল-দীন ভরসা দিতে থাকলেন, আগামী যুদ্ধে মিশর ঠিক দলেই থাকবে। জুন (১৯৫০) মাসে বৃটিশ সেনাপতি-মণ্ডলীর প্রধান, ফিল্ড মার্শাল শিলম মিশরে এলেন; নাহাশ পাশা শিলমকে জানালেন, সোভিয়েটের সঙ্গে যুদ্ধ বাধলে মিশর ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠীর সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করবে, তবে বর্তমান অবস্থায় যতক্ষণ বৃটিশ ফৌজ মিশরে আছে, ততক্ষণ মিশরী জনসাধারণ কিছুতেই 'রুশ আক্রমণ ও দখলের' বিপদটা বুঝতে চাইবে না। ফিল্ড মার্শাল শিলম ও বৃটিশ রাজদূতের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পূর্ণ বিবরণ দিয়ে ওয়াফদ সরকার একখানি দলিল প্রকাশ করেন। বৃটিশ যুদ্ধবিশারদ এবং মিশরী রাজনীতিকদের মনোভাব এই দলিলে খুব পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। বৃটিশ যুদ্ধ-বিশারদেরা বোঝাতে চেয়েছেন, বৃটিশ ফৌজ চলে গেলে মিশরেরই বিপদ বেশি। ওয়াফদ মন্ত্রীরা সেটা হাঁ-না করে মেনে নিয়ে আপত্তি জানাচ্ছেন, বৃটিশ ফৌজ অপসারিত না হলে জনসাধারণকে ঠাণ্ডা রাখা কঠিন হবে। সালা-এদ্দিন বে বৃটিশ রাজদূতকে বলছেন, 'লোকে বৃটিশ জবরদখলটা চোখে দেখে; অন্য বিপদটা সম্ভাবনা মাত্র। তাদের বোঝানো যাবে না যে, আক্রমণের বিপদ ঠেকানোর জন্য বৃটিশ দখল থাকা দরকার।' বৃটিশ রাজদূত চ্যাপম্যান এ্যাণ্ড্রুস জিজ্ঞাসা করছেন, 'লোকে এটা কি বোঝে না, রুশ দখলের বিপদ বৃটিশ দখলের চেয়েও মারাত্মক!' সালা-এদ্দিন বে কাতরভাবে জানাচ্ছেন, 'একথা লোককে বোঝানো খুবই শক্ত। নাহাশ পাশার বিরাট ব্যক্তিত্ব আছে বটে, তবু তিনিও একজন বিদেশী সৈন্যও মিশরে থাকার প্রস্তাবে জনসাধারণকে রাজি করাতে পারবেন না।' যাহোক শেষ পর্যন্ত মিশরী জনসাধারণের চাপে অক্টোবর (১৯৫১) মাসে ১৯৩৬ সনের ইঙ্গ-মিশরী সন্ধি বাতিল করতে বাধ্য হলেন ওয়াফদ সরকার। ঐ সঙ্গে সুদানে বৃটিশ অধিকারও (১৮৯৯ সনের চুক্তিবলে) আর স্বীকার করা হবে না, ওয়াফদ সরকার ঘোষণা করলেন। এর পর ইঙ্গ-মিশরী বিরোধ বিরাট গণ-বিক্ষোভের রূপ নিতে থাকল। সে কাহিনী বলা যাবে মিশরী জাতীয় আন্দোলনের বর্ণনা প্রসঙ্গে। বর্তমান অনুচ্ছেদে মিশরে বৃটিশ প্রতারণা, জবরদস্তি ও ষড়যন্ত্রের কাহিনী মাত্র বর্ণনা করা হচ্ছে। ইঙ্গ-মিশরী চুক্তি বাতিল হওয়ার ফলে সুয়েজ খাল এলাকায় বৃটিশ ফৌজ রাখা বেআইনী জবরদস্তি হয়ে দাঁড়াল। এরকম জবরদস্তি অবশ্য মিশরের ৭০ বৎসরের ইতিহাসে নতুন কিছু নয়। ওয়াফদ সরকার ইঙ্গ-মিশরী সন্ধি বাতিল করে হাত গুটিয়ে বসেছিলেন। তাঁরা বৃটেনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে সাহস করলেন না। অথচ ওদিকে সুয়েজ খাল এলাকায় দলে দলে নতুন বৃটিশ ফৌজ আমদানী হতে থাকল; তারা মিশরী-দের সঙ্গে ছোটখাট সংঘর্ষ শুরু করে দিল। এর পর মিশরের রাজনীতিতে পর্দার আড়ালে শুরু হলো সনাতন কায়দায় ষড়যন্ত্র। ১৯৫২ সনের জানুয়ারী থেকে ২৩শে জুলাই জেনারেল নাগুইবের ফৌজী অভ্যুত্থান পর্যন্ত পর পর যেসব নাটকীয় ঘটনা ঘটল, তার রহস্য এখনও সম্পূর্ণ জানবার সময় আসে নি। একটিমাত্র সূত্র এই সব ঘটনার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। ওয়াফদ নেতৃত্ব দুর্বল ও দ্বিধাগ্রস্ত হলেও জন-সাধারণের বিদেশীবিরোধী জাতীয় সংকল্প ওয়াফদ নেতারা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁরা বৃটিশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অগ্রসর হতে সাহস পাচ্ছিলেন না, আবার জনসাধারণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে বৃটিশের দাবী মানতেও রাজী হতে পারছিলেন না। অথচ জনসাধারণের বিক্ষোভও প্রতিরোধের সংকল্প ক্রমেই তীব্র হচ্ছিল। এই অবস্থায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা খোলাখুলিভাবেই বলা শুরু করেছিল, ওয়াফদকে ক্ষমতাচ্যুত করতে হবে, জন-সাধারণকে সায়েস্তা করতে পারে, এরকম কড়া শাসন মিশরে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ১৮৮২ সন থেকে এ পর্যন্ত যখনই মিশরে জাতীয়তাবাদী গণ-আন্দোলন প্রবল হয়েছে, তখনই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা এই রকম জবরদস্ত শাসন মিশরে চালু করেছে। জেনারেল নাগুইবের ফৌজী অভ্যুত্থান ও ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যতই চটকদার বর্ণনা দেওয়া হোক না কেন, মিশরী রাজনীতির ইতিহাস এর একটি-মাত্রই অর্থ আছে—সে হল সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে জাতীয় আন্দোলন দমন। ১৯৪৯ সন থেকে ১৯৫১ সন পর্যন্ত বিলাতী পত্রিকাগুলির পাতা উল্টালেই দেখা যাবে, তারা সোজাসুজি বলেছে, মিশরের 'নিরাপত্তা' রক্ষার একমাত্র উপায় হল ওয়াফদ দলকে তাড়ানো এবং সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠা। এ বিষয়ে একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হবে। জন কিম্‌স্ নামে একজন ইংরেজ সাংবাদিক ১৯৪৮-৪৯ মিশরের পরিস্থিতি দেখে এসে 'নিউ স্টেটসম্যান য়্যাণ্ড নেশন' পত্রিকায় লেখেন, ব্রিটিশকে হয় মিশর ছাড়তে হবে, নয়ত চিরাচরিত পদ্ধতিতে জাতীয় আন্দোলন দমন করার জন্য বৃটিশের পুরানো বন্ধুদের শরণ নিতে হবে। কিম্‌স্ মন্তব্য করে-ছিলেন বেশ একটু শ্লেষের সঙ্গেই, 'এখন আর একটিমাত্র উপায় আছে। ক্ষমতা ফৌজী নায়কদের হাতে নিতে হবে, যেমন হয়েছিল ১৮৮২, ১৯১৪, ১৯২৪, ১৯৩৯ এবং ১৯৪২ সনে।' কিম্‌স্ এই অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করেছিলেন, ১৯৪৯ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে। ১৯৫২ সনের জুলাই মাসে জেনারেল নাগুইবের অভ্যুত্থান ও ক্ষমতা দখল অপ্রত্যাশিত নয়। মিশরে সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের ইতিহাসে নতুন নয়, এটা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। কাজেই ১৯৫২ সনের জানুয়ারী থেকে জুলাই পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র, কূটকৌশল ও প্রতারণার কাহিনী কিছু বিস্তারিত-ভাবেই আলোচনা করা হবে।

(ক্রমশ)

(৫)

সকাল বেলা ব্রজরাখালের ডাকেই ঘুম ভাঙল। কিন্তু ব্রজরাখাল ততক্ষণে স্নান করে তৈরী। বললে—ওঠো হে বড়কুটুম—এত দেরি করলে চলবে না, এখানে ঘড়ি ধরে সব কাজ হয়—এ কলকাতা—তোমার গিয়ে ফতেপুর নয়—

কত রাত্রে যে ব্রজরাখাল শুলো, কখন ঘুমোল আর কখনই বা উঠলো কে জানে।

ভূতনাথ উঠে দেখলে ব্রজরাখাল ততক্ষণে রান্না ঘরে গিয়ে রান্নায় ব্যস্ত। সকাল বেলা বাড়িটার চারদিকে চেয়ে দেখলে এক পলক। দক্ষিণ দিকে জানালা দিয়ে দেখা যায় মস্ত বড় বাগান। মাঝখানে একটা পুকুর।

ব্রজরাখাল এল হঠাৎ। বললে—এটা খেয়ে নাও দিকিনি বড়কুটুম—

এক কাঁসি ফ্যানে-ভাত। ব্রজরাখাল বললে—খেয়ে দেখ খাঁটি ঘি দিয়েছি—তোমাদের ফতেপুরের ঘিয়ের চেয়ে ভালো—

ব্রজরাখালের ব্যবহারে ভূতনাথ অবাক হয়ে গেল। কোথাকার কে নন্দ জ্যাঠা—তার মেয়ে রাধা—সেও তো আর বেঁচে নেই—কী-ই বা সম্পর্ক—অথচ এমন করে আপন করে নিতে পারে পরকে!

ভূতনাথ বললে—তুমি খাবে না?

—আমার ভাত ওদিকে তৈরি—এখনি ন'টার ঘণ্টা পড়বে—আমিও অফিসে বেরুব—আমার কথা বোল না—হাঁটিতে হাঁটিতে অফিসে দশটার মধ্যে পৌঁছে যাব ঠিক—তারপর ফিরতে যার নাম সেই—

খানিক পরেই খাওয়া দাওয়া সেরে তৈরী হয়ে পড়ল ব্রজরাখাল। সেই ধুতির কোঁচাটা কোমরে গুঁজে আলপাকার কোটটা চড়ালে গায়ে। তারপর যাবার আগে বললে—এইটে রাখো তো বড়কুটুম—এই পুরিয়াটা—

—কী এটা—ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে।

—হোমিওপ্যাথিক ওষুধের পুরিয়া যদি কেউ এসে ওষুধ চায়—বলে—মাস্টারবাবু কোনও ওষুধ রেখে গেছে—তো দেবে এইটে—আমি বলেছি কিনা বংশীকে, যে আমার সম্বন্ধীর কাছে রেখে যাব—

ভূতনাথের বিস্মিত দৃষ্টির দিকে চেয়ে ব্রজরাখাল হো হো করে হেসে উঠলো। বললে—চেয়ে দেখছ কি—ডাক্তারিও জানি হে—তোমার বোনকেই শুধু যা বাঁচাতে পারলাম না—আমার রুগীদের মধ্যে ওই একজনই যা মরে গেছে—নইলে এ পাড়ায় আমার খুব নাম-ডাক হে—

বলে হন্ হন্ করে বেরিয়ে গেল। আবার ফিরে এল খানিক পরে।

বললে—একটা কথা বলতে ভুলে গেছি—যদি রাস্তায় বেরোও তো বেশি দূরে যেও না—নতুন মানুষ হারিয়ে যাবে—আর ভেবো না। তোমার চাকরিরও একটা চেষ্টা করছি—তবে বাজার বড় খারাপ কি না—

ব্রজরাখাল চলে গেল। এ যেন একেবারে অন্য মানুষ। কখন সে ভাত রাঁধলে নিজের হাতে, কখন খেলে—আবার অফিসেও চলে গেল—নটার ঘণ্টা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে। কাজের মানুষ বটে! ঘর ছেড়ে আর একবার বাইরে এসে দাঁড়াল ভূতনাথ। কত বড় বাড়ি। এখানে দাঁড়ালে বাড়ির বাইরে আর কিছু দেখা যায় না। বড় বাড়িটার ভেতরে যে কোনও মানুষ বাস করে বাইরে থেকে তা বোঝবার উপায় নেই। শুধু বাইরেই যা তোড়-জোড়—নড়া-চড়া—হাঁক-ডাক। চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতেই বেলা বেড়ে গেল। আস্তে আস্তে রান্না বাড়ির দিকে গেল। পাশেই সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি দিয়ে নেবে স্নান করবার জায়গা। নতুন জলে স্নান করা উচিত নয়। মুখ হাত পা ধুয়ে ওপরে রান্নাঘরে ঢুকলো। খাবার ঢেকে রেখেছে ব্রজরাখাল। এক হাতে অনেক রান্না করেছে বটে। ডাল, ঝোল ভাত।

সবে থালা বাটি গেলাস সাজিয়ে বসেছে খেতে—এমন সময় দরজার পাশে কে যেন উঁকি দিলে।

—কে?

ভূতনাথ দরজার দিকে মুখ করে জিজ্ঞেস করলে। লোকটা কিন্তু সামনে এল না। আড়াল থেকে বললে—আপনি খান্ আজ্ঞে—আমি আসবো খন পরে—

লোকটা সত্যি সত্যিই পরে এল। ভূতনাথ ততক্ষণে খাওয়া-দাওয়া সেরে বাসন কোসন মেজে রান্না-ঘর ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে ফেলেছে।

এসে বললে—আপনি মাস্টার বাবুর শালা—

রোগা ক্ষয়া-ক্ষয়া চেহারা। তেল-চকচকে তেড়ি কাটা মাথা। আধ-ময়লা ধুতিটা কোঁচা করে কোমরে গোঁজা। বললে—আমি বংশী—

ভূতনাথ ওষুধের পুরিয়াটা দিয়ে জিজ্ঞেস করলে—অসুখ কা'র—

—আজ্ঞে চিন্তার—

—চিন্তা কে?

—ছোট মা'র ঝি—

—কী অসুখ?

—ম্যালেরিয়া—ডাক্তারবাবু তো বলেন ম্যালেরিয়া—দেশে গিয়ে অসুক বাধিয়ে এনেছে—আমার বোন হয় সে, এই ছোট বেলা থেকে কলকাতায় আছেন কিনা, দেশে-গাঁয়ের জল আর সাহ্য হয় না পেটে—আমার বিয়েতে সেবার গেল দেশে, বললুম—অত করে পুকুর ঘাটে জল ঘাঁটিসনে চিন্তা—তা কি শুনবে—ছোটমার আদর পেয়ে পেয়ে কথার বড় অবাধ্য হয়ে উঠেছে আজ্ঞে—এখন আমার ভোগান্তি—ছোট মা'র ভোগান্তি—মাস্টারবাবুর ভোগান্তি—এখন এক গেলাস জল খেতে গেলে ছোট মা'কে নিজে গড়িয়ে খেতে হয়—

তারপর চলে যেতে গিয়ে থামল বংশী—ছোট মা বলে বটে যে বংশী তোর নিজের মায়ের পেটের বোন, তুই বউ বাজারের শশী ডাক্তারকে দেখা—আমি বলি—থাক। মাস্টারবাবু কি ছোট ডাক্তার—বড় বাড়ির

সমস্ত লোক ভালো হয়ে যাচ্ছে ওর ওষ্ধ খেয়ে—তা' আজ্ঞে ছোট মা'র দেখুন 'কি জ্বালা, এই সাবু আন্, মিছরি আন্—ফল-ফলুরী আন্—হ্যান্ আন্ ত্যান আন্—তা খরচার বেলায় তো সেই ছোট মা—

বংশী গলা নিচু করলো এবার।

বললে—এ বাড়ির সবার যে আজ্ঞে হিংসে আমাদের দু'জনের ওপর—কেউ তো ভালো চোকে দেখে না কি না—

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—কীসের হিংসে—হিংসে কেন—

—ওই যে মধুসূদনকে দেখছেন—

—কে মধুসূদন? ভূতনাথ মধুসূদন কেন কাউকেই এখনও দেখেনি।

বংশী বললে—তোষাখানায় একদিন যাবেন—ওই মধুসূদনই তোষাখানার সর্দার কিনা—আমাদের পাশের গাঁয়ে বাড়ি হুজুর—বললে বিশ্বেস করবেন না, আমার আপন পিসীর সম্পক্কে ভাসুর হয় আজ্ঞে—আর তার এই কাণ্ড—বুঝুন—

—কী কাণ্ড—

—সে অনেক কথা হুজুর—অনেক কথা—বলে বসলো বংশী। ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে গলা আরো নিচু করলো। বংশীর অনেক অভিযোগ। এত বড় বাড়ি—কত পুরুষ আগে থেকে বংশ-পরম্পরায় কত দাস-দাসী, কত লোকজন আসা-যাওয়া করেছে। কত বংশের ভরণ-পোষণ জীবিকা নির্বাহ নির্ভর করেছে এই চৌধুরী পরিবারের দান-ধ্যান ধর্মানুষ্ঠানের সূত্রে। গ্রাম-কে-গ্রাম ঝেঁটিয়ে এসেছে চাকরির চেষ্টায় এখানে। উঠেছে এসে এই চৌধুরী বাড়িতে। ওই মধুসূদন এখন তোষাখানার সর্দার। ওর কোন পূর্ব পুরুষ কবে কী সূত্রে এসে আশ্রয় পেয়েছিল কর্তাদের আমলে। তারপর সংসারের আয়তন বেড়েছে, আয়োজন বেড়েছে, আয় বেড়েছে, ধনে জনে প্রতিষ্ঠায় প্রতিপত্তিতে চৌধুরী বংশের প্রসার বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছিয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয়, স্বজন, পরিজন, বন্ধু বান্ধব, পরিষদ, মোসাহেব, দাস দাসী—তাদের প্রয়োজনও বৃদ্ধি পেয়েছে। কোন্ সুদূর বালেশ্বর, কটক বারিপাদা জেলা থেকে মধুসূদনের পূর্ব পুরুষের আত্মীয় পরিজন-গ্রামবাসীরা এসে জুটেছিল এখানে। এসে ভার নিয়েছে এক একটা কাজের। ভিস্তিখানা, তোষাখানা, রান্নাবাড়ি, কাছারি-বাড়ি, বৈঠকখানা সেরেস্তা অলঙ্কৃত করেছে। পুজোয়, পার্বনে, উৎসবে, আনন্দে যোগ দিয়েছে পরিবারের একজনের মত। দেশে গিয়েছে, বিবাহ করেছে—আবার ফিরেও এসেছে, দেশে টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে মাসে মাসে। এ সংসারে তাদের প্রয়োজন যেমন অপরিহার্য, এ সংসারও তেমনি তাদের জীবিকার পক্ষে অনিবার্য। এ পরিবারের কেউ-ই পর নয়। সাধারণ দোল-দুর্গোৎসবে তারা নতুন কাপড় পেয়েছে, পার্বণী পেয়েছে। শুধু তারা কেন, একটা কুকুর-বেড়ালেরও ন্যায্য অধিকার আছে এ বাড়ির ওপর। এখানে কেউ অনাত্মীয় নয়—সবাই আপন—সবাই অনস্বীকার্য!

কিন্তু সেদিন বদলে গেছে।

বংশী গলা নিচু করে বলে—কিন্তু সেদিন বদলে গেছে হুজুর—এখন এক-একজন চাকরি পাবে আর মধুসূদনকে পাঁচ টাটা করে বাবু দিতে হবে—আর চাকরি যতদিন না হবে, ততদিন বছরে তাদের কাছে এক টাকা করে বাবু আদায় করবে—এই যে আমার বিয়ে হলো না—ওকে দিতে হলো ওর দস্তুরী—বিয়ের দস্তুরী আজ্ঞে দশ টাকা—এই ধরুন যদি আমার সঙ্গে যদুর মা'র ঝগড়া হয় আর ও যদি মিটিয়ে দেয়—ওর আদায় হবে চার আনা, আমি দেব দু' আনা, আর যদুর মা দেবে দু' আনা—আমার যদি ছেলে হয় আজ্ঞে তো ওকে দিতে হবে সোয়া শ' পান আর পৌনে পাঁচ গণ্ডা সুপুরী—এই হলো নেয়ম—তা এত বড় পিশেচ আজ্ঞে ওই মধুসূদন—আমার যদ্দিন চাকরি হয়নি—তদ্দিন এক টাকা করে আমার মাইনে হবার পর থেকে কেটে নিয়েছে—

বংশী বললে—মাস্টারবাবুর কাছে শুনেছি আপনি এখানে থাকবেন এখন—চাকরি করবেন এখানে—অনেক সব দুঃখের কথা বলবো আপনাকে—আমি পুরুষ মানুষ, আমার জন্যে ভাবিনে আজ্ঞে—নিজে গতরে খেটে দেনা-পত্তর শোধ করে দেব একদিন—কিন্তু ওই চিন্তার জন্যেই তো ভাবনা,—

ভূতনাথ বললে—কেন—

—আজ্ঞে গরীবের ঘরে জন্মেছে, না খাটলে চলবে কেন, কে তোকে বসে বসে খাওয়াবে—সোয়ামী থাকলে সেও খাটিয়ে নিত, শুধু শুধু শুধু খেতে দিত না, তা' সোয়ামীকে খেয়েছে, এখন ছোট মা-ই তো ভরসা—তা' ছোট মা-ই বা ক'দিক দেখবে—

ভূতনাথ বললে—তোমার ছোট মা বুঝি চিন্তাকে খুব ভালবাসেন—

—ভালবাসলে হবে কি শালাবাবু, তার যে নিজেরই শতেক জ্বালা—

—কিসের জ্বালা—

—সে সব অনেক কথা, পরে বলবো আপনাকে—তা' ছোট মা ভালবাসে বলেই তো মধুসূদন দেখতে পারে না আমাদের—শুধু মধুসূদন কেন, মধুসূদনের দলের কেউ দেখতে পারে না, ও গিরিই বলুন, সিন্ধুই বলুন, সদুই বলুন, রাঙাঠামকাই বলুন—কেউ না, এমন কি বেণীও নয়—

—বেণী কে? ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে।

—আজ্ঞে বেণী হলো মেজবাবুর চাকর—
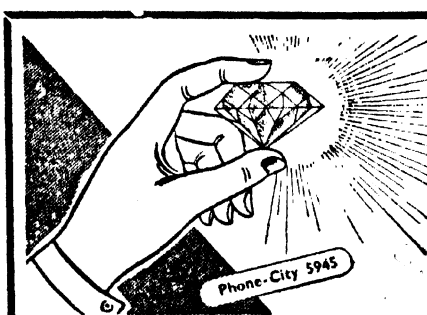
অথচ দেখুন সবাই এক জেলার লোক আমরা—বেণী তো আমার গাঁয়ের লোকই বটে—

আশ্চর্য। ভুতনাথও আশ্চর্য হয়ে গেল।

—রাঙাঠাকুমাকে আপনি দেখেন নি আজ্ঞে—

—কে রাঙাঠাকুমা?

—ভাঁড়ারে থাকে, ভাঁড়ার দেখে শোনে, ওই মধুসূদনের সম্পর্কে রাঙাঠাকমা হয় বলে—এ-বাড়ির আমরাও সবাই রাঙাঠাকমা বলি—তা' সেই রাঙাঠাকমাকে গিয়ে কাল বললাম আজ্ঞে—পো'টাক সাবু দাও আর মিছরি আধপো—। শুয়ে নানান কথা—কে খাবে, কেন খাবে, হ্যান্ ত্যান্—আমি বললাম—ছোট মা'র হুকুম—। তখন বলে—ছোট বৌমা নিজের ঝিকে দিয়ে বলে পাঠালে না—তোকে দিয়ে কেন বললে রে বংশী। আমি বললাম—চিন্তার যে অসুখ, সে কি নড়তে পারে—। তখন বললে—ছোট বউমাকে গিয়ে বলগে—একটা চিরকুট লিখে দিক—

আমি গিয়ে বললাম সব ছোট মাকে—। ছোট মা বললে—কাজ নেই বংশী—পয়সা নিয়ে দোকান থেকে কিনে আনগে—ঝঞ্জাট চুকে যাক—বলে টাকা দিলে আমাকে—

—অথচ দেখুন আজ্ঞে—

বংশী আবার বলতে লাগলো—

—অথচ দেখুন, এই যে গিরি, মেজমার পেয়ারের ঝি; তার একাদশীতে ফল পূর্ণিমেতে পাকা ফলার—সব জোগান দেবে রাঙাঠাকমা—ছোট মা ভালো মানুষ, তা সংসারে ভালো মানুষ হওয়াও খারাপ শালাবাবু—

বংশীর কথার হয়ত শেষ নেই। কিন্তু যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও এবার উঠলো সে।

বললে—যাই আবার—ছোটবাবু হয়ত ঘুম থেকে উঠবে এখনি—উঠে যদি ওপরে যায় তো মুশকিল—

ভুতনাথ অবাক হয়ে গেল। বললে—এখন? এই বারোটার সময়?

বংশী বললে—তা' ছোটবাবুর এক-একদিন ঘুম থেকে উঠতে দুপুর দু'টোও বেজে যায়—তারপর তখন উঠে ভাত খাবেন সেই বিকেল পাঁচটায়—

তারপর হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে বললে—যাই আমি, অনেকক্ষণ বসলাম, আজকে বিকেল বেলা আবার বার-বাড়িতে রাক্ষস দেখতে যাব—যাবেন নাকি দেখতে? ডাকবো খন আপনাকে—

—রাক্ষস? ভুতনাথ যেন ভুল শুনেছে!

—আজ্ঞে হ্যাঁ, নর-রাক্ষস আর কি—একটা জ্যান্ত পাঁঠা খাবে—। কালকে সরকারবাবু নিজে হাতীবাগানের বাজার থেকে কিনে এনেছে—ওই যে দেখুন না, জানলা দিয়ে—পুকুরের পাড়ে খোঁটায় বাঁধা রয়েছে, চরে চরে ঘাস খাচ্ছে—তা' কচি বেশ, এখনও শিং গজায় নি—কালো রং—

ভুতনাথের বিস্ময় বিস্ফারিত চোখের দিকে চেয়ে বংশী বললে—এ আপনার গিয়ে সব মেজকর্ত্তার সখ, ভারি সৌখীন মানুষ আপনার এই মেজকর্ত্তা—সেদিন সুখচর থেকে একজন লোক এসে বাজি রেখে দশ সের রসগোল্লা খেয়ে গেল—বাজি ছিল খেতে পারলে মেজকর্ত্তা নগদ পাঁচ টাকা দেবে—ভৈরববাবুও খেতে বসেছিল—তিন সের খেয়েই হেঁচকি তুলতে লাগলো—তা সে নগদ পাঁচটা টাকাও নিলে, দশসের রস-গোল্লাও খেলে, আবার মেজকর্ত্তা খুশী হয়ে একটা গরদের উড়ুনি দিলেন তাকে—

একলা ঘরে ঘুরে ঘুরে ভুতনাথের সময় আর কাটে না। একবার মনে হলো—রাস্তায় বেরোয়। কিন্তু অচেনা জায়গা কোথায় গিয়ে শেষে চিনে চিনে বাড়ি ফিরতে পারবে না। আসুক ব্রজরাখাল। প্রথম দিন তার সঙ্গে বেরুতে হবে।

জানালা দিয়ে আবার চেয়ে দেখলে দক্ষিণ দিকে। পুকুরের পাড়ে বাঁধা রয়েছে ছাগলটা। আপন মনে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘাস খেয়ে চলেছে। বাগানে একজন মালী গাছের গোড়াগুলো খুঁজে দিচ্ছে। কেশের মেথরপাড়ার ছেলেমেয়েরা খেলা করছে রাস্তার ওপর। আর তারপর বুঝি ধোপাদের ঘর। দড়িতে সার সার অসংখ্য শাড়ি কাপড় জামা শুকোচ্ছে।

ঘরের দেয়ালের তাকে হঠাৎ ভুতনাথের নজর পড়ল—পুরোন কাগজপত্রের জঞ্জালের মধ্যে ঢাকা পড়ে আছে এক জোড়া বাঁয়া তবলা। কা'র জিনিস কে জানে। ব্রজ-রাখালের এ দিকেও সখ আছে নাকি! সর্বাঙ্গে ধুলো মাথা। বোধ হয় বহুদিন কেউ হাত দেয়নি। মনে পড়ল ভুতনাথের—সেই ফতেপুরের বারোয়ারীতলার যাত্রা দলের কথা। একদিন এই নিয়ে কত মাথাই না ঘামিয়েছে। সাত মাত্রার যৎ, আবার আট মাত্রার যৎ! বিলম্বিত লয়ের কাওয়ালী আর একতালা। দুন, চৌদুন, তেহাই। রসিক মাস্টার বলেছিল—ডুগি তবলায় খাসা হাত তো ছোকরার—

কেমন যেন ইচ্ছে হলো ভুতনাথের তবলা বাজাতে। কিন্তু ভয় হলো যদি কেউ আপত্তি করে। কোথায় পরের বাড়িতে থাকা। ব্রজরাখালের নিজের বাড়ি তো

আর নয়। তবলাটায় হাত বুলিয়ে সামনের তর্জনীটা দিয়ে দুই একটা টোকা মেরে আবার রেখে দিলে। ঘাটগুলো বাঁধা নেই। কেমন যেন মরা আওয়াজ বেরুলো।

সামনের রাস্তা দিয়ে ফেরিওয়ালার ডাক কানে আসে—বাসন চাই—বাসন—

কাঁসি ঘণ্টা বাজিয়ে কাঁসার বাসন বেচতে চলেছে। সামনের আস্তাবল বাড়ির কার্নিসের ওপর একটা চিল চুপ করে বসে ছিল, এবার হঠাৎ অকারণে চিঃ হিঃ ইঃ শব্দ করে তীর বেগে উড়ে পালাল। আর একজন ফেরিওয়ালা কী একটা অদ্ভুত চিৎকার করতে করতে চলেছে। প্রথমটা কিছু বোঝা যায় না। অনেকক্ষণ শোনার পর বোঝা গেল। বলছে—কুয়ো—রা—ঘ—টি তো-লা-আ—আ—

ভুতনাথের আজো মনে আছে সে কলকাতার সেই প্রথম দিনের দুপুরটা যেমন রোমাঞ্চময় লেগেছিল, জীবনে আর কোনও-দিন তেমন লাগেনি। সেই তার স্বপ্নে দেখা কলকাতার সঙ্গে চোখের সামনের কলকাতাকে মিলিয়ে নিতে চেষ্টা করেছিল সে। শুধু বাড়ি—আর বাড়ি। এত বড় বাড়ি। মল্লিকদের তারাপদর দেখা কলকাতার সঙ্গে কি তা মিলেছে? পিসীমা যদি বেঁচে থাকত তো ভয়ে হয়ত তার ঘুমই হতো না। তার ভুতনাথ এত বড় কলকাতায় কোথায় হয়ত হারিয়ে যাবে, হয়ত গাড়ি চাপা পড়বে—সেই ভয়।

বিকেল হতে তো অনেক দেরি আছে। ভুতনাথ ঘরের দরজায় তালা লাগিয়ে আস্তে আস্তে রাস্তায় বেরুল।

ব্রিজ সিং বন্দুক দিয়ে পাহারা দিচ্ছিল গেট-এ'। কিছু বললে না।

খোয়ার রাস্তা। এবড়ো খেবড়ো। বনমালী সরকার লেন-এ তখন পিচ বাঁধানো হয়নি। দুপুরের নির্জন রাস্তা। রাস্তা পেরিয়ে মোড়ের মাথায় আসতেই মনে পড়লো সেই নরহরির কথা। বুড়ো অশথ গাছটার তলায় চেয়ে দেখলে ভুতনাথ। কেউ নেই কোথাও। দেব-দেবীরা সব সাজানো পড়ে আছে। ফুল বেলপাতা শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে। নৈবিদ্যির চাল দু'একটা ছড়ানো এদিক ওদিক। কিন্তু নরহরি নেই।

এবার হঠাৎ যেন ভক্তি ভরে' ভুতনাথ—কোন্ দেবতাকে লক্ষ্য করে কে জানে—প্রণাম করলে। বেদীর কাছে গিয়ে দুই হাত জোড় করে প্রণাম করলে। ফতেপুরের বারোয়ারী তলার মঙ্গলচণ্ডীর কাছে যেমন প্রণাম করে কামনা করতো ভুতনাথ, তেমনি মনে মনে প্রার্থনা করলে—মঙ্গল কর মা, মঙ্গল কর—

ভুতনাথের আর কোনও প্রার্থনা মনে এল না। কার মঙ্গল, কী মঙ্গল, সে প্রশ্ন নয়। সমস্ত মঙ্গল হোক। তার নিজের মঙ্গল, ব্রজরাখালের মঙ্গল—তারপদ, ভূষণ কাকা—ননী, রাধার আত্মার মঙ্গল। বিশ্ব সংসারে সকলের মঙ্গল। ওই বংশী, ওর বোন চিন্তা ওর ছোট মা—ছোটবাবু—মধুসূদন সকলের মঙ্গল।

বড় রাস্তার ওপর যেতে ভয় করলো ভুতনাথের। হুস্ হুস্ করে সেই কালকের মত ট্রাম আর মটর গাড়ি চলেছে। ঘোড়ার গাড়িওয়ালা ঘোড়াকে ছিপটি মারতে মারতে চলেছে হু হু করে। মুখে এক অদ্ভুত শব্দ করছে—উ-উ-উ-উ—। আবার কেউ বলছে—টি-টি-টি-টি—

একটু ওপাশে একটা বাড়িতে ঢং-ঢং করে ঘণ্টা বাজলো। ছেলেদের স্কুল। ভুতনাথ পড়লে। বেঙ্গল সেমিনারি। স্কুলের সামনে গোটা কতক কাবুলিওয়ালা অদ্ভুত ভেলভেটের ফতুয়া আর ঢিলে-ঢালা সাদা পাঞ্জাবী পরে বসে আছে। বসে বসে ফল বেচছে। একটা কাপড়ের ওপর আঙুর—বেদানা—বাদাম—ছড়ানো।

গঞ্জের স্কুলের কথা মনে পড়লো। সে ছিল প্রকাণ্ড খড়ের আটচালা ঘর। এমন দোতলা পাকা দালান নয় সামনের দিকে এগিয়ে গেল ভুতনাথ। তাদের ফার্স্ট ক্লাশে সংস্কৃত বই ছিল হিতোপদেশ। পড়াতেন শরৎ পণ্ডিত। লম্বা করে নস্যি নিতেন। সর্বদাই বোয়াল মাছের মত লাল-লাল গোল চোখ। টিকিতে ফুল বাঁধা থাকতো তাঁর। ভুতনাথ ভারি ভয় করতো তাঁকে। ধাতুরূপ মুখস্থ বলতে না পারলে মাথায় গাঁট্টা মারতে মারতে টিপ করে কিল বসিয়ে দিতেন পিঠে! রাগ হলে চীৎকার করে বলতেন—এই গর্দভ—

শরৎ পণ্ডিতের অস্ত্র ছিল শুধু হাতের গাঁট্টা।

অঙ্কের মাস্টার হরনাথবাবুর অস্ত্র ছিল খাকের কলম। দুই আঙুলের মধ্যে খাকের কলমটি দিয়ে জোরে এমন টিপে ধরতেন মনে হতো বুঝি বিছে কামড়িয়েছে।

আর হেড মাস্টার অবনীবাবুর বেত। দরোয়ান সত্যনারায়ণ ছিল বেতের ভাঁড়ারি। বড়, মাঝারি, ছোট, নানা মাপের বেত সাজানো থাকতো লম্বা লম্বা বাঁশের নলের মধ্যে।

চিৎকার করে অবনীবাবু ডাকতেন—সত্যনারায়ণ—আমার কেন্—

কেন মানে কেন্।

অবনীবাবু বাঙলা ভাষায় বেত বলতেন না। শাস্তির গুরুত্ব বোঝাবার জন্যে বোধ হয় ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করতেন।

অর্থাৎ যেন বেতের আঘাত কম, আর কেন-এর আঘাত প্রচণ্ড। সত্যনারায়ণ সব বেত গুলো এনে হাজির করতো হেডমাস্টারের সামনে।

অপরাধীর অপরাধের তারতম্য হিসেবে বেতের আকারের তারতম্য হতো। অর্থাৎ পরীক্ষার খাতায় বই থেকে নকল করলে—বড় বেত। পেছনের বেঞ্চে বসে ব্যাঙের ডাকের নকল করলে—মাঝারি বেত। আর সত্যনারায়ণের কাছ থেকে ধারে জিভে-গজা খেয়ে ধার শোধ না করলে—ছোট বেত।

পঞ্চাননের ভাগ্যে তিন রকম বেতই জুটতো।

সেই পঞ্চানন! ভূতনাথের এতদিন পরে আবার পঞ্চাননকে মনে পড়লো। একদিন হঠাৎ পুলিশের ধরে নিয়ে গেল সেই পঞ্চাননকে। ম্যাজিস্ট্রেটের বাগান থেকে ফুল চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল। বিচারে জেল হয়ে গেল পঞ্চাননের তিন মাস।

তারপর জেল থেকে বেরিয়ে পঞ্চানন আর গ্রামে আসেনি। কোথায় যে উধাও হয়ে গেল কেউ জানতে পারলে না।

স্কুলের সামনে যেতেই কেমন একটা হৈ-চৈ গণ্ডগোল শোনা গেল।

ওদিক থেকে ঢিল ছুঁড়তে লাগলো কারা—আর এদিক থেকে কাবুলিওয়ালারাও চিৎকার করে। কী বিকট ভাষা এদের। গোটাকতক শব্দ কেবল—কিছু মানে বোঝা যায় না।

ওদিক থেকে ঢিল ছুঁড়তে লাগলো ছেলেরা—আর এরা কিছু না পেয়ে বড় বড় বেদানা ছুঁড়তে লাগলো ছেলেদের লক্ষ্য করে।

রাস্তাময় বেদানা ডালিম আঙুর ন্যাসপাতির ছড়াছড়ি। ভিড় জমে গেল চারিদিকে। চার পাঁচটা কাবলিওয়ালা যেন পাগলের মত ক্ষিপ্ত হয়ে ছুটোছুটি করতে লাগলো। হাতের লম্বা লাঠিগুলো নিয়ে ঘোরাতে লাগলো। দমাদম জানালা-দরজা বন্ধ হয়ে গেল বেঙল সেমিনারীর। স্কুলের সাইন বোর্ড টেনে নামিয়ে ভেঙে দিলে।

ভূতনাথের কেমন অবাক লাগলো—কেন হঠাৎ এই মারামারি—। অথচ একটু আগেও তো কোনও কিছু ছিল না। ফল কিনছিল ওদের কাছে।

—কী হলো মশাই—কী হলো—

যে যা' পারলে দু'টো চারটে বেদানা কুড়িয়ে পকেটে পুরলে।

একজন বললে—ছেলেদেরই দোষ—

—কেন?

—ওরা ওদের বেইমান্ বলেছে—

—বেইমান! বেইমান বলা এত বড় অপরাধ! হট্টোগোলের মধ্যে থেকে ভূতনাথ বেরিয়ে এল। কয়েকটা লাল চামড়ার সাহেব পুলিশ ততক্ষণ এসে পড়েছে। ভয়ে যে যেদিকে পারলে দৌড় দিলে। এখনি হয়ত গুলী ছুঁড়বে। ওরা ভয়ানক মারে। গোরাদের ক্ষমতা কি কম। এসেই চার পাঁচটা কাবলিওয়ালাকে ধরে ফেললে। তারপর দমাদম লাথি মারতে লাগলো স্কুলের বন্ধ দরজার ওপর। রাস্তার গাড়ি ঘোড়া ট্রাম লোক চলাচল বন্ধ হয়ে গেল। হৈ হৈ কাণ্ড!

আবার বনমালী সরকার লেন-এর মধ্যে ঢুকে পড়লো ভূতনাথ। বুকটা তখনও তার দুর দুর করে কাঁপছে। বেইমান! কথাটার মানে কী!

মনে আছে বহুদিন আগে পঞ্চানন একবার হেডমাস্টার অবনীবাবুর কাছে খুব মার খেয়েছিল।

দুই হাতের পাতায় তখনও লাল দাগ হয়ে আছে। রাস্তায় এসে বলেছিল—এই বইগুলো একটু ধর তো—বোধ হয় জ্বর আসছে—

পঞ্চাননের কপালে হাত দিয়ে ভূতনাথ চমকে উঠেছিল। জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে যেন।

জ্বরের ঝোঁকে সেই রাস্তার মধ্যেই শুয়ে পড়েছিল পঞ্চানন।

মনে আছে সেই জ্বরের ঘোরেই পঞ্চানন বলেছিল—শালা হেডমাস্টারটা বেইমান—

ভূতনাথ সেদিন মানে বোঝেনি পঞ্চাননের কথাটার। বেঙ্গল সেমিনারীর ছেলেদের বেইমান বলায় কাবলিওয়ালার রাগের কারণটাও ভূতনাথ সেদিন বুঝতে পারেনি। কিন্তু মানে বুঝতে পেরেছিল অনেকদিন পরে, যেদিন ছোট বৌঠান বলেছিল—ভূতনাথ তুই এত বড় বেইমান—

হেডমাস্টারের বেইমানি বোঝবার বয়েস তখন হয়নি ভূতনাথের। কাবলিওয়ালাদের বেইমানিরও অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়নি সেদিন। কিন্তু ভূতনাথ যে কেমন করে বেইমান হলো সে প্রশ্ন......কিন্তু ছোট বৌদি তো তখন অপ্রকৃতিস্থ। তাকে অবশ্য ক্ষমা করেছিল ভূতনাথ। ছোট বৌদিকে চিনেছিল বলেই তো ভূতনাথ পরে তাকে ক্ষমা করতে পেরেছিল। (ক্রমশ)

আঠারো

বিজয়ের মা অবোধ নন নির্বোধও নন—তিনি শহরের মেয়ে লেখা-পড়াও জানেন, এককালে গৌরীকান্তের মায়ের অত্যন্ত প্রিয়সখী ছিলেন—তাঁর কাছে অনেক শিখেছিলেন। কিন্তু আজ প্রায় তিরিশ বৎসর সংসারের নানা ঘাত-সংঘাতের মধ্যে আঘাতের পর আঘাত খেয়ে এবং নিদারুণ দুঃখদায়ক অম্বলের ব্যাধিতে ক্রমান্বয়ে ভুগে জীর্ণ হয়ে পড়েছেন। এর উপর ওই ব্যাধির জন্যে আফিং খেয়ে ওই বস্তুটার প্রভাবে যেন আর এক মানুষ হয়ে গেছেন। একেবারে জীর্ণ হতাশ ভগ্নপ্রাণ মানুষ। তেজ নাই দীপ্তি নাই—আশা নাই ভরসা নাই, শুধু দুঃখ আর দুঃখ, অভাব অভাব আর অভাব ছাড়া কিছু নাই; থাকবার মধ্যে আছে অসাধারণ সহ্য গুণ, যার বলে কোনক্রমে তিনি বহন করে চলেন নিজের জীবন এবং ছেলের উপেক্ষিত সংসার। আরও একটি জিনিস তাঁর আছে। সেটি এ সংসারে দুর্লভ—সুদুর্লভ; অনাবিল শান্তি কামনা, ঘরে, পাড়ায়, গ্রামে, সমাজে দেশে সংসারে সর্বত্র। বিবাদ বিসম্বাদ কলহ ঈর্ষা এর জন্য তাঁর বেদনা অকৃত্রিম। জীবনের জীর্ণতার ফলেই বোধ করি তিনি আজকাল ছেলের সংসারের সকল দুঃখ অভাব অশান্তি এবং দুঃখকে এক বিচিত্র আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে মানুষের কুটিল ঈর্ষার ফল বলে মনে করেন। ছেলেকে বলেন—ওরে সহ্য কর। সহ্য করে যা। কাউকে কটুকথা বলিস নে। বিজয়, আমার কথা শোন!

বলেন—পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখ—সর্বত্র সুন্দর সর্বত্র সুস্বর—এমন কি যেখানে শব্দ নাই—নির্জন নিস্তব্ধ সেখানে শান্তি বিরাজ করছে। যেখানে শান্তি সেখানেই সুখ। সেইখানেই ভগবান। সেই-খানেই মঙ্গল।

এদেশের রামায়ণ-মহাভারত পড়া একটি মধ্যম রকমের ভাষাজ্ঞানসম্পন্না প্রবীণার পক্ষে যে ভাষায় ভঙ্গিতে ও ভাবে আত্ম-প্রকাশ করা সম্ভব তাই করেন। যুক্তিতে বুদ্ধির বিচারে বা তর্কে তাঁর এই তত্ত্ব টিকুক বা নাই টিকুক তাঁর হৃদয়ের বিশ্বাসের আবেগ সরল গাম্ভীর্যের মহিমায় প্রতিধ্বনি তুলবার মত ধ্বনি তুলে থাকে। তম্বুরায় বা সেতারে ঝঙ্কার তুললে আশপাশের ধাতব পাত্রে যেমন সেই ঝঙ্কারের রেশ সঞ্চারিত হয় তেমনিভাবে আশপাশের মানুষের অন্তরে একটা রেশ সঞ্চার করে।

বিজয় মানে না। তার শিক্ষা বড় নয়—জীবনীশক্তিটাই প্রবল। সে তার শক্তির গতিমুখে কোন বাধাকেই মানতে চায় না। ভেঙে চলাই তার স্বভাব। আগে অর্থাৎ ইংরেজ না-চলে যাওয়া পর্যন্ত এই শক্তির সবলতা সত্ত্বেও এতখানি প্রবল হয়ে ওঠেনি,—আজ প্রবল হয়ে উঠেছে।

যা সবল—যা প্রবল—আঘাতকে স্বীকার করা তার স্বভাব নয়, এবং যে দুর্বল সে যে আঘাতে যাতনা অনুভব করে সবল সে যাতনা অনুভবও করে না।

তাই মা যখন নিজের বিশ্বাস মত মনে করছেন—এ সর্বনাশ ঘটল মানুষের অভি-শাপে এবং মুখ ফুটে সেই বলেই কাঁদছেন তখন সে তার নিজের বিশ্বাস মত চীৎকার ক'রে প্রতিবাদ করছে—চুপ কর, বলছি—চুপ কর।

তবুও মা চুপ করছেন না। তখন সে স্পষ্ট প্রতিবাদ করছে—মিথ্যে কথা। মানুষের অভিশাপ আমি মানি না।

গৌরীকান্ত তার হাত ধরে আকর্ষণ করলে, সে-হাত সে ছাড়িয়ে নিলে। এক-বার কাঁদলে। তারপর আবার চোখের জল মুছে রূঢ় কণ্ঠে বললে—আমি মানি না। আমি মানি না।

—তুই না মানলে কি হবে? সত্যি তো মিথ্যে হয় না বাবা!

—কি সত্যি? কোন কথা সত্যি? আমি কানাই বাউড়ীকে দিয়ে অক্ষয় ঘোষালকে মারিয়েছি?

—না। তাতো বলি নি বাবা! সে মিথ্যে তো বলি নি!

—তবে? তবে কি?

—মানুষের অভিশাপ সত্যি বাবা! দেখছ তো চোখের ওপর।

—কোন পাপ করি নি, তার কোন ক্ষতি করি নি, তবু সে অভিশাপ দিলে, সেই অভিশাপ সত্যি হবে?

—তার বিশ্বাসে, সে তোমার অনিষ্ট চিন্তা ক'রে যদি ভগবানকে ডেকে থাকে?

—সে ভগবানকেই আমি মানি না।

—বিজয়! আর সর্বনাশ করিস নে!

—সর্বনাশ? কিসের সর্বনাশ? একটা দু বছরের ছেলে মরা সর্বনাশ! তা হ'লে পৃথিবীতে অহরহই সর্বনাশ হচ্ছে! অভিশাপ! অভিশাপে যদি মানুষ মরত—তা হ'লে পৃথিবীতে আজ একটা মানুষও থাকত না বেঁচে। তুমি এমন ক'রে চীৎকার কর না বলছি। গিয়েছে গিয়েছে। সবারই যায়, দশটা হ'লেই পাঁচটা যায়, সাতটা যায়, কারুর বা দশটাই যায়, আমার একটা গিয়েছে, কি হবে? তোমার ছেলে মরে নি, আমার ছেলে মরেছে। তুমি এমন ক'রে বুক চাপড়াও কেন? আমি মরি, তখন যা খুসী করো।

অবাক হয়ে গিয়েছিলেন কিশোরবাবু। গৌরীকান্ত স্তব্ধ হয়ে শুনছিল।

এই মুহূর্তেই ঘরে এসে ঢুকলেন দেবকী দেবী এবং শান্তি। বোধ করি বাড়ীর বাইরে থেকেই কথাগুলি তাঁরা শুনেছিলেন। শান্তি এসেই সেই কথার সূত্র ধরে বললে, ছি বিজয় এ সব কি বলছ?

জ্বলে উঠল বিজয়। বললে—থামুন, আপনি থামুন। বি এ পাশ লেখাপড়া জানা মেয়ে আপনি তা' আমি জানি। আপনাদের

সঙ্গে আমার মেলে না। আমি যা বুঝি তাই বলি।

সে হন হন ক'রে বেরিয়ে চলে গেল।

বাড়ীর বাইরে অনেক লোক এসে জমেছিল। বিজয়ের মাথায় যেন আগুন জ্বলে গেল। এরা সব মায়ের ওই প্রলাপোক্তি শুনেছে, মনে মনে হাসছে, বিশ্বাস করছে যে, অক্ষয় ঘোষালের অভিশাপে এই হয়েছে। ভাবছে ঘোষালকে কানাই চড় মেরেছে তারই নির্দেশে এইটাই সত্য। প্রাণপণে আত্মসম্বরণ করে সে বললে—যাও ভাই, বাড়ী যাও সব। ছোট ছেলে জলে ডুবে মরেছে! মা কাঁদছে! এর আর কি শুনবে, কি দেখবে? যাও সব বাড়ী যাও। শক্তি! শোন!

শক্তি বিজয়ের চেলা। শিক্ষার দিক দিয়ে বিজয়ের চেলা হতে তার বাধা নাই। বিজয় ম্যাট্রিক পাশ করেছিল এককালে, শক্তি থার্ড ক্লাস পর্যন্ত পড়েছে; প্রকৃতিতে সে কিন্তু শান্ত মানুষ, একটু মুখচোরা লোক; সেই দিকে একটু গরমিল আছে এবং সেইখানেই বিজয়ের অত্যন্ত স্নেহের পাত্র হতে পেরেছে। শক্তির অন্যদিকে গুণ বিজয়ের চেয়ে কম নয়। মড়া-ফেলা ময়লা মাটি সাফ করা থেকে আগুন নিভানো; গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ানোতে বিজয়ের পাশে পাশেই ফেরে। শক্তি চুপ করেই একপাশে দাঁড়িয়েছিল। বোধ করি কি বলে বিজয়দাকে সান্ত্বনা দেবে ভেবে পাচ্ছিল না।

শক্তি এগিয়ে এল।

বিজয় বললে—যা হয় ব্যবস্থা কর।

অর্থাৎ শ্মশানে পাঠাবার ব্যবস্থা।

শক্তি বললে—একটা কথা আছে, ওদিকে চলুন।

—কি কথা? কথা টথা এখন থাক শক্তি! পরে হবে। এখন ভাল লাগবে না।

—চলুন না।

—বল, তবে এইখানেই বল।

—চল। আমার মরণ হয় তো বাঁচি তোমাদের কথার দায় থেকে।

শক্তি কোন কথা না-বলে এগিয়ে চলল নির্জন স্থানের দিকে।

—কি? কি কথা বল?

শক্তি মুখ নিচু করেই দাঁড়িয়ে রইল।

—বল হে!

এবার শক্তি মৃদুস্বরে বললে—ওরা একটা দরখাস্ত করেছে।

—দরখাস্ত? কিসের দরখাস্ত? করুক। করুক দরখাস্ত। যা করতে পারে করুক।

বিজয় হন হন করে চলে এল। শক্তির উপর তার বিরক্তির আর সীমা ছিল না। দরখাস্ত করেছে। এখন সেই দরখাস্ত নিয়ে মাথা ঘামাবার সময়ই বটে তার! আর এরা, এই শক্তি পর্যন্ত সেই দরখাস্ত দরখাস্ত করে পাগল হয়ে উঠেছে। দরখাস্তকে সে গ্রাহ্যই করে না। কারও সাহায্যেরও তার প্রয়োজন নাই। সে নিজেই চলল, বাউরিপাড়ার দিকে।

লোক চাই।

এ অঞ্চলে পাঁচ বছরের কম বয়সের শিশুর শব দাহ করে না; সমাধি দেয়। একজন লোক চাই যে গর্ত খুঁড়ে দেবে। আর ছেলেটাকে নিয়ে সে নিজেই যাবে। কারও সাহায্যের তার প্রয়োজন নাই।

বিজয়দা, শুনুন।

—না। শুনব না। শুনবার আমার সময় নাই শক্তি। আমাকে তুমি মাফ কর।

—কিন্তু ছেলেটিকে শ্মশানে পাঠাবার আগে থানাতে একবার খবর দিতে হবে তো। জলে ডুবে মৃত্যু।

হ্যাঁ। কথাটা তার ভুল হয়ে গিয়েছে। বিজয় থমকে দাঁড়াল, বললে—তুমি একবার যাও। কিম্বা—। কিম্বা কিশোরবাবুকে বল গিয়ে।

—আমি থানা থেকেই আসছি বিজয়দা।

—বলে এসেছ?

—সেই কথাই বলছি। ওরা এরই মধ্যে একটা দরখাস্ত পাঠিয়েছে। দরখাস্ত করেছে—থেমে গেল শক্তি। বলতে সে পারছে না। আটকে যাচ্ছে মুখে।

এবার বিজয় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে শক্তির মুখের দিকে তাকিয়ে এগিয়ে এল তার দিকে। কাছে এসে মৃদুস্বরে ডাকলে—শক্তি!

—বিজয়দা!

—কি দরখাস্ত করেছে?

—দরখাস্ত করেছে, আমরা জনপরম্পরা শুনিতেছি, ছেলেটির জলে ডুবিয়া মৃত্যু হয় নাই। খুব সম্ভব ছেলেটিকে হত্যা করা হইয়াছে।

—হত্যা করা হয়েছে!

—হ্যাঁ। আপনি না কি চড় মেরে মেরে ফেলেছেন।

—আমি চড় মেরে মেরে ফেলেছি খোকনকে?

—হ্যাঁ। তারপর সেইটা ঢাকবার জন্যে জলে ফেলে দিয়ে, তুলে প্রকাশ করা হচ্ছে যে জলে ডুবে মারা গেছে ছেলে। দারোগাবাবু আমাকে দরখাস্ত দেখালেন। বললেন—কি করব শক্তিবাবু আমি বুঝতে পারছি না।

বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে রইল বিজয়!

অভিশাপের কথা উড়িয়ে দেওয়া যায়—কিন্তু হত্যার অভিযোগ? সে তার ছেলেকে চড় মেরে খুন ক'রেছে? হত্যা করেছে?

একটি ছেলে ছুটতে ছুটতে এসে বললে—বিজয়দাকে ডাকছে। দারোগাবাবু এসেছেন।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বিজয় বললে—চল।

তাই হবে। ফাঁসী কাঠেই ঝ্লবে সে! চল।

* * * * *

কিশোরবাব্ দীর্ঘপদে ঘ্রে বেড়াচ্ছিলেন মর্মান্তিক ক্ষোভে আক্ষেপে। মনে মনে তাঁরও যেন অভিসম্পাত দেবার বাসনা উগ্র থেকে উগ্রতর হয়ে উঠছে। ইচ্ছে হচ্ছে, উচ্চকণ্ঠে আকাশ বিদীর্ণ করা চীৎকারে অভিসম্পাত দেন—ধ্বংস হয়ে যাক, এ পাপ নবগ্রাম ধ্বংস হয়ে যাক।

দারোগা বসে আছেন নতম্খে।

গৌরীকান্ত বসে রয়েছে গম্ভীরম্খে। তার হাতে দরখাস্তখানা।

একজন অপরিচিত লোক খামখানা একজন কনস্টেবলের হাতে দিয়েই চলে গিয়েছে। বলেছে—এখ্নি দারোগাবাব্র হাতে দাও। জর্রী।

বাইসিক্লে চেপে এসেছিল, সঙ্গে সঙ্গেই বাইসিক্লে চেপে চলে গিয়েছে। এতে সন্দেহের কিছ্ ছিল না, কনেস্টবল সন্দেহও করে নাই।

দরখাস্তের নিচে লেখা আছে—অবিকল নকল জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠানো হইল।

কারণের পর কার্য, কার্যের ফলে ন্তন কারণের উদ্ভব, তার ফলে কার্য, স্নিপ্ণ পরম্পরায় গেঁথে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। ফাঁক রাখা হয় নি কোথাও। এর মধ্যে জড়ানো রয়েছে—শান্তি —গৌরীকান্ত—বিজয়—বিজয়ের মা।

লেখা হয়েছে—ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রী শান্তি ম্খার্জির রীতি আচরণ স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে এখানকার লোকের ধারণার কথা সাবইনস্পেক্টর অবশ্যই জ্ঞাত আছেন। এবং সম্প্রতি গৌরীকান্তের সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠতা লইয়া যে দরখাস্ত হইয়াছিল, তাহার ফলে তিনি যে চাকরী ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছেন, ইহাও সর্বজনবিদিত। অর্থাৎ প্রমাণিত সত্য।

প্র্বে এই শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে বিজয়-চন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা লইয়াও দরখাস্ত হইয়াছে এবং এ সম্পর্কে এখানকার লোকের ধারণার কথাও সকলে জানেন।

গত রাত্রে এই লইয়া শিক্ষয়িত্রী শান্তি-দেবীর সঙ্গে বিজয়ের বচসা হয়। বিজয় তাহাকে চাকরী ছাড়িয়া যাইতে দিবে না বলে। শান্তিদেবী চাকরী ছাড়িয়া গৌরী-কান্তের সঙ্গে কলিকাতা যাইবেন সংকল্প করিয়াছেন। এই সব লইয়া গ্রামের দেওয়ালে দেওয়ালে ছড়াযুক্ত যে সব বিজ্ঞাপন মারা হইয়াছে তাহা দেখিতে পারেন।

অদ্য ভোরে এই লইয়া বিজয়ের সহিত তাহার মায়ের কলহ হয়। সে কলহ অনেকে শ্নিয়াছে। সেই কলহের সময় ছেলেটি বার বার তাহার পিতার কাপড় ধরিয়া টানিয়া কোলে চাপিতে চাহিলে ক্রোধোন্মত্ত বিজয় তাহার গালে চপেটাঘাত করে এবং সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেটির ম্ত্যু হয়। বিজয়ের মা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলে, বিজয় তাঁহাকে শাসায় এবং চুপ করিতে বলে।—চুপ কর বলছি, চুপ কর! বিজয়ের এই শাসনবাক্য পাড়ার সকলেই শ্নিয়াছে।

আমরা এই অপরাধের এবং মহাপাপের ধর্মসম্মত ও ন্যায়সম্মত বিচার চাই। রীতি-মত তদন্ত করা হউক। লাস সংকারের আদেশ দিলে প্রধান প্রমাণ বিল্প্ত হইয়া যাইবে বলিয়াই অবিলম্বে থানা অফিসারকে সম্দয় বিবরণ জানানো কর্তব্য বলিয়া মনে করিলাম। এবং অত্র দরখাস্তের নকল মাননীয় জেলা শাসক মহোদয়ের নিকট প্রেরিত হইল। ইতি—নবগ্রামের ন্যায় ও ধর্ম বিচার প্রার্থী অধিবাসীব্ন্দ।

নিচে প্নশ্চ লেখা হইয়াছে—ছেলেটি মারা গেলে জলে ডুবাইয়া দিয়া তুলিয়া আনিয়া জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে, এই পরামর্শ দিয়াছেন স্চতুরা শ্রীমতী শান্তি-দেবী। ভাল করিয়া তদন্ত করিলে সবই প্রকাশ পাইবে বলিয়াই আমাদের দৃঢ় ধারণা।

বিজয় দরখাস্তখানা পড়ে, গৌরীকান্তের হাতে ফিরে দিলে এবং হন হন করে বাড়ীর মধ্যে গিয়ে শিশ্টির ম্তদেহ এনে দারোগার সামনে নামিয়ে দিয়ে বললে, চালান দিন লাস। এই নিন।

(ক্রমশ)

সমাপন

শ্রীনীরেন্দ্র গ্প্ত

আমি কি ফ্রিয়ে গেছি সন্ধ্যায় বিলীয়মান আলোকের মত?
অথবা মিলিয়ে গেছি ব্দ্ব্দের মত চিহ্নহীন?
যত স্পর্শকাতরতা তাই ব্ঝি ম্ত এই ব্কে!
তাই আত্মবিস্ম্ত কি নয়নে আবেশ!

প্র্ণতার চেয়ে আরো কিছ্ বেশী ছিলাম একদা,
জীবনময়তা ছিল স্বপ্নে স্বপ্নে পরিদ্শ্যমান।
সেদিন অমেয় প্রেম আপনাতে জাগাতো চেতন,
প্লাবনের পরশের চিহ্ন রেখে যেতো।

সত্তার স্পন্দন কোথা? আজ কোথা রক্তের নিঃশ্বাস?
শেষ কি হয়েছি তবে নিভে-যাওয়া স্ফ্লিঙ্গের মত?
এত তৃষা—এত স্র এত শীঘ্র হ'ল সমাপন!
গান হ'ল স্খলিত এখনি!

তব্ ভাবি হয়তো বা ক্ষণিকের অবসান শেষে
আবার হৃদয়পাত্র পারেও বা প্র্ণ হয়ে যেতে।

রঞ্জন

আমার রাজনৈতিক চেতনা এত ক্ষীণ, (কিংবা সাহিত্যিক বোধ এত প্রখর), যে মতৈক্য ঘটলেই আমি কোনো লেখকের রচনার অক্ষমতা ক্ষমা করতে পারিনে। তেমনি ভিন্নমতাবলম্বী হলেও সার্থক লেখকের লেখা উপেক্ষা করতে আমি অক্ষম। এই নীতিতে দৃঢ় থাকার সুবিধা এই যে, রাতারাতি আমার জিদ্, অরওয়েল বা মালরোর সাহিত্যিক গুরুত্ব সম্বন্ধে মত পরিবর্তন করতে হয় না। অসুবিধা এই যে প্রায়শই অপ্রিয়ভাষণ করতে হয়। রাজনৈতিক কুয়াশা সাহিত্যিক দৃষ্টি আচ্ছন্ন করেছে এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। কিন্তু রাজনীতির রাহুর সাহিত্যের পূর্ণগ্রাসের একটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ রাডিয়ার্ড কিপলিং। প্রধানত একটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত উদ্ধৃতির কল্যাণে এই অসামান্য গল্পলেখক ও কবি ভারতে ঘৃণিত এবং বাইরেও অনাদৃত। দেশীয় ঘৃণা এত প্রবল যে কোনো ভারতীয় কিপলিঙের প্রশংসা করলেই তা প্রায় দেশদ্রোহিতা বলে পরিগণিত হয়।

এগারো বছর আগে টি এস এলিয়ট এবং মাস দেড়েক আগে সমরসেট মম যথাক্রমে কিপলিঙের পদ্য ও গদ্যের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে তবু অন্তত একজনের, আমার, কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। যদিও, আমার এক শিক্ষকের প্রেরণায়, আমি কৈশোরেই কিপলিঙের রাজ্যে প্রবেশের আনন্দ ও অধিকার লাভ করেছিলেম এবং কোনো কারণেই সে অনুরাগ ক্ষুণ্ণ হতে দিইনি। সমগ্রভাবে কিপলিঙের রচনা পাঠ করলে তাঁর বহুঘোষিত ভারতীয়বিদ্বেষের সাক্ষ্য তার সত্যকার অকিঞ্চিৎকরতায় পর্যবসিত হয় এবং তাঁর কালের রাজনীতিক মাপকাঠি দিয়ে বিচার করলে অস্বীকার করবার উপায় থাকে না যে, তাঁর সাম্রাজ্যবাদ যতটা তাঁর দেশপ্রেমের উচ্ছ্বসিত বিকাশ, পরের প্রতি ঘৃণার বিকার ততটা নয়। তাঁর গল্পগুলিতে শুধু অসামান্য শক্তিরই পরিচয় নেই, পরিচয় আছে ভারতের বিশেষ এক প্রান্তের বিশেষ এক শ্রেণীর ভারতীয়দের প্রতি প্রগাঢ় সহানুভূতি ও সম্মানের।

কিন্তু কিপলিঙের সাহিত্যিক মূল্যনির্ধারণ বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্যবহির্ভূত। আমার আলোচ্য সদ্যপ্রকাশিত কিপলিঙের গদ্যসংকলনে সমরসেট মমের ভূমিকাটির কয়েকটি মন্তব্য। গল্প লেখক মমের প্রতি আমার অনুরাগ কারো চেয়ে কম নয়। কিন্তু প্রবীণ ও জনপ্রিয় লেখকের আসন থেকে তিনি যখন অন্যান্য লেখকদের সম্বন্ধে রায় দিতে উদ্যত হন, তখন তাতে না থাকে উদারতার আভাস, না যুক্তিসূক্ষ্মতার। মাঝে মাঝে এমন সন্দেহও উদ্রিক্ত হয় যে তিনি বিচারের আবরণে আত্মসমর্থনে ব্যস্ত। তাঁর কিপলিঙের গুণগানের অন্তরালেও অনুরূপ আত্মত্রুটিস্খালনের প্রয়াস একেবারে অস্পষ্ট নয়।

মম বলছেন, "কিপলিং যে কখনো কখনো দীন, অবিশ্বাস্য বা তুচ্ছ গল্প লিখেছেন তাতে অবাক হওয়া উচিত নয়। বিস্ময়ের বস্তু হচ্ছে এই যে, তিনি এতগুলি ভালো গল্প কী করে লিখলেন।" একটু পরে আরো স্পষ্ট করে বলছেন, "রচনাপ্রাচুর্য লেখকের দোষ নয়, গুণ। সব মহান লেখক অনেক লিখেছেন। তাঁদের সব লেখাই ভালো হয়নি; কিন্তু শুধু মাঝারি ধরণের লেখকরাই বরাবর তাঁদের মাঝারিত্ব বজায় রাখতে পারেন। সত্যকার বড়ো লেখকরা মাঝে মাঝে, হঠাৎ, অমূল্য লেখা সৃষ্টি করতে পেরেছেন এই বলেই যে তাঁরা অনেক অনেক লিখেছেন।" অর্থাৎ? অর্থাৎ লেখকের পক্ষে আত্মসমালোচনা অনাবশ্যক, প্রতি রচনাই প্রকাশযোগ্য এবং মহৎ সৃষ্টি বৃহৎ উৎপাদনের একান্ত আকস্মিক উপজাতক। এমন মত শুধু ভিত্তিহীন নয়, অত্যন্ত ক্ষতিকর। এতে রচনায় অযত্ন প্রশ্রয় পায়, সাহিত্যসৃষ্টি লটারির স্তরে নেমে আসে। সফল লেখকের মুখ থেকে উচ্চারিত হলে এমন উক্তির ক্ষতিসাধ্যতা ভয়াবহরূপে বৃদ্ধি পায়।

১৯৪৬এ এডমন্ড উইলসনের তিরস্কার সত্ত্বেও মম আজো বুঝতে পারলেন না যে সফল লেখক মাত্রই সার্থক লেখক নন। কিপলিং সফল লেখক ছিলেন, মমকেও শুধুমাত্র সফল লেখক বলে অবজ্ঞা করলে অবিচার হয়; কিন্তু তার মানেই তো এই নয় যে, ক্রেতৃসংখ্যাই সাহিত্যবিচারের একমাত্র মানদণ্ড। অথচ মম অল্পপ্রিয় লেখকদের প্রতি অশোভন শ্লেষের লোভ কখনো সম্বরণ করতে পারলেন না। আলোচ্য ভূমিকাতেও এই সস্তা বিদ্রূপের স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। এটা শুধু মূঢ়তা নয়, একান্ত রুচিহীন। এ যেন নবধনীর ঐশ্বর্যপ্রদর্শন, এ যেন রূপবতীর অশালীন অবজ্ঞা গুণবতী সামান্যদর্শনার প্রতি। রূপগ্রাহীর সংখ্যাধিক্য যেমন নারীত্বের শ্রেষ্ঠ পরিচয় নয়, তেমনি পাঠকসংখ্যাই রচনার শ্রেষ্ঠতার অকাট্য প্রমাণ নয় নিশ্চয়ই। একথাও মমের জানা উচিত যে লোকপ্রিয় লেখক সম্বন্ধে প্রশংসাকৃপণতা সর্বক্ষেত্রেই ঈর্ষাজাত নয়। এই কথাগুলি আমি এমন অসংকোচে বলতে পারলেম এই জন্যে যে—বাঙালী পাঠককে ধন্যবাদ—আমি একেবারে অবিক্রেয় গ্রন্থকার নই। কিন্তু তাই বলে বিক্রয়কেই সাহিত্যপ্রচেষ্টার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার বলে জ্ঞান করব—এ ধিক্কার থেকে ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করুন।

সবচেয়ে আপত্তিকর হচ্ছে উপভোগসর্বস্ব সাহিত্যের প্রতি মমের অলজ্জ পক্ষপাত। উপভোগ্যতার প্রতি উন্নাসিক অবজ্ঞা থেকে আমি একেবারেই মুক্ত, কিন্তু মমের সঙ্গে মতান্তর আমার উপভোগের শ্রেণী-বিচার নিয়ে। পিত্তশূলে ও চিত্তশূলে যেমন শুধু অবোধের কাছে সদৃশ, তেমনি উপভোগেরও স্তরভেদ আছে। রাজসিক ও তামসিক উপভোগ কি এক পদার্থ? মম পড়লে তাই মনে হবে। এবং ভুল মনে হবে। ধারণাটি যে ভ্রান্ত তা মমের রচনা থেকেই দেখানো যেতে পারে। তাঁর 'দি এলয়েন কর্ন' গল্পটির রস 'দি অ্যাণ্ট অ্যাণ্ড দি গ্রাসহপার'-এর রস থেকে একেবারেই আলাদা জাতের। তাঁর 'অব হিউম্যান বণ্ডেজ' যে শ্রেণীর উপন্যাস, 'দেন অ্যাণ্ড নাউ' সে শ্রেণীর নয়।

উপভোগ্যতার উপাসনা করেই মম ক্ষান্ত নন। সাফল্যের ময়ূরপুচ্ছ সঞ্চালন করে তিনি প্রায়ই বলবেন, কিপলিং-প্রসঙ্গেও বলছেন, ঔপন্যাসিক বা গল্পলেখকের ভাবুক হবার প্রয়োজন নেই। মানলেম। কিন্তু তার পরেই: "আমি এমন কোনো বড়ো কথাসাহিত্যিকের নাম স্মরণ করতে পারিনে যিনি চিন্তানায়কও ছিলেন।" এখানেও শুধু কিপলিঙের ওকালতি নেই, আছে আত্মসমর্থন। তত্ত্বচিন্তা প্রায়ই চরিত্রচিত্রণ ও কাহিনী বর্ণনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু একটু চেষ্টা করলেই তিনি এমন দু' চারজন প্রতিভাবান কথাশিল্পীর কথা স্মরণ করতে পারতেন যাঁরা একাধারে সার্থক লেখক এবং গম্ভীর দার্শনিক বলে সম্মানিত। টলস্টয়, শ, টমাস মান্ ইত্যাদির কথা মম শোনেননি, এমন হতেই পারে না।

পাঠযোগ্য লেখকমাত্রই যে নির্ভরযোগ্য সাহিত্যসমালোচক নয়, সমরসেট মম তার অন্যতর দৃষ্টান্ত।

বিজ্ঞান-বৈচিত্র্য

চক্রদত্ত

মানুষের দেহ একটি যন্ত্রবিশেষ আর এই দেহযন্ত্র যখন নিয়মিত কাজ করে যায় তখন আর এর মধ্যের কোনও কিছু জানার উৎসাহ বা কৌতূহল মানুষের থাকে না। এমন কি, এ্যানাটমিতে যাদের বেশ ভাল ধারণা আছে বলে মনে করেন তাঁরাও এর কতকগুলি অদ্ভুত খবর রাখেন না। সাধারণভাবে একটি মানুষের শরীরে পোণে চার থেকে প্রায় সাড়ে চার সের মত ওজনের রক্ত থাকে; মানুষের শরীরের মধ্যে সবচেয়ে বড় যন্ত্র হচ্ছে যকৃৎ; অবশ্য ছোটবেলায় মানুষের মস্তিষ্ক ও যকৃতের ওজন প্রায় একই থাকে। মানুষের শরীরের যাবতীয় উপাদানের মধ্যে জলের অংশই ⅔ ভাগ। একটি সাধারণ মানুষের মস্তিষ্কের ওজন প্রায় তিন পাউন্ড। অবশ্য দেহের অনুপাতে এর তারতম্য ঘটে। দেহের মধ্যে সর্বশুদ্ধ প্রায় ২০৬টি হাড় আছে, এই সংখ্যার কম-বেশী খুব কমই ঘটে। যেটুকু তফাৎ কখনও সখনও দেখা যায় সেটা সাধারণতঃ মেরু-দন্ডের শেষের দিকেই দেখা যায়। দাঁতই মানুষের শরীরের সবচেয়ে শক্ত অংশ। দাঁতের ওপর যে শক্ত আবরণটি থাকে তাকে এনামেল বলা হয়। দেহের সমস্ত অংশ ধুলোর সঙ্গে মিশে গেলেও তখনও দাঁত কয়টিই অবশিষ্ট থাকে। কোনও মানুষ যদি কোনও রকম পরিশ্রম না করে শুধুই বসে থাকে তাহলে ১০০০০০ বার তার হৃৎপিন্ডের স্পন্দন হয়ে থাকে। মানুষের পেশীগুলির সংখ্যা গড়ে ৬৩৯। দেহের সমস্ত চামড়া যদি খুলে নেওয়া যায় তাহলে চব্বিশ বর্গফিট্ পরিমিত স্থান ঢাকা যায়। এই চামড়ার ওজন প্রায় সাত থেকে দশ পাউন্ড। পাক নালি প্রায় ২৫ থেকে ৩০ ফিট্ লম্বা হয়ে থাকে। সাধারণতঃ মানুষের দাঁত ৩২টি হয় বটে, কিন্তু ছোটবেলায় দুধে দাঁত মাত্র কুড়িটি থাকে। দেহের রক্ত হৃৎপিন্ড থেকে শুরু করে সারা শরীর ঘুরে আবার হৃৎপিন্ডে ফিরে আসতে গড়পড়তা ৪৫ সেকেন্ড সময় লাগে। অবশ্য কোনও রকম অঙ্গসঞ্চালন হওয়ার সময় আরও কম সময়ের মধ্যে এটি হয়। সারা দুনিয়ার মানুষের ৮৫ থেকে ৯০টি সন্তান সাধারণ-ভাবে জন্মানর পরে একজোড়া যমজ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। একজন মানুষের মাথার চুলের সংখ্যা গড়পড়তা ১৫০০০০ হয়। তবে চুল সরু মোটা হওয়ার সঙ্গে এই সংখ্যা কমবেশী নির্ভর করে। ১০০০০ থেকে আরম্ভ করে ১৪০০০০ পর্যন্ত হয়। মানুষের দেহের উপাদানগুলি যদি বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক পদার্থে ভাগ করা যায় তাহলে সমস্ত রাসায়নিক পদার্থ-গুলির দাম চার থেকে আট টাকার বেশী হবে না।

*

বিমানে বা জাহাজে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের অনেক রকমেই বিপদ ঘটতে পারে। অনেক সময় বিমান অস্থানে ভেঙ্গে গেলে কিংবা জাহাজডুবি হলে নাবিকরা জীবন-তরীতে সমুদ্রের বুকে ভেসে থাকতে পারে। জীবনতরীটা রবারের তৈরী, এগুলি গুটিয়ে ছোট করে রাখা হয়, জলে পড়ে যাবার পর এগুলো হাওয়া দিয়ে ফুলিয়ে নেওয়া যায়। যতক্ষণ না কোনও সাহায্য-তরী এসে পৌঁছায় ততদিন এতে করে ভাসমান থাকা যায়। পানীয় জলের অভাবেই এভাবে বেশীদিন থাকা সম্ভব নয়। কারণ, সমুদ্রের লোনা জল পানীয় হিসাবে ব্যবহার করা যায় না। জীবন-তরীর সঙ্গে আজকাল পানীয় জলের একটা সুবন্দোবস্ত রাখার চেষ্টা চলছে। জীবন-তরীর সঙ্গে আর একটা বলের মত থাকে, এটাকেও হাওয়া দিয়ে ফুলিয়ে নেওয়া যায়। এই বলটার ওপরের আবরণটা ভিনিলাইট জাতীয় প্লাস্টিকের তৈরী। এই বলটার ভেতরে একটা কালো কাপড়ের থলে মত থাকে আর এইটার সঙ্গে আসল বলটার ওপরের প্লাস্টিকের আবরণের সঙ্গে অনেক জায়গায় যোগাযোগ রাখা হয়। ঐ কাপড়ের থলেটার মধ্যে সমুদ্রের জল ভরা থাকে। এই জলটা সূর্যের উত্তাপে গরম হয়ে গিয়ে বাষ্পে পরিণত হয় এবং ঐ বাষ্প আবার তরল হয়ে জলের আকারে ওরই সংলগ্ন আর একটা থলিতে জমা হতে থাকে। দ্বিতীয় থলিটি প্রথম থলির নীচের দিকে থাকে। ঐ বাষ্প থেকে সংগৃহীত জলটুকু পরিস্রুত জল হয়ে পানের উপযোগী হয়। মেঘাচ্ছন্ন দিনে যখন সূর্যের আলো পাওয়া যায় না তখন আলোর ইনফ্রায়েড্ রশ্মির সাহায্যে ঐভাবে সমুদ্রের জল পরিস্রুত করা হয়। অবশ্য সূর্যের উত্তাপে যেদিন পানীয় জল সংগৃহীত হয় সেদিন জলের পরিমাণ কিছুটা বেশী হয়। সাধারণতঃ এভাবে দিনে প্রায় দুই সের মত পরিস্রুত জল পাওয়া যেতে পারে।

*

দু' হাজারটি পানাসক্ত পুরুষ মানুষকে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, সাধারণ মানুষের তুলনায় এদের মধ্যে শারীরিক কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। যাদের মদপান করা অভ্যাস আছে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাদের মাথায় টাক পড়ে না, এমন কি, তাদের মাথায় চুল খুব বেশী হয় তবে সাধারণত সে চুল অকালেই পেকে যায়। তাদের শরীরে লোম খুব কম হয়, এদের চর্মরাগ কম হয়।
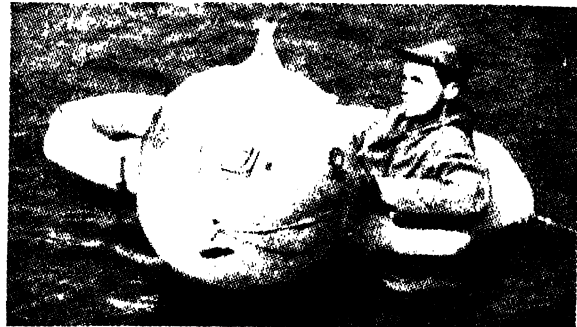
পানীয় জলের ব্যবস্থাসহ নূতন জীবনতরী

ট্রামে-বাসে

শ্রীযুক্ত নেহরু বলিয়াছেন—আমরা যখন স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়াছি, তখন আমাদের সংখ্যা ছিল নিতান্তই নগণ্য। কিন্তু আমরা কোটি কোটি নরনারীর সমর্থন লাভ করিয়াছি। বিশু খুড়ো বলিলেন—"এখনও তো সেই মামা, সেই মামী, সেই পুকুরপাড়ে ঘর, তবে এখন সমর্থন নেই কেন?" আমরা চুপ করিয়া রহিলাম, খুড়ো নিজের প্রশ্নের জবাব নিজেই দিলেন—"বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না!!"

* * * *

ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নেহরুজী চাষবাসের কৌশলে সামান্য একটু পরিবর্তনের পরামর্শ দিয়াছেন।—"মধ্যপ্রদেশ সামান্য একটু পরিবর্তনের স্বপক্ষে নিতান্ত সামান্য একটি হাতির চাষ প্রবর্তন করিয়াছেন"—মন্তব্য শ্যামের।

* * * *

উৎপাদনের ব্যাপারে এশিয়া নাকি পশ্চাতে পড়িয়া আছে। খুড়ো বলিলেন—এশিয়ার কথা জানিনে, কিন্তু ভারতকে সে কথা কারু বলবার জো নেই। মধ্যপ্রদেশের আদমসুমারি দেখুন—ছাপ্পান্নজন বাইশটি সন্তানের জননী; পাঁচশত তিরিশজন কুড়ি থেকে একুশ এবং ছ' হাজার জননী পোনের থেকে উনিশটি সন্তান প্রসব করেন। শুধু গান্ধারীর শতপুত্র নয় ষাট সহস্র সগর-সন্তান এই ভারতেরই উৎপাদন—জয় হিন্দ্!!"

* * * * * *

পাকিস্থানের সঙ্গে ভারতের সম্বন্ধের বিচার-বিতর্ক প্রসঙ্গে নেহরুজী বলিয়াছেন—শুধু ভাবাবেগে চলা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়, তাকে সর্ব ব্যাপারে Fair হইতে হয়। জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"কিন্তু তাতেই কি সব সময় কাজ হয়; এই তো সেদিন দ্বারভাঙ্গা কাপে আমরা Fine and Fair খেলে মলুম।"

* * * * * *

পাকিস্থানের অন্য এক সংবাদে প্রকাশ, সেখানে অসামরিক সরকারী কর্মচারীরা একসঙ্গে চারিটি বিবি শাদী করিতে পারেন। আমাদের জনৈক ব্রিজরসিক বলিলেন—"শুধু চার বিবিতে কল্ হয় না, সুতরাং সেটা শুধুই তাসের ঘর"।

* * * *

পাক প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন সম্প্রতি লণ্ডনে গিয়াছেন। শহীদ সুরাবর্দি সাহেব মন্তব্য করিয়াছেন—তিনি

লণ্ডনে গিয়াছেন ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিয়া। খুড়ো বলিলেন—"উপায় কী, সেখানে তো লড়কে লেঙ্গে চলে না"!!

* * *

এক সংবাদে জানা গেল যে, তাঁত-শিল্পকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে সরকার মিলবস্ত্রের উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। ঈসপ্ বর্ণিত গল্পে এক কুকুর মুখের মাংস খণ্ড ছাড়িয়া জলে প্রতিবিম্বিত মাংস খণ্ড ধরিতে গিয়াছিল। উক্ত সংবাদে এই গল্পটি আপনা হইতেই মনে পড়িয়া গেল।

* * *

ভারতীয়দের নাগরিক অধিকার দিতে নাকি লংকা সরকার নারাজ। শ্যাম বলিল—"তাই তো বলি—আজকে মন্ত্রী জাম্বুবানের বুদ্ধি কেন খুলছে না, সংকট কালে চট্‌পট্ কেন মুক্তির কথা বলছে না"!!

* * * * *

ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ বলিয়াছেন নেহরুজীর হৃদয়টি দশজনের মত ঠিক্ বুকের ভিত

অবস্থিত। খুড়ো বলিলেন—"এ সং জন্যে ডাক্তারকে ধন্যবাদ। তবে হচ্ছে কারু হৃদয় ময়ূরের নাচে আর কারু শুধু ধুক্‌পুক্ ক

* * *

ইস্ট বেঙ্গল দিবস প্রতিপালন সম্ আলোচনায় যোগদান করিয়া খুড়ো বলিলেন—"ইস্ট বেঙ্গল দিবস প্র

পালন সার্থক হয়েছে কিনা বলতে পারি তবে সেই দিনেই ইস্ট বেঙ্গল আবার ডুরা বিজয়ী হয়েছে"।

মিঃ সম্মত
ঘড়ি ধরেই চলে
তার কাজ. . . .
কিন্তু প্রতিশ্রুতি পালনে
তার বছরের পর
বছর অতিবাহিত
হয়ে যায় . . . . . .
এই অলীক বাবুর
কৌতুকোজ্জ্বল কাহিনী
দেখুন ~
জেমিনীর
পঞ্চম হিন্দি চিত্র
মিঃ সম্মত
শ্রেষ্ঠাংশে
সম্মতের ভূমিকায় মতিলাল
মালিনী ,, পদ্মিনী

রঙ্গজগৎ

প্রমোদ বাজারের অবস্থা এখন খুবই খারাপ। তানসেন সঙ্গীত সম্মিলনী হয়ে গেলো, উদয়শঙ্কর এখনও নেচে যাচ্ছেন, 'ক্যা ভ্যাডিস' চলছে,—কিন্তু এ ছাড়া যেন আর কোন খবর দেবার নেই। ছবি অবশ্য নিয়মিতভাবেই প্রতি সপ্তাহে মুক্তিলাভ করছে, কিন্তু এখনকার দ্বিধাবিক্ষুব্ধ দর্শক-মনে কোন ছবিই যেন পছন্দের আসরে দাঁড়াতে পারার মতো হয়ে উঠছে না। অবস্থাটা চলচ্চিত্রের দিকেই বেশী খারাপ। চিত্রনির্মাতারা মহা ফাঁপরে পড়েছেন—কি

ফরাসী প্রমোদকার এ্যাল কার্থি তার বিচিত্র খেলা "দি মেকানিক্যাল ম্যান" বা কৃত্রিম মানুষ দেখিয়ে বর্তমানে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের নৈশ প্রমোদবিহারীদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। এ্যাল কার্থি আসছেন ফরাসী দেশ থেকে এবং তাঁর এই বিস্ময়কর খেলাটি ইওরোপের সর্বত্র দেখিয়ে আসছেন দীর্ঘকাল ধরে।

রকমটি হলে দর্শকদের মন পাওয়া যাবে তার কোন খেই-ই তারা ধরে উঠতে পারছেন না। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেকরকম করে তারা ছবির ভোল পালটে দেবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু কিছুতেই যেন দর্শকদের বাগে নিয়ে আসা যাচ্ছে না। তবুও চিত্রগৃহে নতুন ছবির আমদানী অব্যাহত রয়েছে, যতো কম দিনের জন্যেই ছবি চলুক না কেন। এ হলো কলকাতার খবর; এতো তবুও ভালো। অন্যান্য বড়ো বড়ো শহরের অবস্থা আরো কাহিল।

দিল্লীতে দিশী প্রথমমুক্তি ছবির এতো টান ধরেছে যে গত সপ্তাহে অনেক ছবিঘরের কাউকে পুরণো আবার কাউকে নতুন ইংরিজী ছবি দেখাতে বাধ্য হতে হয়েছে। বম্বেতে, মানে প্রাচ্যের হলিউডে এখন এতো কম ছবি তোলার কাজ হচ্ছে যার সংখ্যা গুণে অন্যান্য শহরের প্রদর্শকরা দিল্লীর অবস্থার কথা মনে মনে ভাঁজতে আরম্ভ করেছে। এর ওপর পাকিস্থানের বাজার নিয়ে উদ্বেগের অন্ত হয়নি এখনও।

পাকিস্থান 'ভারতি' ছবির আমদানী একেবারে বন্ধ করে দেবার কোন আইন করেনি, কিন্তু এমন একটা ভড়কী দিয়ে বসে আছে যার জন্যে ভারতীয় চিত্র-নির্মাতাদের বিশেষ করে বাঙলা ছবির প্রযোজকদের অবস্থা কাহিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাকিস্থানের,—পূর্ব বা পশ্চিম পাকিস্থানের—কোন পাকিস্থানেরই এতে অবশ্য অবস্থা ভালো করার কিনারা দেখা যায় না। কারণ, উভয় পাকিস্থানের চিত্রগৃহে কোনখানে বাঙলা আর কোনখানে হিন্দী ছবি না হলে চলে না। উভয় পাকিস্থানেরই চিত্র প্রদর্শক এবং এখানকার ভারতীয় ছবির পরিবেশকদের অবস্থা তাদের ভারতীয় সহচরদের চেয়েও খারাপ। কারণ, ভারতে ভারতীয় ছবি যেমনভাবেই হোক তবুও চলবার জায়গা রয়েছে, কিন্তু পাকিস্থানের নিজের তোলা ছবি সংখ্যায় এতোই কম যে, সেগুলি নিয়ে সব ছবিঘরকে বছরের মাত্র কয়েকটি সপ্তাহের বেশী চালানোও যেতে পারে না। ওরা তাহলে করবে কি? এ কথাটা ভারতের এবং পাকিস্থানের উভয় দেশেরই চিত্র ব্যবসায়ীরা ভাবছেন ... কোন্ দিক থেকে কি যে সুরাহা হতে পা... দু'দেশের কারুরই মাথায় সেটা এখ... খেলছে না। বলা যাচ্ছে না, অবস্থা ... পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

*

তবুও কিন্তু নতুন ছবি তোলার ... হচ্ছে এবং যতো ছবি তৈরী হচ্ছে ম... হচ্ছে তার পাঁচগুণ। নতুন নাচের ... তৈরী হচ্ছে। নতুন থিয়েটারের

ফরাসী দেশের আর এক রঙ্গকার য... জর্জেট ও বেন চেনীও বর্তমানে ... ইস্টার্নের প্রমোদাগারের বিশেষ আকর্ষণ ... পরিগণিত হচ্ছেন। এরা নাচেন, গান ক... রঙ্গ করেন।

গজাচ্ছে নিত্যই নতুন (অবশ্য সৌখীন ... আর পুরনো নাটক নিয়ে)। কাগজে কা... প্রতিদিন শহরের অলিতে গলিতে স... কতো রকমেরই না প্রমোদ অনুষ্ঠা... বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু লো... মধ্যে এতো সবের কোন উৎসাহই যেন ... কেমন যেন মিয়নো ভাব সব ব্যাপারে ... এ অবস্থা পুরাতনের একঘেয়ে... ক্লান্তিতে, না নতুনের প্রতীক্ষায়?

খেলার মাঠে

ক্রিকেট

মাদ্রাজের চতুর্থ ক্রিকেট টেস্টম্যাচে ভারত ও পাকিস্থানের এইবারের টেষ্ট পর্যায়ের খেলার জয়পরাজয় মীমাংসিত হইবে ইহাই ছিল সকলের ধারণা, কিন্তু ফলতঃ তাহা হয় নাই। প্রকৃতিদেবী ইহাতে বাদ সাধিয়াছেন। চারি দিন-ব্যাপী খেলার দুইদিন নির্বিঘ্নে সুন্দর পরিবেশের মধ্যে পরিচালিত হইয়া শেষ দুই দিন প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার আকস্মিক আবির্ভাব সকল কিছুই পণ্ড করিয়াছে। খেলা এই দুইদিন চালনা সম্ভব হয় নাই। মাঠ জলসিক্ত ও স্থানে স্থানে জলমগ্ন হওয়ায় উভয় দলের অধিনায়ককে শেষ পর্যন্ত খেলা পরিত্যক্ত বলিয়া ঘোষণা করিতে হয়। ইহা খুবই পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই। তবে এই খেলা সম্পর্কে পাকিস্থান ক্রিকেট দলের অধিনায়কের অভিমত খুব ক্রীড়াসুলভ মনোভাবের পরিচায়ক হয় নাই। তিনি একরূপ স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, খেলা ঠিকমত পরিচালিত হইলে পাকিস্থানের জয়ী হইবার সম্ভাবনা ছিল। ভারতীয় দলের অধিনায়কও বোধ হয় এই উক্তিতে বিরক্ত হইয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে খেলা চলিলে তিনি নিশ্চয়ই উহা অমীমাংসিতভাবে শেষ করিতে পারিতেন। খেলার ফলাফল সকল সময়েই অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকে। সুতরাং যাহা হয় নাই, তাহা লইয়া এরূপভাবে উভয় দলের অধিনায়কের বাগ-বিতণ্ডা ও এক অপরকে অপদস্থ করিবার প্রচেষ্টা কোনরূপেই বরদাস্ত করা চলে না। ভবিষ্যতে এইরূপ কিছু না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

খেলার বিবরণ

পাকিস্থান দল প্রথম ব্যাটিংয়ের সুযোগ লাভ করেন। প্রথম দিনের সারাদিন খেলিয়া ৯ উইকেটে ২৭৩ রান করেন। সকলেই কল্পনা করেন যে, ইহাদের প্রথম ইনিংস ৩০০ রানের মধ্যে শেষ হইবে। কিন্তু দ্বিতীয় দিনে শেষ খেলোয়াড়দ্বয় জুলফিকার আমেদ ও আমীর ইলাহি একত্রে ১০৪ রান সংগ্রহ করেন। পাকি-স্থানের প্রথম ইনিংস ৩৪৪ রানে শেষ হয়। পরে ভারতীয় দল খেলা আরম্ভ করিয়া শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেন। ৩০ রানে ৩টি উইকেটের পতন হয়। পরে উমরিগারের দৃঢ়তা-পূর্ণ ব্যাটিংয়ের জন্য অবস্থার পরিবর্তন হয় ও ভারত দিনের শেষে ৬ উইকেটে ১৭৫ করেন। ইহার পর তৃতীয় ও চতুর্থ দিনের খেলা অনুষ্ঠিত হয় না।

খেলার ফলাফল—

পাকিস্থান প্রথম ইনিংস—৩৪৪ রান (ওয়াকার হাসান ৪৯, আব্দুল কারদার ৭৯, ফজল মামুদ ৩০, জুলফিকার আমেদ ৬৩ রান নট আউট, আমীর ইলাহি ৪৭, মানকড় ১১৩ রানে ২টি, ডি জি ফাদকার ৬১ রানে ২টি, রমেশ ডিভেচা ৩৬ রানে ২টি, অমরনাথ ৯ রানে ১টা ও জি এস রামচাঁদ ৬৬ রানে ১টি উইকেটই পান।)

ভারত প্রথম ইনিংস—৬ উইঃ ১৭৫ রান (এম আপ্তে ৪৩, উমরিগার ৬২, অমরনাথ ১৪, ডি জি ফাদকার ১৮ রান নট আউট ও জি এস রামচাঁদ ২৫ রান নট আউট, মামুদ হোসেন ৭০ রানে ২টি, ফজল মামুদ ৫২ রানে ২টি ও আব্দুল কারদার ৩৭ রানে ২টি উইকেট পান।)

পঞ্চম টেস্ট দল

ভারত পাকিস্থানের পঞ্চম বা শেষ টেস্ট-ম্যাচ আগামী ১২ই ডিসেম্বর হইতে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হইবে। এই খেলায় ভারতের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য নিম্নলিখিত খেলোয়াড়-দের মনোনীত করা হইয়াছে—(১) লালা অমর-নাথ (অধিনায়ক), (২) বিজয় হাজারে, (৩) বিনু মানকড়, (৪) ডি জি ফাদকার, (৫) পি সেন, (৬) পি আর উমরিগার, (৭) গোলাম আমেদ, (৮) জি এস রামচাঁদ, (৯) ভি এল মাঞ্জরেকার, (১০) পি রায়, (১১) ডি কে গাইকোয়াড়, দ্বাদশ—এস পি গুপ্তে।

অতিরিক্ত—সি ডি গোপীনাথ, পি জি যোশী ও ডি এইচ সোধন।

টেবিল টেনিস

বহুবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান টেবিল টেনিস খেলোয়াড় রিচার্ড বার্জম্যান সুদূরপ্রাচ্য ভ্রমণ শেষ করিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করিয়া বলেন, "জাপানের বিশ্ব গৌরব খ্যাতি হংকং ছিনাইয়া লইবে। জাপানকে হংকংয়ের নিকটই পরাজয় বরণ করিতে হইবে।" মিঃ রিচার্ড বার্জম্যানে সেই ভবিষ্যদ্বাণী যে কতখানি সত্য, তাহা এই-বারের সিংগাপুরে অনুষ্ঠিত প্রথম এশিয়ান টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়ানসিপে প্রমাণিত হইয়াছে। হংকংয়ের পুরুষ ও মহিলা খেলোয়াড়-গণ দলগত প্রতিযোগিতার দুইটি বিভাগেই চ্যাম্পিয়ান হইয়াছেন। এমনকি বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান জাপানের খেলোয়াড় হিরাজী স্যাটোকে পর্যন্ত প্রতিযোগিতার বিভিন্ন খেলায় হংকংয়ের বিভিন্ন খেলোয়াড় পরাজিত করিয়া ইহাই প্রমাণিত করিয়াছেন যে, বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানের খ্যাতি লাভের যোগ্য খেলোয়াড় হংকংয়ে একজন নাই, কয়েকজনই আছেন। এশিয়ান টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়ান-সিপের পুরুষদের সিংগলস ফাইনালেও পর্যন্ত বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান জাপানের খেলোয়াড় হিরাজী স্যাটোকে হংকংয়ের খেলোয়াড় শি সু চুর নিকটই পরাজিত হইতে হইয়াছে। তবে এই প্রসংগে একটি কথা উল্লেখ না করিলে অন্যায় হইবে যে, জাপানের হিরাজী স্যাটো অপেক্ষাও উন্নতস্তরের খেলোয়াড়গণকে এশিয়ান টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়ানসিপে যোগদান করিতে দেখা যায় নাই। এমনকি যে দুইজন জাপানী মহিলা খেলোয়াড় বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানসিপে ডাবলসের খেলায় সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং জাপান এশিয়ান টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়ানসিপে সকল গৌরবের অধিকারী হইতে না পারিলেও ভবিষ্যতে বিস্ময়কর কিছু করিতে পারিবে না ইহা জোর করিয়া বলা চলে না। তাহা হইলেও মিঃ রিচার্ড বার্জম্যান হংকংয়ের টেবিল টেনিস খেলা সম্পর্কে যে উচ্চ ধারণা বিবৃতি মারফৎ প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা একেবারেই উপেক্ষা করিবার নহে, ভবিষ্যতে হংকংয়ের প্রতিনিধিগণ জাপানের বিশ্ব গৌরব খ্যাতি দখল করিতে পারেন ইহা না বলিয়া পারা যায় না।

ভারতের ক্রমোন্নতির পরিচয়

ভারত টেবিল টেনিস খেলায় যে দ্রুত অগ্র-গতির পথে চালিত হইয়াছে ও শীঘ্রই বিশ্ব ক্রীড়াক্ষেত্রে স্থানলাভ করিবেন, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এশিয়ান টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়ানসিপ অনুষ্ঠানে দিতে না পারিলেও কিছুটা নিদর্শন দিয়াছেন। এই বিষয় সর্বাগ্রে ভারতের দুই নম্বর মহিলা খেলোয়াড় বর্ষিয়সী, সন্তানের জননী, মিসেস গুলনাশিকওয়ালার কথা উল্লেখ করিতে হয়। এশিয়ান টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় তিনিই একমাত্র খেলোয়াড়, যাঁহার ভাগ্যে তিনটি বিভাগে বিজয়ীর সম্মানলাভ করা সম্ভব হইয়াছে। ইহা সত্যই গৌরবের ও আনন্দের বিষয়। মিসেস গুল নাশিকওয়ালা মহিলাদের সিঙ্গলস ও ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলসের চ্যাম্পিয়ান হইয়াছেন। ভারতীয় দলের ম্যানেজার শ্রীযুত টি ডি রঙ্গরামানুজম অনুষ্ঠানের শেষে বলেন, "মিস সুলতানা ভারতীয় দলে যোগদান করিতে পারিলে মহিলা বিভাগের দলগত চ্যাম্পিয়ানসিপে ভারত সাফল্যলাভ করিতে পারিত। আগামী বৎসরে জাপানের টোকিও সহরে দ্বিতীয় বার্ষিক এশিয়ান টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়ানসিপ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইবে। ঐ প্রতযোগিতায় ভারত অধিকতর কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে যাহাতে পারে, তাহার জন্য এখন হইতেই সচেষ্ট হওয়া উচিত।

রাইফেল সুটিং

দিল্লীর জাতীয় সুটিং চ্যাম্পিয়ানসিপে বাঙলার প্রতিনিধিগণ স্মল বোর রাইফেলের প্রতিযোগিতায় ব্যক্তিগত ও দলগত চ্যাম্পিয়ান হওয়ায় সারা বাঙলার রাইফেল চালকদের মধ্যে অভাবনীয় উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে। পরবর্তী অনুষ্ঠানে যাহাতে বাঙলার প্রতিনিধিগণ প্রতি-যোগিতার সকল বিভাগে সাফল্যলাভ ও গৌরব প্রতিষ্ঠা করেন, তাহার জন্য এখন হইতেই প্রচেষ্ট হওয়া উচিত। তবে এই প্রচেষ্টা ফলবতী হইতে পারে, যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকার সর্ব-বিষয় সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইয়া আসেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বাঙলার প্রতিনিধিদের সাফল্যে আনন্দিত হইয়া দিল্লীতেই প্রতিনিধিদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। সেইজন্য আশা হইতেছে, তিনি প্রয়োজনীয় সাহায্য করিতে কুণ্ঠাবোধ করিবেন না। তবে এই প্রসংগে পশ্চিমবঙ্গ রাইফেল এসোসিয়েশনের কর্মতৎপরতার অভাব দেখিয়া আমরা একটু দুঃখিত হইয়াছি। আমেদাবাদের গঠিত জাতীয় রাইফেল এসোসিয়েশনকেই যখন সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তখন বাঙলার রাইফেল চালকগণ সর্বভারতীয় সকল বিভাগে গৌরব প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, তাহার জন্য বিপুল উদ্যমে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার বাধা আর কি থাকিতে পারে? অসহযোগী মনোভাব ত্যাগ করায় বাঙলারই গৌরব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার পর পূর্ণ সহযোগী মনোভাব লইয়া কার্য না করিলে ভবিষ্যতে এই খ্যাতি হইতে বঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা যে আছে, ইহা কি তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না?

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

২৪শে নবেম্বর—লোকসভায় খাদ্যমন্ত্রী মিঃ রফি আমেদ কিদোয়াই ঘোষণা করেন, পশ্চিমবঙ্গ ও মহীশূরে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরও শিথিল করা হইবে। কলিকাতা শিল্প অঞ্চলে খাদ্যশস্য সরবরাহের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। নূতন বৎসর হইতে কলিকাতার অধিবাসীরা প্রত্যহ মাথাপিছু সাড়ে চার আউন্সের পরিবর্তে ৬ আউন্স হিসাবে চাউল পাইবেন। পশ্চিমবঙ্গে বৃহত্তর কলিকাতা, দার্জিলিং, কালিম্পং ও কার্শিয়াং-এ রেশন ব্যবস্থা চালু থাকিবে।

জম্মু প্রজা পরিষদের সভাপতি শ্রীপ্রেমনাথ ডোগরা অদ্য ঘোষণা করেন যে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত কাশ্মীর রাজ্যের "পূর্ণ ও নিঃসর্ত অন্তর্ভুক্তির" উদ্দেশ্যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন সংগঠন ও পরিচালনার জন্য তিনি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক শ্রীদুর্গাদাস বর্মার উপর ভার অর্পণ করিয়াছেন।

লোকসভায় ১৯৫২ সালের অগ্রিম চুক্তির কারবার নিয়ন্ত্রণ বিল সিলেক্ট কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত আকারে গৃহীত হয়। এই সংক্রান্ত সমস্ত সংশোধন প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়। বিরোধী দলের অনেকে বিলের সমালোচনা করিয়া বলেন যে, বিলে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের বড় বড় ব্যবসায়ীদের দয়ার পাত্র করা হইয়াছে।

২৫শে নবেম্বর—ঢাকার সংবাদে প্রকাশ, গত সোমবার কুমিল্লা জেলার নবীনগর থানার তিন মাইল পূর্বে মোলা গ্রামে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এক মারমুখো জনতার উপর পুলিশ গুলী চালাইলে ৪ জন নিহত ও ১৩ জন আহত হয়।

পাক পার্লামেন্টে পাক-ভারত পাসপোর্ট বিল সম্পর্কে বিতর্কের সময় আজাদ পাকিস্থান দলের মিঞা ইফ্‌তিকারউদ্দীন বলেন, পাকিস্থান সরকার পাকিস্থানে হিন্দুদের উপযুক্ত রক্ষা ব্যবস্থা করেন নাই।

২৬শে নভেম্বর—আগামীকল্য হইতে উড়িষ্যায় জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ হইবে। উড়িষ্যার রাজস্ব সচিব শ্রীসদাশিব ত্রিপাঠি আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে উহা ঘোষণা করেন।

ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন যে সব বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানকে ঋণ মঞ্জুর করিয়াছেন, সরকারের নিকট হইতে তাহাদের নাম জানিবার অধিকার সম্পর্কে অদ্য লোকসভায় তুমুল বিতর্ক চলে।

উত্তর-পূর্ব ভারতের ২০টি চা-বাগানের কাজ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আজ লোকসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী এই সংবাদ জানান। তিনি বলেন যে, চা-এর বাজারে মন্দা পড়া ও ব্যাঙ্কগুলির ঋণদান সুবিধার সঙ্কোচ সাধনই চা-বাগানগুলির কাজ বন্ধের কারণ।

বাঙলার অন্যতম খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতা শ্রীহেমন্তকুমার সরকার অদ্য মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৮ বৎসর হইয়াছিল।

•

২৭শে নভেম্বর—কলিকাতায় এই মর্মে এক সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে, বন্দুক, লাঠি ও মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া একদল গুণ্ডা গত ১৩ই নভেম্বর রাত্রিতে ঢাকা জেলার বক্তারপুর-ট্যাংরাটি গ্রামে শ্রীকালীচরণ দাসের গৃহে হানা দেয়। দুর্বৃত্তদের গুলীতে শ্রীকালীচরণ দাস ও তাঁহার ভ্রাতা মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং অপর দুইজন আহত হন।

আগরতলা-কুর্তি (ধর্মনগর) রাস্তার নির্মাণকার্য শেষ হইয়াছে এবং এযাবৎ উক্ত রাস্তা নির্মাণে ১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। আজ লোকসভায় রেলওয়ে দপ্তরের পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী জনাব শা নওয়াজ এই সংবাদ জানান।

২৮শে নভেম্বর—সমগ্র ভারতে সরকারী কর্মচারীদের ধনদৌলত সম্পর্কে তদন্তের উদ্দেশ্যে একটি কমিশন গঠনের জন্য আকালী নেতা সর্দার হুকুম সিং আজ লোকসভায় একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনাকালে সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ করা হয়।

২৯শে নভেম্বর—আজ সাঁচীতে আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সাংস্কৃতিক সম্মেলন আরম্ভ হয়। ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ উহাতে সভাপতিত্ব করেন এবং প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু, ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রী উ নু, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বক্তৃতা দেন। প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু বলেন যে, বর্তমান অশান্ত ও সংশয়াক্রান্ত জগতে বুদ্ধের আদর্শ ও বাণীকে প্রয়োগ করিতে পারিলে জগতের পক্ষে শান্তি সম্ভব হইবে। এই সম্মেলনে এশিয়ার বিভিন্ন স্থান হইতে বহু বৌদ্ধ পণ্ডিত, ভিক্ষু, ভিক্ষুণী ও ঐতিহাসিক যোগদান করেন।

ভগবান বুদ্ধের প্রধান শিষ্যদ্বয় সারিপুত্ত ও মহামোগ্‌গল্লানের পূতাস্থি অদ্য কলিকাতা হইতে একখানি স্পেশ্যাল ট্রেনে সাঁচীতে আনীত হয়।

পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল তাঁহাদের রায়ে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় রাজ্য সরকারের দেশরক্ষা (স্বরাষ্ট্র) বিভাগীয় উপ-মন্ত্রী শ্রীসত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মৌলিকের নির্বাচন সম্পূর্ণ অসিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

৩০শে নভেম্বর—ভগবান বুদ্ধের শিষ্যদ্বয় সারিপুত্ত ও মহামোগ্‌গল্লানের পূতাস্থি অদ্য সাঁচীতে নবনির্মিত বিহারে সংস্থাপিত হয়। প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু, উপ-রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ, মহাবোধি সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ব্যতীত ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রী উ নু, সিংহলের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ রত্নায়ক প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ অন উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠান উ সমবেত ৫০ সহস্রাধিক নরনারীর বক্তৃতাকালে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রী ব্যক্তিগত ও আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানে ভগবান বুদ্ধের আদর্শ—প্রেম, সহিষ্ণুত করুণা অবলম্বন করিতে বিশ্ববাসীকে জানান।

বিদেশী সংবাদ

২৪শে নবেম্বর—অদ্য রাত্রিতে রা সাধারণ পরিষদের রাজনৈতিক ক সোভিয়েট পররাষ্ট্র মন্ত্রী মঃ আঁদ্রে ভিঁ বলেন, কোরিয়ার যুদ্ধবন্দীর প্রত্যর্পণ স সমাধানের জন্য ভারত যে ভিত্তিতে আ প্রস্তাব করিয়াছেন আমি তাহাতে সম্মত পারি না। ভারতীয় প্রস্তাবটিকে যথ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

জেনারেল আবদুল মোতালিব আমিন বাগদাদ জেলার সামরিক গভর্নর নিযুক্ত ছেন। কার্যভার গ্রহণ করিয়াই তিনি ই পাঁচটি রাজনৈতিক দল ভাঙ্গিয়া দিবার দিয়াছেন।

২৫শে নবেম্বর—ওয়াশিংটনের স প্রকাশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অফি জানাইয়াছেন যে, ভিয়েৎমিন সরবরাহ হইতে চারিটি রুশ লরী ও ২৫০ টন বারুদ আটক এবং কয়েকজন রুশ ও চ গ্রেপ্তারের ফলে ইন্দোচীনের যুদ্ধে এক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে।

২৬শে নবেম্বর—সোভিয়েট পররাষ্ট্র আঁদ্রে ভিসিনস্কি অদ্য রাষ্ট্রপুঞ্জ স পরিষদের রাজনৈতিক কমিটিকে জা দিয়াছেন যে, কম্যুনিষ্ট চীন কোরিয়া স ভারতীয় প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।

২৭শে নভেম্বর—চেকোশ্লোভাক কম্যু দের ১১জন ভূতপূর্ব নেতা (তন্মধ্যে ইহুদী) অদ্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড় অভিযোগে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

কমন্স সভায় বৃটিশ ইস্পাত শিল্প ত সম্পত্তি হইতে ব্যক্তিগত মালিকানায় আ বিলটি ৩০৫—২৬৯ ভোটে গৃহীত হয়।

লণ্ডনে কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রী স আরম্ভ হইয়াছে।

২৯শে নভেম্বর—গতকল্য রাত্রিতে রাষ্ট্রপ সাধারণ পরিষদের রাজনৈতিক কমিটি বে সংক্রান্ত ভারতের শান্তি পরিকল্পনা স কোনরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিয়া এই বি আলোচনা আগামী সপ্তাহ পর্যন্ত মু রাখিয়াছেন।

৩০শে নভেম্বর—সিউলের সংবাদে প্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নব নির্বাচিত প্রেসি ডুইট আইসেনহাওয়ারের দক্ষিণ কো পৌঁছিবার পূর্বে নিরাপত্তা ব্যবস্থা হি ২৫ হাজার নরনারীকে সাময়িকভাবে গ্রে করা হইয়াছে।

ভারতীয় মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা—।√০ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষাণ্মাসিক— ১০৲
পাকিস্থানের মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা (পাক্) ।√০ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষাণ্মাসিক—১০৲ (পাক্)
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র

দেশ

২০শ বর্ষ
৭ম সংখ্যা

২৭শে অগ্রহায়ণ, ১৩

DESH Saturday, 13th December 1952

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীমা

১২৬০ বঙ্গাব্দের ২২শে অগ্রহায়ণ ভারতের ইতিহাসে একটি মহা মহাপুণ্যময় তিথি। এইদিন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহধর্মিণী শ্রীশ্রীমা হুগলী জেলার অন্তর্গত এক অজ্ঞাত পল্লীগ্রামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইংরেজী হিসাবে সেটি ১৮৫৩ সাল। এই বৎসরে ভারতে সর্বপ্রথম রেলপথ প্রবর্তিত হয় এবং এই বৎসরেই এদেশে টেলিগ্রাফের লাইনও প্রথমে খোলে। কিন্তু জড়বিজ্ঞানের এইপ্রকার সম্প্রসারণ কিংবা সমুন্নতি, নিত্যই পরিবর্তনশীল। এগুলি আসিতেছে এবং যাইতেছে। বস্তুত মানুষের অন্তরধর্ম এবং মানবাত্মার মহিমময় সম্পর্ককে অবলম্বন করিয়াই এগুলি সার্থকতা লাভ করিয়া থাকে। মানবাত্মার এই মহিমা শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবে ভারতের সংস্কৃতিকে উজ্জ্বল করিয়া বিশ্ব-মানব-সমাজের কাছে এক অভিনব আদর্শ উপস্থিত করে। এই হিসাবেই ১৮৫৩ সালটি আমাদের কাছে সমধিক স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। একশত বৎসর পূর্বে তিনি আমাদের কন্যারূপে আসিয়াছিলেন, তিনি আজ তাঁহার জীবন-মহিমায় সমগ্র দেশের লোকচিত্তে জননীর গৌরবে জাগ্রত আছেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহধর্মিণী স্বরূপে শ্রীশ্রীমা তাঁহার দিব্য জীবনের যে আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন এ জগতে তাঁহার দৃষ্টান্ত সত্যই বিরল। ঠাকুর তাঁহার সহধর্মিণীর সান্নিধ্য-বর্জন করিয়া দূরে থাকেন নাই, সারদামণিও তাঁহার সাধক স্বামীর জীবনে সাধারণ বিষয়-সংস্কারের রীতি প্রতিষ্ঠার কোন দাবী করেন নাই। এইভাবে দুইটি জীবন পরম আধ্যাত্মিক সত্যে একাত্ম হইয়া বিকশিত হইয়াছে। ঠাকুরকে ছাড়িয়া শ্রীশ্রীমায়ের ভাবনা করা যায় না, আবার শ্রীশ্রীমাকে ছাড়িয়া ঠাকুরের অচিন্ত্য অমৃতময় লীলার অনুধ্যান করাও সম্ভব নয়। এ যুগল লীলার পুণ্য প্রভাব বিশ্বমানবের কাছে অমৃতত্ব লাভের পথ উন্মুক্ত করিয়াছে। জগৎকে বাঁচাইবার উপায় দেখাইয়াছে। সত্যই এ লীলা অপূর্ব এবং অভাবনীয়। আনন্দের বিষয়, শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষ জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপনের আয়োজন করা হইতেছে। আগামী পৌষ মাস হইতে

আরম্ভ করিয়া পরবর্তী পৌষ মাস পর্যন্ত এই জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপিত হইবে। আমরা আশা করিতেছি, শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষ জয়ন্তী অনুষ্ঠান সমগ্র ভারতে নূতন জীবনের উদ্বোধন করিবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। আমাদের দেশ সকল দেশের চেয়েও অধম কেন, শক্তিহীন কেন, শক্তির অপমান সেখানে হয় বলে। মা ঠাকুরাণী পুনরায় ভারতে সেই শক্তি জাগাতে এসেছেন। তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গী, মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে।" স্বামীজীর এই উক্তি অভ্রান্ত। তিনি সত্যদ্রষ্টা, বাঙলার বর্তমান দুর্দিনে তাঁহার বাণী আমাদের অন্তরে আশার আলোক-রেখা সঞ্চার করিতেছে। তাঁহার উক্তি সার্থক হোক্, শ্রীশ্রীমায়ের শতবার্ষিকী জন্মতিথিতে আমরা তাঁহার চরণে এই প্রার্থনা নিবেদন করিতেছি এবং এই জয়ন্তী অনুষ্ঠান সর্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়া দেশের জনসাধারণের জীবনে শক্তি, শান্তি এবং আনন্দ উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবে, ইহাও আশা করিতেছি।

লৌহ-যবনিকার অন্তরালে

ছাড়পত্র প্রবর্তিত হইবার পর পূর্ববঙ্গ প্রকৃতপক্ষে লৌহ-যবনিকার অন্তরালে পড়িয়াছে। পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে আগমন করা সহজে সম্ভব নয়; পরন্তু অত্যন্তই দুষ্কর ব্যাপার, একথা আমরা বলিয়াছিলাম। কিন্তু ভারতের প্রধান-মন্ত্রী তাহা স্বীকার করেন নাই। পরন্তু তিনি এবং তাঁহার মন্ত্রিমণ্ডল দিল্লী-চুক্তি এখনও জীবিত আছে, এই যুক্তিই প্রদর্শন করেন এবং সেই চুক্তির মর্যাদা রক্ষার জন্য তাঁহাদের পক্ষ হইতে আগ্রহ দেখানো হয়। কিন্তু গত ৬ই ডিসেম্বর ভারতীয় লোকসভার বিতর্কে সত্য প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। ভারতের সংখ্যালঘু মন্ত্রী শ্রীযুত চারুচন্দ্র বিশ্বাস ক্ষুণ্ণ মনে আমাদিগকে শুনাইয়া দিয়াছেন যে, পাকিস্থান ও ভারতের মধ্যে উদ্বাস্তুগণের গমনাগমনে কোন বাধা থাকিবে না, এমন নীতি পাকিস্থান স্বীকার করিয়া লইয়াছিল সত্য, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বহুতর বাধা সৃষ্টি করা হইতেছে। শ্রীযুত বিশ্বাস আজ একথা আমাদের নিকট গোপন করিতে চাহেন না বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু তিনি কথাটা আমাদের

আমরা জানিতাম। এখন ইহা জানিতে সমর্থ হাতেই আমরা ধন্য হইয়াছি। সংখ্যালঘু মন্ত্রীর উক্তি হইতে ও সুস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে যে, পাকিস্থান অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ সরকার স্বতঃপ্রবৃত্তভাবেই উদ্বাস্তুদের গমনাগমনের পক্ষে এই বাধা সৃষ্টিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং ভারতের সঙ্গে এই সম্পর্কে তাঁহাদের যে চুক্তি হইয়াছিল তাহা ভঙ্গ করিতেছেন। বিশ্বাস মহাশয় বলিয়াছেন, ছাড়পত্র-প্রথা প্রবর্তিত হইবার পূর্বে উভয় সরকারের মধ্যে এইরূপ বোঝাপড়া হইয়াছিল যে, বাস্তুত্যাগীদের নিকট ভ্রমণ সংক্রান্ত কোন দলিল না থাকিলেও তাহাদিগকে পাকিস্থানের পরীক্ষা-ঘাটি অতিক্রম করিয়া আসিতে দেওয়া হইবে। কিন্তু পাকিস্থান এই নীতি এখন মানিতেছে না। পূর্ববঙ্গ সরকার এ পক্ষে এই যুক্তি দেখাইতেছেন যে, উদ্বাস্তুদের এইরূপ গমনাগমনে অবাধ অধিকার দিলে উদ্বাস্তুদের মিথ্যা পরিচয়ের সুযোগ অপরাধী ব্যক্তিরাও গ্রহণ করিতে পারে। শ্রীযুত বিশ্বাসের মতে পাকিস্থান পক্ষের এই যুক্তি নিতান্তই বাজে। কারণ, দিল্লী চুক্তি যখন পূর্ণভাবে বলবৎ ছিল, তখন যে কেহই পূর্ববঙ্গ হইতে চলিয়া আসিতে পারিত। বিচারের হাত এড়াইবার জন্য কেহ পলায়ন করিতে পারে, এই যুক্তিতে তখন কোন বাধা সৃষ্টি করা হয় নাই। সে অবস্থাটা বজায় থাকুক, ভারত সরকার ইহাই চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ভারত সরকার যাহাই চাহিয়া থাকেন না কেন, তাঁহারা যাহা চাহিবেন, তাঁহাদের সহস্র রকমের সদিচ্ছা সত্ত্বেও যে তাহা রক্ষিত হইবে না এবং স্নিগ্ধ প্রলেপ প্রয়োগের যে ব্যবস্থা তাঁহারা সার বলিয়া বুঝিয়া লইয়াছেন, তাহাতে কোন কাজই যে হইবে না, ইহা আমরা পূর্ব হইতেই বুঝিয়া লইয়াছিলাম। অতীতের অভিজ্ঞতা এ সম্বন্ধে আমাদিগকে শঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছিল এবং সেই আশংকা বর্তমানে সত্যে পরিণত হইয়াছে। শ্রীযুত বিশ্বাস আমাদিগকে এই আশ্বাস দিয়াছেন যে, পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোন লোক যদি উদ্বাস্তুস্বরূপে ভারতে আসিতে চাহে, তবে তাহার ভ্রমণ-সংক্রান্ত দলিল নাই বলিয়া ভারতের পক্ষ হইতে কোন রকম বাধা সৃষ্টি করা হইবে না। কিন্তু তাঁহার এই আশ্বাসে উল্লাস বোধ করিবার কোন কারণ আমরা দেখিতেছি না; কারণ, পাকিস্থানের কর্তারা ঘাটি রক্ষা করিতেছেন। তাঁহাদের পক্ষ হইতে যে নানা অছিলায় অন্তরায় সৃষ্টি করা হইবে এ আশঙ্কার কারণ রহিয়াই যাইতেছে। শ্রীযুত বিশ্বাস এ প্রশ্নের এই সাফ জবাব শুনাইয়া দিয়াছেন যে, সঙ্গত হোক, অসঙ্গত হোক, এ ব্যাপারে ভারত সরকারের কোন হাত নাই। ফলতঃ এক্ষেত্রে শ্রীযুত বিশ্বাসের যুক্তি একান্তই মামুলি। তাঁহারা তাঁহাদের কর্তব্য করিয়া খালাস হইতে চাহেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একতরফা এই নীতি অবলম্বনে তাঁহাদের সেই কর্তব্যই যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয় কি? দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্রের মধ্যে যে চুক্তি হইবে, এক পক্ষ ক্রমাগতভাবে তাহা ভঙ্গ করিয়া চলিবে এবং অপর রাষ্ট্র নিতান্ত অসহায়ভাবে তাহাই মানিয়া হইবে, এ-যুক্তি যেমন উদ্ভট, তেমনই অসঙ্গত। পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ এবং নিরাপত্তার সম্বন্ধে দায়িত্ব ভারত সরকার কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারেন না। সে দায়িত্বের কথা তাঁহারাও বহুভাবে আমাদিগকে শুনাইয়া থাকেন, কিন্তু কার্যত সেই দায়িত্ব প্রতিপালনে তাঁহাদের এই অসহায়ত্ব ভারত সরকারের রাষ্ট্রনৈতিক দৈন্য এবং দুর্বলতার এক শোচনীয় অধ্যায়ই উন্মুক্ত করিতেছে। ইহার পরিণতি কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, আমরা ভাবিয়া শঙ্কিত হইতেছি।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

গত ২২শে অগ্রহায়ণ ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বহুপ্রত্যাশিত চূড়ান্ত রিপোর্ট ভারতের উভয় সংসদে উপস্থিত করা হইয়াছে। সংসদের সদস্যদের মধ্যে বিতর্কসূত্রে এই পরিকল্পনার গুণ-দোষের আলোচনা হইবে, সুতরাং এ সম্বন্ধে আমাদের মতামত খুঁটিনাটি রকমে প্রকাশ করা আমরা স্থগিত রাখিলাম। মোটামুটিভাবে এই পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের প্রতি সুবিচার করা হয় নাই, আমরা এই কথাটিই শুধু এখন বলা প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। পরিকল্পনার বেশির ভাগ অর্থই কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের হাতে রাখা হইয়াছে। মোট দুই হাজার কোটি টাকার মধ্যে রাজ্য সরকারগুলি সকলে মিলিয়া আটশত কোটি টাকা পাইবেন। বোম্বাই ও মাদ্রাজের ভাগে যথাক্রমে ১৪৬ কো[illegible] ১৪০ কোটি টাকা পড়িয়াছে; কিন্তু এই পশ্চিমবঙ্গ! বহুসমস্যায় বিড়ম্বি[illegible] বিব্রত পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যে পড়িয়া[illegible] ৬৯ কোটি টাকা। দেশ বিভাগের ফ[illegible] সকল সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে, পরি[illegible] কমিটির রিপোর্টে তাহার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে দে[illegible] কিন্তু দেশ বিভাগের ফলে পশ্চি[illegible] সম্মুখেই সমস্যা সর্বাপেক্ষা গুরুতর দেখা দিয়াছে, অথচ সেই পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ৬৯ কোটি টাকার বরাদ্দ হইল! ইহার মূলে কি যুক্তি আছে আমাদের পক্ষে দুর্বোধ্য। গঙ্গা[illegible] উপর বাঁধ পরিকল্পনা পশ্চিমবঙ্গের নানা কারণেই অপরিহার্য; কিন্তু কল্পনা কমিশনের চূড়ান্ত রিপোর্টে দাবীও উপেক্ষিত হইয়াছে। ফর[illegible] সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর [illegible] নিবেদনে কর্ণপাত করা কর্তারা [illegible] বোধ করেন নাই। এখন সংসদে [illegible] কালে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি যাহাতে সু[illegible] ব্যবস্থা করা হয়, তৎপ্রতি পশ্চিম[illegible] সদস্যগণের বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে [illegible] তাঁহাদের চেষ্টার ফল যাহাই দাঁড়াক না জনমতের অভিব্যক্তি দানে এবং দেশ জাতির বৃহত্তর স্বার্থ সংরক্ষণে তাঁহাদের তৎপর থাকা দরকার। [illegible] এই ধরণের কোন পরিকল্পনার [illegible] শুধু পরিকল্পনা রচনার পারিপাট্যের নির্ভর করে না। পরিকল্পনাটি [illegible] পরিণত করিবার জন্য জনসাধারণকে [illegible]যোগিতা এবং তাঁহাদের সেজন্য [illegible] ও উদ্দীপনা জাগাইবার উপযোগি[illegible] তাহাতে থাকা প্রয়োজন। [illegible] অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। ইহাদের [illegible] পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবার আবশ্যক ভূমি-ব্যবস্থা সংস্কার আগ[illegible] পাঁচ বৎসরের মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব হইবে কি না, এ বিষয়ে সম্পূর্ণই স[illegible] আছে। সুতরাং পরিকল্পনাটি সা[illegible] করিতে হইলে জনসাধারণের মধ্যে যে অ[illegible] উদ্দীপনা এবং সহযোগিতার ভাব [illegible] দরকার, তাহার অভাব ঘটিবে বলি[illegible] আশংকা হয়। জাতীয় জীবনে বর্তমানে অর্থনৈতিক বৈষম্য রহিয়াছে, তাহা [illegible] করিবার উদ্দেশ্যে পরিকল্পনার মধ্যে সর্মা[illegible] ভাবে সুস্পষ্ট হওয়া উচিত ছিল ব[illegible] আমরা মনে করি। প্রধানত এই অর্থনৈ[illegible]

বৈষম্য দূর করিবার দিকে জোর দিয়াই চীন অল্প দিনের মধ্যে অসম্ভব সম্ভব করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছে; কিন্তু ভারত সরকারের নীতি এ সম্পর্কে দ্বিধাজড়িত, আদৌ বলিষ্ঠ নয়—বৈপ্লবিক তো নহেই। ইহা ছাড়া পরিকল্পনাটি যে সকল কর্মী কার্যে পরিণত করিবেন, তাঁহাদের ঐকান্তিকতার উপরও ইহার সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করিতেছে। এ বিষয়েও এদেশের শাসন-বিভাগের যথেষ্ট দুর্বলতা রহিয়াছে। দুর্নীতির প্রভাব হইতে শাসন-বিভাগ যে মুক্ত নয়, ইহা সকলেই জানেন। এই সব বিষয় বিবেচনা করিয়া আমরা পঞ্চবার্ষিকী এই পরিকল্পনার সম্বন্ধে বিশেষ আশাশীলতা পোষণ করিতে পারিতেছি না।

শিল্পপতিদের স্বার্থ-দৃষ্টি

ভারতের শিল্প-বাণিজ্য সচিব শ্রীযুত কৃষ্ণমাচারী সেদিন বোম্বাই সহরে এ দেশের শিল্পপতিদের উদ্দেশ করিয়া সত্যবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। তাঁহার উক্তি এই যে, একদল স্বার্থগৃধ্নু এবং দেশদ্রোহী ব্যবসায়ী রপ্তানি শুল্ক হ্রাস করিবার জন্য দলবদ্ধভাবে ক্রমাগত চাপ দিতেছে। দেশের স্বার্থের প্রতি ইহাদের দৃষ্টি নাই। ইহাদের নজর শুধু নিজেদেরই দিকে। শিল্প-বাণিজ্য সচিবের পক্ষে এই অভিজ্ঞতা নূতন হইতে পারে, কিন্তু দেশের লোকের কাছে এ সত্য সর্ব-জনবিদিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ভারত সরকারের অনুসৃত নীতি এই শ্রেণীর স্বার্থসেবীদের বশংবদ-ভাবেই চলিতেছে। সে নীতির কোন স্থিরতা নাই। পরন্তু শিল্পপতিদের আবদার অনুসারেই তাহা উঠা-নামা করে। শ্রীযুত কৃষ্ণমাচারী আজ যে এতটা উত্তেজিত হইয়া অপ্রিয় সত্য প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, শিল্পপতিদের বর্তমান দাবী এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, ভারত সরকারের পক্ষে সেই দাবীর সঙ্গে নিজেদের দাবী খাপ খাওয়াইয়া লওয়া অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। নতুবা এই শ্রেণীর শিল্পপতিদের আবদার তাঁহাদের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। বাণিজ্য-সচিব শিল্পপতিদের অবলম্বিত কৌশলটির তাৎপর্যও ব্যাখ্যা করিতে ভুলেন নাই। তিনি বলেন, উঁহারা কিছুদিন থাকিয়া থাকিয়াই এক একটা হুমকী দেখান এবং ইহাদের ধারণা এই যে, তাহা হইলেই সরকার তাহাদের দাবী মানিয়া লইবেন। বলা বাহুল্য, শিল্পপতিদের এই মতিগতির মূলে সরকারের নীতিই রহিয়াছে। শিল্পপতিরা বুঝিয়া লইয়াছেন যে, যে কোন রকমে একটা আতঙ্কের ভাব জাগাইয়া তুলিলেই তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়; সুতরাং বুদ্ধিমান মানুষ তাঁহারা, এমন সুযোগ ছাড়িবেন কেন? নিজেদের স্বার্থ সকলেই বুঝে। সুতরাং শিল্পকে এজন্য দোষ দেওয়া যায় না। ইঁহারা যে ন্যায় ধর্মের অবতার নহেন এবং দেশের ভাবনায় ইঁহাদের নিদ্রার কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটে সে পরিচয় কোনদিনই পাওয়া যায় নাই; অথচ দেখা যায়, ইঁহারা যখনই একটা আবদার উপস্থিত করেন, ভারত সরকারের শুল্ক নীতি তদনুযায়ী সঙ্গে সঙ্গেই পরিবর্তিত হয়। বস্ত্রশিল্পের সম্পর্কে আমরা এ পরিচয় কয়েক দফায় পাইয়াছি। শুল্ক-নীতি সম্বন্ধে ভারত সরকারের এইরূপ অব্যবস্থিতচিত্ততার কারণ এই যে, সমগ্র দেশের জনসাধারণের স্বার্থ এবং প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সুপরিকল্পিত কোন নীতি তাঁহারা এখনও অবলম্বন করিয়া চলিতেছেন না। দেশের স্বার্থ কিরূপ নীতি অবলম্বন করিলে রক্ষা হইবে, সম্ভবতঃ তাঁহারা নিজেরাই তাহা জানেন না। এজন্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট দল বিশেষের জিগীরে তাঁহারা বিচলিত হইয়া পড়েন এবং মনে করেন যে, সে জিগীরে সায় না দিলেই বিপদ। সুতরাং রাতারাতি তাঁহাদের শুল্কনীতি ওলট-পালট খায়, অথচ সমস্যা কোনদিনই মিটে না। কারণ, দাবীদারেরা আবার নিজেদের নতুন সুযোগ সৃষ্টি করিবার ফিকিরেই থাকেন। ভারত সরকারের নীতি এই অব্যবস্থিত গতিতে দেশের সমস্যা জটিল আকার ধারণ করিতেছে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

জাতীয় সঙ্গীতের বিকৃতি সাধন

বোম্বাইয়ের কংগ্রেস-কর্মীদের এক সভায় ভারতের জাতীয় সঙ্গীত বিকৃতভাবে গীত হয়। সভাপতি ছিলেন কংগ্রেস-সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল স্বয়ং। তিনি ইহার প্রতিবাদ করেন। জাতীয় সঙ্গীতে "পঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাটী, মারাঠী"র এই অংশটির পরিবর্তন করিয়া "পঞ্জাব, কামরূপ, গুজরাট, মারাঠা" এইভাবে গাওয়া হইয়াছিল। পরিবর্তনকারীদের উদ্দেশ্য বুঝিতে অবশ্য বেগ পাইতে হয় না। ভারত বিভাগের পর সিন্ধু প্রদেশ সম্পূর্ণভাবে পাকিস্থানের কুক্ষিগত হইয়াছে বস্তুতঃ রাজনীতিক এই সত্যটি এক শ্রেণীর লোকের মনে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের রচনার উপর কলম চালাইবার দুষ্প্রবৃত্তি জাগ্রত করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইহা বোম্বাইতেই প্রথমে মিলিল, এমন নয়। ইতঃপূর্বে আমরা দুই-একটি স্থানে জাতীয় সঙ্গীতকে এমনভাবে বিকৃত করিবার প্রয়াসের আভাস পাইয়াছি এবং সিন্ধুকে ঐ সঙ্গীত হইতে বাদ দিবার প্রস্তাব শুনিয়াছি। পণ্ডিত জওহরলাল বলিয়াছেন, 'রবীন্দ্রনাথের মূল রচনার পরিবর্তন করা অন্যায়। দেশে এমন বহু অংশ আছে, যেগুলির নাম জাতীয় সঙ্গীতে উল্লেখ করা হয় নাই।' কিন্তু পরিবর্তন-প্রয়াসীর লক্ষ্য 'সিন্ধু'র উপরই বিশেষ করিয়া পড়িয়াছে দেখা যাইতেছে; এ সম্বন্ধেও পণ্ডিতজীর উক্তি সমীচীন। প্রত্যুত রাজনীতিক কারণ যাহাই থাকুক, ভারত সিন্ধুকে পর করিতে পারে না এবং করা উচিতও নয়। উদ্বাস্তুস্বরূপে যেসব সিন্ধুবাসী বর্তমানে ভারতে অবস্থান করিতেছেন, এই পরিবর্তন তাঁহাদের নিকট মরার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মতই পীড়াদায়ক হইবে। ভারতের পক্ষে দুর্দৈব যে, আজ তাহাকে বিভক্ত হইতে হইয়াছে। ভারতের অখণ্ডতা আমরা রক্ষা করিতে পারি নাই। নিজেদের আদর্শকে আমরা নির্লজ্জভাবে ক্ষুণ্ণ করিয়াছি। নিজেদের লক্ষ্য হইতে আমরা বিচ্যুত হইয়াছি। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমাদিগকে কতভাবে করিতে হইবে, আমরা জানি না। কিন্তু নিজেদের সেই পাপ, সেই দুর্বলতার গ্লানিকর, ছাপ শত শত স্বদেশপ্রেমিক কর্মী এবং ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক, বাহকও পোষক সিন্ধুর যেসব সুসন্তান, তাঁহাদের গায়ে আমরা আঁটিয়া দিব, ইহার পক্ষে কোন যুক্তিই থাকিতে পারে না। প্রকৃত প্রস্তাবে সিন্ধুর ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীরা ভারতের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির জন্য গর্ব করে এবং ভারতকে আপন করিয়া দেখে, ইহাই আমরা চাই এবং এই অধিকার হইতে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করাও উচিত নহে।

বরকন্যার প্রতি

[বন্ধুকন্যার শুভপরিণয় উপলক্ষে রচিত]

নিশিকান্ত

১

আজি তোমাদের
নবজীবনের
পথ-যাত্রায় শুভক্ষণে,
হে বরকন্যা, বরণ করিয়ো চিরন্তনে।

যুগল গতির নদী-অভিযান আজিকে হ'তে
রেখো অম্লান, রেখো অবিরত অবাধ-স্রোতে

অকূল উদার
আলোক-সুধার
অতলান্তিক সিন্ধু সনে।
হে বরকন্যা, বরণ করিয়ো চিরন্তনে॥

২

মলিন-লোহিতে
মর্ত্য-মহীতে
মানব জীবন-প্রবাহে মিশি
তমোরঞ্জিত বাসনা-শোণিতে দিবস-নিশি

যে-জলধিজল আলোক-বিমুখী আবিলতায়
শুভপরিণয়ে অশুভকালের আবেশ ছায়,

আজি জ্বালো তা'র
ম্লান আঁধিকার
পাবক-সাগর-সঙ্গমনে।
হে বরকন্যা, বরণ করিয়ো চিরন্তনে॥

৩

বহুজন্মের
অপমিলনের
যবনিকাজাল এবার তোলো,
অপরিচয়ের স্বপন-মোহের ভবন ভোলো।

এবার স্বয়ং অগ্নিদেবতা যজ্ঞানলে
তোমাদের শুভমিলনের বিভা বিকশি' জ্বলে,

জ্বলে তোমাদের
প্রতি অঙ্গের
সর্বাঙ্গীণ সন্দীপনে।
হে বরকন্যা, বরণ করিয়ো চিরন্তনে॥

৪

নির্মলতার
গাঁথো ফুল-হার
শুভ্র রজনীগন্ধা তুলি',
মালা-বদলের মালাতে এবার রেখো না ধূলি

দীপক-রাগের উদ্ভাসে ঐ সানাই বাজে:
সুরের শিখায় তপন-কিরণে পবন নাচে;

গোধূলি-লগন
ঘনায়ে-গগন
রঞ্জিত হয় দিগঙ্গনে।
হে বরকন্যা, বরণ করিয়ো চিরন্তনে॥

৫

সাজো সযতনে
অরুণ বসনে,
শ্বেতচন্দন অঙ্গে মাখো,
ধূপের গন্ধে ফুলের শোভায় স্বভাব রাখো।

রাখো অন্তরে পরস্পরের যুক্তপাণি,
বলো অনাহত আত্মদানের মন্ত্রবাণী;

দেখো আঙিনায়
আলিম্পনায়
হংসমিথুন পদ্মবনে।
হে বরকন্যা, বরণ করিয়ো চিরন্তনে॥

৬

কুমারী উমার
সঙ্গে কুমার
শিবের বিবাহে মেলিয়া আঁখি
আমি তোমাদের মিলন-বাসর শিখরে রাখি।

রতি-বিজয়ার জ্যোতির তুষার মর্মে ধরি'
মদনবিজয়ী বীর্য-অনল বরণ করি;

এই পরিণয়
করি হিমালয়
হরপার্বতী-সম্মিলনে।
হে বরকন্যা, বরণ করিয়ো চিরন্তনে॥

৭

গৃহলক্ষ্মীর
হৃদয়ে অধীর
হ'ল বুঝি দেবী দাক্ষায়ণী
কন্যারে নিয়ে বর-বরণের প্রহর গণি'!

ভবন-পতির অন্তরাসনে শৈল-রাজ
সারা নিখিলের প্রিয়-পরিজনে সাধিল আজ:

স্বজন-মিলন
লভে ত্রিভুবন
এই ভবনের নিমন্ত্রণে।
হে বরকন্যা, বরণ করিয়ো চিরন্তনে॥

৮

এ উপলক্ষ্যে
কন্যাপক্ষে
আমি 'আদর্শ'-আসন পাতি'
শুভ পরিণয়ে ধ্রুবলক্ষ্যের সাধন সাধিঃ

কন্যার মাঝে বিরাজে বিশ্বজননী, তাই
বর-আবাহনে অখিল-জগৎ-জনকে পাই;

দেব-দেবী-দলে
আনি ধরাতলে
এ-মিলন মধু-আস্বাদনে।
হে বরকন্যা, বরণ করিয়ো চিরন্তনে॥

৯

কমলার সনে
কমল-শয়নে
নিখিল-স্বপনী কমলা সাথী
এল বিতরিয়া লীলা-কমলের বিমল-ভাতি।

এল শচী আর শচীন্দ্র সাথে বরুণ-ব্যোম;
সূর্যসনাথ সাবিত্রী এল, এসেছে সোম;

এল অনন্ত,
এল অবন্ধ
এই বিবাহের প্রবন্ধনে।
হে বরকন্যা, বরণ করিয়ো চিরন্তনে॥

১০

এই উৎসবে
কোন বৈভবে
বহিয়া অবনী মহোৎসবা,
প্রদীপ-মালায় জ্বলে জ্যোতিষ্কমিলন প্রভা।

শুভদৃষ্টিতে ধ্রুবতারা হয় নয়ন-তারা;
যুগল-রূপের উৎপলে আনি' অমল-ধারা

দেব-প্রজাপতি
দিল সম্মতি
সরূপের সুধা সংরচনে।
হে বরকন্যা, বরণ করিয়ো চিরন্তনে॥

১১

পুরাঙ্গনার
শুভকামনার
হুলুধ্বনিতে, শঙ্খরোলে
দেবী-অসীমার আশীর্বাদের আকাশ দোলে।

মঙ্গলঘটে পাবনী গঙ্গা আপনি আসি'
করে সঞ্চার দেব-বাঞ্ছিত সলিল রাশি;

ইন্দ্র-সভার
ওঠে ওঙ্কার
বিবাহ-মন্ত্র-উচ্চারণে।
হে বরকন্যা, বরণ করিয়ো চিরন্তনে॥

১২

আদিম-রাতের
ঘন তামসের
অরণ্যচারী নারীতে-নরে
সাধি' চন্দ্রিত মধু-যামিনীর বধূ ও বরে

তোমাদের মাঝে আছে অতন্দ্র নারীশ্বর,
রচে তোমাদের রূপান্তরের বাসর-ঘর

এই পৃথিবীর
নব নগরীর
চির মিলনের চন্দ্রায়ণে।
হে বরকন্যা, বরণ করিয়ো চিরন্তনে॥

তানসেন সঙ্গীত সম্মেলন

পঙ্কজ দত্ত

বছর পাঁচেক ধরে কলকাতার সংগীতের বার্ষিক মরশুমকে অভ্যর্থনা জানাবার দায়িত্বটা নিয়ে রেখেছেন দক্ষিণ কলকাতার তানসেন সংগীত সঙ্ঘ। ১৯৪৩ সালে সঙ্ঘটির প্রতিষ্ঠা হয় এবং ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত মাসিক একটি করে জলসার ওপরেই এদের অনুষ্ঠান পর্ব সমাধা হচ্ছিল। সাধারণে উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রচার এবং লুপ্তপ্রায় সংগীতাদি পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যকে সফল করতে গিয়ে এরা ভারতের বিভিন্ন ঘরোয়ানার সংগীতের অনুষ্ঠান বসাবার দরকারটা অনুভব করেন এবং সেই থেকেই প্রবর্তিত হয় এদের এই বার্ষিক সংগীত সম্মিলনী।

এ বছরে সম্মিলনী আরম্ভ হয় ২৮শে নভেম্বর এবং শেষ হয় ১লা ডিসেম্বর। অনুষ্ঠান ক্ষেত্র ছিলো এবারও ভবানীপুরের ইন্দিরা সিনেমা। মোট চার দিনে ছটি অধিবেশন হয়। সন্ধ্যার অধিবেশনগুলি আট ঘণ্টারও বেশী কাল স্থায়ী হয় এবং সকালের অধিবেশন চার ঘণ্টার কিছু বেশী সময় এবং সব কটি অধিবেশন মিলিয়ে মোট প্রায় ৪১ ঘণ্টা সময় গ্রহণ করা হয়েছিলো। সবশুদ্ধ ৫২জন শিল্পী যোগদান করেছিলেন; এর মধ্যে ১৭জন ছিলেন বাইরেকার। শিল্পীদের মধ্যে কণ্ঠ সংগীতজ্ঞ ছিলেন কুড়িজন, যন্ত্রসংগীতে ২৯জন এবং নৃত্যে ৩জন।

অনুষ্ঠানে মোট গানের সূচী ছিলো ১৯টি এবং বাদ্যযন্ত্রেরও তাই। কিন্তু বাদ্যের মধ্যে চর্মবাদ্যকেই বেশী রাখা হয়েছিলো। ষোলজন তবলাবাদক যোগদান করেছিলেন, তাদের মধ্যে শুধু সংগতে কাজ করেছিলেন মাত্র তিনজন আর বাকীদের মধ্যে নজন একক বাদ্যের সুযোগ পেয়েছিলেন এবং চারজন বাজিয়েছিলেন দ্বৈত লহরায়। একক মৃদঙ্গ লহরায় ছিলেন দুজন আর বাঙলার ঢোল শুনিয়েছিলেন একজন। অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে সেতার বাজনা ছিলো পাঁচ দফা, সরোদ দুদফা, সেতার ও সরোদ একবার, হারমোনিয়ম একবার, বেহালা ও সরোদ একবার, একবার শুধু বেহালা এবং একবার তার সানাই। নাচিয়েদের তিনজ ছিলো কথক নৃত্য এবং মোট চার দফা হয়।

শ্রোতাদের অনেকেই বাদ্যযন্ত্র অত বেশী হয়েছে বলে মনে করছিলেন, বি করে অতো তবলা। প্রত্যেকের সংগে সং তো তবলা ছিলোই, কেবলমাত্র তিন ধ্রুপদ ও ধামার গান ও দুবার মৃ লহরার বেলা ছাড়া, তার ওপর আট তবলা লহরা স্বতঃই খুব বেশী বলে হবেই অর্থাৎ চারদিনের সমগ্র অনুষ্ঠা ৩৮টি দফার মধ্যে এককভাবে অথবা সং হিসেবে ৩৩বার তবলা চলেছে। সম হিসেব ধরলে দেখা যায় যে, ছয়টি অ বেশনে যতো সময় লেগেছে তার প্রায় এ চতুর্থাংশ চলে গিয়েছে একক ত বাজনাতেই। বীন, বাঁশী বা সানাই এ অন্যান্য ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রের অভাবটা সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলীই অনুভব করছিলেন।

গানের দিক থেকেও টপ্পা বা বাউ কীর্তনাদি গান না থাকার জন্যে অ অনুযোগ শোনা যাচ্ছিলো। এরা বলছি সংগীতের পুনরুদ্ধার ও প্রচারই যখন ত সেন সংগীত সঙ্ঘের লক্ষ্য তখন তারা ও গান শোনাবার ব্যবস্থা রাখবেন না কে এমন সব আসরে যদি ওসব গান জায়গা পায়, তাহলে তো ওরা লোপই পেয়ে যা ওদের মধ্যেও কেউ কেউ বিভিন্ন ধা লোকসংগীতকেও এ আসরে ঠাঁই দে উচিত বলে মনে করেন। তারা বলেন, দে অধিবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণস্পন্দনের তা তালে যে সংগীতের প্রকাশ লোকসংগী তারই সুরদ্যোতনা। লোকসংগীত প্রাণে কি উদ্দাম সাড়া জাগিয়ে তুলতে পা তার প্রমাণ অবশ্য সম্মিলনীতে ছি বাঙলা দেশের ঢোল বাজনা শোনার ব্যবস্থাটির মধ্যে। লোকে দেশের আরো জায়গার ভিন্ন ভিন্ন রকমের লোকসংগীতে সঙ্গে পরিচিত হতে চায়।

অনুষ্ঠান সূচী

তানসেন সম্মিলনীর এবারকার জলস প্রভূত সাফল্য অনুষ্ঠান সূচী সাজানে ওপরে কিছুটা নির্ভর করেছে। এক এক অধিবেশনে আট-ন'টার বেশী সূচী ছি না এবং গান ও বাজনাকে এমনভা পর পর সাজিয়ে রাখা হয়েছি যার ফলে কোথাও শিল্পী তে জমাটি কিছু দিতে সক্ষম হলে

এবারকার সম্মেলনের দুই দিক্‌পাল ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁ ও ওস্তাদ আল্লাউদ্দীন খাঁ
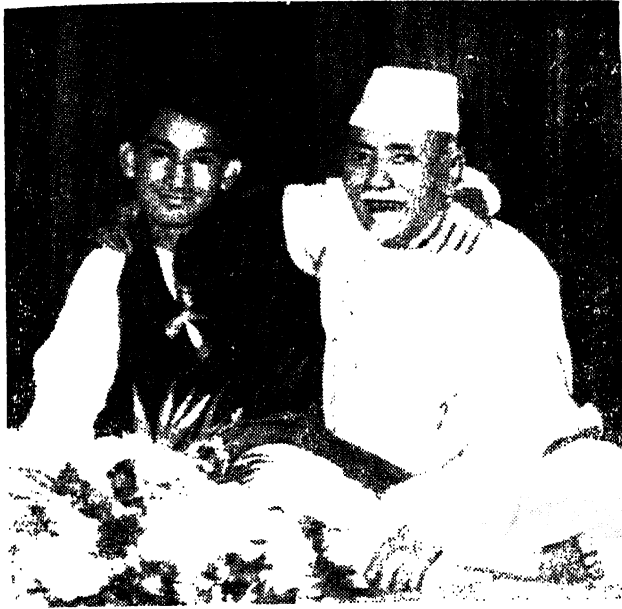
আসরে বাজাবার পূর্বমুহূর্তে পৌত্র আশীষ খাঁ ও ঠাকুর্দা আল্লাউদ্দীন

শ্রোতাদের কোনদিনই তেমন একঘেয়েমীর বিরক্তি বোধ করতে হয়নি। তবে শ্রোতারা বিরক্ত অবশ্য হয়েছে সকালের অধিবেশন দুটিতে এবং শেষদিনের শেষ অধিবেশনে।

ভোর পাঁচটা পর্যন্ত সারারাত জেগে তারপর সেইদিনই সকাল ন'টায় আবার আসরে এসে হাজির থাকা খুবই কষ্টকর। কেমন লোককে আসতেও দেখা গিয়েছে খুবই কম সংখ্যক, সকালের অধিবেশনে লোক মোটেই হয় না, আর যাও-বা এসে হাজির হন, তাঁরা হলেন রাতের শ্রোতাদের প্রত্যাশি। 'মজা' দেখারই ঝোক তাঁদের, সমঝদারী কম। শ্রোতা ভালো না হলে শিল্পীদেরও মেজাজ খোলে না, তার ওপর শ্রোতাবিরল প্রেক্ষাগৃহ। এই সবের ওপরে বিরক্তিকর হচ্ছে তাড়াহুড়ো। শিল্পীদের আসরে বসবার আগেই সময় বেঁধে দেওয়া হয়। বাঁধাবাঁধির মধ্যে গানবাজনা জমে না, আর শিল্পীরাও চটে যান। দুটো সকালের অধিবেশনই তাই নামমাত্র ব্যাপার হয়েছিল।

আকাশবাণী ও সম্মিলনী

শেষ অধিবেশনটিতে শ্রোতাদের মেজাজ বিগড়ে দিয়েছিল আকাশবাণী। রাত্রি সাড়ে দশটা থেকে বেতারে রীলে। প্রথমতঃ রীলের সময়টা ধরিয়ে দেবার জন্যে অধিবেশন আরম্ভ হতেই তাড়াহুড়োর ব্যাপার; শিল্পীদের সময় বেঁধে দেওয়া। শুধু তাই নয়, বেতারে রীলেটা যাতে খুব ভালো কোন শিল্পীকে নিয়ে আরম্ভ হতে পারে, তার জন্যে অনুষ্ঠানসূচীকে পরিবর্তনও করা হলো পর্যন্ত। তারপর রীলে চলতে চলতেই যাতে ভালো শিল্পীদের সবাইকে গাইয়ে দেওয়া যায়, তার জন্যেও গাইবার সময় বেঁধে দেওয়া—শ্রোতা ও শিল্পী উভয়পক্ষেরই এতো বিরক্তির কারণ হয়েছিলো যে, বার বার সমস্ত প্রেক্ষাগৃহই ক্ষিপ্ত হয়ে চীৎকার করে উঠেছিলো। আকাশবাণীর এমন একটা ভাব যেনো তারা সম্মিলনীর অনুষ্ঠান প্রচার করে সম্মিলনীকে ধন্য করে দিচ্ছেন; আর আকাশবাণীর সুবিধের জন্যে সম্মিলনীর কর্তৃপক্ষের হুটোপাটি দেখে মনে হলো যেন বেতারে রীলে হওয়ায় তারাও কৃতার্থ হয়েছেন। কিন্তু ঐভাবে আকাশবাণীর তাঁবেদারীতে অনুষ্ঠান পরিবর্তন ও পরিচালনা শিল্পীদের কাছে অপমানসূচক হয়েছিলো, আর শ্রোতাদের বিরক্তি ও উষ্মার কারণ হয়েছিলো। আকাশবাণীকে যদি রীলে করে বেতারশ্রোতাদের কিছু শোনাতেই হয় তো সম্মিলনীর অনুষ্ঠানসূচী মতোই তাদের চলা উচিত; সম্মেলনের শ্রোতাদের বিরক্ত করার কোন অধিকারই নেই তাদের। আর সম্মিলনীর কর্তৃপক্ষেরও জেনে রাখা উচিত যে, আকাশবাণী রীলে করতে আসছে, তাদের নিজেদের স্বার্থে, বেতারশ্রোতাদের সুবিধের জন্যে, তাই বলে কোন্ বিবেচনায় তারা সম্মিলনীতে উপস্থিত শ্রোতাদের বঞ্চিত করতে পারেন?

সম্মিলনীর সাফল্য

এবারের তানসেন সম্মিলনী সঙ্গীতে যে পুলক এনে দিয়েছে শ্রোতাদের তা আজীবনই মনে থাকবে। বিশেষ করে হচ্ছে বাদ্যযন্ত্রের দিকে। ওস্তাদ আল্লাউদ্দীন খাঁ, রবীন্দ্রশঙ্কর, আলি আকবর এর আগেও এই আসরে বাজিয়ে গিয়েছেন; কিন্তু এবারে তারা এককভাবে, দ্বৈতভাবে, সম্মিলিতভাবে ভারতীয় সঙ্গীতের যে মাধুর্য ফুটিয়ে তুলেছিলেন সকলে একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, অন্তত কলকাতার আসরে এমনটি আর শোনা যায়নি কখনও। ভারতীয় সঙ্গীত যে সমগ্র পৃথিবীরই একটা কত বড়ো সম্পদ, উপস্থিত শ্রোতাদের প্রতি জনের নিবিড় অনুভূতিতে তা পৌঁচেছিলো ঐ কদিন।

ওস্তাদ আল্লাউদ্দীন খাঁ তো এক পরম বিস্ময়। তিরাশি বৎসরের বৃদ্ধ কিন্তু সে কি প্রাণশক্তি! দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে রাত তিনটে থেকে একা এক নাগাড়ে প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে সরোদ ও বেহালা বাজিয়ে শোনালেন। শুধু শোনালেনই না, সুরের অসংখ্য ছন্দের সৃষ্টি করে যে রূপৈশ্বর্যকে সামনে তুলে ধরেছিলেন, তার আর কোন তুলনা পাইনি আমরা। বিস্ময় আরও বেড়ে গেলো শেষ দিনের অধিবেশনে একনাগাড়ে চার ঘণ্টা বাজিয়ে যাওয়া দেখে। বিচিত্র বর্ণময় কতো স্বপ্নরাজ্যের শোভা আর রূপকথার সৌন্দর্য সুরে সুরে তিনি গেঁথে গিয়েছিলেন, জীবনের শেষদিন পর্যন্তও স্মৃতিতে তা ভেসে থাকবে। সঙ্গীত জগতের একটা ইতিহাসও তিনি রচনা করে গেলেন এবারে তিনপুরুষ একসঙ্গে বাজিয়ে—তিনি, পুত্র আলি আকবর এবং পৌত্র মহম্মদ আশীষকুমার খাঁ। সাধারণ্যে এই তিনপুরুষ শিল্পীর একত্রে বাজানোও এই প্রথম এবং সাধারণ্যে আশীষকুমারেরও আত্মপ্রকাশ এই প্রথম। তানসেন সম্মিলনীর এ এক ঐতিহাসিক কৃতিত্ব।
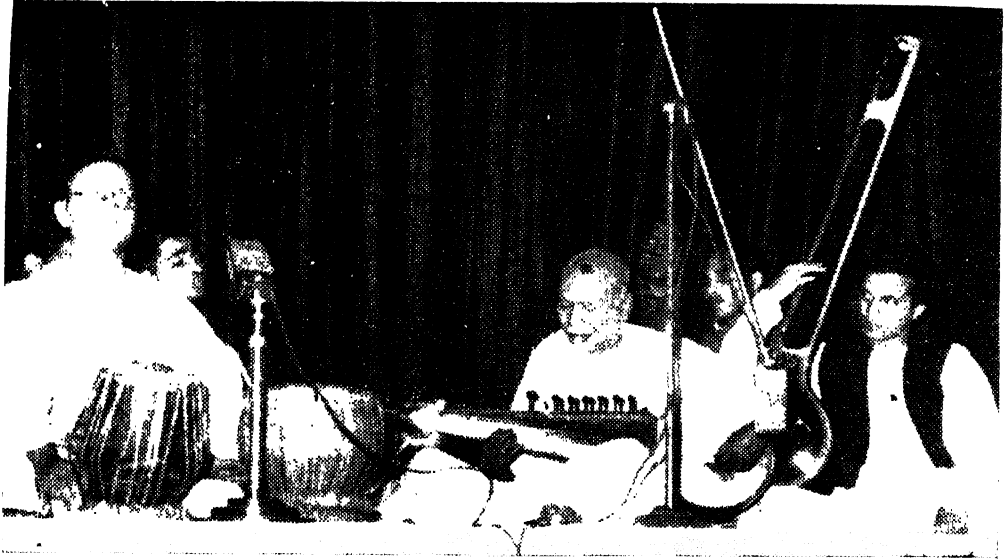
দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে সরোদ বাজনায় তন্ময় ওস্তাদ আল্লাউদ্দীন খাঁঃ সংগত করছেন হীরু গাঙ্গুলী ও তানপুরায় সুর ছাড়ছেন রবীন্দ্রশঙ্কর

সম্মিলনীতে প্রধান আকর্ষণের মধ্যে আর ছিলেন করাচীর বড়ে গোলাম আলি খাঁ। আগে অনেকবার তিনি কলকাতার জলসায় যোগদান করেছেন। এবারে সম্মিলনীতে তিনি দ্বিতীয় দিনে এবং শেষদিনের অধিবেশনে গান শোনান। তার গলা এবং সুরের কাজ আগের মতোই আছে, এবারে যেনো তেমন তৃপ্তি পাওয়া গেলো না। মনে হলো তিনি যেন কলকাতার শ্রোতাদের চিনে নিয়েছেন যে শ্রোতারা একখানি কি দুখানি গান শুনে তৃপ্ত হতে চায় না। শ্রোতাদের আবদারও তাকে রাখতেই হয়। শ্রোতাদের আবদার মতো শেষ পর্যন্ত তাদের প্রিয় গানগুলি না গাইলে রেহাই নেই। ফলে পাঁচ ছ'খানি করে গান তাকে গাইতেই হয়; কাজেই একখানি গানে তিনি বেশী সময় দিতে পারেন না। পনেরো কুড়ি মিনিটের মধ্যেই তাকে এক একখানি গান শেষ করতে হয় বলে মনে হয় যেন গানটি পুরো হলো না—এই রকম একটা অতৃপ্তি রেখে গিয়েছেন তিনি এবারে।

বম্বের সরস্বতীবাঈ রাণে প্রথম দিনেই আবদুল করিমের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। ঐ ঘারানারই শিষ্যা তিনি; তিনি শিখেছেন তার দিদি হীরাবাঈ বরোদকারের কাছে, আর হীরাবাঈ হচ্ছেন আবদুল করিমের সুশিষ্যা। সরস্বতীবাঈ প্রথম দিন ঘণ্টাখানেক গান শুনিয়েই তার স্তাবক সৃষ্টি করে নিতে পেরেছিলেন। শেষ অধিবেশনেও তার গান ছিলো, কিন্তু আকাশবাণীর তাড়াহুড়োতে মাত্র আধ ঘণ্টার মধ্যেই তাকে আসর ছেড়ে দিতে হয়; শ্রোতারা তৃপ্তিলাভে বঞ্চিত হয়। তিনপুরুষের সরোদের মাঝখানে তবলা সংগত নিয়ে একটা দারুণ হট্টগোলের সৃষ্টি হয়। সেই ফাঁকে শ্রোতাদের মধ্যে থেকে আবদার জানানো হয় সরোদ বাজানো শেষ হলে যেন সরস্বতীবাঈকে গাইতে দেওয়া হয়। একজন শিল্পী আসরে থাকতে থাকতে আর একজন শিল্পীর জন্যে আবদার জানানোটা অসৌজন্যের পরিচায়ক, তবে মনে হলো যারা ঐ আবদার জানিয়েছিলেন, তাঁরা ওরকম কিছু ভেবে দেখেন নি। যাই হোক শেষ পর্যন্ত তিনপুরুষের সরোদেই এমনি প্রাণমন ভরে উঠেছিলো যে তারপর সরস্বতীবাঈয়ের কথা কারুর মনেও ছিলো কিনা সন্দেহ। তাছাড়া সরোদেই ভোর পাঁচটা বেজে গিয়েছিলো কাজেই, আর কিছু তখন শ্রোতাদের দরকারও ছিলো না।

শ্রোতাদের উদ্বেগ

সময়ের ব্যাপারে কতকগুলি বিষয় লক্ষ্য করার আছে। সন্ধ্যের অধিবেশন ৮টায় লেখা থাকলেও আরম্ভ হতে সাড়ে-আট পোনে-ন'য় আগে হয়নি। কিন্তু মাঝ রাত থে শ্রোতাদের মধ্যে একটা উদ্বেগ সৃষ্টি হ থাকে। উদ্বেগটা হচ্ছে গৃহে প্রত্যা নিয়ে। কেবলই তারা মনে করতে থা অনুষ্ঠান যেন রাত দু'টো তিনটেতে না হয়। শীতের রাতে তারা যাবেন তখ কোথায়! ট্রাম বাসও থাকে না বাড়ি ফে বার। এই আশঙ্কায় শ্রোতারা শেষের দি শিল্পীদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে থাকে নানা আবদার জানিয়ে যাতে তাদের হওয়া পর্যন্ত সময় আটকে রাখা যায়। অ সকালের দিকে অনুষ্ঠান গড়িয়ে যাক লো আপত্তি করবে না, কিন্তু মাঝরাতে হবার আশঙ্কা থাকলেই শ্রোতাদের ম স্থৈর্য আর থাকে না। অনুষ্ঠান প চালকমণ্ডলী সময়ের এই দিকটায় ন রাখলে শ্রোতাদের পক্ষে শান্তির স সংগীত উপভোগ করা সম্ভব হয়।

উদ্বোধন

উদ্বোধন অনুষ্ঠানের মধ্যে কোন আড় ছিলো না। সন্ধ্যা আটটা বলে সময় দে থাকলেও আরম্ভ হয় আধ ঘণ্টা প সভাপতি হন কলিকাতা কর্পোরেশ কমিশনার শ্রীবিনয়কুমার সেন এবং প্র অতিথি হন পশ্চিমবঙ্গের বিচারবিভাগ **মন্ত্রী শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু। শ্রীমতী বি**

ঘোষ দস্তিদারের 'বন্দে মাতরম্' গানের সঙ্গে অধিবেশনের উদ্বোধন হয়।

তানসেন সঙ্গীত সংঘের যুগ্ম সম্পাদক শৈলেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সংঘের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। তিনি জানান সংঘের পরিচালনায় সঙ্গীত শিক্ষার একটি কলেজ স্থাপনের জন্য এমনিধারা সম্মিলনীর সহায়ে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রথম সম্মিলনীটি অর্থার্জনের দিক দিয়ে ব্যর্থ হয়, সঙ্ঘ ঋণগ্রস্ত হয়। কিন্তু এখন তাঁরা আগের ঋণ তো শোধ করে দিয়েছেনই, উপরন্তু কলেজের তহবীলেও অর্থ সাহায্য করতে সক্ষম হচ্ছেন। তানসেন সঙ্গীত কলেজটি ইন্দ্র রায় রোডের রঘুনাথ চৌধুরীয়োল হলে স্থাপিত। সঙ্গীত সম্পর্কে পুস্তক প্রকাশের চেষ্টাও তাঁরা করেছেন। জাতীয় সঙ্গীত প্রচার, চর্চা এবং গ্রন্থ প্রকাশাদি ব্যাপারে সাহায্যের জন্য গভর্ণমেন্টের দৃষ্টি তিনি আকর্ষণ করেন। শৈলেন্দ্রনাথ জানান যে, কলকাতার সঙ্গীত-রসিকদের সহায়তাতেই তানসেন সঙ্গীত কলেজটির প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে।

প্রধান অতিথি শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু বৈদিক যুগ বা তারও আগের সময় থেকে সঙ্গীতের উৎপত্তির কথা উল্লেখ করেন। তারপর যুগে যুগে বহু গুণীর আবির্ভাবে সঙ্গীত পুষ্টতর হয়ে ওঠে। তিনি বলেন, আগে গান-বাজনা রাজা-মহারাজাদের দরবারেই সীমাবদ্ধ ছিল। অল্পকাল আগেও সাধারণ লোকে গান-বাজনা পছন্দ করতো না: এখন গান-বাজনা শিক্ষারও অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি চান, মানুষের দৈনন্দিন প্রতিটি কাজের মধ্যে যেন গান-বাজনা মিশে থাকে। ইউনিভার্সিটির শিক্ষার মধ্যে দিয়ে গান-বাজনার আরও চর্চা হোক।

সভাপতি শ্রীবিনয়কুমার সেন বলেন, সঙ্গীত আজ আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে। রাগ-রাগিণী সম্পর্কে তার কোন জ্ঞান না থাকলেও ভালো সঙ্গীত তিনি উপভোগ করেন। সঙ্গীত লোককে মোহিত করে দেয়—লোককে কাঁদাতে পারে, হাসাতে পারে। সঙ্গীত মানুষের অন্তরের গভীরতায় গিয়ে পৌঁছয়। বাঙলার সঙ্গীতও অত্যন্ত উচ্চ স্তরে পোঁছেছে, তার প্রমাণ, ভারতের দুটি জাতীয় সঙ্গীতেরই উদ্ভব বাঙলা দেশে। তিনি বলেন, সমবেত সঙ্গীতের (Community Songs) দিকটা আমরা অবহেলা করে আসছি। তিনি অনুরোধ করেন তানসেন সঙ্ঘ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত প্রচারের সঙ্গে যেন সমবেত সঙ্গীত রচনায়ও সচেষ্ট হন, কারণ সমবেত সঙ্গীত মানুষকে পরস্পরের কাছে টেনে আনে। সঙ্গীত জীবনের অনেক কাজে লাগে।

প্রথম অধিবেশন

বক্তৃতাদির পর প্রায় সাড়ে নটাতে প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হয় ওস্তাদ দবীর খাঁর ধ্রুপদ গান নিয়ে। বেশ মানানসই আরম্ভ। তারপর দ্বৈত খেয়াল গাইলেন অরুণা ও শিপ্রা চক্রবর্তী ভগিনীদ্বয়। আসর ঠিক-

বোম্বাইয়ের সরস্বতী বাঈ রাণে

ভাবে জমলো এর পরই অনোখীলালের তবলা লহরা থেকে। বানারসের কণ্ঠে মহারাজের এই শিষ্যটি অনেক দিন ধরেই প্রতিবছর এই সময়ে কলকাতার আসরে বাজনা শুনিয়ে আসছেন এবং বেশ একদল স্তাবকও তিনি তৈরী করে নিয়েছেন। মিষ্টি হাতের জন্যে তার খ্যাতি; সে খ্যাতি তিনি এবারেও বজায় রেখে গেলেন। এর পরই হয় কালিদাস সান্যালের মালকোষ রাগে খেয়াল গান; তার সঙ্গে তবলা সঙ্গত করেন বানারসের ভিখু মহারাজের ছাত্র শান্তাপ্রসাদ। এর পর হয় বম্বের শিল্পী শীলা নায়েকের কথক নাচ; সঙ্গে তবলা বাজান ইকবাল হোসেন খাঁ। কলকাতার সম্মিলনীতে দাঁড়িয়ে নাচ দেখাবার মতো শিল্পচাতুর্য তিনি দেখাতে পারেন নি, তবে একেবারে অপাংক্তেয়ও নয়।

নাচ দেখতে দেখতে প্রশ্ন জাগছিলো, এখানকার সঙ্গীত সম্মিলনীগুলিতে একমাত্র কথক নাচকেই রাখা হয় কেন? শিল্পী তো আনা হয় বাইরে থেকেই, তাহলে মাদ্রাজের ভারতনাট্যম কি কথাকলি, মণিপুর থেকে শিল্পীর দল আনানো হয় না কেন? সম্মিলনীর সংগঠকদের কেবলমাত্র কথক নাচের ওপর পক্ষপাতিত্বের কারণ বুঝা যায় না।

নাচের পর বেহাগে খেয়াল গাইয়ে শোনান কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়; এবারও তবলা সঙ্গত করেন শান্তাপ্রসাদ। কলকাতার শিল্পীদের মধ্যে কাশীনাথের গানই জমেছিলো এবার সবচেয়ে। স্থানীয় শিল্পীরা কেউ আসরে বসলে দেখা যায় শ্রোতারা যেন তাদের অবজ্ঞা করতে চান। এখানকার সব সম্মিলনীতেই এই ব্যাপার দেখা যায়। ক্রমশ এইভাবটা অবশ্য কমে আসছে, তবে সে রাতের অধিবেশনে গোড়ার দিকে স্থানীয় শিল্পীদের বেলা শ্রোতৃমণ্ডলীর একাংশকে আকস্মিকভাবে অন্যমনস্ক হয়ে যেতে দেখা গিয়েছিলো। কাশীনাথবাবু গান ধরবার মুখে শ্রোতাদের আবার সেই অন্যমনস্কতা দেখা দিলেও, তা অল্পক্ষণের জন্যেই ছিলো, বেহাগের তানকে শ্রোতাদের পক্ষে উপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি। বেশ জমেছিলো গানটি। আর এ পর্যন্ত শান্তাপ্রসাদের সঙ্গতও ছিলো বেশ নম্র। শান্তাপ্রসাদ উদ্দাম হয়ে উঠলেন এর ঠিক পরই মায়া মিত্রের সেতার বাজনার সঙ্গে সঙ্গত করতে। মায়া মিত্রের রাগটা ছিলো সুন্দরকোষ। এর শিল্প-সম্ভাবনা আছে এবং সুরের খেলায় মেজাজও আনতে পারেন, অন্তত আসরে বসবার যোগ্যতা দেখিয়েছেন। কিন্তু শান্তাপ্রসাদের উদ্দাম বাজনার চোটে সময় সময় সেতারের সুক্ষ্ম কাজ চাপা পড়ে যাচ্ছিলো।

আসরের মেজাজটা ঠিকভাবে তৈরী হলো সরস্বতীবাঈ রাণের গান থেকে। প্রথমে তিনি খেয়াল গাইলেন চন্দ্রকোষ রাগে; তার সঙ্গে সঙ্গত করলেন অনোখীলাল। রাত তখন প্রায় আড়াইটে। তানপুরার তার ঝঙ্কৃত হতেই সারা প্রেক্ষাগৃহে একটা থমথমে ভাব জেগে উঠলো। শান্ত আবহাওয়া, উদ্গ্রীব শ্রোতৃমণ্ডলী। সরস্বতীবাঈ হলেন আবদুল করীম খাঁর ঘরাণার শিল্পী—যে খাঁ সাহেব কলকাতার সঙ্গীত-রসিকদের শিল্পানুভূতিতে আজও

জীবিত রয়েছেন। সরস্বতীবাঈ সরাসরি-ভাবে আব্দুল করীমের কাছে শেখেন নি, তিনি শিখেছেন আব্দুল করীমের ঘরাণার শ্রেষ্ঠ শিল্পী হীরাবাঈ বরোদকারের কাছ থেকে। হীরাবাঈ কলকাতার আসরের অতি জনপ্রিয়া শিল্পী, আর সরস্বতীবাঈ তাঁরই কনিষ্ঠা ভগিনী। তাই লোকের অমন উদ্‌গ্রীবতা দেখা গিয়েছিলো, সরস্বতীবাঈও তাঁর ঘরাণার মান রেখে দিতে পেরে-ছিলেন, গলা খুবই মিষ্ট এবং সুরের কাজও ছন্দোমধুর; শ্রোতাদের আশা তিনি মেটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তবলায় অনোখীলালের নম্র বোল গায়িকার কণ্ঠের অতি সূক্ষ্ম শিল্পকাজগুলিকেও উপভোগ করার সুযোগ দিয়েছিলো। খেয়াল গান-খানির পর সরস্বতীবাঈ শোনালেন ঠুংরী "হোরি খেলো মুক্সে নন্দলাল" এবং তারপর একখানি ভজন শোনালেন "গোবর্ধন গিরিধারী"। শেষের দিকে তিনি যে তাড়াতাড়িতে সেরে নিতে চাইছেন, সেটা বোঝা গেলো। তাহলেও তিনি দক্ষিণ কলকাতার এই আসরে প্রথমদিনেই যে ছাপ রেখে গেলেন, তাতে তিনি সঙ্গীত-রসিকদের মনে স্থায়ী আসন করে নিতে পেরেছেন বলা যেতে পারে।

আসরের মতো আসর জমলো রাত সাড়ে তিনটে থেকে রবীন্দ্রশঙ্কর যখন সেতার নিয়ে বসলেন। সঙ্গে আর একটি সেতার নিয়ে বসলেন তাঁরই ছাত্র উমাশঙ্কর মিশ্র। তবলা নিয়ে বসলেন শান্তাপ্রসাদ। রাগ—আহীর ললিত। আলাপ আরম্ভ হলো সাদামাটা কাজ ধরে। তারপর আলাপ যতো এগিয়ে যেতে লাগলো, ততোই বের হতে লাগলো ছন্দোবৈচিত্র্য। মায়াময় সুরের জাল বিস্তৃত হয়ে গেলো। সুরের সে কি মধুর সৌন্দর্য, শিল্পীরও সে কি খুশীর মেজাজ! অবর্ণনীয় সেই পুলকানুভূতি। সত্তর মিনিট ধরে তিনি আলাপ করে তারপর গৎ ধরলেন। এবার থেকে শান্তা-প্রসাদের তবলাও গেয়ে চললো সঙ্গে সঙ্গে। শান্তাপ্রসাদের উদ্দাম কসরত বরাবর চাগা দিয়ে উঠছিলো আর রবীন্দ্রশঙ্কর তানের চাতুরীপনায় প্রতিবারেই তা দাবিয়ে দিচ্ছিলেন। তবলার সঙ্গতে শেষের দিকে শান্তাপ্রসাদ পাল্লা ঠিক রাখতে পেরেছিলেন কিন্তু বেশ খানিকক্ষণ নাজেহাল হবার পর। পঞ্চাশ মিনিট ধরে গৎ বাজানো হলো। অর্থাৎ আলাপে ও গৎ-এ দু'ঘণ্টার ওপর পার হয়ে গিয়েছে; সময় প্রবাহের দিকে কোনও হুঁশও ছিলো না কারুর। কতো বিচিত্র রকমের সুরের খেলা, স্বপ্নের অঞ্জন মাখানো কতো অপূর্ব তান। পুলককে প্রতিক্ষণে রোমাঞ্চিত করে রেখে দিয়েছিলো এমনিভাবে যে, শেষ হতেই বিপুল হর্ষ-ধ্বনিতে সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফেটে পড়লো। সকলেই একসঙ্গে অনুভব করলেন যে, অমন বাজনা আর কখনও শোনা যায় নি। ভোর পাঁচটা তখন বেজে গিয়েছে, রবীন্দ্রশঙ্কর এবারে ধরলেন ভৈরবী। এবারে তবলায় বসলেন অনোখীলাল। এর

বেনারসের তারাবাঈ

আগে একবার বাজানার সময় শান্তাপ্রসাদ বাঁয়ায় কতো রকমের কেরামতি দেখানো যেতে পারে, তার নিদর্শন দিয়ে রেখেছিলেন; অনোখীলাল তাই খানিকক্ষণ বাজাবার পর তার বাঁয়ার কাজ দুর্বল বলে জানিয়ে রেখে দিলেন। কার্যত কিন্তু তেমন কোন দুর্বলতার পরিচয় পাওয়া গেলো না। তবে অনোখীলাল রবীন্দ্রশঙ্করের সেতারের সঙ্গে শান্তাপ্রসাদের মতো পাল্লা দিয়ে তবলার কসরৎ দেখাবার ঝোঁক দেখান নি। রবীন্দ্র-শঙ্কর আগের আহীর-ললিতে বসন্তের যে স্বপ্নালুতার সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন, শ্রোতাদের মনে ভৈরবীতে যেন সে অনুভূতিকে আরও সজাগ করে দিলেন। কোন্ রাগটা বেশী ভালো লাগলো, সেটা বিচার করার কোন অবকাশ পাওয়া গেলো না, কিন্তু রবীন্দ্রশঙ্কর যে সকল শ্রোতাকেই সে রাত্রে একটা পরম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে রাখবার সুযোগ এনে দিয়েছিলেন, সেই কথাই মুখরিত হয়ে উঠলো শ্রোতাদের মধ্যে।

দ্বিতীয় অধিবেশন

দ্বিতীয় অধিবেশন আরম্ভ হলো কথক নাচ দিয়ে। প্রথমে নাচলেন ভারতী রায়, সঙ্গে তবলা বাজালেন কপিলদেও চতুর্বেদী। শিল্পী অল্পবয়স্কা বালিকা মাত্র, শিক্ষা-নবীশীর ছাপ সর্বক্ষেত্রে। এর পর নাচতে এলেন লক্ষ্ণৌয়ের নৃত্যরতন চোবে মহারাজ। কালকাবৃন্দা ঘরাণার শিল্পী ইনি। শান্তা-প্রসাদ তবলা নিয়ে বসেই নাচের সঙ্গে কি রকমের তবলা বাজাতে হয় তা দেখিয়ে দেবেন জানিয়ে দিলেন। তারপরই আরম্ভ করে দিলেন বাজাতে। চোবে মহারাজ [illegible] তবলার বোলের তোড়ে নাচ ধরবার অবকাশই পাচ্ছিলেন না। শান্তাপ্রসাদ চাইছিলেন নাচটা তাঁর বাজনার তালে হোক, অর্থাৎ লোকে তার তবলাই শুনতে থাকুক। [illegible] ক্রমে একটা তাল পেয়ে চোবে মহারাজ নাচ আরম্ভ করলেন। অতি পাকা শিল্পী, শান্তাপ্রসাদকে কেবল বাগেই নিয়ে এলেন না, মাঝে মাঝে শান্তাপ্রসাদের মাথাও গুলিয়ে দিয়েছিলেন। রমণীয় নৃত্যশৈলী রচনা করতে পেরেছিলেন চোবে মহারাজ এবং বলা যায় এ পর্যন্ত এখানে [illegible] কথক নাচিয়ে এসেছেন ইনি তাদের মধ্যে বিশিষ্ট শিল্পী। প্রথম দিনের শেষের দিক থেকে যে খুশীর মেজাজটা ধরে গিয়েছিলো চোবে মহারাজ তাকে জাগিয়ে তুললেন।

নাচের পর রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মালকোষে ধ্রুপদ গাইলেন; মৃদঙ্গ বাজালেন আরার শত্রুঞ্জয়প্রসাদ সিংহ। এর পর আবার আসর জমলো মহাপুরুষ মিশ্র এবং অনিল রায়চৌধুরীর দ্বৈত-তবলা লহরায়। অল্পবয়স্ক শিক্ষানবীশ দুজনেই। প্রথম হলেন অনোখীলালের শিষ্য আর দ্বিতীয় কেরামৎ খাঁয়ের। মহাপুরুষই বাজিমাৎ করেছিলেন; বিশেষ করে ওপর বাঁয়ার কাজটি অদ্ভুত পরিষ্কার। এরপর চাঁদনী কেদারায় খেয়াল গাইলেন ভবানীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়। তারপর সেতার বাজালেন মদন দাস; সঙ্গত করলেন মহাপুরুষ মিশ্র। আগের রাতের রবীন্দ্রশঙ্করের পর তা কানেই বাজে না অন্য কারুর সেতার। স্থানীয় শিল্পী গঙ্গাদাস ঝাওর মহা-পুরুষের সঙ্গতে দরবারি কানাড়ায় খেয়াল গাইলেন। তারপর একখানা ঠুংরী

আসরের মৌজ তখন অধোগামী। আসরকে বাঁচিয়ে তুললেন বড়ে গোলাম আলি খাঁ এসে। অনুষ্ঠানের সব শেষে তার গাইবার কথা ছিলো, কিন্তু তাঁকে এগিয়ে দিয়ে ওস্তাদ আল্লাউদ্দীন খাঁর সরোদ রাখা হলো সব শেষে। এ পরিবর্তন ভালোই হ'লো। বড়ে গোলাম আলির সঙ্গে তবলা নিয়ে বসলেন কেরামৎ খাঁ। প্রথমটা হ'লো জয়জয়ন্তীতে খেয়াল একখানা। তারপরে গাইলেন একখানি ঠুংরী। লোকের তৃপ্তি পুরো হ'লো না। এক একজন এক একটা গানের ফরমাস করতে লাগলো। ওস্তাদজী গাইলেন "অ্যাসে বালম মুঝসে প্রীত কিয়ে পছতাই"। তাতেও তৃপ্ত নয় লোকে। শেষে তিনি গাইলেন তাঁর বিখ্যাত গানখানি "হরি ওম্ তৎসৎ"। ছন্দে, সুরে, কণ্ঠে সে যে কি দরদ ফুটে উঠেছিলো তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। মন্ত্রমুগ্ধের মতো সম্মোহিত হ'য়ে শ্রোতারা শুনলেন গানখানি; সব শ্রান্তি মুছে গেলো।

রাত তিনটের সময় সরোদ নিয়ে বসলেন ওস্তাদ আল্লাউদ্দীন খাঁ। বসবার আগেই তিনি তাঁর গুরু উজীর খাঁর পৌত্র ওস্তাদ দবীর খাঁকে দিয়ে তাঁর যন্ত্রটি স্পর্শ করিয়ে আশীর্বাদ নিলেন। তবলা সঙ্গতে বসলেন হীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। তানপুরা হাতে বসলেন রবীন্দ্রশঙ্কর। ওস্তাদজী আসরে বসতেই প্রেক্ষাগৃহের আবহাওয়াটাই উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠলো; তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যেই ছিলো এমন কিছু। ছোটখাটো মানুষটি; শিশুর মতো সরল। দেখা মাত্রই শ্রদ্ধা জেগে ওঠে। আলাপ আরম্ভতেই এমন একটা শোভা তুলে ধরলেন যা শ্রোতাদের অন্তরকে সঙ্গে সঙ্গেই উচ্চকিত ক'রে তুললো। অপূর্ব পুলকরেশ বাতাসে বাতাসে অনুরণিত ক'রে অভূতপূর্ব সঙ্গীতশোভা রচনা ক'রে দিলেন। নিজে একেবারে সমাধিস্থ। মাঝে মাঝে অনুচ্চকণ্ঠে গাইছেন "আল্লা, আল্লা, আল্লা, আল্লা"; বা "রাম রাম সীতারাম"। অপূর্ব মিষ্টি তান উঠতে লাগলো। মাঝে মাঝে তার ছিঁড়ে যায় আর তাঁর ধ্যান ভাঙতে থাকে। একবার তার বাঁধতে বাঁধতে এক কলি গান শোনালেন, বললেন ঢাকার রাগ সেটা। শ্রোতৃমণ্ডলী হৈ হৈ ক'রে উঠলো গান শোনবার জন্যে। বললেন, গানের তিনি কিছুই জানেন না, কেবল গাধার মতো চিল্লানই হবে; তবুও আর এক কলি গান ধরলেন, ওদিকে তার বাঁধা কিন্তু

বম্বের আল্লারাখা খাঁ

চলছে সমান তালে। তার ঠিক হ'তে গান বন্ধ হ'য়ে বাজনা চললো আবার। একটু পরে আবার তার ছিঁড়লো। এবারে তার বাঁধতে বাঁধতে অন্য একটা গান ধরলেন, বললেন, তিনি যখন মিনার্ভা থিয়েটারে কাজ করতেন তখনকার আমলে থিয়েটারে ঐরকম গান হ'তো; ধামারের ছোঁয়াচ রয়েছে সে গানে। তার ঠিক ক'রে আবার বাজনা ধরলেন। এবারে জমে উঠলো আগের চেয়ে আরও মাধুর্য বিস্তার ক'রে। ছন্দের আর

আগ্রার বসীর খাঁ

সুরের সে কি বাহার! কথার মালা গেঁথে সে সৌন্দর্যানুভূতিকে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এ শিল্পমাধুর্যের তুলনাও ভেবে ঠিক করা যায় না। আর সঙ্গে তেমনি অপূর্ব তবলা সঙ্গত ক'রে গেলেন হীরুবাবু। খাঁ সাহেব পর্যন্ত মুগ্ধ হ'য়ে বার বার উচ্ছ্বসিতভাবে হীরুবাবুকে অভিবাদন জানাতে থাকেন। প্রায় দেড় ঘণ্টা একটানা বাজিয়ে গেলেন খাঁ সাহেব; যতক্ষণ বাজনা চলছিল জগতের সব খেয়ালই চাপা প'ড়ে গিয়েছিলো। এমন উদ্দীপনা কারুর বাজনাতে এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। সরোদের পর তিনি বেহালা নিয়ে বসলেন। এবারে তবলা ধরলেন কেরামৎ খাঁ। লোকে তখন একেবারেই সম্মোহিত হয়ে রয়েছে। পঁচিশ মিনিট ধ'রে বেহালা বাজালেন ওস্তাদজী। তাতেও তিনি সুরের যে খেলা শোনালেন তাও স্মরণে থেকে যাবে দীর্ঘকাল। এমন মধুময় অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ জীবনে কমই আসে।

তৃতীয় অধিবেশন

তৃতীয় অধিবেশন বসে রবিবার সকাল ৯-৩০টায়। আরম্ভই হ'লো নির্ধারিত সময়ের প্রায় আধ ঘণ্টা পরে, তার ওপর ছিলো বেলা দুটোর মধ্যে প্রেক্ষাগৃহ ছেড়ে দেবার তাড়া। হাতে মাত্র সাড়ে চার ঘণ্টা সময়, তার মধ্যে ছ' দফা গান বাজনা এবং একটা নাচ। শিল্পীরা জমাতে না জমাতেই থামবার জন্যে লাল আলোর সঙ্কেত, ফলে কারুরই গুণের সঠিক পরিচয় পাওয়া গেল না। এরকম অধিবেশনের সার্থকতাই বোঝা গেল না। অনিল বসুর বেহালা দিয়ে অধিবেশন আরম্ভ হ'লো। তারপর বসলেন মৃদঙ্গ লহরা শোনাতে আরার শত্রুঞ্জয়প্রসাদ সিং; বোলচাল তিনি অনেক রকমের জানেন বোঝা গেল। কুতুবুদ্দীন ৪ তাল ১২ মাত্রার যে বোল শুনে বারো হাজার মুদ্রা ইনাম দিয়েছিলেন; পাগলা হাতীকে যে বোল শুনিয়ে কুতুবুদ্দীন পোষ মানাতেন; সিংহ শিকারের জন্য যে বোল বাজতো, এমনি ধারা নানা জাতের বোল তিনি শোনাতে আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু লাল আলোর ইঙ্গিতে অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ ক'রে তিনি আসর ত্যাগ করলেন। এর পর এলেন আগ্রার ওস্তাদ বসীর খাঁ। রঙিলা ঘরাণার শিল্পী তিনি, ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর ভাগ্নে। মিনিট পঁচিশ একটি ধামার গেয়ে আর একটি

ধামার ধরেছেন সবে, সঙ্গে সঙ্গে লাল আলো জ্বলে উঠলো। খাঁ সাহেব বিরক্তি প্রকাশ করলেন। দ্বিতীয়টি তাঁর খেয়াল গাইবার কথা, কিন্তু ধামার আরম্ভ করাতেই তাঁকে লাল আলোর সাহায্যে খেয়াল গাইবার সংকেত দেওয়া হ'লো। বসীর খাঁ বেশ চটে গিয়েছেন মনে হ'লো—ধামারের পর খেয়াল গাইতে চাইছিলেন না ব'লে একটা অনুযোগ তুলে খেয়ালই গাইতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু মিনিট পাঁচেক গাইতেই আবার লাল আলো। মনে হ'লো বেশ অপমান বোধ করেছেন বসীর খাঁ, একটু যেন চটে গিয়েই আসর ত্যাগ করলেন। আসরে এসে বসলেন বানারসের তারাবাঈ। এরও অবস্থা আগের শিল্পীদেরই মতোই হ'লো। শুদ্ধ সারংয়ে একটা খেয়াল শেষ ক'রে একখানি ঠুংরী সবে জমিয়ে তুলেছেন আর অমনি জ্বললো লাল আলো। তিনিও বিরক্ত হ'য়ে আসর ছাড়লেন; শ্রোতাদের বিরক্তিও কম নয়। পরে গাইতে এলেন এ কানন। শুদ্ধ টোড়ীতে তিনি খেয়াল গাইলেন। আধ ঘণ্টা গাইবার কথা, কিন্তু খেয়াল শেষ হ'য়ে সময় থাকতেও পর্দা টেনে ওকে চটিয়ে দেওয়া হ'লো। তবুও কানন ঠুংরী ধরলেন, সঙ্গে সঙ্গে জ্বললো লাল আলো। অত্যন্ত অশোভন ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়ালো। শেষ দফায় নাচ দেখাতে এলেন শীলা নায়েক। আগের দিন চোবে মহারাজের নাচের সঙ্গে তবলা বাজাতে গিয়ে শান্তাপ্রসাদ জানিয়েছিলেন নাচের বাজনা কি হওয়া উচিত। এই দিন শীলার সঙ্গে বাজাতে ব'সে ইকবাল হোসেন জানালেন যে, নাচে যে বোল সৃষ্টি হবে তিনি তাই তবলাতে তুলবেন, অর্থাৎ তিনিই নাচের অনুগমন করবেন, নাচকে তাঁর বাজনার অনুগামী ক'রে তুলবেন না। কিন্তু বেশীক্ষণ নাচ হ'লো না; বলতে গেলে অসমাপ্ত অবস্থাতেই নাচ বন্ধ হ'লো লাল আলোর ইঙ্গিতে।

চতুর্থ অধিবেশন

রবিবার রাত্রের অধিবেশনটি মনে রাখবার মতো হ'য়ে উঠেছিলো বড়ে গোলাম আলির গানের জন্য এবং সবশেষে ওস্তাদ আলি আকবর ও রবীন্দ্রশঙ্করের দ্বৈত সরোদ ও সেতার বাজনার জন্যে। অধিবেশন আরম্ভ হয় গৌরহরি কবিরাজের তার শানাই দিয়ে। তারপর অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিলো শিবকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শৈলেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের খেয়াল গান, মন্টু বন্দ্যোপাধ্যায়ের হারমোনিয়ম এবং কেরামৎ খাঁর তবলা লহরা।

বড়ে গোলাম আলি দরবারি কানাড়া ও মালকোষ রাগে প্রথমে দু'টি খেয়াল শোনান। সংগত করেন কেরামৎ খাঁ। তারপর দু'টি ঠুংরী শোনান—"ক্যায়সে কাটে পূরি নজরিয়া, সৈঁয়া গই পরদেশ" এবং "লাগি পিয়াকী আশ"। এরপর প্রায় তিন ঘণ্টাকাল ওস্তাদ আলি আকবর ও রবীন্দ্রশংকরের সরোদ ও সেতারের দ্বৈত বাজনা চলে। তবলা সংগত করেন বম্বের আল্লারাখা খাঁ ও কেরামৎ খাঁ। এর আগের দু'রাত্রে রবীন্দ্রশংকর সেতারে এবং আলাউদ্দীন খাঁ সরোদে যে অপূর্ব শিল্প কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন, এইদিনের রবীন্দ্রশংকর ও আলি আকবরের দ্বৈত বাজনাও শ্রোতাদের তেমনিই পরিতৃপ্ত করে।

বানারসের পণ্ডিত অনোখীলাল মিশ্র

পঞ্চম অধিবেশন

আগের দিনের সকালের অধিবেশনের সমানই বাস্ততা সোমবার সকালের অধিবেশনেও দেখা গেলো। তবে এ অধিবেশনটা উল্লেখযোগ্য হ'য়ে উঠেছিলো দু'টি জিনিসের জন্যে। একটি হচ্ছে সংগীত শিক্ষার ধারা সম্পর্কে সব ওস্তাদদের নিয়ে একটি আলোচনা বৈঠক, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত ক্ষীরোদ নট্টের দিশী ঢোলের লহরা।

সূচী'তে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলো মাত্র ছ' বছর বয়সের স্বপন চৌধুরীর তবলা লহরা। বছর আড়াই বয়সে স্বপন মুখে তবলার বোল উচ্চারণ করতে আরম্ভ করে। বছরখানেক আগে সে হীরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের শিষ্য সন্তোষ বিশ্বাসের কাছে বাজাতে শেখা আরম্ভ করেছে। এরপর ছিলো বছর বারো বয়সের কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেতার। ওর বাজনা চলতে থাকার সময়ে পাঁচবার লাল আলো জ্বালিয়ে থামবার সংকেত দেওয়া হয়। কিন্তু কল্যাণী সে সংকেত উপেক্ষা ক'রে গৎ শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিবিষ্টমনে বাজিয়ে যায়। এর পর মৃদঙ্গ লহরা শোনান শম্ভু ভট্টাচার্য। টোড়ীতে খেয়াল গান শোনান অঞ্জলি সুর। রবি সেন গুর্জরি টোড়ীতে সেতার বাজিয়ে শোনান। তারপর হয় শিবনাথ ঘোষের তবলা লহরা। বানারসের করিম টোড়ীতে খেয়াল গেয়ে ঠুংরী ধরেন "অব না সহুঁ তোরি গালি"। কিন্তু সময়ের সংকেতে আধাখেচড়াভাবেই তাঁকে শেষ করতে হয়। এর পর বিশ্বনাথ বসুর তবলা লহরী শুনিয়েই আলোচনার আসর বসানো হয়।

সংগীত শিক্ষার বর্তমান ধারা সম্পর্কে আলোচনা শুরু করেন শৈলেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তার সঙ্গে একে একে যোগদান করেন ওস্তাদ আল্লাউদ্দীন খাঁ, ওস্তাদ দবীর খাঁ, ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁ এবং পণ্ডিত শত্রুঞ্জয়প্রসাদ সিং। মাঝে মাঝে প্রশ্ন তুলে আলোচনার সূত্র জুগিয়ে যাচ্ছিলেন কালিদাস সান্যাল।

আলোচনার গোড়াতেই তানসেন সংগীত সংঘ ওস্তাদ আল্লাউদ্দীন খাঁকে "আফতাব-ই-হিন্দ মুসিকী" এবং ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁকে "সিতারে হিন্দ মুসিকী" উপাধিতে ভূষিত করেন। কিন্তু এমনি অনাড়ম্বরভাবে উপাধির কথা জানানো হ'লো যে, লোকের মনে এ ব্যাপারটার কোন ছাপই পড়লো না; না দেওয়া হ'লো কোন সনদ, আর না অন্য কিছু স্মারক। তা'ছাড়া উপাধিটা ফার্সী ভাষায় দেওয়া হ'লো কেন?

পরিশেষে ক্ষিরোদ নট্টের ঢোল বাজনা শ্রোতাদের বিস্মিত ও মুগ্ধ করে। বাঙলার নিজস্ব এই বাজনাটিতে বৃদ্ধ ক্ষীরোদ নট্ট মার্গসংগীতের বোল তুলে শ্রোতাদের চমৎকৃত ক'রে তোলেন। তা'ছাড়া উৎসবে নানা লগ্নের নানা রাগের বাজনাও তিনি শোনান। এমন ঢোল বাজনা কলকাতার

লোকে শুনেছে কিনা সন্দেহ। এর জন্যে তানসেন সঙ্ঘের প্রচেষ্টা অভিনন্দিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, সময়ের অভাবে এই অভিনব অনুষ্ঠানটিকেও বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়, শ্রোতাদের তৃপ্তি পূর্ণ না হ'তেই।

শেষ অধিবেশন

শেষ অধিবেশনটি সংগীতজগতেরই একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ব'লে পরিগণিত হবে। এই অধিবেশনেরই শেষের অনুষ্ঠান হয় তিন পুরুষের সম্মিলিত সরোদ বাজনা। অধিবেশন আরম্ভ থেকে কিন্তু যোগদানকারী শিল্পী এবং শ্রোতাদের মধ্যে প্রচণ্ড বিরক্তির সঞ্চার ক'রে দেওয়া হয়। আকাশবাণীতে রীলের ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখতে গোড়ার শিল্পীদের তাড়াতাড়ি সরিয়ে দেওয়াটা শ্রোতাদের কাছে খুবই বিশ্রী লাগছিলো।

তারাবাঈ পুরবীতে একটা খেয়াল শুনিয়ে ঠুংরী ধরেছিলেন, "রাধেশ্যাম মোরি প্রীতম" কিন্তু মাত্র কয়েক মিনিট গাইতেই তাঁকে লাল আলোর সংকেত দিয়ে উঠিয়ে দেওয়া হ'লো। এবারে বানারসের ঠুংরী আর যুৎসইভাবে শোনাই হ'লো না। আগের দিনও তারাবাঈকে ভালো ক'রে ঠুংরী গাইতে দেওয়া হয়নি, এইদিনও হ'লো না। সকালে করিম খাঁকেও ঠুংরী জমাতে দেওয়া হয়নি। বানারসের ঠুংরী বিখ্যাত ব'লে লোকে উদ্‌গ্রীব ছিলো এঁদের ঠুংরী শোনার জন্যে। খুবই অপমান বোধ ক'রে তারাবাঈ উঠে গেলেন। সংগত করেছিলেন অনোখীলাল। এরপর বেহাগে একটা খেয়াল শোনালেন গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়। এর পরের দফায় ছিলো শান্তাপ্রসাদের তবলা লহরা: কিন্তু আকাশবাণীর নির্দেশে সে জায়গায় দেওয়া হ'লো মীরা চট্টোপাধ্যায়ের খেয়াল। গাঁওতি রাগে তিনি একখানি গাইলেন। এ দু'বারই সংগত করলেন অনোখীলাল। মীরা চট্টোপাধ্যায়ের ঠুংরী "বাতাদে গুঁইয়া কোন নগরী গও শ্যাম" গানখানি শেষ হ'তে শান্তাপ্রসাদের তবলা লহরা দিয়ে বেতারের রীলে আরম্ভ হ'লো রাত সাড়ে দশটা থেকে।

বেতার ঘোষক অনুষ্ঠানটির বিবরণ দিতে গিয়ে যথেষ্ট হাসির খোরাক জুগিয়েছিলেন। শান্তাপ্রসাদের পরিচয় দিতে ও'র নামের আগে "ওস্তাদ" কথাটা প্রয়োগ করলেন। তারপর সঙ্গের সারেংগী বাদকের নাম প্রসংগে বললেন, "সারেংগীতে লহরা" বাজাবেন বানারসের রামনাথ মিশ্র। একবার নয়, বহুবারই তিনি "সারেংগীতে লহরা" ব'লে শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে হাসির লহরা তুলেছিলেন।

শান্তাপ্রসাদের বাজনাতে মিষ্টতা কম, তার চেয়ে বেশী দৃষ্টি তাঁর হাতের কসরৎ দেখানোর দিকে। জোরে বাজান তিনি এবং আওয়াজকে ক্ষিপ্ত ক'রে শ্রোতাদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি ক'রে হাততালি আদায় করার দিকেই তাঁর ঝোঁক। বাজাবার সময় নিজের অংগভংগীর সাহায্যে শ্রোতাদের দৃষ্টিকেও তিনি ধ'রে রাখতে চান। প্রায় পঞ্চাশ মিনিট তিনি ত্রিতাল ও রূপকের অনেক রকমের কায়দা দেখিয়ে গেলেন।

এরপর খেয়াল গাইতে বসলেন সরস্বতী-বাঈ রাগে। বেতারঘোষক তাঁকে পরিচয় করিয়ে দিলেন, শ্রীমতী সরস্বতীরাণী ব'লে। তাঁর সংগে সংগতে বসলেন তবলাতে আল্লারাখা খাঁ, বেতারঘোষক যাঁকে আল্লারা খাঁ ব'লে ঘোষণা করলেন এবং সারেংগীতে সগীরউদ্দীন। পাঁচটা মাইক্রোফোন বসেছে তখন মঞ্চের ওপরে। ফলে এতো প্রতিধ্বনির সৃষ্টি হ'তে লাগলো যে, গানের মাধুর্যই গেলো চাপা প'ড়ে। বিশেষ ক'রে সূক্ষ্ম কাজগুলির কিছুই স্পষ্টভাবে শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল না। এরপর তিনি ঠুংরী ধরলেন "কাহে গয়ে পরদেশ বালম মোরা"। এই সংগে সগীরউদ্দীনের সারেংগী বাজনা খুবই জমে উঠেছিলো। গানও জমতে আরম্ভ করেছিলো, কিন্তু বন্ধ ক'রে দিতে হ'লো যাতে অনুষ্ঠানসূচীর অন্য ক'টি দফাকেও রীলের সময় থাকতে থাকতেই এনে দেওয়া যায়। সরস্বতীবাঈয়ের গান অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই বন্ধ ক'রে দেওয়াতে আকাশবাণীর ওপরে লোকের উষ্মা প্রকাশ পেতে আরম্ভ করলো।

এরপর আরম্ভ হ'লো আল্লারাখা খাঁর তবলা লহরা। বেতারে তাঁকে এবারও আল্লারা খাঁ ব'লে ঘোষণা করা হ'লো। সারেংগী নিয়ে বসলেন সগীরউদ্দীন। বাজানো ঠিক হ'লো ত্রিতাল ও ঝাঁপতাল। আল্লারাখার হাত অনোখীলাল বা শান্তাপ্রসাদের চেয়েও মিষ্টি মনে হ'লো; সূক্ষ্ম কাজও ও'দের চেয়ে ভালো বের হয়। আল্লারাখার ঘরাণা পাঞ্জাবের। হাত চালাবার কায়দাই অন্য রকমের। বেশ খুসমেজাজী বাজিয়ে। বাজাতে বাজাতে শ্রোতাদের মধ্যে উপবিষ্ট শত্রুঞ্জয়প্রসাদকে তালি দিয়ে তাল রেখে যাবার জন্যে অনুরোধ করলেন। সগীরউদ্দীনকেও সারেংগী বাজনায় তাঁর কৃতিত্ব প্রকাশের সুযোগ দিতে লাগলেন মাঝে মাঝে। এক দফা বাজিয়ে দ্বিতীয়বার আরম্ভ করতে যাবার মুখে বাজানো বন্ধ করার সংকেত এলো। এবারে লোকে ক্ষেপে গিয়ে চীৎকার করে উঠলো সমস্বরে। আল্লারাখাকে তারা বাজিয়ে যেতে বললেন যতক্ষণ খুশী এবং চেঁচাতে লাগলেন রীলে বন্ধ ক'রে দেবার জন্যে। ঐ নিয়ে একটা হট্টগোল চললো কিছুক্ষণ। যাই হোক্, আল্লারাখা বাজিয়ে চললেন। তারপরই বসলো ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানটি।

ওস্তাদ আল্লাউদ্দীন খাঁ, আলি আকবর ও আশীষকুমার খাঁ সরোদ নিয়ে বসলেন। আশীষকে বেতারঘোষক কুমার আশীষ ব'লে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তবলা নিয়ে এক পাশে বসলেন আল্লারাখা খাঁ, আর এক পাশে অনোখীলাল। ওস্তাদজী নিজেরই রচিত হেমন্ত বেহাগ রাগে আলাপ আরম্ভ করলেন। একটা ছন্দ তুলে তিনি ইশারা করেন ছেলেকে সেইটেই বাজাবার জন্যে, ছেলের পরে ইশারা করেন নাতিকে। এইভাবে নিজে প্রথমে, তারপর ছেলে

তারপর নাতি ছন্দের পর ছন্দ গেঁথে চলতে লাগলেন। তারপর এক সময় নিজে বন্ধ রেখে ছেলে আর নাতির মধ্যে পাল্লা জুড়ে দিলেন। অপূর্ব পুলক জেগে উঠলো। এই সময়ে হঠাৎ একবার তার ছিঁড়ে যেতে ওস্তাদজী মন্তব্য করলেন যে, নাতি দাদুর তান পুরো ক'রে দিচ্ছে। প্রায় দেড় ঘণ্টা ধ'রে আলাপের পর গৎ আরম্ভ হ'লো। এমন উদ্দীপনাময় রচনা খুব কমই শোনা গিয়েছে, কিন্তু এমন বাজনা আর শোনা যায়নি। গৎ-এর সঙ্গে প্রথমে তবলা ধরলেন আল্লারাখা। তারপর ধরলেন অনোখীলাল। দু'জনের দু'রকম কায়দায় বাজানো। রেষারেষি বেঁধে গেলো তবলায় তবলায়। তবলাবাদকদের উত্তেজনা শ্রোতাদেরও পেয়ে বসলো। একদল হল্লা আরম্ভ করলে, আল্লারাখাকে নিয়ে, আর একদল অনোখীলালকে নিয়ে। তখন ঠিক ক'রে দেওয়া হ'লো, আল্লারাখা বাজাবেন আলি আকবরের সঙ্গে, আর অনোখীলাল বাজাবেন আশীষের সঙ্গে। কিন্তু ঠিক রইলো না; যে যেমনভাবে পারে তাল কেড়ে নিয়ে বাজাতে আরম্ভ করলেন। আবার শ্রোতাদের মধ্যে দুপক্ষ দাঁড়িয়ে গেলো। চললো তবলার লহরা; সরোদ গেলো ডুবে। শ্রোতাদের মধ্যে থেকে অনোখীলাল বাজাবার সময় আল্লারাখাকে হাত বন্ধ রাখার জন্য অনুরোধ। সেই দারুণ উত্তেজনার মুহূর্তে ওস্তাদজীর তার গেলো ছিঁড়ে, কপালে করাঘাত ক'রে তার বাঁধতে লাগলেন তিনি। বাঁধা শেষ ক'রেই এমন একটা সুর ধরলেন, যার সঙ্গে তাল রাখতে দু'জন তবলাবাদকই অক্ষম হলেন। হাতে তাঁরা মাত্রা গুণতে আরম্ভ করলেন। সেই নিয়ে বাঁধলো পরিচালকমণ্ডলীর একজনের সঙ্গে আল্লারাখার বিতর্ক। ঠিক সেই সময়েই আবার আল্লারাখার দিকের মাইক্রোফোন গেলো স্তব্ধ হয়ে। এই ফাঁকে অনোখীলাল খানিকটা বাহাদুরী দেখিয়ে নিলেন। এই-ভাবে হেমন্ত বেহাগ শেষ হলো।

দ্বিতীয়বার বাজনা ওস্তাদজী আরম্ভ করলেন একেবারে গৎ থেকে। তবলার রেষারেষি থেকে তখন অনোখীলাল সরে গিয়েছেন। তাঁর জায়গায় কর্তৃপক্ষ বসিয়ে দিলেন শান্তাপ্রসাদকে। শান্তাপ্রসাদ গোড়া থেকেই আল্লারাখাকে বাজাবার সুযোগই দিতে চাইলেন না, ফলে শুরু থেকেই তবলার দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়ে গেলো। আবার সঙ্গতকার ভাগ করে দেওয়া হ'লো; ঠিক হ'লো, আল্লারাখা বাজাবেন আলি আকবরের সঙ্গে, আর আশীষের সঙ্গে শান্তাপ্রসাদ। আশীষের বাজনা তো শান্তাপ্রসাদ ডুবিয়ে দিলেনই, আবার আলি আকবরেরও বাজনার ওপরে দখল বসাতে লাগলেন। শুধু তাই নয়, শান্তাপ্রসাদ আল্লারাখার প্রতি কোন ক্রুদ্ধ মন্তব্যও

আরার পণ্ডিত শত্রুঞ্জয়প্রসাদ সিং

প্রয়োগ করলেন শোনা গেলো। চললো দু'জনের এক সঙ্গে তবলা। সরোদের আর আওয়াজ শোনা যায় না। শ্রোতাদের মধ্যেও উত্তেজিত কলরব। রবীন্দ্রশঙ্কর দিলেন বাজনা বন্ধ করে। শ্রোতাদের জানালেন, তাঁরা যদি তবলা লহরা শুনতে চান শুনুন, সরোদ বাজনা হবে না। ব'লে ওস্তাদজীকে নিয়ে প্রস্থানোদ্যত হলেন। শ্রোতারা চীৎকার ক'রে উঠলো, তবলা চাই না ব'লে। ওস্তাদজী এবারে শ্রোতাদের শান্ত হবার জন্য আবেদন জানালেন। মন্ত্রের মত সব শান্ত ও স্তব্ধ হ'য়ে গেলো। রাত তখন চারটে। এবারে আশীষ ও আলি আকবর পরস্পর জায়গা বদল করলেন। ওস্তাদজী আলাপ আরম্ভ করলেন। সুরের মায়া সৃষ্টি ক'রে সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলীকে অল্পক্ষণের মধ্যেই সম্মোহিত ক'রে দিলেন। কতো মাধুর্য যে সঙ্গীতে থাকতে পারে যে না শুনেছে তাকে ব'লে বোঝানো যাবে না। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট আলাপের পর গৎ আরম্ভ হ'তেই তবলাবাদক দু'জন মুখ-চাওয়াচাওয়ি করলেন। রবীন্দ্রশঙ্কর আল্লারাখাকে ইঙ্গিত করলেন বাজাতে। কিন্তু ওস্তাদজী বাঁধা দিয়ে বললেন, তিনিও মুসলমান, আল্লারাখাও মুসলমান, লোকে অন্য কিছু ভাবতে পারে, কাজেই তিনি আল্লারাখাকে বাজাতে দিতে পারেন না। শান্তাপ্রসাদ এবারে সঙ্গত আরম্ভ করলেন। এবারে শান্তাপ্রসাদ বাজাতে লাগলেন ভালো, উদ্দামতা আর ছিলো না তখন। বাজনা চললো। একটানা সাড়ে তিন ঘণ্টা বাজিয়ে চলেছেন সেই ৮৩ বৎসরের বৃদ্ধ। অতো প্রাণশক্তি কোথা থেকে অর্জন করেছেন তিনি? লোককে মাতিয়ে দেবারও এই ক্ষমতা! শান্তাপ্রসাদ খানিকটা বাজাবার পর ওস্তাদজী এইবার আল্লা-রাখাকে বাজাবার সংকেত করলেন। তবলার মেজাজই বদলে গেছে তখন। তখন আর কোন রোষ ছিল না তাতে। দু'জনেই তবলার বাহাদুরীর চেয়ে সঙ্গতের যথার্থ সহায়ক হবার দিকেই মন দিলেন। আল্লা-রাখা একটু পরেই শান্তাপ্রসাদকে তবলা ধরার ইঙ্গিত করলেন। প্রথমবার শান্তা-প্রসাদ সে ইঙ্গিত উপেক্ষা করলেন, কিন্তু দ্বিতীয়বারের ইঙ্গিত তিনি গ্রহণ করলেন। কিছুক্ষণ বাজিয়ে তিনি ছেড়ে দিলেন আল্লারাখার হাতে। এইভাবেই দু'জনের মধ্যে একটা মিলাপ হ'য়ে গেলো। বাজনা চললো। খাঁ সাহেবের সঙ্গে সঙ্গত করতে লাগলেন আল্লারাখা, আলি আকবরের সঙ্গে শান্তাপ্রসাদ। আশীষ তখন বাজনা ছেড়েছে। দারুণ জমে উঠলো। তবলা দ্বন্দ্ব আর মনে রইলো না ওস্তাদজীর সৌন্দর্যভরা বিচিত্র ও অভিনব সব সুর ছন্দ শ্রোতাদের মনে অনাস্বাদিত পুলক সঞ্চার করে যেতে লাগলো। বাজনা শেষ হ'লো ভোর পাঁচটায়।

(৭)

আরম্ভেই মুদারার মধ্যমস্বরে দুই গমকের মাণিকজোড়। পরেই একটি সুত্, যেন সুরশৃঙ্গারের ধ্বনির মতো চিকণ উজ্জ্বল রেখা নীচে নেমে এসে উদারার কোমল নিষাদের চারিদিকে কুণ্ডলী পাকিয়ে নিষাদকে কয়েদ্ করেই নিয়ে চলে যায় কোমল ধৈবতের অপ্রমেয় সীমান্তে। এর পরেই বাণী ও সুর একসঙ্গে সপ্রতিভ সঞ্চারে ফিরে এসে দাঁড়ায় ষড়জে; সমের মন্দিরে রাগবিগ্রহের অধিষ্ঠান হয়ে যায়। ঐ জোড়-গমক আর সুতের সুচারু চরণক্ষেপ আর প্রকাশভঙ্গিমা ত ভুলতে পারিনি। পরে মজিদ খাঁ সাহেবের বীণাবাদন শুনে মনে মনে তর্ক করেছি বীণ্‌কার গুণীরাই কি গায়ক গুণীদের কণ্ঠ থেকে কিছু কিছু ধ্বনি তুলে নেন তাঁদের আঙ্গুলে? না, কি গুণী গায়কেরাই বীণাবিনোদলহরীর কিছু অমৃত আকণ্ঠ পান করে সঞ্চয় করেন হৃদয়ের আধারে, গীতসুধার অভিনব ধারায় যেটা উছলে পড়ে গানের সময়ে? রামের গুরু শিব, না শিবের গুরু রাম! মজিদ খাঁ সাহেবকে কালে খাঁ সাহেবের কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেন কালে খাঁ সাহেবকে তিনি ত জানেন না, তিনি বন্দে আলি খাঁ সাহেব বীণ্‌কারের শাগিরদ্। যাই হ'ক, এসব কথা ভাবতে ভাবতে পরে মনে হয়েছে কণ্ঠশিল্পী আর বাদ্যশিল্পী এ'দের মধ্যে কে উত্তমর্ণ আর কে অধমর্ণ এবিষয়ে পাছে তর্ক-কলহ হয় এ জন্যই ত' দেবী সরস্বতী একাধারে বাগ্‌বাদিনী ও বীণাধারিণী হয়ে আমাদের ধ্যানে আবির্ভূত হন; ঐতিহাসিক জিজ্ঞাসার তিমির অপসৃত হ'ক আমাদের চোখের সামনে থেকে। প্রতিভা বস্তুটি ধার করা যায় না, ধার দেওয়া যায় না। উপস্থিত, কালে খাঁ সাহেবের কণ্ঠের সুত-গমকের লহরী উছলে পড়ে স্মৃতির মধ্যে; যেন প্রণয়ীজনের কোমল করাবঘাত সংকেত দিয়ে স্মৃতির লহরী বলতে থাকে আপাতত রমনীয় বস্তুর দিকেই তোমার লক্ষ্য রাখো, ইতিহাসের শুষ্ক হাস্য তোমার কাজে লাগছে না।

সংকেতটা বুঝেই কালে খাঁ সাহেবের গানের দিকে মন দেই। কিন্তু, একি! "পগ্‌লাগন দে" দিয়ে আরম্ভ করে মুহরাটি জমিয়ে নিয়েই একটি সপাট তান হয়ে গেল তড়িৎগতিতে। এর পরে গানের পূর্ণ স্থায়ী পদটি দেখা দিল যেন ঝড়ের আগে কাক-চিলের মত; যে যেমন করে পারে সেই অন্য শব্দগুলি এলোমেলো হয়ে পালিয়ে ঘরে ফিরতে পারলে যেন বাঁচে এমন তাদের অবস্থা! হঠাৎ এমনভাবে সুরের ঝড় উঠ্‌ল যে অন্য কথাগুলি তাদের রূপ বজায় রেখে পরিচয়ই দিতে পারল না! খাঁ সাহেবের হৃদয়ে সুরের আর ছন্দের একটা অভিনব উত্তেজনা এসেছে, বুঝলাম তাঁর চোখ-মুখের উদগ্র উল্লসিত ভাব দেখে, তাঁর কণ্ঠ-ধ্বনির আকুল আবেদন অনুভব করে'। সাধারণত মধ্যলয়ের ছন্দে গানের আর সঙ্গতের গুরুলঘু শব্দগুলি শ্রোতার মনে মাত্রার একটা চেতনা জাগিয়ে রাখে; নিয়ম-নিষ্ঠার মধ্যে দিয়েই শ্রোতার মনে আশা আর প্রত্যাশাগুলি আনাগোনা করে; কাল পূর্ণ হ'লে চলে' যায়, আবার ফিরে আসে এরা। গানের আরম্ভেই ধ্বনি আর ছন্দের এই আশা-প্রত্যাশাগুলি যেন তাল-গোল পাকিয়ে যায়। খাঁ সাহেব তাদের পিষে বেঁটে রগড়ে' সুর আর ছন্দের নূতন সাজে সাজিয়ে রচনা করতে থাকেন রূপগুলি; আর বিদায় করে দেন, মুহূর্তের মধ্যে। আমাদের মন-প্রাণ ভরে গেল সুর ও ছন্দের মধুর উতরোলে। কথাগুলি এল' কি এল না, কি চলে' গেল, এদিকে আমাদের কানই নেই। ঝড়ের সৌন্দর্যে যখন প্রাণ ভরে' ওঠে তখন কি প্রজাপতির সুযোগ দুর্যোগের কথা ভাবতে পারি!

আরম্ভ হ'ল মোটা মোটা সুরের দানা দিয়ে হর্‌কতের পর হর্‌কত; তার মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে দেখা দেয় গমক-লাগান সুরের ফিরত্ আর ফিকর্‌-বন্দী চক্রগুলি; সুরের দলেরা হুড়্‌মুড়্ করে ঘুরে বেড়ায় মুহরার এ পাশে ওপাশে! ছন্দের দোলা ত' যেন ঝড়ের দাপটে তাল-তমাল-শাল বনের মাথা-গুলির এদিক ওদিক উলট্‌-পাক্ খাওয়া; অথচ যে যেমন সে তেমনই থাকে সুরের ঝড় চলে' গেলে! হঠাৎ মনে হয় সুরের ঝড়ের মধ্যে মুহরাটি এবার উড়তে উড়তে এসেই পড়ে; কিন্তু, আসে না। আমরা যখন ভাবতেই পারিনে গানের মুহরা এসে পড়বে তখন চকিতে ছুটে এসে পড়ে সেটা; যেন ভয়ে আসরের কোলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে! ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসতে পেরেছে বলে' আমরা যে তাকে একটু আদর আপ্যায়িত কর'ব এমন অবকাশও পাইনে, কারণ সেই দুর্দান্ত ছেলেটি নির্ভয়ে মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায় সুর ও ছন্দের সংগ্রাম এলাকায়, হুঙ্কার দাপট আর কলরোলের মধ্যে। ঘরে ফিরে আসাটা তার যেন চাতুরী, ছলনা, অভিনয়! সুরের অবিরল ধারা আমাদের শ্রবণকে প্লাবিত করে রাখে, শ্রাবণের বর্ষণের মতো! মনের আকাশে আলোচনার ছিদ্র নেই অবকাশ নেই।

মধ্যলয়ে ছিল গানের আরম্ভ। গতি-বেগের উত্তেজনায় এখন গানের মেঘমালা যেন উড়ে চলে দ্রুত মান-লয়ের পাখা মেলে। ছন্দের দোলায় দোলায় বয়ে যায় সুরের প্লাবন, অতর্কিতে দেখা দেয় তানের তুফান। এক একটি পর্যায় শেষ হয় হলক্ তানের বাহার দিয়ে, ঝড়ের অবকাশে বিদ্যুতের ঝলকের সঙ্গে মেঘের গুড়্‌গুড়্ ধ্বনির মতো। রুক্ষতার লেশমাত্র নেই এই হলকের মেঘধ্বনির মধ্যে। মধুর সুরে ভেজান' এরা, এই হলকের দল তিন সপ্তকের দিক্‌-বিদিক ছুটে যায় আর' ফিরে আসে। এরা যে সুরে ভেজান বেশ বুঝতে পারি অনুভবের মাধুর্য দিয়ে; শুখ্‌নে' ধোঁয়া বা বাষ্পের কুণ্ডলী নয় এরা! মধুর আওয়াজের এই হলক তানের দৃষ্টান্ত কোথায় পাই! কল্পনা করি, বীণার তারে আঙ্গুলের এক দবাওটে যদি দেড় সপ্তক সুরে মীড়-মূর্চ্ছনা সম্ভব হ'ত তাহ'লে বলতাম কালে খাঁ সাহেবের কণ্ঠের হলক্ সেই বীণার হলকের মত'। প্রসঙ্গত বলি, সাধারণভাবে গীত শিল্পীদের মুখে হলক তানের চেষ্টা ও শেষ ফল দেখে বুঝেছি,—হলক তানের চমৎকারী নির্ভর

করছে শিল্পীর কণ্ঠে মাধুর্যের পুঁজির উপর। হলকের ধাক্কা আর হাওয়া, জোর-জবরদস্ত হ'লেই কণ্ঠের স্বাভাবিক মাধুর্যকে খেয়ে ফেলে তারা, এক দমে। যাঁদের কণ্ঠে মাধুর্যের পুঁজি অল্প তাঁদের পক্ষে হলক্ তানের প্রয়াসের অর্থ মাধুর্যের বিষয়ে দেউলে হয়ে হাহা-কার করতে করতে ঘরে ফেরা। কণ্ঠস্বরে নাকীভাব (অর্থাৎ অনুনাসিকত্ব) থাকলে হলকের কারবারে একেবারে দেউলে হওয়া থেকে কিছু পরিত্রাণ হয়: এর নিদর্শনও আছে। কিন্তু, গানের অন্য সব কারবারে সেই নাকীসুরগুলি কণ্ঠের স্বভাব-মাধুর্যের পক্ষে ভেজালের মত' শোনায়, যেন মধুর সঙ্গে নলেন-গুড়ের ভেজাল; আর তম্বুরার সহযোগে সেই ভেজালের ঝাঁঝটাও বেশ ফুটে ওঠে। প্রসঙ্গের খাতিরেই বলি, কালে খাঁ সাহেবের হলক্ তানগুলি আমাকে অন্য এক গুণীর কথা স্মরণ করায়; ইনি হ'লেন আবদুল করিম খাঁ সাহেব। এঁ'র মুখে "কঙ্গন মুন্দরিয়া" মুলতান রাগের গানেই অন্যতম উৎকৃষ্ট হলকের পরিচয় পেয়েছিলাম। হলক তানের যথার্থ বাহার খুলেছে অনুভব হলেই আমি বুঝি শিল্পীর বুক-ভরা দম্ আছে, কণ্ঠভরা মাধুর্য আছে, আর আছে চিৎকার প্রবৃত্তি দমন করার সুবুদ্ধি আর সামর্থ্য। কিন্নরকণ্ঠী বাইজীরা যে হলকের প্রয়াস করেন না তার একমাত্র কারণ আমি বুঝি তাঁরা মাধুর্যের পুঁজি দিয়ে হলকের কারবারে ফাটকাবাজী করার মত ইচ্ছা বা সাহস রাখেন না। সেকালের জোহরা বাইজী এর একমাত্র ব্যতিক্রম এবং এই ব্যতিক্রমের কারণে গুণীমহলে তিনি যথেষ্ট যশ অর্জন করেছিলেন, এমন কথা আমি শুনেছি শ্যাম-লালজী, বদল খাঁ সাহেব এবং বাগাঘাট-নিবাসী প্রসিদ্ধ গায়ক নগেন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের মুখে। জোহরা বাইজী রেকর্ডে যে সব গান পরিবেশন করে গিয়েছেন, তাদের মধ্যে "আল্লা জানে" (টোড়ি রাগ) ও "ধেতেলে দেরে তনন" (ভূপালী রাগের তেরানা) শুনেই বুঝতে পারা যায় ওকথা কতখানি সত্য: অনুমানও করা যায় মধুর বামাকণ্ঠে হলকের সৌন্দর্য কতো বিচিত্র ও মধুর হ'তে পারে।

কালে খাঁ সাহেবের গানে ফিরে আসি; এই গান অর্থাৎ আগাগোড়া ছন্দের দোলন-দার স্তম্ভগুলির উপরে ভর করা সুরের বিরাট ছাওনি। ছাওনির শিরায় শিরায় কথা বা কথার টুকরাগুলি এমনভাবে মিশিয়ে আছে যে ছাওনি চিরে তাদের বেছে নিয়ে জোড়া-তাড়া দিতে রীতিমত পরিশ্রম করতে হয়। সম্প্রতি এরকমের কাজে অপারগ হয়েছি আমরা। সেই মহান্ দোদুল্যমান রাগরূপ প্রত্যক্ষ করে আমরা বসে' থাকি সম্মোহিতের মতো। সুরে আর ছন্দের প্রাণে জেগেছে উল্লাস-তাণ্ডবের উত্তেজনা; আমরা অন্তরে শুনি মল্ল-কৌশিকের পিনাকনিস্বন আর ডমরুধ্বনি।

অকস্মাৎ থেমে যায় সুর-ছন্দের তাণ্ডব-লীলা; আমাদের চমক ভাঙে অবকাশের আঘাতে। সুরের রেশ আর ছন্দের দোলা প্রহরীর মতো জেগে আছে; এদের সাবধান বাণী শুনি তম্বুরার গুঞ্জনে, পদধ্বনি শুনি সঙ্গতের মাত্রায় মাত্রায়। গুণীর হৃদয়ে কখন কোন্ সংকল্পের আগুন জ্বলে ওঠে কিছু ত' জানা যায় না। খাঁ সাহেব যেন আমাদের প্রস্তুত হওয়ার অবসর দিলেন, মুহূর্তের জন্য।

এমনি সতর্ক অবকাশের কোন এক মুহূর্তে যেন জ্বলন্ত সুররেখার মতো একটি সূত্র সহসা দেখা দেয় আমাদের শ্রবণের আকাশে, কোথা হ'তে সেটা উদয় হ'ল জানিনি। সেই জ্যোতির্ময়ী রেখা যখন চলে গিয়ে দাঁড়াল তার-সপ্তকের মধ্যম স্বরে তখন মনে হল যেন একটা উল্কা-পিণ্ড উড়ে যেতে যেতে সহসা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে আপন দীপ্তির ধ্যানে, আপন প্রভায় আপনিই মোহিত হ'য়ে। অপরূপ সেই 'তারা'র মধ্যম আর তার আলো! আমাদের অন্তরে এর রশ্মিচ্ছটা তখনও ম্লান হয়নি, আমাদের ধ্যান কল্পনা তখনও পরিতৃপ্ত হয়নি এমন সময়ে চমক্ দিয়ে উঠতে থাকে অবরোহের সুরনক্ষত্রগুলি; আর শেষে দেখা দেয় মুদারার মধ্যম স্বর, সমুজ্জ্বল একটি তারকার মতো। মুদারার মধ্যমে আমাদের শ্রুতির ধ্যান স্থির হ'তে না হ'তেই সুরের পাঁতি ছুটে চলে যায় উদারার মধ্যগগনে। মনে হ'ল, রাগের একটি জ্যোতিষ্মান্ সূত্র দিয়ে রচিত সুরের হারাবলী তার-সপ্তকের দিগন্ত থেকে প্রলম্বিত হয়ে এল উদারার গগনে; সেই উল্কার স্বরূপ যেন তখনও সপ্রভ ও প্রাণবন্ত হয়ে রয়েছে আমাদের মনে। সুরের হারে তিনটি মধ্যমের রক্তরাগ-মণি! অপূর্ব এই মণিমালার শোভা আর সৌন্দর্য!

প্রতিবা'র নূতন রকমের সূক্ষ্ম সূত্ দিয়ে সুরের অভিনব জ্যোতির্মাল্য রচনা করেন গুণী; বার বার এই হার পরিয়ে দেন রাগরাজ মালকোশের কণ্ঠে! এর পর আর কী হ'তে পারে, কী হবে, কীই বা হওয়া উচিত কিছুই কল্পনা করিনি, কিছুই প্রত্যাশা করিনি। মুহূর্ত কয়েকের জন্য কথা-সুর ও ছন্দের আলোড়ন থেমে যায়। আমাদের মানসচক্ষে উদ্ভাসিত হ'ল যেন রাগের একটি সমাহিত যোগমগ্ন স্বরূপ; তার-মধ্যমের রক্তললাটিকা তখনও যেন ঝক্‌ঝক্ করে জ্বলে উঠছে, কণ্ঠ ও বক্ষ যেন ঈষৎ আন্দোলিত হয়ে উঠছে সুরের হারাবলীর আলিঙ্গনে।

আমরা ভাবছি গানের মুহূর্তটি এবার না-জানি কেমনরূপে দেখা দেয়। এমন সময়ে আচম্বিতে দেখা দিল বড় বড় পাল্লার গমক; বিস্ময়কর উদ্‌ভ্রান্তিকর সে এক ব্যাপার!

আভাসে মনে পড়ে উদারার ষড়্জ আর মধ্যমের মাঝামাঝি কোনও সুর থেকে এদের উদ্ভব আর অভিযান শুরু হ'ল আর তার-সপ্তকের মধ্যমের শ্রুতির দুয়ারে যেন তিন চারবার ধাক্কা দিয়ে দুলতে দুলতে ফিরে এল, আবার সেই উদারার মধ্যমের এলাকায়। নিমেষের বিরামান্তে আবার আরম্ভ হ'ল এই যুগল সুরের বিরাট হিন্দোলগতি; আবার এরা প্রমত্তের মত' চলে যায় তার সপ্তকে, আর যেন মধ্যমের ঘরে কয়েকবার ধাক্কা দিয়ে দুলতে দুলতে ফিরে আসে উদারার মধ্যমে। দ্বিতীয়বার যখন এই ব্যাপার আরম্ভ হয়েছে তখন আমার মনে হ'ল যেন সঙ্গীত-নিকুঞ্জের আলোগুলি দুয়ার-জানালা সর্বকিছু দুলে উঠছে সেই গমকের দোলে, যেন সুরের ভূমিকম্পই দেখা দিচ্ছে থেকে থেকে। মনে হল আমি নিজেই দুলছি। সেই বিহ্বল অবস্থায় খাঁ সাহেবের দিকে চাইলাম। অদ্ভুত এক রকম আবেদনের আগুন খেলছে তাঁর দৃষ্টিতে, তাঁর চোখ দুটি জ্বলজ্বল করে উঠছে, আর সেই মুরেঠা সমেত সর্বদেহটি দুলে দুলে কেঁপে কেঁপে উঠছে গমকের পর্বে পর্বে! বাইরের জগতের জ্ঞান যেন তাঁর নেই। পরে এই স্বরূপটি স্মরণ করলেই মনে হয় ভিতরের জ্ঞান ছিল কিনা বুঝিনি, কিন্তু ভিতরে জ্বলে উঠেছিল আগুন। কালে খাঁ সাহেব মালকোশ রাগে সিদ্ধ এমন কথা বললেন বিশ্বনাথজী আমার ধারণা খাঁ সাহেব সিদ্ধ মাত্র নন তিনি রাগের অগ্নিতে বিদগ্ধ একটি সত্তা স্মৃতির আলোয় ক্ষণে ক্ষণে রাগাবেশে

এই মূর্তিমান বিগ্রহ দেখা দেয়, এখনও। এখনও দেখি কালে খাঁ সাহেবের জীবন্ত ছবি, সেই নীল কুরতার উপর তারা কাটা নক্‌শা, আর সেই রক্তজবা রংএর মুরেঠা। কিন্তু এই গানটির কথা মনে হলে যেন দেখি সেই দেহ, সেই পরিধেয় সেই মুরেঠা;—সমস্ত মিলে গিয়েছে যেন মালকোশ রাগের স্বরূপে, আর স্বরূপটি দুলে উঠছে গমকের দোলায়।

মহারাজ শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হয়েছে এ যাবৎ। কদাচিৎ ঐ অভূতপূর্ব ব্যাপারের প্রসঙ্গ উঠলে তিনি চমকিত হয়ে সে সব দিনের বিচিত্র কথা স্মরণ করেন আর বলেন 'পাঁচুবাবু! এসব কথা এখন মনে করেই আনন্দ পাই, আর সেই আনন্দটাই একটা মস্ত উপরি পাওনা আজকের দিনে, আসলের উপর সুদের মত। মাঝে মাঝে একটু আধটু গান আর সুরও শুনি; নূতন নূতন গুণীর নূতন নূতন কারিগরীও দেখি মোহিত হয়ে। কিন্তু মনে হয়, যেমনটি হয়ে গিয়েছে তেমনটি আর ত' হয় না"।

এই সেই তান যার কথা শ্যামলালজী আর বদল খাঁ সাহেবকে বলতেই তাঁরা বল্‌লেন "হাঁ হাঁ, এ ত' লরজ্‌দার তান"। আর বদল খাঁ সাহেব তখনই হড়বড় করে' কত কী বলে গেলেন। সার কথা হ'ল—বীণ্‌কারদের ঘরে, বিশেষ করে' বন্দে আলি খাঁ সাহেবের ঘরে এর কায়দা প্রচলিত আছে বটে, তবে এ জমানার গায়কেরা এরকম তানের প্রয়াস করেন না; কারণ একবার যদি গাইতে বসে' এ তান বেসুরা হয়ে যায় তাহলে সেই গায়ক হয় পাগল হয়ে যায়, না হয়ত' তার লক্‌বা (পক্ষাঘাত) রোগ হয়ে যাবে, অথবা মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে থাকবে। এ জমানায় রামপুর নিবাসী মুস্তাক হুসেন আর একজন গুণী যিনি কণ্ঠে এই কাজ হাঁসিল করতে পারেন ইত্যাদি। এত খবরও রাখতেন বদল খাঁ সাহেব! শ্যামলালজীও ঐ মুস্তাক হুসেন খাঁ ও তাঁর সম্প্রদায়ের গুণীদের ভাল খবরই রাখতেন; কিন্তু মুস্তাক হুসেন খাঁ এই লরজদার তানের কায়দা গান করে দেখাতে পারেন একথা শ্যামলালজীও প্রথম শুনলেন খলিফা বদল খাঁ সাহেবের মুখে।

মুস্তাক হুসেন খাঁ সাহেবের সম্বন্ধে প্রসঙ্গ বিস্তার করব না; মাত্র এই কথা বলি যে, অনেক বৎসর পরে শ্যামলালজীর বৈঠকে বসে এবং শ্যামলালজী বদল খাঁ সাহেব প্রভৃতি সমঝ্‌দারদের সামনে মুস্তাক হুসেন খাঁ সাহেব সেই অদ্ভুত লরজ্‌দার তানের নমুনা দেখিয়েছিলেন। আমার জীবনের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার পক্ষে মুস্তাক হুসেন খাঁ সাহেবই দু নম্বরের গুণী যাঁর মুখে লরজ্‌দার তান শুনেছি। ভারতের সমস্ত গুণীর গান ত' আমি শুনিনি; অতএব একথা বলতে পারিনে যে অন্য আর কেউ লরজ্‌দার তান করতে পারেন না। বরং এখনকার দিনে এমন একজন ধুরন্ধর খেয়ালী রয়েছেন যাঁর কণ্ঠের সামর্থ্য ও শিল্প পরিবেশনের চাতুর্য দেখে মনে হয় তিনি এই তান পরিবেশন করতে পারেন। শুধু তাই নয়; তিনি ইতিমধ্যেই একাধিকবার এমন কিছু তান রচনা করে শুনিয়েছেন যার ছবি লরজ্‌দারের খুব কাছাকাছি আত্মীয় বলে বোধ হয়েছে। এই গুণীর নাম শ্রীওঙ্কারনাথ ঠাকুর। এঁর খ্যাতি ভারতেরও বাইরে চলে গিয়েছে।

যাই হ'ক, সেই সুরের ভূমিকম্পের প্রসঙ্গেই ফিরে যাই। আবার মনে পড়ে যায় ইন্দোর নিবাসী মজিদ্ খাঁ সাহেব বীণ্‌কারের কথা। এই প্রসঙ্গ চাপা দিতে পারিনে।

শ্যামলালজীর বৈঠকে মজিদ্ খাঁ সাহেবের মাইফেল; ইং ১৯১৯ সালের কথা। বীণার আওয়াজ যতো বা মৃদু ততো বা মধুর। শ্যামলালজী, আমি, গিরিজাবাবু, তম্বুলালজী, বদল খাঁ সাহেব, ননী ও ঠাণ্ডীরাম —গুণীর খুব নিকটে বসে; প্রথম তিনজন গুণীর মুখোমুখী হয়ে বসে; যেন সূত্ মীড়ের একটি কাজও ফস্‌কে না যায় কান থেকে, আর পুরোপুরি আদায় করতেই হবে, কারণ, কয়েকদিন আগে মজিদ খাঁ সাহেবের বাজনা শুনে বুঝলাম তিনি সেই ধরণের গুণী যাঁরা একটি কাজ, বিনা প্রার্থনায়, কখনও দুবার করে দেখান না। শ্রবণের আগ্রহে আমরা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছি। বাহ্য জ্ঞান লোপ হয়েছে, জগৎ বলতে দরবারীর বিলম্‌পদের শ্রব্যরূপ ছাড়া আর কিছু মনে হচ্ছে না। বিলম্‌পদ শেষ হয়ে সহসা দেখা দিল যোড়ের কাজ। যোড়ের কাজগুলি জমে এসেছে এমন সময়ে খাঁ সাহেব অকস্মাৎ এমন ধরণের একটি গমক-যোড় জাহির করলেন যে আমরা তিনজন চমকে উঠে শিরদাঁড়া সোজা করে বসলাম। খাঁ সাহেব "লরজের" যোড় শুরু করেই একটি লম্বা তানকে তিন সপ্তকের পাল্লায় ছুটিয়ে আর নাচিয়ে একেবারে খাদের খরজের নীচে বৃদ্ধ খরজের পঞ্চমে এসে বারকতক দোলা দিলেন। আমাদের মনে হল যেন দুনিয়া ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে; আর উপরে ঝোলান ঝাড়লণ্ঠনটি যেন দুলছে। তানের শেষে মুহূর্তের মধ্যে মনে পড়ে গেল কালে খাঁ সাহেবের মুখে লরজের রূপ, আর বদল খাঁ সাহেবের মন্তব্য, যেটা ভুলেই গিয়েছিলাম। তানটি একবার শেষ হ'তেই বাবুজী খাঁ সাহেবকে আর একবার ঐ কাজটি করতে বল্‌লেন। খাঁ সাহেব মাথা একটু ঝুঁকিয়ে বাবুজীর প্রতি আদাবের ইঙ্গিত জানিয়ে দ্বিতীয়বার এবং বিনা বিশ্রামে তৃতীয়বার সেই একই ব্যাপার কমাল্ করে দেখালেন। ঠাণ্ডীরাম এই তৃতীয়বার আবৃত্তির শেষে থাকতে না পেরে দাঁড়িয়ে উঠে "হোয়্ হোয়্" শব্দে আওয়াজ করে উঠল। বাবুজী খাঁ সাহেবকে অল্পক্ষণের জন্য বিরাম নিতে অনুরোধ করে উঠে গিয়ে আলমারি থেকে একটি সবুজ রংএর রেশমী দু-পাট্টা বার করে নিয়ে এলেন; খাঁ সাহেবের ডান হাতখানি ধরে তার উপরে সেই দু-পাট্টাখানি রেখে বল্‌লেন, "এটা আপনার ইনাম নয়, এটা ঐ চার-আঙ্গুলের মেহনতের যৎসামান্য একটা সেলামী মাত্র বলে মনে করবেন, জী হাঁ"। চার আঙ্গুল অর্থাৎ ডান হাতের আর বাঁ হাতের তর্জনী আর মধ্যমাদের যুগল। খাঁ সাহেব বীণাটি ফরাশের উপর নামিয়ে দু' হাতে বাবুজীকে আর অন্যদের বারবার আদাব জানিয়ে বীরাসনে বসে আবার সারস্বত যন্ত্রটিকে ঘাড়ে তুলে নিলেন। গুণীর আঙ্গুল রক্তমাংসেরই আঙ্গুল। কিন্তু অদ্ভুত সে সব মুহূর্তে যখন ঐ আঙ্গুলে অলৌকিক সারস্বত বহ্নির দু' একটি লেলিহমান সুরশিখা প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে, আর রাগের অনন্যসাধারণ রূপকে উদ্‌ভাসিত করে মুহূর্তেরই জন্য। শ্যামলালজীর গুরু গণপত রাও ভাইয়া সাহেব বন্দে আলি খাঁ বীণকারের পরম বন্ধু ছিলেন, অধিকন্তু তিনি বন্দে আলি খাঁ সাহেবের কাছে বীণার তালিমও নিয়েছিলেন। অতএব শ্যামলালজী ও মজিদ খাঁ সাহেবের সম্বন্ধ ছিল শিষ্য ও গুরু পর্যায়ের সমান। আমরা সকলেই দেখলাম বাবুজী যেন ঐ সম্বন্ধের খাতিরে প্রণামী নিবেদন করলেন। কিন্তু পরে মজিদ খাঁ সাহেবের কৃতিত্বের সমধিক পরিচয় পেয়ে আমার মনে হয়েছিল ঐ নজরানা একটি কথা মাত্র। ভিতরের কথাটা ছিল গুণীর সেই হাতের আঙ্গুল ছুঁয়ে সদ্য সদ্য সেই অগ্নিশিখার কিছু তাপ গ্রহণ করা, যেমন করে আরতির শেষে পঞ্চপ্রদীপ থেকে

আমরা তাপ নেই আর সেই তাপটা মুখে চোখে গায়ে মেখে নেই। সত্য কথা বলতে এখন লজ্জা নেই, সেদিন সে মুহূর্তে আমার মনে ইচ্ছে হয়েছিল গুণীর সেই তান-তাজা আঙুলগুলি একবার ছুঁয়ে দেখি; কিন্তু লজ্জায় পারিনি সে কথা বলতে। রিক্ত হৃদয় না হলেও আমি যে রিক্তহস্ত! পরে অন্য একদিন,—মজিদ খাঁ সাহেব যখন যোগিয়া রাগের আলাপ করেছিলেন, সেদিন লজ্জাকে জয় করে গুণীর আঙুল ছুঁয়ে দেখেছিলাম তাপও অনুভবে তুলে নিয়েছিলাম। নানা রকমের তাপ নিয়েছি জীবনে। মধুর তাপ-গুলি মনে ধরে নেই। এগুলি এখন দেখা দেয় অনুতাপের রূপে, কারণ, তপস্যা ত' আমার হয়নি।

মজিদ্ খাঁ সাহেবের আঙুলে লরজ্‌দার তান শুনে আমার বিশ্বাস হয়েছিল কালে খাঁ সাহেব নিশ্চয় তাঁর বীণাতে গমক ও লরজের পরীক্ষা ও অভ্যাস করেছিলেন, যার ফলে তাঁর কণ্ঠে গমক ও লরজের সূক্ষ্মতা ও সৌন্দর্য একসঙ্গে দেখা দিয়েছিল। আরও মনে হয়েছে কালে খাঁ সাহেব যে নিজেকে শ্রেষ্ঠ বীণকার মনে করতেন তার মূলে সম্ভবত ঐ গমক-লরজ্‌দার যোড় বিষয়ে সাধনা ও সিদ্ধির আত্মপ্রত্যয় একটা দেখা দিত, তীব্রভাবে। এ কথা বলতে পারি, মজিদ্ খাঁ সাহেব ছাড়া অন্য দ্বিতীয় কোনও যন্ত্রীকে লরজ্‌দার তানের চেষ্টা করতে দেখিনি। তবে, সবিনয় নিবেদন করি, আমি ভারতের সমস্ত যন্ত্রী বা বীণ্‌কারদের বাজনা শুনিনি।

মজিদ্ খাঁ সাহেবের আঙুল থেকে কালে খাঁ সাহেবের কণ্ঠে 'পগ্ লাগন দে' গানে ফিরে যাই। কিন্তু বিশেষ লাভ আর নেই। স্মৃতির খসড়া-লিপি পরীক্ষা ও অনুসন্ধান করে দেখি সেই লরজ্‌দার তান গানের অবশেষ সমস্ত কিছুকে আচ্ছন্ন অভিভূত করে রেখেছে, যেমন চন্দ্রিকা নিষ্প্রভ করে দেয় নক্ষত্র তারকার ঝিকিমিকি। সুরের কিছু ছায়ারূপে অস্ফুট রেখা-বর্ণের ছবির মতো আভাস দেয়। অস্পষ্টভাবে মনে রেখেছি 'পগ্ লাগন্ দে' গানটি আরও কিছুক্ষণ চলেছিল; খাঁ সাহেব কিছু কিছু চক্‌করদার চৌদুনি তানের খেলা দেখিয়ে ছিলেন। গানের স্মৃতি বল্‌তে যে, মহল্লা এতক্ষণ আমাকে চমৎকৃত করে রেখেছিল, তার অন্য সমস্ত ঘর যেন শূন্য আর অন্ধকার।

এর পরেই স্মৃতিতে আঁকা রয়েছে, সংগীতের সাক্ষাৎ অবধূত সেই কালে খাঁ সাহেবকে পরিতৃপ্ত করে ভোজন করান হ'ল; বিশ্বনাথজী মহারাজকুমার, ননী ও আমি সেখানে উপস্থিত রয়েছি।

এর পরেই মনে পড়ছে বিশ্বনাথজী, খাঁ সাহেব আর সংগতীয়া ভদ্রলোকটি কুমারের মোটরে উঠে বিদায়ী নমস্কার জানাচ্ছেন। মোটরখানি যখন নিঃশব্দে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল, তখন আমার মনে হ'ল যেন সংগীতের আসরের জোড়া কলেজাই ছিটকে বার হয়ে গেল।

পরের পরের দিন খাঁ সাহেবের ডেরায় গিয়ে দেখি ঘর তালাবন্ধ। করিমের কাছে গেলাম। করিম বল্‌ল, খাঁ সাহেব কাল ঢাকায় রওয়ানা হয়ে গিয়েছেন।

এর পর, খাঁ সাহেবের কোনও পা[...] পাইনি আমি।

আমার জীবনের আকাশে মাত্র দু'দিনে প্রত্যক্ষে কালে খাঁ সাহেব দেখা দিলেন অ[...] চলে গেলেন; তেজঃপুঞ্জ উল্কার মতে[া] সেই উড়ন্ত আগুনের ভস্মাবশেষ কি[...] কিছু উড়ে এসে পড়ে আমার অভিজ্ঞতা[য়] এগুলিকে উপেক্ষা করিনে আমি। প্রতিভ[া] পক্ষে যেটা ভস্মাবশেষ, আমার পক্ষে সে স্মৃতির বিভূতি মনে করেছি।

শ্যামলালজী ফিরে এলে সমস্ত ক[...] বল্‌লাম তাঁকে। খাঁ সাহেবের চরিত্রে দু'একটি অসংগতির প্রসংগ হ'লে শ্যা[ম]লালজী আমার তর্ক ও সন্দেহকে নিরস্ত করে দিলেন; বল্‌লেন,—গহরের প্রতি খ[াঁ] সাহেবের দৃষ্টি ছিল সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ আ[...]

কামনারহিত একটা প্রশংসার দৃষ্টি। গহরের গানের প্রতিভাই খাঁ সাহেবের হৃদয়কে আপ্লুত করেছিল। কিন্তু, কিছু বিচিত্র রকমের ভয় বা বর্জনের সংস্কারও ছিল খাঁ সাহেবের হৃদয়ে যে কারণে তিনি গহরের অনুনয় ও সংস্রব এড়িয়ে গিয়েছেন। গহর কতোবার তাঁর কাছে অনুরোধ পাঠিয়েছিল যে, তিনি কলিকাতায় থাকার কালে গহরের বাড়িতে সম্মানিত অতিথি ও মুরশিদের মতোই থাকুন। খাঁ সাহেব সে কথা কানে ধরেননি। অথচ—তিনি গহরের প্রস্তাবে সম্মত হ'লে তাঁর বসবাস আহারাদির জন্য দুশ্চিন্তা করতে হ'ত না। এমন একটা বাঞ্ছিত সুযোগকে তিনি উপেক্ষা করতে বাধ্য হয়েছিলেন; এইটেই ছিল সম্ভবতঃ তাঁর আন্তরিক দুঃখ ও দীর্ঘনিঃশ্বাসের মূলে।

'চৌধুরান্' প্রসঙ্গে আমার মিথ্যা রচনার কথা শুনে তিনি একটু হেসে বল্‌লেন, মিথ্যাটা সত্যের কান ঘেঁসে ছুটে গিয়েছে। চৌধুরান্ বিখ্যাত নর্তকী; বিন্দাদীনের শাগরেদ্। দুলীচাঁদের বাড়িতে একবার চৌধুরানের নাচ ও কালে খাঁর গান হয়েছিল এক জলসায়। কিন্তু, গহর ছিলই না সেখানে। কালে খাঁ সম্ভবতঃ আপনার (লেখকের) মতো চেহারাওয়ালা কাউকে নজর করেছিলেন, তাই'তে ঐ প্রশ্নটি তাঁর মনে হয়েছিল। খাঁ সাহেব কল্পনাও করেননি যে, তাঁর প্রশ্নের উত্তরে আপনি গহর আর আমাকে (শ্যামলালজীকে) জড়িয়ে একটা মিথ্যা সংবাদ দেবেন। তিনি জানতে চেয়েছিলেন যে, আমি (শ্যামলালজী) তাঁর সেদিনকার জলসায় গানের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু মন্তব্য করেছিলাম, কি না।

ফিরোজ্ পাথরের চাক্‌তির প্রসঙ্গ করতেই শ্যামলালজী হাসতে হাসতে কপালে হাত ছুঁয়ে পাশের ক্যাশবাক্স খুলে তার ভিতর থেকে একটি সযত্নে রক্ষিত মখমল-মোড়া প্যাকেট বার করলেন; আর প্যাকেট থেকে বার হ'ল একটি ফিরোজ পাথরের চাক্‌তি। শ্যামলালজী বল্‌লেন,—তাঁর একটা পুরানা বেমারী, সেকালের ডাক্তার হ্যারিস-লিউকিস্ সাহেবেরা যাকে 'প্যারেক-সিজ্‌মাল ট্যাকিকার্ডিয়া' বলতেন, সেই রোগের প্রতিকারকল্পে হাকিম অজমল্ খাঁ সাহেব এই ফিরোজ পাথরখানি উপহার দিয়েছিলেন। আমি ভাবলাম,—এই পাথর-খানি নিয়ে তিনখানি হ'ল!

শ্যামলালজীকে যখন জিজ্ঞাসা করলাম মৈজুদ্দীন, বশীর, জঙ্গীর মতো এই গুণীকে আপনার এখানে আশ্রয় দিলেন না কেন, তখন তিনি বল্‌লেন কালে খাঁ অত্যন্ত খাম্‌খেয়ালী আজব প্রকৃতির লোক, কখন কোথায় যায় আসে কিছুরই ঠিক নেই; অমন লোককে আশ্রয় দেওয়া সুবিধা নয়। মৌজুদ্দিন বশীর জঙ্গীরা আমার কথা মানে, সম্বন্ধের কারণে; সভ্যভব্য হয়ে মজলিশে বসে। কিন্তু কালে খাঁ ত' সে ধরণের লোক নয়। দুলীচাঁদ একবার চেষ্টা করেছিল; কিন্তু সুবিধা না হ'য়ে অসুবিধাই ঘটেছিল।

মনে ভাবি এখন, সুরের এই বিদগ্ধ পুরুষ, রাগের এই বিচিত্র অবধূত আরও কতোজনের হৃদয়ে কতোরকমের রেখা লিখে রেখে গিয়েছেন, কে জানে। সমস্ত রেখা-গুলি একত্র করে হয়ত' পরিপূর্ণ একটা জীবনগতির চিত্র ফলিত হ'তে পারত। প্রতি মানুষের অন্তরের জীবন ত' এক একটা গান; প্রত্যেকের গানের স্থায়ী অন্তরা সঞ্চারী ভোগ আভোগ আছে নিশ্চয়।

কিন্তু সেটা সম্ভব নয়, বিশেষ করে কালে খাঁর মত অবধূতের জীবনের পক্ষে, প্রতিভার পক্ষে। মনে দুঃখ হয়, লজ্জাও হয় এই ভেবে যে, আমরা জীবনসঙ্গীতের যথার্থ সম্মান করতে জানিনে; দিতেও নয়, নিতেও নয়। এমনই একটা উদাস চিন্তার মুহূর্তে, —প্রতিভাই যেন কবির মুখ দিয়ে সান্ত্বনা বাণী শুনিয়ে দেন—

> শুধায়োনা, কবে কোন্ গান
> কাহারে করিয়াছিনু দান।
> পথের ধূলার পরে
> পড়ে আছে তারি তরে
> যে তাহারে দিতে পারে মান।

(শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মহুয়া' কবিতাবলী)

('স্মৃতির অতলে কালে খাঁ সাহেব' সমাপ্ত)

শ্রীবিমল মিত্র

৬

সেদিন অফিস থেকে ব্রজরাখাল ফিরল একটা মস্ত বড় বাণ্ডিল নিয়ে। বললে—তোমার ও জামা-কাপড়ে চলবে না বড় সম্বন্ধী—ভদ্রলোকের কাছে চাকরি করতে গেলে একটু ভদ্র হয়ে যেতে তো হবে—

একেবারে তৈরী কামিজ নিয়ে এসেছে। ধুতিও একজোড়া। লাটুমার্কা রেলির ধুতি। যেমন মিহি তেমনি খাপি।

—আর এই নাও জুতো—এতো ফতেপুরের রাস্তা নয়। —এখানে খেয়ার রাস্তা, খালি পায়ে চললে পা ছিঁড়ে যাবে একেবারে—

ভুতনাথ জুতো জোড়া পায়ে দিলে। ব্রজরাখাল নিজের হাতে ফিতে বেঁধে দিলে।

বললে—পছন্দ হয়েছে তো—টেরিটি বাজারের খাস চিনে বাড়ির জুতো—

সেই বিকেল বেলা ভুতনাথকে জুতো জামা কাপড় পরিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চারদিক থেকে দেখলে ব্রজরাখাল। তারপর বললে—এইবার সব ছেড়ে রাখো—পরশু আমার ছুটি আছে অফিসের—ওইদিন আবার পরতে হবে—

কেন?

ব্রজরাখাল উত্তর করলে না।

কিন্তু খেতে বসে কথাটা বললে ব্রজরাখাল। বললে—চাকরি তো কখনও করোনি ভুতনাথ—চাকরির শতেক জ্বালা—এক-একবার ভাবি ছেড়ে দেব—আমার কীসের দায়; না-আছে বাপ-মা, না-আছে বউ ছেলে, —কিন্তু ঠাকুর বলতেন—

ভুতনাথ মুখে ভাত পুরে বললে—কোন্ ঠাকুর—

—আমার ঠাকুর—রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব—গেঁয়ো ভুত, নাম শোনোনি তুমি—দেখবে, বলে রাখছি তোমাকে—ওই ঠাকুরের ছবিই একদিন দেশের ঘরে ঘরে থাকবে—আমার চোখ খুলিয়ে দিয়েছেন ঠাকুর—তোমার বোন যখন মারা গেল বড় সম্বন্ধি, সে বড় কষ্টের মধ্যে কাটাতে লাগলাম—সে যে কী কষ্ট কী বলবো—বড় ভালবাসতাম রাধাকে—

বলে ভাত খেতে খেতে হো হো করে হেসে উঠলো ব্রজরাখাল।

ব্রজরাখাল হাসলো না কেঁদে উঠলো দেখবার জন্যে ভুতনাথ ব্রজরাখালের মুখের দিকে তাকালে। কিন্তু ব্রজরাখাল কোনও দিকেই যেন চেয়ে নেই।

আবার বলতে লাগলো ব্রজরাখাল—

তোমার বোন আমায় একদিন কী বলেছিল জানো—

ভুতনাথ বললে—কী

—এই অসুখ হবার কিছুদিন আগে, আমি শনিবার দিন বাড়ি গেছি। রাধা বললে—তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল—

বললাম—কী কথা বল—

রাধা বললে—আমার ভুতোদাদার বড় ইচ্ছে কলকাতা দেখবার—আমায় কতবার বলেছে—তুমি চাকরি কর কলকাতায়, ওকে একবার কলকাতা দেখাতে পারো না—

বললাম—পারি—

পারি তো বললাম, কিন্তু তার কিছুদিন পরেই ও মারা গেল। আমার মনের অবস্থা তখন তো বুঝতে পারছো—ফতেপুর থেকে ফিরে এসে লম্বা ছুটি নিয়ে দিনরাত কেবল দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে পড়ে থাকতাম। বেশ ভালো লাগতো। মনে হলো দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে আর সংসারে ফিরে যাবো না—কিন্তু ফিরে এলাম ভাই।—ঠাকুরই আমায় ফিরিয়ে দিলেন—কেমন করে দিলেন সেই কথা বলি—

সেদিন সব ভক্তরা বসে আছি। আছে, লাটু আছে, সারদাও আছে—গি ছিল বোধহয়। আমি বললাম—ঠাকুর আর সংসারে ফিরে যাবো না—

ঠাকুর জানতেন সব। রাধার মারা যা খবর শুনে খুব কেঁদেছিলেন। জা আমার কেউ নেই সংসারে—সংসারে ওপর কোনও দায়িত্ব নেই। কা'র জন চাকরি করছি, কার জন্যেই বা টাকার একটা পেট, সে-জন্যে ভাবিনে। শুনলেন খানিকক্ষণ। তারপর ব একটা গল্প শোন্—

বললেন— দেখ্ নারদ মুনির অহংকার ছিল যে, ত্রিভুবনে তাঁর মত আর কেউ নেই। বিষ্ণু শুনে বলে তোমার চেয়েও আর একজন বড় ভক্ত আছে হে—সে এক চাষী, যাও তাকে দেখে এস নারদ। নারদ গেলেন দে গরীব চাষা। সারাদিন ক্ষেতে খামারে করে—ফুরসুৎ নেই মরবার। কেবল স ঘুম থেকে উঠে আর রাত্রে শুতে আগে দু'বার মাত্র 'হরি'র নাম করে। কিছু বুঝতে পারলেন না। এলেন কাছে। বিষ্ণু তাঁকে একটা বাটিতে টুম্বুর তেল দিয়ে বললেন—যাও নারদ বাটিটা নিয়ে একবার সারা সহরটা এস—কিন্তু সাবধান, তেল যেন একফে না পড়ে। নারদ চললেন। অনেকক্ষণ ফিরে এলেন আবার বাটিভর্তি তেল তেল এক ফোঁটাও পড়েনি। বিষ্ণু জি করলেন—'নারদ, আমার কথা ক'বার করেছ তুমি'? নারদ বললেন,—প্রভু, আ নাম স্মরণ করবার সময় পেলাম কই—তো সারাক্ষণ তেল নিয়েই ব্যস্ত'। বিষ্ণু নারদকে বুঝিয়ে দিলেন—সেই চাষার ভক্তি কেন বড় নারদের চেয়েও সেই চাষা হাজার কাজের মধ্যেও অন্ততঃ হরিকে স্মরণ করে—

ঠাকুর এমনি কথায় কথায় কেবল বলতেন। গল্প শুনে চুপ করে রই তখনও যেন বিশ্বাস হলো না। বুঝলেন। বুঝে হাসলেন এবার। ব —ওই গিরীশকে জিজ্ঞেস করে দেখ্— বলেছিলাম যখন প্রথম ও এসেছিল— দিনের মধ্যে দু'বার নাম-জপ্ ক একবার খাবার আগে, আর একবার আগে—ও পেরেছে—তুই-ই বা পারবি

কন—তার বেশি তোকে কিছু করতে হবে
—মা তোর কাছে আর কিছু চায় না রে
বোকা ছেলে—

তারপর হাসি থামিয়ে নরেনের দিকে চেয়ে বললনে—

—ওরে দেখ্, ব্রজরাখালের বিশ্বাস হচ্ছে —ওরে এ-সংসারে যত মত তত পথ যে, কোনও মতটাই নিখ‌ুঁত নয়। তা' ভেবে তোর কী দরকার—তুই যা করছিস করে যা সংসারের সমস্ত জীবের মধ্যেই শিবকে দেখবি—। আর যদি না-ই পাস তাতেই বা কী। মা তো তোর মনের কথা জানে রে—এই দেখ না, সবাই ভাবে তা'র হাতঘড়িটাই ঠিক সময় দেয় কিন্তু কোনও ঘড়ির সঙ্গে কোনও ঘড়ির তো মিল নেই—অথচ আসলে সঠিক সময়টা যে কী তা কেউ জানে না—তা নাই বা জানলো, তাতে কারো কোনও কাজের ক্ষতি হচ্ছে—?

গল্প করতে করতে কখন যে খাওয়া শেষ হয়ে গেছে কারোর খেয়াল ছিল না। ভূতনাথ একমনে ব্রজরাখালের কথা শ‌ুনছিল। হঠাৎ চমক্ ভেঙে ব্রজরাখাল বললে—যা' বলছ—রাধার কাছে সেই কথা দিয়েছিল‌ুম যে ভূতোদাদাকে কলকাতা দেখাবো—তা' এতদিন মনে ছিল না, তোমার চিঠি পেয়ে মনে পড়লো—

রাত্রে ভূতনাথ বললো—ও বাঁয়া তবলা কার ব্রজরাখাল—

ব্রজরাখাল বিছানা পাততে পাততে বললে —ও আমারই, এককালে আমিই বাজাতাম —তারপর এখন বাজাই খোল, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সামনে খোল বাজিয়ে আর তবলা ভাল লাগে না—

শোবার আগে ব্রজরাখাল বললে—ঠাকুরকেই দেখলে না বড়কুটুম, কলকাতার আর কী দেখলে তবে...তা হলে পরশ‌ুদিন ওখানে মনে রেখ, আবার ভুলে যেও না যেন —আমার ছ‌ুটি আছে সেদিন—

—কোথায়? ভূতনাথ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে।

—এরই মধ্যে ভুলে বসে আছ, তোমার চাকরি হে—মাইনে এখন পাবে সাত টাকা করে, আর এক বেলা ওখানেই খাবে। বেশ ভগবান্ ধার্মিক লোক স‌ুবিনয়বাব‌ু। ব্রাহ্মবিধান সভার ব্রাহ্ম ওঁরা—

—সে কী ব্রজরাখাল—

—সে তুমি ব‌ুঝবে না এখন—ব্রজরাখাল পাশের ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলে।

পাশের ঘরে শ‌ুয়ে অনেকক্ষণ ভূতনাথের ঘ‌ুম এল না। সেই কালকের মত ঘোড়ার-পা ঠোকার শব্দ, অনেক চাকরের গোলমাল। তারপর রাত্রি বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সেই তন্দ্রার মধ্যে কালোয়াতী গানের সঙ্গে তবলার ঠেকা, অনেক রাত্রে লোহার গেট খোলার ঘড় ঘড় শব্দ। আর তারপর... তারপরের কথা আর ভূতনাথের মনে থাকবার কথা নয়।

শেষ পর্যন্ত চাকরি হলো ভূতনাথের। সাত টাকা মাইনে আর এক বেলা খাওয়া। সাত টাকাই কি কম।

ব্রজরাখাল বললে—সাত টাকাই কি কম—আমি তো এল-এ পাশ করে দশ টাকায় ঢ‌ুকেছিলাম—তুমি লেখাপড়া জানা ছেলে, বিদ্যে রয়েছে পেটে—দেখবে, ও সাত টাকাই শেষে সতের টাকায় গিয়ে দাঁড়াতে দেরি হবে না—তুমি কিছু দ্বিধা করো না তা বলে—

দ্বিধা নাকি ভূতনাথের আছে। দ্বিধা কিসের। ব্রজরাখালের বিনা-ভাড়ার ঘরে থাকা আর এক-বেলা খাওয়া আবার সাত টাকা নগদ মাস গেলে। জলখাবার, জামা-কাপড় নিয়ে মাসে তিন টাকাই খরচ হোক—তারপর চার টাকা করে জমা! কত বাব‌ুয়ানি করবে করো।

ব্রজরাখালের কেনা নতুন জামা-কাপড় জ‌ুতো পরে রওনা দিলে ভূতনাথ ব্রজরাখালের সঙ্গে।

রাস্তায় বেরিয়ে ব্রজরাখাল বললে—খ‌ুব মন দিয়ে কাজ করবে বড়কুট‌ুম—দেখো আমার বদ‌্নাম না হয়—ওরা আবার ব্রাহ্ম কিনা—

—ব্রাহ্ম মানে? ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে।

—এই তোমরা যেমন হিন্দ‌ু, উনি তেমনি ব্রাহ্ম—অর্থাৎ এই দ‌ুর্গা কালী গণেশ ও-সব প‌ুজো ট‌ুজো করেন না—বলেন প‌ুতুল প‌ুজো, তা সে-সব নিয়ে তোমার কী দরকার—তুমি চাকরি করবে মন দিয়ে—ফাঁকি দেবে না, ব্যস্ চুকে গেল ল্যাঠা—

ভূতনাথ বললে—আমাকে আমার হিন্দ‌ু ধর্ম ছাড়ত যদি বলেন—

—তা' তো বলবেনই—ব্রজরাখাল বললে।

—তা' হলে—?

—তুমি ছাড়বে না—

—তাতে যদি চাকরি যায়?

—যাবে, যাবে। তা' বলে তো আর রাতারাতি ধর্ম বদলাতে পারো না—ধর্ম হলো তোমার মনের বিশ্বাসের ব্যাপার—আর যদি মনে কর সাতটা টাকাই তোমার কাছে বড় তা হলে হবে ব্রাহ্ম, ব্রাহ্মসমাজে গিয়ে নেবে দীক্ষা—

ভূতনাথ উত্তর দিলে না। চুপ করে ভাবতে ভাবতে চললো।

খানিক পরে বললে—এ-চাকরিতে তোমার মত আছে তো ব্রজরাখাল—তোমার মত না থাকলে দরকার নেই চাকরির—হয়ত গর‌ু-শোর খেতে বলবে—

ব্রজরাখাল বললে—না না ওসব ভয় তোমার নেই—স‌ুবিনয়বাব‌ু লোক খ‌ুব ভালো, আমার চেয়েও ভালো, তবে একট‌ু গোঁড়া—তা'তেই বা তোমার কী! ওর ধারণা কেশববাব‌ু যা বলেন তাই-ই ঠিক তাই-ই ধ্র‌ুব আর কারোর কথা কিছু নয়—না হয় তাই-ই বললেন তাতে তোমারই বা কী আর আমারই বা কী—

ভূতনাথ ব্রজরাখালের কথা কিছু বুঝতে পারলে না।

ব্রজরাখাল বলেই চললো—অথচ দেখ বড়কুটুম—আমার ঠাকুর বলতেন—ও হিন্দুধর্ম'ই বল আর খৃষ্টধর্ম কিম্বা ইসলামধর্ম'ই বল—সব চর্চা করে দেখেছি—দেখলাম আসলে সেই ভগবানকেই সবাই ডাকে—শুধু বিভিন্ন নামে—। একটা পুকুরের যেমন অনেকগুলো ঘাট থাকে—তার এক ঘাটে হিন্দুরা ঘড়ায় করে 'জল' তোলে। আরেক ঘাটে মুসলমানেরা মশকে করে 'পানি' তোলে, আর একটা ঘাটে খৃষ্টানরা তোলে 'ওয়াটার' —আসলে সেই জলই তো সবাই-এর লক্ষ্য—শুধু নামটা নিয়ে মারামারি—

বউবাজার স্ট্রীট দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মাধববাবুর বাজার পেরিয়ে সোজা উত্তরে চললো।

এক ঘণ্টা সময় লাগলো পৌঁছুতে।

বাড়ির সামনে বড় সাইনবোর্ডের ওপর লেখা—'মোহিনী সিন্দুর কার্যালয়'

দরজা খোলাই ছিল। ভেতরে ছোটখাট অফিসের মতন। চেয়ার-টেবিল সাজানো। কাগজ-পত্র গোছানো রয়েছে। পরিপাটি পরিচ্ছন্ন।

কে একজন এগিয়ে এল সামনে। এসে বললে—বাবু আপনাদের বসতে বলেছেন—আপনারা কি বনমালী সরকার লেন থেকে আসছেন—

খানিক পরে আবার ফিরে এল লোকটা। এসে ব্রজরাখালকে বললে—আপনাকে ওপরে ডাকছেন—

ভূতনাথকে বসতে বলে ব্রজরাখাল ওপরে চলে গেল। ভূতনাথ ঘরটার চারধারে চেয়ে দেখলে। অফিস ঘর। দেয়ালের গায়ে অনেকগুলো ফোটো টানানো। ভূতনাথ কাউকেই চেনে না। অনেকগুলো সাহেব মেমদের ছবি। সোনালি ফ্রেমে বাঁধা। সদর দরজার মাথার ওপর দেয়ালের গায়ে বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে—'ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্'।

সমস্ত বাড়িটা নিস্তব্ধ। ভূতনাথ চুপচাপ অনেকক্ষণ বসে রইল।

খানিক পরে কোথা থেকে যেন গানের শব্দ কানে এল।

ধন্য ধন্য তুমি বরেণ্য নমি হে জগত বন্দন
প্রণতজনে কৃপাবিধানে ঘুচাও
কলুষ বন্ধন।
সত্যসার নির্বিকার সৃজন পালন কারণ
জীবনে মরণে শ্মশানে ভবনে
জীবনের অবলম্বন
পূর্ণ পরম অনাদি চরম, অনন্ত জ্ঞান নয়ন
ওতপ্রোত তোমাতে চিত
জগত-চিত্তরঞ্জন।
অযাচিত দয়ার সিন্ধু, দুঃখ দারিদ্র ভঞ্জন,
পবিত্র পাপনাশন পতিতজন পাবন॥

গান গাইছে একজন মহিলা। ভূতনাথ অভিভূতের মতন সমস্ত গানটা শুনলে। তারপর আবার সব নিস্তব্ধ। একা একা বসে থাকতে ভূতনাথের কেমন অসহ্য লাগছিল।

খানিক পরে আবার সেই লোকটা ঘরে এসে বললে—আপনাকে ওপরে ডাকছেন বাবু—

ভূতনাথ লোকটার পেছন পেছন গিয়ে হাজির হলো ভেতরের বারান্দায়। সেখানে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠবার রাস্তা। ওপরে উঠে লোকটা পাশের একটা ঘরের দরজা খুলে বললে—ভেতরে যান—

দরজা খুলতেই ভূতনাথ দেখলে।

প্রকাণ্ড এক ঘর। মাঝখানে এক গোল টেবিলের চারপাশে নিচু নিচু চেয়ারে বসে আছেন সবাই। আর সব মুখ অচেনা। কেবল ব্রজরাখালের দেখা পেল একপাশে।

ভূতনাথকে নিজের পাশের চেয়ারে বসিয়ে ব্রজরাখাল বললে—এই হলো আমার বড়কুটুম—এখন আপনার হাতেই এর ভার দিলাম—নেহাৎ গ্রাম্য সরল ছেলে—এখ[...] শহরের হাওয়া গায়ে লাগেনি—

সামনের ভদ্রলোক একমুখ দাড়ি [...] নিয়ে হাসতে লাগলেন। হা হা করে হা[...] তারপর হাসি থামিয়ে বললেন—বেশ না[...] —ভূতনাথ—ভূতনাথ—

কয়েকবার নামটা উচ্চারণ করলেন [...] তারপর বললেন—শিবের আর-এক নাম [...] নাথ—উপনিষদে পড়েছি 'ন [...] তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ'—ওই শিবেরও বিত্ত[...] —বিভব নেই—ভোলানাথ—

ভূতনাথ বললে—বামুনগাছির পঞ্চানন্দের দোর ধরে হয়েছি কি না—তাই পি[...] আমার নাম রেখেছিল ভূতনাথ......

খুক্ খুক্ করে পাশ থেকে হাসির [...] এল।

ভদ্রলোক বললেন—ছি মা, হাসতে [...] এ-হাসি তোমার চাপল্যের লক্ষণ [...] ভূতনাথবাবু ঠিকই বলেছেন—সেই [...] কত নাম—পঞ্চানন্দও এক নাম [...] আপনি কী বলেন ব্রজরাখালবাবু—

ভূতনাথ ব্রজরাখালের উত্তরের দিকে [...] না দিয়ে দেখলে—যে হাসছে সে [...] মেয়ে। অনেকটা রাধার বয়সী। কিম্বা রাধার চেয়েও কিছু বড়। কিন্তু বড় [...] দেখতে। তখনও হাসিটা মুখে [...] রয়েছে তার। ভূতনাথের চোখে চোখ প[...] মেয়েটি আবার হাসিতে ফেটে [...] যাচ্ছিল—কিন্তু কেন জানিনা বোধহয়

মুখ চেয়েই চেপে গেল। মেয়েটির পাশে আরেকজন মহিলা বসে আছেন। বোধ হয় মেয়েটির মা। দুই হাতে কী একটা বুনছেন। সেই দিকেই নজর তাঁর। মাঝে মাঝে এক-একবার সুবিনয়বাবুর দিকে তাকাচ্ছেন।

—আমার বাবা ছিলেন গোঁড়া হিন্দু বললেন ব্রজরাখালবাবু—

সুবিনয়বাবু দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে গল্প করতে লাগলেন।

ভারি গোঁড়া হিন্দু—কালীভক্ত—প্রতি শনিবার মধ্যরাত্রি পর্যন্ত কালীপুজো করে রবিবার দিন জল গ্রহণ করতেন—আমার এই মেয়ে যখন হলো উনি নাম রাখলেন জবা-দাসী কালীর যেমন জবা—শিবের তেমনি ধুতুরা—তুমি হাসছিলে মা, কিন্তু ভূতনাথ-বাবুর নামটা আমার ভারি পছন্দ হয়েছে—সেই গানটা গাও তো মা—

এতক্ষণে মহিলাটি হাতের বোনা বন্ধ করে চোখ তুললেন একটু। আর তুমি কেন বলো না ওকে—এখনি যদি গলা ভেঙে বসে থাকে, আসছে শনিবার দিন গাইতেই পারবে না যে একেবারে—

ব্রজরাখাল জিজ্ঞেস করলে—আসছে শনি-বারে গান-বাজনা আছে নাকি—

সুবিনয়বাবু বললেন—আসছে শনিবার দিনই জবার জন্মদিন কিনা—তা হলোই বা জন্মদিন—জবার গলায় এ-গানটা আমার বড় মিষ্টি লাগে ব্রজরাখালবাবু—খাঁটি সরস্বতীর ধ্রুপদ—গাও না—গাও না মা—

—বলে সুবিনয়বাবু নিজেই হাতে তাল দিতে দিতে ধরলেন—

—নাথ, তুমি ব্রহ্ম, তুমি বিষ্ণু, তুমি ঈশ,
তুমি মহেশ,

গান থামিয়ে ব্রজরাখালবাবুর দিকে চেয়ে বললেন—চৌতালে তাল দিয়ে যান তো—

বলে আবার আরম্ভ করলেন—

—নাথ, তুমি ব্রহ্ম, তুমি বিষ্ণু, তুমি ঈশ,
তুমি মহেশ,
তুমি আদি, তুমি অন্ত, তুমি অনাদি,
তুমি অশেষ—

হঠাৎ ভূতনাথের এক সময় মনে হলো, পৃথিবীর সমস্ত কোকিল যেন এক সঙ্গে গান গেয়ে উঠলো—আকাশ বাতাস অন্ত-রীক্ষের সমস্ত অশ্রুত সুর এক সঙ্গে ধ্বনিত হয়ে উঠলো—মধুকামারের পালা-গানে শ্রীকণ্ঠ হাজরাও বুঝি খেদের গান এমন করে গাইতে পারে না—। অবাক হয়ে ভূতনাথ দেখলে, বাবার সঙ্গে জবাও গলা মিলিয়ে গাইছে—মুখে তার সে বিদ্রুপের হাসি নেই, চোখ অর্ধমুদ্রিত—স্থির মূর্তিতে এক অলোকসামান্য জ্যোতি বেরুচ্ছে। সেই মুহূর্তে জবাকে যেন আরো সুন্দর দেখাতে লাগলো।

—জল স্থল মরুত ব্যোম, পশু মনুষ্য
দেবলোক
তুমি সবার সৃজনকার, হৃদাধার
ত্রিভুবনেশ।
তুমি এক, তুমি পুরাণ, তুমি অনন্ত
সুখ সোপান,
তুমি জ্ঞান, তুমি প্রাণ, তুমি মোক্ষধাম...

পাশের ব্রজরাখালের দিকে চেয়ে দেখলে ভূতনাথ। হাতে তাল দিচ্ছে আর লম্বা লম্বা চুল ভর্তি মাথাটা মাতালের মত দুলছে—আর চোখ দিয়ে অঝোরধারে জল গড়িয়ে পড়ছে। সুবিনয়বাবুরও সেই অবস্থা। কিন্তু আশ্চর্য জবার মা আপন মনে মাথা নিচু করে একমনে বুনে চলেছেন, সংগীত তাঁর কানে যাচ্ছে কিনা কে জানে।

এক সময়ে গান থামলো। কারো মুখে কোনও কথা নেই।

সুবিনয়বাবু নিস্তব্ধতা ভাঙলেন। বললেন—তাল কেটেছি নাকি ব্রজরাখাল-বাবু—? আপনি ভাল খোল বাজিয়ে—আর চৌতালটা আপনার ঠিক ধরতেও পারি না আমি—সুরের দিকে নজর দিতে গেলে আমার তালটা ওদিকে আবার গোলমাল হয়ে যায়—

তারপর জবার দিকে চেয়ে বললেন—দেখলে তো মা, তুমি ভূতনাথ নাম শুনে হাসছিলে—যে ভূতনাথ সেই মহেশ, সে-ই ব্রহ্ম, সে-ই বিষ্ণু—সবই সেই এক ধ্রুব নির্বিকার অনন্ত জ্ঞান-স্বরূপ পরমাত্মা—উপনিষদ বলেছে 'একং রূপং বহুধা যঃ করোতি'—যিনি এক রূপকে বহুপ্রকার করেন—

এবার মহিলাটি আবার মুখ তুললেন, বললেন—কেন তুমি বার বার জবাকে বকছো বলো তো—ও তো হাসেনি—

জবা বললে—না বাবা, আমি হেসে-ছিলাম—

সুবিনয়বাবু দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন—কেন হেসেছিলে মা, ভূতনাথ-বাবুকে দেখে তো—

এবার ভূতনাথ কথা কইলে। বললে—হাসলেনই বা উনি, আমি তো সে-জন্যে কিছু মনে করিনি—রাধাও হাসতো—

রাধা কে? প্রশ্ন করলেন সুবিনয়বাবু।

—নন্দজ্যাঠার মেয়ে—ভূতনাথ জবাব দিলে।

ব্রজরাখাল বুঝিয়ে দিলে—আমার পর-লোকগতা স্ত্রীর কথা বলছে বড়কুটুম—

—রাধা হাসতো, রাধার সই হরিদাসী হাসতো, হরিদাসীর বর হাসতো, আম্মা হাসতো, রাধার বিয়েতে বাসর ঘরে সবাই আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করেছিল—তোমার মনে আছে ব্রজরাখাল? তা' হাসুক গে—আমি কিছুছু মনে করি না—

বলে ভূতনাথ নিজেই হাসলো।

কথা শুনে সবাই হেসে উঠলো। জবা হাসলো, সুবিনয়বাবু হা হা করে হাসলেন, ব্রজরাখালও হেসে উঠলো। জবার মা হাসলেন কিনা দেখা গেল না। তিনি নিজের মনেই বুনতে লাগলেন মুখ নিচু করে।

সুবিনয়বাবু হাসতে হাসতে বললেন—ব্রজরাখালবাবু আপনার বড়কুটুমটি বেশ লোক—ভূতনাথবাবুকে আমার বেশ পছন্দ হয়েছে—

অতীদিনের কথা। এখন সব মনে নেই। কিন্তু সুবিনয়বাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাড়ি ফেরবার পথে ভূতনাথ জিজ্ঞেস করেছিল—তুমি বলছিলে ওরা ব্রাহ্ম, কিন্তু বেশ লোক ও'রা—না ব্রজরাখাল—

আমি তো ও'কে খারাপ লোক বলিনি বড়কুটুম—লোক খুব ভালো, বেশ আমুদে মানুষ, ওদের সমাজের একনিষ্ঠ সভ্যও বটে—টাকাও আছে অনেক, কিন্তু মনে ওর শান্তি নেই—

—কেন?

—মাঝে মাঝে ও'র ওই স্ত্রীর মাথা খারাপ হয়ে যায়, তখন ও'কে ঘরে বন্ধ করে রাখতে হয়—যখন ভালো থাকেন ওই কেবল আপন মনে একটা কিছু নিয়ে বুনে যান—তা ওসব নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই—তুমি তোমার চাকরিটা মন দিয়ে করে যাবে—

রাস্তায় আসতে আসতে ভূতনাথ কেবল সেই কথাটাই ভাবছিল—অমন হা হা করে প্রাণখুলে হাসতে পারেন কী করে সুবিনয়বাবু!

(ক্রমশ)

ফ্রাঁসোয়া মরিয়াক

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

শুধু কমলাকে চাঞ্চল্যের অপবাদ দিলে কী হবে, সরস্বতীর তুলাদণ্ডের মানও স্থির থাকে না। তাঁর দরবারেও সব সময় সুবিচার পাওয়া যায় না। কথাটা মনে পড়ে ফ্রাঁসোয়া মরিয়াকের খ্যাতিভাগ্য দেখে। সাহিত্য ও শিল্প সম্বন্ধে শেষ কথা বলতে যাওয়ায় বিপদ আছে; তবু বলতে দ্বিধা নেই যে মরিয়াক বর্তমান ফরাসী সাহিত্যের অবিসম্বাদী নেতা। তাঁর বই ইংরেজীতে অনুবাদ হবার পর ইংরেজ সমালোচকরা অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। বলেছেন, শুধু ফরাসী সাহিত্যে নয়, পৃথিবীর সমসাময়িক কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে তাঁর স্থান সকলের উপরে। কিন্তু পৃথিবীর সাহিত্য-রসিক সমাজে এখনো তিনি সুপরিচিত নন। জিদ ও সার্ত্রে স্বদেশের বাইরে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন; অথচ মরিয়াকের নাম জানে খুব কম লোকেই। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো সাহিত্যেও এমনিতরো খাম-খেয়ালীর অভাব নেই। প্রথম শ্রেণীর পুরস্কার আসে সকলের শেষে; কখনো বা আসেই না। ১৯৫২ সালের নোবেল পুরস্কার মরিয়াককে সম্মান দিয়েছে, কিন্তু জনপ্রিয়তা দেবে কিনা তা আজও অনিশ্চিত। এখন পর্যন্ত যে মরিয়াক লোকপ্রিয় হয়ে ওঠেননি তার কারণ হয়তো তাঁর রচনার মধ্যেই পাওয়া যাবে। মরিয়াকের রচনায় বর্তমান জীবনের সমস্যাগুলির প্রতিবিম্ব নেই; তাদের সমাধানের ইঙ্গিতও নেই। তাই সমস্যাজর্জর দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গী হিসাবে তাঁর রচনাবলী আমাদের পাশে এসে দাঁড়াতে পারে না। মনো-জগতের অস্পষ্ট অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে তাঁর যাতায়াত; আজকের জীবনের অন্তরালে যে শাশ্বত জীবন তার প্রশ্ন নিয়ে মরিয়াকের কারবার। বর্তমান খণ্ডজীবনের অচির-স্থায়ী সমস্যার ঊর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করবার ক্ষমতা থাকলেই মরিয়াকের রচনাবলীর সম্যক্ আস্বাদন সম্ভব।

১৮৭৫ সাল থেকে আজ পর্যন্ত ফরাসী সাহিত্য যেরূপ নিরবচ্ছিন্ন সমৃদ্ধি লাভ করেছে এবং বিদেশে মর্যাদা পেয়েছে তা বোধ হয় আর কোন সাহিত্য পায়নি। বহুসংখ্যক প্রথম শ্রেণীর লেখক কাব্য, উপন্যাস ও নাটক দিয়ে ফরাসী সাহিত্যের ভাণ্ডার পূর্ণ করেছেন। ১৮৭৫ সালকে ফরাসী সাহিত্যের যুগ-সন্ধি বলে নির্দেশ করা যেতে পারে। ঐ বছরের মধ্যে ডুমা, গতিয়ের, মেরিমে, স্যাণ্ড প্রভৃতির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে রোম্যান্টিক যুগ শেষ হয়ে গেল; এলো বাস্তববাদ। কিন্তু বছর দশেক পরই মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রাধান্য লাভ করল। সহানুভূতিপূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার দ্বারা চরিত্র চিত্রণ আরম্ভ করলেন আনাতোল ফ্রাঁস্ ও লোটি। ফরাসী সাহিত্যের গতি যখন বাস্তববাদ ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ,—এই দুই রীতির মধ্যে দ্বিধাগ্রস্থ তখন মরিয়াকের জন্ম হলো।

১৮৮৫ সালের ১১ই অক্টোবর দক্ষিণ ফ্রান্সের বোর্দো শহরে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে ফ্রাঁসোয়া মরিয়াক (Francois Mauriac) জন্মগ্রহণ করেন। বোর্দো একটি বিখ্যাত কৃষি ও বাণিজ্য কেন্দ্র। এখানে নানা ধরণের লোকের সমাবেশ; তাদের বিচিত্র জীবনযাত্রা মরিয়াককে ছেলে-বেলাতেই আকৃষ্ট করেছিল। পরবর্তী জীবনে তিনি বোর্দো শহরের পরিবেশকে তাঁর উপন্যাসের পটভূমিকারূপে ব্যবহার করেছেন। মরিয়াকের বয়স যখন মাত্র বাইশ মাস তখন তাঁর বাবার মৃত্যু হয়। তাঁদের চার ভাই এবং এক বোনকে মানুষ করবার ভার পড়ল মা'র উপর। পরিবারের প্রচলিত গোঁড়া রোমান ক্যাথলিক আদর্শানু-যায়ী মা ছেলে-মেয়েদের মানুষ করে তুলতে লাগলেন। ছেলেবেলায় অন্যায় গোঁড়ামি সহ্য করতে হয়েছিল বলে বড় হয়ে মরিয়াক গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দেননি।

পাঁচ বছর বয়সে মরিয়াককে স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হলো। স্কুলের জীবন ছিল অত্যন্ত কঠোর। সকাল সাড়ে পাঁচটায় স্কুলে যাবার জন্য বাড়ি থেকে বেরুতে হতো, আর ফিরতে সন্ধ্যা সাতটা বেজে যেত। স্কুলের পড়া থেকে মুক্তি পেয়ে মরিয়াক অন্য ছেলেদের মতো খেলা-ধুলোয় যোগ দিতেন না; বসতেন বই নিয়ে। আর একটা অভ্যাস ছিল তাঁর; নিজের খাতায় লিখে রাখতেন টুকিটাকি কথা যখন যা মনে আসত। জুল ভার্নের মোহ কাটিয়ে তেরো চৌদ্দ বছর বয়স থেকে উ পড়তে আরম্ভ করেন। এক-জন অজ্ঞা লেখিকার "মাটির পা" উপন্যাসটি গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল। বা ও ডস্টয়ভেস্কির রচনা তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করেছে; কিন্তু ত উপন্যাসটির কথা তিনি আজও পারেননি।

বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে পা ও রাসিন মরিয়াকের পড়তে ভালো ল রাসিনের ট্র্যাজেডির সুর মরি রচনাকেও স্পর্শ করেছে। পাস (১৬২৩—'৬২) শুধু তাঁর রচনাতে জীবনেও প্রবেশ করেছেন। যে পাস্ স্কুলে না পড়ে নিজের চেষ্টায় যোল বয়সের মধ্যে গণিতশাস্ত্র আয়ত্ত ক ছিলেন; যিনি আধুনিক হিসাবে আদিরূপ আবিষ্কার করেছিলেন; বিজ্ঞানের সূত্র দিয়ে ধর্মজীবনের প্র গুলির মীমাংসার চেষ্টা করেছিলে জীবনে প্রেমের অভিজ্ঞতা না থাকা স যিনি প্রেমতত্ত্ব নিয়ে বই লিখেছিলেন, অদ্ভুত রোমান্টিক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পাসক জীবন মরিয়াককে ছেলেবেলা থেকেই প ভাবে আকর্ষণ করেছিল। আজও টেবিলের উপর দৈনন্দিন হস্তস্পর্শে ম পাসকালের এক খণ্ড 'Pensees' 'চিন্তাধারা' দেখতে পাওয়া যায়। পরব কালে পাসকালের বাণী সংকলন সম্পাদনার ভার নিয়েছিলেন মরিয়াক।

ছেলেবেলায় মরিয়াক বড় অভিম ও বিষণ্ণ প্রকৃতির ছিলেন। এর জন্য হয় তাঁর দুর্বল দেহ দায়ী। এবং এ থেকেও পাসকালের উপর মরিয়া আকর্ষণের একটা কারণ রয়েছে। পাস আজীবন স্বাস্থ্যহীনতার গ্লানি ভোগ গিয়েছেন।

বোর্দোর স্কুলে মরিয়াকের মেধাবী বলে খুব নাম হলো। বিশেষ করে সাহি পত্রে কেউ তাঁর সঙ্গে এঁটে উঠতে প না। এখানকার পড়া শেষ করে ১৯ সালে মরিয়াক উচ্চশিক্ষার জন্য প্যা এলেন। হোস্টেলের সাহিত্যানুর ছাত্রদের সাহচর্যে সাহিত্যচর্চার সু পাওয়া গেল। আগেই কিছু কিছু লেখ অভ্যাস ছিল; এখন অনুকূল পরিবেশে অভ্যাস নিয়মিত হলো; গুণের দিক থে

ফ্রাঁসোয়া মরিয়াক

রচনায় উন্নতি দেখা দিল। এ সময় মরিস বারেস্, আঁদ্রে জিদ, পল ক্লদেল প্রভৃতি ছিলেন তাঁর প্রিয় লেখক। জিদকে অবশ্য পরে তিনি কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন অশ্লীলতার অভিযোগে।

প্যারিসের সাময়িকপত্রে একে একে তাঁর কবিতা ও সাহিত্য সমালোচনা বেরুতে শুরু হলো। ১৯০৯ সালে বেরুলো তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ Les Maints Jointes. বারেস্ প্রমুখ বিশিষ্ট সাহিত্যিকরা তাঁর কবিতার প্রশংসা করলেন এবং তাঁদের উৎসাহবাক্য থেকে সাহিত্যের পথে চলবার প্রেরণা পেলেন মরিয়াক। দু' বছর পরে তাঁর আর একখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এর পর তিনি কাব্য ছেড়ে উপন্যাস রচনায় হাত দিলেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস L'Enfant Charge de Chaines বা শৃঙ্খলাবদ্ধ শিশু; এই উপন্যাসে এবং Commencements d'une Vie (১৯৩২) এ জীবনপ্রভাতে মরিয়াকের ছেলেবেলার ছবিটা দেখতে পাওয়া যাবে।

প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হবার কিছুকাল পরে ফরাসী সরকারের রাজস্ববিভাগের এক উচ্চপদস্থ কর্মচারীর মেয়েকে মরিয়াক বিয়ে করেন। নবদম্পতি ইতালিতে মধুচন্দ্র যাপন করে ফিরে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল। হাসপাতালের সহকারীরূপে মরিয়াক নাম লেখালেন। কিন্তু স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ায় যুদ্ধ শেষ হবার আগেই তাঁকে ফিরে আসতে হলো।

এবার মরিয়াক আত্মনিয়োগ করলেন সাহিত্য সাধনায়। ১৯২০ সাল থেকে গড়ে প্রতি বৎসর একখানা করে উপন্যাস বেরুতে লাগল। তাঁর প্রথম কয়েকখানা উপন্যাসে বোর্দো অঞ্চলের সমাজের ছবি পাওয়া যাবে। সেখানকার ঘৃণা, বিদ্বেষ, প্রতিহিংসা এবং অর্থের প্রতি অদম্য লালসা তাঁর পাত্র-পাত্রীর মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। এসব উপন্যাস অপরিণত হাতের রচনা হলেও মরিয়াকের মূল সুরটি সহজেই অনুভব করা যায়। একদিকে ঈশ্বরের প্রতি আকর্ষণ এবং অন্যদিকে জাগতিক জীবনের মোহ,—এই দোটানায় পড়ে মানুষের যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয় তাঁর সকল কাহিনীর অন্তরালে আছে তারই চিত্র। মরিয়াকের প্রথম যুগের পাত্র-পাত্রীরা প্রায় সকলেই জাগতিক সুখের প্রতি আকর্ষণের জন্য শেষ পর্যন্ত অনুতপ্ত হৃদয়ে ঈশ্বরের কৃপাভিক্ষা করেছে।

মরিয়াকের সাহিত্য জীবনে একটা নূতন যুগের সূচনা হলো যখন তাঁর বয়স সাঁইত্রিশ বছর। Le Baiser au Lepreux বা 'কুষ্ঠরোগীর জন্য চুম্বন' উপন্যাসটি তাঁকে ফরাসী পাঠক মহলে প্রতিষ্ঠা দিল। এই উপন্যাসেই প্রথম দেখা গেল পরীক্ষা-নিরীক্ষার ধাপটা পার হয়েছে, দেখা দিয়েছে মুন্সীয়ানা। তাঁর লক্ষ্য স্থির হয়েছে, জীবন দর্শন সম্বন্ধে আর দ্বিধা নেই। এর পর থেকে একে একে অনেকগুলি উপন্যাস লিখেছেন মরিয়াক; উত্তরোত্তর তাদের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পেয়ে পাঠকদের আনন্দ দিয়েছে। মোট প্রায় কুড়িখানি উপন্যাসের মধ্যে এই তিনখানি শীর্ষস্থানীয়ঃ (১) Le Desert de l'Amour (১৯২৫); (২) Therese Desqueyroux (১৯২৭); এবং (৩) Le Noeud de Viperes (১৯৩২)। কথাসাহিত্যে ফরাসী একাডেমির সবচেয়ে সম্মানিত পুরস্কার Grand Prix du Roman ১৯২৫ সালে মরিয়াককে দেওয়া হয়।

Asmodee (১৯৩৮) এবং Les Mal Aimes (১৯৪৫) লিখে নাট্যকার হিসাবেও মরিয়াক প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। Asmodee প্যারিসের Comedie Francaise (সরকারী থিয়েটার)এ অভিনীত হয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। এর পূর্বে কোনো জীবিত লেখকের নাটক সরকারী রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়নি।

প্রবন্ধ-সাহিত্যেও মরিয়াকের দান কম নয়। তিনি রাসিন (১৯২৮) ও যীশুখৃষ্টের (১৯৩৬) জীবনী লিখেছেন। তাঁর প্রবন্ধ-সংগ্রহ Le Roman (১৯২৮) ও Dieu et Mammon (১৯২৯) বিশিষ্টতার দাবী করতে পারে। তিন খণ্ড জার্নালে (১৯৩৪-'৪০) পাওয়া যাবে মরিয়াকের উৎকৃষ্টতম গদ্যের নিদর্শন। তাঁর জার্নাল সাহিত্য, সাহিত্যিক ও শিল্প সম্বন্ধে মন্তব্যে পূর্ণ।

ধর্মপ্রাণ, নীতিপরায়ণ মরিয়াক সহজেই জাতির শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পেরেছেন।

১৯৩৩ সালে তাঁকে বহুবাঞ্ছিত ফরাসী একাডেমির সভাপদে নির্বাচিত করা হয়েছে। আজ সাতষট্টি বৎসর বয়সেও তরুণ সাহিত্যিকরা তাঁকে নেতা বলে স্বীকার করতে দ্বিধা করে না। এটা সকল প্রবীণ সাহিত্যিকের পক্ষেই গৌরবের কথা।

গত মহাযুদ্ধে ফ্রান্স যে বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে, প্রতিরোধ দলে যোগ দিয়ে মরিয়াক তা থেকে দেশকে রক্ষা করবার জন্য আপ্রাণ সংগ্রাম করেছেন। শত্রুর আক্রমণে দেশ যখন হতাশায় মুহ্যমান তখন তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন যে, শত্রু সব ধ্বংস করতে পারে কিন্তু ফরাসী সাহিত্যের ঐতিহ্যকে নষ্ট করবার ক্ষমতা তার নেই। এই সাহিত্যের মহৎ বাণীর মধ্যেই রয়েছে নবজীবনের মূলমন্ত্র। ১৯৪০ সাল থেকে ফ্রান্সে যে রাজনীতির খেলা চলছে দুর্ভাগ্যক্রমে মরিয়াক তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন। তাঁর রোম্যান ক্যাথলিক ধর্মমত স্বভাবতই তাঁকে কম্যুনিস্ট বিরোধী ক'রে তুলেছে। বর্তমানে তিনি প্যারিসের রক্ষণশীল সংবাদপত্র Le Figaro-তে সপ্তাহে গোটা দুই করে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখেন।

নোবেল পুরস্কার পাবার সংবাদ জেনে মরিয়াক বলেছেন, "জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান পেলাম; এ থেকে ভবিষ্যৎকালের মতামতের আভাসও কিছুটা পাওয়া যেতে পারে। আমার সৃষ্ট চরিত্রগুলি যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিচিত্র মনোভঙ্গীর পাঠকদের চিত্তে সাড়া জাগাতে পেরেছে সেজন্য আমি আনন্দিত। নোবেল পুরস্কার দিয়ে প্রকৃতপক্ষে আমার দেশকেই সম্মানিত করা হয়েছে। কারণ আমার অক্ষমতা যত বড়ই হোক না কেন, আমি ফ্রান্সের শাশ্বত বাণীকে রূপ দিতে চেষ্টা করেছি।"

১৯১১ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত ফরাসী সাহিত্যে উপন্যাসের প্রাধান্য দেখা যায়। প্রুস্ত, জিদ, রোলাঁ, কলেৎ, দুগার্ড প্রভৃতি বিখ্যাত ঔপন্যাসিকদের মধ্যেও মরিয়াক তাঁর আপন বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। প্রথম মহাযুদ্ধের পর যাঁরা খ্যাতি অর্জন করেছেন মরিয়াক তাঁদের অগ্রগণ্য। ক্যাথলিক আদর্শ, গভীর নীতিবোধ, সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ, কাহিনীর নাটকীয়তা এবং সর্বোপরি আন্তরিক দরদ তাঁর রচনায় স্বকীয়তা দিয়েছে। ক্যাথলিক হলেও তাঁর মধ্যে প্রাচীনপন্থীদের সংকীর্ণতা নেই। মরিয়াকের ধর্মবোধ ফল্গুধারার ন্যায় কাহিনীর অন্তরালে থাকে। ঈশ্বরের আবির্ভাব গল্পের গতি কখনো ব্যাহত করেনি। তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলিতে ঈশ্বরের উল্লেখ দু' একবারের বেশি পাওয়া যাবে না।

মরিয়াক "টেরেসের" মুখবন্ধে বলেছেন, "লোকে হয়তো বলবে আমি তাদের কথা লিখি না যাদের গা দিয়ে ধর্ম চুইয়ে পড়ছে, যাদের জীবন স্বচ্ছ, গোপন কিছুই নেই? এদের জীবন এমনিতেই স্বপ্রকাশ, গল্প রচনার সুযোগ পাওয়া যায় না। কিন্তু আমি তাদের কথা জানি যাদের হৃদয় কামনা-বাসনার নিচে চাপা পড়ে আছে। এদের হৃদয়ের কথা উদ্ধার করে প্রকাশ করাই আমার কাজ।"

মরিয়াক বার বার বলেছেন, খনিগর্ভে চাপা পড়া শ্রমিকের মতো আমরা যেন জীবন্ত সমাধি লাভ করেছি। আমাদের হৃদয় নিষ্ক্রমণের পথ পায় না; সহস্র লোভ ও কামনার গহ্বরে আমাদের সমাধি হয়েছে। তাই আমাদের সত্য পরিচয় পাওয়া বড় কঠিন। মরিয়াকের পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী কেউ কাউকে যথার্থরূপে চেনে না; যে যাকে সত্যি ভালোবাসে জীবনে সে তাকে পায় না। এই অপরিচিতি থেকে জীবনে দুঃখ আসে। নিজেকেও ভালো করে চিনি না বলে পাপের পথে পা বাড়াই। সমাজে ও ন্যায়াধিকরণে যারা অন্যায়ের বিচার করে তারা অনুচিত কার্যের সত্যিকার পটভূমিকাটা উপলব্ধি করতে পারে না। এমন কি, অপরাধী নিজেও তার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন নয়। টেরেসকে যখন প্রশ্ন করা হলো সে কেন তার স্বামীকে হত্যা করতে চেয়েছিল তখন হঠাৎ সে আবিষ্কার করল একথার জবাব দেওয়া সহজ নয়। অপরাধীকে নির্মম ঘৃণায় আমরা নিচে ঠেলে দেই, পাপের কুণ্ড থেকে উঠে আসবার পথে তথাকথিত ধার্মিকরাই প্রাচীর সৃষ্টি করে। তাই একবারের পতনটা চিরদিনের পতন হয়ে দাঁড়ায়।

মরিয়াক সমাহিত মানুষের আত্মার আর্তনাদ শুনতে পেয়েছেন। মাটির তলায় হীরা জহরতের খনি কোথায় আছে তা তো উপর থেকে বোঝবার উপায় নেই। তার জন্য মাটি খুঁড়তে হয়। মরিয়াক এই খননের ভার নিয়েছেন। তিনি পাপীকে উদ্ধারের দাবী করেন না। কিন্তু পাপ-মণ্ডিত জীবনের নিচে অস্পষ্ট যে হৃদয় রয়েছে তার প্রকৃত পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর আবিষ্কারের ফলে দুষ্কৃতি-কারীর উপর ঘৃণা দূর হয়ে সহানুভূ[illegible] জাগে। অনুভব করতে পারি একবার ভু[illegible] পথে গেলেই জীবনের সকল পথ বন্ধ হ[illegible] যাওয়া উচিত নয়।

তাঁর পাত্র-পাত্রীরা পাপাসক্ত, কিন্তু ধ[illegible] ও ন্যায়কে ভুলতে পারে না। তাই নিরন্[illegible] তাদের অন্তর ভালো-মন্দর দ্বন্দ্বে ক্ষ[illegible] হতে থাকে। দেহ ও আত্মার বি[illegible] আদিতম, শাশ্বত এবং চরম যন্ত্রণাদা[illegible] রুশ-জার্মান সংগ্রাম একদিন থেমে [illegible] কিন্তু আমাদের মনের মধ্যে পাপ-পু[illegible] যে সংগ্রাম তার বিরাম নেই। এই নি[illegible] মর্মান্তিক যুদ্ধ গভীর বেদনার [illegible] ফেলেছে মরিয়াকের সকল কাহিনীর উপ[illegible] এ বেদনা কোনো এক বিশেষ কা[illegible] দেশের নয়; সর্বকালের সকল মানু[illegible] হাতে পীড়িত হয়েছে। তাই মরিয়া[illegible] ট্র্যাজেডির মহান্ গাম্ভীর্য স[illegible] আমাদের আকৃষ্ট করে।

পাপকে মরিয়াক ঘৃণা করেন, [illegible] সহানুভূতি পাপীর উপর। এজন্য পা[illegible] ছবি তাঁর রচনায় নেই। তিনি [illegible] ইঙ্গিত দিয়েছেন। যৌন আবেদনের [illegible] মরিয়াকের উপন্যাসে পাওয়া যা[illegible] ফরাসী সাহিত্যের সঙ্গে যাঁদের প[illegible] আছে তাঁরাই এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কর[illegible]

শুধু বিকৃতচরিত্র নরনারীরাই [illegible] ভীড় করেনি। মাঝে মাঝে কয়েকটি [illegible] পার্শ্ব চরিত্রের সাক্ষাৎ মেলে। Le [illegible] de la Nuit-এর তরুণী পরিচারিকা [illegible] এমনি একটি সৃষ্টি। টেরেস একা [illegible] একটা ফ্ল্যাটে। অ্যানা তার কাজ [illegible] সন্ধ্যার পর বাড়ি চলে যায়। ক[illegible] যাবৎ টেরেসের মন উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছে; [illegible] থাকতে ভয় পায়; মানুষের সান্নিধ্য [illegible] করে। সেদিন সন্ধ্যায় বিদায় নিতে [illegible] অ্যানা চলে আসতে পারল না। [illegible] তাকে আঁকড়ে ধরল; একা থাকতে [illegible] না; অন্ততঃ ঘুম না আসা পর্যন্ত [illegible] হবে। ইচ্ছা করলেই অ্যানা এই অ[illegible] ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারত; কিন্তু ত[illegible] বসল। ভেবেছিল একটু বসেই [illegible] কিন্তু টেরেসের উত্তপ্ত মস্তিষ্কে ঘুম [illegible] না। রাত ন'টা বাজল ঢং ঢং করে। [illegible] ছিল নটায় সে আসবে। নূতন প্রেমে [illegible] অ্যানা। টেরেসের ঘন সান্নিধ্যে ব[illegible] শুনতে পাচ্ছে তার প্রেমিকের পদ[illegible] তার ঘরের সামনে এসে পায়ের শব্দ

গেল। সে চাপা গলায় ডাকছে, অ্যানা, অ্যানা! সাড়া না পেয়ে দ্বিধাজড়িত হাতে আস্তে আস্তে কড়া নাড়ছে। তারপর হতাশ হয়ে সে চলে গেল। ব্যর্থ হয়ে গেল তাদের প্রথম প্রেমের একটা রোমাঞ্চ-মধুর রাত। যার সঙ্গে শুধু টাকার সম্পর্ক, সেই কর্ত্রীর জন্য এমন একটা রাতকে বলি দেওয়া সাধারণ পরিচারিকার পক্ষে কম বড় স্বার্থত্যাগ নয়।

মরিয়াকের সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ কখনো নীরস হয়ে ওঠে না কারণ তাঁর কাহিনী নাটকীয় পরিস্থিতির আবর্তে পড়ে খরধারা হয়। গল্প বলবার একটা বিশেষ রীতি আছে তাঁর, তা হলো অতীতের রোমন্থন,—বর্তমান ঘটনা থেকে অতীতে ফিরে যাওয়া। তাঁর "সাপের গেরো" উপন্যাসের নায়ক শেষ বয়সে নিজে জীবনের কাহিনী লিখে রাখছে এই আশায় যে, মৃত্যুর পরে স্ত্রী এ থেকে তার সত্য পরিচয়টা জানতে পারবে। এরা দীর্ঘকাল স্বামী-স্ত্রীরূপে বাস করেও তারা পরস্পরের নিকট অপরিচিত। টেরেসের গল্প বলতেও মরিয়াক এই রীতির আশ্রয় নিয়েছেন। স্বামী হত্যার অভিযোগ থেকে মুক্তি পেয়ে টেরেস বাড়ি যাচ্ছে, আর তার ভ্রমণের পটভূমিকায় আগের ঘটনাগুলি বলে দেওয়া হলো। "প্রেমের মরুভূমির" মধ্যেও দীর্ঘ সতেরো বছর পরে এক রেস্তোরাঁয় নায়িকার দেখা পেল। এই সুযোগে মরিয়াক তাঁর গল্পটা বলে নিলেন। তাঁর মতো শক্তিশালী লেখকের হাতে কাহিনী এগিয়ে নেবার এই কৌশল চমৎকার উৎরে গেছে।

মরিয়াক ক্ল্যাসিকাল রীতির পক্ষপাতী। যা অনাবশ্যক তাকে তিনি কখনো রচনায় স্থান দেননি। তাঁর কাহিনী শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত নয়; অনেক উপন্যাসই একটি বড় গল্পের মতো। ভাষায় কিংবা অনুভূতিতে কোথাও প্রয়োজনাতিরিক্ত আবেগ সৃষ্টি প্রয়াস নেই। বোর্দো অঞ্চলের প্রাদেশিকতা দোষ খানিকটা থাকলেও তাঁর ভাষা প্রাঞ্জল, বেগবান, কবিত্বময়। ভাষার পিঠে চড়ে কাহিনী অনায়াস গতিতে ছুটে চলে। একমাত্র প্রুস্তের ভাষার সঙ্গেই এর তুলনা করা যায়।

এত সব বলবার পরও মনে হয়, আসল কথাটাই বলা হয়নি। হয়তো বলা যায়ও না। হাজারো ব্যাখ্যার মধ্যে শিল্পীর মন্ত্রগুপ্তি, তার নিগূঢ় কৌশল ধরা পড়ে না। মরিয়াকের বই হাতে নিয়ে গল্পের মধ্যে ডুবে যাই, মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। সেদিন এবং বহুদিন তাঁর পাত্র-পাত্রীরা আমার নিবিড় সান্নিধ্যে বিচরণ করে। পাঠককে মগ্ন করাবার এই ক্ষমতার মধ্যেই আছে শক্তিধর লেখকের পরিচয়।

মরিয়াকের এই ক্ষমতার পরিচয় আমি পেয়েছি। বছর কয়েক আগে তাঁর মানস-কন্যা টেরেসের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল, আজও ভুলতে পারিনি। টেরেস বোর্দোর এক বনেদী ক্যাথলিক পরিবারের মেয়ে। ছেলেবেলায় সে এমন পরিবেশে মানুষ হয়েছে যেখানে সর্বদা কেবল টাকা-পয়সা নিয়ে আলোচনা চলত। ছেলেবেলা থেকেই সে বুঝতে শিখেছে, টাকা না থাকলে জীবনে নিরাপত্তা, সুখ বা শান্তি কিছুই পাওয়া যায় না। তাই বড় হয়ে সে বিয়ে করল তাদের জমির লাগোয়া জমির মালিক বার্নার্ডকে। এ বিয়ের মূলে প্রেম ছিল না; ছিল পারিবারিক শিক্ষার প্রতিক্রিয়া। তার চোখ পড়েছিল বার্নার্ডের স্বচ্ছলতার উপর। বিয়ের পর টেরেস সংসারের সর্বময়ী কর্ত্রী হয়ে বসল। বার্নার্ডের পেটে মাঝে মাঝে একটা তীব্র বেদনা দেখা দেয়; এর জন্য তাকে বিষাক্ত ওষুধ খেতে হয়। মাত্রা একটু বেশি হলেই বিপদ। সে বিপদ একদিন সত্যি এলো। কিন্তু ডাক্তারের সাহায্যে ফাঁড়া কেটে গেল। আবার কিছুদিন পরে অচৈতন্য বার্নার্ডের জন্য ডাকতে হলো ডাক্তারবাবুকে। ডাক্তারের মনে সন্দেহ জাগল। ওষুধের দোকানে খোঁজ নিয়ে জানা গেল টেরেস জাল প্রেস্‌ক্রিপ্‌শান দিয়ে তীব্র বিষ এনেছে। কেন যে এনেছে সে সম্বন্ধে টেরেস কোনো বিশ্বাসযোগ্য জবাব দিতে পারল না। বার্নার্ড ভালো হয়ে উঠল, কিন্তু ডাক্তারের অভিযোগে টেরেসকে উঠতে হলো আসামীর কাঠগড়ায়।

বার্নার্ডের সাক্ষ্যের জোরে টেরেস মুক্তি পেল। আদালত থেকে বাড়ি ফেরবার পথে সে স্থির করে এসেছে স্বামীর কাছে সব খুলে বলে ক্ষমা চাইবে। কিন্তু পৌঁছে দেখল সমস্ত পরিবেশটা পালটে গেছে। স্ত্রীকে ভালোবাসে বলে বার্নার্ড মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়নি। পরিবারের সম্মান রক্ষার জন্য সে বিচারকে ঠকিয়েছে। অভিযোগটা সত্য প্রমাণিত হলে বার্নার্ডের বোনের বিয়ে হবে না এবং তাঁদের মেয়ে মেরির ভবিষ্যৎও অন্ধকার হয়ে যাবে। তাই স্ত্রীকে বাঁচিয়েছে।

টেরেস স্বামীর বাড়ি থেকে চলে যেতে প্রস্তুত। কিন্তু তাহলেও তো কুলে কালি পড়বে। তাই বার্নার্ড আদেশ দিল টেরেস তার মেয়েকে চোখের দেখাও দেখতে পাবে না; রান্নাঘরে যেতে পারবে না; আবার কবে বিষ দেবে কে জানে? একটা আলাদা বাড়িতে ঝি-চাকর নিয়ে থাকবে। যদি পালিয়ে যায় টেরেস? বার্নার্ড ক্রুর হাসি হাসল। তাহলে হাতকড়া পড়বে। পুলিশের হাতে দেবার মতো অকাট্য প্রমাণ আছে তার জিম্মায়। শিউরে নীরব হয়ে গেল টেরেস। আদালত যাকে মুক্তি দিয়েছে বার্নার্ডের হাতে তার বন্দীদশা শুরু হলো।

নিঃসঙ্গ জীবনের ভার বয়ে বয়ে টেরেস প্রায় পাগল হয়ে উঠল। পথে বেরুতে পারে না, লোকে আঙুল দিয়ে তাকে দেখিয়ে চুপি চুপি কথা বলে। এদিকে বার্নার্ডের বোনের বিয়ে হয়ে গেছে; তার মেয়েকেও পাঠানো হয়েছে বোর্ডিং-এ; আর কলঙ্কের ভয় নেই। বার্নার্ড টেরেসকে নিয়ে প্যারিস এসেছে; তাকে এখানে রেখে যাবে। চরম বিচ্ছেদের আগে একটা কথা জেনে যেতে চায় বার্নার্ড। তাকে কেন হত্যা করতে চেয়েছিল টেরেস? একথার উত্তর টেরেসও জানে না। অনেকগুলি অস্পষ্ট অনুভূতি তাকে যেন সম্মোহিত করেছিল। বোধ হয় বার্নার্ড কিছুদিন পর পর যে বেদনা ভোগ করত তার হাত থেকে মুক্তি দেওয়াই ছিল উদ্দেশ্য। ঠিক জানে না। বার্নার্ড ভাবল ইচ্ছা করেই সত্য গোপন করছে।

বার্নার্ড ক্ষমা করলে টেরেস সানন্দে তার সঙ্গে ফিরে যেত। সে নিজে ক্ষমা চাইল; অভিমান করে বলল, আমি মরে গেলেই ভালো হতো, তাহলে তুমি আবার বিয়ে করতে পারতে। কিন্তু এসব মান-অভি-মানের কথা বার্নার্ডের অন্তর স্পর্শ করল না; সে তাকে প্যারিসের রাস্তায় ফেলে চলে গেল। টেরেস দোকানের আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব লক্ষ্য করল। এখনো যৌবন আছে। আছে মুখের লাবণ্যমাধুরী এবং মোহময় হাসিটুকু। সে সুন্দরী নয়; কিন্তু এর জন্য তার খ্যাতি ছিল গ্রামে। এই দেহকে সম্বল করে সে প্যারিসের জনসমুদ্রে ঝাঁপ দিল।

এর পরে টেরেসের দেখা পাই এক মানসিক ব্যাধির ডাক্তারের চেম্বারে। টেরেস উন্মত্তপ্রায়; খুন করবার একটা দুর্নিবার প্রবৃত্তি তাকে তাড়া করছে। ডাক্তার নিজেও

ভয় পেয়ে গেছে। টেরেসের স্বীকারোক্তি থেকে জানতে পারি কী ঘৃণিত জীবন তার। এত নীচে নেমেও মহৎ সুন্দর জীবনকে সে ভোলেনি। তাই তাকে উদ্ধার করবার প্রার্থনা নিয়ে ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়েছে।

কয়েক বছর পরের কথা। টেরেস প্রৌঢ়ত্বে পা দিয়েছে। মাথার চুল উঠে উঠে কপাল হয়েছে প্রশস্ত। হাতের শিরাগুলি দেখা যায়। মাঝে মাঝে বুকের বেদনায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে। পরিচারিকা অ্যানাকে নিয়ে তার দিন কাটে। হঠাৎ মেরি একদিন সেই সঙ্কীর্ণ ফ্ল্যাটে এসে উপস্থিত হলো, —সঙ্গে নিয়ে এল জীবনের স্রোত। মা ও মেয়ের মধ্যে এই প্রথম প্রকৃত পরিচয়। টেরেসের মনে একটা অনাস্বাদিতপূর্ব অনুভূতি জাগল। বার বার আপন মনে বলতে লাগল, "আমার মেয়ে, আমার মেয়ে।" সেদিনকার ছোট্ট শিশুটি আজ তরুণী হয়ে দেখা দিয়েছে; বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। মেরি জর্জকে ভালোবাসে। জর্জ আইন পড়ে প্যারিসে। তার সঙ্গে দেখা হবার সুযোগ পাবে বলেই সে মার কাছে এসেছে। আরো একটা উদ্দেশ্য আছে মেরির। তার মা সম্বন্ধে সত্য পরিচয়টা জানতে হবে। একটা গোপন ইতিহাস আছে জানে; কিন্তু স্পষ্ট করে কেউ কিছু বলেনি তাকে। কল্পনায় সে ধরে নিয়েছে তার মা ভালো-বাসার জন্য লাঞ্ছিত হয়েছে। জর্জের বাড়ি থেকে ওদের বিয়েতে আপত্তি উঠেছে টেরেসের জন্য। মেরি জেরা করে তার কাছ থেকে জেনে নিল অবৈধ প্রেম নয়, তার চেয়েও অনেক সাংঘাতিক অপরাধ করেছে তার মা। মার জন্য তার জীবন ব্যর্থ হতে বসেছে। মেরি হতাশায় ভেঙে পড়ল। টেরেস সান্ত্বনা দিয়ে বলল, আমি তোমাদের জীবন থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব; তাহলেই তো বাধা দূর হয়ে যাবে। মেরির আবার মার জন্য মায়া হলো; তাড়াতাড়ি বলল, না, সে বাধা নয়। জর্জের মনটা উড়ু উড়ু; টেরেস যেন প্রভাব বিস্তার করে তার মন মেরির প্রতি আকৃষ্ট করায়। তাহলেই সে কৃতজ্ঞ থাকবে। বাবার ভয়ে মেরি তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে গেল।

জর্জের সঙ্গে টেরেসের পরিচয় করিয়ে দিয়ে গেছে মেরি। মাঝে মাঝে দেখা হয়। একদিন রাত্রিতে জর্জ এসে বলল, সে মেরিকে চায় না, চায় তার মাকে; সে টেরেসকে ভালোবাসে। টেরেস ভয় পেল; স্তম্ভিত হলো। তার বিষাক্ত নিঃশ্বাস বুঝি স্পর্শ করেছে জর্জকেও। পর মুহূর্তে একটা বিজাতীয় আনন্দে মন ভরে গেল। সপ্তদশী তরুণীকে ত্যাগ করে চল্লিশোত্তীর্ণা বিগতযৌবনা তার দিকে ঝুঁকেছে জর্জ। তার জীবনে এই শেষ-বারের মতো প্রেমের আবির্ভাব। টেরেসের অভিজ্ঞ চোখ ঠকে না। জর্জের অনুরাগ খাঁটি। শেষ নয়, এই তার প্রথম প্রেম। যারা তার জীবনে এর আগে এসেছে তারা ছিল যৌবনের ভোজে ক্ষণিকের অতিথি। জর্জ তার দেহ দেখে ভোলেনি। এই প্রেমকে গ্রহণ করবার লোভ সে সংবরণ করবে কেমন করে? তার দীর্ঘকালের উচ্ছৃঙ্খল জীবনে সংযম ছিল না।

ঘড়ির তাকের উপর নীল খামের চিঠিটার দিকে হঠাৎ চোখ পড়ল। আজই মেরির চিঠি এসেছে। লিখেছে, মা, তোমার হাতেই আমার জীবন। ইস্পাতের মতো শক্ত হয়ে গেল টেরেস। তোমার হাতেই আমার জীবন। জর্জকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে বলল, আর এখানে এসো না। তারপর নিঃসঙ্গ শয্যায় এপাশ ওপাশ করে ক্ষোভ হতে লাগল জীবনের একমাত্র সুধাপাত্র নিজের হাতে ছুঁড়ে ফেলেছে। কোনো সাক্ষী ছিল না; কেউ জানত না; একটা রাত্রির স্মৃতি অনন্ত সুধায় ভরে দিতে পারত তার জীবন।

লোভ ও ত্যাগের দ্বন্দ্বে পড়ে টেরেসের মন উদভ্রান্ত হয়ে গেল। অতীতের সকল অপরাধের সন্ধান পেয়েছে পুলিশ এবং তার সন্ধান করছে,—এমনি একটা কাল্পনিক ভয়ে সে আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে। কোনো শব্দ শুনলেই মনে করে, পুলিশ এসেছে; রাত্রে ঘুমাতে পারে না, পাছে অতর্কিতে পুলিশ এসে পড়ে। প্রায় উন্মাদ। অ্যানার চিঠি পেয়ে মেরি এল। টেরেস মেয়েকে জড়িয়ে ধরে বললে, তোমাদের বাড়ি আমাকে নিয়ে চলো; এখানে থাকলে আমাকে ওরা ধরে নিয়ে জেলে দেবে।

কিন্তু—। বুঝতে পারল টেরেস। বলল, তোমাদের অত বড় বাড়ি; এক কোণে আমি পড়ে থাকব, কেউ টেরও পাবে না। অগত্যা মেরি রাজী হলো। যে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল একদিন, সেখানেই ফিরে এল। বার্নার্ড এবং পরিবারের অন্যান্য সকলের মুখ হলো গম্ভীর। কিন্তু তার দেহের অবস্থা দেখে বুঝল আর বেশি দিন নয়। এর পর থেকে শুরু হলো শেষ দিনটির প্রতীক্ষা।

জর্জ বাড়ি এসেছে কলেজের ছুটি[illegible] টেরেসের অসুখের সংবাদ শুনে দেখতে এ[illegible] টেরেস মেরি ও জর্জের হাত মিলিত ক[illegible] আশীর্বাদ করল, তোমরা সুখী হ[illegible] মেরি নারীসুলভ অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা অ[illegible] জর্জের মনোভাব আঁচ করতে পেরে[illegible] তাই বুঝল জর্জ এগিয়ে এসে তাকে গ্র[illegible] করেনি, টেরেসের শেষ অনুরোধ র[illegible] করল সে।

মেরি ঘরে নেই; জর্জ টেরেসের ক[illegible] এসে দাঁড়াল। টেরেস তার অতী[illegible] দুষ্কৃতির কথা স্মরণ করে মৃত্যুর প[illegible] কিছুতেই শান্তি পাচ্ছে না। জর্জ ভা[illegible] তাকে প্রবোধ দেবে; বলবে, টেরেস, তু[illegible] কোনো পাপ করোনি। তুমি পুরু[illegible] অর্ধমৃত, অনুর্বর হৃদয়ে জীবনের ব[illegible] বপন করেছ। লাঙ্গলের নিষ্ঠুর ফ[illegible] মতো তুমি পুরুষের হৃদয়কে ছিন্ন[illegible] করেছ; এর ফলে আমার মতো অন্য অ[illegible] জীবনের স্বাদ পেয়েছে; তুমি প[illegible] করোনি।

কিন্তু নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকল, বল[illegible] পারল না কিছুই। দেখা করবার [illegible] নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেল। [illegible] জিজ্ঞাসা করল, একটা বই দিয়ে যা[illegible] পড়বে?

না, আজকাল সে পড়তে পারে [illegible] টেরেস বলল, কিছুই করি না; শুধু ঘ[illegible] শব্দ শুনি আর প্রহর গুণি সমাপ্তির।

কিসের সমাপ্তি? রাত্রির শেষ?

অকস্মাৎ টেরেস তার হাত দুটি নি[illegible] হাতের মধ্যে টেনে নিল; কিসের দীপ্তি[illegible] চোখ ভাস্বর হয়ে উঠেছে। বলল, প্রিয়তম, জীবনের শেষ আর রাত্রি শে[illegible] প্রতীক্ষা।

"প্রেমের মরুভূমির" ডাঃ কুরাজ, মা[illegible] ক্রশ ও রেমন্ডকেও ভোলা যায় না। অ[illegible] বলেন এটি মরিয়াকের শ্রেষ্ঠ উপন্যা[illegible] "প্রেমের মরুভূমি" প্রকাশের পর [illegible] কথাসাহিত্যে ফরাসী একাডেমির [illegible] পুরস্কার পান।

মারিয়া ক্রশ একটি শিশু সন্তান [illegible] বিধবা হয়েছে। এই ছেলের চিকি[illegible] উপলক্ষ্যে হলো ডাক্তার কুরাজের স[illegible] পরিচয়। ছেলে শেষ পর্যন্ত বাঁচল [illegible] কিন্তু যাতায়াতটা থেকে গেল। ডাঃ কু[illegible] গম্ভীর প্রকৃতির কর্তব্যপরায়ণ লোক। [illegible] পুত্র এবং পরিবারের অন্য কারো স

তাঁর অন্তরঙ্গতা নেই। তাঁর মন নিঃসঙ্গ। হঠাৎ বহুনিন্দিতা মারিয়ার প্রতি তাঁর দুর্নিবার আকর্ষণ জাগল। সমস্ত দিনের কাজের মধ্যে সেই মুহূর্তটির জন্য লালায়িত হয়ে থাকেন কখন মারিয়ার সঙ্গে দেখা হবে। মারিয়া ডাক্তারকে শ্রদ্ধা করে, তার বেশি কিছু দিতে পারল না। এক চিঠি দিয়ে মারিয়া তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করে দিল। চিঠিতে তুলে দিয়েছে মেতারলিঙ্কের একটা লাইনঃ এমন দিন আসবে, এবং সে দিন বেশি দূরে নেই, যখন ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ছাড়াও আত্মার সঙ্গে আত্মার আত্মীয়তাটা অনুভব করা যাবে।

ডাক্তারের ছেলে রেমণ্ড তখন স্কুলে পড়ে। অল্প বয়সেই সে বখাটে নাম কিনেছে। স্কুল থেকে ফেরবার পথে ট্রামে মারিয়ার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। মারিয়ার নামের সঙ্গে অপবাদ জড়িত ছিল বলে উদ্ভিন্নযৌবন রেমণ্ড সহজেই তার প্রতি আকৃষ্ট হলো। তাছাড়া অল্প বয়সে প্রেমপ্রয়াসী বলে অন্য মেয়েরা তাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। কিন্তু মারিয়া তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করল যাতে রেমণ্ড উৎসাহিত হলো। একদিন কামনাজর্জর চিত্তে রেমণ্ড গেল মারিয়ার বাড়ী; কিন্তু মারিয়া সাড়া দিল না। আহত হৃদয়ে অতৃপ্ত কামনা নিয়ে ফিরতে হলো রেমণ্ডকে।

এর পর থেকে রেমণ্ডের জীবনে নূতন অধ্যায় আরম্ভ হলো। পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচল; সে গেল প্যারিস। একটি মেয়ের কাছ থেকে যা চেয়ে পায়নি প্যারিসের পথে পথে হাজারো মেয়ের মধ্যে তাই সে খুঁজে বেড়াতে লাগল। কিন্তু কামনার নির্বাণ কই? অতীত থেকে একটি উদ্ভাসিত মুখ সিনেমার ক্লোজ আপের মতো ক্রমশ বড় হয়ে তার চারপাশে ভেসে বেড়ায়। শান্তি নেই। এত মেয়েকে জেনেছে, তবু একটি মেয়ের অভাবে তার কৌমার্য ঘুচল না। দুর্লভ জীবন; জীবনের একটি মাত্র কামনা তৃপ্ত হলো না; অথচ এর জন্য সে জীবনটাকে ধূলোর মতো বাতাসে উড়িয়ে দিয়েছে।

সতেরো বছর কেটে গেছে। এই দীর্ঘকাল সে আশা করেছে মারিয়া ক্রশের সঙ্গে একদিন দেখা হবে। অন্ততঃ এই আশাটুকু পূর্ণ হলো। হঠাৎ রেস্তোরাঁয় দেখা পেল মারিয়া এবং তার স্বামীর। একদিন মারিয়া ভিক্তর লারুসেলের রক্ষিতা ছিল, আজ তাকে বিয়ে করেছে। একটু দূর থেকে দুজনে দুজনকে লক্ষ্য করতে লাগল। ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ এল যখন লারুসেল মাতাল হয়ে পড়ে গিয়ে আঘাত পেল। রেমণ্ডের সাহায্যে অচৈতন্য স্বামীকে বাড়ী নিয়ে এল মারিয়া। একটা চিকিৎসক সম্মেলন উপলক্ষ্যে ডাক্তার কুরাজও প্যারিসে ছিলেন। রেমণ্ড তাঁকে টেলিফোন করে আনাল। রোগীর ব্যবস্থা করে বিদায় নেবার আগে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে দু'চারটে কথা হলো মারিয়ার সঙ্গে। তাতেই বোঝা গেল ডাক্তার এখনো ভোলেননি মারিয়াকে। বরং বহুদিনের ব্যবধানে সে আকর্ষণ আরো তীব্র হয়েছে। মারিয়া স্বামীর কাছে ফিরে এসে বলল, তুমি বিদ্রূপ করো না; কিন্তু আজ মনে হচ্ছে ডাক্তার আমাকে সত্যি ভালোবাসত। স্বামী ঘুমাবার পর রেমণ্ড যেখানে বসেছিল সে জায়গায় মারিয়া তার কম্পিত মুখের কোমল স্পর্শ বুলিয়ে দিল।

রেমণ্ড তার বাবার নূতন পরিচয় পেল; সহানুভূতিতে ভরে উঠল তার মন। তাদের শুধু পিতা-পুত্রের সম্পর্ক নয়; দুজনেই মারিয়াকে কামনা করেছিল, দুজনেই ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু এই ব্যর্থতা তারা একভাবে গ্রহণ করেনি। তার বাবা সংযম ও ধর্মের পথ ধরেছেন, আর সে নিয়েছে পাপের পথ। দেখা গেল কামনা সংযমের দ্বারা গভীর হয়, ভোগের পথে হয় তীব্রতর। তাকে জয় করবার পথ নেই। এই সংসারের মরুভূমিতে আমরা মরুদ্যানের মতো। দুই মরুদ্যানের মধ্যে দুস্তর অনুর্বর বালুরাশির ব্যবধান। মিলতে চাই, এই ব্যবধানের জন্য পারি না। তাই অতৃপ্ত কামনা বুকে করে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করি। রেমণ্ড দেখল সে একটি কামনার সূর্য; যারা তাকে ভালোবেসে প্রতিদান পায়নি তারা গ্রহ উপগ্রহের মতো কামনা-সূর্যের চারদিকে ঘুরছে আর বিকীর্ণ করছে জ্বালাকর উত্তাপ। এর হাত থেকে কি মুক্তি নেই? হয়তো নেই, একমাত্র ঈশ্বরের করুণা ছাড়া।

আরো এমনি কতো টেরেস, অ্যানা, রেমণ্ড, জর্জ ও মেরির দেখা পাওয়া যাবে মরিয়াকের রচনাবলীতে। দুর্ভাগ্যের কথা, বর্তমানে তিনি সমাহিত মানবহৃদয় আবিষ্কারের কাজ প্রায় বন্ধ করেছেন। যে কোদাল দিয়ে খননের কাজ করতেন তা দিয়ে আজ শুরু করেছেন রাজনীতির জঞ্জাল ঘাঁটতে। তাঁর পাত্র-পাত্রীরা যেমন ভালো-মন্দের দ্বন্দ্বে বিপর্যস্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত সত্যের পথে ফিরে এসেছে, তেমনি মরিয়াকও সাহিত্যে ফিরে আসবেন বলে ভরসা করি। কারণ, সবচেয়ে আশার কথা, মরিয়াকের কলম এখনো থামেনি।

ইংরেজী অনুবাদে মরিয়াকের বই ঃ

1. A Woman of the Pharisees
2. Therese
3. The Unknown Sea
4. The Desert of Love
5. The Enemy
6. A Kiss for the Leper
7. Genetrix
8. That which wos lost
9. The Dark Angels
10. The Knot of Vipers
11. The Little Misery
12. The Frontenac Mystery
13. The Loved and the Unloved

(ছাপা হচ্ছে)

সাদামাঠা গল্প

শ্রীদেবেশ চন্দ্র দাশ

দেখবে না কি একখানা চিঠি লিখে মিসেস রুজভেল্টকে?

ওদের আমেরিকা হল গিয়ে সোনার দেশ, ডলারে মোড়া। একটা ডলার আবার গোটা চার পাঁচ টাকার সমান। দিতে পারেন ডলার দশেক পাঠিয়ে আমার মানসিক ব্যর্থতার কাহিনী চিঠিতে জেনে। একজন ইয়ং ম্যানের ফ্রাস্ট্রেশন (যুবকের মানসিক বৈকল্য) ওদের দেশে চাঞ্চল্যকর ব্যাপার বলে ধরে নেবে। এই ত সেদিন মিসেস রুজভেল্ট এদেশে ঘুরে বেড়িয়ে গেছেন আর এদেশের সব রকম কষ্টই নিজের চোখে দেখে গেছেন। কাজেই আমার চিঠিতে অবিশ্বাস করার মত কিছু থাকবে না। নিজের দেশের মান ও নিজের নাম বজায় রাখবার জন্য নিশ্চয়ই একটা কিছু সাহায্য পাঠিয়ে দেবে।

আই এ পাশ অকিঞ্চন ভাবছে পাশের বাড়ীর রোয়াকে বসে। এই সুবিধাজনক রোয়াকটি তার ও পাড়ার আর গুটিকয়েক ছোকরার বিনাখরচের ও বিনা খাজনার জমিদারী। মাঝে মাঝে অবশ্য ক্ষ্যান্ত ঝি চেঁচামেচি করে এ নিয়ে। কিন্তু তোর তাতে কি বাবা? তোর মনিব যখন কিছু বলে না আর তোকেও যখন একবারও বেশী ঝাটা লাগাতে হয় না আমাদের জন্য তখন কেন এত আপত্তি।

অবশ্য মনটা যখন প্রসন্ন থাকে—অর্থাৎ যখন মনে হয় যে এই বিজ্ঞাপনটি ঠিক ওকেই তাক করে কাগজে ছাপিয়েছে বা আজই সম্ভবত একটি বড় চাকরির দরখাস্তের ভাল উত্তর আসবে তখন অকিঞ্চন মনে মনে ক্ষ্যান্ত ঝিকে ক্ষমা করে। বলে—কলেজে ত আর পড়েনি। তাই ডগ ইন দি ম্যাঞ্জার পলিসি যে করছে তা ও বেচারা জানে না। অর্থাৎ রোয়াকটি ওর নিজের ভোগেও লাগবে না তবু আমাদের ভোগ করতে দেবে না এটা যে কত অন্যায় তা ও জানে না।

তবে সারা দুনিয়াটাই যেখানে ওর উপর অন্যায় করছে সেখানে শুধু পরের বাড়ীর ঝি ক্ষ্যান্তর ওপর রাগ করে কি হবে? কত বড় অন্যায় ভেবে দেখুক একবার প্রেমোৎপল, নির্ঝর ও নবীন। ওদের কাছেই সে আজ একথা বিচারের ভার দেবে যখন ওরা এই রকে আড্ডা জমাতে আসবে রোজকারের মত। ওরাই বিচার করে বলুক কত ঘোর অন্যায়।

আজ বিকেলে মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলের ফুটবল ম্যাচ আছে। এই খেলাটির উপরই নির্ভর করছে এবারকার লীগ জেতা। অন্যান্য দিন সে গড়েরমাঠের গ[...] উঁচু দিকটায় দাঁড়িয়ে গ[...] বকের মত তুলে ধরে খে[...] দেখার চেষ্টা করে কোন ম[...] দুধের সাধ ঘোলে মিটি[...] ফিরে আসে। কই, কোনদি[...] ত' বাবাকে বলে নি ট্রা[...] পয়সা দিতে গড়ের মা[...] যাওয়া আসার জন্য। এমন [...] মার কাছেও চায় নি লুকি[...] লুকিয়ে। তবে এত কৃপণ কেন?

কিন্তু আজকের ব্যাপারটা হচ্ছে স্পেশাল[...] আজ খেলাটির উপর লীগের কলকাঠি নি[...] করছে আর কাল রাত্রে বহুবার এই খেলা[...] স্বপ্ন সে দেখেছে ঘুমের মধ্যে। ইস্টবেঙ্গ[...] ত' প্রায় গোল করে দিয়েইছিল, নেহাৎ [...] নিজে আকাশ ফুড়ে নেমে এসে মান্না সে[...] গোল লাইনের উপর থেকে অমন জোর[...] কিকটা যদি না করে দিত। অবশ্য ভাগ্য[...] ডান পায়ে কিক করেছিল বলে দেওয়া[...] পাটা লেগে একটু যা ব্যথা হয়েছে; কি[...] বা-পায়ে কিক করলে বোগাস ছোট্কা[...] গায়ে নির্ঘাৎ লাথি লাগত। ও আহাম্ম[...] আবার বড় সুশীল ও সুবোধ বালক। [...] বুজে বই মুখস্ত করে চোখে চশমা এ[...] আর খেলধুলোর মর্ম কিছুই বোঝে ন[...] কাজেই একটি চেঁচামেচি লাগাত।

যাই হোক, গোলমাল কিছু হয় নি। অ[...] এই পায়ের চোটটা মোহনবাগানের কল[...] কামনায় সামান্য একটু উৎসর্গ মাত্র। [...] কলকাতার সব লোকই যদি এমন ত[...] একটু একটু আত্মোৎসর্গ করত তাহ[...] দেশটি কি আর এত পেছনে পড়ে থা[...] আর মোহনবাগানের হারার কোন প্র[...] ওঠে?

কিন্তু বাবা বুড়ো অত্যন্ত বেদরকা[...] একটুও বোঝে না যে আজকের দিনে অন্[...] খেলাটি মাঠের বাইরে থেকে অস্পৃশ্[...] মন্দিরের বাইরে থেকে দেবী দর্শনের মত [...] দেখে ভিতরে গিয়ে রসিয়ে রসিয়ে দে[...] অত্যন্ত দরকার। তাতে শুধু যে প্রা[...] শান্তি হবে তা নয়, মনের ডেভেলপমেণ্ট অথ[...] উন্নয়নও হবে। আর সবাই মিলে এক সা[...] এক মন এক কণ্ঠ হয়ে একটা দলকে উৎস[...] দিলে জাতীয় একতার দিকেও যে কতখা[...] এগিয়ে যাওয়া যায় তার মূল্য কে বোঝে[...]

অন্তত অকিঞ্চনের বুড়ো বাবা তা বোঝে না। চশমাটা নাকের ওপর থেকে নামি[...]

হাতের পত্রিকাটা পাশে সরিয়ে রেখে কৃতী ছেলের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর গত রাত্রির হাঁপানীর চোটে দুর্বল বুকটার উপর হাত বুলাতে বুলাতে একটু কেসে জিজ্ঞাসা করলেন,—মোহনবাগানের খেলা? তার জন্য পয়সা চাই? কিন্তু বাপু, কোথা থেকে এ সংসারে দুটো পয়সা ফেলবে বলতে পার? শুধু বুড়োর পেন্সনে যে আর চলে না। চোখ বুজলে চালাবে কি করে? দশ দশটা মুখের খোরাক আসবে কোথা থেকে?

বলেই হাড়কৃপণ বাবা হৃদয়হীনভাবে চোখের উপর চশমার ঠুলিটা আবার এ'টে নিলেন। দৃষ্টিপথের বাইরে চলে গেল মোহনবাগান।

চোখের সামনে দিয়ে যেতে শুরু করল অফিসযাত্রীর দল। এক সময় অকিঞ্চন ওদের একটু অনুকম্পার চোখেই দেখত। ভাবত ওরা সামান্য কটা টাকার জন্য নিজেদের গোলামখানায় বিকিয়ে দিয়েছে। ছিঃ, লেখাপড়া কি মানুষ শেখে এইজন্য? সে বড় হবে, অনেক বই পড়বে, অনেক বিদ্যা অনেক বুদ্ধিতে সে দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে, এই তার আকাঙ্ক্ষা ছিল ছেলেবেলায়। অতএব সে অফিসে কেরাণী হবে না।

তারপর আরো একটু বড় হয়ে সে আরো একটা কারণ বের করল যার জন্য সে ওই বৃত্তি গ্রহণ করবে না বলে ঠিক করল। অফিসে কেরাণীর অর্থাৎ কলম-মজদুরের কাজ করে সে পুঁজিপতিদের কায়েমী স্বার্থ চিরকাল বজায় রাখতে সহায়তা করবে না। যতদিন পর্যন্ত মার্চেণ্ট অফিসগুলি দেশের টাকা সমানভাবে সবাইয়ের মধ্যে ভাগ করে দেবার বন্দোবস্ত না করছে আর সরকারী অফিসগুলিতে সকলের সমান মাইনের হার না চলু হচ্ছে অন্ততপক্ষে ভিতরে ভিতরে বুর্জোয়া কংগ্রেসের পাঁচ শ টাকার নিয়মটি না কাজে লাগান হচ্ছে ততদিন সে অফিসের ছায়া মাড়াবে না। সে পাবে পঁচিশ আর ম্যানেজিং ডিরেক্টার পাবে পাঁচ হাজার এই অসম্মানজনক ব্যবস্থার মধ্যে সে নেই।

সরসী অবশ্য সেরকম যুগান্তকারী সংস্কার না আসার আগেই দল ভেঙেগ চাকরীতে ঢুকে পড়েছে আর সকাল বিকেল চিনির ভারবাহী সেই বিখ্যাত জন্তুর মত অফিস ও বাড়ী যাতায়াত করছে। অফিসের মুনাফা ভাগে বা ভোগে কোন হাত নেই, শুধু হাড়ভাঙা খাটুনী দিতে হবে সেই গরীবের রক্তশোষা মুনাফাটা বাড়িয়ে দেবার জন্য। সরসী অবশ্য বলেছিল যে বাপের বিনি পয়সার হোটেলে আর চলছে না বলেই নেহাৎ চাকরী নিতে হয়েছে। কিন্তু ওসব ওজরে ভবীরা ভোলেনি। কেন, বাপমার দায়িত্ব নেই নাকি আমাদের প্রতি যে আমাদের আদর্শ নষ্ট করে শিঙ ভেঙেগ গোয়ালে ঢুকতে হবে? আমরা জন্মিয়েছি বড় কাজের জন্য, শুধু ডালভাতের বন্দোবস্তের উদ্দেশ্যে জীবনটা ঘানিতে জুড়ে দেবার জন্য নয়। যতদিন সেই বড় কাজ হাতের কাছে না এগিয়ে আসছে ততদিন অবশ্য এমনি করে রোয়াকে বসে সে সম্বন্ধে আলোচনা চালিয়ে আদর্শটা জীইয়ে রাখতে হবে।

সেকথা মনে হতেই অকিঞ্চন একটু বল অনুভব করল ভিতরে ভিতরে। শরীরটা নাড়াচাড়া দিয়ে একটু বুকটা চিতিয়ে বসল। শাদামাঠা জীবন তার জন্য নয়।

কিন্তু আজকের ফুটবল ম্যাচটা? সামান্য এই ক'আনা পয়সার জন্য বুড়ো বাপের কাছে হাত পাততে হয়। কথাও শুনতে হয়। আবার তাতেও পয়সা মেলে না।

এরকম অসহ্য অন্যায় আর কতদিন সওয়া যায়? রাগের চোটে নতুন কিছু ভাববে বলে সে ঠিক করল। নতুন কিছু। ভাবতে শুরু করল অকিঞ্চন। এরকমভাবে সব কিছু থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকাই ভাল, না কখনো কখনো বিশেষ ব্যাপারের সময় বাড়ীতে হাত পেতে চেষ্টা করে দেখাই ভাল, না একটু লুকিয়ে লুকিয়ে আদর্শ ভেঙেগ কিছু কাজ করে উপায়ের চেষ্টা করা চলতে পারে? কই, এখনো নবনী নির্ঝর এরা এসে পৌঁচায় নি। নিরিবিলিতে একটু ভেবে দেখা যাক। ওরা এসে হাজিরা মারলে এসব কথা আর ভাবতে দেবে না। এরকম কথা ওদের কাছে পাড়তেও লজ্জা করবে।

না, মিসেস রুজভেল্টের কাছে লিখে কোন সুবিধা হবে না। গোটা কয়েক টাকা অবশ্য দিতেও পারে পাঠিয়ে, কিন্তু তা পেলেই নবনী কোম্পানী তাতে ভাগ বসাতে চাইবে, অন্তত নীলকণ্ঠ কেবিনে রোজ সন্ধ্যায় খাবার তাগাদা দিয়ে সত্যিকারের সোস্যালিজম চালাবে আমার পকেটের উপর। তারপর আবার পকেট গড়ের মাঠ আর আবার সেই একই চালচুলোহীন অবস্থা। জাতও যাবে, পেটও ভরবে না।

তার চেয়ে একটা বাঁধাধরা উপায় মন্দ নয়। কিন্তু কই, তার ত কোন পথ দেখছে না অকিঞ্চন। ওসব লেখাপড়ার লাইনে কিছু সুবিধা হওয়া বড় শক্ত। দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মহড়া দেবার জন্য অনেকগুলি "দিবস" সে সিপাইয়ের মত নিষ্ঠা ও ত্যাগ এমনকি বীরত্ব দেখিয়ে পালন করতে কসুর করেনি। ভীড়ের মধ্যে পুলিশের ব্যাটন আর গুলীর ভয়ও সে করেনি। ভেবেছিল যে ভিয়েৎনাম দিবস পালনের মধ্যেও ভারত স্বাধীনতা দিবস মেশান আছে, ভেবেছিল টেনিসনের সেই চার্জ অব দি লাইট ব্রিগেড কবিতাটায় সৈন্যদের মত—

Their's but to do and die,
Their's not to reason why......

তারও স্বাধীনতা যুদ্ধে শুধু প্রাণ ঢেলে এগিয়ে যেতে হবে নির্বিচারে; সেই ডিসিপ্লিনেই হবে তার পরীক্ষা। সে পরীক্ষায় অবশ্য পাশ সে করেছে, তবে দুর্ভাগ্যের কথা কলেজের অ্যানুয়াল পরীক্ষায় পাশ করেনি আর পার্শেণ্টেজেও যে ঘাটতি পড়েছে তা বুঝতে পেরে সে নিজে থেকেই কলেজ থেকে রেহাই নিয়েছে।

তারপর এই রোয়াকে সে রোজ পার্শেণ্টেজ কামাচ্ছে।

ইতিমধ্যে যারা স্বার্থত্যাগ করল না দেশের জন্য যুদ্ধ করল না, নির্বিবাদে পাশ করে গেল তারাই এখন চাকরীর বাজার গুলজার করছে। এমন জমাটভাবে যে, কোন স্কুলে পর্যন্ত তার মাস্টারী জোটান শক্ত

তার চেয়ে ভাবতেও মনে মনে সঙ্কুচিত হয়ে উঠল অকিঞ্চন—আজ একবার অফিস-পাড়াটা ঘুরে আসা যাক। যদি কিছু জুটে যায় অন্তত প্রথম কিছু দিন নবনী কোম্পানীকে কিছু না বললেই চলবে একটু চক্ষুলজ্জা ত আছে।

চোখটা ওপরে তুলতেই সামনের বাড়ী জানলায় অতসীর দিকে নজর পড়ল অকিঞ্চনের বোনের সঙ্গে এক ক্লাশে পড়ে এবার ইণ্টার দিয়েছে, পড়াশুনায় খুব মন ভারী ইণ্টারেস্টিং মেয়ে। ওর সম্বন্ধে আলোচনা করতে, ওর কথা ভাবতে, ওকে হঠাৎ দেখতে পেতে খুব ভাল লাগে। বোনে বন্ধু, সেই সুযোগে একটু ভাবসাবও করবার চেষ্টা না করেছে তা নয়। খুব ভাল লাগে ওকে। সত্যি কথা বলতে কি য দিন যাচ্ছে ততই বেশী ভাল লাগতে আরম্ভ করেছে।

কিন্তু লাভ কি? ভাল লাগায় কোন লা নেই যদি তার পিছনে আরো কিছু না থাকে অকিঞ্চন জানে যে অতসীর বাবা মা ও বিয়ের সম্বন্ধ খুঁজতে আরম্ভ করেছে এর মধ্যে। বলছে যে হাতের কাছে এমন কো

পাত্র ত নেই যে এখন থেকেই খোঁজখবর না নিলে চলবে। হাজারটা সম্বন্ধ আর লাখটা কথায় একটি বিয়ে। কাজেই বছর দু'তিন আগে থেকেই খোঁজখবর নিতে শুরু করা দরকার।

কিন্তু হায় তার ঘাটে কোনদিন নিজের নৌকা ভিড়াবার আশা নেই অকিঞ্চনের। শুধু অতসী কেন, কোন মেয়েই তাকে ভিড়তে দেবে এমন আশা সে ঠিক এই মুহূর্তে করতে পারছে না। কলেজের ভাল ছাপ তার কপালে পড়ল না। সময় কাটছে রোয়াকে না হয় পাড়ার মাঠে, কোন অফিসে বা কাজের মধ্যে নয়। ভবিষ্যতের জন্য কোন রঙীন আশা নতুন পথ কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ওই অতসীর মতই সব কিছু জানলার পিছনে অন্ধকারে মিলিয়ে যাবে।

ভাবতে ভাবতে একটু গরম হয়ে উঠল কানের ডগাটা। তাহলে সব কিছু পাওনা, সবকিছু চাওয়ার মত জিনিষই ওই জানলার লোহার শিকের পিছনে আড়াল হয়ে যাচ্ছে? সব কিছুই ছিনিয়ে নিতে হবে নিজের চেষ্টায়, নিজের পরিচয় দিয়ে? বাপের হোটেলের কল্যাণে যে দেহ বাঁচান যেতে পারে, আড্ডা, ম্যাচ ও হৈ হৈ যে উত্তেজনা প্রাণে সঞ্চার করে তাতে বেশী দূর এগোন যাবে না? পাড়ার লোকে এর মধ্যেই যে বকা ও বাউণ্ডুলে বলতে শুরু করেছে এমন কথাও মা অশ্রুসিক্ত মুখে দুয়েকবার বলেছে ওকে।

নাঃ এর একটা বিহিত করতেই হবে। সে গা আড়ামোড়া দিয়ে আলস্য ভেঙ্গে উঠে পড়ল। নবনী কোম্পানীর সঙ্গে এবেলার মত আড্ডা দেওয়া আর হল না।

অকিঞ্চন কয়েকটা অফিসে ঘোরা ফেরা করেই বুঝল যে চাকরীর বাজারটা কলেজের পরীক্ষার চেয়ে অনেক বেশী কঠিন ব্যাপার। বাবার সময়কার চেনা কয়েকজন বড়বাবুর কাছে গিয়ে সে ধর্ণা দিল। কিন্তু চাকরীর উমেদারী আর উমার তপস্যা, সে দেখল, সমানই শক্ত কথা। প্রার্থী এসে দাঁড়িয়েছে বুঝলেই মহাবাবুর দুই নেত্রই সঙ্গে সঙ্গে সামনের ফাইলে ধ্যানস্থ হয়ে যায়।

সে অনেক অনুনয় করল, অনেক গলা খ্যাকারী দিল ও বিগলিত ভাব দেখাল। কিন্তু কিছুতেই বর পাবার ভরসা পর্যন্ত পেল না। ধ্যান যদি বা ভাঙ্গে বড়বাবু এমন ভাবে তাকান যে নেহাৎ কলিযুগ না হলে অকিঞ্চন একেবারে ভস্মই বোধ হয় হয়ে যেত। এত রাগ, এত তাচ্ছিল্য।

তাতে অবশ্য তার সংকল্প আরও দৃঢ়ই হতে লাগল। বেকারজীবনের অবসান আজই ঘটাতে হবে। এখনো কয়েকটি চেনা অফিসে চেষ্টা করা বাকী আছে। সম্ভব হলে ও হেস্তনেস্ত আজই করে নিতে চায়। আর নবনী কোম্পানীর আদর্শ পথ বিচ্যুত হওয়া বা ফুটবল ম্যাচ দেখতে পাওয়া তাকে বিচলিত করে তুলছে হাউই বাজীর মুখে দেশলাইয়ের জ্বলেছে—সে ক্লান্ত হয়ে, ক্ষুণ্ণ হয়ে নিরুৎসাহ হতে হতে অন্য একটা অ ঢুকতে ঢুকতে মনে মনে বলতে লা হাউই বাজীর মুখে দেশলাইয়ের জ্বলেছে; আজই এটাকে ওড়াতে আকাশে, পলতে জ্বলে শেষ হয়ে আগে।

কিন্তু হায়! পলতে জ্বলে ছাই গেল এবং সে ছাই দেখে অকিঞ্চন একটি কিছু করবে ঠিক করে ফেলল

শেষ যে অফিসে সে ভাগ্য পরীক্ষা গেল সেখানে বড়বাবুর শিবের ধ্যান কেহ বোধ হয় একটু আগেই ভ গিয়েছিল। মদনভস্ম তৎক্ষণে হয়ে কারণ মদন অন্তর্ধান করে অ করেছে। চাপরাশী দাঁত বের করে কাঠের বোর্ডটি চোখের সামনে তুলে বড় বড় করে লেখা আছে চিরকালের নো ভেকান্সি। তাতেও সে দমল না সামনে বেড়া দেওয়া থাকলেও খিড়কি

কি ভাবে ঢোকা যায় সে কথা সে অনেক শুনেছে। অতএব সে যখন ঢুকতে চাইল চাপরাশী তাকে দাঁতের ফাঁক দিয়ে সরবে জানিয়ে দিল, নো ভেকুন্সি হ্যায়।

তবু সে আবার ঢোকবার চেষ্টা করছে এমন সময় দেখল বড়বাবুই বোধ হয় নিজে বেরিয়ে এলেন। চড়া গলায় বললেন, এই যে, আর এক ছোকরা ভ্যাগাবণ্ড, চাকরী চাও এসেছই। আরে বাবা, চাকরী তোর বাপের পোঁতা গাছের ফল কিনা। ঝেড়ে নামালেই মুখে এসে সেঁধোবে। বলি, জন্ম তপস্যা করেছ?

আত্মসংবরণ করে সে বলল, স্যার, একটি ছোট খাট চাকরী হলেও চলে যায়।

ব্যঙ্গের কোন প্রয়োজন ছিল না কারণ বড়বাবুর মুখটাই একটি ব্যঙ্গ। তার উপর তিনি যখন আরো ব্যঙ্গের বিকাশ করলেন তখন অকিঞ্চনের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা পড়তে লাগল,—চলে যায়? বটে, ছোট চাকরীতেই চলে যায়? অবশ্য বড়সাহেব হয়েই তোমাদের শুরু করা উচিত, কেবল দয়া করে ছোট চাকরীতেই চালাতে চাও। যাও না, ওই যে বেগ ব্যারো এণ্ড স্টীল কোম্পানী আছে। ওখানে বড়সাহেব হয়েই শুরু করতে পারবে। যাও যাও যত্তো সব ভ্যাগাবণ্ড।

বলেই তিনি আঙ্গুলটা যেদিকে এগিয়ে দিলেন সেটা তার নিজের বড়সাহেবের কামরা না ওই নামের কোন অফিসের পথ তা ঠিক বোঝা গেল না।

সিঁড়ির মাথায় নেমে আসছে এমন সময় অকিঞ্চন শুনতে পেল চাপরাশি মহাবীরত্ব দেখিয়ে আস্ফালন করছে,—হামি ত আগে ভি বলিয়েছে, নো ভেকুন্সি হ্যায়।

সর্বত্রই নেই নেই এই রব। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। হাউইয়ের ছাই অকিঞ্চনের মনকে ভরে দিচ্ছে এতক্ষণে। উৎসাহ নিভে গেছে এবং সে ঠিক করেছে যে কলকাতায় স্কোপ এত কম এবং চাকরী নিয়ে কাড়াকাড়ি এত বেশী যে এখানে ওর মত যার এত কম যোগ্যতা ও মুরুব্বির জোর তার পক্ষে কোন আশা নেই। ভাবতে ভাবতে অবসন্ন মনে সে হাওড়া স্টেশনে এসে হাজির হল। অন্য মনস্ক ভাবে একটা প্ল্যাটফর্ম টিকিট কিনে ভিতরেও ঢুকে এল। সারাদিনের ব্যর্থতার পর মন এত ক্ষুণ্ণ ও অবসন্ন যে সে আর ভাবতেও পারছে না যে এর পর কোথায় যাবে বা কি চেষ্টা করবে। তবে কলকাতায় যে ওর কিছু হবার আশা নেই এমন একটা সিদ্ধান্ত সে করে নিয়েছে। কাজেই খালি পকেটে ও বিনা টিকিটে, যতদূর যাওয়া যায় গিয়ে নতুন জায়গায় একবার চেষ্টা করে দেখবে।

কোন্ ট্রেনে ভীড়ের মধ্যে সুবিধামত ওঠা যায় তা ভেবে দেখবার জন্য সে প্ল্যাটফর্মে একটা বেঞ্চে বসল। এই কলকাতায় কিছু হবে না। বাইরে কোথাও গিয়ে চাকরীর চেষ্টা করতে হবে।

পশ্চিমের একটা ট্রেন এসে প্ল্যাটফর্মে ঢুকল। সামনের একটা থার্ড ক্লাস কামরা থেকে কয়েকজন লোক বেরিয়ে এসে একটু দিশেহারার মত এদিক ওদিক তাকাচ্ছে দেখে টিকিট চেকার এসে টিকিট পরীক্ষা করে নিয়ে নিল। লোকগুলি যে কোথায় যাবে তার ঠিক নেই। এদিক সেদিক চেয়ে ওরা অকিঞ্চনের পাশে ও পিছনে লাগান বেঞ্চের ওপাশে বসল।

কিছু করবার নেই বলে অকিঞ্চন ওদের দিকে একটু লক্ষ্য রাখল। নেহাৎ দেহাতী লোক, শক্ত সমর্থ কিন্তু এখানে সম্পূর্ণ নতুন। হাবভাবে একটু বিব্রত ভাব প্রকাশ পাচ্ছে। লোটা ও পুটলীর বহর দেখে বুঝতে বাকী থাকে না যে ওদের পকেটও তার নিজেরই মত প্রায় গড়েরমাঠ। ভাল করে ওদের লক্ষ্য করতে লাগল। ওরা নিজেদের গ্রাম্য ভাষায় কথা বলছে। অকিঞ্চন ভাবল ওরাও তার নিজের মত টাকার সন্ধানেই বেরিয়েছে। বেঁচে থাকার সমস্যাই সব চেয়ে বড় সমস্যা। তার মতই ওরা স্বদেশ থেকে পলায়ন করেছে।

সে সমস্যা ওদের ব্যাকুল করে তুলেছে। পোটলা থেকে একটা আলুমিনিয়ামের গ্লাস বের করে প্ল্যাটফর্মের কলের জল খেতে খেতে একজন সে কথা তুলল। জয়পুরের কোন গ্রাম থেকে অনির্দিষ্টের অদৃশ্যের সন্ধানে এই বিরাট শহরে এসে পড়ে সে একটু যেন ভড়কিয়ে গিয়েছে মনে হল। অন্য সবাই তার মতই ভড়কিয়ে গিয়েছে; কিন্তু একজন বলে বসল যে ভয় পাবার কিছু নেই। স্টেশন থেকে বেরিয়ে শহরে একবার পা দিতে পারলেই হল। তার শোনার মধ্যে বহুলোক আছে যারা তার মত নিঃসম্বল হয়ে এখানে এসে এমন শ্রীধনধনিয়াজী ইত্যাদি নাম নিয়ে লাখপতি হয়ে বসেছে।

আর একজন তাড়াতাড়ি বলে উঠল,—বল নি কেন এতক্ষণ? তাহলে ধনধনিয়াজীর কাছেই ত এখন যাওয়া যেতে পারে। আজ রাত্রিটি ধর্মশালায় কাটিয়ে কাল তার কাছে গেলে ছোটখাট একটা চাকরী ত জুটিয়ে দিতে পারবে অন্তত আরম্ভ করবার মত।

প্রথম জন প্রতিবাদ করে উঠল মনে হল। বেশ ঝাঁঝ দিয়ে বলল, চাকরী করণে মাটে কই ফয়দা নেই। সে আরও কি সব বলে গেল বোঝা গেল না। এটুকু বোঝা গেল যে, গেলামে হুঁ দেখতা দেখতা হি কামালুঁ গা।

'গেলামে' জিনিষটা কি? কোথায় ওরা দেখতে দেখতে টাকা কামাই করবে? উৎসুক হয়ে বুঝবার চেষ্টা করতে লাগল অকিঞ্চন।

ওরা যদি 'গেলা' থেকে দেখতে দেখতে টাকা করে নিতে পারে সেই বা কেন পারবে না। বাপের হোটেলে এত কিছু সমাদর বা যত্ন সে পেতে অভ্যস্ত নয় যে একটু কষ্ট করে বাজারের ভীড়ে বা রাস্তার ঠেলা-ঠেলিতে নিজের একটু ঠাঁই করে নিতে পারবে না। ওরা অত দূর থেকে কষ্ট করে এসে আস্তানাবিহীন অবস্থাতে মূলধন ছাড়া যা পারবে, অন্তত মাথা গুঁজবার জায়গা যার আছে সে পরিচিত কলকাতায় তা করতে পারবে না?

এতক্ষণে বোঝা গেল, গেলা মানে রাস্তা। আচ্ছা, ওরা এত কাজের লোক যে রাস্তা থেকেই টাকা কামাতে পারবে? তবে সে নিজে তা পারবে না কেন? ফেরি করে, রকের কোণায় প্যাকিং বাক্সের কাঠের দোকান দিয়ে আজকাল উদ্বাস্তুরাও নিজেদের সংস্থান করে নিচ্ছে। তবে কেন আমি পারব না? কোন না কোন পথে পারবই। থাকুক ড্যালহাউসি স্কোয়ারের তপস্যা পিছনে পড়ে। আমি এগিয়ে যাব। পালাব না।

অকিঞ্চন ঠিক করল সে আর মিছেমিছি সময় নষ্ট করবে না। ওই দেহাতী জয়পুরী লোকগুলি বলেছে যে কলকাতায় এত উপায়ের পথ পড়ে আছে যে যো কি মর্জি আবে ওই লে যাবে। তারও মতি এসেছে, সেও নিজের পথ নিতে পারবে। শাদামাঠা ভাবেই তার প্রথম জীবন শুরু হোক।

দৃঢ় পদক্ষেপে একজন নতুন মানুষ প্ল্যাটফর্ম থেকে বের হয়ে আসছে। সামনের লম্বা রেলিংগুলি ওকে বাধা দিতে পারবে না। জানলার শিকের ওপারে অতসী ও সংসারের আরো বহু চাওয়ার ধন তার পাওয়ার জন্যই অপেক্ষা করছে।

খেলনা ও সৌন্দর্যবোধ

বদ্রীনারায়ণ

শিশুদের খেলনা-প্রীতি—বাড়ন্ত শিশু-মনের সহজগ্রাহ্য, সরল বলিষ্ঠ আঙ্গিকযুক্ত এবং উন্মেষশীল দর্শনেন্দ্রিয়ের আনন্দজনক উজ্জ্বল বর্ণশোভাময় খেলনার প্রতি প্রবল ও দুর্নিবার আকর্ষণ শিশুমনের সহজাত ধর্ম। শিশুদের নির্মল আনন্দ দেবার জন্যে, তাদের মনোরঞ্জনের খোরাক হিসেবে

কাদার তৈরী কলসী কাঁখে সুন্দরী

আবহমান কাল থেকে তাদের উপযোগী করে বিশেষভাবে খেলনা তৈরী হয়ে আসছে—যা আনুষ্ঠানিক, ধর্মসম্পৃক্ত মূর্তি-শিল্পের চাইতে সম্পূর্ণ পৃথক জাতের। অতীত যুগের নিরেটবস্তুর সাদাসিধে খেলনা, বিশেষত যেগুলো লোক ও কিষাণ সংস্কৃতির পরিচয়বাহী, সেগুলোর বলিষ্ঠ গঠন নৈপুণ্য সৌন্দর্যতত্ত্বের দিক থেকে অনিন্দ্য ছিল।

প্রত্নতাত্ত্বিকরা সাম্প্রতিক কালে মোহেন-জো-দড়ো ও হরপ্পায় খনন-কার্য করে অতীত সভ্যতার শিল্প-কীর্তির কতকগুলো নিদর্শন আবিষ্কার করেছেন এবং সেগুলোর মধ্যে প্রাচীনতম খেলনারও সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। সেকালের শিশুদের খেলনার বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতার সাথে একালের ভারতে তৈরী কতকগুলো খেলনার আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখা যায়। সেকালের খেলনার ভাণ্ডারে ছিল—টেরাকোটা, গরুর গাড়ি, পক্ষি-রথ প্রভৃতি চাকাযুক্ত খেলনা; ষাঁড় বাঁদর গণ্ডার প্রভৃতি পশুমূর্তি; ঝাঁকুনি দিয়ে বা সুতো টেনে 'সজীব' করা যায়, সঞ্চরণশীল হাত ও মুণ্ড-বিশিষ্ট এমন সব মূর্তি; চাটু প্রভৃতি গৃহস্থালীর দ্রব্য; ঝুমঝুমি, গোলক, পাখির আকারে মাটির বাঁশী; নানা আকারের মনুষ্য মূর্তি। প্রাচীন ভারতে শিশুদের জন্য মনোহারী খেলনা তৈরী একটা আকাঙ্ক্ষিত সৃজন-কর্ম বলে গণ্য ছিল বলে মনে হয়।

বিভিন্ন সংস্কৃত কাব্যে খেলনা ও খেলার উল্লেখ পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীরও পূর্বে রাজা শূদ্রক বিরচিত বলে কথিত সুবিখ্যাত নাটক 'মৃচ্ছকটিক'-এর

কাঠের তৈরী পুরুষ

নাম লক্ষ্য করিবার বিষয়। 'মৃচ্ছকটি[ক'] অর্থ ক্ষুদ্র মৃৎ-শকট এবং নাটকের স্বপ্রকাশ যে খেলনা থেকেই এর নাম একটি খেলনা-শকটের ভেতরে রত্ন-অ[লংকার] লুকিয়ে রাখা হয়েছিল, এই ঘটনাকে [কেন্দ্র] করে নাটকের আখ্যান রচিত। সু[বিখ্যাত] 'শকুন্তলা' নাটকে কালিদাস জনৈকা

কাঠে খোদাই করা পুরুষ

বাসিনীর মুখ দিয়ে শিশুর খেলনা—মাটির ময়ূরের প্রতি আমাদের আকর্ষণ করেছেন—

"মদীয়ে উটজে মার্কণ্ডেয়স্য ঋষিকু[মারস্য] বর্ণচিত্রিতো মৃত্তিকাময়ূরোস্তিষ্ঠতি"—কুটীরে মার্কণ্ডেয় নামক ঋষিকুমারের বর্ণে রঞ্জিত একটি মাটির ময়ূর আ[ছে]। (৭ম

দেশীয় খেলনা ও পুতুল এখনও ভ[ারতের] সর্বত্র সগৌরবে বিরাজমান। এগুলোর কল্পনায় ভারতীয় সনাতন ধারার ব্যত্যয় ঘটেনি এবং কতকগুলো [...] সাথে প্রাচীন কালের খেলনার এখনও বিস্তর সাদৃশ্য রয়েছে। খেলনার ম[ধ্যে]

সবৎসা গাভী
(উত্তর ভারত)

গুলোতে উচ্চাঙ্গের কলাজ্ঞানের পরিচয় রয়েছে, সেগুলো লোক-শিল্প ও গ্রাম্য-সংস্কৃতির উর্বর কল্পনার দান। এই কারু-শিল্পের উপাদান হচ্ছে প্রধানত কাদামাটি, টেরাকোটা, মাটি ও খড়ের সংমিশ্রণ, কাঠ, কাপড়, বাঁশ কাগজের মণ্ড প্রভৃতি। আধুনিক কালে সাধারণত ছাঁচে ঢেলে, মডেলের সাহায্যে, খোদাই করে, টুকরো টুকরো কাঠ একত্র জোড়া লাগিয়ে, করাত-গুঁড়ো বা অন্য কোন জিনিস ভেতরে ঠেসে দিয়ে পুতুল গড়া হয়। খেলনা ও পুতুলকে রঞ্জিত করবার জন্যে সচরাচর ব্যবহৃত হয় খুব কড়া রঙের রঞ্জক পদার্থ—যেমন, গাঢ় সিঁদুরে লাল, গাঢ় বাদামী ও হলদে, গাঢ় সবুজ ও নীল প্রভৃতি; অলংকরণ ও আকৃতি পরিস্ফুটনের জন্য পুতুলের গাত্র পরিষ্কার গোল গোল ফোঁটা ও বলিষ্ঠ রেখা দ্বারা শোভিত হয়; ফোঁটায় ও রেখায় পুতুলের চেহারা অতি চমৎকাররূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। খেলনার আকার-অবয়বও নানাবিধ হয়ে থাকে, যেমন চৌকা, লম্বা, স্থূল ও গোল। তা' ছাড়া, দীপালি প্রভৃতি উৎসব-অনুষ্ঠান ও রূপসজ্জার জন্যে ফুল পাতা পশু পাখি মাছ আঁকা নানা বিচিত্র ধরণের ও বর্ণসমুজ্জ্বল মৃৎপাত্র তৈরী হয়। মৃৎপাত্রগুলি সাধারণত 'গোপুর' আকারে একসঙ্গে তিন-তিনটি করে সাজান থাকে। বর্ণ-সম্ভারে ও রচনা-সৌষ্ঠবে এগুলি অতি নয়ন-তৃপ্তিকর।
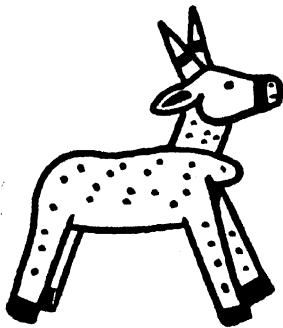
দিশি সনাতন খেলনা ও পুতুলই এখন পর্যন্ত অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ও অশিক্ষিত শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের প্রধান খেলার সামগ্রী। কারণ, 'শিক্ষিত' ও 'সংস্কৃতিবান' সম্প্রদায় সাধারণত এ সকল খেলনাকে সস্তা ও তাঁদের ছেলেমেয়েদের পক্ষে অমর্যাদাকর বলে মনে করেন। ফলত ভারতীয় খেলনা-শিল্পের অনিষ্ট করে তাঁরা প্রায়ই কলে-তৈরী বিদেশী রবার, প্ল্যাস্টিক ও সেলু-লয়েডের খেলনাই বেশী পছন্দ করে থাকেন। এর মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া তাঁদের ছেলে-মেয়েদের ওপর কি রকম হয়ে থাকে, আমরা এখানে প্রসঙ্গত তার উল্লেখ করতে পারিঃ এ সকল ব্যক্তির প্রায়ই সৌন্দর্যবোধ ও শিল্প-রুচির অভাব থাকে এবং এই দৈন্যের ফলে তাঁদের সন্তান-সন্ততিরও বিচার-বুদ্ধির বিপথগামী হবার সম্ভাবনা থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোন বালকের হাতে যদি একটা খেলনা-বন্দুক ('রাখাল বালক' ও 'দস্যু-সর্দার' জাতীয় জোরালো ছায়াচিত্রের কুপ্রভাব যাদের উপর পড়েছে, আজকাল এটি তাদের প্রিয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে) দেওয়া হয়, তবে পরিণত বয়সে সে যদি সত্যিকারের বন্দুক দাবী করে বসে, তবে আশ্চর্য হবার কিছু নেই এবং এর পরিণাম, যা ছিল বালক-দের কৃত্রিম যুদ্ধ তাই গিয়ে শেষ পর্যন্ত দাঁড়াবে বয়স্কদের প্রাণঘাতী লড়াইয়ে—যে মর্মান্তিক ব্যাপার এড়াবার জন্যে পৃথিবীর স্থিতধী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা সতত আগ্রহশীল।
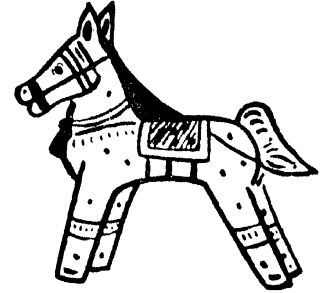
দামী, পাইকারী হারে কলে-প্রস্তুত খেলনার পরিবর্তে স্বদেশের কলা-সুন্দর খেলনা দ্বারাই বর্ধিষ্ণু শিশুর ক্রম-বিকাশমান মনের চাহিদা পর্যাপ্ত পরিমাণে

রূপবতী কন্যা

মাটির ঘোড়া

মধ্য ভারতের মাটির গরু
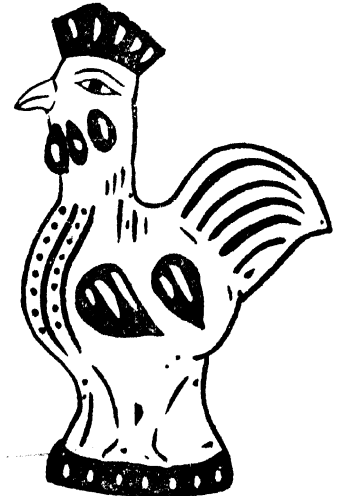
দাক্ষিণাত্যের মাটির তৈরী মোরগ

নারকেল মালার উপর তৈরী পুতুল

মেটানো যেতে পারে। এগুলো দামেও সস্তা এবং একটি নষ্ট হয়ে গেলে আর একটি কিনে তার স্থান পূরণ করাও শক্ত নয়। সুন্দর ছোট হাতী, বাছুরকে স্তন্যদান রত গাভী, মা ও শিশু, কলসী-মাথে আয়ত-লোচনা সুন্দরী কুমারী, বাঁশের মত লম্বা পা-ওয়ালা ঘোড়া, প্রকাণ্ড কুঁজ-ওয়ালা উট, বিচিত্র রঙের ময়ূর, উপবিষ্ট ভেক এবং আরও কত অজস্র খেলনা শিশুদের দেওয়া যেতে পারে। এগুলো শিশুকে শুধু আনন্দ ও কৌতুকই দেবে না, সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাও দেবে। এ সব সহজ খেলনার মারফৎ তারা বিভিন্ন পশু-পাখির সঙ্গে পরিচিত হতে পারবে।

প্রসঙ্গক্রমে দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে, এই পুরাতন খেলনা-শিল্প অবনতির পথে চলেছে এবং কলে-তৈরী রাশিকৃত খেলনার প্রতিযোগিতা ও সাধারণভাবে রুচির ক্রমাবনতিই এর কারণ। মেলা প্রভৃতিতে পূর্বে যেখানে সস্তায় রুচিসম্মত খেলনা বিক্রি হত, আজকাল সেখানে জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও বরেণ্য মহাপুরুষদের ছাঁচে-তোলা মাটি ও প্লাস্টারের মামুলি আবক্ষ মূর্তির (পৌরাণিক মূর্তির কথা বাদই দেওয়া গেল) আবির্ভাব হয়েছে। পূর্বে যেখানে খেলনা, পুতুল ও চিত্র-শোভিত মৃৎপাত্র গৃহসজ্জার অঙ্গ ছিল, এখন তার পরিবর্তে জাতীয় নেতৃবৃন্দের কলাবর্জিত আবক্ষ-মূর্তি দিয়ে ঘর সাজান

দীপাবলী উৎসবের মাটির ঘট
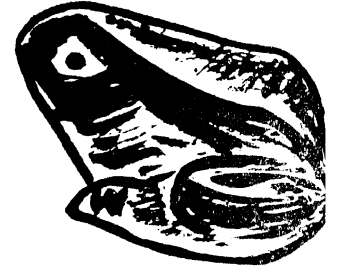
মাটির ব্যাঙ্

ফ্যাশন হয়েছে। সুতরাং একথা জো সঙ্গে বলতে হবে যে, জনসাধারণ য সুকুমার কারু-শিল্পের ঐকান্তিক পৃ পোষকতা না করেন, তবে জীবিকার তা প্রাণহীন তুচ্ছ জিনিস তৈরী করতে ক এককালের খ্যাতনামা ভারতীয় শিল্প সৃজনী-প্রতিভা ক্রমশ লুপ্ত হয়ে যাবে।

জাতীয় জীবনে খেলনা ও পুতু একটা বিশেষ স্থান আছে। কারণ সু বস্তু হিসেবে এগুলোর সাথেই শিশুর প্র পরিচয় ঘটে এবং সুন্দর রুচিসম্মত খেল মারফৎ অতি শৈশব থেকেই শিশুর অ নিহিত বিচার-বুদ্ধিকে যথোপযুক্ত উদ্বোধিত, নিয়ন্ত্রিত ও পরিপুষ্ট করা যে পারে।

[March of India-র সৌজন্যে]

লোকোশেডের গান

শ্রীঅরুণেন্দু দাস

বয়লার কালো ধোঁয়া ফিসফাস কথা
রাত্রির বুকে জমা একটানা ব্যথা
হাতুড়ীর ঠং-ঠাংয়ে কোথা যে উধাও!
কলোনীর কালো রাতে নীরবে শুধাও।

চঞ্চল জীবনের যাযাবর-পথ
সচকিত মুখরতা গতির শপথ
ফুঁসে ওঠা বাষ্পের তীব্র করুণ—
জ্বলে ওঠা অঙ্গার তপ্ত-তরুণ!

পেশী আঁকা হস্তের চঞ্চল গতি
সৃষ্টির গতিবেগে কোথায় বি-রতি?
ইস্পাতী সুরে কাঁপে রাত থরোথর
তবুও, কামনা-কাঁপা মন-সরোবর!

বয়লারে কয়লার লালচে আভায়
জ্বলে ওঠে মুখ কার মনের ছায়ায়?
চূর্ণ অলক-ঢাকা এক অদ্ভুত
কয়লার কালো মেঘে এ কে মেঘদূত!

ঠুনকো চুড়ির গানে কি যে যাদু আঁকা!
দেহের সীমায় ওড়ে কামনার পাখা
বেশোয়িত জীবনের দেহ-পেয়ালায়
নীলে নীল নেশা কার মনের কারায়!

গতি হারা জীবনের কামনার টিপ
সময়ের লিপিকায় ক্ষণিক ঝিলিক।

হঠাৎ

সুশীল রায়

হঠাৎ—কথাটা মনে পড়ে গেল হঠাৎ। তৈরি ছিলাম না। এমন একটা কথা আকস্মিকভাবে এভাবে আক্রমণ করল কেন, তাই ভাবছি।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হয় ব'লে শুনেছি। সে জিনিসটা কেমন, তা চাক্ষুষ দেখি নি অবশ্য কোনো দিন। তাই তার স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণা নেই। কিন্তু মেঘলা আকাশের বজ্রপাত দেখেওছি, শুনেওছি। তেমন কড়া হলে এ বাজ শাল-তাল মানে না, তাদের লক্‌লকে কচি পাতাদের ঝলসে দেয় এক নিমেষে! সেই গাছেদের এই হঠাৎ-পরিবর্তনে আমরা হয়তো শিউরে উঠি। কিন্তু ওইটুকুই। ওই শিহরণ-টুকুই আমাদের লাভ। ওই কাঁপুনিটুকুই আমাদের এক লহমার সহানুভূতি। ওই বাজ ওদের মাথায় না পড়ে আমার মাথায় পড়লে হয়তো তাদের পাতা সমেত একটু কেঁপে উঠত হয়তো।

কিন্তু এ কাঁপনেরই-বা বাড়তি দাম কতটুকু? দক্ষিণের সামান্য একটা বিলাসী বাতাসের সঙ্গে রসিকতা করেও তো ওরা পাতা সমেত কাঁপে, তাহলে বাজের আওয়াজে বেশি আর কী করল?

বাজের আর বাতাসের মধ্যে কোনো পার্থক্য তাহলে হয়তো নেই ওদের কাছে! বাজও যেমন আসে, বাতাসও নাকি তেমনি আসে—হঠাৎ। তাই ওরা একইভাবে অভ্যর্থনা জানায় উভয়কে। ওদের সম্পর্ক কেবল হঠাতের সঙ্গে।

জানিনে, হয়তো এমনি এক ঝাঁক হঠাৎ দিয়ে আমাদের জীবন তৈরি। এর অগ্রও নেই এর পশ্চাতও নেই। তাই ঠিক করেছি, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে হঠাৎদের সঙ্গে সমানে কোলাকুলি করে যাব।

এটা দুরূহ দর্শনের কথা নয়, নেহাতই সহজ দর্শনের কথা। যা নিত্যনিয়মিত চোখে দেখছি, যা সরল ও সুবোধ্যভাবে স্পষ্ট বুঝতে পারছি—তাকে দুরূহ আর বলি কী করে?

সমুদ্রের উপকূলে বালুর ডেলা তৈরি করে খেলেছিলাম একদিন—তখন আমার বালককাল। তার পরে অনেককাল কেটে গেছে। সেই খেলাটার কথা—আশ্চর্য—মনে পড়ে গেল হঠাৎ। জীবনের বেলাকে এবং সমুদ্রবেলার সেই বালুকে অনেক দূরে ফেলে রেখে এসেছি অনেক দিন হল। সে-ঘটনা মন থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যাবারই কথা। মুছেও হয়তো গিয়েছিল, কিন্তু আজ নতুন করে দাগ কাটল—কী আশ্চর্য—বার বার একই কথা উল্লেখ করা উচিত না হলেও বলতে হচ্ছে, সে নতুন করে দাগ কাটল হঠাৎই। আজ বালাও নেই বালুও নেই, অথচ খেলার ঝোঁকটা আছে পুরোদস্তুর।

হাতের কাছে খেলা করার মত আর কিছু নেই। তাই খেলা শুরু করলাম লহমা নিয়ে। এক চাপ মুহূর্ত একত্র করে নিয়েছি, বানিয়ে তুলেছি একটা ডেলা। আসলে অগুন্তি লহমা পর-পর সাজালেই তো তৈরি হয়ে যায় একটা লম্বা চিরকাল। সেই চিরকালের কোল থেকে এক চাপ সময়ের কণা কুড়িয়ে নিয়ে বালোর খেলাটাকে ঝালিয়ে নিতে কেন-যেন শখ হল আজ এই অসময়ে। এ কেনর উত্তর খুঁজি নি, কেন না এই কেনর সঙ্গে হঠাতের চক্রান্ত যে আছেই—এটা নির্ঘাৎ বলে মেনে নিয়েছি।

সময়ের এই ডেলাটিকে অবিকল সেই বালুর ডেলা ব'লেই মনে হল। দু হাতে চেপে যতই সেটাকে আঁট করে বেঁধে গোল করে তুলছি, আর লোফালুফি করছি—ততই দেখছি, গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে আলাদা আলাদা লহমায় ভেঙে যাচ্ছে সেটা। একটা লম্বা জীবনকে দু হাতে তাহলে হয়তো চেপে ধরে রাখা যায় না বেশিক্ষণ; বেশিক্ষণ তাকে নিয়ে মাতামাতি করা যায় না। জীবনের ঘটনারা তফাত তফাত হয়ে গিয়ে চিরকালের কিনার ঘেঁষে গা বিছিয়ে পড়ে থাকতে চায়, যেন সমুদ্রসৈকতের সেই বালুকাদের মত।

বালুকা-বিছানাতে রামধনু দেখেছি আমি, আমি তাতে দেখেছি রোদের ঝিল-মিলানি। তির্যক ভঙ্গিতে যখন হেলে-পড়া সূর্যের আলো এসে তার উপর পড়ে, তখন তার থেকে বিচ্ছুরিত হয় সাত রকমের বর্ণচ্ছটা। আমার হাত ফসকে আজ হঠাৎ

যখন সময়ের ডেলাটা পড়ে গিয়ে গ‍ুঁড়ো হয়ে গেল, তখন তার উপর আমার চোখের ত্যারছা আলো ফেলে দেখলাম, তার থেকে নানা রঙের আলো ঠিকরে বা'র হ'চ্ছে। চিত্তও অমনি ঝলমল করে উঠল এই হঠাৎ-আলোর ঝলকানিতে।

আবার কুড়িয়ে নিতে ইচ্ছে হল না। ছেলেবেলার ছেলেখেলা করতে গিয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেলাম যেন নিজেরই। নিজের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে নিজেকে যেন চেনা-চেনা ঠেকতে লাগল আমার। বহুকাল আগে বহু জায়গায় যেন দেখেছি এই মুখ, কখনো হাসিতে উজ্জ্বল, কখনো বিষাদে ফ্যাকাশে, কখনো ম্লান, কখনো অম্লান, কখনো দীপ্ত, কখনো-বা দৃপ্ত, কখনো-বা নেহাতই আটপৌরে—এই সাত রকম রঙেই এর দেখা যেন মিলেছে।

যে-সময়কে কুড়িয়ে নিয়ে খেলা করছিলাম, সেই সময়কে ছড়িয়ে দিয়ে খেলা শুরু করলাম এবার। এই বিস্তৃত সময়ের চেহারা ধ'রে যেন আমিই পড়ে আছি টান হয়ে। বালুকার অজস্র কণার মত পড়ে আছে আমার জীবনের লহমারা—যারা একত্র হয়ে আমার জীবনের বছরগুলো গড়ে তুলেছে। তারা পড়ে থেকে চিকচিক করছে আমার চোখের সামনে। একদৃষ্টে চেয়ে আছি সেই দিকে, আমি যেন অভিভূত হয়ে গেছি, যেন সম্মোহিত হয়ে গিয়েছি একেবারে।

বহুদিন আগে একবার শখ হয়েছিল, ম'রে গিয়ে মজা দেখবার শখ। যারা অন্তরঙ্গ, যারা পরমাত্মীয়, যারা ঘনিষ্ঠ সুহৃদ্—তারা আমার মৃত্যুর পরে কীভাবে কাৎরায়, তাই দেখবার শখ। সে-শখ মেটাতে পারিনি। এ জন্যে আক্ষেপ ছিল। আজ সে-আক্ষেপ কিছুটা যেন মিটল। মনে হ'ল, আমি যেন স্বচক্ষে আমার নিজের জীবনের শ্মশান দেখতে পাচ্ছি। আমার বিগত মৃত জীবনটা আমার চোখের সামনে পড়ে আছে টান-টান হয়ে। আমি, আমার নিজের অকপট সুহৃদ্ হওয়া সত্ত্বেও, এই করুণ দৃশ্যটা দেখে এতটুকু বিচলিত হলাম না, আমার হাসি পেল। আমার নিজেরই যখন হাসি পেয়েছে, তখন অন্তরঙ্গরা এ দৃশ্য দেখলে কতখানি উপভোগ করতে পারবেন তা আন্দাজ করতে পারছি। সুতরাং সত্যি সত্যি ম'রে গিয়ে পুরো জীবনটা একেবারে খোয়ানোর ঝুঁকি আর নিতে চাই নে। জীবনের যতটা খোয়া গেছে, তাকে নিয়েই পরখ ক'রে দেখা আজ হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ আগেও আমি এতটা জ্ঞানী ছিলাম না। কিছুক্ষণ আগে পর্যন্তও ম'রে গিয়ে মজা দেখার শখটা মনের মধ্যে চাপা ছিল। কিন্তু জ্ঞানী হয়ে উঠলাম আমি, জ্ঞানী হয়ে উঠলাম হঠাৎ। যদি এই জিনিসটার আকস্মিক আবির্ভাবের জন্যে এতটুকু অপেক্ষা না করতাম, যদি হঠাৎ মরে যেতাম, তাহলে কী সাংঘাতিক সর্বনাশ হয়ে যেত—ভেবে শিউরে উঠছি। যেভাবে শিউরে ওঠে শাল-তালেরা দক্ষিণের বাতাসের ধাক্কা খেয়ে।

যাঁরা অভিজ্ঞ ও সর্বজ্ঞ, গুণী ও জ্ঞানী—তাঁদের অবহেলা আমরা করতে পারি, তাঁদের কোনো পরোয়া না রেখে নিজের খুশিমত চলতেও উৎসাহিত হতে পারি, কিন্তু নেহাৎ ভদ্রতার খাতিরে যদি তাঁদের জীবনের দু-চারটে টুকিটাকি ঘটনার কাহিনী শুনে নেবার আগ্রহ আমাদের হয়, তাহলে হয়তো অনেক বেকুব বাসনার হাত থেকে আমরা ত্রাণ পেয়ে যাব। হঠাৎ হয়তো আমরা বুঝতে পারব যে, আসলে জীবনটা হঠাতের একটা লম্বা প্রসেশন। এরই ধাক্কায় ধাক্কায় হোঁচটে আর হয়রানিতে জীবনটা মস্ত একটা মোচড় খেয়ে গোলক-ধাঁধার গলি পেরিয়ে সদর সড়কের কংক্রিটে পা দিতে পারে। যাকে বলে রাজপথ, যার আর একটা চলতি নাম হচ্ছে মহাজনদের রাস্তা। এই পন্থা ধরে চলাটাই নাকি সবচেয়ে নিরাপদ—রকমারিরও বালাই নেই এখানে, ঝকমারিও নাকি নেই আদপে।

বলেছি তো, জ্ঞানী হয়ে উঠেছি আমি একটু আগে। তাই অনেক সর্পিল রাস্তার প্রলোভন ডিঙিয়ে এই সিধাপথের হাত-ছানিতে সাড়া দিয়ে ফেলেছি। আর কোনো বাঁধ নেই, আর কোনো বাধাও চোখে পড়ছে না। মনে হচ্ছে এই পথ-বরাবর সটান সিধে চললে হয়তো একদিন চিরকালের শেষ সীমানায় গিয়ে পেঁছিতে পারব।

এ-পথ কতটা লম্বা জানি নে। কেবল একবার একটু থেমে কৌতূহলের বশে নিজের জীবনটা টান করে নিয়ে মেপে দেখলাম—সমান সমান। কিন্তু জীবনটা লম্বা কতখানি? ভালো করে দেখে বুঝতে পারলাম, এই মসৃণ রাস্তাটার সমান।

এই পথ বরাবর এখন চলেছি। আজ যেন চলার উৎসাহ এসেছে নতুন, আনন্দ এসেছে দ্বিগুণ। আজ আর ছেলেখেলা করার এতটুকু অবসর নেই, বিগত জীবনের চিক্‌মিকানি দেখার জন্যে সময়ের ডেলা তৈ[রি] করে সেই ডেলাটা ভেঙে চোখের সা[মনে] বিছিয়ে মেলে ধরার আগ্রহও নেই এতই। তার ঠিক কোন্ খানটায় ছিল ধাক্কা, কোনখানে ছিল হোঁচট—তাও আর দে[খতে] চাই নে এখন; পালিশ করা পথটা [ধরে] গিয়ে এখন এই পথ ধরে ঊর্ধ্বশ্বাসে [ছুট] দিতেই ইচ্ছে হচ্ছে শুধু; কিন্তু বেশি তা[ড়া]হুড়ো করলে রাস্তাটা যদি ফুরিয়ে যায়, জিরিয়ে জিরিয়ে চলছি। আরও কি [ভয়] নেই? আছে। এই পথটা যখন মাপে আ[মার] জীবনটার একেবারে সমান, তখন রাস্[তা] ফুরিয়ে গেলে সেই সঙ্গে জীবনটাও জুড়িয়ে যাবে হঠাৎ।

ঊনিশ

নবগ্রামের জীবনাকাশ যেন একটা অনিয়মের—একটা অস্বাভাবিকের আকাশ। কোন স্ব-ভাব নাই—সেই হেতু কোন নিয়ম নাই; একটা ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়ায় স্বাভাবিক নিয়মে যা ঘটবার তা ঘটে না। প্রকৃতির স্নায়ুশিরা পর্যন্ত যেন অসাড় হয়ে গেছে; দুঃখে সে কাঁদে না, সুখে সে প্রসন্ন হাস্যে বিকশিত হয়ে ওঠে না। নিতান্ত একটা অস্ফুট প্রকাশ হয় তো হয় তাও অতি ক্ষীণ এবং ক্ষণস্থায়ী।

এত বড় একটা ঘটনাতেও নবগ্রামের জীবনে কোন ক্ষোভ ঝড়ের মত ঘনিয়ে উঠল না, না প্রতিবাদের না সমর্থনের। এত বড় একটা মিথ্যা চক্রান্তে একজনকে খুনী অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর চেষ্টার প্রতিবাদে নিদারুণ ক্রোধ বা ঘৃণাও যেমন প্রকাশ পেলে না, অতি বড় একটা পাপের সত্য প্রকাশিত হয়েছে দেখে নবগ্রামের মানুষ—এর বিচার হোক, অপরাধীর সাজা হোক একথাও উচ্চকণ্ঠে বললে না। নিতান্তই যেন দৈনন্দিন পারিবারিক কলহের মত একটা তুচ্ছ ঘটনা ঘটে গেল যেন। এর বেশি কিছু নয়।

সাধারণ ঘটনা ঘটলে যেমন অর্ধ গ্রাম অর্ধ শহরে আলোচনা হয় তাই হল এখানে ওখানে সেখানে। স্তিমিত দুর্বল। এমন কি বিজয়ের নিজের বা তার পারিবারিক জীবনেরও একটা কোন বড় রকমের আলোড়ন সৃষ্টি করলে না। সে তার স্বাভাবিক ভঙ্গীতে ও গতিতে যেমন চলছিল তেমনিই চলল।

দেওয়ালে দেওয়ালে তিন-চার রকম কাগজে লেখা বিজ্ঞাপন সাঁটা হল। একখানাতে কুৎসিৎ অশ্লীল ছড়া, একখানাতে বিচার দাবী করা হ'ল। একখানাতে গালাগাল দেওয়া হল বিজয়ের বংশকে।

বিজয় সন্দেহ করলে গুণীবাবুকে, মহাদেব সরকারকে, হৃদয়কে, অক্রূরকে—অর্থাৎ সকলকেই একসঙ্গে। কিন্তু সে নিয়ে অনুসন্ধানও করলে না, কোন প্রতিশোধ গ্রহণের পন্থাও চিন্তা করলে না, তার মাথার উপর পর পর কয়টা নির্বাচন সেই নিয়েই সে মেতে রইল।

তার ওপর এ অঞ্চলে নদীতে বাঁধ দিয়ে ক্যানাল কেটে বিরাট এক সেচ পরিকল্পনার ব্যবস্থা হবে তারই নোটিশ পড়েছে, তাই নিয়েও তার কর্ম-ব্যস্ততার আর সীমা নাই। কংগ্রেসী পাণ্ডা সে, কংগ্রেস কর্মীদের সম্মেলন, স্থানীয় অধিবাসীদের নিয়ে কমিটি তৈরি করা, কোন্ কোন্ অঞ্চল দিয়ে খাল গেলে তার অনুগামী জনসাধারণের বেশি উপকার হবে সেই নিয়ে তদ্বির-তদারক করা—কাজ তার অনেক।

কিশোরবাবু স্তম্ভিত হতবাক হয়ে গেলেন।

বাল্যকাল থেকেই তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের ভক্ত পাঠক। আনন্দমঠ তাঁর প্রিয় বই, বলেন, বই নয়, শাস্ত্র! সত্যদর্শন! কতবার যে পড়েছেন তার সীমা নাই। আনন্দমঠের মধ্যে আবার মা যা ছিলেন, মা যা হইয়াছেন, মা যা হইবেন—এই অংশটি তাঁর সবচেয়ে প্রিয় অংশ। এ অংশটি তাঁর কণ্ঠস্থ। মধ্যে মধ্যে আবৃত্তি করে থাকেন। বাংলা দেশে প্রচলিত এই অংশের ব্যাখ্যা এবং শিক্ষিত বাঙালীর বিশ্বাস অনুযায়ী তিনিও বিশ্বাস করতেন যে, দেশে পরাধীনতার অবসান হলেই শবরূপী শিব-বক্ষবিহারিণী নগ্নিকা কঙ্কালী কালী-মূর্তিরূপিণী দেশমাতৃকার এ রূপেরও পরিবর্তন হবে; 'মা যা হইবেন' রূপে প্রকাশমানা হবেন দেশমাতৃকা। সে রূপ দশভুজা দশপ্রহরণধারিণী ষড়ৈশ্বর্যময়ী রূপ।

"দিগ্‌ভুজা, নানা প্রহরণধারিণী, শত্রুবিমর্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী, দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যা-বিজ্ঞানদায়িনী, সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ।"

মন্ত্রের মত দীর্ঘ উচ্চারণে আবৃত্তি করতেন কথাগুলি, সত্যানন্দের মতই তাঁর কণ্ঠ আবেগে ভক্তিতে গদগদ হয়ে উঠত; আবৃত্তি শেষে 'সর্বমঙ্গলা মঙ্গল্যে' মন্ত্র উচ্চারণ করে কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করতেন। এই বিশ্বাসেই তিনি দীর্ঘজীবন কামনা করেছেন—নিজের জীবনের যত্ন নিয়ে বেঁচেছেন যে, এই রূপ তিনি দেখে যাবেন দেশমাতৃকার। কিন্তু আজ তিনি শিউরে উঠে মৃত্যু কামনা করলেন নিজের। কেন বেঁচে রইলেন তিনি?

পরাধীনতার অবসানে দেশমাতৃকা যেন অকস্মাৎ ছিন্নমস্তা মূর্তি পরিগ্রহ ক'রে বিভীষণা মূর্তিতে প্রকটিতা হলেন। অন্ততঃ বাংলা দেশের নবগ্রামের মূর্তি ঠিক তাই।

"উলঙ্গিনী উন্মাদিনী কঙ্কালসার দেহ, আত্মকলহের অস্ত্রাঘাতে দ্বিখণ্ডিত, তবু রক্তক্ষয়ার অবধি নাই; ছিন্নকণ্ঠের উচ্ছ্বসিত রক্তধারা বিকট উল্লাসে নিজেই পান ক'রে চলেছেন। দেশে অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, রোগজর্জর দেহ, মানুষেরা পীতবর্ণ স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে প্রেতের মত। অন্ধ আক্রোশে কলহ করছে, নিষ্ঠুর হিংসায় আঘাত করছে পরস্পরকে, ওই রক্তধারা পানের অধিকার লাভের লোভে, দাবীতে। চারিদিক যেন উন্মত্ত উল্লাসের শ্মশান কলরবে ভরে গেছে। ময় ভুখা হুঁ! ময় ভুখা হুঁ! ময় ভুখা হুঁ!

গভীর রাত্রি। বিনিদ্র চোখে দীর্ঘ-

পদক্ষেপে তিনি পায়চারী করছিলেন। পাশেই সতরঞ্চির উপর মাদুর পাতা। মাদুরের উপর একখানি জলচৌকীতে খাতা বই দোয়াত কলম।

সন্ধ্যাতে তিনি নিত্যই কিছু কিছু লিখে থাকেন। এবং মহাভারতের একটি অধ্যায় পড়েন। আজ লিখতে বসে লিখতে পারেন নি। পায়চারী করে ফিরছেন।

গৌরীকান্ত এসেছিল, তাকে এখানে ধ'রে রাখবার গভীর আগ্রহ ছিল কিশোর-বাবুর। নবগ্রামের সন্তান—সে নবগ্রামেই থাকুক। দেশ নবগ্রামের দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখুক। আসুক তারা নবগ্রামে। গৌরীকান্ত থাকবার অভিপ্রায় নিয়ে আসেনি, তবু সে পরে রাজি হয়েছিল, থাকত সে এখানে। প্রথম মনে হয়েছিল আকর্ষণটা বোধ হয় শান্তির আকর্ষণ। কিন্তু গৌরীকান্তের কথায় সে ধারণা তার ঘুচে গিয়েছে। শান্তির মন অন্যত্র আবদ্ধ। কথাটা শান্তির কাছে বা দেবকী দেবীর কাছে পরিষ্কার করে জানা হয়নি। কথাটা জানবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেদিন বিজয়ের মায়ের কান্না ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল। সেকথা ওইখানেই চাপা পড়ে গিয়েছিল সেই মুহূর্তেই। এবং এ কয়দিনের মধ্যে মনের এই চঞ্চল অধীর অবস্থার মধ্যে সে কথা তুলতেও ঠিক ইচ্ছে হয়নি, তোলেওনি: কিন্তু ঘটনাচক্রে কথাটা যেন আপনি উঠেছিল এবং খানিকটা বুঝতেও পেরেছেন।

এই সব কুৎসিৎ দরখাস্তের প্রসঙ্গে দেবকী দেবীই সেদিন বলেছিলেন--এ কুৎসিৎপনা আমার মেয়েকে স্পর্শ করতে পারে না। এ নিয়ে আমাদের কথা ভেবো না ভাই কিশোর। আর দেশের মানুষের উপর রাগ ক'রেই বা করবে কি? এ তো তোমাকে অনেকবার বলেছি ভাই।

—কিন্তু একটি কুমারী মেয়ে--তার ভবিষ্যৎ জীবন রয়েছে—এই কালীর ছিটে যদি সেখান পর্যন্ত পেঁৗছোয় তবে কি হবে ভাবুন তো!

—না, সে নিয়েও ভাবনা আমার নাই। আমার ভাবনা হল, নিজের মনের কালী থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা। পরস্পরকে না-জেনে না-শুনে না-বুঝে একজনের গলায় ঝুলে পড়বার মত মেয়ে শান্তি নয়; আমিও তা চাই না। তার নিজের ভবিষ্যৎ সে নিজেই স্থির করবে। হয় তো বা স্থির ক'রেই রেখেছে সে।

একটু স্তব্ধ থেকে বলেছিলেন—আর সে যদি ঠিক নাই হয়, তবে শান্তির পক্ষে কুমারী জীবন যাপন করাও তো খুব একটা বড় কথা নয়।

কথাটা আর অগ্রসর হতে পায়নি। এসে পড়েছিল বিজলী মেয়েটি। —দিদিমা রয়েছে নাকি?

দেবকী দেবী মুহূর্তে রূঢ় হয়ে উঠে-ছিলেন, ওকথা বন্ধ ক'রে কঠোরস্বরেই বলেছিলেন, কি চাই তোমার বিজলী?

বিজলী হেসে বলেছিল, আমার আর কি আছে বল? চাই তো সবই গো। টাকা-পয়সা, ঘর-বাড়ি, বিষয়-সম্পত্তি, ঝি-চাকর, গয়নাগাঁটি—।

হি-হি করে হেসে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে বলেছিল, হিঁদুর মেয়ে, বামুনের কন্যে, বিয়ে হয়ে গিয়েছে নইলে—।

—হেসো না বিজলী। তোমার ওই রকম হাসি আমি আর দেখতে পারছি না। কি বলছ বল?

বিজলী হাসি বন্ধ ক'রে বলেছিল, সাত দিন পরে নতুন দিদিমণি আসবে। এই বাড়িতেই থাকবে। তোমরা তাহ'লে কোথায় যাবে? আমাকে বললে কি না, ওই গুণীবাবুদের নায়েব। বললে বিজলী ঠাকরুণ, নতুন দিদিমণির কাজ করতে হবে। পারবে তো? বাবু লিখেছেন, বিজলীকে বলে রেখো। তাতেই শুনলাম। শুধালাম কি না, দিদিমণি কোন্ বাসাতে থাকেব? বাজার পাড়াটাড়া হলে সে আমি পারব না। অভাবের দায়ে খেটে খাই, কারুর কাছে বা কাপড়টা চাই, জামাটা চাই—সে নিজের পাড়ার মধ্যে আপন জনের কাছে। তাই বলে পাড়া অন্তর,—হাজার লোকের আনা-গোনার মাঝখানে পথ চিরে যাওয়া-আসা সে পারব না! হাজার হলেও কুলীন—বিষ্ণুঠাকুরের বংশের কন্যে তো! এখানকার জমিদার বাড়ির দৌহিত্রী! না কি বল দিদি?

শেষ কথা ক'টি বলতে বলতে বিজলী আর এক বিজলী হয়ে উঠল। হাসি না, কৌতুক না, কণ্ঠস্বরে-মুখের চেহারায় সে আর এক মানুষ।

তারপর সে চেপে বসল।

কিশোরবাবুর ভাল লাগল না, উঠে চলে এলেন।

এর দিন তিনেক পরে গৌরীকান্ত বললে, আমি এই সপ্তাহেই চলে যাব কিশোরবাবু। এখানে এসেছিলাম প্রণাম করতে। তারপর থাকতে মমতায় জড়িয়ে পড়েছিলাম। ভে[illegible] থাকব। অসুবিধেও খুব ছিল না, আর পারছি না। প্রাণটা যেন [illegible] উঠছে।

গৌরীকান্তের কথাগুলি অবিশ্বাস পারলেন না কিশোরবাবুর। এখানে পাওয়ার অভিপ্রায়ের মধ্যে [illegible] আকর্ষণ ছিল না বলেই মানতে হ'ল এবং কোন আপত্তিও করতে পার[illegible] তিনি। আপত্তি তুলবার কল্পনা তাঁ[illegible] [illegible]নই ছিল না, তবে একটি প্রচ্ছ[illegible] ছিল—আশা ছিল শান্তির আকর্ষণ গাঢ় হয়ে উঠে গৌরীকান্ত বাঁধা এবং একদিন এইখানেই পৈতৃক [illegible] উপর নূতন ঘর গড়ে তুলে এ[illegible] স্থায়ীভাবে বাস করবে।

গৌরীকান্তের কথায় তিনি [illegible] করেন নি, কিন্তু আঘাত পে[illegible] মর্মান্তিক আঘাত।

আজীবন সন্ন্যাসীর মত এই [illegible] মনে মনে গৌরীকান্তই ছিল [illegible] অবলম্বন। কারুর কাছে প্রকা[illegible] করলেও নিজে মনে মনে ভাব[illegible] আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছে—[illegible] প্রচারিত হয়েছে সমগ্র দেশে, গৌরী[illegible] সফলতায়, তার সাহিত্যসাধনার সা[illegible] তিনি মূল—গৌরীকান্ত কাণ্ড! একদা সে আজ পঁয়ত্রিশ বৎসর পূ[illegible] নবগ্রামের নূতন কালের বা[illegible] জীবনের সাধন মন্ত্র বহন ক[illegible] ছিলেন পরমহংস রামকৃষ্ণ দেবে[illegible] পীঠ হতে। রামকৃষ্ণদেব মন্ত্র দিয়ে সেই মন্ত্র স্ফুরিত হয়েছিল পূ[illegible] স্বামীজী বিবেকানন্দের কণ্ঠ সেই বাণী।

সেই বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে একটি এগারো বছরের ছেলে তাঁর পাশে প্রথম দাঁড়িয়ে বলেছিল, আমি কাজ আমাকে কাজ দিন।

গৌরীকান্ত তাঁর মানসপুত্র। ম[illegible] বেদনা তিনি অনুভব [illegible] না গৌরীকান্তের চলে [illegible] প্রস্তাবে! নবগ্রাম ছেড়েই যাবে না গৌরীকান্ত—তাঁকে ছেড়েও

দীর্ঘপদক্ষেপে পদচারণা করতে সেই কথাই ভাবছিলেন তিনি।

তাই যাক। এই নবগ্রামের শ্মশানে তাকে আটকে রেখে জীবনে ব্যর্থ ক'রে দেবেন না তিনি।

ফিরে এসে জলচৌকির সম্মুখে বসে মোটা খাতাটা তিনি টেনে নিলেন। খুলে লিখতে গেলেন। লিখলেন ওই নের কথাগুলি। দেশমাতৃকার ছিন্নমস্তারূপের কথা।

"উলঙ্গিনী, উন্মাদিনী আত্মকলহের নিজের হাতের খড়্গে দ্বিখণ্ডিত; নিষ্ঠুর রক্তক্ষয়ে নিজের ছিন্নকণ্ঠোৎসারিত রক্তধারা ছিন্নমুণ্ডু লোলরসনা লেহনে পানরতা। দেশে অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, রোগক্লিষ্ট শোকজর্জর দেহ-মন, কঙ্কালসার দেহ, পাণ্ডুবর্ণ চক্ষু; সেই পীত চক্ষুতে স্থিরদৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে প্রেতের মত।"

পরিশেষে ছেদ টেনে দিলেন।

খাতাগুলি তুলে নিলেন—আরও নিলেন আর একখানি খাতা। খাতা দু'খানি নিয়ে আসলেন গৌরীকান্তের হাতে। বললেন, সুদীর্ঘকাল আগে এক সৌম্যদর্শন প্রশান্তচিত্ত বৃদ্ধ বিচলিত হয়ে নবগ্রামের কথা লিখতে শুরু ক'রেছিলেন। বিশাল ভারতের একখানি গ্রামের উপাখ্যান। তিনি শেষ করতে পারেননি। বিচলিতচিত্তে একদা তাঁর হাতে সমর্পণ করে বলেছিলেন ভাই কিশোর, এ শেষ হল না, করতে পারলাম না। তুমি শেষ করো।

সন্তোষবাবুর লেখা খাতা। দীর্ঘদিন কিশোরবাবুর কাছে আছে। কিশোরবাবু নিজেও লিখেছেন সন্তোষবাবুর লিখিত অংশের পরবর্তীকালের কথা। ইতিহাস নয় ইতিহাসেরও মর্মস্থলের কথা।

তুলে দেবেন গৌরীকান্তের হাতে।

তুমি শেষ করো। জানি কালের শেষ নাই দেশ এবং সৃষ্টি যতকাল মহাকালের অতিগ্রাসে মহাকালীর কুক্ষিগত না হয়, ততকাল চলবে এর কাহিনী। তবু একটি পরিচ্ছেদ রচনা করো। একটি পরিচ্ছেদের একটি অনুচ্ছেদ।

খাতা দুখানি হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। আজই রাত্রে এই গভীর স্তব্ধতার মধ্যে তাকে সকল কথা বলে দিয়ে আসবেন। গভীর রাত্রির নির্জন অবসর ছাড়া সে বলা হবে না।

গৌরীকান্ত জেগে রয়েছে!

আলো জ্বলছে তার বারান্দায়। কিশোরবাবুর ছাদ থেকে দেখা যাচ্ছে। মধ্যে মধ্যে খেলাচ্ছলে একটা টর্চের আলো ফেলছে। আলোকপুচ্ছটা অকস্মাৎ জ্বলে উঠে তৎক্ষণাৎ নিভে যাচ্ছে কখনওবা ঘুরে বেড়াচ্ছে এপাশ থেকে ওপাশ, তারপর নিভে যাচ্ছে। এদিকে ওদিকে, পূর্বে-পশ্চিমে-দক্ষিণে—তিন পাশেই ঘুরেছে।

গৌরীকান্ত তাহলে জেগেই রয়েছে এবং নিতান্ত শূন্য মনে আলো ফেলে খেলা করছে। হয়তো বা তারই মধ্যে কিছু ভাবছে। সেও নিশ্চয় কোন গভীর ভাবনা নয়!

বাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন।

অন্ধকার পথ। মনের চাঞ্চল্যে অথবা ব্যগ্রতায় আলোটা আনতে ভুলে গেছেন। তা হোক্। অন্ধকারকে তিনি ভয় করেন নি কোনদিন।

প্রথম যৌবনে যখন প্রাণের আবেগে এই পথে নেমেছিলেন, তখন অন্ধকারেই নেমেছিলেন। রাত্রে গিয়েছেন দুক্রোশ দূরের বিপন্নের বাড়ি। ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন দুজনে তিনি আর শূলপাণি। ঘাড়ে চাল আর কাপড়ের মোট। গৌরীকান্তদের ঠাকুরবাড়ির ভিতর দিয়ে যাবার সময় সামনে পড়ল বৃদ্ধ অজগর। তার মুখের সামনে দিয়েই চলে গিয়েছিলেন। সেদিন আকাশে জ্যোৎস্না ছিল। সাপ দেখে চীৎকার করে উঠেছিল শূলপাণি। ওদিকে গৃণীর পিতামহ—নবগ্রামের নূতন কালের স্রষ্টা রহস্য গোপীকান্তবাবু তাঁর খোলা জানালা থেকে প্রশ্ন করেছিলেন কে? তাঁরা ছুটে পালিয়েছিলেন ধরা পড়বার ভয়ে। গোপীকান্তবাবু অনুসরণ করেছিলেন তাদের। তিনি আবছা চিনতে পেরেছিলেন তাকে। সেদিন শূলপাণির হাত ধরে কিশোরবাবু শ্মশানের বিশাল অর্জুন গাছটার তলায় গিয়ে লুকিয়েছিলেন।

অর্জুন গাছটা আজ আর নাই। মরে গেছে। কত বয়স যে তার হয়েছিল কে জানে। অন্ততঃ দুশো বছর তাতে সন্দেহ নাই। লোকে বলত, ওই গাছে থাকেন নাকি কালপুরুষ। সে পুরুষকে যে দেখে তার ডাক আসে মহাকালের।

তারপর সেই দিন রাত্রেই ওই চালের বোঝা মাথায় নিয়ে, ডাক্তার সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন এক বিখ্যাত ডাকাতের বাড়ি। ডাকাত তখন জেলে, তার ছেলের নিউমোনিয়া। তাকে সাহায্য দিতে গিয়েছিলেন। শূলপাণি পথেই একটা পুকুরে মাছ পেয়ে সঙ্গ ত্যাগ ক'রেছিল। ডাক্তার আর তিনি। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাত্রি। অবারিত মাঠের ভিতর দিয়ে পথ। দু'পাশে অল্প দূরে দূরে গ্রাম। তারই মধ্যে পথ চলতে চলতে কিশোরবাবু বন্দে মাতরম্ গান ধরেছিলেন। সেদিন কণ্ঠ ছিল তরুণ, সতেজ, বন্দে মাতরম্ গানটির প্রতিটি শব্দ সেদিন বুকের মধ্যে তরঙ্গময় উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করত, চোখে জল আসত। নমামি কমলাং, অমলাং, অতুলাং, সুজলাং,

সুফলাং মাতরম্! বন্দে মাতরম্!

শ্যামলাং, সরলাং, সুস্মিতাং, ভূষিতাং,

ধরণীং, ভরণীং মাতরম্!

এই শেষের দুলাইনে যে কি ছিল, সেদিনও বুঝেন না, আজও ঠিক বুঝতে পারেন না, তবে এইখানে এসেই চোখদুটি অকস্মাৎ জলে ভরে উঠত!

আলোতে তিনি পথ হাঁটেননি। একলাই অন্ধকারে পথ হেঁটে এলেন। ডাক শুনে সাড়া ওই গৌরীকান্তের কাছেই পেয়েছিলেন। সে তখন একান্ত বালক। তারপর যুবক হয়েই চলে গেল এখান থেকে। তিনি নবগ্রামে একলাই হাঁটলেন চিরকাল। আবারও চলে যাবে সে। তাই যাক।

একলা চলো রে!

থমকে দাঁড়ালেন তিনি। গৌরীকান্তের বাড়ির সামনের ফাঁকা জায়গাটায় এসেই থমকে দাঁড়ালেন। কার সঙ্গে কথা কইছে গৌরীকান্ত? খিল খিল শব্দে হাসি! নারী কণ্ঠের হাসি! (ক্রমশ)

আরনেস্ট রীস-এর বাড়িতে এক সন্ধ্যা

শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়

বিলেত যাচ্ছি শুনে, গুরুদেবই আরনেস্ট রীস্-এর কাছে এক চিঠি দিয়েছিলেন। রীস্ গুরুদেবের খুব ভক্ত। তাঁর উপর একটা বই-ও লিখেছেন। বই-টা অবশ্য, বিশেষ কিছু কাজের নয়।

লণ্ডনে পা ফেলেই প্রথম কাজ লিংকন্স ইন্-এ ভর্তি হওয়া—সেটা সেরে ফেল্লুম। তারপর গুরুদেবের চিঠিটা আরনেস্ট রীস্-এর কাছে পাঠিয়ে দিলুম। জবাব এল। রীস্ লিখেছেন, অমুক দিন বিকেল পাঁচটায় আমার এখানে চা খেতে এস। এর আগেই জাহাজে বসে শুনেছিলুম, আজকাল, অর্থাৎ প্রথম মহাযুদ্ধের ঠিক পরেই লোকে আর সহজে কাউকে লাঞ্চে ডিনারে ডাকে না। আলাপ-সালাপ যা কিছু চা খাইয়েই সেরে নেন। বিলিতী চা-এর পর্ব এদেশের মতন নয়। তার উপকরণ যৎসামান্যই।

আরনেস্ট রীস্ বোলেছিলেন, বিকেলে আসতে। কিন্তু লণ্ডনে নামা ইস্তক দেখছি, সেখানে বিকেল বোলে কিছু নেই। আছে শুধু সন্ধ্যে আর রাত্তির। সকাল থেকেই অন্ধকার। সব সময় আলো জ্বালিয়ে রাখতে হয়। তার উপর অনবরত টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি। আমি ঠিক শীতকালের মুখেই গিয়ে পড়েছিলুম কি না। যাই হোক্, রীস্ সময় নির্দেশ দিয়েছিলেন পাঁচটা। তাই যথেষ্ট। তা সে বিকেলই হোক, আর সন্ধ্যেই হোক।

আরনেস্ট রীস্ থাকতেন সেই গোল্ডার্স গ্রীনে। শহর ছাড়িয়ে সেই একেবারে একটেরে। দেশে থাকতেই শুনেছিলুম, ইংরেজরা পাংচুয়ালিটীর বড়ই ভক্ত। ঠিক্ সময় অ্যাপয়েন্টমেন্ট না রাখতে পারলে, ওই অন্ধকার দেশে ওরা চোখে আরো অন্ধকার দেখে। দ্বিতীয়বার আর অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয় না। মনে মনে আঁচ কোরে নিলুম, রীস্-এর বাড়ি ঠিক সময় পৌঁছতে গেলে, অন্তত এক ঘণ্টা আগে নিজের বাড়ি থেকে বেরুনো চাই।

আন্ডারগ্রাউন্ড ইলেক্‌ট্রিক্ ট্রেন চোড়ে গোলডার্স গ্রীন স্টেশনে আসা গেল। আর্‌নেস্ট রীস্-এর বাড়ির রাস্তা, ওয়েস্ট হীথ্ ড্রাইভে পৌঁছে, ঘড়ি খুলে দেখি, পাঁচটা বাজতে তখনো আধ ঘণ্টা বাকি। পৌঁছতে পাছে এক মিনিটও দেরি হয় তারি ভয়ে, সাবধান হোতে হোতে দেখছি তিরিশ মিনিট আগেই এসে পৌঁছে গেলুম। এখন করি কি? রীস্-এর বাড়ির খানিক দূরে গিয়ে এদিক-ওদিক পাইচারি কোরতে লাগলুম। একটু দূরেই যেতে হোল, পাছে রীস্‌দের কেউ দেখে ফেলে আমাকে নেহাৎ গ্রাম্য বোলে ঠাউরে বসেন।

মুহুর্মুহু ঘড়ি দেখছি। কিন্তু ঘড়ি আর চলে না। আধ ঘণ্টাকে মনে হোল যেন দু ঘণ্টা। অবশেষে ঘড়িতে পাঁচটা বাজতে এক মিনিট। রীস্-এর বাড়ির সামনের ছোট গেটটা খুলে সদর দরজার মুখে এসে দাঁড়ালুম। ঘড়িতে যখন কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটা, তখন দরজার গায়ে লাগানো টেপা ঘণ্টার বড়িতে একটা হাল্কাগোছের টিপ্ দিলুম। আরো মিনিটখানেক পর এক দাসী এসে দরজা খুলে দাঁড়াল।

দাসীর হাতে নিজের নামলেখা কার্ডটা দিলুম। বাড়ির ভিতর ঢুকে, হল্-এ তারই হাতে টুপিটা ছাতাগাছটা আর ওভারকোটটা জিম্মা কোরে দেওয়া গেল। ড্রয়িং-রুমের দরজা খুলে দাসী হাঁকল, মিস্টার চ্যাটার্জি। রীস্-সাহেব উঠে এসে দোরগোড়া থেকে আমায় ভিতরে নিয়ে গেলেন। সেখানে মিসেস্ রীস্ আছেন, তাঁদের কন্যা রেচেল্ আছেন, আর আছেন ইয়া লম্বাচওড়া এক ষণ্ডামার্কা পুরুষ। মাথাটা প্রায় কামানো। মনে হয় যেন সম্প্রতি পিতৃ কি মাতৃশ্রাদ্ধ কোরে উঠেছেন। গলা বোলে কিছু নেই। ঘাড়ে গর্দানে সমান। ধড় থেকেই একেবারে মুণ্ডুটা উঠেছে।

রীস্ একে একে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ভদ্রলোকের নামটা বল্লেন বটে, কিন্তু আমি সেটা ঠিক ধরতে পারলুম না। মনে হোল যেন জার্মান নাম। ভদ্রলোকের সুটের কাট্ দেখেও বোধ হোল, তিনি ইংরেজ নন, কন্‌টিনেন্‌টল। তারপর শুনলুম, তিনি কোন্ একটা জার্মান ইউনিভার্সিটির ডক্‌টর্। তিনি কিসের ডাক্তারি করেন, সেটা জিজ্ঞেস করাটা ভদ্রতায় বাধে কি না ভাবছি, এমন সময় অন্য অতিথিরা একে-একে এসে পড়তে লাগলেন।

হা-ডু-ডু পর্ব শেষ হোতে বোঝ
এঁদের মধ্যে কেউ কবি, কেউ ন
কেউ নাট্যকার, কেউ জারনালিস্ট।
মধ্যে একটু মৃদু গুঞ্জন উঠল। জো
বলাটা বিলিতী এটিকেট্-বিরুদ্ধ।
সবাইকার স্বর ছাপিয়ে উঠছে,
ডক্‌টরের কণ্ঠস্বর। তিনি ইংরেজ
কেটের ধার দিয়েও গেলেন না। তা
ঐ উঁচু গলায় তিনি অনর্গল বোলে
ছেন। এক মিনিটও কামাই নেই।
ইংরিজি শুনে মনে হোল, আ
কিছুটা ইংরিজি আয়ত্ব কোরতে

আন্দাজে আন্দাজে জার্মান ড
বক্তব্য যা বুঝতে পারলুম, তার থে
হোল তিনি ইয়রোপীয়নদের মৃ
গোর দেওয়াটার ঘোরতর বিরোধী
করারই পক্ষপাতী। কেন যে, তাই নি
মস্ত বক্তৃতা জুড়ে দিলেন। খানি
অতিথিদের মধ্যে কেউ মুখে
আঙুল চাপা দিয়ে হাই তুল্লেন,
স্পষ্টাস্পষ্টি উস্‌খুস্ কোরতে ল
কিন্তু জার্মান পণ্ডিতের সেদিকে
দৃকপাত নেই। তিনি তাঁর বক্তৃ
চল্লেন।

বেচারী নাট্যকার পকেট থেকে
টাইপ-করা কাগজ বের কোরেছেন
ছিল, তাঁর নতুন-লেখা নাটকটি সবাইকে
শোনাবেন। তা আর হোল না।
মুখে কামানের গর্জন শোনা গেল
দিতে দিতে ইয়রোপে শেষে
বাস করবার একটুও স্থান থাকবে
থাকে নেই থাক। তাতে আমার কোনো
ব্যথা নেই। আমাদের দেশ এত ব
সেখানে শুধু মরতে কেন, সবাইকে
কবর দিলেও কখনো স্থানাভাব

আমাদের সংস্কৃতে বলা আছে, এই
সংসারে কেবল দুটি মাত্র সারবস্তু
এক সজ্জনসঙ্গ আর এক কাব্যরসপান
করা গিয়েছিল ও দুটিরই বিলিতী
রীস্-এর বাড়িতে একটু-আধটু
যাবে। কিন্তু সেখানে জার্মান প
মুখে শবতত্ত্বের ব্যাখ্যা শুনতে
এই অসার পৃথিবীকে আরো অসার
মনে হোতে লাগল। একজন অতিথি
ভঙ্গ দিয়ে, আসি বোলে উঠেই প
আমিও উঠি উঠি কোরছি, এমন সময়
গিয়ে জাঁতিকলে পড়ে গেলুম।

রীস্- সাহেব আমায় দেখিয়ে পণ্ডিত মশায়কে বোল্লেন—এই যে, মিস্টার চ্যাটার্জিই তো এখানে আছেন। উনি ভারতবর্ষের লোক। উনি আপনাকে অনেক তথ্য জানিয়ে দিতে পারবেন।

আর ওঠা গেল না। জার্মান ডক্‌টর্ তাঁর চেহারার মাপ সই একটা লম্বা চুরুট ধরিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলেন। গিলতে এলেন বোল্লেই কথাটা পরিষ্কার হয়। জায়াণ্ট এণ্ড দি ডয়ার্ফ রূপকথার ছবিটা মনে পড়ে গেল। জার্মান ডক্‌টর-এর প্রজ্ঞাটা ঠিক তাঁর আকার সদৃশ কি না সেটা আমি ঠিক বোলতে পারলুম না, কিন্তু তাঁর কণ্ঠ-স্বরটা যে অবিকল তাই বটে, এটা আমি হলফ কোরে বোলতে রাজি।

আমার দিকে এক প্রচণ্ড নয়নবাণ হেনে তিনি বোল্লেন,—তাই তো মশায়, আপনি আছেন, তা তো এতক্ষণ দেখিনি। বোলুন তো মশায়, আপনিই বোলুন, আমার কথাটা ঠিক কি না? সেই অ্যাডাম-এর আমল থেকেই তো আপনাদের শবদাহ প্রথা চলে আসছে?

আমি সবিনয় নিবেদন কোরলুম—আপনি যে এতক্ষণ দেখেন নি, তাতে আমি কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইনি। আমার চেহারাটা হঠাৎ কারুর দৃষ্টিপথে পড়বার মতন চেহারাও নয়। তবে একটা কথা মনে রাখবেন, আমরা কস্মিন কালে অ্যাডাম্-এর আমল থেকে কাল গণনা করিনে। মান্ধাতার আমল থেকেই চোলে আসছি। এই সঙ্গে এটাও আপনার জেনে রাখা উচিত, ভারতীয়দেরও মধ্যে একটা দল আছেন, তাঁরা দলে বড় কম ভারি নন, যাঁরা শবদাহ করাটাকে অত্যন্ত গর্হিত কর্ম বোলে মনে করেন। এ সম্বন্ধে একটা ঐতিহাসিক গল্প আছে—

গল্পের গন্ধ পেয়ে সকলে নিজের নিজের চেয়ার টেনে এনে আমায় ঘিরে বসলেন। আমি কিছুটা কুণ্ঠিত হয়ে পড়ছি দেখে, ওঁরা সবাই বোল্লেন, বলুন আপনার গল্প। কিছু সংকোচ কোরবেন না। ঐতিহাসিক না হোলেও আমরা কিছুই মনে কোরব না। গল্প হোলেই হোল।

আমি বোল্লুম—আমাদের দেশে আকবর নামে এক বাদশা ছিলেন। তিনি আপনাদের রাণী এলিজাবেথ্-এরই সমসাময়িক। তাঁর নাম আপনারা কেউ কেউ হয় তো শুনে থাকবেন।

অতিথিদের মধ্যে একজন লাফিয়ে উঠলেন। বোল্লেন, হ্যাঁ আমি শুনেছি। আক্‌বার দি গ্রেটের কথাই তো আপনি বোলছেন? তিনি মোগল না?

আমি বোল্লুম, আপনি ঠিকই আদেশ কোরছেন। আক্‌বর দি গ্রেট যে মোগল ছিলেন, এটা সব ঐতিহাসিকরাই স্বীকার করেন। আর ধর্মে গোঁড়া না হোলেও, তিনি মুসলমান ছিলেন সেটাও ঠিক। তাই মৃত হোলে, তাঁকে না পুড়িয়ে গোর দেওয়া হয়েছিল। তাঁর কবরের উপর তাঁর ছেলে জাহাঙ্গীর বাদশা এক ভালোগোছের ইমারত বানিয়ে দিয়েছিলেন। সে ইমারত আজও আগ্রা শহরের কাছে সিকন্দ্রা বোলে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। টুরিস্টরা আগ্রায় গেলে তাজমহলের সঙ্গে সেটাও দেখে আসেন।

—তারপর? একজন কে জিজ্ঞেস কোরলেন।

—তারপর? তারপর অনেকদিন চলে গেছে। মোগলরা তখন আর তেতটা শক্তিমান নন। মোগল সাম্রাজ্যও ভেঙে পড়েছে। এমন সময় আগ্রার কাছাকাছি এক রাজ্যে সুরজ-মল জাঠ বোলে এক সর্দার মাথা চাগিয়ে উঠেছেন। এই সুরজমল জাঠ আকবর বাদশার উপর জাতক্রোধ ছিলেন। তিনি মনে কোরতেন, আকবর শুধু বুদ্ধি কোরেই হিন্দুদের প্রতি ভালো ব্যবহার কোরতেন। তাইতেই হিন্দুরা তাঁর আনুগত্য স্বীকার কোরে, ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সহায় হয়েছিলেন। তাই আকবর হচ্ছেন মোগল বাদশাদের মধ্যে সব চাইতে দুষমন।

একসঙ্গে এত কথা, বিশেষত ইংরিজি ভাষায় বোলে ফেলে আমার দমবন্ধ হবার উপক্রম। দম নেবার জন্যে খানিকটা থামলুম। এবার স্বয়ং মিসেস রীস্ জিজ্ঞেস কোরলেন, তারপর কি হোলো মিঃ চ্যাটার্জি? দেখলুম, তাঁরও মৌতাত লেগেছে। তাহোলে কি গল্পটা জমলো? না, জার্মান পণ্ডিতের হাত এড়াবার জন্যেই মিসেস রীস্ অত আগ্রহ দেখালেন? ঠিক বুঝতে পারলুম না।

আমি খানিকটা দম নিয়ে আবার শুরু কোরলুম—সুরজমল জাঠ জানতেন, মুসলমানদের শব, শব অভাবে কঙ্কাল, একবার পুড়িয়ে দিতে পারলে, সে ব্যক্তি সোজা, আপনারা যাকে বলেন হেল্, তাতে গিয়ে প্রবেশ করেন। হেল্ কথাটা মহিলাদের সামনে উচ্চারণ করাটা ইংরিজি ভদ্রতায় বাধে। কথার পিঠে কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়াতে আমি একটুখানি জিব্ কেটে অপ্রতিভ ভাবে মিসেস রীস্ আর রেচেলের দিকে চাইলুম।

মিসেস রীস্ অভয় দিয়ে বোল্লেন,—বোলে যান মিস্টার চ্যাটার্জি, আপনি নির্ভয়ে বোলে যান। আমি ওসব কিছু মনে করি না।

তাহোলে বেশ, শুনুন,—বোলে আমি আবার আরম্ভ কোরলুম—একদিন সুরজমল জাঠ তাঁর সৈন্য-সামন্ত নিয়ে এসে আগ্রা শহর লুঠ করলেন। তারপর সিকন্দ্রায় গিয়ে আকবর বাদশার কবর খুঁড়ে তাঁর হাড়গোড় সব খুঁজে বের কোরে ফেললেন।

গল্প কোরতে কোরতে সামনে তাকিয়ে দেখি, দামী ড্রয়িংরুমের দরজাটা একটু ফাঁক কোরল। এক ব্যক্তি নিঃশব্দে ঘরের ভিতরে এলেন। তখন সকলে আমার গল্প শুনতে মত্ত। আগন্তুকের নামও কেউ শুনতে পেলেন না; কেউ তাঁর দিকে তাকালেনও না।

আমি গল্পটা শেষ কোরলুম—তারপর সুরজমল জাঠ আকবর বাদশার হাড় কখানা নিয়ে গিয়ে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দিলেন।

সকলে একবাক্যে বোলে উঠলেন—আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দিলেন?

আমি বোললুম—তা দিলেন বৈ কি? ইতিহাসে তো সেই রকমই লেখে।

সকলে উৎসুক হয়ে প্রশ্ন কোরলেন—কিন্তু তারপর কি হোল?

আমি বোল্লুম—তারপর কি যে হোল, তা আমার সঠিক জানা নেই। মরবার পর, আকবর বাদশা যে কোথায় অবস্থান কোরছিলেন, আর সুরজমল জাঠ তাঁর হাড়গুলো পুড়িয়ে দেবার পর তিনি সে স্থান ছেড়ে আর কোথাও গিয়ে পড়েছিলেন কি না, তার সংবাদ আমি ইতিহাসের কোনো পুঁথিতে এ পর্যন্ত পাই নি।

ইতিমধ্যে হোল কি, যে ভদ্রলোকটি ড্রয়িং-রুমে নিঃশব্দে ঢুকেছিলেন, তিনি এক কান্ড কোরে বসলেন। ঘরের কোণে একটা ফুলদানিতে জলসুদ্ধ একগোছা টিউলিপ্ ফুল সাজানো ছিল। কেউ তাঁর দিকে দৃষ্টি-পাত কোরছে না দেখে, ভদ্রলোকটি ফুল-দানি থেকে ফুলগুলো তুলে নিয়ে চোঁ কোরে এক নিঃশ্বাসে তার সব জলটুকু চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেল্লেন। তারপর টিউলিপ্ ফুলগুলো নিয়ে ঠিক জলখাবারের মতো চিবুতে লাগলেন।

তখন আমায় ছেড়ে সকলেরই তাঁর দিকে নজর পড়ল। আর্নেস্ট রীস্ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোকটির দিকে এগিয়ে গেলেন। সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে বোল্লেন, আরে এজ্রা পাউন্ড যে? কতক্ষণ? এজ্রা পাউন্ড তখনো টিউলিপ্ চিবিয়ে চলেছেন। কোনো উত্তর দিলেন না। ব্যাপার দেখে অমন নক্তার জার্মান ডক্টরেরও মুখ দিয়ে আর কথা সরে না।

এইবার আমি উঠ্লুম। অনেকক্ষণ বসা গেছে। দাঁড়িয়ে উঠে সবার ভাগে পড়ে, এমন একটা বাও কোরে আমি বোল্লুম, গুড্ নাইট টু অল্ অভ্ ইউ।

ড্রয়িং রুম থেকে বেরিয়ে হল্-এ। দাসী ওভারকোটটা পরিয়ে দিলে। টুপি নিয়ে এল। ইংরিজি কেতা অ তার হাতে দু-আনির মত চাঁদির থ্রি-পেনী পিস্ গুঁজে দিতে হোল

রাস্তায় পড়ে আপন মনে চলেছি। পাউন্ডের কান্ডটা মনে পড়ে যাওয়ায় উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলুম। কাছে যে কন্স্টবল্ দাঁড়িয়ে ছিল, অত দে জুতো মস্ মস্ কোরতে কোরতে বল্টা আমার দিকে এগিয়ে এসে স্টেডী সার্। হাঁসি বন্ধ হয়ে গেল

এক দৌড়ে গোলডার্স গ্রীন স্টেসনে গিয়ে উঠ্লুম।

তারপর একদম সোজা মাটির নী

খাবারের সঙ্গে যে, কুষ্ঠব্যাধির বিশেষ কোনও যোগাযোগ আছে একথা বিজ্ঞান জগতে এ পর্যন্ত যুক্তিসহ প্রমাণিত হয়নি। টাঙ্গানিকার একটি কুষ্ঠাশ্রমে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে যে, কুষ্ঠ রোগীদের প্রোটীন বহুল খাদ্য খাওয়ালে এবং তার সঙ্গে সালফানো জাতীয় ওষুধ খাওয়াতে থাকলে তাদের শারীরিক কোনও ক্ষতি তো হবেই না উপরন্তু উপকার পাওয়া যাবে প্রচুর। এই সালফানো জাতীয় ওষুধই সাধারণ খাবার খাওয়ানোর সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োগ করলে চিকিৎসার দিক থেকে কোনও উপকার তো হয়ই না বরং শারীরিক অপকার হতে থাকে। সালফানো জাতীয় ওষুধ প্রয়োগে এই রোগের চিকিৎসার প্রচলন হওয়ার পর থেকে এই রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কীয় মতামতের বহুল পরিবর্তন ঘটেছে। পূর্ব আফ্রিকার প্রায় ৬০০০ হাজার কুষ্ঠরোগীর নতুন ব্যবস্থা অনুযায়ী চিকিৎসা করে শতকরা ৫০।৬০জন রোগীকে নিরাময় করা সম্ভবপর হয়েছে। অবশ্য আরও বিশেষভাবে এ বিষয়ে পরীক্ষা না করা পর্যন্ত স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছান সম্ভবপর নয়।

*

এককালে, ক্ষয়কাশ রোগ সারানো 'শিবের অসাধ্য' বলেই লোকে জানতো—এখন অবশ্য এ ধারণা মানুষের মন থেকে একেবারেই বিলুপ্ত হয়েছে। আজকাল এ রোগের প্রতিষেধক হিসাবে বহু নতুন নতুন ওষুধই চিকিৎসাজগতে আবির্ভূত হয়েছে। বর্তমানে নতুন ওষুধটির নাম হচ্ছে প্যাস (P. A. S.)। এর আসল নামটি প্যারা এ্যামিনো স্যালিসিলিক এসিড। চিকিৎসা জগতে এর আবির্ভাবও হয়েছে বড় নাটকীয় ভঙ্গীতে। কোন একটি স্যানাটোরিয়ামে একটি মরণাপন্ন ক্ষয়রোগীর ওপরই এই ওষুধটির পরীক্ষা হয়। রোগীটির বাঁচার কোনও আশাই ছিল না। ডাক্তার তখন এই নতুন ওষুধটি পরীক্ষামূলকভাবে ঐ রোগীকে প্রয়োগ করতে থাকে। যেমনভাবে ডাক্তার গিনিপিগ বা বাঁদরের ওপর নতুন ওষুধ ব্যবহার করেন, সেই রকম বেপরোয়া হয়েই মৃত্যু পথযাত্রী রোগীটির ওপর প্যাস (P. A. S.) প্রয়োগ করা হতে থাকে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে রোগীর

বিজ্ঞান-বৈচিত্র্য

চক্রদত্ত

মৃত্যু ১৫ দিনের মধ্যে অনিবার্য ছিল 'প্যাস' তাকে ঐ ১৫ দিনের মধ্যে মৃত্যুর দ্বার থেকে ফিরিয়ে আনে।

*

গল্প শোনা গেছে—কোনও এক খেয়ালী রাজা তাঁর মন্ত্রীকে সমুদ্রের ঢেউ এবং আকাশের তারা গুণে দিতে আদেশ করেছিল। গল্পটা নিতান্তই আজব কাহিনী সন্দেহ নেই, তবে বিজ্ঞানের দৌলতে এ ধরণের অনেক আজব খবরই আজকাল সত্যে পরিণত হচ্ছে। বর্ষাকালে ঝুপঝাপ, টুপ-টাপ, ঝির ঝির বা ফুঁই ফুঁই আওয়াজ শুনেই আমরা বুঝতে পারি যে, কত জোরে বা কত বেশী বৃষ্টি হচ্ছে এমন কি, ফোঁটাগুলি ছোট কী বড় তাও কিছুটা অনুমান করা যায়, কিন্তু এই বৃষ্টি বিন্দুর সংখ্যা বা পরিমিতি কত! এর হিসাব রাখার চেষ্টাও করা হয়নি এবং এটা সম্ভব বলেও মনে হয়নি এতকাল। অষ্ট্রেলিয়াতে বৃষ্টি বিন্দুর সংখ্যা গোনবার এবং এর এক একটি বিন্দুর পরিমিতি মাপার জন্য একটি নতুন রকম যন্ত্র বার হয়েছে—বৃষ্টি বিন্দুর গঠন কী করে হয় এটাও ঐ যন্ত্রের সাহায্যেই অনুসন্ধান করা হচ্ছে। এদের মতে উষ্ণ প্রদেশ ও তার নিকটবর্তী স্থান

সমূহে লবণকণা বৃষ্টির ফোটা তৈরী করতে সাহায্য করে।
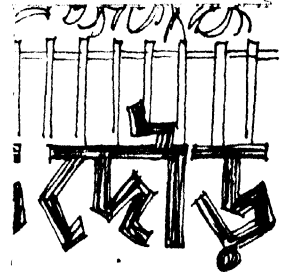
*

ছিপের মুখে বঁড়শী লাগিয়ে মাছ ধরা

লছি 'কাল ফ্লাওয়ার'। 'পাস্ট্ রেকর্ড'টা দেখেছ একবার! অর্ডিনারী ঘোড়া নয় বাবা, 'জেট্ প্রোপেল্ড'। আর কি বংশ! একেবারে বনেদী কুলীন। ওর ঠাকুমা তিনবার দার্বিতে সেকেন্ড, দিদিমা দুবার আইরিশে উইন', বাপ গ্রান্ডে বরাবর প্লেস রেখেছে, আর মা, আহা হা, অমন একটা মেয়ে লাখে মেলে মশাই। ডার্বির পর ইন্ডিয়াতে এল। প্রথমেই বোম্বাইতে দৌড়ুলে, জকি ছিল নতুন নতুন আকৃতি প্রকৃতি ... সংগ্রহ করেন। এর আগে এই ধরণের মাছ দেখাই যায়নি। ডাঃ কার্ল হাবসের মাছ ধরার এই নতুন পদ্ধতি বাণিজ্যিক ব্যবহারে লাগানোর প্রচেষ্টা চলছে—এটি কার্যকরী হলে সমুদ্রের তলদেশ থেকে মাছ ধরার খুবই সুবিধা হয়।
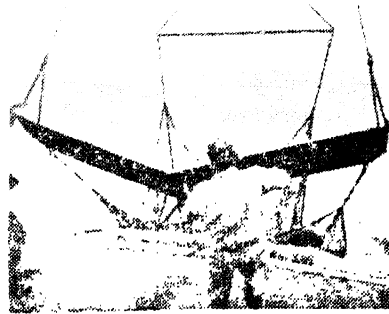
ডাঃ হাবসের বৈদ্যুতিক শক্তিসম্পন্ন নতুন ধরণের জাল

মাছগুলি সত্যই অদ্ভুত

শ্রীমতী সরমা ভৌমিক

দাঁড়িয়ে দেবার পর তিনি সে স্থান ছেড়ে আর কোথাও গিয়ে পড়েছিলেন কি না তার সংবাদ আমি ইতিহাসের কোনো পুঁথিতে এ পর্যন্ত পাই নি।

ইতিমধ্যে হোল কি, যে ভদ্রলোকটি ড্রয়িং-রুমে নিঃশব্দে ঢুকেছিলেন, তিনি এক প্রান্ত কোরে বসলেন। ঘরের কোণে একটা ফুলদানিতে জলসুদ্ধু একগোছা টিউলিপ্ ফুল সাজানো ছিল। কেউ তাঁর দিকে দৃষ্টি-পাত কোরছে না দেখে ভদ্রলোকটি ফুল-দানি থেকে ফুলগুলো তুলে নিয়ে চোঁ কোরে

গ্লাডিওলাস

শ্রীমতী সরমা ভৌমিকের একটি চিত্র-প্রদর্শনী একাডেমীর সালোনে সম্প্রতি (১৪ই নবেম্বর—২১শে নবেম্বর) অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আমাদের দেশের মেয়েদের স্বল্পায়ু শিল্পজীবনের কথা সুবিদিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপযুক্ত সামাজিক পরি-বেশের অভাবে কতো মুকুলিত প্রতিভা স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই অসুবিধার মধ্যে থেকেও যাঁরা শিল্পচর্চা থেকে নিরস্ত হননি তাঁদের মানসিক দৃঢ়তা অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হবে। শিল্পী শ্রীমতী সরমা ভৌমিক এ'দের দলেই পড়েন। সংসারের কোলাহলের মধ্যে থেকেও মাঝে মাঝে শিল্পচর্চার অনুকূল পরিবেশ রচনা করে তিনি যে ছবি এ'কে চলেছেন তা সত্যই বিস্ময়কর।

শিল্পী নিয়মিত কোন বিদ্যায়তনে শিল্প-শিক্ষা না নিলেও ক'একজন শিল্পীর কাছে কিন্তু কিছু শিল্পশিক্ষার পাঠ নিয়েছেন। তাঁর আঁকা এই প্রদর্শনীর প্রায় ৬৬টি ছবিকে প্রধানতঃ দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে। নব্যপন্থীদের প্রভাবে এবং মোটা-মুটি ভারতীয় আঙ্গিকে অঙ্কিত ধারাকেই তিনি অনুসরণ করেছেন। তাই কোন কোন ছবিতে যেমন পাই কল্পনার বিস্তার তেমনিই আবার কোন কোন ছবিতে দৃশ্য-বস্তুর সঙ্গে নিজের ভাব ও কল্পনা মিলে অন্য রূপ নিয়েছে। যেখানে শিল্পী মোটা-মুটি নিজের কল্পনায় ভারতীয় আঙ্গিকে আঁকবার চেষ্টা করেছেন সেখানেই তিনি সাফল্য অর্জন করেছেন বেশি। এ ছবি-গুলোতে 'ফর্ম'-এর কোথাও কোথাও বিকৃতি চোখকে পীড়া দিলেও শিল্পীর আলঙ্কারিক বোধ বেশ মনোরম। মোলায়েম রং-এর ব্যবহার এবং কাজে যত্ন ছবিগুলোকে আরও আকর্ষক করেছে। কোন কোন ছবির আলঙ্কারিক প্রথার ব্যবহার ছুঁচের কাজের মত মনে হয় এবং তা বেশ ভাল লাগে। কিন্তু এর পাশেই যখন নব্যপন্থীদের প্রভাবে অঙ্কিত ছবি দেখি তখন নিরাশ হতে হয়। রেখার শিথিলতা, সস্তা এবং কোথাও বা চড়া রংএর ব্যবহার এবং আঁকতে গিয়ে যে পরিমাণ যত্ন ও মনোযোগের প্রয়োজন তার অভাবের দরুণ অধিকাংশ ছবিই দৃষ্টিকে একান্ত পীড়া দেয়। শিল্পী যদি এইভাবে নব্যপন্থীদের ধারা বিচারহীনভাবে অনু-সরণ না করে তাঁর স্বকীয় বিশেষত্ব অলঙ্কারিক পন্থায় কাজ করে যেতেন, মনে হয়, তাতে তিনি পূর্ণভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারতেন এবং সেই দিক থেকেই প্রকৃত সাফল্য অর্জন করতে পারতেন। রচনার আর একটা প্রধান ত্রুটি এই যে, অধিকাংশ ছবিই Central composition নিয়ে আঁকা। এ ধরণের ছবি চোখকে বড় পীড়া দেয়, যদি না উপযুক্ত দক্ষতা তাতে দেখানো যায়। শিল্পী ভবিষ্যতে এ বিষয়ে দৃষ্টি দিলে মনে হয় উপকৃত হবেন।

আলঙ্কারিক ও ভারতীয় আঙ্গিকের কাজগুলোর মধ্যে Village Corner, Three Peacocks, Radha Krishna

পাখি ও মাছ

with Gopies Winding Path, L[illegible] scape (24) Raining, Mother [illegible] Child, A family group, [illegible] pegions, Landscape (56) [illegible] উল্লেখযোগ্য। নব্যপন্থীদের ধারায় অ[illegible] কাজগুলোর মধ্যে 'দিবাস্বপ্ন' (৬) [illegible] মানিনী' প্রভৃতি মন্দ নয়।

সমালোচনার উদ্দেশ্যেই ত্রুটি[illegible] উল্লেখ করতে হলো। কিন্তু শ্রী[illegible] ভৌমিকের সমগ্র রচনার মধ্যে যে [illegible] শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাব আ[illegible] সত্যই লক্ষণীয়। আশা করি, ভবি[illegible] শিল্পীর আরও পরিণত রচনার [illegible] পাওয়া যাবে।

ঘোড়দৌড়

রূপদর্শী

রূপেয়ার ঝিলিক কড়া-ঝিলিক। যার আঁখতে সে ঝিলিক একবার চোট মেরেছে, সে জখম। তার চক্ষে লাগে ধাঁধাঁ। তারপর যেদিকে আলো আলো দেখে, সেই দিকে দৌড়োয়। আগুপাছু চাওয়া নেই, ভাবা-চিন্তে কিছু নাই, একেবারে বে-দিশা, বে-হুঁশ, বাওরা। তারপর একদিন যখন ঠেক খায়, হুঁশের গাছে পাতা ওঠে নতুন করে, আক্কেলের পানি চোখের ঘুম মুছে ফেলে তখন বোঝে যাকে নিশানা করে ছুটে-ছিল, তা আলো নয়, আলেয়া। তা পথ দেখায় না, পথ ভোলায়।

এই রেস অর্থাৎ ঘোড়দৌড় এমনি এক আলেয়া। ঢোকবার মুখে হৈ হৈ, বেরুবার মুখে হায় হায়।

হপ্তার বেবাক দিনগুলি একেবারে পানসে। ইনফ্লুয়েঞ্জার শেষের মত। হ্যাঁ, বেস্পতিবার হল তো একটু নড়াচড়া, একটু উসখুস। শুক্রবার হল তো একটু চুলবুল ইচ্ছা। চাপা পড়া উত্তেজনার চুলে উকুনের চিরুণী বুলানো শুরু হল। তারপর শনিবার হল কি, বাস্, বাঁধ ভাঙ্গা ঢল চলল, হেঁটে নয়, মোটরে নয়, ট্রামে। কোথায়? না, রেস-ময়দান। দুয়ে দুয়ে, শয়ে শয়ে, হাজারে হাজারে।

দুটী টাকা ফ্যালো, 'গেটমানি', টিকিট কেনো, ভেতরে ঢোকো। তারপর আর কি? টিকের তো কষাই আছে। কিসে খেলবে? কত খেলবে? ট্যাঁকের অবস্থা বেশ মোটা তো? বহুৎ আচ্ছা। প্রেমসে খেলো। এসো টিপ্স্ বলে দিই।

কি, বেলুড় পেলট্ থেকেই শুরু বুঝি আজকে? আচ্ছা। তবে তো ভালই, এসো। স্বামীজীর নাম নিয়ে ঝুলে পড়ি, কাটো শালা 'উইনে', পনর টাকা লাগাও। 'ড্রাই ডে', 'ড্রাই ডে'তে ধরবে ভাই, মনটা সকাল থেকে 'ড' 'ড' করছে। আপিসে বেরুবো, ছোট ছেলেটা হামাগুড়ি দিয়ে সামনে এল। কোনদিন করে না ভাই, ধর্মত বলছি, দু-হাত দিয়ে কোঁচা চেপে ধরে, মুখ তুলে আওয়াজ ছাড়লে, ডা ডা ডা। আপিসে দেরী হয়ে গেসল, সাহেব গাল দিলে, তাও মাইরী ড্যাম্ বলে, এতগুলো যোগাযোগ যখন, তখন 'ড্রাই ডে', শালা 'সিওর উইন্'। নির্ঘাৎ বাজী মারবে। এই বলে দিলাম। দত্ত, ভয় বাবা বেলুড়েশ্বর বলে ছ'খানা 'উইন' কেটে ফ্যালে।

আরে ধেৎর, তোমার 'ড্রাই ডে', ও শালার যত লপচপানি 'স্টার্টে'। 'ফিনিসে' গিয়ে হেঁদিয়ে পড়ে। ঘোড়া চেননা বাবা। আমি বলছি 'কলি ফ্লাওয়ার'। 'পাস্ট্ রেকর্ড'টা দেখেছ একবার! অর্ডিনারী ঘোড়া নয় বাবা, 'জেট্ প্রোপেল্ড'। আর কি বংশ! একেবারে নৈকুষ্যি কুলীন। ওর ঠাকুমা তিনবার ডার্বিতে সেকেন্ড, দিদিমা দুবার আইরিশে 'উইন', বাপ গ্রান্ডে বরাবর প্লেস রেখেছে, আর মা, আহা হা, অমন একটা মেয়ে লাখে মেলে মশাই। ডার্বির পর ইন্ডিয়াতে এল। প্রথমেই বোম্বাইতে দৌড়ুলে, ভাকি ছিল কানা প্যাট্। একেবারে হাউই ছোঁড়া দেখিয়ে দিলে মশাই। 'গোল্ডেন বারের' দৌড় তো সেবারে দেখেছিলেন, অমন তেজী 'এনিমল'টাকে তিন লেংথে মেরে বেরিয়ে গেল। তারপর মাদ্রাজ, তারপর দিল্লী, কোথাও আর সে বছর বাকী রাখলে না। তার পরের বছরই বিয়োলে, আর সেই সন্তান হল এই 'কলি ফ্লাওয়ার'। এই রেকর্ড আপনার 'ড্রাই ডে' কোথায় পাবেন কলি ফ্লাওয়ারের পাশে 'ড্রাই ডে' মশাই হিমালয়ের পাশে উইয়ের ঢ্যাপচেপে ঢিপি। গাট গচ্চা দেবার ইচ্ছে থাকে, 'ড্রাই ডে'তে লাগান।

ঘোড়া বললে পাছে 'প্রেস্টিজে' লাগে, হাজার হোক কেষ্টের জীব, মান অপমান জ্ঞান তো ওদেরও আছে, মেজাজও আছে, কথাটা ঠোঁট থেকে বেরিয়ে বেটক্করে কার কানে লেগে যাবে, মেজাজটা যাবে তার বিগড়ে, দৌড়ুতে গড়িমসি করবে আর যাবে তকদিরের বারটা বেজে, কি দরকার বাবা ঘোড়াকে ঘোড়া বলে, অনেকে তাই আদর করে বলে 'এনিম্যাল্'। সাহেব বললে এক-

কালে হ্যাটকোটধারী বাঙালী বাবুরা খুশ-মেজাজ হতেন। 'এনিম্যাল্' বললে ঘোড়াদের 'প্রেস্টিজে'ও বোধহয় তেমনি সুড়সুড়ি লাগে, অন্তত এদের ধারণা।

দলে দলে লোক ঢুকছে। বসবার জায়গা ফুল তো মাঠ আছে কেন? শুরু হল পয়লা রেস্। ঘোড়া তো দৌড়ুবে শেষে দাঁড়ান, আগের কাজগুলো আগে শেষ হোক! টিকিট কেনা হোক! ঝড়াক করে বোর্ড টাঙানো হল। বোর্ডের গায়ে বিস্তারিত লিখন। রেসের নম্বর। ঘোড়ার সিরিয়াল— এক, দুই, তিন, চার......যত-গুলো ঘোড়া দৌড়ুবে ততগুলো নম্বর। এক নম্বরে যার নাম সে বেড়ার পাশে দাঁড়াবে, দু নম্বরে যার নাম সে এক নম্বরের বাঁ পাশে দাঁড়াবে, এমনি করে তিন নম্বর দু নম্বরের পাশে, চার নম্বর তিন নম্বরের পাশে.....যে যত ডাইনে, তার দিকে তত নজর, বাজী মারবার তার তত 'চান্স'।

ঘোড়ার সিরিয়ালের পর ঘোড়ার 'রাইডারের' নাম। 'রাইডার' অর্থ যে ঘোড়ায় চড়ে শাদা বাঙলায় 'জকি'। জকির নামের পাশে ঘোড়ার আসল নম্বর। বোর্ডের গায়ে দ্যাখ তো রে কত নম্বর? নয়। নয়? মিলা তো হাতের কেতাবের সঙ্গে। কি বলে? 'ব্ল্যাক্ স্টর্ম'। বাঃ, 'পোজিশন' ভালই আছে দেখি, তিনের 'পোজিশন্'। ঠিক হ্যায়, ধরে রাখ, ওটাকে 'প্লেসে'। 'উইনে' বাবা যাকে স্বপ্নে পেয়েছি, তাকে ছাড়া আর কাউকে খেলছিনি, সে ব্রহ্মা বিষ্টু মহেশ্বর এসে বললেও না। বলি বিশ্বাসের একটা মূল্য তো আছেই। কথায় বলে, বিশ্বাসে মিলায় কেষ্ট, তর্কে বহুদূরে।

কার কথা বলছেন মশাই? আজ্ঞে না, এই বলছিলুম আর কি? আপনি কাকে 'উইনে' রাখলেন? 'গোল্ডেন ঈগল'। 'গোল্ডেন ঈগল'! মাই ঘড্! ওটা কি রেস খেলার যুগ্যি নাকি মশাই? অ্যাঁ। ও তো গাড়ি টানার ঘোড়া। পাছা নিয়ে নড়তে পারে না, দৌড়ুবে কি মশাই?

বটে! ঘোড়ার দৌড় কাকে বলে দেখেছেন কখনো? ফুটুনি মারছেন খুব যে, অ্যাঁ। আমাকে ঘোড়া চেনাচ্ছেন মশাই! কদিন ধরে রেসে আসছেন? কখনো বাড়ি বেচেছেন? বাজারে ক'টাকা দেনা হয়েছে? শুনুন, মেলা ফট্‌ফট্ করবেন না, বাগবাজারের ওপর তিনখানি বাড়ি, সাত বিঘে জমি বরানগরের, সব এই ময়দানে গেছে, এই অশ্বিনীকুমারদের খুরে খুরে, আমাকে ঘোড়া চেনাবেন না। রোজ সকালে এই ময়দানে আসছি মশাই। সব ঘোড়ারই 'ট্র্যাকিং' দেখেছি। দুদিন 'গোল্ডেন ঈগল'কেও এনেছিল। দৌড় দেখলুম। কি 'গ্যালপ্', ওয়ান্ডারফুল! তবু তো বাচ্চা, এখনো 'ফর্মে' আসেনি। ফর্মে এলে দেখবেন, ও-ঘোড়া চপায়ে দৌড়ুবে। এখনই 'ফার্লং' ক্লিয়ার করছে স' বারো, সাড়ে বারো সেকেন্ডে। জকির যে বাবুর্চি তার সঙ্গে আমাদের আপিসের পদা খুব জমিয়ে নিয়েছে। পদা বললে, শালা নাকি ঘুঘুস্য ঘুঘু। মুখ আর খুলতেই চায় না। তুইয়ে তাইয়ে, মাল টাল খাইয়ে তবে পদা তাকে জপিয়েছে। এত সিওর কি মশাই সাধে হই। 'সোর্স' পাকা বলেই না। বাবুর্চি বলেছে, ছ ফার্লংএ 'গোল্ডেন ঈগল'কে মারবে এমন কেউ এই ময়দানে নেই।

তবে আপনি বলছেন, গোল্ডেন ঈগল? নিশ্চয়ই। 'প্লেসে' ধরি। কি বলেন? কলজে ফোলান। টিপু টিপু করবেন তো রেসে এসেছেন কেন? তবে কি 'উইন'? এর আবার 'হেজিটেশন্' কি! চোখ বুঁজে খেলে যান।

'উইন' কি? 'প্লেস্' কি? 'উইন' জেতা অর্থাৎ 'ফার্স্ট'। যে ঘোড়ায় খেলব, সে যদি ফার্স্ট হয় তবেই প্রাপ্তি, নইলে লবডঙ্কা। আর 'প্লে সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থএর মধ্যে হলেই 'উইন'এর টিকিট আলাদা। 'প্লেসে'র আলাদা। এতো গেল অর্ডিনারি। আরেক কায়দা আছে। তাকে বলে কাস্ট্'। কোন্ ঘোড়া ফার্স্ট হবে, হবে সেকেন্ড তোমাকে আগে বলে হবে। টিকিট কিনতে হবে সেই যদি লেগে গেল তো পেলে এক যদি ফস্কে গেল তো ব্যস। পায় কটা? লাখে এক। যায় সব্বার

টিকিট কেনবার সময় তো সবারই এ বাবা ঝোপ বুঝে কোপ নয়, এ অঙ্ক, 'ম্যাথামেটিক্যাল ক্যালকুলেশন' মতো হিসেবের কড়ি। এই যে ধর ফক্সে টাকা ধরলুম, সে কি হুট কক্ষনো না। বেস্পতিবার সকালে ট্র্যাকে ছিলুম! দু ফার্লং সেকেন্ড দিব্যি মেরে ওকে এক মারতে পারে 'প্রিম রোজ' তার হিসেব দ্যাখ, 'সেম্ ডিসট্যান্স' করেছে, 'টাইমিং' দ্যাখ, সময় নিয়েছে সেকেন্ড। আর যারা আছে তাদের থোড়াই কেয়ার করে, তারা সব কেউ উঠতে পারে নি। এতক্ষণ চুপ ছিলুম কোন প্লেস পায় দেখবার জন্য নম্বর পেলে না, তিনে দাঁড়াল, 'প্রিম রোজ'কে ঠেলেছে সাতে। শনের যেটুকু চান্স ছিল, গেল। তাই তিনকে 'উইনে' রাখ। আর 'ফোরকাস্ট' তিন সাত। দ্যাখ কপালের ঘড়িতে টিক কি বলে?

আফিসে তুমি বড় সাহেব আমি কেরাণী, তুমি ম্যানেজিং ডিরেক্টর, আমি আর্দালী, সর্বদা তটস্থ থাকি, মুখ তুলে চাইনে, সেলাম বাজাই চলতে ফিরতে, জো হুজুরে সর্বদা হাজির থাকি। কিন্তু রেসের ময়দানে তোমায় আমায় ফারাক শুধু বসার জায়গার। তুমি গরীব, পায়দলে আসি, আমার স্থান দু টাকার স্ট্যান্ডে। তুমি রইস্‌লোক, মোটর হাঁকাও, দূরবীণ কসে দৌড় দ্যাখ, 'বারে' ঢুকে গলা ভেজাও, পাঁচ টাকা আট টাকার স্ট্যান্ডে বস। এই শুধু ফারাক। কিন্তু সাহেব কিন্তু বড়বাবু, খেলার শেষে তুমি

... এক সমান। তুমিও হার আমিও হারি। ... আমরা হারতুতো ভাই।

সাহেব ইশারা করেন, বেয়ারা ছোটে। ওদিকটা পাঁচ টাকার স্ট্যান্ড, এদিকটা দু টাকার। এপারে স্ট্যান্ড ওপারে স্ট্যান্ড মাধ্যখেনে পাঁচিল। সাহেবে বেয়ারাতে বাতচিৎ চালাচালি হয়। সাহেব ডাকেন, রামধারী! বেয়ারা বলেন, হুজুর। সাহেব বলেন, টিপস্‌ মিলা? সুলুক সন্ধান পেয়েছ? বেয়ারা বলে, জী হাঁ। সাহেব বলেন, বাতাও? বলো? বেয়ারা বলেন, হুজুর ফোরকাস্‌ ... এক। সাহেব বলেন, খবর পাক্কা হ্যায়? বেয়ারা বলেন, একদম পাকা। সাহেব বলেন, ... রুপেয়া লো, হমারে নামপর পন্দর রুপেয়া ফোরকাস্ট লাগাও। টাকা নাও, আমার নামে পনের টাকা ফোরকাস্টে ধর। বেয়ারা নারাজ। বলেন, হামকো নসিব আচ্ছা নেহি, আপ্‌ খুদ লাগাইয়ে। আমার কপাল ভাল নয়, আপনি নিজেই লাগান। সাহেব বলেন, হাম বড়া আন্‌লাকি হ্যায়। তুম্‌হারা ভাতিজা কাঁহা? উসকো লায়া নেহি? আমিও তো পোড়া কপাল্যা, তোমার ভাইপোকে আনোনি?

খুড়ো এই তাকেই ছিলেন। অনেকদিন ধরে ফাঁক খুজছেন, ভাতিজার আখেরী এক বন্দোবস্ত করে দেবার জন্য। মওকা মিলল। বললেন, হুজুর, বেচারা বড় মনমরা হয়ে আছে। চাকরী বাকরী নেই। সাহেব বলেন, ঠিক হ্যায় উস্কো, সময় নষ্ট করো না। শিগ্‌গির টিকেট কেন। ওকে কাল থেকে ঠিক সময় আপিসে আসতে ব'ল।

পাঁচ টাকা আট টাকার স্ট্যান্ডে কি আহামরি শোভা! লাল নীল হলদে, পোষাকের জেল্লা কি! লেডিরা বসে আছেন ওদিকে, যেন নব রঙের সূর্যোদয়। এক হাতে ঝোলানো-ঝোলা, অন্য হাতে 'দি টার্ফ'। ঘোড়ার ঠিকুজী-কুষ্ঠি। এরা সব সোসাইটি-মেয়ে। ঘোড়ার নাম, জকির নাম, ট্রেনারের নাম, আস্তাবলের সহিসের নাম, ঘোড়ার মালিকের নাম ওরা লিপস্টিকের সঙ্গে ঠোঁটে মেখে রাখেন। ডিনার খানায় কি ক্লাব নাচের ফাঁকে ফাঁকে মিহি করে দুটি একটি ঝেড়ে দেন। কে? জাক গর্ডন রে? ও! উনপঞ্চাশ সালে ওর পায়ে একবার খিঁচ্‌ ধরেছিল। মিলি বোনার্জী তো খবরটা পেয়ে কেঁদেই একশা। সমবেদনা জানিয়ে একটা রেডিও মেসেজ্‌ পাঠিয়েছিল। কেন শিবাজীর ঘোড়া 'হোপলেসে'র যখন অসুখ হয় তখন কি মিলিকে দেখেছিলে? খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল প্রায়। মিলির 'হট্‌ ফেভারিট্‌' ছিল। ওকে নিয়েই তো ডাইভোর্স হয়ে গেল বোনার্জীর সঙ্গে মিলির। পুওর ডক্টর, কি করে রেসের খরচ জোগাবে? না পারবে তো মিলিকে বিয়ে করতে যাওয়া কেন? ফুঃ! শুনছি জৈদ্‌কার সঙ্গে এবার ওর বিয়ে হবে। জৈদ্‌কা উইল বি এরিয়েল ম্যাচ ফর হার। হি ট্যু ইজ্‌ এ হর্স লাভার।

ঘোড়া দৌড়য় আর কতক্ষণ। বড় জোর দু আড়াই মিনিট। কিন্তু টিকিট কেন, পেমেন্ট নাও, হ্যান ত্যান সাত সতেরোয় সময় যায় বেশী। প্রথম চোট যদি হারলে তো 'লস' 'মেক্‌ আপ্‌' করবার জিদ্‌ চাপল। তারপর চলল হারের পর হার। যতক্ষণ দম। যতক্ষণ পকেটে শেষ কড়িটুকু। যদি প্রথমে জিতলে, তো আরো জেতার লোভ। আরো খেলা, আরো হার। আবার সেই জেদের যাদু—লস্‌ মেক আপ্‌ করব। আবার সেই হার। হারের পর হার। যতক্ষণ বুকে দম। যতক্ষণ পকেটে শেষ কড়িটুকু।

যে কটা সেকেন্ড ঘোড়া দৌড়য়, সেই সময়টুকুতেই আশা, উন্মাদনা, উত্তেজনা, আকাশে চীৎকারের পিন্ড ছুঁড়ে দেওয়া।

দৌড় শেষ তো শ্রান্তি। ভারী অবসাদ। একবার একবার ঘোড়া দৌড় দেয়, সহস্র কন্ঠের আওয়াজ ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি করে আকাশে ওঠে। দৌড় শেষ তো আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে শ্রান্তি। অবসাদ নিবিড় করে পেঁচিয়ে ধরে।

সব কটা রেস শেষ হয়। বারে ভীড় বাড়ে। যারা জিতেছে তারা আনন্দে টাকা ওড়ায়। যারা হেরেছে তারা তো ডুবেছে। ডুবতে ডুবতেও প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে বোতলের গলা। যাদের কিছুই আর নেই, তাদের শূন্য দৃষ্টি প্রাণহীন ট্র্যাকের উপর নির্জীব পড়ে থাকে। টার্ফের রিপোর্টগুলো, ঘোড়ার হিসাবগুলো, গোপনীয় টিপ্‌সগুলো পাশাপাশি পড়ে থাকে। এলোমেলো বাতাসে ওড়ে। খেল খতম। তারপর দৃশ্যটাকে ঢেকে দিতে রাত্রির যবনিকা নেমে আসে ধীরে ধীরে, অতি নিশ্চিত নিরীখে।

অতঃ কিম্

আমরা মুখে যতই বলি না কেন যে, আমরা নিন্দাস্তুতি অগ্রাহ্য করে আমাদের শান্তি-নীতি অনুসরণ করে যাব, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে ইউনোতে কোরিয়া সম্পর্কিত ভারতীয় প্রস্তাবের মোট ফল হয়েছে—আমেরিকার পক্ষে একটা বড়ো রকমের কূটনৈতিক জয়। সোভিয়েট ব্লক ভোটে এরকম কোণঠাসা পূর্বে কদাচিৎ হয়েছে। তাহলেও মিঃ ভিসিন্স্কি যে রকম ভাষায় ভারতীয় প্রতিনিধিদের বুদ্ধি ও উদ্দেশ্যের সমালোচনা করেছেন, তাতে অনেকে আশ্চর্যবোধ করেছে। কেউ কেউ বলছে পিকিং গভর্নমেন্টের মন ভারতীয় প্রস্তাবটির প্রতি ততটা বিরুদ্ধভাবাপন্ন না হতে পারে, এই আশঙ্কা করে আগে থাকতেই মিঃ ভিসিন্স্কি এমন কড়া ভাষায় ভারতীয় প্রস্তাবটিকে আক্রমণ করেন, যাতে পিকিং গভর্নমেন্টের পক্ষে সুরে সুর মেলানো ছাড়া গত্যন্তর না থাকে।

এই ব্যাখ্যা যারা দিচ্ছে, তাদের ধারণা যে, কোরিয়ায় যুদ্ধ চালানো সম্বন্ধে রাশিয়া ও চীনের মনোভাব এখন আর ঠিক এক-রকম নয়—রাশিয়া চায় যে, যুদ্ধ চলুক, কারণ তাতে রাশিয়ার লাভ—যেহেতু তাতে ইঙ্গ-মার্কিন ব্লকের লোক ও শক্তিক্ষয় হচ্ছে, অথচ একটিও সোভিয়েট সৈন্য মারা যাচ্ছে না; কিন্তু চীনের যথেষ্ট গায়ে লাগছে, কারণ তার লোক মরছে; সুতরাং সে যুদ্ধ থামাতে গররাজী নয়।

রাশিয়া এবং চীনের মধ্যে মতভেদের এই থিয়োরীর সঙ্গে কিন্তু একটা ব্যাপারের সামঞ্জস্য দেখা যাচ্ছে না, সেটা হচ্ছে এই যে, রাশিয়া ইউনোতে নিজে যে প্রস্তাব আনে এবং ভারতীয় প্রস্তাব সম্পর্কে যে সংশোধন প্রস্তাব দেয়, তাতে কিন্তু অবিলম্বে যুদ্ধ-নিবৃত্তি চাওয়া হয়। এতে কিন্তু আমেরিকারই ঘোর আপত্তি ছিল এবং মিঃ ভিসিন্স্কির সংশোধন প্রস্তাবে যুদ্ধ-নিবৃত্তির কথা যদি ভারতীয় প্রতিনিধিরা স্বীকার করে নিতেন, তবে তৎক্ষণাৎ ভারতীয় প্রস্তাব মার্কিন সমর্থন থেকে বঞ্চিত হোত। আমেরিকার এক কথা—বন্দিমুক্তির প্রশ্নের কিভাবে সমাধান হবে, তার সুস্পষ্ট নির্দেশসম্বলিত আরমিস্টিস চুক্তি সম্পাদিত হবার আগে যুদ্ধনিবৃত্তির কথা উঠতে পারে না। বন্দিমুক্তি সমস্যার

বৈদেশিকী

আলোচনায় দেখা গেছে যে, কোন পক্ষেরই নীতির দোহাই খাঁটি নয়। ইউনোর ভোটে আমেরিকার কূটনৈতিক জয় হয়েছে, নৈতিক জয় কারোই হয় নি।

ইউনোর এই ভোট পর্যন্তই ট্রুম্যান সরকারের কোরিয়া-কীর্তির সীমানা, এর পর কোরিয়ায় কি হবে, সেটা নির্ভর করছে অনেকটা জেনারেল আইজেনহাওয়ারের উপর। নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জানুয়ারী মাসে তাঁর পদে অধিষ্ঠিত হবেন, কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁর ছায়া পড়েছে সরকারী জুড়ে। এই মাসটা মিঃ ট্রুম্যান ও মন্ত্রীরা অনেকটা প্রেতের মতো কাজ ক যাবেন, যেন থেকেও নেই। ... আইজেনহাওয়ার কি বলেন, এখন সেই দিকে কান খাড়া করে আছে।

জেনারেল আইজেনহাওয়ার তাঁর নি অভিযানকালীন প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অ কোরিয়া দেখে এসেছেন। কোরিয়াতে নূতন নীতি অনুসৃত হবে কিনা, সে জেনারেল আইজেনহাওয়ার প্রেসিডে অধিষ্ঠিত হবার পূর্বে বিশেষ বলবেন, এরূপ মনে হয় না। ... তিনি তাঁর মনোনীত মন্ত্রীদের কোরিয়া পরিদর্শনের অভিজ্ঞতায় আ

(সি

করছেন। তবে কোরিয়া ত্যাগের অব্যবহিত পূর্বে তাঁর মুখ থেকে যে দুটি-একটি কথা বেরিয়েছে, তারই অর্থ নিয়ে জল্পনাকল্পনা চলছে। জেনারেল আইজেনহাওয়ার যা বলেছেন, তা থেকে এটা স্পষ্ট যে, তাঁর আমলে কোরিয়ার যুদ্ধ আরো ভালো করে চালানোর ব্যবস্থা হবে, যদিও যুদ্ধ চীনের বিরুদ্ধে ব্যাপকতর করার অভিপ্রায় নাই। কিন্তু এইখানেই মুশকিল, কোরিয়ার মধ্যে আবদ্ধ রেখে যুদ্ধে "পূর্ণ জয়লাভ" কি সম্ভব? এ বিষয়ে শেষ পর্যন্ত জেনারেল আইজেনহাওয়ার জেনারেল ম্যাকার্থারের সঙ্গে একমত না হয়ে যান।

আর একটা কথা আছে। চীনের সঙ্গে ব্যাপকতর যুদ্ধের সম্ভাবনা যে কেবল কোরিয়ার ভিতর দিয়েই আছে তা নয়। ইন্দোচীনে ফরাসীদের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হয়ে উঠছে। ফরাসীরা আমেরিকার কাছ থেকে টাকাকড়ি অস্ত্রপাতির সাহায্য পাচ্ছে, কিন্তু তাতে কুলচ্ছে না। কেবল নিজের সৈন্যসামন্ত (এর মধ্যে অবশ্য অ-য়ুরোপীয় ফরাসী প্রজা এবং ফ্রান্সের বিখ্যাত Foreign Legionভুক্ত নানাদেশীয় লোক, এমন কি ভূতপূর্ব নাৎসীপন্থী জার্মানও আছে) দিয়ে ফ্রান্স ভিয়েৎমিনকে আর খুব বেশীদিন হয়ত ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না, আর পারলেও তাতে ফ্রান্সের এতো শক্তিক্ষয় হবে যে, তার ফলে পশ্চিম ইউরোপ সুরক্ষার পরিকল্পনায় ফ্রান্স তার নির্দিষ্ট অংশ নিতে পারবে না। সুতরাং ফ্রান্স চাইছে যে, ইন্দোচীনে তার সাহায্যে অন্যেরাও সৈন্য দিক।

এইখানেই বিপদ। ফরাসীরা যদি ইন্দোচীন থেকে হঠে যায়, তবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বার কম্যুনিস্টদের সামনে খুলে যাবে। সেটা থেকে বাঁচতে হলে ইন্দোচীনে ভিয়েৎমিনকে ঠেকিয়ে রাখা দরকার। সে কাজ যদি ফ্রান্স একলা না পারে, তবে তার পাশে এসে ইংরেজ, মার্কিনকে দাঁড়াতে হবে। কিন্তু শুনা যাচ্ছে পিকিং গভর্নমেণ্ট এইরকম একটা আভাস দিয়েছেন যে, যদি ইন্দোচীনে অন্য দেশের সৈন্য আমদানী করা হয়, তবে তাতে চীন নিজেকে বিপন্ন বলে মনে করবে এবং আত্মরক্ষার্থ ইন্দোচীনে ভিয়েৎমিনকে সাহায্য পাঠাতে বাধ্য হবে—অর্থাৎ কোরিয়ায় যেমন চীনা ভলাণ্টিয়ার বাহিনী লড়তে গেছে, ইন্দোচীনেও তেমনি চীনা ভলাণ্টিয়ার বাহিনী যাবে। সুতরাং চীনের সঙ্গে ব্যাপকতর যুদ্ধের সম্ভাবনা এদিক দিয়েও আছে।

ইন্দোচীনের বেলায় কিন্তু ইংরেজদের মনোভাব অন্যরকম দেখা যাবে। কোরিয়ার ব্যাপারে ইংরেজরা আমেরিকাকে বেশীদূর এগুতে দেয়নি, চীনের সঙ্গে ব্যাপকতর লড়াইয়ের আশঙ্কায়। তার কারণ কোরিয়াতে সাক্ষাৎভাবে ইংরেজ-স্বার্থ বিশেষ নেই, তাই চীনের সঙ্গে পুরোপুরি যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়ে হংকংকে বিপন্ন করতে ইংরেজরা চায় না। কিন্তু ইন্দোচীন যদি কম্যুনিস্টদের হাতে চলে যায়, তবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াস্থ ইংরেজের যা কিছু সব বিপন্ন হবে। সে অবস্থায় চীনের সঙ্গে লড়াই বাধাতে ইংরেজের আপত্তি হবে না, বরঞ্চ তখন ইংরেজরাই আমেরিকাকে তাগিদ দেবে। সুতরাং কোরিয়া যুদ্ধের কেন, আরো অনেক কিছুর ভবিষ্যৎ হয়ত ইন্দোচীনের অবস্থার উপর নির্ভর করছে। ফরাসীরা যদি ক্রমশ হটতে থাকে, তবে কেবল চীনের সঙ্গে নয়, তার চেয়েও ব্যাপকতর যুদ্ধের সম্ভাবনা বাড়বে। কারণ চীনকে যদি দুই ফ্রণ্টে লড়তে হয়, তবে রাশিয়ার পক্ষে বেশীদিন "ধরি মাছ না ছুঁই পানি" করে থাকা সহজ হবে না। সেই ভীষণ সম্ভাবনা একেবারে সামনে এসে দাঁড়ালে যদি দুই পক্ষের চৈতন্য হয়!

প্রাগ মামলার রায়

সম্প্রতি প্রাগে যে রাজনৈতিক মামলার রায় ঘোষিত হয়েছে ১৯৩৭ সালের মস্কো মামলাগুলির পরে এত বড়ো বহরের চাঞ্চল্যকর কম্যুনিস্ট বিচার আর হয়নি। ইতিমধ্যে অবশ্য হাঙ্গারী, রুমানিয়া প্রভৃতি কম্যুনিস্টশাসিত সকল দেশেই ছোটো-বড়ো অনেকের চাকরী ও কারো কারো মাথাও গিয়েছে, কিন্তু চেকোশ্লোভাকিয়ার এই মামলার বহর এবং পরিণামের সঙ্গে কেবল মস্কোর ১৯৩৭ সালের নাটকেরই তুলনা হয়। ১৪ জন আসামীর মধ্যে ১১ জনের প্রাণদণ্ড এবং তিনজনের যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ হয়েছে। প্রাণদণ্ডিতদের মধ্যে চেকোশ্লোভাকিয়ার কম্যুনিস্ট পার্টির ভূতপূর্ব সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ স্লানাস্কি এবং ভূতপূর্ব মন্ত্রী ডক্টর ক্লিমেনটিফ ছিলেন (ছিলেন লিখছি এইজন্য যে, ইতিমধ্যে তাঁদের ফাঁসী বোধ হয় হয়ে গেছে)। সকল আসামীই একদা গভর্নমেণ্টে অথবা কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। অভিযোগ—দেশদ্রোহিতা, সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে গুপ্তচরের কাজ করা, সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে চেকোশ্লোভাকিয়ার সম্পর্ক দূষিত করার চেষ্টা, টিটোপন্থী কার্যকলাপ, প্রেসিডেণ্ট গটওয়ালডকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র, ইহুদী জাতীয়তাবাদীদের সমর্থন (১৪ জন আসামীর মধ্যে ১১ জন ইহুদী এবং ১১ জন প্রাণদণ্ডিতদের মধ্যে ৮ জন ইহুদী) ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, সকল আসামীই ষোল আনা অপরাধ স্বীকার করেছেন। এই সব মামলার কথা যখন পড়া যায়, একটা দুঃসহ অস্বস্তি বোধ হয়—সাচ্চা হলেও ভীষণ, সাজানো হলেও ভীষণ।

৭।১২।৫২

রঞ্জন

বলা বাহুল্য, আমার প্রথম মার্কিন বইয়ের আলোচনায় আমি আমার নিজের প্রতি যেমন সুবিচার করিনি, তেমনি অবিচার করেছি আমেরিকার প্রতিও। ওদেশে আরো অনেক শক্তিশালী লেখক জন্মগ্রহণ করেছেন এবং আমিও তাঁদের সাহিত্যের সঙ্গে একেবারে অপরিচিত নই। একটি শোচনীয় অনুল্লেখ ছিল আর্নেস্ট হেমিংওয়ে এবং তাঁর নতুন বই হাতে পেয়ে পূর্বতন ত্রুটি স্খালনের ও আমেরিকাকে অভিনন্দন জ্ঞাপনের আকাঙ্ক্ষিত সুযোগ ঘটল। বইটি প্রায়-নিখুঁত একটি প্রায়-ক্ল্যাসিক।

ছোট গল্প নয়, দৈর্ঘ্যে তার চেয়ে বড়ো। উপন্যাস নয়, দৈর্ঘ্যে তার চেয়ে ছোট। রূপক নয়, একেবারে বাস্তব। কিন্তু শুধু বাস্তব নয় যেন, অকথিত একটা ইঙ্গিত আদ্যন্ত পরিব্যাপ্ত।

চরিত্র তিন-চারটি মাত্র; বুড়ো জেলে, বাচ্চা ছেলে, অসীম আকাশ, অনন্ত সমুদ্র, আর একটা বৃহৎ মাছ আর দুটি হাঙ্গর।

কাহিনী? বুড়ো একা মাছ ধরতে গেল, সেই মাছটি যা সে ধরবে বলে সারা জীবন আশা করে এসেছে, যেমন মাছ গাঁয়ে কেউ দেখেনি কখনো; সংগ্রাম চলল শিকারী আর শিকারে, মানুষে আর মাছে। মাছে আর মানুষে, মনে হোল কখনো কখনো। সত্যি মাছ ধরা পড়ল। কিন্তু তুলবে কে? বুড়োর বয়স হয়েছে যে! বাচ্চা ছেলেটিও সঙ্গে নেই, তাকে তার মা-বাবা ভর্তি করে দিয়েছে অন্যান্য জেলেদের দলে, যাদের ভাগ্য এই বুড়োর মতো নয়, যারা শূন্য নায়ে সাগর থেকে ফেরে না রোজ রোজ।

আজ বুড়োর ভাগ্য প্রসন্ন হয়েছে, কিন্তু এ কী পরিহাস যে, সে-মাছ ডাঙায় তুলতে তার সাধ্য বা সম্বল নেই? তবু চেষ্টা চলল, সাক্ষী রইল আকাশ আর তারাগুলি। বড়ো মাছ, বুড়োও, ওই বুড়োরই মতো। দুজনে তো ভাব হওয়া উচিত। ভাব? মানুষে আর জন্তুতে, মানুষে আর প্রকৃতিতে, একটিমাত্র সম্বন্ধ আছে। সেটা নিরাপস শত্রুতা। মাছ সেকথা বুঝিয়ে দিল বুড়োকে। সমুদ্রও। এদের সঙ্গে যোগ দিল হাঙ্গর। সেই হাঙ্গরের কৃপায় শেষ পর্যন্ত যা ডাঙায় উঠল, তা মাছটার বৃহৎ কুৎসিত কঙ্কাল মাত্র। চরম জয়ের মুহূর্তে বুড়ো জেলে হাতের মুঠো খুলে দেখল, হাতে তার মুক্তো নেই, আছে একতাল কাদা মাত্র। মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত আঠারো ফুট মাছ, ধরা পড়ল, মারা পড়ল, কিন্তু মানুষকে না হারিয়ে নয়। বুড়ো পাঁচ ফুট লম্বা খাটে এসে আশ্রয় নিল; ক্লান্ত, আহত। আবার স্বপ্ন দেখল সিংহের। ইতি।

*

কিন্তু শেষ যেন হয়নি। একশ' সাতাশের পাতাটা উল্টেও পরের সাদা পৃষ্ঠাটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে হয়। যেন ওটাতেও কিছু লেখা আছে, যা কালো কালিতে লেখা যেতো না, তাই বুঝি সাদা চোখের জলে লেখা হয়েছে। বস্তুত এ-বইয়ের বেশির ভাগই লাইনগুলির মাঝে মাঝে লেখা, লাইনের লেখা অল্পই।

কিন্তু সেই অল্পে কী বিশাল ভাবৈশ্বর্য, কী গভীর ভাবানুষঙ্গ! হাভানার জেলেদের কেন, কাউকেই আমি চিনিনে। কিন্তু হেমিংয়ের রচনাগুণে সমস্ত দৃশ্যটা যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে। অথচ দুটি-একটি কথার নিপুণ আঁচড়ে মাত্র। জেলের মনে প্রতিফলিত হয়ে আকাশ, সমুদ্র আর মাছ জীবন্ত হয়ে উঠেছে; মাছ, সমুদ্র আর আকাশের পরিবেশে জেলে বুড়ো প্রাণ পেয়েছে। সমুদ্র বড়ো বুঝি? বুড়োরা নিঃসঙ্গ বুঝি? হেমিংয়ের বর্ণনা এক লাইন—বুড়ো সমুদ্রের দিকে চাইল, বুঝল কত একা সে। একটি বিশেষণ নেই, এতটুকু বিস্তার নেই। কিন্তু সব কিছু বলা হয়নি কি?

আগাগোড়া বইটির প্রধান গুণ এই নিরাভরণ সৌন্দর্য, যা প্রায় আদিম (এলিমেন্টাল)। বইয়ে ফোর্ডের উল্লেখ আছে, হেলিকপ্টরের কথা আছে, কিন্তু সে যেন আনুষঙ্গিক মাত্র। এ-ঘটনা যেন ইতিহাসের প্রথম দিনে ঘটতে পারতো, এ যেন ইতিহাসের শেষ দিনেও ঘটবে। শুধু হাভানার উপকূলে নয়, এ যেন ডায়মণ্ড-হারবারেও ঘটতে পারতো। হয়তো ঘটছেও।

বেশির ভাগ সময় তো কাটল সমুদ্রে। বুড়ো কথা বলছে কার সঙ্গে? ... সঙ্গে, আকাশের সঙ্গে, জলের ... মাছের সঙ্গে। কী রকমের কথা? ... বরাত বড়ো খারাপ। আচ্ছা, বরাত ... কিনতে পাওয়া যায় না? কিনতুম ... কিছু।' বুড়ো মাছটাকে ডেকে বলছে, ... তুই মরবি। কিন্তু আমাকেও মারবে ... কেন? আয়, আয় লক্ষ্মীটি।' নিজের মনে বুড়ো বলছে, 'ভগবান, এ-যাত্রা ... বাঁচিয়ে দে। মানৎ রইল, একশ'বার আ... ফাদার, আর একশ'বার হেল্ মেরী ব... একটু পরে বলছে, 'আহা বললুম ... বলব। ধরে নে বলেছি। এখন আমি ... বুড়ো মানুষ তো। পরে বলব।' কি... এমনি নিজের মনে কথা বলে চলেছে, ... আমি কি সত্যি পাগল হয়েছি নাকি ... নিজের সঙ্গে কথা বলছি।' শুধু এরাই ... পারে ফেলে-আসা বাচ্চা ছে... অনুপস্থিতি পর্যন্ত যে কোন উপস্থি... মতো জীবন্ত। মাঝে মাঝে বুড়ো ... বলে, 'আহা, ছেলেটা যদি সঙ্গে থাক...

শুধু আলাপে নয়, লেখকের ... বর্ণনাতে পর্যন্ত ঠিক এই রকমের অসা... বাক্-সংক্ষেপ। সেখানেও প্রতিটি ... এক আউন্সের শিশিতে এক গ্যালন ... জেলেটির বর্ণনাঃ বুড়ো। ওর হা... কিছু বুড়ো। ওই চোখ দুটো বাদে ... রঙ্ সমুদ্রের; উচ্ছল, অপরাজিত। ... শেষে বুড়ো ক্লান্তঃ হেলান দিয়ে ... পড়ল জেলে। বুঝল সে মরেনি। ... বেদনার্ত স্কন্ধ সেকথা স্মরণ করিয়ে ... মরা মানুষ কি ব্যথা পায়? না। আছে ... আছে প্রাণ।

কঙ্কাল নিয়ে তীরে এসে ঘুমন্ত ... আবার সিংহের স্বপ্ন দেখছিল ... কেননা, সে হার মানেনি। মাছের কাছে ... সমুদ্রের কাছেও না। মার খেয়েছে ... ভুলের জন্যে, বেশি দূরে চলে গিয়ে... তাছাড়া হাঙ্গর মারবার মতো ... হাতিয়ারও নিয়ে যায়নি। পরের বার ... ভুল হবে না। আগে থেকে ব্যবস্থা ক... সঙ্গে ওই বাচ্চা ছেলেটাও থাকবে। ... যে-মাছ ধরা পড়বে, তা অক্ষত অ... তীরে আসবে। এবার—কিংবা এর পরে... —কিংবা তারও পরের বার—

কিন্তু আসবে কি? এই সন্দেহটা ভা... আমার। তরুণ মার্কিন এখনো আশা...

The Old Man and the Sea* by **Ernest Hemingway (Jonathan Cape, London, 7s 6d.)

পুস্তক পরিচয়

উপন্যাস

নানা রঙ-এর দিন—সন্তোষকুমার ঘোষ। ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিমিটেড, ৮৯, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৭। দাম চার টাকা।

ছোট গল্প রচনার ক্ষেত্রে বাঙলা সাহিত্য আজ যে পরিমাণ ঐশ্বর্যশালিনী উপন্যাস প্রভৃতি রচনায় সে-পরিমাণ সমৃদ্ধা হয়নি। অধিকাংশ সমালোচক এই আক্ষেপ করে থাকেন। বিশ্ব-সাহিত্যের নাটক-নভেলের অফুরন্ত ভাণ্ডারের সঙ্গে তুলনা করবার মত কোন উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি বাঙলা সাহিত্যে গত বিশ বছরের মধ্যে হয়নি। বঙ্কিম-রবি-শরৎ উপন্যাস রচনার শেষ মাইল পোস্ট। তার পরের যা নেই-মামা, পরি-তাপের বিষয় সন্দেহ নেই।

কথাটা অন্যভাবে ধরলে দাঁড়ায় এই, সার্থক ছোট গল্পের সৃষ্টি বাঙলা উপন্যাসের কাল। অর্থাৎ বাঙালী লেখকের ছোটর দক্ষতা বড়কে খর্ব করেছে। ঘুরিয়ে বললে বলতে হয়, as short stories flourish novels decline!

কিন্তু তাই কি? আমাদের তো মনে হয়, এভাবে বিষয়টা ঠিক নয়। ছোট গল্প বিচারে সময় যে মনোভাবের পরিচয় দিই, উপন্যাস বিচারে ঠিক সে-মনোভাবের পরিচয় দিই না—প্রথমটির সংজ্ঞা নিরূপণ ব্যাপারে আমরা যতটা উদার, দ্বিতীয়টির বিষয়ে ঠিক ততখানি অনুদার, গল্পকে যদি নিছক গল্প হিসাবেই শুধু দেখা হতো, তাহলে বলতুম, আমাদের পূর্বসূরীরা যে-সব গল্প রচনা করে' গেছেন, সেগুলো আর গল্পই হয় না। কিন্তু কালে-কালে দেশে-দেশে গল্পের কত না আকৃতি এবং প্রকৃতি বদল ঘটেছে, নিছক কাহিনী নিয়ে আজ ছোট গল্প নয়। তেমনি উপন্যাসেরও প্রকৃতি এবং রূপ বদলাচ্ছে, ঘটনা-বৈচিত্র্য আর লম্বা দৌড় শুধু আর তার প্রধান এবং একমাত্র উপজীবিকা হতে পারে না। একালের মানুষ হয়ে সেকালের মানদণ্ডে এখনো উপন্যাস বিচার করে' আধুনিক বাঙালী উপন্যাসিকের প্রতি সামর্থহীনতার অভিযোগ করে' নাসিকা কুঞ্চন করাটা উচিত হবে না। কালের পরিপ্রেক্ষিতে তার তুল্য মূল্য করা উচিত।

বর্তমান যুগের শক্তিশালী নবীন কাহিনী-কারদের অন্যতম সন্তোষকুমার ঘোষ ছোট গল্প রচনায় যেমন, উপন্যাস রচনায়ও তেমনি সিদ্ধ-হস্ত সিদ্ধকামও। সাহিত্যের উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর সমান দক্ষতা। যাঁরা বাঙলা উপন্যাস সম্বন্ধে হতাশ্বাস পোষণ করেন, তাঁরা আলোচ্য উপন্যাসটি পাঠে নিশ্চয়ই আশান্বিত হবেন। আশ্চর্য জীবনবোধ আর মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে লেখক উপন্যাসের ঘটনাবিন্যাস করেছেন। আলোচ্য উপন্যাস পাঠ শেষে মনে হবে, এ যেন একটা সূর্যোদয় প্রত্যক্ষ করায় আনন্দ উপ-ভোগ করলুম, যে সূর্যোদয় সচরাচর দেখবার সৌভাগ্য আমাদের বড় একটা হয় না। একটি কিশোর মনের উন্মেষ আর বিকাশ চিত্রকে গত জাতীয় আন্দোলনের পটভূমিকায় এমন করে আর কোনদিন আঁকা হয়নি। বাঙলা উপন্যাস আজ ভাবের গাম্ভীর্যে এবং বক্তব্যের স্বকীয়তায় কতখানি উৎকর্ষতা লাভ করেছে, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই উপন্যাস। 'কিনু গোয়ালার গলি' রচনা করে' লেখক যে খ্যাতি অর্জন করেছেন, আলোচ্য গ্রন্থ রচনায় তা দ্বিগুণিত হবে, আমাদের বিশ্বাস।

শুধু লিপিকুশলতার জন্যে নয় চরিত্র সৃষ্টির অপূর্ব কলানৈপুণ্যে উপন্যাসের কাহিনীটি পাঠক মনে অবিস্মরণীয় ছাপ রেখে যাবে। কিশোর শুভাশীষকে কেন্দ্র করে ঘটনা এবং চরিত্রের যে বৃত্ত সৃষ্টি হয়েছে, তার সমাপ্তির পরিচয় না পাওয়া পর্যন্ত পাঠক মন তৃপ্ত হবে না। জননী এবং জন্মভূমির অপরূপ দ্বন্দ্বে একটি কিশোর মন অত্যাশ্চর্যভাবে উদ্ঘাটিত হয়েছে। (পথের পাঁচালীতেও বোধ করি এমনটি প্রত্যক্ষ করিনি।) উপন্যাসটি কেবল রসোত্তীর্ণ বলে নয়, পাঠক মনে অভূতপূর্ব বিস্ময় সঞ্চার করার জন্যে সন্তোষকুমার অকুণ্ঠ অভিনন্দন এবং প্রশংসা পাবেন। মনে থাকবে, মিশনারি স্কুলের পরিবেশকে, জনসনকে, সরমাদিকে 'মেয়ে দেখতে আসার' নামে হৃদয়-হীন সামাজিক ব্যবস্থাকে। আর মনে থাকবে শুভাশীষের মাকে—স্বামীর স্বদেশী আন্দোলনের পশ্চাতে যাঁর নেপথ্য আত্মত্যাগ তিলে তিলে সমাধা হলো সার্থক হলো।

পরিশেষে বলতে ইচ্ছে করে, একি আনন্দ, একি বিস্ময়, একি বেদনা! ৩২২।৫২

চক্রবৎ—**শ্রীবিষ্ণুপদ বন্দ্যোপাধ্যায়**। রীডার্স কর্ণার, ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬। মূল্য ঃ চার টাকা।

ঘটনায়, পরিকল্পনায়, ভাষায় ও প্রকাশ-ভঙ্গীতে 'চক্রবৎ' একটি সম্পূর্ণ অভিনব ধরণের উপন্যাস। মোটামুটিভাবে উপন্যাস-খানি যেমন রসপ্রধান তেমনি যুক্তিপ্রধান। জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদের মধ্যে, ভারতীয় দর্শনের মূল ভিত্তিকে আশ্রয় করে, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটা 'কেলিডোস্কোপিক মুভমেণ্ট' বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে দিয়ে দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে গেছে সমগ্র উপন্যাসখানির মধ্যে। লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগত হলেও তাঁর শক্তি অনস্বীকার্য এবং সমসাময়িক কোন সাহিত্যিকের প্রভাব তাঁর মধ্যে যে পরিলক্ষিত হয়নি তা সহজেই অনুমান করা যায়। পরন্তু, ঘটনাগুলি নিয়ে তাঁর অনন্যতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যই বিশেষভাবে নজরে পড়ে। নানা ধরণের বহু চরিত্র আছে বইখানির মধ্যে এবং এক একটির মধ্যে স্বাতন্ত্র্যসম্পূর্ণ অনবদ্য 'টাইপ' সৃষ্টি হয়েছে। খুটিপুঁটি, মনো, ভুবনমোহন প্রভৃতি অদ্ভুত চরিত্রগুলি আমাদের বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে দুর্লভ হলেও, উদ্ভট কল্পনা-প্রসূত নয়। বিশেষভাবে 'খুটিপুঁটি' রোমান্স-জগতে লেখকের অপূর্ব সৃষ্টি। ঠিক এই ধরণের রোমান্স চরিত্র বাঙলা সাহিত্যে ইতঃ-পূর্বে যে আর চিত্রিত হয়নি, একথা বললেও অত্যুক্তি হয় না। এতদ্ব্যতীত ঘটনার দিক থেকে 'খণ্ডাংশ' হিসাবে ছদ্মবেশধারিণী বোরখাওয়ালী আফজল উন্নেসার কাহিনী, বোলা-বিদাবের চমকপ্রদ কাহিনী, ফ্রণ্টিয়ার মেল দুর্ঘটনার কাহিনী পাঠকের চিত্তকে অভিভূত করে তোলে। আরও এর মধ্যে রূপ নিয়েছে সর্বহারাদের বাস্তবোজ্জ্বল চিত্র, ডাল-রুটির সমস্যা নিয়ে আলোচনা, ধনিক সম্প্রদায়ের অত্যাচারের কথা, শ্রমিক সংগঠনের উল্লেখ। কিন্তু এই সকল বর্তমান সমস্যা ও শোষিত সর্বহারা জীবন্ত চিত্র চিত্রিত হলেও, তথাকথিত প্রগতি-সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত করা যায় না 'চক্রবৎ'কে। আসলে লেখক কোন 'ইজম্'-এর দাসত্বকে স্বীকার করে নেননি। তাঁর অখণ্ড দৃষ্টিতে ডাল-রুটির সমস্যাটাই যে জীবনের একমাত্র সমস্যা নয়—জীবনের যে আরও বিভিন্ন দিক আছে, আরও বহু সমস্যা আছে, প্রসারিত মন নিয়ে তিনি সেই কথাই প্রকাশ করেছেন।

সত্যই আশ্চর্য লাগে, যখন ২৬২ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থের মধ্যে এত ঘটনা ও এত অসংখ্য চরিত্রের সমাবেশ একত্রে দেখা যায়! এবং এ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, চলমান মানবজাতির একটা বিরাট শোভাযাত্রা যেন দ্রুত

পর্দাবিক্ষেপে এগিয়ে চলেছে কোন মহাকালের নির্দেশে! কোন কোন চরিত্র কয়েক ঘণ্টা; এমন কি কয়েক মুহূর্তের জন্য দেখা দিয়ে, মনের উপর গভীর রেখাপাত ক'রে চিরতরে বিদায় নিয়েছে, কিন্তু তাদের সঙ্গলাভের জন্য পাঠকের চিত্তে রয়ে গিয়েছে সুতীব্র বাসনা। কালের স্রোতে এরা হ'ল চলমান বুদ্বুদ—বিচিত্রগতিতে ছুটে চলাই এদের ধর্ম। জীবনপথে মানুষ এমনি নিরন্তর ছুটে চলেছে, আর তার পথের আনাচে-কানাচে রয়ে যাচ্ছে কত আনন্দ-বেদনা, কত আশা-নিরাশা ও জয়-পরাজয়ের ইতিহাস! এদের, অর্থাৎ এই ছোট ছোট চরিত্রগুলির স্থিতি ক্ষণিক হলেও, অনুভূতির গভীরতায়, অভিব্যক্তির অকুণ্ঠতায় ও প্রকাশের ব্যঞ্জনায় হয়ে উঠেছে প্রাণবন্ত ও অবিনাশী। কেবলমাত্র এই চরিত্রগুলির কথাই নয়, সমগ্র গ্রন্থখানির মধ্যে এমন কতকগুলি স্বয়ম্ভূ ঘটনা আছে, আপাতদৃষ্টিতে সেগুলি মূল আখ্যানভাগের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা দোষদুষ্ট বলে মনে হলেও, গভীর বিচারে তা দূরীভূত হয়। খণ্ডের মধ্যে বৃহত্তের এবং বৃহত্তের মধ্যে খণ্ডের যে অস্তিত্ব বিদ্যমান, 'চক্রবৎ'-এর খণ্ড চিত্রগুলিও সেই বৃহত্তেরই মূলাংশসম্ভূত এবং সমগ্রতায় পরিপূর্ণ। গল্পের মূল ধারাকে আভাসে-ইঙ্গিতে পরিপুষ্ট করাই এদের উদ্দেশ্য। লেখকের অনবদ্য প্রকাশভঙ্গী ও ভাষার সাবলীল গতি গল্পকে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে গেছে নিরবকাশে। বর্তমান কালধর্মী মানুষের বিক্ষুব্ধ ও চঞ্চল রূপটি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়েছে গ্রন্থখানির মধ্যে।

আধুনিক সমাজ-জীবনের দু'একটি বীভৎস অথচ অতি-বাস্তব ঘটনা গ্রন্থকার উপস্থিত করেছেন বটে এই গ্রন্থের মধ্যে, কিন্তু কোথাও সেগুলি অতিরঞ্জিত দোষে আক্রান্ত হয়নি। লেখকের সংযম ও মার্জিত রসদৃষ্টি সেদিক থেকে প্রশংসার্হ। মানুষের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতার প্রতি লেখকের রয়েছে একটা প্রচ্ছন্ন দরদ। তিনি সকলকেই দেখেছেন, মহাকালের কোলে নিত্যরত কালোমেয়েরই বিচিত্র প্রকাশ-ভঙ্গী হিসাবে। এই নির্বিকার আধ্যাত্মিক চেতনা ও চরিত্রগুলির উপর দরদ, মানসিক অবলোকনের গভীরতা ও রসজ্ঞান 'চক্রবৎ'-কে সার্থক উপন্যাস ক'রে তুলেছে। লেখক যে শক্তিশালী সে সম্বন্ধে মতান্তরের অবকাশ নেই। ৩৪২।৫২

ছোট গল্প

শুভা—শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী, বিশ্বনাথ বুক স্টল, ৮৮ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—দুই টাকা।

গঠন পারিপাট্যে উপন্যাস ব'লে ভুল করার যথেষ্ট কারণ থাকলেও আলোচ্য পুস্তকটি গল্প-সংকলন। ন্যূনাধিক সাতটি গল্প এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হ'য়েছে।

লেখিকা যথেষ্ট খ্যাতনামা। এক সময়ে রচনানৈপুণ্য ও বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে পাঠক সমাজে প্রতিপত্তি ও পশার দুইই ছিলো। অনাড়ম্বর ভাষায় সাবলীল ভঙ্গীতে কাহিনী ব্যক্ত করার ক্ষমতায় লেখিকা অদ্বিতীয়া ছিলেন। বাঙলাদেশের ভাগ্যহীনা মেয়েদের দুঃখ দুর্দশার কাহিনীই প্রায় প্রত্যেকটি গল্পেরই মূল উপজীব্য। 'শুভা' সম্ভবত দারিদ্র্য ও সামাজিক নিষ্পেষণে নিপীড়িতা মেয়েদের প্রতীক। প্রতিটি গল্পের মধ্যেই এমন একটি ভাগ্যহীনা 'শুভা'ই লুকিয়ে আছে।

কাহিনী আর সমস্যা বিগত যুগের, কিন্তু তাতেও আমাদের কোন আপত্তি ছিলো না যদি বলার ভঙ্গীটি এ যুগের হ'তো। গতানুগতিকভাবে দুঃখ দুর্দশার কাহিনী বিবৃত ক'রেই এ যুগের লেখকের দায়িত্ব শেষ হয় না। সেই সমস্যার সমাধান, পথ নির্দেশের প্রচেষ্টা থাকা চাই। ঠিক এই কারণেই গল্পগুলি নিছক 'বিবরণী'তেই পর্যবসিত হ'য়েছে, রসোত্তীর্ণতার দাবী ক'রতে পারে নি। ৩৩৫।৫২

শ্যাম্পেন—সদাশিব বসাক, ঘোরতর পাবলিশিং, ১৮৮ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা—৪। মূল্য—আট আনা।

ডেলি প্যাসেঞ্জার—নিশি মজুমদার, ঘোরতর পাবলিশিং, ১৮৮ আপার সার্কুলার কলিকাতা—৪। মূল্য—আট আনা।

বাঙলা যেহেতু আমাদের মাতৃভাষা, পরিচয় হলেই তো আমরা এক একজন লে আর মুদিখাতা লেখাও লেখা, গল্প লেখা। অতএব গল্প আমরা সবাই পারি, আর অর্থ সামর্থ্য থাকলে বই ছেপে করতে পারি। লোকে না কিনতে না পড়তেও পারে। তাদের খুশি। যত শাস্তি অভাগা সমালোচকদের। সমা যদি করতেই হয় মনোযোগ দিয়ে পড়তেই অপাঠ্য কুপাঠ্য সবকিছু। সবচেয়ে বড় সে সব বই পড়ার পরে আবার সে স কিছু না কিছু লেখা। আলোচ্য গল্পে দুখানিতে এমন কিছুই নেই যার লেখকদের বই লিখতে হলো, তা আবার বার করতে হলো। গল্প লিখছেন অথচ গল্প হয় কিসে হয় না সে সম্বন্ধে কোন নেই। সমসাময়িক কালের কোন এঁরা পড়েছেন বলে মনে হলো না। অর্থ নষ্ট করে বই ছাপবার আগে অন্তত ভেবে দেখতেন। ২৯৮।৫২, ২৯

বিবিধ

বেতার তথ্য—কালাচাঁদ শীল। প্রক শীল রেডিয়ো অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল রিয়ম, ১৩ দুর্গা পিতুরী লেন, কলিকা মূল্যে আট টাকা।

গত কয়েক বছরের মধ্যে বেতারের উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু বেতার সাধারণের তেমন-কিছু ধারণা নাই। লেখক স্কেচের সাহায্যে বেতারের য ইত্যাদির বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। এই দিকে কাজ করেন তাঁহাদের পক্ষে উপকারে লাগিবে। ২২৯।৫২

ভারতীয় অর্থনীতি (২য় খণ্ড): শ্রীহিমাংশু রায়। প্রকাশক—এইচ চ্যাটা কোং লিঃ, ১৯, শ্যামাচরণ দে কলিকাতা—১২। মূল্য—সাড়ে তিন টা

উপরোক্ত পুস্তকে বৈদেশিক বাণিজ্য, আয়, ব্যাঙ্কিং ও ক্রেডিট, কারেন্সী ও রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়, পঞ্চবার্ষিকী পরি কল্পনা পরিকল্পনা, জন-সংখ্যার বিবরণ বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

ভারতীয় অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ গুলি অধ্যাপক রায় সুনিপুণভাবে অ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ভারতের অর্থ ক্ষেত্রে আজ অনেক জায়গায় পরিবর্তন দিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব বণ্ট রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ক্ষমতার সম্প্রসারণ, বাণিজ্যের নীতি, পঞ্চবার্ষিকী পরি ভিত্তিতে কল্যাণ পরিকল্পনা ইত্যাদি লেখক সময়োপযোগী আলোচনা ক পুস্তকটি পাঠকদিগের কৌতূহল পারিবে বলিয়া মনে হয়। প্রাপ্ত পুস্তকটির একটি বৈশিষ্ট্য।

৩।

"কেরানীর জীবন"

মিনার্ভা রঙ্গালয়ে "কেরানীর জীবন", রূপ-দর্শীর "অফিস শেষের পথটুকু" এবং কদিন পূর্বেকার নেহরুজীর ভাষণ—বিভিন্ন দৃশ্যপটে সম্পাদিত এ তিনটি চিত্রের মধ্যে যে একটা সুর-সঙ্গতির আভাস অনুভব করা যায়, এতে হয়ত আশ্চর্য লাগতে পারে। "কেরানীর জীবন" এবং "অফিস শেষের পথটুকু" একই জীবন-নাট্যের পূর্ণ অথবা খণ্ডরূপ। সামাজিকভাবে অবনত যে এক শ্রেণীর মানুষজীব রয়েছে তাদের জীবনের প্রতি দরদ দিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি হয়ে আসছে এবং এ নাট্যে এতদিন ধরে প্রধান ভূমিকা ছিলো সামন্ততন্ত্রের জোয়ালে বাঁধা গাঁয়ের চাষী সম্প্রদায় আর কলের শ্রমিক শ্রেণীর। এই অবনত জনগণের মানবজাতির বিস্তীর্ণ প্রান্তরে আজ এসে ভীড় জমিয়েছে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী। একদিন যারা শুচিবাই তাড়নায় অতি সন্তর্পণে শ্রমিক কৃষকের ছোঁয়াচ এড়িয়ে অভিজাতের [illegible] হয়ে সমাজে একটি ত্রিশঙ্কু ভূমিকা অবলম্বন করে ছিলো, আজ তারা ক্রমে ক্রমে ইচ্ছা অনিচ্ছায় অথচ অব্যাহত গতিতে, যারা [illegible] উৎপীড়িত তাদের ভাগ্যের শরিক হয়ে পড়েছে। রঙ্গালয়ে, সাময়িকপত্রের ছোট [illegible] সমাজসচেতন নাট্যকার ও সাহিত্যিকের [illegible] দৃষ্টিও এদিকে আকৃষ্ট হয়েছে। অফিসের কেরানী, স্কুল কলেজের শিক্ষক, [illegible] উকীল এবং ছোট চাকুরীজীবী [illegible] নির্বিত্ত "মধ্যবিত্ত" সমাজ তাদের অসহায়তা ও লাঞ্ছনার প্রকৃতিটা ভেবে দেখা দরকার। গল্পকার, নাট্যকার, অভিনেতা এবং [illegible] দর্শক সম্প্রদায়—এদের অধিকাংশই এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষিত গল্পকার যখন সর্বহারা চাষী মজুরের আর্তনাদ নিয়ে হা-হুতাশ করেন অথবা শিক্ষিত পাঠক যখন সেই গল্প পড়ে অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠেন, তখনও এ দুজনের সঙ্গে সেইসব অভাজনদের একটা ভেদরেখা থেকে যায়। গল্পকার বা পাঠকের অনুকম্পা সেখানে পরোক্ষ। কিন্তু কেরানী যখন "কেরানীর জীবন" দেখে বা "অফিস শেষের পথটুকু" পড়ে তখন তার অভিজ্ঞতার পরোক্ষতা নিঃশেষে লুপ্ত হয়। [illegible] চুয়ে চুয়ে যে অশ্রুসায়র সে রচনা করে তাতেই সে হাবুডুবু খায়।

কেরানীজীবনের বড়ো বিড়ম্বনা—সদাসচেতন শিক্ষিত মন। মনোবিজ্ঞানেই বলে, যে মন সদা আত্মসচেতন দুঃখের পসরা তারই বেশী। লেখাপড়া শিখেছে, তার অভিমান কিছু কম নেই এবং মার্জিত রুচির হাড়িকাঠে ছোট ছোট স্বার্থবুদ্ধিকে বলি দিতে সে বাধ্য হয়। অথচ অর্থনীতিক জীবন তার সংশয়াকুল এবং তার উপরে মিলেছে অফিসজীবনের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ—শিক্ষিত মনের উপর একটি খড়্গাঘাত। শৈশব থেকে স্কুল কলেজের চৌকাঠ পেরিয়ে বেরিয়ে যে শিক্ষিত মার্জিত মন ও রুচিবোধটি সে গড়ে তুলেছে, জীবিকা-জীবনের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যেও তাকে সে ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু ছেদহীন আর্থিক সঙ্কট এবং জীবিকার দীন পরিবেশে তার [illegible] ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় একদিন। জ্ঞান ও বুদ্ধিকে প্রতি মুহূর্তে জাগ্রত রেখে এই যে আত্মহত্যা, এ অভিশাপের তুলনা নেই।

শুধু ব্যক্তি মানুষেই নয়, সঙ্কটের আবর্ত সে সৃষ্টি করেছে সমাজজীবনেও। মানুষের সামর্থ্য ও প্রবণতার প্রতি লক্ষ্য রেখে তার জীবিকা নির্ধারণ করা সুস্থ সমাজ ব্যবস্থার পরিচয়। এ ব্যবস্থায় মানুষ নিজের জ্ঞানবুদ্ধি ও সামর্থ্য পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে আত্মবিকাশের পথ খুঁজে পায়; সমাজও তার কাছ থেকে যা আশা করে তা পুরোপুরি লাভ করতে পারে। মানুষকে সাধারণত বিচার করা হয় তার জীবিকার রূপ থেকে। সেই জীবিকার পরিবেশকে শ্রীমণ্ডিত করা সমাজ স্বাস্থ্যের লক্ষণ। সামাজিক অপচয়ের এই দিকটার প্রতি লক্ষ্য রেখেই বোধ হয় নেহরুজী সেদিন বলেছেন, "ভারতের সকল তরুণ তরুণীকে আত্মবিকাশের সমান সুযোগদান করতে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।" প্রতিজ্ঞা যদি সময় থাকতে পূরণ হয় তবেই মঙ্গল, নইলে অপচয়ের এই গভীর ক্ষত একদিন সরকারী চিকিৎসার এলাকা ছেড়ে যেতে পারে।

নিবেদক—সুকুমার সেন, ইছাপুর।

"১৩৫৯-এর শারদীয়া ও বাঙলা সাহিত্য"

৬ই অগ্রহায়ণের দেশে শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র মহাশয়ের "১৩৫৯এর শারদীয়া ও বাঙলা-সাহিত্য" আগ্রহের সহিত পাঠ করিলাম। প্রবন্ধ পাঠে আমার এই ধারণাই বদ্ধমূল হইল যে, উক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে যে গুরুদায়িত্ব আছে, তাহা মিত্র মহাশয় কৌশলে এড়াইয়া গিয়াছেন। ইহাতে সাহিত্যামোদী মাত্রেই যে নিরাশ হইবেন, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। উক্ত প্রবন্ধে কোলকাতা হইতে প্রকাশিত পত্রিকার কয়েকটি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। শ্রীযুত মিত্র বলিয়াছেন, "নতুন কোনো পত্রিকা সম্পর্কে দীর্ঘ পরিচয়ের অভিজ্ঞতাও অবান্তর। যে-সব কাগজ বছরে বছরে পাঠকের চোখে পড়েছে এবং মনে জেগেছে সেইগুলিই অথবা সেই ক'খানিই হোল বাঙলা-সাহিত্যের পুজো মরশুমের প্রধান নৈবেদ্য।" তিনি কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক ও সাহিত্যপত্র সম্পর্কেই বলিতে চাহিয়াছেন বা বলিয়াছেন। কিন্তু কোলকাতায় এবং কোলকাতার বাহিরেও অনেক পত্র-পত্রিকাই বাঙলা-সাহিত্যের সমৃদ্ধি কামনায় যে নীরব সাধনায় নিয়োজিত আছে, সে সম্বন্ধে শ্রীযুত মিত্র কোনরূপ আলোচনাই করেন নাই। ফলে প্রবন্ধের শিরোনামার সার্থকতা প্রমাণিত হয় নাই। এই সমস্ত পত্র পত্রিকা ও সাহিত্যিকবৃন্দ বাঙলা সাহিত্যে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিতেছে (সমৃদ্ধি অথবা অবনতি), সে সম্বন্ধেও আলোচনা করা প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। উক্ত পত্র-পত্রিকা সম্পর্কে উপেক্ষা করা বা এড়াইয়া যাওয়া কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নয়। কেন না, এরূপ মনোভাব যে বাঙলা-সাহিত্যে সমৃদ্ধির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিবে, তাহা অনস্বীকার্য।

শ্রীঅমরেন্দ্রলাল দে, কৃষ্ণনগর।

ট্রামে-বাসে

শ্রীযুক্ত রাজাগোপাল আচারি পাকিস্থান ক্রিকেট টিমকে তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছেন। কেননা, মাদ্রাজে বহু আকাঙ্ক্ষিত বৃষ্টি পাকিস্থান টিমই নাকি বহন করিয়া আনিয়াছে।—"আমরা সবিনয়ে কারদার

সাহেবকে অনুরোধ করছি—তিনি যেন কলিকাতায় বৃষ্টিপাতের ব্যবস্থা না করেন। কথায় বলে—যদি বরষে আগনে, রাজা যায় মাগনে—মাসটা অগ্রাণ কিনা"—মন্তব্য করেন খুড়ো।

* * * *

মাদ্রাজে পাকিস্থান টিমের সম্বর্ধনা সভায় রাজাজী তাঁর ভাষণে বলিয়াছেন যে, ক্রিকেট তিনি পছন্দ করেন না, তাঁর ভাললাগে ফুটবল, হকি, পলো প্রভৃতি উত্তেজনাপূর্ণ খেলা।—"কিন্তু ক্রিকেটের সভা রাজাজীর ভাষণ ছাড়া নেহাৎ জেল্লাহীন হয়ে পড়ে"—বলেন শ্যামলাল।

* * * *

এক সংবাদে প্রকাশ পশ্চিমবঙ্গ সরকার মাছ ও অন্যান্য পচনশীল খাদ্যদ্রব্য রক্ষার জন্য ইডেন গার্ডেনে একটি তাপনিয়ন্ত্রণ কুঠী প্রস্তুত করিবেন।—"ইডেন গার্ডেনে খাদ্যদ্রব্যের বাইরেও শুনেছি অনেক পচনশীল দ্রব্য আছে, সে সব সংরক্ষণের ব্যবস্থা হলে আমরা বেঁচে যেতাম"—বলেন বিশু খুড়ো।

কলিকাতা কর্পোরেশন অফিস হইতে দুই লক্ষ উনত্রিশ হাজার টাকার থলি নাকি উধাও হইয়া গিয়াছে।—"এর জন্যে দায়ী ইঁদুর না আরশোলা সে সংবাদ এখনও প্রকাশ করা হয়নি" বলেন এক সহযাত্রী।

* * * *

বিলিয়ার্ড চ্যাম্পিয়ান মার্শাল কলিকলিকাতার সাম্প্রতিক প্রতিযোগিতায় পরাজিত হইয়াছেন। শ্যাম বলিল—"বিশ্বের রাজনৈতিক বিলিয়ার্ড খেলার মার্শালরা অবহিত হউন"!

* * * *

কলিকাতায় অনুষ্ঠিত তানসেন সঙ্গীত সম্মেলনে শুনিলাম ওস্তাদদের মধ্যে রাগারাগির ফলে বেশ গোলমালের সৃষ্টি হইয়াছিল। বিশু খুড়ো বলিলেন—"ওটা

স্বাভাবিক। ভুলে গেলে চলবে না যে ওটা রাগপ্রধান সংগীতের আসর"!!

* * * *

প্রকৃতির খেয়ালে মেয়েদের পুরুষে রূপান্তরিত হওয়া এবং কখনও পুরুষের মেয়েতে রূপান্তরিত হওয়ার সংবাদ আমরা মাঝে মাঝে পাইয়া থাকি। কিন্তু এক সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ নিউ

ইয়র্কের একটি পুরুষ চিকিৎসা সাহায্যে নিজেকে মেয়েতে . . . করিয়াছেন। খুড়ো বলিলেন— দেশে এই চিকিৎসার ব্যবস্থা থাক বাসের অনেক যাত্রীই বোধহয় . . . নিতেন"!!

* * *

সোবিয়েৎ রাশিয়া ভারত হই . . . ছায়াছবি তুলিয়া নিয়া দেখাইতেছেন। জনৈক সদস্য প্র . . . সেই ছবিতে ভারতের বস্তি . . . নোংরামি প্রদর্শিত হইয়াছে কিন . . . শ্রীযুক্ত অনিল চন্দ জানাইয়াছেন কোন এলাকার দারিদ্র্যের ছবি ত . . . বটে, তবে সেই সঙ্গে ভারতের দিকটাও বাদ পড়ে নাই।—"যাক্ . . . হওয়া গেল, লোকসভার ক্লো . . . দিয়েই আমরা টেক্কা মেরে বেরি . . . বলেন আমাদের এক সহযাত্রী।

* * *

প্রসংগত মনে পড়িল—কেন্দ্র নাকি ছায়াছবির ডাইরে ক্যামেরাম্যানদের শিক্ষানবিশির বিদ্যালয় স্থাপন করিতেছেন।—শিক্ষানবিশির জন্যে সংবাদপত্রে বিভাগই যথেষ্ট"—মন্তব্য করে

সার্থকসৃষ্টি "শুভদা"

দুর্বল ব'লে "শুভদা"-কে শরৎচন্দ্র সাধারণ্যে আত্মপ্রকাশ করতে দেননি। তাঁর ইচ্ছে ছিলো, ওকে আরও পুষ্ট করে তবে লোকের সামনে হাজির করবেন। কিন্তু সে অভিপ্রায় শরৎচন্দ্র পূরণ ক'রে যেতে পারেন নি। "শুভদা" অপুষ্ট ও অসম্পূর্ণ রচনাই থেকে গেলো।

শরৎচন্দ্র নিজের হাতে "শুভদা"-কে কি সাজে ভূষিতা করতেন, তার জীবনকে কিভাবে গড়ে তুলতেন, কিসের ওপরে শুভদার জীবন কাহিনীতে সম্পূর্ণতা নিয়ে আসতেন, কে আর তা জানিয়ে দেবে! কিন্তু ছবিতে কাহিনীটিকে যে চেহারায় উপস্থিত করা হয়েছে সেটা শরৎচন্দ্রের অনুমোদন-লাভে বঞ্চিত হ'তো ব'লে মনে হয় না। দেশে একটা প্রাণে সাড়া জাগাবার মতো নাট্য-রসপুষ্ট কাহিনীই ফুটিয়ে তুলেছে এস বি প্রোডাকসন্সের "শুভদা" ছবিখানি। চিত্র-নাট্যে মূল কাহিনীর অনেক কিছুই পরি-বর্তন ও পরিবর্জন করা হ'লেও শরৎচন্দ্রের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীটা এঁরা ধ'রে নিতে পেরেছেন। তবে একটা কথা বলতে হবে—চিত্রনাট্যে যে কাহিনী সাজানো হ'য়েছে ছবির নাম "শুভদা" তার সঙ্গে যেন মানায় কম।

* * *

"শুভদা" নামের অন্তরালে ছবিখানিতে আমাদের দেশের চরম দারিদ্র্যের একটা বুকফাটা বিবরণকে রূপায়িত করা হ'য়েছে। আগে যা ছিলো তাই নয়, দারিদ্র্যের সে চেহারাটা আজও দেখা যায় দেশের অনেকাংশেই। একটি মধ্যবিত্ত ভদ্র পরিবারের সব ক'জনকেই নিয়ে এই কাহিনী। "শুভদা" হচ্ছেন এই পরিবারেরই গৃহিণী। কিন্তু গল্প কেবলমাত্র তাঁকেই নিয়ে নয়—তাঁর স্বামী হারাণ মুখুজ্যে আছেন, দুই কন্যা ললনা ও ছলনা আছে, পুত্র মাধব আছে—এবং সব ক'টি চরিত্রকেই একটা পরিণতিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। শুভদা এতে মুখ্য চরিত্রও নন; বা তাঁর জীবনের দুঃখটাই কাহিনীর প্রধান লক্ষ্য নয়। মা ব'লে তাঁর জীবনের এক দুঃখ; স্বামী ও পিতা ব'লে হারাণের দুঃখ এক; কন্যা হিসেবে ললনা ও ছলনার দুঃখের চেহারা আর এক। এদের সবায়েরই দুঃখের মূল কারণটা অবশ্য একই—দারিদ্র্য।

এ ছাড়া দুঃখী জীবন আরও রয়েছে। যেমন পরহিতৈষী পাগলা সদানন্দের দুঃখ ব্যর্থ প্রণয়ের জন্য—এমনি আরও সব চরিত্র। একটা লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে এতে অনেক রকমেরই চরিত্রের সমাবেশ রয়েছে, কিন্তু "ভিলেন" বলতে একজনও নয়; দরদী চরিত্রই প্রায় সবক'জনই—"ভিলেন" অবশ্য আছে, সে হ'লো দারিদ্র্য-দানব—অতি নির্মম ও হিংস্র চেহারায় দেখা যায় তাকে।

* * *

ছবির আরম্ভ সদানন্দকে নিয়ে এবং তারই গতিপথ ধ'রে শুভদার সংসারটা

সংগীতজগতে সাম্প্রতিক কালের একটি স্মরণীয় ঘটনা—ওস্তাদ আল্লাউদ্দীন খাঁ (সরোদ হস্তে দণ্ডায়মান), পুত্র আলি আকবর খাঁ (বাম হইতে চতুর্থ) ও পৌত্র মহম্মদ আশীষকুমার খাঁর (ডান হইতে প্রথম) প্রথম একত্রে সরোদ বাজান গত তানসেন সংগীত সম্মিলনীতে

উদ্ঘাটিত করা হয়েছে। শুভদার স্বামী হারাণ মুখুজ্যে জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করে; গাঁজা খায়; যা রোজগার করে সব ধরে দিয়ে আসে কাতু বোষ্টমীর পায়ে, এমন কি, সেজন্যে সেরেস্তা থেকে তহবিল তছরূপেও তার বাঁধে না। হারাণ মুখুজ্যে বলে, তিরিশ টাকায় অতো লোকের দিন চালানো যায় না; ঘরে তার রুগ্ন পুত্র মাধবের ডালিম খাবার আবদারটাও সে পূরণ করতে পারে না, এই দুঃখকে সে চাপা দেবার জন্য গাঁজা খায়, বাড়ির অবস্থা চোখে দেখতে পারে না ব'লে কাতু বোষ্টমীর ঘরে প'ড়ে থাকে। বড়ো মেয়ে ললনা বাল-বিধবা। সে-ই কেবল শুভদার হাতধরা। ছোট মেয়ে ছলনা কি-ই বা বোঝে সংসারের। এমনিতেই রোজ হাঁড়ী চড়ে না, কিন্তু সদানন্দের দয়াতেই হোক কিংবা বাসনপত্তর বেচেই হোক যদি বা এক মুঠো ভাতের সংস্থান করা গেলো তো মনোমত রান্না না হ'লে সেই অবস্থায়ও ছলনা ভাতের থালা ছুঁড়ে ফেলে উঠে চলে যায়। হারাণ মুখুজ্যে যেন আরও অন্ধ। ঘটিবাটি বেচা কি সদানন্দের কাছ থেকে পাওয়া দু'এক টাকা দেখলেই মাধবের ওষুধ আনার নাম ক'রে নিয়ে যায় আর গাঁজার ধোঁয়ায় উড়িয়ে দেয়। তারপর খেয়াল হ'লে গিয়ে হাত পাতে কাতুর কাছে। কাতু তাকে দু'কথা শুনিয়ে দেয়। এই কাতুর জন্যেই হারাণ সেরেস্তার তহবিল ভেঙেছে। জমিদারের কাছে ধরা পড়েছে; তার জেলে যাবার কথা কিন্তু সদানন্দ টাকাটা জোগাড় ক'রে শুভদার হাত দিয়ে জমিদারের কোপ থেকে হারাণকে মুক্ত করেছে। হারাণের একটু যেন ঘৃণা ও লজ্জাবোধ ফিরে এলো। সে বের হলো চাকরীর খোঁজে, কিন্তু একবার যে বিশ্বাসভঙ্গের কাজ করেছে কে তাকে জেনেশুনে কাজে নেবে? ভিক্ষার চেষ্টা করলে, কিন্তু তাও সবদিন জোটে না। তারপর একদিন ছোট মেয়ে দুর্মুখী ছলনার তিরস্কারে লজ্জিত হ'য়ে সে গৃহত্যাগী হ'লো। ললনাই সান্ত্বনা দিয়ে মাধবের প্রাণটুকু ধরে রাখার চেষ্টা করতে থাকে, কিন্তু শুকনো মুখের সান্ত্বনায় প্রাণ বাঁচানো যায় না। অন্নের সংস্থান করার জন্য ললনা একদিন নিজের দেহ বিক্রীতেও বেরিয়ে পড়েছিলো, কিন্তু তাকে বাঁচিয়ে দিলে সে যাত্রা কাতু বোষ্টমী—কলকাতায় চলে যাচ্ছিলো সে রোজগারের ধান্দায়, যাবার আগে সে ললনাদের কিছু সাহায্য করে যেতে চায়। ক'দিনই বা চলে ঐটুকু সাহায্যে! সদানন্দও চ'লে গিয়েছে তার পিসীকে নিয়ে তীর্থভ্রমণে। ছলনার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। সদানন্দই সে ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে। ললনা আর পারে না সইতে। মাধবকে শোনায় স্বর্গরাজ্যের গল্প, বলে সেখেনে গিয়ে মাধবকে সে ডেকে নেবে। আর, সত্যিই একদিন ললনা বেরিয়ে পড়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দেয়। মৃত্যু তার হ'লো না, তাকে উদ্ধার করলে বাইজী নিয়ে বজরায় বিহাররত এক জমিদার সুরেন্দ্র। কিন্তু ওদিকে মাধবের মৃত্যু হ'লো। সুরেন্দ্রের কোথায় যেন একটা কিসের অভাব ছিলো যেটা ললনাই পূরণ করে দিতে পারবে ব'লে তার বিশ্বাস হ'লো। বাইজীও বুঝলে সেকথা, তাই সুরেন্দ্রকে ললনারই হাতে সঁপে দিয়ে চলে গেলো সে। সুরেন্দ্র ললনাকে বিয়ে ক'রে বাড়িতে নিয়ে গেলো। ললনার নাম তখন মালতী। মায়ের কাছে সে টাকা পাঠালে ঐ নতুন নামে। শুভদা অবাক হ'লো অজ্ঞাত স্থান থেকে টাকা পেয়ে। সদানন্দকে বললেন, টাকা ফিরিয়ে দিয়ে আসতে। সদানন্দ গিয়ে ললনাকে চিনতে পারলে; সে ফিরে এলো সে কথা জানাতে। হারাণও এতোদিন পর ফিরছে। ললনাও আসছে স্বামীকে নিয়ে মাতৃদর্শনে। এসে পৌঁছলও সকলে, কিন্তু শুভদার তখন শেষ নিঃশ্বাস পড়ছে। যাবার সময় শুধু কন্যা-জামাতাকে আশীর্বাদ করার আর স্বামীর কোলে মাথা রেখে মরার সান্ত্বনাটুকু পেয়ে গেলো সে।

* * *

গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত একটানা করুণরসের প্রবাহ। দারিদ্র্যের করাল, কিন্তু বাস্তব চেহারা চোখের জলে মনকে ভিজিয়ে রেখে দেয় সারাক্ষণ। আর স্বস্তি আনিয়ে দেয় এই দেখিয়ে যে, সদানন্দর মতো পর-হিতৈষী আত্মভোলা লোকও পৃথিবীতে আছে, জমিদার সুরেন্দ্রের মতো সহৃদয় ও প্রশস্তমনা লোকও আছে যে ললনাকে বিয়ে ক'রে ঘরে তুলতে পারে; কাতুর মতো সহানুভূতি দেখাবার মতো নারী আছে। আরও আছে বাইজীর সুমতি; জমিদারের দাক্ষিণ্য। সব জুড়ে প্রাণ ও মনকে উদ্বেলিত ও দরদাসিঞ্চিত ক'রে তোলার মতোই সব চরিত্র ও ঘটনা আছে অসাধারণ নাটকীয় শক্তিসমন্বিত হয়েই।

* * *

কাহিনী ভালো হ'লে, কাহিনীতে জোর কলে ছবির অন্য সব দিকও যে উদ্দীপনা- হয়ে ওঠে "শুভদা"-তে সে যুক্তি ক্ষুণ্ণ। ঘটনার বিন্যাস ও উপস্থাপন এবং নার ভাব অনুযায়ী দৃশ্য রচনায় যে কৌশ ও শিল্পসংযুক্তির পরিচয় পাওয়া র তা খুব সুলভ নয়। পরিচালক নীরেন হিড়ী তাঁর শ্রেষ্ঠ কৃতিত্বের নিদর্শন টিয়ে তুলেছেন এতে।

*　　*　　*

অভিনয়ে কয়েকজনের অনন্যসাধারণ ত্ব এবং বাকী প্রায় সকলেরই প্রাণস্পর্শী মতার প্রকাশে ছবিখানি বিশেষভাবে রণীয় সৃষ্টি ব'লে পরিগণিত হবে। ধনদের মধ্যে পড়েন ছবি বিশ্বাস। পর্দায় পর্যন্ত তাঁর সমস্ত চরিত্রসৃষ্টিই ম্লান য়ে গিয়েছে হারাণ মুখুজ্যের তুলনায়। সহায়, বিমূঢ়; মাঝে মাঝে স্বামী ও পতা হিসাবে কর্তব্যের প্রতি বিহ্বলতার অভিব্যক্তি তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তাতে রাণ মুখুজ্যে বাঙলার পর্দায় একটি রণীয় চরিত্রসৃষ্টি হয়ে থাকবে। নিবারের কাছে চৌর্যবৃত্তির কারণ ব্যক্ত নিজের অসহায়তার জন্য স্ত্রীর কাছে াপ,—সেসব দৃশ্য এখনও ভাসছে ল ক'রে। ললনার ভূমিকার সাবিত্রী উপাধ্যায় পরিপুষ্ট শিল্পচাতুর্যের যে চয় দিয়েছেন নতুন শিল্পী হিসেবে তা উজ্জ্বল কীর্তি হ'য়ে থাকবে। আর মনে বে দীর্ঘকাল বাইজীর নিখুঁত চরিত্র- রূপে মঞ্জু দে'কে। ছোট ভূমিকা হু সেই সময়টুকুতেই রসানুভূতিকে লোড়িত ক'রে দিয়ে যান। পাগলা দের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীকে মরমী র দেখবার দৃষ্টি এনে দিয়েছেন পাহাড়ী ন; তাঁরও এটি শিল্পী-জীবনের টি খ্যাতি পাবার মতো সৃষ্টি। অভিনয়ে য় এনে দিয়েছে রুগ্ন মাধবের ভূমিকায় টোটন। ওকে নিয়ে দৃশ্যগুলো প্রাণকে একেবারে মথিত করে দিয়ে যায়। ভূমিকায় সুনন্দা দেবী শেষের অংশ গেলে একাই নাট্যবিভূতিতে জ্জ্বল করে তুলেছেন। সেদিনের শিখারাণীকেও মনে থাকবে ছলনার য়; এখন অবশ্য ছোট্টটি আর নয় সে। ঠে গাঞ্জিকাসেবকরূপে তুলসী চক্রবর্তী ও প্রমাণ করে দিলেন, হাল্কা রসের দিয়েও ছবিতে প্রাণ সঞ্চার করার তা তাঁর কি অসাধারণ। মোট কথা, এ ছবিতে সকলকে জড়িয়ে অভিনয়ের দিকটা এক দুরারোহ উঁচু ধাপে গিয়ে পৌঁচেছে।

*　　*　　*

সঙ্গীতের দিকে রবীন চট্টোপাধ্যায় সাধারণের চেয়ে অনেক বেশী মনোজ্ঞ শিল্পসম্ভার সংযোজিত করতে সক্ষম হয়েছেন। বিশেষ ক'রে ক'খানি গানের সুর যোজনায়। আত্মঘাতিনী হবার আগে মাধবকে সান্ত্বনা দিয়ে চ'লে আসবার সময় "বিদায় পৃথিবী" গানখানি একটি অনবদ্য সৃষ্টি। ঘটনাক্রমের দিক থেকে গানটি ধর্তাতেই অপ্রয়োজনীয় বলে মনে ধারণা জন্মাতে না জন্মাতেই, গাওয়া সুর ও সাবিত্রীর অভিব্যক্তির জন্যে গানটি ছবি-খানির একটি প্রধান আকর্ষণই হয়ে দাঁড়িয়েছে। গোড়ার দিকের কয়েকটি দৃশ্যের চড়চড়ে আলো দৃষ্টিকে একটু চটিয়ে দেয়, তা বাদ দিলে আলোকচিত্র গ্রহণে নাট্যরস-সম্ভূত উঁচুদরের শিল্পমনের পরিচয় পাওয়া যায়। জায়গায় জায়গায় শব্দের অস্পষ্টতা, সংলাপ বুঝতে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। দৃশ্যপট রচনা ও সংগঠনে নতুন রকমের চেষ্টার পরিচয় রয়েছে।

খেলার মাঠে
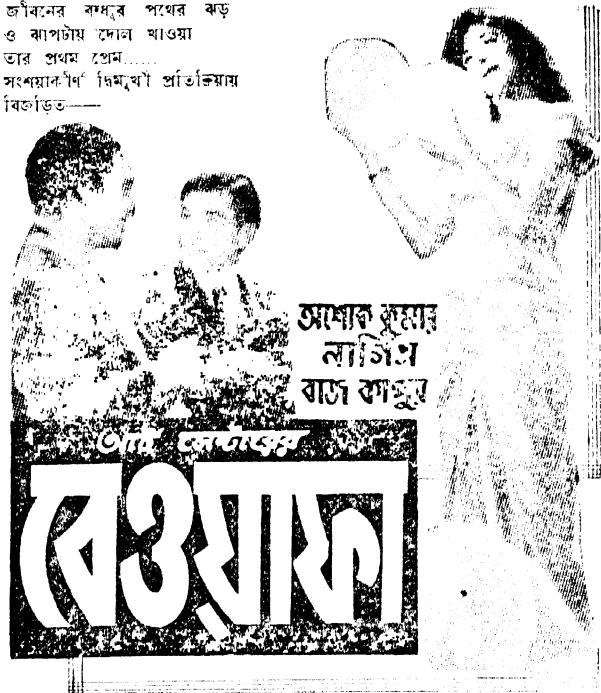
ক্রিকেট

ভারতীয় ক্রিকেট দলের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভ্রমণ ব্যবস্থা সত্য সত্যই ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় রচনা করিয়াছে। এই ভ্রমণ ব্যবস্থার সূচনা হইতে এই পর্যন্ত ক্রিকেট পরিচালকগণের সামঞ্জস্যহীন কার্যকলাপ যেভাবে ক্রিকেট উৎসাহীদের বিভ্রান্ত ও ব্যথিত করিয়াছে, ইতঃপূর্বে ভারতীয় ক্রিকেট দলের কোন বৈদেশিক ভ্রমণের পূর্বে তাহা পরিলক্ষিত হয় নাই। তবে এই নূতন অধ্যায় কেবল ভারতীয় ক্রিকেট পরিচালকদের দুষ্কৃতি, অনাচার, স্বেচ্ছাচারিতা, নির্লজ্জতার বিশদ বিবরণীতে পরিপূর্ণ ইহাই পরম পরিতাপের বিষয়। একদল সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত সমাজের লোক স্বার্থসিদ্ধির অত্যুগ্র উৎসাহে জাতির স্বার্থ, ব্যক্তিবিশেষের খ্যাতি ও প্রতিপত্তির মূলে যে কোন সময় কুঠারাঘাত করিতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করে না, ইহার চরম নিদর্শন ইহাদের কার্যকলাপের মধ্য দিয়া যেভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে, ইতঃপূর্বে কখনও হয় নাই। ইহারা কখন যে কাহাকে মুকুটমণি করিবেন, কখন যে মুকুটমণিকে স্বার্থের যূপকাষ্ঠে বলি প্রদান করিয়া ভূলুণ্ঠিত করিবেন কেহই বলিতে পারে না। ইহাদের স্বার্থের দাস ছাড়া আর কোন নামে অভিহিত করা চলে না। সুতরাং ইহাদের সংস্পর্শে যিনিই আসিবেন, তাঁহাকে কোন না কোন সময় চরম দুঃখ ভোগ করিতে হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য কি? সেইজন্য অমরনাথের উত্থান ও পতন, হাজারের পতন ও উত্থান অবলোকন করিয়া বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। এই সকল লোক যতদিন এইরূপ পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন, ততদিন এই ধরণের কত অধ্যায় যে ভারতীয় ইতিহাসে লিখিত হইবে বলা কঠিন। তবে জনগণের সৃষ্ট স্বাধীন ভারতে এই শ্রেণীর লোক এখনও সম্মানিত আসনে উপবিষ্ট থাকিবেন, ভারত সরকার কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবেন না ইহাই দুঃখের বিষয়।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভ্রমণকারী ভারতীয় দল

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভ্রমণকারী দল কতকগুলি অভিজ্ঞ ও কতকগুলি তরুণ খেলোয়াড় লইয়া মনোনীত করা হইয়াছে; তাহারা সকলেই কৃতী সন্দেহ নাই, কিন্তু ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ন্যায় বিশেষ শক্তিশালী দলের প্রতিনিধিমূলক খেলার সময় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবেন বলিলে খুবই অন্যায় হইবে। বিশেষ করিয়া টেস্ট খেলার ছয়দিনব্যাপী অনুষ্ঠান ও বিশিষ্ট সম্মিলিত দলের পাঁচ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে যে শারীরিক শক্তি ও দৃঢ়তা থাকা প্রয়োজন উহা নির্বাচিত খেলোয়াড়দের মধ্যে কাহারও আছে বলিয়া আমাদের ধারণা নাই। দলের অধিনায়ক বিজয় হাজারেই সম্প্রতি এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন, "উপর্যুপরি দীর্ঘদিন ক্রিকেট খেলায় যোগদান করিয়া আমি ক্লান্ত।" সেই ক্লান্তি ও অবসাদ-গ্রস্ত খেলোয়াড়কে পুনরায় চরম শক্তি পরীক্ষার ক্রীড়াক্ষেত্রে প্রেরণের মধ্যে যত কিছু যুক্তি থাকুক না কেন তাহা কোনরূপেই সমর্থন করা চলে না। অতিরিক্ত শ্রমজনিত খেলায় যোগদানে যে দৈহিক ও মানসিক শক্তি ক্ষয় হইবে তাহা বর্জন করিলেই বা দেশের কি ক্ষতি হইত? ক্রিকেট খেলা এমন একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় খেলা নহে, যাহা না খেলিলে ভারতের জনসাধারণের স্বাস্থ্যোন্নতির পথ রচিত হইবে না। রাশিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি প্রকৃত শক্তিশালী দেশে এই খেলার যে কোনই প্রচলন নাই, ইহা কি কেহই চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন?

নির্বাচিত দল

বিজয় হাজারে (অধিনায়ক), বিনু মানকড় (সহ অধিনায়ক), দাত্তু ফাদকার, পলি উমরিগার, জি এম রামচাঁদ, ভি এন মাঞ্জরেকার, এম এল আপ্তে, এস পি গুপ্তে, পি জি যোশী, পি সেন, পি রায়, ভি কে গাইকোয়াড়, সি ভি গোপীনাথ, গোলাম আমেদ, দীপক সোধন ও কস্তুরীরঙ্গম। ইহাদের মধ্যে দীপক সোধন ও কস্তুরীরঙ্গম কোন টেস্ট খেলায় এই পর্যন্ত যোগদান নাই।

পাকিস্থান দলের শোচনীয় পরাজয় হই[illegible] অব্যাহতি

ভারত ভ্রমণকারী পাকিস্থন ক্রিকেট বাঙ্গালোরে সম্পূর্ণ তরুণ খেলোয়াড় [illegible] গঠিত ভারতীয় সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় [illegible] বিরুদ্ধে খেলিয়া যেরূপ শোচনীয় প[illegible] হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন ভ্রমণের টেস্ট [illegible] ব্যতীত অন্য কোন খেলাতেই পাকিস্থান দ[illegible] এইরূপ শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হইতে[illegible] নাই। তিন দিনব্যাপী এই খেলার শেষ[illegible] আকস্মিক প্রবল বারিপাত খেলা অনুষ্ঠানে[illegible] সৃষ্টি না করিলে পাকিস্থান দলের শে[illegible] পরাজয় হইতে অব্যাহতি পাওয়া অসম্ভব [illegible] ভারতের ধুরন্ধর খেলোয়াড় দ্বারা গঠিত [illegible] খেলায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করায় পাকিস্থান [illegible] দল এতই গর্বিত হইয়াছিলেন যে, এই [illegible] টসে জয়ী হইয়াও বিশ্ববিদ্যালয় দলকে [illegible] ব্যাট করিবার সুযোগদান করেন। [illegible] বিশ্বাস ছিল, তরুণ খেলোয়াড়গণ অতি [illegible] রানের মধ্যেই প্রথম ইনিংস শেষ করিবেন, [illegible] ফলতঃ তাহা হইল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের

খেলোয়াড়গণ প্রথম হইতেই অপূর্ব দৃঢ়তার সহিত খেলিয়া মাত্র ৮ জন আউট হইয়া ৩৪০ রান করিবার পর ডিক্লেয়ার্ড করেন। তরুণ খেলোয়াড় বেনী ৯৯ রান করিয়া ব্যাটিংয়ে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করে। পরে পাকিস্থান দল খেলিয়া সুন্দরম ও ঘোরপদের মারাত্মক বোলিংয়ের জন্য মাত্র ৯২ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করিতে বাধ্য হইলেন। ইহাই পাকিস্থান দলের ভ্রমণের সর্বাপেক্ষা কম রান সংখ্যা। ২৪৮ রান পশ্চাতে পড়িয়া পাকিস্থান দলকে "ফলো অন" করিতে হইল। দ্বিতীয় দিনের শেষে কেহ আউট না হইয়া ১৬ রান করিলেন। তৃতীয় দিনে খেলা বৃষ্টির জন্য অনুষ্ঠিত হইল না। খেলা অমীমাংসিত বলিয়া ঘোষিত হইল। বিশ্ববিদ্যালয় দল পাকিস্থানের আন্তর্জাতিকতায় চরম আঘাত করায় এই দলের কি অধিনায়ক কি ম্যানেজার কেহই কিছু বলিতে সাহসী হইলেন না। তবে মহীশূরের মুখ্যমন্ত্রী এই তরুণ বিশ্ববিদ্যালয় দলের খেলোয়াড়গণের ক্রীড়া-কৌশলের যোগ্য প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "ভারতের বিখ্যাত টেস্ট খেলোয়াড়গণ যে কোন বৈদেশিক দলের সহিত সমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারেন, তাহা এই খেলায় প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে।" মহীশূরের মুখ্যমন্ত্রীর এই বাণী ভারতীয় ক্রিকেট পরিচালকগণ উপলব্ধি করিয়া কার্যক্রম রচনা করিলে আমরা সুখী হইব। তবে এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ না করিয়া পারি না যে, বাঙলার কোন ছাত্র খেলোয়াড় এই গৌরব অর্জনকারী দলে ছিলেন না, ইহা যেন বাঙলার ক্রিকেট খেলোয়াড়গণ বিস্মৃত না হন। অন্য প্রদেশের খেলোয়াড়দের সমকক্ষ হইবার জন্য তাঁহারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হউন ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা। সাজ-পোষাকের যুগ অতিবাহিত হইয়াছে, প্রকৃত ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন না করিলে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভের কোনই আশা নাই।

সম্মিলিত ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দল:—৮ উইঃ ৩৪০ রানে ডিক্লেয়ার্ড (এন তামানে ৩০, চিনভাই ২৫, এম কনট্রাক্টার ৩৯, এইচ দানী ২৫, সি ডি গোপীনাথ ৩৮, আর বি বেনী ৯৯, বিশ্বনাথ ৩৬, আব্রাহাম ২০ রান নট আউট, ইসরার আলী ৯৩ রানে ২টি, খনিচ কুরেশী ৯০ রানে ৪টি উইকেট পান)।

পাকিস্থান:—প্রথম ইনিংস ৯২ রান (ওয়াজির মহম্মদ নট আউট ২৩, হানিফ ২৪, মকসুদ আমেদ ১৩, সুন্দরম ৩১ রানে ৪টি, ঘোরপদে ১৯ রাণে ৬টি উইকেট দখল করেন)।

২য় **ইনিংস** ১৬ রান কেহ আউট না হইয়া।

উড়িষ্যা ক্রিকেট দলের কৃতিত্ব

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় উড়িষ্যা সম্প্রতি যোগদান করিয়াছে। এই রাজ্যের দল গত বৎসর প্রথম খেলাতেই আসামের নিকট শোচনীয় পরাজয় বরণ করেন। **কিন্তু এইবারে তাঁহারা কেবল প্রতিশোধ লইয়াছেন ইহা বলিলে যথেষ্ট হইবে না। ব্যাটিং ও বোলিং সর্ববিষয়ে উড়িষ্যার ক্রিকেট খেলোয়াড়গণ আন্তরিক সাধনায় যে লিপ্ত আছেন তাহার কিছুটা পরিচয় দিয়াছেন। এই দলের এক তরুণ খেলোয়াড় এন পারিজা ব্যাটিংয়ে শতাধিক রান ও বোলিংয়ে আসাম দলের** দ্রুত পতন সূচনা করিয়া চৌকস খেলোয়াড়ের পর্যায়ে উন্নত হইতে যে চলিয়াছেন তাহাও প্রমাণিত করিয়াছেন। আমরা উড়িষ্যার ক্রিকেট খেলোয়াড়গণের এই ক্রমোন্নতি লক্ষ্য করিয়া সকলেই আনন্দিত হইয়াছি।

খেলার ফলাফল:—

উড়িষ্যা প্রথম ইনিংস:—৩৩৩ রান (এন পারিজা ১০৩, বনবাসী পট্টনায়ক ৮৭, রামপ্রকাশ ৭৭, সেনগুপ্ত ৩৫ রানে ২টি, এন করমজী ৩৫ রানে ৪টি ও জে ঘোষ ৬৭ রানে ২টি উইকেট পান)।

আসাম প্রথম ইনিংস:—১ম ইনিংস ৭৪ রান (মেজর সেন ১৩, এন বর্ধন ২৩ রানে ৩টি, এন পারিজা ৬ রানে ৩টি, টি শাস্ত্রী ১৮ রানে ২টি উইকেট পান)।

২য় ইনিংসে ৯০ রান (এস গুরুয়া ৩২, বি পট্টনায়েক ২১ রানে ৫টি, এন পারিজা ১৩ রানে ২টি উইকেট পান)।

হোলকার বনাম রাজপুতানা

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় মধ্যাঞ্চলের খেলায় হোলকার দল দশ উইকেটে রাজপুতানা দলকে পরাজিত করিয়াছেন। হোলকার দলের পক্ষে অভিজ্ঞ খেলোয়াড় সি টি সারভাতে শতাধিক রান করিয়াও নট আউট থাকেন। হোলকার দলের তরুণ খেলোয়াড় খানওয়াড়ের বোলিং বিশেষ কার্যকরী হয়। খেলার ফলাফল—

রাজপুতানা প্রথম ইনিংস:—১৬৮ রান (খানওয়াড়ে ৫০ রানে ৭টি উইকেট পান।)

হোলকার প্রথম ইনিংস:—২৮৫ রান (সারভাতে ১০০ রান নট আউট, সি বি নিম্বলকার ৪০, হোসেন ১৬ রানে ৫টি উইকেট পান।)

রাজপুতানা দ্বিতীয় ইনিংস:—১৪৩ রান (সি কে নাইডু ২ রানে ৫টি ও হীরালাল গাইকোয়াড় ৩ রানে ২টি উইকেট পান।)

হোলকার—দ্বিতীয় ইনিংস ১১ রান কেহ আউট না হইয়া।

মাদ্রাজ ও হায়দরাবাদের খেলার সমস্যা

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় দক্ষিণাঞ্চলের মাদ্রাজ ও হায়দরাবাদ দলের খেলা এক নূতন সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছে। এই সমস্যা বোর্ড কি ভাবে সমাধান করিবেন বলা কঠিন, তবে উভয় দলের অধিনায়ক যেরূপ ক্রীড়াসুলভ মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন, ইতিপূর্বে কখনও দেখা যায় নাই। এই খেলাটি চারিদিনব্যাপী হইবার কথা। প্রথম দিনে খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই দিনে মাদ্রাজ ১৬১ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করে ও হায়দরাবাদ দল খেলা আরম্ভ করিয়া ১ উইকেটে ৮০ রান করে। ইহার পর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দিন অবিরল বারিপাতের জন্য খেলা পরিচালনা করা একেবারেই সম্ভব হয় না। চতুর্থ দিনের শেষে আম্পায়ারদ্বয় রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আইন অনুসারে খেলার মীমাংসা টসে করিবার নির্দেশ দেন। ইহাতে হায়দরাবাদ দলের অধিনায়ক গোলাম আমেদ **স্বীকৃত** হন, কিন্তু মাদ্রাজ দলের অধিনায়ক রঙ্গচারী আপত্তি করেন। তিনি বলেন, ইহা সম্পূর্ণভাবে অবিচার করা হইবে। উভয় দলের চারিদিনের মধ্যে মাত্র একদিন খেলিবার সৌভাগ্য হইয়াছে, অপর **কোনদিনই মাঠে খেলিতেই পারে নাই, সুতরাং** খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হইয়াছে ধরিয়া টসে জয়-পরাজয় নির্ধারণ করা ঠিক যুক্তিসঙ্গত হইবে না। তিনি বলেন, ইহার সিদ্ধান্তের জন্য বোর্ডের নির্দেশ প্রার্থনা করা হউক। ইহাতে হায়দরাবাদের অধিনায়ক গোলাম আমেদ বলেন যে, বোর্ড যাহা স্থির করিবেন তাহই মানিয়া লইবেন। ইহার জন্য ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের নির্দেশের জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কর্মকর্তাগণ কিরূপ কাণ্ডজ্ঞানহীন কর্মী তাহার চরম নিদর্শন সম্প্রতি আমরা পাইয়াছি। এই ক্ষেত্রে কোন বিবেচনা না করিয়াই টসে জয়-পরাজয় নির্ধারণের নির্দেশ দিলে কোনরূপ আশ্চর্যের কিছুই হইবে না। আমরা এই ক্ষেত্রে পুনরায় খেলার অনুষ্ঠানের নির্দেশ দেওয়া যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করি।

ফুটবল

পূর্ণ ক্রিকেট মরসুমের মধ্যে আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা সম্পর্কে পুনরায় আলাপ আলোচনা আরম্ভ হওয়ায় অনেকেই আশ্চর্য হইয়াছেন, কিন্তু আমরা হই নাই। আমরা জানি এই আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য কেবল শীল্ড ফাইনালের অনুষ্ঠান নহে, বৈদেশিক ফুটবল দলের ভারত ভ্রমণ ব্যবস্থা কার্যকরী করা। ফুটবল মাঠের সহিত যাঁহারা বিশেষভাবে পরিচিত, তাঁহারা সকলেই জানেন বাঙলার বিশিষ্ট দলের প্রকৃত শক্তি বলিতে কাহারা—ইহারা বাহিরের আমদানী করা খেলোয়াড়। এই সকল খেলোয়াড়কে আই এফ এ শীল্ডের অজুহাতে যদি পুনরায় কলিকাতায় আমদানী করা যায়, তাহা হইলেই ডিসেম্বর বা জানুয়ারী মাসে যদি বৈদেশিক ফুটবল দলের কলিকাতায় শুভাগমন হয়, তাহা হইলে তাহাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য দল গঠন করা সম্ভব হইবে। তাহারা দলে থাকিলে খেলাও আকর্ষণীয় হইবে ও মাঠেও লোকের ভীড় হইবে। আর্থিক দিক দিয়াও আই এফ এ লাভবান হইবেন। সকলেই ইহারা করিৎকর্মা লোক!

শীল্ড ফাইনাল কি হইবে?

আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল কি অনুষ্ঠিত হইবে এই প্রশ্ন অনেকেই করিয়া থাকেন। আমরা ইহার উত্তরে বলিতে পারি, সম্প্রতি আই এফ এর বেতনভুক সম্পাদক যখন সুদূর বাঙ্গালোরে পর্যন্ত পদার্পণ করিয়াছিলেন, তখন বাঙলার আমদানী খেলোয়াড়গণ যাহাতে শীঘ্রই কলিকাতায় আগমন করেন, তাহার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ না করিয়া তিনি প্রত্যাবর্তন নিশ্চয়ই করেন নাই। ইহার প্রমাণ স্বরূপ রাজস্থান ক্লাবের সম্পাদকের সম্প্রতি আই এফ এর নিকট প্রেরিত পত্র হইতেই পাওয়া গিয়াছে। রাজস্থান ক্লাবের বাহিরের খেলোয়াড়গণকে পাওয়া যাইবে ইহা স্থির নিশ্চিত না হইলে উক্ত সম্পাদক কখনই আই এফ এর নিকট পত্রে লিখিতেন না যে, শীঘ্রই তিনি ক্লাবের কার্যকরী সমিতির আহ্বান করিতেছেন। তাহা ছাড়া **এই বিষয়ে সাহায্য করিবার জনাই যে আই এফ এর সম্পাদক বাঙ্গালোর পর্যন্ত ছুটিয়া ছিলেন? আই এফ এ শীল্ড ফাইন্যাল অনুষ্ঠিত হইবে, বৈদেশিক ফুটবল দলের ভারত ভ্রমণ সময়ে বাঙলার ফুটবল খেলোয়াড়ের অভাব হইবে না, এই বিষয় আমরা নিঃসন্দেহ।**

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

১লা ডিসেম্বর—নয়াদিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতের পরিবহন মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী ঘোষণা করেন, পাঁচটি বৃহৎ বন্দর—বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ, কোচিন ও বিশাখাপত্তনের উন্নয়ন এবং কাণ্ডালায় একটি নূতন বৃহৎ বন্দর নির্মাণের পরিকল্পনা ভারত সরকার অনুমোদন করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, বিশেষজ্ঞ কমিটি অনতিবিলম্বে হুগলী নদীতে বাঁধ নির্মাণের সুপারিশ করিয়াছেন।

উত্তর প্রদেশ সরকার আজ এই মর্মে এক আদেশ জারী করেন যে, প্রত্যেক সরকারী কর্মচারীকে তাঁহার প্রথম নিযুক্তিকালে তাঁহার ও তাঁহার পরিবারবর্গের সকল স্থাবর সম্পত্তির তালিকা পেশ করিতে হইবে।

আগরতলায় ভারতের স্বরাষ্ট্র ও দেশীয় রাজ্য দপ্তরের মন্ত্রী ডাঃ কে এন কাটজু ঘোষণা করেন যে, ত্রিপুরার চীফ কমিশনারের উপদেষ্টাগণের নিয়োগ সম্পর্কে শীঘ্রই এক ঘোষণা প্রকাশিত হইবে।

শ্রী এন সি চাটার্জি আগামী বৎসরের জন্য অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন।

২রা ডিসেম্বর—বোম্বাই সরকার আজ ঘোষণা করেন যে, আগামী ১লা জানুয়ারী হইতে রাজ্যের ৭৪টি ক্ষুদ্র শহরের খাদ্যশস্য রেশনিং ব্যবস্থা সম্পূর্ণ প্রত্যাহৃত হইবে।

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ঘোষণা করেন যে, এবার পশ্চিমবঙ্গের উদ্বৃত্ত জেলাগুলিতে সরকার যে দামে ধান কিনিয়া থাকেন, তাহা অপেক্ষাও কম দরে ধান বিক্রয় হইবে। সরকার বর্তমানে মণপ্রতি ৮৷৷৹ টাকা দরে ধান কিনিয়া থাকেন। খাদ্যমন্ত্রী এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, পশ্চিমবঙ্গে চাউলের দাম আরও কমিবে।

৩রা ডিসেম্বর—কলিকাতা কর্পোরেশনের ট্রেজারী অফিস হইতে কর্পোরেশনের প্রায় ২ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা সমেত একটি থলিয়া রহস্যজনকভাবে উধাও হইয়াছে। ঐ থলিয়ায় নগদ ২৯ হাজার টাকা ও অবশিষ্ট টাকার ক্রশ চেক ছিল।

কাছাড় জেলার ১২টি চা-বাগিচা ১লা ডিসেম্বর হইতে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এ সকল চা-বাগিচায় প্রায় ১৬ হাজার কর্মচারী নিযুক্ত ছিল।

৪ঠা ডিসেম্বর—নয়াদিল্লীতে পুনর্গঠিত রপ্তানি উপদেষ্টা পরিষদের প্রথম বৈঠকে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রী টি টি কৃষ্ণমাচারী বিশেষ জোরের সহিত বলেন যে, দেশের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া বণিক সম্প্রদায় দাবী করিতেছেন—কেবলমাত্র এই কারণে রপ্তানি শুল্ক হ্রাস করা হইবে না।

মধ্যভারত সরকার অদ্য রাজ্যের সকল জায়গীরের দখল লইয়াছেন।

লোকসভায় জম্মু ও কাশ্মীরের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্পর্কিত দুইটি মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপনের অনুমতিদান সম্বন্ধে ১৫ মিনিটকাল তুমুল বাগবিতণ্ডা চলিবার পর ঐ দুইটি প্রস্তাব সহকারী অধ্যক্ষ কর্তৃক বিধিবহির্ভূত বলিয়া ঘোষিত হয়।

মাদ্রাজের সংবাদে প্রকাশ, দক্ষিণ ভারতের পূর্ব সমুদ্রোপকূলে সাম্প্রতিক প্রবল ঝঞ্ঝাবাত্যায় ৭৫জন লোক প্রাণ হারাইয়াছে এবং কয়েক লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

৫ই ডিসেম্বর—লোকসভায় পাকিস্থান হইতে লোকাগমন (নিয়ন্ত্রণ) রহিত বিল সম্পর্কে বিতর্ককালে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি পুনরায় পাকিস্থানের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রয়োগের দাবী জানান। সরকার ও সরকার-বিরোধী উভয় দলই একবাক্যে পাসপোর্ট প্রথার নিন্দা করেন।

অদ্য লোকসভায় ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন বিলটি গৃহীত হয়।

মাদ্রাজে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, গত ৩০শে নবেম্বর তাঞ্জোর জেলার উপর দিয়া যে ঝড় বহিয়া যায়, তাহার ফলে ঐ জেলায় ১৩৪জন নিহত এবং বহু লোক আহত হইয়াছে।

৬ই ডিসেম্বর—পশ্চিমবঙ্গের দমদম 'বান্ধবনগর' কলোনীর দুই শত উদ্বাস্তু পরিবারের উপর যে উচ্ছেদের নোটিশ জারী করা হইয়াছে, ঐ সম্পর্কে আলোচনার জন্য শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী আজ লোকসভায় যে মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করেন, পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন "বিজ্ঞাপন প্রচার" ঐ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য বলিয়া মন্তব্য করেন। ডেপুটি স্পীকার শ্রীঅনন্তশয়নম আয়েঙ্গার ঐরূপ মন্তব্য করার জন্য শ্রীযুত জৈনকে ভর্ৎসনা করেন।

আজ লোকসভায় যখন পাকিস্থান হইতে লোকাগমন (নিয়ন্ত্রণ) রহিত বিলের আলোচনা চলিতেছিল, তখন ভারতের সংখ্যালঘু মন্ত্রী শ্রী সি সি বিশ্বাস বলেন, পাকিস্থান সরকার পূর্ব পাকিস্থান ও ভারতের মধ্যে উদ্বাস্তুগণের গমনাগমন বাধা-মুক্ত রাখার নীতি মানিয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ঐ ব্যাপারে বহু বাধা সৃষ্টি করা হইতেছে। দুই দিনব্যাপী তুমুল বিতণ্ডার পর আজ লোকসভায় উক্ত বিলটি গৃহীত হয়।

৭ই ডিসেম্বর—প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু আজ বরোদায় এক বিপুল জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে দেশবাসীকে তাহাদের সমস্ত শক্তি, উদ্যম ও উৎসাহ দেশের উন্নতি বিধানের জন্য নিয়োগ করিতে এবং সমগ্র বিশ্বে দেশের গৌরব বৃদ্ধি করিতে আহ্বান জানান।

বিদেশী সংবাদ

১লা ডিসেম্বর—অদ্য কেনিয়ায় সামরিক ও পুলিশ বাহিনীর লোকেরা কিকুয়ু জাতীয় লোকদের সংরক্ষিত অঞ্চলে হানা শত শত লোককে গ্রেপ্তার করে।

২রা ডিসেম্বর—ডাঃ ইউসুফ দাদু জে এস মোরোকা প্রমুখ দক্ষিণ আ সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ২০জন নেতার প্র অদ্য কম্যুনিজম সম্প্রসারণের অভিযোগে মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

কোরিয়ার অচল অবস্থা দূর করিবার ভারতের যে প্রস্তাবটি 'দুর্বল' বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছিল, অদ্য রাত্রিতে রাষ্ট্র রাজনৈতিক কমিটিতে তাহা ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়।

গতকল্য রাত্রিতে কম্যুনিস্ট পরি সপ্তদশ সহস্র ভিয়েৎমিন সৈন্য ইন্দো বৃহত্তম ফরাসী দুর্গ নাসামের উপর আক্রমণ চালায়।

৩রা ডিসেম্বর—অদ্য রাষ্ট্রপুঞ্জের পরিষদের পূর্ণ অধিবেশনে কোরিয়া স ভারতের প্রস্তাব ৫৪—৫ ভোটে অনু হইয়াছে। সোভিয়েট পক্ষের ৫টি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে গিয়াছে।

৫ই ডিসেম্বর—তিউনিসের সংবাদে দক্ষিণ তিউনিসিয়ায় গাফসার নিকট সৈন্যদের সহিত সশস্ত্র তিউনিসি সংঘর্ষ হয়। গতকল্য ট্রেড ইউনিয়ন হাসেদ নিহত হওয়ার পর তিউনিস পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কার্ফু জারী করা হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নব-নির্বাচিত প্রে মিঃ আইসেনহাওয়ারের কোরিয়া সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হ

৫ই ডিসেম্বর—দক্ষিণ আফ্রিকায় দের প্রতি আচরণ সম্পর্কে দক্ষিণ ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে আপোষ আ ব্যবস্থা করিবার জন্য অদ্য রাষ্ট্রপুঞ্জের পরিষদ উক্ত তিনটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি লইয়া একটি শুভেচ্ছা মিশন গঠনের ৪২-১ ভোটে অনুমোদন করিয়াছেন।

অদ্য নিরাপত্তা পরিষদে মার্কিন প্রতিনিধি কাশ্মীর বিরোধের মীমাংসা ভারত ও পাকিস্থানের নিকট আবেদন ঘোষণা করেন যে, বিষয়টির মীমাংসায় করিলে সকলের পক্ষেই "গুরুতর বিপদ দিবে।

৬ই ডিসেম্বর—মাদ্রিদ হইতে কিউবার কিউবান এয়ার লাইনসের একটি বিমান অবস্থায় ৩৩ জন যাত্রী ও ৮ জন বৈমা সমুদ্র গর্ভে পড়িয়া ডুবিয়া যায়। উদ্ধ জাহাজে নিমজ্জিতদের মধ্যে ৪ জনকে করা হয়।

৭ই ডিসেম্বর—চিলির সান্টিয়াগোতে র্জাতিক সাংবাদিক সম্মেলনে সংবাদপত্র, ও টেলিভিসানে মতামত প্রকাশের স্বা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য বার্তাজীবিগণের প্র লইয়া একটি স্থায়ী আন্তর্জাতিক গঠনের সুপারিশ করা হয়।

ভারতীয় মুদ্রা ঃ প্রতি সংখ্যা—৷৵৹ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষাণ্মাসিক—১০৲
পাকিস্থানের মুদ্রা ঃ প্রতি সংখ্যা (পাক্) ৷৵৹ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষাণ্মাসিক—১০৲ (পাক্)
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র

রাধাবিনোদ মার্কা
বিশুদ্ধ সরিষার তৈল
পুষ্টিকর ও আহার্য্যকে উপাদেয় করে
সর্ব্বমঙ্গলা অয়েল মিল
৭নং হালসি বাগান রোড, কলিকাতা

২০শ বর্ষ
৮ম সংখ্যা

দেশ

শনিবার
৫ই পৌষ, ১৩৫৯

DESH Saturday, 20th December, 19[illegible]

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

সাময়িক প্রসঙ্গ

কলিকাতায় রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ

আগামী সপ্তাহে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ কলিকাতায় আগমন করিতেছেন। রাষ্ট্রপতি হিসাবে তাঁহার পশ্চিমবঙ্গে আগমন এই প্রথম। আমরা এতদুপলক্ষে ভারতের রাষ্ট্রপতিকে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। কয়েকদিনের জন্য আমরা তাঁহাকে নিজেদের মধ্যে পাইব, আমাদের অন্তরের কথা তাঁহাদিগকে জানাইতে ও বুঝাইতে পারিব, ইহা আমাদের পক্ষে বড়ই আনন্দের বিষয়। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদের জন্মভূমি বিহার হইলেও বাঙলা দেশের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক নূতন নয়। কারণ, পশ্চিমবঙ্গেই তাঁহার কর্মজীবনের সূত্রপাত হয় এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী এই কলিকাতা নগরীতে এখানকার মনীষী সন্তানগণের চরণমূলে বসিয়াই তিনি শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদেরই জীবনাদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। সুতরাং শুধু রাষ্ট্রপতি হিসাবেই নয়, পরন্তু অন্যভাবেও তিনি আমাদের একান্তই আপনার জন। পশ্চিমবঙ্গের ব্যথা ও বেদনাকে তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করিবেন এবং তৎপ্রতীকারে তাঁহার আন্তরিক আগ্রহ জাগিবে, ইহা স্বাভাবিক। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ যখন বাঙলাদেশে ছিলেন, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার চেতনা তখন বাঙালী জনজীবনে বিকাশোন্মুখ অবস্থায় ছিল। প্রভাত-বায়ুর সংস্পর্শে দুই একটি বিহগকণ্ঠের কাকলী তখন ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে। পাখীর ডাকে কেহ কেহ নয়ন মেলিয়া চাহিতেছে এবং নবোদিত অরুণের বন্দনায় ব্যাকুল হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ ইঁহাদের সঙ্গে যোগ দেন। বাঙলার সেই জাতীয়তাবাদ উত্তরোত্তর দীপ্ত হইয়া সমস্ত ভারত ব্যাপ্ত হয় এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামে আত্মদানের দুর্জয় সংকল্প উদ্বুদ্ধ করে। বাঙলার রক্তে মাতৃপূজার বেদীমূলে সিক্ত হয়। এখানে প্রজ্বলিত সেই যজ্ঞানল-শিখা পরিশেষে ঐতিহাসিক বিবর্তনক্রমে রাজনীতিক নানা ধারা ধরিয়া ভারতের আকাশে বাতাসে উত্তপ্ত আবর্ত সৃষ্টি করে এবং তাহার ফলে বহুদিনের বৈদেশিক প্রভুত্বের গ্লানি ভস্মীভূত হইয়া যায়। রাষ্ট্রপতি স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাঙলার অন্তরের আগুনে এই আবর্ত-গতি লক্ষ্য করিয়াছেন, বীর্যময় সেই ঐতিহ্য তাঁহার অবিদিত নয়; প্রত্যুত মাতৃসাধনার মন্ত্রবীজ তিনি এখান হইতেই লাভ করেন; এজন্য বাঙালীর সঙ্গে নিজত্ব-বোধ তাঁহার নিবিড়। দুঃখের বিষয় বাঙলার সেই গৌরবময় স্মৃতি বর্তমানে দুর্দৈবের প্রভাবে বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। ভাগ্যচক্রের বিড়ম্বনায় আমাদের জাতীয় জীবন আজ অভিভূত; বাঙালীর সমাজ-সংসার বিপর্যস্ত; তাহার সংস্কৃতি নানাভাবে বিপন্ন। বাঙলার অগ্নিময় জাতীয়তাবাদের আদর্শ বর্তমানে পরিম্লান হইয়া পড়িয়াছে। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদের উপস্থিতিতে বাঙলার গৌরবময় স্মৃতি পুনরুদ্দীপ্ত হইয়া উঠুক। তিনি নূতন আশার বাণী শুনাইয়া বাঙালীর অন্তরের অবসাদ দূর করুন এবং আত্মীয়তার স্পর্শে বাঙলার প্রাণশক্তিকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলুন, এই আশা অন্তরে লইয়া আমরা পুনশ্চ তাঁহাকে অভিবাদন করিতেছি।

পশ্চিমবঙ্গের প্রাণধারার সঞ্জীবন

ভারত সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হইতে ফারাক্কা বাঁধের পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হওয়াতে পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র গভীর নৈরাশ্যের সঞ্চার হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিদেশ হইতে ফিরিয়া এ সম্বন্ধে আমাদিগকে যে আশ্বাস দিয়াছিলেন, তাহা যে এমনভাবে উপেক্ষিত হইবে, আমরা ইহা কল্পনাও করিতে পারি নাই। ভারত সরকারকে তিনি অবশ্যই ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করাইতে চেষ্টার ত্রুটি কিছু রাখেন নাই। পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভাতেও সর্বসম্মতিমে এই পরিকল্পনা গৃহীত হয়, অধিকন্তু ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত বিশেষজ্ঞগণ এই বাঁধটি নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা একান্তভাবেই অভিব্যক্ত করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা এই বাঁধ নির্মাণের জন্য সুপারিশও করিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যের দোষেই কার্যত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হইতে ফারাক্কার বাঁধ পরিত্যক্ত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ভাগীরথীর জলধারার উপর সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের জীবনমরণ নির্ভর করে। ভাগীরথী পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে কেবল নদীবিশেষই নয়, পরন্তু ইহা পশ্চিমবঙ্গের প্রাণধারা বলা যায়। বস্তুত যেভাবে ভাগীরথীর জলধারা শুকাইয়া যাইতেছে, তাহাতে পশ্চিমবঙ্গ ধ্বংসের মুখেই যাইতে বসিয়াছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, এই নদীর পুনরুদ্ধারের প্রশ্ন পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে যেরূপ প্রয়োজন, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্যান্য রাজ্যের প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় কোনটিই সেরূপ গুরুতর নয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখপাত্রগণ এ সম্বন্ধে এখনও হতাশ হন নাই। তাঁহারা এ বিষয়ে ভারত সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছেন বলিয়া আমরা শুনিতেছি। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টার ফল এ পর্যন্ত যাহা হইয়াছে, তাহাতে তাঁহারা এ সম্পর্কে কতদূর কি করিয়া উঠিতে পারিবেন, ইহাই ভাবিবার বিষয়। কারণ পঞ্চবার্ষিকী পরি-

কল্পনা হইতে নেহাৎ ভুলের বশে পশ্চিমবঙ্গের এই গুরুত্বপূর্ণ দাবীটি যে স্থান পায় নাই, এমন মনে করিবার কোন কারণই দেখা যায় না। পরন্তু বুঝিয়া-সুঝিয়া এবং বিচার-বিবেচনা করিয়াই কোন বিশেষ কারণে প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইয়াছে, ইহাই মনে হয়। সে কারণগুলি কি হইতে পারে, অনেকের মনেই এ প্রশ্নও সঙ্গে সঙ্গে জাগিতেছে। কেহ কেহ এমন ইঙ্গিতও করিতেছেন যে, পাকিস্থানের কর্তৃপক্ষের আপত্তির জন্যই এই প্রস্তাবে হাত দেওয়া হয় নাই। তাঁহাদের নাকি আশঙ্কা এই যে, ফারাক্কায় ঐরূপ বাঁধ তুলিলে পদ্মা নদী দিয়া গঙ্গায় জলধারার অবাধ প্রবাহ ব্যাহত হইবে। যদি সত্যই পাকিস্থান কর্তৃপক্ষ এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন, তবে আন্তর্জাতিক বিধি-বিধানের দিক হইতে তাঁহাদের সেই দাবী কতটা যুক্তিসঙ্গত, সে সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার-বিবেচনা করা কর্তব্য। মোটের উপর, বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা চূড়ান্তভাবে যাহাতে পরিত্যক্ত না হয়, সেজন্য পশ্চিমবঙ্গের যাঁহারা প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তি, তাঁহাদের সঙ্কল্পশীলতার সঙ্গে চেষ্টায় প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক। বস্তুত ভাগীরথীর জলধারা যদি পশ্চিমবঙ্গে বহতা রাখিবার ব্যবস্থা না করা যায়, তবে শুধু যে কলিকাতা শহরই ধ্বংস হইবে, এমন নয়; পরন্তু সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ উৎসন্ন হইয়া যাইবে।

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন

স্বতন্ত্র অন্ধ্র প্রদেশ গঠনের দাবীতে অনশনব্রত অবলম্বন করিয়া শ্রীপাত্তি শ্রীরামুলু ৫৮তম দিবসে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। বড়ই মর্মন্তুদ এই ব্যাপার। বস্তুত অন্ধ্র-নেতা শ্রীরামুলুর দাবী অযৌক্তিক ছিল না, পক্ষান্তরে কংগ্রেস কর্তৃক ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের নীতি বহু পূর্বেই স্বীকৃত হয়; কিন্তু তদনুযায়ী কাজ হয় নাই। এই আক্ষেপই আজ দেশবাসীর মনে জাগিবে। অন্ধ্র প্রদেশ গঠন সম্বন্ধে অতঃপর ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল এতদিনে একটা ধরা-বাঁধা কথার মধ্যে গিয়াছেন দেখা যাইতেছে। সম্প্রতি তিনি ভারতীয় রাষ্ট্র-সংসদে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, অন্ধ্র প্রদেশবাসীরা যদি মাদ্রাজ শহরের দাবী পরিত্যাগ করিতে পারেন, তবে ভারত সরকার অবিলম্বে ভাষার ভিত্তিতে অন্ধ্র প্রদেশ গঠনের জন্য প্রবৃত্ত হইতে প্রস্তুত আছেন। এক্ষেত্রে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের জন্য অন্তত পক্ষে ভারতের প্রধান মন্ত্রীর আন্তরিকতার পরিচয় আমরা পাইয়াছি। কিন্তু এতদিন তাঁহার এতৎসম্পর্কিত কোন উক্তি বা বিবৃতির ভিতরই সে পরিচয় পাওয়া যায় নাই। পক্ষান্তরে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের নীতি কংগ্রেস কর্তৃক স্বীকৃত হইলেও কংগ্রেস-সভাপতির এ বিষয়ে অনাস্থার ভাব সব সময় দেখা গিয়াছে। তিনি সোজাসুজি ঐ নীতিকে অস্বীকার করেন নাই ইহা ঠিক; কিন্তু প্রদেশ গঠন সম্পর্কে তিনি যে সর্ত দিয়াছেন তাহা এতই অবাস্তব যে, তাহা পূর্ণ করিতে গেলে কোনরকমেই ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন করা বস্তুত সম্ভব হইতে পারে না। বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে মতের মিল আগে হোক্, তবে প্রদেশ গঠনের সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাইবে, তাঁহার মুখে শুনিয়াছি এই একই কথা। কিন্তু এই মতের মিলের অর্থ কি? বস্তুত এই ধরণের প্রশ্ন সম্বন্ধে মতভেদ কিছু না কিছু থাকিবেই। উভয় বঙ্গের প্রত্যেকটি লোকের মধ্যে মতের মিল কোনদিনই হইতে পারে না। এরূপ অবস্থায় সম্পূর্ণ মতের মিল দাবী করার অর্থ প্রস্তাবটি কার্যতঃ চাপা দেওয়াতেই গিয়া দাঁড়ায়। ভারতীয় সংসদের বিগত অধিবেশনে পণ্ডিতজী খোলাখুলিভাবেই এই কথা জানান যে, বর্তমানে ভারত সরকার ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের দাবী সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহাদের সম্মুখে আরও গুরুতর সমস্যা সব রহিয়াছে। স্বরাষ্ট্রসচিব ডাঃ কাটজু কথাটা আরও ভাঙ্গিয়া বলেন। তাঁহার অভিমত এই যে, ঐ প্রশ্ন সম্বন্ধে বিবেচনা করা ভারতের নিরাপত্তা এবং রাষ্ট্রীয় ভাষার সম্প্রসারণের অনুকূল নহে, সুতরাং এখন ইহার আলোচনাকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত হইবে না। বস্তুতঃ এ সব যুক্তি যে একান্তই বিচারসহ নয়, এ কথা আমরা বহুবার বলিয়াছি। পক্ষান্তরে আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস এই যে, ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশগুলি যদি সুগঠিত হয়, তবে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে সংহতিই বৃদ্ধি পাইবে এবং প্রদেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধের অবসানই ঘটিবে। সুতরাং প্রশ্নটিকে চাপা না দিয়া তাহা সুমীমাংসার জন্যই ভারত সরকারের প্রবৃ[illegible] হওয়া প্রয়োজন। অন্ধ্র প্রদেশ গঠন সম্বন্ধে ভারতের প্রধান মন্ত্রীর উক্তিতে এই হিসা[illegible] আশার আভাষ পাওয়া গিয়াছে। আমর[illegible] আশা করি, পশ্চিমবঙ্গের দাবী সম্বন্ধে তাঁহার দৃষ্টি এখন আকৃষ্ট হইবে। প্রকৃত পক্ষে অন্ধ্র প্রদেশ গঠনের প্রশ্নটির চে[illegible] পশ্চিমবঙ্গের দাবী অনেক সহজ এব[illegible] সরল। নূতন রকমে একটা গোটা প্রদে[illegible] গঠন করিবার প্রশ্ন এখানে নয়। বঙ্গভাষ[illegible] ভাষী যে সব অঞ্চল, এতদিন বাঙলার অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদে[illegible] কূটনীতির ফলে সেগুলি বিহারের অন্তর্ভু[illegible] হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সেগুলি নিজের রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহিতেছে।। এই দাব[illegible] প্রতিপালিত হইলে সমগ্রভাবে ভারতে স্বার্থই সংরক্ষিত হইবে। উদ্বাস্তুদে[illegible] পুনর্বাসনের গুরুতর সমস্যার সমাধা[illegible] সেইভাবে অনেকটা সহজ হইয়া আসিবে প্রাদেশিকতার সংস্কার বুদ্ধিকে অন্তর সৃষ্টি করিতে দেওয়া উচিত নয় এবং ভার[illegible] সরকারের এই প্রশ্নটির সমাধানের [illegible] অবিলম্বে আগাইয়া আসা কর্তব্য।

ইংলণ্ডেশ্বরীর অভিষেকে ভারত

ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের অভিষে[illegible] উপলক্ষে লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া ভারতে[illegible] প্রধান মন্ত্রী রাজানুগত্যের শপথ গ্র[illegible] করিবেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাইকমিশ[illegible] পরিচালিত একখানি জার্মান পত্রিকায় এ[illegible] রূপ একটি সংবাদ প্রকাশিত হ[illegible] ভারতেরও কোন কোন সংবাদপত্রে তা[illegible] প্রচারিত হইয়াছিল। এই সম্বন্ধে বিরো[illegible] দল ভারতীয় লোকসভায় একটি মুলতু[illegible] প্রস্তাব উপস্থিত করেন। ভারতের প্রধ[illegible] মন্ত্রী বিরোধীদলের এই কাজে অত্য[illegible] উত্তেজিত হন এবং তিনি তাঁহাদিগ[illegible] সমঝাইয়া দেন যে, ভারতীয় শাসনত[illegible] অনুসারে ইংলণ্ডেশ্বরীর আনুগত্য স্বীক[illegible] করা ভারতের পক্ষে যে সম্ভব নয়, বিরোধ[illegible] দলের এ জ্ঞানটুকু থাকা উচিত ছি[illegible] পণ্ডিত নেহরুর যুক্তি অবশ্য স্বীকা[illegible] কিন্তু জার্মান পত্রিকায় এইরূপ একটি ভ্রা[illegible] সংবাদ অথবা সংবাদের ভুল অনুবাদ প্রকাশ হওয়ার পর ভারত সরকারের [illegible] হইতে তাহার প্রতিবাদ করা উ[illegible] ছিল; ভারতের হাইকমিশনার এক[illegible]

সে দেশে তো রহিয়াছেন। পরবর্তী সংবাদে দেখা যাইতেছে, রাণী এলিজাবেথের রাজ্যাভিষেকের সময় ভারত তাঁহাকে কমনওয়েলথের প্রধানরূপে স্বীকার করিয়া লইবে। পাকিস্থান কিন্তু ভিন্ন পথ ধরিয়াছে। পাকিস্থান সরকার তাঁহাকে গ্রেটব্রিটেন এবং তদধীনস্থ অন্যান্য রাজ্যের রাণী বলিয়া অভিহিত করিবে। দুইয়ের পার্থক্য সুস্পষ্ট। কমনওয়েলথের প্রধান-স্বরূপে রাণী এলিজাবেথকে ভারতের পক্ষ হইতে স্বীকার করিয়া লওয়ার মধ্যে ভারতের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্কের ভাবটি কি বাদনিক আকারে অভিব্যক্ত হইবে, আমরা জানি না। তবে ইংলণ্ডের রাজার মৃত্যুতে রাষ্ট্রীয় শোক-পালন, জাতীয় পতাকা অর্ধনমিতকরণ, ছুটি এবং অশৌচপালন ভারত সরকার এসব ব্যবস্থা দিয়াছেন, আমরা দেখিয়াছি। স্বাধীন সাধারণতন্ত্র হিসাবে ভারতের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা ইহাতে নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পায় না। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ভারতের কোন জাতীয় অনুষ্ঠানের সম্বন্ধে এই ধরণের ব্যবস্থা স্বীকার করিয়া থাকেন কি? এরূপ অবস্থায় বিরোধী পক্ষ হইতে মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য ভারতের প্রধান মন্ত্রীর ধৈর্যচ্যুতি ঘটিবার কারণ আমরা দেখি না। সংবাদটি যে অমূলক, এই কথা প্রকাশ করিয়া যে সংবাদপত্রে ঐরূপ ভ্রান্ত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে কৈফিয়ৎ তলব করিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য প্রধান মন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিলেই গোল মিটিয়া যাইত। বাস্তবিকপক্ষে বিরোধীপক্ষ মুলতুবী প্রস্তাবটি উপস্থিত করিয়া নিজেদের দেশের স্বাতন্ত্র্য মর্যাদার প্রতি তাঁহাদের সজাগ কর্তব্যবুদ্ধিরই পরিচয় দিয়াছেন। ভারতের প্রধান মন্ত্রী ইহাকে নিজের উপর টানিয়া না লইলেই ভাল হইত। ভারতের রাষ্ট্র-মর্যাদার বিরোধী অসঙ্গত সংবাদ রটাইয়া অপর দেশের সংবাদপত্র যে অপরাধ করিয়াছে, তাহার দায়িত্ব বিরোধীপক্ষের উপর চাপাইবার সত্যই কোন হেতু দেখা যায় না। ভারতের আন্তর্জাতিক মর্যাদার দিক হইতে অপরাধটি অবশ্যই সামান্য নহে এবং কমনওয়েলথের মহিমাতেও দেশবাসীরা মুগ্ধ নহে।

কংগ্রেস-সভাপতি

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু দুই বৎসরের জন্য পুনরায় কংগ্রেস-সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছেন। এই পদ তিনি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, এই কথাই বলা যায়। কি অবস্থার মধ্যে তাঁহাকে বর্তমানে কংগ্রেস-সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে হইয়াছে, কংগ্রেসের অর্থসচিব শ্রীযুত বলবন্ত মেহতার নিকট পণ্ডিতজীর লিখিত পত্রেই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। এই পদ গ্রহণে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া পণ্ডিত নেহরু তাঁহাকে জানান, ভবিতব্য এবং অবস্থার চাপ তাঁহাকে বন্দীর অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছে। তিনি নিষ্কৃতি লাভের কোন পথ দেখিতেছেন না। অদৃষ্টের খেলা সত্যই জটিল ও কুটিল এবং সে গ্রন্থি উন্মোচন করিবার মত ক্ষমতা সাধারণ লোকের নাই। আমরা সাধারণত ইহা বুঝিতে পারিতেছি যে, প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেস বর্তমানে এমন অবস্থার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে যে, পণ্ডিত জওহরলালের ব্যক্তিত্বের আওতায় কোনরকমে থাকা ছাড়া তাহার পক্ষে অন্য উপায় নাই। বস্তুত দ্বিতীয় কোন সভাপতির পক্ষে এই প্রতিষ্ঠানকে বর্তমান সংকট হইতে ত্রাণ করা সম্ভব নহে। শুধু পণ্ডিত নেহরুই এইভাবে কংগ্রেসের সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন এমন নহে, কংগ্রেসীগণও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পণ্ডিত নেহরুকেই সভাপতি নির্বাচন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহারা জানেন, ইহা না হইলেই অনর্থ ঘটিবে। কংগ্রেসের প্রয়োজন এখনও শেষ হয় নাই, পণ্ডিত নেহরুর এই উক্তির যাথার্থ্য আমরাও স্বীকার করি। স্বাধীন ভারতের গণতান্ত্রিক অগ্রগতির জন্য কংগ্রেসের বিশেষ দায়িত্ব রহিয়াছে, ইহাও স্বীকার্য; কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও স্বীকার্য যে, কংগ্রেস আজ যে অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহাতে পূর্বোক্ত প্রয়োজন সিদ্ধ ও দায়িত্ব প্রতিপালন করা তো দূরের কথা, কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠানগত অস্তিত্ব সম্বন্ধেই আশংকার কারণ দেখা দিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিত্বের যত বড়াই হোক, আদর্শ যদি সজীব না থাকে, তবে কোন প্রতিষ্ঠানকেই বাঁচাইয়া রাখা যায় না। কংগ্রেসের সেই আদর্শের কতটা পতন ঘটিয়াছে, সাম্প্রতিক নির্বাচনেই আমরা তাহার পরিচয় পাইয়াছি। বিহারের নির্বাচন এজন্য বাতিল করিয়া দিতে হইয়াছে। কিন্তু অবস্থাটা শুধু বিহারেরই বিশেষভাবে নয়; সব প্রদেশেই ঐ একই অবস্থা। পদ, মান এবং প্রতিষ্ঠার জন্য কাংলামি এবং কাড়াকাড়ি। ইহার ফলে গান্ধীজীর প্রদর্শিত গঠনমূলক কর্মসূচী অনুসরণ করিবার ভারটা স্বাধীনতা লাভের পর হইতে অন্যের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং নেতৃত্বের মর্যাদা বিভিন্ন আইন-সভায় বক্তৃতার মধ্যেই কার্যত গিয়া দাঁড়াইয়াছে। নেতারা আইনসভায় জাঁকিয়া বসিয়া উপদেশই দিতে চান, অপরকে কর্তব্য নির্দেশ করেন; কিন্তু নিজেরা পদ, মান প্রতিষ্ঠানের ঘাটিগুলিই জুড়িয়া থাকিবেন। আদর্শের হিসাবে তাঁহাদের এমন ফাঁকিবাজীই আরম্ভ হইয়াছে। কংগ্রেসের ন্যায় একটি ব্যাপক প্রতিষ্ঠানকে এই ধরণের দুর্নীতি, দলাদলি এবং আদর্শচ্যুতি হইতে মুক্ত করিতে হইলে কংগ্রেস-সভাপতিকে পদে পদে ব্যক্তিগত ক্ষমতার প্রয়োগ করিতে হইবে এবং তাহার ফলে কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠানের কাজে ডিক্টেটরসীপের প্রভাব আসিয়া পড়িতে বাধ্য। কোন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই এমন অবস্থা কল্যাণকর নয়। ইহার ফলে বিভিন্ন আকারে উপদলসমূহ গড়িয়া উঠিবার সুযোগ পাইবে। প্রকৃতপক্ষে পণ্ডিত নেহরু যদি সমগ্রভাবে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নৈতিক আদর্শ পুনরায় উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিতে পারেন, তবেই ভবিষ্যতের সম্বন্ধে কিছু আশা দেখা যায়। কিন্তু তিনি শুধু কংগ্রেস-সভাপতিই নহেন, পরন্তু তিনি ভারতের প্রধান মন্ত্রী এবং সেই সঙ্গে পররাষ্ট্রসচিব। তাঁহার এই শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব-সমস্যা আরও জটিল করিয়া তুলিতেছে এবং তাঁহার আনুগত্যের আড়ালে কংগ্রেসের আদর্শের অপহ্নব ঘটিবার আশঙ্কার কারণ সৃষ্টি করিতেছে। পণ্ডিত জওহরলাল এই আশংকাকে বলিষ্ঠ আদর্শনিষ্ঠার প্রভাবে কতটা প্রতিহত করিয়া কংগ্রেসকে পূর্ব-গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইবেন, ভবিষ্যতের উপরই তাহা নির্ভর করিতেছে।

অমর্ত্য-গান

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

সাধারণ, তুমি সাধারণ, তাই
অসাধারণের গানে
উতলা হয়োনা হয়োনা, তোমার
যা কিছু স্বপ্ন সীমা টানো তার,
তুলে দাও খিল হৃদয়ে, নিখিল
বসুধার সন্ধানে
যেয়োনা, তোমার নেই অধিকার
দুর্লভ তার গানে।

সাধারণ, তুমি সাধারণ, তাই
ছোটো আশা ভালোবাসা—
তা-ই দিয়ে ছোটো হৃদয় ভরাও,
তার বেশি যদি কিছু পেতে চাও
পাবেনা পাবেনা, যাকে আজো চেনা
হলোনা, সর্বনাশা
সেই মায়াবীর গান ভুলে যাও,
ভোলো তার ভালোবাসা।

সাধারণ, তুমি সাধারণ, তবু
অসাধারণের গানে
ভুলেছ; পুড়েছে ছোটো ছোটো আশা
পুড়েছে তোমার ছোটো ভালোবাসা,
ছোটো হাসি আর ছোটো কান্নার
সব স্মৃতি সেই প্রাণে
বুঝি মুছে যায় যে-প্রাণ হারায়
সেই অমর্ত্য গানে।

বৈদেশিকী

আফ্রিকার দ্বন্দ্ব

ইউনো'তে টিউনিসিয়া সম্পর্কিত আরব-এশিয় প্রস্তাবটি ভোটে বাতিল হয়েছে। ঐ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ছিল, একটি কমিটি নিযুক্ত করা, যাঁরা ফ্রান্স ও টিউনিসিয়ার মধ্যে বিবাদ নিষ্পত্তির আলোচনার ব্যবস্থা করবেন ও তার সহায়তা করবেন। অবশ্য এরকম একটা কমিটি নিযুক্ত হলেই যে বেশি কিছু কাজ হোত, তা নয়, কারণ টিউনিসিয়া ফ্রান্সের ঘরোয়া ব্যাপার, এই যুক্তি দিয়ে ফ্রান্স ইউনো'তে টিউনিসিয়া সম্পর্কিত আলোচনা বয়কট করেছে এবং উপরোক্ত ধরণের কোন কমিটি নিযুক্ত হলেও ফ্রান্স তাঁদেরকে কোন কাজ করতে দিত না, দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করত। আরব-এশিয় প্রস্তাবটির পরিবর্তে যে প্রস্তাবটি পাশ হয়েছে, তার কোনই মূল্য নেই।

আসলে ফ্রান্স জানে যে, বৃটেন এবং আমেরিকা তার উপরে কোন চাপ দিতে পারবে না। বৃটেন তো গোড়া থেকেই টিউনিসিয়ার ব্যাপার ইউনোর আলোচ্য বিষয় নয় বলেই বলে আসছে। দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাপারেও বৃটেনের ঐ একই যুক্তি ছিল। তা না হলে যে বৃটেনের নিজেরই মুশকিল। তবে নিজের উপনিবেশগুলিও তো স্বর্গরাজ্য নয়। বৃটিশ-শাসিত পূর্ব আফ্রিকায়, বিশেষ করে কেনিয়াতে, যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তাতে সেখানেও ইউনো'র দৃষ্টি পড়া উচিত। নিজের ঘরে যার এই অবস্থা, তার পক্ষে পরের দোষ দেখতে যাওয়া বিপজ্জনক। সেইজন্য বৃটেন বরঞ্চ ফ্রান্সের দোষ ঢাকতেই তৎপর।

আমেরিকা আরব-এশিয় জাতিদের সামনে ভদ্রতা রক্ষার জন্য টিউনিসিয়ার বিষয়ে ইউনোতে আলোচনা হতে দিতে আপত্তি করেনি। কিন্তু তার বেশি কিছু করতে আমেরিকা রাজী নয়। ভয় পাছে ফ্রান্স বিগড়ে বসে।

কেবল তো টিউনিসিয়ায় নয়, মরক্কোতেও ফ্রান্স বেপরোয়া চণ্ডনীতি চালাচ্ছে। মরক্কো ও টিউনিসিয়ায় জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে ফরাসীদের এক সঙ্ঘর্ষে আমেরিকা চিন্তিত হতে পারে, কিন্তু ফ্রান্সকে জোর করে কিছু বলা সহজ নয়, কারণ ফ্রান্স বেঁকে বসলে অনেক কিছু গোলমাল হতে পারে, এই আশঙ্কা রয়েছে। য়ুরোপ-সুরক্ষার পরিকল্পনায় ফ্রান্সের সহযোগিতা চাই যে। ফরাসী ঘাঁটিটি আলগা হলে ন্যাটোর (North Atlantic Treaty Organization) ঘর খাড়া করে রাখা যে দুষ্কর হবে। আমেরিকা যত শীঘ্র সম্ভব জার্মানীর পুনরস্ত্রীকরণ চাইছে, কিন্তু জার্মানদের আবার যুদ্ধক্ষম হতে দিতে ফ্রান্সের মন চায় না। এই ব্যাপারে ফ্রান্সকে নানাভাবে তুইয়ে বুইয়ে রাজী করাতে হবে। সুতরাং এখন কোন বিষয়ে ফ্রান্সকে ধমক দেওয়া মুশকিল। তাছাড়া, গত সপ্তাহের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, ইন্দোচীনের অবস্থা খুবই সংকটজনক হয়েছে। ফ্রান্স যদি বলে বসে, 'আমি আর পারলাম না ঠেকাতে কমুনিস্টদের, বাড়ি চল্লাম", তবে তো চক্ষুস্থির। অবশ্য ফ্রান্স চট করে এরকম বলে বসবে, সেটা খুব সম্ভব নয়, কারণ ইন্দোচীনে যুদ্ধ চালাতে ফরাসী জাতির যত ক্ষতিই হোক, এক শ্রেণী ফরাসীর তাতে নানা রকম লাভ হচ্ছে। এদের প্রভাব ফরাসী গভর্নমেণ্টের উপর যথেষ্ট আছে। সুতরাং ফরাসী গভর্নমেণ্টের পক্ষে ইন্দোচীনে যুদ্ধ ত্যাগের কল্পনা সহজ নয়। তবে আমেরিকার সঙ্গে দরাদরির সুবিধার জন্যে ফ্রান্স এই অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে না তা নয়। এ ব্যাপারে ফ্রান্স

বৃটিশ গভর্নমেণ্টের সহানুভূতি পাবে। তার প্রথম কারণ এই যে, বৃটেনের নিজেরও প্রচুর ঔপনিবেশিক স্বার্থরক্ষার গরজ আছে। দ্বিতীয়ত, ফ্রান্সকে ইন্দোচীনে টিকিয়ে না রাখতে পারলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বৃটেনের যাবতীয় সম্পত্তি বিপন্ন হবে। অতএব আপাতত ফ্রান্স বৃটিশ সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হবে না।

আমেরিকাও বৃটেন এবং ফ্রান্সকে বাঁচিয়ে চলছে ও চলবে। এমনকি, মালান সরকারকেও দস্তুরমতো খাতির করতে হচ্ছে। আরব-এশিয় জাতিদের কাছে নিতান্তই দেখতে খারাপ হয়, সেইজন্য দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাপার ইউনো'তে উঠতে দিতে আমেরিকা আপত্তি করেনি, কিন্তু তার বেশি আর কিছু নয়। ডক্টর মালান জানেন যে, কেবল বৃটেনের কেনিয়া-নীতি বা আমেরিকার নিগ্রো-সমস্যা দারুণ চক্ষুলজ্জার জন্য নয়, তার চেয়ে বড়ো কারণ আছে, যার জন্য বৃটেন ও আমেরিকা দক্ষিণ আফ্রিকাকে জোর করে কিছু বলতে পারে না। সে কারণ হচ্ছে, সামরিক গুরুত্বের দিক থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার অবস্থান—অর্থাৎ Strategic position। কোরিয়ার যুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার নামকা-ওয়াস্তে যে অংশ গ্রহণ করছে, তার পরোয়া আমেরিকা নিশ্চয়ই করে না, তবে আর একটি বিশ্বযুদ্ধ যদি লাগে, তবে দক্ষিণ আফ্রিকার গুরুত্ব বেড়ে যাবে। কারণ যুদ্ধের সময়ে ভারত মহাসমুদ্রে প্রতিপত্তি অক্ষুন্ন রাখতে হলে কেপ এলাকা, অর্থাৎ দক্ষিণ আফ্রিকা হাতে থাকা চাই। কেপ এলাকায় ডাচরাই প্রথম উপনিবেশ পত্তন করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ মুহূর্তে বৃটিশের সঙ্গে যখন ফরাসীদের লড়াই চলছিল, তখনই ইংরেজরা অনুভব করে যে, ভারতবর্ষে ও ভারত সমুদ্রে প্রতিপত্তি রাখতে হলে উত্তমাশা অন্তরীপ হাতে থাকা দরকার। তখন অবশ্য সুয়েজ খাল ছিল না। য়ুরোপ থেকে জাহাজ আসত আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করে। যেখানে জাহাজ এসে আশ্রয় নিতে পারে, মেরামতাদি করতে পারে এবং জল, খাদ্যাদি সংগ্রহ করতে পারে, এরকম একটা বন্দর দক্ষিণ আফ্রিকার দখলে না থাকলে বিপদ, বিশেষ করে যুদ্ধের সময়ে। যতদিন পর্যন্ত ডাচরা নিরপেক্ষ ছিল, ততদিন পর্যন্ত বৃটিশ জাহাজও কেপ কলোনীর বন্দর ব্যবহার করতে পারত ও রসদাদি সংগ্রহ করতে পারত। কিন্তু ডাচরা যখন ফরাসীদের পক্ষে গেল, তখন বৃটিশের হোল মুশকিল। তখন থেকেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বৃটিশ গভর্নমেণ্টকে কেপ কলোনী দখল করে নেবার জন্য তাগিদ দিতে লাগল এবং বৃটিশ গভর্নমেণ্টেরও সেই চেষ্টা শুরু হোল। শেষ পর্যন্ত ১৮১৪ সালে সেই চেষ্টা সফল হয়—কেপ কলোনী বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

তারপর অবশ্য অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সুয়েজ খাল কাটা হয়েছে। উড়ো-জাহাজ এসে অনেক কিছু ওলটপালট করে দিয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে তা সত্ত্বেও ভারত মহাসমুদ্রের উপর ক্ষমতা রাখতে হলে দক্ষিণ আফ্রিকা হাতে থাকা চাই—নৌবহর ও বিমানবহর, উভয়ের জন্যই এটা আবশ্যক। গত দুই মহাযুদ্ধের সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকা যদি নিরপেক্ষ বা জার্মানীর পক্ষে থাকত, তাহলে যুদ্ধের পরিণাম সম্ভবত অন্যরূপ হোত। এইখানেই মালানের জোর।

সমস্ত আফ্রিকা বিভিন্ন য়ুরোপীয় জাতির ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের অংশরূপে বিভক্ত এবং সর্বত্রই মার্কিন বিমানঘাটি রয়েছে অথবা প্রয়োজনকালে মার্কিন বিমানঘাটি বসবে স্থির আছে। সুতরাং আমেরিকাকে এই সব ঔপনিবেশিক সরকারের মন রেখে চলতেই হবে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, আজ আফ্রিকার প্রায় সব সাদা সরকারের সঙ্গে কালা অধিবাসীদের সংঘর্ষ চলছে। কম-বেশি আজ সমগ্র অশ্বেত আফ্রিকাবাসীর মন য়ুরোপীয় শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। এ অবস্থায় কেবল সরকারের সঙ্গে মিতালি রেখে চলতে পারলেই কি যথেষ্ট হবে? এ অবস্থায় যদি যুদ্ধ লাগে, তবে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের অশ্বেত জনমত ইঙ্গ-মার্কিন-ফরাসীর বিশেষ অনুকূল হবে বলে মনে হয় না। সেই জনমতকে অনুকূল করতে হলে সাদার প্রভুত্ব, সবটুকু না হোক, অনেকখানি বিসর্জন দিতে হয়। তাই দিতে পারলে তো যুদ্ধের প্রয়োজনই অনেকটা চলে যাবে। তা আর হচ্ছে কোথায়?

১৪।১২।৫২

কাশ্মীর ভ্রমণ

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

১

কিছু লোক আছেন যাঁদের ঘুরে বেড়াতে ক্লান্তি নেই। অনবরতই ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গা, এক দেশ থেকে অন্য দেশ। [illegible] বাঁধা, টিকিটপত্র কেনা ইত্যাদি [illegible] আনুষঙ্গিক হাঙ্গামাকে এঁরা মোটেই ভয় পান না—বরং কিরকম অল্প আয়াসে এঁরা এসব অতিক্রম করে কেবলই ঘুরে বেড়ান, দেখলে আশ্চর্য লাগে। এক ভদ্রলোককে আমি জানি, প্রায় প্রত্যেক বছরই তিনি বছরটা শুরু করেন ইউরোপ ঘুরে, তার বছরের শেষ দিক্‌টায় চক্কর মারেন জাপান পর্যন্ত। পাসপোর্ট, বিভিন্ন দেশের মুদ্রার হাঙ্গামা, নতুন নতুন হোটেল খুঁজে বার করা—এসব তাঁর কাছে কিছুই নয়। কিন্তু বিদেশের কথা ছেড়েই দিলাম। আমাদের দেশটাও তো কম বড় নয়। তার উপর এদেশে স্বল্প হাঙ্গামায় ঘুরবার সুবিধে খুব কম, কলকাতায় বসে লণ্ডন—প্যারিস—জেনেভা—রোম তো বটেই, ইউ-রোপের ছোট ছোট শহরেও হোটেলের ব্যবস্থা, যাতায়াতের ব্যবস্থা প্লেন-ট্রেনের নিকট সবই টমাস কুকের কল্যাণে ঠিক করে ফেলা যায়—সব ঘড়ির কাঁটার মত চলে। কিন্তু মাথা খাটিয়েও এখানে সব জায়গায় সে ব্যবস্থা করা চলে না। বোম্বাই দিল্লীতে হয়তো এ ধরণের ব্যবস্থা সম্ভব, কিন্তু মথুরা, বৃন্দাবন, কাশীর বেলায় কি হবে? এমন কি, বাঙালীর চিরাচরিত পূজাবকাশ কাটাবার জায়গা দেওঘর মধুপুর রাঁচি হাজারিবাগ ঘাটশিলায়? কোনও উপায় নেই,—মোটঘাট বিছানাপত্তর বেঁধে হাঁড়ি-কুঁড়ি নিয়ে সপরিবারে হাঁপাতে হাঁপাতে ট্রেন ধরতে হবে, লেপকম্বলের বাণ্ডিল সঙ্গে নিতেই হবে; আমসত্ত্ব আর বড়ির হাঁড়িটাও ফেলে যাওয়া চলবে না, সারা ট্রেন শঙ্কিত হয়ে থাকতে হবে কখন কোন্‌ জিনিসটা হারালো, তারপর যদি কোনরকমে গন্তব্যস্থানে পৌঁছন গেল তো মনের মত একটা আড্ডা ঠিক করতে গলদ্‌ঘর্ম হতে হবে, নতুন করে চাল ডালের সন্ধান করতে হবে, হয়তো রেশন কার্ডও করাতে হবে, কোথায় ভাল দুধ পাওয়া যায় তার সন্ধান করতে হবে, গৃহিণীর আজ্ঞায় ন' টাকা সেরের চেয়ে সস্তা দরে খাঁটি গাওয়া ঘি পাওয়া যায় কিনা তার চেষ্টা করতে করতে হিমসিম খেতে হবে—তারপর এত কাণ্ড করে গুছিয়ে বসতে না বসতে ছুটি যাবে ফুরিয়ে এবং এইসব হাঙ্গামা করতে করতে আবার ফিরে আসতে হবে, মাঝ থেকে হয়তো কারও অসুখ বিসুখ করবে এবং সবার উপর গৃহিণী মন্তব্য করতে থাকবেন যে, এমন অকেজো লোক তিনি আর একটিও দেখেননি এবং এইরকম লোকের হাতে পড়ে তাঁর হাড় মাস কালি হয়ে গেল। এ যেন প্রাণধারণের চেষ্টাতেই প্রাণশক্তি ফুরিয়ে দেওয়া, জমার চেয়ে খরচ বেশি। গত কয়েক বছর বাঙালীর জীবন কিছু বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে, তা না হ'লে পূজোর সময় হ'লেই বাঙালীকে যেন বিদেশে ছড়িয়ে পড়তেই হত; বাস্তবিক, পূজোর সময় হ'লেই আর কোনও কথা নেই, কেবলই আলোচনা হচ্ছে, এবার কোথায় যাওয়া যায়, কাশী, পুরী, দেওঘর, হাজারি-বাগ, রাঁচি, মধুপুর, গিরিডি?

অথচ আমি লোকটা এমন কুঁড়ে যে, আমার আদপেই এসব পোষায় না। ভাল ভাল দৃশ্য, নতুন নতুন দেশ, নতুন ধরণের মানুষ দেখতে কার না ইচ্ছা করে? কিন্তু তার জন্য যদি অসাধারণরকম হাঙ্গামাই করতে হয় তাহলে আর লাভ কি? কিন্তু শুধু হাঙ্গামার কথা নয়। ধরা গেলো, কচিসংসদের গল্পের মতই কোনও অঘটন-ঘটনপটীয়সী দেবী গৃহিণীরূপে আবির্ভূতা হয়ে এইসব হাঙ্গামার অবসান করলেন,—কিন্তু তবু আমি ঘুরবার নামে ভয় পাই। ঘরটা এমন পরিচিতের মায়ায় বেঁধে ফেলেছে যে, তার মায়া কিছুতেই কাটাতে পারিনে। ঐ যে দীর্ঘ ব্যবহারের ফলে বিছানার মধ্যে খানটা বসে গিয়েছে, শুতে গেলেই মাধ্যাকর্ষণের টানে ঐখানটায় গড়িয়ে আসতে হয়; ঐ যে চেয়ারটার হাতলটা ঢিলে হয়ে গিয়েছে, সাবধানে টেনে বসতে হয়; ইচ্ছে হ'লেই পাশে আমার লেখার টেবিলটায় বসতে পারি, তার এলোমেলো কাগজের স্তূপ থেকে দরকারী কাগজ আমি ছাড়া আর কেউ-ই খুঁজে বার করতে পারে না; ঐ যে জানলাটার চৌকো ফ্রেমে-আঁটা ফাঁক দিয়ে এক চিলতে আকাশের তলায় দু'টো নারকেল গাছ দেখা যায়—এসবের মায়ায় এমনই আটকে গিয়েছি যে, বাইরের নবনীত-কোমল শুভ্র-শয্যা আমার ভালোই লাগে না, ঐ হাতল-নড়া চেয়ার ও অগোছালো লেখার টেবিল ছাড়া আমার চলেই না, ঐ আকাশটুকুর সকাল-থেকে-সন্ধ্যে সন্ধ্যে-থেকে-সকাল রং বদল আর মেঘের খেলা দেখতে দেখতে আমার আর বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। এসবগুলো জীবনের টানা-পোড়েনের মধ্যে এমনই বোনা হয়ে গিয়েছে যে, এগুলো এখন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, অন্য জায়গায় গেলেই অনুভব করি, এগুলো কতখানি অবিচ্ছেদ্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, অন্য কোথায়ও গেলে

সেইজন্য আবার নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াবার রীতিমত চেষ্ট করতে হয়।

অবশ্য বলতে পারেন, এটা নিছক কুঁড়েমি। কিন্তু শুধুই কি কুঁড়েমি? কারণ, কুঁড়েমি ছাড়াও তো অন্য একটা জিনিস আছে। মনে পড়ে, গুপ্ত নিবাসে একদিন অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি। দোতলার বড় বারান্দায় বাগানের দিকে মুখ করে একটি ইজি চেয়ারে স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন তিনি। বললেন, রবিকা যে লিখে গিয়েছেন ঘর থেকে দু'পা বেরিয়ে শিশিরবিন্দু দেখবার কথা, সে কি শুধু কথার কথা? চোখ থাকলেই দেখা যায়। সামনের দিকে দেখো তো চেয়ে,—ঐ যে ঘাসগুলো, তার গোড়ার দিকে কেমন একটি রং, ডগার দিকে কেমন আর একটি রং! মেঠোফুল ফুটেছে, তার মধ্যেখানটিতে কেমন গভীর রঙের টান, পাপড়িগুলোর ধারটিতে কেমন হাল্‌কা রং ধীরে ধীরে মধ্যেখানের গভীর রঙের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। গাছের পাতাগুলোর মধ্যে তেমনি কতরকম রঙের খেলা। ঐ পাখীটা ঘুরছে দেখো, তার পাগুলি কেমন, ডানাটা কেমন নীল নীল, বুকের কাছটায় পাখার পাশে কেমন শাদা শাদা ছিট্। আকাশের রঙের খেলার তো কথাই নেই। সৃষ্টির রূপকার কতো রঙে জগৎটাকে রাঙিয়ে দিয়েছেন, চোখ থাকলেই দেখা যায়। সত্যিই তাই। ঘরের কাছেই তো বিস্ময়ের অন্ত নেই, কিন্তু আমরা তার কতটুকুই বা দেখি? রোগের প্রকোপে যখন দীর্ঘদিন শয্যাগ্রহণ করেছিলুম তখন ছ'মাস ঐ জানলার মধ্য দিয়ে নজরে-পড়া এক টুকরো আকাশ ছাড়া বাহির বিশ্বের সঙ্গে আমার আর কোনই যোগাযোগ ছিল না, কিন্তু ঐ আকাশটুকু তার অনন্ত বৈচিত্র্যের ভাণ্ডার আমার বিস্মিত চোখের সামনে উজাড় করে দিয়েছিল। জ্যৈষ্ঠের দিন ভোরবেলা হতে সেই আকাশে আগুন ঝরত, তীব্র আলোয় দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়ে যেত, আলসের ছায়ায় পাখীরা আশ্রয় খুঁজত, দুপুর বেলায় সমস্ত জগৎ যেন থমথম করতে থাকত। সেই আকাশের চেহারা ক্রমে পাল্‌টে গেল, নীল রঙের আর চিহ্ন নেই, সারা আকাশ ঘোলাটে রঙে লেপাপোছা একাকার, ধারা স্নানে নারকেল গাছগুলো সবুজ হয়ে উঠল, ভিজে-যাওয়া পালক-ফোলা কাকগুলোর পর্যন্ত নতুন চেহারা। তারপর দেখলুম, শরতের প্রসন্ন আভা, গভীর নীল আকাশে শাদা মেঘের খেলা, সারাদিন কাঁচা সোনার মত রৌদ্র আর সারারাত কুন্দ ফুলের মত জ্যোৎস্না। দিন হতে রাত্রি, রাত্রি হতে দিন, ঋতুর পর ঋতু—কত বিচিত্র লীলা ঘটে চলেছে, আমার বিস্ময়ের ভাণ্ডার একেবারে উজাড় করে কেড়ে নিয়েছে,—তার জন্য ঐ একটুকরো আকাশ ছাড়া আর কিছুর তো দরকার হয়নি। নড়নচড়নহীন হয়ে বিছানায় শুয়ে না থাকলে হয়তো এ জিনিস কোনও দিন চোখেই পড়ত না। কিন্তু মানুষে দেখুক আর নেই দেখুক, এ বিচিত্র লীলা তো এক মুহূর্তের জন্যও বন্ধ নেই! সে লীলা এত অভিনব, এত বেশি, এত বিচিত্র যে, ঐটুকু আকাশের অনন্ত বিস্ময় একজনে পরিপূর্ণ গ্রহণ করতে পারে না; তার প্রাচুর্যের ভারে পীড়িত হতে হয়, বুকটা টনটন করতে থাকে। সাতসমুদ্র পেরিয়ে দৃশ্য দেখতে যাবার কি সত্যিই কোন দরকার থাকে এমন হলে?

তাছাড়া আমি বিশ্বাস করি সিসেরোর কথা—To me, the man hardly seems to be free, who does not sometimes do nothing (Cicero)। কুঁড়েমির জয়গান করছিনে। যে মানুষটা কোন কালেই কিছু করল না, নিছক কুঁড়েমি করেই কাটিয়ে দিল তার জীবনটা নিশ্চয়ই বিকশিত হল না। যে ঐশী-অশান্তির স্পর্শে মানুষের মনে চঞ্চলতা জাগে, হৃৎকম্পন ধীরে ধীরে ফুটে উঠে, আপন গভীর সত্তাকে চিনবার অধীর আগ্রহে সে নতুন নতুন পথে জয়যাত্রায় বেরোয়, সে ঐশী অশান্তির স্পর্শ না পেলে মানুষ মানুষই হল না। কিন্তু এ কথাটা অন্য। প্রাণধারণ ও জীবিকার্জনের চেষ্টায় আমরা তো দিনরাত এমনই ঘুরি, জীবনযাত্রার যুদ্ধে আমাদের তো এমনিতেই কোনও অবসর নেই, তার ওপর ভদ্রতার ও সামাজিকতার নানারকম তাগিদ আছে, এমন কি বাড়িতে এলেও দেহ-মনের অসীম ক্লান্তি সত্ত্বেও হাসিমুখে গৃহিণী যা বলেন তা শুনতে হয়, এতেই তো আজ প্রাণশক্তি নিঃশেষ হতে চলেছে। তার উপরও যেই ছুটি মিলল অমনি যেহেতু পিসশাশুড়ির দেওরঝি'রা দেওঘর বেড়াতে গিয়েছেন সেহেতু আমাদেরও কোমর বেঁধে লটবহর নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে উটকামণ্ড বা মাউণ্ট আবু; নিতান্তপক্ষে হাজারিবাগ কি শিলং দৌড়তেই হবে—এমনতর কথায় আমার মন কিছুতেই উৎসাহ পায় না। এই রকম বাধ্যবাধকতা থাকলে সত্যিই কি মানুষ free? তার সব শক্তিই যদি বাইরের দিকেই নিঃশেষ হয়ে গেল তাহলে তার অন্তরকে ফুটিয়ে তোলবার জন্য আর কি শক্তি থাকবে? বীজ ফুটবার আগে অঙ্কুর কিছুদিন নিবিড়ভাবে বীজের মধ্যে লুকিয়ে থাকে, জীবনপথে দীর্ঘ যাত্রা শুরু করবার আগে শিশু মাতৃকক্ষের গভীর আশ্রয় আঁকড়ে থাকে। যেমন, মহাত্মাজীর সাপ্তাহিক মৌনব্রত ছিল নতুন করে শক্তি সঞ্চয়ের উপলক্ষ্য। যে লোকটা যত বেশি পরিমাণে মানুষ তার তত বেশি দরকার সময়ে সময়ে নিজের মধ্যে খুব গভীরভাবে আত্মসংহরণের, তা না হলে জমার চেয়ে খরচই বেশি হয়ে যাবে। যেমন সমষ্টির বেলায় আন্দ্রেজিদ্ বলেছেন, Culture, too, like the seed in the Gospel, needs to sink in the tomb in order to burst forth again, তেমনই [illegible] বেলাতেও একথা সত্য। কারণ, [illegible] বাইরের দিকে তাকালে ভিতরের দিকে তাকাবার অবসর থাকে কই?

কিন্তু দৈবের লিখন এড়ানো যায় না। মনে মনে এই সব কথা যতই ভাবি না কেন কাজের বেলায় দেখি আমাকে [illegible] ঘুরতে হয়, এমন কি বাক্স বিছানা [illegible] রাখবারও অবকাশ হয় না। সে [illegible] নানা জায়গায় ঘোরা;—কখনও কাছাকাছি, কখনও দূরে, কখনও বাংলাদেশের [illegible] অজানা কোণে, কখনও বাংলা দেশের [illegible] কখনও বা ভারতবর্ষের সীমানাও ছাড়িয়ে। সবটাই যে লোকসান হয়েছে এমন [illegible] বলতে পারিনে। বরং একদিকে [illegible] একটি লাভ হয়েছে যা সকলের ভাগ্যে [illegible] না। একালের তীর্থযাত্রা নামজাদা [illegible] পরিবর্তন কেন্দ্রগুলির ঘাটে [illegible] সেকালের তীর্থের মতই এতদিনে [illegible] বাঁধা হয়ে গিয়েছে। রাঁচি গেলেই [illegible] রোপ্না হুণ্ড্রুফলস্ নেতারহাট [illegible] এরকম ধরণের একটা অলিখিত [illegible] সকলেই বাঁধা। সেখানে আমরা [illegible] একটা যেন অদৃশ্য conducted tour-এর পাল্লায় পড়ে গিয়েছি—ধরেই নিতে [illegible] যায় যে, যাঁরা রাঁচি গিয়েছেন তাঁরা [illegible] দেখেছেনই, যাঁরা দেওঘর গিয়েছেন [illegible] নিশ্চয়ই ত্রিকূট পাহাড় তপোবনে [illegible] এসেছেন, যাঁরা গিরিডি গিয়েছেন [illegible] নিশ্চয়ই পরেশনাথের মাথায় চড়েছেন

[illegible] ক্লাস্ দেখেছেন, যাঁদের নীল সমুদ্র-[illegible] (Cote Azure) যাবার সৌভাগ্য [illegible] তাঁরা নিশ্চয়ই নীস মণ্টি কার্লো [illegible] তীর্থ দর্শন করেছেনই, [illegible] গেলে ভিস্যুভিয়স দেখেন বা [illegible] কাপ্রি দ্বীপে বেড়িয়ে আসতে [illegible] ভোলেননি, প্যারিতে গেলে ঈফেল [illegible] ও লুভর-এর সঙ্গে সঙ্গে কেলিস্ [illegible] নৃত্যগীত নিশ্চয় বাদ যায়নি। কিন্তু বাংলা দেশকে ভাল করে দেখবার সুযোগ ক'জন বাঙালীর হয়? ক'জন বাঙালী বাংলা দেশের অজানা অখ্যাতনামা প্রান্তগুলির সঙ্গে নিবিড় পরিচয় করবার সুযোগ পান? সমুদ্রধৌত সুন্দর বনের [illegible] গম্ভীর অরণ্য আর সমুদ্রের মত [illegible] থেকে শুরু করে রাঢ়ের তরঙ্গায়িত অঞ্চল, অজয় ময়ূরাক্ষীর ধারে ধারে তান্ত্রিক আর বৈষ্ণব সমাজের ধ্বংসাবশেষ, পীঠস্থান [illegible] বৈষ্ণব বাউলের আখড়া, নানুর বা কেন্দুলির মন্দির? অথবা পদ্মার শাদা [illegible] চিক্‌চিকে জলস্রোতের ধারে ধারে [illegible] ক্ষেত আর মাঠ, জলপাইগুড়ির [illegible] আর চা-বাগান, জল্পেশের মন্দির, বা বাঁকুড়ার রুক্ষপ্রান্তর যেখানে [illegible] ভূমির অরণ্যসঙ্কুলতায় শেষ হয়ে গিয়েছে তার অপূর্ব দৃশ্য? যখন কোনও [illegible] পরিবর্তনের নামজাদা তীর্থকেন্দ্রে যাই তখন যা দেখি, জানি তা সকলেই দেখেছেন, কিন্তু বাংলা দেশের প্রত্যন্ত কোণে কোণে ঘুরবার সুযোগ পেয়ে বাংলার এই অপূর্ব রূপের প্রত্যক্ষ অনুভূতির যে সুযোগ পেয়েছি জমাখরচের অঙ্ক মিলিয়ে দেখি জমার অঙ্ক বেশি হয়ে উঠেছে।

কিন্তু সেকথা থাক্, এবার যখন তীর্থ ছাড়া অন্য কোথায়ও হাওয়া বদলের উপায় ছিল না, তখন ভাবা গেল যে তাহলে এবার [illegible] নামজাদা তীর্থেই যাওয়া যাক্। [illegible] সুইজারল্যাণ্ড দেখেছি অথচ কাশ্মীর দেখিনি, এ অপবাদ রাখবার জায়গা নেই। অতএব ঠিক করা গেলো, এবারকার [illegible] ভূস্বর্গ কাশ্মীরে।

২

আমরা যখন দিল্লীর বায়ুপোত থেকে [illegible] করলুম তখন সকালবেলাতেও ধূলোর [illegible] বইছে, চারপাশে ধূলোয় অন্ধকার। [illegible] উপরে উঠতে ধূলোর ঝড় থেকে পরিত্রাণ পাওয়া গেল বটে, কিন্তু সেই [illegible] নজরে পরতে লাগল চারপাশের ধূসর রুক্ষ রূপে। যতবারই বাংলা থেকে দিল্লী এসেছি বা দিল্লী থেকে বাংলায় গিয়েছি, বাংলার পুঞ্জ পুঞ্জ ঘন নীল মেঘ আর শ্যামল সরস মাটির সঙ্গে এই ধূলোর ঝড় আর রুক্ষ মাটির তুলনা না করে পারিনি। বাংলা তো নতুন-জেগে-ওঠা পলিমাটি, হাজার নদীনালা তাকে শ্যামল সিক্ত করে রেখেছে, ফসলে গাছে সে ঘন সবুজ। আর, দিল্লী বহু প্রাচীন দেশ, কত যুগের ঝড়-ঝাপটা সইতে সইতে তার মাটি গিয়েছে উড়ে, পাথরের কঙ্কাল বেরিয়ে পড়েছে, সেই কঙ্কাল-পঞ্জর ভেদ করে কিছু কিছু কাঁটা গাছ ঝোপ-ঝাড় জন্মায় মাত্র। শুধু কি ভৌগোলিক অর্থে একথা সত্য? কত রাজত্ব, ইতিহাসের কত যুগের পরি-সমাপ্তি ঘটেছে এখানে, কুরুক্ষেত্রের সময় থেকে ভারতবর্ষের নবতম স্বাধীনতা লাভের দিন পর্যন্ত। হাজার হাজার বছরের ইতিহাসের কঙ্কাল জড় হয়েছে এখানে, তার শুকনো হাড় গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ধূলির সঙ্গে উড়ছে আকাশে। এমন কি, দিল্লীর গাইড-বুকে লেখে যে নাদির শাহ দুরবাণী দিল্লীবাসীদের হত্যা করে সেখানে বহু নরমুণ্ড স্তূপীকৃত করে-ছিলেন ঠিক সেই টিলার উপরই ভাইস-রয়ের (বর্তমানে রাষ্ট্রপতির) আবাসভবন গড়া হয়েছে, লুটিয়েন্স (Lutyens) এবং লর্ড হার্ডিঞ্জ নাকি অজানিতে সেই জায়গাটাই ঐ প্রাসাদ নির্মাণের জন্য পছন্দ করেছিলেন।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা শ্রীনগরে এসে পৌঁছলাম। মনে হল, এই পথ আগে সন্ন্যাসীরা পায়ে হেঁটে অতিক্রম করতেন। মোগল সম্রাটদের সময় সৈন্য-সামন্ত, হাতি-ঘোড়া, তাঁবু নিয়ে কত মাসে এই পথ অতিক্রম করতে হত,—আর আজ আমরা বিজ্ঞানের কৃপায় পাহাড় টপ্‌কে ক'ঘণ্টার মধ্যেই সে পথ পেরিয়ে এলাম। অবশ্য দিল্লী থেকে আমাদের বায়ু-যাত্রা মোটেই আরামের হয়নি। অমৃতসহর পর্যন্ত কোন রকম অসুবিধা হয়নি বটে, কিন্তু তারপরই আমাদের বায়ুরথ এমন নাচন, লাফালাফি আরম্ভ করল যে, প্লেনের ভিতরে আমাদের টেকা কোন রকমে সম্ভব হলেও আমাদের ভিতরে আহার্য-বস্তুর টেকা কোন রকমেই সম্ভব হল না। এইভাবে এগোতে এগোতে আমরা জম্মু-শ্রীনগরের সীমানা বানিহল গিরিবর্ত্মের কাছে হাজির হলাম, পাঞ্জাবের সমতলভূমি এইখানে শেষ হয়ে পাহাড়ের রাজত্ব শুরু হল। পাহাড়ের দেওয়াল বৃত্তাকারে ছড়িয়ে আছে, তার পূর্বদিকের সীমানা মিশে গেছে লাঙ্গাস হয়ে হিমালয়ের মধ্যে; পশ্চিমে তা গিলগিট অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত, তার দক্ষিণে জম্মু, উত্তরে শ্রীনগরের উপত্যকা, একশো মাইল লম্বা পঁচিশ মাইল চওড়া এই উপত্যকা পেরিয়ে গেলে আবার অমরনাথ-কোলাহোই-এর পাহাড় শুরু হল, যার কিছুদূরে নঙ্গ-পর্বত। জম্মু ছাড়বার খানিকক্ষণ পরেই আমরা দেখতে পেলাম আকাশচুম্বী পাহাড়ের প্রাকার, সাধারণতঃ তের চোদ্দ হাজার ফুট উঁচু। তারই মধ্যে এক জায়গায় পাহাড় সাড়ে নহাজার ফুট উঁচু, সেইটুকু বোধ হয় আধ মাইল চওড়াও নয়, তার দুপাশে আবার বরফ-ছড়ানো পাহাড়ের দেওয়াল, তারই মধ্যে ঐ যেটুকু নীচু জায়গা সেইটিই হল বানিহল গিরিবর্ত্ম। সেখান দিয়ে রাস্তাও গিয়েছে, প্লেনও যায়। আমরা বানিহলে প্রবেশ করে দেখলাম দুধারে বরফ-ছড়ানো পাহাড়ের দেওয়াল, মধ্যে প্রায় সিকি মাইল ফাঁক দিয়ে প্লেন উড়ে আসছে, মাত্র পাঁচশো ফুট নীচে বানিহল পাহাড়ের মাথা। সেখানে যখন আমাদের বায়ুরথ লাফালাফি করছিল তখন সত্য কথা বলতে, আমি অস্বস্তি বোধ করছিলুম, যা আল্পস পেরোবার সময়ও করিনি। কারণ সে প্লেন ছিল বড় ও জোরালো, উড়ছিলুম আল্পসের মাথার পাঁচ ছ'হাজার ফুট উপর দিয়ে, আর অত উঁচুতে কোনও দোলা ছিল না। কিন্তু এখানে প্লেন ছিল ছোট, হাওয়ার ধাক্কায় ঝড়া পাতার মত দোলা খায়, তার উপর পর্বতশৃঙ্গের মাত্র পাঁচশো ফুট উপর দিয়ে চলতে চলতে লাফালাফি করছে—এ অবস্থাটা নিশ্চয়ই খুব স্বস্তিকর নয়। এইভাবে বানিহল পার হয়ে পর্বত প্রাকারের সীমানা ছাড়িয়ে আমরা উপত্যকার রাজত্বে প্রবেশ করলুম। দিগন্তবিস্তৃত মাঠ, তার মধ্যে মধ্যে ছোট-ছোট পাহাড়, দূরে দিগ্-বলয়ে বরফ-ঢাকা পাহাড়ের সারি, নদী-নালা বয়ে চলেছে, চেনার ও পপলারের সারি, উপত্যকার চেহারাই অন্য। আমরা এই উপত্যকা দেখতে দেখতে পার হয়ে শ্রীনগরে এসে পড়লাম। বায়ুপোত থেকে নেমে পুলিশের কাছে পারমিট দাখিল করে মোটরে করে শ্রীনগর রওনা হওয়া গেল।

মনে পড়ে, বহুকাল আগে মোটরে করে পুজোর আগে একবার রাঁচি যাচ্ছিলুম, গরমে কাঠ ফাটছে আমরা [illegible]

তেল নিতে দাঁড়িয়ে রৌদ্রের ঠেলায় অস্থির, এমন সময় আর একটি রাঁচি-যাত্রী গাড়ি পাশে এসে দাঁড়াল। সপরিবারে তাঁরা রাঁচি যাচ্ছিলেন, কয়েকটি ছোট ছেলেও ছিল, বাকী সব যুবকের দল; কর্তা-গৃহিণীও আছেন। শুনতে পেলুম গৃহিণী গম্ভীরকণ্ঠে সবাইকে আদেশ করলেন গরম জামা পরে নিতে, ছোট ছেলেরা তো বটেই, যুবকেরা এবং কর্তাও আদেশমত সেই দুপুরে গরম জামা পরে নিলেন—রাঁচি Hill-station কি না! তখন মনে মনে হেসেছিলুম। কিন্তু ভাগ্যদেবতাও বোধ হয় সে সময়ে অলক্ষ্যে হেসেছিলেন; তা তখন টের পাইনি, কিন্তু এতদিনে টের পেলুম। কাশ্মীর অর্থাৎ শ্রীনগর সাড়ে পাঁচ হাজার ফুট উঁচু, একটা রীতিমত Hill-station, কাছেই গুলমার্গ-খিলানমার্গ, যেখানে গ্রীষ্মের সময়ও নাকি স্কি খেলা চলে—সুতরাং ঠাণ্ডা হবেই এ রকম ধারণাই ছিল। সেই অনুসারে গরম জামা-কাপড় চাপিয়ে এসেছিলুম। কিন্তু শ্রীনগরে নামতেই চক্ষুস্থির। ঠাণ্ডা কোথায়, এ যে কলকাতার শেষ ফাল্গুন বা প্রথম চৈত্রের মত গরম, প্রখর রৌদ্র, বেশ ঘাম হচ্ছে। প্রথমেই তো এই ব্যাপারে হতাশ হয়ে গেলুম। মনকে সান্ত্বনা দেওয়া গেল, থাকগে নাই বা থাকলো ঠাণ্ডা, সে তো পরশুরামের ভাষায় বরফের চাঙরের উপর অয়েলক্লথ পেতে শুয়ে থাকলেই পাওয়া যায়। এখানকার দৃশ্যের সৌন্দর্য দেখেই ও আফশোশটা মিটিয়ে নেওয়া যাবে। মোটর চলল। বিস্তৃত ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে ধুলোর রাস্তা, আশে-পাশে ছোট ছোট পাহাড়ও আছে, রাস্তার ধারে চেনার গাছ। ক্রমে আমরা শ্রীনগরে প্রবেশ করলুম। করতেই মনে হল, এতদিনে বুঝি ইয়ারো দেখার ফল ফললো, ভূস্বর্গটা কি আমাদের দেখে লুকিয়ে পরলো? না, আমাদের পাপ চোখে ভূস্বর্গের দর্শন মিলছে না? এতো দেখছি বহু প্রাচীন শহর—ভাঙ ভাঙা দারিদ্র্যলাঞ্ছিত বস্তি, অপরিস্কার গলি, রাস্তাঘাট অপরিচ্ছন্ন। তারই মধ্য দিয়ে চলতে চলতে ঝিলম নদীর প্রথম ব্রিজ আমীর কদলের কাছে এসে পড়লাম। ঝিলম নদী চলেছে, জল তার ঘোলা, তারই ধারে মহারাজার পুরানো প্রাসাদ। হাউসবোটে ও অন্য নানারকম বোটে নদী ভর্তি। দু'পাশে ভাঙা ঘিনুজি শহর। প্রথম দর্শনে মনে হল, কবি কোন **কল্পনায় "সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের** স্রোতখানি বাঁকা" লিখেছিলেন জানিনে, কিন্তু আসলে এতো আমাদের প্রায় টালার খালের ব্যাপার! ঐ রকমই ঘোলা জল, ঐ রকমই ঠাসাই নৌকা। অবশ্য চওড়ায় টালার খালের চেয়ে অনেক বেশি, প্রায় আড়াই তিন গুণ, স্রোতও অবশ্য খুব প্রখর। কিন্তু তফাৎটা আকারের যতই হোক্ না কেন, প্রকারে কতখানি? যদি কেউ মনে করে নিতে পারেন যে, টালার খালটা তিন গুণ চওড়া হয়ে গিয়েছে, তীরে আম-কাঁঠাল বটগাছের বদলে চেনার-পপলারের সারি, পাটের নৌকার বদলে হাউস বোট আর শাকসব্জীর বোট তা হলেই ঝিলম নদীর রূপ তার চোখে পড়তে বাধা কি? তাছাড়া শহর! সেই ছোট ছোট খুপরি খুপরি ভাঙা বাড়ী, ধুলো ময়লা নোংরা ভর্তি পথঘাট, অসহ্য দুর্গন্ধ গলিপথ আর নোংরা আল-খাল্লা পরা লোকজন, অপরিচ্ছন্নতায় এরা ভারতীয় শহরের নোংরামির সনাতন ও নৈষ্ঠিক আদর্শ বজায় রেখেছে—কাশ্মীরের তিনটি বিষয় ভারতে অন্তর্ভুক্তির সঙ্গে এই বিষয়টিতেও তাদের স্বাভাবিক এবং স্বচ্ছন্দ অন্তর্ভুক্তি আছে একথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে। আর লোকজন? সাধারণত পর্বত-বাসীদের যা হ'য়ে থাকে তাই-ই, সুতী গরম অনেকগুলি জামা এরা পর পর পরে থাকে, তার উপর মাথায় পরে তাজ কিম্বা পাগড়ী এবং তা কখনও খোলে না, ফলে নানাকম পোকামাকড়কে এরা অঙ্গের ভূষণ করে তো রেখেছেই, উপরন্তু শিরোধার্য করে রেখেছে। তার উপর, শুনলাম, শীত-কালে এরা জামাকাপড়ের মধ্যে পেটের উপর ঝোলায় কাংড়ি অর্থাৎ অগ্নিপাত্র, জ্বলন্ত কয়লায় ভরা ছোট ছোট আংটার মত,—চেন দিয়ে গলা থেকে ঝোলানো থাকে, তাতে শীতনিবারণ হয় সত্য, কিন্তু দেহের ঐখানটায় তাপ লেগে লেগে পুড়ে যাওয়ার মত হয়, কেউ কেউ বলেন, অনেক সময় ক্যান্সারও নাকি হয় ঐ কারণে। আর ছোট ছোট ছেলেদের কাংড়ি থেকে আগুন লেগে সর্বাঙ্গ পুড়ে গিয়েছে এরকম দুর্ঘটনা শীতকালে খুব সাধারণ। যাই হোক্, প্রথম দর্শনে এই সমস্ত মিলিয়ে আমাদের এমন চমক লেগে গেল যে, আমাদের সকলের মধ্যে রীতিমত প্রতিযোগিতা লেগে গিয়েছিল, কোনখানটা একটু একটু ভূস্বর্গ ভূস্বর্গ মনে হচ্ছে তা কে আগে খুঁজে বার করতে **পারে, কিন্তু এতেও শেষ নয়, ওস্তাদের** মার শেষ বেলায়। আমরা নেড়ুর হোটেলে গিয়ে উঠলাম, আমাদের সবচেয়ে চমক সেই হোটেলেই লাগিয়ে দিল, এই সেই বিখ্যাত নেড়ুর হোটেল, শুনেছি নাকি স্বেন হেডিনের না অরেল স্টীনের রচনাতেও এর তারিফ আছে, এ হ'ল ভূস্বর্গেরও স্বর্গ, শ্রীনগরের শ্রেষ্ঠ হোটেল, তার শেষকালে এইরূপ? মধ্যে একটি দোতলা বাড়ী, বহু পুরোনো তার আদল, একালের আদর্শে আলোবাতাস যথেষ্ট কম, দু'পাশে দুটি পাথরের বাড়ী, তার ঘরগুলি অন্ধকার, বাথরুমগুলিতে ড্যাম্পের ভ্যাপসা গন্ধ, সামনে একটা বাগান, কিন্তু তাতে ডাল ডালিয়া ছাড়া কিছু ফুল নেই, দার্জিলিঙের উইণ্ডামীয়র হোটেলের সঙ্গে তুলনা করলে এটা তার শতাংশেরও একাংশ নয়—বাগানে তো নয়ই, ঘরেও নয়। স্থানাভাবে বাধ্য হ'য়ে সেখানেই দুদিনের জন্য আশ্রয় গ্রহণ করতে হল, কিন্তু অনবরতই মনে হতে লাগল, আমরা কি এইজন্যই বহু ব্যয় করে বহু দেশ ঘুরে এই পর্বতমালা দেখতে এলুম? কিন্তু এইসব কথা ভাবতে ভাবতে আরও একটা কথা মনে হ'তে লাগল। দিল্লীতে থাকতে ইন্দ্রপ্রস্থ দেখতে গিয়ে ছিলুম, মীরাটের কাছে হস্তিনাপুরও দেখেছি। পথে আসতে কুরুক্ষেত্রের উপর দিয়ে উড়ে এলুম। এক হিসেবে কুরুক্ষেত্র তো হ'ল ভারতীয় সভ্যতার সীমানা। আলেকজান্দার হ'তে শুরু ক'রে কত [illegible] কত আক্রমণ পশ্চিমদিক থেকে হয়েছে। কখনও বা সিন্ধুনদীর ধারে, কখনও বা পানিপথে শক্তিপরীক্ষা চলেছে, কুরুক্ষেত্র বা পানিপথের সীমানা যে পেরোতে পেরেছে সে সমস্ত উত্তর ভারতের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পেরেছে, ভারতের ইতিহাসে তার স্বাক্ষর রয়ে গেছে। প্রাগৈতিহাসিককালে কুরুক্ষেত্র তো এমনই একটি শক্তিপরীক্ষার সীমা-স্তম্ভ। সেইজন্য সিন্ধু পাঞ্জাব, প্রভৃতি দেশ ইতিহাসের আবর্তে কখনও ভারতের [illegible] থেকেছে, কখনও অভারতীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু যখনই ভারতে কোন শক্তিশালী পুরুষের আবির্ভাব হয়েছে —তা সে রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই হোক্ বা [illegible] ক্ষেত্রেই হোক্—অমনই তা পঞ্চনদের [illegible] থেকে পুবে পশ্চিমে বিস্তৃত হ'তে [illegible] ভারতবর্ষের এই উত্তর-পশ্চিম প্রত্যন্ত [illegible] পর্যন্ত প্রসারিত হ'য়েছে। আজ সে [illegible] সম্রাট নেই, সেইসব মহাপুরুষও [illegible] **কিন্তু তাঁদের চিহ্ন আজও তো চার[illegible]**
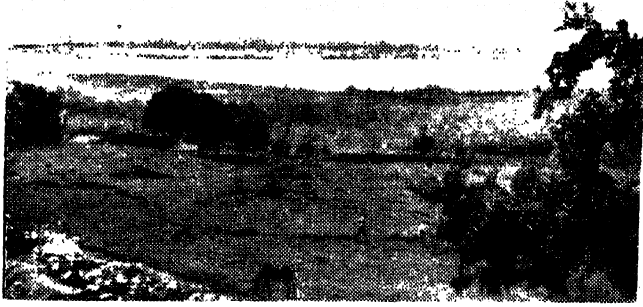
ডাল থেকে—দূরে হরিপর্বত। ডাল লেকের মধ্যে রাস্তা

ছড়ানো, আজও তো সে জীবন্ত সত্য, আজও তো সে নতুনভাবে মহাভারত কথা রচনা ক'রে চলেছে। শ্রীনগরে এসে দেখলুম, সেই মহাভারতের হরিপর্বত, যে পথ দিয়ে পান্ডবেরা মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করেছিলেন, যেখানে দ্রৌপদীর দেহপাত হ'ল ব'লে জনশ্রুতি, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হ'ল, ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হ'ল, কিন্তু সাম্রাজ্যে সুখ নাই, সমস্ত ত্যাগ ক'রে পান্ডবেরা চললেন মহাপ্রস্থানের পথে, সঙ্গে ছদ্মবেশে ধর্ম, মহাহিমে একে একে পান্ডবদের দেহপাত হ'তে লাগল, তবু তাঁরা কি মহারহস্যের আকর্ষণে এগিয়ে চললেন। যখন এই কথা ভাবি তখন মনে হয়, মহাভারত কথা তো কেবল বেদব্যাসের রচনা নয়, পুরাণের কাহিনী নয়, ভূগোলের সীমানা নয়, কিন্তু সব মিলিয়ে আজও তা ভারতবর্ষের মহাকাশকে পরিব্যাপ্ত ক'রে রেখেছে, পলে পলে, তিলে তিলে সে মহাভারতকথা আজও রচিত হ'য়ে চলেছে, যার টান রক্তে অনুভব ক'রে কত মহাপুরুষ এইসব পথে যাত্রা করেছেন, কত কেদার-বদরী মন্দির কত জ্যোতির্মঠ রচিত হয়েছে, আবার কত মহাপুরুষ আছেন যাঁদের যাত্রার কোন চিহ্নই তাঁরা রেখে যাননি, তবু তাঁদের মহিমায় এই সব যাত্রাপথ উদ্ভাসিত হয়ে রয়েছে। সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন হয়, ইতিহাস তার সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করে রাখে, এই কাশ্মীরে একদিন মহারাজ অশোকের সাম্রাজ্য প্রসারিত হয়েছিল, তিনিই নাকি শ্রীনগর শহরের প্রথম সূচনা করেন। তাঁর শিলালিপি নাকি মানসেরা এবং অন্যত্রও পাওয়া গিয়েছে, তারপর এককালে কুশান সাম্রাজ্য সারনাথ থেকে শুরু করে কাশ্মীর গান্ধার ছাড়িয়ে খোটান অবধি বিস্তৃত ছিল, কিন্তু সেসব কথা তুলছিনে। তার চেয়েও বিস্ময়ের সঙ্গে ভাবি সেই অদ্ভুত সন্ন্যাসীর কথা, মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে যাঁর গুহা-প্রবেশ হল, অথচ সেই স্বল্প সময়ের মধ্যেই কি অমিত-বীর্যে অদম্য তেজে তিনি পদব্রজে সমস্ত ভারত পরিক্রমা করলেন, ব্রাহ্মণ্যধর্মের আবার ঘটলো অভ্যুদয়, অদ্বৈতবাদের হল প্রতিষ্ঠা, ভারতের চতুঃসীমায় রচিত হল চার মঠ—সেই সন্ন্যাসী এই সুদূর সীমান্তে এসেও প্রতিষ্ঠা করলেন তাঁর মহিমা। ডাল লেকের ধারে তখত-ই-সুলেমান পর্বত, তার মাথার উপরে শঙ্করাচার্যের মন্দির, রাত্রে সে মন্দিরচূড়ায় আজও প্রত্যহ আলো দেয়, তারাখচিত মহাকাশের সুগম্ভীর শান্তির নীচে রজতসন্নিভ মহাদেব পাহাড়ের সামনে সে আলোর শিখা আজও অম্লান জ্বলে। সেই যুগ থেকে এ যুগ পর্যন্ত কত পট বদল হয়েছে, কিন্তু সেই মহারহস্যের আকর্ষণে অগণিত মানুষ এই পথের যাত্রী হয়েছে। আরও এক দিব্য দীপ্ত সন্ন্যাসীর কথা মনে পড়ে। এঁরও তো চল্লিশ বছর বয়সে দেহত্যাগ হয়েছিল, কিন্তু তারই মধ্যে ইনিও কি অমিত তেজে সারা ভারতকে মথিত করে গিয়েছেন, এমন কি য়ুরোপ-আমেরিকাতেও তুলেছেন তরঙ্গ। সেই অদ্বৈতপন্থার নবতম পথিক বিবেকানন্দও তো এই প্রত্যন্ত সীমায় এসে ক্ষীর-ভবানী অমরনাথ দর্শন করে গিয়েছেন। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে আরও কত মহাপথিক এই পথের যাত্রী হয়েছেন, কত তান্ত্রিক শৈব উপাসনার ছাপ রয়ে গিয়েছে। তেমনি ইতিহাসের কথাও মনে আসে। অশোক কুশানের পর কতকাল কেটে গেল, দিল্লীতে পট পরিবর্তন ঘটেছে, মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা। সম্রাটশিল্পী শাহজাহান আগ্রার কেল্লা রচনা করেছেন, তাজমহল গড়ে উঠছে, তারপর গড়ে উঠল দিল্লীর লালকেল্লা, তাতে রুপোলি চাঁদোয়া মতির ঝালর, দেওয়ানি খাসে মণিমুক্তার ঝলক, তার মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে নহর-ই-বেহেস্ত, গোলাপ জলের ফোয়ারা, মর্মর-প্রাঙ্গণে নর্তকীদের নৃত্যভঙ্গী শীশ-মহলের হাজারো আয়নায় ঝলকে উঠছে, ময়ূর সিংহাসনে বসেছেন শাহান শাহ, ফুলের গন্ধে আতরের সুবাসে বাতাস ভারি, সত্যিই মনে হয়,—

অগর ফির্ দৌস্ বররুয়ে জমিনস্ত্।
হামিনস্ত্ উয়ো হামিনস্ত্ উয়ো হামিনস্ত্॥

সেই শাহজাহান চললেন কাশ্মীরে, গড়ে উঠল ডাল লেকের পাশে পাশে অপূর্ব বাগান, শালিমার নিশাতবাগ চশমশাহী। সুনীল মানসবল হ্রদের উপর রোশেনারা রচনা করলেন তাঁর নিভৃত স্নানের নিকেতন—ঝরোখা। আজ সেই ঝরোখা আর নাই, আচ্ছাবলে নূরজাহানের হামাম ভেঙে পড়েছে, কিন্তু গন্ধভারে ভারি বাতাস আজও শালিমার নিশাতবাগে সেই অতীত যুগের সৌরভের রেশ বহন করে।

এখানে এসে আরও একটা জিনিস খুব চোখে পড়ছে। দার্জিলিং বা তার ভিতরে পাহাড়ে গেলে চোখে পড়ে মহাচীনের ছায়া স্থাপত্যে, পোষাকে, দেহ-গঠনে, আর হিমালয়ের এই সীমায় এলে চোখে পড়ে মধ্য এশিয়ার ছায়া। মোগল সাম্রাজ্যও যখন সুদূরভবিষ্যতের গর্ভে সেই সুপ্রাচীন অতীতেও ব্যবসা চলত তাশকন্দ-ইয়ারকন্দ-খোটান থেকে পাহাড় পার হয়ে ভারতবর্ষ পর্যন্ত। ঝিলম নদীর সপ্তম ব্রিজের কাছে শ্রীনগরে ইয়ারকন্দি সেরাই আছে, ইয়ারকন্দের ব্যবসাদারেরা প্রতি বছর ব্যবসা করতে এসে সেইখানে আশ্রয় নিত। কাশ্মীরে এই যে ক'বছর লড়াই চলছে মাত্র সে ক'বছর তারা আসেনি।

কিন্তু কাশ্মীরের বিখ্যাত চেনার গাছ হল পারস্যের আদিম অধিবাসী, সেখান থেকে এদেশে তা আমদানী হয়েছে। সেইরকম লতানো গোলাপবীথির তলা দিয়ে কুঞ্জবনের পাদচারণাপথ। আর তেমনি ফলের প্রাচুর্য। শিল্পকর্মে স্থাপত্যে গালিচার কাজে ভারতীয় রূপরেখার ধারে ধারে বয়ে চলেছে মধ্য এশিয়ার, বিশেষতঃ ইরাণের ধারা। মহাভারত কথার এও তো একটা অংশ—যার মধ্যে অঙ্গীকৃত ও অঙ্গীভূত হয়ে আছে এশিয়ার ছায়া, চীন হতে ইরাণ পর্যন্ত। আজ হয়তো আমাদের জীবনে এই বিরাট ইতিহাসের পরিব্যাপ্তি নেই। কিন্তু যখন সেই সীমানা ছাড়িয়ে এই বিরাট ইতিহাসের ক্ষণিক দর্শনও আমরা পাই তখন তার বিরাট ঐতিহ্যভার ও ব্যাপক আহ্বান রোমাঞ্চিত বিস্ময়ের সঙ্গে স্মরণ করি। (ক্রমশঃ)

মাতৃদেবীর সঙ্গে শ্রীক্ষেত্রধাম

শ্রীআশুতোষ মিত্র

নাট্য-সম্রাট গিরীশচন্দ্র ঘোষের বসুপাড়া লেনস্থ বাটীর সম্মুখে মাতৃদেবী তখন এক ভাড়াটিয়া বাটীতে থাকিতেন। যোগীন মহারাজ (স্বামী যোগানন্দ—ঠাকুরের ভক্ত) নীচের একখানি ঘরে থাকিয়া শ্রীমার সেবাকার্য চালাইতেন। তাঁহার অসুখ করায় কলিকাতার প্রসিদ্ধ বিপিন ডাক্তার ও শশী ডাক্তার এবং শ্যামাদাস কবিরাজ দেখিতে থাকেন। দীক্ষিত হইবার জন্য মঠ হইতে ফুল বিল্বপত্র লইয়া ভক্ত আসিয়া উপস্থিত হন। যোগীন মহারাজ তাহাকে দেখিয়া আনন্দিত হইয়া বলেন—যা যা শিগ্‌গির উপরে যা মা এখনি পূজায় বসিবেন। ইহা শুনিয়া ভক্তটি মাতৃসমীপে গিয়া উপস্থিত হন। মা তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন—মন্ত্র নেবে কি? উত্তরে সে হাঁ বলিলে তিনি তাহার হাত হইতে ফুল লইয়া তাহাকে অপেক্ষা করিতে বলেন। ইতাবসরে নিজে ঠাকুরের পূজাদি সারিয়া লন। পরে তাহাকে নিজের নিকটে ডাকিয়া লইয়া এবং একখানি আসনে বসিতে বলিয়া জিজ্ঞাসা করেন—তুমি ঠাকুরকে দেখেছ কি? উত্তরে সে বলিল—হাঁ মা তখন তিনি শ্যামপুকুরের বাড়ীতে ছিলেন আর পাড়ার যত মেয়েরা তাঁহাকে দর্শন করিতে যায় সেই সঙ্গে আমিও আমার গর্ভধারিণীর কোলে যাই। তখন আমার বয়স পাঁচ বৎসর।

তিনি তোমায় দেখে শিকে থেকে আঙ্গুল বাড়াইয়া একটি নারকেল নাড়ু তোমায় দিতে ইশারা করেন। কে দিয়েছিল তা জান কি?

ভক্ত—হাঁ মা সে তো একটি স্ত্রীলোক।

তিনি বলেন সে আমি।

ভক্ত—আপনি!

মা—তুমি শ্রীক্ষেত্রে গিয়েছিলে আর জগন্নাথদেবের দিকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছিলে। আর মন্দিরশুদ্ধ লোক চীৎকার কোরে বলে ওঠে এ ছেলের দর্শন হয়েছে।

ভক্ত—হাঁ মা তখন আমি আমার দাদার কাঁধে ছিলাম। ঠাকুর আমাকে ডেকেছিলেন আমিও তাঁহাকে ডেকেছিলাম। আপনি জানলেন কি কোরে?

শ্রীমা—আমি ছিলাম।

দীক্ষার পর্ব শেষ হইল।

ইহার কিছুদিন পরেই যোগীন মহারাজের দেহান্ত হইল। শ্রীমা ঐ বাড়ীতে থাকিতে পারিলেন না। ভক্ত যোগীন মহারাজের অদর্শনে ব্যথিত হইলেন। অবশেষে রামের মা (ঠাকুরের একান্ত ভক্ত বলরামবাবুর বিধবা স্ত্রী) এবং নিতাইয়ের মা (বলরামবাবুর বিধবা ভ্রাতৃবধূ) আসিয়া মাকে তাঁহাদের পুরীর বাটীতে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিলেন। সেই সঙ্গে শ্রীমা ঐ নব-দীক্ষিত ভক্ত এবং দেশ হইতে শ্রীমার খুড়তাত, দিদিমা ও ছোটমামী ও তাঁহার শিশুকন্যা, মেজমামা তাহার শ্বশুর, নটীর মা (কথামৃত প্রণেতা শ্রীম'র স্ত্রী) ইত্যাদি কয়েকজন তাঁহার সঙ্গে পুরীতে বলরামবাবুর বড় দাঁড় (বড় রাস্তার অর্থাৎ মন্দির সংলগ্ন রাস্তার) ক্ষেত্রবাসীর মঠ নামক বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে ঠাকুরের ভক্ত গৌরীমা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রামের মা ও নিতাইয়ের মা প্রায় প্রতিদিন এই বাড়ীতে তাঁহাদের সমুদ্রতীরস্থ বাড়ী হইতে আসিতেন এবং শ্রীমার সঙ্গে জগন্নাথ মন্দিরে যাইতেন। প্রথম দিন সকলের পূর্বে ঐ নব-ভক্তটিকে শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে রত্নবেদীতে লইয়া গিয়া শ্রীমূর্তিকে দেখাইয়া বলেন—দেখ গুরু আর ইষ্ট একত্রে দেখতে হয়। সে তাহা পালন না করিয়া তাঁহারই দিকে দেখিতে থাকিল। তারপর অপর সকলকে একে একে দেখাইল। কয়েক দিন পরে ভক্তকে জিজ্ঞাসা করেন—তুমি আমার দিকে কেন তাকিয়েছিলে? তোমাকে যাহা বলিলাম তাহা করিলে না কেন? সে উত্তরে বলে আমার মাকেই তো জানি। মা আর ছেলে। শ্রীমা হাসিয়া বলেন—মা আর ছেলে, মা আর ছেলে। পরে প্রায়ই কথাপ্রসঙ্গে মা ঐ ভক্তটিকে বলিতেন তুমি আমাকে জীব বার করা থেকে বাঁচিয়েছ। একবার ভগ্নী নিবেদিতা মাকে বলেন—"মা ঠাকুর আমাদের শিব আর আপনি আমাদের কালী।"

দ্বিভাষীরূপী ঐ ভক্তটির মুখে শুনিয়া হাসিতে হাসিতে উহাকে দেখাইয়া শ্রীমা বলিলেন—ওই আমাকে বাঁচাইয়াছে। ইশারায় তাহাকে মা আর ছেলে কথাটি বুঝাইতে বলিলে ভক্তটি নিবেদিতাকে বুঝাইয়া দিলেন। নিবেদিতা শুনিয়া হাসিলেন। তাহাকে দেখিলেই তিনি বলিতেন—মা আর ছেলে—মা আর ছেলে।

ব্যবসা-বাণিজ্য

লাক্ষা

শ্রীঅশ্বিনীকুমার

লাক্ষা কীট থেকেই লাক্ষা তৈয়ারী হয়

বিরহের তাড়নায় মানিনীর পদযুগলকে অলক্তরাগে রঞ্জিত করবার আকাঙ্ক্ষাই হয়ত সেকালের আর্যপুত্রদের লাক্ষা আবিষ্কারে প্রেরণা দিয়ে থাকবে। কবে যে লাক্ষা আবিষ্কৃত হয়ে অলক্ত ও রঞ্জনী তৈরিতে প্রথম ব্যবহৃত হয়েছে, তার নজীর ইতিহাস বহন না করলেও বহু যুগ ধরে ভারতে যে লাক্ষা দিয়ে আলতা, ক্ষৌমবস্ত্র রাঙানোর রঞ্জনী, খেলনা, চুড়ি ইত্যাদি তৈরি হয়ে ললনাদের অঙ্গে শোভা পেয়ে আসছে তা ঠিক। আজও যখন রেকর্ডে "তুমি আমি দুজন প্রিয়" বেজে উঠে মনকে উচ্চকিত করে তোলে, তখনও কি মনে পড়ে যে, এই আনন্দ পরিবেশনে মূক লাক্ষা-কীটের অবদান কতখানি? সত্যি কত সৌখীন জিনিসই না লাক্ষাকীটপ্রসূত গালা ও তাদের জীবনের বিনিময়ে তৈরি হয়। আলতা, রেশমী বস্ত্রের রং, মূল্যবান আসবাবপত্রের বার্নিশ, খেলনা, চুড়ি, হাতীর দাঁত প্রভৃতি শিল্পে ও বার্নিশ তৈরি করতে, গ্রামোফোন রেকর্ড, নকল হাতীর দাঁতের জিনিসে, লিথোগ্রাফিক কালিতে, শীলমোহর, অয়েলক্লথ, মায় বর্তমান যুগের বৈদ্যুতিক যন্ত্রের ইনসুলেটর, প্লাপনেল, বিস্ফোরক প্রভৃতি তৈরি করতে লাক্ষা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কৃত্রিম রং ও নানা রকমের নকল জিনিসের আবিষ্কারে লাক্ষার আদর কিছু কমে গেলেও বর্তমানে তার চাহিদা মন্দ নয়।

লাক্ষার ব্যবসা এককালে ভারতেরই একচেটে ছিল। আর সেই ব্যবসায়ে আয়ের অংকও ছিল মোটা। তবে ভারত থেকে ব্রহ্মদেশ বিচ্ছিন্ন হবার পর আমাদের একচেটে অধিকারে ব্রহ্মের কিছু হস্তক্ষেপ হয়েছে। তাহলেও আমাদের দেশের আব-হাওয়া ও কুসুম, কুল, পলাশ, পাকুড়, শিরিষ, যজ্ঞডুমুর প্রভৃতি বনসম্পদে আধিক্য ও সহজপ্রাপ্যতা লাক্ষা চাষের খুবই অনুকূল। এই সব গাছে স্বাভাবিক অবস্থায় লাক্ষার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। আসামে আবার অরহর ডালেও লাক্ষা হয়ে থাকে। এদের মধ্যে কুসুম, কুল, পলাশের লাক্ষাই বিশেষ মূল্যবান। লাক্ষাকীট রক্তবর্ণের খুব ছোট ছোট পোকা। এদের মুখে সূঁচের মত তীক্ষ্ণ ছোট শুঁড় থাকে। কুল, কুসুম, পলাশ প্রভৃতির কচি কোমল ডালে শুঁড় চালিয়ে এরা রস খায় ও বংশ বৃদ্ধি করে। গালার আবরণ কচি ডালের ওপর জমে পুরু ও শক্ত হয়ে ওঠে। এই আবরণ চেঁছে নিয়ে শোধিত হলে 'শেলাক' বা গালা হয়।

সরস জমির গাছপালাতেই লাক্ষা ভাল হয়। যেখানে পরিমিত বৃষ্টিপাত হয় (প্রায় ৩০"—৪০" মত) এবং যে জায়গা নাতি-শীতোষ্ণ, সেই জায়গাই লাক্ষা চাষের উপযুক্ত। বেশি শীতেও যেমন লাক্ষাকীট বাঁচে না, আবার বেশি গরমেও তাদের আবরণী গালা গলে হাওয়া ঢোকবার ফুটো-গুলো বন্ধ হয়ে পোকা মরে যায়।

লাক্ষা বছরে দুবার উৎপন্ন হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে গাছে কীট লাগিয়ে কার্তিক মাসে যে
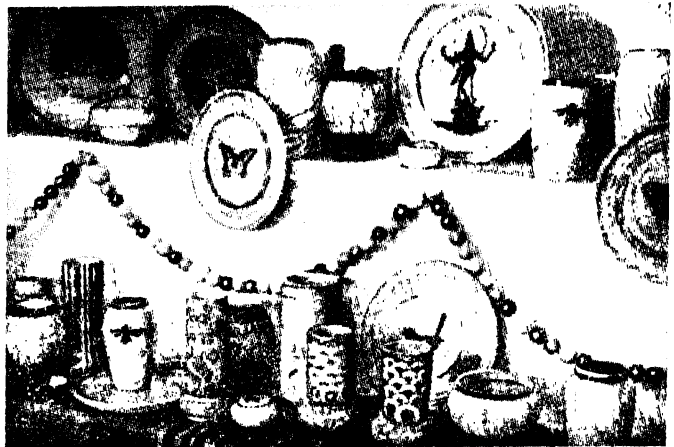
লাক্ষার তৈরী রকমারী সৌখীন জিনিস

লাক্ষা দিয়ে রেকর্ড থেকে শুরু করে বাটি, গেলাস, থালা পর্যন্ত তৈরী হয়

লাক্ষা পাওয়া যায়—তাকে 'কাংকী' বা 'কার্তিকী' এবং কার্তিক মাসে গাছে বীছন লাগিয়ে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে যে লাক্ষা পাওয়া যায়—তাকে 'বৈশাখী' বলে। 'কাংকী'র চাষে কুলগাছের নূতন শাখা বেরোনোর জন্য ফাল্গুন মাসেই ডাল ছেঁটে দিতে হয়। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে নূতন ডাল বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে বীছন লাগিয়ে দিতে হয়। 'বৈশাখী' লাক্ষার জন্য গাছের ডাল জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে ছেঁটে কার্তিক মাসে নূতন ডালে বীছন লাগাতে হয়।

জীবন্ত লাক্ষাকীটসহ ৮ থেকে ১৪ ইঞ্চি ডাল কেটে বীছন হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। একেই 'বীছন ডাল' বা 'ব্রুড ল্যাক' বলে। ঘাস বা বাঁশের শরু বাঁকারি দিয়ে এই বীছন ডাল কুলগাছের কচি ডালে বেঁধে দেওয়া হয়। যারা এই পরিশ্রমে নারাজ, তারা এক তুড়ি বীছন ডাল নিয়ে কচি ডাল লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দেন। ফলে কিছু বীছন ডাল কচি শাখায় আটকে থাকে, কিছু নীচে পড়ে নষ্ট হয়। বলা বাহুল্য, এতে কাজ হলেও নিষ্কর্মার গঙ্গাকে কাছে পাবার উপায় মাত্র। নূতন কচি ডালে লাক্ষাকীট লেগে গেলে আক্রান্ত ডাল ক্রমেই সাদা থেকে গাঢ় লাল হয়ে ওঠে ও পরে গালার আবরণ জমে মোটা হতে থাকে। ৫।৬ মাস পরে গালা পেকে উঠলে ডাল কেটে নামিয়ে নিয়ে চেঁছে লাক্ষা সংগ্রহ করা হয়। একে 'কাঁচা লাহা' বলে। পুরো-পুরি পেকে গেলে গালার ওপরে ছোট ছোট ফুটো দেখা যায় এবং ঐ ফুটো দিয়ে পোকা আহার্যের খোঁজে বেরিয়ে যায়। একে 'ফুঁকি' লাহা' বলে। এই ফুঁকি লাহা ডাল থেকে চেঁছে নেওয়া হয়। যাঁরা সাবধানী ও সঞ্চয়ী, তাঁরা বীছন ডাল থেকেও পোকা বেরিয়ে যাবার পর ঐ বীছন ডাল নামিয়ে নিয়ে লাক্ষা চেঁছে নেন। প্রথম বাজারে কিছু চড়া দাম পাবার আশায় অনেকে আবার ফুঁকি হবার আগেই পোকা-সহ লাক্ষা নামিয়ে বাজারে বিক্রি করে থাকেন। কুসুম গাছের লাক্ষা বীছন খুব তেজী এবং কুল ও পলাশের ওপর চাষ করে এদের থেকে ভাল বীছন পাওয়া যায়। কিন্তু তাই বলে বেশিবার কুসুম গাছের বীছন নেওয়া উচিত নয়।

একজন চাষী দুটো কুলগাছ থেকে বছরে অনায়াসেই এক মণ লাক্ষা পেতে পারেন। গত বছর লাক্ষার মণ বাজারে আশি টাকা করে বিক্রি হয়েছে। আমাদের চাষীরা দুটো চারটে কুলগাছ রেখে লাক্ষার চাষ করে সহজেই বছরে একটা বাড়তি আয়ের পথ করতে পারেন।

ডাল থেকে চেঁছে যে লাক্ষা পাওয়া গেল, তাকে প্রথমে পিষে চালুনিতে ছাঁকা হয়। এতে অনেকটা আবর্জনা বেরিয়ে যায়। এই ছাঁকা লাক্ষাকে বলে 'বিউলী'। বিউলী আবার খুব মিহি করে পিষে মেটে গামলায় পা দিয়ে মাড়িয়ে জল দিয়ে তিনবার ভাল করে ধুয়ে নিতে হয়। এতেও কিছুটা ময়লা ও তার সঙ্গে রং বেরিয়ে যায়। এই ধোয়া জল দিয়েই আলতা বা লাল রঞ্জনী তৈরি হয়। ধোয়ার পর লাক্ষার রং অনেকটা মশুর ডালের মত দেখতে হয়। একে 'চৌরী' বলে। চৌরী শুকিয়ে আবার কুলোয় ঝেড়ে ফেলা হয়। তারপর একসঙ্গে হরিতালের খুব মিহি গুঁড়া জলে গুলে মেশাতে হয়।

শ্রীনিকেতনের তৈরী লাক্ষার খেলনা

প্রতি চৌরীতে হরিতালের ভাগ একপোয়া কে আধ সের পর্যন্ত হতে পারে। এই শনের ফলে গালার রং ঠিক সোনার মত হয়। এর পর ২০।৩০ ফুট লম্বা ও ২।২ই ইঞ্চি চওড়া দোহার কাপড়ের থলেতে ঐ শোধিত চৌরী পুরে পাঁচ ফুট লম্বা বিশেষ ধরণের চুলায় গরম করা হয়। কাপড়ের ভিতর দিয়ে গরম গালা চুঁইয়ে বেরোতে থাকে। দুই থেকে আড়াই হাত লম্বা ও দেড় হাত বেড়বিশিষ্ট গরম জলপূর্ণ দুই মুখ আঁটা একটা চিনেমাটির পিপের ওপর ঐ তরল গালা হাতা বা 'চার্না' দিয়ে ঢালা হয়। তারপর ঐ গালাকে টেনে পাতলা চাদরের মত করে ফেলা হয়। এই গালাই সব চাইতে দামী শেল ল্যাক। ঐ গালার চাদর ভেঙেচুড়ে কাগজের বাক্সে বিদেশে রপ্তানি করা হয়ে থাকে। এছাড়াও নানা রকমের গোল বা চাকতী লাহাও তৈরি করা হয়। কাপড়ের থলেতে যে লাহা থেকে যায়, সেগুলো বড় কড়াতে গরম জলে সিদ্ধ করে বার করে নেওয়া হয়। একে 'কিরি' বলে। এই কিরি দিয়েই খেলনা, চুড়ি, স্যাকরার চাঁচ, শিলমোহরের গালা প্রভৃতি তৈরি হয়। আর তারই ওপর গড়ে ওঠে আমাদের জীবনের নানা মান-অভিমান, খেয়াল-খুশির জটিল মামলা।

পলাতক

অরুণ গুপ্ত

নির্জন পর্বত আর ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ সমুদ্রের দেশে
পলাতক কটা দিন। ক্লান্ত মন জীবনের গান
আর স্বপ্ন সব প্রত্যহের রিক্ততার ঝড়ে ভেসে
গেলে ব্যর্থতার ঝোলা টেনে টেনে। প্রাণের সন্ধান
পাথরের রুক্ষপথে তাই, সমুদ্রের সীমাহীন
ঢেউয়ে ঢেউয়ে অশান্ত গর্জনে। ঢেউ যদি হই আমি
ফেনার মুকুট পরে জ্বলে উঠি, আলোয় রঙীন
হয় রাত্রি, উদ্দাম দুর্বার গতি কোথাও না থামি!

আমি যদি ঢেউ হই ভেসে যাই দূরের আকাশে
গান আর স্বপ্ন আর হাসিতে মধুর হয় মন,
আমি যদি পাখী হই উড়ে যাই দক্ষিণ বাতাসে।
যদি হই ঢেউ, যদি পাখী হই, অন্ধকার কোন
যে ঘরের বন্দী করে, রুদ্ধ করে রেখেছে আমায়
তাকে ভেঙে চলে যাই জীবন আলোর প্রত্যাশায়!

ধূসর স্বপ্ন

আশুতোষ পাল

পৃথিবী তুমিও অন্ধ? মানুষের চোখের মায়ায়
প্রেম-ছলোছলো এক পুষ্টিকর আনন্দ-মদিরা
দেখেছ আলেখ্য আঁকে? অসংখ্য চোখের নীল হীরা
চারদিকে দীপ্তি জ্বালে' সবুজের ধূসর ছায়ায়?
জ্বলন্ত বসন্তরবি ফাগুনের আগুনে জ্বালায়
তোমার শিরার মাঝে; দিকচক্রবালে অটবীরা
দেখেছ কি কালো মেঘে দাগ কাটে? চঞ্চল অধীরা
নীলিমা এসেছে নেমে যৌবনের স্বপ্নকিনারায়?

পুষ্পেতে ভ্রমর নাচে। মনের চাঞ্চল্য দেহমাঝে,
রেখে যায় আনন্দের স্মৃতিমুগ্ধ ক্লান্তির প্রবাহ।
রক্তের উত্তাপে ফুটে গ্রীষ্মের উতলা দাবদাহ—
জীবনের মর্মধ্বনি অনন্তের সুরে সুরে বাজে।
পৃথিবী! তোমার বুকে স্বপ্নের মধুর প্রবাহ,
দেয় কি আনন্দদোলা, প্রাণহীন জড়ের সমাজে?

খারিজ

প্রভাত দেব সরকার

যে-যার এদিক-ওদিক ছিল।

খালের ওপারে জেলখানার ঘড়িতে একটার ঘা পড়তে একে-একে, দুয়ে-দুয়ে দেখা গেল। সময় এগিয়ে আসছে। বোঝাপড়া একটা এই বেলা করে' না নিলে ডাক শুরু হয়ে যাবে। তার পর কার মনে কি আছে কে জানে। দেওয়ানী আদালতের মাঝখানে অশ্বত্থ গাছটার অজস্র শিকড়, শিরটান দাগড়া-দাগড়া। বসতে হ'লে ওর ওপরই বসতে হবে, উবু হয়ে কি থুপি মেরে। কিন্তু কোনটাতেই স্বস্তি নেই। উপায়ও নেই। ভিড়ের মধ্যে এমন নিরিবিলি জায়গাই বা কোথায়! ওদিকে সেরেস্তায় হাট বসেছে, স্ট্যাম্প ভেণ্ডার, জমিদারের তহশিলদার, দালাল, নেঙটি উকিল আর বাজে মাৎফেরেক্কার গুতো-গুতি, হৈ-চৈ। ভাতের হাঁড়িতে ফুট ধরেছে, টগ্-বগ্।

প্রথমে এল বিনোদ ঘুরতে ঘুরতে, একটা শিকড় আশ্রয় করলে। ইজিচেয়ারে বসার ভঙ্গিতে গা এলিয়ে দিলে; ওদের পিছনে পিছনে আর কতো ঘোরা যায়, যা হয় হোক! থাকে থাকবে যায় যাবে।

কোথায় ছিল কে জানে, দেখতে পেয়ে শশিকান্ত গুটি গুটি এগিয়ে এল। একটু তফাতে দাঁড়াল যেন বিনোদের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ পরিচয়ই নেই, ছায়ার লোভে গাছতলায় এসে দাঁড়িয়েছে সে।

দুজনেই চুপ। বিনোদের মুখটা সামনের দিকে খালের ওপারে পথটার ওপর ছবি দেখার ভঙ্গিতে। শশী মুখ করে আছে আদালতের এজলাসের দিকে, দোতলা গৌরমাটি রঙ বাড়িটার দিকে। পাতাল ফুঁড়ে ওঠার মত নেড়া-নেড়া থাম।

বার দুয়েক ডাক হ'লো তারস্বরে ঃ কুসুমকুমারী হাজির! কু-সু-ম্ কু-মা-রী-ী হা-জে-র!! গোলাম আলি সেখ—গোলাম খাঁ গহর জান্—গোলা-ম্ আঁ-আ-লি! স্যা-খ্ খ্—হাজের্!

ও ডাক নয়। এজলাসের ব্যাপার তাদের নয় আর। বাকি খাজনার মামলা তাদের কবে নিষ্পত্তি হয়ে গেছে।

এখন ঘণ্টা বাজবে। নীলামের ঘণ্টা। দুশো নিরা... টাকা তের আনা পাঁচ পাই! মায় খরচা সুদ সমেত। পাঁচ শো তেষট্টি নম্বর জারি।

বিনোদ উবু হয়ে খাড়া হ'লো। খানিক ইতস্তত করে বললে, ওদের খবর কি শশীদা? ওরা কোথায়?

বোধ হয় আহ্বানের অপেক্ষায় ছিল এতক্ষণ শশিকান্ত। এগিয়ে এসে বিনোদের মুখোমুখি বসে বললে, কি জানি অনেক-ক্ষণ দেখছি না। হোটেল ফোটেলে গেচে বোধ হয়।

বিনোদ মুখ শুকিয়ে জিজ্ঞেস করলে, কি রকম বুঝচো শশীদা, নীলেম ডাকবে না, দাবী শোধ করবে?

এতক্ষণ চেয়ে চেয়ে শশিকান্ত বোধ হয় হাল ছেড়ে দিয়েছে, বললে, কি জানি মতলব বোঝা যাচ্ছে না—ট্রেনের কথা এখন খাটে ফেলে দিলে। সহায়রাম এসে জুটেচেন!

বিনোদ চমকে ওঠে। আবার সহায়রাম! তাল হারিয়ে হঠাৎ বলে, কেন?

ওদের ব্যবহারে শশীও বোধ হয় বিরক্ত হয়েছে। বললে, কেন আবার, কাটি দেওয়ার সখ!

বিনোদ করুণভাবে জিজ্ঞেস করে, ওরা কি বলচে? সহায়রাম কি পরামর্শ দিচ্ছে?

কি আর বলবে, তাকে নিয়ে ঘুরচে! ঘন ঘন পান বিড়ি দিয়ে তোয়াজ করচে। যত সব মেড়াকান্ত! সহায়রামের ... শশিকান্ত এতটুকু বিচলিত নয়।

বিনোদ কিন্তু তেমান করুণভাবে জিজ্ঞেস করে, আর কোন কথা হয়নি? এমনি এমনি ঘুরচে।

হয়তো শশী ভাঙে না, নয়তো ঠিক মত বোঝেনি। বলে, কি আর বলবে ঘোড়ার ডিম, ঐ বলে ওদের চরাচ্চে। ওরা যেমন!

বিনোদ বলে, তবু! সহায়রাম ওদের কি বলচে? আইন কিছু একটা বার করেচে। শুধু শুধু ওরা ঘুরচে!

শশী হেসে ওঠেঃ না, শুধু আছে। নাবেস্টার বলচেন, এ নীলেমটা ভুয়ো, কিছু না।

বিনোদের মুখ শুকিয়ে এতটুকু হ'য়ে যায়। আইনজ্ঞ সহায়রামের পরোক্ষ অভয়-বাণীতে সে কোনই আশ্বাস পায় না। বরং আরো যেন ভয় পেয়েছে মনে হয়। বিশুষ্ক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে, ওরা কি বললে শুনে?

কি আর বলবে, লাফালে! সহায়রামকে খাবার খাওয়ালে! সমদর্শীর ভঙ্গিতে শশী বলে।

বিনোদ এবার জিজ্ঞেস করে, ভুয়ো কিসে?

শশী তেমনি হেসে বলে, আইনের সুতো কাটার। সহায়রামের মুখদপ্তরে। সব পার্টির নাম নেই ইস্তাহারে!

উত্তেজনায় বিনোদ বলে, কার নেই? সবাই তো নোটিশ পেয়েছিল!

ভিতরে ভিতরে সহায়রামের পরামর্শটা কিছু কাজ করে কিনা কে জানে। শশী বলে, ওর মধ্যেই গলদ আছে। সরষের ভেতর ভূত আর কি!

বিনোদ কথাটার তাৎপর্য বুঝতে পারে না ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে শশীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। শশী শেখান কথা মুখস্ত বলার মত বলে, গোবিন্দরা চার ভাই, নোটিশ গেচে দুজনের নামে......জমি আছে অমূল্যর নামে নামে নোটিশ পেয়েছে অমূল্য...... সহায়রামের নীলাম খরিদ বেনামে তার নামে কোন নোটিশ নেই! ভুয়ো না তো কি!

বিনোদ আর কিছু জিজ্ঞেস করে না। সহায়রাম লোকটা যাই হোক, বিচক্ষণ—বিপদে ওর বুদ্ধি ক্ষুরধার! কিন্তু তবু—

মাথার ভেতরটা বিনোদের ঝিম্ ঝিম্ করে। একটা ক্রূর সন্দেহ তার মনের মধ্যে পাকিয়ে ওঠে। গত বছর ঐ সহায়রাম তাকে কম বেগ দেয়নি। তিন আনির নালিশে ডিক্রীর সব টাকাটা তার ঘাড় দিয়ে আদায় করেছিল। দাবী শোধের পরামর্শ দিয়ে শেষ পর্যন্ত নিজেই বেনামে মাসতুত ভাইএর নামে নীলাম ডাকিয়েছিল। বাঁচতে বিনোদকে ঊনত্রিশ দিনের দিন হালের গরু বিক্রী করে টাকাটা জমা দিয়ে যেতে হয়। তার ঘা শুকতে না শুকতে আবার এই। সহায়রামকে আর কোন বিশ্বাস নেই। লোকটা জালিয়াত, মৎলববাজ! কাকের চেয়ে সতর্ক, শেয়ালের চেয়ে ধূর্ত, সাপের চেয়ে সাংঘাতিক।

বিনোদের দাঁতে দাঁত ঘসে যায়, চোখ দুটো শরসন্ধানের মত তীক্ষ্ম হ'য়ে ওঠে।

শশী অত কিছু লক্ষ্য করে না। বলে, যাই বল লোকটার বুদ্ধি আছে। গাড়িতে কি ভয়টা আমাদের হয়েছিল ভাব দিকি!

বিনোদ নির্লিপ্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, তুমিও এই দলে নাকি! নীলেম ডাকবে না? জমিদারের খাস হবে?

নিজের ব্যবহারের অসামঞ্জস্যটা শশীর হঠাৎ খেয়াল হয়। আমতা আমতা করে বলে, না, তা ঠিক নয়। তবে কি জান একলা অত টাকা! ক' কাঠাই বা জমি আমার!

বিনোদ রেগে বলে, বুঝেচি। তুমিও ঐ দলে যাও! আমি একলাই ডাকবো! দেখি সহায়রাম তোমাদের কি ক'রে বাঁচায়!

শশী বিচলিত হয়। বলে, আ, রাগ করচো কেন! একটা কথার কথা বলচি! ক্ষেপেচো, আবার সহায়রামের দলে যাই! আমাদের যা কথা হয়েছিল গাড়ীতে আসতে আসতে—

বিনোদ বিকৃত স্বরে বলে, কথার কি মর্যাদা থাক্‌চে! গোবিন্দ কি বলেছিল মনে নেই!

শশী মাথা নাড়লে। এখানে কথার কোন মান্য নেই। ট্রেন থেকে নেমে খাল পার হ'য়ে পরস্পর পরস্পরকে ভুলে যায়। একটু ফাঁক পেলে নীতিজ্ঞান, মানবিকতা, ন্যায়-অন্যায় বোধ উধাও হয়। ভাইকেও ছাড় নেই, দু' তিন নম্বর হ'য়ে যায়। দক্ষিণের ধারাই এই। না হ'লে ঐ হোতা আলিপুর আর হেথায় ডায়মণ্ডহারবার চলছে কি করে? ফৌজদারী কটা, সবই সিভিল সুট! তিনটে চারটে হাকিমে হিমসিম খেয়ে যায়। উকিলকে চার-গণ্ডা পয়সা দিলে আর্জি পেশ করে দেয়।

বিনোদ বললে, ওদের ডেকে আন, যা হয় স্পষ্ট বলুক। সময় আর কই।

ঘাড়মুড়ে শশী উঠতে উঠতে জিজ্ঞেস করলে, ওকালৎনামা কাকে দেবে! প্রফুল্ল-বাবুকে?

বিনোদ নিরুৎসুক কণ্ঠে বললে, যাকে হয় দেওয়া যাবে। আগে ওদের ডাক তো!

শশী উঠে যেতে বিনোদ উঠে দাঁড়াল। এদিক-ওদিক চেয়ে দেখলে। কোর্টরুমের ডানহাতি টিনের চালাটা ঘোমটা দেওয়া কুলবধূর মত নীরব। কতক্ষণ পরে সরব হয়ে উঠবে জায়গাটা—নীলামের ঘণ্টা এখানে বাজবে! কুলবধূর রণচণ্ডী মূর্তি!

শূন্য দৃষ্টিতে এদিক ওদিক চাইতে চাইতে কেমন যেন বিমনা হয়ে পড়ে বিনোদ। তার মাত্র বাইশ কাঠা জমি, তার জন্যে এত মানসিক পরিশ্রম পোষায় না—শরীরেও বয় না। যতখানি রক্ত খরচ হয়েছিল মাটিটা কিনতে, তার বিশ গুণ রক্ত যেন শুকিয়ে যাচ্ছে তাকে রক্ষা করতে। বরাবর খাজনা দিয়েও রক্ষে নেই, জমিদার ছাড়ে না—আর পাঁচজনের বাকি খাজনার দায়ে তাকে শুদ্ধ জালে জড়ায়। রামের বকেয়া হরির ওপর দিয়ে উসুল করে। এই বিচার, এই নিয়ম!

চোখে জল আসে বিনোদের। ভাগ্যে তার মাটি নেই, মৃত্যুকালে বুকে মাটি নেওয়া ছাড়া। জ্যান্তে মাটি ভগবান তাদের জন্যে সৃষ্টি করেননি। তার অন্তর্যামী যদি বুঝতো তা হ'লে আজ এ অবস্থা করতো না, এর একটা বিহিত করতো। গতর খেটে যে জমি অর্জন করলে অইনের ফাঁকে তা চলে যাবে!

আকাশে মুখ তুলে শূন্য বায়ুমণ্ডলে নিজের দীর্ঘশ্বাস মিশিয়ে দিয়ে বিনোদ তার দেবতাকে সাক্ষী মানলেঃ তুমি দেখো ভগবান! ঐ সামান্য জমিটুকু আমার যেন থাকে! সহায়রাম যেন ছোঁ না মারে। শুধু এতটুকু মাটি!

তারপর গাছতলা থেকে সরে বিনোদ গুটি গুটি বার লাইব্রেরীর দিকে এগোয়। চেনাশোনা উকিল কাউকে যদি পায় একবার জিজ্ঞেস করে দেখবে, সহায়রামের পরামর্শটা ঠিক কি না! নাম বাদে নীলেম রদ হয় কি না।

বার লাইব্রেরী ফাঁকা। যে দু' একজন আছেন তাঁরা দিবা নিদ্রা দিচ্ছেন, খবরের কাগজটা বুকের ওপর খোলা, মাথাগুলো লটকে আছে চেয়ারে। মনেই হবে না, বাইরের অত ঢেউ- অত ছোটাছুটি, হাঁটা-হাঁটি, হা-হুতাশ!

ঘরটা এখন কে-কার অবস্থা! বিনোদ চেয়ে দেখলে উঁকি মেরে চেনামুখ পায় কি না। না, কেউ নেই।

আবার গাছতলায় ফিরে যাবার জন্যে বিনোদ বেরিয়ে এল। দেড়টা বেজে গেছে;

আর কতক্ষণ, নীলেম চড়লো বলে! মনে মনে বিনোদ বোধ হয় খুসীই হয়—না-দেখা হয়েচে ভালই হয়েচে! নিদেন কালে আর পরামর্শের দরকার কি! হয় দাবী শোধ, না হয় নীলেম ডাকা, না তো জমিদারের খাস! স্বত্ব, স্বামিত্ব চলে যাবে! যাক্।

ত্রস্ত পায়ে বিনোদ এগোয়। দূর থেকে চোখ দুটো তার সন্ধানী হয়ে ওঠে—এজ্‌-লাসের ওধারে একটা চেনা মুখ দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, ধীরেনবাবু তো! এ কোর্টের নামকরা উকিল।

বিনোদ সামনে এসে দাঁড়াল—ধীরেন উকিল বড় ব্যস্ত—দাঁড়িয়ে আছেন কি চলছেন ঠিক বোঝা যায় না তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আক্ষেপে। স্তিমিত চোখে আইন-এর কালিমা, ওষ্ঠাগ্রে ফেপে-ওঠা বুদ্ধির ঘর্ষণজনিত কালশিরার দাগ। কুব্জ-পৃষ্ঠের অদৃশ্য কিসের বোঝা! আট্ টাকা ফিস্ ধীরেন উকিলের এই মফঃস্বল সদরে!

বিনোদ নমস্কার করতে চোখ ঘুরিয়ে চাইলেন তিনি। ঠিক চিনেছেন এমনভাব করলেন না কিন্তু।

আশপাশে যারা দাঁড়িয়ে ছিল তাদের উদ্দেশ্য করে কথা বলতে লাগ্‌লেন।

ঠিক আছে! দিন আমি করে নেব!...... আরে বাপু অতো তাড়া হুড়ো করলে হয় ......একে বলে আইনএর খেলা, পাকা ঘুঁটিও কাঁচিয়ে দেওয়া যায়। ধৈর্য ধর, লেগে থাক, তোমায় মারে কে!...মনে করো পাক খুলতে খুলতে সুতোর জট পাকিয়ে গেচে, কি করবে এলোপাথাড়ি টানাটানি করবে, না, মাথা ঠাণ্ডা করে খুঁট ধরে চেষ্টা করবে। বললেই হ'লো হার' কোন শালা বলে হার, যতক্ষণ তুমি নিজে না হার স্বীকার করচো......একি লাঠিবাজি! এ বুদ্ধির কসাকসি!......তা হবে বৈকি, আর একটু হবে!

বিনোদ পা ঘসলে। যাকে উদ্দেশ্য করে ধীরেন উকিল সান্ত্বনা বাক্য উচ্চারণ করলেন সে বেচারার মুখ চূণ মনে হয় অন্ত্রের যন্ত্রণায় লোকটি ভুগছে।

তাকে ছেড়ে ধীরেনবাবু একে ধরলেন, কি খবর?

আপনার কাছে। একটা কথা—বিনোদের কথা জড়িয়ে যায়। যেন কত অপরাধ করেছে সে এখানে এ সময় এসে।

ধীরেনবাবু বিনা ভূমিকায় বাঁ হাতটি বাড়িয়ে দিয়ে, চোখ দুটো কুঞ্চিত করে' বললেন, বল। কি, শুনি।

ইঙ্গিতটা বুঝলেও বিনোদ খেয়াল করলে না। মড়া বার করবার আবার পরামর্শ, তার জন্যে আবার দক্ষিণা! কাচুমাচু মুখে বিনোদ হেসে দিলে। ধীরেনবাবুর চোখ দুটো সহসা জ্বলে উঠলো, পুরু ঠোঁট দুটো নিঃশব্দ চীৎকারে বিনোদের বাপান্ত করলে।

আমতা আমতা করে বিনোদ বললে, আজ সেই জমাটায় নীলাম আছে।

ধীরেনবাবু পূর্ব মক্কেলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমি আছি ঘাবড়াবার কিচ্ছু নেই! এখানে ডুবলে আলিপুরে টেনে তুলবো, পয়সা যোগাড় কর!

বিনোদ চিঁচিঁ করলে, জগমোহনের জমা! ঈশ্বরী মৌজায়, ডাক রসুলপুর, উনিশ খতিয়ানের অন্তর্ভুক্ত, তিন শ' উনপঞ্চাশ দাগে, সালিম......

ধীরেনবাবু নির্বিকার কণ্ঠে বললেন, নীলেম তা হ'য়েচে কি! তোমার কিছু আছে?

বিনোদ উৎসাহ পেয়ে বললে, আজ্ঞে গত বছর ছানির মামলাটা আপনাকে দিয়ে করিয়েছিলুম।

ধীরেন উকিলের গোঁফ নেই। কামান-মুখে পাটোয়ারের হাসিটা মুহূর্তের মধ্যে মিলিয়ে যায়। বললেন, তারপর? তাড়াতাড়ি বল!

বিনোদ কি বলবে ভাবতে পারে না। তারপর আর কি? সে ভ্যাবাচাকা খেয়ে যায়। বাড়ান হাতে কিছু দিয়ে দিলেই হ'তো! তাকে তা হ'লে জবাব খুঁজতে হতো না।

ধীরেনবাবু পিছন ফিরলেন। এগোলেন সঙ্গের দলটিকে নিয়ে। বিনোদকে তাঁর নিঃসন্দেহে কোনই প্রয়োজন নেই।

পিছন থেকে বিনোদ আর্তকণ্ঠে বললে, বাবু, এ নীলেম রদ করা যায় না?

ধীরেনবাবু ফিরেও তাকালেন না, বোধ হয় তাঁর সশ্লেষ হাসি শোনা গেল। পরামর্শ এমনি হয় না, পয়সা চাই। সকলে সহায়রাম নয়! বাইশ কাঠা জমি কেনা থেকে এ পর্যন্ত ক' পয়সা দিয়েছো তুমি উকিল মোক্তারকে! ভূম্যধিকারী এমনি হওয়া যায় না! ভূস্বামী তো দূরের কথা!

ইতিমধ্যে অশ্বত্থতলায় ওরা সবাই এসে জড় হয়েছে। কি যেন আলোচনা চলছে। সহায়রাম হাত নেড়ে, গা নেড়ে, মাথা চেলে আইন বোঝাচ্ছে। এ সময় সহায়রামকে না দেখলে 'নখদর্পণের' যথার্থ অর্থ উপলব্ধি করা যাবে না। গোবিন্দ, ভূতনাথ, জয়রাম, তারাদাস, শরৎ একেবারে থ। জমিদারের ল' ক্লার্কও এসে জুটেছে।

বিনোদকে আসতে দেখে সহায়রাম চোখ টিপ্‌লে। মনে হ'লো, আলোচনাটা সবাই চেপে গেল বিনোদকে দেখে।

কথা পেড়ে গোবিন্দ বললে, তা হলে আজ কেবল ডবল ফি দিয়ে জারির কপিটা নেওয়া হোক। জমিদার যা পারে করুক, সবাইকে যখন পক্ষ করেনি তখন—

ল ক্লার্ক অভয়পদ একটু তফাতে সরে দাঁড়াল। কি জানি কেউ যদি আমার এ নামে কিছু লাগায়। জমিদারের লোক হয়ে প্রজাদের এমন পরামর্শ সে দিতে পারে না। তা ছাড়া' টাকা আদায়ের যখন এই সুবিধা
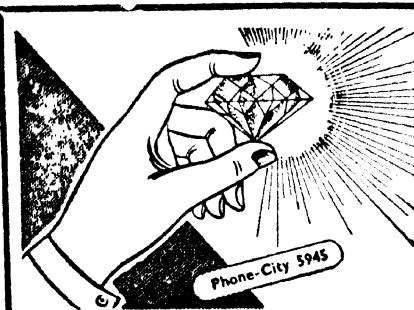
আমতা আমতা করে বিনোদ বললে, সবাইকে না করুক, আমাকে তো করেচে!

জয়রাম বললে, তা হ'লে তুমি একাই ডাক, কি বলুন অভয়বাবু! আমরা ডাকবো না।

কম্পিত হ'য়ে বিনোদ বললে, কিন্তু কোর্টে আসবার সময় ট্রেনে তোমরা কি বলেছিলে! সবাই মিলে ডাকবার কথা ছিল না!

চড়ে উঠে গোবিন্দ বললে, পয়সা আমাদের সস্তা নয়। বার বার করে টাকা দেবো! ঐ তো অভয়বাবু দাঁড়িয়ে আছেন, জিগ্যেস করো ওঁকে আমার অংশের টাকা দেওয়া আছে কি না! তোমার কথায় টাকা দেব!

এক ফাঁকে শরৎ বলে রাখল, আমারও টাকা দেওয়া ছিল কি অভয়বাবু?

বিনোদও চড়ে বললে, সবারই যদি দেওয়া থাকবে তা হ'লে ডিক্রীটা অত টাকার হয় কি করে—তোমার দেওয়া আমার দেওয়া, তা হ'লে বাকি থাকে কার? উসুলের টাকাগুলো গেল কোথায়?

প্রকারান্তরে এটা অভয়পদর ওপরই দোষারোপ। গোবিন্দ অভয়পদর সম্মানরক্ষার্থে মরিয়া হয়ে ওঠেঃ খরচা নেই! টাকাটাই দেখচো! উনি মেরে দ্যানিন!

বিনোদ নিজেকে সামলাতে পারে না। বিকৃত কণ্ঠে বলে, তা আমি কি জানি। সেবে আসবে না তাই বলচি! মাঠে মাঠে টাকা ছড়ালে এমনি হয়!

গোবিন্দ হুংকিয়ে ওঠেঃ তোমার নিজের খাজনা দেওয়া আছে? লম্বা লম্বা কথা তো এখন থেকে বললে খুব!

উত্তেজনায় বিনোদের সর্বদেহ কাঁপতে লাগল। কম্পিত হাতে ছোট র‍্যাশনের থলি থেকে কাগজপত্তর বার করে সবার সামনে মেলে ধরলে। ভাঁজ খুলে খুলে কয়েকখানা দাখিলা বার করলে।

সবাই চুপ, বলবার কিছু নেই, হাল সন পর্যন্ত খাজনা দেওয়া আছে বিনোদের, কড়াক্রান্তি বুঝিয়ে দিয়েছে সে। জমিদারের ঘরের চেক কাটা। বলুক অভয়পদ, জাল দাখিলা এগুলো! তিতুরাম ওঁদের তহশীলদার নয়!

এতক্ষণে সহায়রাম কথা বললে, ওগুলো তুলে রাখ বিনোদ, নতুন জমিদারী করবো! অমন আমাদেরও ছিল! খাজনা দিয়ে জমি রক্ষে করবে, তা হ'লেই হয়েচে!

বিনোদ ভেঙচে ওঠেঃ তা হ'লে কি দিয়ে রক্ষে হবে? মতলব দিয়ে, দমবাজীতে! ধর্ম নেই?

সহায়রাম হেসে ওঠে ব্যঙ্গ করেঃ নতুন কাকে গু খেতে শিখেচে এখন কত কথা বলবে! ভাল ভাল রক্ষে কর!

বিনোদ মরিয়া হয়ে যায়ঃ তোমার মত জোহুরী বুদ্ধি আমার নেই! খাজনা দিই জমি কার! সেই জমি তোমাদের জন্যে বার বার নীলেমে ওঠে, তুমি বলে মুখ নাড়বো!

হঠাৎ সহায়রাম উত্তর খুঁজে পায় না। খানিক চুপ করে থাকে। বিনোদের অভিযোগের উত্তরে হয়তো তার বলবারও কিছু নেই। যে ক'রেই হোক বার বার সে ফাঁক কেটে বেরিয়ে যায়, ইস্তাহারে তার নাম বাদ যায়।

কীল চুরি করে সহায়রাম বললে, তুমিও তো পার! বোকার মত খাজনা দাও কেন! জোড়েল জমা, একলা খাজনা দিয়ে মর কেন!

গোবিন্দ, জয়রাম, তারাদাস মুখচাওয়াচাঁয়ি করে। হঠাৎ সহায়রাম এত নরম হলো কেন। ওরা তো সাপে নেউলে!

বিনোদও নরম হয়। সাক্ষী মানার সুরে বলে, কি করি বল? তোমাদের দাদা অনেক আছে, আমার ওটুকুকে নিয়ে টানাটানি কেন! সেবারে অমনি কতগুলো টাকা শুধু শুধু গালে চড় মেরে নিলে! এবার—

কে জানে সহায়রাম ভেজে কি না। চাপা দিয়ে বলে, যাক, এবার আর নীলেম-ফিলেম নয় সবাই মিলে এস দাবী শোধ করে দিই। আমার অংশের টাকাও দিচ্ছি।

বলেই পকেট হাতড়ে দশ টাকার একখানা নোট বার করে সহায়রাম। সকলের চোখের সামনে নেড়ে বলে, কি রাজী তো! কি অভয়পদ! একটা ব্যবস্থা কর না ভাই!

গোবিন্দ মাথা নাড়ে, আমার টাকা আমি দেব না।

তারাদাসও যোগ দেয়, আমারও ঐ কথা। যার যার টাকা গুণোকার দিতে পারবো না।

বিনোদ কি বলবে বুঝতে পারে না। তার কেমন মনে হয়, সবটাই সহায়রামের চক্রান্ত। আবার তাকে জড়াবার জন্যে ফাঁদ পেতেছে। এক কথায় টাকা বার করবার লোকই ও নয়। সহায়রাম আপোষের সুরে বলে, টাকা তো বিনোদও দিয়েচে, তা বলে জমিদার কি ছাড়বে! যা হবার হয়েচে, পুরোন কথা তুলে লাভ কি! দাবী শোধই কর সব। ব্যবস্থাটা বিনোদের মনঃপুত নয়—বলে, নীলেম ডাকলে ক্ষতি কি?

সেই ব্যবস্থাই তো ছিল। যে যার অংশ মত দিয়ে নীলাম খরিদই তো ভাল।

কি ভাবলে সহায়রাম খানিকক্ষণ। বিনোদের স্থির সিদ্ধান্তে মনে মনে হয়তো প্রমাদ গোণে। মুখে বললে, তাতে আরো কিছু খরচা বেড়ে যাবে, তার ওপর কোন বাকির জন্যে নীলাম বাহাল হবে না। তা ছাড়া আবার সব পার্টিকে তখন জড় করবে কি করে! কি হে জয়রাম!

ছড়ান দাখিলাগুলো কুড়িয়ে র‍্যাশানের থলের মধ্যে পুরতে পুরতে বিনোদ নিমরাজী হয়ে বললে, যা ভাল হয় কর। আমি রাজী। আমার বাঁশকাঠা রক্ষে হ'লেই হ'লো।

সহায়রাম নিশ্চিন্ত হয়। যেন একটা গণ্ডগোল তার মধ্যস্থতায় মিটে গেল। গোবিন্দ তারাদাস, শরৎ, ভূতনাথ, জয়রাম চুপ করে অশ্বত্থ গাছের পাতা গোণে। ল' ক্লার্ক অভয়পদ ইঙ্গিতে সরে যায়। তার আর দরকার কি, যে করে হোক জমিদারের টাকা আদায় হলে হলো!

কাল বিলম্ব না করে সহায়রাম কলম বার করে লিখে—
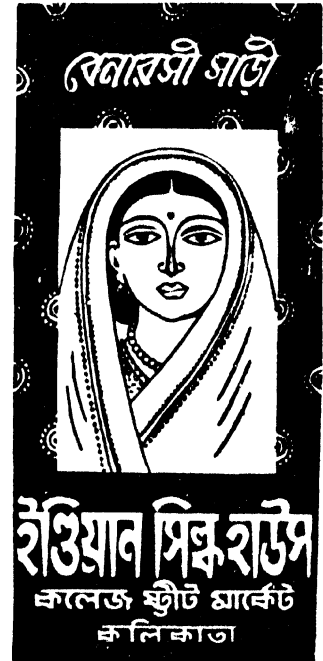
বিনোদ পুরকাইত—	৮০৲
গোবিন্দপাল, তারাদাস,	
ভূতনাথ পাল—	৮০৲
জয়রাম পণ্ডিত	৪০৲
শরৎ দাস—	৪০৲
শশিকান্ত কর্মকার—	৮০৲

উঁকি মেরে বিনোদ বললে, টাকাটা তা হ'লে আমাদের ঘাড় দিয়ে আদায় করতে চাও! শশী আর আমার ক' কাঠা জমি? আমাদের দুজনেরই দাখিলা আছে!

কলম তুলে সহায়রাম বলে, তা হ'লে তুমিই কর। আমাকে ডাকা কেন! কম বেশী তো হবেই।

গোবিন্দ ফোড়ন দিলে, ঐ টাকা তো তুমি দেবে বলেছিলে! বল বলনি। বিনোদ ভাবাচাকা খেয়ে বলে, সে তো নীলেম খরিদের জন্যে. দাবী সোধে অত টাকা আমার ভাগে পড়বে কেন! বাইশ কাঠার খাজনা ছ'বছরে কত? ছ'টাকা তিন পয়সা জমায় কত হয়?

গোবিন্দ হুংকিয়ে ওঠে ঃ অত বুঝি না, আশি টাকা তোমাকে দিতে হ'বে, তবে আমরা এর মধ্যে আসবো।

বিনোদ মারমুখো হয় ঃ না আস বয়ে গেল, তোমাদের দলে আমি এক পয়সা দেব না। যত সব দমপাট্টি!

গোবিন্দ কি বলতে যাচ্ছিল আস্তিন গুটিয়ে। সহায়রাম বাধা দিলে, বেশ, দুজনে মিলে দিই এস। তাহ'লে রাজী তো।

বিনোদ গুম হ'য়ে গেল। আশ্চর্য মানুষকে বিশ্বাস নেই, ঐ গোবিন্দ পাল গাঁয়ে তাকে কি ভাবে অভয় দিয়েছে সহায়রামের বিরুদ্ধে কত কথা বলেছে। এখন সহায়রামের সব ব্যবস্থা আগ বাড়িয়ে নিচ্ছে।

গোবিন্দ রেগে উঠে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ভূতনাথ, তারাদাস, শরৎ, জয়রামও উঠলো। অশ্বত্থগাছের শিকড়গুলো আবার দাগড়া দাগড়া হ'য়ে ফুলে উঠলো। বাঁটোয়ারার কাগজটা ঝুলি ঝুলি করে শূন্যে চেয়ে রইল।

কাঁধে হাত দিয়ে সহায়রাম বিনোদকে আকর্ষণ করে বললে, রাগ কর কেন! চল চা খাওয়া যাক। মাথা ঠাণ্ডা না রাখলে কাজ হয়! ওরা বলচে বলুক না, শেষে যা হয় করা যাবে।

এত বিদ্বেষেও বোধহয় এ সময় সহায়-রামকে আপন মনে হয় বিনোদের। লোকটার দয়ামায়া আছে, ওদের মত অবুঝ নয়। তিন দিন ধরে পায়তাড়া করে শেষ কোর্টে এসে সব ভেস্তে দিলে। গোবিন্দ পালই পালের গোদা! কাউকে বিশ্বাস নেই মিট্‌মিটে শয়তান সব।

আপাতত একটা দুর্ভাবনার হাত থেকে রেহাই পেয়ে অনেকটা লঘু মনে বিনোদ বাড়ি ফেরে। সহায়রামকে হয়তো ক্ষমা করে ফেলে সে মনে মনে। গোবিন্দ, তারা-দাস, ভূতনাথ, জয়রামকে দূরে রাখে। আশ্চর্য মানুষের ব্যবহার, আশ্চর্য জমির কর আদায়ের আইনকানুন, কলা-কৌশল। জমিটা কেনা থেকে কত হাঁটাহাঁটি ক'রেছে বিনোদ চাঁদপালায় জমিদারের কাছারীতে— তার করটুকু নিয়ে তাকে নিষ্কণ্টক করতে। ঐ অভয়পদই কত টাকা খেয়েছে, মিথ্যে স্তোক দিয়েছে— খারিজ সে পেয়ে যাবে জগমোহনের জমায়; শেষ পর্যন্ত কিছুই হয়নি—বাকি খাজনা আদায়ের জারীর নোটিশ ঠিকই এসেছে তার নামে। জোড়েল জমা বলে সে রেহাই পায় নি। প্রতিবার তিন-আনি, তের-আনি নালিশ করে বাকি বকেয়া আদায় করে যার-হোক না যার-হোক কাছ থেকে। সুন্দর ব্যবস্থা, কেউ কোন প্রতিবাদ করে না!

আর যদিও করে আইনএর সাত-সতের ব্যূহ ভেদ করে খাজনা আদায় তাঁসলের এই রাহাজানি বন্ধ করতে নিজেই ঘায়েল হয়ে যায় প্রজা। উকিল বলেন, কন্ট্রিবিউসন কর। মানে দুটাকা ন'আনা তিন পাই আদায় করতে আরো দুশো টাকা খরচ কর— মহামান্য ডায়মণ্ডহারবার দৌড়াদৌড়ি কর। খারিজ পাওয়া মুখের কথা! তিন-আনির একশ তিপ্পান্নজন মালিক, আর তের-আনির দুশো ঊনসত্তরজন হকদার— প্রত্যেকের কাছে যদি যাও, গিয়ে আবেদন কর জোড়হাত করে তাহ'লে এ জন্মের দিন-গুলোতে তোমার কুলবে না। আর এক কথার আইন যেখানে নেই, সেখানে আবেদনেরও কোন দাম নেই। তুমি ভুগবে তা কার কি! জমিদারী বজায় থাকলেই হ'লো।

ভিজে পা দুটো কোঁচার খুঁটে মুছে দাবার ওপর মাদুরটা বিছিয়ে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে সামনে চেয়ে দেখলে বিনোদ। কেমন একটা নিরুপায় শূন্যতা বোধ করে সে। দাবার নীচে উঠানটা অন্ধকার, থমথমে; আকাশে অসংখ্য তারা ঝলমল।

হ্যারিকেনটা উস্কে দিলে বিনোদ, আলোর বদলে ভুষোই উঠলো বেশী করে। এক ফালি কাগজ পুরোন একখানা পাঁজির ওপর রেখে আজকের সারাদিনের খরচটা লিখলে শরের কলম আর ভুষোর কালিতে :—

দাবী শোধ	
৫৫৫নং জারি	৪০৲
রাহা খরচ	
গাড়িভাড়া, জলখাবার ইত্যাদি	১৷১০
অভয়পদ	১৲
মুহুরী	।৹
জ্যোতিষমশাই	৶৫
সহায়রামবাবুকে ধার দেওয়া যায়	৫৲
রতনের মা'র জন্য একটি বাটি	১৷৹
কাস্তের পান দেওয়া	৴১০

কলমটা তুলে সামনে অন্ধকারে [illegible] চুপ করে বসে থাকে বিনোদ। আর কি [illegible] যেন মনে পড়ছে না কিছুতে। পঞ্চাশ টাকার একটা আধলাও ফেরেনি, সাড়ে তের আনা কি খরচ করেছে, কিছুতে স্মরণ হচ্ছে না।

সধূম লণ্ঠনের আলোটা দপ্ দপ্ করছে বিনোদের রগ দুটোও বুঝি—বা। রাত দ্বিপ্রহরের শেয়াল ডাকল খিড়কীর এঁদোপড়া

পুকুরপাড়ে বাঁশবাগানে, নিশাচর পেঁচাও গোটা দুই ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করলে সঙ্গে সঙ্গে।

আর একবার আলোটা উস্কে দিয়ে বিরক্ত হয়ে বিনোদ জমা-খরচের পর্ব শেষ করলেঃ

বাজে খরচ ৮/১০

যাক্ তবু মিলেছে। এবার ওঠা যাক। তবু রক্ষে সবটা বাজে খরচ হয় নি এবার। ধান উঠলে দেনাটা শোধ করে দেবে।

হঠাৎ চমকে ওঠে বিনোদ। ভূত-দেখা ভয়ে কাঠ হয়ে যায়—দাবার নীচে দাঁড়িয়ে কে? নিজেকে সামলাতে গিয়ে কালির দোয়াতটা উল্টে গেল, জমা-খরচের কাগজটা কালিমুখো। আলোটা আবার দপ্ দপ্ করছে।

ধরে দাঁড়িয়ে শশি বললে, আমি শশি। ইচ্ছে হলো কাদার ঢিপি কালির দোয়াতটি শশির মুখে ছুঁড়ে মারে। রাতদুপুরে ইয়ার্কি মারতে এসেছে! বিকৃতকণ্ঠে বিনোদ জিজ্ঞেস করলে, এত রাত্রে?

দাবার ওপর উঠে এসে মাদুরে বসে শশি বললে, খবর আছে। এঁ্যা, কালিতে একশা যে! কি করলে? ভূতের ভয় নাকি!

শশি হাসতে লাগল।

বিনোদ গোঁজ হয়ে বললে, হ্যাঁ, রাত-বিরেতে অমনভাবে এলে সব শালার ভয় হয়। ভূত না, চোর-ছ্যাঁচড়!

আর বোধ হয় কথা নেই। শশি হয়তো নিজের অরসিকতার কথাটা ভেবে চুপ করে থাকে লজ্জায়। সত্যিকারের ভয় বিনোদের কাকে, ভূতকে না চোর-ছ্যাঁচড়কে?

বিনোদ জিজ্ঞেস করলে, কি খবর?

শশিকান্ত এদিক-ওদিকে চেয়ে বিনোদের কানের কাছে মুখ নিয়ে বললে, জগমোহনের জমা আজ নাকি নীলেম হয়ে গেছে। ওরা খরিদ করেচে?

বজ্রপাতের মত বিনোদ চীৎকার করে ওঠে, কে বললে? কারা?

একে একে নীলাম খরিদ্দারদের নাম করলে শশি—বেত-খাওয়া ছাত্রের পাঠ বলার মত। সহায়রাম, গোবিন্দ, জয়—

বিনোদ কোন কথা না বলে তড়াক করে দাবার নীচে লাফিয়ে পড়ল। হাতের কাছে পুঁইমাচার একটা বাঁশের খুঁটি ছাড়িয়ে ছুটে গেল সামনে। শশি বাধা দিলে, কি পাগ্‌লামী করচো! থামো! বাঁশ নিয়ে তেড়ে গেলে নীলেম রদ হবে? ঠাণ্ডা হয়ে একটা ব্যবস্থা ভাবতে হবে।

কাঁপতে কাঁপতে বাঁশটা ফেলে দিয়ে বিনোদ শশির মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল। বোধ হয় সে পাগলই হয়ে গেছে। কিন্তু এখন উপায়!

শশি বললে, ডিক্রীর টাকাটা জোগাড় করে ঊনত্রিশ দিনের মধ্যে জমা দেওয়া ছাড়া পথ নেই। ও শালাদের মারলে কি জমি ফেরৎ পাবে! আইন ওদের পক্ষে।

বিনোদ গর্জন করে উঠলো, ওদের মাথা ফাটিয়ে দেখবো আইন কদ্দুর যায়। চোর-ডাকাত সব শালা।

শশি হাত ধরে বোঝালে, সে যা হয় পরে করা যাবে, এখন টাকাটা আমাদের যোগাড় করতে হবে। আমি চেষ্টা দেখচি, তুমিও দেখ।

সাড়া পেয়ে রতনের মা উঠে এল, চুপ করে উঠানের একপাশে দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ স্বামীর উত্তেজনার কারণটা সে ধরতে পারে না।

অপ্রস্তুত শশি বোকার মত বললে, কিছু না। এই আমাদের একটা আলোচনা হচ্ছিল বৈষয়িক।

নিম্নস্বরে রতনের মা বললে, বাইশ কাঠাটা আমাদের নীলেম হয়ে গেল। ফসল-বন্দীর টাকাতেও আটকান গেল না।

শশি উত্তর দিতে পারলে না, বিনোদও স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাতে পারে না। মনে হলো, মাটি কেনা-বেচার সেই অবাক মুহূর্তে একটা তারাও যেন আকাশ পারে খসে গেল নিঃশব্দে।

রাত থাকতে উঠে গোয়াল থেকে হালের বাকি বলদটা খুলে নিয়ে বিনোদ গোপাল-পুরের হাটের দিকে রওনা হলো। তিন আনির নীলাম রক্ষা করতে একটা গেছে, তের আনির জন্যে আর একটা যাবে। দুঃখ করবার কি আছে! আইন যতক্ষণ আছে জমিদারের পক্ষে, ততক্ষণ তাদের মত নির্বোধ লোক জমি ভোগ দখল করে কি করে! বছর বছর দাখিলা কাটালেই অমনি হলো? কোর্ট-ঘর না করে বিষয়কর্ম করবে, তা হলেই হয়েছে।

খানিকটা পথ এসে গরুটা বিগড়লো। কিছুতে আর এক পা নড়বে না। বিনোদ অনেক চেষ্টা করে শেষটা সামলাতে না পেরে হাতের বাঁশটা দিয়ে ঘা কতক প্রহার করলে গরুটাকে। নিঃশব্দে আবার গরুটা চললো সামনের দিকে।

বিনোদের মনে পড়লো, উঠানের পুঁই-মাথা ভেঙে এই বাঁশটা সে সংগ্রহ করেছিল চোরেদের মাথা ভাঙবে বলে, এখন সেটা দিয়েই একটা অবলা প্রাণীকে তাড়না করছে। অসহায় দুঃখে, বেদনায়, রাগে, ক্ষোভে বিনোদের পা দুটো মাটির সঙ্গে আটকে যায়। কাপুরুষ কোথাকার!

হালের বিজোড় বলদটার গলার দাড়িতে টান পড়ে।

চিত্রপ্রদর্শনী

শ্রীহেমন্ত মিশ্র

শ্রী হেমন্ত মিশ্রের তেল রঙ্, জল রঙ্ ও ড্রইং প্রভৃতি বাষট্টিটি চিত্রের একটি প্রদর্শনী সম্প্রতি (২৯শে ডিসেম্বর —৯ই ডিসেম্বর) ১নং চৌরঙ্গী টেরেসে অনুষ্ঠিত হয়েছে। শ্রী মিশ্র ধারাবাহিক-ভাবে কোন শিল্পায়তনে শিক্ষাপ্রাপ্ত না হলেও তাঁর রচনায় দরদী শিল্পীমনের ছাপ প্রভূত পাওয়া যায়। আধুনিক যুগের শিল্পী হবার দরুণ তাঁর রচনায় সেই নব্য দৃষ্টিভঙ্গী দুর্লভ নয়। মুখ্যত তাঁর দৃষ্টি বাস্তবধর্মী কোথাও কোথাও অবশ্য রঙের দ্বারা রোমাণ্টিক পরিবেশ সৃষ্টিতে তাঁর কল্পনার ছাপ পাওয়া যায়।

হলুদ ফুল

শ্রী মিশ্রের ছবিগুলি প্রায় সবই আসামের সুন্দর ও বৈচিত্র্যময় প্রকৃতিকে নিয়ে আঁকা। এই রচনাগুলোর মধ্যে তেল রঙের কাজ বেশি ভাল লাগে। কাজগুলোয় এমন একটা মোলায়েম 'এফেক্ট' এসেছে, রঙ্ সংস্থাপন ও তুলি চালনার গুণে যা সহজেই মুগ্ধ করে, সে তুলনায় জল-রঙের কয়েকটি রচনা ব্যতীত অধিকাংশ রচনাই দুর্বল ও 'হার্ড' মনে হয়েছে।

তেল রঙের ছবিগুলোর মধ্যে 'হলুদ ফুল', 'সোনারপুঞ্জির কুঁড়েঘর' 'কামাখ্যা পাহাড়ে ভোর' ছবিগুলির বর্ণবৈচিত্র্য ও রঙের কোমলতা সত্যই মুগ্ধ করে দর্শককে। 'ধানকাটা' ছবিটিতে পেছনের পাহাড়টি না দিয়ে বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র দেখালে আরও বোধ হয় রসোত্তীর্ণ হ'ত রচনাটি। পেছনের পাহাড়টি দৃষ্টিকে বিক্ষিপ্ত করে। তবু রঙ সংস্থাপনের ও আঙ্গিকের ব্যবহারে মুন্সিয়ানা আছে, 'মফলঙ' ভাল লাগলেও সম্মুখপট ও পশ্চাদ্‌পট মিশে একাকার হয়ে গেছে। ডালিয়া ফুলের প্রতিচিত্রটি সুন্দর কিন্তু ফুলের নীচে শাঁখটি দৃষ্টিকে বিক্ষিপ্ত করে এবং তাতে রচনাটির মাধুর্য অপেক্ষাকৃত ক্ষুন্ন হয়েছে। শিলং বাজারের পেছনের পাহাড়টি আরও দূরে সরিয়ে দিলে হয়তো উপভোগ্য হ'ত ছবিটি। 'ঝড়ের পরে' ছবিটির চিত্রণ শক্তিশালী হ'লেও রঙের সংস্থাপনে ত্রুটি রয়ে গেছে।

জল রঙের রচনাগুলি যে তেল রঙের তুলনায় দুর্বল সে কথা আগেই বলেছি। এগুলোর মধ্যে 'শিলংয়ের নিসর্গদৃশ্য' বর্ণবৈচিত্র্যে ও অঙ্কণের কুশলতায় ভারী সুন্দর একটি রোমাণ্টিক পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। 'নীল পাহাড়', 'ওহিংদো উপত্যকা', 'আবর যুবক', 'মফলঙ্ পাহাড়' ইত্যাদি রচনাও উল্লেখযোগ্য। 'মফলঙে সূর্যাস্ত' ছবিটির আকাশের বিস্তার দর্শক-চোখকে বিক্ষিপ্ত করলেও এটি একটি সুন্দর রচনা। 'পাইনসারি', 'মলাকির দৃশ্য' ইত্যাদিতে আবার সেই সম্মুখ ও পশ্চাদ্‌পট মিশে গেছে। 'হেমন্ত শিখা' ও 'বসন্ত' ছবি দু'টির তুলনায় 'রাত্রে পানের দোকান', 'বাগান থেকে', 'চা পাতা তোলা', 'মাছ ধরা' প্রভৃতি দুর্বল ও চড়া রঙের ব্যবহারে তা 'হার্ড' হয়েছে।

শিলং বাজার

আসামের শিল্পীদের রচনাবলী কলকাতার দর্শকদের দেখার সুযোগ কম মেলে ব'লেই হেমন্ত মিশ্রের প্রদর্শনীটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রী মিশ্রের রচনায় একটা আন্তরিকতা আর সজীবতার পরিচয় আছে। **সব মিলিয়ে হেমন্ত মিশ্রের চিত্রপ্রদর্শনীটি দেখে খুশি হবার মতো।**

(৭)

'মোহিনী-সিঁদুর' অফিসে চাকরি হয়ে গেল ভূতনাথের।

পরবাড়িতে রাত্রে শোয়া আর সকাল বেলা স্নান করে একটু জলখাবার খেয়ে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে অফিসে পৌঁছুনো। তা হেঁটে যেতে ঘণ্টাখানেকের রাস্তা। সকাল থেকেই কাজ শুরু। দুপুর বারোটার সময় ডাকতে আসে ঠাকুর—বাবু ভাত বেড়েছি—

তাড়াতাড়ি হাতের কাজটা রেখে হাত মুখ ধুয়ে নিয়ে খেতে বসা। একতলায় বাড়ির পেছন দিকের সমস্ত ঘরটাই রান্না-ঘর। তারই এক কোণে এক একদিন আসন পেতে জলের গ্লাস দেয় ঠাকুর। কলাপাতার ওপর গরম গরম ভাত ফেলে দেয়, হাতায় করে।

বলে—মাঝখানটায় একটু গর্ত করুন তো—ডাল দিই—

এক রাশ গরম ভাতের ওপর গরম ডাল পড়ে। তারপর আলু-কুমড়োর একটা তর-কারি দেয় এক থাবা। কোনও দিন শাক-চচ্চড়ি গাদাখানেক।

ছোট বেলায় ফতেপুরে মাছ না হলে খেতে পারতো না ভূতনাথ। তা পরের বাড়ি। এমনিতেই খেতে লজ্জা-লজ্জা করে। তার ওপর আবার চাওয়া!

আরো ভাত দিলে যেন ভালো হতো। কিন্তু ঠাকুর যেমন তাড়া দেয়, তাতে কেমন লজ্জা হয়।

একদিন জিজ্ঞেস করেছিল ভূতনাথ—মাছ নেই ঠাকুর—

ঠাকুর বলেছিল—গোণাগুনতি মাছ—সে তো সব ওপরে চলে গেছে—

তারপর তাড়া দিয়ে বলে—একটু হাত চালান বাবু, হাবুর মা এখুনি এসে আবার এঁটো পাড়বে—

সুতরাং কোনও রকমে খাওয়া সেরে নিয়ে আবার কাজে বসতে হয়। কাজ না কাজ! হাজার হাজার প্যাকেট ভর্তি সিঁদুর। সেই কাগজের কৌটোয় সিঁদুর ভরা—তারপর মুখ বন্ধ করে ছাপানো লেবেল লাগিয়ে দেওয়া। এক একটি কৌটোর দাম—আড়াই টাকা। এক মাসের ব্যবহারের জন্য আড়াই টাকা। কত দূর দূর দেশে যায়। কোথায় রাজসাহী, চট্টগ্রাম, পেনাঙ, আন্না-মালাই, সিংহাচলম্, জাভা, বোর্নিও—

ফলাহারী পাঠক সিঁদুর ভরে, প্যাকেট আঁটে, লেবেল লাগায়—

আর চিঠিপত্র লেখে ভূতনাথ।

মণি অর্ডার এলে সুবিনয়বাবুর কাছে পাঠিয়ে দেয়। ভি-পি করে পার্সেল যায়। যত এজেণ্ট আছে, তাদের কাছে পাঠাতে হয় হ্যাণ্ডবিল। নানান ভাষায় লেখা হ্যাণ্ডবিল। হ্যাণ্ডবিল-এ লেখা থাকত—

"অদ্ভুত তড়িৎশক্তি সম্পন্ন সিঁদুর। মোহিনী সিঁদুরের গুণে মুগ্ধ হইয়া হাজার হাজার নরনারী অসংখ্য প্রশংসাপত্র পাঠাইয়াছেন। কোনও মানুষের জীবনে হতাশ হইয়া আত্মহত্যা করিবার মত অবস্থা আসিলে ইহার এক প্যাকেট পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। যাহারা জীবনে প্রিয়পাত্র কিম্বা প্রিয়পাত্রীর প্রেম পাইতে চান; প্রিয়জনকে আপনার বশীভূত করিতে চান, প্রণয়িনীকে যদি আপনার করতলগত করিতে চান, কিম্বা যে স্ত্রীলোক আপনাকে ঘৃণা করে, অবজ্ঞা করে বা দূরে পরিহার করে তাহাকে যদি হৃদয়েশ্বরী রূপে লাভ করিতে চান, আমাদের এই বহু পরীক্ষিত বহু প্রশংসিত 'মোহিনী সিঁদুর' পরীক্ষা করিয়া দেখুন। স্বামী-স্ত্রী, প্রভু-ভৃত্য, পিতা-পুত্র, শিক্ষক-ছাত্র গুরু-শিষ্য সকলের পক্ষেই অপরি-হার্য। নিত্য হাজার হাজার গ্রাহক ইহার কল্যাণে বিষময় সংসারে অপার শান্তি লাভ করিতেছেন। ইহা ছাড়া মকদ্দমায় জয়লাভ, দুরারোগ্য ব্যাধির উপশম, নিরুদ্দিষ্ট প্রিয়-জনের সাক্ষাৎলাভ ইত্যাদি নানা বিষয়ে ইহার কার্যসিদ্ধি হয়। এক স্ত্রী এই মোহিনী সিঁদুর ব্যবহার করিয়া তাহার পানাসক্ত স্বামীকে পুনরায় সংসারাশ্রমে ফিরাইয়া আনিয়াছে, আর একজন দারিদ্র্য লাঞ্ছিত হত-ভাগ্য লটারীতে বিশ সহস্র অর্থ পাইয়া সুখে কালযাপন করিতেছে, আর একজন...বিফলে মূল্য ফেরৎ...সংসারে শান্তি ফিরাইতে, হতভাগ্যদের সৌভাগ্য সঞ্চারে, অপুত্রকে পুত্র মুখ দেখাইতে, ঋণীকে অঋণী করিতে, প্রবাসীকে ঘরে ফিরাইতে, ইহা অদ্বিতীয়... ইত্যাদি ইত্যাদি—"

হ্যাণ্ডবিল ছাড়া পাঁজিতে বিজ্ঞাপনের পাতায় বড় বড় হরফে লেখা থাকতো 'মোহিনী সিঁদুর'—'মোহিনী সিঁদুর'—

স্বদেশে বিদেশে, বাঙলায়, ইংরেজীতে, জার্মাণী, চিন, জাপানী, তারপর হিন্দু-স্থানী গুজরাটী, গুরুমুখী, পস্তু সর্ব ভাষায় সর্বত্র এই মোহিনী সিঁদুরের বিজ্ঞাপন।

যত বিজ্ঞাপন দেওয়া হতো—ততো বিক্রীর অর্ডার। প্রশংসা-পত্রও আসতো অসংখ্য। এক প্যাকেট ব্যবহার করে যারা অল্প ফল পেয়েছে, তারা আরো দু' প্যাকেটের অর্ডার দিত।

আরো দু'টি পণ্য ছিল সুবিনয়বাবুর। 'মোহিনী আংটি' আর 'মোহিনী আয়না'।

গুণাগুণে অল্পবিস্তর তিনটেরই এক। কিন্তু তিনটের মধ্যে নাম-ডাক মোহিনী-সিঁদুরেরই বেশি। মোহিনী সিঁদুরের চিঠি পত্র লিখতে লিখতেই হাত ব্যথা হয়ে যেত ভূতনাথের।

অফিস ঘরের পেছনে ছোট গুদাম ঘরে ফলাহারী পাঠকের অফিস বা কারখানা। ফলাহারী হেড আর তার দশজন অ্যাসিস্টেণ্ট। তারাও হিন্দুস্থানী। অফিসের ছুটির পর যখন তারা বেরোয়, তখন মাথা থেকে পা পর্যন্ত লালে-লাল হয়ে গেছে শরীর।

সিঁদুর ঢালাঢালি, কৌটোয় ভরা, লেবেল আঁটা আর তারপর প্যাকিং করার পর পোস্টাপিসে ডাকে পাঠানো সমস্ত ভার ফলাহারীর। কিন্তু তদারক করতে হবে ভূতনাথকে। কোন্ অর্ডারটি কখন এল, সেটা রেজিস্ট্রি করা, কত তারিখে ডেসপ্যাচ

করা হলো—সেটি লিখে রাখা। এজেণ্টদের চিঠি লেখা, ভি-পি'র ফরম্ পূরণ করা।

সুবিনয়বাবু এক একবার সকালের দিকে তদারক করতে আসতেন।

বলতেন—কাজকর্ম কেমন হচ্ছে ভূতনাথ বাবু—

কালো চাপকান গায়ে, পরনে পায়জামা, কোঁচানো চাদর বুকের ওপর ক্রসের মতন লটকানো। পায়ে কখনো চটি কখনও অ্যালবার্ট।

এটা সেটা দেখতেন। বলতেন—চমৎকার হচ্ছে ভূতনাথবাবু—

একটু পরেই চলে যেতেন। হাসি হাসি মুখ। সদাশিব মানুষ। টাকার ব্যাপারটা নিয়ে যেতে হতো ওপরে। ওপরে সেই বড় ঘরটায় বসে থাকতেন তিনি। কখনও অফিসের কাগজপত্র নিয়ে। কখনও বই নিয়ে। হয়ত হেলান দিয়ে একটা কিছু পড়তেন। আশে পাশে সাধারণত কেউ থাকে না।

সই করবার আগে একবার জিজ্ঞেস করেন—এটা ভালো করে দেখে নিয়েছেন ভূতনাথ বাবু—

তারপর আবার বই-এর দিকে মনযোগ দেন। বাঁধানো বই সব। আলমারীতে থাকে থাকে সাজানো। 'দুর্গেশনন্দিনী'। 'কামিনী-কুমার', 'হংসরূপী-রাজপুত্র' 'বিজয়-বসন্ত' আরো অনেক বই। 'সোমপ্রকাশ', 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ', 'রহস্য-সন্দর্ভ', 'ব্রাহ্মিকা দিকের প্রতি উপদেশ' 'ব্রহ্মসংগীত ও সংকীর্তন'—

বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হয় না। একটু পরেই নিচে চলে আসতে হয়।

তারপর ঠাকুর রোজকার মত ডাকতে আসে—বাবু ভাতবাড়া হয়েছে—খেতে আসুন—

সেই গরমভাতের ওপর ডালের গর্ত, আর একথাবা তরকারী। প্রত্যহের অফিসের কাজের মধ্যে খাওয়াটা যেন এক শাস্তির মতন অসহ্য হয়ে উঠলো।

ফলাহারীদের অন্য ব্যবস্থা। দুপুর বেলা কারখানা ঘরের মধ্যেই পেতলের কাঁসি বেরোয় এক একটা করে। কাগজের ঠোঙা করে ছাতু বেঁধে আনে কাপড়ে, সেটা ঢালে তার ওপর ঢালে জল। অতি সংক্ষিপ্ত সরল প্রণালী। খাওয়ার পর বাঁ হাতে জলের ঘটিটা উপুড় করে মুখের মধ্যে। কী খাটতে পারে সব। সিঁদুরে ঘাঁটতে লাল হয়ে যায় চোখ মুখ—তবু ক্লান্তি নেই। তারা মাইনে পায় পাঁচ টাকা করে। মাসে মাসে মণি অর্ডার করে তিন টাকা করে দেশে পাঠায়—

ঠাকুর সেদিন যথারীতি ডাকতে এসেছে। রান্নাঘরের কোণে আসন পেতে বসে ভাত আর ডাল দিয়ে ঠাকুর বললে—আজ

ওই দিয়েই খেতে হবে বাবু—তরকারী হবে না—

ভূতনাথ মাথা উঁচু করে বললে—সে কি?

—সব ফুরিয়ে গেছে, কম করে ভাঁড়ার থেকে আনাজ বেরুলে আমি কী করবো বাবু—ভাঁড়ার তো আমার হাতে নয়—

ভূতনাথ ভাবলে তাও তো বটে। ভাঁড়ারের ভার তবে কা'র ওপর?

—আজ্ঞে সে তো হাবার মা'র হাতে জবা দিদিমণি পাঠিয়ে দেয়—

ভূতনাথ বললে—হাবার মা'কে একবার ডাক দিকি—

এল হাবার মা। আধ-ঘোমটা দিয়ে দাঁড়াল দরজার একপাশে—

ঠাকুর বললে—ওই তো হাবার মা এসেছে—ওকে জিগ্যেস করুন—

ভূতনাথ জিগ্যেস করলে—আমাদের খাবার তো আনাজ-তরকারী কিছু দেওয়া হয়নি তোমাকে—

ঘোমটার ভেতর থেকে হাবার মা কী বললে বোঝা গেল না।

ঠাকুর বুঝিয়ে বললে তাকে—আনাজ তরকারী তোমাকে দেওয়া হয়নি—কেরাণী বাবু তোমাকে জিগ্যেস করছেন—

—আজ্ঞে হ্যাঁ, দেওয়া হয়েছিল—

ভূতনাথ জিগ্যেস করলে—আজ কম দেওয়া হয়েছিল কি?

—যেমন বরাদ্দ থাকে তেমনি দেওয়া হয়েছিল—

—কতখানি বরাদ্দ থাকে?

—আমি লেকাপড়া জানিনে, যা বরাদ্দ থাকে তাই নিয়ে আসি—

হাবার মা'র কাছ থেকে কোনও প্রশ্নের সমাধান যে পাওয়া যাবে এমন মনে হলো না।

এবার ভূতনাথ ঠাকুরকে বললে—তুমি বলো কর্তাদের, যে বরাদ্দ যেন বাড়ান হয়—যা দেওয়া হয়, তাতে পেট ভরে না কারো—সারাদিন খাটবো-খুটবো, না খেতে পেলে আমরাই বা কাজ করতে পারবো কেন—তোমরাও তো উপোষ করবে—

ঠাকুর বললে—তা তো ঠিক বাবু—কিন্তু কর্তাদের ও-কথা বলতে পারবো না—

—কেন পারবে না,—সবাই খেতে পেলে কিনা তা তো তোমাকেই দেখতে হবে—

ঠাকুরকে জিগ্যেস করে ভূতনাথ জানতে পারলে—এ বাড়ির নিয়ম প্রতিদিন সকাল বেলা জবা দিদিমণি ভাঁড়ার খুলে তালিকা দেখে দেখে সারাদিনের জিনিস একসঙ্গে বের করে দেয়। বাড়ির লোকজন ছাড়া চাকর-ঠাকুর-ঝি, কেরাণীবাবু, গরু-ঘোড়া-পাখী সকলের খাবার জিনিস দিয়ে দেয়। চাকরদের তামাক পর্যন্ত। চাল ডাল তেল নুন তরী তরকারী, কাঁচা আনাজ ঘোড়ার দানা, গরুর খোল ভূষি চুনি সমস্ত। সমস্ত ওজন করে মেপে দেওয়া। কম পড়বার কথা নয়।

সুবিনয়বাবু যেমন ভালো লোক, তাকে এই নিয়ে বিব্রত করতে কেমন যেন লাগলো। ব্রজরাখালকে বললেও হয়। কিন্তু ব্রজরাখালই বা কী ভাববে। হয়ত এর পরে চাকরিটাই হাতছাড়া হবে শেষ পর্যন্ত। এত কষ্টের চাকরি।

বাড়িতে ফিরে এসে ব্রজরাখাল বলে—কী গো বড়কুটুম, কেমন চাকরি বাকরি চলছে—কোন কষ্ট হচ্ছে না তো?—

না কষ্ট আর কী! অন্য কিছু কষ্ট তো নেই তার। তবু মুখ ফুটে বলতে গিয়ে কেমন বাধে যেন। কিন্তু একদিন বলেই ফেললে। বললে—আজকে চালটা একটু বেশি নাও ব্রজরাখাল—

—কেন? পেট ভরে না বুঝি?—

—ভরে।

—তবে?

ভূতনাথ বললে—আজ সকাল সকাল খেয়েছি ওবেলা, আর ক্ষিদেটাও পেয়েছে একটু বেশি—

সত্যি! পিসীমার মত কে আর সামনে বসিয়ে খাওয়াবে ভূতনাথকে। পেটের কাপড় সরিয়ে পিসীমা পেট দেখে তবে ছাড়ান দিত। খা একটু দুধ দিয়ে। হরগয়লানী নতুন গরুর দুধ দিয়ে গেছে, তার চাঁছি পড়েছে এতখানি—তাই দিচ্ছি আর নতুন আমসত্ত্ব। ও ভাত ক'টা ফেলিসনে আর, খাজা কাঁঠালটা ভাঙছি, বোস্ একটু—কত সব আদর, কত ভালবাসা।

সন্ধ্যেবেলা নিজের ঘরটাতে বসে ভূতনাথ সেই আগেকার কথাগুলো ভাবে। ব্রজরাখাল বড়বাড়ির ভেতরে বাড়ির ছেলেদের পড়াতে চলে গেছে। ডান দিকে নিচু একতলা বাড়িটার বারান্দায় এখন কেউ নেই। গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেছে ইব্রাহিম কচোয়ান আর ইয়াসিন সহিস। ঘরের ভেতরে টিম টিম করে বাতি জ্বলছে। বোরখা পরা দু' একজন মূর্তি কখনও সখনও ছাদের দিকে এসে পড়ে। আর দক্ষিণ দিক থেকে দাসু মেথরের ঢোলের চাঁটির শব্দ ভেসে ভেসে আসে। উত্তরের সদর গেটের দু পাশে রেড়ির তেলের বাক্স বাতি দপ্ দপ্ করে জ্বলছে—যেন দিন হয়ে গেছে ওখানটায়—ঠিক যেমন রাস্তায় আলো জ্বলে তেমনি। ব্রিজ সিং-এর ডিউটি নয় এখন। নাথু সিং বন্দুক উঁচিয়ে পুতুলের মতন দাঁড়িয়ে, কখনও বসে পাহারা দিচ্ছে।

ব্রজরাখালের বাঁয়া তবলা জোড়া নিয়ে এবার বসলো ভূতনাথ। আগেকার অনেক বোল্ আবার তার মনে আসতে শুরু করেছে। চর্চাটা রাখা ভালো তো। আর তাছাড়া সন্ধ্যেটা এই অচেনা দেশে কাটেই বা কী করে। প্রথমটা আস্তে আস্তে। তারপর একবার লয়-এর স্রোতে গা ঢেলে দিলে আর কোন দিকে খেয়াল থাকে না। অন্ধকার ঘর। শুধু চাঁদনী রাত থাকলে—দক্ষিণের জানালাটা দিয়ে ঘরে আলো এসে পড়ে। আর ওধারের বাগানের টগর আর চাঁপা ফুলের গন্ধতে ঘর ভুর ভুর করে সারা রাত।

আর তারপর ছুটুকবাবুর আসরে শুরু হয় আর একজোড়া বাঁয়া তবলার চাঁটি। হাতুড়ি ঠুকে ঠুকে ঘাটগুলো বেঁধে নেয় হারমোনিয়ামের সঙ্গে। এক দিকে তানপুরা ছাড়তে থাকে—সঙ্গে সঙ্গে সাধা গলার শব্দ বেরিয়ে আসে। খেয়াল দিয়ে কোনও দিন আরম্ভ হয় কোনও দিন হয় না। কিন্তু জমে বেশি ঠুংরিতে নয়, টপ্পায়। সেটা বেশি রাত পর্যন্ত জেগে থাকলে শোনা যায়। নিধুবাবুর টপ্পা—

প্রেমে কী সুখ হোত—
আমি যারে ভালবাসি সে যদি ভালবাসিত।
কিংশুক শোভিত ঘ্রাণে,
কেতকী কণ্টক বিনে
ফুল হোত চন্দনে, ইক্ষুতে ফল ফলিত—

কোনও দিন আরো বেশি রাত পর্যন্ত জেগে থাকলে শোনা যায়—মেজকর্তার গাড়ির শব্দ। তখন সবাই প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে। বনমালী সরকার লেন-এর দূরে থেকে ইব্রাহিম গাড়ির ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে আসে, ঘোড়ার গতি মন্থর হয়ে যায়। ব্রিজ সিং ঘড় ঘড় শব্দে করে গেট খুলে দেয়। তারপর সেই গাড়ি এসে দাঁড়ায় খাজাঞ্চী খানা আর বৈঠকখানার মধ্যে লম্বা গাড়ি-বারান্দার তলায়। পাশের ঘর থেকে মেজকর্তার চাকর বেণী শব্দ পেয়ে ছুটে যায় নিচেয়। দরজা খুলে হাত ধরে নিয়ে যেতে হবে তাঁকে। এক একদিন পা দুটো খুব টলে। সেদিন বেণীর ঘাড়ে ভর দিয়ে চলেন। অন্দর মহলে আর যান না, বাইরের বসবার ঘরে ঢালা ফরাস তাকিয়া পাশ বালিশ আছে, সেই-খানেই শয্যা

কখনও ইচ্ছে হয়, সোজা চলে যান মেজ-গিন্নীর শোবার ঘরে।

কিন্তু মেজগিন্নীর ঘুম বড় সাংঘাতিক। একবার ঘুমোলে কা'র সাধ্য জাগায় তাকে।

বংশী বলে—বন্ধ দরজার সামনে গিয়ে মেজকর্তা দমাদ্দম লাথি মারতে থাকেন—

ঘরের ভেতরে মেজগিন্নীরও যত ঘুম, গিরিরও ঘুম তত।

শেষে বুঝি গিরির ঘুম ভাঙে। মস্ত বড় ঘোমটা টেনে দরজা খুলে দেয়। তারপর নিজের বিছানাটা গুটিয়ে নিয়ে বাইরে এসে বারান্দায় আবার পাতে।

কিন্তু ছোট কর্তা আসেন আরো অনেক রাতে। যখন রাত প্রায় শেষ হবার উপক্রম। তখন কেউ জেগে থাকে না। টের পায় না কেউ। ঘুমে ঢোলে ব্রিজ সিং। তবু ছোট-বাবুর সাদা ওয়েলার জোড়া পায়ে ঠকা-ঠক্ শব্দ করে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে। ঢং ঢং বাজে ছোটবাবুর ল্যাণ্ডোলেটের ঘণ্টা। ভেতরে জেগে বসে আছেন একলা। বেশি কথার লোক নন্। গাড়ি এসে গাড়ি-বারান্দার নিচে দাঁড়ালে নিজেই নামেন। বংশী দরজা খুলে বাতিটা জেবলে দেয় ঘরের। গায়ের জামা খুলে নেয়! হাতের হীরের আংটি, পায়ের জুতো। এক এক করে নতুন কোঁচানো ধুতি এগিয়ে দিতে হবে—সেটা পরে শুয়ে পড়বেন।

এ-সব বংশীর কাছে শোনা।

এমনি দিনের পর দিন। রাতের পর রাত।

কিন্তু যদি এই ভূতনাথের ঘরের ছাতের ওপর ওঠা যায়, দেখা যাবে অন্দর মহলের সব আলোগুলো তখন নেভানো। বউদের মহলের বারান্দায় শুধু ঝিলিমিলির ফাঁক দিয়ে টিম্ টিম্ করে জবলছে একটা তেলের ঝাড়। কিন্তু সব চেয়ে উজ্জবল বাতিটা জবলছে ছোট মা'র ঘরে।

বংশী বলে—ছোট মা তো ঘুমোয় না—সমস্ত রাতই পেরায় ঘুমোয় না—

ভূতনাথ বলে—ঘুমোন্ না তো—করেন কী—

—ছোট মা যে লেখাপড়ি জানে শালাবাবু, বই পড়ে—নয়ত গল্প করে চিন্তার সঙ্গে—নয়ত পুতুলের জামা কাপড় তৈরী করে দু'জনে—ছোট মা'র পুতুলের সঙ্গে চিন্তার পুতুলের বিয়ে হয়—আমরা নুচি খাই—রসমণ্ডি খাই—নয়ত পুজো হয় যশোদা-দুলালের—

—সমস্ত রাত?—ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে।

—হ্যাঁ মাঝে মাঝে সমস্ত রাত—

তারপর যখন খবর পেণছোবে যে, ছোট-কর্তা ফিরেছে, তখন আলো নিভবে ছোট-মার ঘরের। চিন্তা ঘরের দরজায় হুড়কো বন্ধ করে ছোটমার ঘরের মেঝের ওপর ছোটমার বিছানার পাশে শুয়ে পড়বে।

এ সমস্ত বহুদিন আগের ঘটনা। কিন্তু অস্পষ্ট কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশের বাঁকা তৃতীয়ার চাঁদের মতন সমস্ত এখনও আঁকা আছে ভূতনাথের মনের শ্লেটে।

মোহিনী সিঁদুরের অফিসে ঢুকে খাওয়ার কথাটা মনে পড়লেই কেমন যেন ঘৃণা হতো ভূতনাথের। বরাবর পেটুক মানুষ। ভাল জিনিস খাওয়ার দিকে বরাবরের ঝোঁক তার। বড় বাড়িতে রাতের খাওয়া তেমন পছন্দ হয় না। ব্রজরাখাল নিরামিষাশী। তাছাড়া নিজের হাতে সে রান্না করে। বাজার করারই সময় হয় না তার। আর এই ষড় রিপুকে স্বদেশে আনতেই সে ব্যস্ত। কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য কোনওটাকেই সে প্রশ্রয় না দেবার পক্ষপাতী। সাধন পথে ওরা বড় অন্তরায়।

কিন্তু কালিঘাটের পাঁঠা এনে যখন পেছনের বাগানে বেঁধে রাখা হয়, পরের দিন মাংস খাবার জন্যে, তখন সারা দিন রাত কী চীৎকারটাই না করে। এক একদিন অন্দরের রান্না-বাড়ির আব্রু পেরিয়ে বাইরে ভেসে আসে গরম মশলা আর মাংসের গন্ধ। সারা বাড়িটা সে গন্ধে মাতাল হয়ে যায়।

ব্রজরাখালের নাকেও গন্ধ যায়।

নাকে কোঁচার কাপড় চাপা দেয়—বলে—জ্বালালে দেখছি—

ভূতনাথ বলে—গন্ধটা ভালো লাগছে না ব্রজরাখাল? পেঁয়াজ রসুন আর.........

ব্রজরাখাল বলে—রাখো তোমার পেঁয়াজ রসুন—শরীরের পক্ষেও কি এত সব মশলা পত্তর ভালো? হে—কেবল তমো গুণ বাড়ায় ও সব তামসিক খাওয়া—

কিন্তু ভূতনাথের পক্ষে লোভ সম্বরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

ব্রজরাখাল বলে—বুঝি তোমার রাতের খাওয়াটা সুবিধে হচ্ছে না—কিন্তু সুবিনয়-বাবুর বাড়িতে দুপুরবেলাটা তো ভালোই খাও—

কিন্তু ব্রজরাখালকে তার অসুবিধের কথাটা যেন বলতে কেমন বাধে।

সেদিন সকালবেলা অফিস যাবার মুখে হঠাৎ বংশী এসে ডাকলে—শালাবাবু—

সার্ট আর ধুতিটা তখন পরা হয়ে গেছে। জুতোটা পায়ে গলিয়ে বেরোবার বন্দোবস্ত করছে সে। ব্রজরাখাল তখন রান্নাঘরে রান্নায় ব্যস্ত।

বাইরে থেকে বংশী আবার ডাকলে—শালাবাবু—

—কী রে বংশী—

বাইরে আসতেই বংশী হঠাৎ কাছে সরে এল। চারিদিকে একবার ভালো করে দেখে নিয়ে গলাটা নিচু করলে। বললে—একটা কথা ছিল আপনার সঙ্গে—

—কী কথা রে—ভূতনাথ উদগ্রীব হয়ে রইল।

বংশী ইতস্তত করে বললে—ছোটমা আপনাকে একবার ডেকেছেন—

—ছোটমা? ছোটমা কে?

বড় বাড়িতে ছোটমা একজনই মাত্র। তবু কি জানি কেন ভূতনাথ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে—ছোটমা কে রে!

—আজ্ঞে ছোটকর্তার বউ ঠাকরুণ, ছোট বউ ঠাকরুণ এ বাড়ির—

কানে কথাটা স্পষ্টই শুনতে পেলে ভূতনাথ। কিন্তু যেন বিশ্বাস হলো না। বললে—আমাকে না মাস্টারবাবুকে?

—মাস্টারবাবুকে নয়, আপনাকে, আমি ঠিক শুনেচি—

এত লোক থাকতে তাকে যে কেন ছোট বউঠাকরুণ ডাকবে তা বুঝতে পারলে না ভূতনাথ। এত আব্রু চারিদিকে। এতদিন আছে এ বাড়িতে কোনও দিন কোনও সূত্রে বাড়ির কোনও মেয়ে-বউকে দেখবার সৌভাগ্য হয়নি ভূতনাথের। চারিদিকে ঝিলিমিলি, পর্দা পাল্কী—সব চিকে ঢাকা। বাড়ির ভেতরেও বাইরের পুরুষদের যাওয়া নিষেধ। সে বাড়িতে বউ তাকে ডাকছে—সে কী রকম! ছোটমার নাম শুনেছে চাকর-বাকরদের কাছে। তাদের কথাবার্তা থেকে ছোট বউঠাকরুণ সম্বন্ধে একটা ধারণাও করে নিয়েছে। কিন্তু বাইরের অজ্ঞাতে পুরুষকে ছোট বউঠাকরুণ ডেকে দেখা করতে চেয়েছেন—তাই বা কেমন বিচিত্র ব্যাপার। তাছাড়া এতো আর সুবিনয়বাবুর বাড়ি নয়। তাঁরা হলেন ব্রাহ্ম। জবামণী ভূতনাথের সামনে বেরিয়েছে, কথা বলতেও তার আপত্তি নেই হয়ত কিন্তু তা বলে বড় বাড়ির ছোট বউ?

ভূতনাথ বললে—কী জন্যে কিছু বলেছেন নাকি তোমার ছোটমা—

—তা কিছু বলেনি—

ভূতনাথ কী বলবে ভেবে পেলে না। ব্রজরাখালকে একবার জিজ্ঞেস করা উচিত যাবার আগে।

বংশী বললে—তা হলে আমি সন্ধ্যেবেলা আপনাকে ডেকে নিয়ে যাবো—কী বলেন—

ভূতনাথ 'আচ্ছা' বলে অফিসে বেরিয়ে পড়ল।

(ক্রমশঃ)

অনুগণক যন্ত্র

শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

দেহ ও মন দুই নিয়েই মানুষ সম্পূর্ণ। দেহের যেমন চাহিদা আছে, মনেরও তেমনি চাহিদা আছে। শুধু দেহের চাহিদা মিটলেই মানুষ সম্পূর্ণ পরিতুষ্ট হতে পারে না, মনের চাহিদাও তার মেটানো চাই। মানুষের কায়িক পরিশ্রম লাঘবের কাজে যন্ত্রকে বিজ্ঞানীরা যেদিন প্রথম নিযুক্ত করেন, সেদিন তাঁরা অনেকখানি উল্লসিত হয়েছিলেন সত্য, কিন্তু পরিপূর্ণ আত্মতৃপ্তি লাভ করতে পারেননি। একটি প্রশ্ন সেদিন তাঁদের বিশেষভাবে চিন্তান্বিত করেছিল—যন্ত্রের দ্বারা মানুষের মানসিক পরিশ্রমও কি লাঘব করা যায় না?

দৈনন্দিন জীবনে মানুষকে কত রকমের হিসাবনিকাশ রাখতে হয় এবং তার জন্যে গণিতের সাহায্য তাকে নিতে হয়। সাধারণ যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগের হিসাব মেলাতে তেমন কিছু অসুবিধা নেই। কিন্তু ৯৩৫ সংখ্যাকে ৯৩৫ দিয়ে যদি ৫০বার গুণ করতে হয়, তাহলে বেশ কিছুক্ষণ মাথা ঘামিয়ে কাগজ পেন্সিল নিয়ে অঙ্ক কষে তার ফল বার করতে হয়। এমন যন্ত্র কি প্রস্তুত করা যায় না, যার সাহায্যে এক সেকেন্ডের মধ্যে এই রকম হিসাব করে ফেলা যায়? এই ধরণের যন্ত্র প্রস্তুত করার আকাঙ্ক্ষা বিজ্ঞানীদের বহুদিনের। বহু দেশের বহু বিজ্ঞানী বহুদিন থেকে এই আকাঙ্ক্ষা পূরণের চেষ্টা করেছেন এবং তার ফলে বহুবিধ যন্ত্রও প্রস্তুত হয়েছে। যন্ত্রের ক্রমোন্নতি হতে হতে অধুনা যে 'ইলেকট্রনিক ক্যালকুলেটার' বা বিদ্যুৎ চালিত অনুগণক যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, তাতে বিজ্ঞানীদের বহুদিনের সেই স্বপ্ন-সাধ আজ সার্থক। গণিত সংক্রান্ত যেসব জটিল সমস্যার সমাধানের জন্যে মানুষকে বহুদিন ব্যাপী কঠোর মানসিক পরিশ্রম করতে হত, আজ অনুগণক যন্ত্রের সহায়তায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে সেগুলির সমাধান করা যায়। অনুগণক যন্ত্র মানুষের কাছে আজ তাই এক পরম আশীর্বাদস্বরূপ।

এইচ এইচ অয়কেনঃ অনুগণক যন্ত্রের প্রথম আবিষ্কারক

অনুগণক যন্ত্রের ক্রমোন্নতির ইতিহাস

মানুষের ইতিহাসে গণিতের প্রচলন খুব প্রাচীন নয়। সাড়ে তিনশো চারশো বৎসর পূর্বে মানুষ গণিতের ব্যবহার শুরু করে। তখন যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগের মধ্যেই গাণিতিক কাজ সীমাবদ্ধ ছিল। কারণ তখন মানুষের জীবনযাত্রার প্রণালী এমন সহজ সরল ছিল যে, এর বেশী গাণিতিক কাজের সাহায্য নেওয়ার প্রয়োজন হত না।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে জগতে মানুষের জীবনধারার গতি দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকে এবং আধুনিক জগতের সূত্রপাত হয়। মানুষের সমাজ-ব্যবস্থা তখন অনেকখানি উন্নত হয়েছে, ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে মানুষ নজর দিয়েছে। রাষ্ট্রের কর, ব্যবসা-বাণিজ্যের লাভ-ক্ষতি, মূলধন ও শুল্কের হিসাব, রাষ্ট্রের সামরিক শক্তির খতিয়ান ইত্যাদি হিসাব-নিকাশের জন্যে গণিতের সাহায্য নেওয়া তখন একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এছাড়া জরিপ, খনিজ যন্ত্রবিজ্ঞান, সামরিক যন্ত্র-বিজ্ঞান এবং অন্যান্য কারিগরী কাজে নির্ভুল গাণিতিক হিসাব একেবারে অপরিহার্য। মানুষ দেখল, গণিতের সাহায্য নিলে তার সময় অনেক বাঁচে এবং ভুলচুকের ঝঞ্ঝাট থেকে রেহাইও পাওয়া যায়। তাই এই সময় থেকে গণিতের প্রতি মানুষের বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ পায়। ১৫৮৫ সালে সাইমন স্টিফিন নামক একজন ওলন্দাজ তাঁর রচিত একটি পুস্তিকায় দশমিক পদ্ধতি অনুসরণের সুবিধার কথা প্রচার করলেন এবং তার ফলে পাটিগণিতের ক্ষেত্রে একটি নতুন ধারার প্রবর্তন হলো। ১৬১৪ সালে আর একটি নতুন ধারা প্রবর্তিত হলো জন নেপিয়ারের 'লগারিদম্' প্রণালীর আবিষ্কারে। লগারিদম প্রণালী আবিষ্কারের জন্যে নেপিয়ার গণিত-জগতে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। কারণ তাঁর উদ্ভাবিত প্রণালী গণিতের বহু জটিল হিসাবনিকাশের কাজ বহুলাংশে সরল করে দিয়েছে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে এইভাবে জগতে যখন গণিতের একটা আবহাওয়া গড়ে উঠেছে, তখন ব্লেইসী প্যাসকল্ নামক ১৮ বৎসরের একটি ফরাসী দেশীয় কিশোর অঙ্ক কষার এক যন্ত্র প্রস্তুত করে। প্যাসকলের বাবা ফ্রান্সের নরম্যাণ্ডি শহরে সরকারী গণিতক বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। গণিতক কাজে তাঁকে নানারকম হিসাব রাখতে হত এবং প্যাসকল তার বাবাকে এই কাজে সাহায্য করত। বাবার কাজে সাহায্য করতে করতে প্যাসকল দেখল—হিসাবপত্র মেলাবার জন্যে হরদম যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ করতে হয়, এতো বড় মুশকিল। তখন তার মাথায় একটা চিন্তা এলো—এসব কাজের উপযোগী একটা যন্ত্র যদি প্রস্তুত করা যায়, তাহলে আর এত ঝামেলা পোহাতে হয় না। ১৬৪২ সালে প্যাসকল এই ধরণের একটি যন্ত্র সত্যসত্যই প্রস্তুত করল। প্যাসকলের এই যন্ত্রই জগতে সর্বপ্রথম অনুগণক যন্ত্র (Calculating Machine)। এই যন্ত্র দিয়ে যোগ-বিয়োগের কাজ অনায়াসে করা যেত, কিন্তু গুণ বা ভাগের কাজ মোটেই করা যেত না।

ডাঃ ভানেভার বুশঃ ডিফারেন্সিয়াল অ্যানা-লাইজারের প্রথম আবিষ্কারক

যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ চারটি কাজই করা যায় এমন যন্ত্র সর্বপ্রথম প্রস্তুত করেন লিবনিজ্ ১৬৯৪ সালে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আরও বহুপ্রকার অনুগণক যন্ত্র আবিষ্কৃত হলো। কিন্তু এই সকল যন্ত্রের কোনটিই তেমন সুবিধাজনক হয়নি। কয়েকটি যন্ত্র ছিল, যা বিশেষজ্ঞরা ছাড়া অপর কেউ ব্যবহার করতে পারত না। তা ছাড়া তখন যান্ত্রিক কলাকৌশলও বিশেষ উন্নত হয়নি। এই কারণে দৈনন্দিন জীবনের কাজে এই সকল যন্ত্রের গণনার উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করা যেত না।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যান্ত্রিক কলা-কৌশলের উৎকর্ষসাধনের সঙ্গে সঙ্গে উন্নত ধরণের অনুগণক যন্ত্র প্রস্তুত হতে লাগল। ১৮২০ সালে টমাস কলমার নামক জনৈক ফরাসী সর্বসাধারণের ব্যবহারোপ-যোগী অনুগণক যন্ত্র প্রথম প্রস্তুত করেন।

১৮৯২ সালে 'ব্রানসভিগা' নামক একটি বিশেষ উন্নত শ্রেণীর অনুগণক যন্ত্র

আবিষ্কৃত হয়। সে সময় এই যন্ত্রটি গণনার কাজে এত উপযোগী হয়েছিল যে, ২০ বছরের মধ্যে ২০ হাজার যন্ত্র বিক্রয় হয়ে যায়। ব্রানসভিগা যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বে হাত দিয়ে যন্ত্র ঘুরিয়ে গণনাকারীকে অঙ্কের ফল বার করতে হত। এতে পরিশ্রম কম হত না। ব্রানস্‌ভিগা যন্ত্রের সময় থেকে বিদ্যুতের সাহায্যে যন্ত্র ঘোরাবার ব্যবস্থা হলো এবং গণনাকারীর পরিশ্রম অনেক কমে গেল।

এতক্ষণ পর্যন্ত যে সকল যন্ত্রের কথা উল্লেখ করা হলো, সেগুলিকে বলা হয় 'ডিজিটাল ইন্‌স্ট্রুমেণ্ট' বা আঙ্কিক যন্ত্র। কারণ এই যন্ত্রগুলি প্রকৃতপক্ষে শুধু অঙ্ক নিয়েই কাজ করে এবং অঙ্কের সাহায্যে এতে সংখ্যা লিখিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে 'অ্যানালোগ্ মেশিন' বা প্রতিসম যন্ত্র নামক সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের অনুগণক যন্ত্র নির্মিত হয়। যান্ত্রিক কলাকৌশলের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই যন্ত্রেরও উৎকর্ষ সাধিত হতে থাকে এবং বিংশ শতাব্দীতে অনেকটা উন্নত শ্রেণীর যন্ত্র প্রস্তুত হয়।

'অ্যানালোগ্' যন্ত্র কিভাবে কাজ করে একটি উদাহরণ উল্লেখ করলে তা বোঝা যাবে। 'স্পিডোমিটার' বা গতি-পরিমাপক যন্ত্রের কথা অনেকে জানেন হয়তো। এটি 'অ্যানালোগ্' যন্ত্রেরই শ্রেণীভুক্ত। মনে করুন, স্পিডোমিটারের সাহায্যে কোন মোটর গাড়ীর গতি আমাদের নির্ধারণ করতে হবে। এর জন্যে আমাদের দুটি তথ্য জানা প্রয়োজন, প্রথমত গাড়ি কতটা দূরত্ব অতিক্রম করেছে এবং দ্বিতীয়ত সেই দূরত্ব অতিক্রম করতে সময় কত লেগেছে। এই দুটি তথ্য যদি জানা থাকে, স্পিডোমিটার অনায়াসেই গাড়ির গতি নির্ণয় করে দেবে।

সমস্যাটি যদি বিপরীত ধরণের হয় অর্থাৎ মোটরচালকের গতির হার দেওয়া আছে এক ঘণ্টায় সে কতদূর পথ অতিক্রম করেছে, তা নির্ণয় করতে হবে, সেই সমস্যারও সমাধান 'অ্যানালোগ্' যন্ত্রে করা যায়। বিপরীত শ্রেণীর এই অ্যানালোগ যন্ত্রকে বলা হয় 'ডিফারেনসিয়াল অ্যানালাইজার'। ১৮৭৬ সালে লর্ড কেলভিন কিভাবে ডিফারেন-সিয়াল অ্যানালাইজার প্রস্তুত করা যেতে পারে, তার একটা নক্সা অংকন করেছিলেন। কিন্তু এই যন্ত্র প্রস্তুত করতে যে সকল যান্ত্রিক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, তার সমাধান তিনি করতে পারেননি এবং সেই কারণে তাঁর পক্ষে যন্ত্র প্রস্তুত করা সম্ভব হয়নি। ১৯৩১ সালে ডাঃ ভানেভার বুশ এই সকল অসুবিধা দূর করে ডিফারেন-সিয়াল অ্যানালাইজার প্রথম প্রস্তুত করেন।

আঙ্কিক যন্ত্রের তুলনায় 'অ্যানালোগ' যন্ত্রের একটি মস্ত সুবিধা হলো এই যে, এই যন্ত্রে একবারে সম্পূর্ণ সমস্যার সমাধান পাওয়া যায়। আঙ্কিক যন্ত্রে হাজারবার ধাপে ধাপে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগের ফল বার করে তারপর প্রাথমিক পর্যায়ের ফলগুলি মিলিয়ে সম্পূর্ণ সমস্যার সমাধান বার করতে হয়।

কিন্তু অ্যানালোগ যন্ত্রের কয়েকটি অসুবিধাও আছে। প্রথমতঃ এই যন্ত্রে নির্ণীত ফল খুব বেশী নির্ভরযোগ্য নয়। আর একটি অসুবিধা হলো, এই যন্ত্রে কেবল এক শ্রেণীর সমস্যার সমাধান করা যায়। পক্ষান্তরে যদি যথেষ্ট সময় দেওয়া যায়, আঙ্কিক যন্ত্র সকল প্রকার সমস্যারই সমাধান করে দিতে পারে।

'অ্যানালোগ্' যন্ত্রের এই অসুবিধা দেখে বিজ্ঞানীদের এই চিন্তা হলো আঙ্কিক ও অ্যানালোগ উভয়বিধ যন্ত্রের সুবিধা সমন্বিত করে এমন যন্ত্র কিরূপে প্রস্তুত করা যায়, যাতে আঙ্কিক যন্ত্রের মতো মিনিটে মিনিটে অঙ্কের ফল নিয়ে কাজ করতে হয় না অথচ যে কোন প্রকার সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান করা যায় এবং যন্ত্রের নির্ণীত ফলও যতদূর সম্ভব নির্ভরযোগ্য হয়।

কয়েক বৎসর পূর্বে বিজ্ঞানীরা উভয়বিধ গুণসমন্বিত এই প্রকার যন্ত্র প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছেন। এই উন্নততর যন্ত্র সাম্প্রতিক কালে আবিষ্কৃত হলেও, এর পরিকল্পনা কিন্তু বহুদিন পূর্বেই রচিত হয়েছিল। ১৮৩৩ সালে কেম্ব্রিজের গণিতজ্ঞ চার্লস ব্যাবেজ এই ধরণের একটি অনুগণক যন্ত্রের নক্সা প্রস্তুত করেন। এই যন্ত্র নির্মাণকল্পে তিনি যে সকল পদ্ধতি উদ্ভাবন করে-ছিলেন আধুনিক যন্ত্র প্রস্তুতের ক্ষেত্রে সে সবগুলিই প্রায় অনুসৃত হয়। দুঃখের বিষয় ব্যাবেজ তাঁর উদ্ভাবিত পদ্ধতিগুলিকে কাজে লাগিয়ে যন্ত্র প্রস্তুত করতে পারেন নি। তার

এই আধুনিক অনুগণক যন্ত্রে একই গণনা পাশাপাশি দুই স্থানে হইতেছে। দুইটির ফলাফল সমান হইলে গণনা নির্ভুল বুঝা যাইবে। দুইটির মধ্যে গণনায় যে মুহূর্তে তফাৎ দেখা দিবে, সে মুহূর্তে যন্ত্র আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া যায়

কারণ ঊনবিংশ শতাব্দীতে গিয়ার, লিভার ইত্যাদি যান্ত্রিক কলাকৌশল ছাড়া উন্নততর কৌশল জানা ছিল না।

বিংশ শতাব্দীতে দুটি নতুন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে এই ধরণের যন্ত্র প্রস্তুত করা সম্ভব হয়। একটি পদ্ধতি হলো ইলেক্‌ট্রো-মেকানিক্যাল রিলে (স্বয়ংক্রিয় দূরভাষ বিনিময়ে দৈনন্দিন যা ব্যবহৃত হয়ে থাকে) এবং অপরটি হলো ইলেক্‌ট্রনিক পদ্ধতি (রেডিও-ভালব, ফটো-ইলেক্‌ট্রিক সেল ও ক্যাথড্-রে টিউবে যা প্রযুক্ত হয়ে থাকে)। যান্ত্রিক কলাকৌশলের পরিবর্তে এই নতুন পদ্ধতি দুটি অনুসৃত হওয়ায় আধুনিক অনুগণক যন্ত্রে গাণিতিক সমস্যাসমূহের অতি সহজেই সমাধান করা যায় এবং যন্ত্রের কার্যক্ষমতার গতিও বহুগুণ বর্ধিত হয়েছে।

আধুনিক অনুগণক যন্ত্র

১৯৪৪ সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অয়কেন আধুনিক পদ্ধতিতে একটি বিরাট স্বয়ংক্রিয় অনুগণক যন্ত্র প্রস্তুত করেন। আধুনিক অনুগণকসমূহের মধ্যে এটিই হলো সর্বপ্রথম, এই কারণে অয়কেনকে আধুনিক অনুগণক যন্ত্রের জনক বলা হয়। তড়িচ্চুম্বক রিলে পদ্ধতির ভিত্তিতে অয়কেন এই যন্ত্রটি প্রস্তুত করেন। এই যন্ত্রে এক সেকেন্ডের এক-তৃতীয়াংশ সময়ে ২৩টি অঙ্কবিশিষ্ট দুটি সংখ্যার ফল এবং ৬ সেকেন্ডের মধ্যে এই প্রকার দুটি সংখ্যার গুণফল নির্ণয় করা যায়। সাধারণ অনুগণক যন্ত্রের তুলনায় অয়কেনের যন্ত্রের গণনার গতি ১০০ গুণ দ্রুত। ১৯৪৬ সালে জন মচলী ও প্রেস্‌পার একার্ট নামক দুজন মার্কিন বিজ্ঞানী ইলেক্‌ট্রনিক পদ্ধতি অনুসরণ করে অয়কেনের যন্ত্র অপেক্ষা দ্রুত কার্যক্ষম একটি অনুগণক যন্ত্র নির্মাণ করেন। এই যন্ত্রের গণনার গতি অয়কেনের যন্ত্র অপেক্ষা ১০০ গুণ দ্রুত। মচলী-একার্টের যন্ত্রের পর আরও কয়েকটি ইলেক-ট্রনিক অনুগণক যন্ত্র প্রস্তুত হয়েছে। এই সকল যন্ত্রের কলাকৌশলের খুঁটিনাটি অত্যন্ত জটিল, এখানে তা বর্ণনা করা সম্ভবপর নয়। জটিলতা পরিহার করে সাধারণভাবে ইলেকট্রনিক অনুগণক যন্ত্রের কলাকৌশল এখানে বর্ণনা করছি।

আধুনিক স্বয়ংক্রিয় অনুগণক যন্ত্র যেমন চিন্তা করতে পারে, এই যন্ত্র আপনা মানুষের মস্তিষ্কস্বরূপ। তবে মানুষ নিজে থেকে সেরূপ চিন্তা করতে পারে না। এইখানেই মানুষের মস্তিষ্কের সঙ্গে এই যান্ত্রিক মস্তিষ্কের পার্থক্য। কিন্তু যন্ত্রীর নির্দেশের যা অপেক্ষা, নির্দেশ পাবার সঙ্গে সঙ্গেই যন্ত্র আপনা থেকে গণনার কাজ শুরু করে দেয়। চিকিৎসক যেমন রোগ নির্ণয় করার পর ওষুধের প্রেস্‌ক্রিপসন লিখে দেন, গণিতজ্ঞ তেমনি তাঁর গাণিতিক সমস্যার সমাধানকল্পে প্রয়োজনীয় তথ্য সহ একটি নির্দেশনামা লিখে যন্ত্রে ভরে দেন। নির্দেশনামায় লেখা থাকে যন্ত্রকে কি কি গাণিতিক কাজ করতে হবে এবং কি পর্যায়-ক্রমে করতে হবে। নির্দেশনামা অনুযায়ী যন্ত্র যোগ বিয়োগ, গুণ ভাগের কাজ করে একটি 'স্মৃতি ভাণ্ডারে' তার গণনার ফল জমা করে রাখে। তারপর যন্ত্রী আবার যেমন নির্দেশ দেবেন, যন্ত্র তখন তার 'স্মৃতি ভাণ্ডারে' সঞ্চিত ফল উদ্ধার করে পরবর্তী নির্দেশ মতো কাজ শুরু করে দেবে। এইভাবে শুধু এক নির্দেশ নেওয়া ছাড়া আর কোন বিষয়ে মানুষের সাহায্য না নিয়ে অনুগণক যন্ত্র অতি অল্প সময়ে গাণিতিক সমস্যার সম্পূর্ণ মীমাংসা করে দেয়। এক দিক থেকে যন্ত্রের 'স্মৃতিশক্তি' মানুষের স্মৃতিশক্তি অপেক্ষাও প্রখর। যন্ত্র তার 'স্মৃতি ভাণ্ডারে' ৪ লক্ষ অঙ্ক চিরদিনের জন্যে সঞ্চয় করে রাখতে পারে। এ ছাড়া যে বিদ্যুৎ গতিতে যন্ত্র যোগ বিয়োগ, গুণ ভাগের কাজ করে তা মানুষের সাধ্যাতীত। যন্ত্রে ১১টি অঙ্ক-বিশিষ্ট সংখ্যার যোগ বিয়োগ প্রতি সেকেন্ডে ৩৫০০ বার করা যায় এবং ১৪টি অঙ্ক-বিশিষ্ট সংখ্যার গুণ প্রতি সেকেন্ডে ৫০ বার ও ভাগ প্রতি সেকেন্ডে ২০ বার করা যায়।

গণনার কাজে মানুষেরই যখন সময়ে সময়ে ভুল হয়, যন্ত্রের গণনায় ভুল হওয়া তখন অস্বাভাবিক নয়। যাতে যন্ত্রের গণনায় কোনও রকম ভুল না হয়, সেজন্যে দুটি সমগোত্রীয় অনুগণক যন্ত্র পাশাপাশি স্বাধীনভাবে কাজ করে যায়। দুটি যন্ত্রে প্রত্যেক পর্যায়ের গণনার একই রকম ফলের অনুলিপি লিখিত হতে থাকে। যদি কোন মুহূর্তে দুটি যন্ত্রের নির্ণীত ফলে বিন্দু-মাত্র তারতম্য ঘটে, সঙ্গে সঙ্গে দুটি যন্ত্রই বন্ধ হয়ে যাবে। যন্ত্রের তত্ত্বাবধায়করা তখন অনুসন্ধান করতে থাকেন কোন্ গাণিতিক কাজ করতে গিয়ে কোন্ টিউব বা রিলে নষ্ট হয়ে গেছে। যে টিউব বা রিলে নষ্ট হয়েছিল সেটাকে পরিবর্তন করে যখন আবার সংযোগ স্থাপন করে দেওয়া হয়, তৎক্ষণাৎ যন্ত্র চলতে শুরু করে। সমগ্র অনুগণক যন্ত্রে ১২ হাজার ইলেকট্রনিক টিউব থাকে এবং প্রতিদিন গড়পড়তায় ৪টি টিউব নষ্ট হয়। কখন কখনও কয়েক মুহূর্তের মধ্যে দোষ ধরা পড়ে। কখন কখনও আবার দোষ খুঁজে বার করতে কয়েক দিনও কেটে যায়।

ইলেকট্রনিক অনুগণক যন্ত্র চালু রাখার খরচ হাতিপোষার ব্যাপার। ১২ হাজার ইলেক্‌ট্রনিক টিউবের জন্যে দৈনন্দিন ১৮০ কিলোয়াট বিদ্যুৎ শক্তি ব্যয়িত হয় এবং এই শক্তি টিউব, তার ও রিলেকে অত্যন্ত উত্তপ্ত করে তোলে। তাপের সমতা রক্ষার জন্যে তাই শৈত্যতাপনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে হয়। কাচের প্রাচীরের মধ্যে শীতল বাতাসের আবহাওয়ায় সমগ্র যন্ত্রটিকে স্থাপন করা হয়। প্রতি ঘণ্টায় ২ টন বরফের গলনে যে শৈত্য উৎপন্ন হতে পারে বৈদ্যুতিক হিমযন্ত্রে তার সমান শৈত্য বজায় রাখা হয়। সমগ্র যন্ত্রের তত্ত্বাবধানের জন্যে মোট ৩০জন যন্ত্র-বিদের প্রয়োজন। এই সমস্ত নিয়ে যন্ত্রের পরিচালনে ঘণ্টায় প্রায় ১২০০ টাকা ব্যয় হয়। এই বিপুল ব্যয়ভার বহন করতে পারে কে? আমাদের দেশের মতো দরিদ্র দেশে এই হাতিপোষার খরচ জোগানো তো সম্ভবই নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো ধন-কুবেরের দেশেও অতি মুষ্টিমেয় প্রতিষ্ঠান ছাড়া অপর কেউ স্বল্প সময়ের জন্যেও ব্যয় দিয়ে এই যন্ত্র ব্যবহার করতে পারে না। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়-ভবনে ইন্টার-ন্যাশনাল বিজনেস্ মেসিন কর্পোরেশন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের যুক্ত তত্ত্বাবধানে একটি সুবৃহৎ ইলেকট্রনিক অনুগণক যন্ত্র স্থাপিত হয়েছে। যন্ত্র ব্যবহারের ব্যয়ভার বহনে অক্ষম বিজ্ঞানীদের বিনা ব্যয়ে এই যন্ত্র ব্যবহার করতে দেওয়া হয়—অবশ্য কয়েকটি সর্তে। কিন্তু কোন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান যদি এই যন্ত্র ব্যবহার করতে চান, তাঁদের ভাড়া দিতে হয়। সমগ্র পৃথিবীতে এই ধরণের ইলেকট্রনিক অনুগণক যন্ত্র ৬টি কি ৭টি আছে।

অনুগণক যন্ত্রের উপযোগিতা

অনুগণক যন্ত্র প্রধানত গাণিতিক সমস্যার সমাধানকল্পে ব্যবহৃত হলেও, এর উপযোগিতা শুধু গণিতের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। যে কোন প্রকার সমস্যা হোক, তা যদি যথাযথভাবে বিবৃত করা হয় এই যন্ত্রের সাহায্যে তার সমাধান ও যৌক্তিক ফলাফল নির্ধারণ করা যায়। মানুষের প্রয়োজনীয় বহুক্ষেত্রে অনুগণক যন্ত্রের উপযোগিতার

সম্ভাবনা আছে। আজ অতি অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে অনুগণক যন্ত্রকে কাজে লাগানো হয়েছে। পারমাণবিক পদার্থবিদ্যা ও বায়বীয় গতিবিদ্যায় এমন অনেক সমস্যা আছে, পুরাতন পদ্ধতি অনুসরণে যার সমাধান করতে গেলে সারা জীবন প্রায় অতিবাহিত হয়ে যায়। বর্তমানে ইলেকট্রনিক অনুগণক যন্ত্রের অমানুষিক গতির বলে অল্প সময়ের মধ্যে সেই সকল সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়েছে।

বিভিন্ন কঠিন পদার্থের মধ্যে পরমাণু বিভিন্নভাবে সাজানো থাকে। কোন্ পদার্থে পরমাণু কিভাবে সাজানো আছে, তা জানবার জন্যে এক্স-রে কৃস্ট্যালোগ্রাফির সাহায্য নিতে হয়। এই পদ্ধতিতে অনেক কিছু নিয়ে বাছ বিচার করে দেখতে হয় এবং তার দরুণ কিছু ভুলচুক থেকে যেতে পারে। যদি বিজ্ঞানী সঠিকভাবে প্রাথমিক অনুমান করতে পারে, তা হলে এক্স-রে আলোকচিত্রের সংগৃহীত তথ্য থেকে কঠিনপদার্থের মধ্যে পরমাণুর যথাযথ অবস্থিতি নির্ণয় করা যায়। কিন্তু প্রাথমিক অনুমানের জন্যে অনেক সময় এত বেশী বাছ-বিচার করতে হয় যে, সমাধান খুঁজে পাওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। ইলেকট্রনিক অনুগণক যন্ত্রে এই বাছ-বিচারের কাজ একের পর এক করে দেখে আকাঙ্ক্ষিত বস্তুটিকে পেতে বিশেষ দেরী হয় না। আরও বহু অনুরূপক্ষেত্রে এই যন্ত্র বিজ্ঞানের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করেছে এবং তত্ত্বীয় বিষয়কে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের পথ সুগম করে দিয়েছে।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান-ক্ষেত্রে এই যন্ত্র যখন প্রযুক্ত হবে, তখন এক যুগান্তর ঘটবে। যদি কোন দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পূর্ণ তথ্য যন্ত্রকে জানিয়ে দেওয়া হয়, তা হলে কোন একটি কর বৃদ্ধি করলে দেশে কি প্রতিক্রিয়া অথবা কৃত্রিম সার প্রয়োগ করলে জমির উৎপাদন ক্ষমতা কতটা বৃদ্ধি পাবে, তার ফলাফল কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যন্ত্র বলে দেবে। বর্তমানে যে সকল অর্থনৈতিক সমস্যার যৌক্তিক উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না, যন্ত্র তার যথাযথ উত্তর জানিয়ে দেবে।

শিল্পী, বিজ্ঞানী, কবি, দার্শনিকদের মতো অনুগণক যন্ত্রের নিজস্ব সৃজনী নেই যদিও, কিন্তু মানুষের মস্তিষ্কের অনেক কাজের ভার সে গ্রহণ করতে পারে। মানুষের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনুগণক যন্ত্রের ব্যবহার যত ব্যাপক হয়ে উঠবে তার উপযোগিতাও তত অনুভূত হবে। ভবিষ্যতে এমন দিন আসবে, যখন মানুষের গতানুগতিক সমস্ত মানসিক কাজের ভার এই যন্ত্র গ্রহণ করবে এবং দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রমের সকল কাজ যন্ত্রের সাহায্যে করা যাবে। সকল প্রকার শ্রান্তি ক্লান্তি থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ সেদিন তার সৃজনী প্রতিভার পূর্ণতম বিকাশসাধনের সুযোগ পাবে।

নিষিদ্ধ সমুদ্রযাত্রার ইতিকথা

নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য

না হয় স্বীকার করে নিলুম যে রূপকথার রাজপুত্র সব পারে : সোনার কাঠি রূপোর কাঠি ছুঁইয়ে পাতালপুরীর রাজকন্যার ঘুম ভাঙগানো, রাক্ষসবধ এবং এক নিমেষে পার হতে পারে সাত সমুদ্র তের নদীর পথ। কিন্তু মুশকিল যতো এই সাধারণ মানুষের বেলায়। সাত সমুদ্র দূরে থাক, এক সমুদ্র পার হতেই তাকে প্রথমে আবিষ্কার করতে হয়েছিল ভাসমান কোন কিছু—যা চলবে, অথচ এমন কি পর্বত-প্রমাণ ঢেউ-এও বেসামাল হবে না। তাকে জানতে হয়েছিল সুগম পথ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে; জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ধাপে ধাপে করতে হয়েছিল একান্ত অপরিহার্য নিরাপদ বিধি-ব্যবস্থা। তবেই একদিন সম্ভব ও সার্থক হতে পেরেছে সমুদ্রযাত্রা।

সমুদ্রযাত্রা মানুষের একটি প্রাচীনতম কীর্তি। বহুকাল পর্যন্ত সেই পথ ছিল ভাগ্যের মতো অনিশ্চিত, আকাশের গ্রহ নক্ষত্রের মতো এক বিরাট বিস্ময়। আদিম যুগে খাদ্যান্বেষী মানুষ সমুদ্রোপকূল ধরে বিচরণ করতো; পরে সভ্যতার ঊষা-উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রবৃত্তি প্রয়োজনের তাগিদে সম্প্রসারিত হয় দূর থেকে দূরান্তরে বিদেশ-যাত্রায়। দেশবিদেশের মধ্যে গড়ে উঠে বেচাকেনার সম্বন্ধ, ব্যবসাবাণিজ্যের লেন-দেন। সুতরাং প্রয়োজন থেকে উদ্ভূত এই সমুদ্রযাত্রা আমাদের পক্ষে কেন নিষিদ্ধ হতে যাবে? তবে, পাছে সমুদ্রপথে দূর দেশে গিয়ে সনাতনী হিন্দুয়ানীতে খাপ খায় না এমনিতরো আচারব্যবহার নিয়ে কেউ ফিরে আসে এবং পরে সেই সব আচারব্যবহার এদেশের সমাজে চালু করতে চেষ্টা করে, সেই ভয়ে হয়ত সেকালের রক্ষণশীল সমাজ সমুদ্রযাত্রাকে নিছক পরিহার্য বলে গণ্য করেছে। কালক্রমে এই আশঙ্কাই সম্ভবত নিষেধের পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এদেশের সমুদ্রযাত্রা কি সেকালে বন্ধ ছিল? ধর্মপ্রচার থেকে আরম্ভ করে বাণিজ্যযাত্রা কতো কী সমুদ্রপথ দিয়ে সাধিত হয়েছে! অবশ্য যোড়শ শতক থেকে পর্তুগীজরা এদেশের ব্যবসাবাণিজ্যে অবতীর্ণ হওয়ার পর, প্রাকৃতিক কারণে যত-না হোক, তার চেয়ে ঢের বেশী মগ-ফিরিঙ্গীর উৎপাতে এদেশী বণিকের পক্ষে সমুদ্রপথে বিদেশযাত্রা দুঃসাধ্য হয়ে উঠলো। ক্রমে ক্রমে এদেশের ব্যবসাবাণিজ্য চলে যেতে থাকলো বিদেশী বণিকদের হাতে। এমনি করে বাঙালী সমুদ্রযাত্রায় অনভ্যস্ত হতে বাধ্য হল এবং এই অনভ্যাসহেতু অক্ষমতার সঙ্গে সংযোজিত হল সনাতনী হিন্দুয়ানীর জাত-যাওয়ার ভয়। অবশ্য অষ্টাদশ শতক থেকে ইংরেজ এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মগ-ফিরিঙ্গীর উৎপাতের ভয় উপশমিত হয়েছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু তখন রক্ষণশীল হিন্দুসমাজে 'অবাঞ্ছিত' সমুদ্রযাত্রার যুক্তি অনেকদূর জেঁকে বসেছে। তাই ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে বাঙলার নবজাগরণের অগ্রদূত রাজা রামমোহন যখন ইংলণ্ড যাত্রা করেছিলেন, তখন সেকালের সমাজ তাঁকে বিরত করবার উদ্দেশ্যে কত কী কটূক্তি করেছিল। রাজা রামমোহনের পর যাঁরা ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে প্রথমবার ইংলণ্ডে যান; ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ফিরে আসেন এবং ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে তিনি পুনরায় ইংলণ্ডে যান। তদবধি রক্ষণশীল সমাজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও সমুদ্রযাত্রা ধীরে ধীরে এত প্রসার লাভ করেছে যে একালে ছেলেমেয়েকে বিলেত দেশটাকে একবার ঘুরিয়ে না আনতে পারলে, উচ্চাভিলাষী মা-বাপের মন কিছুতেই কৌলিন্যে ভরে ওঠে না।

অথচ, এদেশের 'সমুদ্রযাত্রা' একটা এত পুরানো সংস্থা যে তার সন তারিখ নেই। 'মহাবংশ' ও অন্যান্য প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ থেকে জানা যায়, খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে বাঙলার বিজয়সিংহ তাঁর সাতশত অনুচরসহ লঙ্কা-বিজয় করে সেখানে এক উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। কিংবদন্তী আছে যে, অশোকের ভাই যুবরাজ মহেন্দ্র তাম্রলিপ্তি হয়ে জল-পথে সিংহল যাত্রা করেছিলেন। তাম্রলিপ্তি ছিল তখন প্রাচীন বাঙলার ব্যবসাবাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। পেরিপ্লাসের লোহিতসাগরের বিবরণীতেও (খৃষ্টীয় প্রথম শতক) বাঙলার ব্যবসাবাণিজ্যের কথা উল্লেখ আছে; বাঙলা থেকে 'কোলান্দিয়া' নামক একপ্রকার জাহাজে 'মস্‌লীন' রপ্তানি হত একথা জানা যায়। তারপর গুপ্তযুগে (খৃষ্টীয় ৩২০-৪৫৫) মহাকবি কালিদাস তাঁর 'রঘুবংশে' রঘুর বিজয়গৌরব বর্ণনাপ্রসঙ্গে 'বঙ্গান্‌...... নৌসাধনোদ্যতান্‌' বলে বাঙালীর নৌবলের ইঙ্গিত করেছেন। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রাচীন বাঙলার সমুদ্রযাত্রা ও নৌবল বাঙালীর ইতিহাসে এক অনবদ্য অধ্যায়। সমুদ্রযাত্রায় পারদর্শী বাঙালী বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে প্রচুর ধনোপার্জন করতো।

নানা বিষয়ে গুপ্তযুগ এক প্রভূত উন্নতির যুগের অবতারণা করেছিল। তখন বাঙলারও বহির্বাণিজ্যের সুবর্ণযুগ। প্রাচ্যের প্রত্যন্ত দেশসমূহে ও মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে বাঙলার ব্যবসাবাণিজ্য হয়ে উঠলো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এই ব্যবসাবাণিজ্যের যোগাযোগের ফলে সংস্কৃতিতেও বাঙলার অবদান হয়ে উঠলো অপরিসীম। মিঃ হাভেল ভারতীয় ভাস্কর্য ও কলাশিল্প প্রসঙ্গে বলেছেন:—

> "From the seaports of her eastern and western coasts India sent stream of colonists, missionaries and craftsmen all over Southern Asia, Ceylon, Siam and far-distant Cambodia. Through China and Korea Indian art entered Japan about the middle of the 6th, century."*

তখন পূর্বভারতের শ্রেষ্ঠ বন্দর ছিল তাম্রলিপ্তি। কিন্তু গুপ্তরাজাদের পর বাঙলার রাষ্ট্রীয় জীবন হয়ে উঠলো চঞ্চল। দেশের শাসনে এল বিশৃঙ্খলা; শাসক বলতে কেউ নেই। রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর পর সেই অরাজকতা বৃদ্ধি পেয়ে এল মাৎস্যন্যায়ের যুগ। শতাধিক বৎসর কেটে গেল মাৎ-স্যন্যায়ে—দুর্বলের উপর প্রবলের অত্যাচারে। তারপর পালরাজাদের আমলে যখন পুনরায় রাষ্ট্রতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হল, তখন দেখা গেল বাঙলার বহির্বাণিজ্য বহু-লাংশে চলে গিয়েছে আরবীয় বণিকদের হাতে। ইসলামধর্মে দীক্ষিত আরবীয়দের মধ্যে তখন নব জাতীয়তাবাদের সূত্রপাত এবং সুসংবদ্ধ জীবনযাত্রার জন্য নতুন উন্মাদনা। অষ্টম শতকের পর আর একদা সমৃদ্ধশালী তাম্রলিপ্তির কথা শোনা গেল না। ক্রমশ ব্যবসা-বাণিজ্যের অন্তর্নিহিত যথোপযুক্ত যান-বাহনের চলাচলের অভাবে কিম্বা প্রাকৃতিক কারণে সরস্বতী নদীর মুখ বন্ধ হয়ে যাওয়ায়, নদী পূর্ব খাত্‌ পরিত্যাগ করে নতুন খাত্‌ ধরে প্রবাহিত হতে থাকলো। ভারতের অন্তর্বাণিজ্যে রয়ে গেল বাঙলার অংশ; কিন্তু তাতে লাভের অঙ্ক সীমাবদ্ধ; দ্বিতীয়ত, সেকালের অন্তর্বাণিজ্যে দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্যই ছিল অন্তর্বাণিজ্যের মূল্য নির্ধারক। সুতরাং তখন এখানে আর আগের মত ধনসমাগম সম্ভবপর হল না। তাই গুপ্তোত্তর যুগে বেশ কিছুকাল বাঙালীকে পাওয়া গেল না সার্থক সমুদ্রযাত্রার ইতিহাসে। বাঙালী ক্রমশ একান্ত কৃষিনির্ভর হয়ে উঠলো।

কিন্তু বাঙালীর সামুদ্রিক বৃত্তি একেবারে নষ্ট হয়ে গেল না। পাল ও সেন আমলে প্রাচীন গৌড় নগর হিসাবে সমৃদ্ধিলাভ করে। প্রাচীন গৌড় প্রায় চতুর্দিকেই নদী-বেষ্টিত ছিল বলে সেখানে নৌশিল্প প্রতিষ্ঠালাভ করতে পেরেছিল। পরবর্তী-কালে এমন কি সুলতানী আমলেও গৌড়ের সমৃদ্ধি চলতে থাকে; অবশ্য তখন সপ্তগ্রাম হয়ে ওঠে বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দর। ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে বিরচিত মনসামঙ্গলে চাঁদ সদাগরের সপ্তগ্রাম দর্শন প্রসঙ্গে তথাকার সমৃদ্ধির বর্ণনা আছে:—

> অভিনব সুরপুরি দেখি সব সারি সারি
> প্রতি ঘরে কনকের সারা,
> নানা রত্ন অবিসাল জ্যোতিময় কাঁচ চাল
> রাজমুক্তা প্রলম্বিত ধারা।

মধ্যযুগে রচিত জনপ্রিয় মঙ্গলকাব্য-গুলোতে ধনপতি, শ্রীমন্ত ও চাঁদ সদাগরের সমুদ্রযাত্রার কাহিনীগুলো থেকে বাঙালীর সমুদ্রযাত্রার প্রতি আগ্রহ যে কত গভীর ও মজ্জাগত তার পরিচয় পাওয়া যায়। মনসা-মঙ্গলে 'গঙ্গাপ্রসাদ' 'সাগরফেনা' 'হংসরব' 'রাজবল্লভ' প্রভৃতি জাহাজের নাম থেকে মনে হয় যে, সেকালে জাহাজের নামগুলো ছিল একালের তুলনায় খুব কবিত্বপূর্ণ। কবি-কঙ্কণ চণ্ডীতে ধনপতির সিংহল উদ্দেশে সমুদ্রযাত্রা উল্লেখযোগ্য।

> প্রথম তুলিল ডিঙ্গা নাম মধুকর
> শুধাই সুবর্ণে তার বসিবার ঘর।
> আর ডিঙ্গা তুলিলেক নাম দুর্গাবর।
> তবে তোলে ডিঙ্গাখানি নাম গুয়ারেখি।
> দ্বিপ্রহরের পথে যার মাথা কাঠ লেখি॥
> আর ডিঙ্গা তুলিলেক নাম শঙ্খচূড়।
> আশি গজ পানি ভাঙ্গি গাঙ্গে লয় কূল
> তবে ডিঙ্গাখানি তোলে নাম সিংহমুখী
> সূর্যের সমানরূপ করে ঝিকিমিকি॥
> আর ডিঙ্গা তুলিলেক নাম চন্দ্রপাল।
> তাথে ভরা দিলে দুই কূলে হয় থান।
> আর ডিঙ্গা তুলিলেক নামে ছোটমুখী।
> তাহে চালু ভরা চাহে হাজার এক পটী।
> সম ধুনা দিয়া তবে গাইল সাত নায়।
> তড়িৎ গমনে ডিঙ্গা সাজিয়া চালায়॥
> সাতখানি ডিঙ্গা ভাসে ভ্রমরার জলে।
> গোঁজে বাঁধি রাখে ডিঙ্গা লোহার শিকলে।
> তার পিছে চলে ডিঙ্গা নাম চন্দ্রপাটি।
> যাহার উপরে চাঁদ মিলায়েছে হাটি।
> (বিজয় গুপ্ত

* * * *

সমুদ্রবাণিজ্য থেকে এদেশের বণিকদের প্রচুর লাভ হত। এখন কি এদেশের অত্যন্ত সাধারণ দ্রব্যসামগ্রীও বিদেশীরা বহুমূল্যে দিয়ে ক্রয় করতো। কিছুটা কাল্পনিক হলেও তার প্রমাণ পাওয়া যায় সেকালের কাব্যে "মূলার বদলে দিল গজদন্ত" (বিজয় গুপ্ত); 'শুক্তার বদলে মুক্তা দিল, ভেড়ার বদলে ঘোড়া' (কবিকঙ্কণ)।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের প্রথমভাগে পর্তুগীজরা এদেশে বাণিজ্য করতে শুরু করে। পর্তুগীজ বাণিজ্যের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ হয়ে ওঠে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ব্যবসাবাণিজ্যের সুবিধার জন্য তারা রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রয়োজন অনুভব করলো। ১৫৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দে শের শা'র বঙ্গ আক্রমণে সন্ত্রস্ত মহম্মদ শা পর্তুগীজদের বন্ধুত্বানুরাগী ছিলেন। আরাকানরাজ মুসলমান সাম্রাজ্যের ক্রমবিস্তারে মোটেই সন্তু

---

*A History of Indian shipping and Maritime Activity from the Earliest Times by Dr. Radhakumud Mookerji —p. 157.

ছিলেন না; পাছে তার স্বাধীনতা বিপন্ন হয় এই ভয়ে পর্তুগীজদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি একযোগে বৈরিতা আরম্ভ করলেন। মগ্ (আরাকানবাসী) ও ফিরিঙ্গীর উৎপাত তখন বঙ্গোপসাগরে লেগেই ছিল। আরাকানরাজ্যের সীমান্ত-বর্তী অঞ্চল চাটগাঁও হয়ে উঠলো পর্তুগীজ-দের শ্রেষ্ঠ বন্দর (Porto Grande)। ক্রমে সাতগাঁও-ও হল তাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র, যদিও সাতগাঁওকে বলতো তারা ছোট বন্দর (Porto Pequeno) যে সব অঞ্চলে পর্তুগীজদের আধিপত্য আছে, সেখানে তাদের ছাড়পত্র ভিন্ন এদেশী কোন জাহাজকে তারা ভিড়তে দিত না। তাদের অনুমতি ভিন্ন সেই সব অঞ্চলে চলাফেরা করলে বড় হেনস্তা হতে হত। অবশ্য প্রতিযোগি-তার ক্ষেত্রে ওদের জাহাজগুলো ছিল অধিক-তর কার্যকরী; তাই তারা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে টিকতে পারতো কৃতিত্বের সঙ্গে। উপরি তারা বঙ্গোপসাগরে জলদস্যুতা করে এদেশের বণিক সম্প্রদায়কে সমুদ্র-যাত্রা থেকে বিরত করতে থাকে। শের শা এসব বিষয় অবহিত ছিলেন; তাঁর সঙ্গে পর্তুগীজদের বন্ধুত্ব ছিল না; কিন্তু তিনি পর্তুগীজ দৌরাত্ম্যের বিরুদ্ধে যথার্থ প্রতিবিধান করতে যথেষ্ট সময় পান নি, কারণ তাঁর রাজত্বকাল খুব অল্পদিনের এবং উপরি তাঁকে যুদ্ধবিগ্রহে প্রায়ই লিপ্ত থাকতে হ'ত। তখন নদীমাতৃক বাঙলায় পর্তুগীজরা অল্পবিস্তর সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে উঠেছিল। পাছে পর্তুগীজ বিরুদ্ধাচরণের সুযোগ নিয়ে অন্য কোন সামন্ত নরপতি বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে এই আশঙ্কাও শের শার ছিল। এই সব কারণে হয়ত এমন কি অত্যন্ত বাস্তবদৃষ্টিসম্পন্ন শের শা'র পক্ষেও পর্তুগীজ বৈরিতার বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রতিবিধান করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

আকবর বাদশার আমলে তাঁর সাম্রাজ্য মোটামুটি সুসংবদ্ধ ছিল। তাঁর অর্থমন্ত্রী রাজা টোডরমলের নির্দেশে (১৫৮২ খৃঃ অঃ) "আসল তুমার জমা" (original established revenue) নামে যে রাজস্ব বন্দোবস্ত হয় তা'তে নৌবহর বাবদ খরচের (assignments) কথা জানা যায়। সেই রাজস্ব বন্দোবস্ত অনুযায়ী কতিপয় পরগণার আয় শুধুমাত্র নৌবহরের ব্যয়-ভার নির্দিষ্ট হয়। তখন সাধারণত নৌবহর ঢাকায় (হেডকোয়ার্টার) অবস্থান করতো, কারণ ঢাকায় অবস্থানের অন্যান্য সুবিধা ছাড়াও, ঢাকা থেকে বঙ্গোপসাগর উপকূল ধ'রে দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে মগ-ফিরিঙ্গির উৎপাত দমন করার সুবিধা ছিল। আকবরের আমলে মগফিরিঙ্গীর উৎপাত কতটা দমেছিল জানা যায় না। পরবর্তীকালে পরিব্রাজক বার্নিয়ারের ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে জানা যায়*:—

> মোগলদের ভয়ে আরাকানের রাজা নিজ রাজ্যের সীমান্তদেশ চাটগাঁও বন্দরে পর্তুগীজ দস্যুদিগকে জমি দিয়ে বাস করতে অনুমতি দিয়েছিলেন। এই পর্তুগীজদের ব্যবসা ছিল জলপথে ও স্থলপথে লুণ্ঠন করা। ছোট বড় নৌকার সাহায্যে তারা প্রায়ই গঙ্গার শাখা প্রশাখা দিয়ে ৬০।৭০ ক্রোশ পর্যন্ত দেশের ভিতর প্রবেশ করে লুঠতরাজ করতো। আকস্মিক আপতিত হয়ে বহু নগর, হাট, বাজার, ভোজ, বিবাহসভা প্রভৃতি লুণ্ঠন করে লোকজনকে বন্দী করে নিয়ে যেত। ছোট বড় সমস্ত স্ত্রীলোককে বন্দী করে অমানুষিক যন্ত্রণা দিত এবং যে সমস্ত জিনিস লুঠ করে নিয়ে যেতে পারতো না, ওসব পুড়িয়ে ফেলতো। এই সব কারণে গঙ্গার মোহানার নিকট অনেক সুন্দর দ্বীপ জনশূন্য হয়ে পড়লো।

* * * *

সামসুদ্দিন তালিস্ লিখিত বিবরণী থেকে জানা যায়‡:—

> মোগল নাবিকেরা মগদিগকে এত ভয় করতো যে, বহুদূর থেকে চারটি মগের জাহাজ দেখলে, এমন কি, একশত মোগল জাহাজ থাকলেও মোগল নাবিকেরা কোনপ্রকারে প্রাণ নিয়ে পালাতে পারলেই বীরত্বের জন্য প্রশংসা পেত। আর যদি হঠাৎ মোগল ও মগ জাহাজ কাছাকাছি এসে যেত, তবে তারা (মোগলেরা)

* বার্নিয়ে শাজাহানের রাজত্বকালে ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে এদেশে আসেন—Cf. কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়—মধ্যযুগে বাঙলা পৃঃ ১৬৫

‡ মধ্যযুগে বাঙলা—পৃঃ ১৬৬

অবিলম্বে জলে ঝাঁপ দিত এবং ডুবে মরাকে বন্দীত্ব অপেক্ষা শ্রেয় মনে করতো।

*   *   *   *   *

এইভাবে বহুকাল মগ্-ফিরিঙ্গীর উৎপাতে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গ জনশূন্য হয়ে গেল। অথচ, ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে ভিনিসীয় বণিক কন্টি গঙ্গার মোহানার নিকট সমস্ত তীরভূমি বর্ধিষ্ণু নগরে পরিপূর্ণ দেখেছিলেন। মগ-ফিরিঙ্গীর উৎপাতের জন্যই বাঙালীর সমুদ্রযাত্রা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। ক্রমে ক্রমে বাঙলার ব্যবসাবাণিজ্য অবতীর্ণ হ'ল ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরেজ। দিল্লীর বাদ্‌শারা ভেবেছিল, বিদেশী বণিকদিগকে অবাধে বাণিজ্য করতে দিলে একে অন্যকে প্রতি-দ্বন্দ্বিতায় সর্বদা ব্যস্ত রেখে দিল্লীশ্বরের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠবে না। বিদেশী বণিকগণ একে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল সন্দেহ নাই; কিন্তু তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় শেষ পর্যন্ত অভ্যুত্থান হ'ল দু'টি শক্তিশালী জাতির: ইংরেজ ও ফরাসী, যাদের য়ুরোপীয় সংগ্রামের ফলাফলে শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হ'ল ইংরেজ এক অমোঘ সাম্রাজ্যবাদের নীতি নিয়ে শাসকের ভূমিকায়। সেকালের রাজনৈতিক কোলাহলের সুযোগ নিয়েছিল বিদেশীরা; সার্থক হল না বিদেশী বণিক দিয়ে বিদেশী বণিককে অনায়াস আয়ত্বে রাখার বাদ্‌শাহী কূটনীতি।

অবশেষে এদেশের মসনদে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'ল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী নামধারী ইংরেজ বণিক কারবার। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে য়ুরোপেও তখন ইংলন্ডের সর্বত্র জয়জয়কার। ইংলন্ডের তখন আভ্যন্তরীণ সামজনীতিতে স্বাতন্ত্র্যবাদের (laissez faire) প্রসার এবং সমগ্র অর্থনৈতিক জীবনে শিল্পবিপ্লবের সুপ্রভাত। তার সর্বতোমুখী প্রভাব এসে লাগলো ইংলন্ডের বহির্বাণিজ্যের নীতিতেও। তাই, কোন শিল্প কিম্বা বণিকগোষ্ঠীর একচেটিয়া-বৃত্তি (monopoly) রাষ্ট্র কর্তৃক আর অনুমোদিত রইল না। বহির্বাণিজ্যের সম্প্রসারণ উদ্দেশ্যে স্বাতন্ত্র্যবাদ পেল রাষ্ট্র কর্তৃক পুরোপুরি সমর্থন। ফলে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের চার্টার এ্যাক্টে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ভারতে একচেটিয়া বাণিজ্যের সনদ বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দেশশাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার ফলে ইতিপূর্বেই ব্যবসাবাণিজ্যের প্রতি যথার্থ মনোনিবেশ তাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিল। কোম্পানীর এই অক্ষমতায় তার কর্মচারীরা প্রায়ই কোম্পানীর বণিক-অস্তিত্বের সুযোগ নিয়ে নিজেদের নামে ব্যবসা বাণিজ্য চালাতে থাকে। অথচ, ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের চার্টারের পর যে-সকল ব্যবসায়ী ও বণিক এদেশে কাজকারবার করতে এসেছিল তারা কোম্পানীর এমনি-তরো "বণিক অস্তিত্বের" সঙ্গে পেরে উঠছিল না। তাই ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের চার্টারে কোম্পানীর "বণিক-অস্তিত্বের" অবসান হয়ে গেল এবং ইংরেজ সরকারের যে-কোন প্রজার পক্ষে ভারতে অবাধ বাণিজ্য করার নীতি প্রবর্তিত হ'ল। এই অবাধ বাণিজ্যের আঘাতে বিদেশী কলকারখানাজাত দ্রব্যের সঙ্গে স্বদেশী শিল্প পেরে উঠলো না; ফলে হ'ল এদেশে শিল্পীমনোবলের অবনতি, এদেশ থেকে আর্থিক নিষ্কাশন এবং বিদেশে কাঁচামাল রপ্তানি বৃদ্ধি। তখন এদেশের আমদানী রপ্তানিতে এদেশী বণিকের বিশেষ অংশ গ্রহণের প্রশ্নই ওঠে না, কারণ, ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ইংগ-ভারতীয় বাণিজ্যে ভারতীয় জাহাজ চলাচল (Indian shipping) নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং ঊনবিংশ শতকের তৃতীয় দশক থে[...] এদেশের বাণিজ্যে অর্ণব-যান পুরো মা[...] চালু হয়েছিল। সুতরাং, শত শত বছ[...] পুরানো নৌশিল্প বাঙলার অর্থনৈ[...] জীবন থেকে চিরতরে লুপ্ত হয়ে গে[...]

সমুদ্রযাত্রায় আমাদের তখন রইল শ[...] একদিকে রক্ষণশীল সমাজের গোঁড়ামি এ[...] অন্যদিকে ইংরেজ সরকার কর্তৃক প্রবর্তি[...] বাণিজ্যে বিধি ও নিষেধ। শান্তি[...] বাঙালী জীবনে মহাসমুদ্রের অতল ক[...] জাহাজডুবির আশঙ্কাটুকু পর্যন্ত [...] রইলো না। নিতান্তই "ভদ্রলোক" [...] গেলাম আমরা বাঙালী : অল্পসং[...] মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবী ও জমিদার [...] বিপুলাংশে কৃষিনির্ভর নিরীহ জনসাধা[...] মঙ্গলকাব্যের চাঁদসদাগর হয়ে গেতে থ[...] রূপকথার মতো শঙ্কাহীন ও ভয়[...] কিংবা কী জানি হয়ত বা অলীক! ইং[...] শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য পুনরায় স[...] যাত্রার মন ফিরে এসেছে; কিন্তু এ[...] নিতান্তই শিক্ষানবীশের মন। [...] আসে ধন, না ভরে ধানের গোলা। [...] বিদেশযাত্রায় এখন আন্তর্জাতিকতার [...] পাওয়া যায়, কিন্তু সমুদ্রযাত্রায় [...] বাঙালীর সেই বাণিজ্য কোথায়?

কুড়ি

পাপ আর পুণ্য, ন্যায় আর অন্যায় এ সবের ছেলে-ভুলানো ছড়া আউড়ে মানুষকে ঘুম পাড়ানোর দিন চলে গেছে গৌরীদা, একথা তুমি আমার চেয়ে কম জানো না। বেশিই জানো। লড়াই করতে নেমে ট্রেঞ্চের ভিতর বস্তার আড়ালে লুকিয়ে গুলী ছোড়াই হল আজকের যুদ্ধবিধি। সেখানে সম্মুখ যুদ্ধ হচ্ছে না বলে অধর্ম হচ্ছে বলে চেঁচালে লোকে পাগল বলবে। এ যারা পারছে না তাদের মরতে হবে। ওটা তাদের অক্ষমতা। তাদের বরং পালাতে বল সামনে থেকে। নইলে মরতে হবে—মেয়েদের জহরব্রতের জন্যে তৈরি করুক।

নারীকণ্ঠের হাসিতে স্তব্ধ মধ্যরাত্রি যেন শিউড়ে উঠল। কথা শেষ ক'রে হেসে উঠল সে। কিশোরবাবু বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কে এ মেয়ে? ক্ষুরধার কথা—পাথর ডিঙিয়ে উপচে ঝরে-পড়া জলধারার শব্দের মত অসঙ্কোচ তরঙ্গময় হাসি; যতটা মেয়েটিকে দেখতে পাচ্ছেন, তাতে আধুনিকতম রুচি এবং মার্জনায় উজ্জ্বলশ্রী—কে এ মেয়ে? সাদা পাড় কাপড়ে, সাদা জামায়, রুক্ষ চুলে মেয়েটি ঝলমল করছে। অনেক কাল আগে-পড়া একখানি উপন্যাসের নাম মনে পড়ে গেল তাঁর—শুক্লবসনা সুন্দরী! আর একটা নাম মনে পড়ল—মহাশ্বেতা।

গৌরীকান্ত ধীরকণ্ঠে বললে—তুমি কি এই কথা বলতে আমার কাছে এই রাত্রে এসেছ রমা?

—তবে কি ভেবেছ—আমি তোমার কাছে প্রেম নিবেদন করতে এসেছি?

আবার হেসে উঠল রমা মেয়েটি। সেই হাসি।

—ছি, রমা ছি!

—কেন ছি কেন? ওই তো পুরুষের আত্মপ্রসাদ। আবার হেসে উঠল।

—পুরুষ যেখানে শুধু জীব—জৈব জীবন ছাড়া আর কোন বোধ সেখানে নাই—সেখানে ও কথাটা সত্যি। কিন্তু পুরুষ যেখানে মানুষ, অর্থাৎ মনুষ্যত্ব যেখানে থাকে, সেখানে ওটা মিথ্যে।

—তার মানে বলছ, আমার মধ্যে ওটা নেই? থাক্, ওই অহংকার নিয়ে তুমি থাক। তোমার তাসের ঘর ফুঁ দিয়ে আমি ভেঙে দেব না। তর্ক করব না। এখন আমি যা বলতে এসেছি, সেই কথাই হোক। এ কথায় তুমি না বলতে পারবে না। তোমাকে রাজী হতেই হবে। আমি বড় মুখ ক'রে বলে এসেছি। তুমি আসবেই। ওরা তোমাকে যা-তা বলছিল—আমি প্রতিবাদ করেছি, ঝগড়া করেছি।

গৌরীকান্ত ঘাড় নেড়ে বললে—আমি এখানে এসেছি একান্ত সাধারণ মানুষ হয়ে, আমার অন্য সকল পরিচয়, সকল দাবী, সব কৃতিত্বের কথা ভুলবার জন্যে।

এবার মেয়েটির কণ্ঠস্বর উত্তপ্ত হয়ে উঠল—আমি তোমাকে অসাধারণ ভেবে তোমার কাছে আসিনি গৌরীদা। তোমার সাধারণ মনুষ্যত্ব বেঁচে আছে বলেই সাধারণ মানুষের জন্যে তোমার কাছে এসেছি। সাধারণ মানুষ জড়পদার্থ নয়—চেতনাহীন মাংসপিণ্ডও নয়—দুঃখে যন্ত্রণায় সে দুঃখ পায়, দুঃখ পেলে অত্যাচারের বিরুদ্ধে সে নালিশ জানায়।

—সে নালিশে আমার বলার কথা বলতে আমি কোনদিনই কসুর করিনি রমা। নালিশের কারণ যেখানে আসল—

—এটাকে তুমি নকল বলতে চাও?

—হ্যাঁ নকল। দৃঢ়স্বরে বললে গৌরীকান্ত। এটাকে গড়ে তোলা হয়েছে।

—গড়ে তোলা হয়েছে? মেয়েটি যেন সাপের মত ফোঁস করে ফণা তুলে দাঁড়াল। তাদের বাপ-পিতামহের আমলের জমি—তাদের জীবিকার একমাত্র অবলম্বন চলে যাচ্ছে; তাদের এই দুঃখকে তুমি গড়ে তোলা দুঃখ বল?

—কিন্তু ক্যানেল যেতে হলে জমির উপর দিয়েই যাবে; জমি না নিয়ে ক্যানেল কাটা আর আকাশ-গঙ্গা বানানো একই কথা।

—তাতে আপত্তি নেই। সেটা সকলেই চায়। ধানের বদলে শুধু জল নিয়ে তারা কি করবে? তাদের কি তুমি খালের জলে ডুবে মরতে বল?

—আমি কিছুই বলিনে রমা, আমি বলি—আমারও কিছু কাজ নেই—তোমাদের, অর্থাৎ যাদের তরফের হয়ে আজ এসেছ, তাদেরও কিছু বলে দরকার নেই। যা বলবার ওদেরই বলতে দাও। ওরাই বলুক। ওদের ভাল-মন্দ ওরা তোমাদের বোঝার চেয়ে ভালো বোঝে—বেশি বোঝে।

—না বোঝে না। সেই জন্যেই আমাদের দাবী, জমি নিয়ে ওদের জমি দেওয়া হোক। এদেশে জনকতক লোক হাজার পাঁচশো বিঘে করে জমি দখল করে বসে আছে। তাদের জমি এ্যাকোয়ার করে নিয়ে এদের দেওয়া হোক। জমিদারের খাস জমি রয়েছে—তাই থেকে দেওয়া হোক।

—যুক্তির নিন্দে করি না, প্রশংসাই করি। কিন্তু এতেই কি আসল সমস্যা মিটবে তোমাদের? তোমাদের আসল উদ্দেশ্য বাধার সৃষ্টি করা। সেইটেই তোমাদের কাম্য। যা তোমাদের প্রস্তাব— তা কাজে পরিণত করতে অনেক সময় প্রয়োজন, সে তোমরা জান; তাই প্রস্তাবটা তুলেছ। এবং সরকারী লোকেরা জরীপ করতে এলে মেয়েদের এগিয়ে দিয়ে ঝাঁটা মারতে, ইঁট ছুঁড়তে তোমরাই প্ররোচিত করেছ। নইলে এদেশের ব্যাটা ছেলেরা ভীরু বটে—কিন্তু মেয়েদের সামনে এগিয়ে দিয়ে আত্মগোপন করার রীতি কোন কালে জানত না। তোমরা যা ভাল বুঝেছ করেছ—কর; তাতে আমি ভালও বলব না, মন্দও বলব না, কিন্তু এর মধ্যে আমাকে টেনো না।

—টানব তোমাকে। তুমি কেন—টানব সকলকে—যারা না আসবে—তাদের আঘাত করব। এর জন্যে তোমাকে আঘাত সইতে হবে গৌরীদা।

আঘাত করতে তো নিরস্ত নেই তোমরা রমা। আমি তো জানি—যতগুলো কুৎসিত দরখাস্ত হয়েছে, তার সবগুলোই প্রদ্যোত উকীলের খসড়া। সে খবর আমি পেয়েছি। আমি জানি।

—তুমি জান?

—আন্দাজ করেছিলাম, তোমার এই কথায় নিশ্চিন্ত হলাম। ছি রমা ছি!

ক্রোধে গর্জে উঠল রমা—বললে, তোমার কথাতেই তোমার কথার জবাব দিচ্ছি গৌরীদা—ছি তোমাকে ছি! এমন ভীরু নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছ তুমি? এত বড় মিথ্যে তোমার মধ্যে। জীবনটা ভোর মিথ্যে ভাঙিয়ে খেয়ে এলে তুমি? ছি তোমাকে ছি! মরবার সময় তোমার লেখাগুলো পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে যেও। ওই মিথ্যের বোঝায় সংসারকে কলঙ্কিত করে রেখে যেয়ো না। এই অনুরোধ জানিয়েই আমি উঠছি।

—সে ভার তোমাদের উপর দিয়ে গেলাম রমা। তোমরাই করো—আর তুমি বেঁচে থাকলে তুমিই নিজে হাতে করো। তুমিই আগুন লাগিয়ো। —একি তুমি কাঁদছ?

এবার অকস্মাৎ রমা যা করে বসল—সে সম্পূর্ণরূপে অভাবিত—তার এতক্ষণের কথাবার্তা এবং ভাবভঙ্গীর সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন, সঙ্গতিহীন; সে যেন ভেঙে পড়ে গেল—অকস্মাৎ নতজানু হয়ে বসে পড়ে গৌরীকান্তের কোলে মুখ রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। গৌরীকান্তও ত্রস্ত হয়ে উঠে ডাকলে, রমা—রমা।

মাথা নেড়ে উঠতে অস্বীকার জানাল সে —না—না। সে উঠবে না।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল গৌরীকান্ত—রমাকে শান্ত হবার অবসর দেবার জন্যই বোধ করি। তারপর বললে—ওঠ! এইবার ওঠ।

রমা বললে—আমার মুখ চেয়ে আমার জন্যে তুমি রাজী হও গৌরীদা। আমি যে কত কল্পনা করেছি—আমার সব ভেঙে দেবে তুমি? তুমি দেশ ছেড়ে চলে গেলে নিরুদ্দেশের মত, আমি এখানে বসে তোমাকে বুঝবার যোগ্য হবার জন্যে সাধনা করলাম। লোকে তোমাকে ভুলে গেল, ভাবলে—কাল-সমুদ্রে তুমি ডুবে তলিয়ে গেলে, হারিয়ে গেলে। কিন্তু আমি পথ চেয়ে রইলাম—কান পেতে রইলাম। আমি যে জানতাম, তা হবার নয়, তুমি হারিয়ে যাবার নও, তলিয়ে যাবার নও। সে স্বপ্ন আমার মিথ্যে হয়নি। আমি যে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখি—তোমার নাম নিয়ে, বাণী নিয়ে নূতন কালের পথে আমরা যাব। তুমিই হবে সে যাত্রীদের নবজীবনের ভাষ্যকার। তুমি এমনি করে আমার স্বপ্ন ভেঙে দেবে গৌরীদা?

আবার হু-হু করে কেঁদে ফেললে সে, বললে—আর যে আমার ফিরবার পথ নেই। অন্যভাবে ভাববার উপায় নাই। যাদের উপর আমার মর্মান্তিক ঘৃণা কঠিন আক্রোশ—যে ঘৃণা, যে আক্রোশ আপনি মনে জন্মেছে, তাদের ব্যবহার যার জন্যে দায়ী, তাদের সঙ্গে তুমি পথ চললে কি করে ফিরব আমি?

চোখের জলের প্রবাহ তার বেড়ে গেল। গৌরীকান্ত প্রসন্ন কণ্ঠেই বললে—বস রমা, বস। তুমি শান্ত হও। আবেগের বশে আজ তো তোমার কাঁদবার কথা নয়; আর আজ তুমি শিক্ষায় বুদ্ধিতে দীক্ষায় যে মানুষে হয়ে দাঁড়িয়েছ, তাতে আমার সঙ্গে একপথে চলতে পারলে না বলে দুঃখ যদিই-বা হয়, তবু তাতে অভিভূত হবে কেন?

রমা বসল, বললে—তা হওয়া উচিত নয়, সে আমি জানি। কিন্তু কিছুতেই আত্মসম্বরণ করতে পারছি নে আমি। তুমি আমাকে ছেলেবেলা জোর করে মায়ের অমতে, মায়ের মনিবদের অমতে ইস্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলে। নিজে তখন পড়া দেখিয়ে দিতে। এ-জীবনের ভিৎ গড়ে দিয়েছিলে। লোয়ার প্রাইমারী পরীক্ষায় মাসে দু টাকা বৃত্তি পেয়েছিলাম—তুমিই পাইয়ে দিয়েছিলে। তারপর তোমার কথাতেই মায়ের চাকরি গেল—তুমি বিজয়ের মাকে বললে—খুড়ী-মা এ-মেয়েকে তুমি বউ কর, বিজয়ের সঙ্গে বিয়ে দাও। বড়-ঘরের, ভাল ঘরের মেয়ে তুমি পাবে, কিন্তু এমন মেয়ে পাবে না। বিজয়ের বাবা মাকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিলেন।

রমা যেন জ্বলে উঠল, বললে—মাকে বলেছিল এত বড় আস্পর্ধা, একথা তুই যদি গৌরীকান্তকে তুলতে না বলে থাকিস, তবে ও বলবে কেন? কি দায় গৌরীর! ভাত-রাঁধুনীর মেয়ে আসবে আমার বাড়ি বউ হয়ে? সেকথা কি আমি ভুলতে পারি গৌরীদা? তাই তো তোমাকে আর ওদের এক করে দেখতে পারিনে। একসঙ্গে পথ চলার কথা ভাবতে পারিনে। ওদের সঙ্গে তুমি পথ চললে, তোমার সঙ্গ ধরব কি করে বল?

গৌরীকান্ত বললে—তোমার ভুল হচ্ছে রমা।

—ভুল হচ্ছে? কি ভুল বল?

—তুমি যাদের সঙ্গে পথ চলছ, সেই পথে যদি আমি না চলি, তবে এটা কি করে ভাবছ যে, ঠিক তোমাদের বিপরীতপন্থীদে[র] সঙ্গে আমি পথ চলছি? আমার পথ আমা[র] নিজের। আর একটা কথা, তোমার কথা[য়] বুঝলাম, তোমার বিজয়ের উপর আক্রোশ।

—সবার, সবার উপর আক্রোশ আমার ওই বিজয়দের, তোমাদের, এই গাঁয়ের য[ত] সেকালের হোমরা-চোমরা বাড়ি, সবা[র] উপর আক্রোশ। এক তোমার উপর ছাড়া আমার মাকে কে না ভাতরাঁধুনী বলেছে কে না দাসী-বাঁদীর মত হেলা করেছে করনি তুমি, তোমার মা। তুমি চলে গেলে আমার বয়স বাড়ল—এই সব বাড়ির ছেলে[রা] লোলুপ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাত অথচ বিয়ে করবার ইচ্ছে নয়। হবে [না] এদের উপর আক্রোশ? তারপর লেখা পড়া শিখলাম—সে আক্রোশ বাড়ল তোমার বইয়ে এদের ভিতরের চেহা[রা] দেখলাম। ঘেন্না হল এদের উপর। জান না তুমি গৌরীদা—এক একদিন রা[তে] শুয়ে এই সব ভাবি—আর ঘুম হয় না ভেবে কুল-কিনারা পাই না, কল্পনা করি আগুন লেগেছে নবগ্রামে, ধু-ধু ক[রে] পুড়ছে। সে আগুন সর্বাগ্রে লেগেছে ও[ই] বিজয়ের বাড়িতে।

হাঁপাতে লাগল সে। গৌরীকান্তের ম[নে] হল, রমার দুই চোখের মধ্যে সেই আগুনে[র] শিখা জ্বলছে যেন। সে শিউরে উঠে বলল[ে] —ওসব পিছনের কথা তুমি ভুলতে চেষ্[টা] কর রমা।

—না। ও ভুলতে পারা যায় না। পার[ব] না। অসম্ভব।

—নইলে শান্তি পাবে না তুমি।

—শান্তি পাব গৌরীদা। সেদিন আসছে আগুন জ্বলবে। লক্ষ লক্ষ কোটি কো[টি] মানুষের বুকের আক্রোশের মসলায় মশা[ল] তৈরি হয়ে রয়েছে। আগুন ধরাবার অপেক্ষা দাউ দাউ করে জ্বলবে। যারা এ সম[য়] দালান-কোঠায় শুয়ে থাকবে—তাদের পুড়ে [মরতে] হবেই ত। তোমার উপর আমার বড় মমতা তাই তোমাকে বলতে এসেছি—বেরিয়ে এ[সো] গৌরীদা—ঘর থেকে, পাড়া থেকে, গ্রা[ম থেকে]

থেকে এক কাপড়ে বেরিয়ে এসে মাঠে খোলায় মাটির মানুষের মাঝখানে এসে দাঁড়াও। আগুন লাগবে—সব পুড়বে—শান্তি পাব সে আমি জানি—

বাধা দিয়ে গৌরীকান্ত বললে—না, শান্তি তুমি পাবে না রমা, অশান্তি আরও বাড়বে।

বিষণ্ণ হেসে রমা বললে—না, না, না। ওসব তোমাদের ভুল কল্পনা। পরক্ষণেই একটু চকিত হয়ে হেসে গৌরীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—অ! বিজয়ের কথা বলছ তুমি? মরণ আমার। ছি-ছি-ছি গৌরীদা! তারপর একটু স্তব্ধ থেকে আবার বললে, তবে হ্যাঁ তুমি পুড়লে নতুন অশান্তি হবে আমার! গৌরীকান্তদা, তোমায় আমি মিনতি করছি—না বলো না তুমি। দোহাই তোমার!

—না রমা, সে হয় না, সে আমি পারব না। তুমি ভুল বুঝেছ—তোমাকে ভুল বুঝিয়েছে। আগুনে জ্বালিয়ে সৃষ্টি পুড়িয়ে আর যাই হোক, শান্তি কেউ কখনও পায় না। ও যে লাগায়—তাকে ওই

আগুনে হ
দিনরাত্রি
পুরনো
পেয়ে প
বলতে বল
—ও কথা
আভাসে-ই
লাভ নেই
পথে শ
তার জৈব
বড় করে
বোধই দি
উঠছে।
অহিংসা।
তোমার ত
বলি নি।
শান্তি প
ভুল। ও

আমাকে তুমি অনুরোধ ক'র না, সে রাখতে পারব না।

রমা উঠে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—শান্তি কিন্তু আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে গৌরীদা।

গৌরীকান্ত হাসলে। বললে—আমার সঙ্গে তারও কোন সম্পর্ক নাই রমা।

—তুমি এতখানি অমানুষ হয়ে গেছ গৌরীদা—তা আমি ভাবতেও পারিনি। আচ্ছা আমি চললাম।

—তোমার সঙ্গের লোক কোথায়?

—সে ঠিক জায়গায় আছে গৌরীদা। তার জন্যে তুমি ভেবো না। ধন্যবাদ তোমাকে। তার হাতের টর্চটা মুহূর্তে জ্বলে উঠল। সেই আলোতে গৌরীকান্ত দেখলে—দূরে তার খামার বাড়ির কোণে আমগাছের তলা থেকে একটি মানুষ বেরিয়ে আসছে। সে বললে—কি, শখ মিটল আপনার?

—মিটেছে। আপনার কথাই সত্যি। রমা বললে।

—দাঁড়ান, আমি যাই, আপনার কথা শেষ হয়েছে—আমি দুটো কথা বলে আসি ওঁকে। আর—

খানিকটা মেলে—আমাদের শ্রদ্ধা করেন, স্নেহ করেন—আমরা আসি-যাই—খাই থাকি তাঁর বাড়িতে; উনি বললেন—উনি বললেন আপনি কথা ঠেলতে পারবেন না। কৌতূহল হল। বললাম—চলুন তবে, আপনিই বলে দেখুন। আপনার যদি গলায় শেকল বাঁধা আফিংয়ে আচ্ছন্ন বাঘ বা নেকড়ের নেশা ছাড়ে—সে যদি শেকল ছেঁড়ে—তবে তো আপনিই সেই। অর্থাৎ বাঘের বাঘিনী, নেকড়ের নেকড়েনী, মানুষের চিরন্তনী যা বলেন। কিন্তু—।

ব্যঙ্গভরে ঘাড় নাড়লে কপিলদেব।

—কি বলছেন আপনি?

—মাফ করবেন। ভুলে গিয়েছিলাম, আপনি আধ্যাত্মিক ব্যাধি মানে শুচিবাই-রুচিবাই-ওয়ালা প্রতিষ্ঠাবান মানুষ। কিন্তু দেখলাম, আপনি বাঘও নন, নেকড়েও নন—মানুষ তো ননই—আপনি শেয়াল!

—কপিলদেব বাবু! রমাই এবার প্রতিবাদ করে উঠল।

—আচ্ছা, আচ্ছা। আসুন বাড়ি আসুন। অনেকটা পথ। হাসতে হাসতে পথ ধরলে কপিলদেব।

সন্তান সম্ভাবনার খুব প্রথমদিকে সহজে বোঝা যায় না অবশ্য চিরাচরিত প্রথামত কতকগুলি নির্দিষ্ট লক্ষণ দেখে কিছুটা আন্দাজ করা হয়। চিকিৎসা শাস্ত্রের শুরু থেকেই চিকিৎসকগণ এটি নির্ধারণের একটি বৈজ্ঞানিক উপায় বার করার চেষ্টা করছেন। পুরাকালে মিশর দেশেও অভিনব উপায়ে এই প্রচেষ্টা চলেছিল। যে রমণীর সন্তান সম্ভাবনা মনে হতো তাকে সদ্যজাত সন্তানের জননীর স্তনদুগ্ধের সঙ্গে লাউএর মন্ড করে খাওয়ান হতো এবং এই অপূর্ব খাদ্যটি খেয়ে রমণী বমি করলেই সে যে অন্তঃসত্ত্বা এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যেতো। রোমেও এই রকম একটি অদ্ভুত নিয়ম ছিল গাঁজা ওঠা মধু জলের সঙ্গে মিশিয়ে রমণীকে খাওয়ালে যদি তার পেটে ব্যথা হতো তাহলেই তাকে সন্তানবতী বলে ধরে নেওয়া হতো। পঁচিশ বছর আগেও সত্যিকারের কোনও বৈজ্ঞানিক প্রথা এ বিষয়ে বার হয়নি। পঁচিশ বছর আগে বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা দেখা গেল যে, মহিলা সন্তানবতী হলে তাদের প্রস্রাবের সঙ্গে গোনাডো ট্রফিক্ হর্মোন পাওয়া যায়। **বর্তমানে এ বিষয়ে যে দু' ধরণের**

চক্রদত্ত

চামড়ায় লাল দাগ দেখা দেবে। এ উপায়ও খুব ঠিক নয় কারণ চামড়ার নীচে যে, রঞ্জক (পিগমেন্ট) থাকে সেগুলি বিভিন্ন-রকম হওয়ার দরুণ বিভিন্ন চামড়া বিভিন্ন রকম প্রতিক্রিয়া বহুল। এইসব কারণে ডাক্তারদের মতে ইঁদুরের ওপর পরীক্ষার পদ্ধতিই আজ পর্যন্ত সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি বলেই ধরা যেতে পারে।

*

জগতের সমস্ত কিছুর গতি বৃদ্ধি করাই যেন বিজ্ঞানের মূলমন্ত্র তাই যে পথ পায়ে হেঁটে ধীরে ধীরে অতিক্রম করা হতো সেই

এই রেলের গাড়ীটি ওজনে ১২০ টন অ... সবশুদ্ধ ৭০ ফুট লম্বা।

*

এ কথা প্রায় সকলেরই জানা যে, সৃষ্টি আদিতে যে সব প্রাণীর জন্ম হয় সেগুলি এককোষি প্রাণী। এদের মধ্যে এ্যামিবা নামটা সাধারণের জানা শোনা। এ্যামিবা এক জেলীর মত জিনিস, এর নিজস্ব বাঁধা ধরা কোনও আকৃতি নেই; এগুলো চলা ফেরার সময় শরীরের যে কোনও অংশ থেকে শুঁড়ের মত বার করে সেইদিকে চলতে থাকে। প্রয়োজন মিটে গেলে আবার শুঁড়টুকু গুটিয়ে যায়। এই জীবগুলি যত ক্ষণ চলাফেরা না করে চুপচাপ থাকে ততক্ষণ এদের কোনও রং থাকে না। ডাঃ গোল্ড একর কতকগুলি এ্যামিবা আবিষ্কার করেছেন সেগুলোর পিছন দিকে লাল ল্যাজের মত একটা অংশ থাকে। এই ল্যাজ কতকগুলি লাল রঞ্জকের সমষ্টি। এ্যামিবা যখন নড়াচড়া করে তখন লাল রঞ্জক পিছন দিকে একটির পর একটি লেগে গিয়ে ল্যাজের মত একটা অংশ সৃষ্টি করে। ডাঃ গোল্ড একর বলেন যে, এই ল্যাজটি সত্যি বড় অদ্ভুত, আর এটি আরও অদ্ভুত এই যে, এতদিন পর্যন্ত এটি কি করে প্রাণী... চোখ এড়িয়ে গেছে।

মোহিতলাল : আমি যেমন দেখেছি

অর্চনাপ্রসাদ দাশগুপ্ত

আগস্ট, ১৯৩৮। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান সিঁড়ি যেখানে উঠে এসেছে, তারই একপাশে উৎসুক হয়ে দাঁড়িয়ে আছিঃ মোহিতলাল ক্লাস শেষ করে বেরিয়ে আসবেন, সেই প্রথম দেখব। হাতে রেজিস্টার, ডাস্টার আর খান কয়েক বই নিয়ে যখন বেরিয়ে এলেন, সেদিনের নৈরাশ্য আজ গোপন করে লাভ কি? রূপতৃষ্ণিক যে দেহাত্মবাদী কবিকে চিরকাল কল্পনা করে আসছি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা অধ্যাপকের সঙ্গে তার কোনো মিল খুঁজে পেলুম না। তবুও অস্ফুট কণ্ঠে আবৃত্তি করেছিলাম মনে পড়েঃ

যত ব্যথা পাই তত গান গাই,
গাঁথি যে সুরের মালা,
ওগো সুন্দর, নয়নে আমার
নীল কাজলের জ্বালা।
এই অবনীর বেদনা-নিবিড় সবুজ অন্ধকারে
পথ ভুলি বারে বারে,
কণ্টকে ফোটে রক্তকুসুম বাসনা-সুরভি-ঢালা।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, ঢাকাতে ...ছিলাম মোহিতলাল সেখানে ... প্রায় দেড় বছরের মতো তাঁর ...শিক্ষিত হবার সুযোগ পেয়েছি। ...তা প্রায় বঙ্কিমের উপরেই তাঁর ...প্রসারিত হলো। তারপর মনে ...য়তার' রবিরশ্মি বিকীরণ। ...হিসেবে মোহিতলাল সিদ্ধকাম। ...াবৃত্তি, পুষ্পিত ভাষা, তীব্র ...মার মর্মান্তিক রসিকতা—এর ...মোহিতলালের ক্লাসগুলি স্পন্দিত

...াথের সঙ্গে পরিচয় সুদূর বাল্যে, ...ত লয়ে দীপ অগণন' বা 'আজি কি ... মধুর মুরতি'র মাধ্যমে। কিন্তু ...ালের কাব্যের সঙ্ঘাত লেগেছে ...যৌবনের দিনে। হঠাৎ একটা চমক ...লে। বাংলা কাব্যে এমন অমিত পৌরুষ চোখে পড়েনি। শঙ্খের ভিতরে যেমন ...গর্জন গুহায়িত, মোহিতলালের দৃঢ় ... পংক্তিগুলি তেমনি একটা অপ্রমেয় ...া বহন করত।

বাংলার আদি ছন্দ পয়ারে মাইকেল এক অদ্ভুত বীর্যের সঞ্চার করেন। বিশেষ এক ধরণের শব্দবিন্যাস ধ্বনির দিক থেকে তাঁকে সাহায্য করেছিল। রবীন্দ্রনাথের পথ আলাদা। কিন্তু মোহিতলালের কাব্যপ্রবাহ মাইকেলের সেই নির্জন হ্রদের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যকে যুক্ত করেছে। রবীন্দ্র প্রতিভার মধ্যাহ্ন দীপ্তিতে এই যে এক অনন্য তরুচ্ছায়ার সৃষ্টি, এ কম কৃতিত্বের কথা নয়। আমার বিশ্বাস সুধীন্দ্র দত্তও এই কাব্যরীতির উত্তরসূরী।

রচনাশৈলীর দিক থেকে মোহিতলাল ক্ল্যাসিসিস্ট; কিন্তু তাঁর কবিতা রোমান্টিক অন্তঃস্বত্বা। তিনি সচেতন শিল্পী; তাঁর অজানা ছিল না যে সাহিত্য সৃষ্টির যে ক্ষেত্র তিনি বেছে নিয়েছেন, তাতে সোনা ফলাবার নিঃসঙ্গ দায়িত্ব তাঁরই। এই উপলব্ধিতে লিখেছিলেনঃ

যে সুর ফুরায়ে গেছে,
ফিরিবে না কভু এ ভুবনে,
আজিকার গানে তার কিছু দিব—
আমি সেই কবি।
(কবিধাত্রী)

অথচ এ সম্বন্ধে তাঁর কিছু অভিমানও ছিলঃ

আমারে তোমরা ভুলে যেও ভাই,
এসেছিনু পথ ভুলে
পান করিবারে জাহ্নবি বারি
কীর্তিনাশার কূলে।
বহুজনমের ব্যর্থ পিপাসা
এবার মিটিবে মনে ছিল আশা,
ভাঙা মন্দিরে বেঁধেছিনু বাসা
পুরানো বটের মূলে,
প্লাবনের মুখে সব ভেসে গেল
কীর্তিনাশার কূলে।
(বিস্মরণী)

মোহিতলালকে 'পিওরিস্ট' বলা হয়ে থাকে। হয়তো বা কথাটা সত্য। তাঁর মন মূলত, তৎসমধর্মী। আঙ্গিকের দিক থেকে নূতন নূতন পরীক্ষার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। প্রসঙ্গক্রমে একদা বলেছিলেন যে আঙ্গিক নিয়ে সচেতন পরীক্ষা প্রতিভার নঙর্থক দিক। শব্দচয়নেও তিনি অনেক সময় রক্ষণশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু এও সত্য যে, সত্যেন দত্তের মতোই তিনিও প্রয়োজন বোধে চলতি শব্দের, ইংরেজীতে যাকে slang বলে ব্যবহার করেছেন। বিশেষত আরবি-ফারসী শব্দের সুষ্ঠু এবং সার্থক প্রয়োগে বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল একক। নজরুল ইসলামের শব্দ প্রয়োগ অনেক সময় স্বতঃস্ফূর্ত নয়, অনেক সময় তার মেজাজ সমগ্র ভাববস্তুর সঙ্গে সঙ্গতি রাখে না; তাতে রসোপভোগে বিঘ্ন ঘটে। কিন্তু মোহিতলালের ব্যবহারে শ্রেয় হবার অবকাশ নেইঃ

যেটুকু শরাব পড়ে আছে শেষ—ঢালো সাকী!
বেহেশ্‌তেও সে জায়গা এমন আছে নাকি?—
রোকনাবাদের নীল শহরের কিনারাটি,
গুল-গলাগলি গলিটি এমন সুমল্লার?
(হাফিজের অনুসরণে)

অথবা

ঠোঁটের কুঁড়ি সিরিঙ্গা ফুল,
চোখের দু'কোণ রাঙা,
দড়ির মতন মিহিন মাজা, হাসি ডালিম ভাঙা!
রংটি যে তার খেজুর-মৌত চাইতে চমৎকার—
তাঁবুর-ডেরায় আগুন দেওয়া
রূপের জলুস তার।
মুখের হাওয়ায় সুবাস হারায়
ইরাক-দেশের গুল,
চুমার সোয়াদ—হায় রে,
সে যে তুহার জলের তুল!
দিল-দরদী নীল-দরিয়া দারাত জুলুজুলু।
(বেদুইন)

আবারঃ

কহিল সহেলি, "আজ যে গানের নওরোজা!
ফুল দলে চল, কেন গো ফলের বও বোঝা?'
সে কোন্‌ শরাবে করিলি বেহোঁস-মস্তানা—
নার্গি সাকি! কি কথা আমার কোসে কানে।
বড় মিঠা মদ! ফের পেয়ালায় ভর সাকী!
হরদম দাও! আজ বাদে কাল ভরসা কি?
(গজল-গান)

মোহিতলালকে অনেকে ভোগবাদী বলেছেন। বাঙালী নিরীহ ধর্মপ্রাণ জাতি। দেহ শব্দটার সঙ্গে তার একটা অপরিচ্ছন্ন ভাবানুষঙ্গ আছে। বৈষ্ণব রসে চোলাই করা 'গীত-গোবিন্দে' রাধাকৃষ্ণের মিলন তাকে বিব্রত করে না, কিন্তু ভারত-

চন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' তার বালিশের তলাতে আত্মগোপন করে। প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর—এর নিশ্চয়ই কোনো আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে। আর 'পীনপয়োধর পরিসরমর্দন চঞ্চলকরযুগশালী'—এর ধ্বনি ও কান্তি প্রথমেই বেসামাল করে দেয়।

অথচ বাঙালী প্রেম করতে জানে না, এর চেয়ে অবৈজ্ঞানিক কথা আর কী আছে? বৈষ্ণব কবিতা আসলে মানুষী প্রেমেরই কবিতা। তবে ভদ্রতাও রক্ষা করা দরকার। প্রেমকে তাই নৈর্ব্যক্তিক হতে হলো রাধাকৃষ্ণের মুখোশ পরে। বেশ একটা বিদেহী গন্ধ পাওয়া গেল। এ ভাণ বাংলা সাহিত্যে বহু-কাল চলেছে। ভারতচন্দ্র কুলাঙ্গার, তাই ভদ্রলোকেরা মুকুন্দরামের পিছনের পংক্তিতে তাঁর আসন নির্দেশ করেছেন। এরই বিপরীতে মোহিতলালের সুসংস্কৃত দেহবাদ বাংলা সাহিত্যে ফেটে পড়ল। পরবর্তী কালে অবশ্য আদিরসের যে লীলা চলেছে, তাতে মোহিতলাল আউট-মোহিতলাল হয়েছিলেন।

মোহিতলাল নিজেই একস্থানে বলে-ছিলেন যে, তাঁর কবিতার সুর বাংলার মাটিতে নিহিত আছে। সে সুর বৈষ্ণব নয়, অপর সাধনার সুর। সে সাধনা হচ্ছে শাক্ত বা তান্ত্রিক সাধনা। বাঙলার মানসিক পাক-যন্ত্র যেদিন তার দেহেরই মতো অগ্নিমান্দ্যে জীর্ণ হয়ে যায় নি, সেদিন এরই বজ্রগর্ভ মাটিতে এক অপূর্ব জীবনবেদের রচনা হয়েছিল, সে এক সুস্থ-সবল জীবনবাদ। মোহিতলাল নিজেই বলেছেনঃ

আমার পিরিতি দেহ-রীতি বটে,
তবু সে যে বিপরীত—
ভস্মভূষণ কামের কুহকে ধরা দিল স্মরজিৎ!
ভোগের ভবনে কাঁদিছে কামনা
লাখ লাখ যুগ আঁখি জুড়াল না,
দেহের মাঝারে দেহাতীত কার ক্রন্দনসঙ্গীত!
(স্মরগরল)

এ কবিতারই অন্যত্রঃ

ওগো দুখহীন সুখ-লম্পট! সুরতের কৌতুক
তোমাদেরই বটে, সে লীলা-রভসে
নহি আমি উৎসুক।
মোর কামকলা—কেলি-উল্লাস
নহে মিলনের মিথুনবিলাস,
আমি যে বঁধুরে কোলে করে কাঁদি
যত হেরি তার মুখ।

এ কেবল নিছক ভোগবাদ নয়। অন্ধ ভোগের পিচ্ছিল পথ ক্লান্তির মরুপ্রান্তে উত্তীর্ণ করে। কিন্তু আত্মার তৃষ্ণা বাড়বাগ্নির মতো অনির্বাণ, দেহই তার সামাদান। এ হলো ভোগের কৃচ্ছ্রসাধনা, ইন্দ্রিয়ের পঞ্চতপঃ

তাই তনু তুচ্ছ করি ফিরে তার অন্তর তপাসি
বরাঙ্গে যেথায় নিত্য বিরাজিত দেবতা সুন্দর
প্রাণের প্রত্যক্ষ রূপে, হেরিল না সেথায় উদাসী
ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রধনু আঁকা সেই শোভার নির্ঝর!
মাটির প্রতিমা বটে, মাটি বিনা সবই যে নশ্বর
দেহই অমৃতঘট, আত্মা তার ফেন-অভিমান।
(নারীস্তোত্র)

অথচ দেহ ক্ষয়িষ্ণুঃ জীবনদ্বীপের শস্যশ্যাম কটি ঘিরে মৃত্যুর ক্ষুরধার সমুদ্রমেখলাঃ

এত ছোট বেলা, কত খেলা তবু
কত রঙ, কত রূপ!
হায় সখি, হায়! ও রাঙা অধর
করে যেন বিদ্রূপ!
শত যুগ ধরি রূপসী বসুধা
মিটাইতে নারে অসীম সে ক্ষুধা—
এক যৌবনে ফুরাবে সে সুধা?
—তারই পরে যমযূপ?
হায় সখি, হায়! তবু এ ধরায় এত রঙ,
এত রূপ!
(দিন শেষে)

মৃত্যু যখন দুর্বার, তৃষ্ণার যখন শেষ নেই, বাসনার মূলোচ্ছেদই কি সব সমস্যার নির্বাণ? মোহিতলাল নিঃসংশয়ে আত্ম-প্রত্যয়ে ঘোষণা করলেনঃ

আজ আর নাহি ভয়, দুঃখসুখ দুয়েরি সমান
সাধক আমরা সবে, জানি জন্ম হেথা আর নাই
স্বর্গ লোভ করি না যে,
নরকের নাহি কো নিশানা!
কৈশোর যৌবন জরা—জীবনের যত কিছু দান
আগ্রহে লুটিয়া লই, যাহা পাই
অমূল্য যে তাই!
ভুলেছি আত্মার কথা,
মানি শুধু দেহের সীমানা।
(বুদ্ধ)

জীবনকে নিঃশেষে গ্রহণ করাই মৃত্যু-জয়ের আয়ুধ। অমিত বীর্যে, যৌবনের জয়টিকললাটে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। প্রেমই মৃত্যুঞ্জয়ী মন্ত্র। অঘোর-পন্থীদের সঙ্গে তাঁর সহমর্মিতা ধরা পড়েঃ

আমরা ডরি না মৃত্যুরে কেউ—
শব-শিব একাকার!
জীবনের সুরা নিঃশেষ করি
দেখি যে তলানি সার।
অপরূপ নেশা—অপরূপ নিশা!
রূপের কোথাও নাই পাই দিশা—
সোনা হয়ে যায়, সোনা হয়ে যায়
শ্মশান ভস্মধূলি!
টিটকারী দাও মৃত্যুরে, ধর মড়ার মাথার খুলি,
চুমুকে চুমুক দাও বার বার—
পড় গো সবাই ঢুলি।
(অঘোরপন্থী)

অন্যত্রঃ

প্রেম যে আত্মার আয়ু! ক্ষয় নাহি তার;
জন্মে জন্মে তাই মোরা একই বধূ-বর।
(জন্মান্তরে)

পাপকে অস্বীকার করে তাই নির্ভয়ে বলতে পারলেনঃ

প্রেম দিয়ে হেথা শোধন করা যে
কামনার সোমরস,
সে রস বিরস হ'তে পারে কভু?
হবে তায় অপযশ!
ত্যাগ নহে, ভোগ,—ভোগ তার লাগি,
যেই জন বলীয়ান,
নিঃশেষে ভরি লইবারে পারে,
এত বড় যার প্রাণ!
(পাপ)

মোহিতলাল সমগ্র স্থান-কালের পটভূ-প্রেক্ষিতে এই প্রাণসত্তার উপলব্ধি করেছেন। সমস্ত বিশ্বচরাচরে একই রূপলীলা লীলায়িত। সৌন্দর্যের যে অতলান্ত সিন্ধু অনন্তকালে তরঙ্গিত, আমাদের মর জীবনের দেহবিন্দুতে তারই অশান্ত কল্লোল। আমাদের রূপোপভোগের হিম-কণাতে শাশ্বতকালের তৃষ্ণার সূর্যজ্বালা বিম্বিতঃ

চিরবিনিদ্র অগ্নিহোত্রী কাল সে আবহমান—
রবি শশী তারা শত আঁখি মেলি
সে রূপ করিছে পান—
যে মুরতি-রতি-রস বিহ্বলা
এ তিন ভুবন জলদচঞ্চলা—
মেরু হ'তে মেরু পৃথ্বীশরীর
পুলকে বেপথমান,
প্রাণের পানীয় সেই সুরাসার—
আমি যে করেছি পান!
(শেষ আরতি)

তাঁর চরম উপলব্ধি এই ঃ জানি, সত্য এ জগতে আর কিছু নহে,

সত্য শুধু প্রেম আর জীবন-পিপাসা—
সুখে দুঃখে ভোগে ত্যাগে আপনা বিস্মৃতি।
(এক আশা)

এ আলোচনা যে কোটেশন-কণ্টকিত, সেটা ইচ্ছাকৃত, কারণ যে কোনো কারণে মোহিতলাল বহুপঠিত নন। অথচ কবিকে বোঝার পক্ষে তাঁর কাব্যের চেয়ে বড় দিশারী আর কে আছে? আর, গঙ্গা জলেই কি গঙ্গাপূজার রীতি নেই? মোহিতলাল যে ক'টি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন, তা হাতের এক আঙুলেই প্রায় গুণে শেষ করা যায়। তবুও তাঁর প্রতিভূ কবিতাগুলি আলাদা করে একটি ছোট সঙ্কলন কি প্রকাশ করা যায় না?

মোহিতলালের প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিছু বলতে যাওয়া বিপজ্জনক। অপর পক্ষে, গদ্যরচনাতে মোহিতলালের ব্যক্তিত্বের আর

একটি দিক অভিব্যক্ত হয়েছে। আধুনিক বাঙলা সাহিত্য বিচারে 'প্রতিক্রিয়াশীল' শব্দটি অতিপ্রচলিত। মোহিতলাল সম্বন্ধে এ শব্দটি বহুব্যবহৃত। ভাষা এবং ভাব, উভয় দিক থেকেই সাঁড়াশী আক্রমণ এসেছে।

মোহিতলালের গদ্যরীতি সাধু। কথ্য-ভাষার বিরুদ্ধে তাঁর অনমনীয় মনোভাব ছিল। তাঁর মতে বাঙলা গদ্যে প্রকৃতির যে ধ্বনি, সেটা সাধু ভাষার ধ্বনি। আরও, বিদগ্ধ ও প্রাকৃতজনের ভাষা কখনও এক হতে পারে না। সুতরাং কথ্যান্ত্য ক্রিয়াপদ সমস্ত পদের প্রাণধর্মকে ব্যাহত করে। মোহিতলালের নিজস্ব একটি হাসি ছিল, বহুপরিচয়ে যাকে আমরা মারাত্মক মনে করতে শিখেছিলুম। তেমনিভাবে হেসে তিনি একদিন কথ্যভাষার সঙ্গে চটি-পরি-হিত দ্রবিড় সাহেবের সঙ্গে তুলনা করে-ছিলেন। এক আধুনিক সমালোচক লিখেছেন যে, সাধুভাষা লিখতে পারা অপেক্ষাকৃত সোজা, মাথা ঘামাতে হয় না। আমার তো মনে হয় যে, যে কোনো ভাষাই ভালো করে লিখতে গেলে মাথা ঘামাতে হয়, আর যে কোনো ভাষাই যেমন তেমন করে লেখা সোজা।

মোহিতলালের মতে গদ্য হবে নিরাভরণ, অলঙ্করণের বাহুল্যবর্জিত। সে গদ্য যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত,—বর্শাফলকের মতো তীক্ষ্ম ও ঋজু। এ গদ্যে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠও করা চলবে। মোহিতলালের গদ্যে তাঁর মননশীলতার সীলমোহর দেওয়া। খাঁটি বিলিতী আদর্শে যুক্তিসহ সাহিত্য আলোচনার সূত্রপাত বাঙলা দেশে মোহিত-লালই প্রথম করেন। আমার বিশ্বাস, এ বিষয়ে তিনি ওয়াল্টার পেটারকে চোখের সামনে রেখেছিলেন। তাঁর কবিতার মতনই তাঁর গদ্যের রূপ ক্ল্যাসিক্যাল। অথচ প্রয়োজন বোধে এর ধ্বনি কত লিরিক্যাল হতে পারে, তাঁর 'মধুসূদন' প্রবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদে তার চূড়ান্ত নিদর্শন রয়ে গেছে।

মোহিতলালের মতবাদ নানা বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। তিনি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করতেন; বাঙলার বিশিষ্ট সংস্কৃতিকে তিনি একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা গণ্য করতেন। হিন্দুধর্মের সনাতন রূপটির প্রতি তাঁর অগোপন শ্রদ্ধা ছিল। সাহিত্যকে বিশেষ মতবাদের মৃচ্ছকটিক বলে স্বীকার করতেন না। এ প্রত্যেকটি বিষয়ের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ আছে এবং দক্ষিণ ও বামের তূণে একাধিক পাশু-পাতাস্ত্র। বাঙলা দেশে সমালোচনা ও পঙ্কক্ষেপের মধ্যে কোনো সুনির্দিষ্ট সীমা-রেখা নেই। রবীন্দ্রনাথই বোধ হয় একদিন সবচেয়ে প্রিয় লক্ষ্যস্থল ছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্র ব্যক্তিত্বের গৌরীশৃঙ্গে যা পৌঁছতে পারে নি, অসুস্থ বৃদ্ধ কবি মোহিতলালের বাগনানের বাণপ্রস্থে তার দু'একটা ছিটে এসে লেগেছে।

ঢাকা ছাড়ার সায়াহ্নে মোহিতলালের সঙ্গে শেষবারের মতো দেখা করতে যাই। নীলক্ষেতের গোলাপ-কোটা বাড়ীতে বাইরের ঘরে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। একটা অটোগ্রাফ চাইলাম। দ্বিরুক্তি না করে কলম তুলে নিলেন, একটু ভাবলেনও বা, তারপর লিখলেন ঃ

> যাবার বেলায় এই কথা যেন বলে যাই—
> সব দেখা মোর হইয়াছে শেষ
> আর দেখিবারে নাহি চাই।
> (রমণা, ঢাকা, ১৪ ভাদ্র, ১৩৪৭)

হঠাৎ রবীন্দ্রনাথের কোনো গানের বিভ্রম জাগায়। কিন্তু বাইরের সাদৃশ্যটা ধাতস্থ হলে, ভিতরের বৈষম্য প্রকাশ পায়।

বছর সাতেক আগে কলকাতা থেকে 'জয়ন্তী' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ হচ্ছিল, বাঙালীর অনেক সদু-দ্দেশ্যের মতোই তা বীজভ্রষ্ট হলো। তার আগেই মোহিতলালকে প্রথম সংখ্যার জন্যে একটি সনেট পাঠাতে অনুরোধ করি। জবাবে লিখলেন, 'আমার শরীর অতিশয় অসুস্থ এবং নানা কারণে অতিশয় বিরত আছি। কবিতা আর লিখি না, অন্য যাহা কিছু লিখি, তাহাও খুব অল্প এবং বর্তমান অবস্থায় কোনো পত্রিকায় দান আর করিতে পারি না—এক ছত্রও নয়। তুমি আমার ছাত্র, তোমার এই অনুরোধ রক্ষা না করিতে পারিলে আমি দুঃখ পাইতাম, তাই তোমার প্রার্থনামত একটি 'সনেট'ই পাঠাইলাম; বোধ হয় খুব বিলম্ব হইয়া গেল, কিন্তু পাঠাইতে পারিয়া আমি তৃপ্ত হইয়াছি।' (বাগনান, হাওড়া, ১৫ ফাল্গুন, ১৩৫১) কবিতাটি এতাবৎ অপ্রকাশিত, এখানে তুলে দিলাম ঃ

> **দিকে দিকে পরাজয়, অপমান,**
> **লজ্জা ও লাঞ্ছনা,**
> **আকাশে অশনি রব,**
> **ভূমিতলে নিত্যনব ত্রাস,**
> **অন্তরালে শোনা যায়**
> **পিশাচের অট্ট অট্ট হাস,—**
> **মোরা করি নামগান,**
> **না করিলে গুরুর ভর্ৎসনা।**
> **মহাদৈন্য ঢাকিবারে**
> **এ যে ঘোর আত্মপ্রবঞ্চনা!**
> **শত্রু হাসে; কণ্ঠে যত**
> **পাকে পাকে জড়াইছে ফাঁস,**
> **তত শুনি, মুক্তি আর নহে দূর—**
> **কি তার উল্লাস!**
> **নিরাশার আশা সে যে—**
> **মুমূর্ষুর অন্তিম সান্ত্বনা।**
> **আমরা বাঙালী আজ**
> **দাঁড়ায়েছি মহামৃত্যুমুখে;**
> **নাই নেতা, নাই নীতি,**
> **হারায়েছি সকল সম্বল;**
> **হেন কালে, হে জয়ন্তী,**
> **কি সাহসে গাহ কার জয়?**
> **জ্বালিবে কি যজ্ঞানল**
> **চিতাধূমে শ্মশানের বুকে!**
> **কি আহুতি দিবে তায়?**
> **লভিয়াছ কোন্ মন্ত্রবল?**
> **শুনাও সে বাণী তবে,**
> **শুধু যাহে ঘুচে মৃত্যুভয়॥**

রঞ্জন
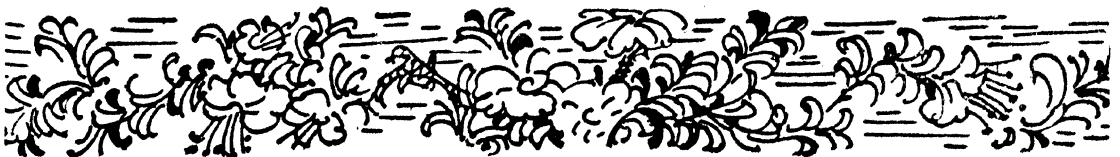
মাসাধিক কাল পূর্বে (দেশঃ ২৯-৭-৫৯) অন্য প্রসঙ্গে লিখেছিলেমঃ "ইংরেজ চলে গেছে, ইংরেজি আমরা ভুলতে বসেছি। অবিলম্বে আমরা যত্নবান না হলে হঠাৎ দেখব আমাদের এমন একটি ভাষা নেই, যাতে উচ্চস্তরের চিন্তা ও তার সুনির্দিষ্ট প্রকাশ সম্ভব।"

সম্প্রতি ভাষা প্রসঙ্গে আরো দু'জন বাঙালী মত প্রকাশ করেছেন। ভিন্ন মত।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সবাইকে ইংরেজি-বৈরিতা পরিহার করতে বলেছেন, অসংকোচে ঐক্যবিধায়ক হিন্দী শিখতে বলেছেন এবং আঞ্চলিক ভাষাগুলির সমান্তরাল সাধনা করতে বলেছেন।

দ্বিতীয় বাঙালী 'অজ্ঞাত ভারতীয়' নীরদ চৌধুরী। পক্ষকাল পূর্বে স্টেটস্‌ম্যান সাময়িকীতে তিনি নিজে কেন ইংরেজি বরণ করেছেন, তার বিবরণ দিয়েছেন। যুক্তিনিষ্ঠ, অত্যন্ত সুলিখিত এই প্রবন্ধটিতে লেখক তাঁর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ভাষা সমস্যা সম্বন্ধে কয়েকটি অত্যন্ত মূল্যবান মন্তব্য করেছেন। আর করেছেন কয়েকটি অসম্ভব সমাধানের পরস্পরবিরোধী ইঙ্গিত। চৌধুরী মশাই বার বার বলেছেন যে, তাঁর সিদ্ধান্ত একান্তই ব্যক্তিগত; কিন্তু বিষয়টি ব্যক্তিগত নয়, নইলে তিনি তা নিয়ে কাগজে প্রবন্ধ লিখতেন না। যাই হোক, তিনি বলছেন, "বাঙলা সম্বন্ধে আমার ছিল একটা আদর্শ, হিন্দি সম্বন্ধে একটা মতবাদ।" (মতটা স্বরাজোত্তর ভারতে হিন্দির প্রভাব সম্বন্ধে।) তবু তিনি ইংরেজি বেছে নিয়েছেন, কেননা বাঙলা ভাষা ঐতিহাসিক রচনা বা আলোচনা-সাহিত্যের বাহন হিসাবে অচল। কেননা, ইংরেজি ও বাঙলা-রূপী দু'নৌকায় পা দেয়ার মূঢ়তা তিনি বুঝেছিলেন। কেননা, বুদ্ধিজাত চিন্তার জন্যে ইংরেজি আর বোধপ্রসূত আবেগের জন্যে বাঙলার ব্যবহারের ফলে আমাদের মস্তিষ্কে ও হৃদয়ে মুখ দেখাদেখি নেই, সেজন্যেই আমাদের চিন্তা অমৌলিক এবং প্রকাশ দুর্বল; এ অবস্থায় বিভক্ত ব্যক্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী; ওটা জাতির জীবনে অভিশাপ। কেননা, অনেকগুলো জিনিস আছে (শুধু যুদ্ধবিদ্যা বা ইতিহাসই নয়, দুর্গা-দর্শনে মনের ভাব পর্যন্ত) বাঙলাতে যথাযথভাবে প্রকাশই করা সম্ভব নয়। কেননা, কয়েকটা রচনারীতি এবং ছন্দ আছে যা কোনো ভারতীয় ভাষায় অনধিগম্য।

কেননা, ইংরেজি ভাষা ত্যাগ করলে শুধু একটা ভাষাই যাবে না, সে সঙ্গে বিসর্জন দেয়া হবে পাশ্চাত্ত্য চিন্তা ও পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টিভঙ্গী। কেননা, ইংরেজির ব্যবহার বিশ্বব্যাপী এবং পৃথিবীর সঙ্গে পা ফেলে চলতে হলে ওটা চাই। অতএব, নীরদ চৌধুরীর মতে, আর সব ভাষা ছেড়ে দিয়ে সর্বান্তঃকরণে ও সর্বমস্তিষ্কে ইংরেজি গ্রহণ না করার অর্থ মূকতা বরণ করা।

*

শ্যামাপ্রসাদের সমাধান নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা অনাবশ্যক। তিনি বলছেন, একসঙ্গে কালীঘাটে বাতাসা, মসজিদে সিন্নি ও গীর্জায় মোমবাতি দিতে। ওটার নাম 'সিনথেসিস' হতে পারে, অর্থাৎ গোঁজামিল, সমাধান নয়। দ্বিভাষিত্বই দুরূহ, তিনটে ভাষা শিখতে গেলে হয়তো একটাও হয়ে উঠবে না। আমার বাঙলাপ্রীতি এত বেশি যে, আমি কিয়দংশে হিন্দী-বিরোধী। বিরোধটি মূলগত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত 'নিবন্ধ-কুসুমাকর' বইতে লেখা আছেঃ 'অভি উস্ দিন রাষ্ট্রভাষাকে সমর্থক এক বিদ্বাননে কহা থা কি যদ্যপি রাষ্ট্র-সংগঠনকে লিয়ে হমেঁ এক হী ভাষাকী আবশ্যকতা হৈ ঔর বহু হোনী ভী চাহিয়ে, লেকিন তো ভী বিভিন্ন প্রান্তিক ভাষায়োঁকে দ্বারা সাহিত্যকী বৃদ্ধি রুকনী নহীঁ চাহিয়ে। ...বহ্ পরিস্থিতি ভী অধিক বাঞ্ছনীয় ন হোগী, ক্যোঁকি ইসমেঁ রাষ্ট্রভাষাকা মূল্য হী ক্যা রহ জাতা হৈ?' অতএব, হিন্দীবরণ মানে বাঙলার মরণ। ইংরেজি সাহিত্যে কালক্ষয় না করে শুধু ইংরেজি ভাষা শিখব, ক্রমে বাঙলা মৃতভাষায় পরিণত হবে এবং শুধু হিন্দী নিয়ে ভাবব ও বলব—এমন দুর্ভাগ্য শিরসি মা লিখ, মা লিখ।

*

নীরদ চৌধুরীর সমালোচনা আমি একটাও পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারিনে, তবু তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নিতে আমার প্রবল আপত্তি। একটা কারণ বোধহয় এই যে, আমার মস্তিষ্কে ও হৃদয়ে বিচ্ছেদটা সম্পূর্ণ নয়। বিচ্ছেদটাকে দ্বিভাষিত্বের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম বলে মানতেও আমার দ্বিধা। আমিও, আগেকার নীরদ চৌধুরীর মতো, ইংরেজির কল্যাণে জীবিকার্জন করি এবং বাঙলায় সাহিত্যপ্রয়াস করি। এরকম দু'নৌকায় পা দেয়া সহজও নয়, সুফলও নয়। কিন্তু উপায় কী? পুরোপুরি বাঙলা-নৌকায় পা দেয়া মানে হুগলীর ঘাটে বাঁধা থাকা, নৌকাতেও ছিদ্রের গুণতি নেই। অপর পক্ষে ইংরেজি-জাহাজে 'কোনো মতে স্থান করি লওয়ার' অর্থ অসুবিধা নিয়ে শুরু করা, শিক্ষিত বিদ্যার পরিমিতি মেনে নেয়া, আপন জন থেকে আরো বেশি বিচ্ছিন্ন হওয়া। এগুলিই কি সৃজনী প্রচেষ্টার অনুকূল? মাইকেলী বিলাপে শুধু পরভাষায় আত্মপ্রকাশের অসাধ্যতার স্বীকৃতি ছিল না, এশিয়াটিকদের ইংরেজি রচনার প্রতি ইংরেজদের স্বাভাবিক অবজ্ঞা বা ঔদাসীন্যেরও ইঙ্গিত ছিল। সেই অবজ্ঞা জয় করতে নীরদ চৌধুরীর মতামত কতটা সাহায্য করেছে, আর কতটা তাঁর রচনা-সৌষ্ঠবের যোগ্য পুরস্কার, তাই বা কে বলবে?

*

আমি আঁচরে ইংরেজি ছাড়ব না। ইংরেজিতে পড়ব; ইংরেজি থেকে নতুন নতুন শিক্ষা আহরণ করব, শুধু ভাষার মাধ্যমে বিষয়ে নয়, সাহিত্যের মাধ্যমে চিন্তারীতিতে ও রচনারীতিতে; আন্তর্জাতিক চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত থাকব অর্থাৎ ইংরেজিকে ব্যবসার প্রয়োজন ছাড়া আর কিছু দেব না। শুধু যেমন ইংরেজ যেমন আমার দেশের পাট আর চামড়া কিনে জামা আর জুতো করে দেয় এবং সেগুলিকে যেমন বিলাতী বলে, তেমনি আমার ইংরেজিতে শেখা, এমনকি ভাবা, জিনিসের বাঙলা লেখা পুরো স্বদেশী বলে পরিচিত হতে অধিকারী। অনুবাদের ত্রুটি বর্তমানে মার্জনীয়, পরে শোধনীয়। বাঙলা গদ্যের নানা দৈন্য সম্বন্ধে আমি সচেতন; কিন্তু পরভাষার পায়ে আত্মসমর্পণ করা আমি শুধু অপমান-কর বলে মনে করিনে, অনাবশ্যক ও ক্ষতিকর বলে জ্ঞান করি। শুধুমাত্র অশিক্ষিত পটুত্বশালী লেখকদের হাতে বাঙলা গদ্যকে ছেড়ে না দিয়ে শিক্ষিত, আলস্যবিমুখ কয়েকজন লেখক ব্রতী হ'লে এমন একটি বাঙলা ভাষার ভিত্তিস্থাপন সম্ভব যা অন্যান্য অগ্রগণ্য ভাষার সমকক্ষ হবে; শুধু সাহিত্যগুণে নয়, ভাষাগুণে। হিন্দী শিখলে তা হবে না, ইংরেজি ভুললে তা হবে না। বলা বাহুল্য, বাঙলা না লিখলেও হবে না।

উপন্যাস

কানামাছি—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়; গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য—দুই টাকা আট আনা।

শরদিন্দুবাবু জাত-সাহিত্যিক। কোন্ আঙ্গিকের মাধ্যমে বক্তব্য পাঠকসমাজে উপস্থাপিত করিতে পারিলে তাহাদের তুষ্টি-সাধন সম্ভব, সে বিদ্যা তাঁহার সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন। পাঠক ঘায়েল করার যাবতীয় অস্ত্র তাঁহার তূণীরে মোতায়েন।

শিক্ষিত ভদ্র চোর 'Property is Theft' এই নীতিবাদে বিশ্বাসী, নিজের যথেষ্ট অর্থ থাকা সত্ত্বেও শুধু মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ধনীর বাড়িতে বাড়িতে হানা দিয়া বেড়ায়। কিন্তু অকস্মাৎ এক রাত্রে ধরা পড়িল আর এক শিক্ষিত তরুণীর শয়নকক্ষে, তাড়া খাইয়া আত্মগোপন করার সময়ে। তাহার পর দুই আর দুই মিলিয়ে চার। সেই রাত্রেই তস্কর ও তরুণীর এক পাত্র হইতে যৌথভোজন। পরামর্শও ঠিক হইয়া গেল। পরদিন গৃহস্বামীর সেক্রেটারীরূপে বহাল। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া 'কানামাছি'র আত্মত্যাগের জলন্ত নিদর্শনে গ্রন্থের পরিসমাপ্তি, অবশ্য তরুণী ও তস্করে বিবাহসূত্রে মিলিত হইবে এমন একটা ইঙ্গিতের পর।

কাহিনী মামুলি, বিষয়বস্তু গতানুগতিক, নানা স্থানে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবকাশও রহিয়াছে; কিন্তু রচনার গুণে কোথাও কাহিনী অবাস্তব অথবা ঘটনাপ্রবাহ কষ্টকল্পিত এমন মনে হয় না। আগাগোড়া গ্রন্থটি চিত্রনাট্যের আঙ্গিকে রচিত। সেলুলয়েডে রূপান্তরিত হইলে কিরূপ হইবে জানি না, কিন্তু রেডিও-নাট্যের পক্ষে কাহিনী উপাদেয়।

মুখবন্ধে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, 'পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ' ও 'property is theft' এই আপাতবিরোধী দুই নীতিবাক্য আগুনে ঝালাইয়া লইবার সদিচ্ছায় এই অগ্নিপরীক্ষা। আধুনিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে এই নূতন পরীক্ষায় তিনি কতটা সফলকাম হইয়াছেন জানি না; কিন্তু রসঘন একটি কাহিনী পরিবেশনে তিনি সমর্থ হইয়াছেন—একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করার পক্ষে কোন অসুবিধা নাই। ৩৭৪।৫২

দূরভাষিণী ঃ নরেন্দ্রনাথ মিত্র। ইণ্ডিয়ানা লিঃ, ২।১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য আড়াই টাকা।

মানুষগুলো অন্তরালবর্তিনী কিন্তু তাদের কণ্ঠস্বর স্বল্পায়াসলভ্য। টেলিফোনের হাতল ধরলেই সাড়া আসে, শুরু হয় যোগাযোগের কারসাজি। নম্বরের খোঁজ প্রথমে তারপর ঈপ্সিত মানুষটির সঙ্গে যোগসূত্র বেঁধে দেওয়া। এই সনাতন পদ্ধতি।

কিন্তু নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কাছে এ নিয়ম বাতিল। হাতল তুলে উনিই নম্বর চেয়েছেন দূরভাষিণীর ঘরের ঠিকানা, জীবনের খোঁজ। তারা শুধু মধ্যবর্তিনী, যোগাযোগের সেতু, আবরণ সরিয়ে তাদের পাঠকদের সামনে টেনে এনেছেন, মেলে ধরেছেন তাদের সযত্নে গোপন করা দুঃখ সুখের কাহিনী।

"দূরভাষিণী" আদ্যোপান্ত পড়ে বার বার এই কথাটাই মনে হয়েছে কি অপরিসীম দরদভরা চোখে গ্রন্থকার দেখেছেন এদের জীবনযাত্রা, কলমের ডগায় ফুটিয়ে তুলেছেন সংগোপনে রাখা ব্যথাবেদনার অন্তর্দাহ। চেষ্টাকৃত সহানুভূতি নয়, মৌখিক সমবেদনা নয়, লেখকের মানসকন্যা বীণা এক অপূর্ব সৃষ্টি। ছোটখাটো সংলাপ, সামান্য পরিস্থিতি, স্বল্পসংখ্যক চরিত্রকে ভর করে কাহিনীকে সাবলীল গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অসামান্য ক্ষমতা নরেন্দ্রনাথ মিত্রের, সেই ক্ষমতা আলোচ্য গ্রন্থটিতে বিস্ময়কর স্তরে উন্নীত হয়েছে।

টেলিফোন কন্যাদের কাহিনী হলেও টেলিফোন-যন্ত্রের চেয়ে হৃদয়যন্ত্রের কাহিনীই এ উপন্যাসের মূল উপজীব্য। হঠাৎ-ভালো-লাগা চোখে নারী পুরুষের দুর্বল প্রেম, যে প্রেমের পরমায়ু কালমেয়, লঘুচিত্তের প্রকাশ, সে প্রেম নয়, মধ্যবিত্ত জীবনের সর্বস্বপণ রাখা, বুকের রক্ত সিঞ্চিত প্রেমের কাহিনীই অপূর্ব মুন্সিয়ানায় আত্মপ্রকাশ করেছে বইটির প্রতি ছত্রে।

শুধু বীণা আর মৃন্ময়ই নয়, সিঁদুরমোছা কমলা আর তার দুর্ধর্ষ স্বামীদেবতা বিনয়, আত্মভোলা চিত্রকর বিমল, মধ্যবিত্ত গৃহস্বামীর পূর্ণ প্রতীক গিরীনবাবু, কমলার মা যোগমায়া, নিছক কালিরই আঁচড়, রক্তমাংসের সজীব প্রাণী নয় এ কথা উপন্যাস শেষ করেও মনকে বোঝানো শক্ত। কোথাও বাড়তি রং ফলানোর প্রয়াস নয়, প্রয়োজনের অতিরিক্ত স্থূল রেখাপাত নয়, পরিমিত রংয়ে রেখায় প্রতিটি চরিত্র বাস্তবানুগ, পরিপূর্ণ।

বীণা গুহঠাকুরতা এ উপন্যাসের নায়িকা, তাঁকে কেন্দ্র করে রচনার মূল প্রতিপাদ্য আবর্তিত হলেও তিনি একক নন। অববাহিকা হিসেবে জড়িয়ে আছে কমলার জীবন। সর্বহারা এই মেয়েটি শুধু সিঁথির সিঁদুরই নয়, একে একে সমস্ত রঙই মুছে ফেলেছিলো নিজের জীবন থেকে। তার এই রিক্ততার রূপ গ্রন্থকারের হাতে এমন পূর্ণতা নিয়েছে যে বেশ কয়েক পাতা বীণার জীবনকেও সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করে রেখেছে কমলার কাহিনী। উপনায়িকা নয়, নিজের ব্যথাবেদনার বোঝা নিয়ে সে সমান্তরালভাবে চলেছে বীণার পাশাপাশি। তার তীব্র বেদনাবোধ, নিষ্পেষিত সত্তার করুণার্দ্র কাহিনী বীণার দুঃখ দারিদ্র্যকেও ম্লান করে দিয়েছে।

মধ্যবিত্ত চরিত্র চিত্রণে নরেন্দ্রনাথ মিত্র অদ্বিতীয়। কষ্টকল্পিত কোন রচনার মাধ্যমে নয়, আমাদের চোখে দেখা অনুভব করা দৈনন্দিন ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি পূর্ণতা লাভ করে। এ উপন্যাসেও কোথাও তার অন্যথা হয় নি। তবু মাঝে মাঝে আমাদের মনে হয়েছে বীণা আর বিমলের ঘনিষ্ঠতা যেন একটু আকস্মিক, মনস্তাত্ত্বিক কোন প্রস্তুতির যথেষ্ট অবকাশ লেখক দেন নি। অবশ্য কমলার মৃত্যুতে, যৌথ শোক প্রকাশের রাত্রের অবসানে, লেখক বিমলের চরিত্রশুদ্ধির এই ব্যাখ্যাই দিয়েছেন 'সেই এক রাত্রে বিমল তার স্বার্থপরতা, ভীরুতা, অযোগ্যতার মরুভূমি পার হয়ে যেন একটি শ্যামল কোমল শস্যভূমিতে এসে দাঁড়িয়েছে।' শব্দমাধুর্যে অনুপম হলেও, হৃদয়তত্ত্বের দিক থেকে মনে হয় এ পরিবর্তন যেন দ্রুত আরোপিত হয়েছে, বীণার সঙ্গে মিলন ঘটিয়ে দেবার জন্যই বুঝি বা।

মঞ্জু আর দিলীপের কাহিনীও অপ্রয়োজনীয় এই কারণে যে, মূল কাহিনীকে বেষ্টন করে প্রায় গোটা দুয়েক কাহিনী ইতিমধ্যেই তন্তুজাল বিস্তার করেছিলো। পাঠকের মনকে আকৃষ্ট রাখার পক্ষে তারাই যথেষ্ট।

সমস্ত উপন্যাসটিতে লেখকের অনবদ্য সৃষ্টি কল্যাণ চরিত্র অর্থাৎ প্রথম পুরুষটি। সেকালের নাটকের ধারারক্ষীর মতন নিপুণ অভিনিবেশ সহকারে ছোটখাটো প্রত্যেকটি ঘটনা তুলে ধরেছেন পাঠকের সামনে, মাঝে মাঝে নিজেও জড়িয়ে গেছেন এই জালে, কিন্তু আবদ্ধ থাকেননি; নিস্পৃহ, নিরাসক্ত মন নিয়ে ঠিক বেরিয়ে এসেছেন। সুখে উচ্ছ্বসিত হননি, শোকে দমিত নয়, নিজের জীবনকে যবনিকার অন্তরালে রেখে মধ্যবিত্ত মানুষের গান গেয়ে চলেছেন। এদের সুধায় যেমন এঁর ভাগ নেই, তেমনি

গরলও স্পর্শ করেনিন কোথাও, বিধাতার মতন কঠিন, তেমনি স্পর্শাতীতও।

বই খোলার আগেও যেমন, তেমনি বই বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গেই বিরক্তিতে ভ্রূ কুঞ্চিত হ'য়ে আসে। অদ্ভুত রুচিবোধ, টেলিফোন ডিরেক্টরীর প্রচ্ছদপটেও এ ধরণের ছবি দিয়ে সাজাতে বোধ হয় কর্মকর্তারা ইতস্তত করতেন, অথচ ন্যক্কার-জনক এমন একটা ছবি শিল্পী না হয় আঁকতে পারেন, কিন্তু তাই ব'লে প্রকাশকও নির্বিকার-চিত্তে এ-সবের প্রশ্রয় দেন কেমন ক'রে? না কি এও একটা পরীক্ষা, রূঢ় আবরণের অন্তরালে সার্থক শিল্পরসের সন্ধান দেওয়া। ৩২৯।৫২

পরিক্রমা—নন্দদুলাল চক্রবর্তী; দি বুক হাউস, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২। মূল্য—দু' টাকা।

উপন্যাসের অন্য নাম যদি জীবনদর্শন হয়, তবে আমাদের সাহিত্যে নিটোল উপন্যাসের সংখ্যা এক হাতের আঙুলেই গুণে শেষ করা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বড় একটি গল্পকে শাখায়িত ক'রে মনোজ্ঞ একটি কাহিনীতে দাঁড় করানো হয়। তবু সে সবের মধ্যে সমস্যা থাকে, ঘাতপ্রতিঘাতে চরিত্রচিত্রণের প্রয়াস দেখা যায়, সামঞ্জস্যপূর্ণ মনোবিশ্লেষণের চেষ্টাও পরিলক্ষিত হয়।

কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে কেবল গল্পের একটা স্থূল কাঠামোই রচনা করা হয়। গল্পের কাহিনীকে থামিয়ে বক্তৃতার রেওয়াজ, ফাঁক পেলেই আদর্শবাদের বুকনিভরা বাণী বিতরণ।

আলোচ্য গ্রন্থটিতে এ সমস্ত থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র সাবলীল বিন্যাস ও ভাষামাধুর্যে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতির কারণ ঘটে না।

ছাপা মামুলি, প্রচ্ছদপট অলংকরণ প্রশংসার যোগ্য। ২৭১।৫২

তিনতারা—রমাপদ চৌধুরী; ইউনাইটেড বুকস্, ৫৪, গণেশচন্দ্র এভেনিউ, কলিকাতা। মূল্য—দুই টাকা।

লাতেহারের পশ্চিমে কুনো পাহাড়ের রেঞ্জ। দীর্ঘশীর্ষ পালামৌ পাহাড়। নূপুর বাজানো রূপঝিলের স্রোত। আরগাডা কোলিয়ারী ঘিরে ওঁরাও আর মুণ্ডাদের আস্তানা। মাঝে মাঝে বাঙালী আর এ্যাংলো পরিবার।

স্বভাবসিদ্ধ চমকলাগানো ভাষায়, অনবদ্য শব্দচয়নে, দরদী দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে রমাপদ-বাবু পাতার পর পাতা জুড়ে কুহকী মায়ার সৃষ্টি করেছেন। ইহার আকর্ষণে পাঠকের মন শহুরে পরিবেশ ছাড়িয়ে আরণ্যক সভ্যতার আদিভূমিতে ফিরে যায়। যেখানে মানুষের চোখের তারায় আগুন, বুকে অরণ্য-তুফান।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, যে লেখনী লখিয়ার বন্য উন্মাদনার রূপের আঁচড় কেটে চলেছে, সেই লেখনীতেই কেমন ক'রে ধরা পড়লো কাবেরীর মেঘমেদুর মনের কামনা। তন্তুবয়নের মত আগাগোড়া এমনি কোমল আর কঠিনের টানাপোড়েন। দিলজখমী বল্লমের ফালাই শুধু নয়, আয়ত নয়নের সলজ্জ কটাক্ষও লেখকের নজর এড়ায়নি।

অযথা বাক্যবিন্যাস নয়, অসামান্য সংযম, সংযত বাচনভঙ্গী; কিন্তু তাতেই পূর্ণাবয়ব ছবি। প্রত্যেকটি নিখুঁত আর নিটোল। হাগিস, রাজেন ডাকার, ব্রিজলাল, দীপ্তেন, কাবেরী, লখিয়া—এমন কি অল্পক্ষণের দেখা পাওয়া নলিনীও।

আলোচ্য উপন্যাসটি পাঠকসমাজে যে বিশেষ-ভাবে আদৃত হয়েছে, তা অল্প সময়ের ব্যবধানে দ্বিতীয় সংস্করণ হওয়াতেই প্রমাণিত। ৩১১।৫২

ছোরা, পরী ও পিস্তল: শ্রীশচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : নবজীবন প্রেস, কলিকাতা—৬ : দেড় টাকা।

ছোরা দিয়ে ঘটনার আরম্ভ, পরী তার নায়িকা আর পিস্তল নায়িকার ভ্যানিটি ব্যাগের প্রসাধন সামগ্রী। লেখক পুস্তক পরিচয় স্বরূপ লিখেছেন '১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষের স্মৃতিতিক্ত পটভূমিকায় রোমাঞ্চকর ডিটেকটিভ উপন্যাস।' কিন্তু দুর্ভিক্ষের তিক্ততাটুকু স্মৃতিমন্থন করে লিখতে হয়েছে বলেই বোধ হয় তেমন ফোটেনি। তাছাড়া রোমাঞ্চ খানিক থাকলেও 'ডিটেকশন' এত কম যে বইটিকে ডিটেকটিভ উপন্যাস বলতে আপত্তি উঠতে পারে। প্রথম থেকেই আসামীর ওপর এত আলো ফেলাতে ডিটেকশনের রোমাঞ্চ শেষ পর্যন্ত প্রায় অনবশিষ্ট। লেখকের পরিচ্ছন্ন বাঙলা এবং বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপের ভাষা, রহস্য রোমাঞ্চ বইগুলিতে যার একান্ত অভাব, বিফলেই গেছে।

সবুজে আর লালে আঁকা প্রচ্ছদপটটি রুচি-বিগর্হিত। এ বিষয়ে প্রকাশকের দৃষ্টি দেবার দিন বাঙলা দেশেও অনেক আগে এসে গেছে। (৩৫৪।৫২)

প্রবন্ধ সাহিত্য

ভারতীয় সমাজ: সার্ভিস ও গুড উইল মিশনের সৌজন্যে প্রকাশিত : প্রকাশক—শ্রীনীলমাধব গাঙ্গুলী : ৪, সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার, কলকাতা—১২ : আড়াই টাকা।

ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে 'সমাজ' সাপ্তাহিকে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর সংকলন। বিভিন্ন প্রবন্ধে অর্থনৈতিক ও রাজ-নৈতিক পটভূমিকায় ভারতীয় সমাজজীবনের,

অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করা হয়েছে। সর্বোদয় রাষ্ট্রের স্বরূপ বিশ্লেষণে আলোচনার সমাপ্তি।

সাময়িক পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হলেই হয়তো প্রবন্ধগুলি বিশেষ কোন যৌক্তিক ক্রমানুসরণ করেনি। ফলে প্রায়শই পুনরুক্তি দোষ ঘটেছে এবং অনেক স্থলে, বিশেষ করে প্রাচীন ভারতীয় আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা প্রসঙ্গে, ভাবপ্রবণতা যুক্তিকে আচ্ছন্ন করেছে। মনোযোগ বর্তমানের সমস্যা থেকে অতীতের ঐতিহ্যের দিকেই অধিকতর প্রগাঢ়। শেষের দিকে অবশ্য প্রবন্ধগুলি এ ত্রুটি অনেকাংশে কাটিয়ে উঠেছে এবং বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার সমস্যাগুলি মোটামুটিভাবে আলোচনা করে উন্নততর সমাজ-সংস্কার পথনির্দেশ করবার চেষ্টা অনেকাংশে সফল। বিশেষত যে প্রবন্ধে আলোচনার উপসংহার করা হয়েছে, যুক্তির দিক দিয়ে তার সঙ্গে সবাই একমত না হলেও সেটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এমনকি শুধু একটি প্রবন্ধ পড়লেই গোটা বইখানার মূল বক্তব্য হৃদয়ঙ্গম হয়। (২৩৩।৫২)

সময় ও সাহিত্য—শ্রীকিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত। প্রকাশক: প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

শ্রীকিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত কবি বলেই খ্যাত। কিন্তু 'সময় ও সাহিত্য' নামক আলোচ্য গ্রন্থখানি প্রকাশ করে কিরণশঙ্করবাবু প্রমাণ করেছেন যে, তিনি মুখ্যত কবি হলেও সমালোচনা সাহিত্যেও তাঁর অধিকার কম নয়। আলোচ্য গ্রন্থে সাহিত্য শিল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে তিনি যেসব আলোচনা করেছেন তার সব কিছুর সঙ্গে একমত হওয়া সম্ভব না হলেও তাঁর পাণ্ডিত্য, শিল্পবোধ ও রচনা-কৌশলের প্রশংসা করতেই হয়। তাঁর এই গ্রন্থ রচনার পিছনে আধুনিক ইংরেজী সমালোচনা সাহিত্যের প্রভাব স্পষ্ট চোখে পড়ে। তবে কোথাও সে প্রভাব তাঁর মৌলিক দৃষ্টি ভঙ্গীকে ছাপিয়ে উঠতে পারেনি। ইংরেজী সমালোচনা সাহিত্যের মাপকাঠির সাহায্যে তিনি আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের নানা দিকের কৃতিত্ব বিচার করার চেষ্টা যেমন করেছেন তেমনই তার দুর্বলতার দিকটাও ধরিয়ে দিতে কসুর করেন নি। নিছক পাণ্ডিত্য প্রকাশ তাঁর রচনার মূল লক্ষ্য নয়। মূল লক্ষ্য হল সাধারণ পাঠক-পাঠিকার মনে প্রকৃত সাহিত্য-বোধ সৃষ্টি করা এবং সাহিত্যের রস গ্রহণে তাঁদের উদ্বুদ্ধ করে তোলা। একাজে তিনি কিছুটা সফলও হয়েছেন।

এ বইয়ের প্রথমাংশ অনেকটা তত্ত্বমূলক—সাহিত্য সমালোচনার মূলসূত্রগুলি নিয়েই গ্রন্থকার আলোচনা করেছেন। 'কবিতার কথা', 'কাব্য বিচার', 'রূপকের সংকট', 'আধুনিক কবিতার রূপ', 'বাঙলা উপন্যাসের একদিক', 'কাব্যনাট্যের ভূমিকা' প্রভৃতি অধ্যায় এর পরিচায়ক। জটিল তত্ত্বগুলিকে যথাসম্ভব সহজ সরলভাবেই গ্রন্থকার বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। গ্রন্থখানির দ্বিতীয়াংশে তিনি আলোচনা করেছেন বাঙলা সাহিত্যের তিনজন দিকপালের সাহিত্যিক জীবন ও অবদান। তাঁরা হলেন, কবি মধুসূদন, নজরুল ইসলাম ও প্রমথ চৌধুরী। তিনটি আলোচনার মধ্যেই গ্রন্থকারের সূক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তি, রসবোধ এবং শিল্পী মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

এই গ্রন্থখানির মধ্যে একটি বড় ত্রুটি বোধ হয় আমার মত অনেক পাঠকের চোখেই ধরা পড়বে। গ্রন্থকার যদিও বইয়ের নামকরণ করেছেন 'সময় ও সাহিত্য', তিনি সাহিত্যের সকল বিভাগের দিকে সমান দৃষ্টি রাখেন নি। বোধ হয় তিনি নিজে কবি বলে এ গ্রন্থে কাব্যালোচনাই স্থান পেয়েছে বেশী। আধুনিক কবিতার বিভিন্ন দিক প্রাধান্য পাওয়ায় সাহিত্যের অন্যান্য অংশের প্রতি সুবিচার করা হয়নি। ৩৭৮।৫২

ছোট গল্প

পকেটমার—অনিল মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ঘোরতর পাবলিশিং কর্তৃক ৬১এ, বাগবাজার স্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। মূল্য—৷৷৹ আনা।

ছোট গল্পের বই। এগারটি গল্প আছে। লেখক সাহিত্য-ক্ষেত্রে নূতন প্রবেশার্থী। তবে তাঁহার লেখার হাত আছে। চর্চা রাখিলে ভবিষ্যতে উন্নতি করিতে পারিবেন, আশা করা যায়। ৩৮৭।৫২

উত্তরাপথ—সমীর ঘোষ; স্টারলাইট পাব্লিকেশন, ১৯এ, চক্রবেড়ে লেন, কলিকাতা—২০। মূল্য—দুই টাকা।

কবিতা উপন্যাসের কথা হয়তো তর্কসাপেক্ষ, কিন্তু বাঙলা ছোট গল্পের আসন বিশ্বের দরবারে মোটেই যে পিছনের শ্রেণীতে নয়, একথা কোন প্রকার তর্কের অবতারণা না ক'রেও জোর গলায় বলা যেতে পারে। শুধু বিষয়-বস্তুর বৈচিত্র্যেই নয়, রচনাশৈলী, আঙ্গিক আর মনোজ্ঞ শব্দযোজনায় রসোত্তীর্ণ গল্পের সংখ্যা বাঙলা-সাহিত্যে সুপ্রচুর। গত দশ পনের বছরের মধ্যে বাঙলা-সাহিত্যের এ শাখাটি আশাতীত পুষ্টিলাভ করেছে এ কথা অনস্বীকার্য।

ভূমিকা হিসাবে এত কথা বলার একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে, ইদানীং কোন গল্প প্রকৃত শিল্পরসসমৃদ্ধ না হ'লে পাঠকদের মনে ধরে না।

আলোচ্য গল্পগ্রন্থটির লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগত। তাঁহার রচনাভঙ্গীমাও জড়তাশূন্য নয়; বরং স্থানে স্থানে আড়ষ্টতার ভাব সুপরিস্ফুট।

আমাদের মনে হয় আরও পরিণত, আরও শিল্পীজনোচিত গল্পের সমষ্টিরও সার্থক গল্প-গ্রন্থের সঙ্কলন করাই বিধেয় ছিল। মুদ্রিত আকারে নিজের রচনা দেখার দুর্বার মোহ থাকা লেখক মাত্রেরই স্বাভাবিক, কিন্তু প্রকৃত শিল্পী এ মোহ দমন করেন। সাহিত্যের পথ ধৈর্যসহ। প্রবালকীটের মত নিজের অবশেষের ওপর কীর্তিসৌধ রচিত হয়।

রচনার স্থানে স্থানে বিদ্যুৎস্ফুরণের আভাস চোখে ঠেকেছে বলেই লেখকের সম্বন্ধে এই সাবধান-বাণী উচ্চারণের প্রয়োজন বোধ করলাম। প্রচ্ছদচিত্র অপূর্ব। ৩২৪।৫২

ভিন্ জাতের মেয়ে—আবদুর রউফ, প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৬১ বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—১৷৹।

লেখকের মহৎ আদর্শ আছে, আছে উদার দৃষ্টি-ভঙ্গী। সেই আদর্শকেই ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন এ বই-এর তিনটি ছোট গল্পে। তাঁর আদর্শ এবং উদার মতবাদ সর্বত্র সুপরিস্ফুট। কিন্তু গল্পগুলি গল্প হয়নি, সেই হয়েছে মস্ত অসুবিধে। ফলে তাঁর মতবাদ, যত মহৎ এবং উদারই হোক না কেন, অক্ষম গল্পের মধ্যে অকারণ প্রাধান্য পেয়েছে। আবেদন ব্যর্থ হয়েছে। না হয়েছে গল্প না প্রবন্ধ। ২৮০।৫২

অনুবাদ সাহিত্য

ইয়ার্লিং : মার্জোরী কিনান রলিংস; অনুবাদ—শ্রীবিমল মিত্র : এম সি সরকার য়্যান্ড সন্স লিমিটেড; ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২ : দশ আনা।

আমেরিকায় শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচনার পুরস্কার হলো পুলিৎজার প্রাইজ। 'ইয়ার্লিং' সেই পুলিৎজার প্রাইজ পাওয়া উপন্যাস। রচয়িত্রী শ্রীমতী মার্জোরী কিনান রলিংস তাঁর এই উপন্যাসে ছোট একটি মানবশিশু আর একটি গৃহপালিত হরিণশাবককে নিয়ে যে অপূর্ব রসস্নিগ্ধ কাহিনীর অবতারণা করেছেন, আঙ্গিকে তা যতোখানি দৃঢ়বিনাস্ত, আবেদনে ঠিক ততোখানিই বিশ্বজনীন। কোথাও কোনও

চমক লাগাবার সামান্যতম চেষ্টা নেই, তা **সত্ত্বেও** কাহিনীর সেই নিরাবরণ নিরাভরণ সারল্যেই শেষ পর্যন্ত চমক লাগে।

ছোট্ট ছেলে যোডি। লোকালয়ের থেকে অনেক দূরে প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যের মধ্যে সে বড় হয়ে উঠছে। তার বড় **সাধ হলো** একটি হিরণছানা পোষে। কিন্তু সংসারের অবস্থা তেমন স্বচ্ছল নয়। হরিণ তো পুষবে, তাকে খাওয়াবে কি। নিজের দুধের ভাগ ছেড়ে দিয়ে যোডি হরিণ পুষল। **শেষ পর্যন্ত,** **অবস্থার** প্রতিকূলতায়, নিজের হাতে যোডিকে সেই হরিণশিশুর মৃত্যু ঘটাতে হলো।

বেদনাবিধুর এই কাহিনীর **মধ্য দিয়ে** লেখিকা যে একটি দুরূহ সমস্যার ছবি তুলে ধরেছেন, সামান্যতম অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন পাঠকও বুঝতে পারবেন, সে-সমস্যা শুধু যোডিরই নয়, **সমগ্র** মানবতার। মানুষ ভালবাসে, ভালবাসতেই **চায়।** ভালবাসাই তার স্বাভাবিক ধর্ম। তবু যে শেষ পর্যন্ত নিজের হাতেই তাকে সেই সুকুমার হৃদয়বৃত্তির কণ্ঠরোধ করতে হয়, তার জন্যে দায়ী সে নিজে নয়, দায়ী তার পারিপার্শ্বিক। কেউ তা জানে, কেউ জানেনা। জানুক, আর না-ই জানুক, প্রতিকূলে সেই পারিপার্শ্বিকের হাত থেকে আমাদের নিস্তার নেই। মানবতা এখানে যোডির মতই অসহায়।

যদি বলি 'ইয়ার্লিং' একখানি ভালো—সুখপাঠ্য অর্থে ভালো—উপন্যাস, তো কিছুই **কিছুই** প্রায় বলা হয় না। ইয়ার্লিং একখানি **আশ্চর্যসুন্দর উপন্যাস।** এর মৃদুসুন্দর কাহিনী, এর বেদনাবিস্তারী মাধুর্য—সব কিছুর মধ্য দিয়েই সেই মহৎ লক্ষণটি পরিস্ফুট মনকে যা শূন্য করে দিয়েও এক অলোকসামান্য অনুভূতির আস্বাদে ভরে তোলে, বেদনা দিয়েও শান্তি দেয়। বাঙলা ভাষায় এ বইয়ের অনুবাদ হওয়ার প্রয়োজন ছিল, বহুল প্রচারের প্রয়োজন রয়েছে।

অনুবাদ করেছেন **শ্রীবিমল মিত্র। শ্রীযুক্ত** মিত্র লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিক। অনুবাদের ক্ষেত্রেও তিনি সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। শুধু কাহিনী নয়, কাহিনীর মেজাজটিকেও তিনি যে আশ্চর্য নৈপুণ্যে ভাষান্তরিত করেছেন, বাঙলা অনুবাদ-সাহিত্যে তা একটি স্থায়ী আদর্শ **তুলে ধরল।**

শিশুসাহিত্য

বেপরোয়া : স্বপন বুড়ো ঃ নিরালয়, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা—১২ ঃ দুই টাকা।

যাদের নিয়ে এবং যাদের জন্যে এই উপন্যাস স্বপনবুড়ো তাদের ভালো করেই চেনেন। ছোটদের নিয়েই বুড়োর কারবার। "এ্যাই খোকা, আমার সঙ্গে পালিয়ে এসো' বলে তিনি একদিন বাচ্চাদের ডেকে নিয়ে গিয়ে কী বিপদেই না ফেলেছিলেন। চিতল মাছ আর ডেঁয়ে পিঁপড়ের ভয়ে তারাতো কেঁদেই ফেলল! শেষটায় ঘুম ভেঙে স্বপ্ন টুটে তবে বাঁচে।

ছোটরা তো দুষ্টুমি করবেই, নইলে আর কারা করবে দুষ্টুমি। কিন্তু দুষ্টুমি আর বদমায়েসি যে এক নয়, একই সঙ্গে দুষ্টু আর মহৎ প্রাণ হওয়া যে সম্ভব তারই সার্থক রূপ আছে বেপরোয়াতে।

সূর্য রায়ের প্রচ্ছদপট যেমনি সুন্দর, বইটির বাঁধাইও তেমনি মজবুত। নাড়ুর মত করে ছুঁড়ে ফেলে দিলেও ছিঁড়বে না। তবে ছুঁড়ে কেউ ফেলবে না এ ভরসা অভিভাবকদের দেওয়া যায়। (৩৫৫।৫২)

জীবনী

গানে রামপ্রসাদ—শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চ্যাটার্জি এন্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

লেখক সাধক রামপ্রসাদের রচিত সংগীতের সাহায্যে তাঁহার জীবন, বিশেষভাবে তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষা, পারিবারিক অবস্থা ও সাধনার ধারা এবং সিদ্ধির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়াছেন। পাঠকদের বুঝিবার সুবিধার জন্য তিনি যে সংগীতগুলি লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, সেগুলি সংখ্যায় পঞ্চাশটির অধিক হইবে, পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইয়াছে। লেখক এই উদ্দেশ্যে রামপ্রসাদের রচিত বিদ্যাসুন্দরেরও স্থানে স্থানে সাহায্য লইয়াছেন। লেখকের মতে রামপ্রসাদের গানগুলি ব্যষ্টি ভাবের গান; কিন্তু সমষ্টিভাবে সেগুলি তাঁহার আত্মকাহিনী। কবির বিস্তৃত জীবনী অবশ্য পাওয়া যায় না, যেটুকু পাওয়া যায়, তাহা অবলম্বন করিয়া ইতিপূর্বে কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে এবং **তাঁহার সংগীতের অন্তর্নিহিত অধ্যাত্ম-তত্ত্ব** সম্বন্ধেও কেহ কেহ আলোচনা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের লিখিত "রামপ্রসাদ"-এর বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু রচনার সাহায্যে কবির আত্ম-জীবনীর এইভাবে বিশ্লেষণ নূতন। আমরা এই আলোচনা পাঠ করিয়া প্রীতি লাভ করিয়াছি। গ্রন্থকার পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হালিসহরস্থ রামপ্রসাদের ভিটার উন্নতির জন্য দান করিয়াছেন। সুতরাং পুস্তকখানি ক্রয় করিয়া যাঁহারা পাঠ করিবেন, রামপ্রসাদের সাধনার সম্বন্ধে তাঁহাদের অনেক গূঢ় রহস্য অধিগত হইবে, সেই সঙ্গে কবির পবিত্র স্মৃতিরক্ষার পক্ষেও সাহায্য করা হইবে।

৩৮২।৫২

শ্রীশ্রীললিতা সখী—(পূর্বাশ্রম কাহিনী)—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, গীতারত্ন প্রণীত। শ্রীনিমাইচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক মাশিলা, ভক্তি-নিকেতন, আন্দুলমৌড়ী পোঃ, জেলা হাওড়া হইতে প্রকাশিত। মূল্য—২, টাকা।

ললিতা সখীর নাম অনেকেই জানেন। ২২ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া এই মহাপুরুষ গুরু-নির্দিষ্ট পথে সাধন-ভজন করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। আলোচ্য পুস্তকে ইঁহার সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত জীবনের আলোচনা করা হইয়াছে। ইঁহার পূর্বাশ্রমের নাম ছিল গোপালকৃষ্ণ। গ্রন্থকার ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। পুস্তকে তিনি তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অনেক কথা বর্ণনা করিয়াছেন। শৈশব হইতেই গোপালকৃষ্ণের জীবনে অসাধারণ নিষ্ঠা, সত্যপরায়ণতা, নির্লোভ, বিশেষতঃ পরার্থপরতা পরিলক্ষিত হইত। গ্রন্থকার বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখে সেগুলি অভিব্যক্ত করিয়াছেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৈরাগ্য এবং অলৌকিক ভাব গোপালকৃষ্ণের মনে সমধিক প্রবল হইয়া উঠে। তিনি পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন। বেদান্তাদি শাস্ত্র তাঁহার অধিগত ছিল। কিন্তু পরিশেষে রাগানুগ মার্গেই আকৃষ্ট হন। পরে শ্রীল চরণদাস বাবাজীর কৃপায় তিনি গোপীভাবের অধ্যাত্ম-জীবনের উচ্চস্তরে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। ইঁহার গুরু-ভক্তি ছিল অনন্যসাধারণ। একদিন ঠাকুরসেবা করিতে প্রবৃত্ত হইবার সময় সংবাদ পান যে, তাঁহার বাল্যের গুরুমহাশয় পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। গোপালের ফুল তোলা বন্ধ হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি ফুলের সাজি ঠাকুর-ঘরের মধ্যে রাখিয়া ঠাকুরকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "আমি তোমার চলন্ত বিগ্রহের সেবায় যাইতেছি।" সে দিনে গোপাল ছাড়া ঠাকুরসেবা করিবার মত কেহ ছিল না। কিন্তু গোপালের সে বিষয়ে চিন্তা করিবার অবসরই হইল না। উত্তরীয় স্কন্ধে ফেলিয়া তিনি গুরুমহাশয়ের বাড়ীর দিকে রওনা হইলেন।" এই একটি ঘটনার ভিতর দিয়াই ইঁহার মহৎ-জীবনের সম্ভাবনা সূচিত হয়। যাঁহার এমন গুরুভক্তি এবং মানব-সেবার মধ্যে ভগবৎ-বুদ্ধি যাঁহার অন্তর এরূপ প্রদীপ্ত, অধ্যাত্ম-জীবনে তিনি সমুন্নত অবস্থায় অধিষ্ঠিত হইবেন, ইহাতে আশ্চর্য কি?

৩৬৭।৫২

বিস্তার লাভ করে। 'ধুড়া গোঁসাই'এর প্রভাব এখনও এই অঞ্চলে কিছু কিছু পাওয়া যায়। এই সময়ে কিছু পরিমাণ বৌদ্ধ-মূর্তি বিষ্ণু-মূর্তিতে পরিণত হইয়াছিল। প্রায় তেরশ' শতাব্দীতে উঃ-পূঃ ভারতে তান্ত্রিক ধর্মভাবের প্রভাব দেখা যায়। এই সময়ে কামরূপে যোগিনীতন্ত্র ইত্যাদি রচিত হয়। পর্বতাদির নিকটে অনেক সমতল ভূমিতে বৌদ্ধতান্ত্রিক ধর্মের উৎপত্তি দেখা যায়। লক্ষ্মীমপুরের কেঁচামাতিতে 'তারা' নাম আঁকা দেওয়াল-গুলিতে বৌদ্ধতান্ত্রিক ধর্মের প্রভাব পড়িয়াছে।

প্রাচীন কামরূপে ভাগবতী ধর্ম ও বিষ্ণু পূজার প্রচলন চোদ্দশ' শতাব্দী পর্যন্ত অল্পবিস্তর ছিল। এই সময়ে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের মধ্যে ভাবগত চর্চা অত্যন্ত ক্ষীণভাবে ছিল; কিন্তু সাধারণ মানুষ ইহার রস গ্রহণ করিতে পারে নাই।

মহাপ্রভু শ্রীমৎ শংকরদেবের আবির্ভাবের পর হইতে উক্ত অঞ্চলে ভাগবত চর্চার বহুল প্রচলন আরম্ভ হয়। এই সময়ে দিল্লীতে মোগল বাদশা জিলালুদ্দীন আকবর রাজত্ব করিতেন এবং কামরূপে রাজত্ব করিতেন মহারাজা নরনারায়ণ। বাদশাহ্ আকবর এই সময়ে হিন্দু ও মুসলমান চিত্রকরদের চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য 'মোয়াজ আবদুল সামাদ' ও সমরকন্দের মহম্মদ নাসিবরকে নিযুক্ত করেন। মোগল

প্রাচীন বলিয়া কেহ কেহ মত প্রকাশ করেন, শ্রীসূর্য পাহাড়ের বেশির ভাগ মূর্তিই বৌদ্ধযুগীয়। খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে উত্তর ভারতে ভাগবত ধর্মের প্রচার হয়। এই সময়ে অনেক বিষ্ণু মূর্তি খোদাই করা হইয়াছিল। গুপ্তবংশের রাজারা বেশির ভাগই বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ছিল। এই সময়ে ভারতে বিষ্ণু ও শিব পূজার বহুল প্রচার ছিল এবং ভারতের শিল্পকলার পূর্ণ বিকাশ এই সময়েই হইয়াছিল। পুরানের ভাবধারা লইয়া শিল্পীরা এই সময়ের নানান ধরণের চিত্র অঙ্কন করেন। অনেকের মতে অজন্তাপুরের চিত্রাবলীও এই সময়ে আঁকা হইয়াছিল।

কামরূপের রাজা ভাস্কর বর্মনের রাজত্ব-কালে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব এখানকার চিত্রাদির মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু ইহার পরে আবার হিন্দু ধর্মের, বিশেষ করিয়া শিব সম্প্রদায়ের প্রভাব উত্তর-পূর্ব ভারতে

বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের আমলে উঃ-পূঃ ভারতে শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হয়। আসামের শিব সিংহ, মহারাজ্য নরনারায়ণ ও পরবর্তী 'কোচ্' রাজাদের আমলের চিত্রাদির ভিতর মোগলী ধরণের প্রভাব দেখা যায়। ইহার দ্বারা ভারতীয় চিত্র-কলাদিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; যেমন—হিন্দু, বৌদ্ধ ও মোগলী। ভারতীয় চিত্রাদির অঙ্কনের ধরণ অনুযায়ী অনেক সময়ে নামাকরণ করা হইয়াছিল এবং পরে জায়গাবিশেষের নামানুযায়ীও নামাকরণ করা হইয়াছিল; যেমন—দিল্লী, কাঙ্গারা, কাশ্মীরী ও জয়পুরী। জয়পুরী অঙ্কন প্রণালীকে রাজপুতী ধরণ বলিয়া থাকে; রাজপুত চিত্রাদিতে মানুষ চরিত্রের অভিব্যক্তি ও চলন-বলনের ছাপ পাওয়া যায়। বৌদ্ধ চিত্রাদিতে বৌদ্ধ ধর্মের মধুর ভাবের প্রকাশ দেখা যায়। মোগলী চিত্রাদি অনেকটা রাজপুতীয় ধরণে আঁকা। কিন্তু এই সমস্ত চিত্রে ধর্মভাবের প্রভাব কম। বেশির ভাগ ছবির বিষয়বস্তুই হইল মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ লইয়া আঁকা। এক কথায় বলিতে গেলে হিন্দু ও বৌদ্ধ চিত্রাদিতে ভারতীয় আত্মিক ভাবের প্রকাশ পাওয়া যায় এবং মোগলী চিত্রাদিতে পার্থিব ও স্বাভাবিক ভাবের প্রকাশ পাওয়া যায়।

ষোড়শ শতাব্দীর কামরূপের চিত্রাদির মধ্যে রাজপুতীয় ধরণের প্রভাব বেশি। কামরূপীয় চিত্রাদির লতা, গাছ ও জীব-জন্তুর চিত্রতে অবশ্য কামরূপীয় বৈশিষ্ট্য আছে। মহাপুরুষ শঙ্করদেবের অঙ্কিত চিহ্নযাত্রার পট (বৈকুণ্ঠের পট), বৃন্দাবনী কাপড়, সচিত্র প্রাচীন ভাগবৎ, ধর্মপুরাণ, হস্তিবিদ্যা মহার্ণব, কীর্তনঘোষা, শংখচূড় বধ ইত্যাদি পুঁথির চিত্রাদি কামরূপী চিত্রের নিদর্শন। প্রাচীন মন্দির, স্তম্ভ, কাঠের ও হাতীর দাঁতের সিংহাসন ইত্যাদিতে কামরূপীয় শিল্পের আদর্শ এখনও পাওয়া যায়। প্রাচীনকাল হইতে কামরূপের বয়নশিল্পে কামরূপীয় সূচী শিল্পের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাচীন পুঁথিগুলির ভিতর 'আদ্য দশম খণ্ড' পুঁথি প্রকাশ করা হইয়াছে। এই পুঁথির পাতাগুলির আকার ১৯"×৭"। পুঁথির প্রায় প্রত্যেক পাতায় আবশ্যকীয় ছোট-বড় ছবি অঙ্কন করা হইয়াছে। প্রায় প্রত্যেক ছবিই তিন রঙের। অসমীয়া 'আদ্য দশম', অর্থাৎ দশমস্কন্ধ ভাগবতের প্রথম খণ্ড মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের রচিত 'মহা ভাগবতের' প্রধান অংশ। ভাগবত বলিলে অসমীয়া জনসাধারণ এই দশম খণ্ডকেই বুঝিয়া থাকে। অনুমান, শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের নির্দেশ মতে তাহার রচিত প্রত্যেক পদে চিত্রাদি অঙ্কন করা হইয়াছিল।

[মূল অসমীয়া হইতে পাঁচুগোপাল ঘোষ কর্তৃক অনূদিত।]
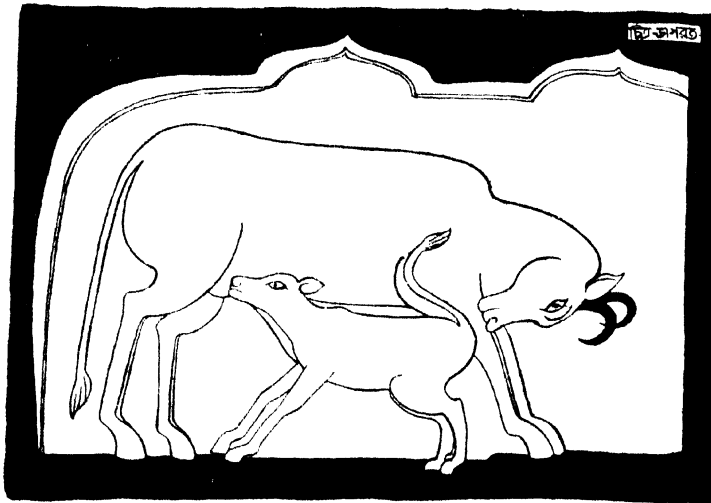
বিদ্যালয়ে 'টিফিন'

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

বিদ্যালয়ে ছেলেদের মধ্যাহ্ন জলযোগের বিষয় 'দেশ' পত্রিকায় আলোচনা প্রসঙ্গে নানা অসুবিধার কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে কোন্ দিক হইতে সুবিধা হইতে পারে বা সাহায্য পাওয়া যায় তাহাও সংক্ষেপে অবতারণা করা হইয়াছে। কিন্তু নানা অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও কিভাবে টিফিন প্রবর্তন করা যায়, তাহাই চিন্তা করা প্রয়োজন।

গত সপ্তাহে পত্রিকায় প্রকাশিত মধ্যশিক্ষা পর্ষদের এক সিদ্ধান্ত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, পর্ষদের নির্দেশ, সকল বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় শিক্ষাদান করিতে হইবে। ইহা পড়িলেই মনে হয় ছাত্রদের শিক্ষার উপযুক্ত একজন স্বাস্থ্যশিক্ষক নিযুক্ত করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িবে। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার আমলেও এই নীতি গৃহীত হইয়াছিল এবং অধিকাংশ বিদ্যালয়ে একজন স্বাস্থ্যশিক্ষক নিযুক্ত করিতে হইত। সংবাদটি পড়িয়া আরও মনে হয়, ক্ষুধার্ত ছাত্রদের উপর যে অত্যাচার সাধিত হইত, তাহা হয়ত এখনও চলিতে থাকিবে। "দানা পানির ব্যবস্থা না করিয়া খালি 'ডলাই মলাই' করিলে," হিতের পরিবর্তে অহিত হইবার সম্ভাবনা বেশী। সুতরাং আমার মনে হয় যেমন উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করিতে হইবে, সেইরূপ বাধ্যতামূলকভাবে টিফিনেরও ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন।

ইহা সম্ভব হইলে টিফিন প্রবর্তনের বিপক্ষে যুক্তি সকল নিজে হইতেই অপসারিত হইবে এবং তাহার জন্য আর দুশ্চিন্তার কারণ থাকিবে না। কিন্তু মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এ বিষয়ে মনস্থির করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না, কারণ কোথাও তাহার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। সেরূপ অবস্থায় যাহাতে স্বেচ্ছায় বিদ্যালয়গুলি টিফিন দিবার ব্যবস্থা করে সেই দিক দিয়া চিন্তা করা প্রয়োজন।

এই স্বাস্থ্যশিক্ষক মহাশয়কে কেন্দ্র করিয়া টিফিন চালু করা সহজ হইয়া পড়িবে। সাধারণত এই শিক্ষককে সমস্ত দিনই ছেলেদের পড়াইতে হয়, ছুটীর পর কয়েকজন ছাত্র লইয়া স্বাস্থ্য চর্চা চলিতে থাকে। অধিকাংশ ছেলেই, বিশেষত যাহাদের বাড়ি স্কুল হইতে দূরে, চলিয়া যায়। কয়েকজন অতি উৎসাহী বা যাহাদের স্কুলের নিকটেই বাড়ি এবং সেখান হইতে কিছু জলযোগ করিয়া আসিতে পাইয়াছে তাহারাই এই খেলার আনন্দে যোগ দিতে পারে। টিফিন প্রবর্তন করিতে হইলে স্বাস্থ্য শিক্ষকের হাতে ছেলেদের স্বাস্থ্যের ভার যথাসম্ভব ছাড়িয়া দিতে হইবে। অবশ্য বহু স্কুলের পক্ষে হয়ত কেবল স্বাস্থ্য শিক্ষার জন্য একজন শিক্ষক নিযুক্ত করা সঙ্গতির বাহিরে; সুতরাং তাঁহাকে ছাত্র পড়াইতে হইবে। কিন্তু যতদূর সম্ভব তাঁহার এ বিষয়ে কম মনোযোগ দিতে হয় বিদ্যালয়ের পক্ষে অর্থাৎ ছাত্রদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ততই মঙ্গল। এই শিক্ষক নিয়োগের সময় চুক্তি করিয়া লইয়া টিফিনের ভার দিলে আর ভবিষ্যতে গোলযোগের সম্ভাবনা থাকে না।

যেখানে এইরূপ শিক্ষক নিয়োগের সম্ভাবনা কম সেখানে বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের মধ্যে প্রতি মাসে এক একজনের উপর ভার দিলে চলিয়া যাইবে। তাঁহাকে এই কার্যের জন্য কিছু অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে। সেই সঙ্গে বিদ্যালয়ের যে পরিচারক থাকে, তাহাকেও এই কার্যের অংশভাগী করা প্রয়োজন। স্থানীয় লোক হইলে কেবল যে বাজার হাট করিতে পারিবে তাহা নয়, কিভাবে মালপত্র সংগ্রহ করিলে সুবিধা হয় তাহারও সন্ধান দিতে পারিবে। এমনও অসম্ভব নয় যে, শিক্ষকগণের সহযোগিতায় সে যথোপযুক্ত পারিশ্রমিক পাইলে বহু বিষয় সাহায্য করিতে পারিবে। বিদ্যালয়ের হিসাব খাতাপত্র রাখিবার জন্য যে কর্মচারী থাকেন, তিনি ছেলেদের পরীক্ষা প্রভৃতি কাজের দায় হইতে মুক্ত, সুতরাং তাহার অবসর বেশী এবং মনও নানাদিকে বিক্ষিপ্ত নয়। তিনি টিফিনের ব্যাপারে একজন বড় সহায়ক হইতে পারেন এবং হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। পুরাতন কর্মচারী না হইলে নূতন নিয়োগের সময় ইহা একটি সর্ত বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে।

অন্য বিষয় আলোচনা করিবার পূর্বে একবার টাকার কথা উত্থাপন করা প্রয়োজন। টাকা আসিবে কোথা হইতে?—একবাক্যে সকলেই এ প্রশ্ন করিয়া বসিবেন। প্রথম কথা ছাত্রদের নিকট হইতে অতিরিক্ত কিছু আদায় করিতেই হইবে এবং এ বিষয়ে অভিভাবকদের বিশেষ আপত্তি হইবে না। পাঁচ ছয় বৎসর পূর্বে যে সকল অভিভাবক দুই বা আড়াই টাকা মাসিক মাহিনা দিতেছিলেন, তাঁহারা এখন পাঁচ ছয় টাকা বা ততোধিক মাহিনা দিতে বাধ্য হইতেছেন। প্রতি স্কুলে কম বেশী আরও নানাভাবে টাকা লইবার ব্যবস্থা আছে। একটি ছাত্র এবার মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পরীক্ষার জন্য 'টেষ্ট' পরীক্ষা পাশ করিয়া মূল পরীক্ষার জন্য টাকা জমা দিতে যাইতেছে। শুনিলাম তাহার 'এথ্‌লেটিক ফি' দুই টাকা ও সরস্বতী পূজার জন্য আরও দুই টাকা দিতেই হইবে। কলিকাতার স্কুলে পাখা, খেলা, 'ম্যাগাজিন,' পরীক্ষা প্রভৃতি প্রত্যেকটির জন্য স্বতন্ত্র 'ফি' হইয়াছে। কোনটিই বার্ষিক দুই বা তিন টাকার কম নয়। কোনও কোনও স্কুলে 'মেডিক্যাল একজামিনেশন' বা স্বাস্থ্য পরীক্ষার ফি দিতে হয়, অথচ স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয় না। 'এথ্‌লেটিক ফি' ও 'ম্যাগাজিন ফি' মাত্র কয়েকটি ভাগ্যবান ছাত্রের জন্য আদায় করা হয়। অধিকাংশ ছাত্রই এই দুই ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করে না। যাহা হউক, ইহা লইয়া বিতণ্ডা না করিয়া বলা যায়, ছাত্রপ্রতি মাসিক এক টাকা করিয়া লইলে খুব বেশী লওয়া হইল না। আর যদি হিসাব করিয়া দেখা যায় যে, এক টাকা লইলে উদ্বৃত্ত থাকিয়া যায়, বা অন্যান্য ফি বিশেষত খেলাধূলা খাতে যদি আয় বেশী হয়, তাহা হইলে টিফিনের ফি হ্রাস করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

একটি চারিশত ছাত্রের স্কুলের মোটামুটি হিসাব লওয়া যাইতে পারে। ইহা যে খুব স্থূল হিসাব, তাহা কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। কার্যক্ষেত্রে ইহার কিছু ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

প্রতি ছাত্র এক টাকা হিসাবে ৪০০ ছাত্রের মাসিক ৪০০ বা বৎসরে ৪,৮০০ টাকা।

গভর্নমেণ্টের নিকট সাহায্য অনুরূপ হারে অর্থাৎ বার্ষিক ৪,৮০০ টাকা।

মোট ৯,৬০০ টাকা, কিছু কম, কিছু বেশী পাওয়া যাইবে।

যে কোনও স্কুলের হাজিরা বই দেখিলে প্রতীয়মান হইবে যে, শনি ও রবিবার এবং অন্যান্য পর্বাদি বাদ দিলে পূর্ণ ঘণ্টা স্কুল বৎসরে ১০০ দিনের বেশী হয় না। শনিবার সকাল সকাল ছুটি হইয়া যায়, সুতরাং ঐদিন বাদ দেওয়া হইয়াছে। আর সংগতিতে যদি কুলাইয়া যায়, তাহা হইলে ব্যবস্থা থাকিলে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না।

১০০ দিনে ৯,৬০০ টাকা খরচ করিতে পাইলে দিনে ৯৬ টাকা পাওয়া যায়। তাহার পূর্বে কারিগর প্রভৃতির মজুরী, দিনে ৪ জন, মাসিক ২০ টাকা হিসাবে মাসে ৮০ অর্থাৎ বৎসরে ৯৬০ বা ১,০০০ টাকা বাদ দিয়া দাঁড়ায় ৮,৬০০ টাকা। অর্থাৎ টিফিনের দিন কয়টিতে প্রতিদিন ৮৬ টাকা পাওয়া যাইবে। তন্মধ্যে অন্তত শতকরা দশজন ছাত্রের জন্য স্বাস্থ্য, রুচি প্রভৃতির খাতিরে বিশেষ টিফিন ব্যবস্থা করিতে হইবে। সেই চল্লিশজন ছাত্রের জন্য ৮ হইতে ১০ টাকা বাদ রাখিলে মোটামুটি দিনে ৭৫ টাকা পাওয়া যাইবে।

বিশেষ জলযোগের জন্য চল্লিশজন ছেলে বাদ গেলে ৩৬০ জন ছাত্র এবং শিক্ষক, কর্মী, পরিচারক প্রভৃতি মিলিয়া খাবার সংখ্যা ৪০০ করা যাইতে পারে। মাল সামান্য উদ্বৃত্ত হইলে গ্রামের দুঃস্থের ছেলেদের সামান্য পরিমাণ দিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে সর্বাঙ্গসুন্দর হয়। তাহা ছাড়া বিদ্যালয়ে দরিদ্র ছাত্রদের নিকট চাঁদা পাওয়া যাইবে না বা লওয়া বিধেয় নয়।

বিদ্যালয়ের টিফিনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী লাল আটার রুটি ও ছোলার ডাল, তাহাতে আলুর ও নারিকেল কুচি দিলেই চমৎকার টিফিন হইবে। এইখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, নিত্য টিফিনের ব্যবস্থা করিতে হইলে বিদ্যালয়ের নিজস্ব তৈজসপত্র, যেমন—বড় চাটু বা তাওয়া, কাঠের বারকোষ ও গামলা, পিতলের বড় পরাত বা থালা, বালতি, কড়া, হাতা, খুন্তি, চাকী, বেলন, ছেলেদের হাত ধুইবার ট্যাংক ও খাদ্য বণ্টনের এ্যালুমিনিয়ম পাত্র, বালতি প্রভৃতি প্রয়োজন। পূর্বে ৩০০ হইতে ৪০০ টাকা হইলে ব্যয় সংকুলান হইত বর্তমানে ইহাতে অন্তত ১,০০০ হইতে ১,২০০ টাকা পড়িয়া যাইবে। ইহার জন্য অন্তত অর্ধেক খরচ গভর্নমেণ্ট হইতে দিবার ব্যবস্থা ছিল, এখনও অবশ্যই করিতে হইবে।

প্রতি পোয়া আটায় দশখানি রুটি হইলে টিফিনের পক্ষে বেশ ভাল মাপ ও ওজন হইয়া থাকে। দশখানি রুটি পাঁচজন ছাত্রের খোরাক, অর্থাৎ ৪০০ লোকের জন্য আধ মণ গম লাগিবে। খুচরা নয় আনা সের দর হিসাবে পড়ে এগারো টাকা চারি আনা।

প্রতি একশত লোকের জন্য আড়াই হইতে তিন সের ছোলার ডাল লাগে; বেশী পক্ষে বারো আনা সের হইলে ২ টাকা হইতে আড়াই টাকা।

ইহা সকল খুচরা দর; মণ হিসাবে বা ছাত্রদের জন্য হইলে গভর্নমেণ্ট হইতে কম দরে পাওয়া যাইবার সম্ভাবনা। সে হিসাব বর্তমানে ছাড়িয়া দেওয়া যাউক।

ইহা ছাড়া নারিকেল ও আলু খুব বেশী পক্ষে দুই টাকা, ঘুটে, কেরোসিন ও এক মণ কয়লা দুই হইতে আড়াই এবং মশলা প্রভৃতি এক টাকা। অপরাপর খুচরা এক টাকা।

সমস্ত হিসাব মোটামুটি, ১১৷৹+২৷৷৹+২৲+২৷৷৹+১৲+১৲=২০৷৹

সকল হিসাবেই টাকা বেশী ধরা হইয়াছে, কার্যক্ষেত্রে এত টাকা প্রতিদিন পড়িবে না, সেকথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

যদি "ঘি" দেওয়ার মত হয়, তাহা হইলে এক সের উদ্ভিজ্জ ঘি বাবদ দিনে দুই হইতে আড়াই টাকা পড়ে। পরিবর্তে আটা মাখিবার সময় গরম জল দিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

যাহা হউক পূর্বে হিসাবে দেখা গিয়াছে, মজুরী ও বিশেষ বা স্পেশ্যাল জলযোগ বাদে হাতে থাকে প্রতিদিন ৭৫ টাকার মত। তাহা হইতে খরচ হইবে সর্বসাকুল্যে ২৫ টাকা। সুতরাং ছাত্রদের নিকট মাসিক আট আনা হিসাবে লইলেও স্বচ্ছন্দে চলিয়া যায়।

হিসাবে যদি কোথাও গলদ বাহির হয়, তাহা দৈনিক এক টাকার অধিক হইবে না। কিন্তু সপ্তাহে তিনদিনের বেশী রুটি ডাল দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়, ছেলেরা আপত্তি করিবে বলিয়া মনে হয় এবং রুটি-ডাল ছাড়া ঘুগনী (বড় মটর কড়াই সাহায্যে), ছোলা, গুড় বা বাতাসা এবং অন্যান্য সামান্য ফল ব্যতীত অপর যে সকল জলখাবারের উল্লেখ করা যাইতেছে, তাহাতে প্রতিদিনই বেশী পড়িবার সম্ভাবনা। সুতরাং উদ্বৃত্ত অর্থ তাহাতে কতকটা খরচ হইয়া যাইবে।

উদ্বৃত্তের পরিমাণ বেশী হইলেই ছাত্রদের নিকট হইতে আদায়ী টাকার হার হ্রাস করিয়া দিতে হইবে। তাহা ছাড়া তৈজসপত্র ক্রয় করিতে যদি টাকা ধার থাকে, তাহা হইলে সেই ধার শোধ করিবার পক্ষে অসুবিধা হইবে না। ইহার পরও যদি কোনও খরচ ধরিতে ভুল হইয়া থাকে, তাহা হইলে একথাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, চারিশত ছাত্রের বিদ্যালয়ে অন্তত পনেরো জন শিক্ষক থাকিবেন এবং প্রত্যেকের নিকট মাসিক এক টাকা লইলে বাৎসরিক ১৮০ টাকা আয়ের দিকে ধরা হয় নাই। ইহা তাঁহাদের দেয়।

শিক্ষক, হিসাবরক্ষক ও পরিচারক যাঁহারা টিফিনে সাহায্য করিবেন, তাঁহারা প্রতিদিনের জন্য এক বা দেড় টাকা লইলেও বৎসরে ৩০০ হইতে ৪৫০ টাকার বেশী পড়িবে না।

কারিগর প্রভৃতির মাসিক ২০ টাকা মজুরী দেখিয়া কম বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বৎসরে ১০০ দিন তাহাদের পরিশ্রম। তন্মধ্যে সপ্তাহে তিনদিন মাত্র বেশী। অন্য দুইদিন হয়ত দুইজনকে ফলমূল প্রভৃতি বাজার হইতে আনিতে হইতে পারে। সে হিসাবে সারা বৎসরের জন্য ২৪০ বা ২৫০ টাকা পাইলে পল্লীর দিকে যথেষ্ট হইল। ঐ লোকই সকালে-বিকালে নিজ কাজ করিতে পারিবে। সকাল দশটা বা সাড়ে নয়টা হইতে রুটি প্রভৃতি তৈয়ারী করিয়া দেড় বা দুইটার মধ্যে কাজের চাপ শেষ হইবে। পরে তৈজসপত্র পরিষ্কার করা; তাহাও অন্য দিনে নাই।

সাধারণত দেখা যাইবে, যে লোক রুটি তৈয়ারীর ভার লইবে, তাহার সহিত "কণ্ট্রাক্ট" বা চুক্তি করিয়া লইলে সে আপনার লোক আনিয়া কাজ উদ্ধার করিয়া দিবে। নিজেদের হাতে ব্যবস্থার ভার থাকিলে গ্রামের বর্ষীয়সী সমর্থ মহিলারা আসিয়া সহায়তা করিবেন এবং তাঁহাদেরও গ্রামের মধ্যে সৎভাবে দু'টাকা উপার্জনের পথ হইবে।

প্রতি গ্রামে বিশেষ বিশেষ খাদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। রুটি-ডাল ছাড়া, ঘুগনী, ছোলাসিদ্ধ, মুড়ী, মুড়কী, বাতাসা, মোয়া, খইচুর, মুড়ি নারিকেল, ঘি, চিনি, আলুর চপ প্রভৃতি, বাদাম ভাজা, সময়ের ফলমূল— আম, কলা, শশা, পিয়ারা, জাম, জামরুল, কমলালেবু প্রভৃতি, মুড়ির চাক্‌তি, চিঁড়ের চাক্‌তি, নারিকেল নাড়ু, রস্করা, নারিকেল ছাপা, পেস্তা-বাদাম ভিজানো, চিঁড়ে দই, কলা, বিস্কুট, পাঁউরুটি, কচুরি, সিংগাড়া, প্রভৃতি দোকানের খাবার প্রভৃতি অর্থানুকূল্য হইলেই স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইবে। যদি সম্ভব হয়, গ্রামের মধ্যে দুধ সংগ্রহ করিয়া এক পোয়া হিসাবে প্রতিদিন ৩০ বা ৪০ জনকে পর্যায়ক্রমে দেওয়া যাইতে পারে। যাহাদের অন্য জলখাবার চলে না, তাঁহাদের জন্য দুধ, দই প্রভৃতি উপযোগী। কবে কোন্ ছেলের জন্য কি বেশী পড়িল, তাহা লইয়া ছাত্রমহলে বিশেষ গোলমাল হইবে না। বিশেষত যদি বণ্টন কার্যে ন্যায়ানুবর্তী হওয়া যায়, তাহা হইলে এ সকল বিষয়ে চিন্তিত হইবার কারণ নাই।

কতগুলি খাবার পাইতে হইলে নিকটস্থ দোকানের সহিত ব্যবস্থা করিলে কাজ অনেক সহজ হইয়া যাইবে। বিশেষত সপ্তাহে একদিন বা দুইদিন প্রায় চারিশত লোকের জলযোগের মত মাল সরবরাহ করিয়া নিয়মিত টাকা পাইলে একটি মরণোন্মুখ দোকান আবার জীবন্ত হইয়া উঠিবে। কলা, শশা প্রভৃতি যাহারা উৎপাদন করে, তাহারা বিদ্যালয়ের দরজায় আসিয়া ডাকিয়া মাল বিক্রয় করিয়া যাইবে; সুতরাং প্রারম্ভে যে সকল বাধা এ শুভ কার্যে নিরুৎসাহ করে, তাহা কার্যক্ষেত্রে অতি সহজ হইয়া দেখা দিবে।

প্রতিশ্রুতির পাতা থেকে

বটকৃষ্ণ দে

কতো প্রতিশ্রুতি দিলে। তারপর ফের তুলে নিলে
তাসের খেলার মতো। হয়তো তাসের ঘরই বেঁধে
আমাকে উতল করো। আমি যতো ছায়ার মিছিলে
শান্তি চাই, ততোবারই ক্লান্ত করো; আমি কেঁদে-কেঁদে
বলিঃ বলো, কবে হবে প্রার্থনার পূর্ণ তিথিডোর?
তুমি হাসো; হাসে আর অনুচ্চার শুভ্রতার ভোর।

অনেক ভোর-বিভোর তিথি পেরিয়ে এসে আজ
যখন দেখি সন্ধ্যা-তারা আকাশে কারুকাজ
করে, তখন দেয়ালে এক প্রতিশ্রুত মুখ
আঁকি। যদি-ই সে মুখে সেই ভোরের নীল সুখ
ঝরে এবং পূর্ণ করে প্রথমা প্রতিশ্রুতি!
দেয়াল তবু দেয়াল-ই, হায়, যতোই করি স্তুতি!

আকাশে তখনো অনেক বিকেল। সূর্যে
সাত রঙে ঝরে সাত মেলোডির সুর যে!
তবু তো তোমার প্রতিশ্রুতির সরণি
বেয়ে, একবারো বাসনার শ্বেত-তরণি
এলো না এ-কূলে; আমি একা, ভুলে ব্যর্থ—
আশার আলোয় ম্লানতরো হই; হয়তো
এ সব-ই তোমার প্রতিশ্রুতির সর্ত!

তাই হোক। তবু তোমারি স্মরণে বসন্ত-বাতায়নে
হৃত-হৃদয়ের, পীত পত্রের মর্মর সমীরণে
অর্ঘ্য সাজাই। যদি-বা তোমার প্রতিশ্রুতির প্রেম
মুকুল রাঙায় ফের-ফাল্গুনে; হৃদয় তাই দিলেম॥

'বেড্ নাম্বার সিক্স্'

দিবাকর সেনরায়

বিষণ্ন রাত্রির ছায়া মিনারের বৃন্তে নামে ধীরে,
সচকিত ঘ্রাণেন্দ্রিয় বিশোধক ওষুধের ঘ্রাণে—
গতস্বাস্থ্য রোগিণীরা শয্যাগতা অবশ শরীরে,
অজানা কি এক শঙ্কা ভরে ওঠে সঙ্গীহীন প্রাণে।

বাঁ দিকের জানলার ফ্রেমে আঁটা নিশীথের ছবি,
মস্‌জিদ্-গম্বুজ শীর্ষে পাণ্ডুর দ্বিতীয়ার চাঁদ,
অকস্মাৎ অকারণ অর্থহীন মনে হয় সবই
চেতনা ফিরায়ে আনে রোগিণীর তীব্র আর্তনাদ।
নিঃশব্দ ঘরের মাঝে লঘু পদশব্দ সেবিকার,
দেয়ালের ঘড়িটির অবিরাম টিক্‌টিক্ চলা—
সম্মিলিত পদশব্দ—ছাত্রদল সহ ডাক্তার,
শেষ হয় চার্ট দেখা—আশ্বাসের কথা কিছু বলা।

নিস্তব্ধ আবার সব, মিনার ছাড়িয়ে গেছে চাঁদ,
মর্ফিয়ার ক্রিয়া শুরু—চোখ বোঁজে দেহে অবসাদ।

সন্ধ্যাবেলার গান

অরুণবরণ চক্রবর্তী

সন্ধ্যার প্রশান্তি এসে ছেয়ে দিয়ে গেলো দুটি মন।
নিথর অতল কালো কোন এক সমুদ্রের সুর—
গভীর গম্ভীর—ভরে দিলো হৃদয়ের অন্তঃপুর।
আরো কাছে সরে এলো দুটি দেহ ক্রমশঃ কখন!

গোধূলির শেষ আলো জানায় শেষের নমস্কার।
বহুদূরে দুটি পাখী—ক্লান্তপক্ষে শ্রান্ত সঞ্চরণে
উড়ে আসে ধীরে ধীরে; বেদনা-কাতর দুটি মনে
আসন্ন বিরহ ব্যথা তোলে বুঝি নীরব ঝংকার!

বেদনার অন্তস্তলে কী মধুর গান আছে জমা—
বেদনা-বিবশ মন পায় শুধু সে গানের স্বাদ,
বেদনা-বিবশ কণ্ঠে সে গান নীরব সুরে বাজে!

সন্ধ্যার প্রশান্ত ছায়া গাঢ় হয়, হয় মনোরমা;
দুটি দেহ, দুটি মন ভুলে গিয়ে সকল বিষাদ
বিমুগ্ধ তন্ময়তায় মগ্ন হয় সে সঙ্গীত মাঝে!

কংগ্রেসের দুর্বলতা ও দুর্নীতি সম্বন্ধে একটি ভাষণে শ্রীযুত জওহরলাল কংগ্রেসসেবীদের বলিয়াছেন যে, তাঁহারা যদি জনকল্যাণে কোন কাজই না করেন, তাহা
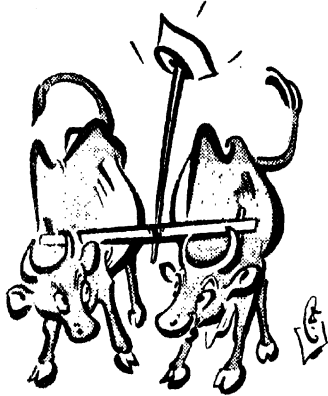
হইলে নির্বাচনের সময় জনগণ তাঁহাদিগকে কী করিয়া চিনিবেন? খুড়ো জবাবে বলিলেন—"কেন, একটি গান্ধী টুপি আর একজোড়া বলদে"!!

* * *

জহরলালজী ছোটদের এক সভায় বলিয়াছেন, তাহারা যেন সুদীর্ঘ বক্তৃতার অভ্যাস না করে। শ্যামলাল আপন মনেই বলিতে লাগিল—"আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়।"

* * *

লোকসভার এক বিতর্কে শ্রীযুত কৃষ্ণমাচারী মন্তব্য করিয়াছেন যে সাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনা যদি তিনি বিকাইয়াই থাকেন, তাহা হইলে তা তিনি দেশের লোকের কাছেই বিকাইয়াছেন। —"বাণিজ্য মন্ত্রীর বেনে-বুদ্ধিতে আমরা প্রীত হয়েছি"—মন্তব্য করে শ্যামলাল।

* * *

শ্রীযুত জগজীবনরাম তাঁর এক সাম্প্রতিক ভাষণে বলিয়াছেন যে, অতঃপর যারা নিজের জাতের বাহিরে অন্য জাতের মেয়েদের বিবাহ করিতে প্রস্তুত থাকিবেন, সরকারী দপ্তরে চাকুরী শুধু তাদের জন্যই বিবেচিত হওয়া উচিত। বিশু খুড়ো

ট্রামে-বাসে

বলিলেন—"পরামর্শটা শুধু মন্ত্রিত্বপদলোভেচ্ছুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে ভালো হয় না কি?"

* * *

গোহত্যা নিবারণ আইন প্রবর্তনের জন্য এক কোটি সত্তর লক্ষ ভারতবাসীর স্বাক্ষরে একটি আবেদনপত্র রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হইয়াছে। —"ভাগের মা শেষ পর্যন্ত গঙ্গা পেলে হয়" —মন্তব্য করে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

পশ্চিমবঙ্গের ভূতপূর্ব পূর্ত ও রাজস্ব মন্ত্রী শ্রীযুত বিমলচন্দ্র সিংহ দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গঙ্গা বাঁধের সম্বন্ধে কোন বিবেচনাই করা হয় নাই। জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"করা হলেও আমরা বাধা দিতাম; পঞ্চবার্ষিকীর জন্যে তো

আর আমরা গাঙ্গেয় ইলিশ ছাড়তে পারিনে"।

* * *

এক সংবাদে প্রকাশ, ভারতের শিল্পপতি ও আমেরিকার পুঁজিবাদীদের সম্বন্ধকে নাকি বৈবাহিক সম্বন্ধ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে এই অবাঞ্ছিত বিবাহে পৌরোহিত্য করিতেছেন ভারত সরকার স্বয়ং। খুড়ো বলিলেন—"পুরোহিতের ততটা দোষ নয়, যত দোষ ঘটকের"।

* * *

এক সংবাদে প্রকাশ যে, দেড় হাজারের উপর ভারতবাসী সম্প্রতি নাবিকের কাজে শিক্ষালাভ করিয়াছে। কিন্তু নাবিকের

কাজে রত অ-ভারতীয় এবং ঐ সঙ্গে চাকুরী বণ্টনের মালিকদের কারসাজিতে তাহাদের চাকুরী পাওয়া সম্ভব হইতেছে না। —"ব্যবস্থা অবিলম্বে একটা কিছু না হলে দেখছি আমাদের ভাটিয়ালি ধরতে হবে—ওরে সুজন নাইয়া, কোন-বা কন্যার দেশে যাওরে চাঁদের ডিঙি বাইয়া"!!

* * *

ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানে পানশালা রাখার প্রতিবাদে শুনিলাম শীঘ্রই একটি জনসভা হইবে। ট্রামের জনতার মধ্য হইতে কে একজন হঠাৎ গাহিয়া উঠিলেন—"হায় সাহারার প্রখর তাপে পরাণ কাঁপে দিল্ কাবার" !!

* * *

শ্রীযুত জওহরলাল বলিয়াছেন যে, র‍্যাডক্লিফ নির্দেশে ইন্দো-পাক বাউণ্ডারি সুনির্দিষ্ট হয় নাই। —"ইডেন গার্ডেনের খেলায় বাউণ্ডারির নির্দেশ খানিকটা "মিলেছে"—মন্তব্য করেন ক্রীড়ারসিক বিশু খুড়ো।

* * *

ভারতে আগত পাকিস্থানী ক্রিকেটারদের প্রায় অনেকেরই 'হবি' নাকি সঙ্গীত।—"সারেগা মন্দ নয়, মারেগা হলেই যে মুশকিল"—এই মন্তব্যও খুড়োই করেন।

রঙ্গজগৎ

ভারতীয় নাট্যশালার এক অতুলনীয় কীর্তি

একাদিক্রমে একত্রিশ বছর ধরে একই নাটকে একই ভূমিকায় অভিনয় করে যাওয়া বোধ হয় সমগ্র পৃথিবীরই নাট্যশালার ইতিহাসে এক অভাবনীয় কীর্তি। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার এ কীর্তি দেখিয়েছেন 'আলমগীর' নাটকখানিতে। ১৯২১ সালে তিনি এ-নাটকখানিতে প্রথম নাম-ভূমিকায় অবতরণ করেন এবং আজও তিনি অন্যান্য নাটকের সঙ্গে এই নাটকখানিতেও অভিনয় করে যাচ্ছেন। গত বছর এই অভিনয়ের ত্রিশ বছর পদার্পণ থেকে তিনি এর একটি বর্ষ-অতিক্রমন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে আসছেন। গত ১১ই ডিসেম্বরও তিনি শ্রীরঙ্গমে 'আলমগীর'এর বত্রিশ বছর পদার্পণ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত করেন।

* * * * *

সেই ১৯২১ থেকে শিশিরকুমার এ পর্যন্ত বহু নাটকেই অভিনয় করেছেন, কিন্তু গোড়া থেকে এতদিন পর্যন্ত কোন নাটকই জনপ্রিয়তাকে পূর্ণ মাত্রায় রেখে দিয়ে এগিয়ে আসেনি। শিশিরকুমারের নিজেরও কাছে এটা বিস্ময় বলে মনে হয়। সেদিনের অনুষ্ঠানেতে নাট্যাচার্য তাঁর বিস্ময়ের কথাটা প্রকাশ করে বলেন, 'সীতা' তাঁকে সম্মান এনে দিয়েছে খুবই, কিন্তু বেশি পয়সা পাইয়ে দিয়েছে 'আলমগীর'—"আর্যাবর্তে 'সীতা' জনপ্রিয়া হলো না, জনপ্রিয় হলো 'আলমগীর'।" সেই কবে নাটকখানি প্রথম মঞ্চস্থ হয়েছে, তার পরে দেশের লোকের রুচি ও মানসিক বৃত্তি, ধ্যান-ধারণা পরিবর্তিত হবার কতো বৈপ্লবিক কারণ ঘটে গিয়েছে, কিন্তু 'আলমগীর'এর জনপ্রিয়তা আজও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। তার প্রমাণও পাওয়া গেলো ঐ ১২ই ডিসেম্বরের অনুষ্ঠানে। অভিনয় আরম্ভ হওয়ার পূর্বে 'আলমগীর'এর ইতিবৃত্ত সম্পর্কে বলতে গিয়ে শিশির-কুমার নিজেই জানালেন সেকথা; বললেন, আজকাল অন্য নাটকের অভিনয়ে যতো না লোক হয়, 'আলমগীর' অভিনয় হলে তার চেয়ে বেশি দর্শক সমাগম হয়। এ-রহস্য তিনিও বুঝতে পারেন না।

* * * * *

'আলমগীর' নাটকখানির কিন্তু গোড়াতে ঐ নামই ছিলো না। পণ্ডিত ক্ষীরোদ-প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ 'ভীমসিংহ' নামে একখানি নাটক লিখেছিলেন, যা অপরেশ-চন্দ্র মুখোপাধ্যায় আর্ট থিয়েটারের জন্য নিয়ে রেখেছিলেন। শিশিরকুমার তখন ম্যাডান কোম্পানীর সঙ্গে কাজ করতেন। ম্যাডান তখন উর্দু নাটক মঞ্চস্থ করতো। তারা চাইলে ঐসব উর্দু নাটকেরই সাজ-পোষাক, দৃশ্যপটাদি যথাযথই রেখে দিয়ে কেবলমাত্র সংলাপের ভাষাটা বদলে বাঙলাতে সেই সব নাটকই মঞ্চস্থ করতে। তাতে খরচ বাঁচবে। ম্যাডান তখন চলচ্চিত্রও নির্মাণ করে। সেদিকেও খরচ বাঁচাবার জন্যে ওরা ওদের নাটকে অভিনয় করার জন্যে যেসব শিল্পী নিযুক্ত করতো, তাদের সঙ্গে ঐ একই চুক্তিতে ছবিতেও অভিনয় করার সর্ত রেখে দিতো। শিশিরকুমার পড়লেন মুশকিলে। 'স্টান্ট' মার্কা উর্দু নাটকগুলি তিনি অনুমোদন করেন কি করে? প্রথম যে ক'খানি নাটক তাঁকে দেওয়া হলো—'অপরাধী কে?', 'বিষ্ণুমায়া' প্রভৃতি নিয়ে তিনি সুবিধে করতে পারলেন না। 'বিষ্ণুমায়া' আবার তখনকার দিনে অতি জনপ্রিয় 'কৃষ্ণজনম্' নামক নির্বাক ছবি থেকে অবলম্বন করা হয়।

* * * * *

অনূদিত নাটকে অভিনয়ে শিশিরকুমারের অনুমোদন বার বার প্রত্যাখ্যাত হবার পর ম্যাডান কোম্পানী শিশিরকুমারকেই কোন নাট্যকার যোগাড় করতে বলেন। শিশিরকুমার নিয়ে এলেন যোগেশচন্দ্র চৌধুরীকে। যোগেশচন্দ্রের তখন কোন নামই ছিলো না। এই অজুহাতে ম্যাডান কোম্পানী তাঁর নাটক নিতে রাজী হলো না। শিশিরকুমার তখন হাজির করলে পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদকে, সঙ্গে এলো ঐ 'ভীমসিংহ' নাটক।

* * * * *

গান্ধীজী তখন মহাত্মা হয়েছেন। খিলাফৎ আন্দোলনের জোরে হিন্দু ও মুসলমানের সম্প্রীতির ঢেউ বইছে তখন। সে প্রবাহ শিশিরকুমারেরও চিন্তাকে প্রভাবিত করলো। 'ভীমসিংহ' নাটকে আওরঙ্গজেবের কথা তাঁর মনে পড়লো—মুসলমানদের কাছে আওরঙ্গজেব পয়গম্বর বিশেষ; কিন্তু হিন্দুদের কাছে তার দুর্নাম। শিশিরকুমার ভাবলেন, ঐ নাটকের আওরঙ্গজেবকে যদি হিন্দুদেরও ভালো লাগাতে পারেন, তাহলে একটা কাজের মতো কাজ হবে। ক্ষীরোদপ্রসাদকে দিয়ে তিনি নাটকখানি সেইভাবে লিখিয়ে নিলেন। 'ভীমসিংহ' হলো 'আলমগীর'।

* * * * *

ম্যাডান ছেড়ে নিজের থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করে শিশিরকুমার প্রথম মঞ্চস্থ করেন 'বসন্তলীলা' নামক একখানি নাটক। সেটা আর্থিক সাফল্য কিছু আনতে না পারায় শিশিরকুমার তখন সম্পূর্ণ নিজের মতো করে 'আলমগীর' পুনর্মঞ্চস্থ করেন এবং

'মিঃ সম্পত'—জেমিনীর পঞ্চম চিত্রের নাম ভূমিকায় মতিলাল

১৯৫২ সালের ১৯শে ডিসেম্বর হইতে
প্রদর্শিত হইতেছে ঃ
প্যারাডাইস ঃ বসুশ্রী
বীণা
(প্রত্যহ ঃ ৩ শো)
এবং আরও অন্যান্য স্থানের চিত্রগৃহে
মিঃ সম্পত
জেমিনীর
৫ম হিন্দী চিত্র

অভাবনীয় জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তারপর শিশিরকুমার কত নাটকই না উপহার দিয়েছেন, কিন্তু 'আলমগীর' তাঁর সেই গোড়ার আমলের জনপ্রিয়তার ধ্বজাকে বত্রিশ বছর হলো আজও অনমনীয় রেখে দিয়েছে। পৃথিবীরই নাট্যশালার এ-এক বিস্ময়কর ঘটনা। নাট্যাচার্যও নিজে প্রশ্ন তুলেছেন, কেন এই জনপ্রিয়তা?

হাসানোর নামে—

হাসানো শক্ত, আবার হাসানো সহজও। শক্ত হয় যখন বুদ্ধি খাটিয়ে এবং উপভোগকারীর মগজের গোড়ায় কাতুকুতু দেওয়া সম্ভবপর হয়; আর সহজ হয় নির্বুদ্ধিতার চরম দেখিয়ে। অন্য লোকের বোকামি মানুষকে হাসায়, কারণ মানুষ তখন নিজেকে ঐ বোকাদের চেয়ে চালাক মনে করে বলে তার আত্মতৃপ্তির শ্লাঘাতে কাতুকুতু লাগে। এই দুই প্রক্রিয়াতেই লোকে হাসে, কিন্তু গোড়ার ধরণটাতে প্রভূত জ্ঞানবুদ্ধির দরকার হয়, আর অপরটির ক্ষেত্রে জ্ঞানবুদ্ধির পরিচয় থাকাটাই হয় নির্গুণতা। এই শেষের ধরণেরই দৃষ্টান্ত ইউনাইটেড পিকচার্সের 'মাণিকজোড়', যা ৩০শে নভেম্বর থেকে মিনার, বিজলী ও ছবিঘরে দেখানো হচ্ছে।

* * * * *

খুবই সেকেলে ব্যাপার পুরো মাত্রায়—গল্পও যেমন, বিন্যাস ও কলাকৌশলাদিও তেমন। নেহাৎই প্রধান ভূমিকায় নবদ্বীপ ও শ্যাম লাহার মতো দুজন কৌতুকাভিনেতা রয়েছে, তাই লোকে হেসে ফেলে, তা নয়তো কোন বিষয়েই নামমাত্র গুণের নিদর্শন নেই।

* * * * *

এক জোড়া ক্যাবলাকে নিয়ে গল্প—গবা আর নবা—পরস্পরের ভায়রাভাই ওরা। ওরা বাসিন্দা হলো আমড়াগাছির, কিন্তু বিয়ে করেছে কলকাতায়। শ্বশুরবাড়ি আসতে ভুল করে আর এক বাড়িতে হাজির। নবা আগেও এসেছে, তবে শ্বশুর মহাশয় বাসা বদল করায় এবং নতুন বাসার ঠিকানা তার জানা না থাকায় তাদের এই বিপত্তি। তাড়া খেয়ে ওরা এসে উঠলো এক হোটেলে। সেখানে এক বন্ধু জুটলো এবং সেই বন্ধুর বান্ধবীর জন্মদিনে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে কেলেঙ্কারি করে বসলো। মধ্যে বারকয়েক ভুলের খপ্পরে পড়ে নানাভাবে ওরা নাজেহাল হলো।। শ্বশুরবাড়ি খুঁজে বেড়াতে বেড়াতে ওরা গিয়ে পড়লো একটা বাগানে, যেখানে সে সময়ে ছবির শুটিং হচ্ছিলো পুকুরে একটি তরুণীর স্নান এবং ফিরতি পথে দুর্বৃত্তের কবলে পড়ার দৃশ্য নিয়ে। ছবিরই অংশ হিসেবে তরুণী সাহায্যের জন্যে চীৎকার করতেই অজ্ঞ গবা আর নবা গিয়ে পড়লো তাকে উদ্ধার করতে। শুটিং গেলো ভেস্তে; মার মার করে উঠলো সকলে। গবা ও নবার প্রাণপণে ছুট এবং রাস্তায় একটা সিন্দুক প[ড়ে] থাকতে দেখে তার ভিতরে আশ্রয় গ্র[হণ] করলে। বাড়ির ভিতরে সিন্দুক খোলা হ[তে] ওরা ধরা পড়ে চোর বলে থানায় নীত হলো। থানার অফিসার নবাকে দেখে চিনতে পারলেন; বিস্তারিত ঘটনা শুনে তি[নি] ওদের ছেড়ে দিলেন এবং শ্বশুরবাড়িতে পাঠিয়েও দিলেন। শ্বশুরবাড়িতে গব[া] নব-পরিণীতা বধূর বেশি করে সান্নিধ্য পাবার আশায় নবার পরামর্শে অসুখের ভাণ করলে। তাতে বিপরীত ফল হলো। গবার খাওয়া বন্ধ হলো, আর শুশ্রূষা করতে এলেন তার শ্বশুর মহাশয়। রাতে খিদের তাড়নায় গবা চুপি চুপি বের হলো অন্ধকারে। ওদিকে নবার সঙ্গে তার স্ত্রী ভুল বুঝে ঘর ছেড়ে বাইরে শুয়েছে, নবাও অন্ধকারে বেরিয়েছে স্ত্রীর খোঁজে। নবা ধরা পড়লো ঝিয়ের হাতে, গবা পড়লো শ্বশুরের হাতে—দারুণ হুল্লোড়ে কাণ্ড বেঁধে গেলো। এইখানেই গল্পের শেষ।

* * * * *

গবা ও নবার ক্যাবলামিতে হাসির উদ্রেক অবশ্যই হয়, সেটা ঐ দুজনের ভূমিকায় যথাক্রমে শ্যাম লাহা ও নবদ্বীপ হালদারের জন্যেই, কিন্তু ওদের বাইরের যা কিছু সবই অত্যন্ত কাঁচা এবং নির্বোধ মনের পরিচায়ক। উপরন্তু আদি বৃত্তিতে কাতুকুতু লাগাবার চেষ্টা করে দেওয়া হয়েছে স্নানরতা তরুণীর স্বচ্ছ আবরণ দেহ দেখিয়ে। এ পর্যন্ত ছবিখানি আর যাই হোক, অপরিচ্ছন্ন ছিলো না, কিন্তু এই একটি দৃশ্যেই কুৎসিত রুচির এমন পরিচয় দিয়ে যাওয়া হলো যে, সেই থেকে ছবিখানির ওপর ঘেন্না ধরে যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে সেন্সর বোর্ডের বিচারবুদ্ধির ওপরে রাগ ধরে যায়। অথচ গবা-নবার সঙ্গে এমন একটা দৃশ্যের দরকারই ছিলো না মোটে।

* * * * *

যাই হোক, গবা-নবার জুড়িটা মিলেছে ভালো—শ্যাম লাহা ও নবদ্বীপের জনপ্রিয়তা যে আছে, 'মাণিকজোড়ে' দর্শক সমাগম তার প্রমাণ। দেখার পর লোকে খুশির কথা বলতে না পারুক, ওদের দুজনের জন্যে যে দেখতে ভীড় করছে, সেকথা অনস্বীকার্য। ভালো লোককে দিয়ে ভালো করে লিখিয়ে ভালো করে ছবি তুললে এমন একটি মাণিকজোড়কে নিয়ে খুসমেজাজী হাসির ছবি অনেকই তোলা যেতে পারবে।

খেলার মাঠে

ক্রিকেট

ভারত ও পাকিস্থান ক্রিকেট দলের পঞ্চম বা শেষ টেস্টম্যাচ ইডেন উদ্যানে অমীমাংসিতভাবে শেষ হইয়াছে। পাঁচটি টেস্ট খেলার মধ্যে ভারত ২টিতে ও পাকিস্থান একটি খেলায় জয়ী ও ২টি খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হওয়ায় ভারত টেস্ট পর্যায়ের গৌরব বা 'রবার' লাভে সক্ষম হইয়াছে। সরকারী টেস্ট খেলার ইতিহাসে ভারতের ইহাই সর্বপ্রথম রবার লাভ। ইতিপূর্বে ভারত, কি ভারতে কি বহির্ভারতে সর্বত্রই টেস্ট পর্যায়ের খেলায় যোগদান করিয়া পরাজয়ের কালিমাই বহন করিয়াছে। এইবারে দীর্ঘ বিশ বৎসরের টেস্ট পর্যায়ের খেলায় 'রবার' বিজয়ীর সম্মানে ভূষিত হইল ইহা খুবই গৌরবের ও আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই। তবে শিশু রাষ্ট্রের এক শিশু প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে খেলিয়াই এই গৌরবলাভ হইল ইহা বিস্মৃত হইলেও চলিবে না। সুতরাং ভারত যতদিন না অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, ইংলণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি ক্রিকেট খেলায় বিশ্ব খ্যাতিসম্পন্ন দেশসমূহের বিরুদ্ধে খেলিয়া গৌরব লাভ করিতেছে, ততদিন ভারতীয় ক্রিকেটের আন্তর্জাতিক খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে না ইহা আমাদের সকল সময়েই স্মরণ রাখিতে হইবে। তবে আমাদের আশা হয়, এইরূপ গৌরব অর্জনের জন্য ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়-আপ্রাণ চেষ্টা করিবেন।

গৌরবের দ্বিতীয় সোপান রচিত হইল

ভারত ক্রিকেট টেস্ট পর্যায়ের খেলায় পাকিস্থান দলকে পরাজিত করিয়া গৌরবের দ্বিতীয় সোপান রচনা করিল। ১৯৫২ সালে মাদ্রাজের চীপক মাঠে নাইজেল হাউহাওয়ার্ড পরিচালিত ইংলণ্ড দলকে সর্বপ্রথম টেস্টের খেলায় পরাজিত করিয়া প্রথম সোপান রচনা করে। ঐ জয়লাভের পূর্বে ভারত কখনও কোন টেস্ট খেলায় জয়ী হইতে পারে নাই। টেস্ট খেলায় যে ভারত জয়ী হইতে পারে, উহা ঐ টেস্টের ফলাফল প্রমাণিত হয়। পাকিস্থান দলকে টেস্ট পর্যায়ের খেলায় পরাজিত করিয়া রবার লাভ করায় পুনরায় ভারত টেস্ট পর্যায়ের খেলাতেও বিজয়ীর সম্মান লাভ করিতে পারে ইহারই নিদর্শন পাওয়া গেল। সুতরাং ইহার পর ভারত কোন টেস্ট খেলায় জয়ী অথবা টেস্ট পর্যায় জয়ী হইলে বিস্ময়ের কিছুই হইবে না। নিম্নে ভারতের বিভিন্ন সরকারী টেস্ট পর্যায়ের খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইল—

প্রতিপক্ষ দল	সংখ্যা	জঃ	ড্র	পরাঃ
ইংলণ্ড (১৯৩২ সাল ও ১৯৫২ সাল)	১৯	১	৮	১০
অস্ট্রেলিয়া (১৯৪৭-৪৮ সাল)	৫	০	১	৪
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ (১৯৪৮-৪৯)	৫	০	৪	১
পাকিস্থান (১৯৫২)	৫	২	২	১
মোট	৩৪	৩	১৫	১৬

ভারত ও পাকিস্থানের টেস্ট খেলা

ভারত ও পাকিস্থানের টেস্ট খেলায় পাকিস্থান যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছে, ইহা অস্বীকার করা চলে না। প্রথম টেস্ট খেলায় ভারত দিল্লীতে পাকিস্থান দলকে শোচনীয়ভাবে ইনিংসে পরাজিত করিতে সক্ষম হয়। ঠিক ইহার পরেই লক্ষ্ণৌতে দ্বিতীয় টেস্টম্যাচে পাকিস্থান পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করে। এই খেলায় পাকিস্থান ইনিংসে ভারতকে পরাজিত করে। তৃতীয় টেস্টে বোম্বাইতে পুনরায় ভারত পাকিস্থানকে ১০ উইকেটে পরাজিত করে। চতুর্থ টেস্ট ম্যাচ মাদ্রাজে বৃষ্টির জন্য পরিত্যক্ত হয় নতুবা এই খেলার সূচনা যেরূপ হইয়াছিল, তাহাতে পাকিস্থান জয়ী হইলেও হইতে পারিত। পঞ্চম ও শেষ টেস্টম্যাচে পাকিস্থান জয়ী হইবার আপ্রাণ চেষ্টা করিবে ইহাই সকলে ধারণা করেন, কিন্তু তাহা সম্ভব হয় নাই। খেলা অমীমাংসিতভাবেই শেষ হইয়াছে। তবে পাকিস্থানের দল সমপ্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

ভারত ও পাকিস্থানের বিভিন্ন টেস্ট খেলার ফলাফল

(১) **প্রথম টেস্ট ম্যাচ** (দিল্লী)—ভারত এক ইনিংস ও ৭০ রানে জয়ী।

ভারত ১ম ইনিংস ৩৭২ রান।
পাকিস্থান ১ম ইনিংস ১৫০ রান।
২য় ইনিংস ১৫২ রান।

(২) **দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ** (লক্ষ্ণৌ)—পাকিস্থান এক ইনিংস ও ৪৩ রানে জয়ী।

ভারত ১ম ইনিংস ১০৬ রান।
পাকিস্থান ১ম ইনিংস ৩৩১ রান।
ভারত ২য় ইনিংস ১৮২ রান।

(৩) **তৃতীয় টেস্টম্যাচ** (বোম্বাই)—ভারত ১০ উইকেটে বিজয়ী।

পাকিস্থান ১ম ইনিংস ১৮৬ রান।
ভারত ১ম ইনিংস ৪ উইঃ ৩৮৭ রান।
পাকিস্থান ২য় ইনিংস ২৪২ রান।
ভারত ২য় ইনিংস কোন উইকেটে না পড়িয়া ৪৫ রান।

(৪) **চতুর্থ টেস্টম্যাচ** (মাদ্রাজ)—বৃষ্টির জন্য খেলা পরিত্যক্ত।

পাকিস্থান ১ম ইনিংস ৩৪৪ রান।
ভারত ১ম ইনিংস ৬ উইঃ ১৭৫ রান।

(৫) **পঞ্চম টেস্টম্যাচ** (কলিকাতা)—খেলা অমীমাংসিত।

পাকিস্থান ১ম ইনিংস ২৫৭ রান।
ভারত ১ম ইনিংস ৩৯৭ রান।
পাকিস্থান ২য় ইনিংস ৭ উইঃ ২৩৬. রান।
ভারত ২য় ইনিংস কেহ আউট না হইয়া ২৮ রান।

দীপক সোধনের কৃতিত্ব

গুজরাট দলের তরুণ অধিনায়ক ন্যাটা খেলোয়াড় দীপক সোধন এই খেলায় প্রথম যোগদান করিয়াই শতাধিক রান করিয়া বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ইতিপূর্বে ভারতে সরকারী টেস্ট খেলায় প্রথম যোগদান করিয়া অমরনাথ ১৯৩২ সালে জার্ডিন পরিচালিত দলের বিরুদ্ধে শতাধিক রান করেন। ভারতীয় খেলোয়াড় হিসাবে ভারতের মাঠে দীপক সোধন দ্বিতীয়বার এইরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিলেন। তবে ভারতীয় খেলোয়াড় হিসাবে ১৯৩২-৩৩ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে পতৌদির নবাব, ১৮৯৬ সালে ইংলণ্ডে ম্যাঞ্চেস্টারে অস্ট্রেলিয়ার

জাতীয় চ্যাম্পিয়ান বাঙলার মহিলা বাস্কেটবল দল
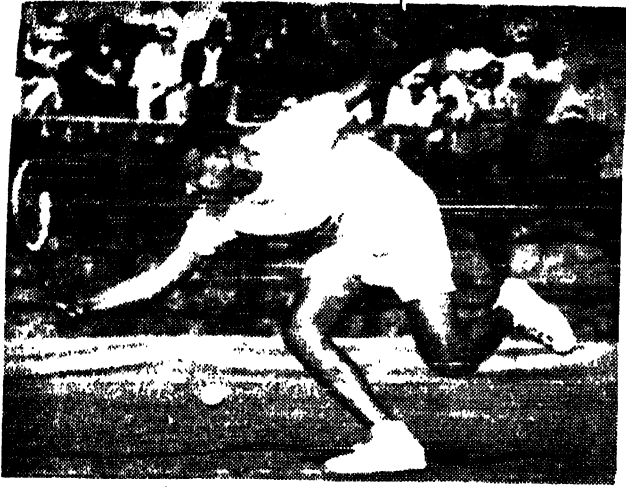
ডেভিস কাপে সুমন্ত মিশ্রের খেলার দৃশ্য

বিরুদ্ধে কে এস রণজিৎ সিংহজী, ১৯৩০ সালে ইংলণ্ডের লর্ডস মাঠে অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে কে এস দলীপ সিংহজী টেস্ট খেলায় প্রথম যোগদান করিয়া শতাধিক রান করেন।

ইডেন উদ্যানে কোন টেস্টম্যাচই মীমাংসিত হয় নাই

ভারত ও পাকিস্থান ক্রিকেট দলের পঞ্চম টেস্টম্যাচ যে কেবল ইডেন উদ্যানে অমীমাংসিত-ভাবে শেষ হইল তাহা নহে, ১৯৩২ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া এই পর্যন্ত যতগুলি সরকারী টেস্টম্যাচ ইডেন উদ্যানে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিইর মীমাংসা হয় নাই। নিম্নের বিভিন্ন টেস্ট খেলার ফলাফল হইতেই আমাদের উপরোক্ত উক্তি সমর্থিত হইবে—

১৯৩৩-৩৪ সালে ডগলাস জার্ডিন পরিচালিত ইংলণ্ড দলের সহিত ভারতীয় দলের খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়।

১৯৪৮-৪৯ সালের জন গডার্ড পরিচালিত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের সহিতও ভারত অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করে।

১৯৫১-৫২ সালের নাইজেল হাউওয়ার্ড পরিচালিত ইংলণ্ড দলের বিরুদ্ধে খেলিয়াও ভারত অমীমাংসিতভাবে শেষ করে।

সুতরাং এইবারের ভারত ও পাকিস্থানের পঞ্চম টেস্টম্যাচ ইডেন উদ্যানে অমীমাংসিতভাবে শেষ হওয়ায় পূর্বের ঐতিহ্যই অক্ষুন্ন রাখিয়াছে বলিলে কোনরূপ অন্যায় হইবে না।

পঞ্চম টেস্টম্যাচ

ভারত ও পাকিস্থান দলের পঞ্চম টেস্টম্যাচে ভারত টসে জয়ী হইয়াও পাকিস্থান দলকে প্রথম ব্যাটিং করিবার সুযোগদান করেন। ভারতীয় দলের অধিনায়ক লালা অমরনাথ এই-রূপ সিদ্ধান্ত কেন করিলেন কাহাকেও তিনি না বলিলেও স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, তিনি খেলা অমীমাংসিতভাবেই শেষ করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই মনোভাব খেলার শেষ পর্যন্ত বেশ স্পষ্টভাবেই সকলে অনুভব করেন তাঁহার দল পরিচালনার কার্যকলাপ দেখিয়া। যখন জয়লাভের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, তখনই তিনি উহা আয়ত্তের মধ্যে আনিবার চেষ্টা না করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। এমনকি শেষ দিনে যাহারা বোলার নহেন, তাহাদের বল করিতে দিয়া খেলার সকল গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্যের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। যাহার প্রত্যুত্তর দিবার জন্যই আমরা বলিব পাকিস্থান দলের অধিনায়কও খেলা শেষ হইবার ২৫ মিনিট পূর্বে ইনিংসের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করিয়া ভারতীয় খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে ব্যাটসম্যানদের বল করিতে দিয়াছেন। টেস্ট খেলার মধ্যে এই-রূপ নিদর্শন পূর্বে কখনও পরিলক্ষিত হয় নাই। ইহা খুবই পরিতাপের বিষয়। ভবিষ্যতে যাহাতে এই ধরণের ঘটনা না ঘটে, তাহার দিকে ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের কর্তৃপক্ষগণ দৃষ্টি রাখিলে আমরা অন্ততঃপক্ষে সুখী হইব।

খেলার বিবরণ

পাকিস্থান দল প্রথম ব্যাটিং লাভ করিয়া প্রথম দিনের শেষে ৫ উইকেটে ২৩০ রান করেন। ইমতিয়াজ, নজর ও হানিফের ব্যাটিং উল্লেখযোগ্য হয়। কিন্তু দ্বিতীয় দিনে মাত্র ৫০ মিনিট খেলা চলিবার পর পাকিস্থান দলের অবশিষ্ট ৫টি উইকেট মাত্র ২৭ রানে পড়িয়া যায়। ভারত প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে ও দিনের শেষে ৫ উইকেটে ১৭৩ রান করে।

তৃতীয় দিনে ভারতীয় দলের ব্যাটিংয়ে নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। চা-পানের কিছু পরে ভারত ৩৯৭ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করে। গুজরাটের তরুণ অধিনায়ক খেলোয়াড় দীপক সোধন শতাধিক রান করেন। পাকিস্থান ১৪০ রান পশ্চাতে পড়িয়া দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে ও দিনের শেষে ১ উইকেটে ৩৮ রান করে। চতুর্থ দিনে মধ্যাহ্ন ভোজ পর্যন্ত ২ উইকেটে ৯৭ রান করে, কিন্তু ইহার পরেই উইকেট পতন আরম্ভ হয়। ১৫২ রানে ৬টি ও ২১৬ রানে ৭ উইকেট পড়িয়া যায়। দর্শকগণ ভারতের জয়লাভের কল্পনা করিতে থাকেন। কিন্তু উহা আর সম্ভব হয় না। নির্দিষ্ট সময়ের ২৫ মিনিট পূর্বে পাকিস্থান ৭ উইকেটে ২৩৬ রানে দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। ভারত দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করিলে পাকিস্থানের ব্যাটসম্যান-গণ নজর মহম্মদ, হানিফ মহম্মদ, ওয়কার হাসান, আনোয়ার হোসেন প্রভৃতি বল করেন ও ভারতের কেহ আউট না হইয়া ২৮ রান হয়। খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়।

খেলার ফলাফল—

পাকিস্থান ১ম ইনিংস—২৫৭ রান (নজর মহম্মদ ৫৫, হানিফ মহম্মদ ৫৬, ইমতিয়াজ আমেদ ৫৭, ওয়াকার হাসান ২৯, ডি জি ফাদকার ৭২ রানে ৫টি, জি এস রামচাঁদ ২০ রানে ৩টি, অমরনাথ ৩১ রানে ১টি, গোলাম আমেদ ৪৯ রানে ১টি উইকেট পান।)

ভারত ১ম ইনিংস—৩৯৭ রান (দীপক সোধন ১১০, পি রায় ২৯, ডি গাইকোয়াড় ২১, বিনু মানকড় ৩৫, মাঞ্জরেকার ২৯, পি আর উমরিগার ২২, ডি জি ফাদকার ৫৭, জি রামচাঁদ ২৫, গোলাম আমেদ নট আউট ২০, মামুদ হোসেন ১১৪ রানে ৩টি, ফজল মামুদ ১৪১ রানে ৪টি, আমীর ইলাহি ২৯ রানে ১টি ও আপ্‌লে কারদার ৪৩ রানে ১টি উইকেট পান।)

পাকিস্থান ২য় ইনিংস—৭ উইঃ ২৩৬ রান (নজর মহম্মদ ৪৭, ওয়াকার হাসান ৯৭, ফজল মামুদ নট আউট ২৮, গোলাম আমেদ ৫৬ রানে ৩টি, জি এস রামচাঁদ ৪৩ রানে ২টি, বিনু মানকড় ৬৮ রানে ২টি উইকেট পান।)

ভারত ২য় ইনিংস—২৮ রান (কেহ আউট না হইয়া) (ডি কে গাইকোয়াড় নট আউট ২০, পি রায় নট আউট ৮ রান)।

টেনিস

ভারত দীর্ঘকাল হইতেই আন্তর্জাতিক ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতেছে। তবে এইবারের যোগদানে একটুখানি বিশেষত্ব আছে এই জন্য যে, চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী ভারতকে উক্ত প্রতিযোগিতার ইউরোপীয় অঞ্চলের খেলায় যোগদান করিতে হয় নাই। পূর্বাঞ্চল বলিয়া যে বিশেষ বিভাগ এইবারে প্রথম করা হইয়াছে, তাহাতেই যোগ-দান করে। এই বিভাগে অপর কোন দেশ যোগদান না করায় ভারত সরসারি প্রতিযোগিতার আঞ্চলিক ফাইন্যালে খেলিবার যোগ্যতা অর্জন করে। এই খেলায় ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে খাড়া হন ইউরোপীয় অঞ্চলের চ্যাম্পিয়ান ইটালী দল। সারা ইউরোপের দলকে পরাজিত করিয়া যে শক্তিশালী ইটালী দল আঞ্চলিক ফাইন্যালে উঠিয়াছে, তাহার সহিত ভারত কি প্রতিযোগিতা করিবে, এই ছিল সকলের ধারণা অর্থাৎ ভারতের শোচনীয় পরাজয়ই সকলে কল্পনা করিয়া রাখেন। একমাত্র অস্ট্রেলিয়ার টেনিস বিশেষজ্ঞগণ যাঁহারা প্রতিযোগিতার পূর্বে ভারত ও ইটালী দলের খেলোয়াড়দের অনু-শীলনী খেলা দেখিয়াছেন, তাঁহারা অভিমত প্রকাশ করেন যে, ভারতের খেলায় জয়ী হইবার সম্ভাবনা আছে। ভারতের প্রতিনিধি সংগঠিত

বলিষ্ঠ সুমন্ত মিশ্রের তীব্র বেগসম্পন্ন সার্ভিস নাকি ইতিপূর্বে তাঁহারা খুবই কম দেখিয়াছেন। এইরূপ সার্ভিস বিশিষ্ট খেলোয়াড় যে দলে আছেন, তাহাদের জয়লাভ করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না। এই উক্তি শুনিয়া অনেকেই আশ্চর্য হন ও অভিমত প্রকাশ করেন, 'ভারতীয় খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করিবার জন্যই বলা হইয়াছে।' এই উক্তি যে একেবারেই যুক্তিহীন নহে, তাহার অকাট্য প্রমাণ সুমন্ত মিশ্র আঞ্চলিক ফাইন্যালের প্রথম দিনে সিংগলস খেলায় প্রমাণিত করিলেন। অপর প্রতিনিধি নরেশকুমার আশানুরূপ খেলিতে না পারায় পরাজিত হইলেন। ফলে প্রথম দিনে খেলার ফলাফল দাঁড়ায় ভারত ১টি ও ইটালী ১টি খেলায় বিজয়ী।

দ্বিতীয় দিনে ডাবলস খেলা। এই খেলায় ভারতীয় খেলোয়াড়দ্বয় অপূর্ব দৃঢ়তার সহিত খেলা আরম্ভ করিয়া ৬—২, ৬—১ গেমে ইটালীর শক্তিশালী খেলোয়াড়দ্বয়কে যাহাদের বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ডাবলস খেলোয়াড়দ্বয়ের অন্যতম বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছিল, তাহাদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিবার মত অবস্থা সৃষ্টি করিলেন। তৃতীয় সেটের খেলা আরম্ভ হইতেই ভারতের ভাগ্যে অশুভ লক্ষণ দেখা দিল। সুমন্ত মিশ্র একটি চাপা মার মারিবার জন্য লাফাইয়া উঠিতেই পেটের মাংসপেশীতে টান লাগিল। তিনি ঠিক পূর্বের মত আর খেলিতে পারিলেন না। ফলে ভারত তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াও ডাবলসে পরাজিত হইল। পরের দিন সিংগলস খেলা। সুমন্ত মিশ্রের শারীরিক অবস্থা দেখিয়া কেহই ধারণা করিতে পারিলেন না যে, তিনি আর খেলিতে পারিবেন। ডাক্তারগণ পর্যন্ত তাঁহার খেলা সম্পর্কে কোন নিশ্চিত অভিমত দিতে পারিলেন না। উপরন্তু বলিলেন, 'খুব সম্ভব হার্নিয়া হইয়াছে। অবিলম্বে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হইতে পারে।' দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সুমন্ত মিশ্র সমস্ত কিছু উপেক্ষা করিয়া খেলায় যোগদান করিলেন ও তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া পরাজয় বরণ করিলেন। অপর প্রতিনিধি নরেশকুমার পূর্বদিন অপেক্ষা উন্নততর নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া শেষ সিংগলসের খেলায় জয়ী হইলেন। ফলে ভারত ২—৩ খেলায় ইটালীর নিকট পরাজিত হইলেন। অস্ট্রেলিয়ার সকল সংবাদপত্র কিন্তু একবাক্যে ভারতের পরাজয় নেহাৎ 'অদৃষ্টের পরিহাস' বলিয়া অভিহিত করিলেন। ইহা খুবই সুখের ও আনন্দের বিষয় যে, দীর্ঘকাল পরে ভারত টেনিস খেলায় আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে সুনাম ও খ্যাতি অর্জনে সক্ষম হইয়াছেন। আমরা আশা করি, ভারতীয় লন টেনিস এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ ইহা স্মরণ করিয়া অদূর ভবিষ্যতে যাহাতে ভারতীয় টেনিস খেলোয়াড়গণ অধিকতর উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করেন ও ডেভিস কাপের প্রতিনিধি প্রতিযোগিতার বহু পূর্বে নির্বাচন করিয়া তাহাদের নিয়মিত অনুশীলনের ব্যবস্থা করেন।

খেলার ফলাফল—

সিংগলস

ফস্টো গার্দিনী (ইটালী) ৬—১, ৫—৭, ৭—৫, ৬—২ গেমে নরেশকুমারকে (ভারত) পরাজিত করেন।

সুমন্ত মিশ্র (ভারত) ৭—৫, ৬—৪, ৬—১ গেমে রোল্যান্ডো ডেল বেলোকে (ইটালী) পরাজিত করেন।

ডাবলস

মার্সেলো ডেল বেলো ও গিয়ানী সুসেলী (ইটালী) ১—৬, ১—৬, ৬—২, ৬—২, ১৩—১১ গেমে সুমন্ত মিশ্র ও নরেশকুমারকে (ভারত) পরাজিত করেন।

সিংগলস

ফস্টো গার্দিনী (ইটালী) ৮—৬, ৮—৬, ১—৬, ৬—৪ গেমে সুমন্ত মিশ্রকে (ভারত) পরাজিত করেন।

নরেশকুমার (ভারত) ৬—২, ৮—৬, ৪—৬, ৬—৩ গেমে রোল্যান্ডো ডেল বেলোকে (ইটালী) পরাজিত করেন।

বাস্কেটবল

বাস্কেটবল খেলা পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা অধিক জনপ্রিয় খেলার অন্যতম। এই খেলা ভারতে তথা বাঙলায় অর্ধ শতাব্দির অধিক কাল হইতেই প্রচলিত, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহা কেন জনপ্রিয়তালাভ করিতে পারে নাই, ইহা চিন্তার বিষয় সন্দেহ নাই। তবে ইহার জন্য এই বিভাগের পরিচালকগণকে যে দায়ী করা যায় না তাহা নহে। তবে উহা করিয়া বিশেষ কোন লাভ নাই। ভবিষ্যতে যাহাতে এই খেলা অধিকতর জনপ্রিয় হয়, তাহার দিকে পরিচালকগণকে বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও করিতে হইবে যেন বাঙলার দল নির্বাচনে কোন পক্ষপাতিত্ব না হয়। এইরূপ উক্তি করিবার কোনই প্রয়োজন হইত না, যদি না এইবারের দ্বিতীয় প্রতিযোগিতায় বাঙলা দল নির্বাচনে আমরা পক্ষপাতদুষ্ট রোগের চিহ্ন দেখিতে না পাইতাম। ইহার জন্যই দল নির্বাচনের পরেই বলিতে সাহসী হইয়াছিলাম যে, বাঙলা পূর্বের খ্যাতি অক্ষুন্ন রাখিতে পারিবে না। আমাদের সেই উক্তি যে কতখানি সত্য, তাহা জাতীয় প্রতিযোগিতায় বাংগালোরেই প্রমাণিত হইয়াছে। বাঙলা দল কেবল যে পরাজিত হইয়াছেন তাহা নহে, প্রাথমিক অনুষ্ঠানেই বিভিন্ন খেলায় পরাজয়বরণ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। অপর দিকে যাহাদের জাতীয় প্রতিযোগিতায় কিছুই করিতে পারিবে না বলিয়া সকলে ধারণা করিয়াছিলেন, তাহারাই গৌরবের অধিকার হইয়াছে। এই সম্পর্কে মহীশূর দলের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই দল কেবল যে পুরুষ বিভাগে সাফল্যলাভ করিয়াছে, তাহা নহে। খেলার কৌশলের যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহার সবকিছু আয়ত্তের জন্য যে খেলোয়াড়গণ আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন, তাহারও নিদর্শন ইহারা দিতে সক্ষম হইয়াছেন। এই জন্যই দলেরই অধিকাংশ খেলোয়াড়কে সুদূরপ্রাচ্য ভ্রমণকারী ভারতীয় দল গঠিত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। তবে বাঙলার বাস্কেটবল পরিচালকগণের একমাত্র সান্ত্বনা যে বাঙলার মহিলা দল মহিলা বিভাগে সাফল্যলাভ করিয়াছেন। বাঙলার মহিলা দল সম্পূর্ণ এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান খেলোয়াড় দ্বারা গঠিত এবং ইহারা অধিকাংশই দীর্ঘকাল ধরিয়াই এই খেলায় লিপ্ত আছেন। ভারতের অপর সকল মহিলা দল বিষয় অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, তাহা সম্প্রতি গঠিত হইয়াছে অথবা অল্পদিন গঠন করিয়াই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছে।

পুরুষ বিভাগের ফাইন্যাল

মহিশূর ৪১—২২ পয়েণ্টে পেপসু দলকে পরাজিত করে।

মহিলা বিভাগের ফাইন্যাল

বাঙলা ৪৪—২২ পয়েণ্টে মহীশূর দলকে পরাজিত করে।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

৮ই ডিসেম্বর—প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহর, অদ্য লোকসভা ও রাজ্য পরিষদে ভারতের প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা চূড়ান্ত আকারে পেশ করেন। বর্তমান হিসাব অনুযায়ী এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে মোট ২,০৬৯ কোটি টাকা ব্যয় হইবে।

মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরাজগোপালাচারী অদ্য বিধানসভায় বলেন, গত ৩০শে নবেম্বর তামিলনাদের তাঞ্জোর ও ত্রিচিনপল্লী জিলায় যে ঝড় হইয়াছে, উহার ফলে ১৬৮ জন মারা গিয়াছে। একমাত্র তিরুচি জিলায়ই প্রায় ৭০ লক্ষ টাকার শস্য হানি হইয়াছে।

বিহার কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্য সংগ্রহ সম্পর্কে যে অভিযোগ করা হইয়াছে তৎসম্পর্কে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি শ্রীঘনশ্যাম সিংহ গুপ্তকে তদন্ত করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। শ্রী গুপ্ত বর্তমান বিহার প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতিকে বাতিল, কংগ্রেস মন্ত্রিসভার পদত্যাগ ও রাজ্যের বিধানসভা ও বিধান পরিষদের সমুদয় কংগ্রেসী সদস্যদের পদত্যাগ পেশের সুপারিশ করিয়াছেন।

ব্যাপকভাবে ভুয়া প্রাথমিক সদস্য সংগ্রহ এবং নির্বাচন পরিচালন ব্যাপারে অন্যায় পদ্ধতি অবলম্বন সম্পর্কে গুরুতর অভিযোগের জন্য অদ্য নয়াদিল্লীতে কংগ্রেসের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এক ঘরোয়া বৈঠকে কংগ্রেসের হায়দরাবাদ অধিবেশনের জন্য বিহার হইতে বর্তমান প্রতিনিধি নির্বাচন স্বীকার না করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

৯ই ডিসেম্বর—প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু অদ্য রাজ্য পরিষদে ঘোষণা করেন যে, ভারত সরকার পৃথক অন্ধ্র রাজ্য গঠনের জন্য সত্বর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক। কিন্তু বর্তমান মাদ্রাজ রাজ্যের তেলেগুভাষী অবিসম্বাদী অঞ্চলসমূহ লইয়া ঐ নূতন রাজ্য গঠিত হইবে এবং মাদ্রাজ শহরকে কোনক্রমেই তাহার অন্তর্ভুক্ত করা চলিবে না।

অদ্য লোকসভায় লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানী একত্রীকরণ বিলটি গৃহীত হয়।

১০ই ডিসেম্বর—চা শিল্পে বর্তমানে যে সঙ্কট চলিতেছে, ঐ বিষয়ে লোকসভায় অর্ধ-ঘণ্টাকাল ধরিয়া আলোচনা চলে। এই আলোচনার উত্তরে বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী জানান যে, ১৯৫৩ সালের উৎপাদনের জন্য গভর্নমেণ্ট সীমাবদ্ধভাবে আর্থিক সাহায্য করিতে পারেন।

অদ্য রাজ্য পরিষদে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন আইন সংশোধন বিল সম্পর্কে আলোচনাকালে রাজ্য পরিষদের সহ-সভাপতি শ্রী এস ভি কৃষ্ণমূর্তি কয়েকজন সদস্যকে প্রশ্ন উত্থাপনে অনুমতি না দেওয়ার প্রতিবাদ স্বরূপ দুইজন সদস্য পৃথক পৃথকভাবে এবং পরে বিরোধী পক্ষের সকল সদস্য একযোগে পরিষদ কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

১১ই ডিসেম্বর—হিন্দু বিবাহ এবং হিন্দুদের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পর্কিত আইন সংশোধন ও সংহিতাভুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে আইন মন্ত্রী শ্রী সি সি বিশ্বাস অদ্য রাজ্য পরিষদে একটি বিল উত্থাপন করেন। এই বিলে বহু বিবাহ দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া ঘোষণা এবং হিন্দু বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বিভিন্ন পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ ছাত্রের হার অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিযুক্ত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন যে, সমস্ত কলেজেই ভর্তির পূর্বে সকল ছাত্রছাত্রীর কলেজী শিক্ষালাভের যোগ্যতা পরীক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

মাদ্রাজ নির্বাচনী ট্রাইবুন্যাল অদ্য মাদ্রাজ বিধান পরিষদের ২৪ জন সদস্যের নির্বাচন 'সম্পূর্ণ অসিদ্ধ' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে পূর্তমন্ত্রী শ্রী এন রঙ্গ রেড্ডী, শ্রীষণ্মুখম চেট্টী, শ্রী টি প্রকাশম প্রভৃতি আছেন।

বোম্বাই হাইকোর্ট অদ্য বোম্বাই বিক্রয়কর আইন অসিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। গত ১লা নবেম্বর হইতে বোম্বাই রাজ্যে বিক্রয়-কর আইন চালু হইয়াছিল।

১২ই ডিসেম্বর—আগামী জানুয়ারী মাসের মধ্যভাগে হায়দরাবাদে ভারতীয় কংগ্রেসের যে ৫৮তম অধিবেশন হইবে শ্রীজওহরলাল নেহরু বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উহার সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন।

১৩ই ডিসেম্বর—নয়াদিল্লীতে সর্দার হুকুম সিংয়ের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত উদ্বাস্তু সম্মেলন আরম্ভ হয়। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সম্মেলনের উদ্বোধন করিয়া বলেন যে, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সম্পর্কিত ব্যাপারে তদন্ত করিবার জন্য সরকার ও জনসাধারণ উভয়েরই আস্থাভাজন এইরূপ ব্যক্তিদের লইয়া একটি নিরপেক্ষ কমিশন গঠন করা হউক। তিনি বলেন যে, উদ্বাস্তু সমস্যা কোন স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট দলের রাজনৈতিক চাল নহে; বস্তুত-পক্ষে ইহা একটি জাতীয় সমস্যা।

অদ্য লোকসভায় তপশীল জাতি ও খণ্ড-জাতি সম্পর্কে কমিশনারের রিপোর্টের আলোচনার সময় কয়েকজন সদস্য কেন্দ্রীয় সরকারে অনুন্নত শ্রেণীর কল্যাণ ও উন্নতি-বিধানের জন্য একটি পৃথক দপ্তর গঠনের দাবী জানান। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু ঘোষণা করেন যে, সামাজিক ও শিক্ষার দিক হইতে অনুন্নত শ্রেণীর অবস্থার উন্নতি বিধানের উপায় সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদানের জন্য আগামী সপ্তাহের মধ্যে একটি কমিশন গঠিত হইবে।

১৪ই ডিসেম্বর—অদ্য নয়াদিল্লীতে নিখি[ল] ভারত উদ্বাস্তু সম্মেলনের দুই দিনব্যাপ[ী] অধিবেশন সমাপ্ত হইয়াছে। এই সম্মেল[নে] উভয় বঙ্গের মধ্যে অবাধে যাতায়াত এ[বং] অবিলম্বে পাশপোর্ট প্রথা প্রত্যাহারের দা[বী] করা হইয়াছে।

জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ব্যাপারে সমা[জ] সেবার ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য অ[দ্য] মাদ্রাজে ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক সমাজসেবা সম্মেলনে[র] উদ্বোধন হয়। ৩০টি দেশ হইতে আগত ১ শতাধিক বিশিষ্ট সমাজসেবক সম্মেলনে যোগ দান করেন। আন্তর্জাতিক সমাজ সে[বা] সম্মেলনের সংগঠক কমিটির চেয়ারম্যান ড[াঃ] জীবরাজ মেটা অদ্যকার অধিবেশনে সভাপতি[ত্ব] করেন।

বিদেশী সংবাদ

৮ই ডিসেম্বর—দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণানুযা[য়ী] অঞ্চল বিভাগ নীতির বিরুদ্ধে "অন্যায় আই[ন] অমান্য" আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিব[ার] অভিযোগে মহাত্মা গান্ধীর পুত্র শ্রীমণিলা[ল] গান্ধী, সাতজন ইউরোপীয় এবং ১৪ জ[ন] ভারতীয়কে অদ্য গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

টিউনিসিয়ান নেতা ফেরহাত হাসেদ নিহ[ত] হওয়ার পর হইতে উত্তর আফ্রিকার ফরাস[ী] অধিকৃত উপনিবেশসমূহের বিভিন্ন স্থা[নে] জাতীয়তাবাদীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এ[বং] দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়। অদ্য ফরাসী অধিকৃ[ত] মরোক্কোর রাজধানী ক্যাসাব্লাঙ্কা শহরে [কয়েক] সহস্র লোকের এক জনতা একটা পুলিশ ঘা[ঁটি] আক্রমণ করিতে গেলে সৈন্যদলের গুলী চাল[নার] ফলে ২৫ জন নিহত হয়।

৯ই ডিসেম্বর—গতকল্য ক্যাসাব্লাঙ্কায় ফরা[সী] বিরোধী দাঙ্গাহাঙ্গামায় ৫১ জন নিহত ও ৭[…] জন আহত হইলে পর সারারাত্রি কার্ফিউ জা[রী] করা হয়। দাঙ্গাহাঙ্গামা সম্পর্কে এ পর্য[ন্ত] ১৪০০ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

অদ্য রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতীয় প্রতিনিধি দলে[র] নেত্রী শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত প্রস্তা[ব] করেন, ফরাসী সরকার টিউনিসিয়ার কো[ন] প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনা চালাইবে[ন] তাহা স্থির করিয়া দিবার জন্য সাধারণ পরি[ষদ] একটি কমিশন গঠন করুন।

১০ই **ডিসেম্বর**—মিশরের প্রধান মন[্ত্রী] জেনারেল নাগিব অদ্য ১৯২৩ সালের শাসনত[ন্ত্র] বাতিল করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন যে, ন[ূতন] শাসনতন্ত্র রচনার জন্য একটি সরকারী কমি[টি] নিযুক্ত হইয়াছে।

১১ই **ডিসেম্বর**—ক্যাসাব্লাঙ্কার সংবা[দে] প্রকাশ, ফরাসী কর্তৃপক্ষ অদ্য সমগ্র দে[শে] ব্যাপক তল্লাসী চালাইয়া মরোক্কোর ইস্তিকলা[ল] (জাতীয়তাবাদী) পার্টি ও কম্যুনিস্ট পার্টি[র] নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করেন।

১৩ই ডিসেম্বর—মরক্কোতে ফরাসী শাসনে[র] বিরুদ্ধে আরব-এশিয়া রাষ্ট্রগোষ্ঠীর অভিযো[গ] সম্পর্কে অদ্য রাষ্ট্রপুঞ্জের রাজনৈতিক কমিটি[তে] যে বৈঠক আরম্ভ হয়, ফ্রান্স তাহা বর্জ[ন] করিয়াছে।

ভারতীয় মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা—।৵০ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষান্মাসিক— ১০৲
পাকিস্থানের মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা (পাক) ।৵০ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষান্মাসিক—১০৲ (পাক)
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক [illegible] হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচিপত্র

২০শ বর্ষ
৯ম সংখ্যা

দেশ

শনিবার
১২ই পৌষ, ১৩৫৯

DESH Saturday, 27th December, 1952

সম্পাদক—**শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন** সহকারী সম্পাদক—**শ্রীসাগরময় ঘোষ**

সাময়িক প্রসঙ্গ

কবিগুরুর সাধনা

রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছেন। ১০ দিনের জন্য তাঁহাকে আমরা নিজেদের মধ্যে পাইয়াছি। গত ২৩শে ডিসেম্বর বিশ্বভারতীর সমাবর্তন-উৎসবে তিনি সভাপতিত্ব করেন। এই উপলক্ষে রাষ্ট্রপতির প্রদত্ত অভিভাষণ জাতির দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিবে। তিনি কবিগুরুর সাধনা এবং জীবনাদর্শ জাতির সম্মুখে উজ্জ্বল করিয়া ধরিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন; কিন্তু প্রাচীন ভারতের সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের মত বিশ্বমানবের জন্যই ছিল তাঁহার সাধনা। মৈত্রীর বাণীই তিনি প্রচার করিয়া গিয়াছেন এবং মানব-মৈত্রীর আদর্শকে তিনি বিশ্বভারতীর ভিতর দিয়া রূপায়িত করিয়াছেন। কবির সাধনা এবং অমৃতময় তাঁহার অবদানে বাঙলা তথা অখণ্ড ভারতের সভ্যতা এবং সংস্কৃতি উজ্জীবিত হইয়াছে—ইহা সত্য; রবীন্দ্রনাথ জাতির জীবন-নদীতে জোয়ার বহাইয়াছেন ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই; কিন্তু সেইসঙ্গে ইহাও বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য যে, কবিগুরুর সাধনা এবং তাঁহার জীবনাদর্শ সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে ভারতের আত্মীয়তা নিবিড় করিয়া দিয়াছে। বিশ্বমানবের সংস্কৃতিতে ভারতকে নূতন মর্যাদা দিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ। শুধু রাজনীতির পথে এ কাজটি হওয়া সম্ভব নয়। ফলতঃ সার্বভৌম সত্যের উদার অনুভূতি আশ্রয় করিয়াই মানব-সংস্কৃতির এই স্থায়ী ভিত্তিটি গড়িয়া তুলিতে হয় এবং একমাত্র এই বস্তুই রাজনীতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের বিপর্যয়ের মধ্যেও মানব-সমাজের সমুন্নতির পথে উজ্জ্বল আলোক সম্পাত করিতে পারে। বস্তুতঃ আমাদের শিক্ষার আদর্শের ক্ষেত্রে এই সত্যটি যদি আমরা বিস্মৃত হই, তবে আমাদের সমস্ত শিক্ষার কোন সার্থকতাই থাকিবে না। কারণ ব্যবহারিক জীবন পরিচালনায় কতকগুলি তথ্য সম্বন্ধে জ্ঞান দেওয়াই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়; পরন্তু সেই সব তথ্য বা জ্ঞান যাহাতে সার্বভৌম উদার সত্যে জীবনকে নিষ্ঠিত করে এবং মানুষের অন্তর-রাজ্যে একটি অনাময় আশ্রয় দেয় শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য তাহাই। প্রকৃতপক্ষে এই পরম সত্যটি উপলব্ধি না করিতে পারিলে আমাদের নিজেদের সত্তাকেই হারাইতে হয়। অন্তরের আলোক-বিবর্জিত জড় স্বার্থের ভাবনা এবং সাধনা বর্তমানে মানব-সংস্কৃতির পক্ষে এক মস্ত সংকট আসন্ন করিয়া তুলিয়াছে। ইহার ফলে মানুষের দৈন্যই শুধু বাড়িয়া চলিয়াছে। বাহিরের উপচার বৃদ্ধি করিয়াও মানুষ উত্তরোত্তর সমধিক অসহায় হইয়া পড়িতেছে। সাম্রাজ্যবাদের গৃধ্নুতা এবং বর্ণবৈষম্যের বর্বরতা বিশ্বশান্তির সব প্রচেষ্টাকে কার্যত প্রহসনে পরিণত করিয়া তুলিতেছে। এ অবস্থায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনে এবং বিশ্বভারতীর ভিতর দিয়া যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, শুধু তাহাই মানব-সমাজকে এই দুর্গতি হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ। আমাদের নিজেদের কথা বলিতে গেলে সেই আদর্শের অনুসরণই আমাদেরও উন্নতির পথ। বর্তমানে জাতীয় জীবনে যে সব দৈন্য এবং দুর্গতি আপতিত হইয়াছে, আমাদের মনের মূলে মানব-মৈত্রীর সর্বজনীন সত্যকে উপলব্ধি করিবার ভিতর দিয়াই আমরা সেগুলি হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিব। মানুষকে আপন করিয়া পাইবার পথেই, সেগুলির সমাধান করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হইবে, অন্য উপায়ে নয়। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা এবং সংস্কৃতি দেশ বা জাতি বিশেষের সম্পত্তি নয়, তাহা সমগ্রভাবে বিশ্বমানবের জন্যই উন্মুক্ত। পক্ষান্তরে যে শিক্ষা বা যে সংস্কৃতি বিশ্বাত্মক অনুভূতি হইতে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে তাহা মানুষের দুর্গতিকে পুঞ্জীভূত করিয়া তোলে। সংস্কৃতির স্বরূপ হইল ব্যাপ্তি, বিরোধের মধ্যে সংগতি, বিভেদের ভিতর অভেদ বা একাত্মতার দীপ্তি সাধন। ভারত যুগ যুগ ধরিয়া এমন সংস্কৃতিরই সাধনা করিয়াছে এবং বহু বিপর্যয়ের মধ্যে মৈত্রী ও মানবতার এই আদর্শকেই ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়াছে। তাই সে মরে নাই। প্রকৃতপক্ষে, মানব-মৈত্রীর এই অমৃত-সাধনা যদি তাহার শিক্ষার আদর্শে সঞ্জীবিত থাকে, তবে সে মরিবেও না। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ জাতিকে এই অমৃতেরই সন্ধান দিয়াছেন। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ কবির আদর্শ এবং সাধনার স্বরূপটি বিশ্বভারতীর সমাবর্তন-উৎসবে আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার এই অভিভাষণে জাতির অন্তরে নূতন আশার আলোক সঞ্চার করিবে সন্দেহ নাই।

সাহিত্য সম্মেলনের সার্থকতা

এ বৎসর কটকে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ২৮তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বাঙলার বহু বিশিষ্ট সন্তান এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল এই যে, সম্মেলনের অধিবেশনে বিভিন্ন প্রদেশের জ্ঞানী ও গুণীগণের দৃষ্টি উত্তরোত্তর বাঙলা ভাষা এবং সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে। তাঁহারা এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আগাইয়া আসিতেছেন। বাঙলা ভাষাকে দাবাইয়া প্রাদেশিকতাকে প্রশ্রয় দিবার দুষ্প্রবৃত্তির প্রকোপের এই যুগে ইহা সুলক্ষণ সন্দেহ নাই। বাঙলা ভাষা এবং সাহিত্যের স্বরূপ যাঁহারা জানেন না, বস্তুত তাঁহারাই এইরূপ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া থাকেন।

বিভিন্ন প্রদেশে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনের ভিতর দিয়া এই ভ্রান্ত ধারণা যদি নিরসিত হয়, তবে অনেকটা ভাল কাজ হইবে বলিয়া আমরা আশা করি। প্রকৃতপক্ষে কোন প্রাদেশিক ভাষার সঙ্গেই আমাদের বিরোধ নাই; পরন্তু আমাদের এই বিশ্বাস যে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বাঙলা ভাষা এবং সাহিত্যের মর্যাদা যদি বৃদ্ধি পায় তবে ঐ সব ভাষারই সংস্কৃতি সমুন্নত হইবে এবং সমগ্রভাবে ভারতের অখণ্ড জাতীয়তাবোধ সংহত হইয়া উঠিবে। পক্ষান্তরে বাঙলা ভাষার সম্প্রসারণে প্রতিকূলতার পথে প্রদেশ হিসাবে এবং অখণ্ড জাতি হিসাবে ভারতের উন্নতি বিশেষভাবেই ব্যাহত হইবে। বস্তুত মনীষী এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিদের অবদানে ভাষা এবং সাহিত্য সমৃদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। ভারতের সব ভাষার চেয়ে এই দিক হইতে বাঙ্গালীরা সবচেয়ে বেশী গর্ব করিবার দাবী সঙ্গতভাবেই রাখে। ঐতিহাসিক সে সত্যকে কোনক্রমেই উপেক্ষা করিবার উপায় নাই। ভারতের জাগরণের মূলে বাঙলা ভাষা এবং সাহিত্যই বেশী কাজ করিয়াছে ইহা কে অস্বীকার করিতে পারে? বাস্তবিকপক্ষে বাঙ্গালী প্রাদেশিকতাকে কোনদিনই বড় বলিয়া বুঝে না। বাঙলার সাহিত্যসাধনা অখণ্ড ভারতের সংস্কৃতিতেই সর্বতোভাবে চেতনা সঞ্চার করিয়াছে। জাতির মনোমূলে এই সাহিত্য যদি অগ্নিময় উদ্দীপনা সঞ্চার না করিত এবং ক্ষুদ্রতার সকল গ্লানি ও দুর্বলতা হইতে জাতির মনকে মুক্ত করিবার দুরন্ত বীর্য ও বল এই সাহিত্য জাগাইয়া না তুলিত, তবে আমাদের পরাধীনতার অবসান ঘটিতে আরও কত যুগ কাটিয়া যাইত কে বলিতে পারে? প্রকৃতপক্ষে রাজনীতি বড় জোর সাময়িক একটা বৈপ্লবিক বেগই সৃষ্টি করিতে পারে; কিন্তু বিভিন্ন বিপর্যয়ের ভিতর দিয়া তাহাকে বলিষ্ঠ গতি দিবার শক্তি একমাত্র সাহিত্যেরই আছে। উদার এই যে বৈপ্লবিক প্রাণ-শক্তি, বৃহতের সাধনায় অলঙ্ঘ্য এই যে মনোবল, বাঙলার সাহিত্য এই বস্তুটি আহরণ করিয়া আনিয়াছে। বাঙলার সাহিত্য-সাধকগণ এমন যজ্ঞাগ্নি উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছেন। আমাদের জাতীয় জীবনকে যদি সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, তবে এই যজ্ঞাগ্নির দীপ্তি ভারতের সর্বত্র আরও ছড়াইতে হইবে। এদেশের সমুন্নতি-সাধনায় সাগ্নিক দলের প্রতি বঙ্গবাণীর এই আমন্ত্রণ বঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলনের ভিতর দিয়া সম্প্রসারিত হইবে, আমরা এই আশা করিতেছি এবং সম্মেলনের কটক অধিবেশনের সার্থকতায় আনন্দ জ্ঞাপন করিতেছি।

নীতির সঙ্গতি

অন্ধ্রনেতা শ্রীপোত্তি শ্রীরামুলুর আত্মদান বৃথা যায় নাই। ভারতের প্রধান মন্ত্রী স্বয়ং তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন এবং অন্ধ্র প্রদেশ গঠনে ভারত সরকারের সংকল্পের কথা ঘোষণা করিয়াছেন। পণ্ডিত নেহরু স্পষ্ট ভাষাতেই প্রকাশ করিয়াছেন যে, সংশিলষ্ট পক্ষসমূহের ভিতর ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হোক্ বা না হোক্, মাদ্রাজ শহরটি বাদ দিয়া সমগ্র তেলেগু-ভাষাভাষী অঞ্চল লইয়া স্বতন্ত্র অন্ধ্র রাজ্য গঠিত হইবে এবং ভারত সরকার সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। স্বতন্ত্র অন্ধ্র রাজ্যের সীমানা নির্ধারণের জন্য একটি সীমানা নির্ধারণ কমিশন এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত করা হইবে, ইহা স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে। স্বতন্ত্র অন্ধ্ররাজ্য গঠনে ভারত সরকারের স্বীকৃতির ভিতর দিয়া একটি সত্য সুস্পষ্ট হইল, তাহা এই যে, জনগণের দাবীকে উপেক্ষা করা যায় না। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের নীতি কংগ্রেস যে এতদিন স্বীকার করিয়া লইয়াছিল তাহা অসঙ্গত এবং অযৌক্তিকও নয়; অধিকন্তু ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট নিজেদের কূটনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের গণ্ডী যে আকারে বাঁধিয়া দিয়াছিল তাহাকে পাকা ব্যবস্থা বলিয়া স্বাধীন ভারতে স্বীকার করিয়া চলার মধ্যে গণতান্ত্রিকতাসম্মত কোন সঙ্গত যুক্তি নাই। আমরা আশা করি, অন্ধ্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিবার পর পশ্চিমবঙ্গের দিকেও এবার ভারতের প্রধান মন্ত্রীর দৃষ্টি পড়িবে এবং এক্ষেত্রেও বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠার অবাস্তব দাবী পরিত্যাগ করিয়া ভারতীয় রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থকেই তিনি বড় করিয়া দেখিবেন। সমস্যাটি কেবলমাত্র দক্ষিণ ভারতেরই, তিনি এমন যুক্তির ভুল বুঝিতে পারিবেন বলিয়াই আমরা মনে করি। প্রকৃতপক্ষে অন্ধ্র রাষ্ট্র গঠনে প্রবৃত্ত হইবার আগেই পশ্চিমবঙ্গের সীমানা-সম্প্রসারণ সম্পর্কিত প্রশ্নের মীমাংসা করা প্রয়োজন ছিল। প্রত্যুত, পণ্ডিত নেহরু যদি অবিলম্বে এই দাবী প্রতিপালন করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন না করেন, তবে ভবিষ্যতে সংকট সৃষ্টি হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। সে অবস্থা যাহাতে দেখা না দেয়, সেজন্য এখনই ভারত সরকারের উদ্যোগী হওয়া উচিত এবং নিজেদের নীতিকে এখন আর অস্পষ্ট হেয়ালীর মধ্যে রাখিয়া সমস্যাকে বিলম্বিত করা কর্তব্য নয়। অন্ধ্রনেতা শ্রীরামালুর আত্মদান পশ্চিমবঙ্গের সীমানা সম্পর্কিত সমস্যার সমাধানেও পণ্ডিত নেহরুর কর্তব্যবুদ্ধিকে প্রণোদিত করে ইহাই বাঞ্ছনীয়।

পরলোকে সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

বিখ্যাত দার্শনিক ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত গত ১৮ই ডিসেম্বর ৬৫ বৎসর বয়সে তাঁহার লক্ষ্ণৌস্থিত বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙলা তথা ভারতের পণ্ডিতসমাজ একজন বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান্ পণ্ডিত ব্যক্তিকে হারাইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন; শুধু ইহাও নয়, বিশ্বের বিদ্বৎমণ্ডলী একজন প্রতিভাশালী পণ্ডিতকে হারাইলেন। সুরেন্দ্রনাথ দার্শনিক পণ্ডিতস্বরূপে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন। বরিশাল জেলার বিশিষ্ট পণ্ডিত পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। উত্তরকালে সুরেন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সী কলেজ, সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংশিলষ্ট থাকিয়া এদেশের শিক্ষা-সম্পদের সমৃদ্ধি সাধন করেন। তাঁহার মনীষা অসামান্য ছিল। বিভিন্ন দেশের পণ্ডিত সমাজে আমন্ত্রিত হইয়া তিনি ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। ৪০ খানিরও অধিক গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থে বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যযুগ পর্যন্ত কালের ভারতীয় দর্শনের ক্রমাভিব্যক্তির ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সুরেন্দ্রনাথ এই বিখ্যাত পুস্তকের ষষ্ঠ খণ্ড রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। এই গ্রন্থের পরিসমাপ্তির দিকে ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলালের বিশেষ আগ্রহ ছিল। কয়েক বৎসর হইতেই তাঁহার স্বাস্থ্যের অবস্থা ভাল ছিল না। দুই বৎসর হইল তাঁহার স্বাস্থ্যের অবস্থার কিছুটা

র্তন ঘটে। তাঁহার লোকান্তরগমনে র আরব্ধ কার্য অসমাপ্তই রহিয়া গেল নিঃসন্দেহে বিশেষ আক্ষেপের বিষয়। রা তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের উদ্দেশে নিবেদন করিতেছি এবং তাঁহার য় স্বজন এবং গুণমুগ্ধ ব্যক্তিগণের কে আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

তির গতি কোন্ দিকে

ভারতীয় লোকসভায় পরিকল্পনা গের মন্ত্রী সেদিন আমাদিগকে আশ্বাস ছেন যে, দেশের লোকের জীবনযাত্রার উন্নত করিবার দিকেই তাঁহাদের লক্ষ্য ং ভারত সরকারের পঞ্চবার্ষিক পরি-পনার উদ্দেশ্যও তাহাই। কিন্তু সেই দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইলে নূতন সামাজিক বেশ গড়িয়া তুলিতে হইবে, অর্থনৈতিক স্থিতির পরিবর্তন ঘটাইতে হইবে; দি। তাঁহারা তাঁহাদের ক্রমিক কার্যনীতি য়া চলিতে থাকুন; কিন্তু আমরা গালীর যাঁহাদের জন্য তাঁহারা এইসব জ করিবেন, তাঁহাদের বর্তমান স্থা ভাবিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছি। তুতঃ জাতির যাহারা তরুণ রাই যদি রুগ্ন, দুর্বল এবং ণকায় হয়, তাহা হইলে জাতির ভবিষ্যৎ সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণ সমিতি মহানগরীর কলেজ-দের পাঁচ হাজার ছাত্রের স্বাস্থ্য ক্ষাতে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন অত্যন্তই উদ্বেগজনক। তাঁহাদের ধান্ত অনুসারে যুদ্ধপূর্ব ১৯৩৯ লর তুলনায় ১৯৫১ ও ১৯৫২ সালের হইতে ২০ বৎসর বয়স্ক ছাত্রদের তা গড়পড়তা আধ ইঞ্চি হ্রাস পাইয়াছে ওজন কমিয়াছে গড়ে চার সের। কর আয়তন প্রায় তিন ইঞ্চি কমিয়া ছে। ১৯৩৯ সালের তুলনায় ফুস-সর রোগে আক্রান্ত ছাত্রদের সংখ্যা করা দ্বিগুণের অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। তঃ ছাত্রকল্যাণ সমিতি বিশিষ্ট সংখ্যার পরীক্ষা চালাইয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত য়াছেন, তাহাতেই বাঙ্গালী ছাত্রদের স্থ্যের অবস্থার মোটামুটি একটা পরিচয় ওয়া যাইতেছে। ছাত্রসমাজের স্বাস্থ্যের এই অবনতির কারণও সুস্পষ্ট। বিগত দশ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত সমাজের আর্থিক অবস্থা যে স্তরে নামিয়া আসিয়াছে, তাহা ইতঃপূর্বে কখনো দেখা যায় নাই। পুষ্টিকর খাদ্য সংস্থানের সামর্থ্য এই শ্রেণীর নাই। সুতরাং অপুষ্টিকর এবং অপ্রচুর খাদ্য গ্রহণের ফলে তাহাদের দেহের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিবে এবং ক্ষয় রোগে আক্রান্তদের সংখ্যা তাহাদের মধ্যে বৃদ্ধি পাইবে, ইহা স্বাভাবিক। আমরা জানি, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বৃহৎ বৃহৎ পরিকল্পনার সাহায্যে কলিকাতা নগরীর উন্নতি সাধনে ঐতিহ্য সৃষ্টি করিবার জন্য উৎসাহিত এবং উৎকণ্ঠিত আছেন। কিন্তু তাঁহার নিকট আমাদের এই অনুরোধ যে, বাঙলার তরুণ সম্প্রদায়কে মৃত্যুর মুখ হইতে তিনি আগে রক্ষা করুন। ছাত্রদের জন্য বিনামূল্যে আহার্য এবং টিফিন সরবরাহ করিবার দায়িত্ব সরকার হইতে গ্রহণ করা হোক; এজন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিভাগের ব্যয় যতই বৃদ্ধি পায় তাহাতে পশ্চাৎপদ হওয়া উচিত নহে।

ছাড়পত্র সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা

ছাড়পত্র প্রথা প্রবর্তনের ফলে যে সব অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে আগামী ২৯শে এবং ৩০শে ডিসেম্বর নয়াদিল্লীতে ভারত ও পাকিস্থান সরকারের প্রতিনিধিদের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হইবে, এই কথা ছিল কিন্তু পাকিস্থান সরকারের অনুরোধক্রমে বৈঠকের দিন মাসখানেকের জন্য স্থগিত থাকিল। ছাড়পত্র-প্রথা প্রবর্তনের ফলে উভয় বঙ্গের মধ্যে গতিবিধির পক্ষে সংকট সৃষ্টি হইয়াছে, ভারত সরকার তাহার গুরুত্ব সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন কিনা আমরা এখনও ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। কারণ, তাঁহাদের মুখপাত্র-দের উক্তিতে এ সম্বন্ধে বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মন্ত্রী শ্রীযুত চারুচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের কথা কিছুটা স্পষ্ট। ছাড়পত্র প্রথা প্রবর্তনের ফল যে গুরুতর আকারে দেখা দিয়াছে, তিনি সোজাসুজিভাবে স্বীকার করিয়াছেন। বস্তুত বিষয়টি গবেষণা-সাপেক্ষ ব্যাপার মোটেই নয়। উভয় বঙ্গের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সংস্থিতি যেরূপ সুনিবিড় তাহাতে ছাড়পত্রের সর্তগুলি যতই সহজ সরল করা যাক্ না কেন, অসুবিধা ঘটিবেই, ইহা সুনিশ্চিত। ফলত এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্যেও অসন্তোষের কারণ সৃষ্টি হইয়াছে এবং পূর্ববঙ্গের আর্থিক সংকট অনেক রকমে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং পূর্ববঙ্গের কর্তৃপক্ষ যে অবস্থাটা না বুঝিতেছেন, এরূপ নয়। কিন্তু পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির চাপে পড়িয়া তাঁহাদিগকে চলিতে হইতেছে। আবার পশ্চিম পাকিস্থানীদের দ্বারাই সে নীতি প্রধানত নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। সাম্প্রদায়িকতার ভাবকে জিয়াইয়া রাখাই পাকিস্থান সরকারের নীতির মুখ্য উদ্দেশ্য। তাঁহাদের শাসনতন্ত্রের মূল নীতি নির্ধারণ কমিটির রিপোর্টে এ সত্য সুস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। মুসল-মান ভিন্ন কেহই পাকিস্থান রাষ্ট্রের সভাপতি হইতে পারিবেন না। পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব-বঙ্গের মধ্যে বিভেদ সুস্পষ্ট রাখা এই নীতিরই অন্যতম লক্ষ্য। এরূপ অবস্থায় পাকিস্থানের প্রতিনিধিদের সাহায্যে আলো-চনায় যে বিশেষ কিছু সুরাহা হইবে, এমন বিশ্বাস আমাদের নাই। এ সম্বন্ধে আমাদের কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। আমাদের মতে ছাড়পত্র রহিত করিবার জন্যই ভারত সরকারের তরফ হইতে জোর দেওয়া উচিত। পুনর্বিবেচনার প্রশ্ন যখন উঠিয়াছে, তখন এই নীতিই তাঁহাদের পক্ষে একমাত্র অবলম্বনীয়। ফলত ছাড়পত্র-প্রথা বজায় রাখিয়া বিভিন্ন সর্তের একটু রদ-বদলে কার্যত এই সমস্যার কিছুই সমাধান-হইবে না এবং ভারত সরকারের পক্ষ হইতে তেমন ফাঁদে জড়াইয়া না পড়াই ভাল। ফলত এজন্য বৈঠকের আলোচনার পরিণতি যাহাই ঘটুক, দেশের লোকে সে ঝুঁকি লইতে বরং প্রস্তুত আছে; কিন্তু পাকিস্থানের নীতির নিয়ামকদের মর্জিমত ভারত সরকার তাঁহাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য লঙ্ঘন করেন, ইহা লোকে চায় না।

ইন্দোনেশিয়া

ইন্দোনেশিয়া আভ্যন্তরিক অনৈক্যের জের টেনে চলেছে। সৈন্যবাহিনীর ভিতরে একটা দল হয়েছে যারা গভর্নমেণ্টকে কেয়ার করতে চায় না, যারা চায় যে, গভর্নমেণ্ট তাদের ইচ্ছানুসারে চলুক। সামরিক বিভাগের কার্যকলাপ সম্বন্ধে একটা তদন্তের প্রস্তাব পার্লামেণ্টে হওয়াতে এই দল কিছু লোক ক্ষেপিয়ে দিয়ে পার্লামেণ্টের উপরই গত অক্টোবর মাসে হামলা করিয়েছিল। ইতিমধ্যে সৈন্যবাহিনীর মধ্যেই দু'তিনবার দলভাঙ্গাভাঙ্গি হয়ে গেছে। জ্যাকর্তার আদেশ অমান্য করে কয়েকজন বড়ো সামরিক কর্মচারী বিদ্রোহ পর্যন্ত করেছিলেন। গভর্নমেণ্ট সৈন্যবাহিনীর চিফ্ অব স্টাফ্ এবং আরো কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে তাঁদের পদ থেকে সরাবার আদেশ দিয়েছিলেন। সেই আদেশের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করে একদল সামরিক কর্মচারী গভর্নমেণ্টকে চিঠি দিয়েছেন। গভর্নমেণ্ট তাঁদের আদেশ যে শেষ পর্যন্ত মানাতে সক্ষম হবেন সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কোয়ালিশন গভর্নমেণ্টের মধ্যে সকল দল একমত নয়, সৈন্যবাহিনীর জবরদস্তি ক্ষমতা ভোগের প্রচেষ্টার প্রতি কোনো কোনো রাজনৈতিক দলের সহানুভূতিও আছে। সুতরাং এ অবস্থায় সামরিক বিভাগের ভিতরের গলদ সহজে দূর হবে না। বরঞ্চ মধ্যপ্রাচ্যের দেখাদেখি ইন্দোনেশিয়াতেও সৈন্যবাহিনীর একদল কর্তা সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা করায়ত্ত করার চেষ্টা একদিন করতে পারেন, এ ভয় যে একেবারে নেই তা নয়।

অন্যদিকে ইন্দোনেশিয়ার অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও খুব ভালো নয়। গত ফেব্রুয়ারী মাসে মার্কিন সাহায্য গ্রহণ করার প্রশ্ন নিয়ে সুকিমান গভর্নমেণ্টের পতন হয়। উক্ত গভর্নমেণ্টের পররাষ্ট্রসচিব ডক্টর সুবার্দিও আমেরিকার মিউচুয়াল সিকিওরিটি এজেন্সীর মারফৎ ৮০ লক্ষ ডলার মূল্যের সাহায্য গ্রহণের একটি চুক্তি করেন। এই চুক্তির কথা প্রকাশ হওয়া মাত্র সকল দলের পক্ষ থেকেই ভীষণ আপত্তি ওঠে এবং চুক্তি বাতিল করে দেওয়া হয়। মিউচুয়াল সিকিওরিটি এজেন্সীর মারফৎ যে সাহায্য নেওয়ার কথা ছিল, সেটা সামরিক সাহায্য বলে গণ্য হবে, এই ছিল আপত্তির কারণ, যেহেতু ইন্দোনেশিয়া রুশ বা ইংগ-মার্কিন কোনো দলে যোগ দিতে চায় না। অবশ্য এর পূর্বে ইন্দোনেশিয়া ইকনমিক কো-অপারেশন এডমিনিস্ট্রেশন-এর মারফৎ এক কোটি ৬০ লক্ষ ডলারের মার্কিন সাহায্য নিয়েছে। ডক্টর সুকিমানের পরে ডক্টর উইলোপো গত এপ্রিল মাসে ইন্দোনেশিয়ার প্রধান মন্ত্রী হলেন। তার কিছুদিন পরেই তাঁর গভর্নমেণ্টের পক্ষ থেকে একথা প্রকাশ করা হয় যে, ইন্দোনেশিয়া পারস্পরিক সুরক্ষা (মিউচুয়াল সিকিওরিটি) প্রোগ্রাম অনুসারে আমেরিকার কাছ থেকে টেকনিক্যাল ও অর্থনৈতিক সাহায্য নিতে রাজী আছে, তবে সামরিক সাহায্য নেবে না। সম্ভবত তখন থেকেই একটা নূতন সাহায্য চুক্তির কথাবার্তা আরম্ভ হয়। সম্প্রতি শুনা গেছে যে, এইরূপ একটা চুক্তির মূল সূত্র স্থির হয়ে গেছে। বিস্তৃত বিবরণ হয়ত শীঘ্রই জানা যাবে। অবশ্য ইন্দোনেশিয়ার নিরপেক্ষ নীতি পূর্বের মতোই উচ্চৈস্বরে ঘোষিত হচ্ছে।

টেকনিক্যাল ও অর্থনৈতিক এবং সামরিক সাহায্যের মধ্যে প্রভেদ আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেটাকে ফাঁকি দেবারও পন্থা আছে। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটা পরিষ্কার হবে। ধরা যাক আমেরিকা কিম্বা রাশিয়া কোনো দেশকে এক কোটি টাকার সাহায্য দিতে প্রস্তুত। এই কোটি টাকা যদি গোলাগুলী, কামান বন্দুক, ট্যাঙ্ক প্রভৃতির আকারে আসে তবে তাকে সামরিক সাহায্য বলা হবে। কিন্তু যদি ধরা যায় যে গ্রহীতা দেশের এক কোটি টাকার কামান বন্দুক প্রভৃতিরও প্রয়োজন আছে, আবার এক কোটি টাকার অসামরিক অন্যান্য জিনিস যথা যন্ত্রপাতি, কাপড়-চোপড়, ওষু ইত্যাদি বাইরে থেকে আনা দরকার। অবস্থায় গ্রহীতা-দেশ যদি শেষোক্ত জি গুলি অপরের সাহায্যে সংগ্রহ করতে তবে হয়ত বন্দুক কামান সংগ্রহ ব টাকাটা তার নিজের ঘর থেকে বার সম্ভব হয়। অর্থাৎ প্রথমোক্ত সাহা না পেলে বন্দুক কামান সংগ্রহ করা স হয় না, অথবা হলেও অন্যদিকে অসুবিধা হয়, দেশের লোকের কাপ অভাব হয় বা আর কিছুর। যদি জানা থ যে এই অর্থনৈতিক সাহায্য দিলে কো দেশের গভর্নমেণ্টের পক্ষে নিজের পয় অমুক অমুক সামরিক সরঞ্জাম সংগ্রহ ক সম্ভব হবে তাহলে উদ্দেশ্য সিদ্ধির থেকে অর্থনৈতিক সাহায্য দান ও সাম সাহায্য দানের মধ্যে বিশেষ কোনো প্র থাকে না। অবশ্য যুদ্ধ বাধলে বা অত্যা হলেই বুঝা যাবে যে কোন দানের কী অ ছিল। তবে এ বিষয়ে ইন্দোনেশিয়ার স লোচনা করে কী হবে? সমস্ত দক্ষিণ-পূ এশিয়ার মধ্যে যে-দেশের পক্ষে একটা আ স্থাপন করা হয়ত সম্ভব ছিল সেই ভার বর্ষের গভর্নমেণ্টই বিদেশী সাহায্যের প্র যে লোলুপতা দেখাচ্ছেন তাতে ভারতবর্ষে চেয়ে বহুলাংশে ছোটো, দুর্বল ও নানাভা বিব্রত ইন্দোনেশিয়াকে কী দোষ দেও যায়?

ইরাণী তেল

কয়েকদিন পূর্বে মার্কিন পররাষ্ট্র সচি দপ্তর থেকে এই মর্মে একটি বিজ্ঞ দেওয়া হয় যে মার্কিন তৈল ব্যবসায়ী কেউ যদি ইরাণের তেল কিনতে যায় ত নিজেদের দায়িত্বে যাবে, অর্থাৎ এ্যাংলো-ইরানিয়ান কোম্পানী গেয়ে রেখেছে ইরাণের তেল তাদের সম্পত্তি এবং কে ইরাণ থেকে তেল কিনে বাইরে নিয়ে যাব চেষ্টা করলে তারা আইনত এ্যাংলো-ইরানিয়ানের কাছে দায়ী হবে—সেই আইনে বুঝাপড়া তাদের করতে হবে, মার্কি গভর্নমেণ্ট কোনো হাঙ্গামা পোয়াবে ন অবশ্য একথায় তেহরানে ইরাণীরা মার্কি গভর্নমেণ্টকে দুষছে, তারা বলছে মার্কিন গভর্নমেণ্ট এ্যাংলো-ইরানিয় কোম্পানীর সুবিধার জন্য ইরাণী তেলে হবু ক্রেতাদের নিরুৎসাহ করার চে করছেন। লণ্ডনে কিন্তু ইংরেজরা মার্কি

সরকারের বিজ্ঞপ্তির উল্টো অর্থ করছে, তারা বলছে এতে যে সব মার্কিন তেল ব্যবসায়ীরা ডক্টর মুসাদেক-এর সঙ্গে কারবার করতে অগ্রসর হচ্ছে তারা আরো উৎসাহিত হবে। কারণ ইংরেজরা জানে যে মার্কিন তেল ব্যবসায়ীরা যদি সত্যই ডক্টর মুসাদেক-এর সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করে ফেলে তবে আদালতের ভয় দেখিয়ে তাদের সঙ্গে পেরে ওঠা যাবে না। প্রকৃত-পক্ষে এতদিন মার্কিন গভর্নমেণ্টের বাধা-দানের ফলেই মার্কিন তৈল ব্যবসায়ীরা বেশিদূর এগোয় নি। মার্কিন গভর্নমেণ্টের বিজ্ঞপ্তি থেকে মনে হয় মার্কিন গভর্নমেণ্ট বলতে চান যে ব্যবসায়ীদের আর বেশিদিন ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। এটা হয়ত বৃটিশ গভর্নমেণ্টকে এই ইঙ্গিত দেওয়া যে এবার একসঙ্গে অর্থাৎ বৃটিশ, মার্কিন এবং ইরাণী মিলে একটা আন্তর্জাতিক কোম্পানী গোছের করে তার মারফৎ তেল বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করে ফেলা দরকার। এই ভাবের কথাবার্তাও শুনা যায় অনেকদিন থেকেই চলছে। কিন্তু ইংরেজরা এতদিন যে জিনিস একলা ভোগ করে এসেছে তার ভাগ আর কাউকে দিতে তাদের প্রাণে সইছে না। কিন্তু আর বেশি-দিন মার্কিন ব্যবসায়ীদের ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। তবে ইংরেজদের একটা ভরসা আছে যে আমেরিকানরা এমন কিছু করতে নিজেরাই ইতস্তত করবে যাতে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশে তৈল-জাতীয়করণের পক্ষপাতী দলগুলি অত্যধিক উৎসাহিত হয়, কারণ নিজেদের সম্পত্তির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও তো আমেরিকানদের চিন্তা আছে। তবে আশু লাভের লোভ দমন করাও কঠিন।

মিশর

মিশরের ডিক্টেটর জেনারেল নেগুইব যে খুব বেশিদিন লোককে সন্তুষ্ট রাখতে পারবেন না, বহু পূর্বেই আমরা এ আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলাম। কিছুদিন থেকেই দেখা যাচ্ছে সে আশঙ্কা অমূলক ছিল না। তবে একটা প্রমাণ এই যে মিশরে রাজনৈতিক দলের যে-সব নেতাকে বন্দী করা হয়েছিল তাদের ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে এবং জেনারেল নেগুইব তাদের সহযোগিতা চাইছেন। এমন কি যে নাহাসকে ওয়াফদ্-এর অনারারী প্রেসিডেণ্ট পর্যন্ত থাকতে দিতে নেগুইব সরকার রাজী ছিলেন না তাঁর সঙ্গেও জেনারেল নেগুইব কথাবার্তা বলছেন। তার মানে বোধ হয় হালে পানি পাচ্ছেন না। ইংরেজরা মুখে যতই তারিফ করুক কার্যত মিশরের জাতীয় দাবী—বিশেষ করে সুয়েজ অঞ্চল সম্পর্কে পূরণ করতে রাজী নয়। অর্থনৈতিক সাহায্যের আশাও এমন কিছু পাওয়া যাচ্ছে না যাতে মিশরের সমস্যা মিটতে পারে। তুলার বাজারের দুর্দশার সীমা নেই। এ অবস্থায় রাজনৈতিক দায়িত্ব একার ঘাড়ে রাখা সমীচীন নয়, ক্ষমতা হাতে রেখে যদি দায়িত্বটা রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেওয়া যায় তো সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। জেনারেল নেগুইব বোধ হয় সেই চেষ্টাই করছেন।

২১।১২।৫২
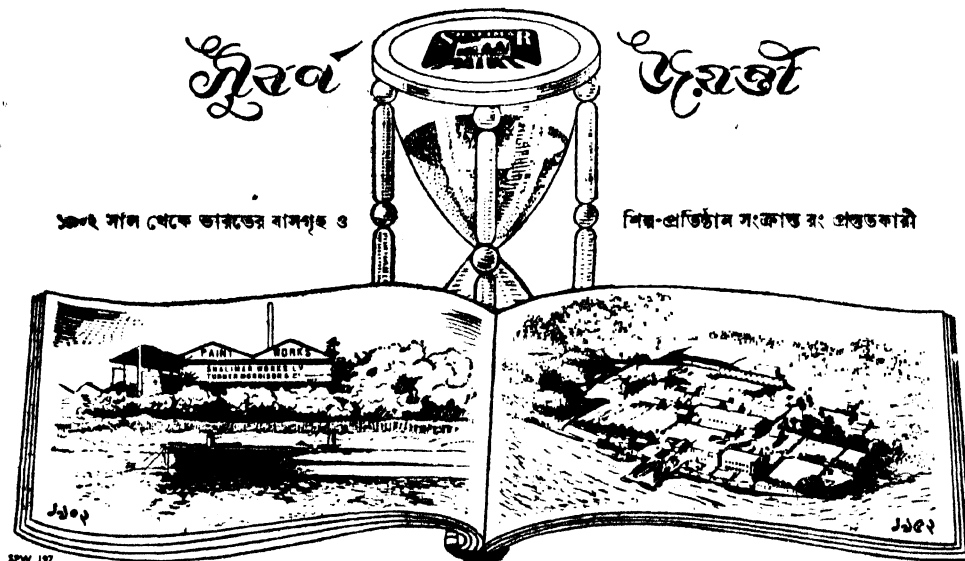
কবিতা

হরপ্রসাদ মিত্র

মনোময়

অজানা, অচেনা পাখি কোথা থেকে আসে শিষ দিতে!
সোনালী গাঁদার বনে দেয় ভুলে ঠোঁটের ঠোকর।
চকিতে আকাশে ভাসে মেঘরঙা পাখার ভেলায়
বাগানে নিড়ানি হাতে মালী করে বকর-বকর।

শালিখ-ময়না-ঘুঘু, পার্টকিলে, শাদা কবুতর—
আসে তো অনেক পাখি কাছাকাছি ঘন বন হতে।
মনোবনে কেউ তারা বাসা বেঁধে যায়নিক ফেলে।
কেবল একটি পাখি ছায়া ফেলে গেছে ফুরসতে।

পাৎলা মেঘের নীচে শাদাবুক ওড়ে গাঙচিল।
টিয়ারা ঝাঁপিয়ে পড়ে ডানা মুড়ে হঠাৎ খেলায়।
একা ধান খুঁটে খায় চুপি চুপি চতুর তিতির।
বটফলে হরিয়াল ভারি খুশি সকাল বেলায়।

এতো পাখি দিয়ে তবু মেটেনাক চোখের পিয়াস!
এ শুধু গভীর মোহ—খুঁৎখুঁতে মনের স্বভাব!

একটি অলীক পাখি এনেছিলো মেঘের কুহক।
সোনালী গাঁদার বনে ফেলে গেছে বাতিল পালক।

সহজিয়া

সকালের সূর্যরাগে নীল নভে মেঘের ভঙ্গিমা।
দুপুরে বাঁশের বনে পাখি আর হাওয়ার আলাপ।
বিকেলে বিস্তীর্ণ চর—বালুবর্ণ বৃহৎ বিষাদ।
রাত্রে রাঙা বলয়ের মাঝে হিম হেমন্তের চাঁদ।

মাঝে মাঝে মনে হয় ঘুম ভেঙে নবজন্মস্বাদ—
ছড়ায় সমস্ত প্রাণে,—এ জীবন বিশাল প্রাঙ্গণ!
বাধা নেই, পীড়া নেই, নেই দীন অজস্র বিরোধ।
আছে নিত্য ক্রমায়নে উদ্বোধন, স্বাদন, গাহন।

তখনই তো সহজিয়া—সর্বস্নায়ু প্রশান্ত পুলকে।
অনেক পথের শ্রম অন্ধকারে হয় বরাভয়।
সানুশেষ জনস্থানে সমতলে বিচিত্র কুহকে—
যে কাল ফুরালো তার কী সহজ নীরব বিলয়!

সহস্র দিনের দীর্ঘ বহুমুখী ব্যাকুল সন্ধানে—
কোথাও জর্মোন স্রোত—জীবনের এই মাত্র মানে।

নিগূঢ়

পাথরে আবদ্ধ জল ইঁদারায় অনেক নীচুতে।
কোনো হাস্য-পরিহাস-ব্যঙ্গ-রোষ যায় না সেখানে।
নিশ্চিত তারই তো দান স্নান-পান অনেক কিছুতে—
অকুণ্ঠ অজস্র সুখে ফুল ফোটে দু'কাঠা বাগানে।

সংসারের দূরে তলে কঠিন মৌনের বেড়া দিয়ে
রেখেছি পরম সত্য প্রাণেমনে গহনে সরিয়ে।

কাশ্মীর ভ্রমণ

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

৩

একদিন আমরা শিকারা অর্থাৎ পানসির মত ছোট নৌকা চড়ে ঝিলম নদী দিয়ে শহরের মধ্যে বেড়াতে গেলুম। শিকারা স্রোতের সঙ্গে ভেসে চলল। ঐ নৌকাগুলি অত্যন্ত নীচু এবং লম্বা; মাথার উপরে চিকণপাটির মত পাটী দেওয়া ছাদ, তার তলায় কারুকাজ করা ঝালর, দুপাশে পর্দা ঝোলানো। বসবার আসনটিও কারুকাজ করা কাপড় দিয়ে মোড়া। প্রমোদযাত্রীরা আরামে গা হেলিয়ে বসেন, রৌদ্র থাকলে পর্দা টেনে দেন, দু-তিনজন দাঁড়ি পান-পাতার মত ছোট ছোট দাঁড় ঝপাঝপ জলে ফেলে নৌকা চালায়। শিকারায় চড়ে শহরের দিকে অগ্রসর হলাম। শহরের মধ্যে নদীর উপর সাতটা ব্রিজ আছে; আজকাল ফার্স্ট ব্রিজ, সেকেন্ড ব্রিজ বলে, কিন্তু ওদেশী ভাষায় ওদের আলাদা নাম আছে। যথা—আমীর কদল, হাব্বা কদল, খেলা কদল ইত্যাদি। শেষে নদীর উপর একটা লক্ (lock) আছে; সেই লকের উপর দিয়ে মাছ লাফিয়ে পড়ে লক পার হয়। ঝিলম নদীতে জল বাড়লে একটি ক্যানেলের মধ্যে বাড়তি জল টেনে নেওয়া হয় ঝিলমের জল কম থাকলে এই লক বন্ধ করে জল বাড়ানো হয় নৌকা চলাচল ঠিক রাখবার জন্যে। ঝিলমের তীরে প্রথম ব্রিজের কাছেই মহারাজার পুরোনো প্রাসাদ। তার পাশে রাণী হল, তারই পাশ থেকে ক্যানালের উৎপত্তি। লকের কাছে গিয়ে সে ক্যানাল আবার ঝিলমে মিশেছে। মহারাজার পুরোনো প্রাসাদের এক কোণে নদীর উপর স্বর্ণচূড় শিবমন্দির; এক-একটা ব্রিজের কাছে নানা রকমের দোকান, শালের দোকান, কাঠের দোকান ইত্যাদি। তাছাড়া ঘন বসতি। পুরোনো দোতলা, তেতলা বাড়ি, অনেক বাড়িতে কাঠের জালি কাজ আছে, অসম্ভব ছোট ছোট আলো-বাতাসহীন ঘর, অত্যন্ত ছোট ছোট গলি-গলি রাস্তা।

মেঘদূতের মেঘ যখন উত্তরাপথে যাত্রা করেছিল, তখন যক্ষ তাকে বলেছিল, সে হিমালয়ে পৌঁছে দেখতে পাবে, নদীতীরে অলকাপুরী। তস্যোৎসঙ্গে প্রণয়িন ইব স্রস্ত গঙ্গা দুকুলাম্। পাহাড়ের গায়ে অলকাপুরী কেমন দেখায়? প্রণয়ীর কোলে প্রণয়িনী যেমন স্রস্তবাসা হয়ে শায়িত থাকে, তেমনই পাহাড়ের কোলে সেই পুরী শায়িত আছে, গঙ্গাটি যেন তার স্রস্তবাস। সেই পুরীর ঐশ্বর্য-বর্ণনায় কালিদাসের কল্পনা উদ্দাম হয়ে উঠেছে—কত অভ্রংলিহ প্রাসাদ, কত ভবনশিখী, কত মণি-মুক্তার ছড়াছড়ি, কত স্ফটিকের অলিন্দ!

এই যে শ্রীনগর নামক পুরীটি, এটিও পাহাড়ের গায়ে এলিয়ে রয়েছে, এরও তলা দিয়ে নদী বয়ে যাচ্ছে, চারপাশে বরফ-ঢাকা পাহাড়, ঠিক একেবারে তস্যোৎসঙ্গে প্রণয়িন
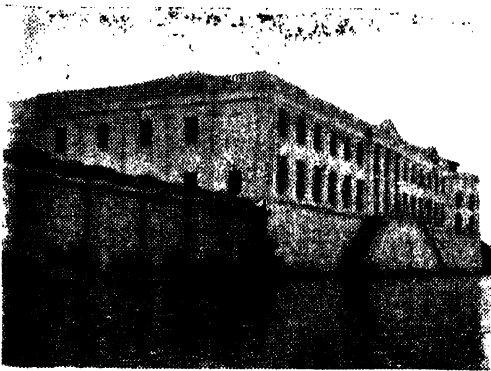
ঝিলমতীরে মহারাজার পুরানো প্রাসাদ—বর্তমানে সরকারী দপ্তরখানা

খানিকটা কাশীর মত দেখতে

ইব প্রস্তগংগা দ্বকুলাম্। কালিদাসের মেঘ এই পথে যাত্রা করেছিল কি না জানিনে, কিন্তু একথা ঠিক যে, এই শহরটি নিশ্চয়ই অলকাপুরী ছিল না।

কথাটা খুলে বলি; শিকারা তো ভাসতে ভাসতে এগিয়ে চলে প্রথম ব্রিজের তলা দিয়ে মহারাজার পুরানো প্রাসাদের সামনে এল; দুপাশে ঘন বসতিও শুরু হল; ঝিলমের জল ঘোলা, শহরের সমস্ত ড্রেন নদীর জলে পড়ছে, সমস্ত আবর্জনা জলে ভাসছে, চারপাশে অজস্র শিকারা, স্থানীয় লোকের বসবাসের বোট, মালের নৌকা। চারপাশে কল্পনাতীত অপরিচ্ছন্নতা। শুনলাম নাকি পূর্বে আরও নোংরা ছিল, শেখ আবদুল্লার আমলে নাকি কিছুটা পরিষ্কার হয়েছে। অথচ অধিকাংশ লোকই এ বিষয়ে নির্বিকার। দিব্যি সকলে সেই জলে হাত-পা ধুচ্ছে, অনেকে স্নানও করছে, সেই জলে রান্নাবান্না হচ্ছে। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই প্রায় স্রস্তবাস হয়ে স্নান করছে, বিশেষত পুরুষেরা, সামান্য আব্রুর জন্য কোথায়ও কোথায়ও নদীর কিনারে জলের মধ্যে কাঠের ঘরের মত করা আছে, তার মধ্যে অনেক সময় স্নানকর্মটুকু সমাধা হয়ে থাকে। কিন্তু নগ্নাবস্থায় বাইরে বেরিয়ে এসে কাপড়-চোপড় পরতে এদের কোন দ্বিধা নেই। নদী দিয়ে শিকারায় পুরুষ-মহিলা যিনিই যান না কেন, আশেপাশে স্ত্রী-পুরুষ যাই থাক না কেন, সে বিষয়ে এদের কোন দৃক্পাত নেই; আমরা ক্রমে
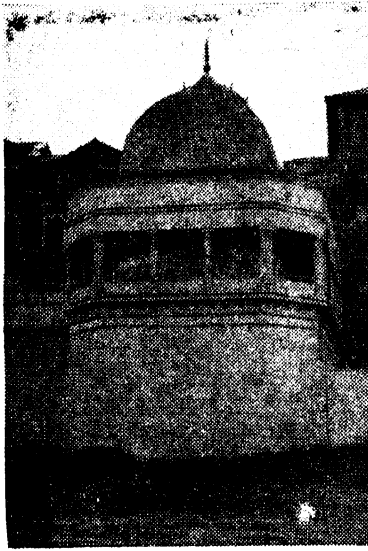
মহারাজার শিবমন্দির

ঝিলম ত্যাগ করে ক্যানালে ঢুকলাম। এখানে জলের স্রোত খুব কম; ড্রেনের সংখ্যা আরও বেশি, জলে বেশ দুর্গন্ধ। দুপাশে উঁচু উঁচু বাড়ি উঠেছে; অনেকগুলির ঘাট একেবারে জল পর্যন্ত নেমেছে, খানিকটা কাশীর মত দেখতে। আশেপাশে ময়লা জলের ধারা, এমনকি, ঘাটের সিঁড়ি বেয়েও অজস্র ময়লা জল ও আবর্জনা গড়াচ্ছে অথচ এরা তারই মধ্যে পরম নির্বিকারচিত্তে হাত-পা ধুচ্ছে, স্নানও করছে, বাসন মাজছে, রান্নাবান্না করছে। আশেপাশের দেওয়াল ফুটো করে ড্রেনের পাইপের মুখ বেরিয়ে আছে, ময়লা জল ঝরছে ক্যানালের উপর; অসাবধানে শিকারা চালালে সেই ময়লা জল শিকারার উপর পড়বে, হায় হায়, এর নাম ভূস্বর্গ। দিলীপ রায় ঠিকই লিখেছেন, কাশ্মীর সম্বন্ধে—হাইজিন আর বিউটি এক বস্তু নয়।

আমরা ক্যানালটি তাড়াতাড়ি ত্যাগ করে আবার ঝিলম নদীতে এসে পৌঁছলাম; এখানে ঝিলম নদীর দুরবস্থা অতখানি না হলে হবে কি, তারও জল কম নোংরা নয়, দুর্গন্ধ থেকেও একেবারে মুক্ত নয়। আমরা একে একে ব্রিজগুলি পার হতে লাগলাম। ব্রিজ বোধ হয় পাকা কোনটিই নয়, প্রথমটি ছাড়া, অধিকাংশই কাঠের ট্রেসলের (Tressle) উপর; থামের মত করে কাঠ সাজানো হয়েছে। বেশ মজবুত, উপর দিয়ে গাড়ি-ঘোড়া সবই চলে, দু-একটি বাদে। নদীর দুপাশে বাড়ির সারি চলেছে, কোনটি দোতলা, কোনটি তেতলা; অবশ্য কোনটিই আমাদের ধারণামত দোতলা-তেতলা নয়। এ সম্বন্ধে পরে আরও বলব। নদীতে সার সার নৌকা বাঁধা। ধারে কোথায়ও দু-একটা মন্দির-মসজিদও চোখে পড়ে। ওদেশের ভাষায় সবই জিয়ারৎ—হিন্দু জিয়ারৎ আর মুসলমান জিয়ারৎ। এখানে ভেদবুদ্ধির সূচনা দেখেছি বটে, কিন্তু তা এখনও প্রবল হয়ে ওঠেনি—সেইজন্য দুই-ই জিয়ারৎ। এই নদীর ধারেই সবচেয়ে বড় মসজিদ—ওখানকার জামে মসজিদ—তার নাম শাহ্-ই-হামদান। মসজিদের চিরাচরিত স্থাপত্য রীতিতে গড়া নয়। সবচেয়ে আশ্চর্য হল এর ছাদে মাটি চাপানো। শোনা যায়, এই মসজিদের গর্ভগৃহ থেকে একটি ঝরণা বেড়িয়েছে; সেই ঝরণা নাকি কালীকে উৎসর্গীকৃত। সেই ঝরণা শাহ্-ই-হামদান থেকে বেরিয়ে পাশেই একটি মন্দিরে প্রবেশ করেছে—মন্দিরটি হিন্দুদের জিয়ারৎ শাহ্-ই-হামদানের একেবারে লাগোয়া।

এবার ডাল লেকের কথা বলি, সেই সুবিখ্যাত ডাল লেক, শ্রীনগর শহর থেকে ডাল লেকের দিকে মুখ করে দাঁড়ালে দেখা যাবে, বাঁ হাতে হরিপর্বত হতে শুরু করে মধ্যে মহাদেব পর্বতমালা হয়ে পরীমহল ও গুলাপবাগ হয়ে পর্বত রেখাটি তখৎ-ই-সুলেমান অথবা শঙ্করাচার্য পর্বতে

ঝিলম নদীর ব্রিজ—শ্রীনগর

ঝিলম নদীর ধার—দু'তিনতলা বাড়ির সার—দূরে দুটি মন্দির চূড়া
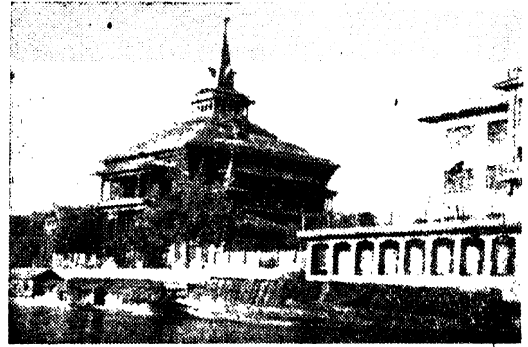
১৪০৪ খৃষ্টাব্দে গঠিত শাহ্-ই-হাস্দা পাশেই হিন্দু জিয়ারৎ

বৃত্তাকারে এসে শেষ হয়ে গিয়েছে। এ পাহাড়গুলি খুব উঁচু নয়, কেবল মহাদেব পর্বতের মাথায় সামান্য কিছু বরফের রেখা গ্রীষ্মকালেও থাকে, স্কুলের ছেলেরা একদিনেই চড়ে ফিরে আসে। এই পাহাড়ের কোলের মধ্যে ডাল লেক। লেকটি পাঁচ মাইল লম্বা, দু মাইল চওড়া। লেকটি প্রায় তিন ভাগ; ডাল গেট দিয়ে প্রবেশ করে প্রথম অংশের নাম গাগ্রিবাল। এখানটা হাউস-বোটে ভরতি। গাগরিবালের সীমানায় একটি ছোট দ্বীপ আছে, সেখানে বসবার জায়গা আছে, সামনে সাঁতারের আড্ডা, বিভিন্ন জলকেলিরও ব্যবস্থা আছে; তারপর শুরু হল বড় ডাল; ওপার থেকে দুটি রাস্তা ডাল ভেদ করে শহর পর্যন্ত গিয়েছে, বড় ডাল এই দুই অংশে বিভক্ত। মধ্যে ছোট একটি দ্বীপ আছে, তাতে চারটি চেনার গাছ আছে, সেজন্য দ্বীপটির নাম চার-চেনারী; আর একটি ছোট দ্বীপে পায়রা বসবার জন্য একটি ছোট ঘর আছে, দ্বীপটির নাম কবুতরখানা। লেকের ডান ধারের পাহাড়—অর্থাৎ শঙ্করাচার্যের ওপাশ দিয়ে ঝিলম বয়ে যাচ্ছে—ঐ পাহাড়ের এপাশে লেক, ওপাশে নদী। লেক থেকে একটি খাল কেটে ঝিলমের সঙ্গে সংযোগ করা হয়েছে, জলের লেভেলের তারতম্য থাকায় ডাল লেক ও খালের সংযোগস্থলে একটা লক আছে; খালটি কিছু দূরে এসে ঝিলমে পড়েছে; সেখানে খালের উপর একটি গেট আছে। তারই নাম ডালগেট। ঝিলমের জল বাড়লে গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়, যাতে নদীর জল লেকে না ঢুকতে পারে। আবার যদি কোন সময়ে লেকের জল বেশি বাড়ে এবং ঝিলমের জল নীচু থাকে —স্বাভাবিকত তাই থাকে—তাহলে খাল দিয়ে হ্রদের জল নদীপথে বেরিয়ে যায়।

কাশ্মীরে এসে শ্রীনগরের শ্রীতে মুগ্ধ না হলেও ডাল লেক সহজেই মন কেড়ে নেয়; কালো জলে হাওয়ায় ছোট ছোট তরঙ্গ উঠছে, ডানামেলা পাখীর মত শিকারা চলেছে, চারপাশে পাহাড়ের বেষ্টনী, ঝির ঝির করে বাতাস বইছে—এখানকার শোভা অপূর্ব। এই ডাল লেকেরই ধারে ধারে বাদশাহী বাগানগুলি, চশমাশাহী, নিশাতবাগ ও শালিমার। তিনটিই শাহ্-জাহানের তৈরি। চশমাশাহী হল সবচেয়ে ছোট, দুই থাকে বাগান। উপরের থাকে পাহাড়ের গা থেকে একটি হিমশীতল ঝরণা বেরিয়ে আসছে; ঝরণার উৎসমুখ পাথরের জালিকাজ দিয়ে ঘেরা। সেখান থেকে সে জলের ধারা উপছে পড়ে সামনে

চশমাশাহীর ঝরণা—পাথরের জালিকাজকরা উৎসমুখ

চশমাশাহী—উপরের থাক—ঝরণা বেরিয়ে আসছে

চশমাশাহীঃ উপরের থাক হতে নীচের থাকের দৃশ্য। ঝরণার জল, ফোয়ারা, ঝাউ, চেনার মাধবীলতা

চলেছে, সেই ধারা আর এক ধাপ লাফিয়ে পড়ে পরের ধাপে নেমেছে, সেখান থেকে তা ডাল লেকের দিকে চলে গিয়েছে। চারপাশে সুদৃশ্য চেনার ও ঝাউ, মাধবী লতার মত কি একটা যেন লতা, আর চারপাশে ফোয়ারা। প্রতি রবিবার ফোয়ারা ছেড়ে দেয়, তখন এ-বাগানের শোভা অপূর্ব। এই ঝরণার জল যেমন ঠাণ্ডা, তেমনই নাকি স্বাস্থ্যপ্রদ। চশমাশাহীর পাশেই একটি গেস্ট হাউস আছে কাশ্মীর সরকারের; পণ্ডিত নেহরু এলে নাকি তাঁকে ঐখানে রাখা হয়। সামনে ডাল লেক, পিছনে পাহাড়, পাশে ঝরণা ও বাগান—জায়গাটি মনোরম।

ডাল লেকের কিনারা ধরে আর একটু অগ্রসর হলেই নিশাতবাগে উপস্থিত হওয়া যায়; ঐ বাগানটি শালিমারের মত অত বড় না হলেও আয়তনে মন্দ নয়; কিন্তু শালিমারের চেয়েও এক হিসেবে এ-বাগানটি আরও চমৎকার। শালিমার বাগানটির দুই কি তিন থাক আছে; থাকগুলিও বেশি উঁচু নয়। কিন্তু নিশাতবাগ আরও খাড়া পাহাড় কেটে গড়ে তোলা হয়েছে। সেইজন্য পাহাড়ের কোল হতে ডাল লেকের তীর পর্যন্ত বহু থাকে ক্রমশ ক্রমশ বাগানটি নেমে এসেছে। প্রত্যেক থাকটি বাঁধানো, সিঁড়ি আছে। শাহজাহানের প্রিয় জিনিস ছিল ঝরণা, উপর থেকে থাকে থাকে ঝরণা নেমে আসছে, তাতে অজস্র ফোয়ারা। থাকগুলির উপর দিয়ে ঝরণা গড়িয়ে প[...] সেখানে দেওয়ালের গায়ের প[...] ঢেউ খেলানো করে কাটা, তার উপর [...] সামান্য জল পড়লেও ভ্রম হয়, কুলকুল [...] ঢেউ চলছে বুঝি। ফুলের বাহার নিশ[...] বাগে অজস্র, কিন্তু তার চেয়েও নজরে প[...] ফলের বাহার। জুন মাসে ফল পাকে [...] কিন্তু তখন গাছে গাছে ফুল এসে[...] আনার গাছে আনারকলি জ্বলন্ত ল[...] রঙের ফোয়ারা ছড়িয়েছে, অন্যান্য ফ[...] গাছে ছোট ছোট ফল ধরেছে, তার গ[...] বাতাস ভারি। একেবারে মৌ-মৌ কর[...] চারপাশে গাছের ঘন ছায়া, ঝরণা চলে[...] তার মধ্যে মধ্যে, ফুলেরা রঙের অজস্র[...] চারদিকে নিজেদের বিলিয়ে দিচ্ছে, বাত[...] গন্ধমন্থর—মনে হল, এই রকম সু[...] নিবিড় বেদনাতেই কোনও সময় কী[...] লিখেছিলেনঃ—

> My heart aches and a drows[...]
> numbness pains
> My sense, as though of hemlo[...]
> I had drunk,
> Or emptied some dull opia[...]
> to the drains*
> One minute past, and Leth[...]
> words had sunk;

শালিমারের খ্যাতি আরও বেশি হ[...] আমার মতে নিশাতের চেয়ে বেশি সু[...] নয়, অবশ্য শালিমার অনেক বড়, [...] চড়াইও নয়। পাহাড়ের সীমানা থে[...] ঝরণা আসছে; প্রথমেই বসবার জ[...] একটি ঘর। সেই ঘরের মেঝের উপর দি[...] জল চলেছে, ধার দিয়ে লাফিয়ে পড়ছে নী[...] সেখান থেকে আবার বাঁধা খাতে প্রবাহি[...]
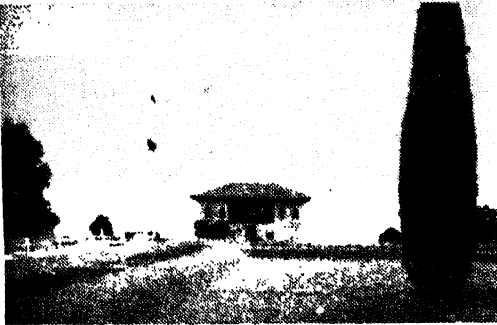
ডাল লেকের তীরে নিশাতবাগ শেষ হয়েছে
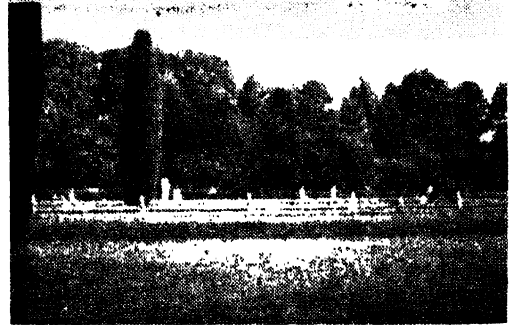
শালিমার বাগ

পাহাড়ের কোল থেকে থাকে থাকে নেমে এসেছে নিশাতবাগ। পিছনে পাহাড় দেখা যাচ্ছে
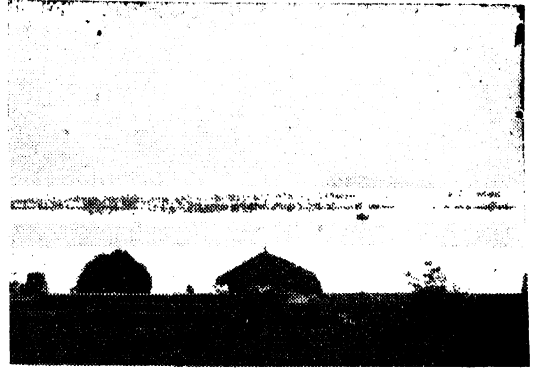
শহরের বাইরে ঝিলাম নদী পাহাড়ের তলা দিয়ে বেঁকে বেঁকে চলেছে

হল সামনে। মধ্যে অজস্র ফোয়ারা, আবার একটি বসবার ঘর; আবার জল লাফিয়ে নামল এক থাক; আবার সামনে ঐরকম ফোয়ারার খেলা। এইভাবে বাগান শেষ হল ডাল লেকের কিনারায় এসে। শাহজাহানের নেশাই ছিল জলের খেলা আর ফ্লের মেলা। দিল্লীর লালকেল্লা দেখলেও তা বোঝা যায়; ঘরে ঘরে চলেছে নহর-ই-বেহেস্ত, হাজারো ফোয়ারার মর্মর মুখ, হামামে ঢেউ-কাটা মর্মরে জল চললে এখনও চোখের ভুল হয়, মনে হয়, ছোট ছোট ঢেউ উঠছে নাকি; এখন আর সেখানে ফুল নেই। কিন্তু কাশ্মীরের এই বাগানগুলি দেখলে কিছুটা কল্পনা করতে পারা যায়, শাহজাহান-পরিকল্পিত জলের খেলা আর ফুলের মেলার অপরূপ সৌন্দর্য।

শালিমার ছাড়াও আরও কয়েকটি বাগান কাছাকাছি আছে। তার মধ্যে শালিমার হতে আরও কিছু দূরে হরবন্‌স্‌ বাগান আছে। এটি খুব উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। একটি নদীকে বেঁধে ছোট জলাশয় করা হয়েছে; এখান থেকে শ্রীনগরের পানীয় জল সরবরাহ করা হয়। এর কাছেই সরকার চালিত একটি ট্রাউট-মাছ-পরিবর্ধন কেন্দ্র আছে। এখানে নানা রঙের ও নানা বয়সের ট্রাউট-মাছ দেখতে পাওয়া যায়। এখানকার রক্ষকদের বললে কুচো কুচো মাছ তারা ছুঁড়ে দেয়, এক-একটা চৌবাচ্চায় শত শত ট্রাউট লাফিয়ে তীরবেগে ছোটে সেই কুচো মাছ ধরবার জন্য—দৃশ্যটি বেশ। এই সব ট্রাউট মাছ পাঞ্জাব এবং অন্যত্র বিক্রি করা হয় মাছের চাষ করবার জন্য। হরবন্‌স্‌ ছাড়া এ অঞ্চলে আরও একটি বাগান আছে ডাল লেকের অন্য কোণায়, তার নাম নিশীথবাগ।

শ্রীনগরের শ্রী সমস্তই এই অঞ্চলটিতে জড় হয়েছে। হমিনস্ত্, উয়ো হমিনস্ত্ উয়ো হমিনস্ত্। শালিমার বা নিশাতবাগে দাঁড়িয়ে দেখি, চারদিকে গোল পাহাড়রেখা, তার পিছনে দূরে বহুদূরে আর একটা বরফ-ঢাকা পাহাড়সারি, মধ্যে লেক, নৌকা চলছে,—এ দৃশ্য কার না মন ভোলায়?

কাশ্মীরের দৃশ্য এক হিসেবে অনন্য। শিলং, দার্জিলিং বা কুমায়ুন—এসব জায়গার সৌন্দর্য নিতান্ত পাহাড়ে সৌন্দর্য; আমরা সমতলের লোক, দার্জিলিং গিয়ে দেখি, পাহাড়ের উপর পাহাড়, সমতল থেকে যেন সিধে উঠে গিয়েছে কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্যন্ত। সেই পাহাড়ের গায়ে শহরটা এখানে-ওখানে উঁচুতে-নীচুতে ঝুলছে, অবিরাম মেঘের আসা-যাওয়া, তার চেহারাটাই অন্য রকম। কিন্তু কাশ্মীরে এরকমটি নয়। দূরে দিক্‌-চক্রবালে বরফঢাকা পাহাড়ের সারি, কিন্তু মধ্যে অনন্ত বিস্তৃত সমতল মাঠ, ধান চাষ হচ্ছে, মধ্যে মধ্যে আবার ছোট ছোট পাহাড়ের চক্র, তার মধ্যে হ্রদ। আবার কোথায়ও পাহাড়ের কোল ঘেঁষে নদী চলেছে, কোথায়ও সে নদী ঝিলমের মত বাঁকে বাঁকে

জেনিভা: লেক, ফোয়ারা: দূরে মঁ ব্লঁ শিখর
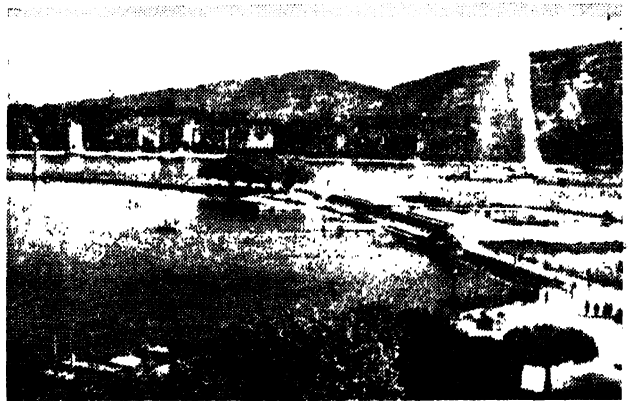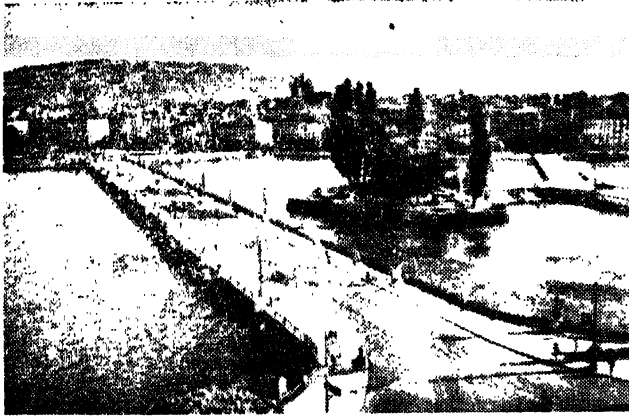
জেনিভাঃ লেক মঁ ব্লঁ ব্রিজ, রুশো দ্বীপ

ব'য়ে চলেছে; কোথায়ও আবার সে লিডার নদীর মত খরস্রোতে পাথরের উপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে গর্জন করতে করতে চলেছে, উঁচু পাহাড়ের মধ্যে গেলে পৌঁছন যায় বরফের রাজত্বে, সেখানে আর সমতলের চিহ্ন নেই, এমন বৈচিত্র্য এবং সেই বৈচিত্র্যের সমন্বয়ে এমন সৌন্দর্য অন্য কোথায়ও মেলে না। আমার তো মনে হয়, কাশ্মীর হ'ল এদেশে য়ুরোপীয় পার্বত্য সৌন্দর্যের নিকটতম সংস্করণ, বিশেষ ক'রে সুইট্‌জরলণ্ডের ছোট পাহাড়, উঁচু বরফ ঢাকা পাহাড়, নদী, হ্রদের তেমনই সমন্বয়।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে এলো। প্রকৃতি তো অকৃপণ হাতে দু' জায়গাতেই প্রায় একই ধরণের সৌন্দর্য ছড়িয়েছেন কিন্তু তার উপর আবার মানুষ চেষ্টা করে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছে। এখানে, স্বীকার করতেই হবে, য়ুরোপ কাশ্মীরকে ছাড়িয়ে গিয়েছে, যেমন জেনিভা বা জুরিখ্ শহরের কথা ধরা যেতে পারে। শ্রীনগরের মত জুরিখ্‌ও একটি নদীর (লিমাৎ নদীর) দু'পাশে গ'ড়ে উঠেছে, সে নদীটি শহরের মধ্য দিয়ে ব'য়ে গিয়ে প্রবেশ করেছে জুরিখ্ হ্রদে। লিমাৎ নদী ঝিলমের চেয়ে চওড়ায় কমই হবে, কিন্তু নদীর ধার কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কিরকম সাজসজ্জা, হ্রদে অত্যাধুনিক মোটর নৌকা, দু'পাশে নানারকম দোকান, পথের ধারে কফি পানের আড্ডা। অথবা, জেনিভা। রোন নদী জেনিভা লেকের একদিক দিয়ে ঢুকে অপরদিক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, সেই বা'র হবার মুখেই জেনিভা শহর লেকের দু'পাশে ছড়িয়ে রয়েছে, নদীর দু'পাশেও, প্রকৃতির কারুকাজ কাশ্মীরের মতই। কিন্তু সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মানুষের কারুকাজ। লেকের যেখান থেকে রোন নদী বেরিয়ে যাচ্ছে সেখানে লেকের দু'পাশ বাঁধানো, তার পাশে কেয়ারি করা অপূর্ব বাগান, রঙীন ফুলের সারি দিয়ে নানা দেশের পতাকা বা রাষ্ট্রীয় চিহ্ন করা রয়েছে, লেকের মধ্যে দু'টি দেওয়াল যেন বাহুপ্রসার করে রয়েছে, সেই বাহুর একটিতে প্রসিদ্ধ ফোয়ারা, জল ওঠে অক্টরলনি মনুমেণ্টের সমান উঁচু হয়ে, রোন নদীর উপরে নানা ব্রিজ, প্রথম ব্রিজের (মঁ ব্লঁ ব্রিজ, Pont du Mont-Blanc) পাশে রুশো দ্বীপ (Ile Rousseau) নামে ঘনছায়া একটি ছোট দ্বীপ, ওপারে ইংরেজ বাগান (Jardin Anglais) নানা রঙের ফুলের সমারোহে ছেয়ে আছে, লেকের ধারে লাল টেবিল চেয়ারে ছোট ছোট রঙীন ইলেক্‌ট্রিক বাতি জ্বালিয়ে আইসক্রীম কফি পানের আয়োজন, এক পাশে ক্যাসিনোতে নৃত্যগীতের আড্ডা, রাত্রে সমস্ত হ্রদের তীর বৈদ্যুতিক আলোক-মালায় ঝকঝক করছে, সার্চলাইটের আলো সেই ফোয়ারার উপর প'ড়ে রামধনু সৃষ্টি করেছে, হ্রদে স্টীমার চলছে, স্নান সাঁতার স্পীডবোটের আড্ডা, দূরে মঁ ব্লঁ-র (Mont Blanc, 'শাদা পাহাড়'—য়ুরোপের সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ) শ্বেত শিখর—মন একেবারে চমৎকৃত হ'য়ে যায়। প্রকৃতিকে তারা এমনই ক'রে সাজিয়েছে যে, তার সৌন্দর্য অন্যরকম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানেও ভারতীয় মনের সঙ্গে য়ুরোপীয় মনের মৌলিক পার্থক্য ধরা পড়ে। ভারতবর্ষ প্রকৃতিকে পূজা করেছে, তার সৌন্দর্যের মধ্যে ভগবানের সান্নিধ্য অনুভব করেছে, য়ুরোপ প্রকৃতিকে মানুষের ক্রীড়াভূমি ছাড়া আর কিছু ভাবেনি। রুটলেজ সাহেবের ভাষায় সেই জন্য, আল্‌প্‌স্ হ'লো মানুষের ক্রীড়াভূমি হিমালয় দেবতাদের। য়ুরোপীয় মনের এই ধারাটিই ওদেশের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে প্রাকৃতিক শক্তিকে বশ করে মানুষের কাজে লাগাবার চেষ্টায়। বার্টাণ্ড রাসেলের কথায়, সে মানুষ প্রথমে চেয়েছিল প্রকৃতির আঘাত থেকে বাঁচতে, তখন সংগ্রাম ছিল প্রকৃতি আর মানুষে। কিন্তু যেই একবার সে প্রকৃতিকে বশ করতে শিখল অমনিই সেই শক্তিকে সে প্রয়োগ করল মানুষের বিরুদ্ধে। রাসেল তাই বলেছেন, যে মানুষের হিত-বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়নি, সে মানুষের হাতে এই অসীম ক্ষমতা এসে পড়াতেই জগতের এই দুর্দশা; সেইজন্য এখন প্রয়োজন হয়েছে মানুষের নিজের অন্তরের সঙ্গে লড়াই করে জয়ী হবার, অর্থাৎ হিতবুদ্ধির প্রতিষ্ঠা চাই, কিন্তু তা'বলে ভারতবর্ষেরও আনন্দ করার কিছু নেই, যে যুগে আমরা প্রাকৃতিক শক্তিকে মানুষের কাজে লাগাবার চেষ্টা না করে ভগবানের সান্নিধ্য অনুভব করবার চেষ্টা করতাম, সে যুগ বা সে সাধনা বহুকাল গত, তার ফলে এখন আমাদের মন নিছক নিষ্ক্রিয়তার পঙ্কে ডুবে গিয়েছে, এমন কি, সাধারণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজনও আমরা আর অনুভব করি না। তা না হ'লে ভিতরে বাহিরে স্তূপীকৃত আবর্জনা সরাবার তাগিদও মনে আসে না কেন?

৪

আমরা হোটেল ছেড়ে হাউসবোটে চ'লে এসেছি। হাউসবোটে থাকলে কাশ্মীরীদের জীবনযাত্রার একটা বিচিত্র আস্বাদ পাওয়া যায়, যা হোটেলে পাওয়া যায় না। হোটেল হ'ল ইংরেজী কায়দার জিনিস, ব্যবসায়ী বুদ্ধি সেখানে বেড়া তুলে রেখেছে। বাস্তবিক ভারতবর্ষ—শুধু ভারতবর্ষ কেন, প্রাচ্যই বলি—আর পাশ্চাত্যদেশের তফাৎই এই। প্রাচ্যের দুয়ার সব সময় খোলা। বাড়ীর দরজা কদাচিৎ বন্ধ হয়। রোয়াকে ব'সে আড্ডা জমে, গ্রামাঞ্চলে বাড়ীর সামনে মাচার উপর পথচালিত মানুষ সহজেই
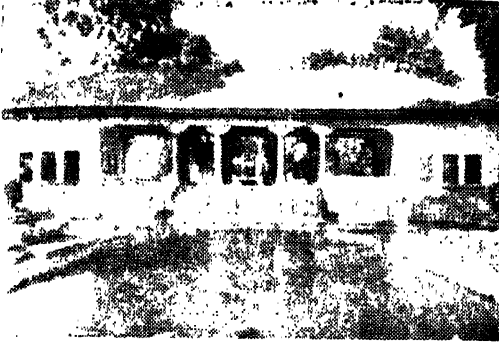
শালিমার বাগানে জলটুংগী ঝরণা ঝরছে
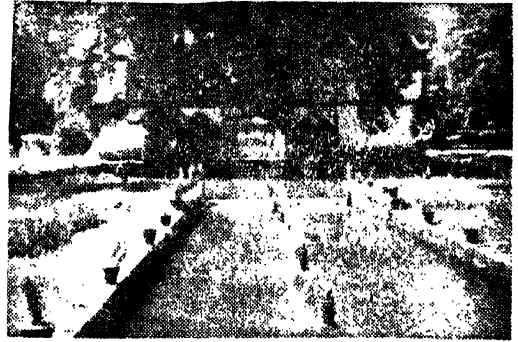
শালিমার—খিলেনের মধ্য দিয়ে দূরে জলটুংগী দেখা যাচ্ছে। সেখান থেকে ঝরণা নেমে আসছে। ফোয়ারা

এসে দু'দণ্ড তামাক খেয়ে খানিকক্ষণ গল্প-সল্প করে যেতে পারে। বাড়ীর মধ্যে ঘরে ঘরে দরজা কখনই বন্ধ থাকে না। বাড়ীর আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব স্বচ্ছন্দেই "কই মশায় কোথায় গেলেন গো" ব'লে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করতে করতে বাড়ীতে প্রবেশ করতে পারে। আজকাল অবশ্য এর কিছু কিছু ব্যতিক্রম হচ্ছে বটে, কিন্তু মোটের উপর এখনও একথা সত্য। পাশ্চাত্যে এসব হবার উপায় নেই। কি হোটেলে, কি বাড়ীতে প্রত্যেকটি দরজা বন্ধ, অনেক ক্ষেত্রে আবার ডবল দরজা, ঢুকতে হ'লে প্রথমে দরজা ঠক্‌ঠক্ করতে হবে, ভিতর থেকে অনুমতি পেলে তবে ঘরে ঢোকা যেতে পারে। নিকটতম আত্মীয়ের বেলাও এর ব্যতিক্রম নেই, এমন কি, এক পরিবারের মধ্যেও। অকারণে এসে আড্ডা জমাবার স্বভাবও সংকীর্ণ—অন্তত পিয়নো ক্লাস বা এইরকম একটা কিছু উপলক্ষ্য হ'লে ভাল হয়, প্রাচ্যে এর উল্‌টো।

হাউসবোটে এলে প্রাচ্যের এই রূপটি অনুভব করতেই হয়। হোটেলে কারবারীদের ঢোকা মানা, কিন্তু হাউসবোটে অন্য ব্যাপার। যেহেতু আপনি কাশ্মীরে এসেছেন এবং হাউসবোটে আছেন, সে হিসেবে তারা আপনার কাছে নানা ধরণের জিনিস নিয়ে আসবে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা আপনাকে বিরক্ত করবে, আপনিও সেসব জিনিস দেখবেন এবং সাধ্যমত কিনবেন—এতে যেন তাদের একটা অদৃশ্য অধিকার রয়ে গেছে। পাথর-ওয়ালা, রূপোর জিনিসের কারিগর, ফুল-ওয়ালা, ফলওয়ালা, কাঠের কাজের কারিগর, শালওয়ালা অবিরত শিকারা চ'ড়ে আসছে—শেষ পর্যন্ত তারা অতিষ্ঠ করে তোলে। এখন এটা প্রায় অত্যাচারে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু এর পিছনে নিছক ব্যবসাদারী ছাড়া ঐরকম একটা মনোভংগীও আছে। কারণ, এমন দু'চারজন শালওয়ালাও অন্তত দেখেছি, যারা, যদি বোঝে যে আপনি সমঝদার ব্যক্তি তা'হলে জিনিস বিক্রীর চেষ্টার বদলে আপনাকে ভাল কারুকার্য দেখাবার জন্য তার আন্তরিক আগ্রহ হয়, আপনি সে জিনিস কিনুন আর নাই কিনুন তার জন্য সে আর মোটেই ব্যস্ত থাকে না। এ আগ্রহ অবশ্য খুব বেশি নেই, তবু এর চিহ্ন একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি। আর, সেই-জন্যই হাউসবোটে ব'সে ওখানকার শিল্প-কাজের নমুনা দেখবার এত সুযোগ মেলে, নানা ধরণের সাধারণ মানুষের সংগে সহজ-ভাবে মিশবার ও কথা কইবার উপলক্ষ্য হয়, চোখের সামনে এতরকমের বিচিত্র চলচ্ছবি ঘটতে থাকে যা ফ্যাশনশাসনবন্ধ কেতাদুরস্ত হোটেলে সম্ভবই নয়।

তা ছাড়া নদীর একটা আলাদা ছন্দ আছে। বহুদিন পূর্বে একবার যখন সুন্দরবন ডেস্‌প্যাসে চ'ড়ে নদীপথে যাত্রা করেছিলুম তখন এই কথাটা সর্বপ্রথম খুব স্পষ্টভাবে অনুভব করেছিলুম। যাত্রার পূর্ব রাত্রে স্টীমার খিদিরপুর ডকের কাছা-কাছি বাঁধা ছিল। সেই সময় বিস্ময়ের
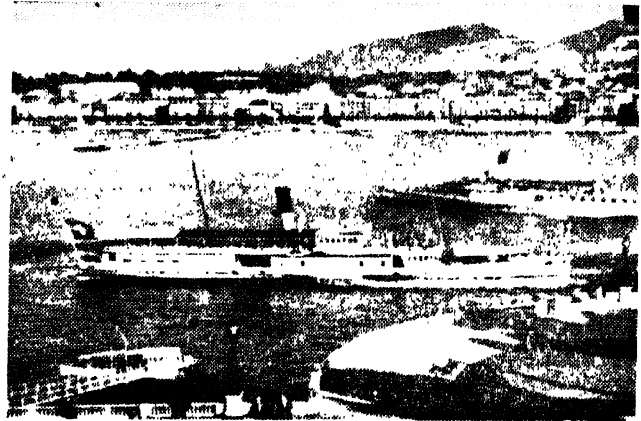
জেনিভাঃ লেক, স্টীমার, বাগান, হ্রদের ধারে দৈ্যুতিক আলোকমালা

সঙ্গে আবিষ্কার করেছিলুম, কলকাতার মধ্যেই এই নদীতে এমন একটা জীবনযাত্রা আছে যার সঙ্গে আজন্ম কলকাতায় থেকেও আমাদের কোনও পরিচয়ই নেই. নৌকো আসে যায়, ঘাটে নৌকো বাঁধা থাকে, তার মধ্যে মাঝিমাল্লারা কেমন ঘেঁষাঘেঁষি করে বসবাস করে, রাঁধে বাড়ে খায়, অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে জলতরঙ্গ বাজনা শোনে, জোয়ারে নৌকো ঈষৎ দুলতে থাকে, আবার কখন ভাঁটা শুরু হয়, ঝড়ের রাতে বাতাস ওঠবামাত্র ব্যস্ত সমস্ত হ'য়ে কাছি টেনে বাঁধতে হয়, আবার যখন নৌকো চলতে থাকে তখন দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন কত বাঁকে বাঁকে ঘুরে ঘুরে তাদের চলতে হয়, কেউ হাল ধরে, কেউ দাঁড় টানে, আবার কেউ বা ছোট কোণটিতে ব'সে রান্নার উদ্যোগ করে. যে হাওয়ায় রান্নার ব্যাঘাত হয় সেই হাওয়া হয়তো তাদের পাল ফুলিয়ে গতিবেগ বাড়ায়, আবার কখনও বা জলে তুফান তুলে প্রলয়কাণ্ড লাগিয়ে দেয়। কতরকম নৌকো চলে, খড়ের নৌকো, মালের নৌকো, পান্‌সি—কারও ধীর মন্থর গতি, কেউ বা তরতর করে চলেছে। তট-ভূমির জীবন থেকে এ বিভিন্ন।

ঝিলমে হাউসবোটে থাকলেও এই কথাটা আবার অনুভব করা যায়। এখানে অবশ্য জোয়ার ভাঁটার খেলা নেই, জল অবিরত চলেছে কলকলস্বরে শ্রীনগর পার হ'য়ে সুদূর উলার হ্রদের দিকে, তারপর উলারের পদ্মবন পার হয়ে চলে যাবে পঞ্চনদীর দেশে। ভোর বেলায় দেখি, নৌকো নেই, তীরে শান্ত চেনাবের মাথায় রোদ ঝিকি-মিকি করতে শুরু করেছে, শুধু জলের কলকল গতি। বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে দু' একটি করে নৌকো বার হয়, দাঁড়ের আঘাতে নদীবক্ষ চঞ্চল হয়ে ওঠে। প্রথমে দু'চারটি শিকারা খরবেগে স্রোতের সঙ্গে ভেসে যেতে থাকে শহরের দিকে শালগম-কপি-পেঁয়াজ-গাজরের পসরা নিয়ে; তারপর আসে ধীরে ধীরে বড় বড় মালের নৌকো শহরের দিক থেকে লগি ঠেলে উজান বয়ে, যত বেলা হয় ততই কারবারী বেপারীদের শিকারা আসতে থাকে, ক্রমে প্রমোদযাত্রীর দল সজ্জিত শিকারায় গা এলিয়ে দিয়ে বেড়াতে বেরোন; কচিৎ বা দু' একটা হাউসবোট যায় নতুন জায়গায় নোঙর ফেলতে ধীর-মন্থর গতিতে,—কুলিরা লগি ঠেলে, হাউস-বোটবাসীরা অলসনয়নে তাকিয়ে থাকে। নদীর কিনারাতেও কতরকমের জীবনযাত্রা, কত লোকের আসা-যাওয়া, নৌকায় ব'সে ব'সেই তীরের লোকের সঙ্গে কতরকম কথাবার্তা, কতরকম কারবার। ক্রমে বেলা গড়িয়ে আসে, শুরু হয় ফেরার পর্ব, প্রমোদযাত্রীরা ক্লান্তিতে শিকারায় গা এলিয়ে দেন, ধীরে ধীরে সন্ধ্যা হয়। চেনাবের মাথায় নেমে আসে অন্ধকার, শিকারার শব্দ আর শোনা যায় না, তীরে লোক যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়, চারিদিক নিস্তব্ধ, শুধু একটানা স্রোতের শব্দ, ওপারের হাউসবোট থেকে দু'চারটি আলো জলে প্রতিফলিত হ'য়ে কাঁপতে থাকে, মাথার উপরে তারাভরা আকাশ, দূরে অস্পষ্ট পাহাড়ের সারি, শঙ্কর পাহাড়ের মন্দিরচূড়ায় আলো স্থিরজ্যোতিতে জ্বলে; দু'চারটি রাতচরা পাখীর আওয়াজ, কচিৎ কখনও বহুদূর থেকে কাশ্মীরী মেয়েদের সরল অনাড়ম্বর সুরের সমবেত-সঙ্গীতে এক আধ কলি ভেসে আসে; সমস্ত মিলে একটি অনাহত সুর চারপাশে বাজতে থাকে। পৃথিবীর সুর, নদীর সুর আর মহাকাশের সুর এক অখণ্ড সুরে মিশে যায়। এই সময়ই অনুভব করি সত্যই

The poetry of earth is
never dead.

কর্ম, কলহ, কোলাহলের বেসুরে মন আচ্ছন্ন থাকলে সে সুরটি ধরা পড়ে না বটে, কিন্তু যখনই এই অসীম স্তব্ধতার মধ্যে সেই বেসুরের বেড়াজাল থেকে মন মুক্তি পায় তখনই তো পৃথিবীর সেই সঙ্গীত আকাশের তারায় নদীর কল্লোলে গাছের মর্মরে মানুষের মনে অনাহত ঝঙ্কারে বাজতে থাকে—The poetry of earth is never dead. (ক্রমশঃ)

নিয়োগ কেন্দ্রে চাকুরীপ্রার্থীদের নাম রেজেস্ট্রী করা হইতেছে

জাতীয় নিয়োগ কৃত্যক

এন দাস

যুদ্ধের পর যুদ্ধ-ফেরৎ সৈনিক ও যুদ্ধ-সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত লোকদের নূতন করিয়া জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিবার সমস্যা প্রবল আকারে দেখা দিলে ১৯৪৫ সালে ভারত সরকারের পুনঃসংস্থাপন ও নিয়োগ সংস্থার (Resettlement and Employment Organization) সৃষ্টি হয়। গত সাত বৎসরে এই প্রতিষ্ঠানটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে চাকুরি ও লোকবল নির্ধারণের ও তদনুযায়ী ব্যবস্থাপনার একটি প্রয়োজনীয় যন্ত্রে পরিণত হইয়াছে।

বর্তমানে ভারতবর্ষের অধিকাংশ বড় শহরে একজন করিয়া এবং কয়েকটি মহানগরীতে একাধিকজন করিয়া নিয়োগ আধিকারিক (Employment Officer) আছেন। দেশের সমগ্র প্রয়োজনের তুলনায় এই প্রকার দপ্তরের সংখ্যা এখনও যথেষ্ট নহে, তবে একটি সুগঠিত ও সুসংহত জাতীয় নিয়োগ কৃত্যক (National Employment Service) যে বেকার সমস্যা ও চাকুরি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে অনেকখানি সাহায্য করিতে পারে, এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে এবং চাকুরিদাতা ও চাকুরিপ্রার্থী উভয়েই উত্তরোত্তর ইহার মূল্য উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন।

অসংখ্য যুদ্ধ-ফেরৎ সৈনিক এবং যুদ্ধ-সংক্রান্ত শিল্প-কারখানা হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত ততোধিক সংখ্যক লোককে পুনরায় অসামরিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যবস্থা নিয়োগ সংস্থার প্রাথমিক কর্তব্য ছিল। মোটামুটিভাবে এইসব লোককে অসামরিক কাজের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া এবং তাহাদের কর্মপ্রাপ্তিতে সহায়তা করিয়া এই কর্তব্য পালন করা হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কারিগরী কাজে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের চাকুরি নিয়ন্ত্রণের জন্য অপেক্ষাকৃত বড় বড় কয়েকটি শিল্প-শহরে কতকগুলি নিয়োগ কেন্দ্র (Employment Exchange) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু জাতীয় নিয়োগ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ১৯৪৫ সালে যুদ্ধাবসানের পর। গোড়ার দিকে ইহা কেবলমাত্র প্রাক্তন সৈনিক ও রণসম্ভার উৎপাদনের কাজ হইতে ছাঁটাই করা কর্মীদের প্রয়োজন মিটাইতেই ব্যস্ত ছিল, কিন্তু পরে সাধারণভাবে কর্মপ্রার্থী মাত্রেরই সেবায় ইহা নিয়োজিত হয়।

নিয়োগ কেন্দ্রগুলি এখন সমস্ত শ্রেণীর কর্মপ্রার্থীর নাম পঞ্জীভুক্ত করে এবং সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে তাহাদের উপযুক্ত চাকুরি জোগাড় করিয়া দেয়। যাঁহারা নিয়োগ কেন্দ্রগুলিতে নাম পঞ্জীভুক্ত করেন, তাঁহাদের মধ্যে উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন ইঞ্জিনীয়ার, কারিগর, ডাক্তার ও অন্যান্য বৃত্তিজীবী হইতে নিম্নতম মজুরীর অনিপুণ শ্রমিক পর্যন্ত আছেন। তাঁহাদিগকে পেশা ও দক্ষতাভেদে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে এবং কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেওয়া হইলে সতর্কতার সহিত পূর্বেই বাছাই করিয়া কর্মপ্রার্থীদের চাকুরিদাতার নিকট প্রেরণ করা হয়। আবেদনকারীদের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা কত ব্যাপক, তাহার একটি প্রমাণ, সম্প্রতি একজন চাকুরিপ্রার্থীকে মাসিক ৩,৭৬০ টাকা বেতনে ফিলিপাইনের একটি চটকলে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের চাকুরী সংগ্রহ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ভারতে নিয়োগ কৃত্যক সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির স্বতপ্রবৃত্তির ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। কোন কর্মপ্রার্থীর পক্ষে নিয়োগ কেন্দ্রে নাম পঞ্জীভুক্ত করার কোন বাধ্য-বাধকতা নাই। আবার, কোন চাকুরিদাতাও নিয়োগ কেন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত কোন প্রার্থীকে নিযুক্ত করিতে বাধ্য নহেন। দ্বিতীয়ত, কোন পক্ষকেই কোন দক্ষিণা দিতে হয় না। গত কয়েক বৎসরে যে সাফল্য অর্জিত হইয়াছে, তাহা প্রধানত
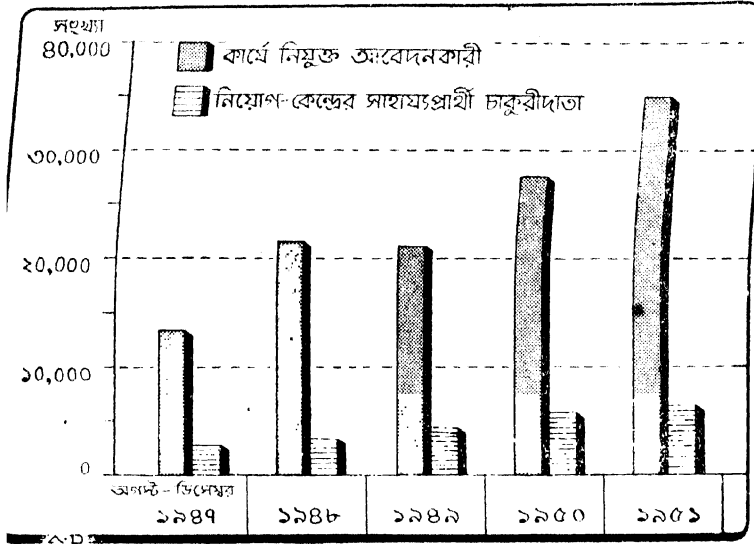
চাকুরীপ্রার্থীদের কার্যে নিয়োগের হিসাব

চাকুরিদাতা ও চাকুরিপ্রার্থী উভয়ের স্বেচ্ছা-প্রণোদিত সহযোগিতার ফল। এই কৃতাকের সহিত চাকুরিদাতাদের সহযোগিতা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। লোক-নিয়োগের কোন নূতন পদ্ধতি প্রবর্তিত হইলেই প্রথম প্রথম অনিবার্যরূপে যে বিরোধিতা দেখা দেয়, ক্রমশ তাহাও অন্তর্হিত হইতেছে। একথাও অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, শ্রমিকদের তরফ হইতেও বরাবর আনুকূল্য পাওয়া যাইতেছে। শ্রমিকরা দেখিতে পাইতেছে যে, নিয়োগ কৃতাক যদি সম্যক পুষ্ট হইয়া উঠে এবং ইহার যথোচিত সদ্ব্যবহার হয়, তবে অতীতকালের গতানুগতিক শ্রমিক নিয়োগ পদ্ধতির অন্তর্নিহিত অনেক গলদ দূরীভূত হইবে।

কাজের সুবিধার জন্য সমগ্র দেশকে কয়েকটি মণ্ডলে ভাগ করা হইয়াছে। আকার ও গুরুত্ব অনুসারে এক বা একাধিক রাজ্য লইয়া এক-একটি মণ্ডল গঠিত এবং প্রত্যেকটি মণ্ডলে পুন-সংস্থাপন ও নিয়োগ সংস্থা একজন মাণ্ডলিক অধিকর্তার অধীন। মাণ্ডলিক অধিকর্তাগণের সংখ্যা এগারো। তাঁহারা পুন-সংস্থাপন ও নিয়োগ সংস্থার মহা-অধিকর্তার (Director-General) নিকট দায়ী। মহা-অধিকর্তার সদর কার্যালয় দিল্লীতে অবস্থিত। সংস্থাটি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার-সমূহ এই উভয় তরফের প্রদত্ত অর্থে পরিচালিত। সংস্থার নীতি ও কার্যক্রম নির্ধারণে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে পারস্পরিক আলোচনা, কমিটি ও সম্মেলন প্রভৃতির মাধ্যমে যোগসূত্র রক্ষিত হয়।

মহা-অধিকর্তা নিয়োগ ও ট্রেনিং সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যার সমাধানে লিপ্ত। পূর্বেই বলা হইয়াছে, ট্রেনিং ব্যবস্থা প্রাক্তন সৈনিকদের পুন-সংস্থাপন প্রক্রিয়ার একটি অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। উপযুক্ত যোগ্যতা-সম্পন্ন প্রাক্তন সৈনিকদিগকে অসামরিক শিল্পে নিযুক্ত হইবার উপযোগী করিয়া তোলার জন্য নানা বিদ্যায় স্বল্পকালীন শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর দেশ-বিভাগের ফলে যাঁহারা পাকিস্থান হইতে ভারতে চলিয়া আসেন এবং যাঁহাদের উপযুক্ত কাজে পুন-প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়োজন দেখা দেয়, সেই সব উদ্বাস্তুদের প্রতিও এই শিক্ষণ-ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করা হয়। এই সকল শিক্ষণ-ব্যবস্থায় ৩১,৩৬৫ জন শিক্ষালাভ করিয়াছেন; তাঁহাদের মধ্যে ২২,০৩০ জন প্রাক্তন সৈনিক এবং অবশিষ্ট উদ্বাস্তু। যথাসম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে পুরুষ ও মহিলাদের চাকুরীর উপযুক্ত করিয়া দেওয়া অথবা নিজস্বভাবে কুটির শিল্প চালাইবার মত ব্যবস্থা করিয়া দেওয়াই এই সকল আয়োজনের লক্ষ্য ছিল এই হেতু স্বভাবতই এ সকল ব্যবস্থায় বিশদ শিক্ষাদানের অবকাশ ছিল না।

তবে ইহা প্রথম পর্যায়ের কথা। ১৯৫০ সালে একটি নূতন শিক্ষণ-পরিকল্পনা প্রবর্তিত হয়। ইহা Adult Civilians Training Scheme নামে পরিচিত। ইহাতে একই সময়ে ১০,০০০ লোক যাহাতে বিভিন্ন বিদ্যায় উচ্চতর মানের দক্ষতা অর্জন করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা হয়। এ যাবৎ এ ধরণের ব্যবস্থা সম্ভব হয় নাই। ১৮ হইতে ২৫ বৎসরের মধ্যে যে কোন উপযুক্ত প্রার্থী এই শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন এবং এই শিক্ষার জন্য কোন ব্যয় লাগে না। শিক্ষার্থীদের কতকগুলি সুবিধা দেওয়া হয়, যেমন বিনামূল্যে কারখানার পোষাক এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা। তা' ছাড়া কিছু-সংখ্যক শিক্ষার্থীকে বৃত্তিও দেওয়া হয়। এই পরিকল্পনা অনুসারে ইঞ্জিনীয়ারিং, পূর্ত ও কুটির-শিল্প সংক্রান্ত কতকগুলি বিদ্যা শেখান হইয়া থাকে। প্রথমটির ক্ষেত্রে শিক্ষাকাল দুই বৎসর এবং শিক্ষায়তনে ও কিছুকাল শিক্ষানবীশ হিসাবে কারখানায় হাতে-কলমে এই শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রথম শিক্ষার্থী দল ১৯৫১ সালের শেষভাগে তাহাদের শিক্ষাক্রম শেষ করিয়াছেন। অধীত বিদ্যার পরীক্ষা গ্রহণান্তে তাঁহাদিগকে নিজ নিজ বৃত্তিতে এ্যাপ্রেণ্টিসরূপে শিক্ষা লইতে পাঠান হইয়াছে।

এই সকল শিক্ষা-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য দুইটি। প্রথমত, এগুলি দ্বারা কর্ম-প্রার্থীরা পেশাগত দক্ষতা অর্জন করিয়া উপযুক্ত কাজ সহজে সংগ্রহ করিয়া লইতে পারেন। দ্বিতীয়ত, এই সকল শিক্ষা ভারতের শিল্পোন্নতির জন্য আবশ্যক দক্ষ কর্মীর যোগান দিতেছে। বিভিন্ন শ্রেণীর কারিগরের জন্য শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষণ-ব্যবস্থা পরিকল্পিত হইয়া থাকে। বিভিন্ন শিল্প-কারখানায় শূন্য স্থান পূরণ ও সম্প্রসারণের জন্য কি পরিমাণ লোক আবশ্যক, তাহার একটি মোটামুটি হিসাব করিয়া লইয়া কি কি বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইবে, কতজনকে শিক্ষা দেওয়া হইবে এবং কোন্ কোন্ স্থান হইতে শিক্ষার্থী লওয়া হইবে, তাহা স্থির করা হয়। এই উদ্দেশ্যে নিয়োগ কেন্দ্রগুলি হইতে প্রাপ্ত তথ্য

ব্যবহার করা ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে অনুসন্ধান কার্য চালান হইয়া থাকে।

শিল্পের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য বহুসংখ্যক কারিগরের শিক্ষাদান এক সুবৃহৎ ব্যাপার। এক যুগেরও পূর্বে যুদ্ধের সময় যখন শিক্ষণ পরিকল্পনা চালু করা হয়, তখন দেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষক ও সুপারভাইজরের অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হইয়াছিল। এমন কি যুদ্ধের পরও এই অভাব সম্পূর্ণ দূর হয় নাই। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য শ্রম-মন্ত্রণালয় ১৯৪৮ সালে মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত কোনি-বিলাসপুরে শিক্ষক ও সুপারভাইজরের জন্য একটি কেন্দ্রীয় শিক্ষায়তন (Central Training Institute) স্থাপন করেন। এই শিক্ষায়তনে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারসমূহ এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রেরিত শিক্ষক ও সুপারভাইজরদের শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। তাঁহারা শিক্ষা সমাপ্ত হইবার পর নিজ নিজ কারখানা বা প্রতিষ্ঠানে ফিরিয়া যান। এ পর্যন্ত সাতটি দলে ৬৬৭ জন শিক্ষক ও সুপারভাইজরকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এবং ১২৪ জন শিক্ষার্থীর অষ্টম দল ১৯৫২ সালের গোড়ার দিক হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিতেছেন।

সর্বভারতীয় ভিত্তিতে শিক্ষা ও সার্টিফিকেট প্রদানের কোন নির্দিষ্ট মানের অভাব ভারতে কারুনৈপুণ্যের সাধারণ মান উন্নয়নের এক প্রধান প্রতিবন্ধক হইয়া রহিয়াছে। বিশেষত ইহা শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রের পরিধি সংকুচিত করিয়া দিয়াছে। যন্ত্রশিল্পীদের পারদর্শিতার মান নির্ণয় করিয়া দিতে পারেন, এরূপ ক্ষমতাসম্পন্ন কোন কেন্দ্রীয় সমন্বয়ী কর্তৃপক্ষের অভাব সবচেয়ে বড় রকমের ত্রুটি। ভারত সরকার এখন একটি নিখিল ভারত ট্রেডস সার্টিফিকেসন বোর্ড গঠনের পরিকল্পনা রচনার জন্য এক কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। এই প্রস্তাবিত বোর্ড শিক্ষার মান নির্ধারণ করিবেন, পরীক্ষা লইবেন এবং ইঞ্জিনীয়ারিং ও পূর্ত বিদ্যায় যন্ত্রশিল্পীদের যোগ্যতার সার্টিফিকেট দিবেন। এইরূপ একটি বোর্ড স্থাপিত হইলে এবং সর্বভারতীয় ভিত্তিতে সার্টিফিকেট প্রদানের ব্যবস্থা হইলে শিল্প-নৈপুণ্যের মান উচ্চতর হইবে এবং নিয়োগ সংস্থারও সুবিধা হইবে।

নিয়োগ কৃত্যকের কাজ সর্বভারতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ে চাকুরিদাতা এবং শ্রমিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিনিধিগণের সহযোগিতায় নির্বাহ হয়। এই সহযোগিতা ত্রিপক্ষীয় নিয়োগ উপদেষ্টা কমিটি-গুলির মাধ্যমে পাওয়া যায়। এই উপদেষ্টা কমিটিগুলিতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার-সমূহ এবং চাকুরিদাতা ও শ্রমিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিনিধিগণ রহিয়াছেন। কেন্দ্রে একটি কেন্দ্রীয় নিয়োগ উপদেষ্টা কমিটি মহা-অধিকর্তাকে পরামর্শ দিয়া থাকেন; মাণ্ডলিক সদর কার্যালয়ে এবং উপমণ্ডলে (Sub-Region) মাণ্ডলিক ও উপমাণ্ডলিক উপদেষ্টা কমিটি রহিয়াছে। এভাবে, যাহাদের সেবায় নিয়োগ কৃত্যক রতী হইয়াছে, তাহাদেরই প্রতিনিধিগণের সুচিন্তিত অভিমত অনুযায়ী ইহার কর্মনীতি নির্ধারিত হইতেছে।

১৯৪৭ সালে দেশ-বিভাগের ফলে বিপুল সংখ্যায় উদ্বাস্তুরা আসিতে থাকিলে পুন-সংস্থাপন ও নিয়োগ সংস্থার উপর প্রচণ্ড চাপ পড়ে। যতদূর সম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে রাশি রাশি উদ্বাস্তুর নাম পঞ্জীভুক্ত করিতে ও তাহাদের চাকুরির সংস্থান করিয়া দিতে হইবে। বিভিন্ন বিদ্যা ও বৃত্তির জন্য ট্রেনিংএর ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। নিয়োগ কেন্দ্রগুলির উপর সীমান্ত রাজ্য পূর্ব পাঞ্জাবেই সবচেয়ে বেশী চাপ পড়ে। এই সমস্যার সুরাহার জন্য নিয়োগ দপ্তরের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হয় এবং এগুলি উদ্বাস্তুদের পুন-প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য কাজ করে। এই কাজ এখনও চলিতেছে।

গত কয়েক বৎসরে কাজের অগ্রগতি কয়েকটি সাংখ্যিক হিসাব দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। ১৯৪৬ সালের শেষ দিকে যেখানে ৬৯টি নিয়োগ কেন্দ্র ছিল, আজ সেখানে ভারতীয় ইউনিয়নের বিভিন্ন রাজ্যে ১২৬টি নিয়োগ কেন্দ্র কাজ করিতেছে। ১৯৪৬ সালে প্রতি মাসে গড়ে ২,৫৭০ জন চাকুরিদাতা নিয়োগ কেন্দ্রগুলির সাহায্য গ্রহণ করিতেন। ১৯৫১ সালে এই সংখ্যা ছিল ৬,৩৫৪। ১৯৪৬ সালে যেখানে মাসে গড়ে ৪৭,১০০ জন কর্মপ্রার্থী নাম লিখাইয়াছিলেন, ১৯৫১ সালে সেখানে মাসে গড়ে ১১৪,৬০০ জন কর্মপ্রার্থী নাম লেখান। ১৯৪৬ সালে গড়ে মাসে ৮,৮৫১ জনকে চাকুরি জোগাড় করিয়া দেওয়া হইয়াছিল; এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৫১ সালে ৩৪,৭৩৮ হয়।

বিভিন্ন কাজ জানা শ্রমিকদের বিভিন্ন স্থানে অসম বণ্টন নিয়োগ কৃত্যকের সম্মুখে এক সমস্যা-বিশেষ। এক স্থানে হয়তো বিশেষ কোন কোন কাজ জানা কর্মীর ঘাটতি, আবার পাশাপাশি অন্য স্থানেই হয়তো তাহারা উদ্বৃত্ত। অদক্ষ শ্রমিক ছাড়াও অপিসে বসিয়া লেখাপড়ার কর্মপ্রার্থীদের বিপুল তালিকা দ্বারা নিয়োগ কেন্দ্রগুলির রেজিস্টারী বহি ভারাক্রান্ত। দেশের অর্থনীতি ও শিক্ষা-পদ্ধতির ত্রুটিই প্রধানত ইহার জন্য দায়ী। এই হেরফের দূর করিবার জন্য অবশ্য চেষ্টা করা হইতেছে, তবুও মসীজীবির বৃত্তির উপর আরোপিত অযথা গুরুত্ব হ্রাস করিয়া বৃত্তি বণ্টনের সাধারণ কাঠামোকে সংশোধন করিতে বেশ কয়েক বৎসর সময় লাগিবে। কারিগরী বিদ্যা শিক্ষার যে অধিকতর সুযোগ দেওয়া হইতেছে এবং দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি দক্ষ শ্রমিকের নিয়োগ-ক্ষেত্র যেভাবে প্রশস্ততর করিয়া দিতেছে, তাহাতে এই চেষ্টার সাফল্য অনেকখানি অবধারিত। নিয়োগ কৃত্যক এই ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে।

শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রের ভৌগোলিক গণ্ডী

সম্প্রসারণ নিয়োগ কেন্দ্রগুলির আর একটি লক্ষ্য। কর্মপ্রার্থী ও দূরবর্তী স্থানের চাকুরি-খালির সংবাদ একত্রিত করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে বটে, কিন্তু উচ্চতর বেতনের চাকুরি ছাড়া সাধারণভাবে চাকুরিপ্রার্থীরা নিজেদের জেলার বাহিরে যাইতে অনিচ্ছুক।

কালক্রমে কোন বিশেষ অবস্থার একদল লোকের পুনর্বাসন-ব্যবস্থার বদলে সাধারণ-ভাবে কর্মপ্রার্থীদের যাহাতে কর্মপ্রাপ্তি হয় সে দিকেই জোর দেওয়া হইতেছে। স্বভাবতই এই ব্যবস্থাকে কার্যকরী করিবার জন্য জাতীয় নিয়োগ কৃত্যকের উদ্ভব হইয়াছে। চাকুরিদাতা এবং চাকুরিপ্রার্থী উভয়েই সমানভাবে এই প্রতিষ্ঠানে আসিতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে এই প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের ইহারা সমান অংশীদার। দেশের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে এই কৃত্যক নতুন ও বিভিন্ন কর্মপন্থা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত রহিয়াছেন। যেহেতু ইহা একটি অভিনব উদ্যম এবং নতুন পরীক্ষা, কাজেই সাধারণ লোকের আচার ব্যবহার, রীতি-নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এবং অবস্থা বিশেষের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ইহাকে পরিচালিত করিতে হইতেছে। একই সঙ্গে ইহাকে অন্য কাজও করিতে হইতেছে। শ্রমিক সংগ্রহের গতানুগতিক পদ্ধতি ত্যাগ করিয়া একদিকে ইহা নতুন পথের ভিত্তি রচনা করিতেছে এবং অন্যদিকে ইহা চাকুরীর বাজারকে সুসংগঠিত করিতেছে।

কর্মপ্রার্থীদের চাকুরীর ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া এবং নাম রেজিস্টারী করা ছাড়াও এই সংস্থা ভালো চাকুরী সংগ্রহ করিয়া দিয়া এবং সন্ধান দিয়াও সাহায্য করে। অতি সামান্য অবস্থা হইতে শুরু হইলে এই সংস্থার সম্মুখে বহু কাজ পড়ি আছে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সেবার জন্য এ সংস্থা আরও বহু নিয়োগ কে খোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। বৃ নির্ণয়ক্ষেত্র এবং চাকুরী-উপদেষ্টার ক্ষে পর্যন্ত ইহার কার্যকলাপ সম্প্রসারণ কর প্রয়োজন। শিক্ষা এবং চাকুরীর সুযোগ লাভের জন্য দীর্ঘস্থায়ী ট্রেনিংএর মধ্যে ইহাকে একটি সংযোগ রক্ষাকারী যন হিসাবেও ব্যবহার করা যাইতে পারে কেবলমাত্র এই সকল বিভিন্ন উপায়ে পুন-সংস্থাপন ও নিয়োগ সংস্থ ভারতবর্ষের বিপুল লোকবলকে সংগঠি করিতে ও উন্নততর নিয়োগ ব্যবস্থা প্রবর্ত করিতে পারেন।

বা দামী কেড্‌স্, মাটি-ছুঁই-ছুঁই কোঁচা, গিলে করা আদ্দির [illegible]জাবী, চুলের সংখ্যা স্বল্প কিন্তু [illegible] কটি আছে সে কটিই বেশ [illegible] আঁচড়ানো। কপালের কাছ বরাবর [illegible]উ তোলার একটা প্রয়াস। ধোপদোরস্ত [illegible]পোষাকের সঙ্গে কিন্তু মানুষটার মিল নেই। [illegible]বড়ানো গাল, মটর ডালের কড়ির মতন [illegible]কের চিপি সলতে-প্রমাণ গোঁফের ছোঁয়ায় [illegible]রো বেমানান। কালো জমির মাঝখানে [illegible]লচে এক জোড়া চোখ। কিন্তু এক জোড়া [illegible]লে হবে কি, দশ জোড়ার কাজ ক'রে [illegible]লেছে। লোকটা আলিপুরের পুলের [illegible]ড়া থেকে শুরু ক'রে এদিকে ঝাঁকড়া নিম-[illegible]তলা অবধি পায়চারি করছে আর চোখ [illegible]রিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে এদিক ওদিক। [illegible]স্তার এ মাথা থেকে ও মাথা। কারুর [illegible]ন্য বুঝি অপেক্ষাই করছে।

অপেক্ষাই অবশ্য করছে বদন। নয়তো [illegible]মন ঝাঁঝাঁ দুপুরে মানুষ কি আর সখ করে [illegible]দ পোহায়! কিন্তু বিশেষ কারুর জন্য নয়, যে কোন মালদার লোক হলেই হবে। ছত্রিশ প্যাঁচের পাগড়ী মাথায় বনোয়ারীলাল চণ্ডারিয়াই হোক কিংবা পেটমোটা খাট ফতুয়া আঁটা তেলকলের মালিক বঙ্কু সাহা হ'লেও ক্ষতি নেই।

বদন পুলের রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালো কিছুক্ষণ। আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলো কে জানে। অবশ্য দেখবার মতন মুখ তো ওই একজনের। উঠতে বসতে ওই দেখতে হয়। আশে পাশের নতুন মানুষের মুখ দেখার সাধ্য আছে বদনের। পাঁচির মা খেংরে দূর ক'রে দেবে বাড়ি থেকে। জাঁহাবেজে মেয়ে মানুষ। একটু বেচাল সইবে না।

কিন্তু বরাতটা সত্যি খারাপ, নইলে হাত পিছলে অমন শিকার পালিয়ে যায় কখনো!

শিয়ালদর কাছ থেকে বদন পিছু নিয়ে-ছিলো। চালচলনেই মালুম হ'য়েছিলো নতুন আমদানী। এক একটা রাস্তা পার হ'তে কম পক্ষে বিশ মিনিট। একেবারে দেহাতী। বিহারের গণ্ডগ্রামের বাসিন্দা তাতে আর কোন সন্দেহ ছিলো না। কিন্তু কামিজের বুক পকেটে মনিব্যাগের স্ফীত কোণাটা উপেক্ষার নয়। একটু গা ঘেঁষে যেতে পারলেই কাজ ফতে। ভীড়ের চাপে অল্প ধাক্কা। তারপর দু আঙুলের কসরৎ। বৃথাই বদন চার বছর আব্দুল মিঞার সাকরেদি ক'রে নি। শুধু একটু অন্তরঙ্গ হবার ওয়াস্তা।

সুযোগও জুটে গেলো। তিন নম্বর বাসে লোকটা উঠতেই বদনও সেই বাসের পা দানীতে উঠে পড়লো। ভগবান সহায়। ভীড়ের চাপে সোজা হ'য়ে দাঁড়ানোই দায়। গাদাগাদি। এক একটা ঝাঁকুনিতে এদিকের লোক ওদিকে। আচমকা একজনের পকেটে আর একজনের হাত ঢুকে গেলেও বলবার কিছু নেই। শুধু চোখের কোণ কুঁচকে মুচকি হাসি একটু। খানিকটে সলজ্জ ভাব। মিষ্টি মোলায়েম সুরে বলা, 'মাপ করবেন, ভীড়ের চাপে—'

কথা আর শেষ হবে না। ওদিকের ভদ্রলোক বিরত হ'য়ে উঠবেন, 'বিলক্ষণ, এ আর কি। ভীড়ে এমন হ'য়েই থাকে।'

বিহারীকে তাক ক'র বদন আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলো। প্রায় জুত ক'রে এনেছিলো। মাঝখানে শুধু একজন লোক। আধাবয়সী বাঙালী। রড ধ'রে টাল সামলাচ্ছেন। বদন আড়চোখে আর একবার শিকারের আপাদমস্তক দেখে নিলো। মনিব্যাগের কোণা ভীড়ের চাপে আরো একটু ওপরে ঠেলে উঠেছে। বারো আনা দেখা যাচ্ছে। ঝাঁকুনীতে আচমকা

গায়ে গিয়ে পড়া। তৈরিয়া হ'য়ে ড্রাইভারকে গালাগাল। চোদ্দপুরুষ তুলে। ব্যস তার মধ্যেই হাত সাফাই। বদন আধাবয়সীর পাশ কাটিয়ে বিহারীর কাঁধে কাঁধ ঠেকালো।

সোনায় সোহাগা। একে টেইটুম্বুর ভীড়, ঠেসাঠেসি মানুষে মানুষে, তার মধ্যেই বিহারীটি রড ধ'রে নিমীলিত চক্ষু। খাটিয়ায় ঘুমোনো অভ্যাস হ'লে হবে কি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও কম যায় না। বুকের ওপর থুতনি মিশলো। ঝাঁকড়া গোঁফের কাঁপুনীর সঙ্গে মৃদু মন্দ আওয়াজও।

বাস হাজরা রোডে বাঁক নিতেই বদন লোকটার গায়ে গিয়ে পড়লো। সামান্য হিসেবের ভুল, তাতেই সব কাজ পণ্ড। পাশের লোকের ছাতির হাতলে হাতটা আটকালো, তার মধ্যেই বিহারী সজাগ। গর্জন থামিয়ে চোখ মেলে চাইলো, তার পর নিচু হ'য়ে দেখেই চেঁচিয়ে উঠলো, 'আরে ভাইয়া, রোখকে, রোখকে।'

ভাইয়াদের রুখতে একটু দেরী হ'লো। যেখানে সেখানে তো আর গাড়ী বাঁধা যায় না। বদনের ইচ্ছা ছিলো বিহারীর পিছন পিছন সেও নেমে পড়বে, অমন দেহাতী শিকার হামেশা মেলে না। কিন্তু ভীড় ঠেলে নামতে নামতেই বিহারী উধাও। রিক্সা থামিয়ে তাতে চেপে বসেছে।

মিনিট দু তিন ফুটপাথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিহারীর বাপান্ত, ওর বাহান্ন পুরুষ নরকস্থ হবার প্রার্থনা, তারপর বদন মণ্ডল আস্তে আস্তে আলিপুরের দিকে পা চালালো।

সেই থেকে ঠায় দাঁড়িয়ে। এই পুল অবধি ওর সীমানা। ওপারে যাবার এক্তিয়ার নেই। অন্য মানুষের এলাকা। গিয়ে পড়লে জরিমানা দিতে হবে, নয়তো ডবল খাটুনি।

ফিরে যাবে কিনা ভাবতে ভাবতে বদন মুখ ফিরিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। মালদার কেউ না হোক, কিন্তু এও শিকার হ'তে পারে। কে কখন কি বেশে আসে কিছু বলা যায় না। বাস থেকে নেমে নিম-গাছতলায় দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক চাইছে। দিক ভুল করেছে বোধ হয়, দু চোখের দৃষ্টিতে ভুল ঠিকানার নিশানা।

বদন গ্যাসপোস্টের কাছ বরাবর সরে এলো।

খয়েরী জমি, নক্সা কাটা পাড়, চোখ টাটানো টকটকে লাল ব্লাউজ, খোঁপা ঢাকা আধ ঘোমটা, দু পায়ে আলতার ছোপ। টলটলে মুখের ভাব, লাল টুকটুকে ঠোঁট কিন্তু এ সবের চেয়েও ঝকঝকে চুড়ির থোক। এক এক হাতে চার গাছা। ঘাড়ের পাশে হারের চেকনাই। বদন মণ্ডল ইষ্ট-দেবতার নাম জপ করলো। মন্দার বাজার। গত তিনদিন একটি পয়সা হাতে আসেনি। গড়ের মাঠে এক বাঙালীবাবুর ব্যাগ হাতে এসেছিলো। কিন্তু অবস্থা শোচনীয়। সাড়ে ন আনা পয়সা আর একটি হাড় জিরজিরে শুটকো মেয়ের ছবি। সব বাবুদেরই এক হাল।

বুকের কাছে শাড়ীটা চেপে মেয়েটি এদিক ওদিক দেখলো। সিঁথিতে সিঁদুরের প্রলেপ। কর্তা নেই এই সুযোগে ধর্ম করতে বেরিয়েছে হয়তো। এক টানে কালী-বাড়ী আর নকুলেশ্বরতলা। হুট হুট ক'রে বাইরে বেরোনো মেয়ে নয় সেটা চোখমুখের ভাবেই বোঝা যাচ্ছে।

মাথায় একটা ফন্দীফিকির আসবার আগেই মেয়েটি বদন মণ্ডলের কাছ ঘেঁষে দাঁড়ালো। বাতাসে তেলের খোসবো, চুড়ির ঝুনঝুন, তারপরেই মোলায়েম গলা, 'মাপ করবেন, মার বাড়ির রাস্তাটা কোনদিকে বলতে পারেন?'

বদন মণ্ডলের খুশী খুশী ভাব চোখে মুখে উপচে পড়লো। জাল ছুঁড়ে পাখী ধরবে কি, পাখী ঝাঁপিয়ে পাখনা আটকালো জালের দড়িতে।

'মার বাড়ী মানে কালীঘাটের কথা বলছেন?' বদন রাস্তার ওপাশের দোকানের সাইন বোর্ডের দিকে চোখ ফিরিয়ে বললো কথাটা। সামনাসামনি চেয়ে দরকার নেই। ডাগর দুটো চোখের দিকে চাইলে সব গোলমাল হ'য়ে যাবে। কি বলতে কি বলে ফেলবে!

'হ্যাঁ' মেয়েটি আরো একটু সরে এলো।

ধুলোর ঘূর্ণি উড়িয়ে একটা বাস পুলের ওপর উঠলো। মেয়েটি আঁচল চাপা দিলো মুখে। উঃ কি ধুলোর বহর! বাস অদৃশ্য কিন্তু ধুলোর কমতি নেই। এই ফাঁকে আড়চোখে বদন একবার মেয়েটির দিকে নজর চালালো। হার দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু চুড়ির গোছা আরো স্পষ্ট, আরো উজ্জ্বল। সিনেমার ছবির মতন সেই ধুলোর পর্দা ভেদ করে রঙীন ছবির সার বদনের সামনে ভেসে উঠলো। ফটিক স্যাকরার দোকান, এক মুঠো টাকা, হাসি হাসি মুখ পাঁচির মার। অঢেল আদর যত্ন। ভালো ভালো খাবারের সঙ্গে ভালো ভালো কথাও।

'আপনি বুঝি এর আগে আসেননি এদিকে?' মেয়েটি আঁচল নামাতে বদন চিবিয়ে চিবিয়ে বললো।

'এসেছিলাম, খুব ছেলেবেলায়। যে সময় রাস্তাঘাট অন্য রকম ছিলো, এত ঘিঞ্জি হয়নি বাপু' মেয়েটি নাক সিটকালো।

'তা সত্যি, কি লোকই শহরে বাড়ছে দিন দিন' মেয়েটির আফশোশের সুরে বদনও সুর মেশালো।

মিনিট দুয়েক চুপচাপ। তারপর বদনই কথা বললো, 'আসুন এইদিক দিয়েই সোজা হ'বে ব'লেই ঢালু জমি বেয়ে নামতে শুরু করলো।

মেয়েটি কি ভাবলো কে জানে। পায়ের আঙুল দিয়ে ধুলোয় আঁক কাটলো। খুব মিহি গলায় বললো, 'আপনি কষ্ট ক'রে আবার যাবেন কেন। আমাকে রাস্তাটা বলে দিন, আমি খুঁজে পেতে ঠিক চলে যাবো।'

বদন কোঁচাটা গুটিয়ে ডান হাতের কব্জির ওপর রাখলো। মুখ ফিরিয়ে মুচকি হাসির চেষ্টা করে বললো, 'তবেই হ'য়েছে, এখান থেকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেই পথ চিনে যেতে পারবেন, মার বাড়ীর রাস্তা এত সোজা কিনা। তার ওপর নেমেছেন উল্টো জায়গায়। পিছু হেঁটে এখন অনেকটা যেতে হবে।'

'সর্বনাশ' মেয়েটি কপাল চাপড়ালো, 'মাথায় থাক আমার মার বাড়ী। এতটা পথ এই রোদে ঘুরতে হবে।'

ডাংগায় তোলা মাছ বঁড়শীশুদ্ধ পিছলে জলে পালিয়ে যায় এমনি অবস্থা। বঁড়শী আর মেহনত দুই লোকসান। ভগবান জানেন, সোমত্ত পুরুষ মানুষকে দেখে ভয়ই পেয়েছে হয় তো। বেশী আগ্রহ দেখানোও ঠিক নয়।

বদন রুমাল বের ক'রে ঘাড়ের ঘাম মুছলো। রুমাল পকেটে রাখতে রাখতে বললো, 'দেখুন তা হ'লে বলুন ঠিক ক'রে। আমাকে আবার আলিপুর যেতে হবে। ছাপাখানার কাজ রয়েছে।'

মেয়েটি ভুরু কুঁচকে কি ভাবলো। ফিস ফিস ক'রে নরম গলায় বললো, মার বাড়ী যাবার নাম ক'রে বেরিয়েছি। এমনি এমনি ফিরে গেলে পাপ লাগবে। ঘুরেই আসি। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে ফিরতে পারবো তো। বাচ্ছাকে শ্বাশুড়ীর কাছে রেখে এসেছি।'

পানের ছোপ লাগা দাঁতের সার বের ক'রে বদন অমায়িক হাসলো, 'খুব, খুব। অতক্ষণ সময়ই বা নেবে কেন!'

বস্তি. মাঝে মাঝে দু একটা কাঠ চেরাইয়ের কারখানা। টেপাকলের মুখে বস্তির মানুষেরা বালতি বসিয়ে গেছে সার সার। কুণ্ডলী পাকানো ঘেয়ো কুকুর ছাই গাদায়। সদর রাস্তায় পড়বার মুখে বদন কথা বললো, 'কালীঘাটে কিন্তু বড্ড ভীড়, খুব সাবধান। তীর্থধর্ম করতে যা না। লোক এসেছে, তার চেয়ে বেশী এসেছে পকেটমার আর গাঁট কাটা।'

'ওমা তাই নাকি' মেয়েটির ভয়চকিত গলা, শুনেই আমার হাত পা পেটের ভিতর সেঁদিয়ে যাচ্ছে। একলা এসে ভালো কাজ করি নি।'

কোন ভয় নেই' বদন মণ্ডল একটা হাত নেড়ে অভয় দিলো, 'আমি তো রয়েছি সংগে. চোখে চোখে রাখবো।'

'আপনি যাবেন মন্দির পর্যন্ত' একটা ইঁটে হোঁচট খেয়ে মেয়েটি একেবারে বদনের পিঠের ওপর এসে পড়লো। আলতো নরম স্পর্শ, শাড়ীর খসখসানি, কিন্তু তার চেয়েও মোলায়েম লাগলো চুড়ির ঝুনঝুন। কান জুড়ানো আওয়াজ।

বদন থেমে পড়লো, 'আহা, লাগে নি তো। আপনি বরং আগে আগে যান।'

মেয়েটি পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেলো। সরু পথ। সদর রাস্তায় গিয়ে দুজনে পাশাপাশি যেতে পারবে। অসুবিধা নেই। কিন্তু ভেবে ভেবে কূলকিনারা করতে পারলো না বদন। আশে পাশে তেমন লোকজন অবশ্য নেই। আচমকা ভয় দেখিয়ে গুদামঘরের পিছনে নিয়ে গিয়ে কাজ হাসিল করা যেতে পারে। হারটা খোলা তো মিনিট দুয়েকের ব্যাপার। চুড়ি কগাছায় যা দেরী। মিনিট দশ বারোর মধ্যে কারবার শেষ কিন্তু অসুবিধেও রয়েছে। ভয় যদি না মানে মেয়েটা। যদি চেঁচামেচিই শুরু করে। অনাচ কানাচ থেকে মানুষ এসে জড়ো হবে। হৈ হল্লা চীৎকার। ল্যাজ গুটিয়ে বদন মণ্ডল পালাতে পথ পাবে না। তেমন তেমন হ'লে ফুলকোচা গুটিয়ে টেনে ছুট। মারমুখো ভীড়ের হাতে পড়লে হাড় আর মাস এক জায়গায় থাকবে না। এমনিই নড়বড়ে দাঁতের সার, মোক্ষম ঘুষির চোটে পাটিকে পাটি খুলে আসবে।

অন্য মতলব বের করতে হবে একটা। মিষ্টি কথায় মন ভিজিয়ে দরকার সারতে হবে।

'আপনিও মন্দির অবধি যাবেন নাকি?' মেয়েটির আচমকা গলার আওয়াজে বদন একটু থতমত খেয়ে গেলো। চট ক'রে কিছু উত্তর জোগালো না মুখে। কপালের ওপর একটা হাত রেখেছে আড়াআড়িভাবে। রোদ আড়াল করার জন্য। চিক চিক ক'রে জ্বলছে দুটি চোখের তারা।

হঠাৎ ভয় পেয়ে চোখের তারা দুটো কেমন হ'য়ে যাবে মনে মনে বদন সেটাও ভেবে নিলো। সচরাচর মেয়েমানুষের গায়ে হাত দেওয়া ওর পছন্দ নয়। এ সব ব্যাপারে অনেক হাঙ্গামা। মাস ছয় সাত সে পাড়ায় আর পা দেওয়া চলে না। কে কোথা দিয়ে দেখে ফেলবে ঠিক কি। তা ছাড়া চেহারার পাত্তা পুলিশের খাতায় গিয়ে ওঠে। খুব ভালো ক'রে ভোল না পালটে চলাফেরা করা দায়। তা ছাড়া, এটা ওর লাইনের ব্যবসাও নয়। এতে অনেক ঝক্কি। এর চেয়ে দু আঙুলের খেলায় বিপদ অনেক কম। মানুষটা চেনবার উপায় রইলো না, অথচ আর একজনের পকেটের জিনিস নিজের কাছে চলে এলো। যার খোয়া গেল, তার পাশে দাঁড়িয়ে সান্ত্বনা দেওয়াও চলে, ভবিষ্যতে সাবধান হ'য়ে চলার উপদেশ বাণী।

কিন্তু এ ছাড়া বদন আর উপায়ও দেখলো না। পুরোপুরি তিনটে দিন একেবারে ফাঁকা। একটি পয়সা রোজগার নেই, অথচ খরচের বহর কম নয়। পাঁচির মা, দুটো অপোগণ্ড বাচ্ছা, তেল চুকচুকে নধর চেহারা বস্তির মালিক নীলমণি দাঁ রয়েছে। ঠিক সপ্তাহ কাবার হবার মুখেই হাত পেতে দাঁড়াবে, 'কই হে, মণ্ডলে'র পো, টাকা কটা দিয়ে দাও, আমার আবার দোকানে বেরোতে হবে।'

সব সপ্তাহে যে হাত পাতলেই টাকা দেওয়া চলে এমন নয়। বদন নীলমণিকে আড়ালে ডেকে নিয়ে যায়, নিচু গলায় ফিস-ফিস ক'রে নিজের অবস্থার কথা বোঝায়, তিন দিনেক সময় চায়।'

কিন্তু এ সবেরও তো সীমা আছে। দু হপ্তার ভাড়া বাকী, পাঁচির মার কানের টপ দুটো পোদ্দারের দোকানে, ছোট ছেলেটার দিন দুয়েক বিকেলের দিকে ঘুষঘুষে জ্বর। অবশ্য সর্দারের কাছে ধার চাওয়া যায় কিছু। কিন্তু সে ভারি লজ্জার কথা। লুঙ্গির গিঁট ঢিলে ক'রে সর্দার কিছু টাকা হয় তো ছাড়বে, কিন্তু টিপে টিপে বুলিও কম ছাড়বে না, 'কি মোড়ল, হাত দু'খানা জগন্নাথকে দিয়ে এলে নাকি? জোয়ান মানুষের হাত কি শুধু পরের কাছে পাতবার জন্য? তার চেয়ে ও হাত দিয়ে নিজের গলাটা টিপে ধ'রো, নয়তো বোরখা প'রে আমার হারেমে এসো, অন্নজলের ব্যবস্থা করবো।'

এই রকম সব হাড় বিঁধোনো কথা; বুকে জ্বালা ধরিয়ে দেয়।

এর আগে অবশ্য আর একবার এই ধরণের কাজ করতে হ'য়েছিলো। এক বুড়ীর কাছ থেকে নোট ডবল ক'রে দেবার নাম ক'রে কুড়ি টাকা নিয়ে হাওয়া। সে প্রায় বছর চার পাঁচ আগের কথা।
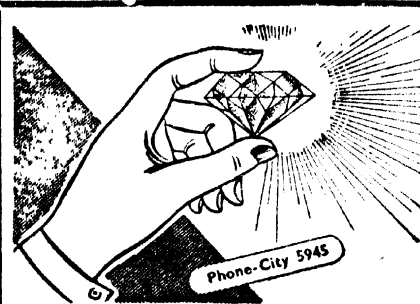
সরু শড়ক। দুটো চালাঘরের মাঝখান দিয়ে। খড় কাটার মেশিন ছিলো এক সময়ে এখন ফাঁকা। আশে পাশে লোকজনের চিহ্ন নেই। একটু এগোতে গিয়েই বদন বাধা পেলো।

মেয়েটি ফিরে দাঁড়িয়েছে। পুরনো কথার খেই ধরে বললো, 'মার বাড়ী অবধি যাবেন নাকি?'

একটু আমতা আমতা করলো বদন। রুমাল দিয়ে কপাল ঘাড় মোছার চেষ্টা, তারপর বললো, 'এমনিতে তো যাওয়াই হয় না, আপনার কল্যাণে ঘুরেই আসি মন্দিরটা।'

'তা হ'লে তো ভালোই হয়'—মেয়েটি দু পা এগিয়ে এলো, 'যে ভীড়ের ভয় দেখালেন, গাঁটকাটার হাতে না পড়ি। অবশ্য চুড়িগুলো একেবারে হাতের মাপের, কব্জি না কাটলে খোলার উপায় নেই। তবে হারটা একটু টানলেই খুলে যাবে?'

বড় বড় চোখ মেলে মেয়েটি বদনের দিকে চাইলো।

বদন মণ্ডলের অবস্থা কাহিল। তালু শুকিয়ে কাঠ। কপালের দুটো রগ টিপ টিপ করছে। বলতে চায় কি মেয়েটা। হার ছিনিয়ে নেবে তা অমনভাবে বদনের দিকে চেয়ে থাকা কেন। যেমনি চোখ, তেমনি কি চাউনী। শুধু চামড়ার ওপর চোখ বোলানো নয়, ত্বক ভেদ ক'রে সন্ধানী দৃষ্টি আরো যেন গভীরে। হাড় মাংস রক্ত নয়, মানুষের মনের কথাগুলোরও বুঝি খোঁজ পায়।

'তার চেয়ে এক কাজ করবো বাপু' পানের রসে ভেজানো ঠোঁট দুটি মুচকে মেয়েটি হাসলো 'আপনি বাইরে দাঁড়াবেন, হারছড়া আপনার কাছে রেখে দর্শন করে আসবো, তারপর না হয় আপনি যাবেন, কেমন?' মেয়েটি আলতো ঘাড় কাত করলো।

ঘাড় কাত করা তো নয়, প্রমাণ সাইজ মানুষটাকেও যেন কাত করা।

কিন্তু হারছড়া আসবে হাতের মুঠোয় বিনা মেহনতে। বদনের সমস্ত শরীর শির শির ক'রে উঠলো। সামনের ডুমুর গাছের ফাঁক দিয়ে মন্দিরের চুড়োর কিছুটা নজরে আসছে। বদন মণ্ডল মেয়েটির চোখ বাঁচিয়ে নিজের চোখ বুজলো, 'মা, মুখ তুলে চাও। অপার করুণা মা তোমার। অভাগাকে—'

দাঁড় কাকের বাজখাই ডাকে টনক নড়লো। আর দেরী নয়, একটু পা চালিয়ে গেলেই হবে। সামনের ছোট গলি, তারপর বাঁ হাতি একটা বাঁক, ব্যস তাহ'লেই একেবারে মন্দিরের সদর দরজা। কাজ হাসিল করে ফেরবার সময় অবশ্য এ পথ নয়, একেবারে ওধারের আঁকাবাঁকা শড়ক ধ'রে পা বাড়াতে হবে। বলা যায় না, বাইরে এসে হারের জিম্মাদারকে না দেখতে পেয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদুনী গাইতে শুরু করলেই সর্বনাশ। মেয়েছেলের কান্নায় গ'লে যাবার মতন লোকেরও তো অভাব নেই। তাড়া ক'রলেই হ'লো। কাজেই সোজা শড়ক নয়, একেবারে গঙ্গার পাড় ঘেঁষে হাঁটি হাঁটি পা পা ক'রে টালিগঞ্জের দিকে রওনা, কিংবা
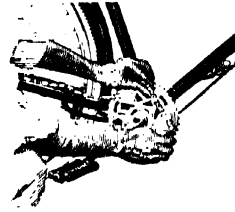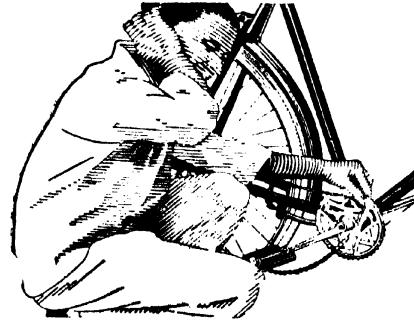
চৌমাথায় দাঁতের মলম বিক্রী করার ভীড়ে মিশিয়ে দিলেই হবে নিজেকে।

গলির মধ্যে ঢোকবার মুখেই মেয়েটি থমকে দাঁড়ালো। 'ওমা, অভয় সরকার লেন, না?'

মেয়েটির চোখের দিকে চেয়ে বদনও নজর ফেরালো।

বাজ পড়া ত্রিভঙ্গ নারক'ল গাছ। পাতার বালাই নেই। তারই মাঝ বরাবর দোমড়ানো টিনের পাত। অভয় সরকার লেন, তাও স্পষ্ট নয়, লেনটা পড়বার উপায় নেই। চোখ বটে মেয়েটির। ঠিক ঠাওর করেছে।

'কেন অভয় সরকার লেনে কি দরকার?' বদন জিজ্ঞাসা না ক'রে পারলো না।

'আঠারো নম্বরটা খুঁজে বের করতে পারেন, আমার রাঙা-মামীর বাসা যে এখানে, এ পথে এসেই যখন পড়লাম, একবার দেখা করেই যাই।'

বদন কষ্টে দম সামলালো। এ পাশের নারক'ল গাছের ওপর তো নয়, বাজ যেন পড়লো ওরই ব্রহ্মতালুতে। যত ঝামেলা। মাসী মামী এসে জুটবে এক গাদা। নানা মুনির নানা মত। গলার হার আর বদনের হাতে আসছে না। উঠকো লোকের হাতে সোনার গয়না ছেড়ে দেবে এমন বোকা মেয়ে অভয় সরকার লেনে নেই। একেবারে পাড় বরাবর এনে ডিঙিগ উল্টে দেওয়ার গতিক। ভিজে কাপড়ে হাবুডুবু খেতে হবে কেবল। কপাল চাপড়ে মরতে ইচ্ছা হ'লো বদনের।

কিন্তু উপায়ও নেই। নাচতে নেমে ঘোমটা টানলে কখনও চলে, না ভিক্ষে করতে বেরিয়ে চলে সরু চালের বায়না। পায়ে পা মিলিয়ে বদন মেয়েটির পিছনে হাঁটতে শুরু করলো। নম্বর দেখতে দেখতে।

সবে সাতের দুই; পর পর তিনখানা সাতের নম্বরই চললো, ভাগের বাড়ি বোধ হয়, তারপর একেবারে এগারো। বাড়ি নয়, কাঠের গুদাম। মালিক খাটিয়ায় ঝিমোচ্ছে। খালি জমি তারপর আগাছায় ভর্তি। ঝোপের গা ঘেঁষে চালাঘরের সার। টিনের দেয়াল, ঢেউ টিনের ছাদ। সামনের দুখানা দরজা ছেড়ে আঠারো নম্বরের সন্ধান মিললো। দরজার ওপরই চুণ দিয়ে বড় বড় ক'রে নম্বরটা লেখা। আধ মাইল দূরে থেকে নজরে আসে। নম্বরের পাশেই সিনেমা কোম্পানীর মানুষ সমান বিজ্ঞাপন আঁটা।

'এই তো আঠারো নম্বর' বদন আস্তে বললো।

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি ঝাঁপিয়ে পড়লো দরজার ওপর, 'ও রাঙা মামী, দোর খোলো গো। রোদ্দুরে একেবারে ভাজা ভাজা হ'য়ে গেলাম।'

মিনমিনে মেয়েটার গলার বহর দেখে বদন অবাক। কার ভিতর কি আছে বলা মুশকিল। অনেকদিন পরে আপনার লোকের সন্ধান পেয়ে মেয়েটার বুঝি জ্ঞানগম্যি নেই।

বার তিনেক, তারপর মেয়েটা দরজায় হাত ঠেকাবার আগেই খিল খোলার শব্দ।'

আঁট সাঁট গড়ন, ভিজে চুল মাথার ওপর চুড়ো ক'রে বাঁধা, খাটো শাড়ী পরনে মাঝ-বয়সী একজন মেয়েছেলে দরজা খুলেই ভিতরে চলে গেলো। ফিরে চাওয়া নয়, একটু শব্দ নয় মুখের, কে না কে এসে দরজায় দাঁড়িয়েছে। রাঙামামীর ব্যাপারে মেয়েটা না হোক বদন বেশ হকচকিয়ে গেলো। এতদূর থেকে ভাগ্নী এসে পেঁছোলো ধুলো পায়ে, আদর আপ্যায়ন চুলোয় যাক, চিনতে যে পেরেছে মুখ চোখের এমন ভঙ্গীও নয়।

মেয়েটির কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই, চৌকাঠ পার হ'য়েই বদনের দিকে ফিরে চাইলো, 'আসুন একটু জিরিয়ে নিই। তেষ্টায় বুকের ছাতি শুকিয়ে গিয়েছে।'

বদনের বুকের ছাতিও অবশ্য ভিজে নেই, কিন্তু সে তেষ্টায় নয়, মেয়েটার চালচলনে।

'আসুন, আসুন রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে থাকবেন না' মেয়েটি মিষ্টি হেসে দরজার পাশে সরে দাঁড়ালো। বদনের ঢোকবার জায়গা ছেড়ে দিয়ে।

এক পা দু পা ক'রে বদন ঘরের মধ্যে ঢুকলো।

মেঝেয় শীতলপাটি বিছানো। কোণের দিকে সাজানো ইঁটের ওপর গোটা দুয়েক ট্রাঙ্ক। এ পাশে আলনায় শাড়ী সেমিজ কয়েকটা। আরো কোণে মাঝারী সাইজের হ্যারিকেন, চিড় খাওয়া চিমনি। অভাবের সংসারের উপকরণ সাজানো। বদন আড় চোখে গোটানো বিছানাটাও দেখে নিলো।

আচমকা খিল দেওয়ার শব্দে বদন ফিরে চাইলো। খিল এ'টে মেয়েটি শীতল পাটির এক ধারে এসে বসেছে। মাথার ঘোমটা কাঁধের ওপর, উস্কোখুস্কো কোঁকড়ানো চুলের রাশ, হাসিতে টলটল করছে সারা মুখ।

'নাও বসো ভালো হ'য়ে। জামা ছাড়বে তো ছাড়ো। সন্ধ্যের আগে আর যেতে দিচ্ছি না।'

'তার মানে?'

'আহা, ন্যাকামী দেখে আর বাঁচি না' মেয়েটি বদনের গা ঘেঁষে বসলো।

সব বুঝতে খুব অসুবিধা হ'লো না বদনের, তবু একবার জিজ্ঞাসা ক'রেই ফেললো, 'তোমার রাঙামামীর কথা বললে না?'

একবার মেয়েটি খিল খিল ক'রে হেসে উঠলো। বদনের গায়ে আলতো ধাক্কা দিয়ে বললো, 'মাস মাস ভাড়া গুণে মরছি আমি, রাঙা মামীর বাসা হ'তে যাবে কোন দুঃখে গা', তারপর হাসি থামিয়ে ফিস ফিস ক'রে যেন মনের গোপন কথা বলছে, এমনিভাবে বদনের কানের কাছে মুখ এনে বললো, 'মাইরী, দুদিন একটি দানা পড়েনি পেটে। কিছু পয়সা বরং আগে দাও, রাঙামামীকে দিয়ে কিছু আনিয়ে নিই দোকান থেকে।'

বদন চট ক'রে মনে মনে একবার হিসেব ক'রে নিলো, বুক পকেটে খুচরো নিয়ে টাকা দেড়েকের মতন আছে, সেটা আজ খতম হবে। ট্যাঁকে গোঁজা দু টাকা লুকোনোই থাক। অসময়ের সম্বল। দিন-কাল কতদিন এমন মন্দা চলবে ঠিক আছে।

শ্রীবিমল মিত্র

(৮)

যথাসময়ে ঠাকুর এসে সেদিনও ডাকলে—ভাত বেড়েছি বাবু—

সেদিন তেমন কিছু গোলমাল হলো না। কিছু তরকারিও দিলে পাতে। তবু গত কয়দিন ধরে যেমন ব্যবহার করছিল, তার চেয়ে যেন কিছুটা ভালো। ভুতনাথ নিজের মনে মনে লজ্জিত হলো। ঠাকুরের ওপর অন্যায় করে সে অবিচার করছিল এ ক'দিন। হয়ত তার কোনও হাত নেই। আসলে তার জবা দিদিমণিই হয়ত ভাঁড়ার থেকে চাল-ডাল তরকারি দেওয়া কমিয়ে দিয়েছে। জবাময়ীর তাচ্ছিল্যের প্রমাণ ভুতনাথ তো আগেই পেয়েছে। যেদিন ব্রজরাখালের সঙ্গে সে প্রথম চাকরি হবার দিন এসেছিল। বাপ-মা-পিসীমার দেওয়া নামই সকলের থাকে। জবার নামও রেখেছিল সুবিনয়বাবুর কালীভক্ত হিন্দু বাবা। নিজের নাম কেউ নিজে রাখে না জন্মাবার পর। নিজের নামের জন্যে সকলকে পরের ওপরেই নির্ভর করতে হয়। তা' ছাড়া 'ভুতনাথ' নামটার মধ্যে কোথায় যে হাস্যকরতা রয়েছে তা ভেবে পাওয়া যায় না। সকলেরই ঠাকুর-দেবতার নাম। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের একজন দেবতা মহেশ্বর—তাঁরই একনাম ভুতনাথ! আর সুবিনয়বাবুর বাবার নামই তো বিশ্বেশ্বর। তার বেলায়!

সেদিন সুবিনয়বাবুই গল্প করছিলেন—প্রথম যেদিন দীক্ষা নিলাম সে কী কাণ্ড ভুতনাথবাবু—শুনুন তবে—

জবা সুবিনয়বাবুর মাথার পাকা চুল তুলে দিচ্ছিল। বললে—আমি সে গল্প দশবার শুনেছি বাবা—

—তুমি শনেছ মা, কিন্তু ভুতনাথবাবু তো শোনেন নি—কী ভুতনাথবাবু, আপনি শুনেছেন নাকি—

তারপর ভুতনাথের উত্তরের প্রতীক্ষা না করে বললেন—আর শুনলেই বা—ভালো জিনিষ দশবার শোনাও ভালো—

বলে সুবিনয়বাবু গল্প শুরু করেন—

এই যে 'মোহিনী-সিঁদুরে'র ব্যবসা দেখছেন, এ আমার বাবার। বাবা ছিলেন গোঁড়া হিন্দু, তান্ত্রিক, কালী ভক্ত। ছোটবেলায় মনে পড়ে—বাড়ির বিগ্রহ কালীমূর্তির সামনে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যান করছেন—'ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপং'—। কালীমন্ত্র জপ করতে করতেই তিনি স্বপ্নে এই মন্ত্র পান—। সেই মন্ত্রপূত সিঁদুরই 'মোহিনী-সিঁদুর' নামে চলে আসছে। তা' বাবা ছিলেন বড় গরীব, ওই, যজন-যাজন নিয়েই থাকতেন, কিন্তু বোধ হয় দারিদ্র্যের জন্যই দয়াপরবশ হয়ে কালী ওই মন্ত্র দিয়েছিলেন যাতে সংসারে স্বাচ্ছল্য আসে—আমরা মানুষ হই—দু'মুঠো খেতে পাই—। মনে আছে খুব ছোটবেলায় বাবা শেখাতেন—'বাবা তোমরা কোন্ জাতি?'

তারপর নিজেই বলতেন—বল, আমরা ব্রাহ্মণ—

আবার প্রশ্ন—কোন্ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ?

নিজেই উত্তর দিতেন—বল, দাক্ষিণাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ—

তারপর প্রতিদিন পূর্বপুরুষের নাম মুখস্থ করাতেন।

—তোমার নাম কী—

—তোমার পিতার নাম কী?

—তোমার পিতামহের নাম কী?

পিতামহ, প্রপিতামহ, বৃদ্ধপ্রপিতামহ—সকলের নাম মুখস্থ করাতেন আমাদের। এখনও চোখ বুজলে দেখতে পাই তাঁকে বুঝলেন ভুতনাথবাবু—। মনে আছে আমি ছোটবেলায় হুঁকো কলকে নিয়ে খেলা করতে ভালবাসতুম। দিনের মধ্যে অন্তত দশবারোটা মাটির কল্‌কে ভাঙতুম—মনে আছে বাবা সেই উঠোনের ধারে বসে বসে আমার জন্যে মাটির কল্‌কে তৈরী করে শুকিয়ে পোড়াচ্ছেন। তখন এক পয়সায় আটটা কল্‌কে—সে-পয়সাও খরচ করবার মত সামর্থ্য ছিল না তাঁর—

তারপর অবস্থা ফিরলো। 'মোহিনী-সিঁদুর' বেচে চালা থেকে পাকা বাড়ি হলো—দোতলা দালান কোঠা হলো—মা'র গায়ে গয়না উঠলো—। আর আমি এলাম কলকাতায় পড়তে। সেই পড়াই আমার কাল হলো, আমি চিরদিনের মত বাবাকে হারালাম—

গল্প বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যান সুবিনয়বাবু।

জবা বলে—থামলেন কেন—বলুন—

সুবিনয়বাবু তেমনি চোখ বুজিয়ে মাথা নাড়তে লাগলেন—না আর বলবো না—তোমাদের আমার গল্প শুনতে ভাল লাগে না—

—না ভাল লাগে বাবা, ভাল লাগে, আপনি বলুন—জবা আদরে বাবার গায়ের ওপর ঢলে পড়লো।

—আপনার ভালো লাগছে, ভুতনাথবাবু—সুবিনয়বাবু এবার ভুতনাথের দিকে চোখ ফেরালেন।

ভুতনাথ বললে—আপনি আমাকে 'আপনি' 'আজ্ঞে' বলেন—আমি বড় লজ্জা পাই—

—তবে তাই হবে—আচ্ছা তুমি মা একবার জানালা দিয়ে দেখে এসো তো তোমার মা ভাত খেয়েছেন কি না—

জবা চলে গেল।

সুবিনয়বাবু বলতে লাগলেন—যেবার সেই ডায়মণ্ডহারবারে ঝড় হয়—সেই সময় আমার জন্ম—সে এক ভীষণ ঝড়, বোধ হয় ১৮৩৩ সাল সেটা—কলকাতায় সেই প্রথম ওলাউঠো হলো—জন্মেছি ঝড়ে'র লগ্নে—সারাজীবনটা কেবল ঝড়ের মতনই বয়ে গেল, দীক্ষাও নিলাম আর পৈতেও ত্যাগ করলাম—বাবাকেও একটা চিঠিও লিখে দিলাম সব জানিয়ে—বাবা খবর পেয়ে নিজেই দৌড়ে এলেন। এসে নিয়ে গিয়ে দেশে একটা ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রাখলেন—একমাসের মধ্যে আর ঘরের বাইরে বেরোতে পারলাম না—আমি একেবারে বন্দী—

জবা এসে বললে—মা এখনও ভাত খায়নি—বলছে তোমাকে খাইয়ে দিতে হবে—

—ও তা হলে বাবা, আমি জবার মাকে ভাত খাইয়ে আসি, আবদার যখন ধরেছেন তখন কিছুতেই আর ছাড়বেন না—

ভূতনাথের বিস্মিত দৃষ্টির দিকে চেয়ে বললেন—জবার মা'র অসুখটা আবার বেড়েছে কি না কাল থেকে—বেশ ভালো থাকেন মাঝে মাঝে—আবার......

সুবিনয়বাবু চলে গেলেন। যাবার সময় বললেন—তুমি বসো মা জবা, ভূতনাথ-বাবুর সঙ্গে গল্প করো—আমি তোমার মা'কে ভাতটা খাইয়ে আসছি—

হঠাৎ ভূতনাথ কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠলো।

তবু কথা বলতে চেষ্টা করলে—তোমার মা'র এ-রকম অসুখ কতদিনের—

জবা মাথা নিচু করে বসেছিল, কথাটা শুনেই মাথা বেঁকিয়ে চাইলে ভূতনাথের দিকে—বললে—আপনি আবার আমার সঙ্গে কথা কইছেন—

—কেন? ভূতনাথ অবাক হয়ে গেল—কেন? এমন কোনও কড়ার ছিল নাকি যে জবার সঙ্গে কথা বলতে পারবে না সে!

—যদি আমি আবার হেসে ফেলি—সেদিন সুনীতি ক্লাশে বাবা রিপোর্ট করে দিয়েছেন—

—সুনীতি ক্লাশ? সে কোথায় আবার—

—সুনীতি-ক্লাশ জানেন না, যেখানে আমি রোজ রোববার সকালবেলা যাই—এ সপ্তাহে সবার রিপোর্ট ভালো, সুজাতাদি আর স্মৃতিদিরা দুজনেই এবারে very good পেয়েছেন, সরলা, সুবল, ননীগোপাল......

—ননীগোপাল? কোন্ ননীগোপাল? কী রকম চেহারা বলো তো—ভূতনাথ উদ্‌-গ্রীব হয়ে উঠলো। সেই গঞ্জের স্কুলের বড় হাসপাতালের ডাক্তারবাবুর ছেলে যদি হয়!

—চেনেন নাকি তাকে? ভারি দুষ্টু, আমাকে বাবা যা পয়সা দেন হাতে, জানতে পারলেই কেড়ে নেবে—খালি লজেঞ্জ খাবে—মিস্ পিগট্ যদি একবার জানতে পারেন—নাম কাটা যাবে ওর—

ভূতনাথ বললে—একদিন যাবো তোমাদের সুনীতি ক্লাশে—দেখবো আমাদের ননী-গোপাল কি না—

—আপনাকে যেতে দেবে কেন—

—তুমি বলবে আমি তোমার দাদা—

—আপনি তো হিন্দু, আপনি কী করে আমার দাদা হবেন! যারা ব্রাহ্ম তারাই শুধু ওখানে যেতে পায়—

—কী শেখায় সুনীতি ক্লাশে?

—নীতি শিক্ষা দেয়—সত্য কথা বলা, গুরুজনদের ভক্তি করা, পরমেশ্বরের উপাসনা করা আর ব্রহ্ম সঙ্গীত—

—তোমার গান আমার খুব ভালো লাগে, সেদিন শুনেছিলাম—

—আমি রাঁধতেও পারি—আমার জন্ম-দিনে আমি মুরগী রেঁধেছিলাম—সবাই......

—তোমরা মুরগী খাও? ভূতনাথ অবাক হয়ে গেল।

—রোজ রোজ খাই—

—কে রাঁধে?

—কেন ঠাকুর—ওই যে ঠাকুর আছে—ও—

—ঠাকুর তো হিন্দু—

—তা হোক, রাঁধে—আপনি খান না? বাবা বলেন—মুরগী খেলে শরীর ভালো হয়—

ভূতনাথের কেমন যেন গা ঘিন্ ঘিন্ করতে লাগলো। তা হোক্—চাকরি করতে হলে এ-সব উৎপাত সহ্য করতে হবে।

হঠাৎ ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা, ভাঁড়ারের জিনিস কে বের করে দেয় রোজ?

—আমি, কেন? ও তো লেখা আছে সব মা'র আমল থেকে—আমি সেই দেখে দেখে বের করে দিই—আগে মা-ই দিত, তারপর আমার ভাই মারা যাওয়ার পর থেকেই মার শরীর খারাপ হয়ে গেল—আমিই তারপর থেকে.....কিন্তু ওকথা জিগ্যেস করছেন কেন?

ভূতনাথ উত্তর দেবে কি না ভাবছে এমন সময় সুবিনয়বাবু এসে পড়লেন।

বললেন—তোমার মা'কে খাইয়ে একেবারে ঘুম পাড়িয়ে এলাম মা,—তা' যাক্ গে যে কথা বলছিলাম ভূতনাথবাবু—সেই দীক্ষা নেবার পর—

সুবিনয়বাবুর গল্প চলতে লাগলো। পুরনো দিনের কাহিনী। ঝড়ের লগ্নে জন্ম। ঘরের মধ্যে বসে থাকতেন সুবিনয়বাবু। আর দলে দলে গ্রামের আশে পাশের বাড়ির মেয়েরা জানালা দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে দেখতো। পৈতে ত্যাগ করেছে, ধর্ম ত্যাগ করেছে, এ কেমন অদ্ভুত জীব। কেউ কেউ মা'কে জিজ্ঞেস করতো—মাঠাকরুণ তোমার ছেলে কথা কয়? মুড়ি খেতে দেখে মেয়েরা অবাক হয়ে গেছে—এই তো মুড়ি খাচ্ছে মাঠাকরুণ, এ তো সবই আমাদেরই মতন—

ভাত খেতে বসে ভূতনাথের এই সব গল্পের কথাই মনে পড়ছিল। খাওয়ার পর উঠে হাত ধুয়ে চলে যাবার সময় ঠাকুর হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়াল—বাবু—

—কী বল—

ঠাকুরের চোখ দুটো যেন জ্বলছে। লাল টক্‌টকে। ভয় পাবার মতন। গাঁজা খায় নাকি?

ঠাকুর ভূতনাথের আপাদ-মস্তক একবার দেখে নিয়ে বললে—বাবুর কাছে আপনি আমার নামে নালিশ করেছেন?

—নালিশ! ভূতনাথ অবাক হয়ে গেল।

—হ্যাঁ নালিশ! কিন্তু এ-ও বলে রাখছি, আমাদের সঙ্গে এমনি করলে এখানে আপনি তো টিঁকতে পারবেন না—

—সে কি, কী বলছো ঠাকুর তুমি—

—হ্যাঁ ঠিকই বলছি, কত কেরাণীবাবুকে দেখলাম, যদি ভালো চান্ তো বুঝে শুনে চলবেন—বলে হন্ হন্ করে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

ঘটনাটা এক মিনিটের বটে। প্রথমটা থতমত লাগিয়ে দেয়। কিন্তু একটু ভাবতেই ভূতনাথ শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়াল। খুব সামান্য ঘটনা তো নয়। আর একদিনও দেরি করা চলবে না এর পর। কিন্তু কী-ই বা উপায় আছে!

নিজের টেবিলে এসে আবার কাজে মন দিলে ভুতনাথ। কিন্তু চোখের সামনে কিছু যেন স্পষ্ট দেখা যায় না। ঝাঁ ঝাঁ করছে মাথা। চাকরির জন্যেই সমস্ত অপমান আজ সহ্য করতে হলো তাকে।

হঠাৎ বাইরে থেকে ঘরে ঢুকলেন সুবিনয়বাবু।

মুখ তুলতেই চোখাচোখি হয়ে গেল। যথারীতি কুশল প্রশ্ন করে চলে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ভুতনাথ হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে পেছন পেছন গিয়ে বললে—আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল স্যার—

থমকে দাঁড়ালেন তিনি। এমন করে কখনও তো কথা বলে না ভুতনাথবাবু!

—খুব জরুরী কথা? কেমন যেন তোমাকে উদ্বিগ্ন দেখছি ভুতনাথবাবু—

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি আর এখানে খাবো না কাল থেকে—আমার চাল নেওয়া যেন বন্ধ হয়—

কথাটা শুনে চুপ করে রইলেন সুবিনয়বাবু। একবার চেয়ে দেখলেন ভুতনাথের দিকে। কিন্তু দাড়ি গোঁফের প্রাচুর্যের মধ্যে মুখের কোনও ভাবান্তর প্রকাশ পেল না। তারপর হঠাৎ 'আচ্ছা তাই হবে'—বলে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেলেন।

ভুতনাথ নিজের টেবিলে এসে আবার বসলো। কাজ করতে আর মন বসে না। এখানে খাওয়া তো বন্ধ, তারপর? তারপর ব্রজরাখাল ভরসা। ব্রজরাখালকে মুক্তি দিতে পারলে না ভুতনাথ। এবারও সেই ব্রজরাখালেরই উপর নির্ভর করতে হবে।

কিম্বা যদি খাওয়ার কোনও বন্দোবস্ত না হয়, তাকে অন্য কোনও চাকরির চেষ্টা দেখতে হবে। ব্রজরাখাল ওদিকে চেষ্টা করতে থাকুক, ভুতনাথ নিজেও ঘুরে চেষ্টা করবে। তারপর যা হয় হোক।

কিন্তু বিকেলবেলা অফিস থেকে বেরোবার আগেই হঠাৎ ডাক এল।

ফলাহারী পাঠক এসে বললে—মালিক আপনাকে একবার ডাকছে কেরাণীবাবু—

ফলাহারী পাঠকের হাসি মুখ দেখে ভুতনাথের কেমন যেন অবাক লাগলো। জিজ্ঞেস করলে—কী ব্যাপার ফলাহারী—

ফলাহারী বললে—নিজের চোখে গিয়ে দেখুন বাবু—

দোতলায় নয়। একতলায় ওপরে ওঠবার রাস্তাতেই সুবিনয়বাবুর গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। একেবারে রান্নাঘরের দিক থেকেই শব্দটা আসছে।

সামনে গিয়ে ভুতনাথ আরো অবাক।

সুবিনয়বাবু একলা নন্। জবাও পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

সুবিনয়বাবু সিংহ-গর্জনে বলছেন—রাখ্ রাখ্ হাতা বেড়ী রাখ্—এখনি ঘর থেকে বের হয়ে যা—

ঠাকুর ঠক্ ঠক্ করে সামনে দাঁড়িয়ে কাঁপছে।

সুবিনয়বাবু আবার চীৎকার করে উঠলেন—বেরিয়ে যা এখনি, এক মুহূর্তও আর তোকে স্থান দেওয়া চলবে না—বেরিয়ে যা, হাতা বেড়ি রাখ্—

জবা পাশে দাঁড়িয়ে চুপ করে সব শুনছে—

হঠাৎ ভুতনাথকে দেখেই সুবিনয়বাবু বললেন—ঠাকুর তোমায় কী বলেছে ভুতনাথবাবু বলো তো—এস এদিকে সামনে এসো—

ভুতনাথ কেমন যেন হতবম্ব হয়ে গেল। সুবিনয়বাবুর এ-মূর্তি কখনও সে দেখেনি আগে। বললে—তেমন কিছু বলেনি আমাকে ঠাকুর—আপনি......

সুবিনয়বাবু হঠাৎ জুতোসুদ্ধ পা'টা মেঝের ওপর সজোরে ঠুকে বললেন—আঃ কী বলেছে তাই বল—বাজে কথা শুনতে চাই না—

—আজ্ঞে ও বলছিল ওদের সঙ্গে এমন করলে আমি এখানে টিঁকতে পারবো না—ওই পর্যন্ত—আমাকে অপমান কিছু করেনি—

সুবিনয়বাবু বললেন—তা হলে বলতে আর বাকি রেখেছে কি? তোমায় দু'ঘা জুতো মারলে কি সন্তুষ্ট হতে ভুতনাথবাবু?

বলে ঠাকুরের দিকে ফিরে বললেন—যা তুই, এ বাড়ির চাকরি গেল তোর—এখানে তো টিঁকতে পারলিই নে, গাঁয়েও টিঁকতে পারবি কি না পরে ভাববো—

যে-কথা সে-ই কাজ। আর মুহূর্ত মাত্র দেরি নয়। ঠাকুর নিজের কাপড়-গামছা গুছিয়ে পুঁটুলি বেঁধে নিয়ে তৈরি হলো। তারপর চোরের মতন দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল নিঃশব্দে।

সেদিনকার সেই ঘটনায় ভুতনাথের মনটা যেন কেমন বিমর্ষ হয়ে গিয়েছিল। সুবিনয়বাবু বলেছিলেন—তোমরা ইয়ং বেঙ্গল বড় মিন্‌মিনে ভুতনাথবাবু, সেই-জন্যেই সবাই তোমাদের অপমান করতে সাহস পায়—গুন্ডার ভয়ে মেয়েদের পুরে রেখেছ পর্দার মধ্যে আর ওদিকে গোরার ভয়ে তেত্রিশ কোটি লোক দেশটাকে পরাধীন করে রেখেছ—তোমাদের গলায় দড়ি জোটে না—

ঠিক এমন কথা সুবিনয়বাবুর মুখ থেকে শোনবার আশা করেনি ভুতনাথ। আম্‌তা আম্‌তা করে বললে—আমি কিন্তু বুঝতে পারিনি—

সুবিনয়বাবু আরো উত্তেজিত হয়ে উঠলেন—তা' হলে বলতে চাও—জবা মা মিথ্যে কথা বলেছে—

হঠাৎ জবার দিকে চোখ পড়তেই জবা বলে উঠলো—আমি যে নিজের কানে সব শুনেছি ভুতনাথবাবু, আপনি ঠিক বলুন তো ঠাকুর আপনাকে শাসিয়ে ছিল কি না—

ভুতনাথ বললে—কিন্তু সে তো অন্য কারণে—

—কী কারণে, বলুন—জবা জবাবের জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে রইল।

ভুতনাথ কী উত্তর দেবে বুঝতে পারলে না। একটু ভেবে বললে—ঠাকুর বলছিল, আমি নাকি পেট ভরে খেতে পাই না বলে আপনার কাছে নালিশ করেছি—

সুবিনয়বাবু বললেন—আমার তো তাই বক্তব্য—তুমি এতদিন নালিশ করোনি কেন ভুতনাথবাবু?

জবা বাবার দিকে চেয়ে জবাব দিলে—ভুতনাথবাবু বোধ হয় ভেবেছিলেন আমি কম করে ভাঁড়ার বার করে দিই—

—তুমি তাই ভেবেছিলে নাকি, ভুতনাথ-বাবু?—সুবিনয়বাবু জিজ্ঞেস করলেন।

ভুতনাথ কিছু জবাব দেবার আগেই জবা বললে—আপনি যা ভেবেছিলেন বাবা, ভুত-নাথবাবু তেমন লোক নন। দেখলেন তো, ব্রজরাখালবাবু বলেছিলেন—সরল পাড়া-গাঁয়ের ছেলে—এখন বুঝুন—আচ্ছা, আপনাকে কম খেতে দিয়ে আমার কী স্বার্থ আছে বলুন—আপনার সঙ্গে আমার কীসের সম্পর্ক? আপনি চাকরি করবেন, মাইনে নেবেন, পেট ভরে খেয়ে যাবেন—সেটা আপনার ন্যায্য পাওনা—অসুবিধে হয় নালিশ করবেন—

—ঠিক কথা, জবা ঠিক কথাই বলছে—তুমি এতদিন নালিশ করোনি কেন ভুত-নাথবাবু?

জবা তেমনি উত্তেজিত হয়ে বলে চললো—উনি ঠাকুরের কথাই ধ্রুব বলে জেনেছিলেন, তার আমাকেই চোর বলে ঠিক করেছিলেন—তাই রাগ করে আপনার কাছে ভাত দেবেন না বলেছিলেন—বাবা আপনি ভুত-নাথবাবুকে জিগ্যেস করুন তো সত্যি করে উনি বলুন যা' বলছি আমি সত্যি কি না।

—সত্যি তুমি তাই ভেবেছিলে নাকি ভুতনাথবাবু?

জবা আবার বলতে লাগলো—কিন্তু ভাগ্যিস আমি নিজের কানে শুনতে পেলাম কথাটা—

উত্তেজনার মুখে জবা যেন আরো কী কী সব বলে গেল, সব কথা ভুতনাথের কানে গেল না। ঘটনাচক্র এমনই দাঁড়াল যেন ভুত-নাথই আসল অপরাধী—ভুতনাথই যেন সমস্ত ষড়যন্ত্রের মুলে। আসামী একমাত্র সে-ই। সুবিনয়বাবু আর তাঁর মেয়ে দু'জনে মিলে ভুতনাথের অপরাধেরই যেন বিচার করতে বসেছেন। ভুতনাথের চোখ কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগলো।

যখন আবার তার সম্বিৎ ফিরে এল, তখন খেয়াল হলো সুবিনয়বাবু বলছেন—......অন্যায় যারা করে তাদের যতখানি অপরাধ, সেই অন্যায় যারা ভীরুর মত সহ্য করে তাদের অপরাধও কি কম—তাই তো সুরেন বাড়ুয্যের মতন লোক আজ আই-সি-এস চাকরি ছেড়ে দিলেন—দিয়ে দেশের কাজে লেগেছেন—। ভাবো একবার গোরা-দের অত্যাচারের কথা—পয়সা দিয়েও রেলের কামরায় সাহেবদের সঙ্গে একসঙ্গে যাবার অধিকার নেই—সত্যি কথা বললে হয় রাজ-দ্রোহ—বুটের লাথির চোটে চাবাগানের কুলির পিলে ফেটে গেলেও প্রতিবাদ করলে জেল হয়—এমনি করে আর কতদিন অত্যা-চার সহ্য করবে ভুতনাথবাবু, একদিকে গোঁড়া বামুনাদের অত্যাচার, বিলেত গেলেই, মুরগী খেলেই জাতিচ্যুত। আর একদিকে সাহেবদের লাথি—ইয়ং বেঙ্গল তোমরা, তোমরাই তো ভরসা—আমরা আর ক'দিনের—

অভিভূতের মত কখন যে ভুতনাথ রাস্তায় বেরিয়েছে, কখন বাড়ির পথে চলতে শুরু করেছে খেয়াল ছিল না। গোলদিঘীর কাছে আসতেই খোলা হাওয়ার স্পর্শ লেগে সমস্ত শিরা উপশিরাগুলো যেন আবার সজীব হয়ে উঠলো। ভুতনাথের মনে হলো যেন কিছুক্ষণ আগে তার আপাদমস্তক বেঁধে কেউ চাবুক মেরে ছেড়ে দিয়েছে। সমস্ত শরীরে যেন এখনও তার যন্ত্রণার সঙ্কেত। সুবিনয়বাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে আসবার সময় সে তো কিছু বলে আসেনি। আত্মপক্ষ সমর্থনের কথা নয়। কিন্তু ওদের ভুল সংশোধনের চেষ্টাও তো ও করতে পারতো। কিম্বা ক্ষমা ভিক্ষা। জবাকে নীচ প্রতিপন্ন করবার চেষ্টাও তো তার ছিল না। ঠাকুরকে সে তো অবিশ্বাসই করে এসেছে। ঠাকুরের বিরুদ্ধে অভিযোগই তো সে করতে গিয়েছিল।

আবার ফিরলো ভুতনাথ।

চারদিকে বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। তবু যত অন্ধকারই হোক, যত রাত্রিই হোক আজ, মোহিনী সিঁদুর অফিসে ফিরে গিয়ে আবার তাকে দু'জনের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। ক্ষমা চাইতে হবে।

পাশে একটা মদের দোকান। উগ্র গন্ধ নাকে এল। ভেতরে বাইরে ভীড়। সামনে মাটির ওপর বসে পড়েছে ভাঁড় নিয়ে লোকগুলো।

আবছা অন্ধকারেও যেন হঠাৎ চম্‌কে উঠলো ভুতনাথ!

ঠাকুর না!

ভালো করে চেয়ে দেখবার সাহস হলো না তার। এক ঘণ্টা আগে যার চাকরি গেছে সে-ও বুঝি বসে গেছে এখানে ভাঁড় নিয়ে। হন্ হন্ করে পা চালিয়ে সোজা চলতে লাগলো ভুতনাথ। ঠাকুর তাকে দেখতে না পেলেই ভালো। অপ্রকৃতিস্থ মানুষ ভুতনাথের যুক্তিগুলো বুঝবে না।

আরো আধ ঘণ্টা পরে যখন ভুতনাথ 'মোহিনী-সিঁদুর' অফিসে গিয়ে পৌঁছুল তখন সদর দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। দরজা খুলে দিলে বৈজু দারোয়ান।

বললে—আবার ফিরে এলেন যে কেরাণী-বাবু?

ভুতনাথ জিজ্ঞেস করলে—বাবু কোথায়?

—ওপরে—

সোজা মন্ত্রচালিতের মত ওপরে গিয়ে বড় হল্-ঘরে কাউকে দেখতে পাওয়া গেল না। এদিক-ওদিক সব দিকে চেয়ে দেখলে ভুতনাথ। ভেতরে অন্দরে যাবে কি না ভাবছে—হঠাৎ হাবার মা সামনে দিয়ে যাচ্ছিল—

হাবার মা বললে—বাবু, এখন মাকে খাওয়াচ্ছেন—

—আর দিদিমণি?

—নিচে রান্নাঘরে—

সেই সিঁড়ি দিয়ে আবার তেমনি করে নিচে নেমে এসে সোজা রান্নাঘরে গিয়ে দাঁড়াল ভুতনাথ। চারজন ঝি সাহায্য করছে জবাকে। জবা রান্না করছে। এ দৃশ্য হয়ত এ-বাড়ির লোকের কাছে নতুন নয়—কিন্তু ভুতনাথের কাছে অভিনব মনে হলো। পেছন থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ দেখতে লাগলো জবাকে। হঠাৎ সেই

অবস্থায় ভূতনাথের মনে হলো জবাই তো এ-বাড়ির আসল গৃহিণী।

পেছন ফিরে কী একটা জিনিস নিতে গিয়ে হঠাৎ নজরে পড়লো।

জবাও অবাক হয়ে গেছে। বললে—এ কি, আবার ফিরে এলেন যে আপনি—বাবা তো ওপরে—

ভূতনাথ প্রথমটা কেমন নির্বাক হয়ে গিয়েছিল। তারপর বললে—তোমার সঙ্গেই আমার দরকার ছিল জবা—আজকে আমার সত্যি বড় অন্যায় হয়ে গেছে—বাবাকে বোলো তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করেন—

আরো যেন কী কী বলবার ছিল, ভূতনাথের কিন্তু আর কিছু তার মুখ দিয়ে বেরুল না।

জবা হেসে ফেললো। বললে—আশ্চর্য, এই কথা বলতেই আবার এখন ফিরে এলেন নাকি—

ভূতনাথ কী উত্তর দেবে ভেবে পেলে না।

জবা এবার হো হো করে হেসে উঠলো। বললে—যে আপনার নাম রেখেছিল, তার দূরদৃষ্টির প্রশংসা করছি—

তারপর একটু থেমে জিজ্ঞেস করলে—কিন্তু কেন? কেন আপনি ক্ষমা চান বলুন তো—?

ভূতনাথ একটু ইতস্তত করে বললে—আমার জন্যেই তো তোমায় আজ রান্নাঘরে ঢুকতে হয়েছে—আমার জন্যেই তো ঠাকুরকে—

জবা বললে—রান্না করতে আমি ভয় পাই না ভূতনাথবাবু, কারণ বাবা যা'র তা'র হাতের রান্না খান না—ঠাকুর নেহাৎ দেশের লোক ছিল তাই......আর......কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা—আপনি খুব ভয় পেয়ে গেছেন তো?

ভূতনাথ বুঝতে পারলে না। বললে—কীসের ভয়?

—জাত যাওয়ার ভয়,—

—কেন?

—এবার থেকে তো আমিই রান্না করবো—ভুলে যাচ্ছেন কেন? আমি তো ম্লেচ্ছ—কথাটা ভাববার মতন। ভূতনাথও হঠাৎ কথাটার জবাব দিতে পারলে না।

জবা বললে—আজ বাসায় গিয়ে ভাবুন—সমস্ত রাত ধরে সেইটেই ভাবুন আগে—তারপর কাল যা বলবেন, সেই ব্যবস্থা করবো—এখন রাত হয়ে গেল—আপনি বাড়ি যান, বরং—বলে উনুনে আর একটা হাঁড়ি চড়িয়ে দিলে।

ভূতনাথ নির্বোধের মত আস্তে আস্তে বাইরে চলেই আসছিল। অন্ধকারে রাস্তায় পা বাড়াতে গিয়ে পেছনে যেন জবার গলার আওয়াজ পেলে—

—শুনুন—

ভূতনাথ আবার ফিরল।

জবা বললে—এই বৈজুকে সঙ্গে নিয়ে যান—রাত্তির হয়ে গেছে—এদিককার রাস্তাটা খারাপ—আপনাকে পেঁছে দিয়ে আসুক ও—

ভূতনাথ মুখ তুলে জবার চোখের দিকে চেয়ে দেখলে। কথাটার মধ্যে বিদ্রূপের খোঁচা আছে না তো!

কিন্তু অন্ধকারে জবার মুখ স্পষ্ট দেখা গেল না।

ভূতনাথ আর সময় নষ্ট না করে রাস্তায় পা বাড়াল। কেন মিছামিছি সে আবার ফিরে এল। কার কাছে সে ক্ষমা চাইলে! কে জানে, কী সমাজের মানুষ এরা সবাই। রাধা, আন্না, হরিদাসী তারা তো কেউ এমন আড়ষ্ট করে কথা বলতো না। শহরের সব মেয়েরাই কি এমনি? না শুধু ব্রাহ্ম-সমাজের মেয়েরাই এই রকম।

ভূতনাথ চলতে চলতে বললে—না, কারোর সঙ্গে যাবার দরকার হবে না—আমি মেয়েমানুষ নই—

(ক্রমশঃ)

অঞ্চলে খেলিতে গিয়াছেন সহস্র সহস্র ছাত্র ইহার দর্শনের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে কলিকাতার বিমান কেন্দ্রের দৃশ্যই মনে জাগে। বিমান ঘাটির বিধিনিষেধ অমান্য করিয়া সহস্র সহস্র ছাত্র দল হানিফের সন্ধানে অতি প্রত্যুষে সমবেত হইয়া 'হানিফকে চাই—হানিফের জয়' ধ্বনিতে মুখরিত করেন। এমন কি বিমান ঘাটির বেড়া অতিক্রম করিয়াও বিমানখানিকে এইরূপভাবে ঘিরিয়া ধরেন যে পাকিস্থান খেলোয়াড়দের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিবার জন্য যে সকল ক্রিকেট পরিচালক এই সময় বিমান ঘাটিতে উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের অগ্রসর হওয়া পর্যন্ত অসম্ভব হইয়া পড়ে। ঠিক ইহার পরের দিন রাজস্থান ক্লাবের মাঠে এক প্রদর্শনী খেলার ব্যবস্থা হইলেও প্রায় দশ সহস্র কলিকাতার ছাত্র হানিফের দর্শনে সমবেত হন। সত্যই হানিফ এক অপূর্ব সৃষ্টি। পৃথিবীর ক্রিকেট ইতিহাসে এত অল্প বয়সে কোথাও কোন ক্রিকেট খেলোয়াড়কে এত খ্যাতি ও সম্মান ও কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে দেখা যায় নাই। ভারতেও ইঁহার বয়সী কোন খেলোয়াড় ক্রিকেটে এত সম্মান লাভ করেন নাই। সি এস নাইডু যখন প্রথম শ্রেণীর খেলায় যোগদান ও কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন তখন তাঁহার বয়স ছিল ১৮ বৎসর। হানিফকে পৃথিবীর সর্বকনিষ্ঠ টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় নামে অভিহিত করা চলে। ইহার ক্রীড়াকৌশল জন্মগত অধিকার। ইংলন্ডে গোভার স্কুলে ইহাকে প্রেরণ করিলে আলফ গোভার পর্যন্ত বলিয়াছিলেন, 'আমি কি শিক্ষা দিব। খেলা সম্পর্কে যাহা কিছু জানার ইহার সব কিছুই জ্ঞান আছে। নূতন কোন ধারায় শিক্ষা দেওয়ার অর্থে ইহার সহজাত শক্তির ক্ষয় করা হইবে।'

তৃতীয় টেস্ট ম্যাচে পাকিস্থানের পরাজয়

দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচে ভারতের ইনিংস পরাজয়ের পর অনেকেই মনে করিয়াছিলেন পাকিস্থান তৃতীয় টেস্টে বেগ দিবেন। কিন্তু এই খেলায় পাকিস্থান ভারতের নিকট ১০ উইকেটে পরাজিত হইলেন। এই পরাজয়ই পাকিস্থান দলকে টেস্ট পর্যায়ের সকল গৌরব হইতে বঞ্চিত করিল। চতুর্থ টেস্ট ম্যাচ মাদ্রাজে আরম্ভ হইয়া অতিরিক্ত বারিপাতের জন্য পরিত্যক্ত হইল। পঞ্চম টেস্ট ম্যাচ কলিকাতার মাঠে অমীমাংসিতভাবে শেষ হইল। দুইটি টেস্ট খেলা এইভাবে অমীমাংসিত হওয়ায় অপর তিনটি খেলার মধ্যে ভারত দুটিতে বিজয়ী হইয়া টেস্ট পর্যায়ের সফল গৌরবের বা 'রবার' লাভ করিলেন। ২০ বৎসরের প্রচেষ্টার পর ভারতীয় ক্রিকেট দলের সর্বপ্রথম টেস্ট খেলায় 'রবার' লাভের সৌভাগ্য হইল।

পাকিস্থান খেলোয়াড়গণের দৃঢ়তা

পঞ্চম টেস্ট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হইলেও পাকিস্থান ক্রিকেট দলের খেলোয়াড়গণের অপূর্ব দৃঢ়তা সকলকেই চমৎকৃত করে। প্রথম খেলোয়াড় তরুণ হানিফের ৪৫ মিনিট সহস্র সহস্র দর্শকের বিরাট বিদ্রূপ ধ্বনির মধ্যে অবিচলিতভাবে ব্যাট চালনা সত্যই প্রশংসনীয়। এমন কি পতনমুখে ওয়াকার হাসানের দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিং ও ৯৬ রান লাভও উপভোগ্য। দলকে পরাজয়ের হাত হইতে ইনি অব্যাহতি দিয়াছেন। ইহা সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইয়াছে। কেবল একটি টেস্ট কেন প্রত্যেকটি টেস্ট খেলাতেই পাকিস্থানের প্রত্যেকটি খেলোয়াড়ের দলগতভাবে দলকে সাহায্য করিবার আপ্রাণ প্রচেষ্টা করিতেও দেখা গিয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে এই দল টেস্ট পর্যায়ের খেলায় বহু শক্তিশালী দলের সহিত যে সমপ্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে এই বিষয় কোন সন্দেহ নাই।

অধিনায়কের ক্রীড়াসুলভ আচরণ

পাকিস্থান ক্রিকেট দলের অধিনায়ক ব্যাটা বোলার ও ব্যাটসম্যান কি খেলার মাঠে, কি বাহিরে প্রত্যেকটি স্থানেই অপূর্ব ক্রীড়াসুলভ মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন। সকল স্থানেই অভিনন্দনের উত্তরে ইনি বলিয়াছেন, "আমাদের তরুণ দল অভিজ্ঞতার জন্যই আসিয়াছে। আমাদের এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতের পাথেয় হইয়া থাকিবে। দুই রাষ্ট্রের দল হিসাবে আমাদের এই সৌখ্য ও আন্তরিক বন্ধুত্ব একদিন রাষ্ট্রদ্বয়ের মধ্যে চিরশান্তির কারণ হউক ইহাই আমাদের কামনা।" শিখান বুলি হইলে কখনই তিনি একইভাবে সকল স্থানে বলিতে পারিতেন না। পাকিস্থানের কোন কোন পত্রিকা ভারতীয় দর্শকমণ্ডলীর তীব্র নিন্দাবাদ করিয়াছেন। অধিনায়ক কারদার তাহার প্রতিবাদ করিয়া প্রত্যেক স্থানেই বলিয়াছেন, "আমরা সকল স্থানেই খেলোয়াড়দের ও দর্শকদের চরম বন্ধুতাপূর্ণ আচরণ পাইয়াছি। সহানুভূতি ও সাহচর্যের এতটুকু অভাব আমরা কোথাও দেখি নাই।"
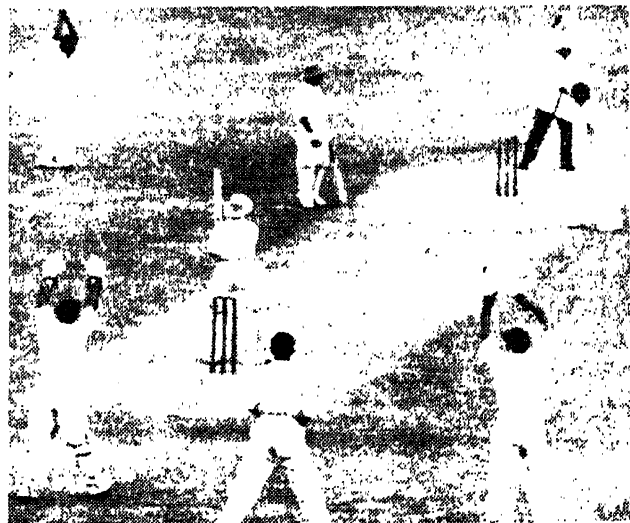
পাকিস্থান ও ভারতের চতুর্থ টেস্ট ম্যাচে পাকিস্থানের খেলোয়াড় হানিফের আউট হইবার দৃশ্য

এমন কি তিনি পূর্বের পরিচিত খেলোয়াড়দের পাইয়া বলিয়াছেন, "আমি বিস্মৃত হইতেছি যে আমি এই দেশের নহি। আমি অন্য রাষ্ট্রের ইহা স্মরণ করিতেও আমার কষ্ট হইতেছে। পূর্বের ঠিক একই অবস্থার মধ্যে আছি ইহাই আমার মনে হইতেছে।" এইরূপ উক্তি অন্তরের গভীরতম স্থান হইতে নির্গত না হইলে কখনই কেহ এই-ভাবে বলিতে পারে না। যে দেশের মাটিতে তাঁহার ক্রিকেট খেলার উৎসাহ ও উদ্দীপনার উৎসস্থল সেই মাটি, সেই দেশ এত শীঘ্র কেহ কি বিস্মৃত হইতে পারে। ঠিক একইভাবে এই দলের নজর মহম্মদ, প্রবীণ খেলোয়াড় আমীর ইলাহি ও কৃতী বোলার ফজল মামুদকে পর্যন্ত ঐ উক্তি করিতে শোনা গিয়াছে। যে সকল তরুণ খেলোয়াড় প্রথম ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিলেন তাঁহারাও বলিয়াছেন, "বহু শুনিয়াছিলাম কত স্বপ্নই না মনে মনে রচনা করিতাম—ইহা পূর্ণ হইল ইহাই আনন্দের বিষয়।" পাঁচ বৎসর পূর্বে যাহারা ছিল একই রাষ্ট্রের লোক অদৃষ্টের পরিহাসে তাঁহারা ভিন্ন হইয়াছে ইহা অস্বীকার কেহই করিতে পারে না।

পাকিস্থান ক্রিকেট দলের শক্তি

পাকিস্থান ক্রিকেট দল নবগঠিত সন্দেহ নাই, কিন্তু এই দলের শক্তি একেবারেই উপেক্ষা করা চলে না। অধিনায়ক কারদার ভ্রমণের শেষ অভিনন্দন উৎসবে বলিয়াছেন, "আমরা যে অভিজ্ঞতা বহন করিয়া লইয়া যাইতেছি তদ্দ্বারা পরবর্তী ভ্রমণের সময় অধিকতর উন্নতিমূলক ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শন করিতে পারিব এই বিষয় নিঃসন্দেহ।" অনেকে ইঁহার এই উক্তি দম্ভের অভিব্যক্তি বলিয়া অভিহিত করিবেন, কিন্তু তাহা নহে। এই দলের ভবিষ্যৎ ভারত অপেক্ষা অনেক ভাল ইহা বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রেই বলিবেন। তাহা নিম্নলিখিত আলোচনা হইতেই উপলব্ধি করা যাইবে।

(১) ওপনিং ব্যাটসম্যানের অভাব নাই। হানিফ মহম্মদ ও নজর মহম্মদ এই অভাব ইহাদের দূর করিয়াছেন। এই বিষয় সাহায্যের প্রয়োজন হইলেও ওয়াকার হাসান পূরণ করিতে পারিবেন। এই তরুণ খেলোয়াড়টি একাধিকবার ইহার পরিচয় দিয়াছেন।

(২) ওপনিং আক্রমণকারী বোলারের অভাব নাই, ফজল মামুদ ও মামুদ হোসেন

প্রথম টেস্ট ম্যাচে পাকিস্থান অধিনায়ক কারদার ও ভারতীয় অধিনায়ক অমরনাথ টস্ করিতেছেন

এই দুইজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। ইঁহারা একইভাবে একই বেগে একই লেংথে যে দীর্ঘ সময় বল করিতে পারেন তাহার চরম নিদর্শন কলিকাতার ইডেন উদ্যানে পঞ্চম টেস্ট ম্যাচে দিয়াছেন। ফজল মামুদকে এই বিষয় আদর্শস্থানীয়

পাকিস্থানের প্রথম খেলোয়াড়দ্বয় নজর মহম্মদ ও হানিফের প্রথম ব্যাট করিতে যাওয়ার দৃশ্য

বলা চলে। কলিকাতার মাঠে এক প্রবীণ খেলোয়াড়কে ইঁহার এক টানা সমান বেগে বল করিতে দেখিয়া বলিতে শোনা গিয়াছে, "ইনি অমর সিংহের দ্বিতীয় সংস্করণ।" এই উক্তি যে অতিরঞ্জিত নহে ইহা অতিবড় ক্রিকেট সমালোচকও স্বীকার করিবেন।

(৩) দলের রান বৃদ্ধিকারী খেলোয়াড়ের অভাব নাই। ইমতিয়াজ আহমদ, ওয়াজির মহম্মদ, জুলফিকার আহমদ, মকসুদ আহমদ, ফজল মামুদকে পর্যন্ত ইহাদের দলভুক্ত করা হয়।

(৪) শেষরক্ষাকারী ব্যাটসম্যান—এই বিষয় ফজল মামুদের নামই প্রথম উল্লেখ করিতে হয়। ইনি যে কোন বোলারের বিরুদ্ধে অপূর্ব দৃঢ়তা অবলম্বন করিতে পারেন।

(৫) স্পিন বোলারের অভাব এই দলে আছে। একমাত্র আবদুল হাফিজ ব্যতীত অপর কাহাকেও প্রথম শ্রেণীর স্পিন বোলার বলা চলে না।

(৬) ফিল্ডিং বিষয়ে ইহাদের প্রত্যেকেই ভাল তবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন জুলফিকার আমেদ, হানিফ ও মকসুদ আমেদ।

(৭) উইকেটরক্ষক হিসাবে কাহারও ঠিক পরিচয় পাওয়া যায় নাই। ইমতিয়াজ আমেদের এখনও শিথিলতা আছে। স্ট্যাম্পিংয়ের সুযোগের ইনি সদ্ব্যবহার করিতে ঠিক পারেন না।

(৮) দল পরিচালক বা অধিনায়কত্ব বিষয়ে আবদুল হাফিজ কারদার ও আনোয়ার হোসেন ভালই। তবে বোলার পরিবর্তন ও মাঠের অবস্থা ঠিক বুঝিবার মত অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা আছে।

(৯) চৌকশ খেলোয়াড় ও ন্যাটা খেলোয়াড়ের অভাব এই দলে নাই। আবদুল হাফিজ, আর এন দিনশা, খলিল কুরেশী, ইশরার আলী প্রভৃতি আছেন। তবে ইঁহাদের ক্রীড়াকৌশল মানকড়, মুস্তাক আলীর সমতুল্য বলা চলে না।

তাহা হইলেও দলটিতে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট দল গঠনের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহার সকল কিছুই আছে। অভিজ্ঞতার অভাব আছে। প্রথম ভ্রমণেই অভিজ্ঞ ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে যেরূপ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিলেন তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে অনেক শক্তিশালী দলের চিন্তার কারণ হইবে বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না।

ই'হাদের আচরণ উল্লেখযোগ্য

ভারতীয় ক্রিকেট দলের খেলোয়াড় ও পরিচালকদের মধ্যে যেরূপ মতদ্বৈধতা বর্তমান ইহা পাকিস্থান ক্রিকেট দলের মধ্যে নাই। অধিনায়ক ও অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও শিক্ষার জন্য খেলোয়াড়গণ সকল সময়েই উৎসুক। বিশেষ করিয়া তরুণ খেলোয়াড়দের ভারতীয় কৃতী ও অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের নিকট হইতে জানিবার ও শিখিবার জন্য প্রচেষ্টা সত্যই উল্লেখযোগ্য। খেলার ও দলের ক্রমোন্নতির জন্য যে ই'হারা চিন্তা করেন ইহা খেলার মাঠে ও বাহিরের কার্য-কলাপ হইতেই উপলব্ধি করা গিয়াছে। ভারতের উদীয়মান খেলোয়াড়গণ যদি এই বিষয় একটু দৃষ্টি দেন আমরা সুখী হইব।

ব্যাটিংয়ে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব

পাকিস্থান ক্রিকেট দল ব্যাটিংয়ে ভারতীয় খেলোয়াড়দের অপেক্ষাও উন্নততর ফলাফল প্রদর্শন করিয়াছেন। ভারতীয় কোন খেলোয়াড়ই ইহাদের বিরুদ্ধে দ্বিশতাধিক রান করিতে পারেন নাই। ইহাদের দুইজন এই গৌরব অর্জন করিয়াছেন। ইহা ছাড়া ১০টি ক্ষেত্রে ইহাদের ব্যাটসম্যানগণ শতাধিক রান করিয়াছেন। এই সমতুল্য কৃতিত্ব ভারতীয় ব্যাটসম্যানগণ প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। সুতরাং ব্যাটিং বিষয়ে পাকিস্থান খেলোয়াড়গণ অধিকতর কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া চলিলে অন্যায় হইবে না। নিম্নে পাকিস্থানের কোন খেলোয়াড় কোন খেলায় শতাধিক রান করিয়াছেন তাহার তালিকা প্রদত্ত হইলঃ—

১২১ রান—হানিফ (অমৃতসহরে) উত্তরাঞ্চলের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে।

১০৯ রান নট আউট—হানিফ (অমৃতসহরে) উত্তরাঞ্চল দ্বিতীয় ইনিংসে।

১২৪ রান নট আউট—নজর মহম্মদ (লক্ষ্ণৌতে) দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে।

২১৩ রান নট আউট—ইম্তিয়াজ (নাগপুরে) মধ্যাঞ্চলের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে।

১০১ রান—খুর্শীদ আমেদ (নাগপুরে) মধ্যাঞ্চলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ইনিংসে।

১০৬ রান—আবদুল কারদার (নাগপুরে) মধ্যাঞ্চলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ইনিংসে।

১০৪ রান নট আউট—ওয়াজির মহম্মদ (আমেদাবাদ) পশ্চিমাঞ্চলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ইনিংসে।

১০৪ রান নট আউট—ওয়াজির মহম্মদ (আমেদাবাদে) পশ্চিমাঞ্চলের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে।

২০৩ রান নট আউট—হানিফ (বোম্বাইতে) বোম্বাইয়ের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে।

১৫৬ রান নট আউট—নজর মহম্মদ (হায়দরাবাদে) দক্ষিণাঞ্চলের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে।

১৩৫ রান—হানিফ (হায়দরাবাদে) দক্ষিণাঞ্চলের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে।

১০৩ রান—ইম্তিয়াজ আমেদ (জামসেদপুরে) পূর্বাঞ্চলের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে।

১২৩ রান—নজর মহম্মদ (জামসেদপুরে) পূর্বাঞ্চলের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে।

পঞ্চম টেস্ট ম্যাচে ভারতীয় বিশিষ্ট খেলোয়াড়গণ—অমরনাথ, গোলাম আমেদ, জি এস রামচাঁদ প্রভৃতিকে খেলার ফলাফলে করতালি প্রদান করিতে দেখা যাইতেছে

তরুণ দলের প্রশংসনীয় কৃতিত্ব

পাকিস্থানের তরুণ খেলোয়াড় দ্বারা গঠিত দল ভারত ভ্রমণে ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং সর্ব বিষয়েই যেরূপ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা অল্প দিনের আন্তরিক সাধনার জন্যই সম্ভব হইয়াছে। ইহা স্বীকার করিয়া ভারতের ভবিষ্যৎ ক্রিকেট খেলোয়াড়গণ যদি অনুরূপ কার্যে ব্রতী না হন পরবর্তী পাকিস্থান ভ্রমণ অথবা পাকিস্থান দলের ভারত ভ্রমণের সময় পুনর্বার 'রবার' লাভের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হইবে না, ইহা সকলকেই স্মরণ না করাইয়া আমরা পারি না। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা যায় এই কথা চিরকালের ভারতের প্রচলিত প্রবাদবাক্য অথচ তাহা ফলবতী হইবে না ভারতের মাঠে, ভারতের মাটিতে ইহা প্রত্যেক ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়েরই কলঙ্কের বিষয় ইহা কি নূতন করিয়া স্মরণ করাইবার প্রয়োজনীয়তা আছে?

প্রান্তবাসীর ঝুলি

শ্রীমতী নীহার বড়ুয়া

আমাদের এই অঞ্চলটি আসামের অখ্যাত গোয়ালপাড়া জেলা। এই জেলাটি আসামের একেবারে পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত। আবার কোচবিহার ও রংপুর জেলার পূর্বপ্রান্তে, গারো হিলের উত্তর ও ভুটানের দক্ষিণপ্রান্তে। তাই এটি সবার প্রান্তদেশে পড়ে কোণচাপা প্রান্তবাসীর দেশ। ইতিহাসে দেখা যায় যে, এই অঞ্চলটি অতীতকালে এক সময় সংস্কৃতির দিক দিয়ে নাকি বিশেষভাবেই সমৃদ্ধ ছিল। কিন্তু পূর্ব-গৌরবের কথা তোলার কোন অর্থ নেই, কেননা, তা বলে কেবল আত্মতৃপ্তির খোরাক জোটে, অন্য কোন লাভ হয় না।

একদা যাই থাকুক, এখন কোণে পড়ে কোণচাপাই হয়ে ছিলাম, এমন সময় হঠাৎ 'খোল-তালে'র সঙ্গে সমবেত ছোটদের মিষ্টি গলার খানিকটা মিষ্টি সুর ভেসে এলো। সেই কোণের ভেতর থেকে মাথা তুলে দেখি—এক-একটি লাঠিতে এক বিঘত দেড় বিঘত অন্তর কেউ-বা তিন-চারটি সীতাকারের ফুলের কেউ-বা পাট দিয়ে তৈরি ফুলের মালা ঝুলিয়ে সেগুলো কাঁধে করে একটি ছেলের ঝাঁক দোর গোড়ায় এসে হাজির হয়েছে—সোনারায়ের দক্ষিণা চাই।

তাইতো! পৌষ মাস যে এসে গিয়েছে, তা এই কোণের ভেতর থেকে বুঝতেই পারি নি। এই সোনারায় ঠাকুরটি হচ্ছেন নাকি বাঘ-ভালুকের দেবতা। যেমন সুন্দরবন অঞ্চলের দক্ষিণরায়। এঁকে সন্তুষ্ট করলে এই হিংস্র জন্তুগুলোর হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে, এই বিশ্বাসে এই পুজোর সৃষ্টি। পুজোটা হয় কেবল পৌষ সংক্রান্তিতে। তবে পৌষের পয়লা তারিখ থেকে সংক্রান্তির আগের দিন পর্যন্ত এই 'দক্ষিণা' সংগ্রহের তোড়জোড় চলে। গ্রামের ছেলেরা খোল, করতাল, দক্ষিণার ঝোলা আর ফুলের মালা বাঁধা লাঠি ঘাড়ে করে দলে দলে কতকগুলি ছড়া একটি বিশিষ্ট ধরণের সুরে গান করে প্রত্যেক বাড়ি থেকে ধান, চাল বা পয়সা 'দক্ষিণা' হিসাবে সংগ্রহ করে এবং সেই সংগৃহীত দক্ষিণা দিয়ে পৌষ সংক্রান্তির দিনে নদীর ধারে বা কোনও মাঠে সোনারায় পুজোর নামে 'রাখাল-ভোগ', অর্থাৎ বন-ভোজনের ব্যবস্থা হয়। সেই ফুলের মালা ঝোলান লাঠিগুলো সেইখানে একটা জায়গা পরিষ্কার করে পুঁতে দেওয়া হয় এবং সেইগুলি সোনারায় ঠাকুরের প্রতীক হিসাবে পুজোর ভোগ গ্রহণ করেন। এই পুজোয় কোন মূর্তি বা ঘট ব্যবহৃত হয় না। আর এই পুজোর উদ্যোক্তা এবং পুজারী বেশির ভাগই বালক বা কিশোরের দল। মাঝে মাঝে দুই-একটি যুবকের দলও যে দেখা যায় না, এমন নয়। আসলে এরা রাখালের দল। যাদের বয়স সম্বন্ধে কাকেও প্রশ্ন করলে উত্তরে শুনতে পাবেন, 'গরুর রাখোয়াল হইচে'। এ তাদেরই পুজো। বাঘের হাত থেকে গরু-মোষ বাঁচাতে হলে বাঘের চেয়ে বাঘের দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে পারাই সহজ এবং তাতে নিরাপত্তার সম্ভাবনাও নিশ্চয়ই বেশি।

এই অঞ্চলে বাঘের গরু নিয়ে যাওয়া এককালে নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনাই ছিল। এখন জঙ্গল কমে যাওয়ার ফলে উৎপাত অনেক কমে আসলেও কোন কোন অঞ্চলে এখনও যে গরু, মোষ, ছাগল ইত্যাদি বাঘের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজন হয়, তার সংখ্যাও নগণ্য নয়। আর এই শীতকালেই উপদ্রবের মাত্রাটা বেড়ে ওঠে। তাই হয়তো শীতকালেই এই পুজোর বিধান নির্দিষ্ট হয়েছে।

এখন এই গান বা ছড়াগুলি সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। ছড়াগুলি এই ধরণের।
প্রথমের দিকে বলা হয়—

"দাদা বলরাম রে হাসিয়া কতা কয়
দুঃশাসনী বাঘ নিয়া নামিল সোনারায়।
বাঘ নামিলো রে **চিতিয়া পাকেরা**
ভোর বিয়ানে নামিল বাঘ মানুষ **কামরা।**
পংখী উঁরিয়া যায় রে তার জোর পায় নেপুর
বাশী বাজায় গান করে সোনারায় ঠাকুর।"

যখন সোনারায় বাঘ নিয়ে নামলেন, তখন তাঁর পুজোর ব্যবস্থার জন্য 'দক্ষিণা' সংগ্রহের প্রয়োজন। তখন গৃহস্থদের বলা হয়—

"সোনারায়র দক্ষিণা নাগে পূর্ণ কুলা ধান
তাহার উপরো নাগে **জোর** গুয়া পান।"

কিন্তু কেউ আবার না ভাবে, ভিক্ষা চাওয়া হচ্ছে। তাই জানিয়ে দেওয়া হয়—

"ধানের কাঙালী না হই গুয়া তো না চাই,
দ্যাশের ব্যবহার কতা কইয়া দিয়া যাই।"

আবার একটু ভয়ই যে দেখানো না হয় তাও নয়—

"সোনারায়র দক্ষিণা দিতে **যায়** করিবে হেলা
তার **ভাতারক** নাগাল পামু **গরুচরের** বেলা।
সোনারায়র দক্ষিণা দিতে যায় করিবে হেলা
হাত পাও খসিয়া পরে চক্ষুর বিরায় ঢেলা।"

আবার দক্ষিণা পেলে আশীর্বাদ দিতেই হবে—

"সত্যঠাকুর সোনারায় **গাইরস্তক** দে তুই বর
ধনে বংশে বাড়ুক **গিরি** চন্দ্র দিবাংকর।
গইলে বারুক গাই গরু গোলাতে বারুক ধান
দেওয়ানে দরবারে পাউক বাটাভরা পান।
গইলে বারুক গাই গরু **জাঙ্গালে** বারুক নাউ
গিরির ঘরের শত্তুর দুষমন্ বনের বাঘে খাউক"

এ ছাড়াও যার সোনারায় ঠাকুরের সঙ্গে কোনই সম্পর্ক নেই, এমন অনেক ছড়াও ঠিক ঐ সুরে ঐ সঙ্গে যোগ করে দেওয়া হয়। যেমন—

"কন্যা জলে নামে রে নদীর উঠে ঢেউ
এতো বেলায় ছিনান করে কোন গাইরস্তের বউ।"

কিংবা—

"কন্যা ফুল তোলে রে বেছিয়া তোলে কোরা
কোরার ভিতিরা আছে গুঞ্জরী ভোমোরা।
বন পোরা যায় রে উঁরিয়া পরে ছাই
এ হেনা সুন্দর কন্যার নাই বাপো ভাই।"

আবার এর মধ্যে হাস্যরসেরও অবতারণা করা হয়—

"মুঞি তো জানোং না রে বৈরাগী জপে মালা
পায়্যা **আতারিত্** ধান ভরাইলং **ঝোঙোলা।**"

কিংবা—

"বুড়ীর বয়স নাই রে ও তোর মাতায় পাকা চুল
তার উপরো তুলিয়া দিচে কলমুশাকের ফুল।"

তা ছাড়াও কৃষ্ণ অথবা বেহুলা এদের সম্বন্ধে দু-একটি ছড়া থাকে, যেমন—

"ফুল ফুটিল রে না ফুটিল **বাঙা,**
ফুলবাড়ী সোন্দেয়া কৃষ্ণের চরণ হইলো রাঙা।"

আবার—

"**ধুপ** চল সখি রে দেবপুরে যাই,
বেউলারে ঘরে থুইয়া চলিল লখাই।"

ঠিক এই ধরণের গান বা ছড়া অন্য কোথাও আছে কি না, আমার সঠিক জানা নেই। তবে শুনেছি, পূর্ববঙ্গে ঢাকা, ময়মনসিংহ, পাবনা ইত্যাদি জেলায় সোনারায়ের গান প্রচলিত আছে। পাবনা জেলার শ্রীমতী মাতঙ্গিনী সাহা নাম্নী একটি মহিলার কাছে এর একটি ছড়াও শুনি। শুনেছি ওখানেও এই পৌষ মাসে কেবল মুসলমানরাই মাঝরাত্রির পর প্রত্যেক বাড়ি বাড়ি এই ছড়াটি বলে যায় এবং পরদিন সকালে এসে ধান, চাল, পয়সা, তেল লবণ ইত্যাদি সংগ্রহ করে এবং ঐরকম সংক্রান্তির দিনে রান্না করে প্রথমে সিন্নি দে

এবং নিজেরা পরে ভোজের ব্যবস্থা করে। ছড়াটি এইরূপ—

"আইল রে সোনারায় আইল সোনার বর।
সোনার-হার সোনার-হার সোনার-হার বিয়া
আবার তো যাও রে মালি ফুলের লাগিয়া
সেও ফুলে হইল রে সোনার-হার বিয়া।
আবার তো যাও রে মালি ফুলের লাগিয়া
সেওই ফুলে হইয়ে গেল সোনার-হার বিয়া।

আইলাম এই বারি, আগদুয়ারে কলা সারি।
কলা সারির ধলা ফুল, নারীর মাথায় নাই চুল।
সেই নারী চুল বান্ধে, সেচার কাটায় কান বিন্ধে।
আইলাম রে **অরণে**, লক্ষ্মীদেবীর চরণে।
লক্ষ্মী দেবী দিবে বর, চাইল কড়ি বাইর কর।
চাইল দিবি না দিবি কড়ি, তারে করি **নরির্বার**।
নরির্বারর শাম হে, সোনা বান্দা **খাম** হে।
সোনা হে দুইপরের বেলা, এই ঘরখানি
দেখতে ভালা।
ঘরখান বর **ছাটুনি**, গিন্নি বরয় খাটুণী।
সেই গিন্নি ব্রাহ্মণ, আমাক দিবি কত ধন।

তবে উত্তরবঙ্গে নাকি এখনও এই পূজোর বিধি প্রচলিত আছে। শ্রদ্ধেয় ডক্টর সুকুমার সেন মহাশয়ের সংগ্রহের মধ্যে এই সোনারায় সম্বন্ধে একটি ছোট পাঁচালিও দেখার সৌভাগ্য লাভ করি। সেটি বহু পূর্বে গ্রীয়রসন সাহেব এই উত্তরবঙ্গ থেকে সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। সেটিও নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।

বাঘে সব নাম লইয়ে ডাকে রে
ও ঠাকুর সোনারায়—বাঘ সবে ডাকে রে।
বাড়ী বাড়ী বেড়ায় ঠাকুর হরি নাম দিয়া।
হরির নাম দিয়া ঠাকুর চলিয়া পথে যায়
যত মোগলের ফৌজ **ঘাটাত** নাগাল পায়
যত মোগলের ফৌজ জিজ্ঞাসিলে কথা
মনের গৌরবে ঠাকুর **দোগ্‌দোগাইলে** মাথা।
কমরের **পাটিকা** খসাইয়া ঠাকুরকে বান্ধিয়া
ধাকাইতে ধাকাইতে নৈলে আগত করিয়া।
ধাকাইতে ধাকাইতে নৈলে **কোটশালের** ঘরে,
বাইস মোন পাথর দিলে তার বুকের উপরে।
ছোট মোগল উঠে বলে বড় মোগল ভাই
কালিকার বন্ধন দাদা চল দেখিতে যাই।
তোনাজল(?) মোগল জাতি করিল স্নান
*　　*　　*　　*

মিঠা জলে মোগল জাতি করিল ভোজন
বন্ধন দেখিতে মোগল করিল গমন।
কতেক দূর ছাড়ি মোগল কতক দূরে যায়
আর কতকদূরে গেলে কোটসালের নাগাল পায়।
কোটশালের ঘরে যাইয়ে মোগল **ভুল্‌কি**
মেরে চায়
বাইস মোন ফেলাইয়াছে তোমার নাই সোনারায়।
ছোট মোগল উঠে বলে বড় মোগল ভাই
এ বন্ধন ভাল নয় দাদা চল বাড়ী যাই।
বাড়ী যাইয়া বান্ধি আমরা সাতখানি ঘর
সে ঘরে থাকিলে বাঘক নাই ডর।
চিনিবার না পারিলো বেটা মোগল ছার জাতি
তোর মোগল মেরে যায় নিশাভাগ রাতি।
অরনের কিনারে ঠাকুর **মারে হাক**
বিশাশয় বাঘ আসিল **তিশাশয় ঠি**...
হেট মুখ হইয়ে আসিল বনের ভাল্লুক।
ধর ধর বাঘগণ বাটার পান খাও
এই বেটা মোগলের সাথে বাদ সাধিয়া দেও
এতেক হুড়মুড়ি বাঘ উঠিল নিল পান
গায়ের ঠেলায় ভাইঙ্গে ফেলায় ঘর সাতখান
ঘর ভাঙ্গিয়া বাঘ হইল কাতর
লম্ফ দিয়া সন্ধাইল বাঘ বাড়ীর ভিতর
মোগলের **মাইয়ে** গিছে অগ্নসালের ঘরে
নাগাইল পাইয়া মোছড়ায় ঘাড় হুড়মুড়ি বাঘে।
মোগলের বেটি গিছে জল ভরিবার
বাঘক দেখিয়া তার নদী সাতরিয়া পার
মৎস্য বলে তাক ঘড়ীয়ালে খায়
আজি কেন বা ঠাকুর মোক এত তাপ দেয়।
বাম হস্তে ধরি মোগলক মারে এক লাফ
মাটিত পড়িয়া মোগল করে বাপ বাপ।
আজি কেন বা ঠাকুর মোক এত তাপ দেয়।
ধনের কিঙ্কর না মুই মনের কিঙ্কর
চরনের ঘোরা বেচে সেবা করিম তোর
সেই দিন সোনারায় ঠাকুর দিয়ে গেল দেখা
নরলোক পূজে তাক পাইয়া পরিখা॥

এই সোনারায় ছাড়াও আমাদের এই অঞ্চলে আরও কতকগুলো বারোয়ারী পূজো আছে। যেমন—'মাদারের বাঁশ', 'কালী', 'বিষহরি' ইত্যাদি। এগুলিও সোনারায়ের মতোই বাড়ি বাড়ি 'দক্ষিণা' সংগ্রহ, অর্থাৎ চাঁদা সংগ্রহ করেই করা হয়ে থাকে। তবে খাতা নিয়ে ভীতির উদ্রেক করে চাঁদা সংগ্রহ নয়—তার পরিবর্তে অনেক কিছু আনন্দ দিয়ে তা সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। এগুলিতে কোনটাতে নাচ, কোনটাতে গান, আবার কোনওটাতে নাচ-গান একসঙ্গে করে গৃহস্থ-দের নিকট থেকে ধান বা পয়সা গ্রহণ করা হয়। এই চাঁদা সংগ্রহকারীদের 'ঠাকুরমাগা' বলে। অর্থাৎ ঠাকুর পূজোর জন্য 'মাগন' মানে ভিক্ষা। তবে 'ভিক্ষা নেওয়া' বলা হয় না—দেবতার জন্য 'ভিক্ষা' কি? 'দক্ষিণা' নেওয়া।

এই সব উৎসবে আর একটি উল্লেখযোগ্য বস্তুর অপূর্ব সমাবেশ দেখা যায়। মেয়েদের উৎসবে বালিকা থেকে বৃদ্ধারা এবং ছেলেদের উৎসবে বালক থেকে বৃদ্ধরা পর্যন্ত একসঙ্গে নাচ ও গানে যোগদান করে। বয়সের তারতম্য এই সমন্বয় রক্ষায় কোন বাধা সৃষ্টি করে না। এখানেও এই নাচ-গান অন্যান্য স্থানের মতোই ভদ্রসমাজে বর্জিত হয়েছে, কিন্তু যারা সত্যিই এখনও 'গ্রাম্য' আছে, যাদের এখনও নব্যযুগের আমোদ-প্রমোদের সুবিধা-সুযোগ ঘটে ওঠে না—তাদের ছোট্ট ছেলে-মেয়ে থেকে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা পর্যন্ত এখনও এই সব ছোটখাট পূজোর উৎসব-অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এদের আনন্দের খোরাক সংগ্রহ করে।

কালের প্রবাহে এ সমস্তই আজ দ্রুত লুপ্ত হতে চলেছে। তাই এই অখ্যাত প্রাচ্য-দেশের প্রান্তবাসী আজ তারই কিঞ্চিৎ সুধীজনের সম্মুখে ধরে দেওয়ার প্রয়াসী।

[চিতিয়া—চিতা; পাকেয়া—ডোরাকাটা; মানুষ কামরা—মানুষখেকো; জোর—জোড়া; যায়—যে; গরুচরের—গরু চরাবার; গাইরস্তক, গৃহস্থকে; গিরি—গৃহস্থালী; জাঙালে—মাচায়; কোরা—কোরক, কুঁড়ি; আতারিত্—খোলা যায়গা; ঝোঙোলা—ঝোলা বা ঝুলি; বাঙা—কাপাস; ধূপ—ধোবিণী নেতা?; সেও, সেওই—সেই; সেচার—সজারু; অরণে—অরণ্যে; নাড়ঘাড়—বিপর্যস্ত; খাম—থাম; ছাটুনী—ছিমছাম; ঘাটাত—রাস্তায়; দোগদোগাইলে—নাড়লে; পাটিকা—কোমরবন্ধ; ধাকাইতে ধাকাইতে—ধাক্কা দিতে দিতে; কোটশালের— ঘর জেলখানা; ভুল্‌কি মেরে—উঁকি দিয়ে; মারে হাক—ডাক পাড়ে; বিশাশয়—একশ' কুড়ি; তিশাশয়—একশ' ত্রিশ; মাইয়ে—স্ত্রী; চরনের—চড়িবার।]

মকবুল শেরোয়ানী

[১৯৪৭ সালের ২২শে অক্টোবর পাকিস্থানী হানাদার কাশ্মীর আক্রমণ করে রাজধানী শ্রীনগরের অভিমুখে দ্রুত অগ্রসর হতে থাকে। অক্টোবরের ২৭—২৮ তারিখ শ্রীনগরের ৩৫ মাইল মধ্যে এসে কাশ্মীর উপত্যকার দ্বিতীয় নগরী বারমুলা অধিকার করবার পরের অবস্থার কথা এই নাটকের মূল বিষয়বস্তু। বিখ্যাত সাংবাদিক খাজা আহাম্মদ আব্বাসের "চৌদ্দগোলিয়া" অর্থাৎ চৌদ্দটি গুলী নামক হিন্দি নাটীকা অবলম্বনে লিখিত। —অনুবাদক]

শহীদ মকবুল শেরোয়ানী

খাজা আহাম্মদ আব্বাস

[পর্দা উঠবার পর দেখা গেল চারজন কাশ্মীরী কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে আছে। সময় রাত্রি অন্তিম প্রহর; আলো খুবই কম।]

অহদ জোঃ আমি বলছি ও আর আসবে না।

পণ্ডিতঃ আর আমি বলছি ও নিশ্চয়ই আসবে। দশ বছর ধরে ওর সঙ্গে কাজ করছি। কোনদিন ওকে ফাঁকি দিতে দেখিনি।

সফদরঃ আরে ভাই এর মধ্যে ফাঁকি দেবার কথা কিছু নেই। এখানে তো ভাই নিজের প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

অহদ জোঃ কে বলতে পারে যে কবে হানাদারের দল এখানে পেঁাছে যাবে? শুনতে পেলাম যে রামপুরে স্টেটের সৈন্যদের মধ্যে অনেক আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছে। আর অনেকে পালিয়েছে। আহত সিপাইদের ভর্তি করে নিয়ে লরীগুলিকে শ্রীনগরের দিকে যেতেও আমি দেখেছি।

সফদরঃ গতকাল থেকে ত বিজলী বাতিও খারাপ হয়ে গেছে। বোঝা যাচ্ছে যে মোহরা বিজলী স্টেশন নিশ্চয়ই শত্রুর হাতে পড়েছে।

অহদ জোঃ ব্যস এবার তবে বারমুলোর পালা। কে বলবে কখন হামলা শুরু হবে? আচ্ছা পণ্ডিত আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি।

পণ্ডিতঃ বল।

অহদ জোঃ এই সময় যদি তোমার একটি মোটর সাইকেল ও পেট্রল মিলে যায়; আর যদি তুমি মোটর সাইকেল চালাতে পার; তবে কি, তুমি এখন সোজা শ্রীনগরের দিকে চলে যাবে না? আর ওখানে পেঁাছে গেলে কি তুমি বারমুলাতে এই মৃত্যুর মুখে ফিরে আসবে? বল না? (পণ্ডিত নীরব) কথা বলছ না কেন?

পণ্ডিতঃ যদি সত্যি কথা বলতে বল তবে বলবো যে ফিরে আসতে মন চাইবে না। এত সাহস আমার......

সফদরঃ তবে অহদ জো যে বলছে শেরোয়ানী আর ফিরে আসবে না, তাতে ভুল কোথায়? মোটর সাইকেলে যখন সে একবার চড়েছে তো আর কথা নেই।

অহদ জোঃ আর যাবার সময়ে সে বলে গেল—আমি শ্রীনগরে যাচ্ছি হামলাদারদের সম্বন্ধে খবর দিতে।

সফদরঃ আরে ভাই আমাদেরও যদি বাঁচবার এই রকম সুযোগ আসতো তবে হয়ত এখানে এসে মরতে চাইতাম না।

পণ্ডিতঃ কিন্তু ভাই আমার অন্তর বারে বারে বলছে শেরোয়ানী নিশ্চয় ফিরে আসবে।

অহদ জোঃ তুমি তা কি করে ভাবতে পারো? আমরা তার জন্য এতক্ষণ ধরে এখানে অপেক্ষা করছি। এতক্ষণ পাহাড়ে বা অন্য কোন জায়গায় লুকোবার চেষ্টা করলেও কাজ হতো। তোমার কি এখনো আশা আছে যে ও ফিরে আসবে? সে কিসের জন্য আসবে?

[কিছুক্ষণ সকলেই নীরব]

গুলাম মহম্মদঃ (ইনি এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিলেন)। এইজন্য যে তার নাম মীর মকবুল শেরোয়ানী। (উঠে দাঁড়িয়ে) এইজন্য যে শেরোয়ানী আজ পর্যন্তও মিথ্যা কথা বলে নি। এইজন্য যে খোদার কৃপায় সে কাউকেই ভয় করে না। সে মহারাজার সৈন্যকে ভয় করে নি; সে ভীরু কাকের* পুলিশকে ভয় করে নি —লাঠির আঘাত, বন্দুকের গুলী ফাঁসির দড়ি, কিছু দেখেই সে ভয় পায় না।

পণ্ডিতঃ আরে ভাই মনে নেই—আর একবার বারমুলার মুসলিম কনফারেন্স-ওয়ালাদের বিষ দাঁত কেমন করে ও ভেঙ্গে দিয়েছিল?

সফদরঃ এতো ঠিকই। এমন নির্ভীক লোক আমি কখনো দেখিনি। যেদিন মুসলিম কনফারেন্সের গুণ্ডা ওকে খুন করবার জন্য পুলের ওপর দিয়ে যাবার সময় ধাওয়া করেছিল, তখন ও লাফিয়ে নদীর মধ্যেই পড়ে সাঁতার কেটে চলে গেল। সকলে ভেবেছিল যে কিছুক্ষণের মধ্যেই ওর লাস জলে ভেসে উঠবে। কিন্তু দেখা গেল যে ও সাঁতরে ওপারে উঠে হাসছে ও কাপড় নিঙড়াচ্ছে।

অহদ জোঃ আরে তুমিও দেখছি ওর কথাই বলতে শুরু করলে। স্বাধীনতার লড়াইয়ের জন্য জেলে যাওয়া, পুলিশ বা মিলিটারীর সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ানো এক কথা, আর হাজার হাজার সশস্ত্র হানাদারের সামনে আসা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা।

গোলাম মহম্মদঃ শেরোয়ানী যেমন আগেরগুলি কাজে করে দেখিয়েছেন, এবারও তা কাজে করেই দেখিয়ে দেবে।

---

* কাশ্মীর রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী রামচন্দ্র কাক। "কুইট কাশ্মীর" আন্দোলনের সময় (মে, ১৯৪৬) ইনি শ্রীনগরে অত্যাচারের বন্যা বহিয়ে কুখ্যাতি অর্জন করেছেন।

অহদ জোঃ কিন্তু কবে? যখন হানাদারের দল বারমুলাতে এসে এক একটি করে ইট খুলে নেবে? যখন সমস্ত কাশ্মীর মুজফ্ফরাবাদ ও উরীর মতন পুড়ে ছাই হয়ে যাবে?—আজ তিন দিন হয় শেরোয়ানী চলে গিয়েছে কিন্তু আজ পর্যন্তও তার কোন পাত্তাই নেই। আমি এতদিন বলিনি কিন্তু আজ বলছি যে ও ভয় পেয়ে পালিয়েছে। ও কখনো ফিরে আসবে না, আসবে না আসবে না।

[এমন সময় দূরে থেকে মটর সাইকেলের আওয়াজ শোনা গেল।]

গোলাম মহম্মদঃ শোনো।

[মোটর সাইকেলের শব্দ আরও কাছে আসতে লাগলো।]

পণ্ডিতঃ কেমন আমি বলেছিলাম কিনা যে ও ফিরে আসবেই।

সফদরঃ আমিও তো তাই বলেছি।

[সবাই উৎফুল্ল হয়ে উঠল।]

গোলাম মহম্মদঃ জিন্দাবাদ মকবুল শেরোয়ানী! ঐ তো তার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

অহদ জোঃ আরে আগে খবর কি তাই জেনে নাও তো!

[শেরোয়ানী ওভার কোট ও দস্তানা খুলতে খুলতে প্রবেশ করল।]

শেরোয়ানীঃ চাচা, খবর বেশ ভালই নিয়ে এসেছি।

অহদ জোঃ কি, হানাদারের দল কি এখন ভেগে গেছে? স্টেটের ফৌজ কি তাদের দূরে করে দিয়েছে?

শেরোয়ানীঃ না স্টেটের ফৌজ হানাদারের দলের সঙ্গে লড়াই করে পারে নি। হানাদারের দল এখন বারমুলায় ঢোকবার উপক্রম করছে।

অহদ জোঃ তবে কি আমাদের রক্ষার জন্য শ্রীনগর থেকে ফৌজ আসবে?

শেরোয়ানীঃ শ্রীনগরের রক্ষার জন্যই এখন ফৌজ নেই। বড় বড় সরকারী অফিসারের দল এখন জম্মুতে পালাচ্ছেন। এমন কি মহারাজা নিজে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে ভেগে গিয়েছে!

অহদ জোঃ মহারাজা ভেগে গিয়েছে?

শেরোয়ানীঃ হ্যাঁ, আশিটি লরী ভর্তি করে নিজের জিনিসপত্র, ছেলেপেলে বৌ নিয়ে ভেগে গেছেন। আর তার সঙ্গে ভেগেছে ডোগরা অফিসারের দল।

অহদ জোঃ মহারাজা পর্যন্ত শ্রীনগর থেকে ভেগে গেছেন আর তুমি বলছ যে ভাল খবর নিয়ে এসেছ!

শেরোয়ানীঃ এর চেয়ে ভাল খবর আর কি হতে পারে? তোমার স্মরণ নেই, সেবার আমরা শের-ই-কাশ্মীরের নেতৃত্বে দাবী করেছিলাম "মহারাজা হরি সিং তুমি কাশ্মীর ছেড়ে চলে যাও।" আজ সেই কুখ্যাত গুলাব সিংহের পৌত্র হরি সিং কাশ্মীর ছেড়ে চলে গিয়েছে।

সফদরঃ মহারাজা চলে গেছে। ডোগরা অফিসারেরাও সব চলে গেছে। স্টেটের ফৌজ হেরে গেছে। তবে আমাদের রক্ষা কে করবে?

শেরোয়ানীঃ আমরা করবো। এই হলো শের-ই-কাশ্মীর কি ফরমান। কাল মুজাহিদ মঞ্জিলের* এক সভায় বক্তৃতা দেবার সময় তিনি এই কথাই বলেছেন। তিনি বলেছেন এই আমাদের প্রিয় দেশ কাশ্মীর, এর রক্ষা আমরাই করবো। মহারাজা ও তাঁর ডোগরা অফিসার কাশ্মীর ছেড়ে চলে যেতে পারেন; কিন্তু আমরা কাশ্মীরী, এখানেই আমাদের জন্ম, এখানেই আমরা মরবো।†

পণ্ডিতঃ আর কি বললো।

শেরোয়ানীঃ এই দস্যু হানাদারের দল আমাদের দুষমণ। এরা মানবতা ও স্বাধীনতার দুষমণ। এদের চালে যেন আমরা ভুল না করি।

সফদরঃ আর কী বলেছে?

শেরোয়ানীঃ তিনি বলেছেন যে যদি কোন জায়গা হানাদারের দখলে এসেও যায় তাহলেও যেন আমাদের কেউ ঘাবড়ে না যায়। শত্রুর ও তার গুপ্তচরের গতিবিধি যেন তারা ভালভাবে লক্ষ্য করে; যে যেভাবে পারে শত্রুর খবর তার কাছে যেন পৌঁছে দেবার প্রাণপণ চেষ্টা করি। এ কাজ যত তাড়াতাড়ি করতে পারবে আমাদের সৈন্যদের ততই সাহায্য হবে। শীঘ্রই তাদের সাহায্যে আমাদের ফৌজ আসবে।

অহদ জোঃ কোন ফৌজ? ডোগরা বাহিনী?

শেরোয়ানীঃ না ডোগরা বাহিনী নয়। কাশ্মীরী। হিন্দু আর মুসলমান; পণ্ডিত ও মূর্খ; কলেজ ও স্কুলের নওজোয়ান ছাত্র। দর্জি, দোকানদার, গরীব আর আমীর; বালক ও বৃদ্ধ। কাশ্মীরীদের নিজেদের বাহিনী আজ শ্রীনগরে গড়ে উঠেছে।

সফদরঃ কিন্তু ডোগরা রাজ ত আমাদের সামান্য বন্দুক রাখবার লাইসেন্সও দেয়নি।

শেরোয়ানীঃ ডোগরা রাজ আজ খতম হয়ে গেছে। আজ শ্রীনগরে হরি সিংহের নয় বরং শের-ই-কাশ্মীর শেখ আবদুল্লার হুকুমে সব কাজ হচ্ছে। আজ ন্যাশনাল কনফারেন্সই সব কাজ করছে। কাল থেকে সমস্ত দেশের জনতার রাজ কায়েম হতে শুরু করবে। আজ থেকে বিপ্লবীদের শুরু। চল্লিশ লক্ষ কাশ্মীরী কিষাণ মজদুরের মুক্তির নিশানা দেখা দিয়েছে।

গোলাম মহম্মদঃ শের-ই-কাশ্মীর জিন্দাবাদ। আর কি আদেশ আছে?

শেরোয়ানীঃ শের-ই-কাশ্মীর বলেছেন—শুধু কাশ্মীরেরই না, সমস্ত ভারতবর্ষের মুক্তি হিন্দু-মুসলিম ও শিখ জনতার দৃঢ় ঐক্যের মধ্য দিয়েই আসবে। তিনি আরও বলেছেন যে হিন্দুস্থান ও পাকিস্থানের হিন্দু-মুসলমান জনতার জন্য কাশ্মীরের মুসলমানদের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে দিতে হবে। হানাদারের দল এখানে এসে প্রথমেই আমাদের হিন্দু ও শিখ ভাইদের ওপর হামলা করতে শুরু করবে। আজ মুসলমানদের নিজেদের জান দিয়েও তার প্রতিবেশী হিন্দু ও শিখ ভাইকে রক্ষা করতে হবে। কাশ্মীরী মুসলমান যেন আজ খেয়াল রাখে যে, তাদের প্রতিবেশী হিন্দু ও শিখ ভাইদের জীবন ও সম্মান তাদের হেপাজতে আছে।

পণ্ডিতঃ শের-ই-কাশ্মীর জিন্দাবাদ।

[দূরে থেকে গুলীর আওয়াজ আসতে লাগলো।]

সফদরঃ ঐ বুঝি খুনীর দল এসে গেলো!

মহম্মদঃ হ্যাঁ, দস্যুর দল এসে গেছে।

শেরোয়ানীঃ তোমরা সব তাড়াতাড়ি করে নিজ ঘরে.....'

আহদ জোঃ (পণ্ডিতকে) শ্যামলাল তুমি আমার সঙ্গে আমার ঘরে চল। তাড়াতাড়ি করে তোমার স্ত্রী-পুত্রদেরও আমার ঘরে নিয়ে এস।

পণ্ডিতঃ কিন্তু আমার জন্য যদি তোমার কোন বিপদ হয় তবে——

অহদ জোঃ আরে তাড়াতাড়ি চল দেখি। (যেতে যেতে) আর শেরোয়ানী তুমি কি একবার তোমার বাড়িতেও যাবে না দেখাশুনা করতে?

---

* কাশ্মীরের ন্যাশনাল কনফারেন্সের কেন্দ্রীয় কার্যালয় ও দপ্তর।

† মহারাজা জাতিতে কাশ্মীরী নন, তিনি ডোগরা রাজপুত।

শেরোয়ানীঃ আমার এখন অনেক কাজ আছে। রামপুর, পত্তন, সোপর—সব জায়গায় আমাকে এখনই যেতে হবে।

সফদরঃ কিন্তু ঐসব জায়গাই ত শত্রুর কবলে পড়ে গেছে। তুমি ওখানে কেমন করে যাবে?

শেরোয়ানীঃ তার জন্য ভেবো না। তুমি এখন নিজ স্ত্রী-পুত্রদের সামলাও দেখি।

সফদরঃ (যেতে যেতে) খোদা হাফিজ!

শেরোয়ানীঃ খোদা হাফিজ! (গোলাম মহম্মদকে) মহম্মদ বারমুলার কাজ আমি তোমার ওপর ছেড়ে রেখে যাচ্ছি। শের-ই-কাশ্মীরের কাছ থেকে আরও একটি আদেশ শীগ্‌গিরই পাবে। এখন হিন্দু ও শিখদের রক্ষা কর এবং যতক্ষণ পারো হানাদার দলকে শ্রীনগরে যাবার পথে বাধা দেবে। শ্রীনগরে শত্রুকে বাধা দিয়ে আক্রমণ করবার জন্য ফৌজ তৈরী হচ্ছে। শত্রুকে রাস্তা ভুল করিয়ে দেবে, যাতে চারদিনের মধ্যে সে শ্রীনগরে পৌঁছতে না পারে।

মহম্মদঃ কিন্তু এত দেরী হলে হানাদারের দল বারমুলাকে লুটে নেবে—বারমুলার সর্বনাশ করে দেবে।

শেরোয়ানীঃ যদি এক বারমুলা জ্বলেই যায় ত' তাতেও পরোয়া করো না। কারণ শ্রীনগর ত বাঁচবে, কাশ্মীর ত' বাঁচবে। চারদিন হানাদারদের এখানে ঠেকিয়ে রাখতেই হবে।

মহম্মদঃ কিন্তু চারদিনের পর?

শেরোয়ানীঃ এর মধ্যে হিন্দুস্তানী ফৌজ পৌঁছে যাবে। আজ শের-ই-কাশ্মীর পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন। আজ তুমি ভুলো না যে, হিন্দুস্তানের প্রধান মন্ত্রী এক কাশ্মীরী। আচ্ছা এখন তুমি যাও। খোদা হাফিজ।

মহম্মদঃ খোদা হাফিজ!

[সব চলে গেলে শেরোয়ানী একা থেকে গেল। যতই ভোরের আলো বাড়তে লাগলো গুলীর আওয়াজও ততই বাড়তে লাগলো। শেরোয়ানী একটু উঁচু জায়গা থেকে বারমুলার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো ও মোটর সাইকেলে স্টার্ট দিয়ে ধীরে ধীরে যেতে লাগলো।]

লাউড-স্পীকারের আওয়াজ শোনা গেল—

"বারমুলায় হানাদারের আক্রমণ হয়েছে। কাশ্মীর ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ঘোষণা করছেন যে, তিনি শেষ পর্যন্ত কাশ্মীরী দেশভক্তদের সঙ্গে লড়বেন। শেখ আবদুল্লা কাশ্মীরের শাসন নিজ হাতে নিয়ে নিয়েছেন। হিন্দুস্তানী ফৌজ শ্রীনগরের দিকে আসছে।

দূরে থেকে বালক-বালিকাদের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—

"শেরোয়ানী কী বলেছে? বলেছে, আমাদের ভয় নেই, শের-ই-কাশ্মীর আমাদের সঙ্গে আছেন। আমাদের সঙ্গে ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন আছে।"

[একজন হানাদারের প্রবেশ।]

হানাদারঃ "কোথায় সেই শেরোয়ানী?"

মোটর সাইকেলের আওয়াজ তখন ক্রমশঃ দূরে চলে যাচ্ছে। লাউড স্পীকারে আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

—"শেরোয়ানী সোপর মে হ্যায়"

"শেরোয়ানী পত্তন মে হ্যায়।"

"শেরোয়ানী রামপুর মে হ্যায়"

"শেরোয়ানী বারমুলা মে হ্যায়।"

*　　*　　*　　*

হানাদার (চীৎকার করে): শেরোয়ানীকে গ্রেপ্তার করো।

আবার লাউড স্পীকারের আওয়াজ শোনা গেল—

২য় হানাদারঃ কিন্তু সে কোথায়?

"শেরোয়ানী পত্তন মে হ্যায়—" ইত্যাদি

[দ্বিতীয় দৃশ্য]

[দুইজন কাওয়ালী অর্থাৎ হানাদার দুদিক থেকে ঢুকলো। একজনের হাতে বসবার চেয়ার।]

১মঃ এখানে চেয়ার পেতে দাও। সর্দার ওখানে বসবে। আজ মকবুল শেরোয়ানীর বিচার হবে। এই কাফেরটাকে আজ ধরা গেছে।

২য়—কাফের কিরূপ। মকবুল শেরোয়ানী ত' মুসলমান আছে।

১মঃ নামে হলে কী হবে! ও আর একজন কাফের শেখ আবদুল্লার চেলা। এখানে সব লোককে ও আমাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছে।

২য়ঃ মকবুল শেরোয়ানী? শেখ আব্দুল্লাঃ —এই কাশ্মীর ত বেশ সুন্দর শান্ত দেশ।

১মঃ তাতে কী হয়েছে।

২য়ঃ এখানে দেখছি সব কাফেরই মুসলমানী নাম রেখেছে।

১মঃ আরে ও নিজেই ত মুসলমান। কিন্তু তাহলে কী হবে। ও আমাদের শত্রু।

[হানাদার সর্দারের প্রবেশ]

১মঃ সালাম আলেকুম সর্দার।

সর্দারঃ আলেকুম। বন্দী মকবুল শেরোয়ানীকে হাজির করো।

[একজন হানাদার মকবুল শেরোয়ানীকে বন্দী অবস্থায় সর্দারের সম্মুখে এনে হাজির করলো। মকবুল শেরোয়ানীর দীপ্ত চোখে তখনো হাসি মাখানো। শেরোয়ানীর পিছনে পিছনে একজন পাঞ্জাবীও প্রবেশ করলো।]

হানাদারঃ (শেরোয়ানীর প্রতি) সর্দারকে মাথা নীচু করে সেলাম করো।

শেরোয়ানীঃ এই শির এক বিদ্রোহীর শির। এই শির কোন রাজা মহারাজা বা বাদশাহের কাছে কখনো নত হয় নি। তুমি ত হানাদার-দস্যুর সর্দার, তোমার কাছে এই শির নত করবো?

সর্দারঃ চুপ কর; এর বিরুদ্ধে অভিযোগ কী?

পাঞ্জাবীঃ (এক নোটবুক থেকে দেখে) সর্দার, এই কাফেরের নাম মকবুল শেরোয়ানী। এই কাফের ন্যাশনাল কনফারেন্সের পক্ষে কাজ করে। আমাদের বিপক্ষে কাজ করছে।

সর্দারঃ ন্যাশনাল কনফারেন্স, সে আবার কি জিনিস?

পাঞ্জাবীঃ এই প্রতিষ্ঠানের নেতা হলো সেখ আব্দুল্লা। তাঁরই নেতৃত্বে এই সভা ডোগরা-রাজের উচ্ছেদের জন্য সংগ্রাম করে এসেছে।

সর্দারঃ বাঃ বাঃ। তবে ত' এই যুবক সম্মানের পাত্র। এ মহারাজার উচ্ছেদের জন্য লড়েছে। আমরাও মহারাজার উচ্ছেদের জন্যই লড়াই করছি।

পাঞ্জাবীঃ না সর্দার, আপনি ভুল বুঝেছেন। এই ন্যাশনাল কনফারেন্স আসলে হিন্দু কংগ্রেস ও অন্যান্য কাফেরদের সঙ্গে মিলেছে। এই বারমুলাতেই চার বৎসর আগে এই মকবুল শেরোয়ানীই আমাদের পাকিস্তানের শাহানশাহ কায়েদী-আজম জিন্নাকে অপমান করেছিল।

সর্দারঃ তবে ত বড় অন্যায়। আর কী?

পাঞ্জাবীঃ যেদিন থেকে আমাদের "আজাদী" ফৌজ কাশ্মীরে ঢুকেছে, সেইদিন থেকেই এই শেরোয়ানী এখানকার জনসাধারণকে আমাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছে। সর্দার, এ হলো একজন দেশদ্রোহী। এর মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত।

সর্দারঃ কিন্তু এ একজন নওজোয়ান, তার ওপর এ একজন মুসলমান। আমি একে আমাদের মতে আনবার জন্য একবার সুযোগ দেবো। (শেরোয়ানীর দিকে চেয়ে) যুবক তুমি বাঁচতে চাও?

শেরোয়ানীঃ নিশ্চয়ই।

সর্দারঃ কেন বাঁচতে চাও?

শেরোয়ানীঃ এইজন্য যে, আমি একজন তরুণ যুবক। আমার অন্তরে পৃথিবীতে বাঁচবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা আছে। আগামী মাসে আমার সাদী হবে। বুড়ো মা বাপের আমিই একমাত্র ভরসা।

সর্দারঃ বাঃ বাঃ। তোমার উত্তরে আমি খুবই খুশী হয়েছি। এখন তুমি যদি তোমার আগে যে পাপ করেছো তার প্রায়শ্চিত্ত কর তবেই আমি তোমাকে মুক্ত করে দিতে পারি। তুমি স্বীকার কর যে, কাল থেকে তুমি আমাদের দলের সঙ্গে কাজ করবে।

শেরোয়ানীঃ (সর্দারের প্রতি থুঃ থুঃ নিক্ষেপ করে) তুমি আমার কথার ভুল অর্থ বুঝেছো। আমি বাঁচতে চাই সত্যই, কিন্তু আমি স্বাধীন হয়ে বাঁচতে চাই। তোমার মত দস্যু সর্দারের গোলামী করে বাঁচতে চাই না। আমি আমার স্বাধীনতার বিনিময়ে জীবন ভিক্ষা নিয়েছি শোনার চেয়ে আমার মা বাবা আমার মৃত্যু হয়েছে শুনলেও কোন দুঃখ করবে না।

সর্দারঃ ব্যস ব্যস, চুপ কর। খুব হয়েছে। (চেরদের মধ্যে একজনকে ইশারা করে) রহমান খাঁ—।

[শৃঙ্খলিত শেরোয়ানীকে নিয়ে ক্রুসের মত একটি কাঠের সঙ্গে বেঁধে হাতে ও পায়ের ওপর পেরেক বিঁধিয়ে দিল। হাত ও পা থেকে রক্ত ঝরতে লাগলো।]

শেরোয়ানীঃ সর্দার! আজ থেকে ১৯শত বৎসর আগে এমনি করেই একজনকে শূলের ওপর ওঠানো হয়েছিল কিন্তু তার আওয়াজ আজও বন্ধ হয়নি। বরং অর্ধেক দুনিয়া তাঁরই নাম করে থাকে।

সর্দারঃ মুখ সামাল করো। গুলী করো এই কাফেরের পায়ে। (প্রথম গুলী) বল এখনো প্রায়শ্চিত্ত করবে কিনা।

শেরোয়ানীঃ দস্যু সর্দার তুমি ভুল বুঝেছো। বন্দুকের আওয়াজে আজাদীর আওয়াজ কখনো বন্ধ হয় না।

সর্দারঃ (ইশারা করার ভঙ্গীতে) দস্যুরা গুলী।

শেরোয়ানীঃ রাজা, বাদশাহ ও দস্যুর দল কেবল এই একটিমাত্র পথই এতদিন ধরে চিনে এসেছে।

[সর্দার ইসারা করবার সঙ্গে সঙ্গে আর একবার বন্দুকের গুলী হলো।]

শেরোয়ানীঃ ভারতবর্ষে ইংরেজের মেশিন-গান যা করতে পারেনি, তোমার এই গুলী সেখানে কী করতে পারবে?

সর্দারঃ ফায়ার (চতুর্থ গুলী)

শেরোয়ানীঃ এই গুলী আমার ওপর পড়ছে না সর্দার, বরং এগুলি পড়ছে প্রত্যেকটি তোমারই মাথার ওপর। ইতিহাসে এর বহু নজীর আছে যে, শহীদের রক্ত কখনো বৃথা যায় না।

সর্দারঃ আবার গুলী (পঞ্চম গুলী)

শেরোয়ানীঃ গদ্দর পার্টী! কামাগাটা মারু। (শেরোয়ানীর কণ্ঠস্বর ক্রমশ উঁচুতে উঠতে লাগলো।)

শেরোয়ানীঃ আঠারো শ সাতান্ন সালের— (ষষ্ঠ গুলী)

শেরোয়ানীঃ কাকোরীর শহীদ, ভগৎ সিং, দত্ত রাজগুরু, এরা সবাই যেন আমাকে ডাকছে, ঐ তারা সব এসেছে। (সপ্তম গুলী)।

শেরোয়ানীঃ ঐ তাঁরা সব আমার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। (অষ্টম গুলী)

শেরোয়ানীঃ কাশ্মীর আজ জেগেছে। গরীব মজদুর কিষাণ এক অত্যাচারী মহারাজার হাত থেকে আপন অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। (নবম গুলী)

শেরোয়ানীঃ ঐ দেখ শের-ই-কাশ্মীর আসছে। আর তার পিছনে উড়ছে আমাদের বিদ্রোহের লাল নিশান। শের-ই-কাশ্মীর জিন্দাবাদ—

(এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে দশম গুলী ছোঁড়া হলো।)

শেরোয়ানীর কণ্ঠস্বর ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগলো। কিন্তু সেই ক্ষীণ কণ্ঠস্বরেই বলে উঠল—

মহারাজা আজ কাশ্মীর থেকে পালিয়েছে, যেনো এমনিভাবে একদিন তোমাকেও কাশ্মীর থেকে পালাতে হবে। ঐ দেখ কাশ্মীরে এক নূতন সূর্য উঠছে। কাশ্মীর আজ জেগেছে। (দ্বাদশ গুলী)

শেরোয়ানীঃ আমি তোমাকে আবার বলছি দস্যু সর্দার, বন্দুকের গুলীতে আমার আওয়াজ বন্ধ করতে পারবে না। এ আওয়াজ স্বাধীনতার আওয়াজ, এ আওয়াজ মানবতার আওয়াজ। (ত্রয়োদশ গুলী)

সর্দারঃ এর মুখ বন্ধ করে দাও নইলে আমি পাগল হয়ে যাবো। (চতুর্দশ গুলী শেরোয়ানীর বুক লক্ষ্য করে গর্জে উঠল।)

সর্দারঃ এই গুলীর মুখেও প্রতিবাদ শুনে মনে হয়—এ এক অশরীরী আত্মা। ওর জিবটা কেটে মাথার ওপর টাঙিয়ে দে এবং জানিয়ে দে ন্যাশনাল কনফারেন্সের দলের সকলের এই শাস্তি হবে যদি না তারা আমাদের দলে আসে।

[একজন হানাদার ছুরি নিয়ে শেরোয়ানীর মুখের ওপর ছুরি চালিয়ে দিয়ে জিভ কেটে নিল। শেরোয়ানীর মুখ দিয়ে দরদর করে রক্ত ঝরে পড়তে লাগলো। মুখে তার তখনো হাসিটি মাখা আছে।]

সর্দারঃ কিন্তু কই শেরোয়ানীর আওয়াজ ত' বন্ধ হলো না। ঐ ত আবার বলছে "দস্যু সর্দার শেরোয়ানী মরেনি, মরতে পারে না। তার আওয়াজ কখনো বন্ধ হবে না। এ আওয়াজ আজাদীর আওয়াজ এ আওয়াজ মানবতার আওয়াজ। চোদ্দ গুলী কেন চোদ্দ হাজার গুলীতেও ঐ আওয়াজ বন্ধ হবে না।"

সর্দারঃ (কিছুক্ষণ কান পেতে থেকে) ঐ আবার বলছে—"এক শেরোয়ানী মরেছে তার বদলে হাজার শেরোয়ানী জেগেছে। আজ শ্রীনগরে যাও সেখানে হাজার হাজার শেরোয়ানী দেখতে পাবে। সারা হিন্দুস্তানে লক্ষ লক্ষ শেরোয়ানী আজ জন্ম নিয়েছে।"

সর্দারঃ না, আওয়াজ আজ অসহ্য। দ্রুত-পদে কান দু'টি ঢেকে প্রস্থান।

[দূর থেকে জনতার আওয়াজ ভেসে আসতে লাগলো—"শের-ই-কাশ্মীর জিন্দাবাদ, নয়া কাশ্মীর জিন্দাবাদ—হামলাদার মুর্দাবাদ।]"

অনুবাদকঃ দুর্গাপদ তরফদার

মধ্যপ্রাচ্য-পরিচয়

০ সরোজ আচার্য ০

(৬)

মিশরে সাম্রাজ্যবাদী কূট-কৌশলের সর্বশেষতম অধ্যায় নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। বর্তমান বৎসরের (১৯৫২) জানুয়ারী থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত মিশরে নাটকীয় ঘটনাবলীর উত্থান-পতন হয়েছে। রাজা ফারুকের সিংহাসন-ত্যাগ, জেনারেল নাগুইবের ফৌজী অভ্যুত্থান ও ক্ষমতা দখল ও জাতীয়তাবাদী ওয়াফদ দলের প্রতিষ্ঠা-নাশ ও ভাঙন— এই সব চমকপ্রদ ঘটনার পিছনে কোন্ কলকাঠি ঘুরেছে সেটা এখন আর গোপন নেই। দুর্নীতি দমন ও ভূমিসমস্যা সমাধান নিয়ে জেনারেল নাগুইব অনেক চটকদার কথা বলছেন বটে, কিন্তু কি উপায়ে এবং কার স্বার্থে মিশরে নাগুইবের ফৌজী শাসন কায়েম করা হয়েছে সেই রহস্য প্রথমে প্রকাশিত হওয়া দরকার।। ১৯১৯ সন থেকে জাতীয়তাবাদী ওয়াফদ দল মিশরে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব করেছে। ওয়াফদ দলের নেতৃত্বে অবশ্যই বিস্তর গলদ ও দুর্বলতা আছে। যেমন ভারতের কংগ্রেস সংগঠন ও নেতৃত্বেও ছিল। কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আমাদের সংগ্রামের চরম মুহূর্তে যদি কোনো জাঁদরেল 'দেশপ্রেমিক' দুর্নীতির অজুহাতে কংগ্রেস আন্দোলন ভেঙ্গে দিত, তবে নিঃসংশয়ে বলা যেত, ঐ 'দেশপ্রেমিক' বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বন্ধু অথবা অনুচর।

জেনারেল নাগুইবের অভ্যুত্থানের কয়েক মাস পূর্ব থেকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের চরম সংকট উপস্থিত হয়েছিল মিশরে। ১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসে ওয়াফদ দলের মন্ত্রি-সভা ইঙ্গ-মিশর চুক্তি বাতিল করে। ওয়াফদ নেতারা জনসাধারণের চাপেই ঐ পর্যন্ত অগ্রসর হতে বাধ্য হয়েছিলেন। এরপর সুয়েজ খাল এলাকায় বেআইনীভাবে বৃটিশ ফৌজ দখলের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদ শুরু করে ছাত্র, মজুর, মধ্যবিত্ত ও চাষী জনসাধারণ। খাল এলাকায় মিশরী মজুরেরা ধর্মঘট করে। কায়রো, আলেক-জান্দ্রিয়া, ইস্মাইলিয়া এবং আরও নানা শহরে ও গঞ্জে জনসাধারণ জাতীয় প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তোলে। মিশরী মেয়েরাও এই প্রথম সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে, গণবিক্ষোভে আহত মুক্তি সৈনিকদের জন্য শুশ্রূষা বাহিনীও মিশরী মেয়েরা এই প্রথম গঠন করে। সরকারী পুলিশ ও ফৌজ অনেক জায়গায় গণ-বিক্ষোভ দমনের হুকুম উপেক্ষা করে। সুয়েজ খাল এলাকায় ৩৫ হাজার মিশরী মজুর বৃটিশের বিরুদ্ধে ধর্মঘট করে। জাহাজীরা বৃটিশ ফৌজের কোনো রকম কাজ করবে না, এই সংকল্প নেয়। ১৯৫১ সনের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরে মিশরের অবস্থা অগ্নি-গর্ভ। কায়রো থেকে 'ইউ-নাইটেড স্টেটস্ নিউজ য়্যান্ড ওয়ার্লড রিপোর্ট' কাগজের সংবাদদাতা ঐ সময়ে সংবাদ দিচ্ছিলেন, "আধুনিক কালের ইতিহাসে এই প্রথম মিশরের গরীব লোক-দের মধ্যে রাজনৈতিক জাগরণ দেখা দিয়েছে, আর এই জাগরণ ক্রোধময়।" জাতীয়তাবাদী ওয়াফদ নেতারা এই জাগরণে শঙ্কিত হয়ে-ছিলেন; দীর্ঘকাল ধরে ওয়াফদ দল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রধান বিরোধীর ভূমিকায় জনসাধারণের নেতৃত্ব পেয়েছিল। কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জন-সাধারণকে অগ্রসর হতে দেখে ওয়াফদ নেতাদেরই উভয় সংকট হ'ল। ওয়াফদ নেতারাই এই সময়ে মিশরের মন্ত্রিসভার গদীয়ান। তাঁরা প্রকাশ্যভাবে জনসাধারণের সংগ্রামী সংকল্পকে নিন্দা করতে সাহস কর-করছিলেন না। অথচ আইন ও শৃঙ্খলার দোহাই দিয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থকেও রক্ষা করছিলেন। তাই প্রথম আঘাত এল ওয়াফদ দলের উপরই। কারণ বৃটিশের চোখে জনসাধারণের সংগ্রামী মনোভাবকে প্রশ্রয় দিয়েছে জাতীয়তাবাদী ওয়াফদ দল। রাজা ফারুকের মারফৎ ওয়াফদ মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করার বন্দোবস্ত গোপনে গোপনে ঠিক হয়ে গেল। ফারুকের খাস মন্ত্রণাদাতা হিসাবে নিযুক্ত হ'ল দুজন কুখ্যাত বৃটিশ তল্পীদার, ওমর পাশা ও আফিফি পাশা। ওয়াফদের উপরে আক্রমণটা অতর্কিতভাবে ঘটল না। ওয়াফদ নেতা প্রধানমন্ত্রী নাহাস পাশা নিজেই অনুভব করছিলেন, তাঁর দম ফুরিয়ে এসেছে। বৃটিশের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলনে নেতৃত্ব করার সাহস তাঁর নেই। ৮ই জানুয়ারী (১৯৫২) মিশরী সংবাদ পত্র আখর লাখজা একটা মজার কাহিনী প্রকাশ করল, "সেরাগ এলদীনের মেয়ের বিয়ের ভোজে নাহাসের সঙ্গে আলি মাহের পাশার দেখা হয়। আলি মাহেরকে ভাবী প্রধানমন্ত্রী বলে নাহাস অভিনন্দন জানান। আলি মাহের সহাস্যে অভিনন্দনটা মেনে নেন।" আলি মাহের যুদ্ধের সময় ছিলেন নাৎসীদের বন্ধু; শোনা যায় মার্কিন রাজ-দূত রাজা ফারুক ও আলি মাহেরকে তালিম দেন ওয়াফদ মন্ত্রিসভা বরখাস্ত করার জন্য। এখন বাকী রইল কেবলমাত্র একটি সুযোগ বা অজুহাত। বৃটিশ মিলিটারী যেখানে মোতায়েন সেখানে সুযোগ বা ছলের অভাব হয় না। জানুয়ারীর (১৯৫২) মাঝামাঝি কায়রো থেকে সামান্য কিছু দূরে তেল-এল-কবির এলাকায় বৃটিশ সৈন্যেরা ছোট-

খাট সঙ্ঘর্ষ সৃষ্টি করতে লাগল। সাম্রাজ্যবাদের ধরণধারণ বদলায় না। ১৮৮২ সনে এই তেল-এল-কবির অঞ্চলেই আরবী পাশার সঙ্গে বৃটিশ ফৌজের লড়াই হয় এবং তারপরই মিশর বৃটিশ দখলে যায়। ২৫শে জানুয়ারী (১৯৫২) ইস্‌মাইলিয়ার মিশরী শাসনকর্তার বাড়ি ও মিশরী পুলিশের দপ্তর বৃটিশ সৈন্যেরা ঘেরাও করে; 'স্বাধীন' মিশরী পুলিশকে অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ করার জন্য বৃটিশ ফৌজী নায়ক চরমপত্র দেয়। মিশরী শাসনকর্তা সেই চরমপত্র অগ্রাহ্য করেন। তখন বৃটিশ গোলন্দাজ বাহিনী, ট্যাঙ্ক ও বিমান মুষ্টিমেয় মিশরী পুলিশ বাহিনীর উপরে হিংস্র আক্রমণ চালায়। পঞ্চাশজন মিশরী পুলিশ প্রাণ হারায় এবং আরও অনেক লোক আহত হয়। স্বভাবতই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের এই দাম্ভিক ও নির্মম আক্রমণে কায়রোতে প্রবল বিক্ষোভ শুরু হ'ল। গণআন্দোলন দমন ও তাঁবেদার সরকার প্রতিষ্ঠার এমন সুবর্ণ সুযোগ ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা ছাড়বে কেন? লণ্ডন থেকে হুমকী এল, ওয়াফদ সরকার যদি গণ-বিক্ষোভ দমন না করে, তাহলে জেনারেল আরস্কাইন রাজধানী কায়রো বৃটিশ ফৌজের দখলে নেবে, যদিও এই গণ-বিক্ষোভের মূলে হ'ল ইস্‌মাইলিয়াতে বৃটিশের হত্যালীলা। বৃটিশ মূলধনীদের মুখপত্র 'ইকনমিস্ট' কাগজ পর্যন্ত মন্তব্য করল, "দাঙ্গা-হাঙ্গামা নিঃসন্দেহেই বৃটিশের কাজের ফলে হয়েছে।" ইস্‌মাইলিয়াতে মিশরী পুলিশ হত্যা ও তার ফলে কাইরোতে দাঙ্গা-হাঙ্গামায় ইঙ্গ-মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্র এক ধাপ অগ্রসর হ'ল। ২৬শে জানুয়ারী মার্কিন রাজদূত রাজা ফারুককে প্রকারান্তরে ইঙ্গিত করলেন, ওয়াফদ মন্ত্রিসভা বরখাস্ত করা চাই। ওয়াফদ নেতারা রাজা ফারুকের নির্দেশ মেনে নিয়ে সামরিক আইন জারী করলেন; একমাত্র কায়রোতেই এক হাজারের বেশি সংগ্রামী নেতা ও কর্মীরা গ্রেপ্তার হলেন। তবুও ওয়াফদ দল রাজা ফারুক ও ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের খুশী করতে পারল না। ওয়াফদ মন্ত্রিসভাকে দিয়ে সামরিক আইন জারী করিয়ে নেবার পর পরই রাজা ফারুক ঐ মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করে আলি মাহেরকে শাসনভার নিতে বল্লেন। মিশর পার্লামেণ্টে ওয়াফদ দলই বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল, তাদের পেছনে ছিল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জনসমর্থন। তবুও নাহাস পাশা এবং ওয়াফদ নেতারা রাজা ফারুকের জবরদস্তি নীরবে মেনে নিলেন। রাজা ফারুক অবশ্য শিখণ্ডীমাত্র; "বিদেশী শক্তির চাপে রাজা ফারুক আলি মাহেরকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেছেন," এই সংবাদ য়ুরোপের নানা কাগজে ও বেতারে প্রচারিত হয়েছিল। জানুয়ারী মাসে (১৯৫২) ইস্‌-মাইলিয়া ও কায়রোতে সংঘর্ষের অনেক পূর্বেই ইঙ্গ-মার্কিন কর্তারা মিশর সম্বন্ধে নূতন ফন্দী করেছিলেন। মধ্যপ্রাচ্যের বৃটিশ বাহিনীর সেনাপতি, জেনারেল রবার্টসন ৩১শে ডিসেম্বর (১৯৫১) ঘোষণা করেন, সুয়েজ খাল এলাকায় বৃটিশ ফৌজ থাকবেই; এ বিষয়ে অন্যান্য শক্তির (অর্থাৎ আমেরিকার) সমর্থন আছে। ১৭ই জানুয়ারী (১৯৫২) মিঃ চার্চিল মার্কিন কংগ্রেসের নিকট আবেদন করেন, মধ্যপ্রাচ্য রক্ষা (!) ব্যবস্থার জন্য কিছু মার্কিন সৈন্য যেন সুয়েজ খাল এলাকায় মোতায়েন করা হয়। কোন কোন মার্কিন কাগজে সংবাদ প্রকাশিত হয়—বৃটিশকে সমর্থনের নিদর্শন হিসাবে ৬০০০ মার্কিন নৌ-সৈন্য সুয়েজ খাল এলাকায় পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। অতঃপর জানুয়ারীর (১৯৫২) শেষ কয়দিনে রাজা ফারুক ও ইঙ্গ-মার্কিন কূটনীতি-বিশারদেরা নূতন চালে বাজী মাৎ করল।

ওয়াফদের পতন

নাহাস পাশা এবং ওয়াফদ মন্ত্রীরা বিদায় নিলেন। তাঁদেরই শেষ কীর্তি—সামরিক আইন জারির জোরে মিশরে বৃটিশ ও কায়েমী স্বার্থ গণ-আন্দোলনের কন্ঠরোধ করল। বৃটিশ লেবার পার্টির গণতান্ত্রিক সমাজবাদী মুখপত্র 'ডেলী হেরাল্ড' রাজা ফারুকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে খবর ছাপাল—

"বড়লোকের দল সায়েস্তা করার জন্য ফারুকের প্রচেষ্টা। বড় জমিদার ও ব্যবসায়ী-দের প্রতিনিধি—মিশরী রাজনীতিতে প্রবল ক্ষমতাশালী দুর্নীতিপরায়ণ ওয়াফদ দলের প্রাধান্য খর্ব করার জন্য রাজা ফারুক শক্ত ব্যবস্থা করেছেন।" বৃটিশ লেবর পার্টির মুখপত্রটি আসল কথাটি চেপে গেল। রাজা ফারুকের শক্ত ব্যবস্থার পেছনে ছিল ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের শক্ত মুঠি। আর 'দুর্নীতিপরায়ণ বড়লোকের দল' ওয়াফদকে সায়েস্তা করায় রাজা ফারুক যোগ্য ব্যক্তিই বটে! জুয়ার আড্ডায় লক্ষ লক্ষ টাকা যিনি উড়িয়েছেন, নব-বিবাহিত স্ত্রীকে নিয়ে য়ুরোপ সফরে বিলাস-ব্যসনে চূড়ান্ত অপব্যয় করে যিনি মিশরী জনসাধারণের প্রবল ঘৃণার পাত্র হয়েছেন, ডেলী হেরাল্ডের মহিমায় তিনি হলেন মিশরে দুর্নীতি দমনের নেতা! আরও একটি কথা ডেলী হেরাল্ড গোপন করেছে। ওয়াফদকে তাড়ানোর পর রাজা ফারুক যাদের মন্ত্রী নিযুক্ত করেছিলেন, তারা প্রত্যেকেই কুখ্যাত নাৎসী-বন্ধু অথবা বৃটিশ কর্তাভজা।
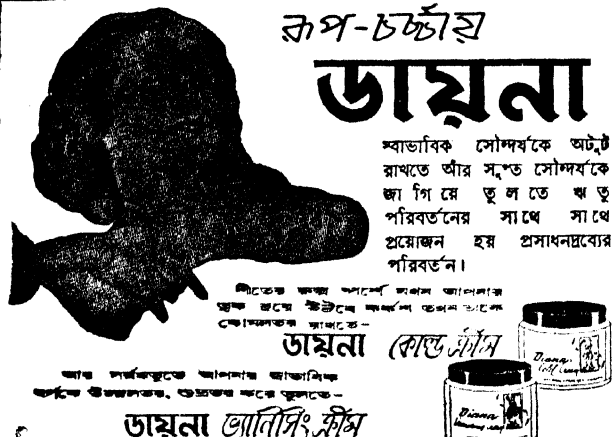
আলি মাহের নাহাসের স্থান অধিকার করে প্রতিক্রিয়ার পথে বেশি দূর অগ্রসর হতে সাহস করলেন না। তখন মাহেরের স্থানে গদীতে বসলেন হিলালী পাশা। হিলালীর প্রথম কাজ হ'ল পার্লামেণ্ট বন্ধ করা—কারণ পার্লামেণ্টে ওয়াফদ দলই প্রবল সংখ্যাগরিষ্ঠ। এরপর ওয়াফদ নেতাদের ব্যক্তিগত দুর্নীতি ও নানা কেলেঙ্কারী প্রচার করে ওয়াফদ দলকে কাবু করার চেষ্টা চলতে থাকল। মিশরী রাজনীতির ভৈরবী চক্রে রকমারি স্বার্থের ঘাতপ্রতিঘাত দেখা দিল। ইংগ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা চায় মিশরে বিদেশীবিরোধী জনসাধারণকে সায়েস্তা করতে পারে এমন জবরদস্ত সরকার। রাজা ফারুক ইংগ-মার্কিন হুকুম মেনে চললেও, সুদানের ব্যাপারে তিনি বৃটিশের সংগে দর কষাকষি করছিলেন। ওদিকে রাজা ফারুকের বিরুদ্ধে জন-অসন্তোষ প্রবল, ওয়াফদ দলের সংগে তাঁর বিরোধ বহু দিনের। সৈন্য বাহিনীর নেতারাও রাজা ফারুকের স্বেচ্ছাচারিতায় অসন্তুষ্ট হয়ে উঠছিলেন। এই সব নানা জটিল কারণের ঘাত-প্রতিঘাতে মিশরের অভিভাবকেরা অনুভব করল, রাজা ফারুক এবং তাঁর কুখ্যাত অনুচরদের দিয়ে মিশরে জবরদস্ত শাসন চালু রাখা অসম্ভব। ওয়াফদের জনপ্রিয়তা নষ্ট করতে হলে আরও চটকদার জননেতাকে মিশরের রংগমঞ্চে হাজির করতে হবে এবং তারই মধ্যস্থতায় মিশরে কায়েমী ব্যবস্থা নূতন পোষাকে জাহির করতে হবে। অতএব রাজা ফারুকের এতদিনের মুরুব্বীরা তাঁকে 'জীর্ণ ভগ্ন মৃৎপাত্রের' মত ছুঁড়ে ফেলে দিতে ইতস্তত করল না। রাজা ফারুককে সিংহাসন থেকে টেনে নামালে জনসাধারণও অনেক পরিমাণে খুশী হবে, কূটনীতিবিশারদেরা এটা ভাল মতই হিসাব করেছিলেন। জানুয়ারীর (১৯৫২) ঘটনাবলীর পরে বিদেশীবিরোধী এবং প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বের বিরোধী গণ-আন্দোলন আরও প্রবল হয়ে উঠছিল। সামরিক আইন জারী থাকা সত্ত্বেও মিশরের অভিভাবকেরা অনুভব করছিল নাটকীয় কোনো রকম পরিবর্তন না ঘটালে জন-সাধারণকে ভোলানো যাবে না। মার্চ মাসে (১৯৫২) 'অবজারভার' কাগজের কায়রো সংবাদদাতা লেখেন, "মিশরের আভ্যন্তরীণ অবস্থা যে কী পরিমাণ সংকটজনক সেটা য়ুরোপের কূট রাজনীতিকেরা ভালমতই অনুভব করছেন। এখানে প্রায়ই তাঁদের মুখে শোনা যাচ্ছে, "আমরা আগ্নেয়গিরির চূড়ায় বসে আছি।" 'সান্‌ডে টাইমস' পত্রিকা লেখেন, "মিশরে আরও গোলোযোগ, এমন কি বিপ্লব এবং অরাজকতার বিপদ এখনও কেটে যায় নি। দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো বহুকাল ধরে এত সংকটজনক কখনও হয় নি।" অতএব এই সাবধানবাণী স্মরণ করে ইংগ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা একটা 'শেষ চেষ্টা'র সংকল্প ও পরিকল্পনা করল।

নাগুইবের অভ্যুত্থান

আলি মাহের-হিলালীপাশা-ফারুকের হাতের তাস ফুরিয়ে এসেছিল। ওয়াফদ দলকে ইংগ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না। তবে ফৌজী নায়কদের উপরে নির্ভর করা যেতে পারে বৈকি। যখনই মিশরে জাতীয়তা আন্দোলন প্রবল হয়েছে তখনই ডাক প... ফৌজী নায়কদের। এবারের ব্যাপারটা ... একটু ঘোরালো। প্যালেস্টাইনের ... অপদস্থ হয়ে মিশরী ফৌজের তরুণ ... নায়করা রাজা ফারুকের উপরে মহা ... হয়েছিল। এই যুদ্ধের জন্য অস্ত্রশস্ত্র ... ব্যাপারে অনেক কেলেঙ্কারী প্রকাশ ... পড়ে, তার মধ্যে রাজা ফারুক ও ... আত্মীয়কুটুম্ব এবং পেয়ারের লোকদের ... সাজি ছিল, দেখা যায়। অতএব ক্ষুব্ধ ফৌ... নায়কেরা রাজা ও রাজনৈতিক দলগু... বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হচ্ছিল। ২৩শে জু... (১৯৫২) জেনারেল নাগুইব ও 'স্বা... সেনানায়ক কমিটি কায়রোতে ক্ষমতা ... করেন। নাগুইব তখনকার মত হিল... পাশার স্থানে কুখ্যাত আলি মাহেরকে প্র...

ন্ত্রী নিযুক্ত করেন। ২৬শে জুলাই রাজা রুক সিংহাসন ত্যাগ করেন ও ইতালী ওয়ানা হন। পর্দার আড়ালে কূটরাজনীতির খলা কিভাবে চলেছিল, তা' জানা যায় না। বে এইটুকু জানা যায় যে, মার্কিন রাজ-ুত জেনারেল নাগুইবের সামরিক অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা পূর্বাহ্নেই জানতেন। মার্কিন কর্তৃপক্ষ নাকি রাজা ফারুককে সিংহাসন ছাড়বার দাবী মেনে নতে পরামর্শ দেন। মার্কিন দূতাবাসের মারফৎ বৃটিশের সঙ্গে নাগুইবের কথা-বার্তা হয়। রাজা ফারুককে গদীচ্যুত করায় নাগুইব মিশরী জনসাধারণের উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন পেলেন। নাগুইবের প্রচার-বশারদেরা তাঁকে 'মিশরের মুক্তিদাতা' বলে ঘোষণা করল। আর ২৩শে জুলাইএর (১৯৫২) ফৌজী অভ্যুত্থানকে বলা হ'ল 'বিপ্লব'।

কথা ও কাজ

ক্ষমতা দখল করার পর নাগুইব ঘোষণা লেন, তিনি রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ বেন না। তবে মিশরের রাজনৈতিক দল-লির দুর্নীতির জঞ্জাল পরিষ্কার করতে ব। নাগুইব এবং তাঁর 'স্বাধীন' সেনা-ক কমিটিই অবশ্য সাব্যস্ত করবেন, নীতি কোথায়, কোন্ কোন্ রাজনৈতিক র দুর্নীতি কিভাবে দূর করতে হবে। নীতিতে হস্তক্ষেপ না করার প্রতিশ্রুতি শ্য নাগুইব রাখতে পারেন নি। ক্রমে তিনিই মিশরের সর্বেসর্বা হয়েছেন। ফদ দল ছিল মিশরের সবচেয়ে প্রবল তীয়তাবাদী দল। কাজেই দুর্নীতি নের ধাক্কাটা সবচেয়ে বেশি পড়ল ওয়াফ-উপরেই। জনপ্রিয়তায় নাগুইবের প্রতি-দ্বী হতে সক্ষম একমাত্র নাহাস পাশা। রন্তু দ্বিধা ও দুর্বলতা সত্ত্বেও নাহাস মিশরে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দো-র নেতৃস্থানীয় ছিলেন। অতএব ইবের ফরমান অনুযায়ী নাহাস পাশাকে ফদের নেতৃত্ব থেকে বরখাস্ত করা হল। ফদ দল পার্লামেণ্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ। জই নাগুইব আগস্ট মাসে (১৯৫২) ণা করলেন, ১৯৫৩ সনে নূতন নির্বাচন , তারপর মিশরে পার্লামেণ্টারী শাসন র চালু করা হবে। কিন্তু এরও পরে তি তিনি 'জনগণের বিপ্লবের দোহাই' নূতন ফরমান জারী করেছেন।—নো রাষ্ট্র-সংবিধান বাতিল করা হবে, নূতন সংবিধান জনগণের নামে রচনা করবে নাগুইবের মনোনীত কয়েকজন পেটোয়া লোক। হিটলারী কায়দায় জনগণের নামে শপথ করে নাগুইব যা করছেন ইঙ্গ-মার্কিন কর্তারা তার খুব তারিফ করছেন। জবরদস্ত শাসন কায়েম করার সঙ্গে সঙ্গে লোক-ভুলানোর জন্য দুই একটা চটক্‌দার ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতিও ডিক্টেটর নাগুইব দিয়েছেন। যেমন, 'পাশা' ও 'বে' উপাধি তুলে দেওয়া হচ্ছে। ২০০ একরের বেশি জমি কারো থাকলে মিশরী সরকার বাড়তি জমি কিনে নিয়ে গরীব ও ভূমিহীন চাষীর মধ্যে সেই জমি বিলি করবেন। এটা অবশ্য পাঁচ বৎসরে চালু করার খসড়া প্রতিশ্রুতি মাত্র। তাছাড়া মিশরের গরীব চাষীর জমি কেনার সামর্থ্যও নেই; নয়া সরকারী বন্দোবস্তে কিছু জমি হাতবদল হয়ে স্বনামে বা বেনামীতে জোত-দারের ভোগদখলেই থাকবে। উপরন্তু মিশরে কয়েকটি বিদেশী কোম্পানী শ্রেষ্ঠ জমির অনেক অংশ দখল করে আছে। নাগুইবের নয়া ব্যবস্থা সেগুলিতে হাত দেবে না। বিদেশী পুঁজিকে সুবিধা দেবার জন্য মিশরী আইন সংস্কারও করা হয়েছে সম্প্রতি। 'নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন' পত্রিকা মন্তব্য করেছেন, এখন মার্কিন তেল কোম্পানীগুলি মিশরে ব্যবসায় করতে আবার অগ্রসর হতে পারবে। জানুয়ারী থেকে মার্চ (১৯৫২) পর্যন্ত ইঙ্গ-মার্কিন মুরুব্বীরা আতঙ্কিত ছিলেন, মিশরে বিপ্লব ঘটবে, মিশরে তাঁরা আগ্নেয় গিরির উপরে বসে আছেন। 'মিশরের মুক্তিদাতা' নাগুইবের আবির্ভাবের পরে লণ্ডন ও ওয়াশিংটনে সুর বদলেছে। ওয়াফদের সঙ্গে যখন বিরোধ তীব্র চলছিল, তখন বৃটিশ সরকার মিশরের প্রাপ্য স্টার্লিং আটক রেখেছিলেন, মিশরী সৈন্য বাহিনীকে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করেছিলেন। 'মুক্তদাতা' নাগুইব গদী দখল করার পর স্টার্লিং পাচ্ছেন, বৃটিশ ও মার্কিন মহল থেকে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ শুরু হয়েছে. মিশরী সেনানায়করা আবার ইংলণ্ডে শিক্ষা নিতে যাচ্ছেন। মিঃ চার্চিলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইডেনও ঘোষণা করেছেন, মিশরের "মুক্তিদাতা" নাগুইবের সঙ্গে সব বিষয়ে বোঝাপড়া সম্ভব হবে, আশা করা যাচ্ছে। জুলাই মাসে নাগুইবের অভ্যুত্থানের পরই "ডেইলী টেলিগ্রাফ" লিখেছিল, সিরিয়ার মত সামরিক অভ্যুত্থান ঘটা মিশরের পক্ষে ভালই। "স্বাধীন পৃথিবী" ও "গণতন্ত্রের" ধ্বজাধারীরা একদা হিটলারকে বরণ করে নিতে লজ্জা বোধ করেনি। মধ্যপ্রাচ্যে তাদের লজ্জার কারণ আরও কম, কারণ সাম্রাজ্যের সিংহদ্বার মধ্যপ্রাচ্য, অফুরন্ত তেলের মালিকানা ও মুনাফার স্বর্গরাজ্যও মধ্যপ্রাচ্য। অতএব নাগুইবের ডিক্টেটরীকে সমর্থন করে ব্রিটিশ কূটরাজনীতিবিশারদ, লর্ড কিন্‌রস আগস্ট মাসে (১৯৫২) লিখলেন, বুদ্ধিমান বাস্তব-জ্ঞানসম্পন্ন ডিক্টেটরই হ'ল সব আরব দেশের উপযুক্ত শাসক। সাম্রাজ্যবাদী শঠতা ও জবরদস্তিতে মিশরের জাতীয়তাবাদী গণ-আন্দোলন এইভাবে আরও একবার বিপর্যস্ত হ'ল। মিশরী জনসাধারণ অবশ্যই এই বিশ্বাসঘাতকতা ও পরাজয়কে চূড়ান্ত বলে মেনে নেবে না। তবে বর্তমানে কোনও আশাপ্রদ পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম। চার্চিল - আইসেনহাওয়ারের পক্ষপুটে মিশরের "মুক্তিদাতা" ডিক্টেটর নাগুইব আশ্রয় পেয়েছেন এটা ভালমতই বোঝা যাচ্ছে। আর মধ্যপ্রাচ্য রক্ষার নামে জেনারেল রবার্টসন সুয়েজখাল এলাকার "উত্তর অতলাণ্তিক সংঘের" ঘাঁটি শক্ত করছেন।

(ক্রমশ)

(একুশ)

কিশোরবাবু ডেকেই বললেন—একটু দাঁড়া রমা। একটু!

এগিয়ে গেলেন তিনি। অদূরে দাঁড়িয়েছিল কপিলদেব। রমার জন্য প্রতীক্ষা করছিল। কিশোরবাবু তাকে অতিক্রম করে কপিলদেবকে লক্ষ্য ক'রে বললেন—আপনাকে বলছি।

—আমাকে? বলুন কি বলছেন?

—মানুষের রিপু যখন প্রবল হয় তখন সে আর মানুষ থাকে না। জন্তুতে পরিণত হয়। হিংসায় এমনই আচ্ছন্ন আপনি যে, মনুষ্যত্বের আর বিন্দুমাত্র অবশেষ আপনার মধ্যে নাই। তাই মানুষকে ঘৃণা করতে এতটুকু সঙ্কোচ হয় না, অকারণে আক্রমণ করতে বাধে না। মানুষের সহ্যশক্তি, মানুষের শালীনতা দেখে তাকে ভীরু মনে ক'রে জন্তুর মধ্যে ভয়ত্রস্ত শেয়াল বলে অনুমান আপনার পক্ষে স্বাভাবিক। কেন আপনি শেয়াল বললেন গৌরীকান্তকে।

খপ্ ক'রে হাত চেপে ধরলেন তার কিশোরবাবু।

কপিলদেব এতক্ষণে চকিত হয়ে উঠল। এবং নিম্ন ক্রুদ্ধ গর্জনে বলে উঠল—হাত ছাড়ুন কিশোরবাবু। কিশোরবাবু মুঠি আরও শক্ত ক'রে মুহূর্তে হাতখানা মুচড়ে কপিলদেবকে বেঁকিয়ে ফেলে বললেন—না। কেন তুমি এমন কথা বললে?

—কিশোরবাবু, সংযত হয়ে কথা বলুন। আমি আপনাকে আপনি বলছি।

—তুমি বালক, আমি বৃদ্ধ, আমি তোমাকে তুমি বলব। আমি মানুষ তুমি মনুষ্যত্বহীন—তোমাকে আমি আপনি বলব না।

রমা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল কয়েক মুহূর্তের জন্য। আত্মসম্বরণ ক'রে আকুলতার সঙ্গেই সে বললে—গৌরীদাদা। এ কি হচ্ছে?

পরক্ষণেই গৌরীর কাছে ছুটে এসে বললে—হয়তো ওর কাছে ছোরা আছে গৌরীদা!

গৌরীকান্তও উঠে দাঁড়িয়েছিল—সে এগিয়ে এসে বললে—ছেড়ে দিন, যেতে দিন কিশোরবাবু।

কিশোরবাবু বললেন—ছেড়ে দেব।

—হ্যাঁ ছেড়ে দিন। ওর দোষ কি বলুন? এই তো পৃথিবীর নিয়ম। হিন্দু বলে মুসলমান ধর্মকে জানে না, মুসলমান বলে হিন্দু কাফের। ওরা যে মতবাদের পায়ে আত্মসমর্পণ করেছে তার দৃষ্টিতে যে তাকে মানবে না—তাকে গ্রহণ করবে না—সেই অমানুষ। ছেড়ে দিন ওকে।

ছেড়ে দিলেন কিশোরবাবু। —যাও। কিন্তু শুনে যাও। আমি বৃদ্ধ হলেও শক্তির অহঙ্কার রাখি। তুমি আত্মাকে মান না আমি আত্মাকে মানি—তাকে লাভ করবার সাধনা করেছি। মৃত্যুকে আমি ভয় করি না। ছোরাই থাক আর পিস্তলই থাক—ওতে আমাকে নিরস্ত করতে পারবে না। আর তুই—। রমা! নাঃ। যা। তোকে কিছু বলা মিথ্যে কথা। যা বাড়ি যা।

কপিলদেব ছাড়া পেয়ে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে অস্থির কণ্ঠেই ডাকলে—রমা দেবী!

রমা একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তাকে অনুসরণ করলে।

কিশোরবাবু ফিরে এসে স্তব্ধ হয়ে বসলেন।

গৌরীকান্তই স্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে বললে—দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি কিশোরবাবু। সেই মেয়ে এমন হয়েছে!

—আমি কিন্তু আজ ভয় পেয়েছি গৌরীকান্ত। নবগ্রাম জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেলে ওর আনন্দ হয়! আর ওই ছেলেটা ঠিক ছদ্মবেশী কুটিল কলির মত ওর হিংসার ছিদ্র দিয়ে ওর জীবনে প্রবেশ ক'রে ওকে খেলাচ্ছে।

—এই তো রাজনীতির খেলা কিশোরবাবু। এ জুয়োতে মিথ্যে হ'ল খুঁটি আর হিংসের ঘরটা হ'ল পাকাদানের ঘর। ওখানে দান ধরলে লাভ না আসুক দান ডোবে না।

কিশোরবাবু বললেন—রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে যখন বেরিয়েছিল গৌরীকান্ত সত্যি বলতে তখন মনে মনে অত্যন্ত আঘাত পেয়েছিলাম। সেদিন দেশপ্রেমের মধ্যে যে কলঙ্ক যে পাপ তিনি দেখেছিলেন তাকে—এত বড় কবির বিদ্বেষের ফল না ভেবেও ভেবেছিলাম ভ্রান্তি। দৃষ্টিটা একপেশে মনে হয়েছিল। আজ দেখছি বিদেশী ভাবাবেশের পরকলা প'রে ভ্রান্তি ঘটেছিল আমাদেরই দেখার মধ্যে। ঋষিদৃষ্টি কখনও ভুল দেখে না। সন্দীপের সেই কবিতাটা মনে পড়ছে।

এস পাপ, এস সুন্দরী
তব চুম্বন-মদিরা রক্তে ফিরুক সঞ্চরি।

সন্দীপের বংশধরে দেশটা ছেয়ে গেছে।

হেসে গৌরীকান্ত বললে—রাবণেরই এক লক্ষ ছেলে একশো লক্ষ নাতি হয় কিশোরবাবু; ধৃতরাষ্ট্রের হয় একশো ছেলে। কিন্তু তারা শেষে মরে। ইতিহাসের একালের ব্যাখ্যাই শেষ ব্যাখ্যা নয় কিশোরবাবু! পুরাণ কাহিনী ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে দিয়েও রাজার ছেলে সন্ন্যাসী গৌতম বুদ্ধ এবং ওই ধরণের মানুষদের কথা দেখা যায়। হাজার অপব্যাখ্যার পঙ্ক লেপনেও ওঁকে ঢাকা যায় নি, ঘষে ঘষে মোছা যায় নি। বিদ্বেষের বশে এই আড়াই হাজার বছর ধরে মূর্তি তো কম ভাঙা হয় নি। কিন্তু বুদ্ধের বাণী! তাকে কলঙ্কিত বিকৃত কিছুতেই করা যায় নি। রাজনীতি এমন করেই দেউলে হয়। নীতিকে বিসর্জন দিয়ে যখন বসে—তখন থাকে ওই রাজ শব্দটি। রাজ্য বা রাজশক্তির জুয়োখেলা। ও খেলায় পাকা খেলোয়াড়েরও

সমৃদ্ধি দুদিনের। তার সাক্ষী ইতিহাসে ভূরি-ভূরি। ইউরোপের ইতিহাসের পাতায় পাতায়। এই ক' বছর আগের হিটলার মুসোলিনী পর্যন্ত। এদের পরে যারা রয়েছে তারা চারিপাশের কলকব্জার প্রতিটি নাট বল্টু অহরহ তৈলাক্ত ক'রে দু'দিন চারদিন অন্তর বাতিল করে—নতুন এ'টে ঘোষণা অবশ্য করছে যে, এ শক্তি অক্ষয় অমর এবং দিন দিন বহু বাহু বিস্তার করে কুড়ি হাত রাবণের স্থলে শতবাহু সহস্র-বাহু হতে চাইছে; কিন্তু মৃত্যুবাণ যথা-স্থানে আছে,—যথাসময়ে বের হয়ে আসবে।

হঠাৎ একটা ধর-ধর শব্দে গোলমাল উঠল কোথায়। রাত্রিকালে স্তব্ধতার মধ্যে শব্দ কতদূরে অনুমান করা কঠিন। দূরের শব্দ কাছে মনে হয়। মনে হচ্ছে কাছেই। কিন্তু বেরিয়ে গিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কিছু দেখা গেল না, বুঝতে পারাও গেল না।

কিশোরবাবু বললেন—কি হ'ল? রমা আর কপিলদেবকে নিয়ে কোন গণ্ডগোল হ'ল নাকি?

গৌরীকান্ত হেসে বললে—ওদের ধরা সহজ নয় কিশোরবাবু। ওরা তো লুকিয়েও পথ হাঁটবে না, কেউ পিছন ধরলেও ছুটবে না। ধর-ধর রব ওদের নিয়ে উঠবে কেন?

গোলমালটা এইদিকেই এগিয়ে আসছে। খানিকটা দূরে অন্ধকারের মধ্যেই দেখা গেল, চারপাঁচজন লোক রাস্তার বাঁক পার হয়ে এইদিকেই মোড় ফিরল।

কিশোরবাবু হাঁকলেন—কে? কারা?

—আমরা। বিজয়—ভক্তি—।

—কি ব্যাপার বিজয়? এত রাত্রে? ধর ধর গোলমাল?

—ব্যাপার বড় খারাপ কিশোরবাবু। আর কে দাঁড়িয়ে? গৌরীদা বুঝি?

—হ্যাঁ। কিন্তু ব্যাপার খারাপ কি হ'ল?

—হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা বে'ধেছে।

—সে কি? কোথায়?

—মুরশিদাবাদ বীরভূমের সীমানা বরাবর। একবারে চার পাঁচখানা গাঁয়ে। আমি সেখান থেকেই আসছি।

বিজয় ভক্তির হাতে বাইসিক্ল—সঙ্গে আরও দু'টি ছেলে। ম্যাজিস্ট্রেট আর রামকালী। ম্যাজিস্ট্রেটের আসল নাম সুধাময় কিন্তু সে ওই নামেই গ্রামে পরিচিত। ওর মেজাজ, হুকুমজারীর ভঙ্গি —এইসবের জন্যেই এই নাম। এবং এই নামটি সমাদর ক'রে বিজয়ই দিয়েছে। সুধাময় তাতে আদৌ রাগ করে নি—হাসি মুখেই গ্রহণ করেছে। ওরা দুজনে সাই-কেলের পিছনে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

বিজয় বললে—বিকেল বেলা গিয়েছিলাম ধর্মডাঙ্গা। শুনেছিলাম মিটিং হবে। ক্যানেলের জন্যে জমি দেবে না; জমির বদলে জমি চাই—এরই মিটিং। শুনে চারজনেই গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম, মিটিং স্থগিত হয়েছে, উদ্যোক্তারা বলে গিয়েছে—তিন চার দিন স্থগিত রইল মিটিং। খুব বড় ক'রে মিটিং হবে। শুনলাম গৌরীদা আসবে—সভাপতি হবে। তারা এই কথা বলে চলে গিয়েছে। আমরা আবার একটা মিটিং করলাম। মিটিং হচ্ছে—হঠাৎ খবর পেলাম দাঙ্গা বেধেছে ভাসাচর শাহপুর গাঁয়ে। শুনে চলে গেলাম সেখানে। সেখান থেকেই আসছি। থানায় দারোগাকে ডেকে দু জন কনেস্টবল এ-এস-আই তিন জনকে তো পাঠিয়ে দিলাম। তারপর কাল সকালে—যা হয় করা যাবে।

দাঙ্গাটা কেমন, কি নিয়ে? তোমার তো সবই একেবারে ভীষণ ভয়ঙ্কর কাণ্ড!

ব্যাপারটা একটা গাছের ডাল কাটা নিয়ে। বড় একটা আমগাছ। ভাসাচরের ফজল খাঁয়ের সম্পত্তি। গাছটা বিশাল ছত্রছায়া মেলে দাঁড়িয়ে আছে অনেক দিন। একদিকে রামলাল গোপের বাড়ী। বাড়ীর উঠান পর্যন্ত ডালটা এসে পড়েছিল। অনেক দিনই এই অবস্থায় আছে। বর্তমানে ফজল খাঁ গত হয়েছে, সম্পত্তি ছেলে মেয়ে এবং পত্নীদের মধ্যে অনেক ক'টি ভাগেই বিভক্ত হয়ে পড়েছে। খাঁয়ের বাড়ীর সে বাড়-বৃদ্ধিও নাই—পসার প্রতিপত্তিও নাই। গাছটার কয়েক অংশ রামলাল গোপ কিনেছে। কয়েক বৎসরই কিনেছে। কিন্তু সেকালে অর্থাৎ সাতচল্লিশ সালের আগে গাছের উপর হাত দিতে তারা সাহস করে নি। ভাসাচরে মুসলমান কয়েক ঘর মাত্র হলেও—পাশের গ্রাম শাহপুর মুসলমান-প্রধান বড় গ্রাম; অনেক সম্ভ্রান্ত প্রতাপ-শালী মিয়া মোকাদেমের বাস। বর্ধিষ্ণু চাষী মুসলমানও অনেক। আগেকার কালে বিশ তিরিশ বৎসর আগে মিয়ারাই ছিলেন প্রধান। তাঁরা ন্যায় বিচার করতেন। হিন্দু মুসলমান বলে প্রভেদ করতেন না। কিন্তু এই বিশ তিরিশ বৎসরের মধ্যে সাধারণ মধ্যবিত্ত মুসলমান চাষীরা হয়ে উঠেছে প্রধান। মিয়াদের অবস্থাও খারাপ হয়েছে এবং তাঁদের ন্যায় বিচারের ধারাকেও সাধারণে অস্বীকার করেছে। এ অঞ্চলে,, বিশেষ করে এই ইউনিয়নে, শাহপুরের মুসলমানেরাই প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসি-ডেন্ট। তার উপর লীগ আমলে তাদের সরকারের ঘরেও মান সম্মান খাতির বেড়েছিল। এই কারণেই গাছের অংশ কিনেও গাছে হাত দিতে রামলালেরা সাহস

করে নি। শাহপুরের পরই মুরশিদাবাদ এলাকা। সেখানেও পাশাপাশি কয়েকখানা মুসলমানপ্রধান গ্রাম। কিন্তু সাতচল্লিশ সালের পর দেশ স্বাধীন হয়েছে ওদিকে পাকিস্থান হয়েছে; এই অবস্থা বৎসর-খানেক ধরে উপলব্ধি করে রামলালের সাহস হয়েছে গাছটায় হাত দিতে। গাছটার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছায়া, বাড়ীর পূর্বদিকে সকালের আলো রোধ ক'রে মাথা তুলেছে বিন্ধ্যগিরির মত। শীতের দিনে বাড়ীতে রোদ আসে না মোটেই, ওর তলায় প্রায় কাঠাখানেক জায়গা বন্ধ্যা হয়ে পড়ে আছে। দু' মুঠো শাক পর্যন্ত হয় না। দ্বিতীয় অভিযোগ গাছটা বড় হওয়ায় উঠানে পাখীর উপদ্রব বেড়েছে। বিয়াল্লিশ সালের ঝড়ে গ্রাম প্রান্তের অর্জুন গাছটা ধরাশায়ী হবার পর এ গাছটায় শকুন বসে। চিল কাকের কথাই নাই। তাদের বিষ্ঠার উপদ্রবে স্থানটা অব্যবহার্য অপবিত্র হয়ে উঠেছে। এই কারণেই মাস খানেক আগে রামলালের স্ত্রী মারা যেতে তার শ্রাদ্ধের আয়োজনে সর্বাগ্রে এই গাছটার ডাল কাটতেই তারা স্থির-সঙ্কল্প হয়েছিল। রামলালের স্ত্রী মারা গেছে নিউমোনিয়ায়। ম্যালেরিয়ার রোগী রামলালের স্ত্রী, অল্প জ্বর নিয়ে ওই ডালটার নিচে গোবর মেখে ঘুঁটে দিচ্ছিল, পাচীলের গায়ে। হঠাৎ শকুনির বিষ্ঠা এসে পড়েছিল মাথায় কপালে। শকুনের বিষ্ঠা মাথায় মুখে নিয়ে কে কবে স্নান না করে থাকতে পারে? রামলালের স্ত্রী জ্বর গায়েই স্নান করে এসে শুয়েছিল, আর ওঠে নি। মাকে পুড়িয়ে এসে, ছেলেরা—তারা একালের ছেলে—বলেছিল—ওই ডাল কেটে মায়ের শ্রাদ্ধে খাওন দাওন হবে।

রামলাল প্রবীণ, সে আমলের ধারাধরণ ভাব-ভঙ্গির প্রভাব সম্পূর্ণ কাটাতে পারে নি। সে বলেছিল—কাটবি? হাঙ্গামা টাঙ্গামা হবে না?

—হাঙ্গামা হবে? তবে আর হ'ল কি? সে জবরদস্তি আর চলবে না। তুমি চুপ করে বসে থাক। কথা বলো না। যা করতে হয় আমরা করব।

রামলালের ছেলেরা নগদ দশ টাকা দিয়ে নিয়ে এসেছিল তারা হাড়িকে। তারাচরণ হাড়ি এ অঞ্চলের বিরূপাক্ষ। বিরূপাক্ষ কিন্তু ক্রোধী নয়। শান্ত মানুষ। বিশাল শরীর, এখানকার দশ ক্রোশ পরিধির মধ্যে তার হাতে হাত দেবার মত জোয়ান নাই। ওই দেহ চর্চা নিয়েই আছে। চোর নয় ডাকাত নয় ক্রোধী নয়, কুস্তী ক'রে লাঠী খেলে, কিছু জমি আছে চাষ করে, মেলায় খেলায়, শক্তির পরিচয় দিয়ে বকশিশ নিয়ে আসে—তাতেই তার চলে। আর এই এক ধরণের উপার্জন আছে। জমির দখল নিতে বিবদমান কোন এক পক্ষের পক্ষ নিয়ে দাঁড়িয়ে তাকে দখল দিয়ে দশ বিশ টাকা রোজগার করে।

তারাচরণ এসে দাঁড়াল একদিন। আগে থেকেই মজুর ঠিক করা ছিল। তারা গাছে উঠে ডাল কাটতে শুরু করলে।

ফজলের ছেলে এক্‌রাম আর এরফান ছুটে এল।—দেব না কাটতে।

তারাচরণ বললে—গাছ বেচেছ যখন, তখন তো এ বলা চলে না মিয়া। আর আমি যখন এসেছি তখন ও ডাল না কাটিয়ে তো আমি ফিরে যাব না। সে তো জান। এখন মিছে বকাবকি না করে যদি লাঠালাঠি চাও এস, না হয় ফিরে যাও।

এক্‌রাম এরফান ফিরেই গিয়েছিল। কিন্তু প্রতিশোধ নেবার জন্য কুটিল একটি ষড়যন্ত্র করে অপেক্ষা করছিল।

রামলালের স্ত্রীর শ্রাদ্ধের আয়োজন সম্পূর্ণ হল, উঠানের ওই দিকে, যে দিকে বিস্তৃত ছিল ওই ডালটি সেই দিকেই রান্নার চালা বেঁধে। জ্ঞাতি ভোজনের উনান জ্বলল কড়াই চড়ল—ওদিকে মুরশিদাবাদ এলাকার জনকয়েক লাঠীয়াল নিয়ে এক্‌রাম ও এরফান এল ওই গাছের আর একটা ডাল কাটতে। রামলাল গাছের ডাল কেটেছে যখন, তখন অংশানুযায়ী তাদেরও ডাল প্রাপ্য হয়েছে। তাই তারা কাটবে আজ।

অকস্মাৎ গাছের উপরে কুড়ুলের শব্দ শুনে রামলাল এবং তার ছেলেরা চমকে উঠল। রামলাল যে বড় ডালটা কেটেছে তারই পাশের একটা ছোট ডাল—এটাও উঠানের একপাশে এসে পড়েছে। ছেলেরা এটাও কাটতে চেয়েছিল, কিন্তু রামলাল দেয় নি। ফলবান বৃক্ষ কাটতে নাইরে বাবা! আর ওটা এক পাশে রয়েছে, নেহাত ছোট; ওটাতে শকুন বসবে না, কাক চিলেও বাসা বাধবে না। না-কি তারাচরণ! তারা-চরণও সমর্থন করেছিল রামলালকে। বলেছিল—আসল যেটা সেটাই গেল, ওটাতে ক্ষতি কিছু করবে না গোপ! ও টা থাক। ফল হ'লে তোমরাই খাবে।

সেই ডালটিতে কোপ মারতে লাগল এরফান।

ছুটে এল রামলাল রামলালের ছেলেরা। —যজ্ঞ পণ্ড হবে। এরফান!

বাইরের লাঠিয়ালেরা বলে উঠল—কাটো এরফান মিয়া আমরা রইছি হেথা।

জ্ঞাতি গোষ্ঠী উত্তেজিত হয়ে প্রতিবাদ করতে এগিয়ে এসেছিল। কথা কাটাকাটির মধ্যে ওদিকে ডালটা ভেঙে পড়েছিল অর্ধ-সমাপ্ত রান্নার উপর। তারপর লাঠালাঠি, ঠেলাঠেলি, হৈ-চৈ। ইতিমধ্যে এসে পড়েছিল তারাচরণ। রামলাল তাকে নিমন্ত্রণ করেছিল বারবার বলেছিল—যেন এসো বাবা তারাচরণ ভুলো না।

বৃদ্ধের সাদর নিমন্ত্রণ ভুলতে পারে নি তারাচরণ। সে একখানা গ্রাম ওপার পর্যন্ত এসেই এই ঘটনার কথা শুনে, মাল সাট বেঁধে হুঙ্কার দিতে দিতেই এসে পড়েছিল। তখন সে সত্য সত্যই বিরূপাক্ষ। তারাচরণ আসতেই গোপেরাও হুঙ্কার দিয়ে লেগে-ছিল। সে এক সত্যকার যুদ্ধ। শেখেরা হটে গিয়েছে; আবার রান্না করে খাওয়া দাওয়াও হয়েছে। কিন্তু বিপদ ঘনিয়ে উঠেছে। গ্রামে গ্রামে হৈ হৈ পড়ে গিয়েছে। হিন্দুরা বলছে—সামাজিক ক্রিয়া পণ্ড করেছে।

মুসলমানেরা বলছে—তারা হাড়ি একজন মুসলমানের মুখে থুক্ দিয়েছে।

বিজয় বললে—আমি শুনে এসেছি, মুরশিদাবাদ জেলার ওদিক থেকে মুসল-মানেরা রাত্রেই এসে আক্রমণ করবে শোধ নেবে। শাহপুরেও গিয়েছিলাম। ওখানে মিয়ারা বলছে, আমরা কি করব? এরফানদের দল আমাদের কথা শুনবে না। বলছে, তারা হাড়িকে বেঁধে আমাদের হাতে দিতে

হবে। নইলে আমরা মানব না। আমরা বিচার করব। মিয়া আমাকে বললেন—আপনি যাবেন না উদের কাছে, ওরা আপনার কথাও শুনবে না। ক্যানেলের জমি দিব না কয়ো তুলেছে যারা, ওই যে গো—রায় ঘোষ—ইয়ারা উদিকে-উস্কানি দিচ্ছে। ওরাই বলেছে—পুলিশ আদালত বুঝি না। বিচার আমরাই করব।—

কিশোরবাবু বললেন—হুঁ। কিন্তু ধর ধর শব্দটা কিসের? ওটাও তোমরাই করছিলে?

বিজয় হেসে উঠল। ও-কিছু নয়।

—মানে?

ম্যাজিস্ট্রেট বললে—ও সেই কপ্লে—কপিল দেব বাইসিক্লে যাচ্ছিল। জিজ্ঞাসা করলাম—কে যায়? তো বলে—সে খোঁজে তোমাদের দরকার কি? তাই আমি বললাম—ধর তো রে। আর এরা চেঁচালে ধর-ধর!

বিজয় এবার প্রশ্ন করলে—আপনারা দাঁড়িয়ে কি করছেন এত রাত্রে? বই পড়া চলছিল বুঝি?

গৌরীকান্ত বললে—হ্যাঁ। মিছে ওই লোকটিকে ধর ধর করতে গেলি কেন?

বিজয় লজ্জিত হল। ম্যাজিস্ট্রেট বললে—করলাম। ওরই বা এত দেমাক কিসের? বললে কেন—সে খোঁজে তোমাদের দরকার কি? এত রাত্রে আমাদের গাঁয়ে ওর কি দরকার?

বিজয় ধমক দিলে। —চুপ কর সুধাময়। তার পর বললে—ওটা হয়ে গেল গৌরীদা।

কিশোরবাবু বললেন—না-হওয়া উচিত হয় নি।

—কাল কিন্তু আপনাকে একবার যেতে হবে কিশোরবাবু। গৌরীদা তুমিও চল। সকালেই স্পেশাল মেসেঞ্জার যাচ্ছে সদরে। বোধ হয় চারটে নাগাদ কেউ না-কেউ আসবে। তাদের সঙ্গে জীপে চলে যাবেন আপনারা। আমি সকালেই যাব এস-আই-এর সঙ্গে। এখন যাই আমরা।

চলে গেল ওরা। কিশোরবাবু দাঁড়িয়েই রইলেন, গৌরীকান্তও দাঁড়িয়ে রইল।

মিনিট খানেক পরে—গৌরীকান্ত তাঁকে ডাকলে—কিশোরবাবু!

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে কিশোরবাবু যেন জেগে উঠলেন।—হ্যাঁ, চল যাই। তিনি ফিরে গৌরীকান্তের বাড়ীতেই ঢুকলেন। বললেন, তুমি রমাকে বলেছিলে, বিজয়ের ঘরে আগুন লাগলে ও আনন্দ পাবে না দুঃখই ওকে পেতে হবে। সে কথাটা ভুল গৌরীকান্ত। বিজয়ের ওপর ও মেয়ের কোন আকর্ষণ থাকতে পারে না। ওর প্রাণই আছে চৈতন্য নেই। ও মেয়েটা এসেছিল তোমার কাছেই। তোমাকেই টানতে এসেছিল। ও ভাবছে, আগুন বুঝি লাগল। সেই আগুন থেকে তোমাকেই ও বাঁচাতে চায়।

—আপনি সকল কথা শুনেছেন কিশোরবাবু?

—ইচ্ছে করে শুনি নি। এসেছিলাম তোমার কাছে। দরজার মুখে এসে শুনলাম মেয়েছেলের গলা। থমকে দাঁড়ালাম। মনে হ'ল শান্তি কি? তারপর কথা শুনে আর যেতে পারলাম না। হয় তো তোমার দিকে একটু মাত্রও আবেগ দেখলে নিঃশব্দে চলে যেতাম। আমি এসেছিলাম, তোমাকে আমার জীবন সাধনার শেষ উপহার দিতে।

অকস্মাৎ আবেগে তাঁর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এল। একটু পর আত্মসম্বরণ করে গলা ঝেড়ে পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন—হ্যাঁ শেষ উপহারই বলব। তা ছাড়া আর কি বলব?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবার স্তব্ধ হলেন। কিছুক্ষণ পর আবার আরম্ভ করলেন। গৌরীকান্ত চুপ ক'রেই বসেছিল। কিশোরবাবুর মনের খবর তার অজানা নয়, শেষ উপহার কি, তাও জানে। যেদিন সে প্রথম ফিরে আসে নবগ্রামে, সেইদিনই বলেছিলেন। মাঝে মাঝে আরও কয়েকবার উল্লেখ ক'রেছেন। নবগ্রামের নূতন কালের কথা; জীবন সংঘর্ষের মর্মকথা আবিষ্কারের চেষ্টা করেছিলেন। প্রথম আরম্ভ করেছিলেন, শান্তির বাবা। বিক্রমপুরের শাস্ত্রী মহাশয়ের শিষ্য তাঁর জামাতা, শাস্ত্র ও ভাগ্যচক্রে যুগপ্রচলিত আচারের আকর্ষণে, নবগ্রামের গৃহজামাতা হয়ে এসে নিরাসক্ত দৃষ্টিতে সমাজের উত্থান-পতন—জীবন-দ্বন্দ্ব কালের পরিবর্তন দেখে একদা অনুপ্রাণিত হয়ে লিখতে আরম্ভ করেছিলেন; তিনি শেষ করতে পারেন নি, নবগ্রাম পরিত্যাগ করে যাবার সময় দিয়ে গিয়েছিলেন কিশোরকে।

কিশোর তখন সন্ন্যাস জীবন থেকে ফিরে এসেছেন, নবযুগের সঞ্জীবন মন্ত্র নিয়ে। তার চোখে নিরপেক্ষ নিরাসক্ত দৃষ্টি দেখেছিলেন। তা ছাড়া কিশোর ছিলেন কবি। বলেছিলেন সম্পূর্ণ করো। জানি কাল নিরবধি—অনন্ত; সৃষ্টিও তার সঙ্গে ক্রমবর্ধমান—এর শেষ নাই। তবু কাল থেকে কালান্তর হয়, মহাকাল একবার দৃষ্টি উম্মিলীত করেন, নূতন অভিষেকে অভিষিক্ত হন, একবার জপমালা হাতে ফিরে আসে; নূতন জপ শুরু হয়। সমস্ত বিশ্বে পরিবর্তন হয়, খন্ড দেশে হয়ে, দেশের মধ্যে গ্রামে হয়; তাই কিশোর—পরিবারের মধ্যেও হয়। একটি মানুষের মধ্যেও ঘটে। নবগ্রামের জীবনের সেই একটি খন্ডকালের কথা লেখার বাসনা ছিল। আমার জীবনে সে কালান্তর দেখা ভাগ্যে নাই। দেখলামও না, লেখাও হল না।

কিশোরবাবুও তাই বলেন—গৌরীকান্তকে।

সেই তাঁর শেষ উপহার। তাই বোধ করি দিতে এসেছেন।

(ক্রমশ)

ঘোড়দৌড়ের মাঠ

রূপদর্শী

ঘোড়ার পিঠে চেপে বসলেন, ছিপটি দিয়ে কসলেন এক সপাৎ ঘাই, আর অমনি ঘোড়া আপনার পংখীরাজের পুত্তুর হয়ে টকাস করে বাজীটি জিতে আপনার পাশ-পকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে গেল, ব্যাপারটা অত সহজ নয়। এলোপাতাড়ি টিকিট কিনে রেস জিতে বাড়ী ফেরা তার চেয়ে ঢের সহজ কাজ।

ঘোড়দৌড়ের জিয়নকাঠি মরণকাঠি ঘোড়া। যে সে ঘোড়া নয়। এবং রেসের ঘোড়াও যে সে নয়। আদর যত্নে নতুন জামাই, আরামে বিরামে রাজাগজা আর নাম-ডাকে 'ফিলিম এস্টার'। এই তিনে এক হয়ে কামনা সাগরে ডুবে মরলে পরজন্মে নির্ঘাত রেসের হর্স।

দৌড়ের ঘোড়ার যেমন জন্মও আলাদা তেমনি তাদের তালিম ট্রেনিং। পেট থেকে পড়ল আর জিন চাপিয়ে রেসের মাঠে নেমেই দিলেন কষে দাবড়, মোটেই তা নয়। মাছে আর মাছ ভাজায় যেমন তেল কড়াই-এর ফারাক তেমনি ঘোড়ায় আর রেসের ঘোড়ায়। ঘোড়ার মায়ের আর কি? বাচ্চাকে বহাল তবিয়তে ডেলিভারী দিয়েই খালাস। তারপর সে নিশ্চিন্ত। আর বাচ্চার জিম্মা? ট্রেনারের। বাচ্চা তো বাচ্চা, তার হাঁচি কাশির জিম্মাদারও ট্রেনার।

দৌড়ের ঘোড়ার তোয়াজ কি! ঘোড়াটা কি খাবে? কতটা খাবে? কতক্ষণ আস্তাবলে থাকবে? কতক্ষণ রাউণ্ডে? সব দিকে নজর চাই কড়া। ঘোড়া পোষার মুলমন্ত্র হল ফিট রাখা। ঘোড়া বলে যে তাকে যা তা গুচ্ছের খাইয়ে যাবে তা চলবে না। এক আধ টাকার মাল নয় মশাই, এক একটা ঘোড়ার দাম শুনলে নিতান্ত আপন লোকের নামও গুবলেট হয়ে যাবে, তাই আর সে কম্ম করলাম না। কোন কিছুর ইতর-বিশেষ হলেই চক্ষুটি উল্টে ফক্কা হয়ে যাবে আর বাস দুনিয়া অন্ধকার। হাতীর খরচ হাতীর খরচ করেন, ঘোড়ার খরচের কাছে সে তো শাক ভাত। ঘোড়ার তম্বির তদারকে শত ফৈজৎ। একঃ ঘোড়াকে নিয়মিত খাওয়ান, দুইঃ নিয়মিত ব্যায়াম করান, তিনঃ দলাই মলাই, আর চারঃ নাল পরান। এই চারটে কাজই ঘোড়া পোষার নিত্যকর্ম পদ্ধতির বীজমন্তর। একটিও কম হলে চলবে না।

সহিসটা বললে, তিন দোফে খাওয়াতে হোবে, সোর্কালে, দুপারে সনঝেকা সোমায়। হররোজ এই টাইম চলবে। ইধার উধার একরোজ হোবে তো সাহেব লাথ মেরে বোলবে যাও সালে ভাগো। কি খাবে? আরে ভাই, বহোৎ চিজ খায়। আর কুথা থিকে থিকে সোব আসে। লন্দন, অস্ট্রেলিয়া, আমুরিকা।

কত কি আসে? ওট্ আসে, মেজ্ আসে, বার্লিদানা। আবার চানা, দাল, শুখা খড়। যতটা ওট্ কি দানা আর ততটা শুকনো খড়, এই হল সাধারণ। তো যেসব

ঘোড়া জোর ছোটে তাদের বেশী দানা আর কম খড় দিতে হবে। নয়তো 'ফিট' থাকবে না। মাঝে মাঝে মুখের সোয়াদ বদল করতে কাঁচা ঘাসে মুখ লাগাতে দেওয়াতে পারো আর তাও খুব হুঁসিয়ার হয়ে, আবার তাও গরমকালে। কাঁচা ঘাসে রুচি ঠিক থাকে, স্বাস্থ্যও ভাল থাকে। কিন্তু কাঁচা ঘাস বেশী খাওয়ালে ঘোড়ার 'স্পীড' কমে যায়। সে ঘোড়া আর জোর কদমে ছুটতে পারে না। মহা লেদ্ড়ুস্ মেরে যায়। খাওয়ার পর ঘোরাফেরা, একটু আধটু ব্যায়াম করানো দু' চার কদম ছোটানো অবশ্যই চাই। নইলে ঘোড়ার পা থাম হয়ে যাবে। তারপর হল দলাই মলাই। দপাস্ দপাস্ থাপ্পড়, আর ভুরুস্ ভুরুস্ বুরুশ চালানো। এ কার্যটি ঠিক মতো না করেছ কি ঘোড়ার মেজাজ তোরিয়া হয়ে যাবে। আর সব শেষে নাল ঠোকা। নাল ক্ষয়ে যাক আর না যাক, পুরানো নাল খুলে ফেলে খটাস খটাস নতুন 'জুতো' পরাতে হয়। মাসে একবার করে অন্তত এই কম্ম করতে হবে। ঘোড়ার দৌড়টি আমার দরকার। সেটি পরিপাটি চাই বলে পায়ের উপর এত নজর। নাল যদি না পরাও তো বাড়তি খুর ছেঁটে ফেল। পায়ের উপর খবরদারী শেষ হল? তো এবার এস আস্তাবলটা দেখি। আরে একি ব্যাপার? এই নাকি আস্তাবল? এই তার জানালা? চলবে না। হাওয়া বাতাস খুশী মতো যেখানে হাসতে খেলতে না পারে সে জায়গার ঘোড়া দৌড়বাজীতে 'খেল' দেখাবে কি করে?

সহিস বললে, এক একটা ঘোড়াকে দুরুস্ত করতে ঘামের পানিতে বর্ষা নেমে যায়। ঘোড়া যা 'জানবর' একটা আছে না, একদম বিলকুল জেনানাকা মাফিক। মন বুঝে না চললে কিছুতেই বাগ মানানো যায় না। একটুতে ঘাবড়ে যায়, একটুতে বেঁকে বসে। ঘোড়ার উপর চড়বেন যেন ওর গায়ে আঁচড়টি না লাগে। যদি একটু লাগল তো ব্যস্, গড়বড় হয়ে গেল। ঘোড়ার থেকে নামবেন তাও আলগোছে। একটু কড়া ঝাঁকুনী ঘোড়ার পিঠে লাগল কি ব্যস্, মেজাজ বিগড়ে গেল। লাগাম ধরে টানলেন, একটু কড়া হল কি চোট লেগে গেল মুখে। চাবুক মারলেন তো চোট লাগল গায়ে, তো আর কাজ হবে না তাকে দিয়ে।

সহিস বললে, এমুন বুদ্ধি আছে কি পিঠে যে সওয়ার থাকবে তার বোসবার কায়দা দেখেই মালুম কোরে লিবে, এ সওয়ারের কি 'পাওয়ার' আছে। যদি বুঝে যে হাঁ, ই আচ্ছা আছে, 'ইস্পর' বিশোয়াস করা চোলবে তো সে সওয়ারের কথায় জান দিয়ে দিবে। আর যদি বুঝে যে ই আদমী কাবিল না আছে তো এক কদম ভি যাবে না। কেন, না ডর লেগেছে। সওয়ার তো কাঁচা। উ নিজে ভি গিরতে পারে আর 'জানবর'কে ভি গিরাতে পারে। তো জান কবুল, এক কদম ভি চলবে না। পিঠ থিকে সওয়ারকে গিরাইয়ে দিবে। এমুন খচ্চর আছে।

রেসের এক চাঁই বললেন, তোয়াজ। সেরেফ তোয়াজেই এ জানোয়ার বশ। আর রেসের ব্যাপার, জানেন তো, এক চুলে হার জিত ঠিক হয়ে যায়। সত্যিই চুল পরিমাণ, কথার কথা নয়। আর ঘোড়াগুলো তা যে
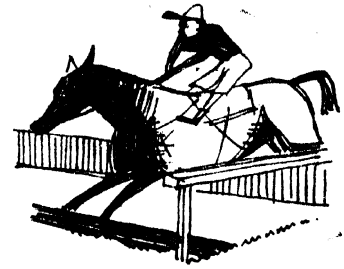
বোঝে না, তা নয়। এমন স্পর্শকাতর জানোয়ার আর দুটি পাবেন না। বড়লোকের একমাত্র আদুরে মেয়েরও বাড়া। কথায় কথায় তার যেমন ঠোঁট ফোলে, মেজাজ বিগড়ে যায়, ঘোড়ারও তাই। ইসারাই যথেষ্ট। চাবুকের শব্দই ঢের। তাতেই যা করবার ওরা করবে। ঘাঘু জকি কখনোই ঘোড়াকে চাবুক মারে না।

দৌড় চলেছে ফুল ফোর্সে। গলায় গলায় চলেছে ঘোড়া। হিস্ হিস্ শব্দ, মৃদু মৃদু পায়ের ঠোক্কর। ওই যথেষ্ট। তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে দিলেন এক ছিপটির বাড়ী কষিয়ে। ঘোড়া চমকে উঠলো। গতি মুহূর্তের জন্য কমে এল। ব্যস্, 'উইন'-এর বারোটা ওখেনেই বেজে গেলো। ঘোড়ার গায়ে যতটা ব্যথা লাগল, তার দুনো লাগল মনে। পাঁচ ঘোড়ার সামনে বে-ইজ্জৎ? যাস্‌শা— কে আর দৌড় করায় দেখি? ঘোড়া বসল বেঁকে। আর ত্যাড়া ঘোড়াকে সিধে করবে কে?

ঘোড়ার হার জিতে জকীদের দায়িত্বই বেশী। ভাল ঘোড়া, সিওর জিত, সেরেফ 'ক্যালকুলেশনে'র অভাবে মার খেয়ে গেল। এই তো সেদিনকার রেসের কথাই বলি। টিপ্‌স্ দিয়েছিলাম। ঘোড়াটা সিওর। প্রত্যেকেই ধরে নিয়েছিল ঘোড়াটা জিতবে। জিততোও, জকীটার সমঝোতার অভাবে পারলে না। কি করলে মশাই, ঘোড়াটাকে সেরেফ ফারাকে নিয়ে দৌড়ুলে। অথচ ওটা দঙ্গলে ঘোড়া। ওটাকে ফাঁকে না রেখে জকীটা যদি দঙ্গলের মধ্যে এনে ফেলত তো দেখতেন, কারো সাধ্যি হতো না ওকে ছাড়িয়ে যায়। আবার অনেক ঘোড়া সিধে বেশ দৌড়ায়, 'টার্নে'র মুখে এসে স্পীড্ কমে যায়, অনেকে আবার 'টার্ন'টাকে কাজে লাগায় পুরো। টুকুস করে ওই টানে আধ 'লেংথ্' মেরে দিলে। তাহলে আর পায় কে? যে জকী তার ঘোড়ার গলদ যত বুঝতে পারে তার তত সুবিধে।

এখানে ফ্ল্যাট রেসই আকছার হয়। কম পাল্লা, মাঝ মাল্লা আর দূরের দৌড়। চার থেকে ছয় ফার্লং-এর দৌড় কম পাল্লার দৌড়, নাম হল স্প্রিন্ট্। সাত থেকে আট ফার্লং-এর দৌড় মাঝ পাল্লা। 'মাঝ পাল্লা'কে রেসের মাঠে কেউ চেনে না, ওখানে বলবেন 'মিড্‌ল্ ডিস্‌ট্যান্ট'। আর দশ ফার্লং থেকে পৌনে দুই মাইল, এই হল কলকাতার রেস-ময়দানের মসজিদ। মোল্লাদের দৌড় এর বাইরে আর যায় না। এর নাম 'স্টেয়ার'। এক এক পাল্লার ঘোড়া অন্য পাল্লায় বড় বিশেষ যায় না। একেবারেই কি যায় না? মিড্‌ল্ ডিস্‌ট্যান্টে'র ঘোড়া কি 'স্প্রিন্ট'-এ দৌড়ায় না? দৌড়ায় বৈ কি। সেখানে জকী যদি মাপজোক ঠিক রেখে দৌড় করাতে পারে তো কামিয়াব হয়। নচেৎ ফটাং।

এক একটা ঘোড়ার যেমন এক এক রকম পাল্লা তেমনি এক এক ঘোড়ার এক এক রকম ওজন। হুট্ করে রেসের মাঠে নামিয়ে অমনি দিলেই হল, কেমন? তার আর হিসেব কিতেব নেই, না? আগে দেখ, কি রেস হচ্ছে। এবার কি 'টার্মে' দৌড়বে, না কি 'হ্যান্ডিকাপে'? কি, 'টার্মে'? তো বেশ, আনো ঘোড়াগুলো, ওজনে চাপাও। সব ঘোড়ার ওজন সমান করে দাও। জিনের গায়ে পকেট আছে। ওজন চাপিয়ে দাও। বাজারে গিয়ে মাছ কেনোনি? পাল্লার পাষাণ ভেঙ্গে নাওনি? তবে, তেমনি করেই ঘোড়ার পাষান ভেঙ্গে নাও। তারপর নামাও দৌড়ে। দেখি কার হেকমত কত?

এবার কোন্ দৌড়? 'হ্যান্ডিকাপ'? আচ্ছা আনো ঘোড়া। আবার পাষান ভাঙ্গতে হবে। তবে অন্য কায়দায়। আগের বার
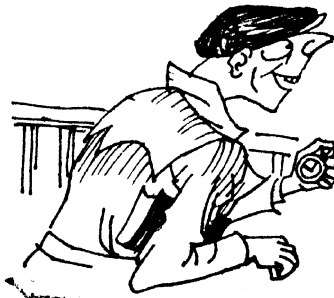
যদি সকলের ওজন সমান করে দিয়ে থাক, এবারে ওজন কমিয়ে বাড়িয়ে সকলের 'চান্স' সমান করে দাও। এই ঘোড়ার এত ওজন? সেকেন্ডে ফার্লং 'কিলিয়ার' করছে। ও ঘোড়াটা এর সঙ্গে পারছে না। ওজন বেশী আছে ওর। আচ্ছা এ ঘোড়াটায় ওজন একটু চাপিয়ে দাও। এমনি করে ওজন কমিয়ে বাড়িয়ে একটা সামঞ্জস্য আনো, তারপর মাঠে নামাও। এই ওজন কমানো বাড়ানোর অঙ্ক কষে কষে একটি ভদ্রলোকের মাথার চুল বেবাক ফাঁক হয়ে গেল। সে ভদ্রলোককে বলে 'হ্যান্ডিক্যাপার'। তাই বেশ মোটা রকম একটা টাকা ইনি চুলের বদলা পেয়ে থাকেন।

লালয়েৎ পঞ্চবর্ষানি শুধু মানুষের বাচ্চার বেলায়। ঘোড়ার বাচ্চা দু বছর বয়সেই মাঠে নামে। তার আগেই তার তালিম ট্রেনিং 'কমপ্লিট্'। ঘোড়দৌড়ের মাঠের সঙ্গে সেই যে তার পায়ের মিতালী শুরু, সে সম্পর্ক আর বছর আষ্টেকের মধ্যে ছিন্ন হয় না। দশ বছর বয়েস পর্যন্ত ঘোড়ার দম থাকে। ততদিনই তার কদর। তার দাম। তার নাম মুখে মুখে। দশ বছরের পর সচরাচর আর 'ফর্ম' থাকে না। মাঠ থেকে ঘোড়া ঢোকে 'স্টাড্ ফার্মে'। তখন তার কাজ বাচ্চা পয়দা করা। ঠিকুজী কুলজী মিলিয়ে অশ্ব আর অশ্বিনীর 'কোর্টশিপ' চলে। ইংরেজীতে বলে 'ব্রিডিং'। বাপদাদার নাম রাখতে, বংশের মুখে বাতি দিতে জন্ম হয় বংশধরের। নতুন এসে পুরানোর সিংহাসন দখল করে। নতুন ঘোড়ার পরিচয় হয়, রেসের সমাজে প্রবেশ হয় বাপ মায়ের জীবনের রেকর্ড দেখে। রেশুড়েরা বাজী ধরবে, চট করে বই বের করে দেখে নেয় কে এই নবাগতের বাপ আর কে এর মা। ও এরই ছেলে! ওর বাপ এই সালে মাদ্রাজে অমুক কাপ জিতেছিল। ওর মা কলকাতায় পর পর তিনটে সিজিনে ভেল্কী দেখিয়ে ছেড়েছিল। তাদেরই বাচ্চা। ধর, 'উইন'-এ।

একটা বাজী জেতে, দুটো বাজী জেতে। আবার বাপ মায়ের নামটা লোকের মুখে মুখে ফেরে। কিন্তু লোকের চোখে চোখে? না, বুড়ো বাপ মা নয়, জোয়ান বাচ্চাটাই সেই জায়গা জুড়ে আছে। আর বুড়ো বাপ? বিগত দিনের 'ফেভারিট'? সে কোথায়? পাবলিক জানে না, জোয়ান বাচ্চাটা জানে না, শুধু সেই ঘোড়াটা জানে, আর জানে ঘোড়দৌড়ের এই মাঠটা। সে দেখেছে, আস্তাবল থেকে বুড়োটাকে বের করে আনতে। সে দেখেছে, খুব বেশী দূরে নয়, একটা ঘেরা জায়গায় তাকে নিয়ে যেতে। সে দেখেছে গোটাকয়েক সার্জেণ্টকে আসতে। সেই শুধু পর পর গোটাকয়েক টোটার
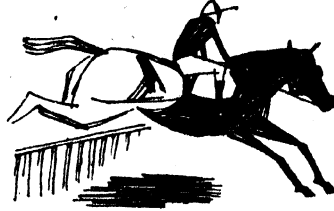
আওয়াজ শুনেছে। বুড়োর কাজ শেষ। মানুষের চোখের সামনে আর কোনদিন সে আসবে না। ঘোড়দৌড়ের মাঠটা নিশ্চিত জানে কেন? আর জানেন জু-বাগানের কর্তৃপক্ষ। কারণ কোন বাঘকে কতটা মাংস দিতে হয়, সে হিসেব তাঁরা করেন।

তাই যখন ঘোড়দৌড় হয়, 'গ্যালপে'র তাড়নায় ঘোড়দৌড়ের মাঠের নরম মাটি কেঁপে কেঁপে ওঠে, বিস্ময়হীন চোখ মেলে ঘোড়দৌড়ের মাঠটা বিজয়ী ঘোড়ার 'গ্যালপ' গুণতে থাকে। গ্যালারী ফেটে পড়ছে চীৎকারে। 'বাক্ আপ্', 'বাক্ আপ্'। আরো জোরে, আরো জোরে, আরো আরো জোরে। থার্ড থেকে সেকেণ্ড, সেকেণ্ড থেকে ফার্স্ট। 'প্লেস্' থেকে 'উইনে'। আরো জোরে। আরো জোরে। 'বাক্ আপ্'। তারপর 'উইন' থেকে? মৃত্যুতে। সারাজীবনের ঝটিকাগতির স্থায়ী পুরস্কারে।

উতল স্বপ্ন

বটকৃষ্ণ দে

আমাকে উতল ক'রে তোমার কী লাভ, বলো, বলো!
যখন বিকেল নামে হংসমিথুনের ছলোছলো
দুই চোখে, মেঘ-মালা মেয়েদের আলোর মঞ্জীর
ক্লান্ত হয়, শান্ত হয় সোণা-মাখা দীঘল দীঘির
দুরন্ত হৃদয়! তবু, তখনো নাচাও তুমি হাতে
একটি ফুলের প্রাণ, ভোরে-তোলা উৎসবের সাথে,—
যার গান, যার ঘ্রাণ উচ্চারিত, তাকে নিয়ে এ কী
নিষ্ঠুর নৃত্যালী, বলো! চাও তবে তার মৃত্যুকে কী?

তবে তাই হোক, হোক। মৃত্যুর মতন অনুনয়ে
নীল হ'য়েছে আকাশ। বেদনার বৃন্তে বিকশিত
হ'য়েছে হৃদয়, ধ্রুব গন্ধের গগনে উদ্ভাসিত
স্মিত হাসি, সে-ও ব্যর্থ, ব্যর্থ হ'ল প্রার্থনা-প্রণয়ে!

একটি গানের রাত দিয়েছিলে, তার সে স্মরণী
উজ্জ্বল শিখার দান সারা রাত বৃত্তের মতন
জীবনের পরিধি-ভ্রমণ করে। তাই তো যখনি
সন্ধ্যার তারার চোখে চাও তুমি, তখনি এ মন
দুরাশায় দীর্ণ হয়, কিন্তু তাতে তোমার কী লাভ?
আমাকে উতল ক'রে জানি না মিটবে কী অভাব॥

কোন একটি মেয়েকে

প্রভাকর মাঝি

আমার কবিতা লেগেছে তোমার ভালো,
পুলকের ঢেউ তুলেছে সবুজ মনে।
জাগর নয়নে জেলেছে প্রীতির আলো
একদা সে কোন্ পরম শুভক্ষণে।

আমার ছন্দে জানি না, কি যাদু আছে,
কি আছে লুকানো হিজিবিজি অক্ষরে—
রামধনু হয়ে ফুটে সে তোমার কাছে,
একটি কবিতা কেমনে উতলা করে!

যে কথা ভাবিয়া কবিতা লিখিনি, মেয়ে,
তুমি আনো সেই নূতন অর্থখানি।
তোমার প্রীতির একটু পরশ পেয়ে
স্থূল ভাষা মোর কবে হয়ে গেছে বাণী।

বেশ জানি, এই সন্ধ্যার অবসরে
নির্জন ঘরে মাটীর পিদিম জেলে,
আমার কবিতা পড়ো গুন্ গুন্ করে
কালো চোখে এ কি বাঁকা বিদ্যুৎ খেলে!

আমার কবিতা তোমার যে ভালো লাগে,
তাই লিখে যাই হৃদয়ের অনুরাগে।

ট্রামে-বাসে

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্বন্ধে আমরা বিশুখুড়োর মতামত জানিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু ট্রামে-বাসে যাতায়াতের কোন সুবিধা সুযোগের কথা ইহাতে নাই বলিয়া খুড়ো মন্তব্য করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শুধু সংক্ষেপে বলিলেন—"ইথে কি হইবে বল নন্দের পিসীর"!

* * *

অনগ্রসর শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণের ভার কোন মন্ত্রীর হাতে ছাড়িয়া দেওয়ার কথা কেন্দ্রীয় সরকার বিবেচনা করিতেছেন। "শ্রীযুক্ত জগজীবন রামের সাম্প্রতিক পরামর্শ অনুসারে সেই ভাবী মন্ত্রীকে অনগ্রসর শ্রেণীর কোন মেয়েকে বিয়ে করতে হবে কিনা সে সম্বন্ধে সরকার এখনো নিরুত্তর"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

আন্তর্জাতিক সমাজসেবীদের মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত এক সভায় প্রদেশপাল শ্রীযুক্ত শ্রীপ্রকাশ অনুরোধ করিয়াছেন—জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ব্যাপারে তাঁরা যেন অনেকখানি উচ্চস্তরের সম্ভাবনার দিকে দৃষ্টিপাত না করেন।—"অর্থাৎ প্রদেশপালের গদিকে যেন তাঁরা ট্রামে-বাসের গদিতে পরিণত না করেন"—টীকা করেন বিশুখুড়ো।

* * *

বাংলার প্রদেশপাল ডাঃ মুখার্জি তাঁর সাম্প্রতিক ভাষণে বলিয়াছেন যে, পুলিশ বাহিনী শুধু আইন ও শৃঙ্খলার ভার নিয়াই যেন ক্ষান্ত না থাকেন, তাঁহাদিগকে এখন জনসেবার ভারও লইতে হইবে। জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"কিন্তু তেলে জলে মিশ খায় শুনেছো তা কেউ কি?"

* * *

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদ বলিয়াছেন—আমরা ভারতবাসীরা বিশ্বাস করি যে, অনেক পথ ধরিয়াই পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করা যায়।—"হয়ত যায় কিন্তু সরকারী গদির চূড়োয় আরোহণের পথ কিন্তু অনেক নেই অন্তত থাকলেও সাধারণ ভারতবাসীর তা জানা নেই"—মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

* * *

পাকিস্তানের অবস্থা অচিরেই মিশরের মত হইবে—এই মন্তব্য করার অপরাধে পাক সরকার "দি স্টার" নামক

কাগজটির মুদ্রণ রহিত করিয়া দিয়াছেন। খুড়ো একটি ব্যঙ্গ রচনার ভাষা অনুকরণ করিয়া বলিলেন—"রাজা-গজার সঙ্গে গেহ ফাজলামি মারাত; অর্ধচন্দ্রের দেশে আবার 'স্টার'!"

* * *

পাকিস্তানের অন্য এক সংবাদে প্রকাশ সেখানে নাকি একটি কুমীর ট্রেন-চাপা পড়িয়াছে। "আহা, বেচারী নিশ্চয়ই শেয়াল পণ্ডিতের পাঠশালায় বাচ্চাদের
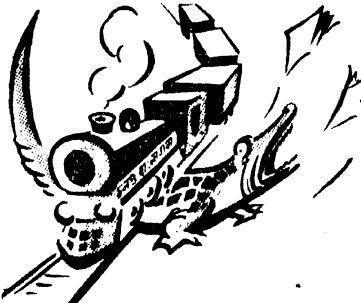
উর্দু শেখার প্রগ্রেস রিপোর্ট নিতে এসেছিল"—বলে শ্যামলাল।

* * *

আফগানদের সঙ্গে পাকিস্তানের ব্যবহারের উল্লেখ করিয়া ভারতে অবস্থিত আফগান রাষ্ট্রদূত বলিয়াছেন যে, পাকিস্তান আগুন লইয়া খেলা করিতেছেন।—"কিন্তু খেলাটা উড়ন তুবড়ীর না ছুঁচো-বাজির সে কথা অবশ্যি রাষ্ট্রদূত প্রকাশ করেন নি"—মন্তব্য করেন এক সহযাত্রী।

* * *

একটি সংবাদে প্রকাশ, মস্কোর বিশেষজ্ঞেরা নাকি মৃতদেহে প্রাণ-সঞ্চারের কথা নিয়া গবেষণা করিতেছেন।—"মনুমেণ্টের পাদদেশে যে বিশল্যকরণী

বিতরণ করা হয় তা কি তবে যথেষ্ট নয়"—বলেন এক সহযাত্রী।

* * *

জাপানের জনৈক গণৎকার ঘোষণা করিয়াছেন যে, তৃতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ আগামী গ্রীষ্মকালেই আরম্ভ হইবে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, এই যুদ্ধে রাশিয়াই পরাজিত হইবে।—"ফল্ অব মস্কো ছবি কেউ তুলবেন কিনা সে সম্বন্ধে অবশ্যি গণৎকার কিছু বলেন নি"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

বিজ্ঞান-বৈচিত্র্য

চক্রদত্ত

সব সময়ে গাছের গোড়ায় জল ঢাললেই যে ভাল ফল অথবা ফুল পাওয়া যাবে এমন নয়। জল ছাড়াও জমিতে সার দেওয়ারও প্রয়োজন হয়। দেখা গেছে যে বাগানে গাছে ভিটামিন বি ওয়ান দিলে গাছের বাড় খুব বেশী হয়। অবশ্য ভিটামিন বি ওয়ান গাছের গোড়ায় না দিয়ে গাছের ওপর ছিটিয়ে দিতে হয়। একটা বড় কাচের বোতলে ভিটামিনের বড়ি জলে গুলে নেবার পর বোতলের মুখে

গাছের ওপর স্প্রে করা হচ্ছে

একটা স্প্রে করবার যন্ত্র লাগিয়ে দিয়ে তারপর পাম্প করলেই সেটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। অবশ্য প্রয়োজন হলে বড়িগুলো মাটির সঙ্গে মিশিয়েও দেওয়া যায়, অথবা বড়িগুলো গুঁড়িয়ে নিয়ে মাটির সঙ্গে মেশান যেতে পারে।

*

ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করা মানুষের আদিম অভ্যাস। যে যুগে মানুষ শুধু খেয়েই বেঁচে থাকতো সে যুগে মানুষের ভবিষ্যতের জন্য খাদ্য সঞ্চয় করা অভ্যাস ছিল। বরফের নীচে কিংবা পাহাড়ের কন্দরে উদ্বৃত্ত খাদ্য ভবিষ্যতের জন্য রেখে দিত। বর্তমানে সভ্য যুগেও এই সঞ্চয়ের প্রথা উঠে যায়নি। এখন কী করে খাদ্যবস্তু বহুদিন তাজা রাখা যায় তারই চেষ্টা চলছে। ঠাণ্ডায় রাখলে কাঁচা খাবার তাজা থাকে একথা সকলেরই জানা কিন্তু এই তাজা থাকারও তারতম্য আছে। সেজন্য বরফের নীচে রাখা থেকে আরম্ভ করে বহু নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে। সাধারণভাবে দু' এক দিনের জন্য কোনও খাবার রাখার সবচেয়ে সহজ উপায় বরফ দিয়ে রাখা, যেখানে রেফ্রিজারেটরের ব্যবস্থা থাকে সেখানে অবশ্য অন্য কথা। এইভাবে বরফ কুঠরীতে খাদ্যবস্তু বহুদিন তাজা রাখা যায়। অবশ্য হিমকুঠরীতে রাখার আগে যদি খাবারগুলোর ওপর বরফের একটা আস্তরণ জমিয়ে দেওয়া যায় তাহলে সেগুলো আরও অনেকদিন অর্থাৎ বেশ কয়েক বছর তাজা রাখা যেতে পারে। ওপরের এই আস্তরণটি জমানর ওপরেই খাবারগুলির আকার, স্বাদ ইত্যাদি নির্ভর করে। ওপরের আস্তরণ জমানোর সময় যত তাড়াতাড়ি জমানো হবে জমাট বরফের দানাগুলি ততই মিহি হবে আর যত দেরী করা হবে দানাগুলি তত মোটা হবে। তাড়াতাড়ি জমাতে পারলে খাদ্যবস্তুগুলির স্বাদ, আকৃতি এবং উপাদান নষ্ট হতে পারে না। ধীরে ধীরে জমাতে থাকলে খাদ্যের মধ্যের জলকণাগুলি বার হয়ে আসে আর তাদের কোষগুলি ফেটে গিয়ে আকৃতি নষ্ট করে ফেলে, প্রোটীন ইত্যাদি উপাদানও নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং এই খাদ্যগুলি একেবারে পচে যায় না বটে কিন্তু কিছুটা বিস্বাদ ও বিকৃতি হয়ে যেতে পারে। সাধারণত শূণ্য ডিগ্রী ফারেনহাইটের নীচে উত্তাপ হলেই সবকিছু জমে যায় কিন্তু উত্তাপ এর চেয়ে বিশ পঁচিশ ডিগ্রী নীচে হঠাৎ নামিয়ে দিয়ে জমিয়ে ফেলতে পারলেই সূক্ষ্ম দানাবিশিষ্ট বরফ পাওয়া যায়। সেই বরফের আস্তরণে ঢাকা খাবারই সবচেয়ে ভাল থাকে। খাবারগুলি দ্রুত জমানর জন্য বর্তমান পদ্ধতি অনুসারে সেগুলি ব্রাইন সলিউশনের সাহায্যে অথবা কোনও রকম ঠাণ্ডা বাতাস দিয়ে জমানো হয়, এর ফলে খাবার সময় দেখা যায় যে, খাবারগুলোতে কিছুটা ব্রাইনের স্বাদ গন্ধ বর্তমান থাকে। ডেনমার্কের একটি কোম্পানী, পরিস্রুত জল, গ্লিসারিন ও ইথিল এলকোহলের একটা সলিউশন করে সেটার উত্তাপ শূণ্য ডিগ্রীর নীচে বিশ ডিগ্রী নামিয়ে দিয়ে তার মধ্যে খাবারগুলো ডুবিয়ে নিয়ে তারপর ঐগুলোর ওপর দিয়ে একটা ঠাণ্ডা বাতাসের প্রবাহ বইয়ে সেগুলোর ওপর বরফের আস্তরণ জমিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করেছে। এই নতুন উপায়ে জমানর ফলে খাবার জিনিসগুলো খাবার সময় একেবারে স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায়। এমন কি, টেঁপারী, টোম্যাটো, আঙ্গুর, জাম ইত্যাদি ফলগুলিও অক্ষত ও অবিকৃত অবস্থায় থাকে। এই নতুন উপায়টির আরও একটা সুবিধা যে, বিভিন্ন গন্ধবিশিষ্ট বিভিন্ন খাদ্যবস্তু (মাংস, মাছ, ফল, মাখন ইত্যাদি) একই আধারের মধ্যে রাখলেও সেগুলোর একের গন্ধ অন্যের সঙ্গে মিশে যায় না।

*

ওষুধ দিয়ে রোগ সারানো এক কথা আর রোগের যন্ত্রণা কমানো আর এক কথা। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই রোগ যতক্ষণ বর্তমান থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত যন্ত্রণার উপশম হয় না। বিশেষত ক্ষত, ফোড়া, কাটা ছেঁড়ার জায়গার যন্ত্রণা সহজে সারানো যায় না। অস্ত্রোপচারের পর কিংবা ঐ ক্ষতস্থানে ড্রেস করার পর যে ব্যথা হয় তাও চট্ করে কমান যায় না। ট্রাইলিনী নামে একরকম সচ্ছ নীল তরল পদার্থের সাহায্যে এ ধরণের ব্যথা সারানোর ব্যবস্থা হচ্ছে। একটা রবারের মুখোশ রোগীর মুখে পরিয়ে ট্রাইলিনীর সিলিণ্ডার থেকে ডাক্তার খুব জোরে জোরে দুটো চারটে নিশ্বাস নিতে বলেন আর নিশ্বাসটা নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত যন্ত্রণার উপশম হয়। আবার যখন যন্ত্রণা শুরু হয় তখন আবার এইভাবে নিশ্বাসের সঙ্গে কিছুটা ট্রাইলিনী শরীরে প্রবেশ করালেই যন্ত্রণা সেরে যায়। এইভাবে অনেক বার নিতে নিতে যদি রোগী অজ্ঞান হয়ে পড়ে তাহলে মুখোশটা মুখ থেকে সরিয়ে নিলেই আবার জ্ঞান ফিরে আসে। এই মুখোশটা হাসপাতালে কিংবা বাড়ীতে অস্ত্রোপচার বা প্রাথমিক চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যবহার করা ছাড়াও প্রসব বেদনার সময় ব্যবহার করতে পারলে অনেক কষ্টের লাঘব হয়। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পরিশ্রুত ট্রাইক্লোরো ইথিলিন থেকে তৈরী করা হয়। এর গন্ধটা বেশ মৃদু ও মিষ্ট এবং এটাতে কখনও জ্বালা করে না। ইংলণ্ডের মহারাণী তার পুত্র চার্লস ও কন্যা এ্যানীর জন্মের সময়ে প্রসব বেদনা লাঘব করার জন্য ট্রাইলিনী ব্যবহার করেছিলেন। তৎকালীন ডাক্তারের মতে এই ট্রাইলিনী ব্যবহার যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই দেবার সবচেয়ে ভাল ব্যবস্থা। বর্তমানের নাইট্রাস অক্সাইডের চেয়েও এটি বেশী কার্যকরী। কারণ এটাকে নিজের প্রয়োজন মত রোগী নিজেই নিতে পারে আর এটা জ্ঞান নষ্ট না করে যন্ত্রণার উপশম করায়। দাঁতের চিকিৎসার সময় এই মুখোশটি মুখের ওপর রাখা যায় না সেজন্য এটাকে একটু বদল করা হয়েছে। শুধু নাকের মধ্যে গ্যাসটা দেওয়ার জন্য অন্য রকম মুখোশ লাগানো হয়। ডাঃ স্টিফেন এই যন্ত্রটি তৈরী করেছেন।

পুস্তক পরিচয়

উপন্যাস

পদচিহ্ন : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় :: কাত্যায়নী বুক স্টল; ২০৩ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ : সাড়ে চার টাকা।

বাঙলাদেশের সেটা যুগসন্ধি। সামন্ততন্ত্রের পুরোনো ইমারতের ফাটল ধরেছে। সেই ফাটলের রন্ধ্রে রন্ধ্রে শিকড় মেলে দিয়েছে নতুন চারাগাছ, বাণিজ্যলক্ষ্মীর বরপুত্র। সমস্ত দেশ জুড়ে এক নতুন চেতনার সঞ্চার হয়েছে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার ক্রমবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠছে এক নতুন সমাজ। এক পক্ষের লড়াই আত্মপ্রতিষ্ঠার, অন্য পক্ষের আত্মরক্ষার। কালের অনুগামী হতে না পারলে ধ্বংস হতে হবে, অদৃষ্টের এই অনিবার্য লিখনকে শত চেষ্টা করেও মুছে ফেলবার উপায় নেই। সামন্তযুগীয় আত্মতৃপ্ত, পর্যুষিত সমাজ ব্যবস্থার পাশাপাশি নববিধান মাথা তুলে দাঁড়াল। পশ্চাতে তার বাণিজ্যলক্ষ্মীর বরাভয়, আর হৃদয়ে নব্য শিক্ষার সংস্কারবিমুক্তি। কিন্তু নিশ্চিত পতনের মুখোমুখী হয়েও হয়ত বংশানুক্রমিক আভিজাত্যের অভিমান ভোলা যায় না। যায় না বলেই পরাজয়ের গ্লানি এত তীব্র। বেদনা এত নির্মম।

তারাশঙ্করের সমাজবোধের এই মূল কথাটি তাঁর একাধিক প্রখ্যাত উপন্যাসে বিভিন্ন সুরে ধ্বনিত হয়েছে। ক্ষয়িষ্ণু এক যুগেতিহাসের পাশাপাশি বর্ধিষ্ণু আর এক ইতিবৃত্ত। অনিবার্য, অনস্বীকার্য। 'পদচিহ্ন'ও তার ব্যতিক্রম নয়। সেই দ্বন্দ্ব, সেই বেদনারই এক নতুন রূপায়নের সঙ্গে এখানে আমাদের পরিচয় ঘটলো।

এ-দুয়ের মাঝখানে আছে তৃতীয় এক জীবনবোধ। বেদনায় বিহ্বল, তবু আনন্দে আত্মস্থ। অতীতের যা কিছু মহৎ, যা কিছু শান্ত—তাই শাশ্বত—তার প্রতীক। অস্তসূর্যের শেষ রঙটুকু সমগ্র হৃদয়ে মেখে নিয়ে সন্ধ্যামেঘের মতই সে করুণ, বিষণ্ণ। তার দূরদৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী অনাগতকে স্বাগত জানাচ্ছে, কিন্তু বিগত দিনের ধূলিধূসর স্মৃতিটিকেও সে মুছে ফেলতে পারছে না। তারাশঙ্কর তাঁর সমস্ত সহানুভূতিই যেন এখানে উজাড় করে দিয়েছেন।

পটভূমিকাটি অত্যন্তই বিরাট। এবং 'পদচিহ্ন' এই বিরাট পটভূমিকায় একটি বৃহৎ উপন্যাসের প্রথম খণ্ড। ঘটনার কেন্দ্রস্থল হলো একটি প্রাচীন গ্রাম। কিন্তু সে-গ্রামের কোনও বিশেষ ব্যক্তি এর নায়ক নন। বরং দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিকেই এ বইয়ের নায়ক আখ্যা দেওয়া চলে। একের প্রতিভূ ধ্বংসোন্মুখ জমিদার স্বর্ণকমলবাবু, অন্যের প্রতিভূ বিত্তশালী বণিক গোপীচন্দ্র। এ-দুয়ের মাঝখানে এ উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য চরিত্র রাধাকান্ত। স্বর্ণবাবু চর্চা করেছেন জমিদারী মেজাজের। তিনি নিষ্ক্রিয়, অথচ কুটিল। আর গোপীচন্দ্র তাঁর আপন অধ্যবসায়ে সাধারণ অবস্থা থেকে সৌভাগ্যের উচ্চতম সোপানে উঠে এসেছেন। লক্ষ্মীর তিনি বরপুত্র। তাঁর জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতা তাঁকে সংযম শিখিয়েছে, বিনয়নম্র করেছে। বহির্জগতের সংস্পর্শে এসে নবগ্রামের কূপমণ্ডূকতার থেকে সর্বৈব মুক্তি ঘটেছে তাঁর। কিন্তু বাইরের পৃথিবীর দেওয়া সম্মানে তাঁর মন ভরলো না, নিজের গ্রামেও তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চাইলেন। স্বগ্রামে স্বীকৃতি চাই তাঁর, অভিজাত বংশীয়দের স্বীকৃতি। এই থেকেই দ্বন্দ্বের সূত্রপাত। আর সেই দ্বন্দ্বের তীব্র বিষবাষ্পের মধ্য থেকেও যিনি একটি অম্লান চারিত্রিক সৌন্দর্য নিয়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছেন তিনি হলেন রাধাকান্ত। দার্ঢ্যে অনমনীয়, মহত্ত্বে অনুকরণীয়। অদৃষ্টের পরিহাসে চরম অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে রাত্রির অন্ধকারে তাঁকে গ্রাম ছাড়তে হলো। এই দুর্দৈবকে কেবল একটি ঘটনা হিসেবে দেখলেই চলবে না। যে প্রতিকূল শক্তির স্বেচ্ছাচারের কাছে সত্যনিষ্ঠ আদর্শবাদী রাধাকান্তকে লাঞ্ছিত হতে হলো তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের উপায় নেই। আর উপায় নেই বলেই, বিবেকের নির্দেশের বিরুদ্ধেও, রাধাকান্ত তাকে স্বীকার করে নিয়েছেন। রাধাকান্তের এই গ্লানি 'পদচিহ্নে' একটি গভীর ট্র্যাজেডীর সুর এনে দিয়েছে। আর এই ট্র্যাজেডির সূত্র ধরে 'পদচিহ্ন' গ্রন্থের আর একটি স্মরণীয় চরিত্রের বিদ্যুৎবিকাশ সম্ভব হলো। তিনি রাধাকান্তের স্ত্রী, 'কাশীর বউ' বলে পরিচিত। কাশীর বউয়ের প্রখর ব্যক্তিত্ব এতদিন শুধু অন্তঃপুরের চৌহদ্দীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল; ঘটনাক্রমে সেই ব্যক্তিত্ব এবার সকল সংস্কারের নির্মোক মোচন করে নবগ্রামের জনসাধারণের সামনে আত্মপ্রকাশ করল। তারাশঙ্করের সৃষ্ট আরও কয়েকটি স্ত্রী-চরিত্রের মত এই কাশীর বউও এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বে আত্মপ্রতিষ্ঠ। স্বল্প পরিসরে চাষী নাদেরও খণ্ড-চরিত্রের একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। মনে গভীর ছাপ রাখে।

'পদচিহ্ন' সম্পর্কে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কথা হলো একটি গ্রামের পটভূমিকায় এবং কয়েকটি চরিত্রের মাধ্যমে বিরাট সম্ভাবনাময় এক যুগসন্ধির পূর্ণাঙ্গ রূপায়ন-প্রচেষ্টা। বিভিন্ন চরিত্রের মারফৎ নানা দিক থেকে একটি ঘটনাবহুল জটিল যুগের প্রায় সমস্ত রকম সমস্যার উপরেই অনায়াস নৈপুণ্যে এবং গভীর সমবেদনায় এখানে আলোকসম্পাত করা হয়েছে। সেই আলোকে তাদের বিচার করা হয়েছে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে। সামনে যারা এসেছে তারা সবাই সেই যুগের প্রতিনিধি। দোষে-গুণে-ভালোয়-মন্দে তারা পূর্ণাবয়ব মানুষ। সবশেষে বলতে হয়, 'পদচিহ্ন' কেবল একখানি মহৎ উপন্যাসের ভূমিকামাত্রই নয়, একটি যুগমানসের সার্থক এবং সর্বাত্মক ইতিবৃত্ত।

২১০।৫২

দৃষ্টিহারা : শ্রীআদিত্যকুমার ভট্টাচার্য **:** বরেন্দ্র লাইব্রেরী **:** ২০৪ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলকাতা। তিন টাকা।

বাঙলার বিপ্লবীদের নিয়ে সার্থক অসার্থক অনেক গল্পোপন্যাস লেখা হয়েছে। আলোচ্য উপন্যাসখানিও বিপ্লবীদের কার্যকলাপ নিয়ে। চরিত্রগুলি কাল্পনিক। এই পটভূমিকায় গল্পোপন্যাস রচনায় সাধারণ যে সব দুর্বলতা দেখা যায় এবং লেখক যাকে পাঠক মনের ওপর অস্ত্র হিসেবে প্রয়োগ করতে প্রয়াসী হন তার সবটুকুই এখানে উপস্থিত। অর্থাৎ গল্প এবং চরিত্র গঠনের দুর্বল কাঠামোর ওপর অকারণ ভাবোচ্ছ্বাসের চোখ-ধাঁধান রং পালিশ। সে রংও যখন অপটু তুলিতে অনুপাত হারায় তখনই হয় সবচেয়ে মুসকিল। উচ্ছ্বাস কেবল উপহাসেরই উপকরণ যোগায়। লেখকের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও দৃষ্টিহারা এর উর্ধ্বে উঠতে পারেনি। দুঃখের কথা। ২২৬।৫২

অনুবাদ সাহিত্য

কয়েকটি রাশিয়ান ছোট গল্প : অনুবাদ—বিজয়কুমার ব্যানার্জি **:** দেবী প্রকাশনী **:** ৫৮।৩ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলকাতা—৬ **:** এক টাকা আট আনা।

রুশ সাহিত্যের সাতজন দিকপালের সাতটি গল্পের অনুবাদ। গল্পনির্বাচনে যথেষ্ট বিবেচনার পরিচয় আছে। অনুবাদকের কাজ একটু দুরূহ। দেশীয় ভাষার পাঠকদের সঙ্গে বিদেশী সাহিত্যের সেতুবন্ধন অনুবাদকের প্রাথমিক কর্তব্য। সে হিসেবে এই প্রাথমিক কর্তব্যের অনেকখানি নির্ভর করে নির্বাচনের ওপর। সেদিক থেকে আলোচ্য বইএর গল্প নির্বাচন সুবিবেচিত। কিন্তু অনুবাদ আশানুরূপ নয়। লেখকের ভাষায় সহজ সাবলিলতা নেই, বিশেষত সংলাপে। এমন কি অনেক ক্ষেত্রে বাক্যগঠনের রীতিটি পর্যন্ত অনুদিত, বাঙলা ভাষার মেজাজ সেখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। সার্থক অনুবাদের পথে এটি নিঃসন্দেহে অন্তরায়। ২৬৮।৫২

শিশু সাহিত্য

সুন্দরবনে সাত বৎসর—ভুবনমোহন রায় ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়; সিটি বুক সোসাইটী, ৬৪, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—৩॥০ টাকা।

সুন্দরবন নামটার সঙ্গেই কেমন একটা রহস্য জড়ানো। এখানকার গাছের পাতা ডাঙ্গায় পড়লে হয় বাঘ, আর জলে পড়লে হয় কুমীর। শুধু বাঘ আর কুমীরই নয়, অসংখ্য স্থলচর আর জলচর প্রাণীতে ঠাসবোঝাই। মাঝে মাঝে সুন্দরবনের বাঘ বা কুমীর শিকারের কাহিনী ইতস্তত নজরে পড়েছে, কিন্তু শুধু শিকার-কাহিনীই, তার বেশী কিছু নয়। কিন্তু আলোচ্য পুস্তকটি সুন্দরবনকে কেন্দ্র ক'রে একশো পঁচিশ পাতার পুরোদস্তুর কাহিনী। ভাগাভাগি ক'রে রচনা করেছেন বাঙলার খ্যাতনামা দুজন সাহিত্যসেবী।

সস্তা প্যাঁচের গোয়েন্দা কাহিনী আর অবাস্তব রূপকথা আমাদের কিশোর-কিশোরী-দের পক্ষে যথেষ্ট হানিকর। সাময়িক একটা উত্তেজনা অথবা রঙীণ কল্পনায় মনকে আচ্ছন্ন করা ছাড়া এ জাতীয় রচনা স্থায়ী কোন উপকার করে না। যে রচনা নিবীর্য ও নিষ্ক্রিয়তার অনুপন্থী, জাতীয় জীবন গঠনে সে ধরণের রচনার মূল্য সামানাই। তা' ছাড়া আমাদেব দেশে যে ধরণের দুঃসাহসিক কাহিনীর প্রচলন আছে, তার বেশীর ভাগেরই পটভূমি আফ্রিকার গভীর অরণ্য অথবা আরো দূরের কোন অপরিচিত বনরাজ্য। এত দূরের কাহিনীর প্রধান অসুবিধা এই যে, সেখানকার বিভিন্ন পশুপক্ষী আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের প্রায়ই অপরিচিত। সুতরাং মনগড়া অসম্পূর্ণ এক ছবি কল্পনা ক'রেই পাঠকপাঠিকাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়। এতে পূর্ণ রসাস্বাদনেও বাধা জন্মায়।

আলোচ্য গ্রন্থটি কিন্তু সব দিক দিয়েই বাঙালী ছেলেমেয়েদের মনের জিনিস। পরিচিত পশুপক্ষী, চিত্তাকর্ষক কাহিনী, কৌতূহল উদ্দীপক ঘটনা সংস্থাপন, সব মিলিয়ে কিশোর-মনের এমন অনবদ্য খোরাক ইদানীং বড় একটা চোখে পড়েনি।

দামী কাগজ, ঝকঝকে ছাপা, অপূর্ব চিত্র-সম্ভারে, আরও বড় কথা নামমাত্র মূল্যে, এমন একটি গ্রন্থ প্রকাশিত করা কি ক'রে সম্ভব, সেটাও কম বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। একাধিকবার পড়ে কেবল এই আক্ষেপই করতে হয়েছে যে, বেশ কয়েকটি বছর পরে জন্মাতে পারলে সমালোচকের সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে নয়, কিশোর-চিত্তের কৌতূহল দিয়ে বইটি বার বার পড়া যেতো। ৩৭৮।৫২

বিবিধ

শালিমার পেণ্ট কলার অ্যাণ্ড ভার্নিস কোম্পানীর সুবর্ণ জয়ন্তী

ভারতবর্ষে রং প্রস্তুত করিবার যে সকল কারখানা আছে শালিমার পেণ্ট কোম্পানীর কারখানা তাহাদের মধ্যে অন্যতম বৃহৎ ও প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। এই ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক সুপরিচিত টার্নার মরিসন অ্যাণ্ড কোম্পানী। শিবপুর বটানিক্যাল গার্ডেনের ১৭৫ বৎসরের প্রাচীন বটবৃক্ষের অনতিদূরে ১৮৯০ খৃস্টাব্দে টার্নার মরিসন কোম্পানী গঙ্গাতীরে এক খণ্ড ভূভাগ ক্রয় করেন, সেই ভূখণ্ডেই পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে শালিমার রং-এর কারখানার ভিত্তি স্থাপিত হয়।

ইহার পূর্বে টার্নার মরিসনের পরিচালনাধীনে শালিমার ওয়ার্কস লিমিটেড নামে একটি প্রতিষ্ঠান কিছু কিছু রং উৎপাদন করিত। এই প্রতিষ্ঠানটিই শালিমার পেণ্ট কলার অ্যাণ্ড ভার্নিস কোপানী লিমিটেড নামে ১৯০২ সালের ১৭ই ডিসেম্বর রেজেস্ট্রিভুক্ত হয় এবং উক্ত স্থানে কারখানা স্থাপন করা হয়। তবে সেদিনের কারখানার সহিত অদ্যকার কারখানার কোনোই তুলনা চলিতে পারে না। শালিমার রং-এর চাহিদা বৃদ্ধির সহিত কারখানাও সম্প্রসারিত হইয়াছে।

শালিমার পেণ্ট ওয়ার্কস এই সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে একটি সুন্দর ইংরাজি ডায়েরী ও একটি ক্যালেণ্ডার প্রকাশিত করিয়াছেন যাহা সব দিক দিয়াই উক্ত প্রতিষ্ঠানের রং-এর ন্যায়ই উজ্জ্বল ও মনোহর।

প্রাপ্তি-স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি দেশ পত্রিকায় সমালোচনার্থ আসিয়াছে। পরে সমালোচনা বাহির হইলে তাহা যথাসময়ে প্রকাশক অথবা গ্রন্থকারের নিকট প্রেরিত হইবে।

প্রেমের সমাধি তীরে—নিত্যানন্দ সাহা: তরুণ রায় কর্তৃক ৫১ উল্টাডাঙ্গা রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—১॥০। ৩৮৩।৫২

Fifth Year of Freedom—Aug. 1951—Aug. 1952 Published by N. Balkrishnan, All India Congress Committee, 7 Jantar Mantar Road, New Delhi. 384|52.

অগ্নিযুগের প্রথম শহীদ প্রফুল্ল চাকী—হেমন্ত চাকী, জেনারেল প্রিণ্টার্স এ্যাণ্ড পাব-লিশার্স লিঃ, ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—৩৲। ৩৮৫।৫২

কালের মন্দিরা—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এ্যাণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—৩॥০। ৩৮৬।৫২

মিলিতা—সুনীলচন্দ্র সরকার, সুরজিৎ দাশ-গুপ্ত কর্তৃক ৩৩, জেলেপাড়া লেন, শালকিয়া, হাওড়া হইতে প্রকাশিত। মূল্য—৮০। ৩৮৮।৫২

ছবি আঁকা—নরেন্দ্রনাথ দত্ত, মহেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক শিশু সাহিত্য-সংসদ লিঃ, ৩২এ, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—১৲। ৩৮৯।৫২

আর্থার কোয়েসলারের প্রায় প্রতিটি লেখা তাঁর নিজের জীবনের নানা অভিজ্ঞতা ঘিরে রচিত। তবে আবার তার উপর খোলাখুলি আত্মজীবনীর* প্রয়োজন কী ছিল? বইটি পড়লে সন্দেহের নিরসন হয়। বর্তমান শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা শক্তিমান লেখকদের অন্যতম একজনের জন্ম থেকে সাম্যবাদে উপনয়ন পর্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্তের বিবরণ ও বিশ্লেষণ এতে লেখকের নৈপুণ্য ও অকপট আন্তরিকতার রূপে অঙ্কিত। এই চিত্র শুধু লেখকের অন্যান্য বইয়ের পরে আরেকটি বই নয়, এ তাঁর সমগ্র রচনাবলীর টীকা। আগে যে পূর্বমুদ্রিত ছবি দেখেছিলেম এখন তার 'প্রগ্রেসিভ্ প্রুফ্' মিলল।

লেখকের নিজের দিক থেকেও এ বইয়ের প্রয়োজন ছিল। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে কোয়েসলার যখন স্পেনে জেনারেল ফ্রাংকোর হাতে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছিলেন তখন তিনি শপথ করেছিলেনঃ "আমি যদি জীবদ্দশায় এখান থেকে মুক্তি পাই তবে একটি আত্মজীবনী লিখব। সে লেখা এমন অকপট ও আত্মসমালোচনায় এমন নির্মম হবে যে তার তুলনায় রুশোর 'কনফেশান্স' ও চেলিনির 'মেমোয়ার্স' ফ্যাকাশে বলে মনে হবে।" সেই মানৎ বা শপথের ফল এই বই। এ শুধু পূর্ববর্ণিত কাহিনীর পুনর্বর্ণন নয়, প্রসারণও নয়; এ হচ্ছে বিশ্লেষণ। অনুবীক্ষণের তলায় রক্তের কাঁচ, এক্স-রের সামনে রোগী। এই রকমের বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সারা বইটিতে পরিব্যাপ্ত। কোয়েসলারে এটা অপ্রত্যাশিত নয়, কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে এই ভঙ্গিটি সমধিক সঙ্গত ও সার্থক হয়েছে। কোয়েসলার আধুনিক য়ুরোপীয়ন মানবের সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও আশানৈরাশ্যের সক্রিয় শরিক; তাই তাঁকে জানলে আমরা শুধু একজন লেখককে জানিনে, য়ুরোপের ইতিহাসের বর্তমান পর্যায়ের সঙ্গে পরিচিত হই।

সচ্ছল গৃহস্থের একমাত্র সন্তান। নিঃসঙ্গ, নিঃসঙ্গতা সারা জীবনে ঘুচল না। পর পর কয়েকটি আয়া, সাদিকা অত্যাচারিণী। নিঃসঙ্গতার সঙ্গে যুক্ত হলো ভীতি, বিনা দোষে শাস্তির ভয়। এ ভয়ও সারা জীবনে কাটল না। পটভূমিতে মা-বাপে চিরন্তন বিরোধ। শিশু আত্মমুখ না হয়ে যাবে কী? এই আত্মমুখীনতায় ইন্ধন

রঞ্জন

জোগায় শিশুর অসাধারণ বুদ্ধিপ্রাখর্য। মোদ্দা কথা, শৈশবে ও কৈশোরে কোয়েসলার মাথা ঠেসে ভর্তি করা হোলো নানা বিচিত্র পাণ্ডিত্যে, কিন্তু জ্ঞান রয়ে গেল আয়ত্তের অতীত। মনও রয়ে গেল অপরিণত। অপরিণত, কিন্তু অত্যন্ত স্পর্শসজাগ। আকাঙ্ক্ষা আরো উঁচু। বিশ্বরহস্য উদ্ঘাটন করতে হবে। ধরণীর এই আবরণ বিজ্ঞান অনেকটা ইতিমধ্যেই উন্মোচন করেছে। বাকিটুকুও বিজ্ঞানই করবে। কোয়েসলার বিজ্ঞানের ছাত্র হলেন। এঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে তিনি বিশ্বকর্মা হবেন, বিশ্বের সব কিছু ব্যাখ্যা করবেন টুকরো টুকরো করে, কোনো যন্ত্রের কলকব্জা সব আলাদা করে যেমন দেখানো যায়। শুধু এই মানববাধ্যুষিত পৃথিবী নয়, সমগ্র নক্ষত্রমণ্ডল তিনি নখাগ্রে আনবেন। আকাশের নীলে উপলব্ধির শর-ক্ষেপ, এই ছিল প্রতিজ্ঞা।

কিন্তু রক্তে ছিল য়াহুদী যাযাবরী বীজ। অনিকেতনিক পরিবারটি যেমন নিরন্তর বাড়িবদল ও দেশবদল করেছে, কোথাও মূল খুঁজে পায়নি, কোয়েসলারের মনও তেমনি বারবার বিভ্রান্ত হয়েছে। নিষ্ঠাহীনতা তাঁকে শুধু এক প্রেমিকা থেকে আরেক প্রেমিকার বাহুতে টেনে নিয়ে যায়নি, টেনে নিয়ে গেছে এক প্রেম থেকে আরেক প্রেমে (যথা, জায়নিজম থেকে কম্যুনিজম), এক ভাষা থেকে অপর ভাষায়। জুডাসের অভিশাপ তো আগেই ছিল; ফ্লাইং ডাচম্যান শুধু রূপকথায় তীর খুঁজে মরে না। কোয়েসলার জাতিতে একজনের উত্তরাধিকারী, চরিত্রে আরেকজনের। এ অভিশাপ আজো ঘোচেনি। 'অ্যারো ইন দি ব্লু' সেই অভিশপ্ত জীবনের কাহিনী, শাপমোচনের নয়।

ঘরছাড়ার ধর্মই এই যে, ঘর নেই বলে তার যেমন হুতাশনের শেষ নেই, তেমনি ঘর পেলেও ঘর না ছেড়ে শান্তি নেই। কোয়েসলারও এই টানাপোড়েনের যন্ত্রণা সারাজীবন ভোগ করেছেন। ভিয়েনায় লেখাপড়া ছেড়ে তিনি বিভোর হলেন দেশের স্বপ্নে—প্যালেস্টাইনকে য়াহুদী রাষ্ট্র করতে হবে। স্বপ্ন মিলিয়ে যেতে, বলা বাহুল্য দেরী হোলো না। বুদ্ধিজীবীর পক্ষে বিজ্ঞাপন বেচা, লেমনেড বিক্রি ইত্যাদি বিলাস বরাবর ভালো লাগতে পারে না। ক্রমে কোয়েসলার তাই হলেন যা তিনি বারোখানা বই লিখেও রয়ে গেলেনঃ সাংবাদিক। তাঁর সব লেখায় খবরের কাগজের হেডলাইনের সজীবতা আছে, চিরন্তনতার পরিমাণ তার চেয়ে অনেক কম। তাই তিনি 'ওশ্যানিক ফীলিং'-এর কথা বলেছেন তা চোখে লাগে, মনে ধরে না।

দেশের স্বপ্ন গেলে খোঁজ পড়ল স্বপ্নের দেশের। রাশিয়ায় বিপ্লবে তখন পুরো জোয়ার, ভাঁটার পালা তখনো আসেনি। সবাই তখন সাম্যবাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তখনো মস্কোর মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়নি গণবিচারের প্রহসন। কোয়েসলার ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দিলেন—সেটা জাগ্রত বুদ্ধির সন্দেহের সমাধি, ব্যক্তিসত্তার শ্মশান।

নাবিকের সেই নিরাপদ বন্দরেও কোয়েস-লারের বসতি স্থায়ী হোলো না। হবারই নয়। কিন্তু সে কাহিনী এ বইয়ে নেই। পার্টিতে যোগ দেয়ার সঙ্গেই বর্তমান গ্রন্থে যবনিকা পড়েছে। শেষে লেখক বলছেনঃ শেষ করলুম যেমন পুরানো সীরিয়াল ছবি শেষ হোতো—নায়ক নদীর উপর দড়ি ধরে দোদুল্যমান, নীচে কুমীরের দল হাঁ করে।...সবাই জানতো যে, নায়ক কখনোই কুমীরের গহ্বরে পড়বে না,—কিন্তু আমি তাই পড়েছিলুম।" কম্যুনিস্ট-দের এ বর্ণনা সঠিক নয়, কিন্তু সেটা অপ্রাসঙ্গিক। আসল কথা হচ্ছে এই যে, লেখকের মনে হয়েছে তিনি কুমীরের মেলে পড়েছিলেন। তাঁর কাহিনী তাই এত কৌতূহলোদ্দীপক।

কিন্তু মতামতের প্রশ্ন আলাদা। কোয়েসলারের অভিজ্ঞতায় তাঁর রচনার মাধ্যমে অংশ গ্রহণ করা মানেই কিছু তাঁর মতের ভাগ নেওয়া নয়। কম্যুনিস্টদের মধ্যে কেউ কোয়েসলারের অর্ধেক ভালো করে ওপক্ষের কথাটা লিখতে পারলে কম্যুনিজমের আবেদন এত সীমাবদ্ধ থাকতো না। ও সীমা যে আমি অবিমিশ্র অভিশাপ বলে মনে করি, এমন মনে করবার অবশ্য কোনো কারণ নেই। তাছাড়া সাম্যবাদ ও একনিষ্ঠ সাহিত্যসাধনা পরস্পর-বিরোধী। যে বিধাতা বর দেয়নি তাকে নিয়ে ভালো লেখা হয়, যেমন ভালো কাব্য হয়•লা বেল্ দাম স' মের্সি নিয়ে। শোক থেকেই শ্লোক হয়, পুলক থেকে নয়। কোয়েসলার সদা শোকাচ্ছন্ন, তাই তাঁর লেখা

* *Arrow in the Blue* by Arthur Koestler (Collins with Hanish Hamilton Ltd., London, 18s.)

খেলার মাঠে

ক্রিকেট

বাঙলার ক্রিকেট পরিচালকগণ সম্পর্কে কোনদিনই সাধারণ ক্রীড়ামোদিগণ উচ্চ ধারণা পোষণ করেন না। তবে সম্প্রতি ইহাদের কার্যকলাপ এতই বিরক্তিকর ও জঘন্য হইয়া উঠিয়াছে যে, সাধারণ ক্রীড়ামোদী বা ক্রীড়া সাংবাদিকগণের পর্যন্ত ধৈর্যচ্যুতির কারণ হইয়া পড়িয়াছে। এই জন্যই বর্তমানে শুনিতে হয় "ইহাদের নিকট নিজেদের স্বার্থ দেশের স্বার্থ অপেক্ষা বড়।" ইহারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যক্তিবিশেষ এমন কি দেশের মান সম্মান সকল কিছু জলাঞ্জলি দিতে এতটুকুও দ্বিধা বোধ করেন না।" "ইহারা বর্ণচোরা, ইহাদের মুখোস না খুলিয়া দিলে বাঙলার ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ একেবারেই অন্ধকারময়।" একদল শিক্ষিত ও দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত লোকেদের উপর এইরূপ কটুবাণী বর্ষণ খুবই পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই, তবে কারণ ও প্রমাণ না থাকিলে কিরূপে ইহারা সাহসী হইতেন, ইহাও চিন্তা করিতে হইবে। তবে আমরা সুখী হইব, যদি এইরূপ বিষাক্তময় আবহাওয়ার অবসান হয়। জাতির মানসিক ও শারীরিক মান বৃদ্ধির জন্যই ক্রীড়ার অনুষ্ঠান। ইহার পরিচালনার গুরু দায়িত্ব তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদেরও উচিত কোনরূপ আলোচনা ও প্রতিবাদ সাধারণ ক্রীড়ামোদিগণ করিতে না পারেন, সেইভাবে কার্য পরিচালনা করা। ভুলত্রুটি মানুষ মাত্রেরই হয়, কিন্তু সেই ভুলত্রুটি যদি একরূপ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহার জন্য যাঁহারা দায়ী, তাঁহাদের তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন না হইয়া উপায় নাই। এই ক্ষেত্রেও ইহাই যে অন্যতম কারণ, ইহা না বলিয়া পারা যায় না। বহু অন্যায়ের পুঞ্জীকৃত জ্বালায় জর্জরিত সাধারণ ক্রীড়ামোদিগণ এইরূপ কটূক্তি বাণীর মধ্য দিয়াই তাহারই অভিব্যক্তি করিতেছেন। ইহার অবসান অনতিবিলম্বেই সম্ভব, যদি এই সকল দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন অবৈতনিক কার্যে লিপ্ত লোকেরা পদ ত্যাগ করিয়া সরিয়া দাঁড়ান। জনসভার তীব্র আলোচনার বিষয় বস্তু হইবার পূর্বেই ইহারা পদত্যাগ করিলে বিরুদ্ধ মনোভাবের দলও হতাশ হইবেন। আমরা আশা করি, এই সকল লোকেরা এই উপদেশ গ্রহণ করিবেন।

মানকড় সম্মানিত

বিনু মানকড় টেস্ট খেলায় সর্বাপেক্ষা অল্প সময়ে সহস্র রান ও শত উইকেট দখল করিয়া যে নূতন রেকর্ড করিয়াছেন, তাহার সম্মানের জন্য বোম্বাইর ক্রিকেট পরিচালকগণ একটি তোড়া প্রদানের ব্যবস্থা করেন। এই তোড়ায় ভারতের রাষ্ট্রপতি ও তাঁহার ভবনের পরিচালকগণ অনেকে অর্থ দান করিয়াছেন। বোম্বাইর বহু ক্রীড়ামোদীও দান করিয়াছেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহার পরিমাণ ১২ সহস্রের অধিক হইতে পারে নাই। ইহা লক্ষ্য করিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। বোম্বাইতে কোটিপতির অভাব নাই অথচ দেশের একটা সুসন্তানের সম্মানের অর্থভাণ্ডারে অর্থ দিতে দ্বিধাবোধ করিলেন ইহাই আশ্চর্য। এই তোড়া প্রদানের সময় মানকড়ের উক্তি আমাদের হৃদয়স্পর্শ করিয়াছে। তিনি খুব প্রয়োজনীয় ও যুক্তিপূর্ণ কথার অবতারণা করিয়াছেন। উৎসাহী ক্রিকেট খেলোয়াড়গণ ইহা স্মরণ করিয়া কার্যকরী করিবার জন্য হইলে সুখী হইব।

পূর্বাঞ্চল ও পাকিস্থান

জামসেদপুরের কীনান স্টেডিয়ামে পূর্বাঞ্চল ও পাকিস্থান দলের তিন দিনব্যাপী খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হইয়াছে। ম্যাটিং উইকেটে খেলিতে অভ্যস্ত পাকিস্থানের ক্রিকেট খেলোয়াড়গণ প্রথম ব্যাটিং করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াও জয়লাভে সক্ষম হন নাই। ইহার জন্য পূর্বাঞ্চল দলের খেলোয়াড়দের দৃঢ়তাপূর্ণ ক্রীড়ানৈপুণ্য দায়ী ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। তবে খেলাটি সাধারণ পর্যায়ের হইয়াছিল বলিলে কোনরূপ অত্যুক্তি করা হইবে না। ভ্রমণের শেষ খেলায় জয়ী হইবার জন্য পাকিস্থান দল যে চেষ্টা করে নাই তাহা নহে, কিন্তু উহা সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। প্রথম দিনে বেপরোয়া ব্যাটিংয়ের সুযোগে পাকিস্থান দল ৭ উইকেটে ৩৪৫ রান সংগ্রহ করে। প্রথম খেলোয়াড় নজর মহম্মদ ও ইমতিয়াজ আমেদ উভয়েই শতাধিক রান করেন। উদীয়মান খেলোয়াড় জুলফিকার আমেদ ৪০ রান করিয়া নট আউট থাকেন। পাকিস্থান দল দ্বিতীয় দিনে না ব্যাট করিয়া পূর্বাঞ্চল দলকে খেলিবার সুযোগদান করে। পূর্বাঞ্চল দলের সূচনাও নৈরাশ্যজনক হয়। একমাত্র বি ফ্রাঙ্ক খেলায় যোগদান করিয়া বেপরোয়া ব্যাটিং করিয়া খেলার অবস্থা পরিবর্তন করেন। তিনি একরূপ দুর্ভাগ্যবশতঃ শত রান করিতে পারেন নাই। তাহা হইলে প্রথম ইনিংস ২১১ রান হয়। পাকিস্থান দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করিয়া [illegible] দিনে মধ্যাহ্ন ভোজের কিছু পরে ৭ উইকেটে ২০০ রান করিবার পর ডিক্লেয়ার্ড করেন। দিনের শেষে পূর্বাঞ্চল দলের ৬ উইকেটে [illegible] রান হয় ও খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়।

ফুটবল

১৯৫২ সালের মধ্যে আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হইবে না বলিয়া যাহা আমরা বলিয়াছিলাম, [illegible] তাহা হইতে চলিয়াছে। বৎসর শেষ হইতে [illegible] কয়েকদিন মাত্র বাকী, এখনও পর্যন্ত এই খেলা অনুষ্ঠান বিষয়ে আই এফ এর পরিচালকমণ্ডলী কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই। রাজস্থান ক্লাব কার্যকরী সমিতিতে এই [illegible] লইয়া আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন [illegible] বলিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও ধামা চাপা পড়িয়াছে। তবে লোক মুখে মুখে যে [illegible] কথা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে [illegible] আই এফ এর পরিচালকগণ [illegible] অস্ট্রিয়ান ফুটবল দলের আগমনকে [illegible] করিয়া বাঙলার প্রতি বৎসরের আমন্ত্রিত [illegible] খেলোয়াড়দের পুনরায় কলিকাতায় [illegible] করিয়া ভ্রমণকারী দলের খেলার পরেই [illegible] এ শীল্ড ফাইন্যাল অনুষ্ঠানের ইচ্ছা [illegible] যদি এই সংবাদ সত্য হইয়া থাকে, ইহা [illegible] আই এফ এর পরিচালকদের বলা [illegible]

পাকিস্থান ফুটবল পরিচালকদের সিদ্ধান্ত

পাকিস্থান ফুটবল পরিচালকগণ [illegible] মরসুমে পাকিস্থানের কোন খেলোয়াড় পাকিস্থানের বাহিরে ভাড়া খাটিতে [illegible] বলিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে বাঙলার যে সকল ফুটবল [illegible] পাকিস্থানের খেলোয়াড়দের সাহায্য [illegible] করিতেন অথবা গ্রহণের ইচ্ছায় ছিলেন, [illegible] একটু চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। মহাযুদ্ধের পরেই পাকিস্থান ছিল ফুটবল পরিচালকদের খেলোয়াড় সংগ্রহের বড় কেন্দ্র, ইহা বন্ধ হইল। তবে একজন ক্রীড়াসমালোচক ইহাদের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া বলিয়াছেন, "সুদূর প্রাচ্যে খেলোয়াড়রা এখনও আছেন। তাঁহাদের [illegible] বন্ধ হইলে ইউরোপ আছে।" দেশের খেলোয়াড়দের সম্পূর্ণ অবহেলা করিয়া ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ না রচনা করিয়া ইহারা কেবল [illegible] খেলোয়াড় আমদানীর কথাই চিন্তা করিবেন ইহা সত্য পরিতাপের বিষয়। দেশের [illegible] খেলোয়াড়গণ ইহার জন্য কবে তীব্র আন্দোলন সৃষ্টি করিবেন, এই চিন্তাই আমরা [illegible] আমদানীর পথ রুদ্ধ না করিলে দেশে [illegible] দিনই খেলোয়াড় তৈয়ারী হইবে না।

নাট্যমহিমাভূষিত "দর্পচূর্ণ"

১৯৫২ সাল আরম্ভের সময় চলছিলো 'পণ্ডিত মশাই' আর বছরটা শেষ হতে চলেছে 'বিন্দুর ছেলে', 'শুভদা' আর 'দর্প-চূর্ণ' নিয়ে। মাঝেতে শরৎচন্দ্রের কাহিনী নিয়ে তোলা আরও দু'একখানি ছবি দেখানো হয়েছে। তবে এখানে যে চার-খানির নাম উল্লেখ করা হয়েছে, বাঙলা ভাষাতে হলেও, তারা ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পেরই গৌরব বলে প্রতিপন্ন হবার যোগ্যতা দেখিয়েছে। বিষয়বস্তুর দিক থেকে এ ছবি চারখানির আবেদন বিভিন্ন কিন্তু ছবিগুলি দেখার জন্য সর্বশ্রেণীর লোকের মনে আগ্রহ জাগিয়ে তোলাতে বা মনকে আবিষ্ট করে তোলার মতো রসসৃষ্টিতে চারখানির মধ্যে কোন্‌টি বেশী নাট্যসমৃদ্ধ সেটা কষে বের করা মুশকিলের ব্যাপার। 'পণ্ডিত মশাই', 'বিন্দুর ছেলে' ও 'শুভদা' সম্পর্কে এ বিভাগে আগেই আলোচনা হয়েছে; 'দর্পচূর্ণ' এসেছে বছরের শেষে এবং একথা বলা যায়, ১৯৫২ সাল বাঙলা ছবিকে যে মহিমায় ভূষিত করে দিয়েছে, শেষ বেশ হিসেবে সেই ভূষণের চমকটাতে পূর্ণতা এনে দিয়েছে শ্রীমতী পিকচার্সের 'দর্পচূর্ণ'।

* * * *

মনের তারগুলিকে ঝঙ্কৃত করে আবেগের জোয়ারে অনুভূতিকে আকুল করে তোলাতে শরৎচন্দ্রের কাহিনী নিয়ে তোলা ছবিগুলির আর তুলনা হয় না। সাধারণ বাস্তব থেকেই নেওয়া যতোসব চরিত্র এবং পরস্পর মানুষের জীবনযাত্রার গতিপথে মনের পরতে পরতে যে সব বিচিত্র ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, ঘটনাবলীর ভিত্তি থাকে সেই সবেরই ওপরে। মানুষের ঈর্ষা, দ্বেষ, হিংসা মানুষের ঘৃণা, প্রেম, মায়া, বাৎসল্য, অহঙ্কার, দর্প প্রভৃতি ভাবানুভূতিতে মনে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়-- ভুল বোঝা ও ভুল করা নিয়ে অন্তরের দ্বন্দ্ব যে চেহারা নিয়ে প্রত্যক্ষের সামনে এসে দাঁড়ায় তারই অতি খোলাখুলি ও প্রাণস্পর্শী পরিচয় শরৎ-চিত্রাবলী। 'দর্পচূর্ণ'-ও তারই একখানি।

* * * *

স্বতন্ত্র পরিবেশে মানুষ ভিন্ন স্তরের দুজনের মানসিক দ্বন্দ্ব নিয়ে 'দর্পচূর্ণ'-এর গল্প। স্বামী আর স্ত্রী। ঘটনাচক্রে নয়, হিসেব মতো ভেবে চিন্তেই ওরা বিয়ে করেছে। নরেন স্বল্পবিত্ত ব্যক্তি কিন্তু ইন্দু ধনী কন্যা। ওদের ভালোবাসা শুরু

রঙ্গজগৎ

হয় বিয়ের আগে থেকেই। নরেনের অবস্থার জন্যে ইন্দুর অভিভাবকরা তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে রাজী ছিলেন না, কিন্তু ইন্দু তাদের কথা অগ্রাহ্য করে নরেনকেই বিয়ে করে। অবশ্য ছবিতে যা বলে দেওয়া হয়েছে তাতে এইটেই ধরে নিতে হয় যে, ইন্দু এমন প্রকৃতির মেয়ে যে, তাকে যেটা নিষেধ করা হবে ও সেইটেই করে বসবে এবং ও যে নরেনকে বিয়ে করলো সেটা যেনো ওর সেই জিদ্‌টাই রক্ষা করার জন্যেই। বিয়ের পর, ইন্দুর ঐশ্বর্যপ্রভাবিত মন নরেনের দারিদ্র্যকে মেনে নিতে রাজী হলো না। আর, নরেনও এমনি নির্বিবাদী প্রকৃতির লোক যে, ইন্দুকে তার বর্তমান অবস্থায় দীক্ষিত করে তোলার চেয়ে, ও বিষয়ে নিশ্চুপভাবে আত্মপীড়ন সহ্য করাটাই বেশী শান্তিপ্রদ মনে করলে। দুটি এমন প্রিয়জন অচ্ছেদ্য বন্ধনের মধ্যে আটকে থেকেও এক-জন আর একজনের কাছে আত্মসমর্পণ করতে চায় না। এই হলো দ্বন্দ্ব।

* * *

মানসিক সংঘাত অন্য দিক্ থেকেও রয়েছে। ননদিনী বিমলার মতে যে যেমন মেয়েই হোক, স্বামীই তার সর্বস্ব, দেবতা; স্বামীর সে দাসী মাত্র। ইন্দুর যা শিক্ষা তাতে বিমলার মতো স্বামী অনুগতা হওয়ার কথা সে মনেও করতে পারে না। স্বামীকে অগ্রাহ্য করাটা ইন্দুর কাছে স্ত্রী-পুরুষের সম-অধিকারের দাবী। সুতরাং সংসারের অসচ্ছলতাটা ইন্দুর কাছে বেশী অসহ্য লাগতে সে তার ধনী দাদার কাছে চলে যেতে দ্বিধা করলে না। নরেন অসুখে পড়লো, কিন্তু ইন্দুকে খবর দিলে না। আসলে নরেন মনেপ্রাণে চাইছিলো ইন্দুর যাতে কোন কষ্ট বা মানসিক আঘাত না লাগে; তার জন্যে সে সামর্থ্যের বাইরে দেনা পর্যন্ত করে যেতে লাগলো। কিন্তু ফল হতে লাগলো উলটো। ফিরে এসে নরেনের অসুখের কথা শুনে ইন্দু ধরে নিলে নরেন তাকে শুধু অবজ্ঞাই করে যায়; তার অভি-মানে ঘা লাগলো। নরেন সাহিত্যিক,; তার আয় গল্প উপন্যাস লিখে, কিন্তু সে কাজের ওপরে ইন্দুর কোন শ্রদ্ধা নেই, তাই নরেন কি করে না করে সেদিকে নজরও দিতো না। অথচ, নরেনের একখানা বইয়ের প্রশংসায় সবাই যখন পঞ্চমুখ হয়ে উঠলো তখন ইন্দু অভিমানরুষ্ট হলো এই ধরে নিয়ে যে,

তাকে এমনিধারা অবজ্ঞার পাত্রীই মনে করে। এইভাবে পরস্পর পরস্পরকে পরিহার করেই যেনো চলতে চাইলে। ফলে অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস বেড়েই চললো। যে যা করে সেটা অপরের কাছে পীড়াদায়ক হয়ে উঠতে লাগলো, অথচ দুজনের কেউ কাউকে ছেড়েও থাকতে পারে না, কেউ কারুর অমঙ্গলও চায় না।

ইন্দুর মন মাঝে মাঝে পারিপার্শ্বিক দেখে নরেনের অবস্থার প্রতি সহানুভূতি-পূর্ণ হবার চেষ্টা করে কিন্তু নরেনের নির্লিপ্ততায় তাকে দ্বিগুণ আঘাত নিয়ে পিছু হঠতে হয়। শেষে অবস্থা এমনি দাঁড়ালো যে, দেনার দায়ে নরেন জেলে যাওয়া পছন্দ করলে তবু নিজের স্ত্রীর কাছে তার অবস্থার কথা জানালে না। ঐই ঘটনাটাই শেষ পর্যন্ত ইন্দুর চেতনা নিয়ে এলো; তারই জন্য নরেনের অপরিসীম দুঃখবরণ তার এতোদিনের অভিমানকে চুরমার করে দিলে। নিজের সর্বস্ব বিলিয়েও স্বামীকে সুখী করাই পত্নীর ধর্ম বলে বুঝতে পারলে।

* * *

স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সত্যিকারের সম্পর্ক নিয়ে পরস্পরের মানসিক দ্বন্দ্বের ঘটনা এমনিতেই সবারের কৌতূহল আঁকড়ে ধরে, তার ওপর শরৎচন্দ্রের শিল্পপ্রতিভাসত হলে দর্শকমনে আকুতির আর অন্ত থাকে না। "দর্পচূর্ণ"-ও দেখতে দেখতে মন আকুতিতে ভরে ওঠে। গল্পটি পরিবেশনে বিন্যাস কৃতিত্বের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়; কয়েকটি ক্ষেত্রে নাট্যসমতা ক্ষুন্নও হয়েছে বলা যেতে পারে। নরেন সাহিত্যিক; সাহিত্যসেবা পেশা করে নিলে আর্থিক স্বাচ্ছল্য থাকে না, কিন্তু তাই বলে অমনি প্রকাশকদের একহাত নেবার জন্যে কয়েকটি দৃশ্যের অবতারণা করিয়ে দেওয়া মূল গল্পের গতিধারাতে অবান্তর হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঐ রকমই অতিরিক্ত দৃশ্য রয়েছে নন্দিনী বিমলার প্রতিবেশী অসুস্থ স্বামীর সেবায় স্ত্রীর আত্মনিয়োগ দেখানোতে। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য ও ধর্ম সম্পর্কে ইন্দুর মতিকে প্রভাবিত করার জন্যই ঐ ঘটনার অবতারণা ভালোই হয়েছে, কিন্তু আরও ভালো হতো যদি মূল গল্পের গতি যাতে ব্যাহত না হয় সেকথা মনে রেখে ঘটনাটি সংক্ষেপে দেখানো হতো। একটা কথা বলা দরকার। আমাদের চিত্রনাট্যকারদের একটা ধারণা আছে যে, কোন গ্রন্থে প্রকাশিত গল্প হলে তা যতো প্রাণস্পর্শীই হোক চলচ্চিত্রের রূপায়নে তার মধ্যে কিছু যোগবিয়োগ না করলে সে গল্প ছবির জাতে উঠতে পারে না। শুধু এই ধারণাতেই তারা চিত্রনাট্যে কিছু না কিছু কারিগরি দেখাবেনই। "দর্পচূর্ণ" এমন সুসংবদ্ধ রচনা যার মধ্যে বাড়তি একটুকুও কিছু দেবার দরকার ছিল না, আর জায়গাও ছিলো না কিছু জুড়ে বা কোন ব্যাপারটাকে লম্বা করে দেবার। কিন্তু ঐ অমূলক ধারণার প্রকোপে পড়ে এতে কিছু কিছু অংশ বাড়ানো হয়েছে যার ফলে মাঝে মাঝে মূল গল্প গতিচ্যুত হয়েছে, আর ছবিরও দৈর্ঘ্য অনর্থক বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

* * * * *

ছবিখানি পরিচালনা করেছেন জনকয়েক কলাকুশলীকে নিয়ে গঠিত শ্রীমতি পিকচার্স ইউনিট। এদের মধ্যে যাঁরাই থাকুন, তাঁদের কাজের মধ্যে নাট্যরস সৃষ্টি করার মতো শিল্পক্ষমতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বিন্যাস ব্যাপারে কিছু বৈচিত্র্যও নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন। নন্দিনী বিমলার প্রতিবেশীনীর স্বামীসেবার দৃশ্যে ইন্দুর মনের ওপর প্রভাব, তারপর বাড়ীতে ফেরার পথে ভিক্টোরিয়ায় চড়ে আসতে চাবুকের শব্দের সঙ্গে ইন্দুর চেতনার জাগরণ—এমনিধারা অনেক জায়গাতে পরিচালনার নাট্য ও শিল্প অনুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়।

* * * * *

শ্রীমতী কানন দীর্ঘদিন পর এই ছবিতে ইন্দুর ভূমিকায় অবতরণ করেছেন। বিরতিটা একরকম ভালোই হয়েছে, কারণ এ ছবিতে তাকে নতুনভাবে দেখতে পাওয়ার ছাপটা স্পষ্ট—গাম্ভীর্যপূর্ণ মনস্তত্ত্বমূলক চরিত্রচিত্রণে অভিনয় প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন; গানেতে তাঁর ক্ষমতা আগের মতোই আছে। নরেনের ভূমিকায় রাধা-মোহন ঠিক নিজের অভিনয়ধারানুগত চরিত্র পেয়ে খুবই ভালো অভিনয় করেছেন এবং "আঁধি"-তে তিনি যে অক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন এ ছবিতে তিনি সে

ছাপটা মুছে দিতে সক্ষম হয়েছেন। নন্দিনী বিমলার মিষ্টি ও আদর্শ নারী-প্রকৃতিকে শ্রীমতী পদ্মা সবায়ের অন্তরে পৌঁছে দিয়েছেন। আর, তার স্বামীর ভূমিকায়ও জহর গাঙ্গুলী ছবির হাল্কা রসের দিকটা মাতিয়ে রেখেছেন।

* * * *

আলোকচিত্রে দেওজীভাই কতকগুলি মনোরম বহির্দৃশ্য রচনা করেছেন; আর নাটকের রসকে জমিয়ে তোলার মতো আভ্যন্তরীণ দৃশ্য রচনায়ও তিনি প্রশংসনীয় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। শব্দের দিকটায় আওয়াজ একটু নম্র হলে ভালো হতো। সুরযোজনায় কালীপদ সেন নতুন কিছু প্রকাশ করতে না পারলেও গল্পের সুরটাকে মনে ধরিয়ে দিতে পেরেছেন, গানেও এবং আবহসংগীতেও।

নাট্যসমৃদ্ধ, আবেগপুষ্ট আদর্শ কাহিনী অবলম্বনে তোলা "দর্পচূর্ণ" সারা বছরেরই একখানি গৌরবজনক চিত্রসৃষ্টি বলে সম্বর্ধিত হবে, নারীমহলে তো নিশ্চয়ই। কারণ, আমাদের দেশের নারীর যে আদর্শ সেই আদর্শকেই অবজ্ঞা করার মতো স্পর্ধার পরাজয় নিয়েই "দর্পচূর্ণ"-র কাহিনী—নারীর মর্যাদা রইলো এই তৃপ্তিটাই ছবি-খানির প্রতি নারী মাত্রকেই আকর্ষণ করবে।

জেমিনীর নতুন কৃতিত্ব

ছবির সাহায্যে একটা নতুন নাম সৃষ্টি করে দেওয়া বড়ো সহজ কথা নয়, কিন্তু জেমিনী পিকচার্স তাদের নবতম ছবি-খানিতে তা সম্ভব করে তুলেছে। নামটি হচ্ছে সম্পৎ, ছবিরও নাম "মিঃ সম্পৎ"—এই নামে এস এস ভাসান এমন একটি বাস্তব ও জীবন্ত চরিত্র সামনে তুলে ধরেছেন যা দেশের লোকের মনে গেঁথে থাকবে—ঐ নামানুকরণে ফন্দীবাজ লোকে-দের আখ্যাই হয়ে যাবে সম্পৎ বলে—যারা কেবল ধাপ্পা মেরেই লোকের মাথায় কাঁঠাল ভাঙে, দেশ ও সমাজের পরোয়া রাখে না, কোন কিছুর ওপরে দরদ নেই, কেবল হৈ-হুল্লোড়ের সৃষ্টি করে যাওয়া অথচ মুখেতে কেবল অন্যায় আর অবিচারের বুলি—এরাই হলো সম্পতদের দল। এমন লোক পথে ঘাটে সর্বত্রই দেখা যায়। জেমিনী এদেরই একজনকে নিয়ে তুলেছেন "মিঃ সম্পৎ"।

* * * *

"মিঃ সম্পৎ" জেমিনীর পাঁচ বছরে পঞ্চম হিন্দী ছবি। এদের পাঁচখানি ছবিই পাঁচ রকমের এবং মুখ্যত প্রমোদ জুগিয়ে যাওয়াই হচ্ছে এদের উদ্দেশ্য। প্রযোজক-পরিচালক এস এস ভাসান কলকাতায় সেদিন এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, intellectual লোকে-দের entertain করবার অনেক রকমের উপাদান আছে, ধনী লোকেদেরও উপায় আছে অনেক রকমের তাই তিনি এমন ছবি তোলেন যা গরীবদের এবং যারা intellectual নয় তাদের entertain করতে পারে। শ্রী ভাসানের ছবিগুলি তা-ই মনে হয়। "মিঃ সম্পত" এর ক্ষেত্রে কিন্তু intellectual দেরও প্রমোদ জোগাবার চেষ্টা করা হয়েছে এবং সাফল্যও লাভ হয়েছে অনেকখানি। দেশের ও সমাজের নানা শ্রেণীর লোককে নিয়ে; নানা অব্যবস্থা, অনাচার ও অসামাজিক কাজ নিয়ে শ্লেষাত্মক কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে যা প্রমোদের সঙ্গে লোকের চেতনাতে সাড়া জাগাবারও কাজ করবে।

* * * * *

ছবিখানি তোলা হয়েছে মাত্র ন সপ্তাহে, খুবই তাড়াহুড়োর মধ্যে দিয়ে, সেইজন্যেই বোধহয় মাত্রাটা ঠিকমতো মাপা যায়নি। নাচের পরিমাণ বড়ো বেশী হয়েছে বিশেষ করে শেষের দিকে যাতে গল্প হারিয়ে গিয়েছে, আর একঘেয়েমীরও ভাব এনে দিয়েছে। অবশ্য গল্প বলতে আছেও খুব একটুই। যাই হোক, "মিঃ সম্পৎ" সব-শ্রেণীর লোককে প্রচুর আমোদ দান করবে। নাচ, গান, ব্যঙ্গ, কৌতুক, শ্লেষের মধ্যে দিয়ে লোককে মাতিয়ে রেখে দেওয়ায় ছবিখানি জনপ্রিয় হবে।

নিখিল ভারত সংগীত সম্মিলনী

ভারতীয় সংগীত জগতের একটি স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে এবারকার নিখিল ভারত সংগীত সম্মিলনী যার অধিবেশন হচ্ছে ২৬শে ডিসেম্বর থেকে ওরিয়েণ্ট সিনেমা গৃহে। এবারের অধিবেশন উদ্বোধন করছেন রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ। বোধহয় রাষ্ট্রপতি হবার পর ডাঃ রাজেন্দ্র-প্রসাদের ব্যক্তিগত উপস্থিতিতে ধন্য হয়েছে এমন সংগীত সম্মিলনী আর হয়নি। সাত দিনের অধিবেশনে যোগদান করার জন্য ভারতের নানা অঞ্চল থেকে বহু শিল্পীও এসে উপস্থিত হয়েছেন। এবারের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, দক্ষিণ ভারতের প্রখ্যাত শিল্পীদের অনেককে আনানো হয়েছে। গান, বাজনা ও নাচের এই সুন্দর আসরটি সমগ্র ভারতেরই সংগীতরসিকদের বিশেষ আকর্ষণ।

দেশী সংবাদ

১৫ই ডিসেম্বর—শ্রীপোত্তি শ্রীরামুলু অদ্য রাত্রি ১১-২০ মিনিটের সময় মাদ্রাজে পরলোকগমন করিয়াছেন। স্বতন্ত্র অন্ধ্র রাজ্য গঠনের দাবীতে তিনি গত ১৯শে অক্টোবর হইতে অনশন করিতেছিলেন।

অদ্য লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য অনুরোধ জানাইয়া বক্তৃতা প্রসঙ্গে দেশের সর্বশ্রেণীর জনসাধারণকে বিপুল উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত এই পরিকল্পনাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার কার্যে আত্মনিয়োগ করিতে আহ্বান জানান।

১৬ই ডিসেম্বর—অন্ধ্র রাজ্য গঠনের দাবীতে ৫৮দিন অনশনের পর গত রাত্রে শ্রীপোত্তি শ্রীরামুলুর মৃত্যুর ফলে অদ্য মাদ্রাজ রাজ্যের ১১টি তেলেগুভাষী জেলায় বিক্ষোভ ও হরতাল হয়। অদ্য বিক্ষুব্ধ জনতা বিজয়বাড়া স্টেশনটি আক্রমণ করে। প্রায় ৫ ঘণ্টাকাল স্টেশনটি তাহাদের দখলে ছিল। পুলিশ নেলোরে বিক্ষুব্ধ জনতার উপর গুলীবর্ষণ করায় তিন ব্যক্তি নিহত হয়।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ লোকসভায় বলেন যে, এমন কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে, যাহার ফলে পরে 'জ-ব-প' (জওহরলাল-বল্লভভাই-পট্টভি) রিপোর্টের ভিত্তিতে অন্ধ্র রাজ্য গঠন সপর্কে আরও আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভবপর হইবে। শ্রীপোত্তি শ্রীরামুলুর মৃত্যু প্রসঙ্গে শ্রীনেহরু এই বিবৃতি দেন।

১৭ই ডিসেম্বর—অদ্য লোকসভায় বিরোধী সদস্যবৃন্দ অন্ধ্রের পরিস্থিতি সম্পর্কে পাঁচটি মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপনের চেষ্টা করেন। কিন্তু ডেপুটি স্পীকার আইন ও শৃঙ্খলারক্ষার দায়িত্ব প্রধানত রাজ্য সরকারের, এই কারণ দর্শাইয়া মুলতুবী প্রস্তাবগুলি আলোচনায় সম্মতি না দেওয়ায় তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

অন্ধ্র নেতা শ্রীরামুলুর মৃত্যুতে আজও বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। গতকল্য বিশাখাপত্তম জেলার আনাকাপল্লীতে পুলিশের গুলীতে পাঁচ ব্যক্তি মারা গিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের ২৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে কলিকাতা শাখার উদ্যোগে ছয়দিনব্যাপী রজত জয়ন্তী উৎসব আরম্ভ হয়। অদ্য কর্পোরেশন স্ট্রীটস্থ ওয়াই ডব্লু সি এ হলে উৎসবের উদ্বোধন করেন শ্রীযুক্তা সরলাবালা সরকার। সভানেত্রীত্ব করেন সম্মেলনের কলিকাতা শাখার প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্তা চারুলতা মুখার্জি।

১৮ই ডিসেম্বর—অদ্য রাজ্য পরিষদে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুমোদনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

সুবিখ্যাত ভারতীয় দার্শনিক এবং কলিকাতা ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতি বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত অদ্য লক্ষ্ণৌতে ৬৫ বৎসর বয়সে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া পরলোকগমন করিয়াছেন।

কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানী রাষ্ট্রীয়করণের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ গবর্নমেণ্ট ১৯৫১ সালে যে কলিকাতা ট্রামওয়েজ আইন পাশ করেন, রাজ্য সরকার সেই আইনের প্রথম তপশীলে বর্ণিত হস্তান্তর চুক্তির সর্তানুযায়ী উপদেষ্টা কমিটি গঠন করিয়াছেন।

১৯শে ডিসেম্বর—অদ্য লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু মাদ্রাজ শহর বাদ দিয়া বর্তমান মাদ্রাজ রাজ্যের তেলেগু ভাষাভাষী অঞ্চল লইয়া অন্ধ্র রাজ্য গঠন সম্পর্কে ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। সাড়ে চারিদিনব্যাপী বিতর্কের পর অদ্য লোকসভায় ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুমোদিত হইয়াছে।

অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভবনে চা-শিল্পের সংকট সম্পর্কে ভারত সরকারের উদ্যোগে সরকার, চা-শিল্পপতি ও চা-বাগান শ্রমিক এই তিন পক্ষের দুই দিনব্যাপী সম্মেলন শুরু হয়। কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী শ্রী ভি ভি গিরি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

অদ্য পশ্চিমবঙ্গ মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং জব্বালানী তদন্ত কমিটির সদস্যগণের মধ্যে কলিকাতা হইতে বর্ধমান পর্যন্ত এবং নগরীর চতুষ্পার্শ্বস্থিত অঞ্চলে বৈদ্যুতিক রেলওয়ে ব্যবস্থা প্রবর্তন সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা হয়।

২০শে ডিসেম্বর—অদ্য লোকসভায় অপহৃত ব্যক্তি (উদ্ধার ও প্রত্যর্পণ) আইন সংশোধন বিল গৃহীত হয় এবং চা-বিল সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত হয়। অতঃপর লোকসভার অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবী রাখা হয়।

অদ্য রাজ্য পরিষদে ১৯৫২ সালের হিন্দু বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ বিলটি জনমত সংগ্রহার্থ প্রচারের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

দিল্লীতে রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্যোগে আহূত প্রথম এশিয়া ছাত্র সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়।

কলিকাতায় চা-বাগান সম্পর্কিত শিল্প কমিটির চতুর্থ অধিবেশন সমাপ্ত হয়। চা-শিল্পের উৎপাদন ব্যয় ব্যবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করিয়া দেখিবার উদ্দেশ্যে এক ত্রি-দলীয় কমিশন গঠনের প্রস্তাবে প্রতিনিধিগণ একমত হন।

২২শে ডিসেম্বর—অদ্য আচার্য বিনোবা ভাবে বিহারের মুখ্য মন্ত্রী ডাঃ শ্রীকৃষ্ণ সিংহের অনুরোধে ঔষধ সেবন করেন। ঔষধ সেবন সত্ত্বেও বিনোবাজীর অবস্থা এখনও উদ্বেগপূর্ণ।

ভারতীয় শান্তি সংস্থার সভাপতি ডক্টর সৈফুদ্দিন কিচলুকে স্ট্যালিন শান্তি পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

১৫ই... ডিসেম্বর—রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে গৃহীত কোরিয়ান যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবটি চীন অগ্রাহ্য করিয়াছে।

১৬ই ডিসেম্বর—তেরটি রাষ্ট্র লইয়া গঠিত আরব-এশিয়া গোষ্ঠী গত রাত্রিতে স্থির করিয়াছেন যে, মরক্কো সমস্যায় হস্তক্ষেপ করিতে তাঁহারা রাষ্ট্রপুঞ্জকে অনুরোধ জানাইবেন না।

১৭ই ডিসেম্বর—পাকিস্থান গতকল্য কাশ্মীর সম্পর্কিত ইঙ্গ-মার্কিন প্রস্তাব গ্রহণ করিবার সম্মতি প্রকাশ করিয়াছে। পাকিস্থান পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার মহম্মদ জাফরুল্লা খাঁ নিরাপত্তা পরিষদে এই স্বীকৃতির বিষয় ঘোষণা করেন।

১৪টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত অতলান্তিক পরিষদ অদ্য ইন্দোচীনে কম্যুনিস্ট বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ফ্রান্সকে কার্যকরীভাবে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। কমন্স সভায় গতকল্য কেনিয়ায় বৃটিশ সরকারের অনুসৃত নীতি অনুমোদন করিয়াছেন।

কেনিয়া সরকার গতকল্য প্রাদেশিক কমিশনারদিগকে এই ক্ষমতা দিয়াছেন যে, মাউ মাউ সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযান প্রয়োজন হইলে তাঁহারা জমি এবং ইমারত দখল করিতে পারিবেন।

১৮ই ডিসেম্বর—রাষ্ট্রপুঞ্জে সাধারণ পরিষদ তিউনিসিয়ায় স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের জন্য অবিলম্বে ফ্রান্স ও তিউনিসিয়ার মধ্যে আলাপ-আলোচনার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করিয়া গত রাত্রিতে এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

১৯শে ডিসেম্বর—আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক অদ্য ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভারতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের ব্যাপক সম্প্রসারণের জন্য ভারতকে তিন কোটি ১৫ লক্ষ ডলার ঋণ প্রদান করা হইবে।

২০শে ডিসেম্বর—তিউনিসিয়ার বে'কে আজই গদীচ্যুত করা হইবে বলিয়া ফরাসী সরকার ভীতি প্রদর্শন করায় তিনি তিউনিসিয়ার শাসন সংস্কার সংক্রান্ত দুইটি প্রস্তাবে স্বাক্ষর করিয়াছেন।

২১শে ডিসেম্বর—'গ্লোব মাস্টার' নামক মার্কিন বিমানখানি বড়দিনের ছুটি উপলক্ষে সৈন্যবাহিনীর ১১৫ জন কর্মচারীকে লইয়া যাওয়ার সময় গতকল্য মোজেসলেকে অগ্নি-প্রজ্বলিত হইয়া ভস্মীভূত হয়। এই দুর্ঘটনায় ৮৪ জনের জীবনান্ত হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। পৃথিবীর বিমান চালনার ইতিহাসে ইহাই বৃহত্তম দুর্ঘটনা।

ভারতীয় মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা—।৵০ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষাণ্মাসিক— ১০৲
পাকিস্থানের মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা (পাক্) ।৵০ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষাণ্মাসিক—১০৲ (পাক্)
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক		পৃষ্ঠা

রাধাবিনোদ মার্কা
বিশুদ্ধ সরিষার তৈল
পুষ্টিকর ও আহার্য্যকে উপাদেয় করে
সর্ব্বমঙ্গলা অয়েল মিল
৬নং হালসি বাগান রোড কলিকাতা

এস, চক্রবর্ত্তীর-
শ্রীরামপুরের
সব চেয়ে ভাল -ও কড়া-
নস্য
সোল এজেন্টস-লক্ষ্মী এজেন্সী
৪৩/১, স্ট্র্যান্ড রোড, কলিকাতা-৭

সম্পাদক—**শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন**

সহকারী সম্পাদক—**শ্রীসাগরময় ঘোষ**

বিদ্যা ও পরাবিদ্যা

দিনের পূর্বের পরিচিত সুর সেদিন দের কানে আসিয়া বাজিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন-উৎসবে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ আমাদের বাংলায় প্রদত্ত তাঁহার অভি-ভাষণের ভিতর দিয়া আমাদের স্মৃতিকে উদ্বেলিত করিয়াছেন। স্বদেশী আন্দোলনের যুগের কথা সেদিন আমাদের মনে পড়িয়াছিল। সে দিনের বাংলার স্বদেশ-প্রেমিক সাধক এবং মনীষীদের মুখে তমান শিক্ষার বিরুদ্ধে যে সব অভি-যোগ আমরা শুনিতাম, স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রপতি সেই সব অভিযোগই উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহার অভিযোগ এই যে, তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা শুধু কেরানীই তৈরী তুলিতেছে; কিন্তু মানুষ ইহাতে তৈরী হইতেছে না। রাষ্ট্রপতি বলিয়াছেন,—"আজিকার শিক্ষাক্রমে চরিত্র গঠনের কোন মহত্ত্ব নাই, আর স্থানও নাই।" ইহার পরিণতি কি দাঁড়াইতেছে, রাষ্ট্র-পতির মুখে স্পষ্ট ভাষাতেই প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার মতে "বর্তমানে দেশের তরুণ-তরুণীরা বিভিন্ন প্রকারের বিচার-ধারার ঘাত-প্রতিঘাতে হালবিহীন নৌকার মত ইতস্তত ভাসিয়া বেড়াইতেছে। নৈতিক জীবনের প্রকৃত ভিত্তি স্থাপিত না হইলে এই মহাবিপদ হইতে জাতিকে রক্ষা করা যাইবে না।" কোথায় সে ভিত্তি? রাষ্ট্রপতি বলিয়াছেন, আত্মতত্ত্বের উপ-লব্ধির ভিতরই এই নৈতিক ভিত্তি নিহিত রহিয়াছে। তাঁহার কথা এই যে, "মানব-সমাজের আজ অবিদ্যা পার হইয়া ঘোর অন্ধকারের বাহিরে যাইবার প্রযত্নও কিছু পরিমাণে সফল হইয়াছে; কিন্তু তাহারা আরও ঘোরতর অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়াছে।" সমস্যা তো এইখানেই। বাস্তবিক পক্ষে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ যাহাকে আত্মতত্ত্ব পরাবিদ্যা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন ভারতীয় সংস্কৃতি সাধনার ক্ষেত্রে বিদ্যার সহিত তাহার কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু বর্তমান বস্তুনিষ্ঠ এই বিচারপরায়ণতার যুগে উপনিষদে ব্যাখ্যাত সেই পরাবিদ্যার কথা উত্থাপন করিতে গেলেই অনেকের মনে আলোড়ন উপস্থিত হইবে। সংশয়বাদে প্রমাদ ঘটিবে। এ যে বিজ্ঞানের যুগ! বিজ্ঞানের সঙ্গে আমাদের অবশ্য কোন বিরোধ নাই। বৈজ্ঞানিক উন্নতির আমরাও পক্ষপাতী। কিন্তু বিজ্ঞান জগৎকে কোন দিকে লইয়া চলিয়াছে, ইহাও বুঝিয়া দেখা দরকার। রাষ্ট্রপতি তাঁহার অভিভাষণে আজিকার বিজ্ঞানের মারণাস্ত্র আবিষ্কারের দিকে নিযুক্ত প্রয়াসের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "মানুষের সমাজে আজ মস্তিষ্কই বড় হইয়া পড়িতেছে, হৃদয় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে।" অস্বীকার করিবার উপায় নাই এবং ইহার ফলে স্বার্থের বিচারই সূক্ষ্ম আকার মানুষের মনের মূলে প্রভাব বিস্তার করিতেছে এবং মনস্বিতার আকার ধরিয়া আসিতেছে। প্রত্যুত মানবতার বিচারবিহীন এমন মনস্বিতাই বর্তমানে যথেষ্ট মর্যাদাও লাভ করিতেছে। নৈসর্গিক শক্তির উপর বিজ্ঞানের প্রভুত্ব একটা বড় কথা। এদেশের সাধকেরা কিন্তু নৈসর্গিক শক্তির ভিতরে ভগবানের কল্যাণেচ্ছার পরিচয় পাইয়াছেন। সর্বতো-ব্যাপ্ত সেই কল্যাণেচ্ছার প্রতিবেশ তাঁহাদের অন্তরে উদার একাত্মতার ভাব উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। তাঁহারা সহজ সরলভাবে সেই সত্যে সংস্থিত হইয়া বিশ্বমানবের সেবাতেই জীবনের সার্থকতা উপলব্ধি করিয়াছেন। নিজত্ববোধের সম্প্রসারণে ত্যাগের অনুপ্রেরণা তাঁহারা লাভ করিয়াছেন। মনুষ্যত্বের চেতনা তাঁহাদের মধ্যে জাগিয়াছে এবং সেই পথে শিক্ষা সার্থকতা লাভ করিয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে মনের স্পর্শে সুসংহত এই কল্যাণেচ্ছাই শিক্ষায় কর্মশক্তিকে সুসংযত ভাবে রূপ পাইয়াছে। ফলত শুধু উপদেশের দ্বারা কিংবা পুঁথি কিতাব পড়িয়া এবং যুক্তি-তর্কের সূক্ষ্ম-সামর্থ্যে এই শক্তি আয়ত্ত করা সম্ভব হয় না। বুদ্ধির সঙ্গে হৃদয়ের এক্ষেত্রে যোগ ঘটান আবশ্যক। জ্ঞানকে সমাজ-চেতনার প্রজ্ঞানময় ভূমিতে প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন হইয়া থাকে। এইটিই আত্মতত্ত্ব। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ সে সত্যকেই আমাদের দৃষ্টিতে উন্মুক্ত করিয়া বলিয়াছেন, "যদি আমরা আত্মতত্ত্ব লাভ করিতে পারি, তবে আমাদের হৃদয় শুদ্ধ হইয়া যাইবে। যতদিন পর্যন্ত শিক্ষা এই বস্তুটি আমাদের মধ্যে সত্য করিয়া তুলিতে না পারিব, ততদিন সমাজের বিশৃঙ্খলতা এবং দুনিয়ার অরাজকতা দূর হইবে না।" রাষ্ট্রপতি ভারতের ভবিষ্যতের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন, "এই আদর্শ একদিন ভারত ভূমিতেই ফুটিয়া উঠিবে এবং বিশ্বমানব-সমাজ ভারতের এই দানের প্রতীক্ষা করিতেছে।" বস্তুত স্বাধীনতা আমরা পাইয়াছি; কিন্তু আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা কেরানী গড়িবার ধারা ধরিয়াই এখনো চলিতেছে। গতানু-গতিকতা স্রোতে আমরা ভাসিয়া চলিয়াছি। রাষ্ট্রপতির অভিভাষণ এদেশের চিন্তাশীল সমাজে বর্তমান শিক্ষার সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা-বোধ জাগ্রত করিয়া তুলিবে, আমরা এই আশা করি।

উভয় সংকটে পশ্চিমবঙ্গ

কলিকাতার পৌরসভার অভিনন্দনের উত্তরে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ পশ্চিম-বঙ্গের সীমানা সম্প্রসারণ সম্পর্কিত প্রশ্নটি অবতারণা করিয়াছিলেন। বাঙ্গলা দেশের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক যেমন গভীর তাহাতে এ কথাটা উত্থাপন না করিলে তাঁহার বক্তব্য

অসম্পূর্ণই থাকিয়া যাইত, সমস্যাটি আমাদের পক্ষে এমনই গুরুত্বপূর্ণ। উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সম্পর্কিত সমস্যার বিচার প্রসঙ্গেই কথাটা উঠে। রাষ্ট্রপতির এ সম্বন্ধে অভিমত এই যে, উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের সমস্যার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সীমানা সম্প্রসারণের প্রশ্নটি জড়াইয়া দেখা উচিত নয়। সীমানা-সম্পর্কিত প্রশ্নটি রাজনীতিক। এই প্রশ্নটির মীমাংসার ভার বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিচার-বিবেচনার মধ্যেই রাখা কর্তব্য। এই দুইটি প্রশ্ন এক করিতে গেলে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের সমস্যা জটিলতর আকার ধারণ করিবে, রাষ্ট্রপতির এই বিশ্বাস। তিনি বলেন, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম এবং অন্যান্য রাজ্যে যেখানে সম্ভব ছিন্নমূল উদ্বাস্তু নরনারীদের পুনর্বসতি বিধান করাই সকলের আগে লক্ষ্য হওয়া উচিত। রাষ্ট্রপতির যুক্তির গুরুত্ব আমরা উপলব্ধি করিতেছি; উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের সমস্যাকে আমরা নিশ্চয়ই লঘু করিতে পারি না। পরন্তু উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের সমস্যার যাহাতে সহজে সমাধান করা সম্ভব হয় সেইদিকেই আমাদের দৃষ্টি। বাস্তবিক পক্ষে বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলের জন্য বাঙালীর দাবী আজ নূতন নয়। সে দাবী তো বহুদিন হইতেই আছে এবং কংগ্রেসও সে দাবীর সঙ্গতি বহু পূর্বেই স্বীকার করিয়া লইয়াছে। উদ্বাস্তুদের সমাগমজনিত সমস্যা সেই দাবীর যৌক্তিকতা প্রবল করিয়া তুলিয়াছে, আমাদের বক্তব্য ইহাই। প্রশ্নটির সঙ্গে সমগ্রভাবে রাষ্ট্রের স্বার্থ, অধিকন্তু মানবতার বিচার বিজড়িত হইয়া পড়িয়াছে। বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলগুলি যদি কংগ্রেস-স্বীকৃত নীতি অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হইত কিম্বা তদনুযায়ী কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বিত হইত, তবে পৃথকভাবে এই প্রশ্নটি উত্থাপনের কোন কারণ থাকিত না। কিন্তু সেজন্য ভারত সরকার কিংবা কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের তরফ কোন দিক হইতেই কোন চেষ্টাই করা হয় নাই। পক্ষান্তরে সে কথা তুলিতে গেলেই প্রাদেশিকতার প্রশ্ন আনিয়া তাহাকে চাপা দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বিনা যুদ্ধে সূচাগ্রমেদিনীও দিব না, বিহারের নেতৃগণ এই মতিগতির পরিচয় দিয়াছেন। উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে অবিসংবাদিতভাবে মতের মিল না ঘটিলে সীমানা সম্পর্কে কোন বিচারই চলিবে না, ভারতের প্রধান-মন্ত্রীর মুখে এই কথাই আমরা আগা-গোড়া শুনিয়া আসিয়াছি। অথচ এদিকে পশ্চিমবঙ্গের উপর উদ্বাস্তুদের চাপ ক্রমাগত আসিয়া পড়িতেছে। এই অবস্থা যে কতদিন চলিবে, ইহারও কোন নিশ্চয়তা নাই। রাষ্ট্রপতি স্বয়ং তাহা স্বীকার করিয়াছেন। এরূপ ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে উপায় কি? সে নিজের সংকটের প্রতি নেতৃবর্গের সহানুভূতি উদ্দীপ্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের দাবীতে প্রাদেশিকতা কিছু নাই; পক্ষান্তরে সমগ্র ভারতের স্বার্থ-প্রেরণাই তাহার মূলে রহিয়াছে, সে ইহাই স্পষ্ট করিয়া ধরিয়াছে। ইহাতে উদ্বাস্তুগণের ভারতে বিভিন্ন রাজ্যে পুনর্বাসনে অন্তরায় সৃষ্টি হইবে, রাষ্ট্রপতির এমন উক্তির গূঢ় তাৎপর্য আমরা তো বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। বস্তুত সমগ্র ভারতের স্বার্থবোধ যদি আমাদের মধ্যে জাগ্রত থাকে এবং প্রাদেশিকতার সংকীর্ণ সংস্কারের দ্বারা প্রভাবিত না হয়, তবে পশ্চিমবঙ্গের দাবীর সমর্থনে নেতারা আগাইয়া আসিবেন ইহাই তো আশা করা যায়। দুঃখের বিষয় এই যে, বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামকালে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে অখণ্ড ভারতের জাতীয়তা-বোধ যতখানি জাগ্রত ছিল, বর্তমানে তাহা আর নাই। প্রাদেশিক স্বার্থ দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। আমাদের মতে এই সংকীর্ণতাকে কিছুতেই প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয় এবং এ সম্বন্ধে দায়িত্ব প্রধানত ভারত সরকারের উপরই রহিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের সীমানা সম্প্রসারণের কর্তব্য-বোধে তাহাদেরই সর্বাগ্রে উদ্বুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। ফলত প্রশ্নটি জাতীয় প্রশ্ন এবং ইহার সঙ্গে সমগ্র ভারতের স্বার্থ জড়িত রহিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের এ দাবীর যৌক্তিকতা যখন সুস্পষ্ট, সেক্ষেত্রে তাহার তাত্ত্বিক আখ্যা বিশ্লেষণে কালাত্যয়ে কোনই লাভ নাই; বরং অনিষ্টেরই সম্ভাবনা আছে। রাষ্ট্রপতির কাছে আমাদের এই নিবেদন।

পশ্চিমবঙ্গের দাবী

পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি ফারাক্কায় গঙ্গার উপর বাঁধ নির্মাণকে পাঁচ-সালা অন্তর্ভুক্ত করিবার গুরুত্বের প্রতি ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদের ফলে রাষ্ট্র হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তৎসম্বন্ধে একটু লক্ষ্য করিলেই এই বাঁধ নির্মাণের গুরুত্ব উপলব্ধি হইবে। পশ্চিম-বঙ্গ বর্তমানে দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে। ইহার এক অংশের সঙ্গে অপর অংশের যোগ নাই। বাঁধটি নির্মিত হইলে পশ্চিমবঙ্গের এই দুইটি বিভিন্ন অংশের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হইবে। ইহার ফলে আসামের সঙ্গে সমগ্র ভারতের সোজাসুজি সংযোগ ঘটিবে। সুতরাং শুধু পশ্চিমবঙ্গের দিক হইতেই এই বাঁধ নির্মাণের যে প্রয়োজন রহিয়াছে, এমন নয়, প্রত্যুত সমগ্র ভারতের সামরিক প্রয়োজনের দিক হইতেও ইহার গুরুত্ব আছে। অন্যান্য নদী এবং উপত্যকা পরিকল্পনার তুলনায় এই বাঁধটি নির্মাণের ব্যয়ও অনেক কম। ৪০ কোটি টাকার অধিক নয়। বিশেষজ্ঞগণ সকলেই এই বাঁধের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়াছেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহা পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই, ইহা সত্যই বিস্ময়ের বিষয়। এ সম্বন্ধে ভারত সরকারের ঔদাসীন্যের ফলে পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র নৈরাশ্যের সঞ্চার হইবে ইহা স্বাভাবিক। প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি এদিকে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সঙ্গত কার্যই করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের এই দাবী কতটা কার্যে পরিণত হইবে, এ বিষয়ে আমাদের মনে একটু সন্দেহ রহিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের সীমানা সম্প্রসারণের দাবী করিয়াও তাঁহারা ইতো-পূর্বে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু আপাতত সে দাবী ধামা চাপা পড়িয়া গিয়াছে এবং সেই দাবীকে নানারকম অবান্তর যুক্তির পাকে ফেলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টাই হইতেছে। রাষ্ট্রীয় সমিতির যাঁহারা ধুরন্ধর ব্যক্তি তাঁহাদের মুখেও সে সম্বন্ধে বড় একটা উচ্চবাচ্য শোনা যায় না। পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় সমিতির সাম্প্রতিক এই দাবীর পরিণতিও যে সেইরূপ দাঁড়াইবে এরূপ আশঙ্কার কারণ রহিয়াছে। বস্তুত পশ্চিম-বঙ্গের স্বার্থ বর্তমানে কংগ্রেস-কর্তৃপক্ষের দ্বারা ক্রমাগত উপেক্ষিত হইয়া চলিয়াছে। ভারতের মধ্যে আজ পশ্চিমবঙ্গ সব চেয়ে অসহায়। আমাদের মনে হয়, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতৃত্বের অভাবই ইহার মূলে রহিয়াছে। জনগণের স্বার্থকে সংহত করিয়া কর্মশক্তি প্রয়োগ করিবার মত ত্যাগী কর্মীদের সাধনার প্রভাবেই বাংলা

দেশ একদিন আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কর্মপ্রেরণার সে আগুন নিভিয়া গিয়াছে। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের কথা আর কেহই কানে তুলিয়া লইতে চায় না।

উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের দায়িত্ব

দুই মাস পূর্বে পূর্ববঙ্গের একদল উদ্বাস্তুকে পুনর্বাসনের জন্য উড়িষ্যার অন্তর্গত চরবেটিয়া শিবিরে প্রেরণ করা হয়। সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ইহাদের মধ্যে শতাধিক নরনারী মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছে। উক্ত শিবিরের অধ্যক্ষের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে এই সংখ্যা ১০৩জন। কিন্তু দুই মাসের মধ্যে একই শিবিরে ৪০জনের মৃত্যুও উপেক্ষার ব্যাপার নিশ্চয়ই নয়। আরামে ইহারা নিশ্চয়ই মরে নাই; ব্যারামেই পড়িয়াছে। উদ্বাস্তুদিগকে উড়িষ্যার শিবিরে গিয়া কতটা দুর্গত অবস্থার মধ্যে পড়িতে হয় এবং তাহাদের বসবাসের ব্যবস্থাটা কিরূপ হইয়াছিল এই সংবাদেই সে পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। প্রশ্ন স্বভাবতই উঠে যে, এতগুলি নরনারীর মৃত্যুর জন্য দায়ী কাহারা? উড়িষ্যা গভর্নমেণ্ট তো দায়ী আছেনই, প্রত্যুত ভারত সরকারের পুনর্বাসনের সচিবকেও এজন্য আমরা দায়ী করিব; কারণ তাঁহারই উদ্যোগে ইহাদিগকে উড়িষ্যায় পাঠানো হইয়াছিল। আমাদের স্মরণ আছে, কয়েক মাস আগে ভারতের পুনর্বাসন সচিব কলিকাতায় আসিয়া এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, বিশেষ বিবেচনার পর উদ্বাস্তুদিগকে পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে পাঠানো হইবে। তাহারা যাহাতে সেখানে গিয়া কোন রকম প্রতিকূল অবস্থার ভিতর না পড়ে এবং তাহাদের দুঃখ কষ্ট না হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখা হইবে। আমরা জিজ্ঞাসা করি, চরবেটিয়া শিবিরে উদ্বাস্তুদিগকে পাঠাইবার পূর্বে সেখানকার অবস্থাটা কেমন ভারতের পুনর্বাসন সচিব কি সে খোঁজ নিয়াছিলেন এবং তাহারা সেখানে কিভাবে আছে, সেদিকে তাহার কি লক্ষ্য এখনও আছে? উড়িষ্যার উদ্বাস্তু শিবির সম্বন্ধে এইরূপ খবর নূতন নয়। ইহার পূর্বেও বহুসংখ্যক উদ্বাস্তু নরনারী সেখান হইতে চলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিল। সেখানকার ব্যাপার সম্বন্ধে অবিলম্বে তদন্ত হওয়া দরকার। প্রকৃতপক্ষে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুগণ কাহারো কাছে দায়স্বরূপ নয়। সমাজ জীবনের অনুকূল প্রতিবেশ ছাড়া, মানুষ বাঁচিতে পারে না সুতরাং গরু ভেড়ার মত ইহাদিগকে যেখানে সেখানে লইয়া ফেলিলেই উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান হইবে না। ফলত তাহাদেরই নিঃস্ব জীবনের বিনিময়ে ভারত বর্তমানে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। সুতরাং তাহাদের প্রতি সমগ্র জাতির একটা কর্তব্য আছে। শুধু মৌখিক সদিচ্ছা প্রকাশের দ্বারা এই কর্তব্য প্রতিপালিত হইতে পারে না এবং আমাদের পক্ষে তাহা সান্ত্বনারও কারণ নয়।

উদ্বাস্তুদের সেবাকার্য

রাজনীতি এবং মানবতা এই দুইটি ক্রমেই পৃথক বস্তু হইয়া পড়িতেছে। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর হইতে আমরা ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতেছি। রাজনীতিকের মান বেশী, পক্ষান্তরে সমাজসেবকেরা অনেকটা বোকা মূর্খের পর্যায়েই গিয়া পড়িতেছেন। কিন্তু পূর্বে বাঙালী এই দুই বস্তুর পার্থক্য এতটা বুঝে নাই। প্রত্যুত মানবতার প্রেরণাই বাঙালীর সমাজ-জীবনে রাজনীতিক চেতনার সঞ্চার করে এবং সেই-পথেই বাঙালী জাতির প্রাণধর্ম প্রকৃত-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। উদ্বাস্তুদের সেবার কার্য পরিচালনা করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার সমাজ-সেবক কর্মীদের সাহায্য গ্রহণ করিবেন স্থির করিয়াছেন জানিয়া আমরা এজন্য সুখী হইয়াছি। প্রস্তাবিত পরি-কল্পনা অনুসারে দুই শতটি পরিবারের তত্ত্বাবধানের জন্য একজন করিয়া কর্মী নিযুক্ত হইলেন। ইহাকে এই পরিবার-বর্গের সঙ্গে বিভিন্ন উদ্বাস্তু শিবিরে এবং পুনর্বাসন কেন্দ্রে অবস্থান করিতে হইবে। ইনি সংশ্লিষ্ট পরিবারবর্গের অভাব-অভিযোগের কথা কর্তৃপক্ষকে জানাইবেন এবং সেগুলির প্রতিকারের জন্য চেষ্টা করিবেন। এই উপায়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংযোগের সূত্র নিবিড় হইবে এবং উদ্বাস্তুদের মধ্যে অনেকটা আশ্বস্তিরও ভাব জাগিবে। পরন্তু উদ্বাস্তু সমাজের পুনর্বাসনের কাজে কর্তৃপক্ষের আন্ত-রিকতাও ফুটিয়া উঠিবে। হতভাগ্য উদ্বাস্তুর দল বর্তমানে অনেকটা স্রোতের সেওলার মত ভাসিতেছে। তাহারা কর্তাদের কাহাকেও তেমন আপন করিয়া পায় না। পরিকল্পনাটি সফল হইলে তাহাদের বিড়ম্বনার কারণ অনেকটা দূর হইবে, ইহা বুঝি। কিন্তু এই পরিকল্পনার সাফল্য যেসব কর্মী এই কার্যে নিযুক্ত হইবেন, তাঁহাদের উপরই সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতেছে। সেবাধর্মের সত্যকার অনুপ্রাণিত কর্মীদের সাহায্যেই এই প্রচেষ্টা সার্থক হইতে পারে; নতুবা সরকারী আওতায় অনুগৃহীত কতকগুলি লোক বাড়াইয়া কিছুই লাভ নাই। এই সব কর্মী যথেষ্ট আত্মমর্যাদা-বোধ থাকাও দরকার। তাঁহারা যদি সেবা-ধর্মের প্রেরণা হারাইয়া কথায় কথায় সরকারী কর্মচারীবৃন্দের ক্রীড়নকস্বরূপেই পরিচালিত হন এবং কার্যত তাঁহাদের নিম্ন কর্মচারী হইয়া পড়েন, তবে এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে। আমরা আশা করি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই সব কর্মীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে এ বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিবেন। বস্তুত এই ব্যাপারের ভিতর দিয়া উপদলীয় স্বার্থ ঘোঁট পাকাইয়া উঠে এবং প্রকারান্তরে সরকারী পোষ্যবর্গ বৃদ্ধি পায়, আমরা ইহা চাহি না। পদ, মান ও যশের কাংলামি ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে এবং মানুষের জন্য প্রকৃত বেদনা-বোধ তাহার কাছে চাপা পড়িয়া যাইতেছে। এই অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্বাস্তুদের সাহায্য কার্যে নির্ধারিত এই নূতন পরিকল্পনার ভিতর দিয়া মানব-সেবার আদর্শ যদি অন্তত কিছুটাও উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে, তবেই আমরা ইহার সার্থকতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইব।
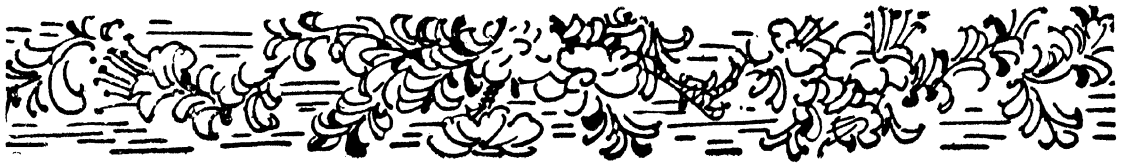
স্মৃতিগন্ধা

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

কে গো তুমি অনেক দূরের
থেকে এলে পুরোনো সুরের
গান নিয়ে। যে-নীরবতার
মাঠে মাঠে মাধবীলতার
ফুলগুলি কথা হয়ে ফোটে,
কথাগুলি হাসি হয়ে ওঠে,
তারপরে ঝরে যায়, — বলো,
তুমি সেই ম্লান ছলোছলো
মাধবীলতার ঝরাফুল?

না-কি স্মৃতিগন্ধ-আকুল
যে-নিশীথে বুড়ো শিমুলের
সারা মনে আবার ফুলের
সাধ জাগে, তুমি বুঝি তার
উতরোল উদাসী হাওয়ার
হাসি হয়ে চোখের আড়ালে
বুড়ো শিমুলের ডালে ডালে
ছোঁয়া দিয়েছিলে? বলো সেই
হাসিটুকু ছড়িয়ে দিতেই
আজ আবার এলে বুঝি তুমি?

পুরোনো গানের ঝুমঝুমি
চেনা-সুরে কে তুমি বাজাও,
কে তুমি কে তুমি বলে যাও।
জানিনে কোথায় কত দূরে
কোনো এক পুরোনো পুকুরে
কোনো এক প্রাচীন বটের
ছায়াখানি শুয়ে আছে, ফের
সারারাত হাওয়ার আঁচলে
জোনাকিরা নেভে আর জ্বলে।

সেখানে তুমিও ছিলে না কি,
তুমি সেই বনের জোনাকি?

আনমনে পা ফেলে পা ফেলে
ম্লানছায়া শীতের বিকেলে
কোনো মেয়ে হারিয়ে গিয়েছে।
হৃদয়ের থেকে হারিয়েছে
তার সব কথা। যদি বলো
তুমি তার ভীরু ছলোছলো
গান কিনা, তবে নিই চিনে।

যেন চিনি, তবুও চিনিনে।
তুমি সেই মাধবীলতার
ফুল নও, রাতের হাওয়ার
হাসি নও, হাওয়ার আঁচলে
যে-জোনাকি সারারাত জ্বলে
তা-ও নও। শীতের বিকেলে
আনমনে পা ফেলে পা ফেলে
যে-মেয়েটি হারিয়ে গিয়েছে,
যার সব স্মৃতি হারিয়েছে,
যার কথা কেউই বলে না
তুমি বুঝি ছিলে তার চেনা,
তার ভীরু গান বুঝি তুমি?

কে তুমি কে তুমি বলো বলো
কে গো তুমি ম্লান ছলোছলো,
একবার শুধু বলে যাও
পুরোনো স্মৃতির ঝুমঝুমি
চেনা-সুরে কে তুমি বাজাও।

এশিয়ান সোস্যালিস্ট কনফারেন্স

আগামী সপ্তাহে রেঙ্গুণে প্রথম এশিয়ান সোস্যালিস্ট কনফারেন্স আরম্ভ হচ্ছে। অবশ্য এই কনফারেন্সের গোড়াপত্তন প্রায় ন দশ মাস আগেই হয়েছে, যখন এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সোস্যালিস্ট পার্টির নেতারা রেঙ্গুণে মিলিত হয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটি সাধারণ এশিয় দৃষ্টিকোণ কিভাবে সুস্পষ্ট করে তোলা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করেন। তখন থেকেই এই কনফারেন্সের জন্য প্রস্তুতি চলতে থাকে। এ ব্যাপারে ভারতীয় সোস্যালিস্টরা একটি মুখ্য অংশ গ্রহণ করছেন। বলা বাহুল্য, বর্তমান চীন থেকে কারো পক্ষে এই কনফারেন্সে যোগ দেয়া সম্ভব নয়। তবে জাপানের উভয় সোস্যালিস্ট দলের প্রতিনিধিরা কনফারেন্সে যোগ দিচ্ছেন। ইন্দোনেশিয়ার সোস্যালিস্ট পার্টিও কনফারেন্সের শরিক হচ্ছেন। বর্মার সোস্যালিস্টরা তো আছেনই। বর্তমান এশিয়ায় বর্মাই একমাত্র দেশ যেখানকার গভর্নমেণ্ট সোস্যালিস্ট পার্টির দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্থানের দুই সোস্যালিস্ট পার্টির প্রতিনিধিরাই রেঙ্গুণে যাচ্ছেন। মধ্যপ্রাচ্যের দু' একটি দেশ থেকেও প্রতিনিধি আসতে পারেন। আফ্রিকা থেকেও হয়ত দু' একজন কনফারেন্সে উপস্থিত থাকবেন, কারণ ঔপনিবেশিক দুঃশাসনের বিরুদ্ধে আফ্রিকানদের যে-সংগ্রাম চলছে তার প্রতি এশিয়ান সোস্যালিস্ট কনফারেন্স যে পূর্ণ সহানুভূতি প্রকাশ করে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দর্শক হিসাবে আমন্ত্রিত হয়ে সোস্যালিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের পক্ষ থেকে মিঃ এ্যাটলী (বৃটেন), মঃ মলে (ফ্রান্স) এবং মঃ কাই বিয়র্ক (সুইডেন) আসছেন।

এশিয় সোস্যালিস্ট পার্টিগুলির পক্ষে সোস্যালিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত কিনা—এই প্রশ্নটি রেঙ্গুণে উঠবে। এ বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। এশীয় সোস্যালিস্ট পার্টিগুলির একটা প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন একটি শক্তিকেন্দ্র গড়ে তোলা যেখান থেকে সোভিয়েট ও ইঙ্গ-মার্কিন উভয় ব্লকের আকর্ষণ এড়িয়ে গণকল্যাণ ও আন্তর্জাতিক শান্তির আদর্শের সেবা করা সম্ভব। কিন্তু সোস্যালিস্ট ইণ্টারন্যাশনাল মুখ্যত য়ুরোপীয় সোস্যালিস্ট পার্টিসমূহের সঙ্গে যাদের পক্ষে বর্তমানে ইঙ্গ-মার্কিন ব্লকের আত্মীয়তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তাছাড়া, য়ুরোপীয় পার্টিগুলির দৃষ্টিভঙ্গী ও এশিয় সোস্যালিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে একটা মতের পার্থক্য রয়েছে। য়ুরোপীয় সোস্যালিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে অনেকেই স্বদেশে সোস্যালিস্ট কিন্তু বিদেশে কেউ কম কেউ বেশি সাম্রাজ্যবাদী—অর্থাৎ যে দেশের যেরকম ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য আছে সেই অনুপাতে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সোস্যালিজ্‌ম্‌-এর দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে আর একটা পার্থক্যের কারণ হচ্ছে দুই অঞ্চলের বাস্তব অবস্থার পার্থক্য। বাস্তব অবস্থার মধ্যে পার্থক্য থাকার দরুণ উভয়ের মূল্যবোধ ও নিকট উদ্দেশ্যের মধ্যেও একটা পার্থক্য থাকতে বাধ্য। প্রথম অবস্থায় এশিয়ান সোস্যালিস্ট কনফারেন্স যদি সোস্যালিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের সঙ্গে বেশি মাখামাখি করে অথবা এশিয় সোস্যালিস্ট পার্টিগুলি পুরোপুরি সোস্যালিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় তবে এশিয়ান সোস্যালিজ্‌ম্‌-এর পৃথক্‌ সত্তা ও পৃথক্‌ দৃষ্টিভঙ্গী কখনো সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে পারবে না এবং তাহলে এশিয়াকে বাঁচার জন্য মার্কিন-সোভিয়েট শক্তি-দ্বন্দ্বের বাইরে যে একটি তৃতীয় শক্তিকেন্দ্র গড়ে তোলার প্রয়োজন রয়েছে সেটা কখনো সিদ্ধ হবে ...থাপি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সোস্যালিস্ট-... মধ্যে সহযোগিতার কোনো ক্ষেত্র বা প্রয়োজন নেই, একথা বলা চলে না। সম্ভবত রেঙ্গুণে এই ধরণের একটা সিদ্ধান্ত হবে যাতে এশিয় সোস্যালিস্ট পার্টিগুলির সংযোগে এশিয়ান সোস্যালিস্ট কনফারেন্স একটি স্বাধীন সত্তা গড়ে তুলতে পারবে অথচ সোস্যালিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের সঙ্গেও, যেখানে প্রয়োজন এবং কর্তব্য, সহযোগিতা করার পথ উন্মুক্ত থাকবে।

মার্কিন-সোভিয়েট দ্বন্দ্বের বাইরে একটি তৃতীয় শক্তিকেন্দ্র গড়ে তোলার পক্ষে রেঙ্গুণ কনফারেন্স এশিয় জনমতকে কতটা সক্রিয় করে তুলতে সমর্থ হবে তার উপর উহার সার্থকতা নির্ভর করছে। এখানে মনে রাখতে হবে যে, এশিয়ার যে-তিনটি বড়ো দেশের পারস্পরিক আকর্ষণ-

বিকর্ষণের উপর এশিয়ার ভবিষ্যত অনেকখানি নির্ভর করবে, সে হচ্ছে চীন, জাপান ও ভারতবর্ষ। চীন বর্তমানে সোভিয়েট ব্লকের অন্তর্ভুক্ত। সেখান থেকে চীনকে আলাদা করে আনার কল্পনার রেশ ইঙ্গ-মার্কিন ব্লকনেতাদের মনে এখনও বোধ হয় আছে। তবে মার্কিন নীতির চেষ্টা হচ্ছে জোর করে, ঠেঙিয়ে, কাজ হাশিল করা। তাই অনেকে মনে করছে যে, জেনারেল আইসেনহাওয়ার প্রেসিডেণ্টের কার্যভার গ্রহণ করার পরে আমেরিকা চীনের উপর এমন জোর সামরিক চাপ লাগাবে যে, চীন আমেরিকার কাছে শান্তি প্রস্তাব করাই নিজের মঙ্গল বলে মনে করবে। অবশ্য এশিয় সোস্যালিস্টদের মত ও পথ সম্পূর্ণ আলাদা। চীন সোভিয়েট ক থেকে বেরিয়ে আসুক' এটা এশিয় সোস্যালিস্টদের অবশ্যই কাম্য কিন্তু চীন সোভিয়েট ব্লক থেকে বেরিয়ে এসে মার্কিন কের সঙ্গে যুক্ত হোক বা মার্কিন ব্লকের দ্বারা নাস্তানাবুদ হোক, এটা সোস্যালিস্ট-দের কাম্য হতে পারে না। চীন যদি সোভিয়েট ব্লক থেকে বেরিয়ে এসে দুই কের মধ্যে নিরপেক্ষ ভাব গ্রহণ করতে পারে তবেই তার নিজের, এশিয়ার এবং পৃথিবীর মঙ্গল। আমেরিকার ভয়-দেখানো নীতির ফল উল্টা হবে।

এখানে জাপানের উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। জাপান যদি নিজেকে প্রকৃত নিরপেক্ষ অবস্থায় নিয়ে আসতে পারে তবে চীনের উপর তার প্রতিক্রিয়া হবেই। আমেরিকা জাপানে সামরিক ঘাটি রেখেছে এবং জাপানকে পুনরস্ত্রীকরণে উৎসাহিত করেছে মার্কিন-দত্ত জাপানী কন্‌স্টিটিউ-শনের বিরুদ্ধে। জাপানীরা যদি এর প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয় অর্থাৎ জাপানীরা যদি জাপান থেকে মার্কিন-সমরঘাটি সরিয়ে নিতে আমেরিকাকে বাধ্য করতে পারে এবং যদি নিজেরা পুনরস্ত্রী-করণের পথে না এগোয় তবে চীনের পক্ষে সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে জুড়ে থাকার কোনো কারণ থাকবে না। অর্থাৎ যেদিন নিরস্ত্র জাপান থেকে আমেরিকা সরে যেতে বাধ্য হবে সেদিন চীনের উপর থেকেও রাশিয়ার মুঠি আলগা হয়ে যাবে। দু' বছর পূর্বের তুলনায় বর্তমানে জাপানে কম্যুনিস্টদের প্রভাব অনেকটা কমেছে। বলা বাহুল্য, কম্যুনিস্টরা জাপান থেকে আমেরিকানদের সরে যাবার জন্য আন্দোলন করে এসেছে কিন্তু কম্যুনিস্টদের উদ্দেশ্য জাপানকে নিরপেক্ষ করা নয়, মার্কিন-প্রভাবের পরিবর্তে জাপানে রুশ প্রভাব আমদানী করা। সেটাও যে জাপান চায় না সেটাও প্রমাণ হয়েছে গত সাধারণ নির্বাচনে। তাতে দেখা গেছে, কম্যুনিস্ট পার্টির আগের তুলনায় ভোট অনেক কমে গেছে। সোস্যালিস্ট পার্টি আমেরিকানদেরও চায় না, তার পরিবর্তে রুশ প্রভাবের আমদানীও চায় না, তারা জাপানকে উভয় ব্লকের প্রভাবমুক্ত করে রাখতে চায়। সোস্যালিস্টরা পুনরস্ত্রীকরণেরও বিরুদ্ধে। অবশ্য আমেরিকানদের একটা বুলি আছে যে, নিরস্ত্র জাপানকে ছেড়ে এলে তারপরদিনই রাশিয়া তাকে গিলে ফেলবে। এর একটা জবাব আছে এবং সেটা ছাড়া অন্য কোনো জবাবে যে কাজ হবে তা মনে হয় না। সে জবাব হচ্ছে—জাপানে এরূপ অহিংস শক্তি সংগ্রহ ও সংহত করা যার প্রয়োগে অথবা প্রয়োগের আশঙ্কায় আমেরিকা সরে আসতে বাধ্য হবে। তখন আমেরিকার শূন্য স্থান রাশিয়া এসে পূর্ণ করবে—এ আশঙ্কা করার অবসর থাকবে না।

যেমন জাপানের তেমনি ভারতবর্ষের নিরপেক্ষতার উপরও এশিয়ার ভবিষ্যৎ অনেকখানি নির্ভর করছে। ভারত গভর্নমেণ্টের কার্যাবলী যদিও সব সময়ে ঠিক হচ্ছে না, তাহলেও ভারত গভর্নমেণ্টের ঘোষিত নীতি হচ্ছে এই যে, ভারত কোনো ব্লকের সঙ্গেই যুক্ত নয় এবং উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ বাধলে ভারত নিরপেক্ষ থাকবে। ভারত গভর্নমেণ্টের দৈনন্দিন কার্যাবলীর সঙ্গে এই নীতির পুরোপুরি সামঞ্জস্য না থাকলেও নিরপেক্ষতার নীতি ভারতে জোরালো করে তোলা অপেক্ষাকৃত সহজ। জাপানের মতো ভারতবর্ষের নিরপেক্ষতার প্রভাবও চীনের উপর পড়বে, তবে তার চেয়ে কিছু কম। ভারতবর্ষ এবং জাপানের নিরপেক্ষতা যদি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে তবে তার ফলে চীনও রাশিয়ার মুঠি থেকে আলগা হয়ে এসে নিরপেক্ষ হবার সুযোগ পাবে। তখন মঃ স্ট্যালিন "নিউইয়র্ক টাইমস্"-এর সংবাদদাতার প্রশ্নের উত্তরে কী বল্লেন বা জেনারেল আইসেনহাওয়ার কোরিয়া পরিদর্শন করে কী বল্লেন তার প্রতিটি কথার এতো পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা থাকবে না—অন্তত এশিয়ার দিক থেকে নয়।

কাশ্মীর ভ্রমণ

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

(৫)

একদিন শ্রীনগর থেকে মোটরে উলার লেক দেখতে যাওয়া গেল। নদীপথেও যাওয়া যায়, কিন্তু তা সময় সাপেক্ষ; হাউস বোটে উলার পেঁছতেই তিন দিন লাগে। শহরের সীমানা ছাড়িয়ে আসতেই দেখা গেল দুপাশে খোলা মাঠ; দিগন্তবিস্তৃত ধান ক্ষেত, মধ্যে মধ্যে পপলার গাছ আছে; চাষীদের পোষাকটাও স্বতন্ত্র; কিন্তু এ দুটি বাদ দিলে বাঙলা দেশের সঙ্গে একটুও তফাৎ নেই; সেই অবারিত মাঠ, কাদার মধ্যে ধান (এদেশের ভাষায় শালি, অবশ্য অন্য ধানও কিছু আছে) পোতা হচ্ছে, সেই গরু-লাঙলের চাষ, অবশ্য আরও একটা তফাৎ আছে, সেটা হ'ল জলের খেলা। কাশ্মীরের সর্বত্র নহর আর চশমার ছড়াছড়ি, সর্বত্র কল কল করে চলেছে জলের নালা, ছোট ছোট বাঁধ দিয়ে তাকে এখানে-ওখানে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, ক্ষেতে ক্ষেতে চলেছে জলধারা, বাঙলা দেশের পাহাড়ে খাড়াই বড় বেশি, ঝরণা লাফিয়ে পড়ে সগর্জনে পাগলা ঝোরার মত, কিন্তু কুলু কুলু শব্দে বয়ে চলে না মাইলের পর মাইল দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে; তাছাড়া আরও তফাৎ আছে। বাঁধাকপির ক্ষেতে লতানো গোলাপের বেড়া—এ-দৃশ্য কাশ্মীর ছাড়া অন্য কোথায়ও দেখা সম্ভব কিনা জানিনে।

কিছুদূর গিয়ে নজরে পড়ল আঞ্চার লেক। বেশি বড় নয়, জলও ঘোলাটে, শুনলাম পাখী শিকারের আড্ডা। আরও কিছুদূরে গন্ধর্বলে পৌঁছন গেল। অতি চমৎকার জায়গা, সিন্ধু নালা বলে একটি ছোট পাহাড়ে নদী এখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, কাঁচ কাঁচ রঙের বরফ-গলা জল, দশবার মাইল দূরে সাদিপুর নামে একটি জায়গায় ঝিলমের সঙ্গে মিলিত হচ্ছে। চারপাশে সবুজ মাঠের উপর চেনার গাছের ঘন সন্নিবেশ, তার তলা দিয়ে ঘুরে ঘুরে চলেছে নানা চশমা, মিলিত হচ্ছে সিন্ধু নালায়, প্রকৃতির রম্য নিকেতন। শহুরে হৈ-চৈ ভালবাসেন না এমন দু-চারজন প্রমোদযাত্রী এইখানে হাউস বোট নিয়ে এসে থাকেন।

গন্ধর্বল থেকে মাইল দুই দূরে ক্ষীর-ভবানীর মন্দির। শাস্ত্রে উল্লিখিত হয়েছে, কাশ্মীরে একটি পীঠস্থান আছে। কিন্তু সে পীঠস্থানটি ঠিক কোথায়, তার কোনও হদিস শাস্ত্রে নেই। কেউ বলেন, অমরনাথ হল সেই পীঠস্থান, কেউ বলেন, সে-পীঠ-স্থান হল ক্ষীরভবানী। আরও প্রবাদ আছে, রামচন্দ্র নাকি এখানে পুজো করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ কাশ্মীর ভ্রমণের সময় এখানে এসেছিলেন, একথা নিবেদিতার বইয়ে উল্লেখ আছে; চারপাশ দিয়ে ছোট একটি জলের নালা ঘুরে চলেছে, মধ্যে একটি দ্বীপের মত; সেই দ্বীপে চেনার গাছের সুনিবিড় ছায়ায় এই মন্দির। একটি দুধবরণ কুণ্ড, তার মধ্যে অতি ছোট একটি মার্বেলের মন্দির, মন্দিরে দেবীমূর্তি, অনেকটা শিলাখণ্ডে সিঁদুর মাখানোর মত, মাথায় রুপোর মুকুট, কর্পূর জেবলে সিঁদুর দিয়ে পুজো হয়; চণ্ডী থেকে পাঠ ও প্রার্থনা করান পুজকেরা, যদিও শুনলাম, দেবী বৈষ্ণবী এবং বৈষ্ণব পদ্ধতিতে পুজো হয়। বলিদান নেই। পুজোর শেষে স্থানীয় বালক-বালিকাদের খাওয়াবার অনুরোধ আসে, পুণ্যার্থীদের জন্য ব্যাপক ভোজনের উপকরণ লুচি ও হালুয়া তৈরি করাই থাকে।

গন্ধর্বল থেকে একটি রাস্তা সোজা মানসবল হ্রদের দিকে গিয়াছে; হিমালয় পার হয়ে মানস সরোবরে যাওয়া সহজ নয়; সেইজন্য এইটি নাকি তার অনুকল্প; কিন্তু এ-লেকটি অত্যন্তই ছোট; লম্বায় মাইলখানেক, চওড়ায় আধ মাইলের বেশি নয়, কাছে কোনও তীর্থক্ষেত্র রচনার কোনও প্রয়াসের চিহ্নই নেই। কিন্তু একটা বিশেষত্ব আছে। এ অঞ্চলে নদীর জল বা হ্রদের জল অধিকাংশই ঘোলাটে; কেবল ডাল লেকের জল খুব গভীর রঙের, প্রায় কালোই। মানসবল হ্রদের জল কিন্তু ঘন গাঢ় নীল—এমন নীল প্রায় দেখা যায় না। আকাশ থেকে লক্ষ্য করেছিলুম, ইটালীর চারপাশে ভূমধ্যসাগরের অদ্ভুত নীল রঙ, সত্যিই ওরকম নীল রঙ দেখা যায় না—কিন্তু সেটি ছেড়ে দিলে এমন নীল রঙ আমার চোখে পড়েনি। চারপাশে পাহাড় ঘিরে রয়েছে, মধ্যে সুনীল হ্রদ, কোন বসতি বা কোলাহল নেই, কেবল দু-একটি নৌকায় জেলেরা মাছ ধরছে, পাহাড়ের বুকে খচিত একটি নীল পাথরের মত এর সৌন্দর্য অনবদ্য। এই নির্জন হ্রদে জলকেলির জন্য সখীপরিবৃতা হয়ে আসতেন শাহজাহানের কন্যা রোশেনারা। তিনি এখানে একটি ঝরণা করিয়েছিলেন, আজও তার ধ্বংসাবশেষ কিছু কিছু আছে।

মানসবল হ্রদ ছেড়ে অনেকক্ষণ চলবার পর আমরা উলার হ্রদে পেঁছলাম; মিষ্ট জলের হ্রদগুলির মধ্যে ভারতবর্ষে এইটিই বৃহত্তম। চারপাশে পাহাড়ের বেষ্টনীর মধ্যে লেকটি দিগন্তবিস্তৃত। বাঁদিপুরের কিছু আগে ঝিলম, এই হ্রদে প্রবেশ করেছে;

মানসবল হ্রদ। ডানদিকে গাছের সারি যেখানে হ্রদের কিনারায় শেষ হয়েছে সেইখানে রোশেনারার ঝরোখার ধ্বংসাবশেষ

অবন্তীপুর ধ্বংসস্তূপ

উল্টো দিকে সোপুরের কাছে বেরিয়ে বারামুলো উরির দিকে বয়ে চলেছে; উলার লেক এত বড় যে, বেশির ভাগ জায়গাতেই এপার-ওপার দেখা যায় না, জল খুব টলটলে নয়, পরিষ্কারও নয়। পদ্মবন আছে। পাহাড়ের ধার ধার দিয়ে মোটরের রাস্তা; লেকের পশ্চিম তীরে একটি ছোট পাহাড়ের মত আছে, নাম বাবা শুকুরদিন; তার চূড়া থেকে উলার লেকের চমৎকার দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়; এই পাহাড়ের তলায় হল ওয়াটলব বাংলো—সেখানে যাত্রীরা বিশ্রাম করেন, খাওয়া-দাওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই, খাবার সঙ্গে নিয়ে আসতে হয়। ওয়াটলবের কিছু দূরে সোপুর—এখানে ঝিলম নদী উলার লেক পরিত্যাগ করে বারামুলার দিকে চলেছে। সোপুরের কিছু দূরে সংগ্রামা, সেখানে পুরোনো রাওয়ালপিণ্ডি-শ্রীনগর রাস্তা পাওয়া গেল। কাশ্মীর আক্রমণের সময় হানাদারেরা এই পথ ধরে এগোতে এগোতে শ্রীনগরের কয়েক মাইল দূরে পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল। সেই-খানে একটা ক্যানালের ব্রিজের কাছে ভারতীয় সেনার সঙ্গে প্রথম লড়াই হয়। শোনা গেল, স্থলযুদ্ধটা হয়েছিল বন্দুক-মেশিনগান, হাতবোমার সাহায্যে, কিন্তু সেই সঙ্গে হাওয়াই জাহাজ থেকে বোমা-বর্ষণ করা হয় হানাদারদের উপরে। আক্রমণ শুরু হবার পনের মিনিটের মধ্যেই নাকি 'কাবাইল' (অর্থাৎ কাবুলী) হানাদারেরা সবেগে পশ্চাদপসরণ শুরু করেছিলেন। সাধারণ লোকে গল্প বলে, নোউরু (নেহরু) সাহেব হুকুম দেওয়ামাত্র চিড়িয়াকি তরেহ্ হাওয়াই জাহাজ আসতে লাগল আর চিঁউটিকে (পিঁপড়ে) মাফিক হিন্দুস্থানকে ছোলদারী (*Soldiery*) চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে কাবায়েল ডাকা-বাজের দল করল পৃষ্ঠপ্রদর্শন। যতক্ষণ হিন্দুস্থানকে ছোলদারী আসেনি, ততক্ষণ সাধারণ কাশ্মীরীরা ঘরের ছাদ থেকে চুপি চুপি দেখছিল গুলমার্গ পর্যন্ত আগুন জ্বলছে, গুলী চলছে। কাশ্মীরীরা পাহাড়ে জাত হলে কি হয়, বোধ হয় আমাদেরই মত ভাত খায় বলে খুব নিরীহ গোবেচারা প্রকৃতির, কাবায়েল ডাকাবাজদের সম্বন্ধে এদের স্মৃতি এখনও ভীতিবিহ্বল।

আমরা আর একদিন পহলগ্রামের দিকে বেড়াতে গেলুম। উলার লেকের দিকে গেলে যে ধরণের দৃশ্য নজরে পড়ে, পহল-গ্রামের দিকে দৃশ্য ঠিক সেরকমটি নয়; প্রথমত, বহুদূর পর্যন্ত ঝিলম নদীর পাশে পাশে রাস্তা, পাহাড় বা সমতল ভূমির বাঁকে বাঁকে ঝিলম বয়ে চলেছে। এখানে সে শহরের মালিন্য থেকে মুক্তি পেয়েছে, জল আবর্জনামুক্ত ও মালিন্যহীন, খরস্রোতে বাঁকে বাঁকে সে বয়ে চলেছে। অপূর্ব তার শোভা। ঝিলমের আর একটি বিশেষত্ব হল, তার জলের ফেনা, খরস্রোতে জল ধাক্কা পাবার জন্যই হোক বা অন্য যে কোন কারণেই হোক, সমুদ্র ফেনের মত থোকা থোকা ফেনা জলে ভেসে চলেছে। ঢেউ নেই, তবুও ফেনা। "বস্তুহীন প্রবাহের প্রচন্ড আঘাত লেগে, পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুফেনা ওঠে জেগে"—একথা কবি ঝিলমকে উদ্দেশ করে লেখেন নি, কিন্তু একথা ঝিলমের পক্ষে যত সত্য, বোধ হয় অন্য কোন নদীর পক্ষেই তত সত্য নয়। তাছাড়া আরও একটু দূরে গিয়ে পড়লে ঝিলমের সীমানা পার হয়ে গিয়ে পৌঁছুতে হয় লিডর উপত্যকায়। কোলাহোই গ্লেশিয়ার, অমরনাথ ও অন্যান্য পাহাড়ের বরফ-গলা জল বহন করছে এই গিরি নদী, পাহাড়ের পাশ দিয়ে পাথরের উপর দিয়ে তীব্র স্রোতে লাফাতে লাফাতে নেমে আসছে। সিকিমের পথে তিস্তার মত তার দুপাশে খাড়া পাহাড় নয়, এখানে কেবল একদিকে পাহাড়। তার পাশে নদী, তারপর বিস্তীর্ণ শ্যামল শালি ক্ষেত। এর বিস্তারও তিস্তার চেয়ে কম, কিন্তু সাদৃশ্য হল ঐ খরবেগ। লিডরের বেগ বোধ হয় তীব্রতর। তাছাড়া তিস্তা উপত্যকার চার-পাশের রঙ হল খুব ঘন গাঢ় সবুজ, প্রায় কালো। তার উপর দুপাশে ভয়ংকর খাড়া পাহাড়—পড়লে রক্ষা নেই। কেমন একটা ভয়ংকরতার ছায়া চারপাশে। এখানকার রঙ হল কাঁচ সবুজ—ধানের রঙ, বসন্ত কালের পাতার রঙ। তার উপর চাষ হচ্ছে, ঘোড়া চরছে, মানুষে অ-ভীত অবস্থায় চলাফেরা করছে—এর একটা কোমল প্রসন্ন শ্রী আছে, যা তিস্তায় নেই।

এই পথে শ্রীনগর থেকে আট মাইল দূরে পামপুর। এই পামপুরেই হল জাফরান চাষের একমাত্র কেন্দ্র। প্রবাদ আছে, এখানকার জিয়ারতে কে কবে প্রার্থনা করেছিলেন, সেজন্য নাকি এইখানেই জাফরান (ওদেশের ভাষায় কেগর) হয়; অন্য কোথায়ও হয় না। পথের ধারেই সেই মসজিদ, ধর্মনিরপেক্ষ-ভাবে সকল যাত্রীই মসজিদের সামনে রাখা পাত্রে কিছু প্রণামী দিয়ে যায়। কার্তিক মাসে জাফরান ফুল ফোটে, তার লালচে সোনালি আভায় সারা মাঠ যায় ছেয়ে; গন্ধে

চারপাশ মৌমৌ করতে থাকে। সেই শোভা যখন কার্তিকী পূর্ণিমার দিন পরিপূর্ণতায় পৌঁছয়, সেই সময় আকাশ থেকে উপচে-পড়া সোনালি চাঁদের আলোর তলায় সেই অপরূপ সোনালি জাফরান ক্ষেতে মাঝরাতে এক মেলা বসে। চাষীরা স্ত্রী-পুরুষে আনন্দে গান গায়; সোনালি ফসলের স্বপ্ন দেখে, দূরে হতেও নানা লোক জড়ো হয়। জুন মাসে সে ঐশ্বর্য-সমারোহের কিছুই নেই, এখন গাছগুলি শুকিয়ে খড়ের মত হয়ে পড়ে আছে।

পামপুরের কিছু পরে, রাস্তা হতে কিছু দূরে জীওন বলে একটা জায়গা আছে পাহাড়ের উপর। সেখানে প্রস্তরীভূত কঙ্কাল ও অন্য নানা রকমের ফসিল আবিষ্কৃত হয়েছে—পণ্ডিত লোকেরা দেখতে যান। আমাদের মত অ-পণ্ডিত লোকের কিন্তু আরও উৎসাহ হল ঐখানে রাস্তার পাশে মাটির উপর বসানো একটি হাউস-বোট দেখে। ডানদিকে বেশ খানিকটা নীচে বয়ে চলেছে ঝিলম, আর রাস্তার বাঁদিকে অনেকখানি দূরে খটখটে উঁচু জমির উপর একটা হাউস বোটে লোক বাস করছে—ব্যাপারখানা কি? ব্যাপার শুনে তো আশ্চর্য! একবার ঝিলমে এসেছিল প্রবল বন্যা; জল বাড়তে বাড়তে খদ ছাপিয়ে, রাস্তা ছাপিয়ে, ওপারের মাঠের উপর দিয়ে স্রোত সগর্জনে বয়ে চলল, ভাসিয়ে নিয়ে এলো হাউস বোটটিকে নদী থেকে অতদূরে। একটি গাছের ধাক্কা খেয়ে হাউস বোটটি থামল, সেখানেই তাকে হল বাঁধা। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে জল দ্রুত নেমে গেল, অতএব হাউস বোটটি সেই গাছের তলায় খটখটে ডাঙা জমির উপর এ পর্যন্ত বিরাজ করছে।

আরও কিছু দূরে অবন্তীপুর। পথের ধারে দুটি ধ্বংসস্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে। কাশ্মীরে অবন্তীবর্মা রাজত্ব করেছিলেন বোধ হয় ৮৫৮ থেকে ৮৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। তাঁরই প্রতিষ্ঠিত এই মন্দির; আজ ধ্বংস-স্তূপে পরিণত। স্থানীয় প্রবাদ-বাক্য হল এ-মন্দির পাণ্ডবদের তৈরি। পাণ্ডবদের নামের সঙ্গে প্রাচীন কীর্তিগুলিকে জড়িয়ে দেবার চেষ্টা এখানে খুব বেশি। শ্রীনগরের কাছে পাণ্ড্রেমান মন্দির আছে। পাণ্ড্রেমান, হরিপর্বত, অবন্তীপুর—সর্বত্রই পাণ্ডবদের টেনে আনবার চেষ্টা যদিচ দু-চার জায়গায় অন্তত ইতিহাস বা পুরান অন্য কথা বলে। এই পথে আর একটু দূরে এগোলে খান্নাবল এবং অনন্তনাগ বা ইস্লামাবাদ পড়ে। অনন্তনাগ থেকে ডানদিকে রাস্তা বেঁকেছে আচ্ছাবল-কোবারনাগ ভেরিনাগের দিকে। এই দিকেই ঝিলমের বা বেথ্ (বিতস্তা) নদীর উদ্ভব। আর খান্নাবল থেকে ডাইনে জম্মুর পথ বেঁকেছে—বানিহল পার হয়ে প্রায় দুশ' মাইল দূরে জম্মু। খান্নাবল আর অনন্তনাগ কাছাকাছি। অনন্তনাগে পৌঁছে আমরা সিধে পহলগ্রাম যাবার বদলে ডাইনে বেঁকে দশ মাইল দূরে আচ্ছাবল দেখতে গেলাম। ছোট একটি গ্রাম—যথানিয়মে অত্যন্ত নোংরা, কিন্তু তারই মধ্যে পাহাড়ের তলায় জাহাঙ্গীর একটি বাগান তৈরি করে-ছিলেন। বাগানটি খুবই ছোট, শালিমার বা নিশাতবাগের মত কারুকার্য কিছুই নেই; জলটুঙ্গীগুলো ভাঙা ভাঙা, তাতে শালিমারের জলটুঙ্গীর মত পাথরের কাজ বা মিনে-করা টালির কাজ কিছুই নেই—তবু সৌন্দর্যে এটি অতুলনীয়। পাহাড় থেকে একটি ঝরণা নেমে আসছে; তাকে তিন ধারায় বিভক্ত করা হয়েছে। প্রধান ধারাটিকে বেঁধে নিয়ে আসা হয়েছে, এখানেও পর পর থাক কাটা, সেই থাকের উপর হতে জল পড়ছে কুলু কুলু ঝরণার মত; তলায় ফোয়ারার খেলা, চারপাশে দীর্ঘ সুবৃহৎ চেনার গাছ, তার তলায় বাঁধানো বেদী, চারপাশে সুনিবিড় শান্তি। সেই ছায়াঘন বেদীতে ইরানী কার্পেট বিছিয়ে আমাদের প্রাতরাশ সম্পূর্ণ হল। এই বাগানের এক কোণে ছিল নুরজাহানের হামাম—এখন তা [illegible]স্তূপে পরিণত। তবুও গরম জল ঠাণ্ডা জল চলবার ব্যবস্থার নিদর্শন সেই ভগ্ন[illegible] কিছু কিছু আছে। এই বাগানের [illegible]নেই একটা বেশ বড় ট্রাউট-পরিবর্ধন কেন্দ্র। রক্ষকেরা খুব আগ্রহ করে [illegible]দের দেখায়, কিন্তু শেষ-কালে [illegible] খুব বেশি। শোনা গেল, এ[illegible] উন্নতির জন্য সম্প্রতি ভারত সরকার পৌনে দু লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন।

আচ্ছাবল থেকেই আমরা ফিরলাম; কারণ ওখান থেকে কোকরনাগ-ভেরিনাগের দূরত্বও কম নয়; আর শোনা গেল, কোকরনাগে একটি ঝরণা ছাড়া নাকি আর কিছু নেই। বিশেষত্ব হল, কোকর, অর্থাৎ মুরগীর পায়ের মত পাহাড়ের গায়ে অসংখ্য ছিদ্র, সেই ছিদ্রপথে ঝরণা বেরিয়ে আসছে। ভেরিনাগে একটি নদী আছে; সেটা হল ট্রাউট-শিকারীদের আস্তা। তাছাড়া নাকি আছে একটি বৃহৎ জলাধার, চন্দ্রভাগার উৎপত্তিস্থল। সেদিকে অগ্রসর না হয়ে অনন্তনাগে ফিরলাম। অনন্তনাগে গরম জল ও ঠাণ্ডা জলের কুণ্ড আছে। গরম জলের কুণ্ডটি ছোট, গন্ধকের গন্ধে পরিপূর্ণ; ঠাণ্ডা জলের কুণ্ডটি বড়, তার মধ্য দিয়ে হুড় হুড় করে একটি ঝরণা বয়ে চলেছে। দুটিই অত্যন্ত অপরিষ্কার।

অনন্তনাগ থেকে আমরা ঊর্ধ্বশ্বাসে এগিয়ে চললাম পহলগ্রামের দিকে। যাবার পথে আর কোথায়ও থামা নয়। কিন্তু পাহাড়ের রাজত্ব শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে
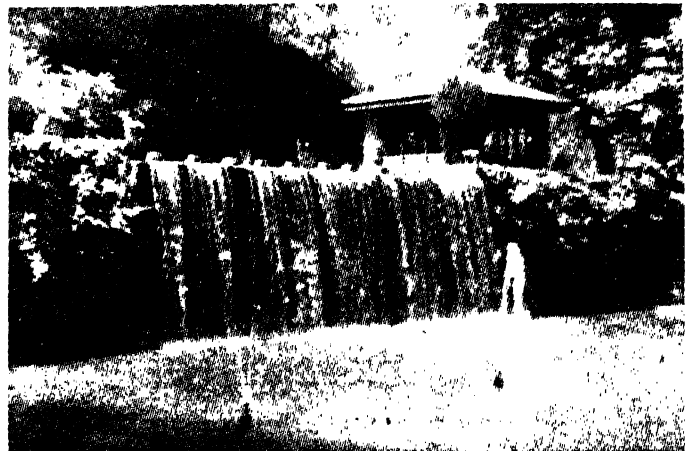
আচ্ছাবল বাগান—মূল ঝরণা

পহলগ্রাম বাজার

আমাদের গতি হয়ে এলো মন্থর। ডানপাশে উঠে গেছে পাহাড়, তার গা কেটে চলেছে রাস্তা। রাস্তার পাশে চলেছে নদী, খরবেগে পাথরের উপর লাফাতে লাফাতে। নদী থেকে নালা কাটা হয়েছে নানা জায়গায়, কোথায়ও-বা ছোট বাঁধ দিয়ে জলের লেভেল উঁচু করে নালা টানা হয়েছে উপর দিকে, রাস্তার পাশ দিয়ে রোদে ঝিক্ ঝিক্ করতে করতে চলেছে নালার জল—রাস্তার এপাশে নালা, ওপাশে নদী। নদীর অপর পার থেকে দিগন্ত পর্যন্ত চাষের জমি, কাঁচা সবুজ ধান বাতাসে হিল্লোলিত। একটু ঠান্ডার আমেজ পাওয়া যায়, পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে বরফমণ্ডিত গিরিচূড়া একটু-আধটু উঁকি-ঝুঁকি মারতে আরম্ভ করে—অপূর্ব দৃশ্য। চিরবসন্তের আভাস মেলে।

পহলগ্রামে পৌঁছতে সময় লাগে অনেকক্ষণ। পাহাড়, বন, নদীর পাশ দিয়ে ঘুরে ঘুরে পথ চলেছে। অবশেষে পৌঁছলাম পহলগ্রামে। প্রথমেই পড়ল বাজার। ছোট পল্লী, মধ্যেখান দিয়ে রাস্তা, দুপাশে কিছু বাড়ি, পোস্টাফিস আছে, বাজারে জিনিসপত্র মন্দ পাওয়া যায় না। ঘোড়া অনেক। তাঁবুও ভাড়া পাওয়া যায়। অমরনাথের যাত্রীরা এইখান থেকে ঘোড়ায় বা পদব্রজে যাত্রা করেন, কোলাহোই তুষার নদীর দর্শকেরাও। পার্বত্য ভ্রমণে যাঁরা খুব মজবুত, তাঁরা অমরনাথের কাছাকাছি গিয়ে কোলাহোই তুষার নদীর মাথা টপকে চলে যান পশ্চিমে সোনামার্গের দিকে, সোনামার্গ গন্ধর্বল হয়ে নেমে আসেন। এ-পথ সাধারণের জন্য নয়, খুব মজবুত পর্বতাচারীদের জন্য। বরফের মধ্য দিয়েই অধিকাংশ পথ নাকি।

আমরা বাজার পার হয়ে পথ যেখানে লিডর নদীর কাঠের পুলের কাছে শেষ হয়ে গিয়েছে, সেখানে এসে থামলাম। প্রথম দর্শনে কাশ্মীরের প্রতি যে অভক্তি হয়েছিল, উলার দেখেও তার সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ হয়নি। কিন্তু এখানে এসে দাঁড়াতেই সকল অভক্তি, ক্ষোভ সম্পূর্ণ ধুয়ে মুছে গিয়ে মনটা কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেল। সামনে বরফমণ্ডিত চূড়া দেখা যেতে লাগল, অমরনাথ না দেখলেও পাহাড়ের তুষারচূড়ায় দেখতে পেলাম মহাদেবের রজতগিরিনিভ প্রত্যক্ষ রূপ। আশেপাশে পাহাড়ের মাথাতেও ইতস্তত ছড়ানো রয়েছে অল্পস্বল্প তুষার রেখা, নেমে এসেছে চূড়া থেকে পাইন বনের তলায় তলায় সেই রেখার ধারা, মিষ্টি ঠান্ডার আমেজ, ঠিক মাঝখান দিয়ে চলেছে ভীমগর্জনে নদী, পাথরে পাথরে জল ছিটকে লাফিয়ে উঠছে, ভেঙে পড়ছে সফেন ধারায়, চারপাশে পাইনের সুবিন্যস্ত সারি; ইতস্তত তাঁবু খাটিয়ে দর্শকেরা বাস করছেন। সামনেই পড়ে আছে মহাতীর্থ অমরনাথের পথ। পথ খোলা থাকলে তিনদিনে পৌঁছন যায়। চোদ্দ হাজার ফুটে পাহাড়ের গায়ে বিরা[ট] গুহা। গুহার ছাদ হতে টপ টপ করে জ[ল] ঝরে নাকি শিবলিঙ্গের উপর। গুহা[র] মেঝেতে বরফে নাকি বিরাট শিবলিঙ্গ আপনা আপনি গড়ে—সেই সঙ্গে পার্বতী ও গণপতি মূর্তিও। পথে কষ্ট আছে, তুষার-ঝড় আছে; তবু প্রতি বছর অগণিত যাত্রী আসেন শ্রাবণ-পূর্ণিমার দিন দর্শন করতে। সে সময় সরকারী ব্যবস্থা হয় পথ পরিষ্কারের, ডাক্তারখানার। ঐদিন নাকি কয়েকটি পায়রা দেখা যায়, তীর্থযাত্রা সফল হয় না, যাঁরা পায়রা দেখতে পান না। শিবলিঙ্গের নাকি তিথি অনুসারে হ্রাসবৃদ্ধি হয়; শ্রাবণ পূর্ণিমায় তাঁর পূর্ণতম আকার। শ্রীযুত নির্মলকুমার বসুর মুখে শুনেছি, নবেম্বর মাসে গিয়ে তাঁরা কোনও মূর্তিরই দর্শন পাননি। জনশ্রুতি অমাবস্যার দিন নাকি কোনও মূর্তিই থাকে না, আবার পূর্ণিমায় তাঁদের পরিপূর্ণতা। এই মহাতীর্থের উদ্দেশে প্রণাম জানালুম। শোনা গেল অমরনাথের কাছেই নাকি শেষনাগ হ্রদ। আমরা থাকতে থাকতে এক পাঞ্জাবী দল গিয়েছিলেন বরফ ভেঙে। তাঁদের মুখে শুনলাম এখনও বরফ যথেষ্ট। কিন্তু শেষনাগে পৌঁছতেই তাঁরা দেখলেন অর্ধেক তুষার গলেছে; চারদিকে পাহাড় বরফের মধ্যে খানিকটা জল দেখা যাচ্ছে। গভীর স্বচ্ছ নীল, তার উপর ভেসে বেড়াচ্ছে তুষারের পিণ্ড। অপরূপ দৃশ্য। তখনও বরফ গলেনি, তাই অমরনাথ যাত্রা আমাদের হল না; কিন্তু মনে হল কোথায় শ্রীনগর আর কোথায় অমরনাথ বা শেষনাগ হ্রদ বা কোলাহোই তুষার নদী। কলকাতা দেখে বরং বাঙলাদেশ চেনা যায়; কিন্তু শ্রীনগর দেখে কাশ্মীর কদাপি নয়।

পহলগ্রামে থাকবার জায়গা বেশি নেই। তিনটি মাত্র হোটেল আছে, প্লাজা, ওয়াজির এবং খালসা হোটেল। গাইডবুকে এদের খরচপত্র একরকম লেখা থাকে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাস্তবের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। এখানকার সর্বশ্রেষ্ঠ হোটেল হ'ল প্লাজা হোটেল, কিন্তু তার চেহারা দেখে মনে হল নেড়ু হোটেলও এর তুলনায় স্বর্গ। আহার্য এবং বাসনপত্র ময়লা এবং অপরিষ্কার; আমরা এক ফ্লাস্ক দুধ-চিনিবিহীন শুধু চা নিয়েছিলাম এখানে, তারই মূল্য দিতে হল সাড়ে সা[ত] টাকা; কৈফিয়ৎ—আজকাল প্লেনে স[ব] জিনিস আনতে হয় শ্রীনগর পর্যন্ত, তারপ[র]

পহলগ্রামের পথ—লিডর নদী

পহলগ্রাম : পথের শেষ : তুষারচূড়ার শুরু : পাইন বন

এতদূরে মোটরে। মোটরের তেলও তো আনতে হয় ঐ প্রকারে। অগত্যা চুপ করে যেতে হল। এইসব হাঙ্গামা থেকে বেঁচে অথচ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে বাসা করতে গেলে পহলগ্রামে তাঁবুতে থাকা উচিত। আসবাব, বাসনপত্রসমেত তাঁবু পহলগ্রামেই ভাড়া পাওয়া যায়, শ্রীনগর থেকেও ব্যবস্থা করতে পারা যায়। ইলেকট্রিকের অভাব নেই; তাঁবু ভাড়া করলেই সেই সঙ্গে তাঁবু খাটাবার জমির জন্য সরকারকে দু-এক টাকা দক্ষিণা দিতে হয়, সঙ্গে সঙ্গেই সরকার থেকে বৈদ্যুতিক আলোর সংযোগ ও মেথরের বন্দোবস্ত করে দেওয়া হয়—আলো জ্বালবার খরচ মিটার দেখে দিতে হয়; মেথরকেও আলাদা কিছু দিতে হয়। নদীর ধারে এরকম বহু তাঁবু পড়েছে, কেও-বা দূরে পাহাড়ের উপর নির্জনে পাইনবনে তাঁবু খাটিয়েছে, ঝির-ঝিরে শীতল মধুর হাওয়া, বেগবতী নদী; চারপাশে পাহাড়,—এর মধ্যে তাঁবুতে বাস না করলে এই সৌন্দর্য পরিপূর্ণ উপভোগ করা যায় না; শ্রীনগরে হাউসবোটে কিছুদিন বাস, আর পহলগ্রামে তাঁবুতে—কাশ্মীর-যাত্রীদের পক্ষে এ দুটি অবশ্য কর্তব্য।

অবশেষে পহলগ্রাম ছেড়ে ফিরবার পথে রওনা হতে হল। পথে দুটি জিনিস দেখা গেল। বুমজো নামে একটি জায়গায় রাস্তা থেকে কিছু উপরে পাহাড়ের গায়ে দুটি গুহা, একটি গুহার ভিতর একটি শিবলিঙ্গের মত আছে। অপর গুহাটি বন্ধ। সেটির নাকি শেষ নেই। অনেক লোক নাকি তার শেষ আবিষ্কার করতে গিয়ে আর ফেরেনি: সেজন্য সেটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এরই কিছু দূরে মার্তণ্ড্য বা মাউন বা বওয়ন। এখানে সূর্যের জন্মভূমি বলে লোক-প্রসিদ্ধি। বামাদিত্য এবং পরে ললিতাদিত্য প্রায় দেড় হাজার বছর আগে যে মন্দিরটি গড়ে ছিলেন, সেটি রাস্তা থেকে প্রায় দু'মাইল দূরে পাহাড়ের উপর, আজ তার সুবিশাল ধ্বংসস্তূপ ছাড়া কিছুই নেই; তবু তার পাথরে খোদাই কারুকাজ আর Trifoil Archগুলি অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিচ্ছে। পথের পাশেই বর্তমান মার্তণ্ড্য মন্দির। দরজার কাছে পৌঁছতেই ঝাঁকে ঝাঁকে পাণ্ডারা ঘিরে ধরল। "আপনার নামটা কি? না হলে অন্ততঃ পদবীটা বলুন। ঘোষ, বোস, বাঁড়ুয্যে, লাহিড়ী? আমি শোভাবাজার চিনি, স্যার রাধাকান্ত দেবের বাড়ী আমার যজমান। নামটা তো বলে ফেলতেই হয়, তা নাহলে পুণ্য হবে না।" আমরা যত বলি আমাদের পুণ্যে প্রয়োজন নেই, আমাদের কোনও নাম নেই, আমাদের বাড়ী ভারতবর্ষ, আমরা জাতে মানুষ,—ততই তাদের চ্যাঁচামেচি বাড়তে থাকে। বহু তীর্থ দেখেছি, গয়া পুরী কাশী এলাহাবাদ দেওঘর ঘুরেছি, কিন্তু এরা এ সবার বাড়া। পরশুরামের কেদার চাটুজ্যে হলে বলতেন, তাঁকে ভূতে ধরেছে বাঘে তাড়া করেছে, কিন্তু এমন বিপদে তিনি কখনই পড়েন নি। একজন রবীন্দ্রনাথ ও রথীন্দ্রনাথের সই দেখালেন তার খাতা খুলে, সইটা ঠিক বলেই মনে হল, যদিচ সন্দেহ একেবারে গেল না। অনেক কষ্টে তাদের হাত হতে মুক্তি লাভ করে মন্দিরটি দেখা গেল। মন্দিরের সামনেই একটি সুন্দর স্বচ্ছ জলভরা কুণ্ড, কুণ্ডে হাজার হাজার ছুরী মাছ পালন করা হচ্ছে, এক টুকরো রুটি ফেলে দিলে তারা সকলে তীরবেগে ছোটে। কুণ্ডের উপর বর্তমান মার্তণ্ড্য মন্দির। মন্দিরটি ছোট, তার মধ্যে শ্বেত পাথরে সপ্তাশ্ব বাহিত রথে সূর্য মূর্তি। সূর্য মূর্তিটির front view, কিন্তু রথ ও অশ্ব Profile, জয়পুরী কাজ যেমন হয়, সেইরকম মোটা মোটা খোদাই, কোনও সূক্ষ্ম কারুকাজ নেই। পাণ্ডাদের জিজ্ঞাসা করলুম, এ মূর্তি কতদিনের এবং এই মূর্তিই আগে ললিতাদিত্যের মন্দিরে ছিল কিনা? উত্তরে কোনও জনশ্রুতিরও খবর পাওয়া গেল না, কেবল শুনলাম এই মূর্তি অনন্তকালের।

ফিরবার পথে আবার অনন্তনাগ খান্নাবাস অবন্তীপুর পেরিয়ে বিজবাহার বলে একটা ছোট পল্লীতে থামলুম। এখানে পথের ধারে একটি চেনার বাগান আছে, তার মধ্যে তলায় বেদী বাঁধান একটি সুবৃহৎ চেনার গাছ আছে, কাশ্মীরের নাকি সেইটিই সবচেয়ে বড় চেনার গাছ। আমরা তার তলায় বসে চা-পান করছি, বিকেল শেষ হয়ে আসছে, এমন সময় উঠল প্রচণ্ড ঝড়, ধুলোর আঁধি এবং একটু পরে ধারাবর্ষণ, ঝড় বর্ষণ কাশ্মীরে বেশি নেই, এই প্রথম পরিচয়। তার মধ্যেই কোন রকমে শ্রীনগরে হাউসবোটে এসে পৌঁছেছি, ঝড় তীব্র হতে তীব্রতর হতে লাগল, ঝিলমের জলস্রোত প্রচণ্ড গর্জনে আছড়ে পড়তে লাগল বোটের গায়ে, অতবড় বোট বেশ দুলছে, হঠাৎ ইলেকট্রিক তার গেল ছিঁড়ে, চারপাশে নিবিড় অন্ধকার, বোট আরও দুলছে বেশ দুলছে, সহসা সেই ঝড় জলের মধ্যে বোটের মাঝিরা টর্চ হাতে লাফিয়ে পড়ল তীরে, একটা শিকলের খুঁটি গেছে উপড়ে, বাঁধো আবার জোর করে শিকল, তবু ঝিলমের গর্জন

বাড়ছে, ঝড় বাড়ছে, আবার বোট দ্বলছে, নিস্তব্ধ অন্ধকারে আমরা কলকল শব্দ শ্বনছি, অন্বভব করছি ঝিলমের আজ এ কী র্প!

দ্বলছে তরী—নদীর স্রোতে তরঙ্গ বন্ধ্বর! অথচ পরদিন সকালে মেঘ কেটে গেল, বর্ষাস্নাত আকাশ গভীর নীলে পরিব্যাপ্ত, মিঠে সোণালি রোদ আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে, পাহাড়ের চেহারা আরও নীল, বরফ ঝক্‌ঝক্ করছে, নদীর জল বেড়েছে, পরিষ্কার টলটলে স্রোত খরতর বেগে চলেছে, ডাল লেক ক্লে ক্লে ভরা, হাওয়ায় ছোট ছোট ঢেউ উঠছে, ভাসমান বাগানগ্নলিতে চাষীরা কর্মব্যস্ত, শাদা শাদা পর্দা উড়িয়ে চলেছে অজস্র শিকারা পাখ্না খোলা উড়ন্ত বকের মত। প্র্বরাতের দ্বর্যোগ সাময়িক দ্বঃস্বপ্নের মতই লয় পেয়ে গেছে। অকস্মাৎ দ্বর্যোগের পর একটি পরিপ্র্ণ দিন।

(আগামীবারে সমাপ্য)

সংগীতের শ্রেষ্ঠত্ব

শ্রীসত্যকিংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের দেশে সংগীত পরিবেশকদের মধ্যে কয়েকটি সম্প্রদায় আছে। তার মধ্যে কাব্য সংগীত, আধ্বনিক ও ওস্তাদি বা মার্গ সংগীত এই তিন পর্যায়ের সংগীত পরিবেশকই প্রধান।

সাধারণের জন্য এই তিনটি শ্রেণীর সংগীত সম্বন্ধে কিছ্ব আলোচনা করার আবশ্যক আছে মনে করে লিখ্তে চেষ্টা করলাম।

কাব্য সংগীত বলতে ব্বঝি যে সকল গান বড় বড় কবিদের দ্বারা রচিত হয়ে তার ভাষাতে মার্গ সংগীতের এটা ওটা রাগের কিছ্ব কিছ্ব বা অনেকখানি অংশ নিয়ে আবার কোন কোন গানে তার সংগে কীর্তন, বাউল ইত্যাদি ভাবপ্রবণ গানের স্বর ছ্বঁইয়ে গানের স্বর রচিত হয়েছে। এই গানে আনে মনের ভিতর ভক্তিভাব ও ঈশ্বরান্বভূতি। এই সংগীতের আর একটি প্থক সাম্রাজ্য গড়ে দিয়ে গেছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ।

আধ্বনিক গান মানে যার মধ্যে ভাবের এবং স্বরের কোন প্রাচীনত্ব নেই অর্থাৎ বনেদি ও খাঁটি বলে কিছ্বই নেই। কতকগ্বলি স্ববিধালোভী ব্যক্তি বেশীর ভাগ জনসাধারণের অজ্ঞতার স্বযোগ নিয়ে অনেক ম্বখরোচক স্বর ও ভাষার অস্বাস্থ্যকর সংগীতের ব্যবসা চালিয়ে সাধারণ লোকের র্বচি ও মনের অবনতি ঘটাচ্ছেন। এই শ্রেণীর সংগীতপরিবেশকদের বেশ চতুর বলা যায়। কারণ তাঁরা ব্বঝে নিয়েছেন সহজে পয়সা ও নাম করতে হলে এত বড় জাতটার কাছে কিরকম জিনিস ছড়ান দরকার। আমাদের এখন পয়সাটাই সবচেয়ে বড় হয়েছে। এই পয়সার জন্য জাতির সব রকম অনিষ্ট করতে পিছ্পা নই। যে গানের ভাব ও স্বর মান্বষের মনের কোন প্রসারতা ও উন্নতি আনে না, বিশ্বদ্ধ তৃপ্তি ও আধ্যাত্মিক পথে নিয়ে যায় না সেই গানের চাহিদাই বেশী। তাকেই আমরা পয়সা দিয়ে শিখি এবং পয়সা দিয়ে শ্বনি। আমাদের বিচার শ্বন্যতার প্রমাণ এর চেয়ে আর কি থাক্তে পারে?

আমার কাছে সেদিন একজন মহিলা এসে বলেন, আমি আপনার কাছে এসেছি ওস্তাদি গান শিখ্ব কিন্তু তার সংগে আমাকে আধ্বনিক গানও শেখাতে হবে। আমি উত্তরে বল্লাম দ্বিতীয় আকাঙ্ক্ষার গান শেখান আমার পক্ষে অসম্ভব। কারণ, ও গান শিখ্তে যাওয়াও যেমন অন্যায় শেখানও তেমনি অন্যায়; কারণ ও গানের জন্য টাকা দেওয়াও পাপ এবং নেওয়াও পাপ মনে করি। আধ্বনিক গানের পরমায়্ব এত ক্ষীণ যে, জন্মাবার দ্ব-চার দিনের পরেই তার জীবনীশক্তি ফ্বরিয়ে যায় অর্থাৎ অতি সহজসাধ্য স্বর ও ভাষা ঐ শ্রেণীর খদ্দেরদের ম্বখে অনবরত বমন হয়ে ত্যাজ্য হয়ে যায়।

ওস্তাদি গান তাকে বলে যাকে শিখ্তে হলে বহ্ব বৎসর সদ্গ্বর্র নিকট শিক্ষা করতে হয়, নিষ্ঠাপ্র্বক তপস্যার মত সাধনা করতে হয়। যার এক একটা রাগের সীমা পরিসীমা নেই—অনন্ত সম্বদ্র বিশেষ, যার স্বর ও ছন্দ অমরত্ব লাভ করেছে তাকে বলে ওস্তাদি বা মার্গ সংগীত। ঐ সংগীতকেই স্বধীসমাজ ও ঋষিরা বলেছেন 'ন বিদ্যা সংগীতাৎ পরা'। এই ওস্তাদি গান কয়েক বৎসর প্র্বেও অধিক লোকে আগ্রহ করে শ্বন্ত এবং শেখ্বার ও ব্বঝবার চেষ্টা করত। বাজে ও সস্তা গানের চলন একরকম মোটে ছিল না বলা চলে। আমি বাল্যকাল হ'তে বাংগলার বহ্ব পল্লীতে গিয়ে দেখেছি প্রত্যেক পল্লীতেই অন্তত একটা ক'রে তম্ব্রা ও পাখোয়াজ থাকত। পল্লীর লোকেরা তখন প্রত্যহ সন্ধ্যার পর বৈঠকী গানের আসর বসাত। এখন সে সব প্রায় একেবারেই শ্বন্য হয়ে গেছে। তার স্থান অধিকার করেছে দ্ব-একটা হারমোনিয়ম ও সিনেমার সস্তা গান।

এখন সংগীতের ম্বল বিষয় সম্বন্ধে অর্থাৎ মার্গ সংগীত সম্বন্ধে কিছ্ব বলবার আছে।

মিশ্রিত স্বরের প্রচলন-প্রয়াসী অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির ম্বখে শ্বনি এবং তাঁদের সংবাদপত্রে বা মাসিকে লিখ্তেও দেখি যে, তাঁরা বলেন, "স্ষ্টি বর্ণসংকর, একরঙা স্ষ্টি নেই। মিশ্রণ গ্রাহ্যত বটেই আর এই মিশ্রণের লীলায় হ'ল স্ষ্টিকর্তার র্পস্রষ্টার, কলাবিদের পরিচয়।" স্ষ্টি বহ্বর্পী, একথা সত্য কিন্তু গবেষণার দ্বারা বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তার গ্বহ্য রহস্য যাই থাকুক র্প হিসাবে স্ষ্ট বস্তুর প্রত্যেকটাকে আমরা প্থকভাবে দেখি ও বলতে অভ্যস্ত হয়েছি। যেমন জল, স্থল, বৃক্ষ, পশ্ব, পক্ষী ইত্যাদি। বাঘ থেকে বাঘের জন্ম, সিংহ থেকে সিংহের জন্ম হয় এইটিই আমরা বাস্তবতার বিচারে জেনে আস্ছি। ব্যতিক্রম হলে তাকে শাস্ত্রকারেরা পর্যন্ত বর্ণসংকর বলে অভিহিত করেছেন। তেম্বনি সংগীতের ম্বল বস্তুগ্বলিকে আমরা বর্ণসংকর বল্তে পারি না বা বলা উচিতও মনে করি না। বৈজ্ঞানিক নিয়মে হয়ত একরঙা স্ষ্টি নেই কিন্তু সাদা, লাল, কালো ইত্যাদি রংকে আমরা এক একটা প্থক র্পেই দেখি। মিশ্রণ গ্রাহ্য, মিশ্রণের লীলার স্ষ্টিকর্তার, র্পস্রষ্টার ও কলাবিদের যথার্থ পরিচয় এ কথা মান্তে হলে, কোন শিল্পকে যথার্থর্পে রক্ষাকল্পে তা ভীষণ অনিষ্টই সাধন করবে। কোন চিত্র শিল্পীকে কোন জিনিসের প্রকৃত র্পের পরিবর্তে বহ্ব র্পের মিশ্রিত র্প অংকনকেই যথার্থ স্রষ্টা ও কলাবিদের সম্মান দেওয়া হয় কিনা জিজ্ঞাস্য আছে। কোন কবি যদি অতি স্বললিতভাবে নানান ভাষা মিশ্রিত করে

বিতা রচনা করেন তবে সেই কবিকেই যথার্থ রূপ-রস স্রষ্টা ও কাব্যরসিক বলে স্বীকার করা হবে?

নানান রংয়ের ফুল কোন্ কোন্ বস্তু দিয়ে কে সৃষ্টি করেছিল তার মূলতত্ত্ব ও অনুসন্ধানটাই বড় কথা নয় এবং তার মিশ্রণকে বড় বলে প্রচার করার কোন সার্থকতা ও উন্নতি নাই। প্রত্যেক ফুলের আদর করা, যে রং-এর যে ফুল তাকে সেই রং-এ চিনে রাখা, পাবার জন্য চেষ্টা করা এবং প্রত্যেকটির সৌরভ অনুভব করে তৃপ্ত হওয়া; এই হল প্রকৃত বস্তুকে রাখবার সার্থকতা ও উপযুক্ততা। এমনিভাবে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রত্যেক রাগকে যথাযথভাবে রক্ষা করে তার সাধনায় রাগ থেকে নব নব বৈচিত্র্যে বিকশিত করে তোলাই প্রকৃত সাধক ও রূপস্রষ্টা কলাবিদের পরিচয়।

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সাধনায় রাগ-রূপ যখন খেলে আসে তখন সাধক প্রত্যেক রাগকে নিয়ে অন্তহীন বৈচিত্র্যের দ্বারা নিত্য নূতন রূপ সৃষ্টি করতে থাকেন। সেইখানেই হল যথার্থ কলাবিদের পরিচয়, যার তুলনা কোন কিছুর মধ্যে নেই। যাঁরা একথা মানতে চান না তাঁদের সঙ্গীতের রূপ সম্বন্ধে উচ্চ কোন ধারণা আছে বলে মনে করি না।

আজ পর্যন্ত কোন গুণী গায়ক বা বাদক সঙ্গীতের বর্ণসংকরকেই যথার্থ শিল্প বলে মেনে নিয়েছেন, এমন কোন প্রমাণ নেই।

উচ্চ সঙ্গীতে যে সকল মিশ্র রাগ আছে তার মধ্যে বহু রাগই অবহেলিত ও লুপ্ত হয়ে গেছে। তার কারণ মিশ্রণ-জিনিসে রূপ-বলিষ্ঠতা ও বৈচিত্র্যের অভাব খুবই থাকে। অনেকের মধ্যে দু-চারিটি যা উৎরে গেছে তারাই আছে টিকে। কিন্তু যেমন প্রধান কয়েকটি রংএর দ্বারা কোন কোনটা মিশ্রিত হয়ে অন্য রংএর সৃষ্টি হলেও তার মধ্যে তৈরি করবার একটা বিশুদ্ধ নিয়ম প্রণালী আছে, তেমনি মিশ্রণ রাগেরও একটা নিয়ম পদ্ধতি আছে; যার বশবর্তী হয়ে সেই মিশ্রিত রাগটাকে যথার্থভাবে রক্ষা করবার দায়িত্ব থাকে। তাছাড়া ঐ সকল রাগেও বহুল পরিমাণ সাবলীল গতিভঙ্গী ও রাগের রূপ-ছন্দ প্রকাশের উপায় আছে বলেই তা সঙ্গীতজ্ঞদের গ্রহণযোগ্য হয়ে আছে।

পাঁচমিশেলি গীতের সুরের মধ্যে কোনরূপ নিয়ম পদ্ধতি নেই—একঘেয়ে মাত্র। যেন সস্তা ক্যামেরায় তোলা ক্ষুদ্র ফটোর শীর্ণ ও দরিদ্র চেহারার নেগেটিভ্। যতই প্রিন্ট করা হোক না কেন সেই একইরকম ছাড়া রূপের বিভিন্ন প্রকাশ কিছুই আসবে না।

যতপ্রকারের সঙ্গীতই সৃষ্টি হোক না কেন তার মধ্যে যদি তপস্যার মত যথার্থ শিক্ষা ও সাধনা না থাকে তবে জনসাধারণের কাছে তার চাহিদা যতই বাড়ান যাক্ না কেন তার স্থান বেশীদূর উচ্চে নয় এবং পরমায়ুও বেশীদিন নয় এ কথা স্বীকার করতেই হবে।

পাঁচমিশেলি সুরের গানে যে প্রকারের যতটুকু সুর থাকে তার কথাকে বাদ দিয়ে সুরটাকে যদি তেরে নেরি করে গাওয়া যায় আলাপের মত করে, তা হলে তার সুরের মহিমা ও মাধুর্য কতটুকু থাকে? সুরের রূপনতা প্রকাশ হয়ে তার স্বরূপ ধরা পড়ে যায় না কি? এজন্য প্রকৃত সুর শিল্পীরা কোন গণ্ডিবদ্ধ সুরের মধ্যে ঢুকতে চান না। সুরের মধ্যে যেখানে সৃষ্টির স্বাধীনতা নেই সেখানে শিল্পীরা তার পিঞ্জরে ঢুকতে যাবেন কেন?

পরিশেষে আমার বিশেষ বক্তব্য এই যে, সঙ্গীত যাঁরাই শিক্ষা করবেন তারা প্রথমত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতকে ভালভাবে দখল করে সঙ্গীতের শক্তিকে আয়ত্ত করে তার বিরাট মহিমার স্বরূপ উপলব্ধিতে এনে তার পর অন্যান্য সঙ্গীত প্রয়োজন বুঝে বেছে নিতে সমর্থ হবেন। এজন্য সকলের কর্তব্য আছে সঙ্গীত সম্বন্ধে কোন কিছু প্রবন্ধ, আলোচনা, বক্তৃতাদি ও প্রচার করতে হলে সর্বাগ্রে বিশুদ্ধ রাগসঙ্গীতকে শিক্ষা করা উচিত বলে জানাতে হবে। সাধনার বস্তুকে লাভ করলে তবেই জীবনের মান উন্নত হয়।

পুরাণ ও ইতিহাসে দেখা যায়, যে সকল রাজা, মহারাজা, সম্রাট, মার্গসঙ্গীতের গুণগ্রাহী ছিলেন তাঁদের সঙ্গীতময় জীবনই এনে দিয়েছিল মনের প্রসারতা। এজন্য দেখা যায় তাঁরাই বেশী করে দেশের হিতার্থে কাজ করে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। বহুর মধ্যে একটি উদাহরণ সম্রাট আকবর এবং সঙ্গীতজ্ঞের যথার্থ সম্মানে 'তানসেন'।

আমার কথা

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

আজকের এই অনুষ্ঠানে* যাঁরা উপস্থিত তাঁদের যথাযোগ্য সম্ভাষণ জানাচ্ছি।

হুকুম হয়েছে কিছু বলতে হবে। এমন ক্ষেত্রে বলা বড় কঠিন, তাই ত্রুটি হলে ক্ষমা করতে হবে।

যাঁদের চিরদিন ভালবাসি তাঁদের এখানে একত্র সম্মিলিত দেখে আজ আমার যে আনন্দ তা অবর্ণনীয়। শুধু আনন্দ নিয়েই শেষ হলে ভাল হত। তবু বলতেই হবে। তাই সেই সব স্নেহাস্পদ ছাত্রদের বলব যাদের 'তুমি' বলে সম্বোধন করতে পারি। উপস্থিত যাঁরা বড় আছেন তাঁরা আজ ক্ষমা করুন।—

হে আয়ুষ্মানগণ, তোমাদের শ্রদ্ধা-প্রীতি অমৃতের মত। কিন্তু সম্মান জিনিসটি বড় সাংঘাতিক. সেই কালকূটকে নীলকণ্ঠ ছাড়া কে কণ্ঠে ধারণ করতে পারে?

এখানে সম্মানের আসল পাত্র গুরুদেব। তাঁরই একটি কবিতা আজ মনে আসছে—

রথযাত্রা, লোকারণ্য, মহাধুমধাম,
ভক্তেরা লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম।
পথ ভাবে আমি দেব, রথ ভাবে আমি,
মূর্তি ভাবে আমি দেব, হাসে অন্তর্যামী।

এখানে **আমার** আবার সম্মানের কথা কি?

৭ই পৌষ শান্তিনিকেতন আম্রকুঞ্জে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রীকে আশ্রমিক সংঘ কর্তৃক শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন। শাস্ত্রীমহাশয়ের দক্ষিণে উপবিষ্ট শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বামে শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়

আমরা **তাঁর** সাধনা নিয়েই অগ্রসর হয়েছিলাম।

আকাঙ্ক্ষা যতই হোক শক্তি বড় কম ছিল—

শক্তি মোর অতি অল্প, হে দীনবৎসল
আশা মোর অল্প নহে।

তাই **আমার** কথা না বলে', **যাঁর** সাধনা **তাঁর** কথাই বলব। আমরা সব **তাঁরই** মধ্যে আপনাকে ডুবিয়ে ফেলতে বাধ্য। গীতায় আছে—

যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে।

(২-৪৬)

এখন বলতে চাই কি করে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হল।

তোমরা ভাগ্যবান বাংলা দেশে জন্মেছ। ছেলেবেলা থেকে গুরুদেবের নাম জান। আমার জন্ম বাংলার বাইরে। সেখানে তখন বাংলা ভাষা বা সাহিত্যের কোন চর্চা ছিল না। বাঙালী ছেলেরা পড়তেন উর্দু, হিন্দী। আমার তবু বাংলার বর্ণপরিচয় ঘটেছিল 'শিশুবোধক' পড়ে'। আর আমার পুঁজি ছিল কীর্তিবাস, কাশীদাস, কাশীখণ্ড ও কালিকাবিলাস। সবই বটতলার ছাপা।

তবু আমার সৌভাগ্য আমার বিদ্যা-আরম্ভ হয়েছিল সংস্কৃত নিয়ে। তখন কাশীতে যেসব মহা মহাপণ্ডিত ছিলেন তাঁরা কেউ গৃহী কেউ সন্ন্যাসী, কিন্তু তাঁরা প্রত্যেকে এক-একটি দিক্‌পাল বৃহস্পতি-তুল্য। এমন যোগাযোগ শত শত বৎসরেও ঘটে না।

তাঁদের চরণ-তলে বসে পড়েছি, আর আমার মন ছিল ব্যাকুল কবীর-দাদু প্রভৃতি ভক্ত সন্তদের বাণীর জন্য। সাধুসন্তদের খবর পেলেই তাঁদের সঙ্গ নিয়েছি। ১৮৯৫ সালে ২০শে মাঘ আমি তাঁদের অন্তরঙ্গদলে যোগ দিই। সন্তবাণী এবং উপনিষদ্ ছিল আমার উপজীব্য। বয়স যদিও ছিল আমার অল্প কিন্তু উৎসাহের কমতি ছিল না।

বাংলা সাহিত্যের কোনো খবর তখন রাখিনি। ১৮৯৭ সালে বরিশাল থেকে বিপিন দাশগুপ্ত কাশীতে গেলেন। বরিশালে তখন রবীন্দ্রকাব্যানুরাগের বন্যা এসেছে। তাঁর কাছেই রবীন্দ্রনাথের কথা শুনলাম।

বিপিনবাবু রবীন্দ্রকাব্য কিছু পড়ে শোনালেন। আমি সেই কাব্যের মধ্যে চির-পরিচিত উপনিষদ্ ও সন্ত-কবিদের ভাব দেখতে পেলাম। তখন থেকেই রবীন্দ্রনাথ আমার পরমাত্মীয়।

না পড়েই অনেকে বলেন রবীন্দ্রকাব্য দুর্বোধ্য। তখন কাশীতে বসন্তকালে বুঢ়ুয়া-মঙ্গলের মেলা হত গঙ্গার উপরে নৌকায়। একদিন রাত্রে একখানি নৌকো ডুবল। উনিশজন লোক, সবাই প্রাণ দিল, অথচ সেখানে মাত্র এক-বুক জল! তারা একবার মাটিতে পা ছুঁইয়েও দেখল না। আমরা মরতে রাজী কিন্তু পরখ করে দেখতে রাজী না। আমরা না পড়েই মনে করি রবীন্দ্রকাব্য দুর্বোধ্য।

তখন রবীন্দ্রকাব্যের একটি টালি-সংস্করণ ছিল। ১৮৯৭ হ'তে বছর সাতেক ঐরূপ একখানি রবীন্দ্র-কাব্যগ্রন্থাবলী আমার চির-সঙ্গী ছিল। তার কবিতাগুলির পাশে পাশে সব পুরাতন ভক্তবাণীর উল্লেখ করে রাখতাম। রবীন্দ্রকাব্য যে কত ভালো লাগত কী বলবো? সন্তবাণী তো শত-শত বছরের পুরানো আর রবীন্দ্রনাথ জীবন্ত। এতদিন খেতাম আমসী, এখন পেলাম টাটকা ল্যাংরা আম। ধন্য হয়ে গেলাম।

---

* শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ কর্তৃক প্রদত্ত শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের উত্তরে আচার্যর ভাষণ

যাঁকে ভালোবাসি তাঁকে দেখতে ইচ্ছা হয়। কাগজে দেখলাম রবীন্দ্রনাথ মিনার্ভা থিয়েটারে স্বদেশীসমাজ প্রবন্ধ পড়বেন।

১৯০৪ সাল, শ্রাবণ মাস। ঘণ্টাখানেক আগে মিনার্ভা থিয়েটারে গিয়ে ঢুকতেই পারলাম না। একটা জামা-ই বিসর্জন দিয়ে এলাম।

মনটা বিষণ্ণ। হঠাৎ কাগজে পড়লাম, প্রবন্ধটা আবার তিনি কার্জন থিয়েটারে পড়বেন। এবার ঘণ্টা চারেক আগে গিয়ে বসে রইলাম। তাঁর স্বরূপ আর তাঁর পড়ার রীতি দেখে মনে যে বিস্ময় জাগল তা আর বর্ণনা করব কেমন করে?

ফিল্ড্ এন্ড একেডেমি বলে একটা সমিতি শিবনারায়ণ দাসের লেনে তখন ছিল। জায়গাটা নাকি বিপ্লবীদের আড্ডা। সেখানে কবি সন্ধ্যায়—সন্ধ্যায় তরুণদের কিছু বলতেন। সন্ধান পেয়ে কয়টি সন্ধ্যায় সেখানে গেলাম। মুগ্ধ হলাম, কিন্তু তিনি এত বিরাট যে পরিচয় করবার সাহস পেলাম না। দূর থেকেই তাঁকে প্রণাম করে কাশী ফিরে এলাম।

এর পরেই এল স্বদেশী-আন্দোলনের যুগ। গ্রামে গ্রামে বউ-ঝিরা পর্যন্ত মেতে উঠেছেন। গ্রীষ্মকাল, বৈশাখ মাস। আমার পিতৃভূমি সোনারং গ্রামে (ঢাকা জেলায়) গিয়ে শুনি—একদল স্বদেশী বক্তা এসেছেন। গ্রামের বউ-ঝিরা মা-বোনের মত তাঁদের সেবা করছেন।

দলের যিনি প্রধান তিনি উৎসাহে ভরপুর, কিন্তু শরীর অপটু। তাঁর সেবার দরকার। তাঁর নাম কালীমোহন ঘোষ। দুই-দিনেই তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল। তিনি রবীন্দ্রনাথের পরম ভক্ত। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এবং তাঁর গ্রামের কাজে কালীমোহনবাবুর ব্যক্তিগত পরিচয় আছে।

কালীমোহন আমার ছোট ভাইয়ের মত হয়ে গেলেন। সারা বিক্রমপুর তাঁর স্বদেশী বক্তৃতার 'প্রোগ্রাম' (programme) ছিল। তিনি আমার মুখে রবীন্দ্র-কবিতা শুনে আমাকে চেপে ধরলেন। আমাকে নিয়ে গ্রামে—গ্রামে 'বক্তৃতা করে বেড়ালেন। গ্রীষ্মকাল গেল। আমাকে পশ্চিমে ফিরে যেতে হ'ল।

১৯০৭ সাল, ডিসেম্বর মাস। আমি হিমালয় আছি। পোস্টাফিসে গিয়ে একখানি চিঠি পেলাম। অপূর্ব হস্তাক্ষর। খুলে দেখলাম লেখক শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি আমাকে শান্তিনিকেতনে আশ্রমের কাজে ডাক্‌ছেন।

আশ্রমের কাজ! কোন্ সাহসে যোগ দেব! তাঁকে নিজ অযোগ্যতার কথা জানালাম। তিনি কিছুই মানলেন না, লিখলেন, "চলে আসুন"।

সংসারী মানুষ। বড় ভাই মারা গেছেন। পুত্রশোকাতুর বৃদ্ধ পিতা শক্তিহীন। সব ভার আমার উপর। আশ্রমের কাজে যোগ দেব কোন্ সাহসে? হিমালয়ের কাজে ভবিষ্যৎ ছিল। কাশীর কলেজের ইংরাজ অধ্যাপকরাও ভালোবাসতেন, তাঁরাও ডাকছিলেন। কবিরাজীটাও পড়া ছিল—এই কুলবিদ্যা নিয়ে কলিকাতায় বসবার কথা সবাই বলছিলেন, অন্য দিকেও ডাক ছিল। অথচ মনটা ঝুঁকে পড়েছিল কবিগুরুর ডাকে।

বাধা দিচ্ছেন সবাই। একমাত্র ভরসা দিলেন আমার মা। তাই কবিগুরুর আহ্বান স্বীকার করলাম, তাঁকে পত্র দিলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ আসতে লিখলেন। একটা মাসিক বৃত্তিও নির্দেশ করে দিলেন।

১৯০৮ সাল, এপ্রিল মাস। হিমালয় ছাড়লাম। কাশীর স্টেশনেই সংবাদপত্রে জানলাম মানিকতলার বম্-কেসের কথা। কলকাতায় চলে এলাম।

বন্ধু চারু বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে কবি-গুরুর সঙ্গে দেখা করতে জোড়াসাঁকোতে গেলাম। এই তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ-আলাপ। তিনি বললেন, "অসময় বসন্তরোগ হওয়ায় আশ্রমে এখন ছুটি। আপনিও ছুটি সম্ভোগ করুন, দেশে যান। আষাঢ় মাসে এসে কাজে যোগ দেবেন।"

আমার কথা কবি জানলেন কার কাছে? শ্রদ্ধাস্পদ রামানন্দ বাবু (প্রবাসী সম্পাদক)? বন্ধুবর চারু বন্দ্যোপাধ্যায়? আমার কাশীর সতীর্থ বিধুশেখর ভট্টাচার্য? অথবা কালীমোহন ঘোষ? হয়তো সবাই কিছু কিছু বলে থাকবেন, কিন্তু কালীমোহনই বেশী।

চারদিকেই বাধা। চারদিকেই কবিগুরু আর শান্তিনিকেতনের সমালোচনা। কেউ বলেন ওটা ব্রাহ্ম জায়গা—অতিআধুনিক; কেউ বলেন ওটা আশ্রম—অতিসেকেলে; কেউ বলেন রবীন্দ্রনাথ কবি, ধনীর সন্তান, চূড়ান্ত আয়েসী এবং নবাবী তাঁর মেজাজ।

তবু যোগ দিলাম। আষাঢ়ের প্রথমেই শান্তিনিকেতনে এলাম। কাশীতে আমার পরিচয় ছিল 'ঠাকুরদা' নামে। ভাবলাম শান্তিনিকেতনে তা ঘুচিয়ে দেওয়া যাবে। কিন্তু আশ্রমে পদার্পণ করা মাত্র সতীর্থ বিধুশেখর এবং কাশীর দাদা ভূপেন সান্ন্যাল সব ফাঁস করে দিলেন। তখনই দিনুবাবু অজিতবাবু 'নাতি' ব'নে গেলেন এবং পরবর্তী সব নাটকে কবি তা পাকা করে দিলেন।

আশ্রমে এসে কবিগুরুর 'নবাবী' দেখলাম! একে যদি নবাবী বলা হয়, তবে ব্রতচারী আর কাকে বলে? শয্যা ত্যাগ করেন রাত তিনটায়। ধ্যানে বসেন রাত সাড়ে তিনটায় ধ্যান সমাপ্ত হয় প্রত্যূষে। কিছু খেয়ে লাগেন কাজে। কাজ চলে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত। স্নানাহার করেই এক মিনিট বিশ্রাম না করে আবার কাজে বসেন। চলে পত্র-পাওয়া এবং পত্র-লেখা। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য লেখা-পড়ার কাজও চলে। সন্ধ্যার সময়ে লেখা-পড়ার কাজ চুকিয়ে, ছেলেদের নিয়ে বিনোদন, আশ্রমবাসীদের নিয়ে আলাপ-আলোচনা, অভিনয়-শিক্ষা প্রভৃতি চলে। কি বিপুল শ্রম তিনি সারাজীবন করে গেছেন! বোঝা যায় যদি কেউ তাঁর রচনাবলী সারাজীবনে শুধু একবার লিখে যেতে পারেন।

কী 'নবাবী' দেখলাম গুরুদেবের, আসবাবপত্রে ও লোকজনে? একটিমাত্র চাকর, নাম উমাচরণ। সে তাঁর খাদ্য প্রস্তুত করে, ঘরদোর ঠিক রাখে, কাপড়চোপড় ধুয়ে ঘরেই ইস্ত্রি করে দেয়। আসবাবপত্র সামান্য, কিন্তু রুচি আর ব্যবস্থাগুণে মনে হয় কতই যেন আছে। অনেকটা ঠাকুরদা গল্পে ঠাকুরদার মত। উমাচরণ শুধু ভৃত্য নয়, সে তাঁর বয়স্য। তার সঙ্গে ঠাট্টাতামাশা চলে। ভৃত্য যদি বয়স্য না হয় তাহলে কবির মন তৃপ্ত হয় না।

গুরুদেবের সাধনার চারিদিকেই বিরুদ্ধতা। দেশবাসী বিমুখ, আত্মীয়স্বজন বিরুদ্ধ, গভর্মেণ্ট প্রতিকূল। অজিতবাবুর কাছে শুনেছি জোড়াসাঁকো থানার কাছ দিয়ে তিনি একদিন চলে যেতে, বাইরে থেকে প্রহরী হাঁক দিয়ে ভেতরে জানালে।—'বারো নম্বর বি দাগী আসামী যাতা হ্যায়।'

ইস্টবেঙ্গল-আসাম গভর্মেণ্টের একটি গোপন সার্কুলারে রাজকর্মচারীদের প্রতি হুকুম হয়েছিল ছেলেপিলেদের শান্তি-নিকেতন থেকে ছাড়িয়ে নিতে। কত ছেলে কেঁদে বিদায় নিল। সেই গভর্মেণ্টের কেবল দুইজন কর্মচারী তখন অটল রইলেন। স্বর্গীয় মথুরানাথ নন্দী এবং

পুলিনচন্দ্র দত্ত ছেলেদের কোনোমতেই সরালেন না।

বিরুদ্ধতা শুধু বাইরের নয়, আশ্রম-বাসী শিক্ষকদেরও অনেকের ধর্ম আর আদর্শগত যোগ গুরুদেবের সঙ্গে নেই। এমন স্থানে থেকেও তাঁরা ধর্মের প্রেরণা খোঁজেন বাইরে থেকে। গুরুদেব অত্যন্ত উদার বলে এইরূপ হওয়ার সম্ভব হয়েছিল। আর কোথায়ও এমনটি চলত না। এমন কথা সেসব জায়গায় কেউ কল্পনাও করতে পারতেন না। আমি যখন এখানে এলাম তখন গুরুদেবের দারুণ অর্থাভাব। চারদিক থেকে আপন ব্যয়-সংকোচ করছেন। সর্বদিক থেকে নিজেকে বঞ্চিত করছেন। তখন ছেলে-দের কাছ থেকে মাসিক নেওয়া হতো দশ টাকা। তাও অনেকে দিতেন না, সেসব ব্যয়ভার তিনিই বহন করতেন। কিন্তু এই-সব সাহায্যপ্রাপ্তদের কাছেও তিনি অনেক সময় ধর্মগত কোনো সাড়া (loyalty) পান নাই। এই অপ্রিয় সত্যটুকু বললাম শুধু গুরুদেবের উদারতার পরিচয় দিতে। এইসব মানুষকেও তিনি সাহায্য করবার জন্যে নিজেকে নিঃস্ব করতেন আর আশ্রমের ব্যয় কুলাবার জন্যে অমূল্য সব লেখা জলের দরে ছেড়ে দিতেন।

একদিকে যেমন এই দুঃখের চিত্র দিলাম তেমন আর একদিকে বলতে হবে অজিত চক্রবর্তীর মত লোকও মাত্র ত্রিশ টাকা মাসিক বৃত্তি নিতেন। এইসব দেখে আমিও আমার মায়ের পরামর্শে প্রতিশ্রুত মাসিক বেতনের অনেকখানি ছেড়ে দিলাম। আমার মা-ই নানাভাবে অর্থগত এই অভাবটা পরি-পূরণ করে সংসারটা চালিয়ে নিতেন। আমার মা কখনও গুরুদেবকে চোখে দেখেন নি, দূর থেকে লেখা পড়েই তাঁর প্রতি অসীম শ্রদ্ধা ছিল।

আশ্রমে এলাম। সবাই দেখি আমার হাতে আশ্রমের ভার তুলে দিলেন। খাটতে কাতর নই। কিন্তু আমার হাতের লেখা অনেকের পক্ষে পড়া দুঃসাধ্য। অধ্যাপক-সভায় ঠিক হল আমাকে একজন কেরাণী দিতে হবে, কিন্তু টাকা কই? তার জন্য আলাদা বেতনও মিলিবে না।

তখন আশ্রমে পদে পদে কাঞ্চন মূল্যে (remuneration) চাইবার রেওয়াজ ছিল না। কিন্তু সবারই ঢের কাজ, কাজেই যখন কারও সাড়া পাওয়া গেল না তখন গুরুদেব বললেন, "আমিই খেয়ে উঠে আপনার দপ্তরে আসব—আর বেলা বারোটা থেকে দুটো পর্যন্ত লেখার কাজ, কেরাণীর কাজ, করে দিয়ে আসব।"

ওরে বাস্ রে! সে আবার কি কথা! কিন্তু কিছুতেই তাঁকে টলানো গেল না। পরদিন দেখি, ঠিক সময় তিনি দপ্তরে এসে হাজির। কাজ দিতেই হল। কি নিপুণ তাঁর কাজ! সমস্ত বিধিবিধান মেনে তিনি কেরাণীর কর্তব্যই পালন করতেন। সব-দিকেই তিনি অতুলনীয়।

অবশেষে স্বর্গীয় জ্ঞানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্বেচ্ছায় এই কার্যভার নিলেন, তখন গুরুদেবকে নিষ্কৃতি দিতে হল। তাতে জ্ঞান-বাবুরও যে উপকার হয়েছিল, জামসেদপুরের কাজে তিনি তা টের পেয়েছিলেন। এই আশ্রমে ঘণ্টাধ্বনি দিয়ে যে বিভিন্ন কর্ম-সময়ের সূচনা করা হয় তার প্রবর্তক জ্ঞানবাবু।

আশ্রমের কাজ করতে হলে গুরুদেবের আদর্শের ও ধর্মের ভালো পরিচয় পাওয়া দরকার। তাঁকে আবেদনটি জানালাম। তিনি তাঁর আপন হাতে লেখা একখানি দীর্ঘ পত্র আমায় দিলেন তাতে আশ্রমের ভাব ও কর্মের একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র রয়েছে।

পত্রখানি হাতে দিয়ে আমাকে বললেন, "বিধাতার ডাক শুনে আমি এই কাজে এক-দিন হাত দিয়েছিলাম। বড় সর্বনেশে সেই ডাক। সংসারের সব সুখ বিসর্জন দিয়ে তবে বের হতে হয়।"

এই কথায় তাঁর একটি গান মনে পড়ে—
মরি লো মরি আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে?
তাঁকে গাইতে বললাম, তিনি গাইলেন। তারপর গুরুদেব বললেন, "আমি ঐ ডাক এড়াবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু পারিনি।"
আবার মনে পড়ে—
সখী, আমারি দুয়ারে কেন আসিল?
এবং আর একটি গান—

কাঙ্গাল আমারে কাঙ্গাল করেছ।

আমার অনুরোধে তিনি এই গান দুটিও গাইলেন। তার পরে বললেন, "শেষটায় আমায় সাড়া দিতেই হল। নইলে আমার মনের ভার কিছুতেই যাচ্ছিল না। যেদিন আমি রাজী হলাম সেদিনই আমার মনপ্রাণ সব প্রসন্ন হল। সেদিন সহজে সর্বস্ব তাঁর চরণে নিবেদন করতে পারলাম। তাঁর মুখের অপূর্ব শোভা দেখে আমার আর কোন ত্যাগই ত্যাগ বলে মনে হ'ল না।" তখনই আমি গুরুদেবকে বললাম, "আপনাকে এই গানটিও গাইতে হবে—

এ কি এ সুন্দর শোভা।"

তিনি সেদিন যে ভাবে এই গানটি গাইলেন তা কখনও ভুলব না। তাঁর চোখে জল এল। কয়েক বছর আগে কাশীতে স্বামী বিবেকানন্দের মুখে এই গানটিই আমি শুনেছিলাম তাঁরও চোখে জল দেখেছিলাম। এঁদের মতন নিবেদিত-জীবন সাধকের কণ্ঠেই এই গান মানায়। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম এই আশ্রমতো করেছেন ছেলেদের জন্য। মেয়েদের প্রতি আপনার কি কিছু কর্তব্য নেই? অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বড় সংকোচে তিনি যা বললেন, তা কখনও ভুলবো না।

তিনি বললেন, "আশ্রমের কাজে আত্ম-সমর্পণ করব ভাবলাম, তখন আমার আত্মীয়-স্বজন সবাই প্রতিকূলে। সকলকে এড়িয়ে চলে এলাম শান্তিনিকেতনে। সঙ্গে এল দৈন্য ও অর্থাভাব। সেবা ও উপযুক্ত পথ্যের অভাবে আমরা অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়লাম। আমার পত্নী তখন তাঁর গায়ের-গয়না-বিক্রীকরা-অর্থ নিয়ে এখানে এলেন ও ঐকান্তিক সেবায় আমাদের সারিয়ে তুললেন। কিন্তু কয়েকদিন পরে তিনি মারা গেলেন। আশ্রমের জন্য এই প্রথম বলি। নারীর এই বলিকে একদিন স্বীকার করতেই হবে। কাজেই নারীর এই দাবী একদিন এখানে স্বীকৃত হবেই। হয়তো একদিন নারীদের জন্যই এই আশ্রম উৎসর্গীকৃত হবে।"

যাঁদের পরামর্শে গুরুদেব আমাকে এখানে ডেকেছিলেন তাঁরা আমাকে তাঁদের প্রীতির দৃষ্টিতে অনেক বড় করে দেখে-ছিলেন। তাই গুরুদেব আমার কাছে অনেক অসঙ্গত উচ্চ আশা করেছিলেন। তাঁর আশার অনুরূপ কিছু করা আমার সাধ্যের অতীত ছিল, তবু তিনি আমাকে দিয়ে যত-টুকু কাজ করিয়েছিলেন ততটুকুও সম্ভব হয়েছিল শুধু তাঁর নিজের গুণে। সেই গৌরবের কোনো দাবী আমার নেই। সবই ঘটেছে তাঁরই মহত্ত্বে।

সংকোচের সঙ্গে সেইরকম দুই-একটা কথা আজ বলতে হবে।—এখানে এসে দেখলাম, এখানেও সভাসমিতি হয় অন্য সব জায়গার মতই, চেয়ার-টেবিল নিয়ে। কাশীতে দেখেছি 'ব্যাস' অর্থাৎ পুরাণ পাঠকদের জন্য থাকে সুসজ্জিত ব্যাস-বেদী বা ব্যাসাসন। মাল্যে-চন্দনে তাঁদের অর্চনা

করতে হয়। তীর্থস্থানের এইসব আয়োজন আমদানী করতেই এখানকার সভার রূপ একেবারে বদলে গেল। বেদীর সম্মুখে আলপনা, পাশে ধূপদীপ গন্ধপুষ্প অর্ঘ প্রভৃতি সমারোহ, একেবারে প্রাচীন যুগের ঐশ্বর্য ফুটিয়ে তুলল। গুরুদেব দেখে অতিশয় সন্তুষ্ট হলেন। প্রত্যেক ঘরের সভাসমিতিতে তা তিনি প্রবর্তিত করলেন। ঘরে-ঘরে এইসব মণ্ডপ-নিপুণতা (decoration) নিয়ে প্রতিযোগিতা চলল। ঘরে-ঘরে তখন হাতে-লেখা পত্রিকা ছিল। সেইসব পত্রিকার জন্মদিন উপলক্ষে ভারি উৎসব পড়ে যেত। এক এক সময় অতিউৎসাহী ছেলেরা পদ্ম-পত্র পদ্মফুল প্রভৃতি সংগ্রহ করতে গিয়ে দেরী করে আমাদের বিষম উদ্বেগের কারণ ঘটিয়ে তুলত।

এইসব আলপনা যারা আঁকত সেইসব ছেলেদের শিল্পশিক্ষা তখন ছিল না। তাদের মধ্যে আজ মনে পড়ছে অনেকের নাম, যেমন সুধীর মিত্র, মুকুল দে, মণি গুপ্ত, যদু-কিশোর চক্রবর্তী, যতীন দাস প্রভৃতি। এদের মধ্যে পরে কেউ কেউ প্রখ্যাত শিল্পী হয়ে উঠেছেন। তখন পাঁচুবাবু (ওমকারানন্দ) বলে একজন ড্রয়িং মাস্টার এখানে ছিলেন। তিনি আর সন্তোষ মিত্রও এ বিষয় সাহায্য করতেন। তখন কলাভবন হয়নি; এখন এইসব কাজ কলাভবনেরই নিজস্ব কর্তব্য হয়েছে।

আমি ছেলেদের দিয়ে আলপনা করাতাম প্রাচীন শাস্ত্রবিধি অনুসারে। পঞ্চবর্ণ গুঁড়িকায় ও নানা রেখায় আলপনারও একটা নিজস্ব ভাষা একদিন ছিল। দুঃখের বিষয় তা আমরা ভুলে গেছি। বৈদিক যজ্ঞেই ইষ্টকা সাজাবারও একটা ভাষা ছিল, তারও অর্থ আমরা ভুলে গেছি। সেই দুঃখ গুরুদেবের মনে চিরদিন ছিল। নাট্যশাস্ত্রে মুদ্রারও একটি অলৌকিক ভাষা আছে।

ধূপ দীপ গন্ধ পুষ্প অর্ঘ এই পঞ্চ বর্ণের সঙ্গে চললো আলপনা। তারপর ধীরে ধীরে যোগ করা গেল বৈদিক মন্ত্রগুলিকে। গুরুদেবের গান তো আছেই। প্রাচীনপন্থী, নবীনপন্থী সবাই আমাদের উপর অপ্রসন্ন। কিন্তু গুরুদেব যখন সহায় তখন 'আমাদের ভয় কাহারে'।

১৯১১ সাল। বৈশাখ মাস। গুরুদেবের পঞ্চাশত্তম জন্মোৎসব উপস্থিত। আমরাতো সবাই নিঃস্ব। যথাসাধ্য দিয়েও খুব বেশী কিছু টাকা সংগ্রহ করা গেল না। কিন্তু উৎসাহের অন্ত নেই। এই উৎসাহ আর প্রাচীন যুগের উপকরণ নিয়েই আমরা অসাধ্য সাধন করলাম।

শান্তিনিকেতনের ছাত্র ও অধ্যাপকের দল দিবারাত্রি যে কি পরিশ্রম করেছেন তার আর বলে বোঝানো যায় না। নেপালবাবু প্রভৃতি প্রবীণ অধ্যাপকের দল যুবা-ছাত্রদের হার মানালেন। হীরালালবাবু ভালো ফলমূল আনবার জন্যে সদলে কাটোয়া গেলেন, সেখান থেকে গরুর গাড়ী করে ফল নিয়ে এলেন।

এখানকার উৎসাহীদের সঙ্গে বাইরেরও কেউ কেউ এসে যোগ দিলেন। তার মধ্যে সবচেয়ে আজ বেশী মনে পড়ছে শ্রীমান প্রশান্ত মহলানবীশের নাম। পাছে মধ্যাহ্ন-ভোজনে শরীর কর্মক্ষম না থাকে তাই সারাদিন ভাত না খেয়ে শুধু বেলের সরবত খেয়ে কাজ করা যেত। সেই দলের মধ্যে প্রশান্ত ছিলেন অগ্রণী। কবি সত্যেন্দ্রনাথ, সুকুমার রায়, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন বাগচী, দিনুবাবু, অজিত চক্রবর্তী, সন্তোষ মজুমদার প্রভৃতি তরুণদের এবং রামানন্দবাবু, নেপালবাবু, দ্বিপুবাবু প্রভৃতি প্রবীণদের সমান উৎসাহ ও সহযোগ পাওয়া গেল। প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতিতে এই উৎসব সম্পন্ন হওয়াতে নানাস্থান থেকে সমাগত সকলেই পরম পরিতৃপ্ত হলেন। এইভাবে এই উৎসব-পদ্ধতি শান্তিনিকেতনের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ল।

মহর্ষির সাধনাপীঠ শান্তিনিকেতন একটি পরম তীর্থস্থান। গুরুদেবের সাধনা তাতে যুক্ত হওয়ায় এখানে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম ঘটল। তাই এখানে কত শত মহাপুরুষের দর্শন প্রায় এই অর্ধশতাব্দী ধরে পেয়েছি। দেশী-বিদেশী কতজনেরই বা নাম করব? শুধু একজনের নাম করলেই আমাদের বক্তব্যটা স্পষ্ট হয়ে যাবে, তিনি হলেন মহাপ্রাণ গান্ধীজি।

১৯১৫ সাল। আফ্রিকা থেকে তিনি ভারতে আসতে চান। ভারতে এসে তাঁর সাধনা চালাতে চান। সেখানে তাঁর একটি স্কুল আছে, নাম ফিনিক্স্ স্কুল। তিনিত আসবেন কিন্তু স্কুলটি কোথায় রাখবেন! কথাটা শুনে গুরুদেব গুরু-শিষ্যসহ সমস্ত স্কুল এবং সপরিবারে গান্ধীজিকে দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ সাহেবের মারফতে এখানে নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন। যতদিন তাঁদের এদেশে কোনো স্থান ঠিক না হয় ততদিনই তাঁরা শান্তিনিকেতনের অতিথিরূপে বাস করবেন।

প্রথমে এলো ফিনিক্স্ স্কুল এবং তার গুরু ও শিষ্যদল। তারপর ১৭ই ফেব্রুয়ারী বিনা খবরে হঠাৎ এলেন গান্ধীজি সপরিবারে। গুরুদেব জানতেন না, কার্যগতিকে ছিলেন বাইরে। তিনি শুনতে পেয়েই তার করলেন। "আমি আসছি"।

কোনোমতে দিন-পাঁচেকের মধ্যে তিনি চলে এলেন। ইতিমধ্যে গোখলের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে হঠাৎ গান্ধীজি পুনা চলে গেছেন, সেখান থেকে ফিরলেন ৩রা মার্চ।

দুই মহাপুরুষের সাক্ষাৎ হল। এই সময় থেকেই তাঁদের মধ্যে প্রীতি এবং মৈত্রী অবিচ্ছিন্নভাবে চলল। রবীন্দ্রনাথের "গুরুদেব" নামটা গান্ধীজি চারিদিকে ছড়িয়ে দিলেন এবং গুরুদেবও গান্ধীজিকে "মহাত্মা" নামে অভিহিত করলেন।

১৯২০ সালে মহাত্মাজির নিমন্ত্রণে গুজরাট সাহিত্য পরিষদে সভাপতিরূপে গুরুদেব গেলেন আমেদাবাদে, আর সবরমতি আশ্রমেরও আতিথ্য স্বীকার করলেন। পরে একদিন মহাত্মাজির অনশনে উদ্বিগ্ন গুরুদেব ভাঙা শরীর নিয়ে যেমন গেলেন যারবেদা জেলে তেমনি মহাত্মাজিও কখনও গুরুদেবের কোনো বিপদের কথা শুনলেই তখনই ছুটে এসেছেন শান্তিনিকতনে।

১৯৩৯ সালে যখন কিছুতেই গুরুদেবকে মধ্যাহ্নে বিশ্রাম করাতে পারা যাচ্ছে না, তখন একথা জানান হল বন্ধুবর মহাদেব দেশাইকে। মহাত্মাজি শুনতে পেয়েই বিনা-খবরে চলে এলেন সপরিবারে এখানে। আশ্রমের নানা বিপদে-আপদে মহাত্মাজি প্রাণপণ করে সহায়তা করেছেন। পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার কালে এই আশ্রমের ভার গুরুদেব মহাত্মাজিকেই সঁপে দিয়ে গেলেন এবং মহাত্মাজি তা আগ্রহের সঙ্গে স্বীকার করলেন।

১৯১৫ সালের কথা হচ্ছিল। মহাত্মাজি যখন ৩রা মার্চ খবর দিয়ে এলেন, তখন গুরুদেবের সম্মতি অনুসারে ভারতীয় প্রাচীন বিধানে মহাত্মাজির সংবর্ধনার এক বিরাট আয়োজন করা হল। প্রশস্তি পাত্রের একুশটি উপকরণ নিয়ে একুশটি তোরণ রচনা করা হল। তারপর গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ অর্ঘ প্রভৃতি মাঙ্গল্য-দ্রব্যের সমারোহ। আলপনা প্রভৃতিতে উৎসব-ভূমি সুসজ্জিত। বৈদিক মন্ত্রে ও পদ্ধতিতে সম্পন্ন এই অভ্যর্থনায় মহাত্মাজি অত্যন্ত তৃপ্ত হন। মহাত্মাজি সেদিন বললেন, "কোন্ ভারতের জন্য আমি প্রাণপাত করতে চলেছি তা জানতাম না, আজ তার অতুলনীয় ঐশ্বর্য উপলব্ধি করা গেল। আজ হতে ভারতের এই পরিচর্যাটি সর্বত্র ছড়াতে হবে।" তাই আজ ভারতের সর্বত্র এই জিনিসটি ছড়িয়ে পড়েছে। এখন কংগ্রেস প্রভৃতি 'কর্মপ্রধান' সম্মিলনেও এর ছোঁয়াচ লেগেছে, কিন্তু এর মূলে রয়েছেন গুরুদেব এবং রয়েছে তাঁর প্রভাব; আমাদের আর শক্তি কি?

আমি এখানে আসবার পরই (১৯০৮) গুরুদেব জানালেন প্রতি ঋতুতে তাঁর ঋতু-উৎসব করবার ইচ্ছে। আমি বললাম, ভারতীয় নানা তীর্থে নানা মন্দিরে ঋতুতে ঋতুতে নবনব উৎসব চলে। নানা প্রাচীন শাস্ত্রে এবং সাহিত্যে ঋতু-উৎসবের অনেক উপকরণ দেখা যায়। গুরুদেব আজ্ঞা দিলেন সেইসব উপকরণ নিয়ে ঋতু-উৎসব প্রবর্তন করতে। তখন থেকেই ঋতু-উৎসব প্রবর্তিত হল।

প্রথমেই এল বর্ষা। হঠাৎ বিশেষ কাজে গুরুদেব গেলেন শিলাইদহ। অথচ এদিকে বৈদিক মন্ত্র প্রভৃতি নিয়ে উৎসবের আয়োজন করে বসে আছি। বর্ষা যায়, কি করব? গুরুদেব তার করলেন 'উৎসব করে ফেলুন'। বিনা খরচে লতাপাতা দিয়ে নীল রঙে কাপড় রাঙিয়ে ব্রহ্মচারীদের নিয়ে উৎসব সুসম্পন্ন হল।

উৎসবের সাফল্য সম্বন্ধে দিনুবাবুর লেখা উচ্ছ্বসিত বিবরণ পেয়ে, গুরুদেব মহা খুশি। সেখানে বসেই শারদোৎসবের জন্য অনেকগুলি গান রচনা করলেন। আশ্রমে এসে সেগুলি শোনাতে আমরাও খুব আনন্দিত হলাম। কিন্তু ছেলের দল বেঁকে বসল। তারা বলল, "বিচ্ছিন্ন গানে হবে না, অভিনয় চাই"। গুরুদেব বললেন, "সময় কই?" তারা বললো, "সেসব বুঝি না, অভিনয় চাই।"

হঠাৎ একদিন গুরুদেব অন্তর্হিত হলেন, 'দেহলী'র উপর তলায় উদয়অস্ত লিখে শারদোৎসব নাটকটি খাড়া করলেন। তাতে আমার অভিনয়ের জন্য যে ঠাকুরদার পার্ট লিখেছেন তাতে বহুগান। তাঁর বিশ্বাস ছিল আমি ভালো গাইতে পারি, তারপর অগত্যা আমাকে দিলেন রাজ-সন্ন্যাসীর পার্ট, তাতেও যে দু-একটা গান আছে তা তিনি পিছনে বসে গাইলেন সামনে আমি মুখ নাড়লাম। সিনেমাতে play back music-এর প্রথা তার অনেকদিন পরে প্রবর্তিত হয়েছে।

'আমার' গান শুনে সেদিন লোকের কী আনন্দ। একেবারে রবিবাবুর সমতুল! এই খ্যাতির বিড়ম্বনা সামলাতে আমার অনেক বছর কেটে গেছে।

আশ্রমে যোগ দিয়ে দেখি, এক-একদিন সন্ধ্যাকালে আলোচনা সভা বসে। তাতে যোগ দিয়ে অসাবধানে কবীর দাদু বাউল প্রভৃতির বাণী দুই-একটা বলে ফেলেছি আমাদের প্রাচীন প্রথা অনুসারে এইগুলি প্রচার না করাই নিয়ম। নিরক্ষর ভক্তদের এইসব বাণী গুরুদেব প্রচার করবার জন্য ব্যাকুল হলেন।

প্রথমে তিনি আমাকে ধরলেন কবীরের বাণী প্রকাশ করতে। তখন শিক্ষিত সমাজে কবীর অনাদৃত। কবীরের দুই-একখানা মুদ্রিত বাণী যা পাওয়া যেত তা তাঁকে দেখালাম, কিন্তু তিনি আমার সংগৃহীত ভক্তদের মুখে শ্রুত কবীর বাণী পছন্দ করলেন। কাজেই লোক মুখে শ্রুত ক্রমে চার কিস্তি কবীর বাণী প্রকাশিত হল (১৯১০ সাল)।

১৯১৩ সালে গুরুদেব নোবেল পুরস্কার পেলেন। তখন কথা উঠল গীতাঞ্জলি অভারতীয়। ওর সব চিন্তা ইউরোপের কাছেই ধার করা। আমাদের দেশের সমালোচকরা অনেকে প্রথমেতো রবীন্দ্রনাথের কাব্যকে ভালো বলে স্বীকারই করেন নি। কেউ বলেছেন, 'ওসব ন্যাকামি'। তবু যখন তাঁর কাব্যের-পসরা ঘটেছে তখন বলেছেন, 'ওসব বিলিতী জিনিস'। একদল খৃষ্টীয় মিশনারী এই কথার জোরে গীতাঞ্জলির মূলে খৃষ্টীয় সাহিত্য বলেই দাবী করলেন। বাধ্য হয়ে গুরুদেব পাঁচ শ বছর পূর্বেকার কবীর-বাণী ইংরিজীতে প্রকাশ করলেন। দেশেবিদেশে তার প্রচুর সমাদর হল।

এতদিন হিন্দী সাহিত্যে কবীরের কোনো স্থান ছিল না এবার তিনি পঙক্তিতে উঠলেন। তিনি হিন্দী নবরত্নের বাইরে ছিলেন এবার ভিতরেই তাঁর স্থান হলো। এখনত এদেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই কবীর সম্বন্ধে গবেষণা চলেছে। এই ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যেন আমরা কখনো না ভুলি।

১৯২৫ সালে কলিকাতার দর্শন-মহাসভার সভাপতিরূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে তাঁর যে অভিভাষণ আর ১৯৩০ সালে পৃথিবীর মহাবিদ্যায়তন অকস্‌ফোর্ডে তাঁর-যে হিবার্ট লেকচার, এই উভয় ক্ষেত্রেই তিনি অপরিসীম সাহসে নিরক্ষর বাউলদের বাণীকে পণ্ডিতদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে গেলেন।

এইসব দুঃসাধ্য কাজ তিনিই সুসাধ্য করতে পেরেছেন। তবে সর্বদা এইসব কাজে তাঁর সেবায় আমাকে হাজির থাকতে হয়েছে। তিনি বার বার বলতেন, "পুরাতন

শাস্ত্র ও গ্রন্থ সব জীর্ণ হয়ে এসেছে এইসব নিরক্ষর সাধকদের জীবন্ত বাণী ম্রিয়মান জগতে নব জীবন সঞ্চার করবে। এই কাজের ভার আপনাদের উপর। আপনারা যদি তাতে গ্রন্থ ভোলেন শাস্ত্র ভোলেন, ক্ষতি নেই। কিন্তু এইসব জীবন্ত আলোক-শিখা হারালে আমাদের কপালে ভবিষ্যতে প্রলয়ের অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে আসবে।"

তাই আমাদের প্রতি তাঁর তাগিদের অন্ত ছিল না। আমরাতো সামান্য উপলক্ষ মাত্র, আসল শক্তি ছিলেন তিনি।

আমরাও তাঁর কাছে তাগিদ কম করিনি। তিনি চাইতেন আমাদের কাছে আশ্রম-সেবা তার প্রেরণার জন্য আমরা চাইতাম সেই সেবার উপযুক্ত শক্তি লাভ করতে তাঁর প্রাত্যহিক ভগবৎ-পূজার প্রসাদ। প্রভাতে প্রভাতে তিনি যে পরমামৃত ভগবানের কাছে পান তার একটু কণা না পেলে আমরা শক্তি পাব কোথায়? কিন্তু এইসব বিষয়ে তাঁর সংকোচের অন্ত ছিল না। তিনি কিছুতেই রাজী হলেন না।

আমার এক জন্মদিন (১৯০৮ সালে) ১৬ই অগ্রহায়ণে তাঁকে প্রণাম করতে গেলাম। জন্মদিনের মত কিছু উপহার তিনি দিতে চাইলেন। আবার চাইলাম সেই প্রসাদ। ১৭ই অগ্রহায়ণ থেকে কিছুদিন তাঁর সেই প্রসাদ বিতরণ চলল, কিন্তু তাঁর কষ্ট দেখে পরে তাঁকে রেহাই দিতেই হল। কিন্তু এই হল অপূর্ব সাহিত্য 'শান্তিনিকেতনে'র জন্মকথা।

তাঁর স্নেহের কথা কী বলব! তাঁর কাছে যে বেতন পেয়েছি তার তুলনা কোথায়ও নেই। অনেক আর্থিক সম্ভাবনাও তাঁর কাছে তুচ্ছ। আত্মীয়েরা আমাদের তিরস্কার করতেন কিন্তু তাঁরা কি জানতেন যে আমরা কোথায়ও একটুকুও ত্যাগস্বীকার করিনি। আমরা তাঁর কাছে যা পেয়েছি কোথায়ও তা মিলত না।

যা দেখেছি যা পেয়েছি তুলনা তার নাই।

তাঁর কাছে শুধু পেয়েইছি। তার জন্য তাঁকে যেরকম সেবা করা উচিত ছিল তা কখনো করে উঠতে পারিনি। তাই আজ খেদের অন্ত নেই। কখনো ভেবেছি ভারতীয় সাধনার ধারায় তাঁর স্থান কিরূপ এবং তাঁর বাণীতে ভারতীয় সাধনার কি পরিপূর্ণ রূপ, এইসব নিয়ে, তাঁর জীবনী রচনা করব। নানা বাধায় তা আর হয়ে ওঠেনি।

আমাদের সব গৃহ্য ও সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি ভালো ভালো বৈদিক মন্ত্রে নূতন করে তৈরি করে তোলবার আদেশ পেয়েছিলাম। কিন্তু সে কি ঠিকমত করে উঠতে পেরেছি?

ভারতীয় সাধনায় বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। সেই বৈচিত্র্যের প্রকাশ-সৌন্দর্য অতুলনীয়। সেই বৈচিত্র্যের ঐক্য কোথায় এবং কেমন তার স্বরূপ তা তিনি নানাভাবে বলে গেছেন। বিশেষত ১৯২৩ সালে ভারতীয় নানা ভক্তি ধারার যোগস্থল কাশীতে বসে তিনি চমৎকার সব আলোচনা করে গেছেন। সেগুলো সব দেখানো গেল কই?

উপনিষদের বাণী নিয়ে প্রাচীন যুগে বহু আচার্য বহু ভাষ্য লিখে গেছেন। গুরুদেবও 'শান্তিনিকেতনে' ও আরও নানা-স্থানে উপনিষদের যে নব নব তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন তাতে উপনিষদ্-ভাষ্যকারদের মধ্যে তাঁরও একটি মহনীয় স্থান থাকা উচিত। উপনিষদের বাণী ও কবিগুরুরচিত সেইসব ভাষ্য নিয়ে একটি ভাষ্যগ্রন্থ প্রকাশ করা যেত। ভারতীয় অনেক বড় বড় পণ্ডিত-জনও তা চেয়েছিলেন। তা করা যায়নি। এ দুঃখ এখনও আমার মনে আছে।

মহাভারতের কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পরে যে মর্ম-সত্যটি ব্যাসদেব ব্যক্ত করে বলেননি সেটি গুরুদেব আপন ধ্যানে পেয়েছিলেন। তা তাঁর প্রকাশ করবারও ইচ্ছা ছিল, কিন্তু পেরে ওঠেনি। সে কাজ আমাদের অসাধ্য।

এইসব কাজ তাঁর জীবৎকালেই করা সম্ভব ছিল, এখন সেগুলি করা প্রায় অসাধ্য।

এই তীর্থস্থানে সমাগত বাইরের বহু মহাপুরুষকে যে দেখেছি সে কথা আগেই বলেছি। এখানেও তীর্থবাসী যাঁদের দেখেছি তাঁদেরও তুলনা নেই। ঋষিপ্রতিম দ্বিজেন্দ্র-নাথ, সংগীতপ্রাণ দীনেন্দ্রনাথ, অজাতশত্রু সুরেন্দ্রনাথ, এণ্ড্রুজ, পিয়ার্সন প্রভৃতি দুর্লভদর্শন মানুষের দেখা এখানে এসেই পেয়েছি। এখানে সহযোগী যাঁদের পেয়েছিলাম তাঁদেরও অনেকের দর্শন পাওয়া ভাগ্যের কথা। ছাত্রদের মধ্যেও অনেকের কথা মনে করলে আজও মন পূর্ণ হয়ে ওঠে।

আমাদের দেশে সাধনা-শাস্ত্রে বলে, চিত্তকে যে জাগায় সেই তো গুরু। ভাগবতে এরূপ চতুর্বিংশ গুরুর কথা আছে (১১, ৭, ৩০)। নানারকম দাবী নিয়ে ছাত্ররা যেমন অন্তরকে জাগাতে পারে এমন জাগানো গুরুদেরও অসাধ্য। গোরখনাথ আপন গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথকে জাগিয়েছিলেন। তাই প্রসিদ্ধ কথা আছে—

জাগ মছন্দর গোরখা আয়া

এই জন্যই সাধিকা নানীমাতা বলেছেন—

চেলা গুরুকো গুরূ।

অথর্বের ঋষিও বলেছেন; ব্রহ্মচারী আপন ব্রহ্মচর্যের দ্বারা আচার্যের অন্তরে নব-জীবন সঞ্চয় করেন এবং আচার্যের অপূর্ণ তপস্যাকে আপন তপস্যায় পূর্ণ করেন—

আচার্যং তপসা পিপর্তি

আজ আমার চারিদিকে যে সব নূতন ও পুরাতন শিষ্যবৃন্দকে দেখছি তাঁদের কাছে এই প্রার্থনা তাঁরাও যেন আমার গুরু হতে পারেন। তাঁরা যেন আপন কৃতার্থতা দিয়ে আমারই অকৃতার্থতাকে পূরণ করেন। আজ তাঁদের সামনে পেয়ে এই কথা বলবার অবসর যে পেয়েছি সেইটাই আজকের এই অনুষ্ঠানের যথার্থ মহত্ত্ব। আজ এইসব সমাগত আশ্রম শিষ্যবৃন্দকে প্রাচীন প্রথায় সাধুবাদ দেব না নূতন প্রথায় ধন্যবাদ দেব না। শুধু অন্তরের এই ব্যাকুল প্রার্থনা তাঁদের কাছে জানিয়ে রাখলাম।

এইখানেই আমার আজকের দিনের বক্তব্য সমাপ্ত করা উচিত ছিল, কিন্তু আমার কথা নিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করতে চাইনে, যাঁর কথা দিয়ে আজ বক্তব্য আরম্ভ করেছি তাঁর কথা দিয়েই শেষ করতে চাই।

ভারতীয় সাধকদের বাণী অনুসারে কবি-

গুরুর জীবনকে সার্থক জীবন বলা যায়। চার শ বছর আগেকার ভক্ত রজ্জবজী বলেন,—

জগতে যে এসেছ, দ্রষ্টব্য যা তা দেখেছ, তার সার্থকতা তখনি হবে যখন তার অনুরূপ কিছু সৃষ্টি তুমিও করতে পারবে। কেউ সৃষ্টি করেন বাণীতে, তিনি কবি; কেউ সৃষ্টি করেন ধ্বনিতে, তিনি কলাবৎ, কেউ সৃষ্টি করেন বর্ণে, তিনি চিত্রকর; কেউ রচনা করেন রেখায়, তিনি রেখাশিল্পী। নানা রীতিতে নানা সাধক নানাভাবে এই সৃষ্টি করতে পারেন। ধ্যানে ভরে কোনো সাধক বাইরের এইরূপ কিছু সৃষ্টি না করে আপন অন্তরে আপন জীবনখানিকে সৌন্দর্য ও মহত্ত্বে রচনা করে তোলেন। যে ভাবেই সৃষ্টি করুন না কেন তাতেই সাধক আপনাকে সার্থক করেন। কিন্তু যে-জন কোনো ভাবেই কিছুই সৃষ্টি করতে পারেনি, সে-জন জন্মলাভই করেনি জগতে তার আসাটাই নামঞ্জুর।

এই হিসেবে রবীন্দ্রনাথ পরম ধন্য। তিনি সর্বদিক দিয়েই সৃষ্টি করে গেছেন। তিনি বাণীতে কবি, ধ্বনিতে কলাবৎ, বর্ণ-শিল্পে চিত্রকর, রেখাশিল্পে রেখাগুণী। আবার ধ্যানসাধক হয়ে ভিতরে ভিতরে আপন জীবনখানি অপূর্ব ভাবেই তিনি সৃষ্টি করে গেছেন। কাজেই জগতে তাঁর আসাটা নামঞ্জুর বলবার সাধ্য কারও নেই।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ঋগ্বেদের বেদাঙ্গ। তাতে ঋষি ঐতরেয় বলছেন, এই বিশ্ব যাঁর রচনা তিনি বিশ্ব-শিল্পী। তোমার আপন শিল্প দিয়েই তাঁর পূজা করতে হবে—

অথ শিল্পানি শংসন্তি দেবশিল্পানি।

কাজেই শিল্পমাত্রই এক মহাযজ্ঞ। এই যজ্ঞের ফলে যজমান আপনাকে বিশ্বের ছন্দে ছন্দোময় করে তোলেন।—

এতৈর্বা যজমান আত্মানং
ছন্দোময়ং সংস্কুরুতে

গুরুদেব নানা বিচিত্র সৃষ্টিতে আপনাকে বিশ্ব ছন্দের সঙ্গে বহু বিচিত্র ভাবে ছন্দোময় করে গেছেন।

রজ্জবজী বলেন,—পৃথিবী থেকে যাবার আগে প্রভুর আদেশ যদি তামিল করে না যাও তবে সবই বৃথা হ'লো। সেই আদেশ বিশ্বচরাচরে নিরন্তর ধ্বনিত হচ্ছে। গ্রহ-চন্দ্র-তারায় অসীম আকাশে দিবারাত্র ঘোষিত হচ্ছে যে যা এখনও রূপ পায় নি তাকে রূপ দাও, যা এখনও ভাষায় প্রকাশিত হয়নি তাকে ভাষায় প্রকাশ দাও বাণী দাও, বাণী দাও, দাও দাও প্রকাশ দাও—

গৈচকুঁ রূপ দে, মৌনকুঁ ভাষ দে
বাণী দে বাণী দে দে দে প্রকাশ দে।

গুরুদেবের মত এমন করে প্রভুর হুকুম কেউ তামিল করে যায়নি। তাঁকে তবে মহাপুরুষ বলব না তো বলব কাকে!

কত ভাগ্যফলে এমন মহাপুরুষের কাছে এসেছিলাম, তাঁর প্রসাদ পেয়েছিলাম। কিন্তু তদুপযুক্ত জীবনে কিছুই করতে পারিনি সেইটাই মহা দুঃখ। এই দুঃখ যাবার নয়।

তাঁর প্রসাদের একটু পরিচয় দিচ্ছি। যখন এই আশ্রমে এলাম তখন তাঁর আশীর্বাদেই ধন্য হলাম। তবু তার উপর তিনি একটি গান গেয়ে আমাকে অভিনন্দিত করলেন—

কত অজানারে জানাইলে তুমি
কত ঘরে দিলে ঠাঁই—
দূরকে করিলে নিকট-বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই॥

১৯১২ গ্রীষ্মকাল। গুরুদেবের শরীর অত্যন্ত অসুস্থ। তিনি রক্তহীন। অস্ত্রোপচারের জন্যে তিনি বিলেতে যাবেন। কঠিন অস্ত্রোপচারের পরে তিনি ফিরতে পারবেন কিনা বলা যায় না।

সকালেই আশ্রম থেকে তিনি বিদায় নিয়ে কলকাতায় যাবেন। তাই ভোরে উঠেই তাঁর কাছে দেখা করতে যাব। প্রাক্ কুটিরে শুয়ে আছি। জেগেছি। শয্যা ত্যাগ করব ভাবছি। তখনও অন্ধকার রয়েছে। হঠাৎ শুনি দুয়োরের বাইরে গুণ গুণ গান গেয়ে গুরুদেব স্বয়ং আসছেন। বিদায়-গান গেয়ে। বড় করুণ সেই বিদায় সংগীত—

পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহো ভাই
সবারে আমি প্রণাম করে যাই।

ভাগ্যক্রমে বিলেতে গিয়ে তিনি নিরাময় হয়ে ফিরলেন আর পরে নোবেলপ্রাইজও পেলেন।

১৯৪১ সাল। তিনি খুবই পীড়িত। কলকাতায় যাবেন অস্ত্রোপচারের জন্যে। অস্ত্র করা হবে। এই যাত্রাই তাঁর আশ্রম থেকে শেষ যাত্রা। তাঁকে উপরতলায় স্ট্রেচারে শোয়ানো হয়েছে। কি একটি কথা জিজ্ঞাসা করবার জন্য আমাকে সবাই উপরতলায় তাঁর কাছে পাঠালেন। কথা হয়ে গেল। বিদায় চাইলাম। কিন্তু তিনি দাঁড়াতে বললেন। আমার সর্বাঙ্গে তিনি হাত বোলাবার মত আশীর্বাদ-দৃষ্টি বুলিয়ে দিলেন।

কি যেন তিনি বলতেও যাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই তাঁকে বহন করে নিয়ে সকলে চললেন। কি যেন তাঁর বলবার ছিল বলতে পারলেন না। হয়তো কোনো দুঃখেরই কথা। তাই বড় দুঃখের দৃষ্টিতে তিনি একবার পিছনে ফিরে তাকালেন, তাঁর সেই কাতর দৃষ্টি কখনও ভুলব না। তাঁরই কণ্ঠে শোনা আর এক উদ্দেশ্যে তাঁরই রচিত একটি গানে আমার মন যেন কেঁদে বলতে লাগল—

মনে কী দ্বিধা রেখে গেলে চলে
সেদিন ভরা সাঁঝে,
যেতে যেতে দুয়ার হতে কী ভেবে
ফিরালে মুখখানি—
কী কথা ছিল মনে॥

তাঁর সেই শেষ বেদনভরা বিদায়দৃষ্টি চিরদিনই মনে থাকবে। তিনি ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা। ভূত ভবিষ্যৎ কোন্ বেদনায় তাঁর দৃষ্টি সেদিন ব্যথিত হয়ে উঠেছিল? আমাদের যে ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা ও হীনতার আর অন্ত নেই। আমরা তাঁর সে বেদনা দূরে করতে পারিনি, হয়তো পারবও না। প্রার্থনা করি তোমাদের সাধনায় তাঁর সে মর্মবেদনা দূর হোক। আমরা তাঁর দুঃখ দূরে করতে পারব না, কারণ আমরাত আপন আপন স্বার্থ নিয়ে তাঁকে নানাভাবেই ব্যবহার মাত্র (exploit) করেছি, নিঃস্বার্থ হয়ে ঠিক তাঁর যথার্থ সেবা করতে পারিনি। সেইরকম সেবা হয়ত তোমরাই করতে পারবে।

প্রাক্তন ছাত্রদের উপর তাঁর ভরসার অন্ত ছিল না। তাঁর বিশ্বাস ছিল এবং কথায় কথায় তিনি বলতেনও, "যেদিন আমার প্রাক্তন ছাত্রেরা এখানকার ভার নেবে সেদিনই এখানকার সব দুঃখ ঘুচবে। সেদিন সব স্বার্থের, সংকীর্ণতার, ক্ষমতাপ্রিয়তার অবসান হবে।"

আমরা তো এখন বিদায় নিচ্ছি। এখন তোমাদেরই সেবার সময় উপস্থিত। যাবার সময় এই প্রার্থনা জানিয়ে যাচ্ছি, ভগবৎ-কৃপায় ও আশীর্বাদে তোমরা ধন্য হও, গুরুদেবের আশীর্বাদে তোমাদের জীবন সার্থক হোক আমাদের আশ্রম কৃতার্থ হোক।

৭ই পৌষ, ১৩৫৯
শান্তিনিকেতন

মালপাড়ায় কীর্তন

সরলাবালা সরকার

মালপাড়া হুগলী জেলায়। এখানে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের পাট। "পাট" শব্দে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কোন বিশিষ্ট তীর্থ বুঝায়।

'আমরা' অর্থাৎ একদল অন্তঃপুরবাসিনী এই মালপাড়ায় আখুরিয়া হরিদাসের কীর্তন শুনিতে গিয়াছিলাম। চল্লিশ বৎসর আগের কথা বলিতেছি।

তখনকার দিনে "আখুরিয়া" হরিদাসের নাম বাংলা দেশে বিখ্যাত ছিল। তিনি কীর্তনের একটি পদ ধরিয়া এমনভাবে "আখর" দিয়া যাইতেন যে, আখরের প্রবাহে রসিক শ্রোতার মন যেন একেবারে ভাসিয়া যাইত. শ্রোতাগণ মন্ত্রমুগ্ধের মত কীর্তন শুনিত।

"আখর" জিনিসটি কী তাহা অনেকে হয়তো জানেন না, সেজন্য একটু উদাহরণ দিতেছি।

রাধিকা গভীরা রজনীতে শ্যাম দর্শনের আশায় চলেছেন অভিসারে, সখীরাও আছেন তাঁর সঙ্গে।

পদকর্তা কিভাবে শ্রীরাধিকা চলিয়াছেন তাহার বর্ণনা করিতে গিয়া এইভাবে আরম্ভ করিলেন ঃ—

"চলে হংসিনী-গামিনী"

সঙ্গে সঙ্গে আখর আরম্ভ হইল,—

"রাই আমার চলে যেতে ঢলে পড়ে
অনুরাগের ভরে ঢলে পড়ে।
কৃষ্ণ প্রেমের মদে মাতোয়ারা,
সে যে চল্‌তে গিয়ে চল্‌তে নারে।
সে যে গহন আলো করে চলে
যেন নবীন মেঘে সৌদামিনী,
যেন আঁধার রাতে পূর্ণ শশী,
ওরে চাঁদ জিনি লাখ্ চাঁদের ভাতি,
ওরে এ, একই চাঁদ নীল গগনে,
এমন কত চাঁদ রাইয়ের নখের কোণে।
যেমন চাঁদে ঘিরে তারাগণে,
তেমনি আমার রাইকে ঘিরি সখীগণে।
ওরে, বৃন্দাবনে এত চাঁদ কোথায় ছিল,
দ্যাখ্‌রে বনে একই কালে উদয় হল।"

ইত্যাদি

আখুরিয়া হরিদাস এক ছত্র পদ ধরিয়া মুখে মুখে অবিশ্রান্ত আখর গাহিয়া চলিয়াছেন, সেই আখরের প্রবাহে মূল পদটি যেন একেবারে কোথায় তলাইয়া গেল। সহসা মৃদঙ্গের গুরু গুরু ধ্বনির সহিত ঝঙ্কার দিয়া উঠিল সেই মূল পদ ঃ—

চলে হংসিনী গামিনী।

আখুরিয়া হরিদাসের কীর্তনের খ্যাতি শুনিয়াছি, কিন্তু কীর্তন শুনিবার সৌভাগ্য হয় নাই। তখন ছিল গুরুজনের শাসন। বাড়ি ছাড়িয়া মেয়েদের এক পা পদব্রজে বাহির হইবার প্রথা ছিল না; গঙ্গাস্নানে যাইতে হইবে, যদিও বাড়ির কাছেই গঙ্গা, কিন্তু তবুও পাল্কীর শরণ না লইলে চলিত না। অবশ্য, তীর্থস্থানে এবং পল্লীগ্রামে এতটা কড়াকড়ি ছিল না।

তবুও আমরা কয়েকজন একত্র হইয়া আখুরিয়া হরিদাসের কীর্তন শুনিবার জন্য একদিন গোপনে বাড়ি ছাড়িয়া রওনা হইয়াছিলাম কলিকাতা হইতে দূরে মালপাড়ার পথে। হুগলী জেলার একটি শাখা রেলপথে মালপাড়া যাইতে হয়। কোন স্টেশনে উঠিতে হয় এবং কোথায় নামিতে হইবে সে সম্বন্ধে আমাদের কাহারও জানা ছিল না, কিন্তু আমাদের পরিচালিকা যিনি ছিলেন তিনি অসম সাহসিকা এবং সমস্ত পথ-ঘাট ছিল তাঁহার নখদর্পণে।

তাঁহাকে আমি বলিতাম 'গোঁসাই মা'। আমাদের বাড়ির কেহ কেহ তাঁহাকে বলিতেন "গোঁসাই দিদি" আবার কেহবা "গোঁসাই পিসি" বা "গোঁসাই মাসী মা"।

হুগলী জেলার উজানী গ্রামে তাঁহার পিত্রালয়। তিনি গোস্বামী পরিবারের কন্যা এবং উত্তরাধিকার সূত্রে পিতৃকুলের বিগ্রহ-সেবার পালার উত্তরাধিকারিণী হইয়াছিলেন।

বিগ্রহ-সেবার যখন পালা পড়িত, তখন তিনি উজানী গ্রামে যাইতেন, কিন্তু অন্য সময় সর্বত্র বিচরণ করিতেন।

কলিকাতায় বহু পরিবারে তাঁহার যাওয়া-আসা ছিল। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেরই ছিলেন তিনি সুখ-দুঃখের অংশভাগিনী ও পরমাত্মীয়া। স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়ের পত্নীর সহিত তিনি এক সময় সই পাতাইয়াছিলেন, সেই অবধি সে বাড়ির সকলেই তাঁহাকে "সইমা" বলিত।

মালপাড়ায় হরিদাস আখরিয়ার কীর্তন হইবে, আমরা তাঁহারই মুখে শুনিতে পাইলাম। তিনি আমাদের নিকট কীর্তনের প্রসঙ্গ তুলিলেন। "প্রসঙ্গ" ঠিক নয়, যেন এক জীবন্ত বর্ণনা। সে বর্ণনা শুনিয়া সকলেরই মন টলমল করিয়া উঠিল, "হায়রে, এমন কীর্তন শোনা আমাদের ভাগ্যে নাই!"

গোঁসাইমা এই আক্ষেপ শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ভাগ্য অভাগ্যের কথাই বা কেন? যেতে চাও কি তোমরা মালপাড়ায় কীর্তন শুনতে? তবে চল না আমার সঙ্গে আমি তোমাদের কীর্তন শুনিয়ে আনবো। যদি যেতে চাও তবে তৈরী হয়ে' নাও।"

"একেবারে তৈরী হয়ে নাও! ওরে বাবা, গোঁসাই দিদি বলেন কী? তাহলে তো দেখছি বাড়ি ছেড়ে পালাতে হবে; অনুমতি তো পাবই না, আর অনুমতি চাইতে যাবার সাহসই বা কার আছে?"

গোঁসাইমা এ সব কথা গ্রাহ্যেই আনেন না। তিনি বলিলেন "পালিয়ে যেতে হবে? তা, যাবার সময় পালিয়ে তো যেতেই হবে। কিন্তু ফিরে এলে কী আর জাত থেকে খারিজ হয়ে যাবি? তা নয় তবে গঞ্জনা সইতে হবে বটে?"

বলিয়াই গান ধরিলেন,—

"গুরু গঞ্জন চন্দন অঙ্গভূষা
রাধাকান্ত একান্ত তুমি ভরসা।"

বলিলেন "গোপিনীগণ গুরুজনের গঞ্জনা যদি আশীর্বাদ মনে করে মাথা পেতে না নিতেন, তবে কৃষ্ণ-অনুরাগের আর কী তাৎপর্য থাকতো বল দেখি? পদকর্তা তাই তো বলেছেন,"

কানু-অনুরাগ বাঘ সম পৈঠল
মন ঘন-কানন-মাঝে,
মান-মাতঙ্গ দূরহি দূরে ভাগল
লাজ ভয় মরত ভয়-লাজে।"

শেষ পর্যন্ত আমাদের লুকাইয়া যাওয়াই স্থির হইল। মেজ মামী মাসীমাকে দু'ছত্র লিখিয়া তাঁহার ঘরে রাখিলেন,

"বড় ঠাকুরঝি, গোঁসাই দিদির সঙ্গে যাচ্ছি। ভাবনা কোর না।"

ইহার আগে একদিন গোঁসাইমার সঙ্গে লুকাইয়া গিয়াছিলাম পানিহাটী, শ্রীরাম-দাস বাবাজীর কীর্তন শুনিতে। সেই অবধি কিছু সাহস হইয়াছিল।

শেষ রাত্রে বাহির হইলাম। ক্রমশ পথে পথে সঙ্গী জুটিয়া গেল বারো-তেরোজন। হাওড়া স্টেশনে গিয়া গাড়ি ধরিতে হইল।

ছোট লাইনের রেলগাড়ি। গাড়ির কামরা-গুলি খুব বড় বড়। সারি সারি কাঠের বেঞ্চ। সেই কাঠের উপর ছানার জল শুকাইয়া রহিয়াছে, মেঝের পাটাতন ছানার জলে সপ্ সপ্ করিতেছে। গাড়িতে বাসি ছানার এমন একটা দুর্গন্ধ যে, প্রথমটা

অসহ্য বলিয়া' মনে হইল, পরে অবশ্য সহিয়া গেল।

গোঁসাইমা পোঁটলা পুঁটলি গুনিয়া-গাঁথিয়া গুছাইয়া রাখিলেন, সঙ্গে সঙ্গিনী-গুলিকেও গুনিয়া লইয়া "নিতাই, নিতাই" বলিয়া এক হুঙ্কার ছাড়িলেন, তাহার পর গান ধরিলেন,

"জয় জয় নিত্যানন্দ, রোহিণীকুমার,
পতিত-উদ্ধার লাগি দুবাহু পসার।
ডগ মগ লোচন ঘুরায় নিরন্তর,
সোনার কমলে যেন ভ্রমিছে ভ্রমর।
দয়াল নিতাই চাঁদ আমার।

(নিতাই) ক্ষণে ক্ষণে "গো" "গো" বলে, "গোরা" বলিতে না পারে,

গোরা-রাগে রাঙা আঁখি জলেরে সাঁতারে।
সকরুণ দিঠে চায় শ্রীগৌরাঙ্গ পানে,
বলে, উদ্ধারহ ভাই যত দীন জনে,
দয়াল নিতাই চাঁদ আমার।

গাড়ি আস্তে আস্তে চলিতেছে। কেহ কেহ নাকে কাপড় দিয়াছেন দেখিয়া গোঁসাই মা বলিলেন "ওরে, মন্দ কিছু নয়, ও ছানার গন্ধ। এই গাড়িতে গোয়ালারা ছানা নিয়ে কলকাতায় যায়। বাবুদের গাড়ি হ'লে রোজ পরিষ্কার হ'ত, গোয়ালার গাড়ি তাই দু' তিন দিন বাদে হয় গাড়ি পরিষ্কার।"

দ্বারবাসিনী স্টেশনে যখন গাড়ি আসিয়া পৌঁছিল, তখন বেশ বেলা হইয়াছে। গাড়ি যদি এত আস্তে না আসিত, তবে আরও আগে পৌঁছিতে পারিতাম বটে, কিন্তু গ্রামের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আসিবার আনন্দ তাহা হইলে পাইতাম না। গাড়ি মন্দ মন্দ গতিতে কখনও বা বাঁশঝাড়ের গা ঘেঁষিয়া কখনও বা গৃহস্থের আঙিনার ধার দিয়া কখনও বা পুকুর পাড় দিয়া চলিয়াছিল। যাহা হউক, দ্বারবাসিনী স্টেশনে গাড়ি থামিল এবং গোঁসাই মার নির্দেশে আমরা সকলে মালপত্র নিয়া নামিয়া পড়িলাম।

রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, কিন্তু শীতের আমেজও আছে। মাসটি কি মাস তাহা এখন মনে নাই, অগ্রহায়ণের প্রথম কিম্বা ফাল্গুনের প্রথম দুইই হইতে পারে, অর্থাৎ সেটা রাসের অথবা দোলের সময়।

গোঁসাই মা বলিলেন, "এবার পায়ে হাঁটার পথ। তোমরা তীর্থযাত্রীর দল, হাঁটিতে ভয় করলে চলবে কেন? 'জয় নিতাই' বলে এগিয়ে চল।"

মাটির পথ, পথে বিষম ধুলো। গরুর গাড়ির চাকার দাগ আছে বটে, কিন্তু একখানা গাড়িও দেখিতে পাইলাম না।

ক্রমশ গ্রামের কাছাকাছি আসিয়া পড়িলাম। মাঝে মাঝে টিনের চালার দোকান ঘর, আবার মাটির পাঁচীল-ঘেরা খড়ের ঘর। শ্যাওলায় ভরা ছোট ছোট ডোবা এই সব দেখিতে দেখিতে চলিয়াছি।

একটা বাড়ির বাহিরের দাওয়ায় এক বুড়ো বসিয়া হুঁকোয় তামাক টানিতেছে ও অনবরত কাশিতেছে। বাড়িটি বেশ বড় বলিয়া মনে হইল, ভিতরের দিকে অনেক-গুলি ঘর আছে।

গোঁসাই মা সেখানে থামিলেন, বুড়োকে বলিলেন, "বাবা এটা তো আপনারই বাড়ি?"

উত্তরে বুড়ো কাশিতে কাশিতে কী যে বলিল মোটেই বুঝা গেল না।

কিন্তু যখন গোঁসাই মা বলিলেন, "আমরা মালপাড়া যাচ্ছি। তোমাদের বাড়ির উঠানে আমাদের রেঁধে নেবার একটু জায়গা হবে কি? আরও তিনি কি যেন বলিতেছিলেন, বুড়ো কাশিতে কাশিতে এখন চেঁচাইয়া উঠিল যে তিনি আর কিছু বলিবার সুযোগ পাইলেন না। সগর্জন চীৎকার ও সেই সঙ্গে কাশির ধমক, প্রথমে কিছুই বুঝা গেল না, তারপর দেখিলাম বুড়ো রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, হুঁকোটি হাত হইতে পড়িয়া গিয়াছে, দুই হাত নাড়িয়া যথাসাধ্য চেঁচাইয়া বলিতেছে, "আমরা হাঁদু নই, আমরা মোছলমান, শুনছো গো ঠাকরুণ, মোছলমানের বাড়ি খাবা নাকি?" এই পর্যন্ত বলিয়াই আর কথা বাহির হইল না, হাত নাড়িয়া ইঙ্গিতে রাস্তার দিকে দেখাইয়া দিল। গোঁসাই মা মৃদুস্বরে বলিলেন, "বাড়ির উঠানটাও বুঝি মোছল-মান হয়ে গিয়েছে?" মেজ মাসী খুবই রাগিয়া গিয়াছিলেন, গোঁসাই মাকে বাড়ির সম্মুখ হইতে টানিয়া আনিয়া আবার পথে নামিলেন এবং রাগত স্বরে বলিলেন, "গোঁসাই দিদি তোমার মতলবটা কি? কীর্তন শোনা না রাস্তায় ঘর-সংসার পাতা?"

গোঁসাই মা সে কথায় কর্ণপাতও করলেন না উৎসুক দৃষ্টিতে রাস্তার দুই ধার দেখিতে দেখিতে চলিলেন যদি কোন বাড়িতে রান্না করিবার জায়গা মিলে।

অবশেষে এক পুষ্করিণীর ধারে আসিয়া দেখা গেল সেই পুকুরে ছোট বড় কয়েকটি মেয়ে স্নান করিতেছে তাহারা একই বাড়ির বলিয়া মনে হইল। তাহাদের মধ্যে রুপার পৈঁছা হাতে ভারিক্কি চেহারার একজন, সম্ভবত তিনিই ঐ মেয়েগুলির মা, তিনি উহাদের ধমক দিতেছেন। তাঁহার ভাবটি বেশ কর্তৃত্বসূচক। গোঁসাই মা পুকুরের ধারে অগ্রসর হইলেন এবং সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁগা মা এই যে বড় বাড়িটা দেখা যাচ্ছে ওটা কি তোমাদেরই বাড়ি?"

মেয়েটি এতক্ষণ আমাদের দেখে নাই। এখন গোঁসাই মাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে বলিল, "ও মা, আপনে গোঁসাই বাড়ির মা ঠাকরুণ বটেক?"

গোঁসাই মা বলিলেন, "হাঁ মা তাই বটে, তবে মালপাড়া আমার বাড়ি নয়, আমার বাড়ি উজানী। এই দেখ না যাত্রীর দল নিয়ে মালপাড়া চলেছি ঠাকুর দর্শনে। তা মা, মালপাড়া অনেকটা দূরে, এখানে একটু ডাল চাল ফুটিয়ে নেবার জায়গা খুঁজছি। তোমাদের বাড়ি একটু জায়গা দিতে পার?"

দেখিলাম মেয়েটির একটু অপ্রস্তুত ভাব, উত্তর দিতে ইতস্তত করিতেছে দেখিয়া মেজ মাসী জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা তো হিঁদু? দেখে তো তাই মনে হচ্ছে।"

মেয়েটি আমতা আমতা করিয়া বলিল, "তা যা বল, হিঁদুই বল আর মোছলমানই বল। এ দেশে আর হিঁদু কোথায়! আচ্ছা এস তোমরা, একটা নূতন ঘর তোলা হয়েছে সেখানেই আপনারা পাক-শাক করে নেবেন,—বাসন-পত্তর আছে তো?"

গোঁসাই মা উৎসাহের সঙ্গে বলিলেন, "রাঁধবার বাসন আছে, তবে জল নেবার জন্য একটা ঘড়া চাই। তা তোমরা তো সবাই এক একটা ঘড়া নিয়ে এসেছো দেখছি, দাও না ওরই একটা।'"

মেয়েটি বলিল, "না, না, বাড়িই চলুন, নতুন ঘড়া একটা আছে, একেবারে নতুন। সেইটে বার করে দিচ্ছি।"

গোঁসাই মা আগে আগে, আমরা তাঁহার পিছনে। তিনি এমন নিঃসঙ্কোচে চলিয়াছেন দেখিয়া মনে হয় না অচেনা কাহারও বাড়ি যাইতেছেন। বাড়িটা বেশ বড়, সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ি বলিয়াই মনে হয়। প্রকাণ্ড উঠান, কয়েকখানি চারচালা ঘর, আবার দোচালা ঘরও এক পাশে দুটি-তিনটি আছে। তাহার ভিতর একটি ঘরকে তাঁতশালা বলিয়া মনে হইল।

মেজ মাসী কেবল গজ্ গজ্ করিতেছেন, "গোঁসাই দিদির যা কাণ্ড! একদিন না খেলে কি হয়? রাস্তায় এসে ও'র যত কিছু হাঙ্গামা!"

এদিকে গোঁসাই মা তাড়া দিতেছেন, "চল, পুকুরে গিয়ে একটা একটা ডুব দিয়ে নেবে! ক্ষীরোদা, মা তুমি কলসীটা নাও। উঠানে দেখছি দড়ি টাঙ্গানোও আছে, ভিজে কাপড় রান্না হতে হতেই শুকিয়ে যাবে। একেবারে নতুন ঘর দেখছি, তা একটু গোবর নিয়ে মার্জনা করে নাও। দাওয়ায় দুখনা ইট পেতে উনুন করে নেওয়া যাবে। নিতাই! নিতাই! এই যে শুকনা ডালপালাও জমা করা রয়েছে দেখছি। দেশলাই এনেছো তো! এইবার পুকুরে চল। মেজবৌ, তুমি রাগ করছো কেন, পথে রথে এমন ভোগ নিতাইচাঁদের বড় প্রিয়।"

পুকুরে গিয়া স্নান করা হইল। পুকুরের জল খুব পরিষ্কার, এত পথ রৌদ্রে হাঁটিয়া আসার পর স্নান করিয়া সকলেরই খুব আরাম হইল। ক্ষীরোদা দিদি বলিলেন, "মেজ খুড়ি, কলসীটা আমাকে দাও, এত বড় জল-ভরা কলসী তুমি ব'য়ে নিয়ে যেতে পারবে না। তোমরা বরং ভিজে কাপড় আর বাসনগুলো নিয়ে চল।" আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "গৌরী তুই ঘটিটা আর বাট্‌লোটা জল ভর্তি করে নিয়ে চল।"

ক্ষীরোদা দিদি আসিয়া নিকানো দাওয়ায় জলের কলসী নামাইয়াছেন, মেজ মামী আর রাঙ্গা মামী কাপড় শুকাইতে দিতেছেন, গোঁসাই মা পুঁটলি খুলিয়া চাল ডাল বাহির করিতেছেন, এমন সময় দুয়ারের কাছে বিষম গোলমাল শুনিতে পাওয়া গেল।

রক্তচক্ষু, ঝাঁক্‌ড়া ঝাঁক্‌ড়া চুল এক কৃষ্ণবর্ণ বলিষ্ঠ পুরুষের আবির্ভাব হইল উঠানে। তাহার হাতে ছোট একটি গরু তাড়াইবার লাঠি, একটি গামছার বস্তা পিঠে বাঁধা। পৈ'ছাপরা মেয়েটির পিঠে সজোরে এক ঘা লাঠির বাড়ি বসাইয়া দিয়া সে চীৎকার করিয়া বলিল, "মাগী! দিনে দিনে তুই কি খুকি হচ্ছিস্? ও'দেরকে যে বাড়ি ঢোকালি, তোর "হায়াটা কি?" গোসাই মা তখন তিলক লইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া দাওয়া হইতে নামিয়া পড়িলেন, কিন্তু তাঁহার কিছু করিবার বা কোন কথা বলিবার সুযোগ হইল না। লোকটি তাঁহার দিকে রক্তচক্ষুতে চাহিয়া চে'চাইয়া উঠিল, "ও বাব্‌বা, ইনি যে দেখছি গোঁসাই ঠাকরুণ, মাগীই যেন ন্যাকা আর পাগ্‌লাটে, কিন্তুক আপনারাও ন্যাকা নাকি? মোছলমানের বাড়ি আস্তানা নিয়েছেন রে'ধে-বেড়ে ভোজ খেতে?"

গোঁসাই মা একেবারে স্তম্ভিত! বলিলেন, "মোছলমান? আমরা মনে করেছিলাম তোমরা তাঁতী!"

সগর্জনে লোকটি বলিল "ঐ মাগী বুঝি তাই বলেছে? ওর যে হিন্দু হবার ভারী সাধ! তাঁতী? হ্যাঁ তাঁতীই বটে, তাঁতীই ছিলাম, কিন্তু এখন? বাপ দাদার আমলে যারা ছিল কাপড় বোনা তাঁতী—তারা হয়েছে এখন জোলা, গামছা বোনা জোলা। শুনলে তো ঠাকরুণ, আমরা হিন্দু নয় মোছলমান, জোলা। যাও, এখন তল্পী-তল্পা গুটিয়ে বিদেয় হও।"

বিদায় হইলাম। মেজ মামী বকিতে বকিতে চলিলেন, ক্ষীরোদা দিদি ভিজা কাপড়ের বোঝা বহিয়া চলিলেন, আর সকলে কে যে কিভাবে চলিতেছেন লক্ষ্য করি নাই, তবে গোঁসাই মার দিকে চাহিয়া দেখিলাম তাঁহার মুখের প্রশান্তভাব পূর্বের মতই আছে। এদিক ওদিক চাহিতেছেন, পথ চলিতেছেন আর মাঝে মাঝে "নিতাই! নিতাই!" বলিয়া নিশ্বাস ফেলিতেছেন। যাহা বলিতেছেন, তাহা স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে না, কিছু কিছু যাহা শোনা যাইতেছে তাহা এই ধরণের— "অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়," আহা, নিতাইচাঁদের লীলার বলিহারী যাই। তীর্থ-যাত্রীর সৌভাগ্য থেকে আমাদের বঞ্চিত করবেন কেন? লোকটা বড় রেগে গিয়েছে বৌটাকে হয়তো মারধোর করবে। আহা, বেচারী! ওমা, এই যে একটা ছানাওয়ালা ছানার বাঁক কাঁধে যাচ্ছে। ও ছানাওয়ালা, ছানাওয়ালা, এ দিকে! এ দিকে! এই পুকুরধারের সড়কে, হ্যাঁ, এই দিকে এসো।"

ছানাওয়ালা তাহার ছানার বাঁক নিয়া উপস্থিত হইল। গোঁসাই মা দরদস্তুর করিয়া তখনই দুই ভাঁড় ছানা কিনিয়া ফেলিলেন, তাহাকে বলিলেন, আমরা মালপাড়ার পাটে যাচ্ছি, তোমাদের বাড়ি ঐ দিকেই তো! তা, আমরা তোমাদেরই অতিথি ঠকিয়ে নিও না যেন। দার-বাসিনীতে টেরেন ধরতে পারিনি তাই ফিরে আসছো, বটে তো! তা পথেই গাহক জুটিয়ে দিলেন নিতাইচাঁদ। আজ তোমার ছানায় গৌরনিতাইয়ের ভোগ লাগবে, কেমন ভাগ্য বল তো।"

ছানা তো কেনা হইল, কিন্তু ভোগ দেওয়া হইবে কিসে করিয়া? ছানাওয়ালা একজনের গামছায় ছানা ঢালিয়া দিয়া দাম নিয়া চলিয়া গেল। কাছাকাছি কোথায়ও কলাগাছ নাই। সঙ্গে পাত্রের মধ্যে পিতলের বাটি, ঘটি আর হাতা-বেড়ি। ভোগ লাগানো হইবে কি গামছায় করিয়া?

আমরা তখন একটি পুকুরের ধারে প্রকাণ্ড এক অশ্বত্থ গাছের নীচে দাঁড়াইয়া আছি। গোঁসাই মা বলিলেন, "সকলে অশদ্ পাতা কুড়িয়ে আন, পুকুরের জলে পাতাগুলি বেশ করে ধুয়ে নিয়ে এস দেখি। হেমাঙ্গিনী, তোমার নূতন গামছাটা বিছিয়ে তার উপর পাতা সাজাও তো! বলিহারি! বলিহারি! এমন ভোগ আর কোথায় হবে? পথের ধারে পুকুর-পারে অশদ্ পাতায় বিনা চিনিতে ছানার ভোগ। দুর্লভ এই মহাপ্রসাদ।"

সামান্য চিনিও ছিল, কিন্তু পানীয় জল? পুকুরের জল মাথার চুলের মত সরু সরু একরকম শ্যাওলায় ভরা, জল তুলিতে গেলে জল না উঠিয়া উঠিল এক ঘটি শ্যাওলা।

শ্যাওলা ছাঁকিয়া সামান্য যে জল পাওয়া গেল সে দিনের মত শ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ সেই পানীয় পাইয়া পরিতৃপ্ত হইলেন, কিন্তু আমাদের সারাদিন পথ চলিয়া যে দারুণ পিপাসা, সে পিপাসা মিটিবে কিসে?

ঘটিতো একটি মাত্র। গোঁসাই মার আদেশে সকলেই পুকুরে নামিয়া অঞ্জলি করিয়া শ্যাওলা চুষিয়া চুষিয়া জল-পান করিল, কিন্তু আমি বিদ্রোহী হইয়া উঠিলাম। দৃঢ়ভাবে বলিলাম, "ও তো জল নয়, কেবল শ্যাওলা। আমি ও জল কিছুতেই খেতে পারবো না।"

প্রথমে গোঁসাই মা আমাকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু কিছুতেই যখন সেই জল খাওয়াইতে রাজী করিতে পারিলেন না, তখন রাগিয়া বলিলেন, "গৌর, তুমি যে এমন মেয়ে আগে তা জানতাম না। জানলে কি সঙ্গে নিয়ে আসি গলা শুকিয়ে মারবার জন্যে?"

আমি বলিলাম, "নিয়ে যখন এসেছ তখন আর এ সব কথা বলে লাভ কি?"

আবার পথ চলা আরম্ভ হইল। সন্ধ্যার আগেই মালপাড়া আসিয়া পৌঁছিলাম।

এখন একটা আস্তানা চাই সকলের আগে।

গোঁসাই মা ইহার আগে অনেকবার মালপাড়া আসিয়াছেন, এখানে কোথায় কি তাহা তিনি জানেন। তিনি আমাদের একটি এক তলা বাড়িতে লইয়া গেলেন। বাড়িটি দেখিলেই বুঝা যায় সেটি একটি পরিত্যক্ত বাড়ি, কোন লোক এখানে বাস করে না। তিনখানি ঘর, ঘরের সম্মুখে চওড়া খোলা রোয়াক, উঠান, উঠানের এক পাশে বাঁধানো কুয়া; কুয়াটী যে পরিত্যক্ত নয় তাহাও বুঝা গেল কেননা, কুয়ার পাশে এক গাছি দড়িতে বাঁধা একটি বাল্তি রহিয়াছে, বাল্তিটি অবশ্য প্রায় ভাঙ্গা। প্রাচীরও আছে, কিন্তু মাঝে মাঝে ভাঙ্গিয়া ইঁট খসিয়া পড়িয়াছে।

গোঁসাই মা বলিলেন, "এই বাড়িটা যাঁর তিনি সন্ন্যাসী হয়েছেন, তাই বাড়িটা খালি পড়ে আছে। কেশবানন্দ স্বামীর নাম শুনেছো তো, মন্ত্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী। তাঁর এ মুলুকে যত না শিষ্য পশ্চিমে তার চেয়ে অনেক বেশী। বৃন্দাবনে তাঁর প্রকাণ্ড মঠ আছে, আবার কাশীতেও এসে মাঝে মাঝে থাকেন। এখানকার লোকে বলে তিনি কোন কোন রাত্রে আকাশপথে এই বাড়িতে আসেন, তাই কেউ ভরসা করে এ বাড়ি দখল করেনি, তবে কুয়ার জল খুব ভাল, তাই গ্রামের লোক কুয়ার জল নিয়ে যায়। ভালই হল, জল তুলবার দড়ি বাল্তি দুই জুটে গেল। এখন ইঁট কুড়িয়ে উনান পাত, শুকনা কাঠ-কুটরাও তো বিস্তর পড়ে রয়েছে।'

এইবার সত্য-সত্যই খিচুড়ি চড়ানো হইল, বাটিলোতেই ভোগ দেওয়া হইল, পাতাও কিছু সংগ্রহ হইল এবং সকলেই কিছু কিছু প্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

গোঁসাই মা বলিলেন, "কীর্তনমণ্ডপ বেশি দূর নয়। খোলের বাজনা আরম্ভ হইলেই মণ্ডপে যাওয়া যাবে। মাঝরাতে কীর্তন আরম্ভ হবে, এখন এই রোয়াকেই একটু গা গড়িয়ে নাও।"

খোলা রোয়াকে চাদর মুড়ি দিয়া ঘেঁষা ঘেঁষি করিয়া সকলের শয়নের ব্যবস্থা হইল। মশার ভন্ ভন্ শব্দ, অচেনা জায়গা, তাহাতে আবার কেশবানন্দ স্বামীর আকাশপথে আগমনের সম্ভাবনা আছে তবুও সারাদিনের ক্লান্তিতে সকলেরই ঘুম আসিল। কতক্ষণ ঘুমাইয়াছি জানি না ঘুম ভাঙ্গিল গোঁসাই মার ডাকে,—"ওঠ ওঠ্ সব, উঠে পড়্। ঐ শোন মণ্ডপে খোলের বাজনা শোনা যাচ্ছে, আর দেরী করলে জায়গা পাওয়া যাবে না।"

(আগামীবারে সমাপ্য)

সিম্ফনি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

এখনো মাঠে জোনাকী ঝরে পড়ে,
শিউলী হাসে অশ্রুঝরা ঘাসে?
কত যে প্রাণ বাঁচার অবকাশে
উধাও হলো বৈশাখের ঝড়ে।
হৃদয়ে হায় বাতাস কেঁদে মরে।

ঘুম কোথায়, বিরামহীন সুরে—
বন্ধদ্বারে অন্ধ মাথা কোটে;
কার চোখে বা সাগর দুলে ওঠে?
বন্দিনীর, নিঝুম ঘুম পুরে!
নিঃস্বতায় হৃদয় মরে ঘুরে।

তারার চোখে রাতের বধূ হাসে
হৃদয়ে হায় বাতাস কেঁদে মরে।
উধাও করা বৈশাখের ঝড়ে—
জীবন মজে আগুন নিঃশ্বাসে।
স্বপ্নে কেউ আজো কি ভালোবাসে?

ব্যাট, বল, বিল

শ্রীরমেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

ব্যাট, বল ও বিল এই তিনের যোগাযোগে জমে ওঠে ক্রিকেটের জমকালো টেস্টের খেলা। টেস্ট ম্যাচ জমজমাটি হতে গেলে খেলায় নৈপুণ্য ছাড়া এ তিনটি অবিচ্ছেদ্য উপাদানের একটিকেও বাদ দেওয়া চলে না। গোড়ার যুগে হকি স্টিকের মত ব্যাট ছিল বাঁকা। তা থেকেই হয়েছিল ক্রিকেটের নামকরণ। নাম যাই হ'ক বল না হলে শুধু ব্যাট দিয়ে খেলা চলে না; তাই ব্যাট ও বল ক্রিকেটের আদি ও সনাতন উপকরণ। কিন্তু বিল আবার কি? ব্যাট ও বলের জ্ঞাতি-শত্রুতা ও বিলের পরিচয় প্রসঙ্গ সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা এ প্রবন্ধের হবে প্রচেষ্টা।

এখনও এই শহরে অনেক বাড়িতে "দেশওয়ালী" তেলওয়ালার গতিবিধি আছে। যোগান দেবার পর দরজা বা দেয়ালের গায়ে সে খড়ির দাগ দিয়ে যায়। কত যোগান হ'ল, পাওনা কত হ'ল সে এই দাগ দেখে হিসেব করে। এককালে ইংলণ্ডে দেনা-পাওনার এই ধরণের হিসেব রাখা হ'ত। পাওনাদার একটা লাঠির গায়ে পর পর দাগ টেনে যেত। কুড়ি হলেই লাঠির গায়ে ছোট্ট একটা গর্ত খোদাই করা হ'ত। এর থেকেই 'স্কোর' কথার মানে দাঁড়াল এক কুড়ি। এইভাবে যে দাগ টেনে গর্ত কেটে সংখ্যা-বাচক ছেদের সৃষ্টি করে, তাকেই ক্রিকেটের পরিভাষায় 'স্কোরার' বলা হ'ত। কালে গণিতের উন্নতি হ'ল এবং লাঠি ছেড়ে বিজ্ঞানসম্মতভাবে স্কোর লেখার প্রচলন হ'ল। শুধু যা 'স্কোরার' নামটাই থেকে গেল। বিল এ যুগের টেস্ট ম্যাচের নাম করা স্কোরার ও 'ব্যাগেজম্যান'।

বিল স্কোরার—অর্থাৎ ব্যাট ও বলের কার্যকলাপের হিসাব অঙ্কে লেখা তার কাজ। এ কাজে তার জোড়া সারা পৃথিবীতে আর কেউ নেই। এ কাজ সে করে যায় চক্ষের নিমিষে নিখুঁতভাবে। এ কাজের ফাঁকে তার হাতে থাকে প্রচুর সময়। এটা সে কাজে লাগায় খেলার মাঠে আশপাশের বাড়িগুলোর ছবি এঁকে। তা ছাড়া ব্যাটসম্যান খেলার মাঠের কোনখান দিয়ে, কিভাবে, উইকেটের কোন কোণা ধরে মার চালনা করলে—সে মার থেকে কত রান হ'ল স্কোর লেখার সঙ্গে সে এ সবের চমৎকার
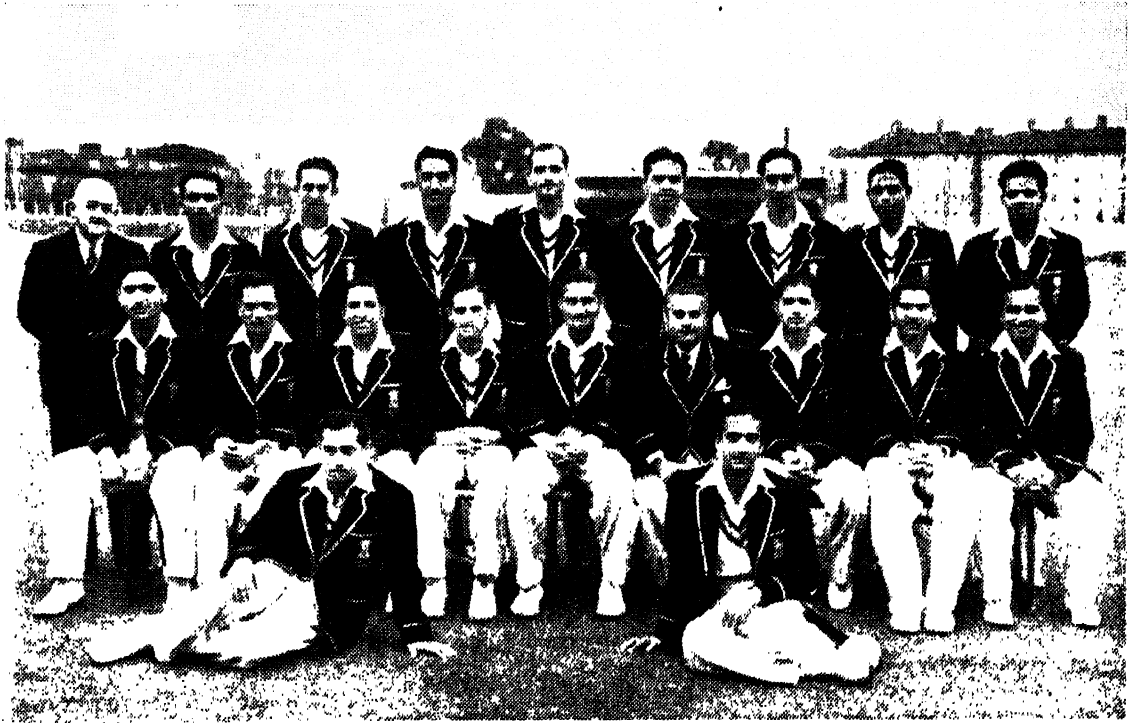
বাঁ দিক থেকে ডান দিকে দাঁড়িয়ে : মিঃ ডব্লিউ ফারগুসন (স্কোরার), এম কে মন্ত্রী, এন চৌধুরী, রামচাঁদ, গুলাম আমেদ, ডিভেচা, গোপীনাথ, এইচ জি গাইকোয়াড়, মঞ্জরেকর। উপবিষ্ট : উমরিগর, সিন্ধে, সারভাতে, অধিকারী (সহ-অধিনায়ক), হাজারে (অধিনায়ক), পংকজ গুপ্ত (ম্যানেজার), মানকড়, ফাড়কর, পি সেন। সামনে উপবিষ্ট : পি রায়, ডি কে গাইকোয়াড়।

(শ্রীপঙ্কজ গুপ্তর সৌজন্যে)

ছক এ'কে থাকে। এ থেকে দু দলেরই সমান সুবিধা হয়। একজন ব্যাটসম্যান বেশির-ভাগ মাঠের কোনখান দিয়ে রান তুলছে, তা এই ছক থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় এবং সেই মত ফিল্ড সাজান যায়। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে, "বিল অমুকের তৃতীয় ওভারে চতুর্থ বলে কে ব্যাট করছিল" সে তখুনি তার যথাযথ জবাব দেবে।

তাই ব্যাট ও বলের সঙ্গে উচ্চাঙ্গের টেস্ট খেলায় বিলকে চাইই চাই—নইলে খেলার সঙ্গত হবে না। গানের সঙ্গে বাজনার মিল হবে তবেই ত আসর জমবে নইলে কেমন ঢিলেঢালা, ফাঁকা ফাঁকা ঠেকবে। তাই টেস্টের খেলায় ব্যাট, বল ও বিল তিনটিই চাই।

বিলের পুরো নাম উইলিয়াম ফারগুসেন। ক্রিকেট খেলার জগতে একে সবাই 'ফারগী' বলেই জানে। এর ডাক নাম বিল—উইলিয়ামের অপভ্রংশ। বিল শুধু যে টেস্ট খেলার অঙ্গের সামিল, শুধু যে টেস্টের অভ্রান্ত গাণিতিক, বিশ্বস্ত, অন্তরঙ্গ অনুপম অনুচর তা নয়। যে সব দল বিদেশে টেস্ট উপলক্ষে সফরে বেরোয় তাদের জন্য জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সে সব কিছু করে থাকে। সে ব্যাগেজ-ম্যান, সে য়্যাকাউন্ট্যান্ট, সে ট্রাভেলিং-গাইড্, সে সব কিছু। বিল না হলে তাদের এক দণ্ড চলে না।

সম্রাট উইলো

এবার ব্যাট ও বলের সংক্ষিপ্ত আদি পরিচয় আলোচনা করা যাক। একদা ব্যাটকে ক্রিকেটের রাজপদে অভিষিক্ত করা হয়েছিল। ক্রিকেটের রাজমুকুট আজও তার মাথায়। একালে রাজার প্রতিপত্তির অবনতি ঘটেছে। পৃথিবীর কোথাও রাজার আর আগের মত আধিপত্য নেই। সেকালের রাজকীয় গৌরব এখন অনেকটা ক্ষীণ শশি-কলায় দাঁড়িয়েছে—এখনও যেটুকু আছে সে শুধু ইংলণ্ডে। একেবারে গোড়ার কথা ছেড়ে দিয়ে বলা চলে, ইংলণ্ডের মাটিতে, ইংলণ্ডের আলো, জল, বাতাস, প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যেই ক্রিকেট খেলার যা কিছু বাড় বাড়ন্ত, নাম ডাক, প্রভাব প্রতিপত্তি সবই সম্ভব হয়েছে। ইংলণ্ডে আজও রাজার গৌরব-মহিমা প্রজার মনের স্বাভাবিক অনুরাগে সমুন্নত, প্রোজ্জ্বল, মহান। সে দেশে রাজা এখনও পুজোমান, সর্বক্ষমতার প্রতীক, অভ্রান্ত মহীপাল। প্রজা তাঁরই আনুগত্য, মনে প্রাণে মেনে নিয়ে নিজেকে ধন্য বোধ করে। এই হ'ল ইংলণ্ড। এই ইংলণ্ডের জাতীয় খেলা ক্রিকেটে ব্যাটকে রাজা বলে মেনে নিয়ে সবাই ধন্য হয়। ক্রিকেটে ব্যাটের স্থান রাজসিংহাসন—ব্যাট রাজা, সম্রাট উইলো—কিং উইলো!

বলের স্থান রাজসিংহাসনের নিকটেই। বল রাজার সহচারী সামন্ত—ক্রিকেটের রাজ-সভায় কুটিল-প্রকৃতি, চক্রান্তকারী 'ডিউক'। এই সামন্তটিকে বিশ্বাস নেই, অথচ না হলেও চলে না। ডিউকের আগমন-ভঙ্গীর গুপ্ত সূচনা ও নির্ধারিত পথে গতি-বিধির উপর রাজা যাতে সতর্কদৃষ্টি রাখতে পারেন ভেবে চিন্তে ভালমত তার ব্যবস্থা হয়েছে। ডিউক ক্ষুদে বাঁটুল—কিভাবে, কি ফন্দি নিয়ে হঠাৎ সে হাজির হবে নজরে তা নাও ঠেকতে পারে। তাই দূরে, তার প্রবেশ পথের সীমানায়, সব কিছু আড়াল দিয়ে মস্ত পর্দা টাঙ্গান হয়, যাতে তাকে চোখে ঠেকে। ব্যাটের চাই দৃষ্টি সহায়ক পর্দা—'সাইট স্ক্রিন'।

সবাই চায় রাজার জয়; সবারই মনে এক কথা—ফন্দীবাজ ডিউকটাকে দাবিয়ে রাখতে হবে। ক্রিকেটের রাজসভায় সভাজন সবাই গায়—

"মৃত্যুঞ্জয়ী সম্মানী বীর হোক মোদের রাজা
ষড়যন্ত্রীকে দিতেই হবে উচিত মত সাজা।"

"So ho! so ho!..the courtiers sing
Honour and Life to Willow
the King."

তাই উইকেট তৈরি করা হয় ব্যাটের সাহায্য-কল্পে—বলটার ঘোরা-ফেরার পথ দুরূহ করে। তাই বক্রী ডিউকের সম্পর্কে রাজাকে সাবধান করেন কবি—

ওগো রাজা, রাজা উইলো
হুঁশিয়ার থেকো;
রাত না হতে বিপদ তোমার
ঘনিয়ে আসবে দেখো।
লাফিয়ে, ছুটে—ক্ষুদে, কড়া
এল ডিউক চামড়া-মোড়া,
প্রাসাদ তোমার পড়ল ভেঙ্গে।
চামার ডিউক ঢোকার সঙ্গে।

"Willow, King Willow, thy
guard hold tight;
Trouble is coming before the night;
Hopping and galloping
short and strong,
Comes the Leathery Duke along,
And down the palaces tumble fas
When once the Leathery Duke
gets past!

ডিউককে কে না চেনে। ছোটদের **অনেকেরই ক্রিকেটের** বর্ণপরিচয় হয় **তা ব্যাট ও টেনিস বল নিয়ে খেলায়।** এর **পর ক্লাসে উঠলেই এ সবই বদলে যায়।** তখন **টেনিস বলের পরিবর্তে 'ডিউস'** বল চাই। **এই 'ডিউস'ও যা 'ডিউক'ও** তাই একই **কথা!** বলের দুষমণীর কথা ইতিহাসের **পাতাতেও উঠেছে। ১৭৫১** সালে ক্রিকেট বলের আঘাতে যুবরাজ ফ্রেডেরিক মারা যান। গাছের ডাল কেটে ব্যাটের কাজ চালান **সম্ভব হলেও বল তৈরি করা** বড় সহজ **ছিল না।** তাই ব্যাটের বহু আগে বল তৈরি করার কাজে নানান্ উন্নতি দেখা গিয়েছিল। সেই কোন যুগের কথা, ১৭৬০ সালে ডিউক এণ্ড সন্-এর বল তৈরি করবার কারখানা বা ফ্যাক্টরি স্থাপিত হয়। কারখানার মালিকের "ডিউক" নামেই হয় বলের পরিচয় খেলার মহলে একান্ত নিবিড় হয়ে উঠেছিল। তারপর একদিন ডিউক য়্যাণ্ড সন্স'-এর নাম লুপ্ত হয় উইসডেনের সঙ্গে যৌথ কারবার খোলায়।

দুর্নিবার ভ্রমণেচ্ছা

এবার বিল ফারগুসনের কথা বলা যাক। ফারগুসনের পূর্বপুরুষেরা হলেন স্কট-ল্যাণ্ডের লোক। —ফারগুসন অস্ট্রেলিয়ার **অধিবাসী। ছেলেবেলা থেকে** এর ফুসফুসে দোষ ছিল। তাই হয়ত দুর্বার নিয়তি এঁর মনে জাগিয়ে তুলেছিল দুর্নিবার ভ্রমণেচ্ছা —তাই ক্রমান্বয় এ'কে ঠেলে দিয়েছে সমুদ্র পথে। তা না হলে হয়ত বালক ফারগু-সনের ফুসফুসের দোষ কারখানার কলুষিত হাওয়ায় বেড়ে যেত—হয়ত তার ফলে তার হোত অকালমৃত্যু। কথায় বলে 'রাখে কৃষ্ণ মারে কে।' বিল ছোটবেলা থেকে খোরাকির টাকা থেকে যৎসামান্য যা পারত তা বাঁচাত। তার মনে প্রবল বাসনা তা দিয়ে সে একদিন জাহাজ চ'ড়ে সাগর পাড়ি দেবে। কিন্তু কি করা যায়—কোন কালেই কোন জাহাজ কোম্পানি তার জমান পেনি যথেষ্ট 'পারানি' বলে মেনে নিয়ে তাকে যে জাহাজে তুলে নেবে এমন সম্ভাবনা ত হিসেবে পাওয়া যায় না। তাই বিল দুধের স্বাদ **ঘোলে মেটায়—মাঝে মাঝে জাহাজঘাটে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে দেখে যাত্রীরা নামছে উঠছে।**

"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" বিল অভ্যাস মত একদিন রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জাহাজ থেকে লোক নামছে। চারিদিকে মহা ব্যস্ততা। একজন যাত্রী এসে বিলের পাশে দাঁড়াল, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সে নিজের মনেই বল্লে "যাক্ আবার দেশে ফেরা গেল।" বিল বল্লে "জাহাজে বুঝি খুব কষ্ট হয়েছে?" সে বল্লে "মোটেই নয়। জাহাজটা দেখতে ঐ রকম পুরানো কিন্তু খুব মজবুত; ঝড়, তুফানে ওকে একটুও ঝাঁকুনি দিতে পারে না। ইংলণ্ড একবার না দেখে এলে কিছুই হ'ল না। তোমার যাবার ইচ্ছে কর না।" তারপর সে তাকে মতলব বাতলে দিল। "তুমি যাও এই সিডনীতেই মণ্টি কাছে থাকেন। তাঁর সঙ্গে দেখা কর। তিনি দাঁতের ডাক্তার। তাঁকে বোলো ইংলণ্ডে যে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট দল যাচ্ছে তাদের সঙ্গে তোমাকে ব্যাগেজম্যান করে নিতে।"

পরামর্শমত বিল বিশ্ব-বিশ্রুত ক্রিকেটার ডাক্তার এম এ নোবেলের চেম্বারে গিয়ে উপস্থিত। দাঁতের একটা কোণা নিজেই সে ভেঙেগেছে। ডাক্তার দাঁত পরীক্ষা করে দেখছেন, সাঁড়াশীগুলো কাছেই রয়েছে। সব বুঝে বিল ব্যাগেজম্যানের জন্য তার আবেদন জানালে। ডাক্তার মনে মনে হয়ত ভাবলেন ছোকরার ত সাহস কম নয়, এই কাজের জন্য সাঁড়াশীর সামনে আসতে ভয় পায়নি। তারপর একটু হেসে বল্লেন "বড় জোরে হাঁ করো ত।"

সেই হোল বিলের যাত্রা শুরু। সেই প্রথম জো ডারলিং-এর অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট দলের সঙ্গে তার প্রথম বিলাত যাত্রা। সে দলে ছিল, ট্রাম্বল্, স্যানডার্স্, নোবল, ট্রাম্পার, হিল, ডাফ্, গ্রেগরি ও ডারলিং। হয়ত অস্ট্রেলিয়া থেকে এর চেয়ে শক্তিশালী দল ইংলণ্ডে কখনও খেলতে যায় নি। বিল বসে বসে দেখলে অবিস্মরণীয় টেস্ট খেলা। উচ্চারণের বৈশিষ্ট্যে ইংরেজী কথা তার কানে বিচিত্র সুরের সৃষ্টি করল আর সূর্যের আলোয় দিনের পর দিন কাটিয়ে ব্যাট ও বলের অবিশ্রাম সংগ্রাম দেখে, ২৬০০০ হাজার মাইল সমুদ্রের হাওয়া খেয়ে সে যখন আবার স্বদেশে ফিরল তখন তার রুগ্ন ফুসফুস সম্পূর্ণ সুস্থ, নিরাময় হয়ে উঠেছে, নিজের মধ্যে এসেছে তার কর্মপ্রবণতা ও আত্মনির্ভরতা। সেই সফরে তাকে প্রতি হপ্তায় দু পাউণ্ড করে দেওয়া হত তাতেই সে নিজের থাকা, খাওয়া, জাহাজ ভাড়া ও অন্যান্য সব খরচই মেটাত।

তারপর বিল অর্ধ শতাব্দী ধরে বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন দলের টেস্ট খেলায় একই কাজ করে আসছে। অগণিতবার তাকে সাগর পারাপার করতে হয়েছে। এম সি সি দলের পূর্বতন অধিনায়ক স্যার পেলহাম ওয়ারনার ফারগীর সম্বন্ধে বলেছেন—"পৃথিবীতে এর মতন কেউ আর কখনও ভ্রমণ করে নি—স্কোরার ও ব্যাগেজ ম্যানেজারের কাজে এ প্রতিভার নামান্তর।"—

("the most travelled man in the world....a scorer and bagage manager—a genius at both.")

ক্রিকেটের বিশিষ্ট লেখক সোয়ানটন্ এর সম্বন্ধে বলেছেন,—বিভিন্ন দেশের প্রত্যেক সফররত দলের ফারগী হ'ল স্কোরার, ব্যাগেজ-মাস্টার, দার্শনিক ও বন্ধু।

("Fergie, the baggage-master, scorer, philosopher and friend to every touring team")

ভারতীয় দলের ম্যানেজার শ্রীপঙ্কজ গুপ্ত শতমুখে ফারগীর প্রশংসা করে থাকেন। ইংলণ্ডে ভারতীয় দলের ১৯৩৬, ১৯৪৬, ১৯৫২ সালের সফরে ও অস্ট্রেলিয়ায় ১৯৪৭-৪৮ সালের খেলায় বিল ছিল স্কোরার। শ্রী গুপ্ত বলেন, "ফারগী আমাদের জন্য সব কিছুই করত। টাকাকড়ির হিসেব রাখা, নানা দিকে নজর রাখা, তদবির করা, ব্যাঙ্কিং প্রভৃতি তার হাতে ছেড়ে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত থাকতুম। অদ্ভুত মানুষ!"

সত্যি এমন কাজের লোক খুব কমই দেখা যায়। অথচ মুখে কোন জাঁক নেই। কেউ বল্লে "ফারগী আমার যে ব্যাটখানা মেরামত করিয়ে আনতে বলেছিলুম—ওঃ এ যে দেখছি এরি মধ্যে করিয়ে এনেছ।" কোন দেশের কোথায় কি দেখবার আছে, কোথায় কোন হোটেল, থাকা, খাওয়া খরচের সুবিধা, অসুবিধা, ব্রিটেনের দূরত্ব রেলওয়ে টাইম টেবল ফারগুসনের সবই নখদর্পণে।

বিল একসঙ্গে তিনখানা স্কোর কাগজ নিয়ে খেলার হিসেব রাখার কাজে ব্যবহার করে। তাতে খেলার বহু তথ্য বিশদভাবে দেওয়া থাকে। তা থেকে এক নজরে বোঝা যায় খেলার কোন দিনের আবহাওয়া কি রকম ছিল, খেলার সাময়িক বাধা, বিঘ্ন বিরতির কি ছিল কারণ। তাতে থাকে কে কতক্ষণ ব্যাট করল, একজোটে কারা কতক্ষণ খেলে কত রান করল, ফিল্ডিং-এর ত্রুটি, বিচ্যুতি, বোলিং-এর সংখ্যা ও দোষগুণের বিচক্ষণ বিশ্লেষণ, যে সব মার থেকে রান হয়েছে তার প্রত্যেকটির ছক, খেলার সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য মন্তব্য আর তা ছাড়া প্যাভিলিয়ান, খেলার মাঠ, আশপাশের বাড়ির পেন্সিলে আঁকা নক্সা। এ ধরণের কাজ করে বিল নিজেকে জগৎ-বরেণ্য করে তুলেছে। ক্রিকেটের এই নম্র মেধাবী লোকটিকে সম্মানিত করা হয়েছে বি ই এম পদক উপহারে। স্টেটের খেলায় উইলিয়াম ফারগুসন "একমেবাদ্বিতীয়ম্।"

নম্বর মিলিয়ে যখন সুশান্তর বাড়ি খুঁজে বের করলাম শীত-সূর্যের শেষ লালটুকু বাদুরডানা অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। এ অঞ্চলটা শহর কলকাতার ক্রম-বর্ধমান প্রত্যঙ্গের মত। আঁকশি বাড়িয়ে এগিয়ে চলেছে। দু বছর আগে যেখানে দেখেছি ফাঁকা মাঠ এখন জমজমাট শহরতলী। খেয়ালখুশিতে বেড়ে চলেছে। নিয়ম কানুন নেই, সিজিল মিছিল নেই। রাস্তা খুঁজে পেলেও নম্বর পাওয়া যাবে এমন কথা কেউ দিতে পারে না। পনের নম্বর বাড়ি খুঁজছো হয়তো। এক ঘণ্টা ঘোরাঘুরি করবার পর তের নম্বর দেখে চোখ খুশি হলো কিন্তু তারপরেই সাতচল্লিশ নম্বর ভেংচি কাটছে। তবু এত হার্ডল পেরিয়েও সুশান্তর বাড়ি পেলাম এবং সুশান্তকে বাড়িতে।

আমি যে চিঠি না লিখে হঠাৎ এসে উঠব, মানে বাড়ি চিনে উঠব এতটা আশা করেনি সুশান্ত। আমিই কি করেছিলাম সেই' শহরতলীর গোলকধাঁধায় পা দিয়ে!

সুশান্তর বিয়ের পরই আমি কলকাতা ছেড়েছিলাম। সেও প্রায় তিন বছর। সেদিনের ক্ষীণাঙ্গী মেয়েটি এরই মধ্যে হাতে পায়ে বেড়ে গিন্নী হয়েছে। উপল-পথের ঝর্ণা সমভূমিতে স্তিমিতস্রোতা প্রবাহিনী। পরিবর্তনটুকু বেশ ভালো লাগল। সবচেয়ে ভালো লাগল ওদের দেড় বছরের মেয়েটিকে। এক মাথা কোঁকড়া চুল ঝুঁটি করে বাঁধা। শঙ্খ-সাদা গোটা কতক মিহি দাঁতের ফাঁকে মিষ্টিদানা হাসি। আদর করে কোলে নিলাম। বললাম, তোমার নাম কি মা-মণি?

প্রাণপণ চেষ্টায় জিভ এবং তালু দিয়ে কি একটা উচ্চারণ করতে চেষ্টা করল। কিন্তু কেবল ম্‌ম্‌ ছাড়া আর কিছুই বোধগম্য হলোনা। কন্যার উদ্ধারে এবার পিতা এগিয়ে এলো। বলল, মমতা রেখেছি ওর নাম।

আচ্ছা, বলুন তো আজকাল কি কেউ আর অমন নাম রাখে। চায়ের কাপ আর খাবারের ডিস হাতে নিয়ে সুশান্তর স্ত্রী শকুন্তলা ঘরে ঢুকল।

আমি বললাম, তা ঠিকই বলেছেন। শকুন্তলার মেয়ের নাম তো নিশ্চয়ই নয়। অন্ততপক্ষে প্রজ্ঞাপারমিতা-টিতা হওয়া উচিত ছিল—না কি বল মমতা?

না, ঠাট্টা নয়। সত্যি করে বলুন তো, মমতা ছাড়া কি বিশ্বসংসারে আর কোন নাম ছিল না? প্রথম মেয়ে, লোকে কত বেছে বেছে নাম রাখে, তা না কী এক মমতাই তোমাকে পেয়েছে। যাই বল ইস্কুলে ভর্তি করবার সময় কিন্তু আমি নতুন নাম দেব তা তোমায় বলে রাখছি।

বেশ, তোমার যা খুশি করো। অন্তত বাড়িতে বাবার দেওয়া নামটা মুছে ফেলো না দয়া করে।

সুশান্তর গলায় কিন্তু পরিহাসের কোন সুর খুঁজে পেলাম না। অথচ প্রসঙ্গটা নিতান্তই লঘু। ওঁর স্ত্রীর অজ্ঞাতে সুশান্তর দিকে একবার তাকালাম। কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক মনে হলো। কিন্তু

এক মুহূর্ত। হারাণো পাঁজি হাতে নিয়ে আবার সুতোয় পাক দিল সুশান্ত। বলল, তুমি তাহলে সর্ত ফিরিয়ে নেবে কুন্তলা?

শকুন্তলা কিছু বলবার আগেই আমি বললাম, কী ব্যাপার? সর্তটা আবার কী?

শকুন্তলা বলল, মুখে তার কৌতুকের হাসি, ও'র সঙ্গে কথা ছিল ছেলে হলে তার সব কিছু হবে আমার মতে, আর মেয়ে হলে ও'র।

আমি বললাম, মমতার নাম নিয়ে তো তাহলে আপনার কোন ওজরই আর টেঁকে না।

না—তা টেঁকে না। আর টিঁকতে দিচ্ছেই বা কে। শকুন্তলা হাসিতে শিশির ঝরাল।

সুশান্তর বাড়ি ছেড়ে যখন রাস্তায় পা দিলাম পাশের বাড়ির দেয়াল ঘড়িতে আটটার ঘণ্টা পড়ল।

এরই মধ্যে তিন ঘণ্টা কেটে গেল। অন্ধকারে করুণ শোনাল সুশান্তর কথা-গুলো। ওঃ কতদিন পরে তোর সংগে দেখা হলো বলতো। আর তুইও তেমনি—সেই যে আমাদের বিয়ের পর কলকাতা ছাড়লি আর দেখা নেই। না আসিস এক আধখানা চিঠিও দিতে পারিস সময়ে সময়ে। সেই আগের দিনের অভিমানী সুশান্ত। অনেকটা ওর তেমনি আছে। আমার সংগে বড় অমিল।

জানিস তো আমার স্বভাব। ওনিয়ে দুঃখ করিস না। চিঠি না লেখা মানেই মনে না রাখা নয়। হাঁটতে হাঁটতে বললাম, আচ্ছা কুন্তলার যখন ভালো লাগেনি তখন নয় মমতার নামটা বদলেই রাখ। প্রথম সন্তান, ওরও তো একটা ইচ্ছে অনিচ্ছে আছে।

অনেকক্ষণ সুশান্ত কোন কথা বলল না। আমি বললাম, কীরে তোর হলো কি?

না, কিছুই নয়।

তবে কথা বলছিস না কেন?

কী বলব, নাম বদলাবার কথা? সে হয় না।

ওর ছেলেমানষি জিদ দেখে আমার হাসি পেল। বললাম, কী এমন নামরে যা আর বদলান যায় না।

নাম হয়তো সত্যিই কিছু নয়, কিন্তু—সুশান্ত চুপ করল।

আমি বললাম, কীরে চুপ করলি কেন? কার রাশি মিলিয়ে রেখেছে বুঝি?

সুশান্ত বলল, না গণৎকার নয়, বলছি। কিন্তু তোর কি আর একটু সময় হবে?

সিরসিরে একটু শীত হাওয়া দিচ্ছিল। সুশান্তর কথায় যেন কৌতূহলের উষ্ণ স্পর্শ পেলাম। বললাম, না এমন কি আর রাত হয়েছে। হাঁটতে হাঁটতে শুনি।

সুশান্তর কাছ থেকে শোনা গল্পটা সিজিল মিছিল করলে এই রকম দাঁড়ায়ঃ

দু বছর পড়বার পরেও যখন ফিএর টাকার অভাবে বি এ পরীক্ষা বন্ধ হয় হয়, মনে এলো সীতুদার কথা। সুশান্তর বাল্যবন্ধু হিমানীশের মামাত ভাই সীতুদা। সেই সূত্রেই জানা শোনা। ছেলেবেলা থেকেই দেখেছেন সুশান্তকে। স্নেহ করতেন চিরদিনই। কলকাতায় নিজের বাসায় রেখেই পড়াতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সুশান্ত রাজী হয়নি। ছেলে পড়িয়ে নিজের পড়ার খরচ চালিয়েছে। নিজের কেউ ছিল না। একটু দূর সম্পর্কের যারা তাদের দ্বারস্থ হয়নি কখনও। কেবল সীতুদাকে নিয়েই পারা যায়নি। কলেজে গিয়ে হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে এসেছেন। বাড়িতে গেলে বৌদি। আর সেই জন্যেই, ভালো লাগলেও, ওদিকে যাওয়া বাধা হয়েই ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু এখন সীতুদার কাছে যেতেই হবে। শেষ বার সীতুদাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ফরিদপুরে হিমানীশদের গ্রামের বাড়িতে। সেও আট নমাস আগে। হিমানীশের দাদার বিয়েতে সবাই জড় হয়েছিল। কলকাতায়ও ফিরেছিল এক সঙ্গে। তারপরে আর যায়নি। কেমন যেন ইচ্ছে করেনি। দেশের কোন লোক অথবা কোন আত্মীয়-স্বজন কারও সঙ্গেই প্রায় কোন সম্পর্ক নেই সুশান্তর। নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে। তবু সীতুদার কাছে আসতেই হলো। না এসে উপায় ছিল না।

গলির মোড়ে এসে সংকোচে পা ভারী হয়ে উঠল। যাই কি যাব না করল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কড়া নাড়ল দ্বিধাগ্রস্ত হাতে। একবার, দুবার, তিনবার। কেউ সাড়া দিল না। এবার সীতুদার নাম ধরে ডাকল। কিন্তু তবু কোন সাড়া নেই। অথচ দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। শীতের সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় কেউ ঘুমোয়ও না। কী আর হবে। সুশান্ত পিছন ফিরল। কিন্তু পা বাড়াবার আগেই দরজা খুলবার শব্দ হলো পিছনে। সুশান্ত ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, আচ্ছা লোক যা হোক, এই সন্ধ্যা বেলায় কি ঘুমুচ্ছিলেন নাকি? ভিতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল। ও'র আগে আগে জোর পায়ে যে মেয়েটি কথা না বলে চলে গেল আবছা আলোয় তাকে ও সীতুদার স্ত্রী মনে করেছিল। কিন্তু মেয়েটির ত্রস্তে হাঁটা আর কথা না বলায় হঠাৎ কেমন খটকা লাগল। তাহলে বাড়ি ভুল করেনি তো! ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা এটা সীতেশ সান্যালের বাড়ি তো?

মেয়ে কণ্ঠের জবাব এলো, হ্যাঁ, তোমার বাড়ি ভুল হয়নি।

কে জানতো এতটা বিস্ময় অপেক্ষা করেছিল সুশান্তর জন্য। গলার স্বরে চমকে উঠল। বলল, কে অনু না?

কোন জবাব নেই।

অনু, অনুরাধা, তুই কবে এলি? আমি কিছু জানিনে তো। বলতে বলতে বারান্দায় উঠে বসলো। কিন্তু তবু কোন সাড়া এলো না অনুরাধার কাছ থেকে।

কিরে, তুই আবার বোবা হলি কবে থেকে? আয়, এদিকে আয়তো। সীতুদা-বৌদিই বা গেল কোথায়?

ও'রা সিনেমায় গেছেন। এতক্ষণে চাপা গলায় ভেতর থেকে উত্তর এলো।

বোবা মেয়ের এতক্ষণে কথা ফুটল। তা তুই যে গেলি না বড়? স্বামী-স্ত্রীর অসুবিধে হতো বুঝি?

না, না আমিই যাইনি, শরীরটা ভালো নয় বলে।

সে কিরে, আর তোকে অসুস্থ অবস্থায় একলা ফেলে ওরা সিনেমায় গেল! আসুক আজ, সীতুদা আর বৌদির সঙ্গে ঝগড়া হয়ে যাবে।

তুমি কি পাগল হলে নাকি শান্তদা। ও'রাতো বলেইছিলেন, আমিই যেতে পারিনি শরীর খারাপ বলে।

বা, এই তো মেয়ের কথা ফুটেছে। তা হ্যাঁরে, তুই আবার এত পর্দানশিন হলি কবে থেকে, তাও আমার কাছে। আয় এখানে এসে বোস। কতদিন এসেছি দেশ থেকে, আর হয়তো যাবই না কোনদিন। তোর মুখে একটু গল্প শুনি। সীতুদাদের আসতে হয়তো এখনও কিছুটা দেরী হবে।

কিন্তু অনুরাধার কাছ থেকে কোন সাড়া এলো না। কেমন যেন অস্বস্তি লাগল সুশান্তর। হিমানীশের বোন অনুরাধা। সেই এতটুকু বয়েস থেকে দেখে আসছে। তার সহস্র আব্দারের প্রশ্রয় দিয়েছে

চিরকাল। এই তো সেদিনও, আট নমাস আগে, কাছে বসে কত গল্প বলেছে, শুনেছে। অথচ সেই অনু হঠাৎ এমন রহস্যময়ী হয়ে উঠল। অনু এখানে এসেছে অথচ সীতুদা তাকে একটা খবর পর্যন্ত দেয়নি, অনুও বায়না ধরেনি শান্তদার সঙ্গে দেখা করবে বলে। এমন কি এখন তার সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলতে চায় না—সবটাই কেমন দুর্বোধ্য মনে হলো সুশান্তর।

আবার ডাকল সুশান্ত, আয় বলছি এদিকে, নাহলে চুলের মুঠি ধরে টেনে আনব। কিন্তু অনু এলো না। রাগ হলো সুশান্তর। অনু, এই অনু, বলতে বলতে ঘরের চৌকাঠে পা দিল।

না, না ঘরে এসো না, দোহাই তোমার পায়ে পড়ি শান্তদা। অনু কান্নায় ভেঙে পড়ল। কিন্তু ততক্ষণে ঘরে ঢুকে পড়েছে সুশান্ত! দরজার এক কোণ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে অনু। ওর দিকে তাকিয়ে সুশান্ত থমকে গেল। অনুর কপালে সিঁদুর, হাতে শাঁখা। সর্বাঙ্গে আসন্ন মাতৃত্বের সমারোহ।

অনুর বিয়ে হলো অথচ কেউ তাকে খবরটাও দেয়নি। আর তা নিয়ে এত বাড়াবাড়িইবা করছে কেন অনু।

সুশান্ত বলল, বাঃ আচ্ছা মেয়ে যা হোক। বিয়ে হলো, একটা খবর পর্যন্ত দিলিনে। বাড়ি বয়ে দেখা করতে এলাম তাও কেঁদে কেটে সারা। থাক না হয় চলেই যাচ্ছি।

সুশান্ত পা বাড়াতেই কান্নাভরা গলায় ডাকল অনুরাধা—শান্তদা।

যেন কাকুতির মত শোনাল।

সুশান্ত ফিরে দাঁড়াল। কী, কী হয়েছে তোর অনু?

অনেক কষ্টে কান্না থামাল অনু। ভিজে গলায় বলল, কেন, তুমি কিছু জান না? কেউ কিছু বলেনি তোমাকে?

না, কে কী বলবে? দেশের কারও সঙ্গে তো আমার দেখা হয় না বহুদিন। খবরও রাখি না কারও।

ও!

কিন্তু তাতে কী হয়েছে? কী শুনবার কথা বলছিলি তুই, তোর বিয়ে? শুনলে আর অবাক হব কেন তোকে দেখে।

এক মুহূর্তে কি যেন ভাবল অনুরাধা। মুখের কমনীয় রেখা মুছে গিয়ে অনমনীয় দৃঢ়তা ফুটে উঠল। হাতের উল্টো পিঠে চোখের জল মুছে ফেলে তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল সুশান্তর দিকে। বলল, বিয়ে! কে বলল আমার বিয়ে হয়েছে?

ইলেকট্রিকের খোলা তারে হাত লাগল সুশান্তর। কথা বলতে গিয়ে মনে হলো জিভ খুঁজে পাচ্ছে না। তাহলে কি অনুরাধার মাথা—। সবটাই কেমন গোলমাল হয়ে গেল। অনুরাধার দিকে তাকিয়ে রইল বোকার মত। অনেক কষ্টে কেবল বলতে পারল, অনু।

কি, বিশ্বাস হচ্ছে না আমার কথা, পাগল ভাবছ আমাকে?

সুশান্ত চুপ। অনুরাধার মুখের অস্বাভাবিক পেশীগুলোয় আবার শিথিল কমনীয়তা ফিরে আসছে। শুকনো চোখের জমি আবার চিকচিক করে উঠল।

মিথ্যা, সব মিথ্যা শান্তদা। ওরা সবাই মিলে আমাকে শাস্তি দিচ্ছে। আমার ভুলের শাস্তি। তুমি এখানে কেন এলে, কেন এলে শান্তদা! ফুলে ওঠা কান্নার ঢেউ নিয়ে খাটের ওপর আছড়ে পড়ল অনুরাধা। এক রাশ ফেনায় ভাঙল যেন।

সুশান্ত দাঁড়িয়ে রইল দরজা ধরে। কেউ যেন তার হাতে পায়ে পেরেক পুঁতে দিয়েছে।

অনুরাধার ব্যবহারে সমস্ত অসঙ্গতির কুয়াশা এতক্ষণে পরিষ্কার হলো।

প্রথম গোটা কয়েক সেকেন্ড। তার মধ্যেই নিজেকে সামলে নিল সুশান্ত।

অনুরাধার মাথার কাছে বসে এক রাশ কালো চুলে বিলি কাটতে লাগল।

আস্তে আস্তে বলল, চুপ কর অনু। কাঁদিস না লক্ষ্মীটি।

অনেকক্ষণ কেঁদে কেঁদে এক সময় চুপ করল অনুরাধা।

সুশান্ত বলল, যেন কানে কানে, এ ভুল তুই কেন করলি অনু, কেন করলি?

অনুরাধা ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে। পরিষ্কার গলায় বলল, ভুল কি কেউ ভেবে-চিন্তে করে, শান্তদা?

তবে বিয়ে, তোরা বিয়ে করলি না কেন?

সে হয় না, সে অসম্ভব শান্তদা। অনু দুহাতে মুখ ঢাকল। ও কথা বলো না।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে রইল।

অনু বলল, তুমি আর দেশে যেয়ো না শান্তদা।

কেন রে?

সেকথা আমাকে জিজ্ঞাসা করো না। বলতে পারবো না।

সুশান্ত ডাকল, অনুরাধা।

অনু ভয়ে ভয়ে তাকাল। ছেলেবেলা থেকেই রেগে গেলে সুশান্ত ওকে অনুরাধা বলে ডাকে। এই ডাককে ওর বড় ভয়।

অনুরাধা মুখ নীচু করে ধীরে ধীরে বলল, ওরা তোমার নামে—

থাক, বুঝেছি।

—আমাকে বিশ্বাস করো শান্তদা, আমি একথার প্রতিবাদ করেছি। কিন্তু ওরা আমাকে ভয় দেখিয়েছে, আমার বাবা আর কাকা। ওরা আমাকে মেরেই ফেলত যদি বৌদি আর সীতুদা না থাকত। বৌদি জানে সব কথা। ওকে বলেছি। দোহাই তোমার আমাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করো না।

সুশান্তর সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলী নিষ্ক্রিয় কে জানত এরকম কোন দৃশ্যের মুখোমুখি তাকে হতে হবে। তার সামনে যে মেয়ে অসহায়ের মত ফুলে ফুলে কাঁদছে, তাকে কোনদিন দেখেনি সুশান্ত। কোনদিন চেনেনি। আসন্ন মাতৃত্বের সবটুকু নমনীয়তা ওর দেহে, কিন্তু কী অসহায়। অনাহূত হলেও যে আসছে বহিরবয়বে আয়োজনে এতটুকু ত্রুটিও সে সইতে নারাজ।

সুশান্ত চুপ করে বসে রইল। সান্ত্বনা দেওয়া বৃথা। অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে ডাকল, অনু।

অনুরাধা তাকাল। সিক্তপক্ষ্ম দুটি চোখে অবসন্ন দৃষ্টি। এই পাঁচ মিনিটে পাঁচ যুগ পাড়ি দিয়েছে সুশান্ত। উথাল পাথাল চিন্তার সমুদ্র সাঁতরে তীরে পা দিয়েছে।

অনু, সুশান্ত একটু থামল। তুমি আমায় বিয়ে করবে? সম্বোধনের অনায়াস এই আকস্মিক পরিবর্তন নিজের কানেও কেমন বেখাপ্পা লাগল। চমকে উঠল অনুরাধা। এমনভাবে তাকাল সুশান্তর দিকে যেন ও কথা কিছুই বুঝতে পারেনি।

ওভাবে তাকিয়ে আছ কেন? আমার কথা কি তুমি বুঝতে পারছ না? অনুরাধার হাত ধরে ঝাঁকানি দিল সুশান্ত।

না, বুঝতে আর পারছি কোথায়? অনুরাধা এত স্পষ্ট উচ্চারণ করতে পারে জানত না সুশান্ত।

আমি তোমায় বিয়ে করব, বুঝতে পারছ?

অনুরাধা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে বসল। উদগ্র আগ্রহে তার দিকে তাকিয়ে আছে সুশান্ত। অনুরাধা, বল তোমার আপত্তি নেই। যে মিথ্যা ওরা রটিয়েছে তাই সত্যি হোক। বল তোমার অমত নেই।

প্রস্তরমূর্তির ঠোঁট নড়ল। না, তা হয় না। প্রত্যেকটি শব্দ নিরুদ্বেগ শান্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করল অনুরাধা।

কেন, কেন হবে না অনু? বিস্মিত বেদনায় আর্দ্র হলো সুশান্তর গলা। তুমি তো আর ছেলেমানুষটি নেই। তোমার নিজের কথা ভাব,—তোমার সন্তানের কথা।

ভাবি বলেই তো তা হতে পারে না। আমাকে আর এর মধ্যে জড়াতে পারব না। এ-কথা আর দ্বিতীয়বার তুমি বলো না। সেদিন এত চেষ্টাতেও যা করতে পারিনি, আর বোধ হয় তাই করতে হবে।

মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যবধান। অথচ কী আশ্চর্য পরিবর্তন হলো অনুরাধার। আর এ সবটাই সুশান্তর চোখের সামনে।

অনুরাধা থামতেই সুশান্ত বলল, কী, কী করতে হবে?

আত্মহত্যা। কথাটা এমনভাবে বলল অনুরাধা যেন বাইরে বেরুবার আগে কাপড় পাল্টাবে। আর তাই ওর শান্ত চোখের দিকে তাকিয়ে ভয় পেল সুশান্ত। সমস্ত গ্লানির বোঝা পরিত্যাগ করে যে মেয়েটি তারই সামনে উঠে দাঁড়াল, তার ব্যক্তিত্ব সমীহ করবার মত।

তোমার কথা আমি কখনও ভুলব না অনুরাধা। কিন্তু তুমি যাও। এখানে আর এসো না। আমার ভুলের শাস্তি আমাকে একাই নিতে দাও। আমার ছেলে শুধু আমারই হোক।

কখন যে বড় রাস্তায় এসে বাসে চেপেছে সুশান্তর মনেই নেই। কণ্ডাক্টর টিকেট না চাইলে মনে হতোও না।

সীতুদার বাড়ী আর যায়নি সুশান্ত। খোঁজ নেয়নি আর কারও। দু'বছর অজ্ঞাতবাস করেছে। বি-এ পরীক্ষাও আর দেওয়া হয়নি। লটারীর টিকেটে টাকা পাবার মত একটা চাকরি জুটে গেল হঠাৎ, আর সেই সঙ্গে শকুন্তলা। বিয়ের সাক্ষী ছিলাম আমি আর অন্য একটি বন্ধু। ওর আত্মীয়-স্বজন যারা তাদের এড়িয়ে চলত। নিজের আর কেই বা ছিল। অনুরাধার কথা মনে হতো মাঝে মাঝে। একটি অভূতপূর্ব নাটকীয় সন্ধ্যা। নিস্তরঙ্গ জীবনে ঘটনার হঠাৎ ঝড়। এই পর্যন্ত।

বিয়ের বছর দুই পরে আবার দেখা হলো অনুরাধার সঙ্গে। এবারও আকস্মিক। শকুন্তলাকে ভর্তি করতে হলো কলকাতার এক বিখ্যাত প্রসূতিভবনে। এই প্রথম সন্তান। দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। তার ওপর এই সময়েই অফিসের জরুরী কাজে দিন তিনেকের জন্য বাইরে যেতেই হলো। আদালতের সমন। পাশের বাড়ীর ছেলেটিকে দেখাশোনা করতে বলে বাইরে গেল সুশান্ত।

কলকাতা ফিরে সোজা এলো হাসপাতালে। তখন সবে চারটে। ভিজিটরদের ভীড় তখনও শুরু হয়নি। এনকয়েরী থেকে খবর পেল মেয়ে হয়েছে। ভালো আছে শকুন্তলা। যাক নিশ্চিন্ত। ওয়ার্ডে গিয়ে বেড খুঁজে নিতে দেরী হলো না। শকুন্তলা শুয়ে আছে, পাশে ছোট খাটে ঘুমুচ্ছে একটি মাংসপিণ্ড। শকুন্তলাও চোখ বুজে ছিল, সুশান্তকে দেখতে পায়নি। টুল টানবার শব্দে চোখ মেলল। কী স্নিগ্ধ ওর দুটি চোখ। শকুন্তলার চোখ যে এত সুন্দর আজ এই প্রথম জানল সুশান্ত। ওর ক্লান্ত একখানা হাত নিজের দুহাতে টেনে নিয়ে বলল, কেমন আছ, খুব কি কষ্ট হয়েছিল?

স্নিগ্ধ হাসির দ্যুতি ছড়াল শকুন্তলা। না, তেমন কোন কষ্ট হয়নি। তুমি ভালো ছিলে তো? কখন এলে?

এই মাত্র, স্টেশন থেকেই সোজা এখানে আসছি।

দেখ তো কাণ্ড। দুপুরে হয়তো চান-খাওয়া কিছুই হয়নি। একটু পরে এলে কী ক্ষতিটা হচ্ছিল শুনি?

সুশান্ত ওর হাতে আর একটু চাপ দিল। বলল, এটা হাসপাতাল, তোমার বাড়ী নয়। তোমার হুকুম এখানে অচল। তোমাকেই হুকুম মেনে চলতে হবে। এখানে তোমার কোন কষ্ট হয়নি তো?

না, একেবারেই না। এত যত্ন আমার বাড়ীতেও হয় না। আচ্ছা, একটু থামল শকুন্তলা, অনুরাধা তোমার কী রকম বোন হয়? কোনদিন বলনি তো ওর কথা।

সুশান্ত চমকে উঠল। অনুরাধা—তাকে তুমি চিনলে কী করে। কোথায় সে? এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে একটু লজ্জিত হলো সুশান্ত।

বাঃ সে না হলে আর দেখা-শোনা কে করত হাসপাতালে। আমি যে হাসপাতালে আছি, সে কথা মনেই হয় না। ও না থাকলে যে কী করতাম জানি না।

অনুরাধা কি এখানে নার্স?

বাঃ, এ খবরটুকুও রাখ না। বেচারা এত দুঃখ করছিল। রেজিস্টারে তোমার নাম দেখেই ওর সন্দেহ হয়েছিল। আমাকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি মীরপুরের সুশান্ত চক্রবর্তীর স্ত্রী কি না? আমি তো অবাক। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কে? ওকে চিনলেন কী করে? বলল, চিনেছি যে এই যথেষ্ট, বাকীটা পরে শুনবেন। আমি অনু, অনুরাধা, সুশান্তদার সম্পর্কে বোন হই। যাক তবু এতদিনে খোঁজ পাওয়া গেল। আমি তো ধরে নিয়েছিলাম বুঝি বা হিমালয়েই চলে গেছে। কিন্তু কী আশ্চর্য দেখুন, বিয়ে করল একটা খবর পর্যন্ত দিল না। যাক এবার পেয়েছি হাতের মুঠোয়, সুদে আসলে উসুল করে ছাড়ব। সেই থেকে বেচারা আর কাছ-ছাড়া হয়নি।

আশ্চর্য, সেই অনুরাধা। সেই সন্ধ্যার অসহায় মেয়েটি। সে ছবি তো ধুলোয় চাপা পড়েছিল। একটি মেয়ে ধীর-পায়ে মৃত্যুর
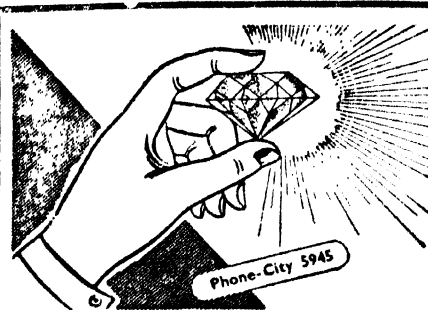
দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। তবু তার দুই চোখে ছিল বাঁচবার আগ্রহ। সে তাহলে মরেনি। বেঁচে থাকবার আস্বাদ পেয়েছে তাহলে অনুরাধা। কিন্তু সে কোথায়—সেই অনাহুত আগন্তুক। সুশান্ত অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। শকুন্তলা বলল, কই বললে না তো?

—কি? যেন শকুন্তলার কোন কথাই সে শুনতে পায়নি।

—বা, অনুরাধা তোমার কেমন বোন।

—ও, আমার এক ছেলেবেলার বন্ধুর বোন। ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছি। আমার নিজের বোনের মতই। উঃ, কতদিন দেখিনি ওদের। কোথায় আছে জান?

এখানেই হোস্টেলে থাকে। আসবে এক্ষুণি। আমার জন্যে কাল সারা রাত জেগেছে। আজও সকালে ডিউটি ছিল। একটায় গিয়েছে বাসায়। হয়তো খেয়ে একটু ঘুমুচ্ছে।

অনুরাধা যখন এলো ওয়ার্নিং বেল বেজে গেছে। চোখ দুটো ফোলা-ফোলা। একটু লাল।

শকুন্তলার শিয়রে সুশান্তকে দেখে আঙুল দিয়ে চোখ কচলাল। ভালো করে তাকিয়ে দেখল একবার। কাছে এলো। বলল, শান্তদা না, কখন এলে?

অনেকক্ষণ। তোমার কথাই বলছিল এতক্ষণ কুন্তলা। এসো।

খুব লোক যা হোক। একটা খোঁজ-খবরও রাখতে নেই? বিয়ে করলে তাও জানালে না। তবু ভাগ্যিস বৌদিকে চিনে বের করেছিলাম। এবার আর রেহাই নেই। দুটো খাওয়া একসঙ্গে। কী সুন্দর মেয়ে হয়েছে দেখেছ?

সে কৃতিত্ব তোমার বৌদির।

কুন্তলা লাল হলো।

ওদিকে তখন শেষ ঘণ্টা পড়েছে। একে একে ওয়ার্ড খালি করে ভিজিটররা চলে যাচ্ছে। সুশান্ত উঠল।

অনুরাধা বলল, চল তোমাকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিই।

সুশান্ত অবাক হচ্ছিল অনুরাধাকে দেখে। জীবনের প্রথমভাগের সব-কথানা কালি-মাখান পাতা ছিঁড়ে ফেলেছে যেন। সুশান্ত বলল, এখানে কতদিন আছ অনু?

তিন বছর। তার মধ্যে এক বছর ট্রেনিংএ।

হিমানীশ কোথায়?

নৈহাটি।

তোমার মা-বাবা সবাই?

সবাই এখন দাদার কাছে। বাড়ী থেকে চলে এসেছে।

সীতুদা, বৌদি ভালো আছে?

হ্যাঁ। তোমার কথা এত বলেন। একবার দেখাও তো করতে পার। বৌদি প্রায়ই আসেন আমার এখানে। ওঁর জন্যেই এখানে ঢুকতে পেরেছিলাম আমি। না হলে যে কি হতো। অনুরাধা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

উপায় নেই। হাওয়ায় বুঝি ঝরান পাতা উড়ল। হাঁটতে হাঁটতে প্রায় গেটের কাছে এসে পড়েছে। বাইরে এরই মধ্যে সন্ধ্যা নেমেছে।

একটা কথা জিজ্ঞাসা করি করি করেও করতে পারছিল না সুশান্ত। অবশেষে বলেই ফেলল—তোমার ছেলে কোথায় অনু?

চলতে চলতে হোঁচট খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল অনুরাধা। অনেক কষ্টে নিঃশ্বাস চাপল যেন। বলল, ছেলে নয়, মেয়ে। নাম রেখেছিলাম মমতা। কিন্তু ওরা মমতাকে একবার দেখতেও দেয়নি আমাকে, জানো শান্তদা। বাবা জোর করে নিয়ে গেছেন। কাকে দিয়ে দিয়েছিলেন।

অনুরাধার কথাগুলো জড়িয়ে গেল। ওর একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিল সুশান্ত। বলল, কোন খবরও পাও নি?

পেয়েছিলাম, বেঁচে নেই।

সুশান্তর হাতের মধ্যে থর-থর করে কাঁপছে অনুরাধার হাত। আপ্রাণ চেষ্টা করছে কান্না চাপতে। তবু ভালো, রাস্তা অন্ধকার। লোক চলাচলও কম।

কিন্তু সহজেই নিজেকে সামলে নিল অনুরাধা। আঁচল দিয়ে চোখ মুছল। বলল, বৃথাই তোমাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম শান্তদা। ভেবেছিলাম একাই পারব আমার সন্তানকে বাঁচাতে। পারলাম না। তোমাকেও ওরা রেহাই দেয়নি। হাসপাতালের রেজিস্টারে মমতার বাবা বলে তোমার নামই লিখিয়েছে, পরে জেনেছি আমি। আমার আবার বিয়ে দেবার চেষ্টাও করেছিলেন বাবা। কিন্তু আর ভুল করিনি। বৌদির চেষ্টায় এখানে ট্রেইনী নার্স হয়ে গেলাম। বাবা আর কোন খোঁজ খবর রাখেন নি। মা চিঠি লেখেন মাঝে মাঝে অভাব-অভিযোগ জানিয়ে। যখন যা পারি পাঠিয়ে দিই।

অনুরাধাকে বড় বেশী প্রগলভা মনে হলো। হয়তো জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা ওকে প্রগলভা করেছে।

আরও একটু হেঁটে অনুরাধা ডাকল, শান্তদা।

এযেন পাঁচ বছর আগের অনুরাধা। ছুটির শেষে কলকাতা আসবার সময় এ অনুরাধাই ফরমাস করত, আবদার জানাত।

কি অনু, কিছু বলবে?

আমার একটা অনুরোধ রাখবে শান্তদা বল।

যদিও এরকম অনুরোধ করা অন্যায়, ত তুমি বলেই করছি। অনুরাধা যেন সাহস সঞ্চয় করছিল।

আঃ অনু, বক্তৃতা থামিয়ে তোমার কথা বল।

তবু একটু দ্বিধা করল অনুরাধা। ধীরে ধীরে, ভয়ে ভয়ে বলল, সম্ভব হলে তোমার মেয়ের নাম মমতা রেখ। তোমার মেয়ের মধ্যে তবু তার নামটা বেঁচে থাক। কেউ তো তাকে চায়নি।

ততক্ষণে ওরা বড় রাস্তার মোড়ে এসে পড়েছে। রাস্তার আলোয় অনুরাধার মুখের দিকে তাকাল সুশান্ত। ওর চোখে জল নেই। বিষণ্ণ করুণ কাকুতি। তাই হবে, তোমার কথাই থাকবে অনু, সুশান্ত প্রতিশ্রুতির মত উচ্চারণ করল কথাগুলো।

অনুরাধা বুঝি কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই সুশান্তর বাস এসে পড়ল।

সুশান্ত যখন গল্প শেষ করল আমি ট্রাম-ডিপোয় পেঁ'ছে গেছি। আমাকে ট্রামে তুলে দিয়ে বলল, জানি মমতা নাম কেউ আর রাখে না। তবু পাল্টাবার সাধ্য নেই আমার। ওই নামে একটি মেয়ে বেঁচে থাকবার অধিকার পায়নি একথা ভুলতে পারি না।

চলতি ট্রামে বসে ভেবেছিলাম আমি কি পারব?

১

বনমালী সরকার লেন-এর বড়বাড়ীর সামনে আসতেই ব্রিজ সিং দেখতে পেয়ে ডাকলে—এ শালাবাবু, এ শালাবাবু —এ—

ভূতনাথ প্রথমটায় অবাক হয়ে গেল। তাকে হঠাৎ ডাকে কেন?

—কী দরোয়ান,

—আরে আপনাকে ছুটুকবাবু ডাকিয়েছেন—

ভূতনাথ আরো অবাক হয়ে গেল। ছুটুক-বাবু তাকে ডাকবেন কেন! ব্রজরাখাল কিছু জানে নাকি। ছুটুকবাবু তাকে চিনলেই বা কী করে। বড় বাড়ীতে কেই বা তাকে চেনে। সবার অলক্ষ্যে আস্তে আস্তে রোজ বাড়িতে এসে ঢোকে সে—আবার সকালবেলা নিঃশব্দে বেরিয়ে যায় চাকরি করতে। কারুর সঙ্গে পরিচয় বা আলাপ করবার সাহসও হয় না তার। বংশী অবশ্য আসে মাঝে মাঝে। নিজের সমস্যা নিয়ে সে বিব্রত। তার কাছেই এ-বাড়ির সকলের নাম শুনেছে সে। স্নান করতে গিয়ে ভিস্তিখানার মধ্যে অন্য চাকর-বাকরদের সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে একটু, কিন্তু সে সামান্যই।

ওই ভিস্তিখানার পাশ দিয়ে যেতেই একদিন লোচন ধরেছিল। খোঁচা খোঁচা কদমফুলের মত দাড়ি, গলায় দুসারি কণ্ঠী। একটা চোখ বোধ হয় ট্যারা। বুড়ো মানুষ বটে।

তখন আফিস যাবার তাড়া ছিল। কোনও-রকমে একটুখানি জল নিয়ে স্নান সেরে হাঁটা দিতে হবে। কিন্তু ভিস্তিখানায় তখন জল নিঃশেষ হয়ে গেছে। জল তুলছে শ্যামসুন্দর। সকাল বেলায় এ-বাড়িতে বিশেষ তাড়াহুড়ো থাকে না। কর্তারা বেলা করে ওঠেন। তাই বেলাতেই কাজের চাপ।

লোচন ডেকে বসিয়েছিল বেঞ্চিতে। বললে—অধীনের নাম লোচন দাস—

চারিদিকে হুঁকো গড়গড়া ফরসী আর তামাকের বোয়েম। দেয়ালের গায়ে সার সার নল ঝুলছে। লাল নীল রেশমের সিল্কের জরির কাজ করা সব। হুঁকোর নলের মধ্যে শিক পুরে দিয়ে পরিষ্কার করা হচ্ছে।

শিক চালাতে চালাতে লোচন বললে—তামাক ইচ্ছে করবেন নাকি শালাবাবু—

এ-বাড়িতে শালাবাবু নামেই ভূতনাথ পরিচিত। আর সুবিনয়বাবুর বাড়িতে সে কেরাণীবাবু।

ভূতনাথ বললে—তামাক খাইনে তো আমি—

লোচন মনযোগ সহকারে ভূতনাথের দিকে চেয়ে দেখলে খানিকক্ষণ, তারপর বললে—এই তো তামাক ধরবার বয়েস আপনার—এবার ধরে ফেলুন আজ্ঞে—দেরি করবেন না—

ভূতনাথ কেমন যেন অবাক হয়ে গেল। ভূষণ-কাকা তামাক খেত খুব। রাধার বাবা নন্দ জ্যাঠাও তামাক খেতেন। তাছাড়া বারোয়ারী ক্লাবের যাত্রার দলে ছোট বড় সবাই কম বেশি তামাক খেত। কেউ সামনে—কেউ বা লুকিয়ে। মল্লিকদের তারাপদ খেত 'বার্ডস্-আই'। একবার যাত্রাঘরের প্রায়নিভন্ত হুঁকোতে টানও দিয়েছিল ভূতনাথ। কিন্তু ধরা পড়ে গিয়েছিল তখনি। বাইরে রসিক মাস্টার আসছিল। ঘরে ঢুকতেই বললে—কাশে কে—

তারপর ভূতনাথকে দেখে বললে—ও নতুন খাচ্ছ বুঝি ছোক্‌রা—তা প্রথম প্রথম অমন হবেই তো—একটু জল খাও—হেঁচকি উঠবে না—

সেই হেঁচকির চোটে আর খাওয়া হলো না তামাক। তারপর কলকাতায় এসে ব্রজ-রাখালের সঙ্গেই কাটলো দিনরাত। শহরের আশে*পাশে বেড়াতে নিয়ে গেছে ব্রজ-রাখাল। তার ওসব নেশা-টেশার বালাই নেই। আর সুবিনয়বাবু ঘোর ব্রাহ্ম! তাঁর বাড়িতে ও-পাটই নেই। ফলাহারী পাঠকরা বিড়ি খায়—তাও কারখানার ভেতরে বসে নয়। রাস্তায় বেরিয়ে গিয়ে খেয়ে আসে।

লোচন বললে—তেল মাখার পরেই তামাকটা জমে কি না—দিই সেজে—বলে সত্যি সত্যিই সাজতে লাগলো লোচন।

বললে—মেজকত্তা যেটা ভাত খাবার আগে খান্—সেই তামাকটা দিই আপনাকে—দেখবেন খিদে হবে—রাত্তিরে ঘুম হবে ভালো—

ভূতনাথ বললে—না লোচন, তামাক আমাকে ধরিও না—গরীব লোক, শেষ-কালে—

লোচন বললে—পয়সা খরচ আপনার কিসে হচ্ছে—ওই তো ভৈরববাবু খান—বাড়িতে তামাকের পাট রাখেননি—আমিই ব্যবস্থা করে দিয়েছি—দিনে একটি করে পয়সা দেন, যতবার খুশী খেয়ে যান—ও'র ডাবা হুঁকো আমি কাউকে ছুঁতে দিইনে—

লোচন বেশ চুরিয়ে চুরিয়ে তামাক সাজতে সাজতে বললে—এ-বাড়িতে কোনও জিনিসের তো আর হিসেব নেই—ছত্রিশ রকমের নেশা বাবুদের—তারি মধ্যে যতক্ষণ বাড়িতে থাকেন ওই তামাকটাই যা খান—ওই যে ছুটুকবাবু, ছুটুকবাবুকে দেখেছেন তো—

ভূতনাথ বললে—দেখেছি বৈ কি—ওই যে গানের আসর বসান—

—আজ্ঞে ওই ছুটুকবাবুকে তো আমিই ধরিয়েছি—হালের ছোকরা মানুষ—তামাকের চেয়ে সিগারেটের দিকেই ঝোঁক বেশি, দশ পয়সায় এক কৌটো সিগারেট হয়—আর বাহারও খোলে চেহারার—আমি একদিন বড়মাকে গিয়ে বললাম—খোকা-বাবুর বয়েস হচ্ছে, এবার তামাক ধরিয়ে দেই—

তা বড়মা বললেন—তামাক ধরাবি খোকা-বাবুকে তা আমার অনুমতি কেন—

বড়মা আমার ভারি রাশভারি মানুষ, বিধবা হয়েছেন ওই খোকাবাবু হবার পর—কারো সাতে পাঁচে থাকেন না, চেহারা নয়তো, যেন সাক্ষাৎ ভগবতী।

আমি হেসে বললাম—তা' কি হয় বড়মা,

যদ্দিন আপনি বেঁচে আছেন তদ্দিন আপনার হুকুম না মেনে কি কিছু করতে পারি—শেষকালে অধমকে অপরাধী করবেন আপনারা সবাই—

লোচন বলতে লাগলো—তারপর থেকে খোলাখুলি হুঁকোর ব্যবস্থা করে ফেললাম, খাজাঞ্চীখানায় গিয়ে সরকারবাবুকে ধরলুম, বড়মার হুকুম পেয়েছি—আর কার তোয়াক্কা—চিৎপুরের নতুন বাজার থেকে রুপোর গড়গড়া, ফরসী এল সব—ভস্চাযি মশাইকে দিয়ে দিনক্ষণ দেখিয়ে হাতে নল ধরিয়ে দিলুম—

কলকেয় ফুঁ দিতে দিতে লোচন বললে—গোলাপ জল দিয়ে কাশীর কলকেয় বেশ করে তাওয়া দিয়ে বালাখানা তামাক সেজেছিলুম, ছুটুকবাবু খেয়ে একগাল হাসি, ভারি খুশী হয়েছিলেন, একটু কাশি নয়, হেঁচকি নয়—বললে বিশ্বেস করবেন না, নগদ একটা টাকা আমায় বকশিশ করে ফেললেন, আর সরকারবাবুকে বলে দিলেন আমার নামে একটা গামছার খরচা খাতায় লিখতে—

তারপর একটা কড়ি বাঁধা ডাবা হুঁকোয় কলকে বসিয়ে ভুতনাথের দিকে এগিয়ে দিলে। বললে—এটা বামুনের হুঁকো, তারকবাবু মতিবাবু সব এইতে খান্—

ভুতনাথ বললে—কেন মিছেমিছি পেড়াপিড়ী করছো লোচন, আমি ও খাইনে—

—এ কেমনধারা কথা হলো আজ্ঞে—

লোচন যেন কেমন বিমর্ষ হয়ে এলো। তারপর যেন একটা সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান করতে পেরেছে এমনি ভাবে বললে—মরুকগে তা না হয় আপনি একটা করে আধলাই দেবেন রোজ, আমি তো রইলাম, রোজ এসে খেয়ে যাবেন যখন ইচ্ছে হয়—এই যে আজ দেখছেন এ-বাড়িতে সকলের মুখে মুখে হুঁকো, এ কেবল এই অধমের জন্যেই, নইলে কবে উঠে যেতো এবাড়ি থেকে তামাক খাওয়ার পাট—আর তামাক খাওয়াই যদি উঠে যায় তো এ অধমের চাকরি কিসে থাকে বলুন তো—এতদিন ধরে তামাক সেজে সেজে, এখন বুড়ো বয়েসে তো আর ঘর ঝাঁট দেওয়া কাপড় কুঁচনো কি মোসায়েবি করা পোষাবে না—

ভুতনাথ বললে—তা এতদিন ধরে তুমি এই কাজ করছ, এখন কি আর তা বলে তোমার জবাব হয়ে যাবে রাতারাতি—

—তা হুজুরে সবই সম্ভব, এই দেখুন না বাবুরা শুনছি মটর গাড়ী কিনবে, তা কিনলে ইব্রাহিম মিয়ার চাকরি কি আর থাকবে, আগে এই বাড়িতেই ছোটবেলায় দেখেছি পাঁচখানা পাল্কী, এখন যেখানে দাসু জমাদারের ঘর দেখছেন ওইখানে থাকতো পাল্কী-বেহারারা, কোথায় সব চলে গেল,—এখন চুরুট সিগারেট যদি বাবুরা ধরে তা হলে গড়গড়া হুকো কে আর খাবে বলুন—

লোচন আরো বলতে লাগলো—বাবু এই বয়েসে কত দেখলুম—ঘোড়ার ট্রাম ছিল—এখন কলের ট্রাম হলো—তারপর কলের গাড়িও হবে—তা আর ভেবেই বা কী হবে, একদিন হয়ত হুঁকো কেউ খেতেই চাইবে না, তখন......কিন্তু তার আগেই যেন যেতে পারি বাবু—নিন্ ধরুন গুলের আগুন কি না—গল গল করে ধোঁয়া বেরুচ্ছে—তাহলে ওই কথাই রইল, আপনি একটা করে আধলাই দেবেন—

কিন্তু ভুতনাথকে নিতে হলো না। বাধা পড়ল।

—এই যে ভৈরববাবু এসে গেছেন।

লোচন তাড়াতাড়ি ভৈরববাবুর গড়গড়া তৈরী করতে গেল। ভুতনাথ চেয়ে দেখলে—বাবু বটে ভৈরববাবু! ঢেউখেলানো বাবড়ি চুল, বাঁকা সিঁথি, পরণে ফিন্‌ফিনে কালাপেড়ে ধুতি, গায়ে চকচকে বেনিয়ান, গলায় মিহি চুনোট করা উড়ুনী, পায়ে বগ্‌লস্ আঁটা চিনের বাড়ির জুতো—

লোচন হুঁকো বাড়িয়ে দিয়ে বললে—আজ যে এত সকাল-সকাল ভৈরববাবু—

—আজ যে ছেনি দত্তর সঙ্গে পায়রার লড়াই আছেরে—শুনিসনি তুই—মেজবাবু সেবার হেরে গিয়েছিল না, এবার পশ্চিম থেকে নতুন পায়রা এসেছে—ছেনি দত্তর গুমোর ভাঙবো এবার, ভালো গমের দানা খাওয়ানো হচ্ছে তো ওই জন্যে—এবার দেখবি ছেনি দত্তর পায়রা তিনবার চক্কর খেয়েই মাচায় বসে পড়বে মেজবাবুর সঙ্গে টেক্কা দিতে এসেছে ঠন্‌ঠনের দত্তরা—

খানিক ভুড়ুক্ ভুড়ুক্ করে হুঁকো টানতে লাগলেন ভৈরববাবু—

লোচন বললে—একটা কথা জিগ্যেস করবো হুজুর—

—বল্ না—

—শুনেছি ছেনিবাবু নাকি হাটখোলায় তেনার মেয়েমানুষকে পাকাবাড়ি করে দিয়েছে—

—শুনেছিস্ ঠিকই লোচন, কিন্তু সে-বাড়ি তিন-তিনবার মর্টগেজ হয়ে এখন সে বাড়ি মায় মেয়েমানুষ শুদ্ধু মল্লিকদের হাতে গিয়ে পড়েছে—মাগ্গি গণ্ডার বাজারে মেয়েমানুষ পোষা ছেনি দত্তর কর্ম নয়—আর এদিকে আমাদের চুঁচড়োর বাগানে গিয়েছিলি নাকি এদানি—?

—আজ্ঞে না—

—গিয়ে একদিন দেখে আসিস লোচন, খড়দ'র রামলীলার মেলায় সেদিন তিনটে মেয়েমানুষকেই নিয়ে গিয়েছিল মেজবাবু, দূরে থেকে ছেনি দত্ত আড় চোখে টেরিয়ে টেরিয়ে দেখছিল—মেজবাবু বারণ করলে নইলে শালাকে—

হঠাৎ এতক্ষণে ভুতনাথের দিকে নজর পড়তেই জিজ্ঞেস করলেন—এ কে লোচন—

—আজ্ঞে উনি আমাদের মাস্টারবাবুর শালা—এখানেই থাকেন—

ভৈরববাবু তামাক খাওয়া বন্ধ করে বললেন—তাই নাকি? কী নাম তোমার ছোক্‌রা—

ভুতনাথ বেঞ্চি ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললে—আমার নাম শ্রীভুতনাথ মুখোপাধ্যায়—

—দেশ কোথায়?

—নদেয় ফতেপুরে গাঁ—

—কী করা হয় এখেনে?

—'মোহিনী সিঁদুর অফিসে চাকরি করি—

—কত বেতন পাও?

—সাত টাকা আর একবেলা খাওয়া—

—আর উপ্‌রি, উপ্‌রি কত......উপ্‌রি নেই? চলা শক্ত, নেশাটা-আশটা করলে গেলে একটু টেনে-বুনে চলতে হবে ভাই—আগে সস্তা-গণ্ডার দিন ছিল, আগেকালে তুই বললে বিশ্বাস করবিনি লোচন ওই এক পাঁটের দাম ছিল চার আনা,—ও গাঁজাই বল্ আর চরস্ বল্ সব জিনিসের দাম কেবল বেড়েই চলেছে—এমন করে দিন দিন জিনিসের দাম বাড়লে কী করে মানুষ বাঁচে বল্—

লোচন বললে—উনি তামাকই খান না—তায় আবার বোতলের কথা বলছেন—

ভৈরববাবু বললেন,—তা' তামাক খাও না-খাও ভাই—পাড়াগাঁ থেকে নতুন এসেছ বড় ভাইএর মত ভাল কথা বলছি ওটি খাও—নইলে এ লোনা হাওয়ার দেশ এমন পেয়ে ছাড়বে—তখন......

বলে ভৈরববাবু আবার টান দিলেন হুঁকোয়—

তারপর থেমে বললেন—বিশ্বেস হচ্ছে

বুঝি ভাই—মেজবাবু তো লেখা-পড়া জানা লোক, মেজবাবু তো আর মিথ্যে বলবে না—তা ওই মেজবাবুর কাছেই শুনেছি—সেকালের মস্ত বড় একজন বাবু রামমোহন রায় খেতো—সকলকে ডেকে ডেকে খাওয়াতো, রাজনারায়ণ বোস খেত, মাইকেল মধুসূদন খেতো—আর রামমোহন রায় তো ছিল মাল খাওয়া শেখাবার গুরু—

তারপর আর এক টান টেনে ভৈরববাবু বললেন—এই এখন তো আমার এই চেহারা দেখছিস্ আগে ছিল প্যাকাটির মতন, মেজবাবু বললেন—নোনা লেগেছে—মাল খেতে হবে—মেজবাবুর কথায় খেতে শুরু করলুম—শেষে নীলু কবিরাজের সালসায় যা হয়নি, মাল খেয়ে তাই হলো, এখন যা খাই দিব্যি হজম হয়ে যায়—জিনিসটা যদি খারাপই হতো তো সাহেব বেটারা সাত সমুদ্দুর তের নদী পেরিয়ে এখানে এসে রাজত্ব করতে পারে—

কথাটা ভাববার মতন। না বিশ্বাস করে উপায় নেই।

তারপর ভৈরববাবু বললেন—একবার চুপি চুপি খবরটা নাও তো লোচন মেজবাবুর ঘুম ভাঙলো কিনা—

তারপর পকেট থেকে বার করলেন একটা তামার পয়সা। বললেন—নাও তোমার নামলী নাও—

লোচন পয়সাটা নিয়ে ট্যাঁকে গুঁজল।

সেদিন ওই পর্যন্ত। এ-বাড়ির হাল চাল দেখে ভূতনাথ এখন আর অবাক হয় না। রবিবার দিন 'মোহিনী সিঁদুর' অফিসের ছুটি। ব্রজরাখাল সেদিন সকাল-সকাল বেরিয়ে যায়—বরানগরের বাগানে। রামকৃষ্ণের চেলারা ওখানে থাকে। সারাদিন কী করে সেখানে, তারপর আসে সেই অনেক রাত্রে।

মেজবাবুকে এক-এক রবিবার দেখা যায়। গাড়ীবারান্দায় এসে দাঁড়ায় ইব্রাহিম মিয়া গাড়ি নিয়ে। আরো দুখানা গাড়িতে থাকে মেজবাবুর মোসাহেবের দল। সকলেরই চুনোট করা উড়ুনি। বাঁকা সিঁথি, বাবরি চুল। ইব্রাহিমের গাড়ির ভেতর মেজবাবুর মেয়েমানুষ। ভালো করে দেখা যায় না। ফরসা টুকটুকে চেহারা। ঘোমটা খোলা। নাকে নাকছাবি। পানের ডিবে হাতে নিয়ে নামে এক-একদিন।

মেজবাবুর চাকর বেণী বলে—শালাবাবু সরে যান এখন থেকে—বাবু দেখতে পেলে রাগ করবে—

সদলবলে চলে যায় সবাই। কখনও বাগান-বাড়িতে। কখনও গঙ্গায় নৌকা-ভ্রমণে। কখনও খড়দা'র মেলায়। সঙ্গে থাকে ডুগি তবলা, ঘুঙুর, মেঝের ওপর শোয়ান থাকে নাকি সার সার বোতল। খাবারের চ্যাঙারী গাড়ির মাথায়।

বেণী বলে—ওই যে কমবয়সী মেয়েমানুষটা দেখলেন, ও যা নাচে—

কমবয়সী মেয়েমানুষটার নাম হাসিনী। হাসিনী নাকি যেমন নাচে তেমনি গায়। ওর মা এসেছিল কাশী থেকে একবার দোলের সময় এ-বাড়িতে গান গাইতে। সঙ্গে এসেছিল হাসিনী। তখন হাসিনীর বয়স আট কি দশ। মেজবাবুর ভারি ভালো লাগলো দেখে। মা আর মেয়েকে আর ফিরে যেতে হলো না কাশীতে। এখানে বাড়ি ভাড়া করে দিলেন। আসবাবপত্র চাকর দারোয়ান বহাল হলো। তারপর হাসিনী বড় হলো, বুড়ী মা গেল মরে। এখন হাসিনী মেজবাবুর সম্পত্তি।

প্রথমে ছিল একজন। তারপর একজন বেড়ে হলো দুই। এখন তিনজন। কলকাতার বাবু-সমাজের মেজবাবুর বাবুয়ানি দেখে তাগ লেগে গেছে।

ভূতনাথ বলে—মেজগিন্নী এসব জানেন তো?

বেণী বলে—মেজমা বড় ঘরের মেয়ে—ওসব গা-সওয়া—মেজবাবুর শ্বশুর এখন বুড়ো থুত্থুড়ো তবু এখনও রবিবার রাতটা বাড়িতে কাটান না, বাঁধা মেয়েমানুষ আছে তাঁর—মেজমা তাকে রাঙামা বলে ডাকে—এ বাড়ি থেকে পুজোর নেমন্তন্ন গেলে রাঙামার বাড়িতেও খবর দিতে হবে—তত্ত্ব এলে দু'বাড়ি থেকেই আসে—সেবার মেজমার অসুখ হলো—রাঙামা নিজে এসে সাত-দিন সাত রাত্তির সেবা করলে—কারো নিজের মা-ও অমন সেবা করতে পারে না—আহা সাক্ষাৎ সতীলক্ষ্মী, যেমন রূপ...... তেমনি......

বেণী বলে—এদানি তো মেজবাবু তবু যা হোক রাত্তিরে বাড়ি ফেরেন—আর আগে?

আগেকার ব্যাপার ভূতনাথের জানবার কথা নয়।

—আগে সেখানেই পড়ে থাকতেন যে। খাজাঞ্চীবাবু আমার হাতে দপ্তরের কাগজ-পত্তর দিতেন, আমি সেই মেজবাবুর মেয়েমানুষের বাড়ি থেকে সই সাবুদ করে নিয়ে আসতুম। মদ খেলে মেজবাবুর আর জ্ঞান থাকতো না কিনা, কাপড় সামলাতে পারতেন না। আমি গেলেই জুতো পেটা করতেন। ও ছাই ভস্ম খেলে কি আর জ্ঞান গম্যি থাকে মানুষের—আমি হাসতুম—কিন্তু মাঠাকরুণ খুব বকুনি দিতেন। বলতেন—নেশা করেছ বলে কি একেবারে বেহেড্ হয়ে গেছ—তুই কিছু মনে করিসনে বাবা, এই চার আনা পয়সা নে—মেঠাই কিনে খাস্—

বেণী বলে—ওই যে পানের ডিবে হাতে বুড়োপানা মেয়েমানুষকে দেখলেন—ওই হলো বড় মাঠাকরুণ—মেজবাবু ওঁকে ভারি ভয় করেন—বড়মাঠাকরুণ যদি বলেন মদ খাওয়া বন্ধ—তো বন্ধ—মেজঠাকরুণ বলুন আর ছোটমাঠাকরুণই বলুন—বড়মাঠাকরুণ একবার 'না' বললে কারুর সাধ্যি নেই মেজবাবুকে দিয়ে হাঁ বলায়—

রবিবার মোসাহেব আর মেয়েমানুষের দল নিয়ে মেজবাবু চলে গেলেন। হয়ত গঙ্গার ওপর পানসীতে বসে খানা-পিনা হবে। বড়মাঠাকরুণ নিজে মেপে মেপে মদ ঢেলে দেবেন। তাঁর নিজের পুজো-আর্চা ব্রত-পার্বণ আছে। সব সময় তিনি দলে যোগ দেন না। বড়মাঠাকরুণ পূর্ণিমে-অমাবস্যা তিথি-নক্ষত্র দেখে চলেন। ভারি বিচার সব বিষয়ে। বাসি কাপড়ে মদ খান না। কাচা কাপড় পরে ঠাকুরঘরে ঢোকেন। কালীবাড়িতে বিশেষ-বিশেষ তিথিতে পুজো পাঠিয়ে দেন পাণ্ডার হাতে।

আর মেজ মা?

বেণী বলে—আর মেজমাকে দেখে আসুন গিয়ে। তেতলায় পালঙে বসে সিন্ধুর সঙ্গে বাঘ-বন্দী খেলছেন—নতুন নতুন গয়না গড়াচ্ছেন, একবার গোটছড়া ভেঙে বিছে হার হচ্ছে, বিছে হার পুরোন হলে অনন্ত হচ্ছে, অনন্তও পুরোন হয়ে গেলে চুড় হচ্ছে—হয়ত এবার পুজোয় হলো কমল হীরের নাকছাবি, আবার কালীপুজোয় হবে চুণী বসানো কানপাশা, মুক্তোর চিক নয়তো পান্না বসানো লকেটওয়ালা চন্দ্র-হার—

মেজবাবুর গাড়ি চলে যাবার পর অনেকক্ষণ ভূতনাথ চুপ চাপ সেইখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবে। পিসীমার কথা মনে পড়ে যায়। পিসীমার শ্বশুরবাড়ি থেকে পাঁচ টাকা মণি অর্ডার আসতো। ওই টাকাতেই মাস চলবে। ওই পাঁচটা টাকার জন্যেই পিসীমার কত ভাবনা। গাজনার পোস্টাপিসে ভূতনাথ হয়ত গিয়ে দেখলে মাস্টারবাবু নেই। শোনা গেল, পোস্টমাস্টারবাবুর

অসুখ। বলে পাঠিয়েছে—আজ আর উঠতে পারছিনে—কাল এসো—

পোস্টমাস্টারবাবু বুড়ো মানুষ। এক-একদিন হয়ত গরুর জাব দিচ্ছে। বলে পাঠিয়েছে—এবেলা আর হবে না, বড় কাজে ব্যস্ত আছি—ওবেলা সকাল-সকাল এসো হে—

ওবেলা যেতে মাস্টারবাবু হয়ত বললে—গাঁয়ে তো যাচ্ছ, তো গাঁয়ের চিঠিগুলো নিয়ে যাওনা সংগে—পিওন আর আজকে ওদিকে যেতে পারবে না, গঞ্জের হাটে পাঠিয়েছি তাকে—

ছোট একটা বাক্সর মধ্যে সেই পাঁচটি টাকা রেখে একটি একটি করে গুণে গুণে পয়সা খরচ করতো পিসীমা। ভূতনাথ মাঝে মাঝে চাইতো—একটা আধলা দাওনা পিসীমা—

আধলা পিসীমা দিত না। বলতো—রইল তো তোরই জন্যে—আমি মরে গেলে তুই-ই নিস্—

কিন্তু সে পয়সা-কড়ি পিসীমার অসুখেই সব খরচ হয়ে গেল তা তার জন্যে আর কী থাকবে।

আর এ-বাড়িতে কোথায় কেমন করে কে পয়সা উপায় করে কে জানে। বাবুরা ঘুম থেকেই ওঠে দুপুর একটার সময়। অফিসেও কেউ যায় না। ব্যবসাও কেউ করে না। অথচ এতগুলো লোক—সব বসে বসে খাচ্ছে।

(ক্রমশ)

সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

শ্রীকালিদাস রায়

আচার্য সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বহুকাল ব্যাধির শরশয্যায় শায়িত থাকিয়া কয়েকদিন আগে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ভীষ্ম যেমন শরশয্যায় শয়ান থাকিয়াও মহাভারতের শান্তি পর্ব ব্যাখ্যান করিয়া গিয়াছেন, তিনিও তেমনি ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসের অসমাপ্ত অংশ ব্যাধিশয্যায় শায়িত থাকিয়াই প্রায় সমাপ্ত করিয়া গিয়াছেন। গত তিন চার বৎসরে আরো কি সারস্বত অবদান ইউরোপ পাইয়াছে আমরা এখনও জানিতে পারি নাই।

আমি অল্পবিদ্য মানুষ, তিনি বিদ্যার মহোদধি, তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া নিজের পরিচয় দিতে সংকোচ বোধ করি—তাহাতে উপহাস্যতাং গমিষ্যামি। কিন্তু আমার মত অভাজনকে তিনি বন্ধু বলিয়া মনে করিতেন—অনেক মান্য ব্যক্তিকে তিনি মান দেন নাই। কিন্তু আমার মত অমানীকে প্রকাশ্যে মান দিতেন। একটা কারণ তিনি দেখাইতেন—"আপনার মত শুশ্রূষু মানুষ যে খুঁজে পাই না। সমবয়সীদের মধ্যে আমার বক্তব্য শোনাবার ধৈর্যশীল নিত্য সহচর কোথায় পাব?"

১৯১০ সালের শ্রাবণ মাসে যখন সংস্কৃতে এম-এ পাশ করিয়া দর্শনশাস্ত্রে এম-এ পরীক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি প্রস্তুত হইতেছেন—তখন একদিন মুর্শিদাবাদ লালবাগে তাঁহার সংগে আমার প্রথম পরিচয়। তখনই তাঁহার বিদ্যাবত্তার খ্যাতি ছাত্রসমাজে প্রচারিত হইয়াছে। আমি তখন বহরমপুর কলেজে বি-এ পড়ি। তাঁহার বিদ্যাবত্তার খ্যাতি শুনিয়া বহরমপুর হইতে তাহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় তিনি অসাধারণ কোন ফল দেখান নাই। সংস্কৃতের এম-এ পরীক্ষায় তিনি তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। ১ম হ'ন বহুভাষাবিদ্ হরিনাথ দে। দ্বিতীয় হ'ন মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন। তিনি তৃতীয় স্থান অধিকার করেন, এজন্য ক্ষুব্ধ হ'ন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন—'বয়ঃপ্রবীণ ভারত-বিখ্যাত দুইজন মনীষীর সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাভূত হওয়ায় কোন লজ্জা নেই।' বি-এ পরীক্ষায়ও তিনি ১ম শ্রেণীর অনার্স পান নাই। দর্শনশাস্ত্রে তিনি এম-এ পরীক্ষা দিয়াও ১ম শ্রেণীর মর্যাদা পান নাই। তিনি বলিয়াছিলেন—'এ পরীক্ষা তুচ্ছ। জীবনের পরীক্ষায় আমাকে ১ম স্থান অধিকার করতে হবে। এটা আমার খেলা, কাজ এবার শুরু করতে হবে।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইতে না পারার একটা হেতু—তাঁহার অপরিচ্ছন্ন দুষ্পাঠ্য হাতের লেখা, আর একটা হেতু পরীক্ষাপাঠ্যের বহির্ভূত নানা বিষয়ের প্রতি অদম্য অনুরাগ। কলিকাতা, কেম্ব্রিজ ও রোম তিনটি বিশ্ব-বিখ্যাত বিদ্যালয় হইতে ডক্টরেট লাভ করিয়া পরবর্তী জীবনে তিনি ছাত্রজীবনের পরীক্ষা পাশকে সত্যই তুচ্ছ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন।

পরিচয়ের প্রথম দিনেই পরিচয় পাইয়াছিলাম—তাঁহার বিদ্যাবত্তার অসামান্য ভার, জ্ঞানতৃষ্ণার অমেয়তার ও স্মৃতিশক্তির প্রখরতার। সেইদিনই বুঝিয়াছিলাম—এই মানুষটির সংগে যে শুভক্ষণে সাক্ষাৎ হইল—সেই ক্ষণটি আমার কাছে কালতীর্থ। আমি যত নগণ্য হই, এই মানুষটির সাহচর্য কিছুতেই ত্যাগ করিব না—উপেক্ষিত হইলেও। সেইদিন হইতে ত্রিশ বছর ধরিয়া তাঁহার জ্ঞানসিন্ধুর কূলে আমি উপলখণ্ড কুড়াইয়া আসিয়াছি। ডাঃ দাশগুপ্ত কয়েক-বৎসর চট্টগ্রামে অধ্যাপক ছিলেন বলিয়া পত্রবিনিময়ের দ্বারা সংযোগরক্ষা করিতে হইয়াছিল।

পরিচয়ের প্রথম দিনই তাঁহার অসাধারণ বিদ্যাবত্তার সূত্র খুঁজিয়া পাইয়াছিলাম। সুরেন্দ্রনাথ বরিশাল জেলার গৈলা গ্রামে যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—সে পরিবারস্থ পণ্ডিতগণ পুরুষানুক্রমে ত্রিপুরা রাজপরিবারের চিকিৎসক এবং সভাপণ্ডিত। গৈলায় এই পরিবারের পরিচালিত একটি সংস্কৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। তাহার নাম কবীন্দ্র কলেজ। এতবড় বেসরকারী সংস্কৃত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বাঙলায় আর ছিল না। বহুশত ছাত্র এই প্রতিষ্ঠানে সংস্কৃতের বিবিধ শাখায় শিক্ষালাভ করিত। এই বিদ্যা-প্রতিষ্ঠানের পরিবেশে সুরেন্দ্রনাথের জন্ম ও প্রতিপালন। সুরেন্দ্রনাথ ৭।৮ বৎসর বয়সেই অধ্যাত্মবিদ্যার অতিজটিল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিতেন। কি করিয়া তাহা সম্ভব হইত সে রহস্য তিনিও উদ্ভেদ করিতে পারেন নাই। একথা আমি তাঁহার মুখে শুনি নাই। শুনিয়াছিলাম পুরীতে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মঠের কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীর কাছে। পরে আরও অনেকের কাছে এই তথ্যটি জানিতে পারি। এ তথ্যের যাহারা প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিল তাহারা বালক সুরেন্দ্রনাথকে বলিত—'খোকাভগবান'।

সুরেন্দ্রনাথের মুখে শুনিয়াছিলাম—"গোস্বামী-প্রভু এবং অনেকে আশা করেছিলেন—আমি মহাসাত্ত্বিক ধর্মগুরুজাতীয় একটা অসাধারণ মানুষ হয়ে উঠব। গোস্বামী-প্রভু একটি কমণ্ডলুর উপর

একটি বেদানা রেখে আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। তখন আমি এর অর্থ কিছুই বুঝিনি। পরে এখন বুঝেছি বেদানাটা ছিল ভোগের Symbol আর কমণ্ডলুটা ছিল সাত্ত্বিকতা ও বৈরাগ্যের Symbol. তিনি প্রত্যাশা করেছিলেন—ভোগের জীবনের অবসানে আমার জীবনে আসবে বৈরাগ্য। সাধারণ লোকে আরো বেশি প্রত্যাশা করেছিল। তাঁদের প্রত্যাশা সার্থক হয়নি। আমার বাল্য জীবনের সে শক্তি কেমন ক'রে ধীরে ধীরে উবে গেল তা বুঝতে পারিনি। আমার মনে হয় গোস্বামী-প্রভু বোধহয় শক্তি সঞ্চার করতেন। যাই হোক্ সেসব প্রশ্নের উত্তর এখনো দিতে পারি—তবে সেসব উত্তর, শাস্ত্র পড়ে। ভারতীয় সংস্কৃতির আমি রাজসিক রূপ, সাত্ত্বিকরূপ নই।"

ভারতীয় অধ্যাত্মবিদ্যার গভীর জ্ঞানের যে পরিণতি প্রত্যাশিত তাঁহার জীবনে তাহা ঘটে নাই। ইউরোপীয় দর্শন তিনি ভারতীয় দর্শনের মতই অভিনিবেশের সহিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি ইংলণ্ডীয় দর্শনধারার ভক্ত ছিলেন না, ভক্ত ছিলেন জার্মান দর্শনধারার, ভক্ত ছিলেন কাণ্ট, হেগেল, সোপেনহাওয়ার ইত্যাদি দার্শনিকদের। ইউরোপীয় দর্শন তাঁর জীবনযাত্রায় সাত্ত্বিকতার পরিপন্থী হয় নাই। তিনি ইউরোপীয় বিজ্ঞানের বিবিধ শাখার গ্রন্থাদিও যত্নের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন। বিজ্ঞানপাঠের ফল ও ইউরোপীয় সভ্যতার পরিবেশের প্রভাব তাঁহার জীবন-যাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল। তাঁহার দার্শনিক মতবাদের সংগে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের সর্বত্র মিল ছিল না। তিনি সমাজধর্ম মানিয়া চলিতেন, কিন্তু হিন্দুর দেবদেবীবাদ, পৌত্তলিকতা, জন্মান্তরবাদ, পরলোকবাদ—এ সমস্ত মানিতেন না। ভারতের অধ্যাত্মবিদ্যার জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে অধিগত করিয়া তিনি বিশ্বের বিদ্বৎসমাজে বিতরণ করিয়াছেন—তাহাতে ভারতের প্রাচীন সভ্যতার গৌরব তাঁহার দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু সে জ্ঞানকে তিনি জীবনে অধ্যাত্ম সাধনায় সার্থক করিয়া তোলেন নাই। ভারতীয় দর্শন তাঁহার সারস্বত সাধনার উপজীব্য ছিল, কিন্তু ভাগবত সাধনার উপজীব্য হয় নাই। সেজন্য তাঁহাকে ভারতীয় আর্যধারার দার্শনিক বলা যায় না, ইউরোপীয় ধারারই দার্শনিক বলিতে হয়। অনেকের কাছে তিনি Intellectual Giant হইয়াই আছেন।

আচার্য সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

তপস্যা সুরেন্দ্রনাথ কম করেন নাই। কিন্তু বর প্রার্থনার সময় তিনি ক্ষত্রিয় সুরথেরই অনুবর্তন করিয়াছিলেন, বৈশ্য 'সমাধি'র অনুবর্তন করেন নাই।

যিনি সংস্কৃতের সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত, সংস্কৃতে বক্তৃতা করেন অনর্গল, অধ্যাত্মবিদ্যার চর্চাই যাঁহার জীবনের ব্রত, লোকে প্রত্যাশা করিত তাঁহার জীবনযাত্রা হইবে স্বধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মত অনাড়ম্বর ও সত্ত্বশুচি। তাহাদের এ প্রত্যাশা ভ্রান্ত। মনে রাখিতে হইবে সুরেন্দ্রনাথের লক্ষ্য ছিল না আধ্যাত্মিক জীবনযাপন—আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য অধ্যাত্মবিদ্যার চর্চা তিনি করেন নাই—তাঁহার লক্ষ্য ছিল ভারতীয় অধ্যাত্মবিদ্যার প্রচার তদ্দ্বারা নিজের এবং ভারতের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি। পাওয়া আর হওয়া এক বস্তু নয়। জ্ঞান অর্জন ও জ্ঞানকে জীবনে সার্থকতা দান এক বস্তু নয়। তিনি ব্রহ্মবিদ্যায় অভিজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ ছিলেন না। যাঁহার যতটা প্রাপ্য তাহার বেশি তিনি চান নাই। ইচ্ছা করিলে তিনি ঋষি সাজিতে পারিতেন, কিন্তু ভণ্ডামি তিনি সহিতে পারিতেন না—কপটতাকেই তিনি স্বধর্মচ্যুতি মনে করিতেন। তিনি বলিতেন —'দেখুন, অধ্যাত্মবিদ্যার প্রচার ও অধ্যাত্মবিদ্যাকে জীবনে সার্থক করে তোলা—এক জিনিস নয়। আমার কাজ অধ্যাত্ম বিদ্যার দেশ বিদেশে প্রচার। এ কাজটা হচ্ছে

রাজসিক। আমরা এখন সেণ্টজনের যুগে বাস করি না। এই রাজসিক যুগে প্রচারের পদ্ধতিও রাজসিক। এ যুগে ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিকেও যেমন মোটর রেল ইস্টিমারে চড়ে যাতায়াত করতে হয়, বিদ্যুতের আলোকে পুঁথি পড়তে হয় বা শিষ্যদের উপদেশ দিতে হয়, মা দুর্গাকে যেমন লরি চড়তে হয়, মা সরস্বতীর বাহন যেমন আজ মরাল নয়, মুদ্রাযন্ত্র, তেমনি এ যুগে অধ্যাত্ম বিদ্যার প্রচার করতে হলে জাহাজ চড়ে দেশবিদেশ যেতে হয়, সাহেব সাজতে হয়, ইংরাজিতে বই লিখতে হয়, অনেক টাকাকড়ির দরকার হয়, বিদেশীয় পণ্ডিতদের সঙ্গে তথাকথিত সম্ভ্রান্তভাবে মেলামেশা করতে হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের চাপরাশ নিতে হয়। এসব হ'লো—রাজসিক ব্যাপার। আমি ভারতীয় সংস্কৃতি—বিশেষ ক'রে অধ্যাত্মবিদ্যার বাহন মাত্র। আমি ঋষি হ'তে চাইনি, ঋষিত্বের ভানও করিনি। আমি ভুল করিনি—আপনারাই ভুল প্রত্যাশা করেছেন। আমাকে আপনারা দার্শনিকও বলতে পারেন না, যতক্ষণ আমি নিজস্ব দার্শনিক মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করছি। আপনারা আমাকে ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের প্রচারক বলতে পারেন। একাজ করতে পারতেন—ব্রজেন শীল। তিনি করলেন না—বিদ্যার জাহাজ হয়ে বন্দরেই বাঁধা থেকে গেলেন। কাজেই আমাকে করতে হল।

সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে বহুদিনকার সাহচর্যের ফলে আমি তাঁহার জীবনে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করিয়াছি—

১। অসাধারণ স্মৃতিশক্তি। পরিচয়ের প্রথমদিনই স্টীমারে বহরমপুর যাইবার সময় গোটা মেঘদূতটা আদ্যন্ত আবৃত্তি করিয়া শুনাইয়াছিলেন—তাহাতে বিস্মিত হই নাই। পরবর্তী জীবনে পণ্ডিতদের সঙ্গে বিচারে আমি লক্ষ্য করিয়াছি—তাঁহার অধিকাংশ অধীতবিদ্যা—তাঁহার কণ্ঠস্থ। শেলাক একবার শুনিলে বা পড়িলে এবং গদ্যাংশ ২।৩ বার পড়িলেই তাঁহার মুখস্থ হইয়া যাইত। কোন্ কথা কোন্ পুস্তকের কোন্ পাতার কোন্ অংশে আছে তাহা তিনি ঠিক ঠিক বলিয়া দিতেন। তিনি বলিতেন, 'আগেকার পণ্ডিতদের সবই কণ্ঠস্থ থাক্‌তো। আজকালকার পণ্ডিতরা সব Reference পণ্ডিত। কোন কথা জিজ্ঞাসা কর—পুঁথি না দেখে উত্তর দিতে পারবে না—নয়ত বল্‌বে অমুক বইএর অমুক প্রকরণ বা পরিচ্ছেদ পড়ে দেখ।' নিমাই পণ্ডিতদের মত পণ্ডিতদের অপদস্থ করিবার একটা দুষ্ট বুদ্ধি তাঁহার ছিল। পণ্ডিত পাইলেই তিনি এমন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া বসিতেন—যাহার উত্তর দিতে হইলে প্রখর স্মৃতিশক্তির প্রয়োজন। অনেক সময়ই দেখিয়াছি পণ্ডিতদের দশা মুরারি গুপ্তের মতই হইত।

২। জিগীষা—আমাদের দেশের প্রাচীন পণ্ডিতদের মধ্যে যে জিগীষা বৃত্তি প্রচলন ছিল, সুরেন্দ্রনাথের চরিত্রে সেই জিগীষা-বৃত্তি দেখিয়াছি। প্রাচীনকালের পণ্ডিতরা দিগ্‌বিজয়ে বাহির হইতেন। ইতর শ্রেণীর ধনীরা ষাঁড়ের লড়াই দেখিয়া যেমন আমোদ পাইত, সুসভ্য ধনী বা রাজন্যরা পণ্ডিতদের বিতণ্ডা বাঁধাইয়া দিয়া তেমনি আনন্দ পাইত। প্রাচীন পণ্ডিতদের জিগীষু মনোবৃত্তি কতকটা সুরেন্দ্রনাথ উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছিলেন। বাদানুবাদ ও বিতর্ক করিবার জন্য তাঁহার মধ্যে একটা অদম্য আগ্রহ ছিল। বিতর্কের জন্য প্রস্তুত হইয়া কেহই তাঁহার কাছে আসিত না, বিতর্কে জিতিবার লোভও বর্তমান যুগে কাহারও বড় একটা নাই। কাজেই সুরেনবাবু সহজেই বিজয়োল্লাস লাভ করিতে পারিতেন। কেবল কয়েকটি শাণিত প্রশ্নাঘাতেই তিনি বর্মহীন পণ্ডিতদের পরাভূত করিতে পারিতেন।

৩। দুর্নিবার উৎকাঙ্ক্ষা—সুরেন্দ্রনাথ Thus far and not further জানিতেন না। তাঁহার উৎকাঙ্ক্ষা ভাষা হইতে ভাষান্তরে, বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে, দেশ হইতে দেশান্তরে ছুটিয়াছে। তিনি একাধারে দার্শনিক, সমালোচক, কথা সাহিত্যিক, কবি, বক্তা, রসতত্ত্ববিদ্, আলঙ্কারিক হইতে চাহিয়াছেন—বহু ভাষার পুস্তক পড়িয়া তিনি বুঝিতেন—৫টি ভাষায় তিনি বক্তৃতা করিতে পারিতেন। তিনি বৈষ্ণব ছিলেন ন প্রতিষ্ঠা তাঁহার কাছে শূকরীবিষ্ঠা ছিল ন তবে আত্মপ্রতিষ্ঠালাভ ছিল তাঁহার প গৌণ। উৎকাঙ্ক্ষার মুখ্য লক্ষ্য ছি —ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রকে দার্শনিক জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক সম্পদ বলিয়া প্রতিপ করা। তিনি প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন-ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্র অদ্যাবধি এমন কিছ বলে নাই, যাহা ভারতীয় তত্ত্ববাদীরা আগে বলিয়া যান নাই। তাঁহার এই উৎকাঙ্ক্ষ অনেকাংশে সাফল্যলাভ করিয়াছে।

৪। গভীর আত্মপ্রত্যয়—তন্ন তন্ন করিয় অধ্যাত্ম শাস্ত্র অধ্যয়ন করার ফলে, সংস্কৃতে সর্বশাস্ত্র নখদর্পণে থাকায় এবং অধী বিদ্যাকে স্মৃতিপুটে রক্ষা করিবার অসামা মেধা থাকায় তাঁহার আত্মশক্তিতে অট প্রত্যয় জন্মিয়াছিল। এই আত্মপ্রত্যয় তাঁহা মন হইতে সর্ববিধ দ্বিধাসঙ্কোচ দূর করিয় দিয়াছিল—পরাধীনতাজনিত হীন মনোভা বিন্দুমাত্র ছিল না। এই অটল আত্মপ্রত তথাকথিত সামাজিক বিনয় সৌজন্য হর করিয়া লইয়াছিল—অনেক সময় তাঁহা ভাষণকে বিকত্থনে পরিণত করিয়াছিল।

৫। নিঃসঙ্কোচ নির্ভীকতা—আত্ম প্রকাশে এরূপ অকুণ্ঠ নির্ভীকতা খুব ক পণ্ডিতের মধ্যেই দেখা যায়। নির্ভীকতার জন্য ছাত্রজীবনে তিনি অধ্যাপক দের সঙ্গে তর্কবিতর্ক করিতে ইতস্ত করিতেন না। অসঙ্কোচে তিনি সমসাময়ি মহাপ্রাজ্ঞগণের (গঙ্গানাথ ঝা, গোপীনা কবিরাজ, রাধাকৃষ্ণণ ইত্যাদি মহামনীষীদে মতবাদের নিঃসঙ্কোচে প্রতিবাদ করিতে রবীন্দ্রনাথের তিনি পরম ভক্ত ছিলেন, কি তাঁহার রচনায় বা রসনায় কিছু অসঙ্গ দেখিলে অকুণ্ঠকণ্ঠে তাহার বিরুদ্ধে ম প্রকাশ করিতেন। তাঁহার চেয়ে বে নির্ভীকতা প্রদর্শিত হইয়াছে—সমগ্র ই রোপের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানিসংসদে ভারতী অধ্যাত্ম সাধনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জ সংগ্রামে। এই নির্ভীকতা তাঁহাকে জ সাধারণের নিন্দা প্রশংসায়, সামাজিক প বাদে ও চারিপাশের বিরুদ্ধ সমালোচন অবিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল।

৬। অক্লান্ত অধ্যবসায়—প্রতিভার সহি অক্লান্ত অধ্যবসায়ের এমন মণিকাঞ্চন যো সচরাচর দেখা যায় না। এজন্য তিনি জীব একদিনের জন্য আরাম বিশ্রাম উপভো করেন নাই। যখন স্বাস্থ্যনিবাসে যাইতে সঙ্গে যাইত রাশি রাশি পুস্তক। পরী

কিছুদিন একত্র ছিল[illegible] —দিবাবসানে ঘণ্টা দুয়েক কেবল বেড়াই[illegible]। প্রভাত হইতে গভীর রাত্রি পর্যন্ত [illegible]সের বাকি সময় লিখিতেন কি না পড়ি[illegible]। শেষ পনেরো বৎসর নানা ব্যাধিতে [illegible] হইয়াছিলেন, রক্তের অতিরিক্ত চাপে[illegible]র ফলে একটি চোখের দৃষ্টিশক্তি ছিল না[illegible]। জরা কেশ-দন্তকে আক্রমণ না করিলেও [illegible] দেহের প্রধান প্রধান যন্ত্রকে আক্রমণ করি[illegible]য়াছিল—শেষ কয়বৎসর শয্যাগতই ছিলেন। [illegible]কিন্তু একদিনের জন্যও তাঁহার সারস্বত সাধন[illegible]র বিরাম ছিল না। অতন্দ্রপ্রহরবৎ তিনি [illegible] এই সাধনা করিয়া গিয়াছেন—রোগের দারুণ যন্ত্রণা, আসন্ন মৃত্যুর ভয়ও তাঁহাকে এ সাধনা হইতে তিলেকের জন্যও বিরত করিতে পারে নাই।

৭। অফুরন্ত জীবনীশক্তি—দেহে মনে জীবনীশক্তির এত প্রাচুর্য রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কাহারও আমি দেখি নাই। মনের কথা ত' বলিলাম। এই জীবনীশক্তির বেগ ছিল যেন ব্রহ্মপুত্রের মত। ইহার অভিব্যক্তিও ছিল বিবিধ শাখায়। জীবন প্রদীপের তৈল যখন নিঃশেষিত হইয়াছে—তখনও প্রদীপের মুখে শলিতাটি জ্বলিয়াছে উজ্জ্বল শিখায়। দেহের জীবনীশক্তিও ছিল অসামান্য। বহুবিধ ব্যাধিকে জরার সঙ্গে ও নিদারুণ মনস্তাপের সহিত যোগ দিয়া ৮।১০ বৎসর অক্লান্ত চেষ্টায় তাঁহার জীবনীশক্তির রক্তমাংসের আশ্রয়টিকে প্রাণহীন করিতে হইয়াছে।

৮। দেহে—সারস্বত সাধনার এরূপ তন্ময়তা সচরাচর দেখা যায় না। কি রচনাকালে, কি গ্রন্থানুবাদে, কি শিক্ষার্থীকে জ্ঞানোপদেশ দানে, কি আলোচনায়—সকল সময়ই তিনি এমনই তন্ময় হইতেন যে, আহার নিদ্রা ভুলিয়া যাইতেন। বসনভূষণ ভুলিয়া যাইতেন। ব্যাধিত অবস্থার ঔষধপথ্য পর্যন্ত ভুলিয়া যাইতেন। জৈবধর্ম পালন তাঁহার কাছে জীবনযাত্রার গৌণ অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছিল। এজন্য জীবনে ভুলভ্রান্তি অল্প হয় নাই। অতিরিক্ত তন্ময়তা অনেক সময় শৃঙ্খলা নষ্ট করিয়া দিত। সতর্ক লেখক-সুলভ শৃঙ্খলা অনেক সময় তাঁহার রচনার মধ্যেও থাকিত না।

৯। অসাধারণ বাক্‌পটুতা—বাক্‌পটুতার অসামান্যতায় মুগ্ধ হইয়া বহু জ্ঞানপিপাসু তাঁহার কাছে যাওয়া-আসা করিত। তাঁহার রসনার আকর্ষিকা শক্তি ছিল দুর্নিবার। তাঁহার রসনায় অতি তুচ্ছ বিষয়ও চিত্তাকর্ষক, সজীব ও সরস হইয়া উঠিত—অতি জটিল গূঢ়গহন তত্ত্বও বিশদ ও স্বচ্ছ হইয়া উঠিত। শিবজটা হইতে নির্গত মন্দাকিনীধারার ন্যায় তাঁহার বাণীধারায় যেন জীবনের তাপজ্বালা জুড়াইয়া যাইত। এই বাক্‌পটুতার গুণে একদিকে যেমন তিনি আদর্শ অধ্যাপক হইয়া উঠিয়াছিলেন অন্যদিকে দেশবিদেশের সভায় সংসদে তেমনি আদর্শ বাগ্মীরূপে সম্মানিত হইয়াছেন। বহু বাগ্মীরই বক্তৃতা শুনিয়াছি—কাহারও ভাষণে যুক্তিমূলক পরম্পরা আছে, আবেগ নাই, কাহারো ভাষণে আবেগ আছে যুক্তিগর্ভ পরম্পরা নাই। আচার্য দাশগুপ্তের বক্তৃতায় এই দুইয়ের রাজযোটক ঘটিয়াছিল। তাহার উপরে ছিল লাবণ্যের মুক্তাফলের আখিতারল্যের ন্যায় সরসতা। একাধারে সাহিত্যিক ও দার্শনিকের পক্ষে যাহা স্বাভাবিক তাঁহার ভাষণে তাহাই ছিল। কেবল জ্ঞানপ্রবীণ্য নয়, কণ্ঠের অকুণ্ঠতাও তাঁহাকে ইউরোপের বিদ্বৎসমাজে বরেণ্য করিয়া তুলিয়াছিল।

তাঁহার সাহচর্য লাভ করিয়াছি বহুদিন ধরিয়া, তিনিও ছিলেন বিরাট পুরুষ। কাজেই তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিবার আছে। একটি প্রবন্ধে সব কথা বলা যায় না।

বিধাতা অত্যন্ত ধীরে ধীরে চলতি ভাষায় যাহাকে বলে সইয়ে সইয়ে তাঁহাকে আমাদের কাছ হইতে সরাইয়া লইয়াছেন। তিনি ইদানীং আমাদের কাছে প্রায় স্বর্গত হইয়াই ছিলেন,—তবু ভগ্ন মৃণালের সূত্রের ন্যায় একটা যোগসূত্র ছিল। তাহাও আজ ছিন্ন হইল। তাই বলিয়া তাঁহার মৃত্যু-সংবাদে বেদনা কম পাই নাই। সান্ত্বনার কথা এই, তিনি তাঁহার ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া নিঃশেষে তাঁহার সর্বস্বদান করিয়া ত্রিতাপের সংসার হইতে মুক্ত হইলেন এবং তাঁহার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ যাহা তাহা শাশ্বত গৌরবে রহিয়া গেল।

শালবন

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বোশেখের কোন ভোরে শালবনে গিয়েছ কখনো?
মাথা উঁচু শালবন আলোর চুমোয়
যখন ঘুমোয়?
ছুটীর মুহূর্তে গাঢ় স্বপ্নেই কাটে
জমা হওয়া ঝরা পাতা তামাটে তামাটে—
আকাশের গানে হয় মাতাল অবোধ
মাঠে মাঠে পড়ে থাকে সোনা সোনা রোদ?
সে সময় শালবনে গিয়ে
তোমার মনের রঙ্ দেখেছ মিলিয়ে?

শালের শাখায়,—
একটি কপোত-প্রাণে গানের পাখায়,
আরণ্যক সুরের নূপুর—
ছায়া-আলো সদা কালো রঙিন্ দুপুর।
ছেড়ে দেওয়া ছাগলের গলার ঘণ্টায়
সময় আটকে রাখে
বুঝি কোন অলক্ষ্য সংকেতে—
লাঙলের ফালে বেঁধা ক্ষেতে।
সে সময়—
তবুও যখন মনে হয়—
সেই ঘণ্টা সেই গানে আছে কোন গূহ্য সমন্বয়
দেহাতী মেয়ের চোখে অচেনার পরম বিস্ময়!

সে দুপুরে শালবনে
মোমে মাথা পাতার সবুজে—
তোমার মনের রঙ্ পেয়েছ কি খুঁজে?

হিন্দু সমাজে জাতিভেদ প্রথার কুফল

ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক বিলোপ সাধনের আবেদন

"শ্রীচৈতন্য, স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় মহাপুরুষগণের চেষ্টা সত্ত্বেও আমাদের হিন্দু ভ্রাতৃবর্গের একাংশকে আমরা হারাইয়াছি। হিন্দু সমাজ তাহাদের ন্যূনতম মানবীয় অধিকারও স্বীকার করে নাই। তাই তাহাদের কেহ কেহ গভীর নৈরাশ্যে বা আক্রোশবশতঃ ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে।"

সাধনা ঔষধালয়ের অধ্যক্ষ ও বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার সহঃ সভাপতি ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ নিখিল ভারত কায়স্থ সভার চতুঃপঞ্চাশৎ অধিবেশনে প্রদত্ত তাঁহার ভাষণে হিন্দুসমাজ হইতে সাধারণভাবে জাতিভেদ প্রথা এবং বিশেষভাবে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য এক বলিষ্ঠ আবেদন জানাইয়া উপরোক্ত মন্তব্য করেন। বিগত ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতায় পরলোকগত রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের বাসভবনে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ

ডাঃ ঘোষ অনিবার্য কারণে স্বয়ং উপস্থিত হইতে পারেন নাই। সভাপতির অনুমতিক্রমে সম্মেলনে তাঁহার লিখিত ভাষণ পঠিত হয়।

ডাঃ ঘোষের ভাষণ নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

ভ্রাতা-ভগিনীগণ,

আপনারা অনুগ্রহপূর্বক আমাকে আপনাদের এই স্মরণীয় অধিবেশনে যোগদান করিয়া আমার বক্তব্য জ্ঞাপন করিতে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। সমগ্র ভারতের কায়স্থ কুলতিলকগণের এই মহাসম্মেলনে আমি পাকিস্থান হইতে—একজন পাকিস্থানী কায়স্থরূপে যোগদান করিয়াছি।

আপনারা সকলেই জানেন যে, সনাতন বর্ণধর্ম হিন্দু সমাজকে চারিটি সুস্পষ্ট বর্ণে বিভক্ত করিয়াছে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। অবশ্য তৎকালে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির গুণানুসারে এই বর্ণভেদ হইত, জন্মের দ্বারা নহে। কিন্তু কালক্রমে গুণানুসারে বর্ণভেদ লুপ্ত হয় এবং একমাত্র জন্ম দ্বারাই চূড়ান্তরূপে বর্ণ নিরূপিত হইতে থাকে। এই পরিবর্তিত প্রথা বহুকাল প্রচলিত ছিল এবং দুর্ভাগ্যক্রমে এখনও রহিয়াছে—যদিও ইহার অনিষ্টকারিতা স্বপ্রকট। সনাতন বর্ণধর্মের মর্যাদা রক্ষার জন্য অমরকীর্তি শ্রীরামচন্দ্র পর্যন্ত শূদ্র রক্তে হস্ত রঞ্জিত করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য তিনি শূদ্র শম্বুকের শিরচ্ছেদন করিয়াছিলেন। এই কাহিনী বিশ্বাস করুন বা না করুন, ইহার মধ্যে বর্ণধর্মের মর্ম-পরিচয় নিহিত রহিয়াছে এবং ইহার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াও ইহার সহিত জড়িত রহিয়াছে।

এক কথায়, হৃদয়হীন ব্রাহ্মণ্য অত্যাচার এবং নিম্ন বর্ণের লোকের উপর আরোপিত শত সহস্র প্রতিবন্ধক তাহাদের জীবনকে দুর্বিষহ করিয়া তোলে এবং এই সমস্ত অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে হিন্দু সমাজের অভ্যন্তরেই এক বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়।

অপমানকর ব্যবহার

আমাদের কায়স্থ সভা এই বিদ্রোহী দলগুলির অন্যতম এবং আমাদের পূর্বগামিগণ তৎকালীন হিন্দু সমাজে কায়স্থগণের অবস্থার উন্নতি সাধনের ব্রত লইয়া প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে এই সভা স্থাপন করিয়াছিলেন। তৎকালে ব্রাহ্মণেরা আমাদিগকেও শূদ্ররূপে বিবেচনা করিতেন এবং ইহার ফলে ক্ষত্রিয়গণের যথার্থ বংশধররূপে আমাদের প্রাপ্য নানা ন্যায্য অধিকার হইতে আমরা বঞ্চিত হইয়াছিলাম। আমরা তৎকালে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতে পারিতাম না, নিজের দেবপূজা করিতে পারিতাম না, দেবতা ভোগ নিবেদন করিতে পারিতাম না এবং আরও বহুবিধ বাধা আমাদের উপর আরোপিত ছিল। এমন কি তৎকালে ব্রাহ্মণের দেবতার মতই আমাদের হাতে পক্ব অন্ন গ্রহণ করিতেন না। ঔর্ধ্বদৈহিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে মৃত্যুর পর ত্রিশ দিন অতিবাহিত না হইলে আমরা শ্রাদ্ধকর্মের অধিকারী ছিলাম না। শাস্ত্রের তথাকথিত ন্যাসরক্ষকগণ আমাদের পক্ষে সংস্কৃত কলেজে প্রবেশাধিকার ও শাস্ত্র পাঠ নিষিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমাদের পুরাঙ্গনাগণের নামের অন্তে "দেবী" শব্দ ব্যবহারও নিষিদ্ধ ছিল; তাঁহাদিগকে একটি সকুণ্ঠ "দাসী" শব্দে সন্তুষ্ট থাকিতে হইত। ঈশ্বরের নামে এই সকল ও অন্যান্য বিধিনিষেধ আমাদের উপর আরোপিত হইয়াছিল ও কড়াকড়িভাবে ঐগুলি প্রতিপালিত হইত। ইহার জন্য শুধু কঠোর ব্রাহ্মণ্য শাসনই নহে আমাদের নিজেদের কুসংস্কারও দায়ী ছিল। আমরাও বিশ্বাস করিতাম যে, ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যাত এই সকল শাস্ত্রের বিরুদ্ধাচরণ করিলে আমরা ভগবানের ক্রোধভাজন হইব। সুতরাং আমাদিগকে একাধারে ব্রাহ্মণ এবং আমাদের স্বসম্প্রদায়ের অন্ধ-বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইতে হয়।

গত অর্ধশতাব্দী ব্যাপী সংগ্রামে আমরা আমাদের নিজস্ব সম্প্রদায়কে অল্প-বিস্তর আত্মসচেতন করিতে সক্ষম হইয়াছি এবং যে সকল অধিকার হইতে এতকাল আমরা বঞ্চিত ছিলাম, সেগুলির প্রায় সব কয়টিই আদায় করিয়া লইয়াছি। অবশ্য শূদ্রের বিরুদ্ধে সমস্ত প্রাচীন "বিধান" লইয়া "মনু" এখনও বিরাজমান। যাহা হউক, আমরা আর শূদ্ররূপে গণ্য নহি এবং ব্রাহ্মণগণও অনিচ্ছা সহকারে হইলেও হিন্দু সমাজে আমাদের এই পুনরুজ্জীবিত মর্যাদা প্রায় স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ইহা নিশ্চয়ই আমাদের একটি কৃতিত্ব। ইহা দ্বারা আমরা শুধু আমাদের নিজেদেরই মর্যাদা বৃদ্ধি করি নাই, কঠিন আঘাত হানিয়া আমাদের হিন্দু সমাজকেই সুদীর্ঘ সুপ্তি হইতে জাগরিত হইতে এবং অভ্যন্তরীণ ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করিয়া পরিবর্তিত জগতের সহিত সমান তালে চলিতেও সাহায্য করিয়াছি।

বিবর্তনধর্মী প্রগতি

ইতিমধ্যে সত্যসত্যই জগতের পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। বিশ্বের এবং আমাদেরও পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গী হিন্দুদের প্রাচীন বর্ণ ধর্মকে জীয়াইয়া রাখার আর অনুকূল নহে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এতকাল আমরা কেবলমাত্র আমাদের নিজস্ব অধিকার আদায়ের জন্যই সংগ্রাম করিয়াছি, দুর্ভাগ্য পীড়িত অস্পৃশ্য শূদ্রদের মনোভাবের প্রতি দৃষ্টি দেই নাই। ইহার ফলে আমরা আমাদের আকাঙ্ক্ষিত সমৃদ্ধি কতকটা লাভ করিতে পারিয়াছি বটে, কিন্তু শূদ্রেরা পূর্ববৎ যথাস্থানেই রহিয়াছে। অবশ্য তাহাদের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধী সংগ্রাম করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য ও অন্যান্য যে সকল আচার্য তাঁহাদের বৈষ্ণব ধর্ম হইতে জাতিভেদ

আমলের স্পষ্ট গোটাগোটা হাতের লেখার সঙ্গে তার অনেক প্রভেদ। শান্তি এ কালের মেয়ে এবং গৌরীকান্তের চেয়ে বয়সে বিশ বছরের ছোট হলেও তার বাপের হাতের লেখার সঙ্গে সুপরিচিত। তাই সেই পড়ছে গৌরীকান্ত শুনছে।

দুপুরের আগে শান্তি ছুটে এসেছিল কিশোর মামার কাছে। কিন্তু কিশোরবাবু এই বৃদ্ধ বয়সেও এই উত্তেজনা এবং চাঞ্চল্যের মধ্যে স্থির থাকতে পারেন নি। তিনি বেরিয়েছেন নবগ্রামের মুসলমান-পাড়ায়। সেখানে গিয়ে তাদের ভরসা দিচ্ছেন—মধ্যে মধ্যে গুজবের জন্য তিরস্কার করছেন এবং বসে আছেন—বলেছেন—আমি রইলাম এইখানে; আমার প্রাণ থাকতে তোমাদের পায়ে কুশাগ্র বিন্ধ হবে না।

কিশোরবাবুকে সঙ্গে নিয়ে গৌরীদা'র কাছে আসবার সঙ্কল্পই ছিল শান্তির। কি জানি কেন সে কিছুদিন থেকে গৌরীকান্তের কাছে আসতে খুব আগ্রহ বোধ করে না। অবশ্য সে কিছুদিন থেকেই নিজের ভবিষ্যত পথ বেছে নেবার চিন্তায় প্রায় মগ্ন হয়ে আছে। কয়েক জায়গায় দরখাস্তও করেছে। মধ্যে একদিন সদরে গিয়েছিল। গৌরীকান্ত সেইদিনই ওদের বাড়ি গিয়েছিল, দেবকী পিসীমার সঙ্গে দেখা করে এসেছে; ওদের খোঁজ খবর নিয়ে বলে এসেছে শান্তির শক্তি আমি জানি। সে শক্তি কখনও ব্যর্থ হবে না পিসিমা। তাকে বলবেন আমি এসেছিলাম। একটা কথা ছিল সেটা আপনাকেই ব'লে যাই। শুনলাম গুণীবাবুদের এস্টেট থেকে আপনাদের বাড়ি খালি ক'রে দেবার জন্যে বলেছে। আপনারা কি করবেন কোথায় যাবেন ঠিক জানি না। যদি কিছু ঠিক না করে থাকেন, আর কিছু মনে না করেন, তা হ'লে আমি একটা প্রস্তাব করে যাই। আমি তো এখানে থাকি না থাকবও না। শিগ্‌গির চলে যাব ঠিক করেছি। নতুন ক'রে বাড়িটা মেরামত করলাম—আবার সেই সাপ খোপের বাসা হবে। তার থেকে আপনারা যদি ওখানে গিয়ে থাকেন তো আমি নিশ্চিন্ত হব।

দেবকী দেবী বলেছেন—শান্তিকে বলব আমি।

শান্তিকে বলেছিলেন দেবকী দেবী। শান্তি বলেছিল—পরের আশ্রিত হয়ে থাকতে চাইনে মা। তিনি যিনিই হোন কিশোরবাবুই হোন আর গৌরীকান্তবাবুই হোন।

—কিন্তু এ বাড়ি তো ছেড়ে দিতে হবে!

—কে বললে হবে? এ বাড়ি আমি ছাড়ব না। উঠিয়ে দিতে হয় জোর করে উঠিয়ে দিক। এ বাড়ির ভাড়া নেন গুণীবাবুরা। এবং বাড়িটার ভাড়া ইস্কুল ফান্ড থেকে দেওয়া হয় না। আমি বাড়ি ভাড়া হিসেবে যেটা পাই সেটাই দিই। আমিই দিই। গুণীবাবুরা ইস্কুলের কাছ থেকে ভাড়া নিতে চক্ষুলজ্জার হাত এড়াতে এই কৌশলটা করেছিলেন। আমিই বা সে কৌশলের সুযোগ নিতে ছাড়ব কেন?

—কিন্তু বিদেশে বিভূঁয়ে এখানকার লোকের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে পারবি কেন শান্তি?

—না করেই বা উপায় কি বল? বাড়ি ভাড়াই দিয়ে থাকেন ও'রা। আমি ভাড়া দেব না এ কথা বলছি না। আমরা একজাত, এমন কি এখানকার লোকেরা আমাদের জ্ঞাতি-কুটুম্ব। আমরা কুকুর-বিড়াল নই, ও'দের খেয়াল খুশীতে আমাদের বেরো বললেই আমরা বেরুব না। আমাদের বাঁচতে হবে। আমার বাবার এখানে একটুকরো ভিটে ছিল—সেটুকু পর্যন্ত এখানকার লোকে আইন দেখিয়ে বেদখল করে দিয়েছে। এ বাড়ি আমি ছাড়ব না। সদরে উকীলদের পরামর্শ নিয়ে এসেছি আমি। এখানকার লোকের নিজেদের বাড়িতে বাড়িতে ঘর পড়ে আছে, তাতে আমি ঢুকতে যাই নি। যার দশ বিশখানা বাড়ি আছে, সুদে টাকা ধার দিয়ে অন্যের ভিটে কিনে যারা ভাড়া দিচ্ছে—তাদের বাড়ি ভাড়া নিয়ে রয়েছি, তাও ছেড়ে না দিলে যদি ঝগড়া হয়—হবে। ঝগড়া করব। আজ গৌরীকান্তবাবুর বাড়ি যাব, কাল যদি উনি উঠে যেতে বলেন?

—তুই না যেতে চাস শান্তি সে আলাদা কথা। কিন্তু ও কথা গৌরীকান্ত কখনও বলবে না।

—কে বললে মা? তা ছাড়া আমার আর একটা আশঙ্কা আছে। শেষকালে কি গৌরীকান্তবাবুর পোষ্য হব? না—সে আমি পারব না।

—ছি শান্তি! সে কথা সে বলে নি।

—মা তুমি শেষ বয়সে আর এক মানুষ হয়েছ। বাবা যে তোমাকে কি মন্ত্র দিয়ে গেলেন—আর কি যে পেয়েছ তাতে তুমি—সে তুমিই জান—পৃথিবীর দুটো দিকের একটা দিক তুমি দেখতেই পাও না।

হেসে দেবকী দেবী বলেছেন—তাতে যা পেয়েছি তা তুই জানিস নে?

—কি করে জানব বল?

—তোমাকে পেয়েছি। শান্তি—শান্তি পেয়েছি।

—আমি বুঝি শান্তি? আমি মূর্তিমতী অশান্তি। একটা ছাই কালো মেয়ে!

—তোর আয়নাগুলো সব খারাপ।

—তোমার চোখ খারাপ মা। আমি মিছে দোষ দিই নি। গৌরীকান্তদা'র বাড়িতে থাকতে যাব—উনি কাল বিশ টাকা পাঠাবেন—আজ এই পর্ব আছে লক্ষ্মীপুজো আছে সেটা অনুগ্রহ করে করবেন পিসীমা। দশ দিন পর পঞ্চাশ টাকা পাঠাবেন—বাড়িটা মেরামত করাবেন। কখনও আসবেন হুশ করে, দশ দিন থাকবেন বাজার হাট করবেন—তোমায় দেবেন। আরও ভয় মা, হয়তো দু'চারজন বন্ধু নিয়ে আসবেন। তোমাকে আমাকে পিসীমা বোন বলেও আসলে রাঁধুনী চাকরাণীর পর্যায়ে ফেলবেন। পোষ্য আর কাকে বলে মা?

আজ কিশোরবাবুর কাছে ছুটে এসে তাঁকে না-পেয়ে সে গৌরীকান্তের কাছে

এসেছিল। দাঙ্গার সংবাদে সে এখানকার মানুষের চেয়ে বেশী চঞ্চল হয়েছে এখানে যে তারা নিরাশ্রয়। তা ছাড়া আরও একটা সংবাদ সে পেয়েছে। ঢাকার ওই হৃদয় নাকি কাল রাত্রেই বেরিয়ে গিয়েছে দাঙ্গাটা যাতে ব্যাপকভাবে বাধে তারই চেষ্টা সে করছে।

কাল রাত্রে তার বাড়িতে এসেছিল একটি বিচিত্র মেয়ে। সে নাকি এই গ্রামেরই মেয়ে—এখন থাকে এখান থেকে মাইল কয়েক দূরে তার স্বামী সেখানে বাড়ী করেছিলেন। তার কাছে এসেছিল একখানি চিঠি নিয়ে। শান্তির এক প্রিয়জনের পত্র। সে এখন পাকিস্থানের জেলে আটকবন্দী। সে শান্তিকে পত্র লিখেছে—"ধর্মান্ধতায় খণ্ডিত ভারতকে আবার অখণ্ড ভারতে পরিণত করবার পথ পেয়েছি। রাত্রির পর রাত্রি চিন্তা করেছি। সে পথ বহুশ্রেণীতে বিভক্ত—এই উভয় অংশের সমাজ এবং বিশেষ এক শ্রেণী সেই চিরকালের শোষক শ্রেণীর দ্বারা শাসিত রাষ্ট্রকে গণবিপ্লবের পথে ধ্বংস ক'রে নূতন সমাজ এবং রাষ্ট্র গঠন করার পথ। তোমার উপর আমার অনেক ভরসা। একসঙ্গে একদা কাজ করেছি—একই গুরুর নেতৃত্বে; অনেক স্বপ্ন দেখেছি। তাই আজ নূতন পথে তোমাকেও সঙ্গে চাই। জেল থেকে বহু চেষ্টায় ও যত্নে চিঠিখানা বাইরে পাঠালাম। তারপর এক দেশের সতর্ক সীমান্ত পার হয়ে আর সতর্ক সীমান্তের প্রহরা অতিক্রম ক'রে তোমার কাছে পৌঁছুবে। কল্পনা করতে পারি তোমার চোখে সেই আগুন জ্বলে উঠবে, যা সে কালে কতদিন জ্বলতে দেখেছি। দিন সমাগত ঐ। পশ্চাতে পড়ে থেকো না। আজ জাতীয়তার পথ নয়—আন্তর্জাতিকতার পথ ইণ্টারন্যাশনালের পথ।"

সে স্তব্ধ হয়ে বসেছিল চিঠিখানা হাতে নিয়ে। অতি পরিচিত হস্তাক্ষর। অনেক পুরানো কথা। এ সব কথা তাদের ছাড়াছাড়ি হবার আগে সে অনেকবার বলেছে। তখন বলেছে প্রশ্নের ভঙ্গিতে। সন্দেহের সুরে। আজ আর তার সন্দেহ নেই। কিন্তু সে কি করবে? কি বলবে? সে তো এ বিশ্বাস করে না। করতে পারে না। কিন্তু—। কিন্তু বিশ্বাস না-করার অর্থ এ পত্রের প্রত্যাখ্যান করার অর্থ তাকে প্রত্যাখ্যান করা। চির-দিনের মত—হ্যাঁ চিরদিনের মত। আজকের ব্যবধান কারাপ্রাচীরের উভয় দেশের সীমান্তের। জেলখানার দরজা একদিন খুলবে, সীমান্ত অতিক্রম করবার অনুমতিও পাওয়া যায়, যাবেও। কিন্তু এই প্রত্যাখ্যানের সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান। দুর্লঙ্ঘ্য নয় অলঙ্ঘ্য।

সেই বিচিত্র মেয়েটি কিন্তু চুপ ক'রে বসে থাকে নি। সে বলেই গেছে একটি কাজ তোমাকে করতে হবে ভাই। গৌরীকান্ত-বাবুকে আমাদের একটা মিটিংয়ে সভা-পতিত্ব করতে রাজী করতে হবে। তোমার কথা তিনি শোনেন শুনেছি।

শান্তি ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকিয়ে বলেছে—আমি তো এখনও নিজের কথাই কিছু বলিনি এবং আরও একটা প্রশ্ন—এই পত্রের মর্মার্থ আপনিই বা জানলেন কেমন করে?

হেসে সে বলেছে, পত্রখানা তো ডাক-যোগে মনোহর একখানি খামের মধ্যে দিয়ে আসেনি, সে অবশ্য সহজেই বুঝতে পারেন। কাজেই—।

—বুঝেছি। ও প্রশ্ন করব না। আপনাদের ভিতর জেলের সেনসারের মত সেনসার আছে। বা পরের পত্র পড়ে দেখা অন্যায় বলে মনে করেন না আপনারা। কিন্তু আমার জবাব তো আমি তাকেই দেব। না আপনাকে দেব?

—আমার হাতে দিতে পারেন। কিন্তু তিনি তো ঠিক উত্তর চাননি। আপনাকে একটা নির্দেশ দিয়েছেন। নির্দেশটা মানলেই উত্তর দেওয়া হবে এবং সে উত্তর ঠিক তাঁর কাছে পৌঁছেও যাবে।

—তা জানি। কিন্তু উত্তর আমি এই মুহূর্তে দিতে পারব না। ভেবে দেখতে হবে আমাকে।

—কেন ভাই? মেয়েটি তার হাত জড়িয়ে ধ'রে বলেছে কেন ভাই? যাকে ভালবাসেন তার হাত ধরে যাবেন—তা ছাড়া সত্যকারের মুক্তির পথ তো এই। অবিশ্যি আপনি ভাই অনেক লেখাপড়া করেছেন—আমি সেই ছেলেবেলা লোয়ার প্রাইমারীতে বৃত্তি পেয়েছিলাম, মুর্খ বললেই হয়—

ঠিক এই মুহূর্তেই বাইরে হৃদয়ের গলা শোনা গিয়েছিল।

উত্তেজিত চাপা গলায় হৃদয় কাকে বলেছিল দাঙ্গা তো লাইগা গেল মশয়। জবর খবর।

আর একটি কণ্ঠস্বর কার তা শান্তি বুঝতে পারেনি, মেয়েটিকে প্রশ্ন ক'রেও উত্তর পায়নি। সেই অপরিচিত কণ্ঠস্বর বলেছিল দাঙ্গা? কোথায়?

—ভাসাচর শাহপুর। একেরে জেলা শ্যাষ এলাকায়। খেইপা গেছে লোকজন। লাঠালাঠি হইয়া গেছে।

ক্যানেলের জরীপের লোকেদের সঙ্গে না জোতদারের সঙ্গে?

—না মশয়। হিন্দু-মুসলমানে। জয় মা কালী!

—এ কি বলছ রামহৃদয়? জান কি বলছ?

—হ। জানি।

—এ সব চলবে না। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা আমরা চাই না।

—না চান। হৃদয় চায়। আমি আপনাগো সাথে থাকব না। আমি চললাম—দিব আগুনে বাতাস। যাক, বেটারা ই দ্যাশ থেকে। আমরা জবর-দখল করা বসব। জয় মা কালী!

—হৃদয়!

হা হা করে হেসে উঠেছিল হৃদয়। হাসিটা দূরে মিলিয়ে যেতে শান্তি বুঝেছিল হৃদয় চলে গেল। মেয়েটি এতক্ষণ কান খাড়া করে ছিল, সে প্রায় ছুটেই বেরিয়ে গিয়ে বাইরের লোকটির সঙ্গে কথা বলছিল। ঠিক আবার এই সময়েই কারের গলা শোনা গেল। এবার কণ্ঠস্বর বিজয়ের এবং আর কার কার। এগিয়ে আসছিল কণ্ঠস্বর। মেয়েটি ছুটে ভিতরে এসে শান্তিকে বলেছিল, আপনি হ্যাঁ-ই বলুন আর নাই বলুন, যাঁর চিঠি নিয়ে এসেছি তাঁর নাম নিয়ে আপনার ঘরে রাত্রির মত আশ্রয় চাচ্ছি। আমাকে রাত্রের মত থাকতে দিতে হবে।

—বেশ তো! তাতে কি? এর জন্য দোহাই পাড়তে হবে কেন?

—তবে দরজাটা দিয়ে দিই। বলেই সে বাইরের দরজাটা বন্ধ করে মুহূর্তে আলোটাও নিভিয়ে মৃদুস্বরে বলেছিল—চুপ করুন। বিজয় যাচ্ছে। ডাকলে যেন সাড়া দেবেন না।

ওদিকে বাইসিক্লের ঘণ্টা বেজে উঠল।

রাত্রে সঠিক ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি শান্তি সকালে উঠে মেয়েটি এই আসি বলে বেরিয়ে গিয়ে আর ফেরেনি। এদিকে বেলার সঙ্গে সঙ্গে দাঙ্গার খবর শুনে শান্তি শঙ্কিত হয়ে উঠেছে। প্রথমেই সে গিয়েছিল এখানে যে একদল রেফেউজী সরকারী সাহায্যে ক্যাম্পে বসবাস করছে সেইখানে। সেখানে ফরিদপুরের একদল

ন্দী চাষী আছে; আর আছে ময়মন-সিংহের একদল চাষী কায়স্থ। সেখানে গিয়ে শুনে এসেছে হৃদয় রাত্রেই এখানে এসেছিল এবং শেষ রাত্রি পর্যন্ত মিটিং করে ফরিদপুরের এদের বাদ দিয়েই ময়মন-সিংয়ের ওই কায়স্থ চাষী ক'জনকে নিয়ে বেরিয়ে গেছে। হৃদয় নিজে গেছে ভাসাচর। বোমা নিয়ে গেছে। বাকী ক'জনকে ওখানকার কাছাকাছি গ্রামে পাঠিয়েছে, তারা হিন্দুদের উত্তেজিত করবে।

এই শুনেই সে আতঙ্কিত হয়ে ছুটে এসেছিল। কিশোরবাবুকে না পেয়ে গৌরীকান্তের কাছে এসে বলেছিল এই ব্যাপার গৌরীদা। যা ব্যবস্থা হয় করুন।

গৌরী বলেছে, দেশে আমাদের একটা শাসন-ব্যবস্থা আছে শান্তি এবং সে আমাদের স্বাধীন দেশের ন্যাশনাল গভর্ন-মেণ্টের শাসন-ব্যবস্থা। সবার উপরে আছেন মহাত্মাজী। উতলা হয়ো না। আমি বলছি কোন ভয় নেই। আমি আমার দেশকে জানি। কিশোরবাবু বেরিয়েছেন আগে। তুমি নিশ্চিন্ত হও। ভাসাচরে ওপারে কাল রাত্রেই পুলিশ গিয়েছে। ও সদর থেকে কর্তাব্যক্তিরা আসবেন।

—আপনি? আপনি বসে কেন গৌরীদা আপনি বের হচ্ছেন না কেন?

—আমি। শান্তি আমি জীবনে যে নিষ্ঠাই লাভ করে থাকি, এখানকার মানুষের ওপরে কর্তৃত্বের কোন দাবী আমার নেই। ওদের সেবা করতে করতে আমি ছেড়ে চলে গেছি। সে অধিকার এখানে একমাত্র কিশোরবাবুর। আর বিজয়ের খানিকটা। আমি তাদের হুকুমের প্রতীক্ষা করে আছি। তারা হুকুম করলে সামান্য সৈনিকের মতই আমি বেরিয়ে পড়ব সেই মুহূর্তে, তার আগে নয়।

ঠিক এই মুহূর্তেই শান্তির চোখে পড়েছিল ওই খাতাখনায় তার বাবার হস্তাক্ষর। —এখানা? এখানা কি গৌরীদা?

—এখানা নবগ্রামের জীবন পুরাণ। তোমার বাবা শুরু করেছিলেন—। শেষ করতে পারেননি। দিয়ে গিয়েছিলেন কিশোরবাবুকে। কিশোরবাবু কাল রাত্রে দিয়েছেন আমাকে। তাই পড়ছিলাম—।

শান্তি বসে পড়ল একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে। খাতার প্রথম পাতাখানাই উল্টে নিলে—"কলিযুগে ভারতবর্ষে জম্বুদ্বীপ শাকদ্বীপ একদা পাঠান মোগল নামধেয় মুসলমান জাতির করতলগত হইয়াছিল। তাহার পর এক শ্বেতকায় জাতি এ দেশে একচ্ছত্র অধিকার বিস্তার করিল। ইহাদের নাম ইংরাজ। সপ্তসাগরবেষ্টিত পৃথিবীর উত্তর-পশ্চিম কোণাংশে ক্ষুদ্র এক দ্বীপে ইহাদের বসতি। ইহাদের বর্তমান রাজার নাম সপ্তম এডওয়ার্ড। ইঁহার রাজত্বকালে কলিযুগ-মহিমায় সমস্ত দেশ অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এমত সময়ে কোন্ কার্যকারণে, কোন্ পুণ্যফলে জানি না, সমগ্র দেশময় এক নূতন তপস্যা যেন জীবন লাভ করিল। পূর্বাপর সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরের তপস্যার সঙ্গে এই তপস্যার ধারার অনেক পার্থক্য। অতীত কালের নানা ঘটনা সংঘটনের ফলে বহু অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন হইয়াছে। এই কালে এই ভারতবর্ষের বঙ্গদেশে রাঢ় অঞ্চলে নবগ্রাম একখানি সমৃদ্ধ গ্রাম। এই গ্রামে বিচিত্রভাবে এক উপাখ্যান সংঘটিত হইল। সমগ্র জম্বুদ্বীপের ঘটনাবলী হইতে বিচ্ছিন্ন নয়, সংযুক্ত।"

শান্তি মনে মনেই পড়ে যাচ্ছিল। তার বাবা মধ্যে মধ্যে বলতেন, এক সময় আমি উপাখ্যান লিখতে আরম্ভ করেছিলাম। সে আর শেষ করতে পারিনি।

—সেই কথা মনে পড়ে মধ্যে মধ্যে আবেগে ঠোঁট দুটি থর থর ক'রে কেঁপে উঠছিল। গৌরীকান্ত শান্তির দিকে তাকায়নি। তার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল আকাশের দিকে। সে যতটুকু পড়েছিল সেইটুকুর কথাই ভাবছিল। তারও মনে পড়ছিল সন্তোষ পিসেমশায়কে। মিষ্ট মানুষ, মধুর মানুষ, শান্ত মানুষ, সুন্দর মানুষ বলেই সে তাঁকে জেনে এসেছে। আজ তাঁর দৃষ্টির প্রসারের পরিধি দেখে, জীবন-বোধের গভীরতা দেখে বিস্ময় বোধ না করে পারছে না। অথচ এই মানুষ এ অঞ্চলে সেকালে ঘরজামাই বলে অবজ্ঞাত হয়েছেন।

আকাশের থেকে চোখ নামিয়ে সে অকস্মাৎ বললে, মনে মনে নয় শান্তি জোরে পড়। আমিও শুনি। পড়।

(ক্রমশ)

গ্রাম ঃ শহর ঃ মন

শ্রীদুর্গাদাস সরকার

দূরের ইশারা আসেঃ ডাক আসে আরেক প্রান্তের।
যোজন যোজন দূরে আদিগন্ত সবুজ-আঁচল
যেখানে বিছানো আছে, আকাশের চোখের কাজল
নদীতে ফেলেছে ছায়া নীল, নৃত্য আছে হরিণের
যেখানে প্রান্তর জুড়ে, সোনালি ধানের রাঙা মুখে
শিশির শুকায় কেঁপে, রোদ জমে আঙিনায় দিনে,
কী মিঠে আহ্বান আসে সেখানের এখানে আশ্বিনে!
সেখানে ফুলের প্রাণ মুগ্ধ করে অঢেল বায়ুকে।

এখানে আহ্বান আসেঃ সে-আহ্বান ধূমোল আকাশ
নিমিষে ফিরিয়ে দেয়। নেই তার অবগাহনের—
মুহূর্ত সময়—কোনো ভেসে আসা সঙ্গীতের সুরে।
এখানে শহুরে বায়ু ছন্দহীন ফেলিছে নিশ্বাস,
আমরা পাইনা কেউ কোনো খোঁজ প্রস্থান-পথের;
তবুও এখানে বাঁচি এই মন ছুটে গেলে দূরে?

নোবেল প্রাইজের কথা আজকের দিনে প্রায় কারো অজানা নেই। প্রতি বছরেই সাহিত্য, বিজ্ঞান, শান্তি ইত্যাদি বিষয়ে বিশিষ্ট স্থান অধিকারী বা অধিকারিণীকে জাতিধর্মনির্বিশেষে এই পুরস্কার দান করা হয়, আজও এর ব্যতিক্রম হয় না। এ বছর শারীরবৃত্ত (physiology) ও ঔষধ বিজ্ঞানের উন্নতি করার জন্য ডাঃ সেলম্যান ওয়াক্সম্যান এই পুরস্কার লাভ করেছেন। ইনি স্ট্রেপ্টোমাইসিন আবিষ্কার করার জন্যই এই পুরস্কার পান। স্ট্রেপ্টোমাইসিন যক্ষ্মারোগ সারানোর পক্ষে ধন্বন্তরি বিশেষ। সেলম্যান ওয়াক্সম্যান তাঁর নোবেল প্রাইজ লাভের পরও আরও একটি অভিনব পুরস্কার লাভ করেন। সুইডেনের রাজা গুস্তাভের হাত থেকে নোবেল প্রাইজ গ্রহণ করার পর একটি ছোট্ট সুইডিস্ বালিকা তাঁকে পাঁচটি লাল গোলাপ দেয়। এই পাঁচটি গোলাপের গুচ্ছটিকে ঠিক পুরস্কার বলা চলে না, এটি একরকম উপহার হিসাবেই তিনি গ্রহণ করেন। পাঁচ বছর আগে স্ট্রেপ্টোমাইসিনের আবিষ্কারের ফলেই বালিকাটি দুরারোগ্য রোগের হাত থেকে রক্ষা পায়; ঐ পাঁচটি গোলাপ তার নবলব্ধ জীবনের পাঁচটি বছরের প্রতীকস্বরূপ। শুধু এই বালিকাই নয়, এইরকম শত শত জীবন ডাঃ ওয়াক্সম্যানের কাছে ঋণী। ১৮৮৮ সালে ইউক্রেনের প্রিলুকা নামে একটি ছোট্ট গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১০ সাল থেকে তিনি আমেরিকায় বসবাস করতে থাকেন। এরও প্রায় পাঁচ বৎসর পরে তিনি রাজার্স য়ুনিভার্সিটি (Rutgers University) থেকে তার প্রথম ডিগ্রী লাভ করেন। তারপর ১৯১৮ সালে ক্যালিফোর্নিয়া য়ুনিভার্সিটি থেকে ইনি পি এইচ ডি ডিগ্রী পান। তারপর প্রায় ৩৭ বছর ধরে নিউজার্সি ইনস্টিটিউশন থেকে তাঁর গবেষণা কার্য চালাতে থাকেন। রাজার্স য়ুনিভার্সিটিতে তিনি প্রফেসর হলস্টেড্ (Halsted)এর অধীনে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন বলেই বোধ হয় তাঁর এতখানি সাফল্য লাভ করা সম্ভব হয়েছে। মাটির মধ্যে যে সব ব্যাক্‌টিরিয়া থাকে সেইগুলি নিয়েই ডাঃ সেলম্যান প্রথম গবেষণা শুরু করেন এবং এর থেকেই তিনি পরে স্ট্রেপ্টোমাইসিন আবিষ্কার করেন। তাঁর ল্যাবরেটরীতে স্তরে স্তরে ফ্লাস্ক ভর্তি করে করে নানারকম মাটি রাখা আছে।

বিজ্ঞান-বৈচিত্র্য

চক্রদত্ত

এত বড় একজন বৈজ্ঞানিকের গবেষণাগারে মাটির প্রাচুর্য দেখে লোকে কৌতূহলী হয়ে অনেক প্রশ্নই করে, উত্তরে তিনি বলেন, এই মাটিতেই যাদু আছে। বাস্তবিকপক্ষে তিনি মাটি থেকেই মাটির মানুষের মঙ্গল সাধনা করেছেন। প্রায় ১০,০০০ ব্যাক্‌টিরিয়া ঘেঁটে তিনি এই স্ট্রেপ্টোমাইসিন আবিষ্কার করতে পারেন। তাঁর এই বিপুল আবিষ্কারে ডাঃ এলবার্ট স্যাট্‌স (Dr. Albert Schatz) সহায়তা করেন। এই আবিষ্কারে ডাঃ ওয়াক্সম্যানের বিপুল যশ ও ঐশ্বর্যের সমাগম হয়েছে। ডাঃ ওয়াক্সম্যান অবশ্য তাঁর ঐশ্বর্যের এক কণাও নিজে ভোগ করেন না। তিনি যে টাকা এ পর্যন্ত লাভ করেছেন এবং এখনও পাচ্ছেন তার সমস্তই বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য দান করেছেন। বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে ৩০০০০০০ ডলার ইতিমধ্যেই ব্যয়িত হয়েছে।

*

সন্তানের জন্মের পরের দিন থেকেই মা সাগ্রহে লক্ষ্য করতে থাকেন ছেলে কতটা বাড়ছে, কী কী নতুন বিদ্যা অর্জন করছে এবং আরও কেন বাড়ছে না আর আরও কেন শিখছে না এই হয় তার প্রধান চিন্তা। শুধু সন্তান সম্বন্ধে নয়, নিজের হাতে কিছু গড়ে তুলতে গেলেই মানুষের এই ধরণের আগ্রহ ও কৌতূহল দেখা যায়।
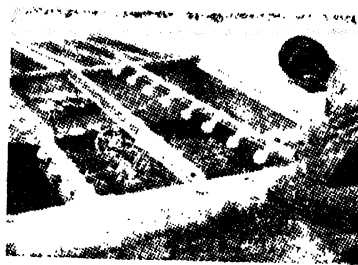
তাপ দিয়ে গাছ বাড়ানো হচ্ছে।

যাদের বাগান করার শখ আছে তাদের মধ্যে এই একই ধরণের আগ্রহ প্রকাশ পায়। ব পুঁতেই দেখতে থাকেন গাছ বার হ কিনা আর গাছ বার হলেই ভাবেন, হবে কবে! ফুল ধরছে না কেন! ফলছে না কেন! এর জন্যে চেষ্টারও থাকে না। জল ঢাললেই গাছ বাড়ে আমাদের জানা আছে কিন্তু তাপ দিয়ে বড় করার পদ্ধতি নতুন। লক্ষ্য করে গেছে যে, যে জমিতে শব্জির গাছ পো হয় সেখানে যদি পঁচিশ পাওয়ারের অ গুলি বাতি পর পর সাজিয়ে জেলে দে যায় তাহলে সাধারণভাবে গাছগুলি যে বাড়তো তার চেয়ে ১০।১৫ দিন ত বেড়ে যায়, ফুলগাছের সম্বন্ধে ঐ ব করলে সাধারণভাবে যখন ফুল ফুটতো চার সপ্তাহ আগে ফুল ফোটে। ক ব্যবহারের জন্য একটা কাঠের ফ্রেমে এই অনেকগুলো বাল্ব লাগানো থাকে। মা একটি তাপমানযন্ত্র পোতা থাকে, সে সঙ্গে এই আলোর যোগাযোগ রাখা তাপমান যন্ত্রের তাপ একটি নির্দি তাপের নীচে নেমে গেলেই আলো জ্বলে ওঠে এবং নির্দিষ্ট তাপে পৌ মাত্রই আলোগুলো নিভে যায়।

*

গম ও যবের এক ধরণের ভাইরাস হয়। এই রোগ হলে গাছে কালো, ব ও হলদে রং-এর ছিটে ছিটে দাগ এগুলিকে "রাস্ট" বলা হয়। দি এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট রকম উন্নত ধরণের যব ও গম উ করেছেন, এই শস্যগুলিতে কালো "র হতে পারে না। অবশ্য তাঁরা আরও প করে এইরকম উন্নত ধরণের শস্য জন্মা চেষ্টা করছেন। তাঁরা এমন শস্য জন্মা চেষ্টা করছেন যেগুলোতে কালো ছাড়াও অন্য কোনও রাস্টও যাতে আ করতে না পারে।

*

মহীশূরের ফুড্ টেক্‌নোলজি রিসার্চ ইনস্টিটিউট নতুন ধরণের ভি ও ধাতব পদার্থবহুল প্রোটিন খাদ্য তাদের প্রস্তুত প্রণালী আবিষ্কার করে এই নতুন খাদ্যটি দুধে ও জলে তাড়াতাড়ি গলে যায় এবং এটি খেতে সুস্বাদু। এটি কোকো, চকলেট ও প জাতীয় জিনিসের খাদ্যবস্তু বাড়ায়।

মধ্যপ্রাচ্য-পরিচয়

সরোজ আচার্য

ইরাণ (পারস্য)

[আয়তন ৬২,২৮,০০০ বর্গ-মাইল; জনসংখ্যা আনুমানিক ১ কোটি ৬৫ লক্ষ —এর মধ্যে প্রায় ৩০ লক্ষ যাযাবর উপজাতি। রাজধানী—তেহরাণ—জনসংখ্যা প্রায় ৭ লক্ষ। ধর্মমতে অধিকাংশ ইরান-বাসী ইস্‌লামের শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত]

মিশরের পরেই মধ্যপ্রাচ্যে ইরাণের স্থান। ও পূর্বেই বলা হয়েছে ভৌগোলিক বে ইরাণ মধ্যপ্রাচ্যভুক্ত ঠিক নয়, কিন্তু ইরাণীরা আরবগোষ্ঠী থেকে ন্ন, আর সম্প্রদায় হিসাবে শিয়া মুসল-নের সংগে সুন্নীদের ব্যবধান অনেকখানি। ণের নামকরণ সম্পর্কে কিছু মতভেদ ছ। ইরাণকে বিকল্পে পারস্য বলে চয় দেওয়া হয়। য়ুরোপের সাম্রাজ্যবাদী রাই ইরাণের পারস্য নামটি চালু রাখার া করেছে। আমরাও বিদেশী ভূগোল খবরের কাগজ মারফৎ ইরাণকে পারস্য ই জেনেছি। ১৯৩৫ সনে ইরাণ সরকার ত বিদেশী রাষ্ট্রকে জানায় যে, ইরাণ ই তাদের দেশকে সম্বোধন করতে হবে। দীর্ঘকালের ব্যবহার চলে আসছে বলে ণ এবং পারস্য দুটি নামই এখনও ছ। ইরাণ প্রাচীন দেশ। ভারতবর্ষের া ইরাণের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক যোগ বহু শতাব্দী পূর্বে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভাষাগত সম্পর্কেও ইরাণীরা া-এরিয়ান গোষ্ঠীভুক্ত। ইরাণীজাতির তির ইতিহাস অবশ্য এখনও নির্ধারিত ন। প্রথম যারা ইরাণে বসবাস করতে এসেছিল তারা সম্ভবত প্রাচীন ভারতের আর্যদের মত মধ্য এশিয়ার অধিবাসী। বর্তমান ইরাণীদের পূর্বপুরুষ যারা তারা বোধ হয় খৃষ্ট-পূর্ব তৃতীয় সহস্র বর্ষে মধ্য এশিয়া থেকে এসেছিল; ঐ সময়ে মধ্য এশিয়া থেকে আর্যরা একদল চলে এসেছিল সিন্ধু উপত্যকায়, আর একদল পূর্ব ও দক্ষিণ ইরাণে বাসা বেঁধেছিল। আর্য চিন্তাধারায় প্রকৃতির শক্তি পূজা, পাপ-পুণ্যের বিরোধ যেসব নানা বিচিত্র বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানে রূপ নিয়েছিল তার নিদর্শন প্রাচীন ইরাণেও পাওয়া যায়। জরথ্রুস্টের ধর্মমত মূলত আর্যদের অধ্যাত্মবাদ পরি-পুষ্ট। এর সংগে অগ্নি উপাসনার প্রথাটি পরে সংযুক্ত হয়েছিল। পশ্চিম ইরাণে তেলের খনি বা কুণ্ড থেকে স্বাভাবিকভাবে যে আগুন জলে উঠত তাই সম্ভবত অগ্নি-উপাসনার অলৌকিক প্রেরণা দেয়। ইরাণ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ও কল্পনা নানা পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কাহিনী নিয়ে রচিত। সোরাব রুস্তমের কাহিনী আমাদের দেশেও অপরিচিত নয়। এই কাহিনীর সূত্র হ'ল ইরাণের প্রাক্ মুসলিম যুগে—খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে। প্রাচীন ইরাণের শক্তি ও সংস্কৃতির গৌরব অসামান্য ছিল। গ্রীসের উপকূল পর্যন্ত ইরাণের সামরিক শক্তি এককালে প্রসারিত হয়েছিল। তারপর কালচক্রে দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডার এশিয়া মাইনর থেকে উত্তরভারত পর্যন্ত পরিক্রমা সমাপ্ত করলেন। এর পর গ্রীক সেলুইকিড, তুরাণী পার্থিয়ান, আখমেনিড, সাসানিড ইত্যাদি নানা গোষ্ঠী একের পর এক ইরাণে রাজত্ব করলেন। আরবদেশে ইসলামের অভ্যুত্থান ও প্রসারের সংগে সংগে সারা মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসে নূতন পরিচ্ছেদ রচনা শুরু হ'ল। খলিফা ওমরের সময়ে ইরাণের সাসানিড বংশের শেষ রাজার পতন হ'ল। ৬৩৬ সনে ইরাণ আরব খলিফার শাসনের অধীন হ'ল।

শিয়া-সুন্নী বিরোধ

আরব খলিফার অধীনে হলেও ইরাণীরা তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে চেষ্টার ত্রুটি করেনি এবং শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছিল। বর্তমান ইরাণে তীব্র জাতীয়তাবাদী ও বিদেশী-বিরোধী মনোভাব দেখে অনেকে আশ্চর্য হয়ে থাকেন; সাম্রাজ্যবাদীরা সনাতন ধারায় অভিযোগ করে, মুষ্টিমেয় চরমপন্থী ইরাণীদের নাচাচ্ছে। অশিক্ষিত দরিদ্রের দেশ ইরাণ। তবু ইরাণীরা প্রাচীন যুগ থেকে একটা বিশিষ্ট এবং উন্নত সংস্কৃতির ধারা বহন করে আসছে বলে গর্ব করতে পারে। আরব খলিফার সাম্রাজ্যবাদী শাসন ইরাণীদের স্বাতন্ত্র্য ও সংস্কৃতিকে কখনও সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে পারেনি। গত শতাব্দী

থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত য়ুরোপের সাম্রাজ্যবাদীরা নানাভাবে ইরাণে দখল প্রতিষ্ঠা করেছে বটে, তবুও ইরাণীরা—ধনী দরিদ্র সকলেই— বিদেশী প্রভাব ও পীড়নকে মেনে নেয়নি, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে, শক্তিতে দুর্বল হলেও বিদ্রোহ করেছে বারে বারে। শিয়া-সুন্নী বিরোধটি সেই-জন্যই ইরাণের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য বুঝবার জন্য জানা প্রয়োজন। মধ্যযুগে আরব শাসন ইরাণীদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য লোপ করতে পারেনি। খলিফা ছিল ইসলামের শ্রেষ্ঠ ধর্মগুরুপদ। ৬৪৪ সনে খলিফা ওসমানের নির্বাচন নিয়ে পারিবারিক ও গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব শুরু হয়। ওসমান ছিলেন কোরেসের বংশধর ওমাইয়ার পরিবারভুক্ত। তাঁর তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী হ'ল পয়গম্বর হজরত মহম্মদের হাসেমী গোষ্ঠী। ৬৫৬ সনে ওসমানের মৃত্যুর পরে হজরত মহম্মদের ভাইপো এবং জামাই আলি খলিফা পদ দাবী করেন। অপরপক্ষে ওমাইয়া পরিবারের দাবীদার হন মোয়াবিয়া। ৬৬১ সনে আলি নিহত হন, মোয়াবিয়া দামস্কসে খলিফা পদে প্রতিষ্ঠিত হন। এই সময় থেকে ইসলামের নেতৃত্ব দ্বিধা-বিভক্ত হয়। ওমাইয়ারা অবশ্য ইসলামের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত করেন। স্পেন থেকে ভারতবর্ষ ও চীনের সীমান্ত পর্যন্ত তাঁরা ইসলামের বিজয় অভিযান চালান। কিন্তু হাসেমীদের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং আরব গোষ্ঠী-বহির্ভূত হওয়ায় প্রজাদের সঙ্গে ওমাইয়াদের বিরোধ তীব্র হতে থাকে। "শিয়ায়েত আলি"—আলির দল তখন দামাস্কসের খলিফার শাসনের বিরুদ্ধে আরবে রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু করেন। এই বিরোধ থেকে ক্রমে ধর্মমত ও আচরণের ক্ষেত্রেও মতভেদ সৃষ্টি হয়। খলিফা পদ অধিকার নিয়ে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইরাণীরা প্রথমে বিশেষ কোনো অংশ নেয়নি। অষ্টম শতাব্দীতে পূর্ব ইরাণের খোরাসান প্রদেশে শিয়া আন্দোলন শুরু হয়। হাসেমী গোষ্ঠীর আব্বাস বংশ এই আন্দোলনে নেতৃত্ব করে। ৭৫০ সনে আব্বাস বংশীয়রা ওমাইয়াদের পরাজিত করে ইরাকে ক্ষমতা লাভ করে। এর পর গড়ে ওঠে বোগদাদ নগর, আর এই নগর কেন্দ্র করে ইসলামী সংস্কৃতি, সাহিত্যে, শিল্পকলায় নূতন ধারা প্রবাহিত হয়। আরব সংস্কৃতি এক সময়ে তার নিজের ও ভারতবর্ষের শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ সম্পদ য়ুরোপকে দিয়েছিল বটে। কিন্তু গোঁড়ামি ও ধর্মান্ধতার ফলে আরবদেশে ইসলামের অবনতিও ঘটেছিল, আরব গোষ্ঠী-ব্যবস্থা সামাজিক, রাষ্ট্রিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রগতির পথে অগ্রসর হতে পারেনি। কাজেই ইসলামের কেন্দ্রস্থল মক্কা ও মদিনা থেকে সরে গিয়েছিল বোগদাদ, দামস্কস ও তেহরানে। হারুন-অল-রশীদ এখনও আমাদের স্মরণীয় তার কারণ শিল্পী, বিজ্ঞানী ও বিরোধী মতাবলম্বী সকলেই তাঁর রাজ্যকালে অনেক পরিমাণে স্বাধীন চিন্তা ও কাজের সুযোগ পেয়েছিল। ইতিমধ্যে শিয়া-সুন্নী বিরোধ নূতন ধারা নিল। হাসেমী এবং ওমাইয়াদের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল নিয়ে দ্বন্দ্বের অবসান হয়েছিল। ধর্মমতের ক্ষেত্রে সুন্নীরা সনাতন ঐতিহ্যের ধারাবাহী। আবার এও ঠিক যে, সনাতনীরাই অবস্থাপন্ন ও পদস্থ। কাজেই ধর্মমত নিয়ে বিরোধ হলেও সাধারণত মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণীর প্রজারাই সনাতনী সুন্নীদের বিরুদ্ধে শিয়া সম্প্রদায়ে যোগ দিল। তবে শিয়া সুন্নীর ধর্মগত বিতর্কে কোনো পক্ষকেই প্রগতি বা প্রতিক্রিয়ার সমর্থক বলা যায় না। শিয়া-মতে আলি হলেন ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষ। সুন্নীদের যেমন খলিফা তেমনই শিয়াদের হ'ল ইমাম। ইমামরা ঈশ্বরের অনুগ্রহে পদ অধিকার করেন। গোঁড়া শিয়া-মতে মাত্র বারজন ইমাম পদাধিকারী ছিলেন, তাঁদের অন্তর্ধান ঘটেছে এবং ভাবীকালে ইমামের পুনরাবির্ভাব হবে অবতাররূপে। নবম শতাব্দীতে ইসলামী ও প্রাচীন ইরাণী ভাবধারার এইরকম মিশ্রণ ঘটে। ইতিমধ্যে বাগদাদের খলিফা-সাম্রাজ্যের অবনতি শুরু হয়েছিল। দক্ষিণ ইরাণে প্রথম ইরাণী মুসলিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হ'ল ৮৭১ সনে। পরের শতাব্দীতে পশ্চিম ইরাণে যে গোষ্ঠী ক্ষমতা দখল করল তারা শিয়া-মতকে সরকারী-ভাবে রাষ্ট্রের ধর্ম বলে ঘোষণা করল। গোঁড়া সুন্নী মতের বিরুদ্ধে কেবল শিয়া নয়, মরমী সুফী মতবাদও ইরাণেই প্রতিষ্ঠা লাভ করে—তার অপূর্ব অনুভূতি ইরাণী কাব্যে সঞ্চিত রয়েছে। ইসলামের শৌর্যবীর্যের প্রতিষ্ঠা আরব খলিফাদের রাজ্যকালে হতে পারে, কিন্তু সাহিত্যে, শিল্পে, সঙ্গীতে, মানব সভ্যতায় ইসলামের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে ইরাণ। ফিরদৌসী এবং ওমর খৈয়াম, রুমী ও হাফেজ—এই কয়টি নাম করলেই সংস্কৃতি ও সভ্যতার ঐশ্বর্য করা যাবে। ইরাণীরা চরম এবং অধোগতি সত্ত্বেও আরব য়ুরোপীয় কোনও প্রবল বিদেশী স্বাতন্ত্র্য হারায়নি। তুর্কীর খ সাম্রাজ্য প্রায় সমস্ত আরব ভূখণ্ডের বিস্তৃত হয়েছিল, স্বাধীন মিশরও খলিফার বশ্যতা স্বীকার করে। শতাব্দী থেকে ১৮ শতাব্দী পর্যন্ত পরাক্রান্ত সাম্রাজ্যের বিরোধিতা ইরাণীরা আত্মস্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ তুর্কী বা অন্য দুর্দান্ত আরবজাতি ইরাণীরা পররাজ্য আক্রমণ বা দখল চেষ্টা করেনি। এর একমাত্র ব তৈমুর-লং-এর অনুকরণে নাদির নিষ্ঠুর অভিযান। নাদিরশাহ খো হলেও শান্তিপ্রিয় ইরাণীদের সঙ্গে মিল ছিল সামান্য। ১৭৪৭ সনে নিহত হন। তারপর ৫০ বৎসর হ'ল অরাজকতার যুগ। ১৭৯৪ সনে বংশ তেহরাণে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

সাম্রাজ্যবাদের অনুপ্রবেশ

কাজার বংশের বাদশাহদের ত ইরাণের স্বাধীনতা ক্রমে ক্রমে পেতে থাকে। উত্তর থেকে আ রুশ বাদশাহের ষড়যন্ত্র ও দক্ষিণে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বেশে প্রবেশ। ইরাণের ভাগ দখল বিরোধটা রুশ বাদশাহী সাম্রাজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে। দুর্ভোগ দুর্ভোগ ইরাণের। তার ইতিহাস শেষ হয়নি, তেল, যুদ্ধ-ঘাটি, যোগ পথ, ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধ পরিকল্পনা, জাতীয়তাবাদ এবং কম্যুনিজম—সব মিলিয়ে এই মধ্য শতাব্দীতে ই পরিস্থিতি আরও জটিল ও স হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে, নেপো আমল থেকেই ব্রিটিশ কূটনীতির সাধনা হ'ল মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটিশের পথে কাঁটা গজাতে দেওয়া হবে না। লিয়নের পতনের পরে ব্রিটিশের প্রতি হ'ল প্রবলপরাক্রান্ত রুশ বাদশাহী। শতাব্দীতেই ব্রিটিশ বণিক স্বার্থ উপসাগরে বেশ ভালো মত কারবার করেছিল; আগে এসেও পর্তুগীজ ওলন্দাজদের হটতে হয়েছিল পারস্য সাগর এলাকা থেকে। তবু এই এবং ইরাণে তেল আবিষ্কারের পূর্বে

খাতিরে এইসব সিংহ এবং শৃগালদের মধ্যে কেয়ারে বাড়িয়ে দেশকে বাঁচানোর কিছুটা চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয়নি। প্রতিবেশী রুশ বাদশাহের ক্ষমতাই তেহরাণে প্রবল ছিল। তার পাল্টা হিসাবে ব্রিটিশ মূলধনীরা ১৮৯৯ সনে ইরাণে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করল। ইতালিয়ানরা চাপাল একটা সামরিক পরামর্শ-মিশন, বেলজিয়ানরা ভার নিল ইরাণের শুল্ক-বিভাগ চালানোর। একটা স্বাধীন রাজ্য এইভাবে ক্রমে ক্রমে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী ও মুনাফাশিকারীদের উদরস্থ হল। এই শোচনীয় ঘটনার জন্য কেবল বিদেশীদের প্রবল শক্তি ও ষড়যন্ত্রই দায়ী নয়। ইরাণের জনসাধারণ বিদেশী-বিরোধী হলেও রাজ্য শাসন ও পরিচালন ব্যাপারে নমাজের সময় তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করা হতে থাকল। ১৮৯১ সনের ডিসেম্বর মাসে ইরাণী জনসাধারণ কঠিন সংকল্প নিল তারা তামাক বর্জন করবে এবং এই সংকল্প তারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল। নিজেদের দেশে আমরা দেখেছি বিদেশী কাপড় বর্জনের আন্দোলনে দেশের অনেক লোকেই বাধা দিয়েছে নানাভাবে, গান্ধীজীর নেতৃত্ব সত্ত্বেও। তামাকের মত নেশা সমস্ত জনসাধারণ একজোট হয়ে বর্জন করা এর চেয়ে অনেক কঠিন। তবু ইংরেজ কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার বাতিল না হওয়া পর্যন্ত ইরাণী জনসাধারণ তামাক স্পর্শ করেনি। বাতিল করা বাবদ ইংরেজ কোম্পানীকে শাহ খেসারত দিয়েছিলেন ৫ লক্ষ পাউণ্ড, এই টাকাও তাঁকে ধার ব্যর্থ হলেও তার তরঙ্গ ইরাণের সংস্কার-কামীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। (ক্রমশ)

রঞ্জন

বড়দিনে শীত পড়েনি বলে অভিযোগ করব না। কারণ কথাটা পুরানো। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে পর্যন্ত রাজনারায়ণ বসু জাতীয় সভায় বলছিলেন, "একালের লোকের বলবীর্য ক্ষয়ের ও অল্পায়ুর প্রথম কারণ, দেশের নৈসর্গিক প্রকৃতির পরিবর্তন বলিতে হইবে। এইরূপ পরিবর্তনের এক প্রধান কারণ এই যে, পূর্বে শীতকালে যেরূপ শীত হইত, এক্ষণে সেরূপ হয় না।...এরূপ পরিবর্তন লোকের শারীরিক বলবীর্যের প্রতি স্বীয় প্রভাব প্রদর্শন করিবে, ইহার আশ্চর্য কি?" প্রকৃতির পরিবর্তনের যে প্রভাব রাজনারায়ণবাবু লক্ষ্য এবং আশংকা করেছিলেন, তা যে বহুলাংশে সত্য, তা বলাই বাহুল্য।

তবু বড়দিনের সময় এখানে-ওখানে একটু প্রাণের সাড়া মেলে। অন্তত দু-চারজন ব্যক্তি কোন কোন সভা-সমিতির সুযোগে প্রিয়ভাষণের প্রলোভন জয় করে সত্যচর্চা করেছেন। গত কয়েক দিনের ছুটিতে আমি অনেকগুলি বক্তৃতা পড়তে বাধ্য হয়েছি। একটি ভাষণ একাধিকবার পড়েছি, সেটি কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি চক্রবর্তী মহাশয়ের। আসাম-বঙ্গ আইনজীবী সম্মেলনে তিনি তাঁর শ্রোতৃমণ্ডলীকে চাটু-বাক্য পরিবেশন না করে উকীলদের বলেছেন, "আগে উকীলদের যে মর্যাদা থাক না কেন, আজকের দিনে সত্য কথাটা হচ্ছে এই যে, তাঁরা আর পাঁচজনের মতো বিশেষ একটি নৈপুণ্য বিক্রয় করেন লাভের উদ্দেশ্যে। এর মধ্যে তাই 'নোবীলিটি অব প্রোফেশন' ইত্যাদি মহত্ত্বের কথা না তোলাই ভালো।" আত্মপ্রবঞ্চনাবিদ্‌রণের এরকম সাহসী প্রচেষ্টা ক্রমেই দুর্লভ হয়ে পড়ছে বলেই আমাদের দুর্বলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কিন্তু শুধু বেচারী উকীলদের নয়, মাননীয় প্রধান বিচারপতি ভারতের ক্ষমতার সর্বোচ্চ আসনগুলিতে যে প্রতিক্রিয়া, যে অতীতমুখীনতা প্রতিদিন শক্তি সঞ্চয় করছে, তাকে পর্যন্ত আক্রমণ করতে দ্বিধা করেননি। তিনি নিঃসংকোচে বলেছেন, "গ্রাম পঞ্চায়েৎ আর পঞ্চায়েৎ সমিতি সৃষ্টি করা মানে ইংরেজরা যে মহান্ বিচার-ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল—যা থেকে আজকের দিনের বিচারে আস্থার জন্ম—সেই ব্যবস্থার ধ্বংস সাধন। পঞ্চায়েৎ-পরিকল্পনার সমালোচনা করা আমার কাজ নয়। আমি শুধু এটুকু বলতে পারি যে, আজকের আদালতগুলির জায়গায় পঞ্চায়েৎ বা অন্য কোন প্রাচীন ব্যবস্থার পুনঃ প্রবর্তন করলে ওকালতির অপমৃত্যু অবশ্যম্ভাবী এবং উকীলদের জায়গা তখন দখল করবে এমন একদল লোক, যাদের চরিত্র ও মনোভাব সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভালো।" অন্তত একজন উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি যে স্বীয় মত এমন নির্ভীক সাহসের সঙ্গে ঘোষণা করতে সাহসী হয়েছেন, তাতে আমাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সকল আশা যেতে যেতেও একটু থেমে দাঁড়ায়।

কিন্তু ওই যে নর্মান ডগলাস যাকে বলতেন, The tenacity of nonsense!

গত কয়েক দিন ধরে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ কলকাতায় এমন নির্বিচারে নানা অযোগ্য প্রতিষ্ঠানে ও উপলক্ষে তাঁর অমূল্য সময় ও মূল্যহীন বাণী বিতরণ করেছেন যে, যা কিছু জীর্ণ, যা কিছু জরাগ্রস্ত, যা কিছু কাল-প্রত্যাখ্যাত, তাকে আঁকড়ে থাকবার প্রবণতা ভয়াবহ পরিমাণে প্রশ্রয় পেয়েছে। কিন্তু রাজনীতির নেতাদের উক্তির প্রতি অযথা অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করা নিরর্থক। সেজন্যে তাঁদের দোষারোপ করাও অনুচিত, কেননা, তাঁরা তাই বলেন, যা তাঁরা মনে করেন আমরা শুনলে খুশি হব। দোষটা আমাদের।

কিন্তু অধ্যাপকরা পর্যন্ত রাজনীতিকদের সঙ্গে হাত মেলালে, গণনন্দকের ভূমিকায় সহাভিনেতা হলে, সত্য প্রকাশের সুযোগ আরো দুর্লভ হয়। জনদৃষ্টি আরো আচ্ছন্ন হয় নানা মিথ্যা ভ্রান্তিতে। গত রবিবার গোয়ালিয়রে ইতিহাস কংগ্রেসে ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় তাই যে ভাষণ দিয়েছেন, তার প্রতিবেদন পাঠে আমি ব্যথিত হয়েছি। তিনি অতীতের বিশ্লেষণ করে ক্ষান্ত থাকলে তাঁর সঙ্গে বিবাদ ছিল না। তিনি ভবিষ্যতেরও নির্দেশ দিতে প্রয়াসী হয়েছেন এবং আগামীকালকে করতে চেয়েছেন গতকালের অঙ্গার-প্রতিলিপি। তিনি 'ভিলেজ রিপাবলিকের' (পঞ্চায়েতের?) পুনরাবির্ভাব চেয়েছেন। অথচ পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও কি এমন একটা নজির আছে, যাতে কোন সভ্যতা মৃত সংস্থায় প্রাণ সঞ্চার করে পুনর্জীবন লাভ করেছে? আমি তো জানিনে। নূতন পুরাতনের কাছ থেকে শিক্ষা আহরণ করে প্রাণরক্ষা করেছে, এমন দৃষ্টান্ত আছে। তাই আমি বিশ্বাস করি যে, আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র আয়ুর্বেদ থেকে কিছু শিখতে পারে। কিন্তু আয়ুর্বেদ আধুনিক হয়ে নবজীবন লাভ করবে, সে আশা দুরাশা—রাজেন্দ্র প্রসাদের আশীর্বাদ সত্ত্বেও। পঞ্চায়েৎ পুরানো গ্রাম-জীবন ফিরিয়ে আনবে, সে আশা দুরাশা—রাধাকুমুদের সুপারিশ সত্ত্বেও।

সভ্যতার উত্থানপতনের টয়েনবি-ভাষ্য আমি পুরোপুরি গ্রহণ করিনে, কিন্তু ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতার আত্মরক্ষায় আর্কেইজম্-রূপী করুণ প্রয়াসের যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন (এ স্টাডি অব হিস্টরিঃ পঞ্চম গ্রন্থ, ৩৮৪ পৃষ্ঠা), তার অখণ্ড্য সত্যতা আমি মানতে বাধ্য। অতীতময়তা হচ্ছে সমকাল থেকে পশ্চাদ্ধাবন। বর্তমান চলিষ্ণুতায় পরাস্ত হয়ে স্থাণু অতীতে মোক্ষসন্ধান। গতি থেকে বিদায় নিয়ে স্থিতির কোলে আশ্রয়ভিক্ষা। এ-ভিক্ষা প্রত্যাখ্যাত হতে বাধ্য, কেননা, সভ্যতা স্থিতিশীল পদার্থ নয়। সে এগিয়ে যায় বা পিছিয়ে পড়ে। এই পিছিয়ে পড়ার কাজটি ত্বরিত করার মধ্যে কোন মাহাত্ম্য আবিষ্কার করতে আমি অক্ষম। য়ুরিপাণ্টিড রাজা চতুর্থ আগিস্, কেটো প্রমুখ অতীতপূজারীদের দৃষ্টান্ত বিশ্লেষণ করে টয়েনবি দেখিয়েছেন যে, তার ফল কী ভয়াবহ হতে বাধ্য।

১৯৪৭-এর অগস্ট মাসে আমরা ভেবেছিলেম, ইংরেজ যে জায়গাটা ছেড়ে গেছে, আমরা সেখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকব। আজ বুঝতে পারছি যে, ইতিহাসের দুর্নিবার ধারা কাউকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেয় না। নিষ্কৃতি হিসাবে, অন্তত অংশত কল্পিত অতীতের জঠরে ফিরে যেতে চাইলে আপাতত মুখরক্ষা হতে পারে, কিন্তু প্রাণ-রক্ষা হবে না; কেননা ইতিহাস যে শুধু বর্তমান জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেয় না তাই নয়, অতীতের অধিকৃত স্থানেও স্থাণু হতে দেয় না, আরো পিছনে ফেলে দেয়। মোদ্দা কথা, ইতিহাসের সঙ্গে ৩৮ অক্ষ-রেখায় সন্ধি চলে না। ও রেখা মূঢ়মতি মানুষ গড়ে, নির্মম ইতিহাস ভেঙে ফেলে। ভাঙার পরে ওখানে যে ফিরে যেতে চায় তার মতি আরো মূঢ়।

খেলার মাঠে

ক্রিকেট

বহু আলোচিত, বহু প্রত্যাশিত ভারতীয় ক্রিকেট দলের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভ্রমণ ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত কার্যকরী হইয়াছে। সারা ভারতের ক্রিকেট উৎসাহীর আন্তরিক শুভেচ্ছা বহন করিয়া অভিজ্ঞ ও তরুণের সমন্বয়ে গঠিত ভারতীয় ক্রিকেট দল গত ২৩শে ডিসেম্বর বিমানযোগে বোম্বাই হইতে যাত্রা করিয়া লণ্ডনে উপনীত হইয়াছেন। শীঘ্রই ইঁহারা লণ্ডন হইতে জাহাজযোগে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ অভিমুখে যাত্রা করিবেন।

ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি শ্রীযুত জে সি মুখার্জি—যিনি এই ভ্রমণের মনোনীত খেলোয়াড়দের তালিকা লইয়া কতই না

সহস্র রান পূরণের পর হানিফ

প্রহসনের অবতারণা করিয়াছিলেন, তিনি দলের যাত্রা প্রাক্কালেও এক বাণীতে খেলোয়াড়দের একরূপ সাবধান করিয়া দিয়াছেন, যেন তাঁহারা নির্বাচনের যোগ্যতা প্রমাণিত করেন। এই ধরণের বাণী ইতোপূর্বে কোন বৈদেশিক ভ্রমণকারী দলের পরিচালকমণ্ডলীর কোন সভাপতি এইরূপ বাণী প্রেরণ করিয়াছেন বলিয়া জানা নাই। ইনি ইহার বাণীতে একরূপ খেলোয়াড়দের উপর অনাস্থারই আভাষ দিয়াছেন। ইহা ছাড়া দলের অন্যতম নির্বাচক ও ম্যানেজার শ্রী সি রামস্বামীর যাত্রার পূর্বের বিবৃতিও উৎসাহ-দীপক নহে। তিনি বলিয়াছেন, "আমরা শক্তিশালীর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে চলিয়াছি। যদি আমাদের দলের প্রত্যেকটি খেলোয়াড় উপযুক্ত নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন, তাহা হইলেই দেশের মান সম্মান রক্ষা পাইবে।" অর্থাৎ ইহারও দলের উপর আস্থা নাই এইরূপ ইঙ্গিত ইনিও করিয়াছেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সত্য সত্যই শক্তিশালী ক্রিকেট দল। অস্ট্রেলিয়ার নিকট টেস্ট পর্যায়ের খেলায় সম্প্রতি পরাজিত হইলেও অস্ট্রেলিয়া ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মাঠে ইহাদের পরাজিত করিতে পারিবে কি না সেই বিষয় যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সেইরূপ এক দলের সহিত যে ভারতীয় দল প্রতিযোগিতা করিতে যাইতেছে, তাহারও সেইরূপ শক্তিশালী না হইয়া যাত্রা করা যুক্তিসঙ্গত নহে ইহা সকলেই জানে। কিন্তু তাই বলিয়া দল নির্বাচন করিয়া দলের যাত্রার পূর্বে সন্দেহ প্রকাশের কোনই মানে হয় না। যদি ইহাদের দলের শক্তি সম্পর্কে এতই সন্দেহ ছিল, তাহা হইলে কেন দল প্রেরণ না করিয়া ভ্রমণ বাতিল করিলেন না, এই প্রশ্ন যদি করা হয় তাহা হইলে কি অন্যায় হইবে?

ম্যানেজার শ্রী সি রামস্বামী যাত্রার পূর্বে বিবৃতিতে আরও বলিয়াছেন, "অধিকারী ও গোলাম আমেদ যদি বিমানে থাকিতেন ভালই হইত, কিন্তু তাঁহারা যে নাই ইহার জন্য বোর্ড কোনরূপ দায়ী নহেন।" অর্থাৎ ইহার দ্বারা তিনি একরূপ স্পষ্টই সাধারণকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন, অধিকারী ও গোলাম আমেদ বোর্ডের ইচ্ছা সত্ত্বেও ভ্রমণ দলে নাই। অর্থাৎ ইহাদের বোর্ডের প্রতি আনুগত্যের সন্দেহ আছে। এইরূপ ভ্রান্তিমূলক উক্তি রামস্বামীর করা একেবারেই সমর্থনযোগ্য নহে। অধিকারী ভ্রমণকারী দল গঠনের বহু পূর্বেই খেলোয়াড় নির্বাচকমণ্ডলীকে জানাইয়া দেন যে, কর্মস্থল হইতে ছুটি পাওয়ার অসুবিধা আছে, তিনি যাইতে পারিবেন না। ইহার পর অধিকারীর নাম উল্লেখ করিয়া সাধারণের মনে অধিকারী সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করিবার প্রচেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নহে। তবে অধিকারী একজন সামরিক অফিসার। ইঁহার দায়িত্বজ্ঞান এতই অধিক যে, ইনি বহু পূর্বেই নির্বাচকমণ্ডলীকে জানাইয়াছেন যে, যাইতে পারিবেন না। সুতরাং ইহার পর শ্রীযুত রামস্বামীর উক্তিতে সাধারণে বিভ্রান্ত হইবেন এইরূপ সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। তবে শ্রীযুত রামস্বামী কি শ্রেণীর লোক তাহা বুঝিতে আর কাহারও বাকী রহিল না।

রামস্বামী আরও বলিয়াছেন যে, গোলাম আমেদ ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম খেলার পূর্বেই তথায় দলের সহিত যোগদান করিবেন। এই উক্তিরও যে কোন ভিত্তি নাই, তাহা গোলাম আমেদের পরবর্তী বিবৃতি হইতেই বুঝিতে পারা যায়। গোলাম আমেদকে জিজ্ঞাসা করা হইলে স্পষ্টই বলেন, "আমি এই বিষয় কিছুই জানি না। আমি ভ্রমণকারী দলে যাইতে পারিব না জানাইবার পর বোর্ড আমাকে কলিকাতায় খেলিবার জন্য অনুরোধ করেন। উহার উত্তরে আমার অক্ষমতা প্রকাশ করি। উহা মঞ্জুর হয়। ইহাতে আমার ধারণা হয় যে, পূর্বে না যাইবার কথা যাহা আমি বলিয়াছি, তাহা বোর্ড অনুমোদন করিয়াছেন। ইহার পর বোর্ডের নিকট হইতে আমি কোন কিছুই সংবাদ পাই নাই।"

বোর্ডের সম্পাদকের ভিত্তিহীন উক্তি

বোর্ডের সম্পাদক শ্রীযুত অমর ঘোষও এক ভিত্তিহীন উক্তি করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "গোলাম আমেদকে পরে পাঠাইবার কথা বোর্ড অনুমোদন করিবেন। তবে তিনি বর্তমানে নিজ বিবাহ লইয়া ব্যস্ত আছেন। উহা ২৬শে ডিসেম্বর হইবে।" শ্রীযুত ঘোষ কেন এইরূপ বিবৃতি বোম্বাইতে প্রদান করিয়াছেন জিজ্ঞাসা করা হইলে বলেন, "গোলাম আমেদকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ যাইতেই হইবে এই সিদ্ধান্ত বোর্ড এখনও করেন নাই, অথবা এই সম্পর্কে তাঁহাকে কিছুই

জানান হয় নাই। বিবাহের পর চেষ্টা করা হইবে ই'হাকে পাঠাইতে।"

সভাপতি, সম্পাদক, ম্যানেজার সকলের বিবৃতির মধ্যে কোনই সামঞ্জস্য খ‍ু‍ঁজিয়া পাওয়া যায় না। এইরূপ লোক যে গুরুদায়িত্বপূর্ণ কার্যের ভার গ্রহণ করিয়া আছেন, তাহা কিরূপে সাফল্যমণ্ডিত হইবে ইহা বলাই বাহুল্য। আমরা কেবল বলিব ইহা ভারতীয় ক্রিকেটের পরম দুর্ভাগ্যের বিষয়। ই'হাদের পদত্যাগ অথবা অপসারণ ব্যতীরেকে ভারতীয় ক্রিকেটের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রচিত হওয়া অসম্ভব।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভ্রমণকারী দল

ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের খেলোয়াড় নির্বাচকমণ্ডলী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভ্রমণ উদ্দেশ্যে যে সকল খেলোয়াড়কে মনোনীত করেন, তাঁহাদের মধ্যে সকলেই গিয়াছেন, কেবল গোলাম আমেদের পরিবর্তে কাহাকেও প্রেরণ করা হয় নাই। উইকেটরক্ষক পি সেনের পরিবর্তে ই এস মাকা, বোলার কস্তুরীরঙ্গমের পরিবর্তে এন কানাইয়ারাম ও ব্যাটসম্যান সি ডি গোপীনাথের পরিবর্তে লেঃ গাদকারীকে প্রেরণ করা হইয়াছে। ই এস মাকা ভাল উইকেটরক্ষক সন্দেহ নাই, তবে ইনি অভিজ্ঞ পি সেনের সমতুল্য নহেন বলিলে কোনরূপ অন্যায় হইবে না। সি ডি গোপীনাথ ব্যাটিংয়ে ইংলণ্ড ভ্রমণেই ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহাকে পুনর্বার ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভ্রমণে নির্বাচিত করাইয়া নির্বাচকমণ্ডলী ত্রুটিই করিয়াছিলেন। লেঃ গাদকারীকে প্রেরণ করায় ভালই হইয়াছে। কস্তুরীরঙ্গম একজন তরুণ কৃতী ওপ্‌নিং বোলার। তাঁহার প্রতিনিধিমূলক খেলার অভিজ্ঞতাও খুবই কম। তাহার পরিবর্তে কানাইয়ারামকে প্রেরণ করা হইয়াছে। তিনিও দলকে বিশেষ সাহায্য করিবেন বলিয়া মনে হয় না। সেইজন্য ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভ্রমণকারীদল ইংলণ্ড ভ্রমণকারীদল অপেক্ষা যে শক্তিশালী ও সমশক্তিসম্পন্ন ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে না। তবে এই দলে দীপক সোধনের ন্যায় একজন কৃতী ন্যাটা ব্যাটসম্যানকে প্রেরণ করা হইয়াছে। ইংলণ্ড ভ্রমণকারী দলে ইহার অভাব বিশেষভাবেই অনুভূত হয়। এইবারে সেই অভাব পূরণ করা হইয়াছে ও দলের ব্যাটিংয়ের শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে বলা চলে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভ্রমণকারী ভারতীয় দল সাফল্যমণ্ডিত হইবে, ইহা বলিতে না পারিলেও সারা ভারতের ক্রীড়ামোদীর ন্যায় দলের সাফল্য আমরা আন্তরিকভাবেই কামনা করি। নিম্নে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভ্রমণকারীদলের খেলোয়াড়গণের নাম প্রদত্ত হইলঃ—

(১) বিজয় হাজারে (বরোদা—অধিনায়ক)
(২) বিনু মানকড় (বোম্বাই—সহ-অধিনায়ক)
(৩) এম এল আপ্তে (বোম্বাই)
(৪) পি রায় (বাঙলা)
(৫) ডি কে গাইকোয়াড় (বরোদা)
(৬) দীপক সোধন (গুজরাট)
(৭) ভি এল মাঞ্জরেকার (বোম্বাই)
(৮) পি আর উমরিগার (বোম্বাই)
(৯) ডি জি ফাদকার (বোম্বাই)
(১০) জি এস রামচাঁদ (বোম্বাই)
(১১) সি ভি গাদকারী (সার্ভিসেস)
(১২) এস পি গুপ্তে (বোম্বাই)
(১৩) এন কানাইয়ারাম (মহীশূর)
(১৪) ই এস মাকা (গুজরাট)
(১৫) পি জি যোশী (মহারাষ্ট্র)

মানকড়ের অর্থলাভ

ভারতের বিশ্ববিখ্যাত চৌকশ ক্রিকেট খেলোয়াড় বিনু মানকড় ২৩টি টেস্ট খেলায় সহস্র রান ও ১০০ উইকেট লাভ করিয়া টেস্ট খেলায় যে পৃথিবীর রেকর্ড করেন, তাহার সম্মান প্রদর্শনের জন্য বোম্বাই ক্রিকেট এসোসিয়েশন একটি অর্থভাণ্ডার খুলিয়াছিলেন। এই অর্থভাণ্ডারের নাম দেওয়া হইয়াছিল "বিনু মানকড় ফাণ্ড"। মানকড়ের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ যাওয়ার পূর্বে ঐ অর্থ তাঁহার হস্তে প্রদান করা হইবে ইহা ছিল পরিচালকগণের উদ্দেশ্য—তাহা পূরণ হইয়াছে। ১২৫০১, টাকার একটি তোড়া মানকড়কে প্রদান করা হইয়াছে। আরও ২৫০০, টাকা পরে পেণছিবার সম্ভাবনা আছে, তাহাও তাঁহাকে দেওয়া হইবে বলিয়া জানান হয়। এই অর্থভাণ্ডারে ভারতের সকল অঞ্চলের ক্রীড়ামোদী দান করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, বিহারের সুদূর পল্লীর লোকের নামও সভায় উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় বাঙলার কথা কেহই বলেন না। ইহাতে বিশ্বাস করিতে পারা যাইতেছে না যে বাঙলার কোন ক্রীড়ামোদী এই সাহায্য ভাণ্ডারে অর্থ প্রদান করে নাই। ইহা জোর করিয়াই বলা যায় যে, বাঙলার মাঠে ক্রিকেট খেলায় যত অর্থ সংগৃহীত হয় ভারতের অন্য কোন রাজ্যেই হয় না। সুতরাং সেই বাঙলার ক্রীড়ামোদীগণ এইরূপ দেশের এক কৃতী সন্তানকে সম্মান প্রদর্শনে কার্পণ্য প্রদর্শন করিবেন ইহা অসম্ভব।

হানিফের সহস্র রান

প্যাকিস্থান ভ্রমণকারী দলের কেহই ভারতে সহস্র রান পূর্ণ করিলেন না এই বিষয় লইয়া যে আলোচনা শোনা যাইত তাহা তরুণ খেলোয়াড় হানিফ কার্যকরী করায় সত্যই প্রশংসার বিষয় হইয়াছে। তবে হানিফ এই সহস্র রান নির্দিষ্ট ভ্রমণ তালিকার খেলার মধ্যে করিতে পারেন নাই। অতিরিক্ত খেলা হিসাবে কলিকাতায় যে বিশেষ চ্যারিটি ম্যাচ খেলা হইয়াছে তাহাতেই করিয়াছেন। তাহা হইলেও এই তরুণ খেলোয়াড় সহস্র রান পূর্ণ করায় আমরা তাঁহাকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। সর্বকনিষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়াড়

হসাবে ভারতের মাঠে সহস্র রান পূরণ করিয়া-ন ইহা ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসেও লিখিত াকিবে। নিম্নে হানিফের সহস্র রান পূরণের ালিকা প্রদত্ত হইলঃ—

(১) উত্তরাঞ্চলের খেলায়—১ম ইনিংসে ২১ রান, ২য় ইনিংসে ১০৯ রান নট আউট।

(২) প্রথম টেস্ট ম্যাচে—১ম ইনিংসে ৫১ ন, ২য় ইনিংসে ১ রান।

(৩) দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচে—১ম ইনিংসে ৪ রান।

(৪) পশ্চিমাঞ্চল—১ম ইনিংসে ৭৫ রান ও ২য় ইনিংসে ১২ রান।

(৫) বোম্বাইর খেলায়—১ম ইনিংসে ২০০ রান নট আউট।

(৬) তৃতীয় টেস্ট ম্যাচে—১ম ইনিংসে ১৫ রান, ২য় ইনিংসে ৯৬ রান।

(৭) দক্ষিণাঞ্চল—১ম ইনিংসে ১৩৫ রান।

(৮) চতুর্থ টেস্ট ম্যাচে—১ম ইনিংসে ২২ রান।

(৯) বিশ্ববিদ্যালয় দলের খেলায়—১ম ইনিংসে ২৪ রান ও ২য় ইনিংসে ৬ রান নট আউট।

(১০) পঞ্চম টেস্ট ম্যাচে—১ম ইনিংসে ৫৬ রান ও ২য় ইনিংসে ১২ রান।

(১১) পূর্বাঞ্চল—১ম ইনিংসে ৪ রান ও ২য় ইনিংসে ৬ রান।

(১২) ডাঃ বি সি রায়ের একাদশের খেলায় ১ম ইনিংসে ১১১ রান।

রঙ্গজগৎ

বাঙলা চিত্রশিল্পের অভাবনীয় সুযোগ

বাঙলার চলচ্চিত্রের ওপরে সারা ভারতের গ্রহ আবার ফিরে এসেছে। ১৯৫২ সালের তই তার জন্যে দায়ী। কারণ এই বারোটি দ বাঙলা ভাষাতে ছাড়াও বাঙলার বাইরের কেদের জন্যেও হিন্দীতে এমন কতক-লি ছবি ছড়িয়ে দিয়েছে যার ছটায় সমগ্র রতই বিমোহিত হয়েছে। বছরের গোড়া কেই "রত্নদীপ", "যাত্রিক" ("মহাপ্রস্থানের থ"), "বিদ্যাসাগর" এবং হালফিল টিমা" একের পর একটি মুক্তিলাভ করে লার ছবির ওপরে সমগ্র জাতির অশেষ া আকর্ষণ করে দিয়েছে। চলচ্চিত্র শলষ্ট, চিত্রানুরাগী বা জনসাধারণই লমাত্র নয়, গভর্নমেণ্টের কর্তৃপক্ষ মহলও লার ছবির ওপরে অকুণ্ঠিত শ্রদ্ধা প্রকাশ তে দ্বিধা করেন না। চলচ্চিত্রকে সংযত র জন্য যেসব নিয়ন্ত্রণাত্মক ব্যবস্থা াতি অবলম্বন করা হচ্ছে কর্তৃপক্ষের গ কথাবার্তায় জানা গিয়েছে যে, সেগুলি লা ছবির দিকে লক্ষ্য রেখে প্রণীত হচ্ছে -বাঙলা ছবির রুচিপরিচ্ছন্নতা এবং প সাহিত্য ও নাট্যানুস্মৃতিই ভারতীয় র মানদণ্ড হওয়াই উচিত বলে সকলে করেন।

* * *

াঙলার ছবির ওপরে এই শ্রদ্ধাটা কিছু ি কথা নয়। নিউ থিয়েটার্সের ছবি ারে বের হওয়া মাত্রই বাঙলা দেশের র ওপরে সারা দেশের [illegible] পড়লো না, চলচ্চিত্রের সংগে কোন না কোন-ভাবে যুক্ত হবার জন্যে দেশের সব জায়গা থেকে লোক এসে বাঙলার স্টুডিওগুলি ভরিয়ে ফেলেছিল। মাদ্রাজের চলচ্চিত্রশিল্পের পত্তনই হয়েছিল কলকাতায়। গোড়াতে মাদ্রাজী সমস্ত ছবি তোলা হতো এখানে তারপর এখানকারই কলাকুশলীদের নিয়ে গিয়ে মাদ্রাজে ছবি তোলা আরম্ভ হয়।

আমেরিকার বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতায় ভারতের প্রতিনিধি শ্রীমতী ইন্দ্রানী রোলিক পিকচার্সের "ধ্রুব" চিত্রের উর্বশী। সংগে নামভূমিকাভিনেতা শ্রীমান [illegible]

'ছোটি মা' (হিন্দী) চিত্রে পাহাড়ী সান্যাল, মীরা মিশ্র ও আনন্দ্

"দেবদাস", "ধুপছাঁও" ("ভাগ্যচক্র") "বিদ্যাপতি", "চন্ডীদাস", "পুরণভকত" প্রভৃতি চিত্র নির্মাণকৃতিত্বে চমক ধরিয়ে দিলে সর্বত্র। বম্বেও উদার-ভাবে এখানকার কলাকুশলী ও শিল্পী-দের নিয়ে যেতে আরম্ভ করলে। তখন বাঙলার চিত্রশিল্পের কাউকে নিজেদের ছবির কোন বিভাগে সংশিল্পষ্ট রাখতে পারাটা বম্বের প্রযোজকদের কাছে মহা সম্মানের ব্যাপার হয়ে উঠেছিলো—, তখন বাঙলার পরিচালক ও কলাকুশলীদের মান ও দর দুই-ই ছিলো ভারতীয় চিত্র-শিল্পে সর্বাধিক। চিত্রনাট্য রচনার ধারা, আলোকচিত্র বিন্যাস, সঙ্গীত প্রয়োগ—এসব সবায়েরই শেখা বাঙলা চিত্রশিল্পের কাছ থেকেই। কিন্তু সেই বাঙলা চিত্রশিল্পই লীন হয়ে গেলো দেখতে দেখতে। শুধু তাই নয়, এমন দিনও এলো যখন বাঙলা দেশের ছবিকে উপেক্ষা করাটাই ফ্যাশন হয়ে দাঁড়ালো।

*   *   *

বাঙলার চলচ্চিত্র যে বহির্বাঙলার বাজার হারালে তার জন্যে বাঙলার চলচ্চিত্রশিল্পের অধিনায়করাই দায়ী প্রধানত। যে সময়ে বাঙলা দেশের ছবির ওপরেই সবায়ের ঝোঁক তখন তারা হিন্দী ছবি তোলা কমিয়ে দিতে দিতে প্রায় বন্ধই করে দিলেন। অন্যান্য জায়গার ছবি যখন প্রতিযোগিতায় এসে দাঁড়ালো, গুণে না হোক, সংখ্যাধিক্যেও অন্ততঃ, তখন বাঙলা দেশের তোলা ছবির সংখ্যা নগণ্যতে পরিণত হওয়া সত্ত্বেও প্রচারাদি জনসংযোগের দিকে কোন খেয়াল করার দরকারই বোধ করলেন না তারা। তারপর ছবির বিষয়বস্তু, আভরণ কলা-কৌশলের সৌষ্ঠব বাড়িয়ে যাওয়ার দরকারকে তারা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করলেন। বাঙলার ছবির ওপর চাহিদাকে এইভাবে নিজেরাই তারা দাবিয়ে ফেললেন।

*   *   *

বাঙলা ছবির ওপরে আবার শ্রদ্ধা ফিরে এসেছে। কলকাতাতেই আজকাল দেখা যাচ্ছে, "বিন্দুর ছেলে", "কার পাপে", "শুভদা", কি "দর্পচূর্ণ" দেখতে বহু অবাঙলাভাষী মেয়েপুরুষও আসছে। আর সেইসঙ্গে দেখা যাচ্ছে বাইরে বাঙলা দেশের তোলা হিন্দী ছবির বিপুল সম্বর্ধনা। এ থেকে বাঙলা দেশের ছবির ওপরে সর্বত্রই যে ঝোঁক দেখা দিয়েছে তারই সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। বম্বের সাংবাদিক এসে জানিয়ে যাচ্ছেন কলকাতা আরও ছবি পাঠাতে থাকুক, কলকাতার ছবির প্রেমে পড়ে গিয়েছে তারা। মাদ্রাজের প্রযোজক এসে বলে যাচ্ছেন, কলকাতার ছবিই আদর্শ, তাদের প্রেরণার উৎস। সারা দেশের এই আকুতির কথাটা কলকাতার প্রযোজকরা কি উপেক্ষাই করে যাবেন? তারা কি দেখতে পাচ্ছেন না যে, কলকাতায় দীর্ঘকাল পর হিন্দীর চেয়ে বাঙলা ছবির জনপ্রিয়তা বেড়ে গিয়েছে এবং আরও বাড়ছে। আর কলকাতার প্রযোজক-দের এ খবরও তো রাখা উচিত যে বম্বেতে আজ যে পরিমাণ হিন্দী ছবি তোলা হচ্ছে সারা ভারতের চাহিদা পরিপূরণ করার পক্ষে তা অনেক কম। এখনই দেখা যাচ্ছে দেশের নানা শহরের চিত্রগৃহ হিন্দী ছবি না পেয়ে বাধ্য হচ্ছে ইংরেজী ছবি দেখাতে—বাঙলার প্রযোজকরা কি পারেন না হিন্দী ছবির চাহিদা মতো সংখ্যাটা পূরণ করে দিতে? বাঙলা চিত্রশিল্পের ভাগ্যে এক অভাবনীয় সুযোগ উপস্থিত হয়েছে; বাঙলার ছবিকে সম্বর্ধনা করার জন্য সকলে উন্মুখ হয়ে রয়েছে, সে-উন্মুখতা এখনও যদি পরিতুষ্ট না করা যায়, তাহলে বাঙলার চিত্রশিল্পের **অবলুপ্তি আর রুখে দেওয়া যাবে না।**

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

২২শে ডিসেম্বর—ভারতের রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ তাঁহার দশ দিনব্যাপী পশ্চিমবঙ্গ পরিক্রমা উপলক্ষে অদ্য বিমানযোগে দিল্লী হইতে কলিকাতায় উপনীত হইলে মহানগরীর অধিবাসিগণ তাঁহাকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জানায়।

পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন অদ্য পাক গণপরিষদে মূলনীতি নির্ধারণ কমিটির রিপোর্ট দাখিল করিয়া বলেন যে, কোন আইনসভাই যাহাতে কোরাণ ও সুন্না-বিরোধী কোন আইন প্রণয়ন করিতে না পারেন, রিপোর্ট প্রণয়নকালে সেই বিষয়ে দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। রিপোর্টে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কেবলমাত্র মুসলমান ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিই কোন রাজ্যের প্রধান নিযুক্ত হইবেন।

২৩শে ডিসেম্বর—শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে নবগঠিত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন উৎসবে ভারতের রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ বাঙ্গলা ভাষায় সমাবর্তন ভাষণ দান করেন। ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ তাঁহার ভাষণে বলেন যে, শিক্ষক ও ছাত্রগণ সত্যানুসন্ধিৎসাকেই যেন তাঁহাদের জীবনে প্রধান কর্তব্য বলিয়া গ্রহণ করেন।

ভারতীয় বিমান বাহিনীর একখানা ডাকোটা বিমান গতকল্য আগ্রা হইতে হায়দরাবাদ যাওয়ার পথে ভাঙ্গিয়া পড়ে। বিমানের তিন জন আরোহীই ঘটনাস্থলে মারা যান। ঝান্সী হইতে ২৫ মাইল দূরে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

২৪শে ডিসেম্বর—কটকে নিখিল ভারত (প্রবাসী) বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অষ্টবিংশতিতম অধিবেশন ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে আরম্ভ হয়।

প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু আজ এলুরে (ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন) দুর্লভ মৃত্তিকা কারখানাটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। কারখানাটি ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হইয়াছে।

কলিকাতায় শোভাবাজার রাজবাটীতে বঙ্গবেশীয় কায়স্থ সভার সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন হয়। স্যার যদুনাথ সরকার উৎসবের উদ্বোধন করেন এবং কুমার শিবেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর উহাতে সভাপতিত্ব করেন।

কলিকাতায় নিখিল ভারত আয়ুর্বেদ সম্মেলনের উদ্বোধন প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ বলেন যে, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে গবেষণা করিয়া আয়ুর্বেদের উন্নতি সাধন করা আয়ুর্বেদানুরাগীদের কর্তব্য।

২৫শে ডিসেম্বর—দক্ষিণেশ্বর আন্তর্জাতিক অতিথি ভবনে শ্রীরামকৃষ্ণ মহামণ্ডলের পক্ষ হইতে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সম্বর্ধনার উত্তরে রাষ্ট্রপতি বলেন, 'আজ সারা পৃথিবী ভারতবর্ষকে বুঝিবার জন্য উৎসুক। সুতরাং আজ আমাদের উপর দেশে দেশে 'ভারতের বাণী' পেঁছাইয়া দিবার বিরাট দায়িত্ব আসিয়া পড়িয়াছে।'

কটকে নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের সাহিত্য, বিজ্ঞান, ভারতীয় সাহিত্য ও ইতিহাস শাখার অধিবেশন সম্পন্ন হয়। এই চারিটি শাখার অধিবেশনে যথাক্রমে ডাঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল), ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ডাঃ হরেকৃষ্ণ মহতাব ও ডাঃ নন্দলাল চট্টোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন।

২৬শে ডিসেম্বর—আজ কটকে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের তৃতীয় ও শেষ দিনের অধিবেশনে ডাঃ শিশিরকুমার মিত্রের সভাপতিত্বে দর্শন শাখা, শ্রীদেবেশচন্দ্র দাসের সভাপতিত্বে বৃহত্তর বঙ্গ শাখা, শ্রীমতী লীলা মজুমদারের সভানেত্রীত্বে মহিলা শাখা, শ্রীমতী বাণী দেবীর সভানেত্রীত্বে সঙ্গীত শাখা ও শ্রীঅখিলচন্দ্র নিয়োগীর সভাপতিত্বে শিশু-সাহিত্য শাখার অধিবেশন হয়। সম্মেলনের পূর্ববঙ্গের আশ্রয়চ্যুত উদ্বাস্তু অধিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষা করিবার জন্য কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারদের নিকট দাবী জানাইয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

লালবাজারে কলিকাতা পুলিশের প্রধান দপ্তর ভবনের অভ্যন্তরে এক ভয়ংকর বিস্ফোরণের ফলে ১৩জন পুলিশ কম-বেশী আহত হয়। আহতগণের মধ্যে তিনজনের অবস্থা উদ্বেগজনক।

রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে বাঙ্গলা ভাষায় এক ভাষণ দেন। রাষ্ট্রপতি বলেন, "যতক্ষণ আমাদের দৃষ্টি আত্মতত্ত্বের দিকে যাইবে না, আর যতদিন ইহার প্রাপ্তির জন্য আমরা প্রযত্নশীল হইব না, ততদিন সমাজের বিশৃংখলতা এবং দুনিয়ার অরাজকতা দূর হইবে না।"

২৭শে ডিসেম্বর—অদ্য কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গণে রাষ্ট্রপতিকে পৌর সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সম্বর্ধনার উত্তরে তিনি প্রসঙ্গক্রমে বলেন, তাঁহারা যেন উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের সরল প্রশ্নটি বাঙ্গলা-বিহারের সীমানা পুনর্নির্ধারণের জটিল প্রশ্নটির সহিত একাকার করিয়া না ফেলেন। সীমানা পুনঃ নির্ধারণের প্রশ্নটি পৃথক ক্ষেত্রে উভয় রাজ্যের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণই কেবল নিজেদের মধ্যে আপোষে মিটাইয়া লইতে পারেন।

রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ আজ প্রাত কলিকাতার শহরতলী অঞ্চলে এক শস্ত্রনির্মা কারখানা পরিদর্শনকালে সমবেত শ্রমিকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলেন যে, তাঁহারা যেন আপনা দিগকে শুধু মাত্র শ্রমিক বলিয়া মনে না করেন তাঁহারা দেশসেবকও বটেন।

২৮শে ডিসেম্বর—প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু অদ্য ত্রিবেন্দ্রামে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর সম্পর্কে যে ইঙ্গ মার্কিন প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, ভারত তাহ মানিয়া লইবে না।

বিদেশী সংবাদ

২২শে ডিসেম্বর—আজ ফরাসী সামরিক কর্তৃপক্ষের ইস্তাহারে ঘোষিত হইয়াছে যে সাইগনের ১৭৫ মাইল পশ্চিমে মাইনে লাগিয়া একটি জাহাজ বিদীর্ণ হওয়ায় ২০৮জন নাবি ও সৈন্য নিহত হয়।

২৪শে ডিসেম্বর—রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদ গত রাত্রিতে কাশ্মীর সংক্রান্ত ইঙ্গ মার্কিন প্রস্তাবটি ৯—০ ভোটে অনুমোদ করিয়াছেন। ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত নিরাপত্তা পরি ষদকে জানান যে, ইঙ্গ-মার্কিন প্রস্তাবে ভিত্তিতে ভারত কাশ্মীর বিরোধ সম্পর্কে পাকিস্থানের সহিত কোনরূপ আলাপ আলোচনা চালাইবে না।

২৫শে ডিসেম্বর—মার্শাল স্টালিন জনৈক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, কোরিয়া যুদ্ধের অবসানকল্পে নূতন কোন কূটনীতি প্রচেষ্টা আরম্ভ করা হইলে রাশিয়া সহ যোগিতা করিতে প্রস্তুত রহিয়াছে। রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া মার্শাল স্টালিন মনে করেন না।

ভারতীয় মূল্য : প্রতি সংখ্যা—।৵ আনা, বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক— ১০,

পাকিস্থানের মূল্য : প্রতি সংখ্যা (পাক্) ।৵ আনা, বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, (পাক্)

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

২০শ বর্ষ
১১শ সংখ্যা

দেশ

শনিবার
২৬শে পৌষ, ১৩৫৯

DESH SATURDAY, 10th JANUARY, 1953

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

সাময়িক প্রসঙ্গ

বিজ্ঞানের সাধনায় ভারত

সম্প্রতি লক্ষ্ণৌ শহরে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪০তম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বসুবিজ্ঞান মন্দিরের অধিকর্তা ডক্টর ডি এম বসু এই কংগ্রেসের মূল সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। এই কংগ্রেসের উদ্বোধন করিতে গিয়া ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল এদেশের বর্তমান সমস্যার প্রতি বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন। তিনি প্রাণের সমগ্র আবেগ দিয়াই এই সত্য উন্মুক্ত করিয়াছেন যে, উদরে যাহাদের অন্ন নাই, পরিধানে যাহাদের বস্ত্রখণ্ডেরও অভাব, তাহাদের কাছে অধ্যাত্ম-বিদের বড় বড় আদর্শ ও নীতি কথার কোনই মূল্য নাই। পণ্ডিত নেহরুর এই উক্তির গুরুত্ব সকলেই স্বীকার করিবেন। প্রকৃতপক্ষে ভারতের চিন্তানায়ক এবং মনীষিগণ কেহই এই সত্যের গুরুত্ব অস্বীকার করেন নাই। স্বামী বিবেকানন্দের মুখে আমরা ঐ কথা শুনিয়াছি এবং এই একই বিষয়ের উপর মহাত্মা গান্ধীও তাঁহার জীবন-সাধনায় জোর দিয়া গিয়াছেন। প্রকৃত ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতিতেও বিজ্ঞান-সাধনা উপেক্ষিত হয় নাই। ভারতীয় সংস্কৃতির সাধকগণ, আমরা যাঁহাদিগকে ঋষি বলিয়া থাকি, তাঁহারা শুদ্ধ অবাস্তব সূক্ষ্মতম অধ্যাত্মতত্ত্বের ধ্যান-ধারণাতেই মগ্ন থাকিতেন এবং মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখের দিকে তাঁহাদের আদৌ লক্ষ্য ছিল না, অনেকে এইরূপ মনে করেন; কিন্তু তাঁদের সে ধারণা ভুল। ভারতের আস্তিকতায় বিজ্ঞানের বিরোধিতা ছিল না। প্রাচীন ভারত সর্বগ্রাহী মনস্বিতার প্রভাবে বৈজ্ঞানিক সত্যসমূহের নিগূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছিল এবং জীবন-সাধনায় সেগুলি সার্থকও করিয়া তুলিয়া-ছিল। দীর্ঘ পরাধীনতার পর আধুনিক বিজ্ঞানের অনেকগুলি অবদান অবশ্য ভারতের সমাজ-জীবনের উপর অনেকটা আকস্মিক রকমে আসিয়া পড়িয়াছে এবং কিছুটা বিপর্যয়ও তাহার ফলে সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু এক্ষেত্রে ভাবিয়া দেখিবার বিষয় আছে। ভারতের সংস্কৃতি সার্বভৌম উদার সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যুত, পরিবর্তনের মধ্যে এদেশের সাধনা মানুষের মনের মূলে সনাতন একটি আদর্শের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। সে মৈত্রীকে বড় বলিয়া বুঝিয়াছে। পরন্তু আধুনিক বিজ্ঞান-সাধনার গতি ধ্বংসের দিকে জগৎকে লইয়া চলিয়াছে। বর্তমান বিজ্ঞান মানুষের কোন কল্যাণ সাধন করে নাই, এতদ্দ্বারা এমন কথা আমরা বলি না; কিন্তু মোটামুটি-ভাবে ধ্বংসের দিকে সে সাধনার গতি দুর্নিবার এবং সেই দিককার অনিষ্টকারিতার সম্বন্ধে বিবেচনা করিলে বিজ্ঞানের ইষ্টের দিকটাও যেন নস্যাৎ হইয়া পড়ে। বিজ্ঞান জড় বস্তুকে বড় করিয়া দেখিতেছে; কিন্তু মানুষের মনের দিকে তাহার লক্ষ্য নাই। তাহার সাধনা কার্যত অনাত্ম এবং আসুরিক। জড় উপচারই জীবনের মূলে সে সাধনা জড়ো করিতেছে, কিন্তু দৈবী সম্পদকে করিতেছে উপেক্ষা। বিজ্ঞানের গতিকে এই মোহের মুখ হইতে রক্ষা করাই বর্তমান জগতের প্রধান সমস্যার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। বৈজ্ঞানিক সাধনা রাষ্ট্রচক্রের পাকে পড়িয়া বর্তমানে যেভাবে প্রভুত্ব-স্পর্ধী বিদ্বেষের বিষজ্বালা জাগাইয়া তুলিতেছে, ইহা সত্যই আশঙ্কার বিষয়। এ-সাধনা মানুষের কল্যাণে প্রযুক্ত হয়, ইহাই আবশ্যক। ফলত বিজ্ঞানের সাধকগণ রাষ্ট্র-চক্রের এই দাসত্ব হইতে যদি মুক্ত হন এবং নিজেদের সাধনাকে মানবতার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, তবেই তাঁহাদের বিদ্যা সার্থক হইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে বিজ্ঞান-সাধনাকে নিয়ন্ত্রিত করি-তেছে রাষ্ট্রনীতিকেরা এবং বৈজ্ঞানিকেরা কার্যত তাঁহাদেরই ক্রীড়নকে পরিণত হইয়া-ছেন। ভারতের প্রধান মন্ত্রীও এ কথাটা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, গত শতাধিক বর্ষকাল হইতে শাসকদেরই প্রাধান্য চলিয়া আসিয়াছে এবং এখনও তাহাই চলিতেছে। প্রধান মন্ত্রী বলেন, শাসকদের পদমর্যাদার গুরুত্ব অবশ্য আছে; কিন্তু তাঁহারা যতখানি মনে করেন, ততখানি নয়। রাজনীতিকদের সম্বন্ধেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। তাঁহার মতে মনীষী এবং বৈজ্ঞানিকগণ ভবিষ্যতে সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ আসনে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যুত ভারতের অধ্যাত্ম-সাধনার মূলীভূত সার্বভৌম সত্যে নিষ্ঠিত হইবার উপরই বিজ্ঞান-সাধনার এই মর্যাদা নির্ভর করিতেছে।

বিশ্ব-সমস্যা সমাধানে গান্ধীবাদ

বিশ্ব সমস্যা সমাধানে গান্ধীবাদের স্থান সম্বন্ধে দিল্লীতে একটি আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রের অধিবেশন চলিতেছে। গত ৫ই জানুয়ারী ভারতের প্রধান মন্ত্রী এই সম্মেলনের উদ্বোধন করিয়াছেন। বিশ্ব রাষ্ট্রসংঘের সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত ভারতীয় জাতীয় কমিশনের উদ্যোগে এই সভা অনুষ্ঠিত হইতেছে। সভায় রাষ্ট্রসংঘের দুইজন প্রধান কর্মকর্তা লর্ড বয়েড ওর এবং ডাঃ র‍্যালফ বাঞ্চ উপস্থিত আছেন। ইঁহারা দুইজনেই নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। এই আলোচনা-সভার বৈঠক ১৭ই জানুয়ারী পর্যন্ত চলিবে। আন্তর্জাতিক দিক হইতে এই বৈঠকটি বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য এবং বিশ্ব-সমস্যা সমাধানে গান্ধী দর্শনের

ত্বের এমন স্বীকৃতি আমাদের পক্ষে সত্যই গৌরবের বিষয়; কারণ মহাত্মা গান্ধীই আমাদের রাষ্ট্রের জনক এবং আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা। গান্ধীজীর জীবনাদর্শ এবং তাঁহার সাধনার বিশ্ব-মানবতার দিকটাই বর্তমানে জগতের চিন্তাশীল সমাজকে সমধিক আকৃষ্ট করিয়াছে। বিশ্বব্যাপী সমরাশঙ্কা এড়াইবার উপায়স্বরূপেই গান্ধী-আদর্শের উপযোগিতা বিচারের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। প্রকৃতপক্ষে গান্ধীজী শুধু রাজনীতিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন সত্যের সাধক। ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষার জন্য জীবন দান করাই তাঁহার ব্রত ছিল। তিনি জগতের অন্যতম মহামানবরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। রাজনীতিক ক্ষেত্রে অহিংসার নীতির প্রয়োগ-নৈপুণ্য গান্ধীজীর জীবনের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য; কিন্তু এই সঙ্গে ইহাও আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে, তিনি অহিংসাকে শুধু নীতি হিসাবেই প্রয়োগ করেন নাই। বস্তুত অহিংসাকে তিনি জীবনে সত্য করিয়া লইয়াছিলেন এবং তাঁহার অহিংসা শুধু সাময়িক প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে কৃত্য নয়, পরন্তু তাহা সমাজ-বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং মনোবিজ্ঞানসম্মত বস্তু। ফলত গান্ধীজীর আদর্শকে অবলম্বন করিয়া যদি বিশ্ব সমস্যার সমাধান করিতে হয়, তবে আমাদের চিন্তার ধারাকেই বদলাইয়া ফেলিতে হইবে। আমাদের সমাজ-জীবনে অর্থনৈতিক বৈষম্য বজায় থাকিবে, জাতি-বিদ্বেষের বর্বরতা সভ্যতার নামে বিভীষিকার বিস্তার করিবে, সাম্রাজ্যবাদের মোহ মনের মূলে জড়াইয়া থাকিবে, অথচ গান্ধীজীর আদর্শের বিশ্বসমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে, এমন আশা করা বাতুলতামাত্র। দুঃখের বিষয় এই যে, গান্ধীজীর আদর্শ আজও আমাদের চিন্তা-ধারার পরিবর্তনে কেবল প্রভাব বিস্তার করিতে পারিতেছে না; পক্ষান্তরে সে বস্তু রাজনীতিকদের সৌখীন বাক্-বিলাসেই পর্যবসিত হইতে চলিয়াছে; কিন্তু তাহার মধ্যে আন্তরিকতা নাই। গান্ধী-নীতির যাঁহারা অনুরাগী, তাঁহাদের এই বিষয়টি তলাইয়া বুঝিতে হইবে এবং সমাজ-জীবনে সেই আদর্শকে বাস্তব রূপ দানের জন্য সাধনা করিতে হইবে। হিংসার পথে যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় না, একথাটা বুঝিবার মত বুদ্ধি অনেকেরই আছে; কিন্তু জীবন-সাধনার ভিতর দিয়া সেই বুদ্ধিকে শুদ্ধ করিবার মত মননের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে এবং সেজন্য ত্যাগ ও তপস্যা আবশ্যক। প্রাণময় যে সত্য, তাহাকে প্রাণ দিয়াই প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। এই প্রাণধর্মের জাগরণের উপরই বিশ্ব সমস্যার সমাধানে গান্ধী-দর্শনের সাফল্য নির্ভর করিতেছে। হিংসা, বিদ্বেষ, বর্ণবৈষম্য এবং সাম্রাজ্যবাদের পীড়নে উত্তপ্ত বিশ্বের বর্তমান প্রতিবেশে পারস্পরিক কল্যাণের কামনা যদি আমাদের মন এবং বুদ্ধিকে প্রণোদিত না করে, তবে সভ্যতা এবং সংস্কৃতির সব কথা ব্যর্থ হইয়া বুঝিতে হইবে। বিশ্বের পরিস্থিতি বর্তমানে সঙ্কট-সন্ধিস্থানে আসিয়া পড়িয়াছে। বিশ্বের মানবসমাজ যদি আজ মৈত্রীর পথ অবলম্বন করিতে না পারে, তবে সভ্যতার নামে বর্বর হিংস্র জীবনের অন্ধকার গর্তেই শেষটা তাহাকে নিমগ্ন হইতে হইবে। গান্ধীবাদের আলোচনায় এই সত্যটি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে, এবং সে আলোচনা বিশ্বমানবের অগ্রগতির পথে অন্ততঃ কিছুটা আলোক-সম্পাত করিবে, আমরা ইহাই আশা করি।

শ্রেণীবিহীন সমাজের আদর্শ

শ্রেণীবিহীন সমাজের আদর্শের উপর ভারতের বিভিন্ন রাজনীতিক দল বর্তমানে বেশি রকমে আকৃষ্ট হইয়াছেন, আমরা ইহা লক্ষ্য করিতেছি। কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি দিল্লীর বিগত অধিবেশনে গণ-তান্ত্রিক পথে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে শ্রেণী-বিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করাই তাঁহাদের আদর্শ হইবে, ইহাই স্থির করিয়াছেন এবং তদনুযায়ী কংগ্রেসের লক্ষ্যের পরিবর্তন সাধনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। 'শ্রেণী-বিহীন সমাজের' সংজ্ঞাটি কম্যুনিস্টদের নিকট হইতেই ধার করা। তাঁহারা আগাগোড়া এই আদর্শের কথা বলিয়া আসিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা শান্তিপূর্ণ উপায়ের বাঁধা-বাধির মধ্যে যাইতে প্রস্তুত নহেন। পক্ষান্তরে সংগ্রামের সাহায্যেই শ্রেণীবিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় তাঁহারা বিশ্বাসী। শ্রেণীবিহীন সমাজ বলিতে ঠিক কি বস্তু বুঝায়, ইহা ধারণা করা উঠা কঠিন। সমাজের প্রত্যেকটি নরনারী সমাজে সুবিধা লাভ করে, শ্রেণীবিহীন সমাজের ইহাই সম্ভবত আদ[...] নববর্ষের প্রারম্ভে পঞ্চবার্ষিকী পরিক[...] উপস্থিত করিয়া ভারতের প্রধান ম[...] শ্রেণী-বিহীন সমাজের এই স্বরূপই নি[...] করিয়াছেন। তাঁহার মতে পঞ্চবার্ষিকী প[...] কল্পনার উদ্দেশ্য হইল—এইরূপ এ[...] সমাজ-ব্যবস্থার প্রবর্তন, যাহার য[...] প্রত্যেকে তাঁহাদের রুজী-রোজগা[...] সম্বন্ধে নিশ্চয়তা লাভ করিবে [...] প্রত্যেক নরনারী নিজের নিজের [...] বিকাশের পূর্ণ সুযোগ পাইবে। ক[...] শ্রেণীবিহীন সমাজের পারিভাষিক বি[...] বিতর্কে আমরা প্রবৃত্ত হইতে চাহি [...] পণ্ডিত জওহরলাল যে আদ[...] কথা উল্লেখ করিয়াছেন, যদি [...] পথে জাতি আগাইয়া চলিবার [...] সুযোগ এবং সুবিধা ও প্রেরণা কেন[...] নীতির নির্ধারকদের নিকট হইতে [...] তবেই আমরা সুখী হইব। কিন্তু দুঃ[...] বিষয় এই যে, বিগত পাঁচ বৎসর কা[...] কংগ্রেসী শাসনে জাতি সে পথে কোন[...] প্রেরণাই লাভ করে নাই। সমাজ-জীবন হ[...] অর্থনীতিক বৈষম্য দূর করিবার অভি[...] কংগ্রেস বলিষ্ঠ কোন কার্যক্রমই এ প[...] অবলম্বন করে নাই। পক্ষান্তরে পদ, [...] এবং প্রতিষ্ঠার মোহ এদেশের রাজনী[...] সাধনায় বৈষম্যকেই বাড়াইয়া চলিয়া[...] রাজনীতিকতা কার্যত একপ্রকার [...] তান্ত্রিকতাতেই গিয়া দাঁড়াইতে বসিয়া[...] ফলত চরিত্রে যেসব গুণ থা[...] গঠনমূলক কাজে শক্তি নিযুক্ত ক[...] করিতে উৎসাহ জাগে, আমরা [...] নৈতিক শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছি। প[...] জওহরলাল বলিয়াছেন, 'আমাদের আ[...] সমুচ্চ, লক্ষ্য মহৎ। তাহার তুলনায় [...] বার্ষিকী পরিকল্পনা অতি ক্ষুদ্র আ[...] মাত্র। আমরা যেন স্মরণ রাখি, এই ধ[...] ব্যাপক প্রচেষ্টা আমাদের দেশে এই [...] এবং ইহার ভিত্তি দেশের বাস্তব অব[...] উপর প্রতিষ্ঠিত।' 'ভারতের প্রধান ম[...] উক্তির যাথার্থ্য আমরাও স্বীকার ক[...] লইতেছি। কিন্তু বাস্তব অবস্থার [...] আদর্শের গণ্ডিকে যদি সীমাবদ্ধ ক[...] ফেলে এবং বৃহৎ সাধনায় প্রাণশক্তিকে স[...] রূপে উদ্বুদ্ধ না করিয়া তোলে, ত[...] বিপদের কথা। সেক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ প[...] সংঘাত এবং বিপর্যয়কে এড়াইয়া অ[...] হওয়া জাতির পক্ষে সম্ভবপর হইবে ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ

স্বতন্ত্র অন্ধ্র প্রদেশ গঠনে ভারত সরকার সম্মত হইলেও পশ্চিমবঙ্গের সীমানা সম্প্রসারণের প্রশ্নকে তাঁহারা যে পাত্তা দিবেন, এমন মনে হইতেছে না। কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতির বিগত অধিবেশনে এ প্রশ্নের কোন সুরাহা হয় নাই। হায়দরাবাদ কংগ্রেসে পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারটি উপেক্ষিত হইবে, এমন আশঙ্কারও কারণ রহিয়াছে। সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের মধ্যে মতের মিল, ভারতের প্রধান মন্ত্রীর এই দাবী; ইহার উপর জে ভি কমিটির রিপোর্ট কিছুই পশ্চিমবঙ্গের অনুকূলে নয়। প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমবঙ্গের সীমানা সম্পর্কিত প্রশ্নটি স্বতন্ত্রভাবে নূতন প্রদেশ গঠনের ব্যাপার হইতে ভিন্ন বস্তু; কিন্তু তাহা হইলেও সে দাবী প্রতিপালনে জে ভি কমিটির রিপোর্টই হয়ত কাজে লাগানো হইবে। প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলালের মতের প্রভাব তো আছেই। পশ্চিমবঙ্গের দাবী সমগ্র ভারতের বৃহত্তর স্বার্থের অনুকূলে, একথা আমরা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু দেখা যায়, ভারত সরকার সেসব যুক্তি সম্পূর্ণভাবেই উপেক্ষা করিতেছেন। ফারাক্কার উপর বাঁধ নির্মাণের ব্যাপারেও তাঁহাদের এই মনোভাবেরই পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। অথচ ফারাক্কার এই বাঁধ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা পশ্চিমবঙ্গের বাহিরেও স্বীকৃত হইয়াছে। ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত জাতীয় বন্দর বোর্ডও সম্প্রতি এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন যে, কলিকাতা বন্দরকে রক্ষা করিতে হইলে ফারাক্কার উপর গঙ্গায় বাঁধ নির্মাণ করা অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন। বোর্ড এই কাজটিকে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্যও ভারত সরকারকে অনুরোধ করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের রাষ্ট্রীয় সমিতি পূর্বেই কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের পক্ষ হইতেও এই প্রস্তাব করা হইয়াছে। কর্পোরেশন প্রস্তাব করিয়াছেন যে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্য দুই-একটি অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজনীয় বিষয় বাদ দিয়াও গঙ্গায় বাঁধ নির্মাণের ব্যবস্থায় প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক। আমাদের দুর্ভাগ্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার নির্ণায়কগণ এইটিকেই বাদ দিয়াছেন। অথচ ইহার উপর কার্যতঃ পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ অস্তিত্বই নির্ভর করিতেছে। ভারত সরকারের পরামর্শদাতারা টাকার জন্যই নাকি এক্ষেত্রে আপত্তি তুলিয়াছেন। ফারাক্কার বাঁধ নির্মাণের জন্য ৪০ কোটি টাকার প্রয়োজন বটে; কিন্তু পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদের মধ্যে এ-কাজে ৪।৫ কোটি টাকার বেশি টাকা আবশ্যক হইবে না। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য বরাদ্দ বিপুল অর্থের মধ্যে এই টাকাটা ব্যবস্থা করা যায় না, ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি। প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা এবং এই ক্ষুদ্র রাজ্য বর্তমানে যে কিরূপ সংকটজনক অবস্থার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ আন্তরিকতার সঙ্গে তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতেছেন না। তাঁহাদের এই মনোভাবই আমাদের মনে নিদারুণ ক্ষোভের কারণ সৃষ্টি করিয়াছে। সমগ্র ভারতের বৃহত্তর স্বার্থের দিক হইতে তাঁহাদের এই মনোভাব পরিবর্তিত হওয়া প্রয়োজন।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস রচনার জন্য ভারত গভর্নমেণ্ট কিছুদিন হইতে উদ্যোগী হইয়াছেন। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিশেষজ্ঞ এবং ঐতিহাসিকদের লইয়া একটি সদস্য-বোর্ড গঠিত হইয়াছে, ইহা অনেকেই অবগত আছেন। ডাঃ সৈয়দ মামুদ এই বোর্ডের সভাপতি এবং শ্রীযুত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ সম্পাদক নিযুক্ত হন। গত ২রা জানুয়ারী এই বোর্ডের প্রথম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ভারতের শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আজাদ এই বৈঠকে বক্তৃতায় বিষয়টির গুরুত্ব বুঝাইয়া দিয়াছেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস রচনা করিতে গেলে তৎকালীন সামাজিক প্রতিবেশটিও যে ফুটাইয়া তোলা দরকার, একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু মৌলানা আজাদের একটি উক্তিতে এক্ষেত্রে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগিয়াছে। তিনি অহিংস পন্থায় ভারতের স্বাধীনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অহিংসার নীতি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল, ইহা সত্য; কিন্তু অহিংসার দার্শনিক মহিমা ঐতিহাসিকের বিবেচনার বিষয়ীভূত নিশ্চয়ই নয়, কিংবা হিংসার নীতির অপকর্ষও তাঁহাদের বিচারের গণ্ডির মধ্যে পড়ে না। প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীনতার আন্দোলনে যে শক্তি যেভাবেই আত্মপ্রকাশ করুক না কেন, তাহার যথাযথ স্বীকৃতি যদি এই ইতিহাসে না থাকে, তবে তাহা প্রকৃত ইতিহাস পদবাচ্য হইতে পারে না। সুতরাং হিংসা এবং অহিংসার প্রশ্ন এক্ষেত্রে একান্তই অবান্তর। প্রকৃত প্রস্তাবে ভারত হইতে বৈদেশিক প্রভুত্ব উৎখাতের কাজে শুধু অহিংসার নীতিই কাজ করে নাই, পরন্তু হিংসা বা বলপ্রয়োগ বা রক্তপাতের নীতিও কাজ করিয়াছে এবং শেষোক্ত নীতি যাঁহারা অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদের অবদানের মূল্যও সামান্য নয়। ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ইঁহাদের আত্মদানের মহিমা উজ্জ্বল হইয়া উঠে এবং বিশেষ নীতির মাহাত্ম্যে প্রকৃত সত্য প্রচ্ছন্ন না হয়, আমরা ইহাই দেখিতে চাই।

ভারতে মিঃ ক্লিমেণ্ট এটলী

বৃটিশ শ্রমিক দলের পূর্বতন প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলী রেঙ্গুণে নিখিল এসিয়া সমাজতন্ত্রী দলের অধিবেশনে যোগদানের জন্য যাইবার পথে অল্প সময়ের জন্য ভারতে পদার্পণ করেন। মিঃ এটলীর গভর্নমেণ্টের আমলে ভারত স্বাধীনতা লাভ করে; কিন্তু ভারতের মুক্তিদাতা কিংবা স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠাতৃস্বরূপে তাঁহাকে আমরা মর্যাদা দিতে পারি না। ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি তাঁহার সহানুভূতি আছে এবং তিনি গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি অনুরাগী এই হিসাবেই আমরা মিঃ এটলীকে আমাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। মিঃ এটলী ভারতকে স্বাধীন গণতন্ত্রের শীর্ষস্থানীয় মর্যাদা দিয়াছেন। ভারতকে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র এশিয়ার গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহ সংহত হইয়া উঠিবে, তিনি আশা প্রকাশ করিয়াছেন। বর্তমান জগতে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বী দুইটি প্রধান রাষ্ট্রগোষ্ঠী, রাশিয়া এবং আমেরিকা, এই দুইয়ের কূটনীতির খেলা হইতে বলিষ্ঠভাবে স্বতন্ত্রতা বজায় রাখিয়া ভারত কতটা অগ্রসর হইতে পারিবে, তাহার উপরই ভারতের এই মর্যাদা নির্ভর করিতেছে। মিঃ এটলীর প্রশংসা-বাক্য যদি আমাদিগকে আত্মশক্তিতে জাগ্রত হইবার জন্য সচেতন করে এবং রাষ্ট্র হিসাবে আমাদের কর্তব্য এবং দায়িত্বের গুরুত্ব যদি আমরা উপলব্ধি করিতে পারি, তবেই সুখের বিষয়।

বোদলেয়ার অবলম্বনে

সান্ধ্য সুর

বুদ্ধদেব বসু

এই তো সেই লগ্ন যবে বৃন্ত-'পরে দুলে
প্রতিটি ফুল মিলায়ে যায় যেন ধূপের ধোঁয়া;
গন্ধ আর শব্দ নিয়ে অন্ধকার হাওয়া
করুণ ভালস-নাচের তালে ফেনিয়ে ওঠে ফুলে।

প্রতিটি ফুল মিলায়ে যায় যেন ধূপের ধোঁয়া;
বেহালা, যেন আতুর প্রাণ, তীব্র তান তোলে;
করুণ ভালস-নাচের তাল ফেনিয়ে ওঠে ফুলে;
বিষাদে হয়ে শ্রীমতী, নামে আকাশ জুড়ে ছায়া।

বেহালা যেন আতুর প্রাণ তীব্র তান তোলে,
কোমল প্রাণ, সহে না এই কালো জোয়ার বাওয়া।
বিষাদে হ'য়ে শ্রীমতী, নামে আকাশ জুড়ে ছায়া;
রক্তঝরা উদ্‌গীরণে সূর্য যায় গ'লে।

কোমল প্রাণ, সহে না তার কালো জোয়ার বাওয়া,
কুড়িয়ে নেয় পূর্বাচলে যা-কিছু সোনা জ্বলে।
রক্তঝরা উদ্‌গীরণে সূর্য যায় গ'লে।
তোমার স্মৃতি আমার বুকে ঈশ্বরের দয়া!

বৈদেশিকী

১৯৫৩

খৃষ্টীয় নব বৎসরের প্রারম্ভে দেশ-বিদেশের রাজনৈতিক নেতারা যে-সব উক্তি করেছেন তাতে অবশ্য যুদ্ধবিগ্রহ বিস্তারের আশংকা বিশেষ প্রকাশ পায় নি। অথচ দু' বছর আগে শুনা গিয়েছিল যে ১৯৫৩ই সব চেয়ে সংকটের বৎসর হবে। সংকট-ত্রাণের জন্য পুনরস্ত্রীকরণের যে-বিপুল পরিকল্পনা আমেরিকা ও পশ্চিম য়ুরোপে চালু হয়েছিল সেটাও তো ঘোষিত লক্ষ্যের তুলনায় এখনো অনেকটা পিছিয়ে আছে বলে প্রকাশ। শুধু তাই নয়, পিছিয়ে আছে বলে বিশেষ উদ্বেগও কেউ দেখাচ্ছেন না অথচ এই পুনরস্ত্রীকরণের ব্যয়-বাহুল্যের ব্যাপার নিয়ে মিঃ এ্যাটলীর মন্ত্রি-মণ্ডলী থেকে মিঃ বিভ্যানের দল পদত্যাগ পর্যন্ত করলেন। তারপর সাধারণ নির্বাচনের ফলে বৃটেনে কনজারভেটিব গবর্ণমেন্ট হোল। লোকের ধারণা ছিল আমেরিকার সঙ্গে অধিকতর একমত হয়ে মিঃ চার্চিল পুনরস্ত্রীকরণের লক্ষ্যের উপর মিঃ এ্যাটলীর চেয়েও বেশি জোর দেবেন। কিন্তু সম্প্রতি মিঃ চার্চিল পুনরস্ত্রীকরণের পূর্ব-পরিকল্পিত বরাদ্দ পর্যন্ত ওঠার চেষ্টা করলেন না। মিঃ বিভ্যান যা বলেছিলেন তাই হোল।

শুধু বৃটেনে নয় পশ্চিম য়ুরোপের অন্যান্য NATO অন্তর্ভুক্ত দেশগুলিতেও পূর্বপরিকল্পিত পুনরস্ত্রীকরণের কার্য-সূচি মত কাজ হয় নি, অনেকটা ঊন রয়েছে। এই সব দেশগুলি আমেরিকাকে একরকম জানিয়ে দিয়েছে যে, পূর্বের পরিকল্পিত পুনরস্ত্রীকরণের অত ভার তাদের সইবে না। যা তিন বছরে করার কথা ছিল তা করতে পাঁচ বছর লাগবে। আর একটা গুরুতর ব্যাপারেও আশানুরূপ কাজ অগ্রসর হয় নি। সেটা হচ্ছে পশ্চিম য়ুরোপের 'সুরক্ষার' জন্য মিলিত বাহিনী গঠন। পশ্চিম জার্মানীর এ্যাডেনোয়ার গভর্নমেণ্টের সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছে তার বিরুদ্ধে জার্মানীর মধ্যেও একটা প্রবল মনোভাব রয়েছে, সেটা জার্মানীর বাইরেও—বিশেষ করে ফ্রান্সে—আন্তরিক সমর্থন পাচ্ছে না। জার্মানীর পুনরস্ত্রীকরণ সম্বন্ধে আমেরিকা কৃতসংকল্প, কিন্তু ফ্রান্সের ভয় যাচ্ছে না। জার্মানীর ভিতরে দুরকমের বিরুদ্ধতা আছে—একদল আছে যারা পুনরস্ত্রীকরণ চায় কিন্তু পুরোপুরি চায় অর্থাৎ এমন ব্যবস্থা চায় যাতে জার্মানীকে খাটো হয়ে থাকতে না হয়। এই দল ক্রমশ মুখর হয়ে উঠছে এবং এই দলকে সন্তুষ্ট না করে জার্মানদের কাছ থেকে সহযোগিতা পাওয়া কঠিন হবে। আমেরিকা এই দলকে ক্রমশ কাছে টেনে নিচ্ছে বলে বোধ হয়। তাতে ফ্রান্সের ভয় ও বৃটেনের অস্বস্তি বাড়ছে। অথচ তাদের এ আশংকাও আছে যে এ্যাডেনোয়ার গভর্নমেণ্টের মারফৎ একটা মাঝামাঝি ধরণের বন্দোবস্তের মধ্যে তাড়াতাড়ি আটকাতে পারলে, জার্মানরা আবার নিজেদের ইচ্ছামতো যেমন করে হোক অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে উঠবে, যেমন ভার্সাই সন্ধির বাঁধন কেটে তারা বেরিয়েছিল।

এ্যাডেনোয়ার গভর্নমেণ্টের সঙ্গে য়ুরোপীয় বাহিনী সম্পর্কে যে চুক্তি হয়েছে—সে চুক্তি এখনো কার্যকরী হয় নি—তার বিরুদ্ধে পশ্চিম জার্মানীর মধ্যেই আর একদিক থেকে আপত্তি আছে। সে আপত্তির দুটি কারণ দেখানো হয়। একটি হোল এই যে, উক্ত চুক্তি অনুসারে পশ্চিম জার্মানীর পুনরস্ত্রীকরণ জার্মানদের পক্ষে বিপজ্জনক হবে—তাতে নিজেদের রক্ষা করার মতো জার্মানদের যথেষ্ট শক্তিও অর্জিত হবে না, অথচ জার্মানীর বুকের উপর যুদ্ধ হবার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। তার চেয়েও আর একটা বড়ো ভয় আছে সেটা হোল এই যে পশ্চিম জার্মানী একবার ইঙ্গ-ফরাসী-মার্কিন সামরিক যন্ত্রের অংগীভূত হলে দ্বিধাবিভক্ত জার্মানীর শান্তিপূর্ণ উপায়ে এক হবার আশা চিরতরে বিনষ্ট হবে। শুধু তাই নয়, যুদ্ধ লাগলে সেটা জার্মান জাতির পক্ষে ভ্রাতৃযুদ্ধে পরিণত হবে, কারণ তখন পশ্চিম জার্মানী ও সোভিয়েট এলাকাভুক্ত পূর্ব জার্মানীকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়তে হবে, জার্মান জার্মানকে মারবে। জার্মান জাতি এই ভয়াবহ পরিণতি থেকে বাঁচতে চায় কিন্তু এক পাশ থেকে সোভিয়েট এবং অন্য পাশ থেকে ইঙ্গ-মার্কিন-ফরাসী শক্তি জার্মান জাতিকে সেই পরিণামের দিকেই ঠেলে নিতে চাচ্ছে।

বর্তমান পৃথিবীর দিকে চাইলে একটা জিনিস লক্ষ্য করা যায়। সেটা হচ্ছে এই, বর্তমানে পৃথিবীর যে দু-জায়গায় রীতিমত যুদ্ধ চলছে দু-জায়গায়ই, তার মধ্যে একটা করে গৃহযুদ্ধ মিশানো আছে। কোরিয়ার যুদ্ধে উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া; ইন্দোচীনে ভিয়েৎমিন ও ভিয়েৎনাম। কোরিয়ায় উত্তর কোরিয়ানদের সঙ্গে চীনা-সৈন্য আছে, সোভিয়েট অস্ত্রশস্ত্র আছে; দক্ষিণ কোরিয়ানদের সঙ্গে আছে মার্কিন, ইংরেজ প্রভৃতি। ভিয়েৎনামকে সঙ্গী করে লড়ছে ইঙ্গ-মার্কিন ব্লকের সাহায্যপুষ্ট

ফ্রান্স এবং ভিয়েৎমিন পাচ্ছে কম্যুনিস্ট ব্লকের সহায়তা। দুই ব্লকের শত্রুতার পাশাপাশি বয়ে চলেছে ভ্রাতৃযুদ্ধের রক্ত-স্রোত। ভবিষ্যতে যদি চীনের সঙ্গে ইঙ্গ-মার্কিন ব্লকের ব্যাপকতর যুদ্ধ বাধে, তবে দেখা যাবে তার মধ্যেও একটি গৃহযুদ্ধ আমদানী করা হয়েছে, তা না হলে ফরমোজায় চিয়াংকাইসেক ও চীনের "জাতীয়" বাহিনীকে পুষে রাখার কোন অর্থ হয় না। আমেরিকা গোটা ইরানকে হাতে রাখার আশা রাখে, তা না হলে হয়ত অ্যাংলো-ইরানিয়ান অয়েল কোম্পানী ও বৃটিশ গভর্নমেন্টের পরামর্শমতো ইরানের দক্ষিণভাগ মুসাদেক গভর্নমেন্টের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সেখানে একটা "স্বাধীন" দক্ষিণ ইরান রাষ্ট্র স্থাপনের চেষ্টা হোত। এই কার্যের জন্য দক্ষিণ ইরানে দু-একজন উপজাতীয় নেতাকে সামনে খাড়া করা অসম্ভব হোত না। তেহরান গভর্নমেন্টকে "সোজা" করার জন্য পূর্বে একাধিকবার ইংরেজরা উপজাতীয়দের উস্কানি দিয়ে বিদ্রোহ করিয়েছে। দক্ষিণ ইরানে একটি "স্বাধীন" রাষ্ট্র ঘোষিত হলে উত্তর ইরানের পক্ষে সোভিয়েট পক্ষপুটের ভিতরে আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকত না এবং তাহলে যথাকালে ইরানেও কোরিয়ার মতো অবস্থার সৃষ্টি হোত। জার্মান জাতি এখনই পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানীর মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, এই বিভাগ কেমন করে দূর করে জাতিকে আবার এক স্বাধীন রাষ্ট্রের মধ্যে আনা যায়, জার্মান জাতির পক্ষে এখন সেইটাই সব-চেয়ে বড়ো সমস্যা। দুই ব্লকের যুদ্ধের মারফৎ যদি জার্মান জাতির ঐক্য ফিরে পেতে হয়, তবে সে ঐক্যের কি রূপ হবে এবং পরিণামে জাতিরই বা কি দশা হবে, কেউ বলতে পারে না। কারণ সে যুদ্ধ জার্মানীর পক্ষে একাংশে হবে গৃহযুদ্ধ। তবে একটা কথা মনে রাখা দরকার। পশ্চিম জার্মানীতেও যেমন অনেক লোক এ্যাডেনোয়ার গভর্নমেন্টের নীতি সমর্থন করছে না, তেমনি পূর্ব জার্মানীতেও হয়ত অনেক লোক আছে, যারা সোভিয়েট-আশ্রিত পূর্ব জার্মান গভর্নমেন্টের নীতিরও সমর্থক নয়। পূর্ব জার্মানীতে হোক অথবা পশ্চিম জার্মানীতে হোক, বেশীরভাগ জার্মান কিসে জার্মান জাতি বাঁচবে, সেই কথাই নিশ্চয়ই ভাবছে। কার্যকালে তারা কি করে, সে সম্বন্ধে ইঙ্গ-মার্কিন ও রুশ কর্তা-ব্যক্তিদের নিশ্চিন্ত হবার উপায় নাই।

সে যাই হোক, মোটের উপর ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ য়ুরোপে "সুরক্ষার" যে পরিমাণ বন্দোবস্ত করা দরকার বলে ঘোষণা করতেন, ততটা হয় নি। অথচ যুদ্ধের আশঙ্কা কমে গেছে, এই রকম একটা ধারণার আভাস ইঙ্গ-মার্কিন মহল থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। এর অর্থ কি? তবে কি সোভিয়েটের আক্রমণাত্মক মনোভাব এবং তোড়জোড় সম্বন্ধে যে সব কথা পূর্বে বলা হচ্ছিল, সেগুলি সত্যি নয় অথবা অত্যুক্তি? অথবা ইতিমধ্যে ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ কি এমন কিছু অস্ত্র আবিষ্কার করেছে, যার ফলে পূর্বের পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যবস্থা করার ততটা দরকার নেই? কয়েক মাস পূর্বে আমেরিকা একটা নব-আবিষ্কৃত বোমার পরখ করে। নূতন বোমার বিষয়ে সরকারী হিসাবে কিছু না জানানো হলেও বেসরকারী এবং কিছুটা আধা-সরকারী যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, তা থেকে অনুমা[ন] হয় যে, আমেরিকা এইচ বম্ব তৈরী করে[ছে] যার ধ্বংস করার শক্তি নাকি এ্যাটম বোমা চেয়েও বহুগুণ বেশি। বৃটেনেরও ইতিম[ধ্যে] নিজস্ব এ্যাটম বোমা হয়েছে। রাশিয়া অব[শ্য] এ্যাটম বোমা তৈরী করছে। তবে এ ব্যাপা[রে] ইঙ্গ-মার্কিনের পুঁজি নিশ্চয়ই বে[শি] বিশেষ করে আমেরিকার এইচ-ব[ম্ব] আবিষ্কারের পরে। এই জন্যই কি যুদ্ধে[র] আশঙ্কা কম বলা হচ্ছে? তা যদি হয়, ত[বে] যুদ্ধের আশঙ্কা সত্যই কমে নি। রাশিয়া[র] যখন এ্যাটম বোমা ছিল না এবং আমেরিকা[র] ছিল, তখন এই কারণেই রাশিয়া যু[দ্ধে] এগোয় নি—একথা ঠিক নয় এবং এখ[ন] আমেরিকার এইচ-বোমা আছে, রাশিয়া[র] নেই। সুতরাং এখন রাশিয়া এগুবে না- এ যুক্তিও ঠিক নয়। যদি ঠিক হোত, ত[বে] ঐ যুক্তির অন্য পিঠ থেকে দেখলে বল[তে] হয় আমেরিকাও তাহলে এতদিনে এস্পা[র] ওস্পার একটা করে ফেলার চেষ্টা কর[ত।] আসলে ১৯৪৫এর পরে সোজাসুজি সাদ[া] সাদায় যুদ্ধের সময় এখনো আসে নি বলে এখনও "বিশ্ব" মহাযুদ্ধ লাগে নি[।] রাজনৈতিকদের প্রকাশ্য উক্তি থেকে যুদ্ধে[র] আশঙ্কার সঠিক পরিমাণ করা যে সব সম[য়] সম্ভব নয়, তার প্রমাণ পৃথিবীতে পূ[র্বে] অনেকবার হয়ে গেছে। যখন ভয় আ[ছে] তখন ভয় গোপন করা এবং যখন ভয় নে[ই] তখন ভয় প্রকাশ করার নজীর ইতিহাস[ে] ছড়ানো রয়েছে। সুতরাং কেবল রা[জ]-নৈতিকদের উক্তি থেকে ১৯৫৩ সা[লে] পৃথিবীর ভাগ্য সম্বন্ধে কিছু আশা [বা] আশঙ্কা করা ঠিক হবে না।

৪।১।৫[৩]

শিলীমুখ

সুচরিতা রায়

ভ্রমর আসিয়া ফুল-বধূটিরে
বলে নিতি কানে কানে,
"তোমার প্রাণের সৌরভ সুধা
সার্থক করো দানে।"
ফুল-বধূ তার দলগুলি মেলি'
সকরুণ লাজে বলে,
"আমার যা' কিছু দিয়েছি তো (প্রিয়)
রিক্ত ক'রেছো ছলে॥"

কাশ্মীর ভ্রমণ

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

৬

মানুষের দেখা সবসময় ড্রইংরুমে পাওয়া যায় না। চালে চলনে দুরস্ত-কেতা দুরস্ত লোকের সন্ধান হয়তো সেখানে অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু তাদের উপস্থিতিতে প্রাণ যেন হাঁপিয়ে ওঠে, মনে হয় কখন এই দমবন্ধ করা আবহাওয়া হতে মুক্তি পাব। অথচ, পথ চলতে চলতে হঠাৎ এক এক সময় অত্যন্ত সাধারণ স্তরেও এক একজন মানুষের দেখা মিলে যায়, যাদের পরিচয় পেলে মন আশ্বস্ত হয়, পরিপূর্ণ প্রশান্তিতে প্রাণ ভরে যায়। হয়তো তাদের শিক্ষা নেই দীক্ষা নেই, চাল নেই চলন নেই বেশভূষা নেই আড়ম্বর নেই, পুঁথিগত বিদ্যার ভার নেই, সামাজিক পালিশের চটক নেই—কিন্তু তবু তারা এমন পরিপূর্ণ প্রশান্তির সঙ্গে জীবনটিকে বহন করছে, মানুষকে ভালবাসতে জানে, লোভ ক্রোধে তারা দিগ্ধ নয়, স্বল্পে সন্তুষ্ট, আনন্দে ভরপুর। শ্রীনগরে হঠাৎ এমনই একজন লোকের সন্ধান মিলে গেল। তার নাম সাদিক চেলা। সে হল ফুলওয়ালা, ছোট্ট একটি বোট নিয়ে ঝিলমের হাউসবোটে হাউসবোটে ফুল বিক্রি করে বেড়ায়। বয়স কত তার ঠিক নেই, অনেকেই বলে, সে নব্বই পেরিয়েছে, গলিতদন্ত, ঝাঁকড়া চুল আর দাড়ি, শতছিন্ন জামা, মুখে একটি প্রশান্ত হাসি। প্রথম দিনই সে প্রাণখোলা হাসি হাসতে হাসতে এসে বলল—ফুল নাও। অপরিচয়ের সঙ্কোচ নেই, সাধারণ ব্যবসাদারের দীনতা নেই। যেন জানে, তার কাছে ফুল আমি নেবই। দ্বিধাও তার সেইজন্য নেই। ঐ ফুলদানিটায় হলদে ফুলগুলি রাখো, মাঝের ফুলদানিটায় এই বড় কমলটি দাও, কোণে এই নীল ফুলগুলি রাখো। এত ফুল দিলো দেখে, শহুরে মানুষ আমরা, শঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, দাম? উত্তর পেলাম, আমার ফুলের কোন দাম নেই, ফকিরের চেলা আমি, পেটটা চলে গেলেই হল, যদি তোমার কাছেই তা পেয়ে যাই তা হলে আর ফুলবিক্রি করতে যাব না, বাকী ফুলগুলি বাবা ধরমদাসের মন্দিরে সাজিয়ে দেব। ফকিরের মানা আছে ভিক্ষে করতে, তাই এই ফুল নিয়ে আসি। এমন আশ্চর্য বেপারীর হাতে কখনও পড়িনি। আমি তাকে একটি টাকা দিলাম। বুড়ো খুব খুশী হয়ে বলল, আমার এত প্রয়োজন ছিল না, যাই হোক্ এতে আমার ক'দিন বেশ চলে যাবে, ক'দিন আর ফুল বিক্রি করতে হবে না, আমার ফকিরের কবরেই ক'দিন সব ফুল দিতে পারব। এই বলে বুড়ো লোটের মুখ ফিরিয়ে উজান বয়ে শহরের বাইরে চলে গেল, আর ফুল বিক্রিও করল না। তারপর তিনচারদিন আমরা ঝিলমে যথেষ্ট বেড়ালাম, কিন্তু সাদিক চেলার আর কোনও সন্ধানই নেই। তারপর একদিন সে এসে হাজির। সেদিন দাম দিলাম আট আনা, কিন্তু ফুল দিয়ে গেল প্রথম দিনের চেয়ে অনেক বেশী; আর দিল একটি প্রকাণ্ড ম্যাগ্‌নোলিয়া, গন্ধে তার চারদিক ভরপুর, বলল, তোমারই জন্য এনেছি।

এমন আশ্চর্য মানুষ তো সচরাচর দেখা যায় না। অভাব তার যথেষ্ট, কিন্তু তবু তার অভাববোধ নেই, অভাববোধের পীড়নও নেই। শতছিন্ন জামার চেয়ে বেশী কিছুর প্রয়োজন সে বোধ করে না। সব ফুলগুলি

সাদিক চেলা

অধিকাংশ বাড়ীর নমুনা ঃ প্রথম তলা পাথরের গাঁথনি, উপর তলা কাঠের ফ্রেমে টুকরো ইঁটে ভরতি। টিনের ছাদ, পলেস্তারার বালাই নেই

ব্যবসাদারের মত বিক্রি করলে সহজেই তার তিন চার টাকা দৈনিক উপার্জন হতে পারত, কিন্তু তাতেও তার দরকার নেই। গুরুর নিষেধ ভিক্ষা করা, তাই ফুল বেচাটা তার জীবিকার উপলক্ষ্য মাত্র, ন্যূনতম প্রয়োজনটি মিটে গেলেই সে আর ফুল বিক্রি করবে না, সে ফুল সাজিয়ে দেবে পীরের কবরে কিম্বা বাবা ধরমদাসের মন্দিরে। পীরের চেলা, তার কিন্তু মন্দিরে মসজিদে কোনও তফাৎ নেই, কোন সংসার নেই, অবিবাহিত সে, তার আস্তানাও কিছু নেই, আজ এখানে কাল ওখানে কাটিয়ে দেয়। তাই সে ফুল বিক্রিও করতে আসে সাধারণ কারবারীদের মত লম্বা সেলাম ঠুকতে ঠুকতে নয়, বেশ সহজে স্বচ্ছন্দে, যেন তার একটা দাবী আছে—সে দাবী-পূরণ করবার জন্য আমরা রাজী হয়েই আছি। তার এই জোরের মূল ব্যবসাদারীতে নয়, ব্যবসাদারীতে এ জোর হয় না, তার মূল অন্যত্র।

একালের হালচাল সম্বন্ধেও তার কোন আফসোস ছিল না। সেকালের তুলনায় একালের মতিগতির কথা জিজ্ঞাসা করলে সে হা হা করে হেসে উঠত। বলত অবশ্য যে, যুগ অনেক বদলে গিয়েছে। তা না হলে দেখুননা সরকার, এই ফুল কি বিক্রি করবার জিনিস, না ঘর সাজাবার জিনিস? এতো তুলে এনে দেবতাকে অর্ঘ্য দিতে হয়। সেকালে মহারাজারা সকালে উঠে পূজো সেরে সূর্য প্রণাম করতেন, তারপর তিন চার শিকারা ফুল ভাসিয়ে দিতেন ঝিলমের জলে। তখন মহারাজার বাড়ীতে সন্ন্যাসীদের সদাব্রত খোলা থাকত। তার উপর অমরনাথযাত্রী সাধুরা মহারাজার কাছ থেকে পেতেন পথের খাদ্যদ্রব্য ও প্রত্যেকে একখানি কম্বল, আজ সে সব দিন বদলে গিয়েছে। তখন মানুষে কি নিষ্ঠার সঙ্গে তীর্থযাত্রা করত কত কষ্ট উপেক্ষা করে। আর আজ হয়তো হাওয়াই জাহাজ গিয়ে নামবে অমরনাথ গুহার সামনে। তক্‌লিফের আসান তো হল সরকার, কিন্তু তাতে কি ইন্‌সাফের দিল্ সাফ হবে? কিন্তু আফ্‌সোসের কি আছে সরকার? খোদার রাজত্বে আফসোসের কিছু নেই, এ সবই তাঁর পরীক্ষা, এই বলেই আবার সেই প্রাণ-খোলা হাসি।

আশ্চর্য লোক। এমন করে জীবনকে বহন করা, এই সমাজে থেকেও অক্রোধের মধ্যে অগ্রহের মধ্যে আনন্দলোকে বাস করা, এই তো পরম প্রশান্তি, জীবনের এই তো পূর্ণতা। আমাদের শিক্ষিত সভ্য মানুষের সত্তা কত খণ্ডিত, দ্বেষ-হিংসায় জর্জর, অপ্রাপ্তির আশংকায় ত্রস্ত, জীবনকে আমরা এমনভাবে গ্রহণ করিতে পারি কই? অথচ এই অশিক্ষিত অমার্জিত বৃদ্ধের মধ্যে জীবনের কি সুন্দর রূপেই না মূর্তি পরিগ্রহ করেছে।

তার একটি মাত্র অনুরোধ ছিল, তার একটি ছবি তুলে দিলে সেই ছবিটি তার দেহান্তের পর গুরুর কবরের পদতলে রাখা থাকতে পারবে। তার একটি ছবি তুলে দিয়েছিলাম।

৭

এখন এদের জীবনযাত্রার কথা দু'চারটে বলি। এদেশে এসে সব চেয়ে বেশি করে চোখে পড়ে এদেশের নিদারুণ দারিদ্র্য। আমরা দরিদ্র দেশের লোক, দারিদ্র্য দশা দেখতে আমাদের চোখ অত্যন্ত অভ্যস্ত, সাধারণ হীন দশা আমাদের চোখে না ঠেকবারই কথা, কিন্তু সেই চোখেও এদেশের দারিদ্র্য বেশ ঠেকে। শ্রীনগর শহর তো এতকাল ধরে প্রমোদের কেন্দ্র হয়ে আছে, কিন্তু ভারতবর্ষের অন্যান্য পাহাড়ে শহর যেমন বিদেশী এবং এদেশী ধনবানদের কৃপায় সুসজ্জিত শ্রীনগর তা নয়। তার একটা কারণ বোধ হয় কাশ্মীরে বিদেশীদের জমি কেনা বাড়ী করা সুগম ছিল না, সম্ভবত এখনও কিছু কিছু বাধা-নিষেধ আছে। কিন্তু সেইটেই একমাত্র কারণ নয়, কাশ্মীরে ধনবান ব্যক্তি থাকলে তাঁদেরও তো দু' চারটি প্রাসাদ থাকতে পারত। কিন্তু সে সব কিছুই নেই। প্রাসাদ বলতে ঐ মহারাজার প্রাসাদ ছাড়া আর কিছু নেই। ডাল লেকের ধারে গুটিকয়েক সুশ্রী আধুনিক বাড়ী আছে মাত্র। শ্রীনগরের অধিকাংশ বাড়ী এক বিচিত্র ভঙ্গীর। সাধারণত নিচের তলাটা মোটা মোটা পাথরের মুখে জোড় দেওয়া দেওয়াল, যাকে বিশেষজ্ঞরা বোধ হয় বলে থাকেন সাইক্লোপীয় পদ্ধতি। তার উপর তলাগুলো সাধারণত ছোট ছোট টুকরো ভাঙা ইঁটের গাঁথনি- গাঁথনি বললে হয়তো ভুল করা হবে, কেন না কাঠের ফ্রেমের মধ্যে ঝুরো মালমশলা বা কাদা ফেলে তার মধ্যে ইঁটের টুকরোগুলি বসিয়ে দেওয়া হয়েছে মাত্র। কোনও বাড়ীর বাইরের দেওয়ালগুলিতে পলেস্তারার কোনও বালাই নেই, জানালা-গুলিতে বেশির ভাগ কাঠের জালিকাজ করা, মাথার উপর সমান পাকা ছাদ নেই বললেই চলে, বেশির ভাগই টিনের ছাদ। এই হল অধিকাংশ বাড়ীর নমুনা। কিন্তু ও ধরণের বাড়ী শহরে দেখতে পাওয়া যায়। গ্রামে গেলে দেখতে পাওয়া যাবে সবই সেই সনাতন চালাঘর। জীর্ণ দারিদ্র্যদশায় এরা ভারতবর্ষের অন্য জায়গা থেকে কম নয়, বরং বেশি, তেমনি তফাৎ পোষাকেও। অবশ্য শহুরে কাশ্মীরী বা একটু ভাল অবস্থার

কাশ্মীরীদেরও পোষাকেরও তেমন খুব জৌলুস নেই, তবু তাদের পরনে কোট মাথায় সাদা পাগড়ি থাকে। চাষীদের পোষাক সে তুলনায় অত্যন্ত দীন—গরম কালে পরে হাঁটু অবধি পাজামা, কনুই অবধি কুর্তা, মাথায় একটা skull-cap, শীতকালে তার উপর একটা কম্বল জড়ানো, না হয় তো একটা আলখাল্লা। দারিদ্র্যের ছাপ খুব প্রকট। কাশ্মীরী খানার নাম তো জগৎ-জোড়া। কিন্তু ময়রা যেমন সন্দেশ খায় না তেমনি সে খানাও ওরা নিজেরা খায় না—প্রধানত ব্যয়সাধ্য বলে। সাধারণ লোকের খানার হল দুবেলা ভাত, তার সঙ্গে শাক-সব্জি কিছু, কখনও মাংস। অথচ কাশ্মীরীরা মাংস খেতে ভালবাসে—কিন্তু সাধ্যে কুলোয় না, রোজ মাংস খাওয়া তাদের কল্পনাতীত। গরবীদের অবস্থা সারা জগতেই এই। সুইট্জারলণ্ডেও দেখেছি, ভদ্র সম্প্রদায় মাছ মাংস দুধ পনীর শাক-সব্জি রুটি ইত্যাদি কতরকমের জিনিস খায়, অথচ সেই মহাহিমের দেশে পর্বতচারী চাষীরা বিশেষত গরীব চাষীরা—দুবেলাই খায় ভুট্টা আর কফি; মাসে দু'চারদিন সামান্য মাংস।

এই দারিদ্র্যের কারণ অনেকগুলি, কাশ্মীরের হাতের কাজ—যেমন শালের কাজ, কাঠের কাজ, রুপোর কাজের—খ্যাতি জগৎ জোড়া। বাইরে এসব জিনিসের দামও যথেষ্ট। আমরা দেখেছিলাম সব—তুষের উপর আগাগোড়া কাজ করে একটি জামেয়ার তৈরী হচ্ছিল, ঐ একখানিরই দাম ২১০০৲ কিন্তু তার মধ্যে জিনিসের দামটা খুব চড়া—তা বাদ দিয়ে কারিগরেরা যা মজুরী পায় তা খুব বেশি নয়। সাধারণ কারিগরদের দৈনিক মজুরী এক টাকা দেড় টাকার বেশি নয়। কিন্তু এ কারিগরের সংখ্যাই বা কত—সমস্ত জনসংখ্যার কতটুকু অংশই বা এরা। এতে সারা দেশের অর্থনৈতিক চেহারার খুব বেশি কিছু বদল হয় না। এই সব কুটীরশিল্প ছাড়া অন্য কোনও শিল্প কাশ্মীরে নেই,—কাজেই সবটাই চাষের উপর বা ছোটখাট ব্যবসার উপর নির্ভর। দর্শকদের সমাগম সেজন্য কাশ্মীরের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু সে-ও তো বছরে বড় জোর ছ' মাস। বাস্তবিক, কাশ্মীরের প্রায় সকল স্তরের লোককেই ছ'মাসের উপার্জনে সারা বছর কাটাতে হয়। শীতকালে চাষাবাসও নেই, দর্শক সমাগমও নেই—জীবিকার কোনও উপায় নেই, সুতরাং গ্রীষ্মকালের উপার্জনের উপরই সারা বছর নির্ভর। এ অবস্থায় আরও নিদারুণ দারিদ্র্য অবশ্যম্ভাবী, তার উপর বর্তমানে জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে। রাওয়ালপিণ্ডির পথ বন্ধ হওয়ায় এখন সব জিনিসই নিয়ে যেতে হয় পাঠান-কোট-জম্মুর পথে, হয় মোটরে না হয় এরোপ্লেনে। দাম বেশি অনিবার্য। কেবল চালের দর সস্তা। শোনা গেল যে এক খারোয়ার অর্থাৎ দুমণ ধানের দাম নাকি পনের থেকে কুড়ি টাকার কাছাকাছি। অবশ্য কালোবাজারও আছে; কাশ্মীরে প্রায় কুড়ি বছর থেকে ঢিলে ঢালা এক রকম প্রোকিওরমেণ্ট চলে আসছে। একবার ব্যবসাদারো দল পাকিয়ে দেশময় দাম বাড়াবার চেষ্টা করায় নাকি এই ব্যবস্থা চালু হয়। জাগীরদারদের কাছ থেকে বাড়তি ধান নিয়ে শহরে আনা হয়,—মস্ত বড় বড় গোলা আছে শ্রীনগরে ঝিলমের ধারে—সেখান থেকে আবার শহর অঞ্চলে রেশন কার্ড মারফৎ বিলি করা হয়। কিন্তু সব ব্যবস্থাটাই অত্যন্ত ঢিলে। কার কত জমি, কত উদ্বৃত্ত এ-সব সম্বন্ধে ঘরে ঘরে কোনই খোঁজ নেওয়া হয় না, ঐ যারা দিয়ে আসছে তারাই দিয়ে থাকে বরাবর। রেশন কার্ডও ঐ ধরণের। কোন মান্ধাতার আমলে যে পরিবারে লোকসংখ্যা ছিল তিন-জন আজও তার রেশন কার্ডে তিনজনই রয়ে গেছে; নানা চেষ্টা সত্ত্বেও তা বাড়ে না। তবে বাজারে এমন দোকানও আছে, সেগুলির দাম বাঁধবার একটা ক্ষীণ চেষ্টাও আছে—কিন্তু সে চেষ্টা অনেক ক্ষেত্রেই কাজের হয় না। কাশ্মীরী ব্যবসাদারেরা তো এমনই তিরিশ টাকার জিনিসের দর হাঁকতে শুরু করে একশো টাকা থেকে, এ তো তাদের জন্মগত অভ্যাস। তার উপর শাসন ব্যবস্থা এখনও খুব কড়া হয়ে বসেনি, অনেকখানি ঢিলে ঢালা আছে, কাজেই এ ধরণের ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা স্বাভাবিক। আর কাশ্মীরকেই বা দোষ দিই কেন? ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থা তো ঢের কড়া,—তবু সেখানেও তো এই সব ত্রুটি-বিচ্যুতির অন্ত নেই।

গ্রাম, চালাঘর

এই প্রসঙ্গে কাশ্মীরের রাজনৈতিক পরি-স্থিতির কথাও মনে আসে। এখানকার পরিস্থিতির কিছুটা ইতিহাস না জানলে এখনকার মানসিক আবহাওয়া সম্পূর্ণ বুঝতে পারা যাবে না। প্রথমেই মহারাজদের কথা। মহারাজ প্রতাপ সিংহ বা গোলাপ সিংহের আমলে একালের গণতন্ত্রের চিহ্ন-মাত্র ছিল না একথা সত্য। কিন্তু তখনও মহারাজার দরবার জনসাধারণের পক্ষে রুদ্ধ ছিল না। সাদিক চেলা গল্প বলে, জামার থানের দর চার আনা হতেই তারা দল বেঁধে মহারাজার দরবারে গিয়ে নালিশ জানিয়ে এসেছিল; মহারাজা ব্যবসাদারদের ধমকে ধামকে দর কমিয়ে দিয়েছিলেন। সে সময় মোটর এরোপ্লেন ছিল না, মহারাজারা পথ চলতেন ঘোড়ায়, গ্রামে গ্রামে থামতেন, প্রজা-দের অবস্থা স্বচক্ষে দেখাও হত, তাদের

অভাব অভিযোগের কথা স্বকর্ণে শুনতেনও। অটোক্রেসি বটে, কিন্তু অনেক সময় benevolent autocracy· সে যুগে জনসাধারণ এতেই খুশী ছিল। ক্রমে হাওয়া বদল হল। মহারাজারা সাবেকি চাল ছাড়লেন, দরবারের পথ জনসাধারণের কাছে রুদ্ধ হয়ে গেল। মহারাজা প্লেনে মোটরে চলতে লাগলেন; জনতা থেকে তাঁর ব্যবধান ক্রমেই বাড়তে লাগল, তাঁর বেশির ভাগ সময় কাটতে লাগল য়ুরোপে ইংলণ্ডে। প্যারিস থেকে এলো এক লাখ টাকার আসবাব কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ আসবাব হাতের কাছে থাকা সত্ত্বেও। জনচিত্ত আহত হতে শুরু করল। কিন্তু জনচিত্ত সবচেয়ে বিক্ষুব্ধ হল কাশ্মীর গণ্ডগোলের সময়। মহারাজা সেই বিপদের মুখে দেশকে ভাসিয়ে দিয়ে কাশ্মীর ছেড়ে চুপিচুপি পালিয়ে যাওয়ায়। এর পিছনে কি রহস্য ছিল, তা বলতে পারব না। কোন কোন উচ্চ রাজনৈতিক মহলে শুনেছি, শেখ আবদুল্লা নাকি মহারাজ হরিসিংহের সঙ্গে কাজ করতে রাজি হননি, সেইজন্য করণ সিংহ যাতে রাজপ্রমুখ হতে পারেন, সেই জন্যই নাকি হরি সিংহকে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হতে হয়েছিল। কিন্তু একথা সত্যই হোক মিথ্যাই হোক, দেশের লোকের কাছে আজ বহুল প্রচারিত যে হরি সিংহ বিপদের সময় পালিয়েছিলেন। পদস্থ কর্মচারী হতে শুরু করে ব্যবসাদার টাঙ্গাওয়ালা মোটর ড্রাইভার প্রভৃতি সকলেই মনেপ্রাণে একথা বিশ্বাস করে। সেজন্য মহারাজা নামক প্রতিষ্ঠানটির উপর তারা আস্থা হারিয়েছে। পক্ষান্তরে শ্রীনগর উপত্যকার প্রত্যেকটি লোকের জ্বলন্ত বিশ্বাস, শেখ আবদুল্লা তাদের ভাল করতে সক্ষম। এতদিন দেওয়ানী করে এসেছেন বেশির ভাগই বিদেশীরা—যেমন গোপালস্বামী আয়েঙ্গার, রামস্বামী আয়ার, মেহেরচাঁদ মহাজন। এইতো প্রথম একজন সাধারণ কাশ্মীরীর হাতে রাজত্ব ভার এলো। এ নিয়ে ওদের গর্বের অন্ত নেই। দ্বিতীয়ত পাকিস্থানী হানার সময় ন্যাশনাল কন্ফারেন্সই এগিয়ে এসেছিল। তৃতীয়ত, শেখ আবদুল্লার রাজত্বে কিছু কিছু উন্নতিও প্রত্যক্ষ হতে শুরু হয়েছে; কিছু নতুন ক্যানাল, পথ, কৃষি বিদ্যালয় আমিও দেখেছি; পূর্বে হাউস বোটের মালিকরা (তাঁদের হাজী বলে) যে যার খুশীমত ঠকিয়ে পয়সা নেবার চেষ্টা করত; এখন সরকারী ভিজিটরস ব্যুরোর ডিরেক্টরের কৃপায় ওসব আর কিছু হবার উপায় নেই। এইসব কারণে শেখ আবদুল্লার উপর এদের অগাধ বিশ্বাস।

পাকিস্থানী হানাদারেরা এদের উপর অত্যাচার করেছে যথেষ্ট। লুঠতরাজ করেছে, বাড়ীঘর পুড়িয়েছে, ক্ষেতের ফসল নষ্ট করেছে। মেয়েদের শরীর থেকে গয়না ছিঁড়ে নিয়েছে, নারী অপহরণও করেছে। সেসব কথা এরা এখনও ভুলতে পারেনি। কিন্তু এ সবের জন্য যে পরিমাণে তীব্র বিরাগ থাকা স্বাভাবিক ছিল, ততখানি তীব্র বিরাগ লক্ষ্য করিনি, অন্তত বিরাগ থাকলেও তার খুব জ্বালাময় প্রকাশ বেশি দেখিনি। (প্রসঙ্গত একথা কি সত্য যে, শেখ আবদুল্লা রাজত্ব ভার পেয়েই বলেছিলেন, তাঁরা ভারতবর্ষ বা পাকিস্থান কোনটির সঙ্গে যোগ দেবেন, তা ঠিক করেননি?) কিন্তু একথাও সত্য যে, পাকিস্থানের প্রতি এদের অনুরাগও নেই। আসলে সকল লোকই খুব গভীরভাবে বিশ্বাস করে যে, কাশ্মীর হল কেবলমাত্র কাশ্মীরীদেরই জন্য। রাজনৈতিক কর্মী, ন্যাশনাল কন্ফারেন্সের ছোট বড় কর্মকর্তা হতে শুরু করে অতি সাধারণ মানুষ পর্যন্ত এইকথা ভাবতে একেবারে উদ্দীপিত হয়ে ওঠে যে, কাশ্মীরের আকাশ বাতাস জলস্থলে কাশ্মীরীদেরই পরিপূর্ণ অধিকার। এর ফলে তারা যে ভারতবর্ষের অংশ একথা তাদের চিন্তায় আসে না। ভারতবর্ষ তাদের বন্ধুরাষ্ট্র, মিত্রশক্তি, সৈন্যবল ও অর্থবল দিয়ে তাদের বিপদে সাহায্য করেছে, তার জন্য তারা কিছুটা কৃতজ্ঞ, এইমাত্র। মহাত্মা গান্ধী একজন বড় নেতা, নেহরু তাদের বন্ধু। কিন্তু নেহরু যে তাদেরও প্রধানমন্ত্রী, কাশ্মীরের প্রতিনিধি যে ভারতবর্ষের আইনসভায় আসন গ্রহণ করে ভারতবর্ষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে অংশ গ্রহণ করছে, এসব চিন্তাভাবনার কোনও সন্ধানই পওয়া যায় না, যাঁরা রাজনৈতিক ঘোরপ্যাঁচের কথা কইতে অভ্যস্ত নন, এমনই সাধারণ মানুষদের সঙ্গে আলাপ করবার সময় অবিরতই দেখেছি, কাশ্মীর হল কাশ্মীরীদের জন্যই, ভারতবর্ষ তাদের সাহায্যকারী বন্ধুরাষ্ট্রমাত্র—এই ভাবটাই তাদের কথাবার্তায় খুব দ্বিধাহীন স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। ভারতবর্ষের পতাকা কাশ্মীরের কোথায়ও দেখা যাবে না। সযত্ন চেষ্টায় এখন এই চিন্তাধারা চারপাশে এমন ছড়িয়ে পড়েছে যে, সে বিশ্বাসের তীব্রতা দেখে মনে হয়, এরপর শেখ আবদুল্লাও আর এর মোড় ঘোরাতে পারবেন কিনা সন্দেহ। এ বিশ্বাসের তীব্রতা তার প্রতিক্রিয়া তুলেছে জম্মু আর লাদাখ অঞ্চলে, এদিকে যতই এই বিশ্বাস বাড়ছে, ওদিকে জম্মু এবং লাদাখ ততই ব্যাকুল হয়ে পড়ছে সম্পূর্ণ ভারতভুক্তির জন্য। কিন্তু জম্মু বা লাদাখে যাই হোক, কাশ্মীর উপত্যকার লোকের মনোভাব অন্য। আর কাশ্মীর উপত্যকাই ওখানে রাজনীতির পুরোভাগে।

৮

অবশেষে স্বর্গ হতে বিদায়ের দিন ঘনিয়ে এলো। আমাদের যাত্রা স্থির হয়ে গেল শ্রীনগর থেকে দিল্লী, দিল্লী থেকে কলকাতা। প্রথম দর্শনে ওয়ার্ডসওয়ার্থের ইয়ারো দেখার মত জেগেছিল ক্ষোভ; শেষের দিনে ওয়ার্ডসওয়ার্থের ইয়ারো বারবার দেখবার মতই বোধ হয় মিললো সান্ত্বনা। শুধু দার্শনিক সান্ত্বনা নয়, চোখেরও তৃপ্তি। শ্রীনগরের বাজার গলি দেখতে দেখতে মনে হয় কাশ্মীরের সৌন্দর্য বুঝি কেবলই "দৃষ্টি এড়ায়, পালিয়ে বেড়ায়, ডাক দিয়ে যায় ইঙ্গিতে।" কিন্তু কাশ্মীর শ্রীকে তার পরিপূর্ণতায় গ্রহণ করতে পারলে তার বিচিত্র শোভায় মন পরিপূর্ণ হয়ে যায়। বিশেষতঃ যারা আল্পসের সৌন্দর্য দেখেননি, তাঁদের পক্ষে এ শোভা অনাস্বাদিতপূর্ব। ভারতবর্ষে এমন তুষার, পাহাড়, নদী, হ্রদ এবং শ্যামল উপত্যকার মিলন আর কোথায়ও ঘটেনি। এক হিসেবে আল্পসের শোভা হতেও এ অনন্য। আল্পসে উপত্যকাগুলি পরিধি ছোট, এমন দিগন্ত বিস্তৃত নয়। সেইজন্য যেন আরও অনেকটা বুকচাপা; কিন্তু এখানকার সবুজ ধানে হিল্লোলিত দিগন্তব্যাপী মাঠ উদার মুক্তির নিঃশ্বাস আনে। মাঝে মাঝে চেনার পপলার উইলো সাইপ্রেসের সারি; কোথায়ও কোথায়ও হ্রদ বাঁকে বাঁকে চলেছে নদী, দূরে তুষারের ইঙ্গিত, আরও আরও দূরে বিশাল পাহাড়ের সারি, ঘনীভূত তুষার আর তুষার-নদী, আরও দূরে হিমালয়ের অত্যুচ্চ গিরি শ্রেণী, তার ফাঁকে ফাঁকে পথ চলেছে খোরাসান ইয়ারকন্দ সমরকন্দের দিকে। যাত্রা পূর্বদিন গৃহতরীর ছাদে বসে আছি স্তব্ধ হয়ে; বিকেল হয়ে মাথায় ঢলে পড়েছে পড়ন্ত রোদ, শিকারা চলেছে মাঝে মাঝে জলতরঙ্গ তুলে, চারদিকে প্রশান্ত স্তব্ধতা। দিনের আলো ক্রমে

লিয়ে গেল; নেমে এলো অন্ধকার, মাথার পর তারাখচিত আকাশ, দুপাশে স্তব্ধ নারের সারি। প্রাণের স্পন্দন বাইরে দেখা না, অথচ সমস্ত প্রাণশক্তি যেন ব্ধতার মধ্যে সংহত ও উদ্যত হয়ে হে। অনুভব করতে পারি, এমনি সময় লম নদীবক্ষে বসেই তো কবি লিখে-লেন,—

ধারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
আঁধারে মলিন হল, যেন খাপে ঢাকা
বাঁকা তলোয়ার;
দিনের ভাঁটার শেষে রাত্রির জোয়ার
লো তার ভেসে-আসা তারাফুল নিয়ে কালো
জলে;
অন্ধকার গিরিতটতলে
দেওদার তরু সারে সারে;
ন হল, সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে,
বলিতে পারে না স্পষ্ট করি—
ক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি॥

সময় যদি হঠাৎ হু হু করে বাতাস বয়ে যেত, বলাকার তীব্রগতিছন্দে আকাশ চিরে জাগত স্পন্দন, তাহলে সত্যিই মনে হত সেই অব্যক্তের আবরণ ছিঁড়ে ফেলে হঠাৎ প্রাণের লীলা দিগন্ত সম ঢেউ তুলে গেল, তার আবেগে গাছের সারি পাহাড়ও চঞ্চল হয়ে উঠল যেন—

এ পাখার বাণী
দিল আনি
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ।
পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ;
তরুশ্রেণী চাহে পাখা মেলি
মাটির বন্ধন ফেলি
ওই শব্দরেখা ধরে চকিতে হইতে দিশাহারা,
আকাশের খুঁজিতে কিনারা।

এ কবিতার সাহিত্যিক বা দার্শনিক ব্যাখ্যা যাই থাক্, চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি কবিতার সেই দৃশ্য সেই তারাফলে খচিত স্তব্ধ আকাশ, মৌন পাহাড়ের সারি, কালি-ঢালা নদীর পাশে নিস্তব্ধ তরুশ্রেণী —এ সবের মধ্যেই অনুপরমাণুতে কি চঞ্চল প্রাণলীলা চলছে,—আজ যদি হঠাৎ চোখের আবরণ সরে যায় তখনই তো এই লীলা প্রত্যক্ষ হবে,—বাইরের স্তব্ধতার ঢাকা খুলে গিয়ে সর্বত্র জীবন স্পন্দন জেগে উঠবে।

হে হংসবলাকা,
আজ রাত্রে মোর কাছে খুলে দিলে স্তব্ধতার
ঢাকা।
শুনিতেছি আমি এই নিঃশব্দের তলে
শূন্যে জলে স্থলে
অমনি পাখার শব্দ উদ্দাম চঞ্চল।
তৃণদল
মাটির আকাশ 'পরে ঝাপটিছে ডানা;
মাটির আঁধার নিচে কে জানে ঠিকানা,
মেলিতেছে অংকুরের পাখা
লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা।

জুলাই, ১৯৫২

[প্রবন্ধে ব্যবহৃত অধিকাংশ
ফটো লেখক কর্তৃক গৃহীত]

সমাপ্ত

ইতিগজ

আরতি দাস

সুখের পায়রা খোপে বসে শুধু
দানাই খুঁটবো?
কখ্খনো নয়,—
সাত সাত ঘোড়া ছুটিয়ে,
সাতটি সওয়ার জুটিয়ে,
সাত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে হীরে
মুক্তো লুটব।
*　　*　　*
নীল সায়রের অতলে কন্যা
ঘুমোয় নিঝুম,
চোখে আসে ঘুম
সাত সওয়ারের, সাতটি ঘোড়াই
আদ্দেক পথে হয়েছে চোরাই।
*　　*　　*
এবার তাহলে দেশেই ফিরব
মাসের শেষেই,
খেজুরের কাঁটা দিয়েই ঘিরব
পুবের ঘরটা,
ফিরব দেশেই
মাসের শেষেই।

গলি

আনন্দ বাগ্‌চী

হিংস্র অন্ধকারের জঠরে
পাক খায় অতটুকু গলিঃ সেই গলির কোটরে
বন্দী এক পাখীর জীবন!
ছোট পাখী। ডানা নাড়ে কোনমতে বাঁচার মতোন।

আকাশে অনেক তারা! ঝিকিমিকি জোনাকি প্রহর।
এখানেও ছোট ঘর। আর সেই পাখীটার কেঁপে-যাওয়া স্বর!
অনেক আলোক বর্ষ ঘুরে
সময় উড়িয়ে যায় হিমঝুরি হাওয়া ফুরফুরে!
এ-আকাশ উড়ে যায় সূর্য ছুঁয়ে আরেক সূর্যেতে;
ভাড়াটে খাঁচার কোণ হতেঃ
পাখীর চিকন ডাক নাম হতে নামে উড়ে যায়।

গর্ভিণী গলিটা ঘামে হিমেহিমে শীতের সন্ধ্যায়

গুমোট গোঙানীটুকু ঝাপটায় ডানা
অবিকল ছোট এই পাখীরই মতোন রাতকানা!
আমি সেই পাখী,
বধির আস্বাদে বাঁধি, একটি নিবিড় নীড় মনে মনে নাকি!

ভারতে সংবাদপত্রের অভ্যুদয়

আর্থার মুর

আনন্দবাজার পত্রিকার বার্তা-বিভাগের একাংশ

সংবাদপত্র আজ পৃথিবীর সর্বত্র। যে সকল দেশে স্বাধীন বিকাশের সুযোগ আছে, কর্তৃপক্ষের শাসনদণ্ড সর্বদা সমুদ্যত নহে, সে সকল দেশে সংবাদপত্রের বিশিষ্ট লক্ষণগুলো মোটামুটি একই প্রকারের। ভারতবর্ষ এখনও সমুদ্র ও পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতমালা দ্বারা পরিবেষ্টিত, কিন্তু তা সত্ত্বেও বহির্জগতের সঙ্গে এর বিচ্ছিন্নতা লোপ পেয়েছে। তার ও বেতার অবিরত সমগ্র পৃথিবীর সংবাদ আমাদের কাছে বহন করে আনছে এবং আমাদের সংবাদ বিশ্বময় ছড়িয়ে দিচ্ছে। এখন অসংখ্য আমেরিকান, ব্রিটিশ, ডাচ, ফরাসী, ভারতীয় ও স্ক্যান্ডেনেভিয়ান বিশ্ব-পরিক্রামক বিমান-সার্ভিস ভারতের উপর দিয়ে যাতায়াত করে এবং প্রায় প্রত্যহই বিমান-ডাক পাওয়া যায়। যুদ্ধের আগে ওরিয়েণ্ট এক্সপ্রেসে চেপে কনস্ট্যান্টিনোপল্ থেকে লণ্ডনে যেতে যে সময় লাগত এখন আমি তার চেয়ে অনেক অল্প সময়ে দিল্লী থেকে লণ্ডনে যেতে পারি বিমানে ক'রে।

সুতরাং আন্তর্জাতিক সংক্রমণ থেকে ভারত মুক্ত নয়। "ইডিওলজী" নামক যে দুর্বোধ্য পরিভাষাটি মস্কোতে উদ্ভূত হয়ে এখন বার্লিন, রোম, প্যারিস ও লণ্ডনে ছড়িয়ে পড়েছে, সেই শব্দটি ব্যবহার করতে বাধা না থাকলে বলতে পারি যে, "ইডিওলজী" আমাদের বিভ্রান্ত করেছে। সংবাদপত্র জগতে যে কোন আইডিয়ার বীজাণু জন্মলাভ করুক, তার ছোঁয়াচ ভারতে কারুর না কারুর মধ্যে লাগবে। সংবাদপত্রে দেখা যায়, পৃষ্ঠাব্যাপী শিরোনামা, দুই তিন অথবা চার কলমব্যাপী সংক্ষিপ্তসার, পুরাতন সম্পাদকীয় প্রবন্ধের স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিবন্ধ পরম্পরা, একান্ত অপ্রত্যাশিত স্থানে ছবি—এমন কি বাণিজ্য সংবাদের মধ্যেও—"সপ্তম পৃষ্ঠায় তৃতীয় কলমের নিম্নাংশ দ্রষ্টব্য" লিখে পাতা ওল্টাবার সঙ্কেত, পাতার নিম্নার্ধে দুই বা তিন কলমে সংবাদ স্থাপন কৌশল; তার উপর রয়েছে ব্যঙ্গ-কৌতুক, রস-রচনা, ছোটদের পাতা, বিশেষ সংখ্যা প্রভৃতি।

এ সমস্ত বিষয়েই ভারত প্রচলিত ধারা অনুসরণ করে চলেছে। ভারতের উপর লণ্ডন ও নিউইয়র্কের প্রভাবই সর্বাধিক এবং লণ্ডনের সাংবাদিকতার উপর আমেরিক প্রভাব সুস্পষ্ট হয়ে ওঠার পর ভারত সংবাদপত্রও লণ্ডন মারফৎ আমেরিক প্রভাবে বহুলাংশে প্রভাবিত হচ্ছে। ওয়াল লিপম্যান ও নাথানিয়েল গাফিন্সের ন বিশ্ববিখ্যাত প্রবন্ধকারদের ভারতীয় সংবা পত্রেও দেখা যায়।

সংবাদপত্রের মুদ্রণকলার উৎকর্ষ লক্ষ্য বিষয়; বিশেষত গত পনেরো বৎসরে ভা এ বিষয়ে যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছে। চ বৎসর পূর্বে মাত্র একটি সংবাদপত্র রো মুদ্রাযন্ত্রে ছাপা হত এবং লাইনো সবেমাত্র দেখা দিয়েছিল। এখন অন সংবাদপত্র লাইনোটাইপে বিন্যস্ত ও রো মুদ্রাযন্ত্রে ছাপা হয়। ছবি ভারতে খু জনপ্রিয় এবং তা অপ্রত্যাশিত নয়। এ কি, ফ্ল্যাট-বেড প্রেসে যে সকল কাগজ ছা হয় এবং দেশীয় ভাষার অসংখ্য সংবাদ যেগুলির উন্নত মুদ্রণ ব্যবস্থা ন সেগুলোরও লক্ষ্য থাকে তাদের পাঠক ছবির মতো কিছু না কিছু পরিবে করতে। আয়তনে সান্ধ্যপত্রের স তুলনীয়, "পায়োনিয়ার" ধরণের ক্ষুদ্র সংবাদপত্র এখনও সর্বত্র দেখা যায়; কলিকাতা, বোম্বাই ও দিল্লীর সংবাদ গুলি চিরকাল বড়ো আকারের কাগজে পক্ষপাতী।

আন্তর্জাতিক প্রভাব সত্ত্বেও ভার গতানুগতিকতার আদর খুব বেশী। রা নীতিতে কিছুমাত্র রক্ষণশীলতা না থাকলে সংবাদপত্র সম্বন্ধে পাঠকদের রুচি মো উপর রক্ষণশীল। তাঁরা আশা কর সংবাদপত্র শুধুমাত্র সংবাদপত্র না হ আরো কিছু বেশী হবে। ভারতীয়দে মত এমন পরম নিষ্ঠাবান সম্পাদকীয় প্র পাঠক সম্ভবত পৃথিবীর আর কোথ নেই। ভারতের ইউরোপীয় সম্প্রদায় এ ভারতীয় জনসাধারণ সমভাবে তা সংবাদপত্রকে মত-পত্র বলে মনে করে ভারতে ইংরেজী ভাষাকে স্থানচ্যুত কর নানা প্রস্তাব করা হয়েছে বটে, কি এখনও পর্যন্ত ভারত উপমহাদেশে সাধা ভাষার কাজ ইংরেজী ভাষাই সবচেয়ে বে করে আসছে। ভারতীয় স্বত্বাধিকারি পরিচালিত প্রধান প্রধান রাজনৈতিক স পত্রগুলি ইংরেজী ভাষায় প্রকাশি গান্ধীজীর 'হরিজন'-এর একটি সংস্কর ইংরেজীতে প্রকাশিত হয়। ভারতে সং

ও সোৎসাহে ইংরেজী ভাষা ও ইংরেজী সাহিত্যের অনুশীলন করা হয়ে থাকে এবং বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গী উভয় দিক থেকে লেখাগুলো প্রথম শ্রেণীর ইংরেজী রচনা সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় স্বত্বাধিকারিগণের কাগজেই দেখা যায়। এ সংগে সংবাদপত্র ও টেলিগ্রাফ ভারতে এমন কতকগুলো রীতিনীতি প্রচলন করেছে যা কোন ইংরেজের কানে শ্রুতিকটু ঠেকতে পারে। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় সহ-সম্পাদকরা এর জন্য দায়ী। কারণ কোন প্রেস-টেলিগ্রাম যখন তাঁদের হাতে পড়ে, তখন তাঁরা অনেক সময়েই একে নামমাত্র বিস্তৃত করে প্রেসে পাঠিয়ে দেন। এই থেকেই আজ ভারতবর্ষে যেমন কথাবার্তায় তেমনি লেখায়ও ইংরেজী ব্যাকরণের article বাদ দেওয়া অথবা ইংরেজদের বিবেচনায় যা অপ্রয়োজন, সেখানে নির্বিচারে definite বা indefinite article বসাবার ঝোঁক দেখা যায়। ভারতে মাননীয় গভর্নরগণ থেকে আরম্ভ করে কেহ "the Government" বলেন কি না সন্দেহ; প্রায় সকলেই বলে থাকেন "Government"। "In the village of Nanpur" কথাটা প্রায়শ লেখায় ও কথাবার্তায় দাঁড়ায় "in village Nanpur"। অপরপক্ষে Oxford University অথবা Calcutta University-কে সম্ভবত বলা হবে "the Oxford University" অথবা "the Calcutta University"। আবার কতকগুলো শব্দকে প্রেস টেলিগ্রামে একশব্দরূপে ধরা হয় বলে সাধারণ অক্ষরেও সেগুলো একশব্দরূপেই লেখা হয়ে যাচ্ছে এবং বহুলোক এগুলোকে একশব্দ বলেই মেনে নিয়েছেন। "Our young men" ছাপা হয় "our youngmen" রূপে এবং "a youngman"-এর জন্য বিজ্ঞাপন তো হামেশাই দেখা যায়। প্রেস টেলিগ্রাম ভারতে স্থায়ীভাবে ইংরেজী ভাষার কি রকম বিকৃতি সাধন করেছে, এগুলো তারই দৃষ্টান্ত।

ভারতে অবিমিশ্র ভারতীয় সাংবাদিকতা এবং সংবাদপত্র মুদ্রণের মান অতীব সন্তোষজনকভাবে ও অব্যাহত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখানে সংবাদপত্র পরিচালনার প্রতি লোকের সুতীব্র অনুরাগ ও প্রচুর আগ্রহ আছে। অতীতে অর্থাভাব একটা বড় প্রতিবন্ধক ছিল এবং কত কাগজ যে ভূমিষ্ঠ হয়ে শৈশবেই লয় প্রাপ্ত হয়েছে, তার সীমা-পরিসীমা নেই। ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিতে বেতনভুক সাংবাদিকরা অতি সামান্য বেতন পান এবং চরম দুর্গতি ভোগ করেও তাঁরা যে কর্মনিষ্ঠার পরিচয় দেন, তা নিতান্ত শ্লাঘার বিষয়। সাংবাদিকদের ভাগ্যোন্নতির জন্য সঙ্ঘ সমিতির মারফৎ চেষ্টা করেও বিশেষ কিছু ফল হয়নি, কারণ অধিকাংশ সংবাদপত্রই এমন কোন মুনাফা অর্জন করতে পারে না, যা দিয়ে কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করা যেতে পারে। তবে অন্যান্য দিকের মত এবিষয়েও উন্নতি হচ্ছে। একটি বিষয় স্বীকার না করা অসংগত হবে যে, ভারতীয় সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে অনেক বিতর্কমূলক বিষয় নিয়ে প্রচুর বাগবিতণ্ডা হয়ে থাকে। এটা শক্তি ও বুদ্ধির অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়। তা ছাড়া অন্যান্য দেশের মতোই ভারতেও সুরুচিবোধহীন সাংবাদিকের অভাব নেই। সুপরিচিত সংবাদপত্রগুলি প্রায়ই উল্লেখযোগ্য সংযম ও দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় দিয়ে থাকে। আমি নিজেকে একাধারে একজন ইংরেজ ও ভারতীয় রূপে জ্ঞান করে এর দৃষ্টান্তস্বরূপ একটা ঘটনার উল্লেখ করতে পারি। ঘটনাটি হচ্ছে ইংলণ্ডের রাজার সিংহাসন ত্যাগ। সিংহাসন ত্যাগের পূর্ববর্তী সমস্যাকুল সপ্তাহগুলিতে এই সংবাদপত্রগুলি ইংলণ্ডের সংবাদপত্রের মতোই স্বেচ্ছাকৃত মৌন অবলম্বন করেছিল। সিংহাসন সংকট সত্যি-সত্যিই যখন দেখা দিল, সে সময়েও এই সংবাদপত্রগুলির লেখনী একান্ত সংযত ও ভব্য ছিল। রাজা পঞ্চম জর্জ ও রাজা ষষ্ঠ জর্জের মৃত্যুকালে এদের সহানুভূতি অন্তর স্পর্শ করে।

অন্যান্য স্থানের মত ভারতেও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় বিজ্ঞাপনের বাহন হিসাবে সংবাদপত্রের মূল্য স্বীকার করেছেন এবং সংবাদপত্র পরিচালনায় বিজ্ঞাপন ক্রমশই প্রধান অংশ গ্রহণ করছে। এর ফল সংশ্লিষ্ট সকলের পক্ষেই হিতকর। লক্ষ্য করবার বিষয় যে, বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রেও আধুনিক রীতিনীতি ভারতে এসে পৌঁচেছে এবং এক্ষেত্রেও ক্রমশ উন্নতি ঘটছে। তা ছাড়া বিজ্ঞাপনের কতকগুলো সুপরিচিত প্রণালী আছে, যেগুলোর সদ্ব্যবহার করলে ভাল ফলই পাওয়া যায়। আবার অপব্যবহারে বিপদের সম্ভাবনা। বিজ্ঞাপনদাতারা শুধু বিজ্ঞাপন স্তম্ভেই নয়, সংবাদ অথবা সম্পাদকীয় স্তম্ভ পর্যন্ত বিজ্ঞাপন প্রকাশের জন্য ঝুঁকে পড়েছেন। এই স্তম্ভগুলি অধিকতর মূল্যবান তো বটেই, তার ওপর কোন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন পত্রিকা এইসব স্তম্ভে বিজ্ঞাপন প্রকাশ পছন্দ করে না। সংবাদপত্রকে তার উচ্চমান রক্ষায় সাহায্য করলে বিজ্ঞাপনদাতাদের নিজেদেরই যে লাভ, এদেশের বড়ো বড়ো বিজ্ঞাপনদাতারা একথাটা হৃদয়ংগম করলেন বলে আমি আশা করি। পাঠকরা সম্পাদকীয় প্রবন্ধই পাঠ

হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকার লাইনো-টাইপ যন্ত্রে কম্পোজ হইতেছে

আনন্দবাজার পত্রিকার পৃষ্ঠা সাজানোর দৃশ্য

করুন বা বিজ্ঞাপন স্তম্ভই পাঠ করুন, স্বাধীনচিত্ততা ও অপক্ষপাতিত্বের সুনামই পাঠকের চক্ষে সংবাদপত্রের সবচেয়ে বড় মূলধন।

একটা প্রশ্ন হয়তো কৌতূহলের সৃষ্টি করে থাকবে এবং আমি তার একটা উত্তর দেবার চেষ্টা করব। প্রশ্নটি হচ্ছে, স্বাধীন ভারতে ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির ভবিষ্যৎ কি হতে পারে। যে সকল সংবাদপত্র কেবলমাত্র ভারতের ইংরেজদের জন্য লিখিত হত, ভারতীয় সংবাদ প্রকাশে বিশেষ আগ্রহ বোধ করত না অথবা স্বাধীনতার জন্য ভারতের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষার প্রতি বিমুখ ছিল, সে সকল সংবাদপত্র স্বাধীনতা লাভের পূর্বেই হয় বিলুপ্ত হয়েছে, নতুবা হাত ও নীতি বদল করেছে। কারণ তারা বুঝতে পেরেছিল যে, তারা আর প্রচারসংখ্যা বাড়াতে পারবে না। এসব পত্রিকা যে-অঞ্চল থেকে প্রকাশিত হত, সে-অঞ্চলের ইউরোপীয়দের বাইরে তাদের কোন পাঠক প্রায় ছিলই না এবং তাদের মতামত কখনও কখনও ইউরোপীয়দের পর্যন্ত সমর্থন লাভ করত না। তা ছাড়া কোন ইউরোপীয় ব্যবসায়ী মতবাদে গোঁড়া রক্ষণশীল হলেও ভারতীয় জনসাধারণের নিকট তাঁকে তাঁর পণ্য বিক্রি করতে হবে। এজন্যে জনসাধারণ যে সকল সংবাদপত্র পড়ে, সে সকল কাগজেই বিজ্ঞাপন দেওয়া তিনি বাঞ্ছনীয় মনে করেন। এর স্বাভাবিক ফল যা ফলবার তাই ফলেছে। ইংরেজী ভাষার যে সকল সংবাদপত্র অতীতে ভারতের স্বায়ত্তশাসন আকাঙ্ক্ষাকে সহানুভূতির চক্ষে দেখেছে, সে সকল কাগজ দেখতে পাচ্ছে যে, ইংরেজী শিক্ষার ক্রমবর্ধমান প্রসার ও লোকসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রচারসংখ্যার সম্ভাবনাও সীমাহীনভাবে বেড়ে চলেছে; অবশ্য লক্ষ লক্ষ প্রচারসংখ্যার অনুপাতে কোন কাগজেরই প্রচার বেশী নয়।

আজ ভারতে ইংরেজী ভাষার প্রভাব সম্পূর্ণরূপে এর আপন ঐশ্বর্যের উপর নির্ভরশীল। ইংরেজদের স্বাধীনতা ও সহনশীলতার ঐতিহ্য এবং ইংরেজী সাহিত্যের প্রাণপ্রাচুর্য বিপুল শক্তিতে মানুষের মন অধিকার করেছে। ইংরেজী বাইবেলের উদ্ধৃতি ভারতীয় স্বত্বাধিকারী পরিচালিত ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বী সম্পাদকের সম্পাদিত কাগজে যত অধিক ও যত নিভুলভাবে প্রকাশিত হয়, সম্ভবত ইংলণ্ড অথবা আমেরিকায় গোটা এক বৎসরে ধর্মনিরপেক্ষ সব কাগজ একত্রে মিলিয়েও তত প্রকাশিত হয় না। ভারতে ইংরেজী ভাষার সংবাদপত্রে যে সকল মত ও যুক্তি প্রকাশিত হয়, কোন না কোন ভারতীয় ভাষার কাগজে তা ঢুকে এসে পড়ে এবং কিছুদিন গত হবার পরও হয়তো হিন্দুস্থানী অথবা বাঙলা, তামিল, তেলেগু অথবা গুজরাটিতে তার প্রতিধ্বনি শোনা যাবে। ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের সংখ্যা বহু, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, বিভিন্ন বর্ণমালার লাইনো টাইপ, মনোটাইপ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে টাইপ-রাইটার তৈরীর পথে এখনও প্রবল বাধা রয়েছে। তবে ছবির আবেদন সর্বজনীন এবং বর্ণমালাঘটিত অসুবিধাও ক্রমশ দূর হচ্ছে।

(March of India-র সৌজন্যে)

ভাস্কর্যে মধ্যযুগীয় ইউরোপের পরলোক-বিশ্বাস

শ্রীযতীন্দ্র সেন
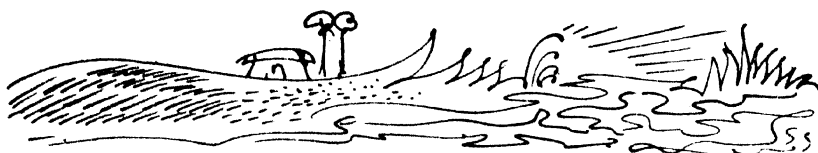
হিন্দুরা আত্মার পুনর্জন্মে বিশ্বাস করেন। হিন্দুদের চিরাগত বিশ্বাস ... কর্মফল অনুসারে আত্মা জন্মান্তরে যে ... জীবের দেহ ধারণ করতে পারে। ইহ-... কে কৃতকর্মের পাপ-পুণ্য-ফল অনুসারে ... আত্মার অধোগতি বা উন্নতি সাধিত হয়। ... জন্মান্তর ধরে সৎকর্মশীল আত্মার ... যোগ্য সাধনার ফলে, ঐহিক জীবনে ... বিষয়ে পূর্ণ অনাসক্তির অবস্থায় ... পৌঁছুতে, আর সেই সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে ... শ্বরে আত্মসমর্পণ করতে পারলে আত্মার ... বন্ধন ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং মোক্ষ বা ... র্বাণলাভ ঘটে। মোক্ষ বা নির্বাণের অর্থ ... চে, জন্ম-মৃত্যু চক্রে ঘুরে ঘুরে পুনঃ পুনঃ ... ন্মগ্রহণ এবং মৃত্যু-সংঘটন থেকে চির-... মুক্তি অর্থাৎ জীবদেহ-ধারণের জন্য ... পুনর্জন্মলাভের চির-অবসান এবং ঈশ্বরে ... লয়প্রাপ্তি।

... পরলোক সম্বন্ধে খৃষ্টান ও মুসলমানদের ... লোক-বিশ্বাসের মিল লক্ষণীয়। খৃষ্টানদের ... 'ডুমস্ ডে' বা 'ডে অব্ জাজমেণ্ট' ও ... মুসলমানদের 'রোজ কেয়ামৎ', অর্থাৎ শেষ ... চারের দিন পর্যন্ত মৃত্যুর পরে আত্মাকে ... পেক্ষা করতে হয়। পৃথিবীতে জীবিত-... লের কর্মফল অনুসারে 'ডুমস্ ডে', ... রোজ-কেয়ামৎ' বা শেষ বিচারের দিনের ... রে কারও কারও বা অনন্ত স্বর্গবাস, ... র কারও বা অনন্ত নরকবাস হবে।

হিন্দুগণের কাছে স্বর্গবাস সাধারণত ... না হলেও আত্মার পক্ষে পরম কাম্য শেষ ... শ্যরূপে বিবেচিত হয় না, নির্বাণ বা ঈশ্বরে লয়প্রাপ্তিই আত্মার চরম ও পরম লক্ষ্য।

যে কোন ধর্মাবলম্বীই হোক না কেন, আধুনিক যুগের অধিকাংশ মানুষের মনে বিশ্বাস বস্তুটি শিথিল হয়ে গিয়েছে। বর্তমান যুগে মানুষের মন যুক্তিবাদী এবং সেই সঙ্গে সংশয়বাদী হয়ে পড়েছে। কাজেই ধর্ম সম্বন্ধে চিরপ্রচলিত বিশ্বাসে দৃঢ়তা অধিকাংশের মনে বর্তমানে আর তেমন অটল হয়ে নেই। বৈজ্ঞানিক যুগের প্রমাণ-সাপেক্ষ সত্য-বিশ্বাসের দিকে মানুষের মন ঝুঁকে পড়েছে। ধর্ম সম্পর্কেই হোক, অথবা অন্য যে কোন বিষয় সম্বন্ধেই হোক, মানুষের অন্ধবিশ্বাস বা সহজ বিশ্বাস-প্রবণতার ভিত্তি কেবল শিথিল নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিশ্চিহ্নপ্রায় হয়েছে। কেবল পরলোক সম্বন্ধেই নয়, ভগবান সম্বন্ধেও আস্তিক্য ও নাস্তিক্য-বুদ্ধির মাঝখানে সংশয়াপন্ন মন দোলায়মান। সত্য হোক বা মিথ্যা হোক, সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন, যুক্তি বা বিচার-বিতর্কের দ্বারা সংশয়িত না হয়ে সহজ বিশ্বাসবশে জগদতীত বা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ামক ঐশ সত্তায় বা ভগবানে একান্ত বিশ্বাস ও অকুণ্ঠ নির্ভরতার যুগ অতীত হয়ে গিয়েছে।

ধর্মতত্ত্ব, ধর্মশাস্ত্র সংক্রান্ত কাহিনী ও ভগবানে মানুষের পূর্ণ বিশ্বাসের রূপ মধ্যযুগে ও তার পূর্ববর্তী অন্যান্য যুগে কেমন ছিল, তার নিদর্শন যেমন আমাদের দেশের ধর্ম সংক্রান্ত পুঁথিপত্রে ও প্রাচীন মন্দিরগুলির ভাস্কর্যে পাওয়া যায়, ঠিক তেমনি পাওয়া যায় ইউরোপের মধ্যযুগীয় খৃষ্টীয় ধর্ম-মন্দিরগুলিতে। 'চার্চ', 'চ্যাপেল', 'ক্যাথেড্রাল', 'অ্যাবি' ইত্যাদির প্রাচীরগাত্রের ও স্তম্ভশীর্ষের ভাস্কর্যে ও অলঙ্করণে, জানালার কাচের সার্শিতে, চিত্রসজ্জায় এবং প্রাচীন গুটানো পাণ্ডুলিপি ও পুঁথির পৃষ্ঠায় চিত্রকর্মে যীশুর জন্ম ও তাঁর জীবন-কথা, বাইবেলের বিভিন্ন কাহিনী বা বাইবেল-উক্ত ঘটনাসমূহ, খৃষ্টধর্ম সংক্রান্ত অন্যান্য নানা কাহিনী এবং পরলোক ও পাপ-পুণ্যের সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা রূপায়িত হয়ে উঠেছিল তৎকালের ইউরোপে।

সমস্ত খৃষ্টীয় ধর্মমন্দিরেই যে উল্লিখিত-রূপ বাইবেলের কাহিনী ও পরলোক সংক্রান্ত ভাস্কর্য ও চিত্রকর্ম করা হত, তা নয়। অধিকাংশ চার্চ বা চ্যাপেলই অনাড়ম্বর বা সাদামাঠাভাবে নির্মিত হত। সব শহরেও ক্যাথেড্রাল থাকত না। কেবল যে সমস্ত শহরে বিশপ অধিষ্ঠিত থাকতেন, সেই সমস্ত শহরেই ক্যাথেড্রাল নির্মিত হ'ত। এই সকল বিশালাকৃতি গাম্ভীর্যপূর্ণ ক্যাথেড্রাল কেবল ভগবানের মহিমাই প্রচার

নোৎরদাম্-এর একটি উৎকীর্ণ প্যানেলে যীশুখৃষ্টের প্রথম জীবনের ঘটনাবলী : প্যানেলের (বাঁ দিক থেকে ডান দিকে) প্রথম অংশে আস্তাবলে পশুদের আহার-পাত্রের মধ্যে নবজাত যীশুকে ও তাঁর মাতা মারীয়া বা মেরীকে শয্যায় শায়িতা দেখা যাচ্ছে। দ্বিতীয় অংশে যীশুকে ধর্মমন্দিরে আনয়নের, তৃতীয় অংশে রাজা হেরোদ কর্তৃক যীশুর জন্মবার্তা-শ্রবণের এবং চতুর্থ অংশে রাজা হেরোদের ভয়ে যীশুকে নিয়ে মিশরে পলায়নের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে।

করত না, ক্যাথেড্রালের অবস্থিতি শহরের গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্যসূচক ছিল। এই সমস্ত ক্যাথেড্রাল চতুষ্পার্শ্ববর্তী শহর ও গ্রাম-জনপদসমূহের ধর্মবিশ্বাসী খৃষ্টান সম্প্রদায়ের এক-একটি আকর্ষণীয় কেন্দ্ররূপে বিরাজ করত।

প্রত্যেকটি ক্যাথেড্রাল মধ্যযুগের ইউরোপের প্রত্যেক খৃষ্টধর্মাবলম্বীর কাছে বিশালায়তন বিশ্বগ্রন্থের মতোই জ্ঞানের এবং সেই সঙ্গে ধর্মভাব ও ভক্তির অনুপ্রাণনার সহজ উৎস-স্বরূপ ছিল। কেবল মৌখিক ধর্মোপদেশনাই নয়, বাইবেল ও খৃষ্টধর্ম সংক্রান্ত নানা কাহিনীর চিত্রায়িত ও ভাস্কর্যায়িত রূপ তাঁরা দেখতে পেতেন ক্যাথেড্রালগুলিতে। লিপিবদ্ধ ও মৌখিক ধর্মকাহিনীসমূহকে চিত্রে ও ভাস্কর্যে, রূপে ও রেখায়, বর্ণে ও বঙ্কিমায় বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করতে দেখে তাঁরা যেমন ভক্তি ও বিশ্বাসে আপ্লুত হতেন, তেমনি বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে যেতেন। খৃষ্টধর্মাবলম্বীরা এক চিত্রাঙ্কিত বাতায়ন থেকে অন্য চিত্রাঙ্কিত বাতায়নে, এক ভাস্কর্যমণ্ডিত প্রাচীর থেকে অন্য ভাস্কর্য-খোদিত প্রাচীরে ঘুরে ঘুরে দেখে বেড়াতেন বাইবেলের নানা ধর্মকাহিনীর ও গসপেলের ধর্মকথার এবং প্রচলিত বিশ্বাস-ধারণার আলেখ্য ও প্রস্তরে খোদিত মূর্তিসমূহের সাহায্যে রূপায়িত কাহিনী ও ঘটনার ক্রম-বিন্যাস। পাপীদের দুঃসহ যন্ত্রণাময় শাস্তি ও পুণ্যাত্মাদের পুরস্কারের উৎকীর্ণ ভাস্কর্যরূপ তাঁদের মনে গভীর রেখাপাত করত।

আমাদের দেশের প্রাচীন মন্দিরগুলিতে—খাজুরাহো, পুরী, ভুবনেশ্বর ও কোনারকে, দক্ষিণ ভারতের অসংখ্য মন্দিরের অন্তর্গাত্রে ও বহির্গাত্রে, ফলকে ও প্যানেলে এই ধরণের কাহিনী-উৎকীর্ণ ও নানা প্রাকৃতিক দৃশ্য-খোদিত ভাস্কর্য-রূপ দেখতে পাওয়া যায়। যে সহজ ধর্মানুরাগ, ঈশ্বরে বিশ্বাস ও অতুলনীয় নিষ্ঠার ফলে ভারতের ভাস্কর্য-সমৃদ্ধ মন্দিরসমূহের নির্মাণ সম্ভবপর হয়েছিল, মধ্যযুগের ইউরোপের অ্যাবি, চ্যাপেল, মনাস্টারি, ক্যাথেড্রাল ইত্যাদি মঠ ও গির্জাগুলিতেও তার অনুরূপ নিদর্শন পাওয়া যায়।

এই সমস্ত ক্যাথেড্রাল থেকে নিনাদিত গভীর ও গুরুগম্ভীর ঘণ্টাধ্বনি বহু মাইল দূরবর্তী সুদূর অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ত। ক্যাথেড্রাল থেকে দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে-পড়া উচ্চ গম্ভীর ঘণ্টাবাদ্যের ধীর মন্থরধ্বনি-তরঙ্গ মধ্যযুগে বেতার-বার্তার কাজ করত। ঘণ্টাধ্বনির দ্বারা প্রার্থনা ও ধর্মানুষ্ঠানের ব্যাপার ছাড়াও যুদ্ধবিগ্রহ, অগ্নিকাণ্ড, ভোজ-উৎসব, রাজার বা সম্রাটের আগমন ইত্যাদির বার্তা ঘোষিত হ'ত। শহরে বা গ্রামে, গৃহাভ্যন্তরে বা উন্মুক্ত পথে-প্রান্তরে বিশ্রামশীল বা কর্মরত জনগণকে ঘণ্টাধ্বনি করিয়ে জানিয়ে দেওয়া হত, শহরের ক্যাথেড্রালে কি অনুষ্ঠান হচ্ছে। শহরের বাইরে কৃষিক্ষেত্রে এই ঘণ্টাধ্বনি বয়ে নিয়ে যেত জীবনের ছন্দ আর স্পন্দন, প্রাতঃকালীন বা সান্ধ্য প্রার্থনার মন্দ্রিত আহ্বান এবং খৃষ্টধর্মসম্মত নানা সংস্কার-সংক্রান্ত কৃত্য

ফরাসীদেশের ভেজলের অ্যাবি-গীর্জার স্তম্ভ-শীর্ষে দু'জন কিম্ভূতকিমাকার ডেভিল কর্তৃক সেণ্ট অ্যাণ্টনীকে অঙ্কুশ-প্রহার ও অন্যান্য নানা উপায়ে নিপীড়ন করবার চেষ্টার উৎকীর্ণ দৃশ্য।

বা ক্রিয়াকাণ্ড—যেমন দীক্ষা, বিবাহ বা শ্রাদ্ধ ইত্যাদি ঐহিক, সামাজিক ও পার-লৌকিক নানা অনুষ্ঠানের ধ্বনিময় সংবাদ। মধ্যযুগের ইউরোপে খৃষ্টীয় ধর্মমঠসমূহ বা 'মনাস্টারি'গুলিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠত গ্রাম। এই সমস্ত খৃষ্টীয় মঠই ছিল জ্ঞান ও বিদ্যাশিক্ষার কেন্দ্র। চার পাশের গ্রাম থেকে শিক্ষার্থীরা ও জ্ঞানানুসন্ধিৎসুগণ এসে জুটত 'মনাস্টারি'তে বা মঠে। ক্রমে ক্রমে গ্রাম থেকে গড়ে উঠত শহর আর শহরগুলি হয়ে উঠত ব্যবসায়-বাণিজ্যের এক-একটি কেন্দ্র। এমনি করে গ্রাম-গঠনে, নগর-প্রতিষ্ঠায়, ব্যবসায়-বাণিজ্য-সম্প্রসারণে তথা স্থানীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নতিতে ও দৃঢ়তা-সাধনে এবং জ্ঞান ও বিদ্যা-বিতরণে এই সমস্ত খৃষ্টীয় ধর্মমঠের অবদান চি অতুলনীয়। মঠবাসী খৃষ্টীয় সন্ন্যাসী কেবল ধর্মচর্চাই নয়, জনগণের মধ্যে বিদ্যা দান ও জ্ঞানবিস্তারও করে যেতেন।

মধ্যযুগের ইউরোপে প্রত্যেক খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী অকপটে বিশ্বাস করতেন যে মৃত্যুর পর আত্মাকে পৃথিবীতে কৃতকর্মের জন্য একদিন বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। বিচারের পর সম্ভবতঃ কিছুকাল যাবৎ অনুশোচনা বা প্রায়শ্চিত্তের পরে পর আত্মা স্বর্গে বা নরকে স্থান করবে। এই সংস্কারের বশে ইউরোপে তৎকালীন খৃষ্টানেরা আত্ম-সম্প কতকটা উদাসীন হয়ে বাহ্য ধর্মানুষ্ঠান সম্পর্কে অধিকতর উৎসাহী ও যত্ন হয়ে উঠেছিলেন।

পরলোক সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহল চিরন্তন। বর্তমান যুগে পরলোক, পাপ পুণ্য ও ভগবান সম্বন্ধে মানুষের ম কতকটা মানসিক নিষ্ক্রিয়তা বা ঔদাসীন ভাব এসেছে বটে, কিন্তু তা সকলের মধ্যে নয়। যাঁরা একান্ত ইহলোক-সর্বস্ব, অথবা যাঁরা অনন্যবিশ্বাসপরায়ণ বা যাঁরা এমন বেপরোয়া যে, মৃত্যুর পরে আত্মা হবে—না হবে, তা নিয়ে মাথা ঘামাতে চা নন, যাঁদের মনে নাস্তিক্য-বুদ্ধির প্রভাব বেশী এবং সে কারণে যাঁরা মৃত্যুকে উদ্দেশ্যহীন আকস্মিক ঘটনা মনে করেন, তাঁরা সাধারণত পরলোক বিশেষ বা আদপেই কোন চিন্তা-ভা করেন না। বর্তমান যুগে এঁদের সং বেশী হলেও সমগ্র জনসংখ্যার তুলনায় বে নয়। তা-ও আবার এ-শ্রেণীর অ লোকের প্রথম বয়সে, অর্থাৎ রক্তের যতদিন বেশী থাকে, ততদিনই এই ধরণ দৃক্‌পাতহীন বেপরোয়া ভাব বেশী যায়, জীবনের সন্ধ্যা যতই ঘনিয়ে আসে থাকে, ততই তাঁরা মৃত্যু ও পরলোক সম্প ভাবিত হয়ে পড়েন। তাই অনেক অতি কঠোর-হৃদয় অবিশ্বাসী ব্যক্তিকে যাঁর দাপটে এক সময়ে ত্রিভুবন অস্থির হ মেদিনী কম্পিত হ'ত, যিনি জীবন-মৃত্যু খেলোয়াড়ী মনোভাব নিয়ে খেলার বলেই বিচার-বিবেচনা করে এসেছে তাঁকেও ভক্ত বনে যেতে বা রাতারা 'পারের কড়ি'র ব্যবস্থাটা সেরে নিতে গুরুর শরণ নিতে বা নাম-করা আধ্যা সাধক বলে পরিচিত ব্যক্তির শিষ্যত্ব গ্র করে 'short cut' হিসেবে দীক্ষা গ্রহণক

...ন্ত্র জপ করতে লেগে গিয়েছেন দেখা যায়। অনেককে আবার গুরুর উপর ...দ্ধির ব্যবস্থার ভার দিয়ে কতকটা ...শ্চিন্ত হতেও দেখা যায়।

...টের উপর, পরলোক চির-অজ্ঞাত আর ...জ্ঞেয়, অদৃশ্য বলেই সে সম্বন্ধে মানুষের ...তূহল যেমন বেশী, ভয়ও তেমনি ...ঙ্কর। পরলোক-সম্বন্ধীয় কৌতূহল-...শ্রিত ভয় বা ভয়-মিশ্রিত কৌতূহলের ...ভব অনেকেরই কাটিয়ে ওঠা কঠিন। ...নের প্রথম প্রথম এ সম্বন্ধে মানসিক ...রতা থাকলেও শেষকালে ভয়টা যেন ...ড় হয়ে মগজে আর মনে বাসা বাঁধে। ...ষের অসহায় মনের চিরন্তন দুর্বলতার ...যোগ নিয়ে পরলোকের ভয় ভূতের ভয়ের ...ই ঘাড়ে চেপে বসে।

এই কারণেই পরলোক সম্বন্ধে মানুষের ... জল্পনা-কল্পনা আর অনুমান-...নার অন্ত নেই। মানুষ তার ভাবিষ্যৎ ...ন সম্বন্ধেই একান্ত দিশেহারা। ...নের যতটুকু অংশ মানুষ অতিক্রম করে ...ছে ততটুকুই তার জানা। কিন্তু জীবনের ...অংশটা সামনে বাকী পড়ে থাকে, ভবিষ্যৎ ...নের সেই অজানা অদেখা অংশ তার ...ছে অন্ধকার। জীবনের এই ভবিষ্যৎ ...র রূপায়নে বা তার গতিপথ-নিয়ন্ত্রণে ...ষ সম্পূর্ণরূপে অক্ষম, একান্ত অসহায়। ...বিষ্যৎ জীবনে কি ঘটবে—না ঘটবে, তা ...না যেমন অসম্ভব, তেমনি সেই অনাগত ...ন-প্রবাহকে ইচ্ছাধীনভাবে নিয়ন্ত্রিত বা ...রিচালিত করাও তেমনি অসম্ভব। কাজেই ...সহায় অক্ষম মানুষ এক সর্বনিয়ামিকা ...সামর্থী অন্ধশক্তির কল্পনা ক'রে, তাকে ...নিয়তি' নাম দিয়ে নিরালম্ব নিরাশ্রয় ...র্বল মনে তার কাছে আত্মসমর্পণ করে।

মানুষের জীবিতকালে জীবন সম্বন্ধেই ...নুষ যখন এতখানি অসহায়, তার ভবিষ্যৎ ...জীবন তার কাছে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত ...র্যন্ত যখন প্রতিকারহীন ও নিরুপায়ভাবে ...অজ্ঞাতই রয়ে যায়, তখন মৃত্যুর পরবর্তী ...অবস্থাটা যে তার কাছে চিররহস্যাবৃত ...চিরঅজ্ঞাত রয়ে যাবে এবং সেজন্য তার ...মনে অনন্ত কৌতূহল আর অশেষ আতঙ্ক-...আশঙ্কা সদাজাগ্রত হয়ে থাকবে, তাতে আর ...বিচিত্র কি!

কাজেই এই কৌতূহল আর আতঙ্ক মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে আবহমানকাল ধরেই—যেমন প্রাচ্যে, ঠিক তেমনি পাশ্চাত্যেও। মৃত্যুর পর ইহজীবনের দুষ্কৃতি বা সুকৃতির কর্মফলরূপে জীবনের পাপ-পুণ্যের সঞ্চয় আত্মার শাস্তি অথবা পুরস্কার-বিধানে একমাত্র সম্বল, পাপ-পুণ্যের তুলাদণ্ডে মানুষের আত্মার বিচার এবং তার ফলে স্বর্গ অথবা নরকবাস—ইত্যাদি ধরনের পারলৌকিক ধারণায় আর বিশ্বাসে ভারত আর ইউরোপের মধ্যেই কেবল নয়, অনেক দেশের মধ্যেই মিল আছে। এ হ'ল পরলোক সম্বন্ধে ধারণা-ভাবনার মোটামুটি সীমারেখা। ধর্মবিশ্বাস ও প্রথা-কিংবদন্তী অনুসারে খুঁটিনাটি বিষয়ে পার্থক্য অবশ্য সর্বত্রই আছে।

আমাদের দেশের ধারণা অনুসারে মৃত্যুর পর পাপ-পুণ্যের বিচার পৃথক পৃথকভাবেই হয়ে থাকে এবং সে বিচারের জন্য এক সাধারণ বিচারের দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকতে হয় না। পৃথক পৃথকভাবে যেমন মানুষের মৃত্যু হয়, তেমনি পৃথক পৃথকভাবে তাদের বিচারও অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু খৃষ্টানদের মতে যার যখনই মৃত্যু হোক, তাকে সেই 'শেষ বিচারের দিন' অর্থাৎ 'ডুমস্ ডে' বা 'ডে অব্ জাজমেণ্ট' পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকতে হবে। শেষ বিচারের পর পাপ-পুণ্য অনুযায়ী কারও কারও অনন্ত স্বর্গবাস, কারও কারও আবার অনন্ত নরকবাস হবে।

বিচারের দিন সম্বন্ধে হিন্দু ও খৃষ্টানদের মধ্যে ধারণার পার্থক্য থাকলেও হিন্দুদের ও মধ্যযুগের খৃষ্টানদের পরলোক ও মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা-সম্বন্ধীয় ধারণার মধ্যে অনেক মিল দেখা যায়। হিন্দুরা যেমন জীবন-চাঞ্চল্য শান্ত বা স্তব্ধ-কারী, মৃত্যুলোকের অধিপতি যমরাজা ও তাঁর অনুচররূপী যমদূতগণের কল্পনা করেন, মধ্যযুগের খৃষ্টানরাও তেমনি 'ডেভিল'দের (Davils) কল্পনা করতেন। পাপীর আত্মাকে যমদূতের মতোই এই 'ডেভিল'ই মরদেহ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। পুণ্যবানের আত্মাকে যেমন বিষ্ণুদূতে বা শিবদূত ইত্যাদি দেবদূতগণ স্ব স্ব লোকে নিয়ে যান, তেমনি মধ্য-যুগীয় খৃষ্টানরাও বিশ্বাস করতেন যে, 'অ্যাঞ্জেলস্' বা স্বর্গদূতগণই পর-লোকে পুণ্যবানের আত্মাকে বহন করে

ফরাসীদেশের ভেজ্‌লের অ্যাবি-গীর্জার প্রাচীর-গাত্রে স্বর্গলোকে গমনের উৎকীর্ণ দৃশ্য : চিত্রের বাঁ দিকে তিনজন স্বর্গীয় দূতকে পুণ্যবানদের আত্মাদের স্বর্গে বহন করে নিয়ে যেতে দেখা যাচ্ছে। ডান দিকে : স্বর্গীয় দূতত্রয়ের সংগে সেণ্ট পিটার ও ভার্জিন মেরীকেও দেখা যাচ্ছে।

ফরাসীদেশের ভেজলের অ্যাবি-গীর্জার প্রাচীর-গাত্রে পরলোকের উৎকীর্ণ দৃশ্য : বাঁ দিকে স্বর্গীয় দূত কর্তৃক তুলাদণ্ডে পুণ্যবান ও পাপীর আত্মা ওজন করবার সময় এক 'ডেভিল' স্বর্গীয় দূতের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে তুলাদণ্ডে হাতের চাপ দিয়ে পাপীর দিকটা নীচে নামিয়ে পুণ্যবানের সমান ভারী বলে দেখাবার অপচেষ্টা করছে। ডান দিকে : ভয়ে আড়ষ্ট পাপীদের আত্মারা নরকাগ্নির দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

নিয়ে যান এবং ডেভিলদের নিপীড়ন থেকে স্বর্গদূতগণই পুণ্যবানের আত্মাকে রক্ষা করেন। অনেক সময় মুশা বা মোজেস (Mozes), সেণ্ট পিটার ও ভার্জিন মেরীও পুণ্যাত্মাদের আত্মাবহনকারী স্বর্গীয় দূতগণের সঙ্গে থাকেন।

হিন্দুরা যেমন বিশ্বাস করেন যে, পাপীদের আত্মা দলে দলে নরকে যায়, আর পূৎ, কুম্ভীপাক, রৌরব ইত্যাদি নানা শ্রেণীর নরকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে, মধ্যযুগের খৃষ্টানরাও তেমনি বিশ্বাস করতেন যে, পাপীদের নরকে অবর্ণনীয় দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়। ফরাসী দেশের ভেজলের (Vezelay) অ্যাবি-গীর্জায় প্রাচীর-গাত্রের উৎকীর্ণ প্রস্তরময় চিত্রে দেখানো হয়েছে যে, পাপীরা দুঃসহ নরকাগ্নির ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে নরকের পথে অগ্রসর হচ্ছে।

হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত ধারণা-বিশ্বাস অনুসারেও পাপীদের অধঃপতিত কলুষিত আত্মাকে পরলোকে নরকাগ্নির দুঃসহ দহন ভোগ করতে হয়। 'উত্তপ্ত তৈলপূর্ণ কটাহে' পাপীদের আত্মার ধারণাতীত শাস্তি-ভোগ ইত্যাদি ধরণের নরকযন্ত্রণার কল্পনাও হিন্দুরা করেছেন।

'অশ্বত্থামা হতঃ ইতি গজঃ' বলে একটি মাত্র মিথ্যা বা অর্ধসত্য উক্তি করার পাপে যুধিষ্ঠিরকে যে একবার মাত্র নরকদর্শন করতে হয়েছিল, সেই প্রসঙ্গে মহাভারতে নরক-বর্ণনার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।

তুলাদণ্ডে পাপী আর পুণ্যবানকে ওজন করা, ডেভিল কর্তৃক তুলাদণ্ডের একদিকে অবস্থিত পাপীর হাল্কা দিকটাকে চাপ দিয়ে নামিয়ে পুণ্যবানের সমপর্যায়ে তা আনবার অপপ্রয়াস ইত্যাদি ব্যাপারও উৎকীর্ণ হয়ে আছে ফরাসী দেশের ভেজলে মধ্যযুগে নির্মিত 'অ্যাবি-গীর্জা' প্রাচীরগাত্রে। ভেজলের গীর্জার প্রাচীর গাত্রে ও স্তম্ভশীর্ষে উৎকীর্ণ হয়ে আছে এমনি ধরণের পরলোক-সম্বন্ধীয় বিশ্বাস ও ধারণার বহু প্রস্তরময় চিত্র।

মধ্যযুগীয় ইউরোপের খৃষ্টানদের পরলোক-বিশ্বাস রূপ পরিগ্রহ করে আছে ফ্রান্সের অন্তর্গত ভেজলের অ্যাবি-গীর্জা ছাড়াও ইউরোপের অন্যান্য দেশের মধ্যযুগে নানা মনাস্টারি, অ্যাবি, চ্যাপেল ও ক্যাথেড্রালের উৎকীর্ণ ভাস্কর্যে।

কেবল পরলোক-বিশ্বাসেরই উৎকীর্ণ চিত্র নয়, খৃষ্টান-জগতের নানা ধর্মসংক্রান্ত কাহিনী, চসারের 'ক্যাণ্টারবেরি টেলস্'-এ কাহিনীতে বর্ণিত নানা গ্রাম থেকে দূরবর্তী ক্যাথেড্রাল অভিমুখে তীর্থযাত্রার চিত্র অঙ্কিত আছে পঞ্চদশ শতাব্দীর [illegible] পুঁথিতে। ইউরোপের তখনকার দিনে দূরবর্তী গ্রাম-জনপদসমূহ থেকে শহরের ক্যাথেড্রাল-অভিমুখে তীর্থযাত্রা [illegible] নিয়মিত বার্ষিক অনুষ্ঠানরূপে পরিগণিত ছিল, বিশেষ করে বসন্তকালে এই তীর্থযাত্রা করা হ'ত।

মধ্যযুগীয় ইউরোপের নানা পুঁথির পৃষ্ঠায়, খৃষ্টীয় মঠ ও গীর্জার প্রাচীরগাত্রে রূপ পরিগ্রহ করেছে তৎকালীন খৃষ্টান জনগণের মধ্যে প্রচলিত ও সাহিত্যে বর্ণিত ধর্মকাহিনী ও পরলোক-সম্বন্ধীয় ধারণা ও বিশ্বাস, যার সঙ্গে বর্তমান খৃষ্টান জগতের মানসলোকের তফাৎ অনেকখানি।

গোপালন ও দুগ্ধ সমস্যা

শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত

গো-সম্পদ

একদা ভারতবর্ষের সভ্যতা গো-কেন্দ্রিত ছিল। গরুকে মানুষের সাথী বলিয়া মানিয়া লইয়া উহাকে গৌরব দান করা হইয়াছিল। গরু চাষ করে। আমরা অন্ন উৎপাদন করি। গরু দ্বারাই চাষ করিতে হইবে এমন নয়, মানুষ নিজেই কোদালি দ্বারা চাষ করিতে পারে। চীনে ও জাপানে তাহাই করিয়া থাকে। ভূমি কর্ষণে পশুর ব্যবহার সেখানে কম। পশু মাংসের জন্যই প্রধানত পশু পোষা হয়। দুধের জন্য মানুষের গরুই প্রয়োজন এমন নয়। মাতৃ-স্তন্য দ্বারা শিশু পুষ্ট হইলে অন্য খাদ্য দেওয়া যায়। ভূমি কর্ষণ বা দুগ্ধ দান এ দুইটির একটির জন্যও গরু অনিবার্য আবশ্যক নয়। ভারতবর্ষে গরু যে স্থান পাইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে একথাই বলা যাইতে পারে যে, তাহার মূলে ঐ দুই কারণই কেবলমাত্র আছে এমন নহে। উহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কারণ অথচ উহা হইতে উদ্ভূত কারণ বিদ্যমান।

মানুষের প্রয়োজন কেবল খাওয়া-পরায় মিটে না। খাওয়া-পরার অতিরিক্ত একটা আত্মিক বা হার্দিক প্রয়োজনের বোধ মানুষের আছে বলিয়াই মানুষ পশু হইতে অনেক উচ্চ স্তরে উঠিয়া গিয়াছে। গরু কাজ দেয়, কিন্তু আমরা তো উহাকে খাইতে দিই। কিন্তু কেবল খাইতে দিয়া পালন করিয়া আশা মিটে না। উহাকে স্নেহ দিই, আদর দিই। আবার গরুর দান ভারত সমাজের কল্যাণে এতই অধিক যে সেই স্নেহ বা আদরের ঊর্ধ্ব সীমায় যে পূজা ভাব আছে, আমরা সেইভাবে উহাকে মণ্ডিত করি।

গরু পশু হইলেও উহা মানুষের নিকটতম জীব। মানুষে গরুতে যেন একটা যুক্ত পরিবার। গরু না হইলে মানুষের চলে না, মানুষ না হইলেও গরুর চলে না, এমনি একটা সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে। সেই সম্পর্ককে ঊর্ধ্বে উন্নীত করার প্রয়োজন ভারতীয়েরা অনুভব করিয়াছেন। সর্ব-জীবেই ঈশ্বর আছেন। জলে, স্থলে জড়ে, চেতনে তিনি আছেন। মানুষে পশুতে তিনি আছেন। হিন্দুরা এমন একটা জীব বাছিয়া লইয়াছে এবং উহার উপর দেবত্ব আরোপ করিয়াছে। যে পশু তাহাদের সহিত সুখে-দুঃখে একেবারে অংশীদার হইয়া আছে, গো-মাতা বলিয়া তাহাকে গ্রহণ করিয়া দেবপূজার আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করিয়াছে। এই আবিষ্কার ভারতবাসীকে তাহার নিজ পরিচয়ের ছাপ দিয়া দিয়াছে। উহাকে কেন্দ্র করিয়া ভারতীয় সভ্যতা দিনে দিনে গড়িয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু জ্ঞানের প্রথম উন্মেষেই ভারত গো-মাতাকে আবিষ্কার করে নাই। এক সময় অন্য দেশবাসীর মতই ভারতীয়েরা গোমাংস আহার করিত। কিন্তু কোন সুদূর অতীতে ভারতবাসীর এই জ্ঞানোদয় হয় যে, মনুষ্যত্বকে অগ্রসর করাইতে ধর্মরূপ যে ধারক বস্তু চাই, তাহার অনুভূতির মূল দয়ায়। সর্বজীবে দয়ায়। তারপর এই দয়াভাব মনুষ্য হইতে ইতর জীবে প্রযুক্ত হইতে গিয়া গরুকে মাধ্যম অবলম্বন করা হয়। কারণ তো স্পষ্ট। সে কথা বলাই হইয়াছে যে, ইতর প্রাণীর মধ্যে মানুষের সহিত নিকটতম ব্যবহারিক সম্পর্ক বিশিষ্ট জীব হইতেছে গরু; গো-মাতা মানব মনেরই গড়া বস্তু। উহা মানুষের পূর্ণ মানবতার পথ যাত্রার সহায়ক এক পুণ্যময় সৃষ্টি। যাঁহারা ভারতভূমিতে দৃঢ় সংস্কারে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন সেই পূর্বীয়গণকে নমস্কার।

গরুকে একটি পশুমাত্র বলিয়া দেখিতে পারেন এবং উহার মূল্য উহার উপযোগিতার মূল্যই হইতে পারে। কিন্তু সেই মূল্য মাত্র উহাকে দিলে নিজেকেই সঙ্কুচিত করা হইবে এবং ভারতবর্ষ যে মহান অর্ঘ্য যুগযুগান্তর হইতে অব্যাহত রাখিয়া কৃষ্টির পথে চলিয়াছে, তাহাকে অস্বীকার করা হইবে। গো-মাতা প্রথমত ও প্রধানত আমাদের ভিতরের দৈবী আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। তৎপরে, তৎপূর্বে নয়, গো-মাতা আমাদের উপকারী শ্রমদানকারী, দুগ্ধদানকারী জীব।

বাঙলার গরু

আজ বাঙলা দেশের গরুর অবস্থা খারাপ। ভাল কোনও কালেই হয়ত ছিল না, কিন্তু যাহা ছিল, তাহাও একস্থানে দাঁড়াইয়া নাই। বাঙলার গরুর অবস্থা খারাপই হইয়া চলিয়াছে। বাঙলার গরু নাম-জাতহীন। ভারতবর্ষে অতি উৎকৃষ্ট গরু আছে। তাহার তুলনায় বাঙলার গরু খুবই নিকৃষ্ট। দুগ্ধ-দান ক্ষমতা ও কর্ষণ ক্ষমতা দ্বারাই গরুর শ্রেষ্ঠত্ব বা হীনত্ব মাপা হয়। বাঙলার গরু দুই দিক দিয়াই নিম্নে পড়িয়া আছে।

পশ্চিমের যান্ত্রিক সভ্যতার ঔজ্জ্বল্য ভারতবর্ষের যে নানা ক্ষতি করিয়াছে, গো-পালনে অবজ্ঞা তাহার অন্যতম। শিক্ষিতেরাই সমাজের দিকদর্শক। গত কালও ছিলেন, আজও আছেন। ইংরাজি শিক্ষার প্রচলনে লোক যখন যন্ত্রমুখী হইয়া উঠে, যখন ব্যক্তিগত উপার্জন করার ক্ষমতাই সমাজের শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড হয়, সেই সময় হইতে গো-পালন আর শিক্ষিতের চর্চার বিষয় থাকে না। সুধীদের মন উহা হইতে উঠিয়া যায়। গো-পালকের সম্মান থাকে না। ইংরাজদের নিজের সমাজে কিন্তু অবস্থা অন্যরূপ। সেখানে কৃতবিদ্য লোক গো পালনকে পেশা বলিয়া গ্রহণ করে এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গোজাতির পালন ও উন্নয়নের চেষ্টা চলে।

ইংরেজ-অধিকৃত ভারতবর্ষেও ক্রমশ ক্রমশ কৃষিবিদ্যা ও পশু চিকিৎসার কলেজ খোলা হয় এবং উহার জন্য ডিগ্রী ডিপ্লোমা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকায় কিছু লোককে আকৃষ্ট করে। আকৃষ্ট করিলেও মেধাবী ছাত্রদের অভিভাবকেরা বা অর্থশালী অভিভাবকেরা নিজ সন্তানদিগকে পারতপক্ষে এই সকল শিক্ষাশালায় পাঠান না। কিন্তু সমাজের যে স্তরের ছেলেই হউক এবং মেধা বেশী হউক বা কম হউক, এই দুই বিদ্যা কৃষি ও পশু চিকিৎসা বিদ্যা কেবলি চাকুরীর দ্বারস্বরূপ বলিয়া গৃহীত হয়। ঐ বিদ্যালাভ করিয়া কেহ কৃষক বা পশু-পালক হইবে এরূপ একেবারেই নয়।

এক্ষণে পূর্ব কথায় আসা যাউক। গো-বিদ্যাতে কৃতী লোকেরা আকৃষ্ট হয় না। গো-পালন শ্রেষ্ঠ লোকদের পেশা হয় না। ফলে ইংরাজ-অধিকৃত ভারতবর্ষে ভারতের নিজস্ব গো-জাতির দেখাশুনা করা ও যত্ন করার পরিবেশ নষ্ট হয়। ইংরাজি শিক্ষা আমাদিগকে এমনি মোহমুগ্ধ করিয়াছিল যে, আমরা মানিতাম যে যাহা কিছু ভাল, সে সকলই বিলাতী হওয়া চাই। ভাল গরু

যদি চাই, তবে বিলাতের গরু আনাইতে হইবে এই ভাবনা ক্রিয়াশীল হয়। এমন অবজ্ঞার ক্ষেত্রে ভারতীয় গরুর জাতি রক্ষা করিয়া আসিয়াছে কাহারা? গরুর জাতি রক্ষা কথাটা ব্যবহার করিয়াছি। উহার জাতি আছে, ভাল-মন্দ আছে, সুজাত-কুজাত আছে। শুদ্ধজাত আছে। সঙ্কর জাতও উৎপন্ন হইতেছে।

গো-পালনে শিক্ষিত সমাজের অবহেলা ও অবজ্ঞাও কিন্তু গো-পালনের কৃষ্টিকে ভারতবর্ষ হইতে একেবারে লুপ্ত করিতে পারে নাই, যদিও লুপ্তপ্রায় করিয়া আনিতেছিল। বাঙলার কথাই বলিব। ১৫।২০ বৎসর পূর্বে কয়জন শিক্ষিত বাঙালী গরুর জাতের বিষয় লইয়া কিছুমাত্র চিন্তা করিতেন অথবা জানিতেন! শিক্ষিত সমাজের অবজ্ঞার ভিতরেও গো-জাতির শুদ্ধি রক্ষা করে বনচর যাযাবর জাতিসমূহ। তাহাদের পেশাই ছিল গো-পালন ও গো-প্রজনন দ্বারা জীবিকা অর্জন করা। ব্যবহারিক গো-পালন বিদ্যা বেশ ভালভাবেই তাহারা জানিত ও প্রজননের মূল সূত্রগুলি অতি স্পষ্টভাবে বুঝিত ও মানিত। এই বনচর ও যাযাবর গো-পালক জাতি আজ সমাজ পরিবর্তনের চাপে লুপ্তপ্রায়। তাহাদের সহিত তাহাদের মহামূল্য গো-পালন জ্ঞানও লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। এই গো-পালকেরা জানিত যে, উৎকৃষ্ট গো-পালন করিতে তাহাদের জাতীয় পরিচিতি অক্ষুন্ন রাখিতে হইবে। পালকদের ভিতর গো-বিদ্যা উচ্চাঙ্গের হইলেই তবে বিশুদ্ধ ও অবিমিশ্র গোজাতি বা ব্রীড উৎপন্ন ও রক্ষিত হইতে পারে। ততটা জ্ঞান তাহাদের ছিল। সেইজন্য আজও উৎকৃষ্ট ব্রিডের অবিকৃত বংশ-পরম্পরা আমরা পাইয়াছি।

চিরকালই গো-পালনে আজকার মত অজ্ঞতা ও অবজ্ঞা ছিল না। ভারতবর্ষের গোপালন অতি উন্নত অবস্থায় যে পৌঁছিয়াছিল, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বর্তমান অবিমিশ্র ও শ্রেষ্ঠ পর্যায়ের ভারতীয় গো-জাতির অস্তিত্ব হইতে পাই। এক অঞ্চলে একই প্রকার গো-জাতির বর্ধন করা হইত। অন্য জাতির সহিত অবাধ সংকর উৎপন্ন হইতে দেওয়া হইত না। আবার শ্রেষ্ঠতর কোনও জাতির ষাঁড় দ্বারা স্থানীয় গরুর অবস্থা উন্নততর করা হইত। যদি এই প্রকার জ্ঞান না থাকিত, যদি অবাধ সংমিশ্রণের বাধা না থাকিত, তবে যে সম্পদ আজ আছে, তাহা এই উন্নত অবস্থায় থাকিত না।

বাঙলার শ্রেষ্ঠ নিজস্ব গো-জাতি নাই। পাহাড়ে কালিম্পংএ একটি জাতি আছে, তাহার সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানও অল্পই। ইহা বাদ দিলে একথা বলা যায় যে, বাঙলার গরুর কোনও জাত নাই। বাঙলায় এক বিশিষ্ট গো-জাতি গঠন করা প্রয়োজন। ইহা একটা বড় সমস্যা। গভর্নমেণ্টের কৃষি গো-পালন এবং পশু চিকিৎসা বিভাগের দৃষ্টি এদিকে নাই যে, বাঙলায় একটি উন্নত গো-জাতি একটি বিশেষ বংশীয় জাতিকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। বাঙলায় উন্নত জাতের গরু আমদানী হয়। শাহীওয়াল, হরিয়ানা, সিন্ধী, তাহার পর বিহার হইতে কতক জাতের গরু আসে। কিন্তু বাঙলার গো-জাতির উন্নতি কোন বংশ হইতে করিব, তাহার কোনও স্থিরতা নাই। গভর্নমেণ্টের নিকটও ইহার গুরুত্ব নাই। গভর্নমেণ্টের যান্ত্রিক প্রজনন artificial insemination) বিভাগ আছে। কোন জাতের ষাঁড়ের বীজ ব্যবহার করিবেন, সে বিষয় কোনও বাঁধাধরা নীতি এ পর্যন্ত অবলম্বিত হয় নাই।

বাঙলার গো-উন্নয়ন

বাঙলার গো-জাতি কোন উন্নত জাতিতে পরিণত করিতে হইবে, ইহা নিশ্চয়রূপে সিদ্ধান্তস্বরূপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। গভর্নমেণ্টকে এই কাজ করিতে হইবে এবং তদনুযায়ী যোগ্য ব্যবস্থা করিতে হইবে। কলিকাতা অঞ্চলে শ্রেষ্ঠ দুগ্ধবতী গাভী যাহা আমদানী করা হয়, তাহা সাধারণত হরিয়ানা এবং কিছু সাহীওয়াল। অপর জাতেরও অবশ্য কিছু কিছু আসে। হরিহর ছত্রের মেলা ভাঙ্গার পর বাঙলায় নানা জাতের গাভী ও বলদ আসে এবং সাহীওয়াল অপেক্ষা হরিয়ানা জাতই বাঙলা দেশের অধিকতর উপযোগী। সরকারী পশুপালন নীতিতে কেবলমাত্র হরিয়ানা দ্বারা গো-সংবর্ধন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ও তদনুযায়ী আবশ্যক ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। অন্য কোনও বংশকেও অবলম্বন করিতে পারেন। তবে একই অঞ্চলে একই বংশের প্রসার করিবার ব্যবস্থা করা চাই।

কতকগুলি গ্রাম গ্রহণ করিয়া সেই অঞ্চলে ক্রমশ সম্পূর্ণভাবে হরিয়ানা দ্বারা প্রজনন ব্যবস্থা করিতে হয়। নির্বাচিত গ্রামগুলিতে পঞ্চায়েত গঠন করিয়া এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয় যে, সেই অঞ্চলের ষাঁড়সমূহ হইতে নির্বাচিত করিয়া প্রয়োজনমত কয়েকটি ভাল দেশী ষাঁড় রাখিয়া বাকী সমস্ত ষাঁড় ও এক বৎসর ঊর্ধ্ব বয়েসের এঁড়েগুলিকে বলদ করিয়া দিতে হয়। এজন্য আবশ্যক হইলে লোক-সম্মতি অনুযায়ী আইন করা যায়। তাহার পর যে কয়টি ভাল হরিয়ানা ষাঁড় পাওয়া যায়, তাহা ক্রয় করিয়া প্রজনন করাইতে হয়। যেমন যেমন হরিয়ানা ষাঁড় আসিবে, তেমন তেমন দেশী বাছাই ষাঁড়গুলির মধ্যে অনাবশ্যকগুলিকে বলদ করিয়া দিতে হয়। এমন একটা সময় আসিবে, যখন দেখা যাইবে যে, প্রয়োজনীয় মোট ষাঁড়ের চার ভাগের একভাগ হরিয়ানা করা গিয়াছে, তখন ঐ হরিয়ানাগুলি হইতেই বীজ লইয়া কৃত্রিম প্রজনন প্রথায় সমস্ত গাভীর জন্য হরিয়ানা জাতের বীজ দেওয়া যাইবে। কৃত্রিম প্রজনন প্রথায় একটা ষাঁড় দ্বারা পাঁচ-ছয়টা ষাঁড়ের কাজ পাওয়া যাইতে পারে। কমসংখ্যক ষাঁড় পুষিতে হয়। প্রজনন-ব্যয় কম হয় এবং ষাঁড় বুঝিয়া উন্নতির পরিমাপ করা হয়।

এই ধরণের কাজ করিতে গভর্নমেণ্টই অগ্রসর হইতে পারেন। এক একটি গ্রাম সমষ্টিতে একজন করিয়া প্রজনন কার্যে অভিজ্ঞ লোক রাখা প্রয়োজন। পশু চিকিৎসা বিভাগ হইতে এই কাজ করা যাইতে পারে এবং এজন্য গভর্নমেণ্টের লোক রাখার খরচা লাগিবে না—কেননা ঐ ধরণের যে ফিল্ড-কর্মী গভর্নমেণ্টের দ্বারা নিয়োজিত আছে, পশু-সংক্রামক ব্যাধি রোধ করার প্রয়োজনে তাহাদিগকে রাখিতেই হয়। মধ্যপ্রদেশে তাহারাই গো-সম্বর্ধনের কাজ করিতেছে। অতিরিক্ত খরচার মধ্যে ষাঁড়ের দাম গভর্নমেণ্টকে দিতে হইয়াছে এবং ষাঁড়ের খোরাকীর কতকটা অংশ গভর্নমেণ্ট বহন করেন। ইহাত জনমত জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত। এইরূপ ৭২টি কেন্দ্রে মধ্যপ্রদেশে উন্নয়ন কার্য চলিতেছে। প্রত্যেক কেন্দ্রের সহিত ১০টি করিয়া গ্রাম যুক্ত। প্রদেশ মধ্যে ৭২০টি গ্রামে এই উন্নয়ন কার্য চলিতেছে। ১ বৎসর পরেই নূতন ষাঁড়ের যে বাচ্চা হইতেছে, তাহা দেখিয়া গ্রাম্য-চাষার আনন্দ উপস্থিত হয়। উহারা আকারে বড় ও বলিষ্ঠ। তখন হইতে তাহারা গাভীর ও বাছুরের বেশী করিয়া যত্ন করিতে আরম্ভ করে।

গো-পালনে উৎকর্ষ বিধায়ক একটি মনোভাব তাহাদের উৎপন্ন হয়। তখন গ্রামবাসী নিজেরাই নূতন আমদানী ষাঁড়ের খোরাকী বহন করিতে প্রস্তুত হয়।

ও দেশের অনেক স্থানেই কেবল হল-কর্ষণের জন্যই গরুর প্রয়োজন বলিয়া ধরা হয়। গাভীর প্রয়োজন এঁড়ে বাছুরের জন্য। দুধ দেওয়ার প্রশ্নই নাই। সেই স্থানে নিমার, হরিয়ানা প্রভৃতি ষাঁড় হইতে যে রকম বাছুর হইতেছে তাহা হইতে দুধ বেশ ভাল পাওয়া যাইবে বলিয়া গাভীর কতকটা যত্ন গ্রামবাসীরা লইতে আরম্ভ করিয়াছে। এঁড়ে ভাল দামের হইলে এ কারণেও গাভীর যত্ন হইতেছে। পূর্বে গাভীর অনাদরের সীমা ছিল না। বলদদিগকে খাওয়াইয়া যাহা এঁটো থাকিত সেইই গাভীর জন্য জুটিত। এখন অবস্থা পরিবর্তিত হইয়াছে। গাভীর যত্ন হওয়ায় গোজাতির উন্নতি দ্রুত হইতেছে। মধ্যপ্রদেশ এদিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

সেখানে পশু চিকিৎসা বিভাগেও একটা নূতন জীবন সঞ্চারিত হইয়াছে। পূর্বে (Vet. Asst. Surgeon) পশু চিকিৎসকেরা অবজ্ঞার পাত্র ছিল। জনসাধারণ তাহাদিগকে অবজ্ঞা করিত. তাহারাও যতটা পারে গৃহস্থের সহিত কম মিশিত। নূতন গো কেন্দ্রিত গ্রাম সৃষ্টি হওয়ায় পশু চিকিৎসক আর কেবল পশু চিকিৎসক নহেন। গ্রামের শুভাশুভের সহিত তিনি জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদের অধীনস্থ ফিলডম্যান বা ক্ষেত্র-কর্মীরাও গ্রামবাসীদের নিত্য প্রয়োজনীয় বন্ধুরূপে পরিণত হইয়াছে। এই বিভাগের লোকেরা এখন গ্রাম্য সমাজের সহিত এমন ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছেন যে, তাহাতে তাঁহাদের নিজেদেরও হিত হইয়াছে। দায়িত্বজ্ঞান বাড়িয়াছে এবং কার্যের মধ্যেই আনন্দ লাভ করিতেছেন। তাঁহারা জন-সেবকের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছেন। ইহাদের মধ্যে ফিলড বা ক্ষেত্র কর্মীরা একটু একটু মানুষের রোগের চিকিৎসাও শিখিয়া লইয়াছে। গ্রামবাসীরা "পশু সুধার সমিতি" গঠন করিয়া তাহাতে ঐ ফিলড-কর্মীকে প্রতিষ্ঠিত করিতেছে! তাহার নিকট হইতে গরুর ও মানুষের ঔষধ লইতেছে।

মধ্যপ্রদেশে এই হেতু একটা অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পরিবর্তন তো ঘটেই। গভর্নমেণ্ট অফিসার হইয়া গ্রাম সেবকে পরিণত হওয়া একটা খুবই বড় পরিবর্তন। ইহাই মধ্যপ্রদেশে আজ চলিতেছে। কাল কি হইবে জানি না। কিন্তু আজ যাহা দেখিতেছি তাহাতে তৃপ্ত হইয়াছে। গো-কেন্দ্রিত গ্রামগুলিতে যে নব-চেতনা উপস্থিত হইয়াছে তাহার আর একটা পরিচয় পাইলাম। গ্রাম পঞ্চায়েত ? সৃষ্টি হইয়া কার্যকরী অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে। গ্রামের গরুগুলি সকালে এক স্থানে জমায়েত হয়। ষাঁড়ও সেখানে থাকে। তারপর সকলকে চরাইতে লইয়া যায়। যে জায়গাটায় একত্র হয় সেখানটা প্রাত্যহিক গোবরে অপরিচ্ছন্ন হইয়া থাকে। পঞ্চায়েত উহা হাতে লইয়া ঐ স্থানের নীলাম ডাকিয়াছে। একটা গর্ত করিয়া তাহাতে গোবরগুলি ফেলার ব্যবস্থা হইয়াছে। সাফাইকারক সাফ করিবে। ঐ গোবরের সার করিবে এবং উহা বেচিবে। এইজন্য সে বার্ষিক দেড় শত টাকা গ্রাম পঞ্চায়েতকে দিবে। আবর্জনা হইতে আয় এই স্থানেই শেষ হইল না। গ্রামখানা প্রত্যেক সপ্তাহে একবার ঝাট দেওয়া হয়। জঞ্জালগুলি ৪।৫টা স্থানে গর্তে ফেলা হয়। ঐ জঞ্জাল নীলাম করিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত বার্ষিক পঞ্চাশ টাকা নীলামে পাইতেছে।

মৃত পশু শ্মশান তৈরী হইয়াছে। চর্ম, হাড় কাজে আসিতেছে। প্রত্যেক গৃহের ব্যবহৃত জল পূর্বে রাস্তা বাহিয়া চলিত। এক্ষণে উহা সোকপিটে (Soak pit) যায়। বাড়ী বাড়ী সোকপিট বা জল শোষক গর্ত করিয়া উহা নোংরা দ্বারা ভরাট করিয়া রাখা হইয়াছে। গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভেটেরিনারী ফিল্ডম্যান মিলিয়া এই পরিচর্যা করিয়া গ্রামের উন্নতি করিতেছেন; সাধারণের জন্য গ্রাম অতিথিশালা, পাকা ঠাকুর-ঘর ও লাইব্রেরী গড়িয়া উঠিতেছে। এইজন্যই এগুলিকে গোকেন্দ্রিত গ্রাম বলা যায়।

বাঙলা গবর্নমেণ্টের পশুচিকিৎসা বিভাগ এই উদাহরণ গ্রহণ করিয়া বাঙলার উপযোগী করিয়া ইহাকে রূপ দিতে পারেন। মধ্য প্রদেশে শ্রেষ্ঠ ষাঁড় ও গাভী পুষিয়া তদ্দ্বারা উৎকৃষ্ট গাভী ও ষাঁড় যোগাইবার ব্যবস্থা আরম্ভ হইয়াছে। বাঙলায় ঐ প্রকার Breeding farm গো প্রজনন ও পালন কে প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন।

গবাদির খাদ্য

সারা ভারতেই মানুষের যেমন তেমনি পশুরও খাদ্যাভাব। যদি গো-উন্নতি হয়, তবে অনাবশ্যক পশুর সংখ্যা কমে। ইহাতে অবশিষ্টগুলির খাদ্যাভাব কিঞ্চিৎ কম হয়। তথাপি খাদ্যাভাব থাকিয়াই যায়। গোচারণ ভূমিই নাই; গরুকে গোচার ভূমি দিতেই হইবে। এক্ষণে যে জমিতে ফসল হইতেছে, তাহাতে যদি অধিক ফসল ফলান যায়, তবে কতকটা জমি শস্য উৎপাদন হইতে আলাদা করিয়া ঘাস জন্মাইবার জন্য ও গোচার জন্য রাখা যায়। বেশি ফসল জন্মাইতে হইলে গোবর না পোড়াইয়া সমস্ত গোবর সারে পরিণত করিতে হয়, কিন্তু সেজন্য আবার জ্বালানি কাঠ চাই। লোক জানিয়া বুঝিয়াই গোবরের মত মূল্যবান সার পোড়ায়, কেননা অন্য উপায় নাই। গোবর পোড়ান বন্ধ করিতে হইলে সস্তায় জ্বালানি যোগান চাই। যে স্থানে খনিজ-কয়লা সস্তা, সে স্থানে কয়লার ব্যবহারের প্রচলন করা যায়। কিন্তু অন্যত্র লাকড়িই চাই। লাকড়িও আজ দুষ্প্রাপ্য। লাকড়ির জন্য বৃক্ষরোপণ করিতে হয়। বৃক্ষ রোপণের জন্য জমি চাই। পুনঃ সেই জমিরই আবশ্যক হইল। নূতন জমি যদি পাওয়া যায়, তবে ভাল। যদি না পাওয়া যায়, তবে চাষের জমিরই এক অংশে জ্বালানি কাঠের বন তৈয়ার করিতে হয়। যে সকল বৃক্ষ শীঘ্র বাড়ে তাহাদের দ্বারাই বন বসাইতে হয়। লাকড়ির জন্য বাবলার বন সৃষ্টি করার পদ্ধতি আছে। উহা ২০।৩০ বৎসরে কাটার যোগ্য হয়। ছাল বিক্রয়যোগ্য দ্রব্য। বাবলার ছাল হইতে চামড়া পাকাই চলে। বাবলার গুঁড়ি হইতে ভাল শক্ত কাঠ হয়। গাড়ীর চাকার জন্য উহা উপযোগী। বাবলার ফলগুলি সময়মত পাড়িয়া ফেলিতে হয়। উহা ভাল পশুখাদ্য। বাবলার পাতাও উৎকৃষ্ট পশুখাদ্য। বাবলার ডাল দ্বারা জ্বালানি করা চলে। ডালের দিক দিয়া কল-গাছও ভাল। গাছ ছাঁটিয়া দিলে পর বৎসর ডাল পালায় পূর্বের মত ঝাড় হয়। শিরিষও খুব বাড়ে। এ সকল বিচার করিয়া যোগ্য জাতের গাছ দ্বারা লাকড়ির বৃক্ষ রোপণ ও লাকড়ি বন তৈরি করা যায়। বস্তুত জ্বালানির ব্যবস্থা না করিলে ভূমি উর্বরা করার বিঘ্ন অপসারিত করা কঠিন।

গোবর বাঁচাইয়া তাহা দ্বারা অল্প জমিতে অধিক ফসল উৎপাদন করিতে হয় এবং উদ্বর্ত জমিতে সাধারণ চাষ করিতে প্রলুব্ধ না হইয়া উহাতে গরুর জন্য নেপিয়ার বা অন্য জাতীয় ঘাস উৎপন্ন করা ও কতকটা সমবেত ব্যবস্থায় লাকড়ির বন গঠন করিতে হয়। যে কয় বৎসর লাকড়ির গাছ কাটা যাইবে, সেই কয়টা প্লট করাইলে প্রত্যেক বৎসর একটা প্লট হইতে লাকড়ির বৃক্ষ কাটা যায় ও প্রত্যেক বৎসর একটা

করিয়া নূতন প্লটে পুনঃ লাকড়ি বন বসান যায়। বন বসাইলে গাছের ফাঁকে ফাঁকে ঘাসের চাষও করা চলে। একই জমিতে গোচার বা ঘাস উৎপাদন করা ও লাকড়ির বন বসান যাইতে পারে।

বাঙলার গো-সম্পদ বৃদ্ধির ইহা এক অনিবার্য করণীয়। ভাল জাতের ষাঁড় যেমন চাই, তেমনি গোখাদ্য যোগাইবার জন্য জমি চাই, ফসল বাড়ান চাই, তজ্জন্য গোবর পোড়ান বন্ধ করা চাই এবং লাকড়ির ব্যবস্থা করা চাই। কৃষিতে ও গোপালনে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। দুইদিকে যুক্তভাবে দৃষ্টি দিতে হইবে। এই উভয় কার্য নিষ্পন্ন করার জন্য গ্রামবাসীদের সমবেত প্রয়াস করা চাই। সমবেত প্রয়াস না হইলে ব্যক্তিগত চেষ্টায় এই উন্নয়ন সংঘটিত করা সম্ভব নহে।

কৃষি ও গোপালন বিদ্যা ও গবেষণা

কৃষি ও গোপালন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন। আজ পর্যন্ত এই জ্ঞান লাভের জন্য বাঙলার শিক্ষিত লোকেরা আকৃষ্ট হন নাই। কৃষি ও গোপালন দ্বারা জীবিকা অর্জনের মনোভাব নষ্ট হইয়া গিয়াছে। গত দুইশত বৎসর যে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, উহা হাতের কাজ করা ও গ্রাম্য জীবনে সন্তোষ লাভ করা এই দুইয়েরই প্রতিরোধক। শিক্ষার ধারা বদলাইয়া উৎপাদন মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। উহাকেই বুনিয়াদী শিক্ষা বলে। ঐ শিক্ষা গ্রহণকালে শিক্ষার্থীকে হাতের কাজ শিখিতে হয়, এটা বড় কথা নয়। হাতের কাজ শিক্ষা দেওয়া কাম্য হইলে চলতি বিদ্যালয়গুলিতে কিছু হাতের কাজ অবশ্য করণীয় বলিয়া ব্যবস্থা করিলেই চলিত। কিন্তু তা হাতের কাজ হইবে না। হাতের কাজের মাধ্যমে শিক্ষায় শিক্ষার্থীর হৃদয় হাতের কাজের উপর শ্রদ্ধালু হইয়া উঠে। বর্তমান শিক্ষা কেবল ব্যক্তিগত ভোগমূলক ও প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভের শিক্ষা দেয়। উহা চায় কাহাকে ঠেলিয়া কে আগে যাইতে পারে। বুনিয়াদী শিক্ষায় ইহার বিপরীত মনোভাব জন্মে। আমার যদি কিছু শ্রেষ্ঠত্ব আছে, তবে তাহা আর দশজনের সহিত বাঁটিয়া লইবার মনোভাব আসে। এই ধরণের বিদ্যার্থী উত্তরকালে আজীবিকার জন্য কেবল অর্থমূলক দিকই দেখে না, দেখে সমাজ ও সমষ্টির হিত। গ্রাম হইতে গ্রাম্য শ্রমের কর্ম হইতে যে আজীবিকা পাওয়া যায়, তাহাই সে শ্লাঘ্য মনে করিবে। শ্রমকে, নিজের হাতের শ্রমকে সে গৌরবমণ্ডিত করিবে। গোপালন বা চাষ করা, নিজ হাতে নিজ জীবিকার জন্য এই সকল বৃত্তি গ্রহণ করায় নিজেকে চরিতার্থ মনে করিবে। এই ধরণের শিক্ষাশালায় নিজ সন্তানদিগকে পাঠাইয়া বর্তমান ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজ স্থায়ী কল্যাণের দিকে দেশকে লইয়া চলিবেন।

গ্রাম্য জীবনের প্রতি শ্রদ্ধালু হইলে কৃষি ও গোপালনে গবেষণা কেবল বীক্ষণাগারেই নিবদ্ধ থাকিবে না। জ্ঞানবান ও কুশল কৃষক নিজ নিজ ক্ষেত্রেই নব নব পথে উন্নতির সন্ধান খুঁজিবে ও বাহির করিবে ও শাস্ত্রীয় পদ্ধতির সন্ধানে নিযুক্ত উচ্চাঙ্গের বীক্ষণাগারের সহিত ক্ষেত্রস্থ চাষার সাক্ষাৎ ও জীবন্ত সংযোগ ঘটিবে।

ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজ, শহরবাসী সমাজও তখন গ্রাম কল্যাণে আর উদাসীন থাকিতে পারিবে না ভদ্র ও ইতরের ভেদ লুপ্তপ্রায় হইবে। হাতের কাজে জীবিকা অর্জন তখন ভদ্রোচিত বিবেচিত হইয়া সমাজ জীবনে কল্যাণপ্রবাহ আনিবে।

কৃষিতে খোঁজ দরকার। চাষার হাতে যে সুবিধাটুকু আছে সেই গন্ডীর ভিতর থাকিয়া কি করিয়া জমি হইতে অধিক শস্য উৎপাদিত করা যায়, কি করিয়া কীটের উৎপাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, কি করিয়া সেচের ব্যবস্থা ছাড়াই ক্ষেত হইতে একটা চৈতালী ফসল তোলা যায়, অথচ উর্বরতা সংরক্ষিত থাকে, এ সকল বিষয়ে খোঁজ আবশ্যক।

বর্তমানে জাপানী পদ্ধতিতে ধান চাষ করার সম্বন্ধে আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছে। গান্ধীজীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইয়া যাঁহারা গঠনকার্য করিতেছিলেন, তাঁহাদেরই কয়েকজন বোম্বাইয়ের উপকণ্ঠে কোরা নামক গ্রামে কর্মকেন্দ্র করিয়া গঠনমূলক কর্মশালা চালাইতেছেন। জাপানী পদ্ধতিতে কোরা গ্রামে ধান চাষ করিয়া ভাল ফল পাওয়া গিয়াছে। কোরা কৃষি-শিল্প আলয়ের অন্যতম উদ্যোক্তা লিখিতেছেন যে, তাঁহারা প্রতি একরে ৫০।৬০ মণ ধান পাইতেছেন এবং অন্যত্র কেহ কেহ একরে ৭৫৲ মণ পর্যন্ত ধানও পাইয়াছেন। জাপানী পদ্ধতি তিন চার বৎসর পরীক্ষা চলিতেছে। গুজরাটে কতক গ্রামে ঐ পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে। উহাতে বীজও একর প্রতি মাত্র পাঁচ সের লাগে। রোপা বুনিতে এক হাত ফাঁক ফাঁক করিয়া বুনিতে হয়। এই কারণ বীজ কম লাগে। ফাঁক ফাঁক বলিয়া গোগছা মোটা হইয়া উঠে। কতকটা বড় হইলে পাশের গাছগুলি ছাঁটিয়া দিয়া গোড়ায় নিড়ানী দিয়া কতকটা সার মাটির নীচে চাপা দিতে হয়। দুইবার এই প্রকার করিতে হয়। জৈব মিশ্রিত রাসায়নিক সার দেওয়া হয়। কোরা শিল্পশালায় কর্মীরা গান্ধীনিধির ব্যবস্থাধীনে বিভিন্ন প্রদেশে লোক পাঠাইয়া আগামী ধান চাষের সময় এই প্রথার ব্যাপক প্রসারের চেষ্টা করিবেন। বাঙলায় পাঠাইবেন বলিয়া আমাকে জানাইয়াছেন।

এই বিষয়টার গুরুত্ব কেবল অধিক ফসল প্রাপ্তি নয় অন্য দৃষ্টি দিয়াও দেখিতে বলি। কোরার পদ্ধতি জাপান হইতে প্রাপ্ত। জাপানে বিঘা প্রতি যে ফলন হয় তাহা ভারতবর্ষ অপেক্ষা অনেক বেশি ইহা প্রায় সর্বজনবিদিত। অনেক বর্ষ পূর্ব হইতেই ইহা জানা ছিল। কিন্তু ঐ জ্ঞান ভারতে বহন করিয়া আনার লোক ছিল না। জাপানে কত ভারতীয় শিক্ষার্থীই না গিয়াছেন। কত লোক নানা শিক্ষালাভ করিয়া আসিয়াছেন। কেহ কিছু পাইয়াছেন, কেহ পান নাই। জাপানী শিল্প উন্নতি ভারতকে মুগ্ধ করিয়া ভারতীয় মনকে জাপানের দিকে ধাবিত করিয়াছিল। কিন্তু জাপানে ভূমি হইতে অধিক উৎপাদনের কৌশল শিখিতে ও ব্যবহারিকভাবে ভারতবর্ষে প্রয়োগ কেহ করেন নাই। গান্ধীজীর সহকর্মীর গ্রাম ও কুটিরের দিকেই থাকে লক্ষ্য। সেইরূপ একজন যখন জাপান গেলেন তিনি এই বিদ্যা লইয়া আসিলেন। ইহার কারণ ভারতীয়ের মন যন্ত্রশিল্পই ভরিয়া রাখিয়াছিল ও গ্রাম্য জীবনে কতকটা উদাসীন ছিল। বুনিয়াদী শিক্ষা এই অতি আবশ্যকীয় দৃষ্টি বিন্দু নবীন বুনিয়াদী শিক্ষিতকে দিবে। তাহা হইলেই কৃষি ও গো-পালন গবেষণালয়গুলির সহিত গ্রামের নাড়ীর যোগ ঘটিবে। তখন পশু মড়ক ও শস্যের মড়ক ব্যাধি হইতে মুক্তির নূতন সন্ধান মিলিবে ও প্রযুক্ত হইবে। শস্যে কীট ও পশু-কৃমি আজ যে বিপুল ক্ষতি করিতেছে তাহার কতকটা লাঘব হইবেই।

পূর্বেই বলা হইয়াছে ফসল বৃদ্ধি ও গোজাতির উন্নতি একে অন্যর প্রতি নির্ভরশীল। শস্যের ফসল বৃদ্ধির জন্য সেচের প্রয়োজন। সেচের জন্য যে মূলধন লাগে তাহার অঙ্কের বিপুলতা হৃদয়ঙ্গম করিলে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। ধরুন নলকূপ দ্বারা সেচ। ভাল সেচ করিতে

এক বর্গমাইলে আড়াই লক্ষ টাকার মূলধন প্রয়োজন। খাল কাটিয়া নদী বাঁধিয়া জল প্রবাহিত করার কথা ছাড়িয়াই দেওয়া যাউক; কেননা, ভারত গভর্নমেণ্টের বিপুল ভাণ্ডারেও উহার সামান্য মাত্র সংঘটিত করা সাধ্যের সীমায় পৌঁছিয়াছে। কিন্তু তবুও নিরাশ হওয়ার প্রয়োজন নাই। এমন শস্য আছে যাহা সেচ ব্যতীতই বা অল্প মাত্র জল দিলেই ফসল দেয়। স্থান ও কাল উপযোগী করিয়া ইহার ব্যবহার দরিদ্র গ্রামবাসীর আয়ত্তে আনা প্রয়োজন।

মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে কাপাস ক্ষেতে এক পাটি কাপাসের পর এক পাটি অড়হর পর্যায়ক্রমে দেওয়া হয়। কেন দেওয়া হয়? এমন পর্যায় কেন? কে জানে? কিন্তু উহাই চিরাচরিত রীতি। একজন অনুসন্ধিৎসু ইংরাজ ১৮০০ সালের কাছাকাছি সন্ধান করিয়া জানেন যে, অড়হরটা হইতেছে ইনসিওরেন্স শস্য। যদি বৃষ্টি ঠিকমত হয়, তবে কাপাস গাছ জোর হইয়া অড়হরগুলিকে চাপিয়া কতকটা শ্বাস রোধ করায়। কাপাস ভাল হয়, অড়হর অল্প হয়। আর যদি বৃষ্টি না হয়, তবে কাপাস ফসল খুবই কম হয়, কিন্তু অড়হর পুরোপুরি বাড়িয়া উঠিয়া ভাল ফসল দেয়। অড়হর জমিকেও উর্বর করে। পরবর্তীকালে জানিয়াছি যে, অড়হরের শিকড় জলের সন্ধানে ত্রিশ ফুট পর্যন্ত নীচে চলিয়া যাইতে পারে। কাজেই অনাবৃষ্টি উহাকে সহজে নষ্ট করিতে পারে না। কি উচ্চ ব্যবহারিক জ্ঞান তাঁহাদের ছিল যাঁহারা কাপাসের ও অড়হরের পর্যায় পাটিতে বোনা উদ্ভাবিত করেন। আজ এই দুর্দিনে এই প্রকার পুরাতন জ্ঞানের উৎস আবিষ্কার করিয়া বুদ্ধিমত্তার সহিত প্রয়োগ করা ও নূতন জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া বড় প্রয়োজন। তাহা কেবল বীক্ষণাগার দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না।

গোবর হইতে জ্বালানী

গোবর পচিলেই গ্যাস হয়। হাওয়া স্পর্শ শূন্য বদ্ধ পাত্রে গোবর পচিতে দিলে যে গ্যাস হয় তাহাকে মেথেন বলে। উহা জ্বালান যায়। ২টি গরুর গোবর হইতে এক পরিবারের রশুই করা চলে। গোবর একটুকুও নষ্ট হয় না, বরঞ্চ সার কিছু বেশিই পাওয়া যায়। গ্যাস উৎপাদন কৌশল ও যন্ত্রাদিও জটিল নহে। ঘরে ঘরে যদি এই গ্যাস করা যাইত, তবে আর ইন্ধনের জন্য গোবর পোড়ানর কথাই থাকিত না। কিন্তু ঐ গ্যাস তৈরী করার ডিজেস্টার ও গ্যাসাধার ব্যয়সাধ্য।

এক গৃহস্থের জন্য সরঞ্জাম বসাইতে তিন শত টাকা লাগিবে, এই হইতেছে বর্তমান এস্টিমেট। গ্রামের ঘরে ঘরে ইহা বসান যায় না। সরঞ্জামের প্রস্তুত আরো কম দামের করা যাইতে পারে না এমন নহে! এই দিকে যদি রসায়ন যন্ত্রবিদেরা দৃষ্টি দেন, তবে পথ বাহির হইতে পারে। পেটেণ্ট করিয়া উহা হইতে অর্থ-লাভের মোহ রাখিলে উহা দ্বারা বড় কিছু হওয়া কঠিন। এমন সমর্থ অনুসন্ধিৎসু চাই যাহার নিকট গ্রামসেবাই হইবে পুরস্কার।

গো-মহিষ

মহিষ দুগ্ধ গো-দুগ্ধ বলিয়া বাংলা দেশে চলে। উহাও বাংলায় গো উন্নয়নের একটা অন্তরায়। বাংলার গরু যদি অধিক দুগ্ধদানকারী হইত, তবে গরুর দুধই সস্তা হইত। আমি বেরারে গভর্নমেণ্ট পরিচালিত দুগ্ধশালা দেখিয়াছি। সেখানে বিশেষজ্ঞদের এই অভিমত যে, যদি উৎকৃষ্ট জাতের গাভী পালন করা যায়, তবে গাভী মহিষ অপেক্ষা অল্প খাইয়া অধিক দুগ্ধ দিবে। তখন মহিষের দুগ্ধের প্রতি যাহাদের রুচি তাহাদের অধিক মূল্য দিয়া মহিষ-দুগ্ধ কিনিতে হইবে এবং মহিষ গরুর সহিত প্রতিযোগিতা হইতে সরিয়া দাঁড়াইবে। বাংলা দেশে সেই শুভদিনের আগমনী সূচিত হউক।

গো-মহিষ দুগ্ধে ভেদ বাহির করা কঠিন বলিয়া মানা যাইত। দুধটা গরুর অথবা মহিষের দুধে জল দেওয়া দুধ উহা বাহির করিতে দামী ও সূক্ষ্ম যন্ত্রের আবশ্যক। কিন্তু ডাঃ শ্রী এন কে বসু একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন যাহাতে দুগ্ধে এমনিয়াম সলফেট্ প্রয়োগ দ্বারা উৎপন্ন ছানার চেহারা হইতে তখনই ধরা যায় যে উহা গোদুগ্ধ কি না। এই পরীক্ষা প্রয়োগ দ্বারা সমর্থনযোগ্য।

গো-সদন

সম্প্রতি আইন দ্বারা ১৪ বৎসরের নিম্নবয়স্ক গরু বধ বাংলা দেশে বন্ধ হইয়াছে। মধ্যপ্রদেশে তো কোনও বয়সের গাভীই বধ করা আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে। গাভী ভিন্ন অন্য গরুর বেলায় ১৪ বৎসরের নিম্নের বধ নিষিদ্ধ ইহা উত্তম। কিন্তু ইহার সাথে সাথে বৃদ্ধ গরুগুলিও পালনের ব্যবস্থা করিতে হয়। আইন করিয়া ১৪ বৎসরের নিম্নের বধ বন্ধ হইল। ইহার ফলে সম্পূর্ণভাবে গো-বধ বন্ধ ক্রমশ হইয়া যাইতে পারে। কেননা, আইনের চাপ না থাকিলেও সামাজিক চাপ আছে।

গো-বধ সম্পূর্ণ বন্ধ হউক ইহা আমি চাহি। তবে আইনের দ্বারা নয়। যতটুকু আইনের দ্বারা হইয়াছে তাহাত হইয়াছে। বৃদ্ধ গরুগুলিকেও ঘাতকের হাত হইতে বাঁচান হউক ইহা চাই। এজন্য আইন করা নয়, যাহারা গো-বধ করে তাহাদের উপর চাপ দেওয়া নয়। যাহারা গোকে মাতৃরূপা বলিয়া বিশ্বাস করেন তাঁহাদের কাজ হইবে হিন্দু সাধারণের মধ্যে এই বোধ জাগ্রত করা যে, গো-পালনের সঙ্গে সঙ্গে উহাদের বৃদ্ধাবস্থায় ভরণ-পোষণের দায়িত্ব আসিয়া পড়ে। উহা লইতে হইবে। তজ্জন্য অন্নের ও দুগ্ধের দাম বাড়িতে পারে। সে বাড়তি সহন করিতে হইবে। যতদিন না এই ভাব উৎপন্ন হইয়া গৃহে গৃহে ক্রিয়াশীল হইতেছে ততদিন "গো-সদন" খুলিয়া বৃদ্ধ ও আতুর গরুর যত্ন লইতে হইবে। কসাইখানা হইতে যেগুলি বাঁচিবে সেগুলি অনাহারে দিনে দিনে না মরে তাহা দেখিতে হইবে। গো-সদন চাই। একটা নয় একাধিক পিঞ্জরাপোল প্রয়োজন।

কলিকাতা পিঞ্জরাপোল সোসাইটি একটি বহু পুরাতন মহৎ অনুষ্ঠান। কিন্তু এখনও ঐরূপ আরো অনেক গড়িয়া উঠার প্রয়োজন আছে। বাংলার গৃহস্থ মাত্রই যদি গো-সেবাপরায়ণ হয়েন, তবে সমস্তই সম্ভব। দোকানদারের বিক্রয়ের উপর একটা তোলা বসাইয়া বড়বাজার হইতে প্রভূত অর্থ গো-পালন কার্যের জন্য উঠে। সারা কলিকাতায় বাংলার শহরে বন্দরে ঐ প্রকার ব্যবস্থা দ্বারা খুবই ভাল কাজ করা যাইতে পারে। গো-প্রেমিকদের এই দিকে প্রবুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।

গো-মাতার যোগ্য সেবা হউক
সকল প্রাণীর মঙ্গল হউক।

---

* নিখিল ভারত গো-পালন ও দুগ্ধ সমস্যা সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ.

মুণ্ডা ধাওড়ার মেয়ে রূপমণিকে প্রথম যেদিন দেখেছিলাম, কপালকুণ্ডলার কথা মনে পড়েছিল। আর ঝর্ণাটা দূর থেকে মনে হয়েছিল, শাল আর শালাই গাছে আড়াল-পড়া কোন পার্বত্য মন্দিরের চূড়ায় রূপোর পাত মোড়া রয়েছে।

ঝর্ণার জলস্রোত পাথরের গায়ে বাধা পেয়ে যেখান থেকে উছলে পড়ছে, শুধু সেইটুকুই ভোরের সূর্যকিরণে চকচক করছিল পালিশ করা রূপোর গম্বুজের মত, বাকী গতি-পথটা ঢাকা পড়েছিল শাল আর শালাই গাছের আড়ালে।

আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথের দু'ধারে সাজানো শালের সারিকে দূর থেকে মনে হয়েছিল দীর্ঘাকৃতি ঝাউবন, গুঁড়ির কটি-দেশ থেকে ফুলে উঠে শাখা প্রশাখার রাশি শীর্ণ থেকে শীর্ণতর হতে হতে এমনই নিখুঁতভাবে চূড়ার বিন্দুতে গিয়ে মিলেছে।

হরিতকীর বন আর খয়ের গাছের ঝোপ এড়িয়ে ঐ শালবনের ফাঁকে ফাঁকে উঁচুনীচু অসমতল পথ বেয়ে পাহাড়ে উঠতে উঠতে যার সঙ্গে চোখোচোখি হ'ল, কে জানতো সেই মেয়েই মুণ্ডা ধাওড়ার মেয়ে রূপমণি।

চোখে চোখ পড়তেই ভীতত্রস্ত ভাব ফুটে উঠলো ওর মুখে। দ্বিতীয়বার অনুসন্ধানের দৃষ্টি ফেললো ও আমার মুখের ওপর, বুঝে নিলো আগন্তুক ফরেস্ট গার্ড নয়, কেড়ে নেবে না পাতার বোঝাটা, চড়চাপড় লাগাবে না, অরণ্য আইন ভাঙার জন্যে চাইবে না কোন আরণ্যক ঘুষ। মুহূর্ত কয়েক মাত্র। তারপরই পাহাড়ি ঝর্ণার স্রোতে হাত ডুবিয়ে এক আঁজলা জল খেয়ে নিলো ও, পাতার বোঝাটা তুলে নিলো মাথায়। আর কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে, তরতর করে নেমে গেল দ্রুত পায়ে।

ও চলে যাওয়ার অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ কপালকুণ্ডলার কথা মনে পড়লো। মনে হল, মুণ্ডা ধাওড়ায় এমন মেয়েতো দেখিনি কখনো। আরণ্যক সৌন্দর্যের একটা বিশেষ রূপ আছে জানতাম, কিন্তু তা যে এমন নিখুঁত যৌবন নিয়ে দেখা দিতে পারে, ধারণা ছিল না। কিংবা কে জানে হয়তো পরিবেশ ওকে অত সুন্দর করে তুলেছিল।

কোলিয়ারীর চাকরীতে সেটাই আমার প্রথম দিন। তখনও খাদ চিনিনি, টিপলার কাকে বলে জানতাম না, জলে ডোবানো এক নম্বর খাদটা দেখে ভেবেছিলাম কোন প্রাকৃতিক হ্রদ।

মিশিরজী বললেন, কাজ পরে হবে, পাঁচ নম্বরটা দেখে আসবেন চলুন।

প্রভান্স খাতা এগিয়ে দিয়ে বললে, সইটা করে নিন, য়্যাকসিডেণ্টে মারা গেলে বৌ তবু কিছু টাকা পাবে।

বললাম, ও বস্তুটি এখনো সংগ্রহ করে উঠতে পারিনি ভাই।

মিশিরজী হাসলেন, সংগ্রহ হ'লেই বা লাভ কি হ'ত। এখানে ম্যানেজার থেকে মুনশী সব ব্যাচেলার, বৌ ছেলে ফেলে এসেছে দেশে।

প্রভান্স কিছু একটা ইঙ্গিত করলে, হ্যাঁ, সব ব্যাচেলার, সাণ্ডা সব।

—সাণ্ডা আবার কি দ্রব্য? বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করলাম।

ব্যাপার বিশেষ কিছুই নয়, বোঝালেন মিশিরজী। 'সাণ্ডি' শব্দটার অর্থ 'পুরুষ', তা থেকে 'সাণ্ডা পাল্লা'। সরকারী আইন হয়ে গেছে রাতের সীফ্‌টে মেয়ে রেজাদের কাজ করানো যাবে না। তাই যেসব কুলীদের মেয়ে 'জুড়ি' আছে, তারা কাজ করে সকাল কিংবা বিকেলের সীফ্‌টে। রাত পাল্লায় কাজ করতে হয় না-জুড়ি মজুরদের। অর্থাৎ সাণ্ডিদের।

শুনছিলাম মিশিরজীর কথাগুলো, আর ধীরে ধীরে হলেজের ট্রলি লাইন ধরে মন্থর পায়ে খাদে নামছিলাম।

আঁকাবাঁকা বিরাট একটা ব্যর্থ দিঘী। যতদূর চোখ যায় শুধু শাল শালাই, আমলকী আর মহুয়ার বন। তারও ওপারে পূবে পশ্চিমে একটি সুদীর্ঘ পাহাড়ের তরঙ্গ। আর এই শান্ত নিঃশব্দ অরণ্যের মাঝে বেনিয়া সিণ্ডিকেটের লুব্ধ কণ্ঠের চীৎকার ফুটে উঠছে হাজারো শাবল আর গাঁইতির কোলাহলে।

ধাপে ধাপে পৃথিবী যেন নেমে এসেছে নরকের অন্ধকারে। মাটির স্তর নেমে এসেছে অনেকখানি, তারপর একটা সিঁড়ির ধাপের মত শ্বেতাভ সফ্‌ট স্টোনের স্তর। আরো একটা ধাপ নেমে এসে কঠিন পাথর। তার-পর কয়লা বলে ভুল হবার মত কালো পাথর। নরকের সিঁড়ি শেষ হয়েছে কালো কয়লার অন্ধকারে। কোথাও মাটি, কোথাও বা পাথরের প্লটে কাজ চলছে। মাল-কাটারি রেজা-কুলিদের কলগুঞ্জন ভেসে আসছে খাদের গভীর থেকে। মাথা তুলে আকাশের দিকেই যেন তাকাতে হ'ল। লিলিপুটের মত অসংখ্য ক্ষুদে ক্ষুদে মেয়ে পুরুষ। এক একটা চাঙড়ের কার্নিসে দাঁড়িয়ে কুলিরা গাঁইতির পর গাঁইতি ফেলছে, ছন্দে বাঁধা ধীর পায়ে চলেছে সারি বাঁধা রেজাদের দল। খাড়াই পথ বেয়ে পিঁপড়ের সারির মত চলেছে তারা, মাথায় পাথর বোঝাই ঝুড়ি, পুরুষদের বাঁকের দু'পাশে দড়ির ঝোড়া।

খাদের একপাশে মাটি পাথর ফেলে ফেলে নতুন একটা পাহাড় গড়ে তুলছে ওরা।

ভাবলাম, এই পাতাল-গভীরতায় যদি থাকে অরণ্যবাসী পুরুষের শক্তির স্বাক্ষর, তাহলে নতুন গড়া পাহাড়টা সমর্থশরীর মেয়েদের স্বেদসাক্ষী।

তন্ময় হয়ে সেদিকে তাকিয়ে দেখছিলাম। হঠাৎ সরে যেতে বললনে মিশিরজী।

দু' জোড়া ট্রলি-লাইন নেমে গেছে খাদের গভীরে। ওপরের হলেজ থেকে একটা মোটা তার নেমে এসেছে বাঁ-দিকের লাইনের মাঝখান দিয়ে, খাদ থেকে ফিরে গেছে তারটা ডান দিকের ট্রলি-লাইনের মাঝ বরাবর। রোপওয়ের টানে একটার পর একটা কয়লা বোঝাই বাকেট উঠে আসছে, খালি বাকেট নেমে চলেছে সারি বেঁধে।

মিশিরজী বললেন, সরে চলুন, ক্লিপ খুলে যায় তো হুড়মুড় করে এসে পড়বে ওগুলো, খুঁজে পাওয়া যাবে না আর আপনাকে।

সরে যেতে গিয়ে পা পিছলে গেল বালিতে। প্রভান্সকে ধরে সামলে নিলাম।

প্রভান্স হেসে বললে, আর ওদের দেখুন, কার্নিসে দাঁড়িয়ে পাথর কাটছে। একটু বে-টাল হলেই... ... ...

—সাণ্ডা পাল্লার কুলিদের কথা ভাবুন একবার। সারা বছর রাতে

গর রাত...একে এখানকার বরফ-জমা শীত, তার ওপর অন্ধকারে এমন বিপজ্জনক কাজ!

বললাম, অন্যায়। আইন মেয়ে রেজাদের যেটুকু বাঁচিয়েছে না-জুড়ি কুলিদের মেরেছে তার চেয়ে বেশি।

প্রভাস বললে, খাদে এখন আর রাত পালার ডিউটি দিতে হয় না বটে মেয়েদের, তবে বাবুদের বাংলায় এখনো......

—রূপমণির মত তেজী মেয়েই ফণা গুটিয়ে নিলো। আফশোষ করলেন মিশিরজী।

বিস্মিত হয়ে বললাম, রূপমণি কে?

—পাঁচ নম্বর খাদে যে নেমেছে একবার, রূপমণি কে তা তাকে চিনিয়ে দিতে হয় না।

গায়ের রঙ দেখেই মালুম হবে, আর চোখ! লোকে বলে এক আর্মেনিয়ান ঠিকাদার ওর বাপ, আর মতান্তরে এ কোলিয়ারীর প্রথম ম্যানেজার ম্যাকাকিং সাহেবের ছেলে জোনাথন। বলে হাসলো প্রভাস।

চিনিয়ে দিতে হয় না বলেই এপাশে ওপাশে তাকিয়ে খুঁজছিলাম রূপমণিকে। নতুন লোকটিকে বিস্মিত চোখে পরীক্ষা করে নিচ্ছিল ওরা, কেউ মাথার ঝুড়ি কাঁধের দিক, কেউ বা শাবল গাঁইতি ফেলে রেখে ভাবছিলো নতুন বাবুটি কে বটেক।

মাঝে মাঝে থামছিলেন মিশিরজী, পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিছেন। —নতুন হাজ্‌রিবাবু তোদের। বড় কড়া লোক, দেরী হ'লেই আধা-হাজ্‌রি!

—আও, দিনসকাল খাটবে আউর আধা-হাজ্‌রি করবে! ফোঁস করে উঠলো একটি মেয়েলি কণ্ঠ।

বহুক্ষণ থেকেই চোখে পড়ছিল ও। রীতিবিরুদ্ধ একটি খাড়াই পথ বেয়ে ঝুড়ি মাথায় ওপরে উঠছিল আর নেমে আসছিল ও অনেক উঁচু থেকে। এরই ফাঁকে কখন অন্যমনস্ক হয়েছি আর ওর লিলিপুট চেহারা কাছে পে'াছে গেছে, স্বাভাবিক রূপ নিয়েছে।

পাথরের গা থেকে জল পড়ছে চুঁয়ে চুঁয়ে, আর একটা জায়গায় ছোট একটি গর্ত কেটে জল ধরে রেখেছে ওরা। রেজা কুলিরা মাঝে মাঝে তৃষ্ণা দূর করে আসছে সেই জলে। কালি-ঝুলি মাথা এই মেয়েটিকেও একটু আগে এক আঁজলা জল খেয়ে আসতে দেখেছি। ওর হাতের সেই ভঙ্গিমাটুকু ভাল লেগেছিল, মনে হয়েছিল, এমন ভাল লাগার ছবি হয়তো বা আগেও দেখেছি।

কিন্তু চিনতে পারি নি প্রথমটা। আঁচলে মুখ মুছে নিলো ও, তারপর ঘাড়ের পিছনে দু' হাত রেখে কনুই দুটো পাখনার মত নাড়তে নাড়তে বললে, জঙ্গলে কানে গেলেন তুই?

বললাম, তুই কেন গিয়েছিলি। পাতা কেটে এনেছিস, বলে দোব গার্ডকে।

খিলখিল করে হেসে উঠলো ও, গলায় হারের মত দোলানো টোকেন-চেনটা নাড়া-চাড়া করতে করতে বললে, খাদানে সব আগে চিনা হয়েছিস আমরা, টিকিট ভুলে এলে হাজ্‌রি কাটবিন না বাবু!

মিশিরজী হেসে উঠলেন হো হো করে। বললেন, বাংলা শিখে নিয়েছে রূপমণি, দেখেছেন?

—তুই রূপমণি? অজ্ঞাতেই মুখে বিস্ময় ফুটে উঠলো।

এক হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে কয়লা কাটছিল একটা কুলি, এক চোখ ফিরে তাকিয়ে সে হাসলে।—রূপমণি নয়, খাদানের মণি। ধাওড়ার সেরা কুড়ী।

—আধাটা পরী, আধা লুবুড়ি। বললে বছর বারো বয়সের একটা বাচ্চা মেয়ে মাথার খালি ঝুড়িটা ছুঁড়ে দিয়ে।

অর্থাৎ অর্ধেক পরী, আর অর্ধেক ডাইনী।

বলেই ছুটে পালালো মেয়েটা, রূপমণি তাড়া করে গেল তাকে।

ফিরে আসার পথে মিশিরজী বললেন, রূপমণিকে আপনি ভুলতে পারবেন না কোনদিন। খাদের রাণী ও।

রূপমণি তো দূরের কথা, তার টোকেন নম্বর যে দু'শো সাঁইত্রিশ তাও ভুল হ'ত না।

প্রতিদিনই তো আর দেখা হ'ত না ওর সঙ্গে, তবু এক্সপ্যাণ্ডেড মেটালের জাল-জানালার ওপাশে শুধু হাতখানা দেখেই চিনতে পারতাম।

—সর্দারের নাম?

—গোপী সিং।

—তোর নাম?

—রূপমণি।

—চাকতির নম্বর?

—দু'শো সাঁইত্রিশ।

এ রীতি আর সকলের ক্ষেত্রেই ঘটতো, এমন সওয়াল-জবাবের হাজ্‌রি রূপমণিকে শুধু প্রথম দিনই করতে হয়েছিল।

সাতদিন অন্তর কাজের সীফ্‌ট্‌ বদলে যেত ওর। আমারও। তাই মাসে সাত দিন, বড়ো জোর পনেরো দিন দেখা হ'ত ওর সঙ্গে।

খাদের মুখে ছোট্ট একখানা গুমটি ঘর, এটেনডেন্স ক্লার্কের আপিস। এক কোণে একটা জলের কুঁজো, জাল-জানালার সামনে তে-পায়া একটা ভাঙা টেবিলে একরাশ বড়ো বড়ো হাজ্‌রি খাতা, আর জেলেকনাইট-জেলেটিনের একটা প্যাকিং বাক্স হাজরেবাবুর কেদারা কুর্সি'র কাজ করতো।

কুলিকামিনরা হাসাহাসি করে বলতো, বাস্‌কাটো হাটায় দে বাবু, উটা মেজাজ গরম করে দেয় তোর।

দুপুর বারোটায় আর সন্ধ্যে ছ'টায় যখন 'আওয়াজ' হয়, পাথরের গায়ে বোরিং করে
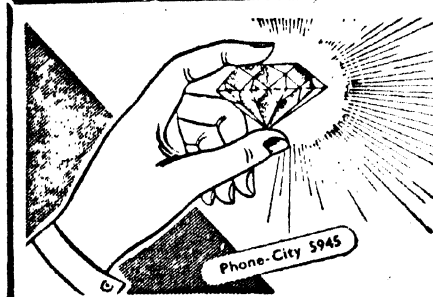
ডিনামাইট দিয়ে প্লটের পর প্লটে পাথর ফাটানো হয় তখন এই কাঠের বাক্স থেকে সাদা সাদা পাউডার ছড়িয়ে দিতে দেখেছে ওরা। যার ছোঁয়া লেগে পাথরই গরম হয়ে ফেটে গ‍ুড়ো হয়ে যায়, তার বাক্সে বসলে বাব‍ুর মেজাজ গরম হয়ে উঠবে এ আর বেশি কথা কি!

র‍ুপমণি কিন্তু ওসবের পরোয়া করতো না। এক ম‍ুখ হেসে উঠেই ম‍ুখে আঁচল চাপা দিতো। কিছ‍ুই জিগ্যেস করতাম না। গোপী সিং সর্দারের পাতাটা খ‍ুলে হাজ‍ুরি করে নিতাম ওর। কিন্তু পিছনে ভিড় জমে গেলেও সরতে চাইতো না ও, আজে বাজে কথার পর কথা বলে যেতো।

খাদে নামতাম যেদিন কোন বিশেষ কাজে, সেদিনও মাথার ঝ‍ুড়ি ফেলে রেখে কাছে এসে দাঁড়াতো ও। দেখাতো হাটে কি রঙিন কাচের জলচুড়ি কিনেছে, কিংবা কানে গড়িয়েছে কোন র‍ুপোর ঝিকাচিল্পি।

—কেমন হয়েছে বল্ বাব‍ু, দাম বেশি লিয়েছে?

কোনদিন হয়তো বলতাম, বাঃ! বেশ মানিয়েছে, খোঁপায় একটা ফিতে বাঁধ এবার।

—আও! ফোঁস করে উঠতো র‍ুপমণি। বলতো, মাথায় ফিতান বাঁধে ঐ কিস্তান মেয়েরা। মরিয়াম, সেবাস্তিনা, মেচ্চী—ওরা ফিতান বাঁধে।

ওর গলার সাত-নরী প‍ুঁতির হারটা দেখিয়ে বলতাম, তবে এটাকে বিদেয় দিয়ে একটা র‍ুপোর হাঁস‍ুলি বানা।

—উঁহ‍ু। ও বাপ্‌লার পর আমার ঠিগিয়া আদমিটা দেবেক।

—বিয়ে করে তোর? ঠিগিয়াটাই বা কে?

—পরিয়াগকে দেখিস নাই তুই? সাণ্ডা পাল্লায় কাজ করে, মালকাটারী।

শনিচারীর হাটেও মাঝে মাঝে দেখা হ'ত ওর সংগে। কখনো এটা ওটা কিনতে আসতো, কখনো তরিতরকারি, সিমসিমারি অর্থাৎ ম‍ুর্গী আর ডিম বেচতে আসতো। দ‍ুটো ডিম হাতে দিয়ে বলতো, লিয়ে যা বাব‍ু-দাম দিতে হবেক নাই। কোনদিন বা বলতো, তিন সের বিলাইতি আছে বেচে দে বাব‍ু, বিলাসপ‍ুরীরা দেখলে ল‍ুঠে করে লেবেক। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বেচে দিতাম টমাটোগ‍ুলো, পয়সা আদায় করে দিতাম ঠিকঠিক।

এমনিভাবে ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছিল র‍ুপমণি। ব‍ুঝতাম, আর পাঁচজনের চোখে লাগছে, আড়ালে কানাঘ‍ুষো করছে অনেকে। ভাবতাম, এবার যদি এসে গায়ে পড়া ভাব দেখায়, কিম্বা অমন ভঙ্গিমায় শরীর দ‍ুলিয়ে কথা বলে, কড়া করে ধমক দেবো। কিন্তু কাছে এলে আপনা থেকেই কেমন যেন মনটা নরম হয়ে যেতো।

হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, অন‍ুরোধ থেকে দাবীতে এসে পে'ীচেছে। কিন্তু দাবীটাও উপেক্ষা করতে পারলাম না।

বললে, দ‍ুটা টাকা দে বাব‍ু।

—কেন? আজ তো শনিবার, হপ্তার মজ‍ুরী পেয়েছিস তো আজ? জিগ্যেস করলাম, কিন্তু জিগ্যেস করার আগেই পকেটে হাত ঢ‍ুকলো।

ঠোঁট বাঁকালে র‍ুপমণি।

—মজ‍ুরী? ছ' টাকা পেলেন আমি, সাত টাকা পাঞ্জাবীর স‍ুদ লাগবেক।

চুপ করে থাকতে দেখে র‍ুপমণি বললে, দে বাব‍ু দে, দশ পয়সা স‍ুদ দোব তোকে হপ্তায়।

—পাঞ্জাবীরা কত নেয়? জিগ্যেস করলাম।

—হপ্তায় টাকায় দ‍ু' আনা লেবে। তিন টাকা লিয়েছিলি পরবের সময়, চালিশ টাকা দেয়া হইছে। স‍ুদ বাকী পড়ে পড়ে, হপ্তায় সাত টাকা স‍ুদ হইছে।

—খেতে পাস কি তা হ'লে?

র‍ুপমণির গলা ভার হয়ে এলো, চোখ ছল্ ছল্ করে উঠলো।—কি করি বল্, টাকা না দিলে পাঞ্জাবীরা বেইজ্জৎ করে। পঞ্চায়েৎকে দ‍ুটা ম‍ুর্গী আর এক হাঁড়ি মাণ্ডি দিয়ে পাপ ধ‍ুয়ে লিয়েছি, আর পাপ করবোন না বাব‍ু।

—না খেয়ে স‍ুদ গ‍ুণবি শ‍ুধ‍ু?

বিষণ্ণ হাসি হাসলে র‍ুপমণি।—পাঞ্জাবীরা রাজা লোক, টাকা করজ্ করেছি, ধাওড়ার লোক আমাকেই দ‍ুষি বলবেক।

হয়তো চেষ্টা করলে দ‍ুটো টাকাই দিতে পারতাম, তব‍ু কেন জানি না একটা টাকা দিয়েই বিদেয় দিলাম।

ঠিক্ পরের সপ্তাহে দশটা পয়সা এনে দিলো র‍ুপমণি।

বললাম, স‍ুদ দিতে হবে না, যখন পারবি ফেরৎ দিস্।

ভাবলাম, হাজ‍ুরির কুলি অন‍ুপস্থিত থাকলে বে-হাজ‍ুরি কুলিকে সেই টোকেনে কাজ করতে দেয়ার জন্যে ঠিকাদারদের কাছ থেকে তো রীতিমত ঘ‍ুষ খাচ্ছি, একট‍ু দয়া দেখালেই বা।

র‍ুপমণি হেসে বললে, যা দিচ্ছি লিয়ে লে তুই, টাকা আর ফেরৎ হবে নাই।

বিস্মিত হয়ে বললাম, কেন?

—চাকতি নম্বর কাড়ে লিয়েছে সর্দার।

তারপর একে একে ব্যাপারটা বর্ণনা করে গেল র‍ুপমণি। দ‍ুপ‍ুর বারোটার সময় দ‍ুটো ঝ‍ুড়ি আর একটা শাবল নিয়ে গোপী সিং তার ডেরায় পে'ীছে দিতে বলেছিল র‍ুপমণিকে। যায়নি র‍ুপমণি। তাই কাজ থেকে বরখাস্ত হয়ে গেছে সে।

বললাম, দোষ তো তোরই, কাজ না করলে চটবে না?

র‍ুপমণি ধমক দিয়ে উঠলো যেন। বললে, এতদিন হ'ল হালচাল ব‍ুঝলিন না তুই? এতগ‍ুলান কুলি থাকতে রেজাদের ডেরায় যেতে বলে কানে? আর সকল কুড়ীরা যাক্, আমি যাবো নাই।

সমস্ত ব্যাপারটা স্পষ্ট ব‍ুঝতে পারলাম। বললাম, ভাবিস না, চাকরী থাকবে তোর। আমি ব্যবস্থা করবো।

ঠিকাদার উপাধ্যায়কে এসে বললাম, আপনার ম‍ুন্‌শী গোপী সিং র‍ুপমণির টোকেন কেড়ে নিয়েছে, ওকে কাজে বহাল রাখতে হবে।

উপাধ্যায় হাসলেন।—ওদিকে চোখ দিলে কোলিয়ারীর কাজ চলে না বাব‍ুজী। চোর লম্পট জ‍ুয়াড়ী, তিন নিয়ে কোলিয়ারী।

—তা ব'লে এমন অনাচার সহ্য করে যেতে হবে?

উপাধ্যায় বললেন, বাব‍ুজী, গোপী সিংয়ের মত ম‍ুন্‌শি না থাকলে ঠিকাদারী বন্ধ হয়ে যাবে আমার। আর র‍ুপমণিকে বহাল রাখলে গোপী সিং ইস্তফা দেবে।

উপাধ্যায়ের কথা শ‍ুনে জ‍ুালা ধরে গেল সমস্ত শরীরে; কথা যখন দিয়েছি র‍ুপমণিকে, ব্যবস্থা একটা করতে হবেই। কিন্তু উপায় ভাবতে গিয়ে দেখলাম মিথ্যে ভরসা দিয়েছি র‍ুপমণিকে।

লেবর ইউনিয়নের সেক্রেটারী স‍ুধীন বাব‍ু হাসলেন।—উপাধ্যায়জী আমাদের প্রেসিডেণ্ট।

এসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার চোখ কুঁচকে বললেন, আমার কাছে পাঠিয়ে দিন, সী বি সেফ হিয়ার। আর সারাদিন খেটে যা পায় তার চেয়ে বেশিই পাবে। কাজ আর কি, ঘর দোর সাফ করবে মাঝে মাঝে, মালী ঘরটা খালি পড়ে আছে ওখানেই থাকবে।

বেরিয়ে এসে মনে হ'ল, জীবনে এমন অসহায় কখনো মনে হয়নি।

আর একটাই পথ, একটাই মাত্র উপায় ছে। কিন্তু, তাও কি সম্ভব?

আর পাঁচজনের চোখ এড়িয়ে মুণ্ডা ড়ায় গিয়ে হাজির হ'লাম। ডেকে লাম পরিয়াগকে।

বললাম, কাল সকাল থেকে ওয়াগন গবে রেল-সাইডিংয়ে। পুরো দমে কাজ বে আজ রাত্তিরে। কিন্তু কাজ বন্ধ খতে হবে সাণ্ডা পাল্লায়, যতক্ষণ না পমণি কাজে বহাল হয়।

উত্তেজিত করবার যত রকমের কৌশল না ছিল সব ক'টা একে একে প্রয়োগ রলাম।

বললাম, পরিয়াগ তুই চেষ্টা করলে হবে, ধু আমি এর মধ্যে আছি জানতে দিবি ।

পরিয়াগ চুপচাপ শুনলে কথাগুলো, কান কথা বললে না। শুধু মাথা কাৎ রে সায় দিলো, তারপর হঠাৎ উঠে ড়ালো।

চলে এলাম।

রাত দশটার সময় খবর পেলাম, খাদে কি একটা গোলমাল হয়েছে, কাজ করছে না কেউ। তিরিশটা ওয়াগন ফিরে যাবে কাল সকালে, আবার কবে ওয়াগন মিলবে ঠিক নেই। এদিকে টিপলারেও আর জায়গা নেই কয়লা স্টক করবার।

ছুটোছুটি গুঞ্জন শোনা গেল কিছুক্ষণ। উপাধ্যায় আর সুধীনবাবু উত্তেজিতভাবে কি যেন বলতে বলতে ছুটে গেলেন। তারপর সব চুপচাপ।

রাত বারোটায় ভোঁ বাজলো দূরের অন্য কোলিয়ারীতে। চঞ্চল হয়ে উঠলাম। কোন খবর নেই, কোন শব্দ নেই।

কি ফল হয়েছে জানবার জন্যে উঠে পড়লাম বিছানা ছেড়ে।

অন্ধকার রাত। দূরের টিপলারে শুধু গোটা কয়েক আলো জ্বলছে। আর শীত-রাতের ঠাণ্ডা কনকনে বাতাস। মাথায় উলের বাঁদুড়ে টুপি আর পায়ে মোজা এ'টে বেরিয়ে এলাম। খবর না জানা পর্যন্ত স্বস্তি নেই, শান্তি নেই।

হাতে টর্চ নিয়ে পিছনের পথ দিয়ে এগিয়ে গেলাম খাদের দিকে। টিলাটার কাছ থেকে বেবি-ক্রেচ অবধি একটা পাহাড়ি সাপ গাছের গুঁড়ির মত মাঝে মাঝে পথ আটকে পড়ে থাকে জেনেও বিচলিত হ'লাম না। ভয়ের চেয়ে আগ্রহ বেশি হ'লে হয়তো সাহস বেড়ে যায়। তাই।

কিন্তু খাদের পাড় থেকে উ'কি মেরে দেখে হতাশ হ'লাম। দিব্যি কাজ চলছে। হ্যাঁ, পরিয়াগও এক মনে গাঁইতির পর গাঁইতি চালিয়ে যাচ্ছে। এত উঁচু থেকে দেখেও পরিয়াগকে চিনতে ভুল হ'ল না।

রোপ-ওয়ে চলেছে অবিরাম গতিতে। খোলার ছাদে বৃষ্টি পড়ার মত ঝিরঝির ঝিরঝির শব্দ হচ্ছে। মালবোঝাই বাকেট-গুলো সারি বেঁধে চলেছে রোপ-ওয়েতে ঝুলতে ঝুলতে।

তবে?

পরের দিন জানতে পারলাম ব্যাপারটা।

খাস ম্যানেজার ডেকে পাঠিয়ে বললেন, চাকরী তো যাবেই, তার চেয়ে রেজিগনেশন দিয়ে দিন। আর সশরীরে যদি বাঁচতে চান, সরে পড়ুন এখান থেকে।

পরিয়াগকে বললাম, এমন নেমকহারাম তুই? নামটা বলে দিলি?

—আমি? বিস্ময়ে কপালে চোখ তুললো পরিয়াগ।—না বাবু, রূপমণি বলে দিয়েছে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, সাণ্ডা পাল্লায় আমাদের সামনে এসে রূপমণি বললে, ওর গুণা হয়েছে, গোপী সিং কিছু দোষ করেনি।

বললাম, তবে? আমাকে কেন বললে ও কথা?

বিষণ্ণ হাসি হাসলে পরিয়াগ। গোপী সিং ওকে নতুন শাড়ী দিয়েছে বাবু, রূপ-মণি ওর ডেরাতেই থাকবে।

আশ্চর্য! ভেবে কোন কূলকিনারা পেলাম না।

দুপুরের সীফটে দেখা হ'ল রূপমণির সঙ্গে। নতুন শাড়ী পরে হেলে দুলে এসে দাঁড়ালো ও সামনে।

বললাম, শরম নেই তোর?

লজ্জায় মাথা নীচু করলে রূপমণি। তারপর ধীরে ধীরে বললে, মুন্‌শীর কত তাকত্ বাবু, ঠিকাদার মানজার সকল ওর কথা শুনে। মুন্‌শী চটলে খাবো কি বল্?

রাগে ঘৃণায় চলে এলাম কোন উত্তর না দিয়ে।

মিশিরজী পিছন থেকে এসে কখন কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, ভাববেন না বাবুজী। লেখাপড়া করেছেন, অন্য কোলিয়ারীতে চাকরী পেয়ে যাবেন।

বললাম, জানি। কিন্তু রূপমণির ব্যাপারটা বুঝলাম না মিশিরজী।

মিশিরজী হাসলেন।—দোষ নেই ওর, ওকে মাফ করবেন আপনি। এ না করলে পরিয়াগকে বাঁচাতে পারতো না ও, ঠিক্ হয়েছিল আঠারো নম্বর প্লটে পরিয়াগকে পাঠিয়ে দিয়ে বিনা ওয়ার্নিংয়ে ডিনামাইট ব্লাস্ট করানোর।

চুপ করে থাকতে দেখে মিশিরজী আবার বললেন, আপনার এত মাথাব্যথা কেন প্রশ্ন করাতেই সাণ্ডারা হাসাহাসি করেছিলো, লজ্জায় মাথা নুয়ে গিয়েছিল পরিয়াগের। তাই পরিয়াগকে লজ্জা থেকে রেহাই দেবার জন্যেই আপনার নাম বলে দিলো রূপমণি।

মন বললে, প্রয়োজন নেই অত শত জেনে শুনে। বাক্স প্যাটরা বেঁধে চলে এসেছিলাম সেদিনই।

পুরো এক বছর পরে আজ সকালে হঠাৎ দেখা হ'ল কোলিয়ারীর ডাক্তার হাজরার সঙ্গে।

বললেন, ঘৃণ্য রোগে ভুগতে ভুগতে রূপমণি মারা গেছে মাসখানেক আগে। শুধু রূপমণিই নয়, সমস্ত জাতিটাই নাকি মরতে বসেছে কোলিয়ারীর কল্যাণে।

শিল্পী বন্ধু সব শুনে চুপচাপ বসে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর সিগারেটে একটা টান দিয়ে বললেন, লিখতে জানলে চমৎকার একটা গল্প লিখতাম রূপমণিকে নিয়ে। লিখুন না আপনি।

কথাটায় সায় পাবার জন্যে এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে দেখি, বন্ধুপত্নী কখন উঠে গেছেন।

বললাম, আপনি শহুরে মানুষ, শহুরে রুচি, তাই অনেক মার্জিত একটা ছবি দিলাম কোলিয়ারীর। যা দেখেছি তার কথা তো দূরের কথা, এইটুকু শুনেই......

শিল্পী বন্ধু বললেন, তা হলেও লিখুন আপনি।

বললাম, সুখ দুঃখ মিলিয়ে যাদের জীবন তাদের নিয়েই গল্প হয়, শুধু দুঃখ-দারিদ্র্য নিয়ে কি গল্প হয়? ভাবছি আপনার মত যদি তুলি ধরতে জানতাম, তা হ'লে কয়েকটা ছবি এ'কে রাখতাম।

মনও সায় দিলোঃ

মুণ্ডা ধাওড়ার মেয়ে রূপমণিকে নিয়ে, রূপমণিদের নিয়ে শুধু ছবিই বুঝি আঁকা যায়!

(১০)

আয়ের বছরটা বোঝা যায় না। কিন্তু খরচের বছরটা বোঝা যায় খাজাঞ্চিখানায় গেলে।

বিধু সরকার মধ্যেখানে উবু হয়ে বসে, আর দু পাশে আরো চারপাঁচজন ঢালু বাক্সর ওপর খেরো খাতায় লেখাপড়া করছে।

বিধু সরকার কানে কলমটা গুঁজে হাত বাড়ায়—পাট্টা-বইটা দেখি কেশব—

মোটা খেরো খাতাটা এগিয়ে দিয়ে আবার লিখতে বসে কেশব।

ভূতনাথ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। খেরো খাতার ওপর মোটা মোটা হরফে লেখা—ফিরিস্তি কাগজ পাট্টা-নকল বহি, শ্রীযুৎ মিস্টার উইলিয়ম ফ্র্যাঙ্কল্যান্ড সাহেব, সন্......

বিধু সরকার চীৎকার করে কেশবকে বলে—আমি বলি তুমি লেখো— আরকুলী সিমলা মছলন্দপুর গ্রামে পুষ্করিণী খনন জন্য শোভারাম বসাককে ৩০ বিঘা জমি লাখরাজ স্বরূপে জমা দেওয়া হইল। বামাপদ সেন পোদ্দারের পৌত্র ক্ষমাপদ সেন, তাহার মছলন্দপুরের বাস্তুভিটা ভুক্ত ১৮ কাঠা জমি তারাপদ মুন্সীকে আঠারশত সিক্কা-টাকায় বিক্রয়......

হঠাৎ মাথা তুলে সামনে ভূতনাথকে দেখে বলে—তোমার কী—?

ভূতনাথ হাতের কাগজখানা এগিয়ে দিয়ে বললে—আমি ব্রজরাখালবাবুর সম্বন্ধী, তার এ মাসের মাইনেটা আমার হাতে......

—রোসো—

বলে বিধু সরকার সমস্তটা পড়ে বললে—এ সই কার?

—আজ্ঞে ব্রজরাখালের—

—ও ব্রজরাখাল শুধু বললে তো চলবে না, ব্রজরাখাল কী, দাস না রুইদাস, বামুন না কায়েত, কার পুত্র, নিবাস কোথায়—আর তুমি কে, শুধু ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় বললে আমি শুনবো না, কার পুত্র, নিবাস কোথায় এসব পোস্টাপিস নয় হে ছোকরা, জমিদারী সেরেস্তার কাজ অমন সোজা নয়, সই মিললেই ছেড়ে দিলাম, সে সরকারী আফিসে পাবে, এখেনে চলবে না,......তুমি লিখে দিলে কেলার পাতে আর আমি অমনি টাকা দিয়ে দিলাম, তেমন কাজ করলে বিধু সরকার আর বাবুদের জমিদারী রাখতে পারতো না—তা তিনি আসতে পারলেন না কেন শুনি?

—আজ্ঞে তিনি গেছেন বরানগরে?

—ওসব আমি দিতে পারবো না, তা সে যাই বলুক আর তাই বলুক। হাতকড়ি পড়বার কাজ আমি করিনে;......এবার তোর কী?

ভূতনাথ একপাশে দাঁড়িয়ে রইল। এবার তার পাশের লোকের ডাক পড়ল।

হিন্দুস্থানী। সামনে এগিয়ে বললে—হুজুর আমার সেই টাকাটা—

—কিসের টাকা বল্ না বেটা, তুই কি আমার বাপের সম্বন্ধী যে তোকে চিনে বসে আছি, লক্ষ লক্ষ টাকার কারবার এখানে হাজার হাজার প্রেজার নাম আর বংশ পরিচয় ওমনি মুখস্ত রাখতে পারে মানুষে—

—আজ্ঞে বরফের পাওনা, চার মাসের একেবারে জমে গেল—

—রোস্, দৈনিক জমা খরচের খাতাটা দেখি কেশব—

বিচিত্র লোক এই বিধু সরকার। ভূতনাথের মনে পড়ে—প্রথম দিন ভারি রাগ হয়েছিল তার। যেন লাট না বেলাট!

বিধু সরকার বলে—মেজবাবু বললে কী হবে, মুখের কথায় খাজাঞ্চীখানা চলে না হে এখানে লেখা-পড়ি সই-সাবুদের কারবার—মেজবাবুর হাতের লেখা দেখা, আমি টাকা ফেলে দেব—আমার কী, আমি তো হুকুমের চাকর—তা বলে জমা-খরচের খাতায় সব লিখে রাখবো, সিকিপয়সা, কড়ি, দামড়ি, ছেদামটি পর্যন্ত হিসেবে ভুল হবে না—এ তোর কারবারের পয়সা নয়, এ হলো জমিদারী, এর হিসেব রাখা যার তার কম্ম নয়—

তারপর থেমে আবার বলে—গোমস্তা যদি লেখে সুখচরের কালেক্টরীর কাছারীতে উমাচরণ মুহুরীকে পান খাওন বাবদ ৶১৫ দেওয়া হইল—আমার খাতায় অমনি খরচ পড়ে যাবে ৶১৫ উমাচরণ মুহুরীর পান খাওন বাবদ—

কাউকে বলে—এ পোস্টাপিসের সরকারী কাজ নয় হে যে পাঁচটা বাজলো আর দরজায় তালা পড়ল—অত তাড়া হুড়ো করলে চলে না এখানে, ছোটকাল থেকে এ কাজ করছি, এ তো আমার জাত-পেশাই বলা চলে, এখনো এ-কাজের হদিস পেলাম না, রোজই নতুন, রোজই নতুন,—একটি পয়সা এদিক-ওদিক হলে নায়েব-গোমস্তার গলা টিপে ধরবো না, বাবুদের ধর্মের পয়সা, বিধু সরকার আর সব পারে দাদা অধর্ম সইতে পারে না,—

তারপর হঠাৎ ভূতনাথের দিকে নজর পড়ায় বললে—তুমি দাঁড়িয়ে কেন ছোকরা? আমি তো বলেছি তোমায়, কাজের সময় বিরক্ত করো না আমায়—আমি কম কথার মানুষ...লেখো কেশব, সেখ আসানুল্লার পুত্র সেখ জয়নুদ্দীনকে মৌরুসী-মোকররী......

—এখন বিরক্ত করো না যাও দিকি সব—বলে বিধু সরকার আবার নিজের কাজে মন দেয়।

ভূতনাথ চলে এল।

ব্রজরাখাল এসে সব শুনে বললে—তা ভালোই তো করেছে—নগদ টাকাকড়ির কারবার, একটু দেখেশুনে হিসেব করে দেওয়াই তো নিয়ম—বিধু সরকার খুব হুঁশিয়ার লোক কি না—তা ছাড়া তোমায় চেনে না—একটু মুখচেনা হয়ে যাক্—তখন আবার......

এই পরিবেশের মধ্যে হঠাৎ ছুটুকবাবু যে কেন ডেকেছেন বোঝা হোল না।

ঘরে গিয়ে ভূতনাথ সবে জামা কাপড় ছাড়তে শুরু করেছে, এমন সময় শশী এল। বললে—শালাবাবু, ছুটুকবাবু আপনাকে ডেকেছে একবার—

ছুটুকবাবুর চাকর শশী! তোষাখানার কাছে দু একবার দেখেছে তাকে।

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—কেন রে—ডেকেছে কেন—

শী বললে—বিরিজ সিংকে বলে রেখেছিলাম—আপনি এলেই খবর দিতে, বলোনি নাকে ?

ভূতনাথ বললে—বলেছে সে, কি দরকার তে পারছিনে— জানিস কিছু তুই—

শশী বললে—ছুটুকবাবু আজ বিকেলে আমাকে জিজ্ঞেস করছিল, মাস্টারের ঘরে ডুগি তব্‌লা বাজায় কে রে—মি বললাম—মাস্টারবাবুর শালা, শুনে বললেন—আজ একবার ডাকিস্ তো, শ হাত—তা চলুন আজ্ঞে—

—বলে দে আমি আসছি এখুনি,—

খাওয়া-দাওয়া তাড়াতাড়ি সেরে ভূতনাথ িনই ছুটুকবাবুর আসরে গিয়েছিল। েক দিন আগেকার কথা। স্মৃতির মণিায় সব কথা জমা করবার মত হয়ত ো নেই আর। তবু ছুটুকবাবুকে বোধ কখনও ভোলা যাবে না। শুচিবায়ুগ্রস্থা বড়বউঠাকরুণের একমাত্র ছেলে। িকের মত চেহারা। অমন স্বাস্থ্য। ু যে-বংশের ঐশ্বর্যের আর বিলাসের রন্ধ্রে শনি প্রবেশ করেছে তাকে কে িতে পারবে।

বদরিকাবাবুর একটা কথা বার বার মনে ড়ে ভূতনাথের।

বদরিকাবাবু বলতো—এ সংসারে যে খেলতে জানে সে কাণাকড়ি নিয়েও খেলে—য ভালো হতে চায়, ভালো থাকতে চায়, ার জন্যে সব পথই খোলা—

হয়ত তাই।

নইলে ছুটুকবাবুই বা অমন হবে কেন।

ছুটুকবাবু দেখেই বললে—আরে আসুন, আসুন স্যার, ঘরে বসে রোজ তবলা শুনি আর ভাবি, এ তো পেশাদারী হাত—কানির কাছে এমন তো শুনিনি আগে—কোন্ ওস্তাদের কাছে নাড়া বেঁধেছিলে ভাই—

ছুটুকবাবুর বন্ধুবান্ধবে ঘর ভর্তি। একজন তানপুরা ধরেছে। আর একজন হারমোনিয়ম। সকলেরই ঢেউ তোলা বাবরি ছাঁট চুল। চুনট করা উড়ুনী। কোঁচানো ধুতি। মেঝের ওপর একহাত পুরু গদীতে ঘর জোড়া। ধব্‌ধবে সাটিনের চাদর তাকিয়ায় হেলান দিয়ে ছুটুকবাবু বসে বসেই ঘামছে। পানের ডিবে, জরদার কৌটো। সিগারেট।

ঠুংরি গানের তানের সময় ছুটুকবাবু মাঝে মাঝে চীৎকার করছে—কেয়াবাৎ-কেয়াবাৎ—সমের মাথায় এসে তবলার চাঁটির সঙ্গে গানের ঝোঁক মিলে গেলেই বলছেন—শোহন্-আল্লা—শোহন্-আল্লা—

অনেক দিন অভ্যেস নেই ভূতনাথের। গাঁয়ের ওস্তাদের কাছে শেখা। দাদ্রা, কাহার্‌বা আর একতালা নিয়েই বেশি ঘাটাঘাটি ছিল। কচিৎ কদাচিৎ যৎ, মধ্যমান, চলতো। পুজোর সময় রসিক মাস্টারের ইয়ার-বক্সিরা এলে ঠুংরি টপ্পা হতো। যাত্রার আসরে মেথর-মেথরাণীর গানের সঙ্গে খেমটারই বেশি চল্।

ছুটুকবাবু চীৎকার করে বললে—আর ঠুংরী ভাল লাগছে না—এবার গজল হোক মাইরি—গজল গা বিশে—

ছুটুকবাবুর হুকুম। গজল ধরলো বিশে মানে বিশ্বম্ভর। গলাটা ভালো।

সঙ্গে ভূতনাথের কাওয়ালীর তাড়ির ঠেকা।

ছুটুকবাবু দাঁড়িয়ে উঠলো। বললে—এবার গান জমে গেছে মাইরি—

উঠে গিয়ে পাশের পর্দা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো। খানিক পরেই কাপড়ের কোঁচায় ঠোঁট মুছতে মুছতে আবার এসে তাকিয়ায় হেলান দিলে। গান তখন বেশ জমে উঠেছে। ছুটুকবাবুও আরও ঘামতে লাগলো। লয় বাড়ছে। হাত তখন টন্ টন্ করছে ভূতনাথের। সমস্ত ঘরখানা মজে গেছে সুরে।

বিশ্বম্ভরবাবু দুলছে। চোখ বোজা। উন্মাদ হয়ে গাইছে—জখ্‌মী, দিলকো না মেরে দুখায়া করো—

তারপর এক সময় সম পড়লো। হো হো হো করে হুমড়ি খেয়ে পড়লো ছুটুকবাবু। এক এক করে সবাই এক-একবার পর্দার ভেতরে গিয়ে ঠোঁট মুছতে মুছতে ফিরে এসেছে। চোখ লাল সবার।

নেশার ঝোঁকে ছুটুকবাবু ভূতনাথের পা ছুঁতে এল।

—করেন কী করেন কী, আহা হা—বলে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায় ভূতনাথ।

মোসাহেবরা বলে—তা পায়ে না হয় হাতই দিলেন ছুটুকবাবু, পা তো আপনার ক্ষয়ে যাচ্ছে না—

ছুটুকবাবু পায়ে হাত দেবার চেষ্টায় উপুড় হয়ে পড়ল। বললে—বাড়ির মধ্যে এমন গুণী রয়েছে, আর তোরা গোঁসাইজীর খোশামোদ করিস, খবরদার—এই শশী, শশে—

পর্দার ভেতর থেকে শশী বেরিয়ে এল।

ছুটুকবাবু—শোন্ বেটা, কাল থেকে যদি গোঁসাইজীকে বাড়িতে ঢুকতে দিবি তো তোকে খুন করে ফেলবো, ব্রিজ সিংকেও খুন করবো আমি—

তারপর হঠাৎ শ্রদ্ধায় ভক্তিতে ছুটুকবাবু মুখের কাছে মুখ এনে বললে—বড্ড খাটুনি গেছে আপনার একটু হবে নাকি স্যার—

ছুটুকবাবুর কথা কিছু বুঝতে পারলে না ভূতনাথ। মুখ দিয়ে মদের গন্ধ অবশ্য আসছিল। তবু ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—কী ?

—ভালো জিনিস ভাই, দিশি মাল নয়, বেশি নয়, একটুখানি, শ্যাম্পেন দিক একটু—ভূতনাথ বড় বিব্রত বোধ করলো।

সামনের একজন বললে—ছুটুকবাবু ভালবেসে দিচ্ছেন, না বলবেন না ভূতনাথবাবু—বলুন হ্যাঁ—

ছুটুকবাবু বললেন—বেশ তা হলে—সিদ্ধির সরবৎ দিক—তাও আছে—ওরে শশে—বেশ পেস্তা বাদাম দিয়ে যুৎ করে…… পর্দার ভেতরে চলে যান্, কেউ দেখতে পাবে না—

রাত বারোটা পর্যন্ত এমনি চললো সেদিন। গজলের পর টপ্পা। নিধুবাবুর টপ্পা।—"চামেলী ফুলি চম্পা—"

শেষে যখন সবাই উঠলো, ছুটুকবাবু তখনও উত্থান শক্তি রহিত। তাকিয়ায় মাথা দিয়ে চিত হয়ে পড়ে আছে। সমস্ত বাড়ি নিঝুম হয়ে গেছে। এতক্ষণ ভূতনাথেরও জ্ঞান ছিল না। সমস্ত পরিবেশটা যেন কেমন সব ভুলিয়ে দিয়েছিল। গানবাজনা বন্ধ হবার পর বাইরে আসতেই আচম্‌কা যেন একটা আঘাত পেলে ভূতনাথ।

ভূতনাথ বিশ্বম্ভরবাবুকে বললে—আপনার গানটা বেশ জমেছিল স্যার—

বিশ্বম্ভর বললে—মনের মত সঙ্গত করেছিলেন স্যার গান গেয়ে বেশ আয়েশ হলো—

সকলেই অল্পবিস্তর অপ্রকৃতিস্থ। সবাই প্রায় ভূতনাথের সমবয়স্ক।

পরেশ বললে—সবাই আমরা অমৃত খেলাম—আপনি স্যার একেবারে নিরম্বু—এ কেমন যেন এক যাত্রায় পৃথক ফল……

কান্তিধর বললে—আহা, আজকে প্রথম দিন, যাক্ না, তুই বড় তাড়াহুড়ো করিস পরেশ—ছুটুকবাবুও কি প্রথম প্রথম খেতো, কত কষ্টে নেশাটি ধরিয়ে দিয়েছি—আর এখন ?

দরজা পর্যন্ত সবাইকে এগিয়ে দিয়ে আবার ফিরে এসে নিজের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে দাঁড়াল ভূতনাথ। ব্রজরাখাল

জানতে পেরেছে নাকি? ব্রজরাখালকে যাবার সময় জিজ্ঞেস করাও হয়নি। এখানে ব্রজরাখালের পরিচয়-সুবাদেই থাকা। যাতে ব্রজরাখালের কোনও মর্যাদা হানি হয়, এমন কোনও কাজ করা উচিত হয়। আস্তে আস্তে ঘরের চাবি খুলে, দরজায় খিল বন্ধ করতে গিয়ে হঠাৎ কেমন থমকে দাঁড়াল সে!

মনে হলো গাড়ি বারান্দার সদর রাস্তা দিয়ে কে যেন সন্তর্পণে বেরোল। অস্পষ্ট মূর্তি। কিন্তু মেয়েমানুষ বলেই যেন মনে হয়। চারিদিকে নির্জনতা। সমস্ত ঘরের আলো নিভে গেছে। ইব্রাহিমের ঘরের ছাদের ওপর একটা তেলের বাতি জ্বলছে, সেই আলোর কিছু রেখা এসে পড়েছে ইট-বাঁধানো দেউড়ীর ওপর। আশে পাশে কেউ কোথাও নেই। শুধু গেটের এক পাশে বসে ব্রিজ সিং বন্দুক হাতে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে পাহারা দিচ্ছে। এমন সময় সদর-দরজা দিয়ে কে বেরুবে!

কেমন যেন কৌতূহল হল ভূতনাথের।

আজকের মতন এত রাত্রে এ বাড়ির এখানকার দৃশ্য কখনও দেখবার সৌভাগ্য হয়নি আগে। কিন্তু তবু এ বাড়ির আবহাওয়া আর হালচালের যতখানি পরিচয় সে পেয়েছে, তাতে যেন ওই নারী-মূর্তি দেখে অবাক হওয়ারই কথা।

উঠোন পার হবার পথে ওপরের আলোটা এসে পড়তেই যেন চেনা চেনা মনে হলো।

তারপর মূর্তিটা নিঃশব্দে গিয়ে দাঁড়াল ছুটুকবাবুর বৈঠকখানার সামনে।

সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে কে যেন দরজা খুলে দিলে।

ভূতনাথ ঘরের ভেতরকার আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেলে শশীকে। ছুটুকবাবুর চাকর শশী। আর নারী-মূর্তিটাও এক নিমেষের জন্যে ভূতনাথের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠলো!

গিরি!

মেজ-গিন্নীর ঝি গিরি!

কিন্তু একটি মুহূর্ত। তারপরেই ঘরের দরজা বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে আবার সমস্ত অন্ধকার।

একটা অন্যায় কৌতূহল ভূতনাথের সমস্ত মনকে যেন পঙ্কিল করে তুললে। এখনও কর্তারা কেউ বাড়ি ফেরেননি। আকাশের তারার দিকে চেয়ে রাতটা অনুমান করবার চেষ্টা করলে একবার! দ্বিতীয় প্রহর শেষ হবার উপক্রম। মেজকর্তা এখনও ফেরেননি। ছোটকর্তা ফিরবেন কি না কোনও নিশ্চয়তা নেই। আজ না-ও ফিরতে পারেন। বন্ধ বৈঠকখানা ঘরের মধ্যে শুধু দুজন— আধো-অচেতন ছুটুকবাবু, আর শশী! ওদের মধ্যে কে?

ঘুমে চোখ জুড়ে আসছিল কিন্তু শুতে গিয়ে ঘুম এল না তার।

ব্রজরাখাল সকাল বেলা দেখা হলেই জিজ্ঞেস করলে—কাল কোথায় ছিলে বড়কুটুম?

তারপর সব শুনে বললে—তা ভালো—তবে বুঝে শুনে চোলো—

—কেন? ভূতনাথ একটু অবাক হয়ে গেল।

ব্রজরাখাল বললে—এখন সময় নেই আমার, অফিসে যেতে হবে, তবে একটা কথা বলি, ঠাকুর বলতেন—কাঁদলে কুম্ভক আপনিই হয়—গান-বাজনা টপ্পা-ঠুংরি ভালো বৈকি—কিন্তু মাঝে মাঝে একটু কেঁদো বড়কুটুম—

—কাঁদবো কেন মিছিমিছি—

—সে অনেক কথা বড়কুটুম, এখন আর আমার সময় নেই, আজকে আমার বাড়ি ফিরতে একটু দেরি হবে, শিগ্গির নরেন আসছে, তারই তোড়জোড় হবে সব......

—নরেন কে—ব্রজরাখাল?

—ওই তোমাদের বিবেকানন্দ—ঠাকুর বলতেন—নরেন একদিন সমস্ত পৃথিবী কাঁপিয়ে দেবে—তা কাঁপিয়ে শুধু নয়, ভূমিকম্প লাগিয়ে দিয়েছিল আমেরিকায়, প্রতাপ মজুমদার, আনিবেশান্ত সব থ হয়ে গেছেন—সেদিনকার ছোকরা নরেন তারি মধ্যে এত—তারা তো কেউ জানে না—এ শুধু ঠাকুরেরই লীলা......

তারপর থেমে আবার বললে—দেখবে বড়কুটুম—এবার আর ঠেকাতে পারবে না কেউ, একদিন এই নরেনই সমস্ত দেশকে বাঁচাবে—অনেক নেড়া-নেড়ী এসেছে, অনেক পাদরী এল, নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনাও হলো অনেক—কিন্তু দরিদ্রনারায়ণদের কথা আগে কেউ অমন করে বলেনি—

ভূতনাথ চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলো।

অফিস যাবার দেরি হয়ে গেছে। তবু ব্রজরাখাল বলতে লাগলো—নরেন আমাদের চোখ ফুটিয়ে দিয়েছে এবার, বলেছে—সাতশো বছরের মুসলমান রাজত্বে ছ' কোটি লোক মুসলমান হয়েছে, আর একশো বছরের ইংরেজ রাজত্বে ছাব্বিশ লক্ষ খৃষ্টান—এটা কেন হয়? কেন হয়, এটা আগে কেউ এতদিন ভাবেনি বড়কুটুম, এবার মাদ্রাজে বক্তৃতা দিয়েছে নরেন তাতে বলেছে অনেক কথা—দাসত্ব বড় খারাপ জিনিস বড়কুটুম—দেখ না, অনেকে কলম্বোতে গেল নরেনের সঙ্গে দেখা করতে—আমি পারলুম না—

অফিস যাবার সময় কোনও দিকে খেয়াল থাকে না কারো।

খানিক বেরিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এল ব্রজরাখাল।

বললে—মাইনে পেয়েছ বড়কুটুম?

পেয়েছে শুনে বললে—একটা টাকা দাও তো আমাকে—

—কেন তুমিও তো কাল পেয়েছ মাইনে—

—পেয়েছি, কিন্তু...ব্রজরাখাল হাসলে।

বললে—পেয়েছিলাম, কিন্তু বরানগরে গিয়ে দেখি গুরুভাইরা সব উপোস করছে, ঠাকুর দেহ রাখবার পর থেকে গুরুভাইদের বড় কষ্টে দিন কাটছে, ভিক্ষে করে পেট চালায় সব, কাল গিয়ে দেখি রান্না-বান্নার যোগাড় নেই—তা শুধু তো বেদ-বেদান্ত পড়লে পেট ভরবে না, কারো খাবার কথা মনেই ছিল না, নরেন আমেরিকা থেকে কিছু পাঠিয়েছিল—আর আমিও সব মাইনেটা দিয়ে এলাম গুরুভাইএর হাতে—

একটা টাকা দিয়ে ভূতনাথ বললে—তারপরে সারা মাস যে সামনে পড়ে আছে—তখন?

ব্রজরাখাল হাসতে লাগলো। বললে—তোমাকে উপোষ করাবো না বড়কুটুম, ভয় নেই—

তারপর বললে—ঠাকুর বলতেন—কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করতে না পারলে ভজন-সাধন হয় না—তা তোমার বোন মরে একটা দিক থেকে আমায় বাঁচিয়ে গেছে—আর টাকা সেটা কী করে যে ত্যাগ করি, আজই যদি চাকরিটা ছেড়ে দেই তো কালই অনেক গুলো পরিবার উপোষ করতে শুরু করবে—প্রত্যেক মাসের শেষে আমার মুখ চেয়ে বসে থাকে তারা—এক টাকা এগার আনা জোড়া কাপড়—তা-ই একখানা কাপড়ে বছর চালায় সব হতভাগীরা—

বেশী সময় ছিল না। ব্রজরাখাল চলে গেল।

(ক্রমশ)

— তেইশ —

শান্তি গলা চড়িয়েই পড়তে শুরু করলে।

"সমগ্র জম্বুদ্বীপের মধ্যে নবগ্রাম বিশাল সমুদ্রের মধ্যে এক গণ্ডূষ জল। সমুদ্রের স্বাদ তাহার প্রকৃতি তাহার বর্ণ সবই যেমন ওই জল গণ্ডূষটির মধ্যে থাকে তেমনি জম্বুদ্বীপ যাহা একদা ভারতবর্ষ নামে খ্যাত হইয়াছে, বর্তমানকালে ইংরাজেরা যাকে ইণ্ডিয়া বলিতেছে, তাহার ধর্ম তার ইতিহাস, তাহার আচার আচরণ তাহারই উত্থান পতন নবগ্রামের জীবনের মধ্যে প্রতিফলিত হইতেছে। একই দ্বন্দ্ব একই সাধনা একই মর্ম কথা।"

ইসলাম ধর্মাবলম্বী পাঠানগণ আর্যাবর্ত জয় করিয়া গৌড়বঙ্গ দেশ অধিকার করিবার ফলে নবগ্রামও তাহাদের দ্বারা অধিকৃত হইয়াছিল।

একদা একদল পাঠান আসিয়া নবগ্রাম অধিকার করিল। তখন এখানে নাকি ঘেঁউড়ী রাজা বলিয়া এক রাজা ছিলেন। কিন্তু সে একান্তভাবেই কাহিনী।

আসল সত্য হইল এই পাঠান দল এক ধর্মগুরুর দ্বারা পরিচালিত হইয়া এখানে আসিয়া নবগ্রামের দক্ষিণে তুর্কীডাঙ্গা নামে অভিহিত প্রান্তরে শিবির স্থাপন করতঃ ঘোষণা করিল ইসলাম ধর্মই একমাত্র সত্য; কাফেরের ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া এই ধর্মকেই সকলকে গ্রহণ করিতে হইবে। হিন্দুরা বিচলিত হইল ভীত হইল দলে দলে তাহারা স্থান ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। সম্পন্ন অবস্থার উচ্চবর্ণীয়েরা ব্রাহ্মণ কায়স্থ গন্ধবণিক সম্প্রদায়ের অনেকে রাঢ় অতিক্রম করিয়া নদী বহুল বঙ্গদেশে পর্যন্ত গিয়া বসতি স্থাপন করিল। অনেকে এ স্থান হইতে কিছু দূর গিয়া সাময়িকভাবে বাস করিতে লাগিল। পলায়ন করিতে পারিল না কৃষক দল এবং দরিদ্র সম্প্রদায়। আর পলায়ন করিতে পারিলেন না নবগ্রামের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত ঠাকুর পল্লীর গুরু বংশীয় ঠাকুর পরিবার।

ঠাকুর বংশ এই অঞ্চলের মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞ সদাচারী গৃহী যোগতত্ত্ববিদ ব্রাহ্মণ বংশ। যোগবিদ্যাবিদ এই ব্রাহ্মণেরা ওই বিদ্যার অনুশীলনে অলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। যোগাভ্যাসের ফলে নিরাময় দেহ নাকি জ্যোতিসম্পন্ন ছিল। তাঁহারা মহা তেজস্বিতায় তেজস্বী এবং কর্তব্য কর্মে মানব ধর্মে অটুট নিষ্ঠ ও অপার্থিব স্নেহে স্নেহপরায়ণ ছিলেন। স্থানত্যাগ করিবার কল্পনা মাত্রেই গৃহকর্তা প্রবীণ ঠাকুরের মনে এক প্রশ্ন উদিত হইল। এই যে শত শত কৃষক পরিবার দরিদ্র সমাজ ইহাদের কি হইবে? তিনি সংকল্প করিলেন, তিনি স্থান ত্যাগ করিবেন না। কৃষক ও দরিদ্র সম্প্রদায়কে তিনি অভয় দিয়া বলিলেন, তোমরা ভয় করিয়ো না। তোমাদের রক্ষা আমি করিব।

এই ঘোষণা করিয়া তিনি একাকী অকুতোভয়ে ওই ইসলামীয় ধর্মপ্রচারকের শিবিরে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমার ধর্মের সারবত্তা সত্যতা প্রমাণের জন্য আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি। ইসলাম ধর্মের সত্য যে সর্বশক্তিমান সর্বত্র বিরাজমান অনন্ত প্রেমময় ঈশ্বরের সন্ধান দেয়, তাঁহারই সমীপবর্তী করে, আমার ধর্মও তদ্রূপ—সেই ঈশ্বরকে জ্ঞাত হইবার তাঁহার করুণা প্রাপ্ত হইবার তত্ত্ব ও সত্য মানুষকে জ্ঞাত করে।

এই বলিয়া তিনি মহাভারতের ধর্মব্যাধের উপাখ্যান বিবৃত করিয়া বলিলেন—হে মহাবাহো! আপনি সশস্ত্র, সশস্ত্র অনুচর পরিবেষ্টিত হইয়া এখানে আগমন করিয়াছেন। কিন্তু আমি সত্যের উপাসক ব্রহ্ম জিজ্ঞাসু; মৃত্যুর মধ্যেও অমৃত আশ্বাসে আশ্বস্ত, সুতরাং আপনাকে ভয়ও করিব না, অবজ্ঞা বা ঘৃণাও করিব না। নির্ভয়ে প্রীতির সহিত বলিব, হে মহাবাহো, ওই ব্যাধ তাহার আরণ্য জীবনে ব্যাধ সমাজের আচার আচরণ পালন করিয়াও যে ক্ষেত্রে ব্রহ্মতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞাত হইয়াছিল, সে ক্ষেত্রে এই দেশের প্রচলিত ধর্মবিধি অনুযায়ী এতদ্দেশীয় মানুষেরা সেই পরম তত্ত্বেরই উপাসনা করে। ইহাতে আপনার সন্দেহের কি কারণ থাকিতে পারে?

ইসলামীয় ধর্মগুরু এই তত্ত্বপূর্ণ ভয়শূন্য বাক্য শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন। কিন্তু তাঁহার অনুচরেরা তাহাদের শাণিত অস্ত্রগুলি মুহূর্তে উদ্যত করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। কাফের! ব্রাহ্মণ নির্ভয়ে প্রসন্ন হাস্য মুখে মুহূর্তে ধ্যানস্থ হইলেন; মৃত্যু যদি হয় তবে হউক, আত্মাকে পরম সত্য ভাবনায় মগ্ন করিয়াই তিনি সকল চিন্তা শূন্য হইয়া গেলেন।

ওদিকে চমৎকৃত মহাবল ইসলামীয় ধর্মগুরু মুহূর্তে ক্ষিপ্র হস্তোত্তোলন করিয়া তীক্ষ্নকণ্ঠে আদেশ উচ্চারণ করিলেন, অস্ত্র সম্বরণ কর।

তাহার পর ব্রাহ্মণকে সমাদর পূর্বক আসন প্রদান করিয়া বলিলেন—হে পণ্ডিত তোমাকে আমি প্রশংসা করিতেছি। সাধুবাদ প্রদান করিতেছি। তুমি আসনে উপবেশন কর। কিন্তু একটি প্রশ্ন আমি করিব। তোমাদের ধর্মে অতিথিপরায়ণতার অভাব কেন? লোকে ভীত হইয়া উপঢৌকন প্রেরণ করিতেছে—আনুগত্য প্রকাশ করিতেছে, কিন্তু কই অতিথিকে সাদর আহ্বান জ্ঞাপন করিতেছে কই?

ব্রাহ্মণ বলিলেন—অস্ত্র সজ্জিত হইয়া রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় এখানে আপনি আগমন করিয়াছেন, স্বাভাবিকভাবেই এ দেশের নিরীহ শান্তি প্রিয় নরনারী ভীত হইয়াছে। তাহারা ভাবিতেছে অস্ত্রবলে আপনি তাহাদিগকে ধর্মপ্রচারক সম্প্রদায়ের দাসে পরিণত করিতে আসিয়াছেন। হে মহাবাহো! কুরুক্ষেত্রের পরবর্তীকাল হইতে আমরা অস্ত্রবলের উপর

তিক্ত হইয়াছি। মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ কামনা যদি শান্তি ও আনন্দ হয়, তবে অহিংসার মধ্যেই তাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কুরুক্ষেত্রের মহানায়ক আমাদের অবতার পুরুষ এই নিষ্ঠুর রক্তপাতে লোক-ক্ষয়ের পর গান্ধারীর অভিশাপ বরণ করিয়া নিজে ব্যাধের শরাঘাতে স্বকীয় পবিত্র রক্তে ধরিত্রীর তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া পরবর্তী অবতারে অহিংসা মন্ত্র প্রচার করিয়া সেই পথেরই নির্দেশ দিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রের রক্তসিক্ত ভূমিতে অহিংসা ধর্ম প্রচারের ভূমিকা রচনা করিয়াছেন। মহাভারত খণ্ডের উত্তর খণ্ডের সূচনা করিয়াছেন। সেই কারণেই যেখানে অস্ত্রবলের প্রাধান্য সেখানে এদেশের চিত্ত বিমুখ হয়। এবং জাগতিক লীলায় মহাতামসী আদিম প্রকৃতির বিকর্ষণে সাধারণ মনুষ মহাভয়কে, কাটাইয়া উঠিতে পারে না, বহুবিধ মায়া মোহে তাহারা আবদ্ধ এবং অন্ধ। সেই কারণেই তাহাদের চিত্ত-বিমুখতার সঙ্গে ভয় যুক্ত হইয়াছে। যাহা হউক আমি আপনাকে আহ্বান করিতেছি। আপনি আমার গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিয়া আমাকে ধন্য করুন।"

*   *   *

শান্তি বই থেকে মুখ তুলে গোরীকান্তের দিকে তাকালে।

গোরীকান্ত তন্ময় হয়ে শুনেছিল। শান্তি থামতেই সে তার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বললে—আশ্চর্যের কথা কি জান শান্তি? এখানকার কোন লোক এ কাহিনী জানবার চেষ্টা করেনি। জানেও না। সন্তোষ পিসেমশায় এখানকার জমিদারী সেরেস্তার কাগজ, ওই ঠাকুর বংশের নানকার জমির সনন্দ এই সব থেকে সংগ্রহ করেছিলেন টুকরো টুকরো তথ্য। তারপর মাল্য রচনার মত মালা গেঁথেছিলেন।

শান্তি চুপ ক'রে উদাসভাবে তাকিয়ে রইল আকাশের দিকে।

গৌরীকান্ত বললে—তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি আমি। একটু হাসলে সে।

খাতাখানি বারবার মাথায় ঠেকিয়ে শান্তি বললে—বাবা যে আমার এমন লিখতেন, তা কোনদিন জানতে পারিনি।

—সেখানে তিনি লিখতেন না?

—না। সেখানে গিয়ে আমার মাকে নিয়েই মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন। মা যেমন তাঁকে পেয়ে সব ভুলেছিলেন—তিনিও তাই। বলতেন—কি হবে? আমি তুমি পৃথিবীর মঙ্গল করব এই ধারণা নিয়ে যারা মঙ্গল করতে যাই, তারা কামনা শূন্য নয়—প্রতিষ্ঠা কামনা তাদের প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। মঙ্গল করতে করতে যখন এই প্রচ্ছন্ন কামনা প্রকট হয়ে উঠবে তখন মানুষের অকল্যাণের আর সীমা থাকবে না। মাকে বলতেন—তার চেয়ে নিজের কল্যাণ কর—তবে দেখো তাতে যেন একটি কীট বা পতঙ্গের অকল্যাণও না হয়। তুমি আমাকে ভালবাস আমি তোমাকে ভালবাসি। আর পৃথিবীর কারুর উপর যেন আক্রোশ পোষণ না করি। মধ্যে মধ্যে নবগ্রামের কথা উঠলে বলতেন—বাপরে, প্রতিষ্ঠার কামনা যে কি সর্বনাশা—কি ভয়ঙ্কর—নবগ্রামে আমি দেখে এসেছি। ও বিষ কখনও মরে না! পুরুষে পুরুষে চলে।

গোরীকান্ত বললে—হ্যাঁ—ওই তত্ত্বই তিনি সারা জীবন ভোর দেখে দেখে যেন উপলব্ধির মধ্যে আবিষ্কার করেছেন। পরে সে কথা পাবে। আছে। এক সন্ন্যাসী আমার বাবাকে বলেছিলেন—বাবা সংসারে মানুষ যেমন হারায় না, পঞ্চভূতের মধ্যে অণু থেকে পরমাণু এবং তার থেকেও ভগ্নাংশ হয়ে মিশে থাকে—সৃষ্টি যতকাল থাকবে—ততকাল থাকবে—ঠিক তেমনি কর্মও হারায় না। কর্ম করে মানুষ তার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সে চলতেই থাকে—চলতেই থাকে। পাবে পরে। এবং এই যে ইতিহাস বা আখ্যায়িকা পড়ছিলে তার মধ্যেও ওই কথা। ওই তত্ত্ব।

—আপনি সবটা পড়েছেন?

—আদ্যোপান্ত।

—কেমন লাগল?

—ভাল না লাগলে তুমি আসবার সঙ্গে সঙ্গেই ওটিকে সরিয়ে রাখতাম। তোমার চোখে পড়তেই দিতাম না। চোখে পড়লে তো তুমি এ প্রশ্ন আমাকে করবেই। এ প্রশ্নের প্রতীক্ষা করছিলাম। যেকালের মানুষ তিনি সেইকালের ধারায় ভাষায় তিনি রচনা করেছেন। কিন্তু একটি সন্ধানী সত্য দৃষ্টি তার মধ্যে আছে যাতে আমি বিস্ময় মেনেছি। আমি এক সময় এখানকার ইতিহাস কাহিনী সংগ্রহ করেছিলাম। অনেক কাহিনী অনেক প্রবাদের অনেক নামের কোন হদিস খুঁজে পাই নি। তার সন্ধান পেয়েছি। ধর ওই ঠাকুরপাড়ার কথা।

শান্তি তার দিকে তাকিয়ে বললে—ওই মুসলমান ধর্মপ্রচারক ব্রাহ্মণের আতিথ্য স্বীকার করে বাড়িতে গিয়ে তাঁকে হত্যা করে ঠাকুরপাড়া দখল করলে বুঝি।

—না। তা হ'লে ঠাকুরপল্লী—কোন বাদ—হজরতাবাদ কি মামুদাবাদ নাম ধারণ করত তা নয়।

মুসলমান ধর্মপ্রচারক শস্ত্রধারী পরি বেষ্টিত হলেও তত্ত্ব সন্ধানী ছিলেন। বহু মন্দির বহু বিগ্রহ এদেশে বহু মুসলমা রাজশক্তি ধ্বংস করেছে। বহু রাজবং ধ্বংস করেছে, বহু পরিবারকে ধর্মান্ত গ্রহণে বাধ্য করেছে। কিন্তু সে সেই যুগে মধ্য এশিয়ার অভিযান ও লুণ্ঠনের ধারা ধর্ম সেখানে উপলক্ষ্য। সংখ্যালঘু রাজশ স্বপক্ষে দল বৃদ্ধি করেছে ভাঙা চোরা করে সম্পদের জন্য। মণি রত্ন নিয়েছে। সুন্দর নারী নিয়েছে।

মুসলমান ফকীর দরবেশেরাও ও পর্যায়ের মানুষ ছিলেন বললে অন্যায় হ তত্ত্বপিপাসু ফকীর ওই ব্রাহ্মণের আতি স্বীকার করে তাঁর বাড়িতে এসে ঘোষ ক'রে দিলেন—কারও ভয় নাই। কাকে জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হবে না। অনুচরদের তিনি সাবধান করে দিলেন।

ধীরে ধীরে দেশের ভয় দূর হতে লাগ একে একে দেশে মানুষ ফিরতে লাগল। এ দেশ ত্যাগ ক'রে বঙ্গদেশে গিয়েছি তারা অবশ্য ফিরল না। সেখানে মৃত্তিকা এবং সরল নিরীহ মাটির মানু মধ্যে সহজ আধিপত্য বিস্তার ক'রে করে এখানে বাস করার চেয়ে বেশী পেলে।

মুসলমান ফকীর এবং প্রবীণ আলাপ আলোচনায় ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে আবদ্ধ হলেন। ফকীর যোগবিদ্যার পরি পেয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বললেন—ঠাকুর আমাকে যোগ শেখাও। তোমাকে কোরাণ পড়ে শোনাব। আমার সম্বল আছে তা আমি তোমাকে দে কিছু চিকিৎসা তত্ত্ব জানি—কিছু সঞ্চয়ের তত্ত্ব জানি।

ব্রাহ্মণ বললেন, ফকীর তাহ'লে তোমা আহারে নিয়মেও আমার অধীন হবে।

ফকীর তাতে গররাজী ছিলেন না বললেন—জরুর। সেতো হতেই হবে।

যোগ শিখে ফকীর ফিরে গেলেন কয়েকদিন পর স্থানীয় কাজির দরবার লোক এল। ব্রাহ্মণকে কাজির সাদর নিমন্ত্র জানালে।

ব্রাহ্মণ যেতেই কাজি তাঁকে সমাদর ক তাঁর দরবারে হিন্দু সমাজ সংক্রান্ত বিরো মীমাংসায় শাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত দেবার জ

ন্ডিত নিযুক্ত ক'রে সম্মানিত করলেন। হ্মণ নিজে সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান ক'রে জের তরুণ পুত্রকে নিযুক্ত করবার জন্য নুরোধ করলেন। এবং পুত্রকে বারবার বধান ক'রে দিলেন—অহঙ্কৃত হবে না, ই প্রতিষ্ঠাকে জীবনের সম্পদ বলে গণ্য রবে না। এই পদের সুযোগে নিজের শের বা স্বজনের বা জ্ঞাতির বা কুটুম্বের র্থ সাধনের চেষ্টা করবে না। কাকেও পীড়ন করবে না। শাসন করবে না। দুমাত্র প্রতিষ্ঠা যদি গ্রহণ কর তবে—। শান্তি পড়; কি লিখেছেন পিসেমশাই।

শান্তি খাতা তুলে নিলে। চোখ বুলিয়ে দান করে ঠিক জায়গাটি পেয়ে পড়ে গেল "ব্রাহ্মণ বলিলেন—হে পুত্র তুমি যে মুহূর্তে বিন্দুমাত্র প্রতিষ্ঠা গ্রহণ করিবে—সেই মুহূর্তে সমাজে সংসারে তোমার কাশে এই ঠাকুর বংশের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সিন্ধু পরিমাণ হইয়া বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিবে। দুর লালসা যে জীব প্রকৃতির ধর্ম বিদ্বেষও সেই প্রকৃতির ধর্ম। মানব জীব জগত হইতে স্বতন্ত্রভাবে জগতকে গঠন করিয়া জীবনকে স্বতন্ত্রভাবে গঠন করিতে চায় যে, আত্ম পরিচয় ও বিশ্লেষণ বোধের দ্বারা, সেই বোধের দ্বারা এই তত্ত্ব অবগত হইয়া সে এই লালসাকে সম্বরণ করে। সুযোগ পাইও যে মুহূর্তে তুমি লালসা সম্বরণের শক্তির পরিচয় প্রদান করিবে, সেই মুহূর্তে সংসারে ও সমাজে বিদ্বেষের স্থলে প্রীতি ও প্রশংসা আকাশ পরিমিত হইয়া প্রসন্ন নীল হইয়া উঠিবে। সেই আকাশে তুমি দীপ্যমান নক্ষত্রের মত শোভা পাইবে।"

গৌরী বললে—চমৎকার নয় শান্তি?

শান্তি হেসে খাতাখানি নামালে। গৌরীকান্ত বললে—কিন্তু সে তো সহজ নয়। ওই প্রবীণ যোগীর পক্ষে যা সহজ ছিল—নবীন ছেলের পক্ষে তা সম্ভবপর হল না। রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা সংসারে ভগবৎ প্রসন্নতার পরেই দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ বল অর্থাৎ শক্তি। ভগবৎ প্রসন্নতায় মাৎসর্য আনে না। রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা হল পূর্ণ মাৎসর্যের আধার। চাণক্য মৌর্য সাম্রাজ্যের কর্ণধার হয়ে পর্ণকুটীরে বাস করতেন হরিণের চামড়ার উপর শুতেন—আতপ চালের ভাত খেতেন—তবুও তাঁর রচনার মধ্যে যে বাস্তব জ্ঞানের পরিচয়ের সঙ্গে বক্র হাস্য উঁকি মারে তাতেই তাঁর মাৎসর্যের পরিচয় ফুটে বেরিয়েছে। ঠাকুর বংশের নবীন ঠাকুর আত্মরক্ষা করতে পারেননি। তিনি অনুগত জনদের বহু স্বার্থ সাধন করে দিলেন। প্রতিপক্ষকে সুকৌশলে সুযোগের সৃষ্টি করে দমিত করলেন। তখন অবশ্য প্রবীণ ঠাকুর গত হয়েছেন। নবীন ঠাকুরও শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন যোগ বিদ্যাও আয়ত্ত করে-ছিলেন, কিন্তু তবু আত্মরক্ষা করতে পারেন নি। ক্রমে ক্রমে রাজ সরকার থেকে সনন্দ পেলেন নিষ্কর ভূমি; সম্মান—অনেক কিছু। ওদিকে তাঁর ছেলে তখন সংস্কৃতের সঙ্গে আরবী পারসী শিখছে—রাজকার্যের উপ-যোগী হিসাব-নিকাশী বিদ্যা শিখছে। সে তখন মুসলমানী পোষাকও পরতে শুরু করেছে। এমনি সময়ে একদিন সমগ্র সমাজ তাঁর একাধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে। তাঁদের পতিত করলে। বললে ধর্মচ্যুত হয়েছ তোমরা।

প্রতিষ্ঠাবান প্রৌঢ় মাৎসর্যে অহঙ্কারে দৃপ্ত তখন।

তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে সমাজ ত্যাগ করলেন। গীতার শ্লোক আউড়েই এ সমাজ ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।' বললেন—এ আমার নব জন্ম।

নবজন্ম লাভ করে তিনিই আহ্বান জানালেন—এ অঞ্চলের কৃষকদের দরিদ্রদের আমরাই তো তোমাদের এক সময় রক্ষা করেছিলাম। আমরাই তো তোমাদের পরিত্যাগ করিনি আমরাই তো এতদিন ঈশ্বরতত্ত্ব তোমাদের জানিয়ে এসেছি। আমরাই আজ নূতন ধর্ম গ্রহণ করে তোমাদের ডাকছি। আমাদের পিছনে পিছনে এস। ইহলোক পাবে পরলোক পাবে। তোমাদের সঙ্গে আমরা—তোমাদের ঠাকুর যাঁরা তাঁরা তোমাদের সঙ্গে এক সঙ্গে আহার করবেন—পরস্পরে আলিঙ্গন করবেন। এস।

গোটা ঠাকুর পাড়া পশ্চিম পাড়া খাঁয়ের পাড়া পাইকার পাড়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে। নবগ্রামের আকাশে লা-ইলাহি ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল।

সেইদিন ওই পশ্চিম পাড়ার এক কৃষক তার এক জ্ঞাতি কৃষককে বলেছিল—দেখ কত বড় হয়ে গেলাম আমরা! তোরা সেই এতটুকু হয়ে গেলি। তোরা হিন্দু এই এতটুকু, আমরা মুসলমান—এ-ই এ তো বড়ো!"

শান্তি চকিত হয়ে বলে উঠল—কিশোর মামার মুখে এ কথাটা শুনেছি। কে যেন বলত?

গৌরীকান্ত বললে—সেই কাল থেকেই চলে আসছে। আমিও বাল্যকালে শুনেছি। বলত পশ্চিমপাড়ারই হাজি সাহেব।

আমরা বলতাম চাচা সেই কথাটি বল। শাল প্রাংশু মহাভুজ, চাচা সাহেব আমাদের বুকে তুলে নিয়ে বলত'—আমরা মো-সল মা-ন এই এ—তো ব—ড়ো! তোমরা হিন্দু এই এতটুকু! হাসলে সে। বললে—তখন জানতাম না এ কথা। এর মধ্যে এত ইতিহাসের বিদ্বেষ মন্ত্র লুকিয়ে আছে সন্দেহও করিনি। তবে কি জান? একটা যেন খোঁচা, সুচের ডগার স্পর্শের মত খোঁচা অনুভব করেছি। আর চাচার মুখে কৌতুকের হাসির সঙ্গে আরও একবিন্দু কিছু ছিল যার মানে চাচাও জানত না।

ঠিক এই মুহূর্তেই একখানা জিপ এসে দোরে দাঁড়াল।

কে? গৌরীকান্ত উঠে দাঁড়াল।

শান্তি মুখ ফিরিয়ে দেখে বললে—এস-ডি-ও, এস-পি। ওইযে কিশোর মামাও রয়েছেন।

ওঁরা এসে ঘরে ঢুকলেন এবং সহাস্যে অভিবাদন জানিয়ে বললেন—আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।

—আসুন। গৌরীকান্ত প্রত্যভিবাদন জানালে।

শান্তি খাতাখানা নিয়ে স'রে দাঁড়াল। সে দ্রুত পড়ে যাচ্ছে। গৌরীকান্ত যেখান পর্যন্ত বলেছে তারপরের অংশ খুঁজছে। পেয়েছে।

"ঠাকুর বংশের নিকট আত্মীয়-কুটুম্ব এবং ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি এ অঞ্চলে নানা স্থানে ছিলেন। তাঁহারাও একে একে মুসলমান হইলেন। যাঁহারাই তাঁহাদের অনুগত ছিলেন সৌহার্দ্য সূত্রে অন্তরঙ্গ ছিলেন এবং এই প্রতিষ্ঠার অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের এই বিদ্বেষ হইতে পরিত্রাণ ছিল না। ইহার মধ্যে কয়েক ঘর ঠাকুর বংশের অতি নিকট জ্ঞাতি যাঁহারা প্রতিষ্ঠার ভাগ লন নাই—তাঁহারা দেশত্যাগ করিলেন। ইহাদের মধ্যে একটি নাম আমার চিত্তে আলোড়নের সৃষ্টি করিতেছে। বিষ্ণু ঠাকুর কুলীন বংশের একটি নাম সেই নাম। সে নাম আমার পূর্ব পুরুষের মধ্যে রহিয়াছে। আমাদের পূর্ব পুরুষদের মধ্যে যোগবিদ্যা পারঙ্গ-মতার খ্যাতি আছে। বিচিত্র কি—আমি সেই ঠাকুরের বংশধর।"

শান্তি অবাক হয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর খাতাখানি রেখে দ্রুতপদে চলে গেল।

(ক্রমশ)

ঝালপাড়ায় কীর্তন

শ্রীসরলাবালা সরকার

[২]

কীর্তনের আসর লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। অনেক কষ্টে আমরা কোন-রকমে একটু জায়গা করিয়া লইলাম।

গৌরচন্দ্রিকা শেষ হইয়া গিয়াছে। কীর্তন আরম্ভের ভূমিকাস্বরূপ কীর্তনীয়া হরিদাস বলিতে আরম্ভ করিলেন, "একদিন দেবর্ষি নারদ ব্রজমণ্ডলে গিয়া উপস্থিত হইয়া-ছিলেন। পুষ্পিত তরুলতা সমস্তই যেন জীবন্ত, যেন শ্রীরাধামাধবের অপূর্ব লীলার অংশ গ্রহণের জন্যই তাহারা প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। নারদ ভাবিলেন, এই ব্রজভূমির তরুলতাগুলিও এমন সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে—ঋষিগণ শত শত বৎসর তপস্যাতেও যাহা লাভ করিতে পারেন নাই।

"ভাই সব, আজ আমাদের সেই সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে, এই কীর্তন-মণ্ডপ সকলে একবার মনে মনে ধারণা করুন এইটিই সেই ব্রজমণ্ডল, যেখানে শ্রীরাধামাধবের নিত্য চিন্ময় প্রেমলীলার প্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছিল। যেখানে, ভ্রমর গুন গুন রবে শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করিতেছে, যেখানে ভাবে বিভোর ময়ূর-ময়ূরী গোপী-গণের অপূর্ব নৃত্যলীলার অনুকরণে নৃত্য করিতেছে। শুক-শারী যেখানে লীলা-কীর্তন গান করিতেছে।

"ধন্য ধন্য জয়দেব গোস্বামী, যিনি এই মধুর লীলারস ত্রিতাপ-পীড়িত জীবগণকে পরিবেশন করিয়াছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে একটি সাবধানবাণীও দিয়াছেন, সেটি এইঃ

যদি হরি-স্মরণে সরস মনং
যদি বিলাস কলাসু কুতুহলং
শৃণু তদা জয়দেব সরস্বতী কৃতং
মধুর কোমলকান্ত পদাবলীং।

"যদি হরি-স্মরণে তোমার মন পবিত্র-রসে অভিষিক্ত হয়, মনের সকল কলুষ ধৌত হইয়া যায়, যদি এই অপ্রাকৃত বিলাস-কলা অনুভবে গ্রহণ করিবার উৎকণ্ঠা ও আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়া থাকে, তবেই তুমি জয়দেব সরস্বতীকৃত এই মধুর কোমলকান্ত পদাবলী শ্রবণ করিবার অধিকারী হইবে। কিন্তু অনধিকারী জন, যাহার মনে কামগন্ধহীন, এই লীলা শ্রবণে অশুচি দৈহিক কামভাবের উদ্রেক হয়, সে যেন এই মুহূর্তে এই পবিত্র স্থান ত্যাগ করে।"

হরিদাস কীর্তনীয়া সগর্জনে বলিলেন, "ন শ্রোতব্য, ন শ্রোতব্য, ন শ্রোতব্য কদাচন।"

কামুক-হীনমনার এই লীলাকথা শোনবার অধিকার নাই, নাই নাই।"

কীর্তনের স্থান একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল। আমি চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম—দেখিলাম একজনও স্থানত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় নাই।

প্রথমে আরম্ভ হইল রূপ বর্ণনা, তাহার পর পূর্বরাগ।

রাধিকা সখীদের নিকট তাঁহার যে "অকথন ব্যাধি" তাহা বুঝাইয়া বলিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু বুঝাইতে পারিতেছেন না। বলিতেছেন, "সখি, এই যে নব অনুরাগ, এটি যেন বেদনায় আমাকে জর্জর করিতেছে, অথচ ইহা ত্যাগ করিতেও তো পারি না। মনে মনে কত কি বিচার করিতেছিঃ—এইবার কীর্তন আরম্ভ হইলঃ—

"যবে নব অনুরাগ, আমার হৃদয়েতে দিল দাগ,
বিচারিলাম আগের পাছের কাজে,—
যা যা করতে যে হবে গো
সখীরে বঁধুয়ার লাগি
সখী আমি বিচার করে দেখলাম।
আগের কথা আর পরের কথা
সবই আমি বিচার করে দেখলাম।
কানু অনুরাগে কোন্ পথে যে চলতে হবে
সবই বিচার করে দেখলাম।
আগে কুলবতী সতী ছিলাম, হতে হবে
কুল তেয়াগিনী, বিচার করে দেখলাম।।
সখি, অনুরাগ যে ভাসিয়ে নিল,
কুলনারী আমি, অকূল-পাথারে যে ভাসিয়ে
নিল বিচার করে দেখলাম।"

তাহার পর, "সখি রে, সখি রে, সখি রে" —মৃদু গুঞ্জন;—বাদ্যধ্বনিও সঙ্গে সঙ্গে মৃদু হইয়া গেল। দোহার এক দৃষ্টিতে কীর্তনীয়ার মুখের দিকে চাহিয়া আছে, সেই মৃদু ঝঙ্কারের সহিত তাহারও গলার সুর যেন মিশিয়া যাইতেছে। আর কোন ধ্বনি নাই, কেবল আকুলতাপূর্ণ অপূর্ব গুঞ্জন, "সখীরে, সখীরে, সখীরে।"

"সখী আমি বিচার করে দেখলাম।
বিচার করতে কিইবা জানি,
তবু বিচার করে দেখলাম।"
আমি অবোধিনী গোপবালা,
তবু বিচার করে দেখলাম।

—কী দেখলাম?

দেখলাম,—

"প্রেম করে রাখালের সনে,
আমার ফিরতে হবে বনে বনে,
ভুজঙ্গ কণ্টক পঙ্ক মাঝে।
আমায় যেতেই যে হবে গো,
রাই বলে বাজিলে বাঁশী
রাজার দুলালীকে যেতেই যে হবে গো
ভুজঙ্গ কণ্টকময় পথে
আমায় যেতেই যে হবে গো
পথ-অপথ নাহি জানি,
যদি, চলিতে চরণে করে
বেষ্টন বিষধরে,—
তারে, মণিময় নূপুর মানি
আমায় যেতেই যে হবে গো!
আমায় যেতেই যে হবে গো,
সেই পাগল-করা বাঁশীর উ[...]
তখন, কোন্‌টি সুপথ কোন্‌টি অপথ,—
বল কে আর চাইবে পথের পা[...]

অনবরত এইভাবে আখরের পর আ[...] চলিতেছে, হঠাৎ কথায় আরম্ভ করি[...] "সখি, যদি বর্ষা-রজনীতে পঙ্কময় পি[...] পথে বাঁশীর আহ্বানে ছুটে যেতে হয়, ত[...] হয়তো পথে পড়েও যেতে পারি, কি হ[...] তখন? তাই আগে চাই অভ্যাস-যো[...] সাধনা।

"আমি ঢালিয়া আঙিনায় জল, করি পঙ্ক-পি[...]
গতাগতি করি সেই পথে।
জানি, আমায় যেতেই যে হবে গো,
উচল, নীচল, পিছল পথে,
পথে হোক্ অপথে হোক্,
আমায় যেতেই যে হবে গো

সখি, তোরা শুনেছিস তো সপ্তস্বরে [...] বাঁশীর আহ্বান—

"এস, কৃষ্ণ-বক্ষ বিলাসিনী, এস, এস!
এস, ত্রিভুবন-বিমোহিনী ,এস, এস!
এস শ্যাম-চিত্ত উন্মাদিনী, এস, এস!
এস, পরা-প্রেম প্রবাহিনী, এস, এস!
এস রমণীর শিরোমণি, এস, এস!
এস কুলশীল তেয়াগিনী এস, এস।"

সখি, কখনও বা মনে হয় বুঝি কত দ[...] দূরান্তর থেকে আসছে ওই বংশী[...] আমি কেমন করে যাব? যশ, মান, [...] গৌরব এই সকল তরঙ্গে ভরা নদীর ও[...] ওই যে বাঁশীর ডাক, আমি কেমন [...] এসব নদী পার হয়ে যাব?

"ওপারে বসে বাজাও বাঁশী
আমি এপারে বসে শুনি,
ওরে, আমি যে অবলা-নারী
সাঁতার নাহি জানি।"

পর পর তিন রাত্রি কীর্তন চলিয়া[...] পূর্বরাগ, অভিসার, মিলন, মান, কলহন্তা[...]

...্য-রজনীতে রাসলীলা প্রভৃতি। এতদিন ...রে সে কীর্তনের বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। ...বে কিছু কিছু সামান্য আভাস দিবার ...ষ্টা করিয়াছি।

...লহন্তরিতায় শ্রীমতীর দারুণ অনুতাপঃ—

...ন্ত সনে কলহ করি কঠিনা কুলকামিনী।
দেখে, শ্যাম নাই, আর সখীও নাই
কৃষ্ণ-তেয়াগিনীরে সখীরাও ত্যাগ করে গেছে
দেখে, শুক-শারীও উড়ে গেছে
পিঞ্জর শূন্য করে উড়ে গেছে।"

শূন্য কুঞ্জে একাকিনী রাধারাণীঃ—

...াধিকার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছেঃ—

"যাকর চরণ নখরজ্যোতি নিরখি
মুরছয়ে কত কোটি কাম রে,
সে হেন বঁধুয়া পদতলে লুটাওল,
নিরদয়া পামরী হামরে।
আমার মত কৃষ্ণত্যাগিনীর গতি কোথায়?
"হা হরি, হা হরি, মুঝে মরম টুটল,
হা কান্ত! ভ্রান্ত মম চিতরে।
আমি অভিমানে ভ্রান্ত মতি,
আমি কেন বা মান করেছিলাম,
আঁচল-বাঁধা নিধি হারাইলাম
দারুণ অহঙ্কারে।"

বৃন্দা আসিয়া বলিতেছে, "ওরে অর্বাচীন, কার মানে তোর এত মান, সেকথা কেমন করে ভুলে গেলি? উচ্চকুলে জন্ম, বলেই কি তোর মান? উচ্চকুলের বধূ বলেই কি তোর মান? সে সব তো মান নয়, কৃষ্ণ-সোহাগিনীর সে যে অপমান! তোর মান তারই মানে, যার জন্য এই মান-অপমান তুই অবহেলায় পায়ে ঠেলেছিস।"

বৃন্দা আবার সান্ত্বনাও দিতেছে—"যে কৃষ্ণমানে মানিনী, মান করা তো তারই শোভা পায়। যে শ্যামনাগরের প্রেমের গরবে, নাগর তাকেই তো চূড়ার ফুলে অঞ্জলি দেন।"

তাই তো মহাজনের বর্ণনায়—

"খুলিয়া চূড়ার ফুল নাগর হাতে নিল,
'নমঃ প্রেমময়ী' বলে চরণে অর্পিল।"

ময়ূর-পুচ্ছ-চন্দ্রিকা-অঙ্কিত যে চূড়া, শ্রীমতী ছাড়া আর কাহার পদতলে সে চূড়া নত হয়?

এবার শ্যামসুন্দরকে উদ্দেশ করিয়া বৃন্দা বলিতেছেন,

"সে তো মান করিতেই পারে—
ওহে তোমার মানেই যার মান
গরব বাড়াবার তরে।
সে যে তোমা ছাড়া আর জানে না
চাতকিনী ক্ষণে ক্ষণে, চেয়ে থাকে মেঘ পানে
সে কি তারে বজ্রাঘাতে প্রাণে মারে?"

"এত নিঠুরালী কি তোমার শোভা পায়? বঁধু হে, তোমার প্যারী যদি তোমার মানে অভিমানিনী হয়ে তোমাকে দু'টা কথাই শোনায়, তবে—

গিরি গোবর্ধন নখে যে জন হেলায় ধরে
সেকি দু'টা কথার ভারও সইতে নারে?"

আবার সখীরা সকলে আসিল, শুক-সারীও ফিরিয়া আসিয়া কুঞ্জের দ্বারে বৃক্ষের উপর বসিল, কিন্তু শ্যামসুন্দর তো আসিলেন না, আসিল এক শ্যামাঙ্গিনী বিদেশিনী, অবগুণ্ঠনে তাহার মুখখানি ঢাকা, সে বৃকভানুনন্দিনীর দাসীপদ প্রার্থিনী হইয়া বহু দূরদেশ হইতে আসিয়াছে।

দাসীপদ প্রার্থিনী? শ্রীরাধিকার দাসী-পদ পাওয়া কি এতই সহজ? সখীরা তাঁহাকে ঘিরিয়া নানা প্রশ্ন করিতেছে, নতবদনা বিদেশিনী এত মৃদুস্বরে উত্তর দিতেছে যে, ভাল করিয়া সে উত্তর শোনাও যায় না।

"বিদেশিনী কোন্ দেশে তোমার ঘর?"

"আমাদের রাজনন্দিনীর সংবাদ কে তোমায় দিল?" আবার কোন সখী বলিল, "তোমার সাহস তো কম নয়? ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার দাস্য লাভ করতে পেলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করেন, তাঁরই দাসীপদ লাভ করতে চাও তুমি বিদেশিনী?"

বিদেশিনী মৃদুস্বরে উত্তর দিতেছে, "না হয় রাজনন্দিনীর দাসীর দাসী হব। না হয় তাঁর দাসী, তাঁর দাসীর দাসী, তার দাসী, তার দাসী হব।"

হরিদাস কীর্তনিয়া এইবার ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন, "কুঞ্জের অদূরে ওই যে পদ্মদল-শোভিত সরোবর, কার সরোবর ওটি?"

"ওটি আমাদের রাজনন্দিনী শ্রীরাধিকার।"

"সরোবরের শেষ প্রান্তের প্রান্তরটি কাহার?"

"ওটিও আমাদের বৃকভানু নন্দিনীর।"

"প্রান্তরের পর যে বিশাল কান্তার দেখা যাইতেছে, সেটির অধিকারিণী কে?"

"সেটিও আমাদের রাজনন্দিনীরই অধিকারভুক্ত।"

"কান্তার পার হয়ে গেলে দেখা যাবে এক জনপদ, গ্রাম ও বাজার। সেগুলির অধিকার কাহার?"

"সে সমস্তই রাধারাণীর অধিকারভুক্ত। তাঁরই নাম ঘোষণা করা হয় সেখানে। তিনি অবশ্য কোনদিন পদার্পণও করেন নি সেখানে—"

ইহার পর মৃদঙ্গের তালে তালে—

"তবু তো গণ্য হব, নামের বলেই গণ্য হব, না হয় তাঁর দাসী তাঁর দাসীর দাসী তার দাসী তার দাসী হব,
তবু তো গণনাতে গণ্য হব।
আমি গণ্য হলেই ধন্য হব।"

দ্রুত তালে মৃদঙ্গ বাজিতেছে—

"না হয় তাঁর দাসী তাঁর দাসীর দাসী তার দাসী তার দাসী হব, তবু তো গণনাতে গণ্য হব।
আমি গণ্য হলেই ধন্য হব।
শুধু গণ্য হলেই ধন্য হব।"

গোঁসাই মার দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তিনিও কাপড়ে এমন করিয়া মুখ ঢাকিয়াছেন যে, তাঁহার মুখ একেবারেই দেখা যাইতেছে না, কিন্তু মৃদঙ্গের তালে তালে তাঁহার শরীর দুলিয়া উঠিতেছে।

কুঞ্জভঙ্গের বিদায়কালীন আকুলতাঃ সুরে সুরে সে আকুলতা যেন মূর্তি ধারণ

করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে কতভাবে সাজাইতেছেন, তবু যেন তাঁর সাধ পূর্ণ হইতেছে না, আর শ্রীরাধা? অবিশ্রান্ত নয়ন-জলের প্রবাহে বার বার শ্রীকৃষ্ণের অঙ্কিত তিলকাবলী ধুইয়া যাইতেছে, শ্রীকৃষ্ণের পা দুখানিতে কতবার চুম্বন করিতেছেন, আর গদ গদ ভাষায় উচ্চারিত হইতেছেঃ

আমার নামটি তোমার চরণের তলে লিখো,
যেন পদতলে আশ্রয় সে পায়,
কলঙ্কিনীর নাম তোমার চরণতলের আশ্রিতা হয়।
বঁধু, চরণে লিখিতে যদি ব্যথা লাগে পায়,
ধুলোয় লিখিয়া নাম দিও পদ তায়।

আজ, চল্লিশ বৎসর পরে সেদিনের সেই কীর্তন, আখুরিয়া হরিদাসের সুরে সুরে অঙ্কিত সেই চিত্রাবলী ছবির মত মনে উঠিতেছে, আবার মিলাইয়া যাইতেছে। এই ছবিতে যে অপার্থিব ভাব আবির্ভূত হইয়াছে বলিয়া অনুভব করিয়াছিলাম, সেদিন সে যেন আজ ছায়াছবির মত দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া যাইতেছে। লেখনীর অঙ্কনে তা কি আঁকিয়া ফুটাইতে পারা যায়?

আবার ফিরিবার পালা।

তিনদিন রাত্রি-জাগরণ আর অবিরত মশক-দংশন, তবুও মন যেন আনন্দে ভরপুর হইয়া রহিয়াছে।

রাধাগোবিন্দের প্রসাদ পাইয়া যখন রওয়ানা হইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম, তখন প্রায় অপরাহ্ন। দাররাসিনীতে গাড়ীধরা সম্ভব হইল না, পথেই সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হইয়া গেল।

রাত্রিটা কোথায় কাটানো যাইবে? গোঁসাইমা একজনের বাড়ির দুয়ারে গিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিলেন সেখানে যদি জায়গা পাওয়া সম্ভব হয়?

বাড়ির একধারে একটি চারচালা ঘর, অন্য ধারে একটি দোচালা ঘর। ঘর দুখানিই বেশ বড় বড়।

একটি লোক বাড়ি হইতে বাহির হইতেছে দেখিয়া তাড়াতাড়ি তাহার সম্মুখে গিয়া বলিলেন, "হ্যাঁগা ছেলে, এটা তোমার বাড়ি বটে তো?

আমরা দারবাসিনীতে গাড়ি ধরতে পারবো না। রাত্তিরের মত একটু জায়গা পাব কি?"

লোকটি আমাদের দিকে চাহিয়া দেখিল, দলটি বেশ বড় দেখিয়া সে কি যেন ভাবিল। তাহার পর বলিল, "এতগুলো মেয়েছেলে আমার বাড়ি জায়গা কোথায়? একটা কেবল শোবার ঘর, আর একটা ঘর ধানের গুদাম, কোথায় আপনারা থাকবেন?"

গোঁসাই মা যখন বলিলেন, "দো-চালা ঘরটা বেশ বড় দেখছি, ধান সরিয়ে ওরই একপাশে আমরা জায়গা করে নেব।" তখন সে একেবারে অবাক হয়ে গেল, বলিল, "ঠাগরুণ, পাগল নাকি? ধানের ঘরে কি সাপের কামড়ে অপঘাত হবেন? আমাকে থানা-পুলিশের দায়ে ফেলতে চান।"

গোঁসাই মা এবার রাগিয়া গেলেন, বলিলেন, "রাতের মত অতিথকে ঠাঁই দিতে পার না, তবে ঘর বেঁধেছ কি, স্বামীটি আর পরিবারটির জন্যে? অমন ঘরে আগুন লাগিয়ে দাও না।' বলিয়া হন হন করিয়া পথে আসিয়া নামিলেন।

লোকটি সেই মুহূর্তে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার পায়ের উপর উবুড় হইয়া পড়িল। কাকুতি-মিনতি করিয়া বলিল, "ফিরে আসুন ঠাগরুণ, আমরা দাওয়ায় থাকবো, আপনারা ঘরের ভিতর একরকম করে রাত কাটাতে পারবে না। আমি নাক-কান মলছি, আমার অপরাধ নেবেন না।"

গোঁসাই মা হাসিলেন, বলিলেন, 'না, না, কিসের অপরাধ? আমি আশীর্বাদ করছি, তোমার ভালো হোক। নিতাই চাঁদ আমাদের জায়গার সংস্থান করে দেবেন, তুমি ঘরে যাও। এস গো তোমরা, ওই যে মাঠটা দেখা যাচ্ছে, ওখানেই মুড়িশুড়ি দিয়ে রাতটা কাটিয়ে দেওয়া যাবে, প্রহরী থাকবেন নিতাই চাঁদ।"

কিন্তু মাঠে রাত কাটাইতে হইল না, দুইজন আসিয়া উপযাচক হইয়া আশ্রয় দিতে চাহিলেন। পাশেই একটি আখড়া ছিল, সেই আখড়া হইতে 'রাধাদাসী' নামে এক বৈষ্ণবী আসিয়া গোঁসাই মা, যাহাতে তাঁহার আখড়ায় যান, সেজন্য আবেদন জানাইল, গোঁসাই মা তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন।

কিন্তু মেজমাসী আমাকে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিলেন, "গৌরী, গোঁসাই দিদিকে বল আমরা মাঠেই থাকবো, আখড়ায় রাত কাটাতে কিছুতেই যাব না।

ইতিমধ্যে আর একজন আসিয়া আমন্ত্রণ জানাইলেন, তিনি এক জমিদার বাড়ির বিধবা বধূ। মাঠের পাশেই তাঁহাদের বাড়ি। জমিদারেরা থাকেন বিদেশে, বধূটি একটি পুরানো চাকর ও একজন ঝি লইয়া দেশের বাড়ি আগলাইয়া থাকেন।

গোঁসাই মা বলিলেন, "বড়লোকের বাড়ি, সবাই গেলে চলবে কেন, আখড়াতেও কেউ কেউ যাও।" কাজেই তাঁহার প্রস্তাবে কয়েকজন আখড়ায় গেলেন এবং আমরা কয়েকজন জমিদারের বাড়িতে গেলাম।

বধূটি বড় খাটে গদীর উপর বিছানায় গোঁসাই মাকে শয়ন করাইয়া তেল গরম করিয়া আনিয়া তাঁহার পদসেবা করিতে লাগিলেন। আর আমরা অন্য ঘরে গিয়া শয়ন করিলাম। কিন্তু বাজার অনেক দূরে, কাজেই সে রাত্রে এক ঠোঙগা মুড়ি ছাড়া অতিথি সৎকারের অন্য কিছুই ঘরে ছিল না, তাই বধূটি সেই মুড়িই আমাদের কাছে আনিয়া দিলেন।

গোঁসাই মা বলিলেন, "সবাই দুটো দুটো মুখে দাও, না হ'লে গেরস্তর অকল্যাণ হবে।

কিন্তু আখড়ায় যাঁহারা গিয়াছিলেন তাঁহারা প্রসাদ পাইয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন পরদিন তাঁহাদের নিকট হইতে শুনিতে পাইলাম।

চিত্র প্রদর্শনী

সরকারী মহাবিদ্যালয়

শীতকালীন বিভিন্ন শিল্পপ্রদর্শনীর মধ্যে একাডেমী অব ফাইন আর্টসের বিরাট প্রদর্শনীর পরই নাম করিতে হয় সরকারী শিল্প-মহাবিদ্যালয়ের বাৎসরিক প্রদর্শনীর। প্রধানত শিল্পী ছাত্রদের রচনা লইয়া প্রদর্শনী সজ্জিত করা হয় বলিয়া কলিকাতার রসিক সমাজ এই প্রদর্শনী সম্বন্ধে প্রতি বৎসরই উৎসুক হইয়া থাকেন। অন্যান্য বৎসর হইতে এইবারের প্রদর্শনী কয়েকটি বিভাগে যে উৎকর্ষের পরিচয় দিয়াছে, তজ্জন্য তাহা বিশেষ সাফল্যের দাবী করিতে পারে। গত ৩০শে ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিয়াছেন। এই অনুষ্ঠানে মণ্ডপসজ্জা, আলপনা প্রভৃতি সাজসজ্জার মধ্যেও এক সুরুচিপূর্ণ এবং শিল্পীসুলভ মনের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ইহা ব্যতীত দেড় সহস্রাধিক রচনাকে বিভিন্ন গৃহে, বিভিন্ন বিভাগে সুরুচিপূর্ণভাবে সজ্জিত করিবার কার্যে ছাত্ররা যে কুশলতা দেখাইয়াছেন, তাহাতে আশ্চর্য হইতে হয়। যদিও এ অনুযোগ করিতে হয় যে, ছবির সংখ্যা আরও কমাইলে দর্শকের উপর সুবিচার করা হইত। কোন কোন ছাত্রের দুই একটি সুন্দর রচনার সহিত একাধিক নিম্নস্তরের কাজ প্রদর্শিত হওয়াতে দর্শকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাইয়াছে। কর্তৃপক্ষকে আমরা আবার অনুরোধ করিব ভবিষ্যতে যেন এইদিকে তাঁহারা সযত্ন দৃষ্টি দেন, যাহাতে প্রদর্শনী আরও মনোজ্ঞ ও দর্শনীয় হইতে পারে।

এবারকার প্রদর্শনীর প্রায় প্রতিটি বিভাগে ছাত্রদের কার্যে প্রভূত উন্নতির লক্ষণ দৃষ্ট হয়। বিশেষ করিয়া ‘ক্রাফট’ ব্যবসায়িক শিল্প, গ্রাফিক আর্ট ও ভাস্কর্য প্রভৃতি বিভাগের উল্লেখ এই প্রসঙ্গে করা যাইতে পারে। কিন্তু এই সবের তুলনায় ভারতীয় ধারায় অঙ্কিত চিত্রগুলি অত্যন্ত দুর্বল মনে হইয়াছে। দুই একজন যাঁহারা ভাল কাজ করিয়াছেন, তাঁহাদের রচনা দেখিয়া সেই পুরাতন যুগের ভারতীয় নব্য-শিল্প-ধারার প্রথম দিকের চিত্রের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। সেই আবর্তেই যেন তাঁহারা ঘুরপাক খাইতেছেন। আজ ইঁহাদের নিজের দেশের শিল্প-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে না ভুলিয়া বাহির হইয়া আসিতে হইবে, সন্ধান করিতে হইবে অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল একদা যেমন নূতন নূতন পথের সন্ধান দিয়াছিলেন। নতুবা ভারতীয় শিল্প বলিতে যাহা বাঁচিয়া থাকিবে, তাহা পুরাতনের পুনরাবৃত্তি বলিয়াই গণ্য হইবে। জল-রঙ ও তেল-রঙের রচনা যে ইহা হইতে খুব বেশী উন্নত তাহা বলা চলে না। কিন্তু সেখানে নতুন পথ খুঁজিবার প্রচেষ্টা এবং গ্রামের ছাপ একাধিক ছবিতে পাওয়া গিয়াছে। ভাস্কর্য বিভাগের প্রায় প্রত্যেকটি সুনির্বাচিত; কিন্তু একটি কথা বার বার মনে হইয়াছে যে, ভারতীয় ভাস্কর্য যে আজও পৃথিবীর ভাস্কর্য-শিল্পের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হইয়া মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, দুই একটি রচনা ব্যতীত সেই গৌরবময় নিদর্শনের এতটুকু পরিচয় এই রচনাগুলোর মধ্যে পাওয়া যায় না।

ভারতীয় আঙ্গিকে অঙ্কিত রচনাগুলোর মধ্যে শান্তিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের রচনাগুলোই শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিতে পারে। রঙে, রেখায় ও প্রকাশভঙ্গীতে তিনি সম্পূর্ণ ভারতীয়, কিন্তু তাঁহাকে এই গণ্ডী
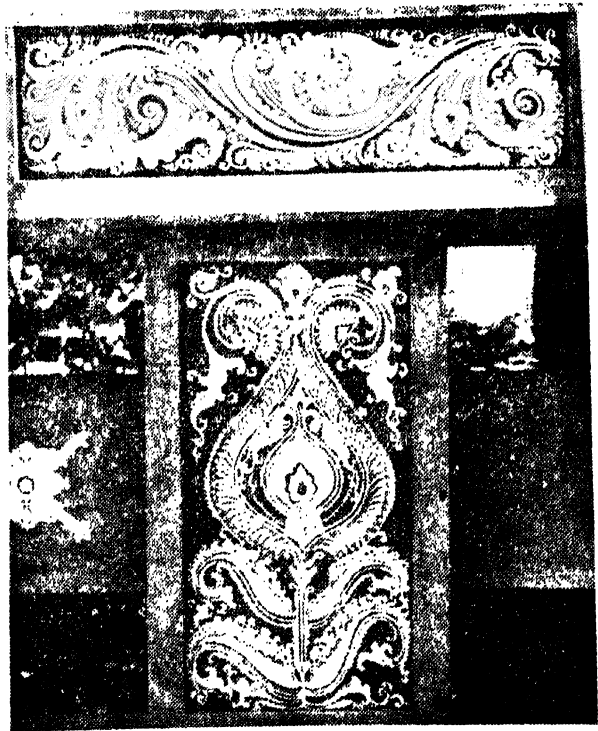
মণ্ডপ সজ্জার একাংশ (আলপনা)

কারুশিল্পের কয়েকটি নমুনা —শিল্প বিভাগের ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক নির্মিত

হইতে বাহির হইয়া আসিতে হইবে। নতুবা তাঁহার কার্যে মুদ্রাদোষ দেখা দিবার আশংকা আছে। প্রসংগত তাঁহার সুভদ্রা-হরণ (৭৭৯) চিত্রটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। সুন্দর 'ফিনিসড্' কাজ—রঙ ও রেখার প্রয়োগ মুগ্ধ করে, কিন্তু কোথায় যেন প্রাণের অভাব। তাঁহার গণেশ-জননী (৭৭৭), মহিষমর্দিনী (৭৭৮), খুকীরাণী (৭৮০), ননীচোরা (৭৮২) প্রভৃতি প্রত্যেকটি রচনায় একটি শিল্পীসুলভ মনের ছাপ পাইয়া দর্শক আনন্দ পাইবেন। নিলীমা দে'র আলংকারিক রচনায় দখল আছে। শিল্পীর সেই ধরণের রচনার সহিত পরিচিত হইতে পারিলে আরও খুশী হইতাম। কিন্তু তাঁহার কোন কার্যেই সেই বিশেষত্বের ছাপ পাই নাই। তবু কথকঠাকুর (৫৭৫) মন্দ নয়। শষ্যকোঠার কাছে (৫৮০) সে তুলনায় অনেকাংশে ভাল। ক্রেয়নে অংকিত চায়ের দোকানও (৫৮১) আকর্ষণীয় হইয়াছে। কল্যাণী চক্রবর্তীর অনেকগুলি রচনার মধ্যে আমাদের সর্বাপেক্ষা আনন্দ দিয়াছে টাচ-এর কাজে অংকিত নৌকাগুলি (৫১০) চিত্রটি। সুশীল মজুমদারের অবসরে (৫২৯), ছায়াশীতল ঘাটে নৌকা ও লোক-জন লইয়া অবসর সময়ের এক শান্ত পরি-বেশের সৃষ্টি করিয়াছে। আশুতোষ সামন্তর তসরের কাপড়ে অংকিত প্রস্ফুটিত ফুল (৭৭৫) চিত্রটি রঙ নির্বাচনের দোষে হারাইয়া গিয়াছে। সিল্কের পশ্চাদপট

খেয়াপারাপার (মুরাল) —ব্যবহারিক শিল্প বিভাগের ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক অংকিত
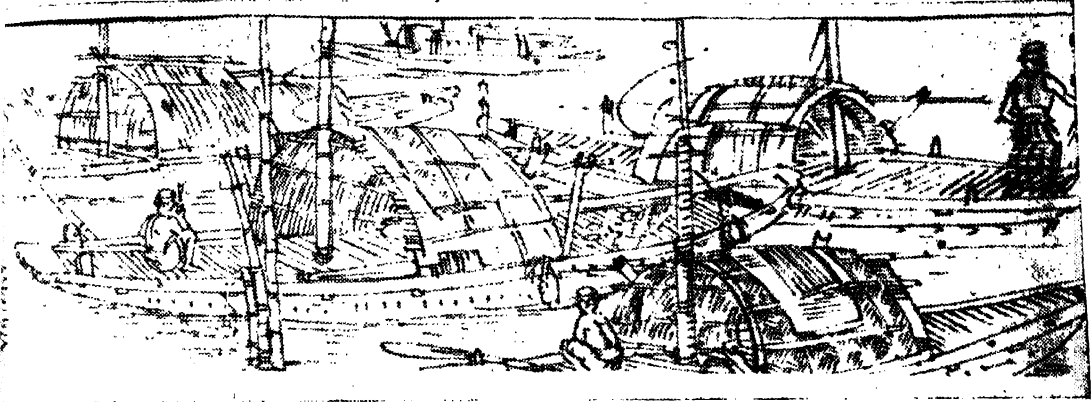
নৌকা (স্কেচ্) —অসিত সেন

ড়য়া কাজ করিবার পূর্বে শিল্পীকে রঙ বাছানে অত্যন্ত যত্নবান হইতে হইবে নতুবা হা হারাইয়া যাইতে বাধ্য। রবীন্দ্রচন্দ্র নগুপ্তের যুগল (৪) চিত্রটির পশ্চাদপটে কা নীল রঙের ব্যবহার ও সম্মুখে শ্বেত পোত যুগল এক মধুর পরিবেশের সৃষ্টি রিয়াছে। শীতলচন্দ্র সাধু খাঁনের আদর ৪০), দুর্গম পথের যাত্রী (৫৪৭), অমর ন্দ্যোপাধ্যায়ের শিলঙের একটি কোণ ৪৯), লাল ছাত (৫৫০), নির্জন (৫৫২), নন্ত দিবাকরের শিকারী (৫৭৩) বং রাজপুত অনুকৃতি গজেন্দ্র-নাঙ্ক (৫৭৫), কনকরতন বিশ্বাস বর্মণের া ও ছেলে (৫৮২) রচনাগুলি নানান্ দিক দয়া উল্লেখযোগ্য এবং আশান্বিত হইবার ত।

পেন্সিলের কাজগুলির মধ্যে অজয়কুমার ট্টোপাধ্যায়ের আস্তাবল (৬৬) নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিতে পারে; ছবিটির শ্রীং ও রেখা সত্যই সুন্দর ও কমনীয়তায় নগ্ধ। সুধাংশু গঙ্গোপাধ্যায়ের ইঁদুরের স্কেচগুলিও (১১০) অত্যন্ত ভাল হইয়াছে। অসীত সেনের নৌকা (৭২১) কালী-কলমে অঙ্কিত আর একটি সার্থক রচনা। সলিল ভট্টাচার্যের কালী-কলমে অঙ্কিত টেরিটিবাজার (৪২০), গণেশচন্দ্র হালোইয়ের কোলাহলের বাহিরে (১৩৪ এ) রঙীন স্কেচটি, কানাই কর্মকারের গঙ্গার পার্শ্ববর্তী গ্রাম (৬৮০), বস্তী (৬৮১), রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্কেচ দুইটি (৬৮৫, ৬৮৬), সমীর সরকারের প্রতিকৃতি (১৫১), শিবেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের টুপি মাথায় মনুষ্য প্রতিকৃতি (৩৫৬) প্রভৃতি রচনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মনোজ-কুমার দাশগুপ্তের বৃষ্টিতে (৩৫৪) হাল্কা মোলায়েম রঙের ব্যবহার এবং বৃষ্টির এফেক্ট সৃষ্টিতে মুগ্ধ করে। সুনীল দাশগুপ্তের Reconstruction (৪৩৮) এবং শ্যামাদাস সেনগুপ্তর ড্রাই ব্রাসের কাজ

মহিষমর্দিনী —শান্তিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

মা ও ছেলে (৪৪৮) আকর্ষণীয় হইয়াছে। তেল রঙের রচনাগুলিতে নানান্ পরীক্ষণের প্রচেষ্টা আশান্বিত করে। ইঁহাদের মধ্যে বিমলেন্দু রায়চৌধুরীর মধ্যাহ্ন বিশ্রাম (৪০৪) রঙ ও রৌদ্র ছায়ার প্রয়োগ কুশলতায় আনন্দ দেয়। তাঁহার 'স্টাডি'ও (৪০২) ভাল হইয়াছে। মণীন্দ্র-নারায়ণের আমাদের দেশের (৪১৩) গ্রাম্য পরিবেশটি সুন্দর ফুটিয়াছে। গোকুলচন্দ্র বড়, অজয় মুখোপাধ্যায় এবং মণীন্দ্র পালের স্টাডিগুলি ভাল। গোষ্ঠবিহারী কুমারের চৌরঙ্গী রোড (৬৫১) টাচে ও রঙে বেশ ভাল হইয়াছে, কিন্তু অতিরিক্ত বাস্তবধর্মী করিবার মোহ চিত্রটির মাধুর্য একটু ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। তাঁহার Still life (৬৫২) রচনাটিও আকর্ষণীয়। চুণী দত্তগুপ্তর প্রতীক্ষা (৬৬৪) মোলায়েম রঙে তুলির Stroke-এ অঙ্কিত করায় অত্যন্ত সুন্দর পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছে, ইঁহার খালে ব্যস্ততা (৬৬৯) এবং বিভূতি সেনগুপ্তর ফল ও শাকসব্জী (৭১০) রচনা দুটিও হৃদয়গ্রাহী।

ব্যবসায়িক শিল্প বিভাগের প্রায় প্রত্যেকটি রচনা সুনির্বাচিত ও আকর্ষণীয়। এই-গুলির মধ্যে প্রথমেই দর্শককে আকৃষ্ট করে তেল রঙে অঙ্কিত ভিত্তিচিত্রের (৯৬৮) একটি বিরাট চিত্র, সমস্ত প্রদর্শনীর এটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। রঙে, আঙ্গিকে ও কম্পোজিশনে চিত্রটি নিখুঁত। অথচ সাত-জন শিল্পী একযোগে ইহার রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন, কিন্তু কোথাও বিভিন্ন শিল্পীর হাতের ছাপ ইহাতে পাওয়া যায় না। রামচন্দ্র দাসের দেওয়াল পঞ্জীটি (৮৬২) কালো রঙের ব্যবহারে দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেও ফিগারের দুর্বলতা ইহার মাধুর্য অনেকখানি নষ্ট করিয়াছে। চুণী দত্তগুপ্তর Set of illustration (৮৮২)-এর সহিত স্কেচগুলিও দেওয়ায় উহা আরও উপভোগ্য হইয়াছে। ছেলেদের পুস্তক (৮৯২) বর্ণ-সুষমায় ছেলেদের অবশ্যই আকর্ষণ করিবে। অনীতা গুপ্তর রসুই (৯৫০)এর শো-কার্ডটি সুপরিকল্পিত। শঙ্কররঞ্জন দাশ-গুপ্তর শাড়ির পাড়ের একটি নক্সা (৫৬৪) চমৎকার। মণীন্দ্র বলের ফসল বাড়াও প্রাচীর চিত্রটি, রণেন সাহার 'সীবন ও বয়ন' পুস্তক প্রচ্ছদপট উল্লেখযোগ্য রচনা।

ভাস্কর্য প্রত্যেকটি সুনির্বাচিত, একথা আগেই বলা হইয়াছে। এইগুলির মধ্যে অজিত চক্রবর্তীর ঠাকুরমার প্রতিকৃতি (৯৯৪), কালো বিড়াল (৯৯৭), নিখিল বিশ্বাসের কার্যরত মা (১০০৭), আশুতোষ সামন্তর একটি মেয়ে (১০১৭), গোষ্ঠ-বিহারী দে'র Joyride (১০৩৩), সর্বরী রায়চৌধুরীর In the passive mood (১০২৮) প্রভৃতি নানান্ বিচিত্র রচনা-সম্ভারের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গ্রাফিক আর্টের নির্বাচনও ভাল হইয়াছে। কাঠ খোদাইএ মনোজ দাশগুপ্ত, নমিতা মিত্র, শঙ্কর দাস, এচিংএ শ্রীকৃষ্ণদাস, অনীতা গুহ লিথোর রচনায় নীহাররঞ্জন দত্ত, বিমলেশ রায়চৌধুরী, কানাই কর্মকার, চুণীলাল দত্তগুপ্ত প্রভৃতির নাম বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য।

ক্রাফটের গৃহটি সাধারণ দর্শককে সর্বাপেক্ষা বেশি আকর্ষণ করে, কারণ নামমাত্র মূল্যে অমূল্য শিল্পসম্ভার এই গৃহ হইতে সংগ্রহ করা যাইতে পারে। সুনির্বাচিত নানান্ দ্রব্যকে সুন্দরভাবে সাজানোর সঙ্গে সঙ্গে মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলীর কতকগুলি অনবদ্য রচনা এই গৃহটিকে, ঘরটিকে আরও আকর্ষণীয় করিয়াছে। বাটিক প্রভৃতি নানান্ দ্রব্যের সঙ্গে গৌরগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাতিদান' এই ঘরের একটি উল্লেখযোগ্য রচনা।

পরিশেষে এই কথা আবার স্বীকার করিতে হয় যে, ইদানীং কালে শিল্প-মহাবিদ্যালয়ের প্রদর্শনীগুলির মধ্যে এবারের প্রদর্শনী নিঃসন্দেহেই উন্নততর এবং এবার ছাত্রেরা বিভিন্ন বিভাগে যে কুশলতার পরিচয় দিয়াছে, তাহাতে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের আশান্বিত হইবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে।

জাহাজ ডুবির পরে

শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়

এখানে জাহাজডুবি মাঝ রাতে হঠাৎ সেদিনঃ
এই দ্বীপে সময়ের শান্ত গতি একদিন থেমে
কি ঝড়, কি ঝড় এলঃ বাতিঘর ভেঙে চুরমার—
অনেক বুদ্বুদ হল এত প্রাণ, সব গেল নেমে
সমুদ্রের জল ভেঙে বহু নিচে যেখানে বিরাম,
সময় সারাটি দিন ধীর-পায়ে সেই পথ হাঁটে,
সেখানে সাম্রাজ্য এক ঝলোমলো কত দিন, বলো,
—সেইখানে সেই দেশে, কে-জানে-কে সে-দেশের নাম।

ওপরেতে ভাঙা হাল, মাস্তুলের কিছু অবশেষ,
আরো কত প্রতিদিন-জীবনের আরো কিছু, আরো
নির্জন সমুদ্র-নীলে হাহা-করা শুধু ইতস্তত
তাদের জীবন-চিহ্ন কারো আছে, আর নেই কারোঃ
তবুও জলের তলে বালি-বালি কত কী যে নিয়ে
তাদের খেলার মুঠি বাড়ি গড়ে মন দিয়ে দিয়ে!

নিখিল ভারত সংগীত সম্মিলনী

পংকজ দত্ত

ভারতীয় সংস্কৃতির একটি বড়ো ঘটনা নিখিল ভারত সংগীত সম্মিলনীর অনুষ্ঠান। এ বছরের অনুষ্ঠান আরো উল্লেখযোগ্য হয়েছিল স্বয়ং রাষ্ট্রপতির হাতে উদ্বোধন সম্পন্ন হওয়াতে। গত ২৬শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় ওরিয়েন্ট সিনেমাতে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ অস্টম বার্ষিক অধিবেশন উদ্বোধন করেন এবং রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালের সমাগমে অনুষ্ঠানটি সর্বাংগসুন্দর হয় এবং এই সব সাংস্কৃতিক বিষয়ের উন্নয়নে রাষ্ট্রের কার্যকরী সচেতনতাটা ব্যক্ত হয়ে যায়।

যতদূর জানা যায়, দেশের আর কোন সংগীতানুষ্ঠানই স্বয়ং রাষ্ট্রপতির দ্বারা উদ্বোধিত হওয়ার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়নি। সংগীতের প্রতি রাষ্ট্রপতির বিশেষ অনুরাগের পরিচয়ও সেদিন পাওয়া গেল। রাষ্ট্রপতির মনোরঞ্জনের জন্য বিশেষভাবে সংগীতানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয় শ্রীশ্যাম গাংগুলীর সরোদ ও শ্রীমতী কেশরবাঈ কেরকারের গান দিয়ে। রাষ্ট্রপতি দিব্য তালে তালে মাথা দুলিয়ে উপভোগ করতে থাকেন এবং শুনতে শুনতে এমনি জমে উঠেন যে, বাজনা ও তারপর দুখানি গান শুনেও আর একখানি ভজন না শুনে উঠতে চাইলেন না।

এবারের সম্মিলনী সাত দিন ধরে মোট ন'টি অধিবেশনে সমাপ্ত হয়। অধিবেশন আরম্ভ হয় পণ্ডিত ওংকারনাথ ঠাকুরের 'বন্দে মাতরম্' গান দিয়ে। গোড়াতেই এই একটা বিসদৃশ ব্যাপার হয়ে গেলো। 'বন্দে মাতরম্' এখন রাষ্ট্রীয় সংগীত; ওর মাঝের খানিক অংশ বাদ দিয়ে রাষ্ট্রীয় সংবিধানেরই অন্তর্ভুক্ত করিয়ে নেওয়া রয়েছে, ওর একটা অনুমোদিত সুরও রয়েছে। কাজেই কোন ক্ষেত্রেই কারুরই অন্য কোন সুরে গাওয়ার অধিকারই নেই। কিন্তু পণ্ডিত ওংকারনাথ গাইলেন অননুমোদিত সুরে এবং পুরো গানখানিই; বিশেষ করে রাষ্ট্রপতির সামনে এমন ব্যবহার উচিত হয়নি।

সম্মিলনীতে আরও লক্ষ্য করা গেলো বাইরে থেকে যে সমস্ত শিল্পী যোগদান করেছেন, প্রায় সবই পশ্চিমঘাট অঞ্চল থেকে। এটা এমন কিছু বিসদৃশ ব্যাপার বলে যদিও মনে না হতে পারে, কিন্তু সম্মিলনী তেমন যেন প্রতিনিধিমূলক নয় বলে মনে একটা খটকা জাগতে পারে। তবে সব মিলিয়ে অনুষ্ঠানটিতে সংগীত যা পরিবেশিত হয়েছে, তাকে দুর্লভ বলা যেতে পারে। শিল্প-প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পীর সমাবেশে এবং সংগীত বৈশিষ্ট্যে সম্মিলনীটি প্রভূত সাফল্য অর্জনও করতে পেরেছে।

শিল্পীদের মধ্যে সর্বাধিক ছাপ রেখে যেতে পেরেছেন গায়ক শ্রীবেহরে বুয়া। পঁয়ষট্টি বৎসরের বৃদ্ধ শ্রী বুয়া মহারাষ্ট্রে এক মন্দিরের বিগ্রহ-সেবা নিয়েই থাকেন এবং অবসরবিনোদন করেন গানের চর্চা
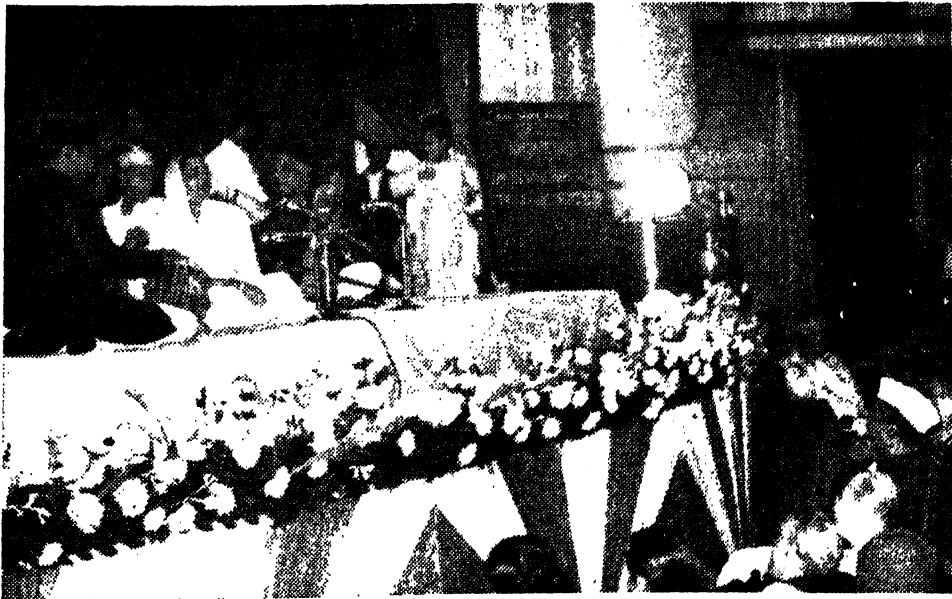
নিখিল ভারত সংগীত সম্মিলনীর অধিবেশনের উদ্বোধনকালে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ তন্ময় হইয়া শ্রীমতী কেশরবাঈ কেরকারের ভজনগান শুনিতেছেন।

তৃতীয়দিনের প্রাতঃকালীন অধিবেশনে সেতার বাদ্যরত ওস্তাদ বিলায়েৎ হোসেন খাঁ (মধ্যে) দক্ষিণে তাঁহার ভ্রাতা এমারৎ হোসেন খাঁ এবং তবলা সংগতে পণ্ডিত আনোখীলাল মিশ্র

করে। মহারাষ্ট্রের কিরানা ঘরোয়ানার সাধক তিনি, যে ঘরোয়ানাকে আবদুল করিম খাঁ বিখ্যাত করে রেখে গিয়েছেন এখানে। আরও ওস্তাদ শিল্পী এ ঘরোয়ানার নাম রেখে গিয়েছেন—আবদুল করিম খাঁর পিতা কালে খাঁ, তাঁর দুই ভাই আবদুল্লা খাঁ ও নান্নে খাঁ, তাঁর কাকা ইন্দোর ও গোয়ালিয়রের সভা-সংগীতজ্ঞ বীণাবাদক বন্দে আলি খাঁ প্রভৃতি কিরানা ঘরোয়ানার জ্যোতি বাড়িয়ে গিয়েছেন। শ্রী বুয়া গাইতে গাইতে কেবলই আবদুল করীমের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিলেন। সংগীত-পূজারী শ্রী বুয়ার প্রথম গান হয় দ্বিতীয় অধিবেশনে। পূরিয়া রাগে খেয়াল শোনান তিনি এবং পরে তিনি গান একখানি ভজন। হঠাৎ দীর্ঘদিন অশ্রুত সর্বজনপ্রিয় কিরানা রীতির মধুর তান সমস্ত ঐশ্বর্য নিয়ে বাতাসে ছড়িয়ে পড়তেই শ্রোতারা একেবারে স্তম্ভিত হয়ে যায়। সেদিন তো প্রশংসা ভেঙে পড়লোই এবং শ্রোতারা যে কতোখানি মুগ্ধ হয়েছিল, তার পরিচয় তাঁরা দিলে ষষ্ঠ অধিবেশনে আবার যখন তিনি গাইতে বসলেন। সেদিন তিনি শোনালেন মুলতানিতে খেয়াল, তারপরে শোনালেন বিখ্যাত ঠুংরীখানি 'পিয়া বিনু নহী আওত চেন'। শুদ্ধ রীতিতে সুর-মাধুর্যপূর্ণ গান শুনিয়ে তিনি শ্রোতাদের মনে যে পুলক সঞ্চার করেন উচ্ছ্বসিত হয়ে তা স্ফূর্ত হলো গান শেষ হতেই প্রচণ্ড করতালি ও প্রশংসাধ্বনির মধ্যে। শ্রোতাদের মধ্য থেকে কয়েকজন সঙ্গে সঙ্গে অর্থ উপহার দিলেন পূজারীর হাতে। শ্রী বুয়া কখনও বাইরের আসরে যোগদান করেন না, বিশেষ অনুরোধে পড়েই তিনি বাইরের আসরে যোগদান করলেন এই প্রথম এবং কলকাতার সংগীতপ্রিয়রা এর জন্য সম্মিলনীর উদ্যোগকর্তাদের অন্যতম

সম্মিলনীতে ঘটম (কলসী) বাদ্যরত মাদ্রাজের শ্রীবিলাবদ্রী আয়ার (দক্ষিণে)। ছবিতে বামদিক হইতে ওস্তাদ হাবিবুদ্দীন খাঁ (তবলা), শ্রী এন বঙ্গরু আয়ার (খঞ্জরী) ও শ্রী ভি জি যোগ (বেহালা)

দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্যশিল্পী ললিতা (বামে), পদ্মিনী (দক্ষিণে) ও সম্প্রদায়—সম্মিলনীতে অনুষ্ঠিত শকুন্তলম্ নৃত্যনাট্যের একটি অংশ

শ্রীদামোদরদাস খান্নাকে নিশ্চয়ই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাবে।

সম্মিলনীর উদ্যোক্তারা সংগীতপ্রিয়দের কাছ থেকে আরও ধন্যবাদ অর্জন করেন ওস্তাদ নিসার হোসেন খাঁ ও শ্রীমতী অঞ্জনবাঈ লোলেকারকে এই আসরে নিয়ে আসার জন্যে। নিসার হোসেন খেয়াল গানের জন্য বিখ্যাত হাদ্দু হাস্সু খাঁর শিষ্য ফিদা হোসেনের পুত্র। সেই সূত্রে নিসার হোসেন প্রভূত সুরৈশ্বর্যের অধিকারী হতে পেরেছেন এবং তাঁর আলাপের যে ঢঙ, তা ফৈয়াজ খাঁর সমতুল্য বলে অনেকে মনে করেন। প্রথম তিনি শোনান চতুর্থ অধিবেশনে হেমকল্যাণে খেয়াল গেয়ে; তারপর তিনি গান করেন পঞ্চম অধিবেশনে জয়জয়ন্তী ও মালকোষ রাগে। তাঁর মধুর স্বরবিন্যাসে শ্রোতারা মুগ্ধ হন।

শ্রীমতী অঞ্জনবাঈ লোলেকার এই প্রথম কলকাতার আসরে এসেই এখানকার সংগীতানুরাগীদের হৃদয় জয় করতে সমর্থ হয়েছেন। তাঁর প্রথম বৈঠক হয় তৃতীয় অধিবেশনে। দেশী ও শুদ্ধ সারংয়ে দুখানি খেয়াল গাইবার পরও শ্রোতাদের অনুরোধে বিখ্যাত ভৈরবী ঠুংরী "যমুনা কে তীর" শুনিয়ে দেন। এই একটা কাঁচা কাজ করে ফেলেন শ্রীমতী লোলেকার। আব্দুল করীম খাঁ এবং তারপরে তদীয় শিষ্যা শ্রীমতী হীরাবাঈ বরোদকার ঐ গানখানির যে স্মৃতি ধরিয়ে রেখে গিয়েছেন,

সাধক সংগীতজ্ঞ শ্রী বেহরে বুয়া

শ্রীমতী লোলেকারের উচিত হয়নি তার সংগে পাল্লা দিতে যাবার—না, তিনি জানতে পেরেছিলেন এখানকার শ্রোতাদের ঐ গানখানির প্রতি দুর্বলতার কথাটা? এর পর তিনি অষ্টম অধিবেশনে আবার গাইতে বসেন এবং জয়জয়ন্তী ও বাগেশ্রীতে খেয়াল ও পরে ঠুংরী শোনান। রামকৃষ্ণ বুয়ার ঘরোয়ানার সূক্ষ্ম পালটি তানের বৈশিষ্ট্যে তিনি চমকপ্রদ কৃতিত্ব দেখান, যা তাঁকে সংগীতানুরাগীদের কাছে স্মরণীয় করে রাখবে।

পণ্ডিত ওংকারনাথ ঠাকুর প্রায় বছর পনেরো কলকাতার আসরে গান শুনিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু সুরশোভা রচনায় এবারের মতো তাঁর কৃতিত্ব আর দেখা যায় নি। তৃতীয় ও পঞ্চম অধিবেশনে তিনি গান পরিবেশন করেন। প্রথমদিন সকালের অধিবেশনে তিনি মুলতানী ধানশ্রীতে খেয়াল গান করেন। গাইবার আগেই তিনি জানিয়ে দেন যে, রাগটা সকালের অধিবেশনের উপযুক্ত নয়, কিন্তু তবুও তিনি ঐ রাগেই গান করবেন, কারণ ওটা তাঁর মন ও ভাবকে দখল করে রয়েছে, কিন্তু তাঁর গাইবার গুণে আবহাওয়াটাই রাগের অনুকূলে বদলে

সম্মিলনীতে সানাইবাদনরত মিঞা বিসমিল্লা কামারুদ্দীন খাঁ ও সম্প্রদায়

গেল। দ্বিতীয় দিনে তিনি সাওন ও বাগেশ্রী বাহারে দুখানি খেয়াল এবং শ্রোতাদের নাছোড়বান্দা অনুরোধে পড়ে একখানি ভজন গেয়ে শোনান। পণ্ডিত ঠাকুরের গাইবার নিজস্বতা অনেক আগেই স্বীকৃত হয়েছে এবং শিল্পকৃতিত্বের তিনি অপূর্ব পরিচয়ও দান করেন।

গান ছাড়া পণ্ডিত ঠাকুর ষষ্ঠ অধিবেশনে 'কামায়নী' নাম দিয়ে একটি নিবন্ধও পরিবেশন করেন যেটাকে তিনি অপেরা বলে আখ্যাত করেছেন। এর বিষয়বস্তু হচ্ছে গানেতে ভাব অনুযায়ী শব্দ, সুর ও উচ্চারণের প্রয়োগ। একই কথার বলবার বা সুরেতে গাইবার ঢঙে নানারকমের অর্থ দাঁড়িয়ে যেতে পারে। প্রলয়ের পর মানবের জন্ম বৃত্তান্ত নিয়ে একটি কাহিনীর মধ্যে দিয়ে তিনি এই তত্ত্ব প্রচারে ব্রতী হয়েছেন। এটা নতুন তত্ত্ব নয়, অন্তত রবীন্দ্র সংগীতের দেশে তো নয়ই। তাঁর এই সুদীর্ঘ নিবন্ধ শ্রোতাদের কাছে খানিক পরেই যে বিরক্তিকর হয়ে উঠেছিলো সেটা তিনি বুঝতে পারেন এবং শ্রোতাদের অধৈর্যতার জন্য চলচ্চিত্রের ওপর দোষ চাপিয়ে তিরস্কার করে বলে ওঠেন যে, একদিন আসবে যেদিন তার তত্ত্বানুসৃত সংগীত দেশ থেকে চলচ্চিত্রকে তাড়িয়ে দেবে।

শ্রীমতী কেশরীবাঈ কেরকার প্রথম অধিবেশনে যে গান শোনান তাতে রাষ্ট্রপতি পুলকিত হয়ে তাল দিলেও নিয়মিত শ্রোতারা একেবারেই হতাশ হয়ে পড়েছিল। পরপর তিনখানি ভজনের পর তিনি শুদ্ধ নট ও বসন্ত রাগে দুখানি খেয়াল গান; মোটেই জমতে পারেনি সে আসর। কিন্তু শ্রীমতী কেরকার সুদে আসলে ক্ষতিপূরণ করে দেন পরপর পাঁচখানি গান শুনিয়ে। নন্দ রাগে খেয়াল আরম্ভ করেন এবং শেষ করেন সোহিনী গেয়ে, মাঝে ছিল নায়কি কানাড়া ও হোরি। বহু বছর আগে সুরের জাল বিস্তার করে তিনি শ্রোতাদের মনে যে মায়ার সৃষ্টি করেছিলেন ঠিক তেমনিভাবেই পাওয়া গেল তাকে। আলাদীয়া খাঁ যে ঘরানাকে প্রভূত ঐশ্বর্যশালী করে দিয়ে গেছেন তার সুযোগ্যা শিষ্যা শ্রীমতী কেশরীবাঈ কেরকার সে ঘরানার মান আরও যে বহু বৎসর রেখে যেতে পারবেন তার সুস্পষ্ট প্রমাণ তিনি এবারও দিয়ে গেলেন।

আলাদীয়া খাঁর আরও একজন শিষ্যার

পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর

এবারে আগমন হয়—শ্রীমতী লীলা শিরগাওকার। আলাদীয়ার একমাত্র অ... দারী শিষ্যা তিনি এবং মহারাষ্ট্রে ... নাকি 'ছোটা কেশরীবাঈ' বলে পরি... এখানে দ্বিতীয় ও সপ্তম অধিবেশনে ... করেন এবং প্রথমদিনে শোনান চার ... খেয়াল ও একখানি ভজন এবং দ্বি... দিনে তিনখানি খেয়াল ও এক... ভজন। ঘরাণার ছাপটা কিছু কিছু প... যায়, নয়তো শ্রীমতী কেশরীবাঈয়ের ... কোন সূত্রেই তার নাম বসানো যায় না। ... ওপর একসঙ্গে পরপর এতোগুলো ... গেয়ে শ্রোতাদের ধৈর্য ধরে রাখার ... মোহময় সুরসৌন্দর্য রচনায় এখনও ... পাকা শিল্পী হতে পারেননি। অপেশ... শিল্পী বলে তার দম্ভেরও পরিচয় ... গিয়েছেন।

কলকাতার সংগীতপ্রিয়দের ... অত্যন্ত জনপ্রিয় শিল্পীদের মধ্যে ... দিগম্বরের পুত্র শ্রীদত্তাত্রেয় বিষ্ণু পালু... একজন। যে কোন জায়গার আসরেরই ... মান বাড়িয়ে যান। বেশ খুশ মেজ... অত্যন্ত পরিপাটি করে গাইবার ... চমৎকার ঢঙ আছে তার। প্রথম দিনে ... নায়কি কানাড়াতে খেয়াল ও পরে ভজন ... দ্বিতীয় দিনে জৌনপুরি রাগে খেয়াল ... এবং পরিশেষে মুগ্ধ শ্রোতাদের অনু... তার বিখ্যাত ভজন **'চল মন গঙ্গা য... তীর'** গাইতে হয়।

বহিরাগত অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে ছি... শ্রীছোটা গন্ধর্ব, পণ্ডিত ওঙ্কারনাথের ... শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণ পর্বতকার ও শ্রীবল... **রায়, তানসেন বিষ্ণুদিগম্বর পুরস্কার প্র...**

ওস্তাদ নিসার হোসেন খাঁ

শ্রীমতী কালিন্দী কেশকার ও শ্রীবমবম চতুর্বেদী। স্থানীয় শিল্পীদের মধ্যে শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী ও শ্রীমতী বিজন ঘোষ দস্তিদার খেয়াল গানে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব প্রকাশ করেন। শ্রীচক্রবর্তী তার অষ্টম বর্ষীয় পুত্র মানসকুমারকে নিয়ে গাইতে বসেন দ্বিতীয় অধিবেশনে এবং পূরিয়া কল্যাণে তিনি খেয়াল গেয়ে শোনান। শ্রীমতী দস্তিদার ইমনে খেয়াল গেয়ে শোনান পঞ্চম অধিবেশনে। স্থানীয় অন্যান্য গায়কবৃন্দের মধ্যে ছিলেন, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

পণ্ডিত দত্তাত্রেয় বিষ্ণু পালুসকর

আড়ানায় ধ্রুপদ গান করেন; শ্রীরমেশ বন্দ্যোপাধ্যায় শঙ্করা রাগে খেয়াল শোনান এবং তানসেন-বিষ্ণুদিগম্বর পুরস্কার প্রাপ্ত শ্রীনিমাইচাঁদ বড়াল দুর্গা রাগে ধ্রুপদ ও ধামার শোনান।

বাজিয়েদের মধ্যে ওস্তাদ বিলায়েৎ হোসেন খাঁ এবং মিঁয়া বিসমিল্লা কামারুদ্দীন খাঁ আসর মাতিয়ে তুলেছিলেন। ওস্তাদ বিলায়েৎ হোসেন তৃতীয় অধিবেশনে শুদ্ধ সারং পরিবেশন করেন; ভ্রাতা ইমরৎ খাঁ বসেন আর এক সেতার নিয়ে। এর পর এরা শেষ অধিবেশনে শোনান ইমন ও খামাজ বাজিয়ে। মিয়া বিসমিল্লা দ্বিতীয় ও সপ্তম অধিবেশনে সানাই বাজিয়ে শোনান।

শ্রীমতী অঞ্জনবাই লোলেকর

এ সানাই শোনা জীবনেরই একটি পরম অভিজ্ঞতা অর্জন করা।

ওস্তাদ হাফিজ আলি খাঁ এবারে তেমন তৃপ্তি দিতে পারেননি। এযাবৎ তাঁর সরোদ বাজনা একটা বিশেষ অনুষ্ঠান বলে পরিগণিত হচ্ছিলো কিন্তু এবারে সে মানটা তিনি থাকতে দেননি। পঞ্চম ও অষ্টম অধিবেশনে তিনি দরবারি কানাড়া, জিল্লা ও মধুবন্তী বেহাগ বাজিয়ে শোনান। অল্পকাল বাজিয়েই তাঁর ক্লান্তি এসে পড়ে দেখা গেলো এবং যা কিছু ঝালার কাজ তাঁর ভাইপো এমদাদ হোসেন খাঁকে দিয়ে বাজিয়ে রাগ শেষ করেন। বোধহয় এখনকার শ্রোতাদের রুচিবিকৃতিকে ব্যঙ্গ করার

কুমারী শরণরাণী মেহরা

জন্যই ওস্তাদ হাফিজ আলি প্রতি বৈঠকেরই শেষের দিকে বিলিতী পাঁচ মিশেলী সুরে কিছু টুং টাং করে বাজিয়ে হাসির রোল সৃষ্টি করে চলে যান।

এবারে তানসেন-বিষ্ণুদিগম্বর বৃত্তি-প্রাপ্তা ওস্তাদ আলি আকবরের শিষ্যা শ্রীমতী শরনরাণী মেহরা প্রথম অধিবেশনে সরোদে মোহনকোষ বাজিয়ে সকলকে খুশী করেন এবং বেশ একটা ছাপও রেখে গিয়েছেন এই প্রথম বারেই। এছাড়া সরোদ বাজিয়ে শোনান ওস্তাদ ওমর খাঁ। প্রথম
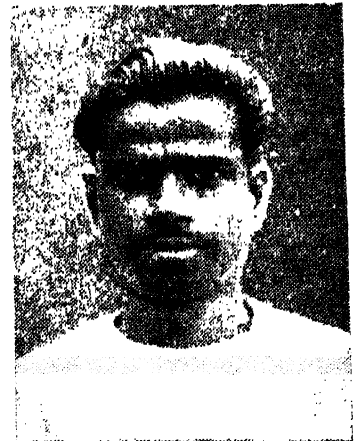
শ্রীঅশেষ বন্দ্যোপাধ্যায়

ওস্তাদ হাবিবুদ্দীন খাঁ

অধিবেশনে তিনি চন্দ্রকোষ বাজান। ওস্তাদ বিলায়েৎ-এর ছাত্র ওস্তাদ হাসমৎ আলি খাঁ সপ্তম অধিবেশনে শুদ্ধ সারং বাজিয়ে যে শক্তির পরিচয় দেন তাতে এ আসরে তাঁর না নামলেই ভাল হতো।

স্থানীয় শিল্পীদের মধ্যে শ্রীশ্যাম গাঙ্গুলীর সরোদ ছিল একটি বিশেষ আকর্ষণ। কল্যাণী রাগে তাঁর বাজনা দিয়ে সম্মিলনীর উদ্বোধন হয়। দ্বিতীয় অধিবেশনে শ্রীরাসবিহারী সেন বেলাওল রাগে সেতার বাজিয়ে শোনান। দ্বিতীয় অধিবেশনে শ্রীমণ্টু বন্দ্যোপাধ্যায় হারমোনিয়ামে পরোজ ও ঠুংরী শুনিয়ে শ্রোতাদের অকুণ্ঠিত প্রশংসা অর্জন করেন। এছাড়া বেহালা বাজিয়ে শোনান ভুপেন্দ্র সংগীত বিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীগণেন্দ্রনাথ হালদার। শান্তিনিকেতন থেকে আগত শ্রীঅশেষ বন্দ্যোপাধ্যায় সপ্তম অধিবেশনে এসরাজ বাজিয়ে শোনান প্রথমে জৌনপুরি ও পরে রবীন্দ্রনাথের একখানি গান। ওস্তাদ বিলায়েৎ-এর এগারো বছরের ভাগনে রহীস খাঁকে লোকের কৌতূহল মেটাবার জন্য চতুর্থ অধিবেশনে সেতার বাজাতে বসানো হয়। বালক রহীস মিশ্র খামাজ শুনিয়ে তার ওপরে লোকের আশা পোষণ করার যোগ্যতা প্রকাশ করেন। পঞ্চম অধিবেশনে শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী কৌশিক ও বাহার ঝাঁঝিঝটে বীণ বাজিয়ে শোনান।

সম্মিলিত বাজনার দুটি বিচিত্র অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। চতুর্থ অধিবেশনে মাদ্রাজের শ্রীবিলাবদ্রী আয়ার বসেন ঘটম (মাটির কলসী) নিয়ে আর তার সঙ্গে থাকেন খঞ্জরী নিয়ে মাদ্রাজের শ্রী এম ভঙ্গরু আয়ার; এ'দের সঙ্গে সংগতে বসেন বেহালায় ভি জি যোগ এবং তবলায় হাবিবুদ্দীন খাঁ। যন্ত্রবাদ্য সমন্বয়ের অপরটি ছিল শেষ অধিবেশনের শেষ অনুষ্ঠানটি। এতে ছিলেন তবলা নিয়ে ওস্তাদ কেরামৎ আলি খাঁ, পণ্ডিত অনোখিলাল মিশ্র এবং ওস্তাদ হাবিবুদ্দীন খাঁ, সরোদ নিয়ে বসেন শ্রীশ্যাম গাঙ্গুলী, সানাই নিয়ে মিয়াঁ বিসমিল্লা ও বেহালা নিয়ে শ্রী ভি জি যোগ। দুটোই হুল্লোড়ে ব্যাপার। এ'রা দ্বিতীয় বার বাজাবার সময় শ্রীগোপাল মিশ্র তাঁর সারেঙ্গী নিয়ে বসে যান; শ্রীশ্যাম গাঙ্গুলী তখন সরোদ নিয়ে উঠে আসেন, কারণ সারেঙ্গীর সঙ্গে সরোদ বাজানো রীতিবিরুদ্ধ। বেহালাও চলে না, তবে শ্রীযোগ রীতিকে না মেনে বাজিয়ে গেলেন। একটা মজার সৃষ্টি করা ছাড়া এ ধরণের সম্মিলিত বাজনার আর কোন সার্থকতা দেখা গেলো না।

বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সংগতে যোগদান করেন তবলায় ওস্তাদ হাবিবুদ্দীন খাঁ, পণ্ডিত অনোখীলাল মিশ্র, পণ্ডিত শান্তা-প্রসাদ, ওস্তাদ কেরামৎ আলি খাঁ, শ্রীরাম-রায় পর্বতকার, শ্রী কে কুণ্টেকর, শ্রীযশোবন্ত আর কেশকার, শ্রীসন্তোষ মল্লিক, শ্রীপঙ্কজ-কুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুবোধ নন্দী; সারেঙ্গীতে ছিলেন ওস্তাদ মজিদ খাঁ, পণ্ডিত গোপাল মিশ্র, দাতারাম পর্বতকার, গোলাম জাফর। মহারাষ্ট্রীয় সংগীতজ্ঞরা এখনও হারমোনিয়ামের ব্যবহার রেখেছেন দেখা গেলো। বাজিয়েদের মধ্যে ছিলেন শ্রী পি মধুকর, শ্রীবসন্তরায় যশোয়াল ও শ্রী পি এম কালে। এ ছাড়া শ্রী ভি জি যোগ প্রধান অনুষ্ঠানগুলিতে বেহালায় সংগত করেন। পাখোয়াজ সংগত করেন শ্রীসতীশ-চন্দ্র দত্ত (দানীবাবু), শ্রীপবিত্র আচার্য ও শ্রীভিঠলদাস গুজরাটি।

এ ছাড়া সম্মিলনীতে নাচেরও ব্যবস্থা ছিল। অধিকাংশই ছিলো অতি অল্পবয়স্ক মেয়েদের নাচ যাদের মধ্যে কোন শিল্প-কৃতিত্ব বিকসিত হবার যোগ্যতা এখনও দেখা দেয়নি। মনে হয় যেন নেহাৎ উপ-রোধে পড়েই কর্তৃপক্ষকে এইসব নাচের ব্যবস্থা রাখতে হয়েছে; কিন্তু উচ্চাঙ্গ আসরের মেজাজই বিগড়ে যায় এইসব নাচেতে। প্রথম দিন ছাড়া প্রতি সন্ধ্যার

পণ্ডিত শান্তা প্রসাদ

অধিবেশনই আরম্ভ হয়েছে শিশুদের নাচ দিয়ে।

উল্লেখ করার মতো পরিণতকৃতী নাচিয়েদের মধ্যে এসেছিলেন কথক নাচ দেখাবার জন্যে বম্বে থেকে শ্রীমতী রোহিণী ওয়াগলে। প্রথম অধিবেশনের সর্বশেষ অনুষ্ঠান ছিল তাঁর। নাচ আরম্ভ হবার আগে থেকেই লোক চলে যেতে আরম্ভ করে এবং নাচ চলতে থাকার সময়ে গমনোদ্যত লোক এতো বেড়ে যায় যে, শ্রীমতী ওয়াগলের পক্ষে আর নাচ দেখানোর মেজাজ রাখাই মুশকিল হয়; একটু পরেই তিনি বন্ধ করে দেন। আর উল্লেখযোগ্য নাচিয়ে এসেছিলেন ত্রিবাঙ্কুরের ভগিনীত্রয় ললিতা, পদ্মিনী ও রাগিনী এবং তাঁদের দল। অতি অল্প বয়স থেকেই ভারতনাট্যমে পারদর্শিতা দেখিয়ে আজ তাঁরা সুপরিণত শিল্পী হয়েছেন। কিন্তু এবারে তাঁরা দেখালেন মিশ্র ঢঙের বিভিন্ন কতকগুলো নৃত্য-নাট্যাংশ। সমস্ত অধিবেশন মিলিয়ে সর্বাধিক ভীড় হয়েছিল এদের নাচের সময়েই। নাচের মধ্যে সম্পূর্ণ একটা কিছু পাওয়া যায় কেবল শ্রীমতী বিজন ঘোষ দস্তিদার পরিচালিত 'মীরাবাঈ' নৃত্য-নাট্যটি থেকে। অবশ্য লোকে নাচের চেয়ে বেশী মুগ্ধ হয় মীরার ভজনগুলি শুনে যা গেয়েছিলেন শ্রীমতী বিজন ঘোষ দস্তিদার, শ্রীমতী মীরা ঘোষ দস্তিদার এবং শ্রীমতী ইরা সেনগুপ্তা। নাম ভূমিকায় ছিলেন শ্রীমতী মঞ্জুলিকা রায় চৌধুরী।

পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি

গৌরকিশোর ঘোষ

ভারতের রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ' কলকাতার ৮ই পৌষের দৈনিকগুলো সমস্বরে জানালে, "দশদিন-ব্যাপী পশ্চিমবঙ্গ সফর উপলক্ষে, গতকাল বিকাল পাঁচটা নাগাত দিল্লী থেকে বিমান-যোগে কলকাতায় এসে পেঁৗচেছেন।"

সেটা ছিল সোমবার। দমদম বিমান-ঘাঁটিতে অপেক্ষা করছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডাঃ মুখোপাধ্যায়, মন্ত্রিমণ্ডলী, পদস্থ সামরিক ও অসামরিক সরকারী কর্মচারিগণ, কলকাতা কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়র, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি, শহরের অনেক গণ্যমান্য লোক। পুলিশ ফৌজ আর পুলিশ ব্যাণ্ডও হাজির। আর ছিল সাংবাদিক ফটোগ্রাফার-দের এক সদাসতর্ক দল। আরও ছিল, অ-পদস্থ এক জনতা, নাম-গোত্রহীনদের একটা দঙ্গল।

রাষ্ট্রপতির বিমান থামল। সিঁড়ি লাগল বিমানের গায়ে। দরজা খুলল। একটু বিরতি। বিমানাবতরণ ক্ষেত্রের বাইরেটা লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা। অবাঞ্ছিত লোক যাতে ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে। সেই রেলিংএ ঠেস দিয়ে দাঁড়ানোদের মধ্য থেকে কে একজন চাপা উল্লাসে বলে উঠল, "ওই যে!"

রাষ্ট্রপতিকে দেখা গেল, সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে বিমান থেকে বেরিয়ে এলেন। সিঁড়ির উপর সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। আর অমনি ক্লিক, ক্লিক, ক্যামেরার ঝিলিক শুরু হ'ল। সবাই ধীর, শান্ত। ব্যস্ততার সবটুকু যেন ইজারা নিয়েছেন প্রেস-ফটোগ্রাফারদের দলটি।

রাজ্যপাল এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন। রাষ্ট্রপতির পিছনেই নামলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। 'গার্ড অব অনার' দেবার জন্য কাঠ-পুতুলের আড়ষ্টতা সর্বাঙ্গে মেখে দাঁড়িয়েছিল পুলিশ ফৌজের এক বাহিনী। নিস্তব্ধতা ভেদ করে তাদের ব্যাণ্ডে জাতীয়-সঙ্গীত বেজে উঠল। পুলিশ বাহিনী সামরিক অভিবাদন জানাল তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধির হাত থেকে মালাটি নিয়ে ডাঃ রায় রাষ্ট্রপতির গলায় পরিয়ে দিলেন। মন্ত্রিমণ্ডলীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেওয়া হ'ল। আর প্রতিটি পর্বেই বিমানঘাঁটির প্রায়ান্ধকার আবরণ প্রেস-ফটোগ্রাফারদের ক্লিক্ ক্লিক্ ফ্ল্যাসবাতির ঝিলিকে ছিঁড়ে যেতে লাগল।

রাষ্ট্রপতি রাজ্যপালের গাড়িতে উঠলেন। এখান থেকে সোজা রাজভবন। পথের দুপাশে লোকের কাতার। অন্ধকারে মুখ চেনা যায় না। তবু রাজ্যপালের গাড়ি আন্দাজ করে পথের দুপাশ থেকে জনতা জয়ধ্বনি ছুঁড়ে দিতে লাগল। দমদম ঘাঁটি থেকে রাজভবন নয় মাইল পথ। জয়ধ্বনির বিরতিহীন এক রেখায় এই নয় মাইল দূরবর্তী দুই বিন্দু অপূর্ব উল্লাসে মিলিত হয়ে গেল।

পরদিন অফিস ফেরত কেরাণীদের মুখে

দমদম বিমানঘাটিতে রাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল ও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়

বোটানিক্যাল বা গানে রাষ্ট্রপতি

অভিযোগ শোনা গেল, আড়াই ঘণ্টাকাল তাঁরা আটক হয়ে ছিলেন। পথ বন্ধ ছিল বলে বাড়ি ফিরতে পারেন নি।

রাষ্ট্রপতি দিল্লী থেকে সরাসরি কলকাতায় আসেন নি। চাণ্ডিলে বিনোবাজী অসুস্থ অবস্থায় ঔষধ গ্রহণে বিরত ছিলেন। রাষ্ট্রপতি বিনোবাজীকে এ-সংকল্প প্রত্যাহার করবার অনুরোধ জানাতে চাণ্ডিলে নেমেছিলেন। সেখানে ডাঃ রায়ও ছিলেন। তারপর চাণ্ডিল থেকে কলকাতা।

দ্বিতীয়বার ভারতের রাষ্ট্রপতি হলেন ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ। তারপর কলকাতায় আসা এই তাঁর প্রথম। অতি স্ফীত এক কার্যসূচী তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে। রাষ্ট্রপতির বিশ্রাম কই? রাজভবনে চার ঘণ্টাও কাটানো হল না। রাজভবনের গাড়ি তাঁকে পেশছে দিল হাওড়া স্টেসন। এক স্পেস্যাল ট্রেন প্রস্তুত। পরদিন সকালে শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর সমাবর্তন। তাঁকে ভাষণ দিতে হবে। রাত দশটায় স্পেস্যাল ছাড়ল আর থামবে গিয়ে বোলপুরে।

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়রূপে স্বীকৃতি' পেয়েছে। এর আর্থিক দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করেছেন। বিশ্বভারতীর এই প্রথম সমাবর্তন উৎসব। রাষ্ট্রপতির সেই উৎসবে উপস্থিতি সুশোভনীয়।

পরিবেশ উৎসব মুখর। এই সময়ে শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলা। প্রতি বছর যাত্রী, অভ্যাগতের আগমনে, মেলার আনন্দে শান্তিনিকেতন টইটম্বুর। হৈ-চৈ আনন্দ কোলাহলের মধ্যেই খবর রটে গিয়েছিল, রাষ্ট্রপতি সমাবর্তন ভাষণ দেবেন বাঙলায়। এ একটা জোর চমক।

৯ই পৌষের সকাল ৯টায় সমাবর্তন উৎসব শুরু হল। পৌষের অকৃপণ দিন অজস্র উজ্জ্বলতা উজাড় করে আম্রকুঞ্জের পরে ঢেলে দিতে লাগল। শঙ্খধ্বনিতে উৎসব শুরুর ঘোষণা শোনা গেল। উপাচার্য শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বাগত সম্ভাষণের পর রাষ্ট্রপতির সঙ্গে বিশ্বভারতীর অধ্যক্ষ, অধ্যাপক ও কর্মিবৃন্দের পরিচয় করিয়ে দিলেন। রাষ্ট্রপতির ললাটে চন্দন-তিলক পরিয়ে দিলে এক ছাত্রী। রাষ্ট্রপতির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। পৌষ-রৌদ্রের আলোতে, নাকি আনন্দে?

উপাধি বিতরণ হল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে ছাত্ররা উপাধি পেয়েই থাকে। বিশেষত্ব তাতে নয়। বিশ্বভারতীর এই সমাবর্তনের উল্লেখযোগ্য বিষয় হল পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী আর শিল্পী নন্দলাল বসুকে 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে ভূষিত করা। দুটি জীবনব্যাপী সাধনা আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পেল। কার গৌরব বেশী? যে প্রতিষ্ঠান স্বীকৃতি দিল তার? অথবা যাঁরা স্বীকৃতি পেলেন তাঁদের? শাস্ত্রীমশাই সর্বসমক্ষেই উপাধি নিলেন। কিন্তু নন্দবাবু অনুপস্থিত। ব্যাধির আক্রমণে শয্যাশায়ী। তবে কি তাঁরটা কেউ গ্রহণ করবে না? উপাচার্য কি গ্রহীতার সামনে গিয়ে আবৃত্তি করবেন না—

"ডক্টর নন্দলাল বসু,

শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের অন্যতম প্রথম ও প্রধান শিষ্য আপনি। বর্তমান ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পিরূপে বিশ্বের সকল দেশেই আপনার নাম আজ সুপরিজ্ঞাত। শিল্পের যে সার্থক পরিবেশ আপনি আমাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহা চিরকালের মতো এই বিশ্ববিদ্যাতীর্থকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করিয়া রাখিবে।

আপনার ত্যাগবিনম্র আদর্শ জীবন ও অবিনশ্বর শিল্পকীর্তির স্বীকৃতিস্বরূপ

বিশ্বভারতীর উপাচার্যরূপে আমি আপনাকে দেশিকোত্তম উপাধিতে ভূষিত করি।"

এ কথাগুলো যার উদ্দেশে উচ্চারিত, তিনি কি স্বকর্ণে তা শুনেবেন না? তাকি হয়! উপাচার্যের সঙ্গে তাই রাষ্ট্রপতি চললেন নন্দলালের রুগ্ন শয্যার পাশে। শান্তিনিকেতনের স্মরণীয় ঘটনা-পঞ্জীতে দিনটি আরো স্মরণীয় হয়ে থাকল!

সবাই উদ্গ্রীব ছিল রাষ্ট্রপতির ভাষণ শুনতে। রাষ্ট্রপতি কি বলবেন? কেমন বাঙলা বলবেন? আগ্রহ পরিতুষ্ট হল। থেমে থেমে বলা তাঁর তেমনি করেই এগাতে থাকলেন। উচ্চারণ একটু আড়ষ্ট। খুব স্পষ্ট। রাষ্ট্রপতির দীর্ঘ বক্তৃতা ক্রমশ শেষ হয়ে এল। কবিগুরুর কথা উল্লেখ করে তিনি বললেন, "তাঁর স্বদেশপ্রেমের অর্থ কদাপি অন্য জাতির অথবা দেশের প্রতি ঘৃণা কিম্বা উদাসীনতা ছিল না।...... তিনি এই সংস্থাকে এইরূপে মানুষের রচনা-কেন্দ্র বানাইতে চাহিয়াছিলেন, যারা মানুষের সহিত প্রেম করে, তারা প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া যায়, যারা বিশ্বহৃদয়ের কল্যাণ-চেতনার অনন্যভক্ত হয়, আর যারা বিশ্বের সহিত পূর্ণ তাদাত্ম্য হয়। আজ এই সংস্থাকে সরকার নিজ আইন দ্বারা স্বীকৃত করিয়াছে, আর তাহার আর্থিক ভার লইয়াছে। কিন্তু এই সংস্থার মস্তিষ্ক এবং শরীরের, আত্মা এবং চেতনাশক্তির নির্মাণ রাজ্যের টাকা দ্বারা কিম্বা আইন দ্বারা হয় নাই। এই সংস্থা গুরুদেবের মূর্তিমান আত্মস্বরূপ......তাঁর স্মৃতির প্রতি আমাদের এই কর্তব্য যে, আমরা তাঁর নিধিকে যে কেবল ভারতের নবসংস্কৃতির এবং নব-চেতনার নহে, কিন্তু নবমানবের সংস্কৃতি ও চেতনার প্রতীক এবং প্রতিজ্ঞারূপে তন-মন-ধন দ্বারা সেবা ও সহায়তা করিতে থাকি।"

কলকাতায় রাষ্ট্রপতির কর্মসূচী অতিশয় স্ফীতকায়। উদ্বোধন, দ্বারোদ্ঘাটন আর পরিদর্শনের অবধি নেই। অন্ত নেই তাঁর ঘোরার।

২৮শে ডিসেম্বর। সকালে প্রেসিডেন্সী কলেজ আর হিন্দু হোস্টেল দেখলেন। প্রতিটি ঘর যে পরিচিত। আজকের রাষ্ট্রপতি নয়, পঁয়তাল্লিশ বছর আগে এক লাজুক ছাত্র এই হোস্টেলে থাকত, এই কলেজে পড়ত। কেমন করে জানা গেল? ওই যে ফটকের গায়ে এক মর্মর ফলক! ওই যে উৎকীর্ণ এক বিজ্ঞাপন—ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, ১৯০২ সালের জুলাই থেকে ১৯০৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এখানে বাস করেছেন। এও তো সেই ডিসেম্বর! এই কি সেই ডিসেম্বর? ফলকটা টাঙানো একটু উপরে। মুখটা উঁচু করে দেখতে হয়। রাষ্ট্রপতি ফলকটা দেখলেন, মুখটা উঁচু করেই। এই কলেজ, এই হোস্টেল, সকলের মুখই তো তিনি উঁচু করেছেন। ঘুরে ঘুরে দেখা শেষ হল। বারে বারে উন্মনা হয়ে যাচ্ছিলেন। এই লোক, এই মুখ, সব অচেনা, কণ্ঠস্বরগুলো অশ্রুত। তবু কেন জানি কাদের মুখের আদল এইসব মুখে ফুটে উঠতে চায়! কথা শুনে হঠাৎ পিছনে চাইতে ইচ্ছে করে, যেন হারানো কার চেনা স্বর পিছনে বেজে ওঠে!

প্রেসিডেন্সী কলেজ প্রাঙ্গণে সম্বর্ধনা জানান হ'ল। মেয়েরা শঙ্খ বাজালে, মাল্য-দান করলে। ৪৫ বছরের মধ্যে দেশের চেহারা অনেক বদলে গেছে। একে একে বক্তৃতা হতে লাগল। পুরানো স্মৃতি, আত্ম-প্রশস্তি মুখ নীচু করে গ্রহণ করছিলেন।

হাওড়ার পণ্ডিত সম্মেলনে রাষ্ট্রপতি

পৌরসভার পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতিকে সম্বর্ধনা জানানো হচ্ছে

হঠাৎ এক ঝলক উত্তেজনা, আরে ইনি কে! মাস্টার মশাই! ডাঃ প্রসাদ সোজা হয়ে বসলেন। শ্রীডি এন সেন, প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব ইতিহাসের অধ্যাপক বলতে উঠেছেন। প'য়তাল্লিশ বছরের ব্যবধান অধ্যাপকের কিছু স্বরবিকৃতি ঘটিয়েছে। তবু, কি আশ্চর্য, চিনতে একটুও ভুল হয় না।

অনেক সভায় অনেক বক্তৃতা তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে রাষ্ট্রপতি করেছেন। কিন্তু আজ যেন সে অভ্যাস ভুল হয়ে গেল। অনেক কথা বলবার ছিল। কিন্তু কণ্ঠ কেন জোগায় না? প'য়তাল্লিশ বছর আগেকার লজ্জা কোথায় লুকিয়ে বসেছিল? পুরানো বন্ধুকে শক্ত আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরলে। রাষ্ট্রপতি বললেন, "সে সময় আমি যা কিছু পেয়েছিলাম, সেই সম্বল নিয়েই বেঁচে আছি। সেই সম্বল থেকেই খরচ করছি। মানুষের জীবনে সেইকালে সে যা পায়, তা যদি বাঁচিয়ে রাখতে পারে, তাহলে অনেক কিছুই হয়।"......

বিকালে বিধানসভা ভবনে রাষ্ট্রীয় সম্বর্ধনা, চন্দ্রমল্লিকার এক প্রদর্শনীর উদ্বোধন। এর আগেই বড়বাজার লাইব্রেরীর সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্বোধন করে এসেছেন। বিধানসভা প্রাঙ্গণের অনুষ্ঠানের পর আপার সার্কুলার রোডে সন্ধ্যার সময় নিখিল ভারত আয়ুর্বেদ সম্মেলনের উদ্বোধন। শ্যামাদাস বৈদ্য-শাস্ত্রপীঠ লোকে ঠাসাঠাসি। সমাগত প্রতিনিধিদের দেখে প্রাচীন ভারতের তপোবন-নিবাসীদের কথা কারো কারো মনে পড়ে গেল। অভ্যর্থনা সভাপতি হিন্দীতে লিখিত এক ভাষণ বের করে পড়তে শুরু করলেন। পাশ থেকে টিপ্পনী শোনা গেল, সবার কথা একাই বলবেন যে! ক্রমেই সবাই চঞ্চল হয়ে উঠতে লাগলেন। দেখা গেল, রাষ্ট্রপতির মিলিটারী সেক্রেটারীও বিচলিত হয়েছেন। সময় উত্তীর্ণ হয়ে এল, রাষ্ট্রপতি তো আর অধিক সময় থাকতে পারবেন না। উপায়? এদিকে যে কবিরাজী ভাষণ কোয়ার্টার মাইলও যায় নি! মিলিটারী সেক্রেটারী নিজেও ডাক্তার, অ্যালোপ্যাথ, তাঁর পদ্ধতিতে ঝটিতি মামলা চোকে। কবিরাজী পদ্ধতির দীর্ঘ মেয়াদ তাঁর বরদাস্ত হবে কেন? বাধ্য হয়েই বক্তার ভাষণকে অস্ত্রোপচার করে ছোট করা হল।

সাংবাদিক যাঁরা আয়ুর্বেদ সম্মেলনে গিয়েছিলেন তাঁদের একজন টিপ্পনি কাটলেন, ফটো তোলবার সময় হুড়োহুড়িটা একবার দেখলে? কে বাদ পড়ে যায় সেই ভয়। আমাদের সামনে এসে সব দাঁড়িয়ে পড়লেন শেষটায় যে কি হল আর বোঝা গেল না!

এক একটা দিন আসে যায়। কাজের চাপে চাপে রাষ্ট্রপতি পিষ্ট হয়ে পড়েন। একজন সাংবাদিক মন্তব্য করলেন, বড্ড বেশী চাপ পড়েছে ওঁর। ২৫ তারিখেও চাপ ছিল প্রচুর। কোথায় শিবপুরের বোটা-নিক্যাল গার্ডেন্‌স্‌ আর কোথায় দক্ষিণে-শ্বরের কালিবাড়ী। সকালের কর্মসূচি হাওড়ায়—পশ্চিমবঙ্গ পণ্ডিত মহাসম্মে-লনের উদ্বোধন, শিবপুরের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ পরিদর্শন শেষ করে গেলেন বোটা-নিক্যাল গার্ডেনস্‌ দেখতে। ছাতখোলা গাড়ীতে ঘুরে ঘুরে রাষ্ট্রপতি যথেষ্ট ক্লান্ত হয়েছেন বেশ বোঝা গেল। কিন্তু সেদিকে নজর দিলে চলবে কেন? হাতের মধ্যে যখন পাওয়া গেছেই কর্মতৎপরতার সরকারী নমুনা না দেখিয়ে ছাড়বে কে? রৌদ্রটা ছিল চড়া। ঘর্মাক্ত রাষ্ট্রপতি প্রায় বাহ্যবন্দী হয়েই ঘুরে ঘুরে সব দেখলেন। অর্কিড হাউস, লার্জ পাম হাউস, দু শ বছরের বট বৃক্ষ, সবই দেখলেন। বনমন্ত্রী শ্রীহেম নস্করের এক 'চান্স' মিলল। বটগাছটির এক ছবি রাষ্ট্রপতিকে উপহার দিয়ে দিলেন। তারপর রাষ্ট্রপতিকে দেখানো হল বোটানি-ক্যাল বাগানের সব চেয়ে মূল্যবান ধন 'হার্বেনিয়াম'। সারা মুলুকের ওষধি যেখানে জড়ো করা হয়েছে।

ছুটির দিন। খৃষ্ট পর্ব। বোটানিক্যাল বাগান যথানিয়মে পিকনিক করনেওয়ালাদে ভরা। রাষ্ট্রপতি ধীরে ধীরে হাঁটছেন। কালো লম্বা কোর্তা, পরনে ধুতি, মাথায় সাদা টুপি, হাতে লাঠি। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা ছুটে ছুটে আসছে আর রাষ্ট্রপতি হেসে হেসে তাঁদের নীরবে স্নেহ জানাচ্ছেন। অ্যামেচার ফটো তুলিয়েরা বেধড়ক 'সাটার' টিপে যাচ্ছে।

সকালের পর সন্ধ্যায় দক্ষিণেশ্বর আন্ত-র্জাতিক ভবনের উদ্বোধন। সম্বর্ধনার উত্তরে রাষ্ট্রপতি বললেন, ভারতবর্ষ বাইরে কখনো সৈন্য সামন্ত পাঠায়নি, পাঠিয়েছে ধর্মের দূত। এমনিভাবেই সে একদিন আধিপত্য বিস্তার করেছে। এই হচ্ছে খাঁটি

নিঃ ভাঃ সংগীত সম্মেলনে রাষ্ট্রপতি

আধিপত্য। জুলুম নেই, জবরদস্তি নেই। প্রেমের ভাব এই আধিপত্যের লক্ষণ আর অস্ত্র হল সে আধিপত্য বিস্তারের হাতিয়ার।

পরদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব। রাষ্ট্রপতিকে 'ডক্টর অব্ ল' উপাধিতে ভূষিত করা হল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন শাস্ত্রে তিনি ডক্টর হবেন, এ তাঁর বরাবরের আকাঙ্ক্ষা। কলকাতায় তিনি পনেরটি বছর কাটিয়েছেন, পড়াশুনায় আর ওকালতি করে। পনের দিন ধরে প্রস্তুত হচ্ছিলেন ডিগ্রীর জন্য। কিন্তু ডাক এল স্বাধীনতা সংগ্রামের। সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা আহুতি দিলেন মহাযজ্ঞে। চলে গেলেন বিহারে। বিহার তাঁর রণক্ষেত্র কিন্তু তাঁকে শিক্ষা দিয়েছে বাঙলা, এই কলকাতা। কলকাতার হাত থেকে সম্মান নেবার এতদিনের সাধ তাঁর চরিতার্থ হল। রাষ্ট্রপতি অভিভূত হয়ে বলে উঠলেন, "নিজের অধ্যবসায় আর চেষ্টা দিয়ে যে সম্মান পাবার চেষ্টা করেছিলাম আজ তা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃপায় সহজেই পেলাম।"

রাষ্ট্রপতি সব রাজনীতির ঊর্ধ্বে। কোন রাজনৈতিক অনুষ্ঠান তাঁকে নিয়ে হয়নি। সংগীত সম্মেলন উদ্বোধন, আর প্রস্তাবিত নগর পরিকল্পনা আর দুগ্ধ সরবরাহ কেন্দ্র পরিদর্শন আর জাতীয় রক্ষী বাহিনীর অভিবাদন নিতেই তাঁর দিন কেটেছে। তিনি নতুন টাঁকশাল দেখেছেন, দেখেছেন শস্ত্র নির্মাণ কারখানা।

সর্বত্র তাঁর মোটর ছুটোছুটি করছে। দুধারে পুলিশ বেষ্টনী। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পথ আটকে রাখা। এত কড়াকড়িতে জনসাধারণ বিরক্ত বোধ করছে। সাধারণ লোক তাঁর কাছে ঘেঁষতে চায়নি নয়, পারেনি।

শুধু দুবার ছাড়া। কল্যাণী স্টেশনে রাষ্ট্রপতি গাড়ীতে উঠছেন, এক উদ্বাস্তু নারী দুঃখ-দুর্দশা সম্পর্কে অভিযোগ জানালে। রাষ্ট্রপতি ফিরে দাঁড়ালেন, মনোযোগ দিয়ে অভিযোগ শুনলেন, সমবেদনা জানিয়ে আশ্বাস দিলেন, "মা, আমার যথাসাধ্য করব।"

আর একবার। রাষ্ট্রপতি গিয়েছেন এক শস্ত্র নির্মাণ কারখানা দেখতে। দেখা শেষ হল। গাড়ীতে উঠে বেরিয়ে যাচ্ছেন। হঠাৎ সবিস্ময়ে সবাই দেখল এক শ্রমিক 'রোখো রোখো' বলে ছুটেছে তাঁর গাড়ীর দিকে। কিন্তু যাবে তার সাধ্য কি? বাঘের থাবা বাড়িয়ে দিয়ে তার ঘাড় ধরে ঝাঁকুনি মারল এক পালোয়ান পুলিশ। চাপা গুঞ্জন উঠল। ধর ধর ব্যাটাকে। তৎক্ষণে রাষ্ট্রপতির গাড়ী থেমে গেছে। মুখ বাড়িয়ে শান্তকণ্ঠে রাষ্ট্রপতি আদেশ দিলেন, ওকে ছেড়ে দাও আসতে দাও।

উত্তেজনায় থর থর লোকটি এগিয়ে গেল। নোংরা ট্যাঁক থেকে টেনে বের করল একটা হলুদ রঙ পৈতে। লাজুক কণ্ঠে বললে, এটা এনেছিলাম, তোমাকে—তোমাকে দেব বলে।

স্মিত মুখে পৈতে গাছটি নিয়ে রাষ্ট্রপতি কপালে ছোঁয়ালেন। গাড়ী আর দাঁড়াল না। মাপা সময় আরও অনেক প্রোগ্রাম। কর্মসূচির পর কর্মসূচি। এখনো বাকী অনেক বাকী। যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, কেন্দ্রীয় কাঁচ ও মৃত্তিকা গবেষণাগার, নিঃ ভাঃ মহিলা সম্মেলনের বৃত্তিশিক্ষা কেন্দ্র, সরকারী কলা মহাবিদ্যালয়ের চিত্র প্রদর্শনী......

সবাই আসা করে আছেন রাষ্ট্রপতির আগমনের। ঝাড় পোঁছ করেছেন পুরাতন ময়লা, নতুন করে রঙ, নতুন সাজ লাগানো হয়েছে ঘরে ঘরে। রাষ্ট্রপতি আসবেন।

"রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ," ঠিক আটদিন পরের কলকাতার কয়েকটি দৈনিক ঘোষণা করলে, "সোমবার মধ্যরাত্রি হইতে জ্বরাক্রান্ত হইয়াছেন। ডাঃ এন আর সেনগুপ্ত তাঁহার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণের পরামর্শ দেন। এই কারণে তাঁহার সমস্ত কর্মসূচি বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে।"

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্বন্ধে একটি ভাষণে শ্রীযুক্ত নেহরু আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, বুদ্ধদেব হইতে গান্ধীজী পর্যন্ত মহাজনগণ যে সত্যপথের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন আমাদিগকে সেই পথেই চলিতে হইবে। খুড়ো বলিলেন—"পায় চলা হলে অবশ্যি কথা নেই কিন্তু সে পথ ট্রামে-বাসে চলতে গেলেই বিপদ। আমি আগেও বলেছি পঞ্চবার্ষিকীতে ট্রামে-বাসের ব্যবস্থার কথা নেই"।

*   *   *   *   *

নিখিল ভারত যাদুঘর সমিতির সভাপতি মহাশয় আক্ষেপ করিয়াছেন যে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যাদুঘরের গুরুত্ব স্বীকার করা হয় নাই। শ্যামলাল একটি অসমর্থিত সংবাদ উল্লেখ করিয়া বলিল—"শুনেছি যাদুঘর না হলেও চিড়িয়াখানার গুরুত্বের কথা সরকারের বিবেচনাধীন আছে"।

*   *   *   *   *

একটি সংবাদে প্রকাশ যে, জনৈক মহিলা ১৮৫২ সালে জন্মগ্রহণ করিয়া এখনও বাঁচিয়া আছেন। তাঁর জন্মশতবার্ষিকীতে তিনি বলিয়াছেন যে, সম্পূর্ণরূপে জল বর্জনই তাঁর দীর্ঘায়ুর কারণ।

শ্যামলাল বলিল—"১৮২০ সালে জনৈক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেও Still going strong. তাঁর দীর্ঘায়ুর কারণও জল বর্জন কিন্তু জলীয় নয়। সুতরাং দীর্ঘায়ুকে ফরমুলার ফেলা যায় না।"

*   *   *   *   *

ট্রামে-বাসে

সত্তর কোটি বৎসরের পুরাতন একটি বিশেষ শ্রেণীর মৎস্য সংরক্ষণের জন্য বৈজ্ঞানিকগণ বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন বলিয়া একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।
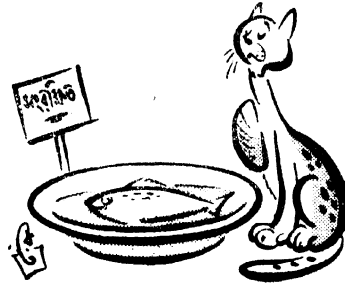
—"তার চেয়ে অনেক নবীন মৎস্য সংরক্ষণের ব্যবস্থাও আমরা করছি। আমাদের উপায়টা অবশ্যি অবৈজ্ঞানিক অর্থাৎ মৎস্যাহার ত্যাগ"—বলে শ্যামলাল।

*   *   *   *

একটি সংবাদে প্রকাশ, অস্ট্রেলিয়া নাকি সুইডেন হইতে আটলক্ষ টাকায় একজোড়া ষাঁড় ক্রয় করিয়াছেন।—"আমরা এর আগে ন' কোটি টাকায় একজোড়া ষাঁড় বিক্রী হতে দেখেছি সুতরাং এতে আর অস্ট্রেলিয়ার কেরামতি কী?"

*   *   *   *   *

আসামে নাকি সম্প্রতি ঝাঁকে ঝাঁকে বুলবুলি আসিয়া সমস্ত ফসল খাইয়া ফেলিতেছে।—"বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে দিসনা আজি দোল"—বললে আজ বুঝি আর চলবে না। ফুল ছেড়ে ফলের প্রতি বুলবুলির এই লোভে এবার মা ফলেষু কদাচন বলার সময় এসেছে"।

*   *   *   *   *

এক সংবাদে প্রকাশ, চারহাজার পাঁচশত মূল্যবান্ মণিখচিত একটি মানচিত্র মস্কোতে প্রণয়ন করা হইয়াছে। শ্যামলাল

বলিল—"সম্মুখেতে প্রসারিত তব মস্কোর মানচিত্র—কর নমস্কার।"

*   *   *   *   *

পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশপাল তাঁর সাম্প্রতিক ভাষণে বলিয়াছেন যে, শিশুরা জাতির নিজস্ব সম্পদ।—"তাই হয়ত সম্পদ বৃদ্ধিতে দেশের দান অপরিসীম !!"

*   *   *   *   *

মীরাটে একটি অশ্বতরী বাচ্চা প্রসব করিয়াছে। পশু প্রজননবিদ্‌রা বলেন যে, খচ্চরের কখনও বাচ্চা হয় না। সুতরাং এই সংবাদটি কৌতূহলপ্রদ।—"কিন্তু খচ্চরের বাচ্চা না হয়েও যা অনেক দেখছি তাতে মনে হয় খচ্চরের প্রতি মা ষষ্ঠীর বিমুখতা মঙ্গলেরই কারণ ছিল। কিন্তু মীরাটের অশ্বতরীর নীতি অনুসারে হলে চিন্তার কারণ আছে বৈ কি"—বলেন বিশুখুড়ো।

পুস্তক পরিচয়

উপন্যাস

কার পাপে? (চলচ্চিত্রে রূপায়িত উপন্যাস) : কালীপ্রসাদ ঘোষ, বি-এসসি : শিশির পাবলিশিং হাউস : ২২।১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলকাতা—৬।

সম্প্রতি লক্ষ্য করছি, সার্থক এবং জনপ্রিয় চলচ্চিত্রের গল্পকে উপন্যাস করে বের করবার রেওয়াজ হয়েছে। ইংরেজীতে অবশ্য এর সার্থক উদাহরণ আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাংলাতে আজ পর্যন্ত একটি মাত্র দৃষ্টান্তও চোখে পড়েনি। এমন কি বাংলার কয়েকজন বিখ্যাত সাহিত্যিকের চলচ্চিত্রের জন্য রচিত গল্পও যখন উপন্যাস হয়ে ছাপার অক্ষরে আত্মপ্রকাশ করেছে, হতাশার হাত থেকে পাঠক রেহাই পায়নি।

চলচ্চিত্র হিসেবে কারপাপে (?) নিঃসন্দেহে উপভোগ্য হয়েছিল। গল্পের যেমন একটি সমস্যামূলক আবেদন ছিল, তেমনি তাকে ফুটিয়ে তুলেছিল কয়েকটি শিল্পীর নিপুণ অভিনয়। এখানে ছায়াছবির মারফৎ গল্প বলার সুযোগ-সুবিধাগুলি অনুপস্থিত। কিন্তু ছায়াছবিতে যে দুর্বলতা ছিল গৌণ, এখানে তাই হয়েছে মুখ্য। উপন্যাসে গল্প বলবেন লেখক তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির মারফৎ। গল্প নির্ভরশীল লেখনীর ওপর। সেই লেখনী যদি দুর্বল হয়, বলাই বাহুল্য, গল্প জমবে না। এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। উপন্যাস লিখবার কায়দাটি লেখকের এখনও অনায়ত্ত। সেই কারণে একটি ভালো গল্পের সম্ভাবনা নিয়েও কারপাপে (?) দুর্বল লেখা একটি নিতান্ত সধারণ গল্প হয়েই রইল।

(৩১২।৫২)

নাটক

ভারত-মঙ্গল : শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় : রঞ্জন পাবলিশিং হাউস : ৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড বেলগাছিয়া, কলকাতা—৩৭ : পাঁচ সিকা।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বাঙলার প্রবীণতম সৃষ্টিশীল সাহিত্যিকদের অন্যতম। তাঁর কলম এখনও সৃষ্টিশীল এটা নিঃসন্দেহে সুখের কথা।

স্বাধীন ভারতের প্রথম নববর্ষের পটভূমিকায় ভারত-মঙ্গল নাটকটি অনেকাংশে রূপকধর্মী। যে দৃষ্টিকোণ থেকে সাধারণত নাটক বিচার করা হয়ে থাকে, সেদিক থেকে দেখতে গেলে ভারত-মঙ্গলের প্রতি অবিচার করবার আশঙ্কা আছে। স্বচ্ছন্দ সংলাপে একটি পরিচ্ছন্ন আদর্শবাদ সহজগতিতে প্রবহমান। ঘটনা সংস্থাপনে কোনরূপ অতিনাটকীয়তা নেই, ক্লাইম্যাক্স সৃষ্টির অযথা প্রয়াস নেই। সমস্ত মিলিয়ে একটি সহজ সাবলীলতায় গীতিনাট্যের আস্বাদন। কাব্যধর্মী গানগুলি নাটকের সৌন্দর্য বাড়িয়েছে।

(৩৬৬।৫২)

ছেঁড়া তার : তুলসীদাস লাহিড়ী : রঙ্গালয়, ২০এ, লেক রোড, কলকাতা : দু'টাকা।

অভিনয়সাফল্য যদি নাটকের সার্থকতাব মাপকাঠি হয়, বোধ হয় তাই-ই হওয়া উচিত, ছেঁড়া তারের সার্থকতা তাহলে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত সত্য। বহুরূপী সম্প্রদায় কর্তৃক অভিনীত এই নাটকটি কলকাতার নাট্যামোদীদের খুশি করেছে। অবশ্য শিল্পীদের অভিনয়-কুশলতা তার জন্য অনেকখানি দায়ী। কিন্তু তাই-ই সব নয়। নাটকের গল্পে যে একটি মর্মান্তিক মানবিক আবেদন আছে নাটক হিসেবে পড়লেও তা বিফল হবার নয়। উত্তরবঙ্গের কৃষক রহিমুদ্দীর ট্র্যাজেডি ব্যক্তিকে অতিক্রমে তার মত আরও অনেক রহিমুদ্দীর জীবনকেই উদ্ঘাটিত করেছে। সংলাপের আঞ্চলিকতা অনভ্যস্ত পাঠকের কাছে প্রথমে একটু অস্বস্তি-কর মনে হলেও কিছুটা এগোবার পর আস্তে আস্তে স্বাভাবিকভাবেই এই অস্বস্তি কাটিয়ে ওঠা যায়। আর এই আঞ্চলিকতাই নাটকে বিশেষ একটি আন্তরিকতার সঞ্চার করেছে। কিন্তু উচ্চারণে অনভ্যস্ত অভিনেতাদের কাছে সেইটিই হবে সবচেয়ে বড় অসুবিধে। কথাটা ভেবে দেখার মত!

(৩৬৮।৫২)

কবিতা

গোধূলী-সূর্য : সন্তোষকুমার অধিকারী : অশোক লাইব্রেরী, ১৫।৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা—১ : আট আনা।

গান্ধীজির জীবনদর্শনকে কেন্দ্র করে একটি রূপকধর্মী কাব্যনাট্য। কবির পাবার এই কাব্যনাট্য একটি মহৎ বিশ্বাসের অঙ্গীকার। স্থানে স্থানে কবিকর্মের যে দুর্বলতা আছে একটি গভীর আন্তরিকতার কাছে তা প্রায় নগণ্য। তবে ভবিষ্যতে এ দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে না পারলে কাব্যরচনার সার্থকতা আশা করা সম্ভব নয়।

(৩৬২।৫২)

রক্ত-লেখা : কবিকঙ্কণ শ্রীনিত্যানন্দ বর্মণ : ভারত সাহিত্য ভবন, ২০৩।২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা, মণ্ডল ব্রাদার্স এণ্ড কোং লিঃ, ৫৪।৮, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা : ১ টাকা।

সহজ ছন্দে এবং সরল ভাষায় লেখা রক্ত-লেখা কাব্য গ্রন্থের সমস্ত কবিতাই সুস্পষ্ট। এত সহজ আর এত সরল যে এ যুগের লেখা বলেই মনে হয় না। কবির অভিনিবেশ সত্ত্বেও মাঝে মাঝে ছন্দ-বিভ্রাট ঘটিয়েছে। অন্যথায় সুপাঠ্য। কাব্যগ্রন্থের পাছে কিছুমাত্র ভূমিকার পরিচয় না পেলে পাঠক দুঃখিত হয়।

(২২৮।৫২)

প্রাপ্তি-স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি দেশ পত্রিকায় সমালোচনার্থ আসিয়াছে। পরে সমালোচনা বাহির হইলে তাহা যথাসময়ে প্রকাশক অথবা গ্রন্থকারের নিকট প্রেরিত হইবে।

বাঁশরী—অসীমানন্দ; সদ্‌গ্রন্থ প্রকাশনী, ৮।১, এম হাজরা লেন, কলিকাতা। মূল্য—১, টাকা। ৩৯৯।৫২

মধুরেন—দক্ষিণারঞ্জন বসু; বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—২, টাকা। ৪০০।৫২

বনহংসী—প্রবোধকুমার সান্যাল; বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—৪॥০ টাকা। ৪০১।৫২

নিশাচর বাজ—দীনেন্দ্রকুমার রায়; গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—২॥০ টাকা। ৪০২।৫২

ধনেপাতা—প্রমথনাথ বিশী; মিত্রালয়, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—২॥০ টাকা। ৪০৩।৫২

আশাপূর্ণা দেবীর শ্রেষ্ঠ গল্প—প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—৫, টাকা। ৪০৪।৫২

দেশ ও বিশ্ব-মানচিত্র—(১ম ও ২য় খণ্ড) অনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী, ৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। ১ম খণ্ড মূল্য—১॥০ টাকা ও ২য় খণ্ড মূল্য—২॥০ টাকা। ৪০৫, ৪০৬।৫২

লাক্ষা

মহাশয়,

আপনার ৫।৯।৫৯ তারিখের "দেশ"এ শ্রীঅশ্বিনীকুমার লিখিত "লাক্ষা" সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পড়লুম। এই ধরণের লাক্ষা চাষ এবং লাক্ষা শিল্প সম্বন্ধে পত্রিকার সহায়তায় প্রচার খুবই সময়োপযোগী হয়েছে।

তবে অশ্বিনীবাবু পত্রিকাতে লাক্ষা সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় ভালভাবে বুঝিয়ে দিতে পারেন নি। সংশোধিত হয়ে প্রকাশ পেলে উদ্দেশ্য আরও সফলতা লাভ করবে আশা করি।

তিনি লিখেছেন, লাক্ষাকীট শীতে মরে যায়। একথা সত্য নয়। লাক্ষাকীট শীতে মরে না। (ভারতীয় লাক্ষা গবেষণাগার—রাঁচী কর্তৃক পরীক্ষিত)।

রঙ্গিনী ও কুসুমী এই দুই প্রকার লাক্ষা এবং লাক্ষাকীটের সম্বন্ধে পরিষ্কারভাবে না লেখায় ভুল ধারণা দেখা দিতে পারে। লাক্ষার বৎসরে চারটে ফসল (৪) পাওয়া যায় দুটো (২) নয়। (কুসুমী—২টা অগহানী ও জেঠুই এবং রঙ্গিনী ২টা—কাতুকী ও বৈশাখী)

কুসুমী ও রঙ্গিনী লাক্ষাকীটের জীবনীও ভিন্ন প্রকারের। কুসুমী লাক্ষাকীটের জীবন-কাল (Life cycle) গড়ে প্রায় ছয় মাস করে। আর রঙ্গিনী লাক্ষাকীটের (কাতুকী) সাড়ে তিন মাস ও বৈশাখী সাড়ে আট মাস থেকে নয় মাসের মধ্যে।

কাতুকী ফসল পেতে হলে ফাল্গুনে মাসে আশ্রয় বৃক্ষ ছেঁটে দিতে হয়। বৈশাখী ফসল পেতে হোলে চৈত্র মাসে কোনও কারণবশত দেরী হয়ে গেলে বৈশাখ মাসেই আশ্রয় বৃক্ষ ছেঁটে দেওয়া হয়। বৈশাখী ফসলের জন্যে জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে গাছ ছাঁটাই করা হয় না। ভারতীয় লাক্ষা গবেষণাগার কর্তৃক অনুমোদিত তো নয়ই। সাধারণ লাক্ষাচাষীরাও ঐ সময়ে ছাঁটাই গাছে বৈশাখী ফসলের জন্যে লাক্ষাকীট সংক্রামিত করে না।

জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে এবং পৌষ-মাঘ মাসে কুসুমী ফসলের জন্যে আশ্রয় বৃক্ষ ছাঁটাই করা হয়। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে এই কুসুমী লাক্ষার চাষ নেই বললেই হয়।

"বৈশাখী লাক্ষার জন্য কচি ডাল লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিন"। এই প্রথা আজকাল আর নেই। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জেলার লাক্ষা প্রধান অঞ্চলে। এ সব অঞ্চলে Lac-Demonstration scheme-এর দ্বারা লাক্ষাচাষের বহুতর উন্নতি হয়েছে।

লাক্ষাকীটের লাক্ষার আবরণীতে সব সময়েই তিনটি করে ফুটো থাকে। ছোট দুটো শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্যে এবং বড় একটি মলমূত্র ত্যাগের জন্যে। সময় হোলে এই বড়টি দিয়েই লাক্ষা-কীটের ক্রীমি (Lac-Larvae) বেরিয়ে আসে। পুরুষ ও স্ত্রী লাক্ষাকীটের পার্থক্য প্রয়োজন এবং কাজ ভালভাবে বুঝিয়ে দিলে সময়োপযোগী ও খুবই ভাল হোত। কারণ এ সময়টা পুং কীটের বাহিরে আসবার সময়।

কুসুমী লাক্ষার বীছন দিয়ে রঙ্গিনী লাক্ষার (কুল-পলাশ) গাছ সংক্রামিত করলে প্রথম ফসল কুসুমী হয় এবং লাক্ষা কীটের জীবনকালও কুসুমীর মত হয়ে যায়। কুল ও পলাশ গাছে কুসুমী বীছন ব্যবহার করলে ফসল বা বীছন কোন সময়েই ভাল হয় না।

বিনীত—মহম্মদ কাজিম সেখ, শ্রীঅতুল কর্মকার, মুর্শিদাবাদ।

বাঙলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ

মহাশয়,

গত ৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯ সালের 'দেশে' প্রকাশিত শ্রীযুত রায় লিখিত 'বাঙলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়েছি। লেখক ভারতের মত উপমহাদেশে একটি রাষ্ট্রভাষার পরিবর্তে ৫।৬টি রাষ্ট্রভাষা প্রবর্তনের পক্ষপাতী। এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে একমত। হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে কেবল গণবোধ্যতা, বিশেষত ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করবার জন্য। বর্তমান হিন্দী প্রচারকদের সংকীর্ণতা এবং পরশ্রীকাতরতা সে সম্ভাবনাকে অংকুরেই বিনষ্ট করতে উদ্যত হয়েছে। এর প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে সারা দক্ষিণ ভারতে এবং পূর্ব বিহারে। কাজেই ভারতের মঙ্গল তথা বাঙলা, উর্দু, মারাঠী, গুজরাটি ইত্যাদি ভাষাগুলির সাহিত্য-সম্পদের কথা চিন্তা করে ভারতে ৫।৬টি রাষ্ট্রভাষা থাকাই সঙ্গত। এতে প্রাদেশিকতাও সমূলে বিনষ্ট হবে। তবে বাঙলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধতর করবার জন্য হিন্দী, উর্দু, গুজরাটি, মারাঠি, তামিল ইত্যাদি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনা সমূহ বাঙলায় অনূদিত হওয়া একান্ত জরুরী।

লেখক বাঙলার বর্তমান সাহিত্য সৃষ্টিতে আস্থাশীল। এ বিষয়ে লেখকের সঙ্গে একমত হওয়া গেল না। একথা অনস্বীকার্য যে, বাঙালী সাহিত্যিকরা অধুনা রম্য রচনা, বিশেষত ছোট গল্পে যথেষ্ট মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু উপন্যাস এবং কবিতা সম্বন্ধে লেখকের মত কি? রবীন্দ্রোত্তর যুগে কয়টি সার্থক উপন্যাস এবং কবিতা রচিত হয়েছে? কবিতার ক্ষেত্রে মনে হয় যেন আধুনিক কবিরা ভাষা, ভাব আর ছন্দের জন্য অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছেন! এদিক দিয়ে অধুনা হিন্দী সাহিত্য সমৃদ্ধতর। হিন্দী সাহিত্যাকাশে এখনও সুমিত্রানন্দন পন্ত, মৈথিলীশরণ গুপ্ত এবং মহাদেবী বর্মার ন্যায় শক্তিশালী ও উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বিরাজমান। যদিও পন্তের দু' কোন কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

সুখের কথা, এখনও মাঝে মাঝে আধুনিক বাঙালী সাহিত্যিকদের বিভিন্ন রচনা, বিশেষতঃ 'ছোট গল্প' হিন্দীর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়—'সরস্বতী', 'মায়া' (এলাহাবাদ), 'হংস' (দিল্লী), এবং 'ধর্মযুগ' (বোম্বাই) ইত্যাদিতে অনূদিত হয়। বাঙালী সাহিত্যিকরা তা'র কোনো খবর রাখেন কি?

সশ্রদ্ধ নমস্কার জানবেন।

শ্রীপ্রশান্তকুমার সরকার, হাজারীবাগ।

স্মৃতির অতলে

মহাশয়,

শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল মহাশয় ইতিপূর্বে "দেশের" পাতায় "স্মৃতির অতলে ফৈয়াজ খাঁ" লিখে আমাদের যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছেন। সঙ্গীত শিল্পীদের বৈচিত্র্যময় ঘটনা সম্বলিত অনেক অলিখিত কাহিনী আমাদের শোনাচ্ছেন।

অমিয়বাবুর লেখাটি বড় ভাল আর বড় মিষ্টি। পড়তে আরম্ভ করলে শেষ না করে ওঠা যায় না—সপ্তাহের জন্য অপেক্ষা করতে হয় বলে দুঃখ হয়। মনে হয় এক সঙ্গে যদি সবটা পড়তে পেতুম!

শিল্পীদের জীবনী লিখতে গিয়ে সুর, তাল, রাগ প্রভৃতির সম্বন্ধে মাঝে মাঝে বিচার সহকারে যে চিত্রগ্রাহী আলোচনা করেন তা সঙ্গীত অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেও প্রীতিকর।

অধিকাংশ লোকই আধুনিক সঙ্গীতের ভক্ত। ঠিক কেন জানি না। তারা খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি, গজলের প্রতি বিশেষ অনুরাগ দেখান না। হয়ত সাধারণের পক্ষে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মধ্যে যে রস আছে তা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। অমিয়বাবু "দেশের" পাতায় তার লেখার মাধ্যমে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রতি আমাদের অনুরাগ বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করছেন।

অনুরোধ করি তিনি যেন তার স্মৃতি থেকে চয়ন করে একে একে স্মৃতির অতলে যে শিল্পীরা আত্মগোপন করে আছেন, তাঁদের জীবনী ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন।

অমিয়বাবু যদি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত উপলব্ধি করতে সাহায্য করেন তবে সঙ্গীত শিল্পের তিনি অশেষ উপকার করবেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ দত্ত, কলিকাতা

অনেক তোড়-জোড় করেন এবং যেখান থেকে

রঙ্গজগৎ

একটি ব্যতিক্রম

চিরকালের একটা ধারণা চলে আসছিল এতোদিন, শরৎচন্দ্রের কাহিনী নিয়ে ছবি যতো খারাপ করেই তুলুক না কেন মানবিক আবেদনের দিক থেকে একটা স্বতঃস্ফূর্ত রেশ আবেগকে নিবিড় করে তোলেই, তাই শরৎ-কাহিনী নিয়ে তোলা ছবি বড়ো একটা ব্যর্থ হয় না। "পথ-নির্দেশ" তার ব্যতিক্রম এবং দেখে মনে হলো যেন জেনে-বুঝেই এই ব্যতিক্রম আনো হয়েছে।

* * *

শরৎচন্দ্রের কাহিনীর বাঁধুনীই এমনি যে তাকে সেলুলয়েডের ওপরে সাজাতে অতি-সাধারণ বুদ্ধির যে কোন পরিচালকের দ্বারাই সম্ভব হতে পারে, কিন্তু "পথ-নির্দেশ" তেমনও একজন কাউকে জোগাড় করতে পারেনি। পরিচালকের নাম দেওয়া হয়েছে "সারথী"—ওটা একটা ছদ্মনাম, শোনা যায় জনকয়েক বিশিষ্ট কলাকুশলীর সম্মিলিত প্রচেষ্টার টিকাস্বরূপ। জানি না এই বিশিষ্ট কলাকুশলী কারা, কিন্তু তারা ছবিখানিতে কাজের যে পরিচয় দিয়েছেন, তাতে শরৎচন্দ্রের কাহিনীর অন্তর্নিহিত দরদ বোঝবার না কোন লক্ষণ আছে, আর না আছে চলচ্চিত্র সম্পর্কেও অভিজ্ঞতার কোন ছাপ।

* * *

সোজাসুজি একটা গল্প। প্রেমই হচ্ছে আসল কথা, যে প্রেমকে মিলনে পরিণত হওয়ায় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ধর্মের গোঁড়ামি। স্বামীর মৃত্যুর পর সুলোচনা তনুয়া কন্যা হেমনলিনীকে নিয়ে এসে উঠলেন তাঁর সইয়ের ছেলে গুণেন্দ্রের বাড়িতে। ক্রমে গুণেন্দ্রের সঙ্গেই হেমনলিনীর বিবাহ প্রায় ঠিকই হয়ে গেলো, দুজনেও তাই চায়। কিন্তু সুলোচনা যখনই শুনলেন গুণেন্দ্র ব্রাহ্ম, তখনই বিবাহে অমত করলেন এবং হেমের বিয়ে দিলেন নবদ্বীপের জমিদার কিশোরী চৌধুরীর সঙ্গে। হেমের মন কিন্তু রইলো গুণেন্দ্রের ওপরে, সুতরাং স্বামীর সঙ্গে তার বিরোধ বাধলো। কিন্তু বেশী দিনের জন্য নয়, কিশোরী হঠাৎ মারা গেলো কলেরায়। হেম বিধবা হয়ে ফিরে এলো, আর সেই আঘাতেই সুলোচনা মারা গেলেন। রোগশয্যায় ধর্মের অভিমানে গুণেন্দ্রের হাতে হেমকে তুলে না দেওয়ার অনুতাপ ভোগ করে গেলেন তিনি। হেম আর থাকতে পারলে না সে বাড়িতে; কাশীতে গিয়ে সে মন্ত্র নিলে, কিন্তু ফিরে আসতে হলো গুণেন্দ্রের কঠিন অসুখের খবর পেয়ে। হেমের সেবাগুণে গুণেন্দ্র সুস্থ হয়ে উঠলো। হেমের জন্য গুণেন্দ্রেরও মর্ম-বেদনার অন্ত ছিল না। জানতে চাইলে সে, বিধবার বিয়ে হতে পারে কি না। কিন্তু হেম গুণেন্দ্রের এই মর্মবেদনাকে বিকৃত কামাভিব্যক্তি মনে করে পালালো সেখান থেকে এতোদিনের পরিত্যক্ত শ্বশুরালয়ে। সেখানেও শান্তি পাচ্ছিল না সে: আবার তাকে ফিরে আসতে হলো গুণেন্দ্রেরই পাশে এবং পরিসমাপ্তি থেকে ধরে নেওয়া যাবে যে, ওদের মিলনও হলো।

* * *

ধর্মের অহেতুক গোঁড়ামি মানুষের জীবনে যে বিপর্যয়ের সূচনা করতে পারে, এ গল্পটি তারই দৃষ্টান্ত। গল্পটির পরিবেশ যদিও কিছুকাল আগেকার, বিষয়বস্তুর আবেদন এখনও অনেকটাই আছে। কিন্তু এমনভাবে ঘুরিয়ে এবং এমন সব ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে যে, না জমেছে বিষয়-বস্তুর আবেদন আর না ফুটে উঠেছে গুণেন্দ্র ও হেমনলিনীর প্রেমের নিবিড়তা—কেমন একটা নিস্তেজতা ছেয়ে রয়েছে সারা ছবিখানিতে। কোথাও মনকে গেঁথে নেবার মতো জোরালো কিছু পাওয়া যায় না, বসে বসে ভোগ করতে হয় শুধু একটা গতিহীন একঘেয়েমীর অস্বস্তি।

* * *

কলাকৌশলের এক একটা দিককে আলাদা ভাবে ধরলে উৎকর্ষের নিদর্শন পাওয়া যায়, কিন্তু তাতেও চিত্রনাট্যের অসারত্বকে কিছুমাত্র চাপা দেওয়া সম্ভব হয়নি। অভিনয়ের জোর থাকলে আবেদনীয় নাটকীয় মুহূর্ত কিছু কিছু হয়তো পাওয়া যেতো, কিন্তু সেদিকেও নিরাশাই সার। অভিনয় দুর্বল হয়েছে প্রধান ভূমিকার শিল্পীদের জন্যে, অথচ দেখা গেলো যে কালি সরকারের মতো একজন বিশিষ্ট ও অভিজ্ঞ অভিনেতা নিযুক্ত ছিলেন অভিনয় শেখাবার জন্যে, যা আগে কোন ছবিতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। অভিব্যক্তির দিক থেকে যদিও বা কোন কোন চরিত্রের কোন কোন ক্ষেত্রে নাটকীয়তার ঝিলিক পাওয়া যায়, কিন্তু কেটে কেটে অনেকটা বানান করার মতো অলসভাবে সংলাপ বলার ভঙ্গী রস জমাবার আর সুযোগ দেয়নি।

* * *

"পথ-নির্দেশ" সম্পর্কে অনেকখানি আশা পুঞ্জীভূত হয়েছিলো। মনে হয়েছিলো এখন বাঙলা ছবি যে রকম মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে, "পথ-নির্দেশ" সেই মাথা আরও উঁচু করে চলার নিশ্চয়ই পথ দেখাবে। তার কারণ, ছবির গল্প শরৎচন্দ্রের, ছবির প্রবর্ধক নিউ থিয়েটার্সের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট

যতীন্দ্রনাথ মিত্রের মতো দক্ষ আলোক ব্যক্তি; অতিরিক্ত সংলাপ রচনা সূত্রে এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের মতো সাহিত্যিকবৃন্দ; আলোকচিত্রে প্রবোধ দাস, শব্দ-যোজনায় মণি বসু ও সুরযোজনায় প্রণব দে'র মতো সুখ্যাত কলাকুশলীবৃন্দও রয়েছেন ছবিখানির সংগঠনে—কিন্তু এতো সব সত্ত্বেও ছবিখানি একেবারে নিষ্প্রভ হলো কেন?—ভাববার বিষয়।

হাসির উৎসব

প্রখ্যাত সাহিত্য-সৃষ্টিকে অবলম্বন করে অবিমিশ্র হাসি পরিবেশন করার জন্য একটি সাংস্কৃতিক দল—হরবোলা। গত শনি ও রবিবার এলগিন রোডে সিগনেট প্রেসের চত্বরে এই দলটি প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন সুকুমার রায়ের রচনা নিয়ে। এ'দের পরিবেশনের মধ্যে ছিলো উদ্বোধন সঙ্গীত, আবৃত্তি এবং "লক্ষ্মণের শক্তিশেল" নামে নাটিকাভিনয়—সবই শিশু-সাহিত্যের যাদুকর সুকুমার রায়ের রচনা এবং অংশও গ্রহণ করেছেন স্কুল-কলেজের ছোট ছেলেমেয়েরা।

* * *

পরিবেশনের মধ্যে বেশ একটা নবীনত্ব নিয়ে আসতে পেরেছেন এ'রা, বিশেষ করে "লক্ষ্মণের শক্তিশেল" অভিনয়ে। একটা নতুন কিছু করার প্রয়াস ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন এ'রা সব দিক দিয়েই। প্রাণের একটা সাড়াও পাওয়া যায় এইসব ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে। আরও বিশেষভাবে লক্ষ্যে পড়ে সাজপোষাক আর আবহ সুর-যোজনার দিকটা। নাটিকার অন্তর্ভুক্ত গানগুলির এ'রা সুকুমার রায়ের দেওয়া মূল সুরেই যথাসম্ভব রেখে দিয়ে দিয়েছেন। ছোটদের এই প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার মূলে উৎসাহ যারই থাকুক, তাঁরা অতি-প্রচ্ছন্ন অথচ শিল্প, সাহিত্য ও নাট্য-সম্মত শিক্ষাপ্রদ প্রমোদ পরিবেশন করার জন্য সর্বসাধারণের ধন্যবাদ অর্জন করবেন।

অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেনঃ সুনন্দ গুহঠাকুরতা, নৃসিংহ বসু, দীপক মজুমদার, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, উৎপল রায়চৌধুরী, রমেন গুহ, চুনী শীল, শ্যাম গুহ, প্রশান্ত দাশগুপ্ত, শৈলেন দাশ, কমলেশ চট্টোপাধ্যায়, সমীর চক্রবর্তী, বিমল গুপ্ত, পার্থপ্রতিম মৈত্র, আলোকবরণ ... অমল সেনগুপ্ত, অনিল গঙ্গোপাধ্যায়, ...র গুপ্ত।